ভারতকোষ

পঞ্চম খণ্ড

বংশধর—হেবের, আলব্রেখ্‌ট্‌ ফ্রীড্‌রীখ্‌

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

ভা র ত কো ষ

পঞ্চম খণ্ড

বংশধর—হ্বেবের, আলব্রেখ্ট্ ফ্রীড্রীখ্

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা - ৬

মূল্য: ৫৫.০০

ভারতকোষ

পঞ্চম খণ্ড

মূল্য কুড়ি টাকা

প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৮০ ।। ১৮৯৫ শকাব্দ

© বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৯৭৩

প্রকাশক

শ্রীমদনমোহন কুমার

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

মুদ্রক

শ্রীভোলানাথ হাজরা

রূপবাণী প্রেস

৩১, বিপ্লবী পুলিন দাস স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

ভারতকোষ

পঞ্চম খণ্ড

বংশধর—হেবের, আলব্রেখ্ট্ ফ্রীড্রীখ্

ভারতকোষ-পরিচালন-সমিতি

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য
শ্রীবিমলেন্দু নারায়ণ রায়
শ্রীমদনমোহন কুমার
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
শ্রীভবতোষ দত্ত

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
কলিকাতা

ভারতকোষ-সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমদনমোহন কুমার
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস
শ্রীভবতোষ দত্ত

সম্পাদন-উপদেষ্টা

শ্রীবিনয় দত্ত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতিবিধানকল্পে প্রদত্ত সরকারী অর্থানুকূল্য লাভের ফলে পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব হ্রাস করা হইয়াছে।

ভারতকোষ ৫ম খণ্ড

ভারতকোষের প্রকাশ পূর্বপরিকল্পিত চার খণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইল। এজন্য গ্রাহকদিগকে ইতঃপূর্বে প্রদত্ত অগ্রিম মূল্যের অতিরিক্ত কিছু দিতে হইবে না। পৃথক পৃথক খণ্ডের ক্রেতাদিগের পক্ষে প্রথম তিন খণ্ডের প্রত্যেকটির মূল্য পূর্ব নির্দিষ্ট ২০ টাকা হারে এবং চতুর্থ খণ্ডের মূল্য ১০ টাকা ও পঞ্চম খণ্ডের মূল্য ২০ টাকা ধার্য হইল।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের
কার্যনির্বাহক সমিতির পক্ষে

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

ভূমিকা

ভারতকোষের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পরিকল্পনা ইহার প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই তামিল, তেলুগু, মরাঠী, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙলা ভাষায় ভারতকোষ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙলা-দেশের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ জাতি ও সভ্যতার সম্বন্ধে সাধারণভাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয়। পৃথিবীর কোন দেশেই এই শ্রেণীর কোষগ্রন্থ প্রথম সংস্করণে সংকল্পিত আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে পারে নাই। নূতন নূতন সংস্করণে নূতন নূতন তথ্যের আলোকে ক্রমাগত পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত হইতে হইতে তাহা বর্তমান আকারে পৌঁছিয়াছে। ভারতকোষও এই পদ্ধতিতে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইবে এরূপ আশা করা অসংগত নহে।

বিভিন্ন মত ও মর্জির শত শত লেখকের সাহায্যে এইরূপ একখানি কোষগ্রন্থ সম্পাদন করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থাভাব ও অন্যান্য কারণে এই সংকলন কার্য পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে এবং ইহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সুখের বিষয়, এই সমুদয় বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও অবশেষে এই কোষগ্রন্থ সমাপ্ত হইল। ইহার দোষত্রুটি সম্বন্ধে পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ সম্পূর্ণ সচেতন। গ্রন্থ সমাপ্তির বহু বিলম্বের প্রধান কারণ অর্থাভাব ও লেখকগণের রচনা পাইতে বহু বিলম্ব। বহু লেখক ৫, ৬ বৎসর যাবৎ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও স্বীয় রচনা পাঠান নাই। কোন কোন স্থলে রচনা নির্ধারিত শব্দ-সংখ্যার প্রায় দশ গুণ বর্ধিত আকারে পাইবার পর ইহা সংক্ষেপ করিতে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। কোন কোন লেখকের—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের—রচনা বর্জন করিয়া পুনরায় লিখিতে হইয়াছে। যাঁহারা ভারতকোষের অগ্রিম চাঁদা দিয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন গ্রন্থ সমাপ্তির নির্ধারিত সময়ের পর বহুকাল অতিক্রম হওয়ায় তাঁহাদের নিকট মার্জনা প্রার্থনা করিতেছি।

এই কোষগ্রন্থ রচনায় বিশেষরূপে যাঁহাদের উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সুশীলকুমার দে, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ আজ আর ইহ-লোকে নাই।

যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের সকলের নামোল্লেখ করা দুরূহ কিন্তু তাঁহাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ভারতকোষ প্রকাশে অর্থসাহায্য মঞ্জুর করায় কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। চারি খণ্ডে সমাপ্য সমগ্র ভারতকোষের জন্য কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২ মার্চ ১৯৬৩ হইতে ৩ অক্টোবর ১৯৬৯ পর্যন্ত বিভিন্ন কিস্তিতে মোট ২,৫৫,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করায় ভারতকোষের প্রথম খণ্ড ১৩৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে (অক্টোবর, ১৯৬৪), দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে (জুন, ১৯৬৬), তৃতীয় খণ্ড ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর ১৯৬৭) এবং চতুর্থ খণ্ড ১৩৭৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৯৭০) প্রকাশিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অনুদান এবং ভারতকোষের গ্রাহকচাঁদা ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় করিয়া চারি খণ্ড প্রকাশ করার পর পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ করার আর্থিক সঙ্গতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের না থাকায় ভারত-কোষের পঞ্চম খণ্ড মুদ্রণের কার্য কিছুকাল বন্ধ ছিল। পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, স্বর্গীয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীআন্টনি লান্সলট্ ডিয়াসের দ্বারস্থ হন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতকোষের পরিকল্পিত কার্য পঞ্চম খণ্ডে সম্পূর্ণ করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে (১৯৭১ খ্রীঃ) তিন কিস্তিতে মোট ১,১৬,০০০ টাকা অনুদান মঞ্জুর করায় ভারতকোষ পঞ্চম খণ্ডে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হইল। উক্ত ১,১৬,০০০ অনুদানের প্রথম কিস্তির ৩৫,০০০ টাকা ১৯ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১), দ্বিতীয় কিস্তির ৩৫,০০০ টাকা ১৯ ফাল্গুন ১৩৭৮ (৩ মার্চ ১৯৭২) এবং তৃতীয় ও শেষ কিস্তির ৪৬,০০০ টাকা ১৯ আষাঢ় ১৩৮০ (৪ জুলাই ১৯৭৩) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ মারফৎ পাওয়া গিয়াছে। শেষ কিস্তির অনুদান পাইবার পর দ্রুত ভারতকোষের কার্য শেষ করা হইল।

সময়মত কোন কোন লেখকের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত রচনা না পাওয়ায় এবং প্রেসের নানাবিধ গোলযোগে ও বিদ্যুৎ-বিভ্রাটে পঞ্চম খণ্ড মুদ্রণের কার্য বারম্বার বিঘ্নিত হইয়াছে। ভারতকোষ সম্পূর্ণ করার কার্যে যাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক সহযোগিতা করিয়াছেন, উৎসাহ দান করিয়াছেন, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া আরব্ধ কর্ম সাঙ্গ করার সহায়তা ও আনুকূল্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। নিবেদন ইতি। ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ৮ শ্রাবণ ১৩৮০। ২৪ জুলাই ১৯৭৩

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
সহকারী সভাপতি,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

শ্রীমদনমোহন কুমার
সম্পাদক,
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

লেখক-বিবরণ

শ্রীঅংশু দত্ত, কলিকাতা/ম্যাকিয়াভেলি, নিকোলো
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল, ২৪ পরগনা/সত্যনারায়ণ, সত্যপীর
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, শারীরবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মজ্জা ; মস্তিষ্ক ; সুষুম্নাকাণ্ড ; স্পর্শ
শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বন্দুক
শ্রীঅজিতকুমার চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ/বৃক্ক ; লালা
শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মুক্তা
শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, হুগলি/বায়রন, জর্জ গর্ডন
শ্রীঅজিতকুমার সুর, কলিকাতা/বারীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীঅজিত দত্ত, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/সপ্তশতী (গাথা) ; সারদারঞ্জন রায়
শ্রীঅঞ্জনকুমার রায়, ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/মদ ; রবার
শ্রীঅঞ্জনা রায়চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ/বিহার ; লাক্ষাদ্বীপ
শ্রীঅতুলকুমার সুর, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, কলিকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ/ শেয়ার বাজার
শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়, অধ্যক্ষ, ইসলামী ইতিহাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিজয়নগর ; মহম্মদ বিন্ কাশিম ; মোগলযুগ ; শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ ; সবুক্তগীন ; সুজাউদ্দৌলা
শ্রীতুল্যচরণ দে, নৈহাটি/সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/বিদিশা ; বিষ্ণুপুর ; বেদসা ; হর্লোবিদ ; হোয়সাল
শ্রীঅধীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/মৌখরিবংশ ; যশোধর্মন ; লিচ্ছবি ; হর্ষবর্ধন
শ্রীঅধীর দে, বিধানচন্দ্র কলেজ, রিষড়া/মীর মশারফ হোসেন ; যোগীন্দ্রনাথ বসু ; ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, রিসার্চ ইনস্টিটিউট অভ্ প্রাকৃত, জৈনোলজি অ্যান্ড অহিংসা, বৈশালী/বাচস্পতি মিশ্র[১] ; বাচস্পতি মিশ্র[২] ; বিধুশেখর ভট্টাচার্য
অনাথনাথ বসু, শান্তিনিকেতন/শিক্ষা, ভারতে
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, কলিকাতা/স্বর্ণমান
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ, ইনস্টিটিউট অভ্ রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মেঘনাদ সাহা ; মেজার ; মোল ; রিলেটিভিটি ; শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ; শুক্র[২] ; সুপারসনিক্স্ ; স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স ; হলডেন, জন বার্ডন স্যান্ডারসন ; পরি. চুম্বকবিদ্যা ; তরঙ্গতত্ত্ব ; ত্বরণযন্ত্র
শ্রীঅনিন্দ্যকুমার পাল, ভূগোল বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়/বরাক ; ব্রহ্মপুত্র
শ্রীঅনিমা মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষিকা, বাগবাজার মাল্টিপারপাস গার্লস স্কুল/ মিলটন, জন
শ্রীঅনিলকুমার আচার্য, ভারতীয় দশমিক সমিতি/সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা-সহায়ক/হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
শ্রীঅনিলকুমার কুণ্ডু, ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/সেলুলোজ ; হীরক
শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত, নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন, মেদিনীপুর/শিক্ষা
শ্রীঅন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, রাজা রাজেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়/শুশুনিয়া
শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সম্পাদক, 'গ্রন্থপরিক্রমা'/রাষ্ট্রসংঘ
শ্রীঅপূর্বকুমার সান্যাল, ইংরেজী বিভাগ, জে. কে. কলেজ, পুরুলিয়া/বোক্কাচিচও, জোভান্নী
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা/বড়নগর ; বিনয়কৃষ্ণ বসু ; বিষ্ণুপুর ; ভারহুত ; ভিতরগাঁও
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বহ্লীক গ্রীক ; যশোধর্মন ; শক ; হূণ ; হেলিওদোরস্
শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন/বিপ্লব আন্দোলন ; বিশ্ববিদ্যালয় ; মজুরী ; মণ্টেগু-চেম্স্ফোর্ড সংস্কার ; মন্ত্রিসভা ; মার্ক্স্, কার্ল হাইনরিখ
শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/লেজার ; লেন্স্
শ্রীঅমলকুমার রায়চৌধুরী, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মহাকর্ষ
শ্রীঅমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ/বাদুড় ; বানর ; ভল্লুক
শ্রীঅমলচন্দ্র চৌধুরী (এ. সি. চৌধুরী), প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজ/মহাস্থানগড় ; মুরগী ; মেষ ; শূকর ; হাতি ; হাঁস
শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ, গ্রন্থাগারিক, ব্যারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়/মতিলাল রায় ; যশোদা ; যুগ ; রসময় দত্ত ; রামরাম বসু ; শশিভূষণ বিদ্যালংকার ; হরকুমার ঠাকুর
শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী, কলিকাতা/বেহুলা
শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/সেনবংশ
শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/রামগোপাল ঘোষ ; সতীদাহ প্রথা ; হিকি. জেম্স অগাস্টাস্ ; হিন্দু স্টুয়ার্ট

শ্রীঅমিতাভ সেন, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলেজ অভ্ লেদার টেকনোলজি/য়াকোবি, কার্ল গুস্তাভ

শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ; রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅমিয়কুমার দাশগুপ্ত, এ. এন. এস. ইনস্টিটিউট অভ্ সোশ্যাল স্টাডিজ, পাটনা/বেকার সমস্যা ; মূল্য

অমিয়কুমার মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার/হুমায়ুন কবির

শ্রীঅমিয়কুমার সেন, পাঠভবন, বিশ্বভারতী/বিশ্বভারতী

শ্রীঅমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ/মুসৌরী ; হাওড়া

শ্রীঅমূল্যধন দেব, ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা/রাংতা

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত, ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/রৌপ্য ; স্বর্ণ ; হাইড্রোজেন

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র, অধ্যক্ষ, ভূগোল বিভাগ, বিশ্বভারতী/হিমবাহ ; হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ব্রজবুলি ; ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীঅরুণকুমার শীল, যক্ষ্মা বিভাগ, অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ্ হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্থ/যক্ষ্মা

শ্রীঅরুণকুমার সেন, ইনস্টিটিউট অভ্ রেডিও ফিজিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/রেডার

শ্রীঅরুণচন্দ্র বসু, বিশ্বভারতী/শ্যামজী, কৃষ্ণবর্মা

শ্রীঅরুণ পাল, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্বভারতী/সুরেন্দ্রনাথ কর

শ্রীঅরুণ সান্যাল, বাংলা বিভাগ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ/মার্শম্যান, জন ক্লার্ক ; ম্যাক, জন ; রবীন্দ্রনাথ মৈত্র ; রমাপ্রসাদ রায় ; লেবেদেফ্, হেরাসিম

শ্রীঅরুণা হালদার, কলিকাতা/বসুবন্ধু

শ্রীঅরূপকুমার ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ মহিলা কলেজ/শ্রেণী ; সামাজিক চুক্তি মতবাদ

শ্রীঅরূপকুমার সিং, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/শামুক

শ্রীঅরূপরতন চট্টোপাধ্যায়, টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজরি কমিটি, ডায়াগ্নস্টিক সার্ভে অভ্ দামোদর ভ্যালি রিজন/মেদিনীপুর

শ্রীঅর্চনা ঘোষ, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/হটী বিদ্যালঙ্কার

শ্রীঅর্চনা নিয়োগী, কলিকাতা/রাণীখেত

শ্রীঅলোক রায়, বাংলা বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ/শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅশোককুমার বাগ্চী, ইন্স্টিটিউট অভ্ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ/মাম্প্স ; মৃগী ; মেনিন্জাইটিস্ ; শল্যচিকিৎসা ; হাম

শ্রীঅশোককুমার ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/মিকেলাঞ্জেলো

শ্রীঅশোককুমার মজুমদার, অধিকর্তা, মুংগালাল গোয়েঙ্কা ইনস্টিটিউট অভ্ পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ অ্যাণ্ড রিসার্চ, ভারতীয় বিদ্যাভবন/ভক্তি, ভক্তিবাদ

শ্রীঅশোককুমার সরকার, 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/সুরেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীঅশোকগোপাল দত্ত, কলিকাতা/সালোকসংশ্লেষ

শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন, এম. পি./ব্যবসায় আইন

শ্রীঅশোকা সেনগুপ্ত, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী/বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ; বিশ্বেশ্বরাইয়া, মোক্ষগুণ্ডম ; মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ; শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ; সূর্যকুমার চক্রবর্তী

শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার, শিলিগুড়ি/রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম

শ্রীঅসিতকুমার দত্ত, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ব্রেক

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/সাময়িকপত্র, বাংলা ; হেমচন্দ্র ; হেয়ার, ডেভিড ; হেরম্বচন্দ্র মৈত্র

শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায়, ডিপার্টমেণ্ট অভ্ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ফর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক/হরিদ্রা

শ্রীঅসীমকুমার মুখোপাধ্যায়, ইনস্টিটিউট অভ্ পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যাণ্ড রিসার্চ/বাতব্যাধি ; হাড়-ভাঙ্গা

আঁতোয়ান, ফাদার রবেয়ার, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/বালজাক

শ্রীআদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়, অর্থনীতি বিভাগ, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ/মূলধন ; যৌথ কোম্পানি ; লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ; শুল্কনীতি ; সমাজতন্ত্রবাদ

শ্রীআরতি গুহ, ইতিহাস বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/লালাবাবু

শ্রীআরতি দাশ, মনোবিদ্যা বিভাগ, বেথুন কলেজ/মন্তেসরি প্রণালী

শ্রীআশা দেবী, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ/শিশুসাহিত্য, বাংলা

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী, কলিকাতা/স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীআশিসকুমার চন্দ্র, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মস ; মূল

শ্রীআশীষ বসু, অখিল ভারত হস্তশিল্প পর্ষৎ/শাঁখা

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিজয়গুপ্ত ; বিপ্রদাস পিপিলাই ; মঙ্গলকাব্য ; রাহুলমাতা ; লোকসাহিত্য, বাংলা ; শীতলা ;

শ্ন্যপ্রাণ ; ষষ্ঠী ; সহদেব চক্রবর্তী ; স্জাতা ; স্বচনী

শ্রীইন্দ্রাণী রায়, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়/মগ ; মণ্টেস্কু ; মসলিপত্তনম

শ্রীউমা ঘোষ, ভ্গোল বিভাগ, গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল অ্যান্ড কলেজ/ব্যারাকপ্র : মালদ্বীপ

শ্রীউমা দাশগ্প্ত, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপ্র বিশ্ববিদ্যা-লয়/হেরোডোটাস

শ্রীউমাপতি কুমার, সহ-সভাপতি, মোহনবাগান অ্যাথ্-লেটিক্ ক্লাব/মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব : শিবদাস ভাদ্ড়ী

শ্রীউমা ম্খোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, দীনবন্ধ্ অ্যান্ড্রজ কলেজ/বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ; বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীউমা রায়, বাংলা বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ/রাধামোহন ঠাকুর ; রামান্জ

শ্রীঊষা সেন, কলিকাতা/শিলা ; সবরমতী

শ্রীএন. জিন্রত্ন মহাস্থবির, মহাবোধি সোসাইটি কলিকাতা/হীনযান

শ্রীকপিল ভট্টাচার্য, ইঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা/বন্যা

শ্রীকমলকুমার গ্হ, সভাপতি, গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার এক্সপ্লোরেশন কমিটি/বগ্ড়া ; বরিশাল ; লছমন-ঝোলা

শ্রীকমলকুমার ঘটক, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/ম্সোলিনি

শ্রীকমলকুমার মল্লিক, ইনস্টিটিউট অভ্ পোস্ট-গ্রাজ্য়েট মেডিক্যাল এড্কেশন অ্যান্ড রিসার্চ, কলিকাতা/বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ; রক্ত আমাশয় ; হাঁপানি

শ্রীকমল নন্দী, ভারতীয় ভ্তত্ত্ব সমীক্ষা/মোটরগাড়ি ; সাইকেল

শ্রীকমল সরকার 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/বামাপদ বন্দ্যো-পাধ্যায় ; যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ; রবিবর্মা ; শশীকুমার হেশ ; স্নয়নী দেবী ; হিরন্ময় রায়-চৌধ্রী

শ্রীকমলা দাশগ্প্ত, প্রাক্তন সম্পাদিকা, 'মন্দিরা'/মোহিনী দেবী

শ্রীকমলা ম্খোপাধ্যায়, কলিকাতা/বদ্রীনাথ ; ব্রহ্মপ্ত্র ; যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ

শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পালি, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়/ভাস্কর্য, ভারতীয়

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগ্প্ত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিষ্ণ্[২]

শ্রীকল্যাণকুমার ম্খোপাধ্যায়, কলিকাতা/রেলপথ

শ্রীকল্যাণকুমার সেনগ্প্ত, ইতিহাস বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/ভাস্করপণ্ডিত ; ভাস্কর বর্মন ; রাজারাম

শ্রীকল্যাণময় সেন, ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/লোহ ; সিমেন্ট ; সীসা ; সেরামিক ; হ্যালোজেন

শ্রীকল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ-সম্পাদক, 'দৈনিক বস্মতী'/যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

শ্রীকল্যাণী দত্ত, সংস্কৃত বিভাগ, বাসন্তী দেবী কলেজ/বতিচেল্লি, সান্দ্রো ; বশিষ্ঠ ; বালী ; বাস্কি ; বিদ্র ; বিল্বমঙ্গল ; বিষ্ণ্শর্মা ; ব্দ্ধদেব ; ব্হদারণ্যকোপনিষদ ; ব্হস্পতি[১] ; বেতালপঞ্চবিংশতি ; বৈষ্ণবদাস ; বোধিদ্রুম ; ব্যোপদেব ; ব্রহ্মা ; ব্রাহ্মণ[২] ; ভরত[১] ; ভীম ; ভীষ্ম ; মদনমোহন তর্কালংকার ; মদালসা ; মনসা ; মনেয়র, উইলিয়মস্ ; মন্থরা ; মন্দোদরী ; ময় ; মল্লিনাথ ; মহাবলীপ্রম ; মাতঙ্গিনী হাজরা ; মাদ্রী ; মাধবাচার্য ; মান্ধাতা ; মারীচ ; মীরাবাঈ ; মৈত্রেয়ী ; রাবণ ; রাহ্[১] ; শিশ্পাল ; সত্যব্রত সামশ্রমী

শ্রীকল্যাণী দাশগ্প্ত, কলিকাতা/হ্গলি

শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, উল্বেড়িয়া কলেজ/মালব্য, মদনমোহন

শ্রীকানাইলাল ম্খোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, রাজা রামমোহন রায় কলেজ, আরামবাগ/বার্দ

শ্রীকামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী, আইন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/মহাজনি

শ্রীকামিনীকুমার দে, প্রাক্তন অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, গ্র্দাস কলেজ/বর্লবিদ্যা ; বিশ্লেষণবিদ্যা ; ভাস্করা-চার্য ; ভেক্টর ; মহাবীর[১] ; ম্যাক্সওয়েল, জেম্স ক্লার্ক ; রাশিচক্র ; রাহ্[২] ; সংখ্যা ; সপ্তর্ষি ; স্র্য ; সৌরজগৎ ; হাব্ল্, এড্ইন পাওএল ; হার্শেল, উইলিয়াম ; হার্শেল, জন ফ্রেডারিক উইলিয়াম

শ্রীকামিনীকুমার রায়, কলিকাতা/যমপ্কুর ; সেঁজ্তি

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগ্প্ত, কলিকাতা/স্ন্দরীমোহন দাস

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, 'বঙ্গদর্শন'/শরচ্চন্দ্র দাস ; হ্যামিলটন, স্যার ড্যানিয়েল

শ্রীকালীপদ সরকার, কৃষিবিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়/বাঁশ ; বেগ্ন

শ্রীকাশীনাথ ম্খোপাধ্যায়, ভ্গোল বিভাগ, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ/বোম্বাই ; ভারতবর্ষ ; মাদ্রাজ[১] ; মাদ্রাজ[২] ; ম্সাবনী, মোসাবনী ; ম্ত্তিকা

শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বাণগড় ; মহেঞ্জো-দড়ো ; হরপ্পা ; হরপ্পা সভ্যতা

শ্রীকুমারেশ ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ/হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ; হরিশ্চন্দ্র মিত্র

শ্রীকুমুদরঞ্জন দাস, বর্ধমান রাজ কলেজ/মহম্মদ বিন্ তোগলক ; মানসিংহ ; রণজিৎ সিংহ ; রাজসিংহ ; শাহ্‌জাহান ; শের আফগান ; শেরশাহ্ ; হায়দার আলী ; হিমু ; হুমায়ুন ; হুসেন শাহী বংশ

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ দে, ইতিহাস বিভাগ, গুরুদাস কলেজ/সেকেন্দ্রাবাদ ; হস্তিনাপুর

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্/ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ ; শিব ও শৈব সম্প্রদায়

শ্রীকৃষ্ণা রায়চৌধুরী, গ্রন্থাগার বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ/বিমানবিহারী মজুমদার ; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

শ্রীকেশবলাল ঘোষ, প্রাক্তন মুখ্য সহ-সম্পাদক, 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/মাখনলাল সেন

কৌশিক, শ্রীশম্ভুদয়াল, ভূগোল বিভাগ, এস. এস. ভি. কলেজ, হাপুর/সিমলা

শ্রীক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/বাউল সম্প্রদায় ; বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ; বুকানন-হ্যামিল্টন, ফ্রান্সিস ; ভূদেব মুখোপাধ্যায় ; মধু কান ; রামপ্রসাদ

শ্রীগম্ভীরানন্দ, স্বামী, অদ্বৈত আশ্রম/বিবেকানন্দ, স্বামী ; রামকৃষ্ণ পরমহংস ; রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীগীতা মিত্র, গ্রন্থাগার বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; ভূপেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য, কলিকাতা/শিব ও শৈব সম্প্রদায় ; শিবায়ন ও শিবগীতি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ; বসু বিজ্ঞান মন্দির/বাতি ; বুধগ্রহ ; বৃহস্পতি[৩] ; মঙ্গলগ্রহ

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, জয়নগর-মজিলপুর/মাকাল ঠাকুর ; মানিকপীর, সতীমা

শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য, কলিকাতা/ব্রজসুন্দর মিত্র

শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য, রিজার্ভ ব্যাংক অভ্ ইন্ডিয়া/মতিলাল শীল ; যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ, সাহিত্য সংসদ/বায়ু ; রসিককৃষ্ণ মল্লিক

শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, কলিকাতা/বার্নেট, লিয়োনেল ডেভিড ; বীম্‌স, জন ; বেন্‌ফী, থেয়োডোর ; বোট্‌লিংক, গেহাইমরাট অটো ফন ; বুলের, য়োহন গেঅর্গ ; ব্লুমফিল্ড, মরিস ; ম্যাকডোনেল, আর্থার অ্যান্টনি ; ম্যাক্সমুলার ফ্রীডরিখ্ ; মুর, জন ; রমাবাঈ, পণ্ডিতা ; রুইদাস ; লাসেন, ক্রিশ্চিয়ান ; হান্টার, উইলিয়ম উইলসন ; হারাণচন্দ্র চাকলাদার ; হ্যামিলটন, আলেকজান্ডার ; হেবের, আলব্রেখ্ট্ ফ্রীডরীখ্

শ্রীগৌরীশংকর ভট্টাচার্য, 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/রাজশেখর বসু

শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মুঙ্গের ; রুশ-জাপান যুদ্ধ ; সিপাহী বিদ্রোহ

শ্রীচণ্ডীচরণ দেব, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/রক্ত

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী, ডিরেক্টর অভ্ রিসার্চ ইন্ডিয়ান ল ইনস্টিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিট/রাসবিহারী ঘোষ

শ্রীচিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন/বোলপুর

শ্রীচিত্রা সেন, ভূগোল বিভাগ, হুগলি উইমেন্‌স কলেজ/মরুভূমি

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বর্ণাশ্রম ; বলি[১] ; বসুধারা ; বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ; বামাচার ; বাস্তুদেব ; বিধবা ; বিবাহ[২] ; বিশ্বকর্মা ; বীরাষ্টমী ; বৃষকাষ্ঠ ; বৃষোৎসর্গ ; বেদি ; মণ্ডল[২] ; মৎস্য মাংস ; মহালয়া ; যন্ত্র ; রাখীবন্ধন[১] ; রাসযাত্রা ; শালগ্রাম শিলা ; শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ; শিবরাত্রি ; শ্রীপঞ্চমী ; সংক্রান্তি ; হবিষ্য ; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ, 'কালান্তর' পত্রিকা/বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; ভগৎ সিং, লেনিন, ভ্লাদিমির ইলীচ উলিয়ানভ

চোপরা, শ্রীহীরালাল, কলিকাতা/শিখধর্ম

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য, টোল বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/শুভংকর ; শ্রীধর আচার্য ; সূর্যসিদ্ধান্ত

শ্রীজটিলকুমার মুখোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/লাও-ৎসু ; শ্রীধরস্বামী ; সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ; হৃষীকেশ শাস্ত্রী

শ্রীজয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/সোমনাথ

শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তী, শান্তিনিকেতন/রেমব্রান্ট, হারমেন্‌জ ভ্যান্ রিন্

শ্রীজয়ন্ত বসু ; সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স/যন্ত্রগণক

শ্রীজয়শ্রী রায়, কলিকাতা/শবরী

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, রামমোহন কলেজ/রাধা ; রামনবমী ; শক্তিপূজা ; শাক্তপদাবলী, সংগীত ; শাক্তপীঠ ; ষট্‌কর্ম ; ষট্‌চক্র ; সংস্কার ; সিদ্ধান্ত

শ্রীজাহ্নবী বাগচী, ভূগোল বিভাগ, উইমেন্‌স ক্রিশ্চিয়ান কলেজ/সমুদ্র ; সুন্দরবন ; সুরাট ; সেচ

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/মূর্তিপূজা, ভারতে

শ্রীজীবনকুমার সেনগুপ্ত, শারীরবিদ্যা বিভাগ, জে. জে. এম. মেডিক্যাল কলেজ/বধিরত্ব

শ্রীজীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আইন বিভাগ, সাহু জৈন/হক, ফজলুল আবুল কাশেম
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/স্বদেশী আন্দোলন
শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/মধু বসু; মনোমোহন পাঁড়ে
শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন/বর্ধমান
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দর্শন বিভাগ, যোগমায়া কলেজ/সাংখ্য; স্পেন্সার, হারবার্ট; হিউম, ডেভিড
টিকেকর, শ্রীশ্রীপদ রামচন্দ্র, বোম্বাই/রাণাডে, এম. জি; রামদাস স্বামী
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/মুর্শিদকুলী খাঁ; রাজবল্লভ; সওকৎ জঙ্গ; সরফরাজ খাঁ
শ্রীতপনী মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, ফর্ডহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্ক/হার্ডিঞ্জ, আর্থার এডওয়ার্ড; হার্ডিঞ্জ, হেনরি
শ্রীতরুণ সান্যাল, অর্থনীতি বিভাগ, স্কটিশচার্চ কলেজ/মুদ্রাব্যবস্থা; মুদ্রাস্ফীতি
শ্রীতারাপদ চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ/বট; বিছুটি; বেত
শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, স্কুল অভ্ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, লন্ডন/রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীতারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ/মন
শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ/বারা; বৌ-নাচ; ব্রত; ভাদু উৎসব; মুখোশনৃত্য; লোকসংস্কৃতি; হুড়
শ্রীত্রিদিবকুমার চৌধুরী, এম. পি./বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল
শ্রীত্রিদিবকুমার বসু, বাটানগর/বাটানগর
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/বাৎসায়ন[১]; বেশ্যা[১]; মুর্শিদাবাদ; মৌর্য; লক্ষ্মীবাঈ; লখনৌ; শিল্পবিপ্লব; সিন্ধিয়া; সীতারাম রায়; সেকেন্দার লোদী; সেকেন্দ্রা; সেলিম চিস্তি; হামির; হিজরী; হুসেন কুলি খাঁ
শ্রীদিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, হুগলি কলেজ/শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী
শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/বপ্, ফ্রান্স; বুর্নুফ, উঝ্যান; মার্শাল, জন হিউবার্ট; মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়; শৈলেন্দ্রবংশ; হিউএন-ৎসাঙ্
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী; বৈজু বাওরা; ব্যাঞ্জো; ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী; মহেশচন্দ্র সরকার; যদুভট্ট; রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী; লালচাঁদ বড়াল; সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ; সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস; হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়; হারমোনিয়ম; হিমাংশুকুমার দত্ত
দীন্‌শা, আর্দেশীর, কলিকাতা/মৈন্যু
শ্রীদীপালি ঘোষ, অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়া/বেদিয়া; হাড়ি
শ্রীদীপ্তি সমাদ্দার, কলিকাতা/ভীল; মারাঠী সাহিত্য
শ্রীদুর্গাদাস সাহা, কলিকাতা/বারোণি; সিন্ধি
শ্রীদেবকুমার বসু, যুগ্ম-সম্পাদক, 'দর্শক'/বিনোদিনী; মোজাম্মেল হক; হরু ঠাকুর
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ, শারীরবিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/বেরিবেরি; ব্যাক্‌টিরিয়া; ব্যোমকেশ মুস্তফী; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; যোগেশচন্দ্র বাগল; শারীরবিদ্যা; সজনীকান্ত দাস
শ্রীদেবনারায়ণ রায়, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/হটু বিদ্যালঙ্কার; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়[১]; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়[২]; হরিমোহন মুখোপাধ্যায়[৩]
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, কিউরেটার, আশুতোষ মিউজিয়াম/বরবুদুর
শ্রীদেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, বারাণসী/বারাণসী
শ্রীদেবব্রত মারিক, ভূগোল বিভাগ, আশুতোষ কলেজ/মানচিত্র
শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/লাইন এনগ্রেভিং
শ্রীদেবলা মিত্র, ডিরেক্টর, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইণ্ডিয়া/বরাবর; বসাঢ়; বাঘ[২]; বাঁশবেড়িয়া; বুদ্ধগয়া; মাণ্ডু; রত্নগিরি; শ্রাবস্তী
শ্রীদেবী চক্রবর্তী, রসায়ন বিভাগ, বেথুন কলেজ/বিষ
শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/মুকুন্দ দাস; রাজনারায়ণ বসু; রূপচাঁদ পক্ষী
শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা/বস্তুবাদ
শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, অধিকর্তা, বসুবিজ্ঞান মন্দির/বসুবিজ্ঞান মন্দির
শ্রীদেবেশ রায়, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ভাণ্ডারকর, রামকৃষ্ণ গোপাল
দ্যতিয়েন, ফাদার পল, কলিকাতা/বাইবেল
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বর্মী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, বাংলা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ/মোহিতলাল মজুমদার; যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; যতীন্দ্রমোহন সিংহ; যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত; যশোরাজ খান; রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়; রাজেন্দ্রনাথ

বিদ্যাভূষণ ; লং, রেভারেন্ড জেমস্ ; শরৎকুমারী চৌধুরানী ; শিবনাথ শাস্ত্রী ; শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ; শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী ; সতীনাথ ভাদুড়ী ; সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ; সরলা দেবী চৌধুরানী ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; সুব্রহ্মণ্য ভারতী ; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; সূর্য সেন ; হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী ; হাম্‌সুন, ; হ্রুট ; হেমচন্দ্র কানুনগো

শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/রিজার্ভ ব্যাংক

শ্রীনকুল চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক, 'আনন্দবাজার' পত্রিকা/বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ; ব্রাউন, পার্সি ; ভগবানলাল ইন্দ্রজী ; রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ; লালা, লাজপৎ রায়

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী/সুজাতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, কলিকাতা/সুবোধকুমার মিত্র

শ্রীননীগোপাল মজুমদার, শিশুরোগ বিভাগ, ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট/রিকেট্‌স

নরেন্দ্র দেব, কলিকাতা/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী, গণিত বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বীজগণিত

শ্রীনলিনীকান্ত রায়, বাংলা বিভাগ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ/হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/সুকুমার রায়চৌধুরী

শ্রীনারায়ণ দত্ত, হুগলি/সুকান্ত ভট্টাচার্য ; সেকশুভোদয়া

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ; যতীন্দ্রনাথ দাস

শ্রীনারায়ণী বসু, মধ্যমগ্রাম, চব্বিশ পরগনা/সাম্রাজ্যবাদ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, অধ্যক্ষ, নিউ ব্যারাকপুর বি. টি. কলেজ/বয়স্ক-শিক্ষা

শ্রীনিতাই রায়, প্রাক্তন শৈলারোহণ-প্রশিক্ষক, হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন/মানস সরোবর

শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ, টোল বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/রঘুনাথ শিরোমণি

শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমার্গ কলেজ, পুরুলিয়া/বিম্বিসার ; রাজ্যবর্ধন

শ্রীনিরঞ্জন দে, ভূগোল বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মেটটুর বাঁধ

শ্রীনিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/মনোমোহন বসু ; মানকুমারী বসু ; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ; রামনারায়ণ তর্করত্ন

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/রুজভেল্ট, এফ. ডি. ; রুশো, জে. জে. ; লক, জন ; ল্যাস্‌কি, হ্যারল্ড জে. ; সক্রেটিস ; সান-ইয়াৎ-সেন ; স্ট্যালিন. ; হব্‌স্, টমাস ; হিটলার অ্যাডলফ

নির্মলকুমার বসু, প্রাক্তন সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্/বিবাহ[১] ; ব্রতচারী আন্দোলন ; ভুবনেশ্বর ; মিকির ; মিজো ; মৃৎশিল্প ; শরৎচন্দ্র রায়

শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী, প্রাক্তন সম্পাদক, ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি/বার

শ্রীনির্মল ঘোষ, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা/হারাণচন্দ্র রক্ষিত

শ্রীনির্মল সিংহ, অধ্যক্ষ, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ/সার্ভেন্টস্ অভ্ ইন্ডিয়া সোসাইটি

শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত, কলিকাতা/মহাজাগতিক রশ্মি

শ্রীনির্মাল্য বাগচী, কলিকাতা/রিপন, জর্জ ফ্রেডরিখ সামুয়েল রবিনসন

শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়, ইতিহাস বিভাগ, আর্ট কলেজ/বোনাপার্ট, নাপোলেঅ

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়/শংকরাচার্য ; শবরস্বামী ; সমাজমনোবিদ্যা

শ্রীনীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ, হুগলি/শিবচন্দ্র দেব

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেন, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, কলিকাতা/বহরমপুর

শ্রীনীলা দে, বি. টি. বিভাগ, লরেটো হাউস/মহাবলী-পুরম ; মহামোগ্‌গল্লান ; মাহিষ্মতী

শ্রীনৃপেন্দ্র গোস্বামী, দর্শন বিভাগ, মতিঝিল কলেজ/বেদ ; বেদান্ত ; মহাভারত ; মায়াবাদ ; যজুর্বেদ ; যজ্ঞ ; রাজসূয় ; সামবেদ ; সায়ণ

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, কলিকাতা/বেশ্যা[২] ; শিশু-অপরাধ

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ/বক্রেশ্বর ; বহুলা ; বিশালাক্ষী ; বেলুড় ; মাহেশ ; মূলাযোড় ; রামেশ্বর চক্রবর্তী ; শোভা সিংহ ; শ্রীখণ্ড. ; হালিশহর

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী/হেমলতা দেবী ; হেয়ার, ডেভিড

শ্রীপদ্মনাভ দাশগুপ্ত, সাহা ইন্‌স্টিটিউট অভ্ নিউ-ক্লিয়ার ফিজিক্স/বোর, নিল্‌স হেনরিক ডেভিড

শ্রীপরিমলবিকাশ সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বার্ধক্য ; বিপাক ; সন্ধান ; সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

শ্রীপরেশচন্দ্র ধরভৌমিক, ইনস্টিটিউট অভ্ রেডিও-ফিজিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মাইক্রোফোন

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/ভাষা ; ভাষাগোষ্ঠী ; ভাষাতত্ত্ব ; ভোজ-পুরী ; ভোট-চীনীয়- ভাষা ; মাগধী ; মারাঠী ; মালয়ালম ভাষা ; মাহারাষ্ট্রী ; মৈথিলী ভাষা ;

রাজস্থানী ভাষা ; রুশভাষা ; শৌরসেনী প্রাকৃত ; সিন্ধী

শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনস্টিটিউট অভ্ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ/ ব্যাক্টিরিয়া ; ভাইরাস

শ্রীপীযূষ সাহা, ভূগোল বিভাগ, শিলিগুড়ি কলেজ/ বরাকর ; বাসরহাট ; বিপাসা ; মহানদী ; রেওয়া

শ্রীপুলকেশ দে সরকার, কলিকাতা/শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; স্বরাজ্য পার্টি

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, অধ্যক্ষ, বিশেষ রবীন্দ্র চর্চা-প্রকল্প, বিশ্বভারতী/মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ; রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সতীশচন্দ্র রায়ং

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, সিটি কলেজ/ বাঙ্গালোর ; ভাবনগর ; মক্কা ; মদিনা ; রাশিয়া

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন যুগ্ম কর্মসচিব, ভারতকোষ/বেঙ্গল জিমখানা

শ্রীপ্রকাশচিত্ত নন্দী, মনোবিদ্যা বিভাগ, এম. বি বি. কলেজ, আগরতলা/মনোবিদ্যা

শ্রীপ্রণবকুমার চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়/বনাস ; বিকানীর ; বিজয়ওয়াড়া ; বিষ্ণুপুর ; বেরিলী ; বেলগাঁও ; ভাগলপুর ; ভাগীরথী ; ভাজা ; ভিলাই ; ভুটান ; ভূপাল ; ভেল্লোর ; ভৈগাই নদী ; ভৈরব নদী ; মানস নদী ; মালপ্রভা ; মালমপুরহা প্রকল্প ; মাহী ; মীরাট ; মুচকুন্দ ; প্রকল্প ; মেঘনা ; মোরাদাবাদ ; রাওয়ালপিণ্ডি ; রাঁচি ; রাজকোট ; রায়পুর ; শ্রীরামপুর ; সিংহল ; সিকিম ; হলদিয়া

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়, গেজেটিয়ার্স ইউনিট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/বীরনগর

শ্রীপ্রণীতা ভট্টাচার্য, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ/রাউরকেলা ; রুড়কি

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/শশাঙ্কমোহন সেন

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, উপাচার্য, বিশ্বভারতী/বর্গী ; মিন্হাজ-ই-সিরাজ

শ্রীপ্রদীপকুমার রাহা, কলিকাতা/ব্লাড ব্যাংক

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম ; বিশ্বযুদ্ধ ; দ্বিতীয়

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/সত্যাগ্রহ ; স্বরাজ

শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায়, ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/রোটারি ক্লাব

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, কলিকাতা/মহেন্দ্রলাল বসু ; যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীপ্রবোধকুমার ভৌমিক, নৃবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ভূমিজ ; হো

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/শ্যাওলা

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; শান্তিনিকেতন

শ্রীপ্রভাতকুমার সেন, চন্দননগর/মধুপুর

শ্রীপ্রভাত বসু, কলিকাতা/ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ; রজনীকান্ত গুহ ; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীপ্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভাটপাড়া/হরচন্দ্র ঘোষ

শ্রীপ্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর গভর্নমেণ্ট কলেজ/রঘুনাথদাস

শ্রীপ্রশান্ত দাঁ, কলিকাতা/রণজিৎ সিংজি ; লন টেনিস ; পরি. দলীপ সিংজি

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট/যোগ ; স্ফোটবাদ

শ্রীপ্রিয়তোষ মৈত্রেয় ; ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট/সমবায়

শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন, ইতিহাস বিভাগ, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ/রাষ্ট্রকূট

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/লালবিহারী দে ; হায়নে, হাইন্রিখ ; হ্যাজলিট, উইলিয়াম ; হোমার

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বাগছী, ডিরেকটর অভ্ রিসার্চ, ঈস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস/মণিমুক্তা ; ম্যাগ্নিসিয়াম ; রেজিন

ফাঁলো, ফাদার পিয়ের, ফরাসী বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মুসা ; মেরী, মারীয়া ; যীশু

শ্রীবংশীধর হাজরা, অধ্যক্ষ, শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজ/বংশধর ; মেণ্ডেল যোহান ; হরিণ

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, সভাপতি, আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষৎ/হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীবরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়, উদ্ভিদ্বিদ্যা বিভাগ, হুগলি মহসীন কলেজ/বীট ; শাল ; সেগুন

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), কলিকাতা/ সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীবাণী রায়, কলিকাতা/বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীবারিদবরণ ঘোষ, গোপাল ব্যানার্জী মহাবিদ্যালয়, হুগলি/মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীবি. এন. সিন্হা, ভূগোল বিভাগ, কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়/মহীশূর

শ্রীবিকাশমোহন সান্যাল, সাঁত্রাগাছি/মুনাফা

শ্রীবিজনবিহারী দে, ইতিহাস বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়/বরদলৈ, গোপীনাথ

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রাক্তন রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শান্তিনিকেতন, কলানবগ্রাম/বুনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা/বরবাক্ শাহ ; বাইজান্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; বার্নিয়ে, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ; বৃহস্পতি রায়মুকুট ; বেণ্টিন্‌ক, লর্ড উইলিয়ম্ ; বৈরাম খাঁ; ব্যাবিলোনিয়া; ভারশিব; ভাস্কো ডা গামা; মইনুদ্দীন চিস্তী; মগধ; মনরো, স্যর টমাস; মন্বন্তর ; মহম্মদ রেজা খাঁ.; মহাসেনগুপ্ত.; মাৎসিনি, জিউসেপ্‌পে; মানুচী; মালব; মিথিলা; মিথ্র ; মিনান্ডার ; মির্জা নাথান ; মিহিরকুল ; মুঞ্জে, বি. এস. ; মেগাস্থিনিস ; মেটারনিক ; মোংগল ; রায়দুর্লভ ; রুদ্রদাম, রুদ্রদামন ; সৎনামী ; সুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীবিনোদশংকর দাশ, ইতিহাস বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ/সাঁওতাল বিদ্রোহ

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, সম্পাদক, 'শিক্ষক'/মণ্ডন মিশ্র.; মথুরানাথ বিশ্বাস

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী, আইনজীবী, কলিকাতা/মরুমরূতয়ম ; র‍্যাফায়েল, রাফায়েল, সাঞ্জো ; লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ; স্থাপত্য ; হ্যাভেল, আর্নেস্ট বিনফিল্ড

শ্রীবিমলেন্দু মিত্র, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বসু বিজ্ঞান মন্দির/বর্ণালীবিদ্যা

শ্রীবিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, কলিকাতা/বৈদিক দেবতা ও বৈদিক ধর্ম ; বেদ

বিমানবিহারী মজুমদার, পাটনা/বলরামদাস ; বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বাসুদেব সার্বভৌম ; বিশ্বনাথ কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস ; বৃহস্পতি[২].; বৈষ্ণবধর্ম.; মণ্ডল[১] ; মাধবেন্দ্রপুরী ; মালাধর বসু ; রঘুনন্দন গোস্বামী ; রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ; রায়রামানন্দ ; শ্রীনিবাস আচার্য ; ষড়গোস্বামী ; সতীশচন্দ্র রায়[২] ; হাম্বির

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ভার্জিল, পুব্লিউস ওয়েগিলিউস মারো ; মলিয়ের ; মায়াকভ্‌স্কী, ভ্লাডীমির ; রিয়ালিজ্‌ম্ ; রোম্যান্টিসিজম্ ; রোলাঁ, রোম্যাঁ ; লেসিং, গট্‌হল্‌ট এফ্রাইম.; শিলার, ফ্রীডরিখ্ ফন ; শেক্‌স্‌পীয়র, উইলিয়াম.; শ্লেগেল, আউগুস্ট ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন্ ; শ্লেগেল, কার্ল ভিলহেল্‌ম্ ফ্রিডরিষ্ ফন ; সনেট ; সাদি, রবার্ট ; হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ; হরেস, কুইন্তুস্ হোরাতিউস্ ফ্লাক্কুস ; হ্যেল্‌ডেলির্ন, জে. সি. ফ্রীড্‌রিখ ; হুইটম্যান

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী/বুদ্ধঘোষ ; বুদ্ধদত্ত ; বৌদ্ধধর্ম ; মার ; মৈত্রেয় ; সারিপুত্ত

শ্রীবিশ্বনাথ মিত্র, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী/মৎস্য ; রুই ; হাঙ্গর

শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগার বিভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্/বলদেব পালিত.; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ; শবর ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; সুখলতা রাও ; সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; সুশীলকুমার দে ; হেমন্তকুমার বসু

শ্রীবিশ্বনাথ রায়, মনোবিদ্যা বিভাগ, এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা/মনোবিদ্যা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়/মৈথিলী সাহিত্য ; রাজস্থানী সাহিত্য

শ্রীবীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ/ভুটান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, বনগ্রাম দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়/ভবানন্দ মজুমদার ; মগহী.; মহেন্দ্রলাল সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ/ভার্ন, জুলে

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শ্রীবৈষ্ণবচরণ দাস, পাটবাড়ি আশ্রম, বরাহনগর/বলদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত, সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স/রিঅ্যাক্টর

শ্রীভক্তপ্রসাদ মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/বৃন্দাবন ; মথুরা ; মন্দার ; রাজগৃহ, রাজগির ; রাধাকুণ্ড ; রামেশ্বর ; রূপগোস্বামী ; শংকরাচার্য ; শ্রবণবেলগোলা ; সারনাথ

শ্রীভবতোষ দত্ত, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; রমেশচন্দ্র দত্ত; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী; শ্রীশচন্দ্র রায়; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, সিটি কলেজ/রঘুনাথ ভট্টাচার্য

শ্রীভবদেব ভট্টাচার্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ/ব্রহ্মগুপ্ত

শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/সর্বোদয়

শ্রীভারতবন্ধু ঘোষ, কলিকাতা/রেডিওলজি

ভাস্করণ, শ্রীকৃষ্ণস্বামী, রাঁচি/হস্পিট্যাল্ ফর মেণ্টাল ডিজিজেস, কাঁকে

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, কলিকাতা/মেলা ; রথযাত্রা ; শিব

শ্রীমংগলপ্রসাদ সিংহ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/রজনীকান্ত গুপ্ত ; রজনীকান্ত সেন

শ্রীমঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/ভবানী, রানী ; ভিক্টোরিয়া, মহারানী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দত্তরায়, কলিকাতা/বলখেলা[১]

শ্রীমদনমোহন কুমার, সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ/রস, রোনাল্ড; রাখীবন্ধন[২]; রামনাথ তর্করত্ন; লাসা; লিপি, লিপিতত্ত্ব; লীলাশুক; লুম্বিনী;

সনাতনগোস্বামী; সর্বানন্দ; সীতাদেবী; স্বরূপ-দামোদর; হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাসি; হিত্তী; হিন্দু কলেজ; হিন্দুকুশ; হগ, সার স্টুয়ার্ট সন্ডার্স; পরি. চিদম্বরম্

শ্রীমনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী, সম্পাদক, অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা/হিন্দু মহাসভা

শ্রীমনোতোষ দাশগুপ্ত, রসায়ন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/লবণ; লাক্ষা

শ্রীমনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়/মণিপুর; শ্রীহট্ট

শ্রীমনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, সেন্ট্রাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, হাওড়া/ব্রাউনিং, রবার্ট

শ্রীমন্মথ রায়, নাট্যকার/শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীমাধবচন্দ্র গোস্বামী, অ্যানথ্রোপলজি বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়/মিরি, মিশিঙ

শ্রীমায়া চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিশাখপট্টনম

শ্রীমায়া দাস, রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইউনিভার্সিটি কলেজ অভ্ মেডিসিন/ভিটামিন

শ্রীমায়া দেব, মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মনঃসমীক্ষণ

শ্রীমালবিকা চাকী, কলিকাতা/বাসুদেব ঘোষ

শ্রীমিত্রা দত্ত, ভূগোল বিভাগ, শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ/বার্নপুর

শ্রীমিনতি বিশ্বাস, ভূগোল বিভাগ, শ্রীশিক্ষায়তন/ভবানী নদী

শ্রীমিহির বসু, ভূবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/স্ফটিক

শ্রীমীনা সেন, রাজস্থান/যোধপুর

শ্রীমীরা গুহ, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বঙ্গোপসাগর; ব্রহ্মদেশ

শ্রীমুকুলিকা কোণার, ইডেন হাসপাতাল, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ/রেডিওথেরাপি; লিউকিমিয়া

শ্রীমুক্তি দাশগুপ্ত, শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়/শান্তিপুর

শ্রীমুক্তিসাধন বসু, ইনস্টিটিউট অভ্ রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ভাবা, হোমি জাহাঙ্গীর; মডুলেশন

শ্রীমুরারিপ্রসাদ গুহ, সিনিয়ার রিসার্চ অফিসার, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন/বাজরা; ভুট্টা; মটর; মধু; মশলা; যব; লেবু; সবজি; সার

মুরার্কা, শ্রীঈশ্বরপ্রসাদ, প্রাক্তন গবেষক, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/রাজস্থান

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, রসায়ন বিভাগ, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ/রসায়ন; শনি; স্নেহপদার্থ; হিপার্কাস

শ্রীমোহনলাল মিত্র, বাংলা বিভাগ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ/মধুসূদন গুপ্ত; মধুসূদন সরস্বতী; মনোমোহন ঘোষ[১]; মহম্মদ মহসীন

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, কলিকাতা/বিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়/শম্ভুনাথ পণ্ডিত; সন্তদাস বাবাজী; হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন

শ্রীযতীন্দ্র রামানুজাচার্য, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ/শ্রীসম্প্রদায়

শ্রীযূথিকা ঘোষ, সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ/বলরাম; বসু[১]; বসু[২]; বাল্মীকি; বিভীষণ; বিষ্ণু[১]; বেদব্যাস; বৈকুণ্ঠ; ভগীরথ; ভস্মলোচন; ভৃগু; ভৈরব; মদন; মার্কণ্ডেয়; মেঘনাদ; মেনকা; যুধিষ্ঠির; যোগবাশিষ্ঠ; রঘু; রাক্ষস; লক্ষ্মী; শর্মিষ্ঠা; শুক্র[১]; শূদ্রক; শ্রীবৎস; হিরণ্যকশিপু

শ্রীযূথিকা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ভাটপাড়া

শ্রীযূথিকা মৈত্র, কলিকাতা/স্তূপ

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কলিকাতা/বর্গী; জিয়াউদ্দীন; রাজবাহাদুর; বাহমনী; বাহাদুর শাহ্ ১ম; বাহাদুর শাহ্ ২য়; ভোঁসলে; মহবৎ খাঁ; মহম্মদ ঘুরী; মহীউদ্দীন ফরুকসিয়র; মামুদ; মালিক কাফুর; মীরকাশিম.; মীরজাফর.; মীরজুমলা.; মীরমদন; মুলরাজ; মেবার; মোহনলাল; যশোবন্ত সিংহ; রাজিয়া; রেজাখাঁ, মহম্মদ; রো, টমাস; লোদীবংশ; শাহ্ আলম, ২য়; সিরাজুদ্দৌলা; সুজা; হোলকার

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার, মিত্র ইনস্টিটিউশন, ভবানীপুর ব্রাঞ্চ/সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়; হলায়ুধ; হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, 'প্রবাসী'/বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়; ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন; মতিলাল ঘোষ; শিশিরকুমার ঘোষ; হিন্দুমেলা

শ্রীরজত রায়চৌধুরী, কলিকাতা/যোগীন্দ্রনাথ সরকার; রাজকৃষ্ণ রায়; রামগতি ন্যায়রত্ন; রাম বসু; রায়শেখর; লোচন দাস; শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

রথীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা/বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়, সাহা ইনস্টিটিউট অভ্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স/রকেট

শ্রীরবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ডিরেক্টর অভ্ রিসার্চ, ঈস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্ক্স/বিস্ফোরক

শ্রীরমাকান্ত চক্রবর্তী, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ/লক্ষ্মণসেন

শ্রীরমা চৌধুরী, উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী/ভাস্কর;

মধ্বাচার্য; মুক্তি; শুদ্ধাদ্বৈতবাদ; সুফী, মতবাদ ও সম্প্রদায়
শ্রীরমাতোষ সরকার, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম/ব্রহ্মান্ড; ব্রাহে, টাইকো; মন্ডল°; হিন্দুগণিত
শ্রীরমানাথ কুন্ডু, মনোবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বুদ্ধি
শ্রীরমেশ ঘোষাল, মার্টিন বার্ন/রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাক্তন উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/বখতিয়ার খিলজী; বঙ্গ[১]; বল্লাল সেন; বসন্ত রায়; বারভুঁইয়া; ভবদেব ভট্ট; যদুনাথ সরকার; যবদ্বীপ.; রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়.; শশাঙ্ক; শালিবাহন; শিবাজী; শিশুনাগ; শ্যামদেশ; শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য; সমতট; সমুদ্রগুপ্ত; সাতবাহন বংশ; সিন্ধু, সিন্ধুসৌবীর; সুবর্ণগ্রাম; সুবর্ণদ্বীপ, সুবর্ণভূমি; সুমাত্রা; সুমের; সোলাঙ্কি; সৌরাষ্ট্র; স্কন্দগুপ্ত; হিন্দু; হুসেন শাহ্; হেস্টিংস্, ওয়ারেন
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, কলিকাতা/বংশী; বড়ে গোলাম আলী খাঁ; বিষ্ণু দিগম্বর, পন্ডিত.; বিষ্ণুপুর ঘরানা; বীণা.; বেহালা.; ভজন.; ভাতখন্ডে, বিষ্ণু নারায়ণ; ভেরী.; মাদল.; মার্গসংগীত; মুদ্রা.; মুরলী; মূর্ছনা.; শ্রীধর কথক.; সংগীত
শ্রীরাধেশচন্দ্র সেন, অধ্যক্ষ, কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়/মূকবধির শিক্ষা
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রসায়ন ও প্রাণরসায়ন বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা/ভেষজ
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ, ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ/বসন্ত; ম্যালেরিয়া.; শারীরসংস্থান.; শিশুরোগ.; স্তন; স্ত্রীব্যাধি; হর্মোন; হিমোগ্লোবিন; হৃৎপিন্ড
শ্রীরেবা দে, কলিকাতা/বিদ্যাধরী
শ্রীরেবা বসু, পিয়ারীচরণ বালিকা বিদ্যালয়/বোকারো
লালওয়ানী, শ্রীগণেশ, জৈন ভবন, কলিকাতা/ভদ্রবাহু; মাহেশ্বরী সম্প্রদায়
লেসুর, ওয়াই. জি., মেক্সিকো/মেক্সিকো
শ্রীশংকরবিজয় মিত্র, 'যুগান্তর' পত্রিকা/বলখেলা[২]
শ্রীশক্তিব্রত ঘোষ, কলিকাতা/শ্রীরামপুর মিশন
শ্রীশত্রুজিৎ দাশগুপ্ত, পরিচালক, 'অন্তরা' মানসিক হাসপাতাল/মানসিক রোগ
শ্রীশরদিন্দু বসু, অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়া/শ্রীনগর
শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ; সহজিয়া[১].; সহজিয়া[২]
শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ, অর্থনীতি বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি আয়-ব্যয়নীতি
শ্রীশান্তি পাল, কলিকাতা/সাঁতার
শাম্বমূর্তি, পি., সংগীত বিভাগ, মাদ্রাজ/সংগীত, কর্ণাটকী
শ্রীশিবচরণ মুখোপাধ্যায়, স্থাপত্য বিভাগ, বেঙ্গল এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ/স্থাপত্য, ভারতীয়
শ্রীশিবতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বহুল কর্মনারায়ণ
শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী সান্ধ্য কলেজ/রাধানাথ শিকদার
শ্রীশিশিরকুমার সিংহ, বাংলা বিভাগ, মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা/শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ; সোফোক্লেস
শিশির চট্টোপাধ্যায়, ইংরেজী বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ভল্‌তেয়ার; মার্লো, ক্রিস্টোফার.; মেটারলিংক, কাউন্ট মরিস; মোপাসাঁ, গী দ্য.; য়েট্‌স, উইলিয়াম বাটলার; লরেন্স, ডি, এইচ.; শেখভ, আনতোন পাভলোভিচ; শেলি, পার্সি বিশি; সুইফ্‌ট, জোনাথন.; স্কট, স্যার ওয়ালটার.; হাউপ্টমান, গেরহার্ট; হার্ডি, টমাস
শ্রীশীলা চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/ময়ূর
শ্রীশুভেন্দুগোপাল বাগচী, শান্তিনিকেতন/বক্রেশ্বর; বীরভূম; সিউড়ী
শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদমী, কলিকাতা/মুন্‌শী আবদুল করিম
শ্রীশুভ্রেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, বাণিজ্য বিভাগ, সিটি কলেজ/বয়নশিল্প
শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস./রাউল্যাট অ্যাক্ট; সংবিধান, ভারতীয়
শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার, প্রাক্তন অধ্যাপক, সংগীত ভবন, বিশ্বভারতী/বাকে, আর্নল্ড এ,
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতা/বররুচি: বাক্যপদীয়; বেকন; ফ্রান্সিস
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সাহিত্য সংসদ/হরিদাস বাগচী
শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধিকর্তা, খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন/সত্যাগ্রহ
শ্রীশোভনলাল মুখোপাধ্যায়, বি. ই. কলেজ, শিবপুর/রাষ্ট্রবিজ্ঞান
শ্রীশ্যামল সেনগুপ্ত, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/বিদ্যুৎ
শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/হেরুক
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিবাসন, কদয়ম সুব্বিয়াহ, ডেপুটি ডিরেক্টর, বোটানিক্যাল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়া/বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া

শ্রীশ্রীহর্ষ মল্লিক, ভূগোল বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়/মাদুরা
শ্রীশ্বেতকেতু ঘোষাল, কলিকাতা/সোডিয়াম
শ্রীসংকর্ষণ রায়, জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্ ইন্ডিয়া, নাগপুর/হিমালয়
শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, নববিধান পাবলিকেশন কমিটি/বঙ্গচন্দ্র রায়; বিনয়েন্দ্রনাথ সেন; মোহিতচন্দ্র সেন ; সুনীতি দেবী
শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়/হরপ্রসাদ রায়
শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, অভয় আশ্রম/মসলিন ; মুগা.; রেশম
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়/মুদ্রণবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র; রঙ্গমঞ্চ ; রঙ্গমঞ্চ, বাংলা ; রেয়ন ; লামা ; শণ ; শবসংকার ; শশিভূষণ দাশগুপ্ত ; শিখযুদ্ধ ; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; সতরঞ্চ.; সিদ্ধাচার্য ; সুখলতা রাও.; সুফী, মতবাদ ও সম্প্রদায় ; সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, হ্যালি, এড্মন্ড ; হিজরী ; সুশীলকুমার দে ; সেমীয়-হামীয়; হীনযান; পরি, ধর্মপাল
শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য, কলিকাতা/লালন ফকির
শ্রীসন্তোষকুমার পাইন, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী/বাষ্পমোচন ; সাহানী, বীরবল
শ্রীসন্তোষকুমার সেন, ইনস্টিটিউট অভ্ রেডিও ফিজিক্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বেতার
শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা/ব্যাংক
শ্রীসমর বসু, কলিকাতা/ভীম ভবানী
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/হাইড্রলিক্স
শ্রীসমীরকুমার ঘোষ, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিশ্বভারতী/ব্যালিস্টিক্স
শ্রীসরোজকুমার দাস, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/শোপেনহাওয়ার, আর্থার
শ্রীসরোজরঞ্জন দাশ, সম্পাদক, মানিকতলা উচ্চ বিদ্যালয়/মলমাস
শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা/ব্যক্তিত্ব
শ্রীসলিলকুমার চৌধুরী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বৈতরণী ; ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা ; মালদহ.; মেঘালয়.; যমুনা ; শিলং.; সপ্তগ্রাম; সরস্বতী২; সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্
শ্রীসাধনা দাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/বিস্মার্ক অটো প্রিন্স ফন; বেনথাম, জেরেমি ; মিল, জন স্টুয়ার্ট
শ্রীসান্ত্বনা দাস, ভূগোল বিভাগ, রানী বিড়লা গার্লস কলেজ/ভারতমহাসাগর
শ্রীসাবিত্রী মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়/বায়ুমণ্ডল ; বৃষ্টিপাত; ময়ূরাক্ষী; মাঙ্গালোর; মান্নার উপসাগর; মালাবার উপকূল; মেঘ
সিংহ, শ্রীরামঅধার, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ব্রাহুই ; মাল্তো.; মুন্ডারী
শ্রীসতেশচন্দ্র লাহিড়ী, ডিপার্টমেণ্ট অভ্ ফার্মাকোলজি, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল/সালফাবর্গীয় ঔষধ
শ্রীসন্দেশ্বর রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল হেল্থ সার্ভিস/হুপিং কফ
শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/বালখিল্য ; বিশ্বামিত্র
শ্রীসীমানন্দ অধিকারী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/বনমানুষ; বাঘ১; ব্যাঙ; ভ্রূণ; মৃত্যু; মেরুদন্ডী প্রাণী; সরীসৃপ; সিংহ; স্তন্যপায়ী প্রাণী ; হনুমান
শ্রীসুকুমার রায়, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাবর, জহীরউদ্দিন মহম্মদ
শ্রীসুকুমার সেন, প্রাক্তন অধ্যাপক, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বাংলা ভাষা ; বিদ্যাপতি; মুন্ডা; যাত্রা; যাযাবর; রাম; রামমোহন রায়, রাজা ; রামায়ণ ; রুদ্র ; লুসেই.; সংস্কৃত ভাষা ; সঙ্ঘ; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; সরস্বতী১; সাঁই১; সাঁই২; সাঁওতাল; সাঁওতালী; সিংহলী; হানসেন, জি. আরমাউএর; হিন্দী; হিবন্টেরনিৎস, মোরিৎস
শ্রীসুকুমারী ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/মধুকৈটভ; যম; যযাতি; শকুন্তলা
শ্রীসুকোমল চৌধুরী, পালি বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/বিজয় সিংহ
শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, সংস্কৃত ও দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী/শৈব ও শাক্ত-দর্শন
শ্রীসুখময় লাহিড়ী, কলিকাতা/বাক; রক্তচাপ; রক্তবাহ; রক্তসংবহনতন্ত্র; হৃৎপিণ্ড
শ্রীসুচিৎকুমার সুর, ভূগোল বিভাগ, চন্দননগর সরকারি মহাবিদ্যালয়/বরোদা; বালুরঘাট; বিকানীর
শ্রীসুজিতকুমার দাশগুপ্ত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ/বিছা; মশা; মাকড়সা; মাছি; মৌমাছি
শ্রীসুদিন চট্টোপাধ্যায়, বারাসাত গভর্নমেণ্ট কলেজ/হলদিঘাটের যুদ্ধ
শ্রীসুদেব দাস, পরিকল্পনা বিভাগ, স্টেট ব্যাংক অভ্ ইন্ডিয়া/মার্শাল, অ্যালফ্রেড
শ্রীসুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী, কলিকাতা/বিধানচন্দ্র রায়
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/শংকরদেব
শ্রীসুধাংশুশেখর চক্রবর্তী, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী/বামাক্ষ্যাপা ; ব্লাভাৎস্কি, মাদাম
শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/হিন্দী সাহিত্য

শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী/বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; বৈশেষিক দর্শন; শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ; সাংখ্যযোগ

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী, দর্শন বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বার্গ্‌সঁ; স্যাদ্‌বাদ; স্পিনোজা, বারুচ; স্বপ্ন; স্বভাববাদ; স্মৃতি; হেগেল

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ/সমাজ-শিক্ষা; স্ত্রীশিক্ষা

শ্রীসুধীর বেরা, সহযোগী সম্পাদক, বসুমতী/সুবোধচন্দ্র মল্লিক; হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীসুধেন্দুপ্রসাদ বসু, ফলিত পদার্থবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/বয়লার; বিদ্যুৎচৌম্বক ক্ষেত্রতত্ত্ব

শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন রায়, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বোলপুর কলেজ/বিপিনবিহারী সেন

শ্রীসুনীতিকুমার পাঠক, অধ্যক্ষ, ভোটভাষা মহাবিদ্যালয়/ভোট সাহিত্য

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, দার্জিলিং গভর্নমেণ্ট কলেজ/বীজপত্র; সপুষ্পক উদ্ভিদ

শ্রীসুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ/বিন্ধ্যপর্বত

শ্রীসুনীলকুমার মুন্সী, কলিকাতা/পরি. ঘনীভবন

শ্রীসুনীল ঘোষ, কলিকাতা/হার্মাফ্রি, ওঁজিয়াস

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা/মৃণালকান্তি বসু.; যবন হরিদাস.; যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ; যোগেশচন্দ্র রায়.; হরিনাথ দে

শ্রীসুপ্রভা রায়, কলিকাতা/মেরুবৃত্ত

শ্রীসুবিমল সিংহরায়, জিওলজিক্যাল সার্ভে অভ্‌ ইন্ডিয়া/ভূতত্ত্ব; ভূমিকম্প

শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার, ইতিহাস বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/লুথার, মার্টিন; সাবর্ণ চৌধুরী.; সিস্তান; স্টাইন, মার্ক আউরেল

শ্রীসুবোধ মৈত্র, কলিকাতা/বেলুন

শ্রীসুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক, ভেষজবিদ্যা বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ভেষজবিদ্যা

শ্রীসুব্রতা সেন, সংস্কৃত কলেজ/মনু; মনুসংহিতা.; যাজ্ঞবল্ক্য

শ্রীসুভদ্রকুমার সেন, কলিকাতা/হেমিংওয়ে

শ্রীসুভাষচন্দ্র কুণ্ডু, মলিকিউলার সাইটো জেনেটিক্স রিসার্চ ইউনিট, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়/শ্যাওলা; সাহানী, বীরবল

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, আকাশবাণী/বাউল; ভাওয়াইয়া; ভাটিয়ালী; মুর্শিদ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/বরাহমিহির; বাগ্‌ভট.; বাণভট্ট.; বাৎসায়ন[২]; বিশাখদত্ত; বিহ্লণ; বৃহৎকথা; ভট্টনারায়ণ; ভট্টি; ভবভূতি; ভরত[৩]; ভর্তৃহরি; ভারবি; ভাস; ভোজরাজা; মাঘ; মুরারি; রাজশেখর; শিহ্লন; শ্রীহর্ষ[১]; সংস্কৃত সাহিত্য; সুবন্ধু; সুশ্রুত; স্মৃতিশাস্ত্র; হর্ষ; হিতোপদেশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/রিচার্ড্‌সন, ডি. এল. ক্যাপটেন

শ্রীসুশান্তকুমার সেন, কলিকাতা/বিবাহ আইন, ভারতীয়

শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার/ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; রাজেন্দ্রলাল মিত্র

শ্রীসুশীল রায়, রামানন্দ লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ভারতচন্দ্র রায়; মধুসূদন দত্ত; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুশোভন সরকার, প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/রুশবিপ্লব

শ্রীসুশ্বেতা বিশ্বাস, বসুবিজ্ঞান মন্দির/বীজ; ভূর্জপত্র

শ্রীসুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ/শব্দ

শ্রীসুহৃদকুমার ভৌমিক, উলুবেড়িয়া কলেজ/হো

শ্রীসূর্যশংকর রায়, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলিকাতা/মেকলে, মার্কাস টমাস ব্যাবিংটন; রাস্কিন, জন

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র, সাহা ইনস্টিটিউট অভ্‌ নিউক্লিয়ার ফিজিক্‌স/মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট; মৌলিক কণা; রামন এফেক্ট; সাইক্লিক অ্যাক্‌সেলারেটর

সোব্‌হান, শ্রীআব্দুস, আরবী, ফারসী ও উর্দু বিভাগ, মওলানা আজাদ কলেজ/শিয়া; সুন্নি

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, প্রাক্তন সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌/বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌.; মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী; স্বর্ণময়ী দেবী

শ্রীসৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা/বাঁকুড়া; বেরিলী.; ব্রাহ্মণী.; ভাকরানাঙ্গাল পরিকল্পনা; ভাগীরথী; ময়মনসিংহ; মহানন্দা; মহারাষ্ট্র; মুণ্ডেশ্বরী; যশোহর; রংপুর; রাজমহল; রাজশাহী; লাহোর; ল্যান্সডাউন; সিন্ধু নদী; হরিদ্বার; হরিয়ানা; হায়দরাবাদ; হালিশহর; হিমাচল প্রদেশ

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা/বিপ্লবী সাম্যবাদী দল

শ্রীসৌরীন ঘোষ, যৌনব্যাধি বিভাগ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা/যৌনব্যাধি

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাস বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ/শুঙ্গবংশ; ষোড়শ মহা-জনপদ

শ্রীস্বদেশভূষণ ভূঞ্যা, কলিকাতা/হিন্দু আইন; পরি. তদন্তকার্য

শ্রীহরপ্রসাদ চৌধুরী, কলিকাতা/হানিমান; হোমিও-প্যাথি

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বিহারীলাল চক্রবর্তী; যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত.; যতীন্দ্রমোহন বাগচী; সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীহরশংকর ভট্টাচার্য, অর্থনীতি বিভাগ, বর্ধমান রাজ-কলেজ/রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ/বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন; বিনয়কুমার সরকার.; বিপিনচন্দ্র পাল

শ্রীহরিহর মিশ্র, সংস্কৃত বিভাগ, সংস্কৃত কলেজ/সন্ধ্যাকর নন্দী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বীরভূম/রঘুনাথ ভট্ট

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল, প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ/রোজা; হজ

শ্রীহারাধন দত্ত, সহকারী সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্/রামতনু লাহিড়ী; রামদুলাল সরকার; লালমোহন বিদ্যানিধি; শশধর তর্কচূড়ামণি.; শিবনিবাস; শ্রাদ্ধ; সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ; সাভারকার, বিনায়ক দামোদর.; সারদাচরণ মিত্র; সেটন্‌কার, ওয়াল্‌টার স্কট; হরদয়াল নাগ; হেমেন্দ্রকুমার রায়; হেমেন্দ্রলাল রায়; পরি. নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীহিমাংশুকুমার সরকার, ন্যাশন্যাল অ্যাটলাস অর্গানাইজেশন/বিদর

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, কলিকাতা/হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা/সরোজিনী নাইডু; সাহিত্য ও শিল্প

শ্রীহীরালাল দত্ত, কলিকাতা/বীমা

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা/রাইবেশে; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়; রাজ্যপাল; রাজশ্রী; রাসমণি, রানী; লীলাবতী

বংশধর পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিভাবে বংশধরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সে সম্পর্কীয় আলোচনা সুপ্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্‌সের অন্তর্গত। এই বিষয়ের অনুশীলনকে বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক ও বিজ্ঞানী মেন্ডেল (১৮২২-৮৪ খ্রী)। সুপ্রজননবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ প্রাথমিক ও মূল সূত্রগুলি মেন্ডেলের মঠের বাগানে মটরশুঁটি গাছের উপর পরীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত হয় (১৮৬৬ খ্রী)। পরীক্ষার ব্যাপারে তিনি বিশেষ কয়েকটি গুণ, যেমন গাছের আকার, বীজের রঙ্‌ ও আকৃতি-প্রকৃতি বাছিয়া লন। পরস্পরের মধ্যে ঐরূপ এক বা একাধিক বিষয়ে প্রভেদ আছে এমন দুইটি গাছের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া তাহা হইতে উৎপন্ন গাছগুলি পরীক্ষার দ্বারা তিনি বহুক্ষেত্রে কতকগুলি গুণের অভাব লক্ষ্য করেন। প্রথম মিলনের ফলে উৎপন্ন এই সংকর গাছগুলির মধ্যে পুনরায় মিলন ঘটাইয়া তিনি দেখেন যে অনুপস্থিত গুণগুলি পরবর্তী জনিতে এক বিশেষ হারে পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে প্রকাশিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সকল সময়ে কোনও জীবের অন্তর্নিহিত চরিত্রের প্রকৃত অবস্থা না দেখাইতেও পারে। প্রচ্ছন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণগুলি বর্ণসংকরের মধ্যে অপ্রকটভাবে থাকে এবং পরবর্তী জনিতে পরস্পরের দ্বারা অপ্রভাবিত অবস্থায় প্রকাশিত হয়। মেন্ডেলের আবিষ্কৃত সূত্রগুলির মধ্যে এইগুলি প্রধান : ১. বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় যাইবার সময়ে একে অন্যের সহিত মিশিয়া যায় না ২. প্রত্যেক বৈশিষ্ট্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বিভিন্ন দলভুক্ত হইতে পারে ৩. কোনও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনও প্রকট হয়, কখনও বা প্রচ্ছন্ন থাকে।

জীববিদ্যার বর্তমান ধারণা এই যে যে-সমস্ত গুণ বংশপরম্পরায় অনুক্রমিত হয়, জীবকোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ক্রোমসোমের 'জীন' (gene) তাহাদের বাহক ('ক্রোমসোম' দ্র)। বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বা একাধিক জীন আছে। প্রত্যেক জীবের দেহে পিতা ও মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত দুই প্রস্থ জীন থাকে। যে সকল জীন স্বভাবতঃ প্রকট তাহাদের প্রভাবাধীন বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয় ; অন্যগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে। বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জীনগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জীনগুলির অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

পরবর্তী কালের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সামান্য কয়েক ক্ষেত্র ছাড়া সর্বদাই একত্র থাকে ('লিংকেজ' এবং 'ক্রসিংওভার')। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলি যে জীনগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহারা একই ক্রোমসোমে অবস্থিত। যে সকল বৈশিষ্ট্য কেবল পুরুষ- বা কেবল স্ত্রী-জাতীয়ের দেহে প্রকাশিত হয় তাহাদের জীনগুলি লিঙ্গ-নিয়ন্ত্রক ক্রোমসোমে অবস্থিত। দ্বিত্বকরণের সময়ে কোনও জীনের সামান্য পরিবর্তন হইলে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণে তাহার ধর্মও পরিবর্তিত হইয়া যায়, ইহাকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে ('অভিব্যক্তিবাদ' দ্র)।

উদ্ভিদ্‌ ব্যতীত 'ড্রোসোফিল্লা' নামক ক্ষুদ্রাকার মাছির মত প্রাণীও সুপ্রজনন-বিদ্যার পরীক্ষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সুপ্রজনন-বিদ্যার প্রয়োগের দ্বারা উন্নততর ও অধিক উৎপাদনক্ষম জাতের কৃষিজ উদ্ভিদ্‌ ও গৃহপালিত প্রাণীর উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে।

বংশীধর হাজরা

বংশী বেণু, মুরলী প্রভৃতি প্রধানতঃ বংশনির্মিত ফুৎকার বাদ্য। এতদ্ব্যতীত ইহা কাংস্য, লৌহ, রৌপ্য বা কাঞ্চন-নির্মিতও হইতে পারে। কোনও কোনও বংশী বংশীনলীর অগ্রভাগে ঈষৎ বক্রভাবে ফুৎকারযোগে বাজানো হয়। কোনটি হুইস্‌লের ন্যায় সহজভাবে বাদিত হয়। আড় বাঁশীতে ফুৎকার রন্ধ্রটি নলের প্রান্তদেশে অবস্থিত থাকে। বংশী লোকসংগীতেও বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ভারতে কয়েক প্রকার পাশ্চাত্য দেশে ব্যবহৃত বংশীও বাজানো হয়, যথা পিকোলো, ফ্লুট ইত্যাদি।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বকর-ঈদ ঈদ-উজ্‌-জোহা দ্র

বক্রেশ্বর (২৩° ২৩′ উত্তর ও ৮৭° ২২′ পূর্ব) সতীর দেহাংশের উপর প্রতিষ্ঠিত পীঠস্থান ও শাক্ততীর্থ। ইহা বীরভূম জেলায় দুবরাজপুর হইতে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পুরাণ মতে এখানে সতীর ভ্রূমধ্য পড়িয়াছিল। তীর্থক্ষেত্রের পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়া বক্রেশ্বর নদ এবং দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী প্রবাহিত। প্রবাদ আছে যে সত্যযুগে বিষ্ণু নরসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু বধ করায় ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হন এবং তাঁহার হস্তপদযুগে বিষম জ্বালা উপস্থিত হয়। অষ্টাবক্র মুনি বিষ্ণুর এই জ্বালা স্বীয় মস্তকে ধারণ করিলে তিনি তাঁহাকে বক্রেশ্বরের শিবের মস্তক স্পর্শ করিতে বলেন এবং ভারতের সকল

তীর্থবারিকে সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার মস্তকে পতিত হইতে নির্দেশ দেন। ইহাই 'পাপহরা গঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ।

বক্রেশ্বরে ৭টি গন্ধকযুক্ত উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই জলে স্নানে নানা রোগ আরোগ্য হয়। বক্রেশ্বরের মন্দিরের নৈর্ঋতকোণে দেবীমন্দিরে কষ্টিপাথরে অঙ্কিত ভ্রূচিহ্ন বর্তমান। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আসিয়াছিলেন বলিয়া চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে। মন্দিরের পাশেই মহাশ্মশান। শিবরাত্রিতে এই তীর্থে সপ্তাহব্যাপী বিরাট মেলা বসে।

উদরাময় ও চর্মরোগের বহু রোগী রোগনিরাময়ের জন্য বক্রেশ্বরে আসেন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রোগসংক্রমণ নিরোধকল্পে ও ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে আধুনিক প্রথায় স্নানাগারাদি নির্মাণ করিতেছেন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী
শুভেন্দুগোপাল বাগচী

বক্সিং মুষ্টিযুদ্ধ দ্র

বখতিয়ার খিলজী মুহম্মদ ঘুরী ও কুতবুদ্দিন কর্তৃক আর্যাবর্তের পশ্চিমাংশে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু ভাগ্যান্বেষী খিলজী ও তুর্কী মুসলমান ভারতে আসেন। মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী ইঁহাদের অন্যতম। অযোধ্যার শাসনকর্তার অনুগ্রহে দুইখানি পরগনা জায়গীর লাভ করিয়া বখতিয়ার নানা স্থান লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের সাহায্যে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করেন। ইহাদের সাহায্যে প্রথমে বর্তমান বিহার শরিফের নিকটবর্তী একটি বৌদ্ধ বিহার লুঠ করিয়া এক বৎসর পরে নদিয়া আক্রমণ করেন। সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন নদিয়ায় বাস করিতেন। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করিলেন ('লক্ষ্মণ সেন' দ্র)। বখতিয়ার নদিয়া অধিকার করিলেন। এইরূপে বখতিয়ার বাংলাদেশের এক অংশ জয় করিয়া বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি তিব্বতে অভিযান করেন। ইহার ফলে তাঁহার সৈন্যবল প্রায় সবই ধ্বংস হয়। বখতিয়ার ভগ্নহৃদয়ে অল্প কয়েকটি সৈন্যসহ ফিরিয়া আসেন এবং অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১২০৬ খ্রী)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

বগুড়া বাংলাদেশের রাজসাহী বিভাগের জেলা ও শহর। জেলাটি ২৪°৩২′—২৫°১৯′ উত্তর ও ৮৮°৫২′—৮৯°৪১′ পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে পশ্চিম দিনাজপুর, দিনাজপুর ও রংপুর, দক্ষিণে রাজসাহী ও পাবনা, পশ্চিমে মালদহ ও পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা। জেলার আয়তন ৩৮৯০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১৫৭৪১০৪ (১৯৬১ খ্রী)।

বগুড়াজেলার পূর্বদিক করতোয়া ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল খালবিলে পূর্ণ নিম্নভূমি। পশ্চিমদিক অপেক্ষাকৃত উচ্চ—বারিন্দভূমির অংশ। জেলার প্রধান নদী যমুনা, করতোয়া নাগর ও বাঙালী। এখানকার বুড়াবিলটি প্রসিদ্ধ চলনবিলের সহিত যুক্ত। জেলার সর্বোচ্চ গড়-উত্তাপ প্রায় ৩৬° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ প্রায় ১৯° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৬২৫ মিলিমিটার।

বগুড়া শহরের প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়ার পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। (মহাস্থানগড় দ্র)।

জেলার কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট প্রধান। ইহা-ছাড়া নানাপ্রকার ডাল, সরিষা ও প্রচুর সব্জি জন্মায়। জামালগঞ্জ ও সান্তাহার পাটের বৃহৎ গঞ্জ। বগুড়ার আম বিখ্যাত। খনিজদ্রব্যের মধ্যে জামালগঞ্জে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া গিয়াছে।

এই জেলার তাঁতের রেশমী ও সুতির কাপড় বিখ্যাত। তসর ও গরদের বস্ত্র প্রতিষ্ঠানও আছে। রেশম রাজসাহী জেলা হইতে আমদানি করা হয়।

বগুড়া জেলার দুইটি প্রধান রেলপথ। একটি ব্রডগেজ লাইন সান্তাহার হইতে হিলি হইয়া উত্তরে প্রসারিত; অন্যটি সান্তাহার হইতে কাউনিয়া জংশন পর্যন্ত বিস্তৃত মিটার গেজ লাইন।

জেলার সদর শহর বগুড়া ২৪°৫১′ উত্তর ও ৮৯°২৬′ পূর্বে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে করতোয়ার পশ্চিমতীরে ইংরেজরা বগুড়া শহরের পত্তন করেন। ইহার লোকসংখ্যা ৩৩৭৯৯ (১৯৬১ খ্রী)। এই শহরটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি দিয়াশলাই কারখানা ও তেলের কল আছে। এখানে একটি কলেজ ও কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়ও আছে।

জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে শেরপুর, শিবগঞ্জ ও ধুপচাচি বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য হিসাবে মহাস্থানগড় ও ভবানীপুর উল্লেখযোগ্য। শেরপুরের ১৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ৫১ পীঠের অন্যতম ভবানীপুর। এখানে দেবী অপর্ণা, ভৈরব বামন।

দ্র J. N. Gupta, *District Gazetteers of Eastern Bengal and Assam, Bogra*, Allahabad, 1910; Nafis-Ahmad, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958.

কমলকুমার গুহ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—৯৪ খ্রী) ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ঐ বৎসর মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাড়িতেই গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের কাছে কয়েক-মাস লেখাপড়ার পরে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে জেলা ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন (১৮৪৪ খ্রী)। অতঃপর তিনি কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া হুগলি কলেজে ভর্তি হন (১৮৪৯ খ্রী)। ঐ বৎসর নারায়ণপুর গ্রামের এক পঞ্চবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমা পত্নী বিগতা হইলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় হালিশহরের চৌধুরী পরিবারের কন্যা দ্বাদশবর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। বঙ্কিম-চন্দ্র অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার তিনটি কন্যাসন্তান ছিল।

ছাত্রজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁঠালপাড়ায় তিনি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা ভাষার চর্চাও করিতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-চন্দ্র আইন পড়িবার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র নব-স্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। আইন অধ্যয়ন শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর রূপে সরকারি চাকুরি লাভ করেন (৭ আগস্ট, ১৮৫৮ খ্রী)। বহু পরে (১৮৬৯ খ্রী) বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বিভাগে বি. এল. পরীক্ষা পাশ করেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুঁয়ায় (কাঁথি) বদলি হন। এই স্থানেই 'কপালকুণ্ডলা' কাহিনীর উৎপত্তি। ঐ বৎসরেই তিনি খুলনায় বদলি হন। খুলনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে তিনি কঠিন হস্তে নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য দমন করিয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ, সুযোগ্য শাসক ও বিচারক ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে শেষজীবনে 'রায়বাহাদুর' এবং সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন।

তেত্রিশ বৎসর সরকারি কর্মের পর বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে প্রতাপ চাটুজ্যের গলিতে নিজ অট্টালিকায় অবস্থান করেন। ঐখানেই বহুমূত্র রোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দীর্ঘ নয়, তাহারই মধ্যে তাঁহার সাহিত্যসাধনা বিস্ময়কর। হুগলি কলেজে ছাত্রজীবনে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে 'সংবাদ প্রভাকরে' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' গদ্য পদ্য লিখিতেন (১৮৫৩-৫৬ খ্রী)। ৪২ বৎসরের সাহিত্যসাধনা তাঁহার ছাত্রজীবন, কর্মজীবন, শেষ-জীবন পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি শেষ লেখা লিখিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৪। ১৫শ বর্ষ বয়সে তিনি দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। তিন বৎসর পরে ওই দুইখানি কাব্য 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প তথা মানস' নামে প্রকাশিত হয় (১৮৫৬ খ্রী)।

ইংরাজী ভাষায় দক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় 'Rajmohan's Wife' নামক ইংরেজী উপন্যাস রচনা করেন (১৮৬৪ খ্রী)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহিত্যজীবনের আরম্ভ। এই উপন্যাসের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের নব দিগন্ত উন্মোচন করিলেন। বাঙালীর রোমান্টিক সত্তার নব জাগরণ ঘটিল বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার আদিযুগের উপন্যাসত্রয়ে—'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রী), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬ খ্রী) এবং 'মৃণালিনী' (১৮৬৯ খ্রী)।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রদীপ্ত মধ্যযুগ বঙ্গদর্শন (১৮৭২ এপ্রিল—১৮৭৬ মার্চ) পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনার মাধ্যমে দেখা দিল। এই মাসিক পত্রে তিনি পর পর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩ খ্রী), "ইন্দিরা' (১৮৭৩ খ্রী), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪ খ্রী), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রী) ইত্যাদি উপন্যাসের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, যথা, 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' প্রভৃতি। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছিল। প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তার সম্পাদক বঙ্কিম-চন্দ্রের বিশিষ্ট অবদান। দুই বৎসর বন্ধ থাকিয়া সঞ্জীব-চন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পুনরায় বাহির হয়। 'রাধারাণী' (১৮৮৬ খ্রী), 'রজনী' (১৮৭৭ খ্রী), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮ খ্রী) এ যুগের রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যযুগের রচনায় সৌন্দর্য ও লোকশিক্ষার মিলন পরিলক্ষিত। শেষ যুগে লোকশিক্ষার প্রাধান্য। প্রতিভার অন্ত্যলীলায় প্রকাশিত পত্রিকা 'নবজীবন' ও 'প্রচার'। এই যুগের প্রধান উপন্যাস 'রাজসিংহ' (১৮৮২ খ্রী), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২ খ্রী), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪ খ্রী), 'সীতারাম' (১৮৮৭ খ্রী)। 'দেবী চৌধুরাণী' আংশিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। 'সীতারাম' 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়। তাঁহার অনেক উপন্যাসই বারংবার পুনর্লিখিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইহার সুবিদিত দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিকতা ও অনুশীলন ধর্মের ব্যাখ্যা তাঁহার প্রতিভার শেষ পর্যায়ে পূর্ণভাবে উন্মেষিত। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র নায়ক নেশাখোর কমলাকান্তের মুখে মাতৃপ্রেমের প্রথম প্রকাশ 'আনন্দমঠের' 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাইল। 'অনুশীলন' ধর্মমূলক প্রবন্ধ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হয়। এই ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে 'স্ব-স্বভাবানুবর্তিতা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্যক স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য'। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের শিষ্য ও মহাভারতের

শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। শ্রীকৃষ্ণই অনুশীলন ধর্মের আদর্শ। 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬-৯২ খ্রী) প্রথমে ধারাবাহিকভাবে 'প্রচারে' মুদ্রিত হয়। 'নবজীবনে' ধর্মজিজ্ঞাসা-সংক্রান্ত প্রবন্ধাবলী, 'ধর্মতত্ত্ব প্রথমভাগ অনুশীলন' নামে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসই ইংরেজী, জার্মান, হিন্দী, কানাড়ী, তেলুগু প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ সাফল্যের সহিত মঞ্চে অভিনীত ও চলচ্চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। উপন্যাসগুলির নাটকীয়তা ও রোমান্টিকভাব সফলতার একটি কারণ।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিস্তৃত অঙ্গনে বাঙালীর রোমান্টিক মনের মুক্তিদাতা। ভাষা ও উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে তিনি পথিকৃৎ। দেশের রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নতির সর্বাঙ্গীণ প্রয়াসে বঙ্কিমচন্দ্র অবিরত লেখনীচালনা করিয়াছেন। 'আনন্দমঠের' 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ভাব প্রবুদ্ধ করিয়াছে, অপূর্ব দেশপ্রীতির উদ্ভব ঘটাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র সাহিত্যিক বা লেখক নন, উপরন্তু তিনি যুগস্রষ্টা। ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, পারিবারিক—এই ত্রিধারায় উৎসারিত বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যানসমূহ সমসাময়িক ও পরবর্তী সাহিত্য ও জীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রাসভারী, গম্ভীর লোক হইলেও বন্ধুবৎসলতার গুণে চতুর্দিকে সুধী-বৃন্দের সমাবেশে উন্নতরুচি, পরিচ্ছন্ন, সুদর্শন বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভার দীপ্তিচ্ছটায় বাংলার সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

বাণী রায়

বঙ্গ[১] পাকিস্তান ভারত হইতে পৃথক্ রাজ্যে পরিণত হইবার পূর্বে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের যে প্রদেশকে বঙ্গদেশ (বাংলাদেশ, Bengal) বলা হইত, তাহার মাত্র এক অংশ প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হইত। সাধারণভাবে বলিতে গেলে গঙ্গানদীর পশ্চিমের ও দক্ষিণের অংশ 'রাঢ়', ও অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল পুণ্ড্র, বরেন্দ্র ও গৌড়। পূর্ব অংশে সমতট, হরিকেল, বঙ্গ, বঙ্গাল প্রভৃতি নানাদেশের নাম পাওয়া যায়—সম্ভবতঃ বিভিন্ন সময়ে এই সমুদয় নাম প্রচলিত ছিল ও ইহাদের বিভিন্ন সীমানা ছিল। সম্ভবতঃ গৌড় এই নামটি হিন্দু যুগের কোনও সময়ে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ এবং কখনও সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইত। মুসলমান যুগে 'বঙ্গাল' নামটির বিকৃত রূপ 'বাঙ্গালা' সমগ্র দেশের নামে পরিণত হয় এবং ইহা হইতেই 'বাংলা', 'Bengala' (পর্তুগীজ), 'Bengal' (ইংরেজী) প্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। 'বঙ্গদেশ' এই নামও সমগ্র দেশের সংজ্ঞা রূপে গৃহীত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কবি মধুসূদন দত্ত এই অর্থে 'গৌড়' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইবে।

ঐতিহাসিক যুগে বঙ্গদেশের কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে গঙ্গানদীর স্রোত রাজমহলের পাহাড় পার হইবার পর বর্তমান মালদহের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ গৌড় নগরীর যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার উত্তর দিয়া আসিয়া পরে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইত। গৌড়ের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী এখন দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে—ভাগীরথী ও পদ্মা। পদ্মা নদী অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে প্রবল স্রোতস্বতীতে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্বে গঙ্গা নদী, ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিত। এককালে ইহাদের মধ্যে সরস্বতী নদীই ছিল বড় এবং ইহা রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া বিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এই নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলে ইহার তীরস্থিত প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক) ও পরবর্তীকালের সপ্তগ্রাম বিনষ্ট হয় ও ভাগীরথীর কলেবর-বৃদ্ধি হইয়া প্রথমে হুগলি ও পরে কলিকাতা প্রাধান্য লাভ করে। ভাগীরথী নদীও পূর্বে বর্তমান কালের ন্যায় কলিকাতা ছাড়াইয়া পশ্চিমে শিবপুর অভিমুখে না গিয়া সোজা দক্ষিণে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। কালীঘাট ও আলিপুরের মধ্যবর্তী শীর্ণকায়া আদিগঙ্গা নদীটি এখনও ভাগীরথীর পূর্বখাতের নাম ও চিহ্ন স্বরূপ বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মপুত্র নদের স্রোতও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে এবং লাঙ্গলবন্দের শুষ্কপ্রায় খাত ইহার পূর্ব-স্মৃতি বহন করিতেছে। বর্তমান কালের মেঘনা নদী অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের সৃষ্টি। স্থল-ভাগে দক্ষিণ বঙ্গের পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদী উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাটি বহন করিয়া যে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মোগল যুগেও সুন্দরবন অঞ্চল সুসমৃদ্ধ জনপদ ছিল।

বহু প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও যে বাংলায় মনুষ্যের বসতি ছিল প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। সম্ভবতঃ কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষেরাই ছিল বাংলার আদিম অধিবাসী। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—নিষাদ জাতি। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য দ্বারা জীবন ধারণ করিত ও গ্রামে বাস করিত। আরও কয়েকটি জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত—ইহাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় ও ব্রহ্মতিব্বতীয়।

ইহাদের পরে অপেক্ষাকৃত উন্নততর সভ্যতার অধিকারী এক শ্রেণীর লোক বাংলাদেশে বাস করে। ইহাদের সহিত

পরবর্তীকালে আর্যদের মিশ্রণের ফলেই বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই প্রচলিত মত। মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে বাংলার সকল শ্রেণীর হিন্দুরাই প্রশস্ত-শির (Brachycephalic), কিন্তু আর্যাবর্তের অন্যান্য হিন্দুগণ দীর্ঘ-শির (Dolechocephalic)। বৈদিক সাহিত্য হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে ঐ যুগে আর্যগণ বাঙালীদিগকে খুব হেয় জ্ঞান করিতেন, এই যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধর্মসূত্রেও পুণ্ড্র ও বঙ্গদেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আর্যগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এরূপ বিধান আছে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে বাঙালীরা ঠিক আর্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু আর্যগণ বঙ্গদেশে বসতি স্থাপনের পূর্বেও বাঙালীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে খুব পশ্চাৎপদ ছিল না। বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় অজয়, কুনুর ও কোপাই নদীর তীরে অনেক স্থানে ভূগর্ভ হইতে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার যে সমুদয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা যে বৌধায়ন ধর্মসূত্র রচনার বহু পূর্ববর্তী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।

মনুসংহিতা রচনার কালে (২০০ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) বঙ্গদেশ আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। মহাভারতে বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত তীর্থের নাম আছে এবং রামায়ণেও বঙ্গদেশ সমৃদ্ধ জনপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বেই যে আর্যগণের সহিত মিশ্রণের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক রীতি ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে বঙ্গদেশের কোনও ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সিংহল দেশীয় পালিগ্রন্থ 'মহাবংশে' উল্লিখিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্বে বিজয় নামক বঙ্গদেশের এক রাজপুত্র লঙ্কা দ্বীপের রাজা হন, ঐ দেশে এক বাঙালী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ সিংহবাহুর নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হয় সিংহলদ্বীপ। এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মহাভারতে বঙ্গদেশের কয়েকটি রাজ্যের ও রাজার উল্লেখ আছে—কিন্তু ইহাদের বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন গ্রীক বীর আলেক্‌সান্দর ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন তখন 'গঙ্গরিডই' জাতি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিল ('গাঙ্গরিদাই' দ্র)। অধিকাংশ গ্রীক লেখকের মতে এই জাতি ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী ভূভাগে বাস করিত এবং পশ্চিমদিকের বিহার রাজ্যও তাহাদের অধীনে ছিল। সুতরাং ইহা মনে করা অসংগত হইবে না যে আলেক্‌সান্দরের সময় বাংলার রাজা প্রথমে মগধদেশ জয় করেন এবং পরে পঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় যে, বাংলার এই সাম্রাজ্যই ঐতিহাসিক যুগে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে বঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজন স্বাধীন রাজা মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন এবং ওড়িশার এক অংশ গোপচন্দ্রের অধীনে ছিল। ইহার অনতিকাল পরে বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক ('শশাঙ্ক' দ্র) পশ্চিমে কান্যকুব্জ এবং দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশের ইতিহাস পাল, সেন প্রভৃতি রাজবংশের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে ('পাল বংশ' ও 'সেন বংশ' দ্র)। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে মুসলমানেরা বঙ্গদেশ জয় করে ('বখতিয়ার খিলজী' দ্র)। পরবর্তী তিনশত বৎসর মাঝে মাঝে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও অধিকাংশ সময়ই বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল ('গৌড়' দ্র)।

মোগল সম্রাট আকবর বঙ্গদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গদেশ প্রায় স্বাধীন রাজ্য ছিল ('মুর্শিদকুলি,' 'আলীবর্দী খাঁ' দ্র)।

সিরাজউদ্দৌলাকে ('সিরাজউদ্দৌলা' দ্র) পরাজিত করিয়া ইংরেজ ক্রমে ক্রমে এই দেশে স্বীয় অধিকার প্রবর্তন করে ('ক্লাইব' ও 'হেস্টিংস' দ্র)।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীনতা হইতে মুক্ত হয় এবং বঙ্গদেশ স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

বঙ্গ[২] পশ্চিমবঙ্গ ও পাকিস্তান দ্র

বঙ্গচন্দ্র রায় (১৮৩৯-১৯২২ খ্রী) ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ষোলজন শ্রেষ্ঠ প্রচারকদের ভিতর বঙ্গচন্দ্র অন্যতম। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট ঢাকার অন্তর্গত পাঁচগাঁ গ্রামে বঙ্গচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামগতি রায়।

তিনি কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়ে, ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যেই বন্ধুদের লইয়া তিনি 'মনোরঞ্জিকা সভা' গঠন করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরনাথ গুপ্ত ঢাকা 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র প্রধান শিক্ষক হইয়া কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হন। তাঁহার সাধু সংস্পর্শ ও উপাসনা বঙ্গচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রস্ফুটিত করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অঘোরনাথের আদর্শে

তিনি ঢাকা 'পগোজ স্কুলে' শিক্ষকতায় এবং ছাত্র ও বন্ধুদের লইয়া ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র ঢাকায় আসিলে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্গচন্দ্র জীবন্ত জাগ্রত ভগবানে বিশ্বাসী হইয়া ওঠেন। কেশবচন্দ্র ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ব্রহ্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গচন্দ্রকে তাহার পরিচালনা ও উপাসনার ভার দিয়া আসেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গচন্দ্র চাকরি ছাড়িয়া দিয়া উপাসনা, প্রচার ও সমাজসেবায় মন দেন। তিনি 'শুভসাধিনী' নাম দিয়া এক পয়সার সংবাদপত্র ও 'বঙ্গবন্ধু' নামে ধর্মবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং 'Boys' Academy' নামে একটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনাভার নেন। তিনি 'The East'নামে একটি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈস্ট বেঙ্গল প্রেস ক্রয় করিয়া তিনি পুস্তকাদি প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে যে আন্দোলন হয় তাহাতে বঙ্গচন্দ্র অটলভাবে কেশবচন্দ্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২ অক্টোবর বঙ্গচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

দ্র বঙ্গচন্দ্র রায়, আমার জীবনালেখ্য, ঢাকা।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিবার যে সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তাহার প্রতিবাদে বাংলাদেশে তৎকালে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আলোড়ন ও আন্দোলন দেখা দেয় তাহা ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জনের শাসনকালে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সেক্রেটারি রিজ্‌লী-স্বাক্ষরিত এক পত্রে বাংলা সরকারের কাছে প্রস্তাব করা হয় যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হউক। এই প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে এক তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হয়। পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সভা অনুষ্ঠান করিয়া সরকারি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করে। প্রতিবাদের প্রচণ্ড বেগ লক্ষ্য করিয়া বড়লাট লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফর করিলেন (১৯০৪ খ্রী, ফেব্রুয়ারি)। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জানা যায় যে ভারত সচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে সম্মতি দিয়াছেন। ৭ জুলাই সিমলা হইতে সংবাদ আসিল যে, আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, দার্জিলিং ও সমস্ত রাজশাহী বিভাগ একত্র করিয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে ও সেই প্রদেশের শাসনভার একজন স্বতন্ত্র ছোটলাটের উপর ন্যস্ত থাকিবে। আপাততঃ এই প্রদেশ কলিকাতা হাই কোর্টের অধীন থাকিবে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে নূতন চীফ কোর্ট স্থাপিত হইবে। ঢাকা শহর হইবে এই নবপ্রদেশের রাজধানী। এই সংবাদ ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জাতি ক্রোধে ও বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। পরদিন ৮ জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনকালে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই প্রকারে বঙ্গভঙ্গে আপত্তি করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুলাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফত ইংরেজের বিরুদ্ধে সামগ্রিক বয়কট যুদ্ধ ঘোষণা করিল। 'বয়কট' মন্ত্রপ্রচারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও মতিলাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন নিজ নিজ পত্রিকা মারফত। 'সঞ্জীবনী' প্রচারিত 'বয়কট' মন্ত্রে সাড়া দিয়া বাংলার জেলায় জেলায়, শহরে ও মফঃস্বলে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ২০ জুলাই সিমলা হইতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক চূড়ান্ত প্রস্তাব ঘোষণার সময় বলা হইল যে আগামী ১৬ অক্টোবর বঙ্গবিভাগের দিন ধার্য হইয়াছে।

সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদ ঘোষণার উদ্দেশ্যে ৭ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে এক ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হইল। সভার পৌরোহিত্য করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। অবিসংবাদিতভাবে 'বয়কট' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ দ্বি-খণ্ডিত হইল। বাঙালী জাতির জাগ্রত স্বদেশপ্রেম এই অবমানকর পরিস্থিতিকে রোধ করিবার জন্যে সর্বশক্তি লইয়া আগাইয়া আসিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাংলার জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলন বিশেষ কোনও শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯০৫-এর এই আন্দোলন শুধু বাংলার শহরে মফঃস্বলে সীমিত ছিল না, ইহার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ইত্যাদি অঞ্চলেও শ্রুত হয়। আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ শাসকবৃন্দ দমননীতির আশ্রয় লইলেন। ১০ অক্টোবর কার্লাইল সার্কুলার জারি হইল। ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক সভা বা বক্তৃতা ও পিকেটিং হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা ছিল ইহার উদ্দেশ্য। কার্লাইল সার্কুলার-এর প্রতিবাদে নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে বাংলার যুব সম্প্রদায় গঠন করিলেন 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'। আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'ডন সোসাইটি' আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিক পরিস্ফুট করিতে সাহায্য করে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে রূপান্তরিত হইল। এই ব্যাপারে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল সর্বাগ্রগণ্য।

প্রথম দিকে বয়কট আন্দোলনের প্রধান সংকল্প ছিল বিলাতি মাল বর্জন। আন্দোলনের প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে 'বয়কটের' অর্থ ক্রমশই গভীরতর ও ব্যাপকতর হইয়া পড়িয়া-

ছিল। ১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে বয়কটের মর্মার্থ দাঁড়াইল বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী বিচারালয় বর্জন, বিদেশী স্কুল কলেজ বর্জন ও বিদেশী শাসন বর্জন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষ বয়কটের এই নব তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। বয়কটের সদর্থক দিক ছিল স্বাদেশিকতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামেও প্রখ্যাত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনের আর একটি আদর্শ ছিল 'জাতীয় শিক্ষা'। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ মার্চ কলিকাতায় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয় এবং আগস্ট মাসে ইহার পরিচালনায় স্থাপিত হয় 'বেংগল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল'। অরবিন্দ ঘোষ হইলেন এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হইলেন ইহার প্রথম তত্ত্বাবধায়ক। বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার মৌলিক দাবী লইয়া যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাত সেই আন্দোলনের চেহারা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হইল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতির কণ্ঠ হইতে 'স্বরাজের' ধ্বনি উচ্চারিত হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে চরমপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটিল। বিপিনচন্দ্র অরবিন্দ পরিচালিত ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা ছিল এই দলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার-বাহন।

বাংলাদেশে এই সময় সন্ত্রাসবাদেরও অভিব্যক্তি ঘটিল। বিপ্লবী দলের মুখপত্র ছিল সাপ্তাহিক 'যুগান্তর পত্রিকা'। হিংসাত্মক কর্মনীতির দ্বারা এবং প্রয়োজন মত সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ প্রশস্ত করাই ছিল এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য।

আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান তেজ ও শক্তি লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ সরকার প্রচণ্ড চণ্ডনীতির আশ্রয় লইলেন।

বড় বড় নেতারা ধৃত ও নির্বাসিত হইলেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির কণ্ঠও ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া আসিল। আন্দোলনের গতিবেগ প্রকাশ্য হইতে রূপ লইল নেপথ্যে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইল আরও বেশি। দমননীতির দ্বারা বৈপ্লবিক শক্তিগুলিকে ধ্বংস করার কাজে ইংরেজ সরকার এই সময় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বাঙালীর জাতীয় হতাশা ক্ষোভকে প্রশমিত করিবার জন্য ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর দিল্লীদরবারে নূতন ঘোষণার দ্বারা বঙ্গভঙ্গ রহিত করিলেন।

দ্র হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ, ১৯৬১

হরিদাস মুখোপাধ্যায়
উমা মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জাতীয় সমস্যা হিসাবে ভারতে গ্রন্থাগারের কথা প্রথম বিবেচিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাঁও শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ৩৯তম অধিবেশনে। ঐ শহরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর নিখিলভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই অধিবেশনে বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করেন ও তাহা পাশ হয়। প্রতিনিধিবর্গ ফিরিয়া আসিয়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের খসড়া তৈয়ারি করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এই উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান জে. এ. চ্যাপ্‌ম্যানের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি ও সুশীলকুমার ঘোষকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া 'অল বেংগল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন'-এর কর্ম পরিষদ গঠিত হয়। এই ২০শে ডিসেম্বরই বর্তমানে গ্রন্থাগার দিবসরূপে পালিত হইয়া আসিতেছে।

ইহার পর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ও ২২ জানুয়ারি প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মহাশয়ের সভাপতিত্বে এলবার্ট হলে গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ নভেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে বরোদা রাজ্যের লাইব্রেরিসমূহের কিউরেটার নিউটনমোহন দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দ্বিতীয় অধিবেশনে গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয় ও 'অল বেংগল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন' নামের বদলে নাম রাখা হয় 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ'। ইহার পর পরিষদের কর্মপ্রবাহে কিছুদিন ভাটা পড়ে। অবশেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও তিনকড়ি দত্ত, এস. এন. রুদ্র ও এ. এম. এফ. ওয়াহেব সাহেবের সম্পাদকত্বে কর্মপরিষদ পুনর্গঠিত হয় ও গ্রন্থাগার পরিষদের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। গ্রন্থাগার পরিষদ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একুশ আইনে রেজিস্ট্রীকৃত হয় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুন।

বর্তমানে গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপদ্ধতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। প্রাথমিক গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণকেন্দ্র হিসাবে ইহার উদ্যম প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

দ্র কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী, কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ; *Bengal Library Association Bulletin*, Vol. IX, 1951-52.

কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পরিষৎ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ঃ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ২৩ তারিখে, কলিকাতা—শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে বিনয়কৃষ্ণ দেব-

বাহাদুরের ২১২ নম্বর ভবনে এল লিওটার্ড ও ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর সুমহান উদ্যোগে বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তারসাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম দিকে প্রতি রবিবার ও পরে পনের দিবস অন্তর একাডেমিটির অধিবেশন হইত। সভার কার্যবিবরণাদি ইংরেজী ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাটির অধিকাংশ ইংরেজীতেই লিখিত হইত। একাডেমি অফ্ লিটারেচারের কার্যকলাপে এইরূপ ইংরেজীর বহুলতায় জাতীয় সাহিত্যানুরাগী কোনও কোনও সভ্য আপত্তি করেন। একাডেমি অফ্ লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তিসূচক কথা উত্থিত হয়। এই হেতু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে ১৩০১ বঙ্গাব্দে ১৭ বৈশাখের অধিবেশনে একাডেমি অফ্ লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। ঐ ১৭ বৈশাখের অধিবেশনেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনরূপে বিবেচ্য। সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আরম্ভে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৩৪৮ হইয়াছিল। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত গুপ্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু এই এগার জন সভ্যের স্বাক্ষরিত এবং সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর নিকটে প্রেরিত এক পত্র অনুসারে পরিষদের কার্যালয় কোনও সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে স্থানান্তরিত করিবার জন্য ৩ ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারি) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। বিরুদ্ধবাদী সভ্যগণ সভাস্থল ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সভ্যগণের সকলের সম্মতিক্রমে পরিষদকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তৎপরদিন পরিষদের কার্যালয় ১৩৭।১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাড়িতে লইয়া যাওয়া হয়। স্থান পরিবর্তনের ফলে পরিষদের সভ্যসংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি লাভ করে। সপ্তম বর্ষের শেষে সভ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৫২৩। সভ্যসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত কার্যক্ষেত্রের প্রসারও দিন দিন বাড়িতে থাকে। ভাড়াটিয়া বাড়িটিতে পরিষদের স্থানের অকুলান হয়। প্রশস্ত ভূমির উপর আপনার উপযোগী অধিষ্ঠান-ভবন নির্মাণ না করিলে পরিষদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ চারুচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষদের এই পাঁচজন সভ্য কাশিমবাজারে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট উপস্থিত হইয়া ভূমি প্রার্থনা করিলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ পরিষদকে হালশীবাগানে আপার সার্কুলার রোডের উপর পাঁচ কাঠা ভূমি দান করিতে সম্মত হন। কিছু দিন পরে মহারাজ ভূমির পরিমাণ আরও প্রায় দুই কাঠা বাড়াইয়া দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট তারিখে দলিল লেখাপড়া হয়। পরিষদের পাঁচজন সভ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায়-চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই পাঁচজন—পরিষদের পক্ষ হইতে ন্যাসরক্ষক নির্বাচিত হইলেন এবং মহারাজ এই ট্রাস্টীদের অনুকূলে হালশীবাগান রোড ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থানে ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখিয়া রেজিস্টারি করিয়া দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পরিষদের জমি এককালে উমিচাঁদের বাগানবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১৯ অগ্রহায়ণ পরিষদের কার্যালয় ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে নূতন মন্দিরে স্থানান্তরিত এবং ২১ অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সাতাশ হাজার টাকা ব্যয়ে পরিষদ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরের দ্বিতল নির্মাণের সমগ্র ব্যয় ১০০৫৮ টাকা একাই বহন করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ নিবাসী রায় শ্রীনাথ পাল পরিষদের নিম্নতলের হল, প্রধান দ্বারের সম্মুখ ভাগ এবং কুঠরিদ্বয় মণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুট মূল্যবান মার্বেল প্রস্তর দান করেন। প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় সাহিত্যিকগণের মূর্তি বসাইবার বেদীগুলি মণ্ডিত করিবার জন্য প্রায় একশত বর্গফুট উৎকৃষ্ট মর্মর-প্রস্তর দান করিয়াছিলেন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সাহিত্য পরিষদ হইতে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর উদ্যোগে রমেশচন্দ্রের স্মৃতি-রক্ষার্থে রমেশচন্দ্র সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। বরোদার মহারাজ সয়াজীরাও গায়কোয়াড় বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে ৫০০০ টাকা দান করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদের সংলগ্ন ৭ কাঠা ভূমি দান করেন। লর্ড কারমাইকেল ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রমেশ ভবনের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ৭ ভাদ্র ১৩৩৮ তারিখের সাধারণ অধিবেশনে 'রমেশ ভবন কমিটি' পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতির উপর রমেশ ভবনের কার্য পরিচালনার সমুদয় ভার অর্পণ করেন।

১৩৪২ বঙ্গাব্দে রমেশচন্দ্রের দৌহিত্রী লেডী প্রতিমা মিত্র, বর্ধমানের মহারাজ ও পরিষদের বহু হিতৈষী বন্ধুর উদ্যোগে রমেশ ভবনের দ্বিতল নির্মাণোদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের সংকল্প গৃহীত হয়। এঞ্জিনিয়ার চন্দ্রকুমার সরকারের পরি-

কল্পনায় দ্বিতল নির্মাণ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে শেষ হয়; ঐ বৎসর ২৫ ফাল্গুন বর্ধমানাধিপতির সভাপতিত্বে রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিভিন্ন উপায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধনই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য। গত ৭৫ বৎসর যাবৎ পরিষদ বিভিন্ন ভাবে বঙ্গসাহিত্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া আসিতেছে। বঙ্গভাষার সমৃদ্ধির ইতিহাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কীর্তি চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলা ভাষায় নানা বিষয়ের গবেষণার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া পরিষদ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছে। সংস্কৃত আরবী ও ইংরেজী ভাষা হইতে বহু সদ্‌গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশ করা পরিষদের অন্যতম কার্য।

দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ, সাহিত্য ও গবেষণা নিয়মিত পুস্তকাকারে প্রকাশ করা পরিষদের অন্যতম কার্যক্রম। পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির 'বাংলা শব্দকোষ', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্র ও রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে পরিষদ বরাবরই অত্যন্ত সজাগ এবং বিগত ইতিহাসে এই বিষয়ে পরিষদের মূল্যবান প্রস্তাব ও সংশোধনসমূহ শিক্ষা-বিভাগ গ্রহণ করিয়াছে।

সদস্য ঃ পরিষদে পাঁচ রকমের সদস্য হইবার বিধি রহিয়াছে। বান্ধব, বিশিষ্ট, আজীবন, সহায়ক ও সাধারণ। বাংলা সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেই পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন। সাধারণ সদস্যের প্রবেশিকা ১ টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ১২ টাকা। আজীবন সদস্যের দেয় চাঁদা এককালীন ২৫০ টাকা।

সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ঃ ১৩০১ বঙ্গাব্দেই মুখপত্র-স্বরূপ এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের সূচনা হয়। সকল সদস্য ইহা বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। এই পত্রিকায় গত ৭৫ বৎসরে পরিভাষা, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা (ডায়ালেক্‌ট) এবং বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে বহু অসামান্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

চিত্রশালা ঃ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসভার অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শিল্প-ও-কৃষি-প্রদর্শনীতে শিক্ষাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পরিষদ কতকগুলি প্রাচীন দ্রব্য, যথা—তাম্র- ও প্রস্তর-লিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরাদির ফটো, অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি, প্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক ও প্রাচীন পুথি— ঐ প্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ফলে স্থির হয় যে, পরিষদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির ও লোকশিক্ষার জন্য পরিষদ-মন্দিরে এক চিত্রশালা স্থাপন করিতে হইবে। প্রথমে পরিষদ কার্যালয়ের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে চিত্রশালার পুনর্বিন্যাস করিবার জন্য সরকারি সাহায্য পাওয়া যায় এবং রমেশ ভবনের দ্বিতলে চিত্রশালা স্থানান্তরিত হয়। চিত্রশালার বিভিন্ন বিভাগগুলির ক্রম এইরূপ, যথা, প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তরমূর্তি, ধাতুমূর্তি, তাম্রশাসন, প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তলিপি—পত্র ও দানপত্রাদি, প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডুলিপি (বিখ্যাত লেখকদিগের রচনা) ও প্রাচীন দলিল।

পরিষদ-গ্রন্থাগার ঃ বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে বর্তমানে পরিষদ-গ্রন্থাগারে যে সকল দুর্লভ প্রাচীন পুস্তক-পুস্তিকা সংগৃহীত হইয়াছে, বাংলাদেশের অপর কোনও বেসরকারি গ্রন্থাগারে তাহা একত্র পাইবার উপায় নাই। এই গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধিসাধনে অনেকে তাঁহাদের পারিবারিক পুস্তক-সংগ্রহ দান করিয়াছেন। পরিষদের নিজস্ব সঞ্চয়, উপহারপ্রাপ্ত ও দানলব্ধ পুস্তকাদি ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ দেব, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমসুন্দর বসু ও যতীন্দ্রনাথ পালের সাতটি মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ পরিষদ-গ্রন্থাগারের অঙ্গীভূত হওয়ায় উহা বাংলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সংগ্রহে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছে।

পুথিশালা ঃ প্রথম বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে ৮ আশ্বিন, ১৩০১ বঙ্গাব্দে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিষদ প্রাচীন বাংলা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ কার্যে প্রবৃত্ত হয় ও দীর্ঘদিন তাহাতে ব্যাপৃত রহিয়াছে। বর্তমানে পুথির সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একমাত্র পুথি পরিষদে সংরক্ষিত। তিব্বতী তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর গ্রন্থমালার পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে।

সাহিত্য সম্মেলন ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ পরিষদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য সম্মেলন আহূত হইত। প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ১৭।১৮ কার্তিক, ১৩১৪ বঙ্গাব্দে কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মূল সভাপতি হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সর্বশেষ সম্মেলন আহূত হয়।

শাখা-পরিষদ ঃ ১৩১১ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতার বাহিরে পরিষদের শাখা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দে রংপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে বাংলার বিভিন্ন জেলা শহরে ও বাংলার বাহিরে সর্বসমেত ৩০টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি শাখা এখনও জীবিত।

গচ্ছিত তহবিল ঃ গ্রন্থ-প্রকাশ, পদক- ও পুরস্কার-দান, দুস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার গঠন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে সহায়তা

করিবার জন্য অনেক মহানুভব ব্যক্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে গচ্ছিত তহবিল (Endowment Funds) স্থাপন করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লালগোলা তহবিলের ও নরসিংহ মল্লদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের আয়ে বহু প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থ, মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিকের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পুলিনবিহারী দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারের আয় হইতে বহু দুস্থ সাহিত্যিক পরিবারকে অর্থসাহায্য করা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।

১৩০১ বঙ্গাব্দে পরিষদের সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক ছিলেন এল. লিওটার্ড, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সভাপতি ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন ও চন্দ্রনাথ বসু এবং সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। ইহার পরে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করিয়াছেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদ পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

বঙ্গোপসাগর ভারতমহাসাগরের একাংশ। ইহা ১০° উত্তর অক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত এবং সিংহল, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপকূল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ঐ দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে আন্দামান সাগর।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মহীঢালের গভীরতা ২৩২০ ফ্যাদম (১ ফ্যাদম=৬ ফুট), কিন্তু উত্তরে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর বদ্বীপের নিকট জলের গভীরতা খুব কম। আন্দামান সাগরের পশ্চিমে সমুদ্রগর্ভস্থ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কার্পেণ্টার পর্বত; সমুদ্রগর্ভ হইতে উহার উচ্চতা প্রায় ১২০০ ফ্যাদম। গঙ্গার মোহানার নিকট বঙ্গোপসাগরের অভ্যন্তরে একটি গভীর উপত্যকা আছে। জলের গভীরতা যে স্থানে ১০ ফ্যাদম, ইহা সে স্থান হইতে নির্গত হইয়া মহীঢালকে ক্ষয় করিয়া ৩৩০ ফ্যাদম গভীরতায় শেষ হইয়াছে। মহীঢালস্থিত নদীগর্ভতুল্য উক্ত নালীটি উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত।

বঙ্গোপসাগরে বৃহৎ কয়েকটি নদী পতিত হওয়ায় ভারতমহাসাগরের সহিত ইহার পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। সমুদ্রতলের অধিকাংশই ভূপৃষ্ঠ-জনিত মৃত্তিকায় আবৃত। অনুমান যে, ক্রমাগত মৃত্তিকা জমিবার ফলে সমুদ্রের দিকে প্রসারিত মহীঢালের অংশ ৪০ বৎসরে ১ মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। নদীবাহিত পলিমাটির জন্য প্রবালের সৃষ্টি হয় না। সমগ্র ভারত মহাসাগরে প্রবালস্তূপ বা শৈল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গোপসাগরে উহার কোনও অস্তিত্ব নাই। ইহা ব্যতীত অনেকগুলি বড় নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়ায় উহার উপরিভাগের জলের লবণাংশ অন্যান্য সমুদ্রজলের তুলনায় কম; বর্ষার শেষে কয়েক মাস জলের লবণাংশ আরও কমিয়া যায়।

বঙ্গোপসাগরের স্রোতের গতি উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময় প্রশান্ত মহাসাগর হইতে একটি প্রবল সমুদ্রস্রোতের শাখা মালাক্কা প্রণালীর মধ্য দিয়া আন্দামান সাগরে আসে এবং অতঃপর উহা বঙ্গোপসাগরের স্বল্প লবণাক্ত জলে মিশিয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। ইহা ব্যতীত একটি ভিন্নমুখী নিরক্ষীয় স্রোত পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত হয়। ইহাতে লবণাংশ বেশি থাকায় স্রোতটি বঙ্গোপসাগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর সময়ে বঙ্গোপসাগরের উপরিভাগে উত্তর ও পূর্ব দিকে একটি স্রোত বহিতে থাকে। ইহা ব্যতীত ভারতের পূর্ব উপকূলে দক্ষিণমুখী একটি স্রোতও বহিতে থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় বঙ্গোপসাগরের পূর্ব দিকে প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে।

দ্র R. B. S. Sewell, 'The Oceans Round India', *An Outline of the Field Sciences of India, Indian Science Congress Association*, Calcutta, 1937; W. G. Kendrew, Climates of the Continents, Oxford, 1953.

মীরা গুহ

বট মোরাসিঈ গোত্রের (Family-Moraceae) অন্তর্ভুক্ত বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বৃহৎ বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফিকস বেংগালেন্সিস (Ficus Bengalensis)। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে বটগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের সবল কাণ্ড ও শাখা হইতে উৎপন্ন মোটা মোটা অস্থানিক মূল ('স্তম্ভ-মূল') গাছটিকে খাড়া হইয়া থাকিতে সাহায্য করে। পাতা স্থূলাগ্র ও চিক্কণ। গোলাকার ফলগুলি সুপক্ব অবস্থায় রক্তবর্ণ। বটগাছের কাষ্ঠ হইতে সাধারণ তৈজসপত্র, বাক্স, জানলা-দরজা, লাঙ্গল প্রভৃতি এবং স্তম্ভ-মূল হইতে ছাতার হাতল, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। বাকল হইতে একপ্রকার তন্তু পাওয়া যায়; বাকল হইতে রবারও প্রস্তুত করা হয়। কোনও কোনও স্থানে কচিপাতা, কাণ্ডশীর্ষ ও ফল খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। পথপার্শ্বে ছায়াদানের জন্যও এই গাছ রোপণ করা হয়। হিন্দুদের নিকট বটগাছ পবিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫২।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

বড়নগর ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আজিমগঞ্জ রেল স্টেশন হইতে ১ মাইল উত্তরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার একটি গ্রাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বড়নগর নাটোরের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নাটোর রাজবংশের (স্বনামধন্যা) রাণীভবানীর আনুকূল্যে নির্মিত চারবাংলা ও ভবানীশ্বর মন্দিরের জন্যই বর্তমানে বড়নগর প্রসিদ্ধ।

মন্দির দুইটির নির্মাণকাল সম্ভবতঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। চারবাংলা বস্তুতঃ ৪টি মন্দিরের সমষ্টি ; একটি অঙ্গনের চারিদিকে এক একটি ইষ্টকনির্মিত মন্দির অবস্থিত। প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিবলিঙ্গ। মন্দিরগুলির আকৃতি বাংলা বা দোচালা ঘরের ন্যায়।

আয়তনে ২৪ ফুট হইতে ২৪ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি হইতে ৯ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া ; সম্মুখভাগে তিনটি করিয়া পলকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ। মন্দিরগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য অতীব উচ্চমানের টেরাকোটা মূর্তিভাস্কর্য ও নক্সা-অলংকরণের সমাবেশ। উত্তরের ও পশ্চিমের মন্দির দুইটির অলংকরণ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়।

সুউচ্চ ও অভিনব আকৃতির ভবানীশ্বর শিবের মন্দিরটিও ইষ্টকনির্মিত। ইহার আসন অষ্টকোণাকার ; প্রতি পার্শ্বেই এক একটি আচ্ছাদিত বারান্দা ও খিলানযুক্ত প্রবেশ-পথ। মধ্যস্থল অষ্টকোণ ঘণ্টাকৃতি (বা পদ্মাকৃতি) গম্বুজদ্বারা আচ্ছাদিত ; বারান্দার ছাদ ঢালু। মন্দিরটি ৫০ ফুট উচ্চ ; বারান্দার দেয়ালে কিছু টেরাকোটা অলংকরণ আছে কিন্তু চারবাংলার ন্যায় উচ্চমানের নহে। নিকটবর্তী মদনগোপালের মন্দিরও দ্রষ্টব্য। ইহা সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে নির্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে পালযুগের ব্রোঞ্জ-নির্মিত একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি বিগ্রহ রূপে স্থাপিত বলিয়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বিবরণীতে উল্লেখ রহিয়াছে।

দ্র নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী; কলিকাতা, ১৩১০ বঙ্গাব্দ ; Gurudas Sarkar, Baranagar Temples in Murshidabad; Rupam, 19-20, Calcutta, 1924; Archaeological Survey of India, Annual Report, 1923-24.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

বড়ে গোলাম আলী খাঁ ঃ (১৯০২-১৯৬৮ খৃী) লাহোরে ১৯০২ (মতান্তরে ১৯০১) খৃীষ্টাব্দে জন্ম। পিতা আলীবক্স ও পিতৃব্য ভারতবিখ্যাত ওস্তাদ কালে খাঁর কাছে তিনি সংগীত-শিক্ষা গ্রহণ করেন ; এতদ্ব্যতীত আসিক আলীর কাছেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাঁহাকে পাতিয়ালা ঘরানার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১৯ খৃীষ্টাব্দে লাহোর সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি প্রথম প্রকাশ্যভাবে গান করেন। পরে তিনি ভারতের সর্বত্র অগণিত সম্মেলনে আসরে ও আকাশবাণীতে সংগীত পরিবেশন করেন। খেয়াল, ঠুংরী এবং বিভিন্নপ্রকার পাঞ্জাবী গীতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল। এ ছাড়া কাওয়ালীতেও তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। সংগীতে তাঁহার একটি স্বকীয় পদ্ধতি ছিল যাহা কোনও ঘরানার প্রভাবান্বিত নহে। ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন এবং সংগীত নাটক আকাদেমি তাঁহাকে ফেলো নির্বাচিত করেন। ১৯৬৮ খৃীষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল রাত্রে ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বতিচেল্লি, সান্দ্রো (আনুমানিক ১৪৪০/৪৪—১৫১০ খৃী) ফ্লোরেন্টাইন চিত্রশিল্পী ; প্রকৃত নাম আলেসান্দ্রো দি মরিয়ানো দিভান্নি ফিলিপেপি ; ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পির শিষ্য মেদিচির লোরেন্‌জো পরিবার ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনে সবিশেষ দক্ষতা অর্জনের পর ইনি প্রথমে ধর্মবিষয়ক (সেণ্ট সিবাস্টিয়ান, রিটার্ন অব দি জুডিথ ইত্যাদি) চিত্র অঙ্কন করেন এবং পরে বিশ্বাসী খৃীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও পৌরাণিক কাহিনী এবং গ্রীক দেব-দেবীর চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হন।

তিনি নিঃসন্দেহে ইটালীয় রেনেসাঁসের আদিপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁহার 'নব বসন্ত' (Prima vera) এবং 'ভেনাসের জন্ম' এই দুইখানি চিত্রে ছন্দ ও গতির সুষমাস্পর্শের উত্তাপ এবং সংগীতের উল্লাস প্রায় অলৌকিক পরিণতি লাভ করিয়াছে। প্রচারক সাভোনারোলার প্রভাবে বতিচেল্লি পুনরায় ধর্মীয় জগতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি হইল 'ম্যাডোনা অব দি ম্যাগ্‌নিফিকাট', 'করোনেশান অফ দি ভার্জিন', 'নেটিভিটি', 'এডোরেশন অফ দি মেজাই' ইত্যাদি।

১৪৮১ খৃীষ্টাব্দে তিনি সিস্টাইন চ্যাপেলে চিত্রাঙ্কন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং শেষ জীবনে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'র চিত্রগুলি আঁকিয়াছিলেন।

দ্র Walter Pater, *The Renaissance*, London, 1925; Vasari, *Lives*, A. B. Hinds, tr., vol. II, London, 1927; Berenson, *Italian Painters of the Renaissance*, London, 1959.

কল্যাণী দত্ত

বদ্রীনাথ (৩০° উত্তর ৭৯° ৩০′ পূর্ব) হিন্দুদের প্রধান চারিটি তীর্থের অন্যতম। তীর্থমাহাত্ম্যে বদ্রীনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও মহাভারতে এই তীর্থ সম্পর্কে বহু উল্লেখ আছে। মানার নিকট সরস্বতী নদীর কাছে

ব্যাসশিলাতে ব্যাসদেবের আশ্রম ছিল এবং এখানেই তিনি চতুর্বেদ লেখেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস—পুরাণেও সেইরূপ বলা হয়। উত্তর প্রদেশের গাড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত ৭০৭৩ মিটার উচ্চ বদ্রীনাথ শৃঙ্গের এক ঢালে ৩১২২ মিটার উচ্চে বদ্রীনাথ তীর্থটি অবস্থিত। ইহা নর, নারায়ণ প্রভৃতি পর্বত দ্বারা বেষ্টিত। ইহার সম্মুখেই নীলকণ্ঠ শিখর। ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি এখানে পদ্মাসন বা যোগমূর্তি। গাড়ওয়ালের রাজা বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া মূর্তিটি স্থাপিত করেন। মন্দিরের উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। কথিত আছে শঙ্করাচার্যের আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তি এই স্থলেই হয়।

অলকানন্দার দক্ষিণ তীরে তিন মাইল লম্বা ও এক মাইল চওড়া প্রশস্ত উপত্যকাতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি ১৫ মিটার উচ্চ, শঙ্কু-আকৃতি, উপরে একটি ছোট চন্দ্রাতপ, তাহার ঊর্ধ্বে গিল্টিকরা বৃত্ত ও চূড়া। মন্দিরের দুইটি অংশ—ভিতরের অংশটি পুরানো, কোনও কারুকার্য নাই। বাহিরের অংশটি বা ভোগমন্দিরটি পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর একটি মন্দির আছে। বিষ্ণু বা বদ্রীনাথের পদ্মাসন মূর্তির পার্শ্বে উদ্ধব নারদ ও অন্যান্য মূর্তি আছে। পূর্বে দণ্ডী, সন্ন্যাসী মহান্তরা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পূজারীর কাজ করিত। বর্তমানে উহা রাওল (দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণ)-এর হাতে।

উত্তর প্রদেশ সরকার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বদ্রীনাথ মন্দির অ্যাক্ট' প্রণয়ন করিয়া নির্বাচিত ও মনোনীত ১২ জন সদস্যের হাতে মন্দির পরিচালনার ভার দেন। রাওলের শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই অধিকার আছে। মন্দিরের আয় ৬ লক্ষ টাকারও অধিক। বদ্রীনাথ মন্দির কমিটি রাস্তাঘাটের উন্নতি, বিজলীবাতির ব্যবস্থাপন, ধর্মশালা ও যাত্রীদের থাকিবার স্থান নির্মাণ করিয়াছেন। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে নভেম্বর মাস অবধি ঐ মন্দির খোলা থাকে। কালীপূজার পর বদ্রীনাথের প্রতীক মূর্তিটিকে যোশীমঠে আনা হয়। শীতের চারিমাস এস্থান বরফে আবৃত থাকে বলিয়া লোকজনও সব নামিয়া আসে।

বর্তমানে দুই দিনেই হরিদ্বার হইতে বাসেই বদ্রীনাথে পৌঁছানো যায়। তদুপরি অপরদিকে নানা গ্রামে সামরিক ঘাঁটি হওয়াতে রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাল। বদ্রীনাথের স্থিতি পূর্বে আদি বদ্রীতে ছিল। পঞ্চকেদারের মত পঞ্চবদ্রীও আছে।

দ্র Govind Prasad Nautiyal, *Call of Badrinath*, U.P., 1962.

কমলা মুখোপাধ্যায়

বধিরত্ব শ্রবণশক্তির অভাব। কর্ণের বিভিন্ন অংশের রোগের ফলে বধিরত্ব জন্মায়। খইল বা বিজাতীয় পদার্থে অথবা প্রদাহের ফলে বহিঃকর্ণের ছিদ্রপথ বন্ধ হইয়া কর্ণে শব্দপ্রবেশ ব্যাহত হইলে, কর্ণপটহের বিদারণ বা মধ্যকর্ণের প্রদাহ ঘটিলে অথবা অন্য কোনও কারণে কর্ণের শব্দবাহী অংশের কার্যে বাধার সৃষ্টি হইলে বধিরত্ব ঘটে। জন্মগত কারণে, আঘাতে বা রোগে কর্ণের শব্দগ্রাহক অংশের কার্য ব্যাহত হইলে, শ্রুতি-নার্ভের প্রদাহ ঘটিলে বা বহুকাল অত্যধিক শব্দ শুনিবার ফলে শ্রুতি-নার্ভের কর্মলোপ হইলেও বধিরত্ব জন্মায়। 'কর্ণ' দ্র।

দ্র J. C. Ballantyne, *Deafness*, London, 1961.

জীবনকুমার সেনগুপ্ত

বনমানুষ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট (Primate) বর্গের প্রাণী। ইংরাজীতে ইহাদের 'এপ' (Ape) বলা হয়। গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং ও উল্লুক বনমানুষ বলিয়া পরিচিত। বনমানুষের সহিত মানুষের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাদের দেহ বলিষ্ঠ, লেজ নাই এবং হাত দুইটি পা অপেক্ষা সর্বদা লম্বায় বড়। বাহু এবং স্কন্ধ দৃঢ়গঠিত। পা দুইটি দেহের ভার রক্ষা করিতে পারে না। ইহাদের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের সংস্থাপন অনেকটা মানুষের মত। বনমানুষ শাকাহারী তবে কীট-পতঙ্গও ইহারা ভক্ষণ করে। ইহাদের বুদ্ধিমত্তা আছে এবং ইহারা অনুকরণে বিশেষ পারদর্শী। বনমানুষেরা শয্যাবিলাসী; সাধারণতঃ পাতা, ডালপালা দিয়া বিছানা তৈয়ারি করিয়া ইহারা ঘুমায়। রৌদ্রতাপ দূর করিবার জন্য কোনও কোনও বনমানুষ বিছানার উপর ছাউনি তৈয়ারি করে। প্রত্যেক বনমানুষের বিছানা স্বতন্ত্র; তবে বাচ্চা বনমানুষেরা মায়ের সঙ্গে ঘুমায়। বনমানুষ সাঁতার কাটিতে পারে না এবং ঘটনাচক্রে জলে পড়িয়া গেলে ইহাদের মৃত্যু নিশ্চিত। বিভিন্ন বনমানুষের বিবরণী নিম্নে দেওয়া হইল।

গরিলাঃ বনমানুষদের মধ্যে বৃহদাকার। পূর্ণবয়স্ক গরিলার ওজন প্রায় ১½ কুইণ্টাল এবং দৈর্ঘ্য ১-৩১৪ মিটার। গরিলার চিবুক ছোট, ঠোঁট পাতলা এবং কান তুলনায় ছোট। গরিলারা ছোট ছোট পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক-একটি পরিবার একজন পুরুষ, এক বা দুইটি স্ত্রী এবং কয়েকটি বাচ্চা লইয়া গঠিত। দিনের বেলায় পরিবারটি আহারসংগ্রহে ব্যস্ত থাকে, রাত্রে পুরুষ বা কর্তাগরিলা মাটিতে ঘুমায় ও পরিবারের অন্যান্যেরা গাছে ঘুমায়। কোনও অবাঞ্ছিত প্রাণী বা বিপদ আসিলে স্ত্রী-গরিলা লুকাইয়া পড়ে। পুরুষ-গরিলা উপস্থিত থাকিলে নাসারন্ধ্র প্রসারিত করিয়া ও দংষ্ট্রা বিকশিত করিয়া দুই হাতে নিজের বুক প্রচণ্ড শব্দে চাপড়ায়। বনের অন্যান্য প্রাণীরা গরিলার শত্রুতা সাধন করে না।

দুই প্রকারের গরিলা পাওয়া যায়—পাহাড়ী ও সমতলভূমিবাসী গরিলা। পাহাড়ী গরিলার গায়ের লোম কালো। আফ্রিকার কিভু হ্রদ-সংলগ্ন পাহাড়ে ও কঙ্গোর পূর্ব দিকে উগাণ্ডা পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়-অঞ্চলে ইহারা বাস করে।

সমতলবাসী গরিলার গায়ের লোম ধূসর বর্ণের এবং মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে ইহারা বাস করে।

শিম্পাঞ্জি : আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাস করে। ইহারা বনমানুষদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান এবং সহজেই পোষ মানে। মুখ, ঠোঁট ও চোখের মাধ্যমে ইহারা মানুষের ন্যায় মুখভঙ্গি করিতে পারে। পূর্ণবয়স্ক শিম্পাঞ্জি লম্বায় ১½ মিটার ও ওজনে প্রায় ৭৫ কিলোগ্রাম। গরিলার ন্যায় ইহাদের দেহের গঠন বলিষ্ঠ নয়। তবে ইহাদের দেহ পুষ্ট, মাথা বড় ও কান গরিলা অপেক্ষা আকারে বড়। পা দুইটিও গরিলার পা অপেক্ষা আকারে বড়। পায়ের বুড় আঙ্গুল বেশ লম্বা। ইহারা প্রয়োজন হইলে দুই পায়ে দাঁড়াইতে ও কিছু পথ অতিক্রম করিতে পারে। পুরুষ-শিম্পাঞ্জি একা একটি গাছে বাস করে ও পরিবারের অন্যান্যরা আশপাশের গাছে বাস করে। স্ত্রী-শিম্পাঞ্জি একবারে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। ইহাদের গড় আয়ু প্রায় ২৫ বৎসর। পশ্চিম আফ্রিকার জঙ্গলে তিন রকমের শিম্পাঞ্জি পাওয়া যায়।

ওরাং-ওটাং : বোর্ণিও ও সুমাত্রার জঙ্গলে ওরাং-ওটাং পাওয়া যায়। ইহাদের আকার বেশ বড়। পূর্ণগঠিত ওরাং-ওটাং-এর ওজন ৭৫-৮০ কিলোগ্রাম। দুই বাহুর বিস্তার প্রায় ২ মিটার, কিন্তু দেহের দৈর্ঘ্য ১½ মিটারের বেশি হয় না। ইহাদের গায়ের লোম ঘন-সন্নিবিষ্ট নয় এবং লোমের রঙ লালচে। ওরাং-ওটাং লাফ দেয় না; দুই হাতের সাহায্যে ঝুলিয়া ঝুলিয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে যায়। অপক্ক ও টক ফল ইহাদের প্রিয় খাদ্য। ওরাং-ওটাং দলবদ্ধ হইয়া বাস করে না। স্ত্রী ওরাং-ওটাং একবারে একটিমাত্র সন্তান প্রসব করে।

উল্লুক : বনমানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রকায় এবং হীনবুদ্ধি। ইহাদের দেহ কৃশ, হাত লম্বা এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় হাতের আঙ্গুল প্রায় মাটি স্পর্শ করে। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ১ মিটার ও ওজনে প্রায় ৮ কিলোগ্রাম। উল্লুক মাটিতে চলাফেরা করিতে অক্ষম, কিন্তু ক্ষিপ্রগতিতে এক গাছ হইতে অন্য গাছে যাইতে পারে। গাছের ডাল একহাতে ধরিয়া ইহারা ঝুলিতে ভালোবাসে। উল্লুক ফল, কচিপাতা ইত্যাদি ছাড়া কীট-পতঙ্গ, পাখির ডিম ও বাচ্চা পাখি খায়। মাকড়সা ইহাদের প্রিয় খাদ্য। উল্লুক তীক্ষ্ন স্বরে চীৎকার করিতে পারে। উল্লুক পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং এক পরিবারে একটিমাত্র স্ত্রী-উল্লুক থাকে। গর্ভধারণের ৭ মাস পরে স্ত্রী-উল্লুক একবারে একটিমাত্র সন্তান প্রসব করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য স্ত্রী-বনমানুষ গর্ভধারণের ৯ মাস পরে সন্তান প্রসব করে।

দুই প্রকারের উল্লুক আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভুটান, তিব্বত ও ভারতের আসাম অঞ্চলের উল্লুক (হাইলোবেটিস, Hyolobetes) আকারে ছোট। মালয়েশিয়া ও সুমাত্রার সিয়ামঙ্গ গণের (genus—Siamong) উল্লুক কৃষ্ণবর্ণ ও বৃহদাকার।

দ্র Robert Hegner, *Parade of the Animal Kingdom*, New York, 1953.

সীমানন্দ অধিকারী

বনাস, বানস রাজপুতানার একটি নদী। আরাবল্লী পর্বত হইতে (২৫°৩′ উত্তর এবং ৭৩° ২৮′ পূর্ব) উত্থিত হইয়া উত্তর-পূর্বে প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার (৩০০ মাইল) প্রবাহিত হওয়ার পর অবশেষে রামেশ্বরে চম্বল নদীতে (২৫° ৫৫′ উত্তর এবং ৭৬° ৪৪′ পূর্ব) পতিত হইয়াছে। নদীটি উদয়পুর, জয়পুর, বুন্দী, টোঙ্ক, করৌলী এবং আজমীরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নদীটির দক্ষিণ তীরে বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দির নাথদ্বার অবস্থিত। বিরাচ, খারী, কোঠারী, মাসী, ঢিল ও মোরেল ইহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপনদী। রাজমহল, টোঙ্ক, নেগরিয়ে প্রভৃতি স্থানে ফেরিঘাট আছে, বৎসরে ৪½ মাস ইহা কাজে লাগে। গ্রীষ্মকালে নদীটি প্রায় শুষ্ক থাকে।

(২) আবু পর্বতের উত্তর-পূর্বে আরাবল্লী পর্বত হইতে উত্থিত হইয়া আর একটি বনাস নদী দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে গুজরাতে প্রবাহিত হইয়া কচ্ছের রনে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৩·৭০ কিলোমিটার (১৭০ মাইল)। নিম্নভাগ গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়।

দ্র The Imperial Gazetteer of India, vol. VI, Oxford, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বন্দুক একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্র। ইহা হাতে রাখিয়া গুলি ছোঁড়া যায়। কামান-জাতীয় ভারী আগ্নেয়াস্ত্র বিবর্তিত হইয়া বন্দুক-জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

'বন্দুক' আজকাল আর সামরিক বাহিনীতে ব্যবহৃত হয় না; পরিবর্তে রাইফেল ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ কার্যনীতিতে বন্দুক ও রাইফেলের বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

রাইফেলকে সাধারণতঃ তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়ঃ প্রান্তভাগ বা বাট, মধ্যভাগ এবং অগ্রভাগ বা ব্যারেল। বাট অংশটি কাঠের তৈয়ারি। বাটের নীচের দিকে গর্ত করিয়া একটি বড় বোল্টের সাহায্যে বাট অংশটি রাইফেলের মধ্যভাগের সঙ্গে আটকানো থাকে। বাটের নীচের দিকে একটি ছোট প্রকোষ্ঠে ব্যারেল পরিষ্কার করিবার সাজ-সরঞ্জাম থাকে। প্রকোষ্ঠটি একটি পিতলের পাত দিয়া বন্ধ করা থাকে, একটু চাপ দিয়া এই পাতটি খোলা যায়। বাটের সম্মুখভাগটি পশ্চাদ্‌ভাগ অপেক্ষা সরু। সৈনিক এই অংশে হাত রাখিয়া রাইফেল ধরে।

মধ্যভাগ বা 'বডি গ্রুপ'ই রাইফেলের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং জটিল অংশ। ইহাতে থাকে বোল্ট, সেফ্‌টি ক্যাচ, ট্রিগার, ট্রিগার গার্ড, ম্যাগাজিন এবং ম্যাগাজিন-ধারক। মধ্যভাগের সর্বপ্রধান অংশটি হইল বোল্ট। ব্যারেলে গুলি ভরা, গুলি ছোঁড়া, গুলি ছুঁড়িবার পর ব্যারেলে পরিত্যক্ত ও রাউণ্ডের ফাঁকা অংশটিকে বাহির করিয়া আনিয়া ফেলিয়া দেওয়া এবং পুনরায় নূতন গুলি ভরা ইত্যাদি সকল কাজই হয় বোল্টের সাহায্যে।

সেফ্‌টি-ক্যাচ্‌টি খুলিয়া ট্রিগার টিপিলে কক্‌ খুলিয়া যায়। কক্‌ খুলিয়া গেলে স্প্রিং-এর ক্রিয়ায় কক্‌-স্পিণ্ড্‌ল্‌টি স্ট্রাইকার পিনকে আঘাত করিলে স্ট্রাইকার পিন রাউণ্ডের 'ফায়ারিং পয়েণ্ট'-এ গিয়া আঘাত করিবে। ফলে বিস্ফোরণ ঘটিবে এবং ব্যারেলের মধ্য দিয়া বুলেট ধাতব ব্যারেল গরম হইলেও রাইফেল হাতে রাখিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

ব্যারেলের উপরে ধাতু-নির্মিত একটি রেঞ্জ-স্লাইড থাকে। ইহার দ্বারা গুলি ছোঁড়ার দূরত্ব বা রেঞ্জ স্থির করিয়া লইতে হয়। ইহাতে একটি স্থির অংশ এবং একটি চলমান অংশ আছে। স্লাইডের গোড়ার দিকে U-এর ন্যায় একটি কাটা জায়গা আছে। ইহাকে 'পশ্চাদ্‌-ভাগের—U' বলে। ব্যারেলের সম্মুখে ক্ষুরধারের ন্যায় একটি ধাতব অংশ আছে (front-side nock)। পশ্চাদ্‌-ভাগের—U, উল্লিখিত ধাতব ক্ষুরধার ও লক্ষ্যবস্তু এক সরলরেখায় রাখিয়া ট্রিগার চাপিলে বুলেট লক্ষ্যভেদ করিবে। ব্যারেলের ব্যাস ০·৩০৩" ইঞ্চি। ব্যারেলের মধ্যে সমদূরত্বে পাঁচটি খাঁজ কাটা থাকে। ইহারা ব্যারেলের মধ্যে পরস্পর

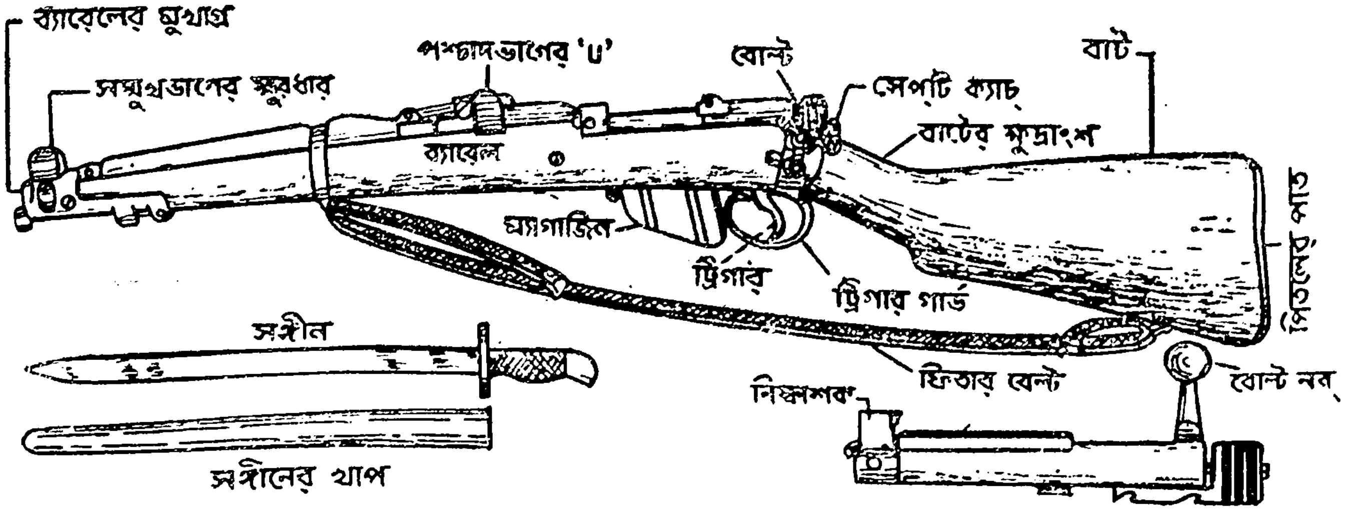

তীব্র বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির হইবে। ব্যারেলের মুখ হইতে বাহির হইবার সময় বুলেটের গতিবেগ থাকে প্রায় শব্দের গতিবেগের সমান।

ম্যাগাজিন হইল রাউণ্ড রাখিবার প্রকোষ্ঠ। ইহাতে একত্রে দশটি রাউণ্ড রাখা যাইতে পারে। ম্যাগাজিনের অভ্যন্তরে নীচের দিকে একটি পাত-স্প্রিং (leaf-spring) এবং একটি W-স্প্রিং থাকে। গুলি ভরিবার সময় ম্যাগাজিনটিকে চেম্বার হইতে খুলিয়া একসঙ্গে পাঁচটি করিয়া দুইবারে মোট দশটি রাউণ্ড ভরা যায়। ম্যাগাজিন চেম্বারে আটকানোর পর বোল্ট ক্রিয়া করিলে (বোল্টকে আগে পিছে করিলে) W—স্প্রিং-এর সাহায্যে রাউণ্ড উপরে উঠিয়া আসে এবং বোল্টের সাহায্যে রাউণ্ড ব্যারেল চেম্বারে ঢুকিয়া যায়।

লক্ষ্য বস্তুকে নিশানা করিবার জন্য ব্যারেল অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার উপাংশগুলি হইল কাঠের তৈরি ফর্ণ (forn), সম্মুখের সাপোর্ট, পশ্চাতের সাপোর্ট। কাঠের এই ঢাকনাগুলি থাকে বলিয়া গুলি ছুঁড়িবার পর সমদূরত্বে ও সমান্তরাল থাকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বাহির হয় এবং লক্ষ্য বস্তুকে বিদ্ধ করিবার সময়েও বুলেটের এই ঘূর্ণন বজায় থাকে।

রাইফেলের এই লক্ষ্য-ভেদ সীমা ৬০০ গজ। ইহার রেঞ্জ বা দূরত্ব সীমা ২০০০ গজ। মার্ক III এবং মার্ক IV—সাধারণতঃ এই দুই প্রকার রাইফেল ব্যবহৃত হয়।

রাইফেলের অগ্রভাগে একটি সংগীন (বেয়নেট) যুক্ত থাকে। কাছাকাছি যুদ্ধে সংগীন ব্যবহৃত হয়। সংগীনসহ রাইফেলের ওজন ৮ পাউণ্ড ১৩ আউন্স।

রাইফেলের ন্যায় বন্দুকেও বাট অংশ, মধ্য অংশ এবং ব্যারেল অংশ, এই তিনটি প্রধান অংশ আছে। গুলি ভরিবার জন্য এবং গুলি ছুঁড়িবার পর ব্যারেল হইতে কার্তুজের ফাঁকা অংশ বাহিরে ফেলিবার জন্য বন্দুককে মাঝখানে ভাঙিতে হয়। বন্দুককে এইভাবে ভাঙিবার জন্য ইহাতে একটি ক্যাচ্‌ এবং একটি কব্জা থাকে। বন্দুকে রাইফ্লিং থাকে না, তাই বন্দুকের গুলি রাইফেলের গুলির ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে যায় না। বন্দুকের ব্যারেলের ব্যাস

সাধারণতঃ ১৬/২০ ইঞ্চি এবং ১২/২০ ইঞ্চি হয়। বন্দুকে বোল্ট থাকে না। ইহার মধ্যভাগে প্রধানতঃ ট্রিগার, ট্রিগার গার্ড এবং স্ট্রাইকার থাকে। বন্দুক এক-ব্যারেল-বিশিষ্ট বা দুই-ব্যারেল-বিশিষ্ট হইতে পারে। দুই-ব্যারেল-যুক্ত বন্দুকে ট্রিগার এবং স্ট্রাইকারও দুইটি করিয়া থাকে। বন্দুকে ব্যবহৃত কার্তুজে ১০০—১৫০টি ছোট ছোট সীসার গুলি বা ছররা থাকে; অবশ্য কোনও কোনও কার্তুজে একটিমাত্র বড় সীসার গুলিও থাকে। রাইফেলের রেঞ্জ অপেক্ষা বন্দুকের রেঞ্জ অনেক কম; তবে কার্তুজ ব্যবহৃত হয় বলিয়া বন্দুকের গুলি বেশী জায়গা জুড়িয়া পড়ে।

পিস্তল ও রিভলবারের কার্যনীতিও রাইফেলের ন্যায়। তবে ইহা আকারে রাইফেল অপেক্ষা অনেক ছোট। পিস্তলের লক্ষ্য-ভেদ-সীমা মাত্র ৫০ গজ। পিস্তল বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। কোনও কোনও পিস্তলে 'ব্রিচ-কক্' নামক একটি অংশ থাকে। এইসকল পিস্তলকে 'স্বয়ং-ক্রিয়' পিস্তল বলা হয়। যতক্ষণ গুলি থাকিবে শুধু ট্রিগার টিপিলেই একটি একটি করিয়া গুলি বাহির হইয়া আসিবে। প্রকারভেদে পিস্তলে ৪—১১টি গুলি ভরা যায়।

ব্রেইনগান বা লাইট মেশিনগানও (L. M. G.) স্বয়ং-ক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, কারণ ইহাতেও ব্রিচ্-কক্ থাকে। ব্যারেলের সহিত যুক্ত দুইটি ধাতব দণ্ডকে মাটিতে ঠেকাইয়া রাখিয়া ব্রেইনগান ব্যবহার করা হয়। ইহার দূরত্ব-সীমা বা রেঞ্জ রাইফেলের ন্যায়; ব্যারেলের ব্যাস ০·৩০৩ ইঞ্চি। ইহাতেও 'রাইফ্লিং' আছে। ইহার ম্যাগাজিনে একত্রে ৩০টি গুলি ভরা যায়, তবে ২৮টির বেশি গুলি একত্রে ব্যবহার করা যায় না।

স্টেনগানও স্বয়ংক্রিয়। ইহাতে পিস্তল ও রিভলবারের গুলি ভরা যায়। রাইফেলের ন্যায় ব্রেইনগান এবং স্টেন-গানে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিক্রিয়া বল (ব্যাক স্ট্রোক) নাই।

অজয়কুমার চক্রবর্তী

বন্যা অববাহিকার জলনিকাশ করাই নদীর কাজ। অতিরিক্ত তুষার অথবা বৃষ্টিপাতের ফলে বৎসরের কয়েক মাস নদীতে জলধারা স্ফীত হইয়া ওঠে; তখন বলা হয় নদীতে বন্যা নামিয়াছে। আবার কখনও কখনও নদীর জল দুই কূল ছাপাইয়া জমি প্লাবিত করে, বসতি ডুবাইয়া দেয়, রাস্তা-ঘাট রেলপথ বিপর্যস্ত করে; তখনও বলা হয় ঐ অঞ্চলে বন্যা হইয়াছে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্লাবন কথাটি ব্যবহৃত হইলেই ভাল।

অববাহিকা অঞ্চল হইতে নদীতে শুধু জলই নামে না, সঙ্গে মৃত্তিকা, শিলাখণ্ড, গাছের ডালপালাও নামে। জল-প্রবাহ নদীর গর্ভ কাটিয়া খাত গভীরতর করিতে সাহায্য করে। ফলে অববাহিকার জলনিকাশের উন্নয়ন হয়। কিন্তু যে সময়ে এবং যে অংশে নদীতে জলপ্রবাহ মন্থর হয়, তখন সেই অংশে জলবাহিত মৃত্তিকা, শিলাখণ্ড প্রভৃতি নদী-গর্ভ ভরাট করে; ফলে জলনিকাশ-ক্ষমতার হানি হয়। তাহার পরে নদীতে অববাহিকা হইতে অধিক জল আসিয়া পড়িলে বন্যা হয়। পার্বত্য এলাকায় মাঝে মাঝে নদীতে আশপাশের পাহাড় ভাঙিয়া ধ্বস নামে, নদীর খাত অবরুদ্ধ করে। সেই অবরোধ অথবা বাঁধের আড়ালে জল জমে। আবার পরে হয়ত সেই সঞ্চিত জলের চাপে বাঁধ ভাঙিয়া হঠাৎ জলপ্রবাহ নামিয়া নদীর নিম্নাঞ্চলে প্লাবন সৃষ্টি করে।

নদী যখন নিম্নে সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখনই তাহার খাতে পলি পড়িয়া ভরাট হয়, চরের সৃষ্টি হয়, জলনিকাশ-ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের হারের সঙ্গে নদীর বন্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু অনেকদিন খরার পরে (যেমন জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে পশ্চিমবঙ্গের দামোদর, অজয় প্রভৃতি নদ-নদীর ক্ষেত্রে) অধিক বৃষ্টিপাত হইলেও বন্যা হয় না, কারণ সেই বৃষ্টিজল অববাহিকা শুষিয়া লয়। কিন্তু জুলাই-আগস্ট মাসে অনেকদিন অল্প অল্প বৃষ্টিপাতের পরে সহসা দুই-একদিন যদি চাপিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, তাহা হইলেই উক্ত নদনদীতে প্লাবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। আবার জুলাই-আগস্ট মাসে মাঝে-মাঝে মাঝারি ধরণের বৃষ্টির ফলে নদীতে ছোট ছোট বন্যা নামিয়া নদীর খাত কাটিয়া গভীরতর করিয়া রাখে। তাহার অব্যবহিত পরে অববাহিকায় অত্যধিক বৃষ্টিপাতেও প্লাবনের সৃষ্টি হয় না। এই কারণে দেখা গিয়াছিল দামোদর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৬½ লক্ষ কিউসেক জলপ্রবাহ (এক কিউসেক= প্রতি সেকেণ্ডে এক ঘনফুট জলের প্রবাহ) নিকাশ করিয়াছে; প্লাবন হয় নাই। অথচ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দামোদরে মাত্র ২ লক্ষ ৯০ হাজার কিউসেক জলপ্রবাহেই বর্ধমান ও হুগলি জেলায় সর্বনাশা প্লাবন হইয়াছিল।

শোন, কোশী, মহানন্দা, তিস্তা প্রভৃতি যে সকল নদী গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্রের মত বড় বড় নদনদীতে মিশিয়াছে, তাহাদের জল অনেক সময়ে প্লাবনের সৃষ্টি করে—যদি সেই সময়ে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র জলে ভরপুর থাকে। ত্বরিতগতিতে উপনদীর জলনিকাশ হইতে পারে না, দুই কূলে উপচিয়া পড়ে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পরিপূর্ণ জলপ্রবাহই বাঁধের মত বাধার সৃষ্টি করে। তেমনই হুগলি নদীতে ভাদ্রের ভরা জোয়ারের সময়ে দামোদর রূপনারায়ণের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে তুলনায় স্বল্পহারের বৃষ্টিপাতেও প্লাবন সৃষ্টি করে—জল-নিকাশে বাধা সৃষ্টি করিয়া।

কপিল ভট্টাচার্য

বপ্, ফ্রান্ৎস (১৭৯১—১৮৬৭ খ্রী) ভারততত্ত্ববিদ্, জাতিতে জার্মান। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে

সংস্কৃতাধ্যাপক আঁতোয়ান লেওনার্ দ্য সেজির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বপ্ ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষার ধাতুরূপ সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'উবের ডাস্ কন্‌জুগেশন সিস্টেম্ ডের্ সান্‌সক্রিট্‌স্প্রাখ্' প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে গ্রীক, লাতিন, পারসীক ও জার্মান ভাষা সমূহে প্রচলিত ধাতুরূপের সহিত তুলনামূলকভাবে সংস্কৃত ধাতুরূপের অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ আলোচনা স্থান পাইয়াছে। ইহার মাধ্যমে বপ্ 'তুলনাত্মক ভাষাবিজ্ঞান'-এর ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। পূর্বোক্ত গ্রন্থে পরিশিষ্টরূপে তিনি বেদ, মহাভারত ও রামায়ণের কিছু কিছু নির্বাচিত অংশের ছন্দোবদ্ধ অনুবাদ সংযোজিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি মহাভারতের নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানটির একটি স্বতন্ত্র সংস্করণ লাতিন অনুবাদসহ প্রকাশ করেন (লন্ডন, ১৮১৯ খ্রী)। ১৮২৭, ১৮৩২ ও ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থগুলি এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্কৃত শব্দকোষও (গ্লসারিয়ুম সান্‌সক্রিতুম্) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও উন্নত বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ সর্বদা তাঁহার গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

বয়নবিদ্যা তাঁত দ্র

বয়নশিল্প, বস্ত্রশিল্প পরিধেয় বস্ত্র মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির অন্যতম। তাই নব্যপ্রস্তরযুগ হইতে বস্ত্রবয়নের ইতিহাস, বলিতে গেলে মানবসভ্যতারই ইতিহাস। চার হাজার বৎসর পূর্বে মিশরীয়রা বিভিন্নধরণের বস্ত্র বয়ন ও নানা রঙে সেগুলি রঞ্জিত করিতে এমন নৈপুণ্য অর্জন করিয়াছিল যাহা আজও বিবর্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষেও আনুমানিক ৪০০০ বৎসর ধরিয়া কার্পাস হইতে সুতা কাটা ও বস্ত্র বয়ন চলিয়া আসিতেছে। চীনাংশুক ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজাদিগের সৌখিন পরিধেয় ছিল এবং পুরাণাদিতে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ব্যবহৃত তন্তু অনুসারে বয়নশিল্পের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। তন্তুগুলি সুতা-কাটার উপযোগী দীর্ঘ, সুসম্বদ্ধ, শক্ত এবং টেকসই হওয়া প্রয়োজন এবং সুতাগুলিও বয়নের উপযুক্ত নমনীয়, স্থিতিস্থাপক, শোষণক্ষম, উজ্জ্বল এবং সমান আকারের হইলে উচ্চমানের বস্ত্র নির্মিত হয়। তন্তু প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম (সংশ্লেষাত্মক) দুইরকমেরই হইতে পারে। প্রাকৃতিক তন্তু আবার প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্জ উভয় ধরণের হয়। প্রাণীজ তন্তু বলিতে পশম রেশম ইত্যাদি বুঝায়। উদ্ভিজ্জ তন্তু বীজ হইতে (যেমন কার্পাস), ছাল বা শকল হইতে (যেমন পাট), পাতা হইতে (যেমন শন) ইত্যাদি নানাভাবে তৈয়ারি হয়। কৃত্রিম তন্তু আবার প্রাণীজাত, যেমন কেসিন্ বা জীন, কোষজাত যেমন প্রচলিত রেয়ন্ ইত্যাদি, খনিজাত যেমন ফাইবারগ্লাস্ প্রভৃতি নানা ধরণের হইতে পারে। কৃত্রিম রজন হইতে পলিমার নামক একাধিক শ্রেণীর সংশ্লেষাত্মক তন্তু নির্মিত হয়, যেমন নাইলন, ডেক্রন, অরলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি। এসমস্ত ব্যতীত অজৈব পদার্থজাত তন্তুও আজকাল নির্মিত হইতেছে, যেমন অ্যাসবেস্টসের চাদর, কাঁচের চাদর ইত্যাদি (তন্তু দ্র)।

আধুনিক যন্ত্রচালিত বয়নশিল্প প্রথম আরম্ভ হয় ব্রিটেনে। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একাদিক্রমে নানাধরণের বস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার দরুন ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়। নানাবিধ আবিষ্কারের ফলে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড বয়নশিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ক্রমশঃ ইওরোপের অন্যান্য দেশে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং জাপানে ইহা ছড়াইয়া পড়ে। বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, চীন, মিশর, মেক্সিকো, ব্রেজিল, তুরস্ক প্রভৃতি বহুদেশে বয়নশিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষে হস্তচালিত তাঁতের স্থলে যন্ত্রচালিত তাঁত ও কারখানাভিত্তিক বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতের বস্ত্রশিল্প ঃ ইহা ভারতের বৃহত্তম বৃহদায়তন শিল্প। কালিকটের 'ক্যালিকো' এবং অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকার 'মস্‌লিন' প্রাচীন ভারতীয় বয়নশিল্পের উৎকর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি তন্তুবায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মাধ্যমে জীবিকার্জন করিতেছে। ইহা ছাড়া কারখানাভিত্তিক বয়নশিল্পে অর্থাৎ মিলে প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিক কাজ করিতেছে। এই সংখ্যা সমগ্র দেশের মোট শিল্পে-নিযুক্ত শ্রমিকের ২০ শতাংশ। বস্ত্রশিল্পের উৎপন্নের বার্ষিক মূল্য সমগ্র দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের ৩০ শতাংশের অধিক। বর্তমানে আনুমানিক সাড়ে ছয়শতের মতন মিল বস্ত্রোৎপাদনে নিয়োজিত আছে। ইহাদের মোট টাকুর সংখ্যা প্রায় পৌণে দুই কোটি, তাঁতের সংখ্যা দুই লক্ষেরও অধিক। ১৮০ কেজি ওজনের গাঁইটের কাঁচাতুলা পাঁচ লক্ষের মতন এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট ঘুষুড়ি নামক স্থানে ভারতের প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু সন্নিহিত অঞ্চলে তুলার চাষ বিশেষ না হওয়ার দরুন ইহার বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জলবিদ্যুতের সহায়তায় বোম্বাইয়ে কাওয়াসজি নানাভাই ডাভার কর্তৃক 'বম্বে স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড' নাম দিয়া প্রথম আধুনিক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটিতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার পর হইতে অদ্যাবধি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতবর্ষের শতকরা ৮০ ভাগ কাপড়ের কল তুলা-

উৎপাদক অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে বোম্বাই ও আমেদাবাদে ইহা অধিকতর কেন্দ্রীভূত।

মহারাষ্ট্র ও গুজরাতকে ঘিরিয়া বৃহত্তর পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত বস্ত্রশিল্পের আরও তিনটি উল্লেখ্য অঞ্চল আছে। সেইগুলি হইতেছে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বাঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, দিল্লী ও পাঞ্জাবকে ঘিরিয়া উত্তরাঞ্চল এবং তামিলনাড়ু, কেরল ও মহীশূরকে ঘিরিয়া দক্ষিণাঞ্চল। এইসব অঞ্চলগুলি আবার বিশেষ বিশেষ ধরণের বস্ত্র উৎপাদনে সুনাম অর্জন করিয়াছে, যেমন দক্ষিণাঞ্চলের ড্রিল, জিন্ ও খাকি, পূর্বাঞ্চলের ধুতি-শাড়ি, উত্তরাঞ্চলের লংক্লথ, মার্কিন, আদ্দি ইত্যাদি এবং পশ্চিমাঞ্চলের সৌখিন ছাপা রঙিন ছিট ইত্যাদি।

কারখানাভিত্তিক শিল্পগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে দেশের বাইশ লক্ষ সক্রিয় হস্তচালিত তাঁতকেও প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের একটি বৃহৎ অংশ এই হাত-তাঁত ব্যবস্থার দ্বারা পুষ্ট। তন্তুবায়দের পারিবারিক ঐতিহ্য ও কারুশিল্প হিসাবে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত গৌরবময়। শান্তিপুর, ফুলিয়া, মুর্শিদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, তিনেভেলি, কটক প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড়ের চাহিদা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের মোট বস্ত্র উৎপাদনের দুই-পঞ্চমাংশ এই হস্তচালিত তাঁতজাত সামগ্রী। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০০ কোটি মীটার বস্ত্র মিল-মারফৎ উৎপাদনের পর বাকি সমস্ত উৎপাদন হাত-তাঁত ব্যবস্থায় করাইবার ব্যবস্থা লওয়া হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে হাত-তাঁত সমবায় গঠনে সরকার যথেষ্ট উৎসাহ দিতেছেন। সরকারি তত্ত্বাবধানে মিল ও তাঁতের উৎপাদনে কোনওরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতবর্ষ বস্ত্র রপ্তানিতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ক্রেতাদের মধ্যে আছে ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, সুদান, অস্ট্রেলিয়া, এডেন, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও বর্মা। রপ্তানিবাণিজ্যে জাপানই ভারতের প্রধান প্রতিযোগী। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস না করিলে এই প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা বেশিদিন সম্ভব নয়। উৎপাদিত বস্ত্রের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ করিবারও বন্দোবস্ত করা দরকার। 'কটন টেক্স্টাইল এক্স্পোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল্' বস্ত্র ও সুতা রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতেছে। তবে উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার ও শিল্পসমূহের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন না করিলে এবং হস্তচালিত তাঁতের সহিত সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি না করিলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইবে না।

দ্র M. R. Choudhury, *Problems and Location of Indian Industries.*

শুভ্রেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

বয়লার সাধারণতঃ জলের বাষ্পীভবনের নিমিত্ত ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষকেই বয়লার বলা হয়।

যন্ত্রযুগের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বয়লারের ব্যবহার মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দী হইতে। আধুনিক কালে জ্বালানি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য বয়লার অত্যাবশ্যক। বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে একক জেনারেটরের ক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, বয়লারের আয়তনও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে একক বয়লার প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০০০০ পাউন্ড পর্যন্ত জলও বাষ্পীভূত করিতে সক্ষম।

বয়লারের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ নিম্নোক্তভাবে করা যাইতে পারেঃ ১. স্মোক টিউব বয়লার; ২. ওয়াটার টিউব বয়লার। আধুনিক কালে বাষ্প-শকট (Steam locomotive) ছাড়া অন্যত্র স্মোক টিউব বয়লারের ব্যবহার প্রায় নাই বলিলেই চলে। ইহার প্রধান কারণ ইহারা অত্যধিক চাপ সহিতে অক্ষম এবং ইহাদের বাষ্পীকরণের ক্ষমতাও সীমিত। শুধু তাহাই নহে, ইহারা খুব দ্রুত জলকে বাষ্পীভূত করিতে পারে না। ওয়াটার টিউব বয়লারের ক্ষেত্রে এই সমস্ত অসুবিধা না থাকায় বর্তমানে ইহাদের ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন। ওয়াটার টিউব বয়লারের যন্ত্রাংশ খুবই জটিল হইলেও সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, অসংখ্য সরু সরু নল বয়লারের চুল্লীর উপর সুবিন্যস্তভাবে সাজানো থাকে, এই নলগুলি উপরের দিকে একটি বাষ্প ও জলের আধারের (Water and Steam) সঙ্গে এবং নীচের দিকেও অনুরূপ একটি আধারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। উপরের আধারটি আংশিকভাবে এবং নলগুলি সম্পূর্ণভাবে জলে পূর্ণ থাকে। নলের জল চুল্লীর উত্তপ্ত গ্যাস এবং বিকীর্ণ তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হইয়া উপরের দিকে সঞ্চালিত হয় এবং ড্রামের জলকে উত্তপ্ত করে। ঠাণ্ডা জল আবার নল বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসে। এইভাবে জল ক্রমাগত উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পীভূত হয় এবং উপরের আধারে জমা হয়। পরে ঐ বাষ্প নলবাহিত হইয়া বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। বয়লার ড্রামের উপরিভাগে যেখানে বাষ্প জমা হয় সেখানে এক বা একাধিক সেফ্টি ভাল্ভ লাগান থাকে। বাষ্পের চাপ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করিলে এই ভাল্ভ চাপ কমাইয়া বয়লারকে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করে। বয়লারে জলের পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য যে পরিমাণ জল প্রতি সেকেন্ডে বাষ্পীভূত হয় সেই পরিমাণ জল উচ্চ চাপে পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। বয়লারের তাপীয় দক্ষতা (Thermal efficiency) বৃদ্ধি করিবার জন্য ফিড ওয়াটারকে পূর্বাহ্নে ইকনমাইজার এবং ফিড ওয়াটার হিটার দ্বারা উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়।

বয়লারের চুল্লী এবং নলগুলি একটি লৌহের চাদরে ঢাকা থাকে। এই চাদরের ভিতরের দিকে পরিবাহিত তাপক্ষয় কমাইবার জন্য কোনও অগ্নিনিরোধক দ্রব্যের (refractory

material) আস্তরণ দেওয়া থাকে। তবে বর্তমানে প্রায় সমস্ত বয়লারেই তাপক্ষয় কমাইবার জন্য অগ্নিনিরোধক আস্তরণের ভিতরের দিকে বয়লারের নলগুলি পরপর সাজাইয়া একটি দেওয়ালের মত করা হয়, ইহাকে জল দেওয়াল বা Water wall বলে।

জ্বালানির ব্যবহারের প্রক্রিয়া অনুযায়ীও বয়লারের শ্রেণীবিন্যাস করা হয় ; যথা : ১. স্টোকার ফায়ার্ড বয়লার ; ২. পাল্‌ভারাইজ্‌ড ফুয়েল ফায়ার্ড বয়লার। আবার বয়লারে জলের সঞ্চালন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল শ্রেণীবিন্যাসও করা হয় : ১. ন্যাচারাল সারকুলেশন বয়লার ; ২. ফোরস্‌ড সারকুলেশন বয়লার। বর্তমানে ক্রমাগত উচ্চতর চাপ ও তাপ সম্বলিত বাষ্পের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য শেষোক্ত শ্রেণীর বয়লার ক্রমাগত বেশি ব্যবহৃত হইতেছে।

দ্র G. A. Gaffert, *Steam Power Stations*, London, 1946; T. H. Carr, *Electric Power Stations*, vol. I, London, 1954.

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

বয়স্ক-শিক্ষা যথাকালে যাহারা লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পায় নাই এবং বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে পড়াশুনা করিবার বয়স আর যাহাদের নাই, চলিত অর্থে সেইসব মানুষকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থাকেই বলা হয় বয়স্ক-শিক্ষা। লিখিতে পড়িতে এবং সাধারণভাবে হিসাব-পত্র রাখিতে পারাই বয়স্ক-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম উৎপত্তি। শিল্প- ও সমাজ-বিপ্লব, গণতন্ত্রের প্রসার এবং নাগরিক সাধারণের ভোটাধিকারলাভ ইত্যাদি কারণে শ্রমিক শিল্পকর্মী তথা প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই শিক্ষালাভ আবশ্যিক বলিয়া গণ্য হয়।

ইংল্যান্ডে মেকানিক্‌স ইন্‌স্টিটিউট, ওয়ার্কার্স এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং ডেনমার্ক ও অন্যান্য স্ক্যান্দিনাভিয় দেশের গণবিদ্যালয়গুলির বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের প্রবর্তন ও পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য অবদান আছে।

বর্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল প্রসার এবং জনশিক্ষার বহুল অগ্রগতির ফলে বয়স্ক-শিক্ষার মান ও উদ্দেশ্যও সম্প্রসারিত হইয়াছে। কেবলমাত্র লেখাপড়ার কৌশল আয়ত্ত করাকেই বয়স্ক-শিক্ষার সমার্থক মনে করা হয় না। অন্ততঃ যে পরিমাণ শিক্ষা লাভ করিলে মানুষ বর্তমান সময়ের জটিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্যক বুঝিতে পারে এবং সাফল্যের সহিত তাহাদের মোকাবিলা করিতে পারে ব্যাপকার্থে বয়স্ক-শিক্ষা বলিতে এখন তাহাই বুঝায়।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুসারে ভারতের বিপুল জনসমষ্টির মাত্র ২৪ শতাংশ অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত। এই ব্যাপক গণ-নিরক্ষরতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে স্বাধীন রাষ্ট্রের যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষা ও সমষ্টি-উন্নয়ন বিভাগ এবং বহু স্বেচ্ছাসেবী জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এখন বয়স্ক-শিক্ষা পরিকল্পনার রূপায়ণে উদ্যোগী হইয়াছে। ভারত সরকার এই পরিকল্পনার নামকরণ করিয়াছেন সমাজশিক্ষা পরিকল্পনা।

নিখিলরঞ্জন রায়

বরদলৈ, গোপীনাথ (১৮৯০-১৯৫০ খ্রী) গৌহাটি শিলপুখুরির বিখ্যাত বরদলৈ পরিবারে জন্ম। পিতা বুদ্ধেশ্বর চিকিৎসক ছিলেন। গোপীনাথ গৌহাটি কটন কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা (১৯০৭ খ্রী) ও কটন কলেজ হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯০৯ খ্রী)। কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে ইতিহাসে অনার্সসহ বি. এ. পাশ (১৯১১ খ্রী) করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। কালক্রমে এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ওকালতি শুরু করেন। অল্প কাল পরে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে (১৯২০ খ্রী) আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া (১৯২১ খ্রী) কংগ্রেসে যোগদান করেন ও আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের কামরূপ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক হন। এই সময়ে কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশন হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গৌহাটি জেলে প্রায় ১ বৎসর (১৯২১-২২ খ্রী) বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তিলাভ করিয়া তিনি আবার কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌহাটি পাণ্ডুতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের কার্যনির্বাহক সমিতির তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৪-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গৌহাটি মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসমনোনীত প্রার্থী হিসাবে আসাম আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া গোপীনাথ বিরোধী দলের নেতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সয়াদুল্লা মন্ত্রিসভার পতনের (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ খ্রী) পর গোপীনাথের নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করে ; মাত্র ১৩ মাস পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের পক্ষে যোগদান করাইবার প্রতিবাদে বরদলৈ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ হইলে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহাকে ধুবড়িতে গ্রেপ্তার করিয়া জোড়হাট জেলে পাঠানো হয়। প্রায় ২ বৎসর বন্দীজীবনের পর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি মুক্তি দেওয়া হয় ; এই সময়ে তিনি রক্তচাপ ও চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর গান্ধীজীর পরামর্শানুযায়ী তিনি পরবর্তী নির্বাচন

পর্যন্ত (১৯৪৫ খৃ) আসামে বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সময়ে গোপীনাথ গৌহাটিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থ-সংগ্রহ করিতে থাকেন, এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান গঠন ও আসামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিলে গোপীনাথ 'Reflections on Assam-cum-Pakistan' নামক পুস্তিকায় প্রস্তাবটির প্রবল বিরোধিতা করেন। বিশ্বযুদ্ধোত্তর নির্বাচনে (১৯৪৫ খৃ) আসামে কংগ্রেস দল জয় লাভ করিলে গোপীনাথের নেতৃত্বে যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত তাহা ক্ষমতাসীন ছিল। স্বাধীনতার পরেও তিনি আসামের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন; মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই আসীন ছিলেন।

আসামের বর্তমান উন্নতির জন্য অনেকখানি কৃতিত্বই গোপীনাথ বরদলৈ-এর প্রাপ্য। গৌহাটির বিশ্ববিদ্যালয়, বিচারালয়, কারিগরি-প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাঁহার কর্মকুশলতার পরিচয় মূর্ত হইয়া আছে।

দ্র মহাদেব শর্মা, লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ, গুয়াহাটি, ১৯৫৬।

বিজনবিহারী দে

বরবাক শাহ্ রুকনুদ্দীন বরবাক শাহ্ গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মহমুদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। তিনি ১৪৫৫ হইতে ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম ৩ বৎসর পিতার সঙ্গে ও শেষ ২ বৎসর পুত্রের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। বরবাকের সেনাপতি ইসমাইল ওড়িশার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের মান্দারণ দুর্গ দখল করেন। ইসমাইল কামরূপের রাজাকেও পরাজিত করেন। বরবাক ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে ত্রিহুতের অন্তর্গত হাজিপুর দখল করেন ও বুড়িগণ্ডক পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন।

বরবাক শাহের মুদ্রা ও শিলালিপি তাঁহার পাণ্ডিত্যের ও সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা সম্ভবতঃ তিনি নির্মাণ করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ও পণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রকে ও সম্ভবতঃ মালাধর বসু ও কৃত্তিবাসকে বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। আমীর জৈনুদ্দীন হরউয়ি তাঁহার সভাকবি ছিলেন। তিনি বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন ও রিয়াজের মতে তিনি আইন মানিয়া চলিতেন। তাঁহার ৮০০০০ হাবসী ছিল ও তাহাদের কয়েকজনকে তিনি উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। অনন্তসেন তাঁহার অন্তরঙ্গ বা চিকিৎসক ছিলেন ও বৃহস্পতি মিশ্রের পুত্রেরা তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন।

দ্র রমেশচন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত, বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ খৃ), শান্তিনিকেতন, ১৯৬৬; Ghulām Hussain Salem, Riyāz-u-s-Salātin, Maulavi Abdus Salam, tr., Calcutta, 1902.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বরবুদুর, বোরবুদুর বহির্ভারতে ভারতের ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির অনন্য কীর্তি বোরবুদুর। আধুনিক জাভার অন্যতম শহর যোগযাগকার্তার ২৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কেদু সমতলভূমি কোনও এক সময়ে প্রাগো নদীর জলে ডুবিয়া থাকিত। এই নিমজ্জিত সমতলের মাঝে ছোট একটি পাহাড়কে কেন্দ্র করিয়া বোরবুদুরের বিশ্ববিখ্যাত শিলামন্দির গড়িয়া ওঠে। বোরবুদুরের পাদপীঠে আবিষ্কৃত একটি অনুশাসন লিপির আক্ষরিক পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে যখন শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা সুমাত্রা ও জাভাতে আধিপত্য করিতেন তখন বোরবুদুর মন্দির নির্মিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বোরবুদুর স্তূপ অথবা মন্দিরের পর্যায়ে পড়ে না, বোরবুদুর বজ্রযান বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী একটি প্রাসাদ বা দেবগৃহ। পরবর্তী কালে নেপালে এবং তিব্বতে যে অঙ্কিত মণ্ডলের চিত্র আমাদের নজরে আসে, বোরবুদুর অনেকটা সেই মণ্ডলের আকারে নির্মিত। বোরবুদুরের সর্বোচ্চ স্তূপটি যেন মহামেরু এবং সেই মহামেরুকে কেন্দ্র করিয়া যেন ৯টি অতীন্দ্রিয় ধাপ ধীরে ধীরে নামিয়াছে।

বোরবুদুর স্থাপত্যের শীর্ষে একটি বৃহদাকার স্তূপ আছে। এই স্তূপটিকে কেন্দ্র করিয়া ৩টি বৃত্ত রচিত হইয়াছে। নিম্নগামী ২টি বৃত্ত উপরস্থ বৃত্ত অপেক্ষা ক্রমশঃ পরিধিতে বৃহত্তর। এই ৩টি ক্রমবর্ধমান বৃত্তের প্রান্তসীমায় ৭২টি সচ্ছিদ্র স্তূপ রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি স্তূপের ছিদ্রবহুল পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ধর্মচক্রপ্রবর্তন-মুদ্রায় আসীন বুদ্ধদেবের সুন্দর মূর্তি নজরে আসে। শেষ বৃত্তটির পর ক্রমশঃ নিম্নমুখী ৬টি বর্গাকার প্রদক্ষিণ পথ দেখা যায়। বর্গাকার পথের প্রতিটি বাহুতে একাধিক কোণের প্রযুক্তি হওয়ায় প্রদক্ষিণ পথগুলি বহুভুজাকৃতি বলিয়া মনে হয়। প্রতিটি প্রদক্ষিণ পথ প্রাচীর দিয়া ঘেরা এবং উপরে উন্মুক্ত আকাশ। নিম্নতম পর্যায় হইতে ঊর্ধ্বগামী হওয়ার জন্য বোরবুদুরের স্থাপত্য পরিকল্পনার চারিদিকে সোপানশ্রেণী আছে। একটি ধাপের পরিক্রমা শেষ করিয়া উপরে উঠিবার সময় চারিদিকে একটি মকরতোরণ দেখা যায়। দরজার চৌকাঠের উপর কীর্তিমুখ হইতে তোরণের দুই পার্শ্বে ২টি দোলায়িত মকরকে নামিয়া আসিতে দেখা যায়।

বোরবুদুরের স্থাপত্য বৌদ্ধদর্শনের একটি সংকেতবিশেষ। এই স্থাপত্যের পাদপীঠে চিত্রার্ধে রচিত কামনা, বাসনা ও লাস্যের চিত্রায়ণ কামধাতু অথবা কামজগতের প্রতিচ্ছবি বলিয়া পরিচিত। সমগ্র মন্দিরের বিপুল ভার হয়তো এই পাদপীঠ বহন করিতে পারিবে না, এই আশঙ্কায় এই পাদপীঠটি বর্তমানে অধিকতর সবল করা হইয়াছে।

পাদপীঠে বাড়তি পাথরের ফলক যুক্ত করায় পাদপীঠে কামজগতের চিত্রায়ণ অধুনা দর্শক সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী অতঃপর ৫টি প্রদক্ষিণ পথের চারিধারে যে প্রাচীর আছে সেই প্রাচীরগাত্রের ভিতরের অংশে ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান, গণ্ডব্যূহ ও জাতকের বহু কাহিনী চিত্রার্ধে রচিত হইয়াছে। কোথাও জাতক, কোথাও মৈত্রেয় এবং সুধনকুমারের কথোপকথন আবার কোথাও সামন্ত ভদ্রের ইতিকথা চিত্রিত হইয়াছে। এই ৫টি প্রদক্ষিণ পথ রূপধাতু অর্থাৎ রূপজগতের মায়া ও আকর্ষণের অনিত্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। এই রূপজগতের গণ্ডি পার হইয়া যখন কোনও পরিব্রাজক আরও ঊর্ধ্বে ৭২টি স্তূপ, তন্মধ্যে বুদ্ধ ও শীর্ষের সেই বৃহত্তর স্তূপটির সম্মুখীন হন তখন তাঁহার মনে হয় তিনি যেন অরূপ ধাতু অর্থাৎ অকল্পনীয় সত্তার সম্মুখীন হইয়াছেন।

বোররুদুরের তথাকথিত রূপজগতের প্রথম চারিটি ধাপের চারিদিকে চারজন ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি নজরে আসে। প্রদক্ষিণ পথের মাথায় যে সমস্ত কুলুঙ্গী আছে তাহার মধ্যে পূর্ব দিকের সমস্ত কুলুঙ্গীতে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্তি, পশ্চিমে অমিতাভের, উত্তরে অমোঘসিদ্ধির এবং দক্ষিণে রত্নসম্ভবের মূর্তি নির্মিত হইয়াছে। বজ্রযান মতে ইঁহারা হইলেন চতুর্দিকের দিকপাল-বিশেষ। প্রদক্ষিণ পথের সর্বোচ্চে পঞ্চটির চতুর্দিকের সমস্ত কুলুঙ্গীগুলিতে ধ্যানী-বুদ্ধ বৈরোচনের মূর্তি দেখা যায়। বোরবুদুরে প্রায় ৫০০ বুদ্ধের মূর্তি আছে।

বোরবুদুরের তালমানসম্মত, সংযত এবং কমনীয়কান্তি বুদ্ধমূর্তিগুলির মধ্যে পরিমার্জিত গুপ্তযুগীয় সারনাথ ও ওড়িশার ললিতগিরির বুদ্ধমূর্তির ছাপ সহজেই ধরা পড়ে। চিত্রার্ধে রচিত অগণিত ফলকগুলি অপেক্ষাকৃত গভীরতায় উৎকীর্ণ, প্রতিটি চিত্রার্ধ শান্ত, সংযত, লাবণ্যময় এবং পরিমাণসম্মত—প্রতিটি ফলক পৃথক পৃথক প্রস্তরখণ্ডে রচিত এবং সজ্জিত। বোরবুদুরের বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্প-রীতি দুইই প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার অনির্বচ-নীয় নিদর্শন।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

বররুচি সংস্কৃত সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে বররুচির নাম পাওয়া যায়। ১. কাত্যায়ন বররুচি। ইনি পাণিনি ব্যাকরণের সূত্রের উপর বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন। এই বার্ত্তিকগুলি সূত্রাকারে রচিত এবং ইহাদের কতকগুলি পাণিনি সূত্রের ব্যাখ্যানমূলক ও কতকগুলি পাণিনিসূত্রের অনুপূরক ও কতকগুলি সমালোচনামূলক। এই বার্ত্তিকগুলি পতঞ্জলির বিখ্যাত মহাভাষ্যের প্রধান উপজীব্য। তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী।

২. কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের কৃৎপ্রকরণের সূত্রগুলির রচয়িতা। আবির্ভাব কাল অজ্ঞাত। তবে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে।

৩. ‘প্রাকৃত প্রকাশ’ নামক বিখ্যাত প্রাকৃত ভাষার ব্যাক-রণের রচয়িতা। ইহা সূত্রাকারে রচিত। আবির্ভাব কাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পূর্বে।

৪. সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ‘নবরত্নের’ অন্যতম।

৫. ‘বাররুচি সংগ্রহ’ নামক ব্যাকরণ বিষয়ক কারিকার রচয়িতা। কাল অজ্ঞাত।

৬. সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের রচয়িতা।

শৈলেন সেনগুপ্ত

বরাক আসামের একটি নদী। মণিপুর রাজ্যের উত্তর দিকের পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা তিপাইমুখ পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে সংকীর্ণ খাড়া উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহা কিছুদূর ধরিয়া নাগাপাহাড় ও মণিপুর রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা রচনা করিয়াছে।

তিপাইমুখ হইতে ইহা সম্পূর্ণ ঘুরিয়া উত্তর দিকে লখিপুর পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এখান হইতে পশ্চিম দিকে বদরপুর পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া বদরপুরের কিছু পশ্চিমে নদীটি দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়। উত্তর-পশ্চিম দিকের অংশ সুরমা ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ কুশিয়াড়া নামে পরিচিত। কুশিয়াড়া বিভক্ত হওয়ার পর তাহার দক্ষিণ দিকের অংশটি পুনরায় বরাক নামে নবিগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতির পাশ দিয়া প্রবাহিত হয়। জিরি, সোনাই, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী বরাকের উল্লেখযোগ্য উপনদী।

দ্র The Imperial Gazetteer of India, Vol. XXIII, Oxford, 1908.

অনিন্দ্যকুমার পাল

বরাকর দামোদরের একটি উপনদী। ইহা ছোটনাগপুরের মধ্যমালভূমির উত্তরাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২৪°৭′ উত্তর ও ৮৫°১৮′ পূর্ব)। ইহা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডকে অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ধানবাদ জেলায় প্রবেশ করে ও ৫১ কিলোমিটার অতিক্রম করিবার পর ধানবাদ ও বর্ধমান জেলার সীমানায় (২৩°৪২′ উত্তর ও ৮৬°৪৮′ পূর্ব) দামোদর নদের সহিত মিলিত হয়। ইহার প্রধান উপনদী খুদিয়া। দামোদর নদী উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণের পূর্বে ইহা গ্রীষ্মে প্রায় শুষ্ক এবং বর্ষাকালে অতি প্লাবিত হইত। একারণে বরাকরের জলশক্তিকে পরিকল্পিত উপায়ে কাজে লাগাইবার জন্য ইহার গতিপ্রবাহে দুইটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহার ঊর্ধ্বপ্রবাহে তিলাইয়া বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ৪০৪৭ হেক্টর ‘খরিফ’ শস্যভূমি ও ২২২৬ হেক্টর রবিশস্যের ভূমিতে জলসেচ করা যাইবে। এখানে বর্তমানে ৪০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। বরাকরের নিম্নাংশে আসানসোল হইতে প্রায়

২৬ কিলোমিটার দূরে মাইথন বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রধানতঃ বন্যা রোধ করা যাইতেছে। এখানে ভূগর্ভস্থ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৬০,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে।

দ্র 1. The Imperial Gazetteer of India, Vol. VI, Oxford, 1908.

2. Our River Valley Projects. Publication Division, Govt. of India. New Delhi, 1961.

পীযূষ সাহা

বরাবর (২৫°১´ উত্তর; ৮৫°১´ পূর্ব) বিহারের গয়া জেলার অন্তর্গত পর্বতমালা; ইহার কয়েকটি শৃঙ্গ আছে। এই স্থান গয়া হইতে প্রায় ২৬ কিলোমিটার উত্তরে। বেলা স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১৩ কিলোমিটার। পাহাড়টি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানকার একটি লেখে গোরথগিরির উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখে এই পাহাড়কে খলতিক পর্বত বলা হইয়াছে। মৌখরী লেখে ইহার নাম প্রবরগিরি; এই নামেরই সম্ভবতঃ অপভ্রংশ বর্তমানের বরাবর।

ভারতবর্ষের শৈলখাত গুহা-স্থাপত্যের ইতিহাসে বরাবরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শুধু এখানেই এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম ঐতিহাসিক শৈলখাত গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগের চারটি গ্রানাইট শৈলখাত গুহার মধ্যে তিনটিতে—করণ চৌপাড়, সুদামা ও বিশ্ব-ঝোপড়ী—অশোকের লেখ রহিয়াছে; চতুর্থটিও (লোমশ ঋষি) মৌর্যকালীন। ইহাদের বাস্তুনক্সা ইত্যাদি তদানীন্তন বাড়িঘরের পরিকল্পনার প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করে।

অশোকের লেখ হইতে জানা যায়, তিনি গুহাগুলি আজীবিক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের নিমিত্ত খনন করাইয়াছিলেন। এই গুহাগুলি এবং পার্শ্ববর্তী নাগার্জুনী পাহাড়ের (২৫°১´ উত্তর, ৮৫°৫´ পূর্ব) গুহাত্রয় বলিতে গেলে এই ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য প্রত্নকীর্তি। গুহাগুলি কয়েক শতকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের করায়ত্ত হয়। অবশেষে মুসলমান ফকিরেরা ইহাদের কয়েকটিতে আস্তানা করে।

পর্বতমালার উপর কানিংহাম প্রাকারের চিহ্ন দেখিতে পান। তাঁহার মতে, অভ্যন্তরস্থ অধিত্যকায় প্রাচীন নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি কিছু কিছু পাথর ও ইটের তৈয়ারি সৌধের ভগ্নাবশেষের উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরমুখী করণ চৌপাড় গুহাটি একটি আয়ত চতুষ্কোণ কক্ষ; উত্তর-দক্ষিণে ১০ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ৪ মিটার। ইহার তলছাদ (Ceiling) অর্ধবর্তুলাকার, গরুর গাড়ির ছই-এর মত। অভ্যন্তরের পশ্চিম দেওয়ালের সংলগ্ন একটি বেদী। দেওয়াল গাত্র সুমসৃণভাবে পালিশ করা। দীর্ঘ উত্তর দেওয়ালের মধ্যভাগে দ্বার। দ্বারের বাজুদ্বয় মাথার দিকে হেলান; তাহার ফলে উপরের লক্ষ্মীপাট নীচের চৌকাট হইতে মাপে ছোট; এই বিশেষত্ব এখানকার সবকটি গুহায় এবং নাগার্জুনী পাহাড়ের গুহাত্রয়েও বিদ্যমান। গুহার সম্মুখভাগে, দ্বারের পার্শ্বে, ঊনবিংশবর্ষাভিষিক্ত অশোকের খণ্ডিত লেখ। গুহাটির বহির্ভাগে, পশ্চিম দিকে, একটি শিলার উপর দুইটি মূর্তি ও একটি লিঙ্গ ক্ষোদিত আছে।

দক্ষিণমুখী সুদামা গুহা দুইটি কক্ষে বিভক্ত। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে অপ্রশস্ত ছাদযুক্ত ক্ষুদ্রায়তন বারান্দা। দ্বারের পশ্চাতে আয়ত কক্ষ; ইহার তলছাদ অর্ধবর্তুলাকার খিলানের মত। কক্ষটির পশ্চিম পার্শ্ব অন্য তিন দিকের মত সোজা লাইনে নয়, আংশিক বৃত্তের মত বাঁকান। এই বঙ্কিম অংশের মধ্যভাগে দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশের দ্বার। পূর্বমুখী দ্বিতীয় কক্ষটির বাস্তুনক্সা বৃত্তাকার এবং তলছাদ অর্ধবর্তুল গম্বুজের মত। কক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তর দেওয়াল ও তলছাদ সুমসৃণভাবে পালিশ করা। বারান্দার পূর্ব দেওয়ালে দ্বাদশবর্ষাভিষিক্ত অশোকের একটি লেখ। লেখটি হইতে জানা যায়, এই নিগোহ কুভা (ন্যগ্রোধ গুহা) আজীবিকদের সমর্পণ করা হইয়াছিল। গুহাটির সম্মুখে প্রাপ্ত কয়েকটি ক্ষোদিত স্তম্ভ হইতে অনুমান করা হয় যে ইহার সম্মুখে একটি মণ্ডপ ছিল।

সুদামা গুহার কয়েক গজ পূর্বে দক্ষিণমুখী লোমশ ঋষি গুহার পরিকল্পনা সুদামা গুহারই অনুরূপ। এই গুহার বিশেষত্ব হইতেছে ইহার বহির্দ্বারের উপরিভাগের প্রলম্বিত অংশে চৈত্য-গবাক্ষের আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষোদিত খিলান। গাত্রস্তম্ভ ও কড়িসমষ্টির উপর ন্যস্ত এই খিলান চালাঘরের অর্ধবর্তুলাকার ছাদের মত। খিলানের শীর্ষে চূড়া। কড়ি ও গাত্রস্তম্ভের মধ্যবর্তী অর্ধবৃত্তাকার অংশে জালি-নক্সা ও গজশ্রেণী ক্ষোদিত। সুদামা গুহার সমসাময়িক এই গুহাটির বহির্দ্বারের উপরে পরবর্তীকালের (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) একটি লেখ রহিয়াছে। এই লেখ হইতে জানা যায়, মৌখরীবংশীয় শার্দূলবর্মনের পুত্র অনন্তবর্মন প্রবর-গিরির গুহায় (সম্ভবতঃ এই গুহায়ই) কৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই গুহাত্রয়ের পূর্বদিকে এবং একটু নীচের দিকে বিশ্বঝোপড়ী গুহা। ইহাতে দুইটি কক্ষ। প্রথম কক্ষটি আয়ত। ইহার সম্মুখ (দক্ষিণ) ভাগ উন্মুক্ত। এই কক্ষটির তলছাদ সমান্তরাল এবং অভ্যন্তর সুমসৃণভাবে পালিশ করা। প্রথম কক্ষটির উত্তর দেওয়ালের মধ্যভাগে দ্বিতীয় কক্ষের প্রবেশিকা। প্রবেশিকার পশ্চাতে বৃত্তাকার অসমাপ্ত কক্ষ; ইহার তলছাদের পরিকল্পনা অর্ধবর্তুলাকার। আয়ত কক্ষটির দেওয়ালগাত্রস্থ লেখে দ্বাদশবর্ষাভিষিক্ত অশোক কর্তৃক খলতিক পর্বতে আজীবিকদের গুহাদানের কথা লিপিবদ্ধ।

সুরজঙ্ক নামক বরাবরের অন্যতম চূড়ায় সিদ্ধেশ্বরনাথ নামে লিঙ্গরূপী শিবের মন্দির। বর্তমান মন্দিরটি প্রাচীন মন্দিরের পাদপীঠের উপর নির্মিত। প্রাচীন মন্দিরটি

সপ্তম শতক অথবা তাহারও পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের প্রাঙ্গণে চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে একটি জলাধার পাতাল গঙ্গা নামে খ্যাত। হিন্দুদের কাছে এইটি অতি পবিত্র।

বরাবরের গুহা চতুষ্টয় হইতে প্রায় ১.৬ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নাগার্জুনী পাহাড়ের তিনটি গুহা। তিনটি গুহাই অশোকের বংশধর দশরথ স্বীয় রাজ্যাভিষেকবর্ষে আজীবিক ভদন্তদের বর্ষাবাসের উদ্দেশ্যে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনটিরই অভ্যন্তর সুমসৃণভাবে পালিশ করা।

ইহাদের মধ্যে দক্ষিণমুখী বৃহত্তমটির নাম গোপিকা গুহা ; ইহাতে একটি মাত্র কক্ষ। কক্ষের বাস্তুনক্সা বৃত্তায়ত ; উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়াল দীর্ঘ এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়াল অর্ধবৃত্তাকার। তলছাদ অর্ধবর্তুলাকার খিলানের মত। দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যভাগে দ্বার। দ্বারের শীর্ষে দশরথের লেখ। দ্বারের পশ্চিম বাজুতে শার্দুলবর্মনের পুত্র অনন্তবর্মনের একটি লেখ হইতে জানা যায়, এই মৌখরীরাজ এই গুহায় কাত্যায়নীর (মহিষাসুরমর্দিনীর রূপ) মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। পূর্ব বাজুতে আচার্য যোগানন্দের নাম ৭ম শতকের হরফে লিপিবদ্ধ। গুহাটির সম্মুখে একটি ইদগা আছে ; এইটি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হয়। পাহাড়টির পাদদেশে বহু কবর ; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রায় ৪০০ বৎসর প্রাচীন।

গোপিকা গুহার উত্তরে পাহাড়ের উত্তর গাত্রে বহিয়কা (বর্তমান নাম বাপী) গুহা। এই গুহাতে একটি দক্ষিণমুখী চতুষ্কোণ প্রবেশিকা মণ্ডপ এবং ইহার পশ্চাতে আয়ত কক্ষ। মণ্ডপের সম্মুখভাগ উন্মুক্ত। দশরথের লেখ ভিন্ন আরও কয়েকটি লেখ মণ্ডপের দেওয়ালে ও দ্বারের বাজুতে ক্ষোদিত আছে। এইগুলিতে সাধারণতঃ তীর্থযাত্রী অথবা দর্শকদের নাম রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটিতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের লিপিতে 'আচার্য যোগানন্দ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বর' লেখা আছে। আর একটিতে গুপ্তযুগের হরফে 'বিদেশ বসুস্য কীর্তি' লিপিবদ্ধ। গুহাটির ১৫ মিটার দক্ষিণে একটি প্রাচীন কূপ।

বহিয়কা গুহার পশ্চিমস্থ বড়থিকা গুহাটি একটি আয়ত কক্ষ। দ্বারের নিম্নে ও শীর্ষে অবস্থিত গর্তগুলির মাধ্যমে পূর্বে কাঠের পাল্লা লাগান হইয়াছিল। দ্বারের সম্মুখস্থ লম্বা প্রবেশপথের দুইদিকে শিলা। দশরথের লেখ অতিরিক্ত একটি লেখে অনন্তবর্মন কর্তৃক ভূতপতি ও দেবীর মূর্তি এই গুহায় প্রতিষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ আছে। বহিয়কা ও বড়থিকা গুহাদ্বয়ের সম্মুখভাগে বুকানন ও কানিংহাম বহু ভগ্ন সৌধের ইট প্রস্তরাদি দেখিতে পান।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Reports*, Vol. I. Simla, 1871; M. H. Kuraishi, *List of Ancient Monuments Protected under Act VII of 1904 in the Province of Bihar and Orissa* (Archaeological Survey of India, New Imperial Series, Vol. LI) Calcutta, 1931; D. R. Patil, *The Antiquarian Remains in Bihar*, Patna, 1963; D. C. Sircar, *Select Inscriptions*, Calcutta, 1942.

দেবলা মিত্র

বরাহমিহির কিংবদন্তী এই যে, বরাহমিহির ছিলেন অবন্তিনগরবাসী এবং বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ; এই বিক্রমাদিত্য কাহারও মতে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য, কাহারও মতে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। বরাহমিহির কাহারও মতে ৫৮৭ কাহারও মতে ৫৭৮ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তিনি যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের লোক ছিলেন, তাহার নানারূপ প্রমাণ আছে। অপর একটি কিংবদন্তী এই যে, বরাহ পিতার এবং মিহির তৎপুত্রের নাম।

বরাহমিহির একাধারে জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতে পারদর্শী ছিলেন। 'বৃহৎসংহিতা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তিনি সূর্যচন্দ্রাদির গতি ও প্রভাব, আবহবিদ্যা, স্থাপত্য এবং পূর্তকর্মাদির প্রসঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা, শাকুনবিদ্যা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বরাহমিহিরের অন্যান্য গ্রন্থঃ ১. বৃহদ্বিবাহপটল ও ২. পল্লববিবাহপটল —বিবাহের জ্যোতির্বিদ্যাসম্মত কালাকালাদির আলোচনা ৩. যোগযাত্রা—রাজগণের যুদ্ধোপযোগী গ্রহাদিসংস্থান, ৪. পঞ্চসিদ্ধান্তিকা—সূর্যসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, পৌলিশসিদ্ধান্ত, পৈতামহসিদ্ধান্ত এবং বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, এই ৫টি পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তথ্যসম্বলিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিশাল বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের একটি জেলা, মহকুমা, থানা ও শহর। জেলাটি ২১° ৫৪′—২৩° ২′ উত্তর ৮৯° ৫৫′—৯১° ২′ পূর্বে অবস্থিত। জেলার আয়তন ৯৭৯৮ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৩৬৪০১৮৫ (১৯৫১ খৃ)। জেলার প্রধান নদী কীর্তনখোলা, মেঘনা, ইলসাবা, তেতুলিয়া, পূর্বদিকে মধুমতী, হরিণঘাটা, বালেশ্বর পশ্চিমে ; বিষখালি, আড়িয়ালখাঁ, তোরকী উত্তর-পূর্বে ও বিঘাই দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত। জেলার জমি অত্যন্ত উর্বর ও প্রচুর শস্য জন্মে। ইহাকে পূর্ববঙ্গের শস্যাগার বলা হয়।

জেলার গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ২৮° সেণ্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ ১৯° সেণ্টিগ্রেড। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৭৫ মিলিমিটার।

মধ্যযুগে এই জেলার নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ ও পরে বাকলা। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা

বাখরগঞ্জ নামে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকে। বর্তমানে এই জেলা বাংলাদেশের অন্তর্গত ও বরিশাল নামে পরিচিত।

বালাম চাউল, নারিকেল ও সুপারির জন্য বরিশাল বিখ্যাত এবং এগুলিই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। বরিশালের মসুর ডাল সুন্দর আঘ্রাণের জন্য বিখ্যাত। এখান হইতে শুক্তি ও ঝিনুক রপ্তানি হয়।

পটুয়াখালিতে বিভিন্ন প্রকার নিব, বড়পাইকা ও উজিরপুরে চুড়ি, কাঁচি, যাঁতি, রামদাও, শাঁখের করাত ইত্যাদি তৈয়ারি হয়। বরিশাল, ভোলা, আমতলি, পটুয়াখালি ও গলাচিপায় প্রচুর পরিমাণে মহিষের শিং-এর বোতাম, চিরুনি ও বালা তৈয়ারি হয়। ঝালকাঠি, নলচিটি ও ভোলায় নারিকেল তৈলের কল আছে।

কীর্তিনাশা, মাধবপাশা, গাবখা, উজিরপুর, ঝালকাঠি, নিয়ামতি, সিদ্ধকাঠি, বানরিপাড়া ও বৈশারী তাঁতশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, দৌলতখাঁ ও পটুয়াখালি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কালীগঞ্জ ও কলসকাঠির মেলাতে গবাদি পশু ও কৃষিজপণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়।

জেলার সদর শহর বরিশাল (২২° ৪২´ উত্তর, ৯০° ২২´ পূর্ব) কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে হইতে ইহা জেলা সদর। ইহার প্রাচীন নাম গিরিধি বন্দর। বরিশালের স্ট্র্যান্ড অতি মনোরম। এখানে একটি জাহাজ মেরামতের কেন্দ্র আছে। ইহার লোকসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ৬৯৯৩৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে বরিশাল শিক্ষা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বরিশাল শহরের ২০ কিলোমিটার দূরে শিকারপুর তারাবাড়ি অবস্থিত। ইহা ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম নাসিকা-পীঠ। দক্ষিণ বঙ্গের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ পটুয়া-খালির মসজিদ বাড়িতে। গৌরনদীর ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে গৈলা একটি পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল।

দ্র সুরেন্দ্রনাথ গুহ ও মনোরঞ্জন দত্ত, বাখরগঞ্জের ভূগোল, ঢাকা, ১৯২৩।

কমলকুমার গুহ

বরোদা গুজরাত রাজ্যের একটি বিভাগ, জেলা ও জেলাসদর। জেলার আয়তন ৭৮০৩ বর্গ কিলোমিটার। উহার উত্তর-পশ্চিমে গুজরাতের কায়রা, উত্তরে পাঁচমহল, দক্ষিণে ব্রোচ জেলা এবং পূর্বে মধ্যপ্রদেশ।

জেলাটি প্রায় সমতল। পূর্বদিকের সর্বোচ্চ উচ্চতা ২৮০ মিটারের বেশি নহে। জেলার উত্তর-পশ্চিমে মাহী ও দক্ষিণে নর্মদানদী প্রবাহিত।

বরোদা জেলার গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ তাপ মে-জুনে ৪১° সেণ্টিগ্রেড ওঠে। শীতকালীন সর্বোচ্চ তাপ নভেম্বরে ৩২° সেণ্টিগ্রেড।

বরোদার প্রাচীন নাম বীরক্ষেত্র বা বীরাবতী। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে বোম্বাই রাজ্যের পুনর্গঠন আইনানুসারে বরোদা বর্তমান গুজরাত রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, বাজরা, জোয়ার, গম, ছোলা, ইক্ষু, তামাক প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে গ্রানাইট, ম্যাঙ্গানিজ, নানাবর্ণের মার্বেল ও চুনাপাথর উল্লেখযোগ্য। এখানকার সবুজ মার্বেল প্রসিদ্ধ। জেলার নানা শিল্পের মধ্যে বস্ত্রবয়ন শিল্প প্রধান। বরোদার স্বর্ণ ও রৌপ্য সুতার সূক্ষ্ম বয়ন শিল্প প্রসিদ্ধ। এখানে কয়েকটি কাপড়ের কল আছে। কাঠের উপর সূক্ষ্ম লাক্ষার কাজ খুবই প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া চশমার কাচ ও সাধারণ কাচ এখানে তৈয়ারি হয়।

জেলার লোকসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ১৫২৭৩২৬।

বরোদা জেলার সদর শহর ও গুজরাতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর বরোদা বিশ্বামিত্রি নদীর তীরে অবস্থিত (২২°১৭´ উত্তর ও ৭৩°১৫´ পূর্ব)। বোম্বাই হইতে ইহার দূরত্ব ৩৯২ কিলোমিটার। বরোদা পৌর এলাকার আয়তন ৩৩ বর্গকিলোমিটার। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা পৌর-শাসনের অধীনে আসে।

দেশীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বদান্যতায় বিশেষ করিয়া গাইকোয়াড় রাজত্বের সময় স্কুল কলেজ, গবেষণাগার প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বরোদা এম. এস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বরোদা শহরে শিক্ষার হার শতকরা ৫৫ জন। শিক্ষামূলক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেঠ ইউ. পি আয়ুর্বেদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলেজ অফ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরোদা কলাভবনও বিশেষ প্রসিদ্ধ। বরোদার মিউজিয়ামটি ভারতের একটি বিখ্যাত ও সুপরিকল্পিত সংগ্রহশালা।

এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে ভীমনাথ মহাদেব মন্দির, বিশ্বামিত্রির উপর পাথরের সেতু, সুরসাগর, স্বর্ণ ও রৌপ্য কামান, মকরপুরা প্রাসাদ, পাঁচবিবির দরগা, সূর্যনারায়ণ মন্দির, নজরবাগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র Bendapudi Subbarao, *Baroda through Ages*, Baroda, 1953.

সুচিৎকুমার সুর

বর্গী ফারসী বারগীর শব্দের অপভ্রংশ। শিবাজীর সময় হইতে মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যদের (পাগা) দুইভাগে ভাগ করা হইত—বর্গী ও শিলেদার। বর্গীদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া সরকার হইতে দেওয়া হইত ; শিলেদারদের দেওয়া হইত না। তাঁহারা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়া লইয়া সৈন্যদলে যোগ দিতেন। সেনাবাহিনীতে শিলেদারদের স্থান বর্গীদের নীচে।

তাঁহারা সংখ্যাতেও কম ছিলেন। শিবাজীর জীবনীলেখক কৃষ্ণাজি অনন্ত সভাসদ বলিয়াছেন সেনাপতি নেতাজী পলকরের অধীনে দশহাজার অশ্বারোহী ছিল। ইহাদের মধ্যে সাতহাজার বর্গী, বাকী তিনহাজার শিলেদার।

২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর একজন কর্মচারী থাকিতেন। তাঁহাকে হাবলদার বলা হইত। পাঁচজন হাবলদারের উপরে আবার একজন জুমলাদার থাকিতেন। দশজন জুমলাদারের উপর একজন হাজারী। পাঁচজন হাজারীর উপরের কর্মচারীকে পাঁচহাজারী বলা হইত।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দীর শাসনকালে নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কররাম কোলহাতকরের (ভাস্কর পণ্ডিত) অধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য বাংলাদেশে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করে। ইহাই বর্গীর হাঙ্গামা বলিয়া পরিচিত। প্রায় ৯ বৎসর এইরূপ হাঙ্গামা চলিয়াছিল। এই বৎসর (১৭৪২ খ্রী) এপ্রিল মাসে ওড়িশা হইতে ফিরিবার পথে আলিবর্দী বর্ধমান শহরে রাণী দীঘির নিকট আসিলে মারাঠা অশ্বারোহীরা তাঁহার শিবির অবরোধ করে। সিয়ার-উল্ মুতক্ষরীণের গ্রন্থকার গোলাম হোসেন বলিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজার ছিল। অন্যান্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন মারাঠা সৈন্যর প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশী ছিল। নবাব অতিকষ্টে তাহাদের অবরোধ ভেদ করিয়া ২৬ এপ্রিল কাটোয়ায় গিয়া উপস্থিত হন। মে মাসের প্রথমদিকে বর্গীরা হঠাৎ ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া মুর্শিদাবাদ শহরে লুটপাট করে। জগৎশেঠের বাড়ি হইতে তাহারা অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে সম্ভবতঃ ইহারই উল্লেখ করিয়াছেন—

"লুঠি বাঙলার লোক করিল কাঙ্গাল
গঙ্গাপার হইল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল।"

আলিবর্দী পরদিন মুর্শিদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার নিকট তাড়া খাইয়া বর্গীরা কাটোয়ায় পলাইয়া গেল। পুজার সময় কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে বর্গীরা দুর্গাপুজো করিতেছিল ; নবমীর দিন আলিবর্দী সহসা তাহাদের আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। পুনরায় বালেশ্বরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে পলাইয়া গেলেন।

এইরূপ ঘটনা প্রতি বৎসরই হইতে লাগিল। পরের বার ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলে নিজে বাংলাদেশ আক্রমণ করিলেন, দিল্লীর বাদশাহের অনুরোধে পেশোয়া বালাজী বাজীরাও বাংলাদেশ হইতে বর্গীদের তাড়াইয়া দিতে রাজী হইলেন। নবাব স্বীকার করিলেন যে তিনি মারাঠা রাজা শাহুকে বাংলাদেশের চৌথ এবং পেশোয়াকে যুদ্ধের খরচ বাবদ ২২ লক্ষ টাকা দিবেন। পেশোয়ার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রঘুজী ভোঁসলে পলাইয়া গেলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনও স্থায়ী ফল হইল না। বর্গীরা প্রতি বৎসর বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার সেনাপতিদের মানকরা নামক স্থানে (মুর্শিদাবাদের নিকট) নবাব শিবিরে সন্ধির অছিলায় নিমন্ত্রণ করিয়া হত্যা করা হইল। ইহার পরে এক বৎসরের বেশিকাল বর্গীর উৎপাত বন্ধ ছিল। তাহার পর আবার সুরু হইল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আলিবর্দী ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহার প্রধান শর্ত ছিল যে মারাঠারা ওড়িশা হইতে সুবর্ণরেখা অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে প্রবেশ করিবে না। জলেশ্বরের কাছে সুবর্ণরেখার হ্রদের পূর্বতীর পর্যন্ত আলিবর্দীর রাজ্যের সীমানা। আলিবর্দী রঘুজীকে প্রতি বৎসর বাংলা দেশের চৌথ হিসাবে বার লক্ষ টাকা দিবেন। ওড়িশা এই সময় হইতে সম্পূর্ণভাবে মারাঠাদের হাতে চলিয়া গেল। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ওড়িশা ইংরেজদের অধিকারে আসে।

বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বর্ধমান ও মেদিনীপুর ছারখার হইয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি হয়। কাশিমবাজার হইতে কলিকাতার পথে ইংরেজদের কয়েকটি নৌকা বর্গীরা লুট করে, কিন্তু তাহারা কখনও কলিকাতায় পদার্পণ করে নাই। ইংরেজরা শহর সুরক্ষিত করিবার জন্য দেশীয় বণিকদের সহায়তায় শহরের চারিদিক ঘিরিয়া 'মারাঠা ডিচ' খনন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কাজ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই বর্গীদের উৎপাত বন্ধ হইয়াছিল। খাতের বাকি অংশ আর সম্পূর্ণ হয় নাই। বর্গীদের ভয়ে অনেক ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী লোক রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশে বসতি করেন। ইহাতে কলিকাতার খুব শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ইংরেজ কোম্পানির প্রতিপত্তিও অনেক বাড়িয়া যায়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' বর্গী আক্রমণের উল্লেখ আছে। গঙ্গারামকৃত 'মহারাষ্টা পুরাণে' ভাস্করের মৃত্যু পর্যন্ত বর্গীর হাঙ্গামার বিশদ বিবরণ আছে। ফারসী ইতিহাস সিয়ার-উল-মুতক্ষরীণ, মুজফ্ফরনামা, আওয়াল-ই-মহবৎজং প্রভৃতি গ্রন্থে বর্গীর আক্রমণের কথা আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্র সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৩ বংগাব্দ ; S. N. Sen, *Siva Chhatropati*, Calcutta, 1920; S. N. Sen, *Administrative System of the Marathas*, Calcutta, 1925; J. N. Sarkar, ed., *The History of Bengal*, vol. II, Dacca, 1948; J. N. Sarkar, *Bengal Nawabs*, Calcutta, 1952; S. N. Sen, *Military System of the Marathas*, Bombay, 1958; K. K. Datta, *Alivardi and his Times*, Calcutta, 1963; Dimock & Gupta, *Maharashta Puran*, Honolulu, 1965.

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

বর্ণমালা লিপি দ্র

বর্ণালীবিদ্যা বিভিন্ন রঙ্‌ অর্থাৎ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মিশ্রিত আলোককে ঐ সকল বিশিষ্ট রঙ্‌ বা বিশিষ্ট তরঙ্গে বিশ্লেষিত করার প্রক্রিয়াকে বর্ণালী পরীক্ষা ও ঐ সংক্রান্ত বিদ্যাকে বর্ণালীবিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। ঐ বিশ্লেষিত আলোককে বর্ণালী বলা হয়। সাধারণতঃ প্রিজ্‌ম বা ত্রিশিরা কাচ ও গ্রেটিং বা ঝাঝরির সাহায্যে বর্ণালী-বিশ্লেষণ করা হয়। বর্ণালী পরীক্ষায় সাধারণভাবে যে সকল যন্ত্রকে কার্যে নিয়োগ করা হয় তাহাদের নাম স্পেক্‌ট্রোস্কোপ বা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, স্পেক্‌ট্রোমিটার বা বর্ণালীমাপক ও স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ্‌ যন্ত্র—যাহাতে বর্ণালীর ফোটোগ্রাফ তোলা হয় বা অন্য কোনও উপায়ে বর্ণালীর রঙ্‌গুলির পারস্পরিক অবস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রাকৃতিক বিশেষ অবস্থায় সৌরালোক বিশ্লেষিত হইয়া রামধনুর জন্ম দেয়।

নিউটনই প্রথম ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সৌরালোককে বিশ্লেষিত করিয়া সপ্তবর্ণবিশিষ্ট বর্ণালীর অনুসন্ধানে কৃতকার্য হন। সৌর বর্ণালীতে অদৃশ্য অতিবেগুনী অংশের আবিষ্কার করেন রিটার। তৎপূর্বেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হার্শেল ঐ বর্ণালীতে অবলোহিত অংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন। ইয়ং (Young) সৌর বর্ণালীর সাতটি রঙ্‌-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিভিন্নতার পরিমাপ করেন। ফ্রাউনহোফার বর্তমানে প্রচলিত যন্ত্রের অনুরূপ স্পেক্‌ট্রোমিটার নির্মাণ করিয়া সৌরবর্ণালী পর্যবেক্ষণকালে তাঁহার নামাঙ্কিত কৃষ্ণরেখাবলীর সন্ধান পান (Fraunhofer lines)। কির্‌সফ্‌ (Kirchoff) আলোক শোষণ ও বিকিরণের বিখ্যাত নিয়মাবলীর প্রস্তাব করেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং তিনি ও বুনসেনই (Bunsen) প্রকৃতপক্ষে প্রথমে বর্ণালীবীক্ষণ দ্বারা পদার্থের রাসায়নিক বিশ্লেষণ পরীক্ষার ভিত্তিস্থাপন করেন (১৮৬১ খ্রী)। বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে তাঁহারা দুইটি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করেন, যথা সীজিয়াম ও রুবিডিয়াম। এই প্রক্রিয়ার মূলসূত্র হইল কির্‌সফের নিয়ম, যথা: বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের রেখবর্ণালীর রূপ পরস্পর হইতে বিভিন্ন;—যেমন কণ্ঠস্বরে নির্দিষ্ট মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই রেখবর্ণালীর রূপ দেখিয়াই মৌলিক পদার্থটিকে চিনিতে পারা যায়।

ইহা হইল বিকিরিত আলোকের বর্ণালীর কথা। আলোক শোষণের ক্ষেত্রেও নিয়ম হইল—যে মৌলিক পদার্থ যে বর্ণালী রেখাবলীর জন্ম দেয় সাধারণ মিশ্রিত আলোক হইতে ঐ মৌলিক পদার্থ (মনে করা যাক উহার গ্যাসীয় অবস্থায় উহার ভিতর দিয়া আলোক পাঠাইলে) ঐ সকল রেখাগুলিকেই শোষণ করিবে। এই নিয়মের ফলেই বর্ণালী শোষণের দ্বারা অঙ্গারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ পরীক্ষা সহজ হইয়াছে।

বর্ণালী বিদ্যায় ব্যবহৃত যন্ত্রাদি:—প্রথমতঃ আলোক-উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। শিখা, বৈদ্যুতিক ঝলক (spark), গাইস্‌লারের স্বল্পচাপযুক্ত গ্যাসপূর্ণ নল (তড়িৎ-চাপ সৃষ্টি করিলে আলোক নিঃসৃত হয়), দুইটি বিদ্যুদ্দণ্ড কাছাকাছি রাখিয়া উহাতে বিদ্যুৎচাপ বজায় রাখিলে যে তড়িজ্জনিত ছটা নিঃসারিত হয় সেই আর্ক (arc), দণ্ড-বিহীন উচ্চ স্পন্দনযুক্ত বিদ্যুৎচাপ দ্বারা পুষ্ট আলোক-নিঃসারী গ্যাসনল (electrodeless discharge) প্রভৃতি নানা প্রকারের উৎস হইতে পারে।

বর্ণালী বীক্ষণ বা পরিমাপক যন্ত্র—ইহাও নানা প্রকারের হয়। দৃশ্য আলোকের ক্ষেত্রে ক্রাউন কাচ নির্মিত প্রিজ্‌ম-সম্বলিত যন্ত্র অথবা সমতল ও অবতল গ্রেটিং যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অতিবেগুনী আলোর বর্ণালী পরীক্ষার কার্যে কোয়ার্ট্‌জ (quartz)-এর নির্মিত প্রিজ্‌ম, ও অবলোহিতের ক্ষেত্রে গ্রেটিং ব্যবহৃত হয়। ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রে বর্ণালী বীক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন মাইকেলসন। দূরস্থ নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণালী পরীক্ষায়ও ইণ্টারফেরোমিটার গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা লইয়াছে। ফাব্রি (Fabry) ও পেরো (Perot)-র বিশেষ ধরণের ইণ্টারফেরোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অতিশয় সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হইয়াছে। বেনোয়া (Benoit) এবং ফাব্রি ও পেরো ক্যাড্‌-মিয়াম হইতে নিঃসারী বর্ণালীর লাল রেখাটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিরূপিত করেন। উহার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৬৪৩৮·৪৬৯৬ আংস্ট্রম (Angstrom) একক। ঐ এককের মাপ $১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার। 'আলোক' দ্র।

বর্ণালীবিদ্যার বিবিধ প্রয়োগ: ১. রাসায়নিক বিশ্লেষণ: এ-বিষয়ে কির্‌সফ ও বুনসেনের কার্যের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অজৈব রসায়ন গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণালী পরীক্ষা আবশ্যিক। জৈব রসায়ন ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। অবলোহিত ও অতিবেগুনী বর্ণালীবীক্ষণ বৃহৎ অণু-সম্বলিত অঙ্গারাত্মক রসায়নের গুণাগুণ বিচারে সর্বদা ব্যবহৃত হইতেছে।

২. পারমাণবিক ও আণবিক গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় প্রয়োগ: হাইড্রোজেন বর্ণালীর উৎসের সন্ধানে গবেষণারত বোর্‌-এর (Niels Bohr) পরমাণু গঠন তত্ত্ব আবিষ্কার প্রসঙ্গ অন্যত্র বলা হইয়াছে ('পরমাণু' দ্র)। যৌগিক অণুতে আণবিক বলদ্বারা বদ্ধ পরমাণুগুলি অনড় নহে; বরং আবদ্ধ অবস্থাতেই কম্পিত হইতেছে ও সামগ্রিক ঘূর্ণন প্রভৃতি গতিও আছে। রমন দেখাইয়াছেন ও কোয়াণ্টম তত্ত্বেও প্রমাণিত হইয়াছে যে 'কণিকাধর্মী' আলোক (Photon) ঐ প্রকার অণুর সহিত সংঘাতে পরমাণুগুলির গতিশক্তি হইতে কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করিয়া অধিকতর বলশালী হয় ও উহার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রস্বতা বর্ণালীমাপক যন্ত্রদ্বারা পরিমাপ করিয়া আন্তরাণবিক বল প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য জানা যায়। রমন তাহা দেখাইয়াছেন।

৩. পরমাণু কেন্দ্র সম্পর্কীয় গবেষণায় প্রয়োগ: দুইটি

সমঘরযুক্ত পরমাণুর রাসায়নিক গুণাগুণ সম্পূর্ণ এক, সুতরাং বর্ণালী রেখাও একই রূপ হইবে—কারণ উভয়ই পরমাণুতে কেন্দ্র হইতে সর্বাপেক্ষা দূরস্থিত ইলেকট্রনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল ('পরমাণু' দ্র)। কিন্তু কেন্দ্রকের ভর ভিন্ন হওয়ার জন্য, বোর্-এর তত্ত্ব অনুযায়ীও দুইটি সমঘরের বর্ণালী রেখায় যৎসামান্য তফাৎ হইবে। অতিশয় সূক্ষ্ম বর্ণালীমাপক যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সূক্ষ্ম তফাৎ ধরা সম্ভব ও এই উপায়েই ইউরে (Urey) হাইড্রোজেনের সমঘর ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম আবিষ্কার করেন।

কেন্দ্রকের আর একটি বিশেষ ধর্ম, ঘূর্ণন (spin)-ও বর্ণালীরেখার সূক্ষ্মতম গঠনবৈচিত্র্য (hyperfine structure) পরিমাপের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে।

এক্স-রশ্মির বর্ণালীবীক্ষণ : সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-চৌম্বক বর্ণালী অনুধাবন করিলে ('আলোক' দ্র) দেখা যাইবে এক্স-রশ্মি সাধারণ আলোকের বহুগুণ ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যসম্পন্ন। এক্স-রশ্মির বর্ণালী বীক্ষণের কার্যে কেলাসের ব্যবহার হইয়াছে ; কারণ একমাত্র প্রকৃতিই এত ক্ষুদ্র অথচ নিয়মিত সজ্জায় বিন্যস্ত, সংঘাত-বিসৃষ্টিকারী (scatterer) বস্তু, যথা পরমাণুগঠিত গ্রেটিং, সৃষ্টি করিতে পারে—যাহার নিয়মিত অন্তরালসমূহ এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের প্রায় সমান। এক্স-রশ্মির বর্ণালী পরীক্ষায় ব্র্যাগ (Bragg)-প্রবর্তিত নিয়মই প্রাথমিক। মোজ্লী (Moseley) সাধারণভাবে প্রতিটি পরমাণুর নিঃসারী এক্স-রশ্মির বর্ণালীর রেখাগুলির তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করিয়া দেখাইয়াছেন যে বোর্-এর (Bohr) পরমাণু গঠনের নিয়মের সাহায্যে এক্স-রশ্মির বর্ণালীর অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা যায়—অর্থাৎ এক্স-রশ্মির জন্ম কিভাবে হইতেছে তাহা বোঝা যায়।

দীর্ঘতরঙ্গযুক্ত এক্স-রশ্মির বর্ণালীবীক্ষণে অবতল রেখাজাল-গ্রেটিং-এর ব্যবহার সম্ভব।

বিমলেন্দু মিত্র

বর্ণাশ্রম হিন্দুসমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি বর্ণে বা শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীবিভাগ জন্মগত। ঋগ্বেদে (১০৷৯০৷১২) ইহার উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ পরম পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, শূদ্র পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন। বর্ণগুলির কর্ম ও বৃত্তি বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। যাগযজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান প্রথম তিন বর্ণেরই কর্তব্য। জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ বা সৎলোকের নিকট হইতে দানগ্রহণ; ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন; বৈশ্যের কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও সুদের ব্যবসায় ; শূদ্রের দ্বিজ শুশ্রূষাই প্রধান কর্ম, তাহা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে বণিগ্‌বৃত্তি ও বিবিধ শিল্পকর্ম অবলম্বনীয়। শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—উপনয়ন নাই। অসৎ কর্মের ফলে উচ্চবর্ণের নিম্নবর্ণে পতিত হইবার নিয়ম ছিল কিন্তু সৎকর্মের দ্বারা নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণে উন্নয়নের ব্যবস্থা ছিল না। সবর্ণ বিবাহ প্রশস্ত ছিল। তবে অনুলোম বিবাহ বা উচ্চবর্ণের পুরুষের নিম্নবর্ণের স্ত্রীগ্রহণ বিহিত ছিল। প্রতিলোম বিবাহ বা নিম্নবর্ণের পুরুষের পক্ষে উচ্চবর্ণের স্ত্রীগ্রহণ নিন্দনীয় ছিল। হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতে অসবর্ণ বিবাহের ফলে বর্ণসংকর ও বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান যথাক্রমে মূর্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও নিষাদ নামে পরিচিত ; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভজাত সন্তান যথাক্রমে মাহিষ্য ও উগ্র নামে অভিহিত ; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত সন্তানের নাম করণ। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তান যথাক্রমে সূত, বৈদেহক ও চণ্ডাল। বৈশ্য ও শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভোৎপন্ন সন্তান মাগধ ও ক্ষত্তা। শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান আয়োগব। এই সমস্ত বর্ণসংকরের পরস্পর মিশ্রণে অসংখ্য জাতি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের কিছু কিছু পরিচয় ও বৃত্তির উল্লেখ বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। আশ্রমের কথা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে দেওয়া হইয়াছে। 'আশ্রম' দ্র।

দ্র মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, আচারাধ্যায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বর্ণী, জিয়াউদ্দীন ঐতিহাসিক; ইনি ফার্সী ভাষায় 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহি' নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ফিরোজ তোগলকের রাজত্বকালে প্রায় ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ইতিহাস রচনা করেন। গিয়াসুদ্দীন বলবন হইতে আরম্ভ করিয়া ফিরোজ তোগলকের রাজত্বের প্রথম ৬ বৎসর পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানগণের সমসাময়িক ঘটনাবলী ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজদরবারে যাতায়াতের সুবিধা থাকাতে তাঁহার পক্ষে প্রকৃত তথ্যাদি জ্ঞাত হইবার এবং বিবৃত করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করাই তিনি একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি তাঁহার রচনায় সন ও তারিখের ভুল, লেখার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব, কোনও কোনও সময়ে পরের ঘটনা আগে এবং আগের ঘটনা পরে উল্লেখ, কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ না করা এবং কোনও কোনও বিষয় গোপন করা ; যেমন গিয়াসুদ্দীন তোগলকের মৃত্যুর ব্যাপারে মহম্মদ তোগলকের দায়িত্ব ইত্যাদি ত্রুটি দেখা যায়। তৎসত্ত্বেও তাঁহার রচিত ইতিহাস নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান গ্রন্থ।

দ্র Elliot and Dowson, *The History of India as told by its own historians*, vol. III, Calcutta, 1953; R. C. Majumder, *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি জেলা ও শহর। জেলাটির বিস্তৃতি ২২°৫৬′—২৩°৫৩′ উত্তর ও ৮৬°৪৮′—৮৮°২৫′ পূর্ব। বর্তমানে ইহার আয়তন প্রায় ৭০৩৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা; পূর্বে নদিয়া; দক্ষিণে হুগলি, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া এবং পশ্চিমে ধানবাদ জেলা অবস্থিত।

জেলার পশ্চিমদিকে আসানসোল মহকুমাটি বন্ধুর। বরাকর নদীর তীরে মাইথন চূড়াটি (২২২ মিটার) জেলার সর্বোচ্চ স্থান। বন্ধুর অঞ্চলটি ব্যতীত সমগ্র জেলাটিই সমভূমি।

বরাকর, দামোদর ও অজয় নদী যথাক্রমে জেলার পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর সীমানা দিয়া এবং ভাগীরথী জেলার পূর্ব দিক দিয়া প্রবাহিত।

আসানসোল মহকুমায় গণ্ডোয়ানা যুগের বিভিন্ন প্রকারের বেলে পাথর, কংগ্লোমারেট এবং শেল পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট অঞ্চল পলিস্তর দ্বারা আবৃত।

জেলায় গ্রীষ্মকালে দিনের তাপমাত্রা প্রখরতর হয়। এপ্রিলে ৩৯° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। রাত্রে গড় তাপমাত্রা জানুয়ারীতে প্রায় ১৪° সেণ্টিগ্রেড ও জুনে ২৬° সেণ্টিগ্রেড। বৎসরে ১৪৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

মহাবীর বর্ধমান জৈনধর্ম প্রচার করিতে এখানে আসিয়াছিলেন। জেলাটি গুপ্ত- ও সেন-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমান রাজ্যের পত্তন হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার সহিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়।

জেলায় বনভূমির আয়তন প্রায় ১১০০০ হেক্টর। দুর্গাপুর-বনভূমি হইতে শাল কাষ্ঠ আহরণ করা হয়। আসানসোলের বনাঞ্চলেও শালবৃক্ষই প্রধান।

ইডেন খাল, দামোদর খাল ও দামোদর উপত্যকা-সংস্থার প্রধান ও শাখা খালগুলির দ্বারা জেলার মধ্য ও পূর্ব ভাগে বর্তমানে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ২৭৭৯৮৮ হেক্টর জমিতে জলসেচ হয়। কিঞ্চিদধিক দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে কৃষিকার্য হইয়া থাকে। আউশ, আমন ও বোরো ধান এবং আলু, পেঁয়াজ, তৈলবীজ, ডাল, ইক্ষু, পাট ও তরকারির চাষ হয়। দিয়ারা জমিতে ডাল, গম, বার্লি, তৈলবীজ ও তরকারি উৎপন্ন হয়। বীজ, সার ও কৃষি-সম্পর্কিত একটি সরকারি পরীক্ষাকেন্দ্র বর্ধমান শহরের নিকটবর্তী নরি গ্রামে অবস্থিত।

বর্ধমানের রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লা প্রসিদ্ধ। বৎসরে ২ কোটি মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এখানে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র লৌহপিণ্ডে শতকরা ৪৩-৬৫ ভাগ লোহা থাকে। ফায়ার-ক্লে ও পটারি-ক্লে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

আসানসোল ও দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল হিসাবে ভারতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে দুর্গাপুর ও বার্নপুরের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প প্রধান। ইহা ছাড়া জে. কে. নগরের অ্যালুমিনিয়াম-শিল্প, রাণীগঞ্জের কাগজের কল, কন্যাপুরের সাইকেল-কারখানা, রূপনারায়ণপুরের বৈদ্যুতিক তারের কারখানা, চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন তৈয়ারি কারখানা, দুর্গাপুরের কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট ও চশমার কাচের কারখানা উল্লেখযোগ্য।

পূর্বস্থলী, কালনা, মন্তেশ্বর প্রভৃতি প্রধান বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র। কাঞ্চননগরে ছুরি, কাঁচি ও ক্ষুরের ফলা তৈয়ারি হয়।

দামোদর উপত্যকা-পরিকল্পনায় দুর্গাপুর ও ত্রিবেণীর মধ্যে বিস্তৃত ১৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ নাব্য খালটি মাল-বহনে সাহায্য করিতেছে। একটি তাপ-বিদ্যুৎ-কেন্দ্র দুর্গাপুরে স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রাণ্ড ট্রাংক রোড এবং পূর্ব রেলের প্রধান রেলপথ দামোদরের উত্তর তীরে প্রসারিত রহিয়াছে। পূর্ব রেলের কয়েকটি অপ্রশস্ত রেলপথ শহর ও গ্রামগুলিকে সংযুক্ত করিয়াছে।

এই জেলায় শতকরা ৩৯ জন পুরুষ ও শতকরা ১৮ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত (১৯৬১)। এখানে ১২টি কলেজ, ২৮০৯টি বিদ্যালয় ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এই জেলার লোকসংখ্যা ৩০৮২৮৪৬।

এখানকার নবাবহাটের ১০৮ শিবমন্দির ও গৌরাঙ্গপুরে ইছাই ঘোষের মন্দির উল্লেখযোগ্য। দেউলিয়া ও মন্তেশ্বরে প্রাচীন মন্দির আছে। মঙ্গলকোট থানার খিবগ্রাম, কোগ্রাম এবং কেতুগ্রাম পীঠস্থান।

জেলার প্রধান শহর বর্ধমান (২৩°১৪′ উত্তর, ৮৭°৫১′ পূর্ব)। বাঁকা নদীর তীরস্থিত এই নগরটিতে জেলা ও মহকুমার সদরদপ্তর অবস্থিত। ইহার প্রায় ২৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় ১০৮২২৪ জন লোক বসবাস করে (১৯৬১ খ্রী)। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পৌরসভা কার্য করিতেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ ও বাগান, কৃষ্ণসাগর ও রাণীসাগর পুষ্করিণী এবং স্টার অফ ইণ্ডিয়া দরজা দর্শনীয়। নূরজাহানের প্রথম স্বামী শের আফগান ও জাহাঙ্গীরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুতুবুদ্দীনের কবর আলমগঞ্জে অবস্থিত। ('দুর্গাপুর', 'কাটোয়া', 'কুলটি', 'আসানসোল', 'চিত্তরঞ্জন' দ্র)

দ্র B. Roy, *Census 1961, West Bengal, District Census Handbook, Burdwan*, vol. II, Calcutta, 1966.

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

বর্মী ব্রহ্মদেশের প্রধান ভাষা। ভোট-চীনীয় ভাষাগোষ্ঠীর

অন্তর্গত ভোট-বর্মী ভাষাগুচ্ছের অন্যতম। ভোট-বর্মী ভাষা ১. হিমাচলীয় দেশগুলিতে ২. আসামে ও ৩. ব্রহ্মদেশে বিভিন্নতা লাভ করিয়াছে। একাদশ শতকের পূর্বে বর্মীয় ভাষার লেখ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্মী লিপি দক্ষিণভারতীয় লিপির সধর্মী। এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য—শব্দের একাক্ষর ও বিচিত্র স্বর (৩টি ঊর্ধ্ব ও ২টি নিম্ন স্বর)। ইহা ছাড়া উল্লেখ্য বিশেষত্ব—বাক্যমধ্যে শব্দের অর্থসম্বন্ধ বুঝাইতে কতকগুলি উপশব্দের ব্যবহার (নামবাচক শব্দের পর অবস্থিত উপায়, সাম্য, তারতম্য প্রভৃতি ও ক্রিয়াবাচক শব্দের সহিত সম্মতি-অসম্মতি, বিভিন্ন কাল ও নানা ভাব এবং বাক্যের প্রাধান্য-অপ্রাধান্যও বুঝাইয়া থাকে) ; সংখ্যা বুঝাইতে জাতিবাচক শব্দ ব্যবহার (যথা, 'লু ত' য়াউ?' = মানুষ একজন, 'য়' 'থা হি? 'সি' = গাড়ি দুই চড়ার জিনিস অর্থাৎ দুইটি গাড়ি) ; নাম ও ক্রিয়ার পুনরুক্তি (যথা, 'ত' নে' নে'' = একদিন ও একদিন অর্থাৎ কোনও দিন), 'মিয়ান মিয়ান' = তাড়াতাড়ি করা তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ শীঘ্র করিয়া) ; ক্রিয়ার পূর্বে 'অ' দিয়া ক্রিয়াবিশেষ্য সৃষ্টি (যথা, 'অ' 'থাউঙ্‌ অ' রে' = বেচাকেনা) ; পালিভাষা হইতে অনেক সময় কিছু পরিবর্তিত অর্থে বহু শব্দগ্রহণ ; লেখার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে পার্থক্য। শব্দক্রমের প্রধান নিয়ম—উপশব্দসহ প্রধান ক্রিয়াশব্দটি বাক্যশেষে বসে ; মিশ্রবাক্যে অপ্রধান বাক্যাংশ প্রধান বাক্যের পূর্বে বসে ; অধিকারীবাচক শব্দ অধিকৃতবাচক শব্দের পূর্বে বসে ; বিশেষক শব্দ বিশেষ্য শব্দের পূর্বে বসে।

[বানান সূত্র ঃ অ'=১ (অতিহ্রস্ব স্বরধ্বনি) ; ?= glottal stop (কণ্ঠনালীয় স্পষ্টধ্বনি) ; ' = ঊর্ধ্বপাতন স্বর ; /=ঊর্ধ্বোত্থিত স্বর]।

দ্র J. E. Bridges, *Burmese Grammar*, London, 1915; L. E. Armstrong & P. M. Tin, *Burmese Phonetics Reader*, London, 1925; *Chambers Encyclopaedia*, vol. II, London, 1955.

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

বলখেলা[২] ফুটবল খেলা নানাপ্রকার। বর্তমান নিবন্ধে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল বা সকার খেলা আলোচিত হইবে। গ্রেট ব্রিটেনে বহুকালব্যাপী বিকাশের ফলে এই খেলা আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছে।

সকার (Soccer) পদ্ধতির ফুটবল খেলায় ২টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, প্রতি দলে ১১ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকে। বলটির আকৃতি গোল এবং চামড়ার নীচে ২৭″ হইতে ২৮″ ব্যাসের একটি ফোলানো রবারের ব্লাডার থাকে। খেলা আরম্ভের সময় বলটির ওজন ১৪·৮২ আউন্স হইতে ১৬ আউন্সের মধ্যে হইবে। বলটি পায়ের দ্বারা অথবা দুই হাত ব্যতীত শরীরের অন্য যে কোনও অংশের দ্বারা খেলা যায়। গোলরক্ষক অবশ্য দুই হাত ব্যবহার করিতে পারেন কিন্তু তাহা নিজস্ব পেনাল্টি সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ফুটবল মাঠের সীমানা দৈর্ঘ্যে ১০০ হইতে ১৩০ গজ এবং প্রস্থে ৫০ হইতে ১০০ গজের মধ্যে হইবে। ভারতে বল খেলার (সিনিয়ার গেম) জন্য মাঠের সীমানা ১০০×৮০ গজ হয়।

৮ গজ চওড়া ও ৮ ফুট উঁচু গোলপোস্ট মাঠের দুই দিকেই শেষ সীমার মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকে। যে পক্ষ অধিক গোল দিতে পারেন সেই পক্ষেরই জয় হয়। গোল করার জন্য প্রতি দলকে বলটি বিরোধী পক্ষের গোলপোস্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইতে হয়। অফসাইডে থাকিয়া খেলা, হ্যাণ্ডবল বা হাত দিয়া বলখেলা, ট্রিপিং বা ল্যাংমারা, পুসিং বা ধাক্কা দেওয়া, বে-আইনি চার্জ বা প্রতিরোধ এবং অবৈধ উপায়ে প্রতিপক্ষের খেলায় বাধা সৃষ্টি করা—এই সমস্ত অপরাধের জন্য আইনলঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে শাস্তিস্বরূপ অপরপক্ষকে ঘটনার স্থান হইতে ফ্রি কিকের সুযোগ দেওয়া হয়। কোনও খেলোয়াড় যদি নিজস্ব পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফাউল করেন তাহা হইলে শাস্তি হিসাবে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষকে পেনাল্টি কিক করিতে দেওয়া হইবে। প্রতিপক্ষের যে কোনও একজন খেলোয়াড় গোল লাইনের মধ্যবিন্দু হইতে সামনে ১২ গজ দূরত্বে অবস্থিত পেনাল্টি কিকের জন্য নির্দিষ্ট স্থান হইতে গোলে কিক করিবার সুযোগ পান। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে কেবলমাত্র গোলরক্ষক এবং যে খেলোয়াড় পেনাল্টি শট লইবেন এই দুই জন থাকিতে পারিবেন। ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার সময়কে ৪৫ মিনিট করিয়া দুই অর্ধাংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। অর্ধাংশের মধ্যভাগে কিছুক্ষণ বিরতি থাকে। বিরতির পর উভয় দলই দিক পরিবর্তন করেন। খেলার পূর্বে দুই দল টস করেন, টসে বিজয়ী দল প্রথমে মাঠের কোন্ দিকে দাঁড়াইবেন অথবা কিক্-অফ করিবেন তাহা বাছিয়া লইবেন। মাঠের কেন্দ্রস্থল হইতে শট করিয়া খেলার সূচনা করা হয়। প্রত্যেক গোলের পর এবং বিরতির পরও অনুরূপভাবে খেলা পুনরারম্ভ হয়। খেলার সময়ে বল যদি পার্শ্বসীমানা বা সাইড লাইনের বাহিরে যায় তাহা হইলে যে পক্ষ শেষ বল খেলিয়াছিলেন তাহার বিরোধীপক্ষের একজন খেলোয়াড় যে স্থান দিয়া বল বাহিরে গিয়াছিল সেই স্থানে (মাঠের বাহিরে) স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া মাথার উপর দিয়া দুইহাতে মাঠের ভিতর বল ছুঁড়িয়া দিয়া খেলা পুনরায় শুরু করিবেন। যদি আক্রমণকারী দল অপরপক্ষের গোলসীমানা বা গোল লাইনের বাহিরে বল পাঠান তাহা হইলে রক্ষণকারীদল নিজস্ব গোল সীমানার ভিতর হইতে ফ্রি প্লেস কিক করিয়া খেলা পুনরারম্ভ করিবেন। যদি রক্ষণকারীদলের স্পর্শে বল নিজেদের গোল লাইন অতিক্রম করে তাহা হইলে

 বলখেলা১

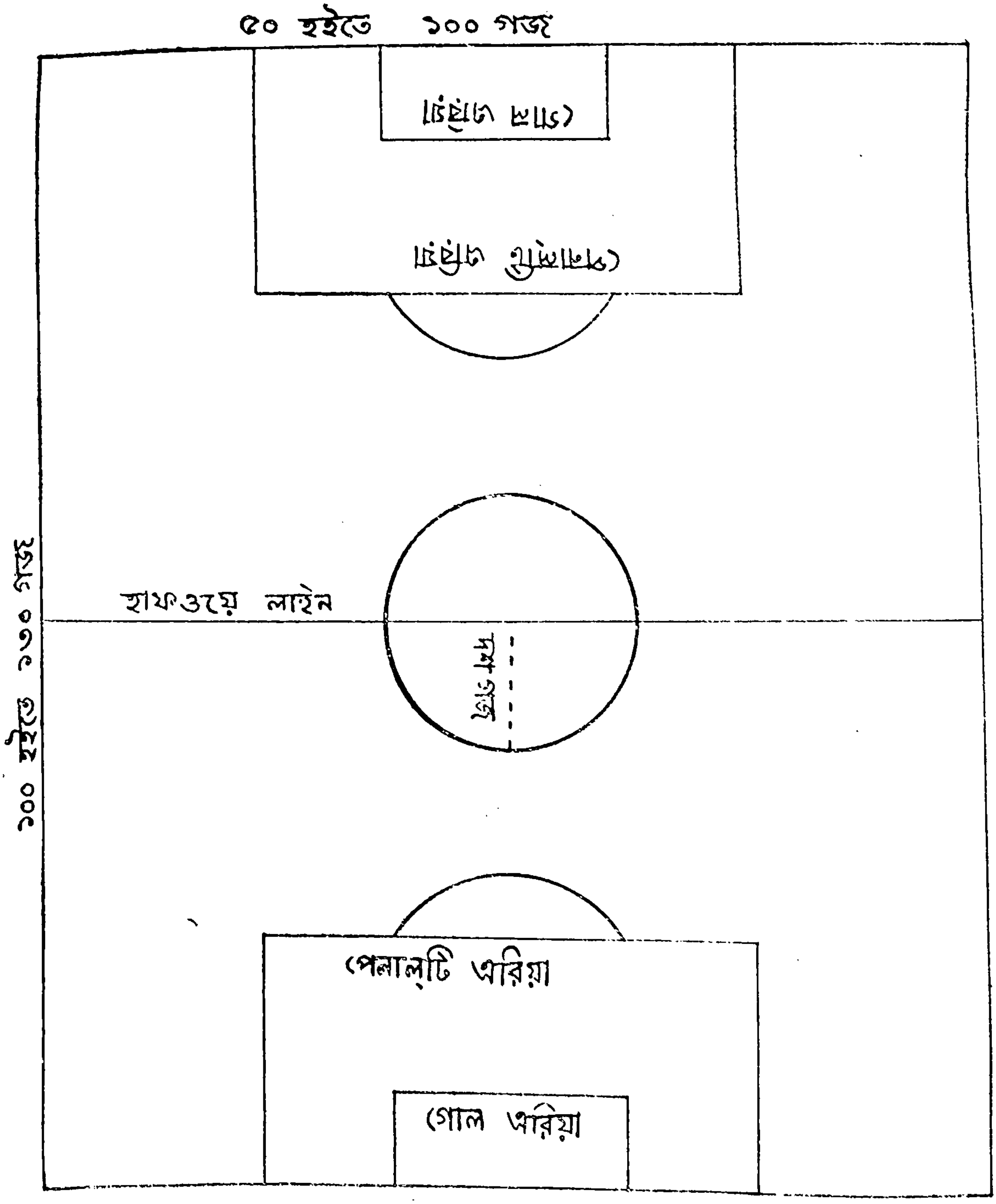

মাঠের ছক (গ্রাউন্ড প্ল্যান)

আক্রমণকারী দল সেই দিকের সীমানার ১ গজের মধ্য হইতে ফ্রি প্লেস কিক করিয়া খেলা পুনরায় শুরু করিবেন।

অফ্‌সাইড আইন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত হইয়া বর্তমানে এইরূপ ঃ যখন একজন খেলোয়াড় বলটি খেলেন তখন স্বদলীয় কোনও খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের গোল লাইনের অধিকতর নিকটবর্তী থাকিলে অফ্‌সাইড (ক্রীড়া-বহির্ভূত) বিবেচিত হইবেন যদি না— (১) তিনি খেলার মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকেন ; (২) প্রতিপক্ষের অন্ততঃ দুইজন খেলোয়াড় তাঁহার চেয়ে প্রতিপক্ষ দলের গোল লাইনের কাছাকাছি থাকেন ; (৩) বলটি প্রতিপক্ষ দলের

কোনও খেলোয়াড়কে শেষবার স্পর্শ করে ; (৪) তিনি বলটি গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন বা রেফারীর ড্রপ হইতে সরাসরি পান।

ভারতবর্ষে সকার পদ্ধতিতে ফুটবল খেলা ব্রিটিশরাই প্রবর্তন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং ইওরোপীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং এইখানেই ভারতীয় ফুটবলের সূচনা ও ক্রমোন্নতি হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফুটবল খেলার নিয়ন্ত্রকসংস্থা ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন প্রথম সংগঠিত হয় কিন্তু আই. এফ. এ. শিল্ড নক-আউট টুর্নামেণ্ট তাহার পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ডুরাণ্ড কাপ টুর্নামেণ্ট-ই (১৮৮৮ খ্রী) প্রথম সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। কিন্তু ইহা প্রথমে কেবলমাত্র সামরিক দলগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কলিকাতার ভারতীয়রা, বিশেষ করিয়া বাঙালীরা, সহজেই এই খেলায় অনুরাগী ও পারদর্শী হইয়া উঠিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহা প্রায় বাংলার জাতীয় খেলার মর্যাদা লাভ করিল। প্রথম দিকের ভারতীয় ফুটবল দলগুলির মধ্যে শোভাবাজার ক্লাব (১৮৮৫ খ্রী), ওয়েলিংটন ক্লাব (১৮৮৪ খ্রী), টাউন ক্লাব (১৮৮৫ খ্রী), কুমারটুলি (১৮৮৫ খ্রী), মোহনবাগান (১৮৮৯ খ্রী), এরিয়ান্স (১৮৮৯ খ্রী), মহামেডান স্পোর্টিং (১৮৯১ খ্রী) এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ান (১৮৯৫ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শুধুমাত্র বাঙালী খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত মোহনবাগানের আই. এফ. এ. শিল্ড জয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে ফুটবল খেলা জনপ্রিয়তার সুউচ্চ শিখর স্পর্শ করিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই ভারতীয় ফুটবলের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ও বিকাশের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ফুটবল খেলার প্রথম যুগে ভারতীয়রা খালি পায়ে খেলিতেন। খালি পায়ে খেলা উন্নত মানের খেলার পক্ষে অসুবিধাজনক হওয়ায় ক্রমশঃই ইহা অপ্রিয় হইতে লাগিল এবং ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে খালি পায়ে খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইল।

ফুটবল খেলা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও বিস্তার লাভ করিল এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক হিসাবে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন গঠিত হইল। ২১টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে এ. আই. এফ. এফ-এর অন্তর্ভুক্ত।

এ. আই. এফ. এফ সন্তোষ ট্রোফির জন্য আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতা এবং জুনিয়ার খেলোয়াড়দের জন্য ডঃ বি. সি. রায় মেমোরিয়াল ট্রোফি প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন। এই সমিতিভুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাগুলিতে সারা ভারতের বিশিষ্ট ফুটবল ক্লাবগুলি যোগদান করে : ১. আই. এফ. এ. শিল্ড (আই. এফ. এ.) ২, রোভার্স কাপ (ডবলিউ. আই. এফ. এ.) ৩. ডি. সি. এম. ফুটবল টুর্নামেণ্ট (দিল্লী)।

ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা কয়েকটি কর্মসংস্থার সভ্য ও কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি সমিতির দ্বারা পরিচালিত হয়।

ভারত ও আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা : ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়রা প্রথম বিদেশ সফরে যান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দেও আর একবার তাঁহারা বিদেশ সফরে গিয়াছিলেন। এই দুইটি সফরই বেসরকারি সফর ছিল। এই সময়ে ভারতীয়রা ব্রহ্মদেশ, স্ট্রেইট্স সেটেল্‌মেণ্ট্স এবং জাভা প্রভৃতি স্থানে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেন এবং কয়েকটিতে উল্লেখযোগ্যভাবে জয়লাভ করেন। পরবর্তীকালে আই. এফ. এ. (এ. আই. এফ. এফ. প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে) সরকারি সফরকারী দলকে সিংহলে (১৯৩৩ খ্রী), দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৯৩৪ খ্রী) এবং অস্ট্রেলিয়ায় (১৯৩৮ খ্রী) সফরে প্রেরণ করেন। অনেকগুলি বিদেশী দলও ভারত সফরে আসেন এবং বিভিন্ন স্থানে ম্যাচ খেলেন।

সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় দল অলিম্পিক প্রতিযোগিতা, ইন্দোনেশিয়ার মারদেকা প্রতিযোগিতা, এশিয়ান কাপ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিতেছে।

মণীন্দ্রনাথ দত্তরায়

বলখেলা[২] রাগবী : ফুটবল খেলার এক স্বতন্ত্র ধারাকে রাগবী ফুটবল খেলা বলে। অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলে এক গোলরক্ষক ছাড়া অপর কোনও খেলোয়াড়ের হস্তপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। রাগবীতে বল চালনা বা আদান-প্রদান হস্ত দ্বারা করা চলে। ইংল্যাণ্ডের রাগবী স্কুলে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সূচনা হয় এবং ক্রমে শীতকালীন ক্রীড়া হিসাবে ইহা জনপ্রিয় হইয়া ওঠে।

অপেশাদার খেলায় প্রতি দলে ১৫ জন খেলোয়াড় থাকে : আটজন ফরোয়ার্ড, দুজন হাফ ব্যাক, চারজন থ্রি-কোয়ার্টার ব্যাক, এবং একজন ফুল ব্যাক। পেশাদার খেলায় থাকে প্রতিপক্ষে ১৩ জন খেলোয়াড়। এক্ষেত্রে ফরোয়ার্ডদের সংখ্যা ছয় জন।

অর্জিত পয়েণ্টের হিসাবে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়। ট্রাই হইতে তিন পয়েণ্ট লাভ করা যায়, এবং ইহার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রাপ্ত প্লেস কিক হইতে গোল করিতে পারিলে আরও দুই পয়েণ্ট যোগ হয়। ড্রপ গোল হইতে পাওয়া যায় চার পয়েণ্ট। পেনাল্টি কিক বা মার্ক হইতে গোল করিতে পারিলে তিন পয়েণ্ট অর্জন করা যায়।

বাস্কেট বল : প্রধানতঃ ইনডোর খেলা রূপে ইহার প্রবর্তন হইলেও বাস্কেটবল ঘরে-বাইরে উভয়তঃই খেলা হয়। আমেরিকাতে ইহার উদ্ভব, এখন বিশ্বের প্রায় সর্বত্র

বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে আউটডোর খেলা হিসাবেই ইহা প্রচলিত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্প্রিংফিলড্ শহরের ওয়াই. এম. সি. এ, কলেজের শারীর শিক্ষক নইস্মিথ (Naismith) এই খেলাটি আবিষ্কার করেন।

এই খেলার জন্য ৯৪′×৫০′ কাষ্ঠনির্মিত কোর্টের দরকার। কোর্টের চারি পার্শ্বে তিন ফুট করিয়া জায়গা রাখা হয়। ৬০′×৩৫′ ছোট কোর্টেও খেলা হয়। কোর্টের দুই প্রান্তে গৃহতল হইতে ৯ ফুট ঊর্ধ্বে বাস্কেট রক্ষিত হয়। এই বাস্কেটের মধ্যে বল নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রতি পক্ষে পাঁচ জন খেলোয়াড় থাকে—একজন সেণ্টার, দুইজন গার্ড ও দুইজন ফরোয়ার্ড। যে কোনও সময় বদলি খেলোয়াড় নেওয়া চলে। মাঝখানে দশ মিনিটের বিরাম ও প্রতি অর্ধে ২০ মিনিট খেলা। খেলা পরিচালক থাকেন ছয়জন ঃ একজন আম্পায়ার, একজন রেফারি, দুজন টাইম কিপার ও দুজন স্কোরার।

ভলিবল ঃ ভলিবলের জন্ম আমেরিকায়। বাস্কেটবলের অনুকরণে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস হোলিওক শহরের ওয়াই. এম. সি. এ-র শারীর শিক্ষক উইলিয়াম. জি. মর্গান এই খেলার প্রবর্তন করেন। প্রথমতঃ ইনডোর খেলা হিসাবে আরম্ভ হইলেও আউটডোর রূপে ইহার জনপ্রিয়তা বর্ধিত হয়। এবং বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহা বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে।

এই খেলার আউটডোর কোর্টের আয়তন ৮০′×৪০′ এবং ইনডোর ৬০′×৩০′। মহিলাদের জন্য আউটডোর ৬০′×৩০′ ও ইনডোর ৪০′×২০′। কোর্টের মাঝখানে টেনিস খেলার অনুকরণে একটি জাল খাটানো হইয়া থাকে। কেন্দ্রস্থলে এই জালের উপরিভাগের উচ্চতা মাটি হইতে ৮ ফুট এবং নিম্ন ভাগের উচ্চতা ৫ ফুট। মহিলাদের খেলায় জালের উপরিভাগের উচ্চতা সাড়ে ছয় ফুট।

প্রতি দলে ছয়জন খেলোয়াড় থাকে—ফরোয়ার্ড তিনজনঃ লেফ্‌ট, সেণ্টার ও রাইট। কেবলমাত্র হস্তের সাহায্যেই খেলা হয়। টেনিসের মত সার্ভিস দিয়া আরম্ভ। হাতের তালু বা পার্শ্বদেশ এবং শরীরের ঊর্ধ্ব ভাগ ঠেকাইয়া বল চালিত হয়। বল ধরা বা কিক করা নিষিদ্ধ।

শংকরবিজয় মিত্র

বলদেব পালিত (১৮৩৫-১৯০০ খ্রী) জন্ম ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা বিশ্বনাথ পালিত। পূর্বপুরুষের বাস ছিল হালিশহরের নিকটবর্তী কোণাগ্রামে। আনুমানিক ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথ দানাপুরে আসেন।

বলদেব দানাপুরে সামরিক বিভাগের পেনসন পে অফিসে কেরাণীর পদে কাজ করিতেন ; পরে প্রধান কেরাণীর পদে উন্নীত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দানাপুরে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই অর্থে বাঁকীপুরে 'টি. কে. ঘোষেজ একাডেমী' (তাঁহার জামাতার নামে) ও গয়া ও আরায় আরও ৩টি স্কুল স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নানারূপ রত্ন আহরণ করিয়া তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। বলদেব সর্বসমেত ৫ খানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ 'কাব্যমঞ্জরী' (১২৭৫ বঙ্গাব্দ), 'কাব্যমালা' (১২৭৬ বঙ্গাব্দ), 'ললিত কবিতাবলী' (১২৭৭ বঙ্গাব্দ), 'ভর্তৃহরি' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) ও 'কর্ণার্জুন কাব্য' (১ম ভাগ, ১২৮২ বঙ্গাব্দ)।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম আচার্য। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকে ওড়িশার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় তাঁহার জন্ম। অতি অল্প বয়সেই বলদেব বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য মহীশূর গমন করেন। সেই সময়ে তিনি তত্ত্ববাদী (মাধ্ব) সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া প্রচুর প্রতিপত্তি অর্জন করেন। পরে তাঁহার সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ হয়। পুরীধামে পণ্ডিতসমাজকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি তত্ত্ববাদী মঠে অবস্থান করেন। অতঃপর গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রাধাদামোদরের নিকট শ্রীজীবগোস্বামী-বিরচিত 'ষট্‌সন্দর্ভ' অধ্যয়ন করিয়া তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি পীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। উদ্ধবদাস ও নন্দমিশ্র ইঁহার প্রধান শিষ্য।

'গোবিন্দভাষ্য', 'গোবিন্দভাষ্যটীকা', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাভাষ্য', 'প্রমেয়রত্নাবলী', 'শ্রীমদ্ভাগবতটীকা', 'ষট্‌সন্দর্ভটীকা', 'গোপালতাপনীভাষ্য' প্রভৃতি রচনা করিয়া ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

বলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চতত্ত্ব ও নবপ্রমেয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি আচার্য মধ্বকে অনুসরণ করিয়াও মধ্বমতকে সর্বাংশে গ্রহণ করেন নাই। বলদেবের মতে শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য, লক্ষ্মী ভগবানের স্বরূপশক্তি, জীব নহেন। কর্মাদিনিরপেক্ষ বিশুদ্ধা ভক্তিই বিচিত্রলীলাবিশিষ্ট ভগবানের পদসেবাপ্রাপ্তির সাধন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র যে কোনও ভক্তেরই ভগবৎসাক্ষাৎকারে মোক্ষ। মাধুর্যজ্ঞানমূলক ভক্তিই প্রধান। ব্রজবাসীগণই ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য। বলদেবের এই সিদ্ধান্ত চৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

দ্র হরিনাথ দাস, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, নবদ্বীপ, ১৯৫৭।

বৈষ্ণবচরণ দাস

বলবিদ্যা যে শাস্ত্র বলের ক্রিয়ার ফলে বস্তুর গতি বা স্থিরাবস্থার আলোচনা করে তাহার নাম বলবিদ্যা (Mechanics)। এক সময়ে বলবিদ্যা বলিতে যন্ত্রনির্মাণ-বিদ্যাকে বুঝাইত। ইহাকে গণিতের অথবা পদার্থবিদ্যার শাখারূপে গণ্য করা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যা বা ইঞ্জিনিয়ারিং-শাস্ত্রে, পদার্থবিদ্যায় এবং জ্যোতিষে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

বলবিদ্যাকে দুইটি পরস্পরসম্পর্কযুক্ত বিভাগে ভাগ করা যায়, যথা গতিবিদ্যা এবং স্থিতিবিদ্যা। গতিবিদ্যা গতিশীল বস্তু লইয়া আলোচনা করে। সাধারণতঃ ইহাকে দুইটি অংশে ভাগ করা হয়, প্রথম অংশকে বলা হয় সৃতি বিদ্যা বা কাইনেমেটিক্‌স ; ইহাতে কি কারণে গতি বা কাহার গতি এ সমস্ত বিষয়ের কোনও আলোচনা নাই, কেবলমাত্র গতির ধর্ম বিবেচনা করা হয়। কাইনেটিক্‌স নামে অভিহিত গতিবিদ্যার দ্বিতীয় অংশে কারণসহ গতির আলোচনা করা হয় ; ইহাতে বস্তুর ভর এবং তাহার উপর প্রযুক্ত বলের প্রভাব বিবেচিত হয়। স্থিতিবিদ্যা বলসমূহের প্রভাবে বস্তুর স্থিরাবস্থার আলোচনা করে। ইহাকে গতিবিদ্যার বিশেষ প্রয়োগরূপে গ্রহণ করা যায়।

বলবিদ্যার উৎপত্তি ভারী জিনিস উত্তোলন করিবার যন্ত্রনির্মাণের উদ্যম হইতে। ইহা একটি সুপ্রাচীন বিদ্যা। মিশরের পিরামিড (৩৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নির্মাণ করিতে যন্ত্রের বহুল প্রয়োগ হইয়াছিল ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। আমাদের দেশে মহেঞ্জো-দড়োতে খননের ফলে যে সমস্ত দালান কোঠা স্নানাগার পয়ঃপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেও প্রাচীনযুগে খ্রীষ্টের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইয়াছিল ইহা সুনিশ্চিত। প্রসিদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞানী আর্খিমেদেস (২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নানাপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইনি বলবিদ্যার একজন পূর্বসূরী, বলবিদ্যার অন্যতম শাখা উদস্থিতিবিদ্যার ইনি জনক। কিন্তু বলবিদ্যার আধুনিক যুগ মাত্র সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছে। বলা যায় গ্যালিলেও (১৫৬৪—১৬৪২ খ্রী) প্রথম গতিতত্ত্ব আলোচনা করেন। সুসংবদ্ধ গতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপিত হয় নিউটনের সময়ে (১৬৪২—১৭২৭ খ্রী) তাঁহার কয়টি সূত্র ও স্বতঃসিদ্ধকে অবলম্বন করিয়া। নব্যগতিবিদ্যা নবতর রূপ লইয়াছে আইনস্টাইনের (১৮৭৯—১৯৫৫ খ্রী) হাতে।

নিউটনের মতবাদ ভৌত ঘটনাবলীর বর্ণনা করে মাত্র, ব্যাখ্যা করে না। আরও দেখা গিয়াছে, নিউটনের গতিবিদ্যা পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কণার উপর এবং আলোকের গতির সহিত তুলনীয় উচ্চগতিবিশিষ্ট বস্তুতে প্রযোজ্য নহে। নিউটনের গতিসূত্রের পরীক্ষামূলক বা বিধিমত অন্য প্রমাণ দেওয়া যায় না। কিন্তু বলের প্রভাবে যে সকল গতিস্থিতি আমরা ভৌতজগতে ঘটিতে দেখি তাহাদের সম্যক বিচার, সূর্য-গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতির গতি ও অবস্থান, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী নিউটনের গতিবিদ্যার দ্বারা সম্ভব। নিউটনের গতিবিদ্যার সহিত ভৌতজগতের ঘটনাবলীর মিল এত বেশি যে সাধারণ উপায়ে কোনও পার্থক্য ধরা পড়ে না। তাই ইহা পরিত্যক্ত হইবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অধিকন্তু অন্য বিকল্প মতবাদে জটিলতা বাড়ে বই কমে না।

বিন্দুর গতি : প্রদত্ত পথে একটি কণা যখন চলে, t সময়ে তাহার অবস্থান ঐ পথের একটি প্রদত্ত বিন্দু হইতে পথ বরাবর s দূরত্বে হইলে ঐ বিন্দুতে কণার বেগ

$$\frac{ds}{dt} \text{ এবং ত্বরণ } \frac{d^2s}{dt^2}$$

কোণ ও সমতলে গতির জন্য t সময়ে বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) হইলে অক্ষদ্বয়ের সমান্তরাল দিকে বেগের বিশ্লেষিতাংশ

$$\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}; \text{ ত্বরণের বিশ্লেষিতাংশ}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}$$

ত্রিমাত্রিক দেশে গতির জন্য বেগ $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$

এবং ত্বরণ $\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2}, \frac{d^2z}{dt^2}$

নিউটনের নিয়ম ঃ প্রথম সূত্র ঃ বস্তুমাত্রেরই স্থিরাবস্থা বা সমবেগে এক সরলরেখায় গতিশীল অবস্থা চিরকাল ধরিয়া চলিতে থাকে ; কেবলমাত্র বাহিরের কোনও বল-প্রয়োগের দ্বারা বাধ্য হইলেই এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

এই সূত্রটি প্রকৃতপক্ষে গ্যালিলেও-এর সূত্র।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ বস্তুর ভরবেগ পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং ইহা বল যেদিকে ক্রিয়া করে সেদিকে ঘটিয়া থাকে।

এই সূত্র হইতে বলের পরিমাপ পাওয়া যায়। P বল m ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করিয়া f ত্বরণ উৎপাদন করিলে—

$$P = mf$$

তৃতীয় সূত্র ঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

এই তিনটি সূত্র ব্যতীত চতুর্থ একটি স্বীকার আছে, তাহা নিউটনের মহাকর্ষের সূত্র। ইহা এইরূপ ঃ

বিশ্বের প্রত্যেক কণা বা বস্তু অপর প্রত্যেক কণাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের মান বস্তুকণা

দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতে এবং তাহাদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে।

গণিতের ভাষায় দুইটি বস্তুর ভর m_1 এবং m_2 হইলে এবং তাহাদের মধ্যে দূরত্ব d হইলে .

$$\text{মহাকর্ষ বল} = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

(G একটি ধ্রুবক)।

স্থিতিবিদ্যা ঃ প্রথমে বলপ্রয়োগের ফলে একটি কণার স্থিরাবস্থার শর্ত আলোচিত হয়। নিউটনের প্রথম সূত্র হইতেই দেখা যায় যে এখানে লব্ধিবল শূন্য। অতঃপর বস্তুর (কণাসমষ্টির) স্থিরাবস্থা বিবেচিত হয়।

দুইটি বল এক বিন্দুতে ক্রিয়া করিলে তাহাদের লব্ধি-বলের জন্য বলের সামান্তরিক সূত্র প্রযোজ্য ঃ

যদি এক বিন্দুতে ক্রিয়মাণ দুইটি বলের মান ও দিক্ কোনও সামান্তরিকের দুই সন্নিহিত বাহুর দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে ঐ দুই বাহুর ছেদবিন্দুগামী কর্ণ লব্ধি-বলের মান ও দিক্ প্রদর্শন করে।

তিনটি বলের সাম্যাবস্থা, বলের ত্রিভুজ সূত্র ঃ কোনও বিন্দুতে ক্রিয়মাণ তিনটি বলের মান ও দিক্ যদি একটি ত্রিভুজের ক্রমানুসারে গৃহীত তিনটি বাহুর দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহা হইলে বল তিনটি সাম্যাবস্থায় থাকে।

ল্যামির সূত্র ঃ যদি এক বিন্দুতে প্রযুক্ত তিনটি বল সাম্যাবস্থায় থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক বল অন্য দুই বলের অন্তর্ভুক্ত কোণের সাইনের অনুপাতে।

O বিন্দুতে প্রযুক্ত তিনটি বল P, Q, R সাম্যাবস্থায় থাকিলে—

$$\frac{P}{\text{Sin } QOR} = \frac{Q}{\text{Sin } ROP} = \frac{R}{\text{Sin } POQ}$$

বলের বহুভুজসূত্র ঃ কোনও বিন্দুতে প্রযুক্ত বলসমূহের মান ও দিক্ যদি একটি বহুভুজের ক্রমানুসারে গৃহীত বাহুসমূহের দ্বারা প্রদর্শিত হয় তাহা হইলে ঐ বল-সমূহ সাম্যাবস্থায় আছে।

বলের বিশ্লেষণ ঃ একটি বলকে দুই পরস্পর লম্বাভি-মুখী দিকে বিশ্লেষণ করিলে স্থিতিবিদ্যায় লব্ধিবল নির্ণয় এবং সাম্যাবস্থার আলোচনার সুবিধা হয়। একটি বল F কোনও দিকের সঙ্গে α কোণ করিলে, ঐ দিকে তাহার বিশ্লেষিতাংশ $F\cos\alpha$ এবং ইহার লম্বাভিমুখে বিশ্লে-ষিতাংশ $F\sin\alpha$.

এখন এক বিন্দুতে একাধিক বল ক্রিয়া করিলে দুই লম্বাভিমুখী দিকে তাহাদের বিশ্লেষিতাংশ $\Sigma F\cos\alpha$ এবং $\Sigma F\sin\alpha$.

$$\text{লব্ধিবল} = \sqrt{(\Sigma F\cos\alpha)^2 + (\Sigma F \text{ Sin }\alpha)^2}$$

লব্ধিবলের দিক্ প্রথম অক্ষের সহিত θ কোণ করিলে—

$$\tan\theta = \frac{\Sigma F\sin\alpha}{\Sigma F\cos\alpha}$$

বলসমূহের ক্রিয়ার ফলে কণার স্থিরাবস্থার জন্য—

$$\Sigma F\cos\alpha = 0 \text{ (i)} \quad \Sigma F\sin\alpha = 0 \text{ (ii)}$$

ত্রিমাত্রিক দেশে একটি কণাতে F_1, F_2, F_3,......বলশ্রেণীর ক্রিয়ার ফলে সাম্যাবস্থার জন্য

$$\Sigma x_1 = 0, \Sigma y_1 = 0, \Sigma z_1 = 0.$$

[x_1, y_1, z_1 যথাক্রমে x, y, z অক্ষের দিকে F_1 বলের বিশ্লেষিতাংশ]

ভ্রামক ঃ কোনও বিন্দু হইতে একটি বলের ক্রিয়ারেখার উপর লম্ব অঙ্কিত করিলে বল ও লম্বের গুণফলকে বিন্দু-টির চারিদিকে বলের ঘূর্ণফল বা ভ্রামক বলে।

স্থিতিবিজ্ঞানে ভ্রামকের গুরুত্ব দেখা যায়। বস্তু স্থিরা-বস্থায় থাকিলে কোনও বিন্দুর চারিদিকে বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলসমূহের ভ্রামকের সমষ্টি শূন্য।

কণার গতিবিজ্ঞান, ঘাত এবং ভরবেগ ঃ কণার ভর এবং বেগের গুণফল হইল উহার ভরবেগ। বল ও তাহার কার্য-কালের গুণফলকে ঘাত বলে।

$$\text{ঘাত} = \int_{t_0}^{t} P\,dt = \int_{v_0}^{v} m\frac{dv}{dt}\,dt = mv - mv_0$$

=ভরবেগের পরিবর্তন।

ভরবেগের নিত্যতা ঃ কোনও বস্তু বা কণাসমষ্টির উপর বাহির হইতে প্রযুক্ত বলসমূহের বিশ্লেষিতাংশের সমষ্টি কোনও নির্দিষ্ট সরলরেখার সমান্তরাল দিকে শূন্য হইলে ঐ দিকে ভরবেগের সমষ্টি সর্বদাই এক।

যখন বন্দুক বা কামান হইতে গুলি বা গোলা ছোড়া হয়, তখন বারুদের বিস্ফোরণহেতু অত্যধিক চাপযুক্ত গ্যাস উৎ-পাদিত হয়। গোলা বাহির হইয়া পড়িবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত গ্যাসের জন্য গোলার উপর সম্মুখের দিকে যে চাপ পড়ে, কামানের উপর বিপরীত মুখে সেই সমান চাপ পড়ে। সুতরাং গোলার উপর এই বলের ঘাত বন্দুকের উপর ঘাতের সমান এবং বিপরীতমুখী। যে মুহূর্তে গোলা বাহির হইয়া পড়ে তখন সম্মুখের দিকে আর বল নাই। কিন্তু পিছনের দিকে বল রহিয়াছে বলিয়া কামানের পশ্চাদপসরণ হয়।

রকেটের গতি অনুরূপভাবে ঘটিয়া থাকে। জেট বিমানের গতিতেও এই তত্ত্ব নিহিত।

কৌণিক ভরবেগ ঃ একটি কণার ভরবেগ এবং কোনও প্রদত্ত বিন্দু হইতে কণার বেগের দূরত্বের গুণফলকে ঐ বিন্দুর চারিদিকে কণার কৌণিক ভরবেগ বা ভরবেগের ভ্রামক বলে।

কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা ঃ যদি কোনও প্রদত্ত বিন্দুর

চারিদিকে (অথবা ত্রিমাত্রিক দেশে প্রদত্ত সরলরেখার চারিদিকে) একটি বস্তু বা কণাসমষ্টির উপর বাহির হইতে প্রযুক্ত বলসমূহের ভ্রামকের সমষ্টি শূন্য হয়, তাহা হইলে ঐ বিন্দুর (বা সরলরেখার) চারিদিকে কণাসমূহের (বা বস্তুর) কৌণিক ভরবেগ সর্বদাই এক।

কণাসমষ্টির (বা বস্তুর) ভরকেন্দ্র : কোনও সরলরেখার সমান্তরাল দিকে m_1, m_2, m_3,......কণাসমূহের স্থানাঙ্ক যদি x_1, x_2, x_3,......হয়, তাহা হইলে ঐ কণাসমূহের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $\bar{x}$-এর জন্য—

$$\bar{x} = \frac{\Sigma m_1 x_1}{\Sigma m_1}$$

ত্রিমাত্রিক দেশে x, y, z অক্ষের দিকে ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-এর জন্য $\bar{x} = \frac{\Sigma m_1 x_1}{\Sigma m_1}$, $\bar{y} = \frac{\Sigma m_1 y_1}{\Sigma m_1}$,

$$\bar{z} = \frac{\Sigma m_1 z_1}{\Sigma m_1}.$$

কার্য, শক্তি, কার্য সমীকরণতত্ত্ব, শক্তির নিত্যতাতত্ত্ব : বলপ্রয়োগের ফলে বল যে অভিমুখে ক্রিয়া করে সেই অভিমুখে বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণ হইলে বলটি কার্য করে।

কার্য$=\int$ Pds.

কার্য করিবার সামর্থ্য হইল শক্তি। শক্তি দুই প্রকার: স্থৈতিক শক্তি এবং গতীয় শক্তি।

কণার ভর m এবং বেগ v হইলে গতীয় শক্তি$=\frac{1}{2}$ mv^2.

স্থৈতিক শক্তি : বর্তমান অবস্থা হইতে প্রমাণ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বস্তু যে পরিমাণ কার্য সাধন করে তাহা স্থৈতিক শক্তির পরিমাপ।

গতীয় শক্তির বৃদ্ধি=প্রযুক্ত বলের দ্বারা কৃত কার্য, এই তত্ত্ব কার্যসমীকরণতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত।

নিত্য-শ্রেণীর বলের দ্বারা প্রভাবিত বস্তু গতিশীল হইলে তাহার গতীয় এবং স্থৈতিক শক্তির যোগফল নিত্য। [যে সকল বল কেবল বস্তুর অবস্থানের উপর নির্ভর করে, বেগ বা গতির দিকের উপর নির্ভর করে না, তাহারা নিত্য-শ্রেণীর বল।]

শক্তির সৃজনও করা যায় না বিনাশও করা যায় না, কিন্তু এক শক্তিকে অন্য যে-কোনও শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বিশ্বে শক্তির পরিমাপ নির্দিষ্ট।

প্রচলিত অর্থাৎ নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের অচলাবস্থা : প্রচলিত গতিবিজ্ঞানের অপরিমেয় সফলতা অনস্বীকার্য; কিন্তু অতি বৃহৎ ও অতি ক্ষুদ্রদের বেলায় এবং অতি উচ্চ-বেগের বেলায় এই গতিবিজ্ঞান বিফল প্রমাণিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে আপেক্ষিকবাদ এবং কোয়াণ্টাম (কণাতম) বলবিদ্যা প্রযোজ্য।

দ্র J. Clerk Maxwell, *Matter and Motion*, New York, 1920; H. Lamb, *Dynamics*, New York, 1923; H. Lamb, *Statics*, New York, 1928.

কামিনীকুমার দে

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও লীলাসহচর। বিষ্ণুর অবতার বিশেষ। পিতা বসুদেব, মাতা রোহিণী, ভার্যা রেবতী, পুত্র নিশঠ ও উল্মুক (বিষ্ণুপুরাণ ৫।২৫।১৯)। বলরামের ক্রোধ ও বীরত্বের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে (হরিবংশ ১০২, ১১৯ ; বিষ্ণুপুরাণ ৫।২৫ প্রভৃতি)।

বলরাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সান্দীপনি মুনির নিকট সাংগ-বেদ, উপনিষদ্, ধনুর্বেদ এবং রাজনীতি শিক্ষা করেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৫)। কৃষ্ণ বলরামের সহিত মথুরায় আসিয়া কংসকে বধ করেন। জামাতা কংসের মৃত্যুতে উত্তেজিত মগধরাজ জরাসন্ধের সংগে কৃষ্ণ ও বলরামের ঘোর যুদ্ধ হয়।

বলরাম বিভিন্ন নামে পরিচিত : বলবত্তাহেতু বলী, বলদেব, বলভদ্র; হলধারণজন্য হলী, হলভৃৎ, হলধর, হলায়ুধ; মুষল অস্ত্র বলিয়া মুষলী; নীলবসনের জন্য শিতিবাস, নীলাম্বর।

মৃত্থিকা ঘোষ

বলরামদাস বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দপ্রভুর প্রিয় ৩৭ জন পার্ষদের নাম করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

> প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস।
> যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥ (৩।৬)

এই বলরামদাসই সুপ্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরামদাস হওয়া বিশেষ সম্ভব, কেননা দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় কেবলমাত্র চৈতন্য-নিত্যানন্দের অন্তরংগজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং কোনও চৈতন্যচরিতগ্রন্থে অপর কোনও বলরামদাসের নাম পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দভক্ত বলরামদাস যে পদকর্তা ছিলেন তাহা দেবকীনন্দন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

> সংগীতকারক বন্দো শ্রীবলরামদাস।
> নিত্যানন্দচন্দ্রে যাঁর অকথ্য বিশ্বাস॥

এই বলরামদাস নিত্যানন্দ বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর চিত্রধর্মী পদ লিখিয়াছেন। সেগুলি পড়িলেই মনে হয় চোখে দেখিয়া লেখা। ইঁহার পদে শ্রীচৈতন্যসম্বন্ধেও অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন ভক্তিরত্নাকরে ধৃত 'ভাল রংগে নাচে মোর শচীর দুলাল' ইত্যাদি পদটিতে পাই যে নিমাই-এর কাছে 'কিন্নরে করয়ে শিক্ষা শুনি মৃদুগান' অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আবার ঐ গ্রন্থেরই অন্যত্র বলরামদাসের একটি পদে আছে—

> বড় অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
> রাজা হইয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥

হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥
(পদকল্পতরু ২২০৭)

নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণবকে দোলায় করিয়া বহন করিতেন এবং কুলবধূদিগকেও কীর্তনে নৃত্য করিতে দিতেন, এমন কথা কোনও চরিতকার বলেন নাই।

বলরামদাস বিদ্যাপতির আলংকারিক রীতি ছাড়িয়া চণ্ডীদাস ও নরহরি সরকারের প্রাণস্পর্শী সহজ সরল ভাষায় সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছেন। বলরামদাসের পদ না গাহিয়া কোনও কীর্তনীয়া গোষ্ঠের পালা জমাইতে পারেন না।

অল্প দুই একটি শাদা কথায় ছবি আঁকিতে কবি নিপুণ ছিলেন। নৌকাবিলাসে ও দানখণ্ডেও বলরামদাস অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রেমবিলাসের রচয়িতা নিত্যানন্দদাস তৃতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার ন্যায় অক্ষম লেখক যে বলরামভনিতাযুক্ত পদ লিখিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, বলরামদাস ও দ্বিজ বলরাম একই ব্যক্তি; ইহা ভ্রান্ত ধারণা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলরামদাস দ্বিজ বলরাম হইতে পৃথক ব্যক্তি।

দ্র রমণীমোহন মল্লিক, বলরামদাস পদাবলী, কলিকাতা, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ; হরিদাস গোস্বামী, দ্বিজ বলরামদাস ঠাকুরের জীবনী ও পদাবলী, কলিকাতা ১৩২৭ বঙ্গাব্দ; ব্রহ্মচারী অমরচৈতন্য, বলরামদাসের পদাবলী, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; বিমানবিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ।

বিমানবিহারী মজুমদার

বলি[১] দেবতার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক পশুবধ বলি শব্দের সাধারণ অর্থ। তান্ত্রিক পূজার বিশিষ্ট অঙ্গ বলি। পাঁঠা, ভেড়া, মহিষ, পায়রা প্রভৃতি বিভিন্ন পশু-পক্ষী বলি দেওয়ার নিয়ম আছে। পুরাকালে স্বগাত্ররুধির দান, নরমেধ ও নরবলির ব্যবস্থাও ছিল। পরবর্তী কালে ইহা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিকৃতাঙ্গ বা স্ত্রী পশু বলি হিসাবে নিষিদ্ধ। পশুর বদলে মৃত্তিকা, পিষ্ট যব বা ধান্যনির্মিত পশুমূর্তি, চালকুমড়া বা আখগাছ বলির বিধান আছে। দেবীপূজায় অগত্যা রক্তচন্দনমিশ্রিত রক্তপুষ্প বলি-রূপে দেওয়ার ব্যবহার আছে। খড়্গের এক আঘাতে বলির পশুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করার কথা। তাহা না হইলে ত্রুটি প্রতিকারের জন্য স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান ও অন্য পশু বলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। খাওয়ার জন্য বধ করা পশুর মাংস বৃথা মাংস—উহা বর্জনীয়। বলির পশুর মাংস বৈধ—উহা গ্রহণে কোনও বাধা নাই। পশুবলির প্রচলন বর্তমান কালে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। একশ দেড়শ বৎসর পূর্বে ইহার বহুল প্রচলনের বিবরণ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে পশুবলির নিন্দা করা হইয়াছে। বৈদিক যুগে পশুযাগে পশুবধ করা হইত। তবে বৈদিকবিধানের যে শব্দ আপাতদৃষ্টিতে পশুবাচক বলিয়া প্রতীয়মান তাহার প্রকৃত অর্থ লইয়া মতদ্বৈধ ছিল (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৭।২৫-২৬)।

দ্র কালিকাপুরাণ, ৫৫, ৬৭ অধ্যায়; রঘুনন্দন, তিথি-তত্ত্ব; কৃষ্ণানন্দ, তন্ত্রসার; Blacquire, Asiatic Researches, V, 1797; Wilson, 'On the Sacrifice of Human Beings as an Element of Ancient Religion of India', *Journal of the Royal Asiatic Society*, XIII, 1852; R. L. Mitra, 'Human Sacrifice in Ancient India', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, XLV, 1876.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বলি[২] (রাজা) দানবীর দৈত্যাধিপতি। প্রহ্লাদের পৌত্র, বিরোচনের পুত্র। ব্রহ্মবাদী ভৃগুগণের অনুগ্রহে বলিরাজা ইন্দ্রপুরী অধিকার করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। ভৃগু-গণের উপদেশে বলি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বামনরূপী বিষ্ণু দানশীল বলিরাজার যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া দৈত্যরাজকে ছলনা করার জন্য মাত্র ত্রিপাদপরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করেন। বলিরাজা তাহা দিতে সম্মত হন। বামনের অভিসন্ধি বুঝিয়া শুক্রাচার্য দৈত্যরাজকে দানবিমুখ হইতে বলিলে বলি তাহাতে কর্ণপাত করেন না। বামনরূপী বিষ্ণু ক্রমে ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করিলেন। তিনি প্রথম পাদে পৃথিবী ও দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ অধিকার করিলেন। তৃতীয় পাদের ভূমিদানে অসামর্থ্য হেতু বলি বরুণপাশে বদ্ধ হইলেন। বলির অনুরোধে বিষ্ণু তৃতীয় পাদ তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। নারায়ণের স্তুতিরত সত্যপ্রিয় বলির আচরণে সন্তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করেন এবং তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পাতালে বাস করিতে আদেশ দেন (শ্রীমদ্ভাগবত, ৮।১৫, মৎস্যপুরাণ ২৪৫-২৪৬ অঃ ও বামনপুরাণ ২৩—৩১ অঃ)।

যূথিকা ঘোষ

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-৯৯ খ্রী) বলেন্দ্রনাথের পিতা বীরেন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ পুত্র। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্বদেশী বস্ত্রের কারবারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথও ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। বলেন্দ্রনাথই ছিলেন এই ব্যাপারের কেন্দ্রস্বরূপ।

অল্প বয়স হইতেই বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'একরাত্রি' প্রবন্ধ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ) এবং 'সন্ধ্যা' কবিতাই (ফাল্গুন, ১২৯২ বঙ্গাব্দ)

তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গদ্য-পদ্য রচনা। রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি উৎসাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে তাঁহার তিনখানি মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল: 'চিত্র ও কাব্য' প্রবন্ধ সংকলন (১৮৯৪ খ্রী), 'মাধবিকা' (১৮৯৬ খ্রী) ও 'শ্রাবণী' (১৮৯৭ খ্রী) কাব্য। কাব্যে ও গদ্যে উভয় ক্ষেত্রেই স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ আপন স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গদ্য রচনাবলীতেই তাঁহার প্রতিভার পরিণততর রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য ও ললিতকলার সমালোচনায়, নিভৃত মনের ভাবুকতায় এবং সৌন্দর্যমুগ্ধতায় বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

দ্র প্রমথনাথ বিশী, বাংলার লেখক, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী (পরিষদ সংস্করণ), কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ; রথীন্দ্রনাথ রায়, সাহিত্য-বিচিত্রা, কলিকাতা, ১৯৬১।

রথীন্দ্রনাথ রায়

বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ দ্র

বল্লাল সেন বঙ্গে সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের পুত্র; পিতার মৃত্যুর পর আনুমানিক ১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। জনপ্রবাদ অনুসারে তিনি মিথিলা জয় করিয়াছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ ইহা সত্য। কারণ মিথিলায় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামে একটি অব্দ এখনও প্রচলিত আছে এবং বল্লাল সেনের নবাবিষ্কৃত একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজত্বের ৯ম বর্ষে বিহার প্রদেশের পূর্বভাগ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়রাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধ ভট্টের নিকট বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং আচার-সাগর, ব্রত-সাগর, প্রতিষ্ঠা-সাগর, দান-সাগর ও অদ্ভুত-সাগর নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সমুদয় গ্রন্থ কেবল বাংলায় নহে বাংলার বাহিরেও আদৃত হইত। তাঁহার একটি গ্রন্থালয় ছিল—দুই-তিনশত বৎসর পরে লিখিত একখানি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে যে 'কৌলীন্য প্রথা' ('কৌলীন্য প্রথা' দ্র) প্রচলিত আছে অনেকের মতে বল্লাল সেনই তাহার প্রবর্তন করেন।

বল্লাল সেন অন্ততঃ ১১ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজার (সম্ভবতঃ জগদেকমল্ল) কন্যা রামদেবীকে বিবাহ করেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণ সেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। অদ্ভুত-সাগরের একটি শ্লোক হইতে ইহা জানা যায়। কিন্তু এই শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১৫৮ হইতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ ঋগ্বেদ সপ্তম মণ্ডলের ঋষি, সপ্তর্ষিগণের অন্যতম, দশপ্রজাপতির একজন (মনু সং—১।৩৫), অষ্টম-দ্বাপরে বেদবিভাগকারী ব্যাস (বিষ্ণু পু—৩।৩), ব্রহ্মার মানসপুত্র, মতান্তরে মিত্রাবরুণের পুত্র, মাতা উর্বশী। পত্নী অরুন্ধতী, উর্জা (বিষ্ণু পু—১।১০), অক্ষমালা (মনু—৯।২৩) ও শতরূপা (হরি-হরি ২)। সৌদাস পত্নী মদয়ন্তীও বশিষ্ঠপুত্রের জননী (বিষ্ণু পু—৪।৪)। সুকালিন নামক পিতৃগণ বশিষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন (মনু সং—৩।১৯৮)।

রাজা সুদাস (ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল), রাজা মুচুকুন্দ (ম. ভা—শান্তি ৭৪) এবং ইক্ষ্বাকু রাজগণের ইনি কুলপুরোহিত, রামচন্দ্রের গুরু ও মন্ত্রী।

বিশ্বামিত্রের সহিত ইঁহার শত্রুতার কাহিনী চিরপ্রসিদ্ধ। বশিষ্ঠের হোমধেনু সুরভিকন্যা নন্দিনীকে বসুদ্যৌ (জন্মান্তরে ভীষ্ম, ম-ভা আদি ৯৯) এবং বিশ্বামিত্র (ঐ আদি ১৭৫) অপহরণ করিবার চেষ্টা করেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের শক্তি প্রভৃতি শতপুত্র বধের কারণ হইলেও শোকার্ত বশিষ্ঠ তাঁহাকে সংহার করেন নাই। অথচ ইক্ষ্বাকু বিকুক্ষি (বিষ্ণু পু—৪।২) কার্তবীর্যার্জুন (পদ্মসৃষ্টি ১২) রাজা নিমি (রামা/উ. কা.—৬৫) রাজা সৌদাস (বিষ্ণু পু—৪।৪) এবং আরও অনেকের বশিষ্ঠ কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়ার কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভীষ্ম বশিষ্ঠের নিকট বেদাধ্যয়ন করেন (ম. ভা. শান্তি ৩৭), অর্বাচীন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের তিনি উপদেষ্টা। একখানি ঋগ্বেদীয় ধর্মসূত্র, একখানি ধর্মসংহিতা ও একখানি তন্ত্রগ্রন্থ তাঁহার নামে প্রচলিত। বিভিন্ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের বশিষ্ঠ প্রবর হইয়া থাকে। চাক্ষুষপুত্র, বরুণপুত্র এবং বালিপুত্র বশিষ্ঠের উল্লেখ পুরাণে রহিয়াছে।

কল্যাণী দত্ত

বসন্ত ভাইরাস-ঘটিত সংক্রামক রোগ। সংক্রমণের ৮—১৫ দিন পরে খুব জ্বর হয় ও সর্বাঙ্গে গুটি দেখা দেয়, মাথায় যন্ত্রণা, সর্বাঙ্গে ব্যথা এবং মুখেচোখে অস্বাভাবিক লালিমাও থাকে। গুটিগুলি সাধারণতঃ মুখে, মাথায়, প্রকোষ্ঠ ও বাহুর পশ্চাদ্ভাগে, পায়ে ও গায়ে শক্তভাবে এবং পরে জলে পূর্ণ হইয়া পরিণামে পুঁজে ভরিয়া উঠে। পরে গুটিগুলি শুকাইয়া যাইবার সময় তাহাদের উপর মামড়ি দেখা দেয়। মামড়িগুলি খসিয়া যাওয়ার পরও সর্বাঙ্গে, বিশেষতঃ মুখমণ্ডলে ছোট ছোট গর্তের মত চিরস্থায়ী দাগ থাকিয়া যায়। চোখে গুটি বাহির হইলে অন্ধত্ব ঘটে। বিষ-

ক্রিয়ার ফলে নিউমোনিয়া, হৃদ্‌বৈকল্য কিংবা বৃক্কের অক্ষমতা-হেতু বহু লোকের মৃত্যু হয়।

সাধারণতঃ এশিয়ার, বিশেষতঃ তদন্তর্গত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ হইলেও বহু শতাব্দী ধরিয়া বসন্ত পৃথিবীর বহু দেশে মহামারীরূপে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটাইয়াছে। সাধারণতঃ শীত ও বসন্ত কালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ও কৃষ্ণকায় লোকের দেহেই ইহার মারাত্মকতা সর্বাধিক। রোগী সংস্পর্শে কিংবা মশা মাছি বা বায়ুর দ্বারা এই রোগের সংক্রমণ হইতে পারে।

বসন্ত রোগ প্রতিবিধানের উপায়গুলি নিম্নরূপ ঃ ১. বসন্তের টিকা গ্রহণ ঃ বর্তমানে প্রতিষেধক টিকার সাহায্যে বসন্তের প্রকোপ বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে ('টিকা' দ্র)। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, বসন্তের টিকার ন্যায় জল বসন্তের (চিকেন পক্স্‌) কোনও প্রতিষেধক টিকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ২. বিজ্ঞপ্তিকরণ ঃ গৃহে বা পাড়ায় বসন্তের আবির্ভাবমাত্র লোক্যাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন প্রভৃতির স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীকে জানানো কর্তব্য। ৩. স্বতন্ত্রীকরণ ঃ রোগীকে অনতিবিলম্বে হাস-পাতালে পাঠানো উচিত ; অন্যথায় অন্য লোকের সংস্পর্শ হইতে দূরে কোনও গৃহে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রাখা কর্তব্য। ৪. সংগরোধ (করান্টিন) ঃ রোগীর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গৃহবাসীর সংস্পর্শে অপরের দেহে যাহাতে রোগ সংক্রামিত না হয়, সেজন্য ঐরূপ সকল ব্যক্তিকে স্বগৃহে পক্ষকালের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অন্তরীণের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। ৫. বিশোধন ঃ রোগীর ঘরের মাটি, মলমূত্র, কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র সব কিছুরই সম্যক বিশোধন আবশ্যক। রোগীর আরোগ্য, স্থানান্তর বা মৃত্যুর পর সংশ্লিষ্ট ঘরের মাটি, দেওয়াল, ছাদ, খাট-পালঙ্ক প্রভৃতি বস্তুর বিশেষ বিশোধন অবশ্যকরণীয়। রোগীর কাপড়-চোপড়, বিছানা প্রভৃতি পুড়াইয়া ফেলাই সমীচীন। ৬. পূর্বেই যাহাদের সাফল্যজনকভাবে বসন্তের টিকা দেওয়া হইয়াছে, কেবল তাহাদেরই সেবা-শুশ্রূষার জন্য রোগীর কাছে যাওয়া উচিত ; রোগীর ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বেই হস্তপদাদির সম্যক বিশোধন এবং বস্ত্র পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক।

দ্র F. W. Price, *A Text Book of the Practice of Medicine*, London-New York-Toronto, 1946; S. K. Chatterjee, *Some Social and Epidemiological Aspects of Small Pox in West Bengal, including Calcutta, The Problems of its Control and Eradication*, West Bengal Government Publication; Technical Memorandum No. 3, Calcutta, 1959.

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৮৬৫—১৯৫২ খ্রী) জন্ম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামক কাব্যের আবিষ্কর্তা পণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌। ইনি বংগীয় সাহিত্য পরিষদের পুথি-শালার প্রথম পণ্ডিত ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ হন। ইনি ১৩১৬ বংগাব্দে বন-বিষ্ণুপুরের নিকটে কাঁকিল্যা গ্রামে নামবিহীন এক কাব্যের পুথি পাইয়া উহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' দেন এবং ঐ গ্রন্থ স্বকৃত টীকার সহিত সম্পাদনা করিয়া তিনি সাহিত্য পরিষদ হইতে ১৩২৩ বংগাব্দে প্রকাশ করেন। বহু বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করেন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর ঝাড়গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিমানবিহারী মজুমদার

বসন্ত রায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের ('বারভুঁইয়া' দ্র) খুল্লতাত ও জমিদার। প্রবাদ এই যে প্রতাপাদিত্য ইঁহাকে হত্যা করেন। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থে ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' নামক উপন্যাস এই কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু ইহা কতদূর ঐতিহাসিক সত্য তাহা বলা যায় না।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

বসাঢ় (বৈশালী) (২৫°৫৮′ ২০″ উত্তর ও ৮০°১১′ ৩০″ পূর্ব) বসাঢ় প্রাক্‌-বুদ্ধযুগে ষোড়শ মহাজনপদের বৃজি, লিচ্ছবি প্রভৃতি সংযুক্ত গণরাজ্যের প্রধান নগর বৈশালীর অপভ্রংশ। উত্তর বিহারের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত এই স্থানটি মজঃফরপুর শহরের ৩৫ কিলোমিটার (২২ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে।

রামায়ণের মতে ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা বিশাল স্বনামে বৈশালী নগরের পত্তন করেন। পুরাণের মতে বিশাল ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা নভাগের বংশধর। এই রাজবংশের পতনের পর ইহা লিচ্ছবি গণরাজ্যের রাজধানী হয়। বুদ্ধদেব ও মহাবীরের সময়ে বৈশালী ভারতের এক বৃহত্তম নগরী ছিল। একপন্ন-জাতকে উক্ত হইয়াছে যে বৈশালী নগরের তিনটি প্রতিরক্ষা প্রাকার, পরস্পর হইতে এক গাবুত দূরে অবস্থিত ছিল। প্রাকারের অট্টালিকাযুক্ত তিনটি গোপুর। বিম্বিসারের সময় পর্যন্ত লিচ্ছবিদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। অজাতশত্রু এই রাষ্ট্রকে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। শিশুনাগের রাজত্বকালে বৈশালী তাঁহার দ্বিতীয় রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নন্দবংশের রাজত্বকালে বৈশালী রাজধানীর গৌরবচ্যুত হয়।

বৈশালীর সমীপস্থ কুণ্ডগ্রামে সর্বশেষ জৈন তীর্থংকর

বসাঢ় (বৈশালী)

মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাই অদ্যাপি জৈনদের নিকট বৈশালী পরম তীর্থস্থান।

বুদ্ধদেব কয়েক বার এই স্থল পরিদর্শন করেন এবং এখানকার কতিপয় চৈত্যে অবস্থানও করেন। এই স্থানেই একদল বানর বুদ্ধদেবকে একটি মধুভাণ্ড প্রদান করে; বুদ্ধদেবের জীবনের আটটি প্রধান ঘটনার (অষ্ট মহাপ্রাতি-হার্য) ইহা একটি। হিউএন-ৎসাঙ্ এই বিস্ময়কর ঘটনার স্মারক একটি স্তূপ মর্কট হ্রদের পার্শ্বে দেখিতে পান। মহাপরিনির্বাণের কিছু পূর্বে বুদ্ধদেব এখানকার প্রখ্যাত বারাঙ্গনা আম্রপালীর উপহৃত অর্ঘ্য আম্রকুঞ্জ গ্রহণ করেন। তথাগতের পরিনির্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষের একাংশ লিচ্ছবিরা কুশীনগরের মল্লদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া বৈশালীতে একটি ধাতুগর্ভ স্তূপ নির্মাণ করিয়া ওই অংশের যথোচিত সম্মান দেন। কথিত আছে, বৈশালীর সন্নিকটে অপর একটি স্তূপে বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দের দেহাবশেষের অর্ধাংশ রক্ষিত হয়। বুদ্ধদেবের তিরোধানের এক শতাব্দী পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি বসে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই যে ইহার চৈত্যগুলির খ্যাতি সুদূরে বিস্তার লাভ করে তাহার অন্যতম প্রমাণ অমরাবতীর একটি প্রস্তরের ফলকগাত্রে ক্ষোদিত এই স্থানের চৈত্য ও বৃক্ষচৈত্যের অনুকৃতি। এই ফলকে বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অনতিপূর্বে অন্তিম পর্যটনের কয়েকটি দৃশ্য ক্ষোদিত আছে। এখানকার মহাবন সংঘারামের ভিক্ষুরা সিংহলের দুট্ঠগামনি কর্তৃক মহাস্তূপের উদ্বোধন-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন ও হিউএন-ৎসাঙ্ উভয়েই বৈশালী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত পরিব্রাজক লিচ্ছবিনির্মিত বুদ্ধধাতুগর্ভ স্তূপ, অশোকের আদেশে নির্মিত স্তূপ প্রমুখ বহু বৌদ্ধ কীর্তি অবলোকন করিয়াছিলেন।

প্রাপ্ত মূর্তিসমূহের পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে এখানে বৌদ্ধধর্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত টিকিয়া ছিল। একাদশ শতকের একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে তীরভুক্তির (তিরহুত) অন্তর্গত বৈশালী-তারার একটি ক্ষুদ্রাকার চিত্রিত মূর্তি অঙ্কিত আছে। তিরহুতের রাজধানী পা—ত হইতে বুদ্ধগয়া গমন করিবার সময়ে তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মস্বামী বৈশালীর মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করেন। মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কায় বৈশালী তখন জনমানবশূন্য। এই পরিব্রাজক একজন উপাসিকা ও আর্যতারার একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রস্তর প্রতিমা ব্যতীত অন্যকোনও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান বা বৌদ্ধকীর্তির উল্লেখ করেন নাই।

প্রাচীন রাজধানী-নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্তমানে রাজা-বিশাল-কা-গড় (বসাঢ় গ্রামের উত্তরে) নামে পরিচিত। পরিখা ও প্রাকার পরিবেষ্টিত এই অন্তর্দুর্গটি আয়তাকার। এই প্রাকারের কিছু দূরে আর একটি প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। গড়ে এবং ইহার পরিপার্শ্বে খননের ফলে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দব্যাপী অধিবসতির নিদর্শন উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই অধিবসতি চারিটি প্রধান পর্বে ভাগ করা হয়। প্রথম পর্বের আবার দুই পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০—৩০০) কৃষ্ণ এবং লোহিত কৌলাল, উত্তর ভারতীয় চিক্কণ কৃষ্ণ কৌলাল (Northern Black Polished Ware), রক্তিম মৃৎপাত্র, লৌহ দ্রব্যাদি ও হাড়ের তীরের ফলা পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০—১৫০) বর্গাকার ইটের সাধারণ ধরণের ঘর-বাড়ি, ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র, উত্তর ভারতীয় চিক্কণ কৃষ্ণ কৌলাল, রক্তিম মৃৎপাত্র, নাতিমূল্যবান প্রস্তরের ও কাচের পুঁতি, লৌহদ্রব্য, হাড়ের ফলা, পোড়ামাটির নাগের ও অন্যান্য মূর্তি অনাবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টাব্দ) শুঙ্গকালীন প্রত্নবস্তু, পাঞ্চ-মার্কড (Punch-marked) ও ঢালাই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই যুগে বাড়ি ঘর বহুল পরিমাণে নির্মিত হয়। রক্তিম মৃৎপাত্রের সঙ্গে উত্তর ভারতীয় চিক্কণ কৃষ্ণ কৌলালের মৃৎপাত্রের কয়েকটি টুকরাও এই যুগে পরিদৃষ্ট হয়। তৃতীয় পর্বে (১০০—৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) কেবল মাত্র রক্তিম কৌলালের ব্যবহার দেখা যায়। এই যুগের বেশ কয়েকটি ইষ্টকের সৌধ ও অন্যান্য প্রত্নবস্তু অনাবৃত হইয়াছে। চতুর্থ পর্বে (৩০০—৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) গুপ্ত যুগের বহু নিদর্শন বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পোড়ামাটির মূর্তিফলক ও উৎকীর্ণ শীলমোহর। এই যুগের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, প্রতিরক্ষা প্রাকারের পুনর্নির্মাণ ও সৈন্যাবাস ইত্যাদি হইতে অনুমিত হয় গুপ্তযুগে বৈশালী বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। গুপ্তযুগের শীলমোহরে বৈশালী-অধিষ্ঠানের অধিকরণের উল্লেখ আছে। কয়েকটিতে গুপ্তরাজবংশের রাজকুমার গোবিন্দগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত ও মহাদেবী ধ্রুবস্বামিনীর নাম আছে।

রাজা-বিশাল-কা-গড়ের বহির্দেশে বৌদ্ধকীর্তির নিদর্শন যথেষ্ট বিদ্যমান। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তিনশত গজের মধ্যে বসাঢ় গ্রামে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরাট ইটের ঢিপি; সম্ভবতঃ এইটি একটি স্তূপ। ইহার উপর মীরানশাহের দরগা। গড়ের ৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কোলহুয়া গ্রামে একটি সুমসৃণ বেলেপাথরের স্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভটির শীর্ষদেশে যথাক্রমে একটি ঘণ্টাকার পদ্ম, রজ্জুর প্রতিকৃতিতে গলদেশ, আয়তাকার ফলক এবং সিংহের একটি মূর্তি। স্তম্ভগাত্রে অশোকের লেখ না থাকিলেও ইহার রূপকল্প, গঠনশৈলী এবং শিরোভূষণ হইতে ইহা যে মৌর্যযুগীয় তাহা সহজেই ধরা পড়ে। ইহার সন্নিধানে একটি বৃহৎ ইটের স্তূপ বিরাজিত। পার্শ্ববর্তী জমিতে প্রাপ্ত পালযুগের একটি বুদ্ধমূর্তি বর্তমানে স্তূপটির উপরে প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভটি ও স্তূপটির অতিসান্নিধ্য হইতে মনে হয় যে স্তূপটির সূত্রপাত হইয়াছিল অশোকের সময়েই। সমীপস্থ পুষ্ক-

রিণীকে বুদ্ধদেবের ব্যবহারের জন্য বানরগণ কর্তৃক খাত মর্কট হ্রদ বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। হিউএন-ৎসাঙ্-এর দিক্ ও দূরত্বের নির্দেশ অনুসরণ করিয়াই অবশ্য এই সিদ্ধান্ত।

গড়ের উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় অর্ধমাইল দূরে একটি নিচু স্তূপে খনন কার্য পরিচালনা আশ্চর্য ফলপ্রসূ হইয়াছে। আদিতে এই স্তূপ ছিল সম্পূর্ণ মাটির (মধ্যে মধ্যে এ'টেল মাটির স্তর); ব্যাস ছিল ২৫ ফুট। পরে চারবার ইহার সম্প্রসারণ ঘটে। সম্প্রসারণের প্রতি পর্বেই পোড়া ইট ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় সম্প্রসারণের ফলে স্তূপটির ব্যাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ৪০ ফুট। তৃতীয়টিকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্থটি নির্মিত হয় সহায়ক দেওয়ালরূপে। মূল স্তূপটির কেন্দ্রস্থলে, অতি প্রাচীন যুগে খননের ফলে উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকার অভ্যন্তরে পাওয়া যায় সোপস্টোনের একটি মঞ্জুষা। ইহার মধ্যে ছিল কিছু পরিমাণে ভস্মমাটি, একটি সোনার পাতা, দুইটি কাচের পুঁতি, ছোট একটি শঙ্খ ও একটি তামার পাঞ্চ্-মার্কড্ মুদ্রা। স্তূপটির একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে কৃষ্ণা উপত্যকার স্তূপগুলিতে বিদ্যমান আয়কসদৃশ প্রলম্বন।

মূল স্তূপটির অতি-প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। স্তূপ নির্মিতির আদিম বৈশিষ্ট্যের বিদ্যমানতা ও ইহার অভ্যন্তরস্থ প্রাচীন খননের চিহ্ন হইতে অনুমিত হইয়াছে যে এই স্তূপটিই হইতেছে লিচ্ছবিনির্মিত বুদ্ধদেবের ধাতুগর্ভ স্তূপ যাহার মধ্যভাগে অশোক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ সংগ্রহার্থে খনন করান। অনুমানের আর একটি কারণ হইতেছে হিউএন-ৎসাঙ্ সূচিত লিচ্ছবি স্তূপের স্থল এই স্তূপের অবস্থিতি-স্থলের সংগে মোটামুটি মিলে। এই সনাক্তকরণ যদি সত্য হয়, তবে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত স্তূপাবলীর মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম।

অশোক-স্তম্ভটির সন্নিকটে উত্তর দক্ষিণ বরাবর বিন্যস্ত দুইটি ঢিপি, যাহাদের তলদেশের ব্যাস যথাক্রমে ৫৬ মিটার ও ৫৫ মিটার এবং উচ্চতা যথাক্রমে ৮ ও ৭ মিটার। খননের ফলে জানা গিয়াছে যে দুইটিই মাটির স্তূপের অবশেষ। উত্তরদিকের স্তূপটির মধ্যে একটি মাটির বাটি ও থালা ছাড়াও কতিপয় তামার তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে; শেষোক্ত দ্রব্যগুলির একটিতে দেহাবশেষও বিদ্যমান। স্পষ্টতঃ ইহা কোনও বৌদ্ধ আচার্যের যুগপৎ শারীরিক ও পারিভোগিক স্তূপ।

দ্র A. Cunningham, *Archaeological Survey of India Reports*, I, Simla, 1871, XVI, Calcutta, 1883; *Annual Report, Archaeological Survey of India*, 1903-04, Calcutta, 1906, ibid, 1913-4, Calcutta, 1917; Hemchandra Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, 6th ed., Calcutta, 1953; *Indian Archaeology*, 1957-58 —*A Review*, New Delhi, 1958; *Journal of Bihar Research Society*, Buddha Jayanti Special Issue, Vol. II; Krishna Deva and Vijayakanta Mishra, *Vaisali Excavations*, 1950, Vaiśāli, 1961.

দেবলা মিত্র

বসিরহাট চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার কেন্দ্র-নগরী (২২°৪০´ উঃ ও ৮৮°৫১´ পূঃ)। শহরটি ইছামতী বা যমুনা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত এই শহরটির দক্ষিণ অংশে কিছু কিছু নিম্নভূমিতে বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। বৎসরের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬২৫ মিলিমিটার।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বসিরহাট পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। বর্তমানে ইহার জনসংখ্যা ৫৩৯৬৩ (১৯৬১ খ্রী)। এখানে কিছু গুড় ও চিনি উৎপাদন করা হয়। প্রতি বৎসর মার্চ-এপ্রিল মাসে এখানে বারুণীর মেলা বসে। এখানকার ১৪৬১-৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত সালিক মসজিদ উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য।

দ্র A. Mitra, *District Handbook, 24-Parganas, Census 1951, West Bengal*, Alipore, 1954.

পীযূষ সাহা

বসু[১] অষ্টসংখ্যক গণদেবতা। কামধেনু নন্দিনীকে হরণ করায় মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে নৃপতি শান্তনুর ঔরসে গংগাদেবীর পুত্ররূপে বসুগণের জন্মকাহিনী মহাভারতে ও দেবীভাগবতে পাওয়া যায়।

বসু[২] পুরুবংশীয় ধর্মনিষ্ঠ নৃপতি। একদা তপোনিরত আশ্রমবাসী বসু নৃপতিকে প্রজাপালনরূপ ধর্মরক্ষার জন্য অনুরোধ করিয়া ইন্দ্র তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করেন। ইন্দ্রের উপদেশে তিনি চেদিরাজ্য জয় করেন। ইন্দ্র মিত্রস্থানীয় বসুনৃপতিকে একটি বিমান, বৈজয়ন্তী মালা ও বেণুযষ্টি দান করেন। বিমানে শূন্যে বিচরণ করার জন্য তাঁহার অপর নাম উপরিচর। বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করার ফলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অক্ষতদেহে অবস্থান করিতেন। মৎস্যরূপিণী এক অপ্সরার সহিত মিলনের ফলে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম মৎস্য ও মৎস্যগন্ধা কন্যার নাম সত্যবতী, বেদব্যাসের জননী (মহাভারত ১।৫৭)।

যূথিকা ঘোষ

বসুদেব কৃষ্ণ দ্র

বসুধারা যজ্ঞীয় ঘৃতাদির ধারা। বর্তমানে বিবাহাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষে করণীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে

বসুধারা দেওয়ার প্রথা আছে। ঘরের দেওয়ালের বাহিরের দিকে নাভিসমান উচ্চস্থানে গোবরের তাল লাগাইয়া উহার উপর হইতে নীচের দিকে সমদূরে সিন্দুর বা চন্দনের দ্বারা ৫টি বা ৭টি দাগ কাটিয়া উহাতে এক-একটি কড়ি আটকাইয়া দেওয়া হয় এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহার উপর ঘৃতধারা বর্ষণ ও চৌদিরাজ বসুর পূজা করা হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে পশুযাগ বিষয়ে দেবতা ও ঋষিদের বিতর্কে উপরিচর বসু দেবপক্ষ সমর্থন করায় ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং পাতালে বাসকালে দেবতাদের বরে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যজ্ঞে প্রদত্ত বসুধারা দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবার সুযোগ লাভ করেন (মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৭/২৫-২৬)।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বসুবন্ধু বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক, অভিধর্মকোশ (অভিধম্মকোশ) মহাগ্রন্থের রচয়িতা। পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। আচার্য অসঙ্গ ছিলেন ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বসুবন্ধুর জীবনকাল লইয়া মতভেদ আছে তবে সম্ভবতঃ তাহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। সংসার আশ্রমে তাঁহার নাম ছিল কৌশিক। কুমারজীব ও পরমার্থ তাঁহার দুইটি জীবনী রচনা করেন। প্রথমটি পাওয়া যায় না। কিমুরা ও ফ্রাউ ওয়ালনারের মতে দুই-জন বসুবন্ধু ছিলেন। ইঁহাদের একজন হীনযানী, অন্যজন মহাযানী; দুইজনের মধ্যে প্রায় আশি বৎসরের ব্যবধান। একই বসুবন্ধু প্রথমে হীনযানী ছিলেন ও পরে মহাযানী হন, ইহাই অধিকাংশ পণ্ডিতের মত।

বসুবন্ধু কাশ্মীরে সর্বাস্তিবাদ দর্শন অধ্যয়ন করেন। কাশ্মীর সর্বাস্তিবাদ বৈভাষিক মতের দর্শন। বসুবন্ধু নিজে কিন্তু সৌত্রান্তিক মতের লোক ছিলেন। কাশ্মীর মতানুসারে রচিত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অভিধর্মকোশের স্থানে স্থানে তাঁহার সৌত্রান্তিক মত প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। অভিধর্মকোশ কারিকা ও তাহার উপর বসুবন্ধুর স্বরচিত ভাষ্য মিলিতভাবে অভিধর্মকোশশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত। ইহাই বসুবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিভাষ মতের গ্রন্থ হইলেও সমগ্র হীনযানী সম্প্রদায় ও মহাযানীদের মধ্যেও এই গ্রন্থের সমধিক প্রচার রহিয়াছে।

তাঁহার গুরু বুদ্ধমিত্রকে প্রসিদ্ধ সাংখ্যমতাবলম্বী বিন্ধ্যবাস (মতান্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ) পরাজিত করেন। তখন বসুবন্ধু নিজে বিন্ধ্যবাসকে পরাজিত করেন। চীনা ভাষায় পরমার্থসপ্ততি নামে বসুবন্ধুর একটি অনূদিত গ্রন্থ আছে। ইহা সাংখ্যকারিকোক্ত মতের খণ্ডন।

অধ্যয়নার্থে বসুবন্ধু অযোধ্যাতেও গিয়াছিলেন। অযোধ্যা হইতে পুরুষপুরে ফিরিয়া তিনি ভ্রাতা অসঙ্গের প্রভাবে অবশেষে যোগাচার-বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক হইয়া দাঁড়ান।

বসুবন্ধু আশি বর্ষকাল জীবিত ছিলেন। ন্যূনাধিক ছত্রিশটি গ্রন্থ তাঁহার নামে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃতে লিখিত। কতকগুলি গ্রন্থের চীনা বা তিব্বতী অনুবাদ আছে। বেশির ভাগ গ্রন্থই মহাযান মতে লিখিত। এইগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল ত্রিংশকারিকা (ত্রিংশিকা), বিংশকারিকা (বিংশতিকা)। তাঁহার শেষ জীবনে লিখিত অপরিমিতায়ুঃসূত্রশাস্ত্রম্ গ্রন্থে অমিতাভ তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অভিধর্মকোশের চীনা অনুবাদ ধরিয়া রাহুল সাংকৃত্যায়ন পুনর্বার এই গ্রন্থের সংস্কৃত রূপ আনয়ন করিয়াছেন। 'অভিধম্মকোশ', 'অসঙ্গ' দ্র।

অরুণা হালদার

বসুবিজ্ঞানমন্দির জগদীশচন্দ্র বসু প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থতত্ত্বের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়েই পরবর্তী কালে যাহাতে তাঁহার গবেষণার কাজ অবিচ্ছিন্ন-ভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা-গার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর দুই বৎসর তিনি ৯৩ নং আপার সার্কুলার রোডে অবস্থিত তাঁহার বাসভবনে একটি ক্ষুদ্র গবেষণাগারে গবেষণার কাজ চালাইয়া যান। ঐ সময়ের মধ্যেই তাঁহার বাসভবনের উত্তর দিকে সংলগ্ন জমির উপর বসুবিজ্ঞানমন্দির নির্মিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার নিজের সঞ্চয় ব্যতীতও অন্যান্য স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং বাংলা সরকারের নিকট হইতেও একটি বাৎসরিক অনুদান লাভ করেন। পরবর্তীকালে ঐ সরকারি অনুদান ভারত সরকারের বাৎসরিক অনুদানে রূপান্তরিত হয়।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বসুবিজ্ঞানমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। উদ্ভিদের সাড়া সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার কাজ অবিচ্ছিন্নভাবে চালাইয়া যাইবার জন্য প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহার কাছে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল ছাত্র নিয়োজিত হয়। বিজ্ঞানমন্দিরের কারখানায় নির্মিত জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রকারের ক্রেস্কোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাঁহারা গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণাগার ছাড়াও বিজ্ঞানমন্দিরে একটি বৃহৎ ও সুপরি-কল্পিত বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হয়। ঐ সময়ে এখানকার গবেষণাসংক্রান্ত প্রদত্ত বক্তৃতাদি বিজ্ঞানমন্দিরের সাময়িক পত্রিকা ট্রানজ্যাক্‌শনে প্রকাশিত হইত। পরবর্তী কালে তাঁহার নিজস্ব গবেষণার ধারা ব্যতীত তাত্ত্বিক ও ফলিত পদার্থতত্ত্ব, কৃষি ও উদ্ভিদ-রসায়ন এবং নৃতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণাও বিজ্ঞানমন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছে।

জগদীশচন্দ্র ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার পর দেবেন্দ্রমোহন বসু অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঐ পদে অধি-

ষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে ৩টি রিভিউইং কমিটি বিজ্ঞানমন্দির পরিদর্শন করেন এবং তাঁহাদের সুপারিশ অনুসারে বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালনা ও গবেষণা-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়।

বর্তমানে এখানে ফিজিক্স, বায়ো-ফিজিক্স, প্ল্যাণ্ট কেমিস্ট্রি, বায়ো-কেমিস্ট্রি, প্রোটিন কেমিস্ট্রি, তাত্ত্বিক ও ফলিত উদ্ভিদবিজ্ঞান, মাইক্রো-বায়োলজি প্রভৃতি বিষয়ের গবেষণা ৪টি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হইয়া থাকে। এতদতিরিক্ত প্রাণী-শারীরতত্ত্ব-বিভাগও রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি কৃষি, শিল্প ও রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যাবহারিক প্রয়োগের উপযোগী। একটি বিশেষ গবেষণাশাখা জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার ধারাকে আধুনিকভাবে সম্প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে।

নিজস্ব আয়ব্যতীত ভারত সরকার, আই. সি. এ. আর., সি. এস. আই. আর., ডি. এ. ই. এবং পি. এল.—৪৮০ হইতে বিজ্ঞানমন্দির অনুদান পাইয়া থাকে। বসুবিজ্ঞানমন্দিরের বর্তমান আয় পূর্বের তুলনায় বিশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দার্জিলিং, ফলতা ও শ্যামনগরে বিজ্ঞানমন্দিরের শাখা রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রমোহন বসু

বস্তুবাদ জ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় বস্তুবাদ একটি প্রধান মতবাদ। জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিষয়ের (অবজেক্টর) সম্পর্ক কি, এই মূল প্রশ্নের উত্তরে বস্তুবাদী বলেন, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাননিরপেক্ষ। অর্থাৎ, আমি এই জগৎকে জানি কিংবা নাই জানি তাহাতে (আমার জ্ঞানের বিষয়রূপী) জগতের কিছুই আসিয়া যায় না। বস্তুবাদের বিরোধী মতবাদের নাম হইল ভাববাদ। ভাববাদীর মতে জগৎ একটি ভাব বই কিছু নহে। ইহা মূলতঃ জ্ঞাননির্ভর।

বস্তুবাদ নানা প্রকার। একদল বস্তুবাদী বলেন, বস্তুজগৎ একেবারে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞানজগতের বহির্ভূত। বস্তুবাদের এই অতি সরল ভাষ্য কিছু ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান-সংক্রান্ত অধ্যাসে বা ভ্রমে পরিস্ফুট। সর্পরজ্জু ভ্রম ইহার সুপরিচিত উদাহরণ। যাহা বস্তুতঃ নাই, কখনও কখনও তাহা যে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তাহা অস্বীকার করা শক্ত। এই যুক্তি স্বীকার করিলে বস্তুবাদের অতি সরল ভাষ্যটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়। জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে জ্ঞানের উপরই নির্ভর করিতে হয়। আর এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভাববাদীরা বস্তুবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন।

বস্তুবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, বস্তুর কয়েকটি গুণ, যথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব—প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ এবং এই (জ্যামিতিক) গুণগুলিকে বলা হয় প্রাথমিক গুণ। বস্তুর অপর কতকগুলি গুণ আছে, যথা, বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, যেগুলি বস্তুবাদীদের মতে প্রত্যক্ষনির্ভর। একই ব্যঞ্জনের স্বাদ বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন বলিয়া মনে হয়। যে যুক্তিতে প্রাথমিক ও অপ্রাথমিক গুণগুলির মধ্যে ভেদরেখা টানা হয়, তাহা ভাববাদীদের মতে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ 'জ্যামিতিক' বা প্রাথমিক গুণগুলিও (অ-প্রাথমিক গুণগুলির মত) বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। একটি বস্তু কত উচ্চ বা দীর্ঘ, তাহা প্রত্যক্ষনিরপেক্ষভাবে নির্ণয় করা যায় না। অর্থাৎ জ্যামিতিক অধ্যাসও অনিবার্য। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে যে সমালোচনাগুলি বেশি প্রচলিত তাহা প্রায় সবই অধ্যাস-সংশ্লিষ্ট। অধ্যাসে বস্তুর বিকৃতি প্রত্যক্ষ হয়, যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়।

আধুনিক বস্তুবাদীরা অধ্যাস সম্পর্কে বস্তুবাদী মতের বিরুদ্ধ সমালোচনা নানাভাবে খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন বস্তুর বিকৃত প্রত্যক্ষ-দ্বারা বস্তুর জ্ঞাননিরপেক্ষ অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে বস্তুর বিকৃত প্রত্যক্ষ হইতে ইহাই পরোক্ষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুর কোনও না কোনও একটি নির্দিষ্ট ও প্রকৃত রূপ আছে আর সেই রূপটি প্রত্যক্ষনিরপেক্ষ। বিকৃত প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যাদানপ্রসংগে বলা হয় যে, যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেন আর যাহা প্রত্যক্ষ করেন এতদুভয়ের মধ্যে তৃতীয় এমন কিছু আছে যাহা বিকৃত প্রত্যক্ষের জনক। এই তৃতীয় জিনিসটি কি, সে বিষয়ে কোনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না।

বস্তুবাদ বনাম ভাববাদের বাদানুবাদ বিশ্লেষণ করিয়া আধুনিক প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, যে-মূল সমস্যাটিকে কেন্দ্র করিয়া এই বাদানুবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা আদৌ কোনও যুক্তিসিদ্ধ সমস্যাই নহে। কোনও বস্তুর প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোনও প্রকৃত স্বরূপ আছে কিনা তাহা কখনই প্রত্যক্ষ ব্যতীত নির্ণয় করা সম্ভব নহে। যে সমস্যার সমাধান নীতিগতভাবেই অসম্ভব বা অলভ্য তাহা সদর্থে সমস্যাই নহে।

একদল বস্তুবাদী আছেন যাঁহাদের মতে বস্তুবাদ অনুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হউক বা না হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। সমস্ত জগৎ কতকগুলি পদার্থে (ক্যাটিগরিস) বিভক্ত—যথা দেশ, কাল, জড়, মন ইত্যাদি। পদার্থের সংখ্যা লইয়া আবার বস্তুবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। পদার্থগুলি এইসব বস্তুবাদীদের মতে জ্ঞাননিরপেক্ষ।

দ্র B. Russell, *Problems of Philosophy*, London, 1912; E. B. Holt etc., *The New Realism*, New York, 1912; Durant Orsk etc., *Essays in Critical Realism*, New York & London, 1920; Jadunath Sinha, *Indian Realism*, London, 1938; G. E. Moore, *Some Main Problems of Philosophy*, London, 1953; Rode-

rick M. Chisholm, *Realism and the Background of Phenomenology*; Glencoe, Ill, 1950.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর (২৪°০৫′ উ ও ৮৮°১৬′ পূ), কলিকাতা হইতে রেলপথে ১৮৬ কিলোমিটার উত্তরে ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত। বহরমপুর শহরের আয়তন ১৬ বর্গকিলোমিটার। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি পৌরশাসনের অধীনে আসে।

গ্রীষ্ম হইতে শীতকাল পর্যন্ত তাপমাত্রা ২৫°—১৮° সেণ্টিগ্রেডের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। শহরের বাৎসরিক গড়-তাপমাত্রা ২৯° সেণ্টিগ্রেড এবং গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১১৩০ মিলিমিটার।

পলাশীর যুদ্ধের পরেই ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়ারের (Captain Brohier) প্রস্তাব অনুযায়ী ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রচুর অর্থব্যয়ে ব্রহ্মাপুরে ক্যাণ্টনমেণ্ট (Cantonment) স্থাপিত হয়। প্রাক্-ব্রিটিশযুগের ছোট্ট গ্রাম ব্রহ্মাপুর নবাবী দরবারে কর্তৃত্ব ও 'বেঙ্গল আর্মি'-র উত্তর প্রান্তিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রয়োজনে মর্যাদা লাভ করে এবং তাহার নাম হয় বহরমপুর। নিকটস্থ বাণিজ্যকেন্দ্র কাশিমবাজারের অবনতি, বিভিন্ন শিল্প-ব্যবসায়ীদিগের সমাগম, সামরিক আশ্রয়ের নিশ্চয়তা, কলিকাতার সহিত রেলপথে সংযোগ (১৯০৪ খ্রী) এবং জেলার শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠার (১৮৭৫ খ্রী) দরুণ বহরমপুর গ্রাম হইতে শহরে রূপান্তরিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয় এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারের নিমিত্ত মহাকালী পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই বহরমপুরেই 'বঙ্গদর্শন'-এর জন্ম।

বর্তমানে এ শহরে ২৬টি প্রাথমিক ও ৫টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৫টি কলেজ আছে। তদ্ভিন্ন ১টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ১টি রেশম শিল্প ট্রেনিং সেণ্টার আছে। কৃষ্ণনাথ মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন আইনশিক্ষা ও কিছুদিন স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শহর হইতে ৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। এখানে ৫টি পুস্তকাগার আছে।

শহরে প্রধানতঃ দুইটি অপ্রশস্ত রাজপথের দুইধারে এবং শীর্ণকায়া ভাগীরথীর তীরে লোকবসতি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী মোট লোকসংখ্যা ৬২৩১৭। কাঁসার বাসনের জন্য এককালে বহরমপুর প্রসিদ্ধ ছিল। খাদি প্রভৃতি সামান্য কুটিরশিল্প আছে। প্রতিবেশী রামনগরের চিনির কল ও কিছু ধান কল বাদে বর্তমানে বহরমপুরে শিল্পায়নের ছায়া পড়ে নাই। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে শহরটির বৈদ্যুতীকরণ হয়।

প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান—গড় বহরমপুরের ব্যারাক, সমাধিক্ষেত্র, সৈদাবাদের আর্মেনিয়ান গির্জা, দয়াময়ী মন্দির, কুঞ্জঘাটায় রাজা নন্দকুমারের গৃহ, বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি, রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়ায় প্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং রক্তমৃত্তিকাসংঘারামের ধ্বংসাবশেষ।

নীরেন্দ্রনাথ সেন

বহল, কর্মনারায়ণ (১৮৯১—১৯৫৪ খ্রী) প্রথিতযশা ভারতীয় জীববিজ্ঞানী। ভারত বিভাগের পূর্বে লাহোরে তিনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন ; পরে অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি. ফিল. ও ডি. এসসি. ডিগ্রি লাভ করেন। লাহোরেই তাঁহার শিক্ষক জীবনেরও সূত্রপাত। পরে আগ্রা, এলাহাবাদ ও সর্বশেষে লখনৌতে তিনি শিক্ষক ও গবেষকরূপে কার্য করেন। তাঁহার নেতৃত্বে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণীবিদ্যার পঠন-পাঠন ও অনুশীলনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে। কেঁচো-জাতীয় প্রাণীর শারীরিক গঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়। তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান জুওলজিক্যাল মেমোয়ার্স' নামক পুস্তিকায় বহু ভারতীয় জীববিজ্ঞানী এদেশের বিবিধ প্রাণীর কথা লিপিবদ্ধ করেন। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকের পদ হইতে অবসরগ্রহণের পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ অলংকৃত করিতে আহ্বান করা হয়। এই গুরু দায়িত্ব তাঁহাকে বেশিদিন বহন করিতে হয় নাই ; অকস্মাৎ মৃত্যু তাঁহার কর্মবহুল জীবনের অবসান ঘটায়।

দ্র K. N. Bahl, *Pheretima*, Lucknow, 1936.

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

বহুলা বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ১৬ কিলোমিটার দূরে কেতুগ্রামে সতীর বাম বাহু পতিত হইয়াছিল। 'বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা। ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ'। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

বহ্লীক গ্রীক সেলিউকিড সম্রাট দ্বিতীয় অন্তিয়োকের (Antiochus II Theos) সময়ে আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বক্ষুনদ (Oxus) ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী বহ্লীক (উঃ আফগানিস্তান) ও কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বস্থ পার্থিয়া নামক প্রদেশদ্বয় স্ব স্ব শাসনকর্তা দিয়দাত (Diodotus I) ও আর্সাকিসের (Arasaces I) অধীনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

দিয়দাতের পুত্র দ্বিতীয় দিয়দাত সম্ভবতঃ ইউথিদিম (Euthydemus I) নামক জনৈক শক্তিশালী রাজপুরুষ কর্তৃক নিহত হন। এই ইউথিদিম বহ্লীকদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। (আনুমানিক ২০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) সেলিউকিড সম্রাট তৃতীয় অন্তিয়োক হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য

বহ্লীক আক্রমণ করেন এবং প্রায় দুই বৎসরকাল ইউথিদিমের সহিত যুদ্ধ করেন। পরিশেষে সন্ধি হয়। অন্তিয়োক ইউথিদিমকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহার তরুণ পুত্র দিমেত্রিয়র (Demetrius I) সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। তৎপরে অন্তিয়োক কাবুল উপত্যকায় অভিযান করেন। স্থানীয় রাজা সুভগ সেন (Sophagasenus) অন্তিয়োককে রণহস্তী প্রভৃতি উপঢৌকন দিয়া মৈত্রী স্থাপন করেন।

কিছুদিন পরে (সম্ভবতঃ মৌর্যরাজ শালিশুকের মৃত্যুর কিছু পরে ও বৃহদ্রথের রাজত্বকালে) বহ্লীকরাজ দিমেত্রিয় মূল-ভারতভূমিতে অভিযান করেন। এই অভিযানের উল্লেখ পাশ্চাত্য সাহিত্যে ও সম্ভবতঃ পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও যুগপুরাণেও পাওয়া যায়। যবনবাহিনী একদিকে মধ্যমিকা (চিতোর) অঞ্চল ও অন্যদিকে পঞ্চাল, মথুরা ও সাকেত (অযোধ্যা) আক্রমণ করিয়া মৌর্যদের রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকার করে। ইতিমধ্যে এবুক্রতিদ (Eucratides I) নামক জনৈক রাজপুরুষ বহ্লীকের সিংহাসন অধিকার করায় যবনবাহিনী অবিলম্বে মধ্যদেশ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সেখানে এবুক্রতিদ ও দিমেত্রিয় এ দুয়ের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং দিমেত্রিয় পরাজিত হন। ইহার পর এবুক্রতিদ ভারতবর্ষের কিয়দংশ জয় করেন, কিন্তু ফিরিবার সময় অতর্কিতে আক্রান্ত ও নিহত হন। বুখারায় এবুক্রতিদের নামাঙ্কিত প্রায় ১৪২ তোলা ওজনের বিশ্বের সর্ববৃহৎ একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবুক্রতিদের পরে আরও কয়েকজন গ্রীক রাজা বহ্লীক রাজ্যে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের মধ্যে পন্তলের (Pantaleon), অগথুক্লেয় (Agathocles) ও হেলিয়ক্লেয়ের (Heliocles) কতকগুলি দ্বিভাষিক মুদ্রা হইতে তাঁহাদের ভারতীয় অধিকার প্রমাণিত হয়। হেলিয়ক্লেয় বহ্লীকের শেষ গ্রীক রাজা ছিলেন। শকেরা তাঁহাকে বহ্লীক হইতে ভারতে বিতাড়িত করে।

এবুক্রতিদের মৃত্যুর পর অপলদত (Apollodotus I) কাবুল উপত্যকায় রাজত্ব করেন। মিলিন্দপঞ্হোর (মিলিন্দ প্রশ্ন) নায়ক মিলিন্দ বা মেনদ্র (Menander I) তাঁহার প্রায় সমসাময়িক রাজা ছিলেন। শাকলে (শিয়ালকোট?) মেনদ্রের রাজধানী ছিল। মিলিন্দপঞ্হোতে লেখা আছে যে, মেনদ্র উত্তরকালে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং রাজ্য ত্যাগ করিয়া অর্হৎ হন। কিন্তু ইহা কিংবদন্তি মাত্র।

অনুমিত হয়, বহ্লীকের শেষ গ্রীকরাজ হেলিয়ক্লেয় ভারতে বিতাড়িত হইবার পর তাঁহার সহিত যুদ্ধে মেনদ্র নিহত হন। মেনদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার মহিষী অগথুক্লেয়া (Agathocleia) নাবালক পুত্র স্ত্রত-এর (Strato I) নামে দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করেন এবং ভারতের রাণীদের মধ্যে প্রথম নিজের নামে মুদ্রাঙ্কন করান। মুদ্রার প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, উপযুক্ত হইয়া স্ত্রত স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং বহুদিন ধরিয়া সগৌরবে রাজত্ব করেন।

এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় ২৪ জন গ্রীক রাজা ও কলিয়পয় (Calliope) নামক একজন গ্রীক রাণীর নামাঙ্কিত বহু দ্বিভাষিক মুদ্রা হইতে তাঁহাদের অস্তিত্ব ও রাজত্বের কথা জানা যায়। তবে ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভবতঃ স্বল্পকালের জন্য পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকল রাজাদের মধ্যে অন্তিঅলিকিত (Antialcidas), লিসিয় (Lysias), দ্বিতীয় অপলদত, হিপ্পস্ত্রত (Hippostratus) ও হেরমেয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিয়পয় এই হেরমেয়ের মহিষী ছিলেন। অন্তিঅলিকিত ভিন্ন আর কাহারও নাম মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনও সূত্রে জানা যায় না।

যে শকজাতি বহ্লীক হইতে গ্রীকদের বিতাড়িত করে, তাহারাই আবার ভারতের গ্রীকরাজ্যের অবসান ঘটায়। পূর্বে পাটলিপুত্র ও দক্ষিণে চিতোর পর্যন্ত গ্রীকরা অভিযান করিলেও তাহাদের অধিকার ও শাসন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্তীকালের ভারতীয় মুদ্রা ও ভাস্কর্য শিল্পে গ্রীকপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

বাইজাণ্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি রোমান সম্রাট কনস্টাণ্টাইন ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টিয়াম বা কনস্টাণ্টিনোপলকে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন। ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস সমগ্র রোম সাম্রাজ্যকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ভাগে ভাগ করেন। প্রাচ্য অর্থাৎ বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ম্যাসিডোনিয়া, থ্রেস, গ্রীস, ক্রীট, এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া ও ইজিপ্ট লইয়া গঠিত হয়। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতনের পর পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় ও বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য প্রাধান্য লাভ করে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজাণ্টিয়ামের পতন হয়। ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, বিশেষভাবে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাইজাণ্টাইন সভ্যতার যুগ। বাইজাণ্টাইন সম্রাটদের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলির আইনের জনক বলিয়া জাস্টিনিয়ান-এর (৫২৭—৫৬৫ খ্রী) নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বাইজাণ্টাইন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ছিল। বাইজাণ্টিয়াম গ্রীক ও রোমান খ্রীশ্চান ও পৌত্তলিকের মিলন তীর্থ ছিল ও বাইজাণ্টাইন সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে ইহার যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। বাইজাণ্টাইন শিল্পের চরম বিকাশ হয় ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শতাব্দীতে। ঈস্টার্ন বা গ্রীক চার্চ ছিল বাইজাণ্টাইন ধর্ম সংস্থা। ইহার প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও প্রাচ্যশিল্পের সমৃদ্ধি ও সমারোহ বাইজাণ্টাইন শিল্পের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। অসংযত ও অত্যধিক পরিচ্ছদের ও অলংকরণের জাঁকজমক ও গৌণ ও

তুচ্ছ অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপায়ণে বাইজাণ্টাইন ভাস্করগণ অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। কিন্তু বাইজাণ্টাইনগণ ভাস্কর্য অপেক্ষা উপল চিত্রণে (মোজেয়িক) বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

বাইজাণ্টাইন চিত্রকলা সুসমৃদ্ধ ছিল না। অলংকরণের প্রাচুর্যের দিকে চিত্রশিল্পিগণ অধিকতর মনোযোগী ছিলেন।

বাইজাণ্টাইনগণ স্থাপত্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই শিল্পে বাস্তুশিল্পীর অপূর্ব দক্ষতার সহিত অতুলনীয় অলংকরণের যোগ হয়। গ্রীক সমতল ছাদের পরিবর্তে বাইজাণ্টাইনগণ গম্বুজ ব্যবহার করেন। এই গম্বুজ তাঁহারা গোলাকার ও বহুভুজ অট্টালিকা ব্যতীত সমচতুর্ভুজের উপর স্থাপনে সক্ষম হন। গ্রীক স্তম্ভশীর্ষের ন্যায় তাঁহারা সপ্তপ্রকার স্তম্ভশীর্ষ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা। সম্রাট জাস্টিনিয়ানের রাজত্বকালে ইহা নির্মিত হয়। ইহার গম্বুজ ১৮৩ ফিট উচ্চ ও ১৮ টন স্বর্ণ ইহাতে ব্যবহৃত হয়। বাইজাণ্টাইন স্থাপত্য রোমানেস্‌ক্‌ স্থাপত্যের জনক।

বাইজাণ্টাইন শিল্প ও স্থাপত্যের প্রভাব দূর দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ইটালি, সিরিয়া, গ্রীস ও রাশিয়ায় ইহার প্রভাব দেখা যায়।

প্রস্তরের উপর কারুকার্যে, ধাতব ও হস্তিদন্তের শিল্পকার্যে, কাংস্যদ্রব্য নির্মাণে, কলাইয়ের কার্যে, রেশমীবস্ত্রের চিত্রণে ও ক্ষুদ্রাকার চিত্রণে বাইজাণ্টাইনগণ বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

বাইজাণ্টাইন সাহিত্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ফোটিয়াস্‌ (৮২০—৯৭), মাইকেল সেলাস (Michael Psellus) (১০১৮—৭৮ খৃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত পিসিদিয়ার জর্জ (৬১০—৪১ খৃ) কাব্যে ও প্রেকোপিয়াস্‌ (মৃত্যু ৫৬২ খৃ) সমসাময়িক ইতিহাস রচনা করিয়া খ্যাতিমান হন। বাইজাণ্টাইন সাহিত্য প্রাচীন গ্রীসের অত্যুত্তম রচনাগুলি রক্ষা করে ও ইহাকে শ্লাভ, কপ্‌টিক্‌, জর্জিয়ান্‌, আর্মেনিয়ান ও সিরিয়াক্‌ সাহিত্যের জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিম ইওরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে ও রেনেসাঁস প্রবর্তনে বাইজাণ্টাইন প্রভাব লক্ষণীয়।

দ্র Edward Gibbon, Decline and Fall of the Roman Empire, London, 1960; Joseph T. Shipley, Encyclopaedia of Literature vol. I, New York, 1946; Jeon Lassus, The Early Christian & Byzantine World, London, 1966.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বাইজী রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এই তিনটি রাজ্যেই 'বাই' শব্দ সম্ভ্রান্ত মহিলা অর্থে প্রচলিত আছে। পূর্বে সম্ভ্রান্ত মহিলারা নৃত্যগীতাদিতে সুশিক্ষিতা হইতেন। পরে ইহা ব্যবসায়ে পরিণত হইলে 'বাই' নর্তকী বুঝাইতে থাকে। 'জী' গৌরবার্থে উচ্চ শ্রেণীর নর্তকী বুঝায়। বাইজীরা সচরাচর মুসলমান, যদিও হিন্দু বাইজীও দেখা যায়। তরফাওয়ালী ইঁহাদের মুসলমানী নাম। মুজরা বা বাইজীদের নাচ গানের ব্যবস্থার আসরকে বলা হয় মহফিল, চলিত বাংলায় মাইফেল; নাচ-গানে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শকেরা টাকা বা নোট রুমালে বাঁধিয়া বাইজীদের দিকে ছুঁড়িয়া দিত, ইহাকে বলা হয় 'প্যালা' দেওয়া।

মুসলমান বাদশা ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইঁহাদের ব্যবসায়ের উদ্ভব ও প্রচলন হয়। ইঁহারা প্রসিদ্ধ ওস্তাদের নিকট তালিম বা শিক্ষা গ্রহণ করেন। অনেক পুরুষও বাইজীদের নিকট তালিম লইয়া ওস্তাদ হইয়াছেন; যদিও বড় ওস্তাদরা প্রকাশ্যে বাইজীদের সহিত এক আসরে গান করিতে চাহিতেন না।

বাইজীরা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ও গজল গাহিতেন এবং নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা গানের ভাব প্রকাশ করিতেন। ইহা হইল ভাও বাতানা।

উত্তর ভারতে বিশেষতঃ মুসলমানপ্রধান শহরে বাইজী প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কলিকাতায় বাইজীদের প্রথম আগমন কখন হয় তাহা ঠিক জানা যায় না। মনে হয় ১৭৭২ খৃীষ্টাব্দের পরে মুর্শিদাবাদ ও ক্রমে পশ্চিমের অন্যান্য শহর হইতে বাইজীরা কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৬ খৃীষ্টাব্দে অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের মেটিয়াবুরুজে আসার পর হইতে লখনৌ, ফয়জাবাদ ইত্যাদি স্থান হইতে বাইজীরা বহু সংখ্যায় কলিকাতায় আসেন; কারণ তিনি ইঁহাদের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মেছুয়াবাজার স্ট্রীট ও লোয়ার ও আপার চিৎপুর রোড কলিকাতায় বাইজীদের তীর্থস্থান হইয়া ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৩৫ বৎসরের মধ্যে এইসব বিখ্যাত বাইজীদের নাম পাওয়া যায়ঃ ১. নিকী বাইজী, ২. অসুরুণ, ৩. জীনৎ, ৪. ফৈয়াজ বক্‌স, ৫. বেগম জান, ৬. হিঙ্গুল, ৭. মীর্জা জান তাপস, ৮. নান্নীজান, ৯. সুপন নান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত এইসব বাইজী প্রসিদ্ধি লাভ করেনঃ ১. শ্রীজান, ২. হীরা বুলবুল (হিন্দু), ৩. মালকা জান, ৪. গহর জান।

১৮২৩ খৃীষ্টাব্দে মিস্‌ ফ্যানী পার্ক্‌স রাজা রামমোহন রায়ের বাগানবাড়িতে নিকী বাইজীর নাচ দেখিয়াছিলেন। নিকীকে তিনি তাঁহার *'Wanderings of a Pilgrim'* পুস্তকে 'Catalani of the East' বলিয়া অভিহিত করেন।

বাইবেল খৃীষ্টানদের শ্রুতিগ্রন্থ। বিশ্বসাহিত্যের সর্বাধিক বিক্রীত (বেস্টসেলার) পুস্তক। আর কোনও

পুস্তকের এতগুলি ভাষায় এতগুলি অনুবাদের এত অধিকসংখ্যক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। ইহাতে সংকলিত হইয়াছে খ্রীষ্টপূর্ব কালে (১৪০০ হইতে, প্রধানতঃ ৯০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে) রচিত 'পূর্ববিধান' এবং খ্রীষ্টোত্তর কালে (প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে) রচিত 'নববিধান' যাহার আয়তন পূর্ববিধানের এক-চতুর্থাংশ। সাধারণ অনুবাদের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২০০০, শব্দসংখ্যা ৭৫০০০০। বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাবলী অধ্যায়মালায় বিভক্ত (S. Langton ১২২৫ খ্রী); অধ্যায়ের পদবিভাগ (R. Estienne ১৫৫১, ১৫৫৫ খ্রী) সর্বত্র অর্থানুযায়ী হয় নাই; পদের শব্দসংখ্যা দুই হইতে পঞ্চাশাধিক হইতে পারে।

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস বাইবেলের সমস্ত অংশই ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণী; পূর্ববিধানের মহর্ষিরা এবং নববিধানের খ্রীষ্টশিষ্যেরা ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াই (যদিও তাহা অধিকাংশতঃ নিজেদের অজ্ঞাতসারে) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু যন্ত্রচালিত ছিলেন না; তাঁহাদের রচনা ছাত্রসুলভ শ্রুতলিপি নহে; তাঁহাদের জাতীয় সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত স্বভাব ও লেখার ভঙ্গি (মুদ্রাদোষ, অশুদ্ধ ব্যাকরণ) তাঁহাদের রচনায় পদে পদে প্রতিবিম্বিত। বাইবেল বিজ্ঞান কিংবা লৌকিক ইতিহাসের গ্রন্থ নয়; তখনকার কালের ও সেখানকার দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ধারণা পূর্ববিধানে বিদ্যমান (সূর্যের সৃষ্টি আলোর সৃষ্টির পরে—সেই সূর্য আবার গতিশীল!)। বাইবেলের যথার্থ ব্যাখ্যা রচয়িতাদের বিবিধ শৈলীর উপর একান্তভাবে নির্ভর করেঃ রূপক, লোকগীতি, উপদেশ, ভবিষ্যদ্বাণী, প্রতীকাত্মক সাহিত্য......।

বাইবেলের মূল বিষয়বস্তু হইল মানবজাতির—তথা 'মনোনীত' ইস্রায়েল জাতির—পরিত্রাণ-ইতিহাস ঃ (পাস্কালের কথানুসারে) পরিত্রাতা খ্রীষ্টই উভয় বিধানের কেন্দ্র, পূর্ববিধানের আশা, নববিধানের আদর্শ। আদিপুস্তকে বর্ণিত আদমের 'আদিপাপে'র পর হইতেই স্বয়ং ঈশ্বর ভাবী পরিত্রাতার প্রেরণের কথা তুলিয়াছেন, প্রবক্তা 'মীখা' তাঁহার জন্মস্থল বেথ্‌লেহেম এবং প্রবক্তা 'যিশাইয়' তাঁহার যাতনা-ভোগের পূর্বোল্লেখ করিয়াছেন। এদিকে পূর্ববিধান নববিধানে দুই শতাধিকবার উদ্ধৃত হইয়াছে; যীশু নিজেই বলেন, 'আমি শাস্ত্র ও ঋষিগণের আদেশ লোপ করিতে আসি নাই, সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।'

পূর্ববিধানে আছে হিব্রু ভাষায় লিখিত ৩৮টি গ্রন্থ (ইহুদীদের শ্রুতি), এবং গ্রীক ভাষায় লিখিত ৭টি গ্রন্থের এক সংযোজন।

১. পঞ্চপুস্তক (হিব্রুতে 'তোরা') ঃ আদিপুস্তক (পরিত্রাণের প্রাগিতিহাস, প্রথম ১২ অধ্যায়; এবং ইতিহাসের আরম্ভ ঃ আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, যোসেফ); যাত্রাপুস্তক (মোশীর কাছে 'ইয়াওয়ে' অর্থাৎ ঈশ্বরের আপন নামের উদ্ঘাটন; মিশর ও দাসত্ব হইতে ইস্রায়েলজাতির নিষ্ক্রমণ; সেনাই পর্বতে 'দশাজ্ঞা'র ঘোষণা); লেবীয় পুস্তক (যাজকত্বসম্বন্ধীয় এবং নীতিমূলক আদেশাবলী); গণনাপুস্তক (পুণ্যভূমির অভিমুখে যাত্রা; পুণ্যভূমির বিভাগ); দ্বিতীয় বিবরণ (ইহাতে আছে ইহুদীদের প্রসিদ্ধতম প্রার্থনা—শোন, ইস্রায়েল, আমাদের পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র ভগবান)।

২. ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী ঃ যিহোশূয় (যিনি মোশীর উত্তরাধিকারী, পুণ্যভূমি-অভিমুখী ইস্রায়েলের নেতা); বিচারকগণ (যিহোশূয়ের মৃত্যু পর্যন্ত); শমূয়েল (২) (ইস্রায়েলের শেষ বিচারকর্তার জন্ম হইতে ইস্রায়েলের প্রথম রাজা শৌলের মৃত্যু হইতে রাজা দাউদের বার্ধক্য পর্যন্ত); রাজাবলী (২) (দাউদের মৃত্যু ও তাঁহার পুত্র শলোমনের রাজত্ব; রাজ্যবিভাজনঃ ইস্রায়েল ও যুদা; যেরুসালেমের পতন—৫৯৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ও বাবিলোনে নির্বাসন পর্যন্ত); বংশাবলী (২) (যুদারাজ্যের ২১টি রাজা, বিশেষতঃ দাউদ, শলোমন, এজেখিয়াস ও যোসিয়াস); ইস্রা এবং নহিমিয় (নির্বাসন হইতে পুনরাগমন—৫৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ; বংশাবলীর অনুক্রম)।

৩. প্রবক্তাদের রচনাসমূহ ঃ যিশাইয় গীতসংহিতা ব্যতিরেকে বাইবেলের দীর্ঘতম গ্রন্থ; ৩টি সংকলন ঃ (১—৩৯, ৪০—৫৫, ৫৬—৬৬); যিরমিয় (যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী ইস্রায়েলীয়েরা মর্মান্তিকভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিল); যিহিষ্কেল (যিরমিয়ের সমসাময়িক, বাবিলোনে নির্বাসিত ইস্রায়েলীয়দের কাছে দৈববাণী প্রচার করেন); দানিয়েল (বাবিলোনের রাজা নবুখদ্‌নিৎসরের রাজসভায় দানিয়েল: গল্পাংশ ১—৬, ভবিষ্যদ্বাণী ৭—১২, কোনও কোনও জায়গায় আরামায়িক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে); এবং আরও দ্বাদশ প্রবক্তা যাঁহাদের রচনা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রঃ হোশেয় (প্রেমের ঈশ্বর); যোয়েল (পতঙ্গ-আক্রমণ, ঈশ্বরের দিবস); আমোষ (ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর), ওবদিয় (পূর্ববিধানের ক্ষুদ্রতম গ্রন্থ); যোনা (তিমি মৎস্যের গর্ভে); মীখা, নহূম (নিনিভের বিরুদ্ধে অভিশাপ); হবক্‌কুক (ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এত উৎপীড়িত কেন?); সফনিয় (ইহাতে ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের প্রথম উল্লেখ আছে); হগয়, সখরিয় (এই দুইজন নির্বাসন হইতে প্রত্যাগত ইস্রায়েলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রবক্তা); মালাখি (গ্রন্থটি আসলে অনামী, মালাখির অর্থ 'আমার দূত')।

৪. কাব্যত্রয়ঃ ইয়োব (বিশ্বসাহিত্যে বিখ্যাত); গীতসংহিতা (এই ১৫০টি 'দাউদের গীত' ইহুদীদের তথা খ্রীষ্টানদের বিশেষ প্রার্থনাপুস্তক; নববিধানে ৭০ বার উদ্ধৃত; অনুবাদ— মহেন্দ্র চক্রবর্তী, সামগীত ১৯৫১ খ্রী); হিতোপদেশ (সংযম, সততা, ভিক্ষাদান......)।

৫. পাততাড়ি-পঞ্চক (ইহুদীদের বিভিন্ন পর্বে পাঠ্য);

পরমগীত (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : 'কবি ও কবিতা' ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৪১—২৫৫) ; রূৎ (ইঁনি বিদেশিনী হইলেও খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষ দাউদের প্রপিতামহী) ; বিলাপ (জাতীয় শোক) ; উপদেশক (ওরফে কোহেলেথ্) ; ইস্টের (বরং উহার প্রথম ৯টি অধ্যায়, অবশিষ্ট ৭টি অধ্যায় শুধু 'গ্রীক সঞ্চয়ে' প্রাপ্য)।

৬. গ্রীক সঞ্চয় (কাথলিক খ্রীষ্টমণ্ডলীতে গৃহীত ; প্রোটেস্টান্ট মহলে 'আপোক্রিফা' নামে আখ্যাত এবং অস্বীকৃত) ; তবিৎ (নীতিমূলক গল্প) ; যুদিথ্ (পৌত্তলিক সেনাপতি হোলোফার্নেসের হন্ত্রী) ; প্রজ্ঞা (উপদেশমূলক ১—৯, ঐতিহাসিক ১০—১৯) ; সিরাখ্ (ভক্তি ও নীতির প্রচার) ; বারুক্ (যিরমিয়ের সহচর) ; মাকাবীজ (২) (অত্যাচারী সিরিয় নৃপতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব শতকে মাকাবীয় তিন ভাইয়ের বিপ্লব)।

নববিধানে আছে প্রথম খ্রীষ্টাব্দের চলিত গ্রীকে রচিত ২৭টি গ্রন্থ। তাহার প্রসিদ্ধ সংস্করণ : ইরাসমাস, বাস্‌ল (Earsmus, Basle ১৫১৬ খ্রী); টিসেন্‌ডর্‌ফ, লাইপ্‌ৎজিগ (Tischendorf, Leipzig ১৮৭২ খ্রী) ; ওয়েস্টকট-হর্ট (Westcott-Hort, London, ১৮৮৮ খ্রী); প্রচলিত সংস্করণ নেস্‌ল, ভোগেল্‌স (Nestle, Vogels)।

১. ঐতিহাসিক ৫টি রচনা : মথি, মার্ক, লুক ও যোহনরচিত মঙ্গল-সমাচার-চতুষ্টয় ; এইগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যীশুর জন্ম ও নিভৃত জীবন, প্রকাশ্য জীবনের আশ্চর্য কার্যাবলী (লাজারুসের পুনরুত্থান......) ও ঐশ শক্তিপ্রকাশ (পাপের ক্ষমা......), উপদেশমালা (পর্বতের উপর প্রচারিত অষ্টকল্যাণ, 'প্রভুর প্রার্থনা'......), খ্রীষ্টমণ্ডলী-স্থাপন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান। মথি ও যোহন যীশুর 'প্রেরিত দূত' ; মার্ক পিতরের শিষ্য, লুক পৌলের শিষ্য। প্রথম ৩টি মঙ্গল-সমাচার 'সিনপ্‌টিক' (Synoptic) নামে আখ্যাত : ঐগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। মথি : ইহুদীদের জন্য রচিত, কালানুক্রমিক নয়, উপদেশমূলক ; মার্ক : প্রাচীনতম, ক্ষুদ্রতম ; সাহিত্যিক নয়, বর্ণনাত্মক ; লুক : গ্রীকদের জন্য রচিত ; খ্রীষ্টদয়ার গস্পেল ; যোহন : আধ্যাত্মিক গস্পেল, পরে রচিত। লুক-রচিত শিষ্যচরিত : প্রধানতঃ পৌলের কার্যাবলী ; দ্বিতীয়ার্ধে রচয়িতা চাক্ষুষ সাক্ষী।

২. পত্রাবলী : পৌলের পত্র : বিভিন্ন স্থানীয় 'মণ্ডলী'র কাছে লিখিত (রোমীয়দের প্রতি, করিন্থীয়দের প্রতি (২), গালাতীয়দের প্রতি, এফেসীয়দের প্রতি, ফিলিপীয়দের প্রতি, কলসীয়দের প্রতি, থেসালোনিকীয়দের প্রতি (২) ; ব্যক্তিবিশেষের কাছে লিখিত : (তিমথির প্রতি (২) তীতের প্রতি, ফিলেমোনের প্রতি) এবং 'বিশ্বজনীন পত্রসঞ্চয়, অর্থাৎ যাকোবের, (যীশুর প্রেরিত দূত) পিতরের (২), (মঙ্গলসমাচার-রচয়িতা) যোহনের (৩) ও যুদার পত্র ; ইহা ব্যতীত 'হিব্রুদের উদ্দেশ্যে' রচিত এক ধর্মালোচনা।

৩. প্রতীকাত্মক এক আগমগ্রন্থ : (মঙ্গলসমাচার-রচয়িতা) যোহনের প্রতি প্রত্যাদেশ।

হস্তলিপি : সম্পূর্ণ হিব্রু পূর্ববিধানের প্রাচীনতম হস্তলেখ খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে লিখিত। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মরুসাগরের নিকটবর্তী এক গুহায় আবিষ্কৃত হইয়াছে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় কিংবা ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত কিছু কিছু আংশিক হস্তলেখ (ইহাতে আছে যিশাইয়ের ২টি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি)।

নববিধানের প্রধান প্রধান হস্তলেখ : ভাটিকানাস (Vaticanus, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী), রোম ; সিনাইটিকাস (Sinaiticus, খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) এবং আলেক্‌সান্দ্রিনাস (Alexandrinus, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী), ব্রিটিশ ম্যুজিয়াম ; কোডেক্‌স এফ্রায়েমি (Codex Ephraemi, খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী), ল্যুভ্‌র ম্যুজিয়াম। প্রাচীনতম হস্তলেখ হইল মিশরে পুনরুদ্ধৃত আনুমানিক ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত এক প্যাপিরাস (Papyrus, যোহনরচিত মঙ্গলসমাচারের ১৮শ অধ্যায়ের এক অংশ)।

অনুবাদ : দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে রচিত সেপ্‌টুয়াজিন্ট (Septuagint) নামক পূর্ববিধানের গ্রীক অনুবাদ (প্রামাণিক সংস্করণ : শোয়েট, কেমব্রিজ (Swete, Cambridge, ১৮৮৭ খ্রী) ; রাল্‌ফ্‌স, গোটিঙ্গেন (Rahlfs, Göttingen, ১৯৩৫ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ। নববিধানে পূর্ববিধানের প্রায় সমস্ত উদ্ধৃতি (শুধু মথি মধ্যে মধ্যে মূল হিব্রু হইতে অনুবাদ করেন) ঐ সেপ্‌টুয়াজিন্ট হইতে গৃহীত (যদিও আক্ষরিক উদ্ধৃতি—হিব্রুদের উদ্দেশ্যে রচিত উপরি-উক্ত ধর্মালোচনার বাহিরে বিরল)।

সেন্ট জেরোম-রচিত ভালগেটা (Valgata) নামে আখ্যাত সম্পূর্ণ বাইবেলের লাতিন অনুবাদ (৩৯১-৪০৫ খ্রী)—বিশ্বসাহিত্যের সর্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক, গুটেনবার্গ, মেইন্‌জ (Gutenberg, Mainz, ১৪৫০ খ্রী)—কাথলিক খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বহু প্রচলিত (১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেন্ট (Trent)-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বজনীন ধর্মসভায় 'প্রামাণিক' বলিয়া স্বীকৃত)।

প্রথম ইংরেজী অনুবাদ : টিণ্ডেল (Tyndale)-এর নববিধান (কোলোন, ১৫২৫ খ্রী) এবং কভারডেল (Coverdale)-এর সম্পূর্ণ বাইবেল (জুরিখ, ১৫৩৫ খ্রী)। প্রচলিত অনুবাদ : Douai নামক কাথলিক সংস্করণ (নববিধান ১৫৮২ খ্রী; পূর্ববিধান ১৬১০ খ্রী); কিং জেম্‌স 'অনুমোদিত' সংস্করণ ১৬০৪ খ্রী; সংশোধিত সংস্করণ ১৮৮১-১৮৮৫ খ্রী; 'সংশোধিত স্ট্যাণ্ডার্ড' সংস্করণ ১৯৪৬-১৯৫৭ খ্রী ; 'নিউ ইংলিশ' বাইবেল ১৯৬১-১৯৭০ খ্রী; 'জেরুসালেম' বাইবেল ১৯৬৬ খ্রী; 'টুডে ইংলিশ' সংস্করণ (নববিধান ১৯৬১ খ্রী)। ইহা ছাড়া সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছেন

জে. মোফাট (J. Moffat, ১৯২৪ খ্রী) এবং আর. নক্‌স্‌ (R. Knox, ১৯৫০ খ্রী)।

ছাব্বিশটি ভারতীয় ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল অনূদিত হইয়াছে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে (লুসাই ও গুরুমুখী ভাষায়) বাইবেলের সর্বশেষ অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় ভাষায় প্রখ্যাত অনুবাদকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন বার্‌থেলেমিউ জীগেন্‌বাল্‌জ্‌ (Barthelemew Ziegenbalg) (ইঁহার অনূদিত নববিধান প্রকাশিত হয় ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে), হেন্‌রি মার্টিন (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার উর্দু নববিধান প্রকাশিত হয়) এবং উইলিয়াম কেরি (ইনি বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া, সংস্কৃত, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় সম্পূর্ণ বাইবেল সম্পাদনা করিয়াছিলেন এবং ইহা ব্যতীত আরও ২৫টি ভাষায় তিনি সম্পূর্ণ নববিধান সম্পাদনা করিয়াছিলেন)। শ্রীরামপুর প্রেস হইতে চীনা, মালয়ালম, তামিল, মালয়, বর্মী, বাট্টা (সুমাত্রার ভাষা), সিংহলী, জাভা দেশীয় ভাষা, উর্দু ও পার্সি ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাংলা ভাষায় অনূদিত ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম বাইবেলের গ্রন্থ হইল উইলিয়াম কেরির 'মঙ্গলসমাচার মতীয়ের রচিত' (সেন্ট ম্যাথুর গস্পেল)। তাঁহার অনূদিত সম্পূর্ণ নববিধান প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বাইবেল প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্বে শুধুমাত্র তামিল ভাষার বাইবেল (১৭২৬ খ্রী) প্রকাশিত হইয়াছিল। সমগ্র বাইবেলের তিনবার সংশোধিত মুদ্রণ হয়। ডবলিউ. ইয়েট্‌স-এর সম্পাদনায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, জে. ওয়েঙ্গার (J. Wenger)-এর সম্পাদনায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. জি. রাউস (B. G. Rouse)-এর সম্পাদনায় ইহা প্রকাশিত হয়। নববিধান এইচ. অ্যাংগাস (H. Angus)-কর্তৃক আরও একবার সংশোধিত হয় (১৯৬৫ খ্রী)। জন. এলার্টন (John Ellerton) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং ক্রিস্টিয়ান বমওয়েট্‌স (Christian Bomwetsch) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নববিধানের দুইটি স্বতন্ত্র অনুবাদ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বিভিন্ন মহলে নূতন নূতন অনুবাদের পরিকল্পনাও দেখা দিয়াছে।

দ্র J. Hooper and W. Culshaw, Bible Translation in India, Pakistan and Ceylon, 1963; J. L. Mckenzie, Dictionary of the Bible, London, 1965; The Jerome Biblical Commentary, London, 1968.

পল দ্যতিয়েন

বাউল বাংলার পল্লীগীতিবিশেষ ও একটি ধর্মসম্প্রদায়। বাউলগান এই সম্প্রদায়েরই গান। তাহাদের যাবতীয় সাধনপদ্ধতি রূপকের ভাষায় বাউলগানে বর্ণিত। একতারা, খঞ্জনি, ডুগি, খমক ইত্যাদি যন্ত্রের সঙ্গে এই গান গাওয়া হয়। গানের সঙ্গে নৃত্য থাকে, সুতরাং গায়কের পায়ে ঘুঙুর বাজে। বাউলগান তালবদ্ধ এবং ছন্দঃপ্রধান হইতে বাধ্য। বাউল গানের কথায় একটা সাধারণ অর্থ এবং আর একটা গভীর অর্থ থাকে। গভীর অর্থটির সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের গোপনীয় সাধনপদ্ধতির যোগাযোগ আছে বলিয়া উহা সাধারণের বোধগম্য নহে। বাউলগানে রচয়িতার স্বনামপ্রসিদ্ধ নানা সুরের নক্‌শা আছে ; যথা 'কিকিরচাঁদি'। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অনেক বাউলের রচনায় বাউল গান পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

বাউল সম্প্রদায় বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী ফকির রূপে বাউলদের দেখা যায়। মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ বাউল শব্দটি পাওয়া যায়।

ধর্মবিশ্বাস ও সাধনরীতিঃ বাউলদের ধর্মবিশ্বাস এবং সাধনরীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। বাউলেরা উল্টা সাধনের পক্ষপাতী। তাহারা বেদবিধি, কোরানপুরাণ নির্দিষ্ট ধর্মসাধনের বিরোধী। স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ম ভাষায় মোল্লা-পুরোহিত, মন্দির মসজিদ, পূজা নামাজকে তাহারা নিন্দা করিয়াছে। প্রচলিত ভোগ ও বাসনাবদ্ধ জীবন তাহাদের নয়। তাহা ছাড়া যোগসাধনার ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণ করিয়া উল্টা পথে প্রেরণ তাহাদের অবশ্য আচরণীয়।

বাউল সাধকদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল গান। স্বরচিত বা গুরু-পরম্পরায় প্রাপ্ত বা গোষ্ঠীর গীতভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত গান তাহারা গাহিয়া থাকে। এই গান তাহাদের সাধনার অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়।

অন্যান্য গুহ্যসাধন পদ্ধতির ন্যায় বাউল গোষ্ঠীতেও গুরু বা মুর্শিদের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। গুরুর নির্দেশ শিষ্য প্রত্যক্ষভাবে লাভ করে। গুরুর সাহায্য ছাড়া প্রকৃত সাধন ব্যাপারটি বুঝা সম্ভব নয়। গুরুকেই অনেক সময়ে বাউলেরা ভগবানের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

বাউলদের সাধ্যবস্তু হইল 'মনের মানুষ'। মনের মানুষ অনন্ত, পরম সত্য, আবার ব্যক্তিগত প্রেমের আধার। অসীমকে সীমার মধ্যে অনুভব করিবার প্রয়াস এবং সীমাবদ্ধ জীবনে অসীমের ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শলাভের ফলে বিস্ময় —বাউলদের গানে এই ভাবটি বারবার প্রকাশ পাইয়াছে। বাউলদের মনের মানুষ আছেন দেহসীমার মধ্যে। তাঁহার সহিত সমন্বিত হইতে হইবে প্রেমের দ্বারা। এই কারণে প্রেমব্যাকুলতায় বাউলেরা উন্মত্ত। নিজেদের 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দিতে তাহারা আগ্রহী।

অন্যান্য তান্ত্রিক সহজিয়া সাধকগোষ্ঠীর ন্যায় বাউলেরাও 'ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড' তত্ত্বে বিশ্বাস করে। মানুষের দেহভাণ্ডই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। মনের মানুষ এই দেহের খাঁচায়ই বাস করেন। বাহিরে তাঁহার সন্ধান না করিয়া দেহের অভ্যন্তরেই খুঁজিতে হইবে। বাউলেরা তাই দেহ-কেন্দ্রিক কায়া সাধনাকে দেহ-অভ্যন্তরস্থ সত্য স্বরূপকে পাইবার একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করে। মানবদেহ তাহাদের নিকট মন্দির-মসজিদ অপেক্ষা উচ্চতর উপাসনা-গৃহ বলিয়া বিবেচিত হয়।

বাউল সাধনা মিথুনাত্মক। ইহা নরনারীর চঞ্চল ক্ষণ-স্থায়ী কামক্রীড়া মাত্র নয়। বাউলদের মিলন প্রেমলীলা, উহা 'অটল, অচঞ্চল, স্থির'। উহার ফলশ্রুতি মিথুনানন্দ। কিন্তু কামক্রীড়াকে ত্যাগ করিয়া ঐ প্রেমলীলায় পোঁছানো যায় না। কারণ কাম ও প্রেম মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

ইতিহাসঃ গত হাজার বৎসরের বাংলাদেশের ধর্মসাধনার যে পরিচয় নানা সূত্রে জানা গিয়াছে তাহাদের সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিলে বাউলদের উদ্ভব ও বিকাশের একটি সম্ভাব্য সূত্র অনুমান করা যায়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। ইহার অন্যতম শাখা সহজযান। সহজযানের একটি শাখা মিথুনাত্মক যোগসাধনা। চর্যাকরেরা এই সাধন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। বৈষ্ণব সহজিয়াদের উদ্ভবের পিছনে ইঁহাদের প্রভাব অনুমিত হয়। ('সহজিয়া' দ্র)।

দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে সুফীদের যোগাযোগ হইতে থাকে। মিথুনাত্মক সাধন ধারাটির সহিত হৃদয়াবেগমূলক ব্যাকুলতার সংযোগ ঘটে সুফীদের আদর্শে। চৈতন্যপ্রভাবে বাংলাদেশ জুড়িয়া প্রেমধর্মের যে জোয়ার আসে, তাহা সহজিয়া এবং ফকির সাধকদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ইহাদের সাধনপদ্ধতির সহিত প্রেমতত্ত্ব, পরকীয়াবাদ, 'কৃষ্ণসাক্ষাৎ শৃঙ্গার' প্রভৃতি বৈষ্ণব ধারণার সাদৃশ্য ছিল। অনেক গবেষকের ধারণা, ইহারাই সপ্তদশ শতাব্দীতে বাউল নামক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিচিতি লাভ করে।

বাউলগানঃ বাউল সাধনার সঙ্গে গানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাউলদের অনেক গান সংকলিত হইয়াছে। এই সূত্রে এই সাধক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের একটি সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাপ্ত বাউল গানগুলির রচয়িতাদের মধ্যে প্রথমেই লালন শাহ ফকিরের নাম করিতে হয়। সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে তাঁহার গান-গুলি রচিত। পূর্ববর্তী কোনও বাউলগানের নিদর্শন সংকলিত হয় নাই। অন্যান্য বাউল কবিদের মধ্যে পদ্ম-লোচন গোঁসাই, যাদুবিন্দু, ফকির পাঞ্জুশাহ, হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল, এরফান্-শাহ্, পাগলা কানাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনেকেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে গানগুলি লিখিয়াছেন, কিন্তু বাংলাসাহিত্যের অষ্টাদশ শতকের প্রাচীনতর কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গেই বাউল গানের সম্বন্ধ। 'সাধন সংগীত' নামে এই অনাধুনিক কাব্য-সংগীতের ধারাটিকে চিহ্নিত করা চলে। রচয়িতারা আপনাদের সাধনভজনের নানা গূঢ়তত্ত্ব বিবিধ রূপকের সাহায্যে ইহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। কখনও কখনও বাউলগানে ব্যক্তিগত ভক্তি-প্রেমের ভাবব্যাকুলতা বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশিত হইয়া উহাদের সাহিত্য-মূল্য বাড়াইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউল গানের একটি উল্লেখ্য সম্বন্ধ আছে। আধুনিককালে তিনিই প্রথম বাউল গান সংগ্রহ করেন। বাউল ধর্মোপলব্ধি (গুহ্য-সাধনার দিকটি নহে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিক) রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের উপরে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বলিয়া অনেক গবেষক মনে করেন।

দ্র ক্ষিতিমোহন সেন, বাউল পরিচয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৬২, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল ও বাউল গান, কলিকাতা, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ; মযহারুল ইস্‌লাম, কবি পাগলা কানাই, রাজশাহী, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; আশুতোষ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ। Sashibhusan Dasgupta, *Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature*, Calcutta, 1948.

ক্ষেত্র গুপ্ত

বাংলাভাষা ভাষা লইয়া জাতি। জাতি লইয়া দেশ। বাংলা-ভাষা লইয়া বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। সমগ্র বাংলাদেশ (পশ্চিমবঙ্গ ও নবগঠিত বাংলাদেশ [পূর্বতন পূর্বপাকিস্তান]) জুড়িয়া বাংলা ভাষা বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ৩৩,৯২৭ বর্গমাইল এলাকার লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলিয়া বাংলা প্রায় ১১ কোটি লোকের মাতৃভাষা। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। ভারতের প্রায় সর্বত্র বাংলা ভাষা কম বেশি প্রচলিত। Culture language বা মানসিক উৎকর্ষের ও উচ্চ চিন্তার ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা ভারতের বাহিরেও সমাদৃত। ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী ও রুষ-দেশে রীতিমত বাংলা ভাষার চর্চা চলিয়াছে। এই সব দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন-গবেষণা চলে। এদেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে বাংলারই আদর বেশি। বিহারী, গুজরাতী, মরাঠী, হিন্দুস্থানী, রাজস্থানী, তেলুগু, তামিল, কানাড়ী ভাষাভাষী বহু শিক্ষিত ভদ্র-লোক বাংলা ভাষা শেখেন ও চর্চা করেন। বাংলাদেশে বাংলা রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষা আর্য-ভাষা-গোষ্ঠীভুক্ত। আর্য ভাষার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় ঋগ্‌বেদের ভাষায়। তাই বাংলা ইত্যাদি আধুনিক আর্যভাষাগুলির জড় গিয়া পৌঁছিয়াছে ঋগ্‌বেদের ভাষায়। বাংলা ভাষার উৎপত্তি-সূত্রটি এইরূপঃ—

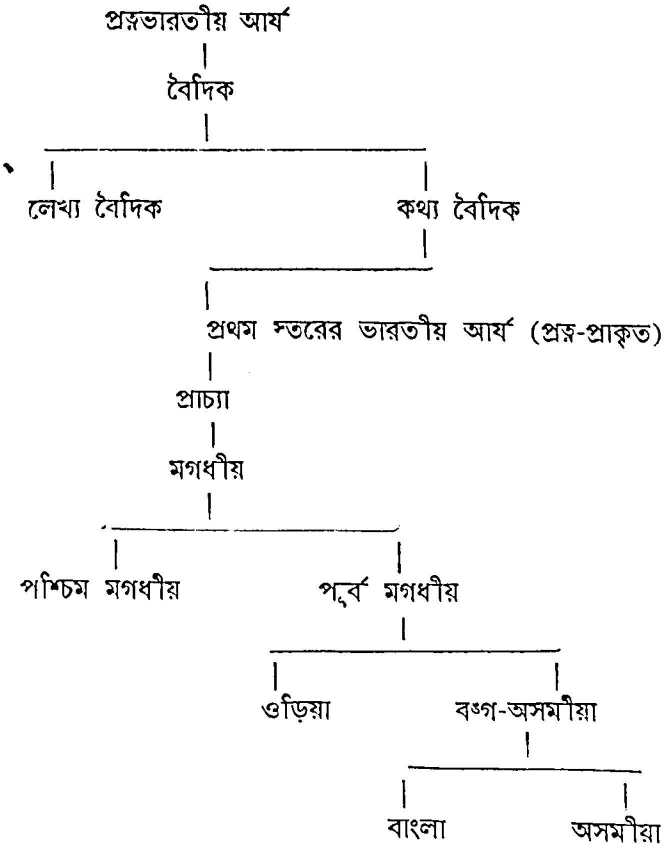

বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল অনুমান করা হয় খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী। এই ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পাওয়া যায়—আদি, মধ্য ও নব্য বা আধুনিক। আদি স্তরের বাংলাকে প্রাচীন বাংলা বলা হয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটি স্তরের সাধারণ নাম মধ্য বাংলা ও আধুনিক বাংলা।

বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল আনুমানিক ৯৫০ হইতে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীন বাংলার প্রধান নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুঁথিতে সংকলিত গীতগুলি।

মধ্য বাংলার দুইটি উপস্তর দেখা যায়—আদি-মধ্য ও অন্ত্য-মধ্য। আদি-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। চতুর্দশ শতাব্দীতে লেখা এমন কোনও বাংলা ভাষার নমুনা পাওয়া যায় নাই। তবে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি খুব পুরাতন না হইলেও ইহাতে আদি-মধ্য বাংলা ভাষার পরিচয় অনেকখানি পাওয়া যায়। অন্ত্য-মধ্য বাংলার স্থিতিকাল ১৬০১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই কালসীমা আনুমানিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে আধুনিক বাংলার আরম্ভ।

বাংলার প্রধান উপভাষা পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়। যথা—

রাঢ়ী (মধ্যপশ্চিম বঙ্গে)
ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণপশ্চিম বঙ্গে)
বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গে)
বঙালী (পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গে)
কামরূপী (উত্তরপূর্ব বঙ্গে)।।

বাংলা ভাষার যে কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ এই ভাষাকে অন্যান্য নব্যভারতীয় আর্যভাষা হইতে পৃথক করিয়াছে, তাহা হইতেছে ঃ '— ইল', '— ইব' যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ; '— ইয়া', '— ইলে', '— ইতে' যোগে অসমাপিকার সৃষ্টি; '— এর' দিয়া সম্বন্ধ পদের; '— রে', '— কে', '— ক' দিয়া গৌণকর্ম সম্প্রদানের; '— তে', '— ত' দিয়া অধিকরণের; '— রা' দিয়া কর্তৃকারকের বহুবচনের পদের সৃষ্টি। তাহা ছাড়া বিশিষ্ট শব্দের—যেমন, 'দিয়া, করিয়া, থাকিয়া, হইতে, মাঝে, সঙ্গে, পরে, কাছে, পাশে, ঠাঁই'—অনুসর্গরূপে ব্যবহার। ইহা ব্যতীত নানাবিধ শিষ্ট প্রয়োগ বা ইডিয়ম।

বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি ব্রাহ্মী লিপি হইতে। সপ্তম শতকে ব্রাহ্মী লিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে—'শারদা', 'নাগর' ও 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মী লিপির 'কুটিল' রূপভেদ হইতে বাংলা অক্ষরের জন্ম। বাংলা ভাষা জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে।

উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যে বাংলা ভাষার ধ্বনি দুই প্রকারের—এক. স্বরধ্বনি; দুই. ব্যঞ্জনধ্বনি। সংস্কৃতের স্বরধ্বনি অল্প-বিস্তর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বাংলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উচ্চারণের দিক দিয়া বাংলার 'অ' সংস্কৃতের 'অ' হইতে পৃথক। সংস্কৃতে 'আ' দীর্ঘধ্বনি, বাংলার 'আ' হ্রস্ব। বাংলায় 'ই' 'ঈ', 'উ' 'ঊ', ধ্বনি আছে। তবে বানানে সেগুলির যথাযথ উচ্চারণ-মূল্য রক্ষিত হয় না। 'এ', 'ও', 'ঐ', 'ঔ' ধ্বনিগুলিও বাংলায় সংস্কৃতের মত উচ্চারিত হয় না। বাংলায় একটি নূতন স্বরধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে—'অ্যা' (æ)।

ব্যঞ্জনধ্বনির বিচার প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বরমধ্যস্থিত একক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি প্রাকৃত যুগের মধ্যস্তর হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সংযুক্ত ব্যঞ্জন সমীভূত হইয়া প্রাচীন বাংলাতেই একক ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল। ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে নানা তারতম্য ঘটিয়াছে। 'শ, ষ, স'—এই তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ এখন বাংলায় এক—ইংরেজির Sh-এর মত। অন্তঃস্থ ব-এর বিশেষ বর্ণ বাংলা বর্ণ-মালায় না থাকিলেও ধ্বনিটি বাংলা ভাষায় আছে। এই

ধ্বনিটি 'ওর'-রূপে লিখিত হয়। বাংলায় 'জ' ও 'য'-এর উচ্চারণ এখন অভিন্ন। চ, ছ, জ, ঝ-এর উচ্চারণ বাংলা দেশে সর্বত্র এক নয়—পূর্ব-উত্তর বঙ্গে এগুলির উচ্চারণ একেবারে পৃথক। 'ণ'-এর ধ্বনি বাংলায় এখন লুপ্ত, ইহার উচ্চারণ হয় 'ন'-এর মত। নাসিক্য ধ্বনিগুলিরও নানা উচ্চারণ পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়াছে।

সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে নাম পদে তিন লিঙ্গ ছিল—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। বাংলায় ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার হ্রাস পাইল। নূতন স্ত্রীলিঙ্গ গঠিত হইল। পদান্তের '— ইঅ (I)' ই-কার বা ঈ-কারে পরিণত হইয়া নূতন স্ত্রীলিঙ্গের পদ সৃষ্টি করিল। প্রাচীন বাংলা পর্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রী-প্রত্যয় চলিত। মধ্য বাংলা পর্যন্ত এই বৈশিষ্ট্যটি চলিয়াছিল। আধুনিক বাংলায় নাই। বাংলায় স্ত্রী-প্রত্যয় দুইটি—'ঈ (-ই)' ও '(-ই) নী'। প্রথমটি জাতিবাচক, দ্বিতীয়টি কার্যবাচক।

বাংলায় বিশেষণে কারক-বিভক্তি যোগ হয় না। ক্রিয়া-বিশেষণ পদে সাধারণত তৃতীয়া-সপ্তমীর '— এঁ', '— এ' বিভক্তি দেখা যায়। কয়েকটি সংস্কৃত অব্যয়েরও ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে প্রয়োগ আছে। বাংলায় বচন দুইটি—এক-বচন ও বহুবচন। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় শব্দরূপে এক-বচন ও বহুবচনের ভেদ নাই। বাংলায় — রা, — গুলা, — গুলি, — সব, — গণ, — দিগ ইত্যাদি বিশিষ্ট বহুত্ববাচক শব্দযোগে বহুবচন গঠিত হয়।

বিভক্তি ধরিয়া বিচার করিলে প্রাচীন বাংলায় কারক ছয়টি—কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ ও সম্বন্ধ। আধুনিক বাংলায় চারিটি—কর্তা, কর্ম, করণ-অধিকরণ ও সম্বন্ধ। বাংলা ভাষায় কর্তা ও কর্ম কারকের বিশিষ্ট বিভক্তি নাই। করণকারকের বিশিষ্ট বিভক্তি '— এঁ', '— এ'। অধিকরণ ও করণের বিভক্তি অনেক সময় এক। 'র' যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। তবে ষষ্ঠী বিভক্তিতে তৃতীয়া-সপ্তমীর — 'এ' যোগ করিয়া গৌণকর্মের 'রে' বিভক্তির উৎপত্তি। অধিকরণের বিশিষ্ট বিভক্তি — ত, — এঁ, — তেঁ। বাংলায় বিশিষ্ট পঞ্চমী বিভক্তি নাই।

বাংলা অনুসর্গগুলি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—নাম অনুসর্গ (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ) ও অসমাপিকা অনুসর্গ। নাম অনুসর্গগুলি তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী এই তিন দফায় ভাগ করা যায়। উপসর্গের ব্যবহার বাংলায় খুব কম।

বাংলায় সর্বনামপদ প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত—পুরুষবাচক সর্বনাম ও নির্দেশক সর্বনাম। পুরুষবাচক সর্বনাম দুইটি—উত্তমপুরুষ ও মধ্যমপুরুষ। নির্দেশক সর্বনাম পাঁচটি।

বাংলা ভাষার ধাতু অধিকাংশ সংস্কৃত হইতে আসিয়াছে। অল্প সংখ্যক ধাতুর উদ্ভব হইয়াছিল প্রাকৃত-সংস্কৃত বা দেশী শব্দ হইতে। উৎপত্তির দিক দিয়া বাংলা ক্রিয়াপদের কাল দুইভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও কৃদন্ত। মৌলিক কাল দুইটি—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। কৃদন্তকাল তিনটি—অতীত, ভবিষ্যৎ (— ইব অন্ত) ও নিত্যবৃত্ত। প্রাচীন বাংলায় যৌগিক ক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্তু যৌগিক কালের উদাহরণ মেলে নাই। মধ্য বাংলায় কিছু কিছু যৌগিক কাল পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক বাংলায় যৌগিক কাল যথেষ্ট মিলিয়াছে। এটি আধুনিক বাংলা ভাষার একটি বড় বিশেষত্ব।

বাংলায় বাচ্য তিনটি- কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য ও ভাববাচ্য। প্রাকৃতের '—ইয়' চিহ্নিত কর্মভাববাচ্য অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলার মধ্য দিয়া মধ্য বাংলায় পৌঁছিয়াছিল। আধুনিক বাংলায় ণিজন্ত ক্রিয়াপদ কখনও কখনও ভাববাচ্যে বা কর্ম-কর্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয়। কর্মভাববাচ্যের অনুজ্ঞার পদ মধ্য বাংলা অবধি মিলিয়াছে। আধুনিক বাংলায় নাই।

বাংলায় নামধাতু প্রায়ই ণিজন্তের মত —'আ' প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হয়। সাধুভাষার তুলনায় কথ্য উপভাষাগুলিতে নামধাতুর প্রচলন বেশি—বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে।

বাংলা ভাষায় যৌগিক ক্রিয়াপদের পূর্বাপর প্রচলন আছে। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় 'বাস' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়ার বিশিষ্ট ব্যবহার ছিল। অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রচলনও বাংলায় বেশ। প্রত্যয় হিসাবে বাংলা অসমাপিকা তিনটিঃ ক. — 'ই' ও — 'ইয়া' যুক্ত ল্যবর্থ অসমাপিকা, খ. -'ইলে' যুক্ত ভূতার্থ অসমাপিকা এবং গ. —'ইতে' যুক্ত তুমর্থ অসমাপিকা।

বাংলা বাক্যগঠনের দুইটি দিক—একটি উদ্দেশ্য, অপরটি বিধেয়। বাংলা বাক্যে সাধারণতঃ উদ্দেশ্য প্রথমে বসে, পরে বিধেয়। বাংলা ভাষায় দুই প্রকারের উক্তি (narration) ধরা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। পরোক্ষ উক্তি একটু ব্যাখ্যান-মূলক এবং কিছুটা কৃত্রিম। বাংলা ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার বেশী ; পরোক্ষ উক্তি সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। বাংলা বাক্য সাধারণতঃ তিন রকমের—সরল, জটিল ও যৌগিক।

বাংলা শব্দ প্রধানতঃ দুই জাতির—মৌলিক ও আগন্তুক। মৌলিক শব্দ ভারতীয় আর্য ভাষা হইতে আগত বা গৃহীত। আগন্তুক শব্দ অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ইন্দো-ইওরোপীয় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা হইতে লওয়া। মৌলিক শব্দগুলি তিনটি ভাগে পড়ে—১. তদ্ভব, ২. তৎসম, ৩. অর্ধতৎসম। আগন্তুক শব্দগুলি দুইটি শ্রেণীতে পড়ে—দেশী ও বিদেশী। দেশী অর্থাৎ অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। বাংলায় যে সব বিদেশী ভাষার শব্দ আসিয়াছে তাহার মধ্যে ফারসী-আরবী, পোর্তুগীস ও ইংরেজী উল্লেখযোগ্য।

দ্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাষা-প্রকাশ বাংলা

ব্যাকরণ, কলিকাতা, ১৯৪৫; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, কলিকাতা, ১৯৬২; সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১০ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৮; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাংলা ভাষার অভিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ; রাজশেখর বসু, 'চলন্তিকা', কলিকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

সুকুমার সেন

বাক, কথন অর্থবোধক শব্দের উৎপাদন। ফুসফুস হইতে আগত নিঃশ্বাস-বায়ুর দ্বারা স্বরযন্ত্রে (ল্যারিংক্স) স্বরের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিধ্বনিকারী কণ্ঠ, মুখগহ্বর ও জিহ্বা ইহাকে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও অর্থবোধক শব্দে পরিণত করে।

গলবিলের (ফ্যারিংক্স) নীচে শ্বাসনালীর (ট্র্যাকিয়া) উপরে স্বরযন্ত্র অবস্থিত। ইহার বহির্দ্বারে (শ্বাসরন্ধ্র, গ্লটিস) আড়াআড়িভাবে ২ জোড়া পেশী বর্তমান; তাহাদের নীচের জোড়াকে স্বরতন্ত্রী (ভোক্যাল কর্ড) বলে। স্বরতন্ত্রীদ্বয়কে ইচ্ছানুরূপ সংকুচিত ও প্রসারিত করা যায় এবং স্বরযন্ত্রের অন্যান্য পেশীর সাহায্যে ইহাদের উপর বিভিন্ন পরিমাণে টান সৃষ্টি করা যায়। ইহার ফলে শ্বাসরন্ধ্রের আকৃতি নানাভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে—শ্বসনকালে ইহা ত্রিভুজাকৃতি থাকে, কিন্তু স্বরসৃষ্টির সময়ে ক্ষুদ্র ছিদ্রে পরিণত হইতে পারে। নিঃশ্বাসবায়ুর সজোর চালনায় স্বরতন্ত্রীতে কম্পন ঘটিলে স্বরসৃষ্টি হয়। স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য, টান ও স্থূলতার (mass) পরিবর্তন ঘটাইয়া স্বরের তীক্ষ্ণতা (পিচ্, pitch) পরিবর্তন করা যায়। মানুষের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা সাধারণতঃ 'দুই অক্টেভ'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। স্বরের তীব্রতা (ইনটেন্সিটি) নিঃশ্বাস-বায়ুর চাপের উপর নির্ভর করে।

বয়োবৃদ্ধির সহিত স্বরযন্ত্রেরও বৃদ্ধি ঘটে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সময়ে অতি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে স্বরযন্ত্র সুপরিণত হইয়া ওঠে। এজন্য ঐ সময়ে স্বরের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। পুরুষের স্বরযন্ত্র স্ত্রীলোকের স্বরযন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর বলিয়া তাহাদের কণ্ঠস্বরের পার্থক্য দেখা যায়।

শব্দোচ্চারণ ব্যতীত শ্রুত বা পঠিত শব্দ হৃদয়ঙ্গম করা এবং লিখন ও পঠন, সকলই বাক-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। শুনিয়া ও দেখিয়া প্রথম কথা-বলা শিখিতে হয় এবং ইহা উচ্চারণ করিয়া বা লিখিয়া প্রকাশ করিতে হয়।

বাক-প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ঐচ্ছিক পেশীর দ্বারা পরিচালিত হয়। গুরুমস্তিষ্কের যে নার্ভ-কেন্দ্র উচ্চারিত ও লিখিত কথন নিয়ন্ত্রণ করে তাহা শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সবিশেষ প্রভাবিত হয়। বাক-প্রক্রিয়ার নানা অংশের নিষ্ক্রিয়তায় নানাপ্রকার বাগ্‌-রোধ (আফাসিয়া) রোগের সৃষ্টি হয়।

সুখময় লাহিড়ী

বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা (২২°৩৮′-২৩°৩৮′ উত্তর এবং ৮৬°৩৬′-৮৭°৪৬′ পূর্ব)। ইহার উত্তরে ও উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, দক্ষিণ-পূর্বে হুগলি ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলা। আয়তন ৬৮৭১ বর্গ-কিলোমিটার। জেলায় সদর ও বিষ্ণুপুর এই দুইটি মহকুমা, ৫টি শহর আছে।

ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে জেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১. উত্তর ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল। ইহা পশ্চিমের ছোটনাগপুর মালভূমির অন্তর্গত। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য পাহাড় শুশুনিয়া (৪৪০ মিটার) এবং বিহারীনাথ (৪৪৮ মিটার)। ২. মধ্যের ভূভাগ বন্ধুর ল্যাটেরাইটের উচ্চভূমি ও উপত্যকা লইয়া গঠিত। ৩. পূর্ব-দিকে বিষ্ণুপুর ও সদর মহকুমার অধিকাংশই পলিগঠিত নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত।

জেলার নদীর মধ্যে দামোদরই প্রধান। ইহা এই জেলাকে বর্ধমান জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রধান নদী দ্বারকেশ্বর বা ধলকিশোর জেলার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কংসাবতী বা কাঁসাই জেলায় প্রবেশ করিয়া প্রায় ৫৬ কিলো-মিটার প্রবাহিত হইয়াছে। অন্যান্য নদীর মধ্যে গন্ধেশ্বরী, জয়পান্ডা, শিলাবতী, কুমারী, রেবাই, তারাফেনী, শালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জেলাটির পশ্চিমাংশে প্রাচীন আর্কিয়ান যুগের নীস ও শিস্ট শিলা এবং উত্তরে দামোদর তীরে গণ্ডোয়ানা যুগের পাললিক শিলা দেখা যায়। উত্তরাংশে এঁটেল মাটি ও অন্যত্র বেলেমাটি ও ল্যাটেরাইট শ্রেণীর কাঁকরযুক্ত লাল মাটি দেখা যায়।

জেলার জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ১৩০৪ মিলিমিটার। গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা ৪৭° সেন্টিগ্রেড এবং শীতে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১২° সেন্টিগ্রেড হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ৮ম শতক হইতে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজারা রাজত্ব করিতেন ('বিষ্ণুপুর' দ্র)।

ইংরেজ আমলে এই অঞ্চল কিছুকাল বর্ধমান জেলার ও জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া একটি পৃথক জেলারূপে গণ্য হয়।

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে রাণীবাঁধ থানায় ছেঁদা পাহাড়ে ও খাতরা থানায় উলফ্রাম; উত্তর দিকে সালতোড়া, মেঝিয়া ও বরজোড়া থানায় কয়লা; শুশুনিয়া পাহাড়ে কোয়ার্ট-জাইট ও অন্যত্র চীনামাটি পাওয়া যায়।

প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান কৃষিভূমির শতকরা ৯০ ভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জেলার অন্যান্য কৃষিজদ্রব্যের মধ্যে গম, ভুট্টা, পাট ও আলু উল্লেখযোগ্য। সেচভূমিতে কিছু ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কংসাবতী ও দামোদরের খাল এবং অন্যান্য খালদ্বারা জেলার প্রায় ৪৫০০০ হেক্টর জমি

সিঞ্চন করা হয়। পুরাতন খালের মধ্যে শুভংকরের দাঁড়া ও পলাশবনি উল্লেখযোগ্য।

জেলায় ১৩টি সংরক্ষিত বনভূমি আছে। বনে শাল, পিয়াশাল, জিয়াল, পলাশ, মহুয়া, বহেরা, কেন্দ, বেল ও সিধা প্রধান। মোট বনভূমির পরিমাণ ১৪০৪ বর্গকিলোমিটার।

জেলায় বড়রকমের কোনও শিল্প গড়িয়া উঠে নাই। কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁকুড়ার রেশম শিল্প প্রধান। বিষ্ণুপুরের রেশমবস্ত্রের বিশেষ সুনাম আছে। জেলার তসর, মটকা, চাদর, গামছা বিখ্যাত। ইহা ছাড়া লাক্ষার বিচিত্র জিনিস, শাঁখের জিনিস, তুলসীর মালা, মোটা কম্বল প্রস্তুত হয়। এখানকার পিতল-কাঁসার বাসন, মাটির জিনিস ও অম্বুরী তামাকের খ্যাতি আছে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামের পোড়ামাটির ঘোড়া জগৎবিখ্যাত।

জেলার (১৯৬১ খ্রী) লোকসংখ্যা ১৬৬৪৫১৩ জন, তন্মধ্যে ৮৪০৪২৩ পুরুষ ও ৮২৪০৯০ স্ত্রীলোক। শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২৩ জন। মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ জন পুরুষ ও শতকরা ৯ জন স্ত্রীলোক। বর্তমানে জেলায় ২২২২ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি কলেজ আছে। ইহা ছাড়া সংগীতশিক্ষাকেন্দ্র, টেকনিক্যাল স্কুল প্রভৃতিও আছে।

অধিবাসীদের মধ্যে মোট শতকরা ১০ জন আদিবাসী। কোরা, ভূমিজ, মাহালি, মেচ, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও ওঁরাও প্রধান।

বিষ্ণুপুর (২৩°৫´ উত্তর ৮৭°২০´ পূর্ব) খড়্গপুর হইতে ৮৫ কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে মহকুমার প্রধান শহর ও প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী। এখানে বহু প্রাচীন কীর্তি আছে ('বিষ্ণুপুর' দ্র)।

বিষ্ণুপুরের ১৯ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ময়নাপুর নামক স্থানে ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত 'যাত্রাসিদ্ধি রায়' নামে ধর্মঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করেন। ময়নাপুর হইতে ১১ কিলোমিটার উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে চাঁপাতলা ঘাটই গুপ্ত বারাণসী বলিয়া বর্ণিত 'চাপায়ের ঘাট'।

বাঁকুড়া (২৩°১৪´ উত্তর; ৮৭°৪´ পূর্ব) জেলার সদর শহর। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ২৩১ কিলোমিটার। শহরের উত্তরে গন্ধেশ্বরী ও দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত। শহরটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৬২৮৩৩ (১৯৬১ খ্রী)। উহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ২৮২৮৬ জন। অল্পবয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনের জন্য 'বরস্টল জেল', কুষ্ঠাশ্রম, মেডিক্যাল স্কুল, সরকারি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, সমবায় তন্তুবায় সমিতি আছে। শহরের অনতিদূরে পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান কুষ্ঠাশ্রম গৌরীপুরে অবস্থিত। নিকটেই দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে মল্লরাজদের একতেশ্বর শিবমন্দিরে চৈত্র-সংক্রান্তি ও গাজনের মেলা ও উৎসব হয়।

বাঁকুড়া হইতে ১৩ কিলোমিটার দূরে ছাতনায় বিশালাক্ষী (বাশুলী) দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে ইহা কবি চণ্ডীদাসের জন্মস্থান। প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড়ে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ক্ষোদিত রাজা চন্দ্রবর্মার একটি শিলালিপি আছে। স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ।

বাঁকুড়ার ৪২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে সোনামুখী থানার সদর শহর সোনামুখী লাক্ষার জিনিস ও তসরের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রাম বিখ্যাত 'শুভংকরী' নামক গণিত পুস্তক-প্রণেতা শুভঙ্কর দাসের জন্মস্থান।

বাঁকুড়া শহরের ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণে হাড়মসড়া গ্রামের প্রাচীন কৃষ্ণপ্রস্তর মন্দির আনুমানিক সপ্তদশ শতকে ওড়িশাশৈলী-প্রভাবিত মন্দিরের নিদর্শন।

ওঁদা থানায় বহুলাড়া গ্রামে আনুমানিক একাদশ শতকে নির্মিত শিবমন্দির অলংকারের প্রাচুর্যে অনুপম।

দ্র Amiya Kumar Banerjee, ed., *West Bengal District Gazetteer, Bankura,* Calcutta, 1968.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বাকে আর্নল্ড এ (১৮৯৯-১৯৬৩ খ্রী) সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারতীয় সংগীতের অনুরাগী আর্নল্ড এ বাকের জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর হল্যাণ্ডে। তিনি লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ভারতীয় সংগীতের গবেষণা করিয়া (১৯৩৭-৪৫ খ্রী) এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি ডক্টর অফ লেটার্স উপাধি লাভ করেন। তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি ফিলিপ স্টার্নের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের ২৬টি গানের অনুবাদসহ বিলাতি স্বরলিপি প্রচার করেন এবং ডাচ-ভাষায় কবিগুরুর কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বালী ও যবদ্বীপ ভ্রমণেও গিয়াছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ও আফ্রিকান শিক্ষাকেন্দ্রে সংস্কৃত ও ভারতীয় সংগীতের অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের রিডার পদে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শৈলজারঞ্জন মজুমদার

বাক্যপদীয় ভর্তৃহরিরচিত ব্যাকরণদর্শনসংক্রান্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে রচিত। এই ভর্তৃহরি 'নীতিশতকা'দির রচয়িতা হইতে ভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইনি মহাভাষ্যের একখানি টীকাও লিখিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে প্রায় ২০০০

শ্লোকে রচিত। প্রথম দুই খণ্ডের নাম ব্রহ্মকাণ্ড ও বাক্যকাণ্ড, তৃতীয় খণ্ডের নাম পদকাণ্ড বা প্রকীর্ণকাণ্ড। প্রথম দুই খণ্ডের টীকাকার পুণ্য বা পুঞ্জরাজ, তৃতীয় খণ্ডের টীকাকার হেলরাজ। গ্রন্থটি অত্যন্ত দুরূহ। টীকা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সকল স্থলে গ্রন্থের আশয় ভালভাবে বোধগম্য হয় না। এই মহাগ্রন্থের স্বল্প পরিসরে পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। প্রধানতঃ যে যে বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম ব্রহ্মকাণ্ড গ্রন্থের উপক্রমণিকাস্বরূপ। শব্দজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল। শব্দজ্ঞান কেবলমাত্র ব্যাকরণপাঠ হইতেই সম্ভব। শব্দশক্তি বর্ণ পদ ধ্বনি স্ফোট বাক্য ও শব্দার্থসম্বন্ধ এই সকল বিষয়ে ইহাতে আলোচনা আছে। দ্বিতীয় কাণ্ডে বাক্যার্থ ও তৎসম্বন্ধে নানা মতের পরীক্ষা যথা, প্রতিভাবাদ সংঘাতবাদ অভিহিতান্বয়বাদ অন্বিতাভিধানবাদ প্রভৃতি। বিভক্তি প্রত্যয় কর্মপ্রবচনীয় উপসর্গ নিপাত ধাতু সমাস প্রকৃতির অর্থ। পদের অনেকার্থত্ব অভিধেয়ার্থ (মুখ্যার্থ) গৌণার্থ। বাক্যার্থে ক্রিয়ার বিশেষত্ব। বাক্যার্থের একত্ব। তৃতীয় কাণ্ডে পদ ও পদার্থ-সম্বন্ধে পরীক্ষা। এই কাণ্ডে জাতি দ্রব্য সম্বন্ধ, দিক্‌ গুণ, সম্বোধন সহ কারক, ক্রিয়া লিঙ্গ ও সমাস সম্বন্ধে আলোচনা। সমাস সম্বন্ধে আলোচনা অতি বিস্তৃত। তন্মধ্যে বিশেষ আলোচনার বিষয় 'সমানাধিকরণ' ইতরেতর বহুব্রীহি সমাস।

দ্র গুরুপদ হালদার, ব্যাকরণদর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ ; G. Sastri, *Philosophy of Word and Meaning*, Calcutta, 1959.

শৈলেন সেনগুপ্ত

বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বাগ্‌ভটনামধারী দুইজন লেখকের মধ্যে প্রাচীনতর বা বৃদ্ধবাগ্‌ভট সিংহগুপ্তের পুত্র, বৌদ্ধ অবলোকিতের শিষ্য এবং গদ্যপদ্যময় 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়'-এর রচয়িতা। পরিব্রাজক ঈৎ-সিঙ্‌ (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) সম্ভবতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্রের লেখক হিসাবে ইঁহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থে অস্ত্রোপচারের বিবরণ আছে। পদ্যে রচিত 'অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা'-প্রণেতা অপর বাগ্‌ভট সম্ভবতঃ উল্লিখিত বাগ্‌ভটের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

অলংকারশাস্ত্রের লেখক অপর দুইজন বাগ্‌ভটের মধ্যে একজন (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) 'বাগ্‌ভটালঙ্কার'-প্রণেতা ; অপর বাগ্‌ভট (আনুমানিক ১৪শ শতক) কাব্যানুশাসন ও উহার বৃত্তি 'অলঙ্কারতিলক'-এর রচয়িতা। আলংকারিক উভয় বাগ্‌ভটই জনৈক বাগ্‌ভটের 'নেমিনির্বাণ' কাব্য হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঘ[১] স্তন্যপায়ীশ্রেণীর মাংসাশীবর্গের (অর্ডার-কার্ণিভোরা, Order-Carnivora) অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে পাওয়া যায়। ইহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ এবং দেহের সর্বত্র কালো ডোরা দাগ। লাঙ্গুলসহ ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ মিটার এবং ওজন ২ কুইণ্টাল। সিংহের ন্যায় বাঘের কেশর থাকে না, তবে বয়স্ক বাঘের গলার লোম দীর্ঘাকার ধারণ করে। স্ত্রী ও পুরুষ বাঘ সারা জীবন জোড় বাঁধিয়া থাকে। স্ত্রী-বাঘ একসঙ্গে ২—৫টি শাবক প্রসব করে। বাঘ নিশাচর প্রাণী এবং রাত্রে গোরু, হরিণ, বানর ইত্যাদি শিকার করিয়া ভোজন করে। বাঘ অত্যন্ত ধূর্ত এবং নিঃশব্দে চলাফেরা করিতে পারে। সাধারণতঃ ইহারা মানুষ শিকার করে না, তবে বয়স হইলে এবং শিকারের অভাব ঘটিলে ইহারা মানুষ শিকার করে। ভারতে বৎসরে প্রায় ১ হাজার মানুষ বাঘের শিকার হয়। ভারতের কোনও কোনও উপজাতি বাঘের চামড়া, নখ, লোম মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস করে ও ঐগুলি ধারণ করে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের উত্তর আমেরিকার কৃপাণদন্তী বাঘ (স্যাবার-টুথ টাইগার), দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনের লিওপার্ড এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার চিতা বাঘের সমগোত্রীয়।

সীমানন্দ অধিকারী

বাঘ[২] (২২°২২′ উত্তর এবং ৭৪°৪৮′ পূর্ব) মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। মাউ রেলস্টেশনের ১৩৯ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে এই ক্ষুদ্র গ্রামটি অবস্থিত। বাঘের প্রত্নবস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টীয় ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের সপ্তমাতৃকামূর্তি। এখানে প্রাপ্ত ব্রহ্মার একটি মূর্তির (বিক্রম সম্বৎ ১২১০) লেখে পরমার যশোধবলের নাম উল্লেখিত আছে।

বাঘের মাহাত্ম্যদ্যোতক শৈলখাত বৌদ্ধ গুহাগুলি গ্রাম হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে নর্মদার শাখানদী ক্ষুদ্র বাঘনদীর বামতটবর্তী। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ ঢালুদেশে একটি পাহাড়গাত্রে এইগুলি খাত। এই পাহাড়টিই এই অঞ্চলে একমাত্র বেলেপাথরের। বাকিগুলি বসাল্টের (basalt)। খননের সুবিধার জন্য এই পাহাড়টি নির্বাচন করার ফল খুব শুভ হয় নাই। ইহার নরম ভঙ্গুর পাথরের জন্য এবং বেলেপাথরের উপরিভাগে অবস্থিত ৬ মিটার মত মোটা ক্লে স্টোনের চাপের জন্য পরে গুহাগুলি বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বারান্দাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগ্ন ; কক্ষগুলির স্তম্ভ, দেওয়াল ও তলছাদ জীর্ণ। ইহার ফলে সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় তলছাদ ও গাত্র-দেশস্থ অনবদ্য রঞ্জিত চিত্রাবলীর লোপপ্রাপ্তি। অজণ্টার দ্বিতীয় পর্বের সমসাময়িক এখানকার গুহাগুলি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের। এই যুগেই এইগুলি অসাধারণ নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত হয়। শিল্পোৎকর্ষে এই চিত্রণ একমাত্র অজণ্টার বিশ্ববিশ্রুত চিত্রণের সহিত তুলনীয়।

মোট নয়টি গুহার অবশেষ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে

একটিও চৈত্যগৃহ নহে। সঙ্ঘারামের উপাসনাগারেই স্তূপ পূজিত হইত।

১ নং গুহাটি চার স্তম্ভের একটি সমাবেশশালা। সম্মুখের বারান্দাটি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত। চতুঃশালা ২ নং সঙ্ঘারামটির সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গনের দুই পার্শ্বে মূর্তি কুলুঙ্গি এবং পিছনে সস্তম্ভ বারান্দা। বারান্দার দুই পার্শ্বে একটি করিয়া কক্ষ। বারান্দার পশ্চাতে বর্গাকার সমাবেশশালা। ইহার দুইটি গবাক্ষ, তিনটি দ্বার ও ২৪টি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির মধ্যে চারিটি বর্গাকার মধ্যস্থানের চতুষ্কোণে বিন্যস্ত। স্তম্ভগুলি বিচিত্ররূপে ক্ষোদিত। সমাবেশশালার তিনদিকে অষ্টাদশটি শয়নকক্ষ ও একটি সস্তম্ভমণ্ডপ (পশ্চাৎভাগের মধ্যস্থলে)। মণ্ডপের পশ্চাতে উপাসনাগার। মণ্ডপের দুই দেওয়ালে বরমুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধের সুন্দর ক্ষোদিত মূর্তি। বুদ্ধের দুইপার্শ্বে ফুল ও চামরধারী ভক্ত। উপাসনাগারের দ্বারোপান্তে বোধিসত্ত্বের মূর্তি। ইহার মধ্যস্থলে শৈলখাত স্তূপ। স্তূপের বেদী অষ্টকোণ, মেধি ডৌলকর্মে সুশোভিত, অণ্ড অর্ধগোলকাকার, হর্মিকা লহরাকার ও ছত্র গোলাকার।

৩ নং গুহায় বিন্যাস অসাধারণ। অঙ্গনের পশ্চাতে আট স্তম্ভের আয়ত সমাবেশশালা। সমাবেশশালার দক্ষিণ দিকে চারিটি কক্ষ ও পশ্চাদ্ভাগে আট স্তম্ভের প্রশস্ত মণ্ডপ। সমাবেশশালার বামদিকে একটি ক্ষুদ্রাকার সস্তম্ভ মণ্ডপ ; মণ্ডপের পশ্চাতে অন্তরাল। অন্তরালের পশ্চাদ্ভাগস্থ কক্ষটির দেওয়ালে ভক্তগণের সহিত বুদ্ধের মূর্তি চিত্রিত। মণ্ডপের পশ্চাদ্ভাগ হইতে দুইটি বারান্দা প্রলম্বিত। এই বারান্দাদ্বয়ের পশ্চাতে দুইটি করিয়া কক্ষ। ঠিক এই ধরণের মণ্ডপ, বারান্দা, অন্তরাল ও কক্ষরাজির বিন্যাস অঙ্গনের বামভাগেও।

গুহাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অলংকৃত ৪ নং গুহার স্থানীয় নাম রংমহল। ইহার বাস্তুনক্সা মোটামুটি ২ নং গুহার ন্যায়। তবে ইহা অধিকতর প্রশস্ত। সমাবেশশালার তিন পার্শ্বস্থ কক্ষসংখ্যা সপ্তবিংশ। সস্তূপ উপাসনাগারের সম্মুখে কোনও মণ্ডপ নাই। সমাবেশশালার মধ্যস্থ বর্গে চারিটি স্তম্ভ। ইহাদের পার্শ্বদেশ পরিবেষ্টিত করিয়া আঠাশটি স্তম্ভ ; ইহাদের ব্র্যাকেটগুলিতে জন্তু জানোয়ারের রঞ্জিত অথবা ক্ষোদিত চিত্র। পশ্চাৎ ও দুই পার্শ্বের সারির মধ্যভাগের স্তম্ভদ্বয়ের শীর্ষদেশ হইতে গাড়িবারান্দার মত এক একটি ছাদের প্রলম্বন। এই প্রলম্বনের সম্মুখ অংশ দুইটি গোলাকার স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। এই অংশ চৈত্যগবাক্ষের অনুকৃতিতে ক্ষোদিত। সঙ্ঘারামের প্রধান দ্বারের ফ্রেম ক্ষোদিত ফুল, লতা, পাতা, বুদ্ধমূর্তি, চৈত্যগবাক্ষের অনুকৃতি এবং গঙ্গামূর্তিতে সুশোভিত। এই গুহাটি এককালে তুলির মাধ্যমে অপরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছিল। দৃশ্যাবলীর অতি সামান্য অংশই এখন বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে বারান্দার পশ্চাৎ দেওয়ালেরটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দৃশ্য এখানে চিত্রিত। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : সহানুভূতিশীলা একটি রমণীর পার্শ্বে একটি রোরুদ্যমানা নারী, ধর্মালোচনায় অভিনিবিষ্ট চারিজন পুরোহিত (দুই জনের মাথায় মুকুট), নৃত্যগীতরত নর-নারী ও দুইটি বিরাট শোভাযাত্রা। রঙের খেলায়, বিষয়বস্তুর বিন্যাসে, লাবণ্যময় সুঠাম দেহাবয়ব চিত্রণে ও বিচিত্র ভাবের সুন্দর প্রস্ফুটনে এই চিত্রগুলি অনবদ্য সমাবেশশালার দেওয়ালে, ছাদে ও স্তম্ভগাত্রে চিত্রিত লতা, পাতা, পুষ্প ও জন্তুদের চিত্রণও রমণীয়।

৪ নং গুহার বারান্দাবরাবর প্রসারী ৫ নং গুহার বারান্দা। ৫ নং গুহার বারান্দার দক্ষিণপার্শ্বে একটি কক্ষ ও পশ্চাতে এক বিরাট শালা (সম্ভবতঃ ভোজনশালা)। এই শালাটিতে ষোলটি স্তম্ভ দুইসারিতে বিন্যস্ত। চারিটি গবাক্ষ ও একটি দ্বারের মাধ্যমে এইটি আলোকিত। একদা এই গুহাটিও চিত্রিত হইয়াছিল সুন্দরভাবে।

৫ নং গুহার সহিত একটি প্রকোষ্ঠমাধ্যমে সংযুক্ত ৬ নং গুহাটির বর্গাকার সমাবেশশালার দক্ষিণ পার্শ্বে দুইটি কক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে তিনটি কক্ষ। সমাবেশশালায় বর্গাকারে ন্যস্ত চারিটি স্তম্ভ।

বাকি তিনটি গুহা নিতান্তই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। ইহাদের মধ্যে ৭ নং-টি এক সময়ে একটি বিরাট সঙ্ঘারাম ছিল। ইহারও উপাসনাগারে স্তূপ।

গুহাবলীর সন্নিকটে ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধ (microliths) বিদ্যমান।

দ্র J. Marshall, M. B. Garde, J. Ph. Vogel, E. B. Havell and J. H. Cousens,, *The Bagh Caves in the Gwalior State*, London, 1927.

দেবলা মিত্র

বাঙ্গালোর মহীশূর রাজ্যের একটি জেলা, তালুক ও শহর। জেলাটি ১২°১৫′—১৩°৩০′ উত্তর ও ৭৭°৪′—৭৭°৫৯ পূর্বে অবস্থিত। জেলার আয়তন ৮৯৮০ বর্গ-কিলোমিটার, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ২৫০৪৪৬২ জন।

বাঙ্গালোর শহর (১২°৫৮′ উত্তর ও ৭৭°৩৫′ পূর্ব) মহীশূর রাজ্যের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শিল্পবাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা রেলপথে বোম্বাই শহর হইতে ১১৯৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ৬৭ বর্গকিলোমিটার। শহরের জনসংখ্যা ১২০৬৯৬১ জন (১৯৬১ খ্রী)।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪৫ মিটার উচ্চ এই শহরটির দুইটি অঞ্চল। পেটা নামে অভিহিত পুরাতন অংশসহ ১টি, অপরটি সেনানিবাস ও অসামরিক আবাস অঞ্চল।

শহরের গ্রীষ্মকালীন গড় তাপ ২৬° সেণ্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় তাপ ২০° সেণ্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৮২৫ মিলিমিটার।

বাঙ্গালোর শহর পশম ও রেশম শিল্পের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে সরকারি শ্রমশিল্প সংস্থার মধ্যে হিন্দু-

স্থান এয়ারক্রাফ্‌ট, হিন্দুস্থান টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ, হিন্দুস্থান মেসিনটুলস, ভারত ইলেক্‌ট্রনিক্‌স প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাবান ও চন্দন তৈল শিল্পও অন্যতম প্রধান শিল্প।

বাঙ্গালোরের শতকরা ৪৮ জন শিক্ষিত (৩৮১৭১৬ পুরুষ ও ২১৫৮০৯ স্ত্রীলোক)। শহরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অংশ এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট পাঁচটি মহাবিদ্যালয় আছে। অন্যান্য গবেষণাকেন্দ্র ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: সুপ্রসিদ্ধ ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্স, এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ও অল-ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ মেন্টাল হেল্‌থ।

শহরে রাজপথ, রেলপথ ও বিমানপথ যোগাযোগ স্থাপন করে। বাঙ্গালোর বহু রেলপথের মিলনস্থল। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমানপথে বাঙ্গালোর একটি বিশেষ বিমানঘাঁটি। শহরটি একটি স্বাস্থ্যনিবাস।

বাঙ্গালোরে মহারাজের প্রাসাদটি ও তৎসংলগ্ন উদ্যান এবং হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের দুর্গ দ্রষ্টব্যের মধ্যে গণ্য।

বাঙ্গালোর শহরের ৫৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নন্দী পর্বতটি (১৪৭৮ মিটার) গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যনিবাস। পাহাড়ের শীর্ষদেশে ও পাদমূলে স্থাপিত দুইটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। 'মহীশূর' দ্র

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. II, Oxford, 1908; National Council of Economic Research, Techno-Economic Survey of Mysore, New Delhi, 1965.

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

বাচস্পতিমিশ্র[১] : মিথিলাবাসী সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র ৮৯৮ শকাব্দে (৯৭৬—৭ খ্রী) ন্যায়সূচীনিবন্ধ সংকলন করেন। ইনি সম্ভবতঃ নৃগনামক কোনও রাজার আশ্রিত ছিলেন। ধর্মকীর্তি প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যদের আক্রমণে ক্ষীণবল আস্তিক প্রস্থানসমূহে ইনি নূতন শক্তি সঞ্চার করেন। বিভিন্ন আস্তিক দর্শনের মূল্যবান টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি 'টীকাকার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মণ্ডনকৃত ব্রহ্মসিদ্ধির টীকা ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা ব্যতীত তৎকৃত অন্যান্য গ্রন্থ সম্প্রদায়ক্রমে অদ্যাবধি আলোচিত হইয়া আসিতেছে। সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী হইলেও বাচস্পতি মূলতঃ নৈয়ায়িক ছিলেন এবং স্বীয় ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকার নামানুসারে 'তাৎপর্যাচার্য' পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ও বাচস্পতির গুরুশিষ্য সম্বন্ধসূচক প্রবাদ অমূলক। বাচস্পতি ত্রিলোচনগুরুর মার্গানুসারী। ত্রিলোচনেরও ন্যায়মঞ্জরী নামক ন্যায়ভাষ্যটীকা প্রসিদ্ধ ছিল।

দ্র জ্ঞানশ্রীমিত্রনিবন্ধাবলী, K. P. Jaiswal Institute, 1969; ন্যায়চতুর্গ্রন্থিকা, Mithila Institute, 1967.

অনন্তলাল ঠাকুর

বাচস্পতিমিশ্র[২] খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতকের প্রথম ভাগে মিথিলাদেশে দ্বিতীয় বাচস্পতিমিশ্রের আবির্ভাব হয়। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে দশখানি এবং ধর্মশাস্ত্রে একত্রিশখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি ন্যায়সূত্রোদ্ধার নামে অক্ষপাদসূত্রের নূতন পাঠসংকলন এবং তদুপরি ন্যায়তত্ত্বালোক নামক সুবিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৃত্তি রচনা করেন। পঞ্চালেশ্বর চৌহানিবংশীয় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহিষী শ্রীপদ্মাবতীর আদেশে ইনি মণিকণ্ঠমিশ্রকৃত ন্যায়রত্নের উপর 'প্রকাশ' টীকা প্রণয়ন করেন। মীমাংসায় সহস্রাধিকরণ নামক তাঁহার এক গ্রন্থ ছিল। কিন্তু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধসমূহই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতসমাজে তিনি মিথিলেশ্বর সূরি ও স্মার্তবাচস্পতি নামে পরিচিত। তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধাবলীর মধ্যে আচারচিন্তামণি, আহ্নিকচিন্তামণি, কৃত্যমহার্ণব, তীর্থচিন্তামণি, দাননির্ণয়, দ্বৈতনির্ণয়, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি, শুদ্ধিচিন্তামণি, শ্রাদ্ধচিন্তামণি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধের উপর ইঁহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্র D. C. Bhattacharya, *History of Navya-Nyāya in Mithila*, Darbhanga, 1958; P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, vol. IV, Poona, 1953.

অনন্তলাল ঠাকুর

বাজবাহাদুর বাজবাহাদুর শেরশাহ্‌ ও তাঁহার পুত্র ইসলাম শাহের রাজত্বকালে মালবের প্রদেশপাল সুজাৎখাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে ৯৬৩ হিজরি অর্থাৎ ১৫৫৫—৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। রাজত্বের প্রথমদিকে ভ্রাতা ও অনেক কর্মচারীকে হত্যা করিয়া তিনি নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছেন।

গীত-বাদ্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং রাজকার্য অবহেলা করিয়া তিনি সংগীত ও নৃত্য ইত্যাদির মধ্যেই বেশি সময় অতিবাহিত করিতেন।

১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মোগল সেনাবাহিনীর নিকটে ঐ রাজ্যের তদানীন্তন রাজধানী সারঙ্গপুরের তিন মাইল দূরে তিনি ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গ, এমন কি অনন্যা সুন্দরী ও সুগায়িকা সঙ্গিনী রূপমতিকেও ফেলিয়া তিনি খান্দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। পরে খান্দেশ ও বেরারের সাহায্যে তিনি মালব উদ্ধার করেন। পরে আবার আকবরের সেনাবাহিনীর নিকটে পরাজিত হইয়া তিনি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অনেক রাজ্য ঘুরিয়া অবশেষে

তিনি আকবরের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন (১৫৭০—৭১ খ্রী)। সম্রাট প্রথম তাঁহাকে এক হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত করেন।

আকবরের রাজসভায় তিনি একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আবুল ফজল তাঁহার সংগীতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

দ্র V. A. Smith, *Akbar the Great Mogul*, Oxford, 1919; A. L. Srivastava, *Akbar the Great*, Vol. I, Agra, 1962; Briggs, *Ferishta*, Vol. II. Reprinted Calcutta, 1962.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাজরা ছোট পুষ্টিকর দানা শস্যের মধ্যে বাজরা বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষের মহারাষ্ট্র, গুজরাত, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশেই অধিকাংশ চাষের অঞ্চল সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলার পশ্চিমাঞ্চল বাজরা চাষের উপযোগী। ভারতে বাজরা চাষের জমি ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৯০২৩০০০ হেক্টর এবং ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িয়া হয় ১২৫৩৯০০০ হেক্টর ; বাজরার উৎপাদন ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ২৪৯৫০০০ মেট্রিক টন এবং ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাড়িয়া হয় ৫১৩২০০০ মেট্রিক টন।

খরা ও অল্প বৃষ্টিতে (৪০-৫০ সেণ্টিমিটার) বাজরা ভালো জন্মে। বেশি বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়। ইহা অনাবৃষ্টির অঞ্চলের খুব উপযোগী ফসল। বেলে মাটিতে এবং ঐজাতীয় নীরস মাটিতে ইহার চাষ করা হয়। প্রথম বৃষ্টির পর ২।৩ বার চাষ দিয়া ছিটাইয়া অথবা লাইন করিয়া চৈত্র-বৈশাখে বোনা হয়। লাইনে এক বিঘত হইতে পৌনে এক হাত দূরে দূরে বাঁশের পোড়ার সাহায্যে বোনা হয়। সেচ ব্যবস্থা থাকিলে জৈব সার প্রয়োগ করা চলে। শুধু বাজরা চাষ করিলে হেক্টর পিছু ৭½—১২½ কিলোগ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। অন্য ফসলের সঙ্গে স্বল্পতর পরিমাণ বীজ লাগে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিটাইয়া বোনা জমিতে একবার হাত নিড়ানি দেওয়া এবং জমি খোঁচানো হয়। লাইনের চাষে বলদের সাহায্যে একবার দুইবার বিদা দেওয়া হয়। একবার হাত নিড়ানি দেওয়ার পর, পাখির হাত হইতে বাজরাকে রক্ষা করা প্রয়োজন।

বর্ষার শেষে এবং শীতের গোড়ায় আশ্বিন-কার্তিকে গোড়া ঘেঁষিয়া ফসল কাটা হয়। কোনও কোনও সময়ে প্রথমে শুধু ডগা হইতে দানার গোছা কাটিয়া নেওয়া হয়। ঝাড়াই মাড়াই সবই গম ও জোয়ারের মত। ফলন হেক্টর পিছু ৫৫০-১০০০ কিলোগ্রাম হইতে পারে, সেচের ব্যবস্থা থাকিলে ইহার দ্বিগুণ ফলানো যায়। সম্প্রতি উচ্চ ফলনকারী বীজ বপনের ফলে ভারতে হেক্টর পিছু বাজরার উচ্চতম ফলন ৬১২৭ কিলোগ্রাম দাঁড়াইয়াছে। বাজরার খড় একটি ভালো গোখাদ্য এবং দানা ছাড়া হেক্টর পিছু ২½-৪½ মেট্রিক টন খড় পাওয়া যাইতে পারে এবং সেচ দিয়া ইহার দ্বিগুণ পাওয়া যায়। কোনও কোনও সময় কেবলমাত্র গোখাদ্যের জন্যই ইহার চাষ হয়, তখন গাছের পাতা সবুজ থাকিতেই কাটিতে হইবে।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

বাজিরাও পেশোয়া দ্র

বাটানগর ২২°৩১′ উত্তর ও ৮৮°১৩′ পূর্ব। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী। বাটা সু-কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা চেকোশ্লোভাকিয়া-নিবাসী টমাস বাটার নামানুসারে ইহার নাম রাখা হইয়াছে। শহরটি বজবজের সন্নিকটে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। ট্রেন, বাস ও স্টিমার সহযোগে কলিকাতার সহিত যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। ইহার আয়তন ১·২৫ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৯৬৬৪ জন (১৯৬১ খ্রী)।

পূর্বে এই অঞ্চল মীরপুর নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে টমাস বাটা নিজে এই অঞ্চলটি তাঁহার ভবিষ্যৎ কারখানার জন্য পছন্দ করিয়া যান। বর্তমানে সম্পূর্ণ মীরপুর গ্রাম এবং জগতলা, বাংলা ও নুঙ্গী গ্রামের কিছু অংশ লইয়া বাটানগর শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। চামড়া, রবার এবং ক্যানভাসের বিভিন্ন প্রকার জুতা প্রস্তুত করিবার জন্যই বাটানগর বিখ্যাত। বর্তমানে প্রায় ১২ হাজার শ্রমিক এই শহরে রোজ কম বেশি ১০৭৩০০ জোড়া জুতা প্রস্তুত করে। বাটার জুতা পৃথিবীর সমস্ত দেশেই রপ্তানি করা হয়।

বাটানগর শহরটি দুইভাগে বিভক্ত—১. বাটানগর এবং ২. নিউল্যান্ড বা নতুন বাটানগর। শহরের মাঝ বরাবর আছে টমাস বাটা অ্যাভিনিউ। শহরটিতে শ্রমিকদের বাসস্থান, ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য দুইটি পৃথক পৃথক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিনটি ক্লাব, সমবায় সংস্থা, পার্ক, শিবমন্দির, মসজিদ, গির্জা, ডাকঘর, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে।

দ্র Thomas Bata, *How I began*, Batanagar, 1942.

ত্রিদিবকুমার বসু

বাণগড় প্রাচীন দেবীকোট বা কোটিবর্ষ নগরী এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কথিত আছে, এখানে দৈত্যরাজ বলির পুত্র বাণ রাজার রাজধানী ছিল। তাঁহার নামেই এই নগরীর নাম হয় বাণপুর এবং পরিশেষে ইহা বাণগড়ে

পরিণত হয়। উমাবন, ঊষাবন, বাণপুর, দেবীকোট, কোটিবর্ষ, শোণিতপুর প্রভৃতি শব্দ বর্তমানে যে স্থান বাণগড় নামে পরিচিত ইহাকে বুঝাইত বলিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। শোণিতপুরের বিষয় বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, রামচরিত ও নৈষধ চরিতের নারায়ণের টীকা প্রভৃতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। কোটিবর্ষের নাম আছে বায়ুপুরাণ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে ও গুপ্ত এবং পালরাজাদের লেখসমূহে। কোটিবর্ষ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত একটি বিষয় বা বিভাগ ছিল। ঐ বিভাগীয় প্রধান নগরকেও কোটিবর্ষ বলা হইত। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের সময় পর্যন্ত শোণিতপুর একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। মুসলমান বা তুর্কীদের নিকট ইহা দেবীকোট বা দেবকোট বলিয়া আখ্যাত হইত। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানা হইতে প্রায় এক মাইলের মধ্যে কোটিবর্ষের বিশাল ধ্বংসস্তূপ বাণগড়। এখানে বিভিন্ন আকারের স্তূপ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুর্গ বা রাজবাড়ি নামক জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-খণ্ডের আয়তন প্রায় ১৮০০´×১৫০০´। ইহা চতুর্দিকে রক্ষাপ্রাচীর এবং তিনদিকে সুগভীর খাত দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রাজবাড়ির উত্তর ও পূর্ব দিকে দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ব্যাপিয়া নাগরিকদের বসতি ছিল। রাজবাড়ির পূর্বদিকে খাতের উপর দিয়া শহরে যাইবার সদর দরজা। অনুরূপভাবে পশ্চিম প্রান্তে ও রাজবাড়িতে প্রবেশের প্রশস্ত রাজপথ ছিল বলিয়া অনুমান হয়। রাজবাড়ির বাহিরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে অনতিদূরে জীবৎকুণ্ড ও অমৃতকুণ্ড নামে দুইটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার কীর্তি সম্বলিত বহু পুরাবস্তু দিনাজপুর রাজবাড়িতে দেখা যাইত। বাণগড়ের পশ্চিমদিকে পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে ঊষাগড় নামে আরও একটি ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। ইহাও কোটিবর্ষের সমসাময়িক যুগেরই হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাণগড়ে জনৈক কাম্বোজ রাজার লিপিযুক্ত প্রস্তরস্তম্ভ ও পালবংশীয় রাজা তৃতীয় গোপালের রাজত্বকালের লেখযুক্ত সদাশিবের প্রস্তর মূর্তি প্রভৃতি পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৩৮-৪১ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪টি শীত ঋতুতে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বিভিন্ন যুগের ইষ্টকনির্মিত বাস্তুগৃহ, দেবমন্দির, দুর্গপ্রাচীর, গৃহপ্রাচীর, শস্যাগার, রক্ষিগৃহ, ভূ-গর্ভস্থিত সুড়ঙ্গ প্রভৃতি বহু প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৌর্য শুঙ্গ যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান যুগ পর্যন্ত ইহাদের কাল নিরূপণ করা যাইতে পারে। মৌর্য শুঙ্গ কুষাণ গুপ্ত যুগে ইট ও পোড়ামাটির দ্রব্যাদিরই বহুল প্রচলন ছিল। পালযুগে প্রস্তরবহুল রাজমহল অঞ্চল পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় মূর্তি, গৃহ, স্তম্ভ ও দরজা প্রভৃতিতে প্রস্তরশিল্পের আধিক্য দেখা যায়।

মৌর্যযুগের কূপ, লাঞ্ছনময় (Punch marked) রজত ও তাম্র মুদ্রা, কাল চকচকে মাটির নানারূপ থালা ও পাত্র, শুঙ্গযুগের প্রশস্ত নগর-প্রাচীর, বাসগৃহ, পয়ঃপ্রণালী, ঢালাই তাম্র মুদ্রা (Cast Copper Coins), পোড়ামাটির যক্ষিণী ও মাতৃকামূর্তি, মাটির নানারূপ বাসনকোশন, ব্রাহ্মী লিপি যুক্ত লেখ, পোড়ামাটির খেলনা ইত্যাদি, পালযুগের কারুকার্য-খচিত পাথরের চৌকাঠ ও মূর্তি, গৃহস্তম্ভ, পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তি ও মৎস্যাশিকারী প্রভৃতি চারুকলার মনোরম নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পালযুগে কোটিবর্ষকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থায় দেখা যায়। ইষ্টকনির্মিত সুদীর্ঘ নগর-প্রাচীর, আবাস-গৃহ, প্রদক্ষিণ-পথ-সংলগ্ন দেবমন্দির, শস্যাগার, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী ও কূপ ইত্যাদি এই যুগের সভ্যতার প্রতীক। প্রস্তরশিল্প ছাড়া পোড়ামাটির শিল্পেও পালযুগে বঙ্গদেশের কৃতিত্ব অসাধারণ। যদিও এই বিষয়ে পাহাড়পুরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়, তথাপি কোটিবর্ষের দান তুচ্ছ নয়। কারণ এখানে পোড়া ইট এমনভাবে তৈয়ারি করা হইত যে ঐগুলি একক কিংবা মিলিতভাবে মানুষ, হাতি, গরু, সিংহ, পাখি, ফুল-ফল ও লতাপাতা ইত্যাদির আকৃতি নির্মাণের উপযোগী হইত। এগুলি সাধারণতঃ গৃহনির্মাণ শিল্পের সহায়ক ছিল। মুসলমান যুগের নীল ও সবুজ রঙের কাচের মত প্রলেপ বিশিষ্ট লাল পোড়ামাটির বাসনকোশনের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পালযুগে অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে গণপতির পূজাও যে এখানে প্রচলিত ছিল ইহা খনন-লব্ধ পোড়ামাটির গণেশের মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয়। এক মন্দিরের ভিতরের কুণ্ড এবং তৎসংলগ্ন সুড়ঙ্গ হইতে মনে হয় এইখানে কোনও দেবমূর্তির স্নানগৃহ ছিল। সেই সুড়ঙ্গ অদূরবর্তী কূপের মধ্যে পড়িয়াছে।

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী'তে বাণভট্ট নিজের জীবনসম্বন্ধে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন চিত্রভানু ও রাজ্যদেবীর পুত্র। বাল্যে মাতৃপিতৃহীন বাণ অসৎসঙ্গে পতিত হন। নানা স্থানে ভ্রমণের পরে তিনি হর্ষবর্ধনের (৬০৬—৪৭ খ্রী) সভায় আহূত হন এবং কালক্রমে সুকবি খ্যাতি অর্জন করেন। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' বাণভট্টের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'কাদম্বরী' কথাজাতীয় গদ্যকাব্য। ইহজীবনে ও বিগত জীবনসমূহে 'চন্দ্রাপীড়' ও 'কাদম্বরী'র প্রেমের কাহিনী 'কাদম্বরী'র মূল বিষয়। ইহার সঙ্গে পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। কাদম্বরীর পূর্বভাগ বাণের রচিত ও উত্তরভাগ তৎপুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্ট কর্তৃক রচিত।

'হর্ষচরিত' একখানি আখ্যায়িকা। হর্ষবর্ধনের জীবনের

কিছু ঘটনা ইহার উপজীব্য। আটটি উচ্ছ্বাসে রচিত এই গ্রন্থের বিবরবস্তু সংক্ষেপে এইরূপঃ—

পুষ্যভূতি হইতে রাজবংশের উদ্ভব; প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যশ্রীর বৃত্তান্ত; হূণগণের বিরুদ্ধে রাজ্যবর্ধনের অভিযান; শত্রুহস্তে রাজ্যশ্রীর পতি-হত্যা ও কারারোধ; রাজ্যবর্ধনের হত্যাকারী গৌড়রাজের বিরুদ্ধে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা এবং হর্ষকর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতাশ্রিত রাজ্যশ্রীর উদ্ধার। হর্ষচরিতের সমাপ্তি অপ্রত্যাশিতভাবে হইয়াছে; সম্ভবতঃ বাণ ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। কবিসুলভ অতিরঞ্জনসত্ত্বেও ইতিহাসমূলক সংস্কৃত রচনাসমূহের মধ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

'চণ্ডীশতক' নামক ১০২টি শ্লোকাত্মক গ্রন্থটির রচয়িতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ পোষণ করিলেও ইহা সাধারণতঃ বাণভট্টের রচিত বলিয়াই বিবেচিত হয়। স্রগ্ধরা ছন্দে কবি ইহাতে চণ্ডীদেবীর গুণস্তুতি করিয়াছেন।

শব্দচয়নে, প্রকৃতির বর্ণনায় ও কল্পনার গরিমায় বাণের নৈপুণ্য সর্ববাদিসম্মত। কাদম্বরীতে প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও চরিত্র-চিত্রণে বাণের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। মাঝে মাঝে তাঁহার গদ্যরচনা গদ্যময় পদ্যের রূপ ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দীর্ঘ সমাসবহুল বাক্য ও দুরূহ শব্দপ্রয়োগে স্থানে স্থানে রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত জন্মে। তাহাছাড়া প্রধান ঘটনার মধ্যে নানা অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায় পাঠকের পক্ষে প্রধান ঘটনার সূত্র অনুসরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। বর্ধমান জেলার গুপ্তিপাড়া গ্রামের এক পণ্ডিতবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি বিভিন্ন সময়ে নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমানের মহারাজ চিত্রসেন ও কলিকাতার মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিত্রসেনের এক মৃগয়া কাহিনী অবলম্বনে চিত্রচম্পূ-কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের গোড়ার দিকে বর্গীর হাঙ্গামার এক সমসাময়িক ও জীবন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। বিবাদার্ণবসেতু নামক হিন্দু বিধিব্যবস্থার সংকলন-গ্রন্থের ইনি মুখ্য সংকলয়িতা। হিন্দু প্রজাদের দেওয়ানি মামলা বিচারের সুবিধার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস বাণেশ্বর প্রভৃতি এগার জন পণ্ডিতের দ্বারা এই গ্রন্থ সংকলনের ব্যবস্থা করেন। ফারসী অনুবাদের মারফত ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'জেণ্টুল' নামে প্রচারিত হয়। বাণেশ্বরের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ কিছু উদ্ভট সংস্কৃত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্র হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাৎস্যায়ন[১] বাৎস্য গোত্রীয় পণ্ডিত। এই নামে দুইজন প্রাচীন গ্রন্থকার পরিচিত ছিলেন। একজন ন্যায়-ভাষ্যকার, অপরজন 'কামসূত্র'-রচয়িতা। কামসূত্রকার বাৎস্যায়নের নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ; তাঁহার প্রকৃত নাম মল্লনাগ বলিয়া সুবন্ধু ও টীকাকার যশোধর উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহার আবির্ভাব কাল লইয়া প্রচুর মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। উৎসন্নপ্রায় বাভ্রব্য প্রভৃতি রচিত কামশাস্ত্রগুলির সার সংগ্রহ করিয়া সূত্রাকারে তিনি 'কামসূত্র' রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রাচীন মত আলোচনা করিয়া নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাই বর্তমানে ভারতীয় প্রাচীন কামশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ। ইহা ৩৬টি অধ্যায়ে ৬৪টি প্রকরণে ও ৭টি অধিকরণে বিভক্ত। সমস্ত গ্রন্থে শ্লোকসংখ্যা ১১২৫। পৃথিবীর সমস্ত যৌনতত্ত্ববিদগণ বাৎস্যায়ন সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করিয়াছেন।

ত্রিদিবনাথ রায়

বাৎস্যায়ন[২] নৈয়ায়িক বাৎস্যায়নের জীবনী অজ্ঞাত। তাঁহার গ্রন্থে প্রাচীন ঋষি হিসাবে ন্যায়সূত্রকার গৌতমের উল্লেখ; 'মহাভাষ্য', 'অর্থশাস্ত্র' ও 'বৈশেষিকসূত্র' হইতে অংশবিশেষের উদ্ধৃতি; তৎকর্তৃক নাগার্জুনের মত খণ্ডনের প্রয়াস; দিঙ্‌নাগ কর্তৃক বাৎস্যায়নের সমালোচনা প্রভৃতি হইতে মনে হয় যে তিনি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। কাহারও কাহারও মতে, তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। ন্যায়সূত্রের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ব্যাখ্যা বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য'। এই ভাষ্যে 'অষ্টাধ্যায়ী'র বার্ত্তিকের ন্যায় কতক অংশ আছে; এবং বাৎস্যায়ন কোনও কোনও ন্যায়সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাতব্যাধি সন্ধি (জয়েণ্ট) ও তৎসংলগ্ন পেশীর প্রদাহকে সাধারণভাবে বাত বলে। বিশেষ প্রকার রোগজীবাণুর সংক্রমণের ফলে প্রদাহ, দেহে বিপাকক্রিয়ার (মেটাবলিজম) পরিবর্তন, বার্ধক্যে সন্ধির বৈকল্য প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাত উৎপন্ন হয়।

স্ট্রেপ্টোকক্কস হিমোলিটিকস নামক রোগজীবাণুর সংক্রমণে শৈশবে হৃৎপিণ্ডে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, বিভিন্ন সন্ধি ও তৎসংলগ্ন পেশীরও প্রদাহ ঘটে (রিউম্যাটিক ফিবার)। এই প্রকার বাতব্যাধি শিশু ও বৃদ্ধ ব্যতীত সকল

বয়সেই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ হাঁটুর মত বড় বড় সন্ধিতে জল জমিয়া ফুলিয়া যায়; কিন্তু কখনও পুঁজ হয় না। দেহতাপ বাড়িয়া ১০১°—১০৪° ফারেনহিট পর্যন্ত উঠানামা করে ও রোগী যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ে। কখনও এক সন্ধি হইতে অন্য সন্ধিতে প্রদাহ বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত সন্ধি স্ফীত, উত্তপ্ত, লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়; বেদনা রাত্রে বৃদ্ধি পায়। দেহতাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগী দুর্বল ও অস্থির হইয়া পড়ে এবং অম্লযুক্ত ঘর্ম বাহির হয়। হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে রোগী বক্ষে বেদনা ও অস্বস্তি অনুভব করে। যুবক ও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ইহা মারাত্মক পীড়া। প্রদাহ উপশমের জন্য পেনিসিলিন বা অন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। সন্ধির যন্ত্রণা ও স্ফীতি কমাইবার জন্য অ্যাসপিরিন ব্যবহার করা হয়।

পুঁজ-সৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণে আক্রান্ত সন্ধিতে পুঁজ হয়; এই পুঁজ বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সন্ধির ভিতরে বিভিন্ন উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ক্রমে সন্ধির অবস্থান-পরিবর্তন সংকুচিত হয়। এরূপ বাতের চিকিৎসাতেও পেনিসিলিন বা অন্য অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়।

বার্ধক্য ও জরায় সন্ধির বিভিন্ন উপাদানের ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় সন্ধির অবস্থান-পরিবর্তনের ব্যাঘাত ঘটায়। ইহাই বার্ধক্যের বাত। এদেশে ইহা সাধারণতঃ হাঁটুতেই হইয়া থাকে। তাপ প্রয়োগ, মালিশ এবং যন্ত্রণা-উপশমের জন্য অ্যাসপিরিন ও অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। শল্য চিকিৎসাও করা হইয়া থাকে।

বিপাকক্রিয়ায় গোলযোগ ঘটিলে দেহের বিভিন্ন বর্জ্য-দ্রব্য দেহের মধ্যে থাকিয়া যায়। এইপ্রকার এক বর্জ্যদ্রব্যের নাম ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিড রক্তে বেশি পরিমাণে জমিয়া বিভিন্ন সন্ধির পেশীর মধ্যে গিয়া প্রদাহের সৃষ্টি করে; ইহাকে গেঁটে-বাত বলে। এই-প্রকার বাত সাধারণতঃ মধ্যবয়স্ক লোকের মধ্যেই দেখা যায়। গেঁটে-বাতের তীব্র যন্ত্রণা উপশমের জন্য সাধারণতঃ যন্ত্রণানাশক ঔষধ এবং মূত্রক্ষরণ বৃদ্ধির জন্য ক্ষার-জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। এই রোগে মদ্যপান ও মাংসাহার ক্ষতিকর।

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

বাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যুতের সাহায্যে আলোক সৃষ্টির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আগুনই ছিল যাবতীয় কৃত্রিম আলোর উৎস। অন্ধকারে মানুষ সর্ব-প্রথম জ্বলন্ত কাঠ মশালের মত ব্যবহার করিত। মালয়েশিয়ার আদিম অধিবাসীরা তালজাতীয় উদ্ভিদের পাতায় রজনের মত পদার্থসমৃদ্ধ আঠা মাখাইয়া মশাল তৈয়ারি করিত। তাহা ছাড়াও দেবদারুর কাঠ ও আঠা, তৈলসমৃদ্ধ অন্যান্য উদ্ভিদ এবং মৃত প্রাণীদেহ শুষ্ক করিয়া জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তাহার পর সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে তেলের বাতির ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। সেই তেলের বাতি অর্থাৎ প্রদীপ বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন দেশে বর্তমানেও প্রচলিত রহিয়াছে। প্রথম তেলের বাতি সম্ভবতঃ পাথর অথবা মানুষের মাথার খুলি হইতে তৈয়ারি হইত। তাহার পর ক্রমশঃ কাদামাটি ও পোড়ামাটির প্রদীপের প্রচলন হয়। পাথর বা মাটির প্রদীপে একটি করিয়া সলিতা ও কিছু তেল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ রাখা হইত। এস্কিমোরা সোপ-স্টোনের প্রদীপ ব্যবহার করিত এবং শৈবালজাতীয় উদ্ভিদের চূর্ণ হইতে সলিতা প্রস্তুত করিয়া প্রদীপে জ্বালাইত। সভ্যতার যুগেও প্রায় সর্বত্রই তিসির তেল বা চর্বির সাহায্যে বিভিন্নরকমের বাতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্র বিশেষে একটি প্রদীপে তিন, চার বা ততোধিক সলিতা ব্যবহার করা হইত। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে সলিতা বাড়াইয়া দিবার জন্য স্বয়ং-ক্রিয় ব্যবস্থাও উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

ইহার পর মোমবাতির ব্যবহার শুরু হয়। ফিনিসীয়-রাই বোধহয় প্রথম মোমবাতির ব্যবহার আরম্ভ করে। খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে চর্বিবাতির প্রচলন হয়; প্রায় ১১শ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম ছোট ছোট কাঠের ফালি চর্বিতে ডুবাইয়া বাতির মত জ্বালান হইত। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিমির চর্বির শিল্প সম্প্রসারিত হইবার ফলে চর্বিবাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্টিয়ারিক অ্যাসিড ও স্টিয়া-রিনের মিশ্রণে নির্মিত বাতির প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে স্টিয়ারিনের সহিত প্যারাফিন মিশ্রিত করিয়া বাতি তৈয়ারি হইতে থাকে। কেরোসিন আবিষ্কৃত হইবার পর কেরোসিনের বাতির ব্যবহারও প্রচলিত হয়। প্রথমতঃ কেরোসিনের উন্মুক্ত শিখার বাতিই ব্যবহৃত হইত; পরে কাঁচের চিমনি ঢাকা বাতির প্রচলন হয়।

ইহার পরে আসে গ্যাসের আলোর যুগ। সর্বপ্রথম চীনারাই সম্ভবতঃ লবণ খনি হইতে বাঁশের নলের সাহায্যে গ্যাস সংগ্রহ করিয়া আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রেভারেণ্ড জন ক্লেটন বকযন্ত্রের মধ্যে কয়লা উত্তপ্ত করিয়া একটা ব্লাডারের মধ্যে কিছু গ্যাস সংগ্রহে সক্ষম হইলেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জিন পিয়ের মিকেলার্স কয়লা ও অন্যান্য পদার্থ পাতন করিয়া গ্যাস উৎপাদন করেন এবং সেই গ্যাস জ্বালাইয়া তাঁহার পরীক্ষাগার আলোকিত করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম মার্ডক গ্যাসের বাতি জ্বালাইয়া তাঁহার ঘর আলোকিত করিয়াছিলেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপ্পা লেবন একরকম গ্যাসের আলোর পেটেন্ট গ্রহণ করেন। এই আলোর নাম দেওয়া হইয়াছিল 'থার্মোল্যাম্প'। কাঠ,

কয়লা প্রভৃতি কঠিন জ্বালানি হইতে গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা বাতির সঙ্গেই সংলগ্ন থাকিত।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মার্ডক 'বেঙ্গল লাইট' নামে শিখা-উৎপাদনকারী উন্মুক্ত বার্নারের বাতি উদ্ভাবন করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাসগোর জে. বি. নিয়েলসন কর্তৃক মৎস্য-পুচ্ছ (ফিশ্-টেল) বার্নার উদ্ভাবিত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে গোল্ডস্‌ওয়ার্দি গার্নি ব্লো-পাইপের সাহায্যে অক্সি-হাইড্রোজেন শিখা চুনের ঢোঙের উপর ফেলিয়া অতি উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ইহাই 'লাইম-লাইট' নামে পরিচিত। ইহার পর ফক্স ও ট্যালবট দেখান যে, স্পিরিট ল্যাম্পের দীপ্তিহীন শিখা চুনের সূক্ষ্ম গুঁড়ার উপর ফেলিলেও উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। ইহার পর উজ্জ্বল আলো সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গ্যাসের শিখার উপর বসাইবার জন্য জিলার্ড সূক্ষ্ম প্ল্যাটিনাম তারের ম্যান্‌টল প্রস্তুত করেন। কিন্তু প্ল্যাটিনাম অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া যায় বলিয়া ইহা কার্যকরী হয় নাই। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভন বুন্‌সেন 'বুন্‌সেন বার্নার' নামে প্রচলিত বার্নার আবিষ্কার করেন। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে বিভিন্ন লবণ-দ্রবণে তুলার আঁশ ভিজাইয়া সেগুলিকে পোড়াইয়া লইয়া ওয়েল্‌স্‌বাক একপ্রকার ম্যান্টল প্রস্তুত করেন। প্রথমে তিনি ম্যান্‌টল প্রস্তুত করিবার জন্য আর-বিয়ামের লবণ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে পরিষ্কার সবুজ আলো পাওয়া যাইত। তারপরে তিনি ম্যান্টল প্রস্তুত করিবার জন্য থোরিয়াম ব্যবহার করেন। ইহাতে ম্যান্‌টল খুব দৃঢ় হইত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে থোরিয়াম ও সিরিয়ামের সাহায্যে প্রস্তুত গ্যাস ম্যান্‌টল উদ্ভাবিত হয়। কলোডিয়নের আস্তরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পর ম্যান্‌টলের আলো প্রায় সর্বত্র প্রচলিত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে টমাস এস. উইলসন ক্যালসিয়াম কার্বাইড হইতে উদ্ভূত অ্যাসিটিলিন গ্যাসের সাহায্যে আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ডিলারু-ই বোধহয় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুতের চেষ্টা করেন। তাহার পর ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাটারির সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইয়া গ্রুভ একটি বক্তৃতামঞ্চ আলোকিত করিয়াছিলেন। ফুকোও স্থির এবং অবিচ্ছিন্ন আলোর বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক ডি. মলিন্‌স্ অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের একপ্রকার বৈদ্যুতিক বাতির জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট হইতে পেটেন্ট গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইট ইংল্যান্ডে আর্ক বাতির পেটেন্ট নেন। ইহার অনেক কাল পরে রাস্তাঘাট আলোকিত করিবার জন্য কোনও কোনও দেশে আর্ক বাতির ব্যবহার প্রচলিত হয়; আর্ক বাতির তীব্র ঔজ্জ্বল্যের জন্য বাড়ি-ঘরে ব্যবহার করা সম্ভব হইত না। তখন কেবল ব্যাটারির সাহায্যেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালান হইত। তখন পর্যন্ত এই সকল বাতির সন্তোষজনক কার্যকারিতার জন্য উন্নত ধরণের ডায়নামোও উদ্ভাবিত হয় নাই।

এতদিন যে সকল বৈদ্যুতিক বাতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সেগুলি কয়েক ঘণ্টা জ্বলিবার পরই কালো হইয়া যাইত এবং অন্যান্য ত্রুটিও ছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এডিসন ও সোয়ান বায়ুশূন্য কাচ-গোলকের মধ্যে কার্বনাইজ্‌ড্ ফিলামেন্ট বসাইয়া 'এডিসোয়ান ল্যাম্প' নামে উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুত করেন। কার্যকারিতার গুণে এই বাতির ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু এই বাতিরও ফিলামেন্ট দীর্ঘস্থায়ী হইত না এবং উত্তাপের ফলে যথেষ্ট শক্তির অপচয় ঘটিত। ইহার পর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পারদ-বাষ্পের বাতির কার্যকারিতা প্রদর্শিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে টাংগস্টেন ফিলামেন্ট উদ্ভাবিত হইবার পর অধিকতর উজ্জ্বল এবং দীর্ঘস্থায়ী বৈদ্যুতিক বাতির নির্মাণ সম্ভব হয়। প্রায় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কাচ-গোলকের মধ্যে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি করিয়া সংকেত জ্ঞাপন ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতির জন্য নিয়ন বাতির ব্যবহার প্রচলিত হয়। নিয়ন বাতির আবিষ্কার হইয়াছিল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ হইয়াছিল অনেক পরে। বৈদ্যুতিক বাতির আরও উন্নতি সাধিত হয় ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর, যখন ফ্লুওরেসেন্ট বাতি উদ্ভাবিত হয়। ইন্‌ক্যান্ডেসেন্ট অর্থাৎ উত্তপ্ত ফিলামেন্ট হইতে নির্গত আলোর বাতি অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ অধিক শক্তিশালী এই ফ্লুওরেসেন্ট (স্বদীপক) আলো উৎপন্ন হয় ভিতরে আস্তরণ দেওয়া একটা কাচের নলের মধ্যে। নলের মধ্যে পারদ-বাষ্পের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়া অতিবেগুনী রশ্মির সৃষ্টি করে। এই অতিবেগুনী রশ্মি স্বদীপক পদার্থের আস্তরণের উপর পড়িয়া নলের মধ্যে আলোর সৃষ্টি করে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাদরায়ণ বেদান্ত দ্র

বাদুড় খিরোপ্‌টেরা বর্গের (Order-Chiroptera) অন্তর্ভুক্ত কোমল লোমে ঢাকা, পাতলা চামড়ার ডানাযুক্ত আকাশচারী স্তন্যপায়ী। ইহারা হাতকে ডানার মত ব্যবহার করে। বাহু ও হাতের হাড়গুলি ছাতার শিকের মত ডানার পাতলা চামড়ার সহিত সংলগ্ন। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আংটার মত বাঁকানো; পা দুইটি ছোট এবং বৃক্ষশাখায় বসিবার অনুপযুক্ত বলিয়া বাদুড় পায়ের শক্ত নখগুলির সাহায্যে গাছের ডালে মাটির দিকে মাথা করিয়া ঝুলিয়া থাকে। বাদুড়ের লেজ আছে, কিন্তু সেটিও চামড়ার। লেজ ইচ্ছামত সামনে বা পিঠের দিকে বাঁকাইতে পারে

বলিয়া কোনও কোনও বাদুড় লেজের সাহায্যে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। বড় বড় কান দুইটির সাহায্যে বাদুড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে এমন শব্দতরঙ্গ (সুপারসোনিক) গ্রহণ করিতে পারে। অনেক বাদুড়ের নাকের উপর পাতার মত পাতলা চামড়ার একটি অংশ আছে।

বাদুড় নিশাচর প্রাণী, যদিও দক্ষিণ আমেরিকায় এক-ধরণের বাদুড় দিনের বেলায় উড়িয়া বেড়ায়। পৃথিবীতে প্রায় ১০০০ রকমের বিভিন্ন মাপের ও স্বভাবের বাদুড় আছে; কাহারও দেহের দৈর্ঘ্য মাত্র ৩ই সেণ্টিমিটার, কাহারও বা প্রায় ৩০ সেণ্টিমিটার। বাদুড়ের ডানার দৈর্ঘ্য দেহের তুলনায় অনেক বেশি: 'উড়ন্ত খেঁকশিয়ালে'র (ফ্লাইং ফক্স) প্রসারিত ডানার দৈর্ঘ্য প্রায় ১ই মিটার। কোনও কোনও বাদুড় নিরামিষাশী: ইহারা ফল, ফুল বা পাতার কেবল রসটুকু পান করিয়া ছিবড়া ফেলিয়া দেয়। ইহাদের দাঁত কেবল পেষণের উপযোগী চ্যাপ্টা ও ভোঁতা। এদেশে সন্ধ্যাবেলা এই ফলাহারী বাদুড় দেখা যায়। অনেক বাদুড় কীটভুক; ইহাদের মাড়ির দাঁত ধারালো ও দুই খাঁজযুক্ত। অপর এক জাতের বাদুড় ছোট ছোট প্রাণী শিকার করিয়া খায়; ইহাদের ভ্যাম্পায়ার বা রক্তশোষক বাদুড় বলে। ইহাদের সামনের তীক্ষ্ম ও ধারালো দাঁত প্রাণীদেহের ত্বক সহজেই ফুটা করিতে পারে। এদেশে এজাতীয় বাদুড় দেখা যায় না। তবে এখানে মেগাডার্মা নামে একপ্রকার বাদুড় পাখি, ব্যাঙ, মাছ প্রভৃতি ছোট ছোট প্রাণী আহার করে।

উড়িবার সময় কানে শুনিতে পাওয়া যায় না এইরূপ একরকম শব্দ বাহির হয়। ঐ শব্দতরঙ্গ সামনের কোনও বাধা বা প্রতিবন্ধক হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। বাদুড় এই প্রতিহত শব্দতরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এবং চোখ বন্ধ করা অবস্থায় অনায়াসে উড়িতে ও খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। কান ছাড়াও বাদুড়ের দেহে প্রতিহত শব্দতরঙ্গ-গ্রাহক সূক্ষ্ম অনুভূতি-সম্পন্ন শিরা আছে। ফলাহারী বাদুড়ের এই তরঙ্গগ্রাহক যন্ত্র নাই।

বাদুড় সাধারণতঃ বৃক্ষশাখা, পুরাতন দালানকোঠা, কিংবা গুহার ফাটলে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এদেশে মার্চ-এপ্রিল মাসে বাদুড়ের বাচ্চা হয়; এসময়ে বাদুড়ী হাতের আংটার মত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি গাছের ডালে আটকাইয়া সোজা হইয়া ঝোলে।

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বানর স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট্ (Primate) বর্গের বৃক্ষচারী প্রাণী। ইহারা মাটিতে চলিবার সময় হাত ও পায়ের উপর ভর রাখিয়া চলে। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি অন্যান্য আঙ্গুল হইতে পৃথক ও বিপরীতদিকে বসানো। পায়ের আঙ্গুলগুলি লম্বা। হাত ও পায়ের আঙ্গুল ও পাতার সাহায্যে ইহারা গাছের ডাল বা অন্য কিছু শক্ত করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে। বানরের লেজ আছে। কিন্তু বানর-জাতীয় শিম্পাঞ্জি, গরিলা, উল্লুক প্রভৃতির লেজ নাই। আসাম, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের জঙ্গলের লজ্জাবতী বানরের (স্লো লরিস বা Slowloris) লেজ নাই, কিন্তু ইহাদের সমগোত্রীয় দক্ষিণ আফ্রিকা ও ম্যাডাগাসকারের লেমুরের লেজ খুব দীর্ঘ। দক্ষিণ আফ্রিকার বেবুন ও আরবদেশীয় কুকুরমুখো ম্যান্ড্রিল (Mandrill)-এর লেজ ছোট। দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাপ্টানাক বানর ক্যাপু-চিন্স্ (Capuchins) দীর্ঘ লেজের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ধরে। আমাদের দেশের হনুমান লেজের দ্বারা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে।

বানর নিরামিষাশী—পাতা, ফল, ফুল ও মুকুল প্রভৃতি আহার করে; বেবুন ফল, ফুল ইত্যাদি ছাড়াও মাকড়সা, টিকটিকি, ব্যাঙ্ প্রভৃতিও খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। কোনও কোনও বানর খাদ্যসংগ্রহের সময় খাদ্য গালের ভিতরে দুই পাশের থলিতে রাখিয়া দেয়; পরে ধীরে সুস্থে সেই খাদ্য চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে।

বানর দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। প্রতি দলে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ অধিপতি অনেকগুলি স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যা লইয়া বাস করে। দলের মধ্যে কোনও পুরুষ বানর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দলপতি তাহাকে দল হইতে বিতাড়িত করে, আবার দলপতি হীনবল হইলে অন্য পুরুষ বানর তাহাকে দল হইতে তাড়াইয়া নিজে দলপতি হয়। দলের বানরীরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকে।

বানর দিবাভাগে গাছে গাছে খাদ্যের সন্ধান করে এবং রাত্রিবেলায় গাছের উপর ঘুমায়। বানরী সাধারণতঃ এক-বারে একটিই সন্তান প্রসব করে। বানরীর অপত্যস্নেহ খুব প্রবল। বাচ্চা মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে এবং মা তাহাকে কোলেপিঠে লইয়াই চলাফেরা করে। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও বানরী সন্তানকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাবর, জহীরউদ্দিন মহম্মদ (১৪৮৩—১৫৩০ খৃ) ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পিতা উমর শেখ তুর্কি তৈমুরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতা মোঙ্গল চেঙ্গিজ খাঁর বংশসম্ভূতা। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর বাবর ১১ বৎসর বয়সে ফরঘানা রাজ্য প্রাপ্ত হন। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ অধিকার ছিল তাঁহার জীবনের সাধনা। বাবর দুইবার সমরকন্দ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যে বিদ্রোহ এবং উজবেকদিগের বিরোধিতার জন্য তিনি পিতৃরাজ্য ফরঘানা এবং সমরকন্দ, দুই-ই ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে কাবুল অধিকার করেন। পরবর্তী ১০ বৎসর কাল তিনি উজবেক্দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে নানা

স্থানে পরাজিত হন এবং ফরঘানা এবং সমরকন্দ পুনরধিকার করিতে ব্যর্থ হন। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বদখশান ও দুই বৎসর পরে কান্দাহার অধিকার করেন। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাবর ৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের আক্রমণ সপ্তম। ঐ বৎসর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। তাহার পর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া তিনি জৌনপুর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে খানুয়ার যুদ্ধে মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করিয়া বাবর রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তার করেন। ভারতে বাবরের আর প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোগরার যুদ্ধে সংঘবদ্ধ আফগান-দিগকে পরাজিত করিয়া তিনি বিহার পর্যন্ত মোগল আধিপত্য বিস্তার করেন। পর বৎসর ২৬ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। অক্ষু নদীর তীর হইতে বিহার এবং হিমালয় হইতে মালব ও রাজস্থান পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি কেবলমাত্র বীর ও সুনিপুণ সেনানায়ক ছিলেন না, বিদ্বান ও সুলেখকও ছিলেন। তাঁহার 'আত্ম-চরিত' তুর্কি সাহিত্যের সম্পদ। তুর্কি ও ফারসী ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংগীত ও চিত্রকলায় তাঁহার অধিকার ছিল। ধর্মে তিনি অনুদার ছিলেন। ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁহার আদৌ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল না।

দ্র S. Lane-Poole, *Babar*, Oxford, 1899; L. F. Rushbrook Williams, *An Empire-Builder of the Sixteenth Century*, Allahabad, 1918; A. S. Beveridge, tr., *The Babur-nama*, 2 vols., London, 1921; F. Grenard, *Baber, First of the Moguls*, New York, 1930.

সুকুমার রায়

বামাক্ষ্যাপা (১৮৩৮—১৯১১ খ্রী) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। জন্ম ১২৪৪ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন। পূর্ণ নাম বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়। পিতা সর্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পৈতৃক নিবাস প্রসিদ্ধ তারাপীঠের সন্নিকটে বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত আটলা গ্রাম। আবাল্য এক অদ্ভুত দেবোন্মাদভাব তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয় এবং সেজন্যই তিনি বামাক্ষ্যাপা নামে পরিচিত হন। বাল্যকালেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া তারাপীঠ শ্মশানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পূজায় বসিলেই তাঁহার মধ্যে উন্মাদভাব পরি-লক্ষিত হইত এবং তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। প্রসিদ্ধ সাধক কৈলাসপতি তাঁহাকে দীক্ষা দেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২ শ্রাবণ তারাসাধক বামাক্ষ্যাপা প্রাণত্যাগ করেন।

দ্র হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবামলীলা, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪১, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।

সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী

বামাচার তান্ত্রিক উপাসনাপদ্ধতির প্রকারভেদ। সাধারণতঃ মদ্যাদি পঞ্চ মকার লইয়া সাধনা—বামাচার কুলাচার বীরাচার (কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার অনুসারে শ্মশান সাধনা, শবসাধনা, বীরসাধনা) প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহার স্বরূপ লইয়া মতভেদ আছে। দক্ষিণাচারের বা সাধারণ পূজাপদ্ধতির বিপরীত বলিয়া ইহার নাম বামাচার হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন—বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী বলিয়া ইহা বাম বা কুৎসিত। পারানন্দ মতে বামাচার দুই প্রকার—উত্তম ও মধ্যম। উত্তমে পঞ্চ মকারের দুইটি (মৎস্য ও মাংস) বর্জনীয়। বামমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য ও মাংস পরিত্যাজ্য। তারাপূজায় বামাচার প্রশস্ত। বামাচার-বিরোধীদের মতে ইহা শূদ্রাদির পক্ষেই বিহিত, ব্রাহ্মণাদির পক্ষে নয়। ইহার সমর্থকগণ এই আচারকে অবৈদিক বলিয়া স্বীকার করেন না এবং ইহার অনুষ্ঠানাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। প্রাচীন ও অর্বাচীন গ্রন্থে ইহার নিন্দা ও প্রশংসা দুই-এরই পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্র Chintaharan Chakravarti, *Tantras: Studies on their religion and literature*, Calcutta, 1963.

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫১—১৯৩২ খ্রী) প্রসিদ্ধ তৈলচিত্রশিল্পী। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মার্চ বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়া গ্রামে জন্ম।

বামাপদ কলিকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি প্রমথনাথ মিত্রের নিকট তৈলচিত্রাঙ্কন এবং বেকার নামে জনৈক জার্মান শিল্পীর কাছে পুরাতন চিত্রের পুনরুদ্ধার পদ্ধতি শিক্ষা করেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় 'ক্যালকাটা ফাইন আর্ট এগ্‌জিবিশান'-এ বামাপদ-অঙ্কিত তৈলচিত্র 'জাগ্‌লার অ্যান্ড মংকি' 'মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পুরস্কার' লাভ করে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বামাপদ উত্তরভারত পরিভ্রমণে যান। এই সময়ে তিনি বহু রাজা মহারাজা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্রাঙ্কন করেন।

বামাপদ-অঙ্কিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মূল প্রতিকৃতি কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত আছে।

বামাপদ নিজের অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রের 'ওলিওগ্রাফ' (Oleograph) প্রচার করেন। 'অর্জুন ও উর্বশী' এবং 'উত্তরা ও অভিমন্যু' তাঁহার প্রথম প্রকাশিত 'ওলিওগ্রাফ' (১৮৯০ খ্রী)।

বামাপদ কলিকাতার শিল্পীদের সংস্থা 'বঙ্গীয় কলা-সংসদ'-এর কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন (১৯০৫ খ্রী)।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা', প্রবাসী,

আষাঢ়, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ; *Fine Art Exhibition Catalogue*, Calcutta, 1879: 'Death of a well-reputed Bengali Artist', *Amrita Bazar Patrika*, April 13, 1932; Kamal Sarkar, 'Precursors of Art Exhibition', *The Statesman*, December 22, 1968.

কমল সরকার

বায়রন, জর্জ গর্ডন (১৭৮৮—১৮২৪ খ্রী) বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও স্বাধীনতার পূজারী লর্ড বায়রন। জন্মাবধি তিনি খঞ্জ ছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড ত্যাগ করিয়া বেশির ভাগ সময় ইটালিতেই বাস করিয়াছিলেন। তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রীসের মুক্তিসংগ্রামে তিনি জীবন দান করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৬ বৎসর বয়সে গ্রীসে মুসোলংঘিতে তাঁহার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ জীবনের অবসান ঘটে।

তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ *Hours of Idleness* (১৮০৭ খ্রী)। তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *English Bards and Scotch Reviewers* (১৮০৯ খ্রী) পোপের অনুসরণে লিখিত বিদ্রূপাত্মক কবিতা। তাঁহার প্রথম জনপ্রিয় গ্রন্থ *Childe Harold's Pilgrimage* (১৮১২-১৮ খ্রী)-এ দেশত্যাগী নায়কের দেশে দেশে পরিভ্রমণ ও বহুবিধ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তির মধ্যে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত স্পষ্ট। *The Vision of Judgment* (১৮২২ খ্রী) ; *Don Juan* (১৮১৯-২৪ খ্রী) তাঁহার অপর দুইটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

বায়রনের রচিত নাটকের মধ্যে *Manfred* (১৮১৭ খ্রী), *Sardanapalus* ও *The Two Foscari* (১৮২১ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আত্মচরিতাখ্যানও একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।

তিনি বায়রণীয় নায়কের স্রষ্টা। এই রোমান্টিক নায়ক নীতিহীনতায় দুর্বার, নিঃসঙ্গ, উদ্ধত আবার অনুশোচনায় বিষণ্ণ। অন্যদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার কবিচেতনায় অন্বিত। 'ডন জুয়ানে'র (১৮১৯-২৪ খ্রী) মধ্যে তিনি স্বপ্রকাশ। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে তিনি সমসাময়িক অভিজাত সমাজের ভণ্ডামি মিথ্যাচার ও কপটতাকে জর্জরিত করিয়াছেন। ১৯শ শতাব্দীর বাঙালী কবিদের উপর বায়রনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

দ্র *Lord Byron's Correspondence*, J. Murray, ed, 2 vols. London, 1922; P, Quennell, *Byron, A Self-portrait*, 2 vols., London, 1950· H. Read, *Byron*, London, 1951.

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বায়ু ভূমণ্ডলের উপরিভাগের গ্যাসীয় আবরণ। বায়ু নাইট্রোজেন (প্রায় ৭৮%), অক্সিজেন (প্রায় ২১%) এবং সামান্য পরিমাণে আর্গন, নিওন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের মিশ্রণ। জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসও সর্বদা বায়ুতে কিছু পরিমাণে থাকে। বায়ুর যে সকল উপাদানের অনুপাতে উল্লেখযোগ্য তারতম্য ঘটে না, প্রতি ১০০ ভাগ বায়ুতে তাহাদের পরিমাণ নিম্নরূপ : নাইট্রোজেন ৭৮·১১০ ; অক্সিজেন ২০·৯৫৩ ; আর্গন ০·৯৩৪ ; নিওন ০·০০১৮১৮ ; হিলিয়াম ০·০০০৫২৪ ; ক্রিপ্টন ০·০০০১১৪ ; জেনন ০·০০০০০৮৭ ; হাইড্রোজেন ০·০০০০৫ ; মিথেন ০·০০০২ ; নাইট্রাস অক্সাইড ০·০০০০৫।

অনুপাতে তারতম্য ঘটে এরূপ গ্যাসগুলির পরিমাণ প্রতি ১০০ ভাগ বায়ুতে নিম্নরূপ : জলীয় বাষ্প ০—৭ ; কার্বন ডাই-অক্সাইড ০·০১—০·১ (গড় ০·০৩৩) ; ওজোন ০—০.০০০০৭ ; সাল্‌ফার ডাই-অক্সাইড ০—০·০০০১ ; নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ০—০·০০০০২ ; অ্যামোনিয়া ০—সামান্য ; কার্বন মনক্সাইড ০—সামান্য।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের অনুপাতের তারতম্যে বিকিরণ, আবহাওয়া ও স্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্য ঘটে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের তারতম্য প্রণিধানযোগ্য। গত ৫০ বৎসরে বায়ুতে ইহার পরিমাণ বাড়িয়াছে শতকরা ১২ ভাগ (১৯০০ খ্রী—০·০২৯% : ১৯৫০ খ্রী—০·০৩৩%)। এই শতকে জীবাশ্মঘটিত জ্বালানি (কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি) অধিকতর দাহ করার ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের অনুপাত শতকরা ৩০ ভাগ বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হয়।

বায়ুকে গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা যায় –১৪০° সেণ্টিগ্রেডে এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থার দ্বারা ; এক্ষেত্রে ৩৯ বায়ুমণ্ডল-চাপ (অ্যাটমোস্‌ফেরিক প্রেসার) থাকা অপরিহার্য। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বায়ুকে প্রথম তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা হয়। বায়ুকে কঠিন অবস্থাতেও রূপান্তরিত করা যায় ; শিল্পে ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানে ইহার ব্যবহার আছে।

বায়ুর প্রধান উপাদান—নাইট্রোজেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে প্রথম চিহ্নিত করেন। নাইট্রোজেন-যৌগ বহু পদার্থে অবস্থিত। ব্যাকটিরিয়ার মাধ্যমে মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন-যৌগের উদ্ভব হয়। গাছপালা মাটির নাইট্রোজেন-যৌগ গ্রহণ করে, ফলে মাটিতে ইহার অভাব হইয়া পড়ে এবং নাইট্রোজেন-যুক্ত সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় ('সার' দ্র)। তরল বায়ুর আংশিক পাতনের দ্বারা বায়ু হইতে প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন আহরণ করা হয়। নাইট্রোজেন গ্যাস দাহ্য নহে। নাইট্রোজেন গ্যাসকে –১৪৯° সেণ্টিগ্রেডে ও ২৭·৫৪ বায়ুমণ্ডল-চাপে তরলীকৃত করা যায়।

গোলোকেন্দু ঘোষ

বায়ুমণ্ডল ভূগোলককে আবৃত করিয়া বায়ুমণ্ডল ঊর্ধ্ব

বায়ুমণ্ডল

আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। অভিকর্ষ শক্তির দ্বারা ইহা পৃথিবী-সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে ('বায়ু' দ্র)।

অনুমান করা হয়, বায়ুমণ্ডল পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে কম-বেশি ১৬০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বাকাশ জুড়িয়া পৃথিবীকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। বায়ুমণ্ডলকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ ক্ষুব্ধমণ্ডল বা ক্ষুব্ধস্তর (ট্রোপোস্ফিয়ার)। এই স্তরটি নিরক্ষরেখার উপর ১৬ কিলোমিটার এবং মেরু-প্রদেশদ্বয়ের উপর প্রায় ৬ কিলোমিটার ঊর্ধ্ব অবধি বিস্তৃত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হইল স্থানভেদে ও ঋতু-ভেদে প্রতি ১০০ মিটার উচ্চতায় কমবেশি ০·৪°—০·৮° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপের হ্রাস। ভূপৃষ্ঠের সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত নিরত ও অনিরত বায়ুপ্রবাহ কর্তৃক এই স্তরটি সদা আলোড়িত। ইহার পরে ট্রোপোপস। ইহা ক্ষুব্ধস্তর ও স্তব্ধস্তর বা শান্তমণ্ডলের (স্ট্রাটোস্ফিয়ার) সীমানা-নির্দেশক। স্তব্ধস্তরের উত্তাপবণ্টন ক্ষুব্ধস্তরের বিপরীত। এই স্তরে উত্তাপের তারতম্য স্বল্প পরিলক্ষিত হয়। শব্দা-তিরিক্ত দ্রুত গতিবেগসম্পন্ন আকাশযানের নিমিত্ত এই স্তরটি অত্যন্ত উপযোগী। ইহার পরেও বায়ুমণ্ডলে আয়নিতস্তর (আয়নোস্ফিয়ার) প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর লক্ষিত হয়। এইসব অংশে বায়ুস্তর অত্যন্ত হাল্‌কা। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে এই নিম্নস্তর অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বায়ুমণ্ডলের প্রবাহ ও গতি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সৌরশক্তিদ্বারা প্রভাবিত।

সৌরশক্তির দ্বারা উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের বিকিরিত উত্তাপেই বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে যত উচ্চে ওঠা যায় ততই উত্তাপের হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, যদিও স্থানভেদে বিশেষ পরিস্থিতিতে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায় (ইনভারসন অফ টেম্পারেচার)। স্থানীয় পরিবেশের বিভিন্নতায়, অক্ষাংশভেদে, স্থলভাগ ও জলভাগের অসমবণ্টনে ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতায় পৃথিবীপৃষ্ঠ সর্বত্র সমভাবে উত্তপ্ত হয় না। সেইহেতু উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলও সর্বত্র সমভাবে উত্তপ্ত হয় না। উপরন্তু পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি, সূর্যরশ্মির তীব্রতা ও স্থিতিকাল, স্থানভেদ ও ঋতুভেদ বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের তারতম্য ও পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

উত্তাপের অসমবণ্টনে বায়ুমণ্ডলে বায়ুর চাপের বিভিন্নতা দেখা যায় এবং পরিণতিতে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ুমণ্ডলের সর্বোচ্চ স্থান হইতে সমুদ্রপৃষ্ঠ পর্যন্ত সমগ্র বায়ুমণ্ডলের গড় চাপ ১ বর্গ ইঞ্চি আয়তনবিশিষ্ট স্থানের উপর ১৪·৭ পাউণ্ড বা ১০১৩·২ মিলিবার। বায়ুচাপ নির্ধারণ যন্ত্রে ইহা ২৯·৯২ ইঞ্চি অথবা ৭৬০ মিলিমিটার মাপে সূচিত হয়।

উচ্চতার সহিত বায়ুমণ্ডলের চাপেরও পরিবর্তন হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে কয়েক হাজার মিটার পরিমিত স্থানের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব সর্বাধিক। এই স্থানে প্রতি ২৭৪—৩০৫ মিটার (৯০০′—১০০০′ ফিট) উচ্চতায় কম-বেশি ১″ ইঞ্চি অথবা ৩৪ মিলিবার পরিমাণ বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। ইহার উপরকার বায়ুমণ্ডল এতই হাল্‌কা যে বায়ুর চাপ তথায় অতিশয় অল্প।

প্রকৃতি অনুযায়ী বায়ুচাপকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা চলে, যথা, উচ্চ চাপ ও নিম্ন চাপ। উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ঘন। স্বভাবতঃ নিজ ঘনত্ব এবং অভিকর্ষ শক্তির বলে বায়ু উপর হইতে নিম্ন অভিমুখে চাপ সৃষ্টি করে। ফলে উচ্চচাপ অঞ্চলের বায়ু চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। নিম্ন-চাপ অঞ্চলে ইহার বিপরীত পরিস্থিতি দৃষ্ট হয়। তথায় বায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। সেইজন্য ইহার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ায় বায়ু হাল্‌কা হইয়া ঊর্ধ্বাভিমুখী হয়। নিম্নস্থ বায়ুশূন্যতা পূরণ করিতে পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চচাপ অঞ্চলের বিক্ষিপ্ত বায়ুই ছুটিয়া আসে। কাজেই নিম্নচাপ অঞ্চলে চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু কেন্দ্রীভূত হয়। নিম্ন চাপের তীব্রতা অনুসারে বায়ুপ্রবাহের বেগও নির্ধারিত হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন বায়ুর চাপসৃষ্টির মূলে দুইটি কারণ বর্তমান। প্রথমটি উত্তাপজনিত (থার্মাল) এবং দ্বিতীয়টি গতিবেগজনিত (ডাইনামিক ফ্রিক্‌শন)।

সম্পূর্ণ ভূগোলক একই জাতীয় উপাদানে গঠিত বলিয়া যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠকে প্রধানতঃ সাতটি চাপ বলয়ে বিভক্ত করা চলে। প্রথমটি নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্নচাপ বা শান্ত বলয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি নিরক্ষরেখার দুইপার্শ্বে উপক্রান্তীয় অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়। চতুর্থ এবং পঞ্চমটি মেরুবৃত্তস্থিত দুই নিম্নচাপ অঞ্চল। ষষ্ঠ এবং সপ্তমটি মেরুপ্রদেশদ্বয়ের উচ্চ-চাপ অঞ্চল। নিরক্ষীয় অঞ্চলের নিম্ন চাপ এবং মেরুদ্বয়ের উচ্চ চাপ সৃষ্টির মূলে উত্তাপজনিত কারণটিই প্রধান। প্রথমটির ক্ষেত্রে উত্তাপের প্রাচুর্য এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে উত্তাপের স্বল্পতা দায়ী। উপক্রান্তীয় উচ্চ চাপ ও মেরু-বৃত্তের নিম্ন চাপ সৃষ্টির মূলে পৃথিবীর গতি এবং বায়ু-প্রবাহের কেন্দ্রাতিগ শক্তিই অধিকতর কার্যকর।

নিরক্ষরেখা হইতে ৫°—১০° উত্তর এবং দক্ষিণ জুড়িয়া নিরক্ষীয় শান্তবলয়টি অবস্থিত। এই অঞ্চলে সূর্য সংবৎসরই প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এইরূপ অবারিত উত্তাপের প্রাচুর্যে জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুস্তর উত্তপ্ত ও হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, তাহারই ফলে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বায়ুর গতি ঊর্ধ্বমুখী হয় বলিয়া এই স্থানে সমান্তরাল বায়ুপ্রবাহ কম পরিলক্ষিত হয়। বায়ুপ্রবাহের স্বল্পতা এবং অনিশ্চয়তার জন্য এই অঞ্চল-টিকে শান্তবলয় বলে। উপরে উঠিয়া ক্রমক্ষীয়মাণ বায়ু-চাপের দরুণ এই বাতাস ছড়াইয়া পড়ে ও শীতল হয় এবং মেরুপ্রদেশমুখী দুইটি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি করে। এই

বায়ুপ্রবাহের একটি অংশ মোটামুটি উপক্রান্তীয় অঞ্চলে (৩০° উত্তর ও দক্ষিণ) অবতরণ করে এবং সেখানে উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। ইহা অনেক সময় অশ্ব অক্ষাংশ নামেও খ্যাত হয়। ইহাকেও শান্তবলয় বলা চলে। এই উচ্চচাপ বলয় উভয়পার্শ্বে বিচ্ছুরিত বায়ু হইতে দুইটি নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে ঃ ১. নিরক্ষীয় শান্তিবলয় অভিমুখী আয়নবায়ু ; ২. মেরুবৃত্তস্থিত নিম্নচাপঅভিমুখী পশ্চিমা বায়ু ('রোরিং ফোয়ার্টিজ' বা 'গর্জনশীল চল্লিশা' বলিয়া অভিহিত)।

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে মেরুপ্রদেশের বায়ুমণ্ডলেও আবর্ত সৃষ্টি হয় এবং সেখানে নিম্ন চাপ সৃষ্টির উপক্রম হয়। উচ্চচাপ অঞ্চল হইতে বিচ্ছুরিত বায়ু কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে মেরুবৃত্তের নিকটে প্রভূতরূপে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলেই সেখানে প্রবল শৈত্য সত্ত্বেও নিম্ন চাপের উদ্ভব হয়। সুমেরু ও কুমেরু তীব্র শীতলতার জন্য উচ্চচাপ অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। দুই মেরুকেন্দ্র হইতে মেরুবায়ু বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের লম্বভাবে অবস্থান পরিবর্তিত হয়। তাহার ফলে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের চাপবলয়গুলি এবং পরিণতিতে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ অঞ্চলও ঋতু অনুযায়ী কিঞ্চিৎ উত্তরে বা দক্ষিণে স্থান পরিবর্তন করে।

বায়ুমণ্ডলস্থিত নির্দিষ্ট চাপবলয়গুলির অবিচ্ছিন্নতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। তাহার ফলে চাপকেন্দ্র (Pressure Cell) সৃষ্টি হয়। মহাদেশ ও মহাসমুদ্র অসমভাবে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। ফলে দেখা যায় যে গ্রীষ্মকালে নিম্নচাপ বলয়গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবলমাত্র মহাদেশেই সীমাবদ্ধ। সমুদ্রে তখন আপেক্ষিক উচ্চ চাপ। শীতকালে মহাদেশের অভ্যন্তরে উচ্চ চাপ এবং সমুদ্রে আপেক্ষিক নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয়। ফলতঃ বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে বিভিন্ন ঋতুতে কতকগুলি আঞ্চলিক বা স্থানীয় বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। তন্মধ্যে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরে বায়ুপ্রবাহ অন্যপ্রকার। ইহা অনুমিত হয় যে ঊর্ধ্বাকাশে বায়ুমন্ডলে বায়ুচাপের অবস্থান অন্যরূপ। তথায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরই বিশাল উচ্চ চাপ সৃষ্টি হইয়াছে এবং মেরুদ্বয়ের উপর বায়ুচাপ স্বল্প। কাজেই ঊর্ধ্বাকাশে মেরুপ্রদেশদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া বিপরীত বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্র জিতেন্দ্রকুমার গুহ, মহাকাশ-পরিচয়, কলিকাতা, ১৯৬৯ ; Vernor C. Finch and Glenn T. Trewartha, *Physical Elements of Geography*, London, 1949.

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

বায়োকেমিস্ট্রি রসায়ন দ্র

বার সপ্তাহের বিভিন্ন দিন, রবি সোম ইত্যাদি। বার বা সপ্তাহের উৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে জ্যোতির্বিদ্যা বা গ্রহবিজ্ঞানের ইহা কোনও অংশ নহে।

সাতদিনের সপ্তাহের কল্পনা আদিতে ছিল না। প্রাচীন মিশরীয়গণের মধ্যে দশদিনাত্মক চক্রের প্রচলন ছিল, বৈদিককালে ভারতে ছয়দিনের চক্রের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়দের মধ্যে মাসের ১ম, ৮ম, ১৫শ এবং ২২শ দিনগুলি ধর্মকার্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, ইহা একপ্রকার সপ্তদিবসাত্মক চক্র। কিঞ্চিন্ন্যূন সাড়ে সাত দিবসে চান্দ্রমাসের একচতুর্থাংশ হয়, এবং দৃশ্য গ্রহও ৭টি। ইহা হইতে সপ্তদিবসাত্মক চক্রই ক্রমে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। এই প্রকার সপ্তদিবসাত্মক চক্রের ধারাবাহিক ব্যবহার কিন্তু আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের পরে।

বেদ বা মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের কোথাও বারের উল্লেখ নাই। মহাভারতের যে স্থানে বার শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তথায় উহা পালা অর্থে ব্যবহৃত।

চ্যালডীয় বা গ্রীক জ্যোতির্বিদগণ খ্রীষ্ট জন্মের কিছু পূর্বে এই সপ্তদিবসাত্মক বারচক্রের প্রবর্তন করেন, ইহাই অনুমিত হয়। পরে এই বারচক্র ইহুদিগণ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ইহার ব্যবহার সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

সূর্য-সিদ্ধান্তে আছে, 'হোরেশাঃ সূর্যতনয়াৎ অধোঽধঃ ক্রমশস্তথা'—অর্থাৎ দিবসের বিভিন্ন হোরার (hour) অধিপতি শনি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অধঃস্থ গ্রহ হইতে থাকে। এই প্রকারে দিবসের ২৪টি হোরা সংখ্যা এবং তাহাদের অধিপতি গ্রহ সাজাইলে ক্রমান্বয়ে শনি, রবি, চন্দ্র (অর্থাৎ সোম), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই সাতটি বার পাওয়া যায়।

রোমক সম্রাট কনস্টানটিন ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত কালে এক আদেশের বলে এই বার গণনা পদ্ধতি খ্রীষ্টান জগতে প্রবর্তন করেন। তিনি খ্রীষ্টানদের বিশ্রামের দিন বা 'স্যাবাথ' দিনটিও ঈশ্বরের দিনে (অর্থাৎ রবিবার) লইয়া আসেন। ভারতবর্ষেও প্রায় এই সময়েই এই বারচক্র প্রবর্তিত হয় এবং নিঃসন্দেহে উহা প্রতীচ্য দেশ হইতেই আসে। এদেশে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে বারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এবং তৎপরবর্তীকালের শিলালিপিতে বারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যদিও বারের উৎপত্তির জ্যোতিষিক কোনও ভিত্তি নাই, ইহা একটি মনুষ্যরচিত প্রথা মাত্র, তথাপি ইহা পৃথিবীর জনগণের ধর্মীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমাদের দেশের আর্যভটাদি জ্যোতির্বিদগণও

কল্প এবং মহাযুগাদির স্থিতিকাল নির্ণয়ে এই বারচক্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

দ্র M. N. Saha and N. C. Lahiri, *Report of the Calendar Reform Committee,* Calcutta, 1955.

নির্মলচন্দ্র লাহিড়ী

বারভুঁইয়া বঙ্গদেশে পাঠান কররানী বংশীয় সুলতানদের রাজ্য হীনবল হইয়া পড়িলে, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক জমিদার স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করেন। ইঁহাদের সংখ্যা ১২ না হইলেও ইঁহারা 'বারভুঁইয়া' নামে অভিহিত হন। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে ঈশা খাঁ ও বিক্রমপুরে কেদার রায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" এবং কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনার ফলে একজন অদ্বিতীয় বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। প্রতাপাদিত্যের পিতা দাউদ কররানীর কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহার পতনের পরে রাজকোষের অনেক অর্থসহ পলাইয়া আসিয়া সুন্দরবন অঞ্চলে এক জমিদারি পত্তন করেন। প্রতাপাদিত্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নাই, বরং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহা রক্ষা না করায় মোগল সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করে এবং তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্য নৌযুদ্ধে পরাজিত হইলে প্রতাপাদিত্য মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।

বারভুঁইয়ারা কোনও প্রাচীন রাজবংশের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন। পাঠান রাজত্বের অবসানে তাঁহারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আবার মোগল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

বারা বিশিষ্ট লৌকিক দেবতা। বারাপুজো সচরাচর পৌষসংক্রান্তি বা ১ মাঘ আক্ষিণ দিনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ চব্বিশ পরগণায়—বিশেষভাবে দক্ষিণ অংশে—ও হাওড়ায় বারা পুজোর প্রচলন আছে। বারা মূলতঃ ধড়হীন মনুষ্যমুণ্ডমূর্তি, যাহার মাথায় সচরাচর শিরস্ত্রাণ থাকে। বারামুণ্ড কালুরায়, গাজী, বনবিবি, ক্ষেত্রপাল, বাস্তুঠাকুর, প্রভৃতি নানা নামে উল্লেখিত হইলেও দক্ষিণরায়ের বারাই সবিশেষ খ্যাত। দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান লৌকিক দেবতা দক্ষিণরায় স্থানবিশেষে ব্যাঘ্র বা পূর্ণাঙ্গ অশ্বারোহী দিব্যমূর্তিতে পূজিত হইলেও অনগ্রসর অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বারামুণ্ডেই পূজিত হন।

বারাপুজো বন, নদীতীর, বৃক্ষমূল, ক্ষেতের আল প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। বারার জাতাল পুজো হয় গভীর রাত্রে বনের মধ্যে। অনেক ক্ষেত্রে একক পুরুষ বারার পার্শ্ববর্তী জলঘটকে স্ত্রীবারার প্রতীক হিসাবে ধরা হয়। বারা পুজোয় ক্ষেত্রবিশেষে একটি বা অনেকগুলি মুণ্ডমূর্তি স্থাপিত হইলেও সাধারণতঃ যুগ্মমূর্তি (পুরুষ ও নারী) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপরীত লিঙ্গের যুগ্মবারার সহ-অবস্থান লৌকিক উর্বরতাবিষয়ক জাদুবিশ্বাসের প্রতীকরূপে বিবেচিত হয় এবং সেই সূত্রে দক্ষিণরায় বারাকে বাস্তুঠাকুর, ক্ষেত্রপাল বা সুবর্ষণ ও সুফলনের সহায়ক দেবতা হিসাবে পুজো করিবার যৌক্তিকতা বুঝা যায়।

দ্র গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা, ১৯৬৬ খ্রী; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ; বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; Tushar Chattopadhyay, 'Dakshin Roy Cult', *Proceedings of the Fifty-sixth Indian Science Congress,* Part III, Sec. VIII, Bombay, 1969.

তুষার চট্টোপাধ্যায়

বারাণসী (২৫°২০′ উত্তর ও ৮৩° পূর্ব) উত্তর প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ নগরী, গঙ্গার বাম কূলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কিঞ্চিদুচ্চ তীরভূমিতে অবস্থিত। ইহা বারাণসী জেলার সদর শহর। গঙ্গা এইখানে উত্তরবাহিনী। বারাণসী (বা বনারস) শহরের বর্তমান মোট আয়তন প্রায় ৭৩ বর্গ কিলোমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা ছিল ৪৮৯৮৬৪ জন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী পৌরসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বারাণসীর অপর নাম কাশী। কাশীখণ্ডে (৩০/৬৯—৭০) লিখিত আছে যে, বরণা ও অসির সঙ্গমস্থল বলিয়া এই নগরী বারাণসী নামে বিখ্যাত। আরও কথিত হয়, কাশ নামক রাজা এই নগরীর পত্তন করেন (১২০০ খ্রী পূ) এবং তাঁহার নামানুসারে কাশীর নামকরণ হইয়াছে। কাশী ভারতের এক প্রাচীনতম শহর। ইহা ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল। রামায়ণে, মহাভারতে, বৌদ্ধ জাতকে ও জৈন ধর্মগ্রন্থে কাশীর উল্লেখ আছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই কাশী হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত। ইহা সপ্ত তীর্থের ও একান্ন পীঠের অন্যতম। কাশীকে পঞ্চক্রোশ প্রমাণ (কাশীখণ্ড, ২২।৮৩) ও পঞ্চক্রোশী (শিবপুরাণ, ৪।৯।৪) বলা হয়। কাশী প্রদক্ষিণ করা (পঞ্চক্রোশ-পরিক্রমা) পুণ্যকর্ম বিবেচিত হয়। বারাণসী বৌদ্ধদের নিকটেও পুণ্যস্থান। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে

হিউএন্-ৎসাঙ বারাণসীতে ৩০টি বৌদ্ধ বিহার, ৩০০০ ভিক্ষু ও ১০০টি হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বারাণসী দিল্লীর সুলতানদের এবং কালক্রমে মোগল সম্রাটদের শাসনাধীন হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব বারাণসীকে ব্রিটিশদের হাতে অর্পণ করেন। বারাণসীর অপর পারে রামনগরে বারাণসীর মহারাজা বা কাশীনরেশের প্রাসাদ। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব মনসারামকে কাশীর জমিদারি স্বত্ব দিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী কাশীর জমিদারেরা (বলবন্ত সিং, চৈৎ সিং, মহীপনারায়ণ সিং প্রভৃতি) রাজা এবং পরে প্রভুনারায়ণ সিং হইতে মহারাজা উপাধিতে বিভূষিত হইতেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরাজ্য পুরাপুরি দেশীয় রাজ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীরাজ্যকে উত্তর প্রদেশের অংগীভূত করা হয়।

বারাণসী শিল্প ও বাণিজ্যের এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। রেশমী বারাণসী শাড়ী, কিংখাবের কাজ, সোনারূপার তারের ও বিদরির কাজ, অলংকৃত ও উদ্‌গত পিতলের সামগ্রী, গালার আস্তরণযুক্ত কাঠের খেলনা প্রভৃতির জন্য কাশী প্রসিদ্ধ। বারাণসীতে ডিজেল লোকোমোটিভের একটি বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের, ভারতীয় দর্শনের এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রাদির চর্চার ও অধ্যাপনার জন্য বারাণসীর টোল ও চতুষ্পাঠীগুলি প্রসিদ্ধ। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে জোনাথান ডানকান বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে 'কুইনস কলেজ' মেজর কিটো কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার সংস্কৃত বিভাগ বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের নামের সংগে জড়িত। এখানকার সংগ্রহশালায় অনেক মূল্যবান সংস্কৃত পুথি আছে। অ্যানি বেসান্টের উদ্যোগে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন মালব্যের চেষ্টায় বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত অন্যতম বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাশী বিদ্যাপীঠ। সংস্কৃত চর্চার সংবর্ধনে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতধর্মমহামণ্ডল, কাশীরাজ ট্রাস্ট প্রভৃতি সংস্থার কাজ উল্লেখযোগ্য। ভূকৈলাসের জমিদার মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর ইংরেজী শিক্ষার জন্য কাশীতে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক বিদ্যায়তন স্থাপন করেন। সংগীতে বারাণসীর বিশিষ্ট ঘরানা ভারতবিখ্যাত। বারাণসী থিওসফিক্যাল সোসাইটির ভারতীয় কেন্দ্র। ইহা হিন্দী সাহিত্যচর্চারও এক বিশিষ্ট কেন্দ্র। এখানকার নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে 'হিন্দী বিশ্বকোশ' প্রকাশিত হইয়াছে।

বারাণসীর গংগাতীরে প্রায় ৮০টি ঘাট আছে। তন্মধ্যে মণিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, অসি ঘাট, বরণাসংগম ও পঞ্চগংগা ঘাট—এই ৫টি ঘাট পঞ্চতীর্থ নামে পুণ্যার্থীদের স্নানের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কাশীর রাজঘাটে গুপ্তযুগের মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বারাণসীতে বর্তমানে ১৫০০-র বেশি মন্দির আছে। পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটি ঔরংগজেবের রাজত্বকালে বিধ্বস্ত হয়। বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দিরটি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রানী অহল্যাবাঈয়ের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। মহারাজা রণজিৎসিংহ ইহার স্বর্ণশিখরটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অন্নপূর্ণার মন্দির, কালভৈরব ও সাক্ষী বিনায়ক প্রভৃতি মন্দিরগুলি এবং বহু ঘাট মারাঠা নৃপতিদের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত হইয়াছিল। দুর্গামন্দির রানী ভবানীকর্তৃক অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়। সাধু সমাগমের জন্য বারাণসী বিখ্যাত।

বারাণসীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য ঃ ১৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জয়সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির; ঔরংগজেবের প্রতিষ্ঠিত মসজিদ; তুলসীমানস মন্দির; রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম; ভারতমাতা মন্দির; রামনগর দুর্গাপ্রাসাদ ইত্যাদি।

দ্র কাশীখণ্ডম্, স্বামী সত্যানন্দ-প্রকাশিত, বেনারস, ১২৯৬ বংগাব্দ; মন্মথনাথ চক্রবর্তী, কাশীধাম, কলিকাতা, ১৯২২; E. B. Havell, *Benares, The Sacred City*, London, 1905; A. S. Altekar, *Banaras, Past and Present*, Benares, 1943.

দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০—১৯৫৯ খ্রী)। প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী। জন্ম লণ্ডনের উপকণ্ঠে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ, মাতা স্বর্ণলতা। অগ্রজ ভ্রাতা অরবিন্দ ঘোষ। ক্রয়ডনের (Croydon) জন্ম নিবন্ধ অনুসারে বারীন্দ্রের নাম 'ইম্যানুয়েল ম্যাথিউ ঘোষ'। দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর সাহচর্যে তাঁহার কৈশোর অতিবাহিত হয়। তিনি দেওঘর বিদ্যালয়, পাটনা কলেজ ও ঢাকা জগন্নাথ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। দেওঘর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু ও সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁহার মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বরোদায় অরবিন্দের নিকট বিপ্লবের দীক্ষালাভ করিয়া তিনি বিপ্লবী দল গঠনের উদ্দেশ্যে অরবিন্দ কর্তৃক বাংলায় প্রেরিত হন। প্রথমে তিনি হতাশ হইয়া বরোদায় ফিরিয়া যান এবং ধর্ম ও রাজনৈতিক সাহিত্যের অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন ও বিপ্লব আন্দোলনের প্রসারে অগ্রণী হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহায়তায় বিখ্যাত 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বিপ্লবের কর্মপন্থা লইয়া পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়া মাণিকতলার মুরারিপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে এক বোমার কারখানা স্থাপন করেন। জসিডিতে ও আরও নানা স্থানে তিনি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। অরবিন্দই ছিলেন বারীন্দ্রের দলের নেতা। বারীন্দ্রের নেতৃত্বে শুরু হয় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড। বারীন্দ্রের নির্দেশেই ছোটলাট অ্যানড্রু ফ্রেজারকে হত্যার চেষ্টা হয় এবং ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে যাইয়া বোমার দ্বারা ভুলক্রমে মিসেস ও মিস্ কেনেডিকে হত্যা করেন (৩০ এপ্রিল, ১৯০৮ খ্রী)।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বারীন্দ্রকুমার তাঁহার বিপ্লবী সহচরগণসহ মাণিকতলার বাগানে গ্রেপ্তার হন। আলিপুর আদালতের বিচারে তাঁহার ফাঁসির হুকুম হয় কিন্তু অবশেষে আপিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্তে সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার ফলে বারীন্দ্রও মুক্তিলাভ করেন (১৯২০ খ্রী)। প্রথমে তিনি বাংলায় ফিরিলেন, পরে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ আশ্রমে ছয় বৎসর যাপন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বারীন্দ্রকুমার বাংলায় স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্র শৈলজা ঘোষকে বিবাহ করেন।

আন্দামান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বিখ্যাত 'বিজলী' পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯২০ খ্রী)। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় ইংরেজী সাপ্তাহিক 'দি ডন অফ ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে রামানন্দ লেকচারার নিযুক্ত করেন। তাঁহার 'মানবাধিকার ও তাহার ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধমালার গতানুগতিকতামুক্ত অভিনব চিন্তাধারার পরিচয় ও নূতন পথের ইঙ্গিত আছে।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক : 'দ্বীপান্তরের বাঁশি' ; 'আমার আত্মকথা' ; 'পথের ইঙ্গিত' ; 'ঋষি রাজনারায়ণ' ; 'ভারত কোন্ পথে ?' ; 'অগ্নিযুগ' ; *'The Tale of My Exile'* ; *'Sri Aurobindo'*।

অজিতকুমার সুর

বারুদ গোলাগুলি বা আতশবাজি ঊর্ধ্বাকাশে বা দূরে উৎক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। এই মিশ্রণ এমন হওয়া প্রয়োজন যে আঘাত বা অগ্নিসংযোগ করিলে দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া হইবে এবং এই বিক্রিয়ার ফলে অকস্মাৎ স্বল্পায়তন কঠিন বারুদ বহুগুণ আয়তনের গ্যাসে পরিণত হইবে। বারুদ সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। বিপুল পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হওয়ামাত্র সেই প্রকোষ্ঠে প্রচণ্ড চাপ জন্মায়। প্রকোষ্ঠের রন্ধ্রপথ দিয়া সেই গ্যাস তীব্রবেগে নির্গত হইতে এবং সম্মুখস্থ গোলাগুলি বা আতশবাজিকে তীব্রবেগে উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকে। ৩৫ মিলিমিটার ব্যাসের শক্ত লোহার নলে প্রতি সেন্টিমিটারে ১·০৬ গ্রাম বারুদ ঠাসিয়া অগ্নিসংযোগ করিলে তজ্জনিত বিক্রিয়ার উৎপন্ন গ্যাসের নির্গমবেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে ৪২০ মিটার। হাউইজাতীয় বাজিতে গ্যাসের নির্গমপথ নিম্নমুখী। গ্যাস বেগে নির্গত হইতে থাকিলে তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় হাউই ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে। বোমার মধ্যেও বারুদ, কিন্তু বোমাটির খোল এমন বস্তুর দ্বারা নির্মিত যে গ্যাস উৎপন্ন হইয়া চাপ দেওয়া মাত্র তাহা বহু খণ্ডে ভাঙিয়া যায় এবং সেই খণ্ডগুলি সবেগে চতুর্দিকে প্রক্ষিপ্ত হয়।

অনেকের মতে চীনারাই সর্বপ্রথম বারুদ ব্যবহার করিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, ১৪শ শতাব্দীর প্রথম পর্বে জার্মান সাধু বের্থোল্ড শোয়ার্ৎস্ এবং ইংরেজ ধর্মযাজক রোজার বেকন বন্দুকে বারুদ ব্যবহারের উপযোগিতা নির্দেশ করেন। ভারতবর্ষে বাবরের আগমনের পর হইতেই ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদের ব্যবহার শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বন্দুকে ও কামানে ব্যবহৃত বারুদ ছিল অঙ্গার, গন্ধক ও সোরা চূর্ণের মিশ্রণ। নানা অসুবিধা দূর করিবার জন্য ক্রমে এই মিশ্রণ-চূর্ণের পরিবর্তে নির্দিষ্ট আকারে মিশ্রণের দানার ব্যবহার প্রচলিত হইতে লাগিল।

গান-কটন (নাইট্রিক অ্যাসিড ও তুলার বিক্রিয়ার উৎপন্ন) আবিষ্কারের পর হইতে যুদ্ধাস্ত্রে বারুদের জন্য ইহাই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা গন্ধক-সোরা-অঙ্গার চূর্ণের মত সহজে ভিজিয়া যায় না এবং ইহাতে অনেক কম ধূম উৎপন্ন হয়। ফাঁকা আওয়াজের গুলিতে, খনিতে বিস্ফোরকরূপে এবং আতশবাজিতেই এখন গন্ধক-অঙ্গার-সোরা মিশ্রিত বারুদের ব্যবহার বেশি। গান-কটন ও এই জাতীয় বিস্ফোরক উদ্বায়ী দ্রাবকের সাহায্যে লেই-এর মত করিয়া প্রশস্ত পাত্রে ঢালিয়া রাখিলে শুকাইয়া পাতলা চামড়ার মত হয় ; তাহার টুক্‌রা দিয়া আজকাল যুদ্ধাস্ত্রের বারুদ তৈয়ারি হইতেছে।

কানাইলাল মুখোপাধ্যায়

বারৌণি মুঙ্গের জেলার বেগুসরাই মহকুমার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু শহর ও প্রসারশীল শিল্পনগরী (২৪°২৩′ উত্তর ও ৮৪°৪৫′ পূর্ব)। রেলওয়ে জংশন হিসাবে ও ইহার তৈল শোধনাগারের জন্যই বর্তমানে ইহার খ্যাতি। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুসারে বারৌণির

আয়তন প্রায় ১১·৮ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা রেলওয়ে কলোনি সহ ৪৫৯৮৯ জন।

উত্তর বিহারের ক্রমবর্ধমান শক্তি-চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ১৩·৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে একটি ৩০ মেগাওয়াট শক্তি-উৎপাদনক্ষম বাষ্প-চালিত শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পরীক্ষামূলক ভাবে এখানে একটি ১০ লক্ষ টনের তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ লক্ষ টনের আর একটি তৈল শোধনাগার ও একটি কেরোসিন শোধনাগার এবং তৃতীয় পর্যায়ে একটি পিচ্ছিল তৈল উৎপাদন কেন্দ্র (Lubricating Oil Plant) স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে গৌহাটি ও বারৌণির মধ্যে নলপথ (Pipe Line) স্থাপিত হয়। নলপথ দ্বারা বারৌণির সহিত কানপুর ও হলদিয়ার সংযোগ সাধনের কার্য চলিতেছে। বারৌণির নিকট গঙ্গার উপরে মোকামা রেল ও সড়ক সেতু স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানের রেলওয়ে জংশনটি বর্তমানে উত্তর-পূর্ব 'ন্যারো গেজ' রেলওয়ে ও পূর্ব রেলওয়ের 'ব্রড গেজ'-এর সংযোগ সাধন করিয়াছে। বারৌণি রেলওয়ে স্টেশন বিহারের সহিত আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগের উন্নতিসাধন করিয়াছে।

বারৌণিতে প্রাপ্ত প্রচুর মূর্তির মধ্যে কারুশিল্পের দিক হইতে একটি সূর্যমূর্তি উল্লেখযোগ্য। এই সূর্য-মূর্তিটি 'রয়্যাল আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটি মিউজিয়াম'-এ রক্ষিত হইয়াছে। ইহার নির্মাণ-কাল গুপ্ত ও পাল রাজত্বের অন্তর্বর্তী কোনও সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়।

দ্র P. C. Roychowdhury, *Bihar District Gazetteer of Monghyr*, Patna, 1960.

দুর্গাদাস সাহা

বার্গ্‌সঁ (১৮৫৯—১৯৪১ খ্রী) আঁরি লুই বার্গ্‌সঁ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অধ্যাপক হিসাবে তিনি বহু-খ্যাত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফরাসী আকা-দেমির সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

বার্গ্‌সঁর মতে পরিবর্তন নিত্য (পার্‌মানেন্স) অপেক্ষা অধিকতর সত্য ; তাই কাল তাঁহার কাছে মহত্তর সত্যের দাবী করে। তাঁহার মতে মানুষের ইচ্ছা স্বাধীন ও স্ববশ। তিনি বলেন দর্শনে সাক্ষাৎ প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতিই একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভের পন্থা। তত্ত্বার্থ জানিতে হইলে আমাদিগকে বিচারনিরপেক্ষ কোনওরূপ জ্ঞানসাধনের আশ্রয় লইতে হইবে এবং সাক্ষাৎ প্রতীতি বা অপরোক্ষানুভূতিই হইল এই ধরণের জ্ঞানসাধন। এই জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্তাটুকু প্রকাশ করে। নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনশীলতাই হইল তাঁহার মতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের মৌল তত্ত্ব ('রিয়ালিটি') এবং সাক্ষাৎ প্রতীতির মাধ্যমে ইহা জ্ঞাতব্য। এই পন্থায় জ্ঞাতা যেন জ্ঞেয় বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্ভাবভাবিত হয় এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একাত্ম হইয়া যায়। এইভাবে কোনও জ্ঞান-রূপ সহানুভূতির দ্বারা যদি আমরা বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করিতে পারি, তবেই তাহার স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়।

তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য হইল : *Time and Free Will* (১৮৮৯ খ্রী), *Matter and Memory* (১৮৯৬ খ্রী), *Creative Evolution* (১৯০৭ খ্রী), *The Two Sources of Morality and Religion* (১৯৩২ খ্রী)।

সুধীরকুমার নন্দী

বার্জেস, জেমস (১৮৩২—১৯১৬ খ্রী) প্রখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতাত্ত্বিক। জন্ম ১৪ আগস্ট, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। গ্লাসগো ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং প্রথমে কলিকাতায় ও পরে বোম্বাইয়ে শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন। বোম্বাইয়ে গিয়া তিনি ভারতের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হন এবং এ বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনো-নিবেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিম ভারতের ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে জেনিভা ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি স্বপ্রবর্তিত প্রসিদ্ধ 'ইন্ডিয়ান অ্যান্টি-কোয়ারি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন' ও 'এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা' প্রভৃতি পত্রিকার এবং প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার রিপোর্টগুলিতে তাঁহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার গবেষণার প্রধান বিষয় ছিল ভারতের গুহা স্থাপত্য। এ বিষয়ে তিনি বহু প্রামাণিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন লেখমালার সম্পাদনা তাঁহার অন্যতম কীর্তি। ৩ অক্টোবর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার লিখিত প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক রচনা : *The Rock-cut Temples of Elephanta*, 1871; *Notes on the Bauddha Rock Temples of Ajanta and Bagh*, 1879; *Cave Temples of India* (with J. Fergusson), 1880; *The Buddhist Stupas at Amaravati and Jaggayapeta*, 1887; Gandhara Sculptures, *Jour-*

nal of Indian Art, 1898-1900; *Buddhist Art in India*, 1901; *The Architectural Antquities of Northern Gujerat* (with H. Cousens) 1903; *The Ancient Monuments, Temples and Sculptures of India*, 2 vols. 1897-1911.

বার্ধক্য বার্ধক্যের সম্পূর্ণ সুসংগত সংজ্ঞা দেওয়া এখনও সম্ভব নয়, কারণ ইহার মূলগত কারণের অনেক কথা এখনও ভাল জানা নাই। মোটামুটিভাবে বার্ধক্য বলিতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে দেহযন্ত্রের এমন একটি ক্রমাবনতি বুঝায় যাহা সার্বজনীন ও যাহার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। বৃদ্ধি শেষ হইলে জীব ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইতে থাকে। বৃদ্ধের জরাগ্রস্ত অবস্থাই বার্ধক্য।

বার্ধক্যের জরাচিহ্নগুলি সুপরিচিত। এ সময়ে দেহের ত্বক নিষ্প্রভ, কর্কশ ও শুষ্ক হইয়া ক্রমে বলিরেখায় ঢাকিয়া যায়। ত্বকের নীচে সংযোজক দেহকলাগুলিতে চর্বি কমিয়া যায় ও উহার স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। ঘর্মগ্রন্থিগুলি ভালভাবে কাজ না করায় দেহতাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমিয়া যায়। চুল পাকে ও সাধারণভাবে চুলের বৃদ্ধিও কমে। মাথায় টাক পড়িবার প্রবণতা হয়, আবার কান প্রভৃতি কেশবিরল জায়গাগুলিতে নূতন করিয়া চুল ওঠে। হাড়ের ক্যালসিয়াম ক্রমে কমিতে থাকায় হাড় ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা বাড়ে। ত্বক, ধমনী, শিরা প্রভৃতি স্থানে ক্যালসিয়াম বাড়িয়া ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। রক্তচাপের উপর ইহার প্রভাব অনিষ্টকর। ৪০ বৎসর বয়সে সাধারণতঃ চোখের উপযোজন ক্ষমতা (অ্যাডাপ্টেশন) কমিয়া দৃষ্টিক্ষীণতা হয়। বৃদ্ধ বয়সে কিছু লোকের চোখে ছানি পড়ে। লোকে কানে কম শুনিতে আরম্ভ করে ও উচ্চগ্রামের কিছু ধ্বনির অনুভূতি হারায়। স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করার শক্তি কমিয়া যাওয়ায় খাদ্য স্বাদহীন ও গন্ধহীন মনে হয়। সকল ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা কমিতে থাকায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু উপভোগ করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। ইহার ফল মানসিক জগতে প্রতিফলিত হইতে থাকে। বার্ধক্যে পেশীশক্তি ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কোনও শ্রমসাধ্য কাজ করিবার সময় বিবিধ পেশীর জটিল ক্রিয়া-সমন্বয়ের ক্ষমতা কমিয়া যায়। যৌবনান্তে পাকস্থলীর পাচকরস প্রতি ১০ বৎসরে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ কমিতে থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্রান্ত্রের পরিপাকশক্তি এত হ্রাস পায় না। পরিপাকের ক্ষমতা কমিলেও বৃদ্ধ বয়সে অল্পপরিমাণ খাদ্যেই দেহরক্ষা হয়। পৌষ্টিক নালীর ব্যাপক পেশীশৈথিল্য ঘটিলে বৃহদন্ত্র মলের চাপে বড় হইতে থাকে ও সেখানে জীবাণুঘটিত পরিবর্তনের ফলে নানা অ্যামাইন উৎপন্ন হইয়া শরীরের ক্ষতি করে। বৃদ্ধের ফুসফুসের সর্বাধিক বায়ুধারণক্ষমতা ও সর্বোচ্চ শ্বসনক্ষমতা কমিয়া যায়। এজন্য শ্রমসাধ্য কাজের সময় অক্সিজেন ঘাটতির সম্ভাবনা থাকে। বার্ধক্যে রক্তসংবহনতন্ত্রের কার্যের অবনতি মৃত্যু ঘটাইতে পারে। এ সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের উৎপাদনক্ষমতা ও রক্তবাহগুলির স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া যায়। রক্তসঞ্চালনক্রিয়া ব্যাহত হওয়ায় সকল অঙ্গের কর্মক্ষমতাই কমিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনগতি অল্পশ্রমেই বাড়িয়া যায়, কিন্তু কঠিন শ্রমসাধ্য কাজের সময়ে সে স্পন্দনগতি এত বাড়ে না যাহাতে পেশীতে উপযুক্ত পরিমাণে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ হইতে পারে। পরিশ্রমের অবসাদ দূর করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্যক্তির অধিক বিশ্রাম প্রয়োজন। ৪০ হইতে ৫০ বৎসর বয়সে নারীর ও উহা হইতে আরও অধিক বয়সে পুরুষের প্রজনন শক্তি লোপ পায়। স্মরণশক্তি, মস্তিষ্কচালনার ক্ষমতা এবং নার্ভবাহিত উদ্দীপনার গতিবেগ বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে। ৩০—৩৫ বৎসর বয়স হইতে প্রতি বৎসর শরীরের গড় কর্মক্ষমতা শতকরা ০·৮—০·৯ ভাগ হারে কমিতে দেখা যায়।

বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ব্যাধির ফলে বার্ধক্যচিহ্নগুলিও প্রভাবিত হইতে পারে। এই জন্য দৈহিক ও মানসিক অবনতির পূর্বাপর ধারা নির্ধারণ করা কঠিন। সাধারণতঃ দ্রুত ও কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হ্রাস পাইতে থাকে। যে সকল কাজে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও বহু পেশীর সুনিয়ত সুসংগত ব্যবহার প্রয়োজন, বৃদ্ধ বয়সে সে কাজগুলি করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়। এইজন্য মুষ্টিযোদ্ধা ৩০ বৎসরের পূর্বেই বুঝিতে পারে যে তাহার অবসর গ্রহণের কাল আগতপ্রায়, অথচ একজন বিচারকের বিচারক্ষমতা পঞ্চাশোর্ধ্বেও অটুট থাকে। আঘাত ও শারীরিক পীড়ন সহ্য করা অথবা প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে মানাইয়া লইবার ক্ষমতা বেশি বয়সে কমিয়া যায়। শারীরবৃত্তিগুলি পরস্পর যোগসূত্রে সম্বন্ধ, তাই অঙ্গবিশেষের বৈকল্যের প্রভাব ক্রমে সারা দেহে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং দেহাভ্যন্তরে সমস্থিতি (হোমিওস্ট্যাসিস) রক্ষা করা কঠিনতর হয়। ইহা বার্ধক্যজনিত মৃত্যুর একটি কারণ। কিন্তু সকল মৃত্যুই বার্ধক্যের জন্য হয় না; দুর্ঘটনা ও আকস্মিক কারণেও মৃত্যু হইতে পারে। কোন্ মৃত্যুটি বার্ধক্যের জন্য ও কোন্ মৃত্যুটি আকস্মিক কারণে ঘটিয়াছে তাহা নির্ভুলরূপে নির্ণয় করা কঠিন। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে উন্নত স্বাস্থ্যবিধি ও সুচিকিৎসার গুণে অল্পবয়সের লোকের মৃত্যুসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়াছে, কিন্তু ৭০ হইতে ৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধদের মৃত্যুর হার তেমন কমে নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পূর্বে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও সুষম খাদ্য আহার না করায় নানা রোগে ভুগিয়া যাঁহারা প্রকৃত বৃদ্ধ হইবার আগেই মারা যাইতেন, বর্তমানে বিজ্ঞানসম্মত প্রতিকারপন্থা আবিষ্কারে তাঁহাদের দীর্ঘ জীবনের সম্ভাবনা বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বার্ধক্যের বয়স অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার পন্থা আজও অনাবিষ্কৃত।

এককোষী প্রাণী বারবার কোষ বিভাজনের দ্বারা বার্ধক্যকে এড়াইয়া যায়। কিছু এককোষী প্রাণী পর-নিষেকের সাহায্যে নূতন জীবনীশক্তি আহরণ করে। ইহারা এক অর্থে অমর, কারণ ইহারা আদিম ক্রোমসোম-ধারার বাহক। বহুকোষী প্রাণীতেও জনন-কোষগুলি একই অর্থে অমর। অন্য অংশগুলি সুসম্বন্ধ শারীরবৃত্তীয় কর্মসূত্রে যুক্ত থাকিয়া প্রজননধারা অব্যাহত রাখে মাত্র। উচ্চতর প্রাণীতে এই অংশে চেতনা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণগুলি অভিব্যক্ত হইলেও প্রজননের বয়স অতিক্রম করিলে জৈব প্রয়োজনের দিক দিয়া ইহারা নিষ্প্রয়োজন।

এই ব্যাখ্যা বার্ধক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিতমাত্র ; বার্ধক্যের কারণ সম্বন্ধে ইহা কোনও আলোকপাত করে না। বার্ধক্যের মৌল কারণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচলিত, তাহাদের মোটামুটি সারমর্ম হইতেছে বার্ধক্যের কারণ কোষাভ্যন্তরস্থ এন্‌জাইমের বিপর্যয়। কোনও কারণে কোষে অতি প্রয়োজনীয় এন্‌জাইমগুলির অসাম্য ঘটিলে দেহে সমস্থিতি (হোমিওস্ট্যাসিস) বিপর্যস্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, প্রয়োজনমত এন্‌জাইম তৈয়ারি করার ক্ষমতা কোনও কোষেই অসীম নহে। তাই বিপাক-নির্ভর জীবনের গতিবেগ প্রখরতর হইলে অথবা জীবকে প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইলে কোষের এন্‌জাইম নিঃশেষিত হইয়া বার্ধক্য চিহ্নিত হইবে। একটি জড়যন্ত্রের মতই জীবিতকোষ কর্মবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

অন্যমতাবলম্বী বিজ্ঞানীগণের ধারণা, বার্ধক্যের মূল কারণ ক্রোমসোমে নিহিত। কোনও কারণে দেহকোষের কোনও অত্যাবশ্যক এন্‌জাইমের উৎসস্বরূপ 'জীন' (gene) নষ্ট হইলে কোষ আর সেই ক্ষতি সামলাইয়া লইতে পারে না। তাই ক্রমে সমস্থিতি বিপর্যস্ত হয়।

পরিমলবিকাশ সেন

বার্নপুর (২৩°৪০′ উত্তর ও ৮৬°৫০′ পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র। শহরটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের আদ্রা-আসানসোল শাখার উপর অধিষ্ঠিত। শহরটির মোট আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার। বিহার-বাংলা সীমারেখার সামান্য পূর্বে অবস্থিত হওয়ায় বার্নপুরের আবহাওয়া, প্রকৃতি, মৃত্তিকা ও উদ্ভিদে উভয় প্রদেশের মিশ্রিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ২০৬ কিলোমিটার। ইহা ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানির শিল্পনগরী। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স বার্ন অ্যান্ড কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্সির তত্ত্বাবধানে বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিকট ইস্কোর (IISCO) লৌহ কারখানার ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে কয়েকটি কারখানা একত্রিত হইয়া ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতির এক আদেশনামায় ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি নামে পরিচিত হয়। কোম্পানির তিনটি অত্যাবশ্যক অংশ আছে : ১. লৌহ তৈয়ারির বিভাগ ; ২. ইস্পাত তৈয়ারির বিভাগ; ৩. রোলিং মিল বিভাগ। বার্নপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি কুলটি লৌহ ঢালাই কারখানাকে কাঁচা লোহ সরবরাহ করে। কয়লা, আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, ডোলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি শিল্প সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের সুবিধা থাকায় বার্নপুর আদর্শ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। বার্নপুরের বৈদ্যুতিক শক্তির বাৎসরিক চাহিদার অধিকাংশ তাহার নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র সরবরাহ করে, কিছুটা ডি. ভি. সি হইতে ক্রয় করা হয়। শহরটির দক্ষিণদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত দামোদর নদই কারখানার প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করে। ইস্কোর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলির মধ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগনই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইহা রেলের মালগাড়ি তৈয়ারি করিয়া থাকে।

বার্নপুর লৌহ ও ইস্পাত কারখানার ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ইস্পাত ১০ লক্ষ টন এবং লৌহ ১৩ লক্ষ টন। এই দুইটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য লৌহ ও ইস্পাত উপজাত দ্রব্যগুলি যথাক্রমে ১. ইস্পাত প্রস্তুত ও ঢালাই কাজের উপযোগী লৌহ ২. ইস্পাত এবং ইস্পাত হইতে অ্যাংগ্‌ল জয়েস্ট টি. চ্যানেল রেললাইন, রড, লোহার পাত (চাদর) প্রভৃতি এবং ৩. কয়লা উপজাত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক পদার্থ।

বার্নপুর শিল্প শহরটি সম্পূর্ণ আধুনিক পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২১০২৪ (১৯৬১ খ্রী)। শহরে কর্মীদের স্থান সংকুলান না হওয়াতে কারখানা প্রসার পরিকল্পনায় শহরেরও আয়তন বাড়িয়াছে এবং ইভ্‌লিন লজ ও ছোট দিঘারী নামক দুইটি উপশহরের উৎপত্তি হইয়াছে। বার্নপুর একটি সুদৃশ্য পাকা রাস্তা দিয়া জি. টি. রোডের সহিত যুক্ত। শহর হইতে ৪৮ কিলোমিটার দূরে কোম্পানির একটি নিজস্ব বিমান ঘাঁটি আছে। মহিলাদের জন্য পৃথক ভবনে একটি সমিতি রহিয়াছে। কর্মীদের কারিগরী শিক্ষার জন্য একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টার আছে। শহরে ছেলেদের ও মেয়েদের একটি করিয়া উচ্চ বিদ্যালয় আছে। ইহা ভিন্ন একটি ছেলেদের জুনিয়ার হাইস্কুল এবং ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কর্মীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদন আছে। শহরটিতে সমস্ত রকম আধুনিক বন্দোবস্ত বর্তমান।

দ্র M. R. Chaudhury, *Industrial Landscape of West Bengal*, Calcutta, 1971.

মিত্রা দত্ত

বার্নিয়ে, ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার (১৬২৫—৮৮ খ্রী) ফরাসী দেশের আঁজ প্রদেশের জুয়ে গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরি-

বারে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়েরের জন্ম হয়। তিনি ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ও সেই বৎসরেই ডক্টর অফ মেডিসিন হন। ইহার পরে তিনি সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, জেদ্দা ও মক্কা ভ্রমণ করিয়া ১৬৫৮ বা ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে ফরাসী মন্ত্রী কোলবেয়ারের প্রতিনিধি হইয়া সুরাট বন্দরে আসিয়াছিলেন। সুরাট হইতে তিনি আগ্রার পথে পলাতক দারার সংগী হন। নানা বিপর্যয়ের পর তিনি আমেদাবাদে পেঁছান ও তথা হইতে কোনও মোগল ওমরাহের আশ্রয়ে ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী পেঁছান। দিল্লীতে তিনি প্রথমে ঔরংগজেবের গৃহচিকিৎসক ও পরে দানেশমন্দ খাঁর অধীনে চাকুরি করেন। ঔরংগজেবের কাশ্মীর অভিযানে বার্নিয়ে সংগী ছিলেন।

অতঃপর বার্নিয়ে যখন বাংলাদেশে আসেন, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ পর্যটক তাভের্নিয়ে রাজমহল পর্যন্ত তাঁহার সংগী হন। রাজমহল হইতে বার্নিয়ে কাশিমবাজার যান। বাংলাদেশে ভ্রমণের পর তিনি মাসুলিপত্তন ও গোলকুণ্ডায় যান, পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়ে মার্সাই-এ পেঁছান। পরে ফরাসী সম্রাটের অনুমতি লাভের পর তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বার্নিয়েরের মৃত্যু হয়।

বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনী হইতে আমরা জানি মোগল সম্রাটের প্রচুর রাজস্ব ও প্রভূত ব্যয়ের কথা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের অপরিসীম দুর্দশার কথা। বার্নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা লিখিয়াছেন। সমকালীন অন্য পর্যটকদের তুলনায় বার্নিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সত্যই বিস্ময়কর।

দ্র Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire*, A. Constable, tr., Oxford, 1914.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বার্নেট, লিয়োনেল ডেভিড (১৮৭১–১৯৬০ খ্রী) প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের লিভারপুল শহরে জন্ম। গৌরবময় ছাত্রজীবনান্তে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধি লাভ করিয়া ইনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রাচ্যবিভাগের সহকারী পুস্তক ও পুঁথিরক্ষকের পদ লাভ করেন। পরে ১৯০৮ হইতে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি এই বিভাগের রক্ষকরূপে কার্য করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার সময়ে এবং অবসর গ্রহণের পর তিনি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ ও লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ-এ সংস্কৃত ভাষা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইওরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাগুলি ব্যতীত তিনি সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী, ফারসী, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষা জানিতেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপকপদ হইতে অবসরগ্রহণের পর তিনি পুনরায় ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্মে যোগদান করেন।

ইঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে ভারতবিদ্যা-সংক্রান্ত সাধারণবোধ্য এই পুস্তকগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য:— *Bhagavadgita* (English tr., 1905); *Hinduism* (1906); *Brahma Knowledge* (*Vedanta*), 1907; *The Heart of India* (1908); *Antiquities of India*, 1913, reprinted 1964; *Hindu Gods and Heroes* (1922).

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি স্বদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র গৌরাংগগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

গৌরাংগগোপাল সেনগুপ্ত

বালখিল্য সূর্যসহচর বালখিল্যগণ মহর্ষি ক্রতুর পুত্র (মহাভারত, আদি ৬৬।৯)। মৃগচর্ম, চীর অথবা বল্কল-পরিহিত অংগুষ্ঠপর্বমাত্র-পরিমিত এই মুনিগণ অতি তেজস্বী ও ধর্মপরায়ণ (ঐ অনুশাসন ১৪১।৯৯–১০১)। মহর্ষি কশ্যপের যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে খর্বকায় এই মুনিগণ অনেকে মিলিতভাবে যখন একটিমাত্র পলাশবৃন্ত বহন করিয়া আনিতেছিলেন তখন মদগর্বিত ইন্দ্র তাঁহাদিগকে উপহাস করেন। ক্রুদ্ধ বালখিল্যগণ দ্বিতীয় ইন্দ্র উৎপাদনের জন্য যজ্ঞ করিলে কশ্যপ সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, 'ইন্দ্র ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, আপনাদের সংকল্পিত ইন্দ্র পক্ষিগণের রাজা (ইন্দ্র) হউন'। বালখিল্যগণ সম্মত হইলেন। যজ্ঞপ্রভাবে বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে গরুড়ের উৎপত্তি হইল।

সীতানাথ গোস্বামী

বালজাক (Honore de Balzac, ১৭৯৯–১৮৫০ খ্রী) ফরাসী ঔপন্যাসিক। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জন্ম। ক্রমওয়েল নামক একটি বিয়োগান্ত কাব্য রচনার মধ্য দিয়া বালজাকের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে বালজাক সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি ৯০টি উপন্যাস ও ছোটগল্প, ৩০টি কাহিনী এবং ৫টি নাটক রচনা করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি সমগ্র সমাজ-চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার উপযোগী একটি খসড়া তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করেন। বালজাক এই খসড়াটির নামকরণ করেন *La Comédie Humaine*।

বালজাকের পর্যবেক্ষণ ছিল সর্বময়ঃ পরিবেশ, জীবনের নানা পর্যায় ও বিভিন্ন কাল, বস্তুর ও বাস্তব পরিবেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তাহাদের মানবিক পূর্ণাংগতা দান করিয়াছে। কল্পনায়

তিনি নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত একাত্ম হইয়া তাহাদের জীবন যাপন করিতেন।

La Comédie Humaine উপন্যাসগুলিতে এমন একটি সমাজচিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে যেখানে অর্থই প্রধান এবং অর্থ শুধু অর্থের জন্যই। সমস্ত শক্তির উপায় ও কামনানিবৃত্তির একমাত্র পন্থাই হইল অর্থ। প্রত্যেক দুঃসাহসী যে গুপ্তধনের সন্ধান করিতেছে তাহা হইল অর্থ।

বালজাকের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি হইলঃ— লা পের্ গোরিয়ো; উর্জেনিয় গ্রাঁদে; লা কুরে দ্য তুর্; লা কুজিন্ বেৎ।

বালজাক জৈবিক শ্রেণীবিভাগের ধারা অনুসারে মনুষ্য-সমাজবিভাগের স্বপ্ন দেখিতেন বলিয়াই তাঁহার সমগ্র সাহিত্যকর্ম অত্যন্ত সরল এবং কিছুটা অপরিণত।

বালজাকের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উচ্ছৃংখল আবেগ (প্যাশন) যাহাতে সমাজকে ধ্বংস না করে, সেইজন্য সমাজকে ধর্মের ও রাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

রবেয়ার আঁতোয়ান

বালাজী বিশ্বনাথ পেশোয়া দ্র

বালী কিষ্কিন্ধ্যার অধিপতি বানররাজ। ইন্দ্রের অংশে ইঁহার এবং সূর্যের অংশে ইঁহার ভ্রাতা সুগ্রীবের জন্ম। ব্রহ্মার অশ্রুবিন্দু হইতে ইঁহাদের বানরী জননীর উৎপত্তি। রাক্ষসরাজ রাবণ বালীকে যুদ্ধার্থ আহবান করিয়া লাঞ্ছিত হন এবং সন্ধি করেন। অসুর দুন্দুভিকে বধ করিয়া মতংগ মুনি কর্তৃক বালী অভিশপ্ত হন। দুন্দুভিপুত্র মায়াবীকে হত্যা করিতে গিয়া সুদীর্ঘকাল বিলম্ব করিলে সুগ্রীব ইঁহাকে মৃত মনে করিয়া ইঁহার সিংহাসন ও পত্নী তারাকে গ্রহণ করেন। বালী প্রত্যাগত হইয়া সুগ্রীবকে বিতাড়িত করিয়া প্রতিশোধার্থে তাঁহার পত্নী রুমাকে গ্রহণ করেন।

ভীত সুগ্রীব মতংগমুনির আশ্রমে বাস করিতে থাকিলে তাঁহার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। সুগ্রীব সীতা উদ্ধারের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলে রামচন্দ্র কৌশলে বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ ঘটাইয়া অন্তরাল হইতে গুপ্তবাণে বালীকে হত্যা করেন। বালীর পুত্রের নাম অংগদ।

দ্র রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২—২২ সর্গ, উত্তরকাণ্ড ৩৪ সর্গ।

কল্যাণী দত্ত

বালুরঘাট পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার (বালুরঘাট, হিলি, কুমারগঞ্জ, গঙ্গারামপুর ও তপন থানা লইয়া গঠিত) সদর মহকুমা, উহারই অন্তর্গত একটি থানা এবং একটি শহর। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বালুরঘাট সদর মহকুমা গঠিত হয়। ইহার আয়তন ১৫১৬·৭ বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা ৪০৩৪৪৮ (১৯৬১ খ্রী)।

বালুরঘাট মহকুমা প্রায় সমতল। ভূমি কোথাও ৪০০ মিটারের অধিক উচ্চ নহে। মহকুমার ভিতর দিয়া ইছামতী ও আত্রাই নদী প্রবাহিত।

মহকুমার কিছু অংশ বনজংগলে পূর্ণ। জংগলে খর্বাকৃতি শালই প্রধান। বিল অঞ্চলে হিজল দেখা যায়। শিশু, শিমুল প্রভৃতিও প্রচুর আছে। বর্তমানে কিছু সেগুন গাছের চাষ হইতেছে। অন্যান্য গাছের মধ্যে আম, জাম, বাঁশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বালুরঘাট জেলার একটি উন্নত মহকুমা ও জেলার শস্যাগার বলিয়া অভিহিত। ধান, সরিষা, আখ ও পাট প্রধান কৃষিজ দ্রব্য এবং চাল ও পাট প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

নদীর তীরে জেলার সদর শহর বালুরঘাট (২৫°১৫′ উত্তর ও ৮৮°৪৭′ পূর্ব) অবস্থিত। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বালুরঘাট পৌরসভা গঠিত হয়। শহরটির আয়তন ৬·৩৭ বর্গকিলোমিটার। ইহার লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬৯৯৯ জন ছিল। শহরে শিক্ষিতের সংখ্যা ১৫৯৭০ (মহিলা ৬২৩৪ জন)। এখানে কয়েকটি স্কুল ছাড়াও গভর্নমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বালুরঘাট কলেজ আছে। শহরের ২৯ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে মাত্র ৩ কিলোমিটার রাস্তা পাকা। বালুরঘাট রেলপথের সহিত যুক্ত নহে। নিকটবর্তী রেলস্টেশন ৯৬ কিলোমিটার দূরে কালিয়াগঞ্জ। বালুরঘাট-কলিকাতা বিমানের সাহায্যে মাল আমদানি-রপ্তানি করা হয়।

দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও পুরাকথিত বাণগড়, ভাটোরের গ্রামের মস্তকহীন দশভুজার বিশাল পাষাণমূর্তি ও ধলাদীঘি, কালদীঘি এবং তপনদীঘি প্রভৃতি ঐতিহাসিক জলাশয়সমূহ। ধলাদীঘির ধারে শীতের শেষে ১৫ দিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। এই মেলায় পশুবিক্রয় প্রধান।

দ্র J. C. Sengupta, *West Bengal District Gazetteers (West Dinajpur)*, Calcutta, 1965.

সুচিৎকুমার সুর

বাল্মীকি রামায়ণপ্রণেতা আদি কবি। প্রচেতা ঋষির বংশধর। বনপরিবৃত তমসা নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। যৌবনে বাল্মীকি রত্নাকর নামে দুরাচারী দস্যু ছিলেন। অরণ্যে পথিকদের প্রাণনাশ করিয়া লুণ্ঠিত অর্থ দ্বারা তিনি পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতেন। একবার ব্রহ্মা ও নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বকৃত পাপের অংশ গ্রহণে আত্মীয়গণ অসম্মত হইলে ব্রহ্মার উপদেশে তিনি ষাট হাজার বৎসর নিরন্তর রাম নাম জপ করিতে থাকেন, তখন

তাঁহার সমস্ত শরীর বল্মীকে আবৃত হয়, সেজন্য তাঁহার নাম হয় বাল্মীকি (কৃত্তিবাসী রামায়ণ ১।১—৩)।

একদা শিষ্য ভরদ্বাজের সহিত তমসাতীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ব্যাধের শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চকে ও বিলাপরতা ক্রৌঞ্চীকে অবলোকন করিয়া শ্লোকছন্দে নিবদ্ধ আদি কবিতা তাঁহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ব্রহ্মার আদেশে ঐ নূতন ছন্দে তিনি রামায়ণ রচনা করেন।

বনবাসকালে চিত্রকূটের নিকট অবস্থানরত বাল্মীকি ঋষির সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটে (রামায়ণ, ২।৫৬)। লোকাপবাদ ভয়ে ভীত রামচন্দ্রের আদেশে বাল্মীকির আশ্রমের নিকট লক্ষ্মণ গর্ভবতী সীতাকে নির্বাসন দিয়া আসেন। বাল্মীকির আশ্রমে সীতা দুইটি যমজ পুত্র কুশ ও লবের জন্মদান করেন। ঋষি কুশ ও লবকে সযত্নে পালন করেন ও স্বরচিত রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে বাল্মীকির সহিত কুশ ও লব উপস্থিত হইলে তাহাদের রামায়ণ গান শুনিয়া রামচন্দ্র বিস্মিত হন। সীতার সতীত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া বাল্মীকি সীতা গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, কিন্তু রামচন্দ্র পুনরায় অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা সীতার সতীত্বের প্রমাণ গ্রহণে ইচ্ছুক হইলে বিষণ্ণ সীতা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সকলের সম্মুখে পাতালে প্রবেশ করেন।

যূথিকা ঘোষ

বাঁশ ধান্য-গোত্রীয় (ফ্যামিলি-গ্রামিনিঈ), বহুবর্ষজীবী গুল্ম বা বৃক্ষ। প্রায় ৭০ প্রজাতির বাঁশ আছে, তন্মধ্যে সাধারণতঃ ৭টি প্রজাতি পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ এবং ওড়িশায় দেখা যায়। বাঁশের মূল গুচ্ছাকৃতি; কাণ্ড হইতেও অস্থানিক মূল বাহির হয়। শাখাপ্রশাখা থাকিলেও প্রধান কাণ্ডের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধিই তুলনায় অধিক হইয়া থাকে। বর্ষায় পুরাতন বাঁশের 'রাইজোম' নামক ভূনিম্নস্থ কাণ্ড হইতে অঙ্গজবিস্তার (ভেজিটেটিভ প্রোপাগেশন) পদ্ধতির সাহায্যে চারা জন্মায়; নূতন চারার দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি এক ঋতুতেই প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া যায়। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে, শাখাহীন প্রধান কাণ্ডের দ্রুত বৃদ্ধি 'অক্সিন' নামক হর্মোনের নিয়ন্ত্রণাধীন। কোনও কোনও বাঁশের ফুল এবং আহারোপযোগী বীজও হইয়া থাকে। শিল্পে বাঁশের অন্যতম প্রধান প্রয়োগ বাঁশের মণ্ডের সাহায্যে কাগজ ও রেয়নতন্তুর উৎপাদন। 'ঘাস' দ্র।

দ্র J. D. Hooker, *Flora of British India*, vol. VII, England, 1897; Council of Scientific and Industrial Research, *The Wealth of India: Raw Materials*, vol. I, Delhi, 1948.

কালীপদ সরকার

বাঁশবেড়িয়া (২২°৫৮′ উত্তর ও ৮৮°২৪′ পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার অন্তর্গত একটি শহর। ইহা বংশবাটি নামেও পরিচিত। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জনসংখ্যা ছিল ৪৫৪৬৩। হুগলি নদীর পশ্চিম তট বরাবর ইহার বিস্তৃতি।

সম্রাট শাহজাহানের সময়ে জমিদার রাঘব দত্তরায়-চৌধুরী শহরটির পত্তন করেন। তাঁহার পুত্র রামেশ্বর এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আসেন। সম্রাট ঔরংগজেব রামেশ্বরকে বংশপরম্পরাক্রমে রাজা মহাশয় খেতাব দেন।

বিদ্যানুরাগী জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁশবেড়িয়া সংস্কৃত অনুশীলনের কেন্দ্র হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এখানে বার-তেরটি টোল ছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার তত্ত্ববোধিনী সভা এখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আলেকজাণ্ডার ডাফ এই বিদ্যালয়ের জমি-বাড়ি ইজারা লইয়া একটি মিশন স্কুল স্থাপিত করেন।

বাঁশবেড়িয়ার অনতিপ্রাচীন স্থাপত্য-কৃতিগুলি গড়-বাটির মধ্যে অবস্থিত। দুইটি পরিখাবেষ্টিত গড়বাটি প্রাচীন জমিদারদের বসতবাটি। পুরাতন প্রাসাদটি অবলুপ্ত। বর্তমান দ্বিতল বাড়িটির সমীপেই বিষ্ণু, কালী স্বয়ংভব ও হংসেশ্বরীর মন্দির। বাসুদেব মন্দির নামে বিদিত বিষ্ণু মন্দিরটির লেখ হইতে জানা যায়, মন্দিরটি জমিদার রামেশ্বর দত্ত ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (১৬০১ শক) নির্মাণ করেন। ইষ্টকনির্মিত পূর্বমুখী মন্দিরটি একটি পীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা চালাঘরের ন্যায় ইহার ছাদ। ছাদের মধ্যভাগে অষ্টকোণ শিখর। গর্ভগৃহের তিনদিকে বারান্দা। বারান্দার সম্মুখভাগে স্তম্ভের উপর ন্যস্ত সুদৃশ্য খিলানাবলি। মন্দিরটির গাত্র ও শিখর পোড়ামাটির সুন্দর ফলকের দ্বারা অলংকৃত। অলংকরণের বিষয়বস্তু বিবিধ; ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য ও পুরাণ হইতে গৃহীত উপাখ্যান ও কৃষ্ণলীলা। গর্ভগৃহের বাসুদেব বিষ্ণুর চতুর্ভুজ বিগ্রহটি পালযুগের।

রামেশ্বরের প্রপৌত্র নৃসিংহদেব রায় কালী স্বয়ংভবের জন্য একটি অতি সাধারণ ধরণের মন্দির নির্মাণ করেন (১৭৮৮—৮৯ খ্রী)। হংসেশ্বরীর মন্দিরের নির্মাণকার্য নৃসিংহদেব রায় কর্তৃক ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয় ও তদীয় পত্নী রাণী শংকরী কর্তৃক ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

বারাণসীর শিল্পিগণের দ্বারা নির্মিত হংসেশ্বরীর মন্দির বাংলা মন্দিররীতির অনুগ নহে। বারান্দা ও প্রকোষ্ঠ পরিবেষ্টিত গর্ভগৃহ। ছাদের উপর তেরটি ক্ষুদ্রাকার মন্দিরের প্রতিকৃতি। ইহাদের মোচাকৃতি শিখর পদ্মপত্রের অনুকৃতিতে বিভূষিত। মন্দিরগুলি তিন ধাপে বিন্যস্ত। মুখ্য গর্ভগৃহে শিব-নাভি হইতে উদ্ভূত পদ্মের উপর আসীনা চতুর্ভুজা হংসেশ্বরীর দারুমূর্তি।

দ্র L. S. S. O'Malley and Monmohan Chakravarti, *Bengal District Gazetteers;* Hooghly, Calcutta, 1912.

দেবলা মিত্র

বাষ্পমোচন ট্রান্‌স্‌পিরেশন। মূলরোম দ্বারা শোষিত জল পত্রকোষে পৌঁছাইলে তাহার শতকরা ২-৪ ভাগ নানাবিধ বিপাকক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়; বাকি ৯৫ ভাগের অধিক জল সূর্যকিরণে উত্তপ্ত পত্রের প্যারেন্‌কাইমা কোষ হইতে বাষ্পীভূত হইয়া প্রথমে পত্ররন্ধ্র(স্টোমা)-গহ্বরে জমা হয় এবং পরে রন্ধ্রপথ দিয়া বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে বাহির হইয়া যায়। এইভাবে পত্ররন্ধ্র দিয়া অতিরিক্ত জল-নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে বাষ্পমোচন বলে। পত্ররন্ধ্র ছাড়া কিউটিক্‌ল ও লেন্টিসেল হইতেও কিছু কিছু বাষ্পমোচন হইয়া থাকে। সাধারণ বাষ্পীভবন হইতে ইহা পৃথক। পত্র-রন্ধ্রের প্রহরীকোষ দুইটির স্ফীতি বা সংকোচনের ফলে রন্ধ্রপথের পরিধির কমবেশি হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে প্রায় ৩ মিটার উচ্চ একটি আপেল গাছ হইতে দৈনিক প্রায় ৯—১৯ লিটার, মানুষের সমান উচ্চ একটি সূর্যমুখী গাছ হইতে দৈনিক ১ লিটার, একটি পূর্ণাঙ্গ ভুট্টা গাছ হইতে দৈনিক ২—৪ লিটার, উষ্ণপ্রধান আর্দ্র জমির একটি নারিকেল গাছ হইতে দৈনিক প্রায় ৭৫ লিটার এবং মরূদ্যানের একটি খেজুর গাছ হইতে দৈনিক প্রায় ৩৭০—৪৭০ লিটার জল বাহির হইয়া যায়। জমিতে প্রচুর জল থাকিলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু মাটিতে জলের অভাব ঘটিলে উদ্ভিদের ক্ষতি হইতে পারে; সেজন্য বাস্তুসংস্থান (ইকোলজি) অনুযায়ী বাষ্প-মোচন কমাইবার জন্য উদ্ভিদের নানাবিধ আঙ্গিক পরি-বর্তন দেখা যায়।

আবহাওয়ায় আলোক, উত্তাপ ও বায়ুপ্রবাহ বৃদ্ধি পাইলে বাষ্পমোচনের মাত্রা বাড়িয়া যায়, কিন্তু বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িলে বাষ্পমোচন কমে।

দ্র W. H. Muller, *Botany,* New York, 1963.

সন্তোষকুমার পাইন

বাসুকি সর্পরাজ। ইঁহার পিতা প্রজাপতি কশ্যপ এবং মাতা দক্ষ প্রজাপতির কন্যা কদ্রু। অনন্ত বা শেষনাগ বাসুকির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সর্পকুলের ধ্বংস নিবারণের উদ্দেশ্যে ইনি ভগিনী জরৎকারুর সহিত মুনি জরৎকারুর বিবাহ দেন। সুপ্রসিদ্ধ আস্তীক মুনি বাসুকির ভাগিনেয়। দেবাসুরকৃত সমুদ্র-মন্থনকালে বাসুকি ছিলেন মন্থনরজ্জু। দুর্যোধনপ্রদত্ত বিষপানে মৃতপ্রায় ভীমকে পাতালে ইনি রসায়ন পান করাইয়া সঞ্জীবিত করেন।

দ্র মহাভারত, আদিপর্ব

কল্যাণী দত্ত

বাসুদেব ঘোষ শ্রীচৈতন্যের সহচর, কবি ও কীর্তনগায়ক। বাসুদেব উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দ ঘোষ এবং মাধব ঘোষও বিখ্যাত কবি ও কীর্তনিয়া ছিলেন। দীনবন্ধু দাস সুধীজনকে কীর্তনের আরম্ভে বাসু ঘোষের গৌরলীলার পদ গাহিতে বলিয়াছেন।

রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃতসমুদ্র'-এ বাসু ঘোষের মাত্র তিনটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'পদকল্পতরু'-তে বাসু ঘোষের একশতটি পদ আছে। বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথিতে তাঁহার প্রায় দুই শতটি পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কয়েকটি তাঁহার রচিত নাও হইতে পারে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে বাসু ঘোষের পদ শুনিয়া কাষ্ঠ এবং পাষাণও গলিয়া যায়। তাঁহার পদে গয়া-প্রত্যাগত নিমাই পণ্ডিতের বেশভূষা, আচার-ব্যবহারের যে আলেখ্য পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত মূল্যবান।

বাসু ঘোষের নিমাই সন্ন্যাসের পদগুলি খুবই জন-প্রিয়। সেইগুলিকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কবিগণ অনেকে পালাগান বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত শচীমাতা, চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার চরিত্র অত্যন্ত সজীব এবং কৃত্রিমতা-হীন। তাঁহার শচীমাতা বাৎসল্যের প্রতিমূর্তি।

বাসুদেব-বর্ণিত সমস্ত বৃত্তান্তের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইতেছে প্রভুর তিরোভাবের বিবরণ। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ব্যতীত অন্য কোনও কবির পদে মহাপ্রভুর তিরোধান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। বাসু ঘোষের লিখিত বিবরণের সহিত জয়ানন্দের বিবরণের কোনও অসামঞ্জস্যও নাই।

শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিতে বাসুদেব প্রায়ই পুরীতে যাইতেন। এই সাক্ষাৎকারের সুবিধার জন্যই তিনি তমলুকে বসতি স্থাপন করেন। সেখানে এখনও তাঁহার শ্রীপাট বর্তমান।

মালবিকা চাকী

বাসুদেব সার্বভৌম উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত, অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। ইঁহার পিতা নরহরি বিশারদ ন্যায় ও বেদান্তের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি তাঁহারই নিকট নব্যন্যায় পড়িয়াছিলেন। ইঁহার রচিত সাতটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামীর 'পদ্যা-বলীতে' ধৃত হইয়াছে। তাহার একটিতে (৯৯) তিনি বলিয়াছেন—কণাদের মত জানিয়াছি, আণ্বীক্ষিকী বিদ্যার পরিচয় পাইয়াছি। মীমাংসা ও সাংখ্যশাস্ত্র জানিয়াছি, যোগে মতি উত্তীর্ণ হইয়াছে, বেদান্ত সর্বতোভাবে অনুশীলন করিয়াছি। কিন্তু নন্দনন্দনের মুরলীই আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার বিবিধ শাস্ত্রের জ্ঞান প্রমাণিত হয়। ইনি তত্ত্বচিন্তামণির টীকা রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য পুরীতে জগন্নাথ-দর্শনকালে প্রেমে বিহ্বল

হইলে ইনি তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং পরে বেদান্ত শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তিনি নিজেই শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে অষ্টক, শতক বা সহস্রনাম লিখিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

দ্র দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ ; বিমানবিহারী মজুমদার, চৈতন্য চরিতের উপাদান, কলিকাতা, ১৯৫৯

বিমানবিহারী মজুমদার

বাস্কেট বল বলখেলা দ্র

বাস্তুদেব বাস্তোষ্পতি (ঋগ্বেদ), বাস্তুপুরুষ, বাস্তুপাল, বাস্তুরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ বাসভূমি বা বাসগৃহের অধিপতি দেবতা। গৃহবিষয়ক বিবিধ অনুষ্ঠানে (গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি) বাস্তুযাগ, অন্ততঃপক্ষে বাস্তুপূজার, ব্যবস্থা আছে। শ্রাদ্ধ কার্যের সূচনায় অন্যান্য দেবতার সঙ্গে বাস্তুদেবের পূজা করা হয়। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে স্বতন্ত্র বাস্তুপূজার রীতি আছে। এই উপলক্ষ্যে মৃত্তিকানির্মিত কুম্ভীর বলি দেওয়ার প্রথা আছে। বাস্তুর মূর্তিনির্মাণের নিয়ম নাই। তবে পূজার ধ্যানের বর্ণনা অনুসারে তাঁহার বর্ণ চন্দ্রের বর্ণের ন্যায়, রত্নহারে তাঁহার দেহ উজ্জ্বল, তাঁহার মস্তকে স্বর্ণমুকুট, স্বর্ণময় তাঁহার যজ্ঞোপবীত, তাঁহার হস্তে বরাভয়মুদ্রা, ভুবন তাঁহার স্বরূপ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বাহ্‌মনী (রাজত্ব) দিল্লির সুলতান মহম্মদ-বিন তোগলকের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের অভিজাত সম্প্রদায় দৌলতাবাদ দুর্গ অধিকার করিয়া ইস্‌মাইল মুখ্‌কে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। পরে বৃদ্ধ ইস্‌মাইল সিংহাসন পরিত্যাগ করেন এবং আমীর হাসান 'আবুল মজফ্‌ফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ্‌' উপাধি গ্রহণ করিয়া ঐ সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৩৪৭ খ্রী)। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ বাহ্‌মনী বংশ নামে অভিহিত।

আলাউদ্দীন দ্রুতগতিতে স্বরাজ্য বিস্তৃত করেন। ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে বাহ্‌মনী রাজ্য উত্তরে ওয়েনগঙ্গা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা এবং পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্বে ভোঙ্গীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি সমগ্র রাজ্য গুলবর্গা, দৌলতাবাদ, বেরার ও বিদর, এই চারিটি তরফ বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল গুলবর্গায়। ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত হয়।

এই বংশের আঠারজন সুলতান প্রায় দুইশত বৎসর দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে প্রতিবেশী রাজ্যগুলি, বিশেষতঃ বিজয়নগর ও বঙ্গালের সহিত বহুকাল ধরিয়া পুনঃ পুনঃ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ হয়। দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী ও স্থানীয় দাক্ষিণী মুসলমান আমীরগণের মধ্যে কলহ সর্বদা বর্তমান ছিল। বাহ্‌মনী সুলতানদের অনেকেই ছিলেন ঘোর অত্যাচারী। তৎসত্ত্বেও বাহ্‌মনী রাজত্বকালে কিছু জনহিতকর কার্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ্‌ (১৩৭৮—৯৭ খ্রী) খুব শিক্ষিত ছিলেন এবং কবি হাফিজকে তাঁহার রাজসভায় আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ্‌ (১৩৯৭—১৪২২ খ্রী) অনেক ভাষা জানিতেন এবং জ্যোতির্বিদ্যারও অনুরাগী ছিলেন ; দৌলতাবাদের সন্নিকটে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপিত করেন। আহম্মদ শাহ্‌ (১৪২২—৩৬ খ্রী) এবং আলাউদ্দীন আহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৬—৫৮ খ্রী) উভয়েই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আলাউদ্দীন রাজধানীতে একটি বড় হাসপাতাল স্থাপন করেন।

বাহ্‌মনী রাজ্যে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মন্ত্রী মামুদ গাওয়ান। তৃতীয় মহম্মদ শাহের আমলে (১৪৬৩—৮২ খ্রী) কার্যতঃ তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। তাঁহার সমরকুশলতা, দূরদর্শিতা এবং সুদক্ষ শাসনব্যবস্থার ফলে এই রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিল। তাঁহার সমরাভিযানে রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত হয়। তিনি বাহ্‌মনী রাজত্বকে ৮টি প্রদেশে বিভক্ত করেন।

নিকিতিন নামে একজন রুশ পর্যটক ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে বিদরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাস্তাগুলিতে দস্যু-তস্করের ভয় ছিল না, কৃষির অবস্থা ভাল এবং রাজধানী বিদর একটি জমকালো শহর ছিল।

মামুদ গাওয়ান সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রওজাৎ-উল-ইনশা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে ৩০০০ পুস্তক ছিল। তিনি ছিলেন বিদেশী মুসলমান। চক্রান্তের ফলে সুলতান তৃতীয় মহম্মদ শাহের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। পরবর্তী শাসকগণের অযোগ্যতা এবং স্থানীয় ও বিদেশী আমীরগণের কলহের ফলে এই রাজ্য ধ্বংস হয়। এই বংশের শেষ সুলতান কলিমুল্লাহ শাহ্‌ রাজধানী বিদর হইতে পলায়ন করেন (১৫২৭ খ্রী)। ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে অখণ্ড বাহ্‌মনী রাজ্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল এবং ইহা ৫টি স্বতন্ত্র খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইল।

দ্র Muhammad Qasim Ferishta, *Tarikh-i-Ferishta*, (Pers-text), Bombay, 1831-32; Taba-taba, Ali bin Azizullah, *Burhan-i-Ma'asir*, J. S. King, tr., under the title *The History of the Bahmani Dynasty*, London, 1900; J. Briggs,

History of the Rise of the Mahomedan Power in India, vol. II, Calcutta, 1908; *The Cambridge History of India,* vol. III, Cambridge, 1958; R. C. Majumdar ed. *History and Culture of the Indian People,* vol. VI, Bombay, 1960.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাহাদুর শাহ্ ১ম মোগল সম্রাট ঔরংগজেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুয়াজ্জম বাহাদুর শাহ্ উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্রাট হন (১৭০৭ খ্রী)। তিনি প্রথম শাহ্ আলম নামেও পরিচিত। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতা আজম ও কামবক্স ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে পরাজিত ও নিহত হন।

তিনি অজিত সিংহকে মাড়বারের রাণা স্বীকার করিয়া রাজস্থানের সহিত সুদীর্ঘ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করেন এবং শিখ নেতা বান্দাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন।

১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র *The Cambridge History of India,* vol. IV; Delhi, 1959; A. L. Srivastava, *The Mughal Empire,* Agra, 1957.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বাহাদুর শাহ্ ২য় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজদের অধীনে নামে মাত্র দিল্লীর মোগল সম্রাট ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার কোনও রাজ্য বা সাম্রাজ্য ছিল না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁহাকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করে এবং ভারতের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু ইংরেজগণ পরে বিদ্রোহীদের পরাজিত করিয়া দিল্লী পুনরুদ্ধার করিলে বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী ও রেংগুনে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সেখানে মারা যান।

দ্র A. L. Srivastava, *The Mughal Empire,* Agra, 1957; R. C. Majumdar ed., *The History and Culture of the Indian People,* vol. IX, Bombay, 1963.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

বিকানীর বিকানীর রাজস্থানের ভারত-পাক সীমান্তবর্তী একটি জেলা, একটি থানা, এবং একটি শহর। পূর্বের দেশীয় রাজ্য 'বিকানীর' ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিকানীর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিকা-র (১৪৮৩—১৫০৫ খ্রী) নামানুসারে এই রাজ্যের ও শহরের নামকরণ হয়।

বিকানীর (২৮° উত্তর ৭৩°১৮′ পূর্ব) জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র। ইহা যোধপুর-বিকানীর রেলপথে অবস্থিত এবং রাজস্থানের চতুর্থ বৃহৎ শহর।

আয়তন ৩৮·১০ বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা ১৫০৬৩৪ (১৯৬১ খ্রী)। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ৪৬° সেণ্টিগ্রেড এবং শীতকালে ০° সেণ্টিগ্রেড। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় ২৫০ মিলিমিটার। গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে তীব্র ধূলিঝঞ্ঝা বহিতে থাকে। জলাভাব এখানের প্রধান অসুবিধা।

এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে লবণ, হস্তিদন্তনির্মিত দ্রব্য, পিতল ও তামার দ্রব্য, কম্বল, পশমবস্ত্র, কার্পেট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাও বিকা কর্তৃক এই নগর নির্মিত হয়। শহরের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৮·৩৪ মিটার। চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। এই শহরে প্রচুর মন্দির ও একটি সুদৃঢ় দুর্গ আছে। দুর্গটি পবিত্র স্থান হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রায় সিংহ পুরাতন দুর্গটির সংস্কার করাইয়া বৃহৎ আধুনিক দুর্গ ঐ একই স্থানে নির্মাণ করেন। ইহা ব্যতীত শহরে জৈন উপাসনালয়, মন্দির, মসজিদ, বিদ্যালয়, কাছারি, হাসপাতাল, জেল এবং বিভিন্ন সৌধ আছে। ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে ইদানীং বিকানীর জেলার বহু স্থানে হরপ্পার সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

দ্র *The Rajputana Gazetteers,* vol. III A, 1909; *Census, of India,* 1961, vol. 14 Rajasthan, Part II A, 1963.

সুচিৎকুমার সুর
প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বিক্রমশীল, বিক্রমশীলা বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্যাপীঠ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে ধর্মপাল ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার অবস্থানস্থল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই, তবে সম্ভবতঃ ইহা মগধে বর্তমান ভাগলপুরের সন্নিকটে গংগাতীরে পাথরঘাট পর্বতের উপর অবস্থিত ছিল। ১০৮ জন পণ্ডিত ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ইঁহারা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র, ক্রিয়া ও যোগ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, ন্যায় ইত্যাদির অধ্যাপনা করিতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকে বজ্রাচার্য বলা হইত। প্রারম্ভে ইহার প্রথম বজ্রাচার্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তারনাথের বিবরণে বুদ্ধজ্ঞানপাদের পরবর্তী আরও ১২ জন বজ্রাচার্যের নাম পাওয়া যায়। এই বিদ্যাপীঠে ১০৮টি কক্ষ এবং প্রাচীরগাত্রে ছয়টি দ্বার ছিল। ছয়জন দ্বারপণ্ডিত ছাত্রদের ভর্তি করিতেন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের সহিত তর্কবিতর্ক করিতেন। ধর্মপালের পর পালবংশীয় নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ইহা বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। ভারতের চারিদিক হইতে এবং তিব্বত হইতেও অধ্যয়নার্থীরা এখানে আসিত। কথিত হয় যে নালন্দার পরেই

ইহা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার বহু-বিখ্যাত শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন তান্ত্রিক আচার্য প্রশান্ত-মিত্র, রাহুলভদ্র, কাশ্মীরের আচার্য পদ্মাকরঘোষ, টীকাকার কমলশীল ও জিনরক্ষিত, নৈয়ায়িক কল্যাণ-রক্ষিত ও ধর্মাঙ্কুরদত্ত, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান ইত্যাদি।

দ্র শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া, প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ; Phanindranath Bose, *Indian Teachers of Buddhist Universities;* Madras, 1923; R. C. Majumdar ed., *History and Culture of the Indian People,* vol. IV, Bombay, 1964.

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত২য় দ্র

বিছা সন্ধিপদ গোষ্ঠীর (ফাইলাম-আর্থ্রোপোদা) অন্তর্ভুক্ত মিরিয়াপোদা শ্রেণীর শতপদী (সেন্টিপেড) প্রাণী। বিছার প্রায় ২০০০ প্রজাতি লইয়া খিলোপোদা বর্গ গঠিত। ৭ কোটি বৎসর পূর্বের টার্শিয়ারি যুগ হইতে ইহারা ধরাপৃষ্ঠে বর্তমান। উষ্ণপ্রধান দেশই ইহাদের পক্ষে অনুকূল। বিছা মুখ্যতঃ নিশাচর প্রাণী, আর্দ্র আবর্জনাস্তূপ, কাঠের গুঁড়ি বা পাথরের তলদেশ, দেওয়ালের গর্ত ইত্যাদি স্থানে বাস করে ও রাত্রে বাসস্থানের বাহিরে আসে।

সাধারণভাবে বিছার দেহ চেপ্টা, লম্বাটে, কঠিন খোলকাবৃত এবং শির ও দেহকাণ্ডে বিভক্ত। অখণ্ডিত শিরে একজোড়া সংবেদনশীল শৃঙ্গ (অ্যান্টেনা), কতিপয় ভোজন-সহায়ক সন্ধিল (জয়েন্টেড) উপাঙ্গ এবং এক জোড়া চক্ষু অবস্থিত। দেহকাণ্ড ১৫—১৮১ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ম্যাক্সিলিপেড নামক একজোড়া উপাঙ্গ বর্তমান। শেষোক্ত উপাঙ্গ চারি অংশে বিভক্ত; শেষাংশটি বাঁকা ও সূচালো এবং উহার অগ্রভাগে বিষনালীর ছিদ্র থাকে। ম্যাক্সিলিপেড আসলে বিছার বিষনখ এবং আত্মরক্ষা ও শিকারের প্রধান অবলম্বন। দেহকাণ্ডের অন্যান্য প্রত্যেকটি খণ্ডে একজোড়া পা থাকে। প্রতিটি পা ৭টি গাঁটযুক্ত এবং সূচ্যগ্র; সর্বশেষ পা দুইটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও পশ্চাতে প্রসারিত। পুং-বিছার শেষ পদযুগল স্ত্রী-বিছার তুলনায় দীর্ঘতর। ৫ ভাগে বিভক্ত ও সরলাকৃতি খাদ্যনালীর সহিত ২—৩ জোড়া লালাগ্রন্থি যুক্ত থাকে। মুখ ও পায়ু যথাক্রমে শির এবং দেহকাণ্ডের শেষ খণ্ডের অঙ্কদেশে অবস্থিত। নলের মত লম্বাটে হৃৎপিণ্ড দেহকাণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত এবং প্রায় ২১টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সুবিস্তৃত ও জটিল শ্বাসনালীর (ট্র্যাকিয়াল টিউব) সমষ্টি লইয়া শ্বাসতন্ত্র গঠিত। খাদ্যনালীর শেষাংশে সংযুক্ত একজোড়া দীর্ঘ রেচকনালী (ম্যাল্‌পিঘিয়ান টিবিউল) বর্জ্য পদার্থ রেচনের (এক্স্‌ক্রিশন) প্রধান অঙ্গ।

বিছা একলিঙ্গ প্রাণী। সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত কতিপয় শুক্রাশয়, একটি শুক্রনালী ও একটি শুক্রনিক্ষেপনালী লইয়া পুং-বিছার প্রজননতন্ত্র গঠিত; শেষোক্ত নালী পায়ুর সম্মুখে জননরন্ধ্রে শেষ হয়। একটি দীর্ঘ ডিম্বাশয় ও জননরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ডিম্বনালী লইয়া স্ত্রী-বিছার প্রজননতন্ত্র। পুং-বিছার জননরন্ধ্রের নিকট একজোড়া অতিরিক্ত উপাঙ্গরূপী যন্ত্র (অ্যানাল স্টাইল) বর্তমান। স্ত্রী-বিছা সাধারণতঃ ডিম পাড়িয়া সামান্য মাটি চাপা দিয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়া 'সরাসরি গঠন' প্রক্রিয়ায় (ডাইরেক্ট ডেভেলপ্‌মেন্ট) পূর্ণাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও বিছা শাবক প্রসব করে।

বিছা মাংসাশী প্রাণী এবং কেঁচো, পতঙ্গ প্রভৃতি উহার ভক্ষ্যবস্তু। বৃহদাকার বিছা (প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত দীর্ঘ) ক্ষুদ্র টিকটিকি, নেংটি ইঁদুর প্রভৃতিকেও আক্রমণ করিতে পারে এবং উহার বিষনখ বা ম্যাক্সিলিপেডের দংশনে মানবদেহে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়। নানাজাতীয় বিছার মধ্যে বাদামী বর্ণের তেঁতুলেবিছা সচরাচর দেখা যায়; ইহার দেহের খণ্ডগুলির বর্ণ ও আকৃতি অনেকটা তেঁতুলের বীজের মত।

দ্র T. J. Parker & W. A. Haswell, *A Text-book of Zoology,* vol. I, London, 1949.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

বিছুটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। দুই জাতের বিছুটি গাছ হইয়া থাকে—এরণ্ড গোত্রের (ফ্যামিলি-এউফোরবিয়াসিঈ, Euphorbiaceae) অন্তর্ভুক্ত বিছুটি (ট্রাগিয়া ইন্‌ভোলুক্রাতা, *Tragia involucrata*) এবং বট গোত্রের (ফ্যামিলি-উর্তিকাসিঈ, Urticaceae) অন্তর্ভুক্ত লাল-বিছুটি বা জল-বিছুটি। ইহারা আগাছা-জাতীয় ছোট গাছ। গাছের পাতা ও কাণ্ড সূক্ষ্ম কণ্টকে আবৃত। কণ্টকের মধ্যে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ বর্তমান। প্রাণীদেহের সংস্পর্শে আসিলে কণ্টকগুলির অগ্রভাগ ভাঙিয়া যায় অথবা দেহের মধ্যে ঢুকিয়া যায় এবং বিষাক্ত পদার্থ দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অসহ্য জ্বালার সৃষ্টি করে। জল-বিছুটির ক্ষেত্রে ক্ষতস্থানে জল লাগিলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের সমুদ্রতীর অঞ্চলের কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত তালুক ও শহর।

তালুকের প্রধান শহর ও সদর কার্যালয় বিজয়ওয়াড়া (১৬°৩১ উ এবং ৮০°৩৭′ পূ)। শহরটি একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে এবং কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে সমুদ্র হইতে ৭২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। কৃষ্ণা নদী এই-স্থানে একটি নীস শিলা গঠিত নীচু পাহাড় কাটিয়া প্রবহমাণা। নদীর ধার প্রায় ১৮০ মিটার খাড়া।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে (মে মাসে) কখনও কখনও তাপমাত্রা ৪৮° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠে। বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় ৯৮৪ মিলিমিটার।

শহরের কাছে কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বড় বাঁধ (অ্যানিকট) আছে। শহরের নিকট কোণ্ডাপল্লী পাহাড়ের কাছে কিছু ক্রোমাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া লবণ ও চূণাপাথরও কিছু আছে। অধিকাংশ শিল্পই কৃষিজ পণ্যের উপর নির্ভরশীল। টিনে ফল রক্ষণ (fruit canning), বনস্পতি শিল্প প্রভৃতি প্রধান। সিমেণ্ট, রেশম শিল্প, রাসায়নিক কারখানা, চূণ তৈয়ারী, যন্ত্রপাতি নির্মাণ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

শহরের জনসংখ্যা ২৩০৩৯৭ (১৯৬১ খৃ)। উহার মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা ১১৬২৫৮। শহরের বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় নিযুক্ত কর্মীর (৭৬৬৪২ জন) মধ্যে অধিকাংশ লোক ব্যবসা-বাণিজ্য (১৬৬৭১ জন) ও কল-কারখানায় (১৪৮৪১ জন) নিযুক্ত। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়ওয়াড়া পৌরসভার অন্তর্গত হয়। বিজয়ওয়াড়া একটি প্রসিদ্ধ রেলকেন্দ্র। সুন্দর সড়কপথও বিজয়ওয়াড়াকে হায়দরাবাদ, এলোর, মসুলিপট্টনমের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণানদীর নাব্যতাও যোগাযোগের সহায়ক।

পূর্বে এই অঞ্চলে বৌদ্ধপ্রভাব যথেষ্ট ছিল। অনেকের মতে হিউএন্-ৎসাঙ এইস্থানে আসিয়াছিলেন (৬৪৫ খৃ)। শহরের দক্ষিণে একটি পাহাড়ের ধারে কয়েকটি বৌদ্ধ গুহা আছে। অন্ডাভাল্লের বিখ্যাত প্রাচীন গুহামন্দির কৃষ্ণা-নদীর অপর পারে শহর হইতে অল্পদূরে অবস্থিত। গুহা-মন্দির পাঁচতলা, এখানে ৫ মিটার দীর্ঘ অনন্তনাগশায়ী বিষ্ণুমূর্তি আছে। সপ্তদশ শতকে গোলকোণ্ডার কুতুব-শাহী বংশের রাজধানী বিজয়ওয়াড়াতেই স্থাপিত হইয়াছিল।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. VII, Oxford, 1908; *The Techno-Economic Survey of Andhra Pradesh*, New Delhi, 1962.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১২৪৮—১৩০৬ বংগাব্দ) খ্যাতনামা ধর্মপ্রচারক ও ভক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নদিয়া জেলার অন্তর্গত দহকুল নামক স্থানে প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনন্দকিশোর গোস্বামী এবং মাতা স্বর্ণময়ী দেবী।

শান্তিপুরে গোবিন্দ গোস্বামীর টোলে অধ্যয়নান্তে তিনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার মনে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। তিনি বেদান্ত পাঠে ব্রতী হন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগী হন এবং পরে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালেই তিনি হাওড়ার রামচন্দ্র ভাদুড়ীর কন্যা যোগমায়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রচারকার্যে তিনি ক্রমান্বয়ে ২৫ বৎসর কাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে বৃত হইয়াছিলেন।

অতঃপর গয়াতে সাধুসংগের ফলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। তিনি যোগসাধনা করেন এবং গুরুর অভিপ্রায় অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে যোগসাধনে দীক্ষার কার্যে ব্রতী হন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন।

শেষ জীবনে তিনি ছিলেন হরিভক্ত বৈষ্ণব। ১৩০৬ বংগাব্দে ২২ জ্যৈষ্ঠ পুরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 'প্রশ্নোত্তর' নামে একটি যোগসাধনবিষয়ক গ্রন্থ আছে।

অশোকা সেনগুপ্ত

বিজয়গুপ্ত মনসামংগল কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার কাব্য রচনার কাল সম্পর্কে নিজে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সুলতান, তখন তিনি তাঁহার মনসামংগল কাব্য রচনা করেন। তাঁহার কাব্যখানি চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগের রচনা বলিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। বিজয়গুপ্তের রচনায় একটি বলিষ্ঠ বাস্তব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যখানি তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের এক-খানি নিখুঁত চিত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মংগলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪; অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—১৯৪২ খৃ) কবি, বহু-ভাষাবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষক। জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৭ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে। তিনি সম্বলপুরে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ওড়িশার দেশীয় রাজ্য সোনপুরের রাজার আইন উপদেষ্টার কার্য করিয়াছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চোখের অসুখে ভুগিয়া শেষ পর্যন্ত তিনি অন্ধ হইয়া যান।

তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ ঃ কবিতা (১৮৮৯ খৃ), যুগপূজা (১৮৯২ খৃ), ফুলশর (১৯০৪ খৃ), যজ্ঞ-

ভস্ম (১৯০৪ খ্রী), পঞ্চকমালা (১৯১০ খ্রী), হেঁয়ালি (১৯১৫ খ্রী)। থেরীগাথা (১৯০৫ খ্রী), এবং গীত-গোবিন্দ (১৯০৬ খ্রী) যথাক্রমে পালি ও সংস্কৃত হইতে অনূদিত।

তাঁহার 'কথা নিবন্ধ' (১৯০৫ খ্রী) গদ্য ও কবিতায় মিশ্রিত; 'তপস্যার ফল' (১৯১২ খ্রী) কথাসাহিত্যের ও গদ্যরচনার উদাহরণ।

বামড়া রাজ্যের রাজা সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনের সাহিত্য-কর্মকে ওড়িয়া হইতে বাংলায় ভাষান্তরিত করিয়া তিনি 'সচ্চিদানন্দ গ্রন্থাবলী' রচনা করেন (১৯২৬ খ্রী)। তিনি প্রবাসী পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিত বাংলা পত্রিকাগুলি সম্পাদনা করিয়াছিলেন: বঙ্গবাণী (১৩২৮—৩৪ বঙ্গাব্দ), শিশুসাথী (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), বাংলা (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার রচিত ইংরেজী গ্রন্থ: *Elements of Social Anthropology; Aborigines of Central India; Orissa in the Making; History of the Bengali Language.*

বিজয়চন্দ্র ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বিজয়নগর দিল্লীর সুলতান মহম্মদ-বিন-তোগলকের রাজত্বকালে যখন সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ ও গোলযোগ চলিতেছিল সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ উপকূলে বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় (১৩৩৬ খ্রী)। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হরিহর ও বুক্ক নামে দুই ভ্রাতা। ইঁহারা মহীশূরের হয়সল রাজ্যের বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন। বিজয়নগর রাজ্যে চারিটি রাজবংশ যথাক্রমে রাজত্ব করে, যথা, সঙ্গম বংশ, সালুব বংশ, তুলুব বংশ ও আরবিডু বংশ। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ভারতের ইতিহাসে বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রায় তিন শতাব্দী ধরিয়া এই রাজ্য প্রথমে মুসলমান রাজ্য বাহ্‌মনী এবং পরে দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের ক্রমাগত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দক্ষিণভারতে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছিল। দক্ষিণভারতে হিন্দু শিল্পের ও স্থাপত্যের উন্নয়ন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারের সহিত বিজয়নগরের নৃপতিগণের নাম জড়িত রহিয়াছে।

সঙ্গমবংশীয় বুক্কের পুত্র দ্বিতীয় হরিহরই (১৩৭৭—১৪০৪ খ্রী) সর্বপ্রথম রাজসূচক উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র মহীশূর, কানাড়া, ত্রিচিনপল্লী ও কাঞ্চী বিজয়নগরের অন্তর্গত হয়। সঙ্গম বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় দেবরায় (১৪০৬—২২ খ্রী)। যোদ্ধা ও শাসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার আমলে বিজয়নগর রাজ্য সিংহলের উপকূলে পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

সালুব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন বীর নরসিংহ (১৫০৩—১৫০৯ খ্রী)। তিনি বাহমনীর সুলতান ও ওড়িশার রাজার যুগ্ম আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া বিজয়নগরকে নিশ্চিত ধ্বংস হইতে রক্ষা করেন। নরসিংহ ছিলেন সুদক্ষ ও প্রজাহিতৈষী শাসক।

তুলুব বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুদক্ষ যোদ্ধা ও সুশাসক। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া তিনি পশ্চিমে কঙ্কণ, পূর্বে বিশাখপত্তনম এবং দক্ষিণে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি পশ্চিম উপকূলে পর্তুগীজদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলেন এবং পর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্ককে ভাটখাল নামক স্থানে একটি নৌঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত চরিত্র ও সুদক্ষ শাসনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে দাক্ষিণাত্যের বাহ্‌মনী রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে এবং উহার ধ্বংসস্তূপের উপর পাঁচটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের উৎপত্তি হয়, যথা—বিজাপুর, গোলকোণ্ডা, বিদর, বেরার ও আহম্মদনগর। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের এই পঞ্চরাজ্যের সহিত বিজয়নগরকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে হয়। তুলুব বংশীয় রাজা সদাশিব রায়ের আমলে ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সহিত সম্মিলিত দাক্ষিণাত্যের চারিটি রাজ্যের এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণা নদীর উত্তর তীরে তালিকোটা নামক স্থানে মুসলমান সৈন্য সমবেত হয় এবং ইহার ৩০ মাইল দূরে নদীর অপর পারে বর্তমান কালের রাক্ষস ও তগদি গ্রামে এই যুদ্ধ হয়। কিন্তু ইতিহাসে ইহা তালিকোটার যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধে বিজয়নগর পরাজিত হয় এবং বিজয়ী মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া প্রচুর ধনরত্নাদি লুণ্ঠন এবং রাজধানী বিজয়নগর ধ্বংস করে। তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে তুলুব বংশের পতন ঘটে এবং আরবিডু বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিরুমল। তিনি পেনুগোণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বিজয়নগরের বিনষ্ট গৌরব ও শক্তি কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই বংশের নরপতি তৃতীয় রঙ্গের রাজত্বকালে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বিজাপুর ও গোলকোণ্ডার সুলতানদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বিজয়নগরের রাষ্ট্রীয় শক্তি ভাঙিয়া পড়ে এবং শ্রীরঙ্গপত্তনম্, বিদনুর, মাদুরা ও তাঞ্জোরের শাসনকর্তাগণ বিদ্রোহী হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ভাবে বিজয়নগর রাজ্যের পতন ঘটে।

বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা ছিল উন্নত ও প্রজাকল্যাণ-

মূলক। বিজয়নগর নগরটি ছিল বৃহৎ, সুসজ্জিত ও জনবহুল। ইহার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মনোরম। পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ ও ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি এই নগরের নাগরিকদের সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চে ছিলেন রাজা। স্বৈরাচারী হইলেও বিজয়নগর-রাজগণ ছিলেন প্রজাহিতৈষী। রাজকর্তব্য সম্বন্ধে রাজা কৃষ্ণদেব রায় তাঁহার তেলুগু ভাষায় রচিত 'আমুক্ত-মাল্যদা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 'ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজ্য শাসন করাই রাজার প্রধান কর্তব্য।' রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য করার জন্য একটি মন্ত্রিসভা ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণী হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইত। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ 'নায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন। সাধারণতঃ রাজপরিবার ও অভিজাত শ্রেণী হইতেই প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইত। গ্রামগুলিতে স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত ছিল এবং পঞ্চায়েতের হস্তে গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত থাকিত। 'মহানায়কাচার্য' নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখিতেন। ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারের প্রধান আয়। জমির উর্বরতা অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারিত হইত। ইহা ছাড়া বাণিজ্যশুল্ক, বিবাহকর, শিল্পকর প্রভৃতি করও প্রচলিত ছিল।

বিজয়নগরের সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সৈন্যবাহিনীতে ৩৬০০ অশ্বারোহী, ৭ লক্ষ পদাতিক ও ৬৩০টি হস্তী ছিল। বিজয়নগর রাজাদের একটি গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। বিজয়নগরের বিচারব্যবস্থা ছিল উন্নত। রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক ও আইন-প্রণেতা। গ্রামাঞ্চলে বিচারের ভার পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রচলিত রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই আইন রচিত হইত। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল।

পায়েজ, নিকোলো কণ্টি, বারবোসা, আব্দুর রজ্জাক প্রভৃতি বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী হইতে বিজয়নগর রাজ্যের সুষ্ঠু সমাজ-জীবনের ও সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে নারী ছিলেন সম্মানিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। শিল্প, শিক্ষা, সংগীত, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি নানা বিষয়ে নারীগণ শিক্ষালাভের সুযোগ পাইতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নারী বিচারকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ধনীদের মধ্যে বহুবিবাহ ও পণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ সমাজে প্রশংসনীয় হইত। সমাজে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন নিরামিষাশী। বিজয়নগরের নৃপতিগণ সাধারণতঃ ধর্মপ্রবণ এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। অন্য ধর্মের প্রতিও তাঁহারা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান ও ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ নির্বিবাদে রাজ্যে বসবাস করিতেন। রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

বিজয়নগর রাজ্যে বহুসংখ্যক বন্দর ছিল। এই সকল বন্দর হইতে পারস্য ও ইওরোপের সহিত বিজয়নগরের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। ব্রহ্মদেশ, মালয় ও চীনের সহিত বিজয়নগরের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। কৃষি ও শিল্প ছিল যথেষ্ট উন্নত। রাজ্যের সর্বত্র জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল। শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল বস্ত্র-শিল্প ও মৃৎশিল্প। বণিক ও শিল্পীদের পৃথক সংঘ ছিল। এই সংঘগুলি জনগণের অর্থনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিত। তাম্র ও স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

সাংস্কৃতিক ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিজয়নগর উন্নত ছিল। নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তেলুগু, তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষাগুলিও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বৈদিক গ্রন্থের টীকাকার মাধবাচার্য ও সায়নাচার্য বিজয়নগর রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। তাঁহার রাজসভা সে যুগের আটজন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিকগণ কর্তৃক অলংকৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায়ের প্রধান সভাকবি পোদ্দন ছিলেন তেলুগু গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণদেব রায় পোদ্দনকে 'তেলুগু কাব্যের পিতামহ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

বিজয়নগরে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল হাজারা মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দির।

অতুলচন্দ্র রায়

বিজয়সিংহ দীপবংশ ও মহাবংশ নামে সিংহল বা লঙ্কা-দ্বীপের দুইখানি প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে ঐ দ্বীপের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিপুরুষ বিজয়সিংহ সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহার মর্মার্থ এইরূপঃ

বঙ্গদেশের রাণী মগধে যাইবার পথে একটি সিংহ কর্তৃক আক্রান্ত ও অপহৃত হন এবং ঐ সিংহের ঔরসে তাঁহার গর্ভে সিংহবাহু (পালি-সীহবাহু) নামক এক পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। সিংহবাহু বড় হইয়া ঐ সিংহকে হত্যা করেন, তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করেন এবং বঙ্গদেশের রাজা হইবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাঢ়দেশে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার রাজধানী ছিল সিংহপুর।

সিংহবাহুর বত্রিশটি পুত্রসন্তান হয়। প্রথম দুইটির নাম বিজয় ও সুমিত্র। বিজয় যৌবনে অত্যন্ত দুর্বিনীত ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার দুর্ব্যবহারে রাঢ়বাসিগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বাধ্য হইয়া রাজা সিংহবাহু কুমার বিজয়সিংহকে এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দকে অর্ধমুণ্ডিত মস্তক করাইয়া নৌকাযোগে সাগরে নির্বাসিত

করিয়াছিলেন। সঙ্গে বিজয়ের ছয়শত নিরানব্বই জন অনুচরের সহিত ছিল তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার-বর্গ। সাগরজলে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহারা লংকাদ্বীপে উপনীত হইলেন। যেদিন বিজয় এখানে আসিয়া উপস্থিত হন সেদিনই কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

লঙ্কাদ্বীপে তখন যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতির আধিপত্য ছিল। বিজয়সিংহ প্রথমে কুবেণী নামক যক্ষিণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার সাহায্যে বহুসংখ্যক যক্ষকে হত্যা করিয়া সিংহলদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যাভিষেককালে বিজয়সিংহ দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় মহিষী করেন—কুবেণী যক্ষদের হস্তে নিহত হন। বিজয়সিংহ ভারতীয় শাসনপ্রথা অনুসারে মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার সুশাসনে লঙ্কাদ্বীপ একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত হয়। ইহার ফলে সিংহলে আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। বিজয়ের পরে তাঁহার রাজ্যের আরও অনেকে ভারতীয় কন্যাদের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারে সহায়তা করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত অষ্টাদশ প্রকার শিল্পব্যবস্থা সিংহলেও প্রচারিত হইয়া সিংহলের জনগণের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছিল।

বিজয়সিংহের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। তাই তিনি মৃত্যুর পূর্বে রাঢ়-অধিপতি তাঁহার অনুজ সুমিত্রের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তিনি যেন আসিয়া অগ্রজের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। স্বীয় বার্ধক্যনিবন্ধন সুমিত্র স্বয়ং না যাইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসুদেবকে প্রেরণ করেন। কিন্তু পাণ্ডুবাসুদেব সিংহলে পৌঁছিবার পূর্বেই সুদীর্ঘ আটত্রিশ বৎসর রাজত্বের শেষে বিজয়সিংহ মৃত্যু-মুখে পতিত হন। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব নির্বিঘ্নেই তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

দীপবংশে সংক্ষেপে এবং মহাবংশে বিস্তারিতভাবে এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। পরবর্তীকালে এই কাহিনী নানা-রূপে পল্লবিত হইয়াছে। কিন্তু সেগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও মহাবংশের কাহিনী কতদূর ঐতিহাসিক তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। বিজয়সিংহের পিতার জন্মকাহিনী যে সম্পূর্ণ কিংবদন্তী বা উপকথা মাত্র সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সিংহবাহু কর্তৃক রাঢ়দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা, বিজয়সিংহের লঙ্কাদ্বীপে গমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা, এমন কি বিজয়সিংহের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মের ৪৮৩ বৎসর পূর্বে তিনি সিংহল গিয়া-ছিলেন, বিশেষ প্রমাণ না পাইলে ইহা একেবারেই বিশ্বাস-যোগ্য নহে। দীপবংশ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও মহাবংশ পঞ্চম শতকে রচিত হয়। প্রায় আট-নয় শত বৎসর পূর্বেকার বিবরণ এই দুই ইতিহাসের গ্রন্থকার কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। সুতরাং বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে বিজয়সিংহের কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অনেকে মনে করেন যে বিজয়সিংহের পৈতৃক রাজ্য পালিতে লিখিত 'লাড়' বাংলার রাঢ় নহে, লাট অর্থাৎ গুজরাট দেশকে সূচিত করে।

দ্র *Mahavamsa*, tr. Wilhelm Geiger, London, 1912, 1929; *History of Ceylon*, published by the University of Ceylon, Chapter VII.

সুকোমল চৌধুরী

বিতস্তা ঝিলম দ্র

বিদর মহীশূর রাজ্যের বিদর জেলার একটি শহর (১৭°৫৫′ উত্তর এবং ৭৭°৩২′ পূর্ব)। ইহা বিদর জেলার সদর কার্যালয় ও প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। আয়তন ৯ বর্গ-কিলোমিটার ও জনসংখ্যা ৩২৪২০ (১৯৬১ খ্রী)

স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে, তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ওয়ারাঙ্গালের কাকতীয় রাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরের উপকণ্ঠে বিদর শহর গড়িয়া ওঠে।

১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের রাজধানী গুলবর্গা হইতে বিদরে স্থানান্তরিত হয়। পরে বিদর বারিদশাহী রাজ্যের (১৪৯২—১৬০৯ খ্রী) রাজধানী ছিল। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বাধীন হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময়ে বিদর উক্ত রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিদরের ঐতিহ্যময় অতীতের বহু ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আহমেদ শাহ্ কর্তৃক নির্মিত (১৪২৮ খ্রী) পরিখা ও সুদৃশ্য প্রাকারবেষ্টিত দুর্গ অন্যতম। ধ্বংসপ্রায় মসজিদ-গুলির মধ্যে জমা মসজিদ ও ১৬ স্তম্ভবিশিষ্ট মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

বিদরের প্রধান শিল্প 'বিদির' কাজ (লোহার উপর সোনা বা রূপার কাজ)।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. VIII, Oxford, 1908; R. C. Majumder, ed., *The History and Culture of the Indian People*, vol. VI, Bombay, 1960.

হিমাংশুকুমার সরকার

বিদিশা রামায়ণে, মহাভারতে এবং পালি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কাব্যে, ইতিহাসে, পুরাণে উল্লিখিত বিখ্যাত নগরী। ইহার ধ্বংসাবশেষ বেস (কিংবা বিদিশা) এবং বেত্রবতী নদীর সংগমস্থলে ছিল। ইহার বর্তমান নাম বেসনগর, ভূপাল নগরী হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পূর্বে

অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে দশার্ণ অথবা পূর্ব মালবের রাজধানীরূপে ইহার বিভিন্ন নাম ছিল, যথা, বিদিশা, বেদিশা, বৈদিশা অথবা বৈদাশা। সার্থবাহেরা এই নগরে বসবাস করিত বলিয়া ইহার অন্য নাম ছিল বৈশ্যনগরী। গরুড় পুরাণ অনুসারে ইহা একটি শান্তিপ্রিয়, জনাকীর্ণ এবং ধনী শহর ছিল। বাণভট্টের কাদম্বরীতে বিদিশা হস্তিদন্তের শিল্পের এক অন্যতম প্রধান নগরী বলিয়া উল্লিখিত। পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইহা সমর্থন করে। বিদিশা চন্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী ছিল। অশোকের মহিষী দেবী বিদিশার এক শ্রেষ্ঠিবংশের দুহিতা ছিলেন।

বিদিশার অনতিদূরে অবস্থিত বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিদিশার হস্তিদন্তশিল্পীরা সাঁচীস্তূপের একটি তোরণ-স্তম্ভের 'রূপকর্ম' করিয়াছিলেন। ভারহুত স্তূপের প্রথম স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে বিদিশা নগরীর অধিবাসী রেবতীমিত্রের ভার্যা, চাঁপাদেবী, এই স্তম্ভের মূল্য বহন করিয়াছিলেন। বিদিশা খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ২য় শতক হইতে ১ম শতক পর্যন্ত বৈষ্ণবধর্মের বা ভাগবতধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বেসনগরের গরুড়চূড়াযুক্ত স্তম্ভের লিপি হইতে জানা যায় যে কৌৎসীর পুত্র বিদিশার মহারাজা ভগভদ্রের রাজসভায় তক্ষশিলার যবনরাজ আন্তিআলিকিদের (Antialkidas) দূত, দিয়নের (Dion) পুত্র এলিয়দোর (Heliodoros) ভগবান বাসুদেবের পূজার জন্য এই গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

বেতবা (বেত্রবতী) এবং বেস (বিদিসা) নদীর সঙ্গমস্থল বহু শতাব্দী ধরিয়া অনাদৃত থাকিবার পর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ইহার প্রথম খনন করেন। তাহার অর্ধশতাব্দী পরে ১৯৬৩—৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহেশ্বর দয়াল খারে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে উৎখনন করিয়া এই নগরীর পুরাবৃত্তের সমীক্ষা করিয়াছেন। তিনি ছয়টি যুগের স্তর এবং সংস্তর (strata এবং layers) পাইয়াছেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সংস্তর প্রমাণ করে যে তাম্রযুগে বিদিশার অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ে লালরঙ্-এ চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল (Black Painted ware), কৃষ্ণ এবং লোহিত কৌলাল (Black and Red ware), স্ফটিকের ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের ফলা (microlithic blades of crystal), পোড়ামাটির পুঁতি ব্যবহৃত হইত। ইহার উপরিস্তর চিত্রিত ধূসর কৌলাল (Painted Grey ware) যুগের বলিয়া অনুমিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য : উত্তরভারতীয় চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল (Northern Black Polished ware), অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রাসমূহ (punch-marked coins), তাম্র এবং লৌহ-নির্মিত বস্তু, পোড়ামাটির উদ্দেশিক পুষ্করিণী (terracotta votive tanks), পাষাণলিঙ্গ, পাথরের শিল ও নোড়া প্রভৃতির সহিত দারুনির্মিত অন্তরাল, গর্ভগৃহ এবং প্রদক্ষিণপথযুক্ত দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে ইহা প্রাক্-মৌর্য ও মৌর্যযুগের স্তর বলিয়া ধরিলে ভ্রম করা হইবে না। বোধহয় মৌর্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ইহা ধ্বংস হইয়া পুনর্নির্মিত হয়।

পরবর্তী সংস্তর শুঙ্গযুগের। কারণ এই স্তরে শুঙ্গ লিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা (seal), এলিয়দোরের স্তম্ভের পাদদেশ এবং পাষাণ-বেষ্টনীর অবশেষ পাওয়া যায়। পাষাণ এবং মৃন্ময় পুঁতি, শিল ও নোড়া, মসৃণ এবং অর্ধদগ্ধ অস্থিসমূহ ও রক্ত মৃত্তিকার প্রদীপ পাওয়া গিয়াছে।

চতুর্থ যুগ নাগ ও কুষাণ রাজন্যবর্গের সমসাময়িক। এই যুগে রক্তবর্ণের মৃন্ময় পাত্র, কয়েকটি খণ্ড কৃষ্ণবর্ণের চিত্রিত কৌলাল, মাটির পুঁতি, উদ্দেশিক পুষ্করিণী এবং তাম্রমুদ্রাও উৎখননের দ্বারা পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্তী গুপ্তযুগে চিত্রিত মৃন্ময় কৌলালের সহিত নক্সা উৎকীর্ণ যুক্ত কৌলাল, রজতমুদ্রা, পোড়ামাটির মানব এবং জান্তব মূর্তিসমূহ, মাটির ছাপ দিবার সীল, শঙ্খের বালা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। খননে প্রাপ্ত প্রমাণানুসারে অনুমিত হয় যে খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে এই সমৃদ্ধিশালী নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠ স্তরে একটি গ্রামীণ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ হূণ প্লাবনে প্রাগৈতিহাসিক বিদিশানগরী বিলুপ্ত হয়। বহু শতাব্দী পরে, বোধ হয় কোনও ক্ষুদ্র গ্রাম বিদিশার ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যাহার বর্তমান নাম বেসনগর।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদুর ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা। ব্যাসদেবের ঔরসে রাজা বিচিত্রবীর্যের পত্নী অম্বিকার দাসীর গর্ভে বিদুরের জন্ম। বুদ্ধিমান ও ধর্মনিষ্ঠ পুরুষরূপে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি দুর্যোধনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। তবে তিনি তাঁহার কোনও অসৎকর্ম সমর্থন করেন নাই এবং বিপদের সময় পাণ্ডবদের যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছেন। বিদুরের গোপন সাহায্যে পাণ্ডবগণ জতুগৃহদাহে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পান। ইনি কুরুপাণ্ডবদের দ্যূতক্রীড়ার অনুমোদন করেন নাই, এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে ইনি কুন্তীকে নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া কৃষ্ণ বিদুরের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

মহাভারতের বিদুরনীতি অংশ (উদ্যোগপর্ব, ৩৩—৪০ অধ্যায়) গভীর তত্ত্বপূর্ণ ও পরম উপাদেয়।

কল্যাণী দত্ত

বিদ্যাধরী পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী। ইহাকে নদী না বলিয়া খাঁড়ি বলিয়া অভিহিত করা যায়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাধরীই কলিকাতার প্রধান জলনিকাসী খাল হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ভাগীরথী হইতে এই নদী নোয়াই, সুনতি ও হরোয়া গাঙের মাধ্যমে জল পাইত। দামোদরের গতি পরিবর্তনই বিদ্যাধরী শুকাইয়া যাইবার প্রধান কারণ। ইহা ক্যানিং-এর কাছে মাতলায় পড়িয়াছে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাধরী সম্পূর্ণরূপে অকেজো হইয়া পড়ে।

দ্র S. C. Majumder, *Rivers of the Bengal Delta,* Calcutta, 1942.

রেবা দে

বিদ্যাপতি বিদ্যাপতি একাধিক কবি পণ্ডিতের নাম অথবা উপনাম। বিদ্যাপতি নামধারীদের মধ্যে একজন ছিলেন মিথিলার সর্বাধিক বিখ্যাত পদকর্তা ও কবি। তাঁহার কথা বলিবার আগে অপর বিদ্যাপতিদের উল্লেখ কর্তব্য। একাদশ শতাব্দীতে তীরভুক্তির রাজা কর্ণাটবংশীয় কর্ণদেবের এক সভাপণ্ডিতের নাম ছিল বিদ্যাপতি। এই বিদ্যাপতির রচিত পাঁচটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সংকলিত আছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে কোনও কোনও মৈথিল কবি 'বিদ্যাপতি' উপনাম ভণিতায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেমন 'ভনহি বিদ্যাপতি কবি জয়রাম'। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলাদেশে শ্রীখণ্ড অঞ্চলে এক কবি বিদ্যাপতি ভণিতায় অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক বাঙালী 'বিদ্যাপতি' সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। খুঁজিলে আরও দুই-চারিজন বিদ্যাপতি পাওয়া যাইবে।

মিথিলার পণ্ডিত-কবি বিদ্যাপতি—তিনি যদি একই ব্যক্তি হন—অনেক স্থানীয় রাজারাজড়ার সভা কখনও না কখনও অলংকৃত করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি-নামাঙ্কিত প্রথম রচনা 'কীর্তিলতা' লেখা হইয়াছিল রাজা কীর্তিসিংহের আমলে (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দশকে?)। বইটি অবহট্‌ঠ ভাষায় গদ্যে-পদ্যে লেখা ঐতিহাসিক কাব্য। বিষয় কীর্তিসিংহের কীর্তি, পৈতৃক রাজ্যখণ্ড উদ্ধার। দ্বিতীয় রচনা (অদ্যাপি অপ্রকাশিত) সংস্কৃতে 'ভূপরিক্রমা' কীর্তিসিংহের পিতার পিতৃব্যপুত্র দেবসিংহের আশ্রয়ে। দেবসিংহের পুত্র শিবসিংহের আশ্রয়ে লেখা হইয়াছিল সংস্কৃতে ও অবহট্‌ঠে রচিত—অদ্যাপি অপ্রকাশিত 'কীর্তিপতাকা' এবং সংস্কৃতে রচিত লৌকিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীগ্রন্থ 'পুরুষপরীক্ষা'। পুরুষপরীক্ষা রচনা শেষ হইবার পূর্বেই শিবসিংহের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের মৃত্যুকাল অজ্ঞাত। তবে তাঁহার রাজ্যকালের একটি তারিখ পাওয়া গিয়াছে। শিবসিংহের রাজ্যকালে ২৯১ লক্ষ্মণ সংবতে (অর্থাৎ ১৪১০ খ্রীষ্টাব্দে) 'সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায় ঠক্কুর' শ্রীবিদ্যাপতির আজ্ঞায় শ্রীধরের 'কাব্যপ্রকাশবিবেকে'র পুথি নকল করা হইয়াছিল। দ্রোণবারের রাজা পুরাদিত্যের আশ্রয়ে বিদ্যাপতি সংস্কৃতে পত্রদলিল আদর্শগ্রন্থ 'লিখনাবলী' লিখিয়াছিলেন। শিবসিংহের অনুজ পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবীর আশ্রয়ে লেখা হইয়াছিল সংস্কৃতে দুইখানি পূজাপদ্ধতি 'গঙ্গাবাক্যাবলী' ('গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী') ও 'শৈবসর্বস্বহার' (বা 'শৈবসর্বস্বসার')। বিদ্যাপতির নামে শিবসিংহের খুল্লতাতপুত্র নরসিংহ ও তৎপত্নী ধীরমতীর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যাপতি অন্তত তিনখানি বই লিখিয়াছিলেন সংস্কৃতে—দুইখানি স্মৃতির গ্রন্থ 'বিভাগসার' ও 'দানবাক্যাবলী', একখানি পূজাপদ্ধতি 'দুর্গাপূজাতরঙ্গিণী'। বিদ্যাপতির নামে আরও একখানি খুব ছোট পূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে—মনসাপূজার বই, নাম 'ব্যাড়ীভক্তিতরঙ্গিণী'।

ভাষাগীতযুক্ত সংস্কৃতে লেখা খুব ছোট নাট্যরচনা দুই তিনখানি বিদ্যাপতির নামে পাওয়া গিয়াছে নেপাল হইতে। যেমন 'গোরক্ষবিজয়' ও 'মণিমঞ্জরী'।

ভাষাগানের অর্থাৎ পদাবলীর কবি বিদ্যাপতির সর্বাধিক প্রসার ছিল বাংলাদেশে। চৈতন্যদেব তাঁহার পদ আগ্রহের সহিত শুনিতেন। এই সূত্রে বাঙালী বৈষ্ণব পাঠক ও কবিরা তাঁহাকে ষোড়শ শতাব্দী হইতে স্মরণ করিয়া আসিতেছেন এবং নিজেদেরই লোক মনে করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমার সহিত তাঁহার গোপন প্রেম, সে প্রেমের সহজসাধনার স্তরে উন্নীতি, চণ্ডীদাসের সহিত সখ্য ইত্যাদি। এইসব ঘটনা মৈথিল অথবা বাঙালী কোনও বিদ্যাপতির সম্বন্ধেই প্রমাণ করা যায় না। মিথিলায় বিদ্যাপতির যে জীবনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা অধিকতর দৃঢ়মূল। কিন্তু তাহাতেও ঐতিহাসিকের সমর্থন সর্বত্র নাই। যেমন দিল্লীর বাদশাহের কাছে বিদ্যাপতির জায়গীর পাওয়া। এই জায়গীরের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে (সর্বপ্রথম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উল্লিখিত এবং গ্রীয়র্সন কর্তৃক প্রকাশিত)। সে শাসনটি স্পষ্টতঃই কূট।

বাংলাদেশে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যমুনা-গঙ্গার মত নানা কবির রচনাস্রোত আত্মসাৎ করিতে করিতে পদাবলীর রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কীর্তনগায়কদের মুখে অথবা পদাবলীপ্রিয় লিপিকরদের কলমে ব্রজবুলি পদ হইলে বিদ্যাপতির এবং বাংলা পদ হইলে চণ্ডীদাসের ভণিতা গ্রহণ করিয়াছে। বাংলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদ সংখ্যায় খুব অল্প এবং সেগুলির প্রাচীনত্বও অসংশয়িত নয়। বিদ্যাপতির পদ যাহা খাঁটি বলিয়া নেওয়া যায় তাহা হইল 'ধুয়া' (অর্থাৎ দুই অথবা চারি ছত্রের) পদগুলি। তাহার পরে লইতে পারা যায় নাট্যরচনায় সন্নিবিষ্ট গানগুলি। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির ধুয়াগানের উল্লেখ আছে। সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব শান্তিপুরে

আসিলে যে গানের সঙ্গে অদ্বৈত নাচিয়াছিলেন সেটি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিদ্যাপতির প্রাচীনতম 'ধ্রুবগীতি'।

বিদ্যাপতি সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছিলেন বীম্‌স (১৮৭৩ খ্রী), তাহার পর রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮ খ্রী), তাহার পর গ্রীয়র্সন (১৮৮২, ১৮৮৫, ১৮৯৯ খ্রী)।

দ্র সুকুমার সেন, 'বিদ্যাপতিগোষ্ঠী', বর্ধমান সাহিত্য-সভা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

সুকুমার সেন

বিদ্যুৎ সর্বপ্রকার বিদ্যুতের উৎস প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক কণা। ইহাদের মধ্যে প্রধান ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন। ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যুৎকে ঋণাত্মক আধান ও প্রোটনের বিদ্যুৎকে ধনাত্মক আধান বলা হয়। প্রত্যেক পরমাণুতে ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন সমসংখ্যায় থাকে বলিয়া পরমাণু ও বস্তুসমূহ আধানশূন্য হয়। বস্তুতে ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যাধিক্য/সংখ্যালঘুত্ব ঘটিলে উহাতে ঋণাত্মক/ধনাত্মক আধান

বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত পরীক্ষায় ধাতব পদার্থের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন বস্তুতে পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচল করে না। ধাতব পদার্থে কিছুসংখ্যক ইলেক্‌ট্রন কোনও নির্দিষ্ট পরমাণুর সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া ধাতব বস্তুটির সর্বত্র চলাচল করিতে পারে। ইহাদিগকে 'মুক্ত' ইলেক্‌ট্রন বলে। ইহাদের জন্যই ধাতব পদার্থ বিদ্যুতের সুপরিবাহী হয়। কাচ, গালা, প্লাস্টিক প্রভৃতি বস্তুতে সব ইলেক্‌ট্রনই অণু বা পরমাণুর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। তাই ইহারা বিদ্যুতের অপরিবাহী।

স্থির বিদ্যুৎ ঃ একটি কাচের দণ্ডকে সিল্ক দিয়া ঘর্ষণ করিলে কাচ হইতে কিছু ইলেক্‌ট্রন সিল্কে চলিয়া যায়। ফলে কাচের দণ্ডে ধনাত্মক ও সিল্কে ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় সমপ্রকৃতির আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে ও বিপরীত আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। আধানের পরিমাণ e_1 ও e_2 হইলে এবং উহাদের দূরত্ব d হইলে বলের পরিমাণ $e_1 e_2/d^2$-এর সমানুপাতিক

১নং চিত্র

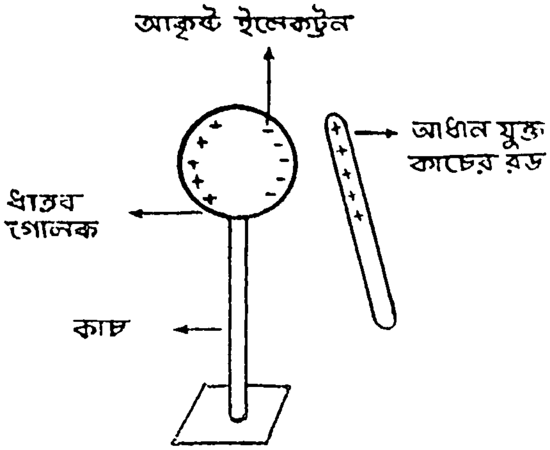

(ক)
বৈদ্যুতিক আবেশ

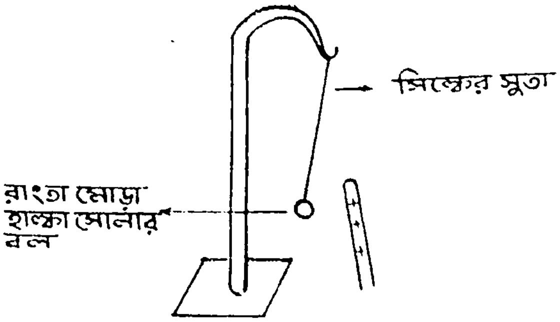

(খ)
সোলার বলের তৈয়ারী ইলেক্ট্রোস্কোপ

সৃষ্টি হইবে। প্রোটন অপেক্ষা ইলেক্‌ট্রন প্রায় ১/২০০০ গুণ হাল্কা বলিয়া ইলেক্‌ট্রনের স্থানান্তরণের জন্যই বস্তুতে দুই বিপরীতধর্মী আধানের সাম্য নষ্ট হয়। আধানযুক্ত কণাগুলি যখন সমষ্টিগতভাবে স্থির অবস্থায় থাকে তখন বিদ্যুতের গুণাগুণ আলোচনার শাস্ত্রকে স্থির-বিদ্যুৎ শাস্ত্র (electrostatics) বলা হয়। আধান সচল অবস্থায় থাকিলে ভিন্ন প্রকার ফলাফল পাওয়া যায় ও এই বিষয়ে আলোচনা চল-বিদ্যুৎ (current electricity) শাস্ত্রে করা হয়।

হইবে। একটি আধানহীন ধাতব বস্তুর নিকট একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত কাচের দণ্ড আনিলে ধাতুর ইলেক্‌ট্রন-সমূহ আকৃষ্ট হইয়া কাচের দণ্ডের দিকে আসিবে। ফলে ধাতব বস্তুটির ঐ প্রান্তে ঋণাত্মক ও বিপরীত প্রান্তে ধনাত্মক আধান সৃষ্টি হইবে। ইহাকে বৈদ্যুতিক আবেশ (electrostatic induction) বলা হয় [১ নং চিত্র (ক)]। গোলকটি অপরিবাহী হইলে দণ্ডটির সম্মুখে অবস্থিত অণু ও পরমাণুর ইলেক্‌ট্রনগুলি আকৃষ্ট হইয়া

বিদ্যুৎ

২নং চিত্র

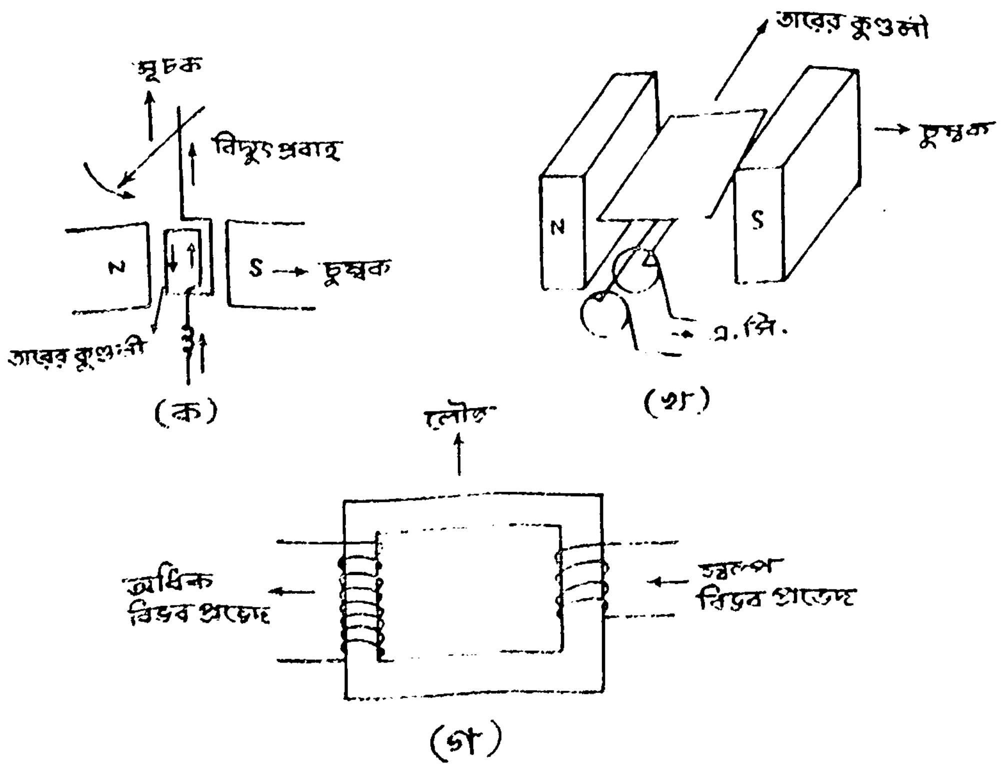

(ক) গ্যালভানোমিটার (খ) এ. সি. ডাইনামো (গ) ট্র্যান্স্‌ফরমার

কিছুটা আগাইয়া আসিবে এবং দণ্ড ও গোলকের মধ্যে সামান্য আকর্ষণ অনুভূত হইবে।

বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকিলে উহা আধানযুক্ত বস্তুর দ্বারা সহজে আকৃষ্ট হইয়া বস্তু হইতে আধান সংগ্রহ করিয়া লয়। ফলে বস্তুটির আধান নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বর্ষাকালে কোনও বস্তুকে আহিত করা কঠিন।

একটি হাল্‌কা সোলার বল রাংতা দিয়া মুড়িয়া সিল্কের সুতায় ঝুলাইয়া দিলে উহার সাহায্যে কোনও বস্তুতে আধানের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, [১ নং চিত্র (খ)] ইহাকে তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্র (electroscope) বলে। সূক্ষ্মতর পরীক্ষার জন্য স্বর্ণপত্র তড়িৎ-বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আধানের পরিমাণ সাধারণতঃ 'কুলম্ব' এককের সাহায্যে মাপা হয়। একটি ইলেক্‌ট্রনের আধান ১৬×১০^{-২০} কুলম্ব। নিকটে অন্যান্য আধানযুক্ত বস্তু থাকিলে একটি আধানকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইতে কিছুটা কাজ করার প্রয়োজন হয়। যদি এক কুলম্ব আধানকে এক বিন্দু হইতে অন্য এক বিন্দুতে লইতে এক জুল (Joule) পরিমাণ কাজ করিতে হয় তবে ঐ দুই বিন্দুর বিভব-প্রভেদ (potential difference)-এর মান ভোল্ট। ধনাত্মক আধান উচ্চ-বিভব হইতে নিম্ন-বিভব স্থানে যায়। ঋণাত্মক আধানের বিপরীত গতি হয়। বিভব-প্রভেদ অধিক হইলে আধানের উপর বল অধিক হয়। স্থির বিদ্যুতের ব্যবহারিক প্রয়োগ এখনও পর্যন্ত সামান্যই।

চল বিদ্যুৎ ঃ একটি কাচের পাত্রে কিছু পরিমাণ জল-মিশ্রিত সালফিউরিক অ্যাসিড লইয়া উহাতে একটি দস্তা ও একটি তামার দণ্ড ডুবাইয়া রাখা হইল। মাপিলে দেখা যাইবে তামা ও দস্তার মধ্যে প্রায় এক ভোল্ট বিভব-প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছে। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই ইহা হয়। একটি ধাতব তার দিয়া উহাদের যোগ করিলে ধাতুর মুক্ত ইলেক্‌ট্রনগুলি নিম্ন বিভব (দস্তা) হইতে উচ্চ বিভবের (তামার) দিকে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এইরূপে একটি অবিরাম বিদ্যুৎপ্রবাহ হইতে থাকিবে। দস্তার সহিত বিক্রিয়ার ফলে সালফিউরিক অ্যাসিড নিঃশেষ হইলে প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকে 'সরল ভোল্টীয় কোষ' বলে। এইরূপ কয়েকপ্রকার কোষের মধ্যে লেক্লান্স কোষই সর্বাধিক প্রচলিত। টর্চের ব্যাটারি এইরূপ একটি কোষ। এখানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহৃত হয়। মোটর গাড়িতে যে ব্যাটারি (সঞ্চারক কোষ) ব্যবহার করা হয় তাহাদের সুবিধা এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ হইলে উল্টাদিকে বিদ্যুৎ

পাঠাইয়া পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনা যায়। ইহাকে 'ব্যাটারি চার্জিং' বলে।

চল বিদ্যুতের বহু গুণ আছে যাহা স্থির বিদ্যুতের নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান তিনটি হইল ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ তাহার চতুর্দিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে; খ. কোনও তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে উহা উত্তপ্ত হয়; গ. অনেক দ্রবণের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে দ্রবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে।

কোনও তারে বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ কত হইবে তাহা ওহ্‌মের সূত্রে (Ohm's law) বলা হইয়াছে তারের দুই প্রান্তে বিভব-প্রভেদ V হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ (প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হইতেছে) $C = V/R$ হইবে। নির্দিষ্ট পরিবাহীর জন্য এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় R একটি ধ্রুবক; ইহার নাম পরিবাহীর রোধ। প্রত্যেক বস্তু বিদ্যুৎপ্রবাহে যে বাধার সৃষ্টি করে তাহাকেই রোধ (resistance) বলা হয়। কোনও পদার্থের একক প্রস্থচ্ছেদ ও একক দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট তারের রোধকে ঐ পদার্থের 'রোধাঙ্ক' বলে। ধাতব পদার্থের রোধাঙ্ক কম, অপরিবাহীর রোধাঙ্ক অত্যন্ত অধিক। সব ধাতুর রোধাঙ্ক সমান নয়। তামা ও রূপার রোধাঙ্ক খুব কম। একই ধাতুতে বিভিন্ন তারের (দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ ভিন্ন হইলে) রোধ বিভিন্ন হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ সাধারণতঃ অ্যাম্পিয়ারে (এক সেকেন্ডে এক কুলম্ব আধানের প্রবাহ) মাপা হয়, রোধ মাপা হয় ওহ্‌ম-এককের সাহায্যে। একটি ২২০ ভোল্ট-১০০ ওয়াট ল্যাম্পের রোধ প্রায় ৪৮০ ওহ্‌ম। একটি তারে V ভোল্ট বিভব-প্রভেদে C অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে প্রতি সেকেন্ডে $V \times C$ জুল পরিমাণ কার্য (work) হইয়া থাকে (ক্ষমতা $= V \times C$ ওয়াট)। উহাই তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বৈদ্যুতিক বাতি ও চুল্লিতে এই তত্ত্ব কাজে লাগানো হয়।

তড়িৎ কোষের সাহায্যে উচ্চ মাত্রার বিভব-বৈষম্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ফ্যারাডে আবিষ্কৃত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নিয়ম কাজে লাগাইয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। একটি তারের কুন্ডলীর মধ্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে তারে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হইবে। ইহাই তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নিয়ম। কোনও চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি তারের কুন্ডলী ক্রমাগত ঘুরাইতে থাকিলে তারে অবিরাম বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইবে। ইহাই জেনারেটর যন্ত্রের মূল-সূত্র ('জেনারেটর' দ্র)। বিপরীতক্রমে, চৌম্বকক্ষেত্রে অবস্থিত তারের কুন্ডলীতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে কুন্ডলী ঘুরিতে থাকিবে। ইহাই বৈদ্যুতিক মোটর যন্ত্রের কার্যনীতি। জেনারেটর হইতে সমপ্রবাহ (direct current) ও পরিবর্তী প্রবাহ (alternating current)—এই দুইপ্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়। সমপ্রবাহ জেনারেটর (D. C. generator) বা ডাইনামোর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ দিক পরিবর্তন করে না। কিন্তু পরিবর্তী জেনারেটরের (A. C. generator) ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহের অভিমুখ ও মান উভয়েই সময়ের সহিত পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তী প্রবাহের সুবিধা এই যে, ট্রান্স্‌ফর্‌মার যন্ত্রের ('ট্রান্স্‌ফর্‌মার' দ্র) সাহায্যে সহজেই স্বল্প/অধিক বিভব-প্রভেদকে অধিক/স্বল্প বিভব-প্রভেদে রূপান্তরিত করা যায়। ডি.সি.-তে ইহা সম্ভব নয়। ডি.সি.-কে এ.সি.-তে রূপান্তর করার যন্ত্রকে কন্‌ভার্টার বলে। এ.সি.-কে ডি.সি-তে রূপান্তর করা হয় রেক্টিফায়ার যন্ত্রে। ২২০ ভোল্ট ডি. সি. অপেক্ষা ২২০ ভোল্ট এ. সি অধিক বিপজ্জনক, কারণ এ.সি.-তে বিভব-প্রভেদ O হইতে ৩১০ ভোল্টের মধ্যে ওঠানামা করে। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপা হয় তাহাকে গ্যালভ্যানোমিটার বলে ('গ্যালভ্যানোমিটার' দ্র)। কয়েকটি সাধারণ যন্ত্রের মূলসূত্র ২ নং চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

গ্যাসের রোধ খুব বেশি। সাধারণতঃ উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু চাপ কমাইলে অপেক্ষাকৃত সহজে গ্যাসে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা যায়। তখন গ্যাস হইতে আলোক বিচ্ছুরিত হয়।

আলোর রঙ্ গ্যাসের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। নিওন গ্যাসে লাল রঙ্, অক্সিজেনে নীলাভ, পারদ বাষ্পে সবুজ, সোডিয়াম বাষ্পে হলুদ বর্ণের আলো হয়। ইহা কাজে লাগাইয়া নানারূপ নিওন চিহ্ন (neon signs) তৈয়ারি করা হইয়া থাকে।

দ্র G. Gamow and J. M. Cleveland, *Physics, Foundations and Frontiers*, New Delhi, 1963; R. Resnick and D. Halliday, *Physics*, vol. 2, New York, 1960.

শ্যামল সেনগুপ্ত

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রতত্ত্ব যে কোনও বিদ্যুৎবাহী তারের চারিপার্শ্বে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এই চৌম্বক ক্ষেত্র তারের দীর্ঘচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া চক্রাকারে বেষ্টিত থাকে। এই উক্তির সারমর্ম এই যে এই চৌম্বকক্ষেত্রের উৎপত্তি চলমান বিদ্যুৎ হইতেই। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, যে কোনও চলমান বিদ্যুৎকণিকা তাহার চারিপার্শ্বে বৈদ্যুতিক বলরেখার সৃষ্টি করে এবং এই বলরেখা বিদ্যুৎ-কণিকার সঙ্গেই চলে। ম্যাক্সওয়েলের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কোনও পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তাহার লম্বাভিমুখে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। আরও সম্যকভাবে বলা যাইতে পারে যে, যে কোনও পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের চলমান বলরেখার সহিত আলম্বভাবে একটি চৌম্বকক্ষেত্রেরও সৃষ্টি হয়, অথবা বিপরীতক্রমে যে কোনও পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের চলমান বলরেখার সহিত লম্বভাবে একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রও বর্তমান থাকে।

বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের এইরূপ পারস্পরিক সাযুজ্য-সম্বলিত ক্ষেত্রকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র বলা হয়। বিদ্যুৎ-কণা বা চুম্বকের স্পন্দন তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ইহা আলোর সমান গতিবেগ লইয়া মহাশূন্যের মধ্য দিয়া বা অপর কোনও স্বচ্ছ আলোক মাধ্যমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে। বিজ্ঞানী হার্জ (Hertz) এইরূপ তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি তড়িৎ ভেক্টর ($\overline{E}$) এবং চৌম্বক ভেক্টর ($\overline{H}$)-এর লম্বাভিমুখে প্রবাহিত হয়। ম্যাক্সওয়েল গাণিতিক উপায়ে দেখাইয়াছেন যে, তড়িৎ-চৌম্বকীয় শক্তির অভিমুখ এবং মাত্রা পয়েন্টিং ভেক্টর (Poynting vector) -এর উপর নির্ভর করে। ইহার মানকে $P=\overline{E}\times\overline{H}$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সমস্ত তথ্যই ম্যাক্সওয়েলের গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এই সূত্রগুলি নিম্নরূপ—

$$\nabla \cdot \overline{D} = P$$
$$\nabla \cdot \overline{B} = O$$
$$\nabla \times \overline{H} = \overline{J} + d/dt(\overline{D})$$
$$\nabla \times \overline{E} = -\delta\overline{B}/\delta t$$

এখানে,

$P=$ আধানের আয়তন-ঘনত্ব।

$\overline{D}=$ ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর (Displacement Vector)

$\overline{B}=$ চৌম্বকীয় আবেশ (Magnetic Induction)

$\overline{H}$ = চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা (Intensity of Magnetic field)

$\overline{E}=$ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের তীব্রতা (Electric field intensity)

উপরে লিখিত সূত্রগুলি সমস্ত স্থিতি-বৈদ্যুতিক ও তড়িচ্চৌম্বক ঘটনা এবং তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যাখ্যা করে।

দ্র Walter E. Rogers, *Introduction to Electric Fields*, New York, 1954; Samuel Seely, *Introduction to Electromagnetic Fields*, New York, 1958.

সুধেন্দুপ্রসাদ বসু

বিধবা যে নারীর স্বামী মৃত। পতির মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীর সহমরণ, অনুমরণ বা ব্রহ্মচর্যপালনের ব্যবস্থা আছে। তবে কঠোর ব্রহ্মচর্যপালনের রীতিই বেশি প্রচলিত ছিল। আজকাল অবশ্য এই কঠোরতা অনেকটা শিথিল হইয়াছে। সর্বপ্রকার বিলাসিতা ও প্রসাধন বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাই বিধবারা পাড়ওয়ালা শাড়ীর বদলে থান পরিধান করেন, সমস্ত অলংকার ত্যাগ করেন, সিঁথির সিন্দুর মুছিয়া ফেলেন, অনেকে দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া ফেলেন। চুল আঁচড়ানো, চুল বাঁধা আয়নায় মুখ দেখা বৈধব্যের নিয়মবিরুদ্ধ। দিনের মধ্যে একবার আমিষবর্জিত আতপ চালের ভাত বিধবার বৈধ আহার। তবে শুধু মাছ-মাংসই আমিষ নয়—মসুর ও মাষ-কলাই ডাল, পান, লাল শাক প্রভৃতিও আমিষ বলিয়া পরিগণিত। কাঁসার পাত্রে আহার গ্রহণ তাঁহাদের নিষিদ্ধ; পাথরের পাত্রে প্রশস্ত। তাঁহাদের নিত্য ব্রতনিয়ম পালনীয়, বিশেষ করিয়া, একাদশী ও অম্বুবাচী। বিবাহাদি শুভকার্যে অমঙ্গলের প্রতীক রূপে পরিচিত বিধবাদের, বিশেষ করিয়া বালবিধবাদের, উপস্থিতি অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে করা হয়। 'অম্বুবাচী', 'একাদশী' দ্র।

দ্র রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিধানচন্দ্র রায় (১৮৮২—১৯৬২ খ্রী) বিখ্যাত চিকিৎসক, কংগ্রেস নেতা ও বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আদি পৈতৃক নিবাস টাকী শ্রীপুর। পিতা প্রকাশচন্দ্র রায়, মাতা অঘোরকামিনী দেবী। জন্ম পাটনা শহরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১ জুলাই। বিধানচন্দ্র নাম কেশবচন্দ্র-প্রদত্ত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাটনা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন; পাটনা কলেজ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গণিত শাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ পাশ করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইলেন। কঠোর আর্থিক ক্লেশের মধ্যে নিজের খরচ চালাইয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র এল. এম. এস পরীক্ষা পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়া বাহির হইলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য বিলাত যাত্রা করিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া লন্ডনের এম. আর. সি. পি এবং ঐ একই বৎসর এফ. আর. সি. এস উপাধি লাভ করেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায়ও আরম্ভ করিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়িতে লাগিল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য নির্বাচিত হইলেন। এই বৎসরই তিনি ৩৬ ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাড়ি ক্রয় করিয়া নিজস্ব আবাসে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি চাকরি ত্যাগ করিয়া তিনি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। বিধানচন্দ্র ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনকেন্দ্র হইতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংগ্রামে জয়ী হন। ঐ বৎসর

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পর্ষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন ও বঙ্গীয় আইনসভায় ঐ দলের ডেপুটি লীডার নির্বাচিত হন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের প্রতিষ্ঠার পর তিনি ইহার সম্পাদক ও কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যে পঞ্চ-প্রধানের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় বিধানচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন ও লাহোর কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই সময়ে অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তিনি ভারতবিখ্যাত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন; ইহা বেআইনী ঘোষিত হইলে ইহার অন্যান্য সদস্যের সহিত তিনিও গ্রেফতার হইয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন; ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হন।

১৯৩৩—৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস আন্দোলনের স্রোত স্তিমিত হওয়ার পর বিধানচন্দ্র ডাঃ আনসারী ও ভুলাভাই দেশাইয়ের সহযোগী রূপে স্বরাজ্য পার্টির পুনরুজ্জীবনের জন্য অগ্রণী হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বিধানচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের প্রথম বেসরকারি সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হন; ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. এস. সি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

বিধানচন্দ্রের কর্মশক্তি ছিল বহুসঞ্চারী। মালয়ের জন্য মেডিক্যাল মিশন সংগঠন, বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন প্রভৃতি বহু কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল, আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানের তিনি কাণ্ডারী ছিলেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, বেঙ্গল ইমিউনিটি কোম্পানি, ইণ্ডিয়ান এয়ারওয়েজ, ইউনাইটেড প্রেস, শিলং হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক কোম্পানি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার পরে তিনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদ প্রত্যাখ্যান করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগের পর বিধানচন্দ্র কংগ্রেস দলের নেতা রূপে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের নবরূপায়ণে বিধানচন্দ্রের বহুমুখী অবদান স্বীকৃত।

তিনি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (Indian Science Congress) সাধারণ সভাপতি পদে বৃত ছিলেন।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি ভারতরত্ন উপাধি পান। ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিজ জন্মতারিখ ১ জুলাই কলিকাতার আবাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুধাংশুবিকাশ রায়চৌধুরী

বিধান পরিষদ সংবিধান, ভারতীয় দ্র

বিধানসভা সংবিধান, ভারতীয় দ্র

বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী (১২৮৫—১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত সংস্কৃতাধ্যাপক ও ভারততত্ত্ববিদ্। তিনি মালদহ হরিশ্চন্দ্রপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীধামে বহু বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনায় তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে বৃত হইয়া তিনি ১৩১১ বঙ্গাব্দে উক্ত কার্যে যোগ দেন। ইতঃপূর্বে বিধুশেখর পাঞ্জাবের শাস্ত্রিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নিজ চেষ্টায় তিনি ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। বৈদিক সাহিত্যের তুলনামূলক চর্চার জন্য তিনি অবেস্তা অধ্যয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালি অধ্যয়নে ব্রতী হন। বৌদ্ধশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনার জন্য তিনি ফরাসী, জার্মান, তিব্বতী ও চীনা ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিব্বতী অনুবাদ হইতে লুপ্ত সংস্কৃত মূল গ্রন্থের পুনরুদ্ধারের পথ তিনি সুগম করিয়া দেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং তাহার সংস্কৃতবিভাগাধ্যক্ষ তথা আশুতোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুথি বিভাগ, তিব্বতী ও চীনা শাস্ত্রবিভাগ এবং আশুতোষ সংস্কৃত গ্রন্থমালা তাঁহার প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি লাভ করে।

তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী : 'পালিপ্রবেশ' ব্যাকরণ; 'ভোট প্রকাশ'; অসঙ্গ প্রণীত যোগাচার ভূমিশাস্ত্র (১ম খণ্ড); তিব্বতী পাঠসহ বোধিচর্যাবতার তথা নাগানন্দ নাটক; গৌড়পাদীয় আগমশাস্ত্র; অশোক-নির্দিষ্ট বৌদ্ধপাঠাবলী; আর্যদেবের চতুঃশতক (২য় খণ্ড); মধ্যান্তবিভাগভাষ্যটীকা (অধ্যাপক তুচ্চির সহযোগে); নাগার্জুনকৃত মহাযানবিংশক; উপনিষৎ (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহমালা); বিবাহমঙ্গল; কল্যাণরক্ষিত-কৃত ঈশ্বরভঙ্গ কারিকা; ইত্যাদি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতী শাস্ত্রী মহাশয়কে যথাক্রমে ডি. লিট্. এবং দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারত সরকার তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দান করেন।

অনন্তলাল ঠাকুর

বিনয়কৃষ্ণ বসু (১৯০৮—৩০ খ্রী) ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম শহীদ। ইঁহার জীবন স্বল্পকাল-স্থায়ী কিন্তু কীর্তি অবিস্মরণীয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সেপ্টেম্বর বিনয়কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রেবতী-মোহন বসু, মাতা ক্ষীরোদবাসিনী (নন্দরাণী) দেবী। পরিবারের আদিনিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাউত-ভোগ গ্রামে।

অল্পবয়সেই তিনি বিপ্লব আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন এবং কালক্রমে বি. ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনীর একজন মেজর বলিয়া গণ্য হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অসাধারণ সাহস ও তৎপরতার সহিত তিনি তদানীন্তন বেঙ্গল পুলিশের ইন্‌সপেক্টর-জেনারেল লোম্যান ও ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট হডসনকে রিভলবার লইয়া আক্রমণ করেন। তাঁহার গুলিতে লোম্যান নিহত হন এবং হডসন গুরুতরভাবে আহত হন। এই সময়ে তিনি ঢাকা মিট-ফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র, সুতরাং ঐ এলাকায় বিশেষ পরিচিত। তথাপি পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। সহকর্মীদের সহায়তায় বিনয়কৃষ্ণ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং কিছুকাল আত্ম-গোপন করিয়া থাকেন। তৎপরে তাঁহার নেতৃত্বে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর ডালহৌসী স্কোয়ারের (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) উত্তরস্থিত রাইটার্স বিল্ডিং-এ বিখ্যাত অলিন্দ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ('দীনেশচন্দ্র গুপ্ত' ও 'বিপ্লব আন্দোলন' দ্র)। যুদ্ধের শেষে তিনি আত্মবিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে বিষ গ্রহণ করেন এবং নিজের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়েন। ফলে ১৩ ডিসেম্বর (১৯৩০ খ্রী) হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অমরেন্দ্রনাথ রায়

বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭—১৯৪৯ খ্রী) প্রখ্যাত মনীষী, অধ্যাপক, বাগ্মী, লেখক ও দেশপ্রেমিক। জন্ম মালদহ জেলায় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। মালদহ জেলা স্কুল হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইংরেজী ও ইতিহাস দুই বিষয়েই অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া তিনি ঈশান স্কলার-শিপ লাভ করেন। কলিকাতায় ছাত্রাবস্থায় 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার ফলে তাঁহার মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়। স্বদেশী যুগে যে 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়, বিনয়কুমার ছিলেন তাহার একনিষ্ঠ সাধক।

১৯১৪ হইতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এক-টানা বিশ্বপর্যটন করেন। এই সময়ে তিনি পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্য করেন। বিদেশে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী পরাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক দূত। ১৯২৬ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনার কাজ করেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি এক নিজস্ব ধারা ও ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন যাহার মূল কথা হইল বস্তুনিষ্ঠা ও দুনিয়ানিষ্ঠা। তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দী এবং ইংরেজী, ইটালীয়, ফরাসী ও জার্মান ভাষা জানিতেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ভারতের বাণী প্রচারের জন্য পুনরায় আমেরিকা সফরে যান। ঐ বৎসর ২৬ নভেম্বর বিদেশে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তিনি সর্বসাকল্যে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় সকল লেখায় তাঁহার স্বচ্ছন্দবিহারী মনের ও স্বকীয় ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। খ্রীষ্টাব্দানুসারে প্রকাশকাল সহ তাঁহার কয়েকটি প্রধান গ্রন্থ : 'বর্তমান জগৎ', তের খন্ড, ১৯১৪—৩৫ ; ধনদৌলতের রূপান্তর, ১৯২৪ : *The Science of History and the Hope of mankind*, 1912 ; *Love in Hindu Literature*, 1916 : *Hindu Achievements in Exact Science*, 1918; *Political Theories and Institutions of the Hindus*, 1922; *The Futurism of Young Asia*, 1922; *Sociology of Population*, 1936; *The Positive Background of Hindu Sociology*, 1937; *Economic Development*, 1938; *Sociology of Races, Cultures and Human Progress*, 1939; *Villages and Towns as Social Patterns*, 1941.

দ্র হরিদাস মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, 'বিনয় সরকারের বৈঠকে', দুই খন্ড, কলিকাতা, ১৯৪২—৪৫ খ্রী।

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

বিনয়েন্দ্রনাথ সেন (১৮৬৮—১৯৩৭ খ্রী) প্রখ্যাত অধ্যাপক, ব্রাহ্ম প্রচারক ও সমাজসেবী। পিতা মধুসূদন সেন, মাতা কেশবচন্দ্রের পিসতুতো ভগিনী মঙ্গলা দেবী। তিনি অ্যালবার্ট স্কুল ও অ্যালবার্ট কলেজে এবং জেনারাল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন। তিনি এম. এ. পরীক্ষায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এম. এ. পাশ করিয়া তিনি প্রথমে বহরমপুরে কলিজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে অধ্যাপক হন। দুই তিন বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই ছিলেন—কেবল কিছুদিনের জন্য ইন্‌স্‌পেক্টর অফ কলেজেস্‌-এর কাজ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভা

ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রমথলাল সেন ও অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেনের সহযোগিতায় ৯২ নং হ্যারিসন রোডে বাড়ি ভাড়া করিয়া 'ফ্রেটারনাল হোম' নামে ছাত্রাবাস গঠন করিয়া ছাত্রদের লইয়া প্রার্থনা, আলোচনা, গান, গল্প ও দুঃস্থ বা পীড়িতদের সেবার কার্য আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রসন্নকুমার সেনের কনিষ্ঠা কন্যা শকুন্তলা দেবীকে বিবাহ করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহকারী রূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য করেন। বিনয়েন্দ্রনাথের সুপরিচালনায় ব্রহ্মবিদ্যালয়, বালক-বালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া ইন্‌স্টিটিউশন প্রভৃতি গড়িয়া উঠে। তিনি বহুদিন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিনয়েন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে জেনিভা, অ্যাট্‌লান্টিক সিটি প্রভৃতি স্থানে ভাষণ দেন।

তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী ও গ্রন্থঃ আরতি ও গীতা অধ্যয়ন; *Lectures and Essays; The Intellectual Ideal; The Pilgrim.*

দ্র দেবেন্দ্রনাথ বসু, মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনী, কলিকাতা, ১৯২৮; S. N. Dutt, *Life of Benoyendranath Sen,* Calcutta, 1928.

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিনোদিনী (১৮৬৩—১৯৪২ খ্রী) প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী বা নটী বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার-এ প্রায় ১২ বৎসর বয়সে 'শত্রু সংহার' নাটকে একটি ক্ষুদ্র চরিত্রে তাঁহার প্রথম অভিনয় ও ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর স্টার থিয়েটার-এ 'বেল্লিক বাজার' নাটকে রঙ্গিণী চরিত্রে তাঁহার শেষ অভিনয়। মাত্র বারো বৎসরের অভিনেত্রী জীবনে গ্রেট ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল ও স্টার থিয়েটারে প্রদর্শিত তৎকালীন প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ নাটকেই তিনি প্রধান নারী চরিত্রে খ্যাতি ও যশের সঙ্গে অভিনয় করেন।

বিনোদিনী অভিনীত কয়েকটি নাটক ও চরিত্রঃ 'নীল-দর্পণ'-এ সরলতা, 'সরোজিনী'-তে সরোজিনী, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-তে আয়েষা, 'কপালকুণ্ডলা'-য় মতিবিবি, 'মেঘ-নাদবধ'-এ প্রমীলা, 'পাণ্ডবের অজ্ঞতবাস'-এ দ্রৌপদী, 'দক্ষযজ্ঞ'-এ সতী, 'শ্রীবৎস চিন্তা'-য় চিন্তা, চৈতন্য-লীলা'-য় চৈতন্য, 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'-এ চিন্তামণি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লেখিকা রূপেও বিনোদিনীর ক্ষমতা স্বীকৃত। তাঁহার রচিত গ্রন্থ ঃ 'বাসনা' কাব্যগ্রন্থ (১৩০০ বঙ্গাব্দ) ঃ 'কনক ও নলিনী' কাহিনীকাব্য (১৩১২ বঙ্গাব্দ) ; 'কনক ও নলিনী' কাহিনীকাব্য (১৩১২ বঙ্গাব্দ) ; 'আমার কথা' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ, পরবর্তী সংস্করণে ইহার নামকরণ হয় 'আমার কথা বা বিনোদিনী কথা'), ইত্যাদি। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে বিনোদিনীর মৃত্যু হয়।

দেবকুমার বসু

বিন্ধ্যপর্বত ভারতবর্ষের একটি পর্বতশ্রেণী। ইহা গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যে প্রাচীরস্বরূপ। বিন্ধ্যশ্রেণী পশ্চিমে গুজরাতের জোবাত (২২°২৭′ উত্তর, ৭৪°৩৫° পূর্ব) হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্দোর, ভূপাল, বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড প্রভৃতির মধ্য দিয়া গিয়া পশ্চিম-বিহারে শেষ হইয়াছে। বিহারে সাসারাম (২৪°৫৭′ উত্তর, ৮৪°০২′ পূর্ব) ইহার পূর্ব প্রান্ত। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১২ কিলোমিটার। প্রস্থ গড়ে ৮০ কিলোমিটার। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিম অংশ বিন্ধ্যপর্বত। ইহা মালব মালভূমির দক্ষিণ প্রান্তে। তাহার পূর্বে বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণে বিন্ধ্যশ্রেণীর মধ্যাংশ ভাঁড়ার বা পান্না পর্বতমালা নামে পরিচিত ; তাহারও পূর্বে কৈমুর পর্বত এই শ্রেণীর তৃতীয় অংশ। ভাঁড়ার ও কৈমুর শ্রেণীর মধ্যে এক অপেক্ষাকৃত নিম্ন গিরিপথ বর্তমান। এই গিরিপথ দিয়া দুইটি রেলপথ বিন্ধ্যশ্রেণী পার হইয়াছে। একটি এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর গিয়াছে। অন্যটি কোটা হইতে দামো হইয়া বিলাসপুর গিয়াছে।

বিন্ধ্যশ্রেণী প্রকৃতপক্ষে মালব, বুন্দেলখণ্ড ও রেওয়া মালভূমির দক্ষিণপ্রান্ত। অনেকক্ষেত্রে এই মালভূমিগুলিকেও বিন্ধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়। মালভূমির অংশ বলিয়া ইহার শীর্ষদেশ বহুদূর পর্যন্ত প্রায় সমতল। গড় উচ্চতা প্রায় ৪৫৬—৬১০ মিটার। কোথাও কোথাও উচ্চতা ৭৬১ মিটারেরও অধিক। চম্বল নদীর উৎসের নিকট মানপুর (উচ্চতা ৮৮১ মিটার) বিন্ধ্যশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। ভাঁড়ার শ্রেণীতে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কালুমার ৭৭৫ মিটার উচ্চ। কৈমুর শ্রেণীর কয়েকস্থানের উচ্চতা প্রায় ৭৬১ মিটার।

বিন্ধ্যপর্বতমালা প্রধানতঃ পাললিক শিলা গঠিত। শিলাগুলি জীবাশ্মহীন এবং প্রাক্‌কেম্ব্রিয় (Pre-Cambrian) যুগের বলিয়া অধিকাংশ ভূতাত্ত্বিকের মত। এই শিলাসমূহের নিম্নাংশে চূণাপাথর ও কাদাপাথরের ভাগ অধিক। উপরের অংশে লাল রঙ্‌-এর বালিপাথর সর্বাধিক। জব্বলপুরের কিছু পশ্চিমে এই পাললিক শিলা বেসল্ট নামক আগ্নেয় শিলার দ্বারা চাপা পড়িয়াছে। বিন্ধ্যের এই পশ্চিম অংশ সেজন্য বেসল্ট শিলা (Deccan Traps)-য় গঠিত। উত্তরে ঝাঁসি অঞ্চলে প্রাচীন রূপান্তরিত শিলা দৃষ্ট হয়।

পশ্চিমে চম্বল, পার্বতী, বেতোয়া, সোনার ও পূর্বে কেন্‌ ও ধ’সন বিন্ধ্যশ্রেণীজাত উল্লেখযোগ্য নদী। বিন্ধ্যের দক্ষিণে শোন ও নর্মদা কিন্তু মেকল পর্বতজাত।

এই পর্বতশ্রেণীর বহুস্থান অরণ্যাবৃত। পশ্চিম অংশে সেগুন গাছ দেখা যায়। অর্জুন, হরীতকী, বহেড়া, করঞ্জ, তিন্দুক (গাব), সিতাশাল প্রভৃতি বৃক্ষ এই সকল অরণ্যে দেখা যায়।

বিন্ধ্যের লোহিত বালিপাথর নিকটস্থ দুর্গনির্মাণের প্রধান উপাদান। এই দুর্গগুলির মধ্যে রোহিতাশ্বগড়, কালিঞ্জর, অজয়গড়, গোয়ালিয়র, চান্দেরি, চুনার প্রভৃতি দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

ইহা ব্যতীত এই পাথর নিকটস্থ পূর্বভারতের বহু মন্দির, প্রাসাদাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর প্রান্ত বিন্ধ্যাচলের উপর বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গার মন্দির হিন্দুদের তীর্থস্থান।

কৈমুর পর্বতে বিজয়গড় দুর্গের নিকট পর্বতগুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানবের অঙ্কিত চিত্র ও তাহাদের দ্বারা নির্মিত প্রস্তরাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, vol. XIV, Oxford, 1908; M. S. Krishnan, *Geology of India and Burma*, Madras, 1960.

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

বিপাক বিপাক একটি স্বয়ংক্রিয় জীবনধর্ম, যাহার প্রভাবে বাহিরের জিনিস জীবদেহের একান্ত অংশীভূত হয় এবং তাহার সহিত চলিতে থাকে সময়োচিত সুসম্বদ্ধ গ্রহণ-বর্জনমূলক দেহ-কর্ম। ইহা উপচিতি (অ্যানাবলিজম্) ও অপচিতির (ক্যাটাবলিজম্) সমষ্টিগত ফল।

শক্তি-সক্রিয়তা (ডাইনামিজম্) সকল পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত ধর্ম এবং সৌরশক্তি জীবজগতের সকল শক্তির আদি উৎস। ক্লোরোফিলের সহায়তায় হরিৎবর্ণের উদ্ভিদগুলি সালোকসংশ্লেষ (ফোটো-সিন্থেসিস) ক্ষমতাবলে এই সৌরশক্তি আহরণ করিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড, ধাতব লবণ, জল প্রভৃতি অজৈব পদার্থ হইতে নিজদেহ গঠন করে। সৌরকিরণ-প্রভাবে সংশ্লেষিত পদার্থগুলির বিপাকের দ্বারা উদ্ভিদজীবনের সকল কর্ম সম্পন্ন হয়।

দেহবৃদ্ধি ও সকল দৈহিক কর্মের জন্য প্রাণীকে খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এন্‌জাইম প্রভাবিত ভাঙাগড়ার সহায়তায় এই খাদ্যের কিয়দংশ হইতে দেহোপযোগী নানাবিধ প্রোটিন তৈয়ারি হয়; কিছু অংশ দেহে নানাভাবে সঞ্চিত থাকে, যাহাতে প্রয়োজন মত উহা হইতে কর্মশক্তি অনুপূরিত হইতে পারে। দেহের একান্ত অংশীভূত এই পদার্থগুলির জারণ অন্তর্জাত (এন্ডোজেনাস) বিপাক শক্তির উৎস। শোষিত খাদ্যের যে অংশ দেহের একান্ত অংশীভূত হইতে পারে না, তাহা হয় বর্জিত হয়, অন্যথা জারিত হইয়া বহির্জাত (এক্সোজেনাস) বিপাক শক্তি উৎপন্ন করে। এন্‌জাইম প্রভাবিত এই জারণ ক্রিয়ায়, কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল প্রভৃতি উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্ট হয়, যাহাদের গঠনে বিপাকজাত রাসায়নিক শক্তি ঘনীভূত অবস্থায় সঞ্চিত থাকে। পাইরোফস্‌ফেট, অ্যাসাইল ফস্‌ফেট, গুয়ানিডিন ফস্‌ফেট, থায়োএস্টার জাতীয় কয়েকটি পদার্থে এইরূপ উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন (এনার্জি-রিচ) রাসায়নিক বন্ধন বর্তমান। এন্‌জাইমপ্রভাবে উপযুক্ত পরিবেশে যখন ঐ রাসায়নিক নিগড় উন্মোচিত হয়, তখন বন্ধনমুক্ত সেই প্রবল শক্তির সাহায্যে পেশী-সংকোচন, প্রোটিন-সংশ্লেষণ, জৈব-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বিবিধ দৈহিক কর্ম সম্পন্ন হয়।

কোনও কাজ না করিয়া বসিয়া থাকিলেও হৃৎস্পন্দন, শ্বসন প্রভৃতি অপরিহার্য দৈহিক কর্মগুলি সর্বদাই চলিতে থাকে। ইহার জন্য যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, তাহা দেহের মৌল বিপাকক্রিয়া (বেসাল মেটাবলিজ্‌ম) হইতে পাওয়া যায়। দৈহিক কর্মের পরিমাণ বাড়িলে শক্তির প্রয়োজনীয়তাও বাড়ে। তখন জারণের গতি দ্রুততর হয় এবং প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ প্রভৃতি জৈবপদার্থের বিপাক ঘটাইয়া অধিকতর শক্তি উৎপন্ন হয়। বিপাকের পথগুলিতে স্বয়ংনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিলে উহা জীবনের অনুকূল পরিবেশ সৃজন করে। ব্যাধি, জরা প্রভৃতিতে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

পরিমলবিকাশ সেন

বিপাশা (বিয়াস) ইহা পাঞ্জাবের পঞ্চ নদের অন্যতম একটি নদী। কুলু উপত্যকার রোটাং গিরিপথের সন্নিকটে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৫২ মিটার উচ্চে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে এবং মাণ্ডি, কাংড়া, রেহ, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর জেলা অতিক্রম করিয়া ইহা কপূরথালার দক্ষিণ-পশ্চিমে শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল 'বিসত্ দোয়াব' (Bist Doab) নামে পরিচিত। বর্তমানে পাঞ্জাব ও রাজস্থান সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় বিপাশা নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা দুইটি অংশে বিভক্ত : ক) বিপাশা-শতদ্রু সংযোগ পরিকল্পনা ও খ) পঙ-এ বিপাশা বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার দ্বারা ৭৩৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রায় ৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচও করা যাইবে। এই পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতেছে।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, vol. VII, Oxford, 1908; *India*, 1964, New Delhi, 1965.

পীযূষ সাহা

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮—১৯৩২ খ্রী) স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা, বাগ্মী, প্রতিভাশালী মনস্বী ও নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা। বিপিনচন্দ্রের জন্মস্থান শ্রীহট্ট

জেলায়। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উচ্চশিক্ষার্থে কলিকাতায় আসেন ও কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তৎকালীন প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রভাবে তিনি ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু প্রচলিত ব্রাহ্মধর্ম তাঁহার মনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না। তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট আধ্যাত্মিকতার নবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তাঁহার জাতীয়তাবাদী ভাবধারার মূলে ছিল ধর্মবোধ ও আধ্যাত্মি-কতা।

রাজনীতিক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের যৌবনের দীক্ষাগুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের প্রগতিশীল শাখার সঙ্গে বিপিনচন্দ্র একাত্ম হইয়াছিলেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ আগস্ট তাঁহার সম্পাদনায় বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা 'বন্দে মাতরম্' প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপিনচন্দ্র ছিলেন ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও তাহার বাণীমূর্তি। বিংশ শতকের প্রথম দশকে তাঁহার অগ্নিস্রাবী লেখনী ও কণ্ঠ জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় সমগ্র ভারতকে উদ্বুদ্ধ করে এবং জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মাদ্রাজের সমুদ্রসৈকতে প্রদত্ত তাঁহার বক্তৃতা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। বিপিনচন্দ্র যে স্বরাজের স্বপ্ন দেখিতেন তাহা ছিল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-বহির্ভূত ভারতীয় স্বরাজ। স্বাধীনতা-লাভের জন্য তিনি 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স' বা 'বয়কট' কর্মপন্থার প্রবর্তক ছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় তাঁহার ছয় মাস বিনা শ্রমের জেল হয় (১৯০৭ খ্রী)।

স্বদেশী যুগের বিপিনচন্দ্র ছিলেন স্বপ্নদর্শী, কল্পনা-বিলাসী আইডিয়ালিস্ট। জাতীয়তাবাদের রোমাণ্টিক ভাবে তাঁহার চিত্ত তখন ভরপুর। রোমাণ্টিক বিপিনচন্দ্র ধীরে ধীরে যুক্তিবাদী, রিয়ালিস্ট বিপিনচন্দ্রে রূপান্তরিত হইলেন। খিলাফত আন্দোলনকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অঙ্গীভূত করিয়া মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করিলেন, তখন যুক্তিবাদী বিপিনচন্দ্র সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার বিরোধিতা করিলেন। তিনি বলিলেন, ম্যাজিক নয়, লজিক চাই। বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন রচনা ও বক্তৃতার মধ্যে অনাগত ভবিষ্যৎ ধ্বনিত হইয়াছিল। শেষ জীবনে বিপিনচন্দ্র নিদারুণ আর্থিক ক্লেশের মধ্যে দিন যাপন করিতেন। কলিকাতায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

বিপিনচন্দ্র শুদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন না। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, সমাজশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার মৌলিক অবদান প্রচুর।

দ্র B. C. Pal, '*Memories of my Life and Time*', Calcutta, 1932; Haridas Mukhopadhya-ya and Uma Mukhopadhyaya, '*Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj*', Calcutta, 1958.

উমা মুখোপাধ্যায়
হরিদাস মুখোপাধ্যায়

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (১৮৮৭—১৯৫৪ খ্রী) প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা। জন্ম ৫ নভেম্বর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। পৈতৃক নিবাস চব্বিশ পরগণা জেলার হালিশহর গ্রামে। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি রিপন কলেজে ভর্তি হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি অরবিন্দ ঘোষ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বাল গঙ্গাধর টিলক প্রমুখ নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার নেতৃত্বে কলিকাতার আত্মোন্নতি সমিতি একটি সুগঠিত বিপ্লবী দলে পরিণত হয়। বিখ্যাত রডা কোম্পানির বন্দুক চুরি ও বণ্টনের ব্যাপারে (১৯১৪ খ্রী) তাঁহার নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ছিল। এই ঘটনার পর তিনি ফেরার হন। প্রথম মহা-যুদ্ধের সময়ে তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির (বাঘা যতীন) নেতৃত্বে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন (১৯১৫ খ্রী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসর গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহে তিনি যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও তিনি যোগ-দান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বহু বৎসর কারাগারে, নির্বা-সনে ও ফেরারী অবস্থায় কাটাইতে হইয়াছিল।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি, জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বা-চিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

বিপিনবিহারী সেন (১৮৭৩—১৯৩৭ খ্রী) চিকিৎসক, জনসেবক ও কংগ্রেস নেতা। জন্মভূমি বরিশাল, কিন্তু ময়মনসিংহ জেলাকেই কর্মভূমিরূপে বরণ করিয়া ও হিন্দু-মুসলমান, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের সহিত একাত্ম হইয়া তিনি আমৃত্যু এতদঞ্চলের 'মুকুটহীন রাজা' রূপে পরিগণিত ছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা ব্যবসায় সূত্রে ময়মনসিংহ শহরে আসিবার পরে তিনি ক্রমশঃ এই

জেলার সর্বশ্রেণীর হিতকর নানা কর্মে যুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন; জাতীয় বিদ্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গঠন ও পরিচালনায় এবং অন্যান্য সংগঠনকর্মে তিনি পুরোবর্তীদের অন্যতম ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে ময়মনসিংহ জেলায় তিনি অন্যতম প্রধান কর্মী ও নায়ক ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের আইন অমান্য আন্দোলনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি বা সর্বাধিনায়করূপে তিনি কারাদণ্ড স্বীকার করেন।

দীর্ঘকাল তিনি ময়মনসিংহ পৌরসভার কমিশনার ছিলেন ও দুইবার তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে শহরের হরিজনদের শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক বৎসর তিনি ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। বেঙ্গল কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশনে তিনি একাধিকবার মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। অপহৃতা নারীদিগের পুনর্বাসনার্থ নারীকল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং দুইটি জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা করিয়া তিনি প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেন। বহু দরিদ্র ছাত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজ ব্যয়ে করিতেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুধেন্দুরঞ্জন রায়

বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গল কাব্যের একজন প্রাচীন কবি। তাঁহার যে পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের যে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতেও মনে হয়, এক অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের উপরই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাঁহার যে পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বহু অংশই প্রক্ষিপ্ত।

বিপ্রদাস একটি সংক্ষিপ্ত আত্মবিবরণী দিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দ, তাঁহারা চারি সহোদর ছিলেন এবং বাদুড়্যা বটগ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। তাঁহার দুইখানি পুথিরই চব্বিশ পরগণা জেলায় সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; মনে হয় বাদুড়্যা বটগ্রাম চব্বিশ পরগনা জেলারই অন্তর্গত কোনও গ্রাম।

দ্র সুকুমার সেন সম্পাদিত মনসাবিজয়; আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা, কলিকাতা, ১৯৫৪; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বিপ্লব আন্দোলন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ও ভারতের মুক্তিসাধনের জন্য গুপ্ত সমিতি ও দল স্থাপন করিয়া যে সশস্ত্র ও বীরোচিত কর্মপ্রচেষ্টা উনিশ শতকের অন্তকাল হইতে প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল তাহাকেই ভারতের বিপ্লব আন্দোলন বলা হয়। এই অভিধার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে কিন্তু নামটি সুপ্রতিষ্ঠিত। সিডিশন কমিটির রিপোর্টেও (১৯১৮ খ্রী) ইহা ঐ নামে অভিহিত।

মহারাষ্ট্রে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চাপেকর ভ্রাতৃগণ কর্তৃক মিঃ র‍্যাণ্ডের ও লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট আয়ার্স্টের হত্যা হইতে এই আন্দোলন শুরু হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এই আন্দোলন অল্পবিস্তর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবই ইহাতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। বাংলাদেশে অরবিন্দ ঘোষই বিপ্লব আন্দোলনের জনক। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (নিরালম্ব স্বামী) গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন স্থাপনের জন্য বরোদা হইতে বাংলায় প্রেরণ করেন। বারীন্দ্র প্রথমে হতাশ হইয়া বরোদায় ফিরিয়া যান। যতীন্দ্রনাথ অনুশীলন সমিতির সহযোগে ১০৮ আপার সার্কুলার রোডে বাংলার একটি গুপ্ত বিপ্লবী আখড়া স্থাপন করিয়াছিলেন (১৯০৩ খ্রী)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্র বাংলায় প্রত্যাবর্তন করিয়া বিপ্লব আন্দোলনের প্রসারে অগ্রণী হন। বাংলায় বিপ্লব আন্দোলনের প্রবর্তনে ভগিনী নিবেদিতারও এক মুখ্য ভূমিকা ছিল। বিপ্লববাদে প্রেরণা যোগাইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', অনুশীলনতত্ত্ব ও বন্দে মাতরম্ গান, বিবেকানন্দের বাণী, যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের মাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনী ইত্যাদি।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ মার্চ সতীশচন্দ্র বসু কলিকাতায় প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন। প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ইহার সভাপতি ও সর্বাধিনায়ক ছিলেন। বরোদা দলের সহিত মিলনের পর পি. মিত্র অনুশীলন সমিতির সভাপতি, অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ সহ-সভাপতি ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোষাধ্যক্ষ হন। এই চারিজন ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া গঠিত হয় সমিতির আভ্যন্তরীণ চক্র। ব্যায়ামচর্চা ভিন্ন অনুশীলন সমিতিতে লাঠিখেলা, তলোয়ার ও ছোরাখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত, সেবাকার্য ও আর্তত্রাণের জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হইত, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে পি. মিত্র, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অ্যাথানেসিয়াস অপূর্বকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি ব্যক্তিরা শিক্ষকতা করিতেন। সমিতির সভ্যদের দীক্ষা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র ঢাকা অনুশীলন সমিতির পত্তন করেন। ইহার সমস্ত ভার ন্যস্ত হয় পুলিনবিহারী দাসের উপর। পূর্ববঙ্গে ঢাকা অনুশীলনের প্রায় ৫০০ শাখাকেন্দ্র ছিল। কলিকাতা অনুশীলন সমিতি স্তিমিত

বিপ্লব আন্দোলন

হওয়ার পর অনুশীলন সমিতি বলিতে ঢাকা অনুশীলন সমিতিকেই বুঝাইত। পরে ইহার কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। পুলিন দাসের পর এই দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন মাখনলাল সেন, নরেন্দ্রমোহন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), রমেশ আচার্য, রমেশ চৌধুরী, নগেন্দ্র দত্ত (গিরিজা বাবু), নলিনীকান্ত ঘোষ, রবি সেন, অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরা প্রভৃতি। এই দলের কর্মক্ষেত্র আসাম, বিহার, ওড়িশা, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও পুনায় বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলার প্রায় সকল প্রখ্যাত বিপ্লবীই এক সময়ে অনুশীলনের সভ্য ছিলেন। ইহা 'সর্কেন্দ্রিক' দল বলিয়া আখ্যাত। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় খেলাতচন্দ্র ইন্‌স্টিটিউশনে সতীশ মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির নন) ও সতীশ সেন প্রভৃতির উদ্যোগে আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্র নন্দী, হরিশ শিকদার প্রভৃতি সহকর্মীদের সহায়তায় বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ইহাকে একটি সুগঠিত বিপ্লবী দলে পরিণত করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ইউনিভার্সিটিজ্ বিল সম্পর্কিত উত্তেজনা, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ খ্রী), স্বদেশী আন্দোলন, রুশ জাপান যুদ্ধে (১৯০৫—০৬ খ্রী) জাপানের জয় বিপ্লব আন্দোলনকে উদ্দীপিত করে। বাংলা 'সন্ধ্যা', 'নবশক্তি' ও 'যুগান্তর' পত্রিকা ও ইংরেজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকা সরাসরি সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শ ও কর্মধারা প্রচার করিতে থাকে।

পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিপ্লবের কর্মপন্থা লইয়া মতভেদ হওয়ায় বারীন্দ্রকুমার বন্দে মাতরম্ পত্রিকায় এক বিবৃতি দিয়া মাণিকতলায় মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে এক গুপ্ত বোমার কারখানা স্থাপন করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সমবেত হইলেন হেমচন্দ্র কানুনগো, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু প্রভৃতি। অরবিন্দই ছিলেন বারীন্দ্র দলের নেতা। বোমা তৈয়ারির সঙ্গে গোপনে পিস্তল সংগ্রহও চলিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রমজীবী সমবায়ও রাম মজুমদার মারফত গোপনে পিস্তল সংগ্রহের কাজে ব্রতী ছিল। অরবিন্দ-বারীন্দ্র চক্রের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) যোগাযোগ ছিল।

মুরারিপুকুর বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের স্তরে বা 'অ্যাক্‌শন'-পর্বে প্রবেশ করাইল। ছোটলাট স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার তিনটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয়। ৩০ এপ্রিল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে জজ মিঃ কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডির গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করায় তাঁহারা নিহত হন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার সহচরগণ ধরা পড়েন, অরবিন্দ ঘোষ ও নিরালম্ব স্বামীও গ্রেপ্তার হন। শুরু হয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা (১৯০৮—১০ খ্রী)। বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র ও উল্লাসকর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। অরবিন্দ ও নিরালম্ব স্বামী খালাস পান।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও আত্মোন্নতি সমিতিকে বেআইনি ঘোষণা করেন। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি, বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতি ও ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি বেআইনি ঘোষিত হয়।

ইহার পর অনেকগুলি হত্যাকাণ্ড ঘটে। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ ১. জেলের মধ্যে সত্যেন বসুর সহায়তায় কানাইলাল দত্ত কর্তৃক আলিপুর মামলায় রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা (১ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ খ্রী), কানাইলালের ও সত্যেন বসুর ফাঁসি হয় ; ২. রণেন গাঙ্গুলীর সহায়তায় শ্রীশ পাল কর্তৃক প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারে চেষ্টিত দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হত্যা (৯ নভেম্বর, ১৯০৮ খ্রী), রণেন গাঙ্গুলী আত্মোন্নতি সমিতির ও শ্রীশ পাল ঢাকার হেম ঘোষের মুক্তি সংঘের (উত্তরকালের বি. ভি.) সভ্য ছিলেন ; ৩. আলিপুর কোর্টে চারু বসু কর্তৃক সরকারি উকীল আশু বিশ্বাসের হত্যা (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৯ খ্রী), চারু বসুর ফাঁসি হয় ; ৪. কলিকাতা হাইকোর্টে বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত কর্তৃক পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শামসুল আলমের হত্যা (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০ খ্রী), বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তের ফাঁসি হয় : ৫. লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক কার্জন উইলির হত্যা (১ জুলাই, ১৯০৯ খ্রী), মদনলালের ফাঁসি হয় : ৬. মহারাষ্ট্রের নাসিকে অনন্তলক্ষ্মণ কান্‌হেরে কর্তৃক জেলাশাসক মিঃ জ্যাক্‌সনের হত্যা (২৯ ডিসেম্বর, ১৯০৯ খ্রী), অনন্তলক্ষ্মণ ও তাঁহার সহকর্মী বিনায়ক দেশপাণ্ডে ও কৃষ্ণগোপাল কার্ভের ফাঁসি হয়, তাঁহারা ছিলেন সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয় প্রতিষ্ঠিত অভিনব ভারত নামক বিপ্লবী সমিতির সভ্য : ৭. ওয়াঞ্চি আয়ার কর্তৃক টিনেভেলির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশের হত্যা (১৭ জুন, ১৯১১ খ্রী), ওয়াঞ্চি আয়ার 'ভারতমাতা অ্যাসোসিয়েশন' নামক বিপ্লবী সংস্থার সভ্য ছিলেন, তিনি আত্মহত্যা করেন : ৮. কলিকাতায় ঢাকা দলের নির্মলকান্ত রায় কর্তৃক ইন্‌স্পেক্টর নৃপেন্দ্র ঘোষের হত্যা (১৯১৪ খ্রী), ব্যারিস্টার মিঃ নর্টন নির্মলকান্ত রায়ের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, নির্মলকান্ত খালাস পায় ; ৯. চিত্তপ্রিয় রায় কর্তৃক কলিকাতায় ইন্‌স্পেক্টর সুরেশ মুখার্জির হত্যা (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫ খ্রী) ; ১০. অনুশীলন দলের কর্মিগণ কর্তৃক কলিকাতায় পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের হত্যা (৩০ জুন, ১৯১৬ খ্রী) ; ইত্যাদি।

বিপ্লব আন্দোলন

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিংয়ের গাড়ির উপর রাসবিহারী বসু ও তাঁহার সহচর বসন্ত বিশ্বাস বোমা নিক্ষেপ করেন। হার্ডিং আহত হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মে, লাহোরের লরেন্স গার্ডেনে বসন্ত বিশ্বাস কর্তৃক সিলেটের ভূতপূর্ব জেলা-শাসক মিঃ গর্ডনের হত্যাকল্পে স্থাপিত বোমার বিস্ফোরণে এক চাপরাসির মৃত্যু হয়। বসন্ত বিশ্বাস ও আরও অনেকে ধরা পড়েন। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়।

১৯০৮—১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি ও বহু অস্ত্রচুরি ঘটে। অস্ত্রচুরির ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা হইল রডা কোম্পানির বন্দুক চুরি (২৬ আগস্ট, ১৯১৪ খ্রী)। ৫০টি মসার পিস্তল ও ৪৬০০০ রাউন্ড কার্তুজ অপহৃত হয়। অপহরণ কার্য আত্মোন্নতি সমিতির অনুকূল মুখার্জি, শ্রীশ মিত্র (হাবু), ভুজংগ ধর প্রভৃতি এবং হেম ঘোষের দলের শ্রীশ পাল ও হরিদাস দত্তের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। রডা পিস্তলগুলি বাংলার ৯টি বিপ্লবী সংস্থার মধ্যে বণ্টিত হয় এবং পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবী 'অ্যাকশন'গুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে ব্যবহৃত হয়। রডা অস্ত্র মামলায় হরিদাস দত্ত, কালিদাস বসু ও ভুজংগ ধরের সাজা হয়।

১৯১০—১১ খ্রীষ্টাব্দে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিনায়ক সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা একরকম ফাঁসিয়াই যায় এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিনবিহারী দাসের সাত বৎসর দ্বীপান্তর হয়। দ্বিতীয় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও মদনমোহন ভৌমিকের দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।

হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলাতেই সর্বপ্রথম সরকার পক্ষ হইতে যুগান্তর বিপ্লবী গ্রুপ নামটি উল্লিখিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ও কাঁথির বন্যায় আর্তত্রাণের জন্য বাংলার সকল বিপ্লবী দল হইতে লোক আসে। এই উপলক্ষে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য (উত্তরকালে মানবেন্দ্রনাথ রায়), নরেন ঘোষ চৌধুরী, পূর্ণ দাস, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, হরিকুমার চক্রবর্তী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ইত্যাদি।

বিপ্লবের জন্য প্রচার, অস্ত্রসংগ্রহ, সংগঠন স্থাপন, বিপ্লবী কেন্দ্র গঠন প্রভৃতি কার্যের জন্য ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, মাদাম কামা, সর্দার সিংরাওজি রানা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভি. ভি. এস. আয়ার, বিনায়ক সাভারকর, তারকনাথ দাস, লালা হরদয়াল, মহম্মদ বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা সিন্ধী, চম্পকরামন পিল্লে, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, বিষ্ণু গণেশ পিংলে, হেরম্ব গুপ্ত, সত্যেন সেন, জিতেন লাহিড়ী, রামচন্দ্র পেশোয়ারি, অবনী মুখার্জি, ডক্টর মনসুর, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ভারতীয় বিদেশে গিয়াছিলেন।

প্রথমদিকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা ছিল লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া হাউস'। ভোলানাথ চ্যাটার্জী ব্যাংককে এক গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হরদয়াল আমেরিকায় গদর পার্টির পত্তন করেন ('গদর পার্টি' ও 'হরদয়াল' দ্র)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মান অস্ত্রসাহায্যে ও অর্থসাহায্যে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরদয়াল এবং বরকতুল্লা, হেরম্ব গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মিগণ ইহাতে লিপ্ত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলিন ইন্ডিয়া কমিটি নামক এক সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহার সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে ফন বার্লিন ও ব্যারন ওপেনহাইম ও কর্মসচিব ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ সরকার। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে বেলিনে প্রতিষ্ঠিত হয় ডক্টর মনসুরের সভাপতিত্বে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি। প্রথম দুই বৎসর ইহার কর্মসচিব ছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শেষ দুই বৎসর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। জার্মান সরকারের সঙ্গে এই কমিটির কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে এই কমিটিই সচরাচর 'বেলিন কমিটি' নামে অভিহিত হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, মহম্মদ বরকতুল্লা, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, বিষ্ণু সুখতানকর প্রমুখ ব্যক্তিরাও এই কমিটির সভ্য ছিলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে স্বাধীন ভারতের এক অন্তর্বর্তীকালীন 'আজাদ সরকার' স্থাপিত হয়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ছিলেন ইহার রাষ্ট্রপতি। মহম্মদ বরকতুল্লা প্রধানমন্ত্রী ও ওবেদুল্লা সিন্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইহা দুই বৎসর টিকিয়াছিল।

গদর পার্টির প্রচারকার্য প্রবাসী শিখদের মধ্যেই বিশেষভাবে কার্যকরী হইয়াছিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে 'কোমাগাতা মারু' ঘটনা ও 'তোসামারু ঘটনা' ('গুরুদিৎ সিংহ' দ্র)। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পাঞ্জাব হইতে মধ্যপ্রদেশ ও পূর্ববাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত এক 'সর্ব-ভারতীয়' সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ঘটে। পাঞ্জাবই ছিল এই পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের ঝটিকা-কেন্দ্র। এই প্রচেষ্টায় অনুশীলন সমিতি, রাসবিহারীর দল, কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের দল ও চন্দননগরের মতিলাল রায়ের দল এক হইয়া কাজ করে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থানের দিন ধার্য হয় এবং পরে দিনটিকে আগাইয়া ১৯ ফেব্রুয়ারি করা হয়। কিন্তু জনৈক কিরপাল সিংয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পুলিশ সব খবর পায় এবং

ষড়যন্ত্রটি ব্যর্থ হয়। ঐ বৎসর রাসবিহারী পি. এন. ঠাকুর নামে পাসপোর্ট লইয়া জাপানে চলিয়া যান। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত পিংলে মীরাটে বোমা সমেত ধৃত হন। ষড়যন্ত্রের অন্যতম নেতা কর্তার সিং এবং আরও অনেকে ধরা পড়েন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কর্তার সিং, বিষ্ণু গণেশ পিংলে ও আরও ২৬ জনের ফাঁসি হয়। কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

ঐ বৎসর দ্বিতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ইওরোপ হইতে আগত জিতেন লাহিড়ী মারফত খবর আসে (মার্চ, ১৯১৫ খৃ) যে জার্মান অস্ত্রসাহায্য পাওয়া যাইবে। তদনুসারে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সি. মার্টিন নাম গ্রহণ করিয়া এপ্রিল মাসে বাটাভিয়ায় গিয়া জার্মান এজেন্ট ও ব্যবসায়ী থিওডোর হেলফেরিখের সঙ্গে দেখা করেন। শোনা গেল যে ম্যাভেরিক জাহাজ ক্যালিফোর্নিয়া হইতে যাত্রা করিয়া ৩০ হাজার রাইফেল, ৬০ লক্ষ কার্তুজ ও দুই লক্ষ টাকা লইয়া করাচী যাইবে। মার্টিন বন্দোবস্ত করেন যে জাহাজটা যেন করাচীতে না যাইয়া সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্র নামায়। জুন মাসে ভারতে ফিরিয়া মার্টিন এই সংবাদ যতীন্দ্রনাথকে জানান।

কিন্তু ম্যাভেরিক রায়মঙ্গলে আসে নাই। ব্যবস্থা এই-রূপ ছিল যে তৈলবাহী ম্যাভেরিক জাহাজ সমুদ্রপথে অ্যানি লারসেন নামক অস্ত্রবাহী জাহাজ হইতে অস্ত্র বোঝাই করিয়া বাটাভিয়ায় আসিবে। কিন্তু অ্যানি লারসেন আটক পড়ায় ম্যাভেরিক সম্পূর্ণ খালি অবস্থাতেই বাটা-ভিয়ায় আসে। ইহার পর হেনরি এস জাহাজে ম্যানিলা হইতে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের এবং শ্যাম-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে জার্মান অস্ত্র এবং হেভড (Wehde) ও বোয়েম নামক দুইজন জার্মান-আমেরিক্যানকে প্রেরণের চেষ্টা বিফল হয়। অন্যান্য জাহাজে ব্যাংকক, সাংহাই প্রভৃতি স্থান হইতে জার্মান অস্ত্রপ্রেরণের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় হরিকুমার চক্রবর্তীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ্যারি অ্যান্ড সন্সের ঠিকানায় হেলফেরিখ যে টাকা পাঠাইতেছিলেন, পুলিশ তাহার সন্ধান পায়। ৭ আগস্ট পুলিশ হ্যারি অ্যান্ড সন্সের অফিসে হানা দেয় এবং ৪ সেপ্টেম্বর তাহার বালেশ্বর শাখা ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে খানাতল্লাসি করে। ফলে বালেশ্বরের ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপদায় যতীন্দ্রনাথের গোপন ঘাঁটিও পুলিস তল্লাস করে। যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারিজন অনুগামীসহ তৎপূর্বেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। ৯ সেপ্টেম্বর বুড়াবালামের তীরে চাশখন্দের কাছে পুলিসের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হয়। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ঘটনাস্থলেই মারা যান। যতীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক আহত হইয়া পরদিন (১০ সেপ্টেম্বর) হাসপাতালে মারা যান। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাঁসি হয় ও জ্যোতিষ পালের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। ('যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্র)

মার্টিন ১৫ আগস্ট পুনরায় বাটাভিয়ায় যান। ভোলানাথ চ্যাটার্জি বাটাভিয়ায় মার্টিনের নামে যে তার পাঠাইয়াছিলেন সেই সূত্রে পুলিশ ভোলানাথকে গ্রেপ্তার করে। তিনি পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন। অবনী মুখার্জি রাসবিহারী ও ভগবান সিং প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে জাপানে মিলিত হইয়া সাংহাই হইতে ভারতে ফিরিবার পথে সিঙ্গাপুরে তাঁহার মারাত্মক নোটবুক সহ ধরা পড়েন। সেই নোটবুক হইতে বহু গোপন ঠিকানা পুলিশের হস্তগত হয়। ফলে ভারতে ও ভারতের বাহিরে বহু জায়গায় খানাতল্লাসি ও ধরপাকড় হয়। মান্দালয় জেলে ব্যাংককের ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং-এর ফাঁসি হয়।

ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে শিকাগো মামলায় হেভড, বোয়েম ও হেরম্ব গুপ্তের সাজা হয়। এই সম্পর্কে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সানফ্রান্সিস্কো মামলায় হরদয়ালের অন্যতম প্রধান সহকর্মী রামচন্দ্র পেশোয়ারি আদালত কক্ষে নিহত হন।

বালেশ্বরের খন্ডযুদ্ধের পর প্রধান ঘটনা গৌহাটির খন্ডযুদ্ধ (৯ জানুয়ারি, ১৯১৮ খৃ) এবং ঐ বৎসর ঢাকা কলতাবাজারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করিয়া নলিনী বাগচির মৃত্যু। ইহাই বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্বের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রবর্তন উপলক্ষে সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।

গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলে যাদু-গোপাল মুখার্জি প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা তাঁহাকে মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেন যে দুই বৎসর তাঁহারা কোনও হিংসাত্মক কার্যকলাপ করিবেন না। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের নেতারা কংগ্রেসে ঢুকিয়া বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির উচ্চ পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়িলে পুরাতন বিপ্লবী নেতাদের অধি-কাংশই কংগ্রেসের মত এক বিরাট গণ-সংগঠন ছাড়িয়া পুরাতন পথে ফিরিয়া যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কংগ্রেসের মাধ্যমেই একদিন সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক দিতে হইবে, এই চিন্তাধারা তাঁহাদের মনে ছিল। পুরাতন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, এই বিশ্বাস তাঁহাদের অনেকের মনে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তরুণ বিপ্লবীরা 'অ্যাক্‌শন'-এর জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাসটি প্রধানতঃ বাংলায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নূতন বিপ্লবী দলের ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর এবং উত্তর ভারতে হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন ও হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপের ইতিহাস। শাঁখারিটোলা ডাকঘরে ডাকাতির চেষ্টা (১৯২৩ খৃ) ও গোপীনাথ সাহা কর্তৃক টেগার্ট-

ভ্রমে মিঃ ডে-র হত্যা (১৯২৪ খ্রী) এই নূতন পর্বের সূচনা ঘোষিত করে। এই পর্বে ডাকাতি খুব বেশি হয় নাই কিন্তু খুন ও সংঘর্ষ অনেক হইয়াছিল এবং অসংখ্য বিপ্লবী শহীদ হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য দল গঠন করিলে বিপ্লবী নেতারা তাঁহাকে সমর্থন করেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের (১৯২৩ খ্রী) পর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশনে ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অর্ডিনান্সে বিপ্লবী নেতাদের আটক রাখার হিড়িক পড়িয়া যায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে পুলিশ একটি বোমার কেন্দ্র আবিষ্কার করে। এই ব্যাপারে যাঁহারা ধৃত হন তাঁহাদের মধ্যে অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী আলিপুর জেলে 'আই. বি'র স্পেশাল এস. পি. ভূপেন চ্যাটার্জিকে হত্যা করেন। দুইজনেরই ফাঁসি হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কাকোরী রেল স্টেশনে ট্রেন ডাকাতি হয়। ইহা অনুশীলন সমিতি কর্তৃক প্রেরিত যোগেশ চ্যাটার্জির নেতৃত্বে উত্তর ভারতে যে বিপ্লবী সংস্থা (হিন্দুস্থান রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন) স্থাপিত হইয়াছিল তাহার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৬ খ্রী) রাজেন লাহিড়ী, আস্‌ফাকুল্লা খান, রামপ্রসাদ বিস্‌মিল ও ঠাকুর রোশন সিং-এর ফাঁসি হয়। যোগেশ চ্যাটার্জি ও শচীন সান্ন্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে সকল বিপ্লবী বন্দী মুক্তি পান। মেদিনীপুর জেলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুগান্তর ও অনুশীলন এক হইয়া কাজ করে। কিন্তু ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের কংগ্রেস সংগঠনে অনুশীলন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ও যুগান্তর সুভাষচন্দ্রের সমর্থক হইয়া পড়ে। বিপ্লব আন্দোলনকে বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এক নূতন বিপ্লবী দল গঠনের চেষ্টা হয় (১৯২৯ খ্রী)। ইহাকে বলা হয় 'রিভোল্ট গ্রুপ'। ইহাতে ছিলেন আত্মোন্নতি সমিতির সন্তোষ মিত্র, অনুশীলনের সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি, চট্টগ্রাম দলের জুলু সেন ও গণেশ ঘোষ, মাদারিপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তী, বি. ভি.-র (মেজর) সত্য গুপ্ত ইত্যাদি। ঐ বৎসর মেছুয়াবাজার আড্‌ডার খানাতল্লাসির ফলে সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন প্রভৃতি ধরা পড়েন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় অনেকের সাজা হয়।

ইহার পরেই অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের সূর্য সেনের বা মাস্টারদার দলের দ্বারা বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন (১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ খ্রী)। দুই দিনের জন্য চট্টগ্রাম শহর বিপ্লবীদের 'করায়ত্ত' হয়। ২২ এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে ঘটে সৈন্যদলের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ। কিশোরবয়স্ক হরিগোপাল বল (টেগরা) ও আরও দশজন যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হন। আরও দুইজন পরদিন মারা যান। সূর্য সেন দুই বৎসর ফেরার থাকিয়া ধরা পড়েন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ধলঘাটে পুলিশের সহিত ফেরারি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের সংঘর্ষে ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হন ও নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন মারা যান। ঐ বৎসর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার পাহাড়তলী ইওরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করিয়া আহত অবস্থায় আত্মহত্যা করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, কল্পনা দত্ত প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং সূর্য সেনের ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হয়।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে। ভগৎ সিং যোগেশ চ্যাটার্জির বিপ্লবী দলভুক্ত হন (১৯২৪ খ্রী)। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভগৎ সিং তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিক্যান অ্যাসোসিয়েশন নামে এক নূতন বিপ্লবী দল গঠন করেন। তিনি রাজগুরু ও অন্যান্য সহকর্মীদের সাহায্যে লাহোরে লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী মিঃ স্যন্ডার্সকে হত্যা করেন। ২৬ জুন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লীর অ্যাসেম্‌ব্লি কক্ষে দর্শক গ্যালারি হইতে একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা যে লাল ইস্তাহার ছড়াইয়াছিলেন তাহাতে লিখিত হইয়াছিলঃ "It takes a loud voice to make the deaf hear"। উভয়েই ধৃত হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে স্যন্ডার্স হত্যা ও অন্যান্য অ্যাক্‌শনের অভিযোগে তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯৩০. খ্রী) ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের (সুখদেব) ফাঁসি হয়। অপর আটজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। এই মামলাতে অভিযুক্ত হইয়া যতীন দাস লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬৩ দিন অনশন করিয়া মারা যান (১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খ্রী)।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে হরিকিষণের গুলিতে পাঞ্জাবের গভর্নর জিওফ্রি ডি' মণ্ট্‌মোরেন্সি আহত হন ও ইনস্পেক্টর চন্দন সিং নিহত হন। হরিকিষণের ফাঁসি হয়। ভগৎ সিং-এর অন্যতম প্রধান সহকর্মী চন্দ্রশেখর আজাদ এলাহাবাদে অ্যালফ্রেড পার্কে পুলিশ বাহিনীর সহিত একক লড়াই করিয়া নিহত হন (২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ খ্রী)। লাহোর মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষকে বেতিয়া শহরে হত্যা করেন কিশোরবয়স্ক বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিং। বিচারে বৈকুণ্ঠ সুকুলের ফাঁসি হয় (১৪ মে, ১৯৩৪ খ্রী)।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বাধিনায়কত্বে যে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠিত হয়, তাহার মধ্য হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া গঠিত হয় ঢাকার হেম ঘোষের 'বেংগল ভলাণ্টিয়ার্স' বা বি. ভি. দল। হেম

ঘোষের সহিত মতভেদ হওয়ায় লীলা নাগ ও অনিল রায় শ্রী সংঘ নামে এক বিপ্লবী দল গঠন করিয়াছিলেন। দলের বিনয়কৃষ্ণ বসু ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা শহরে পুলিশের আই. জি. মিঃ লোম্যানকে হত্যা করেন ও ঢাকার পুলিশ সাহেব মিঃ হড্‌সনকে মারাত্মকভাবে জখম করেন। ঐ বৎসর ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু ও বি. ভি.র আরও দুইজন তরুণ সভ্য সুধীর গুপ্ত (বাদল) ও দীনেশ গুপ্ত কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ঢুকিয়া জেলের আই. জি. কর্নেল সিম্প্‌সনকে হত্যা করেন। আরও কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী তাঁহাদের গুলিতে আহত হন। তাহার পর ঘটে পুলিশ বাহিনীর সহিত বিনয়-বাদল-দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অলিন্দ যুদ্ধ। বাদল গুপ্ত ঘটনাস্থলেই মারা যান। হাসপাতালে পাঁচদিন পরে বিনয় বসুর মৃত্যু হয়। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসি স্কোয়ারে (বর্তমানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) মিঃ টেগার্টকে হত্যা করার এক ব্যর্থ চেষ্টা হয়। নিক্ষিপ্ত বোমায় অনুজা সেন ঘটনাস্থলেই মারা যান। এই ব্যাপার-সংক্রান্ত ষড়যন্ত্র মামলায় ডাক্তার নারায়ণ রায় ও ডাক্তার ভূপাল বসু প্রভৃতির কঠোর সাজা হয়।

মেদিনীপুরে পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি. ভি. দলের বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন; ১. বিমল দাশগুপ্ত ও জ্যোতিজীবন ঘোষ কর্তৃক মিঃ পেডি (১৯৩১ খ্রী); ২. প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য কর্তৃক মিঃ ডগ্‌লাস (১৯৩২ খ্রী); ৩. অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত ও তাঁহাদের সহকর্মী ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, নন্দদুলাল সিং প্রভৃতির দ্বারা মিঃ বার্জ (১৯৩৩ খ্রী)। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত ঘটনাস্থলেই নিহত হন। নবজীবন পুলিশী অত্যাচারে মারা যান। ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের ফাঁসি হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি. জি. বি. স্টিভেন্‌সকে শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী হত্যা করেন। ৭ জুলাই কানাই ভট্টাচার্য আলিপুরের জেলা ও সেসন্‌স্‌ জজ মিঃ গার্‌লিককে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করেন। ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলি বন্দীশালায় পুলিশের গুলিতে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নিহত হন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেনকে হত্যা করার জন্য কালিপদ মুখার্জির এবং কলিকাতায় ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জিকে হত্যা করার জন্য রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস বাংলার গভর্নর স্যার স্টান্‌লি জ্যাক্‌সনকে গুলি করিয়া মারার চেষ্টা করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে পুলিশের সহিত ফেরারি বিপ্লবীদের সংঘর্ষ হয়। ধরা পড়িয়া দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়। স্যার জন অ্যান্ডার্সন বাংলার গভর্নর হইয়া আসিলে (১৯৩২ খ্রী) বিপ্লবীদের দমন করার জন্য ‘বেংগল সাপ্‌প্রেশন অফ টেররিস্ট আউটরেজেস অ্যাক্ট, ১৯৩২’ পাশ হয় ও কঠোর দমননীতি অবলম্বিত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিংয়ে লেবংয়ের ঘোড়দৌড়ের মাঠে বি.ভি.র ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বলা মজুমদার প্রভৃতি তাঁহাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা ও টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ ২৯ জনের বিচার ও কঠোর সাজা হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নামে বিবৃতি দিয়া যুগান্তর দল তুলিয়া দেওয়া হয়। এইখানেই অনেকের মতে বিপ্লব আন্দোলনের পরিসমাপ্তি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক ‘আজাদ হিন্দ সরকার’ ও ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক বিচারে বিপ্লব আন্দোলনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায় বলিয়া গণ্য। ‘আজাদ হিন্দ ফৌজের’ ১৫৬৪ জন সৈনিক শহীদ হন। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের সংগে ‘বিপ্লব আন্দোলন’ নামে অভিহিত আন্দোলনটির সমাপ্তি ঘটে। (‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ ও ‘সুভাষচন্দ্র বসু’ দ্র)।

দ্র যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ; জীবনতারা হালদার, কলিকাতার প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪; নলিনীকিশোর গুহ, বাংলায় বিপ্লববাদ, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ; ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ; *Report of the Sedition Committee*, London, 1918; Gopal Thakur, *Bhagat Singh*, New Delhi, 1962; R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, vol. III, Calcutta, 1963; Kalicharan Ghose, *The Roll of Honour*, Calcutta, 1965; Uma Mukherji, *Two Great Revolutionaries*, Calcutta, 1966.

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল শ্রেণী সংগ্রাম, রাষ্ট্রের উপর শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে ধনতান্ত্রিক সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিয়া পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলার বৈপ্লবিক আদর্শে বিশ্বাসী এদেশের অন্যতম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনৈতিক দল; ইংরেজীতে রিভলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি, সংক্ষেপে আর. এস. পি।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের রামগড়ে এই দলের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হয়। অতীতে এই দলের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের ভিতরে অনেকেই এদেশের সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও বহুকাল ধরিয়া কারাপ্রাচীরের অন্তরালে আটক ছিলেন। কারামুক্তির পরে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইঁহারা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রামগড়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন এবং তাহার পাশাপাশি সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক আহূত সর্বভারতীয় আপসবিরোধী সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই সময়ে ইঁহারা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল' গড়িয়া তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাস্তব পরিস্থিতিতে অবিলম্বে প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর যে প্রস্তাব কংগ্রেস নাকচ করিয়া দেয়, ইঁহারা তদনুরূপ কর্মপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল এ ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিরুদ্ধাচরণ করিতে সম্মত হয় নাই। তাহা ছাড়া মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রশ্নেও উভয় দলের চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল।

এই সময়ে দেশের অন্যান্য যে সমস্ত রাজনৈতিক দল বামপন্থী বা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতন্ত্রী দল হিসাবে পরিচিত ছিল, যেমন কমিউনিস্ট পার্টি বা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রভৃতি, তাহাদের মার্কসবাদী চিন্তাধারা সত্ত্বেও তাহাদের সঙ্গে এদেশের বাস্তব পরিবেশে কিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূলসূত্রগুলির প্রয়োগ হইবে এবং বিশেষ করিয়া এদেশের বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কি পরিমাণে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করিয়া চলিবে অথবা নিজেরা নিজেদের দেশের বিপ্লব আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিয়া নিজেদের স্বতন্ত্র নীতি নির্ধারণ করিবে, এ সব প্রশ্ন লইয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য ছিল। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে এই সব মতপার্থক্য এদেশের রাজনীতিতে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বর্তমানে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল পশ্চিমবাংলা ও কেরালা এই দুই রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনাধিকারীর দ্বারা রাজ্য দল হিসাবে স্বীকৃত। কেন্দ্রীয় সংসদে, রাজ্যসভায় ও লোকসভায়, এবং পশ্চিমবাংলা ও কেরালার বিধানসভাতেও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে। এই দুই রাজ্য ছাড়াও আসাম, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ ও কেরালা রাজ্যে দলের সংগঠন আছে। শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ও কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংযুক্ত কিসান সভা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এবং দেশের রাজনীতিতে উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল দেশের বাস্তব রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাহিদা বিচার করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবী গণ-আন্দোলন পরিচালনার নীতিতে বিশ্বাসী।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে 'জনযুদ্ধের' প্রশ্নে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল কমিউনিস্ট পার্টি বা র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির মত মানিয়া লইতে পারে নাই।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের অল্প কিছুদিন পূর্বে শাসকদল হিসাবে কংগ্রেসের আসন্ন পরিবর্তিত ভূমিকার কথা চিন্তা করিয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া কংগ্রেসের বাহিরে আসিয়া স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল মস্কো বা পিকিং অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা কমিউনিস্ট চীন কাহাকেও অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া চলার পক্ষপাতী নয়। বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ধনতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবীগণ আন্দোলনের বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের সমাজ-বিপ্লব পরিকল্পনাকে এদেশে বাস্তবে রূপায়িত করিবে, ইহাই হইল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের উদ্দেশ্য।

ত্রিদিবকুমার চৌধুরী

বিপ্লবী সাম্যবাদী দল (R. C. P. I) ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১ আগস্ট এই দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইওরোপ হইতে ফিরিয়া সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্তালিনবাদ কমিউনিজমের পরিপন্থী এক স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, এই মর্মে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রচার শুরু করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্তালিনবাদকে শিরোধার্য করিয়া নেওয়ায় ভারতে একটি সত্যকার কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করা আবশ্যক, এই মত পোষণ করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সুধীর দাশগুপ্ত, প্রভাত সেন ও রণজিৎ মজুমদার এই তিনজনের সহযোগিতায় সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর এই দল 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে পরিচিত ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিপ্লবী সাম্যবাদী দল' নাম রাখা হয়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ও শ্রেণীভেদলুপ্ত সোস্যালিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা—এই ছিল দলের উদ্দেশ্য। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দল সর্বদাই অংশগ্রহণ করিয়াছে। এই দল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয়

কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী। কমিউনিস্ট পার্টিকে এই দল স্তালিনপন্থী ও কমিউনিজমের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া মনে করে। জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতের বিপ্লবী সাম্যবাদী দল ভারতের পুঁজিবাদীদের দল বলিয়া অভিহিত করে।

ভারতবর্ষের চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্তদের দাবী লইয়া ভারতের সাম্যবাদী দল বিরামহীন সংগ্রাম করিয়াছে ও চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্তদের পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠা করাই এই দলের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই দল কর্তৃকই বাংলাদেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি-আন্দোলন সর্বপ্রথম সংগঠিত হয়। নিখিল-বিশ্ব ফ্যাসিজম-বিরোধী সংঘের ভারতীয় শাখার প্রতিষ্ঠায় (১৯৩৪ খ্রী?) এই দল অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

বিপ্লবী-সাম্যবাদী দলের আদর্শ প্রচার করার জন্য এই দল তিনটি (অধুনা বিলুপ্ত) সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে—বাংলায় 'গণবাণী', ইংরেজীতে 'টয়লার্স ফ্রন্ট' (Toiler's Front) ও হিন্দীতে 'মশাল'।

সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ও সংগ্রামের পদ্ধতির প্রশ্ন লইয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য ও বিরোধের ফলে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। পান্না-লাল দাশগুপ্তের নেতৃত্বে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দমদম বসিরহাটে ও পরে আসামে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়া আঞ্চলিক ক্ষমতা দখলের পথ গ্রহণ করে। সামরিক তৎপরতা ও গ্রেপ্তারের ফলে দলের নেতা ও কর্মিবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলে এই দলের কর্মতৎপরতা ও প্রভাব স্তিমিত হইয়া আসে। পরবর্তীকালে এই দলের বৃহত্তম অংশ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। অবশিষ্ট অংশ ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হয়। তিনটি উপদল বিপ্লবী সাম্যবাদী দলরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবর্তবাদ পরিণামবাদ দ্র.

বিবাহ[১] নর ও নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ককে সকল সমাজেই নানা বিধি ও নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সেই সকল বিধি-নিষেধকে মানিয়া নর-নারীর মধ্যে যে সম্পর্ক সমাজে স্বীকৃত হয় এবং যাহার বশে উভয়ে মিলিত হইয়া পরিবার রচনা করে তাহাকে বিবাহ বলা হয়। হিন্দু শাস্ত্রে কথিত আছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'। কিন্তু যদি ভার্যার পুত্র না হয় তবে একাধিক দার পরিগ্রহের ব্যবস্থাও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। এতদ্ভিন্ন শুদ্ধ উচ্চ কুলের পাত্রের নিকট কন্যাদান করিয়া মর্যাদা লাভের চেষ্টায় পূর্ব-কালে বাংলাদেশে বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল।

হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণ এবং জাতি অনুসারে নানা-বিধ স্তর বা শ্রেণী বর্তমান। প্রতি জাতি আবার নানা শাখা, গোত্র ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুদ্রতর বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। নিয়ম অনুসারে বিবাহের পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে কোন্ বিভাগ প্রশস্ত এবং কোন্ বিভাগ নিষিদ্ধ তাহা সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করা হইয়া থাকে। দেশভেদ অনুসারে ইহার অতিরিক্ত আরও বিশেষ বিশেষ নিয়মের প্রচলন আছে। দক্ষিণ ভারতে উচ্চ-নীচ বিবিধ জাতির মধ্যে মাতুলকন্যার সহিত বিবাহ প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পাত্রী মাতার বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। কোথাও বা বিধবা ভ্রাতৃবধূ দেবরকে পতি-রূপে গ্রহণ করে। হিমাচল প্রদেশে কিন্নোর লাহুল প্রভৃতি জেলায় কয়েক ভ্রাতায় মিলিয়া একই কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করে। বাংলাদেশে বা সাধারণভাবে উত্তর ভারতে উপরোক্ত বিবাহ-সম্বন্ধ নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়। উপরন্তু পিতৃকুল বা মাতৃকুলের মধ্যে যে কয়পুরুষ পিণ্ডদানের অধিকারী তাহাদের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়।

কোনও কোনও সমাজে বিবাহের দ্বারা পুরুষ এবং নারী আজীবন পরস্পরের সংগী হইয়া যায়, কিন্তু ইহা সকল সমাজের পক্ষে সত্য নয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে উচ্চবর্ণের বিশ্বাস যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্মজন্মান্তর ধরিয়া বর্তমান থাকে। হয়তো এই কারণেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের মধ্যে এক সময় সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর জাতির মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং বিধবা রমণীর দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা বহুকাল যাবৎ বর্তমান আছে। সম্প্রতি স্বাধীন ভারতে বিবাহ সম্পর্কে আইনের যে সংস্কার ঘটিয়াছে তাহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ, সগোত্র বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। অর্থাৎ বিবাহ কোনও আধ্যাত্মিক বা ধর্মনির্দিষ্ট শাসনের দ্বারা শাসিত না হইয়া পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র সামাজিক বন্ধনের আকার ধারণ করিয়াছে।

পাত্র-পাত্রীর বয়স সম্পর্কেও নানা সমাজে নানাবিধ নিয়ম প্রচলিত আছে। বাংলাদেশেই গৌরীদানের রীতি প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম অনুসারে রজঃস্বলা হইবার পূর্বেই কন্যাকে পাত্রস্থ করা হইত। বিবাহের পর কন্যা পিতৃগৃহেই কালাতিপাত করিত। রজঃস্বলা হইলে 'দ্বিতীয় বিবাহ' নামে অপর একটি অনুষ্ঠানের অন্তে তাহাকে শ্বশুরালয়ে পাঠানো হইত।

১৯২৯ সালের সারদা-আইন অনুসারে (The Child Marriage Restraint Act XIX of 1929) উপরোক্ত বিবাহ আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদিও গ্রামদেশে কোনও কোনও দরিদ্র ও অশিক্ষিত জাতির মধ্যে ইহা আজও বর্তমান রহিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহিত ইহা স্বভাবতঃই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

পাত্রপাত্রী নির্বাচনে বিবিধ নিয়মশাসন ভিন্ন বিবাহের

পদ্ধতির মধ্যেও নানা প্রকার ইতরবিশেষ দেখা যায়। স্মৃতি অনুসারে দৈব, আর্ষ, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ পদ্ধতির বর্ণনা আছে। এগুলির মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে প্রাজাপত্য পদ্ধতিই সমধিক প্রচলিত। অপরগুলি পূর্বে প্রচলিত থাকিলেও অধুনা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

বাঙালী হিন্দুসমাজে বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে কতকগুলি লক্ষণের মিশ্রণ দেখা যায়। যে সকল জাতি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের শাসনাধীন তাহাদের মধ্যে বর ও কন্যাকে একত্র যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়, সপ্তপদী গমন করিতে হয় ইত্যাদি। এগুলি পুরাপুরি ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান। কিন্তু এতদ্ভিন্ন স্ত্রী-আচার নামে প্রচলিত আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান বিবাহের অঙ্গ-স্বরূপ পালিত হয়। দেশ, জাতি এবং কুল অনুসারে ইহার মধ্যে নানাবিধ ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। ধুতুরা প্রদীপ ও বরণডালা দিয়া পাত্রকে বরণ করা, মোনামুনি ভাসানো, পাত্রের দৈর্ঘ্য অনুসারে একটি সুতা মাপিয়া শাশুড়ীর পক্ষে তাহা গলাধঃকরণ করা, নাপিতের দ্বারা নানা প্রকার শ্লীল-অশ্লীল রহস্য করা, বিবাহান্তে কন্যার হাতে শোলমাছ ধরানো, তাহার মুখে ও কানে মধুর প্রলেপ দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা যে বাঙালী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দ্বারা শাসিত হইবার পূর্ব হইতেই এই সকল প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল।

নির্মলকুমার বসু

বিবাহ[২] সাধারণ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য। বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল বৃহৎ ব্যাপার। ইহার কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয়, কিছু লৌকিক বা স্ত্রী-আচার। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শাস্ত্রীয় অংশের মোটামুটি মিল আছে—লৌকিক অংশে নানারূপ স্থানীয় ও পারিবারিক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান আশীর্বাদ, পাটিপত্র, পাকা দেখা, দিনাবধারণ প্রভৃতি নানা নামে প্রসিদ্ধ। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া বিবাহের সম্বন্ধ ও তারিখ পাকাপাকিভাবে স্থির হয়। এই উপলক্ষে বরপক্ষ হইতে কন্যাকে ও কন্যাপক্ষ হইতে বরকে কিছু উপহার দিয়া আশীর্বাদ করা হয়। কোথাও কোথাও দেনা-পাওনার হিসাব লিখিতভাবে দেওয়া-নেওয়া হয়। বিবাহের দুই-একদিন পূর্বে গায়ে হলুদ বা গাত্রহরিদ্রা। অনেকস্থানে ইহা অধিবাসের অঙ্গ ও বিবাহের দিনে অনুষ্ঠেয়। বরের গায়ে কাঁচাহলুদ বাটা স্পর্শ করানো ও মেয়ের বাড়ীতে পাঠানো তাহার অংশ মেয়ের গায়ে স্পর্শ করানো—ইহাই হইল অনুষ্ঠানের স্বরূপ। বিবাহের দিন ভোরে দধিমঙ্গলের অনুষ্ঠান দ্বারা কার্যারম্ভ। পবিত্র মাঙ্গলিক দধি মুখে দিয়া শুভ কার্যের সূচনা করা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এই দিন দিনের বেলায় অন্য কার্য অধিবাস ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। বিবাহের প্রধান কার্য, কন্যার পিতা বা তৎস্থানীয় কাহারও দ্বারা বরকে আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যাদান, রাত্রিতে শুভমুহূর্তে বা লগ্নে কন্যার গৃহে সাধারণতঃ বাসগৃহের বাহিরে সাময়িক ভাবে আচ্ছাদিত খোলা জায়গায় অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর আসিলে কন্যাকর্তা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নূতন কাপড় চাদর প্রভৃতি দিয়া বরণ করেন। তারপর কন্যাকে পিঁড়ির উপর বসাইয়া দণ্ডায়মান বরের চারপাশে সাত পাক ঘুরানো হয় এবং সেই অবস্থায়ই কন্যাকে বরের সামনে নিয়া উভয়কে উভয়ের মুখ দেখানো বা শুভদৃষ্টির অনুষ্ঠান করা হয়। এই সময় আধুনিক রীতি অনুসারে বরকন্যাকে দিয়া পরস্পরের গলায় ফুলের মালা দেওয়ানো ও বদল করানো হয়। ইহার পর বরকন্যার মুখোমুখি আসন গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিক কন্যাদান। একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপরে বরের চিৎ করা ডানহাত, তাহার উপর কন্যার ডানহাত ও তাহার উপর লাল গামছায় বাঁধা পাঁচটি ফল (পাঁচটি হরীতকী অথবা আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, জায়ফল ও সুপারি এই পাঁচটি ফল) রাখিয়া হাত দুইখানি কুশ ও ফুলের মালা জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইলে কন্যাদাতা বর ও কন্যার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম গোত্র তিন তিন বার উল্লেখ করিয়া সম্প্রদান কার্য সম্পন্ন করেন। সম্প্রদানের পর হাতের বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয় এবং ফুলবাঁধা গামছার একপ্রান্ত কন্যার কাপড়ের আঁচল ও আর একপ্রান্ত বরের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহারই নাম গাঁটছড়া বাঁধা। বিবাহের পর আট বা দশ দিনের দিন একটা ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে এই বাঁধন খুলিয়া দেওয়া হয়। এই কয়দিন বরবধূর একসঙ্গে বা জোড়ে থাকিতে হয়—বিজোড় হইতে নাই। কেবল বিবাহের পরের দিন রাত্রে একসঙ্গে থাকিতে নাই। এই রাত্রি কালরাত্রি নামে পরিচিত।

সধবার প্রধান চিহ্ন ও শ্রেষ্ঠ অলংকরণ সিঁথির সিন্দুর। ইহা সম্প্রদানের পরে বিবাহের রাত্রিতে, রাত্রিশেষে বা পরের দিন বরের বাড়ীতে বধূবরণের সময় পারিবারিক নিয়ম অনুসারে বর নিজের হাতে বধূর সিঁথিতে দিয়া দেয়। বিবাহের বেশির ভাগ শাস্ত্রীয় কার্য অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদানের পরে সেই রাত্রেই বা পরের দিন সকালে বা সুবিধামত অন্যদিন। এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা। ইহা বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কর্মকেও বুঝাইয়া থাকে। লাজ বা খই মাঙ্গলিক দ্রব্য। বধূর ভ্রাতা বধূর হাতে খই তুলিয়া দিলে অগ্নিতে সেই খই আহুতি দেওয়া হয়। শিলারোহণে বধূর পা শিলের উপর তুলিয়া দিয়া তাহাকে শিলার মত স্থির হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পর পর সাতটি আলপনার রেখার উপর দিয়া বর বধূকে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর করিয়া দেন। ইহাই সপ্তপদী গমন। আনুষ্ঠানিকভাবে বর কর্তৃক বধূর হস্তগ্রহণ করা পাণিগ্রহণ। এই সমস্ত

অনুষ্ঠান বিবাহের অপরিহার্য অংগ হইলেও বর্তমানে অংপবিস্তর উপেক্ষিত। বিবাহের পরদিন উঠানে চারটি কলাগাছ পুঁতিয়া তৈয়ারি করা কলাতলায় বা ছাদনাতলায় বাসি বিবাহের লৌকিক অনুষ্ঠান। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর বর বধূকে নিয়া গৃহে গমন করিলে সেখানেও কলাতলায় বধূ বরণের পর বরবধূকে ঘরে তোলার আনুষঙ্গিক স্ত্রীআচার। বিবাহের তৃতীয় দিন ফুলসজ্জা। এইদিন রাত্রিতে ফুলের সাজে সজ্জিতা বধূর সহিত বরের বাধাহীন প্রথম মিলন। এইদিন বা দুই একদিনের মধ্যে পাকস্পর্শ বা বৌভাত উপলক্ষে নববধূর পরিবেশিত বা স্পর্শ করা অন্নগ্রহণের ভিতর দিয়া বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধূকে আপনজন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই পতিসহ নববধূর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন এবং সেখান হইতে পতিগৃহে পুনরাগমন বা দ্বিরাগমন। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান নামমাত্র প্রচলিত। কারণ শাস্ত্রানুসারে বধূর বার বৎসর বয়স হইলে এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিবাহ আইন, ভারতীয় ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকের বাস। তাহাদের বিবাহ-প্রথার স্বরূপ ও আচার-অনুষ্ঠানও বিভিন্ন, বিবাহের আদর্শও ভিন্নরূপ, কোনও ক্ষেত্রে ইহা ধর্মানুষ্ঠান, কোথাও চুক্তিমাত্র, কোথাও ইহা দুইয়ের সংমিশ্রণ।

হিন্দুধর্মমতে বিবাহ ধর্মাচরণের জন্য নরনারীর পবিত্র মিলন। শাস্ত্র মতে ইহা দশটি সংস্কারের অন্যতম। ঐহিক সুখ-সুবিধা কিংবা চুক্তির কোনও বিধান ইহাতে নাই। ধর্ম ও শাস্ত্রানুযায়ী হিন্দুবিবাহ অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু এ-কথা অনস্বীকার্য যে অনেকক্ষেত্রেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনই দুঃসহ হইয়া পড়ে, এবং বিবাহবিচ্ছেদের প্রয়োজন হয়। সমাজের বিবর্তন, পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে উদার দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করিয়া উনিশ শতক হইতেই হিন্দু বিবাহ প্রথার নানারূপ সংস্কারসাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন (Hindu Widow's Remarriage Act, 1856), শিশুবিবাহ নিরোধ আইন (Child Marriage Restraint Act, 1929), হিন্দুবিবাহ অযোগ্যতা অপসারণ আইন (Hindu Marriage Disabilities Removal Act, 1946), হিন্দুবিবাহ বৈধতা আইন (Hindu Marriage Validity Act, 1949) প্রভৃতি আইন বিভিন্ন সময়ে বিধিবদ্ধ হয়। কয়েকটি প্রদেশে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইনও বিধিবদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে মূল সমস্যার সামগ্রিক-ভাবে সমাধান হয় নাই। এই সকল কারণে হিন্দু বিবাহ-সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ ও সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় (Hindu Marriage Act, 1955) এবং তাহা ঐ বৎসর ১৮ মে তারিখ হইতে বলবৎ হয়। এই আইন সকল হিন্দুর উপর প্রযোজ্য। ব্রাহ্ম, প্রার্থনা ও আর্য সমাজী, বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখ এই আইনমতে হিন্দু। একই গোত্র ও প্রবরের বিবাহ এই আইন মতে সিদ্ধ; একবিবাহ (monogamy) ইহার মূলকথা। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণে আইনানুমোদিত বিচ্ছেদ (judicial separation), বিবাহ-বিচ্ছেদ (divorce), দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (restitution of conjugal rights) হইতে পারে। কুমারী কিংবা বিধবার বিবাহে কোনও পার্থক্য করা হয় নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে খোরপোষেরও (alimony) ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ বিবাহ আইন (Special Marriage Act) বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনে যে কোনও হিন্দু অন্য কোনও হিন্দু বা যে কোনও ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সহিত 'সিভিল' বিবাহ করিতে পারে। এই বিবাহ রেজিষ্ট্রি হইবে। ইহাতেও আইনানুমোদিত বিচ্ছেদ, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদির বিধান আছে। তবে 'সিভিল ম্যারেজ' বিধায় ঐ সকল প্রতিকার অনেক সহজলভ্য করা হইয়াছে।

মুসলমান আইনমতে স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার নিরংকুশ। মুসলমান স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের Dissolution of Muslim Marriage Act-এ মুসলমান স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণে মুসলমান স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ করিতে পারেন।

খ্রীষ্টানদের বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে, ভারতীয় খ্রীষ্টান বিবাহ আইন (Indian Christian Marriage Act, 1872) ও ভারতীয় বিবাহবিচ্ছেদ আইন (Indian Divorce Act, 1869) উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনে বিচ্ছেদের বিধান অত্যন্ত কঠোর, রক্ষণশীল ও অনুদার। পাশী বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের আইন সংশোধন করিবার জন্য ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে পাশীবিবাহ ও তাহার বিচ্ছেদ আইন (Parsi Marriage and Divorce Act, 1936) বিধিবদ্ধ হয়। ইহা ব্যতীত আনন্দবিবাহ ও আর্যবিবাহসংক্রান্ত আইনও আছে (Anand Marriage Act, 1909, Arya Marriage Validating Act, 1937)।

সুশান্তকুমার সেন

বিবেকানন্দ, স্বামী (১৮৬৩—১৯০২ খ্রী) সন্ন্যাস জীবনে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কলিকাতার সিমুলিয়া পল্লীর বিশ্বনাথ দত্ত এবং

মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি মাতার নিকট স্বধর্মের ও পিতার নিকট এক উদার সংস্কৃতির পরিচয় পান। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সংগে তিনি সংগীত ও ব্যায়ামেও পারদর্শী হন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বি. এ. পাশ করিয়া আইন পড়িবার সময় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অর্থাভাবে তাঁহাকে অনাহারে পর্যন্ত দিন কাটাইতে হয়। তবু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট যাতায়াত চলিতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর গৃহী ভক্তদের অর্থানুকূল্যে তিনি অপর গুরুভ্রাতাদের সহযোগে বরানগরে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে পরিব্রাজকরূপে তিনি ভারত ভ্রমণে বাহির হইয়া ভারত ও ভারতবাসীদের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করেন। এই সময়ে তিনি বিবিধ শাস্ত্রাদিও অধ্যয়ন করেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মাদ্রাজবাসী ও অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্যে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বরে এই সভার অধিবেশনে স্বামীজীর বক্তৃতার ফলে ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীদের শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত হয়। আরও কিছুকাল ইওরোপ ও আমেরিকায় থাকিয়া তিনি বক্তৃতা শাস্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থপ্রণয়ন ও ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে বিদেশীদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার কাজে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দকে সর্বপ্রথম দেখেন। স্বামীজীর বাণী তাঁহার হৃদয়ে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীজীর আহ্বানে ভারতে আসেন ('নিবেদিতা' দ্র)। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশবাসীর দ্বারা রাজসম্মানে অভ্যর্থিত হন।

বিবেকানন্দ ভারতকে এক নবজাগরণের বাণী শোনাইয়া ও নূতন কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়া ভারতের আত্মাকে সমগ্ররূপে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষতঃ অবতীর্ণ না হইলেও তাঁহার বক্তৃতা ও রচনা তেজ, বীর্য, কর্তব্যপরায়ণতা, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ভারতের ভাবী সম্ভাবনা ও অতীত মহিমায় গৌরবানুভবের বার্তা প্রতিনিয়ত ধ্বনিত করিয়া দেশের যুবকদের প্রাণে ও রাষ্ট্রজীবনে এক অভূতপূর্ব অনুভূতি ও উদ্বোধন আনিয়াছিল। তিনি রাষ্ট্রজীবনে স্বাধীনতার দ্বার অর্গলমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সাম্যের বার্তাবহ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। ধর্ম ও সমাজের যুক্তিহীন চাপে জাতি কর্মশক্তি হারাইবে ইহা বিবেকানন্দের নিকট অসহ্য ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ সমাজসংস্কারের বিরোধী না হইলেও ভাঙিবার পথে চলিতে চাহিতেন না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে নবীন জীবন গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি গতানুগতিকতার বিরোধী ছিলেন কিন্তু ভারতের শাশ্বত আত্মাকে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ভারতের সমাজ ধর্মভিত্তিক। কিন্তু সে ধর্ম আচারগত নহে; উহা সর্বসমাজের, সর্বকালের, সর্বমানবের অন্তর্নিহিত চরম সত্য—দেশকালপাত্রানুযায়ী ইহার বিকাশ বিভিন্ন।

তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শক্তিক্ষয় অপেক্ষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বারা মানবমনকে পরিশীলিত করিয়া উদারভূমিতে তুলিয়া লইলে নীচতা ও ক্ষুদ্রতা সহজেই দূরীভূত হইবে। শিক্ষার ফলে নারী সমাজ স্বাধীনভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান করিবে। সে শিক্ষা হইবে সর্বতোমুখী—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক এবং উহা মানবের অন্তরাত্মাকে বিকশিত করিবে।

বিবেকানন্দের মতে জাতীয় জীবনে উপনিষদুক্ত ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বহির্জগৎ হইতে ভাবধারা ও কর্মকৌশল আহরণ করিতে হইবে। বিজ্ঞান, সংঘবদ্ধভাবে কার্যপরিচালনা, উদার সামাজিক দৃষ্টি ইত্যাদি আধুনিক জগতের অবদানকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। তিনি পাশ্চত্যবাসীকে বলিতেন, ভারত শুধু বিদেশীদের দ্বারে ভিখারী নহে, অপরকে শিখাইবার মত উদার আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শাশ্বত সত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতারও সে অধিকারী। তিনি চাহিতেন, ভারতবাসী সাহসভরে ও আত্মবিশ্বাস লইয়া সসম্মানে বিদেশীদের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করুক।

বিবেকানন্দের মতে ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ভারতের চিরন্তন আদর্শ। তিনি ভারতের ইতিহাসে সমাজসেবার এক নূতন অধ্যায় রচনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন (১৮৯৭ খ্রী) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে সফল কথ্যভাষার তিনি অন্যতম প্রথম প্রচারক। তাঁহার মূল ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলী বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পুনরায় পাশ্চাত্য দেশে যান এবং পূর্বের মতই প্রচারে সফলতা লাভ করেন। বিদেশে কয়েকটি স্থায়ী বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বিবেকানন্দ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র ইংরেজী রচনাবলী ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ : 'পরিব্রাজক' (১৯০৩ খ্রী); 'ভাববার কথা' (১৯০৫ খ্রী); 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫ খ্রী);

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; Karmayoga; Rajayoga; Jnanayoga; Bhaktiyoga.

দ্র প্রমথনাথ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, কলিকাতা, ১৯১৯; Sister Nivedita, *The Master as I saw Him*, Calcutta, 1910; *The Life of Swami Vivekananda* (by His Eastern and Western Disciples), Calcutta, 1912; Romain Rolland, *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel*, Calcutta, 1931.

স্বামী গম্ভীরানন্দ

বিভীষণ রাক্ষসরাজ রাবণের পরমধার্মিক, অমর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিশ্রবা মুনি, মাতা কৈকসী। কৈকসীর অভিপ্রায়ানুসারে বিশ্রবা মুনির আশীর্বাদে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ পরম ধার্মিক হয়। বিভীষণের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বিভীষণের চিরদিন ধর্মে মতি থাকিবে এবং তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন এই বর দান করেন। বিভীষণ গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা সরমার পাণিগ্রহণ করেন (রামায়ণ, উত্তরকান্ড ৯—১২)।

বিভীষণ রাবণের অসংগত কার্যে পদে পদে বাধা দিয়াছেন। রাবণ দূত হনুমানকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি দূত সর্ব অবস্থায় অবধ্য এই যুক্তিতে তাঁহাকে নিবারণ করেন (রামায়ণ, সুন্দরকান্ড ৫৮)। তিনি রামের হস্তে সীতা প্রত্যর্পণের জন্য বার বার রাবণকে সদুপদেশ দান করেন, ক্রুদ্ধ রাবণ বিভীষণকে পরুষ ভাষায় তিরস্কার করিলে বিভীষণ রামের সহিত মিলিত হন (রামায়ণ, যুদ্ধকান্ড ৯, ১৬)। এই কার্যের জন্য তিনি জনসমাজে ঘরের শত্রু বিভীষণরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। রাবণের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত রাবণকে দেখিয়া বিভীষণ অতিশয় শোকাভিভূত হন। রাম কর্তৃক আশ্বস্ত বিভীষণ ভ্রাতার পারলৌকিক কার্য যথাবিধি সম্পন্ন করেন (রামায়ণ, যুদ্ধকান্ড ১১২—১১৫)।

যূথিকা ঘোষ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০০—১৩৫৭ বঙ্গাব্দ) ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র, বুধবার কাঁচড়াপাড়া-হালিশহরের নিকটবর্তী মুরারিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে বিভূতিভূষণ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা মৃণালিনী দেবী। বনগ্রাম হাইস্কুল হইতে তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; অতঃপর কলিকাতার রিপন কলেজ হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ. এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিস্টিংশনে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গৌরী দেবীর সংগে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই প্রথম পত্নীর মৃত্যু হয়। ইহার তেইশ বৎসর পরে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে রমা দেবীর (ওরফে কল্যাণী দেবী) সংগে বিভূতিভূষণের বিবাহ হয়। এই বিবাহ লেখকের রচনার উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বিভূতিভূষণ তাঁহার সমগ্র কর্মজীবনে মূলতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি হুগলির জাঙ্গিপাড়া গ্রামের স্কুলে এবং তাহার পর সোনারপুর হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে দীর্ঘকাল এবং জীবনের শেষপর্বে স্বগ্রাম বারাকপুরের নিকটবর্তী গোপালনগর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। হরিনাভি স্কুল হইতে খেলাৎচন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে যোগ দিবার মধ্যবর্তী সময়ে তিনি কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিণী সভার প্রচারক, খেলাৎ ঘোষের বাড়িতে গৃহশিক্ষক, প্রাইভেট সেক্রেটারি, ভাগলপুরস্থিত খেলাৎ ঘোষ এস্টেটের নায়েব তহশিলদার প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি মাত্র একুশ বৎসরের সাহিত্যজীবনে গল্প, উপন্যাস, শিশুসাহিত্য, দিনলিপি ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর রচনা মিলাইয়া অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিভূতিভূষণের সমগ্র সাহিত্যে নানাভাবে তাঁহার ব্যক্তি জীবনের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'র দুই খন্ড লেখকের সাহিত্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিভূতিভূষণের প্রতিভার আর একখানি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'আরণ্যক' উপন্যাসটির পরিকল্পনা সাধারণ বাংলা উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ নূতন প্রকৃতির। প্রকৃতি এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিভূতিভূষণের সাহিত্যের প্রধানতম সুর। বঙ্গাব্দানুসারে প্রকাশকালসহ তাঁহার রচিত কয়েকটি প্রধান উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ: 'পথের পাঁচালী' (১৩৩৬), 'মেঘমল্লার' (১৩৩৮), 'অপরাজিত' (১৩৩৮), 'মৌরীফুল' (১৩৩৯), 'যাত্রাবদল' (১৩৪১), 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (১৩৪২), 'কিন্নরদল' (১৩৪৫), 'আরণ্যক' (১৩৪৫), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (১৩৪৭), 'অনুবর্তন' (১৩৪৯), 'দেবযান' (১৩৫১), 'তালনবমী' (১৩৫১), 'কেদার রাজা' (১৩৫২), 'মুখোশ ও মুখশ্রী' (১৩৫৪), 'ইছামতী' (১৩৫৬), 'কুশল পাহাড়ী' (১৩৫৭) ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণের গ্রন্থ সাহিত্য আকাদেমি সংস্থা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরাজী ও ফরাসীতে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণকে তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হয়। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ১৫ কার্তিক (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, খৃ) ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের মৃত্যু হয়।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বিভূতিভূষণ ভারতীয় অধ্যাত্মবোধ ও অসীমপ্রয়াণ-প্রবণতার এক আশ্চর্য নিবিড় উদ্ভাসনের দৃষ্টান্তস্থল।

পল্লীবাসী মানুষের সরল উপকরণবিরল জীবনযাত্রা ও গ্রাম্য প্রকৃতির স্নেহনিবিড় স্পর্শ বিভূতিভূষণের অধ্যাত্ম-দৃষ্টির উদ্বোধনে প্রধান উদ্দীপন-বিভাবরূপে সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার প্রথম দুইখানি উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' উপনিষদের জীবনচেতনাকে আধুনিক বিশ্বানুভূতির সুরে বাঁধিয়া তুলিয়াছে। উপনিষদের অনন্ত-বিসর্পিত দূরবানী দৃষ্টি বাঙালী গৃহস্থের ক্ষুদ্র সংসার-সীমায় ও স্বল্পতম পরিসরের মধ্যে নভোচারী কল্পনার জ্যোতির্বলয়বেষ্টিত হইয়াছে। অপুর জীবনের সংকুচিত অববোধের মধ্যে দূরের প্রতি আকর্ষণ স্থান ও কালগত বাধার জন্যই প্রবলতরভাবে উদ্দীপ্ত হইয়াছে। তাহার নিরা-সক্ত স্বভাবে অসীমচেতনা পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে। দাম্পত্যপ্রেমের নিবিড়তার অভাবের যে শূন্যস্থান তাহা অনন্তের বাধাহীন প্রসারে ও সাংকেতিক ব্যঞ্জনায় নিজসীমা অতিক্রম করিয়াছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অপরাজিত' অপুর প্রৌঢ় জীবনের ইতিহাস। ইহার মধ্যে বাল্যস্মৃতির মাধুরীর তাদৃশ অবসর নাই। অপু যে জীবনসাধনায় অভ্যস্ত তাহাই এখানে পরিণত বিকাশ ও বিস্তৃততর পরিবেশে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অধ্যাত্মচেতনার বিদ্যুৎস্ফুরণ এখানে দার্শনিক সমীক্ষার স্থির দীপ্তিতে জীবনপথকে আলোকিত করিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা, বিশ্বপরিক্রমা ও ইতিহাসচেতনা দার্শনিক অনুভূতিকে এক নিবিড় রূপসংহতি দিয়াছে। যাহা একটি শিশু কল্পনার মৌলিক উপলব্ধি ছিল তাহা সাধারণ বিদগ্ধ মনের উত্তরাধিকাররূপে তাহার বিশ্ববোধের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বিভূতিভূষণের উপন্যাস, ছোটগল্প ও দিনলিপি তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবনপ্রত্যয়ের নিবিড় সম্পর্কটি প্রতি-বিম্বিত করে। বিভূতিভূষণের সৃষ্ট চরিত্রাবলী যে অবি-সংবাদিতভাবেই তাঁহার মানস সন্তান ও তাঁহার দৈনন্দিন ভাবধারাপুষ্ট, তাঁহার অপুর জীবনসমীক্ষা ও বিশ্বচেতনা যে তাহার স্রষ্টার মানসপ্রক্রিয়ার অব্যবহিত দর্পণপ্রতিবিম্ব-স্বরূপ, তাহা তাঁহার যে কোনও দিনলিপির অভিজ্ঞতার বর্ণনা হইতে সহজে বোঝা যায়। কোনও গ্রন্থকারের ক্ষেত্রেই সাহিত্য ও জীবনের এরূপ অব্যবহিত নৈকট্য ও অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ দেখা যায় না। বিভূতিভূষণের ছোট-বড় সব সৃষ্টিই এককেন্দ্রিক। উহাদের পরিবেশের পার্থক্য আছে কিন্তু রসবস্তু সম-উপাদানে গঠিত।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৮—৬১ খৃ) কান্দি ও পাইক-পাড়া রাজবংশের রাজা মণীন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি বি. এ ও এম. এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম বিভাগে প্রথম হন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৯৪৬ খৃীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন ও দেশ স্বাধীন হইবার পর মন্ত্রী হন। প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। পরে ১৯৪৮—৫২ ও ১৯৫৭—৬১ খৃীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সম্মুখে কংগ্রেসের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের দাবি পেশ করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া তাঁহার সুনাম হয়। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। স্বনামে ও ভীষ্মদেব খোসনবীশ জুনিয়ার নামে তিনি সাময়িক পত্রেও বহু প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার প্রকাশিত কতকগুলি পুস্তকের নাম : বিশ্বপথিক বাঙ্গালী (১৮৮২ শকাব্দ), বাংলার চাষী, বঙ্কিম-প্রতিভা (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), কাশ্মীর ভ্রমণ(১৩৬৯ বঙ্গাব্দ), ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন দত্ত

বিমানবিহারী মজুমদার (১৮৯৯—১৯৬৯ খৃ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৮৯৯ খৃীষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, মাতা কৃষ্ণপ্রিয়া।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. (১৯২৩ খৃ) পাশ করেন এবং অর্থ-নীতিতেও এম. এ. (১৯২৯ খৃ) পাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি (১৯৩২ খৃ), গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৩৫ খৃ) লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খৃীষ্টাব্দে 'চৈতন্যচরিতের উপাদান' রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি পাটনা বি. এন. কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে (১৯২৫—৪৫ খৃ) এবং পরে আরায় এইচ্. ডি. জৈন কলেজের অধ্যক্ষ পদে (১৯৪৫—৫২ খৃ) কাজ করেন। ১৯৫২ খৃীষ্টাব্দে তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক নিযুক্ত হন; এবং ১৯৫৯ খৃীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ খৃীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ইউ. জি. সি. গবেষক অধ্যাপক ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৩৬৭—৬৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করেন। ১৯৬৯ খৃীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'নির্মলেন্দুস্তেফানোস-স্মৃতি-পুরস্কার' (১৯৬৯ খৃ) প্রদান করেন। তাঁহার রচিত, সম্পাদিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী : চণ্ডীদাসের পদাবলী (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); ষোড়শ

শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ); পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, ১৪১০—১৯১০ খ্রী (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ); শ্রীশ্রীক্ষণদাগীতচিন্তামণি (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ); *Heroines of Tagore: A Study in the Transformation of Indian Society*: 1875—1941 (১৯৬৮ খ্রী); *History of Political Thought: From Rammohun to Dayananda*: 1821—84 (১৯৩৪ খ্রী) *Indian Political Associations and Reform of Legislature*: 1818—1917 (১৯৬৫ খ্রী); *Kṛṣṇa in History and Legend* (১৯৬৯ খ্রী); *Militant Nationalism in India and its Socio-Religious Background*: 1897—1917 (১৯৬৬ খ্রী)।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণা রায়চৌধুরী

বিম্বিসার মগধের রাজা, রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক। পুরাণে বিম্বিসারকে শৈশুনাগ বংশের পঞ্চম নৃপতিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বুদ্ধচরিত রচয়িতা অশ্বঘোষ বিম্বিসারকে হর্যঙ্ক-কুলসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ-গ্রন্থের বিবরণ পুরাণ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ হইতে জানা যায় যে বিম্বিসার পনের বৎসর বয়সে নিজ পিতা কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন (আনুমানিক ৫৪৫ খ্রী পূ)। তাঁহার পিতা ভট্টিয় বা মহাপদ্ম নামে পরিচিত ছিলেন। অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক তাঁহার পিতা পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বিম্বিসার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে অঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করিয়া অঙ্গরাজ্য নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই জয়লাভ মগধ সাম্রাজ্যের ভিত্তি রচনা করিল।

বিম্বিসার মদ্র, কোশল ও বৈশালীর রাজবংশগুলির সহিত বৈবাহিক সূত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। বিম্বিসার রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়া গন্ধার রাজ্যের সহিতও মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ-এর সহিতও বিম্বিসার মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের রাজ-ধানী ছিল রাজগৃহ।

বিম্বিসার জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে বিম্বিসারের সহিত গৌতম বুদ্ধের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা রহিয়াছে।

বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে বিম্বিসারের পুত্র অজাত-শত্রু পিতাকে হত্যা করিয়া রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।

দ্র R. C. Majumder, H. C. Raychaudhuri and K. K. Datta, *An Advanced History of India*, London, 1950: H. C. Raychaudhuri, *Political History of Ancient India*, Calcutta, 1950.

নিরঞ্জন ঘোষ

বিল্বমঙ্গল মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সাধক ও কবি, নামান্তর লীলাশুক। শ্রীভক্তমালগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরবাসী ব্রাহ্মণ বিল্বমঙ্গল বেশ্যা চিন্তা-মণির প্রতি আসক্ত ছিলেন। দৈবাৎ তাঁহার ভর্ৎসনায় ইঁহার চৈতন্যোদয় হয়। ক্রমে কৃষ্ণকৃপার অধিকারী হইয়া ইনি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থকার বলিয়াছেন তাঁহার গুরুর নাম সোমগিরি, তিনি প্রথমে শৈব এবং পঞ্চাক্ষরীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক আনীত হইয়া এই কাব্য উত্তর ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচারিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রান্তে ভক্তিগ্রন্থরূপে ইহার অসাধারণ সমাদর। দক্ষিণী সংস্করণে সমুদয়ে তিনশতাধিক শ্লোক আছে।

কবিরাজ গোস্বামীকৃত ইহার সারঙ্গ রঙ্গদা সংস্কৃত টীকা প্রসিদ্ধ। পদকর্তা যদুনন্দন দাস কর্ণামৃতের এক উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

দ্র মতিলাল বসু, সটীক শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, কলিকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; S. K. De, *Krishnakarnamrita of Lilasuka with Three Commentaries*, Dacca, 1938; Ramaswami Sastri, *Srikrishnakarnamrita*, Madras, 1958.

কল্যাণী দত্ত

বিশাখদত্ত ইঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি ছিলেন মহারাজ ভাস্করদত্ত বা পৃথুর পুত্র এবং সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র। তিনি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ভাস, কালিদাস ও ভারবির গ্রন্থসমূহের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বিশাখদত্তের গ্রন্থের অন্তিম শ্লোকে অবন্তিবর্মা (সম্ভবতঃ প্রামাদিক পাঠান্তর রন্তিবর্মা বা দন্তিবর্মা) নামক রাজার উল্লেখ আছে। এই রাজা কাহারও মতে মৌখরীরাজ অবন্তিবর্মা (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতক) এবং মতান্তরে কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মা (খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগ)। কোনও কোনও পুঁথিতে 'অবন্তিবর্মা'র পরি-বর্তে চন্দ্রগুপ্ত নামটি পাওয়া যায়; কেহ কেহ মনে করেন, ইনি গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতক)। উক্ত শ্লোকে ম্লেচ্ছগণের যে অত্যাচারের উল্লেখ আছে উহাতে বোধ হয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক হূন ও অপরাপর ম্লেচ্ছগণের পরাভবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে, বিশাখদত্তের গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকে এবং কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, ১১শ-১২শ শতকে রচিত। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' সপ্তাঙ্ক নাটক। নানা কৌশলে

চন্দ্রগুপ্ত-মন্ত্রী চাণক্য কর্তৃক নন্দরাজগণের বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে আনয়ন—এই ঘটনাই এই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'মুদ্রারাক্ষস' একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী; শুধু রাজনৈতিক ব্যাপার অবলম্বনে রচিত ইহাই একমাত্র নাটক। একটিমাত্র নগণ্য নারীচরিত্র ছাড়া নাটকটি স্ত্রীচরিত্র-বর্জিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশাখপট্টনম অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি জেলা, শহর ও বন্দর। বিশাখপট্টনম জেলার সদর শহর (১৭°৪২′ উত্তর এবং ৮৩°১৮′ পূর্ব)। মাদ্রাজ হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৭৭৬ কিলোমিটার এবং কলিকাতা হইতে ৮৪০ কিলোমিটার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরের জনসংখ্যা ১৮২০০৪ ছিল।

উত্তরে কৈলাং এবং দক্ষিণে ইয়ারোদা গিরিশিরার মধ্যে শহরটি অবস্থিত। শেষোক্ত পর্বতশিরাটি সমুদ্র পর্যন্ত খাড়াভাবে দাঁড়াইয়া বিশাখপট্টনম পোতাশ্রয়টিকে সুরক্ষিত করিয়াছে। এই স্থানটি 'ডলফিন্‌স নোজ' (Dolphin's Nose) নামে পরিচিত।

বিশাখপট্টনম ভারতের চতুর্থ বন্দর; ইহার পশ্চাদ্ভূমি ওড়িশা হইতে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বন্দরের মধ্য দিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, চীনাবাদাম, চামড়া ও ওড়িশার কাঠ রপ্তানি হয় এবং উৎকৃষ্ট কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল প্রভৃতি আমদানি হয়।

রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে জোয়ারপ্লাবিত জলাভূমি খনন ও পুনরুদ্ধার করিয়া গভীর জলে এই পোতাশ্রয়টি নির্মাণ করা হইয়াছে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশাখপট্টনম একটি প্রধান বন্দর হিসাবে এবং সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমানে ৮·৭ মিটার চওড়া এবং ১৬৮·০ মিটার লম্বা জাহাজ বৎসরের সকল সময়ই এই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে।

এই বন্দরে ১৫২·৫ মিটার লম্বা আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত ৪টি বড় জাহাজঘাটা (Quay berths) আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ আকর রপ্তানির জাহাজের জন্য এবং অপর দুইটি সাধারণ মালবাহী জাহাজের (general cargo) জন্য নির্দিষ্ট। দৈনিক গড়ে প্রায় ৩০৬ মেট্রিক টন মাল বোঝাই করা হয়। ইহা ছাড়া আরও তিনটি জেটিবার্থ (কয়লা ও তেলের জন্য) এবং মুরিং বার্থ রহিয়াছে। সর্বাধুনিক সামুদ্রিক বন্দর বলিয়াই বিশাখপট্টনমে জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

বিশাখপট্টনমের 'ডলফিন্‌স নোজ'-এর আধুনিক ও শক্তিশালী আলোকস্তম্ভটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭১.০৪ মিটার উচ্চে অবস্থিত। ইহার আলো ৬৪ কিলোমিটার দূর হইতে দেখা যায়। পূর্ব উপকূলে ইহাই আধুনিক ও সর্বাধিক শক্তিশালী আলোকস্তম্ভ।

দ্র *Census of India* 1951, *Vizagapatnam, District Handbook*; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1954.

মায়া চক্রবর্তী

বিশালাক্ষী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় দেবতার বিশেষণ বা নামান্তর। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে নানা নামে প্রচলিত জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। ইনি চতুঃষষ্টি যোগিনীর অন্যতমা। দুর্গাপূজার বিশেষ করিয়া মহানবমী তিথিতে ইঁহার পূজা করিতে হয়।

বাংলাদেশের নানাস্থানে নানা নামে নানারূপে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা হয়। ইনি দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, দশভুজা বা অষ্টা-দশভুজারূপে বিভিন্ন স্থানে বিরাজিত। কোনও কোনও স্থানে ব্যাঘ্রবাহনরূপেও প্রকটিত। অনেকে মনে করেন বাসুলি শব্দ বিশালাক্ষী হইতে উদ্ভূত।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ রামানুজ-প্রবর্তিত দার্শনিক মতবাদের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শংকরের ন্যায় রামানুজও অদ্বৈতবাদী, কিন্তু রামানুজমতে ব্রহ্ম একমাত্র চরমতত্ত্ব হইলেও নির্গুণ, নির্বিশেষ এবং স্বগতভেদ-রহিত নহেন। তিনি ঈর্ষা-দ্বেষাদি যাবতীয় হেয়গুণবর্জিত বলিয়া উপনিষদে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি সর্বশক্তিমত্তা, সর্বজ্ঞত্ব, করুণাময়ত্ব প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণের আধার। ব্রহ্মের বিস্ময়করী সৃষ্টিশক্তির নাম মায়া। ব্রহ্ম নির্বিশেষ সত্তামাত্র নহেন। তিনি গুণ দ্বারা বিশেষিত। ব্রহ্মের 'সজাতীয়' ও 'বিজাতীয়' ভেদ স্বীকার্য নহে, কারণ যিনি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্ব সেই ব্রহ্মের বাহিরে তাঁহার সমজাতীয় কিংবা ভিন্নজাতীয় কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার্য, কারণ তাঁহার অভ্যন্তরে পরস্পর ভিন্ন চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জগৎ) পদার্থদ্বয় বিদ্যমান। ইহারা উভয়েই ব্রহ্মের অংশ এবং ব্রহ্মের ন্যায় সত্য। ইহারা প্রলয়কালে অতি সূক্ষ্মভাবে ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং সৃষ্টিকালে স্থূল জীব-জগৎরূপে প্রকাশিত হয়। ব্যষ্টির দৃষ্টিতে বৃক্ষের মূল-কান্ডাদি যেমন বৃক্ষ হইতে ভিন্ন এবং সমষ্টির দৃষ্টিতে তাহারা যেমন বৃক্ষ হইতে অভিন্ন সেইরূপ জীব ও জগৎ ব্রহ্মাঙ্গমাত্র বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্নধর্মী হইলেও ব্রহ্মাশ্রয়ী ও পৃথক্‌সত্তাহীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলার হেতু এই যে, এই মতে চিৎ-ও-অচিৎবিশিষ্ট ব্রহ্মই একমাত্র চরম তত্ত্ব। বিশিষ্টাদ্বৈতমতে

মুক্তিকালেও ব্রহ্মের সহিত জীবের একান্ত ঐক্য অস্বীকার্য। ভক্তিলভ্য ভগবৎপ্রসাদই মুক্তির হেতু।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

বিশ্বকর্মা দেবশিল্পী। শিল্পযন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারূপে ঘরে ঘরে পূজিত। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন কলে-কারখানায় ইঁহার বিশেষ পূজো ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে গজবাহন প্রতিমা নির্মিত হইয়া থাকে। তবে প্রতিমার প্রচলন বেশি দিনের নয়। মূর্তি অনেকটা কার্তি-কের মত। ইহার আকর অজ্ঞাত।

ছুঁচা বিশ্বকর্মার পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিপুণ কর্মীর ঐকান্তিক সাধনার ব্যর্থতার নিদর্শন হিসাবে বিশ্বকর্মার পুত্র ছুঁচার কথা বলা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রসিদ্ধ আলংকারিক, 'সাহিত্য দর্পণ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা। পিতার নাম চন্দ্রশেখর। বিশ্বনাথ চতুর্দশ শতাব্দীতে ওড়িশার কোনও নৃপতির 'সান্ধিবিগ্রহিক মহাপাত্র' অর্থাৎ উচ্চপদস্থ মন্ত্রী ছিলেন। 'সাহিত্য দর্পণ' ব্যতীত বিশ্বনাথ কয়েকটি কাব্য ও নাটকও লিখিয়াছিলেন। 'সাহিত্য দর্পণ' ইঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। 'কারিকা' ও তদুপরি 'বৃত্তি' সংবলিত এই গ্রন্থ প্রধানতঃ 'কাব্যপ্রকাশ', 'দশরূপা' ও ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' অবলম্বনে রচিত। অলংকারশাস্ত্র সামগ্রিকভাবে শিক্ষা করিবার পক্ষে ইহা সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নাটক সম্বন্ধে ইহার ষষ্ঠ অধ্যায় অতি উৎকৃষ্ট। শ্রীরাম-তর্কবাগীশ (আনুমানিক ১৭০০ খৃ) ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ইহার উৎকৃষ্ট টীকা লিখিয়াছেন। কানের ইংরেজী ভাষায় লিখিত সাহিত্যদর্পণের ভূমিকা ও অলংকার প্রকরণের উপর টীকা প্রসিদ্ধ।

শৈলেন সেনগুপ্ত

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার, টীকাকার, পদকর্তা এবং পদসংকলয়িতা। জন্মস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার দেবগ্রাম। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের পুথিতে পাওয়া যায়, তরুণ বয়সে বিশ্বনাথ সৈদাবাদে বাস করিতেন। তাঁহার লিখিত মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' নামক সংস্কৃত কাব্যের রচনাকাল (১৬৭৯ খৃ) হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের টীকার সমাপ্তিকাল (১৭০৪ খৃ) পর্যন্ত অন্ততঃ ২৫ বৎসরকাল তিনি ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন। বিশ্বনাথ শ্রীবৃন্দাবনে গোকুলানন্দজী নামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

বিশ্বনাথ তাঁহার 'মন্ত্রার্থদীপিকা'য় লিখিয়াছেন যে স্বপ্নে আবির্ভূতা শ্রীরাধার নির্দেশে বর্ণাগমভাস্বৎ নামক গ্রন্থ হইতে তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সার্ধচল্লিশ অক্ষরের কামগায়ত্রী-মন্ত্রের অর্ধ অক্ষরের মন্ত্রার্থ উদ্ধার করিতে সক্ষম হন। তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেহত্যাগ করেন।

বিশ্বনাথ ভাগবতের টীকা ছাড়া গীতার 'সারার্থবর্ষিণী', উজ্জ্বলনীলমণির 'আনন্দচন্দ্রিকা', ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 'ভক্তি-সারপ্রদর্শিনী', দানকেলিকৌমুদীর 'মহতী' নামে টীকা, গোপালতাপনীর 'ভক্তবর্ষিণী', আনন্দবৃন্দাবনচম্পুর 'সুখ-বর্তনী' এবং অলংকারকৌস্তুভের 'সুবোধিনী' রচনা করেন। তিনি সংস্কৃতভাষায় কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও লেখেন। 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' কাব্যটি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি 'চমৎকারচন্দ্রিকা' 'স্তবামৃতলহরী' 'গৌরাঙ্গলীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি হরিবল্লভ ভণিতা দিয়া চল্লিশটি এবং বল্লভ ভণিতা দিয়া তেরটি পদ রচনা করিয়া ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে সন্নি-বিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা দুরূহ বলিয়া তাঁহার পদ-গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। বিশ্বনাথ পরকীয়াবাদের প্রবল সমর্থক ছিলেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চতর বিদ্যার শিক্ষণ, প্রচার ও অগ্রগতির উদ্দেশ্যে কয়েকটি স্কুল, ফ্যাকাল্টি বা কলেজ লইয়া গঠিত যৌথ সংস্থা ('কর্পোরেশন')। ইহা বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক এবং নানা স্তরের ও নানা শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দান করে।

মধ্যযুগীয় ইওরোপে, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতকে, নানারূপ পেশায় প্রবেশার্থীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটে। সালের্নো (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক) ও মন্তপেলিয়ে (Montpellier) (খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতক) চিকিৎসাবিদ্যায়, বোলোনা (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতক) আইনবিদ্যায় এবং পারী (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) ধর্মবিদ্যায় শিক্ষাদানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আরিস্তো-তলের রচনাবলীর পুনরাবিষ্কারজনিত জ্ঞানের প্রসার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটি মূল কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথম দিকে (বিশেষ করিয়া ইটালীতে) সংঘবদ্ধ ছাত্রেরাই শিক্ষকদের নিযুক্ত করিত। কালক্রমে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপর শিক্ষকসংঘেরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্সফোর্ড (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক) আদিতে ছিল শিক্ষক-দের গিল্ড।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক স্কুল বা কলেজ লইয়া গঠিত, ধর্মনিরপেক্ষ ও স্বাতন্ত্র্যভোগী সংস্থা। ইহা সর্ব-প্রকার উদারনীতিক কলাবিদ্যায় ও বিজ্ঞানে শিক্ষাদান করে। উপরন্তু, ইহাতে নানাবিধ পেশায় ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আছে, যথা, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রশিক্ষণ, গ্রন্থাগারিকতা, সাংবাদিকতা, হিসাবনিরীক্ষা, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ব্যবসায় পরিচালনা, ইত্যাদি। সর্বপ্রকার

গবেষণাকেন্দ্ররূপে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে জনমণ্ডলের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ উপযুক্ত নেতৃত্বের সরবরাহ ইহার একটি কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রাচীন ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল বটে (যথা তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ইত্যাদি), কিন্তু ভারতের আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহিত তাহাদের কোনও ঐতিহাসিক যোগসূত্র নাই। ভারতসচিব চার্লস্ উড-এর এডুকেশন ডেসপ্যাচ-এর (১৮৫৪ খ্রী) সুপারিশ অনুসারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি প্রেসিডেন্সি শহরে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এইগুলিই আধুনিক ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। ইহারা ছিল পুরাপুরি সহযোজক বা অনুমোদক (affiliating) ও পরীক্ষক (examining) বিশ্ববিদ্যালয়। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রমের নির্ধারণ, অনুমোদিত স্কুল ও কলেজগুলির দ্বারা প্রেরিত ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ ও উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী দান—এইগুলিই ছিল ইহাদের কাজ। ইহাদের অধিকারক্ষেত্রও (jurisdiction) ছিল বিস্তীর্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারকে খর্ব করার জন্য ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে পাকিস্তানে) ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই দুইটিও ছিল মাত্র অনুমোদক ও পরীক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আর কোনও নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

বর্তমান শতকের প্রথম হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রের ও শাসনব্যবস্থার সংস্কারের ও সংখ্যাল্পতার প্রতিকারের চেষ্টা চলিতে থাকে। ব্রিটিশ আমলে এ ব্যাপারে পথনির্দেশ করে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯০২ খ্রী), ভারত সরকারের শিক্ষা প্রস্তাব (১৯১৩ খ্রী) ও স্যাড্‌লার কমিশন (১৯১৮ খ্রী)। নিম্নলিখিত শীর্ষে সংস্কারকার্য সাধিত হয়, যথা, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ও গবেষণার ব্যবস্থা, আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সকল বড় প্রদেশে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারি কর্তৃত্বের হ্রাসসাধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলেজগুলির ঘনিষ্ঠতর যোগসাধন, পুরা সময়ের উপাচার্য নিয়োগ ইত্যাদি। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মোটামুটি স্যাড্‌লার কমিশনের আদর্শানুযায়ী বহু নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২০।

স্বাধীন ভারতে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের (১৯৪৯ খ্রী) সুপারিশ অনুযায়ী ত্রিবাৎসরিক ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন হয় এবং ইউ. জি. সি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫৩ খ্রী)। (এই দুইটির প্রস্তাব ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্জেণ্ট রিপোর্টেই প্রথম করা হইয়াছিল।) ১১ বৎসরের স্কুল শিক্ষা এবং তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স ব্যবস্থিত হয় মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫২-৫৩ খ্রী) সুপারিশ অনুযায়ী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজগুলির সংখ্যার দ্রুত প্রসার ঘটিয়াছে এবং এখনও ঘটিতেছে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪। কলেজসংখ্যা ১৯৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ১৭৮৩; ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া হয় ৩১১২। এ যুগের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হইল, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থার ও গবেষণাব্যবস্থার ব্যয়নির্বাহে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ, মেধাবী ছাত্রগণকে বৃত্তিদানের বহুল প্রসার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারবহির্ভূত করা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করার মানের উন্নয়নের চেষ্টা, ইংরেজীর পরিবর্তে সংস্কৃত বিনা অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাকে (আঞ্চলিক ভাষা অথবা হিন্দী) শিক্ষার মাধ্যম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কয়েকটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা, ইত্যাদি। কোঠারি কমিশন (১৯৬৬ খ্রী) প্রস্তাব করিয়াছে যে, বাছিয়া বাছিয়া ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মুখ্য বিশ্ববিদ্যালয়' ('Major Universities') রূপে গঠন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমকক্ষ হইতে পারে। স্বাধীনতোত্তর যুগের একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ও কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যার অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি। ইহাদের নিবন্ধভুক্ত ছাত্রসংখ্যা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৩৯৬৭৪৫; ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহা বাড়িয়া হয় ২৪৭৩৬৬৪।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অল্প কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় আইনের দ্বারা স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত) ও বাকি সব কয়টি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় (রাজ্য আইনের দ্বারা স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত)। বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনব্যবস্থার কর্তৃপক্ষ ও অঙ্গগুলি এইরূপ ঃ ১. আচার্য ঃ (রাজ্যপাল পদাধিকারবলে) ; ২. উপাচার্য ঃ প্রধান শিক্ষাধিকর্তা ও কর্মকর্তা, বেতনভুক পুরা সময়ের কর্মচারী, সংসদকর্তৃক মনোনীত প্যানেল হইতে আচার্যের দ্বারা নির্দিষ্ট মেয়াদে নিযুক্ত ; ৩. সংসদ (সেনেট বা কোর্ট) ঃ নির্বাচিত, মনোনীত ও পদাধিকারবলে অধিষ্ঠিত সদস্যের দ্বারা গঠিত, আলোচক ও নির্দেশক সংস্থা ; ৪. সিন্ডিকেট বা কার্যনির্বাহক পর্ষদ ঃ উপাচার্য, সরকারি শিক্ষা অধিকর্তা (ডি. পি. আই) এবং সংসদ, ফ্যাকাল্টিসমূহ ও অধ্যক্ষদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত প্রধানতম কার্যকর সংস্থা ; ৫. শিক্ষা পর্ষদ (Academic Council) ঃ প্রধানতঃ কলেজের শিক্ষক ও অধ্যক্ষদের লইয়া গঠিত, ইহার কাজ শুধু শিক্ষাসংক্রান্ত-পাঠক্রমের নির্ধারণ, শিক্ষাব্যবস্থার ও পরীক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি পরিদর্শক (Visitor)। বিশ্ববিদ্যালয়-

গুলির শাসনব্যবস্থায় রকমফের আছে; মডেল অ্যাক্ট কমিটির (১৯৬৪ খ্রী) আদর্শানুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে সর্বত্র একপ্রকার করার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ১. অনুমোদক ও শিক্ষাদানকারী ঃ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই এই পর্যায়ভুক্ত; ইহাদের বেশির ভাগই প্রথমে ছিল মাত্র অনুমোদক, পরে শিক্ষাদানে ব্রতী হয়; ইহাদের শিক্ষাদানকার্য স্বকীয় বিভাগীয় শিক্ষকদের দ্বারা অথবা স্বীকৃত কন্স্টিটিউয়েণ্ট কলেজের শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়; উপরন্তু ইহারা স্বীয় অধিকারক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজকে অনুমোদনদান (affiliate) করে; এই সকল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা দান করে; ২. অনুমোদক ঃ শিক্ষাদানে বিরত কেবল অনুমোদক বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে মাত্র কয়েকটি আছে; ৩. একক (unitary) ও শিক্ষাদানকারী ঃ ইহারা সচরাচর আবাসিক; এইগুলি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত, শুধু স্বকীয় শিক্ষকেরাই শিক্ষা দান করে; ৪. সংযুক্ত (federal) ও শিক্ষাদানকারী ঃ কয়েকটি কন্স্টিটিউয়েণ্ট কলেজ লইয়া গঠিত; স্নাতক ও অবস্নাতক স্তরে এইগুলি স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দান করে, আবার ইহাদের শিক্ষকেরা মিলিতভাবে স্নাতকোত্তর এবং কখনও বা স্নাতক স্তরে শিক্ষা দান করে।

নিম্নে প্রতিষ্ঠার খ্রীষ্টাব্দানুক্রমে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নাম লিখিত হইল ঃ

১৮৫৭ ঃ ১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ২. বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়; ৩. মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়। **১৮৮৭** ঃ ৪. এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯১৬** ঃ ৫. বেনারস হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়; কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত; বিশেষ উদ্দেশ্য হিন্দু সংস্কৃতির সংবর্ধন; ৬. মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯১৭** ঃ ৭. পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯১৮** ঃ ৮. ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ। **১৯২১** ঃ ৯. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়; কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্যার সৈয়দ আহ্মেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাহোমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ ইহার ভিত্তিস্বরূপ; বিশেষ উদ্দেশ্য মুসলিম সংস্কৃতির সংবর্ধন; ১০. লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯২২** ঃ ১১. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯২৩** ঃ ১২. নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯২৬** ঃ ১৩. অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়ালটেয়ার)। **১৯২৭** ঃ ১৪. আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯২৯** ঃ ১৫. আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় (আন্নামালাই নগর)। **১৯৩৭** ঃ ১৬. কেরল বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রিবান্দ্রম); পূর্বে ইহার নাম ছিল ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়; কেরল রাজ্য গঠিত হওয়ার পর ইহার নূতন নামকরণ হয়। **১৯৪৩** ঃ ১৭. উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর)। **১৯৪৬** ঃ ১৮. সগর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৪৭** ঃ ১৯. রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (জয়পুর); ২০. পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (চণ্ডীগড়)। **১৯৪৮** ঃ ২১. গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়; ২২. জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়; (শ্রীনগর)। **১৯৪৯** ঃ ২৩. রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়; ২৪. পুনা বিশ্ববিদ্যালয়; ২৫. বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও বিশ্ববিদ্যালয়; ২৬. কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয় (ধারোয়ার)। **১৯৫০** ঃ ২৭. গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় (আহমেদাবাদ)। **১৯৫১** ঃ ২৮. শ্রীমতী নাথুভাই দামোদর ঠ্যাকর্সে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় (বোম্বাই); ২৯. বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন); কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৫২** ঃ ৩০. বিহার বিশ্ববিদ্যালয় (মজফ্ফরপুর)। **১৯৫৪** ঃ ৩১. শ্রীবেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় (তিরুপতি)। **১৯৫৫** ঃ ৩২. সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ (বল্লভ বিদ্যানগর); গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়; ৩৩. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (যাদবপুর)। **১৯৫৬** ঃ ৩৪. কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় (কুরুক্ষেত্র); ৩৫. ইন্দিরা কলাসংগীত বিশ্ববিদ্যালয় (খয়রাগড়)। **১৯৫৭** ঃ ৩৬. বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয় (উজ্জয়িনী); ৩৭. গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ৩৮. জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৫৮** ঃ ৩৯. বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (বারাণসী); ৪০. মারাঠাওয়াড় বিশ্ববিদ্যালয় (আওরঙ্গাবাদ)। **১৯৬০** ঃ ৪১. উত্তরপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পন্থনগর, নৈনিতাল); ৪২. বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; ৪৩. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়; ৪৪. ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ৪৫. রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৬১** ঃ ৪৬. কামেশ্বর সিংহ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় (দ্বারভাঙ্গা)। **১৯৬২** ঃ ৪৭. পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (লুধিয়ানা)। ৪৮. পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয় (পাতিয়ালা); ৪৯. ওড়িশা কৃষি ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় (ভুবনেশ্বর); ৫০. নর্থ বেঙ্গল (উত্তরবঙ্গ) বিশ্ববিদ্যালয় (শিলিগুড়ি); ৫১. রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলিকাতা); ৫২. মগধ বিশ্ববিদ্যালয় (গয়া); ৫৩. যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ৫৪. উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়; ৫৫. শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয় (কোল্হাপুর)। **১৯৬৪** ঃ ৫৬. ইন্দোর বিশ্ববিদ্যালয়; ৫৭. জিওয়াজি বিশ্ববিদ্যালয় (গোয়ালিয়র); ৫৮. রবিশঙ্কর বিশ্ববিদ্যালয় (রায়পুর); ৫৯. কৃষিবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় (হেব্বল, বাঙ্গালোর); ৬০. অন্ধ্রপ্রদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ); ৬১. বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়; ৬২. জওহরলাল নেহরু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (জব্বলপুর)। **১৯৬৫** ঃ ৬৩. ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়; ৬৪. দক্ষিণ গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয় (সুরাট); ৬৫. সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় (আহমেদাবাদ); ৬৬. কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৬৬** ঃ ৬৭. মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়; ৬৮. মীরাট বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৬৭** ঃ ৬৯. গুজরাত আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় (জামনগর); ৭০. সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়; ৭১. বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়। **১৯৬৮** ঃ ৭২. মহারাষ্ট্র কৃষি বিদ্যাপীঠ; ৭৩. কালিকট বিশ্ববিদ্যালয়; ৭৪. অওদেশ প্রতাপ সিং বিশ্ববিদ্যালয়, রেওয়া।

১৯৬৯ ঃ ৭৫. জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী, কেন্দ্রীয় ও সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ৭টি 'স্কুল' স্থাপনের সংকল্প আছে ; ৭৬. আসাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (জোড়হাট)।

ইউ. জি. সি. অ্যাক্ট (১৯৫৬ খ্রী) অনুসারে আরও কয়েকটি বিদ্যায়তন বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া বিবেচিত হয়, যথা ঃ বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি অ্যান্ড সায়েন্স, পিলানি ; ইন্ডিয়ান অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নয়াদিল্লী ; ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বাঙ্গালোর ; জমিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লী ; ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ ইণ্টারন্যাশনাল স্টাডিজ, নয়াদিল্লী ; গুরুকুল কাংড়ি বিশ্ববিদ্যালয়, হরিদ্বার ; কাশী বিদ্যাপীঠ, বারাণসী ; গুজরাত বিদ্যাপীঠ, আহমেদাবাদ ; টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্স, বোম্বাই ; ইণ্ডিয়ান স্কুল অফ মাইনস, ধানবাদ।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

বিশ্বভারতী ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (৭ পৌষ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) বোলপুর হইতে কিছু দূরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ('শান্তিনিকেতন' দ্র) রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহার সংকল্প ছিল বালকদিগকে তৎকাল প্রচলিত শিক্ষানামক খাঁচা হইতে বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হইবে এবং শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি নানা আনন্দরসের সংস্থান করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতের তপোবন বিদ্যালয়ের মূল আদর্শকে আধুনিক কালের উপযোগী করিয়া পরিবেশন করিবার সংকল্প ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বিধৃত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংকল্পে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সানন্দ অনুমতি ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ অন্যতম।

বিদ্যালয়টি প্রথমে দেশবাসীর দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে নাই। বিদেশী সরকার এক সময়ে একটি গোপনীয় নির্দেশনামায় সরকারি কর্মচারীদের পুত্রদের ওই বিদ্যালয়ে প্রবেশ কার্যতঃ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্বভার রবীন্দ্রনাথকেই বহন করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার আহ্বানে কয়েকজন শিক্ষাব্রতী ও কর্মী বিদ্যালয়ের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র রায়, মোহিতচন্দ্র সেন, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদানন্দ রায় শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রারম্ভ যুগেই ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে বিধুশেখর শাস্ত্রী, কালীমোহন ঘোষ, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, অসিতকুমার হালদার, নন্দলাল বসু প্রমুখ কর্মিগণ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করেন। ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের আদর্শের রূপায়ণে এবং শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি পরিমণ্ডল রচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

সূচনায় বিদ্যালয়ের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত সরল ছিল। শিক্ষকদের নির্বাচিত একটি সমিতির উপরই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। ছাত্রদের মনোবিকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ তাহাদের স্বাধীনতা দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'আশ্রম সম্মিলনী' নামে একটি সংগঠনের মধ্য দিয়া তাহারা নিজেদের দৈনন্দিন দায়িত্ব নিজেরাই পালনের শিক্ষালাভ করিত। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'আশ্রমিক সংঘ' নামে প্রাক্তন ছাত্রদের ও আশ্রমের অনুরাগীদের একটি সংগঠনের সূচনা করেন। আজ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর পরিচালনা ক্ষেত্রে এই সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণ একটি ব্রত উদ্‌যাপনের মত ('রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র)। বিশ্বসংস্কৃতির পীঠস্থান, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সংকল্প এই সময়ে ক্রমশঃ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। ইহা হইবে 'সর্বজাতিক মনুষ্যত্বচর্চার কেন্দ্র', 'বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র' ও একটি বিশ্ববিদ্যাবিহার।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ফ্রিয়র অ্যান্ড্রুজ ও উইলিয়ম উইনস্ট্যান্‌লি পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেন। আশ্রম বিদ্যালয় এবং বিশ্বভারতীর ক্রমবিকাশে ইঁহাদের প্রয়াস বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (৮ই পৌষ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) বিশ্বভারতীর সূচনার জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এম্পায়ার থিয়েটারে পঠিত এক প্রবন্ধে কবি 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনা দেশবাসীর নিকটে পেশ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে বিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থা হয়। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, ঔপনিষদিক সাহিত্য, পালি, প্রাকৃত এবং কিছু পরবর্তী কাল হইতে তিব্বতী, চীনা এবং ঐস্লামিক সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উচ্চমানের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা হয়। প্রথমে প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনের এই বিভাগটি বিদ্যালয়ের উত্তর বিভাগ নামে অভিহিত হইত। পরে এই বিভাগের নাম হয় বিদ্যাভবন। ঐ বৎসরই স্বতন্ত্র বিভাগরূপে কলাভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। কলাভবনে চিত্রকলা এবং সংগীতের অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে কলাভবন ও সংগীতভবন পৃথক বিভাগ হিসাবে পরিগণিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই বিশ্বভারতীর সংকল্পবাক্যে 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্' গৃহীত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (৮ পৌষ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে সর্ব-

বিশ্বভারতী

সাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। বিশ্বভারতীর প্রথম সংবিধান রেজিস্ট্রি করা হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। এই সংবিধান অনুসারে বিশ্বভারতী পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্বভারতী পরিষদের সদস্যদের উপর ন্যস্ত হইল। পরিষদের সদস্য দুই শ্রেণীর, সাধারণ সদস্য ও জীবন-সদস্য। সদস্যগণের দ্বারা সংসদ বা পরিচালক সমিতি, কর্মসচিব ও অর্থসচিব নির্বাচিত হইতেন। মূল সংবিধান অনুসারে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিষদ (Academic Council) এবং নারী-পরিষদ, এই দুইটি শাখার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিছুকাল পরে নারী-পরিষদ পরিত্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তিনিই বিশ্বভারতীর আচার্য ছিলেন। তাঁহার প্রয়াণের পর আচার্য হন যথাক্রমে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সরোজিনী নাইডু।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিকেতনে পল্লী-সংগঠন বিভাগের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। ঐ বৎসরই আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীতে নারীবিভাগেরও উদ্বোধন হয় এবং স্থায়ীভাবে ছাত্রীদের জন্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। পরবর্তীকালে ছাত্রীদের বাসগৃহের নাম হয় শ্রীসদন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঐ সময় পর্যন্ত লিখিত সমস্ত বাংলা পুস্তকাদির স্বত্ব বিশ্বভারতীকে দান করেন। ইহারই ফলে প্রকাশন বিভাগ বা গ্রন্থন বিভাগের সূচনা হয়।

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পর নানা দেশ, বিশেষতঃ ইওরোপ, হইতে নানা-বিদ্যাবিদ্ অধ্যাপকদের শান্তিনিকেতনে আগমন হইতে থাকে। তাঁহাদের মধ্যে সিলভ্যাঁ লেভি, হিন্‌টের্নিৎস, লেসনি, স্টেন কোনো, ফর্মিচি, তুচ্চি, কলিন্‌স, বোগ্‌দানভ, বেনোয়া, আঁদ্রে কারপেলেস, স্টেলা ক্রাম্‌রিশ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনিকেতনের পল্লীকল্যাণ কার্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেন লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট। শ্রীনিকেতনের সংশ্লিষ্ট 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ে সৃষ্টিমূলক কর্মকে কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী রূপায়িত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারটি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের সময় হইতেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের বিশেষ তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষাদরদীর সৌজন্যে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিছুকাল পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিকরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট হন। পুঁথি সংগ্রহ এবং সম্পাদনের জন্য ইহার একটি বিশেষ বিভাগও ছিল। এই গ্রন্থাগারটি বহু গবেষকদের সহায়তা করিয়াছে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একটি সমবায় ভান্ডারের উদ্বোধন করেন। সমবায় ভান্ডারটি ভারতের সমবায় আন্দোলনের অন্যতম প্রথম নিদর্শন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে লোকশিক্ষা সংসদের উদ্বোধন হয়। পূর্বনির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে গৃহে বসিয়া বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া বিশ্বভারতী হইতে উপাধি লাভ করিবার সুযোগ দিবার জন্যই এই সংসদের কার্যপ্রণালী পরিকল্পিত হয়। বর্তমানে এই সংসদে বাংলাভাষা ও সাহিত্য এবং ইতিহাস এই দুই বিষয়ে উচ্চতম মান অর্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে। শ্রীনিকেতনের সংলগ্ন শিল্পসদন স্থাপিত হয় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। রুচিসম্মত শিল্পসামগ্রী নির্মাণের পথিকৃৎ হিসাবে শিল্পসদন ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে।

বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগগুলি হইল যথাক্রমে পাঠ-ভবন (স্কুল), শিক্ষাভবন (কলেজ), বিদ্যাভবন (স্নাতকোত্তর ও গবেষণা বিভাগ), কলাভবন, সংগীতভবন, পল্লীসংগঠন বিভাগ (শিক্ষাসত্র, শিল্পসদন প্রভৃতি ইহার বিভিন্ন শাখা), গ্রন্থনবিভাগ। শিক্ষাভবনের সূচনা হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার প্রথম অধ্যক্ষ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রথমে শুধু বিশ্বভারতীর নিজস্ব পাঠক্রম (বিশ্বভারতী কোর্স) প্রচলিত ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. ও বি. এ. পাঠক্রমের প্রচলন হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক তান য়ুন-সানের সহায়তায় চীন ভবন ভারত-চীন ঐতিহ্যের গবেষণাবিভাগ-রূপে স্থাপিত হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দীভবনের উদ্বোধন হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভবনের উদ্বোধন হয়। এটি রবীন্দ্রচর্চার পীঠস্থান। ইহার সহিত বিচিত্রা নামক নিদর্শ গৃহটি সংশ্লিষ্ট। এই গৃহে রবীন্দ্রনাথের পান্ডুলিপি, চিত্র, চিঠিপত্র এবং পুস্তক এবং তাঁহার জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগৃহীত হইতেছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতীর শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র বিনয়ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫—৬৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় পল্লীশিক্ষা সদন। এখান হইতে সমাজবিদ্যা এবং কৃষি-বিদ্যায় উপাধি দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বহু উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বিশ্বভারতীতে রূপায়িত হইয়াছে বা হইতেছে।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সংসদে একটি আইন প্রণয়ন করিয়া বিশ্বভারতীকে একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। জওহরলাল নেহরু আচার্য নির্বাচিত হন। প্রথম উপাচার্য হন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতের রাষ্ট্রপতি বিশ্বভারতীর পরিদর্শক ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিশ্বভারতীর প্রধান (রেক্টর)।

বিশ্বভারতীর বর্তমান পরিচালনা কয়েকটি সমিতির সাহায্যে হইয়া থাকে, যথা সংসদ (Court), কর্মসমিতি (Executive Council) ও শিক্ষাসমিতি (Academic Council)। সংসদ বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ নিয়ামক সমিতি। বিশ্বভারতীর দৈনন্দিন প্রশাসন, আয়ব্যয় এবং অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ কর্মসমিতির কর্তৃত্বাধীন। শিক্ষাসমিতি বিশ্বভারতীর পঠন-পাঠন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থার দায়িত্ব বহন করে।

বর্তমানে প্রায় ২১০০ ছাত্রছাত্রী বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নে রত আছেন। পল্লীশিক্ষাসদন ছাড়া অন্য সব বিভাগেই

সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীসংখ্যা শতকরা ৪০ ভাগের কিছু বেশি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই আবাসিক।

দ্র প্রভাত মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, ৪ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪০—১৩৭১ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, শান্তিনিকেতন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ; প্রমথনাথ বিশী, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; অজিতকুমার চক্রবর্তী, ব্রহ্মবিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ; সুধীরঞ্জন দাস, আমাদের শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ; চিত্তরঞ্জন দেব, শান্তিনিকেতন পরিক্রমা, কলিকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; সুধীরচন্দ্র কর ও সাধনা কর, শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ; Pulin Behari Sen, *Santiniketan* (1901—1951), Calcutta, 1951; Ranjit Ray, *Visva-Bharati and its Institutions*, Santiniketan, 1956.

অমিয়কুমার সেন

বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম: ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো শহরে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উপনিবেশ স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ে স্বার্থ সাধনের সংঘাতের ফলে ইওরোপের প্রধান প্রধান রাজশক্তিগুলি কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়। একদিকে অস্ট্রিয়া, ইটালী ও জার্মানী এবং অন্যদিকে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ব্রিটেন, এই দুইটি মিত্রগোষ্ঠী স্থাপিত হয় এবং পরস্পরের বিপদে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপনীয় অনেক চুক্তি হয়।

সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ডের জন্য সার্বিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অস্ট্রিয়া তাহার নিকট অনেকগুলি দাবী করে এবং সার্বিয়া তাহা পালন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। রাশিয়া সার্বিয়াকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় অস্ট্রিয়ার মিত্র জার্মানী প্রথমে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ও পরে রাশিয়ার মিত্র ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। ইহার ফলে ৪ আগস্ট ব্রিটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। নভেম্বরে তুরস্ক এবং ১৯১৫-র অক্টোবরে বুলগেরিয়া জার্মানীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। জাপান (আগষ্ট, ১৯১৪ খ্রী), ইটালী (মে ১৯১৫ খ্রী) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ আঠারটি রাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামের মধ্য দিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করে। বেলজিয়ামের আত্মসমর্পণের পর জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে মার্নে পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু মার্নের যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মান বাহিনী প্রতিহত হওয়ায় গোটা পশ্চিম রণাঙ্গন জুড়িয়া আত্মরক্ষাত্মক পরিখা (Trench) যুদ্ধের সূচনা হয়। সার্ধ-তিনবৎসরব্যাপী পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধ এই পরিখারেখার বিভিন্নস্থানে পরস্পরের রক্ষাব্যূহ ভেদ করিবার বিফল চেষ্টায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থ আক্রমণগুলির মধ্যে ভের্দ্যাঁতে (Verdun) জার্মান আক্রমণ ও সোমে (Somme) মিত্রপক্ষের আক্রমণ (এখানে ব্রিটেন প্রথম ট্যাংক ব্যবহার করে) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকালে মিত্রপক্ষের রক্ষাব্যূহ ছিন্ন করিবার জন্য জার্মানীর সর্বশেষ আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং জার্মান বাহিনী বেলজিয়ামে পশ্চাদপসরণ করে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-বাহিনী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী আক্রমণ করে এবং গ্যালিসিয়া দখল করে। কিন্তু টানেনবের্গের যুদ্ধে জার্মান সেনাপতি হিণ্ডেনবুর্গ রুশ বাহিনীকে গুরুতরভাবে পরাজিত করেন এবং রুশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া পুনরায় অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়া বুকোভিনা দখল করে। এই বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া রুমানিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেয় কিন্তু মিলিত অস্ট্রিয়-জার্মান বাহিনীর নিকট রুমানিয়া পরাজিত হয়। রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের (নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রী) পর ডিসেম্বর মাসে রুশ-জার্মান যুদ্ধবিরতি হয় এবং রাশিয়া ব্রেস্ট-লিটোভ্‌স্কের সন্ধি (মার্চ, ১৯১৮ খ্রী) মানিয়া লয়। বল্কান অঞ্চলে সার্বিয়া ১৯১৫—১৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার সম্মিলিত আক্রমণে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সালোনিকায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনী বুলগেরিয়াকে পরাজিত করে।

ইটালীতে ইসোন্‌জো রণাঙ্গনে জার্মান-অস্ট্রিয় বাহিনীর নিকট ইটালী কাপোরেত্তোর যুদ্ধে পরাজিত হয় কিন্তু এক বৎসর পরে ইটালী ভিত্তোরিও-ভেনেতোর যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে। ব্রিটিশ বাহিনী মিশর হইতে প্যালেস্টাইনের তুর্কী বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করে (১৯১৮ খ্রী)। এশিয়ার জার্মান উপনিবেশগুলি জাপান দখল করিয়া লয়।

জুটল্যাণ্ডের (Jutland) যুদ্ধকে (১৯১৬ খ্রী) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান নৌযুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে জয়-পরাজয় সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত না হইলেও সমুদ্র-পথে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় থাকে। অতঃপর জার্মান নৌ-কর্তৃপক্ষ ডুবোজাহাজের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

উড়োজাহাজের ব্যাপক ব্যবহারও এই যুদ্ধের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফা শর্তের ভিত্তিতে জার্মানী যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করে (১১ নভেম্বর, ১৯১৮ খ্রী)। দশ সপ্তাহ পরে শান্তি

সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ জুন জার্মানীর সহিত ভার্সেই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্স আলসাস-লোরেন ফিরিয়া পাইল। বিবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও শান্তিরক্ষার জন্য একটি রাষ্ট্রসংঘ (League of Nations) গঠন করা হইল।

পৃথক পৃথক সন্ধির দ্বারা পরাজিত অপর রাষ্ট্রকয়টির সহিত শান্তি স্থাপিত হয়। এইসব সন্ধির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শর্ত হইল—অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি, জার্মান ভাষাভাষী নূতন অস্ট্রিয়া গঠন, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া এই কয়টি স্বাধীন রাষ্ট্রের সংগঠন এবং তুরস্ক সাম্রাজ্য হইতে অ-তুর্কী-অধ্যুষিত অঞ্চলের পৃথকীকরণ।

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সেই সন্ধি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটাইলেও ইওরোপে প্রকৃত শান্তি আসে নাই। পরাজিত জার্মানী ভার্সেই সন্ধির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি, জার্মানীর উপর ক্ষতিপূরণের অসহ্য চাপ, যুদ্ধোত্তর জার্মানীর অর্থনৈতিক বিপর্যয়, হ্বাইমার (Weimer) প্রজাতন্ত্রের সংকটময় অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, ফ্রান্সের নিরন্তর নিরাপত্তার অন্বেষণ, পশ্চিমী গণতন্ত্রের সোভিয়েত-বিরোধিতা এবং সর্বোপরি শান্তিরক্ষায় ও নিরস্ত্রীকরণে রাষ্ট্রসংঘের অপরিসীম ব্যর্থতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃষ্ঠপট সৃষ্টি করিয়াছিল।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে জার্মানীতে ক্ষমতা-লাভের পর নাৎসীদলের নেতা হিটলারের একমাত্র লক্ষ্য হইল ভার্সেই সন্ধির শর্ত অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় জার্মান শক্তি ও রাজ্য সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে হিটলার সন্ধির শর্তের বিরুদ্ধে ক্রমশ রাইনল্যান্ডে সৈন্য সমাবেশ, জার্মানীর সহিত অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিসাধন, চেকোশ্লোভাকিয়া-গ্রাস ও মেমেল অধিকার করেন এবং অবশেষে পোল্যান্ডের নিকট ডানজিগ ও পোলিশ 'করিডর' দাবি করেন। ('হিটলার' দ্র)।

পোল্যান্ড আক্রান্ত হইলে তাহাকে ব্রিটিশ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া চেম্বারলেন হিটলারকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। পোল্যান্ড বিনা যুদ্ধে দাবি মানিয়া লইতে রাজি না হওয়ায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। জার্মান বাহিনী পক্ষকালের মধ্যে পোল বাহিনীর প্রতিরোধ চূর্ণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল হিটলার নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণ করেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে উভয় রাষ্ট্রের উপর জার্মান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

১০ মে (১৯৪০ খ্রী) হিটলার ফ্রান্স আক্রমণের সূচনারূপে বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও লুক্সেমবুর্গ আক্রমণ করেন। ১৫ মে হল্যান্ড আত্মসমর্পণ করে। বেলজিয়াম আত্মসমর্পণ করে ২৮ মে। জার্মান বাহিনী সেদাঁয় (Sedan) ফরাসী প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া ব্রিটিশ ও বেল-জিয়ান বাহিনী ও বহু ফরাসী ডিভিজনকে মূল ফরাসী সৈন্যবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ফলে ব্রিটিশ বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া অতি-কষ্টে ডানকার্ক হইতে ব্রিটেনে ফিরিয়া আসে। ১০ জুন মুসোলিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জার্মান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ফ্রান্সের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান মার্সাল পেত্যাঁ (Petain) ২২ জুন হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ফ্রান্সের পতনের পর ব্রিটেন আক্রমণের প্রথম পর্ব হিসাবে ব্রিটেনের উপর জার্মান বিমানবহর প্রচন্ড আক্রমণ চালায়। কিন্তু এই আক্রমণ সফলতা লাভ করে নাই।

অক্টোবরের প্রথমভাগে জার্মানী রুমানিয়া অধিকার করে। মার্চে (১৯৪১ খ্রী) হিটলার বুলগেরিয়া অধিকার করেন। যুগোশ্লাভিয়া অধিকৃত হয় এপ্রিলে এবং ঐ মাসেই গ্রীস অধিকৃত হয়। মে মাসে জার্মানী ছত্রীবাহিনী (Paratroop) অবতরণ করাইয়া ক্রীট দ্বীপ অধিকার করে। এইভাবে সমগ্র বল্কান উপদ্বীপ হিটলারের করতল-গত হয়। ২২ জুন (১৯৪১ খ্রী) হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। ৫ ডিসেম্বর জার্মান বাহিনী মস্কোর উপকণ্ঠে পৌঁছায় কিন্তু রাশিয়ার প্রচন্ড শীতে জার্মান বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। এইবার রুশ প্রতি-আক্রমণ শুরু হয় এবং রুশ গেরিলা বাহিনী তৎপর হইয়া ওঠে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্ল বন্দর আক্রমণ করিয়া আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। ১১ ডিসেম্বর হিটলার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন।

সেপ্টেম্বরে (১৯৪০ খ্রী) ইটালীয় বাহিনী লিবিয়া হইতে মিশর আক্রমণ করে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রতি-আক্রমণে ইটালীয় বাহিনীর চরম বিপর্যয় ঘটে এবং ব্রিটিশ বাহিনী বেনগাজি পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মে মাসে (১৯৪১ খ্রী) ইটালীয় সোমালিল্যান্ড ও আবিসিনিয়া ইটালীর হস্তচ্যুত হয়। জেনারেল রোমেল ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করিয়া তব্রুক দখল করেন এবং এল অ্যালামেইনে অগ্রসর হন। কিন্তু অক্টোবর মাসে (১৯৪২ খ্রী) মণ্টগোমারির অধি-নায়কত্বে ব্রিটিশ অষ্টম বাহিনী এল অ্যালামেইনের যুদ্ধে রোমেলকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। নভেম্বরে জেনারেল আইজেনহাওয়ারের অধিনায়কত্বে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করে এবং ১৩ মে (১৯৪৩ খ্রী) জার্মান আফ্রিকা বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধাবসানের পর মিত্রশক্তি আফ্রিকা হইতে সিসিলি আক্রমণ করে (১০ জুলাই, ১৯৪৩ খ্রী)।

ইতিমধ্যে ইটালীর রাজার আদেশে মুসোলিনিকে বন্দী করা হয় এবং মুসোলিনির স্থলাভিষিক্ত জেনারেল বাদোলিও (Badoglio) মিত্রপক্ষের সহিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন (মুসোলিনি দ্র)। ইটালীতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া মিত্রশক্তি ক্রমে সার্ডিনিয়া ও কর্সিকা মুক্ত করিয়া মধ্য ইটালীতে অগ্রসর হয় এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইটালীতে জার্মান প্রতিরোধের অবসান হয়।

জুলাই মাসে (১৯৪২ খ্রী) জার্মান বাহিনী সেবাস্তোপোল অধিকার করে এবং স্তালিনগ্রাড অভিমুখে অগ্রসর হয়। নভেম্বর মাস হইতে রুশ বাহিনী প্রতি-আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জার্মান বাহিনী স্তালিনগ্রাডে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় (৩১ জানুয়ারি —১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ খ্রী)। অতঃপর জার্মান বাহিনী ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। রুশ বাহিনী মূল রুশ ভূখণ্ড শত্রুমুক্ত করিয়া জুলাই মাসে (১৯৪৪ খ্রী) পোল্যান্ডে উপস্থিত হয়। ক্রমে রুশ বাহিনী রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও হাঙ্গেরী অধিকার করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রুশ বাহিনী ভিয়েনা অধিকার করে। গ্রীস ও ক্রীটকে মুক্ত করে ব্রিটিশ বাহিনী। এপ্রিলের মধ্যভাগে (১৯৪৫ খ্রী) মার্শাল জুকভ বার্লিনের শহরতলীতে পৌঁছান।

৬ জুন (১৯৪৪ খ্রী) জেনারেল আইজেনহাওয়ারের সর্বাধিনায়কত্বে মিত্রশক্তি ফ্রান্সের উত্তরভাগে নর্মাণ্ডির উপকূলে অবতরণ করে। আগস্টে ফরাসী মুক্তিবাহিনী পারী প্রবেশ করে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী রাইন নদী আক্রমণ করে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে জার্মানী বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে।

৭ ডিসেম্বর (১৯৪১ খ্রী) পার্ল হারবার অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ করে এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহু দ্বীপসহ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংগাপুর এবং হংকং অধিকার করে। ব্রহ্মদেশ হইতে জাপান ভারত আক্রমণের উপক্রম করে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়া অতুল বিক্রমে যুদ্ধ করে এবং দুই স্থানে সীমান্ত পার হইয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ('আজাদ হিন্দ ফৌজ' দ্র)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস হইতে প্রশান্তমহাসাগরীয় যুদ্ধ ক্রমে মার্কিন রাষ্ট্রের অনুকূলে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি একটি করিয়া প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ পুনরায় দখল করিতে থাকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কেন্দ্রস্থলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও জাপানী নৌবহরের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ফলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসে। ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইওজিমা ও ওকিনাওয়া অধিকার করে এবং জাপানে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়া জাপানী যোগাযোগ ব্যবস্থা ও শিল্পাঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ চতুর্দশ বাহিনী ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে এবং মে মাসে (১৯৪৫ খ্রী) রেংগুন অধিকার করে। জাপানী সৈন্য ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

৬ আগস্ট (১৯৪৫ খ্রী) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জাপানের হিরোশিমা শহরে এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকি শহরে একটি করিয়া পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়। এই বোমায় বহু লোকের মৃত্যু হয় ও শহর দুইটি বিধ্বস্ত হয়। ২ সেপ্টেম্বর (১৯৪৫ খ্রী) জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর আত্মসমর্পণের পর জার্মানীকে চারিটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া এক একটি অঞ্চল আলাদাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সামরিক কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। অনুরূপভাবে সোভিয়েত অঞ্চলস্থিত বার্লিন চারিভাগে বিভক্ত হয় এবং পৃথকভাবে অধিকৃত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ফরাসী অঞ্চল একত্র করিয়া বন্-এ (Bonn) জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় এবং পাঁচ মাস পরে সোভিয়েত অঞ্চলটিতে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

পট্স্ডাম সম্মেলনে যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পরিষদ স্থাপিত হয় তাহার উপরেই জার্মানীর পাঁচটি আশ্রিত মিত্ররাষ্ট্রের (ইটালী, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও ফিনল্যান্ড) সহিত শান্তিচুক্তির খসড়া প্রস্তুতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। যুদ্ধবিরতির আঠার মাস পরে এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রী)। ইহার ফলে ইটালীর উপনিবেশগুলি হস্তচ্যুত হয়, আবিসিনিয়া ও আলবেনিয়া স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, এবং হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, ফিনল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডের বর্তমান রাজ্যসীমানা নির্ধারিত হয়।

জার্মানী ও তাহার আশ্রিত মিত্ররাষ্ট্রসমূহ নিরস্ত্রীকৃত হইল এবং প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণের বোঝা স্বীকার করিতে হইল।

হন্সু, হক্কাইডো, কিউসু, পিকোকু ও আরও কয়েকটি দ্বীপ লইয়া পুনর্গঠিত জাপান মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাকার্থারের সর্বময় কর্তৃত্বাধীনে আসিল। জাপান-কবলিত এশীয় ভূখণ্ড মুক্ত হইল কিন্তু মুক্ত এশিয়ায় ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পুনরায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নাই।

সমগ্র বিশ্বে শান্তিরক্ষার জন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের

অক্টোবর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

দ্র J. F. C. Fuller, *The Second World War*, London, 1948; Winston S. Churchill, *The Second World War*, London, 1964; Basil Collier, *A Short History of the Second World War*, London, 1967.

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ২৬টি জাতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ অনুমোদন করেন। ৭ এপ্রিল সারা বিশ্বে বাৎসরিক বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্দেশ্য জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের কেবল রোগনিরাময় নয়, তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্বাঙ্গীণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংস্থাটি চিকিৎসা-বিদ্যার গবেষণা, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, বিভিন্ন ঔষধের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান, চিকিৎসক, ধাত্রী, সেবিকা প্রভৃতির শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশনে সাহায্য করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তিনটি বিভাগে বিভক্ত—বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন, কার্যনির্বাহক সমিতি এবং সম্পাদকের মহাকরণ।

সংস্থার স্থায়ী সদর কার্যালয় জেনিভায় অবস্থিত। বিশ্বে ইহার ছয়টি শাখা আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আমেরিকা মহাদেশদ্বয়, পশ্চিম প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চল, আফ্রিকা এবং ইওরোপ মহাদেশের শাখা-কার্যালয়গুলি যথাক্রমে দিল্লী, আলেক-জান্দ্রিয়া, ওয়াশিংটন, ম্যানিলা, ব্রাজাভিল এবং ক্যোবেন-হাভ্‌ন-এ (কোপেনহাগেন-এ) অবস্থিত। শাখা-কার্যালয়-গুলি নিজ নিজ এলাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যা-বলী নির্ধারিত করে।

এই সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগ, রেড ক্রস, বিশ্ব চিকিৎসক সংঘ এবং আন্তর্জাতিক সেবিকা পরিষদকেও সাহায্য করিয়া থাকে।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া শাখার কার্যালয় স্থাপিত হয়। মাতা ও শিশুর মৃত্যুহার, পুষ্টির অভাবজনিত রোগ, সংক্রামক ব্যাধি এবং জনস্বাস্থ্যের সমস্যাদির সমাধান করাই এই কার্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। চিকিৎসক, সেবিকা ও ধাত্রীদিগের শিক্ষা, বি. সি. জি. টিকাপ্রদান, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগনিয়ন্ত্রণকল্পে গণ-কর্ম-পরিকল্পনা, শিশুবিদ্যা ও প্রতিরোধক চিকিৎসার অধ্যাপকপদসৃষ্টি, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রস্থাপন, উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার জন্য ইহার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।

দ্র The World Health Organisation, *First Ten Years of the W. H. O.*, Geneva, 1958.

কমলকুমার মল্লিক

বিশ্বামিত্র একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্‌বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অনেকগুলি সূক্তের তিনি ঋষি বা দ্রষ্টা।

কান্যকুব্জের রাজা কুশিকতনয় ক্ষত্রিয় গাধি তাঁহার পিতা (মহাভারত, আদি ১৭৫।৩)। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের হোমধেনু নন্দিনীর প্রতি লোভাকৃষ্ট হন। তিনি যুদ্ধে বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজের নিকট পরাজিত হইয়া গ্লানি অনুভব করেন। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র কৌশিকী নদীর তীরে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (মহাভারত, বন ৮৭।১৩)। কান্যকুব্জাধিপতি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের সহিত সোমপান করিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঘোষণা করেন (ঐ, বন ৮৭।১৭)।

সীতানাথ গোস্বামী

বিশ্বেশ্বরাইয়া, মোক্ষগুণ্ডম (১৮৬১—১৯৬২ খ্রী) প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অগ্রদূত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর মহীশূরের অন্তর্গত সুত্তেনহল্লি গ্রামে জন্ম। শিক্ষা বাঙ্গালোর সেন্ট্রাল কলেজে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এল. সি. ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বোম্বাই সরকারের পূর্তবিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন (১৮৮৪ খ্রী)। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তিনি হায়দরাবাদে জলনিষ্কাশন এবং মুসি ও ঈসি নদীর বন্যানিরোধের পরিকল্পনা রচনা করেন। ওই সময়েই তিনি মহীশূর রাজ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ার হন। ১৯১২ হইতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। মহীশূরে কাবেরী নদীর উপর বিশ্বেশ্বরাইয়ার কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধের পরিকল্পনা ভারতের প্রথম বহুমুখী প্রকল্প।

বিশ্বেশ্বরাইয়া পুনাতে 'লেক ফাইফ' নামক বাঁধের লক গেট পরিকল্পনা রচনা করেন (১৯০১—০৩ খ্রী)। তিনি ভারত সরকারের 'নিউ ক্যাপিটাল এন্‌কোয়ারি কমিটি'র (১৯২২ খ্রী) সভ্য ও 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক এন্‌-কোয়ারি কমিটি'র (১৯২৫ খ্রী) চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কিছুকাল ভারতসরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের উপদেষ্টা ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে কে. সি. আই. ই. (K. C. I. E) খেতাব দিয়াছিলেন (১৯১৫ খ্রী)। তাঁহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'Reconstructing *India*' (১৯২০ খ্রী), '*Planned Economy for India*' (১৯৩৪ খ্রী)।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত-সরকার তাঁহাকে ভারতরত্ন উপাধিতে বিভূষিত করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র Dildar Hussein, *An Engineering Wizard of India,* (1861--1962). Hyderabad, 1966.

অশোকা সেনগুপ্ত

বিশ্লেষণবিদ্যা বিশ্লেষণ বলিতে যে কোনও জটিল সমগ্রকে তাহার উপাদানসমূহে বিভক্ত করা বুঝায়। জ্ঞান-চর্চার বহু শাখাতে এই নামের প্রচলন আছে।

গণিতশাস্ত্রে গ্রীক পণ্ডিতেরা পূর্ব-প্রমাণিত সরলতর সিদ্ধান্ত এবং স্বতঃসিদ্ধের সাহায্যে কোনও প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিবার প্রণালীর নাম দিয়াছিলেন বিশ্লেষণ। যে প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা যেন সত্য ; ইহা হইতে পূর্ব-প্রমাণিত একটা সত্যে ফিরিয়া যাওয়া হয় ; তাহার পর ঐ সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়া মূল প্রতিজ্ঞার প্রমাণ করা হয়। পরবর্তী ইওরোপীয় সংস্কৃতির যুগে বৈশ্লেষিক জ্যামিতি প্রভৃতি বিষয়ে সমীকরণের সাহায্যে প্রশ্ন সমাধানের প্রণালীকে বিশ্লেষণ বলা হইত।

বর্তমানে গণিতশাস্ত্রে বিশ্লেষণ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্তরকলন, সমাকলন, ইহাদের সম্বন্ধীয় সমীকরণ, বাস্তব এবং অবাস্তব বা জটিল চলরাশির অপেক্ষক (Function of Real and Complex Variables), অসীম শ্রেণী, ফুরিয়ার শ্রেণী, স্থৈতিকতত্ত্ব (Potential Theory), সম্ভাবনা এবং পরিসংখ্যান, বীজগণিতের একটি বিশেষ শাখা, এই সকলই বিশ্লেষণের অন্তর্ভূত।

কামিনীকুমার দে

বিষ শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। যে বস্তু সেবনে, পানে, ঘ্রাণে বা দেহের সহিত সংস্পর্শে শরীরের ক্ষতি হয়, এমন কি প্রাণহানিও ঘটিতে পারে তাহাকে বিষ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ সংজ্ঞাই ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে স্বীকৃত হইয়াছে। বিষক্রিয়ার সহিত ইহার মাত্রাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কেন না বহু-ক্ষেত্রে একই বস্তু স্বল্প পরিমাণে দেহের পুষ্টি এবং বেশি পরিমাণে দেহের বহুল ক্ষতি সাধন করে।

বিষের নানা শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ অনুসারে বিষের এক নূতন শ্রেণীবিভাগ সম্ভব, যেমন জৈব, অজৈব, উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, খনিজ, বায়বীয় ইত্যাদি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীগণ দেহের উপর বিষের প্রতি-ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহারও সুবিধা প্রচুর। পাশ্চাত্য মতে বিষকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ ১. অবক্ষয়ী (করোসিভ) বিষ যাহা দেহকলার (টিসু) ক্ষয়সাধন করে ২. উত্তেজক (ইরিট্যান্ট) বা যন্ত্রণা-দায়ক বিষ ৩. নার্ভ-বিকৃতিকারক (নিউরোটিক্স) বিষ ৪. বায়বীয় (গ্যাসীয়াস) বিষ।

অবক্ষয়ী বিষের মধ্যে পারদ ও ইহার যৌগ 'রসকর্পূর' (বা করোসিভ সাব্লিমেট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এত-দ্ব্যতীত সাল্‌ফিউরিক, হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক, অক্সা-লিক, কার্বলিক প্রভৃতি অ্যাসিড, পটাশ, সোডা, অ্যামোনিয়া, সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ এই শ্রেণী-ভুক্ত। বিষক্রিয়ার ফলে পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অসহ্য জ্বালাবোধ, তৎসহ বমন হয় এবং কখনও কখনও বমির সহিত রক্তের কণাও পরিলক্ষিত হয়। পারদ-ঘটিত বিষের জন্য ডিমের অণ্ডলাল তৎক্ষণাৎ জলে গুলিয়া সেবন করানো হয়। কার্বলিক অ্যাসিডের বিষক্রিয়ার প্রতিকার চুনের জলের সহিত চিনি মিশাইয়া রোগীকে পান করানো।

উত্তেজক বিষের ভিতর আর্সেনিকের ('শঙ্খবিষ', 'সেঁকো বিষ') নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রসাঞ্জক, সীসা, তামা, দস্তা, ক্রোমিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি এজাতীয় বিষ। এই বিষের ক্রিয়া অতি ধীরে দেহের উপর পরিলক্ষিত হয়। বিষক্রিয়ার লক্ষণ মুখে ও পেটে অসহ্য জ্বালা, পরে বমি ও ক্ষারাধিক্য দেখা দেয়। সর্ষপচূর্ণ গরমজলে মিশাইয়া পান করানো ইহার প্রতিষেধক।

হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড নার্ভ-বিকৃতিকারক বিষের শ্রেণীভুক্ত ; সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। অহিফেন, কুচিলা (স্ট্রিক্‌নিন), অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, ধাতু প্রভৃতিও এই জাতীয় বিষ। অহিফেন সেবন এদেশে আত্মহত্যার একটি প্রধান উপায়। এই বিষের রোগী তন্দ্রাভিভূত হইয়া মারা যায়। রোগীকে তন্দ্রামুক্ত করা ও বমি করানো এই রোগের প্রতিষেধক।

ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বনিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, সাল্‌ফিউরাস অ্যাসিড, কার্বন মোনো-অক্সাইড, কয়লাঘটিত গ্যাস ইত্যাদি বায়বীয় বিষ। বিষাক্ত গ্যাসগুলি কণ্ঠনালীতে ভয়ানক আক্ষেপ এবং শ্বাসযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রদাহ উৎপন্ন করে, ফলে অচিরেই মৃত্যু ঘটে।

বহু বিষাক্ত উদ্ভিজ্জ বস্তু ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন এপোকোডিন, মর্ফিন, নার্কোটিন ইত্যাদি। ডিজিটালিস-জাতীয় কয়েকটি বিষাক্ত গাছ হৃদ্‌রোগে বিশেষ কার্যকরী। কয়েকপ্রকার বিষাক্ত গাছ হইতে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থ কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, খাম-আলু, চুপরি আলুর শ্রেণীভুক্ত ডাইস্কোরিয়া ইয়াম। কয়েকপ্রকার অতীব বিষাক্ত আলুর বিষের সাহায্যে আদি-বাসীরা মাছ ধরে ও বন্যজন্তু মারে। এই বিষাক্ত আলু হইতে যে রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহা হইতে অতি সুলভে স্টেরয়ড হর্মোনগুলির উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে।

সর্পবিষ বিভিন্ন প্রকার বিষের সংমিশ্রণ এবং প্রাণহানি-

কর। ইহা রক্তের লোহিত কণিকার ধ্বংসসাধন করে, পেশীর পক্ষাঘাত ঘটায় এবং হৃদ্‌যন্ত্রকে আক্রমণ করে।

জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ, দুই কারণেই খাদ্যদ্রব্যের সহিত বিষ মিশিয়া যাওয়ায় বহু দুর্ঘটনা ঘটে। শিয়ালকাঁটা বা আর্জিমন মেক্সিকোনা গাছের বীজ দেখিতে অনেকটা কালো সরিষার মত ; এই বীজের তৈল অতীব বিষাক্ত এবং বহুক্ষেত্রে সরিষার তৈলের সহিত ইহার ভেজাল দেওয়ার ফলে 'এপিডেমিক ড্রপসি' নামক রোগ দেখা যায়। ইহাতে ধীরে ধীরে হৃদ্‌যন্ত্র আক্রান্ত হয় ও রোগী মারা যায় ; কখনও চোখে গ্লকুমা হওয়ায় দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। ফলিডল নামক কৃত্রিম কীটনাশক বিষ পাট প্রভৃতি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয় ; অসাবধানতাবশতঃ এই বিষ খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশিয়া প্রাণহানি ঘটায়। ট্রাইক্রেসিল ফস্‌ফেট প্রধানতঃ প্ল্যাস্টিক প্রস্তুতির কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার খালি ড্রামে তৈল এবং বিয়ার রাখার ফলে পৃথিবীর বহু দেশে এই বিষজনিত পক্ষাঘাতে বহুলোক আক্রান্ত হয়। গুঁড়া হলুদের রং উজ্জ্বলতর করিবার জন্য ইহার সহিত হলুদ রং-এর লেড-ক্রোমেট মিশানো হয়, ফলে সীসাঘটিত লবণ দেহে প্রবেশ করে ; ইহা সহজে দেহের বাহিরে না যাওয়ায় সীসাজনিত অবসাদ (লেথার্জি) বা পক্ষাঘাত রোগ সৃষ্ট হয়। কুঁচ ও রেড়ির বীজে বর্তমান টক্স-অ্যাল্‌বুমিনের জন্যও বিষক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিষাক্ত 'ব্যাঙের ছাতা'ও দেহে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ হইতে যে সকল অদৃশ্য রশ্মি বাহির্গত হয় সেগুলি বেশিমাত্রায় দেহে প্রবেশ করিলে ক্যান্সার রোগ জন্মায়।

দেবী চক্রবর্তী

বিষ্ণু[১] ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা। স্বশক্তিতে সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান, তাই নাম বিষ্ণু (মৎস্য পুরাণ, ২৪৮।৩৯—৪০)। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে ইন্দ্রের পর জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম উপেন্দ্র। পদ্মপুরাণের উত্তর-খণ্ডে (৭১।১৫৭) বিষ্ণুর সহস্র নাম কীর্তিত হইয়াছে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু সত্ত্বগুণ আশ্রয়ে সমগ্র সৃষ্টির পালনকর্তা। অগ্নিপুরাণ, বরাহপুরাণ ও বায়ুপুরাণে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম বা শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি—এই প্রসিদ্ধ দশ অবতারের উল্লেখ আছে। দুর্বৃত্তের দমন ও সাধু ব্যক্তিদের পরিত্রাণের জন্য তিনি বিভিন্ন রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৪।৭-৮)। কল্কি বিষ্ণুর ভবিষ্যৎ দশম অবতার।

বিষ্ণুর ভার্যা লক্ষ্মী, বাহন গরুড়, ধাম বৈকুণ্ঠলোক, আয়ুধ সুদর্শনচক্র, ধনু শার্ঙ্গ, অসি নন্দক, গদা কৌমদকী, শঙ্খ পাঞ্চজন্য, শয্যা অনন্তনাগ। বক্ষোদেশে তাঁহার কৌস্তুভমণি, আর শ্রীবৎস নামে অদ্ভুত চিহ্ন। অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়।

ঋগ্‌বেদে মাত্র ৫।৬টি সূক্তে বিষ্ণুস্তুতি পাওয়া যায়। স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষে পদত্রয় স্থাপন করেন বলিয়া বেদে তিনি ত্রিবিক্রমরূপে পরিচিত। এই ত্রিবিক্রম আখ্যা পরবর্তী বলিবামনোপাখ্যানের ভিত্তিস্বরূপ। বৈদিক বিষ্ণু অপেক্ষা পৌরাণিক বিষ্ণুর মাহাত্ম্য ও সর্বব্যাপকত্ব জন-সমাজে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে।

যূথিকা ঘোষ

বিষ্ণু[২] পরমভাগবত গুপ্ত-সম্রাটদের আমল (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-ষষ্ঠ শতক) হইতেই বিষ্ণুমূর্তির বৈচিত্র্য ও প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। গুপ্তপূর্ব যুগের মূর্তিগুলির মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের বিষ্ণুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় উৎকীর্ণ অস্পষ্ট বিষ্ণুমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পৌরাণিক বিষ্ণুর অর্থাৎ আদিত্য-বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেব কৃষ্ণের সমন্বয়ে সঞ্জাত দেবতার রূপকল্পনা সার্থক, বিচিত্রতর ও বহুবিধ মূর্তির মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে।

বিষ্ণুর বিভিন্ন দেবমূর্তিকে 'ধ্রুবের' অর্থাৎ 'ধ্রুব-মূর্তি,' 'ব্যূহমূর্তি' এবং 'বিভব' বা 'অবতারমূর্তি' এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই তিন শ্রেণীর মূর্তি যথাক্রমে বিষ্ণুর 'পর', 'ব্যূহ' এবং 'বিভব' রূপের প্রকাশক।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে দক্ষিণ ভারতে রচিত বৈখানসাগম গ্রন্থ হইতে জানা যায়, যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ, কামনা-বাসনার চরিতার্থতা, শৌর্যবীর্য লাভ এবং শত্রুর ক্ষতিসাধন—ভক্তগণের এই চতুর্বিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যথাক্রমে 'যোগ', 'ভোগ', 'বীর' এবং 'অভিচারিক' এই চারি শ্রেণীর ধ্রুবমূর্তির সৃষ্টি। ইহাদের প্রত্যেকটি আবার 'স্থানক' 'আসন' ও 'শয়ন' এই তিনভাগে বিভক্ত। আলোচ্য দ্বাদশটি উপবিভাগের প্রত্যেকটি আবার 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'অধম' এই তিন শ্রেণী-পর্যায়ে বিভক্ত। বাস্তবে অবশ্য ছত্রিশ রকমের ধ্রুবমূর্তির সাক্ষাৎ মেলে না। বীরশ্রেণীর কোনও বিষ্ণুমূর্তি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। অভিচারিক শ্রেণীর একটি স্থানক বা দণ্ডায়মান প্রস্তর-মূর্তি বর্ধমানের চৈতনপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর এই চারি-হস্তবিশিষ্ট কুদর্শন মূর্তির নীচের দক্ষিণ ও বাম হস্ত যথাক্রমে গদাদেবী ও চক্রপুরুষের মস্তকোপরি ন্যস্ত, উপরের দক্ষিণ ও বাম হস্তে যথাক্রমে পদ্ম ও শঙ্খ ধৃত রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত যোগমূর্তিগুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের যোগস্থানক ও যোগশয়ন এবং মথুরার যোগাসন-মূর্তিগুলির উল্লেখ করা যায়। বিষ্ণুর ভোগমূর্তির সংখ্যা স্বভাবতঃই বেশি এবং ভারতের সর্বত্রই এইরূপ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দুই হাত- চারিহাত- ও আটহাত-বিশিষ্ট ভোগস্থানক মূর্তির মধ্যে চতুর্ভুজ প্রতিমার সংখ্যা সর্বাধিক ; এই শ্রেণীর মূর্তিতে দেবতার দুই পার্শ্বে তাঁহার দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী (কখনও বা দেবী বসুমতী) দণ্ডায়মানা।

উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর সিক্রির কাছে রূপবাস গ্রামে প্রাপ্ত শঙ্খ- ও চক্র-ধারী মূর্তিটি দ্বিভুজ, বাদামী গুহাগাত্রে ক্ষোদিত মূর্তিটি অষ্টভুজ। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হস্তে চক্র, শর, গদা ও খড়্গ এবং বামদিকের তিন হাতে শঙ্খ, খেটক ও ধনু; অপরটি কটিহস্ত ভঙ্গীতে বিন্যস্ত। দেবতার চতুর্ভুজ মূর্তি-শ্রেণীর প্রাচীন নিদর্শন মথুরার রাধাকৃষ্ণ সংগ্রহালয়ে এবং মধ্যপ্রদেশের উদয়গিরি গুহাগাত্রে দেখা যায়। প্রথম মূর্তির পিছনের দুই হাতে গদা ও চক্র, সামনের দুই হাতের দক্ষিণটি অভয়মুদ্রায় বিন্যস্ত, বামটিতে কমণ্ডলু-সদৃশ দীর্ঘগ্রীব জলপাত্র; দ্বিতীয় মূর্তির পিছনের হাত দুইটি চক্রপুরুষ ও গদাদেবীর মস্তকোপরি ন্যস্ত, সামনের বাম হাতে শঙ্খ, ডান হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; উদয়গিরির মূর্তির বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্নের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে।

বিষ্ণুর ভোগাসন মূর্তির দুইটি উপবিভাগ : এক-শ্রেণীর মূর্তিতে দেবতা আদিশেষের কুণ্ডলীনির্মিত আসনে সমাসীন, অন্যটিতে তিনি স্বীয় বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে বসিয়া থাকেন। এই দুই শ্রেণীর আসনমূর্তির দুইটি উদাহরণ যথাক্রমে উত্তরপ্রদেশের দেওগড়ের দশাবতার-মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ মূর্তি এবং বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত মূর্তি। দেওগড়ের মন্দিরগাত্রে দেবতার ভোগ-শয়ন মূর্তির যে দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে অনুপম ও সুপ্রসিদ্ধ ('দেওগড়' দ্র)।

বিষ্ণুর ব্যূহমূর্তিগুলির দুইটি রূপ : চতুর্ব্যূহ ও চতুর্বিংশতি ব্যূহ। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মূর্তিসমন্বিত রূপ 'চতুর্ব্যূহ' বা চতুর্মূর্তি নামে পরিচিত। একাধারে সন্নিবেশিত এই চারিটি মুখের সম্মুখের সৌম্য মুখটি ব্যূহ-বাসুদেবের, দক্ষিণের মুখটি সিংহাস্য সংকর্ষণের, বামের মুখটি বরাহবদন প্রদ্যুম্নের এবং পিছনের রাক্ষসমুখটি অনিরুদ্ধের। মনে হয় কাশ্মীরে বিষ্ণুর চতুর্ব্যূহ রূপকল্পনা অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় ছিল। কালক্রমে চতুর্ব্যূহ যখন 'চতুর্বিংশতি ব্যূহে' রূপান্তরিত হইল, তখন ভিন্ন এবং সহজতর উপায়ে দেবতা রূপায়িত হইলেন; বিষ্ণুর চারিটি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটি লাঞ্ছনের ভিন্নরূপ অবস্থানের দ্বারা বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি রূপ পাওয়া গেল এবং প্রত্যেকটি রূপের একটি করিয়া নামও স্থিরীকৃত হইল। এই চব্বিশটি মূর্তির প্রত্যেকটিতে দেবতা একবক্ত্র ও দণ্ডায়মান।

বিষ্ণুর বিভব বা অবতার-মূর্তির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক, ইহাদের প্রাচীনত্বও সমধিক। বিভিন্ন পুরাণে অবতার-রূপের যে সকল তালিকা আছে, তাহার একটিতে আছে বিষ্ণুর ঊনচল্লিশটি অবতার। কিন্তু বিষ্ণুর দশাবতারের ঐতিহ্যই সুপ্রচলিত। মৎস্য, কূর্ম ও বরাহ অবতারের রূপ পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পশুরূপে শিল্পিত হইত। নরসিংহ স্বভাবতঃই সিংহাস্য ও মনুষ্যদেহী; বামন অবতারের দুই রূপঃ (১) বামনাকৃতি ব্রাহ্মণবালক ও (২) ঊর্ধ্বে পাদোৎক্ষেপকারী দেবতার বিরাট রূপ। বাকি অবতারমূর্তির সবগুলিতেই বিষ্ণু নররূপী এবং প্রধানতঃ দ্বিভুজ।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার-রূপের প্রতিমা পাওয়া গিয়াছে। এইসকল রূপের মধ্যে প্রধানতঃ বরাহ, নরসিংহ এবং বামন-ত্রিবিক্রম, এই তিন অবতারের স্বতন্ত্র প্রতিমার সংখ্যা সমধিক। অনেক ক্ষেত্রে বিষ্ণুমূর্তির পৃষ্ঠ-ফলকে একসঙ্গে দশাবতারের দেবতার প্রতিকৃতি ক্ষোদিত হইত। বিষ্ণুপট্ট নামে এক-শ্রেণীর প্রস্তর ও ধাতব পট্টের উপর উৎকীর্ণ বিষ্ণুর দশাবতার-মূর্তি বাংলাদেশের নানা স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত অবতার-মূর্তিগুলির মধ্যে এলাহাবাদের নিকটস্থ গাড়ওয়া গ্রামের মৎস্য ও কূর্ম মূর্তি; মহাবলীপুরম, উদয়গিরি, বাদামী ও এরানের বরাহমূর্তি (এরানের মূর্তিতে দেবতা পুরাপুরি পশুরূপেই রূপায়িত, বাদামীর মূর্তিতে পৃথিবীদেবী দেবতার বাম হস্তের উপর দণ্ডায়মানা); এলোরা, দাদিক্কোম্বু (মাদ্রাজে দিন্দিগুল-এর কাছে), গাড়ওয়া, পাইকোড় (বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) প্রভৃতি স্থানের নরসিংহ-মূর্তি; মহাবলীপুরম, বাদামী, এলোরা প্রভৃতির বামন-ত্রিবিক্রম মূর্তি উল্লেখযোগ্য। পরশুরাম, রাঘব-রাম এবং বলরামের প্রাচীন স্বতন্ত্র মূর্তি বিরল এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে সাধারণতঃ দ্বিভুজরূপে চিত্রিত হন। দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণের সত্যভামা ও রুক্মিণী এই দুই পত্নী সহ রূপটি সমধিক প্রচলিত। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বালগোপাল (নাড়ুগোপাল), বেণুগোপাল, গোবর্ধনধারী, কালীয়দমন, মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি কৃষ্ণের নানাবিধ প্রতীকী লীলামূর্তি সংশ্লিষ্ট এবং এইসব মূর্তি মধ্য ও বর্তমান যুগের বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষ্ণুমন্দিরে পূজিত হয়। কল্কির স্বতন্ত্র মূর্তি পাওয়া যায় না; দশাবতার-ফলকেই তিনি অশ্বারোহী ও অসিধারীরূপে চিত্রিত হন।

বিষ্ণুর পূর্বোল্লিখিত ঊনচল্লিশ অবতার-রূপের মধ্যে শান্তাত্মন্ বুদ্ধের সঙ্গে অভিন্ন, ঋষভনাথ জৈনধর্মের প্রবর্তক ঋষভনাথ বা আদিনাথ। অন্যান্য অবতারের মধ্যে নর-নারায়ণ, মান্ধাতা, করীবরদ, দত্তাত্রেয়, বিশ্বরূপ প্রভৃতির স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেওগড়ের দশাবতার-মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ নর-নারায়ণের যুগ্মমূর্তি, অমরাবতীতে প্রাপ্ত মান্ধাতার মূর্তি, করীবরদ বা গজেন্দ্র-মোক্ষ রূপের প্রতিকৃতি, দত্তাত্রেয় অর্থাৎ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সমন্বয়াত্মক বা সমবেত মূর্তি, রাজশাহী মিউজিয়ামে বিদ্যমান বিংশতি-হস্ত সমপদস্থানক বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্তি, অশ্বমুখবিশিষ্ট বিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্তি (দৃষ্টান্ত : লুণ্গেহাল্লীর অষ্টভুজ মূর্তি) প্রভৃতি বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার-রূপের প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত।

দক্ষিণ ভারতের একাধিক স্থানে আবিষ্কৃত 'ত্রিমূর্তি' শ্রেণীর মূর্তিগুলিতে মধ্যবর্তী প্রধান স্থানটি বিষ্ণুর,

পার্শ্ববর্তী মূর্তিদ্বয় শিবের ও ব্রহ্মার; এখানে বিষ্ণুকে অপর দুই দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার প্রয়াস সুপ্রকট। অন্য পক্ষে, হরিহর, বাসুদেব-লক্ষ্মী, সূর্য-নারায়ণ, পূর্বোক্ত দত্তাত্রেয় (বা হরিহর-পিতামহ) মূর্তি-গুলিতে বিষ্ণুভক্তদের ধর্মীয় ঔদার্য ও সমন্বয়াত্মক মনোভাবের পরিচয় প্রতিফলিত। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের সমন্বয়াত্মক প্রচেষ্টা বিষ্ণু-লোকেশ্বর শ্রেণীর প্রতিমা-গুলিতে প্রমূর্ত।

বিষ্ণুমূর্তির সূত্রে বিষ্ণুর লাঞ্ছনগুলির মানবিক রূপ-কল্পনারও উল্লেখ করিতে হয়। চক্রপুরুষ ও গদাদেবী ছাড়া অন্য দুই লাঞ্ছনের মানবিক রূপ হইল পদ্মপুরুষ ও শঙ্খপুরুষ। আয়ুধপুরুষ নামে কথিত এই চারিটি লাঞ্ছনের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মূর্তি নাই, বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁহারা রূপায়িত হন। বিষ্ণুর বাহন গরুড়ও দেবতার সহিত মূর্তিপ্রাপ্ত হন। তবে গরুড় কখনও কখনও স্তম্ভ বা ধ্বজের উপরও দৃষ্টিগোচর হন। এখানে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত গরুড়ধ্বজ স্মরণীয়। গরুড় এক হিসাবে বিষ্ণুর বাহন, অন্যভাবে তাঁহার পশুপ্রতীক-রূপ।

দ্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০; Gopinath Rao, *Elements of Hindu Iconography*, Madras, 1914; Jitendra Nath Banerjea, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮০৪—১৯০০ খ্রী) ঊনবিংশ শতকের অন্যতম স্মরণীয় গায়ক ও সংগীতজ্ঞ। জন্ম রাণাঘাটের নিকটবর্তী আন্দুলে কায়েতপাড়া গ্রামে। তিনি বিভিন্ন রীতির বাংলা গান নানা উপলক্ষে গাহিলেও মূলতঃ ধ্রুপদগায়ক এবং কলিকাতায় আদি বাঙালী ধ্রুপদীদের মধ্যে একজন ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালিপ্রসাদকে রামমোহন রায় স্ব-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে প্রথম হইতেই (১৮২৮ খ্রী) গায়ক নিযুক্ত করেন। বিষ্ণু-চন্দ্র পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল একনিষ্ঠভাবে সমাজগৃহে উপাসনাকালে ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করেন। তাঁহার সংগীত-জীবন ব্রাহ্মসমাজ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করিয়া উদ্‌যাপিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক দ্বাদশ খণ্ডে প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীতাবলীর প্রথম ছয় খণ্ডের অন্তর্গত গীতগুলির তিনি সুরসংযোজক। বিষ্ণুচন্দ্রের নিকটেই রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে প্রথম সংগীতশিক্ষা লাভ করেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু দিগম্বর, পণ্ডিত (১৮৭২—১৯৩১ খ্রী) প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। মহারাষ্ট্রের কুরুন্ধোয়াদ নামক একটি দেশীয় রাজ্যের উক্ত নামের রাজধানীতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। পিতার কীর্তন শুনিয়াই তাঁহার প্রথম সঙ্গীতবোধ জন্মে। দেশীয় রাজ্য মিরাজের দরবারী ওস্তাদ গোয়ালিয়র ঘরানার পণ্ডিত বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরন্‌জিকারের নিকট নয় বৎসরকাল তিনি সংগীত শিক্ষা করেন। তৎপরে তিনি বরোদায় আসিয়া খ্যাতিলাভ করেন। মথুরার পণ্ডিত চন্দন চৌবের নিকট তিনি ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। তিনি লাহোরে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ৫ মে তারিখে গন্ধর্ব মহা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি "সংগীতামৃতপ্রবাহ" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই শহরে লাহোর প্রতিষ্ঠানের শাখা হিসাবে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে ইহাই মূল প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হয়। মহা-বিদ্যালয়ে নয় বৎসরব্যাপী শিক্ষাক্রমের পর "সংগীতপ্রবীণ" উপাধি প্রদান করা হইত। ক্রমে বিভিন্নস্থানে এই শিক্ষা-য়তনের শাখা স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আগস্ট মিরাজে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর রামায়ণের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" এই বিখ্যাত ভজনটি বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ দত্তাত্রেয় পালুসকর তাঁহার পুত্র ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ হিরলেকার, নারায়ণরাও খারে, বিনায়করাও পট্টবর্ধন, নারায়ণরাও ব্যাস এবং ওঙ্কারনাথ ঠাকুর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সংগীতের মান উন্নয়ন এবং সমাজে সঙ্গীতজ্ঞের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থাদির মধ্যে "ব্যায়ামকে সাথ সংগীত" এবং "বাঙ্গালী গায়ন" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

দ্র V. R. Athavale, *Pandit Vishnu Digambar*, New Delhi, 1967.

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বিষ্ণুপুর পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার একটি মহকুমা ও শহর। এই অঞ্চলের প্রধান মৃত্তিকা ল্যাটেরাইট শিলাস্তর হইতে উদ্ভূত। মধ্যে মধ্যে পলিমাটি স্তরও দেখা যায়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ইহাকে 'জঙ্গলমহল' বলা হইত।

মহকুমার প্রধান শহর বিষ্ণুপুর (২৩°৫´ উঃ ও ৮৭°২০´ পূঃ) দ্বারকেশ্বর নদীর পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। শহরের আয়তন ২০·৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ৩০৯৫৮ (পুরুষ ১৬২৮৬, নারী ১৪৬৭২)। শিক্ষিতের সংখ্যা ১৩০৪৬। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর পৌরসংস্থা স্থাপিত হয়। শহরটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাওড়া-গোমো লাইনের দ্বারা কলিকাতার সহিত যুক্ত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ২০১ কিলোমিটার। শহর হইতে তিন কিলোমিটার দূরে বিড়াই নদী। শহরের জলবায়ু শুষ্ক ধরনের, আর্দ্রতা কম। বাৎসরিক বৃষ্টি-পাতের গড় ১১৭·৫ সেন্টিমিটার।

বিষ্ণুপুর শহর ব্যবসায় ও কুটিরশিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। তসর ও রেশম বস্ত্র ও কারুকার্যমণ্ডিত রেশমী চাদর উৎপাদনের জন্য বিষ্ণুপুর বিখ্যাত। মহকুমায় গুটি-পোকার চাষ হয়। অন্যান্য কুটিরশিল্পের মধ্যে পিতল, কাঁসা, শঙ্খ, তুলসীমালা নির্মাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের অম্বুরি ও বালাখানা তামাক বিখ্যাত। বর্তমানে এখানে রেয়ন শিল্পেরও উন্নতি হইতেছে।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজগণের আমলে সংস্কৃত চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে এখানে রামানন্দ কলেজ, কৃষ্ণ-গোবিন্দ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট, ১টি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২টি সংগীতের কলেজ ও ২টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন আছে। সংগীতে বিষ্ণুপুর ঘরানা ভারত-বিখ্যাত।

কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই অঞ্চলের নাম ছিল মল্লভূম। মল্লরাজাদের রাজধানী লাউগ্রাম হইতে বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হওয়ার (সম্ভবতঃ ১৪ শতকে) পর হইতে রাজারা বিষ্ণুপুররাজ বলিয়া অভিহিত। রাজারা প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বির (১৫৯১—১৬১৬ খ্রী) শ্রীনিবাস আচার্য কর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। কথিত হয়, তিনিই বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের পূজা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর রাজত্ব করেন রঘুনাথসিংহ (১৬১৬—১৬৫৬ খ্রী, মতান্তরে ১৬৪৩—১৬৫৬ খ্রী), দ্বিতীয় বীরসিংহ (১৬৫৬—১৬৭৭ খ্রী), দুর্জন সিংহ (১৬৭৮—১৬৯৪ খ্রী) ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ মন্দির-গুলির নির্মাণ ইঁহাদের এবং দ্বিতীয় বীর সিংহের দুই রাণী শিরোমণি ও চূড়ামণির নামের সঙ্গে জড়িত। বিষ্ণুপুর শক্তিশালী রাজ্য ছিল। অষ্টদশ শতকে গোপাল সিংহের রাজত্বকালে বর্গীদের আক্রমণে রাজ্যটি বিধ্বস্ত হয় ও তাহার পতন ঘটিতে থাক।

প্রায় ১১ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর পরিবেষ্টিত এই শহরে অতীত গৌরবের পরিচায়ক বহু প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মল্লরাজগণের রাজধানীরূপে এবং খজুরাহো ও ভুবনেশ্বরের ন্যায় মন্দিরনগররূপে বিষ্ণুপুরের খ্যাতি। বিষ্ণুপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ ও মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের অতীত গৌরবের পরিচায়ক। বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গটি বাংলাদেশের শাশ্বত প্রথানুযায়ী পরিখা ও মৃণ্ময় প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। গড়ে প্রবেশ করিতে হইলে দুইটি পাষাণ তোরণ দিয়া যাইতে হইত। বৃহদাকার প্রবেশিকায় (gateway) তীর এবং বন্দুক ছুঁড়িবার ব্যবস্থা ছিল। বিখ্যাত 'দলমর্দন' অথবা 'দলমাদল' কামান (দৈর্ঘ্য ৩·৫৮ মিটার) মল্লরাজগণের শৌর্যের এবং বাঙালী কর্মকারের তোপনির্মাণ দক্ষতার সাক্ষ্য দেয়। কথিত হয় যে, বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ, যমুনাবাঁধ, শ্যামবাঁধ প্রভৃতি আটটি বৃহৎ পুষ্করিণী দ্বিতীয় বীরসিংহের রাজত্বকালে খনিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুরের গৌরব মাকড়াপাথর (laterite) এবং পোড়ামাটির ভাস্কর্য দ্বারা অলংকৃত দেবালয়গুলি। শ্যামরায় (১৬৪৩ খ্রী), জোড়বাংলা (১৬৫৫ খ্রী), লালজী (১৬৫৮ খ্রী), রাধাশ্যাম (১৭৫৮ খ্রী), কৃষ্ণ, বলরাম, নিকুঞ্জবিহারী মন্দিরগুলি গড়ের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। কালাচাঁদ (১৬৫৬ খ্রী), রাধামাধব (১৭৩৭ খ্রী), রাধা-গোবিন্দ (১৭২৯ খ্রী), জোড়মন্দির (১৭২৬ খ্রী), নন্দ-লাল লালবাঁধের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মল্লেশ্বর (১৬২২ খ্রী), মদনগোপাল (১৬৬৫ খ্রী) এবং মদন-মোহন (১৬৯৪ খ্রী) মন্দিরগুলি গড়ের উত্তরে অবস্থিত।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরসমূহকে পাঁচটি শৈলীতে বিভক্ত করা যায়। কৃষ্ণ, বলরাম, নিকুঞ্জবিহারী দেউলগুলি 'রেখ' শৈলীতে নির্মিত; মল্লেশ্বরের দেউলটিও বোধ হয় এই শ্রেণীতে ছিল, কিন্তু এখন তাহা পরিবর্তিত হইয়াছে। অন্যান্য ভাগ হইতেছে জোড়বাংলা, একরত্ন, পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দিরসমূহ।

বিষ্ণুপুরের অতুলনীয় ষষ্ঠ শৈলী রাসমঞ্চ নামক এক অনুপম ও বিস্ময়কর সৌধ। বীর হাম্বির ইহা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রাসমঞ্চটির ছাদ স্তরে স্তরে সোপানের ন্যায় (stepped pyramid) উঠিয়া এক বিন্দুতে পরি-ণতি লাভ করিয়াছে। ছাদের গুরুভার ন্যস্ত আছে পরস্পর হইতে সমদূরত্বে অবস্থিত খিলানযুক্ত তিনটি দেওয়ালের উপর। সর্বাপেক্ষা ভিতরের দেওয়ালে প্রতিদিকে পাঁচটি, দ্বিতীয় দেওয়ালটিতে আটটি, বাহিরের দেওয়ালটিতে দশটি করিয়া পত্রাকৃতি (engrailed) খিলান দ্বারা স্তম্ভাবলম্বন (arcade) সৃষ্টি করা হইয়াছিল। মঞ্চটি প্রায় ১·৫ মিটার উচ্চ জগতির (podium) উপর নির্মিত হয়। পরিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত খিলানগুলির উপর ক্ষুদ্রা-কার দোচালা ও চারচালাগুলির কোনও স্থাপত্য-প্রয়ো-জনীয়তা ছিল না। ইহারা কেবল ছাদের শোভাবৃদ্ধির জন্য। ইহাদের কয়েকটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (Indian Archaeological Survey) কর্তৃক পুন-নির্মিত। চতুষ্কোণের প্রত্যেকটিতে চারচালা এবং তাহাদের মধ্যবর্তী স্থানে চারটি করিয়া দোচালা ছিল।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে যে অভিনব মন্দিরস্থাপত্যরীতি ও উৎকৃষ্ট টেরাকোটা শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছিল ('টেরাকোটা' ও 'স্থাপত্য, ভারতীয়' দ্র), বিষ্ণুপুরেই তাহা সম্যক পর্য-বেক্ষণ করার প্রশস্ততম ক্ষেত্র। এত অধিক সংখ্যায় বাংলার বিশিষ্ট কুটির মন্দিরের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। বিষ্ণুপুরের কুটির মন্দিরের অধিকাংশই একরত্ন

বা একচূড়াবিশিষ্ট চারচালা কুটির মন্দির। চূড়া কোনও ক্ষেত্রে একটি অষ্টকোণাকৃতি বা গোলাকার গম্বুজ, কোনও ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকৃতি পীঢ়া দেউল। বিষ্ণুপুরের চারিটি শ্রেণীর কয়েকটি বিখ্যাত মন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ক. জোড়বাংলা ঃ এই শ্রেণীর মন্দিরটির নাম শ্রেণীর নামানুসারে জোড়বাংলা মন্দির (১৬৫৫ খ্রী)। পাশাপাশি দুইটি বাংলা মন্দিরের সমন্বয়ে মন্দিরটি গঠিত। উপরে একটি চারচালা কুটিরের অনুকৃতি মন্দিরের শোভা বর্ধন করিয়াছে। মন্দিরটি ইষ্টকনির্মিত এবং উৎকৃষ্ট টেরাকোটা ভাস্কর্য দ্বারা অলংকৃত। অলংকরণ বাহিরের ও ভিতরের দেওয়ালে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সম্মুখভাগের বিন্দুশীর্ষ খিলান (pointed arch)-যুক্ত প্রবেশদ্বার লক্ষণীয়।

খ. একরত্ন ঃ ১. লালজী (১৬৫৮ খ্রী), মাকড়াপাথরে (laterite) নির্মিত; চূড়া উচ্চাবচ কার্নিসের সমন্বয়ে গঠিত। ইহা বিষ্ণুপুরের অন্যতম বৃহত্তম মন্দির; এককালে দক্ষিণ দিকের দালান ভিত্তিচিত্রশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। ২. রাধাবিনোদ (১৬৬১ খ্রী), ইষ্টকনির্মিত ও সম্মুখভাগ টেরাকোটা-অলংকৃত; এইটির চূড়াও উচ্চাবচ কার্নিস দ্বারা গঠিত ছিল। বর্তমানে মন্দিরটির ভগ্নদশা কিন্তু অলংকরণের কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯২২—২৩ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে ইহার ভাস্কর্যের উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছিল), ইহা খরবাংলা পাড়ায় অবস্থিত। ৩. কালাচাঁদ (১৬৫৬ খ্রী), মাকড়াপাথরে নির্মিত; চূড়া উচ্চাবচ কার্নিস-সমন্বিত একটি পীঢ়া দেউল। ৪. মদনমোহন (১৬৯৪ খ্রী), এই সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরটি ইষ্টকনির্মিত, ইহার চূড়া অষ্টকোণাকৃতি গম্বুজ; মন্দিরের টেরাকোটা অলংকরণ উচ্চ মানের; ভিতরের ও বাহিরের প্রবেশপথ পত্রাকৃতি (cusped) খিলানযুক্ত এবং সম্মুখভাগের পরিকল্পনায় গৌড় পাণ্ডুয়ার মুসলিম ইমারতগুলির প্রভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট। ৫. রাধাশ্যাম (১৭৫৮ খ্রী), মাকড়াপাথরে নির্মিত; এই পাথরে গঠিত অজস্র প্রস্তরভাস্কর্য ইহার বৈশিষ্ট্য; চূড়া একটি গোলাকৃতি গম্বুজ।

গ. পঞ্চরত্ন ঃ ১. শ্যামরায় (১৬৪৩ খ্রী), ইষ্টকনির্মিত এই মন্দিরটির বাহিরের দেওয়াল, ভিতরের দেওয়াল, স্তম্ভ প্রভৃতি উচ্চ মানের টেরাকোটা ভাস্কর্য দ্বারা শোভিত; কোণের একটি চূড়া এবং মধ্যস্থিত প্রধান চূড়াটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পুনর্নির্মিত। ২. মদনগোপাল (১৬৬৫ খ্রী), মাকড়াপাথরে নির্মিত বিষ্ণুপুরের বৃহত্তম মন্দির; কেন্দ্রীয় চূড়াটি অষ্টকোণাকৃতি এবং অন্য চূড়াগুলি চতুষ্কোণ; ভাস্কর্য-অলংকরণ সামান্য।

ঘ. নবরত্ন ঃ শ্রীধর মন্দির (নির্মাণকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক), বসুপল্লীতে অবস্থিত; ইষ্টকনির্মিত মন্দির, টেরাকোটা ভাস্কর্য দ্বারা শোভিত।

শ্রীধর মন্দির ব্যতীত উল্লিখিত সকল মন্দিরই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের আনুকূল্যে নির্মিত।

দ্র অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার মন্দির, কলিকাতা ১৯৬৫; রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ; Amiya-Kumar Banerjee, *West Bengal District Gazetteer, Bankura*, Calcutta, 1968; *Archaeological Survey of India, Annual Report*, 1903—04 to 1910—11, 1921—22 to 1923—4.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

বিষ্ণুপুর ঘরানা মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহের আমলে (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে) বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে স্থাপিত হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদের একটি বিশেষ ঘরানা স্থাপিত হইতে দেখা যায়। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তক কে এ সম্বন্ধে কোনও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের সংগীতজ্ঞদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস বাহাদুর সেন (খাঁ বা শাহ বাহাদুর) নামক তানসেনবংশীয় দিল্লীর একজন প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুপুরে সেনীধ্রুপদ এবং হিন্দুস্থানী সংগীতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে গদাধর চক্রবর্তী, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী, নিতাই নাজীর এবং বৃন্দাবন নাজীর বিষ্ণুপুরের সংগীতধারাকে প্রবাহিত রাখেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রামশংকর ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের সাংগীতিক খ্যাতি সমধিক বর্ধিত করেন। বর্তমানে কোনও কোনও মতবাদ অনুসারে আগ্রার কোনও ঘরানা হইতে রামশংকরের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরে বিশেষ ঘরানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রামশংকর বহু কৃতী শিষ্য রাখিয়া যান। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিষ্ণুপুর ঘরানার রামকেশব ভট্টাচার্য এবং কেশবলাল চক্রবর্তী কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলিকাতায় রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক স্থাপিত সংগীত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খ্যাতিমান গায়ক দীনবন্ধু গোস্বামী ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সমসাময়িক। অনন্তলালের বহু শিষ্য ছিলেন। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই ঘরানার অন্তর্ভুক্ত যদুভট্টের নাম সুবিদিত। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর ঘরানার গায়ক ছিলেন।

দ্র দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর ঘরানা, কলিকাতা, ১৯৬৩ খ্রী; Amiya Kumar Banerjee, *West Bengal District Gazetteer, Bankura*, Calcutta, 1968.

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বিষ্ণুপুরাণ পুরাণ দ্র

বিষ্ণুশর্মা দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির মন্দবুদ্ধি পুত্রগণকে গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়ার

নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা 'পঞ্চতন্ত্রকথামুখম্' নামে এক গল্পগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে অমরশক্তি ও বিষ্ণুশর্মার ঐতিহাসিকত্ব নাই। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র ভারতীয় কথাসাহিত্যের অক্ষয় উৎস। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের মধ্যে ইহা রচিত।

ইহার পহ্লবী অনুবাদ (খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ট শতক) এবং পরবর্তী কালে পৃথিবীর নানা ভাষায় অসংখ্য অনুবাদ ইওরোপের এবং পশ্চিম মধ্য এশিয়ার গল্পসাহিত্যকে প্রভাবিত করে। কোনও কোনও মতে তন্ত্রাখ্যায়িকা ইহারই প্রাচীনতর কাশ্মীরী রূপ। উত্তর-পশ্চিম দেশীয় রূপান্তরটি কথাসরিৎসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব ভারতীয় সংস্করণটি বঙ্গদেশে হিতোপদেশ নামে প্রচলিত। 'পঞ্চতন্ত্র' দ্র।

দ্র Peter Peterson, *Hitopodesa*, Bombay Sanskrit Series, 1887; Buhler and Kielhorn. *Panchatantra*, vols. I-III. Bombay Sanskrit Series, 1891-94.

কল্যাণী দত্ত

বিসমার্ক অটো, প্রিন্স ফন (von) (১৮১৫—১৮৯৮) জার্মান রাজনীতিক। বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত জার্মান জাতিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘবদ্ধ করিয়া আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকারীরূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। বিসমার্ক প্রুশীয় জমিদারশ্রেণী হইতে উদ্ভূত ও প্রচণ্ড শারীরিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। প্রথম জীবনে বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মান জাতির উপর অস্ট্রিয়ার নেতৃত্বের বিশেষ বিরোধী না হইলেও শীঘ্রই তিনি স্থির-নিশ্চয় হন যে একমাত্র প্রুশীয় রাজশক্তির অধীনেই জার্মান জাতির একীকরণ সম্ভব এবং এজন্য গণতান্ত্রিক প্রগতিবাদ ত্যাগ করিয়া কঠোর (Blood and Iron) নীতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই জন্যই ইওরোপীয় ইতিহাসে ইনি *The Iron Chancellor* রূপে পরিচিত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গণতন্ত্রবাদিগণ কর্তৃক রাজা প্রথম উইলিয়মের সৈন্যবল-বৃদ্ধিমূলক বাজেট নাকচ করার পরিপ্রেক্ষিতে বিসমার্ক প্রথম ক্ষমতা লাভ করেন এবং অপূর্ব কূটনীতির সহায়তায় অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সকে আক্রমণকারী প্রতিপন্ন করিয়া জার্মান জাতির জাতীয়তাবাদ উদ্বুদ্ধ করেন। প্রথমে উত্তর জার্মানীর রাজ্যসমূহের ফেডারেশন ও পরে অনুরূপভাবে দক্ষিণ জার্মান রাজ্যগুলিকে সংগঠিত করিয়া তিনি নবীন জার্মান জাতি ও রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান সম্ভব করেন।

জাতীয়তাবাদের পরিপন্থী হিসাবে ক্যাথলিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিসমার্ক Kultur Kampf নামক নীতি গ্রহণ করেন।

দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিসমার্ক গণতান্ত্রিক ও সোস্যালিস্ট উভয় দলের বিরোধী হইলেও শ্রমিক সমাজের সমর্থন লাভের জন্য সামাজিক সুরক্ষা (social security) ব্যবস্থার প্রবর্তন ইওরোপে ইনিই প্রথম করেন।

বিসমার্ক সুদীর্ঘকাল একনিষ্ঠভাবে প্রুশীয় রাজা প্রথম উইলিয়মের সেবা করিয়া তাঁহাকে জার্মানীর সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু প্রথম উইলিয়মের পৌত্র দ্বিতীয় উইলিয়ম বিসমার্কের প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে বিসমার্ক চান্সেলার পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

সাধনা দাস

বিস্ফোরক বিস্ফোরণ বলিতে বুঝায় একটি প্রবল ও সশব্দ বিদারণ, যাহাতে চাপের সৃষ্টি ও নির্গম হয়। দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহিত বিস্ফোরণ সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট। বিক্রিয়ার অবশ্যই তাপ এবং কিছু কিছু গ্যাসীয় পদার্থও উৎপাদিত হয়। কোনও বিস্ফোরক (যাহা বিস্ফোরণ ঘটায়) টি. এন. টি-এর মত একটিমাত্র রাসায়নিক যৌগ হইতে পারে, আবার বারুদের মত (পটাসিয়াম নাইট্রেট, অঙ্গার ও গন্ধক) একটি সংমিশ্রণও হইতে পারে। সমস্ত বিস্ফোরণেরই অন্ত-ফল কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, জল ও নাইট্রোজেনের ন্যায় সরল অণুনিচয়; কিন্তু বিস্ফোরণ বিক্রিয়ার উচ্চতাপে কিছু কিছু ক্ষণস্থায়ী অণু-অংশ বা মুক্ত-মূলক (Free radical) যেমন OH, H এবং O উদ্ভূত হয়, আবার গ্যাসীয় পদার্থগুলি শীতল হইলে উহারা সংযুক্ত হইয়া স্থায়ী অণুগুলি গঠন করে। রাসায়নিক বিচারে বিস্ফোরণ একটি জারণ প্রক্রিয়া। বিস্ফোরক মাত্রই দাহ্য। সাধারণতঃ দাহ্য পদার্থ ও বিস্ফো-রকের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য আছে। দহনক্রিয়া কিছু সময় ব্যাপিয়া হয়; কিন্তু বিস্ফোরক পদার্থে দহনক্রিয়া তাৎক্ষণিক এবং সহসা বিপুল পরিমাণে শক্তি উৎসারিত হয় বলিয়া চাপ ও তাপের উদ্ভব হয়; ফলতঃ বিস্ফোরণ ঘটে। কোনও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের সঙ্গে রাসায়নিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট নাও থাকিতে পারে। যেমন উচ্চচাপে কোনও পাত্রের স্ফোটন। এখানে চাপ নির্গমই মুখ্য প্রতীত ব্যাপার। আবার পরমাণুকেন্দ্রিক বিস্ফোরণে মৌলের গুণান্তরই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কোনও কোনও বিস্ফোরকে দাহ্য ও দাহক পৃথক পৃথক যৌগ পদার্থ। যেমন বারুদে অঙ্গার ও গন্ধক হইল ইন্ধন, আর পটাসিয়াম নাইট্রেট হইল জারক দ্রব্য। কিন্তু বিশুদ্ধ অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরকে এই ধর্ম দুইটি একটি অণুতেই ওতপ্রোতভাবে থাকে। সামরিক ও অসামরিক ব্যবহার অনুসারে বিস্ফোরক পদার্থের শ্রেণীবিন্যাস করা যাইতে পারে। বহুকাল যাবৎ বারুদ বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহা শক্তি-শালী বিস্ফোরক নয়। সাধারণ দাহ্য পদার্থের মতই ইহারও প্রজ্বলনের একটি নির্দিষ্ট হার আছে। বস্তুতঃ

একটি আবদ্ধ জায়গায় দহনক্রিয়া সম্পন্ন না করা হইলে বারুদের বিস্ফোরণ মোটামুটিভাবে ফলপ্রসূ হয় না। জনজীবনে বিস্ফোরক পণ্যের ব্যবহার অ্যালফ্রেড নোবেলের নাইট্রো-গ্লিসারিন আবিষ্কারের পরেই সর্বপ্রথম বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ইহার স্থান অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট অধিকার করিতেছে। বহু চমকপ্রদ বিস্ফোরক ইহার সহায়তায় উৎপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট বিস্ফোরক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট সমস্ত বিদারণে জারক দ্রব্যের ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং ইন্ধন হিসাবে তুষ বা ঐ জাতীয় যে কোনও অঙ্গারময় পদার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। অধুনা যুদ্ধে ব্যবহারের নিমিত্ত টি-এন-টি (ট্রাইনাইট্রোটলুইন), আর-ডি-এক্স (সাইক্লোট্রাইমিথিলিনট্রাইনাট্রামিন), পি-ই-টি-এন্ (পেন্টাইরাইথ্রিটলটেট্রানাইট্রেট), টেট্রাইল (ট্রাইনাইট্রোফিনাইলমিথাইলনাইট্রামিন) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত ৪টি বিস্ফোরকই গৌণ বিস্ফোরক। ইহারা স্বতঃবিদীর্ণ হয় না। কোনও মুখ্য বিস্ফোরক, যেমন, লেড অ্যাজাইড বা মার্‌কিউরিক ফাল্‌মিনেট প্রভৃতির নিকট হইতে বিশেষ শক্তিশালী ঘাততরঙ্গ ইহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছাইলে তবেই ইহারা বিদীর্ণ হয়। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, পলিতা দ্বারা প্রজ্বলিত করিলে অথবা সজোরে আঘাত করিলে মুখ্য বিস্ফোরক সঙ্গে সঙ্গে বিদীর্ণ হয়।

দ্র M. A. Cook, *The Science of High Explosives*, New York, 1958.

রবীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বিস্ফোরণ বিস্ফোরক দ্র

বিহার ভারতের অন্যতম রাজ্য। ইহা ২২°—২৭°৩০′ উত্তর ও ৮৩°২০′—৮৮°১৯′ পূর্বে অবস্থিত। আয়তন ১৭৪০৩৭ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে নেপাল, পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণে ওড়িশা। গঙ্গানদী বিহারকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

বিহারের উত্তর ভাগের অধিকাংশই গঙ্গার পলিমাটি দ্বারা গঠিত। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কিয়দংশ বিহারের দক্ষিণদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। বিহারের, বিশেষতঃ দক্ষিণ বিহারের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস যে সুপ্রাচীন, বিভিন্ন যুগের প্রস্তরের সমন্বয় ইহাই প্রমাণ করে। হিমালয় পর্বতের উত্থানের সহিত বিহারের এই অঞ্চলেও কিছু উত্থানের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহারের উত্তরাংশ প্রায় সমভূমি। সামান্য উচ্চ অঞ্চল পুরাতন পলিতে গঠিত। উহাকে ভাঙ্গর বলে। অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি খদর দ্বারা নির্মিত। ভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বে। পশ্চিমে উহা ১৫০ মিটার উচ্চ এবং উহা পূর্বে ৩০ মিটার নামিয়াছে।

দক্ষিণ বিহারের পুরাতন প্রস্তররাজি বহুলাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত, কিছু উচ্চ স্থানও আছে। হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পর্বতের উচ্চতা ১৩৬৭ মিটার। দক্ষিণ-পশ্চিমের উচ্চ মালভূমিকে পাট বলে। এই অঞ্চল হইতে সর্বদিকে ভূমির ঢাল নামিয়াছে। দামোদর নদীর উপত্যকা হাজারিবাগ ও রাঁচির মালভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। হাজারিবাগ মালভূমির উত্তর-পূর্বদিকে রাজমহল পর্বত অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনেকগুলি লাভা দ্বারা নির্মিত মালভূমি এবং অন্যান্য খণ্ডিত ছোট পাহাড় বিহারের পূর্বসীমায় অবস্থিত। দক্ষিণ বিহারের পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় সর্বত্র মাকড়াপাথর (laterite) ও বক্সাইটে আবৃত সমউচ্চতাবিশিষ্ট মালভূমি দেখা যায়। সিংহভূমের সমভূমি দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। চাইবাসা অঞ্চলে প্রচুর গ্রানাইটের পাহাড় ও ক্ষয়প্রাপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহারে বহু নদী প্রবাহিত হইতেছে। এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গঙ্গা পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রায় ৫৬০ কিলোমিটার প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর বিহারে অন্যান্য নদীর মধ্যে ঘর্ঘরা, মাহি, গণ্ডক, বুড়িগণ্ডক, বাগমতী, কমলা, তিলযুগা, কোশি এবং মহানন্দা প্রধান। শোন, পুন্‌পুন্‌, ফল্গু, কর্মনাশা এবং দুর্গাবতী প্রভৃতি দক্ষিণ বিহারের প্রধান নদী। ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রধান নদীর মধ্যে দামোদর, সুবর্ণরেখা, বরাকর এবং কোয়েল উল্লেখযোগ্য। রাজমহলের পার্বত্য অঞ্চলে অজয়, মোর, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি কয়েকটি পূর্বগামী নদী দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর বিহারে প্রধান তিনটি বন্যার অঞ্চল রহিয়াছে—১. গণ্ডকনদীর উপত্যকা ২. মধ্যবর্তী অঞ্চল ও ৩. কোশিনদীর উপত্যকা। এই সকল অঞ্চলের নদীগুলি প্রায়শই গতি পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং বন্যার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি এই সকল অঞ্চলে বন্যা রোধের জন্য কয়েকস্থানে বহুমুখী প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বিহারও মৌসুমী জলবায়ুর অধীনে অবস্থিত। মার্চ মাস হইতে গরমকাল আরম্ভ হয়। উষ্ণতা মে মাস পর্যন্ত বাড়িতে থাকে; সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৪০০-৪৬০ সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ওঠে। এপ্রিলের মাঝামাঝি হইতে উষ্ণ ধুলিঝড় বা 'লু' বহিতে থাকে। এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি হয় তাহাতে বিহারের পূর্বাঞ্চলেও কিছু বৃষ্টি হয়। পশ্চিমাবায়ু বিহারের পশ্চিমে মে মাসে কিছু বৃষ্টিপাত ঘটায়।

জুন মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল। এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং তাপমাত্রা কমিয়া যায়। পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে বৃষ্টিপাত কমিয়া থাকে। বিহারে গড়ে বৎসরে ১২৫০ মিলিমিটার হইতে ১৩২৫ মিলি-

মিটার বৃষ্টি হয় এবং শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বৃষ্টি জুন হইতে অক্টোবরের মধ্যে হয়।

নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি মাসকে শীতকাল বলা যাইতে পারে। সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ১৫°-১৪° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়। বিহার প্রদেশের নানা অংশের প্রাচীনকাল হইতেই নানা নাম ছিল। বর্তমান পাটনা, গয়া ও আরা জেলা মগধ নামে, দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী, উত্তর মজঃফরপুর বিদেহ বা মিথিলা নামে এবং দক্ষিণ মজঃফরপুর বৈশালী নামে পরিচিত ছিল। মগধ বৌদ্ধতীর্থ। এখানে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং এখানেই নানা বিহারে ধর্ম প্রচার করেন। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক হইতে মগধ শক্তিশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহার রাজধানী প্রথমে রাজগৃহ (রাজগীর) ও পরে পাটলিপুত্রে স্থাপিত হয়। মৌর্য, শুঙ্গ, কণ্ব, গুপ্ত, পাল প্রভৃতি বংশের রাজারা এখানে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। পালবংশের রাজা গোপালের সময় ওদন্তপুরীতে একটি বৃহৎ বৌদ্ধমঠ (বিহার) স্থাপিত হয়। অনুমান করা হয় এই হইতে সমগ্র প্রদেশের নাম বিহার হয়। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী বিহার অধিকার করিয়া মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করে। তখন হইতে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয় এবং ইহা যুক্তভাবে শাসিত হইতে থাকে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গণ্য হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রদেশ ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

বিহারের প্রায় ৩২১৫২ বর্গকিলোমিটার বনভূমিতে আবৃত এবং ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ইহা ব্যতীত মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া এবং আরাতে (সাহাবাদে) বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বনভূমিতে শাল, পলাশ, মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। শালের সহিত বাঁশও দেখা যায়। সাবাই ঘাস সিংহভূম ও পালামৌতে প্রচুর জন্মে। প্রধান উৎপাদন হিসাবে কাঠ এবং জ্বালানী উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বনভূমি হইতে বাঁশ, লাক্ষা, রজন প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য পাওয়া যায়। শাল বৃক্ষ হইতে সর্বপ্রকারের আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়। বাঁশ ও সাবাইঘাস হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ লাক্ষা বিহারে হয়।

উত্তর বিহারে শতকরা ৫৭ ভাগ, দক্ষিণ বিহারে শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগ এবং মালভূমি অঞ্চলে শতকরা ৩০ ভাগ জমি কৃষিতে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ বিহারে বৎসরে চারবার ফসল কাটা হয়। শীতকালীন আঘনী ফসলে ধান, ডাল, তৈলবীজ ও ইক্ষু পাওয়া যায়। রবিশস্য হিসাবে গম, ছোলা ও যব প্রধান। ভাদোই ফসলে ভুট্টা, ধান ও পাট উৎপন্ন হয়। উত্তর বিহারে কৃষিভূমির শতকরা ৭০ ভাগই খাদ্যশস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে ধানই প্রধান। ইহা ছাড়া এখানে আখ ও তামাক যথেষ্ট জন্মে। পাটনা, গয়া এবং আরায় ধান ব্যতীত গম, ছোলা, ডাল ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। মুঙ্গের ও ভাগলপুরে ছোলা ও জোয়ার উৎপন্ন হয়। মালভূমিতে ধানের সহিত ছোলা, ভুট্টা, রাগী ও শব্জী লাগানো হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের নানাস্থানে কার্পাসের চাষ হয়। দ্বারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরের আম ও লিচু বিখ্যাত। বিহারে কৃষিযোগ্য ভূমির মধ্যে শতকরা ২৪ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে।

বিহারে গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ২৬৭টি গোরু দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষির কাজে বলদের প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত গ্রামে যাত্রী ও মাল পরিবহণের জন্য বলদের গাড়ি ব্যবহৃত হয়। মৎস্যচাষে বিহার ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

খনিজ পদার্থে বিহার ভারতবর্ষে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের প্রায় শতকরা ৪১ ভাগ খনিজ পদার্থ বিহার হইতে সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে কয়লা, লৌহ, চুণাপাথর, অভ্র, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, চীনামাটি, পোড়ামাটি, বক্সাইট ও কায়নাইট উল্লেখযোগ্য। ভারতের অধিকাংশ তাম্র, শতকরা ৯৪ ভাগ কায়নাইট এবং শতকরা ৫০' ভাগের উপর কয়লা, শতকরা ৮০ ভাগের উপর অভ্র, ও শতকরা ৪০ ভাগ লৌহ বিহারে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বক্সাইট ও চীনামাটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

বিহারের প্রধান কয়লা খনি ঝরিয়াতে অবস্থিত। ইহা ব্যতীত গিরিডি, বোকারো, করণপুরা, রামগড়, পালামৌ, ডাল্‌টনগঞ্জে কয়লা পাওয়া যায়। সর্বত্র কয়লা বিটুমিনাস জাতীয় এবং ঝরিয়ার কয়লা কোকের উপযুক্ত। বিহার ভারতের প্রধান অভ্র উৎস। গয়া, হাজারিবাগ, দক্ষিণ-মুঙ্গের ও দক্ষিণ ভাগলপুরের মধ্য দিয়া ১৪৪ কিলোমিটার প্রসারিত একটি স্তরের মধ্যে অভ্র পাওয়া যায়। বিহারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লৌহ সিংহভূম জেলায় পাওয়া যায়। বিহারের লৌহ উচ্চশ্রেণীর। ভারতের মধ্যে বিহারে সর্বাপেক্ষা বেশি তাম্র পাওয়া যায়। তাম্রস্তর দুয়ারপুরম হইতে তুরান্দি পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ব্যতীত রাখা, মুসাবানী, ধোবানী, গিরিডিতেও তাম্র পাওয়া যায়। বক্সাইট উৎপাদনে বিহার একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। রাঁচি জেলায় লোহারদাগা অঞ্চলে এবং পালামৌ জেলায় প্রধানতঃ বক্সাইট পাওয়া যায়। বিহারে প্রায় ২৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন বক্সাইট আছে। কাইমুর মালভূমিতে প্রধানতঃ চুণাপাথর পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত পালামৌ, হাজারিবাগ, রাঁচি এবং সিংহভূম জেলাও চুণাপাথরের জন্য বিখ্যাত। সিংহভূম, সাঁওতাল পরগনা এবং ভাগলপুরে প্রচুর পরিমাণে চীনামাটি পাওয়া যায়।

বিহারে জলসেচের উদ্দেশ্যে শোন নদীর উপর বৃহৎ

সেচবাঁধ (১৮৭৫ খ্রীঃ) নির্মিত হয়. ইহা প্রায় ৩২০০০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি সিঞ্চিত করে। বর্তমানে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় কয়েকটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁধ ও সেচখাল নির্মাণ করা হইয়াছে। বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি প্রায় সবই ছোটনাগপুর অঞ্চলে দামোদর ও তাহার শাখানদীর উপর অবস্থিত; যথা, তিলাইয়া, মাইথন, পাঞ্চেত, আয়ার, কোনার ইত্যাদি। বোকারো নদীর উপর বোকারোতে তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কোশি, গণ্ডক ও ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচ ও জলজ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জামসেদপুরে টিস্কোর ইস্পাত কারখানা ভারতে ইস্পাতের প্রধান কেন্দ্রস্থল। ভারতের প্রধান নাইট্রোজেন সারের কারখানা বিহারের সিন্ধ্রিতে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও সিমেন্টও তৈয়ারি হয়। মৌভাণ্ডারে তাম্রের কারখানা আছে। ভারী যন্ত্র ও পূর্তাদির (Engineering) কেন্দ্রস্থল হইল রাঁচি। বিভিন্ন প্রকারের লৌহনির্মিত যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, বৈদ্যুতিক মোটর, পেশনের যন্ত্রাদি, কৃষির উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, ঔষধপত্র, রাসায়নিক ও অ্যালুমিনিয়ামের দ্রব্যাদি তৈয়ারি হয়। রাঁচিতে ইহা ব্যতীত কার্পাস ও চীনামাটির শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ধানবাদ, ঝরিয়া শিল্পকেন্দ্রে খনিজ-শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, কাচ ও কৃষিজাত শিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। রামগড় ও ভরকুণ্ডার কাচশিল্প বিখ্যাত। শোন উপত্যকায় ডালমিয়ানগর সিমেন্ট, চিনি, কাগজ এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির কেন্দ্রস্থল। বারৌণীতে তৈল শোধনা-গার স্থাপিত হইয়াছে।

মধ্যম আয়তনের শিল্পকেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ গঙ্গা-নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। এই অঞ্চলে পাটনা প্রধান কেন্দ্র। সাইকেল, কৃষিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কার্পাস ও কৃষিজাত শিল্প এই শহরে গড়িয়া উঠিয়াছে। মজঃফরপুর ও বিহিটাতে চিনির কল রহিয়াছে। কার্পাস ও কাগজ শিল্প ডুমরাঁও-এ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগলপুর লক্ষ্মী-সরাই-এ ভেষজ ঘিয়ের কারখানা আছে। ইহা ব্যতীত রাজ্যে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরে কৃষিভিত্তিক শিল্পকেন্দ্র ও দক্ষিণে বনজ ও খনিজ সম্পদের উপর শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের লোকসংখ্যা ছিল ৪৬৪৫৫৬৯০ জন। কিন্তু উহার বিস্তৃতি ও ঘনত্ব সব জায়গায় সমান নহে। গঙ্গানদীর উভয়কূলে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বাস করে। মালভূমি অঞ্চলে লোকবসতি শতকরা ৩০ ভাগ।

মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগ মাত্র শহরে বাস করে। এক লক্ষ এবং তদূর্ধ্ব লোকসংখ্যা বিশিষ্ট শহরের মধ্যে পাটনা, জামসেদপুর, গয়া, ভাগলপুর এবং রাঁচি উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ বিহারে পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতিদের দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল ব্যতীত ওঁরাও, মুণ্ডা, বীরহোড়, বির্জিয়া প্রভৃতি উপজাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

বিহারে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১৮·২৩ জন। পাটনা ও ধানবাদে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। এখানে বর্তমানে (১৯৬১ খ্রী) পাটনা, বিহার ও রাঁচি এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি গবেষণাকেন্দ্র ও ৫৪টি কলেজ আছে। হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে গঙ্গানদীই ছিল যোগাযোগের প্রধান উপায়। গঙ্গার ঘাটের সহিত কয়েকটি গ্রামের কাঁচারাস্তার যোগ ছিল। শেরশাহ্ ও সম্রাট আকবরের সময়ে কয়েকটি ছোট ও বড় রাস্তা নির্মিত হয়। ইহার মধ্যে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডই প্রধান। ১৭৫০—১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসকদের সময়ে বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর কয়েকটি রেলপথ নির্মিত হয়। ক্রমে রেলপথের উন্নতির জন্য জলপথের প্রাধান্য কমিয়া যায়। রেলপথ গঙ্গানদীকে মুঙ্গের ও মোকামাঘাটে স্পর্শ করিয়াছে। মোকামায় সেতু নির্মাণের ফলে উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের যোগাযোগের সুবিধা হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ব্যতীত আরা ও পাটনায় আরও চারিটি ছোট রেলপথ আছে— ১. আরা-সাসারাম ২. ডিহ্রি-রোটাস ৩. বক্তিয়ারপুর-রাজগীর ৪. ফতোয়া-ইসলামপুর। ছোট রেলপথের মাধ্যমে পচনশীল শব্জী ও ফল গ্রাম হইতে শহরে দ্রুত লওয়ার সুবিধা হইয়াছে।

বিহার প্রদেশের বহুস্থানে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদের নানা তীর্থ আছে; যথা—গয়া, দেওঘর, বুদ্ধগয়া, পরেশ-নাথ, পাবাপুরী। রাজগীরে প্রাচীন মগধ সম্রাটদের রাজ-ধানী ছিল। নালন্দা ৫ম শতক হইতে ১২শ শতক পর্যন্ত জ্ঞানচর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

বিহারের নানাস্থানে নানা মেলা হয়। গয়া জেলার সেলেমপুরের বাসুয়া ও কার্তিক পূর্ণমাসীর মেলা, দেওকান্দের শিবরাত্রির মেলা, সাহাবাদ জেলার বরাহপুর গ্রামের পশুমেলা উল্লেখযোগ্য।

'জামসেদপুর', 'ধানবাদ', 'লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প' ও 'অ্যালুমিনিয়াম' দ্র।

দ্র National Council of Applied Economic Research, *Techno-Economic Survey of Bihar*, New Delhi, 1960; George A. Grierson, *Bihar Peasant Life*, Patna, 1926.

অঞ্জনা রায়চৌধুরী

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—৯৪ খ্রী)। পিতা দীননাথ চক্রবর্তী। 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮ খ্রী) গদ্য-রূপক কাব্যই বিহারীলালের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। ঐ সময়ে 'পূর্ণিমা'

পত্রিকায় (১৮৫৯ খ্রী) তাঁহার গদ্য-পদ্য বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হইত এবং তৎপরে স্বল্পকালস্থায়ী 'সাহিত্য সংক্রান্তি' মাসিকপত্রে এবং প্রসিদ্ধ 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় ১২৭০-৭৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ কয়েকখানি কাব্য অংশতঃ আত্মপ্রকাশ করে। দ্বিতীয় বর্ষের নবম সংখ্যা হইতে বিহারীলাল 'অবোধবন্ধু'-র স্বত্বাধিকারী হন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' হইতে জানা যায় যে, তরুণ বয়সে সেকালের বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থাদি ব্যতীত বিহারীলাল সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ও নাটক, বাইরনের চাইল্ড হ্যারল্ড এবং সেক্সপীয়ারের নাটক উত্তমরূপে পড়িয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সহিত বিহারীলালের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৈশোরপর্বে বিহারীলাল-প্রবর্তিত রোমান্টিক সুরটি তাঁহাদের প্রাণে ধরিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের 'ভোরের পাখি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদে যখন মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কৃত্রিম ক্লাসিক ভঙ্গিই বাংলা কবিতায় প্রধান অনুশীলনের বস্তু ছিল, বিহারীলাল সেই সময়ে বাংলায় বিশুদ্ধ গীতিকবিতার ধারাটি নূতন খাতে বহাইয়া দেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' জীবৎকালে তাঁহার পাঠকসংখ্যার প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু মুষ্টিমেয় কাব্যরসিকের কাছে তিনি ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি'। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঃ স্বপ্নদর্শন (১৮৫৮ খ্রী); সংগীত-শতক (১৮৬২ খ্রী); বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০ খ্রী); নিসর্গসন্দর্শন (১৮৭০ খ্রী); বন্ধুবিয়োগ (১৮৭০ খ্রী); প্রেম-প্রবাহিনী (১৮৭০ খ্রী); সারদামঙ্গল (১৮৭৯ খ্রী)। বিহারীলালের 'সংগীতশতকে' বাংলার নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতি কবির গীতিধারার অনুসৃতি এবং 'বন্ধুবিয়োগে' ঈশ্বরগুপ্তের রীতির প্রতিধ্বনি অনুভূত হয়। কিন্তু অন্যান্য কাব্যগুলিতে নিজস্ব অন্তরঙ্গ অনুভূতির সার্থকতর নিদর্শন রহিয়াছে। প্রকৃতি ও মানবজীবনের অভিব্যক্তিতে তিনি এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। মিস্টিক মনোভঙ্গির বিশিষ্ট প্রবর্তক এবং ঊনবিংশ শতকের আদি-রোমান্টিক কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠা। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য 'সারদামঙ্গল' 'আর্যদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অন্তরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীর বিচিত্র অভিব্যক্তির উপলব্ধিই এই কাব্যের বক্তব্য বিষয়। 'সারদামঙ্গলে' তিনি যে সরস্বতীর বন্দনা করিয়াছেন, তাহার সহিত শেলির *'Hymn to Intellectual Beauty'*-র সাদৃশ্য রহিয়াছে। কবিতায় নিজের সূক্ষ্ম গভীর অনুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া বিহারীলাল রূপক ব্যবহার করিয়াছেন, তবে সর্বত্র তাহা স্পষ্টতা লাভ করে নাই। আর, ছন্দের দিক দিয়া, প্রচলিত ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে তিনি অপূর্ব ধ্বনিবিশিষ্টতা সঞ্চার করিয়াছেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২৫, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

হরপ্রসাদ মিত্র

বিহ্লণ (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) জ্যেষ্ঠকলশ ও নাগদেবীর পুত্র বিহ্লণ স্ব-রচিত 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'-এর সর্বশেষ সর্গে নিজের পরিচয়, স্বদেশের বিবরণ, নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও সাহিত্যকৃতির বর্ণনা দিয়াছেন। কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রবরপুরের নিকটবর্তী কোণমুখ নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম। তিনি ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। মথুরা, কান্যকুব্জ, প্রয়াগ ও বারাণসী ভ্রমণের পরে বিহ্লণ ডাহলের রাজা কৃষ্ণের সভায় অভ্যর্থনা লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যের নানা তীর্থস্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি কল্যাণ নামক স্থানে উপনীত হন। তথাকার রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা ত্রিভুবনমল্ল (১০৭৬—১১২৭ খ্রী) তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' পদে বরণ করেন।

বিহ্লণের নামাঙ্কিত তিনটি গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায়; যথা—'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত', 'কর্ণসুন্দরী' ও চৌরপঞ্চাশিকা'। ইহাদের মধ্যে 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত'-ই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ১৮ সর্গে রচিত এই মহাকাব্যে বিহ্লণ স্বীয় পৃষ্ঠপোষক বিক্রমাদিত্যের জীবনের কতক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যের বিবিধ যুদ্ধ ও বিবাহই এই মহাকাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে চালুক্যবংশের উৎপত্তি ও প্রাচীনতর রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণও আছে। ইহার ঐতিহাসিক তথ্য সাধারণতঃ লেখমালার সাক্ষ্যদ্বারা সমর্থিত।

'কর্ণসুন্দরী' নাটিকা চৌলুক্যরাজ কর্ণদেব ত্রৈলোক্যমল্লের (১০৬৪-৯৪ খ্রী) সহিত এক রাজকুমারীর বিবাহের প্রচ্ছন্ন বিবরণ। 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা 'চৌর'-(চৌরী-) সুরত পঞ্চাশিকা' সাধারণতঃ বিহ্লণের নামে প্রচলিত হইলেও বস্তুতঃ ইহার রচয়িতা অজ্ঞাত। ইহাতে পঞ্চাশটি শ্লোকে গোপন প্রণয় বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালী কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য 'চৌরপঞ্চাশিকা' দ্বারা প্রভাবিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বীজ বীজ কথাটির অর্থ অনেকরকম হইতে পারে। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত অর্থে বীজ হইল সপুষ্পক উদ্ভিদের পূর্ণবর্ধিত ডিম্বক। নিষিক্তকরণের পর ক্রমশঃ ডিম্বক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বীজে পরিণত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বীজ ফলে আবৃত থাকে। তবে বীজহীন ফলও উৎপাদিত হইতে পারে। সকল বীজের মধ্যে অংকুর

নিহিত থাকে। এই অংকুর একটি বা দুইটি বীজাবরণ দ্বারা আবৃত হয়। বিভিন্ন বীজের অংকুর বিভিন্ন আকৃতি এবং প্রকৃতির হয়। সাধারণতঃ প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ বীজের অংকুর নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়, যথা এক বা একাধিক বীজপত্র, ভ্রূণমুকুল এবং বীজপত্রাবকাণ্ড। অনেক বীজে অংকুরের খাদ্য সস্যে (এন্‌ডোস্পার্ম) সঞ্চিত থাকে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বপন করা হইলে বীজ হইতে পরিপূর্ণ উদ্ভিদের জন্ম হয়।

বীজের আরও বিভিন্ন অর্থ আছে। রোগের সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহাকে বলা হয় রোগের বীজ (জার্ম) অর্থাৎ রোগের মূল কারণ। বীজ কথাটি শুক্র বুঝাইতে পারে এবং সন্তানকেও বীজ বলা চলে।

সুশ্বেতা বিশ্বাস

বীজগণিত আরবীয় মনীষী মহম্মদ বেন মুসা আল্ খাওয়ারিজমী প্রণীত গ্রন্থ আল-জেবার ওয়াল্ মোকাবালা (অর্থ ঃ সমীকরণের পক্ষান্তরকরণ ও পদ অপসারণ)-এর নাম হইতেই অ্যালজাব্রা বা বীজগণিত নামের উদ্ভব। পাটীগণিতের তথ্যসমূহের সামন্যীকরণ এবং প্রসারণই বীজগণিতের মূলসূত্র।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও বীজগণিত বা অ্যালজাব্রা নামটিই আজও প্রচলিত। নিউটন উহাকে *Universal Arithmetic* আখ্যা দিয়াছিলেন।

বীজগণিতের প্রাচীনতম গ্রন্থ মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক্‌সে অনুলিখিত (১৭০০ খৃীঃ পূঃ) 'আহমেস প্যাপিরাস' (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত)। বীজগণিতের প্রাথমিক উন্নতিসাধনে ভারতের প্রাচীন গণিতাচার্যেরাই ছিলেন অগ্রণী। দ্বিঘাত সামীকরণের দুই বীজের অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহারা অবহিত ছিলেন। অনির্ণীত সমীকরণসমূহ (Ideterminate equations) এবং তথাকথিত অধুনাতন 'পেল' সমীকরণ (Pell-equation) $cy^2 = ax^2+b$-এর সমাধানের সাধারণ নিয়ম তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন। মূলদ বা অমূলদ সংখ্যা বা রাশিসমূহে পাটীগণিতিক নিয়মাবলী প্রযুক্ত করিয়া প্রাপ্ত বিজ্ঞানকে বীজগণিত বলিলে হান্‌কেলের মতে বীজগণিতের স্রষ্টা আমাদেরই পূর্বপুরুষগণ। ভারতের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বীজগণিতাচার্যের নাম ঃ প্রথম আর্যভট্ট (৪৭৬ খৃী), প্রথম ভাস্করাচার্য (৫২২ খৃী), ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃী), শ্রীধর (৭৫০ খৃী), মহাবীর (৮৫০ খৃী), দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খৃী), দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য (১১৫০ খৃী)। সুপ্রাচীন চীনেও বীজগণিতের প্রভূত চর্চা হইয়াছিল ; সমীকরণের সমাধানে হর্নারের নিয়মের অনুরূপ নিয়মও তাঁহারা জানিতেন। বীজগণিতে গ্রীসের দান অনন্য, কিন্তু প্রাচীন মিশরীয়দের দান ইঁহাদের তুলনায় সীমিত।

বীজগণিতে পাটীগণিতের আলোচ্য নির্দিষ্ট মানের অংকসমূহ ছাড়াও বর্ণমালার অক্ষরসমূহ যথা a, b, c,... কে বদ্ধ বা শুদ্ধ সংখ্যারূপে ব্যবহার করিয়া আলোচ্য বিষয়সমূহকে আরও ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়। পাটীগণিতের আলোচনা শুদ্ধ ধন সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ ; কিন্তু বীজগণিতের সংখ্যা আরও বিস্তৃত ; ঋণসংখ্যা এবং জটিল সংখ্যার আলোচনাও বীজগণিতের অন্তর্গত। a, b, c,...ইত্যাদি সংখ্যা নির্দেশক অক্ষরসমূহ, +, −, ×, ÷, =, >, < ইত্যাদি প্রক্রিয়াসূচক চিহ্নসমূহকে সাধারণভাবে বীজগণিতীয় প্রতীক বলা হয় এবং ইহারা পাটীগণিতের অর্থেই বীজগণিতে প্রযুক্ত হয়। 0 এবং 1-ও পাটীগণিতের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পাটীগণিতের নিয়মে যে প্রশ্নের সমাধান সহজসাধ্য নহে বা অসাধ্য, বীজগণিতের নিয়মে তাহা অতি সহজেই সমাধান করা যায়। বীজগণিতের সার্থকতা এখানেই। বীজগণিতের প্রক্রিয়াসমূহ নিম্নলিখিত নিয়মানুগামী ঃ

	যোগ	গুণ
বিনিময় নিয়ম :	$a+b=b+a$	$ab=ba$
সংযোগ নিয়ম :	$(a+b)+c=a+(b+c)$	$a(bc)=(ab)c$
বিচ্ছেদ নিয়ম :	$a(b+c)=ab+ac$	
ব্যস্ত নিয়ম :	$x+a=o$-এর সমাধান $x=-a$, a-র ব্যস্ত 1	$ax=1, a\neq o$-এর সমাধান $x=a^{-1}=1/a$, a-র ব্যস্ত 1
অভেদাবলী :	$a+o=o+a=a$	$a.1=1.a=a$
অপসারণ নিয়ম :	$ca=cb$, $c\neq o$, হইলে,	$a=b$.

এখানে উল্লেখযোগ্য যে বীজগণিতে ব্যবহৃত সকল সংখ্যাই মানের ক্রম অনুসারে সজ্জিত হইতে পারে না ; (যেমন জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে)।

অবিরত ভগ্নাংশ, অসীম শ্রেণীর অভিসৃতি, ছক্ বা ডিটারমিন্যাণ্ট ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রাথমিক বীজগণিতের অন্তর্গত।

বিমূর্ত বীজগণিত ঃ আধুনিক গণিতের প্রধান বিশেষত্ব পূর্বে প্রাপ্ত গাণিতিক তত্ত্বসমূহের সামান্যীকরণ এবং ব্যাপকতর অর্থে উহাদের প্রয়োগ। বীজগণিতের প্রতীকসমূহকে গাণিতিক উপাদান রূপে কল্পনা এবং উহারা উপরে উল্লিখিত নিয়মসমূহের অনুগামী কিনা তাহার পরীক্ষা, এই দুই কার্যের ফলশ্রুতিই বিমূর্ত বীজগণিত। এই রূপেই বিভিন্ন গাণিতিক পদ্ধতি, যথা সেট, রিং

(বলয়), ফিল্ড (ক্ষেত্র), ইন্টিগ্রাল ডোমেন, (Integral domain), সমষ্টি (Group) ইত্যাদির উদ্ভব। এই সকল পদ্ধতির তাত্ত্বিক ধর্মই বিমূর্ত বীজগণিতের আলোচ্য বিষয়। 'বুলে'র অসাংখ্য বীজগণিত (Non-numerical Algebra), মোরিয়াসের ব্যারিসেণ্ট্রিক ক্যালকুলাস, 'হ্যামিলটনে'র কোয়ার্টারনিয়নস্ (Quarternions), ভেক্টর বীজগণিত ইত্যাদি বিমূর্ত বীজগণিতেরই বিভিন্ন শাখামাত্র।

কতকগুলি গাণিতিক বস্তুর একত্রীকরণে সেটের উৎপত্তি। যেমন কতকগুলি বিন্দুসমবায়ে বিন্দুসেট, আবার কতকগুলি ধনসংখ্যার সমবায়ে ধনসংখ্যার সেট উৎপন্ন হয়। মনে করি, কোনও সেট D-এর উপাদানসমূহ a, b, c,... এবং 0 ও 1; আর ইহাতে + ও × প্রক্রিয়াদ্বয় সংজ্ঞায়িত। যদি Dতে (১) $a+b$, ab একইভাবে উৎপন্ন হয় এবং সংযোগ নিয়ম, বিচ্ছেদ নিয়ম ও বিনিময় নিয়ম সিদ্ধ হয়; (২) $a+x = 0$-এর সমাধান $x=-a$ একটি উপাদান রূপে বিদ্যমান হয় এবং (৩) অপসারণ নিয়ম সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে D-কে বলা হয় ইন্টিগ্রাল ডোমেন। সমস্ত বাস্তব সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, মূলদ সংখ্যার সেটসমূহ এক-একটি ইন্টিগ্রাল ডোমেন। D, এই ইন্টিগ্রাল ডোমেনে aর ($a \neq 0$) ব্যস্ত উপাদান a^{-1} থাকিলে উহাকে বলা হয় ক্ষেত্র (Field)। + ও × প্রক্রিয়াসংবলিত কোনও সেটে যদি বিনিময়, সংযোগ ও বিচ্ছেদ নিয়ম সিদ্ধ হয় এবং $a+0=a$ ও $a+(-a)=0$ হয়, তাহা হইলে ঐ সেটটিকে বিনিময় বলয় (Commutative Ring) বলে। বলয়ের ক্ষেত্রে গুণের বিনিময় নিয়ম সিদ্ধ নাও হইতে পারে। সেটটিতে মাত্র + প্রক্রিয়া থাকিলে এবং উহার উপাদানসমূহ যোগসম্পর্কীয় বিনিময় নিয়ম, সংযোগ নিয়ম ও ব্যস্ত নিয়ম সিদ্ধ করিলে আমরা পাই মডিউল (Module)।

দুইটি সেটের প্রতিষঙ্গ (Correspondence) নির্ণয় করিয়া একের ধর্ম হইতে অপরের ধর্ম নিরূপণ বিমূর্ত বীজগণিতের একটি বিশেষত্ব এবং এই নিমিত্ত বিশেষ তিনটি প্রক্রিয়া ১. সমানাকৃতিত্ব (Homomorphism), ২. সমাকৃতিত্ব (Isomorphism) এবং ৩. স্বতঃকৃতিত্ব (Automorphism) প্রশস্ত।

সেট তত্ত্ব ঃ স্বাধীন চলরাশি এবং অপেক্ষকের সম্যক ধারণা নির্ণয়ের চেষ্টার ফল সেট তত্ত্ব। সেট তত্ত্বের জন্মদাতা জর্জ ক্যাণ্টর এবং ইহা জর্দাঁ, লেবেগ, বোরেল, আস্কোলি, ইয়ং (W. H. এবং G. C. Young) প্রভৃতি মনীষীদের গবেষণাসমৃদ্ধ। গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সেট তত্ত্ব প্রযুক্ত হইয়া নানা রহস্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করিতেছে। নিম্নে সেট বীজগণিতের মূল তথ্য বর্ণিত হইল।

A, B, C,..., X, Y, Z.... দ্বারা বিভিন্ন সেট নির্দিষ্ট হইলে ঃ

১. $A \subseteq B$ অথবা $B \supseteq A$ দ্বারা B,A-র ধারক (অর্থাৎ A-র উপাদানসমূহ B-র অন্তর্গত) এইরূপ বোঝানো হয়। সেটের $\subseteq$ এবং $\supseteq$ চিহ্নদ্বয় আর পাটীগণিতের $\leqslant$ এবং $\geqslant$ সমজাতীয়।

২. $A \cap B$ (A এবং B-র ছেদক) দ্বারা যে সেটের উপাদানসমূহ A ও B উভয়ের অন্তর্গত তাহা বোঝানো হয়।

৩. $A \cup B$ (A এবং B-র সংযোগ) দ্বারা যে সেট A-র, B-র অথবা A ও B উভয়ের উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত তাহা বোঝানো হয়।

$\cap$ এবং $\cup$ প্রক্রিয়াদ্বয় যথাক্রমে পাটীগণিতের গুণ ও যোগ প্রক্রিয়ার অনুরূপ এবং ইংরেজীর Cap ও Cup-এর অনুকরণে ইহাদের 'টুপি' ও 'টাটি' বলিয়া অভিহিত করা যায়।

৪. অভেদ নিয়ম : $x \cap x = x$; $x \cup x = x$

৫. বিনিময় নিয়ম : $x \cap y = y \cap x$; $x \cup y = y \cup x$.

৬. সংযোগ নিয়ম : $x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z$; $x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z$.

৭. বিচ্ছেদ নিয়ম : $x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z)$; $x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z)$.

যে সেটের সকল উপাদান 0, তাহা শূন্য সেট এবং উহা 0 দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। 0 সেটের ক্ষেত্রে $0 \cap X = 0$ এবং $0 \cup X = X$ হয়।

Z সেটটি Y-এর পরিপ্রেক্ষিতে X-এর পূরক বলা হইবে তখনই যখন Y, X ও Z উভয়েরই ধারক হইবে কিন্তু X, Z-এর ধারক হইবে না। Z-কে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ X′ এই চিহ্ন দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। পূরক সেটে প্রযুক্ত নিয়মসমূহ নিম্নরূপ ঃ

$$x \cap x' = 0;\ x \cup x' = y;\ (x \cap A)' = x' \cup A';\ (x \cup A)' = x' \cap A';\ (x')' = x.$$

পূরক সেট আর পাটীগণিতের বিয়োগফল তুলনীয়।

বুলিয়ান বীজগণিত আর ল্যাটিস তত্ত্ব সেটতত্ত্বেরই সামান্যীকৃত রূপ।

সমষ্টিতত্ত্ব ঃ যে গাণিতিক পন্থায় কোনও সেটের যে কোনও দুইটি উপাদান যুক্ত হইয়া মাত্র একইভাবে উহার তৃতীয় উপাদান নির্ণীত হয়, তাহাকেই সেটটির 'যোজনা প্রক্রিয়া' (Binary operation) বলে। যেমন পাটীগণিতের +, × প্রভৃতি প্রক্রিয়া। সুতরাং কোনও সেট G-র উপাদানসমূহ a, b. c,... এবং যোজনা প্রক্রিয়া 'o' হইলে মাত্র একইভাবে $a_0 b = c$ হইবে। সাধারণতঃ $a_0 b \neq b_0 a$. G-এর একক উপাদান বা অভেদ e দ্বারা

নির্দিষ্ট হইল। এক্ষণে যদি G-র উপাদানসমূহ ১. সংযোগ নিয়মঃ $a_0(b_0c) = (a_0b)_0c$, প্রত্যেক a, b, c-র জন্য ; ২. অভেদ নিয়ম ঃ $a_0 e = e_0 a = a$, প্রত্যেক a-র জন্য ; ৩. ব্যস্ত নিয়ম ঃ $a_0 a^{-1} = a_0^{-1} a = e$, ($a_0^{-1}$a-র ব্যস্ত) প্রত্যেক a এবং কিছু a^{-1}-র জন্য—এই তিনটি নিয়মানুগ হয়, তাহা হইলেই G-কে বলা হয় সমষ্টি বা Group। সীমিতসংখ্যক উপাদান দ্বারা গঠিত সমষ্টিকে সসীম সমষ্টি বলা হয় এবং উপাদানসমূহের সংখ্যা দ্বারা উহার ক্রম নির্ধারিত হয়। সমষ্টি অবিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন অথবা অসীমও হইতে পারে। সমষ্টিতে বিনিময় নিয়ম সিদ্ধ নাও হইতে পারে। বিনিময় নিয়ম সিদ্ধ হইলে সমষ্টিকে বলা হয় আবেলিয় সমষ্টি (Abelian Group)।

যোজনা প্রক্রিয়াটি + হইলে সমস্ত বাস্তব সংখ্যাদ্বারা একটি সমষ্টি সৃষ্টি হয়; আর উহা × হইলে পাই 0 ছাড়া সমস্ত বাস্তব সংখ্যার সমষ্টি। জ্যামিতির প্রতিসমতা (Symmetry), পরিবর্ত (Transformation) ইত্যাদি, n সংখ্যক সংখ্যার বিন্যাস, ত্রিমাত্রিক স্থানে অবস্থিত বিন্দুসমূহের গতি প্রভৃতি এক-একটি সমষ্টির উদাহরণ।

ফলিত ও বিশুদ্ধ গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পদার্থবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমষ্টি তত্ত্বের প্রভূত প্রয়োগ।

সমষ্টিতত্ত্বের উদ্ভবের উৎস তিনটি ঃ ১. বীজগণিতের সমীকরণ তত্ত্ব; ২. সংখ্যাতত্ত্ব; ৩. জ্যামিতিক তত্ত্ব। প্রাক-১৮৩৫ যুগে লাগ্রাঁজ, রুফিনি, আবেল, গ্যালোয়া-র সমীকরণ সম্পর্কীয় গবেষণায় এবং অয়লার ও গাউসের সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কীয় গবেষণায় সমষ্টিতত্ত্বের বীজ নিহিত। সমষ্টির বীজগণিতীয় তত্ত্বের উদ্ভাবক রুফিনি, যদিও 'সমষ্টি', এই শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেন গ্যালোয়া। জ্যামিতির দিক হইতে বিচার করিলে সমষ্টিতত্ত্বের ভাবনা ইউক্লিডের প্রমাণাদির মধ্যেই নিহিত। সীমিত সমষ্টি-তত্ত্বের ভিত্তি কসির (A. L. Cauchy) ১৮৪৪-৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত গবেষণা নিবন্ধসমূহ। বিমূর্ত সমষ্টি-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা কেলি (Cayley) এবং উহা সিল্‌ভেস্টার, ক্রনেকার, ফ্রবেনিয়াস প্রভৃতি গাণিতিকগণের গবেষণায় সমৃদ্ধ। সমষ্টিতত্ত্বের সামান্যীকরণেই 'লি'-র অবিচ্ছিন্ন সমষ্টিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। ফেলিক্‌স ক্লাইন সসীম ক্রমের রৈখিক সমষ্টিতত্ত্বের স্রষ্টা। সমষ্টিতত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া এক নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে জ্যামিতির পাঠের সূচনা তাঁহারই অবদান।

দ্র F. Cajori, *A History of Mathematics*, New York, 1919; G. Birkhoff & S. McLane, *A Survey of Modern Algebra*, New York, 1948; K. Kuratowski, *Introduction to Set Theory and Topology*, New York, 1961.

নলিনীকান্ত চক্রবর্তী

বীজপত্র সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজের অভ্যন্তরে বীজ-পত্র থাকে। যে সকল উদ্ভিদের বীজে দুইটি বীজপত্র থাকে তাহাদের দ্বিবীজপত্রী এবং যাহাদের বীজে মাত্র একটি বীজপত্র থাকে তাহাদের একবীজপত্রী বলা হয়। ছোলা, মটর প্রভৃতি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের গোলাকার ও স্ফীতকায় বীজপত্রে খাদ্য সঞ্চিত থাকে। অংকুরোদ্‌গমের সময়ে শিশু উদ্ভিদটি বীজপত্র হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া বাড়িতে থাকে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজপত্রে যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকে না। এই সকল বীজপত্র অংকু-রোদ্‌গমের সময়ে মাটির উপর উঠিয়া হরিৎবর্ণ ধারণ করে এবং পত্রের ন্যায় সালোকসংশ্লেষ দ্বারা শিশু উদ্ভিদটিকে খাদ্য সরবরাহ করিয়া থাকে। সরিষা, তিসি, তিল, চীনা-বাদাম প্রভৃতি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজপত্রে তৈলজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত থাকে। রেড়ির বীজপত্র কাগজের মত পাতলা। বীজের তৈলজাতীয় খাদ্য সস্যে (এন্‌ডোস্পার্ম) সঞ্চিত থাকে। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভি-দের বীজপত্র অতি ক্ষুদ্র, ইহাকে 'স্কুটেলাম' বলা হয়। এই সকল বীজেও সস্যের মধ্যে খাদ্য জমা হইয়া থাকে। নারিকেলের বীজপত্রটিও ক্ষুদ্র। কিন্তু অংকুরোদ্‌গমের সময়ে ইহা স্ফীত হইতে থাকে এবং শাদা, গোল স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। ইহা খাইতে সুস্বাদু। পাইন প্রভৃতি ব্যক্তবীজী উদ্ভিদে তিন বা ততোধিক বীজপত্র থাকে।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

বীট পালং-গোত্রের (ফ্যামিলি-খেনোপোদিয়াসিঈ, chenopodiaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী সরস বীরুৎ-জাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম বেতা ভল্‌গারিস (Beta Vulgaris)। বন্য বীটের বিজ্ঞানসম্মত নাম বেতা মেরিতিমা (Beta meritima)। স্বাভাবিক জন্মস্থান ছিল দক্ষিণ ইওরোপের সমুদ্রোপকূলে এবং ইহার সবুজ পাতা মানুষের আহার্য ছিল। পরে বিজ্ঞানসম্মত নির্বাচনের সাহায্যে ইহা হইতে বেতা ভল্‌গারিস প্রজাতির বীট উৎপন্ন হইয়াছে। নানা জাতের বীটের চাষ সুপ্রচলিত, তন্মধ্যে ইজিপ্সিয়ান, হাফ্‌লং ব্লাড, সাটন গাঢ় লাল, ব্লাড রেড ও গ্লোব সুপরিচিত।

সকল জমিতে বীটের চাষ হইতে পারে, তবে উত্তমরূপে কর্ষিত দো-আঁশ জমিতে চাষ ভাল হয়। সাধারণতঃ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে ইহার বীজ বপন করা হয় ; উত্তর ভারতে শীতকালে ও অন্যত্র সারা বৎসর চাষ করা চলে। ৩ মাসের মধ্যে আহারোপযোগী মূল উৎপন্ন হয়।

বীট সাধারণতঃ দ্বিবর্ষজীবী। প্রথম বর্ষে একটি বৃহৎ স্ফীত মূল ও অনেক পাতা জন্মায় ; দ্বিতীয় বর্ষে ফুল ও বীজ উৎপন্ন হয়। মূলটি শালগমাকার, সাধারণতঃ গাঢ় রক্তবর্ণ, কখনও কখনও শ্বেতবর্ণ বা গোলাপী। বীট

অপুষ্পক্রম উদ্ভিদ ; ইহার উভলিঙ্গ পুষ্পে দল বা বৃত্যংশ নাই, পুষ্পপুট (পেরিহানথ্) হরিৎবর্ণ।

বীটের মূলে শতকরা প্রায় ৮৩·৮ ভাগ জল, ১৩·৬ ভাগ কার্বোহাইড্রেট, ১·৭ ভাগ প্রোটিন, ০·১ ভাগ স্নেহ-পদার্থ ও ০·৮ ভাগ অজৈব লবণ বর্তমান ; এতদ্ব্যতীত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন বি এবং সি থাকে। বীটের কার্বোহাইড্রেট মুখ্যতঃ সুক্রোজ বা ইক্ষুশর্করা। বীটের মূল নিষ্কাশন করিয়া চিনি উৎপাদন করা হয় ; প্রতি ১০০ মেট্রিক টন বীট হইতে প্রায় ১৮ মেট্রিক টন চিনি পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এজন্য বীট চাষ হইয়া থাকে।

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

বীণা শাস্ত্রানুসারে ৩৩ জাতীয় অর্থাৎ তারের যন্ত্রমাত্রই বীণার পর্যায়ে পড়ে। তথাপি বীণা লাউনির্মিত শব্দ-প্রকোষ্ঠের সহিত সরু, লম্বা বাদনদণ্ডযুক্ত Lute-জাতীয় একটি বিশেষ যন্ত্র হিসাবেই স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগের উদুম্বর বীণ নামক বীণা হার্পের (HARP) আকৃতিবিশিষ্ট ছিল এবং ইহাতে একশত তন্ত্রী যোজিত হইত। এতদ্ব্যতীত কাণ্ডবীণা, অলাবুবীণা, মহাবীণা, শীলবীণা প্রভৃতি বৈদিক যুগে ব্যবহৃত কয়েকটি বীণার নাম পাওয়া যায়। পরবর্তী আর্যযুগে চিত্রা, বিপঞ্চী, কচ্ছপী, ঘোষক প্রভৃতি বীণা প্রাধান্যলাভ করে। মধ্যযুগে বাংলায় সপ্তস্বরা, স্বরমণ্ডল, রুদ্র, কপিলাস, মধুস্রবা, যন্ত্র প্রভৃতি বীণা বাদিত হইত। স্বরমণ্ডল lyre-এর আকৃতি-বিশিষ্ট এবং ইহা এখনও কণ্ঠসংগীতের সহকারী যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে বীণার প্রচলন সমধিক। উত্তর ভারতে বীণাবাদন কয়েকটি ঘরানার মধ্যে প্রচলিত আছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বীম্‌স, জন (১৮৩৭—১৯০২ খ্রী) ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুন ইংল্যাণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস'-ভুক্ত কর্মচারীরূপে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। দুই বৎসরকাল পাঞ্জাব প্রদেশে কর্মরত থাকার পর তিনি ১৮৬১ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি'র নানা স্থানে নানা উচ্চ পদে যোগ্যতার সহিত কর্ম করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে পরলোক গমন করেন।

ছাত্রাবস্থায় স্বদেশেই বীম্‌স সংস্কৃত ও কয়েকটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতে বাসকালে সংস্কৃত ও প্রধান প্রধান কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় বীম্‌স প্রচুর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং এই ভাষাগুলির গতি প্রকৃতি ও ব্যাকরণগত পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তমরূপে অনু-ধাবন করেন। এই অধ্যয়ন ও চর্চার ফলস্বরূপে তিনি ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক ব্যাকরণ-বিষয়ক আলো-চনার অন্যতম পথিকৃৎ রূপে অনেকগুলি মৌলিক গবেষণা-মূলক মূল্যবান প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেন। কলিকাতা ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সহিত বীম্‌সের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বীম্‌স-রচিত নিম্ন-লিখিত পুস্তকগুলির নাম উল্লেখযোগ্য : *Outlines of Indian Philology*, Calcutta, 1867; *A Comparative Grammar of the Aryan Languages of India*, 3 Vols, (1872—79, New Edn., Delhi, 1966) ; *A Grammar of the Bengali Language, Literary and Colloquial*, Oxford, 1894.

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীর ভারতবিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫ ; John Beames, *Memoirs of a Bengal Civilian*, London, 1961.

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বীমা বীমাব্যবসায়। বীমাচুক্তির অর্থ বীমাদার ও বীমাকারী নামে পরিচিত দুই পক্ষের মধ্যে এমন একটি চুক্তি যাহাতে বীমাকারীর প্রদত্ত ও প্রদেয় অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্য বা বীমাশুল্কের (প্রিমিয়াম) বিনিময়ে কোনও নির্দিষ্ট প্রকৃতির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ঘটনার ফলে তাহার বিত্তনাশ, আয়হ্রাস বা ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে বীমাদার ঐ ক্ষতির সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিপূরণের জন্য প্রতিশ্রুত হয়। অবিমিশ্র কালাত্যয়ী বীমায় (Pure Endowment Assurance) বীমাকারীর নির্দিষ্ট আয়ুষ্কালপ্রাপ্তি ঘটিলে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদেয় হয়। এ স্থলে ঘটনাটি অনিশ্চিত ও ভবিষ্যৎ বটে; কিন্তু অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা নহে। আয়হ্রাস অথবা পুত্রকন্যার বিবাহাদির জন্য ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে এবং তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য লোকে এই জাতীয় বীমাপত্র গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে আমৃত্যু জীবন বীমায় (Whole Life Assurance) মৃত্যু অবাঞ্ছিত কিন্তু নিশ্চিত ঘটনা যদিও ঘটনাকাল অনিশ্চিত। তাহার মৃত্যুতে তাহার স্থলবর্তী পরিজনবর্গের আয়হ্রাস ঘটে এবং বীমার সাহায্যে উহার কথঞ্চিৎ পরিপূরণ হয়। বীমাশুল্ক বৎসরে একবার অর্থাৎ বাৎসরিক, কিংবা ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক প্রদেয় হইয়া থাকে, অথবা আরম্ভে একবার মাত্র সকৃৎশুল্ক (Single premium) রূপে প্রদত্ত হয়।

বীমার বিভিন্ন বিভাগ : বীমার প্রধান বিভাগ দুইটি—জীবনবীমা ও জীবনেতর বা সাধারণ বীমা। সাধারণ বীমার প্রধান ও প্রাচীন দুইটি বিভাগ নৌবীমা ও অগ্নি-বীমা ; এতদ্ব্যতীত দুর্ঘটনা বীমা বা বিবিধ বীমা অসংখ্য শাখায় অসংখ্য আকারে প্রচলিত থাকিয়া জীবনযাত্রার

বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাইতেছে। শারীরিক দুর্ঘটনা (Personal Accident), সাধুতা প্রতিভূত্ব (Fidelity Guarantee), চৌর্যবীমা (Burglary Insurance), ফসলবীমা (Crop Insurance) প্রভৃতি বীমার প্রকৃতি ও প্রয়োজন নাম হইতেই প্রতীয়মান হয়। মোটরগাড়ি বীমা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বীমা না করিয়া মোটরগাড়ি রাস্তায় বাহির করা নিষিদ্ধ। কারণ রাস্তায় ঐ গাড়িতে চাপা পড়িয়া কাহারও অংগহানি বা মৃত্যু ঘটিলে সেজন্য আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ করিবার মত অর্থসংগতি বীমাহীন গাড়ির মালিকের না থাকা বিচিত্র নহে।

জীবন ও জীবনেতর বীমার মৌলিক পার্থক্য এই যে জীবনবীমায় 'ক্ষতিপূরণ নীতি' প্রতিপালিত হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন নিজের ও পরিজনবর্গের নিকট অমূল্য, ভিক্ষুককল্প লোকের জীবনের উপর লক্ষ টাকার বীমা করা অবৈধ নহে। পক্ষান্তরে সাধারণ বীমার 'ক্ষতি-পূরণ নীতি' কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। পর্ণকুটিরের উপর লক্ষ টাকার বীমা করা চলে না; করিলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত কুটিরের জন্য লক্ষ টাকা দাবি করা যায় না; উপযুক্ত মূল্য হয়ত হাজার দেড় হাজার টাকা, তাহার অধিক বীমাদারের নিকট হইতে আদায় হয় না। জীবন ও জীবনেতর বীমার এই মৌলিক পার্থক্যের কারণ এই যে, সুস্থমস্তিষ্ক কোনও লোক বীমাদারকে লক্ষ টাকা বা কোটি টাকা পরিমাণ প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণনাশ করে না, কিন্তু নিজের অল্পমূল্যের সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ করিয়া বা অন্যপ্রকারে ধ্বংস করিয়া বীমাদারের নিকট প্রভূত ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, এমন বীমাকারীর সংখ্যা বিরল নহে।

বৈধ ও অবৈধ বীমা: উন্মাদ বা নাবালকের সংগে বীমা-চুক্তি, অথবা মিথ্যা উক্তি ও অন্যপ্রকার প্রবঞ্চনার সাহায্যে সম্পাদিত চুক্তি অবৈধ। প্রবঞ্চিত পক্ষ প্রবঞ্চনা প্রকাশ পাইবার সংগে সংগে ঐ চুক্তি ভাঙিয়া দিতে পারে ও প্রতারকপক্ষ ঐ বীমা হইতে কোনও উপকার পাইয়া থাকিলে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং কোনও উপকার পাইয়া থাকিলে সে জন্য কোনও ক্ষতি-পূরণ করিতে বাধ্য নহে। বীমার প্রস্তাবপত্রে ও ডাক্তারের সাক্ষাতে লিপিবদ্ধ প্রস্তবকারীর উক্তিপত্রে অনেক সময় অসত্য বা অপূর্ণ সত্য থাকিয়া যায় এবং বীমাকারীর মৃত্যুর পর দাবিপূরণের পূর্বে বীমাদারের নিযুক্ত অনুসন্ধানকারীর নিকট প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে বীমাদার চুক্তি ভাঙিয়া দেয় ও দাবিপূরণে অসম্মত হয়।

সাধারণ চুক্তি অপেক্ষা বীমাচুক্তি এক বিষয়ে বীমাকারীর প্রতি অনেক বেশি কঠোর। সাধারণ চুক্তিতে 'অকাপট্য নীতি' প্রতিপালিত হয় কিন্তু বীমাচুক্তিতে চাই 'চরম অকাপট্য নীতি' (utmost good faith)। জিজ্ঞাসিত হউক আর না হউক, বীমার প্রস্তাবকারী স্বেচ্ছায় নিজ শরীর, স্বাস্থ্য ও পরিবারস্থ সকলের জন্ম, মৃত্যু, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে সমুদয় প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পূর্ণ অকপটে প্রকাশ করিবে। অধিকাংশ বীমাদার ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে, প্রস্তাবপত্রের অন্তর্গত ব্যক্তিগত ঘোষণাপত্রে (Personal Declaration Form) ইহাও মুদ্রিত করিয়া রাখে যে ঘোষণাপত্রে প্রকাশিত উক্তিসমূহ 'সরলোক্তি' মাত্র নহে, পরন্তু 'অনাবিল তথ্যপ্রকাশ' (warranty) বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রয়োজনীয় বা অকিঞ্চিৎকর কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার মিথ্যা ভাষণ বা সত্যগোপন থাকিলে বীমাপত্র অসিদ্ধ্যর্হ (voidable) হইবে। বিলাতি বীমাবিষয়ক আইন বীমাকারীর প্রতি এইরূপ কঠোরই বটে, যদিও অন্যান্য অনেক কঠোর আইনের মত এই আইনও প্রয়োগকালে বিলাতে সহনীয় মাত্রা অতিক্রম করে না। কানাডা প্রভৃতি দেশে বিলাতী এই আইন কিয়ৎপরিমাণে শিথিল করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে জীবনেতর বীমায় সর্বত্র; এবং জীবনবীমায় চুক্তিসম্পাদনের পর দুই বৎসর পর্যন্ত এই আইন প্রযোজ্য। তৃতীয় বৎসর হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বীমা আইনের ৪৫ ধারা অনুসারে চুক্তির বলবত্তা বা ব্যর্থতা নিরূপিত হয়। চুক্তি ব্যর্থ করিতে হইলে বীমাদারকে প্রমাণ করিতে হইবে যে প্রথমতঃ যে বিষয়ে মিথ্যাপ্রকাশ বা সত্য গোপন করা হইয়াছে, তাহা একটি অত্যাবশ্যক তথ্য, দ্বিতীয়তঃ প্রতারণাই প্রস্তাবকারীর উদ্দেশ্য ছিল, তৃতীয়তঃ মিথ্যা-প্রকাশকালে প্রস্তাবকারী জানিত যে উক্তিটি মিথ্যা অথবা সত্যগোপন স্থলে তাহার জানা ছিল যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সত্যপ্রকাশ অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। এ বিষয়ে এতদপেক্ষা উদার অথচ সুসংগত বিধি আর হইতে পারে না।

বীমাযোগ্য স্বার্থ: পূর্ববর্ণিত 'ক্ষতিপূরণ নীতি' অনুসারে বীমাকৃত বিষয়ে বীমাকারীর স্বত্ব, স্বামিত্ব বা অন্য কোনও প্রকার স্বার্থ বিদ্যমান থাকা আবশ্যক, অন্যথা আশংকিত ঘটনা সংঘটিত হইলে বীমাকারীর বিত্তনাশ, আয়হ্রাস বা ব্যয়বৃদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বীমার সিদ্ধতার জন্য বীমাকারীর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। কোনও অট্টালিকার অগ্নিবীমা করিবার অধিকারী হইতে পারে উহার মালিক, অথবা ভাড়াটিয়া অথবা ঐ অট্টালিকায় যাহার বা যাহাদের কোনও পণ্যদ্রব্য বা মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষিত আছে এমন লোক। কিন্তু ইহাদের সকলের স্বার্থের পরিমাণ সমান নহে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে অট্টালিকাখানি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইলে যাহার যে পরিমাণ ক্ষতি আশংকা করা যায়, সে সেই পরিমাণেই অগ্নিবীমা করিতে পারে।

বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকিলে বীমাচুক্তি অসিদ্ধ। সর্বপ্রকার বীমায় চুক্তিসম্পাদনকালে বীমাকৃত বিষয়ে

বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক, কিন্তু নৌবীমায় বিঘটনাকালে এইরূপ স্বার্থ থাকিলেই যথেষ্ট। এইরূপ পৃথক বিধানের কারণ এই যে নৌবীমায় জাহাজ সমুদ্র-যাত্রা করিলে জাহাজের মালিক, বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের বিভিন্ন মালিক ও অন্যান্য বহুলোকের বহুপ্রকার স্বার্থের ভিন্ন ভিন্ন বীমাচুক্তি হয়; যাত্রা শেষ হইবার পূর্বে বহুক্ষেত্রে একই স্বার্থ বারংবার হস্তান্তরিত হয়, কিন্তু এই হস্তান্তর কার্য দলিলপত্রাদিদ্বারা আইনতঃ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই বিঘটনার ফলে বীমাকৃত বিষয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে বীমাচুক্তি টেলিগ্রাম প্রভৃতির সাহায্যে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হস্তান্তরিত হয়। ইহার ফলে দাবিপূরণ সম্বন্ধে নানাবিধ জটিল আইনগত সমস্যা উপস্থিত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্যই বস্তু-নাশকালে বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান থাকাই যথেষ্ট এই-রূপ বিধান করা হইয়াছে।

জীবনবীমায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ জীবনের উপর সীমাহীন স্বার্থ আছে, সুতরাং এই বীমার স্বজীবন বীমাবিষয়ে বীমাযোগ্য স্বামিত্বের প্রশ্ন অবান্তর। সমস্যা উপস্থিত হয় অন্যের জীবনের উপর জীবনবীমা করা সম্পর্কে। যাহার জীবনের উপর বীমা করা হইতেছে, তাহার মৃত্যুতে বীমাকারীর অর্থনাশাদি হওয়া আবশ্যক এবং বীমার পরিমাণও আশঙ্কিত ক্ষতির অধিক হইতে পারিবে না। পিতাপুত্রে বা ভ্রাতাভগিনীদের মধ্যে এক-জনের জীবনের উপর অন্যের বীমাযোগ্য স্বার্থ নাই, কারণ উপর্জনশীল পুত্র বা ভ্রাতা, পিতা বা অন্য ভ্রাতা বা ভগিনীর ভরণপোষণ করিতে আইনতঃ বাধ্য নহে। এক-মাত্র স্বামীস্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কজনিত বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে; স্ত্রী নিজ অর্থে এবং নিজ স্বার্থে স্বামীর জীবনের উপর বীমাচুক্তি করিতে পারে, স্বামীরও স্ত্রীর জীবনের সম্পর্কে অনুরূপ অধিকার আছে।

কখনও কখনও অন্যের জীবনের উপর বীমা করিয়া লাভবান হইবার আশায় দুষ্ট লোকে নিঃসম্পর্ক লোকের জীবনবীমা করাইয়া লয়, বীমাদারকে বুঝাইয়া দেয়, বীমা-কৃত জীবন ও প্রকৃত বীমাকারী এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। অল্পদিন পরে ঐ দুষ্ট লোক নিজ নামে বীমাপত্রখানি হস্তান্তরিত (assign) করাইয়া লয়। বলা বাহুল্য, এই রূপ বীমা আইনতঃ অচল, এবং ধরা পড়িলে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

জীবনবীমার গণনা পদ্ধতি ঃ ১. জীবনবীমায় বীমা-দারের সঞ্চিত কুসীদলব্ধ অর্থসমেত প্রায় সমস্ত অর্থ সর্বদা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লগ্নী থাকে, যৎকিঞ্চিৎ অংশ ব্যতীত কিছুই বিনা আয়ে মজুত অবস্থায় পড়িয়া থাকে না। এই জন্য জীবনবীমায় সর্বদা চক্রবৃদ্ধিক্রমে সুদ গণনা করা হয়। কার্যের সুবিধার জন্য প্রথমে সুদ গণনা করিয়া পরে আসলের সঙ্গে যোগ দিয়া দ্বিতীয় বৎসরের সুদ নির্ণয় করার পরিবর্তে একসঙ্গেই দ্বিতীয় বৎসরের মূল-ধন অর্থাৎ সুদ ও আসলের যুক্ত অঙ্ক বাহির করা হয়। ইহার উদাহরণ, ৫% হারে সুদ হইলে ১·০৫ দিয়া মূল-ধনকে গুণন করিলে দ্বিতীয় বৎসরারম্ভের মূলধন পাওয়া যায়; গুণফলকে পুনরায় ১·০৫ দিয়া গুণন করিলে তৃতীয় বৎসরারম্ভের মূলধন বাহির হয়। এইরূপে যে কোনও সময়ের মূলধন নির্ণয় করা হয়। আবার বিপরীত প্রক্রিয়াকালে অর্থাৎ কত টাকা মূলধন হইতে সুদে-আসলে এত টাকা হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ১·০৫ দিয়া ভাগ করিলেই হইল। ভাগফলকে পুনর্বার ১·০৫ দিয়া ভাগ করিলে দুই বৎসর পূর্বের মূলধন এবং বারংবার ১·০৫ দিয়া ভাগ করিলে যে কোনও ঈপ্সিত পূর্বকালীন মূলধন নির্ণীত হয়।

২. (ক) সকৃৎশুল্ক নির্ধারণ ঃ প্রথমে একটি উপযুক্ত মৃত্যুতালিকা মনোনীত করিতে অথবা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে 'ওরিয়েন্টাল (১৯২৫-৩৫) অন্ত্য' (Oriental 1925-35 ultimate) তালিকা ব্যবহার করা হইতেছে। বৎসরারম্ভের কোনও বয়সের জীবিত লোকসংখ্যাকে ঐ তালিকানুযায়ী মৃত্যুহার দিয়া গুণন করিলে ঐ বয়সের মৃত্যুসংখ্যা পাওয়া যায়। আরম্ভের লোকসংখ্যা হইতে ঐ মৃত্যুসংখ্যা বিয়োগ করিলে পরবর্তী বয়স আরম্ভের লোকসংখ্যা জানা যায়। এইরূপে মনো-নীত বয়সের উর্ধ্বস্থ যে কোনও বয়সের মৃত্যুসংখ্যা ও জীবিতসংখ্যা সহজলভ্য হয়। এক লক্ষ ৫৫ বৎসর বয়স্ক বীমাকারী লইয়া আরম্ভ করিয়া এইরূপে গণিত মৃত্যু-সংখ্যা যথাক্রমে (৫৫) ২৯০৩, (৫৬) ৩০৬২, (৫৭) ৩২১৬, (৫৮) ৩৩৫৮ এবং (৫৯) ৩৪৮৫ এবং ঐ সকল বয়সের আরম্ভকালীন লোকসংখ্যা (৫৫) ১০০০০০, (৫৬) ৯৭০৯৭, (৫৭) ৯৪০৩৫, (৫৮) ৯০৮১৯, (৫৯) ৮৭৪৬১, (৬০) ৮৩৯৭৬। এক্ষণে ৫৫ বৎসর বয়সের পঞ্চবার্ষিক কালাত্যয়ী বীমার (Endowment Assurance) সকৃৎশুল্ক নির্ণয় করিবার জন্য একলক্ষ লোকের প্রত্যেকের এক হাজার টাকার বীমা লইয়া আরম্ভ করিলে প্রথম হইতে পঞ্চম বৎসরের পূরণীয় দাবি হইবে (১) ২৯০৩০০০, (২) ৩০৬২০০০, (৩) ৩২১৬০০০, (৪) ৩৩৫৮০০০, এবং (৫) ৩৪৮৫০০০, টাকার মৃত্যুদাবি এবং পঞ্চম বৎসরের শেষে ৮৩,৯৭৬,০০০, টাকার বয়ঃ-প্রাপ্তি দাবি—মোট দশ কোটি টাকার দাবি। ইহার জন্য প্রথমেই ৫% সুদে লগ্নী করিতে হইবে যথাক্রমে (১) ২৭৬৪৭৫৯, (২) ২৮৭০৭৭৩, (৩) ২৯৫৪৩৩৩, (৪) ৩০৪৯৫২২, এবং (৫) ৩১২২৩৬৭, টাকা তথা বয়ঃ-প্রাপ্তির জন্য ৬৫৯০৮৪০৯, টাকা—একুনে ৭৯৬৬২৯৬৩, টাকা। প্রতি হাজারে পড়িবে ৭৯৬ টাকা ৬২ পয়সা। এই পরিমাণ নিচ্ছদ (Net) সকৃৎশুল্ক পাইলে তবে ঐ দাবি-সমূহ পূরণ করা সম্ভব হইবে।

২. (খ) বাৎসরিক বীমাশুল্ক নির্ধারণ। মনে করা যাউক ঃ লক্ষ বীমাকারীর নিকট হইতে ৭৯৬৬২৯৬৩৲ সকৃৎশুল্ক লইয়া বীমাদার নিজ বৃত্তিবিভাগের (Annuity Department) হস্তে ঐ টাকা অর্পণ করিল এবং বৃত্তিবিভাগ ঐ টাকা ৫% সুদে লগ্নী করিয়া তাহা হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বৎসরারম্ভে বীমাবিভাগের নিকট তৎকালে জীবিত প্রত্যেক বীমাকারীর নামে বাৎসরিক বীমাশুল্কে জমা দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, বীমাদারের কথঞ্চিৎ অন্তর্বর্তী কার্যবৃদ্ধি ব্যতিত এই ব্যবস্থায় কাহারও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। বীমাবিভাগ প্রত্যেক বীমাকারীর নামে উপযুক্ত পরিমাণে বাৎসরিক বীমাশুল্ক পাইবে এবং যথাকালে প্রত্যাশিত দাবি পূরণ করিবে।

বৃত্তিবিভাগ ঐ লগ্নীকৃত টাকা হইতে প্রত্যেক জীবিত বীমাকারীর নামে যত টাকা জমা দিতে পারিবে, তাহাই হইবে এক-একটি বীমার অর্থাৎ প্রতি হাজার টাকার বাৎসরিক বীমাশুল্ক। যদি বৃত্তিবিভাগ প্রত্যেকটি জীবিত বীমাকারীর জন্য বৎসরে বীমাবিভাগে এক টাকা করিয়া জমা দেয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত গণানানুসারে প্রথম বৎসর ১০০০০০৲, দ্বিতীয় বৎসর ৯৭০৯৭৲, তৃতীয় বৎসর ৯৪০৩৫৲, চতুর্থ বৎসর ৯০৮১৯৲, এবং পঞ্চম বৎসর ৮৭৪৬১৲ টাকা দিতে হইবে এবং তাহার জন্য ৫% সুদে লগ্নী করিতে হইবে যথাক্রমে ১০০০০০·০০ টাকা, ৯২৪৭৩·২৫ টাকা, ৮৫২৯২·৫৭ টাকা, ৭৮৪৫৩·০৮ টাকা ও ৭১৯৫৪·১৬ টাকা, একুনে ৪২৮১৭৩·০৬ টাকা। সুতরাং বীমাবিভাগ হইতে প্রাপ্ত ৭৯৬৬২৯৬৩৲ লগ্নীকৃত টাকা হইতে দিতে পারিবে ৭৯৬৬২৯৬৩৲÷ ৪২৮১৭৩·০৬ = ১৮৬·০৫ টাকা। ইহাই নির্ণেয় বাৎসরিক বীমাশুল্ক।

(৩) দায়নির্ধারণ ঃ জীবনেতর বীমায় মাত্র এক বৎসরের জন্য চুক্তি হয় এবং একটি বাৎসরিক বীমাশুল্কের আদান-প্রদান হয়। আশঙ্কিত বিঘটনা ঘটিলে অঙ্গীকৃত সমস্ত টাকাই বীমাদারের দায় বা ঋণে পরিণত হয়। বিনা বিঘটনায় বৎসর শেষ হইলে চুক্তি ও দায় নিঃশেষ হইয়া যায়। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালের অবস্থা কি? বীমারম্ভে বীমাশুল্ক আদান-প্রদানের অব্যবহিত পরে সম্পূর্ণ শুল্কই দায় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য, কারণ ঐ শুল্ক বীমাকারীকে প্রত্যর্পণ করিলে বীমাকারী অন্য কোনও বীমাদারের নিকট হইতে অনুরূপ অন্য একখানি বীমাপত্র গ্রহণ করিতে পারে। এই দায় সময়ের অনুপাতে হ্রাস পাইতে পাইতে বৎসর শেষে নিঃশেষ হইয়া যায়, এইরূপ যুক্তি সম্পূর্ণ সমীচীন—অর্থাৎ তিন মাস পরে প্রাপ্ত বীমাশুল্কের এক-চতুর্থাংশ অনুরূপ অন্যান্য বিঘটনাগ্রস্ত বীমাচুক্তির দাবি পূরণে ব্যয়িত হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে; এবং যদি কিছু অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তাহা বীমাদারের ন্যায্য লাভ বলিয়া গণ্য। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ বীমাশুল্ক অবশিষ্ট নয় মাসের জন্য দায় পূরণার্থ সঞ্চিত থাকিবে।

জীবনবীমার দায়নির্ধারণের মূলসূত্রও জীবনেতর বীমার অনুরূপ কিন্তু জটিলতর। কারণ জীবনবীমায় চুক্তির স্থিতিকাল এক বৎসর মাত্র নহে, বহুবর্ষব্যাপী; মৃত্যুহার স্থির নহে, অনবরত বর্ধনশীল; উদ্বৃত্ত অর্থ কোষে পড়িয়া থাকে না, লগ্নী করা হয় এবং তাহা হইতে সুদ অর্জিত হয়। এই জন্য সুদ ও মৃত্যুহার ব্যবহার করিয়া বীমাশুল্কে নির্ণয়ের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় গণনা করা আবশ্যক হয়। শুল্ক নির্ণয়ের উদাহরণের একলক্ষ বীমাকারীকে লইয়া গণনা আরম্ভ করা যাউক, এবং ধরিয়া লওয়া হউক যে দুই বৎসর অন্তে দায়নির্ধারণকালে দেখা গিয়াছে যে বাৎসরিক ৫৲ টাকা হারে সুদে লগ্নী করা আর সম্ভব হইবে না, ভবিষ্যতে ৪৲ টাকা সুদের হার ধরিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার পরিবর্তন হয় নাই। তৃতীয় বৎসরারম্ভে প্রাপ্য বাৎসরিক বীমাশুল্ক এখনও হস্তগত হয় নাই, অনতিবিলম্বে পাওয়া যাইবে।

এক লক্ষ বীমাকারীর মধ্যে অদ্যাবধি জীবিত আছে ৯৪০৩৫ জন। মৃত্যুতালিকা অনুসারে এখন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম বৎসরে মৃত্যু হইবে ৩২১৬ জনের, এবং মৃত্যুদাবি দিতে হইবে ৩২১৬০০০৲ টাকার। মৃত্যুর পর দাবিপূরণ করিতে কিছু সময় লাগিবে এবং ধরিয়া লওয়া যায় যে গড়ে এই পরিমাণ অর্থ কোষ হইতে নির্গত হইবে বর্ষশেষে। যদি দাবিপূরণের জন্য এখনই সমুদয় অর্থ লগ্নী করিতে হইত, তাহা হইলে লগ্নীর পরিমাণ হইত এইরূপঃ—

	প্রথম বৎসর	দ্বিতীয় বৎসর	তৃতীয় বৎসর
প্রত্যাশিত মৃত্যুদাবি	৩২১৬০০০৲	৩৩৫৮০০০৲	৩৪৮৫০০০৲
তজ্জন্য লগ্নীর পরিমাণ	৩০৯২৩০৮৲	৩১০৪৬৬০৲	৩০৯৮১৫২৲

তৃতীয় বর্ষশেষে প্রত্যাশিত কালাত্যয়ী দাবী ৮৩৯৭৬০০০৲ টাকা এবং তাহার জন্য আবশ্যক ৭৪৬৫৪৩৫৮৲ টাকা। মোট লগ্নীর পরিমাণ ৮৩৯৪৯৪৭৮৲ টাকা। কিন্তু এখনও তিন বৎসরের বীমাশুল্ক পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই টাকা সমস্তই অচিরাৎ লগ্নী করিতে হইবে না, ইহার যে অংশ লগ্নী করিয়া আগামী তিন বৎসরের আরম্ভকালে প্রাপ্য বাৎসরিক শুল্কের সমান অর্থ লাভ করা যাইতে পারে, তাহা পরে যথাসময়ে লগ্নী করিলেই চলিবে। এই অংশের গণনা এইরূপ—

	প্রথম বৎসর	দ্বিতীয় বৎসর	তৃতীয় বৎসর
বৎসরারম্ভে জীবিত লোকের সংখ্যা	৯৪০৩৬	৯০৮১৯	৮৭৪৬১

বৎসরারম্ভে প্রাপ্য
বীমাশুল্ক (টাকায়)
১৭৪৮২৯২৮, ১৬৮৮৫৯৭৭, ১৬২৬১৬২৪,
ঐ অর্থ উৎপাদনক্ষম লগ্নী
টাকায় ১৭৪৮২৯২৮, ১৬২৩৬৫১৬, ১৫০৩৪৭৮৫,
মোট লগ্নী ৪৮৭৫৪২২৯, টাকা

এই পরিমাণ অর্থ এখনও দায় বলিয়া গণ্য নহে, দাবি পূরণের জন্য আবশ্যক লগ্নী হইতে ইহা বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকে ৩৫১৯৫২৪৯, টাকা। ইহাই নির্ণেয় সমুদয় দায়। দুই বৎসরে যে ভাণ্ডার (Life Assurance Fund) গঠিত হইয়াছে তাহার সহিত বীমাদারের এই নির্ণীত দায় বা প্রয়োজনীয় ভাণ্ডারের তুলনা করিলেই বীমাদারের উদ্বৃত্ত (Surplus) অথবা অপ্রাচুর্য (Deficit) পাওয়া যাইবে। উদ্বৃত্তকে সাধারণতঃ লাভ বলিয়া ধরা হয় এবং অপ্রাচুর্যকে ক্ষতি বলা হয়।

একক বীমাপত্রের দায় ও ভাণ্ডার ঃ উপরিবর্ণিত দায় ও ভাণ্ডার শব্দদ্বয় বহু বীমাপত্রের সমষ্টি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য ; আশঙ্কিত বিঘটনা সংঘটনের পূর্ব পর্যন্ত একক বীমাপত্রের দায় ও ভাণ্ডার অবিদ্যমান বা শূন্য, এবং সংঘটনের পরমুহূর্তে দায় ও ভাণ্ডার উভয়ই বীমার অঙ্কের সমান। মধ্যবর্তী কোনও সময়ে দায় বা ভাণ্ডারের কোনও অর্থ হয় না, কারণ একটিমাত্র বীমাচুক্তির কোনও ভগ্নাংশের মৃত্যুদাবি বা কালাত্যয়ী দাবি হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু গণনার সুবিধার জন্য এইরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত নহে যে, অবিকল এক ধরণের ৯৪০৩৫ খানি বীমাচুক্তির যত দায় ও ভাণ্ডার জন্মিয়াছে, একখানি মাত্র বীমাচুক্তির দায় ও ভাণ্ডার তাহার ৯৪০৩৫ ভাগের এক ভাগ।

নিষ্ক্রয় ঃ কয়েক বৎসর বীমাপত্র চালাইবার পর যদি বীমাকারী অর্থকৃচ্ছ্রাদি হেতু চুক্তি বর্জন করিতে চাহে, তাহা হইলে ঐ চুক্তির জন্য বীমাদারের হস্তে যে ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে বীমাকারীকে প্রত্যর্পণ করা হয়। আধুনিক বীমাপত্রে কোন অবস্থায় নিষ্ক্রয় (Surrender) করিলে অন্যূন কতটাকা পাওয়া যাইবে, তাহা মুদ্রিত শর্তে লিপিবদ্ধ থাকে।

বীমাবন্ধকী ঋণ ঃ অর্থকৃচ্ছ্রতা নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার হইলে নিষ্ক্রয় করিয়া বীমাপত্রখানি চিরদিনের জন্য নষ্ট করার পরিবর্তে বীমাদার অথবা কোনও ব্যাঙ্কের নিকট হইতে বীমাপত্র বন্ধক দিয়া ঋণ গ্রহণ করাই সমীচীন। বীমাদার নিষ্ক্রয় মূল্যের শতকরা ৯০ ভাগ বা তদধিক অর্থ ঋণ দিয়া থাকে। সুদের হার অল্প।

মুক্তশুল্ক বীমা ঃ অর্থাভাবে বীমাশুল্ক চালাইয়া যাওয়া সম্ভবপর না হইলে বীমাকারী বীমাদারের নিকট এই মর্মে দরখাস্ত করিতে পারে যে, ভাবী শুল্ক সে বন্ধ করিল এবং বীমাদার যেন বীমার অঙ্ক উপযুক্ত পরিমাণে কমাইয়া দিয়া বীমাপত্রকে মুক্তশুল্ক (Paid up) করিয়া রাখে। ইহার পর মৃত্যু ঘটিলে বা কালাত্যয় হইলে দাবি অনেক কম পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু সমস্ত বীমা নষ্ট হওয়া অপেক্ষা এইরূপ আংশিক নাশ শ্রেয়ঃ। কালাত্যয়ী বীমায় অথবা যে সকল আমৃত্যু বীমায় কোনও অবস্থায়ই নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক বাৎসরিক বীমাশুল্ক প্রদেয় নহে, সেই সকল স্থলে প্রদত্ত বীমাশুল্ক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বীমাশুল্কের অনুপাতে বীমার অঙ্ক হ্রাস করা হয়। অন্য প্রকার জীবনবীমার ক্ষেত্রে মুক্তশুল্ক বীমার গণনা গণিতশাস্ত্রের নিয়মানুসারে করা হয়, কালাত্যয়ী বীমার অনুরূপ কোনও সহজ নিয়ম নাই।

জীবনেতর বীমার সমস্যা ও বিধিপদ্ধতি ঃ জীবনেতর বা সাধারণ বীমা অধুনা শিল্পবাণিজ্য ও সর্বপ্রকার সাংসারিক ব্যাপারের সহিত এইরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে অসংখ্যপ্রকার প্রয়োজনের জন্য অসংখ্য শ্রেণীর বীমা উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকের নিজস্ব সমস্যা ও নিজস্ব বিধিপদ্ধতি আছে। এ স্থলে উদাহরণ স্বরূপ মাত্র দুইটি বিধিব্যবস্থা বর্ণিত হইতেছে ঃ ১. অধিরোহণ ; ২. স্বধৃত বীমা।

১. সাধারণ বীমার মূলসূত্র ক্ষতিপূরণ নীতি, এবং ক্ষতিপূরণের মূলমন্ত্র হইল বীমাকারী যেন বিঘটনা বা বিপত্তি হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার পরিবর্তে বীমার সাহায্যে লাভবান না হয় ; কারণ তাহা সম্ভব হইলে বীমাকারীর মনে নিজের বিপত্তি স্বেচ্ছায় ঘটাইবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়া বিচিত্র নহে। বীমাকারী বীমার বিষয়ীভূত কোনও বিঘটনায় একাধিকবার ক্ষতিপূরণ পাইলে এইরূপ অবাঞ্ছনীয় লাভ হইতে পারে ; সুতরাং সাধারণ বীমার একটি বিধান এই যে, ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দিবার পর বীমাদার ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তিতে বীমাকারীর সর্বপ্রকার স্বত্বে অধিরোহণ (Subrogation) করিবে। যদি বীমাকারী অন্য কাহারও নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যতে আদায় করিবার অধিকারী হয়, তাহা হইলে ঐ আদায়ীকৃত ক্ষতিপূরণ অথবা ঐরূপ অধিকার বীমাদারের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। যেমন, অন্য গাড়ীর সহিত সংঘর্ষে বীমাকৃত মোটরগাড়ী বিধ্বস্ত হইলে, ধ্বংসাবশিষ্ট গাড়ীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং সংঘর্ষে সংশ্লিষ্ট অপর গাড়ীর মালিকের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার অধিকার উভয়ই নিজ বীমাপত্র অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ মিটাইয়া দিবার পর বীমাদারের প্রাপ্য হইবে।

২. সাধারণ বীমাপত্রের একটি বহুপ্রচলিত শর্ত অনুসারে বীমাকারী যদি বীমাকৃত সম্পত্তির বর্তমান সময়ের ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যের জন্য বীমা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ন্যায্য মূল্যের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ মনোনীত অল্পমূল্যের অতিরিক্ত বিবেচনা করা হয় তাহা বীমাকারীর "স্বধৃতবীমা" বলিয়া গণ্য হইবে। যদি ৫০০০, টাকা মূল্যের গাড়ী ৩০০০, টাকার জন্য বীমা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বীমাদারের নিকট বীমা ৩০০০, টাকার জন্য এবং বীমাকারীর নিজের নিকট করা

বীমা ২০০০৲ টাকার জন্য হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইবে। 'আনুপাতিক স্বধৃত বীমা' শর্তে (subject to prorata average) ঐ গাড়ীর বীমাকৃত দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতির পরিমাণ ১৫০০৲ টাকা হইলে বীমাদার ক্ষতিপূরণ করিবে ১৫০০৲ টাকার তিন-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ ৯০০৲ টাকা ; আর ধরিয়া লওয়া যাইবে যে অবশিষ্ট দুই-পঞ্চমাংশের অর্থাৎ ৬০০৲ টাকার জন্য বীমাদার হইতেছে বীমাকারী স্বয়ং ; সুতরাং অন্য কোনও বীমাদার তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে আসিবে না। স্বধৃত বীমা সর্বত্র আনুপাতিক শর্তের অধীন হয় না ; এ সম্বন্ধে বিশেষ শর্তও করা হইতে পারে এবং হইয়া থাকে।

হীরালাল দত্ত

বীরনগর নদিয়া জেলার রানাঘাট টাউনগ্রুপের অন্তর্গত একটি শহর। ইহা চুর্ণি নদীর তীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ৭৬১৩ (১৯৬১ খ্রী)। পূর্ব রেলপথের কলিকাতা-লালগোলাঘাট শাখায় ঐ নামে একটি স্টেশন আছে। উহা রানাঘাট হইতে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বীরনগরে পৌরসভা গঠিত হয়। শহরটি পূর্বে উলা নামে পরিচিত ছিল (সম্ভবতঃ দেবী উলাইচণ্ডীর নামানুসারে)। প্রতি বৈশাখ মাসে দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে এখানে মেলা বসে। মুস্তৌফি পরিবার কর্তৃক স্থাপিত এখানকার জোড়বাংলা রীতির মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে উলা-বীরনগর জনশূন্য হয়। পরে এখানে জনবসতি বাড়িতে থাকে। বীরনগর নদিয়া জেলায় তন্তুশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র।

দ্র *West Bengal District Handbook, Nadia*, Calcutta, 1953.

প্রণবরঞ্জন রায়

বীরভূম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। জেলাটি ২৩°৩৩′-২৪°৩৫′ উত্তর এবং ৮৫°১০′-৮৮°২′ পূর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৪৫৫১ বর্গ-কিলোমিটার। বীরভূমের উত্তরে ও পূর্বে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে বর্ধমান ও পশ্চিমে বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলা।

বীরভূম জেলার সাঁওতাল পরগনা-সংলগ্নভূমি পাহাড়ী ও উঁচা; নদীর নিকটবর্তী জমি সমতল এবং এই দুই অঞ্চল ব্যতিরেকে সমগ্রভাবে বীরভূমের ভূ-প্রকৃতি ঢেউ-খেলানো বলা যায়। এখানে দুইটি উল্লেখযোগ্য নদী— অজয় ও ময়ূরাক্ষী; ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বাঁশলই প্রভৃতি ছোট ছোট আরও অনেক নদী আছে। অজয় বীরভূম ও বর্ধমান জেলাদ্বয়ের সীমান্তনির্ধারক রেখা হিসাবে বীরভূমের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া বহিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষী জেলাকে প্রায় দ্বিধাবিভক্ত করিয়া সিউড়ী শহরের ৩ কিলোমিটার উত্তর দিয়া প্রবাহিত। নদীগুলি জমির ঢাল অনুসরণ করিয়া মোটের উপর পূর্বগামী হইয়াছে।

বীরভূম জেলা নীস, গ্রানাইট, মাকড়াশিলা ও গাঙ্গেয় পলি দ্বারা গঠিত। পশ্চিম অংশে নীস, মাকড়াশিলা বেশি দেখা যায়। দুবরাজপুরের নিকট গ্রানাইট শিলা বিচিত্র প্রকারের। অজয় নদীর উত্তরে কিছু নিকৃষ্ট কয়লা স্তর পাওয়া গিয়াছে। অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদীর উপত্যকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল লৌহমিশ্রিত মাকড়াশিলায় গঠিত। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব অঞ্চল পলি দ্বারা গঠিত। বক্রেশ্বর প্রভৃতি নানাস্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ রহিয়াছে।

জলবায়ু শুষ্ক। গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ গড় উত্তাপ ৩৮° সেণ্টিগ্রেড ও শীতকালীন সর্বনিম্ন গড় উত্তাপ ১৩° সেণ্টিগ্রেড। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ১৪২৫ মিলিমিটার।

বীরভূম ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, পাঠান ও ইংরেজদের শাসনাধীন হয়। ইংরেজ আমলে নীলচাষকে কেন্দ্র করিয়া বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে (১৮৫৫ খ্রী)।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব-ভারতীয় রেল কোম্পানি অজয়, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি নদীগুলিকে প্রায় সমকোণে ছেদ করিয়া জেলার উত্তর-দক্ষিণ দিয়া রেলরাস্তা প্রসারিত করিয়া দেয়; ফলে সুপুর, রামপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি নদীতীরবর্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম তাহাদের প্রাধান্য হারায় এবং বোলপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, নলহাটি ইত্যাদি রেল-পথের পার্শ্ববর্তী নাতিবৃহৎ রেলশহরগুলি ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বলাভ করে।

বীরভূম জেলার লোকসংখ্যা ১৪৪৬১৫৮ জন (১৯৬১ খ্রী)। উহাদের মধ্যে ৪১২৩৪৪ জন তফসিলভুক্ত হিন্দু-জাতি ও ১০৬৮৬০ জন তফসিলভুক্ত উপজাতি। বেশির ভাগ লোকের ভাষা বাংলা। ইহার পরেই সাঁওতালী ভাষার স্থান। জেলার শতকরা ২২ ভাগ লোক শিক্ষিত। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬৭০ (১৯৬১ খ্রী)। প্রখ্যাত শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বোলপুর স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত।

জেলার কর্মীদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৬ ভাগ কৃষি-কর্মে নিযুক্ত। কৃষিভূমির শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উৎপন্ন দ্রব্য ছোলা, নানা-বিধ ফল, শাকসবজি ও ইক্ষু। এখানে বহুদিন হইতে সমবায় প্রচেষ্টায় বৃহৎ পানের বরজে (২-৩ হেক্টর পরি-মিত) পান চাষ করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বক্রেশ্বর খালই একমাত্র উল্লেখযোগ্য সেচখাল ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার

ফলে বীরভূম ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ২৫০০০০০ হেক্টর পরিমাণ জমি সেচের অধীনে আসিয়াছে।

বীরভূমে ভারী শিল্প বিশেষ নাই। গনুটিয়ার রেশম শিল্প, ইলামবাজারের লাক্ষাশিল্প এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। রামপুরহাট থানার বাসওয়া ও বিষ্ণুপুর গ্রামের রেশম-শিল্প, কবিধার তসর, সিউড়ী, শান্তিনিকেতন, তাঁতীপাড়া, দুবরাজপুর প্রভৃতির সূতিবস্ত্রশিল্প উল্লেখযোগ্য। সিউড়ীর শতমূলের মোরব্বার খ্যাতি আছে। কবিধার শংখশিল্প অতি নিপুণ।

জেলার পরিবহণ ব্যবস্থা ভাল। লুপ লাইন জেলার ভিতর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। একটি শাখা লাইন নলহাটি হইতে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত পূর্বদিকে বিস্তৃত। অন্ডাল-সাঁইথিয়া লাইনে সিউড়ী অবস্থিত। 'সিউড়ী-সাঁইথিয়া', 'সাঁইথিয়া-মহেশা', 'সিউড়ী-রাজনগর', সিউড়ী-ইলামবাজার-পানাগড়' প্রভৃতি রাস্তা জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

জেলার সদর শহর সিউড়ী। অন্যান্য শহরের মধ্যে সাঁইথিয়া, নলহাটি, রামপুরহাট, বোলপুর প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। প্রায় প্রত্যেক শহরের অনতিদূরে একটি করিয়া সতীর দেহাংশের উপর প্রতিষ্ঠিত শাক্ত পীঠ আছে, যথা, বক্রেশ্বর, নন্দীপুর, নলহাটেশ্বরী, অট্টহাস, তারাপীঠ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে তারাপীঠ বা সিদ্ধপীঠই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত।

বীরভূমে বৈষ্ণবদেরও বহু তীর্থস্থান আছে, যথা, জয়দেবের কেন্দুবিল্ব (কেন্দুলি), চণ্ডীদাসের নান্নুর, একচক্রাপুরে নিত্যানন্দ প্রভুর সাধনক্ষেত্র। গ্রামাঞ্চলে গ্রাম-দেবতা ধর্মরাজের পূজার বহুল প্রচলন আছে।

এইসব বিভিন্ন ধর্মকে ভিত্তি করিয়া বীরভূমে নানা-ধরণের ধর্মীয় সাহিত্য রচিত হইয়াছে, যথা, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', চন্ডীদাসের 'পদাবলী', 'ধর্মমঙ্গল' ও তদ্‌ভাবসূচক অন্যান্য গ্রন্থ, বিষ্ণুপালের 'মনসা মঙ্গল', ইত্যাদি।

বীরভূমে বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যা খুব বেশি। কেন্দু-লিতে মকর সংক্রান্তিতে বাউলদের এক বড় উৎসব হয়।

দ্র B. Roy., *Census* 1961; *West Bengal District Census Hand Books, Birbhum;* Calcutta; N. K. Bose, *Culture and Society in India,* Bombay, 1967.

শুভেন্দুগোপাল বাগচী

বীরাষ্টমী শারদীয়া দুর্গাপূজার অষ্টমী। এই দিন পুত্রলাভার্থে অর্বাচীন স্বল্পপরিচিত বীরাষ্টমী ব্রত অনু-ষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখা যায়। এই ব্রতে দুর্গাদেবীর পূজা করাইয়া মহিলাদের হাতে ডোর বাঁধিবার বিধান আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও দেশপ্রেমী সরলা দেবীচৌধুরাণী ব্রতটি নূতনভাবে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রবর্তিত বীরাষ্টমী উৎসবের প্রধান অংগ দেশের প্রাচীন বীরদের নামে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ; তরুণদের হাতে 'বীরো ভব' (বীর হও) বলিয়া মাতা বা মাতৃস্থানীয় মহিলাগণ-কর্তৃক রাখি বাঁধিয়া দেওয়া ও বীরোচিত খেলাধুলার অনুষ্ঠান।

দ্র পুরোহিতদর্পণ; সরলা দেবীচৌধুরাণী, জীবনের ঝরাপাতা, কলিকাতা, ১৮৭৯ শকাব্দ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮০—১৯৪৩ খ্রী) অঘোর-নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা।

হায়দারাবাদে স্কুল ও কলেজে শিক্ষা লাভের পর উচ্চ-শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করেন (১৯০১ খ্রী)। বীরেন্দ্র-নাথ কিন্তু শীঘ্রই সেখানে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রমুখ প্রবাসী বিপ্লবীদের কাজকর্মে জড়িত হইয়া পড়েন। তিনি কৃষ্ণবর্মা প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া হাউসে'র ছাত্রদের এবং 'অভিনব ভারত-সংঘ' ও 'ফ্রী ইন্ডিয়া সোসাইটি'র সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ক্রমে কৃষ্ণবর্মা-সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' পত্রিকা পরিচালনার প্রধান দায়িত্বও আসিয়া পড়ে তাঁহার উপরে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়ার গুলিতে স্যর উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলি নিহত হওয়ার পর তাঁহার ব্যারিস্টারির সনদ নাকচ করা হয় এবং গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তাঁহাকে ইংল্যান্ড ছাড়িয়া যাইতে হয় পারীতে।

পারীতে বীরেন্দ্রনাথ শ্রীমতী ভিকাজী রোস্তম কামা প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত কাজ শুরু করেন। 'বন্দে মাতরম্‌' ও 'তলোয়ার' পত্রিকা পরিচালনায় তিনি শ্রীমতী কামাকে বিশেষ সাহায্য করেন। অন্যদিকে রাশিয়া, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশের বিপ্লব-কর্মীদের সংগে ঐ সময়ে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যোগ দেন ফরাসী সমাজ-তন্ত্রী দলে।

বীরেন্দ্রনাথ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় পারী ছাড়িয়া উপস্থিত হন বের্লিনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি ও ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য জার্মানীর সহায়তায় ভারতে বিদ্রোহ ঘটানোর উদ্দেশ্যে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের সংগে একটি ১৫ দফা চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হন। ইহার সূত্রে কয়েক মাসের মধ্যেই বের্লিনে গঠিত হয় বিখ্যাত 'ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি' (বের্লিন কমিটি নামে সমধিক পরিচিত)। সমিতির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন বীরেন্দ্রনাথ।

যুদ্ধের শেষদিকে বীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় রুশ বিপ্লব ও নবোদ্ভূত সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি। ১৯২০

খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি মস্কো যান। পরের বছর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র তৃতীয় সম্মেলনের প্রাক্কালে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরং খানখোজে প্রমুখ একদল ভারতীয় বিপ্লবীর নেতা হিসাবে তিনি পুনরায় মস্কো যাত্রা করেন। ভারতীয় বিপ্লবের চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার ও কয়েকজন সহকর্মীর বক্তব্য সেখানে তিনি লেনিনের নিকটে নিবন্ধ আকারে পেশ করেন।

সোভিয়েত দেশ হইতে বীরেন্দ্রনাথ পুনরায় জার্মানীতে ফিরিয়া আসিয়া ঐখানে বিপ্লবী কাজকর্মের একটি কেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাসেলস্ শহরে যে 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন বীরেন্দ্রনাথ। ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বহু রাজনৈতিক রচনা প্রকাশিত হয় 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' মুখপত্রে।

জার্মানীতে হিটলার-এর দলের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিলে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া বেলিন ছাড়িয়া সোভিয়েত দেশে আসিতে হয়। সেখানে তিনি কয়েক বছর লেনিনগ্রাড শহরে কাটান। অবিশ্রাম বিপ্লবী তৎপরতার মধ্যেও বীরেন্দ্রনাথ দর্শন, গণিত, বিশেষ করিয়া নৃকুল-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লেনিনগ্রাডের নৃকুল-বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থার কর্মী ও গবেষক হিসাবে তাঁহার ঐ বিষয়ে বহু নিবন্ধ সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বীরেন্দ্রনাথকে গ্রেফতার করিয়া গোপন বিচারের পর অজ্ঞাতস্থানে পাঠানো হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর কারণ জানা যায় নাই। তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আনা হইয়াছিল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পুনর্বিচার করিয়া সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে ঐগুলি মিথ্যা। সুতরাং অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া মৃত্যুর পর বীরেন্দ্রনাথকে পূর্ণ বিপ্লবী মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

চিন্মোহন সেহানবীশ

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১—১৯৩৪ খ্রী)। বাঙালী ব্যারিস্টার, রাজনৈতিক নেতা। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ৯ কার্তিক মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীভেটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশ্বম্ভর শাসমল। কলিকাতায় এফ. এ. পড়িবার সময়ে তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া (১৯০৪ খ্রী) কলিকাতা হাইকোর্টে আইনব্যবসায়ে যোগ দেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় হইতে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। কংগ্রেসের নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন (১৯২১ খ্রী)। ঐ বৎসর চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহাকে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে তিনি গ্রেফতার হন। কারামুক্তির পরে তিনি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক হন।

তিনি দুইবার মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯২৩ খ্রী, ১৯২৬ খ্রী), দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য (১৯২৩ খ্রী, ১৯২৫ খ্রী,) দুইবার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯২৫ খ্রী, ১৯২৬ খ্রী)। কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধের ফলে তাঁহার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ওঠে এবং তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন (১৯২৭ খ্রী)। আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০ খ্রী) তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই। কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থীরূপে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার (১৯৩৩ খ্রী) এবং ভারতীয় আইনসভার সভ্য (১৯৩৪ খ্রী) নির্বাচিত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ নভেম্বর সন্ন্যাসরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষেত্র গুপ্ত

বুকানন-হ্যামিল্টন, ফ্রান্সিস্ (১৭৬২—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। চিকিৎসক ও সমাজতাত্ত্বিক গবেষক। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা টমাস বুকানন। এডিনবরা হইতে তিনি এম্. ডি. ডিগ্রি পান (১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে)। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী রূপে তিনি একুশ বৎসর ভারতে ছিলেন। কূটনীতিবিদ্‌রূপে তিনি আভায় (১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) ও নেপালে (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে) যান।

সমাজতাত্ত্বিক গবেষক হিসাবে পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য (১) চট্টগ্রাম ত্রিপুরা (১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ), (২) মহীশুর কানাড়া-মালাবার (১৮০০-০১ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পূর্বভারতের পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, ভাগলপুর, পুর্নিয়া, গোরক্ষপুর, দিনাজপুর, রংপুর, আসাম (১৮০৭-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি অঞ্চলে তিনি ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। যে-সব বিষয়ে তিনি অনুসন্ধান করেন তাহার মধ্যে ছিল ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, জনজীবন, ধর্ম, কৃষি, খনি, উদ্ভিদ, মৎস্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলা। পরে তিনি কিছুকাল কলিকাতা-বোটানিকাল গার্ডেন্স-এর কর্মকর্তা রূপে কাজ করেন (১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কটল্যান্ডে ফিরিয়া যান। তাঁহার গবেষণাকার্যের জন্য তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে: 'এ জার্নি থ্রু দি কানাট্রিজ্ অফ্ মাইসোর, কানাড়া অ্যান্ড মালাবার' ৩ খণ্ড (১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'দিনাজপুর

রিপোর্ট' (১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'বেঙ্গল রিপোর্টস্ ৩ খণ্ড (১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

ক্ষেত্র গুপ্ত

বুড়ীগণ্ডক বিহার রাজ্যের একটি নদী। নেপালের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহা মতিহারী, দ্বারভাঙ্গা ও উত্তর মুঙ্গের জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পারাপার সহজসাধ্য। বর্ষার বন্যার প্রকোপে আশপাশের গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জামওয়ারী ও বালান ইহার দুইটি শাখা নদী। মুঙ্গের শহরের কয়েক মাইল নিম্নে খাগারিয়ার নিকটে নদীটি গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। খাগারিয়া পর্যন্ত স্টিমার চলাচল করে। হারহা (Harha), শিকরানা, মাসান প্রভৃতি নামেও নদীটি অভিহিত হয়।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বুদ্ধগয়া, বোধগয়া (২৪°৪২´ উত্তর ও ৮৫°০´ পূর্ব) বিহার রাজ্যের গয়া জেলার লীলাজন (প্রাচীন নাম নৈরঞ্জনা) নদীর তীরে অবস্থিত পবিত্রতম বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। গয়া স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ১৩ কিলোমিটার। প্রাচীন উরুবিল্ব (বর্তমানের উরেল, মহাবোধি মন্দির হইতে ২ কিলোমিটার দূরে) পল্লীর পার্শ্বস্থ সুপ্রাচীনকালের বৌদ্ধতীর্থসার সম্বোধিকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক বুদ্ধগয়ার উৎপত্তি। সম্বোধি কালক্রমে মহাবোধি নাম পরিগ্রহ করে এবং এখানকার সমগ্র বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি এইনামে অভিহিত।

দীর্ঘ ছয় বৎসর কৃচ্ছ্রসাধনার পর গৌতম একদিন এখানে একটি অশ্বত্থ তরুমূলে (পরবর্তীকালে বোধিবৃক্ষ বলিয়া খ্যাত) একটি তৃণাসনের (পরে বজ্রাসন বলিয়া অভিহিত) উপর উপবিষ্ট হইয়া সেই রাত্রেই বোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন ('বুদ্ধদেব' দ্র)।

মৌর্যসম্রাট অশোকের অনুশাসনে লেখা আছে, অশোক স্বয়ং সম্বোধিতে ধর্মযাত্রা করেন। ভারহুতের আবেষ্টনীর (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) গাত্রস্থ উদ্গত চিত্রের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে অনুমান করেন অশোক বোধিবৃক্ষমূলে একটি প্রস্তরের বেদিসহ (বজ্রাসন) একটি মণ্ডপ, মণ্ডপ-ও-বোধিবৃক্ষ-পরিবেষ্টক একটি আবেষ্টনী ও গজশীর্ষ একটি স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার দৃশ্যমান নিদর্শনরাজির প্রাচীনতম হইল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের : (১) বোধিবৃক্ষের সম্মুখস্থ কারুকার্যক্ষোদিত একটি প্রস্তরের আসন (বজ্রাসন); (২) তিন সূচির (Cross bars) রক্তিমাভ বেলেপাথরের একটি ক্ষোদিত চতুষ্কোণ আবেষ্টনীর অংশ (মূলতঃ ইহা বোধিবৃক্ষ ও তৎসম্মুখস্থ বজ্রাসন আচ্ছাদনকারী ক্ষুদ্র সস্তম্ভ মণ্ডপ পরিবেষ্টন করিয়াছিল); এবং (৩) বুদ্ধদেবের আচ্ছাদিত চংক্রমের বা পদচারণ-চত্বরের স্তম্ভাবলীর পাদপীঠ ও একটি স্তম্ভ। কথিত আছে, বোধিলাভের পরবর্তী তৃতীয় সপ্তাহ চিন্তামগ্ন বুদ্ধদেব চংক্রমে পদচারণ করিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখন চংক্রমটি পদ্মের অনুকৃতিতে অলংকৃত আয়ত ইষ্টকবেদি।

গুপ্তযুগে গ্রানাইটের স্তম্ভ (Posts), সূচি (Cross-bars) ও উষ্ণীষ (Coping) সংযোজন করিয়া আবেষ্টনীটি সম্প্রসারিত করা হইয়াছিল। পূর্বতন আবেষ্টনীর অংশসমূহের সহিত এইগুলি অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে গ্রথিত হইলেও ইহার উদ্গতচিত্রের শৈলী স্বতন্ত্র ধরনের। গুপ্তযুগে আবেষ্টনীর এইরূপ সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন হইয়া পড়ে, কারণ এই যুগে ক্ষুদ্র বজ্রাসন-মণ্ডপের পবিত্রস্থলে বোধিলাভর মুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিরাট মন্দির (বর্তমান মহাবোধি মন্দিরের মূল) নির্মিত হয়। ফলে, বেলেপাথরের আবেষ্টনীর পাদপীঠ, পূর্বতন মণ্ডপ ও চংক্রমের খানিকটা অংশ মহাবোধি মন্দিরের তলদেশে নিহিত।

মূল মন্দিরটি (বজ্রাসন-বৃহৎ-গন্ধকুটী) আনুমানিক ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের একটি লেখে এই মন্দিরের সুধা-কর্মের (Stucco-work) কথা লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। ইহার পূর্বেও ইহার বহুবার জীর্ণোদ্ধার হয়। জীর্ণোদ্ধারের সময়ে মূল আয়তন ও আকৃতি সর্বদা বজায় রাখা হয়। তাই হিউএন্-ৎসাং-এর মূল মন্দিরটির বর্ণনা প্রাক্-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান মন্দিরটির ক্ষেত্রে প্রায় অবিকলভাবে প্রযোজ্য। তবে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাড়ের মূল অলংকরণ যথাযথভাবে অনুকরণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই।

ভারতবর্ষের মন্দির-স্থাপত্যধারার ইতিহাসে মহাবোধি মন্দিরের স্থান অদ্বিতীয়, কেন না এই ধারায় নির্মিত অপরাপর মন্দিরগুলির একটিরও শিখর এই দেশে অবশিষ্ট নাই। ইষ্টকনির্মিত মন্দিরটির বাড়টি একটি সু-উচ্চ বেদির বিভ্রম জন্মায়, কেন না বাড়ের সমগ্র শীর্ষ জুড়িয়া গণ্ডি নহে। গণ্ডির চতুষ্পার্শে, বাড়ের ছাদের উপর একটি খোলা চত্বর। ছাদের চারিকোণে মূলমন্দিরের অনুকৃতিচতুষ্টয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমূল নির্মিত হয় (ইহাদের প্রাচীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা আছে)।

বাড়ের বহির্ভাগের পাদদেশ আদিতে ডৌলকর্মে সুশোভিত ছিল। এই অংশের উপর গাত্রস্তম্ভাবলী দ্বারা বিভক্ত কুলুঙ্গিসমূহে পূর্বে সুধার (*Stucco*) বুদ্ধ ও অন্যান্য মূর্তি ছিল (১৮৮০-র জীর্ণোদ্ধারের সময় জীর্ণ মূর্তিগুলি অপসৃত করিয়া মন্দিরের পরিপার্শ্ব হইতে প্রাচীন প্রস্তরের মূর্তি সংগ্রহ করিয়া

সন্নিবেশিত করা হইয়াছে)। কুলুঙ্গি ও গাত্রস্তম্ভাবলীর উপর দুই প্রস্তের ডোলকর্মের মধ্যে কীর্তিমুখধৃত মুক্তামালার অনুকৃতি ছিল। ইহার উপরে এক সারি চৈত্য-গবাক্ষের (আদিতে গবাক্ষের মধ্যে বুদ্ধমূর্তি ছিল) প্রতিকৃতি। চৈত্যগবাক্ষ-সারির উপরেই আবার ক্ষুদ্রাকার গাত্রসম্ভাবলীর ফাঁকে ফাঁকে কুলুঙ্গি। ইহার উপর ডোলকর্মের কার্নিস। বাড়ের অভ্যন্তরস্থ গর্ভগৃহের মধ্যে ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি। পালযুগের এই মূর্তিটির বসাল্টের বেদির (বজ্রাসন) অভ্যন্তরে প্রাচীনতর বেদি সুধাকর্মে আবৃত ছিল। গর্ভগৃহের সম্মুখস্থ প্রবেশ-মণ্ডপের দুই দেওয়ালের গভীরে নির্মিত দুইটি সোপানের মাধ্যমে বাড়ের ছাদে পৌঁছাইতে হয়। গণ্ডির নীচের দিককার অংশে প্রবেশিকাসহ আর একটি গর্ভগৃহ। ক্রমক্ষীয়মাণ গণ্ডি অন্যান্য রেখমন্দিরের মত স্কন্ধের দিকে বাঁকিয়া যায় নাই; ইহা শীর্ষকাটা লম্বিত পিরামিডের মত। গণ্ডির প্রতি পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া উপপগ। মধ্যটি সর্বাপেক্ষা চওড়া। প্রতি পগ সাতটি ভূমিতে বিভক্ত। প্রতি ভূমিতে ডোলকর্মের উপর একটি আরও কুলুঙ্গি; কুলুঙ্গির দুই পার্শ্বে একটি করিয়া উপস্তম্ভ এবং শীর্ষ-পাটের উপর চৈত্য গবাক্ষের অনুকৃতি। কনিকের প্রত্যেক ভূমির মাথায় একটি ভূমি-আমলক। গণ্ডির শীর্ষে মস্তক-বেকি, আমলক এবং ছত্রাবলীসহ ক্ষুদ্রাকার স্তূপ। মন্দির-টির মোট উচ্চতা ৪৮ মিটারের অধিক। ইহার গাত্রদেশে বহুবার চূণ-বালির পলস্তারা করা হয়।

ফা-হিয়েন মহাবোধিতে তিনটি সমৃদ্ধ সংঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। সিংহলের পূর্বকালীন জনৈক নৃপতি কর্তৃক নির্মিত মহাবোধি-সংঘারামে হিউএন্-ৎসাঙ এক সহস্র স্থবিরবাদী সিংহলী ভিক্ষু দেখিতে পান। সম্ভবতঃ, এই সংঘারামটিই সিংহলের নৃপতি মেঘবর্মা বা মেঘবর্ণের দান। এই নৃপতি ওয়াংগ-হিউয়েন-ত'সের বিবরণী অনুযায়ী সিংহলের ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীদের আবাসের নিমিত্ত একটি সংঘারাম নির্মাণের জন্য সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে অনুরাধপুরে বোধিবৃক্ষের একটি কলমের চারা বপন করিবার পর হইতেই সম্বোধির সংগে সিংহলের যে নিবিড় সংস্রব হইয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে বহুসংখ্যক লেখে। এমন কি খৃীষ্টপূর্ব প্রথম শতকেও বোধিবৃক্ষের আবেষ্টনী যাহাদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হইয়াছিল একজন সিংহলী তাহাদের অন্যতম। ৫৮৮-৮৯ খৃীষ্টাব্দে সিংহলের স্থবির মহানামন বোধি-মণ্ডতে বুদ্ধদেবের এক প্রাসাদ (মন্দির) নির্মাণ করেন। খৃীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সিংহলীয় উদয়শ্রী কর্তৃক বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথা পাটনা সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত একটি লেখে উল্লেখিত আছে।

পালরাজবংশের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সমৃদ্ধির যুগ। উৎসর্গের বিবরণীসহ লেখগুলির কতিপয় এই রাজবংশের বৌদ্ধ নৃপতিদের রাজত্বকালের তারিখযুক্ত। মহাবোধি মন্দিরের গাত্রে বা পরিপার্শ্বে যে অসংখ্য মূর্তি এখনও বিদ্যমান (সর্বাপেক্ষা অধিক সংগ্রহ বুদ্ধগয়ার শৈব মহান্তের ভবনে) তাহাদের অধিকাংশই হইল পালযুগের। বেশির ভাগ মূর্তিই হইল বোধিপ্রাপ্তির মুদ্রায় (অর্থাৎ ভূমিস্পর্শ) বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট বুদ্ধের। তবে মহাযানীয় ও বজ্রযানীয় গোষ্ঠীর দেবদেবীর বিগ্রহের সংখ্যাও কম নহে।

প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধেরই—কী ভারতীয়, কী বিদেশী—জীবনের অভিলাষ এই পবিত্রতম তীর্থ দর্শন করা, মহাবোধি মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তি পূজা করা ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী অর্ঘ্য প্রদান করা। এই সব অর্ঘ্যরাজির অধিকাংশই স্তূপ। বহুসংখ্যক এখনও বিদ্যমান। তীর্থ-যাত্রীদের লেখসমূহের মধ্যে কতিপয় চৈনিক হরফে।

মুসলমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মহাবোধির চরম বিপর্যয় ঘটে নাই। তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মস্বামীর ১২৩৪ খৃীষ্টাব্দে বজ্রাসন (মহাবোধি) পরিভ্রমণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে তুরুষ্কগণ মুখ্য মন্দিরের মূর্তিটির মরকতমণির নয়নদ্বয় অপহরণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিল। বজ্রাসন প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক সিংহলীয় হীনযানী শ্রমণেরা মহাযান বজ্রযান রীতির ক্রিয়াকলাপের তীব্র বিদ্বেষী ছিলেন এবং ধর্মস্বামীর হস্তধৃত মহাযান অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পুঁথিটি নদীতে নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলেন। বজ্রাসনের পবিত্রতম বস্তুরাজির মধ্যে ধর্মস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন— (১) বোধিবৃক্ষ, (২) মহাবোধির মূর্তি, (৩) গন্ধোলা (গন্ধকুটী অর্থাৎ মহাবোধি মন্দির), (৪) তথাগতের কোণ-দন্ত, (৫) বুদ্ধপদাঙ্কিত প্রস্তর সিংহাসন, (৬) প্রস্তর আবেষ্টনী ও (৭) তারা-বিহার। শেষোক্তটি সম্ভবতঃ মহাবোধি মন্দিরের প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ তারা নামের সংগে যুক্ত ইষ্টকের মন্দিরটি। এই সময়ে বারটি সংঘারামে অধিবাসী ভিক্ষুসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল।

ধর্মস্বামীর সংগে মগধনৃপতি বুদ্ধসেনের (ইনি বজ্রাসনের সন্নিকটে বাস করিতেন) সাক্ষাৎ হয়। ইনি ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ ছিলেন। ইনি শুধু সিংহলীয় স্থবিরদেরই নহে, কমা রাজ্যের নৃপতির ধর্মগুরু ভিক্ষুপণ্ডিত শ্রীধর্ম-রক্ষিতকেও দানাদি করিয়াছিলেন, একথা জানা যায় বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত তাঁহার একটি লেখে। নির্বাণ অব্দের ১৮১৩ তারিখযুক্ত একখানি লেখে উল্লেখ আছে, এই ধর্মরক্ষিত কমারাজ্যের পুরুষোত্তমসিংহ কর্তৃক নির্মিত বুদ্ধের গন্ধকুটীর নির্মাণকার্য তত্ত্বাবধান করিতে বুদ্ধগয়ার আগমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের অতীত রাজ্যের ৭৪ অব্দের তারিখযুক্ত অপর লেখটিতে অশোকবল্লের অনুজ, রাজ-

কুমার দশরথের জনৈক বৌদ্ধ কর্মচারীর অনির্দিষ্ট দানের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

বুদ্ধসেনের পুত্র পীঠিপতি জয়সেন বজ্রাসনের জন্য একটি গ্রাম দান করিয়া সিংহলী ত্রিপিটক-বিশারদ ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীর হস্তে দলিলটি অর্পণ করেন।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে বর্মীরা মহাবোধি মন্দিরের সংরক্ষণে বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। প্রয়োজনানুযায়ী সংস্কারসাধন ও অর্থদানের বিবরণ-সম্বলিত বর্মী হরফে কতিপয় লেখ এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই লেখগুলির একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ইহাতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকে বর্মার নৃপতি কর্তৃক তাঁহার কর্মচারীর মাধ্যমে মন্দিরটির পূর্ণ সংস্কারের বিবরণ আছে, উপরন্তু এই মন্দিরটির প্রাথমিক নির্মিতিকাল হইতে তৃতীয় জীর্ণোদ্ধার পর্যন্ত ইহার বিচিত্র ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

চত্বরের প্রস্তর ফলকাবলীর উপর উৎকীর্ণ তীর্থযাত্রীদের লেখ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকেও মন্দিরটিতে পূজা-পাঠ চলিতে থাকে। পগ সম জোন জঙ্গ গ্রন্থ অনুযায়ী গন্ধোলার সংস্কার সাধন করেন (আনুমানিক ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদেশের ছগল-রাজের মহিষী। ইহার অনতিকালের মধ্যেই মন্দিরটি বৌদ্ধ পূজারী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং শৈব গিরি সম্প্রদায়ের করায়ত্তে আসে। শৈব প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত এখানে বহুপূর্বেই হয়। ধর্মপালের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে কেশব মহাবোধিতে মহাদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মস্বামী মহাবোধি মন্দিরের বহির্দ্বারে চিত্রিত মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলেন। গিরি সম্প্রদায় ষোড়শ শতকের শেষের দিকে মন্দিরটির সন্নিকটে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টাদশ শতকে ইঁহারা মোগল সম্রাটের নিকট হইতে তারাডিহ গ্রামটি (যে গ্রামের এলাকাভুক্ত ছিল মন্দিরটি এই সময়ে) দান লাভ করে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মন্দিরটি ইহাদের হস্তে ছিল আর পান্ডারা ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর আবরণে বৌদ্ধ বিগ্রহগুলি পূজা করিতেছিল।

ঊনবিংশ শতকের অষ্টম দশকে ব্যাপক সংস্কারের ফলে মন্দিরটি ও ইহার প্রাঙ্গণ বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হয়। সঙ্ঘারামগুলির ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত। বর্তমান অশ্বত্থ বৃক্ষটি মূলবোধিবৃক্ষের অতিপরোক্ষ বংশধর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বীজ, নূতন চারা বা কলমের মাধ্যমে কয়েকবার বোধিবৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা হইয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূপতিত বৃক্ষটির শিকড় হইতে বর্তমান বৃক্ষটি উৎপন্ন হইয়াছে।

স্থানীয় সংগ্রহালয়টি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্নবস্তুতে সমৃদ্ধ। 'গয়া' দ্র।

দ্র R. L. Mitra, *Buddha Gaya,* Calcutta, 1878; A. Cunningham, *Mahabodhi,* London, 1892; B. M. Barua, *Gaya and Buddha-Gaya,* I and II, Calcutta, 1934; Prudence R. Myer, 'The Great Temple at Bodh-Gaya', *The Art Bulletin,* (Published by the College Art Association of America), Vol. XL, No. 4, 1958.

দেবলা মিত্র

বুদ্ধঘোষ বৈদিক সাহিত্যে সায়ণাচার্যের যে স্থান পালিসাহিত্যে বুদ্ধঘোষ সেইস্থানের অধিকারী। এই কীর্তিমান পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মগধদেশে বোধিবৃক্ষের সমীপবর্তী এক গ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিবার পর রেবত নামে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তথাগতের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

সিংহলী অট্‌ঠকথাসমূহ পড়িবার উদ্দেশ্যে তিনি সিংহলরাজ মহানামের রাজত্বকালে সিংহলে গমন করেন। তথায় অনুরাধপুরের বিখ্যাত 'মহাবিহারে' তিনি বিশেষ যত্নসহকারে ত্রিপিটক ও অট্‌ঠকথাগুলি অধ্যয়ন করেন। কথিত আছে যে সিংহলী পণ্ডিতগণের নিকট বুদ্ধঘোষ অট্‌ঠকথাগুলিকে অনুবাদ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তাঁহারা বুদ্ধঘোষের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করিবার জন্য তাঁহাকে দুইটি গাথা দেন। এই গাথা দুইটিকে অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধঘোষ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ বিশুদ্ধিমগ্‌গ রচনা করেন। ২৩ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই গ্রন্থে বৌদ্ধশিক্ষার মূলসূত্রগুলির বিশেষ সারগর্ভ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থটিকে যথার্থই বৌদ্ধশিক্ষার কোষগ্রন্থ (Encyclopaedia) হিসাবে অভিহিত করা যায়।

বৌদ্ধ পালি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ টীকাকাররূপে বন্দিত হইলেও বুদ্ধঘোষের দান ও কৃতিত্ব আরও বেশি। পালি-সাহিত্যের বহু জটিল অংশ তিনি নিপুণভাবে আলোচনা করিয়া যে আলোকপাত করিয়াছেন তাহার সাহায্যে আজ আমরা সহজে পালিসাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারি। তাঁহার নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, ধৈর্য ও অমানুষিক পরিশ্রমের নিদর্শন তাঁহার প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যেই রহিয়াছে। পালি-ভাষা এবং বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন ছাড়াও জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল।

বুদ্ধঘোষ রচিত বিরাট গ্রন্থতালিকার মধ্যে রহিয়াছে সুত্তপিটকের প্রথম চারিটি নিকায়ের টীকা, বিনয়পিটকের টীকা সমন্তপাসাদিকা, কঙ্খাবিতরণী নামক পাতিমোক্‌খের

টীকা, সুত্তনিপাত, ধম্মপদ ও খুদ্দকপাঠের টীকা, বিভঙ্গ, পট্‌ঠান ও কথাবত্থুর টীকা। বিখ্যাত গ্রন্থ অত্থশালিনী তাঁহার রচিত ধম্মসংগনীর টীকা। জাতকের টীকাও তাঁহার রচিত কেহ কেহ মনে করেন।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদত্ত আচার্য বুদ্ধদত্ত অভিধর্মের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাকে বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক বলিয়া মনে করা হয়। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ্যে উরগপুরে বুদ্ধদত্ত জন্ম গ্রহণ করেন এবং সিংহলের বিখ্যাত 'মহাবিহারে' বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন।

বুদ্ধদত্তকৃত উত্তরবিনিচ্ছয়, বিনয়বিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ এই চারিটি গ্রন্থ (Buddhadatta's Manuals) পণ্ডিত সমাজে বিশেষরূপে আদৃত। অভিধর্মের পঠন-পাঠনের যে ধারা আজ প্রচলিত রহিয়াছে তাহার মূলে বুদ্ধদত্তর দান অপরিসীম। একজন দেশপ্রেমিক হিসাবেও ইঁহার খ্যাতি ছিল।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। গৌতম বুদ্ধের পিতা শুদ্ধোদন ছিলেন শাক্যবংশের প্রধান। উত্তর-প্রদেশের বস্তি জেলার পিপ্‌রাওয়ায় বা মতান্তরে নেপালের তিলৌরাকোটে শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু অবস্থিত ছিল। উহার সন্নিকটে লুম্বিনী উদ্যানে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্ভবতঃ ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গৌতম বা সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। মাতা মায়াদেবীর মৃত্যুর পর বিমাতা মহাপ্রজাবতী (মহাপজাপতি) গৌতমী তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পত্নীর নাম গোপা, যশোধরা বা ভদ্রকচ্চানা। কেহ কেহ বলেন দেবদত্ত ছিলেন গোপার সহোদর ভ্রাতা।

কথিত আছে, ক্রমান্বয়ে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখিয়া গৌতমের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে একমাত্র পুত্র রাহুলের জন্মের অত্যল্পকাল পরেই অনুচর ছন্দক এবং অশ্ব কণ্ঠককে লইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন। গৌতম প্রথমে বৈশালীনগরীতে আসেন এবং তৈর্থিক, জটিল, মুণ্ড, নির্গ্রন্থ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের সহিত পরিচিত হন কিন্তু তীর্থঙ্কর মহাবীরের সহিত তাঁহার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। আরাড় কালাম এবং রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গৌতম শ্রাবস্তী হইয়া রাজগৃহে আসেন এবং মগধরাজ বিম্বিসারের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। পরে গয়ার নিকটে কৌণ্ডিণ্য প্রভৃতি পঞ্চ সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে করিতে গৌতম অবশেষে শরীর পীড়নের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করেন। তাঁহাকে কৃচ্ছ্রত্যাগ করিতে দেখিয়া পঞ্চ সহযোগিবৃন্দ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন।

কথিত আছে, প্রায় ছয় বৎসর তপশ্চর্যার পর একদিন গোপনারী (মতান্তরে শ্রেষ্ঠিকন্যা) সুজাতা পরমান্ন দিয়া তাঁহাকে সেবা করেন। ঐ দিন নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্বা নামক স্থানে এক অশ্বত্থবৃক্ষের (পরে বোধিদ্রুম নামে খ্যাত) মূলে তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তৃণাসনে উপবিষ্ট হইলেন যে বোধিলাভ, না করা পর্যন্ত তিনি আসন ত্যাগ করিবেন না। সেই রাত্রেই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম বোধিলাভ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর। তিনি উপলব্ধি করিলেন, বিশ্বের সকল রহস্য তাঁহার নিকট উন্মোচিত হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় তৃষ্ণার ক্ষয় হইয়াছে এবং আনন্দময় নির্বাণের তিনি অধিকারী হইয়াছেন। তিনি দেখিলেন বিশ্বজগৎ এক অস্তিত্ব প্রভাবে বিধৃত (প্রতীত্যসমুৎপাদ) এবং অনাদি অবিদ্যাই ভবচক্র প্রবর্তনের মূল।

বোধিলাভ করিবার পর তিনি ঋষিপত্তনে (বর্তমান সারনাথ) গমন করেন এবং পূর্বোক্ত পঞ্চ সন্ন্যাসীর সম্মুখে নবধর্মের (মধ্যম পন্থার) যে ব্যাখ্যা করেন তাহাই ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্র।

এই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুই জগতের প্রথম পাঁচজন বৌদ্ধ; তাঁহাদের নাম কৌণ্ডিণ্য, অশ্বজিৎ, বপ্র, ভদ্রিয় এবং মহানাম। ইঁহারা চতুরার্য সত্য এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ শ্রবণ করিলেন, ইঁহাদের রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চস্কন্ধের জ্ঞান জন্মিল। ইঁহারা স্রোতাপন্ন অবস্থা হইতে সকৃদাগামী এবং অনাগামী হইয়া চরমে অর্হৎ হইলেন। ইঁহাদের পর শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ বুদ্ধের প্রথম গৃহী শিষ্য। ক্রমে যশের চারিজন বন্ধু এবং তাহাদের সঙ্গে আরও পঞ্চাশ জন মিলাইয়া বৌদ্ধ সংঘের পত্তন হয়।

পরলোক আত্মা বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় প্রশ্নে বুদ্ধ নিরুত্তর থাকিতেন। তিনি স্বয়ং কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তিনি অসামান্য দেহ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার আলাপশক্তির তীব্র আকর্ষণ ছিল। তিনি মিতাহারী, পরিশ্রমী, সৌন্দর্যপ্রিয় ও শৃঙ্খলাপ্রিয়, সাংসারিক বুদ্ধিযুক্ত, সুবক্তা এবং উত্তম সংগঠক ছিলেন। বুদ্ধের শরীরলক্ষণ ও দিনচর্যার বিবরণ মজ্ঝিম-নিকায় এবং সুমঙ্গলবিলাসিনীতে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্মশানে পরিত্যক্ত বস্ত্র হইতে তিনি নিজেই চীবর প্রস্তুত করিয়া লইতেন এবং ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া নগ্নপদে এবং পদব্রজে ৪৫ বৎসর ধরিয়া উত্তর ভারতের গ্রাম ও জনপদে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিয়া সদ্ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। কেবল বর্ষার চারিমাস এক নির্দিষ্ট স্থানে থাকিতেন বলিয়া বুদ্ধের বর্ষাবাসের কিছু ইতিহাস সংরক্ষিত হইয়াছে।

ঋষিপত্তনে বুদ্ধ প্রথম বর্ষা যাপন করেন। ঋষিপত্তন হইতে বুদ্ধ রাজগৃহে আসেন ও রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষা রাজগৃহেই যাপন করেন। বিম্বিসার বুদ্ধকে 'বেণুবন আরাম' দান করেন

এবং তাঁহার চিকিৎসক জীবক বুদ্ধকে একটি আম্রবন দান করেন। রাজগৃহেই কোলিত এবং উপতিষ্য (পরে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন) নামে দুই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আচার্য সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তকে ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করেন। ইহার পর বুদ্ধ কপিলবস্তু গমন করেন এবং পিতা মাতা ও পত্নীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বালক পুত্র রাহুল ও নাপিত উপালি দীক্ষা প্রাপ্ত হন। কোনও কোনও মতে বুদ্ধের প্রিয় সেবক আনন্দও এই সময় সংঘে যোগ দেন এবং তিনিও বুদ্ধের জ্ঞাতিভ্রাতা।

বৈশালী নগরীতে বুদ্ধ পঞ্চম বর্ষা যাপন করেন। বৈশালীর প্রসিদ্ধ গণিকা আম্রপালী শেষ জীবনে সংঘে প্রবেশ করেন। তিনি বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি আম্রবন দান করেন। কৌশাম্বী নগরীতে বুদ্ধের নবম বর্ষা উদ্‌যাপিত হয়। মথুরার নিকটে বেরঞ্জা নগরীতে বুদ্ধের দ্বাদশ বর্ষা কাটে এবং সাঙ্কাশ্য নগরীতে সহসা আবির্ভূত হইয়া তিনি বহু ধর্মোপদেশ দান করেন। শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্ত বহু দান করিয়া অনাথপিন্ডদ (অনাথপিণ্ডিক) আখ্যা প্রাপ্ত হন। তৎপ্রদত্ত জেতবনে এবং বিশাখা প্রদত্ত পূর্বারামে বুদ্ধ পঁচিশটি বর্ষা যাপন করেন। রাজা বিম্বিসারের পত্নী ক্ষেমা, প্রসেনজিৎ-মহিষী মল্লিকা এবং উদয়ন-মহিষী সামাবতী, ইঁহারা সকলেই ছিলেন বুদ্ধভক্ত।

শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী গৌতমী বুদ্ধের নিকটে সংঘ-প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। একান্ত অনিচ্ছুক হইয়াও আনন্দের আগ্রহেই বুদ্ধ নারীগণের সংঘ-প্রবেশ অনুমোদন করেন।

অবন্তীরাজ চণ্ড প্রদ্যোৎ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিলেও বুদ্ধ যান নাই। মহর্ষি অসিতের শিষ্য নালক বা মহাকচ্চায়নকে বুদ্ধ অবন্তীতে প্রেরণ করেন। ইনি অবন্তী ও দক্ষিণ ভারতে বুদ্ধবাণী প্রচার করেন। বুদ্ধশিষ্য পিপ্পলি উত্তর জীবনে মহাকাশ্যপ নামে পরিচিত হন। ইনি বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রথম মহাসঙ্গীতি আহবান করিয়া বুদ্ধবচন সংগ্রহের প্রথম প্রয়াস করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রার্থনায় দুর্দান্ত দস্যু অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ বশ করেন। ইনিও সংঘে প্রবেশ করেন।

দেবদত্ত প্রেরিত মত্তহস্তী নালাগিরিকে বশ করিলেও বুদ্ধ দেবদত্তকে বশ করিতে পারেন নাই। আজীবন বুদ্ধদ্বেষী দেবদত্ত বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুকে বুদ্ধ-বিদ্বেষী করিয়া বুদ্ধের চরম শত্রুতা করেন। রাজা প্রসেনজিতের পুত্র বিড়ুডভ কর্তৃক তিনবার শাক্য নগরী আক্রান্ত হইলে বুদ্ধের মধ্যস্থতায় তিনবারই বিরোধের মীমাংসা হয় কিন্তু বুদ্ধের জীবিতকালেই চতুর্থবার আক্রমণ করিয়া বিড়ুডভ শাক্যগৌরব সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন। রাজা বিম্বিসার, অনাথপিন্ডদ, সারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি বুদ্ধ-ভক্তগণের মৃত্যু বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই ঘটে এবং তাঁহার বার্ধক্যের দিনে সংঘেও নানা অশান্তি দেখা দেয়।

জীর্ণ শরীর লইয়া পদব্রজে বৈশালী হইতে কুশীনারা যাইবার পথে পাবাগ্রামে চুন্দ নামক কর্মকারের গৃহে সূকরমদ্দব (শূকর মাংস বা ছত্রাক) ভোজন করিয়া বুদ্ধ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, ক্রমে হিরণ্যবতী নদী পার হইয়া মল্লদেশের শালবনে আসিয়া বহু ক্লেশে শয়ন করিয়া —বয়ধম্মাসংখারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ—সমুদয় সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংসশীল, তোমরা অপ্রমাদের সহিত কার্যসম্পাদন করিও—এই শেষ বাণী উচ্চারণ করিয়া ৮০ বৎসর বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তথাগত বুদ্ধ ৪৮৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পরিনির্বাণ লাভ করেন। কুশীনগরের মল্লগণ যথানির্দিষ্ট প্রকারে বুদ্ধের শরীর দাহ করেন এবং তাঁহার দেহাবশেষ, অঙ্গার এবং শেষ জলপাত্রটি লইয়া মোট দশটি স্তূপ নির্মিত হয়।

বুদ্ধের জন্ম ও পরিনির্বাণের বৎসর যথাক্রমে ৬২৩ ও ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, এইরূপ এক মত প্রচলিত আছে। অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে এই মত অগ্রাহ্য। সিংহলে লিপিবদ্ধ এক প্রাচীন মতানুসারে অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২১৮ বৎসর পূর্বে বুদ্ধের পরিনির্বাণ ঘটিয়াছিল। ইহার এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বুদ্ধের পরিনির্বাণকালকে ৪৮৩ (বা ৪৮৬) খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং জন্মকালকে ৫৬৩ (বা ৫৬৬) খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন।

দ্র বিমলাচরণ লাহা, গৌতম বুদ্ধ, কলিকাতা, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ; অমূল্যচন্দ্র সেন, বুদ্ধকথা, কলিকাতা, ১৯৫৫; সুকুমার দত্ত, মহাপরিনির্বাণের কথা, দিল্লী, ১৯৬০।

কল্যাণী দত্ত

বুদ্ধি বুদ্ধির নানারূপ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। বিনে (Binet) বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি কতগুলি ক্ষমতার সমষ্টি মাত্র; যেমন, বিচারের ক্ষমতা, ব্যবহারিক জ্ঞান, এবং নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়ার ক্ষমতা। টারম্যান (Terman) বলিয়াছেন, বুদ্ধি হইল সেই ক্ষমতা যাহার ফলে মানুষ বিমূর্ত (abstract) বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে। ডিয়ারবর্নের (Dearborn) মতে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে যথাযথ মানাইয়া চলার ক্ষমতাই বুদ্ধি। থর্নডাইক (Thorndike) বলিয়াছেন বুদ্ধি কতগুলি বিশেষ ক্ষমতার সমষ্টি। স্পিয়ারম্যানের (Spearman) মতে সাধারণ ক্ষমতা এবং বিশেষ ক্ষমতার সমষ্টিই বুদ্ধি।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে বুদ্ধি সহজাত। যে কম বুদ্ধি লইয়া জন্মাইয়াছে তাহাকে কিছুতেই বেশি বুদ্ধি-মান করা যাইবে না, তবে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহার সেই বুদ্ধিকে ভাল কাজে লাগানো যাইতে পারে।

বুদ্ধির অগ্রগতি দুই রকম—১. লম্বভাবাপন্ন অগ্রগতি, এবং ২. সমান্তরাল অগ্রগতি। প্রথম অগ্রগতি নির্ভর করে

পৈতৃক গুণাগুণের উপর এবং মূলতঃ ইহার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় অগ্রগতি নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক প্রভাব ও শিক্ষার উপর এবং তাই এই অগ্রগতির কোনও সীমারেখা টানা যায় না। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধির দুই রকম অগ্রগতি হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার পর বুদ্ধি সমান্তরাল দিকেই অগ্রসর হয়। তাই মনোবিদ্‌গণ বলেন যে বুদ্ধি ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্তই বাড়ে, তাহার পর আর বাড়ে না, উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান ও ভাল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের দ্বারা কেবলমাত্র মার্জিত ও কার্যকর হইয়া ওঠে।

ফরাসী মনোবৈজ্ঞানিক বিনে দীর্ঘদিন গবেষণা করিয়া সর্বপ্রথম বুদ্ধি মাপার অভীক্ষা (test) বাহির করেন (পরে অবশ্য আরও অনেকে বুদ্ধি মাপার নানারূপ অভীক্ষা উদ্ভাবন করিয়াছেন)। বিনের মতে শরীরের যেমন বয়স আছে ঠিক তেমনই মনেরও বয়স আছে। মনের বয়স মাপার জন্য বিনে বিভিন্ন বয়সের উপযোগী একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী স্থির করেন। এইগুলির নির্ভুল উত্তর দেওয়ার ক্ষমতার দ্বারা যে কোনও দৈহিক বয়সের ব্যক্তির মনের বয়স নির্ণীত হয়। এই উপায়ে লব্ধ মনের বয়সকে দৈহিক বয়স দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাকে বলা হয় ঐ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক intelligence quotient বা I ors। ভগ্নাংশ এড়াইবার জন্য বুদ্ধ্যঙ্ককে ১০০ দিয়া গুণ করা হয়। মনের বয়স দৈহিক বয়সের সমান হইলে বুদ্ধ্যঙ্ক হইবে ঠিক ১০০ এবং ব্যক্তিটি হইবে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন। বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ অপেক্ষা যত বেশি হইবে ব্যক্তিটি হইবে তত বেশি বুদ্ধিমান, আর ১০০ অপেক্ষা যত কম হইবে ব্যক্তিটি হইবে তত কম বুদ্ধিমান।

বুদ্ধ্যঙ্ক অনুযায়ী মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ এই রকম ঃ

বুদ্ধ্যঙ্ক	প্রকার
৬৯ এর অনূর্ধ্ব	জড় বুদ্ধি
৭০—৭৯	জড় বুদ্ধির প্রান্তসীমা
৮০—৮৯	স্বল্প বুদ্ধি
৯০—১০৯	সাধারণ বুদ্ধি
১১০—১১৯	উচ্চ বুদ্ধি
১২০—১৩৯	তীক্ষ্ন বুদ্ধি
১৪০—তদূর্ধ্ব	সুতীক্ষ্ন বুদ্ধি

দ্র রমানাথ কুণ্ডু, 'বুদ্ধি ও ইহার পরিমাপ' যুগান্তর সাময়িকী, ১৮ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ; P. B. Ballard, *Group Tests of Intelligence*, London, 1937; F. S. Freeman, *Theory and Practice of Psychological Testing*, New York, 1955.

রমানাথ কুণ্ডু

বুধগ্রহ সৌরজগতের গ্রহগুলির মধ্যে বুধগ্রহ সূর্যের সর্বাধিক নিকটবর্তী। সূর্য হইতে বুধগ্রহের দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে, আর বুধ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে মাত্র ৮৮ দিনে। বুধ পৃথিবীর মত নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘুরপাক খাইয়া চলে না, ইহার এক পিঠ চিরকাল সূর্যের দিকে মুখ করিয়াই আছে। কাজেই সেই পিঠেই চিরকাল দিন। অন্য পিঠ অন্ধকার—চির রাত্রি। সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহটির কক্ষপথ কতকটা ডিম্বাকার। ঘুরিবার সময় যখন নিকটের দিক হইতে দূরের দিকে আসিয়া পড়ে, তখনই ভোর রাত্রিতে তাহাকে পূর্বাকাশে দেখা যায়, আর সন্ধ্যা বেলায় দেখা যায় পশ্চিমের আকাশে। পৃথিবীর চাঁদের মত বুধেরও হ্রাস-বৃদ্ধি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা আছে। বুধ আমাদের চাঁদের মত একটি শুষ্ক গ্রহ। বুধগ্রহে জল, বাতাস, বৃষ্টি কিছুই নাই।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বুনিয়াদি শিক্ষা মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষা-পদ্ধতির নাম বুনিয়াদি শিক্ষা। এই শিক্ষা সমস্ত শিক্ষার বুনিয়াদ হইবে, এই হিসাবে এই নামকরণ। কথাটি ইংরেজী Basic Education-এর অনুবাদ।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দেশবাসীর সম্মুখে এই শিক্ষা-পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। ঐ সময়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সম্মুখে দেশের শিক্ষার সমস্যা বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল। দেশের কোটি কোটি অশিক্ষিত ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন দরিদ্র দেশে সে অর্থ নাই। তাহা ছাড়া প্রচলিত শিক্ষা জাতিগঠনের উপযোগী নয়।

গান্ধীজী বলিলেন, শিক্ষার প্রথম হইতেই ছেলে সমাজজীবনের প্রয়োজনীয় কোনও একটি শিল্প শিক্ষা করিবে। এই শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সরকার কিনিয়া লইবে। ইহা হইতে যে আয় হইবে তাহাতেই শিক্ষার ব্যয় নির্বাহিত হইবে। এইভাবে শিক্ষা স্বাবলম্বী হইবে। ইহাতে শিক্ষাও ভাল হইবে। শিক্ষার অর্থ শুধু লেখাপড়া শেখা নয়, শিক্ষার অর্থ ছেলের শরীর মন ও চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ; একমাত্র এইরূপ শিক্ষা দ্বারাই তাহা হইতে পারে। তাহার উপর শিক্ষা সমাপ্তির পর ঐ শিক্ষার দ্বারা ছেলে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবে। মাতৃভাষা এই শিক্ষার বাহন হইবে এবং সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই শিক্ষা ইংরেজী বাদে বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশনের সমান হইবে।

'হরিজন' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে গান্ধীজীর এই অভিমত প্রকাশিত হয় এবং চারিদিকে ইহার সমালোচনা হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ওয়ার্ধায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের লইয়া একটি

শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করা হইল। সম্মেলন এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিলেন ঃ ১. দেশের সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য সাত বৎসরব্যাপী অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে ; ২. মাতৃভাষা এই শিক্ষার বাহন হইবে ; ৩. গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী কোনও একটি উৎপাদনাত্মক কাজের ভিতর দিয়া এই শিক্ষা দেওয়া হইবে ; ৪. আশা করা যায় এই শিক্ষা হইতে কালক্রমে শিক্ষকদের বেতন উঠিয়া আসিবে। সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের জন্য ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হইল। কমিটি যথা সময়ে সম্মেলনের সভাপতি গান্ধীজীর নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিলেন। তদবধি এই শিক্ষা পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত হইয়াছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে এই শিক্ষা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য একটি নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতির নাম হইল 'হিন্দুস্থানী তালীমী সংঘ' এবং সেবাগ্রামে ইহার সদর কার্যালয় স্থাপিত হইল। স্থির হইল এই সমিতি সেবাগ্রামে এই আদর্শে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন এবং যাঁহারা সরকারি অথবা বেসরকারিভাবে এই শিক্ষার কাজ করিবেন তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবেন।

বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও ওড়িশা এই ছয়টি প্রদেশে সরকারিভাবে বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তিত হইল। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীরে এবং বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও বেসরকারিভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার কাজ আরম্ভ হইল। সর্বত্রই হিন্দুস্থানী তালীমী সংঘের নির্দেশ অনুসারে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইতে লাগিল। সেবাগ্রামে হিন্দুস্থানী তালীমী সংঘের তত্ত্বাবধানে একটি বুনিয়াদি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ও একটি আদর্শ বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিলে যেখানে যেখানে সরকারিভাবে বুনিয়াদি শিক্ষার কাজ চলিতেছিল প্রায় সর্বত্রই তাহা বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষদ তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত কমিটির পরামর্শ অনুসারে ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি স্বীকার করিয়া লইয়া কয়েকটি বিষয়ে এই পরিকল্পনা কিছু কিছু পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা বুনিয়াদি শিক্ষার কাল সাত বৎসরের স্থানে আট বৎসর করিবার এবং সমগ্র বুনিয়াদি শিক্ষাকে নিম্ন বুনিয়াদি ও উচ্চ বুনিয়াদি এই দুই ভাগে ভাগ করিবার কথা বলিলেন। তাহার মধ্যে নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার শিক্ষাকাল পাঁচ বৎসর এবং উচ্চবুনিয়াদি শিক্ষার শিক্ষাকাল তিন বৎসর হইবে। তাঁহারা বলিলেন, ছাত্রদের শিল্পকর্মের আয় হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্বাহ হওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনীয় শিল্পের সরঞ্জাম এবং শিল্পোপকরণের ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। এই পরিবর্তিত পরিকল্পনা সার্জেণ্ট পরিকল্পনা বলিয়া পরিচিত।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারত-সরকার বুনিয়াদি শিক্ষাপদ্ধতিকে সমগ্র ভারতের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে সর্বত্রই ধীরে ধীরে বুনিয়াদি শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইতেছে।

তবে ভারতে সরকারিভাবে যে বুনিয়াদি শিক্ষা চলিতেছে তাহা ঠিক গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষা নয়, অনেকটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-পর্ষদের দ্বারা গৃহীত পরিবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষা। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে এক নূতন বিকেন্দ্রীকৃত সমাজ গঠনের যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা ছিল, বর্তমান বুনিয়াদি শিক্ষায় তাহা নাই।

তাহা হইলেও প্রচলিত শিক্ষার তুলনায় এই বুনিয়াদি শিক্ষারও উপযোগিতা আছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বলিয়া ইহা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া শিশুমনের বেশি উপযোগী। তাহা ছাড়া আমাদের দরিদ্র দেশে সার্বজনিক শিক্ষার ব্যয়-হ্রাসের জন্য শিক্ষার ভিতর দিয়া আংশিকভাবেও শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে।

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

বুন্দেলখণ্ড মধ্যপ্রদেশ দ্র

বুন্দেলা মধ্যপ্রদেশ দ্র

বুন্দেলী হিন্দী দ্র

বুর্নুফ, উজ্যান (১৮০১–১৮৫২ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী সংস্কৃত ভাষাবিদ্ ও প্রাচ্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ। তিনি ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজকীয় বিদ্যালয় 'কল্যাজ দ্য ফ্র্‌স্'-এর প্রথম সংস্কৃতাধ্যাপক আঁতোয়ান লেওনার্ দ্য শেজির নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শেজির মৃত্যু হইলে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবন প্রাচ্যবিদ্যার নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন, গবেষণা ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত হইয়াছিল।

তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যের, আলোচনাতেই বুর্নুফের স্বাভাবিক প্রবণতা ও সর্বাধিক আনন্দ ছিল। এই বিষয়ে সমসাময়িক জার্মান প্রাচ্যবিদ্ বপের দৃষ্টান্তে তিনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তিনি ক্রমশঃ সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কান্বিত স্থবিরবাদ বৌদ্ধশাস্ত্রের বাহন পালি ও ইরানের সুপ্রাচীন জরথুশ্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার ভাষায় বিশিষ্ট অধিকার

অর্জন করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টিয়ান লাসেনের সহযোগিতায় পালিভাষাসম্পর্কে তাঁহার সুবিখ্যাত গবেষণা-গ্রন্থ 'এসে সুর ল্য পালি' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে পালিই মূল মাগধী ভাষা—সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রচলিত এই মতের বিরুদ্ধে নানা যুক্তি প্রদত্ত হইয়াছে; সংস্কৃতের সহিত পালির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ বিশেষ যত্নসহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে; পালি ব্যাকরণের সূত্রগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে; এবং তৎকাল যাবৎ আবিষ্কৃত পালি গ্রন্থসকলের বিষয়বস্তু বিশ্লেষিত হইয়াছে। আধুনিক কালে বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণার ইতিহাসে এই গ্রন্থ যথার্থই দিগ্দর্শক ও বর্নুফের ক্ষেত্রে ইহা তাঁহার উত্তরকালীন বৌদ্ধধর্মগবেষণার পথপ্রশস্তকারী। বর্নুফ যে কালে অবেস্তার চর্চা আরম্ভ করেন তখন এই প্রাচীন পারসীক ধর্মগ্রন্থের ভাষাসম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত-সমাজের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যের সহিত তাঁহার গভীর পরিচয়হেতু বর্নুফই প্রথম দেখাইতে সমর্থ হইলেন, মূল জরথুশ্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থের ভাষা প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতের সগোত্র ও বৈদিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা উক্ত ভাষা ও শাস্ত্র অনুশীলনের নির্ভুল ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই বিষয়ে তিনি যে সকল গবেষণামূলক গ্রন্থ-প্রবন্ধ রচনাপূর্বক এক নূতন জ্ঞানরাজ্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান: ১. 'ভেন্দিদাদ সাদে' (১৮২৯—৪৩ খ্রী) ২. 'কোমাঁত্যার সুর ল্য যশ্ন' (১৮৩৩ খ্রী) ৩. 'এত্যুদ সুর লা লাঁগ এ লে তেক্স্ত জাঁদ্' (১৮৪০—৫০ খ্রী)। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে অবেস্তার ভাষার একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও একটি শব্দকোষ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'মেমোয়্যার সুর দ্যোজ্যাঁস্ক্রিপশিয়ঁ ক্যুনিফোর্ম ত্রুভে প্রে দ্য হামাদান' গ্রন্থে তিনি পারস্যের হামাদানে আবিষ্কৃত হখামনীষ-বংশীয় দরেইওস (Darius) ও ক্সের্ক্সেস (Xerxes) নামক সম্রাটদ্বয়ের দুইখানি অনুশাসনের পূর্ণ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও অবেস্তার ভাষার সহিত উক্ত লেখদ্বয়ে ব্যবহৃত প্রাচীন পারসীক ভাষার নিকট সাদৃশ্য দেখাইয়া প্রাচীন পারসীক ক্ষোদিতলিপি-চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই বর্নুফের অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৮৪০ হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ভাগবত পুরাণের অধিকাংশ ফরাসী অনুবাদসহ ৩ খণ্ডে সম্পাদনপূর্বক প্রকাশ করেন। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রে বর্নুফের দুইখানি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রথমখানি 'অ্যাঁত্রোদ্যুক্শিয়ঁ আ লিস্তোয়ার্ দ্যু বুদ্ধিজ্ম্ যাঁদিয়ঁ' (১৮৪৪ খ্রী) অথবা ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এই গ্রন্থেও তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তুলনামূলক পদ্ধতিতে সিংহল, তিব্বত, নেপাল, চীন, মঙ্গোলিয়া, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশে প্রাপ্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানপূর্বক বৌদ্ধধর্মের বিকাশের একটি একদেশদর্শিতা-মুক্ত নির্ভরযোগ্য চিত্র দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম-বিষয়ক তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ হজ্‌সন কর্তৃক নেপাল হইতে আবিষ্কৃত সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-এর সটীক ফরাসী অনুবাদ (১৮৫২ খ্রী)।

তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে ফ্রীড্রীশ ম্যাক্স্‌ম্যুলের ও রুডল্ফ ফন রোট উত্তরকালে যথাক্রমে ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানীতে বৈদিক সাহিত্যের সার্থক গবেষণা করিয়া গুরুর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ফরাসী দেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার মুখ্য কেন্দ্র 'সোসিয়েতে আজিয়াতিক'-এরও বর্নুফ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

বৃক্ক দেহ হইতে অনুদ্বায়ী বর্জ্যদ্রব্য রেচনের মুখ্য অঙ্গ। কটিদেশে মেরুদণ্ডের প্রতি পার্শ্বে একটি বৃহৎ শিম্বাকৃতি বৃক্ক অবস্থিত। প্রত্যেক বৃক্ক হইতে গবিনী (ইউরেটার) নামক একটি নালী মূত্রস্থলীতে (ব্লাডার) গিয়া পড়ে। বৃক্কে মূত্র উৎপন্ন হয়, এই মূত্র অতঃপর গবিনী বাহিয়া মূত্রস্থলীতে গিয়া সঞ্চিত হয় এবং মূত্রত্যাগের সময় মূত্রনালী দিয়া দেহের বাহিরে যায়। মূত্র মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্জ্যদ্রব্যের জলীয় দ্রবণ।

বৃক্ক বহু ক্ষুদ্র রেচন-যন্ত্র বা 'নেফ্রন' দ্বারা গঠিত। নেফ্রন আণুবীক্ষণিক প্রণালী, ইহার গাত্র একটিমাত্র কোষ-স্তরে নির্মিত, ইহার এক প্রান্ত রুদ্ধ ও অপর প্রান্ত উন্মুক্ত। প্রত্যেক নেফ্রনের রুদ্ধ প্রান্তের নিকটে থাকে ধমনীশাখা (আর্টেরিওল) হইতে উদ্ভূত বহু জালকের (ক্যাপিলারি) একটি গুচ্ছ (গ্লোমেরিউলাস)। নেফ্রনের রুদ্ধ প্রান্তটি আবরণীর আকারে এই গুচ্ছের গাত্রে সংলগ্ন; নেফ্রনের এ অংশের নাম বোম্যান্স্ ক্যাপ্সিউল। নেফ্রনের অবশিষ্টাংশ টিবিউল নামে পরিচিত—ইহার প্রথম ও তৃতীয় ভাগ অত্যন্ত জটিল (কন্ভলিউটেড) এবং দ্বিতীয় ভাগ ইংরেজী 'U' অর্থাৎ 'লুপ'-এর মত। টিবিউলের শেষে নেফ্রনের উন্মুক্ত প্রান্তটি কালেক্টিং টিবিউল নামক নালিকায় গিয়া পড়ে।

রক্তচাপের সাহায্যে গ্লোমেরিউলাসের রক্ত হইতে প্রোটিন ব্যতীত রক্তরসের অন্যান্য পদার্থ পরিস্রুত হইয়া নেফ্রনের প্রথম অংশে (বোম্যান্স ক্যাপসিউল) আসে। রক্তরসের প্রোটিনের অভিস্রাবক প্রেষ (অস্মোটিক প্রেসার) এবং নেফ্রনের মধ্যে ইতঃপূর্বে পরিস্রুত দ্রবণের চাপ এই পরিস্রবণের সময়ে রক্তচাপের বিরোধিতা করে। পরিস্রুত দ্রবণটি ক্রমে নেফ্রন দিয়া আগাইয়া চলার সময় টিবিউলের বিভিন্ন অংশের কোষগুলি উহা হইতে নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী অল্পাধিক শোষণ করিয়া রক্তে ফিরাইয়া দেয়। টিবিউলের

কোষগুলির ক্ষরণের দ্বারা কিছু কিছু নূতন বর্জ্যদ্রব্যও পরিশ্রুত দ্রবণটিতে যুক্ত হয়। এভাবে নেফ্রনের বিভিন্ন অংশে পরিস্রবণ, বিশোষণ ও ক্ষরণ—এই তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে মূত্র উৎপন্ন হয়। নেফ্রন হইতে মূত্র কালেক্টিং টিবিউল-এ আসে ও ক্রমে বৃক্ক হইতে গবিনী দিয়া মূত্র-স্থলীতে যায়।

অতিরিক্ত অম্ল ও ক্ষার দেহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া বৃক্ক দেহে অম্ল ও ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে। অতিরিক্ত জল দেহ হইতে অপসারণ করিয়া বৃক্ক দেহে জলের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য বর্জ্যদ্রব্য রেচন করিয়াও বৃক্ক দেহাভ্যন্তরে স্বাভাবিক অবস্থার স্থায়িত্ব বিধান করে।

দ্র C. H. Best & N. B. Taylor, *The Physiological Basis of Medical Practice*, Baltimore, 1961.

অজিতকুমার চৌধুরী

বৃদ্ধি আভ্যুদয়িক দ্র

বৃন্দাবন উত্তর প্রদেশের মথুরা জেলার একটি শহর ও বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ (২৭°৩৩′ উঃ, ৭৭°৪৪′ পূঃ)। ইহা মথুরা হইতে প্রায় ১০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। পূর্বে যমুনা বৃন্দাবনের পাশ দিয়া বহিত কিন্তু বর্তমানে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। মথুরা হইতে বাসে টাঙ্গায় বা ছোট লাইনের ট্রেনে বৃন্দাবনে যাওয়া যায়। লোকসংখ্যা ২৫১৩৮ (১৯৬১ খ্রী)। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন পৌরসভার অন্তর্গত হয়।

বরাহপুরাণ অনুযায়ী মথুরার দ্বাদশ বনের একটি হইল বৃন্দাবন। বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র অনুসারে বৃন্দাবনের বিস্তৃতি পঞ্চ যোজন, শ্রীমদ্‌ভাগবত অনুসারে ষোড়শ ক্রোশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন, "চৌরাশীক্রোশবেষ্টিত শ্রীব্রজমণ্ডল"। আধুনিক যুগে বৃন্দাবনের পরিক্রমা ৬·৪ কিলোমিটার। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন। এইখানে কালিন্দীর (যমুনার) কূলে তাঁহার রাসলীলা হইয়াছিল। কথিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের কেলিলীলার বিস্মৃত বার্তাকে শ্রীচৈতন্য পুনরায় প্রচলিত করেন (চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৯।৪৮)। কিন্তু খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের বহু গ্রন্থে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছিল।

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন (বা মদন গোপাল), গোবিন্দ ও গোপীনাথের মন্দির সর্বপ্রাচীন। ইহাদের নির্মাণকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক। কিংবদন্তী অনুসারে রামদাস (বা কৃষ্ণদাস) নামে এক মুলতানী বণিক মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের শিলালিপি হইতে জানা যায়, রামচন্দ্রের পুত্র গুণানন্দ ইহা নির্মাণ করান। গুণানন্দ ইতিহাসে অজ্ঞাতনামা। সম্ভবতঃ শূরবংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে মন্দিরটি স্থাপিত হয়। কবি সুরদাসের লেখায় মদনমোহনের উল্লেখ আছে। গোবিন্দজী মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রধান এবং মন্দিরস্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। গোপীনাথের মন্দিরের নির্মাতা ছিলেন কাছোয়া রাজা রায়সালজী (আকবরের অধীনস্থ সেনাপতি)।

কেশিঘাটে যুগোলকিশোর মন্দিরের নির্মাণকাল সম্ভবতঃ ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দ ; কথিত হয়, এই মন্দিরটির নির্মাতা নোন্‌করণ (বা নেওকরণ) নামক এক নৃপতি। ইহার নাটমণ্ডপের খিলানের নীচে গোবর্ধনলীলা ক্ষোদিত। রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হরিবংশ গোঁসাই রাধাবল্লভ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৮৩ খ্রী), এইরূপ জনশ্রুতি।

পরবর্তীকালীন মন্দিরগুলির মধ্যে মথুরার শেঠদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতীয় শৈলীতে নির্মিত শ্রীরঙ্গজীর মন্দির ('শেঠের মন্দির') বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক মন্দির হইল বঙ্কেবিহারী (স্বামী হরিদাসের শিষ্যদের দ্বারা স্থাপিত), রাধারমণ, রাধাবিনোদ, রাধাদামোদর, সাক্ষিগোপাল, শ্যামসুন্দর ইত্যাদি।

প্রাচীন মন্দিরগুলির প্রায় সব কয়টিরই ভগ্নদশা। অন্ততঃ পাঁচটি মন্দিরের বিগ্রহ স্থানান্তরিত। সনাতন গোস্বামী স্থাপিত মদনমোহনের আদি বিগ্রহ বর্তমানে করৌলিতে অবস্থিত। গোপীনাথ মন্দিরের পার্শ্বে নূতন মদনমোহনের মন্দির নন্দকুমার ঘোষ নির্মাণ করান (১৮২১ খ্রী)।

ভকতপ্রসাদ মজুমদার

বৃন্দাবনদাস বাংলাভাষায় শ্রীচৈতন্যের চরিতকারদের মধ্যে প্রথম ও অদ্বিতীয় লেখক, শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণীর বয়স ছিল চার বৎসর। কবি যদি নারায়ণীর ১৪।১৫ বৎসর বয়সে জন্মিয়া থাকেন তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা তিনি মাত্র ৩৭।৩৮ বৎসরের ছোট ছিলেন। তাহা ছাড়া বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ও কনিষ্ঠতম শিষ্য ছিলেন। তিনি বারংবার লিখিয়াছেন যে নিত্যানন্দের নিকট শুনিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে ঐতিহাসিকের চোখে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মূল্য খুব বেশি। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিকর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় বৃন্দাবনদাসকে বেদব্যাসের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। জয়ানন্দ, লোচন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থকে প্রামাণিক আকর রূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ বা অদ্বৈত প্রভুর তিরোধান কাহিনীর, এমন কি তাঁহাদের শেষ বয়সের লীলারও উল্লেখ নাই। ইহাতে নিত্যানন্দের বিবাহের ও গঙ্গাদেবী, বীরভদ্র প্রভৃতি

সন্তানদের কোনও বিবরণ নাই। 'নিত্যানন্দবংশবিস্তার' এবং 'চৈতন্যভাগবতের অবশিষ্ট অধ্যায়ত্রয়' বৃন্দাবনদাসের দ্বারা রচিত হয় নাই বলিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন। কবির শ্রীপাট বর্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামে। কথিত আছে সেইখানে বসিয়াই তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাসের ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তাঁহার বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবেরা নিত্য শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক ঘটনার প্রভাব হইতে ইহা মুক্ত নহে।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, চৈতন্যভাগবত, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ।

বিমানবিহারী মজুমদার

বৃষকাষ্ঠ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বৃষোৎসর্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃষ বন্ধন করিবার তিন-চার হাত লম্বা এক বিঘত পরিমাণ চওড়া কাষ্ঠ। বেল বা তদভাবে অন্য গাছ হইতে ইহা তৈয়ার করা হয়। ইহার অগ্রভাগ ক্রমসূক্ষ্ম; সূক্ষ্ম অংশের নীচের দিকে শিবমন্দির শিবলিঙ্গ প্রভৃতি উৎকীর্ণ হয়। যজ্ঞীয় পশুবন্ধন কাষ্ঠ হিসাবে শিষ্টসমাজে ইহা যূপকাষ্ঠ নামে পরিচিত। জনসাধারণ ইহাকে বৃষকাষ্ঠ বা ব্রেষ (বৃষ) বলিয়া থাকে। শ্রাদ্ধান্তে ইহা শবের মত বহন করিয়া লইয়া গিয়া শ্মশানে বা জলের ধারে পুঁতিয়া রাখা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বৃষোৎসর্গ আদ্যশ্রাদ্ধের বিশিষ্ট অঙ্গ। মৃতের স্বর্গ-কামনায় আড়ম্বরপূর্ণ এই অনুষ্ঠান করা হয়। ইহাতে চারিটি বৎসতরী সহিত - একটি বৃষকে যথেচ্ছ বিচরণের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অশক্ত পক্ষে চারিটির স্থলে দুইটি বা তাহাও সম্ভব না হইলে অগত্যা একটি বাছুর দিয়াও কাজ চলিতে পারে। উত্তপ্ত লোহার সাহায্যে বৃষের গাত্রে গোয়ালা দিয়া ত্রিশূল ও চক্রচিহ্ন আঁকিয়া দেওয়া হয়। বৃষকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হয় সে যেন পরের শস্য আহার ও গর্ভিণী গাভীকে আক্রমণ না করে। বৎসতরীদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাহাদের এই যুবা পতি দেওয়া হইতেছে—ইহার সহিত তাহারা বিচরণ ও ক্রীড়া করিবে। এই বৃষ ও বাছুরকে কোনও কাজে লাগান, এমন কি ইহাদের দুগ্ধ পান করাও নিষিদ্ধ।

বৃষোৎসর্গ প্রাচীন অনুষ্ঠান। বৈদিক সাহিত্যেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। তবে তাহাতে শ্রাদ্ধের সহিত ইহার যোগ দেখা যায় না। পরবর্তী কালেও জীবিতাবস্থায় পুণ্য লাভ কামনায় বৃষোৎসর্গানুষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও মাটির তৈয়ারী নীল রঙের বৃষ উৎসর্গ করিবার রীতি দেখা যায়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বৃষ্টিপাত বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যথাক্রমে মেঘ ও বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের বৃষ্টিপাত হইতে পারে কিন্তু মূলতঃ ইহার জন্য জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনই দায়ী। নানারূপ পরিবেশে এই ঘনীভবন সংঘটিত হইতে পারে।

ভূপৃষ্ঠ অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার ফলে তথায় নিম্ন চাপ সৃষ্ট হয় এবং উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলও উত্তপ্ত ও হাল্কা হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। বায়ু যতই উপরে উঠিতে থাকে বায়ুস্তরের চাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, ফলে বায়ু ছড়াইয়া পড়িয়া ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে। শীতলতার ফলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইয়া বায়ু পরিপৃক্ত হয় এবং ঘনীভবন ও বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। এইরূপে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহাকে "পরিচলন বৃষ্টি" (Convectional Rainfall) বলে। সাধারণতঃ নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ে এই ধরনের বৃষ্টি খুব বেশী দৃষ্ট হয়।

বায়ুপ্রবাহের গতিপথে যদি উচ্চ মালভূমি অথবা পাহাড়-পর্বত থাকে তাহা হইলে বাধা পাইয়া পহাড়ের গা বাহিয়া বায়ু ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে। এই আরোহণের ফলে বায়ু যতই উচ্চে উঠে ততই বায়ুর চাপ ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়ার ফলে ঘনীভবন হয় ও পর্বতের প্রতিবাত ঢালে বৃষ্টি হয়। এইরূপ বৃষ্টিপাতকে "শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি" বলে। প্রতিবাত ঢালে বর্ষণ করিয়া বায়ুটি পর্বত অতিক্রম করিয়া তাহার অনুবাত ঢালে নামিতে থাকে। বায়ুর এই অবরোহণের ফলে ইহা ক্রমশঃ উত্তপ্ততর হয় এবং শুষ্কতার সৃষ্টি করে। শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন পর্বতের অনুবাত ঢালকে বলা হয় "বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল"।

বিভিন্ন উষ্ণতাবিশিষ্ট ও জলীয় বাষ্পবিশিষ্ট দুইটি বায়ুপ্রবাহ যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয় তখন ঘূর্ণবাত-সহ বৃষ্টিপাত হয়। ইহাকে "ঘূর্ণবাত বৃষ্টি" (Frontal or Cyclonic Rainfall) বলে। মেরুবৃত্তের নিকটবর্তী স্থানে এই জাতীয় বৃষ্টিপাত হয়।

ইহা ছাড়াও নানারূপে স্থানীয় পরিবেশে বিভিন্নরূপে বৃষ্টিপাত হয়, যেমন, অরণ্যাঞ্চলের বৃষ্টিপাত, মৌসুমী বৃষ্টিপাত ইত্যাদি। অরণ্যস্থিত পত্রবহুল বৃক্ষরাজি হইতে নির্গত বাষ্প শীতলতার সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহকে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহত্তর মহাদেশীয় সংস্করণ বলা চলে। ইহা হইতে ঋতুভেদে মৌসুমী বৃষ্টিপাত ঘটে।

বৃষ্টিমাপক যন্ত্র বা 'রেইন গেজ' দ্বারা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাপা হয়। ঋতুভেদে যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ একই, সেগুলিকে 'সমবর্ষণ রেখা' দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

বৃহৎকথা বৃহৎকথা নামে কোনও গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বিবিধ গ্রন্থে, বিশেষতঃ 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, গুণাঢ্য নামক জনৈক পণ্ডিত কলাপ-ব্যাকরণ-রচয়িতা সর্ববর্মার সঙ্গে পণে পরাস্ত হইয়া বিন্ধ্যপর্বতে বাস করেন এবং সেখানে পণের সর্তানুসারে সংস্কৃতভাষার চর্চা বর্জনপূর্বক পৈশাচী প্রাকৃতে সাত লক্ষ শ্লোকে বৃহৎকথা রচনা করেন। ইহার মূল রূপ অজ্ঞাত। ইহা অবলম্বনে রচিত কাশ্মীরী ও নেপালী এই দুই রূপের তিনটি পদ্যে রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। প্রথম রূপের দুইটি গ্রন্থ—ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' (১০৩৭ খ্রী) ও সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' (১০৬৩-৮১ খ্রী)। নেপালীরূপের গ্রন্থটির নাম 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' (খ্রীষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতকের মধ্যবর্তী), রচয়িতা বুধস্বামী। গুণাঢ্যের কাল অজ্ঞাত। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' ও সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'য় 'বৃহৎকথা'র উল্লেখ হইতে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের পূর্বেই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উক্ত উভয়রূপের গ্রন্থেই উদয়নের পুত্র নরবাহনদত্তের কীর্তিকলাপ, 'মদনমঞ্চুকা' নামক কন্যার পাণিগ্রহণ ও বিদ্যাধরগণের রাজ্যলাভ প্রভৃতি প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। উদয়নের কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যে সুবিদিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহৎসংহিতা বরাহমিহির দ্র

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ঃ শুক্ল যজুর্বেদীয় উপনিষৎ, শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত। শতপথব্রাহ্মণে দুই কাণ্ড (প্রবর্গ্য ও মধু) আরণ্যকের পর উপনিষৎ, তাই ইহা সংহিতোপনিষৎ নহে, আরণ্যকোপনিষৎ। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে (৩।১১০) ইহা আরণ্যক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর বৃহদারণ্যকের কাণ্বশাখীয় পাঠ গ্রহণ করার ফলে সর্বত্র সেই পাঠই আলোচিত হইয়া থাকে। আয়তনে, বিষয়বাহুল্যে এবং অর্থ গৌরবে ইহা উপলব্ধ উপনিষদগুলির মধ্যে বাস্তবিকই বৃহৎ। ইহাতে তিন কাণ্ড ও ছয় অধ্যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় লইয়া মধুকাণ্ড, ইহা আগম-বা-উপদেশ-প্রধান। প্রথম অধ্যায়ে অশ্বমেধবিজ্ঞান, উদ্‌গীথ উপাসনা ও সপ্তান্নবিদ্যা বিবৃত হইয়াছে। পরবর্তী অধ্যায়ে বালাকি অজাতশত্রু এবং যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ। প্রথম অধ্যায়ে 'অধ্যারোপ' রীতি যোগে ব্রহ্মে আরোপিত প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও বিস্তার দেখান হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'অপবাদ' রীতিতে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ের পঞ্চমে অর্থাৎ মধু ব্রাহ্মণে 'ত্বাষ্ট্র' এবং 'কক্ষ্য' মধুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই মধুবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, যাহা ইন্দ্রের নিকট পাইয়া দধ্যঙ্ আথর্বন অশ্বশির ধারণপূর্বক অশ্বিদ্বয়কে দান করেন (ঋক্, সং, ১।১১৬ দ্র)। মধু হইল পরম রহস্য, তাই উহা কক্ষ্য বা গোপনীয়। ত্বাষ্ট্র মধু হইল ত্বষ্টা বা আদিত্যসম্বন্ধী মধু। আদিত্যই যজ্ঞশির এবং যজ্ঞশির বলিতে সমুদয় প্রবর্গ্য কর্ম বুঝায়। তাই বৃহদারণ্যকের ন্যায় প্রধানতম উপনিষদের শীর্ষে বা প্রথমকাণ্ডে এই প্রবর্গ্য কর্মবিজ্ঞান থাকায় উহা দ্বারা জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের অচ্ছেদ্য ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রমাণিত হইতেছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় লইয়া যাজ্ঞবল্ক্য বা মুনিকাণ্ড। ইহা উপপত্তি-বা-যুক্তি-প্রধান তৃতীয় অধ্যায়ে 'জল্পন্যায়' এবং চতুর্থে 'বাদন্যায়' অবলম্বনে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য স্থাপিত করিয়াছেন। ক্রমান্বয়ে অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কহোল, গার্গী ও উদ্দালকের সহিত জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের আলোচনাই তৃতীয়ের বিষয়। চতুর্থ অধ্যায়টি সম্পূর্ণই জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় লইয়া খিল বা শেষ কাণ্ডে উপদেশ ও উপপত্তির পর উপাসনার কথা। পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চদশটি ব্রাহ্মণে সমগ্র আরণ্যকের সারবস্তু পুনরায় প্রদত্ত হইয়াছে। ষষ্ঠে প্রাণের উপাসনা ও পঞ্চাগ্নিবিদ্যার পর ব্রহ্মচর্য সাধনের ও সৎপুত্র লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তিনকাণ্ডের তিনটি বংশ ব্রাহ্মণে ব্রহ্মবিদ্যার সম্প্রদায় ক্রমে গুরু-পরম্পরা নির্দিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতই এই তিন কাণ্ডের মধ্যে সুন্দর ঐক্য থাকায় ইহাকে কেবল সংকলন পুস্তক মনে করার কোনই কারণ নাই।

দ্র দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ, কলিকাতা, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ; যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থ, বেদের মন্ত্রভাগে অধ্যাত্মবিদ্যা, কলিকাতা, ১৯৬৫।

কল্যাণী দত্ত

বৃহস্পতি১ দেবগুরু। ইঁহার পিতা আঙ্গিরস অথর্বা ও মাতা সুরূপা। ঋগ্‌বেদে ইনি দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে বৃহস্পতিই ব্রহ্মা এবং যজ্ঞস্বরূপ। পরবর্তী সাহিত্যে ইনি দেবগণের আচার্য, আদিত্যস্বরূপ।

বৃহস্পতিই ব্যাসরূপে জন্ম লইয়া বেদ বিভাগ করেন (বিষ্ণু পুঃ)। ইনি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না, তাই পুত্র কচকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের নিকট উক্ত বিদ্যালাভের নিমিত্ত প্রেরণ করেন (মহাভা-আদি)। বৃহস্পতির এক পুত্র ঋষি ভরদ্বাজ (অগ্নি পুঃ)। বৃহস্পতি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ মমতার গর্ভস্থ পুত্রকে অভিশাপ দেন। ফলে অন্ধ অবস্থায় দীর্ঘতমা মুনির জন্ম হয় (মহাভা-আদি)। বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে চন্দ্রের পুত্র বুধের জন্ম হয়।

কল্যাণী দত্ত

বৃহস্পতি² ইঁহার নামে বৃহস্পতি স্মৃতি ও বার্হস্পত্য-সূত্র নামক অর্থশাস্ত্রের গ্রন্থ প্রচলিত আছে। বৃহস্পতি স্মৃতি মনুস্মৃতির বার্তিক মাত্র। সম্ভবতঃ মৌর্যযুগের শেষভাগে এই স্মৃতি রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে বিচারকার্য অধ্যক্ষ বা বিচারপতি সভ্যদের সাহায্যে নিষ্পন্ন করিতেন, রাজা তাঁহাদের অভিমত অনুসারে দণ্ড দিতেন মাত্র। বৃহস্পতির মতে সভ্যের সংখ্যা তিন, পাঁচ বা সাত হইতে পারিত। সৈন্যদের জন্য আদালত সেনানিবেশেই বসিত। বৃহস্পতি পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগের যে বিধান দিয়াছেন তাহা হইতেই পরবর্তীকালে মিতাক্ষরা আইনের প্রবর্তন হয়।

বার্হস্পত্যসূত্রের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। কিন্তু মহাভারত ও অর্থ-শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন কালেও বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্রের প্রচলন ছিল। বৃহস্পতি দণ্ডনীতির উগ্র সমর্থক। তিনি বলেন, যে রাজা দণ্ডনীতি অধ্যয়নে অব-হেলা করে পতঙ্গের মত তাহাকে অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হয়। জনমত সমর্থনের জন্য রাজা ধর্মকেও অমান্য করিতে পারেন। আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে কৌটিল্যের মতের অনুবর্তন করা হইয়াছে। বৃহস্পতির মতে মন্ত্রণার উপরই রাজার কৃতকার্যতা নির্ভর করে। সুতরাং রাজার উচিত উপযুক্ত মন্ত্রী নিয়োগ এবং স্থিরচিত্তে তাঁহাদের মন্ত্রণা শ্রবণ।

দ্র R. C. Majumdar ed. *History and Culture of the Indian People*, vol. II, Bombay. 1951 ; U. N. Ghoshal. *History of Indian Political Ideas*, Oxford, 1959.

বিমানবিহারী মজুমদার

বৃহস্পতি³ (জুপিটার) বৃহস্পতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। ঔজ্জ্বল্যের দিক হইতে শুক্র গ্রহের (শুকতারার) পরে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হইলেও সাধারণ কোনও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া গ্রহটিকে খালি চোখে দেখা যায় না। বৃহস্পতি সূর্য হইতে প্রায় আটচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে রহিয়াছে। এতদূরে আছে বলিয়াই পৃথিবী সূর্য হইতে যে তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তাহার সাতাশ ভাগের একভাগ মাত্র। গড় উত্তাপ—১৫০° সেন্টি-গ্রেড। বৃহস্পতির ব্যাস প্রায় ৮৮৭৭০ মাইল ; আমাদের প্রায় বার (১১·৮৬) বৎসরে বৃহস্পতি সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরিয়া আসিতে বৃহস্পতির লাগে মাত্র ১০ ঘণ্টা। কাজেই পৃথিবীর একদিন ২৪ ঘণ্টায় আর বৃহস্পতির একদিন হয় ১০ ঘণ্টায়।

বৃহস্পতির আকার বড় হইলেও তাহার ওজন মাত্র তিন শত পৃথিবীর ওজনের সমান। এই কারণে এক সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা হইয়াছিল যে, বৃহস্পতির মধ্যে কোনও নিরেট পদার্থের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে, বৃহস্পতির মধ্যে কঠিন পদার্থেরও অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই কঠিন পদার্থ প্রায় ২২ হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহার উপরে প্রায় ১৬ হাজার মাইল বরফের স্তর জমাট বাঁধিয়া আছে। বৃহস্পতির গায়ে সমান্তরালভাবে কতকগুলি কালো রেখা বা বেল্টের মত দাগ দেখা যায়। উজ্জ্বল স্থানের দ্বারা পৃথকীকৃত এই বেল্টগুলিকে 'জোন' বা মণ্ডল বলা হয়। আধুনিক উন্নত ধরণের টেলিস্কোপে এই বেল্টগুলিকে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত দেখা যায়।

বৃহস্পতির আজ পর্যন্ত বারটি উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

বৃহস্পতি রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, প্রথিতযশা পণ্ডিত ও টীকাকার। পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীল-সুখায়ী (পাঠান্তরে নীলমুখায়ী), পত্নীর নাম নির্বৃতা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে রমা)। গুরু শ্রীধরের নিকট হইতে তাঁহার বাগ্‌বিশুদ্ধি হয় ও তিনি মিশ্র উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বিশ্রাম ও রাম (মতান্তরে বিশ্বাস ও রায়) নামে দুই বিখ্যাত পুত্রের নাম পাওয়া যায়। বৃহস্পতি মিশ্রের গ্রন্থাবলীঃ ১. সুবোধা নামে কুমারসম্ভবটীকা ; ২. রঘুবংশবিবেক নামে রঘুবংশটীকা ; ৩। নির্ণয়বৃহস্পতি নামে শিশুপালবধটীকা; ৪. পদ-চন্দ্রিকা নামে অমরকোষটীকা ; ৫. রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও শুদ্ধিতত্ত্বে উল্লিখিত রায়মুকুটপদ্ধতি ; ৬. স্মৃতিরত্ন-হার; ৭. বোধবতী নামে মেঘদূতটীকা; ৮. গীত-গোবিন্দের টীকা। তাঁহার নানা উপাধি ছিল—মহীন্তাপনীয়, কবিচক্রবর্তী, রাজপণ্ডিত, পণ্ডিতসার্বভৌম, পণ্ডিত-চূড়ামণি, মহাচার্য, রায়মুকুট। বৃহস্পতি মিশ্রের পৃষ্ঠ-পোষকগণের মধ্যে প্রথমে নাম করিতে হয় গৌড়াধিপ জালালুদ্দীনের ও পরে বারবক শাহের। তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী। স্মৃতিরত্নহার আনুমানিক ১৪৩০ হইতে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ও পদচন্দ্রিকা ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। রায়মুকুট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ও "মহিন্তা" শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও সম্ভবতঃ গৌড়াধিপের অধীনে উচ্চ রাজ-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। উজ্জ্বল মণিময়হার, ভাস্কর কুণ্ডলদ্বয়, দশাঙ্গুলে ধারণের জন্য প্রভাময় ঊর্মিকা তিনি নৃপতির নিকট লাভ করেন। পরে তাঁহাকে হস্তী-পৃষ্ঠে উপবেশন করাইয়া ভৃঙ্গারবারিতে অভিষেক করিয়া ছত্র ও তুরগের সহিত রায়মুকুট উপাধি দান করা হয়।

দ্র ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ), কলিকাতা, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ;

Indian Historical Quarterly, vol. XVII No. 4, December, 1941, Calcutta.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বেকন, ফ্রান্সিস (১৫৬১—১৬২৬ খ্রী) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ্ ও আইনজ্ঞ মনীষী। আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া অল্প বয়সেই বেকন আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং মাত্র ২২ বৎসর বয়সেই পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ইনি রাজা প্রথম জেম্‌সের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে বহু উচ্চপদ অলংকৃত করেন। ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'লর্ড চান্সেলর' ও Baron Verulam হন। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে Viscount St. Albans করা হয়। ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে বেকন উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে হাউস অফ লর্ডসের বিচারে শাস্তি পান ও পদচ্যুত হন। জীবনের অবশিষ্ট পাঁচ বৎসর তিনি দর্শন ও সাহিত্যের আলোচনায় অতিবাহিত করেন।

বেকন বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন। তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তাঁহার *Essays* (১৫৯৭—১৬২৫ খ্রী), *Advancement of Learning* (১৬০৫ খ্রী) ও *Novum Organum* (১৬২০ খ্রী)। তাঁহার প্রবন্ধসংগ্রহ বহু বিষয়ের উপর লিখিত। এগুলির ভাষা ও লিখনশৈলী এত প্রৌঢ় যে অনেকের মতে ইংরাজী ভাষায় এত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আর নাই। *Advancement of Learning* এবং *Novum Organum* এই দুই গ্রন্থ তদানীন্তন দার্শনিক জগতে প্রায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ঐ যুগে পণ্ডিতগণের দৃঢ় ধারণা ছিল যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাহা কিছু বলিবার তাহা আরিস্তোতল ও মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টধর্মের দার্শনিকগণই বলিয়া গিয়াছেন। *Advancement of Learning*-এ বেকন প্রচার করিলেন, আরিস্তোতল বা মধ্যযুগীয় দার্শনিকগণ যাহা বলিয়াছেন তাহাই শেষ কথা নহে; জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পরিধি নাই, দর্শন নূতন করিয়া লেখা উচিত। বেকন নির্ভীক ও বলিষ্ঠভাবে ইহা বলিয়া বিজ্ঞান ও দর্শনের অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বেকন বলিলেন, প্রাকৃতিক নিয়ম ও কার্যকারণসম্বন্ধ ও পদার্থের গুণাগুণ একমাত্র ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার দ্বারাই নির্ভুলভাবে জানা যাইতে পারে। ভূয়োদর্শন ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে করিতে হইলে Inductive Method-ই যে একমাত্র প্রামাণ্য পন্থা ইহাই বেকনের *Novum Organum* গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। হব্‌স, লক, দিদেরো, দা'লেম্বেয়ার প্রভৃতি মনীষীগণ বেকনের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

শৈলেন সেনগুপ্ত

বেকার সমস্যা কাজ না করিলেই যে কেহ বেকার বলিয়া পরিগণিত হইবে এমন নহে। শিশু, অতিবৃদ্ধ, পঙ্গু—এই সব শ্রেণীর বহু লোক আছেন যাঁহারা কাজ করিতে একেবারেই অক্ষম। কোনও কোনও লোক আবার স্বভাবতঃ শ্রমবিমুখ। কাজ করিতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিরা শ্রমিক বলিয়া গণ্য হন না; ইঁহাদের বেকার দলভুক্ত করা সমীচীন নহে। বেকার বলিতে বুঝা যায় এমন সম্প্রদায়কে যাঁহারা কাজ করিতে সক্ষম, যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইচ্ছুক, অথচ প্রচলিত বেতন হারেও কাজ সংগ্রহ করিতে পারেন না। ইঁহারাই প্রকৃতপক্ষে বেকার।

এই সংজ্ঞা অনুসারে কোনও দেশে বেকারের সংখ্যা সমগ্র শ্রমিকসংখ্যার তুলনায় শতকরা দুই-তিন জনের অধিক হইলে বেকারত্ব সমস্যার আকার ধারণ করে। বেকারশূন্য অর্থনৈতিক অবস্থা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ধনবৈজ্ঞানিকগণ ঐ অবস্থা সর্বতোভাবে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন না। কারণ ঐ অবস্থায় অর্থনৈতিক সামান্য কোনও আন্দোলনেই মুদ্রাস্ফীতি ও আনুষঙ্গিক অসংগতির সম্ভাবনা দাঁড়ায়—যাহা সমাজের পক্ষে, এমন কি শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেও স্বাস্থ্যকর নহে। দ্রব্য উৎপাদনে উন্নততর প্রথার উদ্ভাবন, উৎকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার সম্প্রসারণ এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদার সংকোচন—এই সবের মধ্য দিয়াই আর্থিক অগ্রগতি সাধিত হয়। অথচ ইহারই ফলে সমাজে কিছুসংখ্যক বেকারের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। উন্নত দেশগুলি এই ধরনের বেকারের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছে। এই কারণে ঐ সব দেশে এই অস্থায়ী বেকারদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরকারি বিধিব্যবস্থাও রহিয়াছে — যেমন বেকার বীমা।

যাহা হউক, বেকার সমস্যা কোনও কোনও অবস্থায় বিশেষ রকম প্রবল আকার ধারণ করে, যখন বেকারের সংখ্যা শতকরা পাঁচ, সাত, এমন কি দশ জন পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। ইহা যে কেবল এক দেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহ বাণিজ্য সূত্রে নিবদ্ধ বলিয়া এই ধরনের বেকার সমস্যা সংক্রামক হইয়া দাঁড়ায়। গত মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্বে একটি বিশেষরকম সংক্রামক বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল।

শিল্পপ্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রতি পাঁচ-ছয় বৎসর অন্তর ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর মন্দা ভাব দেখা দেয়। ধনবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে শিল্পপ্রধান আর্থিক সমাজ চক্রের মত পরিবর্তনশীল; ব্যবসায়ের উত্থান-পতন ইহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই উত্থান-পতনের ফলে শ্রমিক শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। মন্দার সময়ে বহু সমর্থ লোক চাহিদার অভাবে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কেহ কেহ হয়তো রাস্তায় ঘাটে সামান্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে

নিজেদের নিযুক্ত করে; তাহাতে ইঁহাদের শ্রমশক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না; উপযুক্ত আয়েরও সংস্থান হয় না। অপরদিকে ব্যবসায়ের অগ্রগতির চরম পর্যায়ে বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইয়া শূন্যে পরিণত হইতে পারে, ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সুতরাং এই দুই অধ্যায়ের সংযোগেও অবশিষ্ট রহিয়া যায় মন্দাকালীন বেকার।

আধুনিক ধনবিজ্ঞান আবার ইহাও প্রমাণ করিয়াছে যে, ব্যবসায়-স্ফীতির চরম পর্যায়েও শ্রমিকশক্তির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভবপর হয় না। সমাজের আয়বৃদ্ধির মধ্যেই একপ্রকার অপচয়ের বীজ নিহিত থাকে। উন্নত আর্থিক সমাজে সঞ্চয়ের হার এত অধিক যে মূলধন প্রয়োগ ইহার সঙ্গে সংগতি রাখিতে পারে না। কারণ ঐসব সমাজেই আবার যন্ত্রপাতির ক্রমবৃদ্ধির ফলে মূলধন প্রয়োগের পরিধি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে উৎপাদনের স্বাভাবিক বিধানে শুধু যে শ্রমিকশক্তির অপচয় ঘটে তাহাই নহে, যন্ত্রপাতির পূর্ণ ব্যবহারও সম্ভব হয় না।

সুদের হার কমাইয়া এবং ব্যবহার্য দ্রব্যের চাহিদার সম্প্রসারণ ঘটাইয়া এই ধরনের বেকারির গুরুত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে লাঘব করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু ইহার ব্যাপক প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন মূলধন প্রয়োগে রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতা—সঞ্চয়ের মাত্রাবাহুল্যের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ন্যূনতার সৃষ্টি তাহার পূর্তিসাধন।

ইহাই হইল শিল্পপ্রধান উন্নত দেশগুলির কথা। অনুন্নত কৃষিপ্রধান সমাজে বেকারের রূপ স্বতন্ত্র, এবং সমস্যা হিসাবে আরও গুরুতর।

কৃষি ঋতুনির্ভর। বৎসরের সব ঋতু চাষের অনুকূল নহে। ভূমিকর্ষণ, বীজবপন ও ফসল কাটিবার সময়ে চাষীরা ব্যস্ত; অন্য সময়ে কাজের অভাব। এই ধরনের মন্দাকালীন বেকারী প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন কৃষক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। বৎসরে একাধিকবার চাষের ব্যবস্থা থাকিলে এই বেকার সমস্যার উপশম সম্ভব। ইহা ছাড়া অবসর সময়ে ঐ সব শ্রমিকদের এমন সব কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে যাহার জন্য যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ন্যূনতম, যেমন রাস্তা নির্মাণ, কূপখনন ইত্যাদি। গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের প্রণয়ন এই কারণে অনেকে সার্থক বলিয়া মনে করেন। এই সব প্রক্রিয়ার ফলে কৃষকদের বেকারত্ব ঘোচে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপযুক্ত আয়ের সংস্থান হইতে পারে না।

সর্বোপরি প্রাচ্যের অনুন্নত দেশগুলিতে একপ্রকার ব্যাপক বেকার সমস্যা রহিয়াছে যাহার মূল কারণ লোকসংখ্যা অনুপাতে মূলধনের স্বল্পতা। একদিকে উন্নত আর্থিক সমাজে যেমন সঞ্চয়ের অতিমাত্রায় বেকারের উৎপত্তি, অপরদিকে অনুন্নত দেশগুলিতে তেমনই বেকারের উদ্ভব উপযুক্ত সঞ্চয়ের অভাবে, তথা মূলধনের স্বল্পতায়। এই সব দেশে আবার বিশেষ একরকমের বেকার থাকে যাঁহাদের অস্তিত্ব বাহিরে প্রকাশ হয় না, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। মূলধনের অভাবে শিল্পের প্রসার সীমিত বলিয়া শহরে শ্রমিকশক্তির চাহিদা কম। অথচ জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে চাষের জমির উপর চাপ পড়িতেছে অত্যধিক। এ অবস্থায় যেখানে কৃষি একটি পারিবারিক ব্যবসা সেখানে অপ্রয়োজনেও বহু সমর্থ ব্যক্তিকে কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকিতে দেখা যায়। এই অতিরিক্ত কৃষকদেরও বেকার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। তবে ইঁহারা প্রচ্ছন্ন বেকার।

এই বিশেষ ধরনের বেকারির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষ। মূলধনের স্বল্পতাই এই দেশের ব্যাপক বেকারত্বের মূল কারণ। এই বেকার সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য নহে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি মূলসূত্র বেকারত্ব নিরোধ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত দশ বৎসরে প্রকাশ্য বেকারের সংখ্যাই এদেশে পঞ্চাশ লক্ষ হইতে প্রায় এক কোটিতে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যাও অবহেলাযোগ্য নহে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানা রকম শ্রমাশ্রয়ী প্রথার উদ্ভাবন ও প্রণয়নের ফলে এ সমস্যার উপশম হইতে পারে। কিন্তু ইহার সম্যক সমাধান করিতে হইলে প্রয়োজন মূলধনের উপযুক্ত প্রসার—যাহা সময়সাপেক্ষ। সামাজিক এই অব্যবস্থারই একটি বিশেষ অভিব্যক্তি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা। মূলত এই সমস্যার কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির তুলনায় জাতীয় আয়মাত্রার অ-পর্যাপ্তি। শ্রমশক্তির অপচয় শুধু যে আর্থিক ক্ষতির সৃষ্টি করে তাহা নহে, ইহা সামাজিক শৃঙ্খলা সাধনেরও পরিপন্থী। বেকারির প্রাবল্যে যে অসন্তোষ জন্মায় সেই অসন্তোষই বিদ্রোহের বীজ বহন করে। এই জন্য বেকার সমস্যার সমাধান প্রত্যেক সমাজের পক্ষেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

দ্র T. Balogh and Others, *The Economics of Full Employment*, Oxford, 1944; W. H. Beveridge, *Full Employment in a Free Society*, London, 1944; A. K. Das-Gupta, *Planning and Economic Growth*, London, 1965; United Nations, *Measures for the Economic Development of Countries*, 1951; Nurkse, *Problems of Capital Formation in Under-developed Countries*, Oxford, 1953; K. N. Raj, *Employment Aspect of Planning in Under-developed Economics*, Cairo, 1957.

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

বেগুন সোলানাসিঈ গোত্রের (Family-Solanaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। সবজিজাতীয় সাধারণ বেগুনের বিজ্ঞানসম্মত নাম সোলানম মেলোনজেনা (*Solanum melongena*)। ইহার ফুলের রং বেগুনি; ফুলে ৫টি পরস্পরসংলগ্ন বৃতি, ৫টি পাপড়ি, পাপড়িতে লাগানো ৫টি পুংকেশর এবং ২টি পরস্পরযুক্ত গর্ভকেশর বর্তমান; গর্ভকোষের দুইটি প্রকোষ্ঠ। বেগুনের ফল বহুবীজযুক্ত। ভারতের প্রায় সর্বত্রই বেগুনের চাষ হয়। সাধারণতঃ উঁচু জমি এবং প্রধানতঃ বর্ষা ও শীতকাল বেগুন চাষের উপযোগী। শিকড়-পচা ও পাতা কুঁকড়াইয়া যাওয়া বেগুন গাছের উল্লেখযোগ্য রোগ। মূলের স্তরের মাটিতে বায়ুর সহজ চলাচল, পাতার উপর প্রচুর সূর্য-কিরণের প্রভাব এবং পাতায় তাম্রঘটিত ঔষধ প্রয়োগ রোগ-নিবারণে সহায়তা করে।

সোলানম গণের (জেনাস) অন্তর্গত কয়েকটি প্রজাতির বন্য বেগুন আছে।

টম্যাটোকে বিলাতি বেগুন বলা হয়। 'টম্যাটো' দ্র।

দ্র D. Prain, *Bengal Plants*, Vol. II, Calcutta, 1963.

কালীপদ সরকার

বেঙ্গল জিমখানা বাংলার প্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব ক্রিকেট সংস্থা। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের দ্বিজেন সেনের উদ্যোগে সম্ভবতঃ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল জিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাপতি কুচবিহারের মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর; প্রথম কর্মসচিব দ্বিজেন সেন। নৃপেন্দ্রনারায়ণ জিমখানাকে ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র-নাথ রায়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল জিমখানা দল কাশ্মীরের মহারাজার দলের বিপক্ষে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলে (উড্ল্যান্ড্স্ গ্রাউন্ডে)। জিমখানা দলের অধিনায়ক ছিলেন কুচবিহারের প্রিন্স ভিক্টর নারায়ণ; সকল খেলোয়াড়ই ছিলেন বাঙ্গালী। বাংলায় ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা-সাধনের ও মানোন্নয়নের জন্য বেঙ্গল জিমখানা চেষ্টা করে। ইহা মফঃস্বলে ভ্রাম্যমান ক্রিকেট 'টিম' প্রেরণ করে এবং বোম্বাই হইতে খেলোয়াড় আনাইয়া বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের 'কোচিং'-এর ব্যবস্থা করে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত বাৎসরিক 'ব্রিটিশ স্কুল্স্' বনাম 'বেঙ্গলী স্কুল্স্' ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পরিচালনাভার বেঙ্গল জিমখানার উপর ন্যস্ত হয়। কুচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর বেঙ্গল জিমখানা মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইহার কাজকর্ম একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে আর্থার গিলিগ্যানের এম. সি. সি. ক্রিকেট দল ভারতে আসিলে কলিকাতায় বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের দলের সঙ্গে এম. সি. সি.-র খেলার ব্যবস্থা হয় নাই। বাঙ্গালী ক্রিকেটের এই অমর্যাদায় বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পঙ্কজ গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ গুঁই ('গাইস বাবু'), পূর্ণচন্দ্র ('পাটু') মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেঙ্গল জিমখানাকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করেন (১৯৩২ খ্রী)। দ্বিতীয় পর্যায়ে জিমখানার প্রথম সভাপতি স্যার মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (সন্তোষের মহারাজা) এবং প্রথম কর্মসচিব দেবেন্দ্রনাথ গুঁই। পরবর্তী কর্ম-সচিবদের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলার সকল ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবই বেঙ্গল জিমখানায় যোগ দেয়।

ইতোমধ্যে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম' (উত্তরকালে 'ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল' বা 'সি. এ. বি' নামে পরিচিত) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার গঠনতন্ত্রের ভিত্তি ছিল ইওরোপীয় প্রাধান্য এবং সাম্প্রদায়িকতা। এইরূপ নিয়ম ছিল যে 'ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব'-এর সভাপতি ও কর্ম-সচিবই হইবেন সি. এ. বি.-র সভাপতি ও কর্মসচিব; ১ জন আসামের প্রতিনিধি ব্যতীত কর্মসমিতির সদস্যেরা হইবেন: ৩ জন ইওরোপীয়, ২ জন হিন্দু, ১ জন মুসল-মান, ১ জন পার্শী ও ১ জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান।

বেঙ্গল জিমখানা সি. এ. বি.-তে যোগ দেয়। জিমখানায় ৪ জন সদস্য সি. এ. বি.-র কর্মসমিতিতে স্থান পায়। বেঙ্গল জিমখানার যোগদানের ফলে সি. এ. বি.-র কর্ম-সমিতির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি রদ হয়। কিন্তু সি. এ. বি.-র গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে উভয় সংস্থার মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য চলিতে থাকে। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা সত্ত্বেও দুই সংস্থা কতকটা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করিতে থাকে। ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা ইমপ্রুভ্মেন্ট ট্রাস্ট'-এর সহ-যোগিতায় বেঙ্গল জিমখানা টালা পার্কে নিজের খেলার মাঠ তৈয়ারি করে। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার পরিচালনাভার কিয়দংশে জিমখানার উপর ন্যস্ত হয়।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সি. এ. বি.-র সহিত গুরুতর মত-ভেদের ফলে বেঙ্গল জিমখানা সি. এ. বি. হইতে বাহির হইয়া আসে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থ-তায় উভয় সংস্থার মধ্যে বোঝাপড়া হয়। সি. এ. বি.-র গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন হয়। নূতন গঠনতন্ত্র অনু-সারে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত সি. এ. বি.-র সভাপতি হন জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জে. সি. মুখার্জি), কর্ম-সচিব পঙ্কজ গুপ্ত ও কোষাধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। বেঙ্গল জিমখানার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আর প্রয়োজন থাকে না ('ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব'-এর টি. সি. লংফিল্ড বেঙ্গল জিমখানার স্বতন্ত্র অস্তিত্বে আপত্তি জানান); অবশেষে ডাক্তার রায়ের চেষ্টায় বেঙ্গল জিমখানা 'ক্রিকেট অ্যাসো-সিয়েশন অফ বেঙ্গল'-এর মধ্যে মজ্জীভূত হয় ও তাহার

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় (সম্ভবতঃ ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে)।

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বেণু বাঁশি দ্র

বেত তাল গোত্রের (ফ্যামিলি-পাল্‌মী, Palmae) অন্তর্গত একবীজপত্রী রোহিণী (ক্লাইম্বার) জাতীয় লতা। নানা প্রজাতির বেতগাছ হইয়া থাকে, যথা কলামস্ রোতাংগ (*Calamus rotang*) কালামস্ তেনুইস (*Calamus tenuis*) ইত্যাদি। সাধারণতঃ ইহারা বাংলা, আসাম, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যের আর্দ্র অঞ্চলে জন্মায়। ইহাদের কান্ড দুর্বল ও রোহিণী, পাতা যৌগিক ও কণ্টকাকীর্ণ, সুবৃহৎ পুং-পুষ্পদন্ডটি শাখাযুক্ত, কণ্টকময় ও চাবুকাকৃতি, স্ত্রী পুষ্পগুলি পুষ্পদন্ডের শাখাপ্রশাখায় বিক্ষিপ্ত এবং ফল ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি। বেতগাছ অত্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং বনাঞ্চলে বৃহৎ বৃক্ষের শীর্ষদেশে উঠিয়া পড়ে। আসবাবপত্র, বাক্স, ব্যাগ, ছাতা, চেয়ার, দড়ি, হাতি ধরিবার কাছি, নৌকা, ছোট নদীর উপরের সেতু প্রভৃতি নির্মাণে বেত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বেতগাছের শীর্ষভাগ এবং ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্র A. F. Hill, *Economic Botany*, New York-Toronto-London, 1952.

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

বেতার বেতারকেন্দ্রের প্রেরক-যন্ত্রের আকাশতার (aerial) হইতে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তি তরঙ্গের আকারে, তারের সাহায্য ব্যতীত চতুর্দিকে সঞ্চারিত হয়। এই বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে বেতারতরঙ্গ বলা হয়। ইহার সাহায্যেই রেডিওর মাধ্যমে আমরা গানবাজনা শুনি। সাধারণ ব্যবহারের পরিবর্তী প্রবাহের (A. C.) তুলনায়, বেতার-তরঙ্গের স্পন্দন অনেক বেশি দ্রুত (স্পন্দন হার প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ বা তারও বেশি)। বেতার ও আলোক তরঙ্গের গতিবেগ সমান (প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কোটি মিটার বা ১৮৬০০০ মাইল)। আলোক, তাপ ও অন্যান্য বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে, বেতারতরঙ্গেরই দৈর্ঘ্য সর্বাপেক্ষা বেশি। দূরেক্ষণ (Television), বেতার টেলিগ্রাফ বা টেলিফোন দ্বারা দূরদেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন বেতারের জন্যই সম্ভব হইয়াছে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ্ জেমস্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গণিতের মাধ্যমে প্রথম বেতারতরঙ্গের অস্তিত্ব প্রকাশ করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর হাইন্‌রিখ হার্জ সর্বপ্রথম এই বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র বসু ক্ষুদ্রতর দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সাহায্যে বেতারে সংকেত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইটালীর বেতার-বিজ্ঞানী গুগ্‌লী-য়েল্‌মো মার্কোনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বেতার টেলিগ্রাফের সংকেতের মাধ্যমে, অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের দুই প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

বেতারকেন্দ্রের প্রেরক-যন্ত্রে উচ্চহারের বিদ্যুৎস্পন্দন সৃষ্টি করা হয়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বেতার অনুষ্ঠানের শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ স্পন্দনে রূপান্তরিত করিয়া বিশেষ গুণ-সম্পন্ন রেডিও ভাল্‌ভের (electron tube) সহযোগিতায় বিদ্যুৎ স্পন্দনকে বিবর্ধন (amplification) করা হয়। তারপর এই বিবর্ধিত স্পন্দনকে, প্রেরক-যন্ত্রের বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে প্রেরক-যন্ত্রের সংলগ্ন আকাশতারে, মিশ্র তরঙ্গের স্পন্দন (modulated wave) সৃষ্টি হয়। প্রেরক-যন্ত্রের অবিমিশ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ (Carrier Wave) বলে কারণ ইহার উপর শব্দ তরঙ্গের অনুরূপ বিদ্যুৎ তরঙ্গটি এই তরঙ্গের সাহায্যেই দূর দূরান্তে বাহিত হয়।

২০০—৬০০ মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যম তরঙ্গগুলির (medium waves) শক্তি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া কয়েক শত মাইল যাওয়ার কালেই ক্ষীণতর হইতে হইতে নিঃশেষ হইয়া যায়। অপরদিকে ১৩—৯০ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হ্রস্ব তরঙ্গের (short waves) দৌড় আরও অনেক কম। সূর্যরশ্মির অতিবেগুনী আলোর প্রভাবে পৃথিবীর বহির্মণ্ডলে অবস্থিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু-গুলির ঘনায়মান এক বা ততোধিক ইলেক্‌ট্রন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠের ১০০—২৫০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে এইরূপ বিদ্যুতাবিষ্ট পরমাণু সৃষ্টির ফলে তড়িৎ পরিবাহী কয়েকটি স্তর সৃষ্টি হয়। সমগ্রভাবে এই স্তর-গুলিকে বলা হয় আয়নমণ্ডল (Ionosphere)। বেতার তরঙ্গ এই স্তরগুলি হইতে প্রতিফলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়া আসে। এই প্রতিফলিত নিম্নগামী বেতার তরঙ্গের সাহায্যেই দূরে দেশান্তর হইতে বেতারে কথাবার্তা ও গান শোনা যায়।

রেডিও একটি বেতার-গ্রাহক যন্ত্র। নির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল (variable) বিদ্যুৎধারক (condenser), তারের কুণ্ডলী (coil), উপযুক্ত মানের রোধ (resistance), ট্রান্‌সফর্মার, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন রেডিও ভাল্‌ভের (electron tube) সমাবেশ ও লাউডস্পিকার প্রভৃতির সহযোগিতায় যান্ত্রিক ব্যবস্থা এই রেডিওতে থাকে। সমপ্রবাহের (D. C.) বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা ইহা চালিত হয়। সেখানে শুধু পরিবর্তী প্রবাহের বিদ্যুৎশক্তি আছে সেই-ক্ষেত্রে সমসাধক (rectifier) রেডিও ভাল্‌ভের সাহায্যে এই শক্তিকে সমপ্রবাহে পরিণত করা হয়। রেডিও বর্তনী প্রেরণ প্রান্ত (transmitting station) হইতে আগত মিশ্র তরঙ্গ হইতে শ্রুতিবোধ্য স্পন্দনকে আলাদা ও বিবর্ধিত করিয়া লাউডস্পিকারের সাহায্যে পূর্ব-প্রচারিত শব্দের অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করে।

অতি সাধারণ রেডিওতে মিশ্রবেতার তরঙ্গকে সোজা-সুজি সমসাধন করিয়া বিবর্ধন করিবার ব্যবস্থাই শুধু থাকে। দূরদেশান্তরের গান-বাজনা ইহাতে শোনা যায় না। মধ্যম হারের বিদ্যুৎ স্পন্দন ইহাতে সৃষ্টি না করার দরুণ অল্প কারণেই অবাঞ্ছিত গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এই প্রকার রেডিওতে সুর ও স্বরের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য রাখা কঠিন। অপরদিকে এই সাধারণ রেডিওর নির্বাচন গুণ অর্থাৎ কাছাকাছি বেতার তরঙ্গকে সুরসংগত করিয়া পৃথক-ভাবে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কম।

আজকাল ট্যানজিস্টার রেডিওর যে প্রচলন হইয়াছে তাহা আকারে ছোট ও ব্যাটারী দ্বারা চালিত হয়। ইহা একই নিয়মে কাজ করে, শুধু রেডিও ভালভের পরিবর্তে ট্র্যানজিস্টার ব্যবহৃত হয়।

সন্তোষকুমার সেন

বেতালপঞ্চবিংশতি সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ। ইহার প্রাচীন রূপ ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী এবং সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগরে বিধৃত। আনুমানিক ১২শ শতাব্দীতে শিবদাস-কথিত গদ্যপদ্য সমন্বিত সংকলন গ্রন্থটিই বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত।

রাজা বিক্রমাদিত্যের (মতান্তরে ত্রিবিক্রম সেন) সহিত এক বেতালের সাক্ষাৎকার, বেতালকথিত পঁচিশটি গল্প, গল্পশেষে প্রশ্ন এবং বিক্রমাদিত্যকৃত সমাধান—এই লইয়া নানা রসের সমন্বয়ে গল্পগুলি অতি বিচিত্র।

ব্রজভাষা হইতে শুরু করিয়া ভারতের অধিকাংশ ভাষা-তেই এক একটি বেতাল কাহিনী আছে। তামিল এবং মারাঠী সংস্করণ পাঠবৈচিত্র্যে পৃথক গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। গ্রিয়ার্সন এগুলির আলোচনা করিয়াছেন। কবি লল্লুলালকৃত হিন্দি বৈতালপচ্চীসীর অনুসরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুবিখ্যাত বেতালপঞ্চবিংশতি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

দ্র G. A. Grierson, *The Modern Vernacular Literature of Hindustan*, Calcutta, 1855; S. N. Dasgupta and S. K. De, *A History of Sanskrit Literature*, Calcutta, 1947.

কল্যাণী দত্ত

বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিংকওয়াটার (১৮০১—১৮৫১ খ্রী) বেথুন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কেম্ব্রিজের চতুর্থ র‍্যাংলার, গ্রীক-লাতিন বাদে জার্মান, ফরাসী এবং ইটালীয় ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁহার কবিখ্যাতিও হয় যথেষ্ট। ব্যবহারজীবীরূপে বেথুনের কর্মজীবন আরম্ভ। বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাঁহার আইনজ্ঞানে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বড়-লাটের আইন সচিব নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন কাউন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষাপর্ষদের সভাপতির পদও লাভ করেন। এই পদেই তাঁহার মনোমত কার্যের সুযোগ ঘটিল। তাঁহার লক্ষ্য ছিল ইংরাজী-শিক্ষিতেরা অধীত বিদ্যা মাতৃভাষায় পরিবেশন করুক যাহাতে জনসমাজের মানসিক উন্নতিসাধন ত্বরায় সম্ভব হইতে পারে। তিনি নিজে হইতে ছাত্রদের উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য একটি স্বর্ণপদক দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারই উপদেশে কবিবর মধুসূদন দত্ত ইংরেজী কাব্যের পরিবর্তে বাংলা কাব্য ও সাহিত্য রচনায় পরে প্রবৃত্ত হন।

বেথুনের প্রধান কীর্তি 'নেটিভ-ফিমেল স্কুল' নামে কলিকাতায় সাধারণের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (৭ মে ১৮৪৯ খ্রী)। এই বিদ্যালয়ের জন্য তিনি সময় শক্তি ও অর্থ প্রচুর ব্যয় করেন। বিদ্যালয়টির কার্য প্রথমে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সিমলা স্ট্রীটের বৈঠকখানা বাড়িতে আরম্ভ হয়। পরে হেদুয়ার পশ্চিমদিকের ভূমিতে বর্তমান বেথুন স্কুলগৃহ নির্মিত হয়। ৬ নভেম্বর, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলবাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর সাড়ম্বরে স্থাপিত হয়। বেথুন বিদ্যালয় ভবনটির নির্মাণের শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহার পূর্বেই কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয় (১২ আগস্ট, ১৮৫১ খ্রী)। তিনি যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি এই স্কুলের জন্য উইল করিয়া দিয়া যান। বেথুনের মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা বেথুন স্কুল নামে আখ্যাত হয়। কলিকাতার বাহিরে আরও কয়েকটি স্থলেও তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য তাঁহারই পরামর্শে মদনমোহন তর্কালংকার বালিকাদের উপযোগী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। বেথুন নিজে পণ্ডিত গৌরমোহনবিদ্যালংকারকৃত স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক পুস্তকের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রচার করেন। তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি এবং বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, কলিকাতা, ১৯৬৩ ; J. C. Bagal, 'History of the Bethune School and College', *Bethune School and College Centenary Volume*, Calcutta, 1951.

যোগেশচন্দ্র বাগল

বেদ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্ঞান। সায়ণাচার্য বলিয়াছেন, বেদ হইতে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহার সম্বন্ধে অলৌকিক উপায় জানা যায়, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা যে উপায় জানা যায় না, বেদ দ্বারা সেই উপায় লাভ করা যায়।

বেদকে শ্রুতি বলা হয়। ঋষিরা বেদের রচয়িতা নন, দ্রষ্টা, বেদ অপৌরুষেয়, আচার্য-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বেদ শ্রুত হইয়া আসিয়াছে—

ইহাই শ্রুতি নামের তাৎপর্য। বৈদিক শব্দের স্বতঃপ্রামাণ্য ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহে স্বীকৃত।

ঋক্, যজুঃ, সাম—পদ্য, গদ্য ও গীতি, এই তিনপ্রকার মন্ত্র ত্রয়ী বিদ্যা নামে অভিহিত। অথর্ববেদ অন্য তিনটি বেদের পরে রচিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ইহার স্থান ছিল অন্যান্য বেদের নীচে।

প্রতিটি বেদের চারি ভাগ ঃ (১) সংহিতা বা মন্ত্রাংশ ; (২) ব্রাহ্মণ ; (৩) আরণ্যক ; (৪) উপনিষদ্। মন্ত্রাংশ হইল দেবস্তুতি, প্রার্থনা ইত্যাদি ; ইহাই সর্বপ্রধান ভাগ। হোতা ঋক্ মন্ত্রের দ্বারা দেবতার আবাহন করিতেন। উদ্গাতা সামগান দ্বারা আহূত দেবতার স্তুতি করিতেন। অধ্বর্যু যজুর্মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে 'হব্য' আহুতি দিতেন। আরণ্যক ও উপনিষদ্ ব্রাহ্মণভাগেরই অংশ। শুদ্ধব্রাহ্মণ হইল কর্মকান্ড বা যজ্ঞকান্ড—বিধি ও অর্থবাদ। উপনিষদ্ বা বেদান্ত হইল জ্ঞানকান্ড। আরণ্যক একাধারে কর্মাশ্রয়ী ও জ্ঞানাশ্রয়ী। 'ব্রাহ্মণ' 'আরণ্যক' 'উপনিষদ্' দ্র।

প্রত্যেকটি বেদের বিভিন্ন শাখা ছিল। সম্ভবতঃ প্রতি শাখারই স্বতন্ত্র সংহিতা, ব্রাহ্মণাদি ছিল। বেদের বচনক্রম বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন রকমের ছিল। পাঠভেদ অনুসারে শাখাভেদ ছিল। অধিকাংশ শাখাই কালক্রমে লোপপ্রাপ্ত। ঋগ্বেদের শাকল শাখা, কৃষ্ণযজুর তৈত্তিরীয় শাখা, শুক্ল-যজুর মাধ্যংদিন শাখা, সামবেদের কৌথুম শাখা এবং অথর্ববেদের শৌনক শাখা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বিশাল বৈদিক সাহিত্যের সামান্য অংশই বর্তমানে প্রচলিত। অল্পকাল পূর্বে অথর্ববেদের পৈপ্পলাদসংহিতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। 'ঋগ্বেদ', 'যজুর্বেদ', 'সামবেদ', 'অথর্ববেদ' দ্র।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

বৈদিক দেবতা ও বৈদিক ধর্ম ঃ বেদের মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—স্তুতি ও প্রার্থনা। প্রত্যেক বেদ-মন্ত্রের দেবতা আছে। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ (দ্যুলোক) —এই লোকত্রয়ভেদে দেবতাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। অগ্নি, বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং সূর্যই যথাক্রমে এই স্থানত্রয়গত প্রধান দেবতা। পরে প্রত্যেক স্থানে এগার জন করিয়া দেবতা ধরিয়া মোট তেত্রিশ দেবতার কথাও বলা হইয়াছে। অগ্নি, সোম প্রভৃতি পৃথিবীস্থ দেবতা ; ইন্দ্র, রুদ্র, মরুৎ, বায়ু, পর্জন্য প্রভৃতি অন্তরিক্ষের দেবতা ; মিত্র, বরুণ, সূর্য, সবিতা প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা।

ঋষিরা মানুষের মত করিয়াই নৈসর্গিক শক্তির বা ঘটনাবিশেষের রূপকল্পনা ও নামকরণ করিয়াছেন। নাম-রূপ-সমন্বিত এই সকল শক্তিই হইয়াছেন বেদের দেবতা। অধিকাংশ দেবতারই পুরুষ-আকৃতি কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রী দেবতার স্থান গৌণ। উষস্ স্ত্রী দেবতাগণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছেন ; তাঁহার পর সরস্বতী, পৃথিবী ও রাত্রি। ঋগ্বেদেই দেবতাগণকে 'প্রাচীন' ও 'নবীন' বলা হইয়াছে সুতরাং দেবতাদের ক্রমোৎপত্তিবাদই স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে বেদে বহুদেববাদের প্রতীতি হইলেও বেদের মূল কথা একেশ্বরবাদ। ঋষিরা পরমব্যোমে স্বমহিমায় সমাসীন সর্বাধ্যক্ষ এক পরমেশ্বরের কথা স্পষ্ট-রূপেই বলিয়াছেন। তিনি 'ক', 'প্রজাপতি', 'হিরণ্যগর্ভ', 'পুরুষ', 'বিরাট' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র, বরুণাদি দেবতা সেই এক ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ বিভূতির প্রকাশ, স্থানভেদে ও কর্মভেদে তাঁহারই বিভিন্ন নাম মাত্র। বেদেই অদ্বৈতবাদের সূচনা হয়।

যে প্রশাসনে আধিভৌতিক জগতে অহরহ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে তাহার নাম ঋত। মানুষের নৈতিক জগৎ ও ধর্মীয় আচরণও ঋতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সহস্রনয়ন বরুণ ঋতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে রাজাকে ধর্মের রক্ষক বলা হইয়াছে। ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে 'পাপ' বা 'এনস্' মানুষকে অভিভূত করে। "ঋত' দ্র।

দেবতাদের প্রসন্নতা ভিক্ষা করার জন্যই ঋষিরা যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিতেন। বৈদিক ধর্মের অনুষ্ঠানের দিকটি ছিল সম্পূর্ণভাবে যজ্ঞকেন্দ্রিক। বৈদিক ধর্মকে যজ্ঞধর্ম বলা চলে। পূজাপদ্ধতি, মন্দির বা সাধারণের উপাসনার ক্ষেত্র বৈদিক যুগে ছিল না। শ্রৌতকর্ম ত্রিবিধ: ১. দর্শপূর্ণমাসাদি ইষ্টি-যজ্ঞ ; ২. নিরূঢ়পশুবন্ধ প্রভৃতি পশুযজ্ঞ ; ৩. অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সোমযজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞের মধ্যে সোমযজ্ঞই সর্বপ্রধান। সোম একপ্রকার লতা। উহা ছেঁচিয়া উহার রস যজ্ঞে আহুতি দিয়া সোমযাগ সম্পন্ন হইত। ব্রাহ্মণেরাই যজ্ঞে ঋত্বিকের (অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা) কাজ করিতেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ঋত্বিক্ পদে অধিকার ছিল না। এই দিক দিয়া বলা যায় যে যজ্ঞধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবমুক্ত সমাজের আচার অনুষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায় অথর্ববেদে। 'ঋত্বিক' 'যজ্ঞ' দ্র।

সপ্তবিধ পাকযজ্ঞ, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ও গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি শ্মশানান্ত সকল সংস্কারই গৃহ্যকর্ম। গৃহস্থের নিজ গৃহে সদা সংরক্ষিত গৃহ্য অগ্নিতেই গৃহ্যকর্মগুলির অনুষ্ঠান হইত। গৃহ্যকর্মগুলি গৃহ্যসূত্রে বিহিত। বিভিন্ন বেদের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গৃহ্যসূত্র আছে।

দ্র পশুপতিনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ঋগ্বেদভাষ্যোপক্র-মণিকা, কলিকাতা, ১৯২৬ ; R. C. Majumdar ed. *The History and Culture of the Indian People*, Vol. I, London, 1951 ; S. N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Cambridge. 1957.

বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য

বেদব্যাস ঃ মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, শক্তির পৌত্র। পিতা ঋষি পরাশর, মাতা দাসরাজার পালিতা কন্যা সত্যবতী,

পুত্র মহাজ্ঞানী শুকদেব। বেদবিভাগকর্তা বলিয়া নাম বেদব্যাস এবং যমুনাদ্বীপে জন্ম ও গাত্রবর্ণের কৃষ্ণতা হেতু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়া সুবিদিত (মহাভারত, পুনা সংস্করণ, ১৫৭।৬৯-৭৫)।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে সত্যবতী আজন্ম তপোনিরত প্রশান্তচিত্ত কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আবির্ভূত হইয়া জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঔরসে বিচিত্র-বীর্যের পত্নী অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং এক দাসীর গর্ভে মহামতি বিদুরের জন্ম হয় (মহাভারত, ১।৯৯-১০০)। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই প্রয়োজনকালে মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেবের সদুপদেশলাভে অনুগৃহীত হয়। ইঁহার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করেন। স্বজনবিনাশে বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব শান্তিপর্বে বহু উপদেশ দেন এবং তাঁহারই আদেশে পাপনাশের জন্য যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।

বেদব্যাস মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণের রচয়িতা। তিনি সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন ও পুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। চিরজীবীদের মধ্যে বেদব্যাস একজন।

বিষ্ণুপুরাণ (৩।৩।৭) ও বায়ুপুরাণ (৬০।১১) অনুসারে বেদব্যাস বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, বিষ্ণু যে মূর্তি গ্রহণ করিয়া বেদবিভাগ করেন সে মূর্তির নাম বেদব্যাস। জগতের কল্যাণের জন্য ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুগে যুগে বেদবিভাগকারী বিভিন্ন ব্যাসের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে (৩।৩) ও কূর্মপুরাণে (১।৫১) পাওয়া যায়, তবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নই বেদব্যাসরূপে সুপরিচিত।

যূথিকা ঘোষ

বেদসা পশ্চিম ভারতের অন্যতম বিখ্যাত গিরিগুহা। যে গিরিগাত্রে ভাজা গুহার অবস্থিতি, তাহারই দক্ষিণদিকে পৌণা নদীর সম্মুখে মাত্র তিন শত ফুট উচ্চে বেদসা অবস্থিত। ইহা দুর্গম। পুনা হইতে প্রায় ৫০ কিলোমিটার দূরবর্তী পিম্পলি গ্রাম হইতে পদব্রজে গিরিচূড়ার খাড়াই ও উৎরাই অতিক্রম করিয়া বেদসায় পৌঁছাইতে হয়। বেদসার শৈলী ভাজা'র ন্যায় প্রাচীনকালে দারুনির্মিত প্রাসাদের অনুকরণ। ইহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গোলাকার অথবা অষ্ট-কোণ স্তম্ভগুলি ঈষৎ হেলানো (sloping) ভাবে পবর্তগাত্রে খোদিত করা হইত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কাষ্ঠনির্মিত ছাদের ভারে পীঠহীন স্তম্ভ মাটিতে বসিয়া যাইত। পাষাণে খোদিত করার ক্ষেত্রে ইহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাথর কাটার সময়ে শিল্পী পরিচিত দারুশৈলী পাষাণে খোদিত বিহার ও চৈত্যগুলিতে অনুকরণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অনুকরণস্পৃহা ভারতীয় সুধীসমাজকে চিরঋণী করিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা ভারতের প্রাচীনতম আবাস-গৃহ, আরাধনাগৃহ প্রভৃতি কিসে নির্মিত হইত তাহার প্রমাণ পাই।

বেদসা'র গুহাগুলির মধ্যে একটি চৈত্য, একটি বিহার, কয়েকটি প্রকোষ্ঠ এবং কূপ আছে। চৈত্যগৃহের পশ্চিমে একটি অসমাপ্ত স্তূপ এবং বর্তুলাকার (Circular apse) গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনতিদূরে আর একটি স্তূপ চৈত্যের প্রবেশদ্বারের অনতিদূরে বিদ্যমান। চৈত্যের গৃহমুখে (Facade) একটি বারান্দা আছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৩০´ এবং প্রস্থে ১২´। ইহার দুই পার্শ্বে অসমাপ্ত প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্যের অন্তর্ভাগ দৈর্ঘ্যে ৪৫´ এবং প্রস্থে ২১´ এবং পশ্চাতের দিক সূর্পাকার (apsidal)। চৈত্য ও বিহারের অন্তর্বর্তী স্থানে আর একটি অসমাপ্ত গুহা বিদ্যমান। বিহারটি ৩২´ লম্বা এবং ১৮´ চওড়া এবং শেষভাগ সূর্পাকার এবং চতুর্দিকে প্রকোষ্ঠবেষ্টিত। ভাজার ন্যায় চৈত্যগৃহের গৃহমুখ ব্যতীত সমস্ত গুহাগুলি অলংকরণবিহীন এবং দুইপার্শ্ব স্তম্ভবেষ্টিত। তবে বারান্দার দুইপার্শ্বে দুইটি অর্ধস্তম্ভে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাদের শীর্ষে একটি শতদল ফলকের (Abacus) উপর একটি আমলক খোদিত হইয়াছিল এবং তাহার উপরে ক্রমবর্ধমান চতুষ্কোণ পিঠগুলির উপর জান্তব মূর্তি। কার্লা গিরি গুহায় এবং শিবাজীর জন্মস্থান শিবনেরীর নিকট জুন্নারেও যে গিরিগুহা দেখিতে পাওয়া যায়, সবগুলিতেই এইরূপ চূড়াসমন্বিত স্তম্ভ খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে বেদসা ভাজার উত্তরকালে এবং কার্লার পূর্বে খোদিত হইয়াছিল।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদান্ত আক্ষরিক অর্থে বেদান্ত হইল বেদের অন্তভাগ উপনিষৎ। প্রচলিত অর্থে একটি দার্শনিক মতবাদের নাম বেদান্ত। এই মতবাদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ বা চৈতন্যবাদ, অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাধান্য। বেদান্ত দর্শনের বহু সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই উপনিষদ্ ও বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রকে আকর-গ্রন্থরূপে স্বীকার করে। ব্রহ্মসূত্রই বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। সকল সম্প্রদায়ের আচার্যেরাই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া আপন মতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

উপনিষদের মধ্যে দুইপ্রকার ব্রহ্মবাদ লক্ষিত হয় : ১. সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, অর্থাৎ প্রপঞ্চ বা জগতের সহিত যুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব ; ২. নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবাদ, অর্থাৎ জগৎকে মিথ্যা ও ব্রহ্মকে সত্যরূপে প্রতিপাদন। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিতে কতকটা সূচিত হয় ব্রহ্ম-পরিণামবাদ। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ সমর্থিত হয়। জগতের কারণ রূপে ব্রহ্মেরই

প্রকৃত সত্তা, কার্য অর্থাৎ জগৎ নাম-রূপ মাত্র ; জগৎ-প্রপঞ্চের প্রকৃত সত্তা নাই ('পরিণামবাদ' দ্র)।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার শংকর গৌড়পাদাচার্যের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কেবলাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি দ্বৈতকে বা জগৎকে ভ্রান্ত প্রতীতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম বা আত্মাকে একমাত্র সত্তা রূপে স্থাপন করিয়াছেন। শংকর জ্ঞানমার্গী ছিলেন ('অদ্বৈত-বাদ', 'অবিদ্যা' 'মায়াবাদ' দ্র)।

ব্রহ্মসূত্রের বৈষ্ণব ভাষ্যকাররা ঈশ্বরবাদী ও ভক্তিবাদী। এই বৈষ্ণব ভাষ্যকারদের মধ্যে রহিয়াছেন রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক এবং বলদেব।

রামানুজের প্রতিপাদ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর অভিন্ন। ঈশ্বর বিশেষ্য। তাঁহার বিশেষণ জীব ও জগৎ মিথ্যা নয়। ঈশ্বর ও জীবের, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ স্বীকার্য এবং অভেদও স্বীকার্য। কিন্তু ভেদের চেয়ে অভেদের গুরুত্বই বেশি। রামানুজ শংকরের মায়াবাদকে এবং ভাস্কর ও যাদবপ্রকাশের ভেদাভেদবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন ('বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' দ্র)।

নিম্বার্ক ভেদাভেদবাদী বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জীবের, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ স্বাভাবিক, আবার অভেদও স্বাভাবিক। ভেদ ও অভেদের সমান গুরুত্ব ('দ্বৈতাদ্বৈতবাদ', 'নিম্বার্ক' দ্র)।

বল্লভাচার্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে পরতত্ত্ব শুদ্ধ ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মজনিত। ব্রহ্মই কারণ এবং কার্য। অদ্বয়-তত্ত্ব প্রতি-পাদনের জন্য কার্যকে মিথ্যারূপে গণ্য করা চলে না ('শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' দ্র)।

মধ্বাচার্যের প্রতিপাদ্য দ্বৈতবাদ বা কেবলভেদবাদ। ঈশ্বর ও জীবের, ঈশ্বর ও জড়জগতের নিত্য ভেদ। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, কিন্তু জীব ও জড় পরতন্ত্র। জড়জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি কিন্তু নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর ('দ্বৈতবাদ' দ্র)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে জীব গোস্বামী অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিরাজমান এবং অচিন্তনীয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গ্রহণ করিয়াছেন একথা কেহ কেহ বলিয়াছেন ('অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' দ্র)।

ভাস্কর ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে অভেদ স্বাভাবিক, ভেদ উপাধিগত। উপাধি সত্য ('ভাস্কর' দ্র)।

ব্রহ্মসূত্রের শৈব ভাষ্য রচনা করেন শ্রীকণ্ঠ। তাঁহার মতে ব্রহ্মই শিব এবং শক্তি। শিব ও শক্তির ভেদ ও অভেদ যেমন রহিয়াছে ঠিক তেমনই ব্রহ্ম ও জীবের, ব্রহ্ম ও জগতের ভেদ ও অভেদ রহিয়াছে। বৈষ্ণব বৈদান্তিকরা ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও বিষ্ণুকে একীভূত করিয়াছেন ; শৈব বৈদান্তিকরা ব্রহ্ম ও শিবকে একীভূত করিয়াছেন।

দ্র সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, অপ্পয় দীক্ষিত বিরচিত, চৌখম্বা সংস্করণ, ১৯১৬ ; শ্রীভাষ্য, চতুঃসূত্রী, নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯১৬ ; V. S. Ghate, *The Vedanta*, Poona, 1926.

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

বেদি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত করা পরিষ্কৃত ভূমিখণ্ড। বর্তমানে বৃষোৎসর্গ এবং কখনও কখনও ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে বেদি নির্মিত হইয়া থাকে। ঘরের বাহিরে নির্মিত চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া, এক হাত উঁচু খুঁটি ও আচ্ছাদনযুক্ত বেদি (চৌয়ারি) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। বিশেষ জাঁকজমকের ক্ষেত্রে আট হাত লম্বা, আট হাত চওড়া বেদির ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়। অনেকস্থলে মুখ্যতঃ বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বেদিতে বসিয়া কাজ করিবার অধিকার স্বীকৃত হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বেদিয়া পশ্চিমবঙ্গে বেদিয়া নামে একপ্রকার ভ্রাম্যমাণ জাতি আছে। তাহাদের মোট সংখ্যা ১১/১২ হাজার। মেদিনীপুরেই তাহাদের সংখ্যাধিক্য।

ইহারা ধর্মে মুসলমান ; কিন্তু হিন্দুদের দেবদেবীর প্রশস্তি রচনা করিয়া গান করে। তাহাদের অনেক শাখা-জাতি আছে—যেমন (১) ব্যবাজিয়া, (২) বাজীকর, (৩) মাল, (৪) চিরিমার বা চিড়মার, (৫) সাম্পেরিয়া, (৬) শাম্ভার- ও (৭) রাসিয়া বেদিয়া। বেদিয়া স্ত্রীলোকেরা জড়িবুটি দ্বারা শিশু চিকিৎসা, বাতের ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা, মালিশ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ এরূপ প্রচলিত বিশ্বাস আছে। তাহারা নানাপ্রকার ভানুমতীর খেলা দেখায়। পুরুষেরা উল্কি পরায়। পুরুষেরা শারীরিক কসরৎও দেখায়, তাহা ছাড়া পাখি শিকার করে। সাম্পেরিয়া শ্রেণী সাপুড়ে ; তাহারা মনসা পূজা পছন্দ করে। আবার রাসিয়া বেদিয়া দস্তার অলংকারাদি তৈয়ারি করে।

দীপালী ঘোষ

বেন্‌থাম, জেরেমি (১৭৪৮—১৮৩২ খ্রী) ইংরেজ দার্শ-নিক ও আইনবিদ্, হিতবাদ (ইউটিলিটেরিয়ানিজম)-এর প্রবক্তা। জেম্‌স মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল, জন অস্টিন ও দুমোঁ তাঁহার শিষ্য ছিলেন।

Fragment on Government গ্রন্থে (১৭৭৩ খ্রী) ব্ল্যাক্‌স্টোনের রক্ষণশীল মত খণ্ডন করিয়া বেন্‌থাম জন-হিতার্থে আইনব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (১৭৮৯ খ্রী)। এই গ্রন্থে বেন্‌থাম মানুষের আচরণে ও

সমাজব্যবস্থায় বহুতম মানুষের প্রভূততম হিতসাধনের নীতিকে সমর্থন করেন। তাঁহার মতে মানুষ সুখবোধ ও দুঃখবোধ, এই দুই প্রভুর নির্দেশে জীবনপথে চলে এবং স্বভাবতঃই যে কার্যে সর্বাপেক্ষা সুখপ্রাপ্তি সম্ভব তাহাই করিয়া থাকে। অতএব সমাজজীবন নির্বাধ হইলে সার্বিক সুখপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হয়। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও এই নীতিই প্রযোজ্য। কোন পন্থায় সমাজে সর্বাপেক্ষা বেশি সুখ পাওয়া যাইবে তাহার সঠিক বিচারের জন্য বেন্‌থাম বিস্তৃত নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি কারাগার সংস্কার প্রভৃতি বহুপ্রকার পরিকল্পনার সহিত জড়িত ছিলেন। বেন্‌থামীয় দর্শনের ফলশ্রুতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে 'লেসে ফেয়ার'।

দ্র L. Stephen, *The English Utilitarians*, London, 1900; C. M. Atkinson, *Jeremy Bentham*, London, 1905.

সাধনা দাস

বেন্‌ফী, থেয়োডোর (১৮০৯—১৮৮১ খ্রী) ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি জার্মানীর অন্তর্গত গোটিংগেন শহরে ইঁহার জন্ম হয়। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ইঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জার্মান অনুবাদ সহ সামবেদ সর্বপ্রথম সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পঞ্চতন্ত্রেরও একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি প্রমাণ করেন যে ভারতাগত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিই ইওরোপীয় লোককথার আদি উৎস। সংস্কৃত ভাষা, ও ব্যাকরণ বিষয়ে ইনি অনেকগুলি গ্রন্থও রচনা করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ ইনি গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারতবিদ্যা-পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বেণ্টিন্‌ক লর্ড উইলিয়ম (১৭৭৪—১৮৩৯ খ্রী) লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্ডিশ বেণ্টিন্‌ক, তৃতীয় ডিউক অফ পোর্টল্যাণ্ডের পুত্র। ১৮০৩—১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। পুনরায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশের গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ অনুযায়ী তিনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। লর্ড মেকলে তাঁহার শাসনপরিষদে ব্যবহার সচিব নিযুক্ত হন। মহীশূরের রাজাকে পেনসন দিয়া বেণ্টিন্‌ক তাঁহার রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রুশ প্রভাব প্রতিরোধের জন্য তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহের সহিত শতদ্রুর তীরে রূপারে সাক্ষাৎ করেন ও সন্ধি করেন। ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুর আমীরগণের সহিত সন্ধি করেন। তিনি কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও কুর্গ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করেন।

আভ্যন্তরীণ শাসন সংস্কারের জন্য বেণ্টিন্‌ক ভারতবাসীর নিকট স্মরণীয়। মেজর স্লিম্যানের সাহায্যে তিনি ঠগী দমন করেন। (১৮২৯-৩৭ খ্রী)। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ নিবারক রেগুলেশন জারি করেন। এই বিষয়ে রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন। বিচারবিভাগে তিনি ভারতীয়দের অধিকতর নিয়োগের ব্যবস্থা করেন ও তাঁহাদের দায়িত্ব ও বেতন বর্ধিত করেন। ভারতীয়দের জন্য সাবজজ পদের সৃষ্টি হয়। বিচারালয়ে ফারসীর পরিবর্তে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হয়। স্থির হয় যে, শিক্ষার জন্য যে সরকারি অর্থ ব্যয় করা হইবে তাহা একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের জন্যই হইবে। পরবর্তীকালে ইহার ফল ভারতীয়দের পক্ষে সুদূরপ্রসারী হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিন্‌ক ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন ও ১৭ জুন ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বেরিবেরি থিয়ামিন নামক ভিটামিন 'বি' বর্গীয় একটি ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ। জাপান, চীন, ফিলিপীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোচীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এই রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অধিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জাপ নৌবহরের চিকিৎসক তাকাকি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন যে খাদ্যের কোন উপাদানের অভাবই বেরিবেরির কারণ। পরবর্তীকালে আইখ্‌ম্যান, ফুন্‌ক, ম্যাক্‌কোলম প্রভৃতি বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে বেরিবেরি-প্রতিরোধক ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়। 'ভিটামিন' দ্র।

বেরিবেরি দুই প্রকার—'ভিজা' বেরিবেরিতে টিসুর মধ্যে জল জমে বলিয়া হস্ত-পদাদির স্ফীতি দেখা দেয়, কিন্তু 'শুষ্ক' বেরিবেরিতে হাত-পা ফোলে না। বেরিবেরি রোগীর দেহে থিয়ামিনের অভাবে কার্বোহাইড্রেটের বিপাক বিপর্যস্ত হয়; সম্ভবতঃ সেজন্যই নার্ভের প্রদাহ দেখা দেয়। ফলে হাত-পায়ে অসাড়তা, ব্যথাবেদনা, এমন কি পক্ষাঘাত পর্যন্ত হইতে পারে। চোখের নার্ভের প্রদাহের ফলে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের গতি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণভাগ স্ফীত হয় এবং হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটিতে পারে। ইহা ছাড়া এই রোগে অক্ষুধা, অজীর্ণতা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অস্বাভাবিক শ্রান্তি, পেশীর দৌর্বল্য ও ক্ষয়,

রক্তাল্পতা, দেহের ওজন কমিয়া যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গও দেখা দেয়।

কলে-ছাঁটা চাল বা শাদা ময়দা খাইলে এবং আহার্যে শাকসবজি, মটর, বাদাম, ডিম প্রভৃতির অভাব থাকিলে বেরিবেরি হওয়ার সম্ভাবনা। থিয়ামিন-প্রধান খাদ্য ও ভিটামিন বি-কমপ্লেক্‌স্‌-ঘটিত ঔষধ দ্বারা এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

দেবজ্যোতি দাশ

বেরিলী উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা ও শহর। জেলার সদর কার্যালয় বেরিলী শহর (২৮°২২′ উ, ৭৯°২৪′ পূ) কলিকাতা হইতে রেলপথে ১২৯৯ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৭২৮২৮ (১৯৬১ খ্রী)।

বেরিলী শহর তরাই অঞ্চলের নিকটবর্তী এবং রামগংগা নদীর তীরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩২° ও ১৪° সেণ্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টি-পাত প্রায় ১০৪·৫ সেণ্টিমিটার। বর্ষাকালে প্রবল ঝড়ের আধিক্য হইয়া থাকে। শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে আলী মহম্মদ রোহিলাদের একত্র ও অধীনস্থ করিয়া বেরিলী শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর ইহা ইংরেজগণের কর্তৃত্বাধীনে আসে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়।

বেরিলী শহর রেলপথ ও সড়কপথের কেন্দ্র। উত্তর-পূর্ব রেলপথ, উত্তর রেলপথ ও আলীগড়-চান্দৌসী শাখা লাইন এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল রাজপথ গোরখপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি শহরের সহিত বেরিলীকে যুক্ত করিয়াছে। এখানে একটি সেনানিবাস আছে। সেনা-নিবাস সহ শহরের আয়তন প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার।

বেরিলীতে রজন, ববিন, খয়ের ও দিয়াশলাই-এর কারখানা আছে। পূর্বে এই শহরে লাক্ষা ও গিল্টির কাজ প্রচুর হইত। এখানে বহু চিনির কল আছে। দড়ি, নেওয়ার, তাঁবু, সতরঞ্চি ও পিতলের বাসনপত্র এখানে তৈয়ারি হয়।

বেরিলীতে শাহ্‌জাহানের আমলের একটি মসজিদ আছে। হাফিজ রহমন খাঁর সমাধি, সামরিক এলাকার পুরাতন দুর্গ প্রভৃতি দর্শনীয় বস্তু।

দ্র *Imperial Gazetteer of India*, Vol. VII, Oxford, 1908; *Census* 1961, *District Census Hand-book, Uttar Pradesh, Bareilly District*, Allahabad, 1966.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী
সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বেল লেবু গোত্রের (ফ্যামিলি-রুতাসিঈ, Family-Rutaceae) অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ঈগ্‌লে মার্মেলোস (*Aegle Marmelos*)। ভারতের সর্বত্রই, বিশেষতঃ হিমালয়ের পাদদেশস্থ অরণ্যে, পশ্চিম-বঙ্গে, বিহারে ও দক্ষিণ ভারতে প্রচুর বেলগাছ জন্মায়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৬-৯ মিটার। কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার প্রত্যেক কক্ষে দুইটি করিয়া কঠিন ও তীক্ষ্ন কাঁটা থাকে। যৌগপত্রগুলি ৩টি করিয়া পত্রকে গঠিত এবং উপপত্র-বিহীন। গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে সবুজাভ হলুদ উভলিংগ ফুল ফোটে। পুষ্পবিন্যাস নিয়ত (সাই-মোজ)। ফুলে ৪-৫টি বৃত্যংশ, ৪-৫টি দল, বহু পুংকেশর, ৪-৫টি গর্ভপত্র ও একটি গর্ভাশয় বর্তমান। গোলকাকার ফলের ব্যাস প্রায় ১৫ সেণ্টিমিটার। ফলের কঠিন খোলা কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাকিলে পীত-বর্ণ। ফলের অভ্যন্তরভাগ ৮-১৫টি কক্ষে বিভক্ত এবং প্রতি কক্ষে শাদা আঠার মধ্যে বহু বীজ থাকে; বীজের বহিস্ত্বক আঠালো। শাঁস কাঁচা অবস্থায় শাদা, পাকিলে পীতবর্ণ, সুমিষ্ট ও সুগন্ধযুক্ত। ফুল ফুটিবার প্রায় ১১ মাস পরে চৈত্র-বৈশাখে ফল পাকে।

বেলের ফল, পাতা ও মূলের ভেষজগুণ আছে। কাঁচা ফলের শুষ্ক শাঁস বা বেলশুঁট অজীর্ণ, আমাশয়, উদরাময় ইত্যাদি রোগে এবং পাকা ফল অম্লাধিক্য, উদরাময় প্রভৃতি অবস্থায় ফলপ্রদ; কাঁচা ফল হইতে প্রস্তুত মোরাব্বা, পাকা বেলের শরবত প্রভৃতি সুস্বাদু এবং উদরাময় ইত্যাদি রোগে সেবন করিলে উপকার হয়। পাচনতন্ত্রের নানা রোগে দগ্ধ কাঁচা বেলের শাঁস চিনি সহযোগে গ্রহণ করিলে সুফল পাওয়া যায়। বেলপাতা শিবপূজার উপকরণ। বেলের আঠা নানা দ্রব্য জুড়িতে কাজে লাগে।

দ্র কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৫০ খ্রী।

বেলগাঁও মহীশূর রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। পূর্বে ইহা বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিন্তু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র পুনর্গঠন কালে ইহা মহী-শূর রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়।

জেলার সদর শহর বেলগাঁও (১৫°৫১′ উত্তর ও ৭৪°৩১′ পূর্ব) সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭৬২ মিটার উচ্চে বেল্লরীনালা নামক মার্কণ্ডী নদীর একটি শাখাস্রোতের তীরে অবস্থিত। বেলগাঁওয়ের প্রাচীন নাম বেণুগ্রাম। পুনা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৩৯৫ কিলোমিটার। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত পুনার সন্ধি অনু-সারে ইহা ইংরেজদের অধীনে আসে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। সেনানিবাস সহ শহরের আয়তন প্রায় ৪৯ বর্গকিলোমিটার।

বেলগাঁও-এর অধিকাংশই দাক্ষিণাত্য ট্র্যাপ (লাভা) ও মাকড়াশিলায় গঠিত সমভূমি (ময়দান), তবে স্থানে স্থানে

ছোট ছোট গিরিশৃঙ্গও দেখা যায়। কৃষ্ণমৃত্তিকাই এখানকার প্রধান মৃত্তিকা।

শহরের জলবায়ু মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে গড় উত্তাপ প্রায় ৩৮° ও শীতকালে গড় উত্তাপ ১২° সেণ্টিগ্রেড হইয়া থাকে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১২৭ সেণ্টিমিটার। বৃষ্টিপাত পশ্চিমদিকেই অধিক হয়।

বেলগাঁও-এর পশ্চিম অংশে বনভূমির প্রাচুর্য্য দেখা যায়। সংরক্ষিত বনভূমির শাল, সেগুন, হরীতকী প্রভৃতি প্রধান বৃক্ষ। ইহা ব্যতীত বেত, বাঁশ, রিঠা এবং আম, কাঁঠাল, আনারস, নারিকেল প্রভৃতি নানা ফলের গাছও দেখা যায়। পার্বত্য অংশে স্থানে স্থানে আকরিক লৌহ, অভ্র ও বেলেপাথর পাওয়া যায়। স্বর্ণ ও ম্যাংগানিজের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। কৃষিকার্যের মধ্যে তুলা চাষই প্রধান। ইহা ছাড়া আখ, ধান, জোয়ার প্রভৃতিও হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্যাদির মধ্যে তামাক, তুলা, নারিকেল, নারিকেল-ছোবড়া, কাগজ, খেলনা, তাঁতের বস্ত্রাদি, সুতা প্রভৃতি প্রধান। বেলগাঁও-এ হস্তচালিত বস্ত্রবয়নশিল্পের প্রচুর কেন্দ্র আছে।

হুবলী-পুনা রেলপথ (মিটার গেজ) বেলগাঁও-এর উপর দিয়া গিয়াছে। পাকা সড়ক ইহাকে ধারওয়ার, বাংগালোর ও তামিলনাড়ুর সহিত যুক্ত করিয়াছে।

শহরের মোট লোকসংখ্যা ১৪৬৭৯০ (১৯৬১ খৃী), উহাদের মধ্যে ৮৬২৫২ জন শিক্ষিত। কর্মীসংখ্যার মধ্যে ৪৫% লোক নানা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে নিযুক্ত। মাত্র ৭% কৃষিকর্ম করে।

শহরের পূর্বাংশে গিরিশৃঙ্গের উপর অবস্থিত প্রাচীন দুর্গটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। ইহার মধ্যে দুইটি জৈন মন্দির আছে। সাফা মসজিদ, আসদখাঁর দরগা প্রভৃতি মুসলমান স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India* Vol. VIII, Oxford, 1908; *Indalumin Bulletin*, Vol. 12, No. 1, Calcutta, 1966.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বেলুড় হাওড়া স্টেশনের ৭ কিলোমিটার উত্তরে, হুগলি নদীর পশ্চিমতীরে, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণমঠ, বর্তমানে বেলুড়মঠ, নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানের এবং শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্র।

শ্রীরামকৃষ্ণমঠ পরিচালিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যায়তন প্রভৃতি এখানে আছে ('রামকৃষ্ণমিশন' দ্র)। বেলুড়ের নানা শিল্পসংস্থার মধ্যে অ্যালুমিনিয়ম শিল্প অন্যতম।

পরমহংসদেবের মন্দির বর্তমান শতাব্দীর ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। শ্রীমা সারদাদেবীর মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। ফাল্গুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম মহোৎসবে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়।

দ্র B. Roy, *Census* 1961, *West Bengal District Census Handbook, Howrah,* Calcutta.

পঞ্চানন চক্রবর্তী

বেলুন বেলুনই মানুষের তৈরী প্রথম আকাশযান। ইহার কার্যনীতি অতীব সরল। বেলুনের ওজন সম-আয়তন বায়ু অপেক্ষা হাল্কা বলিয়া বায়ুর প্লবতার জন্য উহা ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে। প্রথম বেলুন আবিষ্কার করেন ফরাসী কাগজ নির্মাতা মঁগোলফিয়ে (Montgolfier) ভাতৃদ্বয়। তাঁহারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ জুন আনোন শহরে বহু দর্শক সমাবেশে কাগজের তৈয়ারি একটি উষ্ণ বায়ুপূর্ণ বেলুন উড়াইয়াছিলেন। ইহার মাস দুয়েক পরে ফরাসী বিজ্ঞানী জে. এ. সি শার্ল হাইড্রোজেন গ্যাসপূর্ণ একটি বেলুন তৈয়ারি করিয়া আকাশে উড়াইয়াছিলেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ নভেম্বর পারী নগরীতে বহু দর্শক ও রাজদম্পতির সম্মুখে পিলাত্র দ্য রোজিয়ে ও মার্কি দারল্দ (Marquis d'Arlandes) নামক দুই জন ব্যক্তি বেলুনে আরোহণ করিয়া ৮·৩ কিলোমিটার অতিক্রম করেন; ইতিহাসে ইহাই প্রথম আকাশভ্রমণ।

পূর্বে বেলুনের সাহায্যে আকাশভ্রমণ করিবার সময় বায়ুর গতির উপর নির্ভর করিতে হইত। শুধুমাত্র বায়ুর শক্তির উপর যাহাতে নির্ভর করিয়া না থাকিতে হয়, সে উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আঁরি জিফার (Henri Giffard) নামক জনৈক ফরাসী একটি বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যবহার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে বায়ুচালিত বেলুনের স্থানে দেখা দিল যন্ত্রচালিত উড়োজাহাজ।

ভারতে প্রথম বেলুন উড়ানো হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরীর লালবাগ উদ্যান হইতে। উহাতে অভিযাত্রী ছিলেন জোসেফালিন। ইহার পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ মার্চ কলিকাতার রেসকোর্স হইতে এক বিপুল জনতার সম্মুখে স্পেনসার নামক জনৈক ব্যক্তি 'এমপ্রেস অব ইণ্ডিয়া' নামধারী বেলুনের সাহায্যে আকাশ ভ্রমণ করেন।

নেপোলিয়নের সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত নানা সামরিক উদ্দেশ্যে বেলুন ব্যবহৃত হইয়াছে। আবহাওয়া ও ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল বিষয়ক গবেষণায় এখনও বেলুনের ব্যবহার আছে।

সুবোধচন্দ্র মৈত্র

বেশ্যা[১] বেশভূষ্যাদির দ্বারা পুরুষের মনোরঞ্জন করে ও তাহাদিগকে আকৃষ্ট করে বলিয়া বেশ্যারা এই নামে অভিহিত। বেশ্যাবৃত্তি মানুষের আদিমতম বৃত্তি। নাগরিক জীবনযাত্রার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বাৎস্যায়ন

প্রভৃতি কামশাস্ত্রকারগণ বেশ্যাকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন— (১) 'কুম্ভদাসী' (২) 'রূপাজীবা' ও (৩) 'গণিকা'। যে সকল দাসীশ্রেণীর যুবতী নারী গৃহস্থ-বাড়িতে অর্থের বিনিময়ে গৃহকর্তা বা তৎপুত্রগণের অথবা প্রতিবেশীগণের শয্যাসঙ্গিনী হইত তাহাদিগকে কুম্ভদাসী বলা হইত। যাহারা শুধু রূপ ও যৌবনের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে তাহারা রূপাজীবা। রূপাজীবাকে বাৎস্যায়ন ছয় ভাগে ভাগ করিয়াছেন ঃ (১) 'পরিচারিকা', (২) 'কুলটা', (৩) 'স্বৈরিণী', (৪) 'নটী', (৫) 'শিল্পকারিকা' ও (৬) 'প্রকাশবিনষ্টা'। যে নারীকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়া প্রভু তাহার বিবাহ দিয়া এক বৎসর পরে আপন-গৃহে পরিচারিকার কার্যে নিযুক্ত করেন তাহাকে পরি-চারিকা বলা হইত। এ নারী অন্যের বিবাহিতা হইলেও প্রভুর অধীনা। (২) যে নারী পতির অগোচরে প্রচ্ছন্নভাবে নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বহু পরপুরুষের সহিত সংগত হয় তাহাকে কুলটা বলে। (৩) যে নারী স্বামীর সম্মতিক্রমে বা তাহাকে গ্রাহ্য না করিয়া অন্যের অভিগমন করে তাহাকে বলে স্বৈরিণী। (৪) যে নারী নৃত্যগীত বা অভিনয়াদির দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিত তাহাকে বলা হইত নটী। ইহারা শিল্পজীবিনী হইলেও বেশ্যাবৃত্তি করিত, সাধারণতঃ কোনও নটকে বিবাহ করিত এবং বিবাহিতা হইলেও বৃত্তিত্যাগ করিত না। (৫) দরিদ্র শ্রেণীর শিল্পীর ভার্য্যা অথবা যে নারী শিল্পকলা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে তাহাকে শিল্পকারিকা বলে। ইহারা পতির অনুমতি অনুসারে অর্থশালী কামীর অভিগমন করে। (৬) যে স্ত্রী পতির জীবদ্দশায় অথবা বৈধব্যকালে প্রকাশ্যে কামাচার করিয়া থাকে তাহাকে প্রকাশবিনষ্টা বা নষ্টা স্ত্রী বলে।

বাৎস্যায়নের মতে, চতুঃষষ্টি কলায় উৎকর্ষ লাভ করিয়া শীলবতী, রূপবতী ও গুণান্বিতা বেশ্যা গণিকা সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে। রাজা সর্বদা তাহাকে সম্মান করেন, গুণবান ব্যক্তিগণ তাহার স্তুতিবাদ করেন এবং সে সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূতা হইয়া থাকে। গণিকাগণ গণিকাকুলোদ্ভবা (গণিকার কন্যা) বা স্বয়ংভবা (পিতৃকুল বা পতিকুলত্যাগিনী) হইত।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায়, মৌর্যযুগের বহু পূর্ব হইতে গণিকাগণ রাষ্ট্রের একটা প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত। রাজা তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, তাহাদের রক্ষা, শিক্ষা ও প্রতিপালনের ভার রাজাই গ্রহণ করিতেন। এই গণিকাগণের পরিদর্শনের জন্য একজন 'গণিকাধ্যক্ষ' নামে রাজকর্মচারী থাকিতেন। গণিকাধ্যক্ষ কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম গণিকাকে যথাক্রমে বার্ষিক এক সহস্র, দ্বিসহস্র ও ত্রিসহস্র পণ বেতনে নিযুক্ত করিতেন এবং তাহাদের ভোগ, দায়, আয়, ব্যয় ও আয়তির হিসাব রাখিতেন। গণিকার উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইতেন। গণিকাদিগের কার্য ছিল রাজার ছত্র, ভৃঙ্গার, ব্যজন প্রভৃতির ধারণ ও শিবিকা, পীঠিকা বা রথে নৃপতির পার্শ্বচারিণী হইয়া তাঁহার পরিচর্যা করা। কোনও গণিকা গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিবাহাদি করিয়া সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে চতুর্বিংশতি সহস্র পণ নিষ্ক্রয়মূল্য দিতে হইত। গণিকার পুত্রগণ আটবৎসর বয়স হইতে রাজসভায় কুশীলবের কার্য করিত। তাহারা স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশ সহস্র পণ নিষ্ক্রয় মূল্য দিতে হইত।

কোনও গণিকা সাধারণ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া কোনও পুরুষের সহিত 'কলত্রপত্র' চুক্তি সাধন করিয়া তাহার রক্ষিতা হইলে তাহাকে মাসিক সওয়া পণ করস্বরূপ দিতে হইত।

দ্র পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কামসূত্রম্, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ; রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

ত্রিদিবনাথ রায়

বেশ্যা২ বেশ্যাবৃত্তি পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসায়। আইনতঃ অর্থের বিনিময়ে নির্বিচারে যাহারা যে কোনও পুরুষকে দেহদান করে তাহাদিগকেই বেশ্যা বলা হয়। প্রেম-ঘটিত কারণে দেহদাত্রী নারীকে ব্যভিচারিণী বলা হইয়া থাকে।

সমাজবদ্ধ বেশ্যাগণ প্রধানতঃ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যথা, নিম্ন শ্রেণীর এবং উচ্চ শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যারা পংকিল বস্তীসমূহে অপরাধীদের সহিত সাময়িক স্ত্রী রূপে বসবাস করে। অথবা গরীব শ্রমিকদের জন্য গলির মোড়ে বা খোলার ঘরের দুয়ারের সম্মুখে অধিক রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করে। উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যাদের মধ্যে আত্মসম্মান, লজ্জা এবং শালীনতার বোধ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। কলিকাতায় সাধারণতঃ ইহাদিগকে সমাজবদ্ধভাবে সোনাগাছি এবং রামবাগান অঞ্চলে দেখা গিয়াছে। সেখানে উহারা এক-একটি বড় বড় অট্টালিকার এক-একটি কামরাতে বসবাস করে। স্ব স্ব উপপতিদের কল্যাণের জন্য প্রতি সন্ধ্যাতে উহারা সিঁথিতে সিঁদুর পরিধান করে, কক্ষে ধূপধুনা দেয় এবং হিন্দু রীতিতে পূজা-অর্চনা করে। উল্লেখযোগ্য এই যে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নির্বিশেষে নারীগণ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ইহাদের সমাজে আশ্রয় লইলেও তাহারা সকলেই হিন্দু-নাম ও সংস্কৃতি সমানুভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। বর্ষীয়সী বেশ্যারা নবীনাদের বহু ছলাকলা ও বচনবিন্যাস বা 'বাহানা' শিক্ষা দেয়। ইহারা স্ব স্ব মানী ও গুণী উপপতি-দের নাম-ধাম সতর্কতার সহিত গোপন রাখিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অনেকে নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হইয়া থাকে।

পূর্বে সিনেমা ও থিয়েটারে অভিনেত্রীর চাহিদা ইহারাই মিটাইত। উহারা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর।

ক. বাঁধা ঃ ইহারা একজন মাত্র উপপতির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করে। একজনের নিকট বাঁধা থাকার সময়ে অন্য কোনও পুরুষকে তাহারা আপন গৃহে বা কক্ষে কদাচ স্থান দেয় না।

খ. টাইম ঃ ইহারা দুইজন কিংবা তিনজন মাত্র উপপতিকে বিভিন্ন দিনে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নির্দিষ্ট কয়জন ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও ইহারা স্বগৃহে স্থান দেয় না।

গ. ছুটা ঃ ইহারা নির্বিচারে একই রাত্রে একে একে (একত্রে নহে) বহু ব্যক্তিকে সাময়িক উপপতিরূপে নিজ কক্ষে গ্রহণ করে। উপপতিরা নিজেরা অথবা দালাল মারফৎ সেখানে আসে।

উচ্চশ্রেণীর বেশ্যাপল্লীগুলিতে সাধারণতঃ চার শ্রেণীর জীব দেখিতে পাওয়া যায়ঃ ১. গুর্গা বা ভৃত্য; ২. পোষ্যবর্গ ; ৩. দালাল ; ৪. বাড়িউলী। বাড়িউলীরা এক-একটি বেশ্যা বাড়ির বয়োবৃদ্ধা মালিক। বাড়িউলীর অধীনে এক এক কক্ষে এক এক ভাড়াটিয়া নারী পেশারত থাকে। ইহারা তাহাদের ভাড়াটিয়াদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজন হইলে তাহাদের অর্থসাহায্যও করে। বাটীর প্রাথমিক শান্তি রক্ষার ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত। ভৃত্যকুল শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হইলে ইহারা বেতনভুক গৃহস্থ গুন্ডা পোষণ করে। বাড়িউলিদের পঞ্চায়ত বসিয়া থাকে। ইহারা অপরাধিণী বেশ্যা নারীদের বিচার করিয়া অর্থদন্ড করে। অপরিণত বালকদের কক্ষে স্থান দিলে, একজন অন্য জনের উপপতিকে ভাঙ্গাইয়া নিলে, কোনও উপপতির পিতা বা পুত্রকে কক্ষে স্থান দিলে কিংবা কোনও উপপতির অর্থাপহরণ কিংবা উহাদের প্রতি কদর্য ব্যবহার করিলে ঐ সকল কার্য ভদ্র বেশ্যাপল্লীতে জঘন্যতম অপরাধরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

ভারতে শহরাঞ্চলে বেশ্যালয় প্রাচীনকাল হইতে আছে। ব্রিটিশ শাসনকালে সেনা বাহিনীর ছাউনির নিকটেও উহাদের বাসস্থান করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু কোনও উচ্চশ্রেণীর বেশ্যা কখনও ঐস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

বেশ্যাগণকে মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা চলে, যথা ঃ

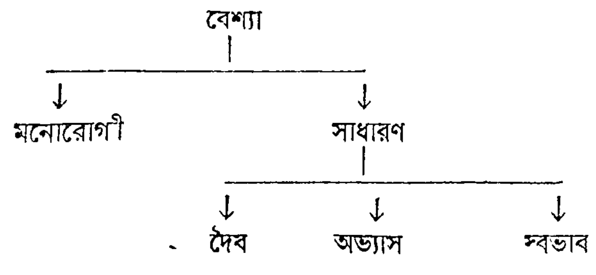

মনোরোগী বেশ্যারা নিস্কোম্যানিয়া নামে এক প্রকার মানসিক রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে তাহাদের যৌন স্পৃহা দুর্দমনীয় হইয়া ওঠায় যত্রতত্র তাহারা যৌনসংগমের জন্য আকুল হইয়া ওঠে। এই রোগের দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসা আছে। যে সকল সৎ নারী ক্ষুধার জ্বালায় কিংবা সন্তানের মুখে অন্ন দেওয়ার জন্য কিংবা হঠাৎ প্রলোভিত হইয়া বেশ্যা হইয়াছে তাহাদিগকে দৈব বেশ্যা বলা হইয়া থাকে। দৈব বেশ্যাদের পক্ষে অভ্যাস দ্বারা অভ্যাস বেশ্যাতে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। বরং হামেশাই তাহা হইয়া থাকে। যে সকল বেশ্যার মধ্যে আদিম যৌন প্রবৃত্তি অন্য কারণে উপগত হয়, উহাদের স্বভাব বেশ্যা বলা হয়।

পঞ্চানন ঘোষাল

বেসনগর বিদিশা দ্র

বেসান্ট, অ্যানি অ্যানি বেসান্ট দ্র

বেসেমার কনভার্টার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প দ্র

বেহালা ভিয়ল জাতীয় বাদ্যের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ "ভায়োলিন" নামক পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র এদেশে বেহালা নামে পরিচিত হইয়াছে। ইহা ছড়ি দিয়া বাজান হয়। ইহাতে চারটি তার আছে তন্মধ্যে দুইটি তাঁতের, একটি লৌহের এবং আর একটি নিকেলের অথবা তার বেষ্টিত রেশমের হইয়া থাকে। ইহার বাদ্যপ্রকোষ্ঠ চ্যাপটা এবং হালকা কাষ্ঠ নির্মিত ; বাদনদন্ড ক্ষুদ্র এবং উপরের দিকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। এই যন্ত্র দণ্ডায়মান অবস্থায় বাজাইবার রীতি, কিন্তু এদেশে বসিয়া বাজান হয়। মোগল রাজত্বে পাশ্চাত্যদেশীয় বণিকগণের সহিত এই যন্ত্র এদেশে আসে এবং ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতব্দীর শেষভাগে আখড়াই গানে ইহার বিশেষ ব্যবহার ছিল। বর্তমানে ইহা গানের সঙ্গে, এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে বাজান হয়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

বেহুলা ঃ মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র। চম্পকনগরের চাঁদ সদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দর বা লখীন্দরের পত্নী বেহুলা পরমাসুন্দরী ও সর্বগুণান্বিতা। মনসার কোপে বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হইলে পতিপ্রাণা বেহুলা একটি কলার ভেলায় করিয়া লখীন্দরের মৃতদেহ লইয়া দেবপুরের উদ্দেশ্যে অপরিচিত পথে যাত্রা করেন। অনেক বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া বেহুলা গন্তব্যস্থানে পৌঁছান এবং নৃত্য-গীতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেন। মহাদেবের অনুরোধে মনসা লখীন্দরকে পুনর্জীবিত করেন। কৌশলে বেহুলা মনসার কোপে নিহত চাঁদের আরও ছয়পুত্রের জীবন এবং নৌকাডুবিতে

সমুদ্রতলশায়ী ধনরত্ন সব উদ্ধার করিয়া চাঁদ সদাগরের কাছে ফিরিয়া যান। শিবভক্ত চাঁদ মনসার পূজা করিতে অস্বীকার করেন কিন্তু বহু অনুনয়-বিনয় করিয়া, এমন কি চোখের জলের আশ্রয় লইয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বেহুলা চাঁদকে দিয়া মনসার পূজা করান।

সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতই সতী বেহুলাও নারীত্বের মহিমায় বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হইয়া আছেন।

অমিতা চক্রবর্তী

বৈকুণ্ঠ (১) ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম। বিভিন্ন পুরাণে বৈকুণ্ঠ শব্দের নিম্নরূপ ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায়। চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামে জন্মগ্রহণ করেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১।৪২)। যিনি জড় জগৎপুঞ্জকে রূপাদিগুণে বিশেষিত করেন, বেদসমূহ তাঁহাকে বিকুণ্ঠা বা প্রকৃতি আখ্যা দেন। সৃষ্টির জন্য গুণাবলম্বনে ভগবান তাঁহাতে জাত হন বলিয়া জ্ঞানীগণ পূর্ণতম ভগবানকে বৈকুণ্ঠ নামে অভিহিত করেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ৪।১১১।৪৯-৫০)। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে (৭১।১৫৭) বিষ্ণুর সহস্রনামের মধ্যে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১১১।১৯-২০) বিষ্ণুর পাপনাশক একাদশ নামের মধ্যে বৈকুণ্ঠের উল্লেখ আছে।

(২) বিষ্ণুলোক, বিষ্ণুভক্তদের একান্ত প্রার্থনীয় আরাধ্য পরম পদ ; ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোকের কোটি যোজন উপরে অবস্থিত ঐশ্বর্যমণ্ডিত জরামৃত্যুহীন অত্যুত্তম স্থান (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ৪।৪।৫৪-৫৫)।

যূথিকা ঘোষ

বৈজু বাওরা (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতক) স্বনামধন্য গায়ক ও সংগীত রচয়িতা। তাঁহার অসাধারণ সংগীতগুণের জন্য তাঁহার নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। তাঁহার বিষয়ে ঐতিহাসিক বিবরণের নিতান্তই অভাব ; কোনও কোনও মতে বৈজু নামের একাধিক গায়ক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম সম্ভবতঃ বৈজনাথ। উদাসীন স্বভাবের জন্য বৈজু বাওরা নামে পরিচিত হন। তাঁহার চার তুকে রচিত এবং চৌতাল ও ধামারে গঠিত বৃজভাষার অনেক গান পাওয়া যায়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বৈতরণী ওড়িশা রাজ্যের একটি নদী। ইহা কেওনঝড় জেলার মলয়াগিরি পার্বত্য অঞ্চল (২১°২৮′ উ ও ৮৫°৩০′ পূ) হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে ও বিহার রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করিয়া পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া যাজপুরের নিকট দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ শাখা ব্রাহ্মণী নদীতে ও পূর্ব শাখা পামিরাস বিন্দুতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মোট দৈর্ঘ্য ৪০০ কিলোমিটার।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাগমন কালে এই নদীতে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন।

দ্র M. Ahmad, *Census of India* 1961, *Orissa Administrative Atlas* Vol. XII pt. IX-B; *The Imperial Gazetteer of India* vol V. Oxford, 1908.

সলিলকুমার চৌধুরী

বৈরাম খাঁ হুমায়ুনের বিশ্বস্ত অনুচর। হুমায়ুন তাঁহাকে সিরহিন্দ এলাকাটি দান করেন ও আকবরের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বৈরাম কলনৌরে আকবরের অভিষেক সম্পন্ন করেন। আদিল শাহ্ সুরের সেনাপতি হিমু আগ্রা, দিল্লী অধিকার করিয়া পাণিপথে সৈন্যসমাবেশ করিলে বৈরাম ও আকবর তাঁহাকে পরাজিত করেন (৫ নভেম্বর, ১৫৫৬ খ্রী)। বৈরামের আদেশে আকবর অচৈতন্য হিমুকে নিহত করেন। বৈরাম খাঁ ৪ বৎসর অল্প বয়স্ক আকবরের অভিভাবকত্ব করেন (১৫৫৬-৬০ খ্রী)। এই সময়ের মধ্যে তিনি আকবরকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ও পাঞ্জাব, মুলতান, দিল্লী, জৌনপুর পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র, আজমীর, নগোর, মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আকবর বৈরাম খাঁকে 'খান বাবা' বলিতেন। ক্রমে ক্রমে বৈরাম খাঁর প্রভাব প্রতিপত্তিতে তুর্কি অভিজাতসম্প্রদায়, আকবরের ধাত্রীমাতা অনগ ও তাঁহার পুত্র আধম খাঁ ঈর্ষান্বিত হইয়া বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। পরিণামে আকবর তাঁহাকে বরখাস্ত করেন ও তীর্থ পর্যটন করিতে বলেন (১৫৬০ খ্রী)। ক্ষুব্ধ হইয়া বৈরাম খাঁ বিদ্রোহ করেন কিন্তু জলন্ধরের নিকট পরাজিত হইয়া তিনি আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর মক্কা যাইবার পথে ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আফগান পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য বৈরাম খাঁকে হত্যা করে। বৈরাম খাঁ সুদক্ষ সেনাপতি, বিচক্ষণ শাসনকর্তা, শিক্ষিত ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। 'আকবর' দ্র

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

বৈশেষিক দর্শন বৈশেষিক দর্শন ভারতীয় আস্তিক দর্শনসমূহের অন্যতম। বৈশেষিকেরা সপ্তপদার্থবাদী, পরমাণুকারণবাদী এবং প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণে বিশ্বাসী। বৈশেষিক দর্শনের মূলগ্রন্থ মহর্ষি কণাদ-প্রণীত বৈশেষিকসূত্র। ন্যায়দর্শনের সহিত এই দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয় দর্শনের মতেই সংসার দুঃখময়, জীবনের চরম উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ ; মোক্ষের অর্থ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং উপায় তত্ত্বজ্ঞান। কণাদ বলিয়াছেন যে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় পদার্থের

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের বোধ হইতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পদার্থধর্মসংগ্রহ-প্রণেতা প্রশস্তপাদাচার্য 'অভাব' নামে এক সপ্তম পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা গুণ ও কর্মের আশ্রয় এবং যাহা ব্যতীত গুণ ও কর্ম থাকিতে পারে না তাহাই দ্রব্য। দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। ইহাদের প্রথম পাঁচটি পঞ্চভূত নামে পরিচিত। আকাশ ব্যতীত অপর চারিটি ভূত পরমাণুরূপে নিত্য এবং পরমাণুর সংঘাতজনিত শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপে অনিত্য। আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন নিত্যদ্রব্যের অন্তর্গত। আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় এবং মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। ইহা বিভু, অথচ সংখ্যায় বহু এবং শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন। মন অণু, ইহা আত্মা এবং সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের কারণ। যাহা দ্রব্যে সমবেত থাকে এবং যাহার নিজের গুণ বা কর্ম নাই তাহাই 'গুণ'। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্মভেদে গুণ চব্বিশ প্রকার। ধর্ম ও অধর্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট। ভৌতিক গতিক্রিয়াকে 'কর্ম' বলা হয়। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনভেদে কর্ম পাঁচ প্রকার। প্রথম চারি প্রকার কর্ম ভিন্ন অপর সকল কর্মই গমনের অন্তর্গত। নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম 'সামান্য' বা 'জাতি'। ব্যাপকতার পরিমাণ অনুসারে পরা, অপরা ও পরাপরা এই তিন প্রকার জাতি স্বীকার্য। যে পদার্থ একটি মাত্র নিত্যদ্রব্যে সমবেত এবং উহার ভেদসাধক তাহার নাম বিশেষ। ইহা সামান্যের বিপরীত। বৈশেষিক মতে নিত্যদ্রব্য অসংখ্য হওয়ায় তাহাদের ভেদসাধক বিশেষও অসংখ্য। বিশেষ স্বীকৃত না হইলে নিরবয়ব একজাতীয় পরমাণুদ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ হয় না। বিশেষ নিজেই নিজের ভেদসাধক। যাহারা পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না এইরূপ পদার্থদ্বয়ের নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায়। সূত্রের সহিত বস্ত্রের, গুণের সহিত গুণীর, ক্রিয়ার সহিত দ্রব্যের, জাতির সহিত ব্যক্তির সমবায়সম্বন্ধ বিদ্যমান। অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাবভেদে সংসর্গাভাব ত্রিবিধ। এক বস্তুতে অপর বস্তুর (যেমন অশ্বে গজের) অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব। বৈশেষিক মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও তিনি জগতের উপাদান-কারণ নহেন, নিমিত্ত-কারণমাত্র। এই মতে চতুর্বিধ পরমাণুই জগতের সকল উৎপন্ন বস্তুর উপাদান-কারণ।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণু যাঁহার দেবতা তাঁহাকে বৈষ্ণব বলে। প্রাচীনকালে বৈষ্ণব শব্দের পরিবর্তে একান্তিক, সাত্বত, ভাগবত ও পঞ্চরাত্র শব্দ প্রয়োগ করা হইত। মহাভারতের একেবারে শেষের দিকে (১৮।৬।৯৭,৯৮,১০৩) বৈষ্ণব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্মের কয়েকটি মূলতত্ত্ব বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের ৭।১০০।২ মন্ত্রে আছে 'হে প্রাপ্তকাম বিষ্ণু, তুমি তোমার সর্বজনহিতকারী দোষ-বিরহিত অনুগ্রহবুদ্ধি আমাদিগকে দাও।' উহার ১।২২।১৮ অনুবাকে বিষ্ণুকে গোপা বা গাভীদের রক্ষক ও ১।১৫৫।৬ অনুবাকে 'যুবা আকুমারঃ' (চিরকিশোর) বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৭) বলা হইয়াছে, ভগবান প্রেম-স্বরূপ ও তাঁহাকে পাইলে লোকে আনন্দলাভ করে। মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৩) আছে যে যাহাকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে। ভগবৎপ্রসাদ ব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না এইকথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ-কথিত নিমি-নবযোগীন্দ্র সংবাদে বলা হইয়াছে যে, যিনি সর্বভূতে নিজের ভগবৎসত্তা বা একাত্মতা অনুভব করেন এবং ভগবানে যিনি যাবতীয় সৃষ্টবস্তু অবলোকন করেন তিনিই উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা এবং দ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম। আর যিনি শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাতে হরিপূজা করেন, তাঁহার ভক্তগণকে বা অন্য কোনও বস্তুতেই পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত বা সাধারণ ভক্ত।

খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পূর্বে পাণিনি বাসুদেব ভক্তদের কথা ইংগিতে বলিয়াছেন (৪।৩।৯৮ বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্ সূত্রে)। তাঁহার ভাষ্যকার পতঞ্জলি বিশেষ করিয়া বাসুদেবের পূজক গোষ্ঠীর কথা বলিয়াছেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাওয়া যায় যে সৌরসেনয় নামক একটি ভারতীয় জাতি হেরাক্লিস দেবতাকে বিশেষ সম্মান করিত। ইহাদের মেথোরা নামে নগরী ছিল এবং জোবারিস নামে নদী ইহাদের দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। মথুরা প্রদেশ সৌরসেন রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং জোবারিস যমুনারই নাম; হেরাক্লিস শব্দে কৃষ্ণকেই বুঝাইতেছে। পঞ্চম শুংগরাজ ভাগভদ্রের সভায় তক্ষশিলার অধিবাসী এলিয়দর (হেলিওদোরাস) নামক গ্রীক দূত আসিয়া আনুমানিক ১১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মধ্যপ্রদেশের বেসনগরে এক বিরাট গরুড়ধ্বজ স্থাপন করেন এবং তিনি নিজেকে ভাগবত সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া পরিচয় দান করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকে বৈষ্ণবধর্ম রাজপুতানাতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চিতোরগড়ের আট মাইল উত্তরে ঘোসুন্দি নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলালেখ হইতে জানা যায়, কান্ববংশজাত রাজা সর্বতাত সংকর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার স্থানে নারায়ণ বাটিকায় পাথরের

দেওয়াল তৈয়ারি করাইয়া দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্রেও বৈষ্ণবধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল; সাতবাহন রাজবংশের তৃতীয় রাজা শ্রী সাতকর্ণির মহিষী নায়নিকা সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে অবস্থিত নানাঘাটে গুহায় খোদিত লিপিতে সংকর্ষণ ও বাসুদেবের নাম করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মুদ্রায় ও শিলালেখে ত্রৈকুটক রাজ দর্হসেন পরম বৈষ্ণব এবং সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরমভাগবত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

গুপ্তযুগের প্রাক্‌কালে বিহার ও বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের নিদর্শন পাওয়া যায়। শাহাবাদ জেলায় মুণ্ডেশ্বরী পাহাড়ের একটি শিলালেখে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) শ্রীনারায়ণের মন্দিরের উল্লেখ আছে। বাঁকুড়ার নিকটবর্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্মণ চক্রস্বামী বিষ্ণুর পূজার জন্য গুহা ও চক্রচিহ্ন নির্মাণ করিয়া দেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে ভাগবতে বর্ণিত যমলার্জ্জুনভঙ্গ, কেশিদৈত্যবধ, গোকুলে নবজাত কৃষ্ণকে আনয়ন, চানুর মুষ্টিক বধ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার পাথরে অঙ্কিত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ সময়ে বাংলাদেশে যে কৃষ্ণের উপাসনা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত।

পঞ্চম ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে দ্রাবিড় দেশে আড়্‌বার অর্থাৎ ভগবানের প্রেমে আত্মহারা ভক্তগণ আবির্ভূত হইয়া দিব্য প্রবন্ধাবলী রচনা করেন ('আড়্‌বার' দ্র। আড়বারদের পরে বৈষ্ণব আচার্যগণের আবির্ভাব হয় ও নানা বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যমুনাচার্যই শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যদিও রামানুজাচার্যের (১০১৬—১১৩৭ খ্রী) খ্যাতি সর্বাপেক্ষা অধিক। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ। ইহার পর নিম্বার্কাচার্য (আনুমানিক কাল ১১১৪—৬২ খ্রী) ও মধ্বাচার্য (১১৯৭—১২৭৬ খ্রী) নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন।

মহারাষ্ট্রে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন। মধ্যযুগে ভীমানদীর তীরে পান্ডারপুরে বৈষ্ণবধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানুজসম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ (১৪০০—১৪৭০ খ্রী) কবীর, রুইদাস বা রবিদাস প্রভৃতিকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যদল বৈষ্ণবধর্মকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুজরাতে নরসি মেহতা নামক ভক্ত কবির উদ্ভব হয়। পরে গুজরাতে বল্লভাচার্যের সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। বল্লভাচার্য (১৪৭৮—১৫৩১ খ্রী) বালগোপালের উপাসক ছিলেন; তাঁহার পুত্র বিঠ্‌ঠলনাথ রাধাকৃষ্ণের উপাসনার প্রবর্তন করেন।

আসামের মহাপুরুষিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক শংকরদেব (১৪৬৩—১৫৬৮ খ্রী) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করেন। রাজপুতানায় মীরাবাঈ (১৫০০—১৫৪৭ খ্রী) গিরিধরকে নাগররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। রামানুজাচার্য হইতে শংকরদেব পর্যন্ত সকলেই আচার্য বলিয়া সম্মানিত কিন্তু বাংলাদেশের চৈতন্যদেব (১৪৮৬—১৫৩৩ খ্রী) তাঁহার ভক্তগণকর্তৃক সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপে পূজিত হন। তিনি বিশুদ্ধ মাধুর্যগুণোপেত প্রেমধর্ম প্রবর্তিত করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও গদাধর পঞ্চতত্ত্বরূপে পূজিত হন। কর্ণাটক বংশীয় সনাতন, তাঁহার ভ্রাতা রূপ ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব, দ্রাবিড় দেশের গোপাল ভট্ট, বারাণসীর রঘুনাথ ভট্ট ও বাংলার কায়স্থ রঘুনাথ দাস ছয় গোস্বামী রূপে সম্মানিত। শ্রীচৈতন্যের অনুপ্রেরণায় ইঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ করেন।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে স্ত্রীজাতি ও তথাকথিত নীচবর্ণের ব্যক্তিরা নূতন সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। তামিল, তেলুগু, কন্নড়, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, অসমীয়া ও মারাঠি সাহিত্য বৈষ্ণব লেখকদের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে। স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যেও বৈষ্ণব ধর্মের দান অসামান্য। 'ভক্তিবাদ' দ্র

দ্র জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চোপাসনা, কলিকাতা, ১৯৬০; R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems*, Poona, 1928; Hemchandra Raychoudhuri, *Materials for the Study of the Early History of the Vaisnava Sect*, *Calcutta*, 1936; Sushil Kumar Dey, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, Calcutta, 1962.

বিমানবিহারী মজুমদার

বৈষ্ণবদাস পদকর্তা, গায়ক এবং পদাবলীর সংকলনকারী, নামান্তর গোকুলানন্দ সেন, নিবাস কাটোয়া অঞ্চল, গুরু রাধামোহন ঠাকুর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংকলিত ইঁহার পদকল্পতরু (বা গীতকল্পতরু) বৈষ্ণব পদাবলীর বৃহত্তম এবং সর্বাধিক প্রচারিত সংগ্রহ পুস্তক। পদকল্পতরু চারিটি শাখায় এবং শাখাগুলি পল্লবে বিভক্ত; ইহাতে সার্ধশতাধিক পদকর্তার মোট ৩১০১টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণবদাসের স্বরচিত পদসংখ্যা ২৬।

রসশাস্ত্রের আলোচনায় এবং বিপুল পদসম্ভারের যথাযথ বিন্যাসে বৈষ্ণবদাস প্রবীণ বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন।

দ্র সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ১—৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২২—১৩৩৮ বঙ্গাব্দ; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড অপরার্ধ, কলিকাতা, ১৯৬৫।

কল্যাণী দত্ত

বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য সহজিয়া দ্র।

বোকারো বিহার রাজ্যের হাজারিবাগ জেলার একটি শহর (২৩°৪৭´ উ, ৮৫°৫৫´ পূ)। ইহা গোমো-বরকাকনা রেলপথের উপর কলিকাতা হইতে ৩৩১ কিলোমিটার দূরে বোকারো নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৫৪০৬। স্থানটির বাৎসরিক সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড়ে ২৭° সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা গড়ে ১০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়।

বোকারো কয়লাখনি অঞ্চলের নিকটে বোকারো ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরিকল্পিত উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ লক্ষাধিক টন। বেরমো অঞ্চলের নিকৃষ্ট কয়লা ধূলিচূর্ণ করিয়া কারখানার জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। লৌহ আকর ও চুনা পাথর সিংহভূম এবং ওড়িশা হইতে আসে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোনার ও বোকারো নদীর তীরে বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির উদ্বোধন হয় ('দামোদর উপত্যকা প্রকল্প' দ্র)। বর্তমানে ২৪৭৫০০ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া জামসেদপুর, হীরাপুর প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাত কারখানায় এবং বাংলা ও বিহারের কয়লাখনি অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ প্রেরণ করিতেছে। বোকারো নদীর উপর ২১১ মিটার দীর্ঘ বোকারো জলাধার নির্মিত। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বোকারো জলাধারের জল যথেষ্ট নহে; সেইজন্য কোনার জলাধার হইতে নিয়ন্ত্রিত জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই তাপকেন্দ্রটি কুলজিয়ান কর্পোরেশনের সাহায্যে ৩ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

শহরে কর্মীদের থাকিবার উপযুক্ত আবাসিক অঞ্চলটিতে সকল প্রকার আধুনিক ব্যবস্থা রহিয়াছে।

দ্র P. C. Roy Chowdhury, *Bihar District Gazetteers, Hazaribagh*, Patna, 1957.

রেবা বসু

বোক্কাচ্চিও, জোভান্নী (১৩১৩-৭৫ খ্রী) ইটালীয় মানবতাবাদী ও কবি, গদ্য আখ্যায়িকা দেকামেরনের লেখক। তিনি 'ফিলোকোলো' (১৪৭২ খ্রী), 'ফিলেস্ট্রেটো' (১৪৮০ খ্রী), 'তিসাইদ' (১৪৭৫ খ্রী), 'আমেতো' (১৪৭৮ খ্রী) ও কোরবাচ্চিও (১৪৮৭ খ্রী) ইত্যাদি কাব্যরচনা করেন। প্রেমের বেদনা ও বিশ্বাসহীনতাই কাব্যগুলির প্রধান উপজীব্য বিষয়।

'দেকামেরন' (১৩৪৮-৫৩ খ্রী) বিশ্বসাহিত্যের এক অনন্য সৃষ্টি। জীবনরসভূয়িষ্ঠ এই গদ্যকাহিনী ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ইওরোপব্যাপী মহামারীর (ব্ল্যাক ডেথের) পটভূমিকায় রচিত। ইহা মারীভয়ে তিনটি যুবক ও সাতটি মহিলার ফ্লোরেন্স ত্যাগ ও প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে গল্প কথন ও শ্রবণের মধ্যে দশটি দিন (গ্রীক deka = দশ, hamera = দিন) অতিবাহনের কাহিনী। অত্যন্ত বাস্তববাদী এই গদ্যরচনার মধ্যে শ্লেষ ও অশ্লীলতার স্পর্শ থাকিলেও, জীবন্ত চরিত্রসৃজনে গ্রন্থকার একজন পারংগম মহাশিল্পী। এই গ্রন্থ চতুর্দশ শতকের ইটালীর এক সামাজিক প্রতিচ্ছবি।

দ্র দেকামেরন বা উপাখ্যানমঞ্জুরী, কালিপদ মুখোপাধ্যায়-অনূদিত, কলিকাতা, ১৮৭০; J. A. Symonds, *Renaissance in Italy*, Part IV, New York, 1888; J. M. Rigg, tr., *Works of Boccaccio*, London, 1903; J. H. Whitfield, *A Short History of Italian Literature*, London, 1960.

অপূর্বকুমার সান্যাল

বোট্‌লিংক, গেহাইমরাট অটো ফন (Bohtlingk, Geheimrath Otto Von, ১৮১৫—১৯০৪ খ্রী) ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ (বর্তমান লেনিনগ্রাড) নগরে এক জার্মান পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ, বের্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া ইনি প্রথমে য়েনা ও লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদে আসীন ছিলেন। পাণিনি ব্যাকরণের সম্পাদনা ও জার্মান ভাষায় ইহার সর্বপ্রথম অনুবাদ করিয়া ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ রূপে খ্যাত হন। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রমে ইনি অধ্যাপক রুডল্‌ফ রথ-এর (Rudolph Roth) সহায়তায় এক বিরাট সংস্কৃত-জার্মান অভিধান (Sanskrit-Worterbuch) সংকলন করেন (সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ, ১৮৫২—১৮৭৫ খ্রী)। এই বিখ্যাত সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গ অভিধানই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : *Dissertation Sur l'accent Sanskrit* ও *Sakuntalā de* Kālidāsa (Ed. and Tr.)। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে লাইপ্‌ৎসিগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারতবিদ্যা পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া ভারতীয় উদ্ভিদ-সমীক্ষা বিভাগ, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরের বোটানিক গার্ডেনে সংগঠিত হয়। ভারতসাম্রাজ্যের উদ্ভিদসম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ভারতের নানা অংশে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত কার্যাবলীর সমন্বয়সাধনই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মধ্যযুগে ভারত উপমহাদেশে মশলা ও তদনুরূপ বাণিজ্যবস্তুর প্রাচুর্যের আকর্ষণ থাকায় স্বভাবতঃই উদ্ভিদবিদ্যা ও উদ্যানবিদ্যায় উৎসাহী বহু ব্যক্তি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারি-

গোষ্ঠীতে স্থান পাইয়াছিলেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত কয়েকটি উদ্যানে বিলাতী বিশেষজ্ঞের পরামর্শে নূতন উদ্ভিদ প্রচলনের উদ্যোগ করা হইয়াছিল। উদ্যানগুলির মধ্যে কলিকাতা, সাহারানপুর, বোম্বাই ও মাদ্রাজের নীলগিরির উদ্যান, এই চারিটি উল্লেখযোগ্য; এগুলিতে উদ্ভিদসম্পর্কিত অনুসন্ধানকার্যের সুযোগ লইয়া এই ৪টি উদ্যানকে যথাক্রমে পূর্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ আঞ্চলিক বোটানিক্যাল সার্ভেরূপে সংগঠিত করা হয়; প্রত্যেকটি উদ্যানের কেন্দ্রে ছিল একটি ওষধিশালা (হার্বেরিয়ম)—গবেষণা ও পথনির্দেশের জন্য শুষ্ক উদ্ভিদের সংগ্রহাগার।

জর্জ কিং ছিলেন বোটানিক্যাল সার্ভের প্রথম অধিকর্তা (১৮৯৩-৯৮ খ্রী); তিনি কলিকাতার রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের অধীক্ষকও ছিলেন। সমীক্ষাকার্যের জন্য বোটানিক্যাল সার্ভের পূর্বাঞ্চল তাঁহার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিদেরও সার্ভের আঞ্চলিক অধিকর্তা আখ্যা দেওয়া হইত। কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক সার্ভের কার্যের সমন্বয়সাধন বিশেষ সাফল্যলাভ করে নাই। প্রায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই বোম্বাই, মাদ্রাজ ও সাহারানপুরের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত বোটানিক্যাল সার্ভের সম্পর্ক বস্তুতঃ ছিন্ন হইয়া যায়। ফলে পূর্বাঞ্চলই বোটানিক্যাল সার্ভের একমাত্র অংগ হইয়া থাকে এবং রয়্যাল বোটানিক গার্ডেনের অধীক্ষক সার্ভের অধিকর্তারূপে অধিষ্ঠিত থাকেন।

প্রথম যুগে সার্ভের কোনও স্বতন্ত্র কর্মী বা পৃথক ব্যবস্থাদি ছিল না, সমীক্ষাদির ব্যয়নির্বাহের জন্য ১০০০ টাকারও কম অর্থ বরাদ্দ ছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের অর্থনৈতিক উপজবিষয়ে অন্বেষণের উদ্দেশ্যে 'ডিক্শনারি অফ দি ইকনমিক প্রোডাক্ট্স অফ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থ সংকলনার্থে জর্জ ওয়াটকে নিয়োগ করা হইয়াছিল; ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের শিল্পশাখায় ভারতসরকারের অর্থনৈতিক উপজবিষয়ক প্রতিবেদকের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয় এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে উহা বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সহিত মিলিত হয়। তখন হইতে কলিকাতায় সার্ভের কার্যালয়গুলি ২টি কেন্দ্রে বিন্যস্ত হয়: ১. শিবপুরে ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন: উইলিয়াম রক্সবার্গ, ন্যাথানিয়েল ওয়ালিচ প্রমুখের আহৃত মূল্যবান উদ্ভিদসংগ্রহে সমৃদ্ধ ওষধিশালাটি ইহার অংশবিশেষ ছিল; ২. ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে অবস্থিত কার্যালয়: শিল্পবাণিজ্য ও কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্জ উপজবিষয়ক দুর্মূল্য সংগ্রহশালাটি এখানে অবস্থিত ছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একই ব্যক্তি সার্ভের অধিকর্তা ও ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনের অধীক্ষকপদে নিযুক্ত হইতেন; ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পদদুইটিতে পৃথক পৃথক ব্যক্তিকে নিয়োগের প্রথার সূচনা হয়।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ কর্মক্ষেত্রের প্রসারার্থে সার্ভের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সরকারি অনুমোদন লাভ করে। আধুনিককালে বৎসরে গড়ে প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধানকার্য পরিচালনার দায়িত্ব সার্ভে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের উদ্ভিদ-ভৌগোলিক (ফাইটো-জিওগ্রাফিক) অঞ্চলগুলিতে উদ্ভিদান্বেষণ পরিচালনার জন্য দেরাদুন, শিলং, এলাহাবাদ, পুনা ও কোয়েম্বাতুরে কেন্দ্র করিয়া ৫টি আঞ্চলিক মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। আসামের বনবিভাগের ওষধিশালা, বোম্বাইয়ের অর্থনৈতিক উদ্ভিদবিজ্ঞানীর ওষধিশালা, কলিকাতার ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনের ওষধিশালা ইত্যাদি স্থানীয় মুখ্য ওষধিশালাগুলির ভার বিভিন্ন রাজ্য সরকার বা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে বোটানিক্যাল সার্ভে গ্রহণ করিয়াছে। উদ্ভিদবিদ্যা ও দেশের প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ হইতে জীবিত উদ্ভিদকুল সম্বন্ধে চর্চার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উদ্ভিদবিদ্যা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। সার্ভে কয়েকটি নির্বাচিত অঞ্চলে আঞ্চলিক বোটানিক গার্ডেন স্থাপন করিয়াছে। আসামে শিলং-এ এবং দক্ষিণ ভারতের ইয়ারকোদে অর্কিড চাষের জন্য জাতীয় অর্কিডাগার (অর্কিডারিয়া) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সার্ভের মুখপত্র হিসাবে বুলেটিন, রেকর্ড্স, অ্যানাল্স প্রভৃতি গবেষণাপুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদকুল ও উদ্ভিদশ্রেণীবন্ধ (সিস্টেমেটিক বোটানি) সম্বন্ধে গবেষণার সুবিধার্থে বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাংলা, ওড়িশা, উচ্চতর গাংগেয় সমভূমি প্রভৃতি অঞ্চলের আঞ্চলিক উদ্ভিদকুল বিষয়ে গ্রন্থাদি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনে কেন্দ্রীয় জাতীয় ওষধিশালার জন্য শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ভবনের নির্মাণকার্যও আরম্ভ হইয়াছে।

কদয়ম সুব্বিয়াহ শ্রীনিবাসন

বোড়ো ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের একটি প্রাচীন জাতি ও তাহাদের ভাষা, ইহা ভোট-বর্মী মণ্ডলীর অন্তর্গত। এক সময়ে ইহারা সমগ্র ব্রহ্মপুত্র অঞ্চল, ভুটান, মণিপুর, নাগাপর্বতের পশ্চিম অঞ্চল, ত্রিপুরা ও বংগদেশের নানা স্থানে বাস করিত। আর্যভাষীগণের আক্রমণে ইহারা হটিয়া উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লয়।

গ্রিয়ারসনের মতে কাছাড়ী, মেচ্, রাভা, লালুংগ, ডিমা-ছা, গারো, ত্রিপুরা চুতিয়া প্রমুখ ভাষা বোড়ো ভাষামণ্ডলীর অন্তর্গত। বোড়ো ভাষার প্রধান লক্ষণ 'গ্রন্থিবদ্ধ' (agglutinative) শব্দের ব্যবহার। ইহা আর্যভাষার নানালক্ষণ বর্তমানে গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বোড়োভাষীর সংখ্যা ২,৮০,৩৪৩। 'কাছাড়ী' দ্র।

দ্র G. A. Grierson, *Linguistic Survey of India*, Vol. III, Part II, Calcutta, 1903.

বোধগয়া বুদ্ধগয়া দ্র

বোধিদ্রুম গয়াতীর্থে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে যে অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভ করেন তাহাই বোধিদ্রুম। তথাগত বিমুক্তিলাভের পর সাতসপ্তাহ ধরিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করায় সমগ্র স্থানটি বজ্রাসন, অনিমেষ প্রভৃতি সাত অংশে চিহ্নিত হইয়া বৌদ্ধগণের নিত্যবন্দনীয় হইয়াছে। বুদ্ধ করযোড়ে বোধিবৃক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছেন, ইহা সিংহলে মেডাওয়ালা বিহারের একটি বিখ্যাত ভিত্তিচিত্র।

কথিত আছে বুদ্ধ স্বয়ং আনন্দকে বোধিদ্রুমের শাখা শ্রাবস্তীতে রোপণ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ফলে অচিরকালের মধ্যে শ্রাবস্তী, বারাণসী, পুরুষপুর এবং সমস্ত বৌদ্ধতীর্থে বোধিদ্রুম রোপিত হইয়া পূজিত হইতে থাকে। মহাবংশ মতে সিংহলরাজ দেবনাংপিয় তিস্সের অনুরোধে অশোক বোধিবৃক্ষের শাখাসহ থেরী সংঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। অদ্যাপি সেই প্রাচীনতম বৃক্ষ অনুরাধপুরে পূজিত হইতেছে।

হিউএন্-ৎসাঙ অশোকের বোধিবৃক্ষ সেবা, গৌড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক বৃক্ষচ্ছেদন এবং মগধরাজ পূর্ণবর্মা কর্তৃক পুনরায় বৃক্ষরোপণের বর্ণনা করিয়াছেন।

জেনারেল কানিংহাম বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসন খনন করিবার সময় শশাঙ্ক কর্তৃক ছেদিত বারশত বৎসরের পুরাতন বৃক্ষকাণ্ড আবিষ্কারের গৌরব দাবি করিয়াছেন। অধুনা-দৃষ্ট বোধিবৃক্ষ অত্যন্ত প্রাচীন নহে। 'বুদ্ধগয়া' দ্র।

A. Cunningham, *Mahabodhi under the Bodhi Tree*, London, 1912.

কল্যাণী দত্ত

বোধিসত্ত্ব মহাযান দ্র।

বোনাপার্ট, নাপোলেঅঁ (১৭৬৯—১৮২১ খ্রী) কর্সিকা দ্বীপের রাজধানী আয়াচো (Ajaccio) নগরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নাপোলেঅঁ'র জন্ম হয় (১৫ আগস্ট, ১৭৬৯ খ্রী)। এই পরিবারের আদি বাসভূমি ছিল ইটালীর টাস্কানী প্রদেশ। নয় বৎসর বয়সে বালক নাপোলেঅঁ ব্রিয়েন (Brienne)-এর সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন; ষোল বৎসর বয়সে তিনি ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করেন। ইহার চারি বৎসর পরেই ফরাসী বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় (১৭৮৯ খ্রী) আরম্ভ হয়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলন্দাজবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে নাপোলেঅঁ তুলোঁর (Toulon) বিপ্লব আন্দোলন দমন করিয়া সামরিক দক্ষতার পরিচয় দান করেন। দুই বৎসর পর পারীতে (প্যারিসে) এইরূপ আর একটি অভিযান (অক্টোবর, ১৭৯৫ খ্রী) দমন উপলক্ষে তিনি অদ্ভুত সাহসিকতা ও রণনৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ইহার ফলে ইটালীর রণাংগনে অস্ট্রিয়া ও সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব (১৭৯৬ খ্রী) তাঁহার উপর ন্যস্ত হইল। এই দায়িত্ব পালন উপলক্ষে যুবক সেনানায়ক সামরিক প্রতিভার আরও পরিচয় দেন। পরাজিত অস্ট্রিয়া-সরকার বেলজিয়ম ত্যাগ এবং উত্তর-ইটালীতে নাপোলেঅঁ-প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রী-সরকারকে স্বীকৃতি দান করিয়া কাম্পো ফর্মিও-র সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন (১৭ অক্টোবর, ১৭৯৭ খ্রী)। অতঃপর ফ্রান্সের অপর প্রধান শত্রু ইংল্যাণ্ডের শক্তি খর্ব করার অভিপ্রায়ে ফ্রান্সের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর (Directory) অনুমোদনক্রমে নাপোলেঅঁ মধ্যপ্রাচ্যকে নূতন সামরিক পরিকল্পনার ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইলেন। মিশর হইতে অভিযান শুরু করিয়া প্রাচ্যদেশে ইংরেজ প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধনই ছিল এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও প্রধানতঃ ইংরেজ নৌবহরের বিরোধিতা হেতু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা সফল হইল না।

অতঃপর বিপ্লব-কবলিত ফ্রান্সের শাসনক্ষেত্রে গুরুতর শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটিল। এই পরিবর্তনের নায়ক ছিলেন নাপোলেঅঁ। ইহার ফলে ডিরেক্টরী শাসনের অবসান হইল এবং নবগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতার শীর্ষস্থলে অধিষ্ঠিত হইলেন প্রথম কন্সাল রূপে অভিহিত নাপোলেঅঁ স্বয়ং (ডিসেম্বর, ১৭৯৯ খ্রী)। সমরবিজয়ী নায়ক অতঃপর আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে উদ্যত হইলেন। বিপ্লবী নায়করা 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র আদর্শে যে ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং জটিল সামরিক পরিস্থিতি উহার সফল প্রয়োগের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছিল। ক্ষমতা লাভ করিয়াই প্রথম কন্সাল বিপ্লব-প্রচারিত আদর্শ যথাসম্ভব রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে অস্ট্রিয়াকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত এবং রাশিয়াকে ফ্রান্স-বিরোধী শক্তি সমবায়ের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিতে বাধ্য করিয়া পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের সহিত আমিয়েন-এর সন্ধি (Treaty of Amiens, মার্চ, ১৮০২ খ্রী) করিলেন। এইভাবে সামরিক শক্তি পরীক্ষার দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক নিশ্চিন্তমনে দেশের আভ্যন্তরিক সংস্কার প্রবর্তনে উদ্যোগী হইলেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর কালের মধ্যে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষা-দীক্ষা, যোগাযোগ, পরিবহন, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সকল স্তরে যুগান্তকারী পরিবর্তন হইল।

কিন্তু ইওরোপের রাজতন্ত্র-শাসিত রাজ্যসমূহের সহিত দীর্ঘকাল সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব হইল না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইওরোপ জুড়িয়া যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে নাপোলেঅঁ "আজীবন কন্সাল"-

রূপে আপন শক্তি দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অতঃপর "ফরাসীদের সম্রাট"রূপে তিনি ক্ষমতা ও মর্যাদার উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত হইলেন (২ ডিসেম্বর, ১৮০৪ খৃী)। ইংল্যান্ডের শক্তি চূর্ণ করার জন্য নাপোলেঅ' জলপথে সরাসরি ইংল্যান্ড আক্রমণের অভিপ্রায়ে বহু শ্রম ও অর্থব্যয়ে এক বিরাট নৌ-অভিযান পরিচালনা করিলেন; কিন্তু ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেলসেন-এর কাছে ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবাহিনী পরাজিত হইল (২১ অক্টোবর, ১৮০৫ খৃী)। কিন্তু স্থলযুদ্ধে ফরাসী বাহিনী তখনও অপ্রতিহতগতি। সুতরাং এই সময় ফ্রান্স-বিরোধী শক্তিজোট পুনর্গঠিত হইলেও ফরাসী সৈন্যের অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রগতি রোধ করা অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া বা রাশিয়ার সাধ্যায়ত্ত হইল না; অস্টারলিৎস এবং অয়েরস্টাট, ও ফ্রিড্‌লান্ট-এর রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ একে একে ফরাসী বাহিনীর নিকট শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। রুশ অধিপতি প্রথম আলেকজান্ডার ফরাসী সম্রাটের সহিত টিল্‌সিট-এর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন (জুলাই, ১৮০৭ খৃী)।

অতঃপর সমগ্র ইওরোপব্যাপী এক অখণ্ড, বিশালায়তন ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্খায় বিজয়ী সম্রাট তাঁহার দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তি সর্বপ্রযত্নে নিয়োজিত করিলেন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া উড্ডীন হইল ফ্রান্সের বিজয় পতাকা। নাপোলেঅ'-র প্রথমা পত্নী যোশেফিনের (Josephine) প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ইউজেন (Eugene) ইটালীর, সম্রাটের ভ্রাতা লুই হল্যান্ডের, এবং অপর ভ্রাতা যোশেফ স্পেনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; বিশ্বস্ত সেনাপতি, অনুচর ও ভগ্নীপতি মুরা (Murat) লাভ করিলেন নেপল্‌স্-এর রাজপদ। নাপোলেঅ'র নির্দেশে ইতিহাসকীর্তিত সুপ্রাচীন "পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য" (Holy Roman Empire) ভাঙিয়া নূতনভাবে রচিত হইল জার্মানীর রাজনৈতিক মানচিত্র। রাজনৈতিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পত্নী যোশেফিনকে ত্যাগ করিয়া অস্ট্রিয়ার সম্রাট-দুহিতা মেরী লুইস্-এর সহিত তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন (১৮০৯ খৃী)।

ইহার কিছুকাল পরেই ফরাসী নায়কের ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ভবিষ্যৎ দুর্বিপাকের ঘনঘটা। ইংরেজ শক্তি পর্যুদস্ত করার অভিপ্রায়ে নাপোলেঅ' অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধের যে এক বিরাট পরিকল্পনা করিয়াছিলেন ইংরেজ নৌ-শক্তির অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের ফলে তাহা ব্যর্থ হইল এবং শিল্প-বাণিজ্যে সর্বাধিক উন্নত দেশ ইংল্যান্ডের সহিত ইওরোপের বাণিজ্যিক সম্পর্কচ্ছেদ করার ফলে রাশিয়া এবং মধ্য ও উত্তর ইওরোপের একাধিক রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিরোধী হইল। রুশ সম্রাট টিলসিট্-এর সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন এই অভিযোগ করায় নাপোলেঅ' ও রাশিয়ার মধ্যে তীব্র বৈরীভাবের সৃষ্টি হইল। ইতিমধ্যে যোশেফের শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র স্পেনদেশ জুড়িয়া শুরু হইল প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ। সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পর্তুগাল ও স্পেনে পুনরায় নূতন উদ্যমে নাপোলেঅ'র সহিত সংগ্রামে (Peninsular war) লিপ্ত হইলেন। প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের মনেও সংক্রামিত হইল ক্রমবর্ধমান নাপোলেঅ'-বিরোধী মনোভাব। স্পেনের জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ ফরাসী বাহিনীর পক্ষে প্রতিহত করা সম্ভব হইল না। রুশ দেশের বিরুদ্ধে ফরাসী বাহিনী অভিযান করিল (১৮১২ খৃী) কিন্তু মস্কো (মস্ক্‌ভা) পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পর ফরাসী বাহিনী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। প্রত্যাবর্তনকালে একদিকে প্রচণ্ড শীত ও খাদ্যাভাব, অপরদিকে শত্রু সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণ তাহাদের যাত্রা প্রতিপদে বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিল। ইহার ফলে পাঁচ লক্ষাধিক ফরাসী সেনা বিনষ্ট হইল।

মস্কো অভিযানের ব্যর্থতার পর হইতে ফরাসী সম্রাটের ভাগ্যবিপর্যয়ের গতি আরও ত্বরান্বিত হইল। রাশিয়া, সুইডেন, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও ইংল্যান্ড নূতন উদ্যমে ফ্রান্সের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইল। নাপোলেঅ' লুৎসেন (Lutzen), ড্রেসডেন-প্রমুখ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও লাইপৎসিগ্ (Leipzig)-এর চারদিনব্যাপী (১৬-১৯ অক্টোবর, ১৮১৩ খৃী) সংগ্রামে পরাজিত হইলেন। বিজয়ী শত্রুবাহিনী অগ্রসর হইয়া পারী অধিকার করিয়া লইল (৩১ মার্চ, ১৮১৪ খৃী)। পরাজিত সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ (৬ এপ্রিল) করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হইলেন (১১ এপ্রিল)।

এই ভাগ্যবিপর্যয়কে উচ্চাকাঙ্খী নাপোলেঅ' চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২০ মার্চ তিনি গোপনে পারীতে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বুর্বোঁরাজ অষ্টাদশ লুই সিংহাসন ত্যাগ করিলেন। ফ্রান্সের সম্রাট ও ভাগ্যবিধাতারূপে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পুনরায় নাপোলেঅ'-র করায়ত্ত হইল; কিন্তু এই ক্ষমতার মেয়াদ ছিল মাত্র একশতদিন (২০ মার্চ—২৮ জুন, ১৮১৫ খৃী)। ফ্রান্স-বিরোধী শক্তিজোট পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইল। অবশেষে ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে নাপোলেঅ'র পরাজয়ের (১৮ জুন, ১৮১৫ খৃী) ফলে তাঁহার সামরিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করার পর তিনি দক্ষিণ আটলান্টিক সমুদ্রে অবস্থিত সেন্ট হেলেনাদ্বীপে নির্বাসিত হইলেন। এই ক্ষুদ্রপরিসর দ্বীপে ছয় বৎসর বন্দীদশায় অবস্থানের পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে এককালের দিগ্বিজয়ী বীর, ফরাসী সম্রাটের জীবন নাট্যের পরিসমাপ্তি হইল।

দ্র H. A. L. Fisher, *Napoleon,* London, 1912; J. Holland Rose, *Life of Napoleon* I, London, 1922; J. M. Thompson, *Napoleon Bonaparte : His Rise and Fall,* Oxford, 1952; F. M. H. Markham, *Napoleon and the Awakening of Europe,* London, 1954.

নিশীথরঞ্জন রায়

বোম্বাই (মুম্বাই) মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী, ভারতের অন্যতম মহানগরী ও পোতাশ্রয় (১৮°৫৫′ উত্তর ও ৭২°৫৪′ পূর্ব)। ইহা ভারতের পশ্চিমাংশে আরবসাগর-তীরে অবস্থিত। বৃহত্তর বোম্বাই পূর্বে অপরিসর খাড়ি দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন সাতটি দ্বীপের সমষ্টি ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান ধারাবে (ট্রাবি), সলসেট, ট্রম্বে ও বোম্বাই।

বোম্বাই নামের ইতিবৃত্ত অনিশ্চিত। একমতে, পর্তুগীজ 'বম বাহিয়া' (অর্থাৎ সু-সাগর) হইতে, অন্যমতে মুম্বাই (কোলাবা অঞ্চলে কোলি জেলেদের পূজ্য দেবী) নাম হইতে বোম্বাই নামের উৎপত্তি। বোম্বাই দ্বীপ পর্তুগীজ অধিকারে আসে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইংরেজ অধিকারে আসে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে (প্রকৃত হস্তান্তর ১৬৬৫ খ্রী)। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে বার্ষিক দশ পাউণ্ড খাজনায় ইজারা নেয়। বোম্বাই দ্বীপের দক্ষিণাংশে পরাতন কেল্লাকে কেন্দ্র করিয়া গভর্নর জেরাল্ড আঙ্গিয়ার (Gerald Aungier)-এর সময়েই (১৬৭২-৭৭ খ্রী) খাঁড়ি বুজাইয়া প্রকৃতপক্ষে বর্তমান নগরীর পত্তন হয়। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম ভারতে ইংরেজের প্রধান কার্যালয় সুরাট হইতে বোম্বাইতে আসে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সহিত সলবাই সন্ধি হয় এবং বেসিন বন্দর ও সলসেট দ্বীপ ইংরেজ অধিকারে আসে।

পার্শি সম্প্রদায়ের ওয়াদিয়া ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে থানা শহর পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করা হয়। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময় বোম্বাই বন্দর মারফৎ ব্রিটেনে প্রচুর তুলা রপ্তানি করা হয়। এই সময় হইতেই নগরীর ঐশ্বর্য বাড়িতে থাকে। সুয়েজ খালপথ উন্মুক্ত হওয়ায় (১৮৬৯ খ্রী) বোম্বাই বন্দরের বাণিজ্য সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রথম কার্পাস বয়নশিল্পের কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বন্দর সংস্থা (Port Trust) গঠিত হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭ খ্রী), বিধান পরিষদ (১৮৬২ খ্রী), পৌরনিগম (১৮৮৮ খ্রী) ও উন্নয়ন সংস্থা (১৮৯৮ খ্রী) একে একে গড়িয়া ওঠে।

সমুদ্রের উপকূলে অবস্থানের জন্য বোম্বাইতে শীত-গ্রীষ্মের আধিক্য নাই। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৩৩° সেণ্টিগ্রেড। শীতকালীন গড় উত্তাপ ২৮° সেণ্টিগ্রেড। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮০ সেণ্টিমিটার। আশ্বিনের শেষের দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবাত্যাময় বৃষ্টি দেখা দেয়।

বৃহত্তর বোম্বাই মহারাষ্ট্রের একটি জেলা এবং ইহার সমগ্র অঞ্চল 'বৃহত্তর বোম্বাই পৌরনিগম'-এর আয়ত্তাধীন। ইহার আয়তন ৪৮১ বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ৪১৫২০৫৬ (১৯৬১ খ্রী)। বৃহত্তর বোম্বাইতে নানা ধর্মের লোকের বাস, তন্মধ্যে হিন্দু (৬৯%) ও মুসলমান (১৩%) প্রধান। এখানে বেশ কিছু সংখ্যক পার্শি (১·৭%) বাস করে। ভাষাগতভাবে মারাঠী ভাষাভাষী (৪২·৭%) ও গুজরাতী ভাষাভাষী (১৯·২%) প্রধান। অন্য ভাষাভাষীর সংখ্যা কম। সার্বিকভাবে নগরে জন-সংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯ হাজার (সর্বোচ্চ ঘনত্ব ৩৫ হাজার)।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, টাটা বিজ্ঞান গবেষণাগার, ট্রম্বে পারমাণবিক গবেষণাগার ও নানা ধরণের ৫৯টি কলেজই প্রধান। উচ্চশিক্ষার স্তরে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০ হাজারের কিছু বেশি। ২·৫ লক্ষ শিক্ষার্থী প্রায় ৫ শত বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করে। ১২ শতের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌণে পাঁচ লক্ষ শিক্ষার্থী আছে। নগরে শিক্ষিতের হার শতকরা ৫৯ জন।

নগরের অভ্যন্তরে স্থান সংকুলান একটি প্রধান সমস্যা। বৃহত্তর বোম্বাইতে ৮ লক্ষের উপর পরিবার বাস করে।

প্রতিদিন পশ্চিম ও মধ্য রেলপথ সমবেতভাবে প্রায় ৮০০ স্থানীয় ট্রেনে উপকণ্ঠ হইতে ১০ লক্ষের উপর যাত্রী বহন করে। নগরীর মধ্যে মোট ১৩৫০ কিলো-মিটার পাকা রাস্তা আছে। পৌরনিগমের অধীনে 'বম্বে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যাণ্ড ট্রান্সপোর্ট' প্রতিদিন প্রায় নয় শতটি বাস চালাইয়া ১৬ লক্ষ যাত্রী বহন করে। ভারতের মূল ভূখণ্ড হইতে স্থলপথে বৃহত্তর বোম্বাই প্রবেশের চারিটি পথ — ওয়াসাই খাড়ির উপর দিয়া পশ্চিম রেলপথ ও বোম্বাই-দিল্লী-কলিকাতা জাতীয় সড়ক এবং থানা খাড়ির উপর দিয়া মধ্য রেলপথ ও বোম্বাই-মাদ্রাজ জাতীয় সড়ক। ভারতের দুইটি আকাশ পরিবহণ সংস্থারই ('ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্‌স কর্পোরেশন' ও 'এয়ার ইণ্ডিয়া') সদর দপ্তর বোম্বাইতে অবস্থিত। বিমান অবতরণের জন্য সলসেট দ্বীপে দুইটি ক্ষেত্র আছে— সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর ও জুহু (ফ্লাইং ক্লাব' গুলির জন্য)।

নগরে চিকিৎসার জন্য মোট ৫৬২৫টি শয্যাসমন্বিত ৪৪টি সাধারণ চিকিৎসাগার ও ৮২টি দাতব্য ঔষধালয় আছে। নগরে জল সরবরাহ সলসেট দ্বীপে দুইটি হ্রদ (বিহার ও তুলসী) ও মূল ভূখণ্ডে দুইটি হ্রদ (তাঁসা ও বৈতর্ণ) হইতে করা হয়।

খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে। মহানগরে ৭৭টি পার্ক ও উদ্যান আছে, তন্মধ্যে বাইকুল্লা অঞ্চলের উত্তরে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনস (চিড়িয়াখানা ও ভিক্টোরিয়া অ্যালবার্ট যাদুঘর) ও সলসেট দ্বীপের উত্তরে কৃষ্ণগিরি উপবন (ন্যাশন্যাল পার্ক) বিখ্যাত। নগরের কেন্দ্রে ফোর্ট অঞ্চলে সুবৃহৎ 'প্রিন্স অফ ওয়েলস' যাদুঘর ও 'জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী' (চিত্রশালা) উল্লেখযোগ্য। বোম্বাইতে দুইটি স্টেডিয়াম 'ব্রেবোর্ন স্টেডিয়াম', ও বর্তমানে ভারতের সর্ববৃহৎ 'বল্লভ-ভাই স্টেডিয়াম' আছে। চৌপট্টি অঞ্চলে তারাপোরওয়ালা মৎস্যাগার (Aquarium) একটি বিশেষ আকর্ষণ। স্নানের জন্য সমুদ্রতীরে বহু বালুকাময় সৈকত আছে, তন্মধ্যে সলসেটের পশ্চিমাংশে 'জুহু'ই সর্বাপেক্ষা মনোরম।

'বৃহত্তর বোম্বাই' বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম পৌর-নিগম। ৪৪টি ওয়ার্ডে বিভক্ত নিগমের জন্য ১৩১ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে টাটা কোম্পানি পশ্চিমঘাট পর্বতে খোপোলিতে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়িয়া তুলে। পরবর্তীকালে ইহা পরিবর্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি কয়না নদীতে সরকারি উদ্যোগে বাঁধ দিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। সম্প্রতি ট্রম্বেতে উৎপাদিত পারমাণবিক বিদ্যুতেরও ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে।

নগর শিল্পাঞ্চল হিসাবে বৃহত্তর বোম্বাই-এর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প কারখানাগুলি প্রধানতঃ উপনগরী এবং বহিঃউপনগরী অঞ্চলেই বেশি গড়িয়া উঠিয়াছে। কার্পাস বস্ত্রশিল্পই প্রধান। কৃত্রিম বস্ত্রশিল্পও খুবই বৃহৎ। বস্ত্রশিল্পের প্রধান অঞ্চল পারেল। নানা প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের গুরুত্ব বস্ত্র-শিল্পের পরেই ; মাজাগাঁও প্রধান অঞ্চল। খনিজ তৈল, সার, প্লাস্টিক, সেলুলয়েড ও অন্যান্য রসায়ন শিল্প ট্রম্বে, সলসেট ও মাতুঙ্গাতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের সর্ববৃহৎ সরকারি দুগ্ধকেন্দ্র সলসেটের উত্তর-পূর্বে 'অ্যারে'তে (Aarey) অবস্থিত। মাঝারি ও বৃহৎশিল্পে সর্বসমেত প্রায় ১৫২ শত কারখানায় ছয় লক্ষের উপর শ্রমিক কাজ করে। বোম্বাই চলচ্চিত্র নির্মাণশিল্প ভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্রশিল্পের প্রায় ৪ হাজার কারখানায় ৬৮ হাজারের উপর লোক নিযুক্ত। বোম্বাই-এর ভুলেশ্বর ও বাইকুল্লা অঞ্চলের খোদাই শিল্পীদের ধাতু ও কাঠের কাজ বিখ্যাত।

ভারতের উপকূলীয় বহির্বাণিজ্যে এক্ষণে বোম্বাই বন্দরের স্থান প্রথম। উন্মুক্ত আরব সাগর হইতে বোম্বাই দ্বীপের অন্তরালে (পূর্বে) প্রায় ২০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ৮-১১ মিঃ গভীর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়টি অবস্থিত। 'প্রিন্সেস' 'ভিক্টোরিয়া' ও 'আলেকজান্দ্রা' এই তিনটিই প্রধান ডক। অপেক্ষাকৃত বড় জাহাজগুলি (৩০০০০ টনের উপর) বোম্বাই বন্দরে অনায়াসে ভিড়িতে পারে। মাজাগাঁও শুষ্ক ডকে ছোট জটিল যান্ত্রিক জলযান নির্মাণ ও বড় জাহাজ মেরামত হয়।

বোম্বাই বন্দর মারফৎ ১৯৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে মোট ৫১·৪ লক্ষ টন মাল রপ্তানি ও ১২৯·৮ লক্ষ টন মাল আমদানি হয় (ভারতের মোট রপ্তানির ২২·৮% ও মোট আমদানির ৪৫·৬%)। অনেক পূর্বে কার্পাস ও শস্যই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। বর্তমানে কার্পাস বস্ত্র, তৈলবীজ, ম্যাঙ্গানিজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যই প্রধান। আমদানি দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধান — যন্ত্রপাতি, শস্য ও শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল (কার্পাস, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ধাতু ইত্যাদি)। উপকূলীয় ও পুনঃরপ্তানি বাণিজ্যের অনেকটাই ছোট বড় বজরাগুলি (বাঘলা - baghla) মারফৎ চলে।

বোম্বাই মহানগরীর প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে নগরকেন্দ্র 'ফোর্ট' অঞ্চল। জর্জ কেল্লা ও 'হর্নিম্যান সার্কল' (Horniman বা old Elphinstone)-কে কেন্দ্র করিয়া পুরাতন ইওরোপীয় ও নূতন অফিস অঞ্চল গড়িয়া উঠিয়াছে। ফোর্ট এলাকার পূর্বে ব্যালার্ড ও পশ্চিমে নেতাজী সুভাষ রোডের (Marine Drive) বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভ ভরাট করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে।

ফোর্ট এলাকার উত্তরে বোম্বাই-এর অতি পুরাতন ও সর্ববৃহৎ 'ক্রফোর্ড মার্কেট'। ইহার উত্তরে ভুলেশ্বরে আছে মোম্বাদেবীর মন্দির ও নগরীর প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র নল বাজার।

'ব্যাকবে'-র উত্তরে চৌপট্টিতে সমুদ্রতীরে গান্ধী ময়দান এবং তাহার পশ্চিমে প্রাসাদাকীর্ণ 'মালাবার হিলস'। মালাবার হিলস-এ বিখ্যাত 'ঝুলন্ত' উদ্যান ও পার্শিদের মৃতদেহ রাখিবার স্থান (Tower of Silence) আছে। মালাবার ও কাম্বালা হিলস-এর উত্তরে আরব সাগর তীরে রহিয়াছে পুরাতন মহালক্ষ্মী মন্দির ও বাণ-কুণ্ড। বোম্বাই দ্বীপের উত্তরাংশ পারেল উপনগরীতে আছে ভারতের প্রধান প্লেগ গবেষণাগার হপকিন্স ইনস্টিটিউট।

বিহার ও তুলসী হ্রদের নিকটে যোগেশ্বর ও কানহেরি গুহার শিল্পকার্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই বন্দর হইতে ১০ কিলোমিটার পূর্বে এলিফ্যান্টা (ঘারাপুরী) দ্বীপের গুহামন্দিরগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। কর্ণাট জেটি হইতে প্রতিদিন খেয়া নৌকা (launch) যাতায়াত করে।

দ্র C. D. Deshpande, *Western India,* Dharwar, 1948; O. H. K. Spate, *India and Pakistan,* London, 1957; Govt. of Maharashtra, *Commercial Directory of Industries in Maharashtra,* Bombay, 1962.

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

বোর, নিল্‌স হেন্‌রিক ডেভিড (১৮৮৫—১৯৬২ খ্রী) ডেনমার্কদেশীয় পদার্থতাত্ত্বিক। জন্ম ৭ অক্টোবর ১৮৮৫ খ্রী। শিক্ষা কোপেনহাগেনে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ধাতু-অন্তর্গত ইলেক্‌ট্রন সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি কোপেন-হাগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। অতঃপর বোর প্রথমে জে. জে. টমসন ও পরে রাদারফোর্ডের গবেষণাগারে যোগদান করেন। তথায় তিনি পরমাণুর গঠনসংক্রান্ত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন। এই ব্যাখ্যায় বোর তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর ধনাত্মক আধান কেন্দ্রকস্থিত এবং ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেক্‌ট্রনসমূহ কেন্দ্রকের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করে এবং পরমাণুর আলোক শোষণ ও বিকিরণ কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট। এই আবিষ্কার পরমাণুতত্ত্বের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীকালে বোরের অবদান করেস্‌পণ্ডেন্‌স সূত্র, যাহার সাহায্যে পুরাতন তত্ত্বের সহিত নব্যচিন্তার যোগসূত্র সংরক্ষিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বোর ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির হিউজ (Hughes) পদক লাভ করেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই তিনি কোপেন-হাগেনে ইন্‌স্টিটিউট অফ থিওরেটিক্যাল ফিজিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। বোরের পরিচালনায় উক্ত প্রতিষ্ঠান কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্বন্ধে একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বোর কম্‌প্লিমেণ্টারিটি সূত্র বর্ণনা করেন। এই সূত্র অনুসারে বিষয় ও প্রমাণপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্যতা ও পারস্পরিক প্রভাব স্বীকার করা হয়। উদাহরণতঃ ইলেক্‌ট্রন ও তাহার গতি বা অবস্থান নির্ণয়-কারী যন্ত্রের পারস্পরিক প্রভাব ও তজ্জনিত অনিশ্চয়তা লক্ষিত হয়। বোর কম্‌প্লিমেণ্টারিটি সূত্রকে জ্ঞানতত্ত্বের একটি প্রধান সূত্র হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃতি-তত্ত্ব, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইহা প্রয়োগ করিয়াছেন। তৃতীয় দশকের শেষ দিকে বোর কেন্দ্রক ও তাহার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। নাৎসীদের নিকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে গোপনে ইংল্যাণ্ডে ও পরে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময় হইতেই তিনি পরমাণুশক্তির উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ও শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে উক্ত শক্তির ব্যবহার সুরক্ষিত করার নিমিত্ত যথা-সাধ্য চেষ্টা শুরু করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ২০ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

বোলপুর পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার দক্ষিণপ্রান্তে অজয় নদীর নিকটে অবস্থিত শহর (২৩°৪০′ উত্তর ও ৮৭°৪২′ পূর্ব)। ইহা বর্ধমান হইতে সাহেবগঞ্জ লুপ রেলপথে বীরভূম জেলার প্রথম স্টেশন। শহরের উত্তর-পশ্চিমে শান্তিনিকেতন ও পশ্চিমে শ্রীনিকেতন। বোলপুর ও বাঁধগোড়া মৌজার একাংশ এবং কালিকাপুর ও মকরম-পুর মৌজার সম্পূর্ণাংশ লইয়া গঠিত বোলপুর শহর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৌর অঞ্চল বলিয়া গণ্য হয়। ইহার আয়তন ১৩ বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা ২৩৩৫৫—পুরুষ ১২৭৪৭, নারী ১০৬০৮ (১৯৬১ খ্রী)।

বোলপুর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ক্যাপ্টেন শেরউইন-কৃত সার্ভে ম্যাপ অনুযায়ী ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে বোলপুরে মোট ১৬৩টি কাঁচা বাড়ি ছিল। রেলপথের সহিত যুক্ত হওয়ার পর বর্ধিষ্ণু গ্রাম সুরুল, সুপুর, রায়পুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ব্যবসায়ীরা বোলপুরে বসবাস শুরু করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জমিদারদের কাছ হইতে এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া সেখানে 'শান্তিনিকেতন' নামক বাড়ি প্রস্তুত করেন ('শান্তিনিকেতন' দ্র)। চাল রপ্তানির গঞ্জ হিসাবে বোলপুরের দ্রুত প্রসার ঘটে। ইলামবাজার, লাভপুর, ও নানুর এই তিনটি থানা লইয়া যে অঞ্চল তাহার প্রধান গঞ্জ বোলপুর। ১৯০১ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার জনসংখ্যা ছয়গুণ বাড়ে। বর্তমানে বোলপুর বীরভূম জেলার অন্যতম চালকলকেন্দ্র। সপ্তাহে দুইদিন (রবিবার ও বৃহস্পতিবার) হাট বসে। মোটরবাসে বোল-পুরের সহিত চতুর্দিকস্থ বিভিন্ন গঞ্জ ও গ্রামের যোগাযোগ উন্নত হইয়াছে।

দ্র *Birbhum District Handbook, Census* 1961; Chittapriya Mukherji, *Urban Growth in a Rural Area : A Case Study of Bolpur.*

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস স্ট্যাটাস্টিক্যাল মেকানিস দ্র।

বৌদ্ধচৈত্য স্তূপ দ্র

বৌদ্ধদর্শন বুদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ববিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না। পরাতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি মৌন থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার সকল নৈতিক উপদেশের মূলে ছিল যুক্তিতর্ক ও বিচার। ইহার দ্বারা তিনি দার্শনিক তত্ত্বালোচনা বর্জন করিতে চাহিলেও এক নূতন দার্শনিক মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধের অনুবর্তী শিষ্যেরা নানা সম্প্রদায়ে ও উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বুদ্ধের আংশিকভাবে ব্যক্ত দার্শনিক মতের নানা দিকগুলিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এইভাবে বৌদ্ধদর্শনের অন্ততঃ ত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা উদ্ভূত হয়। ইহাদের মধ্যে চারিটি শাখাকে ভারতীয় দর্শন সাহিত্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ১. মাধ্যমিক ; ২. যোগাচার ; ৩. সৌত্রান্তিক ; ৪. বৈভাষিক। প্রথম দুইটি মহাযানী ও শেষ দুইটি হীনযানী।

মাধ্যমিক দর্শন ঃ অন্য নাম শূন্যবাদ। নাগার্জুন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের কেহ কেহ শূন্যবাদকে সর্বনাস্তিত্ববাদ (nihilism) বলিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাধ্যমিকেরা সর্বনাস্তিত্ববাদী নন। তাঁহাদের মতে যদিও দৃশ্যমান, প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা স্বীকার্য নয়, তথাপি তাহার পিছনে এক সদ্‌বস্তু আছে কিন্তু তাহা অনির্বচনীয়। এই অনির্বচনীয় সত্তাকেই মাধ্যমিকেরা 'শূন্য' বলেন।

মাধ্যমিক মতে সকল বস্তু শূন্য, যেহেতু চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত। যাহা সৎ তাহা কারণাতীত ; জাগতিক বস্তু কারণসাপেক্ষ, সুতরাং সৎ নয়। তাহাকে অসৎ বলা যায় না কেন না অসৎ বস্তুর কোনও কারণ থাকা সম্ভব নয়। তাহা যুগপৎ সৎ ও অসৎ এইরূপ বলা যায় না, কেন না দুইটি পরস্পরবিরোধী গুণ একত্রে অবস্থান করিতে পারে না। আবার এমন বলা যায় না যে তাহা সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, কেন না দুই বিরোধী গুণের অভাব একত্রে থাকিতে পারে না। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় তাহা অনির্বচনীয় এবং এই অর্থে শূন্য।

নাগার্জুনের মতে বস্তুর কারণসাপেক্ষ অস্তিত্বই (অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদই) শূন্যতা। তাহা কারণ নিরপেক্ষ সৎ নয়, আকাশকুসুমের ন্যায় সম্পূর্ণ অসৎ-ও নয়। এই কারণে এই মতবাদকে দার্শনিক অর্থে মধ্যম পন্থা বলা হয়। বস্তুর অস্তিত্ব ও গুণ কারণজনিত, অতএব আপেক্ষিক।

বুদ্ধের উপদেশ ব্যাখ্যাকল্পে নাগার্জুন দুই প্রকার সত্যের ভেদ করিয়াছেন ঃ ১. সংবৃতি-সত্য বা ব্যবহারিক সত্য ; ২. পরমার্থ-সত্য বা পূর্ণ সত্য। নির্বাণাবস্থায় উচ্চস্তরের পরমার্থ-সত্য উপলব্ধ হয়। নির্বাণ কিরূপ তাহা কোনও প্রকার ঐন্দ্রিয় প্রত্যয়ের দ্বারা অবর্ণনীয়। তাহা অনির্বচনীয়, বাক্য ও মনের অগোচর। তাহা ইহা নয়, উহা নয়, তাহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই ইত্যাদি নেতিমূলক বচনের দ্বারা নির্বাণের কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যায়।

যোগাচার দর্শন ঃ অন্য নাম বিজ্ঞানবাদ বা বাহ্যার্থ-শূন্যতাবাদ। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু এই সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় দার্শনিক ছিলেন। মাধ্যমিকেরা বাহ্য বস্তু ও মন, দুইয়েরই প্রকৃত সত্তাকে অস্বীকার করেন। যোগাচারদর্শনের মতে বাহ্যবস্তু অসৎ কিন্তু মন সদ্‌বস্তু। মনের সত্তাকে অস্বীকার করিলে যুক্তিতর্ক সবই মিথ্যা হইয়া পড়ে এবং মাধ্যমিকদের চুলচেরা বিচার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

মনের প্রত্যয়কেই আমরা ভ্রান্তির বশে বাহ্য বস্তুরূপে দেখি। ইহা মরীচিকাদর্শনের মত বা চক্ষুরোগবশতঃ একই চন্দ্রকে দ্বি-চন্দ্ররূপে দেখার মত। জ্ঞান ও জ্ঞেয়, যেমন, রক্তবর্ণের জ্ঞান ও রক্তবর্ণ, অভিন্ন। জ্ঞানসত্তা হইতে পৃথক বস্তুসত্তাকে প্রমাণ করা যায় না। যদি বাহ্যবস্তু থাকে তবে মানিতে হয় যে তাহা নিরবয়ব বা অণুপরিমাণ অথবা তাহা সাবয়ব। নিরবয়ব হইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সাবয়ব হইলে তাহার সকল অবয়বকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করা যায় না, অতএব সাবয়ব বস্তুরও প্রত্যক্ষ হয় না। উপরন্তু বাহ্যবস্তু থাকিলে তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই ক্ষণিক হইবে। তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান উদ্ভূত হওয়ার পূর্বেই তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং বর্তমানকে আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যদি বলা যায় বস্তুর বিনাশের পর তাহার প্রত্যক্ষ হয় তাহা হইলে বস্তুকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বলা যায় না। বাহ্যবস্তুকে জ্ঞান বা মানসিক প্রত্যয়মাত্র বলিলে উপরের আপত্তিগুলি এড়ানো যায়।

সৌত্রান্তিক দর্শন ঃ বাহ্যানুমেয়ত্ববাদী দর্শন, সূত্রপিটকের উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌত্রান্তিকগণ সর্বাস্তিবাদী : তাঁহারা বাহ্যবস্তু ও আন্তর বস্তু, এই দুইয়েরই সত্তা স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, ভ্রমের বশে বিজ্ঞানই বাহ্য বস্তুর সদৃশ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাহ্য বস্তু অস্তিত্ব-হীন হইলে তাহার ভ্রমপ্রত্যক্ষও সম্ভব নয় এবং 'বাহ্য বস্তুর সদৃশ', এইরূপ বাক্য 'শশশৃঙ্গের সদৃশ' বাক্যটির ন্যায় অর্থহীন হইয়া পড়ে। বস্তু ও তাহার জ্ঞান অভিন্ন নয়। বস্তুকে জানিবার মুহূর্তেই উপলব্ধি হয় যে, বস্তু বাহ্য কিন্তু তাহার জ্ঞান আন্তর। একই কালে এই বস্তুকে বিভিন্ন ব্যক্তি দেখেন কিন্তু তাহাদের সকলের জ্ঞান এক নয়। বাহ্য বস্তুর সত্তা না মানিলে 'ঘটজ্ঞান', 'পটজ্ঞান' প্রভৃতি জ্ঞানের ভেদ অনধিগম্য হইয়া পড়ে ; মাত্র জ্ঞান হিসাবে তাহারা এক, বিষয়ভেদেই তাহাদের ভেদ।

সুতরাং মানসিক সত্তার বাহিরে বাহ্য বস্তুর সত্তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষগোচর নয়। বাহ্য বস্তু স্বলক্ষণ (Unrelated Particular)। বাহ্য বস্তুর সামান্য লক্ষণ নাই (সামান্য লক্ষণ কল্পিত)। ক্ষণিক ও স্বলক্ষণ বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। অনুকূল অবস্থার মধ্যে বাহ্য বস্তু মনে একটি আকার উৎপাদন করে। সাক্ষাৎভাবে যাহার প্রতীতি ঘটে তাহা বস্তুর এই মনোগত বিষয়াকার। ইহারা কার্যস্বরূপ ; ইহাদের কারণ-রূপে আমরা বাহ্য বস্তুর সত্তা অনুমান করিতে পারি।

বৈভাষিক দর্শন ঃ বাহ্যপ্রত্যক্ষত্ববাদী দর্শন, অভিধর্মের 'বিভাষা' (অভিধর্ম-মহাবিভাষা') গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈভাষিকগণ সৌত্রান্তিকদের মতই সর্বাস্তিবাদী (এক

মতে শুধু বৈভাষিকেরাই সর্বাস্তিবাদী)। তাহারা বাহ্য বস্তু ও আন্তর বস্তু, এই দুইয়েরই সত্তা স্বীকার করেন। সৌত্রান্তিকদের ন্যায় বৈভাষিকেরাও বলেন যে, বাহ্য বস্তু ক্ষণিক স্বলক্ষণের প্রবাহ। কিন্তু তাহাদের মতে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য, অনুমেয় নয়। অগ্নির প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না থাকিলে ধূমদর্শনে অগ্নির অনুমান সম্ভব নয়। বাহ্য বস্তু কিরূপে তাহা জানা না থাকিলে তাহার মানসিক বিষয়াকার যে বাহ্যবস্তুর প্রতিচ্ছবি (representation বা copy) তাহা জানিব কিরূপে? বরং তাহা বাহ্যনিরপেক্ষ মৌলিক পদার্থ বলিয়াই জ্ঞাত হইবে। সুতরাং হয় বিজ্ঞানবাদ মানিতে হয়, নয়ত বাহ্যবস্তুকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

দ্র S. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. 1, London, 1923; S. N. Dasgupta, *A History of Indian Philosophy*, Vol. 1, Cambridge, 1932.

বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগে গৌতম বুদ্ধ বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য যে ধর্ম প্রচার করেন তাহাই বৌদ্ধধর্ম নামে প্রসিদ্ধ। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করার দুর্দম ইচ্ছায় শাক্যবংশীয় রাজপুত্র গৌতম কঠোর সাধনার মাধ্যমে যে বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন, বুদ্ধরূপে দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরিয়া তাহাই তিনি মানুষের মধ্যে প্রচার করেন। জগৎকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়াছিল এই ধর্ম; ইহার অভ্যুদয় ভারতবর্ষের শিল্পকলা, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতিতে নতুন ভাবধারা বহাইয়া ভারতের প্রাণকে রসময় করিয়া তুলিয়াছিল। বহির্ভারতে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রসারে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অবদান আছে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডকে অস্বীকার করিয়া বুদ্ধ তাঁহার মতবাদ প্রচার করিলেও তাঁহার ধর্ম ও দর্শন কোনও বিশেষ জাতি, বর্ণ বা দেশের সমাজব্যবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে প্রচারিত হয় নাই। মানুষকে ব্যক্তিগত মুক্তির পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রতী হন। তাঁহার মুক্তিমার্গ গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ।

দীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষকে উপদেশ দিলেও বুদ্ধের বাণী তাঁহার জীবদ্দশায় কখনও লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। তাঁহার মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই তাঁহার উপদেশ যথেচ্ছ ব্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে প্রধান বুদ্ধশিষ্যগণ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হইয়া বুদ্ধবচনের বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে তাঁহার উপদেশাবলী আবৃত্তি করেন। ইতিহাসে এই সম্মেলন প্রথম বৌদ্ধসংগীতি (First Buddhist Council) রূপে বিখ্যাত। ইহার একশত বছর পরে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি। বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগীতিগুলির অপরিসীম মূল্য আছে। বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁহার ধর্মমত প্রধানতঃ তদানীন্তন মগধ ও কোশলদেশের মধ্যেই প্রচারিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বুদ্ধবাণী ভারতে এবং বহির্ভারতে বিশেষরূপে প্রসার লাভ করে। প্রধানতঃ সম্রাট অশোকের প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম প্রথম বহির্ভারতে প্রচারিত হয়। তৃতীয় বৌদ্ধসংগীতির পরেই তিনি তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে সিংহলে বুদ্ধের উপদেশ প্রচারার্থ পাঠান। দেশে ও বিদেশে দূত পাঠাইবার ফলে কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে পরিগণিত হয়। অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা, উজ্জয়িনী, কাশ্মীর ও পরে কাঞ্চী। অশোকের পর কণিষ্কের সময়েও বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি হয়। তাঁহারই আনুকূল্যে চতুর্থ বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। তিনিও মধ্য এশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিবার জন্য দূত পাঠান।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোজ, তিব্বত, ভূটান, সিকিম, নেপাল, চীন, মোঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, আনাম, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াও এই ধর্ম আজ কার্যতঃ ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত, কিন্তু সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে এই ধর্মের প্রভাব এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির পর্যায় অনুসারে প্রাচীন বৌদ্ধাচার্যগণ তাঁহাদের ধর্মমতকে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেন,—হীনযান ও মহাযান। নানাপ্রকার আচার ব্যবহারের মতানৈক্যের জন্য এই দুই সম্প্রদায় আবার স্ব স্ব গণ্ডির মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত হয়। সম্রাট অশোকের পূর্বেই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে আঠারটি শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার মধ্যে মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদ, এই দুই শাখার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মহাযানের এত গূঢ় সম্বন্ধ লক্ষ করা যায় যে, মনে হয় এই দুই শাখা হইতেই মহাযানের উদ্ভব হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতকে মহাযানী ধর্মমতে আবার বিশেষ বিবর্তন দেখা দেয়। ঐ সময় হইতে বৌদ্ধধর্মমতে মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল এবং অন্যান্য তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের এতদূর অনুপ্রবেশ ঘটে যে বুদ্ধের বাণীর বিশেষরূপে পরিবর্তন হয় এবং প্রাচীন বৌদ্ধমতের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এইরূপে এক নতুন যানের আবির্ভাব ঘটে। এই যানকে বজ্রযান বলা হয়। এই সম্প্রদায় আবার কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে সহজযান ও কালচক্রযান বিশেষ প্রভাবশালী।

বুদ্ধের সামগ্রিক চিন্তা ও মত চারিটি শ্রেষ্ঠ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা চতুরার্যসত্য নামে পরিচিত। এই চার সত্য হইল—দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধগামী মার্গ।

বুদ্ধের মতে এই জীবন ও জগৎ দুঃখময়। জাগতিক বস্তু বা অনুভূতিমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, অতএব ক্লেশদায়ক; জীবের সকল দুঃখের কারণ তাহার জন্মগ্রহণ। জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, প্রিয়বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি, এবং পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু,— জীবমাত্রেই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত হয়।

এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তির কথা আলোচনা করিতে যাইয়া বুদ্ধ কতকগুলি কার্যকারণের পরম্পরা নির্ধারণ করিয়াছেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই পরম্পরামূলক তত্ত্ব প্রতীত্যসমুৎপাদ নামে পরিচিত। এই তত্ত্বমতে একটির অস্তিত্ব থাকিলে অন্যটিও থাকে, একটি উৎপন্ন হইলে অন্যটিও উৎপন্ন হয়।

(ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌স্‌ুপ্‌পাদা ইদং উপ্‌পজ্‌জতি।) দ্রব্যমাত্রই কারণসম্ভূত। উৎপত্তির জন্য কারণসমষ্টির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় উৎপন্ন দ্রব্যের কোনও সত্তা থাকে না। যাহা কিছু সংস্কৃত বা সৃষ্ট তাহাই অনিত্য (বয়ধম্মা সংখারা)। দ্রব্যমাত্রই অশাশ্বত এবং দুঃখের কারণ।

দুঃখের এই কারণ নিরোধের উপায় হইল নির্বাণ। এই নির্বাণলাভই বৌদ্ধসাধকের প্রধান কাম্য। প্রবৃত্তির বিনাশ করিয়া সমভাব ও শান্তির অবস্থা লাভই নির্বাণ। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই সাধকের পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়।

নির্বাণলাভ বা পুনর্জন্ম নিরোধের জন্য বুদ্ধ একটি মার্গ বা পন্থা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মার্গ বৌদ্ধশাস্ত্রে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে বিখ্যাত। এই মার্গের অনুশীলনে তৃষ্ণা ও অবিদ্যা বিদূরিত হয় এবং নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে আমরা নির্বাণলাভের চারটি স্তরের উল্লেখ পাই। যিনি সাধনার স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন তিনি স্রোতাপন্ন ; সাধনমার্গে যিনি এমন অবস্থায় আছেন যে নির্বাণলাভের জন্য তাঁহাকে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, তিনি সকৃদাগামী ; যাঁহাকে আর একবারও জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না তিনি অনাগামী ; আর যিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি অর্হৎ।

বুদ্ধের উপদেশে কর্মের খুবই প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁহার মতে ব্যক্তির এক জন্মের কর্ম তাহার অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ। বুদ্ধ বলেন, কর্মই তাঁহার গতি, কর্মই তাঁহার বন্ধু, কর্মই তাঁহার আশ্রয়। তাঁহার মতে জীবাত্মা, পরমাত্মা বা ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। জীব পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টিমাত্র। পঞ্চস্কন্ধের সংমিশ্রণেই আত্মবোধ উৎপন্ন হয় ; বিশ্লেষণ করিলে আত্মারূপী কোনও সদ্বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পারমার্থিক বিচারে কোনও পুদ্‌গল বা জীবাত্মা নাই। আছে কেবল নিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বা চিৎশক্তির প্রবাহ। এই বিজ্ঞানপ্রবাহ যতক্ষণ বর্তমান ততক্ষণই ধর্ম ও সংস্কারের উৎপত্তি ও বিনাশ, ততক্ষণই মিথ্যা জগতের সৃষ্টি, এবং ততক্ষণই দুঃখের অনুভূতি।

দ্র প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৫৯ ; T. Rhys Davids, *Buddhism–Its History and Literature*, London, 1926; E. Thomas, *The Life of Buddha*, London, 1927; Nalinaksha Dutt, *Early Monastic Buddhism*, Vols. I and II, Calcutta, 1960.

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৌদ্ধ সংগীতি বৌদ্ধধর্ম দ্র।

বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্য সহজিয়া দ্র।

বৌ-নাচ বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত অবগুণ্ঠনবতী নববধূর নৃত্য। বরণের পর নাচের যোগ্যতা প্রদর্শনে আহূত হইয়া নববধূ ভীরু-নম্র ও লজ্জাজড়িত অবস্থায় প্রথমে জোড়হাত করিয়া প্রণাম জানায় ও পরে লৌকিক সুরে পরিবেশিত গানের ও ঢাক-ঢোল-কাঁশির বাজনার তালে মাটিতে পা ঘষিয়া ঘষিয়া হাতের পাতা বিচিত্র ভঙ্গিতে দোলাইতে থাকে এবং সুরের ছন্দে ছন্দে ওঠা-নামার ঈষৎ দোলায় নাচিয়া চলে। কেবলমাত্র পদ সঞ্চালন এবং হাতের পাতা ও অঙ্গুলির মুদ্রা বিন্যাসে বৌ-নাচের নৃত্যাঙ্গিক পরিস্ফুট হয়। যশোহর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে, আসামের কাছাড় অঞ্চলে ও বাংলার পশ্চিমপ্রান্তবর্তী কোনও কোনও অঞ্চলেও বৌ-নাচের প্রচলন আছে।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ; শান্তিদেব ঘোষ, গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য, কলিকাতা, ১৮৮১ শকাব্দ।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ব্যক্তিত্ব দৈহিক ও মানসিক কতকগুলি অন্তর্নিহিত গুণ-বিশেষের সমন্বয় এবং তাহার সহিত পরিবেশের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা সৃষ্ট হয় তাহাকেই ব্যক্তিত্ব বলা যাইতে পারে। চালচলন, কথাবার্তা, মতামত, প্রবণতা, বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির যে আচরণ প্রকাশ পায় তাহাই তাহার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির চিন্তাধারা বা ধারণা বাহ্যিক প্রকাশ না পাইয়া অমূর্ত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়। সেগুলিকেও ব্যক্তিত্বের সীমানার মধ্যে ধরা হয়। এই অমূর্ত বিষয়গুলি সব সময়ে মনের সংজ্ঞান স্তরে থাকে না। আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান স্তরে বদ্ধ থাকার ফলে সেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সরাসরি সচেতন হওয়া সম্ভব হয় না।

ব্যক্তিত্বের মৌলিক গুণগুলি শৈশবকালে নমনীয় ও অপরিস্ফুট অর্থাৎ সম্ভাব্য শক্তির আকারে নিহিত থাকে। বয়োবৃদ্ধি এবং তাহার সমকালীন সমাজ ও বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে নানারূপে সংঘাত বা আদান-প্রদানের ফলে সেগুলি একটি বিশেষ ছাঁচে রূপ নেয়। সাধারণতঃ পরস্পর নির্ভরশীল এই গুণগুলি বিধিবদ্ধ ও সুচারুভাবে সমন্বিত হইয়া বিভিন্ন পরিবেশের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ক্রিয়াশীল হয় এবং তাহার সাফল্যের মাত্রা অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের মাপকাঠি নির্ধারিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা সম্ভব না হইলে অস্বাভাবিক আচরণে তাহার প্রকাশ ঘটে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ খাপখাওয়ানোর কার্যে সীমিত থাকে না, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারেও যথেষ্ট কার্যকরী হইতে দেখা যায়।

অধুনা মনোবিদ্‌গণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের সঠিক রূপ ও উপাদান নির্ণয় ও মাপন কার্যে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছেন।

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

ব্যবসায় আইন ব্যবসায় করিতে হইলে যে সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তাহাই ব্যবসায় আইনের ভিত্তি। ইংল্যান্ডে লেনদেন, বেচাকেনার সুবিধার্থে ব্যবসায়ীরা কতকগুলি প্রথা মানিয়া চলিত, তাহা হইতেই সেখানে ব্যবসায় আইনের সূত্রপাত। উক্ত আইন আমাদের দেশেও বহুলাংশে গৃহীত হইয়াছে।

ব্যবসায়ে পারস্পরিক চুক্তি অনুসারেই অধিকাংশ কার্য নির্বাহিত হয়, এইজন্য চুক্তি-সংক্রান্ত আইনই (Law of Contract) ব্যবসায় আইনের মূল ভিত্তি। কেবল দুই পক্ষের মতের মিল হইলেই চুক্তির উদ্ভব হয় না। একমাত্র আদালতগ্রাহ্য মতৈক্যকেই চুক্তি বলা হয়। সকল চুক্তিই আদালতে গ্রাহ্য হয় না। আইনবিগর্হিত কিংবা নীতি-বিগর্হিত চুক্তি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

নাবালক কিংবা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি চুক্তি করিতে অক্ষম। কেহ ভ্রমবশতঃ কিছু করিতে প্রতিশ্রুত হইলে অথবা প্রতারণা করিয়া কিংবা ভয় দেখাইয়া কাহারও মত আদায় করিলে তাহা চুক্তিপদবাচ্য নহে।

প্রতিশ্রুতি-প্রদানকারী যে দায়িত্ব দ্বারা নিজেকে আবদ্ধ করে অপর পক্ষকে তাহার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়; উক্ত মূল্যকে বলা হয় প্রতিশ্রুতির মূল্য বা প্রতিদান। প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়া যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয় আদালতে তাহা সাধারণতঃ অগ্রাহ্য হয়। কোনও কিছু দান করিবার অঙ্গীকার আইনতঃ পালনীয় নহে।

ভারতবর্ষে চুক্তি সংক্রান্ত আইন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ হয়। উক্ত আইনের প্রথম ছয়টি পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়, যথা, চুক্তিকে আদালতগ্রাহ্য করিতে হইলে কি করণীয়, কোন্ কোন্ দোষে চুক্তি বাতিলযোগ্য, কোন্ জাতীয় মতৈক্য চুক্তি নামের অযোগ্য, চুক্তির পক্ষদ্বয়ের কাহার কি কর্তব্য, এক পক্ষ কর্তব্য পালনে অস্বীকার করিলে অপর পক্ষের কর্তব্য কি, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একযোগে কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করিলে কে ঐ দায়িত্ব পালন করিবে, কোন্ কোন্ চুক্তি পালন করিবার আবশ্যকতা নাই, চুক্তি না থাকিলেও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দায়িত্বের উদ্ভব হয়, চুক্তি-ভঙ্গের পরিণাম কি, ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কিভাবে নির্ণয় করিতে হয় ইত্যাদি।

অষ্টম নবম ও দশম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে জামিনদারী চুক্তি (Contract of guarantee), প্রদত্ত জিনিস-সংক্রান্ত কাজের চুক্তি (Contract of bailment) এবং প্রতিনিধি (Agency) নিয়োগের চুক্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঋণী ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ হইলে জামিনদার উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য। কোনও কাজের জন্য জিনিস প্রদত্ত হইলে কার্যসমাধানান্তে উক্ত জিনিস প্রত্যর্পণ করিতে হয় এবং যাহার জিনিস সে অপর পক্ষকে পারিশ্রমিক দিতে বাধ্য। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিনিধির কার্যের ফলাফল প্রতিনিধি-নিয়োগকারীকেই ভোগ করিতে হয়।

ব্যবসায়ী মহলে আরো নানাবিধ চুক্তি প্রচলিত আছে। পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের নিয়মাবলী পণ্য বিক্রয় আইনে পাওয়া যাইবে। কয়েক ব্যক্তি মিলিয়া ব্যবসায় করিলে তাহাদের ভিতর লাভালাভের বণ্টন কিরূপভাবে হইবে, কে বা কাহারা ব্যবসায় পরিচালনা করিবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য অংশীদার আইন (Partnership Act) রচিত হইয়াছে।

অধুনা যৌথ প্রথায় বহু ব্যবসায় পরিচালিত হয়: তাহার জন্য কোম্পানি আইন প্রণীত হইয়াছে। 'কোম্পানি আইন' দ্র

অগ্নিদাহ, সামুদ্রিক বিপত্তি প্রভৃতি কারণে ক্ষতি হইলে তাহার পূরণের জন্য ব্যবসায়ীদের পক্ষে বীমা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অগ্নিবীমা, সামুদ্রিক বীমা প্রভৃতি বীমা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ভারতীয় বীমা আইনে পাওয়া যাইবে।

যাহারা নদীপথে, রেলযোগে, শূন্যমার্গে কিংবা রাস্তা দিয়া মালবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ও যাহারা মালের মালিক, তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পণ্যপরিবহণ আইন (Carriage of Goods Act) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে চেক, হুণ্ডি ও তমসুক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। উহারা হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায়; অবশেষে উহাদিগকে ব্যাঙ্ক কিংবা মূল দায়িকের নিকট উপস্থিত করা হয়। ইহাদের জন্য হস্তান্তরযোগ্য দলিলের আইন (Negotiable Instruments Act) সৃষ্টি হইয়াছে।

ঋণ পরিশোধে অসমর্থ কোনও ব্যবসায়ীকে যদি আদালত দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করে তবে পাওনাদারগণ তাহাকে জেলে প্রেরণ করিতে পারে না, উপরন্তু সে মোট দেনার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়াই সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত হইতে পারে। দেউলিয়া আইনের (Insolvency Act) বিষয়বস্তু হইল কি অবস্থায় একজনকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা যায় এবং পাওনাদারদের দাবি কিভাবে মিটানো যায়।

সালিশ সংক্রান্ত নিয়মাবলী সালিশী আইনের (Law of Arbitration) বিষয়বস্তু। দুইজন ব্যবসায়ী পরস্পর একমত হইয়া যদি কোনও ব্যক্তিকে সালিশ মান্য করে তবে ঐ ব্যক্তি যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবে উভয়পক্ষকেই তাহা মানিয়া লইতে হইবে। সালিশ যদি পক্ষপাতিত্ব করে, কিংবা বিচার করিতে যাইয়া কোনওরূপ চারিত্রিক দৌর্বল্য প্রকাশ করে তবে আদালত সালিশের রোয়েদাদ নাকচ করিয়া দিতে পারে।

উল্লিখিত আইনসমূহের সমষ্টিকেই সাধারণতঃ সংক্ষেপে ব্যবসায় আইন নামে অভিহিত করা হয়।

অশোকচন্দ্র সেন

ব্যাক্‌টিরিয়া থ্যালোফাইটা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অপুষ্পক উদ্ভিদ। ব্যাক্‌টিরিয়া আণুবীক্ষণিক জীব। দেহে ক্লোরোফিল না থাকায় সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্‌থেসিস) দ্বারা নিজ খাদ্য উৎপাদন করা ব্যাক্‌টিরিয়ার পক্ষে অসম্ভব। সেজন্য বিভিন্ন খাদ্যবস্তু, মৃত জীবদেহ, বর্জ্য দ্রব্য প্রভৃতি জৈব পদার্থে অথবা পরজীবীরূপে অন্য কোনও জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে ইহাদের বাস করিতে হয় এবং ঐ সকল বস্তু হইতেই স্বীয় খাদ্য আহরণ করিতে হয়।

নানা জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া সংক্রমণের ফলে জীবদেহে নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনও কোনও জাতের ব্যাক্‌টিরিয়া বিভিন্ন বিষয়ে অল্পাধিক কল্যাণকরও বটে। উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীর পৌষ্টিকনালীতে বসবাসকারী নানাপ্রকার ব্যাক্‌টিরিয়া খাদ্যের দুষ্পাচ্য সেলুলোজ-এর পরিপাক সাধন করে। রোমন্থক প্রাণীর পাকস্থলীর প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষে বিভিন্ন ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে ইউরিয়া ও অন্যান্য নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ হইতে প্রোটিনের সংশ্লেষণ ঘটে। অন্ত্রে নানা জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া ভিটামিন কে, ভিটামিন বি-১২, ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতি ভিটামিন উৎপাদন করে। এরূপ ব্যাকটিরিয়ার সহিত প্রাণীর সম্পর্ক মিথোজীবিতার (সিম্‌বায়োসিস) পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন খাদ্যবস্তু উৎপাদনেও কোনও কোনও ব্যাক্‌টিরিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। লাক্‌তোবাসিল্লস (*Lactobacillus*) জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া দুগ্ধশর্করা বা ল্যাক্‌টোজ-এর সন্ধানের দ্বারা ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপাদন করে; ইহাদের ক্রিয়ার ফলে দুধের শর্করার সন্ধান ঘটিয়া দুধ দই-এ পরিণত হয়। আসেতোবাক্‌তের (*Acetobacter*) জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া সন্ধানের দ্বারা অ্যাসেটিক অ্যাসিড উৎপাদন করে; ইহাদের সাহায্যে শর্করার সন্ধান ঘটাইয়া ভিনিগার প্রস্তুত করা হয়। লাক্‌তোবাসিল্লস, প্রোপিওনিবাক্‌তেরিয়ম (Propionibacterium) প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় দুধ হইতে বিভিন্ন প্রকার পনির তৈয়ারি হয়। ক্লোস্‌ত্রিদিয়ম (Clostridium) জাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়ায় পাট ও অন্যান্য সমগোত্রীয় উদ্ভিদের কাণ্ডে পেক্‌টিন নামক পদার্থের সন্ধানের ফলে কাণ্ড হইতে তন্তু পৃথক করা সহজসাধ্য হয়। 'কার্বোহাইড্রেট', 'দই', 'পাট', 'ভিটামিন' দ্র।

দ্র S. C. Prescott & C. G. Dunn, *Industrial Microbiology*, New York, 1949; W. B. Sarles & Others, *Microbiology : General and Applied*, New York, 1951.

দেবজ্যোতি দাশ

ব্যাধির সহিত অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর যোগসূত্র বহুকাল পূর্বেই বোধগম্য হইয়াছে। ফ্রাকাস্‌তোরো (১৪৮৩-১৫৫৩ খ্রী) ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উপলব্ধি করেন যে, অতি ক্ষুদ্র অদৃশ্য কণা হইতে সংক্রমণের উৎপত্তি হয়। লেউয়েনহোয়েক (১৬৩২-১৭২৩ খ্রী) অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সর্বপ্রথম ব্যাক্‌টিরিয়ার আকৃতিগত বর্ণনা দেন। স্পালান্‌ৎসানি (১৭২৯-৯৯ খ্রী) ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবাণুমুক্ত মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ব্যাক্‌টিরিয়ার বংশবৃদ্ধি করাইতে সক্ষম হন। জেনার (১৭৪৯—১৮২৩ খ্রী) গো-বসন্তের বীজ টিকা হিসাবে ব্যবহার করিয়া বসন্ত প্রতিরোধের উপায় আবিষ্কার করেন('জেনার, এডওয়ার্ড' দ্র)। ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবাণুবিদ্যার জনক লুই পাস্তুর (১৮২২—৯৫ খ্রী) বিজ্ঞানভিত্তিক জীবাণুবিদ্যার চর্চার সূত্রপাত করেন ('পাস্তুর, লুই' দ্র)। রোবের্ট কোখ (১৮৪৩—১৯১০ খ্রী) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষ্মা ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেরার রোগজীবাণু আবিষ্কার করেন (কোখ, রোবের্ট' দ্র)। ক্লেব্‌স ও লোফ্‌লার (১৮৫২—১৯১৫ খ্রী) ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিফ্‌থেরিয়ার এবং কিটাসাটো (১৮৫৬—১৯৩১ খ্রী) ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ধনুষ্টংকারের ব্যাক্‌টিরিয়া আবিষ্কার করেন। কিটাসাটো ও ইয়ের্‌সিন (১৮৬৩—১৯৪৩ খ্রী) প্লেগের রোগজীবাণু আবিষ্কার করেন; ইয়ের্‌সিন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রমাণ করেন যে ডিফ্‌থেরিয়ার ব্যাক্‌টিরিয়া একপ্রকার টক্‌সিন সৃষ্টি করে ('টক্‌সিন' ও 'প্লেগ' দ্র)। ফেবার ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ধনুষ্টংকারের ব্যাক্‌টিরিয়া কর্তৃক টক্‌সিন সৃষ্টির প্রমাণ দেন।

ব্যাক্‌টিরিয়া উদ্ভিদ জগতের অন্তর্গত অতি ক্ষুদ্র

এককোষী বা বহুকোষী জীব। ইহার কোষের গঠন মূলতঃ অপরাপর কোষের ন্যায় বাহিরে—একটি কঠিন কোষপ্রাচীরের আবরণ, ভিতরে সাইটোপ্লাজ্‌ম। সাইটোপ্লাজ্‌ম ও কোষপ্রাচীরের মধ্যবর্তী একটি ঝিল্লীর মধ্যে সাইটোপ্লাজ্‌ম আবদ্ধ থাকে; ইহা সাইটোপ্লাজ্‌ম হইতে উদ্ভূত। ব্যাক্‌টিরিয়ার কোষে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সাইটোপ্লাজ্‌মের অভ্যন্তরে খাদ্যকণা ইত্যাদি থাকিতে পারে। গতিশীল ব্যাক্‌টিরিয়ার দেহে এক বা একাধিক চুলের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম 'ফ্ল্যাজেল্লা' থাকে; গতিবিধির সময় এগুলি আন্দোলিত হয়। কতকগুলি ব্যাক্‌টিরিয়ার সর্বদেহ ব্যাপিয়া ফ্ল্যাজেল্লা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্মতর এবং বহুসংখ্যক 'ফিম্‌ব্রিয়া' বর্তমান। কোনও কোনও ব্যাক্‌টিরিয়ার কোষপ্রাচীরের বাহিরে অপর একটি অপেক্ষাকৃত স্থূল বহিরাবরণ বা 'ক্যাপসিউল' থাকে। প্রতিকূল অবস্থায় কতকগুলি ব্যাক্‌টিরিয়ার দেহের অভ্যন্তরে বীজগুটি (স্পোর) সৃষ্ট হয়। বীজগুটি সহজে ধ্বংস হয় না; সাধারণতঃ যে তাপমাত্রা, অম্লত্ব বা ক্ষারত্বে ব্যাক্‌টিরিয়ার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব, সে সকল অবস্থায় বীজগুটির মধ্যে প্রাণ অটুট থাকে এবং অনুকূল অবস্থায় এইগুলি হইতে পুনরায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাক্‌টিরিয়ার উদ্ভব হয়।

কতকগুলি এন্‌জাইমের সাহায্যে ব্যাক্‌টিরিয়ার শ্বাসক্রিয়া, পরিপাক প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। সাধারণতঃ কোষবিভাজনের সাহায্যে প্রজনন ঘটে। দেহের পুষ্টির জন্য কার্বন ও নাইট্রোজেন অত্যাবশ্যক। যে সকল ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে ব্যাধির সৃষ্টি হয়, তাহারা কেবলমাত্র জান্তব সামগ্রী হইতেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। প্রোটিন ও অজৈব লবণ ব্যতীত ইহারা জীবনধারণ করিতে পারে না। পুষ্টি ও প্রজননের জন্য খাদ্য ব্যতীত অনুকূল বায়বীয় অবস্থা ও অম্লত্ব ও ক্ষারত্বের প্রয়োজন। অবায়বীয় ব্যাক্‌টিরিয়া (যথা—ধনুষ্টংকারের রোগজীবাণু) অক্সিজেনের সংস্পর্শে জীবনধারণ করিতে পারে না; বায়বীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার পক্ষে অক্সিজেন ব্যতিরেকে প্রাণধারণ অসম্ভব।

নানা আয়তনের (০·৪ মাইক্রন হইতে কয়েক মাইক্রন পর্যন্ত) ব্যাক্‌টিরিয়া হইতে পারে। মোটামুটি তিন প্রকার আকৃতির ব্যাক্‌টিরিয়া আছে—গোলকাকার 'কক্কাস' বা অণুবীজ, দণ্ডাকৃতি 'ব্যাসিলাস' বা দণ্ডবীজ এবং কুণ্ডলাকৃতি 'স্পাইর‍্যাল' বা কুণ্ডলবীজ।

কক্কাস বা অণুবীজের ব্যাস সাধারণতঃ ১ মাইক্রন। স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, নাইসেরিয়া ইত্যাদি নানা প্রকার অণুবীজ আছে। স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস অণুবীজ পরপর শৃঙ্খলাকারে সজ্জিত থাকে। এক ধরণের পুঁজ-উৎপাদক স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস হইতে কণ্ঠের প্রদাহ এবং অন্য একপ্রকার স্ট্রেপ্‌টোকক্কাস হইতে নিউমোনিয়া হয়। স্ট্যাফাইলোকক্কাস আঙ্গুরগুচ্ছের মত কয়েকটি পুঁজ-উৎপাদক ব্যাক্‌টিরিয়ার সমষ্টি। শ্বাসপথে সর্বদাই কয়েক প্রকার নাইসেরিয়া পাওয়া যায়; ইহারা ক্ষতিকর নয়। একপ্রকার নাইসেরিয়া গনোরিয়া ও অন্য একপ্রকার নাইসেরিয়া মস্তিষ্কঝিল্লীর প্রদাহ (মেনিন্‌জাইটিস) সৃষ্টি করে।

যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ডিফ্‌থেরিয়া, ধনুষ্টংকার, টাইফয়েড, রক্ত-আমাশয় প্রভৃতি অধিকাংশ সংক্রামক রোগের ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যাসিলাস বা দণ্ডবীজ জাতীয়।

কলেরার রোগজীবাণু 'কমা'র ন্যায় ঈষৎ বক্র, অর্থাৎ কুণ্ডলের মাত্র একটি বাঁক। যথার্থ কুণ্ডলাকার বা স্পাইর‍্যাল ব্যাক্‌টিরিয়া মধ্যে ট্রেপোনেমা পাল্লিদা (Treponema pallida) সিফিলিস রোগের কারণ।

টাইফাস জাতীয় রোগের আকর 'রিকেটসিয়া' আয়তনে ব্যাক্‌টিরিয়া অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়ার মতই ইহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয়; দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে এবং ব্যাক্‌টিরিয়ার পক্ষে অনতিক্রম্য ছাঁকনির ভিতর দিয়া সাধারণতঃ যাইতে পারে না। রিকেটসিয়াও অ্যান্টিবায়োটিক-সচেতন। ইহারা কেবল জীবকোষের অভ্যন্তরে পরজীবীর জীবন যাপন করিতে পারে, এজন্য কৃত্রিম পদ্ধতিতে ইহাদের উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উৎপাদক সামগ্রীতে জীবিত প্রাণিকোষের উপস্থিতি অপরিহার্য। মুরগির ডিমের ভ্রূণস্থ কুসুমস্থলীতে রিকেটসিয়ার কৃত্রিম উৎপাদন সম্ভব। উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি কতিপয় সন্ধিপদ প্রাণীর আন্ত্রিক কোষ রিকেটসিয়ার স্বাভাবিক আবাস।

দ্র G. S. Wilson & A. A. Miles, *Topley & Wilson's Principles of Bacteriology and Immunology*, London, 1955; T. M. Rivers & F. L. Horsfall, *Viral and Rickettsial Infections of Man*, London, 1959.

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাকটিরিওলজি ব্যাক্‌টিরিয়া ও ভাইরাস দ্র।

ব্যাঙ উভচর শ্রেণীর আনুরা (Anura) বর্গের প্রাণী। বঙ্গদেশের সর্বত্রলভ্য কুনো ব্যাঙ ও সোনা ব্যাঙ ভেকের উদাহরণ। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ব্যাঙ পাওয়া যায়। ইহারা অনুষ্ণশোণিত চতুষ্পদ প্রাণী। দেহ প্রধানতঃ মাথা ও ধড় লইয়া গঠিত। ঘাড় নাই। সকল ব্যাঙের লেজ থাকে না। সামনের পায়ে চারিটি আঙুলের মধ্যে তৃতীয় আঙুলটি দীর্ঘতম; পিছনের পায়ে পাঁচটি আঙুলের মধ্যে চতুর্থ আঙুলটি দীর্ঘতম। সব আঙুলই নখহীন। পায়ের আঙুলগুলি পরস্পরের সহিত পাতলা চামড়া দিয়া যুক্ত। ভেককুল দিনে বিশ্রাম করে ও সন্ধ্যার পর কর্মচঞ্চল

হয়। শীতে ইহারা শীতঘুমে (হাইবারনেশন) আচ্ছন্ন হইয়া থাকে।

ইহাদের চক্ষু বৃহদাকার, গোল ও ড্যাবড্যাবে। প্রতি চোখে তিনটি পাতা, উপরের পাতাটি মোটা ও স্থিতিস্থাপক ; নীচের পাতাটি পাতলা অর্ধস্বচ্ছ ও সঞ্চরণশীল ; তৃতীয় পাতাটি স্বচ্ছ ও নীচের পাতার তলায় অবস্থিত। প্রয়োজনে তৃতীয় পাতাটি প্রসারিত হইয়া সমস্ত চোখটিকে ঢাকিতে পারে।

কুনো ব্যাঙের রঙ গাঢ় ছাই, মাথা অর্ধবৃত্তাকার এবং পৃষ্ঠদেশে বহু কালো কালো ছোট গুটিকা (ওয়ার্ট) থাকে। প্রতি চোখের পিছন দিকে একটি নরম ও উচ্চ প্যারোটিড গ্রন্থি থাকে। গুটিকা ও প্যারোটিড গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হয়। কুনো ব্যাঙের দাঁত নাই।

সোনা ব্যাঙ জলে থাকিতেই ভালবাসে। ব্যাঙজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে ইহারা আকারে বৃহত্তম। ইহাদের মাথা ত্রিভুজাকার, চোয়াল দুইটি চোখের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। উপরের চোয়ালে দাঁত থাকে। চামড়ায় গুটিকা নাই, প্যারোটিড গ্রন্থিও স্পষ্ট নয়। সোনা ব্যাঙের পিঠের দিকের রঙ গাঢ় সবুজ ও পেটের দিকের রঙ ময়লা শাদাটে।

গেছো ব্যাঙ আকারে ছোট। গাছে থাকিবার সুবিধার জন্য ইহাদের আঙুলে টিকটিকির মত ছোট ছোট গর্ত থাকে।

পোকামাকড় খাইয়া ব্যাঙ জীবনধারণ করে। পোকামাকড় ধরিবার জন্য ইহাদের জিহ্বা আঠালো। জিহ্বা নীচের চোয়ালের অগ্রভাগে যুক্ত থাকে এবং ইহার যুক্ত দিকটি মুখবিবরের ভিতর দিকে প্রসারিত থাকে। শিকার ধরিবার সময়ে জিহ্বাটি মুখবিবর হইতে উল্টাইয়া বাহিরে আসে এবং স্প্রিং-এর ন্যায় শিকারের উপর পড়িয়াই আবার মুখবিবরে ফিরিয়া যায়।

ব্যাঙ একলিঙ্গ প্রাণী। পুরুষ ব্যাঙের সামনের পায়ে একটি কালো গোলাকার মাংসপিণ্ড (ক্ল্যাস্‌পিং প্যাড) থাকে। ইহা ছাড়া পুরুষ ব্যাঙের নীচের চোয়াল ও চামড়ার মধ্যে আড়াআড়িভাবে একটি কালো ও পাতলা পরদা (ভোক্যাল স্যাক বা স্বরথলি) থাকে। বর্ষাকালে ইহাদের প্রজনন হয়। পুরুষ ব্যাঙগুলি এই সময়ে জলাশয়ের ধারে আসিয়া স্বরথলির সাহায্যে আওয়াজ করে। এই শব্দে স্ত্রী-ব্যাঙ জলাশয়ের ধারে আসে। স্ত্রী-ব্যাঙ শব্দ করিতে পারে না। স্ত্রী-ব্যাঙ ডিম পাড়িবার পর পুরুষ ব্যাঙ নিঃসৃত ডিমের উপর শুক্রকীট ঢালিয়া দেয়। ব্যাঙের ডিম জেলির ন্যায় একটা পাতলা আবরণী দিয়া ঢাকা থাকে। কুনো ব্যাঙ একসঙ্গে ৪০০০—১২০০০ ডিম পাড়ে। নিষিক্ত ডিমগুলি হইতে ব্যাঙাচির জন্ম হয়। ব্যাঙাচির ফুলকা ও লেজ থাকে। ব্যাঙাচি রূপান্তরিত হইয়া পূর্ণাঙ্গ ভেকে পরিণত হয়।

গুটিকা ও গুটিকা-নিঃসৃত রসের জন্য ভেককে বিষাক্ত প্রাণী বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু এই গুটিকা-নিঃসৃত রস মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। চীনদেশে ব্যাঙের চামড়া ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভেকের গুটিকা-নিঃসৃত রসে এড্‌রিনালিন (Adrenalin) থাকে। উত্তর আমেরিকার বুলফ্রগ ও এদেশের সোনা ব্যাঙের মাংস আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

সীমানন্দ অধিকারী

ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কিং ব্যাঙ্ক টাকাপয়সার ব্যবসায় করে। ব্যাঙ্কই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখা যায়, অথচ প্রয়োজনে দাবি করামাত্র ফেরত পাওয়া যায়। এই সেবার জন্য ব্যাঙ্ক পারিশ্রমিক চায় না, বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সুদ দেয়। গচ্ছিত অর্থকে ব্যাঙ্ক অধিকতর সুদে খাটায়। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা প্রধানতঃ চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) সংগ্রহের জন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে সুদে ঋণ লয়। ঋণগ্রহীতাদের নিকট প্রাপ্য সুদ ও আমানতকারীগণকে প্রদেয় সুদের পার্থক্যই ব্যাঙ্কের আয়ের প্রধান উৎস। টাকাপয়সার এই প্রকার আদানপ্রদানকেই ব্যাঙ্কিং বলা হয়। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য পারিশ্রমিকের বদলে টাকাকড়ি-সংক্রান্ত অন্যান্য কাজও করে ; যেমন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়, লগ্নীকরণে সাহায্য, মূল্যবান বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি।

নানা ধরনের ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান আছে, যথা—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, সঞ্চয় ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। ব্যাঙ্ক বলিতে প্রধানতঃ বুঝায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, চাহিদা আমানতে (কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট) অর্থ গচ্ছিত রাখিলে ইহা দাবি করা মাত্র সমস্ত গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ক চাহিদা আমানত রাখে না, গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সময় বা পরিমাণের বিধিনিষেধ আরোপ করে। বর্তমান নিবন্ধে ব্যাঙ্ক বলিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কই বুঝাইবে।

চাহিদা আমানত রাখে বলিয়া ব্যাঙ্কসমূহ শুধু অর্থ গচ্ছিত রাখারই প্রধান কেন্দ্র হয় না, অর্থ সৃজন করার ক্ষমতাও অর্জন করে এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করে। জনসাধারণের আস্থাভাজন বলিয়া ব্যাঙ্ক তাহার নিকট গচ্ছিত অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশি ঋণ দিতে পারে। কারণ ব্যাঙ্ক জানে যে তাহার ঋণগ্রহীতাদের নিকট যাহারা দায়শোধ হিসাবে ব্যাঙ্কের চেক লইবে তাহারা বহুলাংশেই আবার চেকগুলি ব্যাঙ্কে আমানত করিবে। এমন হইতে পারে যে, 'ক' ব্যাঙ্কের চেক 'খ' ব্যাঙ্কে জমা পড়িল। কিন্তু যেহেতু 'খ' ব্যাঙ্কও এইভাবে অর্থ সৃজন করে, তাহার চেক আবার 'ক' ব্যাঙ্কে জমা পড়িবে। যদি এই দুই জমা সমান হয়, কোনও ব্যাঙ্ককেই দায় শোধ করার জন্য নগদ অর্থ

দিতে হইবে না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই প্রদত্ত ঋণ গচ্ছিত অর্থ অপেক্ষা বেশি হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 'খ' ব্যাঙ্ক যদি ঋণ সম্প্রসারণ না করে তাহা হইলে 'খ' ব্যাঙ্কে গচ্ছিত 'ক'-এর উপর চেক শোধ দিতে 'ক' ব্যাঙ্ক বাধ্য হইবে কিন্তু ইহা তাহার পক্ষে অসাধ্য। ব্যাঙ্কসমূহ একত্রে অর্থ সৃজন করিতে পারে কিন্তু কোনও একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে একাকী তাহা করা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্কসমূহ যে অর্থ সৃজন করে তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে ব্যাঙ্ক-সমূহের মোট আমানত তাহাদের নিকট গচ্ছিত মোট মুদ্রা অপেক্ষা অনেক বেশি।

ব্যাঙ্কসমূহের অর্থসৃজন ক্ষমতা অবশ্য সীমাবদ্ধ। আমানতকারীদের সর্বপ্রকার দায় পরিশোধ চেকের মাধ্যমে করা সম্ভব হয় না, দায়ের কিছু অংশ নগদ মুদ্রায় শোধ করিতে হয়। জনসাধারণের প্রচলিত অভ্যাসের উপর ইহার মাত্রা নির্ভর করে। উন্নত দেশগুলির ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা এই যে, মোট আমানতের শতকরা প্রায় দশভাগ মুদ্রা হিসাবে প্রত্যর্পণের দাবি আসে। ব্যাঙ্ক গচ্ছিত মুদ্রার মোটামুটি নয় গুণের বেশি অর্থ সৃজন করিতে পারে না।

অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ সম্প্রসারণ এবং চেকের মারফত ক্রয়-বিক্রয়ের অভ্যাসের দ্বারা সীমিত এই অর্থসৃজন ক্ষমতার ভিত্তি কিন্তু জনসাধারণের আস্থা। চেক পাওয়া মাত্র সবাই যদি তাহা মুদ্রায় রূপান্তরিত করে তাহা হইলে এই অর্থ-সৃজন ক্ষমতা থাকে না। আস্থা অটুট রাখার জন্য ব্যাঙ্ককে এমনভাবে ঋণ বিতরণ করিতে হয় যাহাতে প্রয়োজনে সহজেই ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া যায় ও আমানতকারীদের সম্ভাব্য দাবি মিটানো যায়। এই কারণে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ বা সহজে বিক্রয়যোগ্য নহে এরূপ সম্পত্তির বন্ধকের পরিবর্তে ঋণ দিতে অনিচ্ছুক হয়। তাহারা সাধারণতঃ অত্যল্পকালীন ঋণ (যাহা দাবিমাত্র ফেরত পাওয়া যায়), তিন হইতে ছয় মাসে পরিশোধ্য ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি, সরকারি ঋণপত্র এবং কাঁচামাল ও বিক্রয়যোগ্য পণ্যের বন্ধকীতে টাকা লগ্নী করে। ঋণ বিতরণের বিভিন্ন খাতের মধ্যে সুচারু সমন্বয় করাতেই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কলাকৌশল। কারণ ঋণ যত স্বল্পকালের এবং যত সহজে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীর পরিবর্তে হইবে, সুদ তত কম হইবে, অর্থাৎ ব্যাঙ্কের লাভ তত কম হইবে। অন্য দিকে, অধিক লাভের আশায় অন্যপ্রকার ঋণ বেশি দিলে আমানতকারীদের আস্থা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক।

ইহা সত্ত্বেও ইওরোপের কয়েকটি দেশে, বিশেষতঃ জার্মানিতে, ব্যাঙ্কসমূহ বহুদিন যাবৎ শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিয়া আসিতেছে। অধুনা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও কয়েক বৎসরের জন্য ঋণদানের প্রথা চালু হইয়াছে। জনসাধারণের আস্থা ইহাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। আসল কথা, দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নতিশীল হইলে এবং কোনও ব্যাঙ্ক তাহার সম্পত্তি অত্যধিক পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী ঋণে লগ্নী না করিলে আস্থা হ্রাস পাওয়ার কোনও কারণ নাই। অন্য দিকে, দেশে আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে এবং আমানতকারীরা সকলেই টাকা ফেরত চাহিলে ব্যাঙ্কসমূহের সম্পত্তি যতই স্বল্পমেয়াদী ঋণে বা সহজে বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীতে লগ্নী থাকুক না কেন, আমানতকারীদের দাবি মিটানো সম্ভব নয়, কারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত ঋণ এক সাথে ক্রয় করা দেশের আর্থিক বাজারের ক্ষমতার অতীত। এইরূপ বিপদে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই মুদ্রা সৃজন করিয়া অবস্থা সামাল দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেই দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। অতএব দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতার মনোভাব অযৌক্তিক।

আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উৎপত্তি ইওরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে। স্বর্ণকারের ব্যবসায় এবং হুণ্ডির ব্যবসায়, এই দুই ধরনের পেশা হইতে ক্রমশঃ ব্যাঙ্কিং-এর উদ্ভব ঘটে। প্রতিষ্ঠাবান স্বর্ণকারেরা বিত্তবান সম্প্রদায়ের স্বর্ণ, মুদ্রা ইত্যাদি নিরাপদে গচ্ছিত রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। হুণ্ডির ব্যবসায়ীরাও ক্রমশঃ বিদেশী মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করে। কালে ইহারা উপলব্ধি করে যে, তাহাদের নিকট মজুত স্বর্ণ এবং মুদ্রার সমগ্রটাই আমানতকারীদের প্রয়োজন হয় না এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ সুদের বদলে ঋণ দিয়া সহজেই লাভ করা যায়। এই উপলব্ধির ফলে ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমানতকারীদের সুদ প্রদানের প্রথার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দেই আধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রথার জন্ম বলা চলে, কারণ ঐ সময়েই ইংল্যান্ডে প্রথম অর্থসৃজনের দুই প্রধান অস্ত্র, চেক এবং ব্যাঙ্ক নোটের আবির্ভাব ঘটে।

ভারতেও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিকদের আগমনের সাথে সাথে আধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রথার সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্বে বহু শতাব্দী যাবৎ মহাজনি ব্যবসায়ের অস্তিত্ব ছিল এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে হুণ্ডি প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। কিন্তু একের সঞ্চয় গচ্ছিত রাখিয়া অন্যকে ঋণদানের প্রথার উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে নাই এবং ব্যাঙ্ক নোট বা চেকের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রয়োজনে ইংরেজ এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্কিং-এর কার্যও আরম্ভ করে। তাহারা অর্থ গচ্ছিত রাখিত, ব্যবসায়ে ঋণ দিত এবং নোটেরও প্রচলন করিয়াছিল। তবে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতে আর কোনও ব্যাঙ্কের নাম জানা যায় না।

দেশের অর্থনীতিতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুরুত্ব সমধিক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জনসাধারণের আস্থার ভিত্তিতে অর্থসৃজন করিলেও বাণিজ্যের প্রয়োজনেই করে। ব্যাঙ্কের ইহা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে সরকারি মুদ্রা সৃজন করিয়া এই প্রয়োজন মিটাইতে হইত। অন্যদিকে মাত্রাতিরিক্ত

ব্যাঙ্ক-মুদ্রার সৃজন সংকুচিত করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। কিন্তু ব্যাংকসমূহ দেশে সঞ্চয়ের প্রধান কেন্দ্র হওয়ায় কাহারা ঋণ লইবে এবং অর্থনীতির বিকাশ কোন্ পথে হইবে তাহা ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের দ্বারা বহুলাংশে নির্ধারিত হয়। 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক' দ্র

দ্র R. G. Hawtrey, *Currency and Credit*, London, 1928; S. G. Panandikar, *Banking in India, London*, 1937; R. S. Sayers, *Modern Banking*, London, 1963.

সন্তোষ ভট্টাচার্য

ব্যাঞ্জো গীটারের ধরনের আকৃতিবিশিষ্ট এই পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রটি উত্তর-আমেরিকায় প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার দীর্ঘ দণ্ডের উপরে সাধারণতঃ ৫টি তার (কখনও ৬।৭টিও) থাকে এবং চর্মনির্মিত, গোলাকৃতি তবলির উপরিস্থিত সোয়ারিতে তারগুলি বিন্যস্ত রাখা হয়। পর্দাবিহীন ও পর্দাসমন্বিত দুই প্রকার ব্যাঞ্জোই প্রচলিত। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে, স্বরদবাদক কৌকব খাঁ চিকারা প্রভৃতি তার সংযোগ ও অন্যান্য সংস্কার করিয়া ব্যাঞ্জো যন্ত্রে ভারতীয় রাগসংগীত বাজাইতেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্যাটারি বিদ্যুৎ দ্র।

ব্যাবিলোনিয়া ব্যাবিলোনিয়ার রাজধানী ব্যাবিলন ইউফ্রেটিস নদীর হিল্লা শাখার তীরে, বর্তমান বাগদাদ হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ব্যাবিলন নামের অর্থ 'ভগবানের দ্বার'। হাম্মুরাবির সময়ে ব্যাবিলন নগরী ব্যাবিলোনিয়ার রাজধানী হয়। সেনাকেরিব এই পুরাতন ব্যাবিলন নগরী ধ্বংস করেন (৬৮৯ খ্রী পূ)। নব-ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সময় নেবুকাড্‌নেজার অসীম সমৃদ্ধিশালী নতুন ব্যাবিলন নগরীর পত্তন করেন। ইহারই ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। হেরোডোটাস বলিয়াছেন যে ব্যাবিলন একটি প্রাচীরবেষ্টিত সমচতুর্ভুজ নগরী ছিল ও ইহার প্রত্যেক দিক ১২০ স্টাডিয়া (প্রায় ২৪ কিলোমিটার) ছিল। সুতরাং মোট চৌহদ্দি ছিল ৯৬ কিলোমিটার। খননকার্যের ফলে জানা যায় যে ব্যাবিলনের প্রাচীরের সমগ্র বিস্তার ছিল ৩·৮ কিলোমিটার।

নিম্ন টাইগ্রীস ও দক্ষিণ ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী দোয়াবে প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার উত্তরদিকের নাম ছিল আক্‌কাদ, ও দক্ষিণদিকের নাম ছিল সুমের। টাইগ্রো-ইউফ্রেটিসের সঙ্গমের নিম্নে ছিল ক্যালডিয়া। এই আক্‌কাদ, সুমের ও ক্যালডিয়া লইয়া প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্য। ইহার দক্ষিণ-পূর্বে ছিল ইলাম ও উত্তরে ছিল আসিরিয়া। আক্‌কাদের নগররাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আগাদে, ওপিশ, কিশ্, কুথা, ব্যাবিলন, বরসিপ্পা ও সিপ্পার সমধিক বিখ্যাত। সুমেরের রাষ্ট্র-নগরীর মধ্যে আদাব, এরেক, এরিডু, উর, উম্মা ও লাগাসের নাম বিখ্যাত। আক্‌কাদ ও সুমেরের বিবদমান নগররাষ্ট্রসমূহের ইতিহাসই প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্যের ইতিহাস।

ইহার পরে ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের আরম্ভ। এই সাম্রাজ্যের রাজগণের কালক্রম নির্ধারণ অতি দুরূহ। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। ঐতিহাসিক কিং-এর মতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োবিংশ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ১২টি রাজবংশের সম্ভবতঃ ১৩০ জন রাজা ব্যাবিলোনিয়ায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রথম রাজবংশের ষষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি (কিং-এর মতে রাজত্বকাল ২১২৩—২০৮১ খ্রীপূ) এরেক ও ইসিন জয় করেন, বিখ্যাত রিম-সিন ও ইলামের রাজাকে পরাজিত করেন, ও উত্তরে আসিরিয়া জয় করেন। তিনি তাঁহার আইনের সারসংগ্রহ বা Code-এর জন্য বিখ্যাত। ২৮২ প্যারাগ্রাফে ৩৬০০ কীলকাক্ষরের লাইনে এই কোড্‌টি একটি স্তম্ভের উভয় পৃষ্ঠে লিখিত হয়। ইহা এক্ষণে পারীতে (প্যারিসে) আছে। ইহা হইতে আমরা জানি যে ব্যাবিলোনীয় সমাজে তিনটি স্তর ছিল—অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও দাস সম্প্রদায়। লক্ষণীয় এই যে এই দাস সম্প্রদায়ের অবস্থা অত্যন্ত ক্লেশকর ছিল না: কোনও কোনও ক্ষেত্রে দাসেরা মুক্তি অর্জন করিতে পারিত। স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিতেন ও স্ত্রী ক্ষেত্রবিশেষে পুনর্বিবাহ করিতে পারিতেন। জমির চাষ ও গবাদি পশু সম্বন্ধেও আইন ছিল. ফৌজদারী আইন অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্যাবিলনে জলসেচের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল: প্রথম রাজবংশের প্রায় প্রত্যেকেই খাল কাটাইয়াছিলেন।

কাসাইট আক্রমণে ব্যাবিলোনিয়ার সেমিটিক রাজবংশের পতন হয় ও তৃতীয় রাজবংশের উত্থান হয়। ইহার অনেক পরে খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আসিরীয়গণ ব্যাবিলন দখল করেন। টিগ্‌লাথ পিলেসার, সারগন, সেনাকেরিব, ইসারহ্যাডেন এই বংশের বিখ্যাত রাজা। ইহার পর নব-ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি নেবুকাড্‌নেজার যুবরাজ হইয়া কারকেমিশের যুদ্ধে (৬০৬ খ্রীপূ) মিশরের ফ্যারাও নেকোকে পরাজিত করেন। রাজা হইয়া তিনি জেরুসালেম জয় ও ধ্বংস করেন ও ইহুদীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার নবনির্মিত বিরাট ব্যাবিলন নগরী তখন পশ্চিম এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে একেমেনীড সাইরাস ব্যাবিলন জয় করেন ও ৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তৃতীয় ডেরিয়াসের সময় আলেকজান্ডার ব্যাবিলন জয়

করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সেলিউকিয়া নগরী প্রাধান্য লাভ করে ও ব্যাবিলনের গৌরব চিরতরে অস্তমিত হয়।

ব্যাবিলনের ধর্ম ঃ ব্যাবিলনের প্রধান দেবতা ছিলেন মার্ডুক বা বেল। রাজগণ মার্ডুকের হস্তগ্রহণ করিয়া রাজা হইতেন। অন্য দেবতাগণের মধ্যে আকাশের দেবতা আনু (Anu), পৃথিবী ও শস্যসমূহের দেবতা এনলিল, প্রেম ও মাতৃকা দেবী ইশ্‌টার, মৃত্যুর দেবতা নেরগাল ও লিপির উদ্ভাবক নেবো সর্বাধিক বিখ্যাত।

ব্যাবিলোনীয় সাহিত্যঃ নিপ্পারের মন্দির গ্রন্থাগার ও আসুরবানিপালের গ্রন্থাগার ব্যাবিলোনীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার। কীলকাক্ষরের ইষ্টকগুলিতে এই সাহিত্য লিখিত হইয়াছে। ব্যাবিলোনীয় সাহিত্যে রাজপুত্র গিলগামেশের কাহিনী সুবিখ্যাত। ১২টি ট্যাবলেটে ৩০০০ ছত্রে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। ইহার বিরাট প্লাবনের বর্ণনার সহিত বাইবেলের মহাপ্লাবনের বর্ণনার মিল লক্ষণীয়। ব্যাবিলোনীয় সাহিত্য আইন, ব্যবসাবাণিজ্য, ধর্মীয় আচার, আচরণ ও ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে সমৃদ্ধ। 'পৃথিবীর মানচিত্র' ব্যাবিলোনীয়গণের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। দুইটি ক্ষোদিত প্রস্তরে নেবুকাড্‌নেজার দেবতা রিত্তি-মার্ডুককে ইলামে জয়লাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান। ইহাতে সূর্য, চন্দ্র, শুক্রতারা ও বৃশ্চিক রাশির উল্লেখ আছে।

ব্যাবিলনের শিল্পকলা ঃ হামুরাবি যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি ধ্বংস হইয়াছে। নবব্যাবিলন রাজ্যের দ্বিতীয় সম্রাট নেবুকাড্‌নেজারের প্রাসাদ পশ্চিম-এশীয় স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। এই সম্রাটের উৎসব পথের উভয় পার্শ্বে মিশরের অনুকরণে তৈরি দুই সারি সিংহ প্রধান আকর্ষণের বস্তু ছিল। প্রাসাদের শূন্যোদ্যান পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি ছিল। মার্ডুকের মন্দিরের টাওয়ার, ইশ্‌টার তোরণ ও ব্যাবেলের টাওয়ার বিশেষ দর্শনীয় ছিল। সিল-কাটায় ও তদুপরি চিত্র খোদাই করায় ব্যাবিলোনীয় শিল্পীগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। নিপ্পারের হস্তিদন্ত-নির্মিত ষণ্ডের মস্তক হইতে হস্তি-দন্তের কারুশিল্পে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্র L. W. King, *A History of Babylon*, London, 1919; *The Cambridge Ancient History*, Vols. I & II; *Encyclopaedia Britannica*, Vol. II; I. H. Breasted, *Ancient Times*, London, 1961.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ব্যারাকপুর পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার একটি শহর। ২২°৪′ উত্তর ও ৮৮°২১′ পূর্ব। ইহা কলিকাতা হইতে পূর্ব রেলপথে ২২ কিলোমিটার উত্তরে হুগলি নদীতীরে অবস্থিত। এই শহরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুইটি পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি আছে। বর্তমানে (১৯৬১ খৃ) ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেণ্টে ১৬৯১২ জন, উত্তর ব্যারাকপুরে ৫৬৬৮৩ জন ও দক্ষিণ ব্যারাকপুরে ৬৩৭৭৮ জন লোক বাস করে।

দমদমের সেনানিবাস উঠিয়া যাইবার পর ব্যারাকপুরে কলিকাতার নিকটবর্তী একমাত্র সেনানিবাস হইয়াছে। ইহা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় একটি সেনা বিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত এই সেনানিবাসেই হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার আয়তন ৩·৬ বর্গকিলো-মিটার।

ব্যারাকপুরের দক্ষিণ মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা রেলপথ, গভর্নমেণ্ট হাউস ও পার্ক প্রভৃতি লইয়া গঠিত। এই অঞ্চলটি সাধারণতঃ ব্যারাকপুর নামে পরিচিত। ব্যারাকপুরের প্রাচীন নাম চানক। বর্তমানে (১৯৬১ খৃ) ইহার আয়তন ১১·৬ বর্গকিলোমিটার।

উত্তর ব্যারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার আয়তন ৮ বর্গকিলোমিটার। কলিকাতার জল সরবরাহের কেন্দ্র পলতা এই মিউনিসি-প্যালিটির অন্তর্গত। ব্যারাকপুরের নিকট ইছাপুরে গভর্নমেণ্টের একটি রাইফেল কারখানা আছে। এই স্থানে বৎসরে দুইটি মেলা যথাক্রমে জন্মাষ্টমী ও ঝুলনের সময় হইয়া থাকে। দুইটি রাস্তা এই মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর দিয়া গিয়াছে,—একটি বি টি রোড, অন্যটি ইছাপুর রোড। এই স্থানে বিখ্যাত গান্ধীঘাট নির্মিত হইয়াছে।

দ্র B. Roy, Census 1951, West Bengal District Census Handbook, 24-Parganas, Vol. I, Calcutta.

উমা ঘোষ

ব্যালিস্‌টিক্‌স ক্ষেপণাস্ত্রবিষয়ক ব্যবহারিক বিজ্ঞান ; এই বিদ্যায় ক্ষেপণাস্ত্রের (বন্দুক, কামান, রকেট, বোমা ইত্যাদির) প্রক্ষেপণ, মাধ্যমের মধ্য দিয়া গতি এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হয়। এই শাখা প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্তঃ ক. আভ্যন্তরীণ ব্যালিস্‌-টিক্‌স (উৎসের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্রের পরিচালন সংক্রান্ত) ; খ. বহির্ব্যালিস্‌টিক্‌স (মাধ্যমের ভিতর দিয়া ক্ষেপণাস্ত্রের গতি সংক্রান্ত) ; গ. প্রান্তিক ব্যালিস্‌টিক্‌স (লক্ষ্যবস্তুতে ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত)। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাসিনি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষেপণাস্ত্রের শক্তি পরীক্ষার উপায় প্রস্তাব করেন এবং ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে, বেঞ্জামিন রবিন্‌স এই উদ্দেশ্যে প্রথম ব্যালিস্‌টিক্‌ পেণ্ডুলাম উদ্ভাবন করেন। যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতিতে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখার ব্যাপক ব্যবহার আছে।

সমীরকুমার ঘোষ

বুলোর (বুল্যের), য়োহন গেঅর্গ (Buehler, Johann Georg, ১৮৩৭—৯৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ জার্মান ভারতবিদ্যাবিদ্। গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও প্রত্নতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বুল্যের এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রদেশের সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগদান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বোম্বাই এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, সংস্কৃত শিক্ষাবিভাগীয় অধ্যক্ষ, সরকারি পুথি সংগ্রহাধিকারিক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে প্রায় পঞ্চ-সহস্র অপ্রকাশিত প্রাচীন পুথি আবিষ্কার ও সংগ্রহ, এইগুলির তালিকা সংকলন, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক সম্পাদন, প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নিবন্ধ রচনা ও প্রকাশ দ্বারা বুলার একজন ধুরন্ধর ভারততত্ত্ববিদ্‌রূপে দেশে ও বিদেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বুল্যের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পদিন পরেই তাঁহাকে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। শেষ জীবনে বুলার বিশ্বের ত্রিশজন ভারতবিদ্যাবিশারদের সহায়তায় ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নিবন্ধযুক্ত একটি 'বিশ্বকোষ' প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হন এবং ইহার নয়টি খণ্ড স্বয়ং সম্পাদন করিয়া যান। লেক কন্‌স্ট্যান্স-এ জলমগ্ন হইয়া বুল্যেরের অকাল মৃত্যুর পর (৮ই এপ্রিল, ১৮৯৮ খ্রী) তাঁহার সহকর্মী ফ্রান্‌ট্‌স কীল্‌হর্ণ বাকি খণ্ডগুলি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (*Grundriss der Indo Arichen Philologie und Altertumskunde*, 21 vols; Strassburg, ১৮৯৬—১৯২০ খ্রী)। ইহাতেই ভারতীয় লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত রচনা, *Indische Palaeographie*, প্রকাশিত হয়।

বুল্যেরের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী: *Digests of Hindu Law* (with Sir R. West), Bombay, 1867; *The Sacred Laws of the Aryas* (English tr. of Apastamba, Gautama, Vasistha and Baudhayana Sutras); *Sacred Books of the East*, Vols. 2 and 14, Oxford, 1879; *The Laws of Manu* (S. B. E. Vol. 25), Oxford, 1886; *Indische Palaeographie*, Strassburg, 1896; *Asoka Inschriften*, Leipzig, 1889.

দ্র শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারতবিদ্যা-পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ব্যোপদেব, বোপদেব (খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী) প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক। তিনি দেবগিরির যাদববংশীয় রাজা মহাদেবের সভাপণ্ডিত ছিলেন। পিতার নাম কেশব; গুরুর নাম ধনেশ।

মুগ্ধবোধ নামক ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম নামক ধাতু-পাঠ, শ্রীমদ্‌ভাগবতের সারসংকলন মুক্তাফল এবং ভাগবতের অনুক্রমণীরূপে হরিলীলা ইঁহার রচনা।

মুগ্ধবোধের সূত্র ও বৃত্তি উভয়ই বোপদেবের রচনা. ইহাতে বৈদিক প্রকরণ নাই। সংজ্ঞাপরিভাষাকে এক একটি অক্ষরে পরিণত করিয়া মাত্র ১১৮৪ সূত্রে ব্যাকরণ শাস্ত্রকে সংক্ষেপ করার ফলে সূত্রগুলি যথার্থই দুর্বোধ ও দুরুচ্চার্য। তথাপি দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার অসাধারণ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য। মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষতঃ নবদ্বীপে, মুগ্ধবোধের চর্চা বিখ্যাত।

মুগ্ধবোধের অসংখ্য টীকার মধ্যে রাম তর্কবাগীশের টীকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। অভিধানকার বোট্‌লিংক ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ হইতে মুগ্ধবোধের এক উত্তম সংস্করণ প্রকাশ করেন।

মুক্তাফলগ্রন্থের হেমাদ্রিকৃত কৈবল্যদীপিকা টীকা বৈষ্ণব জগতে সুপরিচিত।

দ্র শ্যামাচরণ কবিরত্ন, মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্, হাওড়া, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ; S. K. Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar;* Poona, 1915; Durgamohan Bhattacharya, *Muktaphala of Vopadeva*, Calcutta, 1944.

কল্যাণী দত্ত

ব্যোমকেশ মুস্তফী (১২৭৫—১৩২২ বঙ্গাব্দ) নিঃস্বার্থ সাহিত্যসেবী। পিতা অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। বাগবাজারের ব্রাউটন ইন্‌স্টিটিউশন এবং ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে পাঠের পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে চাকরি করিতেন। কৈশোরেই তিনি 'তপস্বিনী' (১২৯১ বৈশাখ) ও 'ভারত' (১২৯১ মাঘ) পত্রিকাদ্বয় প্রকাশে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৩০৬—২২ বঙ্গাব্দে ব্যোমকেশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন; পরিষদের গৃহনির্মাণ, পুথিশালা, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থশালার সংগঠন, প্রাচীন ও প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠান এবং মফস্বলে শাখা-পরিষদ স্থাপনে তাঁহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'পঞ্চপুষ্প', 'বাণী', 'ভাণ্ডার', 'মানসী', 'যমুনা', 'রঙ্গমঞ্চ', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা', 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে এবং 'বিশ্বকোষ' ১ম সংস্করণে বাংলা ব্যাকরণ, প্রাচীন ও লৌকিক সাহিত্য, নাট্যশালা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার সম্পাদনায় 'সাহিত্য-কল্পদ্রুম' (১২৯৮—১৩০০), 'বঙ্গনিবাসী', 'ভারত সংবাদ', 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (১৩০৩ ভাদ্র-অগ্রহায়ণ) এবং 'মালা'

(১৩০৪ মাঘ), এই সাময়িকপত্রগুলি এবং ভবানীপ্রসাদ রায় রচিত 'দুর্গামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থটি (১৩২১) প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ : 'ব্যাটরানিবাসী কবি ঠাকুরদাস দত্তের সংক্ষিপ্তজীবনী' (১৩০৫), 'ললাট লিখন' (১৩০৬) নামক উপন্যাস-সংগ্রহ, 'নববর্ষে অলংকার' (১৩২০); শ্রীরোগাতুর শর্মা ছদ্মনামে লিখিত প্রবন্ধের সংকলন 'রোগশয্যার প্রলাপ' (১৩৩০), নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের 'পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণ' নামক খণ্ডটির অর্ধাংশ (১৬১—৩৬০ পৃষ্ঠা)। ১৩২২ বঙ্গাব্দে ১৯ চৈত্র ক্ষয়রোগে ব্যোমকেশের মৃত্যু ঘটে।

দ্র দেবজ্যোতি দাশ, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১০৩, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

দেবজ্যোতি দাশ

ব্রজবুলি কৃত্রিম মিশ্র সাহিত্যিক ভাষা, ইহার মূলে মৈথিলী। ব্রজবুলিকে বাংলাভাষার সাহিত্যিক উপভাষা বলা হয়, কারণ বাংলাদেশে ইহার উৎপত্তি, বাঙালী কবিদের হাতে পুষ্টি। রাধাকৃষ্ণ-সনাথ ব্রজমণ্ডলের লীলা-বিবরণের ভাষা বলিয়া ইহার নাম ব্রজবুলি। পশ্চিমা হিন্দীর কথ্য-রূপ ব্রজভাষা ও ব্রজবুলি এক নহে।

বাঙালী কবিরা ষোড়শ শতকে আমদানিকৃত মৈথিল প্রেমগীতিকার পদের ভাষা ও ছন্দের অনুসরণে নূতন কাব্যভাষা ব্রজবুলিতে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ লেখেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে ব্রজবুলিতে পদরচনা শুরু হয়।

প্রাচীনতম বাংলা ব্রজবুলি পদ 'এক পয়োধর চন্দন লেপিত' রচনা করেন যশোরাজ খান। প্রথম ওড়িয়া ব্রজবুলি পদ 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' রচনা করেন রামানন্দ রায়। প্রথম অসমীয়া ব্রজবুলি পদটি লেখেন শংকরদেব। উঁহারা তিনজনই ষোড়শ শতকের লোক ছিলেন। ব্রজবুলির শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ (১৬-১৭ শতক) বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যমণি। ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত ব্রজবুলিতে পদ রচিত হয় ; রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'।

দ্র বিমানবিহারী মজুমদার, গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ, কলিকাতা, ১৯৬১ খ্রী ; Sukumar Sen, *A History of Brajabuli Literature*, Calcutta, 1935.

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রজসুন্দর মিত্র (১২২৭—১২৮২ বঙ্গাব্দ) ব্রাহ্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক। বাংলাদেশের মাণিকগঞ্জ মহকুমার বুতুনী-সিমুলিয়া বা বুতুনী-সিসুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ১২২৭ বঙ্গাব্দের ২৪ আষাঢ় ব্রজসুন্দরের জন্ম হয়। পিতা ভবানীপ্রসাদ, মাতা কাশীশ্বরী দেবী। কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে পাঠ সমাপনের পূর্বেই তিনি ঢাকা কমিশনারের আপিসে কেরাণীর পদ গ্রহণ করেন (১৮৪০ খ্রী)। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সার্ভে ডেপুটি কালেক্‌টর এবং ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে আবগারি কালেক্‌টর নিযুক্ত হন। ২১ বৎসর বয়সে ব্রহ্মময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

রামমোহনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রজসুন্দর ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বহুবিবাহ সুরাপান প্রভৃতি দুর্নীতির নিবারণ ও নানাবিধ জনহিতকর কর্মে তিনি দীর্ঘকাল ব্রতী ছিলেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সূত্রপাত তাঁহার গৃহেই হয়। রামকুমার বসু, ভগবানচন্দ্র বসু-প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় তিনি ঢাকায় একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। তথা হইতে 'ঢাকা প্রকাশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। ১২৮২ বঙ্গাব্দের ৩ পৌষ তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৭৩—১৯৫৭ খ্রী) বাংলা-দেশের ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী। ইনি ছিলেন দত্তকপুত্র। তিনি উত্তর জীবনে সুপণ্ডিত, সংগীতজ্ঞ, দেশহিতব্রতী, সমাজসেবী, নাট্যশিল্পী, ক্রীড়া-বিদ্, মুক্তহস্ত দাতারূপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে মুরারিমোহন গুপ্তের নিকট তিনি পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। সাময়িক পত্রিকাদিতে তিনি সংগীততত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন টাউন ক্লাব ও বেঙ্গল জিমখানার অন্যতম স্তম্ভ। ভারত সঙ্গীত সমাজের নাটকাদিতে অভিনয়, গৌরীপুরে স্থায়ী নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁহার নাট্য-জীবনের পরিচায়ক। তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা National Council of Education সংস্থায় ৫ লক্ষ টাকা ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। বিপ্লবী যুগান্তর দল, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, এবং বহু চিকিৎসালয় বিদ্যালয় প্রভৃতিকে ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের সাহায্যকল্পে তিনি প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মোট দানের পরিমাণ ৩৫ লক্ষ টাকা।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১—১৯৫২ খ্রী) জন্ম হুগলিতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর। পিতার নাম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে ব্রজেন্দ্রনাথের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। ২য়

(বর্তমানে ৯ম) শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া অভাবের তাড়নায় তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। কৈশোরেই তিনি কলিকাতায় যান এবং একটি ছোট সওদাগারি প্রতিষ্ঠানে স্বল্প বেতনে টাইপিস্টের কর্ম গ্রহণ করেন (১৯০৯ খ্রী)। শর্টহ্যান্ড শিখিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে চাকরিতে উন্নতি করিয়া শেষ পর্যন্ত জেম্‌স ফিন্‌লে অ্যান্ড কোম্পানিতে নিযুক্ত হন।

ব্রজেন্দ্রনাথ কৈশোর হইতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। যদুনাথ সরকারের নিকট হইতে ইতিহাস অনুশীলনের প্রকৃষ্ট ধারা অবগত হইয়া গবেষণাকার্যেও লিপ্ত হন। মোগল যুগ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা আরম্ভ হয়। সরকারি নথিপত্র ঘাঁটিয়া রামমোহন রায় সম্বন্ধেও নূতন তথ্য প্রবন্ধ ও পুস্তকে পরিবেশন করিতে থাকেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু'র সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন। ইহার পর হইতেই তাঁহার গবেষণাকার্যের মোড় ফিরিল। 'সমাচারদর্পণ' ও অন্যান্য সমসাময়িক পত্রপত্রিকার ভিত্তিতে তিনি কতকগুলি আকর-গ্রন্থ সম্পাদন ও সংকলন করিলেন; 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'বাংলা সাময়িকপত্র' (২ খণ্ড) ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইল। তিনি 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সম্পাদনে অগ্রণী হইলেন। তাঁহার অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' নিয়মিতভাবে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইল। ব্রজেন্দ্রনাথের একক সম্পাদনায় 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' এবং তাঁহার ও সজনীকান্ত দাসের যুগ্ম-সম্পাদনায় 'বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী', 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী', 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী', 'রামমোহন-গ্রন্থাবলী', 'ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবরূপায়ণ ও সুষ্ঠু পরিচালনাকল্পে ব্রজেন্দ্রনাথ বিভিন্ন কর্মকর্তৃপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করেন। তাঁহার রচিত, সম্পাদিত ও সংকলিত বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থগুলি ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় বহন করিতেছে। তিনি ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৪০-৪১, ১৩৫২-৫৫ বঙ্গাব্দ), সহ-সম্পাদক (১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দ), পত্রিকাধ্যক্ষ (১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাব্দ) এবং সম্পাদক-পদে (১৩৪৭-৫১, ১৩৫৬-৫৯ বঙ্গাব্দ) বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগের কার্যসূচী নবপরিকল্পিত রূপ লাভ করে। ফলে বঙ্গসাহিত্যের পথিকৃৎস্বরূপ সাহিত্যসাধকদিগের রচনাবলী পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা হয় এবং পরিষদেরও স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত হয়। পরিষদের কর্মীদের জন্য তাঁহারই উদ্যোগে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পূজা বোনাস ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

পরিষদের প্রকাশনকর্ম ব্যতীত রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা', গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'স্বপ্ন' ও 'লালকালো' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকরূপেও ব্রজেন্দ্রনাথের ভূমিকা উল্লেখনীয়।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' এবং 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থগুলি রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্র-স্মৃতি-পুরস্কার প্রদান করেন। প্রথমোক্ত গ্রন্থদ্বয়কে ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংলা সমাজেতিহাস গ্রন্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক দান করেন। অক্ষয়কুমার বড়ালের সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ প্রদত্ত অক্ষয়কুমার বড়াল রৌপ্যপদকও লাভ করেন।

তাঁহার রচিত অন্যান্য গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখ্যঃ 'বাঙ্গলার বেগম' (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), *'Begams of Bengal'* (১৯১৫ খ্রী), 'নূরজহান' (১৩২৩ বঙ্গাব্দ), 'বেগম সমরু' (১৩২৪ বঙ্গাব্দ), 'মোগলযুগে স্ত্রীশিক্ষা' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), 'মোগল-বিদুষী' (১৩২৬ বঙ্গাব্দ), 'জহান-আরা' (১৩২৭ বঙ্গাব্দ), 'দিল্লীশ্বর' (১৩৩০ বঙ্গাব্দ), *'Begam Samru'* (১৯২৫ খ্রী), *Rajah Rammohun Roy's Mission to England'* (১৯২৬ খ্রী), *'Dawn of New India'* (১৯২৭ খ্রী), 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'পরিষৎ-পরিচয়' (১৩৪৬ ও ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), *'Bengali Stage'* (১৯৪৩ খ্রী), 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' (১৩৫০ বঙ্গাব্দ), 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ), 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), 'শরৎ-পরিচয়' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'বঙ্গসাহিত্যে নারী' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'শরৎচন্দ্রের রচনাবলী' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসঃ সমসাময়িক দৃষ্টিতে' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার রচিত কিশোর-পাঠ্য ঐতিহাসিক গল্পের সংকলন হিসাবে 'রাজা-বাদশা' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'রণ-ডংকা' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'কেল্লা-ফতে' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ), 'শিবাজী মহারাজ' (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), 'মহারাণা প্রতাপসিংহ' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) এবং 'মোগল-পাঠান' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) পুস্তকগুলি উল্লেখ্য।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামক বাংলা কোষগ্রন্থের সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদ-পত্র বিভাগের ব্রজেন্দ্রনাথ অন্যতর সম্পাদক ছিলেন

(১৩৪১-৪৮ বঙ্গাব্দ)। 'বঙ্গীয় মহাকোষ'-এর ২য় খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত 'অনুবাদিকা' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'শিশুভারতী' নামক কোষগ্রন্থের ৫ম খণ্ডে 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটিও ব্রজেন্দ্রনাথের লিখিত। বহু ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক-পত্রেও তিনি প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি নবাবিষ্কৃত ও প্রামাণিক তথ্যের প্রাচুর্য, আবেগবিহীন ও অত্যুক্তিবর্জিত সরল ভাষা, নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণের জন্য উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতকের বঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য, সাময়িকপত্র প্রভৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় তাঁহার গবেষণার গুরুত্ব আছে। অবশ্য তাঁহার বহু রচনা উদ্ধৃতি, টীকা ও প্রমাণপঞ্জীতে ভারাক্রান্ত। তদ্ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার শ্রম কেবল তথ্য পরিবেশনেই সীমাবদ্ধ এবং স্বকীয় সিদ্ধান্তের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত বিরল।

দ্র দেবজ্যোতি দাশ, 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৩-৪৮; দেবজ্যোতি দাশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ সাহিত্য সাধক-চরিতমালা ১০৪, কলিকাতা, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ।

দেবজ্যোতি দাশ

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪--১৯৩৮ খৃী) প্রখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক। পিতা মহেন্দ্রনাথ শীল। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হয়। শৈশব কাটে দারিদ্র্যের মধ্যে। তিনি জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউশনে (১৮৭৮-৮১ খৃী) শিক্ষালাভ করেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দর্শনশাস্ত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন (১৮৮৩ খৃী)। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কলেজ-সহপাঠী ছিলেন। তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক (১৮৮৪ খৃী), নাগপুর মরিস কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৮৫-৮৭ খৃী), বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৮৭-৯৭ খৃী), কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৭-১৯১২ খৃী), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক (১৯১২-২১ খৃী) ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯২১-৩০ খৃী) ছিলেন।

এদেশে তুলনামূলক সাহিত্য-বিচারে, ধর্মদর্শনবিচারে, দর্শনালোচনায় গণিতের সূত্রপ্রয়োগে ব্রজেন্দ্রনাথ পথপ্রদর্শক। জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে ছিল তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিহার। তিনি পি-এইচ. ডি. ডি. এস্‌সি (১৯১৫ খৃী), নাইট (Knight, ১৯২৬ খৃী) ও মহীশূরের রাজরত্নপ্রবীণ (১৯৩০ খৃী) উপাধিতে ভূষিত হন।

তিনি ৪ বার ইওরোপ ভ্রমণে যান। তিনি রোমে ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে (১৮৯৯ খৃী) যোগ দেন। লণ্ডনে বিশ্ব জাতিকংগ্রেসে (১৯১১ খৃী) তাঁহার অভিভাষণ স্মরণীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুদর্শন ও ভারতবাণী পাশ্চাত্য জগতে উপস্থিত করেন, হেগেল ও হার্বার্ট স্পেন্সারের মত-বাদের ত্রুটি দেখান, 'হিস্টরিক্যাল মেথডে'র সংশোধনের দাবি করেন ও বিশ্বমানবধর্মমত প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেন (১৯২১ খৃী)। প্রাচীন ও আধুনিক দশটি ইওরোপীয় ও ভারতীয় ভাষায় তাঁহার দখল ছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথের প্রধান রচনাবলীঃ

A Memoir on the co-efficient of Numbers — A Chapter on the Theory of Numbers (1891); *Neo-Romantic Movement in Bengali Literature* 1890-91; *A Comparative Study of Christianity and Vaisnavism* (1899); *New Essays in Criticism* (1903); *Introduction to Hindu Chemistry* (first published in P. C. Ray's *History of Hindu Chemistry,* 1911); *Positive Sciences of the Ancient Hindus* (1915); *Race-Origin* (paper read at the Universal Races Congress, London, 1911); *Syllabus of Indian Philosophy* (1924); *Rammohan, the Universal Man* (1933); *The Quest Eternal* (a philosophical poem, 1936); Address at the All India Philosophical Congress (1935); *Autobiography* (Unpublished MSS.); *Positive Background of Hindu Sociology* (with B. R. Sarkar); ইত্যাদি।

দ্র *Acharya Brojendranath Seal Birth Centenary Commemorative Volume,* Calcutta, 1965; B. N. Seal Centenary Celebration Committee, *Homage to the Hallowed Memory of Acharya Brajendranath Seal,* Cooch Behar, 1965.

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

ব্রত ইষ্টলাভের উদ্দেশ্যে নিয়মরূপে অনুষ্ঠেয় বিশিষ্ট ধর্মাচার। ব্রত মূলতঃ কামনামূলক অনুষ্ঠান এবং অভীষ্ট-সিদ্ধি ও চরিতার্থতার জন্য ক্রিয়া। ব্রত দুই প্রকার— শাস্ত্রীয় ও লৌকিক। পুরুষের আচরণীয় ব্রতের প্রচলন কিছু কিছু থাকিলেও মূলতঃ ব্রত মেয়েলি অনুষ্ঠান। মেয়েলি ব্রতের দুই ভাগ—কুমারী ব্রত ও মহিলা ব্রত। কিছু কিছু ব্রত পুরুষ ও রমণীগণের সমবেত অংশগ্রহণে প্রতি-পালিত হয়। ব্রত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, দুই রূপে আচরিত হয়।

সামান্যকাণ্ড, শাস্ত্রবিধি, ব্রাহ্মণকে দান-দক্ষিণা, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতায় শাস্ত্রীয় ব্রত প্রতিপালিত

হয়। লৌকিক ব্রত উদ্‌যাপিত হয় পুরোহিতহীন স্মৃতি-পুরাণবহির্ভূত লোকপরম্পরাগত প্রথায়। সামাজিক পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে লৌকিক ব্রতেও পুজারী ব্রাহ্মণ, সামান্যকাণ্ডের জটিল অনুষ্ঠান, ন্যাস মুদ্রা তন্ত্র মন্ত্র ইত্যাদির অনুপ্রবেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রত ক্রিয়ায় সাধারণতঃ আহরণ, আচরণ, পালন, কামনা-জ্ঞাপন, কথাশ্রবণ প্রভৃতি স্তর পরিলক্ষিত হয়। সংযম ও নিষ্ঠা ব্রতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনাহার বা একাহার, বিশেষ বিশেষ খাদ্য ও বস্তুর গ্রহণ বা বর্জন, বিশেষ বিশেষ নিষেধ বা 'ট্যাবু'-র প্রতিপালন ইত্যাদি প্রথা সহকারে ব্রত উদ্‌যাপিত হয়।

লোকায়ত সমাজে ব্যাপকরূপে প্রচলিত লৌকিক ব্রত মূলতঃ সমষ্টিগত অনুষ্ঠান এবং লৌকিক ব্রতের দেব-দেবী বেদ-পুরাণবহির্ভূত। সাভিপ্রায় অভিচারে ব্রত জীবনঘনিষ্ঠ। ব্রতের দেব-দেবী মানবিক গুণে বিভূষিত ও মানবিক আচার-আচরণে সিদ্ধ। লৌকিক ব্রতের দেব-দেবীকে মূলতঃ শুভ-অশুভ শক্তি এবং অদৃষ্ট বা নিয়তির রূপক বলা যায়। ব্রতের কামনা মূলতঃ পারলৌকিক কামনা নয়, ঐহিক জীবনেরই সুখশান্তির কামনা। পার্থিব সুখ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের এবং বৃহত্তর সমাজ-জীবনের মঙ্গল ও সৌভাগ্য কামনাই লৌকিক ব্রতের মূল লক্ষ্য।

ছড়া, গীত, নাট্য, নৃত্য, কথা, আলপনা প্রভৃতির মাধ্যমে ব্রতবিশেষে ব্রতীর মনস্কামনার আত্মপ্রকাশ ঘটে। আলপনার প্রতীকচিহ্নে কামনার রূপপ্রকাশ, ছড়া-কথার বাক্‌রীতিতে কামনার উচ্চারণ এবং নৃত্য-গীত-অভিনয় ও আচার অনুষ্ঠানের বিকল্পে কামনাকে চরিতার্থ করিবার প্রক্রিয়া ব্রতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রত মূলতঃ আদিম ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। ব্রতের আদিম জাদুমন্ত্র ছড়া ও গানে, জাদুক্রিয়া নৃত্য-অভিনয়ে ও আচার-আচরণে এবং জাদুচিহ্ন আলপনা শিল্পে রূপান্তরিত হইয়াছে বলা যায়। ব্রতের কথা-ছড়া-গান-নৃত্য-নাট্য-আলপনা প্রভৃতি শিল্পরূপে লোকায়ত জীবনচিন্তা ও লোকসংস্কৃতি প্রতিভাত। সামগ্রিকভাবে বাংলার ব্রত বাঙালীর জাতীয় জীবন, রস-জীবন ও লৌকিক জীবনের অভিব্যক্তিতে পরিপুষ্ট।

দ্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, কলিকাতা, ১৯১৯ ; আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬২ ; Tapan Mohan Chatterjee, *Alpona*, Calcutta, 1948; Sudhir Ranjan Das, *Folk Religion of Bengal*, Calcutta, 1953.

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ব্রতচারী আন্দোলন গুরুসদয় দত্ত যখন বীরভূমের শাসক তখন ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এক শিক্ষাশিবির চালিত করেন। সেই সূত্র ধরিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রতচারী আন্দোলন আরম্ভ হয়। সভ্যগণ পাঁচটি ব্রত গ্রহণ করেনঃ জ্ঞানব্রত, শ্রমব্রত, সত্যব্রত, ঐক্যব্রত ও আনন্দব্রত। এগুলিকে ষোলটি বিধি ও চৌদ্দটি নিষেধের আকার দেওয়া হয়।

সহজ ভাষায় দেশাত্মবোধক গান, রাঢ়দেশে প্রচলিত রায়বেঁশে, ঢালী প্রভৃতি নৃত্যের অভ্যাস, গ্রাম ও সমাজের সংস্কার, ব্যক্তিগত জীবনে সমবেত শ্রম, নিরহংকার, সমদর্শিতা প্রভৃতি গুণের স্থাপন, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠাতার ('গুরুজী') জীবদ্দশায় আন্দোলন বাংলাদেশে ও অন্যত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ইহা আংশিকভাবে সংকুচিত হইয়া গিয়াছে।

দ্র গুরুসদয় দত্ত, ব্রতচারী মর্মকথা, কলিকাতা, ১৩৪৫ (?) বঙ্গাব্দ ; গুরুসদয় দত্ত, ব্রতচারী-পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ ; Gurusadaya Dutt, *Bratachari: Its Aims and Meaning* (Revised by Dr. J. C. Mukherjee), Calcutta.

নির্মলকুমার বসু

ব্রহ্ম বেদান্ত দ্র

ব্রহ্মদেশ, বর্মা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০°—২৮° উত্তর ও ৯২°—১০১° পূর্বে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভারত ও চীন, পূর্বে থাইল্যান্ড, লাওস ও চীন, দক্ষিণ-পশ্চিমে আন্দামান সাগর ও পশ্চিমে ভারত, বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। আয়তনে বর্মা (ব্রহ্মদেশ ইউনিয়ন) ৬৭৮০৩৪ বর্গকিলোমিটার। বর্মার উপকূল প্রায় ১৯২০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

বর্মায় প্রধান ৪টি প্রাকৃতিক অঞ্চল দেখিতে পাওয়া যায়ঃ ১. উত্তর ও পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল, উচ্চতা ১৮০০ মিটার হইতে ৬০০০ মিটারের মধ্যে। আরাকান উপকূল এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে পর্বতগুলি সমান্তরালভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত। পার্বত্য নদীগুলি গভীর উপত্যকার সৃষ্টি করিয়াছে। এই অঞ্চলটি হিমালয় পর্বতমালার অংশবিশেষ এবং উহা 'বর্মা-জাভা আর্ক' নামে খ্যাত। ক্রেটেশাস যুগের শেষভাগে এই অঞ্চলটি সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়। তখন ইহা দ্বীপের ন্যায় ছিল। ২. পূর্বদিকে অবস্থিত শান পার্বত্য অঞ্চল একটি ক্ষয়প্রাপ্ত মালভূমি। শান মালভূমির উচ্চতা গড়ে ৯০০ মিটার। দক্ষিণে ইহা টেনাসেরিম ইওমা পর্যন্ত বিস্তৃত। শান মালভূমি আরকিয়ান, প্যালিওজোইক ও মেসোজোইক যুগের শিলা দ্বারা গঠিত এবং ইহা পশ্চিমের মধ্যবর্তী টারশিয়ারি অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। ৩. বর্মার মধ্যবর্তী অঞ্চল টারশিয়ারি যুগের শেষভাগ পর্যন্ত সমুদ্রের জলে আবৃত ছিল। ক্রমশঃ উহা টারশিয়ারি পলিমাটিতে পূর্ণ হইলে ইরাবতী ও চিন্দ্‌উইন

নদীর উপত্যকায় পরিণত হয়। এই অঞ্চলে বালুকাপ্রস্তর ও মৃত্তিকাপ্রস্তর বেশি দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে পাললিক শিলা হইতে 'ভাঁজ' পর্বতের (fold mountain) সৃষ্টি হইয়াছে। এখানে প্রচুর পলিমাটি আছে বলিয়া ইহাই বর্মার প্রধান কৃষি অঞ্চল। ৪. দক্ষিণে ইরাবতী ও সিটাং নদীর ব-দ্বীপ অবস্থিত। ধান উৎপাদনে ইহার পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি আছে। ইহার উপকূলে বর্মার কয়েকটি প্রধান বন্দর অবস্থিত।

বর্মার নদীগুলি উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত। প্রধান নদী ইরাবতী ('ইরাবতী' দ্র)। অন্যান্য নদীর মধ্যে সালউইন ও সিটাং উল্লেখযোগ্য।

বর্মার জলবায়ু প্রধানতঃ ক্রান্তীয়। তিনটি ঋতু দেখিতে পাওয়া যায় ঃ মে মাস হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল ; বর্ষার ঠিক পূর্বে ও পরে যথাক্রমে এপ্রিল ও নভেম্বর মাস গ্রীষ্মকালরূপে পরিগণিত হয় এবং ডিসেম্বর হইতে মার্চ অবধি শীতকাল। বাৎসরিক বৃষ্টিপাত উত্তর বর্মার পার্বত্য অঞ্চলে এবং আরাকান ও টেনাসেরিম উপকূলে ৫০০০ মিলিমিটারের বেশি, দক্ষিণ বর্মার রেঙ্গুন অঞ্চলে ২৫০০ মিলিমিটার, মধ্য বর্মায় ৬০০—১১০০ মিলিমিটার। শীত হইতে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তাপমাত্রা দক্ষিণ বর্মায় ১৬°—৩৮° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে কিন্তু মধ্য বর্মায় ১৬° সেন্টিগ্রেডের কম হইতে ৩৮° সেন্টিগ্রেডের বেশি পর্যন্ত উঠানামা করে। উত্তর বর্মায় জলবায়ু সম্বৎসর নাতিশীতোষ্ণ।

বর্মার ৫৭ শতাংশ জমি বনভূমি। ইহার ২৫ শতাংশ সেগুন বন। সেগুন গাছ সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলেই দৃষ্ট হয়। সেগুন ও অন্যান্য কাঠ বর্মার অন্যতম প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। অন্যান্য বনজ সম্পদের মধ্যে লাক্ষা, রজন ও বাঁশ উল্লেখযোগ্য। ব-দ্বীপে, লবণশূন্য জলাভূমিতে ও উপকূলে চিরহরিৎ বাঁশ ও নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। লবণাক্ত জলাভূমিতে 'ম্যানগ্রোভ' বৃক্ষ জন্মে। নদ-নদী, মোহনা ও উপকূলে প্রচুর মৎস্য আছে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্মার লোকসংখ্যা ছিল ২৩৭৩৫০০০ ; লোকঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫। প্রধান শহরগুলির লোকসংখ্যা (১৯৬৩ খ্রী)ঃ রাজধানী রেঙ্গুন, ৬৮৭৭০৮ ; ম্যান্ডালে, ২১২৮৭৩ ; মলমেইন, ১১৫৯৩১। বর্মার শতকরা ৭৫ ভাগ লোক জাতিগতভাবে তিব্বতীদের সহিত সংসৃষ্ট। প্রাচীনকালে তাহারা তিব্বতের পূর্বাঞ্চল হইতে ইরাবতী উপত্যকায় আসে এবং সমভূমির মন ও পিউ জাতির সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়। ক্রমে শান, কারেন, কাচিন, কায়াহ্, চিন প্রভৃতি উপজাতি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব হইতে বর্মায় আসে ; অধিকাংশ উপজাতি বর্মার পার্বত্য সীমান্তে নিজস্ব সংস্কৃতি ও সভ্যতা লইয়া বসবাস করিতেছে। বর্মার রাষ্ট্রীয় ভাষা বর্মী ; ৮০ শতাংশ লোক ঐ ভাষা ব্যবহার করে। শতকরা ৮৫ জন অধিবাসীই হীনযানী বা থেরবাদী বৌদ্ধ। বর্মী সংবিধানে ধর্মের স্বাধীনতা আছে।

এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে সম্রাট অশোক সুবর্ণভূমিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দুইজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বর্মারই প্রাচীন নাম সুবর্ণভূমি, তবে এ বিষয়ে মতভেদ আছে। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক হইতে যে বর্মার পিউ রাজ্যে ও অন্যত্র থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ম্রম্ম' রাজ্যের রাজধানী পাগানে আনাওরাঠা (অনিরুদ্ধ?) সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'ম্রম্ম' উপজাতির নাম হইতেই 'ব্রহ্ম'-দেশের বা বর্মার নামকরণ হইয়াছে। ম্রম্মদের মধ্যে একপ্রকার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল কিন্তু আনাওরাঠা থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার বংশধরেরা সমগ্র ব্রহ্মদেশে আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বর্মার সর্বত্র থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের বিস্তারসাধন করেন। আনাওরাঠা প্রতিষ্ঠিত বর্মা রাজ্যের অস্তিত্ব ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল। ইহার পর বর্মা কুবলাই খানের অধীনে আসে। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া বর্মায় কোনও জাতীয় ঐক্য ছিল না। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আলায়ুংপায়া উত্তরে শান রাজ্য ও দক্ষিণ বর্মায় মন রাজ্য অধিকার করিয়া শেষ বর্মী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উনিশ শতকে এই সাম্রাজ্যের সঙ্গেই ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে।

তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের ফলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি বর্মা সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের হস্তে চলিয়া যায় ও ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উহা একটি স্বতন্ত্র উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্মায় স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতে থাকে। ইহাতে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত তাখিন (থাকিন) নামে একদল সমাজতন্ত্রী। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন আধুনিক বর্মার অন্যতম সৃষ্টিকর্তা আউং সান, স্বাধীন বর্মার প্রথম প্রধানমন্ত্রী উ নু, তাখিন সুমাউং (বর্তমানে জেনারেল নে উইন নামে পরিচিত) এবং কমিউনিস্ট নেতা থান টুন।

বর্মার অর্থনীতিতে কৃষির স্থান সর্বোচ্চে। কৃষিতে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমি ও শ্রমিক শক্তির শতকরা ৬২·৮ ভাগ ব্যবহৃত হয়। ইরাবতী নদীর উর্বর ব-দ্বীপে, সিটাং ও সালউইন নদীর উপত্যকায়, টেনাসেরিম ও আরাকান উপকূলে ৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে প্রধান শস্য হিসাবে ধানের চাষ হয়। চালই বর্মার সর্বপ্রধান রপ্তানি দ্রব্য। ধান ব্যতীত মধ্য বর্মা ও শান মালভূমিতে তিল, বাদাম, গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি অন্যান্য কৃষিদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়। পাট, তামাক, তুলাও কিছু উৎপন্ন হয়। টেনাসেরিম উপকূলে ও ইরাবতীর ব-দ্বীপে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর

জমিতে বার্ষিক ১০১৬০ মেট্রিক টন রবার উৎপন্ন করা হয়।

বর্মা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। নামতুর বড্‌উইন খনিতে সীসা, দস্তা, রূপা, তামা, নিকেল ও কোবাল্ট প্রচুর পাওয়া যায়। কায়াহ্‌ রাজ্যের মাওচি খনিতে ও টেনাসেরিমে টিন ও টাংস্টেন পাওয়া যায়। চাক্‌ ও ল্যানিওয়াতে খনিজ তৈল আছে। জেড, চুণি, নীলা ও স্বর্ণ বিভিন্ন স্থানে সংগ্রহ করা হয়। ইহা ব্যতীত কয়লা, লৌহ ও অ্যান্টিমোনিও আছে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্মার শিল্প কৃষিজ, খনিজ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। চালের কলই প্রধান শিল্প। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আছে কাষ্ঠশিল্প, কার্পাস-শিল্প, তৈলবিশুদ্ধকরণ ও নাইনটুতে লৌহশিল্প।

উত্তরে ও দক্ষিণে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর বিস্তৃতির জন্য বর্মায় স্থলপথে যানবাহনের ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়াছে। রাস্তাঘাটের সংখ্যা কম। প্রাচীনকালে বর্মা নদী ও সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল ছিল ; বর্তমানে জলপথের সহিত বিমানের সংযোগ রহিয়াছে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সহিত স্থলপথে কেবল দক্ষিণ চীনের কুনমিং-এর সহিত লাসিও-র ও উত্তর-পূর্ব ভারতের লিডোর সহিত মিইৎচিনার সংযোগ রহিয়াছে। মোট ১৯৮৭৫ কিলোমিটার রাস্তার মধ্যে ১০৮৯৭ কিলোমিটার পাকা রাস্তা।

বর্মার রেলপথ সম্পূর্ণভাবে সরকারের অধীনে। ৩৬৮০ কিলোমিটার মিটার গেজ রেলপথ আছে। প্রধান রেলপথগুলি নিম্নলিখিত স্থানে রহিয়াছে ঃ রেঙ্গুন হইতে প্রোম ২৫৭ কিলোমিটার ; রেঙ্গুন হইতে ম্যান্ডালে ৬১৭ কিলোমিটার ; এবং ম্যান্ডালে হইতে মিইৎচিনা। রেঙ্গুন হইতে উহার দূরত্ব ১১৫৭ কিলোমিটার।

বর্মার পরিবহণ ক্ষেত্রে জলপথই প্রধান। প্রায় ৫০০০০০ নৌকা ইরাবতী ও তাহার শাখানদীগুলিতে চলাচল করে। ইরাবতী নদী ১৪৪০ কিলোমিটার নাব্য। উহার প্রধান শাখানদী চিন্দ্‌উইনও ৬৪০ কিলোমিটার নাব্য। ইহা ব্যতীত আছে সালউইন, সিটাং ও অসংখ্য নদ-নদী। জলযানের কেন্দ্রস্থল হইল ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ।

সমুদ্রগামী জাহাজের মাধ্যমে অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা হয়। রেঙ্গুন বর্মার স্থলপথ, রেলপথ, আভ্যন্তরীণ জলপথ ও বিমানপথের প্রধান কেন্দ্রস্থল। রেঙ্গুনই বর্মার প্রধান বন্দর। বর্মার শতকরা ৯০ ভাগ আমদানি ও ৭০ ভাগ রপ্তানি রেঙ্গুন বন্দর দিয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য বন্দরের মধ্যে পশ্চিম উপকূলে আকিয়াব ও ব-দ্বীপ অঞ্চলে বাসিন আছে। টেনাসেরিম অঞ্চলের খনিজ দ্রব্য ও কাষ্ঠাদি মলমেইন, টেভয় ও মারগুই হইতে রপ্তানি করা হয়।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত বর্মা সরকারের বিমানপথে আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণের কার্য চলিতেছে। রেঙ্গুন ব্যতীত মিনগালাডন (Mingaladon) প্রধান বিমান বন্দর।

দ্র J. S. Furnivall, *An Introduction to the Political Economy of Burma*, Rangoon, 1931; H. R. Chibber, *The Geology of Burma*, London, 1934; E. E. Hagen, *The Economic Development of Burma*, Washington, 1956; Maurice Collis, *Land of the Great Images, New Directions*, New York, 1959.

মীরা গুহ

ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খ্রী ?—) ভারতের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ ও বীজগণিতাচার্য। অল্‌-বীরুনীর মতে তাঁহার নিবাস ছিল মুলতান প্রদেশের সন্নিকটে ; বালকৃষ্ণ দীক্ষিত মহাশয়ের মতে তিনি উত্তর গুর্জরের রাজধানী ভিল্লমাল নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। নিজ গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, তিনি ('জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্ত') ৫৫০ শকাব্দ গত হইলে ত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীব্যাঘ্রমুখ নামক রাজার রাজ্যকালে ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত রচনা করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে তাঁহার জন্মকাল ৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। বরাহমিহিরের পরবর্তী যুগে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হইলেও প্রাচীন ভারতে উহা সুপ্রচলিত ছিল। অল্‌-বীরুনী ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন। আরবদিগের নিকট ব্রহ্মগুপ্তের সিদ্ধান্ত 'সিন্দ্‌হিন্দ' নামে খ্যাত ছিল। তাঁহার রচিত করণ-গ্রন্থ 'খণ্ডখাদ্যক'ও আরবদিগের দ্বারা অনূদিত হইয়া 'অলর্কন্দ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহার গ্রন্থাদির আরবী সংস্করণ বর্তমানে লুপ্ত।

ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ২৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। গণিত ও গোল জ্যোতিষ ব্যতীত পাটীগণিত (ব্যক্তগণিত) ও বীজগণিতও ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। একটি অধ্যায়ের নাম কুট্টকাধ্যায়। কুট্টক বলিতে বীজগণিতের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝায়। পৃথিবীর গতিশীলতা সম্বন্ধে ও অয়ন চলন সম্বন্ধে ব্রহ্মগুপ্ত নীরব ছিলেন।

ইওরোপীয় বীজগণিতের মূলে আরবী গ্রন্থ ; আরবী গ্রন্থের মূলে ব্রহ্মগুপ্তের রচনা। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তকে 'গণকচক্রচূড়ামণি' আখ্যায় অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

ভবদেব ভট্টাচার্য

ব্রহ্মপুরাণ পুরাণ দ্র

ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবাহিত ২৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নদী। মহাভারতে ইহার মাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে। ইহা তিব্বতের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত মানস সরোবর ও রাক্ষসতাল হইতে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত ৪টি হিমবাহ হইতে উদ্ভূত

৪টি নদীর ও মারিয়ুম চু নদীর জলরাশি লইয়া তিব্বতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ৫৪৯০ মিটার উচ্চ পার্বত্য উপত্যকার উপর দিয়া প্রায় ১৪৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম ১২৮০ কিলোমিটার পার্বত্য মালভূমির উপর দিয়া ইহার প্রবাহ শান্ত। লাসা হইতে ইহা ৩৩ কিলোমিটার পূর্বে প্রবাহিত। তিব্বতে ইহা তামচোক খাম্বার এবং আরও দক্ষিণে ৎসাংপো নামে খ্যাত। পরে আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকট ইহা উত্তর-পূর্বমুখী হইয়া দক্ষিণে নামচে বারওয়া ও উত্তরে গ্যায়লা পেরী পর্বত-শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যে একটি সুগভীর গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী প্রবাহিত হইয়া পর্বতগাত্র ভেদ করিয়াছে এবং কয়েকটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া ও উত্তর-পূর্ব হইতে প্রবাহিত দিহং নদীর সহিত মিলিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সমভূমিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পর্যন্ত নদীর পার্বত্যগতি। আসামে ইহার নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। উত্তর আসামের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড়ের পশ্চিম দিক দিয়া দক্ষিণে বাঁকিয়া ধুবড়ীর নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে। এই পর্যন্ত ইহার মধ্যগতি বলা যায়। এই অংশে বহু নদী উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। বাম তীরে দিবং, দিখো, লোহিত, বুড়ী ডিহিং, ঝাংজি, ধনশ্রী, দিসং, কুলসী ও দক্ষিণ দিকে বড় নদী, সুবর্ণসিরি, ভরেলী, মানস, সঙ্কোস, ধরলা ও তিস্তা। ইহার পর ইহার শেষগতি। সেখানে ইহার নাম যমুনা বা জবুনা। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মার সহিত এবং গোয়ালন্দে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বিপুল জলরাশি লইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। উত্তর আসামে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য বহু নদীর মিলনের ফলে প্রতি বৎসরই ব্রহ্মপুত্রে বন্যা হইয়া উভয় পার্শ্বের শহরগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের উৎসমুখ মাত্র ৬০ বৎসর পূর্বে স্বেন হেডিন আবিষ্কার করেন। আগে বিশ্বাস করা হইত যে ৎসাংপো নদী ইরাবতীতে পড়িয়াছে। অল্পদিন পূর্বে, ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে, এফ কিংডম ওয়ার্ড ও কাউডার সাহেব প্রমাণ করেন যে ৎসাংপো নদীই ব্রহ্মপুত্র; দিহং একটি স্বতন্ত্র নদী, তাহা আবর পাহাড় হইতে নামিয়া ৎসাংপোয় পড়িয়াছে এবং দুইটি নদী মিলিত হইয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে।

কৃষিকার্য ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর পরেই ব্রহ্মপুত্রের স্থান। ব্রহ্মপুত্র প্রায় ১২৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত নাব্য (ডিব্রুগড় পর্যন্ত)। উচ্চাংশে দক্ষিণ তীরবর্তী প্রধান স্থানগুলি হইল সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ি, তেজপুর, বিশ্বনাথ। গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, শিলঘাট, ডিব্রুগড় বাম তীরবর্তী স্থানের অন্তর্ভুক্ত।

পূর্বে আসাম হইতে চা, কয়লা, তৈলবীজ, কাষ্ঠ, চর্ম, লাক্ষা, কার্পাস, এবং বাংলাদেশ (পূর্ববঙ্গ) হইতে পাট, তৈলবীজ, তামাক, ধান, খাদ্যশস্য এই নদের সাহায্যে আমদানি ও রপ্তানি করা হইত।

দ্র সুকুমার বসু, হিমালয়, কলিকাতা, ১৯৬৬; F. Kingdom Ward and Edward Arnold, *The Riddle of the Tsanpo Gorge*, 1926, London.

কমলা মুখোপাধ্যায়
অনিন্দ্যকুমার পাল

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১—১৯০৭ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক, শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক; পূর্বনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ হুগলি জেলার অন্তর্গত খন্যান গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতৃব্য রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবানীচরণ হুগলী কলিজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পাশ করেন। কলিকাতার জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ-এ পড়ার সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অতঃপর তিনি শিক্ষকতা কার্য আরম্ভ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র সেনের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ জানুয়ারি তিনি নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। ইহার পর তিনি সিন্ধুর হায়দরাবাদে গমন করেন এবং পূর্ব-পরিচিত হীরাচাঁদের স্কুলে শিক্ষাকার্যে ব্রতী হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমে প্রোটেস্ট্যান্ট ও পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি করাচী হইতে মাসিক 'সোফিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্যন্ত চলে। তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ ব্রহ্মবান্ধবের স্বাধীন মতামতের জন্য রুষ্ট হইয়া মাসিক 'সোফিয়া'-র প্রচার নিষিদ্ধ করিয়া দিলে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া পুনরায় সাপ্তাহিক আকারে 'সোফিয়া' প্রকাশ করেন (১৯০০ খ্রী, ১৬ জুন)। তিনিই ইহার একটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে 'বিশ্বকবি' ('World-Poet') বলিয়া আখ্যাত করেন। সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকেও ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। ব্রহ্মবান্ধব অতঃপর নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহযোগে *Twentieth Century* নামক এক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন (১৯০১ খ্রী, ৩১ জানুয়ারি)। ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নানাসূত্রে এই সময়ে আলাপ পরিচয় হয়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে ব্রহ্মবান্ধব বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের সহায়তা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে যান এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে হিন্দুদর্শন ও বর্ণাশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সারস্বত আয়তন বিদ্যালয়টিকে পুনর্গঠিত করেন। ইহার পর তিনি দৈনিক 'সন্ধ্যা' বাহির করিলেন (১৯০৪ খ্রী,

১৬ ডিসেম্বর)। ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্তি। তিনি সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' সম্পাদন শুরু করেন ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ হইতে। 'সন্ধ্যা' সাধারণ-বোধ্য ভাষায় নূতন ভাবাদর্শ প্রচারে অবিলম্বে অগ্রণী হইল। স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হইতে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা'-কে এই আন্দোলনের মুখপত্র করিয়া তুলিলেন। ফিরিঙ্গীর সংস্রব বর্জন এবং আত্মনির্ভর শক্তির উন্মেষ—এই দুইটিই ছিল সন্ধ্যার মূল প্রচারকার্য। রাজদ্রোহের অপরাধে সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব মুদ্রাকরসহ ধৃত হন। তিনি আদালতে ঘোষণা করেন যে তিনি ব্রিটিশ কর্তৃত্ব মানেন না এবং ইহার কোনও কাজের সহিত নিজেকে যুক্ত করিবেন না। ব্রহ্মবান্ধব এই সময়ে গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন (১৯০৭ খ্রী, ২৭ অক্টোবর)। ব্রহ্মবান্ধবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা ঃ বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, ব্রহ্মামৃত, সমাজতত্ত্ব, আমার ভারত উদ্ধার, পালাপার্বণ।

দ্র প্রবোধচন্দ্র সিংহ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ; হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, কলিকাতা, ১৯৬১ ; যোগেশচন্দ্র বাগল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা) কলিকাতা, ১৯৬৪ ; B. Animananda, *The Blade*, Calcutta, 1949.

যোগেশচন্দ্র বাগল

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ পুরাণ দ্র

ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার প্রাচীনতম রূপ ঋগ্বেদে ব্রহ্মণস্পতি এবং বৃহস্পতি। ত্বষ্টা, বিরাজ, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, পরমেষ্ঠী, স্বয়ম্ভূ ইঁহারা সকলেই বৈদিক যুগের শেষে ব্রহ্মায় পর্যবসিত হইলেও আদিতে ব্রহ্মা শব্দের অর্থ ছিল পুরোহিত, বিশেষতঃ অথর্ববেদী ঋত্বিক। তিনি পঞ্চমুখ এবং অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা। প্রজাপতির কন্যা কামনার কাহিনী ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ বলেন, আকাশে মৃগশিরা নক্ষত্র প্রজাপতি এবং তাঁহার কন্যা রোহিণী।

মনু বলেন কারণ সলিলে সুবর্ণ অন্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে তাঁহার জন্মকাহিনী পুরাণ-সম্মত। মনুষ্যলোকের দ্বাদশ সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক যুগ বা এক কল্প। তিনি জ্যোতিষ নাট্য ও বাস্তু শাস্ত্রের প্রবক্তা। দক্ষযজ্ঞে এবং শিবের বিবাহে তিনি পুরোহিত।

সাবিত্রী, গায়ত্রী এবং সরস্বতী তাঁহার পত্নী এবং অষ্ট-মাতৃকার অন্যতমা ব্রহ্মাণী তাঁহার শক্তি। সনক, সনন্দ, সনন্দন, সনৎকুমার, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, প্রচেতা, দক্ষ, ভৃগু, নারদ ইঁহারা ব্রহ্মার পুত্র। পৌরাণিক প্রসিদ্ধি আছে যে শিব তাঁহার একটি মুন্ডচ্ছেদ করেন এবং শিবের অভিশাপে তাঁহার পূজা লোপ পায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও ভাস্কর্যে ব্রহ্মাই অবৌদ্ধ জগতের প্রধান দেবতা। জৈনশিল্পে তিনি তীর্থংকর শীতলনাথের যক্ষ বা অনুচর। সচরাচর ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও হংসবাহন, তাঁহার চারিহস্তে স্রুক্, অক্ষমালা, আজ্যস্থালী বা পুস্তক এবং কমন্ডলু। ভারতে মথুরা ইলোরা বাদামি আইহোল হালেবিড ও মহাবলিপুরমে এবং বহির্ভারতে চীন, জাপান, কম্বোডিয়া, বলি ও যবদ্বীপে ব্রহ্মা মূর্তির অজস্র বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়।

রাজপুতানা ও বুন্দেলখন্ডে কিছু প্রাচীন ব্রহ্মার মন্দির থাকিলেও বর্তমানে একমাত্র পুষ্করতীর্থের মন্দিরে তাঁহার নিত্যপূজা হয়। অধুনা সন্ধ্যা-গায়ত্রীর মন্ত্রে, বিবাহের লগ্নপত্রে, সূতিকাগৃহে, ষষ্ঠীবাসরে ও বাস্তু প্রতিষ্ঠাকালে পিতামহদেবকে স্মরণ করা হয়। উত্তর প্রদেশে কুম্ভকারের চক্রে এবং বঙ্গের কোনও কোনও অঞ্চলে রক্তবর্ণ মৃন্ময়-মূর্তিতে তাঁহার লৌকিক পূজার প্রচলন দেখা যায়।

দ্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ ; J. N. Banerjee, *The Development of Hindu Iconography*, Calcutta, 1956.

কল্যাণী দত্ত

ব্রহ্মাণ্ড 'ব্রহ্মাণ্ড' ও 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' শব্দ দুইটি শিথিল প্রয়োগে সমার্থক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। বর্তমান নিবন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ধ্যানধারণা প্রয়োগ করিয়া 'ব্রহ্মাণ্ড' ইংরেজী 'গ্যালাক্সি' শব্দের এবং 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড' ইংরেজী 'ইউনিভার্স' শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইবে।

বিশাল মহাশূন্যে অসংখ্য তারার অবস্থিতি। ইহাদের বিস্তার (ডিস্ট্রিবিউশন) কিন্তু সুষম প্রকৃতির (ইউনিফর্ম) নয়—স্থানে স্থানে জোটবদ্ধ। জোট কথাটি এ প্রসঙ্গে অবশ্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। একই জোটের অন্তর্ভুক্ত দুইটি তারার মধ্যের দূরত্ব সাধারণতঃ কমপক্ষে প্রায় ৪ আলোক-বর্ষ। বলাই বাহুল্য, জোটগুলি পরস্পরের নিকট হইতে বিশালতর দূরত্বে অবস্থান করে। এগুলি যেন এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। এক-একটি জোট হইল ব্রহ্মাণ্ড ('আইল্যান্ড ইউনিভার্স' বা 'গ্যালাক্সি') এবং মহাশূন্যের সমগ্র জোটসমষ্টি হইল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ('ইউনিভার্স')।

এক-একটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কয়েক হাজার কোটি তারা থাকে, হয়তো বা কোনও কোনও তারার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি, আর থাকে গ্যাসীয় নীহারিকা ও বস্তুর ধূলিকণা। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা প্রায় ১০০ কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন ; কল্পনা করা

অযৌক্তিক নয় যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড আছে আরও অনেক বেশি।

আমাদের সূর্য যে ব্রহ্মাণ্ডটির অন্তর্গত তাহার একটি বিশেষ রূপ বা প্রকাশ 'ছায়াপথ' (মিল্‌কী ওয়ে) নামে সুপরিচিত। এটিকে 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' বা 'ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ড' বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এটির মধ্যে তারা আছে প্রায় ১০০০০ কোটি। খালি চোখে বা দূরবীন দিয়া এখন পর্যন্ত যত তারাকে তারারূপে অর্থাৎ একক বিচ্ছিন্ন আলোকবিন্দু হিসাবে দেখা গিয়াছে সেগুলি সবই প্রায় এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা 'ইউনিভার্স' কথাটি এমন কি ৫০-৬০ বৎসর আগেও বিজ্ঞানীরা ঠিক কি অর্থে প্রয়োগ করিতেন তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্তমানকালে যাহাকে 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড' বলা হয় তাহার বাহিরের বিরাট বিশ্বের কথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া জানিতেন না। সম্ভবতঃ 'আমাদের ব্রহ্মাণ্ড'কেই তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। বর্তমান অর্থে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংখ্যাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়।

মহাকাশে তারারা যেমন জোট বাঁধিয়া আছে, ব্রহ্মাণ্ডরাও আছে তেমনই জোট বাঁধিয়া। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড আছে একটি জোটে যাহার সংখ্যা ২০-র কাছাকাছি। এই ব্রহ্মাণ্ডগুলি সবই আছে ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকটে আছে যে-দুইটি তাহাদের দূরত্ব ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ও ১ লক্ষ ৬৪ হাজার আলোকবর্ষের মত। ইহাদের নাম যথাক্রমে 'বৃহৎ ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' (গ্রেটার ম্যাগেল্লানিক ক্লাউড) ও 'লঘু ম্যাগেল্লানীয় মেঘ' (লেসার ম্যাগেল্লানিক ক্লাউড)।

ব্রহ্মাণ্ড-জোট সম্বন্ধে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গিয়াছে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। প্রথম জানিয়াছেন প্রখ্যাত আমেরিকান জ্যোতির্বিদ্‌ এডুইন হাব্‌ল্‌। তথ্যটি এই যে, জোটগুলি পরস্পরের নিকট হইতে প্রচণ্ড বেগে সরিয়া যাইতেছে, আর গতিবেগের প্রচণ্ডতা দূরত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রমেই প্রসারিত হইতেছে। মহাজাগতিক এই অপসরণের গভীরতর ফলাফল বা তাৎপর্য এখনও সঠিকভাবে বোঝা যায় নাই।

দ্র Cecilia Payne-Gaposchkin, *Introduction to Astronomy*, London, 1961; Harlow Shapley, *Galaxies*, Cambridge, 1961; Robert H. Baker, *Astronomy*, Princeton, 1964.

রমাতোষ সরকার

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন দ্র

ব্রাউন, পার্সি (১৮৭২–১৯৫৫ খ্রী) জন্ম বার্মিংহামে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতীয় চিত্রকলা এবং স্থাপত্যবিদ্যার ইতিহাস রচয়িতা ও সমালোচক হিসাবে তিনি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাতত্ত্বের প্রতিও তাঁহার আকর্ষণ ছিল। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এডুকেশন্যাল সার্ভিসে' যোগ দিবার পূর্বে তিনি উত্তর মিশরে 'ঈজিপ্ট এক্সপ্লোরেশন ফাণ্ড'-এর পক্ষে (১৮৯৪-৯৬ খ্রী) উৎখনন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। দীর্ঘ এগার বৎসর 'মেয়ো কলেজ অফ আর্ট'-এর অধ্যক্ষ এবং লাহোর মিউজিয়ামের কিউরেটার রূপে কাজ করিয়া তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার 'গভর্নমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট'-এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতাস্থ 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হলের সম্পাদক এবং কিউরেটার নিযুক্ত হন (১৯২৭-৪৭ খ্রী)।

তাঁহার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। একদিকে তিনি যেমন ভারতীয় মুদ্রার নক্সা তৈরি করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই নূতন দিল্লীর কাউন্সিল চেম্বার অলংকরণ কার্যের তত্ত্বাবধানও করিয়াছেন। ভারতীয় শিল্পকলা এবং স্থাপত্যবিদ্যা ছাড়াও অন্যান্য ভারতীয় বিষয় সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কাশ্মীরে বসবাস করেন ও সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (২২ মার্চ, ১৯৫৫ খ্রী)।

পার্সি ব্রাউনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ *Picturesque Nepal*, 1912; *Tours in Sikkim and the Darjeeling District*, 1917; *Indian Painting*, 1918; *Indian Painting under the Mughals*, 1550-1750 A.D., 1924; *Indian Architecture*, 2 Vols., 1942-43.

নকুল চট্টোপাধ্যায়

ব্রাউনিং, রবার্ট (১৮১২-৮৯ খ্রী) ভিক্টোরীয় যুগের পুরোধাস্থানীয় ইংরেজ কবি। তিনি ছিলেন আশাবাদী। ইটালীয় রেনেসাঁস তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। কথ্যরীতির কর্কশতা, আকস্মিকতা এবং সংক্ষিপ্ততাই ব্রাউনিং-এর কবিতার লক্ষণ। তিনি একদিকে কাব্যে প্রচলিত বাহ্য সৌন্দর্যবোধকে বিপর্যস্ত করেন, অন্যদিকে অঙ্গসৌষ্ঠবের অভাবকে অর্থ-গভীরতার দ্বারা পূরণের চেষ্টা করেন। ব্রাউনিং-এর অধিকাংশ কবিতাই মনস্তাত্ত্বিক। বিচ্ছেদ ও ব্যর্থতার মধ্যে আশাবাদী জীবনদর্শন ব্রাউনিং-এর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। ব্রাউনিং এক নূতন কাব্যরীতির প্রচলন করেন। ইহার নাম dramatic monologue অথবা আত্মবিশ্লেষণমূলক নাটকীয় স্বগতোক্তি।

বাস্তবজীবনে রবার্ট ব্রাউনিং একজন সার্থক প্রেমিক। এলিজাবেথ ব্যারেট-এর সঙ্গে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

তিনি কয়েকটি নাটক, কাব্যগ্রন্থ ও বহু কবিতা রচনা

করেন। ব্রাউনিং-এর কয়েকটি বিখ্যাত রচনা : *My Last Duchess, The Bishop Orders His Tomb, Andrea Del Sarto, Fra Lippo Lippi, The Ring and the Book, The Last Ride Together, Pippa Passes,* ইত্যাদি।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত

ব্রাহ্মণ[১] জাতিব্যবস্থা দ্র

ব্রাহ্মণ[২] মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই উভয় লইয়া বেদ। মন্ত্র বলিতে স্তুতি আশীর্বাদ ও প্রার্থনামূলক সূক্তসমুদয় বুঝায়। মন্ত্রের অতিরিক্ত অংশের নাম ব্রাহ্মণ। ইহার এক অংশ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মধ্যভাগ আরণ্যক এবং অন্তভাগ উপনিষদ্। বেদের ব্যাখ্যা এবং যজ্ঞের সহিত মন্ত্রগুলির সম্বন্ধনির্দেশ বা বিনিয়োগ লইয়াই গদ্যাত্মক ও কর্ম-চোদনাময় শুদ্ধব্রাহ্মণ। কর্মচোদনার অর্থ বিধি। ব্রাহ্মণের প্রধান আলোচ্য বিধি ও অর্থবাদ। আপস্তম্ব বলেন, অর্থবাদ চারি ভাগে বিভক্ত : নিন্দা, প্রশংসা, পুরাকল্প এবং পরকৃতি। জৈমিনিসূত্রে ইহার সহিত হেতু, নির্বচন, ব্যবধারণকল্পনা, সংশয় এবং উপমানের যোগ করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ দুইখানি—ঐতরেয় এবং কৌষীতকি। ইতরার পুত্র মহিদাস কর্তৃক লব্ধ ব্রাহ্মণের নাম ঐতরেয়। ইহাতে অগ্নিষ্টোম গবাময়ন প্রভৃতি যজ্ঞ ও রাজ্যাভিষেকের বিবরণ এবং নাভানেদিষ্ঠ, হরিশ্চন্দ্র ও শুনঃশেপের (শুনঃশেফের) কাহিনী উল্লেখযোগ্য। কৌষীতকি বা শাংখ্যায়ন (সাংখ্যায়ন) ব্রাহ্মণ ঋষি কৌষীতক কর্তৃক দৃষ্ট। ইহার দর্শপূর্ণমাসের বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

আচার্য সায়ণ বলেন, সামবেদের কৌথুমী শাখার ব্রাহ্মণ আটটি। সামবেদের সর্বপ্রধান ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ। ইহা পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এবং আচার্য তাণ্ডি কর্তৃক দৃষ্ট। প্রধান বর্ণনীয় সোমযাগ ও ব্রাত্য স্তোম। ইহার পরই ষড়্বিংশ। ইহাতে বহু অমংগল এবং রিষ্টির শান্তিকর্মের বিধান আছে। ইহার শেষ অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত ব্রাহ্মণ। ষড়্বিংশের পরই মন্ত্র ব্রাহ্মণ। ইহাতে প্রথমাংশে জাতকর্ম ও বিবাহপদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। শেষাংশ ছান্দোগ্যোপনিষদ্। তলবকার ব্রাহ্মণে পরলোক এবং পরব্রহ্মের আলোচনা বিশিষ্ট। গুরু জৈমিনির নামে ইহাকে জৈমিনীয় ব্রাহ্মণও বলা হয়। কেন উপনিষদ্ ইহার অন্তর্গত। সামবিধান ব্রাহ্মণে সামগানের দ্বারা অলৌকিক কার্যের বিধান দেওয়া হইয়াছে। দৈবত বা দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণে দেবতাদের নামসূচী এবং আর্যের ও বংশ ব্রাহ্মণে আচার্যগণের বংশতালিকা আছে। সত্যব্রত সামশ্রমীর মতে সামবেদের ব্রাহ্মণগুলির যৌগিক নাম ছান্দোগ্য, ইহা ৪০ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, বাকিগুলি ক্ষুদ্র অনু-ব্রাহ্মণ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অত্যন্ত প্রাচীন, সর্বত্র উদাত্তাদি স্বরচিহ্নযুক্ত এবং যাজ্ঞিকগণের সর্বপ্রধান উপজীব্য। সায়ণাচার্য এই তৈত্তিরীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সাংকর্য বা মিশ্রণের জন্য ইহার নাম কৃষ্ণ এবং পদ্ধতি কিঞ্চিৎ জটিল।

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ কলেবরে সর্ববৃহৎ। ইহার শাখা দুইটি—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। মাধ্যন্দিন শাখায় মোট ১৪ কাণ্ড, ১০০ অধ্যায়, ৬৮ প্রপাঠক, ৪৩৮ ব্রাহ্মণ এবং ৭৬২৪ কণ্ডিকা আছে। ইহার শেষ কাণ্ডটি বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। ইহাতে রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্ব-মেধ, পুরুষমেধ প্রভৃতি যজ্ঞবিবরণ, উর্বশী-পুরূরবা এবং মৎস্য ও জলপ্লাবনের কাহিনী আছে।

অথর্ববেদের একমাত্র ব্রাহ্মণ গোপথ ভাষার কারণে অর্বাচীন বলিয়া বোধ হয়। যাগযজ্ঞ ভিন্ন ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্যের কথা আছে।

আচার্য সায়ণ চারি বেদের উক্ত সব কয়টি ব্রাহ্মণেরই ভাষ্য করিয়াছেন।

বটকৃষ্ণ ঘোষ বৈদিক সাহিত্য মন্থন করিয়া যে কয়টি লুপ্ত ব্রাহ্মণের নাম পাইয়াছেন তাহা এই—আহবরক, কঙ্কতি, কালববি, চরক, ছাগলের জাবালি, পৈঙ্গায়নি, ভাল্লবি, মাষশরাবি, মৈত্রায়ণী, রৌরুকী, শাট্যায়ন, শৈলালি, শ্বেতা-শ্বতর ও হারিদ্রবিক।

ব্রাহ্মণগুলিতে প্রসংগত তদানীন্তন সভ্যতার বহু তথ্য বিধৃত হইয়াছে। বর্ণাশ্রম, বিবাহ, দাহসংস্কার, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, ভৈষজ, খাদ্যপানীয়, নৃত্য-গীত, ভূগোল, জ্যোতিষ, পুরাকাহিনী, যুদ্ধবিদ্যা ও রাজ্যাভিষেক এখানে যথাদৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ম্যাক্সমুলার ব্রাহ্মণসমুদয়ের রচনাকাল ৮০০—৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বলিয়া নির্ধারিত করিলেও এ বিষয়ে বহু বিতর্ক আছে।

দ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, কলি-কাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। Batakrishna Ghosh, *Collection of the Fragments of Lost Brahmanas,* Calcutta, 1935; V. V. Dixit, *Relation of the Epics to the Brahmana Literature,* Poona, 1950; Julias Eggeling, *Satapatha Brahmana,* 5 Vols., New Delhi, 1966; Jogiraj Basu, *India of the Age of the Brahmanas,* Calcutta, 1969.

কল্যাণী দত্ত

ব্রাহ্মণী ওড়িশা রাজ্যের একটি নদী। ছোটনাগপুরের শঙ্খ ও দক্ষিণ কোয়েল নদী ২২°১৫′ উত্তর ও ৮৪°৪৭′ পূর্বে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণী নামে ওড়িশার বোনাই-গড় ও তালচের খনি অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কটক জেলায় ইহা বৈতরণী নদীর সহিত মিলিত হইয়া

ধাম্ন নামে বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। ব্রাহ্মণী ৪৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ। ইহা হইতে কটকের সমতল অংশে জলসেচনের খাল আছে। নদীর উৎসস্থল পরাশর ও মৎস্যগন্ধার বিবাহের স্থান বলিয়া পরিচিত।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. IX, Oxford, 1908; O. H. K. Spate, *India and Pakistan*, London, 1957.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ব্রাহ্মধর্ম, ব্রাহ্মসমাজ ঔপনিষদ ব্রহ্ম হইতে জাত 'ব্রাহ্ম' শব্দটি রাজা রামমোহন রায় 'একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক' অর্থে ব্যবহার করেন। তিনি ব্রাহ্ম বলিতে বুঝিতেন 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের পূজারী। ইহা তাঁহার চোখে ছিল বিশ্বজনীন সত্যধর্ম। রামমোহনের ভাষায়, 'প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না'। সামাজিক ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্তনের সংকল্প লইয়া তিনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগস্ট (৬ ভাদ্র ১২৩৫ বঙ্গাব্দ) উত্তর কলিকাতার আপার চিৎপুর রোডের একটি গৃহে (বর্তমানে ৪৮ নং) 'ব্রহ্মসভা' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ জানুয়ারি, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে (১১ মাঘ, ১২৩৬ বঙ্গাব্দ) ৫৫ আপার চিৎপুর রোডে 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে'র নিজস্ব উপাসনা গৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় (বর্তমানে ইহা আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির)। ব্রাহ্মসমাজের 'ট্রাস্ট ডীডে' (১৮৩০ খ্রী) রামমোহন নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ 'সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত এই উপাসনা-গৃহে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পাতা অনন্ত অক্ষয় সত্তার আরাধনার নিমিত্ত জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষ পরস্পর প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মিলিত হইবে'। 'পরমেশ্বর ও তাঁহার মনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার', এই দুইটিকে রামমোহন 'পরম মুখ্য উপাসনা' বলিয়াছেন। তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় মহানির্বাণতন্ত্রের পঞ্চরত্ন স্তোত্র বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছিল।

রামমোহন অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেন। কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'ব্রাহ্মধর্মঃ' (১৮৪৮ খ্রী) গ্রন্থে 'অদ্বৈতবাদ', 'অবতারবাদ' ও 'মায়াবাদ' খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রাহ্মরা 'একমেবাদ্বিতীয়মে'র উপাসক হইলেও নির্গুণ পরমাত্মা ও সগুণ ঈশ্বরের সমন্বিত উপলব্ধির উপর জোর দিয়া থাকেন। এই দিক দিয়া রামানুজাচার্য-প্রবর্তিত 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে'র সহিত ব্রাহ্মধর্মের কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে। অবশ্য ব্রাহ্মধর্মের উপর একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামের বিশেষ প্রভাব অনস্বীকার্য।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারকল্পে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ মে এই সভার অধিবেশনে নির্ধারিত হয়, 'অতঃপর ঐ নামের (বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম) পরিবর্তে ব্রাহ্মধর্ম নাম অবলম্বন করা হইবে'। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন, 'পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল'। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ, ১৭৬৫ শক) দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রমুখ ঊনিশজন বন্ধুর সহিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজে ইহাই প্রথম দীক্ষাদান অনুষ্ঠান। উপনিষদে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হইবে না উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মকৃপাবলে স্বয়ং 'ব্রাহ্মধর্মবীজম্' রচনা করিলেন (১৮৪৮ খ্রী)। ঔপনিষদ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মদের উপযোগী শ্লোকসমূহ সংগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার ক্রমগুলি হইলঃ অর্চনা, প্রণাম, সমাধান, ধ্যান, স্তোত্র, প্রার্থনা, স্বাধ্যায় ও উপসংহার (শান্তিবাচন)। সামাজিক উপাসনায় আচার্যের উপদেশও বিবৃত হয়। 'ব্রহ্মসংগীত' ব্রহ্মোপাসনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ প্রবর্তন করেন। প্রধানতঃ তাঁহার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ সর্বসম্মতিক্রমে বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করে। 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া স্থির হয়। অন্ধ শাস্ত্রানুসরণের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরাদেশ নূতন ধর্মসাধনার সোপানস্বরূপ হইল।

দীক্ষাগ্রহণ প্রথা প্রবর্তনের পর ব্রাহ্মগণ একটি সমাজরূপে সুসংবদ্ধ হইলেন। প্রথম ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক লালা হাজারীলাল দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক লোককে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন। ঢাকা, মেদিনীপুর, রংপুর, কুমিল্লা, বাঁশবেড়িয়া, সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১১ মাঘ উপলক্ষে 'মাঘোৎসবে'র বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইল। তৎপূর্বে কেবল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার তারিখ ৬ ভাদ্র উপলক্ষে প্রতি বৎসর 'ভাদ্রোৎসব' উদ্‌যাপিত হইত। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ব্রাহ্মসমাজকে বঙ্গদেশের সর্বত্র সুপরিচিত করিল। দেবেন্দ্রনাথের একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম-প্রতিপাদক প্রসিদ্ধ বচনগুলির কয়েকটি হইলঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, শান্তং শিবমদ্বৈতং, সত্যং শিবং সুন্দরম্, রসো বৈ সঃ, ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্, ওঁ তৎ সৎ, ইত্যাদি।

ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় অধিনায়ক কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি সম্পূর্ণতর এবং ব্রাহ্মধর্মের মূল তত্ত্বগুলি বিস্তৃততর করিয়া ইহাকে ক্রমবর্ধমান সমাজের উপযোগী করিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন, সর্বধর্মসমন্বয়ী রূপ পরিগ্রহ করিল। 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' কর্তৃক পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে সঞ্চয়িত ব্রাহ্মধর্ম-

প্রতিপাদক 'শ্লোকসংগ্রহঃ' প্রকাশিত হইল। কেশবচন্দ্র বলিলেন ঃ 'জগতের পরিত্রাণের জন্য যত বিধান হইয়াছে সমুদয় বিধানের শেষ ফল এই ব্রাহ্মধর্ম'। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে সর্বধর্মসমন্বয়কারী 'নববিধান' বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার রচিত 'নবসংহিতা'র (১৮৮১ খ্রী) দীক্ষা অধ্যায়ে ইহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ। নববিধানের আদর্শ হইল সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শাস্ত্রের সত্যকে সম্মান ও গ্রহণ করা ; সাম্প্রদায়িকতারূপ পাপ বর্জন করা ; ঈশ্বরের সকল বিধানে এবং যে সাধু-ভক্তদের ভিতর দিয়া ঈশ্বরবাণী প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা ; বিজ্ঞানকে ঈশ্বরালোক বলিয়া বিশ্বাস করা ; নববিধান ধর্মের প্রেম, যোগ, জ্ঞান, বৈরাগ্য, কর্ম-রূপ বিভিন্ন ভাবের প্রত্যেকটিকে সমভাবে সর্বদা সাধন করা।

কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মিতার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম বাংলার যুবসমাজে এক নূতন প্রাণচাঞ্চল্য ও আলোড়ন সৃষ্টি করে সুদূর মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সংগত সভা' স্থাপন করিয়া ব্রাহ্ম তরুণ সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করেন। পর বৎসর উত্তর ভারত ও দক্ষিণ বঙ্গের দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ-কার্যে কেশবচন্দ্র সেবাদল গঠন করেন ; ইহাই ভারতবর্ষের প্রথম যুব-আন্দোলন। সারা ভারতের ব্রাহ্মসমাজগুলিকে সুসংহত করার জন্য তিনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রতিনিধি সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম নারী প্রতিষ্ঠান 'ব্রাহ্মিকা-সমাজ' স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' (১৮৬১ খ্রী) ও 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা ব্রাহ্ম-সমাজের বাণী প্রচারে বিশেষ সহায়তা করে।

ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীল অংশের সহিত মতভেদ হওয়ায় কেশবচন্দ্র ১১ নভেম্বর, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করিলেন। এই সময় হইতে দেবেন্দ্র-নাথ-পরিচালিত 'কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ' 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়। মধ্য কলিকাতার মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে (বর্তমানে ৯৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট) ২২ আগস্ট, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' 'নব-বিধান সমাজ' নামেও পরিচিত হয়।

কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে স্ত্রীশিক্ষা, শ্রমজীবী-শিক্ষা, সেবা, জনসংযোগ, মদ্যপান-নিবারণ, নারীকল্যাণ-প্রমুখ সৎকার্যে ব্রাহ্মসমাজই দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কেশবচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন।

'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে' নিয়মতন্ত্রপালন প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু-প্রমুখ তরুণ ব্রাহ্মদের গুরুতর মতভেদ হওয়ায় নব্য-সম্প্রদায় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে (২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ) 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারি (১০ মাঘ, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ) মধ্য কলিকাতায় ২১১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে (বর্তমান বিধান সরণি) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির স্থাপিত হয়। গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে সকল কার্য নির্বাহ করাই ঐ সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষাবিস্তারে, নারীসমাজ-উন্নয়নে, অস্পৃশ্যতা নিবারণে, স্বাধীনতা আন্দোলনে উহা বিশেষ অগ্রগতির পরিচয় দিয়াছে।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ আগস্ট দক্ষিণ কলিকাতায় 'ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আদি', 'নববিধান' এবং 'সাধারণ' এই তিনটি শাখার মিলনের উদ্দেশ্যে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১ অক্টোবর দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাশের প্রস্তাবে উহার নামকরণ হয় 'ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ'। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত তালিকা অনুযায়ী ভারতে ব্রাহ্মসমাজের মোট সংখ্যা ৮১ ও ভারতের বাহিরে ৩৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ 'জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা— তদ্ভাবগতেন চেতসা এই সাধনা করিতে হইবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে ; ইহা ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম।'

দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, কলিকাতা, ১৭৮৩ শকাব্দ ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রাহ্মধর্মঃ, কলিকাতা, ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ ; কেশবচন্দ্র সেন, নবসংহিতা, কলিকাতা, ১৯৩৮ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, কলিকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, কলিকাতা, ১৯৬২ ; P. K. Sen, *Biography of a New Faith*, Vols. I & II, Calcutta, 1950, 1954; Sivanath Sastri, *The Brahmo Samaj—Religious Principles and Brief History*, Calcutta, 1958; Nirmal Kumar Bose, *Culture and Society in India*, Bombay, 1967.

প্রভাত বসু

ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ দ্র

ব্রাহ্মী লিপিতত্ত্ব দ্র

ব্রাহে, টাইকো (১৫৪৬—১৬০১ খ্রী) প্রসিদ্ধ জ্যোতি-র্বিদ। ডেনমার্কে বসবাসকারী সুইডেন-আগত একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে টাইকো ব্রাহের জন্ম হয়। শিক্ষা কোবেন-হাভেন ও লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম যৌবনে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর জ্যোতিষিক ঘটনা দেখিয়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে সম্পূর্ণভাবে তাহাতেই মগ্ন হন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অতিনোভা (সুপার নোভা) সম্পর্কে একটি পুস্তক রচনা করিয়া

বিদ্বৎসমাজে আদৃত হন। ডেনমার্করাজ দ্বিতীয় ফ্রেডরিক তাঁহার জন্য কোবেনহাভেনের নিকটবর্তী একটি দ্বীপে এক মানমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। প্রায় ২০ বৎসর কাল ব্রাহে সেখানে পর্যবেক্ষণ কার্যে নিযুক্ত থাকেন। ডেনমার্কে অনেকেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। জীবনের শেষ ৫ বৎসর তিনি প্রবাসে কাটাইতে বাধ্য হন।

তিনি কোপার্নিকাস-প্রস্তাবিত সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে বিশ্বাস করিতেন না, অথচ টলেমীয় ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদের ত্রুটিগুলিও বুঝিতে পারিতেন। উভয়ের সংমিশ্রণে তিনি এক নূতন ('টাইকোনিক') মতবাদ সৃষ্টি করেন। উত্তরকালে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহার তত্ত্বগত মতামতের বিশেষ কিছুই গৃহীত হয় নাই কিন্তু খালি চোখে ৭৭৭টি তারকা এবং মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের ফল জ্যোতিষিক অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

দ্র J. L. E. Dreyer, *A History of Astronomy from Thales to Kepler*, New York, 1953.

রমাতোষ সরকার

ব্রাহুই পূর্ব বেলুচিস্তানের কালাত ও চগই অঞ্চলের প্রায় দুই লক্ষ লোকের ভাষা। ইহা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের উত্তর-পশ্চিমী শাখা। ব্রাহুই দ্রাবিড় ভাষা হইতে সর্বপ্রথম পৃথক হয়। কুরুখ-মাল্‌তোর সঙ্গেই এই ভাষার সম্বন্ধ নিকটতম। ব্রাহুইর কোনও উপভাষা নাই, কোনও লিখিত সাহিত্য বা লিপিও নাই। ইহা ফারসী লিপিতে লেখা হয়। পার্শ্ববর্তী ভাষাগুলির প্রভাবে অসংখ্য দ্রাবিড়েতর শব্দ ব্রাহুইতে প্রবেশ করিয়াছে।

রামঅধার সিংহ

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বাংলা নাম ভারতবর্ষীয় সভা; কলিকাতায় ২৯ অক্টোবর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব এবং প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্দেশ্য ব্রিটিশ-অধিকৃত ভারতের হিতার্থে বিবিধ আন্দোলন পরিচালনা। প্রতিষ্ঠার অল্প পরেই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ভারত-শাসন সংস্কারমূলক একখানি স্মারকলিপি পার্লামেণ্টে প্রেরিত হয়। ভারতীয় আইন পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য হইবেন ভারতীয়, ইহাই ছিল স্মারকলিপির মূল বক্তব্য। প্রতিষ্ঠাবধি অ্যাসোসিয়েশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজস্ব, পুলিশ, আইনকানুন, প্রশাসন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি নীতির সমালোচনা এবং জাতীয় স্বার্থরক্ষাকল্পে বিবিধ উপায় নির্দেশ করিতে থাকে। এই সভা প্রায় ২৫ বৎসর কাল জাতির মুখপাত্ররূপে কার্য করে।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সরকার কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তনে এই সভা বিশেষভাবে বাধা দেয়। ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে এই সভা কেবল জমিদারদের স্বার্থই দেখিতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স (১৮৮৩ ও ১৮৮৫ খ্রী) এবং ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের অধিবেশনকালে (১৮৮৬ খ্রী) এই সভার নেতৃবৃন্দ উভয়কেই সাফল্যমণ্ডিত করিতে অগ্রসর হন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারি বিলুপ্তির পর ইহার কার্য সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। সভার নিজস্ব ভবন ১৮, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা, ১৯৫৭; যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, কলিকাতা, ১৯৬০।

যোগেশচন্দ্র বাগল

ব্রেইল পদ্ধতি অন্ধশিক্ষা দ্র

ব্রেক গতি বা ঘূর্ণনকে নিয়ন্ত্রিত, হ্রাসপ্রাপ্ত বা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল করিবার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রকে ব্রেক বলে। শক্তির নিত্যতা হেতু ব্রেক যান্ত্রিক শক্তিকে ঘর্ষণ-জনিত উত্তাপে পরিণত করে। কোনও গতিশীল যন্ত্রকে স্থিতিশীল করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে ঘর্ষণশক্তি, ঘর্ষণগতি, ও স্থিতিশীল অবস্থায় আসিবার সময়—এই তিনটির গুণফলের সমান হইতে হইবে। সাধারণতঃ ব্রেকের দুইটি অংশ : একটি স্থিতিশীল ও অপরটি আবর্তিত হয়। স্থিতিশীল অংশটিকে 'ব্রেক্‌সু' ও আবর্তিত অংশটিকে 'ড্রাম' বলে। ড্রাম বা ব্রেক্‌সু যান্ত্রিক লিভার পদ্ধতি অনুসারে যুক্ত থাকে। ব্রেক উচ্চ-চাপ বিশিষ্ট বায়ু বা তরল পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি ইত্যাদি যন্ত্রশকটে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

অসিতকুমার দত্ত

ব্রোঞ্জ অ্যালয় দ্র

ব্লক, ব্লকনির্মাণ মুদ্রণবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র দ্র

ব্লাড ব্যাংক চিকিৎসার্থ ব্যবহারের জন্য রক্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাণ্ডস্টাইনার ও তাঁহার সহকর্মীদের আবিষ্কারের ফলে মানবদেহে রক্তদানের আধুনিক বিকাশের সূচনা ঘটে। লোহিত রক্তকণিকায় 'অ্যাগ্লুটিনোজেন' নামক কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব ও অভাবের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যাবতীয় মানবরক্তকে ৪টি শ্রেণীতে (ব্লাড গ্রুপ) ভাগ করিলেন : 'এ' (A), 'বি' (B), 'এবি' (AB) এবং 'ও' (O)। প্রত্যেক শ্রেণীর বহু উপশ্রেণীও বর্তমান। রক্তের এই 'এ-বি-ও' (ABO) শ্রেণীবিভাগ ছাড়া আরও

অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান; তন্মধ্যে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ল্যান্ডস্টাইনার এবং ওয়াইনার কর্তৃক আবিষ্কৃত 'আর-এইচ' (Rh) সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। 'এম' (M), 'এন' (N), 'এস' (S), 'পি' (P) ইত্যাদি আরও অনেক শ্রেণীবিন্যাসও শোণিতবিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রধান দুইটি শ্রেণীবিন্যাস 'এ-বি-ও' এবং 'আর-এইচ'-এর পরিপ্রেক্ষিতে রক্তদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে রক্তের মিল পরীক্ষার পরই কেবল দাতার রক্তকে গ্রহীতার দেহে সঞ্চালনের উপযোগী বলিয়া বিচার করা যায়। 'রক্ত' দ্র।

সুস্থ রক্তদাতার শিরা হইতে উপযুক্ত আধারে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পদ্ধতিতে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। আধারটিতে রক্তকে তরল রাখিবার উপযোগী উপাদান থাকে। রক্তাল্পতা, ম্যালেরিয়া, মৃগী, উপদংশ, ক্যান্সার, বহুমূত্র, কামলা, উচ্চ বা নিম্ন রক্তচাপ, অ্যালার্জি, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি থাকিলে রক্তদাতা রক্তদানের অনুপযুক্ত বিবেচিত হন। রক্তদাতার নিকট হইতে একবারে ২৫০—৪৫০ মিলিমিটার রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ একবার রক্তদানের ২ মাস পরে রক্তদাতা পুনর্বার রক্তদান করিতে পারেন। রক্তাল্পতা, রক্তস্রাব ও আঘাত, মূলতঃ এই তিন কারণেই মনুষ্যদেহে রক্তদানের প্রয়োজন হয়।

রক্ত তরল রাখার উদ্দেশ্যে নানা রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পরীক্ষা আজও চলিতেছে; তন্মধ্যে অ্যাসিড সাইট্রেট ডেক্সট্রোজ-এর প্রচলনই সম্ভবতঃ অধিক। রক্ত সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় স্ফটিকাধারে সংগৃহীত হয়; প্ল্যাস্টিক-নির্মিত থলিতে রক্তসংগ্রহের পদ্ধতিও বহুল প্রচলিত। প্ল্যাস্টিকের থলিতে রক্তের অণুচক্রিকাগুলি (প্লেটলেট) অবিকৃত থাকে। তাহা ছাড়া ইহা কাচের মত ভঙ্গুর নয়। প্রয়োজনে দ্রুততর রক্তদানের জন্য এই প্ল্যাস্টিক থলিতে ধনাত্মক চাপ দেওয়া হয়। সংগৃহীত রক্ত কম্পনহীন আধারে ৪°-৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২১ দিন পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকে।

রক্তের বিকল্প হিসাবে রক্তমস্তু এবং ইহাদের উভয়ের অভাবে ও রক্তের ঘনমান অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে সাংশ্লেষিক ডেক্সট্রান, পেক্টিন, লবণজল ইত্যাদি প্রায়ই মানবদেহে সঞ্চালিত করা হয়।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শল্যবিদ্ অস্‌ওয়াল্ড রবার্টসন দেখিয়াছিলেন, নিয়মানুগ রক্তসংগ্রহের পরে তুষারপেটিকায় রক্তের আধারটি রাখিয়া দিলে মাসাধিককাল সেই রক্ত ব্যবহারোপযোগী থাকে। ব্লাড ব্যাংকের পরিকল্পনা ও ক্রমবিকাশ এ সময় হইতেই শুরু হয় এবং উত্তরকালে হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক অপরিহার্য বিবেচিত হইতে থাকে।

দ্র P. L. Mollison, *Blood Transfusion in Clinical Medicine*, Oxford, 1956; C. J. C. Britton, *Disorders of the Blood*, London, 1963.

প্রদীপকুমার রাহা

ব্লাভাৎস্কি, মাদাম (১৮৩১—৯১ খ্রী) থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী। জন্ম রাশিয়ার একাতেরিনোস্লাভ নামক স্থানে। পূর্ণ নাম হেলেনা পেত্রোভ্‌না ব্লাভাৎস্কি। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করেন এবং কয়েকমাস পরেই স্বামীর নিকট হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন। অতঃপর তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শুরু করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্ক শহরে আসেন এবং সেখানে কর্নেল অলকটের সহযোগিতায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্লাভাৎস্কি ও কর্নেল অলকট ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ শহরের সন্নিকটে আদিয়ারে থিওসফিক্যাল সোসাইটির আন্তর্জাতিক কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার মতবাদ প্রচারে সমর্থ হন এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে তাঁহার ভক্তশিষ্যদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মে মাদাম ব্লাভাৎস্কি ইহলোক ত্যাগ করেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে *Isis Unveiled* (১৮৭৭ খ্রী), *The Secret Doctrine* (১৮৮৮ খ্রী), *The Key to Theosophy* ও *The Voice of Silence* (১৮৮৯ খ্রী) এবং *A Glossary of Theosophical Terms* (১৮৯১ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। মাদাম ব্লাভাৎস্কির রচনা সংকলন ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আদিয়ার হইতে ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী

ব্লুমফিল্ড, মরিস (১৮৫৫—১৯২৮ খ্রী) সুবিখ্যাত বেদবিৎ পণ্ডিত। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। চারি বৎসর বয়সে পিতামাতার সহিত ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন ও এই দেশেরই নাগরিকত্ব অর্জন করেন। সাধারণ শিক্ষান্তে ইনি ইয়েল ও বাল্টিমোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্‌স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঋগ্‌বেদের বিশেষ্যপদ গঠন পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণার জন্য ইনি পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। ইহার পর কিছুকাল তিনি জার্মানীর বার্লিন ও লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জন্‌স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া তিনি জার্মানী হইতে আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে কার্য করেন। ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও ধর্মবিষয়ে ব্লুমফিল্ড প্রায় দুইশতটি নিবন্ধ রচনা করেন; এইগুলি প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্যা-বিষয়ক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থ সম্পাদনা, অনুবাদ

ও ইহাদের মর্মব্যাখ্যা দ্বারা ব্লুমফিল্ড বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারততত্ত্বজ্ঞরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার প্রধান রচনাবলী ঃ 'কৌশিক সূত্র' (১৮৯০ খ্রী); 'হিম্স্ অফ দ্য অথর্ববেদ' (১৮৯৭ খ্রী); 'কাশ্মীরিয়ান অথর্ববেদ' (পৈপ্পলাদীয়, ১৯০১ খ্রী); 'বৈদিক কন্কর্ডেন্স' (১৯০৬ খ্রী); 'রিলিজিয়ন অফ দ্য বেদস্' (১৯০৮ খ্রী); 'লাইফ্ অ্যান্ড স্টোরিজ অফ দ্য জৈন সেভিয়র পার্শ্বনাথ' (১৯১৯ খ্রী); প্রভৃতি। ব্লুমফিল্ড ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে 'লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অফ আমেরিকা'-র সভাপতি পদে বৃত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির পরিচালক (ডিরেক্টর) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন কালিফোর্নিয়া রাজ্যের সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরে ব্লুমফিল্ডের মৃত্যু হয়।

দ্র গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, বিদেশীয় ভারতবিদ্যা-পথিক, কলিকাতা, ১৯৬৫; *Studies in Honor of Maurice Bloomfield*, New Haven, 1920.

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ব্লাস্ট ফার্নেস লৌহ ও ইস্পাতশিল্প দ্র।

ভক্তি, ভক্তিবাদ 'ভজ্' ধাতু হইতে ভক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি। মধুসূদন সরস্বতীমতে ভক্তিশব্দ ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে অর্থ হয় ভজন—অন্তঃকরণের ভগবদাকারে অবস্থান। কিন্তু যাহা দ্বারা অন্তঃকরণকে ভগবদাকারে আবরিত করা যায়, এই অর্থে করণবাচ্যে 'ভক্তি' শব্দ নিষ্পন্ন করিলে সাধন শ্রবণ কীর্তনাদি বুঝায়।

ভক্তির সংজ্ঞা শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্রমতে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগই ভক্তি। নারদভক্তিসূত্রমতে 'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ, যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।'

অদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদির ন্যায় শুদ্ধ ভক্তিবাদকে কেন্দ্র করিয়া কোনও সম্প্রদায় সৃষ্ট হয় নাই। কারণ ভক্তির একটি আশ্রয় প্রয়োজন— বিষ্ণুর, শিবের কিংবা শক্তির। শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র এবং নারদভক্তিসূত্র বৈষ্ণব গ্রন্থ।

উপর্যুক্ত ভক্তির ধাতুগত অর্থ এবং সংজ্ঞা প্রামাণ্য হইলেও সম্প্রদায় বিশেষে উদ্দেশ্যের বা ভাবনার পার্থক্য হয়। শিবস্তুতির আরম্ভ হইতেই শৈবকবিগণ তাঁহার ভয়ংকরত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শিব শংকর অর্থাৎ নানা প্রকার শুভফলদাতা, কিন্তু ভয়ংকর।

শক্তিবাদেও ভক্তির বিশেষ স্থান আছে। ভক্তশ্রেষ্ঠ সাধক রামপ্রসাদের উক্তি 'চিনি হতে চাই না গো মা, চিনি খেতে ভালবাসি'—ইহাকে ভক্তিবাদের মূলসূত্র বলা যায়। কিন্তু দেবী সর্বশক্তিময়ী, তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য হইতে তাঁহাকে পৃথক করিয়া কল্পনা করা যায় না।

এইখানেই বৈষ্ণবদের সহিত শৈব এবং শাক্তদের পার্থক্য। বৈষ্ণবদর্শন মতেও ভগবানের ঐশ্বর্য অনন্ত কিন্তু সেই ঐশ্বর্যের বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকা পর্যন্ত সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রতির উৎপত্তি হইতেই পারে না। যার কাছে ধন, রূপ, যশ ইত্যাদির প্রার্থনা করা যায়, বালগোপালের কাছে তাহা করা হাস্যকর। ঈশ্বর বলিতে সাধারণতঃ শিবকেই বুঝায়, যেমন হাঠকেশ্বর জল্পেশ্বর ইত্যাদি। বিষ্ণুরও ঈশিতৃত্ব আছে, তিনিও সর্বশক্তিমান, কিন্তু তাহা তাঁহার ভক্তের কাছে প্রচ্ছন্ন লুপ্ত। বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের মূল কথা হইল, ভগবান সচ্চিদানন্দ, রসস্বরূপ কিন্তু রসাস্বাদন করিতে হইলে ভক্তের নিকট তাঁহাকে আসিতেই হইবে। বাউল কবি গাহিয়াছেন, 'জ্ঞানের অগম্য তিনি প্রেমের ভিখারী'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

> 'আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
> তোমার প্রেম হতো যে মিছে'।

ভক্তের এই অহংভাবকে বৈষ্ণবাচার্যগণ অপ্রাকৃত অহংকার বলিয়াছেন।

অনেকে বলেন যে খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম হইতেই হিন্দুধর্মে ভক্তির প্রবেশ। ইহার মূলে তথ্য অথবা যুক্তি নাই। ইতিহাসে দেখা যায় যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুধর্মে ভক্তির ধারা প্রবাহিত। ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় কয়েকটি সূক্তেই সখ্য এবং মধুরভাবের আভাসযুক্ত ইন্দ্রস্তুতি আছে। উপনিষদ জ্ঞানকাণ্ড হইলেও ভক্তিবাদ তাহাতে নাই এমন নহে। শ্বেতাশ্বতরে পরব্রহ্মের নিকট মোক্ষপ্রার্থী শরণ গ্রহণ করিতেছেন ('শরণমহং প্রপদ্যে', ৬. ১৮) এবং শেষে বলা হইয়াছে যে, বেদান্তের অর্থ তাঁহারই নিকট প্রতিভাত হয় যাঁহার ভগবানে এবং গুরুতে ভক্তি আছে। ব্রহ্মসূত্রেও বলা হইয়াছে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'। আরও বলা হইয়াছে, 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (৩. ২. ২৪)। বৈষ্ণব আচার্যদের ভাষ্যানুসারে সংরাধনের অর্থ ভক্তিধ্যানাদি অনুষ্ঠান।

বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ—ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত। শূন্যবাদ প্রচার করা সত্ত্বেও, মহাযান বৌদ্ধধর্মে জগদ্‌ব্যাপী প্রেমের আবেগ, মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ এবং সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠার প্রবল চেষ্টা দেখা যায়। শংকরাচার্য জ্ঞানবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি গীতার ভক্তিমূলক শ্লোকগুলির অনুকূল ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার রচিত স্তোত্রে তাঁহার ভক্তহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে অদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামী ভাগবতপুরাণের টীকা লেখেন, যাহা শ্রীচৈতন্যদেবও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মধুসূদন

সরস্বতী হরিভক্তিরসায়ন লিখিয়া দেখাইলেন যে অদ্বৈত-বাদ ভক্তির পরিপন্থী নহে।

তবে ভক্তি সাধ্য না সাধনা? বৈষ্ণবদের মতে, ভক্তিই সাধ্য এবং পঞ্চমপুরুষার্থ। যেমন বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে, সমস্ত কর্ম ও সাধনের সেই পর্যন্তই অপেক্ষা, যাবৎ আত্মরূপী ঈশ্বরে বিশুদ্ধা রতি না জন্মায়।

অনেক সময়ে বলা হয় যে, কবীর, নানক, দাদু, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রভৃতির সময় হইতেই জনগণের মধ্যে ভক্তির আন্দোলন (Bhakti movement) আরম্ভ হয়। যদিও ইঁহারা ভক্তিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন, তথাপি এই আন্দোলনের আরম্ভ হয় বহু পূর্বে দ্রাবিড় দেশে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আড়বার এবং শৈব নায়নার সন্তগণ ভক্তিমূলক গান রচনা করেন। ভক্তি আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। পরে আচার্য রামানুজ আড়বারদের মতের সহিত বেদান্তের সামঞ্জস্য করেন। মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক, এই তিন বৈদান্তিক আচার্যের সম্প্রদায় ভক্তি আন্দোলনের অগ্রগতি সাধিত করেন। শ্রীচৈতন্যে ইহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।

অশোককুমার মজুমদার

ভগৎ সিং (১৯০৭—১৯৩১ খ্রী) পাঞ্জাবের বিপ্লবী নেতা ও শহীদ। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ সেপ্টেম্বর লায়ালপুর জেলার বাংগা গ্রামে (অধুনা পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) তাঁহার জন্ম। সর্দার অজিত সিং-এর ভ্রাতা সর্দার কিষেণ সিং তাঁহার পিতা। মাতা বিদ্যাবতী দেবী। ১৪ বছর বয়সে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পরে তিনি লাহোর ন্যাশন্যাল কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ কলেজেই ইতিহাসের অধ্যাপক জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারায় দীক্ষিত হন। সেই সূত্রে তিনি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত উত্তর প্রদেশের 'হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' নামক বৈপ্লবিক সংস্থায় যোগ দিয়া তাহার এক বিশিষ্ট সংগঠক হইয়া উঠেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে লাহোরে 'নওয়োয়ান ভারতসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই উহার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বৈপ্লবিক ভাবনা প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কানপুরের 'প্রতাপ' ও 'প্রভা', দিল্লীর 'অর্জুন', এলাহাবাদের 'চাঁদ' ও অমৃতসরের 'কীর্তি' পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশ করেন। ১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি বোমার মামলায় প্রায় দেড় বছর বিচারাধীন বন্দী থাকেন।

এই সময়ে তিনি মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীর ফিরোজশাহ কোট্‌লা ময়দানে উত্তর ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের সম্মেলনের তিনি ছিলেন এক প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে ঐ সম্মেলনে বৈপ্লবিক সংস্থাটির নূতন নামকরণ হয়—'হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাব্‌লিকান অ্যাসোসিয়েশন'।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ অক্টোবর সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে লাহোরে প্রতিবাদ মিছিল পরিচালনাকালে পুলিশের লাঠিচালনায় লালা লাজপত রায় আহত হন এবং তাহারই ফলে ১৭ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রতিশোধে ভগৎ সিং ও তাঁহার দুই সহকর্মী শিবরাম রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট জে. এ. স্কটকে হত্যা করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে তাঁহার সহকারী জে. পি. সণ্ডার্সকে গুলি করিয়া হত্যা করেন (১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৮ খ্রী)। ভগৎ সিং ঐ বৎসর ডিসেম্বরের শেষভাগে জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গোপনে উপস্থিত থাকেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শিল্পবিরোধ' ও 'জননিরাপত্তা' সংক্রান্ত দুইটি বিল বড়লাটের অর্ডিন্যান্স-বলে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। ঐ বৎসর ৮ এপ্রিল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগৃহে ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত স্বৈরাচারী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ দুইটি বোমা নিক্ষেপ করেন এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক', এই দুই ধ্বনি তুলেন। সেইখানেই তাঁহারা গ্রেপ্তার হন। ১২ জুন তাঁহাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

সণ্ডার্স হত্যার সূত্রে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই যে 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয় তাহাতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তও আসামী ছিলেন। ঐ বৎসর লাহোর জেলের বিখ্যাত অনশন ধর্মঘটে ভগৎ সিং ৮১ দিন অনশনে ছিলেন। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের বিচারে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেব মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন (৭ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রী)।

ভগৎ সিং প্রমুখের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বাতিলের উদ্দেশ্যে দেশে প্রবল আন্দোলন হয়। গান্ধীজী বড়লাটের কাছে ঐ মর্মে আবেদন জানান কিন্তু তাহা বিফল হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোর জেলে সর্দার ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়।

দ্র Ajoy Kumar Ghosh, *Bhagat Singh and his Comrades*, Bombay, 1945; Gopal Thakur, *Bhagat Singh—the Man and his Ideas*, Delhi, 1962; B. R. Nanda ed. *Socialism in India*, Delhi, 1972.

চিন্মোহন সেহানবীশ

ভগবানলাল ইন্দ্রজী (১৮৩৯-৮৮ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক ও লিপিতত্ত্ববিদ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ ভাওদাজীর আমন্ত্রণে তিনি বোম্বাই যান।

ঐ বৎসরই তিনি অজন্টার গুহা মন্দিরে যান এবং পূর্বসূরীদের মতামত খণ্ডন করিয়া নিজস্ব বক্তব্য ঐতিহাসিকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাসিক, পান্ডু ও অন্যান্য কয়েকটি গুহা-মন্দিরের শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই কাজের পর তিনি সমগ্র উত্তর ও পূর্ব ভারত এবং নেপাল ভ্রমণ করেন। যে সমস্ত স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত স্থান হইতে বিভিন্ন পান্ডুলিপি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করেন। ডঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজী মুদ্রার সাহায্যে 'ক্ষত্রপ বংশ'-এর বংশলতিকা ও ইতিহাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তাঁহার গবেষণালব্ধ মতামতকে কেহ ভ্রান্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

ডঃ বার্জেস ও ডঃ বুলার তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার আজীবন গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, রয়্যাল ইনস্টিটিউট অব দ্য হেগ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (বোম্বাই) তাঁহাকে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করেন। ভাওদাজী প্রথমদিকে তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তাঁহার সহিত ভাল ব্যবহার করেন নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাতে তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ডঃ ভগবানলাল ইন্দ্রজীর প্রধান রচনাবলী : *Nasik; Pandu Lena Caves,* Bombay, 'Twenty-three (Sanskrit) Inscriptions from Nepal ; tr. from Gujrati, by G. Bühler, *Indian Antiquary, Bombay,* 1885; James Burgess and Bhagavanlal Indraji, *Inscriptions from the Cave Temples of Western India,* Bombay, 1881.

নকুল চট্টোপাধ্যায়

ভগীরথ প্রজানুরাগী ধর্মনিষ্ঠ সূর্যবংশীয় নৃপতি সগররাজার বংশধর, পিতার নাম দিলীপ। মহর্ষি কপিলের শাপে ভস্মীভূত ষাটহাজার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার কামনায় মর্ত্যে গঙ্গা আনয়নের জন্য ভগীরথ গোকর্ণ-তীর্থে দীর্ঘ তপস্যা করেন। ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হইয়া ব্রহ্মা বরদ্বয় প্রদানে অভিলাষী হইলে তিনি প্রথম বরে বংশের অবিলুপ্তি ও দ্বিতীয় বরে পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। স্ব-উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্রহ্মার উপদেশে তিনি গঙ্গার বেগধারণে সমর্থ মহাদেবের তপস্যায় নিমগ্ন হন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব গঙ্গাধারণে সম্মত হন। বেগপাতিতা গঙ্গা মহাদেবকে রসাতলে অকর্ষণ করিলে সহস্র বৎসর তিনি মহাদেবের জটায় অবরুদ্ধা হন।

ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে জটা হইতে বাহির করিয়া দেন। গঙ্গা পাতালে ভগীরথকে অনুসরণ করায় তাঁহার নাম হয় ভাগীরথী। পূর্বপুরুষদের ভস্মরাশির উপর গঙ্গা পতিত হইলে তাঁহারা মুক্ত হন।

দ্র রামায়ণ, বালকান্ড ৪২—৪৪ ; মহাভারত, বনপর্ব ১০৭-১০৮ ; মৎস্যপুরাণ ১২ ; শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৯।

যূথিকা ঘোষ

ভঙ্গকুলীন কুলীন দ্র

ভজন একপ্রকার ভক্তিমূলক গীতি। ক্ষেত্রবিশেষে নীতি-মূলক বা দোহাঁ শ্রেণীর গীতও ইহার অন্তর্গত হইতে পারে। সাধারণভাবে ইহা বিভিন্ন হিন্দীভাষী অঞ্চলসমূহে, রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাতে বহুলভাবে প্রচলিত। ইহাতে সাধারণতঃ স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি কলির ব্যবহার হয়। কখনও বা ইহা দুইটি চরণে একটি পদেই সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে ইহা ভারতীয় সংগীতে খেয়াল অঙ্গে বিশেষভাবে গাওয়া হয়। মীরা, তুলসীদাস, নানক, কবীর প্রভৃতি সাধুসন্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভজন সমধিক বিখ্যাত। বাংলায় ইহার অনুকরণাত্মক প্রচেষ্টা হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু ভজন রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ভট্টজীদীক্ষিত পাণিনি দ্র

ভট্টনারায়ণ বঙ্গরাজ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ অন্যতম—বাংলা কুলজী গ্রন্থের এই তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য বিতর্কের বিষয়। আদিশূরের কাল সম্বন্ধেও মতভেদ আছে ; তাঁহার প্রসঙ্গে প্রস্তাবিত তারিখসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম তারিখ ৭৩২ খ্রী। বামন (খ্রীষ্টীয় ৮ম—৯ম শতক) ও আনন্দবর্ধনের (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক) অলঙ্কারগ্রন্থে ভট্টনারায়ণের গ্রন্থের শ্লোকের উদ্ধৃতি হইতে মনে হয় ভট্টনারায়ণ ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী লেখক। তাঁহার 'বেণীসংহার' ষড়ঙ্ক নাটক। 'মহাভারতে'র সভাপর্বস্থ প্রসিদ্ধ কাহিনী ইহার উপজীব্য। দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণে কুপিত ভীমের প্রতিজ্ঞানুসারে দুঃশাসনবধ, তাঁহার রক্তে রঞ্জিত হস্তদ্বারা দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন ও কালক্রমে দুর্যোধনবধ—নাটকটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ। সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে ইহার রচনাপদ্ধতি বিশিষ্ট প্রকারের। নাট্যাংশ অপেক্ষা কাব্যাংশের প্রতি নাট্যকার অধিকতর অবহিত ; ফলে তাঁহার রচনা অংশতঃ কাব্য ও অংশতঃ নাটক, কিন্তু কাব্য বা নাটক কোনও হিসাবেই ইহা উচ্চশ্রেণীর নহে। দুর্যোধন, ভীম

প্রভৃতির চরিত্রচিত্রণে ভট্টনারায়ণ নিপুণ। নাটকটিতে বীররস, করুণরস ও ভয়ের চিত্রগুলিও মর্মস্পর্শী।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভট্টি ভট্টিকে কেহ কেহ 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা ভর্তৃহরি হইতে অভিন্ন মনে করেন। কাহারও মতে ইনিই মান্দাসোর লিপির বৎসভট্টি (৪৭৩ খ্রী)। স্বীয় কাব্যে (২২।৩৫) ভট্টি বলিয়াছেন যে, তিনি শ্রীধরসেন-শাসিত বলভীতে ইহা রচনা করিয়াছিলেন। এই নামের চারিজন রাজার মধ্যে সর্বশেষ রাজা ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রাজত্ব করিতেন; সুতরাং ইহাই ভট্টির কালের নিম্নতম সীমা। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে দ্বাবিংশতিসর্গে রচিত 'ভট্টিকাব্য' বা 'রাবণবধ' ভট্টির স্মরণীয় কীর্তি। লংকা হইতে রামের প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু। কাব্যটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত; যথা—প্রকীর্ণ, অধিকার, প্রসন্ন ও তিঙন্ত। প্রসন্নকাণ্ডে বিবিধ অলংকারের উদাহরণ আছে; অপর কাণ্ডগুলিতে ব্যাকরণের সূত্রাবলীর উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে যে কোনও কারণে কিছুকালের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্রের অনধ্যায় ঘটিলে ভট্টি কাব্যের মাধ্যমে ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার জন্য এই গ্রন্থের পরিকল্পনা করেন। তিনি এই কাব্যে (২২।৩৩) বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থখানি ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির নিকট দীপতুল্য, কিন্তু ঐ শাস্ত্রে অজ্ঞ পাঠকের নিকট অন্ধের হস্তে দর্পণের ন্যায়। কাব্যখানি ভট্টির মতেই 'ব্যাখ্যাগম্য'। কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বের স্ফুরণ চিত্তাকর্ষক। নিদর্শনস্বরূপ দ্বিতীয় সর্গে শরদ্বর্ণনার উল্লেখ করা যায়।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভদ্রবাহু ৫ম শ্রুত কেবলী। জৈন শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ই ভদ্রবাহুকে ৭ম পট্টধর বলিয়া স্বীকার করেন। শ্বেতাম্বর মতে ভদ্রবাহু বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নন্দবংশীয়দের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র হইতে নেপালে যান ও সেখান হইতে আর প্রত্যাবর্তন করেন নাই। ভদ্রবাহু শেষ চতুর্দশ-পূর্বধর ছিলেন। দিগম্বর মতে ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় দাক্ষিণাত্যে গমন করেন ও শ্রবণবেলগোলার চন্দ্রগিরি পাহাড়ে দেহরক্ষা করেন। ভদ্রবাহু-শিষ্য বিশাখাচার্য চোল ও পাণ্ড্য দেশে জৈনধর্ম প্রচার করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভদ্রবাহুর শিষ্য ছিলেন ও তাঁহাকে অনুগমন করিয়া তিনিও দাক্ষিণাত্যে যান।

শ্বেতাম্বরগণ 'কল্পসূত্র', 'আবশ্যক নির্যুক্তি' ও অন্যান্য কয়েকটি অঙ্গের নির্যুক্তিকে ভদ্রবাহুর বিরচিত বলিয়া বলেন কিন্তু দিগম্বরগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভদ্রবাহুকে 'ভদ্রবাহু-সংহিতা'-র গ্রন্থকার রূপে উল্লেখ করেন। কিন্তু প্রচলিত 'ভদ্রবাহু-সংহিতা' নিতান্তই অর্বাচীন (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে কোনও জৈনেতর ব্যক্তি দ্বারা লিখিত)।

গণেশ লালওয়ানী

ভদ্রা, তুঙ্গভদ্রা মহীশূর দ্র

ভদ্রাবতী মহীশূর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত শহর ও প্রখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। শহরটি ভদ্রা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ২৪৪৯৫ (১৯৬১ খ্রী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরের রাজার উদ্যোগে এখানে মহীশূর স্টেট আয়রন ওয়ার্কস স্থাপিত হয়। ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির নাম মহীশূর আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস। ৪২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বাবাবুদান পাহাড় হইতে উৎকৃষ্ট লৌহ আকর ভদ্রাবতীতে আনীত হয়। ৪৮ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে কাঠ, কাঠকয়লা, চুনাপাথর প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সুলভ্য। কয়লার অভাবে আকরিক লৌহ বিগলনের জন্য জলবিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহৃত হয়। অধুনা এই শিল্পকেন্দ্রের সম্প্রসারণ সাধিত হইয়াছে। এখানে বিশেষ ধরনের ইস্পাত ও ঢালাই লোহের 'স্পান পাইপ' তৈয়ারি হয়। ইস্পাত উৎপাদন প্রায় ৭৭০০০ মেট্রিক টন (১৯৬৮ খ্রী)। মহীশূর ও বাংগালোরের সহিত রেল ও সড়ক পথে যোগ আছে।

ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে বর্মন রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ভবদেব ভট্ট এই বংশীয় রাজা হরিবর্মনের মন্ত্রী ছিলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে সংলগ্ন একখানি শিলালিপি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। এই লিপিখানি বর্তমানে ভুবনেশ্বরের মন্দির গাত্রে থাকিলেও ইহার সহিত উক্ত মন্দিরের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা বংগদেশে সম্ভবতঃ বিক্রমপুরে ভবদেব নারায়ণের যে মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহার গাত্রেই সংলগ্ন ছিল। প্রস্তর ফলকখানি প্রথমে ঢাকায় পরে কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে আনীত হয়, এবং সেখান হইতে ভ্রমক্রমে ভুবনেশ্বরে প্রেরিত হয়। বহুদিন পর্যন্ত এই ভ্রমের ফলে লোকের ধারণা ছিল যে হরিবর্মন ওড়িশায় রাজত্ব করিতেন এবং ভবদেবের যে সমুদয় কীর্তি (মন্দির প্রতিষ্ঠা, জলাশয় খনন প্রভৃতি) উক্ত শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ওড়িশা সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ এ ধারণার কোনও ভিত্তি নাই।

রাঢ়দেশে সিদ্ধল গ্রামে ভবদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ আদিদেব বংগদেশের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। ভবদেবের পিতা গোবর্ধন যোদ্ধা ও পণ্ডিত ছিলেন। ভবদেব ও তাঁহার পুত্র রাজা হরিবর্মনের মন্ত্রী (সান্ধিবিগ্রহিক) ছিলেন। ভবদেব অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে যে তিনি

সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, মীমাংসা (দর্শন), আগম, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজে হোরাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং মীমাংসাদর্শনের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার দুইখানি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ ও দশকর্মপদ্ধতি মুদ্রিত হইয়াছে। তৃতীয় গ্রন্থ ব্যবহার-তিলকের কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নাই কিন্তু রঘুনন্দন, মিত্র মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থে ইহার শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত মীমাংসা-দর্শনের টীকার একখানি খণ্ডিত পুঁথিমাত্র পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন এবং অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহা হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ভবদেবের আর একটি নাম (বা উপাধি) ছিল 'বালবলভী ভুজঙ্গ'। কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য কি সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

দ্র R. C. Majumdar, ed, *History of Bengal*, Vol. I, Dacca, 1943; R. C. Majumdar, *History of Ancient Bengal*, Calcutta, 1971; N. G. Majumdar, *Inscriptions of Bengal*, Vol. III.

রমেশচন্দ্র মজুমদার

ভবভূতি কালিদাসোত্তর যুগের ভারতের খ্যাতিমান নাট্যকার। পিতা নীলকণ্ঠ ও মাতা জাতুকর্ণী। ভবভূতি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভবভূতি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন উহা ছিল 'উদুম্বর' উপাধিধারী ও পদ্মপুরবাসী। এই পদ্মপুর সম্ভবতঃ বিদর্ভের অন্তর্গত ছিল। ভবভূতি 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। টীকাকারগণের মতে, 'ভবভূতি' নাম নহে—উপাধি মাত্র। মালতীমাধবের পুষ্পিকায় যে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে ভবভূতির নাম ছিল মণ্ডন মিশ্র এবং তিনি সুরেশ্বর, বিশ্বরূপ প্রভৃতি নামেও অভিহিত হইতেন। বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী হইয়াছিলেন।

ভবভূতির কাল অজ্ঞাত। কালিদাসের রচনার সহিত তাঁহার পরিচয়ের প্রমাণ আছে বলিয়া তাঁহাকে কালিদাসোত্তর যুগের নাট্যকার মনে করা হয়। কহ্লণের 'রাজতরঙ্গিণী' হইতে জানা যায় যে ভবভূতি কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের পোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। বাক্‌পতিরাজ 'গৌড়বহ' নামক কাব্যে উক্ত যশোবর্মনের গুণকীর্তন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভবভূতির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। এই কাব্যখানির রচনাকাল আনুমানিক ৭৩৬ খ্রী। সুতরাং ভবভূতি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে বা অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়। বামনের (৮ম—৯ম শতক) কাব্যালংকারে (১।২।১২) ভবভূতির শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। অতএব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের শেষ পাদকে ভবভূতির কালের নিম্নতম সীমা বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ভবভূতির নাট্যগ্রন্থ তিনটি—মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিত। সবগুলি নাটকই কালপ্রিয়নাথের মেলাতে অভিনীত হইয়াছিল। কালপ্রিয়নাথ সম্ভবতঃ সেই মহাকাল যাঁহার উজ্জয়িনীস্থ মন্দিরের কথা কালিদাস ও বাণভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন। দশাঙ্কে রচিত 'মালতীমাধব' প্রকরণ শ্রেণীর গ্রন্থ। মাধব নামক এক তরুণ শিক্ষার্থীর সহিত উজ্জয়িনীরাজের মন্ত্রিকন্যা মালতীর প্রণয়-কাহিনী এই গ্রন্থের মুখ্য বস্তু। নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ঘটনাপরম্পরায় এবং মালতী ও মাধবের পিতৃসান্ধবী বৌদ্ধ ভিক্ষুণী কামন্দকীর কৌশলে উহাদের প্রণয়ের সার্থকতা নাট্যকার বর্ণনা করিয়াছেন। মদয়ন্তিকার সহিত মাধবের বন্ধু মকরন্দের প্রেমের কাহিনী মালতী-মাধবের প্রাসঙ্গিক বস্তু। নাটকটি অতি দীর্ঘ এবং মুখ্য ও প্রাসঙ্গিক বস্তুর সমাবেশে কাহিনী জটিল হইলেও মাঝে মাঝে হাস্যরস ও চাঞ্চল্যকর ঘটনার অবতারণায় উহা পাঠকের উপভোগ্য হইয়াছে। মালতী-মাধবের বিষয়বস্তু গতানুগতিক হইলেও রাজাকে অবলম্বন করিয়া রচিত না হওয়ায় এক হিসাবে ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। প্রাসঙ্গিক বস্তুর অতিবাহুল্য, দেড় অঙ্ক জুড়িয়া মাধবের বিলাপের বর্ণনা, অষ্টম অঙ্কে নাটকের স্বাভাবিক পরিণতির পরেও আরও দুই অঙ্কের অবতারণা নাট্যকারের মাত্রাবোধের অভাব প্রমাণিত করে।

'মহাবীরচরিত' ও 'উত্তররামচরিত'-এর বর্ণিত ঘটনাবলী রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। উভয়ই সপ্তাঙ্ক নাটক। 'মহাবীরচরিতে' রামের বিবাহের কিছু পূর্ব হইতে শুরু করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে মূল রামায়ণ কাহিনীর অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নাটকের উপযোগী মূল কাহিনীর পরিবর্তনে ভবভূতি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তবে এই নাটকেও নাট্যকারের মাত্রাবোধের অভাব লক্ষণীয়। একদিকে পরশুরাম ও অপরদিকে জনক দশরথ ও রাম—এই উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ দুইটি অঙ্ক ব্যাপিয়া বাগ্‌যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে।

সীতার বনবাস হইতে রামের সহিত তাঁহার পুনর্মিলন পর্যন্ত ঘটনাবলী লইয়া 'উত্তররামচরিত' রচিত। এই নাটকেও ভবভূতি স্বীয় কবিত্বশক্তি প্রদর্শনের উপযোগী অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন। প্রধান পরিবর্তনগুলি এইরূপ— আলেখ্যদর্শন, পঞ্চবটীতে রামের পরিদর্শন কালে ছায়াসীতার উপস্থিতি, বনদেবতা বাসন্তীর সহিত রামের সাক্ষাৎকার, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বশিষ্ঠ প্রভৃতির বাল্মীকি-আশ্রমে গমন, বাল্মীকি-রচিত রাম-বৃত্তান্তের

অভিনয়। এই নাটকই ভবভূতির পরিণত রচনা। চরিত্র-চিত্রণে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাস্তব বর্ণনায়, বিশেষতঃ করুণ-রসের চিত্রাংকনে, ভবভূতি এই নাটকে সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে দাম্পত্যপ্রেমের যে চিত্র অংকিত হইয়াছে তাহার তুলনা সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যত্র বিরল। ভবভূতির অপর দুইটি গ্রন্থের ন্যায় উত্তররাম-চরিতেও ভাষা স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য ও সমাসবহুল। তাঁহার গ্রন্থগুলিতে হাস্যরসের অল্পতা, এমন কি কোনও কোনও স্থলে তাহার একান্ত অভাব, প্রতিকূল সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানন্দ মজুমদার নবদ্বীপ (বা কৃষ্ণনগর) রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কান্যকুব্জ-আগত ব্রাহ্মণ ভট্টনারায়ণের বংশ-জ হাবিলি পরগণার কাক্দি গ্রামের জমিদার কাশীনাথ রায় সম্রাট আকবরের সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হইলে তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা পত্নী বাগোয়ানের জমিদার হরেকৃষ্ণ সমদ্দারের আশ্রয়ে আন্দুলিয়া গ্রামে এক পুত্র প্রসব করেন। পুত্র রামচন্দ্র নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণর সম্পত্তি ও পদবীর উত্তরাধিকারী হন। রামচন্দ্র সমদ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র ভবানন্দ। মাতা সীতাদেবী।

সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ভাষাবিদ, শাস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্রকুশলী ভবানন্দের প্রতিভায় তুষ্ট ঢাকার নবাব ইহাকে 'কানুনগো' পদ ও 'মজুমদার' উপাধি দেন। রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্য দমনে আসিলে বাগোয়ানে সপ্তাহব্যাপী ঝড়-বৃষ্টিতে সসৈন্যে বিপর্যয়গ্রস্ত হন। সেই দুঃসময়ে ভবানন্দ নানাভাবে মানসিংহকে সাহায্য করেন। প্রতিদানে মানসিংহের অনুরোধে জাহাঙ্গীর ভবানন্দকে বাগোয়ান প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদার ফরমান (১৬০৬ খৃী) প্রদান করেন। অতঃপর ভবানন্দ কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী মাটিয়ারীতে স্থায়ী আবাস নির্মাণ করেন।

বারাণসীর অন্নপূর্ণা মূর্তি ও মন্দির ইঁহার প্রতিষ্ঠিত। দুই পত্নী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী। চন্দ্রমুখীর তিন পুত্র—গোপাল, গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ। ভবানন্দের মৃত্যুতে গোপাল রাজা হন। ভবানন্দ হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সপ্তম পুরুষ।

দ্র ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল ; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, লণ্ডন, ১৮১১ ; কার্তিকেয়-চন্দ্র রায়, আত্মজীবনচরিত, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

বীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭—১৮৪৮ খৃী) ব্যঙ্গ-সাহিত্য-রচয়িতা ও রক্ষণশীল হিন্দু নেতা। জন্মস্থান উখড়া পরগণার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রাম। পিতার দারিদ্র্যহেতু তিনি ষোল বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হইয়া অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হন এবং বেসরকারি ও সরকারি নানা পদে দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কাজ করেন।

বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপময় সরস সামাজিক চিত্রাংকনের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম সার্থক শিল্পী। তাঁহার 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩ খৃী), 'নববাবুবিলাস' (প্রমথনাথ শর্মন্ ছদ্মনামে লিখিত—১৮২৫ খৃী) ও 'নববিবিবিলাস' (১৮৩১ খৃী?—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে) —এই তিনটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলি তৎকালীন বাঙালী সমাজের ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ এবং বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরসসৃষ্টির প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টার মধ্যে গণ্য। 'নববাবুবিলাস'-এ বাংলা উপন্যাসের প্রথম আভাস লক্ষিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর আদর্শ "নববাবুবিলাস"। ভবানীচরণের অন্যান্য গ্রন্থ : 'দূতীবিলাস' (১৮২৫ খৃী), 'শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার' (১৮৩১ খৃী), 'আশ্চর্য উপাখ্যান' (১৮৩৫ খৃী) ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করিয়াছেন যে, 'সমাচার দর্পণ'-এ ১৮২১-২২ খৃীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ', 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক রচনাগুলি "খুব সম্ভব ভবানীচরণেরই রচনা"।

ভবানীচরণ ছিলেন 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকার সম্পাদক-প্রতিষ্ঠাতা (৪ ডিসেম্বর ১৮২১ খৃী)। প্রথম ১৩টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি ইহার সংস্রব ত্যাগ করিয়া ৫ মার্চ ১৮২২ খৃীষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। রামমোহন রায় 'কৌমুদী'তে সতীদাহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহার প্রতিরোধই ছিল 'চন্দ্রিকা'র প্রধান উদ্দেশ্য। সতীদাহনিবারক আইনের প্রতিবাদকল্পে ও হিন্দুদের স্বধর্ম ও সদাচার রক্ষার নিমিত্ত তিনি অন্যান্য হিন্দু নেতৃবর্গের সহযোগে ১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০ খৃীষ্টাব্দে 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন এবং আমৃত্যু ইহার সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মধ্যে হিন্দু আচারব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধাকে তিনি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষার যুগোপযোগিতা তাঁহার রক্ষণশীল মনের কাছেও স্বীকৃত হইয়াছিল। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৮ খৃীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৯, কলিকাতা, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ

সুশীলকুমার গুপ্ত

ভবানী নদী দক্ষিণ ভারতের একটি নদী। ইহা মালাবার জেলায় ১১°১৪′ উত্তর ও ৭৬°৩২′ পূর্বে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ১৬৮ কিলোমিটার প্রবাহের পর ভবানী শহরের নিকট কাবেরী নদীতে পতিত হইয়াছে। উহাদের সঙ্গমস্থল একটি তীর্থস্থান। নীলগিরি পাহাড় হইতে উত্থিত বহু ক্ষুদ্র নদীর জলধারায় ভবানী নদী পুষ্ট।

ইহাদের মধ্যে ময়ার নদী উল্লেখযোগ্য। ময়ার কোট্টা-মঙ্গলমের নিকট ভবানীতে পড়িয়াছে।

'লোয়ার' ভবানী সেচ প্রকল্পের দ্বারা তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোর জেলায় ৭৮৯২০ হেক্টর জমিতে জলসেচন হয়। সত্যমঙ্গলমের ৬ কিলোমিটার উত্তরে এই প্রকল্পভুক্ত একটি বৃহৎ জলাধার আছে।

দ্র *The Imperial Gazetter of India*, Vol. VIII, Oxford, 1908; *India 1969*, Delhi.

মিনতি বিশ্বাস

ভবানী, রাণী নাটোরের বিখ্যাত জমিদার-গৃহিণী 'রাণী ভবানী' সমগ্র বাংলাদেশে পরিচিত। তিনি বগুড়া জেলার ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা ও রাজশাহী জেলার নাটোরের জমিদার রাজা রামকান্ত রায়ের পত্নী। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর ৩২ বৎসর বয়স্কা ভবানী বার্ষিক দেড় কোটি টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া স্বহস্তে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। বিষয়কর্ম পরিচালনা সম্পর্কে তিনি দেওয়ানকে আদেশ-উপদেশ দিতেন; স্বয়ং কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া দান, ধর্ম ও জনকল্যাণমূলক কার্যে এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি প্রদানে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কাশী-ধামে ভবানীশ্বর নামে এক শিব স্থাপন করেন। কাশীর সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ড এবং দুর্গাকুণ্ডের কিছু-দূরে 'কুরুক্ষেত্রতলাও' নামে একটি জলাশয় ইঁহারই কীর্তি। ৭৯ বৎসর বয়সে বড়নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরত[১] রামানুজ, পিতা দশরথ, মাতা কৈকেয়ী, মাতুল যুধাজিৎ, পত্নী জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী। ভ্রাতা শত্রুঘ্ন ইঁহার আজীবন সহচর।

বিবাহের পর হইতে দশরথের মৃত্যু পর্যন্ত ইনি মাতামহগৃহে ছিলেন। মন্থরা ও কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র এবং রামবনবাসাদি ইঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। অযোধ্যায় ফিরিয়া ইনি কৈকেয়ীকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন ও রাজপদ গ্রহণে অসম্মত হন। রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সপরিজনে যাত্রা করিয়া চিত্রকূট পর্বতে ভরত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও রামচন্দ্র ফিরিতে সম্মত না হইলে ভরত তাঁহার পাদুকা লইয়া সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক স্বয়ং নন্দীগ্রামে যাইয়া জটাবল্কল ধারণ করিয়া প্রতিনিধি স্বরূপ রাজ্যভার পরিচালনা করিতে থাকেন। বনবাসান্তে রামচন্দ্র ভরতের মনোভাব জানিবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করিলে ভরত অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনাপূর্বক রামচন্দ্রের অভিষেক নিষ্পন্ন করেন।

মাতুলের পরামর্শে এবং রামচন্দ্রের আদেশে ভরত গন্ধর্ব দেশ জয় করিয়া নিজপুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। জীবনের শেষে রামচন্দ্রের সহিত সরযূনদে প্রবেশ করিবার পর ভরত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে অনুপ্রবেশ করেন।

কল্যাণী দত্ত

ভরত[২] জড়ভরত দ্র

ভরত[৩] দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার পুত্র। দুষ্যন্ত হস্তিনা-পুরের রাজা, তাঁহার পিতা ঈলিন ও মাতা রথন্তরী। শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের পালিতা কন্যা, তাঁহার পিতা বিশ্বামিত্র ও মাতা মেনকা। মহর্ষি মারীচের আশীর্বাদে ভরত চক্রবর্তী রাজা ও সপ্তদ্বীপবিজেতা হন। তাঁহার বাল্যনাম সর্বদমন। মাতৃরোষে ভরতের পুত্রগণ বিনষ্ট হইলে মরুদ্‌গণ বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজকে ভরতের পুত্রে পরিণত করেন। ভরতের বংশধরেরা ভারত নামে বিখ্যাত।

ভরত[৪] 'নাট্যশাস্ত্র'কার ভরতকে সংস্কৃত সাহিত্যে ভরত-মুনিও বলা হয়। তাঁহার জীবনী অজ্ঞাত। তাঁহার কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নাই। সমস্যাটি জটিল হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, যে রূপে 'নাট্যশাস্ত্র' বর্তমানে পাওয়া যায় উহা এই গ্রন্থের আদিরূপ নহে, অনেক বিবর্তনের ফল। আলঙ্কারিক উদ্ভট (আনুমানিক ৮ম শতক) কর্তৃক নাট্যশাস্ত্রের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি, ভবভূতি (আনুমানিক ৭ম-৮ম শতক) কর্তৃক 'তৌর্যত্রিক-সূত্রকার' ভরতের উল্লেখ, আলঙ্কারিক ভামহ (আনুমানিক ৭ম শতক) কর্তৃক অলঙ্কারবিষয়ে 'নাট্যশাস্ত্রে'র অনু-সরণ প্রভৃতি হইতে মনে হয় যে বর্তমান রূপে এই গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকে পণ্ডিগণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই গ্রন্থের সহিত কালিদাসের সম্ভাব্য পরিচয় এবং তৎকর্তৃক এই গ্রন্থোক্ত বিধিনিষেধের অনু-সরণ এবং অন্যান্য কিছু কারণে মনে হয় যে গ্রন্থটি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতির উল্লেখ হইতে অনুমান করা যায় যে ইহা খ্রীষ্টীয় যুগের পূর্বে রচিত হয় নাই।

নাট্যশাস্ত্রের পরিচ্ছেদসংখ্যা কাহারও মতে ৩৬, কাহারও মতে ৩৭। অভিনবগুপ্তের সাক্ষ্য অনুসারে এই গ্রন্থের অধ্যায় সংখ্যা ৩৬ এবং শ্লোকসংখ্যা ৬০০০।

নাট্যশাস্ত্রের বহু টীকাকারের নাম পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একমাত্র অভিনবগুপ্তের 'অভিনবভারতী' নামক টীকাটি অসম্পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। 'নাট্যশাস্ত্র' দ্র

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভরতনাট্যম নৃত্য দ্র

ভরতপুর রাজস্থানের একটি জেলা ও শহর। শহরটি (২৭°১৩′ উত্তর ও ৭৭°৩১′ পূর্ব) পূর্বতন রাজপুতনার ভরতপুর করদ রাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্তমানে ইহা

জেলার সদর শহর। আগ্রা হইতে ইহা ৫৪ কিলোমিটার পশ্চিমে। শহরের আয়তন ২৮·৮ বর্গকিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৬৯৭৭৬ (১৯৬১ খ্রী), শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯০১৭। ভরতপুর রেলপথের কেন্দ্র শহর। রেলপথে ইহা আগ্রা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতির সহিত যুক্ত।

ভরতপুর যমুনা ও চম্বল অববাহিকার পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলে অবস্থিত। কোনও কোনও স্থানে কৃষ্ণ মৃত্তিকাও দেখা যায়। জলবায়ু আর্দ্র। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৩০° সেন্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ ১২° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৬৭০ মিলিমিটার।

বদনসিংহ স্বাধীন ভরতপুর রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার দত্তকপুত্র সুরজমলের রাজত্বকালেই জাঠ রাজ্য ভরতপুর আয়তনের ও গৌরবের চরম শিখরে ওঠে। তাঁহাকে 'জাঠ ইউলিসিস' বলা হয়। তাঁহার পুত্র জওহরসিংহের পরবর্তীকালে রাজ্যটি দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কম্বারমিয়ার ভরতপুর দুর্গ দখল করেন। ক্রমে ভরতপুর ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ মে ভরতপুর রাজ্য ভারতভুক্ত হয়। 'জাঠ', 'দুর্জনশাল' দ্র

ভরতপুরের প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ইক্ষু, ছোলা, গম, বাজরা ও বার্লি। প্রধান সেচ পরিকল্পনা 'ভরতপুর ফিডার'। ইহার দ্বারা ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের প্রায় ৭৪ হাজার হেক্টর পরিমিত জমি সিঞ্চন করা হয়।

ভরতপুরের প্রধান ভারী শিল্পের কারখানা, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ মালগাড়ি নির্মাণ করার জন্য স্থাপিত হয়। ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রতি মাসে প্রায় ৬০টি করিয়া মালগাড়ি নির্মাণ করিয়াছে। ইহা মালগাড়ি ছাড়াও রেলপথ সংক্রান্ত অন্যবিধ দ্রব্যাদিও নির্মাণ করে।

ভরতপুরের কুটিরশিল্পের মধ্যে 'খস ক্ষরণ' প্রসিদ্ধ। জঙ্গলে খস অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে স্থানীয় কারবারীরা সাধারণভাবে ক্ষরণ করিয়া সুগন্ধি প্রস্তুত করে।

মৃত্তিকার দেওয়াল বেষ্টিত ভরতপুর দুর্গ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই দেওয়ালের জন্যই ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক চারবার আক্রমণ করিয়াও ভরতপুর দুর্গ দখল করিতে পারেন নাই। দুর্গের চারিদিকে প্রায় ৬০ মিটার প্রশস্ত একটি পরিখা আছে। ভরতপুরের লছমনজী ও গণপতির মন্দির দুইটি উল্লেখযোগ্য। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভরতপুরের পশুমেলা দর্শনীয়।

দ্র C. S. Gupta, *Census of India* 1961, *Rajputana District Census Handbooks, Bharatpur District*, Jaipur, 1966.

ভর্তৃহরি শতকত্রয়-রচয়িতা ভর্তৃহরির ব্যক্তিগত পরিচয় বিতর্কের বিষয়। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, 'বাক্যপদীয়'-রচয়িতা ভর্তৃহরি ও ইনি অভিন্ন এবং ইনিই সেই বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি যিনি ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পরলোকগমন করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধ পরিব্রাজক ঈ-ৎসিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই ভর্তৃহরি ও ভট্টি একই ব্যক্তি, কিন্তু ইহা প্রমাণসাপেক্ষ।

ভর্তৃহরির তিনখানি শতক গ্রন্থ পাওয়া যায় ; যথা— 'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক'। নারীপ্রেম ও উহার পরিণতি 'শৃঙ্গারশতকে'র বিষয়বস্তু। কবি প্রেমের বিভিন্নস্তর ও প্রেমজনিত সুখের কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু সমস্ত কাব্যটিতে প্রেমের ব্যর্থতা ও অসারতার সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। 'নীতিশতক' ও 'বৈরাগ্যশতক'-এ কবি পার্থিব সুখ ও প্রেমের নিন্দা করিয়াছেন। এই দুই গ্রন্থ হইতে পাঠক বাস্তব জীবন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ লাভ করিতে পারেন। উক্ত তিনটি শতকের কতক শ্লোক অন্যান্য কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং কোনও কোনও কাব্যে ইহাদের কতিপয় শ্লোক অন্য কবির নামাঙ্কিত দেখা যায়। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে শতকগুলি বিভিন্ন কবির রচিত শ্লোকসমূহের সমষ্টি মাত্র ; কিন্তু শতকগুলির মূল নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা যায় না।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮ খ্রী) ফরাসী লেখক, বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যরচয়িতা ; আসল নাম ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়েৎ। তিনি আইন অধ্যয়ন করেন কিন্তু সাহিত্যকেই বরণ করিয়া লন। এই কুদর্শন ও ক্ষীণকায় মানুষটির ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনই সংগ্রামপরায়ণ। তাঁহার জীবিতকালে 'ভল্‌তেয়ার' ও 'বিদ্রোহ' এই দুইটি শব্দ সমার্থক ছিল। তাঁহার যাবতীয় রচনায় ফরাসী জীবনযাত্রা, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও নীতির বিরুদ্ধে চরম আক্রমণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার ও প্রগতির একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি মানুষের মতামতের, তাহা যতই বিপ্লবীভাবাপন্ন হউক না কেন, উচ্ছল প্রকাশের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন ফরাসী তথা সমগ্র ইওরোপীয় সমাজের উপর তিনি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সমসাময়িক বিখ্যাত লেখক ও মনস্বী রুসোর সহিত তাঁহার জীবনবেদের মৌল প্রভেদ লক্ষণীয়।

তাঁহার জীবনের অধিকাংশ কালই স্বদেশের বাহিরে অতিবাহিত হয়। প্যারীতে তিনি দুইবার কারারুদ্ধ হন (১৭১৭ ও ১৭২৬ খ্রী)। তিনি জীবনে বহু অভিজাত পৃষ্ঠপোষকের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। এক পৃষ্ঠপোষকের আদেশে বেত্রাহত হইয়া তিনি দ্বিতীয়বার বন্দীজীবন যাপন করেন এবং পরে ইংল্যাণ্ডে নির্বাসিত হন। তিনি ইংরেজদের সমাজব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব

উপলব্ধি করেন এবং ইংরেজী সাহিত্যের ও বিজ্ঞানচর্চার একজন প্রধান গুণগ্রাহী হইয়া উঠেন। ইংরেজদের সম্বন্ধে তাঁহার প্রশস্তিমূলক রচনা *Lettres sur les Anglais* (১৭৩৩ খ্রী) প্রকাশিত হইলে তিনি পুনরায় রাজরোষে পতিত হন। গ্রন্থটি অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভল্‌তেয়ার লোরেনে পলায়ন করেন। অতঃপর তিনি প্রুশিয়ার ফ্রেড্‌রিক দ্য গ্রেট-এর সভাসদ্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন (১৭৫১ খ্রী), কিন্তু শীঘ্রই উভয়ের মধ্যে কলহ ঘটে। জার্মানী ত্যাগের পর ভল্‌তেয়ার সুইট্‌জারল্যান্ড ও ফ্রান্সের সীমাস্পর্শী ফার্নি নামক স্থানে স্বীয় বাসস্থান রচনা করেন (১৭৫৮ খ্রী)। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীতে প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি জাতীয় বীরের ন্যায় অভিনন্দিত হন। ঐ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভল্‌তেয়ার আমরণ সাহিত্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার বিচরণ ছিল অবাধ। *Henriade* (১৭২৩ খ্রী) ও *La Pucelle* (১৭৫৫ খ্রী) তাঁহার উল্লেখযোগ্য বড় কাব্য। শেষোক্ত কাব্যে ধর্ম ও ইতিহাসকে আক্রমণ করা হইয়াছে। প্রথম যৌবন হইতেই নাটক রচনা ও থিয়েটারের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। কমেডি অপেক্ষা ট্র্যাজেডি রচনাতেই তাঁহার সাফল্য অধিকতর। *Zaïre* (১৭৩২ খ্রী) ও *Mérope* তাঁহার উৎকৃষ্টতম ট্র্যাজেডি। ভল্‌তেয়ারকে ফরাসী গদ্য সাহিত্যের জনক বলা হয়। তাঁহার গদ্য কাহিনী *Zadig* (১৭৪৮ খ্রী) ও *Candide* (১৭৫৯ খ্রী) সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি অর্জন করিয়াছে। *Essai sur les Moeurs* (১৭৫৬ খ্রী) তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির মধ্যে গণ্য। তিনি দিদেরো-সম্পাদিত ফরাসী বিশ্বকোষে বহু দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ফার্নিতে বাসকালে তাঁহার *Dictionnaire Philosophique* রচিত হয়।

ভল্‌তেয়ার ইতিহাসের নূতন ব্যাখ্যা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইতিহাস রাজারাণীদের ও সৈন্যাধ্যক্ষদের কাহিনীমাত্র নহে, মূলতঃ তাহা যুগচেতনার ও মানবসত্তার অগ্রগমনের ইতিবৃত্ত।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

ভলিবল বলখেলা দ্র

ভল্লুক স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আমিষাশী (কারনিভোরা) বর্গের ফিস্সিপেদীয়া (Fissipedia) উপবর্গের অন্তর্গত ভল্লুক-গোত্রের (Family-ursidae) প্রাণী। ইহারা হাতে-পায়ে ধারালো নখবিশিষ্ট এবং শক্ত, ঘন, দীর্ঘ লোমে আবৃত। নিবিড় জঙ্গলে, পাহাড়ের ফাটলে বা গুহায় ইহাদের বাস। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি প্রবল। বৃক্ষারোহণে ইহারা খুব পটু। ভল্লুক হিংস্র না হইলেও ভীষণ বদ্‌রাগী ও মেজাজী; ইহাদের স্বভাবে নিঃস্পৃহা ও বেপরোয়াভাব লক্ষ করা যায়।

এদেশে সাধারণতঃ তিন রকমের ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়—হিমালয়ী কালো ভল্লুক, শ্লথ ভল্লুক (*Melursus ursius*) এবং পিঙ্গল ভল্লুক। হিমালয়ের চিরতুষার উচ্চস্তরে পিঙ্গল ভল্লুকের বাস।

ভল্লুক ফলমূল, সবজি, ঘাস, প্রভৃতি খায়; পিঙ্গল ভল্লুক উই, পিঁপড়ার ডিম এবং পোকামাকড়ও খাইয়া থাকে। মহুয়া ফল ও মধু ভল্লুকের খুব প্রিয়। ভল্লুককে সহজেই পোষ মানানো যায়; শ্লথ ভল্লুককে নানা রকম খেলা শিখাইয়া অনেকে ভালুক নাচ দেখাইয়া ব্যবসা করে।

ভল্লুকী একবারে ২-৩টি শাবক প্রসব করে। জন্মের পর কিছুদিন বাচ্চাদের চোখ বন্ধ থাকে। বড় না হওয়া পর্যন্ত ভল্লুকী শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ করে ও শিক্ষা দেয়।

অমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভস্মলোচন রাবণের অনুগত দুর্ধর্ষ রাক্ষস। সহস্র বৎসর-ব্যাপী কঠোর তপস্যার দ্বারা ভস্মলোচন ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। প্রথমে অমরত্বের বর প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে ব্রহ্মার নিকট হইতে 'যাহার মুখদর্শন করিব সেই ভস্ম হইবে' এই প্রার্থিত বর তিনি লাভ করেন। ভস্মীভূত হওয়ার ভয়ে স্ত্রী-পুত্র কেহই ইঁহার সমীপে বাস করিত না। ইঁহার রথ ছিল চর্মাবৃত এবং ইঁহার চক্ষুতে সর্বদা চর্মঠুলি থাকিত। বীরবাহুর সহিত ভস্মলোচন রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে বিভীষণের পরামর্শে রামচন্দ্র দর্পণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। রামচন্দ্রের বিনাশ কামনায় ভস্মলোচন নিকটে আসিয়া চোখের চর্মঠুলি খুলিলে রামচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে দর্পণ ধারণ করেন। দর্পণে নিজ মুখ দর্শন করিলে ভস্মীভূত হইয়া ভস্মলোচনের মৃত্যু ঘটে (কৃত্তিবাস রামায়ণ, লঙ্কাকান্ড। ৫৪)।

যূথিকা ঘোষ

ভাইয়া সাহেব গণপৎরাও দ্র

ভাইরাস ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব। সাধারণতঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহারা দৃষ্টিগোচর হয় না, ব্যাক্‌টিরিয়ার পক্ষে অনতিক্রম্য ছাঁকনির মধ্য দিয়া অনায়াসে নিঃসৃত হয় এবং রিকেট্‌সিয়ার ন্যায় কেবল জীবন্ত কোষের অভ্যন্তরে পরজীবী হিসাবে জীবনধারণ করিতে পারে। জীবকোষ-সংবলিত উপাদান ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে ভাইরাস উৎপাদন সম্ভব নয়। সংবেদনীয় প্রাণিদেহ ও ভ্রূণ-সংবলিত অণ্ডের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়; নানা প্রকার কোষাশ্রয়ী উৎপাদকের (টিস্যু-কাল্‌চার সিস্‌টেম) সাহায্যেও কৃত্রিমভাবে বংশবৃদ্ধি করানো সম্ভব। একটি ভাইরাসের ব্যাস ০·০১—০·৩ মাইক্রন হইতে পারে (১ মাইক্রন = ১/১০০০ মিলিমিটার) ইলেক্‌ট্রন-নির্ভর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাস দৃষ্টিগোচর হয়; ইহার সাহায্যে ভাইরাসের চিত্রগ্রহণ ও পরিমাপন সম্ভব। ভাইরাস সকল প্রকার জীব-

জন্তু, কীটপতঙ্গ, উদ্ভিদ, এমনকি জীবাণুর দেহও আশ্রয় করিতে পারে; শেষোক্ত ভাইরাসদের 'ব্যাক্‌টিরিওফাজ' বলা হয়।

ভাইরাসের দেহের গঠন অত্যন্ত সরল—দেহসার দ্বারা নির্মিত একটি বহিরাবরণ এবং আভ্যন্তরীণ নিউক্লিইক অ্যাসিড। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও প্রভৃতি ভাইরাসের অভ্যন্তরে আর. এন. এ. (রাইবোনিউক্লিইক অ্যাসিড) এবং অ্যাডেনো ভাইরাস, বসন্ত রোগের ভাইরাস প্রভৃতির দেহে ডি. এন. এ. (ডেস্‌অক্সি রাইবোনিউক্লিইক অ্যাসিড) বর্তমান।

বসন্ত, হাম, ডেংগু, পীতজ্বর, হার্পিস, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, সাধারণ সর্দি, মাম্‌প্‌স, পোলিও রোগ, জলাতঙ্ক, মস্তিষ্কের ও মস্তিষ্কঝিল্লীর কয়েকপ্রকার প্রদাহ, যকৃতের সংক্রামক প্রদাহ প্রভৃতি নানা ব্যাধির সহিত ভাইরাসের যোগসূত্র নিঃসন্দেহে নিরূপিত হইয়াছে। সংবেদনীয় জীবকোষ আক্রমণকালে প্রথমে ভাইরাস আক্রান্ত কোষের প্রাচীরে সংলগ্ন হয়। অতঃপর ভাইরাসের আভ্যন্তরীণ নিউক্লিইক অ্যাসিড ও সামান্য পরিমাণে দেহসার আক্রান্ত কোষে ঢুকিয়া কোষস্থ সামগ্রীর সহিত মিশ্রিত হয়। এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে আক্রান্ত কোষে প্রবিষ্ট ভাইরাসের অবস্থিতির কোনওরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না; ইহাকে গ্রহণ-কাল (এক্‌লিপ্‌স্‌-ফেজ) বলে। আক্রান্ত কোষের সকল জৈব ক্রিয়া ভাইরাসের দেহের উপযোগী বিশেষ প্রকার নিউক্লিইক অ্যাসিড ও দেহসার উৎপাদনে প্রযুক্ত হয়। এই দুইটি সামগ্রী স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইয়া পরে একত্র হয়। এইভাবে পূর্ণাংগ ভাইরাসের সৃষ্টি হয়। প্সিত্তাকোসিস লিম্‌ফোগ্রানুলোমা (*Psittackosis lymphogranuloma*) জাতীয় বৃহদাকার ভাইরাসের প্রজনন ঘটে দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে; অপর সকল ভাইরাসের জীবন-বৃত্তে গ্রহণকাল দেখা যায়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির ভাইরাস সৃষ্টিমাত্রই আক্রান্ত কোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়; প্সিত্তাকোসিস, পোলিওমাইলাইটিস প্রভৃতি ভাইরাসের ক্ষেত্রে ব্যাক্‌টিরিওফাজের ন্যায় আক্রান্ত কোষের অভ্যন্তরে নবসৃষ্ট ভাইরাসের সংখ্যাধিক্য ঘটিতে থাকে এবং পরে আক্রান্ত কোষটি সহসা ফাটিয়া গিয়া সমুদয় ভাইরাস বহির্গত হয়।

দ্র T. M. Riverrs & F. L. Horsfall, *Viral and Rickettsial Infections of Man*, London, 1959.

পান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাওয়াইয়া উত্তরবংগে প্রচলিত লোকগীত। ভাব শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। অনেকে ইহাকে পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালীর সমকক্ষ মনে করেন। কিন্তু ভাটিয়ালীর মত ভাওয়াইয়া ছন্দবিহীন গীত নহে। নরনারীর প্রেমই ইহার উপজীব্য।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ভাকরা-নাংগাল পরিকল্পনা ভারতের সর্ববৃহৎ বহুমুখী নদী প্রকল্প। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান এই তিনটি রাজ্য ইহার শরিক।

১. ভাকরা বাঁধঃ পাঞ্জাবের জলন্ধর বিভাগের হোসিয়ারপুর জেলায় ভাকরা নামক স্থানে (৩১°২৪′ উত্তর, ৭৬°২৮′ পূর্ব) শতদ্রু নদীর উপর প্রায় ২২৬ মিটার উচ্চ ও ৫১৯ মিটার দীর্ঘ একটি বাঁধ তৈয়ারি করিয়া ১৬৪ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বিশাল জলাধার ('গোবিন্দসাগর') সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাঁধ (highest straight gravity dam), নীচের দিকে ২০৭ মিটার ও উপরের দিকে প্রায় ১০ মিটার প্রশস্ত। বাঁধের নীচে নদীর পূর্ব কূলে (East Bank) একটি ও পশ্চিম কূলে (West Bank) একটি — দুইটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

২. নাংগাল বাঁধঃ ভাকরার প্রায় ১৩ কিলোমিটার দক্ষিণে নাংগালে (৩১°১৯′ উত্তর, ৭৬°২৬′ পূর্ব) শতদ্রুর উপরে একটি অপসারণ বাঁধ বাঁধিয়া নদীটিকে নাংগাল জলবিদ্যুৎ প্রজনন খালের (hydel channel) মধ্যে প্রবেশ করানো হইয়াছে। বাঁধটির উচ্চতা ২৯ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩৯২ মিটার, প্রস্থ ১২০ মিটার ও সর্বনিম্ন ভিত নদীর নীচে ১৫ মিটার পর্যন্ত গিয়াছে। নাংগাল বাঁধ ভাকরার পরিপূরক হিসাবে নির্মিত হয়। জলবিদ্যুৎ প্রজনন খালটি নাংগাল হইতে রূপার পর্যন্ত ৬৪ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই খালের উপর গাংগুয়ালে একটি ও কোটলায় একটি—দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

৩. ভাকরা জলসেচ খালঃ জলসেচের উদ্দেশ্যে ১০৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রধান খাল ও ৩৩৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ শাখা খাল কাটা হইয়াছে। ইহার দ্বারা পাঞ্জাবে, হরিয়ানায় ও রাজস্থানে প্রায় ২৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেচের ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সাড়ে আট লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ ভাকরা পশ্চিম কূলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাদে প্রকল্পটির প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি এইরূপঃ ক. গাংগুয়াল—৭৭০০০ কিলোওয়াট; খ. কোটলা—৭৭০০০ কিলোওয়াট; গ. ভাকরা পূর্ব কূল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (৫ ইউনিট)—৪৫০০০০ কিলোওয়াট; মোট ৬০৪০০০ কিলোওয়াট। ঘ. ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন ভাকরা পশ্চিম কূল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (৫ ইউনিট)—৬০০০০০ কিলোওয়াট। সর্বসমেত মোট সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১২০৪০০০ কিলোওয়াট। এই

ক্ষমতার কার্যকারিতা নির্ভর করে বিপাশা-শতদ্রু যোজকের (link) দ্বারা বিপাশার জল গোবিন্দসাগরে আনয়নের উপর।

ভাকরার প্রথম পরিকল্পনা করেন পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব গভর্নর সেট লুইস ডেন (১৯০৮ খ্রী)। কিন্তু সিন্ধু প্রদেশ হইতে বাধা আসায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয় নাই। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হইয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয় (ভাকরা পশ্চিম কূল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বাদে)। এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১৭৫ কোটি টাকা। প্রায় ৬০ কোটি টাকার একটি স্বতন্ত্র প্রকল্প গ্রহণ করিয়া ভাকরা পশ্চিম কূল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নির্মাণকার্য ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়।

দ্র Government of India Publications Division, *Our River Valley Projects*, Delhi, 1961.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সলিলকুমার চৌধুরী

ভাগবত শ্রীমদ্‌ভাগবত দ্র

ভাগলপুর বিহার রাজ্যের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। শহরটি (২৫°১৫′ উত্তর ও ৮৭° পূর্ব) গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৪২৪ কিলোমিটার। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৩০·৯° সেন্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ ১৯·১° সেন্টিগ্রেড। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০৪৩·২ মিলিমিটার।

ভাগলপুর শব্দের অর্থ সৌভাগ্যের শহর বা শরণার্থীদের শহর। আকবর-নামাতে ভাগলপুর শহরের উল্লেখ দেখা যায়, আইন-ই-আকবরীতে ভাগলপুর মহল ও পরগনার শহর হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল ইংরেজদের শাসনাধীনে আসে।

শহরটি ভাগলপুর বিভাগ ও জেলার প্রধান কার্যালয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পৌরশাসনের অন্তর্গত হয়। শহরের আয়তন ২৮·৭২ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১৪৩৮৫০ (১৯৬১ খ্রী)। শিক্ষিতের সংখ্যা ৬৩৭০০।

ভাগলপুর অঞ্চলের নীচু জমি অতিশয় উর্বর। এখানে গম, যব, ভুট্টা, সরিষা ও আখের চাষ হয়। ধান চাষ ব্যাপক। ভাগলপুর ভাল আমের জন্য বিখ্যাত। এখানকার ল্যাংড়া, গুলাবখাস প্রভৃতির সুনাম আছে। ইহা ছাড়া এখানে প্রচুর পরিমাণে সবজি ও মাছ পাওয়া যায়।

রেশম ও কার্পাস বস্ত্র বয়নের কেন্দ্র হিসাবে ভাগলপুর সুপরিচিত। রেশম বয়ন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আকারে গৃহে পরিচালিত হয়। এখানকার প্রস্তুত অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে তসর ও বাফতার কাপড়, নীল, ঘি, লৌহ ও পিতলের তৈজসপত্র, লাক্ষার বালা, চুড়ি ইত্যাদি প্রধান।

ভাগলপুর জেলার একটি প্রধান ব্যবসায় কেন্দ্র ভাগলপুর শহর। সড়কপথে ইহা বড় বড় শহরের সহিত যুক্ত, মুঙ্গের-দুমকা সড়কপথ ইহার উপর দিয়াই গিয়াছে। রেলপথে কলিকাতা, পাটনা, বেনারস প্রভৃতিও শহরের সহিত যুক্ত। হাওড়া-কিউল (সাহেবগঞ্জ লুপ) রেলপথে ভাগলপুর জংশন রেলস্টেশন। আরও দুইটি রেলপথের সহিত ভাগলপুর সংযুক্ত—ভাগলপুর-মন্দার হিল রেলপথ ও থানাবিহপুর-ভাগলপুর রেলপথ। গঙ্গা নদী নৌবহনযোগ্য। স্টীমার ও নৌকাপথে প্রচুর লোক যাতায়াত করে। ভাগলপুরে বিমানপোত নামিবার ব্যবস্থা আছে।

এখানে ৬টি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। ইহা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, কৃষি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, কলাকেন্দ্র, সংগীত বিদ্যালয় প্রভৃতি রহিয়াছে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাতন জুবিলী হাসপাতালও প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভাগলপুরে সুশাসক অগস্টাস ক্লিভল্যাণ্ডের স্মরণার্থে দুইটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত আছে। শহরের সন্নিকটে চম্পানগরে জৈনদের দুইটি বিখ্যাত মন্দির আছে। ১টি মন্দির অষ্টাদশ শতকে জগৎ শেঠ দ্বারা নির্মিত। এই স্থানে ফকির মকদুম শাহের সমাধি আছে। শহরের নিকটে কর্ণগড় পর্বতের গুহাদি উল্লেখযোগ্য।

দ্র P. C. Roychoudhury, *Bihar District Gazetteer, Bhagalpur*, Patna, 1962; The *Imperial Gazetteer of India*, Vol. 8, Oxford, 1908,

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভাগীরথী গঙ্গানদীর একটি শাখা মুর্শিদাবাদ জেলায় (২৪°৩৫′ উ ও ৮৮°৫′ পূ) বহির্গত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত। ছোটনাগপুর মালভূমির পূর্ব প্রান্তের কয়েকটি নদী আসিয়া ইহাতে পতিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর ইহা নদিয়া ও বর্ধমান জেলার সীমানা হিসাবে পরিগণিত। প্রায় ২২৪ কিলোমিটার প্রবাহিত হওয়ার পর জলঙ্গীর সহিত (২৩°২৫′ উ ও ৮৮°২৪′ পূ) মিলিত হইয়া হুগলি নাম ধারণ করিয়াছে ('হুগলি' দ্র)। হিন্দুদের নিকট ইহা অতি পবিত্র নদী এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহাই গঙ্গানদীর প্রধান শাখা ছিল। ভগীরথের দ্বারা আনীত বলিয়া নদীটির নাম ভাগীরথী বলিয়া অনেকে মনে করেন। পূর্বে বাংলাদেশের প্রায় সব রাজধানীগুলি (গৌড়, পাণ্ডুয়া, নবদ্বীপ, সাতগাঁ) ভাগীরথীর তীরেই অবস্থিত ছিল। তখন ইহা যাতায়াতের প্রধান পথ হিসাবে পরিগণিত হইত।

ভাগীরথী ইহার পূর্ব পথ পরিত্যাগ করিয়াছে;

নদীটি বর্তমানেও পথ পরিবর্তন করে। প্রধান শাখাগুলির মধ্যে আছে বাঁশলোই, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, অজয় ও রূপনারায়ণ। ইহার তীরে অবস্থিত প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, কাটোয়া এবং নবদ্বীপ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাগীরথীর জলপ্রবাহের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ও পলিমাটি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফারাক্কার নিকট একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। 'ফারাক্কা বাঁধ' দ্র।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. 8, Oxford, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী
সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভাজা মহারাষ্ট্রের পুনা জেলার একটি গ্রাম (১৮°৪৪′ উত্তর এবং ৭৩°২৯′ পূর্ব)। এই স্থানে ১৮টি প্রাচীন শৈলখাত বৌদ্ধগুহা আছে। গুহাগুলি গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে পাহাড়ের উপর (১২০ মিটার) অবস্থিত। উত্তর প্রান্ত হইতে শুরু করিলে প্রথম গুহাটি স্বাভাবিক পার্বত্য কন্দরকে সম্প্রসারিত করিয়া নির্মিত। ইহার পর দশটি সাধারণ কুঠরী। দ্বাদশ গুহাটি একটি চৈত্যগৃহ এবং ভারতীয় শৈলখাত স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। নিকটবর্তী 'কার্লা'-র চৈত্যগৃহ ('কার্লা' দ্র) অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট এবং গঠনপ্রকৃতি ও অলংকরণ সরলতর। স্থাপত্যে কাষ্ঠশিল্পের প্রভাব স্পষ্ট ('বেদসা' দ্র)। গুহাটি শূর্পাকার এবং দৈর্ঘ্যে ১৭·৭৫ মিটার এবং প্রস্থে ৮·৭০ মিটার। ছাদের নীচের পিঠ অর্ধবৃত্তাকার। অভ্যন্তরে ২৭টি ঈষৎ হেলানো অষ্টকোণা-কৃতি স্তম্ভ বিন্যস্ত। অধিকাংশ স্তম্ভ অনলংকৃত, মাত্র কয়েকটিতে ত্রিরত্ন, চক্র ইত্যাদি বৌদ্ধ পূত চিহ্ন উৎকীর্ণ। নাভিস্থলে উপাসনার নিমিত্ত একটি শৈলখাত স্তূপ। ইহার ভূমির উপরকার ব্যাস ৩·৩ মিটার এবং অণ্ড ১·২ মিটার উচ্চ। অণ্ডের উপরিস্থিত হর্মিকা দুই থাকবিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে প্রস্তরনির্মিত। গুহার দ্বারের উপরিভাগে একটি বিশালাকার চৈত্যগবাক্ষ। সম্ভবতঃ সম্মুখভাগ পূর্বে কাঠের জালিদ্বারা আবৃত ছিল কিন্তু বর্তমানে চৈত্যগৃহের অভ্যন্তর বাহির হইতে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়।

এই চৈত্যগৃহটির নির্মাণকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতক ('গুহামন্দির' দ্র)। পিটলখোরার কয়েকটি গুহায় সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে উদ্ঘাটিত তথ্য এই অনুমান সমর্থন করে। আকার, আয়তন ও গঠনপ্রণালী পর্যালোচনা করিয়া অনেকেই ভাজার চৈত্যগৃহটিকে পশ্চিমভারতীয় শৈলখাত স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া মনে করেন।

এই চৈত্যগৃহ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত একটি শৈলখাত প্রাচীন বিহারও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিহারের বারান্দায় উৎকীর্ণ ভাস্কর্যনিদর্শন বহুল আলোচিত এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের বিবর্তনের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। একটি চিত্র ঐরাবতে আরূঢ় ইন্দ্রের এবং আর একটি রথারূঢ় সূর্যের বলিয়া অনুমান করা হয় ('ভাস্কর্য, ভারতীয়' দ্র)।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. 8, Oxford, 1908; J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, London, 1910; A. K. Coomaraswamy, *History of Indian and Indonesian Art*, London, 1927; Percy Brown, *Indian Architecture*, Vol. I, Bombay, 1942; M. N. Deshpande, The Rock-cut Caves of Pitalkhora in the Deccan, *Ancient India*, No. 15, 1959.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভাটপাড়া পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার একটি শহর (২২°৫১′ উত্তর, ৮৩°২৩′ পূর্ব)। ভাটপাড়া (বা ভট্টপল্লী) কলিকাতার ৩০ কিলোমিটার উত্তরে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নৈহাটি, দক্ষিণে ব্যারাকপুর ও পূর্বে জলাভূমি। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়া পৌরশাসনের অধীনে আসে। ভাটপাড়া পৌর অঞ্চলের আয়তন প্রায় ১৪ বর্গকিলোমিটার; জনসংখ্যা ১৪৭৬৩০ (১৯৬১ খ্রী)।

অনেকের মতে ভট্টপল্লী (অর্থাৎ ভট্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিবাস) হইতে ভাটপাড়া নাম হইয়াছে।

১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত মনসামঙ্গল কাব্যে ভাটপাড়ার উল্লেখ আছে। আইন-ই-আকবরীতেও ভাটপাড়ার নাম পাওয়া যায়। টোডরমল্ল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়াকে সাতগাঁও রাজস্ব পরগনার অন্তর্ভুক্ত করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নারায়ণ ঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভাটপাড়ায় দুর্লভরাম হালদারের আনুকূল্যে একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভাটপাড়ায় বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের গোড়াপত্তন করেন। ভাটপাড়া পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র। ভাটপাড়ার সর্বপ্রথম চটকল কাঁকিনাড়া জুট মিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখন এইখানে মোট ১৩টি চটকল বর্তমান। ইহা ছাড়া টিটাগড় পেপার মিল্‌স, ন্যাশন্যাল ইন্‌সু-লেটেড কেব্‌ল কোম্পানি, ন্যাশন্যাল পাইপ্‌স অ্যান্ড টিউব্‌স কোম্পানি, ন্যাশন্যাল রোলিং অ্যান্ড স্টিল রোপ্‌স, ন্যাশন্যাল কয়েল্‌স অ্যান্ড ফিউজ কোম্পানি প্রভৃতি নানা কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পাধি-

কারের তত্ত্বাবধানে বহু ক্ষুদ্র শিল্প এখন এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাটপাড়ার সহিত কলিকাতার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ; ইহাকে বৃহত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ধরা হয়। উত্তর কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের প্রধান রাস্তা ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডের সহিত ভাটপাড়ার প্রধান রাস্তা সংযুক্ত। একটি বাসরুটের ৪২টি বাস দৈনিক কাঁচড়াপাড়া ও ব্যারাকপুরের মধ্যে যাতায়াত করে। ভাটপাড়া অঞ্চলে ৬টি ডাকঘর আছে। ভাটপাড়ায় একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আছে। ভাটপাড়ায় একাধিক প্রাচীন মন্দির আছে। বীরেশ্বর ন্যায়ালংকার মহাশয় ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজের বসত বাটিতে দুইটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই এই অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির।

দ্র *Annual Administrative Report of Naihati Municipality* 1932-33; *Annual Administrative Report of Bhatpara Municipality* 1958-59.

যূথিকা চট্টোপাধ্যায়

ভাটিয়ালী পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতির প্রকার বিশেষ। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায় বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশুদ্ধ ভাটিয়ালীতে তাল থাকে না। কয়েকটি কথা একসংগে উচ্চারণ করিবার পর একটা লম্বা একটানা সুরের প্রয়োগ ইহার বিশেষত্ব। সাধারণতঃ খোলামাঠে রাখালের মুখে বা নদীর বুকে মাঝি মাল্লাদের কণ্ঠে এই গান শোনা যায়। যে বিশেষ পরিবেশের মধ্যে গায়কের দৈহিক কর্মে কোনও ছন্দ থাকে না, সেই অবস্থায় ভাটিয়ালী গাওয়া হয় বলিয়াই ইহা ছন্দপ্রধান নহে। গানের কথা বিচার করিলে দেখা যায়, গরুর রাখাল আর মহিষের রাখালের ভাটিয়ালীতে প্রভেদ আছে। বিষয় এবং অবস্থা ভেদে ভাটিয়ালীতে অনেক শ্রেণী আছে।

একদিক দিয়া ভাটিয়ালীকে পূর্ববঙ্গের বহুবিধ লোকগীতির ভিত্তিস্বরূপ ধরা যায়। রূপকথায় যে গান গাওয়া হয় তাহার গীতিরীতি ভাটিয়ালীর অনুরূপ। অনেক মেয়েলী গানেও ভাটিয়ালীর আভাস আছে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ভাণ্ডারকর, রামকৃষ্ণ গোপাল (১৮৩৭—১৯২৫ খ্রী) ভারতবিদ্যাপথিক ও সমাজসংস্কারক। জন্ম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই মহারাষ্ট্রের মালোয়া নামক স্থানে। শিক্ষা রত্নগিরি জেলা বিদ্যালয়ে ও বোম্বাইয়ের এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজে। ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃত লইয়া তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন (১৮৬৬ খ্রী)। কিছুকাল হায়দরাবাদে (সিন্ধু প্রদেশে) ও রত্নগিরি জেলা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার পর তিনি এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজে সংস্কৃতাধ্যাপক (১৮৬৭—৭২ খ্রী) ও পুনা ডেকান কলেজে প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক (১৮৮২—৯৩ খ্রী) রূপে অধ্যাপনা করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৮৯৩—৯৫ খ্রী), কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯০৩ খ্রী) এবং বোম্বাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি (১৯০৪ খ্রী) ছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর 'উইল্‌সন ফিলোলজিক্যাল লেক্‌চার্‌স' প্রদান করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনাতে 'আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন'-এ যোগ দেন। তিনি বহু বৈদেশিক প্রাচ্যবিদ্যা সংস্থার সম্মানজনক সদস্য ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ গবেষণামূলক প্রবন্ধ বোম্বাইয়ের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং 'ইণ্ডিয়ান অ্যান্টিকোয়েরি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ডঃ বুল্যের-এর বিখ্যাত ভারতবিদ্যা কোষগ্রন্থে ভাণ্ডারকরের প্রবন্ধ স্থান লাভ করে।

তিনি প্রার্থনা সমাজের দ্বারা পরিচালিত নানা সমাজসংস্কারমূলক প্রগতিশীল আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. এবং কে. সি. আই. ই. খেতাব দান করেন।

তাঁহার প্রধান রচনাবলী ঃ ১. সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদনা (ছয় খণ্ড); ২. মালতীমাধব (সম্পাদনা); ৩. 'আর্লি হিস্টরি অফ দ্য ডেকান' (১৮৮৪ খ্রী); ৪. 'বৈষ্ণবিজ্‌ম্‌, শৈবিজ্‌ম্‌ অ্যান্ড মাইনর রিলিজিয়াস সিস্টেম্‌স' (১৯১৩ খ্রী); ৫. 'এ পিপ ইন্‌টু দ্য আর্লি হিস্টরি অফ ইণ্ডিয়া' (১৯২০ খ্রী)। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সমগ্র রচনাবলী ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

দ্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস, কলিকাতা, ১৯১৫; *Eminent Orientalists*, Madras, 1922; V. G. Paranje, 'R. G. Bhandarkar, An Appreciation', *Annals of the Bhandarkar Institute*, Vol. VI, Poona, 1926.

দেবেশ রায়

ভাতখণ্ডে, বিষ্ণু নারায়ণ (১৮৬০—১৯৩৬ খ্রী) প্রথিতযশা সংগীতজ্ঞ, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে নামে পরিচিত। বোম্বাই শহরে বালকেশ্বর নামক স্থানে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ আগস্ট জন্ম। কলেজে অধ্যয়নকালে গোপাল গিরি বল্লভদাস দামুলজীর নিকট তিনি সেতার শিক্ষা করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. এবং ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের

পাশী সম্প্রদায় কর্তৃক স্থাপিত 'গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী' নামক একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হন এবং দীর্ঘকাল ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি রাওজী-বুয়া বোল্‌বাউগ্‌কের নামক একজন ধ্রুপদীর নিকট বহু ধ্রুপদ শিক্ষা করেন এবং জয়পুরের আশাক আলী খাঁর কাছ হইতেও বহু ধ্রুপদ সংগ্রহ করেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের এবং উত্তর ভারতের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সংগীতশাস্ত্রের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার সংগীতজ্ঞগণের সহিত পরিচিত হন এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা জন্মে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁহার উদ্যোগে বরোদায় প্রথম নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন বিশেষ সার্থকতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী'র সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটে এবং তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তাঁহার উপদেশক্রমে বরোদার সংগীত বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হয় এবং ইহার সহিত বরোদার সভাগায়ক ফৈয়াজ খাঁ সহ আরও বহু বিখ্যাত ওস্তাদ যুক্ত হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহায়তায় গোয়ালিয়রের 'মাধব সংগীত মহাবিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌ শহরে 'ম্যারিস কলেজ অফ হিন্দুস্তানী মিউজিক' স্থাপিত হয় এবং তিনি ইহার শিক্ষাক্রম রচনা করেন ও পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যারিস কলেজ হইতে 'সংগীত' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন এবং তিন বৎসর রোগভোগের পর ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বর্তমান রাগসংগীতকে দশটি প্রধান ঠাটে বিধিবদ্ধ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ বিশেষ স্বরের প্রয়োগ অনুযায়ী রাগগুলিকে পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ পর্যায়ে ভাগ করেন। প্রত্যেক রাগের বিশেষ লক্ষণ-নির্দেশক স্বরসন্নিবেশ বা 'পকড়'-কে তিনি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করেন। তাঁহার মতানুযায়ী যে সব রাগ কয়েকটি প্রধান রাগের সহিত যুক্ত সেগুলি সেই রাগসমূহের অঙ্গ বলিয়া গণ্য; যেমন—কানাড়া অঙ্গ, মল্লার অঙ্গ প্রভৃতি। তিনি প্রচলিত হিন্দুস্তানী ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদ্রা প্রভৃতি পর্যায়ের বহু গানের মূল সুর সংগ্রহ করিয়া সেগুলির স্বরলিপি প্রকাশিত করেন।

তাঁহার লিখিত এবং প্রকাশিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্‌', 'অভিনবরাগমঞ্জরী', 'হিন্দুস্তানী সঙ্গীতপদ্ধতি' এবং 'ক্রমিক পুস্তকমালিকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র S. N. Ratanjankar, *Pandit Bhatkhande*, National Book Trust, New Delhi, 1967.

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ভাদু উৎসব ভাদু বাংলার অন্যতম লৌকিক দেবী। প্রধানতঃ পুরুলিয়া, পশ্চিম বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলার কিয়দংশে ভাদুদেবীর পূজা হয়। পূজার কাল সাধারণতঃ ১ ভাদ্র হইতে ভাদ্রসংক্রান্তি পর্যন্ত। ভাদু পূজায় প্রধান অংশগ্রহণকারী বাগ্‌দী, বাউরি, ডোম প্রভৃতি জাতি ও আদিবাসী সমাজের মেয়েরা, বিশেষতঃ কুমারীরা। ক্ষেত্রবিশেষে ভাদু উৎসবে বারাঙ্গনাদের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

ভাদুর মৃৎমূর্তি হেমবর্ণা, সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি, দণ্ডায়মানা বা পদ্মের উপর উপবিষ্টা। মূর্তির হাতে মোণ্ডা, সন্দেশ, পান, পদ্মফুল বা ধানের শীষ রাখা হয়। পুরোহিতবিহীন ও শাস্ত্রমন্ত্রহীন ভাদু অনুষ্ঠান সমস্ত ভাদ্র মাস ধরিয়া মূলতঃ লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। শেষদিন সমস্ত রাত্রি উদ্দাম নৃত্য-গীতে জাগরণ অনুষ্ঠিত হয়। জাগরণে সমবেত নরনারী অবাধ মেলামেশা করে। জাগরণের পরের দিন ভাদু প্রতিমার বিসর্জন হয়। ঐ দিন বাউরি সম্প্রদায় ভাদুমূর্তি লইয়া শবযাত্রার অনুরূপ অনুগমন করে।

এইরূপ লোককাহিনী প্রচলিত যে, পঞ্চকোটের এক রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরীর (ডাকনাম 'ভাদু') অকালমৃত্যু হইলে তাঁহার স্মৃতিপূজা রূপে ভাদু উৎসব প্রবর্তিত হয়। উৎসবের কাল ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে মনে হয়, ভাদু অনুষ্ঠান মূলতঃ উর্বরতা-সহায়ক কৃষি-সম্পর্কিত লৌকিক উৎসব।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকসাহিত্য, ১ম ও ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৯ ও ১৩৭২ বঙ্গাব্দ; Tushar Chattopadhyay, 'Bhadu—A Folk Godling', *Bulletin of the Cultural Research Institute*, Vol. VII, Calcutta, 1968.

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ভানুমতী ইন্দ্রজাল দ্র

ভাবনগর ভাবনগর বা ভাওনগর গুজরাত রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। শহর ও বন্দরটি ভারতে বর্তমান গুজরাত রাজ্যে খম্বাত উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত। উহার স্থানাঙ্ক ২১°৪৫′ উত্তর এবং ৭২°১০′ পূর্ব। নিরাপদ ও অগভীর জলপথে ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে শহর ও বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর সাহেব ভাও সিংহজী। মারাঠা আক্রমণের ভয়ে ভাবনগর করদ রাজ্যের রাজধানী সিহোর হইতে ভাবনগরে স্থানান্তরিত হয়।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এর তখনকার ইংরেজ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব হয় ও কালে রাজধানী ও বন্দর শ্রীসম্পন্ন হয়।

বর্তমানে ভাবনগর শহরটি গুজরাত রাজ্যের ভাবনগর জেলার সদর শহর। আয়তন ২৩·৫ বর্গ কিলোমিটার। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩৭·৮ সেণ্টিগ্রেড ও ১৭·১ সেণ্টিগ্রেড। লোকসংখ্যা ১৭১০৩৯ (১৯৬১ খ্রী)। অধিবাসীদের মধ্যে ৭২% হিন্দু, ১৯% জৈন, ৮% মুসলমান এবং অবশিষ্ট ১% খ্রীষ্টান, পারসীক ও অন্যান্য সম্প্রদায়। অধিবাসীদের মধ্যে অদ্যাপি রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

বর্তমানে ভাবনগর শহর শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ। বস্ত্রশিল্প, রেয়নশিল্প, ইস্পাতশিল্প, বনস্পতিশিল্প প্রধান। কুটিরশিল্পের মধ্যে লাক্ষার কাজ ও খেলনা তৈয়ারির কাজ উল্লেখযোগ্য। ভাবনগরে নির্মিত কাঠের সিন্ধুকের ও গরুর গাড়ির চাকার নাম আছে। শহর ও শহরতলিতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুজরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মহাবিদ্যালয়টি কার্যকর রহিয়াছে। শহরে উল্লেখযোগ্য দুইটি হাসপাতাল আছে। ভারত সরকারের অন্যতম ল্যাবরেটরী সেণ্ট্রাল সল্ট ও মেরিন-কেমিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটটি লবণ গবেষণার জন্য স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবনগর বন্দর উপকূলীয় ও বহির্দেশীয় যোগাযোগ সাধনের জন্য উল্লেখযোগ্য। এই বন্দর হইতে তুলা, কার্পাস-বস্ত্র, মিছরি, পাগড়ি ও বাক্স রপ্তানি হয়। আমদানি সামগ্রীর মধ্যে খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, ঔষধ, যানবাহন ও তৈল প্রধান।

ভাবনগর শহর ও বন্দর পশ্চিম রেলপথ ও বিমান-পথে গুজরাত রাজ্যের সহিত যুক্ত।

শহরে একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থিত তক্তেশ্বর মহাদেও-এর মন্দির ও একটি হ্রদে অবস্থিত গঙ্গা ছত্রী মার্বেল মন্দিরটি প্রধান দর্শনীয়। 'ইন্দো-স্যারাসেনিক' স্থাপত্যে গঠিত আলফ্রেড উচ্চ বিদ্যালয়ের সৌধটিও অন্যতম দর্শনীয় বস্তু।

দ্র R. K. Trivedi, *Census* 1961, *Gujarat District Census Handbook*, Bhavnagar District, Ahmedabad, 1964.

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ভাবা, হোমি জাহাঙ্গীর (১৯০৯—১৯৬৬) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ, মৃত্যু ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। বোম্বাইয়ের এক ধনী পার্শী পরিবারে হোমি ভাবার জন্ম হয়। তিনি বোম্বাইয়ের এলফিন্‌স্টোন কলেজ ও ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্‌স-এ শিক্ষালাভ করেন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী নেন। ইহার পর তিনি ইংল্যাণ্ডের কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ট্রিপোস উপাধি লাভ করেন। ইহার পর তিনি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার চর্চায় মন দেন। ১৯৩২—১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জুরিখে পাউলি (W. Pauli) এবং রোমে ফের্মি (E. Fermi)-র সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহাজাগতিক রশ্মি-সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণা কাস্‌কেড থিওরি অফ কস্‌মিক রে শাওয়ার্‌স (Cascade Theory of Cosmic Ray Showers) প্রকাশ করেন অধ্যাপক হাইট্‌লারের সহযোগিতায়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ব্যাংগালোরের ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অফ সায়েন্‌স-এ প্রথমে পদার্থবিদ্যার রীডার ও পরে প্রোফেসার-এর পদ অলংকৃত করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের টাটা ইন্‌স্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ-এর পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় পরমাণুশক্তি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভাবা তাহার সভাপতি হন। তিনি ভারতীয় পরমাণুশক্তি বিভাগের সচিব (Secretary)-ও ছিলেন। বোম্বাইয়ের নিকট ট্রম্বে-তে ভারতীয় পরমাণুশক্তি গবেষণাকেন্দ্র ভাবার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে অচিরেই ভারতে পরমাণুশক্তির প্রসার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরমাণু-শক্তি-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং ইহার জন্য প্রয়োজনীয় নানা আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং কারিগরী-বিদ্যা যাহাতে ভারতেই পাওয়া সম্ভব হয় তাহার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে কয়েকটি পরমাণুচুল্লী তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন কানাডার সহযোগিতায়। ভারতের বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে জেনিভায় প্রথম পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন হয় এবং ইহার সভাপতিত্ব করেন ভাবা। তিনি পরে ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি-র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হন। ১৯৬৬ খ্রী এই কমিটির ভিয়েনায় একটি সভায় যোগদানের জন্য যাইবার পথে আল্‌প্‌স পর্বতের মণ্ট ব্ল্যাংক শিখরে বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

দেশে বিদেশে তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন। দেশে বিদেশে ছোট বড় বহু বৈজ্ঞানিক সংস্থার তিনি সভাপতি ছিলেন। লণ্ডন, কেম্‌ব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাম্‌স প্রাইজ ও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটির হপ্‌কিন্‌স প্রাইজ লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'পদ্মভূষণ' হন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মানার্থে ট্রম্বের পরমাণু শক্তি গবেষণাগারটির নতুন নামকরণ হইয়াছে—ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার।

মুক্তিসাধন বসু

ভামতী আচার্য শংকরের শারীরক ভাষ্যের বাচস্পতি-মিশ্রকৃত টীকার নাম ভামতী। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতির আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দী। তিনি ষড়্দর্শনের টীকাকার এবং ভামতীই তাঁহার মনীষার সর্বোত্তম নিদর্শন।

শাংকর ভাষ্যের যথাযথ বোধের জন্য ভামতী নিতান্ত অপরিহার্য গ্রন্থ। বাচস্পতি শাংকর মতই দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছেন, তথাপি বহুস্থলে অন্যান্য অদ্বৈতবাদী আচার্যগণের সহিত তাঁহার মতপার্থক্য বিদ্যমান। বাচস্পতি প্রধানতঃ প্রতিবিম্ববাদী।

ভামতীর বহু টীকার মধ্যে অমলানন্দকৃত ভামতী-কল্পতরু এবং অপ্যয্য দীক্ষিত কৃত কল্পতরুপরিমল সুপ্রসিদ্ধ। আভোগ এবং শাস্ত্রদর্পণও ভামতীচর্চায় উল্লেখযোগ্য।

দ্র রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেদান্তদর্শনম্, কলিকাতা, ১৮৪৩ শক; Surendranath Dasgupta, *A History of Indian Philisophy*, Vol II, Cambridge, 1932.

ভারতচন্দ্র রায় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি। পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ১১১৯ বঙ্গাব্দে (১৭১২ খ্রী) আধুনিক হাওড়া জেলার সীমান্তে ভূরশুট পরগনায় পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্ম। মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে ১১৬৭ বঙ্গাব্দে (১৭৬০ খ্রী) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতচন্দ্রের জীবন ঘটনাবহুল। ভাগ্য-অন্বেষণে তাঁহাকে নানা স্থানে পর্যটন করিতে হইয়াছিল। তিনি ফারসী ভাষায় এবং সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে সবিশেষ অধিকার অর্জন করেন। নীলাচলে উদাসীনভাবে দেবদর্শন ও শাস্ত্র-আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। অনুশীলনে ও অভিজ্ঞতায় এইভাবেই তিনি নিজেকে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আশ্রয় পান এবং মূলাজোড়ে বসতি করেন। এই সময় তাঁহার বয়স আনুমানিক চল্লিশ। ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বগুণে কৃষ্ণচন্দ্র আকৃষ্ট হন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে তিনি রচনা করেন অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দর।

অন্নদামঙ্গলই ভারতচন্দ্রের কবিকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাংলাকাব্যে তিনি নবীন সুষমার প্রবর্তন করেন। বাংলা-সাহিত্যের তিনিই প্রথম নাগরিক কবি। তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের রূপ ছিল অন্য প্রকার, গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট। ভারতচন্দ্র তাঁহার সাবলীল ভাষার প্রয়োগে বাংলা কাব্যে নূতন ঔজ্জ্বল্য আনেন। ভাষার লালিত্য, ছন্দের নৈপুণ্য, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতা, এই ত্রিবিধ গুণ তাঁহার কাব্যকে একটি স্বকীয় মহিমা দান করিয়াছে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

সুশীল রায়

ভারতবর্ষ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট দক্ষিণ এশিয়ার ভারতীয় উপ-মহাদেশ বিভক্ত হইয়া ভারতবর্ষ বা ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান নামে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় ইউনিয়ন একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাকে 'ভারত' বা 'ইন্ডিয়া' বলা হয়। ১৯টি রাজ্য ও ১০টি ইউনিয়ন অঞ্চল লইয়া গঠিত ইহা একটি যুক্তরাষ্ট্র (ফেডারেশন)। কেন্দ্রে ও রাজ্যে সংসদীয় (পার্লিয়ামেণ্টারি) শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। ভারতের বিস্তৃতি ৮°৪′—৩৭°৬′ উত্তর এবং ৬৮°৭′—৯৭°২৫′ পূর্ব পর্যন্ত; আয়তন ৩২৬৮০৯০ বর্গকিলোমিটার। উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৫১২০ কিলোমিটার।

ভারতের উত্তরে চীন (তিব্বত), ভুটান ও নেপাল; উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান; পশ্চিমে আরব সাগর; পূর্বে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর; এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। আরবসাগরে লাক্কাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদীপি দ্বীপপুঞ্জ এবং বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্গত।

ভারতীয় মূল ভূখণ্ডকে চারিটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ (১) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি, (৩) মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল, (৪) দাক্ষিণাত্যের উপকূলীয় সমভূমি।

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল ঃ ভারতের উত্তরে সুবিশাল হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা। ইহা পূর্ব-পশ্চিমে ২৪১৪ কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ২৪০ হইতে ৩২০ কিলোমিটার বিস্তৃত। এই পর্বতমালা উত্তর হইতে দক্ষিণে তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত, যথা উচ্চ হিমালয় ('হিমাদ্রি'), নিম্ন হিমালয় ('হিমাচল') ও 'শিবালিক'। এভারেস্ট কে, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি ৮০০০ মিটারের অধিক উচ্চ তুষারাবৃত শৃঙ্গগুলি উচ্চ হিমালয়ে অবস্থিত। উত্তর ভারতের বহু নদীর উৎসরূপে অনেক হিমবাহ এই উচ্চ হিমালয়ে রহিয়াছে। নিম্ন হিমালয়ের অধিকাংশ বনাচ্ছাদিত, স্থানে স্থানে বনভূমি পরিষ্কার করিয়া চাষ করা হইয়াছে। এখানে অনেক ব্যবসায় কেন্দ্র, শৈলাবাস ও তীর্থক্ষেত্র আছে। সর্বনিম্ন অংশ 'শিবালিক'। ('হিমালয়' দ্র)।

উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল ঃ ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে ও ব্রহ্মসীমান্তে নাগা, পাটকই প্রভৃতি হিমালয়ের কতকগুলি শাখা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এগুলি উচ্চতায় অপেক্ষাকৃত কম (১০০০—৩০০০ মিটার) এবং গভীর বনাচ্ছাদিত ও দুর্গম। পূর্ব-নীফার সামান্য অংশ (৫০০০ মিটার ঊর্ধ্বে) তুষারাবৃত।

সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সমভূমি ঃ হিমালয় ও মধ্য-ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যবর্তী নিম্নাঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক হইতে আগত নদীগুলি দ্বারা বহুকাল ধরিয়া আনীত পলল দিয়া ভরাট হইয়া বিশাল সমভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সিন্ধু, শতদ্রু এবং ব্রহ্মপুত্র ('ৎসাঙপো') হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর অঞ্চল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং হিমালয় পর্বতমালাকে আড়াআড়ি গভীরভাবে কাটিয়া উত্তর ভারতে পেঁাছিয়াছে। অন্যান্য নদী ও উপনদীগুলি প্রধানতঃ হিমালয় ও তাহার শাখাপ্রশাখার ভারতাভিমুখী ঢালেই উৎপন্ন হইয়াছে, যেমন, সিন্ধুর অন্যান্য উপনদী, গঙ্গা ও তাহার উপনদী যমুনা-ঘর্ঘরা-গণ্ডক-কোশী এবং ব্রহ্মপুত্রের উপনদী তিস্তা-জলঢাকা-লোহিত। অবশ্য বিশেষ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার অল্প কয়েকটি বৃষ্টিজলে পুষ্ট উপনদী (চম্বল, শোণ ও দামোদর) মধ্যভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু দ্র)।

উত্তর ভারতের এই বিশাল সমভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৪০০ কিলোমিটার এবং প্রস্থে ২৪০—৪০০ কিলোমিটার। আয়তন প্রায় ৭·৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। এই সমভূমির পললের স্তর এত গভীর যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে ক্যানিং-এর নিকটে সোভিয়েত তৈল বিশেষজ্ঞরা ৩০০০ মিটার পর্যন্ত গভীরতাতেও তলার পাথর পান নাই। দিল্লীর নিকটে যমুনা নদীর পশ্চিমে জলবিভাজক অঞ্চল।

মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য ও মালভূমি অঞ্চল ঃ সাধারণভাবে সমগ্র অঞ্চলটি 'দাক্ষিণাত্যের মালভূমি' নামে অভিহিত। ভূতত্ত্বের দিক হইতে আসামের মালভূমি ('মেঘালয়' ঃ গারো-খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়) এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। প্রধানতঃ আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলায় গঠিত দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ভারতের প্রাচীনতম অংশ। ক্ষয়িত বহুবিভক্ত এই অঞ্চলে কয়েকটি শৈলশিরা আছে (উচ্চতা ৫৪৮ হইতে ১২২০ মিটার)। তন্মধ্যে আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, মৈকাল, অজন্টা এবং পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট উল্লেখযোগ্য। বলা হয় যে, আরাবল্লী পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বত। পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের সংযোগস্থলে, নীলগিরি পাহাড়ের ডোডাবেত্তা দক্ষিণ ভারতের উচ্চতম স্থান (২৬৩৭ মিটার)। দাক্ষিণাত্য মালভূমির সাধারণ ঢাল পূর্বদিকে হওয়ায় বড় বড় নদীগুলি—মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী মধ্য-ভারতীয় পার্বত্য অঞ্চল ও উচ্চতর পশ্চিমঘাট পর্বতে উদ্ভূত হইয়া পূর্বঘাট পর্বতকে ছেদ করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে উত্তর-বাহিনী চম্বল ও শোণ এবং আরবসাগরে পতিত পশ্চিমবাহিনী নর্মদা ও তাপ্তি উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের সকল নদীই বৃষ্টিজলে পুষ্ট, অতএব বর্ষায় বন্যার সৃষ্টি করে ও অন্য সময়ে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। নদীবিভক্ত বৃহত্তর মালভূমিতে কয়েকটি ক্ষুদ্রতর মালভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, যথা, ছোটনাগপুর, মালব, মহারাষ্ট্র (লাভাগঠিত), দণ্ডকারণ্য, তেলেঙ্গানা ও মহীশুর।

দাক্ষিণাত্যের উপকূলীয় সমভূমি ঃ পূর্ব-উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল বহু দ্বীপ-সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন। উপকূলরেখা অসরল ও উপকূলীয় সাগর অগভীর, কিন্তু মহীসোপান অপ্রশস্ত। বন্দরগুলি কৃত্রিম। অপরদিকে পশ্চিম-উপকূলীয় সমভূমি সংকীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, ঢালু ও দ্বীপহীন। উত্তরে কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্য মালভূমির অংশ। পশ্চিমের উপকূলরেখা প্রায় সরল এবং উপকূলীয় সাগর অপেক্ষাকৃত গভীর, ফলে উপকূলের কয়েকটি ভগ্ন অংশে স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠিয়াছে। মহীসোপান প্রশস্ত ও মৎস্য শিকারের পক্ষে অনুকূল। বিচ্ছিন্নতার জন্য পশ্চিম উপকূলে পূর্ব উপকূলের মত একটানা রেলপথ ও রাস্তা গড়িয়া উঠে নাই।

জলবায়ু ঃ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তুঙ্গ হিমালয় প্রাচীর ভারত-পাকিস্তানের মৌসুমী জলবায়ুর নিজস্বতা আনিয়া দিয়াছে। উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুযায়ী ভারতীয় বৎসরকে চারটি ঋতুতে ভাগ করা চলে ঃ ১. শীতকাল (ডিসেম্বর—মার্চ), ২. গ্রীষ্মকাল (এপ্রিল—মে), ৩. বর্ষাকাল (জুন—সেপ্টেম্বর) ও ৪. বর্ষা-বিদায় বা হেমন্তকাল (অক্টোবর—নভেম্বর)।

শীতকাল প্রধানতঃ বৃষ্টিহীন, গড় উষ্ণতা ১০°—১৫° সেণ্টিগ্রেড। এই সময়ে ভারতে উচ্চ চাপের সহিত 'উত্তর-পূর্ব বায়ু' বহিতে থাকে, ইহা উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রধানতঃ উত্তর-পশ্চিমা বায়ু। মাঝে মাঝে ভূমধ্যসাগর হইতে ঘূর্ণিময় পশ্চিমা বায়ু উত্তর ভারতে ঢুকিয়া পড়ে ও গম চাষে সুবিধাজনক কিছু বৃষ্টিপাত ঘটায় (wheat shower, পাঞ্জাবে ১৩ সেণ্টিমিটার)। এই ঝড়বৃষ্টিকে 'পশ্চিমী ঝামেলা' (western disturbance) বলে।

গ্রীষ্মকালও সাধারণভাবে শুষ্ক, গড় উষ্ণতা ২৫°—৩০° সেণ্টিগ্রেড। এই সময়ের প্রথম দিকে ভারতের উত্তর হইতে তিন-চতুর্থাংশে উচ্চ চাপ (গড় ১০০৯ মিলিবার) ও 'উত্তর-পূর্ব বায়ু' থাকে কিন্তু দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করে; ফলে কেরল, মহীশুর ও তামিলনাড়ুর উপর দুই বায়ুর সংঘর্ষস্থলে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। মহীশুর মালভূমিতে এই বৃষ্টি কফিচাষে সাহায্য করে (Coffee shower, ২৫

সেণ্টিমিটার)। এই ঋতুর শেষ দিকে দুই বায়ুর সংঘর্ষ-স্থলটি বোম্বাই ও কলিকাতার উপর আসিয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে স্থানীয়ভাবে বোম্বাই উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতে ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দিনের শেষে ঝড়বৃষ্টি ঘটায়। ইহাকে মহারাষ্ট্রে 'আম্রবৃষ্টি' (Mango shower, ১০ সেণ্টিমিটার) ও পশ্চিমবঙ্গে 'কালবৈশাখী' (Nor'wester, ১৮ সেণ্টিমিটার) বলে।

বর্ষাকালই প্রকৃত মৌসুমী ঋতু, গড় উষ্ণতা ২৮°-৩০° সেণ্টিগ্রেড। জুন জুলাই-এ ভারত-পাকিস্তানের মরু অঞ্চলে অত্যধিক উত্তাপের জন্য (গড় ৩৮° সেণ্টিগ্রেড) তীব্র নিম্ন চাপের সৃষ্টি হয় (৯৯২ মিলিবার)। পর্বত প্রাচীরের জন্য উত্তরের বায়ু আসিতে পারে না, কিন্তু এই নিম্ন চাপের আকর্ষণে ভারত মহাসাগর হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া আসিয়া প্রবেশ করে এবং পশ্চিম উপকূল, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার ও হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় (জুন-সেপ্টেম্বর, ১০০-৩৫০ সেণ্টিমিটার)। নিম্নচাপ কেন্দ্রে অবস্থিত পশ্চিম রাজস্থানে বৃষ্টিপাত সর্বাপেক্ষা কম (১৩-১৫ সেণ্টিমিটার।)

বর্ষাবিদায় বা হেমন্তকালে গড় উষ্ণতা ২০°-২৫° সেণ্টিগ্রেড থাকে। সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হইলে বর্ষার শেষার্ধ হইতে নিম্নচাপ কেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সরিয়া আসিতে থাকে এবং উত্তর ভারতে ক্রমশঃ উচ্চচাপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 'উত্তর-পূর্ব বায়ু'র প্রবাহ শুরু হয়। বর্ষাবিদায় ঋতুতে উত্তর-পূর্ব বায়ুর ও দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুর সংঘর্ষস্থল যখন যেখানে থাকে তখন সেখানে ঝড়বৃষ্টি হয়।

মৃত্তিকা ঃ প্রস্তর জলবায়ু উদ্ভিদ ও ভূপ্রকৃতির তারতম্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা দেখা যায়। উচ্চ হিমালয়ের হিমবাহিত মৃত্তিকা প্রস্তরময় ও অনুর্বর। নিম্ন হিমালয়ের পড্‌সল মৃত্তিকা কঙ্করময়-কর্দম, ধৌত (চুনজাতীয় পদার্থবিহীন), লৌহকণামিশ্রিত ও উদ্ভিজ্জ পদার্থপূর্ণ। উত্তর ভারতের সমভূমিতে সাধারণভাবে পলল মৃত্তিকা। পশ্চিমে মরু অঞ্চলে বালুকা এবং পাঞ্জাব হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশে বালুকা-মিশ্রিত দোয়াঁশ। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে মহারাষ্ট্রের লাভা অঞ্চল 'কৃষ্ণ' মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। এই মৃত্তিকা আঠাল ও বিশেষভাবে জলধারণক্ষম, অতএব এখানে অল্প বৃষ্টিতেও কৃষি সম্ভব। ছোটনাগপুর ও মহীশূর মালভূমিতে অনুর্বর কঙ্করময় ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণভাবে কম উর্বর দোয়াঁশ লোহিত মৃত্তিকা। উপকূল অঞ্চলে প্রধানতঃ বালুকামিশ্রিত পলি-দোয়াঁশ এবং আঞ্চলিকভাবে বালুকা ও কর্দম।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ বনজ ঃ ভারতের ২৩% (৭·৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার) অঞ্চল বনাচ্ছাদিত। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জের দিক হইতে ভারতকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) চিরহরিৎ বনভূমি—(ক) বৃষ্টি-বহুল অঞ্চল (> ২০০ সেণ্টিমিটার) ঃ পশ্চিমঘাট পর্বত, উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। (খ) উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলের অরণ্যঃ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ও গুজরাতের কচ্ছরান উল্লেখযোগ্য। (২) পর্ণমোচী ও মিশ্র বনভূমি—মধ্যম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল (৬৫-২০০ সেণ্টিমিটার) ঃ তরাই, পশ্চিমঘাটের পূর্ব ঢাল এবং উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। আসবাব, কাঠামো ও গঠনের উপযুক্ত অধিকাংশ কাঠ এই অঞ্চলেই পাওয়া যায়, যেমন, শাল, সেগুন, শিশু, লোহা, চন্দন, জারুল ইত্যাদি। (৩) শুষ্ক অঞ্চল (< ৬০ সেণ্টিমিটার) ঃ দক্ষিণ ভারতের বৃষ্টিচ্ছায়া-যুক্ত মধ্যাঞ্চল এবং গুজরাত ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মরুপ্রায় অঞ্চল ; কাঁটাঝোপযুক্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে (সাভানা) প্রচুর সাবাই ঘাস (কাগজের মণ্ড) ও শিমুল্‌ শণ পাওয়া যায়। (৪) নাতিশীতোষ্ণ পর্ণমোচী বনভূমি (৯০০-১৫০০ মিটার উচ্চতায়) ঃ নীলগিরিতে ইউক্যালিপ্‌টাস এবং হিমালয় ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে ওক, চেস্টনাট, অ্যাশ ও বীচ। (৫) সরলবর্গীয় বনভূমি (১৫০০-৩৫০০ মিটার উচ্চতায়) ঃ হিমালয় ও উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের পাইন, সিডার (দেবদারু), স্প্রুস ও ফার-এর নরম কাঠ দিয়াশলাই, কাগজ ও রেয়ন শিল্পের কাঁচামাল। (৬) আল্পীয় অঞ্চল (৩৫০০—৪০০০ মিটার উচ্চতায়) ঃ হিমালয়ে রডোডেনড্রন, ফার্ন, মস ইত্যাদি ; গ্রীষ্মের মেষচারণক্ষেত্র।

প্রাণিজঃ ১৯৬১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতে গো-জাতির সংখ্যা ১৭·৬ কোটি (পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম), মহিষজাতির সংখ্যা ৫ কোটি, ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যা ১০ কোটি এবং ঘোড়া ও টাট্টুর সংখ্যা ১০ লক্ষ। গাভী পিছু দুগ্ধের উৎপাদন বৎসরে মাত্র ৫ মণ (পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন)। নানা প্রকারের বন্যপ্রাণীতে ভারত সমৃদ্ধ। কৃষির বিস্তার, জ্বালানি সংগ্রহ ও শিকারের বাড়াবাড়ির ফলে বহু বন্যপ্রাণী বিলুপ্তপ্রায়। সরকারি প্রচেষ্টায় বন-সংরক্ষণ ও শিকার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা প্রায় প্রতি রাজ্যেই 'জাতীয় পার্ক' ও পশুপক্ষীর আশ্রয়স্থল (sanctuary) গড়িয়া তোলা হইতেছে, যথা, গুজরাতের গির জঙ্গল (সিংহ), আসামের কাজিরাঙ্গা (গণ্ডার ও মহিষ), পশ্চিম-বঙ্গের জলদাপাড়া (হস্তী, গণ্ডার ও ভল্লুক), সুন্দর-বন (ব্যাঘ্র, হরিণ), সজনাখালিতে (পক্ষী), উত্তরপ্রদেশে তরাই-এ 'করবেট জাতীয়-পার্ক' (ব্যাঘ্র, চিতা হরিণ, ভল্লুক ও পক্ষী), ইত্যাদি।

খনিজ ঃ বিশাল ভারতের খনিজ সম্পদ বহুবিচিত্র। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল হইতে প্রধানতঃ খনিজ তৈল ও গ্যাস এবং উত্তর ভারতীয় ও উপকূলীয় সমভূমি হইতে

খনিজ তৈল, লবণ ও ক্ষার পাওয়া যায়। অন্যান্য সমস্ত খনিজই দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। ধাতব শিল্পের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট কয়লার সঞ্চয় কম—ধৌত-করণের উপযোগী কয়লা সমেত ১৩৫২ কোটি টন। সকল প্রকার কয়লার মোট সঞ্চয় ১২০০০ কোটি টন। খনিজ তৈলের উৎপাদন দ্রুত বর্ধমান—১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৭ লক্ষ টন। উৎকৃষ্ট আকরিক লৌহের সঞ্চয় ২১৬০ কোটি টন (পৃথিবীর ⅛ অংশ) মাত্র কয়েকটি অঞ্চল হইতেই ইস্পাত শিল্পের ও রপ্তানির প্রয়োজনে উত্তোলিত হইতেছে। অন্যান্য খনিজের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ (পৃথিবীতে ৩য়, সঞ্চয় ১৮ কোটি টন), বক্সাইট (সঞ্চয় ১৬ কোটি টন), জিপ্‌সাম (সঞ্চয় ১১৭ কোটি টন), অভ্র (পৃথিবীতে ১ম), চুণা-পাথর ও ইলমেনাইট-মোনাজাইট (থোরিয়াম—পৃথিবীতে ১ম) উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন অল্পস্বল্প তাম্র, দস্তা, ক্রোমাইট, হীরক, স্বর্ণও আছে। খনিজ তৈল প্রভৃতি বহু খনিজের পূর্ণ সঞ্চয়ের পরিমাণ এখনও অপরিজ্ঞাত; ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ।

জলসম্পদঃ হিমালয়শীর্ষের বরফ অঞ্চল ('হিমল') ভারতের পক্ষে একটি বিরাট জলসঞ্চয় ক্ষেত্র (৪০০০০ বর্গ-কিলোমিটার)। ভারতের নদীগুলিতে বৎসরে প্রায় ১৬৮০০০ কোটি ঘন মিটার জল প্রবাহিত হয়। এই বিশাল জলরাশির মাত্র ৫৫৫০০ কোটি ঘন মিটার সেচের কাজে লাগানো সম্ভব; তন্মধ্যে ১৯৬৮ খ্রী পর্যন্ত প্রায় ২০০০০ কোটি ঘন মিটার (৩৬%) ব্যবহার করা হইতেছে। প্রধানতঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দামোদর, ভাকরা-নাঙ্গাল, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা ইত্যাদি প্রায় অর্ধ-শতাধিক বহুমুখী নদী প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। নিছক সেচ অথবা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও অনেক প্রকল্প আছে। ভারতের সম্ভাব্য ৪ কোটি ১১ লক্ষ কিলোওয়াটের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৫ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদনক্ষম জলবিদ্যুৎকেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইয়াছে। গত বিশ বৎসরে বৃদ্ধির হার ৪৫১%। ভূত্বকের মধ্যে সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণও ভারতে কম নয়। গাঙ্গেয়, পাঞ্জাব, পশ্চিম রাজস্থান ও গুজরাত সমভূমিগুলি এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সেচের জন্য কেবলমাত্র উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশেই ৫ হাজারের উপর বিদ্যুৎচালিত নলকূপ আছে। পশ্চিম-বঙ্গেও এভাবে সেচের ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বরকমের সেচ অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ৩৫০ লক্ষ হেক্টর; ইহার মধ্যে অবশ্য ⅓ অংশে বর্ষায় সেচের প্রয়োজন হয় না। উত্তর ভারতের সমভূমিতে, বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিমের শুষ্ক অঞ্চলে এবং নদী প্রকল্পের অঞ্চলগুলিতে নিত্যবহ খালের সাহায্যে সেচ করা হয়। গঙ্গা-অব-বাহিকায়, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে ও অন্ধ্র উপকূলে অনেক কূপ আছে; পশ্চিম রাজস্থানে কারেজ-কূপের জল মৃত্তিকামধ্যস্থ নালার সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়। দাক্ষিণাত্যের মধ্য ও দক্ষিণাংশের অসমতল অঞ্চলে অগভীর জলধারাগুলিকে বর্ষাকালে প্রাচীরে বাঁধিয়া জলাশয়ের সৃষ্টি করা হয় ও সেই জলের সাহায্যে সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলে চাষ করা হয়।

ভারতের জনসংখ্যা ঃ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমার অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ৫৪৭৩৬৭৯২৬। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৯৩২। ১৯৬১-৭১ দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৪·৬৬ শতাংশ (প্রতি বৎসরে প্রায় ২·৪৭ শতাংশ হারে)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলো-মিটারে ১৮২। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২৯·৩৪ শতাংশ (পুরুষ ৩৯·৫১ ও নারী ১৮·৪৪ শতাংশ)। শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৯·৮৭ শতাংশ।

কৃষি ঃ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা চলে। ১. ধান-পাট ঃ বিহার-ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ-আসাম সমভূমি। ২. ধান ঃ দক্ষিণ অন্ধ্র-তামিলনাড়ু-কেরল-মহীশূর-গোয়া-মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় সমভূমি ও বৃষ্টিবহুল ধাপকাটা পাহাড়ের ঢাল; অন্ধ্র-তামিলনাড়ুতে জোয়ার-বাজরা-তিসি, কেরলে মরিচ্চিনি (টেপিওকা)-নারিকেল-মসলা ও গোয়া-মহারাষ্ট্রে নারিকেল অতিরিক্ত ফসল। ৩. গম-ধান-ইক্ষু-সরিষা ঃ পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তর প্রদেশ-উত্তরপশ্চিম বিহার, বৃষ্টির স্বল্পতার দরুণ সেচের সাহায্য লইতে হয়; অতিরিক্ত ফসল—কার্পাস (পাঞ্জাবে), ডাল, ভুট্টা, যব ও জোয়ার। ৪. গম-জোয়ার-বাজরা ঃ মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপূর্ব রাজস্থান-গুজরাত; ৫. কার্পাস-জোয়ার-বাজরা ঃ মহারাষ্ট্র-মহীশূর-পশ্চিম অন্ধ্র। ৬. জোয়ার-বাজরা-ডাল-চিনাবাদাম; পূর্ব মহারাষ্ট্র-দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ-দক্ষিণ বিহার-পশ্চিম ওড়িশা-অন্ধ্র-দক্ষিণ মহীশূর-পশ্চিম তামিলনাড়ু; অতিরিক্ত ফসল—মহারাষ্ট্রে লেবু ও কলা (নাগপুর), মহীশূরে কফি (কুর্গ-মারকারা)। ৭. চা ঃ আসাম-পশ্চিমবঙ্গ-হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলঃ অতি-রিক্ত ফসল, সিঙ্কোনা (দার্জিলিং)—ধান, গম, ভুট্টা, আলু, তামাক ও ফল। ৮. চা-রবার ঃ কেরল-মহীশূর-তামিলনাড়ুর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত পার্বত্য অঞ্চল।

ভারতে বিবিধ ধারায় 'সবুজ বিপ্লব' বা কৃষি বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টা চলিতেছে, উচ্চফলনী ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা শস্যবীজের ব্যবহার, পর্যাপ্ত সার সংগ্রহ (উৎপাদন ও আমদানি) এবং সেচের সুযোগ বৃদ্ধির দ্বারা। উচ্চফলনী বীজ ব্যবহারের পূর্বে ভারতে হেক্টর প্রতি ধান ও গমের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২০৫৬ ও ১৪০৮ কিলোগ্রাম এবং তৎপরে হয় ১৩৮৯৮ ও ১১৫৮০ কিলো-গ্রাম। ইহা ভিন্ন কৃষির আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার মধ্যে জমিদারি প্রথার বিলোপ, পারিবারিক ভূমিধারণের উচ্চতম সীমার বিধি, ট্র্যাক্টরের ব্যবহার বৃদ্ধি (১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের আমদানি ১৬৫০০ ও উৎপাদন ১৬০০০), বহু আধুনিক কৃষি গবেষণাগার ও বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের

প্রতিষ্ঠা, ফসলের কীট ও রোগ নিবারণ ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সরকারি প্রচেষ্টায় বর্তমানে ৪৮০টি গ্রামকেন্দ্রে গাভী ও স্ত্রী-মহিষের জন্য উন্নততর প্রজনন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রোগনিবারণ ও দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে এক একটি কেন্দ্রে উৎকৃষ্ট জাতের গো-উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমদানিকৃত অস্ট্রেলিয়ার 'মেরিনো' ভেড়ার দ্বারা ভারতীয় মেষ-সম্পদের উন্নতি ও পশমের উৎপাদন বৃদ্ধিরও সরকারি প্রয়াস চলিতেছে।

শ্রমশিল্প ঃ স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে উন্নতিকামী দেশ-গুলির মধ্যে ভারতে শিল্পায়নের গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত। এই শিল্পায়নে বেসরকারি অপেক্ষা সরকারি মালিকানা অনেক বেশি অগ্রাধিকার পাইয়াছে। (৪র্থ পরিকল্পনায় শিল্পে মোট ৫২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে আছে সরকারি খাতে ৩০৯০ কোটি, বেসরকারি খাতে ২১৫০ কোটি)। অবশ্য প্রয়োজনীয় আমদানি-পরিবর্ত ও রপ্তানি-যোগ্য বস্তু নির্মাণেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩৪৫৯টি নিবন্ধিত কারখানায় মোট প্রায় ৪০ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। অধিক শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চল ঃ মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, গুজরাত, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মহীশূর।

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য শ্রমশিল্পগুলির মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত সর্বপ্রধান। মোট উৎপাদিত ইস্পাতের পরিমাণ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১০ লক্ষ টন ও ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫ লক্ষ টন (উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ লক্ষ টন) হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ভারতে দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে ; ফলে এবিষয়ে স্বাধীনতাপূর্ব সর্বাত্মক আমদানিকারী ভারত আজ বহুলাংশে স্বাবলম্বী, এমন কি অনেকাংশে রপ্তানিকারী। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ কার্পাস বয়নশিল্প (বস্ত্রশিল্প), চলচ্চিত্র, রাসায়নিক, খনিজতৈল-শোধন ও তৈল-রসায়ন, বিবিধ কৃষিভিত্তিক শিল্প, চর্ম, কাগজ, সিমেন্ট ইত্যাদি। সার উৎপাদন শিল্পে মোট উৎপাদন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ লক্ষ টন হইতে ১৯৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ লক্ষ টনে দাঁড়াইয়াছে।

শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শিল্পায়নের দিক হইতে স্বাধীনতাপূর্ব কালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুইটি শিল্পাঞ্চল (বোম্বাই-আহমেদাবাদ ও কলিকাতা-জামসেদপুর) ভিন্ন আরও কয়েকটি অঞ্চল উল্লেখযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ১. পশ্চিমাঞ্চল (পুণা-বোম্বাই, নাসিক-সুরাট-বরোদা-আহমেদাবাদ-মিঠাপুর)। ২. পূর্বাঞ্চল (জামসেদপুর-আসানসোল-কলিকাতা) ঃ (ক) বৃহত্তর কলিকাতা (কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে হুগলি নদীর উভয় তীরে) ; (খ) রাণীগঞ্জ কয়লা ক্ষেত্র (দুর্গাপুর-আসানসোল-চিত্তরঞ্জন) ; (গ) ছোটনাগপুর (রাউরকেলা-জামসেদপুর-রাঁচী-বোকারো-সিন্দ্রি)। ৩. দক্ষিণাঞ্চল (মাদ্রাজ-বাঙ্গালোর-ভদ্রাবতী-কোয়েম্বাটুর-কোচিন) ঃ (ক) পূর্ব-উপকূল (মাদ্রাজ-নেইভেলী-তিরুচ্চিরাপল্লী-মাদুরাই) ; (খ) মধ্যভাগ (কোয়েম্বাটুর-সালেম, মহীশূর-বাঙ্গালোর-ভদ্রাবতী-হস্-পেট) ; (গ) পশ্চিম উপকূল (মাঙ্গালোর-কোজিকোড, আলওয়াই-কোচিন-ত্রিবান্দ্রম)। ৪. উত্তরাঞ্চল (বারাণসী-কানপুর-দিল্লী-অমৃতসর) ঃ (ক) মধ্যগঙ্গা (মতিহারী-মুজাফফরপুর-পাটনা-ডিহরি-রিহান্দ-বারাণসী) ; (খ) উচ্চ-গঙ্গা (লক্ষ্ণৌ-কানপুর-আগ্রা-দিল্লী-মোরাদাবাদ) ; (গ) পাঞ্জাব (লুধিয়ানা-জলন্ধর-অমৃতসর)। ৫. মধ্যাঞ্চল (বিক্ষিপ্ত) ঃ (ক) মধ্যভারত (সম্বলপুর-ভিলাই-নাগপুর-ভুপাল) ; (খ) অন্ধ্র (বিশাখাপত্তনম-রাজামহেন্দ্রী-হায়দরাবাদ)। ৬. উত্তর-পূর্বাঞ্চল (গৌহাটি-নামরূপ-ডিগবয়)।

পরিবহণ ও যোগাযোগ ঃ রেলপথ প্রধান ; ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রেলপথ ৩২ কিলোমিটার ; ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৫৪৮৪৫ কিলোমিটার ; ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯৩৩৯ কিলোমিটার। বর্গকিলোমিটার প্রতি গড়ে ০·০১৮ কিলোমিটার রেলপথ আছে। ভারতের ১/৪ অংশ রেলপথ উত্তরের সমভূমিতে রহিয়াছে। দৈনিক ১০০০০ যাত্রী গাড়ী ও মাল গাড়ী, ৬১ লক্ষ যাত্রী ও ৫·৪ লক্ষ টন মাল বহন করে। ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রেলবিভাগে মোট ১৩·৬ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩৭টি রেলবিভাগকে কমাইয়া ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯টি করা হইয়াছে। বর্তমানে রেলপথের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত সরঞ্জামই ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পাকা পথ প্রায় ৩·২ লক্ষ কিলোমিটার ও কাঁচা পথ প্রায় ৬·৫ লক্ষ কিলোমিটার। বর্গকিলোমিটার প্রতি কাঁচা ও পাকা পথ গড়ে ০·৩ কিলোমিটার। কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২১৫টি প্রধান সেতুসমেত ২৪১৪৩ কিলোমিটার 'জাতীয় সড়ক' ছিল (১ হইতে ৫০ সংখ্যক)। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৩ লক্ষ মোটর-চালিত গাড়ী পথে চালু ছিল (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২·১ লক্ষ)। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি পরিবহণ-সংস্থা যাত্রী ও মাল বহন করে। পথনির্মাণের সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এখন ভারতে প্রস্তুত হয়।

বর্তমানে মোট ১৪০০০ কিলোমিটার আভ্যন্তরিক জলপথের মধ্যে ৩৫০০ কিলোমিটার স্টিমার চলার উপযুক্ত ; তন্মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও হুগলি নদী এবং কয়েকটি রাজ্যের উপকূল অঞ্চলের খাল-গুলিই প্রধান। বহুমুখী নদীপ্রকল্পগুলিতেও অনেক নাব্য খালের সৃষ্টি হইয়াছে। উপকূলীয় সাগরপথ ভারতের ২২৫টি ক্ষুদ্র (১৫০টি নিয়মিতভাবে চালু) এবং ৮টি বৃহৎ বন্দরকে (কলিকাতা-হলদিয়া, পারাদীপ, বিশাখা-পত্তনম, মাদ্রাজ, কোচিন, মর্মুগাও, বোম্বাই ও কাণ্ডলা) যুক্ত করিয়াছে। এই পথে ৮৭টি ভারতীয় জাহাজ

(১৯৬৯ খ্রী, ৩·৭ লক্ষ জি-আর-টি) চলাচল করে। মহাসাগরীয় জলপথে কেন্দ্রীয় সরকারের শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার ও ৩৭টি অন্যান্য বেসরকারি ভারতীয় কোম্পানির মোট ১৬৭টি জাহাজ চলে।

অসামরিক বিমান চলাচলের দায়িত্ব ভারত সরকারের দুইটি সংস্থার উপর ন্যস্ত—ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স্ কর্পোরেশন (অন্তর্দেশীয় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যথা, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, আফগানিস্তান ও নেপাল) ও এয়ার ইন্ডিয়া (বহির্বিশ্ব)। ৪টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর (সান্তাক্রুজ, দমদম, পালাম ও মীনাম্বক্কম), ৭টি বড় ও ৭৪টি অন্যান্য বিমান বন্দর একটি বিমানপথ-জালক দ্বারা যুক্ত।

কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার বিভাগের অধীনে ভারত ১৫টি অঞ্চলে (circle) বিভক্ত। ৩·৪ লক্ষ গ্রামে বর্তমানে দৈনিক ডাক-বিলি হয়। অতিরিক্ত শুল্ক না লইয়াই বিমানডাকে দেশের অধিকাংশ বড় শহর যুক্ত করায় সাধারণ চিঠি ও অর্থ প্রেরণ অত্যন্ত দ্রুত হইয়াছে। সরকারি ও বেসরকারি কাজে টেলিপ্রিন্টার (TELEX) ও বেতারবার্তা বহুলভাবে চালু আছে। বহির্দেশীয় রেডিও-টেলিফোন-টেলিগ্রাফ-চিত্র ব্যবস্থা মহানগরীগুলিতে আছে। আমেরিকার 'টেলস্টার' কৃত্রিম উপগ্রহে গৃহীত চিত্র ও বেতার বার্তা দৈনিক বিভিন্ন সময়ে পাওয়ায় আবহ-পূর্বাভাষণে ও সংবাদপত্র প্রকাশে বহু সুবিধা হইয়াছে। ডাক-তার-টেলিফোন-বেতারের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি এখন ভারতে নির্মিত হইতেছে।

জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রই প্রধান। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪৯টি ভাষায় প্রকাশিত ১০০১৯ সংবাদপত্রের মধ্যে আছে দৈনিক ৬৩৬, সপ্তাহে ২৩ বার ৫১ ও সাপ্তাহিক ২৮৯২ এবং ভাষাগতভাবে আছে হিন্দী ২৩৮৯, ইংরেজী ২০৭৪, উর্দু ৯০২ ও বাংলা ৬৪২।

জনসংযোগের অপর প্রধান মাধ্যম বেতার— কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮টি কেন্দ্র হইতে ১২৭টি প্রবাহযন্ত্রে প্রচারিত অনুষ্ঠান ৯২·৮ লক্ষ বেতার যন্ত্রে ধরা হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের শব্দবন্ধ প্রতিলিপি একটি সংরক্ষণাগারে রাখা হয় এবং কিছু কিছু বিদেশের সহিত বিনিময় করা হয়। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে টেলিভিজন প্রচারের ব্যবস্থা হয় ও জোটবদ্ধভাবে দেখার জন্য কয়েকটি টেলিক্লাব চালু হয়। বেতার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি এখন অধিকাংশই ভারতে নির্মিত হয়। ধারক-যন্ত্র নির্মাণ হয় ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৮·৫ লক্ষ।

ব্যবসাবাণিজ্য : দেশের বিশালতা, জনসংখ্যার বিপুলতা ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের পরিমাণ বহির্বাণিজ্য অপেক্ষা বহুগুণ বেশি। রেলপথেই আভ্যন্তরিক বাণিজ্য সর্বাধিক ; পরিমাণ অনুযায়ী (১৯৬৭-৬৮ খ্রী, কোটি টন) : কয়লা (৪·৫), খাদ্যবস্তু (১·৩), লৌহ-ইস্পাতদ্রব্য (০·৭) এবং কার্পাস ও কার্পাস-দ্রব্য (০·০৯) উল্লেখযোগ্য। উপকূলীয় বাণিজ্যে চর্ম, বস্ত্র, কাষ্ঠ, নারিকেল ও তৈল, মৎস্য, পাট এবং কয়লাই প্রধান। নদী ও খালপথে শস্য, খড়, মৎস্য, গৃহনির্মাণের বস্তু, জ্বালানি, ইত্যাদি পরিবাহিত হয়। খাদ্যশস্যের ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের 'খাদ্য কর্পোরেশন'-এর আয়ত্তাধীন।

বহির্বাণিজ্যও বহুলাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন (১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০% আমদানি ও প্রায় ২৫% রপ্তানি)। সরকারি কর্তৃত্বে 'রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন' (STC), 'খনিজ ও ধাতু বাণিজ্য কর্পোরেশন' (MMTC), 'ধাতু-ছাঁট বাণিজ্য কর্পোরেশন' (MSTC) ও 'হস্তশিল্প-তাঁতদ্রব্য রপ্তানি' (HHE) সংস্থাগুলি বহির্বাণিজ্যে অংশ লয়। বর্তমানে সরকার প্রধানতঃ 'রপ্তানি উন্নয়ন পর্ষদ' (EPC) মারফত সর্বপ্রকারে রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিতেছেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের পূর্বেকার ঔপনিবেশিক চরিত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কোটি টাকার হিসাবে মোট আমদানির পরিমাণ ১৯৭৪ ; তন্মধ্যে খাদ্য-পানীয়-তামাক ২৯·৫% (গম ৩৭৮ ও চাউল ৫৫), শিল্পের কাঁচামাল ২৪·৫% (কার্পাস ৮৪, রসায়ন দ্রব্য ৭৮ ও অশোধিত খনিজ তৈল ৬০) এবং নির্মিত দ্রব্য ৪৬% (যন্ত্রপাতি ৩৩৬, লৌহ-ইস্পাত ১০৬, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও দ্রব্যাদি ৮৪, ও যানবাহনের সরঞ্জাম ৭৬)। ১৯৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ ভারতের আমদানি-বাণিজ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র (৩৮·৫%), যুক্তরাজ্য (৮%), পশ্চিম জার্মানি (৮%) ও জাপান (৫·৫%)-এর সহিত এবং রপ্তানি-বাণিজ্য হয় যুক্তরাজ্য (১৯·৫%), যুক্তরাষ্ট্র (১৭·৫%), সোভিয়েত দেশ (১০%) ও জাপান (৯%)-এর সহিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি চলিতেছে।

দ্র Compiled by Research & Reference Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, *India, 1969*, Delhi.

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

ভারতমহাসাগর ভারতমহাসাগরের উত্তরে ভারত, পাকিস্তান, ইরান ও আরব, পশ্চিমে আফ্রিকা, পূর্বে মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণে রহিয়াছে এণ্টার্কটিকা। ভারতমহাসাগরকে ২০° পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর হইতে এবং ১৪৭° পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর হইতে কাল্পনিকভাবে পৃথক করা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত ইহা ৬২০০ মাইল বিস্তৃত। উত্তর দিকে ইহা ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়াছে এবং দক্ষিণ ভারত

ও সিংহলের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার আয়তন ২৫৩০০০০০ বর্গ-মাইল। পারস্য উপসাগর ও লোহিত উপসাগর ইহাতে মিশিয়াছে।

সাধারণভাবে লম্বালম্বি বিস্তৃত জলমগ্ন পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষ হইতে এন্টার্কটিকা পর্যন্ত গিয়াছে। ইহাকে মধ্যভারতীয় পর্বতশ্রেণী বলা হয়। ইহার প্রধান দুইটি শাখার মধ্যে একটি উত্তর-পশ্চিমে আফ্রিকার দিকে গিয়াছে ও অপরটি পূর্বদিকে ৫০·৫° কাছাকাছি গিয়া বিস্তৃত হইয়া সেণ্ট পল-আমস্টারডাম মালভূমির সৃষ্টি করিয়াছে।

ভারতমহাসাগরের গভীরতা সর্বাপেক্ষা বেশী সুন্ডা-ট্রেঞ্চ অঞ্চলে। গভীরতার গড় ১২৭০০ ফুট।

দ্বীপপুঞ্জ : ভারতমহাসাগরের প্রধান প্রধান দ্বীপগুলি হইল মাদাগাস্কার, সিংহল, সকোত্রা, লাক্ষাদ্বীপ, মালদিভ, চাগোস, মরিশাস, সিচেলাস, আন্দামান, নিকোবর, সেণ্ট পল্।

উষ্ণতা : মকরক্রান্তি রেখার উত্তরে ভারতমহাসাগরের উষ্ণতা সবসময়েই ২০° সেণ্টিগ্রেডের অধিক। বিষুবরেখার মধ্যে ইহার উষ্ণতা গড়ে ২৫° সেণ্টিগ্রেড কিন্তু পূর্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা গড়ে ২৭·৫° ডিগ্রি সে. পর্যন্ত হয়। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উষ্ণতা কখনও কখনও ৩০° সেণ্টিগ্রেডের ঊর্ধ্বে উঠে।

লবণাক্ততা : ভারতমহাসাগরের লবণাক্ততা স্থানবিশেষে কোথাও কম, কোথাও বেশী। অত্যধিক লবণাক্ততা পরিলক্ষিত হয় আরব সাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে (৩৬%-এর অধিক)। হুগলি নদীর মুখে লবণাক্ততা ৩০%।

উপরিভাগের স্রোত : উত্তরভাগে মৌসুমীবায়ুর দ্বারা স্রোতের গতি প্রভাবিত। স্রোতের গতি পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত যখন উত্তর-পূর্ব মৌসুমীবায়ু প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী ও দক্ষিণ বিষুবরেখার স্রোতের মধ্যে ৮° হইতে ১০° দক্ষিণে একটি প্রতিকূল স্রোতের সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু-প্রবাহের সময় স্রোত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হয়, উত্তরভাগে ইহার গতি উত্তরদিকে।

ভারতমহাসাগরের দক্ষিণে বামাবর্ত প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের প্রভাবে। ইহার প্রবাহ পশ্চিমদিকে ২০° দক্ষিণের উত্তরে এবং পূর্ব-দিকে প্রবাহিত স্রোতের গতি ৪০° দক্ষিণের দক্ষিণে যাহা এন্টার্কটিকা মেরুসন্নিহিত স্রোতধারার অংশহিসাবে পরিগণিত। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত মাদাগাস্কারের নিকট দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। উভয়েই দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরদিকেরটি মোজাম্বিক প্রণালীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আগুলহাস স্রোত নামে অভিহিত হইয়া কেপ অফ গুড হোপ গিয়াছে ও পূর্বদিকে প্রবাহিত মেরুসন্নিহিত স্রোতধারার সহিত মিশিয়াছে।

সান্ত্বনা দাস

ভারতী সুব্রহ্মণ্য ভারতী দ্র

ভারবি কালিদাসোত্তর যুগের মহাকবিগণের মধ্যে ভারবি সম্ভবতঃ প্রথম ও প্রধান। 'অবন্তিসুন্দরীকথা' হইতে জানা যায় যে, তাঁহার অপর নাম দামোদর ও পিতার নাম নারায়ণস্বামী। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ উত্তরভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। ভারবি, কাঞ্চী-রাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের আশ্রিত ছিলেন। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আইহোল প্রশস্তিতে ভারবির উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, ঐ সময়ের পূর্বেই তিনি কবি হিসাবে যশস্বী হইয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্বের আখ্যান অবলম্বনে অষ্টাদশ সর্গে রচিত ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' নামক মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ—কুপিতা দ্রৌপদীর অনুরোধ সত্ত্বেও দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণায় যুধিষ্ঠিরের অসম্মতি, দৈব অস্ত্রকামনায় অর্জুনের কঠোর তপস্যা, কিরাতরূপী শিবের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ এবং পরিশেষে তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ শিব কর্তৃক তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র দান। ভারতীয় পণ্ডিত সমাজে ভারবির অর্থগৌরব সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিতে পারিলে প্রকৃত রসের সন্ধান পাওয়া যায় ; মল্লিনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—নারিকেল-ফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ। আধুনিক সমালোচকের দৃষ্টিতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, এই মহাকাব্যে গোমূত্রিকাবন্ধাদি চিত্রবন্ধের ও প্রতি সর্গের অন্ত্যশ্লোকে 'লক্ষ্মী' শব্দের প্রয়োগ এবং একটি মাত্র বর্ণ লইয়া শ্লোক-রচনা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপ্রদর্শনের সচেতন প্রয়াস মাত্র। কিন্তু ভারবির প্রাকৃতিক বস্তু-বর্ণনা অনবদ্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারশিব ভারশিবরা নাগবংশীয় ছিলেন। কথিত আছে যে শিবলিঙ্গ স্কন্ধে বহন করায় তাঁহাদের 'ভারশিব' নাম হয় এবং শিবের বরে খ্রীষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর শেষে অথবা ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, গঙ্গাতীর পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য-বিস্তার করেন ও পবিত্র গঙ্গাজলে তাঁহাদের কপোল অভিষিক্ত হয়। বাকাটক লেখ হইতে জানা যায় যে ভার-শিবরাজ ভবনাগের কন্যার পৌত্রের পৌত্র ছিলেন বাকাটক-রাজ ২য় রুদ্রসেন। এই রুদ্রসেন ২য় চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহাদের একটি শাখা কান্তিপুরীতে রাজত্ব করিতেন।

দ্র K, P, Jayswal, *History of India, 150 A.D. to 350 A.D.*, 1935; R. C. Majumdar ed.

History and Culture of the Indian People, Vol. II, Bombay, 1960.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ভারহুত মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেল্যর অন্তর্গত (পূর্বে নাগোদ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) একটি ক্ষুদ্র গ্রাম (২৪°৩৭′ উত্তর এবং ৮০°৫৩′ পূর্ব)। এই স্থানে আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্বেই স্তূপের মূল অংশের ইট ও পাথর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ কর্তৃক অপসারিত হইয়াছিল। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে ও তাঁহার সহকারী জে. ডি. বেগ্‌লারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উৎখননের ফলে কানিংহাম স্তূপটির রক্তিম বেলেপাথরে নির্মিত বেদিকার (railing, আবেষ্টনী) কিয়দংশ এবং পূর্বদিকের প্রবেশতোরণটি প্রায় সম্পূর্ণই উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহ হইতেও বেদিকার কিছু কিছু অংশ এবং একটি তোরণ-স্তম্ভ সংগ্রহ করা হয়। গ্রামবাসীদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোরণটি এবং আবেষ্টনীর অধিকাংশ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার জাদুঘরে (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম) স্থানান্তরিত হয়। কিছু কিছু অংশ এলাহাবাদ পৌর সংগ্রহশালায় এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের অন্যান্য কয়েকটি সংগ্রহশালায় স্থান পায়। পরে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সাতনা রেসিডেন্সি উদ্যানে রক্ষিত কিছু অংশ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের জন্য সংগৃহীত হয়।

ভারহুত স্তূপের আয়তন ও আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বর্তমানে সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে আবেষ্টনীটি এবং পরিপার্শ্ব পরীক্ষা করিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে স্তূপটি আয়তনে এবং আকৃতিতে সাঁচীর প্রধান (১নং বলিয়া চিহ্নিত) স্তূপের প্রায় অনুরূপ ছিল। ভারহুত স্তূপেরও আবেষ্টনীটি গোলাকার এবং ইহার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এই চারিদিকে ৪টি প্রবেশতোরণ ছিল। সুতরাং আবেষ্টনীটি ৪টি সমান অংশে বিভক্ত ছিল (quadrants)। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্বদিককার তোরণটি মাত্র রক্ষা পাইয়াছে, তবে কানিংহাম আরও দুইটি তোরণের অংশের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আবেষ্টনীর অভ্যন্তরস্থ প্রদক্ষিণ-পথও কানিংহাম চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন। মনে হয় যথারীতি মেধি, অণ্ড, হর্মিকা, যষ্টি ও ছত্র লইয়া মূল স্তূপটি সংগঠিত ছিল ('সাঁচী' ও 'স্তূপ' দ্র)। আবেষ্টনী ও তোরণ-গাত্রে উৎকীর্ণ কয়েকটি স্তূপের অনুকৃতি উপরোক্ত অনুমান সমর্থন করে।

স্তূপটির সকল অংশ এক সময়ে নির্মিত হয় নাই। আবেষ্টনী-নির্মাণের কিছুকাল পরে তোরণগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রবেশপথগুলি সম্পূর্ণ অনাবৃত ছিল না। প্রবেশপথ-সংলগ্ন আবেষ্টনীর শেষ স্তম্ভ (terminal pillar) হইতে লম্বভাবে আর একটি বেদিকা (railing) প্রসারিত করিয়া এবং পুনরায় বেদিকাটিকে লম্বভাবে মোড় ঘুরাইয়া প্রবেশপথের সম্মুখে একটি আংশিক আবরণ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। প্রসারিত বেদিকাটি (return railing) ছিল অনেকটা (.⅃)-আকৃতির। উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কেহ সোজাসুজি আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারে। মূল আবেষ্টনীর শেষ স্তম্ভ (terminal pillar) এবং প্রসারিত বেদিকার স্তম্ভগুলির (return pillar) আকৃতি, আয়তন এবং অলংকরণ স্বতন্ত্র ধরনের। বেদিকা আলম্বন (অধিষ্ঠান), স্তম্ভ, সূচি এবং উষ্ণীষ এই ৪টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। স্তম্ভগুলি চতুষ্কোণ এবং তিনটি আনুভূমিক সূচি-দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত। উপরে গুরুভার উষ্ণীষ স্থায়িত্ব রক্ষা করে। সর্বসমেত উচ্চতা প্রায় ২.৭ মিটার। তোরণটি ৬.৭৫ মিটার উচ্চ এবং ইহার দুইদিকে দুইটি স্তম্ভ ; প্রত্যেকটি স্তম্ভ প্রকৃতপক্ষে চারিটি অষ্টকোণ ও অলঙ্করণবিহীন আলাদা স্তম্ভের সমন্বয়ে গঠিত। স্তম্ভের শীর্ষে পিঠাপিঠি ২টি সিংহ ও ২টি ষাঁড়ের মূর্তি ; ষাঁড়ের মুখ মানুষের মত। ইহার উপর তিনটি ঈষৎ বক্রাকার কড়ি (architrave) বিন্যস্ত। স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য কড়িগুলি ক্ষুদ্রাকার স্তম্ভ-দ্বারা পরস্পর-সংযুক্ত। কড়িগুলির শেষপ্রান্ত কুণ্ডলাকার (volute)। কানিংহাম আরও ২টি তোরণ-স্তম্ভ উদ্ধার করিয়াছিলেন। স্তম্ভ-দ্বয় চতুষ্কোণ এবং অলংকৃত। এইগুলি সম্ভবতঃ উত্তর ও দক্ষিণ তোরণের অংশ। সুতরাং মনে হয় সব তোরণই এক ধরনের ছিল না।

উষ্ণীষের একদিকে মধ্যস্থলে হস্তিমুখনিঃসৃত পদ্মের সারি, অন্যদিকে ঢেউখেলানো লতা। কিনারায় উপরের দিকে নীলোৎপলের ও তিন ধাপ-বিশিষ্ট পিরামিডের সারি (কাহারও কাহারও মতে যজ্ঞের বেদীর অনুকৃতি) এবং নীচের দিকে জাল ও ঘণ্টার সারি (কিঙ্কিণী জাল)। স্তম্ভ ও সূচি নানাবিধ অলংকৃত ফলক দ্বারা শোভিত। পাষাণ গাত্রে ফুলফল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী (স্বাভাবিক ও কল্পিত), হার, কুণ্ডল প্রভৃতি দেহ-অলঙ্কার, মঙ্গলঘট, ত্রিরত্ন, শ্রী, গজলক্ষ্মী ইত্যাদি পূত-চিহ্ন বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

কিন্তু ভারহুত ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হইল বুদ্ধের জীবনের ঘটনাবলী ও জাতকের কাহিনী। স্তম্ভ ও সূচির ফলকগুলিতে, তোরণের কড়িতে এবং উষ্ণীষের ঢেউখেলানো লতার মধ্যবর্তী স্থানে এইরূপ বহু চিত্র ক্ষোদিত। নিম্নে কয়েকটি চিত্রের উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) তুষিত স্বর্গধাম হইতে শ্বেতহস্তীরূপে ভগবান বুদ্ধের মাতৃগর্ভে প্রবেশ সম্পর্কে মায়াদেবীর স্বপ্ন ; (২) গৌতমের মহা-অভিনিষ্ক্রমণ ; (৩) কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর বুদ্ধদেব সমীপে আগমন ; (৪) মগধরাজ অজাতশত্রু-কর্তৃক বুদ্ধবন্দনা (বুদ্ধদেব কোথাও মানব-রূপে চিত্রিত হন নাই, প্রতীকদ্বারাই তাঁহার উপস্থিতি জ্ঞাপন করা

হইয়াছে) ; (৫) অনাথপিণ্ডদ কর্তৃক জেতবন (বুদ্ধের আবাসগৃহ গন্ধকুটী ও কোশাম্বকুটী চিত্রিত রহিয়াছে) ক্রয়ের দৃশ্য ; (৬) মিশ্রকেশী, অলম্বুষা প্রমুখ স্বর্গের অপ্সরাগণের নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রসহকারে নৃত্যগীত ; (৭) মহাকপি জাতক ; (৮) নলিনিকা বা ইসিসিঙ্গিয় জাতক (ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনী) ; (৯) ছদ্দন্ত জাতক ; (১০) বেস্‌সন্তর জাতক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত স্তম্ভসংলগ্ন বহু যক্ষ (কুবের, সূচীলোম, ধৃতরাষ্ট্র, সুপ্রবাস প্রভৃতি), যক্ষিণী (চন্দ্রা, সুদর্শনা), নাগ (এরপত, চক্রবাক ইত্যাদি), দেবতা (চুলকোকা, মহাকোকা) প্রভৃতির পূর্ণাবয়ব মূর্তি রহিয়াছে। অনেকে নরবাহন বা পশুবাহন। একটি বৃক্ষকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া শালভঞ্জিকা ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মানা অনবদ্য দেবতা-মূর্তি (চুলকোকা) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক ঘটনা এবং মূর্তি লেখদ্বারা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। তোরণ-গাত্রেও একটি উৎসর্গ-লেখ রহিয়াছে ; এই লেখটিতে বলা হইয়াছে যে শুঙ্গবংশের রাজত্বকালে রাজা বিশ্বদেবের পৌত্র ও অগরজুর পুত্র, ধনভূতি কর্তৃক তোরণটি স্থাপিত হইয়াছিল। অন্য দুইটি তোরণেও অনুরূপ লেখ ছিল। লেখগুলির লিপি ব্রাহ্মী এবং ভাষা প্রাকৃত। অশোক-লেখের ভাষার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রহিয়াছে। ব্রাহ্মী অক্ষরগুলিরও পরিবর্তন লক্ষণীয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে লিপিতত্ত্বের বিচারে তোরণ-লেখের অক্ষরগুলি স্তম্ভ, সূচি ও উষ্ণীষ-গাত্রে উৎকীর্ণ অক্ষর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের। সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি বিচার করিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, আবেষ্টনীটি খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধে (১৫০—১২৫ খ্রীপূ) এবং তোরণগুলি তাহার অর্ধশতাব্দী পরে নির্মিত হইয়াছিল। তোরণ প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক কয়েকটি স্তম্ভও রহিয়াছে, সম্ভবতঃ তৎকালে আবেষ্টনীর সংস্কার প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভক্তগণ আবেষ্টনী-নির্মাণের ব্যয় অনেকক্ষেত্রে বহন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নামধাম পাষাণগাত্রে ক্ষোদিত রহিয়াছে। পূজা-আরাধনার জন্য ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত হইতে ভক্তগণের আগমন হইয়াছিল, যথা, বিদিশার চাপাদেবী, অনুরাধা, ফগুদেব ও ভুতরক্ষিত, করহকট-বাসী (বর্তমান করহদ, সাতারা জেলা) আর্যভূতক ও সমিক, পাটলিপুত্রবাসী মহীন্দ্রসেন, নাগসেনা ও সঙ্কটদেবী, চেকুলন (চাউল, বোম্বাই)-বাসী সংঘমিত্র ইত্যাদি। করহকটের পৌর নিগম কর্তৃক একটি দানের কথা উল্লিখিত আছে।

ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে ভারহুত স্তূপের স্থান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ চিত্রণের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত এবং রূপকর্মের কালও মোটামুটি নির্ণীত। ভারহুতের ভাস্কর্য প্রাচীনতাদোষ-মুক্ত নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঘটনাবলীর সাবলীল ও অনাড়ম্বর বর্ণন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দেহভঙ্গিমার বলিষ্ঠ প্রকাশ প্রশংসনীয় ('ভাস্কর্য, ভারতীয়' দ্র)। দেহ-অলংকারের বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য লক্ষণীয়। ভারহুতের ভাস্কর্য-রীতি সম্পূর্ণ দেশজ, তবে কয়েকটি রূপচিহ্ন, যথা পক্ষযুক্ত সিংহ, হানিসাক্‌ল (honeysuckle), এবং সম্ভবতঃ উষ্ণীষ-গাত্রে ক্ষোদিত পিরামিডের ও নীলোৎপলের সারি পশ্চিম এশীয় প্রভাব সূচিত করে।

ভারহুত স্তূপের চিত্রগুলি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসের উপরও প্রভূত আলোকপাত করে। বোধিমণ্ড, বুদ্ধদেবের চংক্রম, স্তূপ, বিভিন্ন আকারের মন্দির, সমসাময়িক কুটীর ও অন্যান্য আবাসগৃহ, একাধিক তল-বিশিষ্ট সৌধ, প্রাসাদ, সভামণ্ডপ (স্বর্গলোকের বৈজয়ন্ত নামক প্রাসাদ ও সুধর্মা নামক দেবগণের সমাবেশ-শালা), নগর, প্রাকার, তোরণ প্রভৃতির অনুকৃতি পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়। একটি মন্দিরের ছাদ গজপৃষ্ঠাকৃতি (vaulted) এবং ইহার তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি গজশীর্ষ স্তম্ভ। কয়েকটি সস্তম্ভ মন্দিরের চিত্রও আছে। বুদ্ধগয়ায় অশোকের কীর্তিগুলির অনুকৃতি সম্ভবতঃ ভারহুত-বেদিকায় উৎকীর্ণ আছে। ('বুদ্ধগয়া' দ্র)

ভারহুতের ক্ষোদিত চিত্রাবলীতে তৎকালীন লৌকিক ধর্মবিশ্বাস এবং তাহার সহিত প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কের আভাস পাওয়া যায়। সাধারণ জীবনযাত্রার অনেক চিত্র এবং তৎকালীন নরনারীর বেশভূষা, অলঙ্কার ইত্যাদির বিশদ পরিচয়ও পাওয়া যায়। এলাহাবাদ পৌর সংগ্রহশালায় রক্ষিত একটি মল্লক্রীড়ার ক্ষোদিত দৃশ্য বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। চিত্রে ৪ ধাপ বিশিষ্ট মানুষের একটি পিরামিড দেখানো হইয়াছে। সর্বনিম্ন সারিতে ৬ জন লোক দণ্ডায়মান, উহাদের স্কন্ধে ৪ জন লোক দাঁড়াইয়া আছে, একইভাবে তৃতীয় সারিতে ২ জন এবং সর্বোচ্চ সারিতে একজন দণ্ডায়মান।

দ্র A. Cunningham, *The Stupa of Bharhut*, London, 1879; A. K. Coomaraswamy, *History of Indian & Indonesian Art*, London, 1927; Benimadhab Barua, *Barhut*, Books I—III, Calcutta, 1934; N. G. Majumdar, *A Guide to the Sculptures in the Indian Museum* Pt. I, *Delhi*, 1937; Percy Brown, *Indian Architecture*, Vol. I, Bombay, 1942; Stella Kramrisch, *The Art of India*, London, 1954.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

ভার্জিল, পুব্লিউস ওয়েগিলিউস মারো, (৭০—১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), লাটিন মহাকবি। মাণ্টুআর নিকটে আনডেস গ্রামে ৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৫ অক্টোবর এক অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী পরিবারে ভার্জিল জন্মগ্রহণ করেন।

ভেরোনা, মিলান ও রোম নগরীতে রাজকার্যের উপযুক্ত উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেও প্রকৃতির সৌকুমার্য ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে তিনি কাব্য রচনাকেই বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেন।

ভার্জিলের প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্য 'বুকলিক্স্' বা রাখালী কবিতা (৪২—৩৭ খ্রীপূ)। এই দশটি কবিতার অধিকাংশই থিওক্রিটাস ও অন্যান্য কবির রাখালী কবিতার আদর্শে লিখিত। এইগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রেমগীতি। পঞ্চমটি শোকগাথা, সম্ভবতঃ জুলিয়াস সীজারের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিখ্যাত চতুর্থটিতে একটি মহান্ শিশুর আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, যে শিশু জগতে নূতন যুগের দিশারী হইবে।

ইতিমধ্যে ভার্জিল তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মাইকেনাস-এর প্রস্তাব অনুসারে কৃষিকার্য-সম্পর্কিত কাব্য 'জর্জিকস্' রচনা করেন। গ্রীক কবি হেসিওডের রচনা হইতে প্রেরণা লাভ করিলেও ভার্জিল তাঁহার মৌলিকতার স্বাক্ষর রাখিতে পারিয়াছেন। 'জর্জিক্স্' প্রচারধর্মী রচনায় পর্যবসিত না হইয়া প্রকৃত কাব্য হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি ঈনৃয়িড্-এর জন্যই লাটিন সাহিত্যে ভার্জিলের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব। এই মহাকাব্য তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই ও ইহা নষ্ট করিয়া ফেলার জন্য উইলে নির্দেশ রাখিয়া যান। অগাস্টাসের আদেশে এই নির্দেশ অমান্য করা হয়। মহাকাব্য রচনায় ভার্জিলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অগাস্টাসের নেতৃত্বে রোমের অভ্যুদয়ের যশোগান। যে প্রভূত পরিশ্রম ও স্বার্থ-ত্যাগের ফলশ্রুতি রোমক জাতির মহত্ত্ব তাহার সম্বন্ধে কবি আলোকপাত করিতে চাহিয়াছেন। রোমকদের গুণাবলী তিনি অতিরঞ্জিত করেন নাই, রোমক চরিত্রের দুর্বল দিক-গুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল রাষ্ট্র-শাসনকার্যে রোমকদের বিশেষ প্রতিভা আছে। ট্রয় নগরী ধ্বংস হওয়ার পর ট্রয়ের বীর অধিবাসী ঈনিআস-এর দুঃসাহসিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'ঈনৃয়িড'-এর প্রথম ছয়টি সর্গের বিষয়বস্তু। পরবর্তী ছয়টি সর্গে ইটালীতে নূতন নগর পত্তন করার জন্য ঈনিআসের সংগ্রামের বিবরণ রহিয়াছে।

হোমার প্রভৃতি পূর্ববর্তী বহু লেখকের দ্বারা ভার্জিল প্রভাবিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু অন্য রচনা হইতে সংগৃহীত উপকরণ 'ভাষার অধীশ্বর'-এর লেখনীর জাদু-স্পর্শে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। বিশ্ব-সাহিত্যের মহত্তম কাব্যগুলির মধ্যে 'ঈনৃয়িড্' একটি। গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্য 'ঈনৃয়িড'কে বৈশিষ্ট্য দান করি-য়াছে। বিষয়বস্তুর মহিমা ও জাতীয় গুরুত্বের সহিত উদাত্ত শৈলী, সুস্পষ্ট বর্ণনা-ভঙ্গী, এবং সুললিত ছন্দের সমাবেশ হইয়াছে। তীব্র রোমক সুরের সহিত মানবতার জন্য নম্র দরদ সংমিশ্রিত হইয়াছে। আদর্শ নায়ক ঈনিআসের গুণাবলীর মধ্যে 'পিয়েটাস' (কর্তব্যনিষ্ঠা, ধর্মপরায়ণতা) অন্যতম। তাঁহার প্রতি যেরূপ আমাদের প্রশংসা ও সম্ভ্রমের বোধ জাগে, সেইরূপ ভাগ্যবিড়ম্বিত কার্থেজের মহিষী ডাইডোর জন্য ও রুটুলিআনদের নেতা টুর্নসের জন্য আমরা অনুকম্পাও অনুভব করি। ভার্জিলের মহা-কাব্যের আবেদন বিশ্বজনীন।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভার্জিলের মৃত্যু হয়। সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিন্তাধারা, শৈলী ও আঙ্গিকের উপর ভার্জিলের প্রভাব সর্বাধিক। মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্যের' বিষয়বস্তু ও ছন্দধ্বনির উপর ভার্জিলের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভার্জিলের শব্দ-সম্পদের প্রতি মধু-সূদন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। হৃষীকেশ বসু ও রবেয়ার আঁতোয়ান কর্তৃক ঈনৃয়িড্-এর আংশিক বঙ্গানুবাদ হইয়াছে।

দ্র J. W. Mackail, *Virgil and His Meaning to the World of Today*, New York, 1922; H. W. Prescott, *The Development of Virgil's Art*, Chicago, 1929; B. Otis, *Virgil : A Study in Civilised Poetry*, London, 1963; W. F. S. Putnam, *The Poetry of the Aeneid*, London, 1965.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভার্ন, জুলে (১৮২৮-১৯০৫ খ্রী) বিশ্রুত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক রহস্য-কাহিনীকার। ফ্রান্সের নাঁতে (Nantes)-তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা হয় নাঁতে-তে। পরে পারীতে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' (*Cinq Semaines en ballon*, ১৮৬২ খ্রী) প্রকাশিত হইবার পর হইতেই দেশ-বিদেশে তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং আগামী দিনের সম্ভাব্য বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক নূতন ধরনের মানস ভ্রমণ-কাহিনী রচনার সূত্রপাত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এই সকল গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। বাংলায় ভার্নের গ্রন্থের অনুবাদ করেন রাজেন্দ্রলাল আচার্য। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি 'পাতালে' (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) নামে প্রকাশিত হয় এবং শেষোক্তটির নাম দেওয়া হয় 'চন্দ্রলোক যাত্রা' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। ভার্নের রচিত অপরাপর বৈজ্ঞানিক রহস্য কাহিনীর মধ্যে 'সমুদ্রতলে ষাট হাজার মাইল' (*Vingt Mille Lieues sous les Mers*, ১৮৬৯ খ্রী) এবং 'আশি দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ' (*Voyage autour du Monde en quatre-Vingts Jours*, ১৮৭২ খ্রী) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহিত্যক্ষেত্রে অবদানের জন্য ভার্ন ফ্রান্সের জাতীয় সম্মান 'লিজন অব অনার' লাভ করেন। ইহা ছাড়া ফরাসী আকাদেমিও তাঁহাকে সম্বর্ধনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু সভ্য করেন নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতেও তিনি এমন সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখিয়াছেন, পরবর্তী যুগে যাহা সত্যে

পরিণত হইয়াছে। সহজ-সুন্দর ও চিত্রধর্মী ভাষায় রচিত তাঁহার রহস্য কাহিনীগুলি পড়িতে বসিয়া আজিও অগণিত পাঠক রোমাঞ্চ অনুভব করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ জুলে ভার্নের মৃত্যু হয়।

দ্র C. Lemire, *Jules Verne*, 1908; C. F. Hore, *Jules Verne*, 1914.

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ভার্সাই চুক্তি বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম দ্র

ভাষা ভাষা হইল এমন এক বাঙ্ময় স্বনির্ভর সংকেত-ধর্মী প্রকাশ যাহার রীতিসিদ্ধ প্রচলিতি গড়িয়া উঠে সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কতকগুলি ধ্বনি- বা অক্ষর-সমবায়েই ভাষা রচিত হয় না। সেগুলি যদি কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর নিকট বিশেষ অর্থবহ হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে বলা যায় 'ভাষা'। এই জন্যই ভাষা 'রীতিসিদ্ধ'। যেমন ক, ল, ম—এই তিনটি অক্ষরের ক্রম-বিন্যাস বাংলায় রীতিসিদ্ধ, অন্য ভাষায় নয়। সুতরাং এই ধ্বনি- বা অক্ষর-গুচ্ছ বাংলাভাষার অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত। 'সংকেত' কথাটিরও প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'সংকেত' কথাটি কোনও কিছুর প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত। বাগ্‌ধারা হইতে বিশ্লিষ্ট কোনও অর্থপূর্ণ অংশ যদি হয় ভাষার দেহ, তবে সত্তা হইল তাহার অন্তর্নিহিত অর্থব্যঞ্জনা। এক একটি শব্দ কেবল বস্তুর শব্দচিত্র নয়, তাহা উপলব্ধির চিত্রকল্প, ভাবজগতের চলমান ছবি। ভাষা হইল এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের নিরবয়ব ধারণার প্রতীক। এই প্রতীকগুলি অবশ্য 'স্বনির্ভর'। অর্থাৎ সেগুলির নিজস্ব কোনও অর্থ নাই। ইংরেজী *dog*, জার্মান *hund*, লাতিন *chien* বা বাংলা কুকুর—এই শব্দগুলির অর্থ একই—যে কোনও প্রতীক ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও। আসলে এই প্রতীকগুলি কেবল যথেচ্ছ ব্যবহৃত চিহ্নমাত্র—তাহাদের নিজস্ব কোনও অর্থ নাই। রীতিসিদ্ধ প্রয়োগ হিসাবেই এইগুলি এক একটি ভাষায় এক এক উপায়ে চিহ্নিত হইয়া আসিতেছে। ভাষার আর একটি লক্ষণ হইল যে, ইহা বাঙ্ময়। ভাষার অর্থবহ প্রকাশ নানাভাবেই ঘটিতে পারে—যেমন অঙ্গভঙ্গী বা ইঙ্গিত দ্বারা, লিখিত রচনার মাধ্যমে অথবা কোনও বিশেষ চিহ্নের দ্বারা। 'ভাষা' অর্থে কিন্তু প্রধানতঃ বাঙ্ময় প্রকাশকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, শ্রোতা এবং বক্তার ব্যক্তিমানস, জীবনবোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ অথবা চিন্তানির্ভর দ্বান্দ্বিক প্রত্যয় ইত্যাদি কেবল বাঙ্ময় প্রকাশেই বিধৃত হয়। ভাষার আশ্রয় হইল সমাজ। সমাজভুক্ত ভাষাভাষীর সহযোগ, মনোভঙ্গী এবং প্রতিক্রিয়া হইল ভাষার দৃঢ়মূল ভিত্তি। অপরদিকে জনজীবনের ইতিহাস, চরিত্র, মানসিকতা অথবা সমাজসত্তার অভিজ্ঞতা ভাষার অন্তঃপুরেই সঞ্চিত থাকে। তাই ভাষা যেন এক 'সামাজিক চুক্তিবিশেষ'।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভাষাগোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার প্রধান প্রধান ভাষা চলিত আছে, এই ভাষাগুলিকে আনুমানিক ২৬টি ভাষাগোষ্ঠী বা ভাষা পরিবারের (Language-Families) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। যে কোনও ভাষাকে একটি বিশেষ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার পিছনে রহিয়াছে এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ভাষার বর্গীকরণ (classification) নানা উপায়েই করা যায়। সর্বাপেক্ষা আদৃত পদ্ধতি হইল ভাষার গোত্রগত বর্গবিভাগ (genealogical classification)। ভাষাগোষ্ঠী নির্ণয়ের পূর্বে এই পদ্ধতির সম্যক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অতীতের কোনও একটি ভাষা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যদি দুই বা ততোধিক ভাষায় ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তবে সেই বিবর্তিত ভাষাগুলি সমগোত্রজ বলিয়া বিবেচিত হয়। দুইটি ভাষার গোত্রনির্ণয়ের জন্য তাই প্রয়োজন ভাষাগুলির তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিবরণ। বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত সমার্থক শব্দসম্ভার এবং রূপগত উপকরণ বা উপাদানের মধ্যে যদি বিশেষ কোনও সাদৃশ্য দেখা যায়, অথবা আপাত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে গূঢ় কোনও নিয়মসূত্র আবিষ্কার করা যায়, তবে ঐ ভাষাগুলির সম্পর্ক অবশ্যই মৌলিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর এই সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন—তুলনামূলক বিচারের দ্বারা আলোচ্য ভাষাগুলির অতীত ইতিহাসের পুনর্গঠন। উদাহরণস্বরূপ, সংস্কৃত mātā = গ্রীক māter = লাতিন māter = ইংরেজী mother—এই সমীকরণ হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভাষাগুলি সমগোত্রজ, কারণ অর্থ এবং ধ্বনিগত সাধর্ম্য ভাষাগুলির সাধারণ লক্ষণ। ধ্বনিবৈষম্য থাকিলেও (তুঃ সংস্কৃত ইত্যাদি = ইংরেজী th) উহা নিয়মের ব্যতিক্রম নয় (তুঃ সংস্কৃত pitā, bhrātā = ইংরেজী father, brother ইত্যাদি)। অবশ্য ধ্বনি-বৈষম্যের জটিল ক্ষেত্রগুলিতে (এক্ষেত্রে স্বরধ্বনিগুচ্ছ) অধিকাংশ ভাষার সাক্ষ্য এবং|অথবা প্রাচীনতম রচনা-নিদর্শন অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে দুই বা ততোধিক ভাষা একই গোষ্ঠীভুক্ত কিনা বিচার করিতে হইলে ভাষাগুলির নিজস্ব উপাদানের তুলনামূলক বিচার সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। 'নিজস্ব উপাদান'-এর অর্থ ভাষার সেই উপাদান যাহা সহজে অন্য ভাষার দ্বারা স্থানচ্যুত হইতে পারে না, যথা পিতা/মাতা-জাতীয় শব্দ, সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম, বহুল প্রচলিত ধাতু ইত্যাদি।

ভাষার বর্গীকরণের আর একটি পদ্ধতি হইল রূপতত্ত্ব-নির্ভর (morphological)। এই মানদণ্ডে নির্ণীত বিভাগগুলি হইল ক. অনন্বয়ী (Isolating) ভাষা, যথা, চীনা ভাষা; খ. যুক্তান্বয়ী (Agglutinating) ভাষা, যথা,

তুর্কী ভাষা ; গ. প্রত্যয়ান্বয়ী বা প্রাত্যয়িক (Inflectional) ভাষা, যথা, ইন্দো-ইওরোপীয় এবং সেমীয়-হামীয়; ঘ. দূরান্বয়ী (Incorporating) ভাষা, যথা, এস্কিমো ভাষা ইত্যাদি।

ভৌগোলিক অবস্থিতি বিচার করিয়াও ভাষার বর্গীকরণ করা যায়, অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে—যেখানে সম্পর্কিত ভাষাগুলির নিদর্শন লুপ্ত অথবা নগণ্য। এইরূপ ক্ষেত্রে গোত্রবন্ধন সম্ভবপর হয় নাই বলিয়া ভাষাগুলি অবর্গীয় (unclassified) রহিয়া গিয়াছে, যেমন অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার আদিম ভাষাবর্গ।

যাহাই হউক, গোত্রবিচারের মানদণ্ডে বিভিন্ন ভাষাগুলিকে নিম্নলিখিত ২৬টি ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

১. ইন্দো-ইওরোপীয় ঃ এই গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির আনুমানিক সংখ্যা ১৩২, ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ১৬০ কোটি। ভারতে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ২০ হাজার ৭০০ ; মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহৃত মোট ভাষার সংখ্যা ৫৭৪ (ভারতের ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনসমীক্ষা)। 'ইন্দো-ইওরোপীয়' এবং 'আর্য' দ্র।

২. দ্রাবিড় ঃ এই বর্গভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ২৬টি। ইহার অন্তর্গত ব্রাহুই ভাষা কেবল ভারতের বহির্ভূত অঞ্চলে অর্থাৎ পাকিস্তানে প্রচলিত। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির সংখ্যা ১৫৩। মোট দ্রাবিড়বর্গীয় ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ৭৪ লক্ষ ১০ হাজার ৮১০। তন্মধ্যে সংবিধানে স্বীকৃত তামিল, তেলুগু, মালায়ালম ও কানাড়ী ভাষাভাষীর সংখ্যা ১০ কোটি ২৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৪৭ (অর্থাৎ মোট সংখ্যার শতকরা ৯৫·৫৮ ভাগ)। 'দ্রাবিড়' দ্র।

৩. আন্দামানী ঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত আন্দামানীর মোট ভাষার সংখ্যা ১২, বর্তমানে এই গোষ্ঠীর ভাষা ক্ষীয়মাণ। গ্রিয়র্সন-এর গণনা অনুযায়ী আন্দামানী ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল ১৮৮২, কিন্তু সাম্প্রতিক সমীক্ষায় (১৯৬১ খ্রী) গ্রেট আন্দামানীর ভাষী সংখ্যায় মাত্র ১৯। এখনও ভাষাগুলি অবর্গীভূত রহিয়াছে। ধ্বনিতত্ত্ব বিচারে দেখা যায় স্- ও অন্যান্য উষ্মধ্বনির অভাব, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের প্রয়োগ-প্রাচুর্য, লিঙ্গ বিচারে সচেতন ও অচেতন বিভাগ ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে মেলে কেবল এক- বা দুই-বোধক সংখ্যা। দশের ঊর্ধ্বে গণনারীতি নাই। রূপতত্ত্ব-বিচারে ইহা আংশিক (partial) মুক্তান্বয়ী ভাষাবর্গ।

৪. বুরুশাস্‌কী বা খাজুনা ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমান্তে প্রচলিত (কাশ্মীরের উত্তরে হুনজা-নগ্যর, খিজ্‌র উপত্যকা) এই ভাষা বর্তমানে অবর্গীভূত রহিয়াছে। তুর্কী, ভোট-বর্মী, ইরানীয় এবং ভারতীয় আর্য ভাষা দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া ইহার গোত্র বিচার আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন মুণ্ডা ও দ্রাবিড়, এমন কি বাস্‌ক ভাষাগুলির সহিত ইহার সম্ভাব্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলিতেছে। পূর্বতন লোকগণনা অনুযায়ী ইহার ভাষীর সংখ্যা ছিল ২৬ হাজার মাত্র। এই ভাষায় সর্বনামশ্লিষ্ট উপসর্গ শব্দের যথেষ্ট বিকৃতি ঘটাইয়া থাকে।

৫. ভোট-চীনীয় বা চীনা-তিব্বতীয় ঃ 'ভোট-চীনীয় ভাষা' দ্র।

৬. অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic বা South-East Asiatic) ঃ ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অঞ্চল জুড়িয়া এই ভাষাগোষ্ঠী ছড়াইয়া আছে। আনুমানিক প্রধান ভাষার সংখ্যা ৫২। ভারতে অস্ট্রিক বা নিষাদ ভাষাভাষীর সংখ্যা ৬১ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৯৫। ভারতে এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ৬৫ (মুণ্ডা শাখার ৫৮টি এবং মোন্-খ্মের শাখার ৭টি)। ভাষাতত্ত্বের বিচারে ইহা মুক্তান্বয়ী ভাষা। 'অস্ট্রিক', 'খাসি/খাসিয়া', 'খেরবাল' এবং 'নিকোবরী' দ্র।

৭. অস্ট্রোনেশীয় বা মালয়ী-পলিনেশীয় ঃ এই শাখার ভাষাগুলি পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকা সংলগ্ন ইস্টার দ্বীপপুঞ্জ হইতে পশ্চিমে আফ্রিকার মাদাগাস্কার এবং উত্তরে ফরমোসা হইতে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন স্থানে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিকে লক্ষ রাখিয়া এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, ক. ইন্দোনেশীয়—মালয়েশিয়ার ভাষা মালয়ী, ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বলি, বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, ফিলিপ্পীনের ভাষা তাগালোগ এবং মাদাগাস্কারে প্রচলিত মালাগাসি ইত্যাদি প্রায় ২০০টি ভাষা; খ. মেলানেশীয়—ফিজি, সলোমন, নিউ হেব্রাইডিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রচলিত প্রায় ৩৫টি ভাষা; গ. মাইক্রোনেশীয়—ক্যারোলাইন প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের প্রায় ৮টি ভাষা ; এবং ঘ. পলিনেশীয় —সামোয়া, টাহিটি, হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জের ভাষা, নিউজিল্যান্ডের মাওরি প্রভৃতি প্রায় ২০টি ভাষা। এই গোষ্ঠীভুক্ত মোট প্রধান ভাষার সংখ্যা প্রায় ২৬৩। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১৩·৫ কোটি। তবে ভাষাগুলির মধ্যে যবদ্বীপীয়, নামান্তরে 'কাবি' ভাষার সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রাচীন (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক)। প্রাচীন মালয়ীর উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত 'বাহাসা ইন্দোনেশিয়া' ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ভাষারূপে বহুল প্রচলিত।

ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এই ভাষাগোষ্ঠী হইল মুক্তান্বয়ী ভাষা। উপসর্গ (prefix), প্রত্যয় (suffix) ও অন্তরাগমের (infix) বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বিভক্তি বচন বা লিঙ্গবিচার নাই। ইহা মূলতঃ একাক্ষরমূলক (monosyllabic) ভাষা। নাম বা ধাতুর দ্বিত্ব প্রয়োগের দ্বারা বহুবচন বা ক্রিয়ার তীব্রতা ও পৌনঃপুনিকতা বুঝানো হয়। 'অস্ট্রিক' দ্র।

৮. লা-তি (La-ti) : ভোট-চীনাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই ভাষাগোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থান করিয়া আছে। এই ভাষার গোত্র অনির্ণীত। য়ুনান এবং টংকিং-সীমান্তের সন্নিকটে (উত্তর ভিয়েৎনাম) ইহার ভাষাঞ্চল বিস্তৃত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনা অনুযায়ী ইহার আনুমানিক লোকসংখ্যা ছিল ৪৫০।

৯. পপুয়ান (Papuan) : এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্ত-র্ভুক্ত প্রায় ১৩২টি ভাষার গোত্রগত বিচার এখনও সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ এই বিভাগ ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে নির্ণীত হইয়াছে। ভাষাঞ্চল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিউ গিনি ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত হইলেও ইন্দোনেশীয়, মেলানেশীয় বা অস্ট্রেলীয় ভাষাগুলির সহিত ইহাদের কোনও সাদৃশ্য নাই। এই গোষ্ঠীর ভাষা সম্ভবতঃ মুক্তান্বয়ী।

১০. অস্ট্রেলীয় : অস্ট্রেলিয়ার আদিম ভাষাগুলি সংখ্যায় প্রায় ৯৬টি হইলেও তাহাদের গোত্রগত সাধর্ম্য অনির্ণীত। কাজেই এই বিভাগ ভৌগোলিক বিচারে গৃহীত হইয়াছে। অস্ট্রেলীয় আদিবাসীরাই ক্রমশঃ ক্ষীয়মাণ। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ইহাদের লোকসংখ্যা ৭৬ হাজার মাত্র। পপুয়ান এবং অস্ট্রেলীয় ভাষাভাষীর সম্মিলিত সংখ্যা ২০ লক্ষের বেশি নয়। ভাষাতত্ত্বের বিচারে ইহা মুখ্যতঃ প্রত্যয়ান্বয়ী ভাষা।

১১. তাস্মানীয় : তাসমানিয়ার এই ভাষাগোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। প্রধান ৫টি শাখার সবগুলিই অধুনালুপ্ত। অস্ট্রেলীয় ভাষার সহিত ইহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্যও দেখা যায় না।

১২. জাপানী এবং কোরীয় : জাপান এবং কোরিয়ায় প্রচলিত জাপানী ও কোরীয় ভাষাভাষীর আনুমানিক সংখ্যা যথাক্রমে ৯·৫ এবং ৩·৫ কোটি। এই ভাষাগোষ্ঠীর গোত্রবিচার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। উভয় ভাষার সম্পর্কবিচারও তেমন যথেষ্ট নয়। জাপানী সাহিত্য রচনার সূত্রপাত খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক হইতে। 'জাপানী ভাষা' দ্র।

১৩. প্রত্ন-এশীয় বা হাইপারবোরীয় (Palaeo-Asiatic বা Hyperborean) : ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ করিয়া এই গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে, গোত্র বিচার করিয়া নয়। এশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তিক অঞ্চলে অল্প-সংখ্যক ভাষাভাষীর মধ্যে এই ভাষাগুলি সীমাবদ্ধ। ইহার অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলির মোট সংখ্যা ১২। আইনু (Ainu) ভাষা সমেত এই গোষ্ঠীর ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৩০ হাজার। ভাষাতাত্ত্বিক প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনুসর্গের সাহায্যে কারক গঠন, আইনুতে সহায়ক শব্দের সাহায্যে, ক্বচিৎ অন্যত্র অন্তরাগমের সাহায্যে ক্রিয়াপদের 'কাল' নিরূপণ। আইনু সংখ্যাবাচক শব্দেরও বিশিষ্টতা রহিয়াছে।

১৪. উরালীয় বা ফিন্নো-উগ্রীয় (Uralic বা Finno-Ugrian) : এই গোষ্ঠীভুক্ত মুখ্য ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩২। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ২ কোটি। এই গোষ্ঠীর ভাষাকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—ক. ফিন্নীয় (Finnish) ভাষাগুলি, যেমন ফিন্নীয়, এস্তোনীয়, লাপ্পীয়; লিবোনীয় (ফিন্ল্যান্ড এবং উত্তর রাশিয়া, এস্তোনিয়া, ল্যাপল্যান্ড, লিবোনীয়া ইত্যাদি অঞ্চল) ইত্যাদি; খ. পারমীর বর্গ (Permian); গ. উগ্রীয় (Ugrian) ভাষাগুলি, যেমন ওস্ত্যাক (সাইবেরিয়া), বোগুল (Vogul) [উরাল পর্বতাঞ্চল], এবং একটি প্রধান ভাষা হাঙ্গেরীয় বা মজ্যর (Hungarian বা Magyar); এবং ঘ. সামোয়েদ বর্গ (Smaoyed) [সাইবেরিয়া মেরু অঞ্চল]। এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন রক্ষিত আছে ফিন্নীয় ও হাঙ্গেরীয় ভাষায় (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতক)। ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইল স্বরসংগতির (Vowel Harmony) ব্যাপক প্রয়োগ, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গানুশাসনের অভাব, প্রত্যয়ের প্রয়োগ-প্রাচুর্য, কারক-বাহুল্য (যথা লাপ্পীয় ৮টি কারক, হাঙ্গেরীয় ২২টি কারক), মুক্তান্বয় (agglutination) ইত্যাদি।

১৫. আল্তাইক (Altaic) : এই ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৪টি। ভাষাভাষীর আনু-মানিক সংখ্যা ৬·৫ কোটি। ইহার তিনটি শাখা হইল—ক. তুর্ক-তাতার বা তুরেনীয় (Turanian) এবং অন্যান্য উপভাষা, যথা তুর্কী ইত্যাদি ('তুর্কী' দ্র); খ. মোঙ্গোল এবং গ. মাঞ্চু বা তুঙ্গুস। এই ভাষাবর্গ ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া প্রসারিত। প্রধান ভাষাঞ্চল হইল—তুরস্ক, ভল্গা নদীর পূর্বপ্রান্তীয় ইওরোপীয় রাশিয়া হইতে এশীয় রাশিয়া, চীনা তুর্কীস্তান, মোঙ্গোলীয়া, মাঞ্চুরিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম ইরান ও উত্তর আফগানিস্তানের অঞ্চল বিশেষ। প্রাচীন নিদর্শন মেলে তুর্কীভাষার পূর্বী উপভাষার কয়েকটি লেখমালায়। উরালীয় ভাষার সহিত ইহার সাদৃশ্য রহিয়াছে যথেষ্ট। মুক্তান্বয়, লিঙ্গানুশাসনের অভাব ও স্বরসঙ্গতি উভয় গোষ্ঠীরই সাধারণ লক্ষণ। বিদ্বজ্জনদের কেহ কেহ জাপানী, কোরীয় এবং এস্কিমো গোষ্ঠীকে আল্তাইক গোষ্ঠীভুক্ত মনে করেন।

১৬. বাস্ক (Basque) : এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রধান ভাষা হইল দুইটি। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ। ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে পিরেনীজ পার্বত্যাঞ্চলে বাস্ক কথিত হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকে প্রাপ্ত বাস্ক নিদর্শন হইতে কিছু কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়; ১৬শ শতক হইতে নিয়মিত সাহিত্যের পরিচয় মেলে। এই ভাষা বর্ণমালার দিক দিয়া খুব সমৃদ্ধ, বিশেষতঃ স্পর্শবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও তালব্যীভবনের ক্ষেত্রে। রূপতত্ত্বের বিচারে ইহা প্রত্যয়ান্বয়ী। ক্রিয়াগঠন পদ্ধতি জটিল নয়, তবে কর্তৃবাচ্যের স্থলে কর্মবাচ্য প্রয়োগ সহজলভ্য। বহুপদিক বা যৌগিক পদ গঠনের প্রবণতা বর্তমানে সুলভ। পদগঠনরীতির (Syntax) ক্ষেত্রে ইহা

অত্যন্ত জটিল। এই ভাষা বর্তমানে অবগণ্য ভাষারূপে গণ্য।

১৭. ককেশীয় : এই গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির গোত্র-বিচার সম্পূর্ণ নয়। তাই ইহা প্রধানতঃ ভৌগোলিক বিচারে গৃহীত হইয়াছে। প্রধান প্রধান ভাষার সংখ্যা ২৬। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ৫০ লক্ষ। 'ককেশীয় ভাষা' দ্র।

১৮. প্রায়-প্রাচ্য (Near-Eastern and Asianic) : ইউরেশীয় অঞ্চলের অধুনালুপ্ত কয়েকটি প্রাচীন ভাষার গোত্র নির্ণয় সম্ভব হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপ, সুমেরীয় (নিম্ন মেসোপটেমিয়া, প্রাচীনতম নিদর্শন ৪০০০ খৃঃপূ), মিটান্নী (উত্তর মেসোপটেমিয়া, ১৪১০ খৃঃপূ), এলামীয় (পশ্চিম ইরানের শুশা অঞ্চল অর্থাৎ আধুনিক লুরিস্তান, খুজিস্তান, ২৫০০ খৃঃপূ), ক্যাসাইট (ব্যাবিলোনিয়া জাগ্রোস পর্বতাঞ্চল, খৃষ্টপূর্ব ১৭শ শতক), খট্টী — Khattian (এশিয়া মাইনর, ২০০০ খৃঃপূ), ক্রীটদ্বীপীয় (ক্রীটদ্বীপ, ১৫০০ খৃঃপূ), এট্রুস্কান — Etruscan (ইতালী, খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতক)।

১৯. সেমীয়-হামীয় (Semito-Hamitic) : 'সেমীয়-হামীয়' দ্র।

২০. সুদানী-গিনীয় (Sudano-Guinean) : এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি মধ্য আফ্রিকায় বিষুবরেখার উত্তরাংশে পশ্চিম হইতে পূর্বের সংকীর্ণ ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৪৩৫। ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ কোটি। পশ্চিম ও দক্ষিণ সুদানের গণভাষা (Lingua Franca) 'হাউস্‌সা' (Haussa)-সমেত মোট অসম্পৃক্ত ভাষাগোষ্ঠী ১৬টির কম নয়। প্রাচীনতম লেখ-নিদর্শন নুবিয়ান (Nubian) ভাষায় রক্ষিত আছে খৃষ্টীয় ৮ম শতক হইতে। ভাষাতাত্ত্বিক লক্ষণের কয়েকটি হইল মুক্তান্বয় অর্থাৎ প্রত্যয়রাহিত্য এবং স্বরবৃত্তি (Tone), একাক্ষরী ধাতু, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গশাসনের অভাব, আশ্রিত বাক্যাংশের সরলীকরণ, ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রাচুর্য ইত্যাদি। 'নিগ্রো২' দ্র।

২১. হটেন্‌টট-বুশ্‌মান : হটেন্‌টট এবং বুশ্‌মান ভাষাগুলি আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আদিবাসী পিগ্‌মিদের দ্বারা কথিত হয়। মোট ৬টি শাখা, ভাষাভাষী প্রায় ৩ লক্ষ। ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হইল নিরুদ্ধ ব্যঞ্জনবর্ণ (clicks) ও তিনটি স্বরের (Tones) অস্তিত্ব, তিন বচন, উত্তম পুরুষ সর্বনামের দ্বিবচন ও বহুবচনে অন্তর্ভূত এবং বহির্ভূত (Inclusive and Exclusive) পদের ব্যবহার অর্থাৎ 'আমরা' অর্থে 'আমি ও তুমি', এবং 'তুমি ব্যতীত আমি' ; বিশেষ ধরনের লিঙ্গ গঠনে পুরুষ-বাচক এবং বস্তুবাচক (সচেতন ও অচেতন) বিভাগ, বহু-বচন গঠনের বৈচিত্র্য, যেমন শব্দের দ্বিত্বপ্রয়োগ ইত্যাদি। 'নিগ্রো২' দ্র।

২২. বান্টু : দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম অঞ্চল জুড়িয়া এই ভাষাগোষ্ঠী প্রচলিত। প্রধান প্রধান ভাষার সংখ্যা ৮৩। ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৭·৫ কোটি। ভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হইল জান্‌জিবার অঞ্চলের 'সোয়াহিলি', লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। ইহা পূর্ব উপকূলের বিস্তৃত অঞ্চলের গণভাষা (Lingua Franca)। অন্যান্য মুখ্য উপভাষা হইল কাফির, জুলু ইত্যাদি। ভাষাতাত্ত্বিক বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইল অন্ত্য অক্ষরে সর্বত্র স্বরবর্ণ, যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে কেবল নাসিক্যধ্বনি + ব্যঞ্জন অথবা ব্যঞ্জন-বর্ণ + য, ব সিদ্ধ। রূপতত্ত্ব বিচারে ইহা উপসর্গশ্লিষ্ট মুক্তান্বয়ী (Prefix Agglutinating) ভাষা। প্রত্যয় শব্দ-মূল বা প্রকৃতির অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে আর উপসর্গ করে পদগঠনরীতি বা ব্যাকরণগত আচরণ (যথা বচন ইত্যাদি)। বিশিষ্ট বর্গে বিভক্ত নামবাচক শব্দের (যথা মানুষ, বৃক্ষ, জল ইত্যাদি) পূর্বে সবর্গীয় উপসর্গই যুক্ত এবং পুনরুক্ত হয়, ব্যাকরণসিদ্ধ লিঙ্গ শাসনের অভাব ইত্যাদি। 'নিগ্রো২' দ্র।

২৩. এস্কিমো-আলেউট (Eskimo-Aleut) : এই ভাষাগোষ্ঠী প্রধানতঃ কথিত হয় উত্তর আমেরিকার আলাস্কা হইতে পূর্বে গ্রীনল্যাণ্ড পর্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে এস্কিমো-অধ্যুষিত অঞ্চলে ('এস্কিমো' দ্র), আলেউট-অধ্যুষিত আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এবং উত্তর-পূর্ব এশিয়ায় প্রান্তীয় খণ্ডাঞ্চলে (Tuit)। প্রধান ভাষা-গুলির সংখ্যা ২৪। বিশেষ ভাষাগত লক্ষণ হইল তিনটি বচন, কেবল প্রশ্নবোধক সর্বনামে লিঙ্গবিচার, ক্রিয়াপদে 'কাল' ধারণার অভাব, চারিটি ভাব বা 'বৃত্তি'-র (mood) অস্তিত্ব ইত্যাদি। রূপতত্ত্ব বিচারে ইহা দূরন্বয়ী ভাষা।

২৪. উত্তর আমেরিকাদেশীয় : উত্তর আমেরিকার (কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ভাষাগুলি ভৌগোলিক বিচারে বর্গীভূত। এই ভাষাগুলির বৈচিত্র্য যেরূপ, নৈকট্যও সেইরূপ সুদূর। এই ভাষাগুলিকে ২৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ৩৫১। ইহাদের মধ্যে অ্যাল্‌গঙ্কিন (Algonkin) ভাষা লইয়া গবেষণা হইয়াছে সর্বাধিক। অপর একটি ভাষাগোষ্ঠী অ্যাথাপাস্‌কান (Athapaskan) উত্তর আমেরিকার বিস্তৃততম অঞ্চল জুড়িয়া প্রসারিত। রূপতত্ত্ব বিচারে এইগুলি দূরন্বয়ী ভাষা।

২৫. মেক্সীয় এবং মধ্যআমেরিকাদেশীয় (Mexican and Central American) : ভৌগোলিক বিচারে শ্রেণীবদ্ধ এই বিভাগে কুড়িটিরও অধিক ভাষাগোষ্ঠী দেখা যায়। সর্বমোট ভাষার সংখ্যা প্রায় ৯৬। প্রসিদ্ধ ভাষাবর্গ হইল উটো-আজটেক (Uto-Aztec) এবং মায়া (Maya)। উটো-আজটেক অন্তর্ভুক্ত নাহুয়াট্‌ল বা আজটেক (Nahuatl বা Aztec) প্রাচীন মেক্সীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রধান বাহন ছিল। মায়া ভাষাও একটি প্রধান সাহিত্যিক ভাষা। প্রাচীন মায়া সভ্যতার লিখিত নিদর্শনও রহিয়াছে প্রচুর। দুইটি ভাষারই বর্তমান ভাষা-

ভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১০ লক্ষ করিয়া। বলা বাহুল্য, মধ্য আমেরিকার ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই কেবল লিখন পদ্ধতি প্রচলিত হইতে দেখা যায়। রূপতত্ত্ব বিচারে এই ভাষাগুলি দূরন্বয়ী।

২৬. দক্ষিণ আমেরিকাদেশীয় ঃ গোত্র বিচার সম্ভব হয় নাই বলিয়া ভৌগোলিক বিচারে দক্ষিণ আমেরিকার ভাষাগুলিকে বর্গীভূত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে সম্ভবতঃ ৭৭টি স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী রহিয়াছে, মোট ভাষার সংখ্যা আনুমানিক ৭৮৩। ইহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ভাষা হইল আরাবাক (Arawak) ভাষাবর্গ। এক সময় এই ভাষা আরও ব্যাপক অঞ্চল, এমন কি অ্যান্টিলিস দ্বীপপুঞ্জ (Antilles Islands) পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এতদ্ব্যতীত কিচুয়া (Kichua বা Runa-Simi) ভাষার ঐতিহ্যও প্রাচীন। ইহা একদা পেরুর ইংকা (Inca) জাতির প্রাচীন সভ্যতার প্রধান বাহন ছিল। স্পেনীয়দের আগমনের পূর্বেই ইহা ইকুয়েডর, পেরু, চিলি, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রধান মাধ্যম হিসাবে স্পেনীয় মিশনারীরা ইহার আরও ব্যাপ্তি ঘটাইয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্বের বিচারে এই গোষ্ঠীর ভাষাগুলি দূরন্বয়মূলক।

এস্কিমো-আলেউট এবং উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীদের ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক ১ কোটি ২০ লক্ষ।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভাষাতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব হইল বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। ভাষাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ নানাদিক হইতেই শুরু করা যায়, যেমন—ভাষার গঠনপ্রণালী, মানবজীবনের সহিত তাহার সংযোগ, বিভিন্ন ভাষাবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ইতিহাস পর্যালোচনা ইত্যাদি।

একদিক দিয়া ভাষাতত্ত্বকে বিশ্লেষণভিত্তিক বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলা চলে। কারণ ভাষার নিজস্ব রীতি হইতে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা উদ্ধার করা যায়, তাহা গাণিতিক সূত্রের মতই অবধারিত এবং প্রায়শঃই ব্যতিক্রমহীন। শুধু তাহাই নয়, শ্রবণ, মনন বা উচ্চারণের জন্য যেমন প্রয়োজন হয় বাগ্‌যন্ত্র বা মস্তিস্কের বিশেষ প্রযত্ন, তেমন প্রয়োজন ধ্বনিতরঙ্গ প্রবাহের আধার। তাই শারীরবিদ্যা বা পদার্থ-তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ভাষাতত্ত্বের পক্ষে অপরিহার্য।

কিন্তু ভাষা প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিকতা নয়। ভাষার গঠন ও বিবর্তনের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা দেখা গেলেও তাহা বিচারসর্বস্ব বুদ্ধিদীপ্ত অথবা আবেগপ্রবণ মনের প্রতি-ফলনও বটে। ভাষার প্রকাশ কেবল বাগ্‌ধারার পুনরাবর্তন নয়, তাহা নূতন উদ্‌ভাবনও বটে। তাই মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ভাষার অবিচ্ছেদ্য অংগ। ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, তাহার শারীরিক অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক প্রভাব—এই সমস্ত মিলাইয়া একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রোতা বা বক্তা হিসাবে যে কোনও ব্যক্তির মানস প্রতিক্রিয়া, বিক্ষেপ ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে ভাষা হইয়া উঠে চিন্তার বাহন, জড় হইয়া উঠে চিন্ময়। অবশ্য ভাষা পুরাপুরি চিন্তাকে মূর্ত করিয়া তুলিতে পারে না, কিন্তু তাহাকে সুসংবদ্ধ ও স্বচ্ছ করিয়া তুলে। অপরপক্ষে, ভাষার প্রবাহ অনেক সময় নূতন চিন্তারও আকস্মিক উদ্রেক ঘটায়। শব্দার্থতত্ত্ব এবং বাক্যরীতি—ভাষাতত্ত্বের এই দুইটি শাখার আলোচনা করিলে ভাষার উপর মনস্তত্ত্ব বা চিন্তন-প্রণালীর প্রভাব কতখানি তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়।

ভাষাতত্ত্বকে সমাজবিজ্ঞানেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ভাষা যেহেতু ব্যক্তিসর্বস্ব নয়, তাহা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম, সেইহেতু ভাষায় সমাজ-সচেতনতা সর্বদাই সক্রিয়। এইজন্য নৃবিদ্যা, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংগেই ইহার যোগ রহিয়া গিয়াছে। তবে ভাষাতত্ত্ব কেবল বর্তমান- বা অতীতাশ্রয়ী নয়, অথবা নয় সমাজ ও সংস্কৃতির তুলনাসর্বস্ব অনু-শীলন। প্রয়োজনসঞ্জাত বিজ্ঞানের সংগে ইহার সাধর্ম্য থাকিলেও স্মরণীয় যে, ভাষাসূত্রের সাহায্যে অনেক সময়ই ভাষার বিবর্তন ও পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

কিন্তু মোটের উপর, ভাষাতত্ত্বকে মানববিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, জীবন ও সাহিত্য, আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক ধ্যানধারণা, পরিবেশ-সচেতনতা এবং আচরণ ইত্যাদি মানবজীবনের অনেক তথ্যই ভাষায় বিধৃত হইয়া আছে। তবে ভাষাতত্ত্বের সংগে যে কোনও বিষয়ের নিবিড় সম্পর্ক থাকিলেও, ভাষাতত্ত্বের প্রধান উপজীব্য হইল ভাষাই। তাই ভাষাতাত্ত্বিকের প্রধান দায়িত্ব হইল লেখ্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যে কোনও ভাষার অতীত ইতি-হাস অধ্যয়ন; সমসাময়িক ভাষা বা উপভাষার নিখুঁত বর্ণনা; একই ভাষার বিভিন্ন স্তরাগত লক্ষণগুলির নিরীক্ষণ; অথবা সগোত্রজ বা গোত্র-বহির্ভূত বিভিন্ন ভাষার সাদৃশ্য- বা বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির তুলনা-মূলক আলোচনা।

দ্র L. H. Gary, *Foundations of Language*, New York, 1958; E. H. Sturtevant, *An Introduction to Linguistic Science*, New York, 1960.

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভাস কোশকাব্যে এবং সংস্কৃত নাটক ও অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে ভাসের উল্লেখ ও শ্লোকের উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁহার কালও অনিশ্চিত। বিভিন্ন পণ্ডিত খ্রীষ্টীয় ২য় শতক হইতে ১১শ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সময় ভাসের

কাল বলিয়া নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাসের নামাংকিত নাট্যগ্রন্থগুলিতে অপাণিনীয় শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে পাণিনির পূর্ববর্তী লেখক বলিয়া মনে করেন। ভাসের কালসম্বন্ধে এইটুকু নিশ্চিত যে তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী, কারণ কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমান খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথম দশকে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী দাক্ষিণাত্যের ত্রিবান্দ্রম নামক স্থানে এক গোছা পুথি আবিষ্কার করেন। এই গ্রন্থগুলি সবই নাট্যগ্রন্থ, কিন্তু কোনওটিতেই রচয়িতার নাম নাই। ইহাতে একটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে, এইগুলি ভাসের রচিত। শাস্ত্রী মহাশয় ও তন্মতাবলম্বিগণের প্রধান যুক্তিগুলি এই : ১. রাজশেখর বলিয়াছেন যে ভাসের 'নাটকচক্র' সমালোচকগণ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে স্বপ্নবাসবদত্ত দগ্ধ হয় নাই। উল্লিখিত নাট্যগ্রন্থগুলির মধ্যে একখানির নাম 'স্বপ্নবাসবদত্ত'; সুতরাং অবশিষ্ট গ্রন্থগুলিও ভাস-রচিত বলিয়া অনুমান করা যায়। ২. হর্ষচরিতের ১৫ সংখ্যক প্রারম্ভিক শ্লোকে বাণভট্ট ভাসের প্রশংসাক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি 'সূত্রধারকৃতারম্ভ' 'বহুভূমিক' ও 'সপতাক' নাটকসমূহদ্বারা যশ লাভ করিয়াছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি উক্ত গ্রন্থসমূহে আছে; সুতরাং এগুলি ভাস-রচিত বলিয়া মনে হয়।

উক্ত যুক্তিসমূহের সংগে শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত সবগুলি গ্রন্থেই লক্ষিত হয় বলিয়া গ্রন্থগুলির রচয়িতা একই ব্যক্তি। প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ : 'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশতি সূত্রধারঃ' এই-রূপে প্রারম্ভ প্রস্তাবনার নাম স্থাপনা, সকল গ্রন্থেরই প্রায় একরূপ ভরতবাক্য, অপাণিনীয় পদের প্রয়োগ, ভাষা ও ভাবগত সাদৃশ্য ইত্যাদি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণও অনেক যুক্তি-বলে ভাসের গ্রন্থকর্তৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলি এইরূপ : ক. রামায়ণমূলক—প্রতিমা-নাটক, অভিষেক খ. মহাভারতমূলক—মধ্যমব্যায়োগ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার, ঊরুভঙ্গ, বালচরিত গ. উদয়নের কাহিনীমূলক—স্বপ্নবাসবদত্ত, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ঘ. অজ্ঞাতমূল (সম্ভবতঃ কল্পিত)—অবিমারক, চারুদত্ত।

বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি কবি ও আলংকারিকগণ ভাসের প্রশংসা করিয়াছেন। কালিদাস কর্তৃক ভাসের উল্লেখ হইতে মনে হয় তৎকালেই ভাসের যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থগুলিতে পদ্য ও গদ্য রচনা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রবিশ্লেষণ, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা প্রভৃতিতে ভাস নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্ত'ই সমধিক প্রসিদ্ধ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাস্কর ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতক)। ভাস্কর তাঁহার একটিমাত্র গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের জন্যই সুপ্রসিদ্ধ। বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাসে ভাস্করের 'ঔপাধিক-ভেদাভেদবাদ' সত্যই একটি নূতন, মৌলিক মতবাদ। ইহাতে তাঁহার পূর্ববর্তী কেবলাদ্বৈত-বাদী শংকরের এবং পরবর্তী ত্রিতত্ত্ববাদী রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতবাদের একটি সংমিশ্রণ দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য বৈদান্তিকদের ন্যায় ভাস্করের মতেও ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব। ব্রহ্ম দ্বিরূপ—কারণরূপ ও কার্যরূপ। কারণরূপে তিনি এক, অরূপ, নির্বিশেষ ও স্বগতভেদ-হীন; কার্যরূপে তিনি বহু, বিশ্বরূপ, সবিশেষ ও স্বগত-ভেদবান। রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতে উভয় রূপেই ব্রহ্ম সগুণ, ও সবিশেষ অথবা স্বগতভেদবান।

ভাস্কর ব্রহ্মকে সগুণ বলিলেও রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় কোথাও 'অনন্ত-গুণ-বিশিষ্ট' বলেন নাই। তিনি ব্রহ্মের একটিমাত্র গুণেরই উল্লেখ করিয়াছেন—সর্বজ্ঞত্ব। ভাস্কর-বেদান্তে ব্রহ্মের সৌন্দর্য-মাধুর্য-করুণা-কোমলতাদি-সমন্বিত মধুর রূপের উল্লেখ একেবারেই নাই, যাহা পরবর্তী ত্রিতত্ত্ববাদী বেদান্তে ক্রমশঃ কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়াছিল।

রামানুজ-নিম্বার্কাদির ন্যায় ভাস্করের মতেও জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণু ও বহু। কিন্তু তাঁহাদের সহিত ভাস্করের মূলীভূত প্রভেদ ইহাই যে, ভাস্করের মতে জীবের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অণুত্ব ও বহুত্ব অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান ও অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী নয়; অর্থাৎ নিত্যও নয়, স্বাভাবিকও নয়, কেবলমাত্র ঔপাধিক, আগন্তুক ও অনিত্য; যতদিন পর্যন্ত 'উপাধি' অর্থাৎ জড়দেহ, মন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্যন্তই কেবল স্থায়ী।

ইহাই হইল ভাস্করের নিজস্ব, মৌলিক 'উপাধিবাদ'। এই মতানুসারে সংসারাবস্থায়, অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্যাবস্থায়, জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু প্রথমে, অর্থাৎ ব্রহ্মের কারণাবস্থায়, জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল; এবং পরে, অর্থাৎ প্রলয় ও মোক্ষকালে, জীব-জগৎ পুনরায় ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়া যাইবে।

শংকরের 'উপাধিবাদ' ও ভাস্করের 'উপাধিবাদ'-এর মধ্যেও প্রভেদ মূলীভূত। শংকরের মতে, যাহা ঔপাধিক, তাহা অপারমার্থিক, 'সত্য' ও 'নিত্য' সমার্থক। কিন্তু ভাস্করের মতে, 'সত্য' নিত্যও হইতে পারে, অনিত্যও হইতে পারে। অতএব, যাহা ঔপাধিক, তাহা অনিত্য হইলেও অসত্য অথবা অপারমার্থিক নহে। ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে অভেদ 'স্বাভাবিক' অর্থাৎ সত্য ও নিত্য, কিন্তু ভেদ 'ঔপাধিক', অর্থাৎ সত্য অথচ অনিত্য।

অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায়, ভাস্করের মতেও মোক্ষ পরিপূর্ণ, আনন্দঘন অবস্থা, কেবল দুঃখাভাবমাত্রই নহে।

সাধারণতঃ বেদান্তদর্শনে মোক্ষকে নিত্য ও জীবকে নিত্যমুক্ত বলা হয়। কিন্তু ভাস্করের মতে মুক্তি নিত্য নহে, জীবও নিত্যমুক্ত নহে, যেহেতু মোক্ষ কেবলমাত্র নঞ্‌মূলক অজ্ঞান-অপসারণই নয়, সেই সঙ্গে সদ্মূলক নব অবস্থাপ্রাপ্তিও। ভাস্কর বিদেহমুক্তিবাদী।

সাধনাবলীর দিক হইতে ভাস্কর জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী। অর্থাৎ তাঁহার মতে, জ্ঞানের সহিত কর্মও মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন, অথবা উপায়। এইদিক হইতেও ভাস্করের মতবাদ অভিনব। পুনরায়, ভাস্কর উপাসনা-কর্ম-সমুচ্চয়বাদী, যেহেতু, তাঁহার মতে, জ্ঞানের অনিবার্য পরিণতি উপাসনা। কিন্তু ভাস্কর ভক্তিবাদী নহেন একেবারেই, যেহেতু তাঁহার 'উপাসনা' জ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র।

দ্র ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্-ভাস্করকৃতম্।

রমা চৌধুরী

ভাস্করপণ্ডিত নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলার রাজস্বমন্ত্রী, ও বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁর রাজত্বকালে বাংলা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত মারাঠা সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলার নির্দেশে ভাস্কর পণ্ডিত বঙ্গদেশে অভিযান করেন এবং বাংলার ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজখাঁর কর্মচারী মীর হাবিবের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করেন। বর্ধমান শহরের ১৬ মাইল দক্ষিণে আলীবর্দীর বাহিনীর সহিত ভাস্কর পণ্ডিত পরিচালিত মারাঠা বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষ হয়। পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে ভাস্কর পণ্ডিত ওড়িশা, কাটোয়া, হুগলি, রাজমহল ও জলেশ্বর সহ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিয়া প্রচুর স্বর্ণরৌপ্য লুণ্ঠন করেন। কিন্তু আলীবর্দী অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে মারাঠা নেতা কাটোয়া হইতে মেদিনীপুরের দিকে সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর জলেশ্বরের যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া ভাস্কর পণ্ডিত ওড়িশার পথে নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজী ভোঁসলার নির্দেশে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এই সময় আলীবর্দী খাঁ বিরোধের নিষ্পত্তিকল্পে ভাস্কর পণ্ডিতকে একটি আলোচনাসভায় যোগদানের আহ্বান জানান। কাটোয়ার নিকটস্থ মনকরায় অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে ভাস্কর পণ্ডিত উপস্থিত হইলে মুস্তাফা খান নামক জনৈক আফগান সৈনিক আলীবর্দীর নির্দেশে ভাস্কর পণ্ডিত সহ উচ্চপদস্থ মারাঠা সেনানায়কগণকে হত্যা করেন। 'আলীবর্দী খাঁ', 'বর্গী' দ্র।

দ্র G. S. Sardesai, *New History of the Marathas*, Vol. II, Bombay, 1957; Richard Burn ed. *Cambridge History of India*, Vol. IV, Delhi, 1963.

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

ভাস্কর বর্মন কামরূপের রাজা সুস্থির বর্মন ও শ্যামাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র, কুমার নামেও পরিচিত, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপ) বিখ্যাত বর্মন বংশের ত্রয়োদশ ও সর্বশেষ নৃপতি। তাঁহার আনুমানিক শাসনকাল সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ভাস্কর বর্মন গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধনের সহিত একটি কূটনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনা পরিব্রাজক হিউএন্‌-ৎসাঙ্‌ ইঁহার রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। কথিত আছে যে হর্ষের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ভারতে প্রেরিত চৈনিক রাজদূত ওয়াং হিউএন্‌-ৎসে তিব্বতের নৃপতি স্রং-সান-গাম-পোর সাহায্যে যখন উত্তর ভারতে অভিযান করেন তখন ভাস্কর বর্মন আক্রমণকারী চৈনিক বাহিনীর সহিত সহযোগিতা করেন। শৈবধর্মে বিশ্বাসী হইয়াও তিনি অন্যান্য ধর্ম, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নিধানপুর তাম্রফলকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা হয় যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর ভাস্কর বর্মন সম্ভবতঃ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'হর্ষবর্ধন', 'আসাম' দ্র।

দ্র পদ্মনাথ ভট্টাচার্য—কামরূপ শাসনাবলী, রংপুর, ১৯৩১; D. C. Sarker, 'Harsha and Bhaskar Varman', *Proceedings of Indian History Congress*, IV, Aligarh, 1943; R. C. Majumdar ed. *History and Culture of the Indian People*, Vol. III, Bombay, 1962.

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

ভাস্কর্য, ভারতীয় ভারতের সংস্কৃতি সুপ্রাচীন যুগ হইতে ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই শিল্প বিভিন্ন যুগের নানা ভাববৈচিত্র্যে, নানা রুচি ও রীতির পরিচয়ে মানবসত্তার নানা গভীর উপলব্ধির স্পর্শে বিশিষ্ট ও সমৃদ্ধ।

ভারতের প্রাচীনতম ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতায়। হরপ্পায় প্রাপ্ত বেলে পাথরের সুমসৃণ দেহসম্পন্ন দুইটি অতি ক্ষুদ্রায়তন মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনওটিরই এখন মাথা ও হাত নাই, পা-ও প্রায় সবটাই ভাঙা। তবু বুঝিতে কষ্ট হয় না, একটি মূর্তি নৃত্যের ভঙ্গীতে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে পরবর্তী যুগের নৃত্য মূর্তির পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। মূর্তি দুইটির ধ্বংসাবশিষ্ট অংশে কাঁধ, বুক, পিঠ ও পশ্চাৎ-

ভাগের গড়ন এত মাংসল, ডৌল এত চিক্কণ এবং পরিমিতি-জ্ঞানের দিক হইতে এগুলি এত স্বাভাবিক যে এগুলিকে অনেকে সুপরিণত গ্রীক মূর্তিকলার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য-সম্পন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। মিশ্র ধাতুতে নির্মিত মহেঞ্জোদড়োর হরিণনয়না তন্বী নর্তকী মূর্তির দেহবল্লরীতে উত্তরযুগের দেবদেবীদের পূর্বাভাস প্রত্যক্ষ হয়। মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত চুনাপাথরের শ্মশ্রুমণ্ডিত নক্সাসম্বলিত-উত্তরীয়ধারী মূর্তিটি সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ভাবকল্পনার প্রতীক; সম্ভবতঃ ইহা কোনও এক অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতিকৃতি। এই ধরনের মৌলিক বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কিছু ছাপমুদ্রায় উৎকীর্ণ চিত্রে। চৌকা আকারের পাথরের গায়ে খোদাই-করা এই সব ছাপমুদ্রার বা শীলমোহরের নীচের সারির নক্সায় দেখা যায় সাধারণতঃ হাতী, ষাঁড়, একশৃঙ্গ হরিণ, গণ্ডার ইত্যাদি জন্তুর দৃঢ়, মাংসল সুডৌল মূর্তি। ইহারই মধ্যে আছে তিনটি শিং-সম্বলিত, বহুবলয়-শোভিত-হস্ত, যোগাসনে উপবেশনরত ব্যক্তলিঙ্গ পুরুষ-মূর্তি যাহাকে অনেকে পরবর্তী যুগের ধ্যানপরায়ণ পশুপতি শিবের পূর্বাভাস রূপে অনুমান করিয়াছেন। এই মূর্তির উপরে ও নীচে আছে হাতী, গণ্ডার, বাঘ ও মহিষের দণ্ডায়মান মূর্তি।

মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের মূর্তিকলা : সম্রাট অশোকের সময়ে হরপ্পা সভ্যতার শিল্পধরেরা বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত। অশোকের নামের সঙ্গে জড়িত শিল্পকীর্তির মধ্যে আছে কয়েকটি উজ্জ্বল মসৃণ বেলে পাথরের মূর্তি— কিরীটিত স্তম্ভ এবং ওড়িশার ধৌলিতে অবস্থিত পর্বত-ক্ষোদিত অর্ধপরিসমাপ্ত একটি হস্তিমূর্তি। স্তম্ভগুলির দেহভাগ সুগোল, ঊর্ধ্বদিক ক্রমে ক্ষুদ্রায়ত; শীর্ষে পদ্মফুলের গড়াইয়া-পড়া পাপড়ির আকারে নির্মিত ঘণ্টার অনুকৃতি। ইহারই উপরে উহারই সঙ্গে সংলগ্ন চৌকা ও গোল আকারের পৃষ্ঠ বা আসনের উপরে অধিষ্ঠিত পশুমূর্তি। গোল আসনের গায়ে কোথাও বা গ্রীক আদর্শের আঙ্গুর পাতা, কোথাও বা উড়ন্ত হাঁসের সারি নয়ত চলমান হাতী, ষাঁড়, সিংহ এবং ঘোড়ার অনুচ্চ খোদাইয়ের মূর্তি, মধ্যে চক্রচিহ্নের দ্বারা পৃথকীকৃত। এই ধরণের একটি পৃষ্ঠের উপর সারনাথের স্তম্ভশীর্ষের প্রখ্যাত চতুর্মুখ সিংহ যাহার পিঠে পিঠ-লাগানো আভিজাত্যপূর্ণ দেহ, খোলা বাদামের আকৃতির ভ্রূকুটিপূর্ণ চোখ, অল্প বহির্গত জিভ, গুচ্ছ গুচ্ছ কেশর, জোড়া গোঁফ, নখরখচিত থাবা মূর্তিগুলিকে এক মৌলিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অশোকের আমল হইতেই পশুমূর্তির এই ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রা ভারতশিল্পের এক অন্যতম সম্পদরূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

হরপ্পোত্তর যুগে মানুষের মূর্তির সন্ধান পাইতে হইলে নামিয়া আসিতে হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে। ইহার মধ্যে নির্দিষ্টরূপে স্থিরীকৃত শুঙ্গ আমলের কীর্তি ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ প্রাচীর ও তোরণের অলংকার ছাড়া পরিচয় লইতে হয় পাটলিপুত্র এবং মথুরায় আবিষ্কৃত কয়েকটি প্রমাণ আকৃতির পুরুষ ও নারী বা যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্তির। স্থূল গঠনের এই সব মূর্তির বিশেষত্ব সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাহাদের নৈকট্য। যক্ষ যক্ষিণী মূর্তিতে তখনও দেবত্বের আভাস পড়ে নাই। পাটনার সংগ্রহশালার প্রবেশপথে, দিদারগঞ্জে আবিষ্কৃত নারীমূর্তির ভূষণে-বসনে গঠনে বিন্যাসে জীবনবিলাসী যৌবনদীপ্ত সত্তার অপরূপ রূপায়ণ।

মৌর্যযুগের সৃষ্টিধর্মকেই উদ্বেলিত এবং ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিতে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে পর্বত ও খণ্ডিত শিলাগাত্রে, দূরে দূরে গড়িয়া ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলিতে। ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণায় গড়িয়া উঠিয়াছিল মধ্যভারতের ভারহুতে স্তূপ-বেষ্টনীর গায়ের অলংকরণ, ভূপালের সন্নিকটবর্তী সাঁচীর স্তূপতোরণের অনবদ্য খোদাইয়ের কাজ, বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের অলংকৃত শিলাবেষ্টনী আর ভাজার পর্বতগাত্র খোদাই করিয়া উৎকীর্ণ বিশাল দৃশ্য ও মূর্তি। ওড়িশার খণ্ডগিরির ও উদয়গিরির জৈনসম্প্রদায়ের ক্ষোদিত কৃত্রিম-গুহাপ্রাচীরের অলংকরণ, মথুরার কয়েকটি প্রাচীর ফলক এবং দক্ষিণের কৃষ্ণানদীর উপকূলে জগ্গয়পেটার স্তূপগাত্রের অলংকরণও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধস্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ প্রথমে হয়ত কাঠেই তৈরি হইত, পরে এইগুলি পাথরে নির্মিত হইতে থাকে। এইগুলিতে উৎকীর্ণ হইতে লাগিল ভগবান বুদ্ধসংক্রান্ত বৈচিত্র্যময় নানা ঘটনা ও কাহিনী, তাঁহার অতীত জীবন, গৌতমরূপে তাঁহার জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মপ্রচার, মহাপরিনির্বাণ ইত্যাদি।

ভারহুতের বেষ্টনীর স্তম্ভ, সূচী ও উষ্ণীষের উপর খোদাইয়ের কাজ শিলাগাত্রের ক্ষেত্র হইতে খুব উঁচু নয়। আর উৎকীর্ণ বিষয়বস্তু, তাহা মানুষ, পশু, গাছ, ফুল, লতাপাতা বা অট্টালিকা যাহাই হউক না কেন, সবই যেন একটা সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে বিধৃত। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ কাঠের উপর খোদাইয়ের কৌশল হইতে গৃহীত হইয়াছিল। এই অনুমান আরও দৃঢ় হয় উৎকীর্ণ মানুষের মূর্তির হাত এবং পায়ের ভঙ্গী হইতে। কাহিনীর ক্রমিক বিন্যাস বা একই সীমিত ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিকে একাধিক বার উপস্থিত করিয়া বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশে কাহিনীকে বিবৃত করিবার কৌশল এই শিল্পের একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও বুদ্ধই এই শিল্পের প্রাণকেন্দ্র তথাপি এখানে বুদ্ধের কায়িক উপস্থিতি কোথাও দেখানো হয় নাই। মূর্তির পরিবর্তে এখানে তথাগতের উপস্থিতি সূচিত হইয়াছে তাঁহার পবিত্র পদচিহ্নে, বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষে, বৃক্ষতলস্থ আসনে, আসনে প্রতিষ্ঠিত চক্রে বা পরিনির্বাণোত্তর অবস্থার প্রতীক স্তূপে। তবে বোধিসত্ত্বকে রূপায়িত করা হইয়াছে পশু বা মানুষের রূপেই।

ভারহুতে জাতক কাহিনীর সংখ্যা প্রায় তিরিশটি যে ক্ষেত্রে সাঁচীতে জাতক কাহিনী মাত্র ছয় সাতটি। জাতকের কাহিনী ও তথাগতের লীলাময় জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া শিল্পীরা ফুল ফল বৃক্ষলতা নদী পর্বত নরনারী সমাকীর্ণ পৃথিবীর এক অতি উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিসর্গভিত্তিক এই সব উপকরণ ছাড়াও এই শিল্পে দেখা দিয়াছে সে-যুগের বিশ্বাসভিত্তিক দেবতা, যক্ষ, নাগ ইত্যাদির মূর্তি এবং হয়ত ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবতারও মূর্তি। বসন, উত্তরীয়, উষ্ণীষ এবং নানা অলংকারে শোভিত নানা ভঙ্গীর এই সব মূর্তি তৎকালীন সমাজের বহমান জীবনস্রোতেরই প্রতিরূপ। চাপা গড়নের এবং অপেক্ষাকৃত আড়ষ্ট ভঙ্গীর এই সব মূর্তি অপেক্ষা বুদ্ধগয়ার পাষাণস্তম্ভগুলিতে উৎকীর্ণ এ-যুগের মূর্তিগুলি অধিকতর সুগঠিত, সংবেদনশীল ও গতিপ্রবণ। আর সাঁচীর স্তূপতোরণে যেন পরমসমারোহভরে চলিয়াছে উৎসবমুখর মানুষের জনতা—যে মানুষের দেহের ডৌলে অপূর্ব কমনীয়তা ও গতিভঙ্গ, নিপুণ হাতে যে দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে বর্তুলতা ও প্রাণসত্তা। নারীর নিতম্বে ও বক্ষোদেশে এবং পুরুষের স্কন্ধে এবং বাহুতে পুষ্ট মাংসলতা এবং শক্তিমত্তার স্পর্শ সাঁচীর তোরণভিত্তির মূর্তিগুলিকে পূর্ণ এবং জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে এক অপূর্ব শিল্পচেতনায়। ওড়িশার উদয়গিরিতে জৈনদের নির্মিত কৃত্রিম গুহার বহিঃপ্রাচীরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি একটু লম্বাটে আর বেশ নাটকীয় গতিভঙ্গীতে পরিপূর্ণ। অন্যদিকে ভাজার কৃত্রিম গুহামন্দিরের প্রবেশ-পথের দুই পাশে যে রথারূঢ় মিত্রসূর্য এবং হস্তিসমাসীন ইন্দ্রমূর্তি ও অন্যান্য মূর্তি দেখা যায় সেগুলি অনেকটা আদিমধর্মী।

মথুরা, গান্ধার এবং অমরাবতীঃ পরবর্তী তিনশত বৎসরের ভারতসংস্কৃতির ইতিহাস এক যুগপরিবর্তনের ইতিহাস। প্রাচীন পুরুষপুর কণিষ্কের রাজধানী থাকিলেও মথুরা ছিল কুষাণ আধিপত্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; সেখানে কুষাণদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় একটি বিশিষ্ট শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। মথুরায় আবিষ্কৃত কণিষ্কের শিলাময় প্রতিকৃতি এক অনতিক্রমণীয় সৃষ্টি। দীর্ঘদেহ সম্রাটের দেহে লম্বা অঙ্গরাখা, আঁট চোস্ত পাজামা, লম্বা-চওড়া ভারী বুটজুতা ; গুরুভার দুইটি লম্বা তলোয়ার আর তীক্ষ্ণরেখায় চিহ্নিত এই সব পোষাক এবং আকৃতির মাধ্যমে সম্রাটের উগ্র ব্যক্তিত্বটি চিরকালের জন্য বিধৃত। এই প্রতিকৃতিটি ভারতে উপনিবিষ্ট শকজাতীয় কোনও শিল্পীর সৃষ্টি হইলেও এখানকার অন্যান্য কুষাণ রাজপুরুষ ও নরপতির প্রতিকৃতিতে ক্রমে ভারতীয় প্রভাবের সম্প্রসারণ লক্ষ করা যায়।

মথুরার ভারতীয় শিল্পীর প্রধান কৃতিত্ব ভগবান তথাগতের মূর্তিকে রূপায়িত করা। প্রথমে তাঁহারা ভিক্ষু-রূপী ত্রিচীবরপরিহিত বৃষস্কন্ধ প্রশস্তবক্ষ ক্ষীণকটি দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মাণ করিলেন। ইহার পর বোধিবৃক্ষতলস্থ বজ্রাসনে উপবিষ্ট প্রভামণ্ডল-শোভিত আয়তচক্ষু বোধিসত্ত্ব মূর্তিকে সাহসিকতার সঙ্গে বুদ্ধমূর্তিরূপে পরিচিত করিয়া ইঁহারা বহুশতাব্দীর নিষেধবিধির প্রতিবন্ধকতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। ধ্যাননিবিষ্ট অন্তর্লোকচারী দৈবী প্রতিমার সৃষ্টি ভারতীয় শিল্পের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। মথুরায় প্রথম পরি-কল্পিত এই মূর্তি এবং সেই সঙ্গেই আবির্ভূত জৈন তীর্থংকরের মূর্তি এই প্রতিমাশিল্পের নূতন দিগ্দর্শনের পত্তন করিয়াছিল। এখানকার কঙ্কালীতিলে জৈন অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত, উদ্ভিন্নযৌবনা লীলালাস্যে প্রদীপ্ত পাষাণস্তম্ভে উৎকীর্ণ নারী মূর্তিগুলি ভিন্ন এক আনন্দ-লোকের অভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ।

মথুরার শিল্পীদের আগেই সম্ভবতঃ গান্ধারের শিল্পী-দের নিকট অনুরোধ আসিয়াছিল ভগবান বুদ্ধের মূর্তি ও ফলক রচনার। এই অঞ্চলের শিল্পানুরাগীরা ছিলেন বুদ্ধের নূতন ভক্তের দল, প্রধানতঃ গান্ধারে উপনিবিষ্ট অ-ভারতীয় পৃষ্ঠপোষকের দল। অলংকারে, উত্তরীয়ে এবং পাদুকায় শোভিত গান্ধারের বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের বুদ্ধিদীপ্ত মূর্তিগুলি অপূর্ব সহজ সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ। কিন্তু গঠন, ডৌল এবং সংবেদনের দিক হইতে মথুরা তথা ভারতীয় শিল্পের আদর্শ হইতে গান্ধারের মূর্তি অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবেই স্বতন্ত্র। মাংসল ও দৃঢ়বন্ধদেহ দেশজ মূর্তি যেখানে এক পরিবেশনিরপেক্ষ কঠিন সমাহিত রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেখানে গান্ধারের মূর্তি স্বভাবানুগ অস্থি- ও পেশীগঠিত সহজ মানবদেহবোধকে অতিক্রম করিয়া প্রতিমারূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত গান্ধার শিল্পী অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয় বা বুদ্ধের মূর্তিতে আসন, মুদ্রা, মহাপুরুষ লক্ষণ ও অন্যান্য নানা শাস্ত্রসম্মত চিহ্নাদি সন্নিবেশিত করিলেও ইহা-দের ইঙ্গিতপূর্ণ গূঢ় বৈশিষ্ট্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে গান্ধার শিল্প ভৌগোলিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতকে স্পর্শ করিয়া থাকিলেও মৌলিক অনুভূতি ও তাহার শিল্পভিত্তিক অভিব্যক্তির দিক হইতে কখনই ভারতীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই।

গান্ধার হইতে বহুদূরবর্তী দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্র অঞ্চল কিছু পরিমাণে গান্ধার শিল্পের দ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়াছিল। অমরাবতীতে আবিষ্কৃত কয়েকটি দণ্ডায়মান ও উপবেশনরত বুদ্ধমূর্তির মুখমণ্ডলে কিছু অন্ত-র্জিজ্ঞাসার আভাস থাকিলেও দেহের ডৌলে এবং দুই স্কন্ধদেশ আবৃত করিয়া পায়ের নিম্নভাগ পর্যন্ত বিলম্বিত ভিক্ষুর পোষাকে গান্ধার বুদ্ধের দেহগঠন ও পোষাকের প্রভাব অনেকটা স্পষ্ট। তবে সাধারণভাবে অন্ধ্রদেশের অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা ইত্যাদি অঞ্চলে আবিষ্কৃত বিস্তৃত শিল্পকর্মে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি কিন্তু একান্তই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ। এই শিল্পের আখ্যানভাগ ভারহুত বা সাঁচীর মতই ছিল বুদ্ধজীবনভিত্তিক। এখানেও

অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধের উপস্থিতি দেখানো হইয়াছিল মূর্তির পরিবর্তে নানা প্রতীকের ব্যবহারে। আখ্যানমূলক চিত্রফলকগুলিতে বুদ্ধের মূর্তির ব্যাপক ব্যবহার ঐ মূর্তির জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক। বুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এই শিল্পে বিধৃত হইয়া আছে কল্লোলিত আনন্দমুখর জনতার এক মহোৎসবের আলেখ্য, যে জনতার প্রতিটি নরনারীর দেহের গড়নে লক্ষ করা যায় দৃঢ়বদ্ধ জড়তার সঙ্গে নমনীয় গতি ও নৃত্যচ্ছন্দের এক অপূর্ব সমন্বয়। অন্ধ্রশিল্পের রমণীমূর্তিগুলি দেহচ্ছন্দে সমৃদ্ধ ও প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এ ছাড়া এখানকার পশুপক্ষী, ফল, লতাপাতা এবং অলংকার সমারোহও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যপূর্ণ।

গুপ্তযুগ ঃ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে ভারতসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন ভাব ও চেতনার উন্মেষ হয়। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এই নূতন চেতনার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। ইতিপূর্বে ভাস্কর্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের প্রাধান্য ছিল। গুপ্ত আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মানুরাগীরাও মনন এবং উপলব্ধির প্রকাশের বাহনরূপে ভাস্কর্যশিল্পের প্রয়োগে তৎপর হইয়া ওঠেন। ফলে শিল্পকর্মের উপজীব্য হিসাবে বৌদ্ধ আখ্যানবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত নানা দেবদেবীর মূর্তি এবং পুরাণবর্ণিত কাহিনীও স্বীকৃতি লাভ করে। উপরন্তু এপর্যন্ত কিছু স্বাধীনভাবে উৎকীর্ণ মূর্তি আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকিলেও শিল্প ছিল প্রধানতঃ আখ্যানমূলক। তবে মথুরাতে ইতিপূর্বে পূজার উদ্দেশ্যে যে মূর্তির পরিকল্পনা রূপগ্রহণ করিয়াছিল গুপ্ত আমলে সেই মূর্তিই পূর্ণাঙ্গ প্রতিমায় পরিণতি লাভ করিল। মথুরায় আবিষ্কৃত এই আমলের বেশ কয়েকটি দণ্ডায়মান মূর্তির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুগঠিত বিশালবপু মূর্তিগুলির মাথা কুঞ্চিত কেশে ঢাকা ও উষ্ণীষশোভিত, ললাট আয়ত, যুগ্ম ভ্রূ, অর্ধনিমীলিত ধ্যানস্তিমিত চক্ষু, প্রশস্ত স্কন্ধ ও বক্ষোদেশ, ক্ষীণ কটি। আপাদলম্বিত সূক্ষ্ম আবরণে মণ্ডিত রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত এই মূর্তিগুলিতে করুণা ও আত্মচেতনার এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। মথুরার মত বারাণসীর সন্নিকটবর্তী সারনাথেও এ যুগের মূর্তিশিল্পের এক বৃহৎ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানকার বুদ্ধমূর্তিসমূহে ধ্যানবিহিত লক্ষণগুলির উপস্থিতি ছাড়াও ডৌল এবং প্রকাশভঙ্গীতেও কিছু স্বাতন্ত্র্য ছিল। এখানকার বিখ্যাত ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট প্রতিমায় জমকালো অলংকারমণ্ডিত প্রভামণ্ডল এবং পৃষ্ঠপটের উপর পরিপূর্ণ আড়ম্বরহীনতা ও নির্লিপ্ততার প্রতিফলনটি তুলনাহীন।

সুগোল মাংসল দেহ, গুচ্ছগুচ্ছ কুঞ্চিত কেশ, আয়ত চক্ষু, স্বল্প কিন্তু নিখুঁত গড়নের অলংকার, গুরু কিন্তু সাবলীল গতি—সব মিলাইয়া গুপ্ত আমলের মূর্তি ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়াছিল। মথুরা, সারনাথ, সাঁচী, অজন্টা ইত্যাদি কেন্দ্রের বৌদ্ধশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে কৌশাম্বী, দেওগড়, উদয়গিরি, বিদিশা ইত্যাদি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত নানা মূর্তি এ যুগের বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগ ঃ গুপ্তযুগের প্রভাব নানাভাবে দীর্ঘকাল ভারত ও বহির্দেশের ভারতাশ্রিত শিল্প ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই উত্তরযুগের সাক্ষ্যরূপে প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে বর্তমানে বার্মিংহাম সংগ্রহশালায় রক্ষিত অষ্টধাতু-নির্মিত অভয়মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটির কথা। এই মূর্তির দেহের চিক্কণ ডৌল এবং অভয়মুদ্রায় ধৃত হাতের আঙুলে যে স্পর্শপ্রবণতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল পরবর্তী যুগে, বিশেষ করিয়া পাল ও সেন আমলের মূর্তিশিল্পে সেই আভাসই পূর্ণতর রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। গুপ্তোত্তর যুগে মূর্তিশিল্পের অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ব্যাপকতার প্রধান অনুপ্রেরণা আসিয়াছিল মন্দিরের প্রাচীরকে অলংকৃত করিবার তাগিদ হইতে। অতি কঠিন কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত বাংলা ও বিহারের প্রতিমার মধ্যে দেখা যায় ক্ষীণ আলম্ব দেহ, চিক্কণ তনুশ্রী, অত্যন্ত সুস্পষ্ট দেহপ্রান্ত, নিখুঁত গড়নের অলংকার, মূল প্রতিমা হয় সমভঙ্গীতে দাঁড়ানো নয়ত লীলাসনে উপবেশনরত, কোথাও সঙ্গে দেবতার শক্তি। মূল প্রতিমার দুই পাশে পার্শ্বদেবতাদের মূর্তিতে এক মাধুর্যপূর্ণ রূপলোকের প্রকাশ। অসংখ্য কষ্টিপাথরের এইসব ব্রাহ্মণ্য, মহাযান বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্তির সঙ্গে উল্লেখ করিতে হয় অপূর্ব গড়নের অষ্টধাতুর বহু মূর্তির কথা, যেগুলি সে যুগের শিল্পকৌশলের অবিসংবাদী নিদর্শন।

পূর্বাঞ্চলে গুপ্তযুগের অবসান কাল হইতেই প্রতিমাশিল্পের আবির্ভাবের যে ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়, দক্ষিণে পল্লব রাজাদের আমল হইতে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মতৎপরতার প্রবর্তন হইয়াছিল। প্রথমে এই মূর্তিশিল্প এখানে দেখা দিয়াছিল পর্বতগাত্র খোদাই করিয়া গড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরের প্রাচীরে বা কৃত্রিম গুহার প্রাচীরে। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রিত এই ভাস্কর্য শিল্পের স্বাক্ষর রহিয়াছে মহাবলীপুরমের রথমন্দিরগুলির প্রাচীরে এবং ইতস্ততঃ পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা অর্জুনের তপস্যা, মহিষাসুরের সঙ্গে সংগ্রামরত দেবীদুর্গার আলেখ্যে। পল্লব আমলের এই সব মূর্তি শক্তিগর্ভ ও সুগঠিত এবং ইহারই প্রভাব লক্ষ করা যায় এলোরার পর্বত ছেদন করিয়া নির্মিত বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরের প্রাচীরে এবং সংলগ্ন মণ্ডপসমূহে। সেই আমল হইতেই দক্ষিণের মন্দিরগুলি বহু সহস্র মূর্তির এক লক্ষণীয় সমাবেশক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। এলোরার মূর্তির বীরত্বব্যঞ্জক ও দৃঢ়বদ্ধ দেহ, তাঞ্জোরের বৈচিত্র্যপূর্ণ মূর্তিসম্ভার, চোল আমলের অষ্টধাতুর ভাব- ও লাবণ্যমণ্ডিত প্রতিমারাজি, বিশেষ করিয়া নৃত্যপর নটরাজ ও উমা বা গৌরীর মূর্তি এবং হোয়শাল আমলের অলংকারভারে অতিভারাক্রান্ত নৃত্যভঙ্গীর অসংখ্য মূর্তি ভারতশিল্পের অতীত ঐতিহ্যের এক অবিস্মরণীয়

কীর্তি। দক্ষিণের মন্দিরের গোপুরমগুলিও মূর্তিশিল্পের এক মহাসংগ্রহক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত গড়িয়া ওঠা ওড়িশার উন্নতশিখর মন্দিরগুলি যেন ভাস্কর্যের এক তুলনাহীন লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে অবস্থিত প্রতিমাকে ঘিরিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাচীরে দেখা যায় স্বর্গমর্ত্যের সপ্তলোকের সমারোহ, স্তরে স্তরে পশু, মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, সুরসুন্দরী ও দেবতাবর্গের সমাবেশ। মূর্তিকলার এই অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যে আছে এক অমৃতরসের আভাস, এক সীমাহীন রূপলোক।

এই বিশেষ মূর্তিপ্রকল্প কেবল ওড়িশারই সম্পদ নয়। মধ্যভারতের খজুরাহো অঞ্চলের অপূর্বদর্শন মন্দিরসমূহে এবং তারকা নক্সায় নির্মিত রাজস্থানের মন্দিরগুলিতেও ভাস্কর্যের এই সীমাহীন সমারোহ লক্ষ করা যায়। বস্তুতঃ ভারতে তুর্কী ও মোগলদের আবির্ভাবের পূর্বে এবং অনেক জায়গায় তাহার পরেও নির্মিত দেবমন্দিরগুলি মূর্তি-শিল্পের এক অকল্পিত সংগ্রহশালার মত গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভাস্করাচার্য (আনুমানিক ১১১৪ খ্রী) দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড়গ্রামে জন্ম; পিতা মহেশ দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' গ্রন্থের প্রণেতা (১১৫০ খ্রী)। এই গ্রন্থ চারভাগে বিভক্তঃ ১. লীলাবতী ২. বীজগণিত ৩. গ্রন্থ-গণিতাধ্যায় ৪. গোলাধ্যায়। পাটীগণিতসংক্রান্ত লীলাবতী অধ্যায় তাঁহার বিদুষী কন্যা লীলাবতীর নামে। গোলাধ্যায় অধ্যায়ে বর্তুলের তলের ক্ষেত্রফল-নির্ণয়ে তিনি যে পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সমাকলনের প্রক্রিয়ার সহিত তুলনীয়। বর্তুলের ঘনফল নির্ণয়ের জন্য তিনি বর্তুলকে বহুসংখ্যক শিখরে বিভক্ত করিয়াছেন—ইহাদের সকলেরই শীর্ষবিন্দু বর্তুলের কেন্দ্র। বর্তুলের ঘনমান শিখরসমূহের ঘনমানের সমষ্টি; ইহাও সমাকলনের প্রক্রিয়া। চন্দ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ে ভাস্কর অন্তরকলন ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে নিউটন এবং লাইব্নিট্স (Leibnitz) একই উপায়ে যে কোনও অপেক্ষকের জন্য অন্তরকলন ব্যবহার করিয়া গণিতে যুগান্তর আনিয়াছেন। গোলাধ্যায়ে ভাস্কর পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন।

কামিনীকুমার দে

ভাস্কো ডা গামা (১৪৬০-১৫২৪ খ্রী) পর্তুগীজ নাবিক। ভাস্কো ডা গামা সর্বপ্রথম সমুদ্রপথে ইওরোপের পশ্চিম কূল হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ৮ জুলাই ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল হইতে চারিটি জাহাজ লইয়া তিনি কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ, সেণ্ট হেলেনা উপসাগর, উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে নাটাল আবিষ্কার করেন; পরে মোজাম্বিক, মোম্বাসা বন্দর হইয়া মালিন্দি বন্দরে আসিয়া আহ্মদ ইব্ন মাজিদ নামক একজন আরব পথপ্রদর্শক লইয়া পূর্বমুখে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতের পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কালিকট বন্দরে পৌঁছান (১৭ মে, ১৪৯৮ খ্রী)। সেখানকার হিন্দুরাজা তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। পরে পণ্যভার-সমৃদ্ধ দুইটি জাহাজ লইয়া তিনি ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালে ফিরিয়া যান। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি রাজা ১ম ম্যানুয়েলের নিকট হইতে 'ডোম' উপাধি ও ১৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা পান ও পরে 'অ্যাড্মিরাল' হন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ২০টি জাহাজ লইয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আসেন। প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ, ভীতিপ্রদর্শন ও অত্যাচার করিয়া ভারতের বহির্বাণিজ্য আরবদের হস্তচ্যুত করা ও তাহা পর্তুগীজদের হস্তগত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় তিনি কোচিনে একটি কুঠি স্থাপন করেন। ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সমুদ্রপথে ভারতে আসিবার পথের আবিষ্কার ভাস্কো ডা গামার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। আমেরিকার আবিষ্কার ব্যতীত মধ্যযুগের কোনও ভৌগোলিক আবিষ্কার ফলাফলের দিক হইতে এরূপ সুদূরপ্রসারী নয়।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ভিক্টোরিয়া, মহারাণী (১৮১৯—১৯০১ খ্রী) পিতা এডওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জের চতুর্থ পুত্র ডিউক অফ কেণ্ট নামে পরিচিত এবং মাতা স্যাক্স্-কোবার্গের ডিউকতনয়া মেরিয়া লুইসা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ জুন 'গ্রেটব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের রাণী' উপাধি লইয়া তিনি ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে রাজশক্তির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের একান্ত অভাব ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া গ্রেট ব্রিটেন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে উন্নীত হয়। এই সময় ইংল্যাণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন হয় এবং সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটে। শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় ১৮৮০-র দশক ইতিহাস ও সাহিত্যে 'ভিক্টোরিয়ান যুগ' নামে অভিহিত। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণানুসারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারতের শাসনভার ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর হস্তে হস্তান্তরিত হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভারত সম্রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিত হন।

দ্র Sidney Lee ed. *Dictionary of National Biography Supplementary,* Vol. III, London, 1901; *Letters of Queen Victoria,* 3 vol., London, 1911.

মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিটামিন বিশেষ প্রকারের কয়েকটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ; বাংলা নাম 'খাদ্যপ্রাণ'। স্বাভাবিকভাবে দেহ গড়িয়া উঠার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যদ্রব্যে ইহাদের অত্যল্পপরিমাণ (০·০০৫% হইতে ০·০০০০২%) অবস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমে ইহাদিগকে 'অ্যামিন' মনে করা হইত, পরে দেখা গেল ইহারা 'অ্যামিন' নয়। দেহের বিপাক ক্রিয়ায় ইহাদের ভূমিকা অত্যাবশ্যক। ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্‌স জীবদেহে বিপাক, জারণ (অক্সিডেশন) প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী এন্‌জাইমগুলির কো-এন্‌জাইম রূপে কাজ করে ('এন্‌জাইম' দ্র)। জীবদেহ দুয়েকটি ভিটামিন ছাড়া সাধারণতঃ ভিটামিন পদার্থগুলির সংশ্লেষ করিতে পারে না, খাদ্যদ্রব্য হইতেই ভিটামিন আহরণ করে। সচরাচর সুষম খাদ্য (balanced diet) ভিটামিনের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটায়। বর্তমানে প্রায় সকল ভিটামিন ল্যাবরেটরির পদ্ধতিতে প্রস্তুত হয়।

ভিটামিনগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি আছে ঃ ১. স্নেহদ্রব্যে দ্রবণীয়—ভিটামিন এ (A), ডি (D), ই (E), কে (K) এবং লিপোইক অ্যাসিড ; ২. জলে দ্রবণীয়—ভিটামিন বি (B), সি (C)।

ক. ভিটামিন এ ঃ চর্মকে সুস্থ রাখে, অল্পবয়স্কদের বৃদ্ধির সহায়তা করে ও কয়েকপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারণ করে। ইহাদের অভাবে চর্মরোগ ও রাত্র্যন্ধতা ঘটিতে পারে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজ দ্রব্যে এবং হ্যালিবাট, কড প্রভৃতি মাছের যকৃতের তেলে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। উদ্ভিদে ইহা অবর্তমান। গাঢ় সবুজ ও হলুদ রংয়ের সব্‌জিতে অবস্থিত ক্যারটিন (carotene) ভিটামিন এ২ (বা প্রোভিটামিন এ) বলিয়া অভিহিত। জীবের ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যারটিন ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। মানবদেহে ইহার দৈনিক প্রয়োজনের মাত্রা প্রায় ৫০০০ ইণ্টারন্যাশন্যাল ইউনিট (I U)। অত্যধিক ভিটামিন এ-র সেবন দেহের পক্ষে ক্ষতিকর।

খ. ভিটামিন ডি ঃ দেহে ক্যাল্‌সিয়াম ও ফস্‌ফরাস শোষণের জন্য অত্যাবশ্যক ; অল্পবয়স্কদের বৃদ্ধির সময়ে এবং নারীদের অন্তঃসত্ত্বা ও দুগ্ধবতী অবস্থায় প্রয়োজনীয়। অভাবে রিকেট রোগ জন্মায়। সূর্যালোকের অতি-বেগুনী রশ্মির প্রভাবে চর্মের কোলেস্টেরল (ভিটামিন ডি-র প্রোভিটামিন) ভিটামিন ডি-তে রূপান্তরিত হয়। সূর্যালোক সেবন ইহার অভাব কিয়দংশে দূর করে। যকৃৎ ও যকৃতের তেল, দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে ইহা বিদ্যমান। দৈনিক প্রয়োজন ৪০০ আই. ইউ.। অত্যধিক ভিটামিন ডি-র সেবন দেহের পক্ষে ক্ষতিকর (অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়)।

গ. ভিটামিন ই (বা টোকোফেরল) ঃ মানবেতর জন্তুর জননের জন্য আবশ্যক ; মানবের ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ ইহার অনুরূপ ভূমিকা আছে কিন্তু সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান সামান্য ; গমের বীজাঙ্কুর তৈলে ও ডিম প্রভৃতি খাদ্যে বিদ্যমান।

ঘ. ভিটামিন কে ঃ ইহা রক্তের স্বাভাবিক তঞ্চনের জন্য যকৃতে অত্যাবশ্যক প্রোথ্রম্বিনের সংশ্লেষ করায় ; এইভাবে ইহা স্বাভাবিক রক্ততঞ্চনের সহায়তা করে ; অভাবে রক্তক্ষরণ-প্রবণতা বাড়ে ; বৃহৎ অন্ত্রের জীবাণু ইহার সংশ্লেষ করে ; গাঢ় সবুজ সব্‌জি, শুঁটকি মাছ প্রভৃতিতে বিদ্যমান।

ঙ. ভিটামিন বি-কম্‌প্লেক্‌স ঃ ১২টি ভিটামিন এই সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত—থিয়ামিন, রিবোফ্ল্যাভিন, নিকোটিনিক অ্যাসিড, পিরিডক্সিন, ফোলিক অ্যাসিড, ফোলিনিক অ্যাসিড, প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড, বায়োটিন, কোলিন, ইনোসিটল, প্যারা-অ্যামিনোবেন্‌জোইক অ্যাসিড, সায়ানোকোবালামিন। ভিটামিন বি১ বা থিয়ামিন ঃ স্বাভাবিক ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক ও কার্বোহাইড্রেট বিপাকের সহায়ক, অল্পবয়স্কদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক ; অভাবে বেরি-বেরি রোগ হয় ; আছাঁটা চাল, গম ও বাজ্‌রার ভুষি, ডাল, ঈস্ট প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ; দৈনিক প্রয়োজন ১·৮ মিলিগ্রাম। ভিটামিন বি২ বা রিবোফ্ল্যাভিন ঃ অভাবে জিভে ও ঠোঁটে ঘা হয় ও নেত্রবর্ত্মকলা ও অচ্ছোদপটল ব্যাধিগ্রস্ত হয় ; সব্‌জি, দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ডাল, গমের ভুষি প্রভৃতিতে প্রচুর পাওয়া যায় ; দৈনিক প্রয়োজন ১·৮ মিলিগ্রাম। নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নিয়াসিন ঃ অভাবে পেলেগ্রা (pellagra) রোগ হয়, পাকক্রিয়া ব্যাহত হয় ও স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে ; ডাল, আছাঁটা শস্য, মাংস, ঈস্ট প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে আছে ; দৈনিক প্রয়োজন ১·৮ মিলিগ্রাম। ভিটামিন বি১২ বা সায়ানোকোবালামিন ঃ যকৃতে আবিষ্কৃত ; অভাবে রক্তাল্পতা রোগ হয় ও স্নায়বিক বিকার ঘটে ; বহুপ্রকার জৈব খাদ্যে বর্তমান ; দৈনিক প্রয়োজন ১·২ মিলিগ্রাম। ফোলিক অ্যাসিড ঃ অভাবে রক্তাল্পতা ও স্নায়বিক বিপর্যয় ঘটে ; জীবদেহে অন্ত্রের ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা ইহার সংশ্লেষ হয় ; ডাল, শাক, সীম ও বহুপ্রকার ফলে বর্তমান ; দৈনিক প্রয়োজন ০·৫ মিলিগ্রাম। পিরিডক্সিন বা ভিটামিন বি৬ ঃ প্রোটিন বিপাকে সহায়তা করে ; অভাবে শিশুদের তড়কা হওয়ার সম্ভাবনা ; যকৃৎ, ঈস্ট, আছাঁটা শস্য, ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে প্রচুর আছে ; দৈনিক প্রয়োজন ২·০ (?) মিলিগ্রাম। বায়োটিন ঃ অভাবে চর্মরোগ, চুল পড়া, কৃশতা প্রভৃতির সম্ভাবনা।

চ. ভিটামিন সি বা অ্যাস্‌কর্‌বিক অ্যাসিড ঃ রক্তনালী ও দাঁতের মাড়িকে সুস্থ রাখে এবং ঘা সারাইতে সাহায্য করে ; অভাবে স্কার্ভি রোগ জন্মায় ; লেবু, পেয়ারা, বিলাতি বেগুন, বাঁধাকপি, লেটুস, আঙুর, দুধ প্রভৃতিতে বিদ্যমান ; রন্ধনের উত্তাপে সহজেই নষ্ট হয় ; দৈনিক প্রয়োজন ৭৫ মিলিগ্রাম।

মায়া দাস

ভিতরগাঁও উত্তরপ্রদেশের কানপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কানপুর নগর হইতে ইহা প্রায় ৪৮ কিলোমিটার

দক্ষিণে অবস্থিত। একটি ইষ্টকনির্মিত প্রাচীন মন্দিরের জন্য স্থানটির খ্যাতি। ভিতরগাঁও কোনকালে সুপরিচিত তীর্থস্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। মন্দিরটিও আয়তনে বৃহৎ নহে, তথাপি ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে নানা দিক দিয়া ইহার গুরুত্ব প্রভূত।

মন্দিরটি একটি ইষ্টকনির্মিত অধিষ্ঠানের (basement) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার আসন বর্গাকার, এক একটি পার্শ্ব ১০·৮ মিটার। বাড়ের উপর একটি চতুষ্কোণ ক্রমহ্রস্বায়মান চূড়া বা শিখর অবস্থিত, কিন্তু চূড়ার উপরিভাগ বর্তমানে বিধ্বস্ত। সম্ভবতঃ মন্দিরটির মোট উচ্চতা ছিল ২১ মিটার। বাড়ের উপরিভাগে একসারি কুলুঙ্গি—কুলুঙ্গির দুই পার্শ্বে কারুকার্যখচিত গাত্রস্তম্ভ, মধ্যস্থলে পোড়ামাটির (টেরাকোটা) মূর্তি। বাড় ও চূড়ার সংযোগস্থলে উপর্যুপরি দুইটি কার্নিস, মধ্যবর্তী নিম্নাংশ নানাবিধ টেরাকোটা-অলংকরণ দ্বারা শোভিত। চূড়ার গায়ে মাঝে মাঝে চৈত্যগবাক্ষ—গবাক্ষের মধ্যে টেরাকোটা মূর্তি। ভাস্কর্য অত্যন্ত উচ্চমানের, মূর্তিগুলি সুললিত ও প্রাণবন্ত এবং অলংকরণ-প্রয়োগে রুচি ও সংযম প্রশংসনীয়। অলংকরণের জন্য ছাঁচে-গড়া ও বাটালি-কাটা এই দুইপ্রকার ইটই ব্যবহৃত হইয়াছে। ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনী; কিছু সাধারণ জীবনের চিত্রও রহিয়াছে। কয়েকটি মূর্তি লখনউ-এর রাজ্য সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে—ইহার মধ্যে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর মূর্তিটি সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত ফুল, লতাপাতা, পশুপক্ষীর মূর্তি (স্বাভাবিক ও কল্পনাশ্রয়ী), নানাবিধ জ্যামিতিক নক্সা প্রভৃতি মন্দিরগাত্রের অলংকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় মন্দিরটির ভগ্নদশা, মূর্তি ও অলংকরণ অনেকাংশে বিনষ্ট, তবুও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা হইতে মন্দিরগাত্রে যে অপরূপ শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

মন্দিরটি পূর্বমুখী, সম্মুখভাগ প্রসারিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র মণ্ডপের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া বাহির হইতে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বারের দুই-পার্শ্বে গঙ্গা-যমুনার মৃণ্ময় মূর্তি ছিল। অন্য তিন পার্শ্বের মধ্যস্থল উদ্গত। ডৌলকর্ম (mouldings), গাত্রস্তম্ভ, কার্নিস, কুলুঙ্গি ও চৈত্যগবাক্ষের সংযত বিন্যাস দ্বারা মন্দিরের বহির্গাত্রে আলোছায়ার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মণ্ডপ ও গর্ভগৃহের আয়তন যথাক্রমে ২·৪ × ২·১৮ মিটার এবং ৪·৫ × ৪·৫ মিটার; গর্ভগৃহ ও মণ্ডপ একটি ২·৪ মিটার দীর্ঘ পথদ্বারা সংযুক্ত। মন্দিরের অভ্যন্তর অলংকরণবিহীন। সমগ্রভাবে বিচার করিলে মন্দির-নির্মাণে একটি সুসংগত ও পরিচ্ছন্ন পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে প্রকৃত খিলানের (true arch) ব্যবহার কম। সাধারণতঃ ইট বা পাথর আনুভূমিক এক সারির উপর আর এক সারি লহরাকারে বিন্যস্ত করিয়া (corbelling) দুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থান ক্রমশঃ সংকীর্ণ করিয়া অবশেষে তাহা আচ্ছাদিত করা হইত; কিন্তু ভিতরগাঁও-এর মন্দিরে সংশয়াতীতভাবে প্রকৃত খিলানের ব্যবহার দেখা যায়। মণ্ডপের ও গর্ভগৃহের তলছাদ অর্ধগোলকের ন্যায় গম্বুজ (domical vault) এবং এই দুই অংশের সংযোগ-পথের তলছাদ গরুর গাড়ীর ছই-এর ন্যায় অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ (wagon vault)। সকলক্ষেত্রেই প্রকৃত খিলানের ব্যবহার করা হইয়াছে। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় খিলান-নির্মাণ পদ্ধতি মুসলিম বা পাশ্চাত্য স্থাপত্য-শিল্পের খিলান-নির্মাণ পদ্ধতি হইতে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের ('স্থাপত্য, ভারতীয়' দ্র)। ব্যবহৃত ইটের আয়তন ১৭″ × ১০″ (বা ১০·৫″) × ৩″ এবং গাঁথুনি কাদার।

ভাস্কর্য-শৈলী, পরিকল্পনা, নির্মাণপদ্ধতি, আকৃতি, ইটের আয়তন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া অনুমান করা হয় যে এই মন্দির গুপ্তযুগে খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের সহিত ও পরবর্তীকালের যবদ্বীপের কয়েকটি মন্দিরের সহিত ইহার কথঞ্চিৎ আকৃতিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

মন্দিরের মূলবিগ্রহ (সম্ভবতঃ বিষ্ণু) বর্তমানে অপসৃত।

দ্র *Archaeological Survey of India, Annual Report*, 1908-9; Percy Brown, *Indian Architecture*, Vol. 1, Bombay, 1942; *Marg*, Vol. XXII, No. 2, March 1969.

অমরেন্দ্রনাথ রায়

ভিলাই ভারতের সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলির অন্যতম। মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রায়পুর শহরের সন্নিকটে (২১°১১′ উ, ৮১°২২′ পূ) অবস্থিত। কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথের (নাগপুর শাখা) উপরে রায়পুর ও ভিলাই ইস্পাতনগরী অবস্থিত; সড়কপথেও ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহিত সুষ্ঠু যোগাযোগ আছে। সোভিয়েত সরকারের কারিগরী সহায়তায় এই শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রের ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা প্রথমে ছিল প্রায় ১০ লক্ষ টন এবং লৌহ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১১ লক্ষ টন। ইস্পাত কেন্দ্রটির ব্যয় অনুমান করা হইয়াছিল ১৫০ কোটি টাকা। ৯৬ কিলোমিটার দূর হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের লৌহ আকর সংগৃহীত হয়; চুনাপাথর আসে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দূর হইতে। জ্বালানী কয়লা এই রাজ্যের কোরবা কয়লাখনি হইতে ও বিহার রাজ্যের ধানবাদ ঝরিয়া কয়লাখনি হইতে আসে। ইস্পাতকেন্দ্রটির উৎপাদনক্ষমতা তিনটি স্তরে বিস্তৃত হইয়া অবশেষে ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনে সক্ষম হইবে। এই কারখানায় আনুমানিক ১০০০০ শ্রমিক বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত

আছেন। ইদানীং বিদেশের বরাত পাইয়া ভিলাই ইস্পাত কারখানা নানাপ্রকার পণ্য রপ্তানি করিতেছে। এই শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার ফলে রেলপথ ও সড়কপথের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, নূতন রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। খনিজ সম্পদ আহরণেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভীম মধ্যম পাণ্ডব, কুন্তী ও বায়ুর পুত্র। দুর্যোধনের সহিত একই দিনে জন্ম, উভয়েই গদাযুদ্ধে নিপুণ, উভয়েরই গুরু দ্রোণ এবং বলরাম। শৈশবে দুর্যোধন ইঁহাকে বিষপ্রদান করিলে ইনি পাতালে নীত হইয়া বাসুকি-প্রদত্ত রসায়ন পান করেন। জতুগৃহদাহের পর ভীম একাকী মাতা ও ভ্রাতৃগণকে উদ্ধার করেন। রাক্ষসী হিড়িম্বা ইঁহার প্রথমা পত্নী ও পুত্র ঘটোৎকচ। একচক্রা-নগরীতে বাসকালে ইনি বক রাক্ষসকে বধ করেন। দ্রৌপদীর সহিত ইঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতার বিবাহ হয়। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের পুত্রের নাম সুতসোম।

রাজা জরাসন্ধকে বধ করিবার পর রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে ইনি দিগ্‌বিজয় করিয়াছিলেন। দ্যূতসভায় লাঞ্ছিত হইয়া ইনি দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের রক্তপান এবং ধৃত-রাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। বনবাসকালে হনুমান, নহুষ ও জয়দ্রথের সহিত ইঁহার সংঘর্ষ হয়। অজ্ঞাতবাসপর্বে বিরাট ভবনে পাচকরূপে বাস করিবার কালে ইনি সেনাপতি কীচককে বধ করেন।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে পূর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অন্যায় যুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে বধ করেন। অপরিমিত ভোজনকারী এবং দাম্ভিক ছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের মতে মহাপ্রস্থানের পথে ইঁহার পতন হইয়াছিল।

কল্যাণী দত্ত

ভীম ভবানী (১৮৯০—১৯২২ খ্রী) বাংলার একজন অসাধারণ মল্ল, বলী ও সার্কাসবিদ। তাঁহার আসল নাম ছিল ভবেন্দ্রমোহন সাহা। তাঁহার ডাক নাম ছিল বাচ্‌কানি। রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাভারতের ভীমের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহাকে ভীম ভবানী বলিয়া অভিহিত করেন।

অল্প বয়সে কেশব অ্যাকাডেমিতে পড়ার সময়ই তিনি মাণিকতলা ফ্রেণ্ড্‌স ইউনাইটেড ক্লাবে ভোলানাথ মিত্রের কাছে জিম্‌নাস্টিক্‌স শিক্ষা করেন। কিছুদিন সিমলার অতীন্দ্রনাথ বসুর কাছে কুস্তিও শিখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৪ বৎসর বয়সে অন্যতম কুস্তিবীর অবিনাশ পাঠক তাঁহাকে ক্ষেত্রচরণ গুহের আখড়ায় ভর্তি করিয়া দেন। এইখানেই তাঁহার ভাবী মল্ল জীবনের ভিত্তি।

তিনি অনেক মল্লর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি মুক্তাগাছার খয়রা পালোয়ান, ঝরিয়ার রাম সিং এবং কাশীর স্বামীনাথকে পরাস্ত করেন। তাহা ছাড়া গোবর বাবুর আখড়ার গাজীপুরের আমীর পালোয়ান, মহিষাদলে পেশোয়ারের খোদা বখ্‌শ্‌, আগাসীর সার্কাসে মজিদ ও 'রাশিয়ান স্যাণ্ডো', কোল্‌হাপুরে চন্দুডি, করিম বখ্‌শ্‌ পেরলেওয়ালার শিষ্য মতি পালোয়ান এবং মথুরার মতি চৌবের ভাইপো গিরিরাম চৌবের সঙ্গে সমান সমান লড়িয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়দানে পাঞ্জাবের ছোট গামার সঙ্গে কুস্তিতে চিৎ না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে পরাজিত ঘোষণা করা হইয়াছিল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে রাম-মূর্তি কলিকাতায় খেলা দেখাইতে আসিলে ভীম ভবানী তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার সার্কাসে ঢোকেন এবং বুকে হাতি তোলা, মোটর গাড়ি টানিয়া রাখা, কাঁধের টানে ও বুক ও বাহুর সম্প্রসারণ দ্বারা শিকল ভাঙার কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে তিনি এসব কাজে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি রামমূর্তির সার্কাস ছাড়িয়া কৃষ্ণলাল বসাকের প্রসিদ্ধ হিপোড্রোম সার্কাস এবং আগাসীর সার্কাসেও কাজ করিয়া-ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি নিজেই লোয়ার চিৎপুর রোডে একটি ছোট সার্কাস খুলিয়া কিছুদিন খেলা দেখাইয়াছিলেন।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর নিউমোনিয়ার আক্রমণে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

সমর বসু

ভীল মধ্যভারতীয় আদিবাসী, সম্ভবতঃ মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা ভীল্ল, কাহারও মতে ভীর নামেও প্রসিদ্ধ।

বর্তমানে ইহারা আবু পাহাড় ও আসীরগড়ের মধ্য-বর্তী জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করে। এই স্থান হইতেই ইহারা পশ্চিমে গুজরাত এমন কি সিন্ধু (পাকিস্তান) পর্যন্ত এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইহারা ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের নাসিকা স্থূল। দেহ সুগঠিত এবং কর্মক্ষম। ভীলগণ বনচারী ও সুদক্ষ শিকারী কিন্তু চাষ-আবাদে অভিজ্ঞ নয়। ইহারা ৭টি উপজাতিতে বিভক্ত, যথা, ভীল, ভীলালা, বারেলা, মঙ্কার, নিহাল, পাটলিয়া এবং রাথিয়া।

ভীলদের প্রধান দেবতা ভগদেও। হিন্দুদের কোনও কোনও দেবদেবীকে পূজা করিলেও ধর্মমতে ইহারা সম্পূর্ণতঃ হিন্দু নয়। হিন্দুদের মত জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবে ইহারা অভ্যস্ত। এই আদিবাসীরা অত্যন্ত সংস্কারাচ্ছন্ন। ভীলদের স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে সমাজে বিধবাবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রচলিত।

ভীলরা দাবী করে যে একসময়ে তাহারা রাজপুতানা (রাজস্থান) এবং উহার সংলগ্ন ভূমিতে আধিপত্য বিস্তার

করিয়াছিল। উদয়পুরের ৮০ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ভিলওয়াড় জেলা ও শহর এবং উদয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত খেরওয়ালা ও কোট্রার অধিকাংশ অধিবাসীই ভীল। কোট্রার নিকটবর্তী দুঙ্গারিয়া এবং কোটা প্রভৃতি স্থানেও ভীল আধিপত্য ছিল বলিয়া জানা যায়। ক্রমে এইসব স্থান ভীলদের নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইয়া যায়। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজপুতদের সিংহাসনে আরোহণ কালে একজন ভীলসর্দার রাজটীকা না দিলে রাজ্যাভিষেক সিদ্ধ হইত না।

দীপ্তি সমাদ্দার

ভীষ্ম কুরুকুল-পিতামহ। শান্তনুনন্দন দেবব্রত ছিলেন পূর্বজন্মে বসুগণের অন্যতম। মাতা গঙ্গাদেবীর ইনি অষ্টম পুত্র। ইঁহার গুরু বশিষ্ঠ এবং পরশুরাম। পিতা দাশরাজ-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলে ইনি সিংহাসনের উত্তরাধিকার ত্যাগ করিয়া চির কৌমার্যের ব্রত গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। ভীষ্মের অপূর্ব আত্মত্যাগের স্বীকৃতি হিসাবে আজ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যুতিথিতে প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে তাঁহাকে পিতার প্রাপ্য তর্পণ বা জলদান করিবার প্রথা আছে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহের নিমিত্ত ইনি কাশীরাজের তিন কন্যাকে হরণ করেন। ভ্রাতার অকাল-মৃত্যু হইলে ইঁহার নির্দেশে অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। ভীষ্ম গান্ধারী ও কুন্তীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তিনি কুরুপাণ্ডব সন্তানগণকে একত্র পালন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের শিক্ষার জন্য প্রথমে কৃপাচার্য পরে দ্রোণাচার্যকে নিযুক্ত করেন।

রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানের পরামর্শ ভীষ্মই দিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষপাতী হইয়াও তিনি চিরদিন দুর্যোধনকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি সমুদয় অধর্মাচরণের কোনও প্রতি-কারে উদ্‌যোগী হন নাই। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতিরূপে প্রত্যহ দশ সহস্র পাণ্ডব সৈন্য বধ করিয়া প্রথম দশদিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া অর্জুন তাঁহাকে রথ হইতে পাতিত করেন। পিতৃপ্রদত্ত ইচ্ছামৃত্যু বরপ্রভাবে তিনি শরশয্যায় শয়ন করিয়াও অষ্টপঞ্চাশৎ রাত্রি জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে উত্তরায়ণে মাঘমাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

মহাভারতের সমগ্র শান্তি এবং অনুশাসন পর্ব হইল ভীষ্ম কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত মোক্ষ, রাজধর্ম, তীর্থ ও আপদ্ধর্ম বিষয়ক উপদেশাবলী।

কল্যাণী দত্ত

ভুটান পূর্ব হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে উত্তুঙ্গ এলাকায় (২৬°৪১′-২৮°৭′ উত্তর এবং ৮৮°৫৪′-৯১°৫৪′ পূর্ব পর্যন্ত) অবস্থিত একটি বৃহৎ স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য। এই রাজ্যের এলাকা প্রায় ৪৬৬৫৭·৮ বর্গ কিলোমিটার; ইহার উত্তরে পূর্ব তিব্বত, দক্ষিণে ভারতের জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা, পূর্বে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির তাওয়াং অঞ্চল এবং পশ্চিমে তিব্বতের চুম্বি উপত্যকা, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা। সমুদ্র সমতল হইতে দেশটি প্রায় ৩০৪৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত। সমস্ত দেশটি হিমালয় পর্বতে অবস্থিত বলিয়া বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। উত্তরে কয়েকটি দুর্গম গিরিপথের মধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত, ও পূর্ব-সীমান্তে একটি বিস্তৃত ও সহজগম্য উপত্যকার মাধ্যমে তাওয়াং অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ আছে। দক্ষিণে ভারতের সহিত যোগাযোগও কয়েকটি নিম্ন গিরিপথের সাহায্যে সাধিত হয়। হিমালয়ের অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত ভুটানের উর্বর উপত্যকাগুলিই দেশের সর্বাপেক্ষা উন্নত অঞ্চল। রাজধানী থিম্পু।

ভূপ্রকৃতি অনুসারে সমগ্র দেশটিকে তিনটি সমান্তরাল অঞ্চলে ভাগ করা যায়ঃ (১) বিশাল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) আভ্যন্তরীণ হিমালয় অঞ্চল ও (৩) ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চল।

(১) বিশাল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল—রাজ্যের উত্তর প্রান্তে তিব্বত মালভূমির দক্ষিণে এই অঞ্চলটি অবস্থিত। এখানকার সমস্ত পর্বতমালা অত্যন্ত উন্নত। উত্তর-পশ্চিম কোণে বহু উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ সারা বৎসরই তুষারাবৃত থাকে, চুম্‌লহারী উচ্চতম শৃঙ্গ (৭২৯৩·৮ মিটার)। উপত্যকাগুলি ৩৬৫৭·৬ মিটার হইতে ৫৪৮৬·৪ মিটার উচ্চে হিমবাহগুলির পাদদেশে অবস্থিত। উপত্যকাগুলির পশ্চাতেই বিশাল হিমালয় পর্বতমালা। ইহাদের উত্তরে, তিব্বতের বন্ধুর মালভূমির প্রান্তদেশে আরও কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ (৫৭৯১ হইতে ৬০৯৬ মিটার) পর্বত আছে।

এই অঞ্চলে শীতের তীব্রতা অত্যন্ত বেশি, গ্রীষ্ম স্বল্প-স্থায়ী, বৃষ্টিপাত কম। অধিকাংশ এলাকাই দুর্গম। চাষ সামান্যই হয়। স্থলপথে গিরিপথের মধ্য দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য চলে। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল জনবসতিশূন্য। উচ্চতম ঢালগুলিতে পশুচারণ ক্ষেত্র আছে।

(২) আভ্যন্তরীণ হিমালয় অঞ্চল—বিশাল হিমালয় হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পর্বতশ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ উপত্যকা-গুলি লইয়া এই অঞ্চলটি গঠিত। এই স্থানের গিরিশ্রেণীই দক্ষিণে প্রবাহিত নদীগুলির মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকার কাজ করে। উত্তর-পূর্বে তাওয়াং পর্বত ভুটানকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি হইতে ও পশ্চিমে টুলে লা সিকিম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। দেশের মধ্যভাগ দিয়া কৃষ্ণপর্বত পুনাখা ও টোংলা উপত্যকার মধ্য দিয়া সমগ্র দেশকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। দুই অঞ্চলের ৩৬৫৭ হইতে ৪৫৭২ মিটার উচ্চ পাহাড়গুলি গভীর গিরি-

খাত ও উপত্যকা দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন। উপত্যকাগুলি নদীর গতিপথ অনুসরণ করিয়া দক্ষিণে ব্যাপ্ত। এই উপত্যকাগুলিই ভুটানের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ ; ইহারা স্বাস্থ্যকর, বিস্তৃত ও সমতল বলিয়া এখানেই ভুটানের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি অঞ্চল। পাহাড়ের ঢালে বৃষ্টিপাত বেশি বলিয়া ঘন অরণ্য দেখা যায়। নিম্নে উপত্যকার ক্রোড়ে ও তলদেশে যথেষ্ট চাষবাস হয়।

(৩) ডুয়ার্সের সমভূমি অঞ্চল—ভুটানের দক্ষিণ সীমান্তে ১২·৮৮ হইতে ১৬ কিলোমিটার ব্যাপিয়া এই সমভূমি দেখা যায়। এখানে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত অত্যধিক এবং নদীগুলিতে প্রায়ই বন্যা হয় বলিয়া সমস্ত ডুয়ার্স অঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই অঞ্চলে জনবসতি বিরল। উত্তরাংশের পার্বত্য এলাকায় প্রবল শৈত্য ও আর্দ্রতা অনুভূত হয়। নিম্নভূমিগুলি উষ্ণ ও আর্দ্র।

এই সমভূমি অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। দক্ষিণভাগে ঘন উচ্চ সাভানা তৃণ, বাঁশ ও শাল বন দেখা যায়। স্থানে স্থানে চাষবাসও হয়। উত্তরভাগে পর্বতের পাদদেশে বন্ধুর, অসমতল ঢাল ক্রমে দক্ষিণের সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে।

বিশাল হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালের পার্বত্য এলাকা হইতে অসংখ্য নদনদী বাহির হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গভীর ও সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পরে পরিশেষে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। পশ্চিম হইতে পূর্বদিকের প্রধান নদীগুলির মধ্যে জলঢাকা, তোরসা, ওয়াংচু, সংকোশ ও মানস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ পর্বতের পশ্চিমে পুনাখা (মাচু) নদী ও ফোচু নদী, পুনাখা উপত্যকায় মিলিত হইয়া সংকোশ নাম ধারণ করিয়াছে। এই নদীর তীরেই দুর্ভেদ্য পুনাখা দুর্গ অবস্থিত। ইহার ২৪·১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে ওয়াংদু ফোদ্রঙের বিখ্যাত দুর্গও অবস্থিত।

ভুটানের অধিকাংশ নদীই খরস্রোতা। খরস্রোতা হওয়ায় অধিকাংশ নদীরই জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রচুর। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জলঢাকা নদীকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগাইবার জন্য ভুটান সরকার ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় বর্তমানে এই নদী হইতে ১৮০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইতেছে। নৌচলাচলের পক্ষে কোনও নদীই বিশেষ সুবিধাজনক নহে।

ভুটানে উচ্চতা অনুসারে জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। মধ্য উপত্যকার অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং উত্তরের পার্বত্য এলাকায় তীব্র মেরু প্রদেশীয় জলবায়ু অনুভূত হয়। নিম্ন সমভূমি অঞ্চলে গ্রীষ্মের তীব্রতা যথেষ্ট। প্রায় সর্বত্রই বৃষ্টিপাত পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়। পর্বতের উচ্চতা ও ঢালের জন্য উপত্যকাগুলিতে সময়ে সময়ে মারাত্মক ঝঞ্ঝা হয়।

জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্য ও তারতম্য অনুসারে ভুটানে নানাপ্রকার বৃক্ষাদি দেখা যায়। উক্ত অঞ্চলের ঘন অরণ্য, সাভানা এলাকার তৃণভূমি, মেরুপ্রদেশের ন্যায় বৃক্ষাদির স্বল্পতা—প্রায় সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই এই দেশে পরিলক্ষিত হয়। উপরের পর্বতগাত্রে নানাপ্রকার পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি ও তাহার নিম্নে মিশ্রধরনের বনভূমি আছে। পর্ণমোচী বৃক্ষাদির মধ্যে বীচ, অ্যাশ, বার্চ, ম্যাপ্‌ল, সাইপ্রাস ও ইউ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের উপরে ওক, ফার ও পাইন এবং আরও উচ্চে তৃণগুল্মে পরিশোভিত বিস্তীর্ণ চারণক্ষেত্র দেখা যায়। বনভূমি হইতে নানাপ্রকার কাষ্ঠ, লাক্ষা, মোম, মধু, মৃগনাভি ও নানাপ্রকার বনজ সম্পদ আহরণ করা হয়।

নিম্নের পাহাড়গুলি নানাধরণের জীবজন্তুর আবাসস্থল। উপত্যকা অঞ্চলে চিতাবাঘ, হাতী, হরিণ, উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে নানাপ্রকার হরিণ, বন্যশূকর, ভল্লুক ও নিম্ন ডুয়ার্সের সমভূমিতে গণ্ডারও দেখা যায়।

ভুটানের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। পূর্বে এখানে কোচদের সমগোত্রীয় ভুটিয়া টেফু নামক উপজাতির বসবাস ছিল। প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে তিব্বতীদের হস্তে তাহারা পরাভূত হয়। তিব্বতীরা এই এলাকায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে ও স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে। ইহাদের সংমিশ্রণেই বর্তমান ভুটিয়াদের উৎপত্তি। তিব্বতের ন্যায় লামাপ্রধান শাসনব্যবস্থা এখানেও প্রচলিত হয় এবং প্রধান লামা 'ধর্মরাজা' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ছোট ছোট প্রদেশের শাসনভার পেন্‌লপ এবং দুর্গগুলির কর্তৃত্ব জুঙ্‌পেনদিগের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। পরে শাসনভার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ধর্মরাজা পেন্‌লপদিগের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী বা দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ইঁহারাই পরবর্তীকালে 'দেবরাজা' উপাধি লইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে শেষ 'ধর্মরাজার' মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দুইজন নৃপতি 'ধর্মরাজা' ও 'দেবরাজা'—রাজ্যের শাসনভার পরিচালনা করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পেন্‌লপদিগের মধ্যে ক্ষমতা লইয়া দলাদলি ও গৃহবিপ্লব শুরু হয় এবং কালক্রমে (১৯০৭ খ্রী) টোঙ্‌সার পেন্‌লপ সব কর্তৃত্ব নিজ করতলভুক্ত করেন এবং বংশানুক্রমিক রাজা নির্বাচিত হন। ইংরেজেরা এই নির্বাচন স্বীকার করিয়া লন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত পুনাখাতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ঐ সন্ধিপত্রের চুক্তিবলে ভুটানের বহির্বিষয়ক দপ্তর ও সামরিক ব্যাপার ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পুনরায় চুক্তি সম্পাদিত হয় ও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভুটানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই চুক্তির বলে ভুটান বিদেশ হইতে যুদ্ধোপকরণ আমদানি করিবারও স্বাধীনতা পায়।

প্রথম রাজার তৃতীয় বংশধর, বর্তমান নৃপতি স্যার

জিগমে দোরজী ওয়াংচুক ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্তমানে দেশের শাসনব্যবস্থা রাজা, জাতীয় পরিষদ, উপদেষ্টা পরিষদ, কেন্দ্রীয় দপ্তর ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত। জাতীয় পরিষদ (স্থানীয় নাম সোঙডু) ১৩০ জন সভ্য লইয়া গঠিত। গ্রাম্য প্রধানরা পরিষদের সদস্য নির্বাচন করেন। স্থানীয় এলাকার শাসনভার কাজীদের উপর ন্যস্ত এবং বড় ধরনের অপরাধ ব্যতীত কাজীরা প্রায় সর্বপ্রকার বিচার ও কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিবার জন্য ভারতীয় অর্থসাহায্যে ১৯৬১ সালে ভুটানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপায়ণ করা হয়। ইহা ব্যতীত কলম্বো পরিকল্পনার সাহায্যে ভুটানের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা হইতেছে।

ভুটানের আনুমানিক জনসংখ্যা ৭৫০০০০ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৬। জনগণের অধিকাংশই মহাজ্যায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে ভারতীয় গুরু পদ্মসম্ভব ভুটিয়াদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে নেপালীরা (২৫%) অনুপ্রবেশ করিয়া এদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। নেপালীরা হিন্দু। ইহারা অধিকাংশই তোরসা নদীর পশ্চিমে ও দক্ষিণ ভুটানে বসবাস করে। ইহাদের সঙ্গে স্থানীয় ভুটিয়াদের প্রায় কোনও সংযোগ নাই।

পশ্চিম ও উত্তর ভুটানের জনজীবনে তিব্বতীয় বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতির ছাপ ও পূর্ব ভুটানের জনগণের মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। ভুটানে চারটি প্রধান ভাষা চলিত আছে। উত্তরে ও পশ্চিমে জোঙ্থা, মধ্যভাগে বুমথাঙ্য়া, পূর্বে সারচাপ্য়া এবং দক্ষিণে নেপালী। জোঙ্থা সরকারি ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়। তিব্বতী ভাষার সহিত ইহার প্রচুর সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে।

ভুটানে তিন শ্রেণীর লোক নজরে পড়ে ; পুরোহিত, দলপতি ও সাধারণ কৃষক। পুরোহিতেরা যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও সরকারি খরচে প্রতিপালিত হয়। ভুটানে প্রায় কিঞ্চিদধিক ৪০০০ লামা বা পুরোহিত আছেন। রাজস্বের এক মোটা অংশ ইঁহাদের জন্য ব্যয় করা হয়। ভুটিয়ারা অধিকাংশই পশুচারণ ও চাষবাস করিতে পছন্দ করে। চাষবাস অত্যন্ত অনুন্নত ধরণের।

ভুটিয়াদের দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও সুগঠিত। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু ও অত্যন্ত সাহসী। মাংস, ভাত ও চা ইহাদের প্রধান খাদ্য। চাল ও যব হইতে মদ (স্থানীয় নাম চাঙ) প্রস্তুত করে ও নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই মদ্যপান করে। মাথার চুল নারী ও পুরুষ উভয়েই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটে ও সকলেই ঝোলা কোট পরিধান করে।

অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে। গ্রামগুলি ক্ষুদ্রাকার ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বড় শহর নাই বলিলেই চলে। উপত্যকার ধারে উচ্চে মঠ-দুর্গগুলি অবস্থিত। শহরগুলি এই সব দুর্গের চারিপার্শ্বে গৃহের সমষ্টি মাত্র। বর্তমান নির্মীয়মাণ রাজধানী থিম্পুও এরূপ একটি মঠ-দুর্গকেন্দ্রিক শহর। একমাত্র শহর এলাকাতেই দ্বিতল গৃহ দেখা যায়। ঘরবাড়িগুলি সুচারুরূপে বিন্যস্ত, কাষ্ঠনির্মিত, চারিদিক উন্মুক্ত ও কারুকার্যময়। উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে সমতল ছাদ-বিশিষ্ট প্রস্তরনির্মিত গৃহ, মধ্য উপত্যকায় প্রস্তরের দেওয়াল ও তৃণাচ্ছাদিত বিক্ষিপ্ত বাসগৃহ ও নিম্নে ডুয়ার্সের সমভূমিতে কোথাও কোথাও মাটির দেওয়াল ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহ দেখা যায়।

রাজধানী থিম্পু ব্যতীত অন্যান্য শহরের মধ্যে পুনাখা, পারো, এসিজঙ, টোঙ্সা, ওয়ান্দিপুর, ঘাসা, মুরি চোম, ফুণ্ট্সুলিঙ প্রভৃতি প্রধান।

কৃষিকার্যই ভুটানের জনগণের প্রধান উপজীবিকা। মধ্য-ভুটানের উপত্যকাগুলিতে সর্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় জমির ব্যবহার করা হয়। পাহাড়ের ঢালে বহুদূর পর্যন্ত চাষবাস করা হয়। ভুট্টাই প্রধান শস্য। অন্য শস্যের মধ্যে গম, 'বাক্হুইট', আলু, যব, সরিষা, ধান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এলাচ ও ধান সেচোপযোগী জমিতে ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হয় এবং ঐ শস্য বাহিরে বিক্রয় করিয়া ভুটান সরকার কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন। সাধারণতঃ নিম্ন-উপত্যকায় ধান, আভ্যন্তরীণ এলাকায় ধান ও অন্যান্য শস্য এবং উচ্চ পার্বত্য এলাকায় যব ও আলুর চাষ হয়। বহুদূর হইতে জল আনিয়া পাহাড়ের ঢালে চাষ করা হয়।

বনভূমি ও বরফাবৃত এলাকার চারণ ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পশুচারণ করা হয়। শীতকালে উচ্চ অংশ হইতে নিম্ন এলাকায় পশুসহ চারণিকরা অবতরণ করে এবং আবার গ্রীষ্মকালে উপরে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলে চলিয়া যায়।

এই রাজ্যের খনিজ সম্পদ অধিকাংশই অজ্ঞাত। ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সংস্থার কল্যাণে বিভিন্ন স্থানে কয়লা, ডলোমাইট, তামা, গ্রাফাইট, জিপ্সাম, স্বর্ণ প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ভুটানে ভারী শিল্প বা বৃহৎ আকারের কোনও শিল্প নাই। মদ্য প্রস্তুতের কারখানা, ক্ষুদ্র কাগজ কল ও ফলের উপর নির্ভরশীল নানাপ্রকার শিল্পোদ্যোগ সরকারের ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কুটিরশিল্পের মধ্যে মোটা কম্বল ও অভিজ্ঞ শিল্পিগণের দ্বারা প্রস্তুত সুতী কাপড় প্রধান। মহিষের চামড়া হইতে বরফের উপর চলাফেরা করিবার উপযুক্ত জুতা তৈয়ারি করা হয়। ভুটানীরা তামা, পিতল, রুপার কাজ ও মৃৎশিল্পে পটু। তরবারি, ছোরা, বর্শা, তীর ও কৃষিজ যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত হয়।

ভুটানের সহিত সিকিম, নেপাল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি, আসাম ও পশ্চিম বাংলার বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ও লেনদেন আছে। পূর্বে তিব্বতের সহিতও উত্তরের গিরি-

পথের মাধ্যমে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। সম্প্রতি তিব্বতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে। ভারতীয় এলাকায় স্থলপথে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। নানাপ্রকার কাঠ, কমলালেবু, এলাচ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। ইহা ব্যতীত গবাদি পশু, ঘি, চা, মোম, চমরীগরুর লেজ, চামড়া, হস্তিদন্ত, লাক্ষা প্রভৃতিও সামান্য পরিমাণে রপ্তানি হয়। ভারতীয় মুদ্রাতেই সাধারণতঃ লেনদেন চলে।

ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত এবং দেশের অধিকাংশ স্থানেই যাতায়াত কষ্টসাধ্য। ইদানীং তোরসা ও জলঢাকা উপত্যকায় রাস্তাঘাটের সম্প্রসারণ ও নূতন রাস্তা নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পারো ও থিম্পুতে হেলিকপ্টার বিমান অবতরণ ক্ষেত্রও সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। সীমান্ত শহর ফুণ্ট্সুলিঙ হইতে মোটরে রাজধানী থিম্পু ও পারো যাইবার পথটি ১৯৬৩ সালে সমাপ্ত হইয়াছে। মধ্য-ভুটানের পার্বত্য উপত্যকাগুলির মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে তিনটি রাস্তা, পূর্ব-পশ্চিমে একটি এবং পারো হইতে ফুণ্ট্সুলিঙ জাতীয় সড়ক নির্মিত হইয়াছে। বর্তমানে ভুটানে প্রায় ১২৮৮ কিলোমিটার নূতন পথ নির্মিত হইয়াছে। শেষোক্ত রাজপথটিই ভুটানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পথ ও প্রায় ১৯৩·২ কিলোমিটার লম্বা। ইহার একটি শাখা থিম্পুর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। সাম্প্রতিককালে ডাক ও তার বিভাগেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

দ্র Captain Robert Boiban Penperton, *Report on Bootan*, Calcutta, 1839; P. P. Karan & W. M. Jenkins, Jr., *The Himalayan Kingdoms: Bhutan, Sikkim and Nepal*, New York, 1963; Avoduth Kakodkar, *Bhutan and Sikkim*, Gangktok, 1961.

বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়
প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভুট্টা ধান্যগোত্রের (ফ্যামিলী—গ্রামিনিঈ) অন্তর্গত একবীজপত্রী, বর্ষজীবী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম জেয়া মেস (*Zea mays*)। কাণ্ডে গড়ে ১৪টি গাঁট। গড়ে প্রায় ১৮টি চওড়া ফলকের মত পাতা থাকে। গুচ্ছমূলই গাছকে খাদ্য সরবরাহ করে। পুং- এবং স্ত্রী-পুষ্প ভিন্ন জাতিরূপের। পুং-পুষ্পমঞ্জরী কাণ্ডের শেষ প্রান্তে সূত্রগুচ্ছের ('টাস্‌ল') মত উদ্গত হয়। স্ত্রী-পুষ্পমঞ্জরী গাছের মাঝামাঝি পত্রকক্ষে অবস্থিত ও দেখিতে মোচার মত। ইহার জোড়ায় জোড়ায় সারিবদ্ধ 'স্পাইক্‌লেট'-গুলির প্রত্যেকটি একটি করিয়া ডিম্বক উৎপাদন করার দরুণ ভুট্টার মোচা পূর্ণতা পাওয়ার পর তাহাতে সারিবদ্ধ সমসংখ্যক দানা দেখা যায়। প্রতিটি ডিম্বক হইতে রেশমের ন্যায় সূত্রাকার গর্ভদণ্ড নির্গত হয় এবং ইহার মাধ্যমেই উপরিস্থিত পুং-পুষ্পের পরাগরেণু ডিম্বককে নিষিক্ত করে। ডিম্বকের সংখ্যা সাধারণতঃ ১৫০০-র অধিক হয় না।

ভুট্টার আদি জন্মস্থান মধ্য আমেরিকা বলিয়া অনুমান। কলম্বাসের অভিযাত্রী দল কিউবা হইতে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর ভুট্টার নমুনা ইওরোপে আনেন। বর্তমানে ভুট্টার চাষ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজাত শস্যের মধ্যে ভুট্টার স্থানই সর্বোচ্চ। ঐ দেশে মনুষ্যখাদ্য ও পশুখাদ্য রূপে ব্যবহার ছাড়াও প্রায় ৫০০ রকম শিল্পে ভুট্টার প্রয়োগ আছে। তন্মধ্যে শ্বেতসার, সিরাপ, কোহল, অ্যাসেটিক ও ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড, গ্লুকোজ, কাগজ, রেয়ন, প্ল্যাস্টিক, আঠা, রঞ্জক, কৃত্রিম রবার, টর্পেডোর ইন্ধন, কৃত্রিম চামড়া এবং জুতার পালিশ প্রধান।

ভারতে ভুট্টা প্রধানতঃ খরিফে বৃষ্টির জলে চাষ করা হয় এবং শরৎকালে কাটা হয়। বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ এবং মাদ্রাজের কোনও কোনও রবি মরশুমেও চাষ করা হয়। সমুদ্র-সমতল হইতে ৩৬০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ইহার চাষ হয়। যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৫০—২০০ সেণ্টিমিটার সেখানেই সাফল্যের সঙ্গে ইহার চাষ করা যায়। পলিমাটি উপযোগী। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়া বিদা এবং মই দিয়া চৌরস করিতে হয়।

বর্তমানে সর্বত্রই উচ্চ-ফলনশীল সংকর ভুট্টার চাষ করা হয়। বীজের প্রকারগুলি সংকর ভুট্টার মধ্যে গঙ্গা ৩, গঙ্গা ১০১, গঙ্গা সফেদ ২, রঞ্জিত, ডেকান, থাইস্টার্চ অথবা হিমালয় এবং মিশ্র প্রকারের মধ্যে অম্বর, বিজয়, বিক্রম, কিষাণ, জওহর অথবা সোনা। সংকর বীজের অসুবিধা এই যে তাহা প্রতি বৎসর কিনিতে হইবে। মিশ্র প্রকার একবার কিনিবার পর নিজে বীজ রাখিয়া প্রায় ৫ বৎসর ব্যবহার করা চলিবে। হেক্টর-প্রতি ১০—২০ কিলোগ্রাম বীজের প্রয়োজন। ৬০ সেণ্টিমিটার অন্তর সারিতে ২০ সেণ্টিমিটার অন্তর বীজ বপন করা হয়। প্রতি হেক্টরে ৫০০০০—৬০০০০ গাছ থাকিলেই ফলন সর্বোত্তম।

ভুট্টা অত্যন্ত প্রবল খাদক। হেক্টর-প্রতি অনুমোদিত উর্বরকের পরিমাণ নাইট্রোজেন ৯৫ কিলোগ্রাম, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড ৬০ কিলোগ্রাম এবং পটাস ৫০ কিলোগ্রাম। প্রতি কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন প্রয়োগে ভুট্টার দানার ফলন ১৫—২৫ কিলোগ্রাম বাড়ে।

ভুট্টা ক্ষেত সম্পূর্ণ আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে সীমাজীন বা ২, ৪-ডি সোডিয়াম লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ জনপ্রিয়। দানায় দুধ আসিয়া গেলেই পাখি তাড়ানো দরকার। টিয়াপাখি ভুট্টার একটি প্রধান শত্রু। মিলডিউ, মরিচা রোগ এবং পাতার ধসা প্রভৃতির সহনশীলতা উন্নত সংকর জাতের মধ্যে অত্যন্ত বেশি। ডগাছিদ্রকারী পোকা অত্যন্ত ক্ষতি

করে। এই পোকার এবং সঙ্গে সঙ্গে ফড়িং, কোরিপোকা প্রভৃতির উপদ্রব দমন করার জন্য এনড্রিন, বি. এইচ. সি, ডি. ডি. টি অথবা কার্বল নির্দিষ্ট অনুপাতে জলে গুলিয়া সেই ঔষধ দুই-তিনবার সিঞ্চন করিতে হইবে।

ভুট্টা গাছে প্রকারভেদে মোচার সংখ্যা ১—৪। মোচার আবরণের রঙ বাদামি হইলেই তুলিতে হইবে। মোচাহীন গাছ পশুখাদ্যরূপে অথবা খামারের আবর্জনা সারের জন্য ব্যবহার করা যায়। মোচা পাকা মেঝেতে শুখানো হয়। মোচার দানা পিষিয়া সেই আটার চাপাটি খাওয়া পাহাড়ী ও পাহাড়তলী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ভুট্টার খই এবং আগুনে-ঝল্সানো ভুট্টার দানাও খাওয়া হয়। ভারতে মনুষ্যখাদ্যরূপে ধান এবং গমের পরই ভুট্টার স্থান। ভারতে বর্তমানে ভুট্টাচাষের জমির পরিমাণ ৫৭ লক্ষ হেক্টর এবং মোট উৎপাদন ৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বিভিন্ন রাজ্যে হেক্টর-প্রতি ফলন ১৪০৪—৩৫০০ কিলোগ্রাম, যেখানে সংকর ভুট্টার ফলন ৭৮৩৫ কিলোগ্রাম।

দ্র Boshi Sen, *Hybrid Maize*, New Delhi, 1953; J. N. Batra and D. Sharma, *Maize Cultivation in Punjab*, Ludhiana, 1966; *Report of the Department of Agriculture*, 1969-70, New Delhi, 1970; F.A.O. *Production Yearbook*, 1969, Vol. 23, Rome, 1970.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

ভুটিয়া ভুটান দ্র।

ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯১৬ খ্রী) সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'পরিদর্শক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি দেড় বৎসর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ও ২২ বৎসর 'সংবাদ প্রভাকর'-এর (১৮৬৮ খ্রী ? হইতে) সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'বসুমতী'র ও ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'জন্মভূমি'র সম্পাদক নিযুক্ত হন।

তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫ খ্রী) 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'র আদর্শে 'নিশাচর' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। (ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র সহিত একযোগে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।) তিনি ইংরেজী রহস্য কাহিনীর অনুবাদ বা অনুসরণ করিয়া 'লণ্ডন রহস্য' (১৯১২-১৪ খ্রী), 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (১৯০৪ খ্রী) প্রভৃতি অনেক রহস্যোপন্যাস লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তিনি অর্ধশতাধিক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অসমাপ্ত 'মায়াকানন' নাটকটিকে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক-চরিতমালা —৮৪, ৮ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

গীতা মিত্র

ভুবনেশ্বর ওড়িশার প্রাচীন ও বর্তমান রাজধানী। কলিকাতার ৪৩৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, কটক শহরের ২৭ কিলোমিটার দক্ষিণ, পুরী হইতে ৬৪ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। পুরাণে ইহা একাম্রকানন নামে খ্যাত।

শহরের ৮ কিলোমিটার দূরে ধৌলি পাহাড়ের পাদদেশে সম্রাট অশোকের (২৭২—২৩৬ খ্রীপূ) শিলালিপি ক্ষোদিত আছে। পুরী সড়কের উত্তরে শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ২ কিলোমিটার দূরে শিশুপালগড় নামে পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন কীর্তি বর্তমান। এখানে খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় হইতে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরের ৭।৮ কিলোমিটার পশ্চিমে খণ্ডগিরি-উদয়গিরিতে ক্ষোদিত জৈন গুহাবলী বর্তমান। এখানে চেদি রাজকুল-সম্ভূত মহামেঘবাহন বংশের জৈন নরপতি খারবেলের (খ্রী পূ ১ম শতক) শিলালিপি ও কীর্তি বিরাজমান। ইনি মগধের নন্দবংশের দ্বারা পূর্বে অপহৃত কোনও জৈন পূজাসামগ্রী উদ্ধার করিয়া আনেন এবং জৈন মুনিগণের ব্যবহারার্থ বহু গিরিগুহা নির্মাণ করাইয়া দেন। হাথীগুম্ফার ঊর্ধ্বে পর্বতোপরি একটি চৈত্য গৃহের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরে ইতস্ততঃ (ভাস্করেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বরাদি মন্দিরের নিকটে ও অশোকা-কুণ্ডের পার্শ্বে) শুঙ্গযুগের (?) প্রাচীন কীর্তি, যথা ক্ষোদিত স্তম্ভশীর্ষ, রেলিং-এর খণ্ড প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু হয়ত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের পরে ভুবনেশ্বরের গৌরব ম্লান হইয়া যায়। পরবর্তীকালে খ্রীষ্টীয় ৭ম হইতে ১৫শ শতক পর্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমিতে পরিণত হয়। ঐ সময়ের পূর্বার্ধে নির্মিত শত্রুঘ্নেশ্বর, পরশুরামেশ্বর, সুবর্ণজালেশ্বর, মোহিনী, বৈতাল, শিশিরেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, মুক্তেশ্বর ও গৌরীর মন্দির এখনও টিকিয়া আছে। নিঃসন্দেহে অনেক মন্দিরই ভাঙিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে নির্মিত মন্দিররাজির মধ্যে সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, রাজারাণী, ব্রহ্মেশ্বর, লিঙ্গরাজ, পার্বতী, মেঘেশ্বর, অনন্তবাসুদেব, চিত্রকারিণী, সারিদেউল, ভাস্করেশ্বর প্রভৃতি আজও অক্ষত বা ক্ষত অবস্থায় বিরাজমান।

যে সকল মন্দিরের নামোল্লেখ করা হইল সেগুলি পরীক্ষা করিলে ওড়িশায় মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির বিবর্তনের মনোজ্ঞ তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। মন্দির ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে, গর্ভগৃহের আয়তনও বৃদ্ধি পায়। উচ্চতা বৃদ্ধি ও আসনের (ground plan) বিস্তারের সহিত মন্দিরের নির্মাণ কৌশলে, বিশেষতঃ তাহার

অন্তরের গঠনে নানাবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়। তক্ষণ-শিল্প বা অলংকরণের ব্যাপারে সরল, ঋজু ও দৃঢ় শৈলীর পরিবর্তে মার্জিত পেলব ভাবের আবির্ভাব বেশি প্রকাশিত হয়। মূর্তিরাজির মধ্যে দেবদেবীর পৌরাণিক কাহিনী, অথবা নরনারী ও জীবজন্তুর চিত্র সহ নানাবিধ লতাপুষ্পের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। সমসাময়িক রাজ-দরবারের চিত্র ইহা হইতে সংকলন করা সম্ভব, সাধারণ মানুষের জীবনের নহে।

মন্দিরগুলির মধ্যে শৈব সম্প্রদায়ের আধিকারই বেশি। প্রাচীনগুলিতে বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে লকুলীশের কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়। বৈতাল দেউল বা গৌরীর মন্দির শক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। লিঙ্গরাজ মন্দির সর্ব-প্রধান। ইহা অনাদিলিঙ্গ এবং কীর্তিবাস নামেও পরিচিত। লিঙ্গরাজের পূজারীগণ বড়ুশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে ইঁহারা শূদ্রবর্ণজাত। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বর্ণ ব্যবস্থায় ইঁহাদের অধিকার এবং মর্যাদা বিষয়ে বিবাদ রাজদরবারে বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

ওড়িশায় মহানদীর কূল অনুসরণ করিয়া যদি পশ্চিমে রায়পুর, বিলাসপুর বা ছত্রিশগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, তবে কটকের নিকট হইতে বড়ম্বা (সিংহনাথ) পার হইয়া সম্বলপুর অতিক্রম করিয়া বিলাসপুর জেলায় সিউরিনারায়ণ, খরোদ প্রভৃতি বহু স্থানেই মন্দিরে শূদ্র যাজক দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অব্রাহ্মণ (অনার্য) জাতি-বৃন্দ ব্রাহ্মণাধীন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের গৌরব এইভাবে বর্ধিত করিয়াছিলেন। এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কারণ হইল, রাজশক্তি প্রয়োগের দ্বারা যেমন হিন্দুসমাজের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই মন্দির ও মঠের সহিত হিন্দুসমাজের বিবর্তন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত রহিয়াছে। এবং এই বিবর্তন শুধু ধর্ম-ক্ষেত্রেই নয়, আর্থিক ও সামাজিক জীবনকেও গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল।

ছত্রিশগড় অঞ্চলে কিরারিগ্রামে প্রাপ্ত কাষ্ঠখণ্ডে যজ্ঞ সম্পর্কে ব্রাহ্মী লিপি (খ্রীষ্টীয় ২য় শতক) বা বুঢ়ীখারের বৈষ্ণব মূর্তির গদায় ক্ষোদিত ব্রাহ্মী লিপি (খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতকের শেষার্ধ) হইতে অনুমান করা যায় যে ১ম বা ২য় শতাব্দীতে যখন ওড়িশা গভীরভাবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত তখন মহানদীর উৎপত্তিস্থলের সন্নিকটে ব্রাহ্মণ্যধর্মের যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং এই প্রভাব কালবশে উক্ত নদীর উপত্যকা বাহিয়া দক্ষিণ কোশল বা সোনপুর-সম্বলপুর এলাকা অতিক্রম করিয়া পুরী-ভুবনেশ্বর-কটক অঞ্চলেও অধিকার বিস্তার করে, ইহা হয়ত কষ্টকল্পনা নহে। অন্যপক্ষে ঐতিহাসিকগণ ভুবনেশ্বরে শশাঙ্কের প্রভাব বিস্তারিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, এরূপ মতও পোষণ করিয়া থাকেন।

ইংরেজ রাজত্বকালে ভুবনেশ্বরের গুরুত্ব হ্রাস পায়। তখন গভর্নমেণ্ট এবং ব্যবসাবাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র-স্থল হিসাবে কটক শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, এবং তীর্থ-স্থান হিসাবে পুরী বা পুরুষোত্তম শীর্ষস্থান অধিকার করে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পরে ওড়িশা রাজ্যের রাজধানী ভুবনেশ্বরে স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। বর্তমানে এই নূতন শহরটি প্রাচীন ভুবনেশ্বরের সংলগ্ন পশ্চিমাংশে নির্মিত হইয়াছে। রাজ্যপাল এবং মন্ত্রী ও রাজকর্মচারি-গণের আবাস, রাজ্য সংসদ, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি শিক্ষায়তন, এয়ারপোর্ট প্রভৃতি এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের জনসংখ্যা ছিল ৩৮২১১। শহরের বিস্তৃতি যথেষ্ট ঘটিলেও ওড়িয়া সংস্কৃতির কেন্দ্র-স্থল এবং ব্যবসাবাণিজ্যের মূলাধার কটক শহরে বা তাহার সন্নিকটে আজও অবস্থিত রহিয়াছে।

নির্মলকুমার বসু

ভূতত্ত্ব পৃথিবীর জন্মের পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীপৃষ্ঠের ও জীবজগতের বিবর্তন-ধারাটির অনু-ধাবন ও চর্চা ভূতত্ত্বের সীমানার মধ্যে পড়ে। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে ভূতত্ত্ব সাধারণভাবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গ্রীসীয় ও রোমীয় দার্শনিক এবং প্রকৃতিবিদ্‌গণ ক্রমশঃই এইসব অযৌক্তিক ব্যাখ্যায় সন্দিহান হইয়া উঠিলেন এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক ঘটনা, যথা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত, নদীর পললবহন ও জীবাশ্মের অবস্থান ইত্যাদির যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আরিস্তোতল, লুক্রে-টিয়াস, হেরোডটাস, স্ট্রেণ্টো ও প্লিনি প্রমুখ ব্যক্তিরা। তাহার পর মধ্যযুগে ইওরোপে ভূতত্ত্বের ক্ষেত্রে আলোড়ন আনেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২—১৫১৯ খ্রী), যাঁহার 'সমুদ্র হইতে ভূমির জন্ম' এই মতবাদ সে যুগে নূতনত্বের দাবী করিয়াছিল। এই একই যুগে খনিজ ও শিল্প-সংক্রান্ত বিষয়ে স্টেনো (১৬৩১—৮৭ খ্রী) ও মরো (১৬৮৭—১৭৪০ খ্রী) প্রমুখ ব্যক্তিগণ নূতন মতবাদ ব্যক্ত করেন। এইসব মতবাদের ভিত্তি ছিল বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রকৃতির নিদর্শনগুলির অবিমিশ্র অনুধাবন ও সময়োপযোগী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। আরও পরে আধুনিক ভূতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন হাটন (১৭২৬—৯৭ খ্রী) যিনি 'বর্তমানেই আছে অতীত রহস্যের চাবিকাঠি'—ভূতত্ত্বের এই মৌলিক সংজ্ঞার স্রষ্টা। অর্থাৎ তাঁহার মতে বর্তমানে পৃথিবীপৃষ্ঠে যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর রহিয়াছে অতীতেও অনুরূপ ছিল। তিনি যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় ভারনার-এর মতবাদ, যথা, পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল শিলা ও খনিজ সমুদ্রে সৃষ্ট, ইহাকে খণ্ডন করিয়া শিলার বিন্যাস ও সৃষ্টির আধুনিক চিন্তাধারার পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরবর্তী ভূবিদ্‌গণ, মুখ্যতঃ লিয়েল (১৭৯৭—১৮৭৫ খ্রী), এই মতবাদ অনুসরণ করিয়া ভূতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত গবেষণা করিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে এই বহুমুখী অনুসন্ধানের ফলে ভূতত্ত্বের পরিধি এতই সম্প্রসারিত হইয়াছিল এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ ও অভ্যন্তরের সমস্যাগুলি এতই জটিল আকার ধারণ করিল যে বিভিন্ন তথ্যের সুষ্ঠু অনুধাবনের জন্য ভূতত্ত্ব স্বভাবতঃই বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল ; এবং এই শাখাগুলি ক্রমশঃ সুনির্দিষ্টরূপে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া বর্তমানে সুপরিকল্পিত ভূতাত্ত্বিক শাখায় পরিণত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক ভূতত্ত্ব (Physical Geology) ঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য আনিয়াছে নদী, হ্রদ, পাহাড়, মরুভূমি ইত্যাদি ভূমিবৃত্তির অনেক উপাদান। যদিও এইসব বিষয়ের আলোচনায় ভূগোল ও ভূতত্ত্বের মধ্যে সীমারেখা অতি ক্ষীণ, তথাপি ভূতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন ইহাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয় তখন স্বভাবতঃই শিলাবিন্যাস, তাহাদের গঠনপ্রকৃতি ও কার্যকারণসম্পর্কিত তথ্যের উপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়। অর্থাৎ নদীর গতিপথ, হ্রদ ও পাহাড়ের উৎপত্তি সঙ্গত কারণেই নির্ভর করে শিলার বিন্যাস ও গঠনবৈচিত্র্যের উপর। সুতরাং প্রকৃতির ভৌগোলিক চিত্রের ব্যাখ্যা নিহিত আছে ভূতত্ত্বের মধ্যে। যদিও সমুদ্র অন্যান্য অনেক কিছুর মতই প্রাকৃতিক ভূতত্ত্বের একটি উপাদান, কিন্তু সমুদ্রের বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্যময়তার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণার পরিধি অধুনা অনেক সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সাগরতত্ত্ব (Oceanography) নামে একটি স্বতন্ত্র শাখার জন্ম হইয়াছে। সমুদ্র-তলদেশের গঠন, সমুদ্রে সঞ্চিত পলল ও খনিজ ইত্যাদি বিষয়ে পৃথিবীব্যাপী কাজ চলিতেছে। ভারত-মহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরেও এই বিষয়ে কিছু কিছু গবেষণা হইতেছে। অনুরূপভাবে হিমবাহ, মরুভূমি, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিষয়ও ভূতত্ত্ব-ভিত্তিক আধুনিক পন্থায় সমীক্ষা করা হয় এবং উহাদের প্রকৃতি ও উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে মোটামুটি একটি স্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে বিজ্ঞানীরা সক্ষম হইয়াছেন।

খনিজতত্ত্ব (Economic Geology) ঃ পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব শিলাদ্বারা গঠিত তাহাতে বিভিন্ন প্রকারের খনিজ-পদার্থের সমাবেশ হইয়াছে। বস্তুতঃ শিলার শ্রেণীবিভাগ বহুলাংশে নির্ভর করে উহাদের মণিকের (মিনার‍্যাল—mineral) উপাদানের উপর। যখন কোনও খনিজপদার্থ শিলার মধ্যে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তখন সেই-খানে মূল্যবান খনির উৎপত্তি হইতে পারে এবং তাহা দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। খনিজ-পদার্থকে সাধারণভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, ধাতব ও অধাতব। ধাতব খনিজের মধ্যে লৌহ, তাম্র, সীসা, স্বর্ণ ইত্যাদি। এইসব ধাতব পদার্থ সাধারণতঃ শিলায় মৌলিক ধাতুর আকারে পাওয়া যায় না, কিন্তু একই ধাতু বিভিন্ন মণিকের আকারে শিলা অথবা খনিজসমৃদ্ধ শিলাস্থ আকরিক মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট থাকে। অপরপক্ষে অধাতব খনিজের মধ্যে চুনাপাথর, কয়লা, হীরক, প্রাকৃতিক তৈল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার দ্বারা এই-সব খনিজপদার্থের অনুসন্ধান করা হয় এবং এই সমীক্ষার অঙ্গস্বরূপ বিস্তারিত কার্যক্রমের মাধ্যমে শিলামানচিত্র গঠন, ছেদন-কার্য ও রাসায়নিক অনুশীলন করিবার পর খনিজপদার্থের মূল্যায়ন করা সম্ভব এবং দেশে খনিজের সঞ্চিত পরিমাণের সুস্পষ্ট ধারণা হয়। দেশের সর্বত্র ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষায় সম্প্রসারণের ফলে খনিজসম্পদের প্রকৃত রূপটি ক্রমশঃই স্পষ্ট হইতেছে। সুতরাং ভূতত্ত্ব যে কোনও দেশের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ও অর্থনীতির উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। ভারতবর্ষও এই ব্যাপারে ব্যতিক্রম নহে।

শিলাতত্ত্ব (Petrology) ঃ এই বিভাগ ভূতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। পৃথিবীপৃষ্ঠের বিভিন্ন শিলাকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ; যথা আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা। আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি হয় পৃথিবীর গভীরে যেখানে প্রচণ্ড তাপ ও চাপের ফলে শিলার উপাদানগুলি গলিত অবস্থায় থাকে। ঐ গলিত অথবা তদনুরূপ শিলা পৃথিবীপৃষ্ঠের ফাটল বা আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরনের শিলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বেসল্ট নামক শিলা যাহা ভারতের মধ্য-পশ্চিমখণ্ডের বহুলাংশে ব্যাপৃত। ইহা ভিন্ন সৃষ্টির আদিপর্বে পৃথিবী-গঠিত উপাদানে বিভাজনের ফলস্বরূপ একটি বিশেষ শিলা, যথা, গ্রানিট-এর স্তর উৎপন্ন হইয়াছিল। এই স্তর মহাদেশগুলির নীচে অত্যন্ত পুরু এবং সমুদ্রের তলদেশে অপেক্ষাকৃত পাতলা। পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদানে পার্থক্য থাকায় এবং বিভিন্ন শিলার সংমিশ্রণের ফলে ঐসব উপাদান উদ্ভূত আগ্নেয়শিলায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। যুগ যুগ ধরিয়া এইসব আদ্যশিলার ক্ষয়ের ফলে যে পলল উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা নদীপথে সমুদ্রে ও অন্যান্য নিম্ন-ভূমিতে অবক্ষেপিত হইয়া স্তরে স্তরে জমিয়াছে, এবং ক্রমে প্রস্তরীভূত হইয়া পাললিক শিলায় পরিণত হইয়াছে। এই ধরনের শিলার মধ্যে বালিপাথর, শেলপাথর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের পললের সঙ্গে কোথাও কোথাও যে বিস্তীর্ণ বন-জঙ্গল চাপা পড়িয়াছিল তাহা কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতে গণ্ডোয়ানা শিলা-গোষ্ঠী ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পাললিক শিলার উৎপত্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কয়েকধরনের শিলার উৎপত্তি হয়, যথা চুনাপাথর, আকরিক লৌহঘটিত শিলা ইত্যাদি। বস্তুতঃ পাললিক শিলার গঠনপ্রক্রিয়া সমুদ্রের গভীরে এবং বিভিন্ন ব-দ্বীপে এখনও চলিতেছে। পুরাকালে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়-শিলা ও বিশেষভাবে পাললিক শিলা প্রকৃতির নিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই রূপান্তরের কারণস্বরূপ ভূমধ্যস্থ

চাপ ও তাপই উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী, বিশেষতঃ পর্বতসৃষ্টির সময় এই সমস্ত শিলা যে আলোড়নের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহাতে শিলার গঠনপ্রকৃতি ও উপাদানে প্রচুর পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে পুরাতন এক ধরনের শিলা হইতে যেসব নূতন ধরনের শিলার উৎপত্তি হয় তাহাদের নাম রূপান্তরিত শিলা, যথা স্লেট, ফিলাইট, সিস্ট ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, রূপান্তরিত শিলার প্রকৃতি নির্ভর করে আদ্যশিলার প্রকৃতি এবং চাপ ও তাপের পরিমাণের উপর। একই উপাদান হইতে বিভিন্ন চাপে ও তাপে বিভিন্ন রূপান্তরিত শিলার উৎপত্তি সম্ভব।

স্তরতত্ত্ব (Stratigraphy) ঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্রমবিকাশের ধারাক্রমে উপরোক্ত শিলাসমূহ স্থলভাগে ও সমুদ্রতলে বিস্তৃত আছে। কোনও একটি অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার সাহায্যে শিলাবিন্যাসের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া উহাদের ক্রমপর্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য ভূতত্ত্বের যে বিভাগটি নিযুক্ত তাহা স্তরতত্ত্ব। ইহার দ্বারা ভূপৃষ্ঠে শিলাসমূহের পরস্পরের সম্পর্ক এবং পর্যায়ক্রমে উৎপত্তি ও গঠনের ইতিবৃত্তের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ, শিলাস্তরবিন্যাসের বৈচিত্র্য এবং জীবাশ্ম ও বিভিন্ন পন্থায় শিলার বয়স নির্ণয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর কালক্রমিক ইতিহাস রচনাই স্তরতত্ত্বের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভূগঠনতত্ত্ব (Structural Geology) ঃ স্তরতত্ত্বের পরিপূরক হিসাবে শিলাসমূহের গঠনবৈচিত্র্য অনুধাবন করাও ভূতত্ত্বের একটি প্রধান লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে শিলাস্থ বিভিন্ন ধরনের ফাটল, ভাঁজ ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়। শিলার এই গঠনবৈচিত্র্য পরীক্ষা যে শুধুমাত্র পৃথিবীপৃষ্ঠে ও অভ্যন্তরে সক্রিয় চাপ সম্পর্কে আলোকপাত করে তাহাই নহে, বিবিধ খনিজপদার্থের অনুসন্ধানেও সহায়তা করে। কেননা বিশেষ বিশেষ মণিক শিলার ফাটলে ও ভাঁজে কেন্দ্রীভূত হয় এবং খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চলে ঐসব ভাঁজ ও ফাটল সুষ্ঠুরূপে চিহ্নিত করিতে ও ভূতলে উহাদের প্রসার জানিতে পারিলে খনিজপদার্থের অনুসন্ধানে অনুকূল তথ্য সংগ্রহ করা যায়। বৃহত্তর ক্ষেত্রে পর্বতশ্রেণীর গঠনপ্রণালী, মহাদেশ ও মহাসাগরের উৎপত্তির কারণ ইত্যাদিও আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়। এই সমস্ত তথ্যানুসন্ধানের সাহায্যে পৃথিবীপৃষ্ঠের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের সম্যক ধারণা করা সম্ভব হইয়াছে। ভূগঠনতত্ত্বভিত্তিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে কিরূপে হিমালয় ও আল্‌পসের মত পর্বতশ্রেণী ভূনিম্নভঙ্গে (জিওসিন্‌ক্লাইন, Geosyncline, অর্থাৎ দুই মহাদেশের মধ্যবর্তী অথবা একই মহাদেশের পার্শ্ববর্তী বা অন্তর্বর্তী কোনও গভীর সামুদ্রিক অঞ্চল) হইতে ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়াছে এবং এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে কিরূপে শিলার স্তর আলোড়িত হইয়াছে এবং একস্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ইহাও জানা সম্ভব হইয়াছে যে মহাদেশগুলি অতীতের ক্ষুদ্রায়তন হইতে কিরূপে ক্রমশঃ ভূমিসংযোজনের দ্বারা বর্তমানের আয়তন লাভ করিয়াছে। 'সঞ্চরমাণ মহাদেশ' (Continental drift) মতবাদ অনুযায়ী ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আন্টার্কটিকা প্রভৃতি দেশগুলি একটি অতিকায় স্থলভূমির (গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড—Gondwana Land) অংশ ছিল এবং উহারা অতীতের কোনও এক সময় দক্ষিণমেরু অঞ্চল হইতে ভাসিয়া বর্তমান স্থানে আসিয়াছে। অবশ্য এইসব মতবাদ সম্পর্কে দ্বিমত যে নাই তাহা বলা যায় না।

প্রত্নজীবতত্ত্ব (Palaeontology) ঃ পাললিক শিলার স্তরে স্তরে অতীতের বহু জীব এবং উদ্ভিদ জীবাশ্মের আকারে রক্ষিত আছে। এইসব জীবাশ্ম পরীক্ষার দ্বারা শিলার বয়স নির্ণয় এবং পাললিক শিলার উৎপত্তির পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে পৃথিবীর ভূ-ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা, আরকিয়ান (অর্থাৎ আদিম), পেলিওজোইক (অর্থাৎ পুরাজীবীয়), মেসোজোইক (অর্থাৎ মধ্যজীবীয়) এবং কেনোজোইক (অর্থাৎ নবজীবীয়) ইত্যাদি। এই সমস্ত বিভিন্ন যুগে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের উদ্ভব হইয়াছিল এবং যুগের শেষে যুগনির্দেশক প্রাণীদের বিলুপ্তি ঘটে তবে উহাদের দেহের অংশ ও বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দেহটি শিলায় রক্ষিত হইয়া আছে। জীবাশ্মের অনুশীলন হইতে অতি পুরাতন সব প্রাণী ও উদ্ভিদের বিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়। এমন কি মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসও শিলায় নিহিত আছে।

ভূতত্ত্বের উপরিউক্ত নিজস্ব বিভাগগুলি ছাড়াও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ভূতত্ত্বও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সহিত যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং আরও কয়েকটি বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভূরসায়নবিদ্যা (Geochemistry), ভূপদার্থবিদ্যা (Geophysics) উল্লেখযোগ্য। ভূরসায়নবিদ্যার সাহায্যে শিলাসমূহের এবং বিভিন্ন খনিজপদার্থের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি ও বিবর্তনের রহস্য সহজেই উদ্ঘাটন করা সম্ভব হইয়াছে। অধিকন্তু ইহার দ্বারা গুপ্ত খনিজের সন্ধান করাও সম্ভব হয়। অবশ্য এই ধরনের অনুসন্ধানের কাজে ভূপদার্থবিদ্যার অবদানই সর্বাধিক। প্রাকৃতিক তৈল এবং বিবিধ খনিজপদার্থের জন্য সমীক্ষার অঙ্গরূপে বিভিন্ন ভূপদার্থবিদ্যাভিত্তিক পদ্ধতি অনুসৃত হয়। ইহা ছাড়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের রহস্য উদ্ঘাটনে, ভূচৌম্বকত্ব বিষয়ক গবেষণায় এবং শিলার বয়স নির্ণয়ে পদার্থবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট হইতেছে যে ভূতত্ত্ব যদিও শুরু হইয়াছিল একটি প্রকৃতিবিজ্ঞান হিসাবে কিন্তু ইহা ক্রমশঃই সংকীর্ণ গণ্ডির বাহিরে আসিয়া অন্যান্য মৌলিক বিজ্ঞান-বিষয়ক তত্ত্বে পুষ্ট হইয়া অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে আরও

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

কয়েকটি বিজ্ঞানের শাখার মত ভূতত্ত্বেরও একটি ফলিত অংশের উদ্ভব হইয়াছে। সাধারণভাবে খনিবিদ্যায় এবং কারিগরিবিদ্যায় (যথা নদীর বাঁধ ও সড়ক নির্মাণ, বন্যা ও ধস নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি) ভূতত্ত্ববিষয়ক সমীক্ষা প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে। এমনকি এই সমীক্ষার দ্বারা ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ ও প্রকৃতি নিরূপণ করাও সম্ভব হইতেছে। নগর পরিকল্পনায়, শিল্পাঞ্চল গঠনে ও কৃষি উন্নয়নে ভূজলের (Groundwater) ভূমিকা অনস্বীকার্য।

ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অনুশীলন যে শুধুমাত্র পৃথিবীর প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনেই সহায়ক হয় তাহা নহে, ইহার যে একটি অর্থকরী দিকও আছে তাহা আগেই বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভূবিদ্‌গণ ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া দেশের ভূমানচিত্র (Geological Map) প্রস্তুত ও বহুবিধ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এইসব সমীক্ষার সাহায্যে তাঁহারা খনিজের সন্ধানে লিপ্ত আছেন এবং ইতিমধ্যে বহু আকরিক খনিজ আবিষ্কার করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছেন। তবে ইহা বলা বাহুল্য যে শুধুমাত্র কোনও একটি বিশেষ দেশের ক্ষেত্রেই খনিজের গুরুত্ব সীমাবদ্ধ নহে, মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে খনিজসম্পদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আধিপত্যের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতেছে। অপরপক্ষে ভূতত্ত্ব যদিও পৃথিবীর অভ্যন্তরের ও উপরিভাগের বহুবিধ প্রাকৃতিক সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত আছে, আধুনিককালে চন্দ্রাভিযানের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য, যথা চন্দ্রের গঠনতত্ত্ব ও উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানের কাজেও ভূতত্ত্বের মূল্যবান অবদান আছে। বিভিন্ন নভশ্চর চন্দ্রপৃষ্ঠে যে প্রাথমিক সমীক্ষা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর অনেক গবেষণাগারে চন্দ্রশিলার যে অনুশীলন হইতেছে তাহার ভিত্তিতে বিজ্ঞানিগণ চন্দ্রের জন্মসংক্রান্ত বহুবিতর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আশা করা যায় যে এইসব সমীক্ষা ও গবেষণার ফলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী ও চন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত আরও স্পষ্টরূপে জানা সম্ভব হইবে।

সুবিমল সিংহরায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭—৯৪ খ্রী) শিক্ষাবিদ্‌, চিন্তানায়ক ও সাহিত্যিক। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় তাঁহার জন্ম হয়। পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শ্রেণী পর্যন্ত পড়িবার পরে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন (১৮৩৯ খ্রী)। মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি বহুবার বৃত্তি পান। হিন্দু কলেজে পাঠ শেষ করিয়া (১৮৪৫ খ্রী) হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে (১৮৪৬ খ্রী) এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত চন্দননগর সেমিনারীতে (১৮৪৭ খ্রী) তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকরূপে সরকারি শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন, তাহার পরে হাওড়া ও হুগলীর বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতা করেন (১৮৪৯—৫৬ খ্রী) ও বাংলা বিহার ও ওড়িশার নানা অঞ্চলের বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেন (১৮৬২—৮৩ খ্রী)। ভারত সরকার কর্তৃক উইলিয়ম হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের সভ্যরূপে তিনি মনোনীত হন। বাংলাদেশ সম্পর্কিত রিপোর্টের তিনিই ছিলেন রচয়িতা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

ভূদেব পাঁচ বৎসর ‘শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার’ নামক মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। পত্রিকাটি ছিল মূলতঃ শিক্ষাবিষয়ক—“শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদপ্রদায়ক”। সরকারি পত্রিকা ‘এডুকেশন গেজেট’ তাঁহার সম্পাদনায় (১৮৬৮ খ্রী হইতে) একটি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্রে পরিণত হয়।

বাংলা গদ্যসাহিত্য তাঁহার দানে সমৃদ্ধ। শিক্ষাবিদ্‌ ভূদেব ছাত্রদের উপযোগী বিবিধ পুস্তক রচনা করেন—‘প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান’ (১ম ভাগ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২য় ভাগ ১৮৫৯ খ্রী), ‘পুরাবৃত্তসার’ (১৮৫৮ খ্রী), ‘ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস’ (১৮৬২ খ্রী), ‘ক্ষেত্রতত্ত্ব’ (১৮৬২ খ্রী), ‘বাংলার ইতিহাস’ (৩য় ভাগ ১৯০৪ খ্রী)। শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আলোচনা পাই তাঁহার ‘শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব’-এ (১৮৫৬ খ্রী)। তাঁহার ‘ঐতিহাসিক উপন্যাসে’ দুইটি আখ্যান আছে। দ্বিতীয়টিতে ‘অঙ্গুরীয় বিনিময়’-এর ভিত্তিতে ইংরেজি কাহিনী থাকিলেও শেষ পর্যন্ত উহা মৌলিক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে বাংলা ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ‘পুষ্পাঞ্জলি’ (১৮৭৬ খ্রী) “কতিপয় তীর্থদর্শন উপলক্ষে ব্যাস-মার্কণ্ডেয়র সংবাদচ্ছলে হিন্দুধর্মের যৎকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন”। ‘স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস’ (১৮৯৫ খ্রী) লেখকের ইতিহাসবোধ, স্বদেশপ্রেম এবং কল্পনাবিলাসিতার সমন্বয়ে সৃষ্ট। ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ ১ম ভাগে (১৮৯৫ খ্রী) কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা স্থান পাইয়াছে; ২য় ভাগে (১৯০৫ খ্রী) সমাজ ও তন্ত্রবিষয়ক প্রবন্ধ আছে। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুস্তকাবলী ‘পারিবারিক প্রবন্ধ’ (১৮৮২ খ্রী), ‘সামাজিক প্রবন্ধ’ (১৮৯২ খ্রী), ‘আচার প্রবন্ধ’ (১৮৯৫ খ্রী)। এই তিনটি গ্রন্থে তিনি হিন্দুর আচার-আচরণ, ধর্মনীতি, পারিবারিক বিধি-বিধানকে আধুনিক যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। ইংরেজ আগমনের ফলে সামাজিক জীবনের বিচিত্র পরিবর্তন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করিয়া তিনি জাতীয় রীতিনীতির অনুগামী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

হিন্দী ভাষার উন্নতিতেও ভূদেবের ভূমিকা ছিল। স্কুল

পরিদর্শকরূপে বিহারে বাসকালে তাঁহার চেষ্টায় বহু হিন্দী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলা বইয়ের হিন্দী অনুবাদে এবং মূলে হিন্দী বই রচনায়ও তিনি উৎসাহ দেন। তাঁহার প্রস্তাবে বিহারের আদালতে ফারসীর বদলে হিন্দী প্রবর্তিত হয়। সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষারূপে হিন্দী গৃহীত হওয়া উচিত বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

সংস্কৃত বিদ্যার প্রসারেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় সচেষ্ট হন। সরকারি কাজ হইতে অবসরগ্রহণের পর কিছুকাল তিনি কাশীতে বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় বেদান্ত চর্চার জন্য তিনি বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতির জন্য তিনি বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করিয়াছিলেন (১৮৯৪ খ্রী)। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ মে কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৪৩, ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

ক্ষেত্র গুপ্ত

ভূপাল মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী (২৩°১৬′ উত্তর, ৭৭°২৫′ পূর্ব)। ইহা সেহোর জেলায় ৫০৩ মিটার উচ্চ বেলেপাহাড়ের উপরে অবস্থিত। ভূপাল শহরের নিকট দিয়া প্রবহমাণা নদীগুলির মধ্যে নর্মদাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। নদীটি নৌ-বাহনযোগ্য নহে।

জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ৪০·৭° সেণ্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ১৬·৬° সেণ্টি-গ্রেড। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০৫০ মিলিমিটার।

ভূপাল পূর্বে প্রাক্তন ভূপাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই রাজ্যটি দোস্ত মহম্মদ নামক এক আফগান দ্বারা খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণের সহিত তৎকালীন নবাব সন্ধি করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই করদ রাজ্য ভারতভুক্ত হয় ও নবাবের রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল নবগঠিত মধ্য-প্রদেশ রাজ্যের রাজধানী হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল পৌরশাসনের অধীনে আসে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই পৌরসংস্থা, গোবিন্দপুরা ইন্-ডাস্ট্রিয়াল টাউনসিপ ও বৈরাগড়, টি. এ. লইয়া ভূপাল টাউনগ্রুপ গঠিত হয়। তখন ইহার জনসংখ্যা ছিল ২২২৯৪৮। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৮০৭। জনগণের অধিকাংশই হিন্দুধর্মাবলম্বী; অন্যান্য ধর্মা-বলম্বীদের মধ্যে মুসলমান, শিখ, জৈন, খ্রীষ্টান ইত্যাদিও আছেন। শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৩·৫%। হিন্দী জনগণের প্রধান কথ্যভাষা। অন্য ভাষার মধ্যে উর্দু উল্লেখ-যোগ্য। শহরে অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শহরগ্রুপের আয়তন ছিল ৯৪·৭২ বর্গ কিলোমিটার।

ভূপালে সরকারি উদ্যোগে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জরির কাজ ও বিড়ি প্রস্তুত অন্যতম প্রধান শিল্পোদ্যোগ। শহরে বস্ত্রবয়ন, কাগজবোর্ড, চিনি, ময়দা তৈয়ারির কারখানা আছে।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূপাল শহরটি রেলপথে অন্য অংশের সহিত যুক্ত হয়। সড়ক ও বিমানপথেও ইহা অন্য শহরের সহিত যুক্ত।

শহরের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আফগান দোস্ত মহম্মদ কর্তৃক নির্মিত ফতেগড় দুর্গ উল্লেখযোগ্য। 'পুক্তাপুল তলাও' ও 'বড় তলাও' নামে দুইটি হ্রদ শহরপ্রান্তে অবস্থিত। বড়তলাওটি একাদশ শতকে ধারা নগরের রাজা ভোজের নির্মিত বলা হয়। শহরের কয়েকটি প্রখ্যাত অট্টালিকার মধ্যে তাজমহল, মোতি মসজিদ ও জামা মসজিদের নাম করা হয়।

দ্র G. Jagathpathi, *Census of India*, 1961; *Madhya Pradesh, District Census Handbook, Sehore District, Sehore* (Bhopal), 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১ খ্রী) জন্ম ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০, মৃত্যু ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬১। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত উদার মতাবলম্বী অ্যাটর্নী ছিলেন। আড়াই বৎসর বয়সকালে ভূপেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং সংসারে অসচ্ছলতা দেখা দেয়।

বাল্যে তাঁহার লেখাপড়া শুরু হয় গৃহশিক্ষকের কাছে, এবং পরে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে পড়িয়া এন্ট্রান্স পাশ করেন। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির উপর স্বাভাবিক বিরাগ বশতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং সমাজ সেবার কাজে লিপ্ত হন।

১৯০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে পি. মিত্র, অরবিন্দ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দেন, এবং যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) পরিচালিত সার্কুলার রোডের আখড়ায় যোগ দিয়া অশ্বা-রোহণ, অস্ত্রচালনা শিক্ষা করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে স্বদেশী আন্দো-লনে যোগ দিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া স্বদেশী প্রচার করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিখ্যাত বিপ্লবপন্থী পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। এই সময় রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে তিনি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অসম্মত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, দেশের প্রতি কর্তব্যবোধে যাহা করিয়াছি তাহার জন্য বিদেশীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি প্রস্তুত নই। এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে দেশে এক নূতন উৎসাহ উত্তেজনার বান ডাকিয়াছিল।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেল হইতে মুক্তির পর তিনি আত্ম-

গোপন করেন এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে গোপনে আমেরিকায় চলিয়া যান। সেখানে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির স্নাতক হন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে মহাযুদ্ধ বাধিলে ইওরোপস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর সাহায্য লইয়া ভারতে বিপ্লব সংগঠনের চেষ্টা করে। আমেরিকাস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া বার্লিনে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূপেন্দ্রনাথ শেষ দুই বৎসর এই কমিটির সম্পাদক ছিলেন ("বিপ্লব আন্দোলন" দ্র)।

ভারতে কমিউনিজম প্রচারের উদ্দেশ্যে লেনিন বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীদের মস্কোয় আমন্ত্রণ করিলে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ মস্কো যান। লেনিনের সাহায্যে ভারতের বিপ্লব আন্দোলন পুনর্গঠিত করাই ছিল ভূপেন্দ্রনাথের আশা।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ম্যাকডোনাল্ড সরকার তাঁহাকে দেশে ফিরিবার অনুমতি দেয়। ইতিমধ্যে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন জাতিতত্ত্ব সোসাইটির সভ্য হন। তাহার পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বার্লিন ইউনিভারসিটিতে নৃতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ডক্‌টরেট লাভ করেন। তাহার পর তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময়ে নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের ব্যবস্থা হইতেছিল,—ভূপেন্দ্রনাথ উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। তাহার পর তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন, এবং শ্রমিক, কৃষক, যুব ও ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব করিতে থাকেন।

তিনি অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এবং অল ইণ্ডিয়া কিষাণ সভার সভাপতি-মণ্ডলীর সদস্যরূপে কয়েক বছর কাজ করেন। অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে আইন অমান্য করিয়া তিনি দুইবার কারাবরণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন বিপ্লবী সম্মেলনেও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক তত্ত্বাদর্শ হিসাবে তিনি মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মার্কসবাদী দ্বন্দ্বমূলক বিচার পদ্ধতিতে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় সমাজপদ্ধতি ও ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করিয়া পুস্তক লেখেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ ও বহুমুখী।

বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ সমন্বিত কয়েকখানি পুস্তক ছাড়াও নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি, মার্কসীয় দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার রচিত পুস্তক ভারতীয় বিদ্বৎসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাইয়াছে। তিনি চিরকুমার ছিলেন।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৯—১৯২৪ খ্রী) ভারতীয় নরমপন্থী (মডারেট) রাজনৈতিক ভাবধারার অন্যতম কর্ণধার। খানাকুল কৃষ্ণনগরে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. (১৮৮১ খ্রী)। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনজীবিরূপে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রবেশ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার থাকার সময়ে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৬ খ্রী) বঙ্গভঙ্গ নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে তিনি সরকার কর্তৃক ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় বেঙ্গল রেগুলেশনের প্রয়োগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলনের ৪র্থ বার্ষিক সভার সভাপতি (১৯০৯ খ্রী) হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। তিনি কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান (১৯১১ খ্রী) এবং কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি (১৯১৪ খ্রী) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত সচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য মনোনীত হন। তিনি জেনিভায় জাতিপুঞ্জের অধিবেশনে (১৯২২ খ্রী) ভারতের প্রতিনিধিরূপে এ দেশের শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় যোগ দেন। রয়্যাল কমিশনের সদস্য (১৯২৩ খ্রী) মনোনীত হইয়া তিনি সরকারি কার্যে অধিক সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগের পরামর্শ দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে 'নাইট' খেতাব দেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র B. Majumdar and B. P. Majumdar, *Congress and Congressmen in Pre-Gandhian era, 1885-1917*, Calcutta, 1967.

গীতা মিত্র

ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক ও কমবেশি স্বল্পস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। এক হিসাবে জানা যায়, গত চার হাজার বছরে পৃথিবীতে প্রায় ১৩০ কোটি লোক ভূমিকম্পে প্রাণ হারাইয়াছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থানের নিকটেই ভূমির আলোড়ন অত্যন্ত প্রবল ও মারাত্মক হয়; তথা হইতে দূরে উহার প্রাবল্য ও নাশকতাশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসে। কোনও কোনও ভূমিকম্প এত দুর্বল হয় যে তাহা শুধু যন্ত্রেই ধরা পড়ে।

পৃথিবীপৃষ্ঠে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলি দুইটি নির্দিষ্ট বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। একটি বলয় হইল প্রশান্ত

মহাসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগ; এই অঞ্চলে সাধারণভাবে ৬৮ শতাংশ ভূমিকম্প ঘটে। অপরটি ভূমধ্যসাগরীয় বলয়—ইহা দক্ষিণ ইওরোপ হইতে ভারতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত; এই বলয়ে ২১ শতাংশ ভূমিকম্প ঘটে। অবশিষ্ট ১১ শতাংশের জন্য কোনও বিশেষ বলয় নির্ধারিত নাই।

ভূমিকম্প নানা কারণে ঘটিতে পারে। প্রধান কারণ হইল টেক্টনিক (tectonic) অর্থাৎ শিলার উপর চাপ ও টানের ফলে সৃষ্ট আলোড়ন। একটি শিলাস্তরে প্রচণ্ড চাপ পড়িলে উহার অংশবিশেষে ফাটল দেখা দেয় এবং ঐ ফাটল বরাবর বড় ধরনের চ্যুতি ঘটে—শিলাস্তর এক স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে তৎসংলগ্ন ভূপৃষ্ঠে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয়। চাপ-এর ফলে চ্যুতির আগে শিলার মধ্যে অত্যধিক শক্তি সঞ্চিত হয়; ভূমিকম্পের মাধ্যমে ঐ শক্তির কিছু পরিমাণ মুক্ত হইয়া পার্শ্ববর্তী শিলায় ও ভূস্তরে সঞ্চারিত হয়। এই ধরনের ভূমিকম্প সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হয় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। হিমালয় ও আল্‌প্‌স্‌-জাতীয় ভঙ্গিল পর্বতমালায় এই ধরনের ভূমিকম্প খুবই স্বাভাবিক ঘটনা।

ভূপৃষ্ঠে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির বলয়দ্বয়ের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জন্য ('আগ্নেয়গিরি' দ্র) সময়ে সময়ে ভূমিকম্প ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, অগ্ন্যুৎপাতের পিছনে যে শক্তি কাজ করে তাহার প্রভাবেই ভূমিকম্প হয়। এই ধরনের ভূমিকম্প জাপানে প্রায়শঃই ঘটে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিহিত উল্লিখিত কারণগুলি ছাড়াও অন্যান্য কারণে ছোটখাটো ভূমিকম্প ঘটিতে পারে। তাহাদের একটি হইল পাহাড়ী অঞ্চলে বড় রকমের ধস।

টেক্টনিক ভূমিকম্প পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বিশেষ স্থান হইতে উদ্ভূত হয় তাহাকে কেন্দ্র (focus) বলা হয়; ঐ কেন্দ্রের ঠিক খাড়া উপরে পৃথিবীপৃষ্ঠের স্থানকে উপকেন্দ্র (epicentre) বলে। উপকেন্দ্রের স্থানসমূহেই ভূমিকম্প তীব্রতম। ভূমিকম্পের সময়ে শিলায় যে শক্তি মুক্ত হয় তাহা তরঙ্গের আকারে কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকে সঞ্চারিত হয়। এই তরঙ্গগুলি কোনও বিশেষ স্থানে পর পর অনেকগুলি কম্পন সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের সহিত জড়িত তিন ধরনের তরঙ্গ দেখা যায়। ক. প্রাথমিক তরঙ্গ (T-Wave); ইহা সর্বাপেক্ষা দ্রুত বলিয়া সর্বপ্রথম পৌঁছায়, এই তরঙ্গ অনেকটা শব্দ-তরঙ্গের অনুরূপ; এই তরঙ্গের জন্য ভূমির সমান্তরাল কম্পন সৃষ্টি হয়। খ. মাধ্যমিক তরঙ্গ (S-Wave): ইহা প্রাথমিক তরঙ্গের পরে পৌঁছায়; ইহা আলোক-তরঙ্গের গতিরেখার উপরে লম্বভাবে উঠা-নামা করে; ফলে মাটিতে গর্ত তৈরি হয় এবং ঘরবাড়ি মাটির নীচে বসিয়া যায়। গ. দীর্ঘ বা মুখ্য তরঙ্গ (L-Wave): ভূমি বরাবর এক স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চারিত হয় বলিয়া ইহার গতি অন্য তরঙ্গের তুলনায় কম; ইহা সর্বশেষে আসে এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক; উপকেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানেই এই তরঙ্গ আবদ্ধ থাকে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে এই সমস্ত তরঙ্গ তালিকাবদ্ধ করা হয় তাহার নাম সিস্মোগ্রাফ (Seismograph) এবং এই তালিকার নাম সিস্মোগ্রাম (Seismogram)। প্রবল ভূমিকম্পের তরঙ্গ-তালিকা হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা সম্ভব হইয়াছে।

সুবিমল সিংহরায়

ভূমিজ প্রাক্‌-আর্য আদিম উপজাতি। আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের ভাষা এমনকি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যও হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহারা স্বীয় মাতৃভাষা ভুলিয়া বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছে। অনেকের মতে তাহারা মুণ্ডাদের এক গোষ্ঠী—হিন্দু প্রভাবান্বিত মুণ্ডা শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমবাংলায় ইহাদের সংখ্যা ৯১২৮৯ (১৯৬১ খ্রী)। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও পুরুলিয়া জেলায় ইহাদের বসবাস বেশি।

যদিও ইহারা মূলতঃ কৃষিজীবী তবুও ইহাদের অনেকে নানা উপজীবিকায় ব্যাপৃত থাকে। জঙ্গল-সান্নিধ্যে বসবাসকারী ভূমিজরা শিকার ভালবাসে এবং শিকারের নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি রাখে। ইহাদের অনেক গোত্র আছে। গোত্রদেবতা বা টোটেমের কল্পনা ইহাদের মধ্যে দেখা যায়। সগোত্রে বিবাহ সমাজবিরুদ্ধ। গ্রামে মোড়ল আছে। গ্রাম্য সমস্যার সমাধানে মোড়লের নেতৃত্ব গ্রামবাসী স্বীকার করিয়া লয়।

বেশির ভাগ ভূমিজ হিন্দুদের দেখাদেখি ঠাকুরদেবতার পূজা করিতেছে। তবে অনেকে এখনও দিং বোঙ্গা, ধরম, অথবা 'জাহির বুরু' বা ছোটখাটো ভূতপ্রেতকে ভয় পায়। সেজন্য তাহারা নানারকম তুকতাক করে। মানভূমের ভূমিজদের মধ্যে 'ছো' বা 'মুখোস নৃত্য' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামায়ণ বা মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এই মুখোস নৃত্য হয়। ইহা ছাড়া টুসু, বান্দনা, করম প্রভৃতি লোক উৎসব ইহাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রবোধকুমার ভৌমিক

ভূর্জপত্র গোষ্ঠীগত বৈজ্ঞানিক নাম Betula utilis অথবা Betula Bhojpathrawall, পরিবার Betulaceae। এই গাছটি ছড়াইয়া আছে ভারতবর্ষের সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে ও কাশ্মীরে, প্রায় ২১২১ মিটার হইতে ৩৬৩৬ মিটার উচ্চতায়; সিকিমে প্রায় ৩০০০ মিটার হইতে ৪২৪২ মিটার উচ্চতায়; এবং ভুটান, জাপান এবং আফগানিস্থানে।

যখন কাগজ আবিষ্কৃত হয় নাই তখন ইহাতে লেখা চলিত। এই গাছের ছালও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কুষ্ঠব্যাধি, কর্ণরোগ, রক্তের নানাপ্রকার ব্যাধি, বায়ুরোগ এবং বিষাক্ত

ক্ষতে ইহার রসের ব্যবহার আছে। আয়ুর্বেদে 'ত্রিদোষে'ও এই রসের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ রহিয়াছে।

সুশ্বেতা বিশ্বাস

ভৃগু ধনুর্বেদবিদ্যার প্রবর্তক অশেষ তেজোমণ্ডিত মহর্ষি। ইনি ভৃগুবংশের মূলপুরুষ। বিষ্ণুপুরাণে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও অন্যতম প্রজাপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দক্ষকন্যা খ্যাতি ইঁহার পত্নী; ধাতা, বিধাতা দুই পুত্র ও নারায়ণপত্নী লক্ষ্মী কন্যা (বিষ্ণুপুরাণ, ১।১০।২)। মনুসংহিতায় (১।৩৫) ইনি দশ প্রজাপতির মধ্যে একজন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু একজন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০।২৫) শ্রীকৃষ্ণ মহর্ষিগণের মধ্যে নিজেকে ভৃগু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জমদগ্নি ও পরশুরাম ভৃগুর প্রখ্যাত বংশধর। বিষ্ণুবক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীবৎসচিহ্ন নামে বিদিত। মহাভারতে (৩।৫-৬) যজ্ঞাগ্নিশিখা হইতে ইঁহার জন্ম এবং ভার্যার নাম পুলোমা ও পুত্রের নাম চ্যবন বলা হইয়াছে। ভৃগুপত্নী পুলোমাকে অপহরণে উদ্যত রাক্ষসকে অগ্নি পুলোমার পূর্ণ পরিচয় জ্ঞাপন করেন। সেজন্য ক্রুদ্ধ মহর্ষি অগ্নিকে 'সর্বভুক্' হওয়ার অভিশাপ দেন। ভৃগুপত্নীর শরণাগত অসুরগণের বধের জন্য বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র নিক্ষিপ্ত হইলে ভৃগুপত্নী মস্তকে আহত হন, ফলে অভিশপ্ত বিষ্ণু রামাবতারে সীতা-বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করেন। স্বীয় আশ্রম ক্ষত্রিয়বিহীন হওয়ায় শত্রুকবল হইতে রক্ষা করার জন্য ভৃগু শরণাগত রাজা বীতহব্যকে ব্রাহ্মণত্বে দীক্ষিত করেন। সগর রাজার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ভৃগু তাঁহাকে পুত্রলাভের বর দান করেন (রামায়ণ ১।৩৮)।

যূথিকা ঘোষ

ভেক্টর (বাহিত রাশি) কতকগুলি রাশি তাহাদের মান এবং মানের একক দ্বারা বর্ণনা করা যায়, যথা ভর, ঘনমান, সময়, তাপমাত্রা, কার্য ইত্যাদি। ইহাদিগকে অবাহিত রাশি বা স্কেলার বলা হয়। অপর কতকগুলি রাশি যেমন, বেগ, ত্বরণ, বল ইত্যাদিকে বর্ণনা করিতে হইলে তাহাদের মান ব্যতীত দিকেরও নির্দেশ করা প্রয়োজন। ইহাদিগকে বাহিত রাশি বা ভেক্টর বলা হয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গাণিতিক হ্যামিলটনের উদ্ভাবিত কোয়াটারনিয়ন (Quaternion)-শাস্ত্রে ভেক্টরের প্রয়োগ আছে। পরে দুইজন প্রসিদ্ধ গাণিতিক গিব্‌স (Josia Willard Gibbs, ১৮৮১-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) এবং অলিভার হিভিসাইড (Oliver Heaviside, ১৮৯১ খ্রী) অধুনা প্রচলিত ভেক্টরবিদ্যার রূপ দিয়াছেন।

অবাহিত রাশিতে প্রযোজ্য বীজগণিতের নিয়মাবলী যথাসম্ভব প্রয়োগ করিয়া ভেক্টর বীজগণিত পদার্থ-বিজ্ঞানীদের গাণিতিক প্রয়োজন মিটাইবার কাজে লাগানো হয়।

ভেক্টর সাধারণতঃ রোমান মোটা হরফে বা গ্রীক অক্ষরে লিখিত হয় এবং তাহার মান তদনুযায়ী রোমান ছোট হরফে লেখা হয়।

সরলতম ভেক্টর হইল নির্দিষ্ট দিক ও মানবিশিষ্ট সরলরেখা। ইহাকে লৈখিক চিত্রে একটি আদি বিন্দু A হইতে অন্তিম বিন্দু B পর্যন্ত অঙ্কিত তীর দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এইরূপ ভেক্টরকে রৈখিক ভেক্টর বলা হয় এবং ইহা $\overrightarrow{AB}$ রূপে নির্দেশ করা হয়। এক জাতীয় দুইটি ভেক্টরের যখন সমান মান এবং একই দিক থাকে তখন ভেক্টর দুইটি সমান। যে কোনও ভেক্টরকে উহার দিক এবং মান নির্দেশক একটি রেখার দ্বারা প্রদর্শন করা যায়।

ভেক্টর রাশির যোগ : দুইটি রৈখিক ভেক্টর সামান্তরিক সূত্র অনুসারে কিংবা ত্রিভুজ সূত্র অনুসারে যোগ করা হয়।

ধরা যাক, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ একই আদি বিন্দু (O) হইতে অঙ্কিত দুইটি রৈখিক ভেক্টর। ইহাদিগকে দুইটি বাহু লইয়া একটি সামান্তরিক অঙ্কিত করা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে, সাধারণ আদি বিন্দু O হইতে বিপরীত শীর্ষ-বিন্দু C পর্যন্ত অঙ্কিত রৈখিক ভেক্টর $\overrightarrow{OC}$ প্রদত্ত ভেক্টর দুইটির যোগফল। ইহাকে $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ অথবা $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}$ বলিয়া নির্দেশ করা হয়। অতএব

$$\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} \quad \text{অথবা} \quad \overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}$$

যদি রৈখিক ভেক্টর $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ দুইটি সমজাতীয় ভেক্টর α এবং β প্রদর্শন করে, সংজ্ঞা অনুসারে তাহাদের যোগফল বা লব্ধির সাংখ্যমান $\overrightarrow{OC}$ ভেক্টরের দৈর্ঘ্যের সমান এবং দিক $\overrightarrow{OC}$ ভেক্টরের দিক। অতএব এই দুই ভেক্টরের যোগফল যদি γ হয়, তাহা হইলে

$$\gamma = a + \beta = \beta + \alpha.$$

এখানে যোগের বিনিময়বিধি প্রযোজ্য।

দুইটি ভেক্টর α, β যদি $\overrightarrow{OA}$ এবং $\overrightarrow{AC}$ দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের যোগফল γ-কে নির্দেশ করা হয় $\overrightarrow{OC}$ দ্বারা। α ভেক্টরের অন্তিম বিন্দুকে β ভেক্টরের আদি বিন্দু লইলে, প্রথম ভেক্টরের আদিবিন্দু ও দ্বিতীয় ভেক্টরের অন্তিম বিন্দুর যোজক সরলরেখা লেখ-চিত্রে α এবং β ভেক্টরের যোগফল বা লব্ধি প্রদর্শন করে। ইহা যোগের ত্রিভুজ সূত্র।

এইরূপে তিন বা ততোধিক ভেক্টরের যোগফল নির্ণীত হইতে পারে।

দুইটি ভেক্টরের গুণফল ঃ ধরা যাক, α এবং β দুইটি ভেক্টর; ইহাদের মান a এবং b, অন্তর্বর্তী কোণ θ। α এবং β ভেক্টর দুইটির অবাহিত গুণফল

$$\alpha.\beta = ab \cos \theta = \beta.\alpha$$

ইহা একটি অবাহিত রাশি, গুণের বিনিময়বিধি প্রযোজ্য। বলের দ্বারা কৃতকার্য দুইটি ভেক্টরের অবাহিত গুণফলের একটি উদাহরণ।

α এবং β ভেক্টরের বাহিত গুণফল একটি বাহিত রাশি। ইহার মান ab sin θ, একটি স্ক্রুকে α হইতে β-র দিকে ঘুরাইলে উহা যেদিকে যাইবে তাহা ইহার দিক এবং ইহা ঐদিকে একক ভেক্টর $\acute{n}$-এর ab sin θ গুণ। এই বাহিত গুণফল।

$$\alpha \times \beta = ab \sin\theta \; \acute{n} \; :$$
$$\beta \times \alpha = -\alpha \times \beta.$$

গুণের বিনিময়বিধি প্রযোজ্য নহে।

কোনও বিন্দুর চারিদিকে একটি বলের ঘূর্ণফল, দুইটি ভেক্টরের বাহিত গুণফলের উদাহরণ।

তিন ভেক্টরের গুণফল ঃ $\beta \times \gamma$ একটি ভেক্টর, সুতরাং অপর একটি ভেক্টর α-এর সহিত ইহার অবাহিত এবং বাহিত গুণফল নির্ণীত হইতে পারে।

একক ভেক্টরের i, j, k শ্রেণী ঃ ধরা যাক, পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত ox, oy, oz অক্ষের ধনদিকে যথাক্রমে i, j, k তিনটি একক দৈর্ঘ্যের রৈখিক ভেক্টর। দুইটি ভেক্টর α এবং βকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়

$$\alpha = a_1 i + a_2 j + a_3 k,$$
$$\beta = b_1 i + b_2 j + b_3 k \quad .. \quad (1)$$

এখানে $a_1 i$, $a_2 j$, $a_3 k$ এবং $b_1 i$, $b_2 j$, $b_3 k$ ভেক্টর α এবং β-র বিশ্লেষিতাংশ;

a_1, a_2, a_3 এবং b_1, b_2, b_3 বিশ্লেষিতাংশ সমূহের মান। তাহা হইলে

$$\alpha + \beta = (a_1 + b_1)i + (a_2 + b_2)j + (a_3 + b_3)k$$

এবং সামান্যীকরণ করিলে

$$\Sigma\alpha = i\Sigma a_1 + j\,\Sigma a_2 + k\,\Sigma a_3$$

আবার, $i.i = j.j = k.k = 1;$

$$i.j = j.k = k.i = 0 \quad .. \quad I$$
$$i \times i = j \times j = k \times k = 0;$$
$$i \times j = k, \; j \times k = i, \; k \times i = j \quad .. \quad II$$

অতএব $\alpha.\beta = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \quad .. \quad (2)$

$$\alpha \times \beta = (a_2b_3 - a_3b_2)i + (a_3b_1 - a_1b_3)j + (a_1b_2 - a_2b_1)k \quad .. \quad (3)$$

কোনও দেশের অন্তর্গত অঞ্চলে (region of space) প্রত্যেক বিন্দুতে একটি ভেক্টর আরোপ করিতে পারা গেলে ঐ অঞ্চলকে ভেক্টর ক্ষেত্র বলা হয়। মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্র, তাড়িতক্ষেত্র, চৌম্বকক্ষেত্র প্রভৃতি এইরূপ ভেক্টর ক্ষেত্রের উদাহরণ। এই সকল ক্ষেত্রে ভেক্টরের প্রভাব আলোচনার জন্য অন্তরকলনের প্রয়োগ হয়।

দ্র J. G. Coffin, *Vector Analysis*, 1911; C. E. Weatherburn, *Elementary Vector Analysis with application to Geometry and Physics*, 1928.

কামিনীকুমার দে

ভেড়া মেষ দ্র।

ভেরী ইহা সুপ্রাচীন চর্মবাদ্যের অন্তর্গত এবং ঘোষণা, যুদ্ধ ও উৎসবাদিতে ব্যবহৃত হইত। আচার্য সায়ণ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের ভাষ্যে দুন্দুভি ও ভেরীকে সমপর্যায়ের বাদ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত সংগীত শাস্ত্রাদির বর্ণনা অনুসারে বাদ্যটি দৈর্ঘ্যে ছিল প্রায় দেড় হাত, আকার গোল এবং দুইটি মুখ চর্মাবৃত। ইহার খোল তাম্রনির্মিত, দুইটি মুখে দুইটি বলয় থাকিত এবং বলয়ের সংগে চর্মাবরণ সেলাই করিয়া দৃঢ়বদ্ধ করা হইত। বাদ্যের মধ্যদেশ সূত্রদ্বারা বেষ্টিত থাকিত। ইহার দক্ষিণমুখ দণ্ডদ্বারা এবং বামদিক হস্তপ্রহারে বাজানো হইত।

দ্র তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ষষ্ঠ অধ্যায়, পঞ্চম খণ্ড, সূত্র—১৩, সায়ণভাষ্য; সংগীতরত্নাকর, শার্ঙ্গদেব।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ভেল্লোর মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তর আর্কট জেলার উত্তর-পশ্চিমে পালার নদীর দক্ষিণে অবস্থিত একটি তালুক ও শহর। শহরটি (১২°৫৫′ উত্তর, ৭৯°৯′ পূর্ব) জেলা ও তালুকের সদর দপ্তর। মাদ্রাজ হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ১৩৯ কিলোমিটার। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভেল্লোর পৌরশাসনের অধীনে আসে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে এই শহরের চতুর্দিকের আরও কয়েকটি অঞ্চল লইয়া ভেল্লোর টাউন গ্রুপ গঠিত হইয়াছে, বর্তমানে (১৯৬১ খৃ) ইহার আয়তন ১৮·২৩ বর্গকিলোমিটার ও লোকসংখ্যা ১২২৭৬১।

ভেল্লোরের পশ্চিমদিক পর্বতময়। সমভূমির মৃত্তিকা উর্বর; পাহাড়ী অংশের অধিকাংশই নগ্ন, উদ্ভিদ্‌শূন্য। গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৪১·৯° সেণ্টিগ্রেড ও শীতকালীন গড় উত্তাপ ১৩·৬° সেণ্টিগ্রেড হইয়া থাকে। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১০৭৪ মিলিমিটার।

পালার নদীর তীরে অবস্থিত, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত ভেল্লোরের দুর্গটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ইহার নির্মাণকুশলতা বিজ্ঞানসম্মত। দুর্গটি একটি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ভেল্লোরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ভেল্লোরের কলেজ ও ক্রিশ্চিয়ান মিশন হাসপাতালের নাম আছে।

দ্র P. K. Nambiar, Census of India 1961, *Madras*, Part X-XI, District Census Handbook, *North Arcot*, Volume 1, Madras, 1966.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভেষজ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভেষজ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মাত্র একশত বৎসর হইল শুরু হইয়াছে। প্রাচীনকালে আবিষ্কৃত অনেক অমোঘ ঔষধ আজও ব্যবহার হইতেছে। মিশরীয়রা বোধকরি খৃষ্টপূর্বে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে আফিম ব্যবহার শুরু করিয়াছিল। আর মাত্র পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্যারাসেলসাস ইউরোপে ইহা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রায় একশত পঁচিশ বৎসর পরে সিডেনহ্যাম ইহার ব্যবহার উল্লেখ করেন। আফিমের অন্যতম উপাদান মরফিন আজও শ্রেষ্ঠ বেদনানাশক ঔষধ বলিয়া সুপরিচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে গেলে, এদেশের সর্পগন্ধা, মিশরের ডিজিটেলিস, চীনের এফিড্রা, দক্ষিণ আমেরিকার সিনকোনা আজও অপরিহার্য।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার উন্নতির সহিত ঔষধ আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও প্রয়োগের নবরূপ দেখা দিল। ১৮৩২ সালে ক্লোরোফর্ম সংশ্লেষিত হইল। ১৮৪৫ সালে ইহা রোগীর চেতনা হরণের জন্য প্রয়োগ করা হইল। ১৮৫০ সালের পর হইতে পাথুরে কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের ফলে অনেক রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইল যাহাদের সাহায্যে বিবিধ ভেষজ প্রস্তুত করা গেল। ১৮৫৩ সালে গার্হারড্ট অ্যাস্পিরিন সংশ্লেষণ করিলেন। ১৮৯৯ সালে ড্রেসার ইহাকে মূল্যবান ভেষজ হিসাবে প্রয়োগ করিলেন।

পূর্বে রোগলক্ষণ দেখিয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে রোগের কারণ জানিয়া রোগ নিবারণের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা শুরু হইল। গাছের কোন অংশ, ত্বক, মূল বা পত্র বা গোটা গাছটি সিদ্ধ করিয়া আহৃত সত্ত্ব প্রাণীকে সেবন করাইয়া বা ইঞ্জেকশ্যন দিয়া গাছপালার ভেষজগুণ পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হইল। গাছপালা হইতে আহৃত বিশুদ্ধ যৌগিকেরও ভেষজগুণ পরীক্ষা করা গেল। যখন সংশ্লেষিত যৌগিক উৎপাদন করা গেল, তখন ঐ যৌগিকেরও উদ্ভিজ্জ পদার্থের মত ভেষজগুণ পরীক্ষা করা শুরু হইল। কেবল তাহাই নয়, পেশী, লিভার প্রভৃতি দেহতন্তু ও নার্ভতন্তুর উপর ভেষজের প্রভাব পরীক্ষার উদ্যোগ হইল। দেহের কোন্ তন্তুতে পদার্থটির প্রভাব বেশী জানা হইলে, সেই পদার্থটি কোন্ জাতীয় রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা অনুমান করা গেল। পরে প্রাণীদেহে সেইরূপ রোগে প্রয়োগ করা যায় কি না দেখা গেল। অবশেষে সেই পদার্থটির প্রয়োগ মাত্রা নির্ণয় করিয়া মানুষের রোগ সারাইবার জন্য ব্যবহার উপযোগী কি না পরীক্ষা করা গেল। এই ভাবে ধীরে ধীরে বহু নূতন ঔষধ ও তৎসহ ঔষধ উপযোগী পদার্থের পরীক্ষা বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিল। আর্গমেট্রিন নামক রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিজ্জ আর্গট হইতে সংগ্রহ করা গেল। পরীক্ষায় দেখা গেল ইহা ব্যবহার করিলে জরায়ুর পেশী সংকুচিত হয়। প্রসবকালীন জরায়ুর সংকোচন ক্রিয়ার সাহায্যের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইল। কুকুরের দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া ডিজিটেলিস প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল প্রথমে হৃদয়ের পেশীগুলি সংকুচিত হয়, তৎসহ হৃদ্স্পন্দনের ছন্দ ঠিক থাকে। কিছুক্ষণ পরে ঘন ঘন সংকোচন হইতে থাকে, স্পন্দন বেঠিক হইয়া পড়ে। হৃদয়ের কার্যের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর। বুঝা গেল, হৃদ্রোগে ডিজিটেলিস ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ দরকার।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্ত্যর অণুবীক্ষণ দিয়া এক প্রকার জীবাণু দেখেন। তিনি দেখান ঐ জীবাণুর জন্য অ্যানথ্রাক্স রোগ হয়। তিনি ঐ জীবাণু হইতে টিকা তৈয়ারি করিয়া দেখান যে টিকা দিয়া রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কোন রোগের টিকা হইল সেই রোগের মৃত বা মৃদু জীবাণু।

ডিপথেরিয়ার জীবাণু মারাত্মক বিষ প্রস্তুত করে। তাহাতে আক্রান্ত হইলে ডিপথেরিয়া রোগ হয়। ঘোড়ার দেহে সামান্য পরিমাণে ডিপথেরিয়ার বিষের ইঞ্জেকশ্যন দিলে ঘোড়ার রক্তে ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ঘোড়ার রক্ত হইতে ডিপথেরিয়ার বিষ প্রতিষেধক সিরাম প্রস্তুত করা হইল। এই সিরাম ইঞ্জেকশ্যন দিলে ডিপথেরিয়ার বিষের ক্রিয়া প্রতিহত হইল। ইহাই বলিতে গেলে কোন বিশেষ রোগের প্রথম অমোঘ ঔষধ।

রোগের অন্যতম কারণ জীবাণু জানা গেলে, বিবিধ রোগের ঔষধ উৎপাদন করা গেল। ১৯০৯ সালে জার্মান বিজ্ঞানী এর্‌লিশ সিফিলিস রোগের চিকিৎসার জন্য আর্সেনিক ঘটিত সংশ্লেষিত রাসায়নিক পদার্থ স্যালভারসন ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে ম্যালেরিয়ার ঔষধ অ্যাটাব্রিন উদ্ভাবিত হয়।

জীবাণুর দ্বারা রোগ জন্মায় বলিয়া ১৯৩০ সালে ডম্যাগ স্ট্রেপ্টোকক্কাই জীবাণু প্রত্যাঘাতী ঔষধ প্রন্টোসিল উদ্ভাবন করেন। পরে দেখা গেল প্রন্টোসিল সালফোন-এমাইড গোত্রীয় পদার্থ। পরবর্তীকালে এই সূত্র ধরিয়া বিবিধ সালফোন-এমাইড ভেষজ সংশ্লেষিত ও ব্যবহৃত হইতেছে। ডম্যাগের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা জীবাণু লইয়া বিবিধ পরীক্ষা করিতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহারা টেস্ট টিউবে বা প্লেটে জীবাণুর উপযোগী খাদ্য দিয়া, উষ্ণতার মাত্রা ঠিক রাখিয়া পরীক্ষার জন্য জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি করাইতেন। এইভাবে জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধিতে কোন পদার্থের ভেষজগুণ পরীক্ষা করা তেমন সুবিধা হইত না। ডম্যাগ জীবন্ত প্রাণীদেহে জীবাণুর আশ্রয় ও সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। এবং প্রাণীর কোন ক্ষতি না করিয়া কেবল জীবাণু ধ্বংসের ব্যবস্থার উদ্যোগ করেন।

পেনিসিলিন ফ্লেমিং আবিষ্কার করিলেন। ইহা জীবাণু সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিলেও সংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করে ও দুর্বল করে, তখন রক্তে থাকা শ্বেতকণিকা নিস্তেজ জীবাণুকে মারিয়া ফেলে। পেনিসিলিনের মত আরও অনেক জীবাণু-বিরোধক পদার্থ উত্তরকালে আবিষ্কৃত হইল। এই সকল

আবিষ্কারের মূলে সেই সত্য প্রদীপ্ত রহিল, দেহতন্তুর কোন ক্ষতি না করিয়াও মানবদেহের ভিতরে বাসা বাঁধা জীবাণু বধ করা সম্ভব, যাহা ডম্যাগের পরীক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ("অ্যালোপ্যাথি" দ্র)।

দেখা গেল, দৈনন্দিন খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ শর্করা, স্নেহ, প্রোটিন, জল ও অজৈব পদার্থ থাকিলেও অনেক সময় দেহের পুষ্টি হয় না। বুঝা যায়, খাদ্যে নিশ্চয়ই কোন কিছু উপাদানের অভাব রহিয়াছে। এইগুলিকে ভিটামিন বলা হইল। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ জন্মায়। সেই সব রোগ দূর করিতে ভিটামিন ঘটিত ঔষধ ব্যবহার শুরু হইল।

ঔষধবিজ্ঞানের বৃদ্ধি আর এক দিকে হইল। দেহের মধ্যে কতকগুলি নলহীন গ্রন্থি আছে। বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে বিচিত্র রস, হর্মোন ক্ষরণ হয়। বিবিধ হর্মোন দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কার্যে সমতা রক্ষা করিতে সাহায্য করে। থাইরয়েড হর্মোন ক্ষরণ হ্রাস পাইলে দেহ খর্ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন অদ্ভুত আকৃতির হয়। থাইরয়েড নির্যাস ব্যবহারে দেহের উচ্চতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি স্বাভাবিক হইল। ডায়াবিটিস রোগাক্রান্ত কুকুরের দেহে প্যানক্রিয়াসের নির্যাস ইঞ্জেকশ্যন দিলে তাহার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে। ইহা হইতে ডায়াবিটিস রোগের কারণ অনুমান করা গেল। প্যানক্রিয়াসের হর্মোন ইনস্যুলিনের অভাব ঘটিলে ঐ রোগ জন্মায়। দেহে ইনস্যুলিন ইঞ্জেকশ্যন দিয়া ডায়াবিটিস প্রতিহত করা গেল।

ক্রমে দেখা গেল, ঔষধ কেবল দেহতন্তুর উপর কাজ করে না, কেবল জীবাণু বধ করে না বা কফ মলমূত্র দূর করিয়া দেহে স্বাচ্ছন্দ্য আনে না, উপরন্তু মনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। প্রাণী উত্তেজিত হইলে, যেমন বিড়াল অকস্মাৎ কুকুরের সম্মুখীন হইলে উহার দেহস্থ অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি হইতে অ্যাড্রিন্যালিন হর্মোন ক্ষরিত হইয়া রক্তস্রোতে মিশে। অ্যাড্রিন্যালিন ভয় দূর করে। তখন বিড়াল প্রয়োজন হইলে কুকুরের সামনে রুখিয়া দাঁড়ায়।

বর্তমানে ভেষজবিদ্যার নানাদিকে দ্রুত উন্নতি দেখা যাইতেছে।

রামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

ভেষজবিদ্যা "তদেব যুক্তং ভেষজং যৎ আরোগ্যায় কল্পতে।" তাহাই প্রকৃত ভেষজ যাহাদ্বারা আরোগ্য লাভ হয়।

চরকের এই বিখ্যাত বাণী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে যাহা কিছু দ্বারা ব্যাধির তথা আধির নিরাময় সাধিত হয় তাহাই ভেষজ, সাধারণ ভাষায় ঔষধ।

অথর্ব বেদকেই ম্যাকডোনেল (Macdonnel)-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাচীনতম গ্রন্থের মর্যাদা দিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে ভেষজবিদ্যাকে একটি পৃথক এবং প্রধান বিদ্যারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কাহারও কাহারও মতে কিমিয়াশাস্ত্রের (Hindu Alchemy) আরম্ভও এইখানেই। ঋষিরা বনে, পর্বতে, কান্তারে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন লতাগুল্ম ফলাদি এবং জান্তব পদার্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐগুলির স্বাদ, গন্ধ এবং ক্রিয়া-কলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবহিত হইতেন। সেই সুদূর অতীতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐরকম আহৃত বনজ সম্পদ হইতেই তাঁহারা বিবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন ঔষধ এবং আসবাদি প্রস্তুত করিতেন, যাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ সোমরসের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কালক্রমে 'সুশ্রুতসংহিতা' এবং 'চরকসংহিতা'র মধ্যে ভারতীয় ভেষজবিদ্যা পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। এই দুই মহাগ্রন্থে শত শত উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদজাত ঔষধ বর্ণিত হইয়াছে (আয়ুর্বেদ দ্র)। এই দুই সংহিতাতেই ভেষজাবলী ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল। পরবর্তী কালে গৌড়াধিপতি নয়পালের সমকালীন চক্রপাণি দত্তের 'চক্রদত্তসংহিতা' নামক সর্বভারতে পরিচিত মহাসংগ্রহ গ্রন্থে সেগুলি একত্র সংগৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত তিনি দ্রব্যগুণ পরিচয়ের জন্য 'দ্রব্যগুণ সংগ্রহ' নামক পুস্তকও রচনা করেন। এই দুই পুস্তক আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মেটেরিয়া মেডিকার (Materia Medica) সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে। চক্রদত্তের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি হইল, আত্রেয় সম্প্রদায়ভুক্ত চিকিৎসকগণের বাধা দূর করিয়া স্বীয় সংগ্রহে 'রস চিকিৎসা'র কতকগুলি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, যথা—রসপর্পটিকা, তাম্রযোগ, অভ্রযোগ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট করেন। চক্রপাণির পূর্বেও ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে ভেষজবিজ্ঞান লইয়া প্রভূত গবেষণা হইয়াছে; এই গবেষকদের অন্যতম ছিলেন বৃন্দকুণ্ড। তিনি আয়ুর্বেদীয় ভেষজবিজ্ঞানে গবেষণা করিয়া নূতন নূতন ভেষজের সন্ধান দিয়াছেন তৎকৃত 'সিদ্ধযোগ' গ্রন্থে।

কায়চিকিৎসকগণের মধ্যে সকলেই কেবলমাত্র বনৌষধি প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন না; তাঁহারা রসৌষধি প্রয়োগেরও পক্ষপাতী ছিলেন এবং কালক্রমে রসবৈদ্যসম্প্রদায় বা সিদ্ধবৈদ্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধযুগেই রসচিকিৎসা প্রাধান্য লাভ করে। তৎকালে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ছিলেন নাগার্জুন। পারদের ব্যবহার রসচিকিৎসার এক প্রধান কীর্তি। নাগার্জুনই পারদের অষ্টাদশ সংস্কার এবং ধাতুবিদ্যার প্রবর্তন করেন। 'রুদ্রযামলতন্ত্র' রসশাস্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা ছাড়া এবিষয়ে আরও বহু গ্রন্থ বর্তমান কালেও পাওয়া যায়।

আধুনিক কালে দেখা যায়, আয়ুর্বেদীয় কায়চিকিৎসা ১৪টি বিশিষ্ট অঙ্গে পুনর্বিন্যস্ত হইয়াছে। বিশেষ লক্ষণীয় যে, এই ১৪টি অঙ্গের প্রথম দুইটির নাম হইতেছে— (ক) ভেষজবিজ্ঞান (Pharmacology) এবং (খ) দ্রব্যগুণ (Materia Medica)।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনা করিলেই ব্যাধির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের কাহিনী

পাওয়া যাইবে। বাইবেলের মধ্যেও এইরূপ বহু নিদর্শন রহিয়াছে। ইসায়া (Isaiah) কর্তৃক ডুমুরের পুলটিশের ব্যবহার, জেরিমিয়া অধ্যায়ে গাছপালার রোগোপশমকারী ক্ষমতার বর্ণনা ইত্যাদি প্রাচীন হিব্রুদের ভেষজতত্ত্ব জ্ঞানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন এসেরীয় (Assyria) লেখ-এ (inscription) এবং প্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাসে (papyrus)। প্রাচীন চীনের ভেষজবিদ্যার কথা বর্তমানে সকলেরই জানা আছে। এমন কি আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীরাও যে ভেষজবিদ্যায় পশ্চাৎপদ ছিলেন না, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে প্রাগৈতিহাসিক কেন্টাকি সমাধিগুলিতে (Kentucky tombs)। মানুষের ইতিহাস এইভাবে আধিব্যাধির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে।

বর্তমানকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তৎসহ ভেষজবিদ্যা প্রধানতঃ পাশ্চাত্তের দান। বহুকাল যাবৎ ভেষজবিদ্যা মূল চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, উহার কোনও স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল না। কালক্রমে জ্ঞানের বহুমুখী বিকাশের ফলে এবং অসংখ্য অতি উচ্চমানের বিবিধ গুণাঢ্য ভেষজের আবির্ভাবের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ভেষজবিদ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং মেটেরিয়া মেডিকা এবং ফার্মাকোলজি নামীয় ভেষজ সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট অঙ্গশাস্ত্রের উদ্ভব হয়।

ইওরোপের বর্তমান অগ্রগতি বহুলাংশে রেনেসাঁসের নিকট ঋণী। ভেষজবিদ্যাও এই রেনেসাঁসের পরোক্ষ অবদান এবং ইহার ঋত্বিক হইলেন প্যারাসেল্‌সাস্ (Paracelsus)। তিনি কলম্বাস, মার্টিন লুথার, মাইকেলএঞ্জেলো প্রমুখ রেনেসাঁসের প্রধান প্রধান কীর্তিমানদের সমসাময়িক। প্যারাসেল্‌সাস কিন্তু নূতন কিছু আবিষ্কার করেন নাই, তিনি জগৎকে নূতন পথনির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবশেষে রাসায়নিকরা চিকিৎসা তথা ভেষজের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সহস্র সহস্র নূতন ঔষধের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং চিকিৎসকেরা তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই ঔষধ প্রস্তুতকারক রাসায়নিক এবং ঔষধব্যবহারকারী চিকিৎসকগণের মধ্যে একটা মস্তবড় ফাঁক রহিয়া গেল ; চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে নূতন আবিষ্কৃত ঔষধগুলির গুণাবলীর, বিশেষ করিয়া দোষাবলীর, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিচার-বিবেচনার একান্ত প্রয়োজন। এই বিশেষ প্রয়োজনে চিকিৎসক এবং ঔষধ প্রস্তুতকারকগণের মধ্যে সেতুবন্ধকল্পে, ঔষধের গুণাবলীর এবং দোষাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের জন্যই বিগত শতাব্দীর বিদায়কালে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ফার্মাকোলজি নামে নূতন শাস্ত্রের উদ্ভব হইল।

অতঃপর ভেষজবিদ্যা অর্থে ফার্মাকোলজি শব্দটি ব্যবহৃত হইবে। ফার্মাকোলজি একটি যুক্ত শব্দ, দুইটি গ্রীক শব্দ Pharmakon এবং logos সংযোগে সৃষ্ট হইয়াছে। Pharmakon শব্দটির অর্থ হইতেছে Drug অর্থাৎ ঔষধ, logos শব্দের অর্থ হইল কোনও বিষয়ে বিদ্যা বা জ্ঞান। সুতরাং গূঢ় অর্থে ফার্মাকোলজি হইল ঔষধ সম্বন্ধে বিদ্যা। Drug শব্দটির উৎপত্তি আবার ফরাসী শব্দ Drouge হইতে। Drouge-এর অর্থ হইল শুষ্ক লতাপাতা। দেখা যাইতেছে Drug কথাটির মধ্যেই বনৌষধি বা ওষধি নিহিত রহিয়াছে।

Pharmacology বা ভেষজবিজ্ঞান ঃ বৈজ্ঞানিক নিরিখে ঔষধের সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাবিষয়ক শাস্ত্রই ফার্মাকোলজি বা ভেষজবিজ্ঞান নামে পরিচিত। ঔষধ কোথায় বা কি অবস্থায় পাওয়া যায়, কিভাবে এবং কখন আহরণ করিতে হয়, তাহার রাসায়নিক রূপকল্প কি প্রকার, তাহার প্রস্তুতি প্রকরণ, জীবকোষের উপর তাহার ক্রিয়াকলাপ এবং ঔষধ ব্যবহার প্রকরণ ইত্যাদি এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। ঔষধ ব্যবহারের মাত্রার গুরুত্ব অত্যধিক। কি মাত্রায় ব্যবহার করিলে কোন্ রকম ফলপ্রসূ হইবে এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শরীরে অনুপ্রবেশ করিবার পর ঔষধ কোথায় কোথায় এবং কিভাবে ছড়াইয়া পড়ে, শরীরের অভ্যন্তরে ঔষধের কোনও পরিবর্তন হয় কি-না, শরীরের কোনও বিশেষ অংশে ঔষধের অধিকাংশ জড় হয় কি-না, এবং অবশেষে কিভাবে এবং কি রূপ ধারণ করে, কোন্ পথে ঔষধ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, এসব বিষয়ে সম্যক্ ও সুষ্ঠু জ্ঞান ভেষজবিদ্যার অন্তর্গত। ঔষধের রাসায়নিক বিন্যাসসঙ্কেতের (structure) সঙ্গে জীবকোষের উপরে তাহার কার্যকলাপের অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধ নির্ণয়ও এই বিজ্ঞানের এক প্রধান কাজ। সেজন্য এই বিজ্ঞানে সম্যক্ অধিকার লাভ করিতে হইলে পূর্ব হইতে শারীরবৃত্ত (Physiology), প্রাণরসায়ন (Biochemistry), জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) এবং অণুজীববিজ্ঞান (Microbiology) সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আধুনিক Biophysics (জৈব পদার্থবিদ্যা) এবং পরিসংখ্যানবিদ্যা (Statistics) সম্বন্ধে জ্ঞানেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। আর প্রয়োজন উদ্ভিদবিদ্যাতে (Botany) সমান অধিকার।

প্রশস্ত অর্থে ফার্মাকোলজি শাস্ত্রের মধ্যে Materia Medica (দ্রব্যগুণ), Pharmacy (ভেষজ-প্রস্তুতকরণবিদ্যা), Pharmacognosy (ঔষধ-প্রকৃতি-বিজ্ঞান/ঔষধপরিচিতি-বিজ্ঞান), Toxicology (বিষপ্রকরণ), Posology (মাত্রাবিজ্ঞান), Chemotherapy (রসায়নচিকিৎসা) এবং Therapeutics (ঔষধ-প্রয়োগবিদ্যা) প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এইসব বিভাগগুলি নিজেরাই এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে ইহাদের অনেকগুলিরই আলাদা আলাদা আলোচনা হওয়া উচিত। এখানে ফার্মাকোলজি-র অঙ্গ হিসাবেই ইহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হইবে।

ফার্মাকোলজি(Pharmacology)-র একটি বিশিষ্ট সংজ্ঞাও আছে। সংক্ষেপে বলা যায় ফার্মাকোলজি-র আলোচ্য বিষয় হইল কোনও রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে

কোনও জীবকোষের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তখনই প্রশ্ন ওঠে ঐ জীবকোষ কি সুস্থ ও সবল অবস্থায় আছে অথবা সেটি অসুস্থ অর্থাৎ সেটি রোগাক্রান্ত। এই জীবকোষের তৎকালীন স্বাস্থ্যের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ভরশীল হইবে। সুস্থ ও রুগ্ন জীবকোষের প্রতিক্রিয়ার ভিন্ন প্রকৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ফার্মাকোলজি-র আবার প্রায় মৌলিক দুইটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। সুস্থ জীবকোষের প্রতিক্রিয়ার চর্চার নাম ফার্মাকোডায়নামিক্স (Pharmacodynamics) আর রুগ্ন জীবকোষের প্রতিক্রিয়ার চর্চার নাম ফার্মাকোথেরাপি (Pharmacotherapy)। এই দুই সংযুক্তিবিদ্যার চর্চাই বর্তমান বিশিষ্ট বিজ্ঞান ফার্মাকোলজি।

Chemotherapy (রসচিকিৎসা) : Chemotherapy বা রসচিকিৎসা ফার্মাকোলজি-র একটি বিশিষ্ট ধারা। ফার্মাকোলজিতে প্রযুক্ত ঔষধ রোগীর নিজের জীবকোষ ইত্যাদির উপর ক্রিয়া করে। Chemotherapy-তে কিন্তু আশা করা হয় যে, প্রযুক্ত ঔষধ ক্রিয়া করিবে বহিরাগত ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপর; রোগীর আপন জীবকোষের উপর হয় কোনও কাজই করিবে না অথবা করিলেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে সেই ক্রিয়াকলাপ। (ভেষজ দ্র)।

Toxicology বা বিষপ্রকরণ : রসায়নচিকিৎসার (Chemotherapy) বহু পূর্ব হইতেই ইহা জানা ছিল যে, ঔষধ কেবলমাত্র উপকারই করে না, যথেষ্ট অপকার করিবার ক্ষমতা প্রায় সব ঔষধেরই আছে। সুতরাং ঔষধের গুণাবলী জানাও যেমন প্রয়োজন, অপগুণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকাও তেমনই প্রয়োজন। বেশীর ভাগ ঔষধই অল্পবিস্তর ক্ষতিকারক, কিন্তু কিছু কিছু ঔষধে পূর্ণ বিষক্রিয়া বর্তমান। এইসব ঔষধ বিষের ন্যায় কাজ করে এবং অজ্ঞতাজনিত ইহাদের ব্যবহার মর্মান্তিক ফলপ্রদায়ক। শুধু তাহাই নয়, ঔষধের অপব্যবহারের দরুণ নূতন নূতন রোগেরও সৃষ্টি হইতেছে। এই শ্রেণীর রোগগুলি Iatrogenic diseases (আয়াট্রোজেনিক ব্যাধি) নামে অভিহিত। ভেষজাদির ক্ষতিকরণক্ষমতা তথা বিষের ন্যায় ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি যে শাস্ত্রে আলোচিত এবং নথিভুক্ত করা হইয়াছে তাহার নাম বিষপ্রকরণ বা Toxicology.

Posology বা মাত্রাবিজ্ঞান : ঔষধপ্রয়োগের কালে ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কারণ একই ঔষধ মাত্রাভেদে বিভিন্নরূপের ফলপ্রদায়ক। কখনও কখনও মাত্রাভেদে সম্পূর্ণ বিপরীত ফলপ্রদায়কও হইতে পারে। বয়সভেদে ঔষধের মাত্রার তারতম্য হয়। বিশেষ করিয়া শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য ঔষধের মাত্রা একজন পূর্ণবয়স্ক যুবকের মাত্রা হইতে একেবারেই অন্য ধরনের হয়। এই সমস্তেরই বিশদ আলোচনা আছে মাত্রাবিজ্ঞানে।

Materia Medica বা দ্রব্যগুণ : ঔষধের প্রকৃতি, ঔষধ কোন্ দেশজ, তাহার প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি এবং বিবিধ গুণাবলী বর্ণিত আছে Materia Medica বা দ্রব্যগুণ গ্রন্থে। একটি ঔষধ হইতে কত বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাও এই পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে। তদুপরি ঔষধ ব্যবহারের বিধিনিষেধ, ঔষধের মাত্রা ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এই দ্রব্যগুণ গ্রন্থে।

Pharmacopoeia বা মান্যগ্রন্থ : কালক্রমে একটি সর্বজনগ্রাহ্য ঔষধের মাননির্দেশক গ্রন্থের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই গ্রন্থে ঔষধ চিহ্নিত করার সূত্রসমূহ (Pharmacognosy), ঔষধের মান, মাত্রা, এবং যৌগিক ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী, বিশেষ প্রকরণ ইত্যাদির প্রামাণ্য বর্ণনা থাকে। এই বিধানগুলি চিকিৎসক, ঔষধ-প্রস্তুতকারক এবং ঔষধ-ব্যবসায়ীরা মানিতে বাধ্য থাকিবেন। সাধারণতঃ দেশের সরকারের তত্ত্বাবধানে এইরূপ গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়। এইরূপ গ্রন্থ Pharmacopoeia বা মান্যগ্রন্থ নামে পরিচিত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এদেশে British Pharmacopoeia (B. P.)-র প্রচলন ছিল। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে Indian Pharmacopoeia-র (I. P.) প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। [পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে প্রয়োজনবোধে সংযোজনগ্রন্থ (Addenda) প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখন এই দেশে ব্রিটিশ এবং ইন্ডিয়ান উভয় প্রকার Pharmacopoei-রই প্রচলন রহিয়াছে। আমেরিকায় (U. S. A) প্রচলিত গ্রন্থের নাম United States Pharmacopoeia (U. S. P)। ইহা ব্যতীত বহু সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি Pharmacopoeia বিদ্যমান রহিয়াছে।]

ভেষজ মুখ্যতঃ রোগনিরাময়কল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহা-ব্যতীত ব্যাধির স্বরূপ তথা কারণ নির্ণয়ের জন্য ঔষধের সাহায্য লওয়া হয়। সর্বোপরি ঔষধ হয়তো কেবলমাত্র ব্যাধির নিরাময় করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, আশা করা যায় ঔষধের মাধ্যমেই একদিন মনোজগতের রহস্যোদ্ঘাটনও সম্ভব হইবে।

দ্র প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়, আয়ুর্বেদের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ; G. R. Srivastava, *History of Indian Pharmacy*, Calcutta, 1954; John C. Krantz, Jr. & C. Jelleff Carr, *Pharmacologic Principles of Medical Practice*, Calcutta, 1965.

সুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত

ভৈগাই নদী তামিলনাড়ু রাজ্যের মাদুরা জেলার অন্যতম প্রধান নদী। নদীটির দুইটি শাখা যথাক্রমে কাম্বাম উপত্যকা ও ভারুসানাদ উপত্যকা বিধৌত করিয়া ১০° উত্তর ৭৭°৩১′ পূর্বে ভৈগাই নামে মিলিত হইবার পর উত্তর-পূর্বে প্রায় ৮০ কিলোমিটার প্রবহমাণা। পালনী পাহাড়ের উচ্চ ও নিম্ন অংশের প্রচুর ক্ষুদ্রাকার নদী

আসিয়া ইহাতে পতিত হইয়াছে। পরে ইহা দক্ষিণে ও পূর্বে প্রবাহিতা। মাদুরা শহরের পাশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর রামনাদের ১৬ কিলোমিটার পূর্বে (৯°২০′ উত্তর ও ৭৯°১′ পূর্ব) সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময়ই নদীটি প্রায় শুষ্ক থাকে। কখনও বা প্রবল বন্যা মাসাধিক কাল ব্যাপিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। মাদুরার উপরে নদীতে বাঁধ দেওয়ার পর জলধারণ ও সেচ প্রকল্পের সুবিধা হইতেছে। পেরিয়ার প্রকল্পের পর জলসেচের আরও ব্যাপক সুবিধা হইয়াছে। নদীটির উপরের সেতুপথ দিয়া সড়ক ও রেলপথ চলিয়া গিয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. 24, Oxford, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভৈরব মহাদেবের অংশাবতার। বামনপুরাণে (৭০ অধ্যায়) ভৈরবোৎপত্তির বিবরণ আছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে অন্ধকাসুরের গদাঘাতে মহাদেবের মস্তক হইতে প্রভূত রক্তক্ষরণ হয়। রক্তের পূর্বধারা হইতে বিদ্যারাজ ভৈরব, অপর ধারা হইতে রুদ্রভৈরব, অন্য ধারা হইতে চণ্ডকপালাদি ভৈরবচতুষ্টয়, ভূতলস্থ শোণিতধারা হইতে ললিতরাজ ভৈরব এবং অষ্টম ভৈরব বিঘ্নরাজ আবির্ভূত হয়। অষ্ট-ভৈরবের নামের বৈসাদৃশ্য বিভিন্ন গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার—ইঁহারা তন্ত্রোক্ত অষ্টভৈরব।

যূথিকা ঘোষ

ভৈরব নদী বাংলাদেশের একটি নদী। বহুদিন ধরিয়া নদীটি একটি পরিত্যক্ত শাখা মাত্র ছিল; এখন উহার কেবলমাত্র অংশবিশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভয়ংকর হইতেই ভৈরব নামের উৎপত্তি। প্রথমে ইহার অসাধারণ গুরুত্ব ছিল। মহানন্দা যে স্থানে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে তাহার ঠিক বিপরীত দিকে ইহা গঙ্গা হইতেই বাহির হইয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন যে, পূর্বে ইহা মহানন্দারই শাখা ছিল; পরে গঙ্গানদী পূর্বে প্রসারিত হইবার সময় উহাকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। ভৈরব একদা মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইত; কিন্তু জলাঙ্গী ও মাথা-ভাঙ্গা দ্বারা ইহা তিনখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। নদীটিতে প্রচুর পলিমাটি সঞ্চিত হইয়াছে। যশোহর শহরের নিকট এই নদীটি সামান্য জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। নদীটির কিছু জল মধুমতীতে ও বাকী অংশ রূপসার মধ্য দিয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Vol. 8, Oxford, 1908.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

ভৈষজ্য উদ্ভিদ অ্যালকালয়েড ও ভেষজ দ্র।

ভোজপুরী ভোজপুরী মাগধী প্রাকৃত উদ্ভূত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অন্যতম। গ্রিয়র্সনের মতানুসারে ইহা বিহারীর উপভাষা। ভোজপুরীর ভগিনীস্থানীয় অন্য দুইটি ভাষা হইল 'মগহী' ও 'মৈথিলী'। আধুনিক লোক-গণনা অনুযায়ী (১৯৬১ খৃ) ভোজপুরীর লোকসংখ্যা ৭৯৬৪৭৫৫। ইহা বিহারের সর্বাধিক লোকের কথ্য ভাষা (অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি)। ভাষাঞ্চল পরিধি প্রায় ৪৩,০০০ বর্গমাইল। ভাষার বিস্তৃতি সাধারণতঃ এই অঞ্চলগুলিতে—বেনারস, মির্জাপুর, জৌনপুর, গাজীপুর, বালিয়া, গোরখপুর, বস্তী, আজমগড় (উত্তরপ্রদেশ); শাহাবাদ, চম্পারণ, সারণ, রাঁচি এবং পালামৌর অংশ-বিশেষ (বিহার); এবং সরগুজা (মধ্যপ্রদেশ)।

ভোজপুরীর সাহিত্যিক নিদর্শন বিরল। প্রাচীনকালে সংস্কৃত, ব্রজ্ ও অবধী এবং অধুনা হিন্দী (খড়ীবোলী) ভাষার নিরন্তর চাপে ভোজপুরী সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কবীর (১৫শ শতক) রচিত কিছু গীতিকবিতা। বর্তমানে কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে। ভোজপুরীর নিজস্ব লিপি 'কৈথী', কিন্তু মুদ্রণে নাগরীই প্রচলিত।

ভোজপুরীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হইল, অ-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ; লিঙ্গশাসনের শিথিলতা (হমার|হমারি গাই); 'অন্‌হি', 'অন্‌হ' বিভক্তি-যোগে বহুবচন গঠন (ঘরঃ ঘরন্‌হি); বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার (২য়া-৪র্থী-৬ষ্ঠীতে 'কে', ৩য়া-৫মীতে 'সে' বা 'সে', ৭মীতে 'মে' বা 'পর'); ল্ ও ব্-যোগে যথাক্রমে অতীত ও ভবিষ্যৎকাল গঠন (হম্ দেখলী, দেখবি); যৌগিককালে অস্ত্যর্থক রহ্ ও বাড়্|বাট্ ধাতুর প্রয়োগ (উ আবত্ রহে, হম্ দেখত্ বাটী) ইত্যাদি।

দ্র *Census of India*, Vol. I, Part II—C (ii), *Language Tables;* U. N. Tiwari, *The Origin and Development of Bhojpuri*, The Asiatic Society, Calcutta, 1960.

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভোজবিদ্যা ইন্দ্রজাল দ্র

ভোজরাজা ভোজপ্রবন্ধ নামক গ্রন্থে পরমাররাজ ধারেশ্বর ভোজ সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। পণ্ডিতগণের মতে, ইনি খৃীষ্টীয় একাদশ শতকের আদিভাগের লোক। ভোজের নামাঙ্কিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা অশীতিরও অধিক। প্রধান প্রধান গ্রন্থের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপঃ—

ক. অলংকারশাস্ত্রঃ ১. সরস্বতীকণ্ঠাভরণ—কাব্যের দোষ, গুণ, অলংকার, রীতি, রস, ভাব, বৃত্তি প্রভৃতির আলোচনা। ইহা পাঁচটি পরিচ্ছেদে রচিত। মৌলিক রচনা না হইলেও ইহাতে পূর্ববর্তী আলংকারিকগণের মতের

আলোচনা ও প্রচুর উদাহরণ থাকায় গ্রন্থখানি মূল্যবান। ২. শৃঙ্গারপ্রকাশ— অলংকারশাস্ত্র ও নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা। গ্রন্থকারের মতে, অহংকার-অভিমান-শৃঙ্গার শুধু প্রধান নহে একমাত্র রস। ইহা ৩৬টি 'প্রকাশে' রচিত; ২৪টি 'প্রকাশে'ই রসের আলোচনা করা হইয়াছে। খ. ব্যাকরণ—ইহারও নাম সরস্বতীকণ্ঠাভরণ। গ. দর্শন—রাজমার্তণ্ড (যোগসূত্রের টীকা)। ঘ. বিবিধ—

১. সমরাঙ্গনাসূত্রধার — স্থাপত্য ও ভাস্কর্যবিষয়ক।
২. যুক্তিকল্পতরু — নীতিশাস্ত্রবিষয়ক।
৩. তত্ত্বপ্রকাশিকা — ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক।
৪. রাজমৃগাঙ্ক — জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক।

কোনও কোনও স্মৃতিনিবন্ধ ও প্রাচীন স্মৃতির টীকা হইতে মনে হয়, ভোজরাজ 'ভুজবলভীম' ও অপর একটি বৃহৎ স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ধর্মদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থটি পরবর্তী কালের ভোজনামক জনৈক ব্যক্তির রচিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোট¹ তিব্বত দ্র
ভোট² নির্বাচন দ্র

ভোট-চীনীয় ভাষা (Tibeto-Chinese or Sino-Tibetan) ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষাবর্গ চীন, তিব্বত, বর্মা, শ্যাম, আন্নাম এবং ভারতের অঞ্চল বিশেষের (উত্তর-পশ্চিমে লাদাখ ও বালতীস্থান হইতে নীফা এবং পূর্ব আসামের দক্ষিণপ্রান্তিক অঞ্চল পর্যন্ত) প্রচলিত। এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রধান ভাষাগুলির সংখ্যা প্রায় ১১৫। ভারতে প্রচলিত এই গোষ্ঠীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা (১৯৬১ খৃ) ২২৬ (ভোট-বর্মী ২২৫)। মোট ভোট-চীনাভাষীর সংখ্যা পৃথিবীতে ৭৫ কোটিরও অধিক (ভারতে ৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮০০)। আলোচ্য গোষ্ঠীর প্রধান শাখা-বিভাগ এই-রূপ—

তাই-চীনা (Thai-Chinese) বর্গের প্রধান ভাষা হইল— চীনা (মান্দারিন এবং ক্যান্টনদেশীয়)। তাই বা শ্যামীয় (Thai or Siamese) ভাষাবর্গের মধ্যে খামতী (ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৯৬) উত্তর-পূর্ব আসামের প্রান্তিক বা নীফা অঞ্চলে প্রচলিত। ১৩শ-১৮শ শতক পর্যন্ত আহোম ভাষাও আসামে প্রচলিত ছিল। শান্ এবং অপর উপভাষাগুলি উত্তর বর্মা ও শ্যামদেশে বর্তমানে কথিত হয়। কারেন উপভাষাগোষ্ঠী দক্ষিণ বর্মা ও তৎসংলগ্ন শ্যামদেশে, এবং সি-লো-মো ভাষাগুলি ইয়াংসিকিয়াং অববাহিকা অঞ্চলে চলিত আছে। সুধীজনের মধ্যে কেহ কেহ আন্নামী ও মুং অং ভাষাগুলিকে তাই-চীনাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। মতান্তরে এই দুইটি উপগোষ্ঠী যথাক্রমে অস্ট্রিক শাখার মুণ্ডা ও মোন্-খ্মের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

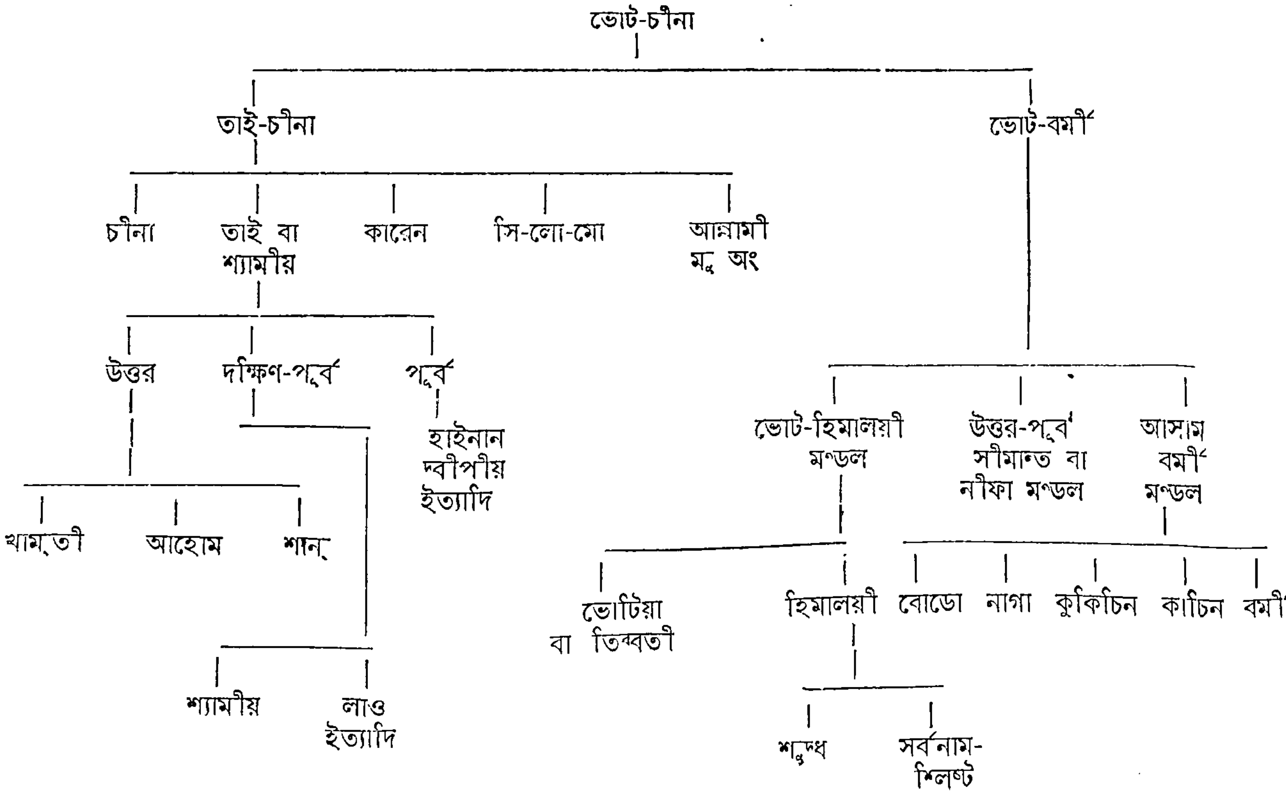

ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) শাখার অন্তর্গত ভোট-হিমালয়ী মণ্ডলের (Tibeto-Himalayan) দুইটি বিভাগ—(ক) ভোটিয়া বা তিব্বতী—মধ্যপ্রদেশীয় তিব্বতী হইল আদর্শ ভাষা (Standard Language)। লাসা ইহার কেন্দ্র। অন্যান্য উপভাষা হইল পশ্চিমা বাল্‌তী ও লাদখী (লহুলী, কাশ্মীর), স্পিতি; পূর্বীসিকিম-ভোটিয়া, ভুটানী, শেরপা, কাগতে ইত্যাদি। ভারতে তিব্বতী ভাষার সংখ্যা ৩৩টি। (খ) হিমালয়ী—মোট মাতৃভাষা ২৪টি। শুদ্ধ হিমালয়ীর প্রধান ভাষাগুলি হইল প্রধানতঃ নেপালের গুরুঙ্, মগর, মুরমী, সুনওয়ার ও নেপালের আদিভাষা নেওয়ারী এবং পূর্ব নেপাল, সিকিম ও দার্জিলিং-এ প্রচলিত লেপ্‌চা বা রোঙ্ (মতান্তরে নাগা গোষ্ঠীভুক্ত)। অস্ট্রিক-প্রভাবিত সর্বনামশ্লিষ্ট (Pronominalised) হিমালয়ীর মধ্যে প্রধান হইল কিরান্তী, ধীমাল, লিম্বু ইত্যাদি (পূর্ব নেপাল) এবং কনওয়রী ইত্যাদি (পশ্চিম নেপাল)।

ভোট-বর্মী (Tibeto-Burman) শাখাভুক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বা নীফা মণ্ডলের ভাষাগুলি হিমালয়ের সানুদেশে আসামের পার্বত্যাঞ্চলে কথিত হয়। মোট মাতৃভাষা ২৪টি। প্রধান ভাষাগুলি হইল—আকা, আবর, আবর-মিরি, দফ্‌লা, মিশ্‌মি।

ভোট-বর্মী শাখাভুক্ত আসামবর্মী মণ্ডলে (Assam-Burmese) প্রচলিত ভাষাগুলির চারটি বিভাগ, যথা—(ক) বোডো/বোরো। এক সময়ে সমগ্র পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম আসাম জুড়িয়া বোডোভাষীদের বসবাস ছিল। বর্তমানে এই শ্রেণীভুক্ত মাতৃভাষার সংখ্যা ২২। প্রধান উপভাষাগুলি হইল— কাছাড়ী (কাছাড় পার্বত্যাঞ্চল), ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ বাঁকের পূর্বে রাভা, প্রায়লুপ্ত কোচ, মেচ (উত্তরবঙ্গ, আসাম সমতলভূমি) ও গারো (গারো পার্বত্যাঞ্চল), ত্রিপুরারাজ্যে ত্রিপুরী, জৈন্তিয়া পাহাড়ের পূর্বে, গৌহাটি ও নওগাঁর মধ্যে লালুঙ্, হোজাই, বোডো (গৌহাটি জেলা) এবং সম্ভবতঃ মিকির। (খ) নাগা। ইহা কথিত হয় প্রধানতঃ নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে, অন্যত্র নীফা ও আসামে, মোট মাতৃভাষা ৪৭টি। শুদ্ধ নাগাভাষাগুলির মধ্যে প্রধান হইল—আও, অঙ্গামী, সেমা, তঙখুল, লোথা, রেঙ্গমা ইত্যাদি। ইহা ছাড়া অবগীকৃত নাগাভাষাও রহিয়াছে (মোট লোকসংখ্যা ৩৩,৩৩৩)। (গ) কুকি-চিন। ইহা কথিত হয় বর্মা, এবং আসামের লুশেই পার্বত্যাঞ্চল, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে। মোট মাতৃভাষা ৬৯টি, প্রধান উপভাষা হইল—মেইতেই বা মণিপুরী, বিভিন্ন চিন্ উপভাষা (উত্তর ও দক্ষিণ চিন্), লুশেই (মধ্য চিন্) এবং কুকি। (ঘ) কাচিন। মুখ্যতঃ বর্মায় প্রচলিত হইলেও উত্তর-পূর্ব আসাম ও উত্তর ব্রহ্ম সীমান্তে ইহার প্রচলন দেখা যায়। (ঙ) বর্মী। ইহা ব্রহ্মদেশ বা বর্মার ভাষা, তবে মধ্যাঞ্চলের উপভাষাগুলি চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে কথিত হয়। এই উপভাষাগুলি হইল আরাকানী, মোঘ ও ম্রু।

ভাষাতত্ত্বের বিচারে ভোট-চীনা ভাষাগুলি হইল মূলতঃ অনন্বয়ী, যেমন, চীনাভাষা। তবে সম্ভবতঃ বিবর্তনের ফলে নূতন লক্ষণও আবির্ভূত হইয়াছে, যেমন, তাই-চীনা ভাষাগুলিকে আংশিক মুক্তান্বয়ী হইতে দেখা যায়। অপরদিকে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রভাবে ভোট-বর্মী ভাষাগুলি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ মুক্তান্বয়ী হইয়া গিয়াছে। অবশ্য অনন্বিত ভাষার সার্বিক লক্ষণ সর্বত্র প্রকট নয়। তাই বর্তমানে অনেকে আবার তাই-ভাষাগোষ্ঠীকে ভোট-চীনাগোষ্ঠীর অন্তর্ভূত করার বিপক্ষে। তাঁহারা তাই-ভাষাগোষ্ঠীর নূতন নামকরণ করিয়াছেন— 'কাদাই' (Kadai) ভাষাগোষ্ঠী।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

ভোট সাহিত্য তিব্বতের সাহিত্য। ভোট সাহিত্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ ধর্মীয় সাহিত্য ও সাধারণ সাহিত্য। ধর্মীয় ভোট সাহিত্য বলিতে বৌদ্ধ-পূর্ব তিব্বতের পোন্ বা বোন্ ধর্মীয় সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় সাহিত্য দুইই বুঝায়।

পোন্ (বোন্) ধর্মীয় ভোট সাহিত্য ঃ তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পূর্বে যে-ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সেই বোন্‌ধর্ম অনুসারে বোন্‌ধর্মী তিব্বতীরা বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাদের অতি অল্প অংশই বর্তমানে বিদ্যমান আছে।

বৌদ্ধধর্মীয় ভোট সাহিত্য ঃ তিব্বতের রাজা স্রোং-চন গম্-পোর (মৃত্যু ৬৫০ খ্রী) রাজত্বকালে তিব্বতের পণ্ডিত থোন্-মি সম্-ভোট ভারতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধদর্শনের পাঠগ্রহণ করেন। পরে তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন কাশ্মীরী ও ব্রাহ্মীলিপি অনুসরণে তিব্বতী লিপি উদ্ভাবন করেন এবং তিব্বতী ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদে মন দেন।

ভারতীয় বৌদ্ধশাস্ত্র এবং কিছু চীনা বৌদ্ধ গ্রন্থের ভোট ভাষায় যে অনুবাদ করা হয় দুই বিপুলায়তন সংকলনে তাহা সংগৃহীত আছে। ভোট ভাষার এই দুই সংকলনের নাম কন্-জ্যুর ও তন্-জ্যুর।

কন্-জ্যুরের ভিতর বুদ্ধের দেশনা সম্বলিত বৌদ্ধসূত্র, তন্ত্র, আগম, বিনয়াদি ত্রিপিটকের বহু গ্রন্থের অনুবাদ সংকলন করা হইয়াছে। অপরদিকে, তন্-জ্যুরের ভিতর কন্-জ্যুরের অন্তর্ভূত গ্রন্থাদির কিছু কিছু টীকাভাষ্যাদি এবং নাগার্জুন, বসুবন্ধু, চন্দ্রকীর্তি, শান্তিদেব প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্যদের মৌলিক রচনার অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল বৌদ্ধ শাস্ত্র ছাড়া ভারতীয় সাহিত্যের বহু বিখ্যাত গ্রন্থ ভোটভাষায় অনুবাদ করিয়াও এই তন্-জ্যুর সংকলনে স্থান দেওয়া হইয়াছে, যথা, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য, শ্রীহর্ষের নাগানন্দ নাটক, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, অমরসিংহের অমরকোষ, পাণিনি ও কলাপ ব্যাকরণ, চাণক্যের নীতিশ্লোক ইত্যাদি।

কন্-জ্যুর সংকলনে শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত প্রায় আট

শতাধিক গ্রন্থ আছে ; তন্-জ্যুর সংকলনে দেড়শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত প্রায় দুই সহস্র ছোট বড় গ্রন্থ আছে।

ধর্মীয় অনুবাদ সাহিত্যের পাশাপাশি তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিতদের লেখা টীকাভাষ্যাদি, তথা এক বিশাল মৌলিক সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের বহু জটিল তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার, তান্ত্রিক ক্রিয়া ও আচারের আলোচনা, যোগরহস্য ও সাধনপ্রণালীর বিবরণ এবং দেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণ তিব্বতের মৌলিক ধর্মীয় সাহিত্যকে এক অভিনব সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। তিব্বতী লেখকদের ভিতর বু-স্তোন, চোঙ্-খা = পা, মি-কম্, ঙগ্-ওয়াঙ্ গ্যাম্-ছো, রিজ্ ছেন সাঙ্-পো প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লৌকিক ভোট সাহিত্য ঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিব্বতে ধর্মীয় সাহিত্যের পাশাপাশি সাধারণভাবে ব্যাপক লৌকিক সাহিত্য রচনার সূচনা হয় বলা যাইতে পারে। তিব্বতের একদল ঐতিহাসিক ও জীবনী-কার কতক পরিমাণে চীনাদের অনুসরণে তিব্বতে ইতিহাস (লো-জ্যু), জীবনী (নম-থর) ও রাজপরিবারের বিবরণ (গ্যে-রব) লেখায় উদ্যোগী হন। এই সকল গ্রন্থ গদ্য ও পদ্য এবং গদ্যপদ্য মিশ্র পদ্ধতিতে লেখা। এই সময়ের গ্রন্থের ভিতর মণি-কা'-বুম, পে-মা-জুড্ (পদ্মসম্ভবের কাহিনী), পোয় ক্যি গ্যে-রব ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন বা দীপঙ্কর-পূর্ব পর্বের তিব্বতী লৌকিক সাহিত্যের ভিতর কে-সর মহাকাব্য সাহিত্যরস বিচারে বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। উহা সংগীতাকারে নিবদ্ধ ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী লইয়া রচিত। কবি মিলা রেপা ও তাঁহার গুরু মার-পার বৈরাগ্যভক্তিমূলক গীত-কাব্য তিব্বতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। মিলা রেপার স্বতঃস্ফূর্ত গীতমালা যেমন রসঘন, তেমনই অভিনব ও মৌলিক।

দীপঙ্করোত্তর পর্বের ভোট-সাহিত্য বহুধা বিস্তৃত। একদিকে যেমন বু-স্তোনের ছোয় জ্যুঙ্, তারনাথের গ্যগর ছোয় জ্যুঙ্, ইসে পলজোরের পগসম জোঙ্সঙ্, দেব থের মার-পো, দেব থের সের-পোর প্রভৃতি বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হইয়াছে—অন্যদিকে তেমনি চোঙ্-খা-পা, ডোম-তোন্, মি ফম, সা স্ক্য পন, প্রভৃতি দার্শনিক কাব্য তিব্বতের সাধারণ সাহিত্যের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

তিব্বতে নাটকের মর্যাদাও কম নয়। তিব্বতী নাটকে গীত ও নৃত্যের প্রাধান্য হেতু সংলাপবহুল আধুনিক ধরনের নাটক বিকাশলাভ করে নাই। ভারতীয় প্রাচীন নাটকের অনুরূপ ত্যাগমূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নোরবু-সাঙ্ পো ও ঠি-মে কুন-দেন প্রভৃতি তিব্বতী নাট্যসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিব্বতী সাহিত্যে গল্প (গ্রুঙ্) ও কাহিনী প্রচুর পাওয়া যায়। সেগুলি কতকাংশে রূপকথার আকারে প্রচলিত। আবার কিছু কিছু গল্প প্রাচীন বৌদ্ধ জাতক ও অবদানের গল্পের মত শিক্ষামূলক।

সাহিত্যের এই সকল সাধারণ বিষয় ব্যতীত গণিত, মূর্তিবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, সামুদ্রিক বিচার, জ্যোতিষ, ধাতব-বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, ও ভৈষজ্যবিষয়ে বহু তিব্বতী মনীষীর রচনা তিব্বতী সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

দ্র Bell, *The Religion of Tibet*, Oxford, 1931; Evans-Wentz, *The Tibetan Book of the Great Liberation*, Oxford, 1954.

সুনীতিকুমার পাঠক

ভোঁসলে এই উপাধির উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কেহ সঠিকভাবে কিছু বলিতে পারেন না। এক কিংবদন্তী অনুযায়ী আলাউদ্দীন খিলজির চিতোর অধিকারের সময়ে শিশোদীয় রাণাবংশের সজ্জন সিংহ বা সুজন সিংহ নামে এক ব্যক্তি কোনওরকমে পলায়ন করিয়া দাক্ষিণাত্যে যান। বংশানুক্রমে তাঁহার পঞ্চম পুরুষ ছিলেন উগ্র সেন; তাঁহার এক পুত্র শুভকৃষ্ণের বংশধরেরা ভোঁসলে নামে পরিচিত। শুভকৃষ্ণের নাতি বাবাজী ভোঁসলের এক পুত্রের নাম মালোজী, তাঁহার পুত্র শাহজী ভোঁসলে শিবাজীর পিতা।

শাহজী স্বীয় কর্মদক্ষতায় আহমদনগর রাজ্যে উচ্চপদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ; পরে তিনি বিজাপুর সরকারে যোগদান করিয়া বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। মহীশূর উপত্যকায় ও পূর্ব কর্ণাটকে বিরাট ভূসম্পত্তিও তিনি তাঁহার অধিকারে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র শিবাজী বিজাপুর রাজ্যের কতিপয় স্থান অধিকার করিলে বিজাপুরের সুলতান শাহজীকে কিছুকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর ('শিবাজী' দ্র) মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শৌর্যবীর্যের অভাব না থাকিলেও পিতার মত কর্মকুশলতা ও দূরদর্শিতা মোটেই ছিল না। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মোগলদের হস্তে পতিত ও নিহত হন এবং তাঁহার সপ্তবর্ষবয়স্ক পুত্র শাহু বন্দী হন।

শম্ভুজীর পরে তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমরণ (১৭০০ খ্রী) মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইহার পরে তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ নাবালক পুত্রকে (তৃতীয় শিবাজীকে) রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া যোগ্যতার সহিত দেশ শাসন ও মোগলদের বিরুদ্ধে সমর পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার অদম্য বীরত্ব, সাংগঠনিক শক্তি ও সুদক্ষ সমর কৌশলের ফলে ঔরংগজেবের মহারাষ্ট্র বিজয় সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

ঔরংগজেবের মৃত্যুর পরে মুক্ত হইয়া শাহু তারাবাঈ-এর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সাতারাতে নিজের অভিষেক সম্পন্ন করেন (১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। তারাবাঈ কোলাপুরে গিয়া শাহুর

বিরুদ্ধতা করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠা রাজ্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়। এক ষড়যন্ত্রের ফলে রাজারামের দ্বিতীয়া পত্নী রাজস্‌বাঈ তারাবাঈ ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া স্বীয় পুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীকে কোলাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭১৪ খ্রী)। কিন্তু ইহাতেও গৃহবিবাদের অবসান হইল না। অবশেষে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ণার সন্ধিতে শাহু ও দ্বিতীয় শম্ভুজীর রাজ্যসীমা নির্দিষ্ট হয় ও মহারাষ্ট্রে শাহুর সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহু তাঁহার দক্ষ ও বিশ্বস্ত সহায় বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। 'পেশোয়া' দ্র।

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহু বা দ্বিতীয় শিবাজী পরলোক গমন করিলে রামরাজা (১৭৫০—১৭৭৭ খ্রী) ছত্রপতি হন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বিপর্যয়ের পূর্বে প্রথম তিনজন পেশোয়ার চেষ্টায় দক্ষিণ ভারত ব্যতীত উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চল, এমন কি পাঞ্জাবও মারাঠা সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই সাম্রাজ্যে সংহতির অভাব ছিল, জায়গীর প্রথার ফলে পাঁচটি অর্ধ-স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়, যথা বেরারে ভোঁসলে, বরোদায় গাইকোয়াড়, ইন্দোরে হোলকার, গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া এবং মালবের অন্তর্গত ধারে পাবার। তাঁহারা প্রায়ই দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করিতে দ্বিধা করিতেন না।

রামরাজার পরে ছত্রপতি হন দ্বিতীয় শাহু (১৭৭৭—১৮০৮ খ্রী)। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বেসিনের সন্ধিতে ইংরেজদের সহিত অধীনতা-মূলক মৈত্রী গ্রহণের ফলে এই রাজ্য তাঁহাদের অধীন হইল।

দ্বিতীয় শাহুর পরে তাঁহার পুত্র প্রতাপ সিংহ ছত্রপতি হন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পেশোয়ার পরাজয়ের ফলে ইংরেজরা পেশোয়া পদ বিলুপ্ত করিয়া সাতারাকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করে এবং প্রতাপ সিংহকে ঐ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অজুহাতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শাহজীকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহজী নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করিয়া সাতারা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

ভোঁসলে পরিবারের ইতিহাসের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হইয়াছে বেরার রাজ্যে। নামে মাত্র সাতারার অধীন হইলেও এই রাজ্য কার্যতঃ স্বাধীন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেরার ভোঁসলে বংশের পার্শজী ভোঁসলের ও পরে তাঁহার পুত্র কানোজী ভোঁসলের অধিকারে ছিল। ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধিতে মোগল সরকার বেরারে মারাঠাদের অধিকৃত অঞ্চলে তাহাদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। ইহার পরবর্তী ভোঁসলে শাসকদের মধ্যে কানোজীর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুজী ভোঁসলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন সুচতুর ও অসাধারণ বীর; বিজেতা হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, দেওগড়গণ্ড রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তিনি নাগপুরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করেন। অসম্ভব ধৈর্যসহকারে দশ বৎসর (১৭৪১-৫১ খ্রী) সংগ্রামের পর এক সন্ধিতে স্থির হইল নবাব আলীবর্দী বাংলা ও বিহারের জন্য বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ নাগপুর রাজ্যকে দিবেন; কটক জেলাও রঘুজীর অধিকারে আসিল। নাগপুর রাজ্যের বিভিন্ন শহরে তিনি মারাঠাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ইহার সামরিক শক্তি ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

তাঁহার পুত্র জানোজীর শাসনকালে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা পেশোয়ার সহিত তাঁহার যুদ্ধ এবং শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার সর্তে তাঁহার সন্ধি স্থাপন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক অন্তর্বিবাদের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিতীয় রঘুজী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেওগাঁও-এর সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৮০৩ খ্রী)। ইহার ফলে কটক ইংরেজদের সমর্পণ করিতে হইল এবং পশ্চিম বেরার প্রদেশের ওয়ার্ধা নদী পর্যন্ত নিজামকে দিতে হইল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় রঘুজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আপ্পাসাহেব নাগপুরের ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই অধীনতার নাগ-পাশ হইতে উদ্ধারের জন্য তিনি তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন; পরে পরাজিত হইয়া তিনি তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হইলেও আবার ষড়যন্ত্রের অপ-রাধে ক্ষমতাচ্যুত হইয়া স্থানান্তরিত হন এবং দ্বিতীয় রঘু-জীর দৌহিত্র তৃতীয় রঘুজীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হয় (১৮১৮ খ্রী)। অপুত্রক ও উত্তরাধিকারিবিহীন অবস্থায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

দ্র G. S. Sardesai, *New History of the Marathas,* Vols. I, II, III; *Cambridge History of India,* Vol. V; J. N. Sarkar, *History of Aurangzib,* Vols. IV and V; *The Imperial Gazetteer of India,* Vols. VII and XVII, Oxford, 1908.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া|ভাইফোঁটা উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুসমাজে প্রচলিত অনুষ্ঠান বিশেষ। কথিত আছে কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ায় যমুনা তাঁহার ভ্রাতা যমকে পূজা

করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা যমরাজ অমরত্ব লাভ করায় এই তিথির অপর নাম যমদ্বিতীয়া। এই দিন চিত্রগুপ্তের পূজা করিবার রীতিও দেখা যায়।

ভগিনী উপবাসী থাকিয়া দিবসের প্রথমভাগে ভ্রাতাকে সমাদরপূর্বক আসনে বসাইয়া বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার কপালে চন্দনের কোথাও তৎসহ ঘি এবং কাজলের ফোঁটা দেন এবং 'ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা যমের দোরে পড়ল কাঁটা' এই ছড়া বলিয়া তাঁহার হস্তে মিষ্টান্ন তাম্বুল ও নববস্ত্রাদি উপহার দিয়া থাকেন। কৃত্যতত্ত্বে উল্লিখিত মন্ত্রটি এই—

ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥

দেশভেদে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে এই অনুষ্ঠানের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়।

কৃষ্ণা রায়চৌধুরী

ভ্রূণ শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে এককোষ-বিশিষ্ট এক নূতন জীবের সৃষ্টি হয়। এই কোষটি গঠন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাবয়ব জীবে পরিণত হয়। নিষিক্ত হওয়ার পর হইতে মাতৃজঠরে অথবা ডিমের বা বীজের আবরণীর মধ্যে থাকাকালীন গঠনমূলক বিভিন্ন অবস্থাকে ভ্রূণ বা ভ্রূণকণা বলা হয়। সপুষ্পক উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ বীজের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। গাছের ভ্রূণের চারটি অংশ ঃ বীজপত্র, ভবিষ্যৎ-কাণ্ড, ভবিষ্যৎ-মূল এবং বীজপত্র ও ভবিষ্যৎ-মূলের মধ্যবর্তী 'হাইপো-কটাইল' অংশ। প্রয়োজনীয় জল, বাতাস এবং আলোক পাইলে বীজ হইতে অংকুরোদ্গম হয়।

উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ বা প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রকীট কর্তৃক ডিম্বাণু নিষিক্ত হইলে তবেই ভ্রূণের জন্ম হয়। কোন কোনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর, যেমন— মৌমাছি, পিঁপড়া ইত্যাদির অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে ভ্রূণ গড়িয়া উঠিতে পারে। অনিষিক্ত ডিম্বাণু হইতে ভ্রূণের উদ্ভবকে অপুংজনি (পার্থেনোজেনেসিস) বলে। কৃত্রিম উপায়ে ব্যাঙের ডিম হইতেও এরূপ অপুংজাত ভ্রূণ পাওয়া সম্ভব।

প্রথমে নিষিক্ত ডিম্বাণুর বহুবার বিভাজনের ফলে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। বিভাজন পদ্ধতি সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে মোটামুটি এক রকম হইলেও বিভাজনের ধারার মধ্যে ভিন্নতা থাকে। বিভাজনের ফলে একটি বহুকোষ-বিশিষ্ট গোলাকার বলের সৃষ্টি হয়। এই গোল অবস্থার নাম 'ব্লাস্টিউলা'। ব্লাস্টিউলায় কোষগুলি একটিমাত্র স্তরে সজ্জিত থাকে। ক্রমে কোষগুলি নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করিয়া এবং বিভাজিত হইয়া প্রথমে দুইটি ও পরে তিনটি স্তরে সজ্জিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এক-নালী পর্ব পর্যন্ত প্রাণীর দেহ দুইটি স্তরে গঠিত। ইহাদের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্তরের সৃষ্টি হয় না। তিনস্তর-বিশিষ্ট অবস্থায় ভ্রূণটিকে 'গ্যাস্ট্রিউলা' বলে। গ্যাসট্রি-উলায় কোষগুলি প্রথমে অনির্দেশিত (আন্‌ডিফারিন্‌-শিয়েটেড) থাকে। পরে উহারা বিশেষভাবে নির্দেশিত (ডিফারেন্‌শিয়েটেড) হইয়া যায়। গ্যাস্ট্রিউলার বিভিন্ন অংশে কোষগুলি সংস্থাপিত হয়। ঐ অংশগুলি হইতে পরে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি হয়।

সরীসৃপ, পাখি প্রভৃতি প্রাণীর ভ্রূণ মাতৃজঠরের বাহিরে ডিমের মধ্যে বর্ধিত হয়। ডিমের ভিতর ভ্রূণকে ঘিরিয়া কতকগুলি আবরণী, যেমন 'অ্যাম্‌নিয়ন', 'অ্যালান্‌টয়েস্‌' ইত্যাদি থাকে। এই আবরণীগুলি ভ্রূণের রক্ষা ও পুষ্টিতে সাহায্য করে। স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ মাতৃজঠরের ভিতর বর্ধিত হয়। গর্ভসঞ্চারের পর ভ্রূণের ও মাতৃজঠরের দেহকলা দিয়া গর্ভফুল (প্লাসেণ্টা) গড়িয়া উঠে। ইহার গঠন কেবল স্তন্য-পায়ীর ক্ষেত্রেই হয় এবং ইহা স্তন্যপায়ী শ্রেণীর ভ্রূণের রক্ষা ও পুষ্টির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ('গর্ভ' দ্র)।

বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ অবস্থায় থাকার সময় বিভিন্ন। মুরগীর ভ্রূণ ডিমের ভিতরে ২১ দিন এবং মানবভ্রূণ মাতৃ-জঠরে ২৮০ দিন থাকে। মানুষের ক্ষেত্রে প্রথমে গঠিত ভ্রূণের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। পরে বৃদ্ধির হার কমিয়া যায়।

বিভিন্ন ভ্রূণের মধ্যে আকার-সাদৃশ্য বর্তমান। ইহার উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞানী হেকেল বিবর্তনের সপক্ষে ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ বিবৃত করেন। ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ অনুসারে প্রত্যেক প্রাণী ভ্রূণাবস্থায় সমগ্র প্রাণিকুলের বিভিন্ন দশা অল্প সময়ের জন্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ 'Ontogeny repeats Phylogeny'। সোজা কথায়, মানবভ্রূণ এককোষী প্রাণী হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য সমস্ত পর্বের দশা প্রাপ্তির পর পূর্ণাবয়ব মানবাকার ধারণ করে।

সীমানন্দ অধিকারী

মইনুদ্দীন চিস্তী সুফী সাধক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল মুইন্ অল-দীন মুহম্মদ। তাঁহার নিবাস ছিল সীস্তানে। তিনি হিঃ ৫৩৭ অব্দে (১১৪২ খ্রীষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে তাঁহার পিতা হসনের মৃত্যুর পর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তিনি বাগ্‌দাদে আসিলে তথায় কয়েকজন সুফী সাধকের প্রভাবে তিনি সুফী ধর্মাবলম্বী হন। ৫৮৯ হিঃ বা ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে আসেন। ইহার অত্যল্পকাল পরেই তিনি আজমীড়ে যান। তথায় হিঃ ৬৩৩ অব্দে বা ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আজমীড়ে তাঁহার সমাধি বিখ্যাত তীর্থস্থানরূপে পরি-গণিত হয়। পরবর্তীকালে আকবর (পদব্রজে) ও জাহাঙ্গীর উভয়েই এই তীর্থে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তিনি ভারতীয় সুফী সাধকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না, ইহা তাঁহার 'অফতাব্-ই-মুল্ক-ই-হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দের সূর্য এই উপাধি হইতে বোঝা যায়। তাঁহার সহিত আর একজন বিখ্যাত সুফী সাধক খাজা-কুতব্ অল-দীন বক্তিয়ার কাকীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

দ্র *Encyclopaedia of Islam*, London, 1953.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মকর সংক্রান্তি সংক্রান্তি দ্র

মকাই ভুট্টা দ্র

মক্কা সৌদি আরবের হেজ্জাজ অঞ্চলের প্রধান শহর (২১°৩০′ উঃ ৪০°১৭′ পূঃ) ও মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। প্রায় চারিধারে ১৫০০—৩০০০ ফিট উচ্চ নগ্ন পাহাড় বেষ্টিত অধিত্যকায় এই শহরটি বহু প্রাচীনকাল হইতেই (টলেমীর Macoraba) আরব দেশের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র ও তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। এখানে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু উৎপীড়নের জন্য (৬২২ খ্রী) পলাইয়া মদিনায় যান; পরে তিনি ইহা অধিকার করেন (৬৩০ খ্রী)। মহম্মদ নিজে 'হজ' করেন ও ইহা মুসলমানদের অবশ্য করণীয় বলিয়া গৃহীত হয় (হজ দ্র)।

দশম শতকে কারমাথিয়ান (Carmathians)-রা মক্কা লুণ্ঠন করে। ষোড়শ শতকে ইহা তুর্কী অধিকারে আসে ও মধ্যে কিছুদিন ওয়াহাবীদের (Wahabis) অধিকারে (১৮০৩—১৩ খ্রী) থাকে; ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইব্‌ন সাউদ (Ibn Saud) ইহা সৌদি আরবের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এখানকার প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ 'অল হারাম' (El Haram) কাবা এবং জমজম কূপ প্রতি হজযাত্রীর কেন্দ্র। এখান হইতে লোহিত সাগরের জিদ্দা (Jidda) বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৫০ মাইল পীচের ভাল রাস্তা আছে। লোকসংখ্যা ১,৮৬,০০০ (১৯৬৫); হজের সময় প্রতি বৎসর গড়ে এক লক্ষ লোকের আগমন হয়।

দ্র J. L. Burckhardt, *Travels in Arabia*, London, 1829; E. Rutter, *The Holy Cities of Arabia*, Vol. I, London, 1928.

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মগ আরাকানবাসী ও ১৮শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত আরাকানী উদ্বাস্তুগণের প্রচলিত বাংলা নাম। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ বর্মীয় উপাধি মোঙ্ হইতে উদ্ভূত। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণের সহযোগী, কখনো বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মগ জলদস্যুগণ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের সুন্দরবন, খুলনা, নোয়াখালি প্রভৃতি নাব্য অরক্ষিত অঞ্চলসমূহের নিদারুণ ক্ষতিসাধন করে। 'মগের মুল্লুক' বাক্যাংশের মধ্যে সেই বিভীষিকা ও অরাজকতার স্মৃতি আজও সজীব। মোগল আমলে প্রত্যন্ত প্রদেশ বঙ্গ বারবার কেন্দ্রীয় শাসনকে প্রতিহত করিয়াছে। এই প্রদেশের অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সুযোগ জলদস্যুগণ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছিল।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক সিয়াবউদ্দিন তালাস ও ফরাসী পর্যটক বার্নিয়েরে তাহাদের লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ভয়াবহ বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মেজর রেনেল তাঁহার প্রস্তুত মানচিত্রে বাখরগঞ্জের অংশবিশেষকে 'মগ অত্যাচারে পরিত্যক্ত' বলিয়া চিহ্নিত করেন। লুণ্ঠন ও ধ্বংসসাধন অপেক্ষাও দাসব্যবসায়ের জন্য ইহারা অধিকতর ভীতিপ্রদ ছিল। বংশজ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের সমাজে বিবাহযোগ্যা পাত্রীর অভাব ছিল, মগ জলদস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত 'ভরার মেয়ে'দের প্রায়ই অবিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা পরিচয়ে তাঁহাদের নিকট বিক্রয় করা হইত। প্রচলিত নানা গল্পে, লোকগীতিতে ও কুলপঞ্জীতে এইজাতীয় ঘটনার আভাস পাওয়া যায়।

মগ দৌরাত্ম্য প্রতিরোধের একমাত্র উপায় ছিল শক্তিশালী নৌবাহিনী ও জলদস্যু গঠন। বাংলার বারভুঁইয়াগণ, বিশেষতঃ প্রতাপাদিত্য, ও পরে মোগল শাসকগণ এইদিকে মন দেন। প্রধানতঃ জলদস্যুদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজয়ের পর মগ দৌরাত্ম্যের প্রধান পর্বের অবসান হয়। ১৮শ শতাব্দীতে আরাকান রাজ্যের দুর্বলতা ও ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের নিকট আরাকানের পরাজয়ের পর মগদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়।

দ্র The Imperial Gazetteer of India, Provincial Series, *Eastern Bengal and Assam, Khulna and Chittagong District Gazetteer;* Jamini Mohan Ghosh, *Magh Raiders in Bengal;* সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩-৬৫।

ইন্দ্রাণী রায়

মগধ প্রাচীন মগধ বলিতে দক্ষিণ বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা বুঝাইত। ইহার উত্তরে গঙ্গা, পশ্চিমে শোণ, পূর্বে চম্পা নদী ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের শাখা। ঋগ্‌বেদে মগধের উল্লেখ নাই, অথর্ববেদে আছে (৫।২২।১৪)। কিন্তু ঋগ্‌বেদে কীকট (৩।৫৩।১৪) বলিয়া একটি অনার্যদেশের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে পুরাণে তাহাকে মগধ বলা হইয়াছে। ঋগ্‌বেদে প্রমগন্দ নামে কীকটের জনৈক রাজার নাম পাওয়া যায়। মহাভারত ও পুরাণের মতে জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথ মগধের প্রথম রাজবংশের স্থাপয়িতা। এই বৃহদ্রথবংশ প্রদ্যোৎ অবন্তির রাজা হইলে অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিলুপ্ত হয়। ইহার পরে বিম্বিসারের বংশ—বিম্বিসার হইতে নাগদাসক ছয়জন রাজা রাজত্ব করেন। বিম্বিসারের রাজধানী ছিল গিরিব্রজ। তিনি অঙ্গ জয় করেন ও গান্ধাররাজ পুক্কুসাতির নিকট দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু কোশল, বৈশালী ও লিচ্ছবির ১৮ জন গণরাজের সহিত যুদ্ধে জয়ী হন। বুদ্ধ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর সমসাময়িক ছিলেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়িনের সময় পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

অবন্তিরাজ বৎস জয় করিলে মগধ ও অবন্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এই শত্রুতার মীমাংসা হয় পরবর্তী রাজবংশের প্রথম রাজা শিশুনাগের সময়। শিশুনাগ বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ও অবন্তিরাজ্য জয় করেন। এই বংশের শেষ রাজা কালাশোক কাকবর্ণের সময় বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতি হয় ও পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কালাশোক কাকবর্ণ নিহত হইবার পর মগধে নন্দবংশ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭৫—৩২২) রাজত্ব করেন (নন্দবংশ দ্র)। নন্দবংশের প্রথম শূদ্ররাজ উগ্রসেন-মহাপদ্ম কুরু, পঞ্চাল, কাশী, সুরসেন, কলিঙ্গ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজ্য জয় করিয়া এক বিরাট শূদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার বিরাট চমূর সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনায় নিরুৎসাহ হইয়া আলেকজান্ডারের সৈন্যগণ বিপাশার তীর হইতেই তাঁহাকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর (৩২৩ খ্রী পূ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রথমে পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করেন, পরে কৌটিল্যের সাহায্যে নন্দরাজকে নিহত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিপতি হন ('মৌর্যবংশ' দ্র)। সেলিউকাস-বিজেতা চন্দ্রগুপ্ত ('চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য' দ্র), তৎপুত্র বিন্দুসার ও তাঁহার পুত্র মহানুভব অশোক এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ('অশোক' দ্র)। অশোকের মৃত্যুর আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র সম্রাট হন। শুঙ্গবংশ ও পরবর্তী কাণ্ববংশের সময় মগধসাম্রাজের আয়তন ও প্রতিষ্ঠা হ্রাস পায়। পুষ্যমিত্রের সময়ে অগ্নিমিত্রকর্তৃক যবনাক্রমণ প্রতিহত হইলেও পরে খ্রী পূ প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ খারবেল 'রাজগৃহনৃপ'কে পর্যুদস্ত করেন। কুষাণ রাজত্বের সময়ে মগধ সম্পর্কে বিশেষ কোনও ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে গুপ্তবংশের রাজত্বকালে মগধ পুনরায় প্রাধান্যলাভ করে ('গুপ্তযুগ' দ্র)। ইহার পর অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌড়-মগধের রাজা ধর্মপাল ও দেবপাল ('দেবপাল', 'ধর্মপাল' ও 'পালবংশ' দ্র) পুনরায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহাদের পরে মগধের পুনরায় অবনতির সূত্রপাত হয়। অবশেষে সেনরাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে মগধ বা বিহার মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ('লক্ষ্মণসেন' ও 'সেনবংশ' দ্র)। ইহার পরে মগধের আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই।

দ্র R. C. Majumdar ed., *The History and Culture of the Indian People,* Vols. II, III, IV & V, Bombay, 1960, 1962, 1964, 1966.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মগহী আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা। মগধ অঞ্চলের মাগধী অপভ্রংশজাত ভাষা, মৈথিলীর ভগনীস্থানীয়।

পূর্বাঞ্চলের ভাষাসমূহের মধ্যে মগহী সর্বাপেক্ষা অবহেলিত। প্রাচীনকালেও বৌদ্ধযুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির পীঠস্থান

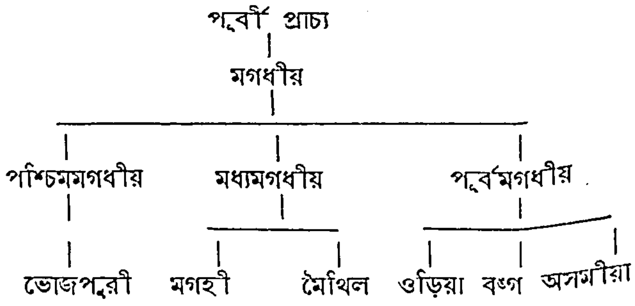

জনাকীর্ণ মগধ দ্বাদশ শতকের শেষে তুর্কী আক্রমণে হতমান হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা সংস্কৃতির মূলধারা হইতে বিচ্ছিন্ন ও কৃষিজীবিতে পরিণত হন। নবাগত সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ হিন্দী, ব্রজভাষা, অবধী, উর্দুভাষা ব্যবহার করিতেন। চর্চার অভাবে ও শিক্ষিতজন কর্তৃক উপেক্ষিত হইবার ফলে দক্ষিণ-বিহারের লোকভাষা মগহী অমার্জিত আঞ্চলিক ভাষায় পরিণত এবং সাহিত্যসৃষ্টিহীন। প্রৌঢ়, উন্নত এবং মার্জিত সাহিত্যের একান্ত অভাব, তবে মগহীর লোক-সাহিত্য ও লোক-সংগীত উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে হাজারিবাগ, পাটনা, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পালামৌ জেলার পশ্চিম অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে মগহী সীমাবদ্ধ।

অন্যান্য মগধীয় ভাষার ন্যায় মগহীতে সংবৃত 'অ' আনুনাসিক 'অ'তে রূপান্তরিত। 'শ, ষ, স' > 'শ'তে পরিবর্তিত। অপিনিহিত 'ই' লক্ষণীয়। অতীতকালে সকর্মক ক্রিয়ার বিভক্তি নিজস্ব ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছেঃ 'দেখলী, দেখলুঁ'। বর্তমানকালের প্রত্যয় 'অত' প্রথম পুরুষে ভবিষ্যৎকাল অর্থে ব্যবহৃতঃ 'দেখত, দেখতই'। ক্রিয়ার বহুবচনে 'থ' প্রত্যয় যুক্তঃ 'দেখথি'। 'ব' কখনও কখনও 'ম'তে পরিবর্তিতঃ 'লেবা' > 'লেমা'। সর্বনামের বহুবচনে 'রা' বিভক্তির প্রয়োগঃ হমরানী দেখা যায়।

ভাষার আধুনিক নিদর্শনঃ 'এক আদমীকা দু বেটা হলৈখন্। আউর উন্হ-কন্হিকের ছোটা অপ্না মহ্তারকে কহলখন্ কা, হে মহতার—সংপত্কের রে বোথ্রা হমরা বোথ্রামে পর হয়, উঅহ্ হমরা দহ্।'

দ্র সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত (৮ম সং), কলিকাতা, ১৯৬৪; G. A. Grierson, *Specimen Translations in Various Indian Languages,* Calcutta, 1897; S. K. Chatterji, *O. D. B. L.* (Vol. I), Calcutta, 1926.

বীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

মঙ্গলগ্রহ সূর্য হইতে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ মাইল। শুক্র ও মঙ্গল পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ। পৃথিবীর আগে শুক্র এবং বাহিরের দিকে অপর পার্শ্বে মঙ্গল। মঙ্গলের ব্যাস ৪২০৬ মাইল। ২৪ ঘণ্টা ৩৭

মিনিটে মঙ্গল অক্ষরেখার উপর আবর্তন করে এবং ৬৮৭ দিনে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ফোবস ও ডেমস নামে মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ আছে। উপগ্রহ দুইটির ব্যাস ১০ মাইলেরও কম। পৃথিবী হইতে মঙ্গলের নিকটতম দূরত্ব ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ছিল ৩ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল।

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, এই সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ইটালীয় বিজ্ঞানী সিয়াপেরিলি ১৮৭৭ সালে মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে সরল রেখার মত কতকগুলি খাল (ক্যানাল) দেখিতে পান এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষ করিয়া তাঁহার ধারণা জন্মায় যে, মঙ্গলে পৃথিবীর মানুষের মত বুদ্ধিজীবীরা কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য কৃত্রিম খাল খনন করিয়াছে। ইহা হইতেই মঙ্গলগ্রহে বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। মঙ্গলগ্রহে অক্সিজেন থাকিলেও তাহা খুবই সামান্য। শীতকালে মঙ্গলের মেরু অঞ্চলে তুষার আবরণের মত সাদা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই সাদা দাগ আকারে ছোট হইয়া যায়। মঙ্গলের আকাশে কিছু মেঘও দৃষ্টিগোচর হয়।

তবে মঙ্গলগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে ইহার পৃষ্ঠদেশে সবুজ রঙের কতকগুলি দাগ দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এই দাগগুলিকে অনেকটা বড় দেখায়, কিন্তু শীতকালে এগুলি ছোট হইয়া যায়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে অনুমান করা হয় যে মঙ্গলে হয়তো উদ্ভিদজাতীয় কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে শাক্ত দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক এক শ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাদিগকে মঙ্গল গান বলিত। বর্তমানে ইহা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। মঙ্গল শব্দটি ক্রমে মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক যে কোনও রচনা বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহার ফলে চৈতন্যদেবের জীবন-চরিতকে যেমন চৈতন্য-মঙ্গল বলিত, তেমনই পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারমূলক সংস্কৃত পুরাণের অনুবাদকেও মঙ্গল নামে অভিহিত করা হইত, যেমন ভবানী-মঙ্গল, দুর্গামঙ্গল ইত্যাদি। ক্রমে যে কোনও বিষয়ের মাহাত্ম্যসূচক পাঁচালী রচনাকেই মঙ্গল বলিত, তীর্থমাহাত্ম্যসূচক একটি রচনা তীর্থমঙ্গল নামে পরিচিত।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই মঙ্গল গানগুলি যে সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকারে রচিত হইয়া সমাজে প্রচার লাভ করিতেছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ব্যাপক প্রচারের ফলে ইহাদের ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকক্ষেত্রেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোনও রচনার মধ্যেই এখন আর চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় না।

মঙ্গল গানগুলির মধ্যে মনসা-মঙ্গলই প্রাচীনতম বলিয়া মনে হয়। কারণ, এ পর্যন্ত মঙ্গল গানের যে সকল প্রাচীন পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের পুথিই সর্বাধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্য-পূর্ববর্তীকালেই মনসা-মঙ্গলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহাদের রচনা বাংলার প্রায় সর্বত্র অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে হরিদত্ত, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস এবং নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদত্তকেই মনসা-মঙ্গল কাব্যের আদি কবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। চৈতন্য-পূর্ববর্তীযুগের বাংলা-সাহিত্যে আর কোনও বিষয়েরই এত কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় বাংলা সাহিত্যে মনসা-মঙ্গলের প্রচলন যেমন প্রাচীন, তেমনই ব্যাপক। চাঁদসদাগরের-বেহুলা-মনসার কাহিনী লইয়া মনসা-মঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে। শতাধিক কবি এই বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য-পরবর্তী যুগের মনসা-মঙ্গলের কবিদের মধ্যে কেতকা দাস, ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, জীবন মৈত্র প্রভৃতি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

মনসা-মঙ্গলের পরই চণ্ডীমঙ্গলের কথা উল্লেখযোগ্য। মাণিক দত্তকে চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া মনে করা হয়। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মালদহ অঞ্চলের কবি বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। তাঁহারই রচনার ধারা অনুসরণ করিয়া মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, তাঁহার উপাধি ছিল কবিকঙ্কণ। বর্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন দামুন্যা গ্রামে তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে তিনি বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে আসেন এবং সেখানকার ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর আশ্রয়ে বাস করিয়া কাব্য রচনা করেন। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে—মানসিংহ যখন বাংলার সুবেদার তখন—তাঁহার কাব্য রচনা করেন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। মাণিক দত্তের পথ অনুসরণ করিলেও তাঁহার রচনা স্বকীয় প্রতিভার স্পর্শে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। জীবনদৃষ্টিতে তাঁহার যে গভীরতা ছিল, তাহা দ্বারাই সেই যুগে তিনি কয়েকটি বাস্তব চরিত্র সৃষ্টি সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনার মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক গুণ বিকাশ লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের আর একজন কবির নাম দ্বিজমাধব। তিনি মুকুন্দরামের কিছু পূর্ববর্তীকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুথি কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ, বিশেষতঃ চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আত্মপরিচয় হইতে জানা যায়, তিনি পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে দ্বিজমাধবের

রচনা অনুসরণ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনার একটি নিজস্ব ধারার সৃষ্টি হইয়াছিল।

মনসা-মঙ্গলে যেমন একটিই অখণ্ড কাহিনী আনুপূর্বিক বর্ণিত হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি কাহিনী, একটির নায়ক ব্যাধ কালকেতু, অপরটির নায়ক ধনপতি সদাগর। দুইটি কাহিনীর সঙ্গে পরস্পর কোনও সম্পর্ক নাই, দুইটি কাহিনীর মধ্যে যে দুইটি দেবীর মহিমা কীর্তন করা হইয়াছে, তাঁহারা একই চণ্ডী নামে অভিহিত হইলেও ইঁহাদের গুণ পরস্পর স্বতন্ত্র। একজন পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর একজন হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার দেবতা, সাধারণ ইষ্ট করিবার গুণও তাঁহার আছে। দুইটি দেবী-চরিত্রের মধ্যে কোনও অখণ্ড ঐক্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তথাপি মুকুন্দরামের রচনার গুণে চণ্ডীমঙ্গলেরও ব্যাপক প্রচার হইয়াছিল।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারা অনুসরণ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয়, তাঁহার নাম ভারতচন্দ্র রায়। তিনি নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন, তাঁহার কাব্যের নাম অন্নদামঙ্গলকাব্য। চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অন্নদামঙ্গল রচিত হয় নাই, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা অন্নদার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়াছে। তবে ভারতচন্দ্র ইহার রচনায় মুকুন্দরাম-রচিত চণ্ডীমঙ্গলের প্রথমাংশের অনুকরণ করিয়াছেন। প্রথমাংশে পৌরাণিক শিব-প্রসঙ্গের বর্ণনা আছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী একত্র সংযুক্ত হইয়াছে, প্রথমাংশে হরিহোড়ের কাহিনী, দ্বিতীয়াংশে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী এবং তৃতীয়াংশে মানসিংহের কাহিনী। তিনটি বিষয়ই পরস্পর স্বতন্ত্র, একটির সঙ্গে আরেকটির কোনও সম্পর্ক নাই। তবে ভারতচন্দ্র কৌশলে ইহাদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই।

ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কেহ কেহ তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যে অন্তর্মুখী ভাব-গভীরতার পরিবর্তে বহির্মুখী শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্যই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতচন্দ্র শব্দশিল্পী, ভাষায় তিনি তাজমহল রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ভাবের দৈন্য গোপন করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার রচনায় সমসাময়িক সমাজের যে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত রুচি ও নীতিবোধের নিকট নিন্দিত হইয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে সে যুগের সমালোচকগণ উচ্চ স্থান দেন নাই। তথাপি দেখা যায়, ভারতচন্দ্রের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল, কেবলমাত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রভাব ম্লান হইতে আরম্ভ করে।

মঙ্গলকাব্যের আর একটি প্রধান শাখা ধর্মমঙ্গল। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার আদি কবির নাম ময়ূরভট্ট। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলের কবিই তাঁহাকে আদি কবি বলিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সহদেব চক্রবর্তী নামে একজন কবি তাঁহার রচিত ধর্মমঙ্গলকে অনিল পুরাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহার কোনও সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাংলাদেশের কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলেই রচিত হইয়াছিল এবং সেই অঞ্চলেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, যে দেবতার মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া এই কাব্যধারা রচিত হইয়াছিল, সেই দেবতার পরিচয় মনসা কিংবা চণ্ডীর মত এত ব্যাপক নহে, বরং কেবলমাত্র রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ইহার প্রতিবেশী অঞ্চলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই দেবতার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কেও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। ইঁহাকে বুদ্ধ, কচ্ছপ, যম, সূর্য, বিষ্ণু, বরুণ ইত্যাদি নানারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কিন্তু ডোম জাতির লোকেরই এই দেবতার পৌরোহিত্য করিবার মৌলিক অধিকার, অন্য কাহারও নহে। বিশেষতঃ এই দেবতার প্রকৃতি এবং পূজাচারের বিধি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইনি মূলতঃ আদিবাসীদের সূর্য দেবতা। যে সূর্যোপাসনা ভারতের অধিকাংশ আদিবাসীর মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে, ইহা তাহাই ; কালক্রমে বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে মাত্র। ডোম জাতি প্রাচীন আদিবাসী জাতিসম্ভূত। পশ্চিমবঙ্গে তাহারা ক্রমে হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই সূত্রেই ধর্মঠাকুরের পূজার মৌলিক অধিকার এখনও ডোম জাতিই রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মঙ্গলকাব্য রচনার যুগে সর্বস্তরের সমাজ কর্তৃক ধর্মঠাকুরের প্রভাবকে স্বীকার করিবার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দু কবিগণ তাঁহার মাহাত্ম্যসূচক কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার ফলে হিন্দু প্রভাব তাহার মধ্যে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের কাহিনীতেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার একটু ক্ষীণ ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। গৌড়ের সম্রাট ধর্মপালের পুত্রের সঙ্গে অজয়নদের দক্ষিণ তীরবর্তী একটি পার্বত্য গড়ের অধিপতি ইছাই ঘোষের যুদ্ধের বৃত্তান্ত লইয়া এই কাব্য রচিত হইয়াছে। এই গড়ের নাম ঢেকুরগড়। পরে ইছাই ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন ত্রিষষ্ঠী গড়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়কের নাম লাউসেন, ইনি গৌড়ের একজন সামন্তরাজ কর্ণসেনের পুত্র, তাঁহার রাজধানীর নাম ময়নানগর। ইহা বর্তমানে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ডোম নরনারীর বীরত্ব কীর্তিত হইয়াছে।

মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন তিনটি শাখা। ইহাদের পথ অনুসরণ করিয়া আরও বহু লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অপ্রধান মঙ্গলকাব্য বলিয়া উল্লেখ করা যায়। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, কপিলামঙ্গল ইহাদের অন্তর্গত। ইহাদের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। তবে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভারতচন্দ্র তাঁহার বিদ্যাসুন্দর কাব্য তাঁহার রচিত অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, তথাপি স্বতন্ত্রভাবেও ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদও অষ্টাদশ শতাব্দীতে একখানি বিদ্যাসুন্দরের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যগুলির উপর হইতে দেবদেবীর প্রতি ভক্তির ভাব দূর হইয়া যায়, তখন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু মঙ্গলকাব্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ই ভারতচন্দ্রের মানসিংহ কাব্য রচিত হয়। ইতিহাস এবং জনশ্রুতির একত্র সংমিশ্রণ করিয়া ভারতচন্দ্র ইহা রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশগৌরব প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়েই বর্গীর আক্রমণের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া গঙ্গারাম তাঁহার মহারাষ্ট্র পুরাণ রচনা করেন। তাহা পূর্ণাঙ্গ মঙ্গলকাব্য না হইলেও তাহার আদর্শেই রচিত হইয়াছিল।

দ্র আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৬৪।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

মজুর শ্রেণী দ্র

মজুরী দ্রব্যের ও সেবার উৎপাদনকার্যে প্রয়াসের জন্য জাতীয় আয়ের যে অংশ সর্বপ্রকার শ্রমিকের প্রাপ্য তাহাকে বলা হয় মজুরী। সচরাচর যাহারা কায়িক শ্রম করে তাহাদের সাপ্তাহিক বেতনকে মজুরী এবং আপিস কর্মচারি, পেশাজীবী, প্রভৃতি ব্যক্তির মাসিক বা বাৎসরিক বেতনকে বলা হয় মাহিনা।

মেহনতের বিনিময়ে শ্রমিক যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহা আর্থিক মজুরী। আর্থিক মজুরীর বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা কিনিতে পারা যায় তাহা প্রকৃত মজুরী। আর্থিক মজুরী ও জীবনধারণের ব্যয়, এই দুইটির উপর প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। শ্রমিকের মঙ্গলামঙ্গল প্রকৃত মজুরীর দ্বারাই নির্ণীত হয়। চুক্তিগত মজুরীর কিয়দংশ হইল স্থগিত মজুরী (deferred pay বা 'fringe benefits'); ব্যাধি, অক্ষমতা, মৃত্যু বা অবসরগ্রহণ ঘটিলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের (বা তাহার পরিজনবর্গের) সাহায্যার্থে ইহা কাটিয়া রাখা হয়। বাকিটা হইল নগদ মজুরী (direct pay) বা গৃহাগত মজুরী।

মজুরীর পূর্বাভাস প্রাচীন যুগে মানবসমাজে দেখা যাইলেও মজুরী প্রথা আধুনিক যুগের ধনতান্ত্রিক সমাজেরই ফলস্বরূপ ও তাহার একটি প্রধান বিশেষত্ব। অষ্টাদশ শতকের শিল্পবিপ্লবের পর ফ্যাক্টরি প্রথা ও মুদ্রাভিত্তিক বিনিময়ব্যবস্থার বিকাশের ফলে আধুনিক মজুরীপ্রথার উদ্ভব।

মজুরীর হার নির্ণয়ের ব্যাখ্যাকল্পে ফিজিওক্রাটগণ ও ডেভিড রিকার্ডো জীবনধারণ ব্যয় তত্ত্ব (subsistence theory) প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। পরিবার প্রতিপালন করিয়া জীবনধারণের জন্য যতটুকু খরচ শ্রমিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক মজুরীর হার তাহার সমান হইবে। মজুরীর হার ইহার নীচে নামিলে জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাওয়ার ফলে মজুরী বাড়িবে। অন্যদিকে মজুরীর হার ইহার ঊর্ধ্বে উঠিলে জনসংখ্যা ও শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মজুরী কমিবে। কার্ল মার্ক্স তত্ত্বটির অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁহার মতে শ্রমশক্তি একটি পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যের মতই তাহার মূল্য স্বীয় উৎপাদন ব্যয় বা পুনরুৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা নির্ণীত হয়। শ্রমিকদের নির্বিত্ততা ও একটি মজুত শ্রমিক বাহিনীর অস্তিত্ব মজুরীকে ইহার ঊর্ধ্বে উঠিতে দেয় না। হিক্‌জেয়ার, মার্শাল ও ক্লার্ক প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের দ্বারা মজুরীর হার নির্ণীত হয়। পিগু বলেন, একটি উচ্চ ও নিম্ন সীমার মধ্যে ব্যক্তিগত বা যৌথ দরাদরির দ্বারা মজুরীর হার স্থিরীকৃত হয়।

জীবনধারণ ব্যয়ের সূচক সংখ্যা বাড়িলে মজুরীর হারও আনুপাতিক ভাবে বাড়িবে, এই মর্মে একটি ধারা ('escalator clause') আজকাল প্রায় সকল মজুরী চুক্তিতে সন্নিবেশিত হয়। উদ্দীপক মজুরী (incentive wage) প্রথা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক, উভয়প্রকার সমাজব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। মজুরী সম্বন্ধে বর্তমানকালে রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ভারতে মজুরীদান বিধি (১৯৩৬ খ্রী), ন্যূনতম মজুরী বিধি (১৯৪৮ খ্রী) প্রভৃতি আইন পাশ হইয়াছে; প্রায় সকল বড় শিল্পে মজুরী নির্ণয়ের জন্য ত্রি-পাক্ষিক 'ওয়েজ বোর্ড' স্থাপিত হইয়াছে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

মজ্জা দেহের কাঠামো নানাপ্রকার অস্থির দ্বারা গঠিত। অস্থির মধ্যস্থ নরম রক্তবর্ণ বস্তুটি মজ্জা। দীর্ঘ অস্থির মধ্যভাগের মজ্জাতে অধিক মাত্রায় চর্বি থাকে এবং ইহাকে পীত মজ্জা বলা হয়। প্রান্তভাগের অস্থির মধ্যে মজ্জায় প্রচুর রক্ত থাকে এবং ইহাকে লোহিত মজ্জা বলা হয়।

মজ্জার অন্তঃস্থ প্রধান ধমনীগুলি অস্থির বহিরাবরণিক ধমনীগুলির সহিত সংযুক্ত। শৈশবে লোহিত মজ্জা পরিমাণে বেশি থাকে এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ কমিয়া কেবলমাত্র অস্থি-প্রান্তভাগে, পঞ্জরাস্থিতে ও মেরুদণ্ড প্রভৃতি কিছুসংখ্যক অস্থির মধ্যে জমা থাকে।

লোহিত মজ্জার মধ্যে অনেক প্রকার কোষ দেখা যায়, ইহারা সবই রক্তকণিকাদের পূর্ণাঙ্গ ও পূর্বরূপ কোষ। কণাযুক্ত শ্বেতকণিকা (Granulocytes), লোহিত কণিকা ও অণুচক্রিকার জন্মস্থান লোহিত মজ্জা। মজ্জার মধ্যে রক্তসঞ্চালন খুবই মন্থর এবং স্ফীত প্রাচীরহীন রক্তবহ-প্রণালীগুলিতে আপেক্ষিক অক্সিজেনের মাত্রাল্পতা লোহিত কণিকার আবহকালের জন্মস্থানরূপে পরিগণিত হয়। রক্তের অক্সিজেনের চাপ কম হইলে মজ্জায় রক্তকণিকা উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়। লোহিত কণিকার বিনাশও হয় এই মজ্জায় এবং লোহিত কণিকাস্থ লৌহ পুনরায় নূতন লোহিত কণিকাস্থ হিমোগ্লোবিনের উৎপাদন করে। বিভিন্ন হর্মোন, ভিটামিন ও লবণ রক্তকণিকা উৎপাদনে সাহায্য করে। নানাপ্রকার বিষাক্ত ভেষজ, তেজস্ক্রিয় রশ্মি লোহিত মজ্জাকে শক্তিহীন ও নিস্তেজ করিয়া দেয় ও কঠিন দুরারোগ্য রক্তাল্পতা ঘটায়। অধুনা একের সতেজ মজ্জা অন্যের নিষ্ক্রিয় মজ্জায় সঞ্চালন সম্ভব হইয়াছে। মজ্জা পরীক্ষায় বিভিন্নপ্রকার রক্তাল্পতার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় এবং অনেক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়। পীত মজ্জা দীর্ঘাস্থিগুলির মধ্য প্রণালীতে থাকে (medullary canal)। পীত মজ্জার রক্তকণিকা উৎপাদনের কোনওরূপ ক্ষমতা নাই।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

মটর শিম্ব গোত্রের অন্তর্গত বর্ষজীবী বীরুৎ। প্রধানতঃ শুষ্ক দানা ডাল হিসাবে এবং সবুজ অবস্থায় দানা পুষ্ট হইলে কাঁচা মটরশুঁটি তাজা সব্জিরূপে অথবা সংরক্ষিত করিয়া সমস্ত বৎসর ব্যবহার করা হয়। কাণ্ড নলাকার এবং শেষাংশ এক বা অধিক আকর্ষীতে রূপান্তরিত; যৌগপত্র পক্ষবৎ, সকর্ণ উপপত্র, ফুল সাদা নীলাভ অথবা বেগুনী-লাল, শুঁটি সরল অথবা বক্র সুচালো অথবা ভোঁতা; ৫-১০ সেণ্টিমিটার লম্বা, খোসা পুরু অথবা পাতলা ; বীজ ৬-৯। সবুজ, হলুদে-সবুজ, নীল-সবুজ, সাদা-ধূসর, বাদামী অথবা ছোপ ছোপ, মসৃণ এবং গোলাকার অথবা চ্যাপ্টা এবং কুঞ্চিত, আয়তনের তারতম্য ৩·৫-৫ মিলিমিটার। ছোট বা পায়রা মটর মাঠের ফসল, বড় বা কাবুলি মটর বাগিচার ফসল (ডালঃ মটর দ্র)।

বর্তমানে চাষ করা শুঁটির এবং ডালের মটর উভয়েরই যে সব বন্য প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহারা কতকগুলির মধ্যে সংকরায়ণ এবং পশ্চাৎ প্রজননের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মটরের বৈশিষ্ট্য বড় শুঁটি এবং বড় দানা। উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং আফগানিস্তানের বৈশিষ্ট্য ছোট শুঁটি এবং ছোট দানা, কিন্তু ইহারা দ্রুত পাকে এবং শুষ্কতাসহনশীল।

উন্নত জাতিরূপ সৃষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রিত প্রজননের কাজে প্রথম ব্যবহৃত ফসলের মধ্যে মটর একটি এবং ইহার উপরেই উদ্ভাবিত মেন্‌ডেলীয় প্রজননতত্ত্ব-এর উপর ভিত্তি করিয়াই আধুনিক প্রজনন বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করিয়াছে।

ভারতে ডালের জন্য মটর মাঠে ব্যাপক আকারে এবং বড় শহরের আশেপাশে শুঁটির জন্য চাষ করা হয়। আমাদের দেশের মোট চাষাঞ্চলের শতকরা ৮৩ ভাগই উত্তরপ্রদেশে সীমাবদ্ধ। এখানে এই চাষ ৩টি শ্রেণীতে বিভক্তঃ দেশী মটর, সাদা বা বড় বা কাবুলি মটর এবং মটরশুঁটি। যদিও সাদা মটরের ফলন বেশি তবুও পাখির উপদ্রবের দরুণ দেশী মটরের চাষেই সবাই বেশি আগ্রহী। মটরশুঁটির চাষ বর্তমানে ক্রমবর্ধমান এবং বহু নূতন জাতিরূপ বিদেশ হইতে আনিয়া প্রচলন করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অলডারম্যান, আর্লিব্যাজার, ম্যারোফ্যাট, টেলিফোন, আসাউজি এবং বন্নেভিল্লে উল্লেখযোগ্য।

ডালের এবং শুঁটির মটর উত্তর ভারতের সমতলভূমিতে শীতকালে রবি এবং পাহাড়ী অঞ্চলে খরিফ ফসলরূপে চাষ করা হয়। ডালের মটর দো-আঁশ এবং কাদা দো-আঁশ মাটিতে সাধারণতঃ জন্মান হয় কিন্তু শুঁটির মটর প্রায় সবরকম মাটিতেই জন্মান যায়।

ডালের মটর মাঠে সাধারণতঃ ছিটাইয়া বোনা হয় এবং বোনার পর মই দিয়া বীজ ঢাকিয়া দেওয়া হয়। হেক্টর প্রতি ৬৭—৯০ কিলোগ্রাম বীজ লাগে। শুঁটির মটর সমান জমিতে অথবা উঁচু বীজতলায় বপন করা হয় এবং উঁচু বীজতলায় সেচের জলের অপচয় কম হয়। জলদি জাতের বীজ হেক্টর প্রতি ছোট দানায় ৮০ কিলোগ্রাম এবং বড়য় ৯০ কিলোগ্রাম এবং প্রধান ফসলের জাতিরূপের ৬২-৬৭·৫ কিলোগ্রামের প্রয়োজন হয়।

মাটি ভালভাবে তৈয়ারি না হইলে অংকুরোদ্গম, ফসল পাকা এবং কাজেই ফলনের তারতম্য হইতে পারে। সেচের অঞ্চলে মাটি তৈয়ারি করার সময়ই হেক্টর প্রতি ২২·৫ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেন এবং ৬৭·৫ কিলোগ্রাম ফসফরাস প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যায়। খামারের সার প্রয়োগে মটর ভাল সাড়া দিয়া থাকে এবং সুপারফসফেট প্রয়োগে ভাল ফলন পাওয়া যায়। যে সব জমিতে পূর্বে শুঁটি জাতীয় ফসল জন্মান হয় নাই এবং জমি নীরস সেখানে শিকড়ের অর্বুদের ব্যাকটিরিয়ার টিকাযুক্ত বীজ বপন করার সুপারিশ করা হয় ভাল ফলনের জন্য।

মটর আক্রমণকারী একাধিক ছত্রাক এবং ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা কোনও কোনও সময় দানা এবং শুঁটির প্রচুর ক্ষতি করিয়া থাকে। একইরূপে মাঠে

এবং গোলায় একাধিক কীটশত্রু ফসল এবং দানার ক্ষতি করিয়া থাকে। বর্তমানে যে সমস্ত কীটঘ্ন এবং রোগঘ্ন রাসায়নিক বাজারে পাওয়া যায়, সময় মত তাহাদের প্রয়োগে ফসল রক্ষা করা সম্ভব।

দানার জন্য চাষ করা হইলে দানা সম্পূর্ণ পুষ্ট হইলে গাছ গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া মাড়াইয়ের উঠানে কয়েকদিন শুখাইবার পর বলদ দিয়া মাড়াই করা হয়। মটর-শুঁটির দানা যখন পুষ্ট পরিপূর্ণ অথচ কাঁচ থাকে এবং শুঁটির রঙ্‌ গাঢ় সবুজ হইতে ফিকা সবুজে পরিবর্তিত হয় তখনই তুলিয়া বাজারে পাঠাইতে হইবে। ইওরোপ আমেরিকায় শুঁটির চাষ ব্যাপকভাবে হয় টিনজাত এবং জলদি-জমাট করার জন্য এবং তাই শুঁটি তোলার সর্বোত্তম সময় নির্ধারণের জন্য যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ৫-৭ সপ্তাহ ধরিয়া ৭-৮ বারে যখন যেমন উপযুক্ত হয় তখন শুঁটি ছিঁড়িয়া গাছের ক্ষতি না করিয়া বোঁটা কাটিয়া তোলা হয়।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা পৃথিবীতে ৯১৬৫০০০ হেক্‌টরে চাষ করিয়া যেখানে ফলন পাওয়া যায় ৯৪৩২০০০ টোনে (গড় ফলন ১০৩০ কিলোগ্রাম/হেক্‌টর) সেখানে ভারতে ১০৯৬০০০ হেক্‌টরে চাষ করিয়া পাওয়া যায় মাত্র ৬৬০০০০ টোনে (গড় ফলন ৬০০ কিলোগ্রাম/হেক্টর)।

অন্যান্য শুঁটিজাতীয় ফসলের মতই মটর প্রোটিন, ভিটামিন (বিশেষভাবে বি বর্গের) এবং খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। মটরে পটাসিয়াম এবং ফসফরাসের পরিমাণ বেশ ভাল। শুষ্ক দানা ডাল, ডালমুট এবং মটর ভাজা, এবং পিষাই করা চূর্ণ বেসমরূপে ব্যবহার করা হয়। জলে ভিজান কাবুলি মটর সিদ্ধ করিয়া বানান ঘুগনি অতি উপাদেয়; কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাংসও যোগ করা হয়। বিদেশে খোসা ছাড়ান মটরশুঁটির সবুজ দানা নানাভাবে সংরক্ষণ করিয়া ১২ মাস ব্যবহার করা হয়। ভারতে এইভাবে ব্যবহারের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ মাত্র। টিনজাত মটর সাধারণতঃ ঘরের তাপে প্রায় ১ বৎসর রাখা যায়।

মটরগাছের কাঁচ ডগা সুমিষ্ট, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর শাক এবং বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়।

শুষ্ক মটর হইতে যে শতকরা ১-২ ভাগ ফিকা-সোনালী-হলুদ স্নেহময় তৈল পাওয়া যায় তাহা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের উপরই সূচি প্রয়োগে জন্ম নিরোধের সম্ভাবনার আশা দেখা যাইতেছে।

দ্র S. Sen & A. G. Kanitkar, *Statistical Studies of the Crop Yield Data II, Study of Oats, Peas, Wheat and Gram Yield*, Indian Journal of Agricultural Science, Vol. XXVIII, Part I, New Delhi, 1958; Food and Agricultural Organization, United Nations, *Production Year Book*, Vol. 22, Rome, 1968; Council of Scientific and Industrial Research, *The Wealth of India : Raw Materials*, Vol. VIII, New Delhi, 1969.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

মডুলেশন স্থানান্তরে বার্তা প্রেরণের ব্যাপারে একটি আনুষঙ্গিক অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়া। যে কোনও মাধ্যমের সহায়তায় যখন বার্তা প্রেরণ করা হয় তখন বার্তার প্রকৃতি অনুযায়ী মাধ্যমের মধ্যে একটা কিছু পরিবর্তন সাধন করাকেই বলা হয় মডুলেশন। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার—এই সবগুলির ক্ষেত্রেই মডুলেশন একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। মাধ্যমের অবস্থা যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অপরিবর্তিত থাকে তবে তাহা কোনও অর্থপূর্ণ সংবাদ (intelligence) বহন করিয়া আনে না। টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়া যদি একটানা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে তবে সংবাদ প্রেরণের পক্ষে তাহা নিরর্থক। প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে তাহাতে স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী ছেদ (টরে টক্কা) সৃষ্টি করিলে তবেই তাহা অর্থপূর্ণ সংকেত বলিয়া চেনা যায়—ইহাই হইল মডুলেশন।

বেতারে অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রেও মডুলেশন প্রয়োজন। কথাবার্তা বা গানবাজনায় যে শব্দতরঙ্গের উদ্ভব হয় তাহাকে প্রথমে মাইক্রোফোনের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহে রূপান্তরিত করা হয়—এই বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন শব্দতরঙ্গের অবিকল প্রতিলিপি। বেতারের বাহক তরঙ্গের (carrier wave) কোনও একটি বৈশিষ্ট্যকে এই বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া দিলেই বাহক তরঙ্গ ঐ বার্তা বহন করিতে সক্ষম হইবে। সাধারণতঃ বেতার অনুষ্ঠান প্রচারে বাহকের বিস্তার (amplitude) পরিবর্তন বা মডুলেশন করা হয়। বিস্তার ছাড়া তরঙ্গের কম্পনসংখ্যা (frequency) বা দশা (phase)—এই দুটি বৈশিষ্ট্যের উপরেও মডুলেশন করা যাইতে পারে।

মুক্তিসাধন বসু

মণিপুর ভারতের পূর্বসীমান্তে অবস্থিত একটি রাজ্য। ইহা ২৩°৫৩′-২৫°৪১′ উত্তর এবং ৯৩°০′-৯৪°৪৭′ পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ ও আসামের মিজো জেলা এবং পশ্চিমে আসামের কাছাড় জেলা দ্বারা বেষ্টিত। এই রাজ্যের আয়তন প্রায় ২২৩৪৯ বর্গ কিলোমিটার; লোকবসতি ৭৮০০৩৭ (১৯৬১)। রাজ্যটি চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত। পর্বতগুলির উচ্চতা সাধারণতঃ ৭৬০ মিটার হইতে ৩০৫০ মিটার। মোট স্থানের প্রায় নয়দশমাংশই পর্বতাবৃত।

প্রাচীনকালে এখানে বহিরাগত কোনও কোনও উপজাতি বাস করিত। মণিপুরের রাজারা মহাভারতে বর্ণিত তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের বংশধর বলিয়া কথিত।

ব্রহ্মদেশের শানদেশীয় এক রাজবংশ মণিপুরে প্রথম

রাজ্যস্থাপন করে বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১৭৭৪ সালে ‘পাম হাইবা’ নামে এক নাগা মণিপুরের রাজা হন। তিনি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইয়া ‘গরিবনিওয়াজ’ নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশ মণিপুর আক্রমণ করে। তৎকালীন রাজা জয়সিংহ ইংরেজদের সহায়তা প্রার্থনা করিলে তাঁহার সহিত ইংরেজদের এক সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মণিপুর রক্ষা পায়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাজ সুরচন্দ্র সিং-এর দুই ভ্রাতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলে তিনি ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজা হন কিন্তু অপর ভ্রাতা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎই ক্ষমতার অধিকারী হন। ইংরেজ সরকার কুলচন্দ্রকে যুবরাজ বলিয়া স্বীকার করেন; এবং সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার বেআইনী কার্যের জন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে চীফ কমিশনারকে সসৈন্যে মণিপুরে পাঠাইলে (১৮৯১) যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধবিরতি হইলে চীফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজ অফিসারগণ আলাপ আলোচনার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু কোন সন্তোষজনক মীমাংসা না হওয়ায় তাঁহারা যখন ফিরিতেছিলেন তখন হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হন এবং বাকি সকলকে বিচার করিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ইংরেজদের উপর আবার আক্রমণ হইলে তাঁহারা কাছাড় হইতে পলাইয়া যান। অতঃপর ব্রহ্মদেশ, কাছাড় ও নাগাপাহাড় এই তিন-দিক হইতে আক্রমণ চালাইয়া ইংরেজরা ২৭শে এপ্রিল ইম্ফল দখল করেন এবং যুবরাজ ও সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেনাপতি ও অন্যান্য নেতাদের প্রাণদণ্ড এবং যুবরাজসহ অপর সকলকে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত করা হয়। রাজপরিবারের এক বালক চুরাচান্দকে সিংহাসনে বসান হয়।

মণিপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে সবুজনীল জঙ্গলময় পর্বতের প্রাচীর, মাঝখানে শস্য-শ্যামলা উর্বরা নদী-উপত্যকা। মণিপুর রাজ্যটি প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ঃ ১. ইম্ফল—শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ২. সদর বিভাগ—পূর্ব ইম্ফল, পশ্চিম ইম্ফল, বিষেণপুর, খেবাল, মায়াং ইম্ফল ও হিল সদর। ৩. পার্শ্ববর্তী পার্বত্যাঞ্চল—মাও, উখরুল, টেংনুপল, চুরাচান্দপুর, টামেংল জিরিরাম বিভাগ। মণিপুর রাজ্যের মধ্যে ইম্ফল প্রধান নদী। অন্যান্য নদীর মধ্যে ইরিল, খোবল ও নাম্বল নদী কয়টি উপত্যকা অঞ্চল বিধৌত করিতেছে।

ভৌগোলিক অনেকের ধারণা মণিপুর উপত্যকা প্রথমে একটি বৃহৎ হ্রদ ছিল। পরে হ্রদ হইতে নদী সৃষ্টি হওয়ায় জল বাহির হইয়া যায় এবং হ্রদ শুকাইয়া সমতল ভূমির সৃষ্টি হয়। এই এককালীন সুবৃহৎ হ্রদের অবশিষ্টাংশ লগতাক হ্রদ নামে পরিচিত।

খনিজদ্রব্য মণিপুরে বিশেষ কিছুই নাই। উখরুল ও পালেল অঞ্চলে চুনাপাথর পাওয়া যায়। পার্বত্য অঞ্চলের কোথাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা আছে কিন্তু তাহার উদ্ধার খুবই ব্যয়সাধ্য। কিছু লোহাও পাওয়া যায়।

পার্বত্যাঞ্চল গভীর জঙ্গলাবৃত। জঙ্গলে নাহর, জারুল, ওক্, অ্যাশ ইত্যাদি গাছ প্রচুর জন্মে। বাঁশ প্রায় সর্বত্রই আছে। পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী কাবো উপত্যকার নিকটবর্তী পার্বত্যাঞ্চলের সেগুন প্রসিদ্ধ। রবার গাছও দেখা যায়। ইম্ফলের দক্ষিণে লগতাক হ্রদের চারিদিকে তৃণাবৃত বনভূমি আছে।

জঙ্গলে হাতি, বাঘ, চিতা, ভালুক, হরিণ, শূকর ইত্যাদি অনেক আছে। গণ্ডার ও বাইসন দক্ষিণদিকে কিছু আছে। তবে সংখ্যায় খুবই কম। লগতাক হ্রদ অঞ্চলে প্রচুর বন্য হাঁস মুরগী পাওয়া যায়।

মণিপুরের শতকরা ৮৩·৪ জন কৃষিজীবি। উপত্যকা অঞ্চলের মোট ১৮৭০ বর্গ কিলোমিটার জমির মধ্যে প্রায় অর্ধেক জমিতে চাষ হয়। এখানকার কুটির শিল্প বিখ্যাত। তাহার মধ্যে মণিপুরের রেশম ও তাঁত বস্ত্রের শিল্প অত্যন্ত উন্নত।

মণিপুর পোলো খেলার জন্য সুপ্রসিদ্ধ। মণিপুরী টাট্টু (ঘোড়া) ভারতবিখ্যাত।

অধিকাংশ মণিপুরী নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন এবং উপবীত ধারণ করেন। ইঁহাদের এক শ্রেণী বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী নামে পরিচিত। অপর এক শ্রেণী রাজকুমার নামে পরিচিত। ইঁহাদের রাজবংশে জন্ম। বিদ্রোহের (১৮৯১) পর ইঁহারা সাধারণ শ্রেণীর সহিত মিশিয়া যাইতেছেন। মণিপুরী ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই বাংলাদেশ হইতে আগত। মণিপুরী মুসলমানরা প্রধানতঃ শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে আগত। ভাষা মণিপুরী। সমাজে স্ত্রীলোকদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। ব্যবসা বাণিজ্য, কুটির শিল্প, প্রভৃতি সকল বিষয়ই তাঁহাদের আয়ত্তে। বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে।

মণিপুরে সকল প্রকার বৈষ্ণব ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন আছে। দোলযাত্রা সর্বপ্রধান উৎসব। দুর্গোৎসব, দীপাবলী ইত্যাদি উৎসবেরও প্রচলন আছে। মণিপুরী ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য (রাসনৃত্য) ও লোকনৃত্য ভারতবিখ্যাত। থাবল চোংবা বা বসন্তের নাচ খুবই জনপ্রিয়। ঈশ্বরের লীলা ও বিশ্বের সৃষ্টি বিষয়ক ‘লাইহারোবা’ এবং প্রেমবিষয়ক খাম্বাথৈবী নাচ (লোকনৃত্য) প্রতিগৃহে শিশুকাল হইতেই সকলে শিক্ষা করে।

মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিপুরী নৃত্য নৃত্য দ্র

মণিমুক্তা অনাদিকাল হইতে মানুষ মণিমুক্তা বা রত্ন অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। খাঁটি রত্ন প্রকৃতিজাত। উৎপত্তি হিসাবে রত্নকে দুই শ্রেণীতে ভাগ

করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে মুক্তা, তৈলস্ফটিক (amber) ও পলা (coral) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে হীরক, নীলা, পান্না, চুনি প্রভৃতি। অনতিকাল পূর্বে নানা জাতীয় অজৈব রত্নপ্রস্তর সংযোজন (synthetic) প্রণালীতে প্রস্তুত করা সম্ভবপর হইয়াছে। সংযোজিত রত্নপ্রস্তর অনুরূপ প্রকৃতিজাত রত্নপ্রস্তর হইতে কোনরূপেই বিভিন্ন নহে। উভয়েরই ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্মাবলি এক। রত্নের আদর নির্ভর করে উহার স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, আয়তন, আকৃতি প্রভৃতি গুণাবলির উপর। অজৈব রত্নপ্রস্তর বিশেষ অজৈব দ্রব্যের স্ফটিক। রত্নপ্রস্তরকে কাটিয়া এবং পালিস করিয়া রত্নে পরিণত করা হয়। জৈব-রত্নগুলির রাসায়নিক গঠন বিশেষ জটিল এবং সম্যকরূপে জ্ঞাত নহে।

তৈলস্ফটিক— একজাতীয় জীবাশ্ম (fossil)। সাধারণতঃ গুটিকাকৃতিতে ব্যবহৃত হয়। বর্ণ হলুদ হইতে পিঙ্গল।

মুক্তা— ঝিনুকের মধ্যে পাওয়া যায়। বর্ণ সাদা, ফিকে বাদামী (cream) অথবা হলুদ এবং গোলাপী অথবা অন্য বর্ণের আভাযুক্ত।

পলা—বিশেষ জাতীয় সামুদ্রিক জীবাণুর সমষ্টি। বর্ণ রক্তজাতীয়।

অজৈব রত্নপ্রস্তরগুলি এক একটি বিশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের স্ফটিক। এই জাতীয় কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের উল্লেখ করা হইল। বিশুদ্ধ অবস্থায় রত্নপ্রস্তরগুলি স্বচ্ছ এবং জলশুভ্র। সামান্য পরিমাণ অন্যান্য ধাতুর যৌগ মালিন্য (impurity) হিসাবে বর্তমান থাকিয়া রত্ন-প্রস্তরগুলিতে নানা প্রকার বর্ণ আরোপ করে।

কোরাণ্ডাম (corundum)—রাসায়নিক গঠন অ্যালু-মিনিয়ম অক্সাইড। পোক্‌রাজ, চুনি, নীলা এই জাতীয় রত্ন।

বেরিল (beryl)— রাসায়নিক গঠন বেরিলিয়াম অ্যালু-মিনিয়াম সিলিকেট। পান্না এই জাতীয় রত্ন। ক্রাইসবেরিল নামক আর একপ্রকার বেরিলিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট রত্নপ্রস্তর জানা আছে যাহা কখন স্বচ্ছ কখন ঈষদচ্ছ (*transluscent*)। বৈদুর্যমণি (cat's eye) এই জাতীয় রত্ন।

হীরক— রাসায়নিক গঠন কার্বন।

স্পিনেল (spinel)— রাসায়নিক গঠন ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনেট।

টাইটানিয়া (titania)—রাসায়নিক গঠন টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড। সম্পূর্ণরূপে সংযোজিত রত্নপ্রস্তর। ইহার জুড়ি প্রকৃতিজাত রত্নপ্রস্তর নাই।

ফণীন্দ্রনাথ বাগচী

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯ খ্রী)। জন্ম শ্রাবণ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ, মৃত্যু ফাল্গুন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ। পিতা বিক্রমপুরনিবাসী অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা। স্বর্ণকুমারী দেবীর পর দীর্ঘকাল 'ভারতী' পত্রিকা (১৩২২-২৯ বঙ্গাব্দ) সম্পাদন করেন।

নানাপ্রকার ভৌতিক ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। নাট্যা-চার্য শিশিরকুমারের সংশ্রবে আসেন ও নৃত্যাদি পরিচালনাতে দক্ষতা দেখান। গদ্য রচনায় অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে।

রচনাবলীঃ উপন্যাস— 'ভাগ্যচক্র' (অনুবাদ, ১৯১১), 'মনে মনে' (১৯১৯); গল্পগ্রন্থ— 'জাপানী ফানুস' (১৯০৯), 'ভুতুড়ে কান্ড' (১৯০৮), 'কল্পকথা' (১৯০৯), 'ঝাঁপি' (১৯১২), 'মহুয়া' (১৯১৩), 'খেয়ালের খেসারৎ' (১৯২২) ও 'মহাপ্রলয়'; সম্পাদিত গ্রন্থ— 'কাদম্বরী' (১৩১৭ বঙ্গাব্দ) ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

দ্র হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'মণিলালের আসর', মানসী ও মর্মবাণী, কলিকাতা, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়', সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা, ১৭ আষাঢ়, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।

বারিদবরণ ঘোষ

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১২৬৭-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) স্বনামধন্য দানবীর, বিদ্যোৎসাহী, বাংলাসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক, বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তা এবং অভিজাত ভূম্যধিকারী।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২৮ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় রামকান্ত বসু স্ট্রীটে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নবীনচন্দ্র নন্দী, মাতা গোবিন্দসুন্দরী। কলিকাতার শ্যাম-বাজার অ্যাংলো-ভার্নাকুলার (এ. ভি.) স্কুল ও হিন্দু স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১২৮২ বঙ্গাব্দে কাশীশ্বরীর সহিত বিবাহ হয়। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে তিনি কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের উত্তরাধিকার লাভ করেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র মহারাজা, কে. সি. আই. ই, শ্রীগৌড়-রাজর্ষি, ধর্মরাজ, বিদ্যারঞ্জন, ভক্তিসাগর, দানকল্পতরু, ভারতধর্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার বিরাট দানের জন্য খ্যাত। বিবিধ সৎকর্মে তিনি কিঞ্চিদধিক তিন কোটি টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবৎকালে এমন কোনও প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার প্রার্থনা তাঁহার নিকট অপূর্ণ রহিয়াছে। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় আইন কলেজ, বসু বিজ্ঞানমন্দির, যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ ও স্কুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, কলিকাতা অ্যালবার্ট ভিক্টর কুষ্ঠ হাসপাতাল, বহরমপুর ওয়াটার ওয়ার্কস, বহরমপুর হাসপাতাল, কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, বেঙ্গলী পত্রিকা, কলিকাতা মূক বধির বিদ্যালয় ইত্যাদি বহু প্রতি-ষ্ঠান তাঁহার দানে সমৃদ্ধ। যে ভূমির উপর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও রমেশ ভবন প্রতিষ্ঠিত তাহাও তাঁহারই দান। কেবল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজেই ১৯০২ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার দান প্রায় দশ লক্ষ টাকা।

দেশের শিল্পোন্নয়নেও তাঁহার অবদান সুবিদিত। কলিকাতায় প্রথমে ক্যালকাটা ও পরে বেঙ্গল পটারী, হালসিবাগানে টিন প্রিণ্টিং, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণায় চীনামাটির খনি, পাকুড় রাজগাঁও ও নলহাটিতে পাথরের খাদান ও কারখানা, বহরমপুরে উইভিং ট্যানারী তেলের কল, উলিপুরে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয় ইত্যাদি সমধিক উল্লেখযোগ্য।

তিনি বাংলা সাহিত্যেরও অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে কাশিমবাজারে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। বহু সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগুণী তাঁহাদের গ্রন্থ প্রকাশের জন্য তাঁহার নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়াছেন। ডাঃ বামনদাস বসুর Indian Medicinal Plants, শ্রীধর স্বামী ও সনাতন গোস্বামীর টীকাসহ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ এবং ইংরাজী ও দেবনাগরী অক্ষরে ঋগ্‌বেদ তাঁহারই অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়।

তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন ঃ নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি (১৯১৫ খ্রী, হরিদ্বার), গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনের স্রষ্টা, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রবর্তক, বঙ্গীয় মহাজন সভা (১৯১৮-২০ খ্রী), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন (১৯২২-২৩ খ্রী), মুর্শিদাবাদ সম্মিলনী (১৮৯৩ হইতে আমৃত্যু) এবং অখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর (১৯১৮-২২ খ্রী) সভাপতি, বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য (১৯০১-৪ খ্রী, ১৯০৯-১২ খ্রী), ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের (১৯১৩-১৬ খ্রী) সদস্য, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯১৭-২১ খ্রী), কাউন্সিল অব্‌ স্টেটের (১৯২১-২৪ খ্রী) সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নির্ভীক। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভায় মহারাজা সভাপতিত্ব করেন। সেই সভাতেই প্রকাশ্যভাবে বিলাতী পণ্য বর্জন নীতি গৃহীত হয়। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে তিনি রৌলট বিলের বিপক্ষে ভোট দেন। আবার প্রাচীন বর্ণাশ্রমের অনুরাগী হিসাবে তিনি গৌড়ের সহবাস সম্মতি বিল, প্যাটেলের অসবর্ণ বিবাহ বিলের বিরোধিতা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

তাঁহার বিচিত্র কর্মজীবনে বাংলা ও ভারতের বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিতও তাঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বাহিরে কুলিপ্রেরণের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধী যখন কলিকাতা আসেন, তখন তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। মহারাজার অনুরোধে গান্ধীজী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ পরিদর্শন করেন। গান্ধীজী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন, "আমি এতদিন মনে ভাবিতাম, জগতের মধ্যে বুঝি আমার পার্শী বন্ধুগণের দানের তুলনা নাই। এখন দেখিতেছি যে, সে ধারণা শুধু সম্প্রদায় হিসাবেই তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এমন একজন পার্শীর কথাও আমার মনে পড়ে না, যাঁহার দান কাশিমবাজারের দানকে অতিক্রম করিতে পারে।"

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮৯৮-১৯৬৮ খ্রী)। জন্ম ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ ঢাকা জেলার আউটশাহী গ্রামে। পিতা রাজেন্দ্রভূষণ, মাতা গিরিজাসুন্দরী। কৈশোরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যয়নকালেই চিত্রাঙ্কনে তাঁহার অনুরাগ ও দক্ষতা প্রকাশ পায়, এই সূত্রে তিনি অবনীন্দ্রনাথের স্নেহ-দৃষ্টি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকায় বি. এ. পড়িবার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা ত্যাগ করেন ও শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিক্ষার্থীরূপে যোগ দেন। আচার্য নন্দলালের পরিচালনায় শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করিয়া তিনি সিংহলে কলম্বো আনন্দ কলেজে চিত্রবিদ্যার শিক্ষকরূপে যোগ দেন। এই সময় তিনি সিংহলের শিল্পকলা ও সংস্কৃতি বিশেষরূপে অনুশীলন করেন। তাঁহার 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' পুস্তক তাহার নিদর্শন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সরকারি কলাবিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কর্মে নিবিষ্ট ছিলেন।

মণীন্দ্রভূষণের শিল্পীজীবন নব্যবঙ্গীয় শিল্পধারার অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তিনি আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের গতিপ্রকৃতির সহিতও সম্যক পরিচিত ছিলেন। এচিং, লিনোকাট প্রভৃতি ছাপের ছবিতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। পুরাণ, ইতিহাস, আধুনিক জীবনযাত্রা, প্রতিকৃতি, এসকলই তাঁহার চিত্রের উপজীব্য ছিল; দৃশ্যচিত্রে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন দেশের শিল্প-ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া মণীন্দ্রভূষণ বাংলায় ও ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শিল্পী-চরিত, শিল্পতত্ত্বালোচনাও এই প্রবন্ধমালার অন্তর্গত; সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এগুলি বিক্ষিপ্ত। কোনও কোনও কুটিরশিল্পের রীতিপদ্ধতি তিনি বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়াছিলেন; কাগজ প্রস্তুত ও গালা শিল্পসম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ প্রামাণিক বলিয়া গণনীয়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা' এবং Impressions of a Pilgrimage to Kedarnath and Badrinath in Twelve Linocuts বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

পুলিনবিহারী সেন

মণ্ডন মিশ্র (আনুমানিক ৬৮০-৭৫০ খ্রী) দাক্ষিণাত্যের

ব্রাহ্মণ হিমমিশ্রের পুত্র। মাহিষ্মতী ও নর্মদা নদীর সংযোগস্থলের নিকটবর্তী মাহিষ্মতী নগরের অধিবাসী। আনন্দগিরির মতে, হস্তিনাপুরের পূর্ব-দক্ষিণে বিজিলবিন্দুর অধিবাসী। ইনি ছিলেন ষড়দর্শনে পারংগম, সুবিখ্যাত পূর্বমীমাংসা দর্শনের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা। দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত কুমারিল ভট্টের (৭০০ খ্রী আনুমানিক) প্রধান শিষ্য। কুমারিল ভট্ট ও মণ্ডন মিশ্র বেদের বিশুদ্ধ ক্রিয়াকাণ্ডকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানকেই তাঁহারা ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বিধিবিবেক ও মীমাংসানুক্রমণী মণ্ডন মিশ্র প্রণীত শ্রেষ্ঠ দুই গ্রন্থ। তিনি রূপ, বিদ্যা, গুণে অসামান্যা বিষ্ণুমিত্রের কন্যা উভয়ভারতীকে বিবাহ করেন।

অদ্বৈত বেদান্তের প্রবক্তা শংকরাচার্যের (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী, কোনও কোনও মত অনুযায়ী ৭৮৮—৮২০ খ্রী) সহিত মণ্ডন মিশ্রের তর্কযুদ্ধের বিবরণ সুপ্রসিদ্ধ। এই বিচার সভায় মণ্ডনমিশ্রের মনস্বিনী পত্নী উভয়ভারতী মধ্যস্থা হইয়াছিলেন। তর্কের ফলে মণ্ডনমিশ্র পরাজয় স্বীকার করেন এবং শংকরাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদান্তদর্শনের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতারূপে যশঃ অর্জন করেন। মতান্তরে এই সময় তিনি সুরেশ্বরাচার্য নামে খ্যাত হন।

মণ্ডনমিশ্রের পরাজয়ে সমগ্র ভারতে পূর্ব মীমাংসার বেদোক্ত মর্মবাদের পরিবর্তে শংকরাচার্যের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শংকরাচার্যের সহিত মণ্ডন মিশ্র প্রমুখ পূর্বমীমাংসক এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের বিচারের বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ কাহিনী বহু অলৌকিক ঘটনা সহ সর্বদর্শন সংগ্রহ প্রণেতা মাধবাচার্য ও আনন্দগিরি শংকর দিগ্বিজয় এবং শংকর বিজয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের দুই বিবরণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অনৈক্য রহিয়াছে। তথাপি তৎকালীন ভারতের জ্ঞানচর্চা এবং সামাজিক জীবনের একটি চমৎকার চিত্র এই বিবরণগুলি হইতে জানা যায়।

দ্র মাধবাচার্য, সর্বদর্শন সংগ্রহ ও শংকর দিগ্বিজয়; আনন্দগিরি, শংকর বিজয়।

বিভুরঞ্জন গুহ

মণ্ডল১ঃ প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। সকলে মিলিয়া একসংগে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার আদর্শ সে যুগে বিশেষ আদৃত হইত না। প্রত্যেক উদ্যমশীল নৃপতিই আশপাশের রাজ্যগুলি জয় করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট হইবার চেষ্টা করিতেন। রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাহাতে শক্তি-সাম্য (Balance of Power) বজায় থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই অর্থশাস্ত্রবিদেরা 'মণ্ডল'বাদ ব্যাখ্যা করেন।

বারটি রাষ্ট্র লইয়া মণ্ডল কল্পিত হয়। ইহার মাঝখানে থাকেন জয় করিতে ইচ্ছুক রাজা—বিজিগীষু (১)। তাঁহার সম্মুখভাগে পাঁচটি, পিছনে চারটি এবং কিছু পাশে দুইজন রাজার অবস্থান। মণ্ডল-মতবাদের মূলকথা হইতেছে এই যে, এক রাজ্যের অব্যবহিত নিকটে অবস্থিত রাজ্যের সহিত শত্রুতা অবশ্যম্ভাবী, সেইজন্য শত্রুর রাজ্যের পরে যে রাজ্য থাকে তাহার সহিত মিত্রতা হওয়া স্বাভাবিক। বিজিগীষুর সম্মুখদিকে যে রাজ্য থাকে তাহার অধিপতি তাঁহার অরি (২), অরির সংগে তাঁহার পাশের রাজ্যের (৩) শত্রুতা, সুতরাং ৩ সংখ্যক রাজ্য বিজিগীষুর মিত্র, কিন্তু ৪ সংখ্যক রাজ্যটি ২ সংখ্যকের মিত্র বলিয়া বিজিগীষুর শত্রু। সেইরূপ ৫ সংখ্যক মিত্রমিত্র রাজ্যের সংগে বিজিগীষুর বন্ধুত্ব এবং ৬ সংখ্যক অরিমিত্রের সংগে শত্রুতা। বিজিগীষুর পিছনে যে রাজা থাকেন তাঁহার নাম পার্ষ্ণিগ্রাহ (৯), তাঁহার সহিত বিজিগীষুর সহজ শত্রুতা। ১০ সংখ্যক রাজ্যের রাজা যেহেতু ৯ সংখ্যকের শত্রু সেইজন্য তিনি ১ সংখ্যকের মিত্র—তাঁহার নাম আক্রন্দ (১০)। ১১ সংখ্যক নৃপতি পার্ষ্ণিগ্রাহাসার বিজিগীষুর শত্রু, কিন্তু ১২ সংখ্যক আক্রন্দাসার তাঁহার মিত্র। বিজিগীষুর প্রভাবের বাহিরে যে রাজা অবস্থিত তাঁহাকে উদাসীন (৭) বলে। মধ্যম নৃপতি (৮) এমন শক্তিশালী যে তিনি বিজিগীষু ও তাঁহার অরিকে সাহায্য করিতে পারেন এবং তাঁহারা কেহ একা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি প্রতিরোধ করিতে পারেন।

মনু (৭।১৭৭) বলেন যে, রাজার এমনভাবে প্রস্তুত থাকা কর্তব্য যে তাঁহার মিত্র, শত্রু বা উদাসীন যেন তাঁহার চেয়ে অধিক শক্তিশালী না হইতে পারেন। মেধাতিথি ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে স্বার্থের প্রয়োজনে মিত্রও শত্রু হইতে পারে।

মণ্ডলের কথা কৌটিল্য (৬।২ এবং ৭ প্রকরণ), মনু (৭।১৫৪—২১১), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৪৫—৩৪৮), অগ্নিপুরাণ (২৩৩ এবং ২৪০ অঃ), মহাভারতের আশ্রমবাসিকপর্ব (৬ এবং ৭) প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

বিমানবিহারী মজুমদার

মণ্ডল২ সাধারণতঃ দৈনন্দিন ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মে ঘরের মেজেতে জলরেখার দ্বারা ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ ক্ষেত্র বা মণ্ডল অঙ্কন পূর্বক স্থানটি পবিত্র করিয়া তাহার উপর পূজার পাত্র ও উপকরণাদি রাখা হয়। নানাবর্ণে রঞ্জিত মণ্ডলের ব্যবহার বড় কাজকর্মে দেখা যায়। বিভিন্ন নাম ও আকৃতির মধ্যে সর্বতোভদ্র মণ্ডল প্রধান।

দুর্গাপূজা, ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মুখ্যপূজার ঘট স্থাপনে চতুষ্কোণ এই মণ্ডল পঞ্চবর্ণে (হলুদের গুঁড়া, বেলপাতার গুঁড়া, চালের গুঁড়া, ধানের চিটা পোড়াইয়া গুঁড়া করা, কুসুম্ভ পুষ্পচূর্ণ অভাবে তৎস্থলে আবীর ব্যবহৃত) রঞ্জিত হইয়া এক সুদৃশ্য বস্তুতে পরিণত হয়।

মণ্ডলের প্রচলন ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে—মণ্ডল আঁকিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা অল্প।

দ্র সারদাতিলক, মহানির্বাণতন্ত্র, তন্ত্রসার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মণ্ডল° মণ্ডল '(কনস্‌টেলেশন') বলিতে বুঝায় আকাশের কোনও এক অংশে অবস্থানকারী তারকার পুঞ্জ, যে পুঞ্জের সহিত পরিচিত কোনও কিছুর সাদৃশ্য পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং প্রায়শঃ তদনুসারেই যাহার নামকরণ হইয়াছে। যেমন—গ্রীষ্ম-বর্ষার আকাশের উড়ন্ত পাখির আকৃতি-বিশিষ্ট হংসমণ্ডল, শীতের আকাশের শিকারী মনুষ্যাকৃতি কালপুরুষ মণ্ডল ইত্যাদি। সুপরিচিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের নামকরণ কিন্তু ঋষির আকৃতি অনুসারে নয়, ঋষির নামানুসারে। আকাশের একই অংশের প্রধানতঃ উজ্জ্বল তারাগুলিকে প্রথমে কল্পনার সূত্রে গ্রথিত করার এবং পরে সেই হিসাবে বেষ্টিত বা দলবন্ধ তারকাপুঞ্জের নামকরণ করার এই পদ্ধতি অতি পুরাতন। প্রাচীনকালে, অর্থাৎ নভোস্থানাঙ্ক ('সেলেশ্চিয়াল কো-অরডিনেটস') উদ্‌ভাবনের পূর্বে আকাশের কোনও অংশকে চিহ্নিত করিতে হইলে মণ্ডলের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। আধুনিককালেও সাধারণ, স্থূল প্রয়োজনে মণ্ডলের ব্যবহার সুপ্রচলিত আছে।

কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলের সঠিক সীমারেখা প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু মতানৈক্য ছিল। এখন আন্তর্জাতিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মোটামুটি মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে। তদনুসারে মোট ৮৮টি (মতান্তরে ৮৯টি) মণ্ডল আছে এবং সেগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ নভোগোলকটি আচ্ছাদিত হইয়া আছে। সূর্য ছাড়া আকাশের যে কোনও তারাই এই মণ্ডলগুলির কোনও না কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত।

দ্র James Sayre Pickering, *The Stars are Yours,* New York, 1958; Josef Klepesta and Antonin Rukl, *Constellations* (A Concise Guide in Colour), London, New York, Sydney, Toronto, 1969.

রমাতোষ সরকার

মৎস্য অনুষ্ণশোণিত (coldblooded) জলচর মেরুদণ্ডী প্রাণী। জলচর সমস্ত প্রাণীকে মৎস্য বলিলে ভুল হয়। চিংড়ী, তারামাছ, তিমি, শীল প্রভৃতি মৎস্য নামে অভিহিত হইলেও মৎস্য নহে। প্রকৃত মৎস্যের বৈশিষ্ট্য—পাখনারশ্মি(Finray)-যুক্ত জোড়া পাখনা, ফুলকার (Gill) সাহায্যে শ্বাসকার্য, দেহের দুইপার্শ্বে মস্তকের পিছন হইতে শেষপর্যন্ত পার্শ্বরেখা (lateral line), হৃৎপিণ্ডে দুইটি প্রকোষ্ঠ—অলিন্দ ও নিলয়।

অসংখ্য আকৃতি-প্রকৃতি-সমন্বিত সংখ্যাবহুল মৎস্যের শ্রেণীবিন্যাস কষ্টসাধ্য এবং তাহা লইয়া বৈজ্ঞানিকদের মতভেদ দেখা যায়। অধুনাবিলুপ্ত এবং জীবিত সমস্ত মৎস্যকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। ১. প্ল্যাকোডারমি (Placodermi) শ্রেণীভুক্ত মৎস্য বর্তমানে লুপ্ত। ইহাদের দেহ অস্থিনির্মিত বর্মে আবৃত। অন্তঃকঙ্কাল অস্থিবিশিষ্ট। উদাহরণ—ক্লাইমেটিয়াস্‌, ডিনিকথিস (Dinichthyes) প্রভৃতি। ২. ইলাস্‌মোব্রাঙ্কাই (Elasmobranchii) বা কনড্রিক্‌থিস (Condrichthyes) : অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি বা কারটিলেজ নির্মিত। সেজন্য ইহাদের তরুণাস্থিবিশিষ্ট মৎস্য বলা হয়। সাধারণতঃ ইহারা সামুদ্রিক। উদাহরণ—হাঙ্গর, শঙ্করমাছ, কাইমেরা প্রভৃতি। ৩. অস্টিক্‌থিস্‌ (Osteichthyes) —অন্তঃকঙ্কাল অস্থিনির্মিত (bony), ফুলকাছিদ্র কানকুয়া আবৃত। সাধারণতঃ শরীর আঁশে আবৃত। শিঙি, মাগুর প্রভৃতির আঁশ থাকে না। পুষ্করিণী, খাল, বিল, নদী, নালা, সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে বাস করে। উদাহরণ রুই, কাৎলা, ভেটকি, ইলিশ প্রভৃতি।

মৎস্য কত প্রকারের হইয়া থাকে তাহা লইয়া প্রাচীনকাল হইতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে প্রায় ২৫০০০ রকম মৎস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমান ইহাদের সংখ্যা আরও অধিক।

মানুষের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই পৃথিবীতে মৎস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মধ্য প্যালিওজইক মহাযুগের সিলুরিয়ান যুগে মৎস্যের প্রথম আবির্ভাব বলিয়া অনুমিত হয়। ডিভোনিয়ান বা মৎস্য যুগে ইহাদের সমৃদ্ধি ঘটে। আবির্ভাবের পর হইতে বহুপ্রকারের মৎস্য পৃথিবীতে বসবাস করিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। সিলাকান্থ গোত্রের ল্যাটিমেরিয়া চালুম্‌নি (Latimeria Chalumnae) বহুযুগ পূর্বে বিলুপ্ত বলিয়া ধারণা ছিল। পুনরায় তাহাদের দেখা পাওয়া যায় ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আফ্রিকার উপকূলে।

একটি আদর্শ মৎস্যের দেহ মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত—মস্তক, ধড় ও লেজ। দেহে দুইটি জোড়া পাখনা : বক্ষপাখনা (pectoral) ও শ্রোণি পাখনা (pelvic); বিজোড় পাখনা একটি বা দুটি : পৃষ্ঠপাখনা (Dorsal), একটি পায়ু (Anal) এবং একটি পুচ্ছ পাখনা (Candal)। পাখনা সন্তরণকার্যে সহায়তা করে।

মৎস্যের মধ্যে যদিও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাহির হইতে স্ত্রী ও পুরুষ পৃথক করা যায় না। কোনও কোনও মৎস্যের একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ জননাঙ্গ পরিলক্ষিত হয়; যেমন কড্‌, হেরিং প্রভৃতি।

মৎস্য নানা আকারের হয়—লম্বা, গোলাকার, উপরে নীচে বা দুইপার্শ্বে চ্যাপ্টা, ফিতাকৃতি ইত্যাদি। সামুদ্রিক অশ্ব-মৎস্যের মুখ প্রায় অশ্বের ন্যায়। উড়ুক্কু গাছের

বক্ষসংলগ্ন পাখনাটি বৃহৎ। জলের উপর লাফ দিয়া ঐ পাখনা বিস্তার করিয়া ইহারা বেশ কিছুদূর বাতাসে ভাসিয়া চলিতে পারে।

সাগরাঙ্কের তিন মাইল ঊর্ধ্ব হইতে সাত মাইল নিম্ন পর্যন্ত যাবতীয় জলীয় পরিবেশে মৎস্যের অভাব নাই। মিঠা, লবণাক্ত, উষ্ণ, শীতল সবরকম জলে মৎস্য বসবাসে সক্ষম। তবে সকল মৎস্য সকল প্রকার জলে বসবাস করে না, মৎস্যকুলে যাযাবর বৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রজনন, খাদ্যান্বেষণ প্রভৃতির প্রয়োজনে তাহারা যাযাবর হয়। ইলিশ ডিম পাড়ার সময়ে সমুদ্র হইতে নদীর মিঠা জলে আসিয়া ডিম পাড়ে। ইহাদের অ্যানাড্রোমাস্ (Anadromous) মৎস্য বলা হয়। বান বা ইল মিঠা জল হইতে লবণাক্ত সমুদ্রে গিয়া ডিম ছাড়ে। ইহাদের ক্যাটাড্রোমাস্ (Catadromous) মৎস্য বলে।

মৎস্য সাধারণতঃ ডিম পাড়ে। কিন্তু হাঙ্গর প্রভৃতি মৎস্য ডিম প্রদান না করিয়া সন্তান প্রসব করে। মাগুর প্রভৃতি বাসা নির্মাণ করিতে পারে। তিলাপিয়া ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিবার পর মুখের ভিতর রাখিয়া তাহাদের রক্ষা করে। বাচ্চা একটু বড় হইলে মুখ হইতে বাহির করিয়া দেয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মৎস্যের প্রজনন এবং ডিম পাড়ার স্থানকাল বিভিন্ন। অধিকাংশ মৎস্যের বৎসরে প্রজননের সময় নির্দিষ্ট থাকে। বৎসরে কাহারও একবার কাহারও একাধিকবার প্রজনন হইতে পারে। কোনও কোনও মৎস্যের সারাজীবনের মধ্যে মাত্র একবার প্রজনন হয়।

কিছু মৎস্যের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। শিকার বা শত্রু আক্রমণের জন্য ইহা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোনও মৎস্যকে তাহাদের কণ্টক বা রশ্মি-বিদ্ধ করিতে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহা মারাত্মক হয়। কিছু সংখ্যক মৎস্য বিষাক্ত, তাহাদের মাংসভক্ষণে মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

মৎস্য নানাপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। কোনও কোনও মৎস্য সর্বভুক্। কিন্তু কোনও কোনও মৎস্য কেবলমাত্র আমিষ-জাতের অথবা কেবল নিরামিষ জাতের খাদ্য গ্রহণ করে। মৎস্যের মধ্যে স্বজনভুক্ মৎস্যও দেখা যায়। বোয়াল, আড় ট্যাংরা, ল্যাটা, চিতল প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে মৎস্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। রুই, কাত্‌লা, ইলিশ, ভেট্‌কি প্রভৃতি মৎস্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যহিসাবে পরিচিত। মাগুর, সিঙি প্রভৃতি রোগীর পথ্যহিসাবে ব্যবহৃত হয়। কড্ মৎস্যের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত কড্‌লিভার অয়েল সর্দি, কাশি, স্নায়বিক ও শারীরিক দৌর্বল্য নিবারণে সহায়তা করে। হাঙ্গরের যকৃৎ হইতে প্রস্তুত তৈলও পুষ্টিকর। মৎস্য ও মৎস্যের হাড় সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। শুঁট্‌কী-মাছ ভারতে ও বিদেশে খাদ্যহিসাবে চলে।

মৎস্য ধর্মের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। ইহা হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র জীব। মৎস্য ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রথম অবতার।

বিশ্বনাথ মিত্র

মৎস্য মাংস খাদ্য হিসাবে মৎস্য মাংস পরম উপাদেয়। তবে ভারতবর্ষে অনেক স্থানেই ইহা নিন্দিত। পূর্ব ভারত ছাড়া ভারতের অন্যাংশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও বিধবাদের মধ্যে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত। বিশেষ বিশেষ দেবতার (দুর্গা, কালী) পূজায় ও প্রেতশ্রাদ্ধ মাংসাষ্টকাদি পিতৃকার্যে ইহার ব্যবহার বিহিত। নিষিদ্ধ মৎস্য মাংসের মধ্যে সিঙি (মাগুর নহে) ও গজাল (শোল নহে) উল্লেখযোগ্য।

গোমাংস ও গৃহপালিত মোরগের মাংস অতি নিষিদ্ধ। তবে প্রাচীনকালে মধুপর্কে গোমাংসের ব্যবহার ছিল দেখা যায়।

দেবকার্যে ব্যবহৃত পশুর মাংস বৈধ মাংস বলিয়া পরিচিত। বৈধ মাংস ভোজন করা প্রশস্ত। তবে দেবপূজায় বলিপ্রদত্ত মহিষ মাংস নেপালে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র নহে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছেন্দ্রনাথ নাথধর্ম ও নাথসাহিত্য দ্র

মতিলাল ঘোষ (১৮৪৭-১৯২২ খ্রী)। জন্ম ২৮শে অক্টোবর, ১৮৪৭ খ্রী। শিশিরকুমার ঘোষের অনুজ এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত। শিক্ষালাভান্তে মতিলাল অগ্রজের অমৃতবাজার পত্রিকায় যোগ দেন। শিশিরকুমার অবসর গ্রহণের পর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকও হন। তাঁহার সম্পাদনাকালে ১৮৯১ খ্রী ১৯শে ফেব্রুয়ারি হইতে অমৃতবাজার দৈনিকে পরিণত হয়। তিনি চরমপন্থী নেতাদের অন্যতম ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতিও ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (১৯১৫ খ্রী) তিনি সভাপতিত্ব করেন। ধর্মজীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। মৃত্যু ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খ্রী।

দ্র Paramananda Dutta, *Memories of Motilal Gosh*, Calcutta, 1935.

যোগেশচন্দ্র বাগল

মতিলাল রায় (১৮৮২-১৯৫৯ খ্রী) বাংলার অন্যতম বিপ্লবী নেতা, শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য এবং প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে মতিলালের জন্ম হয়; পিতা বিহারীলাল সিংহরায়, চৌহানবংশীয় ছেত্রী রাজপুত। কলিকাতার ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশনে কিছুদিন পড়িবার পর তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। ফলে, তাঁহাকে স্কুলের পড়াশোনা ছাড়িতে

হয়। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে (১৮৯৭ খ্রী) রাধারাণী দেবীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক সিদ্ধ অবধূতের নির্দেশে মতিলাল ও রাধারাণী ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হন। পরবর্তী জীবনে মতিলাল অধ্যাত্ম-সাধনায় যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হন। তিনি কানাইলাল দত্ত, বাঘা যতীন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, বিপিন গাঙ্গুলী, রাসবিহারী বসু প্রমুখ বাংলার বহু বিপ্লবী নেতার সহকর্মী ছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দ যখন চন্দননগরে পলাতক হন, তখন মতিলালই তাঁহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দেন। এই সময়েই মতিলাল শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার 'জীবনসঙ্গিনী' গ্রন্থে তাঁহার স্ত্রী রাধারাণীর ও শ্রীঅরবিন্দের ধর্মজীবন ও বিপ্লবী জীবনের নানা কথা বর্ণিত আছে। মতিলালের সুচিন্তিত রচনাপূর্ণ গ্রন্থাবলীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ অরবিন্দ মন্দিরে (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), শতবর্ষের বাংলা (১৩৩১ বঙ্গাব্দ), যুগাচার্য বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ সংঘ (১৯২৬ খ্রী), হিন্দুর জাগরণ (১৯২৬ খ্রী), স্বদেশীযুগের স্মৃতি (১৯৩১ খ্রী), ভারতীয় সংঘ-তত্ত্ব (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ), আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী (১৯৫৭ খ্রী) ইত্যাদি। ভারতীয় সংঘ-তত্ত্ব নামক গ্রন্থ-পাঠে জানা যায়, সংঘ ও জাতিকে মতিলাল স্বাবলম্বনের কর্মদীক্ষায় দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যেই 'প্রবর্তক ট্রাস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তিনি একাধিক জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রবর্তক পাঠশালা, প্রবর্তক বুনিয়াদী বিদ্যালয়, প্রবর্তক বিদ্যার্থীভবন, প্রবর্তক নারীমন্দির ও বালিকা বিদ্যালয়, প্রবর্তক গ্রন্থাগার, প্রবর্তক যোগাশ্রম ও শ্রীমন্দির, প্রবর্তক পাবলিশার্স, প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক কৃষি ও খাদিবিভাগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রবর্তক সংঘ হইতে 'প্রবর্তক', 'নবসংঘ' ও 'The Standard Bearer' নামক সাময়িক পত্রিকাগুলি প্রকাশিত ও পরিচালিত হয়। ১৯৫৯ খ্রী ১০ এপ্রিল ৭৭ বৎসর বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায়, চন্দননগর প্রবর্তক আশ্রমেই মতিলালের মৃত্যু হয়।

দ্র ইন্দুভূষণ রায়, সংঘগুরু শ্রীমতিলাল, ১৯৬৬ খ্রী।

অমলেন্দু ঘোষ

মতিলাল শীল (১৭৯২—১৮৫৪ খ্রী) মতিলালের জন্ম কলুটোলায়, পিতা চৈতন্যচরণ শীল। মতিলাল স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করেন। তিনি চলনসই ইংরেজী ও গণিত জানিতেন। কর্মজীবনে প্রথমে ফোর্ট উইলিয়মে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেন, পরে বালিখালের কাস্টমস্ দারোগা হন। ১৮২০ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুৎসুদ্দির কাজ করেন। প্রথমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যবর্তী হিসাবে ও পরে নিজে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করিয়া মতিলাল ১২/১৩ খানি জাহাজ ক্রয় করেন। বেলঘরিয়ার অতিথিশালা, গঙ্গাতীরে স্নানার্থীদের জন্য মতিলাল ঘাট, শীলস্ ফ্রি কলেজ— তাঁহার অসংখ্য জনহিতকর কীর্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ মতিলালের দেওয়া জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

মথুরা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আগ্রা বিভাগের মথুরা জেলার প্রধান শহর ও শাসনকেন্দ্র। শহরটি ২৭°৩০′ উত্তর ও ৭৭°৪২′ পূর্বে যমুনানদীর দক্ষিণতীরে আগ্রা-দিল্লী সড়কের উপর চন্দ্রাকারে অবস্থিত। দিল্লী হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি পৌরশাসনের অধীনে আসে। ইহার লোকসংখ্যা ১৭৯২৫৮ (১৯৬১ খ্রী)।

মথুরা রেলপথের একটি কেন্দ্র শহর (জংশন), নর্থ-ঈস্ট রেলপথ ও ওয়েস্টার্ন রেলপথ দুইটি এখানে আসিয়া মিলিয়াছে। রেলপথে ইহা দিল্লী-আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের সহিত যুক্ত। হিন্দুধর্মের পীঠস্থান ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি হিসাবে শহরটির ধর্মীয় গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। পূর্বে এইস্থানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রাধান্যও যথেষ্ট ছিল। মথুরা জেলার একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র। নানাবিধ তৈলবীজ, তুলা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য।

শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে অসংখ্য হিন্দু মন্দির, যমুনার তীরে স্নানের ঘাট, উত্তরে রাজা মানসিংহ নির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ, জুম্মা মসজিদ, ঔরঙ্গজেব নির্মিত মসজিদ, সতীমিনার, মিউজিয়ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দ্র Census of India 1961, Vol. 15, *Uttar-pradesh*, Part IIA, New Delhi, 1964.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

বৈদিক যুগে উল্লেখ না থাকিলেও রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ সংকলনের যুগে মথুরা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে মথুরার বিভিন্ন নাম দেখা যায়, যেমন মধুপুরী, মধুবন, মধুরা, মৌর্যপুর, মদুরা। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড, বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণ অনুযায়ী মধুপুত্র লবণকে হত্যা করিয়া শত্রুঘ্ন মথুরাপুরী স্থাপন করেন। নানাশাস্ত্রে মথুরায় স্নানফলের মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে।

মথুরায় মণ্ডল রহিয়াছে। মণ্ডলের সীমা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও সকল পুরাণেই এই স্থানের দ্বাদশ বনের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা, মধু, কুমুদ, তাল, কাম্যক, বহুলা, ভদ্র, খদির, মহাবন, লোহজঙ্ঘ, বিল্ব, ভাণ্ডীর এবং বৃন্দাবন। এই বনগুলি আজও তীর্থযাত্রিগণ দর্শন করেন। লক্ষ্মীধর, বরাহ পুরাণ মতে, মথুরাতে সাতাশটি পুণ্য-

স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র ছয়টি—যমুনা, বৃন্দাবন, ভান্ডীরক, রাধাকুন্ড, গোবর্ধন ও কালিয় হ্রদই এখনও বর্তমান।

শ্রীরামচন্দ্রের পূর্বে মথুরায় যাদব জাতির আধিপত্য ছিল। যাদববংশীয় মধুর পুত্র লবণকে হত্যা করিয়া শত্রুঘ্ন মথুরায় নগর স্থাপন করেন। কিন্তু ভীম সাত্বত শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়কে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় তথায় যাদব আধিপত্য স্থাপন করেন। এই ভীমের বংশেরই উগ্রসেন ও কংস মথুরার রাজা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া কালিয়নাগকে দমন করেন।

অংগুত্তরনিকায় অনুসারে গৌতমবুদ্ধ প্রায়ই মথুরায় গমন করিতেন। তাঁহার বাণী প্রচারের ভার গ্রহণ করেন মহাকচ্চায়ন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্ম মথুরায় বিস্তারলাভ করে। অশোকের সময়ে তথাকার নটবর বিহারে উপগুপ্ত আমন্ত্রিত হন। গুপ্তযুগের প্রারম্ভে যৌধেয় ও নাগগণ মথুরা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় রাজত্ব করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত ইঁহাদের উচ্ছেদ করেন। ফা-হিয়ান মথুরায় বহু বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। হিউ-এন-ৎসাঙ্ সপ্তম শতাব্দীতে মাত্র ৫টি দেবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। গুর্জর-প্রতিহারদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ প্রভাব মথুরায় যথেষ্ট হ্রাস পায়। একাদশ শতাব্দীর মুসলমান ঐতিহাসিক অল-উৎবী বলিয়াছেন যে, মথুরায় সহস্র গৃহে বিগ্রহের পূজা হইত। শহরের মধ্যস্থলে একটি এত বৃহৎ আয়তনের মন্দির ছিল যে উহা অবর্ণনীয়। অধিকন্তু স্বর্ণময় বিগ্রহ ছিল পাঁচটি এবং রৌপ্যমণ্ডিত বিগ্রহ দুইশত। মথুরার এরূপ ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া সুলতান মামুদ ঐ নগরী কুড়িদিন ধরিয়া লুণ্ঠন করেন। তবে একাদশ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ মথুরায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা স্বল্প ছিল। বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রে বৈষ্ণবক্ষেত্রগুলির মধ্যে মথুরা অনুল্লিখিত। জীমূতবাহনের কালবিবেকে মথুরার নাম পাওয়া যায় না। বল্লালসেন গোবর্ধনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু মথুরা সম্বন্ধে নীরব। এমন কি বারাণসী ও প্রয়াগের তুলনায় লক্ষ্মীধর তাঁহার তীর্থবিবেচনকাণ্ডে মথুরার বিবরণ মাত্র নয় পৃষ্ঠায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন।

মুসলমান আমলে মথুরার বহু মন্দির ধ্বংস করা হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মথুরার প্রতি হিন্দুদের আকর্ষণ কমে নাই। শ্রীচৈতন্য ষোড়শ শতাব্দীতে যে কৃষ্ণলীলার পুনঃপ্রচার করেন তাহার স্থায়ী ফল দেখা দেয়; এখনও মথুরা বিশিষ্ট তীর্থরূপে পরিগণিত হয়।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

মথুরানাথ বিশ্বাস কলিকাতাস্থিত জানবাজারের প্রসিদ্ধ মাহিষ্য জমিদার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস। জন্ম চব্বিশ পরগণার বিথুরী গ্রামে। তিনি প্রথমে রাণীর তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাণীর চতুর্থ কন্যা জগদম্বাকে বিবাহ করেন এবং 'সেজোবাবু' নামেই তিনি খ্যাত। রাণীর জমিদারী পরিচালনায় এবং ধর্মকর্মে তিনি তাঁহার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মূর্তি-প্রতিষ্ঠা এবং ঐ উপলক্ষে ১২৬২ বঙ্গাব্দে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ও সাধু ব্যক্তির আমন্ত্রণ ও তাঁহাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা মথুরানাথের স্মরণীয় কীর্তি। মথুরানাথ ইংরাজী-শিক্ষিত ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ও সারদামণির বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং ভবিষ্যতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের যাহাতে আর্থিক অভাব না হয় সেদিকে মথুরানাথ সর্বদা নজর রাখিতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্বেই মথুরানাথের মৃত্যু হয়। মথুরানাথের মৃত্যুর পর ঠাকুরকে কখনও কখনও সাংসারিক অনটন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসংগ, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ভাগ, কলিকাতা; প্রদ্যোত গুপ্ত, রাণী রাসমণি, কলিকাতা।

বিভুরঞ্জন গুহ

মদ অ্যালকোহল (ইথাইল অ্যালকোহল)-মিশ্রিত তরল পানীয়কে মদ বলা হয়। এককোষী নিম্নস্তরের উদ্ভিদ ঈস্টের সাহায্যে অশোধিত ফলের রস এবং স্টার্চকে (শ্বেতসার) সন্ধিত করিয়া সাধারণতঃ মদ প্রস্তুত করা হয়। মদ নানাপ্রকার হইতে পারে যাহা নির্ভর করে মদের রঙ, আপেক্ষিক মিষ্টতা, অ্যালকোহলের পরিমাণ, কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি বা সন্ধানে ব্যবহৃত কাঁচামালের প্রকৃতির উপর। ঈস্টের দেহকোষে এন্‌জাইম (জৈব অনুঘটক) নামক একাধিক রাসায়নিক দ্রব্য থাকে, যাহা গ্লুকোজ (অশোধিত ফলের রসে বর্তমান) এবং স্টার্চ অণুকে ইথাইল অ্যালকোহল এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অণুতে বিশিলষ্ট করে। আংশিক পাতনের সাহায্যে সন্ধিত দ্রবণ (অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা ছয় হইতে দশ ভাগ) হইতে অ্যালকোহল পৃথক করা যায়। শতকরা ৯৫ ভাগ অ্যালকোহল এবং ৫ ভাগ জলের মিশ্রিত দ্রবণকে রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পিরিট (Rectified Spirit) বলা হয়। নির্জল অ্যালকোহলে (absolute alcohol) প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ জল থাকে না। জলশোষণের কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা রেক্‌টিফায়েড্‌ স্পিরিট হইতে নির্জল অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়।

অঞ্জনকুমার রায়

মদন স্ত্রীপুরুষের সংযোগ-সাধক দেবতা। কালিকাপুরাণে (১—৩ অঃ) মদনের জন্মবিবরণ পাওয়া যায়। ভৃগু-নারদাদি মানসপুত্রগণের সৃষ্টির পর ব্রহ্মা মনোহর কম্বুগ্রীব মীনকেতু মকরবাহন পুরুষ মদনের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার আদেশে মদন পুষ্পময় পঞ্চশরে স্ত্রী-পুরুষকে মুগ্ধ করার কার্যভার গ্রহণ করেন। মন্মথ, কন্দর্প, অনঙ্গ,

মনসিজ, কামদেব প্রভৃতি নামে মদন সুপরিচিত। অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই পঞ্চপুষ্প মদনের পঞ্চশর। বসন্ত মদনের সহচর ; দক্ষের দেহজাত কন্যা রতি মদনের ভার্যা। পার্বতীর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের চিত্তবিক্ষোভ ঘটাইলে মহাদেবের কোপানলে মদন ভস্মীভূত হন। পার্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহকালে মদন পুনরায় নিজ শরীর প্রাপ্ত হন। প্রাচীনকালে বসন্ত সমাগমে মদনমহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। শ্রীহর্ষ-বিরচিত রত্নাবলী নাটিকায় প্রথম অঙ্কে মদন-মহোৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়।

যূথিকা ঘোষ

মদনপাল পালবংশ দ্র

মদনমোহন তর্কালংকার (১৮১৭-৫৮ খ্রী) কবি ও শিক্ষাবিদ। জন্ম নদিয়া জেলার বিল্বগ্রাম। পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র (১৮২৯-৪২ খ্রী)। গুরু জয়গোপাল বিদ্যালংকার ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। সতীর্থ ও বান্ধব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা (১৮৪৬-৫০ খ্রী) ; মুর্শিদাবাদের জজপণ্ডিত ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫০-৫৫); কলেরায় আকস্মিক মৃত্যুকালে কান্দীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (মার্চ, ১৮৫৮)।

বিদ্যাসাগরের সহযোগে 'সংস্কৃত যন্ত্র' প্রতিষ্ঠা (১৮৪৭ খ্রী) করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের পর হইতে ইনি নিজ কন্যাদ্বয়কে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া, ছাত্রীগণকে বিনাবেতনে পাঠ দিয়া ও শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া বেথুনকে নানাভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। সর্বশুভকরী পত্রিকায় (১৭৭২ শক) তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ। সাহিত্যকৃতি-রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪ খ্রী) অনুবাদ সহ আদিরসাত্মক শ্লোক-সংগ্রহ। বাসবদত্তা (১৮৩৬ খ্রী) সুবন্ধু অবলম্বনে নানা ছন্দ ও রাগমণ্ডিত কাব্য। সংস্কৃত কলেজ হইতে (১৮৪৮-৫০) তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত ব্যাকরণ, নব্যন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তের সহিত কাদম্বরী, কুমারসম্ভব প্রভৃতির সংশোধিত সংস্করণগুলি যুগপৎ কবির পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

দ্র যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাভূষণ), কবিবর মদন-মোহন তর্কালংকারের জীবনী ও তদ্‌গ্রন্থ সমালোচনা, সংবৎ ১৯২৮; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কা-লংকার, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ১ম খণ্ড, ১৯৬৩।

কল্যাণী দত্ত

মদালসা রাজা ঋতধ্বজ কুবলয়াশ্বের তত্ত্বদর্শিনী পত্নী এবং গন্ধর্ব বিশ্বাবসুর কন্যা। ইনি পতি ও পুত্রগণকে সর্বদা আত্মজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, ফলে ইঁহার তিন পুত্রই যৌবনে সংসারত্যাগ করেন। চতুর্থ পুত্র অলর্ক পিতার ইচ্ছায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। পুত্রকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দিয়া মদালসা স্বামীর সহিত তপস্যার্থ বনগমন করেন।

দ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২০-৩৬ অধ্যায় (বঙ্গবাসী সং)

কল্যাণী দত্ত

মদিনা সউদি আরাবিয়ার হেজাজের ২০০০ ফিট উচ্চ মালভূমির অন্তর্গত মরূদ্যান (২৪°২৫′ উ, ৪০°০′ পূ); মক্কা হইতে প্রায় ২২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। মুসলমান জগতের দ্বিতীয় পবিত্র স্থান। হজরত মহম্মদ মক্কা ত্যাগ করিবার পর (৬২২ খ্রী) হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এইস্থানে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম প্রচার করেন। এখানে তাঁহার নিজের, তাঁহার কন্যা ফাতিমার ও খলিফা আবুবকর এবং ওমরের সমাধি আছে। হজরত মহম্মদের সমাধিই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্যস্থান।

পূর্বে ইহার নাম ছিল ইয়াথ্রীব (Yathrib), ইহা টলেমীর ইয়াথ্রিপ্পা (Iathippa)। উমাইয়াদ (Umaiyad) খলিফারা দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত করার (৬২২ খ্রী) পূর্ব পর্যন্ত ইহা ইসলামিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। ষোল শতক হইতে ইহা তুর্কী সুলতানদের অধীনে থাকে ও ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা ইব্‌ন সায়ুদের (Ibn Saud) -এর অধিকারে আসে।

এই অঞ্চলের খেজুর বিখ্যাত। লোহিত সাগরের ইয়েনবা (Yanba) বন্দর হইতে ১৩২ মাইল পূর্বে। লোক-সংখ্যা ৩০০০০—৫০০০০, স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ২০০০০।

দ্র Eldon Rutter, *The Holy Cities of Arabia*, Vol. 2, London, 1928; C. M. Dougty, *Travels in Arabia Deserta*, Vol. 2, London, 1936.

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মদ্য মদ দ্র

মধু উদ্ভিদের ফুলের সুধাগ্রন্থি নিঃসৃত মিষ্টি, আঠালো তরল পদার্থ। ফুলের সুধার অধিকাংশ ইক্ষু শর্করা ল্যাভু-লোজ (ফ্রুকটোজ) এবং ডেক্‌সট্রোজ (গ্লুকোজ)-এ রাসায়নিক রূপান্তরের এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা দূরীভূত হওয়ার ফলে পরিপক্ক হইয়া মধুতে পরিণত হয়। প্রাচীন কাল হইতেই মধু আমাদের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের সঙ্গে জড়িত।

মধুর বর্ণ এবং স্বাদের তারতম্য হয় মৌমাছি যে ফুলের সুধা সংগ্রহ করে তাহার দরুণ। ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহের ফলে মৌচাকের মধু স্বাভাবিক ভাবেই মিশ্র মধুতে পরিণত হয়। মৌচাকের উপরের একতৃতীয়াংশে মধু সঞ্চিত হয়। বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি পালনের দ্বারা পৃথি-

বীর সর্বত্র মধু উৎপাদন করা হয়। আধুনিক মৌমাছি পালন যুক্তরাষ্ট্রে রেভারেন্ড লরেন্জো লোরেন ল্যাংস্ট্রথ-এর 'মৌমাছি স্থান' আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। মধুর প্রতিক্রিয়া আম্লিক হওয়ার দরুণ তামা, দস্তা এবং অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে সংরক্ষণ সমীচীন নয়। ৬২·৭—৭১·১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে উষ্ণ করিবার পর দ্রুত ঠান্ডা করিলে গাঁজানর এবং মধু দানাদার হইবার ভয়ও থাকে না। দ্রুত ঠান্ডা না করিলে রং কাল হইয়া যায়।

ভারতে মৌচাক হইতে উৎপাদন গড়ে ২·৮৫ কিলোগ্রাম। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি পালনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে মৌচাক প্রতি গড় উৎপাদন ২০·৬৩ কিলোগ্রাম; অনেকক্ষেত্রে ৯০·৯ কিলোগ্রাম। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেণ্টিনা পৃথিবীর প্রথম সারির মধু উৎপাদক।

মধুর সামান্য বীজবারক ধর্ম আছে এবং প্রাচীনকাল হইতেই ছেঁড়া, পোড়া এবং স্তনের বোঁটার ঘায়ে ব্যবহার করা হয়। মুখের ঘায়ে সোহাগা-মধুর বিকল্প আধুনিক বোরাক্স গ্লিসারিন। ফলের মোরব্বা এবং মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্যও মধুর ব্যবহার আমাদের দেশের দুর্গম অঞ্চলে আজও প্রচলিত।

দ্র *The Wealth of India*, Part IV, New Delhi, 1957; S. Singh, *Beekeeping in India*, New Delhi, 1962.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

মধু কান (১২২০-৭৫ বঙ্গাব্দ) ঢপগানের কবি ও গায়ক। মধু কান বা মধুসূদন কিন্নর ১২২০ বঙ্গাব্দে (মতান্তরে ১২২৫ বঙ্গাব্দ) যশোহর জেলার উলসিয়া-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তিলকচন্দ্র কিন্নর। ঢাকায় ওস্তাদের নিকট তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করেন। যশোহরের জনৈক বিখ্যাত বাউলের নিকট তিনি কীর্তন শেখেন। কীর্তন ভাঙ্গিয়া মধু ঢপগানের প্রবর্তন করেন। তাঁহার লেখা ঢপ-পালাগুলির মধ্যে 'কলঙ্কভঞ্জন', 'অক্রূর-সংবাদ', 'মাথুর', 'প্রভাস' মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার রচনা সরল, অনুপ্রাসবহুল এবং শ্রুতিমধুর। কাশিমবাজার রাজবাড়িতে গান গাহিতে যাইবার পথে কৃষ্ণনগরে ১২৭৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ক্ষেত্র গুপ্ত

মধুকৈটভ বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত দুইটি দানবের নাম মধু ও কৈটভ। ইহারা ক্রমশঃ দুর্বৃত্ত হইয়া ওঠে ও ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণু ইহাদের বধ করেন। মহাভারত, হরিবংশ, সুশ্রুত, ভবিষ্যৎ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ইহাদের বিবরণ পাওয়া যায়।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

মধুপুর বিহারের সাঁওতাল পরগণা জেলায় পূর্ব রেল-পথের প্রধান লাইনে অবস্থিত একটি শহর। ১৯০৯ সালের ৩রা এপ্রিলের নোটিফিকেশন অনুযায়ী মধুপুর ও অপর সাতটি গ্রাম লইয়া মধুপুর পৌরসংস্থা স্থাপিত হয়।

মধুপুর সাঁওতাল পরগণার পার্বত্য পরিবেশে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ও বাঙ্গালীবহুল শহর। কলিকাতা হইতে মধুপুরের দূরত্ব মাত্র ২৯৪ কিলোমিটার। দেওঘর বা বৈদ্যনাথধাম ও যশিডি ইহার নিকটবর্তী দুইটি দ্রষ্টব্য স্বাস্থ্যকর স্থান। এখান হইতে শাখা লাইনে গিরিডি যাওয়া যায়। সাধারণতঃ শরৎকালে দুর্গাপূজার সময় অথবা বড়দিনের সময় এই স্বাস্থ্যনিবাসটিতে সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হয়।

১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী মধুপুরের জনসংখ্যা ১৯৫১৯। স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৪৫ এবং পুরুষের সংখ্যা ১০২৭৪। শতকরা প্রায় ২২ জন লোক লেখাপড়া জানে।

প্রভাতকুমার সেন

মধু বসু (১৯০০—১৯৬৯ খ্রী) ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর পুত্র মধু বসুর (প্রকৃত নাম সুকুমার বসু) নাম ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, নাট্য-প্রযোজক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি সুবিদিত।

কলিকাতায় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি তাঁহার জন্ম। শান্তিনিকেতন ও বিদ্যাসাগর কলেজে শিক্ষা। বি. এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ।

জার্মানিতে সিনেমার কলাকৌশলগত শিক্ষালাভের পর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'থ্রো অফ ডাইস" ছবিতে আলোক-চিত্রশিল্পীর কাজ করেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রথম অভিনয় ও ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ারস্ (সি. এ. পি) সংস্থা প্রতিষ্ঠা। চলচ্চিত্র-পরিচালকরূপে তাঁহার আত্মপ্রকাশ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ছবি 'গিরিবালা' (নির্বাক)। বাংলা, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী মিশাইয়া তিনি প্রায় ৩০ খানি কাহিনী-চিত্র পরিচালনা করেন। তালিকার আন্তর্ভুক্তঃ 'আলিবাবা', 'অভিনয়', 'কুমকুম', 'রাজনর্তকী', 'মাইকেল মধুসূদন', 'শেষের কবিতা', 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র'। তাঁহার পরিচালিত শেষ কাহিনী-চিত্রঃ 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১৯৬৪ খ্রী)।

শ্রীবসুর দুইটি উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রযোজনাঃ দালিয়া ও আলিবাবা। তাঁহার আত্মজীবনী 'আমার জীবনী' ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নিঃসন্তান শ্রীবসুর সহধর্মিণী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসু।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ সেপ্টেম্বর মধু বসুর মৃত্যু হয়।

জ্যোতির্ময় বসু রায়

মধুমেহ বা ডায়াবেটিস (বহুমূত্র) এই রোগ ইনসুলিনের অভাবে হয় বলিয়া ইনসুলিন ইন্‌জেকশনই প্রকৃত চিকিৎসা। রক্তে শর্করাজাতীয় দ্রব্যের আধিক্যের জন্য এই দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। জমির তলায় যে সকল তরিতরকারি জন্মায়, যেমন আলু, পিঁয়াজ, বীট ইত্যাদি এবং ভাত না খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই রোগ যুবকদিগের হইলে অথবা রোগের কোনো জটিলতা থাকিলে দ্রবণীয় ইনসুলিন দেওয়া হয়। স্থূলকায় রোগীর ক্ষেত্রে ও অনুগ্র মধুমেহ রোগে কেবল খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াই চিকিৎসা করা হয়। ইহা সফল না হইলে ইহার সহিত ক্লোরপ্রোপামাইড্, টলবুটামাইড্ অথবা ডাই-গুয়ানাইড্ জাতীয় বটিকা সেবন করানো যাইতে পারে। বেশী স্টেরয়ড্ হর্মোন প্রয়োগ করিলে এবং পিটুইটারি অথবা থাইরয়েড্ গ্রন্থির বেশী কার্যের ফলে যে মধুমেহ হয় তাহার কারণ দূরীভূত করা প্রয়োজন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বটিকা উপরোক্ত রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। রোগীর রেটিনার প্রদাহ হইলে এবং মূত্রে অ্যালবিউমিনের আধিক্য থাকিলে অনেকে ভিটামিন সি ও বি দিয়া থাকেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'ডুরাবলিন' নামক হর্মোনও ব্যবহার করা হয়।

দ্র Stanley Davidson, *The Principles and Practice of Medicine*, London, 1956.

কমলকুমার মল্লিক

মধুসূদন গুপ্ত হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর বলরাম গুপ্তের পুত্র। আনুমানিক ১৮০০ খ্রী জন্ম। সংস্কৃত কলেজের প্রখ্যাত ছাত্র। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে 'বৈদ্যকশ্রেণী' প্রবর্তিত হইলে এই শ্রেণীর ছাত্রদলভুক্ত হইয়া চিকিৎসাবিদ্যাতেও ব্যুৎপন্ন হন। ১৮৩০ খ্রী হইতে উক্ত 'বৈদ্যকশ্রেণী'তে অধ্যাপনা করিয়া ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনাতে ইহার শারীরবিদ্যা (Anatomy) ও শল্যবিদ্যার (Surgery) ডিমন্‌স্ট্রেটর পদে নিযুক্ত হন।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের সহিত শিক্ষক মধুসূদন পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়নের পর কলেজের শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন (১৮৪০ খ্রী)।

মধুসূদন হুপারের "Anatomist Vadecum" (১৮৩৫ খ্রী) গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। তৎকৃত বাংলায় অনূদিত দুইখানি পুস্তক: 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া', কলিকাতা (১৮৪৯), 'এনাটোমী অর্থাৎ শারীরবিদ্যা', কলিকাতা (১৮৪৯)।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন গুপ্ত সর্বপ্রথম 'শব ব্যবচ্ছেদ' করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে উন্নীত হন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, 'শব ব্যবচ্ছেদ' কার্যের ১৩ বৎসর পরে, শিল্পী মিসেস বেলনস অংকিত মধুসূদনের তৈলচিত্রখানি মেডিক্যাল কলেজের থিয়েটার হলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল: মধুসূদন গুপ্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, গ্রন্থ নং ৯৬, কলিকাতা, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

মোহনলাল মিত্র

মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন অনেক ঘটনায় ও ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ।

২৫ জানুয়ারি ১৮২৪, শনিবার (১২ মাঘ ১২৩০ তারিখে) যশোহর জেলার অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদীতীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ ব্যবহারজীবির কাজ উপলক্ষে কলিকাতায় আসেন এবং অল্পকালের মধ্যে ঐ কার্যে সদর দেওয়ানী আদালতে সাফল্য লাভ করেন। তিনি কলিকাতার খিদিরপুরে বাড়ি ক্রয় করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন, এবং তথাকার বিশিষ্ট অধিবাসীরূপে পরিগণিত হন।

সাগরদাঁড়ীর গ্রাম্য পাঠশালায় মাতা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে মধুসূদনের জীবনের প্রথমপাঠ আরম্ভ। এখানে অন্যান্য পাঠের সঙ্গে মধুসূদন ফার্সী ভাষাও শিক্ষা করেন। ইহার পর মধুসূদনের পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি করেন। এখানে অধ্যয়নকালে মধুসূদনের কবিত্বের স্ফুরণ ও বিকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি মেধাবী ও কৃতী ছাত্ররূপে গণ্য হন। তিনি ইংরেজি ভাষাতে কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার কিছু রচনা সেকালের বিখ্যাত এদেশী পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়। মহাকবি হইবার ও বিলাত গমনের আকাঙ্ক্ষা এই সময় হইতেই প্রবল হয়।

তাঁহার পিতামাতা তাঁহার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হন। কিন্তু বিলাত গমনের বাসনা তাঁহার মন অধিকার করিয়া থাকায় তাঁহার মনে হইয়াছিল, এরূপ বিবাহ হইলে তাঁহার সব আশা ধূলিসাৎ হইবে। বিবাহের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের অনেক উপায় চিন্তা করিবার পর তিনি ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৩ তারিখে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্মান্তরিত হইবার দরুণ হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের পথ বন্ধ হইল। বিলাতগমনেরও কোনও সুবিধা হইল না। তিনি শিবপুরস্থ বিশপ্‌স্ কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার পিতাই এখানকার শিক্ষার ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বছর তিন তিনি এখানে অধ্যয়ন করেন এবং এই সময় কিছু গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এখানে মাদ্রাজ রাজ্যের অনেক ছাত্র

পাড়তেন তাঁদের মুখে মাদ্রাজের অনেক গল্প শুনিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহার সাহায্য বন্ধ করিলে তিনি ভাগ্য-অন্বেষণের জন্য ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে গমন করেন। সেখানে তিনি শিক্ষকতা ও সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ করেন, এবং এক ইংরেজ নীলকর সাহেবের রেবেকা নাম্নী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই সময়ে তাঁহার প্রথম বই ইংরেজি কাব্য 'Captive Ladie' ও অনেক ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়। মাদ্রাজে তিনি কবিরূপে খ্যাত হন। এখানে থাকিতে তামিল, তেলুগু, গ্রীক ও হিব্রু ভাষার চর্চা করেন। মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসকালেই তাঁহার পিতা-মাতা লোকান্তরিত হন। মধুসূদনের কোনও সংবাদ কেউ জানিতেন না, (অনেকেরই ধারণা ছিল যে তিনি আর ইহ-লোকে নাই)। এই সুযোগে তাঁহার পিতার সম্পত্তি আত্ম-সাৎ করার জন্য আত্মীয়বর্গ তৎপর হন।

মধুসূদনের প্রথম বিবাহ সুখের হয় না। তিনি দ্বিতীয় বার এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়া নাম্নী এক ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাকেই সকলে মধুসূদনের পত্নী বলিয়া জানেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

জীবিকা নির্বাহের জন্য কলিকাতার পুলিশ কোর্টের কেরানিপদ গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনের গতি এই সময় হইতেই পরিবর্তিত হয় বলিয়া ধরা যায়। যিনি ইংরেজী ভাষাই এতকাল চর্চা করিয়াছিলেন, এবার তিনি বঙ্গভাষা চর্চাতে মনোযোগ দিলেন। তিনি প্রথমে লিখিলেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯), বলা যায়, বাংলাভাষায় প্রথম প্রকৃত নাটক। তারপর ১৮৬০ খ্রী প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক 'পদ্মাবতী' রচনা করেন। পদ্মাবতীতে প্রথম অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেন।

১৮৬০ খ্রী তাঁহার অমিত্রাক্ষরে লেখা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাই বাংলায় অমিত্রাক্ষর প্রবর্তনকাল বলিয়া ধরা হয়। তাহার পর অমর রচনা 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১)। পর পর তিনি রচনা করেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), বিয়োগান্ত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) ও 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২)। এই সময়ই তিনি লং সাহেবকে নীলদর্পণের অনুবাদ করিয়া দেন (১৮৬১)। কলিকাতার ৬ নং আপার চিৎপুর রোডে তখন তিনি বাস করেন।

বিলাত গমনের আকাঙ্ক্ষা তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃসম্পত্তি উদ্ধার হইলে তাহার বিলি ব্যবস্থা করিয়া, তিনি ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। সেখানে তাঁহার জমিদারির ব্যবস্থা মতে দেয় টাকা না পাইয়া তিনি অর্থের অনটনে পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই সময়ে তাঁহার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। বিদেশে অবস্থানকালে তিনি রচনা করেন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু এ ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। অর্থোপার্জনের চেষ্টায় তিনি 'হেক্টর বধ' কাব্য (১৮৭১) ও 'মায়াকানন' নাটক (১৮৭৪) রচনা করেন।

মধুসূদনের শেষ জীবন দুঃখ ও দারিদ্র্যে পূর্ণ। আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে ২৬ জুন হেনরিয়েটা লোকান্তরিত হন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, কলিকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ; যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত (তৃতীয় সং), কলিকাতা, ১৩১২; নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, কলিকাতা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

সুশীল রায়

মধুসূদন সরস্বতী (১৫০০ খ্রী ?) মধুসূদন সরস্বতী বেদান্তবাদী দার্শনিক। তাঁহার আবির্ভাব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে। পূর্ববঙ্গে (অধুনা, বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায় বৈদিক রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের বংশে তাঁহার জন্ম। পিতা প্রমোদপুরন্দর ভট্টাচার্য (মিশ্র)। পূর্বাশ্রমে তিনি তর্ক-শাস্ত্রবিদ্যা, সন্ন্যাস ও ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করেন যথাক্রমে নবদ্বীপের হরিনাম তর্কবাগীশ, বিশ্বেশ্বর সরস্বতী ও মাধব সরস্বতীর নিকট। অতঃপর আজীবন কাশীধামে তাঁহার অবস্থান।

মধুসূদন বহু অধ্যাত্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থের প্রণেতা। তাহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: (ক) 'বেদান্ত কল্প-লতিকা', 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণ', 'প্রস্থান ভেদ', 'শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা', 'শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশটীকা', 'সিদ্ধান্ত-তত্ত্ববিন্দু', (খ) 'ভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা', 'ভাগবদ্ভক্তি-রসায়ন'। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনাকীর্তি। ন্যায়দর্শনের প্রবক্তা ব্যাসতীর্থের 'ন্যায়ামৃত' পুস্তকে শংকরাচার্য ও তাঁহার সমর্থকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিবাদ-সমূহ খণ্ডন করিয়া এই গ্রন্থে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন।

দার্শনিকরূপে তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হইলেও ধর্মজীবনে দ্বৈতবাদী এবং ভক্তিমার্গ-অনুসারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'ভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা'য় তিনি ভক্তি-বাদের বলিষ্ঠ ব্যাখ্যাতা।

দ্র S. N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol. II, Cambridge, 1940.

মোহনলাল মিত্র

মধ্যপ্রদেশ ভারতের বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য (১৭°৫২′-২৬°৪০′ উত্তর ও ৭৪°-৮৪°১৪′ পূর্ব)। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের সময় তৎকালীন মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ, ভূপাল

এবং প্রাচীন মধ্যপ্রদেশের চতুর্দশটি জেলা লইয়া ভারতের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত বর্তমান মধ্যপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হইয়াছে। এই রাজ্যের উত্তরপ্রান্তে রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ, পূর্বপ্রান্তে বিহার ও ওড়িশা, দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্র রাজ্য অবস্থিত। রাজ্যের মোট আয়তন ৪৪৩৪৫৯ বর্গকিলোমিটার। রাজ্যে ৭টি বিভাগ—ভূপাল, বিলাসপুর, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, জবলপুর, রায়পুর; জেলার সংখ্যা ৪৩। ইন্দোর, জবলপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, উজ্জয়িনী, রায়পুর, দুর্গ ও সগর এই ৮টি প্রধান শহর। রাজধানী ভূপাল।

সমস্ত রাজ্যটি ভারতের বিশাল মালভূমি অঞ্চলে অবস্থিত; উত্তর সীমা ভারতের বিশাল সমভূমির প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজ্যটি প্রায় সর্বত্র ৩০৫ মিটার উচ্চ; রাজ্যের পূর্বসীমায় বহু অংশের উচ্চতা প্রায় ১২২০ মিটার। বিন্ধ্য, সাতপুরা প্রভৃতি কয়েকটি পশ্চিম-পূর্ব-বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী এই মালভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। নর্মদা এই দুই পর্বতের মধ্য দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত। নর্মদার উৎসের নিকট হইতে উত্তরগামী শোণ নদীর উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ-মৃত্তিকা অঞ্চল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্বাংশে প্রশস্ত ছত্রিশগড় সমভূমি। মহানদী, ইন্দ্রাবতী ও ওয়ার্ধা এই অঞ্চলের জল নিষ্কাশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। চম্বল ও বেতোয়া এই রাজ্যের উত্তর অংশের উপর দিয়া প্রবহমাণা। পশ্চিমে কিছু অংশে তাপ্তী নদী পশ্চিমদিকে বহিয়া গিয়াছে।

পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের গড় ১৫২৫ মিলিমিটার। স্থান-বিশেষে আরও বেশী। পশ্চিম অঞ্চলের গড় ৬৩৫ মিলি-মিটারের চেয়েও কম। উত্তরে দিল্লী-কানপুরের নিকটবর্তী অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম সহনীয়। বিন্ধ্য ও সাতপুরা অঞ্চলের তাপমাত্রা মধ্যশ্রেণীর। আবদ্ধ নর্মদা উপত্যকা বিশেষ উষ্ণ। বৃষ্টিপাতের সময়ের স্থিরতা না থাকায় চাষআবাদের জন্য জলসেচ প্রয়োজন।

মধ্যপ্রদেশে প্রাচীনকালে ভীল, গন্ড প্রভৃতি জাতির বসবাস ছিল। এখনও তাহাদের এই অঞ্চলে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান মধ্যপ্রদেশের এরূপ অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণের সংযোগস্থল বলিয়া ইহার গুরুত্ব ছিল ও নানা সময়ে নানা অঞ্চল ইতিহাসে স্থান পায়। বুদ্ধের সময় উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। অশোকের সময়কার ভিলসার নিকট সাঁচীস্তূপের ভগ্নাংশ এখনও বর্তমান। মালব বা মাল-ওয়া ইতিহাসে বহুবার উল্লেখিত হইয়াছে। শুঙ্গ (খ্রী পূ ২য় শতক), অন্ধ্র, শক, গুপ্ত, হূন, কলচুরি, চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পরমার রাজাদের নাম এই মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষের সহিত হিন্দু রাজত্বকালে ক্রমান্বয়ে জড়িত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে মুসলমান প্রভাব এই অঞ্চলে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। মধ্যে গন্ড-রা গন্ডোয়ানা অঞ্চলে রাজত্ব বিস্তার করে। গন্ডরাণী দুর্গাবতী সম্রাট আকবরের সহিত যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। মুসলমান সম্রাটদের প্রভাব কমিলে এই অঞ্চল মারাঠাদের আয়ত্তে আসে ও পিন্ডারী দস্যুরা এই অঞ্চলে তাহাদের ঘাঁটি করে। ক্রমে ইংরেজেরা এই অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার প্রভৃতি রাজন্যগণ ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। ভারত স্বাধীন হইবার পর এই রাজ্যগুলি ভারতে যোগ দেয় ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ অঞ্চল সৃষ্ট হয়।

এই রাজ্যের প্রায় ৩০% বনাঞ্চল; ইহা প্রায় ১৭২০০০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত। প্রধান ও অর্থকরী বৃক্ষ শাল ও সেগুন। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যে মহুয়া, বাঁশ, ধাওরা, পলাশ, অঞ্জন, হাররা উল্লেখযোগ্য। এখানকার সেগুন অতি প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন জংগলে লাক্ষা ও কেন্দু-বিড়িপাতা প্রচুর পাওয়া যায়।

জংগলে বন্য মহিষ, বাইসন, বাঘ, চিতাবাঘ, হায়না, নীল-গাই, কালো হরিণ, চিতল, নানাবিধ বৃহৎ আকারের হরিণ ও অসংখ্য বানর দেখা যায়। তাহা ছাড়া ময়ূর, বন্য মোরগ, patridges, green pigeon ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে নানাপ্রকার বিষাক্ত সাপ প্রচুর; স্থানবিশেষে কুমীরও দেখা যায়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জবলপুর হইতে ১৬৪ কিলোমিটার দূরে কানহায় ২৫৬ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। এখানকার প্রধান সংরক্ষিত জন্তু বড়শিং হরিণ (Indian Swamp Deer)। আগ্রা-বোম্বাই রাজপথে গোয়ালিয়র হইতে ১২১ কিলোমিটার দূরে শিবপুরী জাতীয় পার্ক ২০৮ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত, এখানে চিনকরা (Indian gazella) প্রচুর পরিমাণে আছে।

এখানকার অধিকাংশ লোকই চাষআবাদের উপর নির্ভর-শীল। রাজ্যের প্রায় শতকরা ৫৬ ভাগ অংশ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্বদিকে বৃষ্টিপাত বেশী থাকায় ধান ও গমের চাষ বেশী। পশ্চিমদিকে মালবের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল তুলার জন্য প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া পশ্চিমদিকে ছোলা, ভুট্টা, তৈলবীজ, কমলালেবু, লেবু প্রভৃতি নানাপ্রকার ফল, তামাক ও জোয়ারের চাষ প্রধান। নর্মদা উপত্যকা ও বিন্ধ্যাঞ্চলের জেলাগুলিতে গম প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। প্রধান বিক্রেয় পণ্যশস্য তুলা ও ইক্ষু; অন্য নানা উৎপাদনও, যেমন তৈলবীজ, তামাক, চীনাবাদাম ইত্যাদি লাভজনক হইতেছে।

রাজ্যে পুষ্করিণী খাল ও নানাবিধ নদী পরিকল্পনা দ্বারা জলসেচ করিয়া চাষের সুবিধা করা হইয়াছে। তান্দুলা খাল (১৯২১ খ্রী) মহানদী খাল (১৯২৭ খ্রী) প্রভৃতি ছাড়া বর্তমানে প্রধান বহুমুখী নদী পরিকল্পনা চম্বল, বর্ণা, তাওয়া, হাসদেও ও মাতাটিলা দ্বারা প্রায় ১৭·৯ লক্ষ একর জমি সিঞ্চিত হইতেছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক ছোট প্রকল্প কুন্দনালা, সগরনদী, দুধওয়া প্রভৃতি রহিয়াছে। চম্বলের উপর গান্ধীসাগর জলাশয় ও রাণাপ্রতাপ সাগর জলাশয় উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশে বিদ্যুৎশক্তির

উৎপাদনক্ষমতা ২৮৭·৫ মেগাওয়াট। কোরবা, অমরকণ্টক, গান্ধীসাগর ব্যারাজ ও সাতপুরায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রহিয়াছে।

বলা হয় খনিজসম্পদে মধ্যপ্রদেশ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ রাজ্য। খনিজ সম্পদের বিস্তৃতি হিসাবে এই রাজ্যের ছিন্দওয়াড়া, সুরতনা, সাতনা, শাহডোল এবং জবলপুরের স্থানই অগ্রগণ্য। মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ইহা বালাঘাট, ছিন্দওয়াড়া, সিওনি ও ঝাবুয়া জেলাতেই প্রধানতঃ পাওয়া যায়। লৌহ দুর্গ, বস্তার, জবলপুর, ছতরপুর, হোসংগাবাদ জেলায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। বস্তারের বয়লাডিলা অঞ্চলের আকরিক লৌহ উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উত্তোলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হইতেছে। কয়লা ছিন্দওয়াড়া, শাহডোল, হোসংগাবাদ, বেটুল, শুরগুজা, বিলাসপুর জেলায় পাওয়া যায়। কোরবা অঞ্চলে উত্তোলন কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বাৎসরিক উৎপাদন ১০০০০০০ টনেরও অধিক। ইহা ছাড়া বক্সাইট, চুনাপাথর, অ্যাসবেস্টস যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই রাজ্যের পান্না অঞ্চলের হীরক জগৎবিখ্যাত।

দুর্গ জেলার ভিলাই-এ সোভিয়েট সাহায্যে ভারতের অন্যতম বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাটি স্থাপিত হইয়াছে। নিকটে চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ ও কয়লা পাওয়া যায়, ফলে ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল (ভিলাই দ্র)। ভূপালে ভারী ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির কারখানা ১৯৬০ হইতে কার্য করিতেছে। পূর্বে নিমার অঞ্চলে নেপানগরে নিউজপ্রিন্ট তৈয়ারীর কারখানা আছে। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্য চলিতেছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের সাবাই ঘাস সাহায্যে উৎপাদন হয়। এখন বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫০০০ টন। মধ্যভারতের বস্ত্র বয়ন শিল্প উল্লেখযোগ্য। গোয়ালিয়রের চীনামাটির বাসন ভারত-বিখ্যাত। এখানে কয়েকটি সিমেণ্টের কারখানা আছে। নানা কুটিরশিল্পের মধ্যে চান্দেরী শাড়ী, পাগড়ী, লাক্ষার কাজ, ভূপালের কাঠের খেলনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লোকসংখ্যা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা প্রায় ২৪% বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩২৩৭২৪০৮ হইয়াছিল, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৪১৬৫০৬৮৪ হইয়াছে। জনসংখ্যা বর্গ-কিলোমিটার প্রতি ৭৩ (১৯৬১) মাত্র।

রাজ্যে নানা জাতির মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। এক-তৃতীয়াংশ বিশেষ আদিবাসী ও তপশীলভুক্ত জাতি। ভীল, মুণ্ডা, বৈগা, গোণ্ডা, মারিয়া, মাণ্ডিয়া প্রভৃতি এই অঞ্চলের আদিবাসী। প্রতি ৭ জনের মধ্যে একজন আদিবাসী। এই রাজ্যে ৩৭৭টি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। হিন্দী প্রধান ভাষা (১৯৯৬৫৯৭২)। অন্যান্য ভাষার মধ্যে মারাঠী, রাজস্থানী, গুজরাটি। (১৯৬১ খ্রী হিসাবে) হিন্দুর সংখ্যা ৩০৪২৫৭৯৮, জৈন ২৪৭৯২৭, বৌদ্ধ ১১৩৩৬৫, মুসলমান ১৭৪৫১০৩, খ্রীষ্টান ১৮৮৩১৪, শিখ ৬৫৭১৫, অন্যান্য ১২৯৪০।

রাজ্যটি শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর নহে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও (১৯৬১ খ্রী) মাত্র ১৭% শিক্ষিত। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। প্রাই-মারী, সেকেন্ডারী ও কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় ৮০০ লোক পিছু ১টি। অনেক শহরে ও প্রায় ৩০০০ গ্রামে প্রাইমারী শিক্ষা আবশ্যিক ও বিনা বেতনে দেওয়া হয়। ১৫০টি কলেজ ও ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। খৈরাগড়ে সঙ্গীতের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। হাজারের অধিক ডাক্তারী অনুষ্ঠান, কলেজ, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আছে। কর্মচারী রাজ্য বীমা সমিতি এই রাজ্যের কর্মীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে। আদিবাসী ও তপশীলভুক্ত জাতির জন্যও নানা সুব্যবস্থা হইতেছে।

এ রাজ্যে তিনটি রেল-ব্যবস্থা—দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের সহিত যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতেছে, মধ্য রেলপথ দক্ষিণে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ এবং উত্তরে উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর সহিত যোগাযোগ, পশ্চিম রেল-পথ দ্বারা রাজস্থান ও গুজরাতের সহিত সংযোগ ব্যবস্থা হইতেছে। রাজ্য মধ্যে জাতীয় রাজপথ ২৬৮৬ কিলো-মিটার, মোটর চলাচলের উপযোগী রাস্তা ২৬৬৫৭ কিলো-মিটার। আগ্রা-বোম্বাই জাতীয় রাজপথ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে খর্জুরাহের বিখ্যাত মন্দির (খজুরাহ দ্র) ও সাঁচীস্তূপের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্র *The Imperial Gazetteer of India*, Oxford, 1908; NCAER, *Techno-Economic Survey of Madhya Pradesh*, New Delhi, 1960.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রেণী দ্র

মধ্বাচার্য শংকরের অদ্বৈতবাদের বিরোধী। তাঁহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ অথবা আনন্দতীর্থ। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক।

মধ্ব মতবাদের নয়টি প্রধান সিদ্ধান্ত এইরূপঃ—(১) ব্রহ্ম, বিষ্ণু, অথবা হরিই সর্বোত্তম সত্য। (২) বিষ্ণুই সকল শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য; এবং একমাত্র শাস্ত্র হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। (৩) জীবজগৎ সত্য। (৪) জীবজগৎ ব্রহ্ম, অথবা, বিষ্ণু হইতে নিত্যভিন্ন। (৫) জীবগণ বিষ্ণুর নিত্যসেবক। (৬) জীবগণ বদ্ধ ও মুক্ত ভেদে পরস্পর ভিন্ন। (৭) বিষ্ণুর পাদপদ্ম লাভ এবং জীবের স্বরূপাভিব্যক্তিই মুক্তি। (৮) শুদ্ধা ভক্তি মোক্ষের সাধন। (৯) প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ।

মধ্ব মতে পদার্থ দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। ব্রহ্ম অথবা বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র অথবা স্বাধীন সত্তা; অন্যান্য সকল পদার্থই পরতন্ত্র অর্থাৎ বিষ্ণুর অধীন। ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, সগুণ; নিষ্ক্রিয় নহেন, সক্রিয়। কিন্তু, তিনি জগতের কেবল নিমিত্ত কারণই মাত্র, উপাদান কারণ নহেন—জড়-প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ।

ব্রহ্ম বা বিষ্ণু সচ্চিদানন্দময়, দিব্যদেহবান ও অনন্ত-মূর্তিবিশিষ্ট। কিন্তু অনন্ত গুণ ও শক্তির আকর, এবং হস্তপদাদি বিভিন্ন অঙ্গ-বিশিষ্ট হইলেও তিনি স্বগত-ভেদশূন্য, যেহেতু, তাঁহার স্বরূপ, গুণ, শক্তি, নাম, রূপ, লীলা, অবয়ব ও দেহে কোনও রূপ পার্থক্য নাই। এই দিক্ হইতে মধ্বের মতবাদ একটি মৌলিক মতবাদ।

মধ্বের মতে জীব জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণু ও বহু।

মধ্ব দ্বৈতবাদী; অর্থাৎ, মধ্বের মতে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ নিত্যভিন্ন। বস্তুতঃ, মধ্ব-মতে, এই পঞ্চবিধ ভেদ নিত্য—(১) জীব ও ঈশ্বরে ভেদ; (২) জড়জগৎ ও ঈশ্বরে ভেদ; (৩) জীব ও জড়ে ভেদ; (৪) জীব ও জীবে পরস্পর ভেদ; (৫) জড় ও জড়ে পরস্পর ভেদ।

জীব ও ঈশ্বর নিত্যভিন্ন বলিয়া মুক্ত জীবও ঈশ্বর হইতে নিত্যভিন্নই থাকেন; কেবলমাত্র কিয়দংশে ব্রহ্মসদৃশ হন মাত্র। মুক্তজীবও ব্রহ্মের অধীন, সেবক, উপাসক ও দাস। মুক্তি চতুর্বিধ—সাযুজ্য, সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য। মধ্বের মতে মোক্ষ পরিপূর্ণ, আনন্দঘন অবস্থা, দুঃখাভাব-মাত্রই নহে। মধ্ব বিদেহ মুক্তিবাদী; অর্থাৎ তাঁহার মতে, জীবিত অবস্থায় নহে, কেবল দেহপাতের পরই মুক্তি সম্ভবপর।

মধ্বের মতে অবিদ্যাই বন্ধনের মূল কারণ। সেজন্য জ্ঞান অথবা বিদ্যাই মুক্তির প্রথন সোপান। জ্ঞান ভক্তির, এবং ভক্তি ধ্যানের জনক। ভক্তি ও ধ্যানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন।

মধ্বের মতে, ঈশ্বর-প্রসাদ ভিন্ন মুক্তি সম্ভবপর নহে। এরূপ প্রসাদ লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বরধ্যান ও ঈশ্বরসেবা।

ব্রহ্ম ও জীবজগতের অভেদজ্ঞান, মুক্তির উপায় ত' নহেই; উপরন্তু জীবের অনন্ত নরকবাসের কারণ। এরূপ অনন্ত নরকবাসবাদ ভারতীয় দর্শনের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। মধ্বের মতে ব্রহ্মের সহিত জীবের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সম্ভব-পর নহে—যেহেতু বিষ্ণুর পুত্র ও প্রিয়তম বিগ্রহ বায়ুর মাধ্যমেই কেবল সে ব্রহ্মের প্রসাদ ও দর্শন লাভ করিতে পারে, সাক্ষাৎভাবে নহে। এরূপ ঈশ্বরপুত্রের মধ্যস্থতাবাদও ভারতীয় দর্শনে অন্যান্য সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয় না।

শংকরাদির অদ্বৈতবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক ও সমালোচকরূপে মধ্বের দ্বৈতবাদ চিরবন্দ্য।

দ্র মধ্ব-রচিতম্ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যম্, মাধবাচার্য-রচিতঃ সর্বদর্শনসংগ্রহঃ; Sarvapalli Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Vol. II, London, 1923, 1927.

রমা চৌধুরী

মন সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তার ধারা পরিপূর্ণ মৌলিক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। এই মন অত্যন্ত চঞ্চল। ইহাকে স্থির করাই যোগের উদ্দেশ্য। বহুদিনের অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন স্থির হয়। মন স্থির হইলেই সমাধি হয়। সমাধিতে আত্মদর্শন হয়। আত্মা ও মন পৃথক।

গ্রীকদর্শনে মন ও আত্মা এক। আত্মা চেতনধর্মী অজড় দ্রব্য এবং অমর। ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত-এর মতে এই মনের অপরোক্ষানুভূতি হয়।

পাশ্চাত্যদর্শনের প্রত্যক্ষাস্তিত্ববাদিগণের মধ্যে চরম-পন্থী হিউম মনকে চেতন বৃত্তিসমূহের সমষ্টি বলিয়াছেন। নিত্যচৈতন্যধর্মী আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব ইহার অস্তিত্ব নাই। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, কল্পনা, সুখ, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, ইচ্ছা, যুক্তি প্রভৃতি চেতন বৃত্তিগুলিকে একযোগে মন আখ্যা দেওয়া যায়।

পাশ্চাত্যদর্শনে জড়বাদী দার্শনিকগণ মনকে দেহের অবস্থা বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। মনের দেহাতিরিক্ত সত্তা এই মতে নাই। ভারতীয় দর্শনে চার্বাকগণও মনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই।

সাংখ্যযোগ মতে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি। বুদ্ধিতে পুরুষচৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় এবং বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতির পরিমাণ হইলেও এই প্রতিবিম্বপাতের ফলে চেতন হয়। এই বুদ্ধি যখন সংকল্প বিকল্প করে, তখন ইহাকে মন বলা হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক।

বুদ্ধি, অহংকার ও মন—এই তিনটি চিত্ত বা অন্তঃ-করণের অবস্থাবিশেষ। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা। বুদ্ধি যখন কর্তৃত্বাভিমানী হয়, তখন তাহাকে অহংকার বলে। এই অহংকারেরই একটি পরিণাম মন।

অন্তঃকরণ বা চিত্তের পাঁচটি বৃত্তি—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। এই পাঁচটিকে মনেরও বৃত্তি বলা যাইতে পারে।

ন্যায়মতে অন্তঃকরণ ও মন অভিন্ন। মন অন্তরিন্দ্রিয় ও সুখ-দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষের কারণ। এই মন অণু। অণুপরিমাণ মন যে ক্ষণে যে ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সে ক্ষণে কেবলমাত্র সেই ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ জন্মে। মন অত্যন্ত দ্রুতগতিশীল পদার্থ, অবয়বহীন ভৌতিক দ্রব্য নহে, আত্মার ন্যায় বিভু নহে।

অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ মনের অণুত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মন সাবয়ব, অনিত্য এবং বহুবিধ পরিণামশীল।

তারাশংকর ভট্টাচার্য

মনঃসমীক্ষণ, মনঃসমীক্ষা ভিয়েনার সিগমুন্ড ফ্রয়েড আবিষ্কৃত মনোবিকার চিকিৎসা পদ্ধতি। ইহাতে অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে রোগীর লুপ্ত স্মৃতিকে মনের সজ্ঞান স্তরে আনিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করা হয়। ফ্রয়েডের পূর্বে ভিয়েনার চিকিৎসক যোসেফ ব্রয়ার এক হিস্টিরিয়া রোগীর লুপ্ত স্মৃতি জাগরিত করিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করেন। ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই মনঃসমীক্ষণ প্রণালী গড়িয়া উঠে।

ব্রয়ার ও তাঁহার সহযোগী ফ্রয়েড লক্ষ করিলেন যে কেবল লুপ্তস্মৃতি জাগরূক করিলেই রোগমুক্তি হয় না; স্মৃতির সহিত রোগীর যে প্রক্ষোভ জড়িত থাকে তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ না হইলে রোগ সারে না। ফ্রয়েড উপলব্ধি করিলেন, অবাধ ভাবানুষঙ্গের সাহায্যেই বিস্মৃত ঘটনা ও তাহার সহিত জড়িত প্রক্ষোভের স্মৃতি জাগরিত করা যায়, এবং তাহা দ্বারাই রোগমুক্তি সম্ভব।

বহু রোগীর মনোবিশ্লেষণের পর ফ্রয়েড মনের কার্যাবলী সহজভাবে বুঝিবার জন্য মনের তিনটি স্তরের কল্পনা করেনঃ ১. সংজ্ঞান মন, ২. অসংজ্ঞান মন, ৩. নির্জ্ঞান মন। মনের যে সকল চিন্তাধারা আমাদের বর্তমান মনকে ব্যস্ত রাখে তাহা লইয়াই সংজ্ঞান মন। যে সকল চিন্তা বা ঘটনা বর্তমানে মনে নাই কিন্তু চেষ্টা করিলেই মনে আনা যায় তাহা লইয়াই হয় অসংজ্ঞান মন এবং যে সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছা, ঘটনা, আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছি, কোনও প্রকার সজ্ঞান চেষ্টা দ্বারা যাহা মনে আনা সম্ভব নয় তাহা নির্জ্ঞান মনের অন্তর্গত। ফ্রয়েডের মতে যে সকল ইচ্ছা অসামাজিক অথবা নীতিবিরুদ্ধ, এবং যে সকল ঘটনা এইরূপ ইচ্ছার সহিত জড়িত তাহা নির্জ্ঞান মনে স্থান লাভ কর। নির্জ্ঞান মনের এই সকল ইচ্ছা সততই সজ্ঞান মনে আসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু একটি বাধাশক্তির দ্বারা ক্রমাগত প্রতিহত হইয়া নির্জ্ঞান স্তরেই থাকিতে বাধ্য হয়। এই বাধাশক্তিকে প্রতিবন্ধ এবং প্রতিহত ইচ্ছাকে 'অবদমিত' ইচ্ছা বলা হয়। এই অবদমিত ইচ্ছাই মানুষের দৈনন্দিন ছোট বড় ভুল-ভ্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ঈডিপাস কম্প্লেক্স প্রভৃতি মনোবিকার পর্যন্ত সব কিছুরই কারণ বলিয়া বর্ণিত হয়।

দ্র সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, মনঃসমীক্ষণ, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ; গিরীন্দ্রশেখর বসু, স্বপ্ন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; Sigmund Freud, *Two Short Accounts of Psycho-Analysis*, Tr. James Strachey, London, 1962.

মায়া দেব

মনরো স্যর টমাস (১৭৬১—১৮২৭) প্রথমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজ সৈন্যদলে যোগদান করেন (১৭৮৯ খ্রী)। ইহার পর তিনি যথাক্রমে স্যর হেক্টর মনরো ও স্যর আয়ার কুটের অধীনে মহীশূর যুদ্ধে ও পরে ৩য় মারহাট্টা যুদ্ধে যোগ দেন ও ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দেন। তিনি মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হন। ইতিপূর্বে তিনি কানাড়ায় নিযুক্ত হন ও পরে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ইংরাজগণকে প্রদত্ত জেলাসমূহের ভার পান। ১৮০৭-১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে থাকিবার সময় হাউস্ অফ্ কমন্স্ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার (সনন্দ) পুনঃপ্রবর্তিত করা সম্বন্ধে তাঁহার মত গ্রহণ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি কে. সি. বি., ও ব্যারনেট হন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। রায়তওয়ারি প্রথা প্রবর্তন তাঁহার বিশেষ কীর্তি।

স্যর হেক্টর মনরো (১৭২৬-১৮০৫) বক্সারের যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মীর কাশিমকে পরাজিত করেন (১৭৬৪ খ্রী)। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলির সহিত যুদ্ধে দারুণ ভীত হইয়া মাদ্রাজে পলাইয়া যান। ইহার পরে পোর্টোনোভোর যুদ্ধের সময় তিনি স্যর আয়ার কুটের অধীনে একটি ডিভিসনের নেতৃত্ব করেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারেল হন।

দ্র *Sir Thomas Munro*, John Bradshaw, Rulers of India Series, Oxford, 1894.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মনসা নাগমাতা। মহাভারতে ইনি জরৎকারুর পত্নী, আস্তীকের মাতা ও বাসুকির ভগিনী। ঋষি কশ্যপ ব্রহ্মার আদেশে ইঁহাকে মন দ্বারা সৃষ্টি করেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)। প্রচলিত মতে, শিববীর্য হইতে পদ্মবনে ইঁহার জন্ম। জরৎকারু, পদ্মা, বিষহরি, জাগুলি প্রভৃতি ইঁহার নামান্তর।

সর্পপূজা অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। গৃহ্যসূত্রেও ইহার উল্লেখ আছে। মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার এবং ভারহুতের যুগ হইতে ভারতের সর্বত্র নাগ ও নাগিনী মূর্তি দেখা গিয়াছে। নাগমুকুট এবং ঘটমণ্ডিত দেবী মূর্তিও সাতনা, খিচিং দিনাজপুর, রাজশাহী এবং অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন, চৈতন্যের আবির্ভাবকালে লোকে নানা পুতুল গড়াইয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করিত। আষাঢের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে ঘটে অথবা সিজবৃক্ষে দুধ-কলা দিয়া দেবীর পূজার প্রচলন বঙ্গের নানাস্থানে আছে। পল্লী অঞ্চলে পূজার পর আটদিন ধরিয়া মনসার ভাসান-গান বা অষ্টমঙ্গলা গীত হয়।

লৌকিক সর্পপূজা বাস্তু, আরোগ্য ও বৃক্ষদেবতার ভাবনার সহিত বৈদিক লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ঐতিহ্য, বৌদ্ধ মহামায়ূরী, জাঙ্গুলী এবং জৈন শাসনদেবী পদ্মাবতীর রূপকল্পনা এবং তৎসহ নানা উপাখ্যানের (চাঁদ সওদাগর ও বেহুলা প্রভৃতি) সমবায়ে মনসা পূজার সৃষ্টি। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মনসামঙ্গল একটি সুবৃহৎ অধ্যায়। কবি-

গণের মধ্যে বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকশিল্পে মনসার ঘট-পট ও চালি এবং লোকসংগীতে রয়ানীগানের বিশিষ্ট মর্যাদা রহিয়াছে। 'নাগপঞ্চমী' ও 'মঙ্গলকাব্য' দ্রষ্টব্য।

দ্র Sukumar Sen, *Manasa Vijaya,* Calcutta, 1953.

কল্যাণী দত্ত

মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্য দ্র

মনেয়র উইলিয়ম (১৮১৯-১৮৯৯) প্রখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ। পিতা কর্ণেল এবং সার্ভেয়ার জেনারেল বোম্বাই প্রেসিডেন্সি। জন্ম বোম্বাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্কলারশিপ লাভ করিয়া সংস্কৃত চর্চা করিতে থাকেন। হেল্‌বেরী কলেজে সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক (১৮৪৪-১৮৫৮ খ্রী)।

ম্যাকস্‌মূলারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি অক্সফোর্ডে 'বোডেন' অধ্যাপক পদ লাভ করেন (১৮৬০-১৮৮৭ খ্রী)। অক্সফোর্ডে ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট স্থাপন (১৮৮৩ খ্রী)। তিনি তিনবার ভারতবর্ষে আসেন। ভারতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রজ্ঞান, গ্রন্থাদির অনুবাদ, পাঠনির্ণয় এবং উত্তম সম্পাদনার জন্য বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সংস্কৃত-ইংরেজী সুবৃহৎ অভিধানখানিই সর্বশ্রেষ্ঠ (১ম সং ১৮৭২)। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌ (১৮৫৩, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ), নলোপাখ্যান (২য় সং ১৮৭৯ খ্রী) Indian Wisdom (১৮৭৫ খ্রী),Hindusim (১৮৭৭) খ্রী)।

দ্র *Dictionary of National Biography Supplement,* Vol. III, London, 1901.

কল্যাণী দত্ত

মনু ব্রহ্মার পৌত্র। মানব জাতির আদি পুরুষ। মনুসংহিতায় বলা হইয়াছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজ দেহকে নারী ও পুরুষরূপে বিভক্ত করিয়া ঐ নারীর গর্ভে স্বয়ং বিরাটরূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই বিরাট পুরুষ তপস্যার দ্বারা মনুর সৃষ্টি করিলেন। মনু প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দশজন প্রজাপতির জনক হইলেন। এই দশজন প্রজাপতি হইতে ক্রমান্বয়ে সাতজন মনু ও অন্যান্য দেবগণের জন্ম হইল।

পুরাণ মতে মনুদিগের সংখ্যা মোট চৌদ্দ; তাঁহাদের নাম স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য ও ভৌত্য। ইহার মধ্যে প্রথম সাতজন মনুসংহিতায়ও উল্লিখিত। মনুদের রাজত্বকাল মন্বন্তর নামে অভিহিত। প্রতি মন্বন্তরে মনুর সঙ্গে সঙ্গে সপ্তর্ষিমণ্ডল, দেবগণ ও মনুপুত্রগণ নূতন করিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

সুব্রতা সেন

মনুসংহিতা মানবধর্মশাস্ত্র। স্বায়ম্ভুব মনুরচিত বলিয়া প্রচারিত। চাতুর্বর্ণিক সমাজের ধর্মনিরূপণ বা কর্তব্য নির্ণয় ইহার বিষয়বস্তু।

ঐতিহাসিকরা বলেন মনুসংহিতা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নহে। কথিত আছে ব্রহ্মার নিকট এই ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মনু তাঁহার শিষ্য ভৃগুর মাধ্যমে মনুসংহিতার প্রচার করেন। আদিতে ইহার শ্লোকসংখ্যা ছিল একলক্ষ, পরে তাহা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হয়। পি. ভি কেণের মতে বর্তমান মনুস্মৃতি খ্রী পূ ২০০ হইতে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে রচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়বিশিষ্ট অধুনালভ্য মনুসংহিতায় ২৬৯৪টি শ্লোক পাওয়া যায়। ইহাতে জগতের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণের প্রশংসা, ব্রহ্মচারীর ব্রতাচরণ; বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিকল্প; জীবিকার লক্ষণ ও গৃহস্থের নিয়ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার, অশৌচ ও দ্রব্যশুদ্ধি এবং স্ত্রীধর্ম; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসধর্ম, রাজধর্ম, ব্যবহার বা বিচারনির্ণয়, স্ত্রীপুরুষের ধর্ম ও দায়ভাগ, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য কর্ম; সংকীর্ণ জাতিগণের উৎপত্তি ও চারিবর্ণের আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্তধর্ম, শুভাশুভ কর্মের ফলাফল ও মোক্ষ ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনুর নাম সংশ্লিষ্ট এই ধর্মশাস্ত্রটি অভ্রান্ত ও ভেষজতুল্য হিতকর বলা হইয়াছে। গ্রন্থটির প্রভাব কেবল ভারতীয় জনজীবনে নহে অপি চ ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মের ন্যায় বিশাল ভারতীয় দেশগুলিতেও স্পষ্ট। মনুসংহিতার মেধাতিথি, কুল্লূক প্রভৃতির বহু ভাষ্য গ্রন্থ আছে।

দ্র P. V. Kane, *History of Dharmasastra,* Vol. I, Poona, 1930.

সুব্রতা সেন

মনোবিদ্যা মনোবিদ্যাকে পূর্বে আত্মাসম্বন্ধীয় বিদ্যা বলিত। গ্রীক দার্শনিকেরাই ছিলেন মনোবিদ্যার ধারক ও বাহক এবং মনোবিদ্যা ছিল দর্শনশাস্ত্রেরই অংশবিশেষ।

বহু শতাব্দী পরে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে অধ্যাপক ভিলহেল্‌ম্‌ ভুনড্‌ট-ই প্রথম মনোবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়গুলির সম্পর্কে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য এক পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হেবর ও ফেকনার নামক পদার্থবিদ্‌দ্বয় তাঁহাদের বিখ্যাত হেবর-ফেকনার সূত্র প্রবর্তন দ্বারা বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সময় হইতে মনোবিদ্‌রা মনোবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। এই ধরনের চিন্তাধারা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে নিম্নলিখিত সম্প্রদায়গুলির উদ্ভব হইয়াছিল ঃ

১. কার্মিক (Functional) মনোবিদ্যাঃ কোন একটা

মনোবিদ্যা

কিছু মানুষ কেন করিয়া থাকে? কেমন করিয়াই বা তাহা করিয়া থাকে? এবং কেনই বা সেইটি করিবে? এই তিনটি প্রশ্নর উত্তর অনুসন্ধান করাই হইতেছে কার্মিক মনোবিদ্যার প্রধানতম আলোচ্য বিষয়।

২. অবয়বী (Structural) মনোবিদ্যাঃ অবয়বের দ্বারা কোনও কিছুর সম্বন্ধে 'ইহা কি'? তাহার কর্মের দ্বারা 'ইহা কি করে?' এবং শেষে 'ইহা কিসের জন্য'—এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে যে মিল আছে তাহা অনুধাবনের জন্য মনের চেতন অংশ লইয়া আলোচনা। এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন ভুনড্‌ট্‌ ও জেম্‌স।

৩. অনুষঙ্গবাদ (Associationism) ঃ শিক্ষাকার্যে স্মরণপ্রণালীর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় শিক্ষার ভাবগুলির মধ্যে অনুষঙ্গের প্রভাবের জন্যই স্মরণে আসে। ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও সান্নিধি একসঙ্গে কাজ করে। এই বিষয়ে গবেষণার জন্য এবিংহস, থর্নডাইক, পাভ্‌লভ, স্পিয়ারম্যান প্রমুখেরা বিখ্যাত।

৪. মনঃসমীক্ষণবাদ (Psychoanalysis) ঃ ভিয়েনাতে সিগমুণ্ড ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণবাদের আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন ('মনঃসমীক্ষণ' দ্র)।

৫. অস্মিতা ও অবয়বী (Personalistic and Organismic) মনোবিদ্যা ঃ জার্মানী ও আমেরিকাতে এই মতবাদের উদ্ভব হয় (১৯০০ খৃ)। উইলিয়াম জেম্‌স এই মতবাদের সূত্রপাত করেন। ইঁহারা ব্যক্তিকে একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিত্ব কয়েকটি অংশ-ব্যক্তিত্বের সমষ্টির দ্বারা গঠিত। ইহাদের মধ্যে সামাজিকতা, বস্তু-কেন্দ্রিকতা, ধার্মিকতা এক-একটি অংশ-ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

৬. হরমিক (Horomic) মনোবিজ্ঞানঃ প্রতিটি মানুষের প্রতিটি আচরণের মধ্যে কোনও এক প্রকারের নিহিত অভিপ্রায় থাকে। এই মতের প্রতিষ্ঠাতা ম্যাকডুগ্যাল (১৯০৮ খৃ) বলেন এই অভিপ্রায়িক ক্রিয়াগুলির উৎপত্তি ১২ প্রকারের সহজ প্রবৃত্তির (রোগ, ভয়, ক্ষুধা ইত্যাদি) উপরে নির্ভরশীল। এইগুলি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিশুদ্ধ হয় এবং আচরণের মধ্যে সামাজিকতা আনে।

৭. আচরণবাদ (Behaviourism) ঃ আমেরিকাতে জন. বি. ওয়াটসনের একক প্রচেষ্টায় আচরণবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১৯১২ খৃ)। ইহা বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবলমাত্র উদ্দীপক (stimulus) এবং প্রতিবেদনের (response) সম্পর্ক, শিক্ষণ ও অভ্যাস এই বিষয়গুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে।

৮. গেস্‌টল্‌ট (Gestalt) মনোবিদ্যা ঃ জার্মানীতে হুারদাইমার, কাফ্‌কা ও কোহ্‌লার এই মতবাদের সূত্রপাত করিয়াছিলেন (১৯১২ খৃ)। বস্তুর বিষয়ের এবং ঘটনার সামগ্রিক সংগঠনের উপর তাহাদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ ও জীবের আচরণ এক সামগ্রিক ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। শুধুমাত্র উদ্দীপক ও প্রতিবেদনের দ্বারা তাহার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ইহাই লিউইনের ক্ষেত্রবাদের মূলকেন্দ্র। ক্ষেত্রবাদ ব্যক্তির সহিত এক সজীব পারিপার্শ্বিক অবস্থা অথবা ক্ষেত্রের সহিত এক মিলিত, নিবিড় সম্পর্কের উপর জোর দেয়।

বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যার প্রসারের ফলে নিম্নোক্ত শাখাগুলির আবির্ভাব হইয়াছে ঃ

১. প্রায়োগিক (Experimental) মনোবিদ্যা ঃ মানুষের বিভিন্ন ধরনের আচরণগুলি যে সকল নিয়ম মানিয়া চলে সেই সকল নিয়মের বিশ্লেষণ।

২. ফলিত (Applied) মনোবিদ্যাঃ মানুষের বিভিন্ন আচরণ যে সকল নিয়ম মানিয়া চলে সেই সকল নিয়মের বিষয়কে অবলম্বন করিয়া কিভাবে শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে তাহার আলোচনা।

৩. শারীর (Physiological) মনোবিদ্যা ঃ মানুষের শরীর ও মনের সম্পর্ক ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত আলোচনা।

৪. প্রাণী (Animal) মনোবিদ্যাঃ প্রাণীদের আচরণ-সম্পর্কে আলোচনা, যেহেতু মানুষকেও প্রাণীদের মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে।

৫. শিশু (Child) মনোবিদ্যাঃ শিশুদের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করিয়া বয়স্ক মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্যক ধারণা গঠন; অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষার আলোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৬. শিক্ষাশ্রয়ী (Educational) মনোবিদ্যাঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার প্রয়োগ কিভাবে শিক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পরের উপযোগিতাকে উন্নত করিতে পারে, তাহার আলোচনা।

৭. অস্বভাবী (Abnormal) মনোবিদ্যাঃ মানসিক রোগগ্রস্ত বা অসুস্থ মানুষের সম্পর্কে আলোচনা।

৮. সমাজ (Social) মনোবিদ্যাঃ সামাজিক পরিস্থিতিতে মানুষ কিরূপ আচরণ করিয়া থাকে, কেমন করিয়া একের দ্বারা অন্যের আচরণ প্রভাবিত হয় ইত্যাদির আলোচনা।

৯. শিল্পাশ্রয়ী (Industrial) মনোবিদ্যাঃ কিভাবে অল্প পরিশ্রমে ও ক্লান্তিতে আনন্দের সহিত ব্যক্তিগত যোগ্যতার সম্পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা শ্রমিক ও মালিক অল্প সময়ে অধিক ও উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে তাহারই আলোচনা।

১০. জনিক (Genetic) মনোবিদ্যাঃ মানবজীবনে বংশগতির বিশেষত্বগুলির উৎপত্তি ও সঞ্চার সম্বন্ধে আলোচনা।

১১. অপরাধবিদ্যা (Criminology)ঃ কেন এবং কিসের জন্য মানুষ অপরাধ করিয়া থাকে তাহার আলোচনা।

১২. মনোমিতি (Psychometry)ঃ মানুষের এক প্রকার আচরণের সঙ্গে আর এক প্রকার আচরণের কি সম্পর্ক তাহার আলোচনা। বিশেষ প্রকারের পরিসংখ্যানের সাহায্যে এই আলোচনা করা হইয়া থাকে।

মনোবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগ থাকা সত্ত্বেও ইহার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্বন্ধে মনোবিদরা যথেষ্ট সচেতন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম মনোবিদ্যা-বিভাগ খুলিয়াছিল। ভারতবর্ষে মনোবিদ্যা প্রকৃত প্রসার লাভ করিয়াছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে।

দ্র E. G. Boaving, *A History of Experimental Psychology*, New York, 1929; R. S. Woodworth, *Contemporary Schools of Psychology*, London, 1951.

বিশ্বনাথ রায়
প্রকাশচিত্ত নন্দী

মনোমোহন ঘোষ[১] (১৮৬৯-১৯২৪ খ্রী) সিভিল সার্জন কে. ডি. ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র মনোমোহন ঘোষের জন্ম বিহারের ভাগলপুরে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি। তিনি অরবিন্দ ও বিপ্লবী বারীন ঘোষের অগ্রজ। তাঁহার পিতা দশম বর্ষীয় বালক মনোমোহনকে ইংল্যান্ডে রাখিয়া আসেন। এখানে অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

১৮৯৪ খ্রী স্বদেশে আসিয়া সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন এবং সুদীর্ঘকাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ব্রতী ছিলেন। সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে মনোমোহন একটি স্মরণীয় নাম; ইংরেজী, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল।

মনোমোহন জন্মকবি। কবি-স্বভাবে বিশুদ্ধ রোমান্টিক। গীতি-কবিতার রচয়িতা। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় তিনি আর্থার ক্রিপ্‌স্, স্টীফেন ফিলিপ্‌স্ ও সহপাঠী কবিবন্ধু লরেন্স বিনিয়নের সঙ্গে একযোগে নিজেদের কবিতা-সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'প্রিমাভেরা' নামে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে তিনি ইংলন্ডে কবিরূপে স্বীকৃতি পাইলেন।

দেশে ফিরিবার পর তাঁহার একটি কাব্যগ্রন্থ "লভ্ সংস্ অ্যান্ড এলিজিস্" লন্ডনে মুদ্রিত হয়। মৃত্যুর পর ১৯২৬ খ্রী বিলাতে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ "সংস্ অব্ লভ্ অ্যান্ড ডেথ" কবি লরেন্স বিনিয়নের স্মৃতিকথা সম্বলিত সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের কবিতাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন ডব্‌লু. বি. ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিবৃন্দ।

১৯১৫ খ্রী তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং ১৯২২ খ্রী হইতে একটি চক্ষু বিনষ্ট ও অপরটিও ছানিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পায়।

তাঁহার অপ্রকাশিত রচনাবলী ও চিঠিপত্র পাঁচটি খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইবে। এই সকলের প্রকাশ সম্পূর্ণ হইলে তাঁহার কবি-প্রতিভা ও কাব্যসাধনার যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভবপর হইবে।

দ্র *Presidency College Magazine*, 1924, No. 3, Calcutta; শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়ঃ কবি মনোমোহন, 'অমৃত', ৩ মাঘ, কলিকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

মোহনলাল মিত্র

মনোমোহন ঘোষ[২] (১৮৪৪-১৮৯৬ খ্রী) পিতা বিক্রমপুরের ঘোষ পরিবারের রামলোচন, রামমোহন রায়ের বন্ধু, সদরআলা। শিক্ষা কৃষ্ণনগর কলিজিয়িট স্কুলে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে। 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬১ খ্রী)। বিলাত গমন ও ব্যারিস্টারি পাশ (১৮৬২-৬৬ খ্রী)। কলিকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস ও প্রতিষ্ঠা লাভ। দেশহিতৈষী, জাতীয় কংগ্রেসের একজন নেতা। বাংলা তথা ভারতের অবস্থা জানাইবার জন্য ১৮৮৫, '৮৭, '৯০, '৯৫ খ্রী ইংল্যান্ড যান। বহুপ্রকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। ইনি মধুসূদন দত্তের বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুকালে প্রতিশ্রুতি মত তাঁহার পুত্রদের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

মনোমোহন পাঁড়ে (বঙ্গাব্দ ১২৮২—১৩৪২) পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ের পুত্র। পুরাতন বাংলা নাট্য জগতের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্ব লাভ করেন (১৯০৪ খ্রী) এবং মহেন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় ১৯০৫ খ্রী ওই থিয়েটার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। মহেন্দ্র মিত্রের মৃত্যুর পর (১৯১১ খ্রী) উক্ত রঙ্গমঞ্চ পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া বিডন স্ট্রীট ও সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-র সংযোগ স্থলে অবস্থিত কোহিনুর থিয়েটারও তাঁহার অধিকারে আসে (১৯১২ খ্রী)। ১৯১৫ খ্রী তাহার নাম দেওয়া হয় মনোমোহন থিয়েটার। ১৯১৫-২৪ খ্রী এখানে কণ্ঠহার, বঙ্গে বর্গী প্রভৃতি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হয়।

বহু জনহিতকর কর্মোদ্যোগে মনোমোহন উদারভাবে দান করিতেন। তিনি কাশীতে 'বীরেশ্বর পাঁড়ে ধর্মশালা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

জ্যোতির্ময় বসু রায়

মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুলাই যশোহর জেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে মনোমোহনের জন্ম হয়। পিতা দেবনারায়ণ বসু। তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। হেয়ার স্কুলে এবং জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) শিক্ষালাভ করেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই মনোমোহন কবিতা রচনা করিতেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনাই 'সংবাদ

প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি নিজেই দুইখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ বিভাকর' এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'মধ্যস্থ'।

মনোমোহন 'হিন্দুমেলার' একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

নাটক রচনায় পুরাতন নাটগীতির সহিত আধুনিক নাটকের যোগাযোগ ঘটাইয়া তিনি যে নূতন রীতির সৃষ্টি করিলেন, তাহা তৎকালীন শিক্ষিত মার্জিতরুচি বাঙালীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই আদর্শেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক রচনা করেন। মনোমোহনের প্রথম রচনা 'রামাভিষেক নাটক' (১৮৬৭) পৌরাণিক এবং দ্বিতীয় নাটক 'প্রণয় পরীক্ষা নাটক' (১৮৬৯) সামাজিক। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে পদ্যমালা (১৮৭০), সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), হিন্দুর আচার ব্যবহার (১৮৭৩), বক্তৃতামালা (১৮৭৩), দুলীন (ঐতিহাসিক উপন্যাস, ১৮৯১) উল্লেখযোগ্য।

তিনি কলিকাতায় 'মনোমোহন লাইব্রেরি' নামে একটি পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন এবং ১৩০৩ বঙ্গাব্দে ইহার অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৫১ সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোহরদাস আউলিয়া ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের সহিত কাঁদড়া গ্রামে থাকিতেন। নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন যে জ্ঞানদাসের সঙ্গে ইনি খেতুরির মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ইনিও জ্ঞানদাসের ন্যায় জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল। হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে। তথায় মকরসংক্রান্তি তিথিতে ইঁহার তিরোভাব উপলক্ষে মেলা বসে ও মহোৎসব হয়। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে এবং বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী গোকুলনগরেও কিন্তু ইঁহার সমাধিস্থল দেখানো হইয়া থাকে।

বিমানবিহারী মজুমদার

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার ২০ আগস্ট ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হইল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ভারতবর্ষে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিকাশ। এই ঘোষণার পরেই তিনি ভারত সফরে আসেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'রিপোর্ট অন ইণ্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশানাল রিফর্‌ম্‌স' ('মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট' নামে খ্যাত)। এই রিপোর্ট অনুযায়ী 'ভারত শাসন আইন, ১৯১৯' বিধিবদ্ধ করিয়া যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয় তাহাকে বলা হয় মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার।

ইহাতে কেন্দ্রে কোনও ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে নাই কিন্তু প্রাদেশিক শাসনে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম ধাপ অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমোক্ত বিষয়গুলির পরিচালনা সপার্ষদ গভর্নরের হাতে ন্যস্ত হয়। শেষোক্ত বিষয়গুলির পরিচালনা এক বা একাধিক মন্ত্রীসহ গভর্নরের হাতে প্রদত্ত হয়। গভর্নর এইগুলি সম্বন্ধে মন্ত্রীদের পরামর্শের দ্বারা চালিত হইবেন, যদি না তিনি অন্যথা কাজ করার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পান। সপার্ষদ গভর্নরের উপর প্রাদেশিক বিধান পরিষদের (নির্বাচিত সভ্য অন্ততঃ ৭০%) কোনও কর্তৃত্ব ছিল না, কিন্তু পরিষদ মন্ত্রীদের বেতন বন্ধ করিয়া মন্ত্রী অপসারণের ক্ষমতা পাইয়াছিল। প্রদেশের এই দ্বিধাবিভক্ত শাসনব্যবস্থাকে ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্য বলা হইত।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

মণ্টেস্কু ফরাসী চিন্তাবিদ মণ্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের জন্য খ্যাত। ১৭২৮ হইতে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ইওরোপ ও ইংল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন। ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে।

আইনের মূলতত্ত্ব (দ্য লেস্প্রি দে লোয়া) তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আইনের সহিত সমাজের শাসনব্যবস্থা, দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও জলবায়ু, ধর্ম, আচারব্যবহার ও অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া মণ্টেস্কু বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় রাজনীতির বাস্তব ভিত্তি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখান। তিনিই প্রথম শাসনব্যবস্থাকে ক্ষমতা প্রয়োগের নীতির ভিত্তিতে গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র এই চারি শ্রেণীভুক্ত করেন, তাহাদের বহিরঙ্গের উপর কম গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতি ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মূল চালিকাশক্তিও নির্ধারণ করেন—যেমন স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রে, ভয়।

একশ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ এবং ইংলণ্ডীয় প্রথানুযায়ী আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির বিভাজন তাঁহার মতে নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

মণ্টেস্কুর নিজেরই কথায়, তিনি প্রথমে মানুষ পরে ফরাসী। ইওরোপের বাহিরের বিভিন্ন স্বল্পজ্ঞাত সমাজব্যবস্থার প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফিরাইয়া তিনি তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার পথ প্রস্তুত

করেন। তাঁহার বিশ্লেষণের নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এইজন্য তিনি স্মরণীয়।

ইন্দ্রাণী রায়

মন্তেসরি প্রণালী প্রাক্-প্রাথমিক শিশুশিক্ষার প্রণালী-বিশেষ। সেগুইন এবং ইটার্ডের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ইতালীয় মনোরোগবিশারদ মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২) ইহার প্রবর্তক। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে প্রচলিত ফ্রয়েবেলের কিন্ডারগার্টেন প্রণালীর ইহা একটি পরিবর্তিত সংস্করণ। সাধারণতঃ ৩ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রণালী-অনুসৃত বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিয়া শিশুকে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজেকেই লইতে শিখানো হয়। শিশুর ইচ্ছাশক্তিকে সঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করায় এবং তাহার আবেগের বাধাহীন প্রকাশের অবকাশ দেওয়ায় শিশুর আত্মসংযম, মনঃসংযোগ, নীতিবোধ প্রভৃতির যথাযথ উন্মেষ ঘটে। সুষ্ঠু শারীরিক বিকাশের মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তার উন্মেষে সাহায্য করা ইহার একটি বিশেষ নীতি। নানা ধরনের খেলা ও কাজের মাধ্যমে সুষ্ঠু অঙ্গসঞ্চালনের ফলে শিশুর দেহের বিভিন্ন পেশীর সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটে ; ব্যক্তিগত নির্দেশ দিয়া শিশুদের পঠন, লিখন এবং অন্যান্য সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করাই ইহার বৈশিষ্ট্য। এই প্রণালীতে মন্তেসরি-প্রবর্তিত ও বিশেষভাবে নির্মিত একপ্রকার কৃত্রিম উপকরণ (ডাইড্যাক্টিক্ অ্যাপারেটাস) শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার দ্বারা শিশুর স্পর্শানুভূতি এবং বিভিন্ন বস্তুর আকার, বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদির ধারণাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে সাহায্য করা হয়। সমবয়স্ক শিশুদের সাহচর্যে, খেলা ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজকর্মের মাধ্যমে শিশুর সহিষ্ণুতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব, সহানুভূতি এবং অন্যান্য সামাজিক গুণাবলী বিকশিত হইয়া উঠে।

ইতালীতে প্রবর্তিত হইলেও কিছুকালের মধ্যেই ইহা ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রসার লাভ করে। তবে কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির তুলনায় ইহার প্রসার অনেকাংশে কম। ভারতে বেসরকারি উদ্যোগে বহুস্থানে মন্তেসরি প্রণালীতে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কলিকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্তেসরি বিভাগটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আরতি দাশ

মন্ত্রিসভা সংসদীয় বা ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থায় সকল শাসনক্ষমতা সাংবিধানিক আইনে রাজার বা রাষ্ট্রপতির অথবা রাজ্যপালের হাতে ন্যস্ত থাকে কিন্তু তাঁহাকে 'সাহায্য ও পরামর্শ' দেওয়ার জন্য একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হয়। মন্ত্রিসভাই প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী ; রাজার, রাষ্ট্রপতির অথবা রাজ্যপালের নামে তাঁহারাই কার্যতঃ দেশ অথবা রাজ্যকে শাসন করেন।

ভারতে কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। রাজ্যে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীরা সমবেতভাবে মন্ত্রিসভা (Council of Ministers) নামে অভিহিত। লোকসভার নিকট কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিধানসভার নিকট রাজ্য মন্ত্রিসভা যৌথভাবে দায়ী। মন্ত্রীরা পার্লামেন্টের অথবা বিধানমন্ডলীর সভ্য হইবেন ; যদি কোনও মন্ত্রী নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে তাহা হইতে না পারেন তবে তাঁহার মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিবে। মন্ত্রীদের পদাধিকারকাল আইনতঃ রাষ্ট্রপতির/রাজ্যপালের 'মর্জি'র ('pleasure') উপর নির্ভর করে কিন্তু কার্যতঃ আইনসভার ইচ্ছানুসারেই এই 'মর্জি' প্রযুক্ত হইবে, ইহাই সংসদীয় ব্যবস্থার অলিখিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধি।

প্রধান মন্ত্রী (কিংবা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী) মন্ত্রিসভার শীর্ষ-স্থানীয়। মন্ত্রীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) ও উপমন্ত্রী (Deputy Minister)। ক্যাবিনেটের যৌথ মন্ত্রণা ও সিদ্ধান্তের দ্বারাই সরকারের সকল বিভাগের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারিত হয়। ক্যাবিনেটের সকল অধিবেশনে যোগদানের অধিকার ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের আছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী নিমন্ত্রিত হইয়া ক্যাবিনেটের কোনও বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন। উপমন্ত্রী স্বীয় দপ্তরের মন্ত্রীকে সাহায্য করেন মাত্র, ক্যাবিনেটের অধিবেশনে যোগ দেন না। 'সংবিধান, ভারতীয়' দ্র।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

মন্থরা দশরথমহিষী কৈকেয়ীর মাতৃকুলের কুব্জা দাসী। ইঁহার মুখে রামাভিষেকের সংবাদ পাইয়া কৈকেয়ী প্রথমে হৃষ্টা হন কিন্তু পরে মন্থরা রামের বনবাস এবং ভরতের অভিষেকের জন্য দশরথের নিকট বর প্রার্থনার মন্ত্রণা দান করিলে কৈকেয়ী রাজ্যলোভে উৎফুল্ল হইয়া মন্থরাকে অভিনন্দিত করেন। পরবর্তী বহু বিপর্যয়েও কৈকেয়ী মন্থরার পরামর্শে শেষ পর্যন্ত অবিচলিত ছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যাকান্ড)। ভরত ও শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিয়া মন্থরাকে নিগৃহীত করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ বলেন, দেবগণের প্রার্থনায় তৎকালে দুষ্টা সরস্বতী মন্থরার হৃদয়ে অবস্থান করিয়াছিলেন।

কল্যাণী দত্ত

মন্দার ভারতবর্ষে দুইটি মন্দার পর্বত। একটি ভাগলপুর জেলায়, অন্যটি আরবসাগরের সন্নিকটে। মন্দারের মাহাত্ম্যের বর্ণনা বরাহ, অগ্নি, গরুড় এবং নারসিংহ পুরাণে

পাওয়া যায়। মন্দার পর্বত দ্বারাই সমুদ্র মন্থন করা হইয়াছিল। বরাহপুরাণে যে মন্দারের বিবরণ লিপিবন্ধ রহিয়াছে তাহা গংগার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। উহাই ভাগলপুর জেলার মন্দার। ইহার প্রধান দর্শনীয় হইল মধুসূদনের মন্দির। ১৫০৮-০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য ইহা দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ ১৫৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে যবন কালাপাহাড় ঐ মন্দিরটি ধ্বংস করেন। হিন্দুরা বিগ্রহটি স্থানান্তরিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং আবার তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানকালে পৌষসংক্রান্তির দিন মধুসূদনের বিগ্রহ বৌংসী হইতে মন্দার পর্বতে আনীত হয়।

মন্দার পর্বত জৈন এবং শাক্তদের তীর্থস্থান। মৎস্য-পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মন্দারের কামচারিণী দেবীর পীঠস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

মন্দিরা খঞ্জনী দ্র।

মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা, অপ্সরা হেমার গর্ভজাতা, লঙ্কেশ্বর রাক্ষস রাবণের প্রধানা মহিষী এবং ইন্দ্রজিতের জননী। সুন্দরকাণ্ডে সুপ্তা মন্দোদরীকে দেখিয়া হনুমানের সীতা বলিয়া ভ্রম হয়।

যুদ্ধকাণ্ডে ইনি স্বয়ং সভাস্থলে উপনীত হইয়া যুদ্ধ-বিরতি ও সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন এবং সীতা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য রাবণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন। অশোকবনে সীতার প্রতি উৎকট আচরণকালেও ইনি রাবণকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। রাবণ বধের পর ইনি বলেন, রূপে, কুলে অথবা দাক্ষিণ্যে মৈথিলী আমার অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট এমন কি আমার তুল্যও ছিলেন না।

বিভীষণ রাজ্যলাভের পর মন্দোদরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার ইনি অন্যতম।

কল্যাণী দত্ত

মন্বন্তর চতুর্দশ মনুর মধ্যে পর্যায়ক্রমে এক একজন মনুর যুগ চলে। ইহাদের প্রত্যেকটি যুগকে মন্বন্তর বলে। ৭১টি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়; এক মন্বন্তরে দেবতা-দের ১২০০০ বৎসর ও মানুষের ৪৩২০০০০ বৎসর। চতুর্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ চতুর্দশ মনুকালের অবসানে এক ব্রহ্মদিন হয়। মোট ৩০৬৭২০০০০টি মন্বন্তর; অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে। বর্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর যুগ বা মন্বন্তর চলিতেছে। মহাভারত ও পুরাণে মন্বন্তরের উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া যায়।

মন্বন্তরের অপর অর্থ দুর্ভিক্ষ, বন্যা, বিপ্লব বা প্রলয়।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

মমতাজমহল অর্জুমন্দবানু বা মমতাজমহল সম্রাজ্ঞী নুর-জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর দুহিতা। তাঁহার জন্ম ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত জাহাংগীরের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুরমের বিবাহ হয়। তিনি সম্পদে বিপদে সর্বদা শাহজাহানের অনুগামিনী ছিলেন। মমতাজ ও শাহজাহানের চতুর্দশটি সন্তান হয়। তন্মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান জাহান আরা বেগম, তৃতীয় দারাশুকো, চতুর্থ শাহশুজা, পঞ্চম রোশন আরা বেগম, ষষ্ঠ ঔরংগজীব, দশম মুরাদ বখ্‌স্‌ ও চতুর্দশ গৌহর-আরা বেগম, এই সাতজন মাতার মৃত্যুর সময় জীবিত ছিলেন। চতুর্দশ সন্তানের জন্মের সময় ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে মমতাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃতদেহ প্রথমে বুরহান-পুরে জৈনবাদের উদ্যানে সমাধিস্থ হয়। ছয়মাস পরে তাহা আগ্রায় নীত হইয়া তাজের উদ্যানে রক্ষিত হয়। একবিংশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার, এবং মৃত্যুর পর শাহজাহানের দেহও তথায় পাশাপাশি রক্ষিত হয়। নুরজাহান, জাহান-আরা, মেহরউন্নিসার ন্যায় মমতাজ মহলও উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন।

দ্র *Padishahnamah,* Abdul Hamid Lahori, Vol. I; *Dara Shukoh,* Vol. I, by Kalikaranjan Quanungo, Calcutta, 1935.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

ময় শিল্পপণ্ডিত, শুক্রাচার্যপ্রবর্তিত নিখিল শিল্পবিদ্যার অধীশ্বর এবং অষ্টাদশজন বাস্তুশাস্ত্র উপদেষ্টার অন্যতম (মৎস্যপুরাণ)। মহাভারত ও হরিবংশ মতে ইঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা দক্ষকন্যা দনু বা দিতি। ইঁহার কন্যা মন্দো-দরী (মৎস্য), পুত্র মায়াবী, দুন্দুভি (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড)।

ময় জামাতা রাবণকে সুবিখ্যাত শক্তি, ভীমসেনকে অসুররাজ বৃষপর্বার গদা এবং অর্জুনকে দেবদত্ত শঙ্খ উপহার দেন।

তপস্যার বলে ময় যে লৌহ, রজত ও স্বর্ণময় পুরত্রয় নির্মাণ করেন তাহা ধ্বংস করিয়াই মহাদেব ত্রিপুরারি আখ্যা লাভ করেন (মৎস্য, ১২৯-১৪০ অ.)।

খাণ্ডবদাহন পর্বে অর্জুনের অনুগ্রহে ইঁহার জীবন-রক্ষা হওয়ায় ইনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ যুধিষ্ঠিরের রত্নময়ী সভা নির্মাণ করিয়া দেন।

কল্যাণী দত্ত

ময়নামতী বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের ৫ মাইল পশ্চিমে ময়নামতী লালমাই পাহাড়শ্রেণী। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খননের সময় যে তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাহার দ্বারা এই অঞ্চলে সহজযানের প্রসার, পট্টিকের রাজ্যের সমৃদ্ধি, সমতট ও আরাকানের সৌহার্দ্য প্রভৃতি তথ্য নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। ১৯৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খননের ফলে অগণিত মৃৎ-ফলক, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, বুদ্ধমূর্তি, বিহার ও স্তূপের ভগ্নাবশেষ এবং এমন কয়েকটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারা খ্রীষ্টীয় ৭ম-১২শ শতক পর্যন্ত সমতটের

বিলুপ্ত ইতিহাস পুনর্লিখিত হইয়াছে। উহা সংক্ষেপে এইরূপঃ ১. বৌদ্ধ খড়্গবংশ (আনুমানিক ৬৫০-৭২০ খ্রী)। রাজগণ ক্রমান্বয়েঃ খড়্গোদ্যম—জাতখড়্গ—দেবখড়্গ—রাজরাজ। রাজধানী—জয়কর্মান্তবাসক (বর্তমান বড়্‌কামতা গ্রাম) (আশরফ্‌পুর তাম্রশাসন)। ২. দেববংশের বৌদ্ধরাজগণ (আনুমানিক ৭৫০-৮৫০ খ্রী)ঃ শান্তিদেব-বীরদেব-আনন্দদেব-ভবদেব। (শালবন ও চারপত্রমুরা শাসন।) ৩. চন্দ্রবংশের বৌদ্ধরাজগণ (আনুমানিক ৮৫০-১০৩৫ খ্রী)ঃ পূর্ণচন্দ্র - সুবর্ণচন্দ্র - ত্রৈলোক্যচন্দ্র - শ্রীচন্দ্র - কল্যাণচন্দ্র-লড়হচন্দ্র-গোবিন্দচন্দ্র। প্রাচীন রাজধানী—রোহিতগিরি, শ্রীচন্দ্রের সময় হইতে বিক্রমপুর। ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ ও হরিকেল এবং শ্রীচন্দ্র ও কল্যাণচন্দ্র গৌড় ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ জয় করেন (মদনপুর, চারপত্রমুরা প্রভৃতি তাম্রশাসন)। ৪. বর্মবংশের বৈষ্ণব রাজগণ (আনুমানিক ১০৫০-১১৫০ খ্রী)ঃ জাতবর্মা, হরিবর্মা, সামলবর্মা, ভোজবর্মা। জাতবর্মা কৈবর্তরাজ দিব্যের বিজেতা। হরিবর্মার মন্ত্রী ভবদেবভট্ট (ভোজবর্মার বেলাব লিপি)। পরবর্তীকালের রাজগণের মধ্যে রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব ও বীরধরদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। ময়নামতীর আবিষ্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল শালবন বিহার। ইহা উচ্চ প্রাকার-বেষ্টিত একটি চতুষ্কোণ ভূখণ্ড, দৈর্ঘ্যে ৫৫০ ফুট। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ, প্রদক্ষিণ পথ, প্রশস্ত অলিন্দ, বেষ্টনী সোপান এবং ১১৫টি প্রকোষ্ঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর বিহারের সহিত শালবন বিহারের মন্দিরের নক্সা, গঠন ও মৃৎফলকগুলির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষণীয়। শালবনের এই নক্সাই মধ্যজাভার কলসনে এবং ব্রহ্মদেশের পগানের আনন্দমন্দিরে মুখ্যতঃ অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। কোটিলার মুরায় (শালবন হইতে ৩ মাইল দূরে) ত্রিরত্নের প্রতীক ৩টি বৃহৎ স্তূপ উল্লেখযোগ্য।

কোটিলার পশ্চিমে চারপত্রমুরায় প্রাচীন রন্ধনশালা এবং বৃহৎ মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাই ছিল লড়হ বা লৌড়মাধবের মন্দির।

দ্র F. A. Khan, *Mainamati*, Pakistan Quarterly, Vol. XI, No. 4, 1963.

ময়নামতীর গান নাথসাহিত্য দ্র।

ময়মনসিংহ বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা, (২৩°৫৭′-২৫°২৬′ উত্তর, ৮৯°৩৬′-৯১°১৬′ পূর্ব)। ইহার আয়তন ১৬৪৭৪ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে আসাম, পূর্বে শ্রীহট্ট, দক্ষিণ-পূর্বে ত্রিপুরা, দক্ষিণে ঢাকা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী।

ময়মনসিংহ জেলা জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, উত্তর ময়মনসিংহ, দক্ষিণ ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও টাঙ্গাইল মহকুমা, ৬০টি থানা, ৮০৬৯ গ্রাম ও ৬টি মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া গঠিত।

ব্রহ্মপুত্র এই জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পূর্বতীরের সহিত শ্রীহট্ট জেলার ও পশ্চিমতীরের সহিত পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা জেলার মিল দেখা যায়। পূর্বাংশ বর্ষায় জলমগ্ন হয়। পশ্চিম অংশ লৌহযুক্ত কর্দম গঠিত, ৪০—১০০ ফুট উচ্চ, উচ্চভূমি মধুপুর জঙ্গল নামে পরিচিত।

জেলার প্রধান নদী যমুনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা; অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীর নাম ধলেশ্বরী, ধামু ঘোরা, উত্তরা ও কংস। ইহারা প্রায়শঃ শাখানদী ও নাব্য।

জেলার অধিকাংশ অপেক্ষাকৃত নবীন পলিমাটি, কাঁকর, বালুময় কর্দম দ্বারা গঠিত। মধুপুর জঙ্গলের লাল মৃত্তিকা পুরাতন পলিমাটির সাক্ষ্য দেয়।

ময়মনসিংহ জেলার গ্রীষ্মকালীন গড় উত্তাপ ৩৭° সেণ্টিগ্রেড। শীতকালীন গড় ২০° সেণ্টিগ্রেড। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২১৫৬ মিলিমিটার।

এই অঞ্চলটি প্রাচীন রাজ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে এখানে পাকাপাকিভাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইহা ইংরাজ অধিকারে আসে এবং ১৭৮৭ খ্রী ময়মনসিংহ জেলার প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭৯০ খ্রী ত্রিপুরা ও নোয়াখালি ময়মনসিংহ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯৪৭ খ্রী পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইহা ঐ রাষ্ট্রের ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে ইহা স্বাধীন রাজ্য বাংলাদেশের অন্তর্গত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার লোকসংখ্যা ছিল ৭০১৮৯০৬ জন, তন্মধ্যে ৬১১৯০০০ মুসলমান, ৪৮৮০০০ হিন্দু, ৩৪৯০০০ নিম্নবর্ণের হিন্দু। জেলার উত্তরে গারো-পাহাড়ের পাদদেশে গারো, হাজং, হাদী, কোচ প্রভৃতি উপজাতিদের বাস।

জেলায় কৃষিজমির পরিমাণ ৩০১৬৩৬২ একর। জেলার প্রধান শস্য—ধান, ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, সরিষা ও গম। জেলায় প্রচুর পাট হয়। মধুপুর ও উত্তরে গারো-পাহাড়ে যথেষ্ট ছোট আঁশের তুলা হয়।

জেলায় ৩৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র আছে।

জেলায় বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান—চিনির কল, চালকল, পাটকল, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের কারখানা, ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতির কারখানা আছে।

কুটিরশিল্পের মধ্যে টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে তাঁতের কাপড় বোনা হয়। টাঙ্গাইলের শাড়ী বিখ্যাত।

এখানে পাটির চলন খুব বেশী। শীতলপাটিও খুব ভাল হয়। কাঁসার বাসনও উল্লেখযোগ্য।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য—পাট, ধান, তুলা ও মাছ।

জেলার সংযোগব্যবস্থা ভাল। ঢাকা ও চট্টগ্রামের সহিত বিমানপথে ময়মনসিংহ শহর যুক্ত।

মেঘনা, যমুনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীগুলি নাব্য। জগন্নাথগঞ্জ, ভৈরববাজার জলপথের বাণিজ্যস্থান।

জেলায় মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ৯৯১৮০৯ জন, তন্মধ্যে ৭৪৯২৫৭ পুরুষ ও ২৪২৫৫২ স্ত্রীলোক। শিক্ষিতের হার শতকরা ৭·৭ জন। জেলায় ৩টি কলেজ, ৭৩৮ উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১২৫৫ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ ও বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

ময়মনসিংহ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে অবস্থিত এই জেলার কেন্দ্র। এ জেলায় বহু জমিদার ছিলেন এবং তাঁহারা বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম স্থাপন করেন। জেলার উল্লেখ-যোগ্য স্থান হইল—জামালপুর, সরিষাবাড়ি (পাটকেন্দ্র) ও এলাসিন (পাট কেন্দ্র), টাঙ্গাইল, সন্তোষ, করটিয়া, ঘাটাইল, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ভৈরববাজার, কুলিয়ার চর, নেত্রকোণা ও সুষঙ্গ।

দ্র নির্মলকুমার বসু, বিয়াল্লিশের বাংলা, কলিকাতা, ১৩৭৭; Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, London, 1958; Govt of East Pakistan Bureau of Statistics, Dacca, 1964.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ময়ূর ভারতের জাতীয় পক্ষী। তিন জাতের ময়ূরের মধ্যে ভারত ও সিংহলে কেবল পাভো (pavo cristatus) দেখা যায়। ইহারা শিখাধারী, ক্ষুদ্রশির, দীর্ঘগ্রীব, বৃহৎ-কায়, লম্বপুচ্ছ। পুরুষই অধিক নয়নাভিরাম। বহুবর্ণ দীর্ঘ পালকে গঠিত পেখম উপর পুচ্ছাবরণ, প্রকৃত পুচ্ছ হ্রস্ব ও গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ।

সচরাচর নদীনালার কাছে, বনমধ্যে ও অরণ্যোপান্তের শস্যক্ষেত্রের নিকটে একটি পুরুষ, ২-৫টি স্ত্রী ও কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ময়ূর একত্র থাকে। কেকাধ্বনি শ্রুতিমধুর নয়। শস্য, গুল্ম এবং পতঙ্গ, ভেক, সরীসৃপ প্রভৃতি ময়ূরের খাদ্য। প্রজনন-ঋতুতে স্ত্রী-ময়ূরের চিত্তাকর্ষণের জন্য পুং-ময়ূর পেখম ছড়াইয়া মনোরম নৃত্য করে। স্ত্রী-ময়ূর সাধারণতঃ ৩-৬টি ডিম পাড়ে। স্ত্রী-ময়ূরই নীড়রচনা এবং ডিমে তা দেওয়া ও শাবকপালনের কাজ করে। ডিম ফুটিতে ১৮-৩০ দিন লাগে।

দ্র J. Delacour, *The Pheasants of the World*, London, 1951.

শীলা চট্টোপাধ্যায়

ময়ূরাক্ষী বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী। ইহা বিহারে সাঁওতালপরগণায় উত্থিত হইয়া সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলাগুলির মধ্য দিয়া প্রায় ২৪০ কিলোমিটার প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নদীতে পড়িয়াছে। ইহার নদীপর্যঙ্কে অন্যান্য উপনদীগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর এবং কোপাই। নদীটি বৃষ্টিপুষ্ট, বর্ষাকালে খরস্রোতা হইয়া নদীর মৃত্তিকা-ও শিলা-রুদ্ধ উচ্চ গর্ভ উপচাইয়া প্লাবনের সৃষ্টি করে ও বর্ষার শেষে আবার শীর্ণকায় হয়। নদী-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের অবস্থার উন্নতি সূচিত হইয়াছে। উপনদীগুলিতে বাঁধ দিবার ফলে জলের গতি-বেগ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। মেসাঞ্জোরের নিকট নদীটিতে ৬৬০ মিটার দীর্ঘ কানাডা বাঁধ নির্মিত হইয়াছে; উদ্দেশ্য, বন্যার উদ্বৃত্ত জল সংরক্ষণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। সিউড়ির নিকট তিলপাড়াতে সেচবাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর উভয়-তীরে খালের সাহায্যে সংরক্ষিত জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষাধিক হেক্টর ও বিহারের ১০ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ দ্বারা রবি ও খরিফ শস্য চাষের সুবিধা হইয়াছে।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

মরুভূমি ভূ-পৃষ্ঠের বালুকাময় বা প্রস্তরময় এবং প্রায় উদ্ভিদ্‌বিহীন ও বৃষ্টিহীন প্রান্তর মরুভূমি নামে পরিচিত। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে মরু অথবা অর্ধমরু অবস্থা দেখা যায়। মরুভূমি সৃষ্টির অন্যতম কারণ হইল শুষ্কতা (সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত ২৫০ মিলিমিটারের কম), এবং ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উদ্ভিজ্জ সংস্থানের স্বল্পতা। কেহ কেহ উদ্ভিদ্‌বিহীনতার জন্য তুষারময় মেরু অঞ্চলকেও তুষারমরু বলেন।

মরুভূমিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, উষ্ণ মরু ও নাতিশীতোষ্ণ মরু। উষ্ণ মরু বলয় মোটামুটি নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ২০° ও ৩০° অক্ষাংশের মধ্যে। উহা প্রধানতঃ মহাদেশসমূহের পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত। প্রাচ্য পৃথিবীর উষ্ণমরু বলয় (Old World Desert Belt) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার মরক্কো হইতে শুরু করিয়া সাহারা, আরব, বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত।

নাতিশীতোষ্ণ মরু অঞ্চল মধ্য অক্ষাংশে মহাদেশের অভ্যন্তরে বিশেষ করিয়া পর্বতবেষ্টিত উচ্চ পর্যংকে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, এশিয়ার গোবি ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রস্তরময় প্যাটাগোনিয়া।

মরু অঞ্চলে দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ প্রায় ৪৮° সেণ্টিগ্রেড, এবং রাত্রির শীতলতা প্রায় ১০° সেণ্টিগ্রেড হওয়ায় শিলা প্রতিদিনের সংকোচন ও প্রসারণে ফাটিয়া যায় ও জোড় আল্‌গা হইয়া যায়। ফলে বায়ুপ্রবাহের আঘাতে এবং বায়ু-বাহিত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম বালুকার ঘর্ষণে এই অঞ্চলের শিলা সহজেই স্থানচ্যুত ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

মরুভূমিতে অবনমনের ফলে মৃত্তিকা অপসারিত হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অবনমিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। এই অবনমিত

অঞ্চলগুলি যদি ভূগর্ভস্থ জলপৃষ্ঠে পেঁছায় তাহা হইলে লবণাক্ত হ্রদ অথবা মরূদ্যান দেখা যায়।

বায়ুবাহিত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ম বালুকার ঘর্ষণে শিলাস্তর সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নানারূপ বিকৃত আকৃতির মূর্তি গঠন করে। পরিবহণের সময় বায়ুবাহিত বালুকণাগুলি পরস্পর ঘর্ষণের ফলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া উঠে।

ক্ষয়িত উপাদানসমূহ বাতাসের দ্বারা বহুদূর বাহিত হইয়া মরুভূমির অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে পুনরায় সঞ্চিত হয়। বালুকাপূর্ণ বাতাস গতিপথে বাধাপ্রাপ্ত হইলেই বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়া উচ্চ ও দীর্ঘ বালুকার স্তূপ গঠন করে, ইহাই বালিয়াড়ি নামে পরিচিত।

মরু অঞ্চলের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূ-প্রকৃতিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। আফ্রিকার সাহারা এবং তুর্কিস্থানের মরুভূমি বালুকাময় এবং ইহারা যথাক্রমে আর্গ ও কুম নামে পরিচিত। আলজিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি মরু অঞ্চল ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা আবৃত। ইহাদের প্রস্তরময় মরুভূমি বলে। আলজিরিয়ায় রেগ্ এবং লিবিয়া ও মিশরে সেরির নামে ইহারা পরিচিত। অনেক মরুভূমি আবার শিলাময় হইয়া থাকে, ইহাদের হামাদা বলা হয়। ইহা বালুকাবিহীন নগ্ন শিলার দ্বারা গঠিত। ইহা বহুবিস্তৃত মসৃণ মঞ্চের ন্যায় অথবা জয়গেন (Zeugen), ইয়ার্দাং (Yardang) প্রভৃতি শিলাখচিত মূর্তির দ্বারা বৈচিত্র্যময়। গভীর নদীখাতযুক্ত মরু মালভূমি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কলরাডো প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়।

দ্র E. J. Monkhouse, *Principles of Physical Geography*, London, 1962.

চিত্রা সেন

মরুমক্কতয়ম দক্ষিণ ভারতের কেরল, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী নায়ার এবং অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের যৌথ পরিবার, যৌথ সম্পত্তি ও তাহার বণ্টন, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ বিষয়ক আইন। ইহা দীর্ঘপ্রচলিত কতকগুলি রীতি ও প্রথার সমষ্টি যাহা বিধিবদ্ধ আইন বলিয়া স্বীকৃত, কিন্তু শাস্ত্রীয় অনুশাসন দ্বারা সমর্থিত নয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয় স্ত্রীলোক হইতে বংশের পরম্পরা নির্ণয় এবং তদনুসারে যৌথ পরিবারের স্বীকৃতি। বিভিন্ন আইনের সাহায্যে ইহার বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬ খ্রী) তাহাদের মধ্যে প্রধান।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

মলমাস বঙ্গদেশ-প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহে সূর্যসিদ্ধান্তোক্ত সৌর ও চান্দ্র মাস, বর্ষই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চান্দ্রমাস দুই প্রকারে গণনা করা হয়। অমাবস্যা হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত অমান্ত; পূর্ণিমা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পূর্ণিমান্ত চান্দ্র মাস। অমান্ত মাস মুখ্য এবং পূর্ণিমান্ত গৌণ চান্দ্রমাস। রাশিসংক্রমণ অবলম্বনে সৌর মাস গণিত হয়। সকল সৌরমাসের দিনসংখ্যা সমান নয়; কারণ ভ-চক্রের পরিকল্পিত দ্বাদশ ভাষা বা রাশি সমান নয়। প্রতি চান্দ্র মাস প্রায় ২৯ দিনে পূর্ণ হয়। ফলে দেখা যায় সৌর ও চান্দ্র মাস কখনও সমান হয়, কখনও বা সৌরমাস আবার কখনও বা চান্দ্রমাস অধিক হয়। সৌরমাস হইতে কোনও চান্দ্রমাস অধিক হইলে সেই চান্দ্রমাসে ২টি সংক্রান্তি হয়। এই দ্বিসংক্রান্তি মাস ক্ষয়মাস। সৌরমাস হইতে কোনও চান্দ্রমাস ঊন হইলে সেই চান্দ্রমাসে একটিও সংক্রান্তি হয় না। সেই অসংক্রান্তি মাস অধিক মাস বা অধিমাস। এই অধিমাসই এক্ষণে মলমাস নামে আখ্যাত। দুই অমাবস্যাযুক্ত এবং রবিসংক্রান্তি বর্জিত মুখ্য চান্দ্রমাসই মলমাস। প্রাচীন নাম মলিম্লুচ বা সংসর্প। মলিম্লুচ শব্দের অর্থ চোর। ঐ মাসটি যেন চোরের ন্যায় দ্বাদশ মাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে। এই মাসে হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ। ইহা একটি অতিরিক্ত চান্দ্রমাস।

মলমাস আবিষ্কার বৈদিক ঋষিগণের কৃতিত্ব। ঋষিগণ বরুণদেবের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ঐ ধৃতব্রত দেবতা স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন এবং অপর যে ত্রয়োদশ মাস উৎপন্ন হয়—তাহাও জানেন। শঙ্করলাল কৃষ্ণ দীক্ষিত নারদসংহিতা হইতে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন যে অ-সংক্রান্তি মাসের নামই মলিম্লুচ বা সংসর্প এবং আধুনিককালের মলমাস। যে বৎসরে ক্ষয়মাস পড়ে সে বৎসরে দুইটি অধিমাস হয় (ঋগ্‌বেদ, ১৷২৫৷৮)। সৌর বৎসর প্রায় ৩৬৫৷১৫৷ এবং চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিন। ইহাদের পার্থক্য গড়ে ১১ দিন। এই সৌর বৎসর এবং চান্দ্র বৎসর ঠিক করিবার জন্য তিন বৎসর অন্তর একটি মাস বাদ দেওয়া হয়, ইহাকে মলমাস বলা হয়। আমাদের পূজাপার্বণ সমস্তই চান্দ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই মলমাস আবিষ্কারের জন্য আমাদের পূজাপার্বণ সমস্ত মাস ছড়াইয়া পড়ে না।

সরোজরঞ্জন দাশ

মলিয়ের (Jean Baptiste Poquelin Moliére, ১৬২২-৭৩ খ্রী) ফরাসী নাট্যকার ও অভিনেতা, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কমেডিলেখকদের মধ্যে অন্যতম; মলিয়ের ছদ্মনামে নাটক রচনা করেন। কলেজে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর মলিয়ের এক অভিনেতৃসম্প্রদায়ে যোগদান করেন ও ক্রমশঃ ইহার কর্মসচিব হন। পরে এই দল পারীতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৮০ খ্রী ইহা Comédie Française বা ফরাসী জাতীয় রঙ্গশালায় পরিণত হয়। মলিয়েরের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না। তিনি নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের অনুগ্রহ

লাভ করিয়াছিলেন। অভিনয় করার সময় হঠাৎ গুরুতররূপে অসুস্থ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

'মানুষের ভিতর যা কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই মলিয়েরের চোখে পড়েছে, আর যা তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন'।

মলিয়েরের প্রকৃত প্রতিভার প্রথম পরিচয় আমরা পাই 'ছলনাময়ী ললনা' (*Les Précieuses ridicules*, ১৬৫৯ খৃী) নাটকে। এখানে তিনি বাস্তব ফরাসী সমাজের যত উদ্ভট, নির্বোধ, পণ্ডিতম্মন্য ও পাপাচারী লোকেদের বিদ্রূপের মধ্য দিয়া ফরাসী নাট্যলোকের নূতন পথের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কালজয়ী বিদ্রূপাত্মক কমেডিগুলির মধ্যে *L'Avare*, *Le Bourgeois gentilhomme*, *Les Femmes savantes*, *Le Tartuffe*, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'মনুষ্যদ্বেষী' (*Le Misanthrope*, ১৬৬৬ খৃী) সম্ভবতঃ মলিয়েরের শ্রেষ্ঠ রচনা।

মলিয়েরের অধিকাংশ নাটক 'কমেডি অফ ম্যানার্স'। তিনি ফ্রান্সের বা আধুনিক ইওরোপের 'কমেডি অফ ম্যানার্স'-এর জনক।

বাংলার নাট্যকারদের বিশেষ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ-এর উপর মলিয়েরের প্রভাব পড়িয়াছে।

ইংরেজীতে বহু অনুবাদ হইয়াছে, তন্মধ্যে জন উডকৃত "Five Plays" (১৯৫৩) উল্লেখযোগ্য। লোকনাথ ভট্টাচার্যের "তার্ত্যুফ" সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত।

দ্র P. F. Saintonge & R. W. Christ, *Fifty Years of Moliére Studies*, Baltimore, 1942.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মল্লজী (মালোজী) ভোঁসলে ভোঁসলে দ্র।

মল্লাব্দ অব্দ দ্র।

মল্লিনাথ প্রসিদ্ধ টীকাকার। কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত তিনটিরই মল্লিনাথকৃত টীকার নাম সঞ্জীবনী। কিরাতার্জুনের ঘণ্টপথ, শিশুপালবধের সর্বংকষা, নৈষধচরিত্রের জীবাতু, ভট্টিকাব্যের সর্বপথীন এবং একাবলী নামক অলংকার গ্রন্থের তরলা টীকা মল্লিনাথের রচনা। পাণিনি, কোষ, অলংকার এবং পাঠনির্ণয়ের জন্য তাঁহার গ্রন্থ এখনও অপরিহার্য।

তাঁহার পুত্র কুমারস্বামী প্রতাপরুদ্রযশোভূষণের রত্নাপন নামক টীকা লেখেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে অনুমান করা হয় যে মল্লিনাথ বরঙ্গল বা তেলেঙ্গানার অধিবাসী এবং তাঁহার আবির্ভাবকাল শেষ ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দী।

কল্যাণী দত্ত

মশলা খাদ্যাদি সুস্বাদু ও সুবাসিত করিবার জন্য এবং ঔষধি ও উদ্বায়ী তৈলের উপাদান হিসাবে এই উদ্ভিদ্গুলির পত্র ফল ইত্যাদি ব্যবহার হয়। নিম্নে কতকগুলির পরিচয় ও ভারতে তাহাদের উৎপাদন-কেন্দ্র দেওয়া হইল।

কাবাব চিনি ঃ গোলমরিচ গোত্রের (ফ্যামিলি পিপেরাসিঈ, Piperaceae) দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের ফল। বিজ্ঞানসম্মত নাম পিপের কুবেবা (Piper Cubeba)। আদিবাস জাভা এবং মোলুক্কা। বর্তমানে ভারতে সামান্য পরিমাণে চাষ হয়।

কালোজিরা ঃ ছাগলবতী গোত্রের (ফ্যামিলি রানুনকুলাসিঈ, Ranunculaceae) দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ (হার্ব)। বিজ্ঞানসম্মত নাম নিগেল্লা সাতিভা (Nigella Sativa)। আদিবাস দক্ষিণ ইওরোপ। ভারতের প্রায় সর্বত্র চাষ হয়।

জয়ত্রী, জায়ফল ঃ মিরিস্তিকাসিঈ গোত্রের (Family Myristicaceae) অন্তর্গত চিরহরিৎ সুগন্ধি বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম মিরিস্তিকা ফ্রাগ্রান্স (Myristica fragrans)। উচ্চতা ৯-১২ মিটার। আদিবাস মোলুক্কা। বর্তমানে উষ্ণমণ্ডলের বহু অঞ্চলেই চাষ করা হয়। ভারতের তামিলনাড়ু ও কেরলে ইহার চাষ হয়; আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যেও কিছু গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল বিদীর্ণ ত্বকযুক্ত গোলাকার পীত-সবুজ ফলই সংগ্রহ করা হয়। পাকা ফল ফাটিয়া যাওয়ায় ভিতরে লাল বীজোপাঙ্গ দেখা যায়, ইহাই জয়ত্রী। সম্পূর্ণ শুষ্ক বীজ নাড়িলে ভিতরের শাঁস বাজিতে থাকে। কঠিন বস্তুর আঘাতে খোলার ন্যায় বীজের বহিস্ত্বক ভাঙিয়া শক্ত শুষ্ক শাঁস বাহির হয়; ইহাই জায়ফল।

জাফরাণ ঃ কলাবতী গোত্রের (ফ্যামিলি কান্নাসিঈ, Family Cannaceae) অন্তর্গত ১৫-২৫ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ বহুবর্ষজীবী কন্দযুক্ত একবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্রোকস সাতীভস (Crocus Sativus)। আদিবাস দক্ষিণ ইওরোপ। ভারতে কাশ্মীরের পাম্পুর এবং জম্মুর কিস্তোয়ার-এ চাষ সীমাবদ্ধ। ফুলের কমলাবর্ণ ত্রিধাবিভক্ত কেশর (গর্ভদণ্ডের অগ্রভাগসহ গর্ভমুণ্ড) দিয়া বাণিজ্যের জাফরাণ তৈয়ারি হয়। ১ কিলোগ্রাম জাফরাণের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ফুলের প্রয়োজন।

জিরা ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত (ফ্যামিলি উম্বেল্লিফেরিঈ, Umbelliferae) প্রায় ৩০ সেণ্টিমিটার উচ্চ বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কুমিনম কিমিনম (Cuminum Cyminum)। আদিবাস মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। ভারতের রাজস্থান ও গুজরাতে ইহার ব্যাপক চাষ হয়।

জোয়ান ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত ৪৫-৬০ সেণ্টিমিটার উচ্চ বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রাকিস্পেরনুম আম্মি (Trachyspernum ammi)। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশে ব্যাপক চাষ হয়।

ডালচিনি ঃ দারুচিনি গোত্রের (ফ্যামিলি লাউরাসিঈ, Lauraceae) অন্তর্গত চিরহরিৎ ৬-৭·৫ মিটার উচ্চ বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কিন্নামোমম জেইলানিকাম (Cinnamomum Zeylanicum)। মালাবার উপকূল ও সিংহলে বন্য অবস্থায় দেখা যায়। গাছের বাকলই ডালচিনিরূপে পরিচিত এবং মশলারূপে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ ডালচিনি সিংহলের চাষকরা গাছ হইতে পাওয়া যায়। ভারতের অধিকাংশ ডালচিনি নিম্নমানের এবং বন্য গাছ হইতে সংগৃহীত।

তেজপাতা ঃ দারুচিনি গোত্রের অন্তর্গত চিরহরিৎ বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কিন্নামোমম তামালা (Cinnamomum tamala)। গাছের পাতাই তেজপাতা বলিয়া পরিচিত। হিমালয়ের ৯০০—১৮০০ মিটার উচ্চ উষ্ণ অঞ্চলে, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে এবং উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের আর্দ্র অঞ্চলে জন্মানো যায়।

ধনিয়া ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত ২/৫-৭·৫ সেণ্টি-মিটার উচ্চ বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কোরিয়ান্দ্রম সাতীভম (Coriandrum sativum)। আদিবাস ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। ভারতের সকল রাজ্যেই ইহার চাষ হয়।

পানমৌরী ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত প্রায় ২ মিটার উচ্চ দ্বিবর্ষজীবী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ফিনিকুলম ভুলগারে (Finiculum Vulgare)। আদিবাস ইওরোপ। ভারতেও ইহার চাষ হয়।

মেথি ঃ শিম্বগোত্রের (ফ্যামিলি লেগুমিনোসী, Leguminosae) বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রিগোনেল্লা ফোয়েনম-গ্রেকম (Trigonella foenum grecum)। আদিবাস দক্ষিণ ইওরোপ। ভারতেও ইহার চাষ হয়।

মৌরী ঃ ধন্যাক গোত্রের বর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম পিম্পিনেল্লা আনীসম (Pimpinella anisum)। আদিবাস মিশর। ভারতেও চাষ হয়।

রাঁধুনি ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম ত্রাকিস্পের্নম রক্স্বর্গিয়ানম (Trachyspernum roxburghianum)। ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে চাষ হয়।

লঙ্কা ঃ বেগুন গোত্রের (ফ্যামিলি সোলানাসিঈ, Solanaceae) বহুবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞান-সম্মত নাম কাপ্সিকম ফ্রুতেন্স (Capsicum frutens)। ভারতের সর্বত্র কাঁচা ও শুষ্ক লঙ্কার উৎপাদন হয় এবং শুষ্ক লঙ্কা যথেষ্ট রপ্তানি হয়। লঙ্কার ঝাঁজের কারণ ক্যাপ্সিয়াসিন নামক উপাদান।

লবঙ্গ ঃ জাম গোত্রের (ফ্যামিলি মির্তাসিঈ, Myrtaceae) অন্তর্গত ৬-১২ মিটার উচ্চ শতাধিকবর্ষজীবী চিরহরিৎ দ্বিবীজপত্রী বৃক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কারিও-ফিল্লস আরোমাতিকস (Caryophyllus aromaticus)। আদিবাস মোলুক্কা। বর্তমানে প্রধান উৎপাদক জাঞ্জিবর। ভারতের কেরলে লবঙ্গ উৎপন্ন হয়। গাছের অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমুকুলই লবঙ্গ।

শা-জিরা ঃ ধন্যাক গোত্রের দ্বিবর্ষজীবী দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কারুম কারুভি (Carrum Carvi)। উত্তর ও মধ্য ইওরোপ ও এশিয়ায় চাষ হয়। ভারতের সমতলভূমিতে শীতকালে এবং কাশ্মীর, কুমায়ুন, গাড়ওয়াল এবং চম্বার ২৭০০—৩৭০০ মিটার উচ্চতায় গ্রীষ্মকালে কিছু পরিমাণে শা-জিরা জন্মায়। রুটি, বিস্কুট, কেক সুস্বাদু করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

শুল্ফা ঃ ধন্যাক গোত্রের অন্তর্গত দ্বিবীজপত্রী বর্ষ-জীবী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম আনেথম সোওয়া (Anethum sowa)। ভারতের সর্বত্র শীতের ফসলরূপে চাষ করা হয়।

হলুদ ঃ আদাগোত্রের (ফ্যামিলি জিঞ্জিবেরাসিঈ, Zingiberaceae) ৬০—৯০ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ বহুবর্ষজীবী একবীজপত্রী বীরুৎ। বিজ্ঞানসম্মত নাম কুরকুমা লঙ্গা (Curcuma longa)। আদিবাস দক্ষিণ এশিয়া এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ। ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষতঃ অন্ধ্র-প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তামিলনাড়ুতে চাষ করা হয়। রন্ধনে ও আচারে হলুদের কন্দ নিত্যব্যবহার্য মশলা। আয়ুর্বেদে ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। হলুদে টারমারল নামক উদ্বায়ী তৈল বর্তমান।

দ্র G. Watt, *A Dictionary of Economic Products of India,* Vols. II, V & VI, Calcutta, 1889, 1891 & 1892; *The Wealth of India : Raw Materials,* Vols. I, II, IV, VI, & VII, New Delhi, 1948, 1950, 1956, 1962 & 1966.

মুরারিপ্রসাদ গুহ

মশা আর্থ্রোপোডা গোষ্ঠীর হেক্সাপোডা শ্রেণীর ডিপ্টেরা বর্গের নেমাটোসেরা অধঃবর্গভুক্ত কিউলিসিডি পরিবারের পতঙ্গসমূহ। কিউলিসিডি পতঙ্গ ক্ষুদ্র ও কৃশকায়; মুখাংশে প্যালিপজোড়া শক্ত; শুয়া-জোড়া বহু খণ্ডে বিভক্ত, স্ত্রীতে বিরল রোমশ কিন্তু পুং-মশাতে বহু রোম-গুচ্ছযুক্ত। ডানা একজোড়া, পর্দার ন্যায় স্বচ্ছ। অপরিণত দশায় (ডিম-শূককীট-মূককীট) ইহা জলচর। পুং-মশার রক্তপান-ক্ষমতা নাই; স্ত্রী-মশাই রক্তপায়ী।

মশার ব্যাপ্তি প্রায় পৃথিবীজোড়া (সংখ্যাধিক্য উষ্ণ-প্রধান দেশেই)। অন্ততঃ ১৬ হাজার বর্ণিত প্রজাতি লইয়া গঠিত কিউলিসিডি পরিবার ডিক্সিনি, চাওবোরিনি ও কিউলিসিনি নামক তিনটি অধঃ-পরিবারে বিভক্ত। কিউ-লিসিনি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ঃ এনোফেলিনি, কিউলিসিনি ও মেগ্যারিনি। এনোফেলিনিতে এনোফেলিস-গণ এবং

কিউলিসিনিতে কিউলেক্স-গণ, ইডিস-গণ, ম্যান্‌সনিয়া-গণ, আর্মেজেরিস-গণ প্রভৃতি গণভুক্ত মশা অন্তর্ভুক্ত।

রোগবিস্তারী হিসাবে এনোফেলিস ও কিউলেক্স সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। অন্ততঃ সাতটি এনোফেলিস প্রজাতি মানুষের ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক ('ম্যালেরিয়া' দ্র) এবং সমগ্র এশিয়া ভূখণ্ডে অপর ২৩টি এইরূপ বাহক প্রজাতি বর্তমান।

কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যান্স উষ্ণদেশীয় অঞ্চলসমূহের একটি মুখ্য মশা প্রজাতি। ফাইলেরিয়া ('ফাইলেরিয়া' দ্র) সৃষ্টি-কারী কৃমিকে উহারাই মুখ্যতঃ বহন ও বিস্তার করে। কিউলেক্স-গণভুক্ত এবং নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলের ফাইলেরিয়া বাহক প্রধান প্রজাতি কিউলেক্স পিপিয়েন্স।

অন্যান্য কিউলিসিনির মধ্যে ইডিস মশা সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। মুখ্য প্রজাতি চারিটি এবং তন্মধ্যে ইডিস ইজিপ্‌ট-র ব্যাপ্তি প্রায় পৃথিবীজোড়া। ইহা ঘর-বাড়ির একটি সাধারণ মশা ও দিনে কামড়ায়। ইডিস মশা সাধারণতঃ ভাইরাস-বাহী; ফলে ইহার মাধ্যমে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মানুষের ডেঙ্গু জ্বর, পীতজ্বর ইত্যাদি হইয়া থাকে।

কিউলিসিনির ম্যান্‌সনিয়া ও আর্মেজেরিস গণভুক্ত মশা বৃহদাকার। ইহারা তীব্র দংশনে সমর্থ। ম্যান্‌সনিয়ার কোনও কোনও প্রজাতি ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকাংশে একজাতীয় ফাইলেরিয়া জীবাণুবাহী হিসাবে পরিচিত। আর্মেজেরিস সচরাচর জীবাণুবাহী নহে।

পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী-মশার মানুষ বা মনুষ্যেতর উষ্ণদেহীকে দংশনের জন্য নির্বাচন উহার মুখাংশের গঠনগত বৈশিষ্ট্য, দংশিত প্রাণীর দেহনিঃসৃত গন্ধ, অনুকূল পরিবেশ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। ২৩° সেণ্টিগ্রেডের নীচে দংশনস্পৃহা বন্ধ হয়।

এনোফেলিস ও অন্যান্য মশা অল্পাবিস্তর আর্দ্রস্থান হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন জলাধারে ডিম ছাড়ে। স্ত্রী-মশা পুং-মশা অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। মশার স্বাভাবিক জীবনকাল মাসাধিক হয় না।

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

মস ব্রায়োফাইটা গোষ্ঠীর নিম্নশ্রেণীর অপুষ্পক ক্ষুদ্র (¼″ হইতে ১½″, ব্যতিক্রমে কয়েক ফুট দীর্ঘ) ও সরল উদ্ভিদ। কাণ্ড ও পত্র আছে কিন্তু মূল নাই, পরিবর্তে গাত্রে রাইজয়েড নামক বহুকোষী রোম জন্মায়, যেগুলি ভিত্তি হইতে রস আহরণ করে। সাধারণতঃ স্বল্পস্থায়ী জীবন। আর্দ্র জলবায়ুতে সিক্ত মৃত্তিকায়, প্রাচীর ইত্যাদি স্থানে, বৃক্ষবল্কলে অথবা শিলার উপর দলবদ্ধ-ভাবে জন্মে। জীবনচক্রে সমমানের দুইটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ের শুরু সূতারূপে শৈবালের আকৃতিতে (প্রোটোনেমা) যাহার উপর মুকুলের ন্যায় সংগঠন হইতে সাধারণভাবে পরিচিত 'মস' (লিঙ্গধর বা গ্যামিটোফাইট) জন্মায়। তাহার উপরেই অযৌন পর্যায় (স্পোরোফাইট) জন্মায়, ইহার তিনটি অংশ থাকে—পাদমূল, দণ্ড ও বীজ-কোষ। কতকগুলি মেরুদেশীয় লাইচেনকে 'মস' বলিলেও তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। মস মানুষের প্রয়োজনে সচরাচর লাগে না। অরণ্যানীতে বিশেষ প্রকারের 'মস' দেখিয়া মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ধারণে সুবিধা হয়।

আশিসকুমার চন্দ্র

মসলিন হাতে কাটা সুতায় হাতের তাঁতে বোনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রের নাম 'মসলিন'। এই ধরণের বস্ত্র প্রধানতঃ তৈরি হইত ঢাকায় ও কালিকটে। মোগল বাদশাহদের আমলেই ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

ঐতিহাসিকদের মতে ঢাকায় জাত দেশী তুলায় তকলীতে সুতা কাটিয়া হাতের তাঁতে বুনিয়া মসলিন তৈরি হইত। সে সুতার নম্বর ছিল ৪০০ হইতে ৬০০ পর্যন্ত। সুতা কাটা হইত অতি প্রত্যূষে ও প্রাতের খানিকটা সময় পর্যন্ত। দৈনিক কাটা সুতার পরিমাণ ছিল ৩ গ্রেন—মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ ৯০ গ্রেন। ১ গজ চওড়া ও ১০ গজ লম্বা একখানা সূক্ষ্ম মসলিনের ওজন হইত প্রায় ৪½ আউন্স। উহা বুনিতে একজন তাঁতীর ৫ মাস সময় লাগিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে একখানা ১০ হাত দীর্ঘ ও ২ হাত প্রস্থ মসলিনের দাম ছিল তখনকার দিনের মুদ্রায় ৪০০৲ টাকা; মোগল আমলে মসলিনের জমিনের উপর বুটি বা ফুল তোলার কাজও হইত। সেই বস্ত্রের নাম ছিল জামদানী। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জন্য ঐরূপ একখণ্ড মসলিনের জামদানী প্রস্তুত হইয়াছিল; উহার মূল্য ছিল তখনকার দিনের মুদ্রায় ১২৫০৲ টাকা।

তখনকার দিনের মসলিনের নাম ছিল "আর-ই-রোয়ান" অর্থাৎ স্রোতের জল, "বাষ্প-হাওয়া" বা বুনানো বাতাস, "শাবনাম" অর্থ—সান্ধ্য শিশির।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এইরূপ মসলিন তৈরি হইয়াছে। পরে অনাদরে এই শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়। স্বাধীন ভারতে খাদি গ্রামোদ্যোগ কমিশন উহার পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করিতেছেন। বাংলায় ও বিহারে কিছু কাটুনী মসলিনের সুতা কাটিতে সক্ষম হইলেও পূর্বের মত অত সূক্ষ্ম বস্ত্র এখনও তৈয়ারি হয় নাই।

সত্যরঞ্জন সেন

মসলিপত্তনম অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণ জেলার সদর শহর, বঙ্গোপসাগরের কূলে অবস্থিত (১৬°১১′ উ, ৮১°৮′ পূ)। ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান বন্দর ও করমণ্ডল উপকূলের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র-রূপে খ্যাতি অর্জন করে। স্থানীয় অধিবাসী ভিন্ন আরবীয়, পারসী, বর্মী ও পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির সমাবেশের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই নগর একটি বিশিষ্টতা লাভ

করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি দুর্গ অঞ্চল, শ্বেতাঙ্গ বসতি ও ভারতীয় বসতি প্রাচীন শহরের এই তিন বিভাগের চিহ্নাবশেষ ভারতের উপকূলবর্তী বিদেশী উপনিবেশগুলির বিশেষ গঠন-ব্যবস্থার পরিচায়ক।

মসলিপত্তনমের সহিত তিনটি অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। প্রথমতঃ, পূর্বদিকে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন বন্দর। প্রধান রপ্তানী পণ্য ঃ বস্ত্র, লোহ ও কাঁচ। আমদানী পণ্য ঃ নীলা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর, লাক্ষা, কর্পূর, টিন ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, ইহার জাহাজ ভারতের দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলস্থিত বন্দরগুলিতেও যাতায়াত করিত। তৃতীয়তঃ, সিংহল ও মালদ্বীপের সহিতও মসলিপত্তনমের ব্যবসা চলিত।

প্রখ্যাত ফরাসী বণিক ফ্রাঁসোয়া মার্ত্যাঁ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মন্তব্য করেন, মসলিপত্তনমে ইওরোপীয়গণ যে স্বাধীনতা ও প্রাধান্য ভোগ করিতেন তাহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে বিরল। ফলে মসলিপত্তনম্ ইহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ এই বন্দর দখল করে। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা ফরাসীদের আয়ত্তে আসে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সহিত চুক্তির ভিত্তিতে এই নগর হস্তগত করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে করমণ্ডল উপকূলের রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ এবং বাংলাদেশ ও মাদ্রাজের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বিস্তারের ফলে মসলিপত্তনমের গৌরবের প্রধান অধ্যায়ের ক্রমে অবসান হয়।

দ্র *Imperial Gazetteer of India,* Vol. 19, Oxford, 1908; Gordon Mackenzie : *A Manual of Kistna District.*

ইন্দ্রাণী রায়

মস্তিষ্ক নার্ভতন্ত্রের সর্ববৃহৎ ও সর্বভাবে সুগঠিত পুরোভাগটিকে মস্তিষ্ক বলা হয়। মস্তিষ্ক সম্পূর্ণভাবে করোটির মধ্যে অবস্থিত। নিম্নভাগে মস্তিষ্ক সুষুম্না-কাণ্ডে রূপায়িত হয়। মস্তিষ্কটি সামগ্রিকভাবে তিনটি পরস্পরবিচ্ছেদ্য আস্তরণীর (meninges) দ্বারা আবৃত।

মস্তিষ্কের পুরোভাগে সেরেব্রম ও তাহার অধস্তন কেন্দ্রগুলি থাকে। মধ্য-মস্তিষ্কের নিম্নাংশে মস্তিষ্ক-যোজক ও সুষুম্নাশীর্ষক। মস্তিষ্ক-যোজক ও সুষুম্না-শীর্ষকের সহিত তিনটি বোঁটার দ্বারা সেরেবেলম যুক্ত। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে চারিটি গহ্বর বা নিলয় (ventricles) আছে। সকল সময়ই নিলয়গুলির মধ্যে তরল পদার্থ (cerebro-spinal fluid) থাকে। ইহা সুষুম্না-কাণ্ডমধ্যস্থ কেন্দ্রীয় প্রণালীতে ও মেনিনজিসের মধ্যেও বেশি পরিমাণে থাকে।

মস্তিষ্কের উপরিভাগে অসংখ্য ভাঁজ থাকায় ইহাকে বিভিন্ন পিণ্ডে (lobe) ভাগ করা যায়। সেরেব্রম দুইটি স্বতন্ত্র গোলার্ধে অসম্পূর্ণ ভাগে বিভক্ত এবং উহারা একটি স্নায়ুবন্ধনীর (corpus collosum) দ্বারা সংযুক্ত। গভীর ভাঁজ ও অগভীর ভাঁজ সেরেব্রমকে সম্মুখ পিণ্ডে, ঊর্ধ্ব পিণ্ডে, টেম্পোরাল পিণ্ডে, পশ্চাৎ পিণ্ডে ও লিম্বিক পিণ্ডে ভাগ করে। এই সকল পিণ্ডে দৃষ্টিকেন্দ্র, শ্রবণ-কেন্দ্র, স্বাদকেন্দ্র ইত্যাদি অবস্থিত। মস্তিষ্কের বেশির ভাগ বহিরংশ ধূসর উপাদানের (grey matter) দ্বারা আবৃত। সেরেব্রমের শ্বেত উপাদানের মধ্যে স্থানে স্থানে ধূসর উপাদানময় পিণ্ডিক ও নিউক্লিয়স দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যমস্তিষ্ক সেরেব্রম, মস্তিষ্ক-যোজক ও সেরেবেলমের সংযোগে গঠিত। এই অংশের মধ্যে লোহিত নিউক্লিয়স ও কৃষ্ণোপাদান নামক দুইটি অংশ বিদ্যমান। ইহারা পেশীর শিথিলতা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। জালি নার্ভতন্ত্র পেশীর কাঠিন্য ও সেরেব্রমের কার্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

সেরেবেলম বিভিন্ন অঙ্গের পেশীর ক্রিয়ার সমন্বিত সম্পাদনের প্রধান কেন্দ্র। চলার সময় সকল পেশীর ও দেহের ভারসাম্য সেরেবেলমের নিম্নাংশ দ্বারা সুচারুভাবে পরিচালিত হয়। সুষুম্নাশীর্ষক হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, ধমনী-সংকোচন, বমন, গলাধঃকরণ প্রভৃতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র। উচ্চতর প্রাণীদের কেবল জীবনধারণের অত্যাবশ্যক কেন্দ্রগুলি এই অংশে থাকে। চেতনা, বুদ্ধি, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতি উচ্চবৃত্তিমূলক কেন্দ্র-গুলি সেরেব্রমে অবস্থিত।

অচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়

মহবৎ খাঁ প্রকৃত নাম জামান বেগ। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহাকে মহবৎ খাঁ উপাধি দেন (১৬০৫ খৃ)। যুবরাজ সেলিমের অধীনে কার্য আরম্ভ করিয়া অসাধারণ শৌর্য এবং সৈন্য সংগঠন ও পরিচালন দক্ষতা দেখাইয়া নয়-হাজারি মনসবদার এবং সুপ্রসিদ্ধ সামরিক নেতা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ। শাহজাহানের বিদ্রোহ কৃতিত্বের সহিত দমন। নূরজাহানের ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহী হন এবং ঝিলম নদীর তীরে অতর্কিতে সম্রাটকে বন্দী করেন। কিন্তু নূরজাহান কৌশলে তাঁহাকে মুক্ত করিবার পরে মহবৎ দাক্ষিণাত্যে পালয়ন করেন।

শাহজাহান সম্রাট হইলে তিনি মহবৎকে আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং খান খানান উপাধিও প্রদান করেন।

দ্র *Tuzuk-i-Jahangiri,* Vols. I, II, tr. by A. Rogers and ed. by H. Beveridge.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মহম্মদ আদিল শাহ আদিলশাহী বংশ দ্র।

মহম্মদ গাজা আলী সুফী দ্র।

মহম্মদ ঘুরী শিহাবুদ্দিন মহম্মদ বা মুইজুদ্দিন মহম্মদ বিন্ সাম ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঘুরের অধিপতি গিয়াসুদ্দিন মহম্মদের ভ্রাতা। গিয়াসুদ্দিন তাঁহাকে গজনীর শাসক নিযুক্ত করেন (১১৭৩ খ্রী)। ১১৭৫-১২০৩ খ্রী মধ্যে তিনি উত্তর ভারতে এক মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পরে গজনী, ঘুর ও দিল্লীর অধিপতি (১২০৩ খ্রী) এবং তিন বৎসর পরে আততায়ীর হস্তে নিহত হন (১২০৬ খ্রী)। 'ঘুর বংশ' দ্রষ্টব্য।

দ্র Minhaj-us Siraj; *Tabaqat-i-Nasiri.*

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মহম্মদ বিন্ কাশিম খালিফৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের জামাতা। সতেরো বৎসর বয়সে সমরকুশল ও উচ্চাভিলাষী বিন্ কাশিম সিন্ধুদেশে আরবদের তৃতীয় অভিযানের সেনানায়করূপে প্রেরিত হন।

মেকরানের (বেলুচিস্থান) ভিতর দিয়া ও পথে বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিন্ কাশিম ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের প্রধান বন্দর দেবলে উপস্থিত হন। সিন্ধুর রাজা দাহিরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিন্ কাশিম এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র সিন্ধুদেশ জয় করিয়া তাহা খালিফৎ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি ছিলেন ভারতে আরব শাসনের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা।

অতুলচন্দ্র রায়

মহম্মদ বিন্ তোগলক গিয়াসউদ্দিন তোগলকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জৌন খাঁ মহম্মন বিন্ তোগলক নামে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৩২৫ খ্রী)। মার্জিতরুচি, তীক্ষ্ণধী, গণিত, দর্শন ও সাহিত্যে পণ্ডিত, কবি, শিল্পরসিক ও অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী, সাহসী, রণকুশল, উদার ও দানশীল মহম্মদ বিন তোগলক নানা গুণের অধিকারী হইলেও ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও বাস্তব জ্ঞানের অভাবের জন্য তাঁহার শাসনকাল অশান্তি ও বিদ্রোহে পরিপূর্ণ এবং তিনি জনসাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে খামখেয়ালী ও নির্দয় শাসকরূপে প্রতিভাত। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তকরণ, তাম্রনোট প্রচলন প্রভৃতি যুক্তিসংগত ব্যবস্থা বাস্তব প্রয়োগজ্ঞানের অভাবে ব্যর্থ হয়। খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ইত্যাদি অবিমৃষ্যকারী কার্যকলাপের ফলে রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ ও তাহা দমন করার জন্য কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাঁহার মৃত্যু (১৩৫১ খ্রী)।

দ্র Mahadi Hussain, *Rise and Fall of Muhammad bin Tughlak.*

কুমুদরঞ্জন দাস

মহম্মদ মহসীন (হাজী) ধর্মপ্রাণ, দানবীর (১৭৩২-১৮১২ খ্রী)। পিতা পারস্য দেশীয় বণিক হাজী ফয়জুল্লা। জন্মস্থান হুগলি।

অধ্যয়ন প্রথমে হুগলী, মুর্শিদাবাদের মক্তব; পরে শিক্ষার্থে আরব ও পারস্য গমন।

মাতা-পিতার অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হইলেও দীন-দুঃখীর দুঃখমোচনের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। জীবিতকালে হুগলিতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসাগুলির উন্নতিকল্পে বহু অর্থদান। সমস্ত সম্পত্তি ধর্মকার্য ও জনহিতার্থ ট্রাস্ট (১৮০৬ খ্রী) করার ৬ বৎসর পরে মৃত্যু।

তাঁহার ট্রাস্টের অর্থে হুগলিতে 'মহসীন কলেজের' প্রতিষ্ঠা হয় (১৮৩৬ খ্রী)।

হুগলির ছোট একটি ইমামবাড়ি তাঁহারই নির্দেশমতে সম্পত্তির আয়ে বিপুল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া গঠিত হয় (১৮৬১ খ্রী)। ইহা পশ্চিমবঙ্গের একটি দর্শনীয় স্থান। এতদতিরিক্ত মহসীনের অর্থে হুগলির দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালটিও প্রতিষ্ঠিত হয়। অদ্যাবধি মহসীনের সম্পত্তির আয় হইতে বহু দরিদ্র মুসলমান ছাত্র এবং মুসলমান পরিবার অর্থসাহায্য পায়।

মোহনলাল মিত্র

মহম্মদ রেজা খাঁ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলিকাতা কাউন্সিলের নির্দেশে মহম্মদ রেজা খাঁ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নজম্‌উদ্দৌলার মাতা মুন্নি বেগমের পরিবর্তে 'অছি' নিযুক্ত হন ও রাজ্যশাসনের ভার পান। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের অধীন ছিলেন। বাংলার নায়েব-দেওয়ান (১৭৬৫-৭২ খ্রী), হেস্টিংস কর্তৃক পদচ্যুত (১৭৭২ খ্রী) ও বে-আইনী অর্থ সংগ্রহের অপরাধে তাঁহার বিচার। দোষী হইলেও ১ বৎসর কারাবাসের পর মুক্তিলাভ। সদর-নিজামত্ অর্থাৎ ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারক (১৭৮৭ খ্রী)। ১৭৮৯ লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে পদচ্যুত ও গভর্নর-জেনারেল ও সুপ্রীম কাউন্সিলের দেশীয় উপদেষ্টাগণের সাহায্যে ফৌজদারী বিভাগের ভার গ্রহণ। রেজা খাঁর রাজস্বশাসন হেস্টিংসের অপেক্ষা উন্নততর ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যাচারী ও কুশাসক ছিলেন ও মন্বন্তরের সময় (১১৭৬ বং) রাজস্ব আদায়ের নামে দারুণ অত্যাচার করেন।

দ্র *Cambridge History of India,* Vol. V, Cambridge, 1929.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মহরম (মুহর্‌রম) শিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান শোকানুষ্ঠান। মহম্মদের জামাতা, খালিফ আলীর কনিষ্ঠ

পুত্র হুসেনের খালিফের পদাধিকার লইয়া যুদ্ধে শোচনীয় মৃত্যু হয় (১০ মুহররম ৬০ হিজরী, ৬৮০ খ্রী)। শিয়ামতে আলী ও তাঁহার বংশধররাই মহম্মদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। শিয়ারা এই উপলক্ষে ১লা মহরম হইতে ১০দিন বিশেষ ৯ম দিনে উপবাস করেন এবং ১০ম দিনে যুদ্ধক্ষেত্র ও ধর্মের নানা প্রতীক লইয়া প্রধান শোকযাত্রা হয়। ইহা 'তাজিয়া' ও প্যাসন প্লে বলিয়া অভিহিত। এখানে কারবালার সমস্ত শোচনীয় ঘটনাগুলি নাটকীয়ভাবে প্রদর্শিত। শোককারীরা 'ইয়া হুসেন', 'ইয়া হাসান' (হুসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ও কখনও 'ইয়া আলী' বলিয়া বক্ষে করাঘাত ও ক্রন্দন করিয়া থাকেন। যাত্রাশেষে তাজিয়া প্রভৃতি জলমগ্ন বা মৃত্তিকায় প্রোথিত করা রীতি। পণ্ডিতরা বলেন, নিষ্পাপ হুসেনের মৃত্যুতে মুসলমান শহীদের শেষ বিচারের দিনে স্বর্গের পথ সুগম হইয়াছে।

শোকযাত্রা দর্শকের মন বিশেষ বিচলিত করে এবং অত্যধিক ভাবাবেগ সঞ্চারের ফলে সময় সময় বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। 'কারবালা' দ্র।

মহাকর্ষ বস্তুর একটি মৌলিক গুণ। মহাকর্ষ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, যে কোনও দুইটি বস্তুকণার মধ্যে একটি আকর্ষণ সদাই বিদ্যমান। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রানুযায়ী এই আকর্ষণের পরিমাণ বস্তুকণা দুইটির ভরের সমানুপাতিক ও তাহাদের মধ্যের দূরত্বের বর্গের ব্যস্ত অনুপাতিক। এই আকর্ষণ বস্তুর ভৌতিক অবস্থা বা তাহার রাসায়নিক উপাদান অথবা বস্তুদুইটির অন্তর্বর্তী মাধ্যমের উপর কোনওরূপ নির্ভর করে না।

মহাকর্ষের সূত্রানুযায়ী পৃথিবী ভূপৃষ্ঠ অথবা তাহার নিকটের বস্তুগুলিকে যে আকর্ষণ করে, তাহাকে অভিকর্ষ বলা হয়। এই অভিকর্ষের জন্য কোনও বস্তু যদি পড়িতে থাকে তবে তাহার গতি স্বতঃই ত্বরান্বিত হয়। নিউটন তাঁহার মহাকর্ষসূত্র ও বলবিদ্যার সাহায্যে দেখাইলেন যে এই অভিকর্ষজ ত্বরণদ্বারা পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের আবর্তনের ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। নিউটন তাঁহার মহাকর্ষ সূত্র হইতে কেপলারের সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলেন, উপরন্তু গ্রহ ও উপগ্রহের গতি হইতে তিনি সূর্য ও অন্যান্য গ্রহগুলির ভরও নির্ণয় করিতে পারিলেন।

কিন্তু ক্রমশঃ বোঝা গেল যে বুধগ্রহের আবর্তন পথ ঠিক একটি অপবৃত্ত নয়—একবার ঘুরিয়া আসিবার পর বুধ তাহার পূর্বেকার কক্ষপথে ঠিক ফিরিয়া আসে না। ইহার কোনও ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্র হইতে মিলিল না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ এই সমস্যার সমাধান করে এবং মহাকর্ষ সম্বন্ধে একটি নূতন মতবাদ প্রবর্তিত হয়। (আপেক্ষিকবাদ দ্র)

আইনস্টাইনের পরবর্তী যুগেও মহাকর্ষ সম্বন্ধে বহু নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব হইয়াছে। ডিরাক, ইয়রডান, ডিকি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের মতবাদ সংশোধনের প্রস্তাব করিলেও এখনও পর্যন্ত আইনস্টাইনের মতবাদই মহাকর্ষ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য। 'আপেক্ষিকবাদ' দ্র।

অমলকুমার রায়চৌধুরী

মহাজনি সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায়কে মহাজনি বলে। সর্বদেশে ও সর্বকালে এই ব্যবসায়ের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে মহাজনেরাই ঋণসংগ্রহের মূল উৎস ছিল। এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঋণের জন্য সাধারণ লোক মহাজনদিগের উপরই বেশি পরিমাণে নির্ভর করে। কোনও কোনও ধর্মে কুসীদব্যবহার নিন্দিত। কিন্তু মহাজনি ব্যবসায় অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সকল সমাজে টিকিয়া আছে। তবে বিধিদ্বারা ঋণচুক্তির অবাধ স্বাধীনতা সীমিত করিয়া প্রধানতঃ খাতকের অনুকূলে এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিবার আবশ্যকতা সর্বত্র স্বীকৃত।

সাধারণতঃ খত, প্রত্যয়-পত্র (প্রমিসরি নোট), হুণ্ডি, বিনিময় পত্র (বিল-অফ-এক্সচেঞ্জ) প্রভৃতি সম্পাদন করিয়া মহাজনের নিকট ঋণ লওয়া হয়। ঋণপরিশোধ নিশ্চিত করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রতিভূতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ; এই উদ্দেশ্যে খাতককে তাহার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিতে হয়।

ভারতে মহাজন ও মহাজনি ব্যবসায় সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাজ্যের উপর ন্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত আইনসমূহের মধ্যে প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় মহাজনবিষয়ক আইন (১৯৪০ খ্রী)। এই আইনদ্বারা মহাজনি ব্যবসায়ের সকল দিকই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং কোনও ক্ষেত্রে ঋণের মূলধনের পরিমাণের অধিক সুদ আদায় নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কামাখ্যাকুমার চক্রবর্তী

মহাজাগতিক রশ্মি আধারে সঞ্চিত বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের সংস্পর্শে না আসিলেও ক্রমশঃ ক্ষরিত হয়। প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল, পৃথিবীজাত কোনও বিকিরণ ও তজ্জনিত আয়ননই এইরূপ ক্ষরণের হেতু।

পরে নানা পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে এই সর্বত্র অনুভূত তীব্রভেদী বিকিরণের উৎস নক্ষত্রের অভ্যন্তর ও তারামণ্ডলের ভান্তঃপ্রদেশ। এই বিকিরণকে তখন মহাজাগতিক রশ্মি বলা হয়।

বৈজ্ঞানিকদের প্রথম অনুমান এই রশ্মি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গবিশেষ, গামা বা ফোটন। কিন্তু ১৯২৮ খ্রী বেটে ও কোল্হ্যরস্টার গাইগার-ম্যুলার যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ

করেন যে এই রশ্মি-বস্তুতঃ কণিকারই সমষ্টি, এবং এই কণিকাগুলি বিদ্যুদাশ্রিত।

মহাকাশ হইতে যে মূলকণিকা পৃথিবীর সন্নিধানে আসে তাহাদের বলা হয় প্রাথমিক কণিকা। এই কণিকাগুলির প্রায় সমস্তই ধনাত্মক বিদ্যুৎ-সমন্বিত। প্রধানতঃ ইহারা প্রোটন বা হাইড্রোজেন পরমাণুপিণ্ড, সামান্য অংশ আল্‌ফা-কণিকা বা হিলিয়ম পরমাণুপিণ্ড, আরও ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে আরও অধিক ভারী পরমাণুপিণ্ডও থাকে, যেমন কার্বন, অক্সিজেন, লোহা ইত্যাদি।

তারকার আলোকে যে শক্তি বর্তমান, মহাজাগতিক রশ্মির কণিকার শক্তি তাহা অপেক্ষা একশত কোটি গুণ বেশি। যে কোনও বস্তুপিণ্ড এই কণিকার সংঘর্ষে ছিন্ন হয়। ফলে এক শ্রেণীর কণিকার উৎপত্তি হয় যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় পৃথিবীতে বর্তমান থাকে না। এই কণিকাগুলির নাম মেসন। ইহাদের ভর ইলেক্‌ট্রন অপেক্ষা বেশি।

মূলকণিকাগুলির সহিত পৃথিবীর যাতাবরণে অবস্থিত বস্তুপিণ্ডের সংঘর্ষের ফলে মূল রশ্মির স্থানে নানা কণিকা সমন্বিত দ্বিতীয় এক রশ্মির উৎপত্তি হয়। ইহার নাম অণু রশ্মি। এই রশ্মিতে মেসন ও আরও ভারী কণিকা এবং পজিট্রন-ইলেক্‌ট্রন ও ফোটনও বর্তমান। ১৯৩৭ খ্রী ভাবা এবং হাইট্‌লর বলেন, বস্তুপিণ্ডের সন্নিকটে ইলেক্‌ট্রনের দ্রুত সঞ্চারের ফলে ফোটনের সৃষ্টি হয়। এই ফোটন বস্তুপিণ্ডের সন্নিকটে সঞ্চারের ফলে ইলেক্‌ট্রন-পজিট্রনের উৎপত্তি হয়। এই প্রকারে কণিকার প্রবাহ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া কণিকা-প্রপাত বা নির্ঝরের সৃষ্টি করে।

প্রাথমিক কণিকাগুলি পৃথিবীর সংস্পর্শে আসিয়া দ্বিতীয় রশ্মি সৃষ্টি করার ফলে তাহাদের শক্তি দ্রুত হ্রাস পায়। এই দ্বিতীয় রশ্মির কণিকাগুলির শক্তিও ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং তাপশক্তিতে পরিণত হয়। শুধু μ -মেসন ভূতল ভেদ করিয়াও চলিতে চলিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

নির্মল সেনগুপ্ত

মহাদজী সিন্ধিয়া সিন্ধিয়া দ্র।

মহাদেব শিব দ্র।

মহানদী মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদী। ইহা প্রায় ৮৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ, অর্ধেকের বেশি পথই মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

রায়পুর জেলার দক্ষিণ-পূর্বে সিহরা গ্রামের (২০°৯′ উত্তর ও ৮১°৫৮′ পূর্ব) নিকট ইহার উৎপত্তি। বিলাসপুর জেলায় প্রধান উপনদী শিওনাথ মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মিলিত স্রোত অতঃপর বিলাসপুর জেলার মধ্য দিয়া সম্বলপুর জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এইখানে হীরাকুদ বাঁধ। এইস্থানে প্লাবন ভূমির বিস্তৃতি প্রায় ১ মাইল। পথে কয়েকটি উপনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঢোলপুরে কয়েকটি ছোট জলপ্রপাত সৃষ্টি হইয়াছে। নারাজের পর ইহা ওড়িশার সমতলভূমিতে পড়িয়াছে। কটক জেলায় এই নদী পশ্চিম হইতে পূর্বে প্রবাহিত। কটক অতিক্রম করার পর ইহা বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ফল্‌স পয়েন্টের নিকট (২০°১৮′ উত্তর, ৮৬°৪৩′ পূর্ব) বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার শাখানদীগুলির মধ্যে কাটজুড়ি খুবই উল্লেখযোগ্য।

বর্ষাকালে ইহার প্রবল বন্যা নিবারণ ও নদীর শক্তিকে কল্যাণকর কার্যে ব্যবহারের পরিকল্পনায় হীরাকুদ, টিকারপাড়া ও নারাজ এই তিনটি স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। হীরাকুদ বাঁধকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাদেক্ষা দীর্ঘ বলা হয়। দৈর্ঘ্য ৪৮৩২ মিটার। ইহার পাশে এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কৃত্রিম হ্রদ (৭৪৫ বর্গ কি. মি.)। এই তিনটি বাঁধের ফলে প্রায় ৯ লক্ষ হেক্টর জমি জলাসিঞ্চিত এবং হীরাকুদ, বুলালাও, চীপলিমার বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই প্রকল্পে ওড়িশার মহানদীর মোহানায় পরাদীপ বন্দর নির্মিত হইয়াছে।

পীযূষ সাহা

মহানন্দা উত্তরবঙ্গের নদী। দার্জিলিং জেলার মহালদিরাম পাহাড় হইতে উঠিয়া জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। অতঃপর দক্ষিণ দিকে পূর্ণিয়া, মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রাজসাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত। দৈর্ঘ্য ৩৬০ কি. মি.। ইহার উপনদীগুলির মধ্যে বালাসন, দঙ্ক, পীতানু, নাগর, মোটী, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, বুলিন্দী প্রধান। কালিয়াগঞ্জ, হলদিবাড়ি, কৃষ্ণগঞ্জ ও বর্সোই শহর মহানন্দার তীরে অবস্থিত। বর্ষা ভিন্ন অপর ঋতুতে নৌচলাচলে বিঘ্ন ঘটে।

দ্র S. C. Bose, *Geography of West Bengal*, New Delhi, 1968.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহাপজাপতী (মহাপ্রজাবতী) গৌতম-বুদ্ধের বিমাতা ও মাতৃষ্বসা, মতান্তরে পিতৃব্যপত্নী। মায়াদেবীর মৃত্যুর পর ইনিই সিদ্ধার্থকে পালন করেন। বুদ্ধ কপিলাবস্তু নগরে গমন করিলে ইনি তাঁহার নিকট নারীগণের সংঘ প্রবেশের অনুমতি চাহিয়া তিনবার বিফল হন। বুদ্ধ যখন বৈশালীর মহাবনে, তখন ইনি মুণ্ডিত মস্তকে পীতবস্ত্র ধারণ করিয়া পাঁচশত শাক্যমহিলার সহিত পদব্রজে আসিয়া পুনরায় উক্ত

অনুমতি প্রার্থনা করিতে থাকেন। বুদ্ধ তখনও আপত্তি জানাইলে আনন্দ বারংবার মহাপ্রজাবতীর ধাত্রীত্ব-গৌরবের উল্লেখ করায় বুদ্ধ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবশেষে ভিক্ষুণীগণের অবশ্য প্রতিপাল্য আটটি অনুশাসনের বিধান করেন এবং মহাপ্রজাবতী এই অনুশাসনগুলি স্বীকার করিয়া লইলে ভিক্ষুণী-সংঘের পত্তন হয়।

মহাপুরাণ পুরাণ দ্র।

মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় শংকরদেব দ্র।

মহাবলীপুরম (মামল্লপুরম) মাদ্রাজ শহর হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে চিংলীপুট জেলার অন্তর্গত (১২°৩৬′৫৫″ উত্তর ও ৮০°১৩′৫৫″ পূর্ব) পারল নদী ও সমুদ্রের মোহানায় অবস্থিত। পেরিপ্লাস ও টলেমি উল্লিখিত এই বন্দরে প্রচুর রোমক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিরুমঙ্গই আলওয়ারের মতে প্রাচীন নাম কদলমাল্লাই। ১৭ শতকের পর্যটক মানুচী বর্ণিত নগরীর ১৯ শতকের বিদেশী নাম *Seven Pagodas*। খ্রী ৩য়-৯ম শতকের কাঞ্চীর পল্লবরাজগণের কীর্তি এবং মহেন্দ্র, মামল্ল ও রাজসিংহ তিনটি স্থাপত্যশৈলীই নিকটবর্তী ভূখণ্ডে ব্যাপ্ত। বিচিত্র-চিত্ত মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মন মামল্লদেবের রাজত্বকালই (আ ৬৩০-৭০) চরম সমৃদ্ধির যুগ। ভগ্না-বশেষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

রথ : সুবিশাল প্রস্তরখণ্ড হইতে ক্ষোদিত রথাকৃতি একক মন্দির বিশেষ। পাণ্ডবগণের নাম যুক্ত পাঁচটি রথ, গণেশ রথ, বলয়ং কুটুই এবং পিডরি মিলাইয়া মোট আটটি। অজ্ঞাত কারণে রথ ও মূর্তি প্রায়ই অসমাপ্ত। বৃষভান্তিক, অর্ধনারীশ্বর প্রভৃতি উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি দীর্ঘাকৃতি ও কিরীটধারী।

গুহা : মহিষমর্দিনী, ধর্মরাজ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব, রামানুজ, কোটিকাল, কোণেরী, ত্রিমূর্তি এবং দুইটি বরাহ—সমুদয়ে দশটি গুহামণ্ডপ। রাজা সিংহবিষ্ণু ও মহেন্দ্রবর্মন এবং গজলক্ষ্মী, বরাহ-অবতার, শেষশায়ী, মহিষমর্দিনী, গঙ্গা-ধর ও গোবর্ধনধারীর মূর্তি শক্তিগর্ভ ও লাবণ্যময়।

মন্দির : তিনটি। স্থলশয়ন-পেরুমল বিজয়নগর-যুগের। রাজসিংহ শৈলীর প্রথম মন্দির তলক্কনাথ, দ্বিতীয়টি সমুদ্রতীরে অগণিত নন্দীমূর্তিবেষ্টিত অতি সুন্দর বেলা মন্দির (shore temple)

দুইটি পাহাড়ের গায়ে মিলিতভাবে ক্ষোদিত গঙ্গাবতরণ বা অর্জুনের তপস্যার রূপগরিষ্ঠ দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। দেব ঋষি যক্ষ নাগ মানব ও পশুপক্ষীর সমাবেশে এরূপ বৃহৎ ও মুখর চিত্র ভারতে পূর্বে রূপায়িত হয় নাই। পল্লব শৈলীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে এবং দ্বীপময় ভারতে অনুসৃত।

নীলা দে
কল্যাণী দত্ত

মহাবালেশ্বর অপর নাম ম্যালকম্‌পেই। ১৭°৫৬′ উত্তর ও ৭৩°৩০′ পূর্ব। মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার জাভ্‌লী তালুকের অন্তর্গত। ১৩৬৫ মিটার উচ্চ সুপরিচিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র। রেলপথ ও সড়কপথে বোম্বাই ও পুনার সহিত যুক্ত। সার্ জন্ ম্যাল্‌কম্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (১৮২৮ খ্রী) ; গ্রীষ্মের প্রকোপ কম ; সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২·২ ডিগ্রী সে, শীতে ১৬·৪ ডিগ্রী সে। কাছেই মহা-বালেশ্বরের মন্দির, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। কৃষ্ণা বাঈয়ের মন্দিরের নিকট কৃষ্ণানদীর উৎস। ইহা পৌরনিগমের অন্তর্গত।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মহাবীর[১] জৈনদের বর্তমান অবসর্পিণীর শেষ বা ২৪ সংখ্যক তীর্থংকর। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক। ৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে বৈশালীর অন্তর্গত ক্ষত্রিয়কুণ্ডপুরে জ্ঞাতক্ষত্রিয়বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ত্রিসলা। পিতৃদত্ত নাম বর্ধমান। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও তপশ্চর্যার জন্য মহাবীর আখ্যা প্রাপ্ত হন।

এক সামন্তরাজের কন্যা যশোদার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ও প্রিয়দর্শনা বা অনবদ্যা নামে একটি কন্যা হয়। দিগম্বর মতে তিনি আজীবন অবিবাহিত।

৩০ বৎসর বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ প্রব্রজ্যা জীবনের বিবরণ আচারাঙ্গসূত্রের ওহান সুত্তে পাওয়া যায়। সেই সময় বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলেও তিনি আসিয়াছিলেন। ঋজুবালুকা তীরে জম্মীয় গ্রামের বাহিরে যখন তিনি দুইদিনের অনাহারের পর ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তিনি অর্হৎ, জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হন। ইহার পর মধ্যমাপাবায় আগমন ও সোমিল নামক এক ব্রাহ্মণের যজ্ঞে উপস্থিত ইন্দ্র-ভূতি গৌতম প্রমুখ ১১জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে তর্কে পরাস্ত করেন। তাঁহারা সশিষ্য মহাবীরের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করেন। এই ১১জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই পরবর্তীকালে মহাবীরের গণধর বা প্রধান শিষ্যরূপে আখ্যাত হন।

মধ্যমাপাবা হইতে মহাবীর রাজগৃহে আসেন ও সেখানে ভগবান পার্শ্ব প্রবর্তিত চতুর্যাম ধর্মকে পঞ্চযাম করেন। সাধুদের জন্য অহিংসাদি পঞ্চব্রত, মহাব্রত ও গৃহীদের জন্য অনুব্রতরূপে নির্দিষ্ট হয়। সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

মহাবীর জীবনের শেষ ৩০ বৎসর ধর্ম প্রচারে নিরত থাকেন। ৭২ বৎসর বয়সে মধ্যমাপাবায় কার্তিক মাসের অমাবস্যায় সূর্যোদয়ের পূর্বে উপদেশ দিতে দিতে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। সেই সময় সেখানে উপস্থিত সকলে তাঁহার তিরোধানে জ্ঞানের আলোক অস্তমিত হইল বলিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দ্রব্যের আলোক প্রজ্বলিত করেন। সেই হইতে দীপান্বিতার উৎসব প্রবর্তিত হইল বলিয়া জৈনরা মনে করেন।

মহাবীরের গায়ের রঙ্ সুবর্ণ, লাঞ্ছন সিংহ, যক্ষ মাতঙ্গ ও শাসনদেবী সিদ্ধায়িকা, চৈত্যবৃক্ষ শাল।

দ্র কল্পসূত্র, আচারাঙ্গ-সূত্র।

গণেশ লালওয়ানী

মহাবীর[২] হিন্দু গণিতজ্ঞ পণ্ডিত, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। প্রাথমিক গণিতের লেখক, ইঁহার 'গণিতসার সংগ্রহ'-এ জ্যামিতি এবং পাটীগণিতে হিন্দুদের অবদানের পরিচয় পাওয়া যায়।

কামিনীকুমার দে

মহাবোধি বুদ্ধগয়া দ্র।

মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। মূল ঘটনা কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। মূল কাহিনীগুলি বৈদিক যুগের। আধুনিক বিচারে, মূল রচনার সঙ্গে বহু অংশ পরবর্তীকালে সংযোজিত হইয়াছে। ভিন্‌তার্‌নিৎস্‌ বলিয়াছেন যে, খৃ. পূ. চতুর্থ শতক হইতে খৃ. চতুর্থ শতক পর্যন্ত ইহার রচনা ও সংকলনকাল। বেদব্যাসের মূল 'জয়' (৮ হইতে ১০ হাজার শ্লোক) হইতে বৈশম্পায়ন-কথিত 'ভারত' (২৪ হাজার শ্লোক) লইয়া ইহা সৌতি-কথিত 'মহাভারত' (৮৪ হাজার শ্লোক) রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পরিশিষ্ট খিল হরিবংশ সমেত ইহা শতসাহস্রী (লক্ষশ্লোকাত্মক) সংহিতা বলিয়া পরিচিত।

প্রচলিত মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। আদিপর্বে বংশ-বিবরণ, জতুগৃহদাহ, পঞ্চপাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ-কাহিনী। সভাপর্বে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতক্রীড়া এবং পরাজয়, বনপর্বে পাণ্ডবদের বনে গমন, বিরাটপর্বে বিরাটের গৃহে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস, কৌরবগণ কর্তৃক গো-হরণ, অর্জুন-কর্তৃক গোধন উদ্ধার বর্ণিত। গো-হরণ ও গো-উদ্ধার স্পষ্টরূপে বৈদিক আচরণের স্মারক। উদ্যোগ-পর্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি। ভীষ্মপর্বের সূচনায় গীতা এবং ইহা হইতে দ্রোণ, কর্ণ, শল্য এবং সৌপ্তিক পর্ব পর্যন্ত কৌরব-পাণ্ডবদের যুদ্ধ-কাহিনী। স্ত্রীপর্বে স্ত্রী-বিলাপ। শান্তিপর্ব ও অনুশাসনপর্ব রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম প্রভৃতির আলোচনায় পূর্ণ। অশ্বমেধপর্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, আশ্রমবাসিক-পর্বে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির আশ্রম বাস, মৌষলপর্বে যদুবংশ ধ্বংসের ইতিবৃত্ত, মহাপ্রস্থানিকপর্বে পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থান, সর্বশেষ স্বর্গারোহণপর্বে যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন ও পরলোকগত অর্জুনাদিকে দর্শন কথিত।

মহাভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী। ইহাতে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব চর্যার সমন্বয়-প্রচেষ্টা দেখা যায়। খিল হরিবংশ গ্রন্থে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রাধান্য পাইয়াছে।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে 'এপিক' বলিতে যাহা বুঝায়, মহাভারতে তাহার বহু লক্ষণ বিদ্যমান। বহু পুরুষশ্রেষ্ঠ ইহার চরিত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত। মূল কাহিনীর মধ্যে মধ্যে নানা আনুষঙ্গিক উপাখ্যান। কিন্তু 'এপিক' সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য ধারণা লইয়া মহাভারতের বিশ্লেষণ ও বিচার ভ্রমাত্মক। মহাভারত শুধু কাব্যই নহে। ইহা যুগপৎ ইতিহাস, আখ্যান, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। ইহা অতীত ভারতের সামগ্রিক রূপায়ণ, মহা-কোষগ্রন্থ। 'যদ্ নেহাস্তি তৎ ন ক্বচিৎ'—ইহা অত্যুক্তি নয়। ইহার পঞ্চম বেদ নাম সার্থক। প্রাচীন ভারতের সমাজ, জীবন ও সংস্কৃতিকে বুঝিবার জন্য ঐতিহাসিকের নিকট রত্নপেটিকা। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভাস-কালিদাসাদি কবিগণ, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর্যশিল্পী মহাভারত হইতে প্রেরণা ও উপাদান পাইয়াছেন। ভারতের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ গণজীবন ও জনসংস্কৃতির উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। দেশীয় ভাষায় লিখিত সাহিত্যের উপরও মহাভারতের প্রভাব অপরিমেয়। সাধারণ মানুষের নিকট ইহা একদিকে যেমন আনন্দের ও নীতি-শিক্ষার, অন্যদিকে তেমনই দুঃখে দুর্দিনে সান্ত্বনার উৎস। গীতা, অনুগীতা ও সনৎসুজাতীয়ে দর্শন ও মোক্ষধর্ম ব্যাখ্যাত। ব্যাসোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্।

মহাভাষ্য পতঞ্জলি দ্র।

মহামোগ্গল্লান (মৌদ্‌গল্যায়ন)ঃ জন্ম কোলিত গ্রামে। কোলিত ও সারিপুত্ত রাজগৃহের সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্তের শিষ্য, বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিতের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও অচিরেই বুদ্ধকর্তৃক 'অগ্‌গভিক্খু' মনোনীত হন। অলৌকিক ঋদ্ধিবল-সম্পন্ন মৌদ্‌গল্যায়নের সংঘের নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইনি সমাধিস্থ অবস্থায় বৌদ্ধবিদ্বেষীদের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। রাজ-গৃহে বেণুবনে তাঁহার 'ধাতুস্তূপ' রহিয়াছে, সাঁচী স্তূপের নামাংকিত আধারে তাঁহার দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। তুর্ফানে প্রাপ্ত অশ্বঘোষের নাটিকাদ্বয়ে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে।

নীলা দে

মহাযান বৌদ্ধধর্মের দুই প্রধানতম শাখার অন্যতম। যান-এর অর্থ যাহা নির্বাণের দিকে লইয়া যায়। আদি থেরবাদী বৌদ্ধধর্মকে মহাযানীরা হীনযান বলেন; ইহা নিম্নাধিকারীর নিকট বুদ্ধকথিত অপূর্ণ সত্য, উপায়-কৌশল্য মাত্র। নিজেদের পথকেই তাঁহারা মহত্তর, এমন কি একমাত্র পথ মনে করেন।

মহাসাঙ্ঘিকেরাই এবং সংশ্লিষ্ট লোকোত্তরবাদীরাই মহাযানীদের অগ্রগামী। তাঁহারা যাহার সূত্রপাত করিলেন, কালক্রমে হিন্দুধর্মের পরিবেশে ও প্রভাবে তাহাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইয়া দাঁড়ায়। নাগার্জুনের নামের সঙ্গেই মহা-

যান বিশেষভাবে জড়িত, কিন্তু তিনি ইহার জনক নন। 'বৌদ্ধধর্ম' দ্র।

মহাযানী সাহিত্য শুদ্ধ অথবা মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহা দুইভাগে বিভক্ত ঃ সূত্রশাস্ত্র ও তাহাদের টীকাভাষ্যাদি। কয়েকটি প্রধান মহাযানী গ্রন্থ ঃ প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র, সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, ললিতবিস্তর, লংকাবতার, গণ্ডব্যূহ, দশভূমিশাস্ত্র ইত্যাদি। নাগার্জুন বাদে কয়েকজন প্রধান মহাযানী আচার্য ঃ চন্দ্রকীর্তি, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, শান্তরক্ষিত, শান্তিদেব, দীপংকর শ্রীজ্ঞান ইত্যাদি।

হীনযানে শাক্যমুনির যতটা অগ্রণী ভূমিকা আছে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে ততটা নাই। ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়, অমিতাভ, অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, বৈরোচন, বজ্রপাণি প্রভৃতির গুরুত্ব সর্বাধিক। মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে লিখিত হইল।

মহাযানীদের বোধিসত্ত্ব বলা হয়। মহাযান বোধিসত্ত্বযান। অর্হত্ত্বলাভ, জীবন্মুক্তি, ভবনিরোধ—এই হীনযানী সাধনা স্বার্থাত্মক। বোধিসত্ত্ব মহাযান ও মহাকারুণিক। তিনি পরার্থে বারংবার জন্মমৃত্যুর দুঃখভোগ করিবেন, পাপীর পাপভার ও দুঃখীর দুঃখভার নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাদের আর্তি দূর করিবেন। বোধিসত্ত্বচর্যাই মহাযানী সাধকের আদর্শ। যাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ প্রজ্ঞা ও মহাকরুণার পরম সমাবেশ ঘটিয়াছে, অবলোকিতেশ্বর প্রমুখ সেই সব বোধিসত্ত্ব মহাযানীদের দ্বারা পূজিত।

মহাযানীরা প্রধানতঃ মাধ্যমিকপন্থী বা শূন্যতাবাদী। তাঁহাদের এক সম্প্রদায় যোগাচারী বা বিজ্ঞানবাদী। 'বৌদ্ধ দর্শন' দ্র।

মহাযান ভক্তিবাদী। মহাযানে বুদ্ধ ঈশ্বর, শাক্যমুনি তাঁহার অবতার। গৌতম বুদ্ধের পূর্বে এইরূপ বহু অবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্মকায়রূপে বুদ্ধ বিশ্বের নিয়ন্তা ; জীবের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। ভগবান বুদ্ধের নিকট পাপীতাপী মানুষ ক্ষমা, প্রেম ও মুক্তি ভিক্ষা করিতে পারে। যদিও সর্বমানবের মধ্যে সম্ভাব্য বুদ্ধত্ব বিদ্যমান, তবু বোধিসত্ত্বচর্যা সাধারণ মানুষের জন্য নয়। জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মকে প্রসারিত করার জন্য মহাযানে বুদ্ধপূজা ও বোধিসত্ত্বপূজা প্রবর্তিত হয়।

মহারাষ্ট্র ভারতের একটি রাজ্য (৭২°৫০′-৭৯°৫৮′ পূর্ব এবং ১৫°৪৫′-২২°০০′ উত্তর)। পশ্চিমে আরব সাগর, উত্তর-পশ্চিমে গুজরাত, উত্তরে মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর ও পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ। মহারাষ্ট্র রাজ্যে বোম্বাই, পুনা, ঔরঙ্গাবাদ, নাগপুর এই ৪টি বিভাগে ২৬টি জেলা। রাজ্যে ২৬৬টি শহর, ২২৯টি তালুক ও ৩৮৮৬৭টি গ্রাম। আয়তন ৩০৭৪৭৭ বর্গকিলোমিটার।

ভূপ্রকৃতির বন্ধুরতা অনুসারে মহারাষ্ট্র রাজ্যের কয়েকটি ভাগ ঃ (ক) কোঙ্কণের সমভূমিঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পশ্চিমদিকে সমুদ্র পর্যন্ত সংকীর্ণ সমভূমি ৫৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ উঁচুনীচু অঞ্চল। গড় উচ্চতা ৭৫ মিটার।

(খ) পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ঃ মহারাষ্ট্রের উত্তর সীমা হইতে দক্ষিণে ৪০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। গড় উচ্চতা ৭৫০-১২০০ মিটার। রাজ্যের শ্রেষ্ঠ জলবিভাজিকা। ভোরঘাট ও থলঘাট গিরিপথ দ্বারা উপকূলের সহিত অভ্যন্তরের যোগাযোগ রক্ষিত। পর্বতমালার পশ্চিমদিক খাড়া এবং পূর্বদিক ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে মিশিয়াছে।

(গ) পশ্চিমঘাটের পূর্ববর্তী মালভূমি ঃ মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধিকাংশ মারাথাওয়াড়া ও বিদর্ভ লইয়া বিস্তৃত। অজন্তা, বালাঘাট ও মহাদেব পর্বতদ্বারা তিনটি বিশিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত। দাক্ষিণাত্যের সমভূমি লাভা দ্বারা গঠিত। ইহার সর্বাধিক গভীরতা বোম্বাই-এর নিকট প্রায় ৩০০০ মিটার।

(ঘ) তাপ্তী-পূর্ণা উপত্যকা ঃ রাজ্যের উত্তর প্রান্তে ধুলিয়া জলগাঁও ও বিদর্ভের পূর্বাংশ লইয়া গঠিত। সাতপুরার দক্ষিণে ইহা মধ্যভাগের উচ্চভূমি ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলরূপে পরিগণিত।

(ঙ) ওয়েনগঙ্গা-ওয়ার্ধা উপত্যকা বা নাগপুর সমভূমি ঃ গড় উচ্চতা ২৭০-৩৩০ মিটার, গোদাবরী উপত্যকার অংশ। রাজ্যের অধিকাংশ বাসাল্ট শিলায় গঠিত। তাহার উপর দাক্ষিণাত্যের লাভা অবক্ষেপিত হইয়াছে। এই শিলাস্তর স্থানে স্থানে ৩০০০ মিটার গভীর।

মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণমৃত্তিকা, ল্যাটারাইট উপকূলীয় মৃত্তিকা প্রধান উল্লেখযোগ্য মৃত্তিকা।

মহারাষ্ট্রের নদীগুলির মধ্যে কৃষ্ণা, গোদাবরী ও তাপ্তী প্রধান।

কৃষ্ণা নদী মহাবালেশ্বর পর্যন্ত উঠিয়া ৩২০ কি. মি. দক্ষিণদিকে বহিয়া রাজ্যের বাহিরে গিয়াছে। ভীমা পুনা জেলার ভীমসংকর হইতে উঠিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ৮০০ কি. মি. মহারাষ্ট্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মহীশূরের রায়চুর-এর নিকট কৃষ্ণায় পড়িয়াছে। গোদাবরী নাসিক জেলার ত্র্যম্বকেশ্বরে উঠিয়া মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, ওয়েনগঙ্গা, পেনুচ ও কানহান গোদাবরীর উপনদী, বিদর্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

বেরার অঞ্চলে লোনার হ্রদ ভারতের একমাত্র জ্বালামুখসৃষ্ট হ্রদের উদাহরণ।

কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত বলিয়া মহারাষ্ট্রের উষ্ণতা সামান্য বেশি। জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের জন্য এই রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত। কোঙ্কণের উপকূলীয় সমভূমি ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অঞ্চলে মৌসুমী বায়ু পশ্চিমঘাটে বাধা পাওয়ায় বৃষ্টিপাত বেশি ; পশ্চিমঘাটের পূর্বদিকের মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত পশ্চিমঘাটে ব্যাহত হওয়ায় কম।

মহারাষ্ট্রের বনভূমি চারিটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ অঞ্চলে বিভক্তঃ চিরহরিৎ বনভূমি, পর্ণমোচী অরণ্য, আর্দ্র বনভূমি এবং উপকূলীয় বনভূমি। মহারাষ্ট্রের ১/৫ অংশ

অরণ্যাবৃত। সংরক্ষিত বনভূমির পরিমাণ ৪০৪৮২ বর্গ-কিলোমিটার। জ্বালানী কাঠ ১৪৯৪০০০০ কিউ. মি. ও চন্দন কাষ্ঠ ৩৯০০০ কিউ. মি. সংগ্রহ করা হয়।

রামায়ণে এই রাজ্যের অংশবিশেষ দণ্ডকারণ্য, মহাভারতে দণ্ডকরাজ্য নামে অভিহিত। কোঙ্কণ মহাভারতে অপরান্ত (উত্তর কোঙ্কণ) ও গোকর্ণ (দক্ষিণ কোঙ্কণ) নামে পরিচিত ছিল। পুরাণে ও বৃহৎসংহিতায় নাসিক, কোঙ্কণ, কোল্‌হাপুরের নাম আছে। এই রাজ্যের ইতিহাস দক্ষিণ-ভারতের ইতিহাসের সহিত অংগাঙ্গিভাবে জড়িত।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে নূতন মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান ভাষাভিত্তিক প্রদেশের সৃষ্টি হয়।

মোট জমির ৩০৭৭৫০০০ হেক্টরের ৫৫% কৃষিতে ব্যবহৃত।

ধান, গম, জোয়ার ও বাজরা, তামাক, ইক্ষু এবং বিশেষ করিয়া তুলা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

মহারাষ্ট্রে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য না থাকিলেও অভাব নাই। এখানে কয়লা, ম্যাংগানিজ, ক্রোমাইট ও হেমেটাইট জাতীয় আকরিক লৌহ, ইলেমনাইট, টুরমালিন, অভ্র, কেয়নাইট, মিলিমেনাইট, ভেনেডিয়াম, বক্সাইট প্রভৃতি পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য। শিল্পগুলির অধিকাংশই বোম্বাই-পুনা অঞ্চলে অবস্থিত। রাজ্যের ১০০টি কার্পাস শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভারতের ৩৭% কাপড় প্রস্তুত হয়। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানঃ কুরলা ঘটকপুরে মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র, ভিকোলিতে এণ্টিমনি শোধনাগার ও গোদরেজের কারখানা, পেনিসিলিন কারখানা, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, দুইটি আণবিক রেয়ার আর্থ কারখানা, বৃহৎ যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা আছে। ভুসাওয়ালে রেলের ও পেচোয়াতে বনস্পতির কারখানা, কয়নায় অ্যালুমিনিয়াম কারখানা আছে। রাজ্যে উপযুক্ত বালি না থাকিলেও ভারতের ১/৬ ভাগ কাচ তৈয়ারি হয়।

মোট ৪৬৪৬০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। শিল্প ও কৃষির উন্নতিকল্পে পার্বত্য উপত্যকায় নদীগুলিতে বাঁধ দেওয়া ও জলসেচের জন্য খাল কাটা হইতেছে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনায় ইহাদের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহারাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যা ৩৯৫৫৩৭১৮ (১৯৬১ খৃ); গ্রামে ২৮৩৯১১৫৭ ও শহরে ১১১৬২৫৬১; ২০৪২৯০০০ পুরুষ এবং ১৯৫২৫০০০ স্ত্রীলোক; তপশীলভুক্ত শ্রেণী ও আদিম অধিবাসী ৪৬২৪০০০ জন। প্রতি বর্গ কি. মি.-এ জনসংখ্যার ঘনত্ব ১২৯ জন। শিক্ষিতের মোট হার ২৯·৮%।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৮৯০০০, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩৩৯৫ এবং উচ্চমাধ্যমিক ৪১৩১; কলেজ ২৭৫ ও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

রাজ্যে অনেকগুলি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতে 'রাখীবন্ধন' ও গণেশ পূজা, ভাদ্রের শুক্লাসপ্তমীতে তিনদিনব্যাপী গৌরী ও পার্বতীর পূজা। আশ্বিন মাসে দশদিনব্যাপী নবরাত্র উৎসব, দশদিনের দিন দশহরা ও সরস্বতী পূজা হয়। প্রতি মাসেই নানা উৎসব হয়।

মহারাষ্ট্রে লোকনৃত্যের প্রচলনই বেশি। গোবিন্দ নৃত্য, মংগলগৌরী নৃত্য, গৌরী নৃত্য, দশহরা নৃত্য ইত্যাদি। বৎসরের সকল উৎসবেই নৃত্যগীতের প্রচলন আছে।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-পুনা ভারতের প্রথম রেলপথ। মহারাষ্ট্রে ২৬৫৬ মাইল রেলপথ আছে। দক্ষিণ রেলপথ, মধ্য রেলপথ ও পশ্চিম রেলপথের শাখা আছে।

রাজ্যে ৩১১৩টি বাস, বাসরুট ২৯৫৭, মোট ১৭৭৩২৭ মাইলে বাস চলাচল করে। রাজ্যে ৪১৪৭৪ কি. মি. রাস্তা, ২৩৪৮ কি. মি. জাতীয় সড়ক।

তাপ্তী ও গোদাবরী মধ্যে মধ্যে নাব্য; কৃষ্ণা, মুলমুথা নাব্য। পশ্চিম উপকূলে ৪০টি বন্দর আছে। বোম্বাই প্রধান ও রত্নগিরি মধ্যমশ্রেণীর বন্দর। বোম্বাই প্রধান শহর। অন্যান্য শহরের মধ্যে পুনা, নাগপুর, শোলাপুর, নাসিক, কল্যাণ, কোল্‌হাপুর, অমরাবতী, সাংগ্‌লী, মালেগাঁও ও আহ্‌মদনগর উল্লেখযোগ্য।

দ্র C. B. Jain & B. Arunachalam, *Maharasthra*, 1964; Census of India, 1961, Vol. X, Parts II, VI.

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মহালয়া আশ্বিনমাসের অমাবস্যা সাধারণতঃ এই নামে পরিচিত। এই দিনে পিতৃপুরুষের পার্বণ শ্রাদ্ধ বা তর্পণ করিবার রীতি আছে। পূর্বে আশ্বিনের কৃষ্ণ বা অপরপক্ষে প্রতিদিনই শ্রাদ্ধ করিবার বিধান ছিল। এখন অনেকে তর্পণানুষ্ঠানের দ্বারা নিয়ম রক্ষা করেন। এই পক্ষ পিতৃপক্ষ বা মহালয় (পিতৃপুরুষের উৎসবের আধার) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহালয়ে শ্রাদ্ধ করা না হইলে দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যমলোক পরিত্যাগ করিয়া মহালয়ে মর্ত্যে অবতীর্ণ পিতৃপুরুষের প্রত্যাবর্তনের পথ প্রদর্শনের জন্য এই সময় আকাশে উল্কাদানেরও ব্যবস্থা ছিল। পঞ্জিকায় ইহার উল্লেখ আছে। এই মহালয় শব্দ হইতেই মহালয়া শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ অন্য প্রসঙ্গে মহালয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'গয়া' (পারস্কর গৃহ্যসূত্র পরিশিষ্টের শ্রাদ্ধসূত্র প্রথম কাণ্ডিকার কৃষ্ণমিশ্রকৃত ব্যাখ্যা শ্রাদ্ধকাশিকা)।

দ্র গোবিন্দানন্দ, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী; রঘুনন্দন, তিথিতত্ত্ব; রুদ্রধর, বর্ষকৃত্য।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

মহাসেনগুপ্ত পরবর্তী গুপ্তরাজবংশের বিখ্যাত রাজা। অফসড়লেখ হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতা দামোদরগুপ্ত ও পিতামহ কুমারগুপ্ত। দামোদরগুপ্ত সম্ভবতঃ মৌখরীরাজ ঈশানবর্মন বা তাঁহার পুত্রের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইলেও নিহত বা আহত হন। সম্ভবতঃ চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মনের (মহাকূট স্তম্ভলিপি) ও তিব্বতরাজ স্রং-ব্‌ত্‌সনের আক্রমণের ফলে মৌখরীবংশ দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই দুর্বলতার সুযোগে মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্যের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কামরূপরাজ সুস্থিতবর্মনকে পরাজিত করেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে মহাসেনগুপ্ত মালবের রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার সাম্রাজ্য এক সময়ে মালব হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলা চলে। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাসেনগুপ্তকে পূর্বে মালবের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার এই মতের অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন।

মৈত্রকরাজ বলভীর প্রথম শিলাদিত্য পশ্চিম মালবের অধিকাংশ দখল করেন ও ৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কলচুরিরাজ শংকরগণ উজ্জয়িনী জয় করেন। পূর্বে শশাঙ্ক (যিনি সম্ভবতঃ প্রথমে মহাসেনগুপ্তের সামন্ত ছিলেন) গৌড় অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ দখল করেন। এইভাবে মহাসেনগুপ্ত ও তাঁহার সাম্রাজ্যের অবসান হয়। তাঁহার দুই পুত্র মাধবগুপ্ত ও কুমারগুপ্ত রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধনের অনুচর ছিলেন।

দ্র *History & Culture of the Indian People*, Vol. III, *The Classical Age*, Edited by Ramesh Chandra Majumdar, 1962.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মহাস্থানগড় বাংলাদেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষপূর্ণ স্থান। স্থানটি বগুড়া শহর হইতে ৮ মাইল উত্তরে এবং করতোয়ার পশ্চিমতটে অবস্থিত। বুকানন হ্যামিল্টন এই বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের উল্লেখ করেন এবং পরে আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রধানতঃ হিউএন্‌-ৎসাঙ-এর বিবরণীর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে মহাস্থান প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কৃত মৌর্যযুগীয় উৎকীর্ণ লিপিসমন্বিত ইষ্টকখণ্ড এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। এই লিপি হইতে জানা যায় যে পুণ্ড্রনগরের মহামাত্র দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অধিবাসীদের মধ্যে রাজকীয় শস্যশালা হইতে শস্য এবং কোষাগার হইতে ধন ঋণস্বরূপ দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের দগ্ধ মৃত্তিকার (terracotta) পুত্তলিকা এবং মূর্তিসমূহ মহাস্থানগড়ের অস্তিত্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত প্রমাণ করে। গুপ্তসম্রাটগণের সময়ে পুণ্ড্রনগর যে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহার প্রমাণ খননে পাওয়া গিয়াছে।

মূল ধ্বংসাবশেষ উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় ৫০০০ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ৪০০০ ফুট। এই পরিধির বাহিরেও প্রত্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯২৮-২৯ খ্রী হইতে ১৯৩৬-৩৭ খ্রী পর্যন্ত এবং পরে পাকিস্তান পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাস্থানগড়ে উৎখনন পরিচালনা করেন।

উৎখননের ফলে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বৈরাগীর ভিটা নামক স্থানে পরবর্তী যুগে নির্মিত দেবালয়ের তলদেশে গুপ্তযুগের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। গড়ের গোবিন্দভিটা নামক স্থানে খননেও এইরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

দামোদরপুরের কয়েকটি তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (খ্রীষ্টীয় ৮ম শতক) বিজয়যাত্রায় নির্গমন করিয়া পুণ্ড্রনগরে আসিয়াছিলেন, কহ্লণ তাঁহার "রাজতরঙ্গিণী'তে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। পালযুগেও পুণ্ড্রনগর উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রধান নগর ছিল।

মহিষ রোমন্থনকারী কৃষ্ণকায়, স্বল্পলোম (কালো বা পাংশুবর্ণ) জন্তু। গরুর সহিত একপরিবারভুক্ত। ইহাদের পাকস্থলী চারটি কক্ষবিশিষ্ট, শিং ফাঁপা ও পায়ে জোড়া ক্ষুর।

কৃষ্ণকায় বলিয়া উত্তাপ সহ্য করিতে অক্ষম এবং কাদায় বা জলে পড়িয়া থাকিতে পছন্দ করে।

মহিষ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুগ্ধদানকারী পশু। মহিষদুগ্ধে স্নেহজাতীয় পদার্থের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৭ ভাগ। ভারতের অধিকাংশ ঘৃত ও মাখন মহিষদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত করা হয়। মহিষ হলকর্ষণ ও গাড়িটানার কার্যেও ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় মহিষের মধ্যে সর্বোত্তম মুর্‌রা (Murrah)। ইহারা বৃহৎকায়। স্বাভাবিক বাসভূমি পাঞ্জাব ও দিল্লী রাজ্য। এক দুগ্ধবর্ষে (lactation year) ইহাদের দুগ্ধের পরিমাণ প্রায় ৪৫০০ পাউন্ড। ভারতের বহু অংশেই মুর্‌রা মহিষ পালন করা হয়। মুর্‌রা ব্যতীত জাফরাবাদী, সুরাটি, মেহ্‌সানা, নাগপুরী প্রভৃতিও উন্নত শ্রেণীর মহিষ। 'পশুপালন' দ্রষ্টব্য।

এ. সি. চৌধুরী
অনুবাদক দেবজ্যোতি দাশ

মহিষাসুর চণ্ডী দ্র।

মহীউদ্দীন ফরুকসিয়র (১৭১৩-১৭১৯ খ্রী) দিল্লীর মোগল বাদশাহ। ইঁহার দুর্বলতা ও ভীরুতার সুযোগে আবদুল্লা ও হোসেন আলী এই দুইজন সৈয়দ ভ্রাতাই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের শাসক হন।

ইঁহার রাজত্বকালে মারবারের রাণা অজিত সিংহ

মোগল অধীনতা স্বীকার করেন। শিখ নায়ক বান্দার পরাজয় ও নিধন এবং জাঠদের দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জন সুরমনের নেতৃত্বে মোগল দরবারে এক দৌত্যের ফলে ইংরেজ কোম্পানি এই সময় ব্যবসায়-বাণিজ্যে কতকগুলি সুবিধা লাভ করে (১৭১৫ খৃ)।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিরোধের সৃষ্টি হইলে ফররুখসিয়র সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

দ্র *The Cambridge History of India,* Vol. IV, Cambridge, 1937; W. Irvine, *Later Mughals;* A. L. Srivastava, *The Mughal Empire,* 1526-1804 A.D., Agra 1957.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মহীপাল পালবংশ দ্র।

মহীশূর রাজ্য ১১°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ১৮°২০′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৭৪°১০′ পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৭৮°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজ্যের উত্তরে মহারাষ্ট্র ও গোয়া, পশ্চিমে আরবসাগর, দক্ষিণে কেরালা ও মাদ্রাজ এবং পূর্বে অন্ধ্রপ্রদেশ অবস্থিত।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর প্রাক্তন বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত কুর্গের কানাড়া ভাষাভাষী অঞ্চলের সমন্বয়ে নূতন মহীশূর রাজ্যের উদ্ভব হয়। ভারতের অষ্টম বৃহত্তম রাজ্য মহীশূরের বর্তমান আয়তন ১৯২২০৩ বর্গকিলোমিটার এবং ইহা ১৯টি জেলা ও ১৭৩টি তালুকে বিভক্ত। প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার্থে সমগ্র রাজ্যকে চারভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা (১) বেলগাঁও বিভাগ—আয়তন ৫৪৩৪৭ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা (১৯৬১) ৬২৮৩৯০০। বেলগাঁও, ধারওয়ার উত্তর কানাড়া ও বিজাপুর জেলা লইয়া ইহা গঠিত। (২) মহীশূর বিভাগ—আয়তন ৫৩৬৩৬ বর্গকিলোমিটার লোকসংখ্যা (১৯৬১) ৬৯৬৭৭৯৫। মহীশূর, মান্দ্যা, হাসান, চিকমাগালুর, দক্ষিণ কানাড়া, শিমোগা ও কুর্গ জেলা লইয়া গঠিত। (৩) বাঙ্গালোর বিভাগ—আয়তন ৪৭৫৭৮ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা (১৯৬১) ৭১৭১৫৫৩। বাঙ্গালোর, কোলার, টুমকুর, চিত্রদুর্গ ও বেল্লারী জেলা লইয়া ইহা গঠিত। (৪) গুলবর্গা বিভাগ—আয়তন ৩৫৭০২ বর্গকিলোমিটার, লোকসংখ্যা (১৯৬১) ৩১৬৩৫২৪। ইহা গুলবর্গা, রায়চুর ও বিদর জেলা লইয়া গঠিত।

ভূপ্রকৃতি—রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব অংশ ১২০০ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট এবং মালভূমিময়। ঐ অঞ্চলটি ক্রমশঃ পূর্বদিকে ঢালু হইয়াছে ও 'ময়দান' (অর্থাৎ সমতল) নামে পরিচিত। পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১০০০ হইতে ১৩০০ মিটার পর্যন্ত। ইহার শিখরদেশ 'ঘাট' নামে এবং পূর্ব-ঢাল অংশ 'মালনাদ' নামে অভিহিত। পশ্চিম ঘাটের পশ্চিমদিকে মাত্র ২৫ হইতে ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত কোঙ্কণ উপকূল উর্বর পললে গঠিত সংকীর্ণ সমভূমি অঞ্চল। কঠিন গণ্ডোয়ানা স্তরে গঠিত এবং বহু ক্ষয়চক্রযুক্ত মহীশূরের দক্ষিণভাগ মহীশূর মালভূমির অন্তর্গত ও গড় উচ্চতা ১৬০০ হইতে ২৬০০ মিটার পর্যন্ত।

ভূতত্ত্ব—পৃথিবীর অন্যতম সুদৃঢ় ও প্রাচীন ভূখণ্ডে অবস্থিত মহীশূর রাজ্যের ৩/৪ অংশ আরকিয়ান শিলায় গঠিত। কিন্তু উত্তরে নবীনতর 'ভীমা' ও 'কালাড্‌গি' স্তর রহিয়াছে। ক্রিটেসিয়াস্‌ ও টার্শিয়ারি যুগীয় উত্তরভাগের লাভাস্তর 'দাক্ষিণাত্যের ট্র্যাপ' নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত এই রাজ্যে বিবিধ ধাতব ও অধাতব শিলা আছে।

মৃত্তিকা—সাধারণতঃ ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও স্বাভাবিক উদ্ভিদের দ্বারা মৃত্তিকা প্রভাবিত হয়। ব্যাপকভাবে মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়, যথা, কৃষ্ণ, লোহিত, ল্যাটারাইট ও উপকূলের পাললিক মৃত্তিকা। ময়দান অঞ্চলে ট্র্যাপ অংশের কৃষ্ণমৃত্তিকা 'রেগুর' নামে পরিচিত ; নদী অববাহিকায় ইহা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের এবং প্রধান নদীগুলির দোয়াব অংশে ধূসরবর্ণের হয়। গভীরতা অনুসারেও মৃত্তিকার বর্ণ ও উর্বরতার পরিবর্তন হইয়াছে। মহীশূর মালভূমিতে লোহিত মৃত্তিকা দেখা যায়। উপকূলভাগ সাধারণতঃ পশ্চিমঘাটের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশ্চিমবাহিনী নদীর পললে গঠিত।

জলবায়ু—সমগ্র রাজ্য গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত এবং জলবায়ুর বিশেষ পার্থক্য হয় না। শীতকালে ঘাট অঞ্চলে উত্তাপ ১৫° সেণ্টিগ্রেড এবং ময়দানের উত্তর-পূর্বে ৫° সেণ্টিগ্রেড। গ্রীষ্মে রাজ্যের দক্ষিণে ৪০° সেণ্টিগ্রেড ও উত্তরে ৪৫° সেণ্টিগ্রেড তাপ থাকে। দিবারাত্রির তাপের প্রসার খুবই সামান্য। বৃষ্টিপাত দক্ষিণ হইতে উত্তরে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে হ্রাস পায়। মহীশূরের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১১৯৩·৮ মিলিমিটার ; ইহা মালনাদে ৭৬২০ মিলিমিটার ও পূর্বে কেবলমাত্র ৩৮১ মিলিমিটার।

মহীশূরের নদীগুলি মোট ৬০০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পূর্ব ও পশ্চিমবাহিনী নদীগুলির মধ্যে প্রধান জলবিভাজিকা। কৃষ্ণা, ভীমা, তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরী পূর্ববাহিনী এবং কালীনদী, গঙ্গাবলী, তাম্রি ও শ্রাবতী প্রধান পশ্চিমবাহিনী নদী।

পশুপক্ষী ও উদ্ভিদ্—আধিক বৃষ্টিপাতহেতু পশ্চিমঘাট পর্বতে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। পর্বতের বায়ুপ্রবাহাভিমুখী অংশে ইহা ক্রমশঃ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আর্দ্র ও শুষ্ক পর্ণমোচী বৃক্ষের সহিত মিশিয়াছে। উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ হইল সেগুন, চন্দন ও মেট্টি। ময়দান অঞ্চলে পর্ণমোচী বনভূমি কাঁটাজাতীয় গুল্ম ও বনভূমির সহিত মিলিয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রে মৃগ, ছাগ, মেষ, শশক প্রভৃতি, ক্ষয়প্রাপ্ত

অঞ্চলে নেকড়ে এবং অরণ্যে হস্তিযূথ, বাইসন, সম্বর, চিত্রিত হরিণ ও শূকরই সচরাচর দেখা যায়। স্থানে স্থানে বাঘ, প্যান্থার, বন্য বরাহ ও বন্য কুকুর গোচরে আসে। মহীশূরের অরণ্যাঞ্চল বন্য হস্তীর জন্য বিখ্যাত। নদীতে চ্যাপ্‌টানাক-কুমীর প্রায়ই থাকে।

লোকবসতি—১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুসারে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যা ২৩৫৮৬৭৭২। লোকবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১২৩। রাজ্যের অভ্যন্তরে লোকবসতির ঘনত্বের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়—মহীশূর মালভূমি ও উপকূলীয় সমভূমিতে সর্বাধিক এবং উত্তর-পূর্ব ময়দান অঞ্চলে সর্বনিম্ন। রাজ্যে প্রতি ১০০০ জন পুরুষে ৯৫৯ জন স্ত্রীলোক আছেন।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুযায়ী রাজ্যে শহরবাসী লোকসংখ্যা মোট ৫২৭০০০০ বা মোট জনসংখ্যার শতকরা ২২·০৩ ভাগ। এখানে ২৩১টি শহর আছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ—

রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা ৭২·৪ ভাগ কৃষিজীবি এবং কৃষি হইতে রাজ্যের মোট আয় আনুমানিক ৩৬০ কোটি টাকা অর্থাৎ রাজ্যের মোট আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ। ১৯৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যের মাথাপিছু গড় আয় ছিল ২২৬ টাকা। মহীশূরের বাৎসরিক মোট আয় ৬০২ কোটি টাকা। মোট আবাদী জমির শতকরা মাত্র ৭·০১ ভাগে জলসেচন করা হয়। আবাদী জমির শতকরা ৭৩ ভাগে খাদ্য ফসল উৎপাদন হয়। ভক্ষ্য শস্য উৎপাদক অঞ্চলের শতকরা ৮২ ভাগেই ধান, গম জাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়। অর্থকরী ফসলের মধ্যে তুলা, ইক্ষু, তৈলবীজ ও তামাক উল্লেখযোগ্য। ভারতের মোট উৎপাদিত তুলার শতকরা ১২·৯৮ ভাগ উৎপাদন করিয়া মহীশূর তৃতীয় স্থান অধিকার করে। মহীশূর ভারতীয় কফির শতকরা ৮০ ভাগই উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন দেশের দারুচিনি উৎপাদনের শতকরা ৪৫ ভাগই মহীশূর হইতে আসে। গোলমরিচ ও সুপারি প্রচুর উৎপাদিত হয়।

বনভূমি—রাজ্যের ভূমির শতকরা ১৭·৯ ভাগ অরণ্য এবং ইহা প্রধানতঃ মালনাদেই সীমাবদ্ধ। বনভূমি হইতে রাজ্যের আয় শতকরা ১·৯ ভাগ। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ অরণ্যাঞ্চল সরকারি মালিকানা ও পরিচালনাধীন। প্রধান বনজ সম্পদ হইল কাঠ, বাঁশ ও চন্দনকাঠ।

খনিজ সম্পদ—প্রায় ৫০০০০ ব্যক্তি খনিজ কার্যে নিযুক্ত; তন্মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ খনিতে, ৩৩ ভাগ স্বর্ণখনিতে এবং ১৫ ভাগ লৌহখনিতে রহিয়াছে।

লৌহ আকরিক খনিগুলি বেলারী-হস্‌পেট অঞ্চলে, চিক্‌মাগালুর অঞ্চলের কেম্মানগুণ্ডি ও বাবাবুদান পার্বত্য অংশে, চিত্রদুর্গ ও সিমোগা অঞ্চলে; ম্যাঙ্গানিজ খনি লোণ্ডা, সান্দুর ও চিত্রদুর্গ-টুমকুর অঞ্চলে এবং ক্রোমাইটের প্রধান খনি মহীশূর-হাসান অঞ্চলে অবস্থিত। কোলারে দেশের একমাত্র স্বর্ণখনি আছে; হুটগীতেও স্বর্ণ পাওয়া যায়।

শিল্প—১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহীশূরে প্রায় ২৪৬০টি বৃহদায়তন ও মাঝারি ধরনের কারখানায় মোট ৭০০০০ ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত ছিল; ইহা রাজ্যের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার প্রায় ১৫·৫%। ব্যাঙ্গালোর, ধারওয়ার, দক্ষিণ কানাড়া ও বেলগাঁও জেলা চতুষ্টয়েই রাজ্যের শতকরা ৬২·৫ ভাগ শিল্পসংস্থা এবং ৬৭ ভাগ শ্রমিক আছে। ব্যাঙ্গালোর প্রধান শিল্পকেন্দ্র। নিম্নোক্ত কয়েকটি শিল্পাঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যথা, (১) কোলার ব্যাঙ্গালোর-মাণ্ড-মহীশূর অঞ্চল, (২) টুমকুর-চিত্রদুর্গ-পামনগেড় অঞ্চল, (৩) হাসান-হাসান-চিক্‌মাগালুর-ভদ্রাবতী-সিমোগা অঞ্চল, (৪) ম্যাঙ্গালোর-উদীপি অঞ্চল, (৫) হুবলী-ধারওয়ার-গাদাগ্‌ অঞ্চল, (৬) বেলারী-হসপেট্‌ অঞ্চল এবং (৭) বেলগাঁও অঞ্চল। প্রধান শিল্পসামগ্রীর মধ্যে চিনি, সিমেণ্ট, সার, বস্ত্রাদি, লৌহ-ইস্পাত, যন্ত্রপাতি ও বিমানপোত উল্লেখযোগ্য।

শক্তি উৎপাদন—দাক্ষিণাত্যের আর্কিয়ান অংশে অবস্থিত হওয়ায় মহীশূরে গণ্ডোয়ানা ও টার্শিয়ারি শ্রেণীর কয়লা ও পেট্রোলিয়াম নাই। জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের জন্য ভারতের প্রাচীনতম শিবসমুদ্রম পরিকল্পনা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়। এতদুদ্দেশ্যে কার্যকরী পরিকল্পনাগুলির কয়েকটি হইল কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম (৪২ মেগাওয়াট), সিম্‌শা (১৭·২ মেগাওয়াট), যোগপ্রপাতের মহাত্মা গান্ধী বিদ্যুৎ প্রকল্প (১২০ মেগাওয়াট), শ্রাবতীনদীর উপর শ্রাবতী পরিকল্পনা (৩৫৬·৪ মেগাওয়াট) এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর তুঙ্গভদ্রা (৪১·৪ মেগাওয়াট) ও ভদ্রা (৩৩·২ মেগাওয়াট)। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রাজ্যের মোট বিদ্যুৎপ্রজনন-ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬২২·০৮ মেগাওয়াট; ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ছিল মাত্র ১০৭·২ মেগাওয়াট।

যানবাহন—যানবাহনের বিভিন্ন সংস্থায় প্রায় ৫ লক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত। মহীশূরে মোট ২৬৯৯ কি. মি. রেলপথ, ২৯০৬১ মাইল বিভিন্ন শ্রেণীর রাস্তা, ৩টি বিমানবন্দর এবং ৩৫০ কি. মি. উপকূলে ২১টি পোতাশ্রয় আছে।

জলপথ—রাজ্যের প্রায় ৩০০ কিলোমিটার উপকূলে অবস্থিত ২১টি বন্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ২টি হইল উত্তরে কারওয়ার ও দক্ষিণে ম্যাঙ্গালোর।

বিমানপথ—প্রধান তিনটি বিমানবন্দরের মধ্যে দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোর, উত্তরে বেলগাঁও এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে ম্যাঙ্গালোর উল্লেখযোগ্য।

দর্শনীয় অঞ্চল—রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ।

বাঙ্গালোর—এই রাজধানী শহরের প্রাচীন প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলি প্রসিদ্ধ। ('বাঙ্গালোর' দ্র)

নন্দীপর্বত—বাঙ্গালোরের অদূরে অবস্থিত স্বাস্থ্য-নিবাস।

মহীশূর—উদ্যানের শহররূপে ইহার খ্যাতি আছে এবং ইহা প্রাচীন রাজধানী ছিল। দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবনাদি, চিড়িয়াখানা, আর্ট গ্যালারী, চামুণ্ডি মন্দির, সেণ্ট ফিলোমিনা গির্জা, ললিতামহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহীশূর শহর হইতে কৃষ্ণরাজ সাগর ও বৃন্দাবন উদ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরঙ্গপট্টম—হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের রাজ-ধানী শ্রীরঙ্গপট্টম ঐতিহাসিক নগরী। দর্শনযোগ্য স্থান-গুলি হইল যথাক্রমে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির, দরিয়া দৌলত, গম্বুজ, প্রাচীন দুর্গ ও কামান, হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সমাধিস্থান।

নাঞ্জনগড়—মহীশূরের দক্ষিণে প্রায় ২৪·১ কি. মি. দূরে অবস্থিত ও পবিত্র শ্রীকান্তেশ্বরস্বামী মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

সোমনাথপুর—ইহা মহীশূর হইতে ৫৩·১ কিলো-মিটার দূরে অবস্থিত। এই স্থানের সোমনাথ মন্দির ও তাহার ভাস্কর্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শিবসমুদ্রম—কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং এই স্থানের ৬১ মিটার উচ্চ জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎ-পাদিত হয়।

মাঙ্গালোর—রাজ্যের বৃহত্তম বন্দর ও মনোরম শহর। ইহা মাঙ্গালোর টালির জন্য বিখ্যাত।

শ্রবণবেলগোলা—জৈন সম্প্রদায়ের পবিত্র স্থান ও ১৭·৪ মিটার উচ্চ গোমতেশ্বর মূর্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

উদীপি—পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের জন্য বিখ্যাত।

গোকর্ণ—কারওয়ার হইতে ৫৩·১ কি. মি. দূরে অবস্থিত। এ স্থানে ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্য-তম মহাবলেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত। মহাশিবরাত্রির দিন এখানে একটি মেলা বসে।

কারওয়ার—প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বন্দরটি রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। এখানে স্যামন মৎস্য আহরণ করা যায়।

শৃঙ্গেরী—এই পবিত্র স্থানে জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য মঠ অবস্থিত।

ভদ্রাবতী—ইহা মহীশূরের ইস্পাত নগরী।

যোগপ্রপাত—শ্রাবতী নদীর উপরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-মণ্ডিত ২৬৮ মিটার উচ্চ জলপ্রপাত। মহাত্মা গান্ধী স্মারক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শ্রাবতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দুইটি যোগপ্রপাতের অদূরে অবস্থিত।

বিজাপুর—মুসলমান স্থাপত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজা আদিলশাহ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোলগম্বুজ শহরের মধ্যে অবস্থিত।

বাদামী—চালুক্য রাজাদের নির্মিত পঞ্চম শতকের গুহামন্দিরগুলি এখানে অবস্থিত।

হাম্‌পি—বিজয়নগর রাজবংশের রাজধানী ছিল ও প্রসিদ্ধ বিজয়নগর শহরের ধ্বংসাবশেষ এখানে অবস্থিত। নিকটবর্তী তুঙ্গভদ্রা বাঁধ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলসেচের জন্য তৈয়ারি হইয়াছে।

রায়চুর—প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর এবং কেল্লা ও মন্দিরের জন্য সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য পবিত্র স্থানের মধ্যে কালবার্গি, মেলুকোট ও তালাকাড়ুর নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাজব্যবস্থা ঃ—

ধর্ম ও রীতিনীতি—মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭ ভাগ হিন্দু, ১০ ভাগ মুসলমান ও বাকি ৩ ভাগ খ্রীষ্টান, শিখ প্রভৃতি।

মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৫·৪ ভাগ শিক্ষিত, অবশ্য গ্রামে এই সংখ্যা মাত্র শতকরা ২০ ভাগ ও শহরাঞ্চলে প্রায় ৪৪·১ ভাগ।

মহীশূরে চারটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—ধারওয়ারে কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাঙ্গালোর কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়। সমগ্র রাজ্যে শতাধিক কলেজ এবং ৩৩৩৫০টি বিদ্যালয় আছে। একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। রাজ্যের প্রধান দুইটি গবেষণাগার হইল যথাক্রমে বাঙ্গালোরের টাটা গবেষণা কেন্দ্র ও মহীশূরের কেন্দ্রীয় খাদ্যবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

বি. এন্. সিন্‌হা

মহেঞ্জো-দড়ো পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগর; প্রাগ্‌বৈদিক সিন্ধু-সভ্যতার বিখ্যাত কেন্দ্র। একই গোষ্ঠীর সভ্যতা পাকিস্তানের হরপ্পা নগরী এবং ভারতের লোথাল ও রূপার প্রভৃতি বহু-স্থানেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় মহেঞ্জো-দড়ো নগরীর লুপ্ত সভ্যতার আবিষ্কর্তা (১৯১৭)। পরে (১৯২২-২৩) তিনি মহেঞ্জো-দড়োতে খননকার্য আরম্ভ করিলে তাঁহার আবিষ্কৃত পুরাবস্তু-গুলি যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়। পরে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের গবেষণার ফলেও এই সভ্যতা যে ভারতীয় তাম্রপ্রস্তর যুগের অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ বৎসরের পুরাতন এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং ইহা অবৈদিক ও প্রাগ্‌বৈদিক বলিয়া পণ্ডিতরা মনে করেন।

অন্যান্য নদীতীরস্থ প্রাচীন সভ্যতার মত সিন্ধুতীরে মহেঞ্জো-দড়োর সভ্যতা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। নগরটি রাজ-পথ দ্বারা বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত। পল্লীগুলি ইটের সুবৃহৎ অট্টালিকায়, এবং অট্টালিকাগুলি ছোট ছোট

প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। রাজপথের উপরে অট্টালিকার নীচের তলায় দোকান এবং পার্শ্ববর্তী গলি হইতে বাড়ির ভিতরে প্রবেশের পথ। কখনও বাড়ির ভিতরে প্রাঙ্গণ। মাঝে মাঝে দ্বিতল বাড়িও হইত।

অনুমান, সুদীর্ঘ তিনটি যুগ ধরিয়া এই সভ্যতার বিস্তার। আদিযুগের ভিত্তি বর্তমানে জলের নীচে পড়িয়া আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া দুরূহ, মধ্যযুগেই সভ্যতার পূর্ণবিকাশ। তৃতীয় যুগে তাহার অবনতি দেখা যায়।

এখানকার স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে ১৮০ ফুট, প্রস্থে ১০৮ ফুট এবং চতুর্দিকে ৭-৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটি প্রাঙ্গণ। ইহার মধ্যে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণবাপী আছে। এই বাপীর চতুর্দিকে এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (Bitumen) প্রলেপ দিয়া একসারি মসৃণ ইট গাঁথা।

এখানকার শস্যাগার ১৫০ ফুট দীর্ঘ, ৭৫ ফুট প্রস্থ এবং ২৫ ফুট উচ্চ। হরপ্পাতে আবিষ্কৃত শস্যাগার তুলনায় ছোট। মহেঞ্জো-দড়োর নগররক্ষক দুর্গ ও শস্যাগার স্নানাগারের খুবই সন্নিকটে; এই ব্যবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, ইহা ধর্মের সহিত যুক্ত এবং এই স্থান কোনও ধর্মযাজক শাসকের অধিষ্ঠান ছিল। প্রায় ৩৫০ মা. দূরস্থ হরপ্পায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

বিশেষজ্ঞরা কঙ্কাল ও মস্তক পরীক্ষার দ্বারা বলেন, এখানে ককেশীয়, ভূমধ্যসাগরীয়, আলপীয় ও মোঙ্গলীয় এই চার জাতীয় লোক ছিল। কিন্তু এই সভ্যতার স্রষ্টা কে বা কাহারা ছিলেন এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার সৃষ্টিকারী জাতি তাঁহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানারূপ উপাদান লইয়া সমুদ্রপথে বিদেশ হইতে আগমন করেন। এই অনুমানের কোনও সন্তোষজনক সূত্র নাই। সর্ববাদিসম্মত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে এই ভারতবর্ষেরই কোনও বর্ধিষ্ণু স্থানে (সম্ভবতঃ কোনও বিশিষ্ট নদীতীরে) বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের আহৃত উপাদান ও আনুকূল্যে এই সভ্যতার পত্তন হয় এবং ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ইহা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরিশেষে আর্যদের আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার পতন ঘটে।

এখানকার খাদ্যদ্রব্য ছিল—যব, গম, তিল, মটর, রাই প্রভৃতি শস্য, মেষ, শূকর ও কুক্কুট, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস, সমুদ্রের শামুক, শুঁটকি মাছ। অধিবাসীদের পরিধানের জন্য কার্পাস সুতার বস্ত্র ও শাল প্রভৃতি পোশাক, গৃহস্থলীর জন্য তামা, ব্রোঞ্জ, পাথর ও মাটির বাসন-কোশন, মাটির হাঁড়ি, কড়া, থালা, বাটি, নৈবেদ্যপাত্র, গেলাস, পানপাত্র, শরা, মালসা, ডাবর, গামলা, কলসী ও মটকী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে চকমকি পাথরের ছুরি, পাথরের কুঠার, হলমুখ, প্রসাধন পেটিকা, থালা, বাটি, রংদানি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন পরিমাণের পাথরের ওজন ও অজ্ঞাত অক্ষরযুক্ত নরম পাথরের শীলমোহর হইতে অনুমান, এই সমাজে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল। এখনও অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। তবে জানা যায় ঐগুলি ডানদিক হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে পড়িতে হইত।

অঙ্গসাজের জন্য সোনা, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের নানারূপ অলংকার ও অস্থি কিংবা গজদন্তের চিরুণী, দর্পণ, ক্ষুর, বঁড়শি এবং সূচ তামা ও ব্রোঞ্জ দিয়া তৈরি হইত। অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারির জন্য তামা, ব্রোঞ্জ ও পাথর ব্যবহার হইত। মাটির পুতুল, ঝুমঝুমি, মারবেল প্রভৃতি শিশুদের এবং ঘুঁটি ও পাশা প্রভৃতি বয়স্ক লোকের খেলার উপাদান ছিল। ব্রোঞ্জের নর্তকী ও পাথরের যোগী মূর্তি এই স্থানের ভাস্কর্যের অত্যুন্নত নিদর্শন।

অধিবাসীরা প্রধানতঃ লিঙ্গোপাসক ছিলেন। হরিণ, হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ বেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বলিঙ্গ পশুপতি শিব ও মৃন্ময়ী মাতৃকা মূর্তির পূজাও এখানে প্রচলিত ছিল।

এখানে পূর্ণ সমাধি—পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহকে শায়িত অথবা উপবিষ্টভাবে প্রোথিত করা, আংশিক সমাধি—মাটির হাঁড়িতে মৃতের মস্তক অথবা কতকগুলি অস্থি রক্ষা, এবং দাহান্তর সমাধি—দাহাবশিষ্ট করেকখণ্ড অস্থি ও ভস্ম কোনও মৃৎপাত্রে রাখিয়া ভূ-গর্ভে রক্ষা, এই তিন-প্রকার ব্যবস্থা ছিল।

সমাজ বিভিন্ন শ্রেণী ও নানারূপ শিল্পীগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি, যেমন কুম্ভকার, কর্মকার প্রভৃতি এখানে বাস করিত। মুদ্রার প্রচলনের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। শস্যের মাধ্যমে বিনিময় প্রথায় বোধ হয় ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। অনুমান, প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মত এখানেও রাজকীয় শস্য-ভাণ্ডার, কোষাগারের মত কাজ করিত এবং রাজস্ব আদায় ও কর্মচারীদের বেতন প্রদান প্রভৃতিও সম্ভবতঃ শস্যাগারের মাধ্যমেই হইত।

দ্র কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, প্রাগৈতিহাসিক মহেন্‌জোদারো, কলিকাতা ; Sir John Marshall, *Mohenjo-Daro and Indus Civilisation*, 3 Vols, London, 1931; J. H. Mackay, *Indus Civilisation*, London, 1935; Mortimer Wheeler, *Early India and Pakistan;* N. G. Majumdar, *Explorations in Sind*, M. A. S. I. No. 48, 1934.

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২ খ্রী) ১৪ জুলাই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মধুসূদন গুপ্ত, মাতা স্বর্ণময়ী দেবী। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া এনট্রান্স, এফ. এ ও বি. এ. পাশ করেন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

এবং সিটি, রিপন ও মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২ খ্রী। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগ অবধি এই মহাপুরুষ-সান্নিধ্যের দিনলিপি তিনি লিখিয়া রাখেন। এই দিনলিপি অবলম্বনে ১৮৯৭ খ্রী তাঁহার Gospel of Sri Ramkrishna প্রকাশিত হয়। পরে "শ্রীম-কথিত" এই নামে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৪-১৯৩২ খ্রী)। অধ্যাত্ম-অনুপ্রেরণা ও সাহিত্য-সৌন্দর্যে 'কথামৃত' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মহেন্দ্রপাল (প্রতীহার) গুর্জর-প্রতীহার দ্র।

মহেন্দ্রলাল বসু বঙ্গদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অন্যতম। ন্যাশনাল থিয়েটারে লীলাবতীর অভিনয়ে (১৮৭১) এই সুদর্শন এবং সুকণ্ঠ যুবক জমিদার ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তখন হইতে আমৃত্যু (মার্চ, ১৯০১) বিভিন্ন রঙ্গালয়ে প্রধান অভিনেতা এবং কখনও কখনও অধ্যক্ষ-রূপে যুক্ত মহেন্দ্রলাল বহু প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তৎকালীন অভিনেতাদের আদর্শস্থানীয় হন।

প্রবোধকুমার দাস

মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩—১৯০৪ খ্রী) প্রখ্যাত ডাক্তার। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা তারকনাথ সরকার। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এম. ডি. হন। ১৮৬৭ খ্রী হইতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ। জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী Calcutta Journal of Medicine মাসিকপত্র প্রকাশ (১৮৬৮); Indian Association for the Cultivation of Science-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক (১৮৭৬-১৯০৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' (১৮৭০), কলিকাতার শেরিফ (১৮৮৪); বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৮৭-৯৩), সি. আই. ই (১৮৮৩) এবং ১৮৯০ খ্রী ডি. এল. উপাধি প্রাপ্তি। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ক বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

দ্র Dr. S. C. Ghose, *Life of Mahendralal Sircar*, Calcutta, 1935.

বীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১২৬৫-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ব্যবসায়ী ও বিদ্যোৎসাহী। বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলার বিটঘর গ্রামে জন্ম। পিতা ঈশ্বরদাস তর্কসিদ্ধান্ত এবং মাতা রামমালা দেবী। দারিদ্র্যের জন্য এন্ট্রান্স ক্লাসের অধিক পড়াশুনা করিতে পারেন নাই।

মহেশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জন করেন।

তিনি কুমিল্লা শহরে পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে দরিদ্র ছাত্রদের জন্য 'ঈশ্বর পাঠশালা', 'রামমালা ছাত্রাবাস' এবং 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন।

ইঁহার রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'স্ত্রীরোগ চিকিৎসা', 'হোমিওপ্যাথিক ওলাওঠা চিকিৎসা' (১৯২২ খ্রী) ও 'পারিবারিক ভেষজতত্ত্ব'।

অশোকা সেনগুপ্ত

মহেশচন্দ্র সরকার (১৮১৮-১৮৮৭ খ্রী) বারাণসীর প্রখ্যাত বীণকার। প্রবাসী বাঙ্গালী। প্রথম জীবনে তিনি সেতার বাদক ছিলেন এবং তাঁহার প্রধান সংগীতগুরু ছিলেন গণেশীলাল বাজপেয়ী। মহেশচন্দ্র পরে তানসেনের পুত্রবংশীয় তন্ত্রকার সাদিক আলি খাঁ ও নিসার আলি খাঁর নিকটেও রাগবিদ্যাবিষয়ে উপকৃত হন। মহেশচন্দ্রের বীণাবাদন শ্রবণে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধিস্থ হন, ইহা সুবিদিত। বারাণসীতেই মহেশচন্দ্রের জন্ম ও মৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মাইকেল এঞ্জেলো মিকেলাঞ্জেলো দ্র।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত মধুসূদন দত্ত দ্র।

মাইক্রোফোন শব্দশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ইহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে বহু উচ্চক্ষমতায় তুলিয়া নেওয়া সম্ভব। মাইক্রোফোনে একটি পরদা বা ডায়াফ্রামের উপর শব্দতরঙ্গ পড়িলে তাহার কম্পন আরম্ভ হয়। এই কম্পন হইতে বৈদ্যুতিক স্পন্দন উৎপাদন করা যায় নানা উপায়ে। প্রথম উপায়—অঙ্গারচূর্ণসহযোগে। অঙ্গার-মাইক্রোফোনে পর্দার সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি অঙ্গারচূর্ণের আধার। পর্দার কম্পনে এই চূর্ণগুলির উপর চাপ বাড়ে কমে। ফলতঃ উহাদের বৈদ্যুতিক রোধের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অঙ্গারচূর্ণগুলি কোনও তড়িৎবর্তনীর মধ্যে থাকিলে ঐ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের স্পন্দন হয়। টেলিফোনে অঙ্গার-মাইক্রোফোন বিশেষ জনপ্রিয়। দ্বিতীয় উপায়—বিদ্যুৎ-চুম্বকীয়। বিদ্যুৎচুম্বকীয় মাইক্রোফোনে পর্দার সঙ্গে সংযুক্ত একটি কুণ্ডলী এক শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকের ক্ষেত্রে লম্বমান থাকে। শব্দতরঙ্গের প্রভাবে কুণ্ডলীটি কম্পিত হইলে চৌম্বকক্ষেত্রে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয়। কুণ্ডলীর পরিবর্তে একটি ধাতব রিবন বা ফিতাও ব্যবহার হয়। তৃতীয় উপায়—তড়িৎধারক সহযোগে। তড়িৎধারক মাইক্রোফোনে পর্দাটি ও তাহার পশ্চাদ্বর্তী

একটি ধাতব পাত একটি তড়িৎধারক সৃষ্টি করে। একমুখী একটি তড়িৎ-বিভব এই দুইটির মধ্যে প্রযুক্ত থাকে। শব্দ-তরঙ্গের আবির্ভাবে পর্দাটি কম্পিত হইলে ধারকটির ধারণশক্তির পরিবর্তন হয়, ফলে একটি স্পন্দনশীল তড়িচ্চালক বল উৎপন্ন হয়। এই মাইক্রোফোন দ্বারা নিখুঁত-ভাবে শব্দ-রূপান্তর সম্ভব। চতুর্থ উপায়—চাপোদ্ভূত বিদ্যুৎ (Piezoelectricity) সহযোগে। কেলাস মাইক্রো-ফোনে একটি কেলাসখণ্ডের উপর শব্দের চাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বলের তারতম্য ঘটে। উহাতেই বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাওয়া যায়। এই মাইক্রোফোন বেশ সস্তা ও ছোট। পরিবর্ধক সহযোগে মাইক্রোফোন একটি ক্ষীণতম শব্দকেও বিরাট ক্ষমতা দান করিতে পারে।

দ্র H. F. Olson, *Acoustical Engineering*, New York, 1957.

পরেশচন্দ্র ধর ভৌমিক

মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান সংবিধান, ভারতীয় দ্র।

মাকড়সা সন্ধিপদ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আরাক্‌নিদা শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রায় ২০০০০ প্রজাতি আছে। কার্বনিফেরাস যুগ হইতে মাকড়সা বর্তমান।

সাধারণতঃ ০·১-৬ সেণ্টিমিটার দীর্ঘ। দেহ শিরোবক্ষ ও উদর লইয়া গঠিত; উভয় অংশই গোলাকার ও অখণ্ডিত এবং সরু কোমর দিয়া পরস্পর যুক্ত। শিরোবক্ষে সাধারণতঃ ৪ জোড়া সরলাক্ষি ও ৬ জোড়া উপাঙ্গ থাকে। ইহারা স্বল্পান্ধকারেও দেখিতে পায়। প্রথম জোড়া উপাঙ্গের সূচালো অগ্রভাগে বিষগ্রন্থির সহিত যুক্ত মাকড়সার বিষনখ। দ্বিতীয় জোড়া উপাঙ্গের অগ্রভাগের রোমগুচ্ছের সাহায্যে মাকড়সা দেওয়ালে ওঠানামা করে। অবশিষ্ট ৪ জোড়া উপাঙ্গের প্রত্যেকটি ৭ খণ্ডযুক্ত পদ।

মাকড়সা একলিঙ্গ প্রাণী। প্রজননকালে পুং-মাকড়সা স্ত্রী-মাকড়সার সহিত যৌনবিহারে রত হয়; সংগম শেষে স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষটিকে তাড়াইয়া দেয় এবং দুই-এক ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত করিয়া ভক্ষণ করে। স্ত্রী-মাকড়সা গুটিকাবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে এবং ১০-১৪ দিনে ডিম ফুটিয়া অপরিণত বাচ্চা বাহিরে আসে। অধিকাংশ মাকড়সা বর্যজীবী প্রাণী।

উদরের পশ্চাদ্‌ভাগে 'স্পিনারেট' নামক অঙ্গের সাহায্যে মাকড়সা স্বীয় গ্রন্থিনিঃসৃত প্রোটিনজাতীয় রসে জাল বোনে। ঐ রস বাতাসের সংস্পর্শে কঠিন সুতার আকার ধারণ করে। ইহার দ্বারাই মাকড়সা সুতার ফাঁদ পাতে।

মাকড়সা মাংসাশী প্রাণী। মুখ্যতঃ পতঙ্গাদি উহাদের আহার্য। মাকড়সা শিকারকে বিষনখের আঘাতে নিষ্ক্রিয় করিয়া উহার রস শোষণ করে।

পাখি, টিকটিকি, ব্যাঙ, পতঙ্গভুক স্তন্যপায়ী প্রাণী ও বোলতাজাতীয় পতঙ্গ মাকড়সার শত্রু।

স্বাধীনজীবী ও একক বসবাসকারী হিসাবেই মাকড়সা সুপরিচিত।

দ্র T. H. Savory, *The Biology of Spiders*, London, 1928.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

মাকাল ঠাকুর বাংলাদেশের পল্লীঅঞ্চলের মৎস্যজীবীদের উপাস্য লৌকিক দেবতা। ইঁহার কোনও মূর্তি নাই, সর্বত্র প্রতীক (টোপরের প্রায় অনুরূপ) পূজিত হয়। মৎস্য-জীবীরাই পৌরোহিত্য করেন। নৈবেদ্য আতপ চাউল ও বাতাসা; একটি পাত্রে শিশুদের ব্যবহার্য চুষি, লাটিম, ঘুন্সি থাকে। মৎস্য ধরিবার ঠিক পূর্বে পূজার সময় ছোট বেদীর উপর এক বা দুইটি প্রতীক স্থাপন করা হয়। বেদীর সম্মুখে ঘট, একটি মাছ, গাঁজার কলিকা এবং প্রজ্বলিত প্রদীপ থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে 'আট' নামক বনদেবতার সঙ্গে মাকাল ঠাকুর পূজিত হন।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

মাখনলাল সেন (১৮৮১-১৯৬৫ খ্রী) বিপ্লবী নেতা ও সাংবাদিক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় সোনারঙ গ্রামের বিশারদ বংশীয়। চট্টগ্রামে জন্ম (১১ জানুয়ারি, ১৮৮১)। পিতা গুরুনাথ সেন। শিক্ষা হুগলির উত্তরপাড়া স্কুলে, কলিকাতার সিটি স্কুলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এম. এ. পড়িবার সময়ে বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রী সোনারঙ-এ সংগঠনকার্য শুরু। ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিনবিহারী দাস বন্দী হইলে অনুশীলন দলের নেতৃত্বগ্রহণ। ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী গ্রেফ্‌তার ও চট্টগ্রামের টেকনাফে আটক (১৯১৫)। মুক্তি পাইয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২০)।

অসহযোগী ছাত্রদের জন্য স্থাপিত গৌড়ীয় সর্ব-বিদ্যায়তনের পরিচালনা। পরবর্তীকালে আইন অমান্য আন্দোলনে (১৯৩০) এবং আগস্ট বিপ্লবে যোগদান করিয়া দীর্ঘদিন কারাভোগ।

ভারতে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাখনলালের অতুলনীয় দান আনন্দবাজার পত্রিকার নবপর্যায়ের গঠন। তাঁহার কর্মশক্তি, সংগঠনশক্তি ও আদর্শনিষ্ঠার ফলেই আনন্দ-বাজারের বিপুল প্রতিপত্তি। আনন্দবাজার হইতে চলিয়া গিয়া 'ভারত' নামক দৈনিক কাগজ প্রতিষ্ঠা। আগস্ট বিপ্লবের সময় এই পত্রিকার বিলোপ। মৃত্যু ১০ মে, ১৯৬৫ খ্রী।

কেশবলাল ঘোষ

মাগধী ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরভুক্ত প্রাকৃত উপভাষা। নাটকে ব্যবহৃত সাহিত্যিক প্রাকৃত হিসাবে ইহার বিশিষ্ট স্থান। ভরতের (খ্রী ৩০০) নাট্যশাস্ত্রে মাগধী

প্রাকৃত উল্লিখিত হইয়াছে অন্যতম প্রধান প্রাকৃতরূপে। প্রাচীনতম প্রাকৃত বৈয়াকরণ বররুচির (খৃ ৫০০) 'প্রাকৃত প্রকাশে' ইহার উল্লেখ আছে।

বিশুদ্ধ মাগধী প্রাকৃতে সংস্কৃত রচনা বহির্ভূত কোনও পৃথক সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন মেলে না। তবে প্রাচ্যের এই উপভাষার বিশুদ্ধ ও প্রাচীনতম নমুনা জোগীমারা গুহায় (ছোটনাগপুর) ব্রাহ্মীলিপিতে ক্ষোদিত তিন ছত্রের প্রত্নলিপি (খৃ পূ ২য় শতক)। প্রাচীনতম সাহিত্যিক নিদর্শন সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী সংলাপ এবং বৈয়াকরণ বা আলংকারিকদের মাগধী সম্পর্কীয় ক্বচিৎ উল্লেখ ও উদ্ধৃতি। সাহিত্যিক প্রয়োগের প্রথম নিদর্শন আছে অশ্বঘোষের নাটকে (খৃ ১ম শতক)। ভাসের (খৃ ২য় শতক) সংস্কৃত নাটকে শৌরসেনীর সঙ্গে মাগধীও প্রযুক্ত হইয়াছে। শূদ্রকের (৩য় শতক) 'মৃচ্ছকটিক'এ এবং কালিদাসের (৪র্থ-৫ম শতক) নাটকে মাগধীর প্রয়োগও সহজলভ্য। প্রাকৃত বৈয়াকরণগণ মাগধীর কয়েকটি বিভাষা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন—যথা, শাকারী, চাণ্ডালী, শাবরী ইত্যাদি। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে রাজশ্যালক শকারের ভাষা শাকারী। সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী অশিক্ষিত ইতরজনের ভাষা। মাগধী নামকরণ হইতেই বুঝা যায়, ইহা মূলতঃ মগধ বা দক্ষিণ বিহারের কথ্য-ভাষা। আধুনিক আর্যভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া এবং বিহারী (ভোজপুরী মগহী মৈথিলী) মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

ব্যাকরণগত বিচারে মাগধীর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি হইল—সংস্কৃত 'স্' 'ষ্'-ধ্বনির 'শ্'-ধ্বনিতে 'র্'-ধ্বনির 'ল্'-এ এবং পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের প্রথমার এক-বচনের 'অস্' 'অঃ' বিভক্তির 'এ'-ধ্বনিতে পরিণতি (যথা, সংস্কৃত 'পুরুষঃ', মাগধী 'পুলিশে')। ব্যাকরণগত অন্যান্য লক্ষণের দিক দিয়া ইহা মোটামুটি শৌরসেনী প্রাকৃতের অনুরূপ।

দ্র পরেশচন্দ্র মজুমদার ; সংস্কৃত ও প্রাকৃতভাষার ক্রম-বিকাশ, কলিকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ ; A. C. Woolner, *Introduction to Prakrit,* Lahore, 1939.

পরেশচন্দ্র মজুমদার

মাঘ কালিদাসোত্তর যুগের মহাকবিগণের অন্যতম। খৃ ৮ম-৯ম শতকের বামন ও আনন্দবর্ধনের পূর্ববর্তী। মাঘ বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতার নাম দত্তকসর্বাশ্রয় এবং পিতামহ বর্মলরাজের মন্ত্রী। মাঘের 'শিশুপালবধ' বিংশতি সর্গে রচিত। ইহা কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল বধের কাহিনী। ভারতীয় পণ্ডিতগণ ইহাতে উপমা, অর্থগৌরব ও পদ-লালিত্য এই ত্রিবিধ গুণের সমন্বয় দেখিয়াছেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঙ্গালোর ভারতের পশ্চিম উপকূলভাগে মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণ কানাড়া জেলায় অবস্থিত একটি ছোট বন্দর। মুসলমান আমলে ইহা ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ছিল। ১৪শ শতকে ইহার নাম ছিল 'মাঞ্জারুর'। বোম্বাই ও কোচিন এই দুইটি প্রধান বন্দরের মধ্যবর্তীস্থানে মাঙ্গালোরের অবস্থান। পরিপূরক বন্দর হিসাবে ইহার গুরুত্ব সর্মাধিক। মহীশূর রাজ্যের বাণিজ্য দ্রব্যাদি এই বন্দরের মাধ্যমে বোম্বাই অথবা কোচিন অভি-মুখে প্রেরিত হয়। নিকটবর্তী লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ, মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি স্থানের সহিতও বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। ইহা ব্যতীত উপকূলীয় বাণিজ্যেও স্থানটি যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিতেছে।

মারকারা, মহীশূর, বাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজের সহিত ইহা রাজপথ দ্বারা যুক্ত। পালঘাট গিরিবর্ত্ম ভেদ করিয়া দক্ষিণ রেলপথ ইহার সহিত মাদ্রাজের এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য স্থানের সংযোগ রক্ষা করে।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

মাছি ব্যাপকার্থে সন্ধিপদ পর্বভুক্ত (Phylum Arthropoda) পতঙ্গশ্রেণীর (Class Insecta) ডিপ্টেরা বর্গের (Order Diptera) নেমাটোসেরা উপ-বর্গস্থ (Suborder Nematocera) পতঙ্গ (**'মশা'** দ্র) বাদে অন্যান্যরা মাছি (মক্ষিকা) বা ফ্লাই (Fly) নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ইহারা ব্র্যাকিসেরা (Brachycera) ও সাইক্লোর্‌হ্যাফা (Cyclorrhapha) নামক উপ-বর্গদ্বয়ের অন্তর্গত। ইহাদের পূর্ণাঙ্গদেহে শুঁয়াজোড়া বুক অপেক্ষা ছোট, মাত্র তিন অংশে খণ্ডিত ও এরিস্ট্যা (Arista) নামক প্রশাখাযুক্ত। ডানা মাত্র একজোড়া ও পাতলা পর্দার ন্যায় এবং উহার পশ্চাতেই থাকে একজোড়া ক্ষুদ্রায়তনের ড্রাম-স্টিকের (Drum-stick) আকারযুক্ত হল্‌টেয়্যার (Haltere) যাহা উড্ডীয়মান মাছির ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। শূককীটের দেহ ভারী, খণ্ডিত কিন্তু মাথা ক্ষুদ্র বা অসম্পূর্ণভাবে পরিগঠিত এবং দাঁতজোড়া খাড়া-ভাবে ব্যবহৃত হয়। মূককীট প্রায় ক্ষেত্রেই গুটিবদ্ধ। পূর্ণাঙ্গের মুখাংশ লম্বাটে ও একত্রে শুঁড়ের আকারে থাকে। ব্র্যাকিসেরা ১৪টি মাছি-পরিবার ও প্রায় ১৫ই হাজার বর্ণিত মাছি-প্রজাতি লইয়া গঠিত এবং ইহাতে উল্লেখযোগ্য হইল 'হর্স্‌-ফ্লাই' বা 'ক্লেগ্'দের (Horse-fly/Cleg) ট্যাব্যানিডি পরিবার (Tabanidae family—যাহার স্ত্রীগণ রক্তপায়ী, 'সুরা' [Surra] নামক ঘোটক-ব্যাধির জীবাণুবাহী ও পশ্চিম আফ্রিকায় মানুষের ক্যাল্যাবার-স্ফোটক [Calabar-swelling] সৃষ্টিকারী 'লোয়া' [Loa] জীবাণুবাহী), র‍্যাগিওনিডি পরিবার (Rhagionidae family—যাহার স্ত্রীগণ রক্তপায়ী), 'রবার-ফ্লাই'দের (Robber fly) এসাইলিডি পরিবার (Asilidae family—যাহারা পতঙ্গভুক্) প্রভৃতি।

অপরপক্ষে, ৫০ হাজারেরও অধিক বর্ণিত-প্রজাতি সমন্বয়ে গঠিত ৫২টি মাছি-পরিবার সাইক্লোর‍্যাফার অন্তর্ভুক্ত। মাস্কিডি (Muscidae) ইহার একটি এবং মাস্কা (Musca) নামক মাছি-গণ (Fly genus) ও স্টমোক্সিস্ (Stomoxys), গ্লসিনা (Glossina), লাইপেরোসিয়া (Liperosia), হিমাটোরিয়া প্রভৃতি দংশক মাছি-গণ লইয়া গঠিত। পূর্ণাঙ্গ মাস্কা-মাছি ঈষৎ ধূসর, কালো বা নীল (ঔজ্জ্বল্যবিহীন) এবং শুঁয়াজোড়ার এরিস্টা পালকের ন্যায়। ইহারা তিনটি দলে (Group) বিভাজ্য—প্রথমটিতে আছে ডোমেস্টিকা বা *domestica* (নাতিশীতোষ্ণ-দেশীয়), **ভিসিনা** বা *vicina* (উষ্ণ-দেশীয়) প্রভৃতি প্রজাতি-নামের মাছি যাহাদের ঘর-বাড়ি, হাট-বাজার ইত্যাদিতে দেখা যায় এবং যদিও মানুষের যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (শর্করা-জাতীয় খাদ্যে আসক্তি বেশী) তথাপি কখনো কখনো ইহারা গবাদিপশুর ক্ষত-নিঃসৃত রক্তাংশ পান করিয়া থাকে। **ভেন্ট্রোসা** (*ventrosa*), **ক্র্যাগি** (*craggi*), **কন্ডুসেন্স্** (*conducens*) ইত্যাদি দ্বিতীয় দলের মাছি। ইহারা দংশন-ক্ষমতাহীন (যদিও ক্ষত-নিঃসৃত রক্ত ইহাদের খাদ্য), বিবিধ স্তন্যপায়ীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং প্রধানতঃ গোময়-স্তূপে ডিম পাড়ে। তৃতীয় দলে আছে **ইন্‌ফিরিয়র** (*inferior*) ও **ক্র্যাসিরস্ট্রিস্** (*crassirostris*) মাছি যাহারা স্তন্যপায়ীর রক্তপানে সমর্থ এবং কেবলমাত্র গোময়-স্তূপেই ডিম পাড়ে। এই তিনদলের মাছির মধ্যে ঘর-বাড়ি বা হাট-বাজারের মাছিই সাধারণতঃ আমাদের পরিচিত। ইহারা ময়লা-আবর্জনা, মল-মূত্র সম্পৃক্ত পচনশীল কোনরূপ জৈবদ্রব্যে ও মানুষ বা গবাদি পশুর দুষ্ট-ক্ষতে বা অনুরূপ স্থানে ডিম পাড়ে—এক এক দফায় ১০০-১৫০ হইতে মোট ৬০০-১০০০ পর্যন্ত এবং এই ডিম ফুটিতে ৮-১২ ঘণ্টার অধিক প্রয়োজন হয় না (২৫°-৩৫° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)। শূককীট-দেহ ভারী, খণ্ডিত, রোমহীন ও অঙ্কদেশে মাংসল পদজোড়া বর্তমান। ইহা দুইবার খোলস বদলায় এবং ৪/৫ দিনের শেষে মূককীট অবস্থা প্রাপ্ত হয় যাহা গুটিবদ্ধ থাকে এবং আরো ৪/৫ দিন পর পূর্ণাঙ্গ-মাছি ঐ গুটি কাটিয়া বাহিরে আসে। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ-মাছির রূপান্তর পরিবেশগত তাপমাত্রার হেরফেরে স্বল্পতম সময় ৫/৬ দিনের মধ্যেও হইতে পারে। তাপ-হ্রাসে এই সময় অবশ্যই দীর্ঘতর হয়। পূর্ণাঙ্গ মাছির আয়ুষ্কাল ১৫ দিন হইতে ২½ মাস। মাকড়সা, টিক্‌টিকি প্রভৃতি খাদকশত্রু ব্যতিরেকে হ্যাব্রোনেমা (Habronema), এলান্টোনেমা জাতীয় (Allantonema) কৃমি, স্টিগ্‌ম্যাটোমাইসিস্ জাতীয় (Stigmatomyces) ছত্রাক প্রভৃতিও উহার ক্ষতিকারক। চ্যাল্‌সিডয়েড্ জাতীয় (Chalcidoid) পতঙ্গ মাছির মূক-কীট-গুটির প্রধান শত্রু। গৃহস্থালীতে বা হাটে-বাজারে মাস্কা-মাছির অবস্থিতিই অশোভন ও বিরক্তিকর এবং ইহার রোমশ দেহ, অস্থির স্বভাব, অনবরত বমন ও মলত্যাগ ইত্যাদির জন্য ইহা মানুষের রোগ-বিস্তারে বিপজ্জনক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। ওলাউঠা, কলেরা, গ্রীষ্মজ বা শিশুর উদরাময়, আমাশয়, আন্ত্রিক কৃমিজনিত ব্যাধি, পলিওমায়েলিটিস (Poliomyelitis), কুষ্ঠ, তড়কা ইত্যাদি প্রায় কুড়িটিরও অধিক মনুষ্য-ব্যাধির জীবাণু-বাহী ইহারা হইতে পারে। অবশ্য এই সকল ব্যাধির একমাত্র বিস্তারী ইহারাই নয় এবং অধিকাংশতেই ইহারা যান্ত্রিক বাহীর সমতুল্য মাত্র। তবে এমনও দেখা যায় যে শূককীট-দশায় কোন জীবাণু ইহাদের দেহে প্রবেশ করিলে ইহার পূর্ণাঙ্গ-দশা ঐ জীবাণু অন্যত্র সঞ্চালন করিতে পারে। মাস্কা-মাছি নিয়ন্ত্রণ তাই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রচনায় অবশ্য কর্তব্য। পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও সুরক্ষণ, ময়লা-আবর্জনার যথাযথ অপসারণ (স্তূপের উপর ব্লিচিং পাউডার ব্যবহারে মাছির ডিম পাড়া বন্ধ হয়), গোবর-সার বা অনুরূপ পদার্থের সুরক্ষণ (যথার্থভাবে ঠাসিয়া রাখিলে স্তূপ-সঞ্জাত তাপমাত্রা মাছির অপরিণত দশার ঐ স্তূপে পরিপূর্ণতা লাভ বন্ধ রাখে), বাসভূমির আশে-পাশে মাছি-মারা-ফাঁদ (সোডিয়াম আর্সেনাইট ভালো বিষাক্ত পদার্থ এই বিষয়ে) ব্যবহারে পূর্ণাঙ্গ-মাছির বিনাশ, ডি. ডি. টি. (D.D.T.) ও গ্যামেক্সিন্ (Gammexane) ব্যবহার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গ।

মাস্কিডির অন্যান্যদের মধ্যে স্টমোক্সিস্ বা 'আস্তাবল-মাছি' (Stable-fly) অন্যতম। ইহার পূর্ণাঙ্গ-দশার শুঁড় তুলনামূলকভাবে শক্ত ও ক্ষতসৃষ্টিতে সমর্থ এবং দেহবর্ণ উজ্জ্বল-কালো। স্ত্রী বা পুং স্টমোক্সিস্ বিবিধ স্তন্যপায়ীর রক্তপান করে (ঘোড়া, গরু প্রভৃতিতে আসক্তি বেশী) এবং স্ত্রীগণ সাধারণতঃ ঘোড়ার বিষ্ঠাস্তূপে ডিম পাড়ে—একত্র ১২২টি এবং কোন একটি মাছি সম্পূর্ণ জীবনে এইরূপ ৬৩২টি ডিম দেয়। ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গা-বস্থা-প্রাপ্তি-সময় মাস্কা-মাছির অনুরূপ। ইহারা ঘোড়ার হ্যাব্রোনেমা, বিভিন্ন গৃহপালিত পশু, হরিণ ইত্যাদির সেটারিয়া (Setaria) ও কুক্কুটাদির হাইমেনোলেপিস্-জাতীয় (Hymenolepis) কৃমির বাহক। এতদ্ব্যতীত গবাদি পশুর গলদেশে ক্ষতসৃষ্টিকারী স্টেফানোফাইল্যারিয়া (Stephanofilaria) নামক কৃমির বাহকও ইহারা অনুমিত হয়।

আফ্রিকার গ্লসিনা (Glossina) বা সি-সি-মাছি (Tse tse fly) ভৌগোলিকভাবে ঐ দেশেই সীমিত হইলেও মানুষের ক্ষতিকারক সমস্ত রক্তপায়ী পতঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পতঙ্গ। ইহাদের চারিটি প্রজাতি মানুষের স্লিপিং-সিক্‌নেস্ (Sleeping-sickness) সৃষ্টি-কারী এককোষী ট্রাইপ্যানোসোম্-জীবাণুর (Trypanosome) বহন ও বিস্তার করে। অন্যান্য গ্লসিনা-প্রজাতি গৃহপালিত পশুতে 'নাগানা' (Nagana) ব্যাধি-সৃষ্টিকারী ট্রাইপ্যানোসোমের বাহন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পক্ষী,

সরীসৃপ এমনকি শামুক বা মথ-প্রজাপতির শূককীট-সমূহকেও আক্রমণ করে। পূর্ণাঙ্গ গ্লসিনা-র শুঁড় স্টমোক্সিস্-দের অনুরূপ, দংশন-ক্ষমতাসম্পন্ন। শুঁয়া-জোড়ার এরিস্ট্যা অনেক লম্বা, বক্র ও বহুধা-বিভক্ত রোম সম্বলিত। দিনের মধ্যভাগে ইহাদের কর্মতৎপরতা শীর্ষ-দেশে পৌঁছে। ইহারা মাটি হইতে ৬/৮ ফুটের অধিক উচ্চতায় ঘোরাফেরা করে না এবং নদী, হ্রদ ইত্যাদির তীরস্থ ঝোপ-ঝাড় ও বন-জঙ্গলের বাসিন্দা হইলেও রক্তের সন্ধানে উন্মুক্ত প্রান্তরে পর্যন্ত আসিয়া থাকে। স্ত্রী-সি-সি ডিম পাড়ে না, সরাসরি শূককীট ভূমিষ্ঠ হয় (একবারে ১টি এবং সম্পূর্ণ জীবনে ১২টি) যাহা এক-ঘণ্টার মধ্যেই মূককীটে রূপান্তরিত হয়। মূককীটের পূর্ণাঙ্গ দশায় রূপান্তর ১৯ দিনে সম্পন্ন হয়।

ম্যাস্কিডি ব্যতিরেকে সাইক্লোরহ্যাফা-উপবর্গস্থ নিম্নোক্ত মাছি পরিবারসমূহ উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ব্যাপ্তি সীমিত বা পৃথিবীজোড়া এবং মানুষের বা গবাদি পশুতে ডিপ্টেরা-শূককীট সৃষ্ট মায়াসিস্-ব্যাধির (Myiasis—দুষ্ট-ক্ষতজাতীয় ব্যাধি এবং মুখ্যতঃ তিনপ্রকার, যথা চর্মস্থ মায়াসিস্, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার মায়াসিস্ ও খাদ্যনালীর মায়াসিস্) মূলে ইহারাই। অন্যান্য তথ্যসহ এই পরিবার-সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে এইরূপঃ—

(১) ফোরিডি (Phoridae)—ক্ষুদ্রকায়, ধূসর-কৃষ্ণ বা আপীত মাছি; পূর্ণাঙ্গাবস্থা উইপোকার বাসায় থাকে।

(২) পাইপানকুলিডি (Pipunculidae)—ঘোর কৃষ্ণ-কায়; ফুল বা গুল্মাদিতে থাকে ও শূককীট একজাতীয় পতঙ্গে পরজীবীভাবে কাটায়।

(৩) ওটিডি (Ottidae)—কিয়দংশের শূককীট ফল-মূলাদিতে থাকে, অন্যথায় স্কারাবিড্-পতঙ্গের (Scara-beid) পরজীবী।

(৪) ট্রিপেটিডি (Trypetidae)—শূককীট ফলমূলা-দিতে থাকে ও অবস্থান-স্থান স্ফীত করিয়া তোলে; চল্তি নাম 'ফ্রুট-ফ্লাই' (Fruit-fly)।

(৫) এগ্রোমাইজিডি (Agromyzidae)—শূককীট উদ্ভিদ-দেহে ক্ষয়মূলক খোঁদল সৃষ্টি করে।

(৬) ড্রাইওমাইজিডি (Dryomyzidae)—কিয়দংশের শূককীট কোকিল পাখীর বাসায় থাকে ও শাবকদের রক্ত-পানে সমর্থ।

(৭) ড্রসোফিলিডি (Drosophilidae)—স্ফীতদেহী, ক্ষুদ্রকায় ও ফিকে লাল রংয়ের চক্ষুযুক্ত মাছি যাহা পচন-শীল জৈব-দ্রব্যাদিতে আকৃষ্ট হয়; বংশানুক্রম-বিজ্ঞান বা জেনেটিক্সের (Genetics) পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বহুল ব্যবহৃত।

(৮) এফিড্রিডি—ইহাদের কোন প্রজাতি ক্যালি-ফোর্নিয়াস্থ (যুক্তরাষ্ট্র) প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম-খনিতে শূক-কীট-দশা কাটায় ও এই হিসাবে একটি বিরাট জৈবিক বিস্ময় ও 'পেট্রোলিয়াম-ফ্লাই' (Petroleum-fly) নামে পরিচিত।

(৯) ক্লোরোপিডি (Chloropidae)—কিয়দংশের চল্তি নাম 'ফ্রিট্-ফ্লাই' (Frit-fly) যাহা শস্যাদির ক্ষতিসাধন করে।

(১০) গ্যাস্টেরোফাইলিডি (Gasterophilidae)—শূক-কীট ঘোড়া, গণ্ডার প্রভৃতি স্তন্যপায়ীর খাদ্যনালীতে বাস করে।

(১১) ইস্ট্রিডি (Oestridae)—চল্তি নাম 'ওয়ার্বল্' (Warble) বা 'বট্-ফ্লাই' (Bot-fly); শূককীট মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীতে নাসিকা বা গল-বিবরে ত্বকের নিম্ন-ভাগে বাস করে।

(১২) ক্যালিফোরিডি (Calliphoridae)—সংখ্যাধিক্যে, গুরুত্বে ও বৈচিত্র্যে ম্যাস্কিডির সহিত তুলনীয়; বিভিন্ন-ভাবে মানুষ ও গবাদিপশুর সম্যক্ ক্ষতিসাধনে সমর্থ ও তাই সর্বদেশে সুপরিচিত। ইহার বিবিধ প্রজাতি বিভিন্ন চল্তি নামে অভিহিত, যথা 'ব্লু-বটল্ ফ্লাই' (Blue-bottle fly) বা 'ব্লো-ফ্লাই' (Blow-fly), 'গ্রীন্-বটল্ ফ্লাই' (Green-bottle fly), স্ক্রু-ওয়ার্ম ফ্লাই' (Screw-worm fly), 'টুম্বু-ফ্লাই' (Tumbu-fly), 'ক্লাস্টার-ফ্লাই' (Clus-ter fly) ইত্যাদি।

(১৩) ট্যাকিনিডি (Tachinidae)—পূর্ণাঙ্গ-দশা ফুল-ফলের আশেপাশে থাকে কিন্তু শূককীট অন্যান্য পতঙ্গে পরজীবী।

(১৪) হিপ্পোবস্কিডি (Hippoboscidae)— 'ফরেস্ট্-ফ্লাই' (Forest-fly) 'স্পি-কেড্' (Spee Ked) 'লাউস-ফ্লাই' (Louse-fly) ইত্যাদি চল্তি নাম; পূর্ণাঙ্গাবস্থা পশু-পক্ষীর রক্ত পানে জীবনধারণ করে এবং কিয়দংশ উপযুক্ত শিকার লাভে সমর্থ হওয়ামাত্র স্বীয় পক্ষদ্বয় বর্জন করে ও সম্পূর্ণ পরজীবী-জীবন যাপন করে।

দ্র A. D. Imms, "*A General Textbook of Entomology including the Anatomy, Physio-logy, Development and Classification of in-sects*", London, Bombay, 1963; D. N. Roy and A. W. A. Brown, *Entomology* (*Medical and Veterinary*) *including Insecticides and Insect and Rat Control*", Calcutta, 1954; L. S. West, "*The Housefly, Its Natural History, Medical Importance, and Control*", London, 1951.

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

মাটি মৃত্তিকা দ্র।

মাণ্ডু বিন্ধ্যপর্বতমালার একটি প্রশাখার উপর অধিষ্ঠিত মাণ্ডু মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। খৃ ১৫-১৬ শতকে মালবের রাজধানী। ইহার চারিপাশে গভীর গিরিখাত। নাতিদূরে নর্মদা নদী।

হিন্দু রাজাদের আমলে মাণ্ডুর পত্তন। প্রাচীন নাম মণ্ডপিকা বা মণ্ডপ। প্রতীহার রাজত্বকালে প্রতাপগড় লেখে (৯৪৬ খ্রী) মণ্ডপিকার উল্লেখ আছে। পরমারদের রাজত্বকালে মণ্ডপ গুরুত্বপূর্ণ দুর্গরূপে বিবেচিত হইত। মুসলমান সুলতানদের আমলে ১৫ শতক হইতেই প্রকৃত-পক্ষে মাণ্ডুর প্রসিদ্ধি। ১৪০১ খ্রী ধারের তদানীন্তন শাসক দিলাওয়ার খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁহারই পুত্র হোসঙ্গ শাহ (১৪০৫-১৪৩৫ খ্রী) ধার হইতে মাণ্ডুতে মালবের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইনিই মাণ্ডু পাহাড়ের শীর্ষদেশ পরিবেষ্টন করিয়া ব্যাপক দুর্গ-প্রাকারের পত্তন করিয়া মাণ্ডুর সমৃদ্ধির সূচনা করেন। মালবের শেষ স্বাধীন সুলতান বজবাহাদুর গীতবাদ্যে পারদর্শিতা ও সুন্দরী রূপমতীর সহিত প্রেমের জন্য প্রসিদ্ধ।

শাদিয়াবাদ ('প্রমোদ-নিকেতন') নামে বিশ্রুত মাণ্ডু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। ইহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া জাহাঙ্গীর এখানে কয়েকমাস ছিলেন। এখানকার হিন্দু প্রত্নকীর্তির একটিও অক্ষত নাই। সৌধনির্মাণে সুলতানদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। বস্তুতঃ মুসলিম প্রত্নকীর্তিতে সমগ্র অধিত্যকাটি পরিকীর্ণ। যদিও বহু সৌধ অধুনা বিলুপ্ত, তথাপি এখনও অর্ধশত প্রত্নকীর্তি বিদ্যমান। তাহাদের বিশালতা ও কারুকার্য দর্শককে মুগ্ধ করে।

মাণ্ডুর দুর্গপ্রাকার, দুর্গতোরণ, প্রাসাদ, মসজিদ, সমাধি-সৌধ, মাদ্রাসা, সরাই প্রভৃতি মুসলিম স্থাপত্যের মালোয়া রীতির সাক্ষ্য দেয়। স্থাপত্যকৃতিগুলিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম পর্যায়ে হিন্দুমন্দির-সৌধাদি ধূলিসাৎ করিয়া সেইগুলির উপাদান সংযোগে বিনা পূর্বপ্রস্তুতিতে ইসলামীয় বাস্তুনক্সা ও প্রথা অনুসারে সৌধাদি নির্মাণ করা হইয়াছে। এই পর্যায়ের উদাহরণ হইতেছে দিলাওয়ার খাঁর মসজিদ (আনুমানিক ১৪০৫ খ্রী) ও মালিক মুঘীসের মসজিদ (১৪৫২ খ্রী)।

দ্বিতীয় পর্যায় মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ও উৎকর্ষের যুগ। এই পর্যায়ে মৌলিকতা, পরিমিতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধের স্বাক্ষর সর্বত্র। ইহার নিদর্শন হইতেছে ঃ (১) জামী মসজিদ—১৪৫৪ খ্রী ইহার নির্মাণকার্যের সমাপ্তি ; (২) আশরফি মহল—ইহার অন্তর্গত হইতেছে একটি মাদ্রাসার ধ্বংসাবশেষ, সুলতান মাহমুদ খলজীর (১৪৩৬-৬৯ খ্রী) সমাধি-সৌধ এবং চিতোরের রাণা কুম্ভের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের স্মৃতি-স্মারক মাহমুদের জয়-স্তম্ভ ; (৩) মর্মরপ্রস্তরে নির্মিত হোসঙ্গ শাহের সমাধি-সৌধ ; (৪) হিন্দোলা-মহল নামক দরবার-কক্ষ ; এবং (৫) মুঞ্জ ও কাপুর নামক তড়াগদ্বয়ের অন্তর্বর্তী জাহাজ-মহল নামে অভিহিত প্রাসাদ।

অপরিমিতিবোধে দুষ্ট ও স্থূল কল্পনাপ্রসূত সৌধাদি তৃতীয় পর্যায়ের স্থাপত্যের বিশিষ্টতাদ্যোতক। এই পর্যায়ের নির্মাণরীতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে প্রবর্তিত হইয়া ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং ইহাতে আরাম-বিলাস-আড়ম্বরবহুল জীবনযাত্রা প্রতিবিম্বিত। এই পর্যায়ের সৌধাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বজবাহাদুরের প্রাসাদ, রূপমতীর সৌধ, নীলকণ্ঠ প্রাসাদ ও চিশ্‌তি খাঁর অট্টালিকা।

মালোয়ার স্থপতিরা দিল্লীর রাজকীয় স্থাপত্য-রীতির বহুল অংশ গ্রহণ করিলেও অপূর্ব দক্ষতার সহিত ইহার সমন্বয় সাধন ও স্বীকরণ এবং তৎসঙ্গে স্বীয় মৌলধারা ও শিল্পচেতনার সংমিশ্রণ করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপত্য-শৈলী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

দ্র Percy Brown, *Indian Architecture, The Islamic Period,* Bombay, 1964; G. Yazdani, *Mandu, the City of Joy,* Oxford, 1929; D. R. Patil, *The Cultural Heritage of Madhya Bharat,* Gwalior, 1952.

দেবলা মিত্র

মাৎসিনি, জিউসেপ্পে (জোসেফ) (১৮০৫-১৮৭২) ইতালীয় ঐক্যের অন্যতম সৃষ্টিকর্তা, চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী। জেনোয়ায় জন্ম। অ্যাড্‌ভোকেট হইবার পর গুপ্ত সমিতি কার্বনারিতে যোগদান (১৮৩০) ও ধরা পড়িয়া নির্বাসন। ক্রমান্বয়ে ফ্রান্স, সুইট্‌জারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে আশ্রয়গ্রহণ। নির্বাসনের প্রথম দিকে মের্সেইতে 'যুব ইতালি' সমিতি গঠন। বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য কয়েক-বার কারাবরণ ; দুইবার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। ১৮৪৯ খ্রী. পোপ পলায়ন করিলে রোমে আসিয়া 'ট্রায়াম্‌ভিরেট' গঠন ; তাহার সভাপতি নির্বাচিত। ফরাসীদের কাছে পরাজিত হইয়া দেশত্যাগ। ইতালির স্বাধীনতা আন্দোলনে মাৎসিনির সহিত গারিবল্‌দির যোগদান (১৮৩৪ খ্রী); রোমে গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে (১৮৪৮ খ্রী) উভয়ের সহযোগিতা। গারিবল্‌-দির সামরিক অভিযানের ফলে ('গারিবল্‌দি দ্র') ভিক্টর এম্মানুয়েলের নৃপতিত্বে সমগ্র ইতালির ঐক্যসাধন। মাৎসিনি চাহিয়াছিলেন প্রজাতন্ত্র, তাই ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আদর্শোপলব্ধির চেষ্টা করিতে থাকেন। পিসায় মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ঃ *The Duties of Man* (১৮৫৮) ও তাঁহার চিঠিপত্র সমধিক বিখ্যাত।

দ্র Bolton King, *Life of Mazzini,* 1902.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মাতঙ্গিনী হাজরা গান্ধী বুড়ি (১৮৭০?-১৯৪২) জন্ম তমলুক থানার হোগলা গ্রামে। পিতা দরিদ্র কৃষক ঠাকুর-দাস মাইতি। নিরক্ষর মাতঙ্গিনী নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮ বৎসর বয়সে বিধবা হন। ১৯৩২ খ্রী আইন অমান্য

আন্দোলনে যোগ দেন এবং লবণ আইনের সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার। ওই বৎসরেই তমলুককে গভর্নরের দরবারকালে শোভাযাত্রা বাহির করায় জেল হয়। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের কালে বহুসহস্র কর্মী তমলুকের থানা দখল করিতে অগ্রসর হইলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও গুলি বর্ষণ করে। কর্মিগণ ছত্রভংগ হইতে থাকিলে জাতীয়পতাকা হস্তে অগ্রসর হইয়া সংগীদের উৎসাহিত করেন। তাঁহার দুই হাতই গুলিবিদ্ধ হয়; একটি গুলি কপালে লাগিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দ্র কমলা দাশগুপ্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলিকাতা, ১৩৭০ বংগাব্দ।

কমলা দাশগুপ্ত

মাতৃকা মাতৃকা শব্দে মাতা, বর্ণমালা, তান্ত্রিকচিত্রসমূহ এবং ব্রাহ্মী প্রভৃতি শক্তিদেবতাগণ বুঝায়। চালুক্য শিলালিপিতে মাতৃকার সংখ্যা সাত। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী ও চামুণ্ডার সহিত পরে চণ্ডিকার যোগ করিয়া অষ্টমাতৃকা। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে রক্তবীজবধকালে ইঁহারা আবির্ভূতা। ভট্টোৎপলমতে যমী, বারুণী, নারসিংহী ও বৈনায়কীও মাতৃকা। পুরাণান্তরে অন্ধকাসুরবধকালে শিবানুচরীরূপে মাতৃকার উৎপত্তি কথিত আছে। পুরাণভেদে সংখ্যায় ইঁহারা শতাধিক। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা প্রভৃতি শান্তি ও পুষ্টিদাত্রী ষোড়শ মাতৃকার উল্লেখ হেমাদ্রি করিয়াছেন। রূপমণ্ডনমতে মাতৃকার আদিতে বীরভদ্র এবং শেষে গণেশ থাকা বিধেয়। এইরূপ মাতৃকামূর্তি সাটনা, খিচিং, পুরী, যাজপুর, ভুবনেশ্বর, অট্টহাস, বিক্রমপুর ও রাজশাহীতে পাওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ তান্ত্রিকগ্রন্থে এবং নেপালী মণ্ডলচিত্রে দৃষ্ট গৌরী, চৌরী, বেতালী, ঘস্মরী প্রভৃতি অষ্টদেবীকে কেহ পরিবার-দেবতা কেহ বা অষ্টমাতৃকা বলেন।

পরবর্তীকালে ৬৪ যোগিনী বা আবরণ দেবতার মধ্যে মাতৃকার নামগুলি গৃহীত হইয়াছে।

কল্যাণী দত্ত

মাত্রা সংগীত ও ছন্দ দ্র।

মাথাভাংগা নদী নদিয়া জেলার একটি প্রধান নদী। ইহা গংগানদীরই শাখা। মাথাভাংগা গংগানদী হইতে (২৪°৪′ উ এবং ৮৮°৪৪′ পূ) বাহির হইয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্বমুখে প্রবাহিত এবং পরে কৃষ্ণনগর শহরের পূর্বভাগ পর্যন্ত আঁকাবাঁকা পথে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত। পূর্বে ব-দ্বীপের পূর্বভাগে নদীটি সমুদ্রে পতিত হইত কিন্তু পরবর্তীকালে নদীটি পথ পরিবর্তন করে। বর্তমানে ইহা ২০৭ কি. মি. পথ পরিক্রমার পর চাকদহের নিকট হুগলি নদীতে পতিত। গংগা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রথম ৬৪ কি. মি. ইহা হাউলী বা কুমার নামেই পরিচিত। মাথাভাংগার অপর একটি শাখা ইছামতী। বর্ষাকালে নদীটি বৃহৎ নৌবহনযোগ্য কিন্তু বৎসরের অন্যসময়ে নহে।

দ্র *Bengal District, Gazetteer, Nadia* Calcutta, 1910.

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মাদল শাস্ত্রানুসারে মৃদংগ, মুরজ এবং মর্দল একই জাতীয় বাদ্য। সংস্কৃত মর্দল বাংলা মাদল। সাধারণতঃ কাষ্ঠনির্মিত হয় কিন্তু মৃত্তিকাদ্বারাও নির্মিত হইত। বৈষ্ণবশাস্ত্র ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন যে আনদ্ধ বা চর্মবাদ্যের মধ্যে মৃদংগ আখ্যাযুক্ত মর্দলই শ্রেষ্ঠ। যন্ত্রের বাম ও দক্ষিণ মুখের পরিধি প্রায় সমান। দুইটি মুখই চামড়ায় ছাওয়া এবং দুইটি প্রান্তই চর্মসূত্র বা ছোট দিয়া টানা।

মধ্যযুগে ইহা রক্তচন্দন বা খদিরকাষ্ঠে নির্মিত হইত। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্য একবিংশতি অংগুলী, বামমুখ দ্বাদশ অংগুলী এবং দক্ষিণ মুখ ত্রয়োদশ অংগুলী দীর্ঘ হইত।

মৃদংগের বামমুখে গোলাকার কিরণ বা গাব লাগানো শাস্ত্রসম্মত রীতি; দক্ষিণ মুখেও এই প্রলেপের স্বল্প প্রয়োগের বিধান আছে। মৃদংগ কীর্তনের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে খোল বলা হয় এবং ইহা মৃত্তিকানির্মিত।

পাখোয়াজও সাধারণভাবে মৃদংগের অন্তর্ভুক্ত।

মাদল সাঁওতালদের প্রিয় বাদ্য। গ্রাম্য উৎসবাদিতে নানা আকৃতিতে ইহার ব্যবহার প্রচুর।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মাদুরা (মাদুরাই) দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির-নগরী। মাদুরা জেলার প্রধান শহর (৭৮°৮′ পূর্ব ৯°৫৫′ উত্তর) আয়তন ৮·৫৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪২৪৮১০ (১৯৬১ খৃ)।

এই শহরটির ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। সংগম রাজত্বকাল হইতে তামিল সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্ররূপে ইহা বহু রাজবংশের উত্থান-পতনের সাক্ষী। গ্রীক ও রোমানদের সহিত ইহার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

মাদুরার শাড়ি ভারতবিখ্যাত। পিতল, তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুশিল্প উচ্চস্তরের। নৃত্য ও গীত চর্চার জন্য শহরটি প্রসিদ্ধ। একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

মন্দিরনগরী মাদুরার প্রধান দ্রষ্টব্য মীনাক্ষীদেবীর মন্দির-অন্তর্ভুক্ত দুইটি দেবদেউল ও বহু কারুকার্যশোভিত স্থাপত্যসমূহ। দেবীর মন্দিরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ, চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর ও চারটি বৃহৎ গোপুরম। মীনাক্ষী ও সুন্দরেশ্বর দেবমন্দির হইতে প্রাকারে যাইবার দুইটি সুবৃহৎ দ্বার; মন্দির-চত্বরে তিনটি ছোট—মোট সাতটি গোপুরম। কথিত আছে পাণ্ড্য রাজকন্যা মীনাক্ষীদেবীর

সহিত মৃগরাকালে সুন্দরেশ্বর (শিব)-এর সাক্ষাৎ ও বিবাহ হয়। অষ্টশক্তিমণ্ডপে ইহা চিত্রিত আছে। মীনাক্ষীদেবী ও সুন্দরেশ্বর দেবের সুসজ্জিত মূর্তির আরতির সময় বিশিষ্ট দর্শন পাওয়া যায়। বিশালায়তন নানা মণ্ডপ, তাহাদের মূর্তিখচিত সুউচ্চ আলম্বস্তম্ভ, চিত্রশালা, দেবীর রত্নভাণ্ডার, স্বর্ণরথদ্বয়, নানা দেবদেবী ও সাধক মূর্তি, প্রদক্ষিণ-পথযুক্ত টেপ্পাকুলম বা পুষ্করিণী এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য। পূর্বদিকে বৃহৎ গোপুরমের নিকটে বসন্তমণ্ডপে নায়ক রাজাদের মূর্তি এবং মণ্ডপ নির্মাতা রাজা তিরুমলের সস্ত্রীক প্রতিকৃতি রক্ষিত। নিকটেই সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ যাহার প্রতিটি স্তম্ভ স্বতন্ত্র, এখানে সপ্তসুরস্তম্ভ বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যের অন্যতম। এই বিরাট মন্দির ষোড়শ শতাব্দীর নায়ক রাজাদের অবিস্মরণীয় কীর্তি এবং দক্ষিণী ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অতুলনীয় গৌরব। অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে নিকটস্থ তিরুমল নায়কের প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহর্ষ মল্লিক

মাদ্রাজ[২], তামিলনাড়ু ভারতের পূর্ব-উপকূলে সর্বদক্ষিণ রাজ্য। ৮°২′ উ-১৩°৫৩′উ, ৭৬°১৮′পূ-৮৪°২৪′ পূ। উত্তরে মহীশূর ও অন্ধ্র, পশ্চিমে কেরল, দক্ষিণে ভারতমহাসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে মান্নার উপসাগর ও পক্‌প্রণালী এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগর। সর্বদক্ষিণ প্রান্ত কন্যাকুমারী অন্তরীপ। সৈকতরেখা ১৮৫০ কি.মি. দীর্ঘ। আয়তন ১৩০০৬৯ বর্গ কি.মি.। ১২টি জেলায় বিভক্ত। জনসংখ্যাঃ (১৯৭১ খ্রী) ৪১১০৩১২৫; ঘনত্বঃ (১৯৭১ খ্রী) প্রতি বর্গ কি. মি. ৩৬১। শিক্ষিতের হার ৩৯·৩৯% পুরুষদের মধ্যে ৫১·৬৮% ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে ২৬·৮৩% (১৯৭১ খ্রী)। তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ঃ মাদ্রাজ, আন্নামালাই ও মাদুরাই। বিভিন্ন কলেজ ও গবেষণাগার ৩৫৮।

ভূমি সাধারণভাবে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ঢালু। প্রধান নদী কাবেরী মহীশূরের কুর্গ জেলায় পশ্চিমঘাট হইতে উত্থিত হইয়া করমণ্ডল উপকূলে একটি বড় বদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী— পালার, পান্নিয়ার, ভৈগাই ও তাম্রপর্ণী।

অতি পুরাতন আর্কিয়ান যুগে গঠিত পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্বত ও উত্তর প্রান্তে মহীশূরে মালভূমি অঞ্চলই রাজ্যের সর্বোচ্চ অংশ, সাধারণ উচ্চতা ১০০০ মি.। হিমালয় বহির্ভূত সমগ্র ভারতের উচ্চতম (২৮৯৪ মি.) স্থান নীলগিরি পাহাড়ের ডোড্ডাবেত্তা। আনাইমালাই ও কার্ডামম উত্তরের মূলে পশ্চিমঘাট ও নীলগিরি হইতে পালঘাট গিরিচ্ছেদ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই শৈলশিরাগুলির দক্ষিণপ্রান্তে কন্যাকুমারিকার সাগরতটে বালুকণায় থোরিয়াম পারমাণবিক খনিজের আকর কিছু ইলমেনাইট ও মোনাজাইট আছে। আনাইমালাই-এর পালনি পাহাড়ে শৈলাবাস কোডাইকনল (২১৩৫ মি.)। পশ্চিমের সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল গভীর অরণ্যে আচ্ছাদিত। বন্যপ্রাণী রক্ষণাঞ্চল মুদুমালাই আকর্ষণীয়। নীলগিরির শৈলাবাস ভারতের সর্বোচ্চ শহর উটকামণ্ড (২২৮৭ মি.)।

এখানকার মাটির জলধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত কম, কৃষিকার্যের বিশেষ অসুবিধা। কোয়েম্বাটুর জেলায় স্থানীয়ভাবে কিছুটা কৃষ্ণমৃত্তিকায় যথেষ্ট কার্পাস উৎপাদিত হয়। সালেম জেলায় শিবরয় ও মেলাগিরি পাহাড়ে যথেষ্ট আকরিক লৌহ ও চুণাপাথর পাওয়া যায়।

টার্শিয়ারি-পরবর্তী যুগে গঠিত পূর্ব উপকূলের কর্ণাট সমভূমি, উত্তর-দক্ষিণে সমগ্র পূর্ব উপকূল ব্যাপিয়া প্রায় ১৮০০ কি.মি. দীর্ঘ এবং গড়ে প্রায় ১০০ কি.মি. প্রস্থ। লোকবসতিও এখানে অনেক বেশি। এই অঞ্চলে কাবেরী নদীর বদ্বীপ। সমগ্র অঞ্চলে বৎসরে দুইবার, শীতের পূর্বে ও গ্রীষ্মের প্রারম্ভে বৃষ্টিপাত হয়।

এই সমভূমিতে সর্বপ্রধান ফসল ধান। কর্ণাট সমভূমির সর্বত্র সেচ-পুষ্করিণীগুলিতে অসংখ্য হাঁস পালিত হয় এবং প্রচুর ডিম উত্তর ভারতে পাঠান হয়। এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খনিজ দক্ষিণ আর্কট জেলায় নেইভেলিতে লিগনাইট কয়লা ও ত্রিচোনপল্লী জেলার জিপসাম। চিঙ্গলপেট জেলায় বেদান্থঙ্গলে দুইটি বন্যপক্ষী রক্ষণাঞ্চল আছে।

তামিলনাড়ু এক্ষণে একটি শিল্পোন্নত অঞ্চল। কোক কয়লার অভাব মুখ্যত জলবিদ্যুৎ-এর দ্বারা মিটাইতে হয়। প্রধান জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র উত্তর-পশ্চিমে পাইকারা/ময়ার ও মেট্টুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে পাপনাশম। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রধান শিল্পগুলি হইতেছে ঃ মাদ্রাজে— হিন্দুস্থান টেলিপ্রিণ্টার্স, সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টস প্ল্যাণ্ট ও মাদ্রাজ ফার্টিলাইজার্স; পেরাম্বুরে ইণ্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী; ত্রিচোনপল্লীতে হেভী বয়লার্স প্ল্যাণ্ট ও স্মল আর্মস ফ্যাক্টরী; উটকামণ্ডে হিন্দুস্থান ফটো ফিল্মস; আবাদীতে হেভী ভিহিক্‌ল্‌স্ (ট্যাঙ্ক) ফ্যাক্টরী; সালেমে স্টীল প্রজেক্টস ইত্যাদি। তাহা ভিন্ন বেসরকারি মালিকানায় বস্ত্রশিল্প, সিমেণ্ট, টায়ার, ট্র্যাক্টর, মোটরগাড়ি ইত্যাদি বহু শিল্প রহিয়াছে।

এখানকার তাঁতশিল্পসমৃদ্ধ কাঞ্চিপুরমের 'কঞ্জীবরম' শাড়ি সর্বভারতে জনপ্রিয়।

রাজ্যের প্রধান বন্দর মাদ্রাজ। উপকূল বাণিজ্যের বন্দর তুতিকোরিণ। রাজ্যের উপকূলের সমুদ্র সর্বত্র অগভীর, ফলে স্বাভাবিক বন্দর গঠনে সুবিধা হয় নাই। নদীগুলি নাব্য নয়, পরিবহণের জন্য প্রধানতঃ স্থলপথের উপর নির্ভর করিতে হয়। পাণ্ডিচেরীর নিকট হইতে 'বাকিংহ্যাম ক্যানাল' বা 'পূর্ব উপকূলীয় খাল' (৪১৫ কি.মি.) বঙ্গোপসাগর উপকূলের সমান্তরালভাবে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত গিয়াছে। অপর উল্লেখযোগ্য নাব্যপথ তাঞ্জোরের 'বেদারণ্যম-খাল'।

দক্ষিণ রেলপথ মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করিয়াছে। ভারতের দুইটি জাতীয় রাজপথ

কলিকাতা ও বোম্বাই হইতে আসিয়া মাদ্রাজে শেষ হইয়াছে।

রাজ্যের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যঃ চামড়া, তৈলবীজ, তেঁতুল, কফি, কাপড় ও তামাক; এবং প্রধান আমদানি দ্রব্যঃ কয়লা, খনিজ তৈল, কাগজ, তুলা, শিল্প ও রাসায়নিক দ্রব্য। কুটির ও কারুশিল্পের মধ্যে তিরুনেলভেলি জেলায় পট্টমাদাই-এর রেশমী মাদুর, কাঞ্চি-গাদুরাই-সালেমের কার্পাস ও রেশমবস্ত্র, তিরুনেলভেলি ও কুম্ভকোনমের কাঁসা ও পিতলের বাসন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানকার ছায়ানাট্য ও পুতুলনাচ এবং বিখ্যাত ভারত-নাট্যম নৃত্যনাট্যকলা উল্লেখযোগ্য।

জানুয়ারি মাসে শস্য কর্তন উপলক্ষে 'পোঙ্গল' উৎসব এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে শক্তিপূজা উপলক্ষে 'নবরাত্রি' জাতীয় উৎসব। শ্রীরঙ্গম, মাদুরাই ও কাঞ্চির রথযাত্রা এবং মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন ও মাইলাপুর-এ জলক্রীড়া উৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাদ্রাজের সন্নিকটে থিরু-কালীকুন্দ্রম-এ পক্ষীতীর্থ ভারতপ্রসিদ্ধ।

'উটকামন্ড', 'কোডইকনাল', 'টোডা', 'ত্রিচিনোপল্লী', 'নীল-গিরি', 'ভারতবর্ষ' দ্র।

দ্র Department of Tourism, Govt. of India, *Madras and Andhra Pradesh*, New Delhi, 1966; *India 1971-72*, New Delhi, Dec. 1971.

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

মাদ্রাজ[২] তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রধান এবং ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম নগর। আয়তন ১২৯ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা (১৯৭১ খৃ) ২৪৭০২৮৮; অবস্থান ১৩°৪′ উ, ৮০°১৫′ পূ। উত্তর-পূর্বে বঙ্গোপসাগর উপকূলে কৃত্রিম পোতাশ্রয় ও ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। গড় উত্তাপ জানুয়ারি ২৫° সে., জুন ৩৩° সে.; বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১২৭ সেমি, সর্বাধিক গড় বৃষ্টিপাত নভেম্বর, ৩৩ সেমি।

ইংরেজরা মাসুলিপতনম (১৬১১ খৃ) হইতে আসিয়া এখানে সেণ্ট জর্জ কেল্লা ও একটি কুঠি নির্মাণ করিয়া বসবাস করে। ১৬৮৮ খৃ পৌরসংস্থা গঠিত হয়। ১৮৩৬ মাদ্রাজ চেম্বার অফ কমার্স ও ১৮৫৭ মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠিত হয়।

দক্ষিণ হইতে নগর ক্রমশঃ উত্তরে ও পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছে। সমুদ্র উপকূলে সর্বদক্ষিণে প্রাচীন পর্তুগীজ উপনিবেশ অঞ্চল সান থোম। তদুত্তরে গান্ধীনগর নবগঠিত অঞ্চল সমন্বিত মাইলাপুর এবং জনবহুল প্রাচীন দেশী অঞ্চল ট্রিপ্লিকেন। সান থোমের পশ্চিমে আদিয়ার ইওরোপীয়দের বসবাস অঞ্চল ছিল, বর্তমানে এখানে রুক্মিণী দেবীর মার্গসংগীত ও নৃত্য শিক্ষালয় 'কলাক্ষেত্র' অবস্থিত। ফোর্ট অঞ্চলে সেণ্ট জর্জ কেল্লার মধ্যে ভারতে ইংরেজদের সর্বপ্রথম গির্জা 'সেণ্ট মেরী' (১৬৭৮-৮০ খৃ) অবস্থিত। আরও উত্তরে প্রাচীন জর্জ টাউন, নগরীর অফিস, ব্যাংক কাছারীগুলির অধিকাংশ এখানে অবস্থিত। জর্জ টাউনের পূর্বে মাদ্রাজের কৃত্রিম পোতাশ্রয় ও বন্দর।

উত্তর উপকণ্ঠে প্রাচীন রায়পুরম ও নবগঠিত ট্যান্ডি-য়ারপেট। জর্জ টাউনের পশ্চিমে কোচার্ন খালের অপরদিকে পিপলস্ পার্ক অঞ্চলে আছে শৌখিন মুর বাজার, ভিক্টো-রিয়া পাব্লিক হল, চিড়িয়াখানা, পৌরসংস্থার দপ্তর, রিপন বিল্ডিং ও ৩৫০০০ দর্শকের উপযুক্ত স্টেডিয়াম। আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে এগমোরের যাদুঘর ঐতিহাসিক সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত।

মাদ্রাজের চওড়া বেলাভূমি 'মেরিনা' আদিয়ার নদীমুখ হইতে বন্দর পর্যন্ত ১৩ কি.মি.। মেরিনায় মহিলাদের কুইন মেরীজ কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, চিপক প্রাসাদে সরকারি দপ্তরসমূহ, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও সেনেট হাউস, জলচর প্রাণীশালা ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বরফ কুঠি দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণ রেলপথের সদর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় চর্ম (Leather) গবেষণাগার মাদ্রাজে অবস্থিত। 'ভারতবর্ষ', 'মাদ্রাজ'[১] দ্র।

দ্র Department of Tourism, Govt. of India, *Madras and Andhra Pradesh*, New Delhi, 1966.

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

মাদ্রী মদ্ররাজকন্যা, শল্যের রূপবতী ভগিনী। ভীষ্ম স্বয়ং শল্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া এবং প্রচুর শুল্ক দান করিয়া কুরুরাজ পাণ্ডুর কনিষ্ঠা পত্নীরূপে ইঁহাকে গ্রহণ করেন।

কিমিন্দম মুনির অভিশাপে পাণ্ডুর পুত্রজন্ম ব্যাহত হইলে কুন্তীদত্ত মন্ত্রের সাহায্যে মাদ্রী অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইতে নকুল ও সহদেব নামে যমজপুত্র লাভ করেন। একদা আত্মবিস্মৃত পাণ্ডু ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে, ইনি রাজার অনুমৃতা হন।

কল্যাণী দত্ত

মাধব রাও পেশোয়া (চতুর্থ) পেশোয়া দ্র।

মাধবাচার্য ১৪শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের রাজা বুক্কের গুরু ও মন্ত্রী। পিতা মায়ণ, মাতা শ্রীমতী, ভ্রাতা বেদভাষ্য-কার সায়ণ ও কবি ভোগনাথ। বিদ্যাতীর্থ, ভারতীতীর্থ এবং শংকরানন্দ ইঁহারা মাধবের গুরু। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শৃঙ্গেরীমঠের অধ্যক্ষ ও বিদ্যারণ্যস্বামী নামে পরিচিত হন।

সায়ণভাষ্যে মাধবের অংশ থাকার জন্য উহা মাধবীয়-ভাষ্য নামেও খ্যাত। সর্বদর্শন সংগ্রহ, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, পঞ্চদশী, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ, স্মৃতি ও উপ-নিষদের টীকা, ধাতুবৃত্তি এবং শংকরবিজয় প্রভৃতি সমুদয় গ্রন্থকেই প্রাচীনেরা মাধবরচিত বলিয়া থাকেন।

কল্যাণী দত্ত

মাধবেন্দ্রপুরী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ। অদ্বৈত আচার্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্র, শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। শ্রীচৈতন্য প্রায়ই বলিতেন "ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার" (চৈতন্যভাগবত, ১।৬)। মাধবেন্দ্র ছিলেন ভাবের মানুষ। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন (৩।৪) যে মেঘ দেখিলেই নবজলধরশ্যামের কথা মনে পড়ায় তিনি মূর্ছিত হইতেন এবং কৃষ্ণনাম শুনিলেই আনন্দে হুংকার করিয়া উঠিতেন। তিনি সেকালের সন্ন্যাসীদের মত ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তীর্থভ্রমণকালে নিত্যানন্দপ্রভুর সহিত দেখা হয়। নিত্যানন্দ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন (চৈতন্যভাগবত ১।৬)। ইনি দীর্ঘকাল গোবর্ধনপাহাড়ের নিকট গোবিন্দকুণ্ডে ভজন করিলে শ্রীগোপালবিগ্রহ তাঁহার নিকট প্রকট হন (চৈতন্যচরিতামৃত, ১।৪)। গোপালের সেবার জন্য পুরী হইতে কর্পূর ও চন্দন আনিতে যান। ফিরিবার পথে রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথকে উহা সমর্পণ করিয়া তথায় অপ্রকট হন।

মাধবেন্দ্রপুরী কবিও ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি শ্লোক শ্রীরূপগোস্বামী পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকটি (৩৩০) শ্রীচৈতন্য আবৃত্তি করিতে খুব ভালবাসিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকটিকে রত্নগণের মধ্যে কৌস্তুভমণির ন্যায় কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।

দ্র শ্রীচৈতন্যভাগবত ; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ; সুশীলকুমার দে, সম্পাদিত, পদ্যাবলী, ঢাকা, ১৯৩৪।

বিমানবিহারী মজুমদার

মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শন দ্র।

মাধ্যাকর্ষণ অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ দ্র।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) খ্যাতনাম্নী মহিলা কবি, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম (২৩ জানুয়ারি, ১৮৬৩)। পিতা আনন্দমোহন দত্তচৌধুরী। বাল্যকালে পিতা, এবং বিবাহের (১৮৭৩) পর স্বামী, তাঁহাকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে 'পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা' নামে অমিত্রাক্ষর ছন্দে একটি বীররসাত্মক কবিতা রচনা করেন, ইহা 'সংবাদ প্রভাকরে' মুদ্রিত হয়। স্বামীর অকালমৃত্যুর পর প্রথম গদ্যপদ্য রচনা 'প্রিয় প্রসঙ্গ বা হারানো প্রণয়' (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—কাব্যকুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কনকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীরকুমারবধ কাব্য (১৯০৪) ইত্যাদি। বামাবোধিনী এবং অন্যান্য পত্রিকায় গদ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বর্ণপদক এবং ছোটগল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করেন। সাহিত্যকৃতির জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি (১৯১১), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক (১৯৩৯) ও জগত্তারিণী সুবর্ণপদক (১৯৪১) লাভ করেন। মৃত্যু ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৩ খৃ।

দ্র যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বঙ্গের মহিলাকবি, কলিকাতা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মানচিত্র মানচিত্র বলিতে সাধারণতঃ গোলাকার পৃথিবীকে কোনও সমতল ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সঠিকভাবে প্রকাশ করাকে বুঝায়। ইহাতে স্থান বিশেষের ভূ-প্রকৃতি ছাড়া রাজনৈতিক সীমারেখা, নদী, বনজ কৃষিজ খনিজ এবং শিল্পজ সম্পদ, পরিবহণব্যবস্থা, লোকবসতি প্রভৃতি বিষয় নানাপ্রকার স্বীকৃত রং ও চিহ্নদ্বারা চিত্রিত করা হয়।

প্রতি মানচিত্রের স্কেল বা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য আছে। এই স্কেল আনুপাতিক হারে দেখানো হয় এবং ইহা সাধারণতঃ পৃথিবীর ভূমি এবং মানচিত্রের ভূমির প্রত্যক্ষ অনুপাতের সমান। সাধারণতঃ এই স্কেল প্রতিরূপ-প্রদর্শক অনুপাত বা 'রিপ্রেসেন্টেটিভ ফ্র্যাক্শন' (আর. এফ) নিয়মে দেখানো হয়, যথা ১/১০০ অথবা ১ : ১০০। ইহাতে দুইদিকের মানই এক বলিয়া ধরা হয়। যেমন, মানচিত্রের ১ ইঞ্চি, ভূমির ১০০ ইঞ্চির বা মানচিত্রের ১ ফুট, ভূমির ১০০ ফুটের সমান হইবে।

স্থানবিবরণমূলক (টপোগ্রাফিক্যাল) এবং দেশব্যাপী জরিপসম্বন্ধীয় (ক্যাডাস্ট্রাল) মানচিত্রাবলী সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া নানাবিধ মানচিত্রাঙ্কনের তত্ত্বাবধানার্থে বহু প্রসিদ্ধ বে-সরকারী সমিতি আছে, যেমন, 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' (ওয়াশিংটন), 'দি ব্রিটিশ রয়াল জিওগ্রাফিক সোসাইটি' (লন্ডন), 'চন্ডীচরণ দাস অ্যান্ড কোম্পানি' (কলিকাতা), ইত্যাদি।

উপগোলক পৃথিবীকে মানচিত্রের সমতল ক্ষেত্রে অভিক্ষেপ করার দুইটি প্রধান প্রণালী হইল, শঙ্কব (কনিক্যাল) ও বেলন (সিলিণ্ড্রিক্যাল)। মেরু অঞ্চলের জন্য 'জিনিথ্যাল' অভিক্ষেপ প্রচলিত। কোনও মানচিত্রই আকার, আয়তন ও কৌণিক দূরত্বে যুগপৎ সঠিকভাবে আঁকা সম্ভব নয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন অভিক্ষেপ ব্যবহৃত হয়, যথা, সমক্ষেত্র (ইকোয়াল এরিয়া), লম্ব (অর্থোগ্রাফিক্যাল) ইত্যাদি।

ব্যাবিলন, মিশর ও গ্রীসে সুপ্রাচীন কাল হইতে মানচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা দেখা যায়। ১৫০ খৃ গ্রীক-মিশরীয় টলেমীর ভূগোল পুস্তকে সমান্তরাল ও দেশান্তর রেখার প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁহার প্রভাব মধ্যযুগীয় মুসলমান মানচিত্রকরদের উপর বিশেষভাবে লক্ষিত হয় এবং নবজাগরণের কালে ইওরোপে তাঁহার রীতি অনুসৃত হয়। ১৫৬৯ খৃ মারকেটর-এর মানচিত্র প্রকাশিত হইবার পর

হইতে প্রকৃত মানচিত্র অংকনের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। বিজ্ঞানের ও কারিগরী বিদ্যার অগ্রগতি, নব ভৌগোলিক অভিযান ও বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সঠিক মানচিত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং নানা মানচিত্রের প্রচলন হইতে থাকে। এখন আকাশ হইতে ক্যামেরাতে তোলা ছবি জরিপ ও মানচিত্রাংকন বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে।

১৭৭৪ খ্রী ফ্রান্সে প্রথম সরকারি সংস্থার দ্বারা জরিপ ও মানচিত্র প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইংল্যান্ডে (১৭৮৪) এবং অন্যান্য দেশেও অনুরূপ সংস্থা গঠিত হয়। ১৮৯১ খ্রী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সমস্ত দেশগুলির একই স্কেলে (১:১০০০০০০) মানচিত্র প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯১৩ খ্রী অপর এক সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ শুরু করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এখনও এ বিষয়ে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই।

ভারতীয় জরিপ সংস্থা (Survey of India) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৃষ্ট হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ল্যাম্বটনই (Lambton) ভারতে বিজ্ঞানসম্মত জরিপের কার্য আরম্ভ করেন বলা যায়।

১৮৪৭ খ্রী হইতে ১৮৮৩ খ্রী পর্যন্ত স্থানে স্থানে জরিপ কার্য চালানো হয় এবং ঐ স্থানসমূহের সাধারণতঃ ১″=১ মাইল স্কেলে এক নতুন মানচিত্রাবলীর অনুক্রমের সূচনা হয়। ১৮৮৩ খ্রী হইতে কোনও স্থানের বিবরণমূলক মানচিত্রাবলী ১″ বা তদপেক্ষা বৃহত্তর স্কেলে অঙ্কিত হইতেছে। এই সকল মানচিত্রাদিতে ১৫ মিনিট পরিমাণ অক্ষাংশ এবং ৩০ মিনিট পরিমাণ দ্রাঘিমাংশ প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ক্রমিক সংখ্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের রঙীন মানচিত্রাবলী প্রস্তুতির জন্য এক বিধিবদ্ধ নীতি গ্রহণ করা হয়। মাদ্রাজের দ্রাঘিমা রেখাকে সমগ্র ভারতের মূল মধ্যরেখা হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এই দ্রাঘিমা রেখাটি ৮০°১৪′৫৪″ গ্রীনিচের পূর্বে অবস্থিত এবং ইহা পূর্বেকার মানচিত্রাদি হইতে ০°২′২৭·১৮″ কম।

ভারতীয় জরিপ সংস্থার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন শাখা আছে। ইহাদের প্রধান কার্যালয় দেরাদুনে অবস্থিত। বর্তমান জাতীয় মানচিত্র সংস্থা (National Atlas Organisation) বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠান হইতে বৈজ্ঞানিক-বিধিসম্মত মানচিত্রাবলী প্রকাশিত হইতেছে।

দেবব্রত মারিক

মানববিদ্যা নৃতত্ত্ব দ্র

মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪) ভারতীয় বিপ্লবী, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা ও শেষ জীবনে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট'। আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পিতা দীনবন্ধু ভট্টাচার্য। কৈশোর অতিবাহিত চাংড়িপোতায়। জাতীয়তাবাদ ও ভারতের মুক্তিসাধনায় দীক্ষা শিবনারায়ণ স্বামীর নিকট। বন্ধুগণসহ চাংড়িপোতায় একটি বিপ্লবী কেন্দ্র ('চাংড়িপোতা গ্রুপ') স্থাপন করেন। অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন (১৯০৫)। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯১০-১১) ধৃত। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুগান্তর দল গঠনে নরেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯১৫ খ্রী গার্ডেন রীচ মোটর ডাকাতি সাধন।

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ খ্রী রাসবিহারী বসুর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার সহিত লিপ্ত। 'মাভেরিক' জাহাজে ভারতে জার্মান অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ ব্যাপারে ১৯১৫ খ্রী 'সি. মার্টিন' নামে দুইবার বাটাভিয়ায় যান ('বিপ্লব আন্দোলন' দ্র)।

১৯১৬ খ্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উপনীত হন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম নেন। ইভ্লিন ট্রেন্টকে বিবাহ ও কমিউনিস্ট জীবনের শুরু। ১৯১৭ খ্রী যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার এবং মেক্সিকোয় পলায়ন। মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৯ খ্রী ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটির সংস্রবে আসেন। ১৯২০ খ্রী মস্কোতে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে অংশগ্রহণ। ঐ কংগ্রেসে উপনিবেশ সম্বন্ধে লেনিনের থিসিসের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের একটি সংযোজক থিসিস গৃহীত। কমিন্টার্ন-এর কার্যকরী সমিতি (E.C.C.I.) ও প্রেসিডিয়াম-এর সভ্য নির্বাচিত। ঐ বৎসর তাশখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাতজন সভ্যের অন্যতম। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের পরিচালনায় তাঁহার অগ্রণী ভূমিকা। ১৯২৭ খ্রী চীনবিপ্লবের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কমিন্টার্ন-এর তরফে চীনে যান। ১৯২৮ খ্রী কমিন্টার্ন-এর ষষ্ঠ কংগ্রেসে তাঁহার অনুপস্থিতিতে 'ডিকলোনাইজেশন থিসিস'-এর জন্য নিন্দিত ও কমিন্টার্ন হইতে বিতাড়িত।

ভারতে প্রত্যাবর্তন ও ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ খ্রী পর্যন্ত কারাবাস। তখনও তাঁহার দল নিজদিগকে 'প্রকৃত কমিউনিস্ট' বলিয়া প্রচার করিত। (১৯৩৭ খ্রী) এলেন রায়কে বিবাহ। ঐ বৎসর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 'লীগ অফ র‍্যাডিকাল কংগ্রেসমেন' গঠন। কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির ও কমিউনিস্ট জীবনের অবসান। ১৯৪০ খ্রী কংগ্রেস সভাপতি পদের প্রার্থী হইয়া পরাজিত এবং র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টির স্থাপন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে 'নিউ হিউম্যানিজম' বা 'নব মানবিকতাবাদ' নামে তত্ত্ব প্রচার। ইহার মূলসূত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সমবায়ী উৎপাদন, রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ণ, গ্রামে মহল্লায় কারখানায় আঞ্চলিক জন-

সমিতির ভিত্তিতে লোকায়ত গণতন্ত্র, ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক দল ও তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিলোপসাধন।

তাঁহার প্রধান রচনা : *India in Transition* (১৯২২); *Revolution and Counter-revolution in China* (১৯৪৬); *New Humanism* (১৯৪৭); *Reason, Romanticism and Revolution*, 2 Vols. (১৯৪৯); *My Memoirs* (১৯৬৪)।

দ্র স্বদেশ বসু, বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ, কলিকাতা; Samaren Roy, *The Restless Brahmin*, Calcutta, 1970.

মানমন্দির জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্যসংগ্রহের জন্য রচিত সৌধ। ব্যাবিলনীয় ও প্রাচীন চীন সভ্যতায় অস্তিত্ব ছিল। উচ্চস্থান হইতে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি দর্শন এবং সেই পর্যবেক্ষণ-লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সাধারণ জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত। এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য আলেকজান্দ্রিয়া (খ্রী. পূ. ২য় শতক) ও সমরখন্দের মানমন্দির (খ্রী. ১৫ শতক); ডেনমার্কে টাইকো ব্রাহের মানমন্দির (১৫৭৬ খ্রী) কিছু পরিমাণে বর্তমান ধাঁচের। পর পর্যায়ে দূরবীন আবিষ্কার ও সমুদ্রযাত্রা বৃদ্ধি হেতু প্রয়োজনীয়তা ও সংগ্রহ-বিষয়ের বৃদ্ধি ও নানা রাজ্যে স্থাপিত। ইংল্যান্ডের গ্রীনিচ অবজারভেটরি (১৬৭৫ খ্রী) এই সময়কার। পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিলে উন্নত ধরনের সুবৃহৎ দূরবীন ও নানা উচ্চস্তরের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ যন্ত্র, ক্যামেরা, স্পেকট্রোগ্রাফ ইত্যাদি লইয়া নানাদেশে মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট উইলসন (১৯১৮) ও মাউন্ট পালোমার (১৯৪৯) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেডিও বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অধিবৃত্ত আকারের রেডিও দূরবীন নভোমণ্ডলের অতি দূরবর্তী অঞ্চল নিরীক্ষণের জন্য নানাস্থানে স্থাপিত হয়; তন্মধ্যে ইংল্যান্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কের সুবৃহৎ দূরবীনই (১৯৫৭) প্রসিদ্ধ।

ভারতে প্রাচীনকালে গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণরীতি থাকিলেও কোনও মানমন্দির এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মধ্যযুগে 'যন্তর মন্তর' উজ্জয়িনী, জয়পুর, কাশী ও দিল্লীতে ছিল। বর্তমানে কোডইকন্যাল ও উটকামণ্ডের (রেডিও) মানমন্দির সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

মানস নদী আসাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি নদী। ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল হইতে নির্গত হইয়া কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলাদ্বয়ের সীমানা এলাকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার পর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। দৈর্ঘ্য ৩১২ কি.মি.। নদীটি ঘন ঘন উহার পথ পরিবর্তন করে। নদীটির অধিকাংশই গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত। নদীটি চাউলখোয়ার সহিত মিলিত হওয়ার পরই নিম্নাংশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। তীরভূমি ঘন জঙ্গলে অবস্থিত। এই নদী উপত্যকার কিয়দংশে বন্য পশু সংরক্ষণের জন্য উদ্যান নির্মিত হইয়াছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মানস সরোবর হিমালয়ের উত্তর গাত্রে অবস্থিত একটি পবিত্র হ্রদ (৩০°৮′ উ ও ৮১°৫৩′ পূ) ও তীর্থস্থান। ইহা তিব্বতের দক্ষিণে ৪৪৮৫ মি. উচ্চে, কৈলাস ও জাসকর পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। সরোবরের উত্তরে সিন্ধু, পশ্চিমে শতদ্রু, দক্ষিণে কর্নালী, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। আয়তন ৫০০ বর্গ কি.মি.। গভীরতা ৯০ মি.। মানসসরোবর ও নিকটবর্তী রাক্ষসতাল-এর জল স্বাদু; নিকটস্থ ছোট হ্রদগুলির জল লবণাক্ত। মানস সরোবরের তীরে তিব্বতী বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির অবস্থিত।

মানস সরোবর যাইবার অনেক পথ আছে। তন্মধ্যে আলমোড়া-ধারচুলা-লিপুলেক গিরিবর্ত্ম-তাকলাকোট-মানস সরোবর পথটি সহজ ছিল। দূরত্ব ৩৩৪ কি.মি.। বর্তমানে ভারতসীমার পর পথটি বন্ধ।

নিতাই রায়

মানসিংহ অম্বররাজ ভগবানদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র মানসিংহ। সুদক্ষ সেনাপতি ও প্রতিভাবান্ রাজনীতিবিদ্ এবং মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক হাজারী (সর্বোচ্চ) মনসবদার পদে অধিষ্ঠিত। মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহকে পরাজিত করেন। বাংলা ও বিহারে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার কীর্তি।

ভগবানদাসের মৃত্যুর পর মানসিংহ অম্বরের রাজা হন (১৫৯০) দাক্ষিণাত্যে ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবনাবসান।

কুমুদরঞ্জন দাস

মানসিক রোগ, মানসিক চিকিৎসা মানসিক ব্যাধির মাপকাঠি সাধারণতঃ আচারব্যবহারে অনাকাঙ্ক্ষণীয় বৈকল্য এবং প্রতীকের প্রতিষ্ঠা ও জীবনসমস্যার সমাধানে যুক্তির বদলে উদ্বায়ু মনোব্যবহারের পরিমাণ। ভারতীয় চরকসংহিতায় এবং গ্রীসের হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাশাস্ত্রে কয়েকপ্রকার মনোরোগের বিবরণ আছে। মনোরোগের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ : মনস্তত্ত্বভিত্তিক, শারীরবিদ্যাভিত্তিক, কারণভিত্তিক, লক্ষণভিত্তিক (প্রথম প্রবর্তক ক্রেপ্লিন)। জাতিসংঘের লক্ষণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগই বর্তমানে অনুসৃত। মনোবিকারগুলি সংক্ষেপে এইরূপ। ক. সাইকোসিস—১. বার্ধক্য বা প্রাক্‌বার্ধক্যজনিত; ২. সুরাজনিত; ৩. করোটির অভ্যন্তরে বীজাণুজনিত; ৪. মস্তিষ্কসংশ্লিষ্ট; ৫. দৈহিক অবস্থানসংশ্লিষ্ট; ৬. সিজোফ্রেনিয়া (চিন্তা, অনুভূতি ও কর্মের সঙ্গতি থাকে না); ৭. আবেগসম্পর্কিত, যেমন, ক্ষিপ্ততা, বিষাদক্ষিপ্ততাচক্র ইত্যাদি; ৮.

ভ্রমবাতুলতা (প্যারানোইয়া) ; ৯. অবিশিষ্টিত। খ. উম্বায়ুরোগ—১. হিস্টিরিয়া, উদ্বেগবিকার, আবেশ-বিকার ; ২. ব্যক্তিত্ববিকার ; ৩. যৌনবিকার ; ৪. সুরা-জনিত; ৫. ভেষজে আসক্তি (নেশা); ৬. মনোজাত (সম্ভবতঃ) দেহবিকার ; ৭. পারিপার্শ্বিকজনিত (ক্ষণ-স্থায়ী) ; ৮. শৈশবের অস্বাভাবিক আচারব্যবহার ; ৯. দৈহিক অসুস্থতাসংশ্লিষ্ট; ১০. অবিশিষ্টিত। গ. মানসিক জড়তা—১. মৃদু হইতে অত্যন্ত কঠিন পাঁচপ্রকার ; ২. অবিশিষ্টিত।

চিকিৎসা ঃ প্রধানতঃ দুইভাবে হয়। ক. মানসিক চিকিৎসা—চিকিৎসকের সংগে রোগীর ঘনিষ্ঠ আলোচনা, রোগীদের নিজেদের ভিতর পারস্পরিক আলোচনা ইত্যাদি নানা উপায়ে রোগীর মানসিক গঠন ও অভ্যাসের পরি-বর্তনের চেষ্টা ('মনঃসমীক্ষণ, মনঃসমীক্ষা' দ্র)। খ. ভৌত চিকিৎসা—১. উত্তেজক ও প্রশান্তিদায়ক রাসায়নিক প্রয়োগ, যেমন, বারবিটিউরিক অম্লের লবণ, ক্লোরোপ্রোমা-জিন, ট্রাইফ্লুপেরাজিন ইত্যাদি এবং বিষাদনাশক ভেষজ (tranquilisers and anti-depressants); ২. মৃগীর মত আক্ষেপসৃষ্টির জন্য ঔষধপ্রয়োগ (কর্পূর, কার্ডিয়ো-জোল, ট্রাইয়াজোল, পিক্রোটক্সিন প্রভৃতি ফেনোথিয়াজিন-ঘটিত ভেষজ ইত্যাদি) বর্তমানে বৈদ্যুতিক আক্ষেপই চিকিৎসকেরা পছন্দ করেন ('ইলেকট্রো-কনভালসন থেরাপী')। ৩. শল্য চিকিৎসা—এই চিকিৎসায় মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের কয়েকটি তন্তু কাটিয়া দেওয়া হয় ('প্রিফ্রন্ট্যাল লিউকোটমি')। অন্যান্য শল্যচিকিৎসাও আছে। ৪. অবিরাম নিদ্রা চিকিৎসা ; ৫. পরিবর্তিত ইনসুলিন চিকিৎসা ; ৬. ইনসুলিন দিয়া নিদ্রা ও অসুস্থতা সৃষ্টি ; ৭. পথ্য, খাদ্যপ্রাণ ও হরমোন প্রয়োগ।

দ্র William Sargent and Eliot Slater, *An Introduction to Physical Methods in Psychiatry*, London, 1969.

শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত

মানিকচাঁদের গান নাথসাহিত্য দ্র

মানিকপীর বাংলাদেশের বহু পল্লীতে লৌকিক দেবতার মর্যাদায় হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক পূজিত। ভক্তদের বিশ্বাস ইনি গৃহপালিত পশুপক্ষীদের রক্ষক এবং রোগনিরাময়-কারী। ইঁহার পূজা বা হাজোতের স্থায়ী থান বা দরগা দুই-এক পল্লীতে আছে। পরিচালক মুসলমান ফকির। মানিকপীরের মূর্তি ফকিরদের অনুরূপ। মূর্তি অপেক্ষা প্রতীক-সমাধিস্তূপ অধিক পূজিত।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) প্রখ্যাত ঔপ-ন্যাসিক ও গল্পলেখক। জন্ম (২৯ মে, ১৯০৮) দুমকা শহরে ; মৃত্যু (৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৬) কলিকাতায়। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকৃত নাম প্রবোধকুমার। কলি-কাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি. পড়িবার সময় লেখা শুরু। 'বিচিত্রা'-য় (পৌষ, ১৩৩৫) প্রথম রচনা 'অতসী মামী' প্রকাশিত। গল্প ও উপন্যাসে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বর্তমান। জীবনের প্রথম পর্বে লেখক ফ্রয়েডতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদ গ্রহণ করেন।

রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫), 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫), 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭), 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' (১৯৩৮) 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮), 'সরীসৃপ' (১৯৩৯), 'সহরতলী' (১৯৪০), 'প্রতিবিম্ব' (১৯৪৩), 'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮), 'হরফ' (১৯৫৫) এবং 'মাশুল' (১৯৫৬)।

দ্র সরোজমোহন মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

বাংলাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ছোটগল্পকাররূপে। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার বিচিত্রায় 'অতসী মামী' গল্পটি প্রকাশিত হইলেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। 'দিবারাত্রির কাব্য' (বঙ্গশ্রী, ১৩৪৬) তাঁহার প্রথম উপন্যাস। পরবর্তী অন্যান্য উৎকৃষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপন্যাস তিনি লিখিলেও তাঁহার প্রথম উপন্যাসের প্রসিদ্ধি আজও অক্ষুণ্ণ। উপন্যাস এবং গল্প—দুয়েতেই তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল।

শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকদের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক নূতন ধরনের বাস্তবতার প্রবর্তন করেন। মানুষের অবদমিত যৌনকামনার নানা প্রকাশ তাহার আচরণে। এই আচরণকে কোনও রূপে নৈতিক মানে বিচার না করিয়া বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার সহিত শিল্প-রূপময় করিয়া তোলাতেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনবত্ব। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে তিনিই যথার্থ জীবনবোধের সংগে যুক্ত করিয়া বাঙালী দরিদ্র, মধ্যবিত্ত এবং ধনী সমাজের নানা পরিপ্রেক্ষিকায় রূপদান করিয়াছেন। এই কারণে মানিকের উপন্যাস বাস্তবধর্মী হইলেও সাময়িকতা দ্বারা খণ্ডিত নয়। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার ভিতর দিয়াই একটি অমোঘ রহস্যময় নিয়তির আভাস তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষার সাঙ্কেতিকতা তাঁহার সৃষ্টিকে শিল্পসাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। ক্রমে তিনি বাস্তববাদের দ্বিতীয় সত্যটিকেও উপন্যাসে আঁকিয়া তুলিলেন। যৌনক্ষুধার সহিত উদর-পূরণের সমস্যাও মানুষের আচরণের নিয়ামক। এই দুয়ের নেপথ্যে ভূমিকা দ্বারা তিনি রচনা করিলেন তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি'।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সৃষ্টিকে দুইটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে কল্লোলের উত্তরাধিকার লইয়া তিনি মানবচৈতন্যের গভীর তলদেশে বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছেন। সমাজ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা নাগরিক জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করিয়াছে, তাহারই নিপুণ চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন দ্বিতীয় পর্যায়ে। ইহারই পরিমাণস্বরূপ অর্থনৈতিক বাস্তবতাবোধ মানিককে সাম্যবাদী চেতনায় লইয়া গিয়াছিল।

ভবতোষ দত্ত

মানুচী (১৬৩৯-১৭১৭) নিক্কোলাও মানুচী ভেনিসের অধিবাসী। ১৬৫৬ খৃ সুরাটে আসেন ও পরে দিল্লী যান। বিচিত্র জীবনে তিনি দারার ও জয়সিংহের গোলন্দাজ-বাহিনীর অধ্যক্ষ, বাংলাদেশে ও লাহোরে চিকিৎসক, গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার দূত, শিবাজীপুত্র শম্ভুজীর সহিত সাক্ষাৎকারী, মাদ্রাজের গভর্নর জিফোর্ডের বৈদেশিক পত্রের লেখক প্রভৃতি নানা রূপে কাজ করেন ও অর্ধশতাব্দীর অধিক বিচ্ছিন্নভাবে মুঘল রাজদরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মানুচীর বিবরণ বা 'স্টোরিয়া ডো মোগর' ইতালীয়, পর্তুগীজ ও ফরাসী এই তিন ভাষায় লিখিত। ইহাতে মুঘল সম্রাটগণের বিবরণ, বিশেষভাবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের কথা, মুঘল দরবার ও রাজত্বের বর্ণনা, হিন্দু-ধর্ম ও ইওরোপীয় কোম্পানিসমূহের বিবরণ আছে। মানুচীর অনুবাদক আরভিনের মতে অবিশ্বাস্য ঘটনাদিতে পূর্ণ হইলেও মানুচীর লেখাকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

দ্র N. Manucci, *Storia do Mogor*, Tr. William Irvine. Vols, I-IV, Calcutta, 1965.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মান্ধাতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজচক্রবর্তী। যজ্ঞদীক্ষিত পুত্রার্থী যুবনাশ্ব মধ্যরাত্রে তৃষ্ণাতুর হইয়া পত্নীর নিমিত্ত রক্ষিত মন্ত্রপূত জল ভ্রমক্রমে পান করিবার পর গর্ভ ধারণ করেন। রাজার কুক্ষিভেদ করিয়া পুত্রের জন্ম হইলে ইন্দ্র আসিয়া 'মাম্ অয়ং ধাস্যতি'—এই বলিয়া জাতকের মুখে অমৃতবর্ষিণী অঙ্গুলি প্রদান করেন।

মান্ধাতা (মাম্ + ধাতা) উত্তরকালে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে রাবণ তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পত্নী শশবিন্দু-কন্যা বিন্দুমতী। পুত্রগণ পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ। ঋষি সৌভরি তাঁহার পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করেন। লবণাসুরের হস্তে মান্ধাতার মৃত্যু ঘটে।

দ্র বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ খণ্ড।

কল্যাণী দত্ত

মান্নার উপসাগর ভারতবর্ষ এবং সিংহলের মধ্যে মান্নার উপসাগর অবস্থিত। ইহার পূর্বে সিংহলদ্বীপ, পশ্চিমে মাদ্রাজ উপকূল, উত্তরভাগে অপ্রশস্ত সেতুবন্ধ ('অ্যাডাম্স্ ব্রিজ') এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। সেতুবন্ধ দ্বারা ইহা পক-প্রণালী এবং উপসাগর হইতে বিচ্ছিন্ন। মান্নার উপসাগরটি অগভীর এবং ভারত-সিংহল মধ্যবর্তী মহীসোপানের অংশবিশেষ। মৌসুমী বাত্যাতাড়িত এই উপসাগরটি বিষধর সর্পসংকুল এবং বিচিত্র বর্ণের মৎস্য ও প্রবাল সমাকীর্ণ। মুক্তা আহরণ করিবার জন্য ডুবুরীগণ অগভীর সমুদ্রগর্ভ হইতে শুক্তি তুলিয়া আনে। মৎস্য-চাষেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। উপসাগরটির উভয় পার্শ্বে ভারত এবং সিংহল উপকূলে একাধিক ক্ষুদ্র সমুদ্র-বন্দর প্রধানতঃ আঞ্চলিক অথবা উপকূলীয় বাণিজ্যের সহায়ক। দক্ষিণে কলম্বো বন্দরটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

মান্যখেট, মালখেড রাষ্ট্রকূট দ্র

মাম্প্স কর্ণমূলের সন্নিকটে অবস্থিত 'প্যারটিড' (কর্ণের নিকট) লালাগ্রন্থির প্রদাহকে মাম্প্স বলে। ইহা একটি ভাইরাস-ঘটিত ছোঁয়াচে রোগ। কখনও কখনও লালাগ্রন্থি প্রদাহের সঙ্গে অগ্ন্যাশয়, ডিম্বকোষ এবং অণ্ডকোষেরও প্রদাহ হয়। শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দিয়া এই রোগের সূচনা হয় এবং তারপর মাথায় ও কর্ণমূলে ব্যথা হয় এবং অতিশীঘ্র প্যারটিড লালাগ্রন্থি দুটি ফুলিয়া উঠে, কোনও জিনিস চর্বণ করা দুষ্কর হয়। এক হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে আপনা হইতেই এই রোগের উপশম হয়। সাধারণতঃ একবার মাম্প্স রোগ হইলে জীবনে আর কখনও হইবার ভয় থাকে না। ইহার প্রকৃত চিকিৎসা এখনও উদ্ভাবিত হয় নাই।

অশোক বাগচী

মামুদ (গজনী) (৯৭১-১০৩০ খৃ) ২৭ বৎসর বয়সে গজনীর সুলতান হন। সমরনায়ক হিসাবে কৃতিত্বের সহিত ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যকে এক বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। স্বকীয় রাজ্যে স্থপতিবিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও তিনি প্রসিদ্ধ। 'শাহনামা'-রচয়িতা কবি ফিরদৌসি, ঐতিহাসিক উৎবী ও বৈহাকী এবং আল্‌বিরুণী প্রভৃতি তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন।

মতভেদ থাকিলেও তিনি অন্ততঃ দ্বাদশ বার ভারতে অভিযান কালে অসংখ্য মন্দির ও দেবমূর্তির লুণ্ঠন ও ধ্বংস এবং বহু জনপদ বিনষ্ট করিয়া উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করিয়াছেন ; শুধু পাঞ্জাব তিনি নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ভারতের

রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরবর্তীকালে এই দেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হয়।

দ্র Briggs' Firishta, Vol, I; M. Nagim, *The Life and Time of Sultan Mahmud of Ghazzani.*

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মায়াকভ্‌স্কী, ভ্লাডীমির (১৮৯৪-১৯৩০) রুশদেশীয় কবি। রুশ 'ভবিষ্যবাদী' লেখকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়। ১৯১৭ খ্রী হইতে রুশ বিপ্লবের প্রধান প্রবক্তা। এক বিশেষ ধরনের সরল সাময়িক প্রচারধর্মী কবিতা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। ইচ্ছাকৃত উচ্চকণ্ঠ, নীরসতা ও উদ্ভট চিত্রকল্প তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য মৌলিকতায় পরিস্ফুট এবং তেজস্বিতা ও কারুণ্যে ভাস্বর। *Voyna i Mir* ('যুদ্ধ ও শান্তি', ১৯১৬) ও 'ভ্লাডীমির ইলায়ীচ লেনিন' (১৯২৪) তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। (১৯৩০ খ্রী) আত্মহত্যা করেন। তরুণতর কবিদের রচনায় তাঁহার প্রভাব গভীর।

দ্র গোপাল হালদার 'রুশ সাহিত্যের রূপরেখা', কলিকাতা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ। *Mayakovsky and His Poetry, tr.* & Ed. H. Marshall, London, 1945.

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

মায়াবাদ বেদান্ত দর্শনের কেবলাদ্বৈতবাদ বিবর্তবাদী। এই তত্ত্ব অনুসারে কারণ সত্য, কার্য মিথ্যা। মৃত্তিকা সত্য, ঘট নিছক নাম-রূপ এবং মিথ্যা। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ নাম-রূপ এবং মিথ্যা। মিথ্যা মানে একেবারে অসৎ বা তুচ্ছ নয়। গগন-পুষ্প কোনকালেই নাই, তাই তুচ্ছ বা অসৎ। জগৎ প্রতীত হয়, সুতরাং অসৎ হইতে পারে না। জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, সুতরাং সৎ হইতে পারে না। জগৎকে অসৎ বা সৎ কোনটাই বলা চলে না। জগৎ অনির্বচনীয় বা বর্ণনার অযোগ্য। জগতের সৃষ্টি মায়ার দ্বারাই সম্ভব। মায়া ব্রহ্মের মধ্যেই আশ্রিত শক্তি-বিশেষ। মায়াই জগতের ভ্রমাত্মক প্রতীতি উৎপাদন করিতেছে। মেঘ যেমন সূর্যকে ঢাকিয়া রাখে, ঠিক তেমনি মায়া ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখিয়া জগতের অবভাস সৃষ্টি করিতেছে। এক সত্য, বহু মিথ্যা; মায়ার দ্বারাই বহুর ভ্রমাত্মক প্রতীতি হয়। মায়াশক্তি বিশ্বমূল জাদু-শক্তি। মায়া নিজেও অনির্বচনীয়া এবং তার সৃষ্ট জগৎও অনির্বচনীয়া। মায়া জগতের উপাদান কারণ। তাই জগৎ মায়ার পরিণাম। কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের কারণ-রূপে ধরিলে ব্রহ্মই সৎ বস্তু এবং জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত। ব্রহ্ম জগৎরূপে প্রতিভাত হন, জগৎরূপে পরিণত হইয়া যান না। 'অদ্বৈতবাদ' দ্র

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

মার বৌদ্ধসাহিত্যে মার নির্বাণলাভের বিঘ্ন। মার মায়ার স্রষ্টা। পালি সাহিত্যে মার-এর কণ্হ, অধিপতি, অন্তগু, নমুচি, পমত্তবন্ধু, প্রভৃতি বহু নাম এবং বহু প্রকারভেদ, যথা, খন্ধমার (স্কন্ধমার), কিলেসমার (ক্লেশ-মার), মরণমার, দেবপুত্তমার (দেবপুত্রমার), এবং অভি-সংখ্যারমার (অভিসংস্কারমার)। তৃষ্ণা, অরতি (অসন্তোষ) ও রাগ এই তিন কন্যার সাহায্যে মার সাধকের সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিলে মার বিধ্বস্ত হয়।

বুদ্ধের সহিত মারের সংঘর্ষের বিস্তৃত কাহিনী ললিতবিস্তর গ্রন্থে আছে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মারণ ষটকর্ম দ্র

মারাঠা খাল কলিকাতা দ্র

মারাঠী আধুনিক মাহারাষ্ট্রী বা মারাঠী মাহারাষ্ট্রী-প্রাকৃত-উদ্ভূত নব্যভারতীয় আর্য ভাষা। গ্রিয়র্সনের মতে 'কোঙ্কণী' (গোয়া) ও হলবী (বস্তার, মধ্যপ্রদেশ) মারাঠীর উপভাষা। আধুনিক ভাষা সমীক্ষায় (১৯৬১) কোঙ্কণী স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃত এবং হলবী পূর্বী হিন্দী বা কোশলীর অন্তর্ভুক্ত। মারাঠী ভাষাভাষী লোকসংখ্যা ৩৩২৮৬৭৭১। সংখ্যায় হিন্দী, তেলুগু ও বাংলার পরেই ইহার স্থান। ভাষার বিস্তৃতি সমগ্র মহারাষ্ট্র রাজ্য জুড়িয়া, তবে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে কোল বা অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষাগুলেও তাহার প্রসার ঘটিতেছে। মারাঠীর নিজস্ব লিপি 'মোড়ী', কিন্তু ১৮শ শতক হইতে 'নাগরী' লিপি (স্থানীয় ভাষায় 'বালবোধ') গৃহীত হইয়াছে।

মারাঠীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হইল—চ-বর্গের দ্বিবিধ উচ্চারণ (দন্ত্য ঘৃষ্ট ও তালব্য ঘৃষ্ট), ওড়িয়া সুলভ মূর্ধন্য ণ্ ও ল্ (l) ধ্বনির অস্তিত্ব, ব ও ব্‌ এবং শ্ ও স্ ধ্বনিগুলির উচ্চারণগত পার্থক্য, তিনটি লিঙ্গের বিচার (পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ), বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার কৃদন্ত অতীত ও বর্তমান হইতে উদ্ভূত যথাক্রমে অতীত ও বর্তমান কালজ্ঞাপক পদগঠন (তো গেলা-'সে গেল', তো জীতো-'সে যায়') এবং ল-যোগে নবীন ভবিষ্যৎ কাল গঠন (তো জাইল) ইত্যাদি।

দ্র *Census of India,* 1961, Vol. I, Part II-C (ii); S. K. Chatterjee. *Languages and Literatures of Modern India,* Calcutta, 1963.

পরেশচন্দ্র মজুমদার

মারাঠী সাহিত্য মারাঠী ভাষাসৃষ্টির কাল সম্ভবতঃ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু বর্তমানে ইহার যে সাহিত্যিক

নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা ১৩শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়।

মারাঠী সাহিত্যের (ইতিহাসকে) প্রধানতঃ ৩টি যুগে বিভক্ত করা যায়ঃ প্রাচীন ধর্মমূলক সাহিত্যের যুগ (—১৩৫০ খৃঃ); মধ্যযুগ ১ম পর্ব (১৩৫০-১৫৫০ খৃঃ) অন্ধকার যুগ, মধ্যপর্ব (১৫৫০-১৭০০ খৃঃ), পেশোয়া যুগ (১৭০০-১৮০০ খৃঃ); আধুনিক যুগ (১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে)।

গুজরাতী ব্রাহ্মণ হরপালদেব বা চক্রধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহানুভব সম্প্রদায় রচিত সাহিত্যই প্রাচীনতম মারাঠী সাহিত্যের নিদর্শন।

মারাঠী সাহিত্যের সর্বপ্রথম সর্বসম্মত খ্যাতিমান্ লেখক হইলেন জ্ঞানেশ্বর। ইঁহার রচিত গীতার ভাষ্য 'ভাবার্থদীপিকা' (১২৯২ খৃঃ) জ্ঞানেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। জ্ঞানেশ্বরী ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। 'জ্ঞানেশ্বর' দ্র। সমসাময়িক কবি নামদেবের অভঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'নামদেব' দ্র।

মধ্যযুগের ১ম পর্বের লেখকদের মধ্যে নরসিংহ সরস্বতী ও জনার্দনস্বামী উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের মধ্যপর্বে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ ব্যক্তি একনাথ স্বামী। 'একনাথ' দ্র।

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাভংগীর জন্য মুক্তেশ্বরের (১৬০৮-১৬৬০ খৃঃ) অনূদিত রামায়ণ-মহাভারত উল্লেখযোগ্য।

১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দুদের পুনরভ্যুত্থানের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। তুকারাম ও শিবাজীর গুরু স্মার্ত রামদাস-ই (১৬০৮-১৬৮২ খৃঃ) এই যুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। রামদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'দাসবধ'।

তুকারাম অভঙ্গ কবিতাবলীর জন্যই ('অভঙ্গ' ও 'তুকারাম' দ্র) প্রসিদ্ধ।

১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাওয়াদার বা যুদ্ধের কবিতা বলিয়া একপ্রকারের নূতন ধরনের লোককাব্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাথাগুলি সরল ও উদ্দীপনাময়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় ইহার কিছু কবিতা অনুবাদ করেন।

পেশোয়া যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীধর (১৬৭৮-১৭২৮ খৃঃ) পাণ্ডব-প্রতাপ, হরিবিজয় ও রাম-বিজয় রচনা করেন; মারাঠী ভাষার প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যিক হইলেন মাধবমুনি।

১৮শ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত কবি হইলেন মুরু-পন্থ (বা ময়ূর পণ্ডিত, ১৭২৯-১৭৯৪ খৃঃ)। ইঁহার রচিত ভক্তিমূলক গীতিকবিতা 'সংশয়রত্নমালা' ও 'কেকাবলী' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৮শ শতাব্দীতে লাবণী নামক একপ্রকার ধর্মনিরপেক্ষ জনপ্রিয় প্রেমসংগীত রচনার প্রবণতা দেখা দেয়।

মারাঠী ভাষায় গদ্যে ইতিবৃত্ত রচনা করা হইত। ইহাকে 'বাখর' বলা হয়। সর্বশেষ বাখর রচয়িতা ছিলেন মালহার রামরাধ চিটনিস। ১৮১০ খৃঃ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন।

আধুনিক মারাঠী সাহিত্য (১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে)ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মহারাষ্ট্রে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মারাঠীরা ইংরেজের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসে ও ইংরেজি সাহিত্য হইতে অনুবাদ শুরু হয়। এ বিষয়ে বিদেশী মিশনারীরাও যথেষ্ট সাহায্য করে। উইলিয়ম কেরী মারাঠী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন (১৮০৫)। সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুসরণ ও অনুবাদই প্রধানতঃ এই যুগের নাটকের বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণু অমৃতভাবের 'সীতা স্বয়ম্বর' নাটকই সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত পণ্ডিতরা মারাঠীভাষার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাংগ গীতা অনুবাদ করেন। সংস্কৃত হইতে অনুবাদের জন্য পরশুরাম তাটাইয়া গোড়বালে, কৃষ্ণহরি চিপলুনকর, বিষ্ণু ভিখাজী গোখলে বিখ্যাত।

বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুণ্করকে (১৮৫০-১৮৮২ খৃঃ) মারাঠী গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়। তেজস্বী ভাষা, সুন্দর যুক্তি, ব্যংগ ও সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধ ইঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। বালগংগাধর টিলকের 'গীতারহস্য' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'টিলক, বালগংগাধর' দ্র

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর মারাঠী ভাষায় উপন্যাসের সূত্রপাত হয়। নারায়ণ রাও সদাশিব ঋষবাড প্রথম একটি মধ্যযুগীয় রোমান্টিক ধরনের উপন্যাস রচনা করেন। হরিনারায়ণ আপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। ইনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস মারাঠী ভাষায় অনূদিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব মারাঠী সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়।

মার্ক্সবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওয়াই. জি. যোশী, ভাবে, গংগাধর গ্যাডগিল, পি. কে. আত্রে, প্রমুখ। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নারায়ণ সীতারাম ফাড়কে, বিষ্ণুসখারাম খাণ্ডেরকর, গজানন ত্র্যম্বক মাদখোলকর, পুরুষোত্তম যশোবন্ত দেশপাণ্ডে। মহিলাদের মধ্যে মালতী বেদেকার (ছদ্মনাম বিভারাণী সিরুরকর), গীতা সানে, মুক্তাবাঈ দীক্ষিত, কমলাবাঈ তিলক ও কুসুমাবতী দেশপাণ্ডে উল্লেখযোগ্য। মহিলা প্রবন্ধ লেখিকাদের মধ্যে ইরাবতী কার্ভে ও দুর্গা ভাগবত সুবিখ্যাত।

কৃষ্ণকেশকার দাম্বের (১৮৬৬-১৯০৫ খৃঃ) কবিতার মধ্য দিয়াই আধুনিক মারাঠী কাব্যের সূত্রপাত হয়। অন্যান্য আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আন্না মুরেশ্বর কুণ্টে, রামগণেশ।

বর্তমানযুগের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাট্যকার হইলেন প্রহ্লাদকেশব আত্রে; ঔপন্যাসিকরূপেও ইনি খ্যাতিমান। মামা বরেরকর ও ভার্গব বিঠ্‌ঠল বরারকর সুপরিচিত নাট্যকার।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মহারাষ্ট্র রাজ্যের পত্তন, গোয়ার স্বাধীনতা প্রভৃতি কারণে মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দীপ্তি সমাদ্দার

মারীচ প্রসিদ্ধ রাক্ষস। পিতা দৈত্যপতি সুন্দ, মাতা যক্ষকন্যা তাড়কা। অগস্ত্যের শাপে মাতার সহিত পুত্র মারীচের রাক্ষসত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

বিশ্বামিত্রের তপোবনে যজ্ঞবিঘ্নকারী মারীচকে রামচন্দ্র শরবিদ্ধ করিয়া বিতাড়িত করিলে তিনি মুনিবেশে বনমধ্যে বাস করিতে থাকেন। রাবণের পরামর্শে তিনি চতুঃশৃঙ্গ-সমন্বিত রত্নকাঞ্চনময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া জনস্থান মধ্যে রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে প্রলুব্ধ করেন। শরবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগকালে তিনি রামের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া যে আর্ত চীৎকার করেন তাহার ফলেই সীতাহরণ সম্ভব হইয়াছিল।

কল্যাণী দত্ত

মারোয়াড়ী, মারবাড়ী রাজস্থানী দ্র

মার্কণ্ডেয় পুরাণ-প্রখ্যাত মহাপ্রভাবশালী মহর্ষি। পিতা মুনি মৃকণ্ডু, মাতা দেবী মনস্বিনী। (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) নৃসিংহপুরাণ হইতে জানা যায়, দ্বাদশবৎসরে তাঁহার অকালমৃত্যু অবধারিত জানিয়া তপোবলে মৃত্যুকে পরাস্ত করিতে তিনি অরণ্যে বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন ও চিরজীবী হন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ঋষি মার্কণ্ডেয়ের দীর্ঘজীবন লাভের কাহিনী ভিন্ন মহাভারতে ঋষি মার্কণ্ডেয় কথিত বিভিন্ন উপাখ্যান পাওয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত অন্যতম মহাপুরাণ। শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য এই মহাপুরাণের অন্তর্গত। জাতকর্মাদি সংস্কারকার্যে মার্কণ্ডেয় পূজার বিধি আছে।

যূথিকা ঘোষ

মার্ক্‌স, কার্ল হাইনরিখ (১৮১৮-৮৩ খ্রী) বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রমিক বিপ্লব আন্দোলনের আচার্য। জন্ম প্রুশিয়ার ট্রিয়ার শহরে (৫ মে, ১৮১৮ খ্রী)। শিক্ষা ট্রিয়ার জিম্‌ন্যাসিয়ামে, বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। বার্লিনে অধ্যয়নকালে হেগেলীয় ভাববাদ অবলম্বন করেন। ব্রুনো বাউয়ার-প্রমুখ বামপন্থী হেগেলীয়দের 'ডক্টরক্লুব'-এ যোগ দেন। এপিকিউরীয় দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী পান (১৮৪১ খ্রী)।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হওয়ার আশা বিফল হয়। কোলোনের র‍্যাডিক্যাল বুর্জোয়া পত্রিকা Rheinische Zeitung-এর (১৮৪২-৪৩ খ্রী) লেখক ও পরে সম্পাদক হন। পত্রিকাটির বিপ্লবী গণতন্ত্রী প্রবণতায় প্রুশীয় সরকার রুষ্ট হন। মার্ক্‌স পদত্যাগ করেন, পত্রিকাটি নিষিদ্ধ হয়। অভিজ্ঞতার ফলে হেগেলীয় বিশ্বাস দূর হয়। মানবসমাজে বৈষয়িক স্বার্থের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হন। ফয়ের বাখ-এর *Das wesen des Christentums* (খ্রীষ্টধর্মের সারমর্ম; ১৮৪১ খ্রী) নামক গ্রন্থের প্রভাবে বস্তুবাদে (মেটিরিয়ালিজম) দীক্ষিত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিজাতবংশীয়া আবাল্যসঙ্গিনী ইয়েনি ফন হেবেস্টফালেনকে বিবাহ করেন ও পারীতে আসেন। Deutche-Französische-Jahrbücher ('জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী') পত্রিকায় (১৮৪৪ খ্রী) হেগেলীয় আইনতত্ত্বের সমালোচনায় বলেন, কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই নিজের শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার ও বাস্তব আবশ্যিকতার কারণে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতে পারে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই দর্শনে বামপন্থী হেগেলীয় পর্যায়ের ও রাজনীতিতে বিপ্লবী-গণতন্ত্রী পর্যায়ের অবসান; বস্তুবাদী, কমিউনিস্ট মার্ক্‌সের আবির্ভাব।

ঐ বৎসর পারীতে তাঁহার জীবনব্যাপী বন্ধু ও সহযোগী এঙ্গেল্‌সের সহিত পরিচয়, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পারী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ব্রুসেল্‌সে যান। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যাহার অঙ্কুরোদ্‌গম, ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মার্ক্‌স ও এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম প্রচেষ্টায় তাহা একটি পূর্ণাবয়ব কমিউনিস্ট মতবাদে (বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ) পরিণত হয়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যঃ ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা; হেগেলের 'ডায়ালেক্‌টিক্‌স' বা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বিকাশতত্ত্বকে বস্তুজগতে প্রয়োগ; ইতিহাসের ও সমাজবিকাশের বিজ্ঞানরচনা। তিন উৎস হইতে মার্ক্‌সীয় মতবাদের উদ্ভবঃ জার্মান দর্শন, ইংরেজ অর্থনীতি ও ফরাসী সমাজতন্ত্র। শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাকে মার্ক্‌স লিখিত ইওরোপীয় ইতিহাস, বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের ও তৎপরবর্তীকালের ইতিহাস হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। ইহাকে তিনি সমগ্র ইতিহাসের চালিকা শক্তিরূপে প্রতিপাদন করিলেন ও ইহাকে ইহার শেষ নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তে লইয়া গেলেন—শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব।

খৃষ্টীয় ১৮৪৪-৪৭ পর্যায়ে প্রধান রচনাবলীঃ *Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus-dem Jahar* 1844 ('১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশ ১৯৩২ খ্রী বিযুক্তি তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত); *Die Heilige Familie* ('পবিত্র পরিবার', এঙ্গেলসের সহযোগে ১৮৪৫ খ্রী, 'এঙ্গেল্‌স, ফ্রিড্‌রিখ' দ্র); *Die Deutche Ideologie*

('জার্মান মতাদর্শ' ১৮৪৬ খ্রী এঙ্গেল্‌সের সহযোগে, বাউয়ার, স্টার্নার, ফয়ের বাখ ও জার্মানীর 'প্রকৃত সমাজ-তন্ত্রী'-দের মত খণ্ডন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের রূপ-রেখাঙ্কন, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩২ খ্রী); *Misire de la Philosophie* ('দর্শনের দারিদ্র্য' ১৮৪৭ খ্রী) শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রুধঁবাদের খণ্ডন। গ্রন্থটি ঐতিহাসিক বস্তু-বাদের সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক বিস্তার বলিয়া গণ্য।

তাঁহার এই সময়কার গবেষণার উল্লেখ করিয়া তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'পলিটিক্যাল ইকনমির সমালোচনা' গ্রন্থে যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহাতে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি সংক্ষেপে প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত। মানুষের সত্তার (being) দ্বারা চৈতন্যের নির্ণয়; ভ্রান্ত চৈতন্য তত্ত্ব; মানবসমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রাধান্য; উৎপাদন সম্পর্কের বা সম্পত্তি সম্পর্কের দ্বৈত ভূমিকা—প্রথমে উৎপাদন-শক্তির সহায়ক পরে প্রতিবন্ধক; উভয়ের বিরোধ বাধিলে নূতন উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে নূতন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা (ক্রমান্বয়ে দাসত্বমূলক, সামন্ত-তান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সমাজের অভ্যুদয়); অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অল্পবিস্তর দ্রুতভাবে উপরিসৌধের (রাষ্ট্র, আইনকানুন, মতাদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি) রূপান্তর; ঐতিহাসিক নিয়তিবাদ; বুর্জোয়া সমাজই শেষ বৈরিতামূলক সমাজ এবং তাহার বিলোপের সঙ্গে মানব সমাজের প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের অবসান।

সর্বপ্রকার অ-বিপ্লবী সমাজতন্ত্রবাদকে খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে মার্ক্‌স নানা সংস্থার মাধ্যমে নূতন বিপ্লবীতত্ত্ব প্রচার করেন ও 'কমিউনিস্ট লীগ' নামে এক বে-আইনি কমিউনিস্ট পার্টি (প্রধানতঃ জার্মান শ্রমিকদের পার্টি) গঠন করেন। ইহারই দ্বিতীয় কংগ্রেসের (লণ্ডন, ১৮৪৭ খ্রী) নির্দেশে এঙ্গেল্‌সের সহিত যুগ্মভাবে মার্ক্‌স বিখ্যাত *Manifest der Kommunistischen Partei* ('কমিউ-নিস্ট পার্টির ইস্তাহার') সূচনা করেন। ইহা কমিউনি-জমের সর্বপ্রথম কর্মসূচীগত দলিল। ইহাতে কমিউনিজমের অভিনব বিশ্বদৃষ্টি উদ্‌ঘাটিত, শ্রেণী-সংগ্রামতত্ত্ব, ধনতন্ত্র বিনাশের অনিবার্যতা প্রভৃতি ঘোষিত এবং এক নূতন কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টারূপে শ্রমিকশ্রেণীকে তাহার ইতিহাসনির্দিষ্ট বিপ্লবী ভূমিকা পালন করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের ডাক দেওয়া হইল। নূতন আন্ত-র্জাতিকতার নীতি ঘোষিত হইল। পুরাতন আন্তর্জাতিকতার মন্ত্র ছিল 'সকল মানুষ ভাই'। নূতন শ্রমিক আন্ত-র্জাতিকতার মূলমন্ত্র হইল 'বিশ্বের শ্রমিক, এক হও'।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ঢেউ ইওরোপময় ছড়াইয়া পড়ে। বার্লিনের ব্যারিকেড লড়াইয়ে জার্মান বিপ্লবীরা জয়ী হয়। বার্লিনে বুর্জোয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্ক্‌স ক্যাল্‌নে আসিয়া *Neul Rheinische Zeitung* পত্রিকা প্রকাশ করেন ও প্রচার-কার্যে ব্রতী হন। জার শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লবী জন-যুদ্ধের ডাক দেন। প্রুশিয়ার পোসে প্রদেশে পোলিশ বিদ্রোহকে সমর্থন করেন। ১৮৪৮ খ্রী পারীতে শ্রমিক শ্রেণীর পরাজয় ঘটিলে মর্মস্পর্শী ভাষায় 'বিজয়ী পরাজিত-দের' স্মৃতিচারণ করেন। জার্মান প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ায় মার্ক্‌স ট্যাক্‌স বন্ধের ডাক দেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভি-যোগে মার্ক্‌সের বিচার হয়। মার্ক্‌স নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

ক্যাল্‌ন হইতে নির্বাসিত হইয়া পারীতে যান এবং তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লণ্ডনে যান (আগস্ট ১৮৪৯ খ্রী)। জীবনের অবশিষ্টাংশ এখানেই স্থায়ীভাবে বাস। ১৮৪৮ খ্রী বিপ্লব এবং তৃতীয় নাপোলেঅঁ-র 'কুদেতা' সম্বন্ধে দুইটি পুস্তক লেখেন *Die Klassenkämpfe in Frankreich* 1848-50 (ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম, ১৮৪৮-১৮৫০) ও *Der Achtzhehnte Brumaire des Louis Bonaparte* ('লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার', ১৮৫২)।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক-আন্দোলনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৮৬৪ খ্রী লণ্ডনে 'International Working men's Association' ('প্রথম আন্তর্জাতিক') স্থাপিত হয়। প্রথম আন্তর্জাতিকের নেতারূপে মার্ক্‌স শ্রমিক শ্রেণীর একী-ভূত কর্মকৌশল গঠনের চেষ্টা করেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম শ্রমিকরাষ্ট্র 'পারী কমিউন' ধ্বংস হইলে মার্ক্‌স কমিউনার্ডদের স্তুতি করিয়া প্রথম আন্তর্জাতিকের সাধারণ সভায় 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' নামে ভাষণ দেন।

১৮৪৪ খ্রী মার্ক্‌সের ধারণা হয় যে সমাজের দৈহিক গঠনের স্বরূপ অর্থনীতির মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে। তখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর অর্থনীতি চর্চায় লিপ্ত থাকেন। প্রধান অর্থনৈতিক রচনাবলী *Lohnarbeit und Kapital* ('মজুরি, শ্রম ও মূলধন', ১৮৪৯); *Kritik der Politischen O'Konomie* ('পলিটিক্যাল ইকনমির সমালোচনা', ১৮৫৯); *Value, Price and Profit* ('মূল্য, দাম ও মুনাফা', ১৮৬৫, পরে নামকরণ হয় *Wages, Price and Profit*); *Das Kapital* ('দাস ক্যাপিটাল') মার্ক্‌সের মহাগ্রন্থ 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড মাত্র তাঁহার জীবিতকালে প্রকাশিত হয় (১৮৬৭ খ্রী)। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড এঙ্গেল্‌সের সম্পাদনায় যথাক্রমে ১৮৮৫-১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড কার্ল কাউট্‌স্কির সম্পাদনায় *Theorien über den Mehrwert* ('উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্বাবলী', ১৯০৫-১০) নামে প্রকাশিত হয়।

ইহার মূল সূত্র উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রমিকদের শ্রমই সামগ্রিক মূল্য উৎপাদন করে কিন্তু তাহারা ইহার একাংশ মাত্র শ্রমশক্তির মূল্য বা মজুরিরূপে পায়। বাকি অংশ উদ্বৃত্ত মূল্য। উৎপাদনের উপায়াদির মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করিয়া উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে এবং বিনা শ্রমে মুনাফা, সুদ ও খাজনা-রূপে ভোগ করে। শ্রমিক শোষণের

দ্বারাই ধনিক শ্রেণীর হাতে মূলধনের ক্রমবর্ধমান সঞ্চয়।

বিপুল তথ্যের ভিত্তিতে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া মার্ক্স দেখাইতে চাহিয়াছেন : সর্ববিত্তহীন শ্রমিক ও সর্ববিত্তবান ধনিক, এই দুই বিরোধী শ্রেণীর উদ্ভবই ধনতন্ত্রের সারমর্ম; শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুর্দশার কারণে ধনিক ও শ্রমিকের সংঘাত ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে; পুঁজির ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে ধনতন্ত্র উৎপাদনের সমাজীকরণের দ্বারা নিজগর্ভে সমাজতন্ত্রের পূর্বাবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; সামাজিক উৎপাদন ও ব্যক্তিগত আত্মীয়করণ এই মূল অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ধনতন্ত্রের আসন্ন মৃত্যুর ভেরীধ্বনি শোনা যাইতেছে।

১৮৫৩ খ্রী 'নিউ ইয়র্ক-ডেইলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় মার্ক্স ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের ভারত লুণ্ঠনের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার ভারত চিন্তার মৌলিকতা এই যে, তাঁহার মতে ভারতের গৃহশিল্পভিত্তিক গ্রাম সমাজগুলিকে ধ্বংস করিয়া ব্রিটিশেরা ইতিহাসের অচেতন যন্ত্ররূপে এশিয়ায় সর্ববৃহৎ সামাজিক বিপ্লব সাধিত করিয়াছে। তিনি বলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা আছে, আবার পুনঃসৃজনাত্মক ভূমিকাও আছে। ভারতে পাশ্চাত্য (অর্থাৎ বুর্জোয়া) সমাজের বাস্তব ভিত্তিস্থাপনই ব্রিটিশ শাসনের পুনঃসৃজনাত্মক ভূমিকা। ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বারা স্থাপিত রেলপথগুলি ভারতে আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত। কিন্তু ইংল্যান্ডে প্রোলেটারিয়েট শ্রেণী ক্ষমতা দখল না করা পর্যন্ত ভারতীয়েরা নিজ শক্তির বলে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ না করা পর্যন্ত ইহাতে ভারতের কোনও মঙ্গল নাই। মার্ক্স গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের (১৮৫৭) ঘটনাগুলি অনুধাবন করিয়াছিলেন।

১৪ মার্চ ১৮৮৩ খ্রী লন্ডনে কার্ল মার্ক্সের মৃত্যু হয়। ১৮৪৮ বা ১৮৪৯ খ্রী শ্রমিক বিপ্লব সাধিত হইবে—তাঁহার মনের এই বিভ্রান্তিকে তিনি শেষ জীবনে স্বীকার করিয়াছিলেন। ইংল্যান্ডের মত দেশে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে স্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি বিপ্লবীই ছিলেন। বর্তমান শতকের পৃথিবীতে তাঁহার চিন্তা ও কর্মের উত্তরাধিকার বিপুল আলোড়ন ও পরিবর্তন সাধিত করিয়াছে।

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

মার্গসংগীত বর্তমানে মার্গসংগীত অর্থে ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ রাগসংগীত বোঝায়। উচ্চাঙ্গ সংগীত বুঝাইতে প্রাচীনকালে নারদ ও ভরত গান্ধর্ব শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। আনুমানিক খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মার প্রদর্শিত পন্থায় ভরতাদি ঋষি কর্তৃক মহাদেব এবং অপরাপর দেবগণের সম্মুখে যে মঙ্গলকর সংগীত প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহাই মার্গসংগীত।

ব্রহ্মার পরামর্শ অনুসারে ভরত ত্রিপুরদাহ নাটক মহাদেবের সম্মুখে প্রযোজিত করেন। নাটক দর্শনে সন্তুষ্ট মহাদেব নাটকের পূর্বরঙ্গে বর্ধমানক, আসারিত প্রভৃতি গীত সহযোগে নবতর নৃত্য পরিকল্পনা করিবার জন্য তন্ডু (তান্ড্য) মুনিকে আদেশ করেন। এতদুপলক্ষে যে গীতকলা রচিত হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহাই মার্গসংগীত নামে পরিচিত। মার্গসংগীতের বিভিন্ন পদ্ধতির ক্রমে বিলোপ ঘটে কিন্তু উচ্চাঙ্গ গীতপ্রয়োগ হিসাবে এই শব্দের প্রচলন চলিয়া আসিয়াছে।

দ্র নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র, সংগীত রত্নাকর।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মার্লো, ক্রিস্টোফার (১৫৬৪-৯৩ খ্রী) ইংরেজ নাট্যকার, একই দিনে তাঁহার ও শেকস্পিয়রের আবির্ভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বকালাবধি মার্লোর কবিকৃতি তেমন পরিচিতি লাভ না করিলেও আধুনিক কালে তাঁহার নাটক সম্বন্ধে কৌতূহলের অন্ত নাই।

মার্লো তৎকালীন ইউনিভার্সিটি উইট্স গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বিখ্যাত গোষ্ঠীর সহিত গ্রীন, পীল, ন্যাশ, কীড প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ যুক্ত ছিলেন। তাঁহার নাটকের ভাষায় যে তীব্র প্রক্ষেপণ ও গুরুগাম্ভীর্য লক্ষিত হয় তাহা মার্লোর নাটকীয় ভাষাচাতুর্যের ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির নিদর্শন। তাঁহার প্রধান নাটকগুলি যথাক্রমে— *Tamburlaine, The Jew of Malta, Edward II, Tragical History of Dr. Faustus, Dido, Queen of Carthage, The Massacre at Paris.* অন্যান্য রচনার মধ্যে ওভিদ ও লুসানের কবিতার অনুবাদ এবং তাঁহার *Hero and Leander* নাটকের মহাকাব্যধর্মিতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্লোর নাট্যচিন্তা নিঃসন্দেহে শেক্স্পিয়রকে এবং সমকালীন ও পরবর্তী কালের বহু নাট্যকারকে প্রভাবিত করিয়াছে। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে মত্ত অবস্থায় এক দুর্বৃত্তের হস্তে তিনি নিহত হন।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

মার্শম্যান, জন ক্লার্ক (১৭৯৪-১৮৭৭ খ্রী) শ্রীরামপুরের মিশনারী গোষ্ঠীর অন্যতম। পিতা ডঃ জোশুয়া মার্শম্যান। তিনি জনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামপুর মিশনের কাজে যোগদান করেন (১৭৯৯)। এখানেই জনের শিক্ষারম্ভ।

জন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন (১৮১৮)। ১৮২১ খ্রী ইতালী ও গ্রীস ভ্রমণে বাহির হন। ডঃ কেরীর আহ্বান পাইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন (১৮২৩)। তখন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর এদেশে থাকিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন। 'দিগ্‌দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' ও 'গভর্নমেণ্ট গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের পরিচালনা এবং ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সরকারি আইন সংকলন উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া (১৮৫২) মার্শম্যান *History of India, Outline of the History of Bengal, Life and Times of Carey, Marshman and Ward,* প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। লন্ডনের তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৭৭)।

দ্র সজনীকান্ত দাস, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

অরুণ সান্যাল

মার্শাল, অ্যালফ্রেড (১৮৪২-১৯২৪ খ্রী) প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌। জন্ম লন্ডনে। শিক্ষা কেমব্রিজের সেণ্ট জন্‌স কলেজে। ১৮৮৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ অক্‌স্‌ফোর্ডের ব্যালিওল কলেজে, পরে কেম্‌ব্রিজের অর্থনীতির অধ্যাপক। নব-ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির প্রবর্তক। অর্থনীতিকে তিনিই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র হিসাবে রূপদান করেন, মানুষের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন।

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রভাবশালী গ্রন্থ Principles of Economics (১৮৯০ খ্রী)। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's surplus,), সময়ের তারতম্য হিসাবে বাজারের শ্রেণী বিভাগ, সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার মূল্য নির্ধারণ প্রভৃতি নূতন বিষয় এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম আলোচিত হয়। জ্যামিতিক রেখা ও গণিতের সাহায্যে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা পদ্ধতিরও তিনি অন্যতম প্রবর্তক। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ *Industry and Trade* (১৯১৯ খ্রী) এবং Money, *Credit and Commerce* (১৯২৩ খ্রী) মার্শালের মৃত্যু ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্র Alfred Marshall, *Principles of Economics,* London 1956 ; J.M. Keynes, *Essays and Sketches in Biography,* New York, 1956.

সুদেব দাস

মার্শাল, জন হিউবার্ট (১৮৭৬-১৯৫৮ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্‌ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিকর্তা। জন্ম ইংল্যান্ডের চেস্টারে; শিক্ষা ডালউইচে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রজীবনে গ্রীকভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসে গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং গ্রীস, দক্ষিণ তুরস্ক ও ক্রীটদ্বীপে উৎখনন-কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ আর্থার জন ইভান্স। ১৯০২ খ্রী লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ও ব্রিটিশ মিউজিয়মের অনুমোদনক্রমে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্‌ ইন্ডিয়ার অধিকর্তারূপে ভারতে আসেন ও ১৯২৮ পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। অবসর গ্রহণের পরেও তদানীন্তন ভারত সরকার তাঁহাকে তাঁহার কার্যকালে উৎখনিত স্থানগুলি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার ও অন্যান্য কার্যের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেন। ১৯৩৪ খ্রী ভারত ত্যাগ করেন।

১৮৮৯ খ্রী জেম্‌স বার্জেসের অবসর গ্রহণের পরে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কার্যে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, মার্শাল তাঁহার কর্মজীবনের প্রারম্ভেই তাহার অবসান ঘটাইয়া সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে উক্ত বিভাগকে নবরূপে সংগঠন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে তিনি লর্ড কার্জনের আন্তরিক সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কীর্তির সংরক্ষণ, প্রত্নশালা সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন, অনুশাসন-পাঠোদ্ধারের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, উৎখননকার্যের নিমিত্ত উৎখননবিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর দায়িত্ব অর্পণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন অদ্যাবধি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন। কিরূপ যত্ন ও দক্ষতার সহিত মার্শাল প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেন তাঁহার আমলে উৎখনিত ও সংরক্ষিত সাঁচীর বৌদ্ধ কীর্তি তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন। ইহা যেন মন্ত্রবলে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ স্থাপত্যের পুনরুজ্জীবন। দিল্লীতে চল্লিশ হাজার পুস্তক সংবলিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও সংগঠন মার্শালের আর এক কীর্তি। উৎখনন-কার্য পরিচালনেও মার্শালের কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার আমলে ভারত-বর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক-স্মৃতি-বিজড়িত ভীটা, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, নালন্দা, বৈশালী, শ্রাবস্তী, সারনাথ, সাঁচী, তক্ষশীলা প্রভৃতি স্থানে, উৎখনন-কার্যের ফলে প্রাচীন ভারত ইতিহাসের যে সুবিপুল উপাদান আবিষ্কৃত ও বিভিন্ন প্রত্নশালায় উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে তাহার দ্বারা বহু জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। অনুসন্ধান ও

উৎখননের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত তথ্যাবলীর গ্রন্থনাতেও মার্শাল তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কার্যকালে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু মার্শালের ইহা অপেক্ষাও ভাস্বর-কীর্তি প্রাক্‌-ইতিহাস যুগের সিন্ধু সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলিতে উৎখনন ও এই সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন। তাঁহার পূর্বে কানিংহাম পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পাতে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করিলেও ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই। মার্শালের আমলে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত মোহেঞ্জো-দড়োতে উক্ত সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রূপে মার্শালের কৃতিত্ব এই যে তিনি এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া উক্ত দুই স্থানে ব্যাপক উৎখনন-কার্যের ব্যবস্থা করেন। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থিত এক সুবিস্তীর্ণ উন্নত ও সমৃদ্ধ নগর-সভ্যতার অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হয় ও ভারত-ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত হয়। এই কার্যে মার্শাল বৎস, ম্যাকে, ননীগোপাল মজুমদার, দয়ারাম সাহানি প্রভৃতি সমসাময়িক সহযোগিগণের নিকট উপযুক্ত সাহায্য পাইয়াছিলেন। মুখ্যতঃ ইঁহাদিগের আবিষ্কৃত ও উৎখনিত সূত্র অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী প্রত্নবিদ্‌গণ বিস্তীর্ণতর উৎখনন-কার্যের মাধ্যমে ক্রমশঃ সিন্ধু সভ্যতা ও ইহার শাখা প্রশাখাগুলির সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে অধিকতর অগ্রসর করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মার্শালের গভীর পাণ্ডিত্য ও তৎসংক্রান্ত উৎখননকার্যে অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রবন্ধসমূহকেও নানা দিক দিয়া অসামান্যতা দান করিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের রচনার সমাবেশে সম্পাদিত তিনখণ্ডে সমাপ্ত বিশাল গ্রন্থ 'মোহেনজো-দড়ো অ্যান্ড দি ইন্ডাস সিভিলিজেশন' (১৯৩১) এ যাবৎ সিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে প্রামাণিক আকরগ্রন্থ বিবেচিত হয়। অনুরূপ যৌথ রচনার অপর দুইটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'দ্য মনুমেণ্ট্‌স অফ সাঁচী' (তিন খণ্ড ১৯৪০) ও 'ট্যাক্সিলা' (তিন খণ্ড ১৯৫১)। সাঁচী ও তক্ষশীলা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত তাঁহার দুইখানি সংক্ষিপ্ত পরিচয়-পুস্তক 'এ গাইড টু সাঁচী' (১৯৩৬) ও 'এ গাইড টু ট্যাক্সিলা' (১৯৩৬) এ যাবৎ প্রাঞ্জলতা ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন সংযোগে ঐ জাতীয় রচনার আদর্শস্থল। তাঁহার মরণোত্তর প্রকাশিত 'দ্য বুদ্ধিস্ট-আর্ট্‌ অফ গান্ধার' (১৯৬০) ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে উদ্ভূত বিদেশী-প্রভাবপুষ্ট প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কে পথনির্দেশক গ্রন্থরাজির অন্যতম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারত-ইতিহাস গ্রন্থমালার প্রথম (১৯২২) ও তৃতীয় (১৯২৮) খণ্ডদ্বয়ে যথাক্রমে প্রকাশিত তাঁহার প্রাচীন ও প্রাক্‌-মোগল মুসলিম যুগের ভারতীয় শিল্পকলা ও সৌধাবলী সংক্রান্ত দুইটি প্রবন্ধ পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী শক্তির সমাবেশে উজ্জ্বল।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের উৎখননকার্যে মার্শাল-অবলম্বিত পদ্ধতির কিছু বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানেই প্রয়োগবিদ্যার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। মার্শালের যুগে যে-পদ্ধতি আধুনিক ও পরীক্ষিত ছিল নিজক্ষেত্রে তাহাই প্রয়োগ করা ভিন্ন তাঁহার গত্যন্তর ছিল না। মার্শাল অনুসৃত পদ্ধতি আজ যেমন তাঁহার সমালোচকগণের নিকট সর্বাংশে উপযোগী বোধ হইতেছে না, তেমনি শেষোক্তগণের প্রশংসিত সাম্প্রতিক পদ্ধতি ও ভবিষ্যতে প্রত্নবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য মনে না হইতে পারে। মার্শালের সমকালীন প্রত্নবিজ্ঞানের অগ্রগতি, নানা বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার কথা মনে রাখিলে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার বিরাট প্রতিভা, ভারত সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও নিজক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য সাফল্যের বিষয় বিচার করিলে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রূপে তাঁহার কীর্তির যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব হইবে।

দ্র আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া, 'উৎখনন ভারতে'। সরসীকুমার সরস্বতী, 'জন মার্শাল', বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশবর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
S. Roy, *The Story of Indian Archaeology : 1784—1947*, Delhi, 1961.

দিলীপকুমার বিশ্বাস

মাল্‌তো, মালপাহাড়ী ইহা বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনা জেলার রাজমহল অঞ্চলের মাল্‌তো আদিবাসী জাতির ভাষা। মাল্‌তো দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর উত্তর শাখার একটি ভাষা। কুরুখ ও ওরাঁও ভাষা মাল্‌তোর একই গোষ্ঠীভুক্ত। ১৯৬১ খ্রী মাল্‌তো ভাষীদের সংখ্যা ৮৮৬৪৫। সাঁওতালী ও আর্যভাষার প্রভাব মাল্‌তোর উপর পড়িয়াছে। এই ভাষায় পুরুষ ও দেবতা-বাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। স্ত্রী ও দেবী-বাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। বহুবচনের প্রত্যয় র্‌। কারক চিহ্নগুলি যোগ প্রতিপাদিকরূপে হয়। অন্ত্য এ এবং ই-র লোপের পর সংজ্ঞা শব্দই বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়। সংখ্যাবাচক শব্দগুলি ক্রমশঃ আর্যভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাঁওতালীর প্রভাবের দরুণ

ক্রিয়াপদ অত্যন্ত বিস্তৃত। সমস্ত ক্রিয়াপদের নঞর্থক (negative) রূপ পাওয়া যায়।

রামঅধার সিংহ

মালদহ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বিভাগের একটি জেলা। এই জেলার সীমানা—উত্তরে পূর্ণিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলা; পূর্বে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা; দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ জেলা ও পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ, পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগনা জেলা। মালদহের বিস্তৃতি ২৪°৪০′২০″ হইতে ২৫°৩২′০৮″ উত্তর ও ৮৭°৪৫′৫০″ হইতে ৮৮°২৮′১০″ পূর্ব। আয়তন ১৩৯১.৯ বর্গমাইল। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল গৌড় নামে সুপরিচিত। সমগ্র জেলা দশটি থানায় বিভক্ত যথাঃ ইংরেজবাজার ('ইংলিশ বাজার') কালিয়াচক, মালদহ, হবীবপুর, রতুয়া, মানিকচক, খারবা, হরিশ্চন্দ্রপুর, গাজোল, বামনগোলা। সদর শহর ইংরেজবাজার। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রশাসনিক সুবিধার্থে এই জেলা সৃষ্টি করা হয়।

মালদহ জেলা পলিমাটিতে গঠিত এবং মোটামুটি সমতল ও দক্ষিণে ঢালবিশিষ্ট। জেলার প্রধান নদী গঙ্গা, মহানন্দা ও কালিন্দী। মহানন্দা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে সমান্বিখণ্ডিত করিয়াছে। জেলার পূর্বাঞ্চল (অনুমান প্যালিওসিন যুগে গঠিত) বারিন্দভূমি ভঙ্গিল, বন্ধুর ও নদীখাত দ্বারা বিভক্ত। ইহা রাঙামাটি অঞ্চল, পুরাতন পলিদ্বারা গঠিত, অপেক্ষাকৃত অনুর্বর। গঙ্গা হইতে উত্থিত কালিন্দী পূর্ববাহী হইয়া মহানন্দায় মিশিয়াছে এবং মহানন্দার পশ্চিমাঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর ভাগ 'তাল', দক্ষিণ ভাগ 'দিয়ারা', পশ্চিমাঞ্চল নব পলিগঠিত। 'তাল' জলা ও বিলে ভরা বিরাট নিম্নভূমি, বর্তমানে চাষ-আবাদ হইতেছে। 'দিয়ারা' অত্যন্ত উর্বর ও ঘনবসতি। গঙ্গার আদিখাত ও 'ছোট ভাগীরথী' পুণ্যস্নানার্থীদের নিকট প্রকৃত গঙ্গা।

জেলার জলবায়ু কিছু চরমভাবাপন্ন। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তপ্ত পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত হয়। বৈকালের দিকে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়; প্রচণ্ড কালবৈশাখীও দেখা যায়। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহে আষাঢ় হইতে বর্ষা নামে। আশ্বিনে আবহাওয়া মনোরম থাকে। শীতের তীব্রতা থাকে মাঘ পর্যন্ত। গড় বৃষ্টিপাত ১৫৪০.৩ মি. মি.। দিনরাতের তাপের পার্থক্য অধিক। গ্রীষ্মের তাপ প্রায় ৪০ সে.। সারা বৎসরই হাওয়ায় আর্দ্রতা বেশি।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে জেলার মোট জনসংখ্যা ১২২১৯২৩ : তন্মধ্যে ৬২১৯৯০ পুরুষ ও ৫৯৯৩৩ স্ত্রী। শিক্ষিতের শতকরা হার মাত্র ১৩.৮ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০.৬৪ জন হিন্দু ও ৪৬.১৮ মুসলমান। প্রধান উৎপন্ন ফসল ধান, গম, যব, তৈলবীজ, পাট ও তামাক। এখানে প্রচুর আমবাগান আছে। মালদহের ফজলী আম বিখ্যাত। বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টাকার আম বিক্রয় হয়। জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান তুত চাষ অঞ্চল।

গম্ভীরা এই জেলার একটি বিশিষ্ট উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তির তিন দিন পূর্ব হইতে এই উৎসব শুরু হয়। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ গ্রাম্য দেবতার পূজা উপলক্ষে নানা দেবদেবীর সাজে নাচগান করেন।

মালদহের তসর, গরদ, মসলিন ও সুতির বস্ত্রের দেশে বিদেশে সুনাম ছিল। ইংরেজরা ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কারখানা স্থাপন করেন ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পর ১৭৬৫ খ্রী শিল্পে-বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি হয় ও ইংরেজবাজার প্রধান নগররূপে গড়িয়া ওঠে। তখন হইতেই মালদহ 'পুরানো মালদা' নামে খ্যাত। গৌড় ও পাণ্ডুয়া এই দুইটি শহরের ধ্বংসাবশেষ এই অঞ্চলের প্রধান দ্রষ্টব্য। 'গৌড়' ও 'পাণ্ডুয়া' দ্র।

দ্র B. Roy. Census '6'. *West Bengal, District Handbooks : Malda,* Calcutta, 1965 ;

সলিলকুমার চৌধুরী

মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরে লাক্ষাদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ ০°৪২′-৭°৭৬′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সিংহল হইতে দূরত্ব ৩২০ কিলোমিটার। প্রধানতঃ ১২টি প্রবাল বলয় লইয়া গঠিত দ্বীপগুলি নিমজ্জিত পর্বতমালার শৃঙ্গবিশেষ এবং সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির লাভা দ্বারা গঠিত। কোনও দ্বীপই সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৬ মি. অধিক উচ্চ নহে।

এই দ্বীপটি দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরব শাখার পথের উপর অবস্থিত এবং ইহার জলবায়ু আর্দ্র মৌসুমী ভাবাপন্ন। ইহার অধিবাসিগণ অধিকাংশই মুসলমান। পূর্বে এই দেশ সিংহলের অধীনে ছিল। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা পৃথক্ হইয়া গিয়াছে। সুলতান এক নির্বাচিত বিধানমণ্ডলীর সাহায্যে দেশ শাসন করেন। ইহার মোট জনসংখ্যা ৮২০৬৮। অধিবাসিগণ সকলেই এককালে নৌবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই স্থানে একটি বিমানঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছিল; ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুনর্গঠিত হয়।

অর্থনৈতিক পেশার মধ্যে বস্ত্রবয়ন ও মৎস্য শিকার প্রধান। নারিকেল, সুপারি, ডুমুর, বাদাম প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। এই সকল বৃক্ষজাত দ্রব্যাদি লইয়া সিংহল ও মালাবার উপকূলের সহিত বাণিজ্য চলে।

উমা ঘোষ

মালপ্রভা মহীশূর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে উত্থিত নদী, কৃষ্ণা নদীতে পড়িয়াছে। সরকারি উদ্যোগে ও পঞ্চবার্ষিক প্রকল্পের মাধ্যমে এই নদীতে গিরিবর্ত্মের নিকট বেলগাও জেলার ভাটনাল গ্রামের নিকট পিক্‌আপ বাঁধ দিয়া জলসেচের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ফলে পার্শ্ববর্তী শুষ্ক অঞ্চলে এখন কৃষিকার্য সম্ভব হইয়াছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মালব প্রাচীন অবন্তী ও বর্তমান মালব এক নহে। প্রাচীন অবন্তী বর্তমান মালব ব্যতীত নিমার ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। আলেকজান্ডার রাভি ও চেনাব নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট অবস্থিত ‘মাল্লোই’ জাতির দেশ দখল করেন। এই মালবজাতি ইহার পরে কোনও এক সময়ে রাজস্থান, অবন্তী ও মহী উপত্যকায় আসিয়া বসবাস করে। যশোধর, হিউএন-ৎসাঙ ও বাণভট্ট পূর্ব মালব ও অবন্তী বা উজ্জয়িনীকে পৃথক দেশ বলিয়াছেন। এই উজ্জয়িনী দেশ পরবর্তী যুগের পশ্চিম মালব ও শকাধিপতি চষ্টন-এর রাজধানী ছিল। পরবর্তীকালে মালব সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মালব স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পরে মালবরাজ যশোধর্মন হূণরাজ মিহিরকুল ও গুপ্তরাজকে পরাজিত করিয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন (৫৩০-৫৪০)। সপ্তম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধন মালব জয় করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গুর্জর প্রতীহাররাজ ১ম নাগভট্ট তুরস্কগণ তাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হইলে তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে পরমারবংশীয় মুঞ্জ ও ভোজ মালবের সম্রাট ছিলেন ও তাঁহাদের রাজধানী ছিল ধারানগরী। তাঁহারা উভয়েই বীর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মুঞ্জের সভায় পদ্মগুপ্ত, ধনঞ্জয় ও ধনিক প্রভৃতি ছিলেন ও ‘কবিরাজ’ ভোজ কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অভিধান ও স্থাপত্যবিদ্যা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হন। ইহার পর মালব আলাউদ্দীন খলজীর রাজ্যভুক্ত হয়। ‘মাণ্ডু’ দ্র।

১৭৩৭ খ্রী প্রথম বাজীরাও মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ও মালবে মারাঠা প্রাধান্য স্থাপিত হয়। উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে সৈন্য চলাচলের প্রায় সকল পথ মালবের উপর দিয়া ছিল বলিয়া মধ্যযুগে মালবের এত গুরুত্ব ছিল। প্রথম বাজীরাও-এর অনতিকাল পরেই মালব দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজ্যভুক্ত হয়। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৮-১৯ খ্রী) পর মালব ইংরেজ অধিকারে আসে। ইহার পরে মালবরাজ্যের স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়।

দ্র R. C. Majumdar, ed, *History and Culture of the Indian People*, Vols. II—VI and IX, Bombay, 1954-55, 57-60 & 1963.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মালব্য, মদনমোহন (১৮৬১-১৯৪৬ খ্রী) জন্ম এলাহাবাদে, ২৫ অকটোবর। পিতা পণ্ডিত ব্রজনাথ মালব্য, মাতা মুন্না দেবী। পিতৃপুরুষ আদিনিবাস মালব হইতে ষোড়শ শতাব্দীতে যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদে আসিয়া বাস করেন, এই কারণে পারিবারিক পদবী মালব্য। শৈশবে এলাহাবাদের ‘ধর্মজ্ঞানোপদেশ পাঠশালা’তে সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে তাঁহার বিদ্যারম্ভ; ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ মুয়ের সেণ্ট্রাল কলেজ হইতে স্নাতক হন। পরে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ীরূপে যোগদান করেন। ছাত্রাবস্থাতে অভিনেতারূপে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে সাংবাদিকরূপেও তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং ‘হিন্দুস্থান’, ‘ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন’, ‘অভ্যুদয়’ প্রভৃতি ইংরেজী ও হিন্দী সাময়িক পত্রের সম্পাদনাকার্য কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করেন। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়।

আইনবিদ্‌ ও আইন ব্যবসায়ী হিসাবে জনজীবনের সহিত তাঁহার সংযোগ ক্রমশঃ গভীর হইলে জনহিতকর ও দেশহিতকর কার্যে তাঁহার আগ্রহ জন্মায় ও তিনি ধীরে ধীরে জাতীয় কংগ্রেসের সহিত যুক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে সুবক্তারূপে তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ পৌর প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক আইন-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার চালান এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেস-আইনের তীব্র বিরোধিতা করেন ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। রাজনীতিতে মদনমোহন মডারেট বা নরমপন্থী ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের ১৯০৯ (লাহোর), ১৯১৮ (দিল্লী) ও ১৯৩২ (দিল্লী) অধিবেশনে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দিল্লী অধিবেশনে যোগ দিবার পথে তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ‘মর্লি-মিণ্টো

সংস্কার'কে নরমপন্থী মদনমোহন সোৎসাহে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নরমপন্থী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার চিন্তাধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা ছিল। মত-পার্থক্য সত্ত্বেও অ্যানী বেসাণ্টের 'হোম-রুল' আন্দোলন তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর পরিচালিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানাইয়াছিলেন। তিনি দাস-প্রথার তীব্র বিরোধী ছিলেন ও 'সিডিশাস্ মিটিং আইন' ও 'রাউলাট আইন'-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে রচিত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'কে জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করিয়া তিনি এ বিষয়ে কংগ্রেসের 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির বিরোধিতা করেন ও প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। এই আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা হইতেই কংগ্রেসী ন্যাশনালিস্ট পার্টির জন্ম হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশেষভাবে হিন্দুস্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখিবার নিমিত্ত লণ্ডনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যু ১২ নভেম্বর, ১৯৪৬।

মদনমোহন সর্বান্তঃকরণে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মাহাত্ম্যে ও শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি বহুলাংশে এই অকৃত্রিম বিশ্বাস ও অনুরাগ দ্বারা রঞ্জিত। এই ক্ষেত্রে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সংগঠনমূলক কীর্তি বারাণসীতে সুবিখ্যাত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকালেই তিনি তাঁহার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনাটির প্রকাশ্য ঘোষণা করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ঃ ১. সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গৌরবময় দিকগুলির অনুশীলন ; ২. কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সম্যক প্রসার ; ৩. ধর্ম ও নীতির ভিত্তিতে যুবকদিগের চরিত্র গঠন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনে রূপান্তরিত হইয়া স্থাপিত হয়। হিন্দু সমাজের প্রতি অনুরাগবশতঃ তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মহাসভার বাৎসরিক অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

দ্র *Speeches and Writings of Pandit Madan Mohan Malaviya*, Madras ; B. J. Akkad, *Malaviyaji ; Malaviya Commemoration Volume*, Banaras Hindu University, 1932 ; *'Malaviya Centenary Supplement'* North India Patrika 25.12.1961 ; *The Modern Review*, July-December, 1946 : *The Leader*, 'Obituary', 20.11.1946, Allahabad.

কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়

মালমপুরহা প্রকল্প কেরালা রাজ্যের পালঘাট জেলার মালমপুরহা নদীর উপর একটি বাঁধ দিয়া নির্মিত জলসেচ প্রকল্প। কোরাযাব নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। মালমপুরহা ভারতপুরহা নদীর শাখা। বাঁধটির দৈর্ঘ্য ১৬০১ মি. এবং জলাধারের ক্ষমতা ৮০০০ মিলিয়ন কিউ ফু.। দুইটি খালদ্বারা ৪৭৬০০ একর জমিতে জলসেচ করিবার বন্দোবস্ত আছে। জলসেচ ব্যতীত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা আছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মালয়ালম ভাষা দ্রাবিড়-গোষ্ঠীভুক্ত ভাষাগুলির অন্যতম। ইহা সম্ভবতঃ নবম শতক হইতে প্রাচীন তামিল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই তামিল ও মালয়ালম ভাষার সাদৃশ্য বিশেষ ঘনিষ্ঠ। মালয়ালম ভাষাভাষীর সংখ্যা ১৭০১৫৭৮২ (১৯৬১)। এই ভাষা কেরল বা প্রাচীন চের প্রদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত। ইহা ভারতের অন্যতম জাতীয় ভাষা।

প্রাচীন স্তরে তামিল ও মালয়ালমের সাহিত্যিক ঐতিহ্য একই। চতুর্দশ শতকের পূর্বে মালয়ালমের সাহিত্যিক নিদর্শন বিশেষ কিছু মেলে না। প্রকৃত সাহিত্য রচনার সূত্রপাত চতুর্দশ শতক হইতে। ভাষা বিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনটি সুস্পষ্ট রীতি পাওয়া যায়। যথা, সংস্কৃতানুগ রীতি 'মণিপ্রবালম্।' সংস্কৃতাদর্শ অনুকরণে গদ-পদ্য মিশ্রিত 'চম্পূ' সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছিল—যেমন পুনম্ রচিত 'রামায়ণ-চম্পূ' (১৫৫০)। নাম্বুদ্রি (ব্রাহ্মণ) ও ক্ষত্রিয় (নায়ার) সমাজে সংস্কৃত ছিল সমাদৃত ভাষা। শঙ্করাচার্যের (৮০০) জন্মভূমিও ছিল কেরল। ফলে সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ মালয়ালমে ঘটিয়াছে সর্বাধিক। এইখানেই তামিলের সঙ্গে ইহার পার্থক্য। এ ছাড়া অবশ্য তামিল প্রভাবপুষ্ট ভাষারীতিও গড়িয়া উঠিয়াছিল। মালয়ালমের সম্ভবতঃ সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 'রামচরিতম্' (১৩০০) এই রীতিতে লিখিত। খাঁটি মালয়ালম বা 'পচ্চ মালয়ালম' অবশ্য তামিল প্রভাব হইতে মুক্ত। সাহিত্য প্রধানতঃ লোকসাহিত্যনির্ভর। এইরূপ খাঁটি মালয়ালমের প্রথম পরিচয় পাই ১৫শ শতকে চেরুশ্শেরি নমপুতিরি বা 'নম্বুদ্রি' রচিত 'কৃষ্ণ প্পাট্টু' বা 'কৃষ্ণগাথা' নামক সাহিত্যে। ইনিই মালয়ালমের প্রথম পরিচিত কবি। মালয়ালমের প্রথম বড় কবি 'এরুত্তচ্ছন' (১৭শ শতক) অধ্যাত্মরামায়ণ, ভাগবত-পুরাণ মালয়ালমে অনুবাদ করেন। মালয়ালমের নিজস্ব লিপি সর্বভারতীয় প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি হইতেই উদ্ভূত। আধুনিক মালয়ালম একটি সমৃদ্ধ ভাষা। ওয়রথ চন্দু মেনন্-রচিত সামাজিক উপন্যাস

'ইন্দুলেখা' (১৮৯০) এবং তকাঝি শিবশংকর পিল্ল-র উপন্যাস 'চেস্মীন' বা 'চিঙড়ী মাছ' (১৯৫৬) আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে দুইখানি শ্রেষ্ঠ বই। কবি 'বলত্তোল' এযুগের মালয়ালম সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক নেতা ছিলেন। 'দ্রাবিড়' দ্র।

দ্র S. K. Chatterjee : *Language and literature of Modern India,* Calcutta, 1963 ; R. Caldwell : *A Comparative Grammar of the Dravidian Languages,* Madras, 1961.

পরেশচন্দ্র মজুমদার

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামক কাব্যের রচয়িতা। শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণবিজয় পড়িয়াছিলেন তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত (২।১৫) হইতে জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ের একখানি পুথিতে ইহার রচনাকাল ১৩৯৫ হইতে ১৪০২ শকের মধ্যে বলিয়া লিখিত আছে। ইহা সত্য হইলে বলিতে হয় যে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণবিজয় সমাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য পুথিতে ঐরূপ তারিখ দেখা যায় না। মালাধর বসু বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাকে সরকার হইতে গুণরাজখান্ উপাধি দেওয়া হয়। কবি-কর্ণপুর চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সত্যরাজ খান্ ও রামানন্দ বসুকে গুণরাজের বংশধর বলিয়াছেন। উঁহারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যভাব অপেক্ষা ঐশ্বর্যভাবের উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। তিনি ভাগবত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিলেও যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। মালাধরের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ভাগবতকে বাংলার জনসাধারণের নিকট সর্বপ্রথম প্রচার করিবার কৃতিত্ব মালাধর বসুর।

বিমানবিহারী মজুমদার

মালাবার উপকূল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমপ্রান্তে বিস্তৃত উপকূলের দক্ষিণ অংশ।

মালাবার উপকূল তিনটি ভাগে বিভক্তঃ ১. প্রাচীন নাইস্‌শিলা গঠিত ঘাট অঞ্চল ; ২. ল্যাটেরাইটময় নিম্ন-মালভূমি এবং পর্বতের সানুদেশ ; ৩. পলি ও বালুকাময় সমুদ্রবেলাভূমি। সমুদ্র উপকূলে দীর্ঘায়িত হ্রদ ইত্যাদি হইতে অনুমান হয়, মালাবার উপকূল সমুদ্রতল হইতে উত্থিত।

পশ্চিমঘাট পর্বতের খরস্রোতা নদীগুলি বালুকাময় উপকূলে বাধা পাইয়া ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া বহু অগভীর জলাধার ((lagoons) সৃষ্টি করিয়াছে। সংকীর্ণ জলপথ দ্বারা এইগুলি সমুদ্রের সহিত যুক্ত।

মৌসুমী বায়ু সেবিত এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বলিয়া চিরহরিৎ অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উপকূলবাসীদের প্রধান উপ-জীবিকা নারিকেলজাত দ্রব্য তৈয়ারি ও রপ্তানি, সমুদ্রে ও হ্রদে মৎস্য শিকার এবং ধানের চাষ। ল্যাটেরাইট, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, জারক ইত্যাদি এই উপকূলের খনিজ সম্পদ। উপকূলস্থ বন্দর হিসাবে কোচিন, কালিকট, তেলিচেরী, এর্ণাকুলম, ত্রিবান্দ্রম, আলেপ্পি, কুইলন উল্লেখযোগ্য। নারিকেল এবং নারিকেলজাত দ্রব্য ছাড়াও কফি, মশলা, কর্পূর ইত্যাদি প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

মালিক কাফুর প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। গুজরাত অভিযানকালে আলাউদ্দীনের এক সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসেন। কর্মনৈপুণ্য ও সামরিক দক্ষতায় কাফুর সুলতানের প্রিয়পাত্র হন এবং তাঁহার প্রভূত পদোন্নতি হয়। তিনি সমরাভিযান পরিচালিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতেও দিল্লী সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন (১৩০৭-১৩১৩)। সম্ভবতঃ তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের শেষ বয়সে তিনি সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন। তিনি সম্ভবতঃ আলাউদ্দীনের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছিলেন এবং সুলতানের নাবালক পুত্র শিহাব-উদ্দীনকে সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন, ফলে তিনি নিহত হন (১৩১৬)।

দ্র Briggs' Ferishta, Vol. I., Calcutta, 1908.

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্যস্তরভুক্ত একটি উপভাষা। 'সাহিত্যিক প্রাকৃত' হিসাবে ইহা 'আদর্শ প্রাকৃত' বলিয়া বিবেচিত হয়। ভারতের নাট্যশাস্ত্রে (৩০০ খ্রী) মাহারাষ্ট্রীর উল্লেখ নাই। দণ্ডিন্ (৬০০ খ্রী) ইহাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনদান করিয়াছিলেন। বৈয়াকরণ বররুচিও (৬০০ খ্রী) 'প্রাকৃত-প্রকাশে' অন্যান্য প্রাকৃতের সঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কাব্য ও গীতিধর্মী রচনার ভাষা হিসাবে মাহারাষ্ট্রী হইল সর্বাধিক আদৃত। সংস্কৃত নাটকের গীতগুলি সাধারণতঃ এই প্রাকৃতেই রচিত হইত—ব্যতিক্রম অবশ্য ভাস ও ভবভূতির রচনা। সংস্কৃত রচনা-বহির্ভূত

স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টিও এই প্রাকৃতে প্রচুর আছে। বিশুদ্ধ মাহারাষ্ট্রীতে রচিত প্রসিদ্ধ রচনাগুলি হইল— হালের 'গাহাসত্তসঈ' (৩য় শতক), প্রবরসেনের 'রাবণবহো'—নামান্তর 'দহমুহবহো' বা 'সেতুবন্ধ' (৫-৬ষ্ঠ শতক), বাক্‌পতিরাজের 'গউড়বহো' (৮ম শতক)।

ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে মাহারাষ্ট্রীর মূলে ভিত্তি ছিল উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল বা মহারাষ্ট্র প্রদেশ। বর্তমানে পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীনকালে এই ভাষার ব্যবহার সম্ভবতঃ কোনও অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই এই প্রাকৃতের সঙ্গে আধুনিক মারাঠীর কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পর্ক দেখা যায় না।

শৌরসেনী, মাগধী, মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতগুলি ভগিনীস্থানীয়া। কিন্তু আধুনিক মতবিশেষে মাহারাষ্ট্রী শৌরসেনীর তুলনায় অর্বাচীন। মাহারাষ্ট্রী প্রগতিশীল বলিয়াই শৌরসেনীর মত ইহাতে স্বরমধ্যগত একক স্পর্শবর্ণ রক্ষিত হয় নাই, যেমন— সংস্কৃত 'গত' শৌরসেনী 'গদ' মাহারাষ্ট্রী 'গঅ' ইত্যাদি।

মাহারাষ্ট্রীর কয়েকটি ধ্বনিগত লক্ষণ হইল— পূর্বে উল্লিখিত স্বরমধ্যগত একক স্পর্শবর্ণের লোপ, সংস্কৃত 'ক্ষ' ও 'অ' ধ্বনির যথাক্রমে 'চ্ছ' ও 'প্প' ধ্বনিতে পরিণতি। যথা—সংস্কৃত 'ইক্ষু' 'আত্মন্', মাহারাষ্ট্রী 'উচ্চু', 'অপ্পা', কিন্তু শৌরসেনী 'ইক্‌খু', 'অত্তা' ইত্যাদি।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

মাহিষ্মতী পৌরাণিক নগরী। যদুকুলের হৈহয়বংশের, রামায়ণে কার্তবীর্যার্জুনের এবং মহাভারতে নীলধ্বজের রাজধানী। অগ্নি কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া নাম অগ্নিপুর। নিকটে ঋক্ষবন্ত পর্বত একটি কুলাচল (হরিবংশ)। কৌটিল্য বলেন হৈহয়বংশের পূর্বে এখানে নাগবংশ ছিল।

অবন্তীরাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম মালবের রাজধানী উজ্জয়িনী, প্রাচীন অশ্মক বা মধ্য ও দক্ষিণ মালবের রাজধানী মাহিষ্মতী। বৌদ্ধশাস্ত্রে অবন্তী দক্ষিণাপথের কেন্দ্র মহিস্সতীর বহু উল্লেখ আছে। কাব্যমীমাংসা বলেন মাহিষ্মত্যাঃ পরতঃ দক্ষিণাপথঃ। কালিদাসের রঘুবংশে ইহা রেবাতীরে অনুপরাজ্যের রাজধানী। অনর্ঘরাঘবে ও শিশুপালবধে ইহা চেদী রাজধানী। শংকরদিগ্বিজয়ে এখানেই শংকর ও মণ্ডলের বিচার বর্ণিত। রাজপুত চারণগীতিতে ইহা চৌহানজাতির আদি পীঠস্থান। পার্জিটার বলেন মাহিষ্মতী ও মান্ধাতা অভিন্ন। কিন্তু (১৯৪৪) উৎখননের ফলে নিমার অঞ্চলে ইন্দোর হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে নর্মদাতীরে মহেশ্বর বা মহেশে পুরাতন নগরী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহাই হিউ-এন-ৎসাঙ্ বর্ণিত মাহিস্সফা (পু) (লা)।

নীলা দে

মাহী পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত নদী। টলেমীর 'মোফিস' এবং পেরিপ্লাসের 'মাইস'। দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬৩.৫০ কিলোমিটার; নদী-বিধৌত এলাকা প্রায় ৪৪২০০ বর্গ কিলোমিটার। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের নিকট আমঝেরা (২২°৫২′ উত্তর ৭৫°৫′ পূর্ব হইতে উত্থিত হইয়া ১৬১.১ কিলোমিটার পথে) গোয়ালিয়র, ধার, মাবুয়া, রতলম ও সৈলানার মধ্য দিয়া রাজপুতনায় পড়িয়া উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত। রাজস্থান হইতে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের ৪৮.৩ কিলোমিটার সন্নিকটে নদীটি ব্রোচ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। নদীটির জল পার্শ্বস্থ স্থলভাগ হইতে বহু নিম্নে অবস্থিত হওয়ায় সেচের উপযোগী নহে। স্থানীয় ভীল এবং কোল সম্প্রদায় নদীটিকে জননী হিসাবে গণ্য করেন।

রাজপুতনার অভ্যন্তরে সোম ও মাহীর সংগমস্থলে বিখ্যাত মহাদেও মন্দিরটি অবস্থিত। প্রতি বৎসর এই স্থানে মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মাহেশ হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার সদরে মাহেশ গ্রামের জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মেলা বাংলাদেশের বৃহত্তম মেলা। এই রথ জগন্নাথদেবের রথের ন্যায় ৭০ ফুট উচ্চ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্যতম পার্ষদ কমলাকর পিপলাই কর্তৃক এই রথযাত্রা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাবলী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী উপন্যাসে 'মাহেশের সুখের মহামেলার' উল্লেখ আছে।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

মাহেশ্বরী সম্প্রদায় মহেশ্বর হইতে উৎপন্ন জাতি বা সম্প্রদায়। কিংবদন্তী অনুসারে খাণ্ডেলার অধিপতি চৌহানবংশীয় রাজা সুজান সিংহ ব্রাহ্মণ্যধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্মাবলম্বনপূর্বক যজ্ঞাদি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলে ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তিনি ৭২ জন অনুগামী সহ জড়ে রূপান্তরিত হন এবং পার্শ্ববর্তী রাজন্যরা এই রাজ্য অধিকার করেন। তাঁহার স্ত্রী তপস্যা দ্বারা শিব-পার্বতীকে পরিতুষ্ট করিয়া অনুগামিসহ সুজান সিংহকে পুনর্জীবিত করেন এবং শিব তাঁহাদের বৈশ্য জাতিতে রূপান্তরিত করেন। সুজান সিংহের ৭২ জন অনুগামী হইতে সোনী, সোমানী, জাখেটিয়া ইত্যাদি মাহেশ্বরী জাতির

৭২টি থাপ বা শাখার উদ্ভব। ই'হারা কেবলমাত্র শিবের উপাসক নহেন, শিব ভিন্ন কৃষ্ণ বা বিষ্ণুও তাঁহাদের উপাস্য। ব্যবসায়ই ই'হাদের প্রধান উপজীবিকা।

দ্র শঙ্করলাল গগরাণী, ইতিহাস মহেশ্বরী বংশোৎপত্তি (হিন্দী)।

গণেশ লালওয়ানী

ম্যাক, জন (১৭৯৭-১৮৪৫ খ্রী) বাংলাদেশে মিশনারীদের শিক্ষা প্রয়াসে সহায়তা করিতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ডের অনুরোধে বিজ্ঞানের শিক্ষকরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য জন ম্যাক জন্মস্থান স্কটল্যান্ডের এডিনবরা হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছান (১৮২১ খ্রী)। এখানে তিনি শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বাংলাভাষায় 'কিমিয়া বিদ্যার সার' রচনা করেন। 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সহিতও যুক্ত ছিলেন।

১৮৩৪ খ্রী মিশনের কাজে আসাম পর্যটনকালে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৩৯ খ্রী)। কলেরায় তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৪৫ খ্রী)।

দ্র সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, ৯ম খণ্ড, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

অরুণ সান্যাল

ম্যাকডোনেল, আর্থার অ্যান্টনি (১৮৫৪-১৯৩০ খ্রী) বিহারে মজঃফরপুরে জন্ম (১১ মে, ১৮৫৪ খ্রী)। শিক্ষালাভের জন্য ইংল্যান্ডে গমন (১৮৬১ খ্রী)। অকসফোর্ড, ড্রেসডেন, গোটিঙ্গেন ও লাইপ্‌ৎসিগে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন ও লাইপ্‌ৎসিগ হইতে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ। অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান (১৮৮৮ খ্রী) বোডেন প্রফেসর (১৮৯৯-১৯২৬ খ্রী)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ভাষণ দিতে (১৯২২-২৩ খ্রী) ভারতে আসেন। মৃত্যু ১৮ ডিসেমবর, ১৯৩০ খ্রী। ম্যাকডোনেলের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: Vedic Mythology (1897); Vedic Grammar (1910); Vedic Index of names and Subjects with A. B. Keith (1912).

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

ম্যাকিয়াভেলি, নিকোলো (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রী) ইতালীয় লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত পরিবারে। পিতা বার্নার্ডো। ১৪৯৮-১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাকিয়াভেলি ফ্লোরেন্সের প্রজাতান্ত্রিক সরকারে গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত ও দূত হিসাবে বহু রাজদরবারে প্রেরিত হন। ফ্লোরেন্সে প্রজাতন্ত্রের পতন এবং মেদিসি শাসন পুনঃ প্রবর্তিত হইলে তিনি পদচ্যুত হন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তিলাভান্তে সাহিত্য, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন।

তাঁহার সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইল প্রিন্সিপে' বা 'রাজকুমার' ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও, ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ফ্লোরেন্সের ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ম্যাকিয়াভেলির মতে রাজধর্মে নীতিশাস্ত্রের স্থান নগণ্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোনও উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং রাজ্যশাসন বলপ্রয়োগ ও ছলচাতুরীর উপর নির্ভরশীল। অনেকের মতে ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীর স্বেচ্ছাচারী রাজার আদর্শে ম্যাকিয়াভেলির 'রাজকুমার'-এর চরিত্র অঙ্কিত। বহুধাবিভক্ত ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একজন স্বেচ্ছাচারী নৃপতির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তবে তিনি প্রাচীন রোমক প্রজাতন্ত্রের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

ম্যাকিয়াভেলি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম পুরোহিত। ইওরোপীয় নবজাগৃতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাষ্ট্রনীতিকে ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্র হইতে পৃথক্ করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচারের প্রয়াস পান।

অংশু দত্ত

এডিনবরায়

ম্যাক্সওয়েল, জেম্‌স ক্লার্ক (১৮৩১-৭৯ খ্রী) প্রসিদ্ধ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী। এডিনবরায় জন্ম। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় র‍্যাংলার এবং স্মিথ পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনের কিংস কলেজে পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতিষের প্রধান অধ্যাপক এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ-এ এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল ফিজিক্‌স-এর অধ্যাপক হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে তথায় ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হয়। 'শনিবলয়ের স্থায়িত্ব' প্রবন্ধ লিখিয়া এডাম্‌স্ পুরস্কার লাভ (১৮৫৯ খ্রী) করেন। তাঁহার প্রণীত 'তাপতত্ত্ব' এবং 'পদার্থ ও গতি' পুস্তকদ্বয় সুপরিচিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ট্রিটিজ অন ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম' (১৮৭৩ খ্রী) যাহা তড়িৎ ও চুম্বক-বিজ্ঞানে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কামিনীকুমার দে

ম্যাক্সমূলার ফ্রীডরিখ্ (১৮২৩-১৯০০ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ্। ৬ ডিসেম্বর জন্ম প্রুশিয়ার দেসাউ নগরীতে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

লাইপ্‌ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ এবং বার্লিনে বোপের নিকট ও প্যারীতে বুর্নুফের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে আগমন। প্রুশিয়ার রাষ্ট্রদূত ব্যারন বুনসেন্‌ ও হোরেস হেমান্‌ উইলসনের মধ্যস্থতায় ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক তাঁহার সম্পাদিত সমগ্র ঋগ্‌বেদ সংহিতা, সায়ন-ভাষ্য সহ ছয়খণ্ডে প্রকাশ (১৮৪৯-১৮৭৩)। ইহা তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইংল্যান্ডে তিনি অক্‌স্‌ফোর্ডে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমৃত্যু তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। "সেক্রেড বুক্‌স অফ দি ঈস্ট" গ্রন্থমালায় সমকালীন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়তায় প্রাচ্যের ধর্ম সংক্রান্ত বিশিষ্ট গ্রন্থসমূহের ইংরেজী অনুবাদ সম্পাদন ও ৫১ খণ্ডে প্রকাশ। আধুনিক ভারতের প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার তিনি মর্মগ্রাহী ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল।

বিদ্যাচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইংল্যান্ড ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্মান পান। তাঁহার অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থঃ— Rig-veda-Pratisakhya, Text with German Trans, (1859-69); The Six Systems of Indian Philosophy (1899); The Science of Language; 2 Vols, (1861-63) Deutsche Liebe (1857); Auld Lang Syne, Vol. I (1898), Vol. II (1899); India: What can it Teach us? (1883); Chips from a German Workshop: Vols. I-IV (1867-1875); Three Lectures on the Vedanta Philosophy (1894); Kant's Critique of Pure Reason (Eng. Trans.) (1881); A History of Ancient Sanskrit Literature (1859).

দ্র *The Life and Letters of F. Maxmueller*, Ed. by Georgina-Maxmueller 2 Vols. London, 1902.

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

মিকির আসাম রাজ্যে শিবসাগর, নওগাঁ, কামরূপ, খাসিয়া পর্বত ও উত্তর-কাছাড় এবং মিকির পর্বতশ্রেণীর অধিবাসী উপজাতি (সংখ্যা ১৫৪৮৯৩, ১৯৬১ খ্রী)। মঙ্গোলবংশ সম্ভূত। ভাষায় কুকি ও সংস্কৃতিতে কয়েকটি নাগা উপজাতির সহিত তুলনীয়। আদি বাসস্থান জানা নাই। তবে অঙ্গামি ও কাচ্চা নাগাদের উৎপীড়নের ফলে জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং পরে আহোম রাজবংশের অধীনে ব্রহ্মপুত্রের সমতলভূমিতে আশ্রয়-গ্রহণ করে।

মিকিরেরা শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী জাতি। এক অংশ পর্বতে জুম প্রথায় চাষ করে। অপরাংশের সহিত আসামের কৃষিজীবী জাতিবৃন্দের প্রভেদ প্রায় নাই। দাঁয় ও অসমীয়া ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁত-শিল্পের জন্য খ্যাতি আছে।

পূর্বকালে মিকির জাতির মধ্যে যুবকবৃন্দের স্বতন্ত্র সংস্থা ছিল, দুঃখের বিষয় উহা প্রায় লুপ্ত হইতে বসিয়াছে।

দ্র S. Barkataki: *Tribes of Assam*, New-Delhi, 1969.

নির্মলকুমার বসু

মিকেলাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রী) ইতালীয় রেনেসাঁসের বিরাট পুরুষ, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের অন্যতম, একাধারে ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, স্থপতি ও কবি। জন্মস্থান কাপ্রেস, টাস্‌কানি। ফ্লোরেন্সে ঘির্‌-লান্ডায়োর চিত্রশালায় শিক্ষালাভের পর হইতে তাঁহার কর্মজীবনকে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। রোমের সেণ্ট পিটরের 'পায়েতা' এবং ফ্লোরেন্সের আকাদেমিতে রক্ষিত 'ডেভিড' তাঁহার প্রথম পর্যায়ের (১৪৮৮—১৫০৫ খ্রী) শ্রেষ্ঠ দান। দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৫০৫—১৫১২ খ্রী) রোমের সিস্টাইল চ্যাপেলের সিলিং-এর ভিত্তিচিত্র রচনা করেন। ইহাতে তিনি বাইবেলোক্ত সৃষ্টি, মানুষের পতন ও নোয়া কাহিনী ৩৪০টি পূর্ণাবয়ব মনুষ্যমূর্তির মাধ্যমে রূপায়িত করিয়াছেন। তৃতীয় পর্যায়ে (১৫১২—১৫২১ খ্রী) তিনি পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সমাধিসৌধ রচনায় ব্যাপৃত থাকেন; মসেস-এর মূর্তিটি এই পর্যায়ের সৃষ্টি। চতুর্থ পর্যায়ে (১৫২১—১৫৩৪ খ্রী) ফ্লোরেন্সে মেডিচিদের সমাধিসৌধ এবং পঞ্চম পর্যায়ে (১৫৩৪—১৫৬৪ খ্রী) রোমে সেণ্ট পিটরের সৌধ রচনা করেন। তাঁহার সকল সৃষ্টিতে মানবিকতাবাদের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

দ্র G. Vasari, *Lives of the Painters, Sculptors and Architects*, London, 1927; B. Berenson, *Italian Painters of the Renaissance*, London, 1952.

অশোক ভট্টাচার্য

মিজো আসামের দক্ষিণতম জেলার অধিবাসী উপজাতি। পূর্বনাম লুসাই, সংখ্যা (১৯৬১ খ্রী) ২২২২০২। উত্তর ব্রহ্মের চীন উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। মণিপুর, ত্রিপুরা ও কাছাড়ে সম্পর্কিত কিছু উপজাতি বাস করে। শারীরিক গঠনে মঙ্গোলীয়।

জুমচাষ প্রধান উপজীবিকা। প্রচুর কমলালেবুর

চাষ হয় এবং আসামে চালান যায়। পূর্বে আরাকানের সহিত এই অঞ্চলের ব্যবসায় চলিত। তাঁত ও বাঁশের কাজ শিল্পচাতুর্যের জন্য সর্বত্র সমাদৃত।

শতকরা ৯০ জন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী (আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন)। শিক্ষিতের হার ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। রাজনৈতিক চেতনাও সতেজ। একশ্রেণী যেমন শিক্ষা ও ব্যবসায়ে অগ্রসর, অপর এক সংখ্যালঘিষ্ঠ দল মার্চ ১৯৬৬ হইতে স্বাধীনতালাভের জন্য বিদ্রোহে লিপ্ত।

জেলা কাউন্সিল স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু জেলার পশ্চিমাংশে পউঙ্গ ও লাখেরদের সহিত মিজোদের সদ্ভাব না থাকায় আর একটি কাউন্সিল স্থাপিত হইয়াছে।

নির্মলকুমার বসু

মিথিলা রাজা জনকের স্থানরূপে খ্যাত ('জনক' দ্র)। প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের রাজধানী। শতপথব্রাহ্মণ অনুসারে এই বংশের আদি রাজা 'মাথব বিদেঘ' সদানীরা অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্বাঞ্চলে যজ্ঞাগ্নি বহন করিয়া আনিয়াছিলেন—তাঁহারই নামে বিদেহের নামকরণ। রামায়ণ মতে আদি রাজা নিমির পুত্র মিথি—সম্ভবতঃ ইঁহারই নামে মিথিলার নামকরণ। আলেকজাণ্ডার কানিংহামের মতে প্রাচীন মিথিলা নগরী নেপালে অবস্থিত বর্তমান জনকপুর। অন্য মতে ত্রিহুতই বিদেহ এবং বর্তমান দ্বারভাঙ্গাই প্রাচীন মিথিলা নগরী। বিদেহের পূর্বদিকে কৌশিকী (কোশি), দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে সদানীরা (গণ্ডক বা রাপ্তি) ও উত্তরে হিমালয় ছিল। এই রাজ্য ৩০০ যোজন বিস্তৃত ও এখানে ১৫০০০ গ্রাম ও ১৬০০০ ভাণ্ডাগার ছিল। বৃজি সঙ্ঘে এক সময়ে লিচ্ছবি ও মিথিলা সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিত।

ইহার বহু পরে কর্ণাটক রাজবংশ মিথিলায় একাদিক্রমে খ্রীষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে শেষ রাজা হরিসিংহ মুসলমান আক্রমণের পূর্বেই নেপাল দখল করেন ও নেপালের একটি জঙ্গলদুর্গ হইতে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু ত্রিহুত গিয়াসুদ্দীন তোগলকের অধিকারে আসে (১৩২৫ খ্রী) ও হরিসিংহ ও তাঁহার বংশ নেপালে রাজত্ব করেন। ইহার ২৮ বৎসর পরে ফিরোজ তোগলক ত্রিহুতে নূতন হিন্দুবংশের পত্তন করেন। নূতন সুগোণ ব্রাহ্মণবংশ সম্বন্ধে সমসাময়িক পদকর্তা বিদ্যাপতি যাহা বলিয়াছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাহাতে অনেক অসংগতি দেখাইয়াছেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা শিবসিংহ। তিনি ত্রিহুতে স্বাধীন হন ও সুবর্ণমুদ্রা প্রচার করেন। এই বংশ ১৩৫৩—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর বঙ্গাধিপ নসরৎ শাহ্ ইহা জয় করেন। ইহার পরে মিথিলার আর স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই।

দ্র R. C. Majumdar, ed. *The History and Culture of the Indian People,* Vol. V & VI, Bombay.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মিথ্র আবেস্তার দেবতা মিথ্র, পারসিক মিহ্‌র (Mihr) ও বৈদিক মিত্র একই আদর্শ হইতে উদ্ভূত। আবেস্তার মিথ্র সূর্যের প্রতীক, মৈত্রীর দেবতা। এশিয়া মাইনরের বোখাজ কোই লেখে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দী) মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের নাম পাওয়া যায়। লিখিত অনুশাসনে মিত্র বা মিথ্রের ইহাই প্রথম উল্লেখ। এই দেবতার উপাসনা খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ও কয়েক শতাব্দী পরে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কনিষ্কের মুদ্রায় একটি মূর্তি ও তাহার পার্শ্বে লিখিত তাঁহার নাম মিইরো (Miiro) বা মিথ্র পাওয়া যায়। মন্দশোর লেখ, বুলন্দ শহরের তাম্রপট্ট এবং মধেরা, গোয়ালিয়র ও মুলতানের সূর্যমন্দির হইতে ভারতে সূর্যোপাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। মিথ্র দেবের পূজায় নারীগণের অধিকার ছিল না।

দ্র R. G. Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and other Minor Religious Systems,* Poona, 1928.

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ তবকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতে মুসলমান রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ করিয়া নাসিরুদ্দীনের রাজত্বকালের বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মিন্‌হাজউদ্দীন সুলতান নাসিরুদ্দীনের রাজত্বের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

মিন্‌হাজ পাঞ্জাবের উচ্ শহরে ফিরোজি বিদ্যায়তনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইলতুৎমিস উচ্ শহর অধিকার করিলে (১২২৮) তাঁহার সহিত দিল্লী আসেন। ইলতুৎমিস তাঁহাকে গোয়ালিয়রের যাজক নিযুক্ত করেন। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর রাজিয়া সুলতান হইলে মিন্‌হাজ পদত্যাগ করেন। তবকৎ-ই-নাসিরিতে রাজিয়ার অনেক গুণপনার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনও মহিলা সুলতানের পদ অধিকার করিবেন, ইহা তাঁহার পছন্দ হয় নাই। বহরমের রাজত্বকালে মিন্‌হাজ দিল্লী শহরে কাজী নিযুক্ত হন। বহরমের মৃত্যু হইলে মিন্‌হাজ এই পদ ত্যাগ করেন। প্রায় তিন বৎসর পরে মিন্‌হাজ আবার নাসিরি কলেজের অধ্যক্ষ ও গোয়ালিয়রের কাজী নিযুক্ত হন। সুলতান নাসিরুদ্দীন তাঁহাকে খুব অনুগ্রহ করিতেন। সুলতানের নাম অনুসারে তিনি তাঁহার

গ্রন্থটির নামকরণ ও উহা তাঁহাকেই উৎসর্গ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকালে মিন্হাজের মৃত্যু হয়। Elliot ও Dowson-কৃত গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে মিন্হাজ তাঁহার গ্রন্থে বলবনের যেরূপ প্রশস্তি করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে বলবনের রাজত্বকালে তাঁহার গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়। মেজর র‍্যাভের্টির মতে এই বিশ্বাসের কোনও ভিত্তি নাই। পূর্ববর্তী সুলতান নাসিরুদ্দীনের সময়ই মিন্হাজের গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হয়।

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে গ্রন্থটির বিশেষ আকর্ষণ এই যে মিন্হাজ দুই বৎসর বা ততোধিক সময় বাংলাদেশে ছিলেন এবং বাংলাদেশের অনেক খবর তাঁহার ইতিহাসে আছে। লক্ষ্মণসেনের সময় সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক নদিয়া আক্রমণের বিবরণ প্রধানতঃ তাঁহার ইতিহাসেই পাওয়া যায়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীর অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিন্হাজের ইতিহাসের উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক রচনায় আছে। স্বর্ণকুমারী দেবী "দীপনির্বাণ" উপন্যাসে মিন্হাজ বর্ণিত পৃথ্বীরাজের কাহিনী হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্র রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, ২ খণ্ড, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ, *Tabakat-i-Nasere*, tr. Ravertv. Calcutta, 1953 ; Elliot and Dowson, *The History of India as told by its own Historians,* Vol. 2.

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

মিনাণ্ডার যবন (গ্রীক) মিনাণ্ডার ব্যাকট্রিয়ার রাজা। রাজধানী শাকল বা শিয়ালকোট। ঐতিহাসিকগণের মতে মিলিন্দপঞ্‌হোর রাজা মিলিন্দ ও মিনাণ্ডার অভিন্ন। ক্ষেমেন্দ্রের অবদানকল্পলতায় 'মিলিন্দের' উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ থের নাগসেনা ও মিলিন্দ সমসাময়িক ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিনাণ্ডার আলেকজাণ্ডার অপেক্ষা অধিক জাতিকে জয় করিয়াছিলেন, যদি তিনি সত্যই হাইপ্যানিস (বিয়াস) ও ইসমান নদী অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইসমান সম্ভবতঃ যমুনা বা ত্রিসামা বা ইক্ষুমতী। কেহ কেহ বলেন মিনাণ্ডারের রাজ্য আফগানিস্তানের কিয়দংশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, কাথিয়াওয়াড় ও সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশের কিয়দংশ লইয়া গঠিত। প্লুটার্কের মতে মিনাণ্ডার ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। মিনাণ্ডার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও অর্হৎ হন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ১১৫-৯০।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মিরি, মিশিঙ আসামে লখিমপুর শিবসাগর ও দরং জেলার অধিবাসী ইন্দো-মঙ্গোলীয় জাতি। সংখ্যা ১৩৬৫৯৮ (১৯৬১ খ্রী)। উত্তর পার্বত্যভূমিতে জুম চাষ অবলম্বনে বসবাসকারীদের নাম মিরি। ব্রহ্মপুত্রের সমতলভূমিতে লাঙ্গল ব্যবহারক চাষীদের নাম মিশিঙ। হিমালয়ের আদি, দাফ্‌লা, কুটিয়া প্রভৃতি আদিবাসীর সহিত মিরি বা মিশিঙ সমজাতীয় মনে হয়। অনুমান, আহোমরাজ্যকালে ১৩শ শতাব্দী হইতে ইহারা নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে।

মিশিঙগণ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কৃষক। বন্যা বিধৌত নদীতীরে খোঁটার উপরে মাচানে বিস্তীর্ণ ঘর নির্মাণ করিয়া বসবাস করে। ঘরগুলি দৈর্ঘ্যে ১৫০/২০০ হাত। কোনও কোনও যৌথ পরিবারে ৭০/৯০ জনের বাস।

মিশিঙগণের মধ্যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি নাই।

গৃহমধ্যে স্বীয় ভাষা ব্যবহার করিলেও মিশিঙগণ অসমীয়াভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া বহু উচ্চপদ পাইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম ইঁহাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে নাই, অধিকাংশই হিন্দু বা বৈষ্ণব।

মাধবচন্দ্র গোস্বামী

মির্জা নাথান মির্জা নাথান বা আলাউদ্দীন ইস্‌ফহানী, মোগল নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মালিক আলী বা ইহ্‌তিমাস্ খাঁর পুত্র। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলা ও আসামের সকল যুদ্ধেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন ও প্রতাপাদিত্য ও মুসা খাঁর সহিত যুদ্ধ করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে শিতাব খাঁ উপাধি দেন। তিনি ফার্সীতে বহারিস্তান-ই-ঘয়বী রচনা করিয়া তাঁহার সকল অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকে বঙ্গ, বিহার, কুচবিহার ও কামরূপের ১৬০৮ হইতে ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত। এই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রচলিত কাহিনী ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে ধারণার সংশোধন আবশ্যক। প্রাঞ্জলতায় ও ভাষার উৎকর্ষে বহারিস্তান সাহিত্যপদবাচ্য।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মিল, জন স্টুয়ার্ট (১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী) ইংরেজ পণ্ডিত, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক জেম্‌স মিলের পুত্র। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মিল নিজকালে ইংরেজী পণ্ডিতসমাজের নেতা ছিলেন। ১২ বৎসর বয়সেই পাণ্ডিত্যখ্যাতি অর্জন করেন। অর্থনীতির ক্লাসিক্যাল ধারার ইনিই শেষ প্রধান পুরুষ।

মিল প্রথম বয়সে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত কঠোর বেন্থামীয় মতবাদ অনুসরণ করিলেও পরিণত চিন্তায় তাঁহার নিজস্ব সামাজিক সংবেদনশীলতার সহায়তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করেন।

কর্মক্ষেত্রে মিল ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'ইন্ডিয়া হাউস'-এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও আজীবন সাংবাদিকতা ও গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত থাকেন।

গণতন্ত্রকে সর্বতোভাবে সমর্থন করিলেও এই ব্যবস্থার বিপদ সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন। কঠোর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত কিছু বিরুদ্ধ হইলেও শ্রমিক সংগঠনকে সমর্থন করিতেন। সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করা কর্তব্য এই মন্তব্যও করেন। নারীসমাজের শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের পক্ষে মিলের মতামত অত্যন্ত সমবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ। মানবসমাজের ইতিহাসে ব্যক্তির অবদানই প্রধান এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই ব্যক্তিত্বস্ফুরণে সহায়ক হওয়া উচিত ইহাই মিলের মতবাদের মূলসূত্র। মিলের প্রধান গ্রন্থাবলী : *System of Logic,* 1843 ; *Principles of Political Economy,* 1848 ; *On Liberty,* 1859 ; *Considerations on Representative Government,* 1860 ; *Utilitarianism,* 1863 ; *Subjection of Women,* 1869; *Autobiography,* 1873.

সাধনা দাস

মিলটন, জন (১৬০৮-১৬৭৪) ইংরেজ মহাকবি। পিউরিটান ও রাজতন্ত্রবিরোধী। শিক্ষা সেন্ট পলস্ স্কুলে ও ক্রাইস্ট কলেজ, কেম্ব্রিজে (১৬২৫-৩২ খ্রী)। একবৎসরকাল ইতালী ভ্রমণ। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুস্তিকা রচনা। ক্রমওয়েলের রাজত্বে লাতিন সচিব (১৬৪৯ খ্রী)। কমনওয়েলথের বক্তব্য প্রচার। চক্ষুঃপীড়া, অন্ধ (১৬৫২ খ্রী)। রেস্টোরেশন অবধি কাজ (১৬৬০ খ্রী)। অতঃপর কাব্যরচনায় বাকি জীবন অতিবাহন।

ছাত্রাবস্থায় *On the Morning of Christ's Nativity* (১৬২৯ খ্রী) ও Shakespeare (১৬৩০ খ্রী) রচনায় তাঁহার কবি প্রতিভা স্বীকৃত। *L'Allegro, Il Peuseroso* (১৬৬২ খ্রী) ; Comus (১৬৩৪ খ্রী) ; Lycidus (১৬৩৭ খ্রী) রচনায় কবিখ্যাতি প্রচার। রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া বিতর্কমূলক গদ্য রচনায় মনোযোগ। এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবিষয়ক *Areopagitica* (১৬৬৪ খ্রী)। রাজরোষ হইতে মুক্তি পাইয়া অন্ধ অবস্থাতেই *Paradise Lost* ১২ সর্গে রচনা (১৬৬৭ খ্রী)। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, ভগবানের বিরুদ্ধে শয়তানের বিদ্রোহ ও অ্যাডাম ও ঈভের পতনের কাহিনী। বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রভাব সুস্পষ্ট। *Paradise Regained* ও গ্রীক-আদর্শে রচিত নাটক *Samson Agonistes* ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নাটকে ও *On His Blindness,* এবং আরও কয়েকটি অনবদ্য সনেটে তাঁহার অন্তরের দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়িয়াছে।

অনিমা মুখোপাধ্যায়

মিহিরকুল হূনরাজ তোরমানের পুত্র। আনুমানিক ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিহিরকুল সম্ভবতঃ সুং ইউনের (৫২০ খ্রী, গান্ধাররাজ ও কস্মাস ইন্ডিকোপ্লেউস্টেসের উল্লিখিত ৫৪৭ খ্রী) শ্বেত হূনদের রাজা গলাস। গোয়ালিয়র শিলালেখ হইতে (৫৩০ খ্রী) জানা যায়, রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে তাঁহার রাজত্ব গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিউএন-ৎসাঙের বর্ণনায় জানা যায়, তাঁহার রাজধানী শাকল বা শিয়ালকোট। ভারতজয়ে অগ্রসর হইলে তিনি মালবরাজ যশোধর্মনের নিকট পরাজিত হন (মন্দশোর শিলালিপি)। পরে পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলে গুপ্তরাজ বালাদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করেন। এই বালাদিত্য সম্ভবতঃ পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য, অথবা গুপ্তরাজ ভানুগুপ্ত। ইহার এক বৎসরের মধ্যে মিহিরকুলের মৃত্যু হয়। মিহিরকুল অত্যন্ত নৃশংস ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মীননাথ নাথধর্ম, নাথসাহিত্য দ্র

মীমাংসা পূর্বমীমাংসা দ্র

মীমাংসা দর্শন পূর্বমীমাংসা দ্র

মীরকাশিম মীরজাফরের কন্যা ফতেমা বেগমের সহিত বিবাহ ও রাজদরবারে ক্রমোন্নতি।

পলাশির যুদ্ধের পরে মীরজাফরের আদেশে সিরাজকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বন্দী করেন। মীরজাফর কর্তৃক রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত, পরে পূর্ণিয়ার ফৌজদার হন। নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া নবাব হন (অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রী)।

তিনি যোগ্য ও সুদক্ষ শাসক ছিলেন। শাসনে সুশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পরিশ্রম, ধৈর্য ও নিপুণতার পরিচয় দেন। প্রতারণা, দুর্নীতি ও কার্যে গাফিলতির জন্য কঠিন শাস্তি প্রদান করিতেন। কঠোর মিতব্যয়িতা দ্বারা এবং নানা উপায়ে, এমন কি, বলপূর্বক উৎপীড়নের দ্বারাও অর্থাভাব দূর করেন। তাঁহার অতিরিক্ত নির্দয় ব্যবহার ও অর্থলোলুপতা চারিদিকে অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরেজদের প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া যুদ্ধাস্ত্রের কারখানা স্থাপন এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে নিজবাহিনী সংগঠন করেন।

বাংলাদেশে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার যে সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহা তাহাদের ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় অনুগৃহীত কর্মচারীরাও অবৈধভাবে লইতে থাকে। ইহাতে নবাবের ও দেশীয় বণিকদের ভীষণ আর্থিক ক্ষতি হয়। ইংরেজ গভর্নরের নিকট হইতে ইহার প্রতিকার না হওয়াতে তিনি দেশীয় বণিকদের উপর হইতেও এই বাণিজ্যশুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহা ন্যায়সংগত, কিন্তু স্বার্থে আঘাত পড়ায় ইংরেজদের সহিত বিরোধ ঘনীভূত হয় ও যুদ্ধ বাধে। কাটোয়া, গিরিয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬৩ খ্রী) অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার, সুজাউদ্দৌলার ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলমের সম্মিলিত বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকটে পরাজিত হয় (২৩ অক্টোবর ১৭৬৪ খ্রী)। পলাতক অবস্থায় মৃত্যু হয় (১৭৭৭ খ্রী)।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মীরজাফর নাম আলী খাঁ। জনাব আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনী শাহ খানমের সহিত বিবাহ ও ফলে ক্রমোন্নতি হয়। পরে বখ্‌সীর (কার্যতঃ সৈন্যাধ্যক্ষের) পদও প্রাপ্ত হন। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আলীবর্দীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

সিরাজের বিরোধী আত্মীয়-স্বজন ও কর্মচারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। নবাব কর্তৃক পদচ্যুত হন। মীরমদন বখ্‌সী-পদে নিযুক্ত হন (এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রী)। নবাব হইলে ইংরেজদের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সর্তে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তাহাদের সহিত গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ২৩ জুন ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ হইতে বিরত থাকেন এবং সেইদিন নবাবকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে ও অপরদিকে ইংরেজদিগকে নবাবেব শোচনীয় অবস্থার কথা জানাইয়া আক্রমণের পরামর্শ দেন। ফলে সিরাজের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়।

২৯ জুন ক্লাইভের সহায়তায় তিনি নবাব হইলেও ইংরেজরাই কার্যতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। শাসনে অক্ষমতা, বিদ্রোহ দমন ও অন্যান্য অনেক কার্যে ইংরেজদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং তাহাদের ক্রমাধিক আর্থিক দাবির ফলে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হয়। ইংরেজদের আর্থিক দাবি পূরণে অক্ষমতা ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদের সহিত ষড়যন্ত্র প্রভৃতি কারণে মীরকাশিমের সহিত মিলিত ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট দ্বারা মীরজাফর গদিচ্যুত ও মীরকাশিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (১৭৬০ খ্রী)। ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের বিরোধ ও যুদ্ধ চলিলে তাহারা মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী পদে বসাইয়া কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আদায় করে।

কুষ্ঠরোগে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭৬৫ খ্রী)।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মীরজুমলা মীরজুমলার প্রকৃত নাম মহম্মদ সৈয়দ। তিনি পারস্য হইতে গোলকুণ্ডায় আসেন। হীরকের ব্যবসায়ে বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান্‌ হন। গোলকুণ্ডার সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহ তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। সুলতানের সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হওয়ায় তিনি মোগল সরকারে যোগ দেন এবং সম্রাট শাহজাহান তাঁহাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন।

ঔরংগজেব তাঁহাকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (১৬৬০ খ্রী)। কুচবিহার ও আসামে সকল সামরিক অভিযান পরিচালিত করিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্যে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পথে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৩ খ্রী)।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মীরমদন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি। পলাশীর যুদ্ধে বীরত্ব ও কর্তব্যপরায়ণতা দেখাইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন।

সমসাময়িক ইতিহাস সিয়ার-উল মুতাখেরিন হইতে জানা যায়, তিনি হোসেনকুলি খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হাসান উদ্দীন খাঁর অধীনে ঢাকায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও বিশ্বস্ততার কথা নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা জানিতেন এবং মীরজাফরকে সর্বোচ্চ সৈন্যাধ্যক্ষপদ (বখ্‌সী) হইতে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে মীরমদন অধীনস্থ সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত ও পরিচালিত

করিয়া শত্রুসৈন্যকে আক্রমণ করেন কিন্তু শত্রুর কামানের গোলায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২২ খ্রী) বঙ্কিম-যুগের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। নদিয়া জেলার লাহিড়ী-পাড়া গ্রামে জন্ম। ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে ও দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করেন। সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁহার রচনা আছে। তিনি 'আজীবন্ নেহার' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদনা করেন (১৮৭৪ খ্রী)। তাঁহার ২৫টি গ্রন্থের মধ্যে 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫ খ্রী), 'আমার জীবনী' (১৯০৯-১০ খ্রী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধীর দে

মীরাট উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মীরাট বিভাগের একটি জেলা ও শহর। শহরটি (২৯°১' উ, ৭৭°৪০' পূ) জেলা ও বিভাগের প্রধান শাসনকেন্দ্র।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে নগরপালিকার দ্বারা পরিচালিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২'২৪ মিঃ উচ্চ। বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি, সামরিক এলাকা ও মালিয়ানার জনসমষ্টি ২৮৩৯৯৭ (১৯৬১ খ্রী).; শহরটির নিকটে কালীনদী, তীরভূমি নীচু ও জলাশয়। মৃত্তিকাতে বালুকণার মাত্রা অধিক। বাৎসরিক বৃষ্টি-পাতের গড় প্রায় ৭৩ সে মি। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা গড়ে ৩২'৭০° সেণ্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় তাপ-মাত্রা ১৩'৮° সেণ্টিগ্রেড।

পূর্বে শহরটি বিরাট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল ও সর্বসমেত ৯টি তোরণ ছিল। শহরে কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, সদরবাজার, ম্যাল, বেগমপুল, সুরজকুণ্ড, স্টেডিয়াম, হাসপাতাল, কলেজ, বিদ্যালয়, গীর্জা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, টাউন হল ইত্যাদি আছে। ঐতিহাসিক কীর্তির মধ্যে গীর্জা (১৮২১ খ্রী) সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভ, কুতুবুদ্দীন-নির্মিত দরগা (১১৯৪ খ্রী), গজনীর সুলতান মামুদের প্রধান মন্ত্রী হাসান সাহ্‌দি-নির্মিত জুম্মা মসজিদ, সুরজকুণ্ড, সতীস্তম্ভ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উল্লেখযোগ্য।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মীরাবাঈ মধ্যযুগের কবি ও সাধিকা। কর্নেল টড মীরাকে রাণা কুম্ভের মহিষী বলিয়াছেন। ভক্তমাল, আকবর ও রূপগোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইয়াছেন। এই সব কাহিনীই ভিত্তিহীন।

যোধপুর রাজ্যের মেড়্‌তা তালুকের কুড়কী গ্রামে (আনুমানিক ১৫০৪ খ্রী) মীরার জন্ম। তিনি রাঠোর দুদাজীর পুত্র রতনসিংহের কন্যা। আবাল্য কৃষ্ণভক্ত, উপাস্যদেবতা গিরধরলাল। রাণা সঙ্গের পুত্র কুমার ভোজের সহিত বিবাহ। বৈধব্যের পর অবিরত সাধুসঙ্গ ও কীর্তনে মগ্ন। ফলে রাজপরিবারের সহিত সংঘর্ষ। এই যুগেই মীরার পদাবলী রচিত। কিংবদন্তী অনুসারে রাণা বিক্রমজিৎ এবং তাঁহার ভগিনী উদাবাঈ মীরাকে সংশয়ে লাঞ্ছনা করিয়া বিষ প্রদান করেন।

মেবার ত্যাগ করিয়া মীরা বৃন্দাবন হইয়া দ্বারকায় আসেন। মৃত্যু আনুমানিক ১৫৬৩-৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ভক্তগণের মতে রণ্‌ছোড়জীর মূর্তিতে মিলাইয়া যান। তাঁহার পদাবলীর ভাষা পশ্চিম রাজস্থানী; উহাতে মারবাড়ী গুজরাতী, হিন্দী ও ব্রজভাষার প্রচুর শব্দ আছে।

কল্যাণী দত্ত

মুকুন্দ দাস (১৮৭৮—১৯৩৪ খ্রী) পিতৃদত্ত নাম যজ্ঞেশ্বর দে, স্বদেশী সংগীত ও স্বদেশী যাত্রাপালা রচয়িতা ও চারণ গায়করূপে বিখ্যাত। পিতা গুরুদয়াল ও মাতা শ্যামাসুন্দরী। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বানারী গ্রাম। আবাল্য পিতামাতার সহিত বরিশালবাসী। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে তিনি কিছুদূর পড়িয়া-ছিলেন তবে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন নাই। আনুমানিক ১৯০২-০৩ খ্রী রামানন্দ অবধূত হরিবোলানন্দের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও 'মুকুন্দ দাস' নাম গ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে (১৯০৫) তিনি বরিশাল কালীবাড়ির তান্ত্রিক-সাধক সোনাঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মুকুন্দ দাস অশ্বিনীকুমার দত্তের একনিষ্ঠ সেবক ও শিষ্য ছিলেন। গ্রামে-গ্রামান্তরে দেশাত্মবোধক সংগীত ও 'মাতৃপূজা' নামক স্বরচিত 'স্বদেশী' যাত্রাভিনয়ের জন্য বরিশালে ইংরেজ সরকারের রোষ দৃষ্টিতে পড়েন ও ১৯০৮ খ্রী এপ্রিল মাসে তিন বৎসর কারাদণ্ড ও তিনশত টাকা জরিমানার শাস্তিসহ দিল্লী জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৪ খ্রী ১৮ মে শুক্রবার কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 'পথ', 'সাথী', 'পল্লীসেবা', 'সমাজ', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিশিষ্ট কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণিস্বরূপ। কবিত্বে, পাণ্ডিত্যে, সমাজবোধ ও বাস্তবদৃষ্টিতে, কলা-নৈপুণ্যে ও সূক্ষ্ম সরসতায় বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাঁহার রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সব দিক্ হইতেই অসাধারণ।

মুকুন্দরামের জীবন সুখদুঃখময় ও বিচিত্র। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আত্মপরিচয়মূলক পদ হইতে জীবন-কথা কিছু জানা যায়। বর্ধমান জেলার দামুন্যা কবির পৈতৃক-ভূমি, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে কবির জন্ম, পিতা 'গুণিরাজ' হৃদয় মিশ্র, পিতামহ 'মহামিশ্র' জগন্নাথ, তাঁহার অগ্রজ কবিচন্দ্র। গ্রন্থমধ্যে বিভিন্ন উল্লেখে জানা যায় কবির পুত্র শিবরাম। রাজ-অত্যাচারে পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া নিঃসম্বলভাবে সপরিবারে কবির নিরুদ্দেশ যাত্রার করুণ কাহিনীও 'আত্মপরিচয়ে' আছে। গোচড়্যা নগরে পৌঁছিয়া মুকুন্দরাম কাব্যরচনার জন্য পার্বতীর স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। ব্রাহ্মণভূমি আরড়ায় উপস্থিত হইয়া ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের নিকটে আত্মপরিচয় দিতে তিনি অবিলম্বে মুকুন্দরামকে তৎপুত্র রঘুনাথের 'পাঠে' নিযুক্ত করেন। পরে রাজা রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি চণ্ডীমঙ্গল গীত রচনা করেন।

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, কবি ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে ষোড়শ শতকের শেষভাগে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার আত্মবিবরণীতে বলিয়াছেন রাজা মানসিংহ তখন 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ', মানসিংহ ১৫৯৪ হইতে ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশার সুবেদার ছিলেন। তাহা হইলে এই সময়ের ভিতরে কাব্য রচিত। কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথ রায়ের রাজত্বকাল: ১৫৭৩-১৬০৬ খ্রী।

মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিলেও নানা প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তির প্রচার আছে। সম্ভবতঃ তিনি সাধারণভাবে পঞ্চোপাসক হিন্দু ছিলেন। মুকুন্দরামের সংস্কৃত-সাহিত্য এবং পুরাণাদি গ্রন্থের সহিত পরিচয় ছিল। অনাড়ম্বর কবিত্বশক্তির সহিত অতিশয় লক্ষণীয় ছিল তাঁহার সমাজ-চেতনা। শুধু ভক্তিরস নহে, বিচিত্র জীবনরসই কবির কাব্যে প্রকাশলাভ করিয়াছে। উপন্যাসের বর্ণনানৈপুণ্য ও নাটকের ঘটনা-সংঘাত ও চরিত্রাংকন মুকুন্দরামের কাব্যে সহজভাবে সুলভ হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

মুক্তা একটি রত্ন। ভারতীয় শাস্ত্রবর্ণিত মহামূল্যবান্ পঞ্চরত্নের অন্যতম। ইহা খনিজপদার্থ নহে, একটি প্রাণীর দান। একজাতীয় শুক্তি বা ঝিনুকের দেহনিঃসৃত রস দানার আকারে জমাট বাঁধিয়া মুক্তার সৃষ্টি করে। ঝিনুকের কঠিন বহিরাবরণ এবং মুক্তা মূলতঃ এক। ঝিনুকের কোমল দেহ একজোড়া শক্ত খোলকদ্বারা আবৃত। শুক্তির কঠিন যুগ্ম খোলাকে নীচে দেহের উভয়পার্শ্বে একটি করিয়া বিশেষ ঝিল্লীদ্বারা (mantle) নরম দেহটি আবৃত। এই ঝিল্লীর বহিঃস্তরের কোষনিঃসৃত রস হইতে শুক্তির খোলা এবং বিশেষক্ষেত্রে মুক্তার সৃষ্টি হয়।

অতি সূক্ষ্মাকারে ঢেউখেলানো মুক্তাপৃষ্ঠের উপর আলোকরশ্মির বিচিত্র প্রতিফলনই মুক্তার দীপ্তির উৎস।

কোনও ক্ষুদ্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ, বালুকণা, পরজীবী প্রাণী অথবা অন্য কোনও বহিরাগত ক্ষুদ্রবস্তু ঝিনুকের খোলকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উহার আক্রমণ হইতে মূলদেহকে রক্ষা করিবার জন্য ঝিনুকটির ঝিল্লী হইতে ঐ বহিরাগত উত্তেজক বস্তুর উপর একপ্রকার রস নির্গত হয় এবং জমাট বাঁধিয়া গোলাকার ধারণ করে। বহিরাগত উত্তেজক পদার্থটি মুক্তার কেন্দ্রবিন্দু। উহার চতুর্দিকে ঝিল্লীনির্গত রসের পলি সমকেন্দ্রিক চক্রাকারে স্তরে স্তরে সজ্জিত। এই স্তরগুলিতে চুনাপাথর জাতীয় পদার্থ বা অ্যারাগোনাইট(aragonite) এবং কন্‌কিওলিন্ (conchiolin) নামক পদার্থ পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত। সুগোল অথবা নাশপাতি আকৃতি উপরিভাগ মসৃণ, শ্বেতাভ এবং স্নিগ্ধদ্যুতিসম্পন্ন মুক্তা সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্। ইহারা মাংসপেশী কিংবা অন্য নরমতন্তুর ভিতর আলগাভাবে থাকে। খোলকের ভিতরের পৃষ্ঠে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া থাকিলে মুক্তা সম্পূর্ণ গোলাকার না হইয়া অর্ধগোলাকৃতি হয়। ক্ষেত্রান্তরে মুক্তা খোলকগাত্রে সমাহিত হইয়া যায়। উত্তেজক বস্তুটি অমসৃণ এবং বিষম হইলে মুক্তাটিও বিষমাঙ্গ হয়। চার বৎসর বয়স্ক ঝিনুক সর্বোৎকৃষ্ট মুক্তাসংগ্রহের উপযোগী।

মুক্তা তিনপ্রকার—স্বভাবসৃষ্ট (natural), সাধিত (cultured) এবং কৃত্রিম (artificial)। সাধিত মুক্তার উপরিভাগ স্বভাবসৃষ্ট মুক্তার ন্যায় হইলেও এক্ষেত্রে মুক্তাকেন্দ্র ও অভ্যন্তরস্থ গাত্রের মধ্যে ব্যবধান থাকে। বিশালাকার চৌবাচ্চায় পালিত শুক্তির নির্দিষ্ট দেহাংশে যথাযোগ্য উত্তেজক অনুপ্রবিষ্ট করিয়া সাধিত মুক্তা পাওয়া যায়।

কৃত্রিম মুক্তা সর্বপ্রথম পশ্চিম ইওরোপে নির্মিত হয়। পাতলা কাচের ক্ষুদ্র গোলকের ভিতরের গাত্রে একপ্রকার মাছের আঁশ লাগাইয়া অভ্যন্তরস্থ গহ্বরটি সাদা মোমদ্বারা পূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। পুরাকালে প্রধানতঃ ভারতবর্ষ ও পারস্য-উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে মুক্তা সংগ্রহ করা হইত। মাদ্রাজে টিউটিকোরিনের নিকট তিনেভেলী ছাড়াও বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, মধ্য আমেরিকা এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের উপকূলবর্তী এলাকা হইতে মুক্তা সংগৃহীত হয়। চীন ও জাপান মুক্তাচাষে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। উত্তর-গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নদীগুলিতে কয়েক ধরনের মুক্তাগর্ভ শুক্তির বাস। স্কটল্যান্ড ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে নদীজাতমুক্তা পাওয়া যায়।

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুক্তি ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব। মুক্তি সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বহু বিভিন্ন বিচিত্র মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু একটি সার্বজনীন তত্ত্ব চার্বাকগণ ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। সেটি হইল এই ঃ মুক্তি, অথবা, মোক্ষ বন্ধাবস্থা, অথবা, সংসারচক্র, এবং তজ্জনিত অসংখ্য দুঃখ ক্লেশ হইতে শাশ্বত মুক্তি অথবা পরিত্রাণ। ভারতীয় দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি 'কর্মবাদ' অনুসারে প্রত্যেক সকাম কর্ম অথবা ফলভোগেচ্ছা সহকারে কৃত কর্মের ন্যায্য ফল কর্ম—কর্তাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। একই জন্মে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সকাম কর্মের যথোপযুক্ত ফল সেই জন্মেই সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা সম্ভবপর হয় না বলিয়া, কর্মকর্তা জীবকে সেই সকল অভুক্ত কর্মফল ভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সেই নূতন জন্মে, অজ্ঞান কবলিত, পার্থিব বাসনা-কামনাগ্রস্ত জীব পুনরায় নূতন নূতন সকাম কর্ম করে ও তাহাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ইহাই হইল "কর্মবাদের" সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত "জন্মজন্মান্তরবাদ"। এরূপ অবস্থারই নাম বন্ধাবস্থা অথবা সংসারচক্র। নিষ্কাম অথবা সম্পূর্ণ ফলভোগেচ্ছা-শূন্য হইয়া কর্ম সম্পাদন, এবং জ্ঞানশক্তি প্রমুখ যথোপযুক্ত সাধন অবলম্বন করিয়া এই নিরন্তর বিঘূর্ণিত দুঃখক্লেশজনক "সংসারচক্র" হইতে মুক্তি লাভ করাই হইল মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভারতীয় দর্শনের ৯টি প্রধান মতবাদে "মুক্তি" সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইতেছে।

চার্বাকদর্শন ঃ জড়বাদী, নৈরাত্মবাদী, ও জন্মান্তরবাদে অবিশ্বাসী চার্বাকদর্শন স্বর্গ অথবা মোক্ষ কোনওটিতেই বিশ্বাসী নহে। চার্বাকগণ উপহাসভরে বলিয়াছেন যে, বর্তমান জীবনে পার্থিব এবং দৈহিক সুখভোগই একমাত্র "স্বর্গ" অথবা "মোক্ষ" ; তাহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ বর্তমান জীবনে পার্থিব এবং দৈহিক দুঃখভোগই একমাত্র "নরক" অথবা "বন্ধ"।

জৈনদর্শন ঃ জৈনদর্শন জড়বাদী নহে; ইহা অজড়, শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাসী। এই মতানুসারে মুক্তি কেবল নঞর্থক দুঃখাভাবমাত্রই নহে; সেই সঙ্গে সদর্থক পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থাও ; যেহেতু মুক্ত জীব "আনন্তচতুষ্টয় অথবা চতুর্বিধ অনন্তগুণ সমন্বিত হন—যথা অনন্ত-জ্ঞান, অনন্ত-দর্শন (বিশ্বাস), অনন্ত-বীর্য, ও অনন্ত সুখ। জৈনগণ জীবন্মুক্তিবাদী।

বৌদ্ধদর্শন ঃ বৌদ্ধদর্শন আত্ম এবং মোক্ষে বিশ্বাসী। এই মতানুসারে, মুক্তি অথবা "নির্বাণ" বাসনা-কামনা বিহীন, উপেক্ষা অথবা বৈরাগ্য-বিমণ্ডিত, সুখদুঃখাতীত, শান্ত, সমাহিত ; ধীর, স্থির, পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা; অথবা সত্য-জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ শীল, অথবা সদাচরণশোভিত, অপূর্ব অবস্থা। বৌদ্ধদর্শনও জীবন্মুক্তিবাদী।

সাংখ্যদর্শন এবং যোগদর্শন ঃ সাংখ্য ও যোগদর্শন অনুসারে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিক-রূপ ত্রিবিধ দুঃখ-সম্বলিত এই বন্ধাবস্থা, অথবা সংসার-দশা। এরূপ দুঃখত্রয়ের শাশ্বত এবং সম্পূর্ণ নিবৃত্তিই "মোক্ষ"। সাংখ্য-যোগ মতে, মোক্ষ এরূপ নঞর্থক দুঃখাভাবই মাত্র, সদর্থক আনন্দঘন অবস্থা নয়—যেহেতু সুখ ও দুঃখ পরস্পরাশ্রয়ী (রিলেটিভ) বলিয়া যেস্থলে দুঃখ নাই সেস্থলে সুখও থাকিতে পারে না। অতএব মুক্তজীব পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপই মাত্র, আনন্দস্বরূপ নহে। জীব নিত্য-মুক্ত ; অথবা শাশ্বতকালই অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ ; কেবল বন্ধাবস্থায় অজ্ঞানাবৃত জীব এই মহাসত্য, নিত্যসত্য, পূর্ণসত্যটিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। সাংখ্য-যোগ দর্শনও জীবন্মুক্তিবাদী।

ন্যায়দর্শন এবং বৈশেষিকদর্শন ঃ ন্যায়দর্শন এবং বৈশেষিকদর্শন অনুসারেও মোক্ষ নঞর্থক দুঃখাভাবই মাত্র, সদর্থক আনন্দঘন অবস্থা নহে। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নহে, গুণই মাত্র—এমন কি, শাশ্বত গুণও নহে ; অশাশ্বত—বন্ধাবস্থা-কালীন, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, পার্থিব জ্ঞেয় বস্তু প্রভৃতির প্রতি নির্ভরশীল, সর্তাধীন গুণই মাত্র। মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানোৎপাদনের এই সকল সর্ত পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়া, সেই সময়ে মুক্ত জীবের জ্ঞান-গুণও থাকে না। মুক্ত জীব সকল গুণবিহীন শুদ্ধ দ্রব্য, তত্ত্ব অথবা সত্যরূপেই বিরাজ করে। ন্যায়-বৈশেষিক-মতাবলম্বীরা বিদেহ মুক্তিবাদী।

মীমাংসাদর্শন ঃ মীমাংসাদর্শনের মুক্তি সম্বন্ধীয় মতবাদ বহুলাংশে ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদের অনুরূপ। এই মতানুসারেও মোক্ষকালে মুক্তজীবের জ্ঞানও থাকে না, আনন্দও থাকে না, অর্থাৎ কোনও গুণই থাকে না; কেবল থাকে শুদ্ধ, গুণবিহীন, কেবল স্বরূপ মাত্র। এই দর্শনও বিদেহ মুক্তিবাদী।

বেদান্তদর্শন ঃ অদ্বৈতবেদান্ত মতে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন বলিয়া বন্ধজীব মোক্ষকালে এরূপ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন। কিন্তু বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদাদি মতে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সর্বদাই ভিন্ন ভিন্ন; অর্থাৎ, স্বরূপতঃ ভিন্ন; গুণতঃ অভিন্ন। মুক্তজীবও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন হইয়া যান না, ভিন্নাভিন্নই থাকেন। এরূপ মুক্তজীবের ব্রহ্মের ন্যায় অন্যান্য সকল গুণ ও শক্তিই থাকে কিন্তু দুইটি বিষয়ে তিনি ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই থাকিয়া যান—প্রথমতঃ ব্রহ্ম বিভু, মুক্তজীব অণু; দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মেরই কেবল সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সম্পাদন করিবার শক্তি রহিয়াছে, মুক্তজীবের নহে। বেদান্তদর্শনের সকল সম্প্রদায়ের মতেই, মুক্তি

কেবল মাত্র দুঃখাভাব নহে, তদুপরি আনন্দরসঘন অবস্থা। একতত্ত্বাবলম্বী অদ্বৈত বেদান্তবাদিগণ জীবন্মুক্তিবাদী, ত্রিতত্ত্বাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদাদিগণ বিদেহ মুক্তিবাদী।

ভারতীয় দর্শনের মোক্ষতত্ত্বের শিক্ষা সংসার-বিমুখতা, এই প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই সংসার পরিশেষে পরিত্যাজ্য হইলেও প্রারম্ভে তাহার প্রয়োজনীয়তা সমধিক। যেহেতু, এই পৃথিবীতেই, এই দেহ মনের দ্বারাই প্রাক্তন অভুক্ত সকাম কর্মের ন্যায্য ফল ভোগ করা যাইতে পারে এবং নব সাধন সম্পাদিত হইতে পারে। উপরন্তু, ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন-রূপে দেখিলে তাহা ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য, পূর্ণ, পূজ্য।

রমা চৌধুরী

মুখোশনৃত্য মুখাবরণ পরিহিত নৃত্য। আদিম সমাজের অনুকৃতিমূলক গোষ্ঠীনৃত্যে টোটেম বিশ্বাস ও যাদু-ক্রিয়ার সূত্রেই প্রধানতঃ মুখোশের ব্যবহার শুরু বলিয়া বিবেচিত হয়।

লোকায়ত স্তরেই সাধারণতঃ মুখোশনৃত্যের অবস্থান। ইহাতে দেহাঙ্গগত উৎপ্লাবনে লোকনৃত্যের প্রাণময় উদ্দামতা সাধারণতঃ স্বতঃস্ফূর্ত রূপে আত্ম-প্রকাশ করে। মুখাবয়ব ঢাকা থাকায় নৃত্যাভিব্যক্তি সীমাবদ্ধ।

বাংলায় সাধারণতঃ কাঠ, কাগজ, কাপড়ের মণ্ড, মাটি, লাউ কুমড়ার খোলা প্রভৃতিতে মুখোশ নির্মিত হয়। সাধারণতঃ ঢাক, ঢোল, ধামসা, সানাই, কাঁসা প্রভৃতির বাদ্য হয়। কালীনাচ, রাভান, রাবণকাটা, মুখাখেইল, সঙ্ বহুরূপী, হরপার্বতী, বুড়া-বুড়ী, নৃসিংহ, ঘোড়া, ডাইনি-পিশাচী, ছৌ-নাচ প্রভৃতি মুখোশনৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্র মণি বর্ধন, বাংলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য, ১৯৬১।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান, ভারতীয় দ্র

মুগা সোনার মত বর্ণের রেশম। গুটি অনেকটা তসরের মত। মুগা-কীট "সুম" ও "সুয়ালো" গাছের পাতা খায়। উহা তসরের মত পুরাপুরি বন্য নয়। কিছুদিন ঘরে পুষিয়া পরে জঙ্গলে গাছের উপর ছাড়িয়া দিতে হয়। সেখানেই পাতা খাওয়া শেষ করিয়া গুটি তৈয়ারি করে। সুতা কাটা হয় আস্ত গুটি হইতে। মুগা সুতা খুব শক্ত। ঐ সুতা পাকাইয়া মাছ ধরার সুতাও তৈয়ারি হয়। মুগা জন্মায় আসামে। পরিধানের বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত উহার উপর সুন্দর ছবি আঁকা চলে। ভারতে মুগা উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড।

সত্যরঞ্জন সেন

মুঙ্গের প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্তী মুঙ্গের বা মুঙ্গগিরির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের সভাপর্বে। বৌদ্ধযুগ ও ঐতিহাসিক হিন্দুস্তানের প্রভূত নিদর্শন মুঙ্গেরে ও সন্নিহিত স্থানগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ্ কিছুদিন এই স্থানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মুঙ্গের বাংলার পালরাজবংশের অধিকারে ছিল। মুঙ্গেরের জয়স্কন্ধাবার হইতেই দেবপালের মুঙ্গের তাম্রশাসন উৎকীর্ণ ও প্রকাশিত হয়; প্রতীহাররাজ মিহিরভোজের গোয়ালিয়র শিলালিপিতেও (৮৩৬ খ্রী) মুঙ্গগিরির সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ১৩শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই মুঙ্গের পালরাজাদের হস্তচ্যুত হইয়া তুর্কি মুসলমানদের শাসনাধীনে আসে এবং সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই মুঙ্গগিরি ক্রমশঃ মুঙ্গেরে রূপান্তরিত হয়। ১৫শ শতাব্দীতে এইস্থান বাংলার সুলতান হোসেন শাহের অধিকারে আসে এবং তিনিই এখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মোগল আমলে মুঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর ছিল। টোডরমল ও মানসিংহ এখানে স্বল্পকাল ছিলেন এবং এই মুঙ্গেরেই পরাজিত শাহ্ সুজা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার নবাব মীরকাশিম কর্তৃক দুর্গনির্মাণ ও রাজধানী স্থাপন (১৭৬১ খ্রী) মুঙ্গেরের ইতিহাসে আর একটি পদক্ষেপ। ইংরেজ আমলে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জেলা স্থাপন এবং ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভয়াবহ ভূমিকম্প আধুনিক মুঙ্গেরের দুইটি স্মরণীয় ঘটনা।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুচকুন্দ প্রকল্প বা মছকুণ্ড বা মৎস্যকুণ্ড অন্ধ্র ও ওড়িশা রাজ্য সীমান্তে গোদাবরীর উপনদী শিলেরুর একটি ক্ষুদ্রতর উপনদী। এই নদী-প্রকল্পটি যৌথভাবে অন্ধ্র ও ওড়িশা সরকার কর্তৃক ১৯৫৯ খ্রী রূপায়িত। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ১১৫ মেগাওয়াট। জলসেচের ব্যবস্থাও আছে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মুঞ্জে, বি. এস. (?-১৯৪৮ খ্রী) বিলাসপুরের এক হিন্দু-পরিবারে মুঞ্জের জন্ম। ১৮৯৮ খ্রী মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করেন। ১৯০০ খ্রী বুয়ার যুদ্ধে যোগ দেন ও যুদ্ধ শেষ হইলে নাগপুরে চক্ষুচিকিৎসক হন। তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন ও টিলকের নেতৃত্বে কাজ করেন।

তিনি পৃথক্‌ নির্বাচন প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। (১৯১৬ খ্রী)। পারস্পরিক সহযোগিতা তাঁহার কাম্য হইলেও তিনি অহিংসা ও সত্যাগ্রহ নীতিতে আস্থাবান্‌ ছিলেন না। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। ইহার পরে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া দুইবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ খ্রী জলপাই-গুড়ি প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার ও ১৯৪৭ খ্রী পাটনায় নিখিলভারত হিন্দুমহাসভার সভাপতি হন। তিনি হিন্দুগণকে সামরিক শিক্ষাদানে উদ্যোগী ছিলেন ও নাসিকের ভোঁসলে সামরিক বিদ্যালয় তাঁহার অবদান। ১৯৪৮ খ্রী ৪ মার্চ ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মুণ্ডা কয়েকটি আদিম অধিবাসী-জাতিসমষ্টির সাধারণ নাম। এই জাতিসমষ্টিগুলির ভাষা—সাঁওতালি, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো, বীরহড়, কোদা, তুরি, আসুরি, খরিয়া, জুয়াং ইত্যাদি—পরস্পর ঘনিষ্ট সম্পর্কিত। মুণ্ডারা সংখ্যায় (১৯৬১ খ্রী আদম সুমারি অনুসারে) প্রায় পাঁচ লক্ষ। মধ্য ও পূর্ব ভারতের বৃহৎ ভূখণ্ডের নানাস্থানে—বিহারের অন্তর্গত ছোটনাগপুর অধিত্যকায় এবং সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ও বাংলার অঞ্চল বিশেষে ইহাদের বাস। নৃতাত্ত্বিকদের মতে মুণ্ডারা অস্ট্রেলিয়ার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মুণ্ডাদের শির দীর্ঘ, রঙ্‌ কালো, চুল অল্পবিস্তর কোঁকড়া, নাক চেপটা, আকৃতিতে কিছু খর্ব। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী।

আর্যেরা এদেশে যখন আগমন করিয়াছিল তখন হইতেই মুণ্ডারা তাহাদের প্রতিবেশী ছিল। আর্যদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডারা পিছু হটিতে থাকে এবং পরিশেষে পূর্ব ও মধ্য ভারতের দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে কতকটা গুপ্ত হইয়া বাস করিতে থাকে। মুণ্ডাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে। সে সংস্কৃতি বিষয়ে মুণ্ডারা খুব সচেতন। ভারতীয় আর্ষ ভাষায় ও সংস্কৃতিতে মুণ্ডাদের দান যে যথেষ্ট তাহার প্রমাণ পণ্ডিতেরা অনেক দিয়াছেন।

সুকুমার সেন

মুণ্ডারী ইহা অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর পশ্চিমী (নিহালী মুণ্ডা) শাখার প্রাচ্য (মুণ্ডা) প্রশাখার উত্তর উপশাখা খেরওয়ারীর অন্তর্গত অন্যতম ভাষা। মুণ্ডারী ভাষী-দের সংখ্যা ৭৩৬৫২৪ (১৯৬১ খ্রী)। এই ভাষা-ভাষীরা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ওড়িশা রাজ্যের সীমান্তের জেলাগুলিতে বাস করেন। সাঁওতালী ও কোরওয়ার সহিত মুণ্ডারীর সম্পর্ক নিকটতম। মুণ্ডারীর অর্ধ-ব্যঞ্জন ও মৃদুব্যঞ্জন তথা স্বরাঘাত সাঁওতালীর মতই। দুইটি ভাগ। পুরুষবাচক শব্দে প্রত্যয় যোগ করিয়া এই ভাষায় লিঙ্গ মাত্র দুইটি। চেতন ও অচেতন এই স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। বচন তিনটি। দ্বিবচনের প্রত্যয় কীঙ্‌, বহুবচনের কো। অচেতনের বহুবচন হয় না। সংজ্ঞার ক্রিয়ার সহিত কোনও কারকীয় সম্বন্ধ এই ভাষায় নাই। অতএব কর্ম ও সম্প্রদান কারকও নাই। কারকের নির্দেশ পরসর্গগুলির দ্বারা হইয়া থাকে। সম্বন্ধ কারকের প্রয়োগ বিশেষণের মত হয়। সংখ্যা-বাচক শব্দগুলি এখন আর্যভাষা হইতে গৃহীত। কুড়িকে গুনিবার একক হিসাবে ব্যবহার এই ভাষাগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও আর্যভাষায় ইহার দান। ক্রিয়াপদ খুবই ব্যাপক। 'ক্যাটিগরিক্যাল' 'অ'-দ্বারা ক্রিয়ার রূপে পরিবর্তন হয়। নিজস্ব কোনও লিপি নাই—দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করা হয়।

রামঅধার সিংহ

মুণ্ডেশ্বরী পশ্চিমবঙ্গের একটি নদী। ইহা দামোদরের অংশ। আরামবাগ মহকুমার মধ্য দিয়া বহিয়া হাওড়া জেলার সদর মহকুমার মানকুর থানার নিকট হুগলি, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার মিলনস্থলে রূপনারায়ণ নদীতে পড়িয়াছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রণবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র মুদ্রণবিদ্যা ঠিক কোন্‌ জাতির বা কাহার মাথায় সর্বপ্রথম আসে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে এ-বিষয়ে দ্বিমত নাই যে ইওরোপে মুদ্রণ-কার্য দেখা দিবার বহু বহু পূর্বে চীন দেশে ইহার উদ্ভব হয়। চীনদেশীয় শিল্পীরা কাষ্ঠখণ্ডের উপর উচ্চাক্ষর (in relief) অথবা চিত্র খোদাই করিয়া কালি মাখাইয়া তাহাতে কাগজ চাপিয়া ছাপার কাজ করিত। যত দূর জানা যায়, ৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশেই সর্বপ্রথম গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইওরোপে খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাস ও ছবির বই (block books) প্রথম ছাপা হয়। আধুনিক মুদ্রণ শিল্পের আরম্ভ সঞ্চালনযোগ্য (movable) টাইপ লইয়া, এবং ইহার আবিষ্কারক জার্মানির ইওহান গুটেনবের্গ, যদিও ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইতালীয়রাও এই প্রথম আবিষ্কারের স্ব স্ব দাবি ছাড়েন না।

ফুস্ট (Fust) ও শাফীর (Schoeffer) নামক দুই ব্যক্তির সহিত মিলিয়া গুটেনবের্গ মুদ্রণবিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং ইঁহাদের মধ্যেই একজন নানারূপ পরীক্ষার পরে সীসা, টিন, অ্যান্টিমনি মিশাইয়া এক সঙ্কর ধাতু ও তৎসাহায্যে ছাঁচযোগে টাইপ সৃষ্টি করেন। অতঃপর এই সমস্ত টাইপ আধারে ফেলিয়া কালি মাখাইয়া হস্তচালিত যন্ত্রে চাপ দিয়া গুটেনবের্গ বা তাঁহার সঙ্গীরা

তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লাটিন ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত করেন।

১৪৬২ খ্রীষ্টাব্দে গুটেনবের্গের মুদ্রণ-কর্মচারীরা নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলে, ইহার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইওরোপের দুই শতাধিক স্থানে দ্রুতগতিতে পুস্তকাদি মুদ্রিত হইতে থাকে। এদিকে Cologne হইতে মুদ্রণ-বিদ্যা শিখিয়া ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম ক্যাক্স্‌টন ইংল্যান্ডে মুদ্রণ ব্যবসায় শুরু করেন। পনের বৎসরে ইনি প্রায় একশত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আমাদের দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস্‌ উইলকিন্স বাঙ্গালা টাইপ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম কেরি শ্রীরামপুরে যে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস স্থাপন করেন তাহাতে বাইবেলের বাঙ্গলা অনুবাদ ছাপা শুরু হয়। এইভাবে ১৮শ শতাব্দী শেষ হইবার মুখেই পৃথিবী ব্যাপিয়া মুদ্রণবিদ্যার প্রসার হয়।

আদিযুগের মুদ্রাযন্ত্রে কাঠের ব্যবহারই ছিল সর্বাধিক। কাঠের আধারে কালি মাখানো টাইপ বসাইয়া স্ক্রু আঁটিয়া ভিজা কাগজ চাপিয়া ছাপ তোলা হইত। পরে হস্ত-চালিত মুদ্রাযন্ত্রে উত্তোলক (lever) ব্যবহার এবং জেলাটিন রোলার সাহায্যে কালি লাগানোর কৌশল উদ্ভূত হয়। ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই হস্ত-চালিত পদ্ধতিতেই ছাপা চলিত। বাষ্পীয় শক্তি সাহায্যে রোটারি সিলিন্ডার যুক্ত মুদ্রাযন্ত্রের চালনা ইংল্যান্ডে প্রথম দেখা দেয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। আধুনা যন্ত্রচালনে বৈদ্যুতিক শক্তিই ব্যবহৃত হয়। ঘূর্ণমান সিলিন্ডার সাহায্যে ছাপার কাজ দ্রুতগতিতে চলে। পূর্বে যেখানে ঘণ্টায় ২৭৫ পৃষ্ঠা ছাপা হইত, অধুনা সেখানে ৩০০০০০ পৃষ্ঠা হয়।

প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত টাইপ হাতেই সাজানো হইত; এখনও বহুত্র তাহাই হয়। কম্পোজিটর সজ্জিত টাইপসমষ্টি গ্যালি নামক আধারে ফেলিলে ছাপ (প্রুফ) লইয়া যথাসম্ভব সংশোধনের পরে পৃষ্ঠার আকারে মুদ্রিত হয়। অধুনা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যন্ত্র-সাহায্যেই টাইপ বসানো হয়। লাইনোটাইপ (আবিষ্কর্তা Otto Mergentheler, ১৮৮৬ খ্রী) ও মনোটাইপ ইহার দৃষ্টান্ত। মুদ্রণবিদ্যার ক্রমবিকাশের ফলে আজ অন্ধদের অধ্যয়নের জন্যও উচ্চ টাইপ সাহায্যে গ্রন্থাদি ছাপা হয়। ইহার মধ্যে ব্রেল পদ্ধতির টাইপই সর্বশ্রেষ্ঠ। মুদ্রণ-শিল্পের আর একটি আবিষ্কার লিথোগ্রাফ (আবিষ্কর্তা Alois Senefelder, ১৭৯৮ খ্রী)। রঙিন ছবি প্রভৃতিও লিথোগ্রাফির সাহায্যে অতি উত্তমভাবে, এবং আলোকচিত্র সাহায্যে হাফ্‌টোন পদ্ধতিতে সাধারণভাবে, ছাপা হয়।

লাইনোটাইপ আজকাল সর্বত্র প্রচলিত। টাইপ-রাইটারের চাবির মত ইহার চাবিগুলি; টিপিবামাত্র ধাতব ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া অক্ষরগুলি স্ব স্ব স্থানে লাইন ধরিয়া বসে। লাইন পুরা হইলে যন্ত্রের অপর অংশ হইতে গলিত সীসা ছাঁচে পড়ে এবং আপনা হইতেই টাইপ সৃষ্টি হয়। টাইপের বক্র আধার যান্ত্রিক কৌশলে ঠিক স্থানে আঁটিয়া বসে। কালিও নিজ হইতেই টাইপে ছড়ায় এবং মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি ছাপিয়া নিজ হইতেই বাহিরে আসে। এ সমস্ত কার্যকলাপই বৈদ্যুতিক শক্তিতেই সিদ্ধ হয়। মনোটাইপ-ও এইরূপে টাইপ-রাইটার ধরনের যন্ত্র। ইহার চাবি টিপিলে সঞ্চরমাণ কাগজের ফিতায় ছিদ্র হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর সৃষ্টি হয়। অতঃপর এখানেও অবশিষ্ট সমস্ত কার্যকলাপ যান্ত্রিক কৌশলেই সম্পন্ন হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

মুদ্রা পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উপাসনায় অঙ্গুলিদ্বারা রচিত যন্ত্রের ব্যবহার বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। নর্তনকলায় অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ অঙ্গুলি-রচনাকে মুদ্রা বলিয়া অভিহিত করা হয় (শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—আনন্দদায়ক)। বিভিন্ন মুদ্রায় বিভিন্ন সংকেত জ্ঞাপন করা হয়। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণে বহু হস্তলক্ষণের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে এইগুলি মুদ্রারূপে পরিচিত হইয়াছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মুদ্রাব্যবস্থা কোনও দেশের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও স্থানে ও সময়ে, অর্থনৈতিক পদ্ধতি হইতে উদ্ভূত যে কোনও পাওনা মিটাইবার জন্য ব্যয় করিবার উপকরণ বা সম্পত্তিকে মুদ্রা বলা হয়। অর্থনৈতিক দ্রব্যাদি ও নানাবিধ সম্পদ হস্তান্তর করিবার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম বা ঐ সামগ্রীসমূহের মান-পরিমাপক একক অথবা মূল্য-পরিমাপের মানদণ্ড, কিংবা দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যপরিমাণ সঞ্চিত রাখিবার উপকরণকে মুদ্রা বলা হইয়া থাকে। 'মুদ্রা' শব্দটির মধ্যে ঐ উপকরণটি বিনিময়ের মাধ্যম ইত্যাদি কার্যের জন্য সর্বসাধারণকে মানিয়া লইবার জন্য অনুজ্ঞা বা নির্দেশ মুদ্রাঙ্কিত বা চিহ্নিত রহিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য সার্বভৌমের নির্দেশ ব্যতীতও, কোনও কোনও মাধ্যম আংশিকভাবেও জন-সাধারণ পাওনা মিটাইবার উপকরণ বলিয়া মানিয়া লইলে, তাহাও মুদ্রা বলিয়া গণ্য করা যাইবে। একমাত্র সার্ব-ভৌম-নির্দেশিত মুদ্রাই আইনসম্মত বিহিত মুদ্রা। আইনসম্মত বিহিত মুদ্রার মধ্যে কিছু অংশ সীমাবদ্ধ পরিমাণ দেনা মিটাইবার অধিকারী। ইহা সীমাবদ্ধ আইনসম্মত বিহিত মুদ্রা। যাহা দ্বারা অসীম পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, উহা অসীম পরিমাণ আইন-সম্মত বিহিত মুদ্রা।

সমগ্র পরিমাণ মুদ্রা যে দেশে যথেচ্ছ পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের সহায়তায় সঞ্চালন করা হইত, ঐ দেশের মুদ্রামানকে দ্বিধাতুমান বলা হইত। কিন্তু কোনও একটি মুদ্রায় রক্ষিত ধাতুমূল্য মুদ্রাঙ্কিত মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে বা কম হইলে একটি মাত্র ধাতুর মুদ্রাই সঞ্চালিত হইতে থাকিবে। এক ধাতুমানের মধ্যে স্বর্ণমানই সুপ্রসিদ্ধ।

বিশুদ্ধ স্বর্ণমানের তত্ত্ব আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনার সমতা রক্ষার জন্যই অধিকতর উপযোগী। বিশুদ্ধ স্বর্ণমানে বিশ্বাসী দেশ, ঐ দেশ ও অন্যান্য দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রত্যাশা করে। বিশুদ্ধ স্বর্ণমানের অন্তর্গত দেশের মুদ্রা ব্যবস্থা তিনটি নীতি আবশ্যিক ভাবে অনুসরণ করিবে ঃ (ক) দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অসীম পরিমাণ মূল্যের স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিবে; (খ) যদি দেশের মুদ্রা স্বর্ণের উপরে মুদ্রাঙ্কিত না হইয়া থাকে তবে সমগ্র পরিমাণ সঞ্চালিত মুদ্রার মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রক্ষিত স্বর্ণের মূল্যের সমান থাকিবে; (গ) বৈদেশিক পাওনা সকল সময় স্বর্ণদ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে। স্বর্ণমান অবশ্য বহু ধরনের হইতে পারে। নির্ভেজাল স্বর্ণমান, স্বর্ণপিন্ডমান, স্বর্ণ-বিনিময়মান প্রভৃতি। স্বর্ণমানকে হয় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রক্ষিত স্বর্ণমূল্যের সমমূল্যের কাগজী মুদ্রার বা অন্যবিধ টাকার সঞ্চালন, অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে স্বর্ণমানের উপরে নির্ভরশীল কোনও দেশের ঋণপত্র, মুদ্রা এবং সঞ্চয় রক্ষা করিয়া, উহাদের সমমূল্যের মুদ্রা সঞ্চালন—কোনও রূপে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাগজের মুদ্রা সঞ্চালনের ইহাই মুদ্রাগত নীতি। অবশ্য বর্তমানে কাগজের মুদ্রার সহিত সমপরিমাণ মূল্যের স্বর্ণরক্ষা করিবার নীতি আর সম্পর্কিত নহে। বরং তখন সরকারী মুদ্রা সঞ্চালনের ব্যাপারে ব্যাঙ্কিং নীতি অনুসরণ করা হয় অর্থাৎ নির্ধারিত পরিমাণ স্বর্ণরৌপ্য, ঋণপত্র ইত্যাদি জমা রাখিয়া তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি মূল্যের কাগজের নোট সঞ্চালন করা। কত মূল্যের মূল্যবান্ ধাতু ও ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে রক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বোচ্চ কোন পরিমাণ মুদ্রাই বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সঞ্চালন করিতে পারিবে তাহা দেশের আইনসভার নির্দেশের উপর নির্ভর করে।

কেইন্‌স মুদ্রাকে হিসাব রক্ষা করিবার মুদ্রা বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। হিসাব রক্ষা করিবার মুদ্রা অর্থাৎ যাহার সাহায্যে ঋণ-পরিমাণ, দাম ও সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা প্রকাশ করা যায় তাহাই মুদ্রা বিষয়ে অর্থতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা। ঋণ বলিতে আমরা পরবর্তী কালে পাওনা মিটানো এবং দাম-তালিকা বলিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সাধারণ তাৎক্ষণিক চুক্তি বুঝিয়া থাকি, সে চুক্তি পোড়ামাটি, মৌখিক অথবা কাগজ-পত্রের মাধ্যমে যে কোনও উপায়েই রক্ষিত হউক না কেন। সুতরাং ঋণগত চুক্তি ও দামগত চুক্তি সমূহ পূরণ করিবার উপকরণই মুদ্রা। মুদ্রার মধ্য দিয়া সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা ধরিয়া রাখা হয়। এবম্বিধ মুদ্রার সহিতই হিসাব রক্ষা করিবার মুদ্রা সম্পর্কিত। মুদ্রা ও হিসাবের মুদ্রার মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে, হিসাবের মুদ্রা আসলে বর্ণনা ও শিরোনাম এবং মুদ্রা হইল সেই সামগ্রী যাহা দ্বারা ঐ বর্ণনা প্রকাশ করা যায়।

জন মেনার্ড কেইন্‌স চতুর্বিধ মুদ্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। স্বাধীনভাবে প্রাপ্তব্য, একচেটিয়া সঞ্চালনের অধিকারি-নিরপেক্ষ, স্বল্পযোগান এবং উচ্চ উৎপাদন ব্যয়সাপে— বিনিময় মাধ্যমই দ্রব্যমুদ্রা (commodity money)। আদিষ্ট মুদ্রা (fiat) ও পরিচালিত (managed) মুদ্রাকে প্রতিনিধিত্বমূলক (representative) মুদ্রা বলা যাইতে পারে। আদিষ্ট মুদ্রা বা নিদর্শন মুদ্রায় (token money) মুদ্রাঙ্কিত মূল্য মুদ্রার ধাতু-মূল্য অপেক্ষা বেশি। আজকাল কাগজেও নিদর্শন মুদ্রা (ভারতে অর্থমন্ত্রক কর্তৃক পরিচালিত এক টাকার নোট) পরিচালিত হয়। পরিচালিত মুদ্রাও আদিষ্ট মুদ্রারই মত, তবে রাষ্ট্র সাধারণতঃ এই ধরনের মুদ্রা পরিচালনায় মুদ্রাপরিবেশক সংস্থাকে শর্তসাপেক্ষ আদেশ দিয়া থাকে। কোনও বাস্তব মানের উপরে ভিত্তি করিয়া এই ধরনের মুদ্রার মুদ্রান্তরণ সম্ভব। দ্রব্য মুদ্রা ও পরিচালিত মুদ্রা উভয়েই বাস্তব মানভিত্তিক মুদ্রান্তরণ সাপেক্ষ। এই ত্রিবিধ আইনগত বিহিত মুদ্রা ব্যতীতও বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কের ঋণ-স্বীকৃতি পত্র ও আমানত পরিমাণ মুদ্রার কার্য করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানত হইতে ঋণ সৃষ্টি করিয়া ব্যাঙ্ক-সমূহ সীমাবদ্ধ প্রচলন ক্ষেত্রে 'মুদ্রা' সঞ্চালন করিতে পারে। অবশ্যই এ ধরনের মুদ্রা আইনগত বিহিত মুদ্রা নহে। উত্তমর্ণ ব্যাঙ্ক ও অধমর্ণ ঋণ-গ্রহীতার সহ-যোগিতা এবং ঈপ্সার উপরে এই ধরনের মুদ্রা সঞ্চালন নির্ভর করে।

তরুণ সান্যাল

মুদ্রাযন্ত্র মুদ্রণবিদ্যা, মুদ্রাযন্ত্র দ্র

মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে মধ্য ও পূর্ব ইওরোপে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছিল, সেই অর্থে সরকারি করের দ্বারা আদায়ীকৃত মুদ্রা পরিমাণ অপেক্ষা অধিক সরকারি ব্যয়নির্বাহের উদ্দেশ্যে মুদ্রার জোগানবৃদ্ধিজাত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্য হ্রাসকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাইতে পারে। ১৯৩০ খ্রী পর্যন্ত দ্রব্য পরিমাণ সঙ্গে

সঙ্গে বৃদ্ধি না করিয়া বিপুল হারে মুদ্রার জোগানবৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হইত। সেজন্য জনপ্রিয় সংজ্ঞায় বলা হয়, মুদ্রাস্ফীতি বহুল পরিমাণ মুদ্রা কর্তৃক স্বল্প পরিমাণ দ্রব্যের পশ্চাদ্ধাবন।

মুদ্রাস্ফীতি বলিতে ‘উচ্চ’ দ্রব্যমূল্য বোঝায় না, ক্রমবর্ধমান মূল্যজনিত অর্থনৈতিক অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের বিনষ্টিজনিত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অবস্থাই মুদ্রাস্ফীতি। পূর্বে মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বে বিশ্বাসী অর্থনীতিকেরা, পূর্ণকর্মসংস্থানের অবস্থায় মুদ্রার যোগানবৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতি উদ্ভবের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

জন মেনার্ড কেইন্‌স-এর মতে, উৎপাদনের উপকরণগুলির আয় উপার্জনের পরিবর্তন না ঘটিলেও, মূলধনে লগ্নি পরিমাণ সঞ্চয় পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই মুনাফাজনিত মুদ্রাস্ফীতি। অপরদিকে, মূলধনে লগ্নি পরিমাণ সঞ্চয়ের সমান থাকিলেও, উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যকে বাড়াইয়া দিবে। ইহাই আয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি। স্বল্পকালে আয় স্থির থাকিলে এবং তৎসহ লগ্নি ও সঞ্চয়ে সমতাজনিত ভারসাম্য বর্তমান থাকিলে, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিবে না। অর্থাৎ এই মতানুসারে চলতি ভোগব্যয় ও বাণিজ্যিক ব্যয় অর্জিত আয়ের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মোটব্যয় ও দ্রব্যমূল্যের ব্যাপক পরিবর্তন, দেশবাসীর লগ্নি করিবার ও ভোগদ্রব্যে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। এই বিশ্লেষণে, অধিক মুদ্রাসঞ্চালনই মূল্যবৃদ্ধির কারণ নহে।

নানা ধরনের মুদ্রাস্ফীতি আছে। দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় কমিয়াছে কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, এরূপ মুদ্রাস্ফীতিকে গোপন বা লুক্কায়িত মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়। তাহা ছাড়া, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও নানা পদ্ধতির সহায়তায় দ্রব্যমূল্য স্থির রাখিলেও যে মুদ্রাস্ফীতি রহিয়া যায়, তাহাকে অবদমিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়, আবার মোট দ্রব্যপরিমাণের এক অংশের দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধিকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি নাম দেওয়া হয়। দ্রুতহারে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতাজনিত ঊর্ধ্বগামী মূল্যের দ্রুত প্রধাবনকে আমরা খোলা বা ধাবিত মুদ্রাস্ফীতি নামে উল্লেখ করিতে পারি। কেইন্‌স “ঈপ্সিত ব্যয় অপেক্ষা ভিত্তিমূল্যে প্রাপ্তব্য দ্রব্যসামগ্রীর উপরে অধিক অর্থব্যয়জনিত ব্যবধান”কে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ফাঁক বা ব্যবধান বলিয়াছেন।

মুদ্রাস্ফীতির নানাবিধ ফল আছে। যাহাদের স্থির আয়, তাহারা দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্যহ্রাসের ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বিনষ্টির জন্য নানা অসুবিধায় পড়ে, সুদভোগী, খাজনাভোগী, স্থির বেতনভোগী ব্যক্তিরা মুদ্রাস্ফীতির জন্য বিড়ম্বিত হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা, উৎপাদনকারী, অধমর্ণ, ব্যবসায়ীরা লাভবান্ হয়। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য বিক্রেতা ও উৎপাদনকারীদের আয়বৃদ্ধির ফলে বেশি কর্মসংস্থান হয়। ফলে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বাড়িলেও, মজুরির ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যায়। বৈদেশিক বাণিজ্যেও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য রপ্তানি কমিয়া যায়; এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দেশবাসীর হাতে জাতীয় আয়ের বিপুল পরিমাণ কুক্ষিগত হইবার ফলে, দেশে অর্থনৈতিক অবনয়নের পূর্বাভাস সূচিত হয়। কেইন্‌স অবশ্য দ্রব্যমূল্যের ধীরে ধীরে বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক বিকাশ ও উচ্চতর কর্মসংস্থানের যোগ্য পন্থা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের নানাবিধ পন্থা আছে। মুদ্রাগত নীতি, সরকারি কর ও আয়-ব্যয়নীতি, প্রত্যক্ষ নীতি। মুদ্রানীতির সহায়তায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক মোট ঋণ সঞ্চালন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা চালায়। পরিমাণমূলক, গুণাত্মক বা বিশেষিত প্রত্যক্ষ নীতি ও নৈতিক উপরোধ, ঋণপরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাড়াইয়া, সরকারি ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া এবং সরকারি ব্যয় হ্রাস ও উদ্বৃত্ত বাজেট নীতি চালু করিয়া মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়।

তাহা ছাড়া মূল্যনিয়ন্ত্রণ, রেশনিং প্রভৃতি নীতিরও সহায়তা লওয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতিকে বহু মস্তকবিশিষ্ট দানব বলিয়া অভিহিত করা হয়; এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে মুদ্রাগত, সরকারী আয়-ব্যয়, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সকল নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিই কার্যকরী করা হয়।

তরুণ সান্যাল

মুন্শী আবদুল করিম (১৮৭১-১৯৫৩ খ্রী) পিতা মুন্শী নুরুদ্দীন। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার সুচক্রদণ্ডী গ্রাম।

বাংলা সাহিত্যের নষ্টপ্রায় আড়াই হাজার পুঁথি সংগ্রহ ও দেড়শতাধিক মধ্যযুগীয় মুসলমান কবির অস্তিত্ব বাহির করিয়াছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু এফ, এ, পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল স্কুলে শিক্ষকরূপে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌সপেক্টরের অফিসে কেরানীর পদ গ্রহণ করিয়া ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ‘পূর্ণিমা’ পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দে ‘অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী’ নামে এক ধারা-

বাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার সংগৃহীত পুঁথির বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হইতে থাকে এবং দুইখণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তাঁহার সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ'-এর বিশেষ প্রশংসা হয়। মুহম্মদ এনামুল হকের সহযোগে 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' রচনা করেন।

চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁহাকে 'সাহিত্য বিশারদ' উপাধি দেন।

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

মুনাফা জাতীয় আয়ের যে অংশ সংগঠক বা উদ্যোক্তার প্রাপ্য, তাহাকে মুনাফা বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করিতে যাহা ব্যয় হয় তাহা মোট ব্যয়; উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা মোট বিক্রয়লব্ধ আয়; মোট আয় হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে অবশিষ্টাংশ মোট মুনাফা।

উদ্যোক্তা দুইটি কার্য একত্রে সম্পাদন করে। প্রথমতঃ সে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানগুলির (জমি, শ্রম, মূলধন) মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে। দ্বিতীয়তঃ সে উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করে। সে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্য যাহা পায় তাহা স্বাভাবিক মুনাফা। ঝুঁকি বহনের যে পুরস্কার তাহাই প্রকৃত মুনাফা। সাধারণতঃ প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা হইতে বেশি হয়। বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে উদ্যোক্তা স্বাভাবিক মুনাফার ঊর্ধ্বে একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করে।

অন্যান্য উপাদানের আয়ের (মজুরি, সুদ, খাজনা) সঙ্গে মুনাফার পার্থক্য আছে। অন্যান্য আয় চুক্তিবদ্ধ, কিন্তু মুনাফা চুক্তিবদ্ধ নয়। সেইজন্য ইহা খুবই অনিশ্চয়তাপূর্ণ। বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতির সময়ে মুনাফা বাড়ে, নিম্নগতির সময়ে মুনাফা কমে। বাণিজ্যে মন্দার ভাব তীব্র হইলে মুনাফা ঋণাত্মক (লোকসান) হইতে পারে। কিন্তু খাজনা, সুদ বা মজুরি কখনও ঋণাত্মক হয় না।

মোট মুনাফা হইতে নীট বা বিশুদ্ধ মুনাফা বাহির করিতে হইলে মোট মুনাফা হইতে কয়েকটি অংশ বাদ দিতে হইবে। তবে বিশুদ্ধ মুনাফা বাহির করিবার হিসাব পদ্ধতি একক ব্যবসায় ও যৌথ মূলধনী কারবারে বিভিন্ন। একক ব্যবসায়ে উদ্যোক্তা যদি নিজেই উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও নিজস্ব জমি ও মূলধন নিযুক্ত করে,তাহা হইলে বিশুদ্ধ মুনাফা বাহির করিতে হইলে মালিকের মোট আয় হইতে তাহার নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব মূলধনের সুদ ও নিজস্ব শ্রমের মূল্য বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্টাংশ তাহার বিশুদ্ধ মুনাফা।

যৌথ মূলধনী কারবারে যাহারা অংশ-পত্র ক্রয় করে তাহারাই প্রকৃত মালিক। কিন্তু ব্যবসায় পরিচালিত হয় বেতনভুক কর্মচারীর দ্বারা। এই সমস্ত বেতনসহ উৎপাদন ব্যয়কে বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে বাদ দিলে মুনাফা বাহির হয়। এই মুনাফা হইতে মূলধনের অবপূর্তি হিসাবে ও সংরক্ষিত তহবিলে কিছু রাখা হয়। অবশিষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ মুনাফা অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টিত হয়।

বিকাশমোহন সান্যাল

মুরগী মুরগীপালন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ কুটির-শিল্প। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩৩৬৪৮ লক্ষ ডিম ও বহু আহারযোগ্য মোরগ উৎপন্ন হয়। এরিল, চট্টগ্রামী, বসরা, দেশী, কালাহস্তী, ডেংক, তিতুরী, তেলিচেরী প্রভৃতি মুরগী ভারতের দেশী মুরগী। ইহারা সারা দেশেই পাওয়া যায় এবং ডিম দেয় কম। এরিল ও ডেংক মোরগ লড়াইয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী মুরগী বৎসরে ১৩০টিরও বেশি ডিম দেয় ও মোরগগুলি মাংসের জন্য পালিত হয়। বসরা মুরগীর ডিম বেশ বড় হয়। উন্নত ডিম্বদান শক্তির জন্য আজকাল ভারতের বহু স্থানে ব্ল্যাক মিনর্কা, হোয়াইট লেগহর্ন, রোড আইল্যান্ড রেড প্রভৃতি বিদেশী মুরগী প্রতিপালন করা হয়। মুরগীর ডিম হইবার পরে মুরগী সাধারণতঃ ২১ দিনে তাহার উপর বসিয়া ডিমে তা' দিয়া বাচ্চার জন্ম দেয়। আজকাল উন্নত কুক্কুটশালাতে ইনকুবেটারের সাহায্যে মুরগীর ডিম ফুটানো হয়। ইনকুবেটারগুলিতে একেবারে কয়েক সহস্র ডিম রাখা যায়। ইনকুবেটারের অভ্যন্তরে বায়ু সঞ্চালনের জন্য পাখা ও ডিমগুলি ঘুরাইবার জন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাও থাকে।

বয়ঃপ্রাপ্ত মুরগীর দৈনিক খাদ্য ৪ আউন্স (গম, যব, ধান্য, ওট্‌স্‌ প্রভৃতি শস্যের দানা, শস্যচূর্ণ, সবুজ ঘাসপাতা ইত্যাদি।)

মুরগীপালনের ক্ষেত্রে আমেরিকাই সর্বাপেক্ষা উন্নত দেশ। এখানে মুরগীপালন প্রায় একটি ফ্যাক্টরি শিল্প হইয়া উঠিয়াছে। মুরগীগুলিকে কৃত্রিম আলোক ব্যবস্থাযুক্ত শেডের মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত খাঁচায় রাখা হয়; যন্ত্রের সাহায্যে চালিত খাদ্য পানীয়ের পাত্রগুলি খাঁচার সামনে আসিলে খাঁচার মুরগীগুলি তাহা হইতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে। ইহাতে মুরগী অধিক খাদ্যগ্রহণে উৎসাহ পায়, স্থান ও শ্রমের অপব্যয় এবং সংক্রামক ব্যাধির প্রসার নিবারিত হয়।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

মুরলী একপ্রকার প্রাচীন বাঁশী। শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাইতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শাস্ত্রানুসারে ইহার দৈর্ঘ্য হস্তদ্বয়াধিক বা চব্বিশ অঙ্গুলী (পৌনে দুই ফিট)। ইহাতে একটি মুখরন্ধ্র ছিল। বাঁশীর শিরঃস্থল হইতে দু, তিন, বা চার অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়া একটি ফুৎকাররন্ধ্র প্রস্তুত করা হইত। মুখ সংযোগে ইহাতে ফুৎকার প্রদান করিয়া বাজানো হইত বলিয়া ইহার নাম মুখরন্ধ্র হইয়াছে। মুরলী একপ্রকার আড়বাঁশী ছিল ইহাকে চতুঃস্বরাছিদ্র যুক্ত বাঁশী বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার চারিটি মাত্র স্বররন্ধ্র ছিল। ইহার আওয়াজ ছিল গম্ভীর কিন্তু সপ্তছিদ্রযুক্ত না হওয়াতে বাজাইবার পক্ষে ব্যাপকতা অধিক ছিল না। মধ্যযুগে আইন-ই-আকবরীতে বলা হইয়াছে মুরলী "নাই"-এর অনুরূপ। আরবী, ফার্সীতে "নাই" শব্দে সাধারণভাবে বাঁশী বোঝায়।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

মুরারি মুরারির নাট্যগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি ছিলেন মৌদ্গল্য গোত্রীয় বর্ধমাঙ্ক ও তন্তুমতীর পুত্র। সম্ভবতঃ তিনি ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' হইতে কিছু কিছু ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকে' (২।১) মুরারির নাটকের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শ্রীকণ্ঠচরিতে' মুরারিকে রাজশেখরের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের শেষ ভাগ বা ১০ম শতকের প্রথম ভাগ বলিয়া মনে হয়। 'অনর্ঘরাঘব' নামক সপ্তাঙ্ক নাটক তাঁহার একমাত্র গ্রন্থ। রাম-লক্ষ্মণের বিশ্বামিত্রাশ্রমে গমন হইতে রাবণবধানন্তর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রামায়ণ-কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। নাটক হিসাবে 'অনর্ঘরাঘব' উচ্চ স্তরের নহে। কাব্য হিসাবেও ইহা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য নহে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মুর্শিদকুলী খাঁ প্রবাদ দাক্ষিণাত্যের এক ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবকালেই দুর্বৃত্ত কর্তৃক হৃত হইয়া এক পারস্য বণিকের নিকট বিক্রীত হন। এই ব্যক্তি, বালককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া বৈষয়িক বিষয়ে নানারূপ শিক্ষা দেয়। ঔরঙ্গজেব যখন তাঁর পিতা সম্রাট শাহজাহানের অধীনে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন তখন মুর্শিদকুলী খাঁ পারস্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন এবং কর্মপটু হওয়ায় শীঘ্রই উন্নতি করেন। পরে ঔরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সম্রাট তখন তিনি মুর্শিদকুলী খাঁকে ঢাকায় সুবেবাংলার দেওয়ান করিয়া পাঠান। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ও জমি বিলির সুব্যবস্থা করেন তাহার ফলে বাংলা দেশের মালগুজারী বাবদ প্রতি বৎসর ১ ক্রোর টাকা ঔরঙ্গজেবকে পাঠাইতেন। সুবাদার আজিম উসমানের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুখসুদাবাদে তাঁহার দপ্তর স্থানান্তরিত করেন।

১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফরুকশিরর মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলা, বিহার, ওড়িশার সুবেদার নিযুক্ত করেন। তখন হইতে মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার নামানুসারে মুর্শিদাবাদ হয় ও ইহা বাংলার রাজধানী হয়। ১৭২৭ খ্রী মুর্শিদকুলী খাঁর দেহান্তর হয়। পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাংলার নবাবী পদে মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু সরফরাজের পিতা সুজাউদ্দীন খাঁ বাংলার মস্‌নদ অধিকার করিয়া বসেন এবং ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করেন।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা; ইহার সদর মহকুমা বহরমপুর। বহরমপুরের ১১ কিলোমিটার উত্তরে বাংলা, বিহার, ওড়িশার শেষ মুসলমান রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে ১৯৭ কিলোমিটার দূরে উত্তর রেলওয়ের শিয়ালদহ-লালগোলাঘাট শাখার মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে স্টেশন হইতে শহরটি ২ মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্বকূলে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহা ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী একটি বিস্তৃত নগররূপে বিদ্যমান ছিল। ইহার পুরাতন নাম মুখসুদাবাদ বা মুখসুসাবাদ। ঔরঙ্গজেবের সময় বাংলার রাজধানী ঢাকায় ছিল। আজিম উস্‌মান যখন নবাব নাজিম ছিলেন তখন ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আসেন। তখন নবাব নাজিম ও দেওয়ান দুইটি পৃথক্ স্বাধীন পদ ছিল। আজিম উস্‌মানের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদিগকে লইয়া মুখসুদাবাদে তাঁহার দপ্তর স্থানান্তরিত করেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ফরুকশিয়র মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলার নবাবী পদ দেন। তখন হইতেই মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্তিত হইয়া মুর্শিদাবাদ হয় ও ইহা বাংলার রাজধানী হয়। কয়েক বৎসর পরে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলা, বিহার, ওড়িশার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে বহু প্রাসাদ, কেল্লা ও দরবারগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কাটরার মসজিদ মাত্র তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। এই মসজিদের সোপানতলে মুর্শিদকুলী খাঁর মরদেহ সমাহিত করা হইয়াছিল। কাটরার মসজিদের অনতিদূরে তোপখানা

ছিল, তথায় 'জাহান কোষা' নামক একটি প্রকাণ্ড কামান পড়িয়া আছে।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বা সুজাউদ্দৌলা বাংলা, বিহার, ওড়িশার সুবাদার হন। তিনিও অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার মুর্শিদাবাদের অন্যতম দ্রষ্টব্য। ভাগীরথীর অপরপারে ডাহাপাড়ায় সুজাউদ্দৌলা ফর্হাবাগ (সুখকানন) নামে একটি প্রমোদকানন নির্মাণ করিয়াছিলেন। ফর্হাবাগের দক্ষিণে রোশনিবাগে সুজা খাঁর সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সুজা খাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দী খাঁ সরফরাজের কর্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তরে গিরিয়া নামক যুদ্ধক্ষেত্রে সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। নেকটাখালির প্রাসাদে সরফরাজকে সমাহিত করা হয়। ইহা এক্ষণে সরকারি "রক্ষিত কীর্তি" বিভাগের রক্ষণাধীন। নবাব আলিবর্দীর পর সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, মীরকাশিম পুনরায় মীরজাফর নবাব হন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলার সময় ক্লাইভ কোম্পানির তরফ হইতে বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। নজমউদ্দৌলার পর সৈফউদ্দৌলা তারপর মুবারকউদ্দৌলা নবাব-নাজিম হন। এই সময়ে নিজামত আদালত কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়, ফলে মুর্শিদাবাদ আর রাজধানী রহিল না এবং নবাবেরও কোনও রাজকীয় ক্ষমতা রহিল না। মুবারকউদ্দৌলার পর বাবরজঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুনজা ও ফেরিদুনজা বা মনসুর আলি নবাব-নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। মনসুর আলি-ই শেষ নবাব-নাজিম। তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

মুর্শিদাবাদের অন্যান্য দ্রষ্টব্যঃ মীরজাফর বংশীয়দিগের সমাধিভবন—ভাগীরথী তীরে জাফরাগঞ্জ ও তাহার নিকটে সিরাজের বধ্যভূমি 'নিমকহারামী দেউড়ী'; নিজামত কেল্লার মধ্যস্থ হাজারদুয়ারী প্রাসাদ ও ইমামবারা; শহরের দক্ষিণে মোতিঝিলের ধ্বংসাবশেষ; মোতিঝিলের পূর্বদিকে মুবারক মঞ্জিল নামক উদ্যান। ভাগীরথীর অপর পারে আলিবর্দী ও সিরাজের সমাধিভবন খোসবাগ; জাফরাগঞ্জের ঠিক অপর পারে সিরাজের হীরাঝিল নামক এক উদ্যান ও প্রাসাদ ইহা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বা লালকুঠি নামে পরিচিত। ডাহাপাড়া হইতে তিন মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন তীর্থস্থান ও উপপীঠ কিরীটেশ্বরী মন্দির অবস্থিত।

দ্র কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাবী আমল; নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম খণ্ড; নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী; পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ', ১ম খণ্ড; Murshidabad District Gazetteer.

ত্রিদিবনাথ রায়

মুর্শিদ গুরুবাদী মুসলমান সাধকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। ভাব ও গানের ধারা বাউল গানের সঙ্গে তুলনীয়। আউল ও মুসলমান বাউল এই গানে গুরুবাদ, সাধনপদ্ধতি, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের আরোপ করেন।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

মুলাযোড় ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগর স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত গ্রাম। মুলাযোড় ব্রহ্মময়ী (দক্ষিণ কালিকা) মন্দির শিব এবং গোপীনাথ জীউর মন্দির দ্রষ্টব্য। প্রতি অমাবস্যায় এবং রটন্তী চতুর্দশীতে বিশেষ সমারোহ হয়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র শেষ জীবন এখানে অতিবাহিত করেন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

মুসা ইহুদী জাতির বিখ্যাত নেতা। খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মিশরে জন্মগ্রহণ করিয়া নির্যাতিত ইহুদী জনগণকে মিশরীয় দাসত্ব হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার নেতৃত্বে মিশর ত্যাগ করিয়া ইহুদীরা লোহিতসাগর পার করিয়া বহু বৎসর আরবদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মরুপ্রান্তরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইহুদীদের 'পুণ্যভূমি'র অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মরুপ্রান্তরে থাকাকালে মুসা ইহুদী জাতিকে সংগঠন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্র ও সমাজব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন। বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তক অর্থাৎ আদিগ্রন্থ, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়, গণনা ও দ্বিতীয় বিবরণ মুসার প্রেরণায় লিখিত হইয়াছিল।

মুসা নামটি আরব ও উর্দু ভাষার মাধ্যমে বাংলায় প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজীতে মুসার নাম Moses, বাইবেলের বাংলা অনুবাদে নামটির সাধারণ রূপ মোশী।

মুসা মুক্তিদাতা যীশুখ্রীষ্টের পূর্বপ্রতিচ্ছবি। মুসা সিনাই-পর্বতে দিব্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'দশ আজ্ঞা' ইহুদীদের কাছে জারি করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবর্তিত 'বিধান'কে যীশুখ্রীষ্ট বাতিল করিতে আসেন নাই বটে, কিন্তু বিধান-আনুগত্যের অপেক্ষায় তিনি ঐশ আত্মার প্রতি আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন এবং ইহুদী জাতির জাতীয় ঐক্য ও ঐতিহ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত বিধানটি খ্রীষ্টের দ্বারা বিশ্বজনীন এক নববিধানে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

পিয়ের ফালোঁ

মুসাবনী, মোসাবনী বিহারের সিংভূম জেলার তাম্র উৎপাদনের একটি ক্ষুদ্র শহর (৮৬°২৮′ পূঃ ও ২২°৫০′ উঃ) জনসংখ্যা ১৯৮২৮ (১৯৭১)। সালফাইড জাতীয় তাম্র আকর-তাম্র ২.৪ °/°। স্থানীয় আকর সঞ্চয় আনুমানিক ৩০০০ মি. টন। ইন্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন (অধুনা কেন্দ্র সরকারের আয়ত্তে) এখানকার আকর মৌভাণ্ডার ও ঘাটশিলায় শোধন ও ধাতুতে পরিণত করে। বৎসরে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টন আকর উত্তোলিত হয় ও উহা হইতে প্রায় ৭৫০০ টন তাম্র পাওয়া যায়। 'তামা' দ্র

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫ খ্রী) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালীতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এক নায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়। ফ্যাসিবাদ নামে পরিচিত এই একনায়কতন্ত্রের জনক মুসোলিনি। ১৯২২-২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসোলিনি দেশে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার অধিকারী মুসোলিনি কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ধর্মের উপর আংশিক অধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম পর্বে (১৯২২-৩৫ খ্রী) মুসোলিনি ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে জার্মানীর সশস্ত্রীকরণ ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির বিরোধিতা করেন। মিউনিখ বৈঠকে (১৯৩৮ খ্রী) তিনি শান্তির সপক্ষে কাজ করেন এবং চেকোশ্লোভাক সমস্যার সাময়িক সমাধান হয়। ফ্রান্সের পতনের পর (১৯৪০ খ্রী) মুসোলিনি হিটলারের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি হিটলারের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করিয়াছিলেন (১৯৩৬-৩৯ খ্রী)। মিত্রশক্তি বিভিন্ন রণক্ষেত্রে ইতালীকে পরাজিত করিয়া সিসিলি আক্রমণ করে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ জুলাই মুসোলিনি পদচ্যুত হন। ইতালীতে গৃহযুদ্ধের চেষ্টা করিবার সময় তিনি বিরোধিদের হাতে নিহত হন (১৯৪৫ খ্রী)।

কমলকুমার ঘটক

মুসৌরী প্রায় ১৯৭১ মি. উচ্চ, বহির্হিমালয়ে অবস্থিত, প্রত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে ইহা একটি প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস। দেরাদুন শহর হইতে উত্তরে ১৫০ কি. মি. দূরে এই স্বাস্থ্যকর শহরটি অশ্বক্ষুরাকৃতি পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে একটি মনোরম স্থান। কলিকাতা হইতে রেলপথে, কোন বদল না করিয়া দেরাদুন যাওয়া যায়। দেরাদুন হইতে মুসৌরী সুন্দর বাঁধান রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত—যাইবার পথে প্রথমে কিছুটা সমভূমি অঞ্চল ও পরে নিম্নশিবালিক পর্বত-মালা পড়ে।

মুসৌরী ও ইহার নিকটস্থ অঞ্চলের মধ্যে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণী থাকায় শৈলাবাসটির রমণীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে ও অনেকগুলি উপত্যকারও সৃষ্টি হইয়াছে। মুসৌরীর পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত এইরূপ একটি উপত্যকা দিয়া যমুনা নদীর একটি শাখা প্রবাহিত। উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত গভীর উপত্যকাগুলিতে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। যে সকল পর্বতগাত্রে নিয়মিত বায়ু প্রবাহিত হয় সেই সকল স্থানে বৃক্ষাদি নাই বলিলেও চলে। উত্তরদিকে তুষারমৌলী "চোর" পর্বতমালা ও ইহার মধ্যে অবস্থিত ভান্ডারপুণা।

মুসৌরীর উপরের দিকে ওক্, ফার্, রোডোডেনডন প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ ও নিম্নাঞ্চলে, বিশেষ করিয়া শীতল বায়ুবর্জিত উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে নানাপ্রকারের ফল ও ফুলের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের ভিতর অ্যাপেল, পেয়ার্স, এপ্রিকট, চেরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পূর্বে বহু ইওরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয়রা এইস্থানে স্বাস্থ্য উদ্ধারের ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাইতেন, এখন প্রধানতঃ ভারতীয়দেরই দেখা যায়।

একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই স্থানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্থাপিত হয়। তাহার পূর্বে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য অ্যাংলিক্যান্ চার্চ্ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৩৫-৩৭ খ্রী)। মুসৌরীতে কয়েকটি বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও আছে।

এই শৈলাবাসের পূর্ব দিকে ল্যান্ডর(Landour) নামক স্থানটি অবস্থিত। ল্যান্ডর পূর্বে ব্রিটিশ সৈন্য-সমূহের ও তাহাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইত। মুসৌরী হইতে চাক্‌রাতা হইয়া সিমলা যাওয়ার একটি রমণীয় পথ আছে।

অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

মূকবধির শিক্ষা বধিরদের শিক্ষাপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতকে। আবে দ্য-ল'পে পারীতে (১৭৭৫ খ্রী) ও সামুয়েল হাইনিকে লাইপৎসিগে মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপন করেন। দ্য ল'পে সাংকেতিক প্রণালীর দ্বারা শিক্ষা দিতেন। হাইনিকে-র প্রণালী ছিল মৌখিক কথা বলা ও ওষ্ঠপাঠ শিক্ষা দেওয়া। তাহার পর ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও পৃথিবীর নানা স্থানে মূক-বধিরদের জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে।

১৮৮৪ খ্রী ভারতবর্ষে বোম্বাই শহরে সর্বপ্রথম বধিরদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৯৩ খ্রী কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথ সিংহ, যামিনীনাথ ব্যানার্জী, মোহিনীমোহন মজুমদার, উমেশচন্দ্র দত্ত ও গিরীন্দ্রনাথ বসু। ১৮৯৬ খ্রী কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম একটি শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগ স্থাপিত হয়। ১৯৬১ খ্রী এই শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগের

বিশেষভাবে উন্নতি করা হইয়াছে। এখন ইহা 'ট্রেনিং কলেজ ফর দি টিচার্স অফ দি ডেফ' নামে র্পান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতা ম্কবধির বিদ্যালয় এখন এশিয়ার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। ১৮৯৬ খ্রী দক্ষিণ ভারতে পালামকোটায় বধিরদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯০৪-৪০ খ্রী-র মধ্যে ৩৮টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৬৮। বর্তমানে ছয়টি ম্কবধির বিদ্যালয়ের সংগে শিক্ষকশিক্ষণ বিভাগ আছে; যথা, কলিকাতা, লখনৌ, দিল্লী, পালামকোটা, আমেদাবাদ ও হায়দরাবাদে। শিক্ষাপ্রণালীঃ প্রধানতঃ নিম্নলিখিত দ্ইটি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১. মৌখিক প্রণালীঃ কথা বলা ও ভাষা শিক্ষা, অপরের কথা যাহাতে ব্ঝিতে পারে সেজন্য ওষ্ঠপাঠ শিক্ষা; ২. মিশ্র প্রণালীঃ মৌখিক প্রণালী ও সাংকেতিক প্রণালীর মিশ্রণে শিক্ষা।

ইহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে মৌখিক প্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষে অধিকসংখ্যক বিদ্যালয় এই প্রণালী অন্সরণ করিতেছে। এই প্রণালী অন্যায়ী প্র্বে দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। বর্তমানে দৃষ্টিশক্তি, স্পর্শশক্তি ও অর্থে কুলাইলে বহ্ব্যয়সাপেক্ষ শ্রবণসহায়ক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা ম্কবধির বিদ্যালয়ে এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে।

রাধেশচন্দ্র সেন

ম্যর, জন (১৮১০-১৮৮২ খ্রী) ইংল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে জন্ম। ১৮২৯ খ্রী ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীর্পে ভারতে আসিয়া ইনি বর্তমান উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে যথাক্রমে রাজস্ববোর্ডের সহকারী সেক্রেটারী, স্পেশাল কমিশনার, কালেকটার, জজ প্রভৃতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মধ্যে ১৮৪৪ খ্রী প্রায় এক বৎসর কালের জন্য বারাণসী কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতে থাকার সময়ে সংস্কৃতশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়া ভারততত্ত্ববিদ্ র্পেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৫৩ খ্রী অবসর গ্রহণ করিয়া এডিনবরায় প্রত্যাবর্তন করেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও তুলনাম্লক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পদটি ম্যরের বদান্যতা ও অক্লান্ত উদ্যমের ফলে ১৮৬২ খ্রী সৃষ্ট হয়। হিন্দ্শাস্ত্র সম্হের ইংরেজী অন্বাদ প্রকাশ দ্বারা ম্যর চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনাঃ Original Sanskrit Text on the Origin and History of the People of Indian, Their religion and Institutions, Tr. by J. Muir. 5 vols., 1858-70.

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগ্প্ত

ম্ছর্না সপ্তস্বরের ক্রমিক আরোহণ এবং অবরোহণকে ম্ছর্না বলা হয়। ইহার দ্বারা এক-একটি রাগের র্প প্রতিফলিত হয়। প্রাচীনকালে ষড়জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামভেদে বহ্তর ম্ছর্নার পরিচয় পাওয়া যায়। ম্ছর্না হইতে স্বরাদির বিলোপসাধন করিয়া বা বিপরীতক্রমে উচ্চারণ করিয়া তানের সৃষ্টি হইত। বিভিন্ন ম্ছর্না ও তান বিবিধ যজ্ঞে বা প্জা-অর্চনায় প্রযুক্ত হইত। সংগীত শাস্ত্রাদিতে কোন কোন রাগের বিশেষত্ব কোন কোন ম্ছর্নায় প্রকাশ পায় তাহার উল্লেখ আছে। বর্তমানে এই জাতীয় ম্ছর্নাকে 'পকড়' বলা হইয়া থাকে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

ম্যর্তিপ্জা, ভারতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দ্, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের অন্যতম প্রধান আঙ্গিক হইল দেবম্যর্তি প্জা। ভারতের প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্য হইল ঋগ্বেদ। ইহার স্ত্রগ্লি আমাদিগকে সাধারণভাবে জানাইয়া দেয় যে উচ্চস্তরের ভারতীয় আর্যেরা আদিতে প্রতীক প্জক ছিলেন না। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে এমন উক্তিও আছে, যাহা পাঠে অন্মিত হয় যে এদেশের অনার্য অধিবাসীরা সে যুগে প্রতীক প্জায় অভ্যস্ত ছিলেন। সিন্ধ্ঘাটী ও অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত কতকগ্লি পোড়া মাটির ক্ষ্দ্র ক্ষ্দ্র 'মাতৃকা' ম্যর্তি এবং লিঙ্গ ও যোনির ক্ষ্দ্র ও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতীকাবলী বলিয়া ব্যাখ্যাত প্রত্নদ্রব্যসম্হ হইতে অনেকে অন্মান করেন যে এগ্লি ভারতবর্ষে আর্যদিগের অভিগমনের প্র্বে তত্তৎস্থানের ভারতবাসীদিগের দ্বারা ধর্মকার্যে ব্যবহৃত হইত। এ অন্মান সঙ্গত। ইহা স্বীকার করিলে ঋগ্বেদে জ্গ্প্সিত 'শিশ্নদেব' ও 'ম্রদেব' সম্হ যে তাঁহারাই ছিলেন এর্প মীমাংসা স্বাভাবিক। বৈদিক আর্যগণও কালক্রমে আর্যপ্র্ব বা আর্যেতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হন, এবং যে সকল ধর্মাচরণ বা সামাজিক প্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না, তাঁহারা তাহাদিগের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করেন। দেববিগ্রহ প্জার প্রথা মনে হয় এগ্লির অন্যতম।

স্ক্তকার প্রাচীন বৈদিক ঋষিরা যে একেবারেই ম্যর্তিপ্জক ছিলেন না ইহা অবশ্য সর্বজনগ্রাহ্য মত নহে। ইন্দ্র, বায়্, বর্ণাদি বৈদিক দেবতার স্ক্তে বর্ণিত মন্ষ্যোচিত র্পের উল্লেখ করিয়া কোনও কোনও পণ্ডিত অন্মান করেন যে ইহা প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতার বিগ্রহসম্হের বর্ণনা ব্যতীত আর কিছ্ই নহে। কিন্তু উক্তর্প মতের বিপক্ষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রগত এমন কিছ্ সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা হইতে জোর করিয়া বলা যায় যে বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদের অন্ষ্ঠিত যজ্ঞাদি ধর্মকার্যে বিভিন্ন দেবতার ম্যর্তি নির্মাণ করাইয়া ও

মূর্তিপূজা, ভারতে

প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তিসহকারে উহাদিগের পূজার্চনা করিতেন। নানারূপ যজ্ঞ-ক্রিয়ার বৈচিত্র্যময় যে সকল বিধি যজুর্বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে, উহাদিগের মধ্যে কোথাও দেববিগ্রহ নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা স্থান পায় নাই। ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে দেবতাদিগের মনুষ্যোচিত আংশিক রূপ বর্ণনা যাহা পাওয়া যায় উহা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত, উহার কোনও বাস্তব ভিত্তি ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে যুগে ভক্তিকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ধর্মসমূহের অভ্যুত্থান হয় নাই যাহার সর্বপ্রধান আঙ্গিক ছিল মূর্তি বা প্রতীক পূজা। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতে যখন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্রমিক উদ্ভব ও বিকাশ হইতে থাকে, তখন আর্যেতর আদিম জাতির দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যতম প্রধান ধর্মাচরণ প্রথা ইহাদিগের দ্বারা গৃহীত ও সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে। উক্তরূপ মীমাংসার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণস্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসক-দিগের ভক্তির আধার দেবতামণ্ডলী আদিতে বৈদিক পর্যায়ের ছিলেন না; ইঁহারা ছিলেন লৌকিক পর্যায়ের এবং খ্রীষ্টপূর্বযুগের এবং উহার অব্যবহিত পরবর্তী-কালের যে সকল পূজামূর্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিই হইল যক্ষ-নাগাদি ব্যন্তর দেবতাশ্রেণী। এই সকল দেবতা ছিলেন প্রাকৃত জনগণের ভক্তির পাত্র। ইঁহাদিগের বিগ্রহ পূজার অনুকরণেই বিষ্ণু, শিব, শক্তি, বুদ্ধ, জিন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক দেবতার ও তাঁহাদের পরিবারাদির প্রতিমা নির্মিত, প্রতিষ্ঠিত ও ভক্তিসহকারে পূজিত হইতে থাকে। এ উক্তির প্রমাণস্বরূপ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কুষাণ মহারাজাধিরাজ প্রথম কণিষ্কের তৃতীয় রাজ্য সম্বৎসরে মথুরার বৌদ্ধ ভিক্ষু বল কর্তৃক নির্মিত ও প্রাচীন শ্রাবস্তীনগরে প্রতিষ্ঠিত বিশালকায় বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধ) প্রতিমার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যক্ষ-নাগাদির সুপ্রাচীন মূর্তির সহিত ইহার আকৃতিগত সাদৃশ্য অত্যন্ত অধিক।

খ্রীষ্টপূর্বযুগে উল্লিখিত ভক্তিসম্প্রদায়গুলির মধ্যে দেবমূর্তি বা প্রতীক পূজা অন্যতম প্রধান ধর্মানুষ্ঠান-রূপে স্বীকৃত হইলেও সাম্প্রদায়িক দেবতাসমূহের তৎকালীন বিগ্রহাবলী অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই বলিলেও চলে। ইহার কারণ এই যে, সেকালে এই সব প্রতিমা প্রায়শঃ কাষ্ঠ, মৃত্তিকা প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী উপাদানের সাহায্যে নির্মিত হইত, কাজেই ইহাদের কোনও নিদর্শন অধুনা পাওয়া যায় না। পটে চিত্রিত দেবমূর্তিও পূজাকার্যে ব্যবহৃত হইত, সেগুলিও সাধারণতঃ ক্ষণিক পর্যায়ের ছিল। খ্রীষ্টপূর্বযুগের এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের যে কয়টি প্রস্তরমূর্তি আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির অধিকাংশই যক্ষ-নাগাদি দেবতা-সমূহের। এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে ভক্তের দেবতা অনেক সময়ে নানারূপ নিদর্শনের সাহায্যে তাঁহার উপাসকদিগের দ্বারা পূজিত হইতেন। ভরহুত, সাঁচী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ বেদিকা ও তোরণগাত্রে উৎকীর্ণ এইরূপ নিদর্শন দেখা যায়; ভগবান বুদ্ধের মূর্তি সেখানে উৎকীর্ণ নাই, কিন্তু তাঁহার পদচিহ্ন, ছত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকসমূহ খোদিত হইয়াছে। তবে অতি অল্পকালের মধ্যেই মথুরা ও গন্ধার প্রদেশের শিল্পীরা তাঁহার মনুষ্যোচিত মূর্তি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং বৌদ্ধস্তূপ ও বিহারের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীভক্তের উপাসনার নিমিত্ত এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ নানাপ্রকারের ও নানাভঙ্গীর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রতিমা এই সমস্ত নিদর্শনের স্থান গ্রহণ করে। মধ্যযুগে বজ্রযানপন্থী তান্ত্রিক বৌদ্ধ উপাসকগণের সাধন-সৌকর্যার্থে অগণিত প্রতিমা কল্পিত ও নির্মিত হইয়াছিল। জৈনধর্মের ক্ষেত্রেও আদিতে জিনস্মারক মাঙ্গলিক চিহ্নাদি (অষ্টমঙ্গলা প্রভৃতি) ভক্তের পূজার প্রতীক ছিল। ধর্মের ক্রমিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্বিংশতি তীর্থংকর, উঁহাদিগের বিভিন্ন শাসন-দেবতা এবং যক্ষিণী প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা বা দেবকল্প বিগ্রহের নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলিত হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যেরূপ গৌতম বুদ্ধ এবং পার্শ্ব-নাথ ও মহাবীরকে কেন্দ্র করিয়া রূপ পরিগ্রহ করে, ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মগুলির উদ্ভব ঠিক সেরূপভাবে হয় নাই। বাসুদেব-বিষ্ণু-নারায়ণকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মের সৃষ্টি হয় উহা উত্তর-গুপ্তযুগে ও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব; এবং প্রাক্ ও উত্তর-বৈদিক শিব এবং বৈদিক রুদ্রকে আশ্রয় করিয়া যে ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা শৈব পশুপতাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। এই দুইটি ভক্তিকেন্দ্রিক মুখ্যধর্মের ন্যায়, শক্তি (দেবী), সূর্য ও গণপতিকে কেন্দ্র করিয়াও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক ধর্মসমূহের উদ্ভব হয়। এই সকল দেবতার এক ভক্ত পূজকগোষ্ঠী নিজ নিজ ধর্মাচরণে তাঁহাদের বিভিন্ন দেবতার অমূর্ত ও মূর্ত প্রতীক ব্যবহার করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে অমূর্ত প্রতীক ও পরে মূর্ত প্রতীক পূজাকার্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ সূর্যদেবতার ভিন্নকালীন পূজাপ্রতীকগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। খ্রীষ্টপূর্ব-যুগের অংক-চিহ্ন-যুক্ত মুদ্রায় (Punch-marked coins) এবং পঞ্চাল প্রভৃতি দেশের মুদ্রায় দেবতা 'চক্র' বা 'ছটাবিশিষ্ট বৃত্তাকার বিম্বের' দ্বারা রূপায়িত হইয়াছেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে ভাজা, অনন্তগুম্ফা প্রভৃতি গুহা-মন্দিরে ও বুদ্ধগয়ার প্রাচীন শিলাপ্রাকারের স্তম্ভগাত্রে অশ্ববাহিত রথে আরূঢ় তাঁহার মনুষ্য-মূর্তি খোদিত দেখা যায়। আবার খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার কিছু পরে

ভারতে শকদ্বীপীয় সূর্যপূজার সম্যক্ প্রচলনের ফলে উপানৎ-গাত্রাবরণাদি বিশিষ্ট নব্যাঙ্গধারী দেববিগ্রহ-সমূহ উত্তর ভারতের নানা অংশে নির্মিত ও পূজিত হইতে থাকে। কালক্রমে এই জাতীয় সূর্যমূর্তি বহু-লাংশে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত হইলেও উহার পদদ্বয়ের উপানৎ অন্তর্হিত হয় নাই। শক্তি দেবী ও তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশ আদিতে মূর্ত ও অমূর্ত প্রতীকের সাহায্যে পূজিত হইতেন। সিন্ধু ঘাটীর প্রাচীন মাতৃকা মূর্তি ও যোনি প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভকালের কিছু পূর্বেকার এই উভয় প্রকার বহু বিচিত্র নিদর্শন উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত সময়ের প্রাচীন মুদ্রায় ও স্তূপগাত্রে এবং পৃথক্‌ভাবে দেবীর (ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই গজলক্ষ্মী বা অভিষেক-লক্ষ্মীর পর্যায়-ভুক্ত) মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। তবে ইহা সত্য যে শক্তিপূজকের প্রধান দেবী বা তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের কোনও খ্রীষ্টপূর্বযুগের প্রতিমা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা মূর্তির প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শন উদয়গিরির গুহাগাত্রে খোদিত আছে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম দশকের)। তাঁহার সিংহ-বাহিনী-রূপের অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন গুপ্তসম্রাট প্রথম ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রায় অঙ্কিত আছে। পরবর্তী কালের দেবীমূর্তিসমূহের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর। বাঙ্গালী শক্তিসাধকের প্রধান পূজাবিগ্রহ কালীর রূপকল্পনা কিন্তু সুপ্রাচীন নহে। বজ্রযান বৌদ্ধদেবতা নৈরাত্মার সহিত ইহার আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেও, ইহা বঙ্গদেশীয় বিশিষ্ট শাক্তউপাসকদের চিন্তাপ্রসূত। গণপতির পূজা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। গুপ্তযুগ হইতে ইঁহার মূর্তি পাওয়া যায়। লম্বোদর গজানন দেবতা-মূর্তি কিন্তু প্রাচীন যক্ষ ও নাগপূজা প্রতীকদ্বয়ের যুক্ত রূপায়ণ। প্রাচীন যক্ষ মূর্তিগুলিও প্রলম্বজঠর, এবং নাগ শব্দের এক অর্থ হস্তী।

বৈষ্ণব ও শৈব এই মুখ্য দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসকেরা বহু প্রাচীনকাল হইতে বিষ্ণু ও শিব এই দেবতাদ্বয় ও ইঁহাদের বিভিন্ন রূপের বিগ্রহাদি পূজা করিয়া আসিতেছেন। খ্রীষ্টপূর্বযুগের কোনও বিষ্ণু-মূর্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য, কিন্তু তৎকালীন পঞ্চালদেশাধিপতি বিষ্ণুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় চতুর্ভুজ দেবতার মূর্তি অঙ্কিত আছে দেখা যায়। বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশায়) প্রাপ্ত যবন ভাগবত হেলিয়দোর কর্তৃক উচ্ছ্রিত গরুড়ধ্বজ (প্রস্তরনির্মিত গরুড়স্তম্ভ) প্রমাণিত করে যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তথায় বাসু-দেব-বিষ্ণুর পূজা মন্দির ছিল এবং খুব সম্ভব তন্মধ্যে দেব-বিগ্রহাদিও ছিল। এ সম্বন্ধে তৎকালীন প্রত্নতত্ত্ব-মূলক আরও কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত-যুগ ও উহার অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তীকালের, এবং মধ্যযুগের বহুপ্রকারের বিষ্ণুমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিগ্রহগুলির মূল, বাসুদেব-বিষ্ণু-দেবতার প্রকার-ভেদের এবং তাঁহার ব্যূহ ও বিভবে (অবতার) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশের বৈচিত্র্যময় রূপায়ণ। পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ বৈখানসাগমে এবং মূর্তিতত্ত্ব সম্বলিত অন্যান্য গ্রন্থে ইহাদিগের আনুপূর্বিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা লিপি-বদ্ধ আছে। মধ্যযুগীয় এই প্রকার বহু মূর্তির বর্ণনা গ্রন্থোক্ত বর্ণনার সহিত অনেকাংশে মিলে। পাঞ্চরাত্র-সাধকগণের ধর্মাচরণে দেববিগ্রহের স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তাঁহারা ইহাদিগকে ভগবানের পঞ্চরূপের (যথা পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চা) অন্যতম বলিয়া গণনা করিতেন। শেষোক্তরূপের অর্থ হইল 'পূজা যোগ্যা প্রতিমা'। আবার তাঁহারা গণ্ডকী নদীগর্ভ হইতে সংগৃহীত শালগ্রামশিলা ইত্যাদিতে তাঁহাদিগের আরাধ্য দেবতার প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণু ও তাঁহার মুখ্য দশাবতারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি সম্বলিত বিষ্ণুপট্টও তাঁহাদিগের পূজাকার্যে ব্যবহৃত হইত।

প্রাক্‌বৈদিক যুগে আদিশিবের লিঙ্গ প্রতীক পূজার নিদর্শন সমূহের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মহাকাব্য-পুরাণাদির যুগেও শৈবদিগের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে ইহার বাস্তবধর্মী রূপচিত্রণের জন্য শিবলিঙ্গ-পূজা উন্নততর সমাজের একাংশের প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করে নাই। অন্ধ্রপ্রদেশ-স্থিত গুডিমল্লম গ্রামে প্রাপ্ত দ্বিভুজ শিবমূর্তিযুক্ত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি বাস্তবধর্মী প্রস্তরনির্মিত বৃহৎ শিব-লিঙ্গ (ইহা এখনও শৈবদিগের দ্বারা পূজিত হইতেছে) দেখিলেই ইহার কারণ বোধগম্য হয়। খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতকে কুষাণ রাজগণের মুদ্রায় শিব ও তাঁহার বাহন বৃষের মূর্তি আছে। কিন্তু গুপ্তযুগ হইতে ইহার বাস্তবধর্মিত্ব সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং শিবলিঙ্গ পূজা এত অধিক প্রসার লাভ করে যে প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে লিঙ্গ প্রতীকই দেবতার মূল বিগ্রহরূপে প্রতি-ষ্ঠিত ও পূজিত হইতে থাকে। মূর্তিশাস্ত্রে শিবলিঙ্গ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার বিধি সবিস্তারে বর্ণিত আছে। দেবতার নানাপ্রকার লীলা মূর্তির, যথা সংহারমূর্তি, অনুগ্রহমূর্তি, দক্ষিণামূর্তি, নৃত্যমূর্তি, সদাশিব ও মহাসদাশিব প্রভৃতি শৈবতত্ত্বমূলক মূর্তি ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনাও শৈবাগমাদি শাস্ত্রে দেওয়া আছে; এবং এই সকল বর্ণনার সহিত আংশিক ও পূর্ণ সামঞ্জস্য জ্ঞাপক মধ্যযুগের বহু শৈবমূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু শিবমন্দিরে ইহাদিগের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ ছিল, ইহার সাধারণতঃ কুলদেবতা রূপেই সম্মানিত হইত।

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট পূর্বে লিখিত অসংখ্য দেবমূর্তি ব্যতীত বিভিন্ন যুগের আরও কয়েকটি দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির প্রকৃতি সমন্বয়াত্মক। এগুলি সবই খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পরবর্তীকালের, এবং বিশেষ করিয়া গুপ্ত ও তৎপরবর্তীযুগের। এই জাতীয় মূর্তির অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন জনৈক হেফথালাইট হূণ সর্দারের একটি মুদ্রিকায় দেখা যায়। ইহাতে অঙ্কিত চতুর্ভুজ দেবতা শিব, বিষ্ণু ও মিহিরের সমন্বয় সূচনা করে। এলিফ্যান্টার তথাকথিত 'ত্রিমূর্তি' ও শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সকল বিভিন্ন প্রকারে শিব-শক্তির একাত্মতার নির্দেশ দেয়। মধ্যযুগের এই সমন্বয়জ্ঞাপক অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া যায়, যাহাদিগকে হরিহর, সূর্য-নারায়ণ, মার্তণ্ড-ভৈরব, হরিহর-সূর্য-বুদ্ধ, শিব-লোকেশ্বর, সূর্য-লোকেশ্বর প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আবার তৎকালীন এমন কয়েকটি প্রস্তর-নির্মিত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি স্মার্ত পঞ্চোপাসকের পূজাবস্তু ব্যতীত আর কিছুই নহে। শিল্পী কৌশলে ইহাদিগের মধ্যে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য ও গণপতির প্রতীক একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন প্রতিমা সমূহের খুব সংক্ষেপে প্রদত্ত সাধারণ পরিচয় হইতে ইহা জানা গেল যে এদেশে মূর্তি পূজার সম্যক্ বিকাশ সময়সাপেক্ষ ছিল। ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব পূর্ণরূপে অনুশীলন করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার সম্প্রসারণ ভারতের নিজস্ব ধারানুযায়ী হইলেও ইহাতে দেশী বিদেশী নানাবিধ উপাদান একত্র কার্যকরী হইয়াছিল। তবে ভারতীয় মূর্তিপূজা যে মুখ্যতঃ ভক্তগণের আরাধ্য দেবতার প্রতীক সমূহেরই পূজা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল উদ্ভিদের তিনটি প্রধান অংশের অন্যতম হইতেছে মূল বা শিকড়। অপর দুইটি পত্র ও কাণ্ড। সাধারণভাবে ইহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত। অঙ্কুরোদ্গমের পর প্রথম যে অংশটি বীজ হইতে বহির্ভূত হয়—উহাই হইতেছে মূলের সূচনা। মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশের পরবর্তীকালে মূলের অগ্রভাগে মূলে ও তাহার উপরাংশে ত্বকের কোষ অধিক বর্ধিত হইয়া মূলরোমের উদ্ভব হয়। ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মূলে ইহারা অবর্তমান। মূলের পত্রমুকুল বিরল এবং অভ্যন্তরীণ কলাবিন্যাস কাণ্ড হইতে স্বতন্ত্র। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ যথা শৈবাল এবং মস্ জাতীয় উদ্ভিদের প্রকৃত মূল থাকে না। উদ্ভিদবিবর্তন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মূলের প্রথম বিকাশ স্থলজ উদ্ভিদের অযৌন পর্যায় (স্পোরোফাইট) সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত।

মূলের মুখ্য উদ্দেশ্য উদ্ভিদকে মৃত্তিকার সহিত আঁকড়াইয়া রাখা ও মৃত্তিকা হইতে অভিস্রাবণ প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্যরস শোষণ করা। ইহা ভিন্ন মূল হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ জৈব রসও নির্গত হয়, যাহার ফলে মূলের সংস্পর্শস্থিত মৃত্তিকার জীবাণু সংখ্যা অন্য স্থান অপেক্ষা শতগুণেরও বেশি হয়।

সৃষ্টি-ভেদে মূল দুই প্রকারেরঃ ১. সাধারণ মূল—ভ্রূণমূলই অপরিবর্তিত থাকিয়া ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া ইহার সৃষ্টি হয়। ইহার আদি অংশ ও শাখা প্রশাখা থাকে। লাইকোপোডিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত উদ্ভিদগুলির মূল দ্বিবিভক্ত হইয়া যায়। ২. আস্থানিক মূল—ইহার উৎপত্তি ভ্রূণমূল ভিন্ন উদ্ভিদের অন্য যে কোনও অংশ হইতে। কাণ্ডের পাদদেশ অথবা পর্ব হইতেই সাধারণভাবে এইরূপ মূলের উদ্ভব। এই শ্রেণীভুক্ত গুচ্ছমূল একবীজপত্রী উদ্ভিদে দেখিতে পাওয়া যায়। অক্সিন জাতীয় কৃত্রিম উৎসেচক রাসায়নিক ব্যবহার করিলে মূলের প্রকাশের সুবিধা হয়। কলমে মূলবিকাশের সহায়ক হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার হইতেছে। কোনও কোনও উদ্ভিদের পত্র হইতেও ইহার উদ্ভব হইতে পারে, যেমন পাথরকুচি, হিমসাগর ও বেগোনিয়া। বিশেষ কার্যসাধন উদ্দেশ্যে মূলের নানাবিধ পরিবর্তন হইতে পারে। খাদ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত সাধারণ মূল পরিবর্তিত হইয়া মূলকাকার (মূলা), শাঙ্কব (গাজর) ও শালগমাকার (বীট ও শালগম) রূপ ধারণ করে। আস্থানিক মূলের পরিবর্তনের ফলে কন্দমূল (রাঙাআলু ও শাঁকালু), গুচ্ছিত মূল (শতমূলী), গুটিকাযুক্ত মূল (আমাদা, অ্যারারুট ও মুথাঘাস), মালাকৃতি মূল (কাঁকরোল), বলয়ী মূল (ইপিকাক) হয়।

অপরবৃক্ষে আশ্রয়ের নিমিত্ত পরাশ্রয়ীমূল প্রায়শই বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প শোষণে ব্যবহৃত হয়। এই নিমিত্ত এইরূপ মূলের বহিঃস্তরে 'ভেলামেন' নামক এক বিশেষ প্রকারের কলাতন্ত্র বিদ্যমান। সবুজকণা (ক্লোরোপ্লাস্ট) থাকার জন্য এইরূপ মূলে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে। রান্না প্রভৃতি উদ্ভিদে এই মূল দেখিতে পাওয়া যায়। গুলঞ্চ প্রভৃতি উদ্ভিদের আত্তীকরণ মূল দ্বারাও এই সালোকসংশ্লেষের কাজ হয়। স্বর্ণলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ আশ্রয়কারী উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে রস শোষণের জন্য এক বিশেষরূপ মূল আশ্রয়দাতার কাণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দেয় ও রস শোষণ করে। ইহাকে চোষক মূল বা ইংরেজীতে 'হস্টোরিয়া' বলে।

ইহা ভিন্ন সুন্দরী, গরান প্রভৃতি বৃক্ষে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বহুছিদ্র বিশিষ্ট মূলের অগ্রভাগ বাহিরে চলিয়া আসে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে। ইহাকে শ্বাসমূল বলে। কচুরীপানার 'ভাসমান মূল' স্পঞ্জের

মত নরম ও ইহাকে ভাসিয়া থাকিতে সাহায্য করে। বট ও অশ্বথ বৃক্ষের 'স্তম্ভমূল' বা 'ঝুলিমূল', কেয়াগাছের 'ঠেশমূল', পান ও গজপিপুলের 'আরোহীমূল' উদ্ভিদকে যান্ত্রিক সাহায্য দিয়া থাকে। বৃক্ষাকার কয়েকটি ফার্ন জাতীয় উদ্ভিদের মূল কাণ্ডের চারিদিকে ঘনভাবে জড়াইয়া একটি আবরণ সৃষ্টি করে।

দেহের ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্ত শিমুল জাতীয় অতিকায় কয়েকটি বৃক্ষের মূল ডানার মত চারিদিকে বিস্তৃত হয়। মাটি হইতে তক্তার মত ইহারা যেন বৃক্ষটিকে চতুর্দিক হইতে ঠেলিয়া রাখে। পার্বত্য নদী-নালায় 'পোডোস্টেমনাসী' গোত্রের উদ্ভিদের কোনও প্রকৃত মূল থাকে না। কিন্তু পাথরের উপর আঁকড়াইয়া থাকিবার জন্য 'হ্যাপটেরা' নামক বিশেষ ধরনের চ্যাপ্টা অংশের সৃষ্টি হয়। আবার ঝাঁঝি জাতীয় কয়েকটি জলজ উদ্ভিদের (ইউট্রিকুলারিয়া) মূলবিহীন হয়।

আশিস্‌কুমার চন্দ্র

মূলধন কথাটির বিভিন্ন অর্থ আছে। সাধারণতঃ ব্যবসায় বা কারবারের পুঁজিকে মূলধন বলা হয়। অর্থনীতিতে উৎপাদনের অন্যতম উপাদানকে মূলধন বলে। ভিন্ন অর্থগুলির মধ্যে সাধারণ বা প্রায়-সাধারণ ভাব উপস্থিত আছে। মূলধন বলিতে একধরনের 'ভাণ্ডার' বুঝায় যেখানে আয় একটি 'প্রবাহ'। অর্থনৈতিক আলোচনার বাহিরে মূলধনের পরিধি বিস্তৃততর। সেখানে জন-সংখ্যা, মানবিক দক্ষতা, গৃহ এবং জমি, যন্ত্রপাতি, শিক্ষা, প্রস্তুত ও অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যনিচয় (যাহা কারবারীদের বা গৃহস্থের হাতে আছে) এই সকলকেই মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয়। ব্যবসায়ক্ষেত্রে আয়ব্যয়ের তালিকায় এমন একটি বস্তুকে মূলধন বলিয়া গণ্য করা হয় যাহা কার-বারের মোটমূল্যের একটি অংশ কিন্তু কারবারের কার্য হইতে যাহার সৃষ্টি হয় নাই।

মূলধনের সাধারণ অর্থ হইতে অর্থনীতিতে প্রচলিত অর্থ ভিন্নতর। উৎপন্ন দ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কার্যে নিযুক্ত হইলে তাহাকে মূলধন বলে। মূলধনের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত। একটি শ্রেণীবিভাগ এইরূপঃ ১. দ্রব্যরূপ মূলধন; ২. অর্থরূপ মূলধন; ৩. ঋণরূপ মূলধন। অপর একটি শ্রেণীবিভাগঃ ১. স্থির মূলধন ; ২. সঞ্চরণশীল মূলধন।

উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইলেও উৎপাদন কার্যের পর যে-মূলধনের আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় না তাহাকে স্থির মূলধন বলে, যেমন, কারখানার গৃহ এবং যন্ত্রপাতি। যে-মূলধন উৎপাদন কার্যে একবার ব্যবহৃত হইলে দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হইতে পারে না তাহাকে সঞ্চরণশীল মূলধন বলে, যেমন কাঁচা-মাল। স্থির মূলধনের মূল্যের অংশমাত্র উৎপন্ন দ্রব্যের দাম হইতে উঠিয়া আসে। কিন্তু সঞ্চরণশীল মূলধনের সমগ্রমূল্য উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসে।

মূলধন-এর সংগঠন এবং মূলধন-এর আয় সুদ— এই দুইটি সমস্যাই অর্থনীতিবিদ্‌গণের দীর্ঘকালের আলোচনার বিষয় হইয়া আছে। প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো, সিনিয়র, মিল প্রভৃতির মূলধন সংক্রান্ত মতবাদ 'মজুরী ভাণ্ডার' তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী পর্যায়ে ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে অস্ট্রিয়ান বা মার্জিনালিস্ট স্কুলের অর্থনীতিবিদ্‌গণ (বম্ বয়ার্ক, জেভনস্, বালরাস) পরিবর্তিত মতবাদের পোষক। বর্তমান শতকের লর্ড কেইন্‌স্ এবং তৎপরবর্তী লেখক-গণ জটিল আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছেন। সংগঠিত মূলধন ব্যতিরেকে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং উৎপাদন সম্ভব নয়— এ ধারণা সার্বজনীন। তবুও ভোগব্যয়ে সংযমই সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ ঘটাইবে, লর্ড কেইন্‌স্ এই মতের সমর্থক নহেন। উৎপাদনমাত্রা অব্যাহত রাখিয়া যদি সঞ্চয় সম্ভব হয় তবেই সে সঞ্চয় মূলধন হইবে। কেইন্‌সের মূলধন সংক্রান্ত মতবাদ এইরূপ। সঞ্চয় নির্ভর করে, সুদের হার, মুনাফা, আয়ন্তর এবং সঞ্চয়-প্রবণতার উপর।

এই শতকের নব-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনুন্নত বা অর্ধো-ন্নত রাষ্ট্রগুলির অভিজ্ঞতা হইতে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে মূলধন সংগঠনের অপ্রতুলতাই অর্থনৈতিক অনুন্নতির কারণ। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে উন্নয়ন প্রচেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে সঞ্চয়ের এবং মূল-ধনের অভাব অনুভূত হইয়াছে।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়

মূলরাজ (শিখ) পিতার মৃত্যুর পরে মুলতানের শাসন-কর্তা হন। উত্তরাধিকার ব্যাপারে অর্থের দাবীতে ইংরেজদের সহিত বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করেন। অপর একজন শাসনকর্তা মুলতানে নিযুক্ত হইবার পরে দুইজন ইংরেজ কর্মচারী নিহত হয়। এইভাবে মূলরাজের নেতৃত্বে সেখানে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। রানীমাতা ঝিণ্ডনকে বন্দী রাখা ও তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতি নানা কারণে শিখদের মধ্যে ইংরেজবিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল।

বীরত্বের সহিত বাধাপ্রদান করিয়া মূলরাজ পরিশেষে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। (জানুয়ারি ১৮৪৯ খ্রী) এবং তাঁহাকে দেশান্তরিত করা হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মূল্য কথাটির সংজ্ঞা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। অর্থশাস্ত্রের সংকীর্ণ ক্ষেত্রেও কথাটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। মূল্যনীতির ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও মতের বিরোধ আছে।

সাধারণভাবে অর্থশাস্ত্রে মূল্য বলিতে বুঝায় দ্রব্য বিনিময়ের হার। বাজারে বহুবিধ জিনিসের কেনাবেচা হইয়া থাকে। ঐ সব জিনিসের বাজারদর টাকা-পয়সার মাধ্যমে ধার্য হইয়া থাকে। এই টাকাকড়ির অন্তরালে জিনিস-পত্রের মধ্যেই যে একটি বিনিময়হার রহিয়াছে তাহা সচরাচর নজরে পড়ে না। অথচ সেই অন্তর্লীন বিনিময় হারের পদ্ধতি নির্ণয় করাই অর্থশাস্ত্রের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য। অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে, এই বিষয়টি লইয়াই অর্থশাস্ত্রের আসল কারবার।

বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, মূল্যনীতির এই দুই প্রত্যয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও দ্বন্দ্ব নাই। টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যহারের নির্দেশক মাত্র। টাকাকড়ির মাধ্যমে প্রতিটি জিনিসের যে মূল্য বাজারে নির্ধারিত হয়, তুলনামূলকভাবে দেখিলে সেই মূল্যই প্রকাশ করে জিনিস-পত্রের স্বমধ্যস্থ বিনিময় হার। এক ক-এর দাম যদি পঞ্চাশ টাকা হয় এবং এক খ-এর দাম হয় দশ টাকা, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ক-এর দাম খ-এর তুলনায় পাঁচগুণ। অঙ্কের ভাষায়ঃ ক=৫খ।

মূল্য কথাটির এই যে সংজ্ঞা দেওয়া হইল ইহাকে বলা যাইতে পারে আপেক্ষিক মূল্য—অর্থাৎ একটি জিনিসের তুলনায় অপর একটি জিনিসের মূল্যহার। এই সংজ্ঞা অনুসারে একটি জিনিসের মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় সংজ্ঞা অনুসারে একটি জিনিসের মূল্য অবশ্য হ্রাস পাইবে প্রথমটির তুলনায়। খ-এর তুলনায় ক-এর দাম বাড়িলে ক-এর তুলনায় খ-এর দাম কমিবে। একই সঙ্গে এই দুই-এর দাম বাড়িতে বা কমিতে পারে না, যদি না তৃতীয় একটি জিনিসের প্রবর্তন করা হয়।

এই আপেক্ষিক মূল্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অর্থশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বিশেষরকম তাৎপর্য রহিয়াছে। বিভিন্ন অবস্থায় জিনিসের আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তনই নির্দেশ দিয়া থাকে দেশের উৎপাদক শক্তি কোন্ পথে চালিত হইবে। সমপরিমাণ উৎপাদকশক্তির প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন জিনিস যে হারে উৎপাদিত হইবে, প্রান্তিক উপযোগিতার ভিত্তিতে উহাদের আপেক্ষিক মূল্য তদনুরূপ হইতে হইবে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে বুঝিতে হইবে উৎপাদকশক্তির নিয়ন্ত্রণে বিশৃঙ্খলতা রহিয়াছে—চাহিদার তুলনায় সরবরাহের কোনও প্রকার অসঙ্গতির সৃষ্টি হইয়াছে। জিনিসের আপেক্ষিক মূল্য ও উৎপাদকশক্তির নিয়ন্ত্রণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চাষের জমি, মানুষের পরিশ্রম, উৎপাদক মালমসলা, বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য, এই সব লইয়া আমাদের আর্থিক জগৎ গঠিত। চাহিদার টানে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয়, এবং সেই টানেই বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের মধ্যে জমি, শ্রম ও মালমসলার নিয়ন্ত্রণ সাধিত হয়। এ সবারই কেন্দ্রস্থল আপেক্ষিক মূল্য। ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের সাম্য স্থাপন হইয়া থাকে।

মূল্য কথাটির এই ব্যাখ্যার একটি বৈজ্ঞানিক আবেদন রহিয়াছে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ কোনও কোনও অর্থবিজ্ঞানী আর্থিক জগতের এই গঠন প্রণালীকে সৌরমণ্ডলের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু মুশকিল এই যে এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে আর্থিক জগতের সামগ্রিক মূল্যের সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় সৌরমণ্ডলের পরিমাপ কল্পনা করা। অথচ আর্থিক বিচারের ব্যাপকক্ষেত্রে সামগ্রিক মূল্যায়নেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানের পরিক্রমা যেমন অণু হইতে বিশ্বে, অর্থবিজ্ঞানের পরিক্রমা তেমনই ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে। ব্যষ্টিগত অর্থনীতির মূল সমস্যার আপেক্ষিক মূল্যের বিশ্লেষণ, এবং এই মূল্যবিচার ব্যক্তির উপযোগিতাভিত্তিক। সমষ্টিগত অর্থনীতির সমস্যা সামগ্রিক মূল্যের পরিমাণ এবং উহার ভিত্তিতে সমাজের আর্থিক অগ্রগতির বিশ্লেষণ। সমাজে মোট আয়ের স্বরূপ কি, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে ঐ মোট আয়ের বণ্টন কোন্ প্রণালীর বশবর্তী, শ্রমিকের মজুরি ও ধনিকের মুনাফা এই দুই-এর মধ্যে সম্বন্ধ কি এবং এই সম্বন্ধের স্তরভেদ সমাজের আর্থিক অগ্রগতিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য যে ধরনের মূল্য বিচারের আশ্রয় লইতে হয় তাহার সঙ্গে আপেক্ষিকবাদের সম্পর্ক পরোক্ষ। কেবল এক শর্তে আপেক্ষিক মূল্যের ভিত্তিতে সামগ্রিক মূল্যের বিচার চলিতে পারে, বিভিন্ন জিনিসের বিনিময় হার যদি সময় ও অবস্থা নির্বিশেষে অপরিবর্তনীয় থাকে। কারণ তাহা হইলে যে কোনও একটি জিনিসকে সামগ্রিক মূল্যের মান হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু সহজেই অনুমেয় যে এ শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

এজন্য অর্থনীতিজ্ঞদের কেহ কেহ আপেক্ষিক মূল্যের বাহিরে প্রতিটি জিনিসের একটি "পরম" মূল্যের কল্পনা করিয়া থাকেন, যাহার ভিত্তি শ্রমে। মূল্য বিচারে শ্রমবাদ একটি বিশেষ অধ্যায়। এই শ্রমবাদের আবার প্রকারভেদ রহিয়াছে। একটি প্রস্তাব অনুসারে মূল্যের উদ্ভব হয়, শ্রমশক্তির প্রয়োগে। দ্রব্যাদির উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শ্রমশক্তি নিযুক্ত হয় সেই শ্রমশক্তিই উহাদের পরম মূল্য। এই শ্রমশক্তির যে অংশ শ্রমিকের ন্যূনতম ভরণ-পোষণের জন্য নিযুক্ত হয় সেই শ্রমলব্ধ সামগ্রী শ্রমিকের মজুরি, অথবা শ্রমশক্তির নিজস্ব মূল্য। উদ্বৃত্ত অংশ মালিকের। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই সমাজের শোষণনীতির সূত্র প্রতিষ্ঠিত। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে এই ব্যাখ্যার

তাৎপর্য রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাজার মূল্যের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতার কারণ বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি ও মূলধন নিয়োগের আনুপাতিক বৈষম্য।

এই কারণেই শ্রমবাদের বিকল্প প্রস্তাব। এই বিকল্প প্রস্তাব অনুসারে শ্রমশক্তি মোট মূল্যের নির্ধারক নয়, উহার মাপকাঠি মাত্র। দ্রব্যাদির মোট মূল্য (অর্থাৎ সমাজের মোট আর্থিক আয়) যাহাই হউক না কেন, শ্রমিকের মজুরির হার অনুসারে ঐ মোট মূল্যের বদলে বাজারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমশক্তি ক্রয় করা যাইতে পারে। সেই শ্রমশক্তিই মোট মূল্যের পরিমাপ। অঙ্কের ভাষায় ঃ মোট মূল্য = মালিকের মোট লাভ (উদ্বৃত্ত) + শ্রমিকের মোট মজুরির হার।

লক্ষণীয় যে এই সমীকরণের মধ্যে সমাজে আর্থিক অগ্রগতির একটি সীমা নির্দেশের ইঙ্গিত রহিয়াছে। অন্যসব যদি সমান থাকে, তাহা হইলে মালিকের মোট লাভ যত বেশি হইবে এবং মজুরির হার যত কম হইবে ততই আর্থিক অগ্রগতির সম্ভাবনার প্রসার হইবে। শ্রমবাদের বিকল্প প্রস্তাবের তাৎপর্য এইখানে।

অমিয়কুমার দাশগুপ্ত

মৃগদাব সারনাথ দ্র

মৃগী মানুষ কখনও কখনও পেশীর আক্ষেপ সহকারে অজ্ঞান হইয়া যায়। এইরূপ আক্ষেপকে সাধারণতঃ মৃগী রোগ বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে মৃগী রোগ বহুবিধ রোগের লক্ষণ হিসাবেও প্রকাশ পাইতে পারে।

সাধারণতঃ মৃগী রোগকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয় ১। অজ্ঞাত কারণজনিত মৃগী (ইডিয়োপ্যাথিক), ২। কারণজনিত বা লক্ষণ মৃগী (সিমটোম্যাটিক)।

মানুষের যে কোনও বয়ঃক্রমকালেই মৃগীরোগ হইতে পারে। অধিক বয়ঃক্রমকালের কারণজনিত মৃগী সাধারণতঃ মস্তিষ্কের প্রদাহ, রক্তচাপাধিক্য, ও অপরাপর রক্তনালীর রোগ, মস্তিষ্কের আঘাতজনিত ক্ষত, মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকার স্ফীতি বা অর্বুদ, মস্তিষ্কের পরভৃতিক কীটসৃষ্ট (প্যারাসাইটিক) রোগ, বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিষক্রিয়া এবং রক্তদুষ্টি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। অনেক সময়ে অজ্ঞাতকারণজনিত মৃগী বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, ইহাকে 'বংশানুক্রমিক মৃগী' বলা হয়।

মৃগীরোগের মস্তিষ্কস্থিত উৎস নিরূপণের জন্য একপ্রকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষা করা হয়। উহাকে 'মস্তিষ্ক-বিদ্যুৎ লেখন' বা 'ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফী' বলা হয়। মৃগী রোগীর চিকিৎসার জন্য ভেষজ প্রয়োগ বা শল্যচিকিৎসা করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে রোগী বহুলাংশে রোগ মুক্ত হয়।

অশোককুমার বাগচী

মৃণালকান্তি বসু (১৮৮৬-১৯৫৭ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ, যশোহর জেলার ফতেপুর গ্রামে জন্ম। পিতা যশোহরের খ্যাতনামা আইনব্যবসায়ী নিবারণচন্দ্র বসু। যশোহর হইতে এনট্রান্স (১৯০২ খ্রী), কলিকাতার মেট্রোপলিটন্ ইন্সটিটিউশন হইতে এফ. এ. (১৯০৫ খ্রী) এবং রিপন কলেজ হইতে বি. এ. (১৯০৭ খ্রী) ও বি. এল্. (১৯০৯ খ্রী) পাশ করেন। অতঃপর যশোহরে ওকালতি শুরু করেন (১৯১০ খ্রী)। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইতিহাসে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র অবর-সম্পাদক হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 'ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট্স্ অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন'-এর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'স্মৃতি-কথা' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ), এবং The Press and its Problems (১৯৪৫ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মার্চ কলিকাতায় তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

দ্র যুগান্তর, ১১ চৈত্র, ১৩৬৩ ; অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫ মার্চ, ১৯৫৭।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃৎশিল্প ভারতের পূর্বোত্তর অঞ্চলে নাগা, কুকি ইত্যাদি উপজাতি এবং আসামের হীরা কুম্ভকারগণ চাক ব্যবহার না করিয়া হাতে মৃৎপাত্র গড়িয়া থাকে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি যবদ্বীপেও হাতে মৃৎপাত্র গড়া হয়। ভারতের অন্যত্র চাকে বাসন গড়িয়া প্রয়োজন অনুসারে হয়ত শেষ অংশ হাতে নিষ্পন্ন করা হয়।

সকল মাটিতে মৃৎপাত্র গঠন সম্ভব নয়। কুম্ভকার উপযুক্ত মাটি সংগ্রহের পর তাহা হইতে বালি কাঁকর বাছিয়া পরে ছাই, ভূসি, ঘোড়া বা গর্দভের বিষ্ঠা প্রভৃতি মিশাইয়া থাকে। মাটি তৈয়ারি হইলে, বাসন গড়িবার পর, বহুক্ষেত্রে তাহার উপরে গেরিমাটি গোলা এবং স্থান-বিশেষে আমের খোসা, বাঁশের পাতা, গোজ, খয়ের প্রভৃতির ক্বাথ মিশাইয়া প্রলেপ দেওয়া হয়। ফলে পাত্রের রঙ্ খুলিয়া যায় এবং জল চুয়াইয়া বাহির হয় না। পোয়ানে পোড়ানোর পদ্ধতি অনুসারে বাসনের রঙ্ লাল বা কালো হইয়া থাকে। কালোরঙের হাঁড়ির জন্য কোথাও কোথাও রঙের প্রলেপও ব্যবহৃত হয়।

ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাতে পোয়ানে দিবার পূর্বে অনেকক্ষেত্রে মৃৎপাত্রে নানাবিধ অলংকার চিত্রিত হয়। পোড়ানোর পরে রঙ্ পাকা হইয়া যায়। কিন্তু এরূপ অলংকরণ যমুনা নদীর পূর্বে বা নর্মদার দাক্ষিণে দেখা যায় না। উত্তরভারতে বোধহয় মুসলিম রাজত্বকালে আমদানি করা একপ্রকার কাচের মত চকচকে মৃৎপাত্র নির্মিত হয়। ইহার জন্য বাসন গড়ার পর তাহার গায়ে কাচের গুঁড়া, সোহাগা, দস্তা বা সীসা হইতে সঞ্জাত মশলার প্রলেপ দেওয়া হইয়া থাকে। তাহার পর পোড়ানো হয়।

ভারতের মৃৎপাত্রের ব্যবহার হরপ্পীয় সভ্যতার কাল হইতে (খ্রীপূর্ব ২৭৫০) চলিয়া আসিলেও চীন, ইরান, মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্যযুগের ইওরোপের মত এ শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে নাই। উল্লিখিত দেশসমূহের চীনামাটির চিত্রিত বাসন ধনী ও রাজপরিবারের আশ্রয়ে এক উচ্চাঙ্গ শিল্পের মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতে মৃৎশিল্প প্রধানতঃ গ্রাম বা শহরের অধিবাসী সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে নিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। সারা বৎসর ধরিয়া পল্লীবাসীর বিবাহাদি উৎসবের সময়ে কুম্ভকার মাটির বাসন জোগাইয়া থাকে এবং তৎপরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের উপরে তাহার কিছু অধিকার জন্মায়। মধ্যভারত, গুজরাত, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জম্মু, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর প্রভৃতি রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের উপনয়ন, বিবাহ বা মৃত্যু উপলক্ষে গ্রামের কুম্ভকারদের কিছু কিছু করণীয় আছে। গ্রামসমাজে কুম্ভকারজাতি নিম্নস্তরের হইলেও এইভাবে অপর জাতিবৃন্দের সহিত তাহারা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ। শুধু তাহাই নহে, তামিলনাড়ুতে কুম্ভকারগণ আয়নার দেবতার পুরোহিত হিসাবে গণ্য হয় এবং সে দেবতার পূজায় গ্রামস্থ সকল জাতিই যোগ দিয়া থাকে।

নির্মলকুমার বসু

মৃত্তিকা পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রস্তরাদি ও জৈব পদার্থসমূহের পচনক্রিয়ার মধ্য দিয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই মৃত্তিকায় অক্সিজেন সহযোগে গঠিত লবণাক্ত দ্রবণীয় পদার্থগুলি উদ্ভিদের খাদ্য। এজন্য কেবলমাত্র চূর্ণিত প্রস্তর মৃত্তিকা নহে। 'আস্থানিক' মৃত্তিকা যে প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হয় তাহারই উপর রহিয়া যায়; কিন্তু 'বাহিত' মৃত্তিকা জল, বরফ বা বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া অন্যস্থানে সঞ্চিত হয়। মৃত্তিকার রঙ্ সাধারণতঃ মূল প্রস্তরের বিশেষ বিশেষ খনিজের আধিক্যের ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল, যথা—লৌহে লাল, ফেলসপার ও চুনে সাদা, সিলিকায় হলুদ বা ধূসর। হর্নব্লেন্ডে কালো বা ছাই এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থে কালো রঙ হয়। অবশ্য বিচিত্র ও মিশ্রবর্ণের মৃত্তিকাই অধিক।

আকর খনিজ অনুযায়ী মৃত্তিকাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়: অ্যালুমিনিয়াম-লোহময় মৃত্তিকা, যথা—তুন্দ্রা, পড্‌জল, প্রেইরী, লোহিত ও ল্যাটেরাইট; এবং চুনজাতীয় মৃত্তিকা, যথা—শারনোজেম, রেগুর, বাদামী স্তেপ্‌স্ ও সাভানা, ধূসর মরু ইত্যাদি। হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম, অঙ্গার, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকা মৃত্তিকার প্রধান রাসায়নিক উপাদান।

মৃত্তিকার গভীরতা অনুযায়ী সাধারণতঃ কয়েকটি স্তরবিন্যাস দেখা যায়: সর্বনিম্নে মূল প্রস্তর, তদুপরি ক্ষয়মান অসম্বন্ধ প্রস্তর খনিজ, পরে নিম্ন ও উপর হইতে রাসায়নিক পদার্থে সঞ্চয় সমৃদ্ধ স্তর; এবং সর্বোপরি ধৌত, চুনাপদার্থবিহীন, উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য জৈবসার সমৃদ্ধ স্তর।

মৃত্তিকাকণার আয়তনের সহিত মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা সম্পর্কযুক্ত: স্থূলায়তন বালু অক্ষম, মধ্যায়তন পলি অল্পক্ষম এবং সূক্ষ্মায়তন এঁটেল অতিক্ষম। কিন্তু মিশ্র দোআঁশ মৃত্তিকার জলধারণ ক্ষমতা মাঝামাঝি।

প্রধানত একই প্রকার জলবায়ুর প্রভাবে গঠিত বহু বিস্তীর্ণ মৃত্তিকাকে 'মাণ্ডলিক' বা মহাদেশীয় মৃত্তিকা বলা চলে, যথা—বৃষ্টিবহুল বনাচ্ছাদিত অঞ্চলের লোহিতাভ 'পড্‌জল', নাতিশীতোষ্ণ তৃণাঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণের 'শারনোজেম' এবং মরুঅঞ্চলের হরিদ্রাভ 'সিরোজেম'। 'অন্তঃমাণ্ডলিক মৃত্তিকা সাধারণতঃ স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট হয়, যথা—জলাভূমির মৃত্তিকা, উপকূলীয় ক্ষার বা লবণাক্ত মৃত্তিকা ও চূর্ণময় মৃত্তিকা। এগুলিকে আঞ্চলিক মৃত্তিকাও বলা চলে। 'অভিমাণ্ডলিক' মৃত্তিকার ক্ষেত্রে জলবায়ু অথবা গঠন প্রক্রিয়া অপেক্ষা অন্তর্নিহিত মূল প্রস্তরের প্রভাবই অধিক। বেশি ঢালু অঞ্চলের অগভীর প্রস্তরময় মৃত্তিকা; মরুঅঞ্চলে বালিয়াড়ীর অথবা লোয়েসের উপরিভাগ ও ঢালু হিমবাহিত নবগঠিত মৃত্তিকা; এবং পলল মৃত্তিকা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

মৃত্তিকার ক্ষয় একটি গুরুতর সমস্যা ('ক্ষয়, ক্ষয়চক্র' দ্র)। ভারতের মৃত্তিকা বিভিন্ন প্রকার ('কৃষি, ভারতবর্ষ' দ্র)।

কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু জীবিত বস্তুমাত্রই জীবন ধারণের জন্য নানা জৈবিক ক্রিয়াকাণ্ড করে। এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডগুলি সামগ্রিকরূপে জীবনের লক্ষণ বা প্রকাশ বলিয়া পরিচিত। মৃত্যু বলিতে জীবনের লক্ষণগুলির অনুপস্থিতি বুঝায়। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে হৃৎস্পন্দনের স্তব্ধতা, রক্ত-

সংবহন না হওয়া ও শ্বাসযন্ত্রের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াই মৃত্যু নির্দেশ করে। সামগ্রিক জীবিত বস্তুর অথবা জীবিত বস্তুর দেহের কিছু কিছু কলার মৃত্যু হইতে পারে।

মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণতি। স্বাভাবিক কারণে যে মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু জীবিত বস্তুর মধ্যে বিবর্তনের ধারায় অনেক পরে আসিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বিশেষতঃ এককোষী প্রাণীরা প্রকৃত অর্থেই অমর। দেহ গঠন ও প্রজনন পদ্ধতির সরলতাই এই অমরত্বের কারণ। দেহ গঠনের জটিলতা বহুকোষ বিশিষ্ট জীবিত বস্তুদের মৃত্যু আনিয়া দিয়াছে। বহুকোষ বিশিষ্ট জীবিত বস্তুদের দেহে অনেক বিশেষিত (specialized) অঙ্গ থাকে এবং এই অঙ্গগুলি পরস্পরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধপরায়ণতায় আবদ্ধ। একটি অঙ্গের ত্রুটি বা অকর্মণ্যতায় অন্যান্য অঙ্গগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এই সমস্ত অঙ্গরূপী যন্ত্রগুলি অতি ব্যবহারে জীর্ণ ও বিকল হইয়া পড়ে। তখন স্বাভাবিক কারণেই জীবিত প্রাণীর মৃত্যু হয়।

সীমানন্দ অধিকারী

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (আ ১৭৬২-১৮১৯ খ্রী) ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান লেখক। আনুমানিক ১৭৬২ খ্রী মেদিনীপুরে তাঁহার জন্ম। মার্শম্যান, জর্জ স্মিথ প্রভৃতি মৃত্যুঞ্জয়কে ওড়িয়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে ; তিনি বাঙ্গালী, কুলীন ব্রাহ্মণ, চট্টোপাধ্যায়। তিনি নাটোরে সংস্কৃত শিক্ষালাভ করেন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগ স্থাপিত হইলে অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরীর অধীনে প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করিবার জন্য কলেজের কর্তৃপক্ষের অর্থানুকূল্যে 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২ খ্রী) প্রকাশ করেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকও নিযুক্ত হন। পরে সুপ্রীমকোর্টের জজ-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন (১৮১৬ খ্রী)। কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনার জন্য যে প্রস্তুতি সমিতি গঠিত হয় মৃত্যুঞ্জয় তাহার একজন সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালক সমিতিরও সভ্য ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ: হিতোপদেশ (১৮০৮ খ্রী), রাজাবলি (১৮০৮ খ্রী), বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭ খ্রী), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩ খ্রী) মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)।

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃদংগ মাদল দ্র

মেকলে, ব্যারন টমাস ব্যাবিংটন (১৮০০-৫৯ খ্রী) পিতার নাম জ্যাকারি। টমাস্ কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে স্নাতক এবং ফেলো। তিনি পার্লামেন্টের সদস্য, হুইগ রাজনীতিবিদ্, ব্যাঙ্করাপ্সির কমিশনার, ভারতের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য, প্রিভি কাউন্সিলার, মন্ত্রী, সামরিক সচিব, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর, লর্ড, সুনিপুণ বাগ্মী, বিদগ্ধ, উল্লেখযোগ্য পত্র রচয়িতা, কবি, প্রবন্ধকার, এবং ঐতিহাসিক রূপে সুপরিচিত।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন। ভারতের সহিত তাঁহার যোগসূত্র হইতে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন (তাঁহার মিনিটকে ভিত্তি করিয়া) এবং ফৌজ-দারী আইনের সংস্কার হয়। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রথায়, বিশেষতঃ প্রার্থী নির্বাচনে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাব্যবস্থায় তাঁহার দান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতীয় ভাষা এবং প্রাচীন সাহিত্যের রস গ্রহণে অসমর্থ হন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হইলেও তাঁহার 'লেজ্ অফ এন্সেণ্টরোম' ও 'এপিটাফ্ অফ এ জ্যাকোবাইট' ছন্দো-গুণ ও দশমাত্রিক যুগ্মকের জন্য স্বীকৃতিযোগ্য।

তাঁহার রচনা 'নাইট্স ম্যাগাজিন' এবং 'এডিন্‌বারা রিভিউ'-তে প্রকাশিত হইত। জীবনীমূলক প্রবন্ধ 'ইরাস ওয়লপোল', 'চ্যাটাম', 'বেকন' ইত্যাদি। মিল্টন-বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি পিউরিট্যানিজ্ম্ এবং পিউরিটান রাজ-নীতির সমর্থক। ক্লাইভ এবং হেস্টিংসবিষয়ক প্রবন্ধ পক্ষপাতপূর্ণ এবং অপ্রামাণিক।

তাঁহার জনপ্রিয় 'হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড' নাটকীয়, পাঠ্যযোগ্য, চিত্ররূপময় এবং স্বীয় প্রত্যয়ে আপোষহীন ; কিন্তু অনির্ভরযোগ্যতা হেতু কালোত্তীর্ণ নহে।

সূর্যশংকর রায়

মেক্সিকো উত্তর আমেরিকার দক্ষিণাংশ। বিস্তৃতি যুক্তরাষ্ট্র হইতে গুয়াটেমালা ও ব্রিটিশ হনডুরাস পর্যন্ত। ইহার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে মেক্সিকো উপসাগর। ইহা একটি উচ্চ মালভূমি ; পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে পাহাড়বেষ্টিত এবং পাহাড়ের পাদদেশে সমতলভূমি। কোনও কোনও অংশে বৎসরে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়, কোনও কোনও অংশ মরুভূমি-তুল্য। জনসংখ্যা ৩৬,০০০,০০০ (১৯৬২ খ্রী)। শতকরা ৯০ জন স্প্যানিশ ভাষাভাষী, অবশিষ্ট দেশীয় (Indian) ভাষাভাষী। মেক্সিকোর ইতিহাসের ৩টি পর্যায়: প্রাচীন, ঔপনিবেশিক ও স্বাধীন।

এখানকার মনুষ্যজাতির ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক কালে মেক্সিকোর সুপ্রাচীন সভ্যতার শুরু। পরে ঐতিহাসিক কালে মায়া (Maya) ও আস্তেক (Aztec) জাতির হাতে মেক্সিকোর প্রাচীন সভ্যতার সৃষ্টি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বেই মায়া-

সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মেক্সিকোর প্রাচীন অধিবাসীরা কৃষিকার্যে দক্ষ ছিল। তাহারা নানাবিধ মাটির পাত্র ও দেবদেবীর মূর্তি গড়িত, পিরামিডাকৃতি দেবমন্দির নির্মাণ করিত। পরবর্তী যুগে শিল্পসুন্দর অট্টালিকা গঠিত হয় ও নাগরিক সভ্যতার বিকাশ হয়। আস্তেক জাতির হাতে শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও সামরিক শক্তির বিকাশ ঘটে। ১৩শ-১৫শ শতকে মেক্সিকোয় বিশাল আস্তেক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী ও বিভিন্ন শ্রেণীর রাজপুরুষ শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। বণিক-যোদ্ধারা দূর দেশে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেন। পুরুষেরা নানা প্রকারের কটি-বস্ত্র পরিত, ধনী ব্যক্তিরা পায়ে চপ্পল ও গায়ে চাদর ব্যবহার করিত। নারীরা স্কার্ট ও কাশ্মীরীদের ন্যায় এক প্রকার লম্বা কোট পরিত। পুরুষেরা সাধারণতঃ একপত্নীক ছিল, তবে ধনীদের উপপত্নী থাকিত। অগ্নিসমক্ষে বিবাহ হইত এবং মিলনের প্রতীকস্বরূপ বর-বধূর বস্ত্রে গ্রন্থি দেওয়া হইত। মেক্সিকোয় দেবদেবীর পূজায় যুদ্ধবন্দী বা ক্রীতদাসদের বলি দেওয়া হইত। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে আস্তেক সাম্রাজ্যের অবসান হয়।

ঔপনিবেশিক যুগে (১৫১৯-১৮২১ খ্রী) স্পেনদেশীয়রা মেক্সিকোয় উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য বিস্তার করে। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্টেসের নেতৃত্বে স্পেনের একদল সশস্ত্র অভিযানকারী মেক্সিকোয় অনুপ্রবেশ করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে, প্রাচীন দেবমন্দিরাদি ধ্বংস করে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও উপনিবেশ স্থাপন করে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে একদল মেক্সিকোবাসী ফরাসী বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং রক্তাক্ত সংগ্রামের পর রাজধানী মেক্সিকো শহর অধিকার করে। অতঃপর বহু বিপ্লব ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়া মেক্সিকোয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ওয়াই. জি. লেসুর

মেগাস্থিনিস পশ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলিউকাসের দূত হইয়া সম্ভবতঃ চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীর শেষভাগে মৌর্যসম্রাট সান্ড্রোকোটাস বা চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি 'ইন্ডিকা' নামে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উহা এখন আর পাওয়া যায় না, তবে অনেক প্রাচীন গ্রীক ও রোমক গ্রন্থকার ইহা হইতে অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শোয়ান্‌বেক মেগাস্থিনিস সম্বন্ধে লাতিন ও গ্রীকভাষায় বিভিন্ন উদ্ধৃতির অনুবাদ সংগ্রহ করিয়া পুস্তক আকারে বাহির করেন। এই গ্রন্থের নাম 'India as described by Megasthenis of Arrian'। এই গ্রন্থই আমাদের মেগাস্থিনিস সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। ইহাতে মেগাস্থিনিসের গ্রন্থের মাত্র ৫৭টি অংশ (fragment) উদ্ধার করা হইয়াছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে fragment I, XXVII -এর অধিকাংশ, ও fragment XXXIV -তে পৌরশাসন ও সামরিক সমিতির বিবরণ আছে তাহা মেগাস্থিনিসের লেখা না হইতে পারে। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণের মধ্যে ভারতবর্ষ ও তাম্রপর্ণের ভৌগোলিক বিবরণ, ভারতবর্ষের উর্বরতা, পাটলিপুত্র নগরের বিবরণ, এখানে দাসপ্রথার অভাব, সাতটি জাতি, ভারতবর্ষে চৌর্য প্রায় ছিল না, দার্শনিকগণের বর্ণনা, ভারতবর্ষ কখনও অপরজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই বা ভারতীয়রা অপর জাতিকে আক্রমণ করে নাই ইত্যাদি কয়েকটি প্রসঙ্গ এবং পৌরশাসন ও সামরিক সমিতিসমূহের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মেঘ বায়ু ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিলে তাহার আপেক্ষিক আর্দ্রতা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায় এবং তখন উদ্বৃত্ত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু জলকণায় পরিণত হয়। ঘনীভবনের ফলে বাতাসে ভাসমান জলকণাসমূহ মেঘ বলিয়া অভিহিত হয়।

আকৃতি অনুসারে মেঘ তিন শ্রেণীর : ক. সিরাস বা পালকমেঘ ; খ. পেঁজাতুলার ন্যায় কিউমুলাস বা পুঞ্জীভূত মেঘ ; গ. স্তরে বিন্যস্ত স্ট্র্যাটাস্ বা স্তর মেঘ।

উচ্চতাক্রমে মেঘ তিন পর্যায়ের : ক. উচ্চ আকাশের মেঘ ২০০০০-৪৫০০০ ফিট ঊর্ধ্বে ; খ. মধ্য আকাশের মেঘ ৬৫০০-২০০০০ ফিট ঊর্ধ্বে ; গ. নিম্ন আকাশের মেঘ ৬৫০০ ফিটের মধ্যে।

উচ্চতা ও আকৃতি অনুসারে মেঘগুলি দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

ক. উচ্চ আকাশের মেঘ : ১. সিরাস ও ২. সিরোস্ট্র্যাটাস আসন্ন ঝড়ের সংকেত দেয়। ৩. সিরোকিউমুলাস সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঞ্জাকৃতি মেঘ।

খ. মধ্য আকাশের মেঘ : ৪. অল্টোকিউমুলাস লোমের ন্যায় নরম পুঞ্জাকৃতি। ৫. অল্টোস্ট্র্যাটাস ধূসরবর্ণের স্তর মেঘ। ইহা ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করে। ৬. নিম্বোস্ট্র্যাটাস ধূসর বা কৃষ্ণবর্ণের মেঘ, প্রায়শঃই বৃষ্টিবাহী।

গ. নিম্ন আকাশের মেঘ : ৭. স্ট্র্যাটোকিউমুলাস গাঢ় ও ভারী হইয়া আকাশ আবৃত করে ও বৃষ্টি ঘটায়। ৮. স্ট্র্যাটাস গাঢ় ও ভারী ধূসরবর্ণের দিগন্তবিস্তৃত স্তর

মেঘ। ৯. কিউমুলাস পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, প্রায়শঃই ঘন, ইহার সূর্যরশ্মিবিচ্ছুরিত অংশ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, তলদেশ অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। ১০. কিউমুলোনিম্বাস ভারী ঘন মেঘ, পর্বতের ন্যায় আকৃতি, তলদেশ হইতে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের সূচনা করে।

মেঘ নিয়ত পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক বিধি অনুসারে মেঘের তারতম্য ও প্রকারভেদ ঘটে। নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের বিশেষ অঞ্চল অত্যন্ত বেশি মেঘাবৃত থাকে। অপরপক্ষে মরুঅঞ্চলগুলি উজ্জ্বল ও মেঘমুক্ত।

সাবিত্রী মুখোপাধ্যায়

মেঘনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। ১৬১ মাঃ গতিপথ। ভৈরববাজারের নিম্নে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন শাখার নামই মেঘনা এবং এই স্থানেই শ্রীহট্ট জেলা হইতে আগত (২৪°২′ উঃ, ৯০°৫৯′ পূঃ) সুরমা বা বরাক-নদী মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিয়া চাঁদপুরের বিপরীত দিকে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে ও হাতিয়া ও সন্দীপ দ্বীপের নিকটে সমুদ্রে পড়িয়াছে। নদীতে জল প্রচুর, খরস্রোতা। সারা বৎসর জাহাজ ও নৌকায় যাতায়াত বিপজ্জনক হইলেও সম্ভব। তবে শীতকালই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। নদীতে প্রচুর পলি-মাটি পড়িয়া চরের সৃষ্টি করে ও নদীটি প্রায়ই পথ পরিবর্তন করে। নোয়াখালি জেলায় স্থল গঠনের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। নদীতে জোয়ারের সময় ১০-১৮ ফিট জলস্ফীতি ঘটে।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মেঘনাদ লঙ্কাধিপতি রাবণ ও মন্দোদরীর পুত্র। পত্নী প্রমীলা। মেঘনাদ ছিলেন অজেয় বীর। মেঘের অন্তরালে থাকিয়া ঘোর নিনাদে যুদ্ধ করিতেন বলিয়া নাম মেঘনাদ। মহাদেবের বরে ইনি দিব্য অন্তরীক্ষগামী কামগ স্যন্দন, তামসী মায়া, অক্ষয় তূণীর ও অমোঘ অস্ত্রসমূহের অধিকারী হন। দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ আখ্যা লাভ করেন। লঙ্কার সমরে মেঘনাদ রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন, কিন্তু গরুড় কর্তৃক তাঁহারা মুক্ত হন। পুনরায় যুদ্ধে মেঘনাদ রাম লক্ষ্মণকে পরাজিত করিয়া সংজ্ঞাহীন করিলে হনুমান ঔষধ আনিয়া তাঁহাদের সঞ্জীবিত করেন। রাম রাবণের যুদ্ধে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হন। এই ঘটনা অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিয়াছেন।

যূথিকা ঘোষ

মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬ খ্রী) বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্ ও দেশসেবক অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রথমে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১৬-২৩ খ্রী), পরে এলাহাবাদ (১৯২৩-৩৮ খ্রী) এবং অবশেষে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৮-৫৩ খ্রী) অধ্যাপনা করেন। মৃত্যুকালে তিনি যাদবপুরস্থিত "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স"-এর ডিরেকটর এবং "ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স"-এর অবৈতনিক ডিরেকটর পদে আসীন ছিলেন। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার "সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" নামকরণ করা হয়।

তাপীয় আয়ননবাদ অর্থাৎ তাপপ্রয়োগে আয়নন-প্রক্রিয়া (tharmal ionasation) সংক্রান্ত তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসাবে অধ্যাপক সাহার নাম পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণে এই তত্ত্বের উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, পরমাণু বিজ্ঞান ও আয়ন মণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণা, পঞ্জিকা সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহাকে "ফেলো" মনোনীত করিয়া লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁহার কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" নামক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। এই পত্রিকায় প্রকাশিত বন্যা প্রতিরোধ ও নদী পরিকল্পনা সংক্রান্ত তাঁহার প্রবন্ধগুলির মধ্যে পরবর্তীকালের "দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন" গঠনের বীজ নিহিত ছিল বলা চলে। ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশনের সভায় যাইবার পথে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।

অনাদিনাথ দাঁ

মেঘালয় 'আসাম পুনর্বিন্যাস' অ্যাক্ট অনুযায়ী ২ এপ্রিল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়। বর্তমানে ইহা আসাম রাজ্যের সংযুক্ত খাসি জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা ও গারো পার্বত্য জেলা লইয়া গঠিত।

এই রাজ্যের দক্ষিণ ও পশ্চিমে ২৪০ মিটার সীমানা নবগঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সহিত আন্তর্জাতিক সীমানাভুক্ত ও উত্তর-পূর্ব অংশের সীমান্ত জেলাগুলি গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মিকির হিল, উত্তর কাছাড় ও কাছাড়।

রাজ্যের প্রধান শহর ও রাজধানী শিলং, আয়তন ২২৪৪৫ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ৯৩০০০০। রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা গারো হিলে ৯৬০ জন ও খাসি জয়ন্তিয়া হিলে ৯২১ জন। শিক্ষিতের হার শতকরা ২০ জন ও খাসি জয়ন্তিয়া হিলে ৩১.৫ জন।

জলবায়ু কিছু অস্বাস্থ্যকর ও ভারতের বৃষ্টিবহুল অঞ্চল। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বারিপাত হয় খাসি জয়ন্তিয়া হিলের মৌসিনরামে ১২৭০ সেণ্টিমিটার।

মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগের উপর আদিবাসী। শিল্প কৃষিকর্মে মেয়েরাই অধিক পরিশ্রম করে। রেশম ও তাঁত শিল্পই প্রধান। কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা, লেবু, আলু ও সুপারী প্রধান। বনজ সম্পদে এই রাজ্য সমৃদ্ধ ও বন্য পশুর আবাসস্থল। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রচুর কয়লা ও চুনাপাথর। তাহা ছাড়া উৎকৃষ্ট সিলিমেনাইট, ফায়ার ক্লে, আব্রেসিভ ও সিরামিক পাওয়া যায়। 'আসাম' দ্র।

সলিলকুমার চৌধুরী

মেজার ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মেজার (ইংরেজী 'maser' শব্দের লিপ্যন্তর) নামক বিস্তুটির সাহায্যে অতি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা যায়। "Microwave amplification by stimulated emission of radiation" এই শব্দগুলির আদ্যক্ষর লইয়া 'maser' শব্দটি গঠিত। তড়িৎক্ষেত্রে বা আলোকরশ্মির প্রয়োগে কোনও পরমাণু বা ইলেকট্রনকে উচ্চতর শক্তিস্তরে উন্নয়ন এবং পরে উপযুক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বিকীরণের সাহায্যে ঐ পরমাণু বা ইলেকট্রনকে উচ্চশক্তিস্তর হইতে নিম্নতর কোনও শক্তিস্তরে আনয়ন করা যায়। এই শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় শক্তিস্তর দুইটির শক্তির ব্যবধান অনুযায়ী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকীরণ নির্গত হয়। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য যখন পূর্বকথিত বিকীরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হয়, তখন ঐ বিকীরণের বিবর্ধন ঘটে। ইহাই মেজারের মূল কথা। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান বিজ্ঞানী ডাঃ চার্ল্‌স টাউনেস্‌ এবং অপর দুইজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী বেসভ্‌ ও প্রোখোরভ্‌কে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

অনাদিনাথ দাঁ

মেটারনিক (১৭৭৩-১৮৫৯ খ্রী) অস্ট্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌ প্রিন্স ফন মেটারনিকের জন্ম কোবলেন্‌ৎসে (১৭৭৩)। অস্ট্রিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী (১৮০৯) ও পরে চ্যান্সেলর হন। তিনি ফঁতেনব্লোর (Fontainebleau) সন্ধি এবং নেপোলিয়ন ও মেরী লুইসের বিবাহের বন্দোবস্ত করেন। ভিয়েনা কংগ্রেসের (১৮১৪) তিনি নেতা ছিলেন ও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বুরবোঁ ও জারের সহিত যোগ দেন। ইউরোপে শান্তিরক্ষার জন্য মেটারনিকের নেতৃত্বে অস্ট্রিয়া, ইংল্যান্ড, রাশিয়া ও প্রাশিয়া মিলিয়া এক চতঃশক্তি চুক্তি করেন। ইহার পর মেটারনিক এ-লা-শ্যাপেল, লাইবাখ্‌, ট্রোপাউ ও ভেরোনার কংগ্রেসে নেতৃত্ব করেন ও এই সময় তাঁহাকে 'ইউরোপের প্রধানমন্ত্রী' বলা চলে। কিন্তু তিনি সর্বত্র দমননীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কোনও জাতীয় আন্দোলনে তিনি বিন্দুমাত্র সাড়া দেন নাই। ১৮৪৮-এর বিপ্লবের সময় তিনি ইংল্যান্ডে পলায়ন করেন। ১৮৫১ খ্রী অস্ট্রিয়ায় প্রত্যাগমন করেন। তখন হইতে ভিয়েনায় মৃত্যু পর্যন্ত রাজনীতি হইতে দূরে ছিলেন। তিনি প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে ক্ষমতাশীল হইতে না দিয়া অস্ট্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি বিভিন্ন জাতির প্রবর্ধমান দেশপ্রেমের স্বরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার লেখার মধ্যে তাঁহার পুত্র কর্তৃক সংকলিত আত্মজীবনীই সমধিক বিখ্যাত।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মেটারলিঙ্ক, কাউণ্ট মরিস (১৮৬২-১৯৪৯ খ্রী) লেখক, নাট্যকার ও দার্শনিক। বেলজিয়ামের ঘেণ্ট নামক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। ফরাসী সিম্বলিস্টদের ধ্যানধারণাকে আত্মস্থ করিয়া তিনি স্বভঙ্গিমায় তাঁহার নাটকে রূপায়িত করেন। তাঁহার এই সময়কার লিখিত নাটক দুইটি La Princesse Mabine (১৮৮৯ খ্রী) ও Pelleas at Melisande (১৮৯২ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়াম পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে বসবাস করেন। La Vie des Abeilles গ্রন্থমালার মাধ্যমে তিনি এক সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত বিজ্ঞাননির্ভর গদ্য রচনার পত্তন করেন। এই পুস্তকমালায় তাঁহার ভাষা ছিল সহজ, সরল ও একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসঞ্জাত। Mouna Vanna (১৯০৩ খ্রী) ও L'oisean Bleu (১৯০৯ খ্রী)—এই দুইটি নাটক তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। রবীন্দ্রনাথ এই নাটক দুইটির দ্বারা প্রভাবিত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে Miracle de st Antoine (১৯১৯ খ্রী) নামক একটি হাস্যরসাত্মক নাটক এবং Avant la grande Silence (১৯৩৪ খ্রী) ও Devant Dien (১৯৩৭ খ্রী) নামক দার্শনিক প্রবন্ধ দুইটি প্রধান।

মেটারলিংক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (১৯১১ খ্রী)। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ মে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

মেট্টুর বাঁধ তামিলনাড়ু রাজ্যে কাবেরী নদীর উপর মেট্টুর বাঁধ নির্মিত। বাঁধটি ১৬১৬ মিটার দীর্ঘ এবং নদীগর্ভ হইতে প্রায় ৬৫ মিটার উচ্চ। ইহা পৃথিবীর একটি বৃহত্তম বাঁধ বলিয়া পরিগণিত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। এই মেট্টুর বাঁধ প্রধানতঃ জলসেচের উদ্দেশ্যে নির্মিত। ইহার জলপ্রপাতের শক্তি হইতে ৪০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নিরঞ্জন দে

মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য-মতে ভেষজবিদ্যা শিক্ষাদানের কথা বিবেচনা করিবার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক একটি কমিটি গঠন করেন (১৮৩৩ খ্রী)। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতবর্ষের প্রথম মেডিক্যাল কলেজের উদ্বোধন করা হয়। তৎকালীন হিন্দু কলেজের পশ্চাদ্দেশে একটি পুরাতন বাটিতে মেডিক্যাল কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়।

ডঃ এম. জে. ব্রাম্‌লে ইহার প্রথম সুপারিন্‌টেনডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং তাঁহার একমাত্র সহকারী হন ডঃ ই. গুড্‌ইভ ইঁহারা দুইজনে ছাত্রদের শারীরবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ভেষজবিদ্যা ও ঔষধ প্রস্তুত প্রকরণ শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। তখন ছাত্রের সংখ্যা পঞ্চাশজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অনন্তর ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল আবাসিক রোগীর জন্য সর্বপ্রথম এই কলেজে কুড়িটি শয্যাসহ একটি হাসপাতাল খোলা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে এই মেডিক্যাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত হয় এবং এই কলেজের ছাত্রদের জন্য এল. এম. এস., এম. বি. ও এম. ডি. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ এল. এম. এস. পরীক্ষা গৃহীত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী গৃহীত হয়।

কালপ্রবাহে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের আয়তন ও উপযোগিতা শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে ইহা প্রাচ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জনে সমর্থ হইয়াছে।

বর্তমানে চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সহিত ডি. জি. ও., ডি. ও. এম্‌-এস., টি. ডি. ডি. প্রভৃতি স্নাতকোত্তর বিষয়গুলি শিক্ষাও দেওয়া হইতেছে এবং ডি. এম. ও এম্‌. এস্‌. প্রভৃতি স্নাতকোত্তর পরীক্ষার জন্য ও শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে আছে কুড়িটি বিভাগ ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় সমসংখ্যক অনুবিভাগ। ছাত্রসংখ্যা বর্তমানে ৬৬০; তাহার মধ্যে ছাত্রীসংখ্যা ১৭৩। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা ৫১ জন। পঠন-পাঠনের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকগণের সংখ্যাও প্রচুর।

১৪০০ শয্যাবিশিষ্ট আবাসিক রোগীর চিকিৎসা-ব্যবস্থার সহিত ১২টি বহির্বিভাগ এখনও এই হাস-পাতালে কর্মনিরত আছে।

মেদিনীপুর (২১°৩৬′-২২°৫৭′ উত্তর, ৮৬°৩৩′-৮৮°১১′ পূর্ব) পশ্চিমবঙ্গের জেলা। আয়তন ৫২৫৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৪৩৪১৮৫৫ (১৯৬১ খ্রী)। জেলায় পাঁচটি মহকুমা: সদর, কাঁথি, তমলুক, ঝাড়গ্রাম ও ঘাটাল।

উত্তরে বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে হুগলি এবং রূপনারায়ণ নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ওড়িশা ও বিহার রাজ্য। সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল সমতল ও গাঙ্গেয় সমভূমির অংশবিশেষ।

হুগলি নদী জেলার প্রধান নদী। দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় প্রবহমান। ইহার উপনদী রূপনারায়ণ, শিলাবতী, হলদি (কাঁসাই ও কালিয়াঘাইয়ের মিলিত ধারা) ও রসুলপুর (বাগদা) এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। সুবর্ণরেখা এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রবহমান।

মেদিনীপুর জেলার জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ ও আর্দ্র বলা চলে। এপ্রিল মাস হইতে বর্ষা না আসা পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায়ই ১০০° ফারেনহাইটের উপর। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হইতে প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাব ইহার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করে। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত জুলাই এবং আগস্ট মাসেই হয়।

সমভূমি অঞ্চলে প্রধানতঃ তিন প্রকারের মৃত্তিকা বর্তমান: এঁটেল, দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চলেও ল্যাটেরাইট ব্যতীত দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি দেখা যায়।

পশ্চিমাঞ্চলের উদ্ভিদের মধ্যে শাল, কুসুম, মহুয়া, পলাশ ও পিয়াশাল প্রধান। পূর্বাঞ্চলের উদ্ভিদ গাঙ্গেয় অঞ্চলের উদ্ভিদের সমগোত্রীয়।

কৃষিকার্যই অধিবাসীদিগের প্রধান উপজীবিকা। জেলার দক্ষিণ ও পূর্ব অংশে জমি উর্বরা,, প্রায় সমস্ত জমিই কৃষিযোগ্য। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের অনেকাংশ বনভূমি।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, নানাবিধ রবিশস্য, গম, যব, তৈলবীজ ও নানা ধরনের সব্‌জি এবং নারিকেল আম্র, আনারস, পান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঘাটাল মহকুমায় ইক্ষু ও বহুস্থানে তামাকও চাষ হয়।

প্রধানতঃ খালের সাহায্যেই সেচকার্য চালানো হয়। সেচ-খালগুলির মধ্যে মেদিনীপুর খাল, হিজলি খাল ও ওড়িশা কোস্ট্‌ ক্যানেল প্রধান। যে সমস্ত জমিতে জলসেচের সুবিধা আছে সেখানে সাধারণতঃ আমন ধান্য উৎপন্ন হয়।

জেলায় খনিজ দ্রব্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ঝাড়গ্রাম মহকুমার অনেক স্থানেই ল্যাটেরাইট্‌, চুনা-পাথর ইত্যাদির খনি আছে এবং ইহা ব্যতীত 'কেওলিন' ও 'সেপ্‌স্টোন'ও পাওয়া যায়। জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে (তমলুক ও কাঁথি মহকুমা) প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয়।

মেদিনীপুর জেলার শিল্পগুলির মধ্যে খড়্গপুরের রেলওয়ে কারখানা (১৯০৪ খ্রী) সর্বপ্রধান।

কুটির শিল্পের মধ্যে কার্পাস, রেশম ও তসরশিল্প (চন্দ্রকোণা, ঘাটাল ও তমলুক), মাদুরশিল্প (কাঁথি ও তমলুক), পিতল-কাসার বাসন তৈয়ারি (ঘাটাল, মেদিনীপুর ও চন্দ্রকোণা), মৃৎশিল্প (ঘাটাল, দাসপুর) ইত্যাদি প্রধান।

সদর শহর মেদিনীপুরের জেলার কেন্দ্র। আইন-ই আকবরীতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ৫৯৫৩২ (১৯৬১ খ্রী)।

রূপনারায়ণ-তীরে তমলুক জেলার একটি শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র প্রাচীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্ত এখন এই নামই একমাত্র চিহ্ন।

ঘাটাল, কাঁথি ও ঝাড়গ্রাম ঐ তিনটি মহকুমার সদর শহর। ঝাড়গ্রাম অপেক্ষাকৃত নূতন শহর।

খড়্গপুর এই জেলার সর্ববৃহৎ নগরী। ইহা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একটি বিশিষ্ট শহর, শিল্প ও পরিবহণ-কেন্দ্র। লোকসংখ্যা ১৪৭২৫৩ (১৯৬১ খ্রী)। নিকটে হিজলিতে কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র এবং কুলাইকুণ্ডায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত।

সমুদ্রতীরবর্তী দীঘা ভ্রমণকারীদের জন্য নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা খড়্গপুর ও কাঁথির সহিত সড়কদ্বারা যুক্ত।

অরুণরতন চট্টোপাধ্যায়

মেনকা ১. প্রসিদ্ধ সুরসুন্দরী, শকুন্তলার জননী। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ করিলে তাঁহার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয় (মহাভারত)।

২. হিমালয়-পত্নী, পার্বতীজননী। দক্ষযজ্ঞে অপমানিতা সতীর দেহত্যাগের পর তাঁহাকে কন্যারূপে পাইবার জন্য মেনকা কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবতী কালীর বরে তিনি শত বীর্যবান্‌ পুত্র ও এক কন্যা লাভ করেন। দেবী স্বয়ং কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।(কালিকাপুরাণ)।

যূথিকা ঘোষ

মেনিন্‌জাইটিস মেনিনজিস্‌ মস্তিষ্কের উপরে ডুরা-মেটার, আরাখনয়েডমেটার ও পায়ামেটার নামক তিন প্রকার আচ্ছাদনী। উহার প্রদাহ 'মেনিন্‌জাইটিস্‌' রোগ।

মানুষের শরীর জীবাণু বা অনুজীবাণু (ভাইরাস) কর্তৃক আক্রান্ত হইলে মস্তিষ্কের আবরণী-প্রদাহ হইতে পারে। আঘাত প্রাপ্তির পর করোটির ভগ্ন স্থানের মধ্য দিয়া জীবাণু-দুষ্ট পদার্থ মস্তকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও এই রোগ হইতে পারে। সাধারণতঃ মেনিন্‌গোকক্‌কাস, নিউমোকক্‌-কাস, স্টাফিলোকক্‌কাস, স্ট্রেপটোকক্‌কাস, গনোকক্‌-কাস, টিউবারকুল-ব্যাসিলাস, স্পাইরোকিটা প্যালিডা, ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাসিলাস প্রভৃতি জীবাণু এবং বহুবিধ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনুজীবাণু উক্ত প্রদাহের সৃষ্টি করে। উক্ত রোগে রোগীর দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, মস্তকে তীব্র বেদনা বোধ এবং তাহার আচ্ছন্নভাব দেখা দেয়। এই অবস্থায় মৃগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপও হইতে পারে। ইহা অতি মারাত্মক রোগ, প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করিলে রোগী সত্বর আরোগ্যলাভ করে। চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ও অপরাপর রসায়ন-জাত ঔষধ ব্যবহৃত হয়। মস্তকের বেদনা নিরসনের জন্য মেরু-মজ্জায় নল বিদ্ধ করিয়া 'সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুয়িডে'র কিয়দংশ অপসারিত করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়াকে চিকিৎসাশাস্ত্রে 'লামবার পাংচার' বলা হয়।

অশোককুমার বাগ্‌চী

মেণ্ডেল য়োহান (১৮২২-১৮৮৪ খ্রী) মেণ্ডেল গ্রেগর য়োহান প্রজননবিদ্যার জনক ও অস্ট্রিয়াবাসী একজন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী। (১৮৪৩ খ্রী) ব্রুন শহরের মঠে ও (১৮৫১ খ্রী) বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিয়েনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গমন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিজ্ঞান শিক্ষক হিসাবে কাজ।

যে সূত্রগুলির উপর ভিত্তি করিয়া প্রজননবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইগুলি তিনি আবিষ্কার করেন

তাঁহার মঠের বাগানের কড়াইশুঁটি গাছের উপর পরীক্ষার ফলে। গাছের বর্ণসংকর উৎপাদন-সম্বন্ধীয় তাঁহার নিবন্ধগুলি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি সমিতির পত্রিকায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমৃত্যু মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। বিজ্ঞানী মহলে অপরিচিত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৮৪ খ্রী)। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক তাঁহার নিবন্ধগুলি পুনঃপ্রচার (১৯০০ খ্রী) করিলে তিনি বিজ্ঞানজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

বংশীধর হাজরা

মেবার মেবারের ইতিহাস স্বদেশ প্রেম, শৌর্য-বীর্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিশেষ খ্যাত। উদয়সিংহ মেবারের রাজধানী চিতোরের পরিবর্তে উদয়পুরে স্থাপিত করেন। পরবর্তীকালে এই রাজ্য সাধারণতঃ উদয়পুর নামে অভিহিত হইত। ('উদয়পুর' দ্র)

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর চিতোর জয়ের কয়েক বৎসর পরে শিশোদীয়া রাণা হামির উহা পুনরুদ্ধার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাণা কুম্ভ ('কুম্ভ' দ্র) এবং পরবর্তী শতাব্দীর সংগ্রামসিংহ ও প্রতাপসিংহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংগ্রামসিংহ খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাস্ত হইলেও বিদেশাগত আক্রমণকারীকে বিতাড়িত করিবার মহান্ প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। পৌত্র রাণা প্রতাপসিংহের ('প্রতাপসিংহ' দ্র) আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম এবং পরবর্তী শতাব্দীতে মহারাণা রাজসিংহের বীরোচিত সংগ্রাম দেশের গৌরবের বিষয়। বাংলা সাহিত্যে মেবারের গৌরবময় কাহিনী নানা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। 'উদয়পুর' দ্র।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মেরী, মারীয়া খ্রীষ্টজননীর নাম। ইংরেজী ভাষায় মেরী; হিব্রু ভাষায় মিরিয়ম; যীশুর সময়ে প্রচলিত ভাষায় মরিয়ম; গ্রীক ও লাতিন ভাষায় মারীয়া। অধিকাংশ ভাষায় নামের মারীয়া রূপ পাওয়া যায়। নামের অর্থ মহীয়সী, ভদ্র মহিলা, রাজকুমারী।

বাইবেলের বিবরণ অনুসারে মারীয়া (মেরী) যখন নাজারেথীয় যোসেফের সঙ্গে বাগদত্তা, তখন স্বর্গদূতের মুখে দিব্য আদেশ লাভ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, পরমেশ্বর মুক্তিদাতার জননী-রূপে তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছেন। মারীয়া সবিশ্বাসে সম্মতি জানাইলে অলৌকিকভাবে পরম আত্মার শক্তিগুণে মুক্তিদাতা যীশু তাঁহার গর্ভে দেহগ্রহণ করিলেন। মারীয়া একাধারে চিরকুমারী ও খ্রীষ্টজননী।

মারীয়া যীশুকে লইয়া বহুদিন নাজারেথে কাটাইয়াছিলেন। যীশুর মৃত্যুর সময় তিনি ক্রুশের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন। যীশু তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য যোহনকে মারীয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। যীশুর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পরে মারীয়া খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গে জেরুসালেমেই রহিলেন। পরবর্তীকালে মারীয়া যোহনের সঙ্গে এফেসস্-এ গিয়া সেখানে মারা গিয়াছিলেন, এই কিংবদন্তী সুপ্রাচীনকাল হইতে বহু লেখকের সাক্ষ্যে সমর্থিত।

খ্রীষ্টভক্তের কাছে মারীয়া যীশুর মা বলিয়া গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। অসংখ্য খ্রীষ্টান মেয়ের নাম মারীয়া, বহু গির্জা আশ্রম বিদ্যালয় ও জনপদের প্রতিষ্ঠা মারীয়া নামের স্মরণে হইয়াছে, মারীয়ার ছবি ও মূর্তি অনেক খ্রীষ্টানের গৃহে সাদরে রক্ষিত হইয়া থাকে, প্রত্যেক বৎসরে মারীয়ার প্রতি ভক্তি জ্ঞাপনের জন্য পর্ব দিন পালিত হয়।

খ্রীষ্টভক্তেরা ভগবান্ যীশুর সঙ্গে মারীয়ার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সকল সাধুসাধ্বী ('সেন্টস্') গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও পুণ্যতমা বলিয়া সমাদর করেন। খ্রীষ্টীয় জগতে মারীয়া আদর্শ নারী বলিয়া সকলের দ্বারা স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

পিয়ের ফালোঁ এস. জে.

মেরুদণ্ডী প্রাণী যে সমস্ত প্রাণীর শরীরের পিঠের দিকে একটি টানা এবং নমনীয় মেরুদণ্ড থাকে তাহাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে। শুরুতে এই সমস্ত প্রাণীর পিঠের দিকে মাথা হইতে পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত একটি লম্বা ও নমনীয় 'রড' সদৃশ হইয়া মেরুদণ্ডটি গড়িয়া উঠে। ইহাকে নোটোকর্ড বলে। নিম্ন শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন অ্যাম্ফিওক্সাস্-এর শরীরে এই অবস্থায় এই নোটোকর্ডটি থাকিয়া যায়। উচ্চ শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর শরীরে নোটোকর্ডটিই মেরুদণ্ডে পরিণত হয়। মেরুদন্ডটি হাড় অথবা তরুণাস্থি দিয়া গঠিত। মেরুদণ্ডটি একাধিক কশেরুকা দিয়া গঠিত ও সামনের দিকে করোটির সহিত যুক্ত। কশেরুকা হইতে দুই পার্শ্বে পাঁজর উদ্ভূত হয়। পাঁজর ও মেরুদণ্ড মিলিয়া দেহ পঞ্জর সৃষ্টি করে। হাত এবং পায়ের হাড়সমূহ এবং মাছের পাখনার হাড়গুলি গার্ড্‌ল হাড়ের সাহায্যে মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত থাকে।

মেরুদণ্ডীর স্নায়ুকোষ কেন্দ্রীভূত হইয়া করোটির মধ্যে মগজের সৃষ্টি করে। মগজের সহিত শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় মেরুদণ্ডী প্রাণীরা অমেরুদণ্ডী প্রাণী অপেক্ষা সহজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল হয়। মেরু-

ভা ৫।।৪৭

দণ্ডী প্রাণীর ফুসফুস দ্বারা শ্বাস কার্য সম্পন্ন করে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত-সংবহন তন্ত্রে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা বদ্ধ ধরনের অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত শিরা দিয়া প্রবাহিত হয় আবার ধমনী দিয়া হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। মেরুদণ্ডীর দেহ-গহ্বর সুস্পষ্ট।

৫০ কোটি বৎসর পূর্বে ক্যাম্ব্রিয়ান যুগে মেরুদণ্ডী শ্রেণীর আবির্ভাব এই পৃথিবীতে ঘটে। ক্রমবিকাশের মাধ্যমে অমেরুদণ্ডী প্রাণী হইতে মেরুদণ্ডী প্রাণী আসিয়াছে। কিন্তু ঠিক কি ভাবে এবং কোন্ বিশেষ অমেরুদণ্ডী প্রাণী মেরুদণ্ডী প্রাণীর জনক তাহা সঠিক ভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই।

মাছ, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখী, মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদাহরণ। এই সমস্ত প্রাণীর সুগঠিত চোয়াল আছে। ল্যাম্প্রে, হ্যাগফিশ্ প্রভৃতি প্রাণী মেরুদণ্ডী হইলেও ইহাদের সুগঠিত চোয়াল নাই। ইহাদিগকে চোয়ালবিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী বলে।

সীমানন্দ অধিকারী

মেরুবৃত্ত বিষুব রেখা হইতে ৬৬.৫° উত্তর ও দক্ষিণ সমাক্ষ রেখার নাম যথাক্রমে সুমেরু বৃত্ত ও কুমেরু বৃত্ত। পৃথিবীর অক্ষরেখা কক্ষপথের উপর ৬৬.৫° হেলিয়া থাকার দরুন সুমেরু বৃত্তে ২১ জুন ও কুমেরু বৃত্তে ২২ ডিসেম্বর সূর্য অস্তমিত হয় না। আবার শীতকালে সুমেরু বৃত্তে ২২ ডিসেম্বর ও কুমেরু বৃত্তে ২১ জুন সূর্য একেবারেই উদিত হয় না। সুমেরু বৃত্তে কুমেরু বৃত্তের ঠিক বিপরীত সময় শীত ও গ্রীষ্ম। এই দুই বৃত্ত হইতে মেরুর দিকে অগ্রসর হইলে সূর্য-বিহীন দিনের সংখ্যা বাড়িতে থাকে।

এই মেরুরেখাদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে নাতি-শীতোষ্ণ ও হিমমণ্ডলের সীমা নির্ধারণ করে। উত্তর আমেরিকা ও গ্রীনল্যান্ডে এস্কিমো, রাশিয়ার উত্তরে ল্যাপদের বাস সুমেরু বৃত্ত অঞ্চলে।

জলবায়ু সাধারণতঃ অত্যন্ত শীতল, বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বরফাচ্ছন্ন থাকে। কুমেরু বৃত্তের অধিকাংশই সমুদ্রের উপর দিয়া গিয়াছে এবং ইহার একাংশ অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের পূর্ব সীমাকে স্পর্শ করিয়াছে।

সুপ্রভা রায়

মেলা বহু মানুষের বহু মানসের মিলনক্ষেত্র মেলা। আধুনিক লোকবিদ্যা মেলাকে সমাজজীবনের দর্পণ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক মিলন, হৃদয়ে হৃদয়ে সেতুবন্ধন, আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নতি সাধন এবং প্রমোদ অনুষ্ঠান মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে মেলার সার্থকতার দিক্ নির্দেশ করে। সাম্প্রতিককালে শুনা যায়, আদানে প্রদানে মেলা।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে মেলাকে বিচার করা যাইতে পারে। যেমন শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের মেলা; ধর্মীয় মেলা এবং ধর্মনিরপেক্ষ মেলা; 'গড়িয়া তোলা' এবং 'চলিয়া আসা' মেলা।

ভারতবর্ষে ধর্মীয় মেলার প্রতি পক্ষপাতিত্ব অধিক। বৈদিক দেবদেবী, পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী, আদিবাসী দেবদেবী, লৌকিক দেবদেবী, পীর-গাজী শাহেবাং বিবিশাহেবা, হাজী মওলানামোসেন-ওলী, জৈন তীর্থঙ্করদের পূজোৎসব উপলক্ষে, বৌদ্ধ সন্তদের স্মরণ উপলক্ষে, খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে, ইসলামের শরিয়তী নির্দেশ অনুসারে দেবায়িত মহিমাসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব-তিরোভাব উপলক্ষে এবং দেবায়িত পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, পথ ও জলকরের মিলনস্থলের মাহাত্ম্য বর্ণন উপলক্ষে অর্থাৎ ধর্মের কোনও না কোনও সূত্র অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে সম্বৎসর মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক মেলা, কৃষি এবং সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজনও হইয়া থাকে। শহরাঞ্চলে শিল্পবাণিজ্য মেলা নামে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহার সহিত পূর্বোক্ত মেলাগুলির মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। শিল্পবাণিজ্য মেলা প্রায়শঃই আন্তর্জাতিক মানের হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সংগঠিতভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু পল্লী মেলার প্রকৃতি, তাহা ধর্মীয়ই হোক বা ধর্মনিরপেক্ষই হোক, সর্বথা পৃথক্। এ পার্থক্য শহর ও গ্রামজীবনের গতিবেগের পার্থক্য, জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পার্থক্য। পল্লী অঞ্চলের মন্থর মরুজীবনে মেলা ওয়েসিস্-স্বরূপ।

কতকগুলি মেলার প্রকৃতির সহিত স্থান-মাহাত্ম্য এবং অনুষ্ঠানের সময়কাল জড়িত। তাই অনেকক্ষেত্রে কোন্ মেলায় কি প্রকার খাদ্যদ্রব্য, কি ধরনের শৌখিন সামগ্রী, পুতুল ও খেলনা, গ্রামজীবনে অত্যাবশ্যক গৃহস্থালীর জিনিস, পরিচ্ছদ-অঙ্গাবরণ ও আভরণ, কৃষি ও কুটিরশিল্পের যন্ত্রপাতি, শিল্পসামগ্রী, বীজ ও চারা এবং গবাদি পশু ও পক্ষী ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব তাহা পরিপার্শ্ব বিচারে অনুমান করা যাইতে পারে। এমন কি বিনোদনের জন্য মেলায় কি কি অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভব তাহাও অনুমান করা যায়। বিভিন্ন আঞ্চলিক মেলাগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়, 'মেলার বিক্রেতা' নামে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন। ইঁহাদের কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক চক্র আছে এবং সারা বৎসর দেশের বিভিন্ন মেলা লইয়া ইঁহারা কর্মব্যস্ত থাকেন।

বর্তমানে কি শহরের শিল্পমেলা কি পল্লী অঞ্চলের মেলা সকলেরই মূলে আছে আর্থিক লেনদেন। বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলের মেলা ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে দেশীয় প্রথায় বাজার সৃষ্টি করিয়া অঞ্চলবিশেষের সমাজ-কাঠামোর অশেষ কল্যাণসাধন করে। মজুদমাল ছাড়িবার সুযোগ, লোকশিল্পী ও কারুকর্মীর সৃষ্টি, নমুনা বিক্রীত হইবার আশা, প্রমোদ বিতরণকারীর একৈব অবলম্বন এই মেলা অনুন্নত অর্থনীতিতে সমধিক সামাজিক গুরুত্বের অধিকারী। বস্তুতঃ পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোটির অন্তরঙ্গ দিক্ যেমন হাট ও বাজার তেমনি বহিরঙ্গ দিক্ হইল মেলা।

পুরাতন মূল্যবোধের পরিবর্তনের সহিত মেলার চরিত্রও পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। আদিতে যে উদ্দেশ্য লইয়া মেলার সূত্রপাত হইত বর্তমান পরিবেশ সেই সনাতন উদ্দেশ্যের অনুকূল না হওয়ায় মেলার চরিত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মেলার এই চরিত্র ও প্রকৃতি পরিবর্তনের সহিত ইহার সামাজিক ভূমিকারও পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। তবুও ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন মহিমায় বিকশিত মেলা যেভাবে হোক চিরন্তনকে স্পর্শ করিবার প্রয়াস পায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজ-অর্থ-রাজনীতির প্রয়োজনে মেলার উৎপত্তি ও বিকাশ, তাই তাহার যাবতীয় পরিবর্তন ও গত্যন্তর সমাজেরই প্রয়োজনে ঘটে। কালক্রমে মেলার ভূমিকার পরিবর্তনের সহিত তাহার সামাজিক গুরুত্ব ও মর্যাদার পরিবর্তন হয়।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

মেষ সম্ভবতঃ 'প্লাইয়োসীন' যুগের শেষভাগে অথবা 'প্লাইস্টোসীন' যুগে ইওরোপে ও এশিয়ার শীতপ্রধান অঞ্চলগুলিতে মেষের জন্ম হইয়াছিল। মেষ পালনের জন্য সাধারণতঃ কোনও আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয় না। দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই ইহারা চরিতে পারে। ইহারা রোমন্থনকারী। পাকস্থলীতে একাধিক কক্ষ থাকে। গড় পরমায়ু ১৫ বৎসর। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমির প্রাণী। ভারতের অধিকাংশ অর্ধমেরুময় ও অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতাবিহীন অঞ্চলে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শরৎকালে প্রজনন করে ও বসন্তে শাবকের জন্ম হয়। মেষের গর্ভধারণকাল গড়ে ১৪৬ দিন।

ভারতে প্রায় ৩,৮০,০০০০০ মেষ আছে ও বৎসরে উৎপন্ন পশম প্রায় ৬ কোটি পাউন্ড। ইহার মধ্যে প্রায় ৩.৬০,০০০০০ পাউন্ড বাহিরে রপ্তানি হয়, অবশিষ্ট ব্যবহার হয় দেশে। প্রতীচ্যে মেষের পশম উৎপাদনের বাৎসরিক গড় প্রতি মেষ পিছু প্রায় ১০ পাউন্ড, ভারতে প্রায় ২ পাউন্ড। কিছু কিছু ভারতীয় মেষের পশম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কার্পেট তৈয়ারির পশম বলিয়া খ্যাত। প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১,১০,০০০০০ পাউন্ড উন্নততর পশম আমদানি করা হয়। ইহা মুখ্যতঃ পশমী দ্রব্যের কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয় মেষের মধ্যে কতকগুলি পশমের জন্য পালিত হয়, যেমন বিকানেরী, বেলারী, ডেকানী, কাথিয়াবাড়ী ইত্যাদি। অপর কতকগুলি শ্রেণী যেমন মান্ডেয়, নেলোর ইত্যাদি রোমশ; প্রধানতঃ মাংস, চর্ম ও জান্তব সারের জন্যই তাহাদের পালন করা হয়।

সাধারণতঃ মেষ-দুগ্ধের পরিমাণ স্বল্প ও শাবকের আহারেই তাহা ব্যয়িত হয়। কিন্তু বাল্খী, লোহী, হস্তনগরী প্রভৃতি মেষ অধিক দুগ্ধ দিয়া থাকে। চর্বি জমিয়া বাল্খী ও হস্তনগরীর লেজ বেশ স্থূল হয়। ইহাকে 'দুম্বা' বলে।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

মৈত্রেয় (পালি মেত্তেয়) অনাগত দিনের 'বুদ্ধ'। বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে তিনি এখন বোধিসত্ত্বরূপে তোষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন এবং গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর জীবজগতের মুক্তির জন্য তিনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। কথিত আছে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ তোষিতস্বর্গে উপস্থিত হইয়া মৈত্রেয়ের নিকট তন্ত্রশাস্ত্রের রহস্যে দীক্ষিত হন।

সুত্তপিটকের খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত বুদ্ধবংশ গ্রন্থের শেষপরিচ্ছেদে এবং পালিগ্রন্থ 'অনাগত বংশে' মৈত্রেয়ের কথা বলা আছে। তিনি কেতুমতী শহরে (বর্তমান বারাণসী) এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে অজিত নামে জন্মগ্রহণ করিবেন।

প্রাচীন শিল্পী ও ভাস্করদের নিকট মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্তিরচনা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যপত্নী। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধুকাণ্ডে (১।২।৪) বিবৃত হইয়াছে যে, মহর্ষি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে অপরা পত্নী কাত্যায়নীর সহিত তাঁহাদের বিষয়বিভাগ করিবার সংকল্প করেন। তখন মৈত্রেয়ী বিত্তপূর্ণা বসুন্ধরার অধিকার পাইলে অমরত্ব লাভ করিবেন কিনা জানিতে চাহেন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন উপকরণে বা বিত্তে অমরত্বের আশা নাই। তখন মৈত্রেয়ী বলেন—'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'। যাজ্ঞবল্ক্য প্রীত হইয়া তাঁহাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেন। উক্ত বচনে তত্ত্বার্থী মানবের চিরন্তর আকাঙ্ক্ষা বিধৃত হইয়াছে।

কল্যাণী দত্ত

মৈথিলী ভাষা মৈথিলী মাগধী প্রাকৃত উদ্ভূত নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির অন্যতম। গ্রীয়ার্সনের মতানুসারে এবং আধুনিক ভাষা সমীক্ষায় (১৯৬১) ইহা 'বিহারী'র উপভাষা। মৈথিলীর ভগিনী স্থানীয় অন্য দুইটি বিহারী ভাষা হইল—ভোজপুরী ও মগহী। তবে ভোজপুরী অপেক্ষা মগহীর সহিত ইহার সাদৃশ্য অধিক। এইজন্য অনেকে মগহীকে মৈথিলীর উপভাষা বলেন। বর্তমান লোকগণনা অনুযায়ী মৈথিলীর লোকসংখ্যা ৪৯৮৪৮১১। এই ভাষার বিস্তৃতি সাধারণতঃ বিহারের দারভাঙ্গা, মজফ্ফরপুর, মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগনা (উত্তর) ও চম্পারণ (পূর্ব) অঞ্চলগুলিতে।

মৈথিলী সাহিত্যের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মৈথিলীতে রচিত প্রাচীন রচনার নিদর্শনও যথেষ্ট। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর রচিত 'বর্ণনরত্নাকর' (১৪শ শতকের প্রথম পাদ) গদ্যে রচিত। মৈথিলীর শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি (১৪০০ খ্রী)। তাঁহার রচিত পদাবলী-সাহিত্যের প্রভাব এককালে সারা পূর্ব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল। আধুনিক মৈথিলীর অগ্রগতি নানা কারণে ব্যাহত হইলেও স্তব্ধ হয় নাই। মৈথিলীর নিজস্বলিপি তিরহুতিয়া (তিরুটে, মৈথিল) ও কৈথী, কিন্তু বর্তমানে দেবনাগরীই অধিকতর প্রচলিত।

মৈথিলীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হইল—'অ'-কারের সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ, লিঙ্গ শাসনের শিথিলতা (তোর/তোরী বেটী), 'সব্/সভ্' এবং 'লোকনি' শব্দযোগে যৌগিক বহুবচন গঠন, বিভিন্ন কারকে অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের ব্যবহার, যৌগিককালে অন্তার্থক আছ্ ও রহ্ ধাতুর ব্যবহার ('দেখইত ছথি, অবইত রহব') ইত্যাদি। আধুনিক মৈথিল সাহিত্য উন্নতিশীল এবং দিল্লীর সাহিত্য একাডেমি-কর্তৃক স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা রূপে মৈথিলী স্বীকৃতি পাইয়াছে।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

মৈথিলী সাহিত্য বর্তমান বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত মিথিলা বা বিদেহ অঞ্চলের ভাষা মৈথিল বা মৈথিলী। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে মাগধী-প্রাকৃত হইতে ইহার উদ্ভব।

জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর-রচিত 'বর্ণনরত্নাকর' (১৪শ শতক) মৈথিলী সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় গ্রন্থ। ইহা উত্তর ভারতের একখানি প্রাচীনতম গদ্যগ্রন্থ ; মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ মিথিলার সংস্কৃতির একটি মনোরম আলেখ্য।

মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি। তাঁহার আখ্যানমূলক পদ্য ও গদ্যে রচিত 'কীর্তিলতা' এবং 'কীর্তিপতাকা' কাব্যের ভাষা অবহট্ঠ, বা অবহট্ঠ প্রভাবিত মৈথিলী। প্রাচীন মৈথিলীতে রচিত পদাবলীই বিদ্যাপতির প্রকৃত গৌরব।

মৈথিলী সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির প্রভাব অসামান্য তো বটেই, বাঙ্গলা সাহিত্যেও তাঁহার প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় মৈথিলী সাহিত্য রাজসভাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে মিথিলার রাজবংশের সহিত বিদ্যাপতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রাজা কংসনারায়ণের রাজ্যকাল (১৪৯৬-১৫২৭ খ্রী) মৈথিলী গীতসাহিত্যের গৌরবময় যুগ। এই যুগের কবিদের মধ্যে গোবিন্দ ঠাকুর, কাশীনাথ, রামনাথ ও শ্রীধর প্রসিদ্ধ। এই কাব্যপ্রবাহের তিনটি ধারা। কোনওটি সংস্কৃত নাট্যরীতির অনুগামী, কোনওটি কৃষ্ণ অথবা জনপ্রিয় পৌরাণিক চরিত্র অবলম্বনে রচিত। এই যুগের লেখকদের মধ্যে বংশমান ঝা, জগৎপ্রকাশমল্ল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গৌড়ের ন্যায় মিথিলাতেও ধীরে ধীরে কীর্তনিয়া নাট্যসাহিত্য জনপ্রিয় হয়। উষাহরণ, গৌরীস্বয়ম্বর প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে শিব বা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য-কীর্তনই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আধুনিক যুগের বলদেব মিশ্রের (জন্ম ১৮৮৭ খ্রী) পর ইহা লুপ্ত হয়।

অষ্টাদশ শতক হইতেই মৈথিলী সাহিত্যের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যধারার শেষ হয়।

বিংশশতাব্দীর প্রথম দশকে ইংরেজী প্রভাবান্বিত আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যের উদ্ভব। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মাসিকপত্র 'মৈথিল হিতসাধনা'ই মৈথিলী-ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র। অতঃপর ক্রমে ক্রমে 'মিথিলা-মৈথিল-মৈথিলী' চেতনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে এবং আধুনিক মৈথিলী সাহিত্যের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

লৌকিক উপন্যাসকার হিসাবে জনার্দন ঝা, ভোলা ঝা, পুণ্যানন্দ ঝা ও হরিমোহন ঝা-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের সমসময়ে মৈথিলী ছোট গল্পও যথেষ্ট সমৃদ্ধিলাভ করে। লেখিকাদের মধ্যে শ্রীমতী শাম্ভবী দেবী, অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মীবতীর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিকে গীতিকাব্য ও আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি প্রাচীন ধারার অনুগামী ছিল। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে প্রধান ছিলেন চন্দ ঝা (১৮৩০-১৯০৭ খ্রী) এবং ভুবনেশ্বর সিংহ (১৯০৭-১৯৪৫

খ্রী)। ইঁহাদের নিঃসন্দেহে আধুনিক কাব্যসাহিত্যের পথিকৃৎ বলা যায়।

নাট্যসাহিত্যে মৈথিলী বিশেষ সমৃদ্ধ নহে। আধুনিক গদ্য সংলাপ-আশ্রয়ী নাটকের পথপ্রদর্শক ছিলেন জীবন ঝা। একাঙ্ক নাটকও বর্তমানে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে।

দ্র J. K. Misra, *A History of Maithili Literature*, Vol. I & II, Allahabad, 1949-1950.

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

মৈনাক পর্বতরাজ হিমালয়ের পুত্র; মাতা মেনা, ভগিনী দেবী পার্বতী, পুত্র ক্রৌঞ্চ পর্বত।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদকালে মৈনাক পবনদেবের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপন করেন। পবন-তনয় হনুমান যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছিলেন তখন পূর্বকথা স্মরণে ইনি হনুমানকে নিজশিখরে বিশ্রামার্থ আহবান করেন।

মৈন্যু সংস্কৃত প্রতিরূপ 'মন্যু' জরথুস্ত্রীয় ধর্মে আহুর কর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈত শক্তিসমূহ : স্পেন্ত শুদ্ধ, সৎ ঃ অঙ্গ্র (অঙ্গর) অন্ধকার, অসৎ। সহ-অবস্থিত অথচ বিপরীতধর্মী মৈন্যু (তুলনীয় সত্ত্বগুণ এবং তমোগুণ) সমূহের (শক্তিসমূহ) যুক্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ফলে বিশ্বের অগ্রগতি সাধিত হয়; কিন্তু অসৎকে জয় করিয়া কেবলমাত্র সৎ চিরকাল থাকিয়া যায়। পহ্লবী ধর্মগ্রন্থে ইহাকে 'অহ্রিমন' বলা হইয়াছে, এবং এই শব্দটি এখনকার ফারসী হইতে লুপ্ত হয় নাই।

আর্দেশীর দীনশা

মোংগল মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব সাইবেরিয়ার আরগুন নদীর গতিপথ বাহিয়া মোংগলগণের আদি-নিবাস। ইহাদের কৃষ্ণকেশ, গাত্রবর্ণ হরিদ্রা হইতে বাদামী মিশ্রিত, উচ্চতা ১.৬৮৪ মিটার, মস্তক গোলাকৃতি, অনুন্নত নাসিকা ও তির্যক চক্ষু। মোংগল জাতির দুইটি শাখা পশ্চিম মোংগল ও পূর্বমোংগল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোংগল উপজাতিকে এক করিয়া ও বহুরাজ্য জয় করিয়া চেঙ্গিজ খাঁ (১১৫৫/৬২-১২২৭ খ্রী) প্রথম সুবৃহৎ মোংগল-সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ('চেঙ্গিজ' দ্র)। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিজ খোয়ারিজম রাজপুত্রের অনুসরণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া (১২২১ খ্রী) তাঁহাকে পরাজিত করেন। কিন্তু ভারত তাঁহার আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পায়। ইহার পর মোংগলগণ কয়েকবার বলবন, কায়কুবাদ, জালালুদ্দীন খিলজী ও আলাউদ্দীন খিলজীর সময় ভারত আক্রমণ করে। চেঙ্গিজের পরে মোংগলগণ রুশদেশের কিয়দংশ, হাঙ্গেরী, জর্জিয়া ও আর্মেনিয়া দখল করে। চেঙ্গিজের পৌত্র হুলাগু পারস্য দখল করেন ও বাগদাদের খলিফাকে নিহত করিয়া বাগদাদ্ ও পরে সিরিয়া, আলেপ্পো ও দামাস্কাস জয় করেন। চেঙ্গিজের অপর পৌত্র সুবিখ্যাত কুবলাই খাঁ ভ্রাতা মঙ্গুর মৃত্যুর পরে রাজা হন (১২৬০ খ্রী) ('কুবলাই' দ্র)। ভিনিসিয় পর্যটক মার্কোপোলো তাঁহার রাজ্যের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। পরবর্তী বিখ্যাত মোংগল-নেতা তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রী) সমরখন্দে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া সুলতান মহম্মদ তোঘলককে পরাজিত করিয়া দিল্লী দখল ও লুণ্ঠন করেন। তৈমুরলঙ্গের বংশধর বাবর ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধ জয় করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাদের শেষ চিহ্ন লুপ্ত হয়। মোংগলগণ দিগ্বিজয়ী ও নৃশংস হইলেও চেঙ্গিজ ও কুবলাই সুশাসক ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁহাদের সবিশেষ আগ্রহ ছিল ও হুলাগু, কুবলাই ও তৈমুর মানমন্দির নির্মাণ করেন।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

মোগলযুগ ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়। বাবর বহিরাগত হইয়াও ভারতে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সুদীর্ঘকাল ভারতে রাজত্ব করিয়া ভারতীয় আচার-ব্যবহারের সহিত আরবীয় ও পারসিক আচার-ব্যবহারের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া এক নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রবর্তন করেন।

সামাজিক জীবন: মোগল আমলে সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজের সর্বোচ্চ ছিলেন সম্রাট এবং তাঁহার নীচে ছিলেন মনসবদার বা অভিজাতগণ ও রাজকর্মচারী। ইঁহারাই একমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইঁহাদের নিম্নে থাকিত বঞ্চিত জনসাধারণ। অভিজাতগণ আলস্যে ও বিলাসব্যসনে দিন কাটাইতেন।

ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ারের মতে সে যুগে সমাজে ধনী ও দরিদ্র ছাড়া কোনও তৃতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকের মতে দোকানদার, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসক ইহারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত ছিল। অবশ্য পশ্চিম উপকূলের বণিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তুলনায় সাধারণ শ্রেণীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

মোগল আমলে পণপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে নারীদের মধ্যে পর্দার প্রচলন ছিল। উভয় সমাজেই নারীরা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সুলতানী আমলের তুলনায় মোগল আমলে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল উন্নত। ইতালীয় পর্যটক ডেলা-ভেলা গুজরাটে জনসাধারণের ধর্মীয় স্বাধীনতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মোগলযুগের শেষের দিকেও সামাজিক ও ধর্মনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। মন্দির ও মসজিদে মুসলমানদের পূজা ও হিন্দুদের সিন্নি দেওয়ার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই যুগে সাধারণভাবে হিন্দুসমাজে পণপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও মারাঠা-সমাজে উহা নিন্দনীয় ছিল। মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। পাঞ্জাবের জাঠদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, সমাজে নারী সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। দেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট ফররুখশিয়রের মাতা রাহিমউন্নিসা, ওড়িশার নবাব দ্বিতীয় মুর্শিদকুলির স্ত্রী দর্দলা বেগম প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নূরজাহানের নাম সর্বজনবিদিত।

অর্থনৈতিক জীবন ঃ মোগল আমলে ভারতের অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি, কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান, গম, নীল, ইক্ষু, কার্পাস ও তামাক ছিল প্রধান। কিন্তু জলসেচের সুবন্দোবস্ত ছিল না, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি ও সৈন্য চলাচলের ফলে কৃষির বিশেষ ক্ষতি হইত। বাংলাদেশ, উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান শস্য ছিল যথাক্রমে ধান, গম ও জোয়ার। বাংলাদেশে ইক্ষু ও নীল এবং আগ্রা ও গুজরাটে নীলের ব্যাপক চাষ হইত। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ভারতে তামাকের চাষ শুরু হয়। মোগল আমলে শিল্প ছিল খুবই উন্নত। সরকারি ও বেসরকারি এই দুই প্রকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল। ভারতের নানা স্থানে সরকার-পরিচালিত কারখানা ছিল। সম্রাট আকবরের প্রচেষ্টায় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সরকার পরিচালিত কারখানাগুলিতে সূচের কাজ, সোনার কাজ, রেশমের কাজ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র প্রস্তুত হইত। মোগল দরবারের প্রয়োজনীয় পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি সরকারি কারখানায় প্রস্তুত হইত। শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প ছিল প্রধান। বারাণসী, আগ্রা, গুজরাট, আহমেদাবাদ ও বাংলাদেশ সুতাবস্ত্রের প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঢাকার মসলিন বস্ত্রশিল্প বিশ্ববিখ্যাত। লাহোর ও কাশ্মীর শাল ও কারুকার্যমণ্ডিত গালিচার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। রঞ্জন-শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কার্পাস-শিল্পের ন্যায় রেশম-শিল্পও জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। রেশম-শিল্পের প্রতি মোগল দরবারের পৃষ্ঠপোষকতার কথা আবুল ফজল ('আবুল ফজল' দ্র) উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলাদেশ ছিল রেশম-শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। মোগল আমলে এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ইওরোপীয় বণিকদের আগমনের পর হইতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ভারত হইতে ইওরোপে নীল, সুতা, কার্পাসবস্ত্র, চিনি ও সোরা রপ্তানি করা হইত। বিদেশ হইতে আমদানি পণ্যসামগ্রীর মধ্যে চীনামাটির বাক্স, রৌপ্য, মূল্যবান্ মণিমুক্তা প্রভৃতি এবং কাঁচা মাল হিসাবে রেশম ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈদেশিক বণিকগণকে উচ্চহারে শুল্ক দিতে হইত। সুরাটবন্দরে আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩.৫ সেই যুগে ভারতের প্রধান বন্দর ছিল সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, বেসিন, গোয়া, কালিকট, কোচীন, মুসলিপত্তনম্, চট্টগ্রাম, সপ্তগ্রাম ও হুগলি। বার্নিয়ার ভারতীয় বণিকগণকে সুদক্ষ ও সুচতুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির কথা সমকালীন ইওরোপীয় পর্যটকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। মোগল সম্রাট বাবর তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে ভারতকে 'এক বৃহৎ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যে পরিপূর্ণ দেশ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্নিয়ার লিখিয়াছেন, 'দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য খুবই উন্নত ছিল, ধনসম্পদের প্রাচুর্য এবং মোগল-দরবারের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের তুলনা ছিল না। একদিকে অভিজাত শ্রেণীর বিপুল ঐশ্বর্য, অপর-দিকে জনসাধারণের দারিদ্র্য ছিল তদানীন্তন ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যমান সাধারণতঃ কম হইলেও দেশে দুর্ভিক্ষ প্রায়ই দেখা দিত এবং অভিজাতগণ ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিত।

হ্যাভেলের মতে মোগল আমলে ভারতীয় শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। জন মার্শালের মতে ভারতীয় স্থাপত্যে কোনও একটি বিশেষ ধরনের রীতি ছিল না। সম্রাটদের ও আঞ্চলিক শাসকদের ব্যক্তিগত রুচির ওপর স্থাপত্য নির্মাণ নির্ভর করিত। বাবরের পর ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে পারসিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আকবর পারসিক শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে ভারতীয়

ও পারসিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটে। আকবরের উত্তরাধিকারীদের আমলে ভারতীয় শিল্প সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রভাবে গড়িয়া ওঠে এবং পারসিক প্রভাবের বিলুপ্তি ঘটে। মোগল আমলের স্থাপত্য আলংকারিক কারুকার্যাদি ও সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত। বাবর কর্তৃক নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে পাণিপথের 'কাবুল-বাগ' ও সম্বলের জামামসজেদ উল্লেখযোগ্য। আকবরের আমলে আগ্রা ও ফতেপুরসিক্রীর প্রাসাদগুলিতে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। ফারগুসন্ ফতেপুরসিক্রীকে 'মহৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক-হিসাবে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন মোগল সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার নির্মিত স্থাপত্যে আলংকারিক কারুকার্য ও চিত্রাঙ্কনের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। তাঁহার নির্মিত প্রাসাদ ও সৌধগুলির মধ্যে দিল্লীর দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জুম্মা মসজিদ, মতি মসজিদ ও তাজমহল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। আলংকারিক কারুকার্যের দিক্ দিয়া দেওয়ান-ই-খাস সর্বশ্রেষ্ঠ। শিল্পসৃষ্টির দিক্ দিয়া তাজমহল বিশ্বের অন্যতম বিস্ময় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মোগল-শাসিত ভারতে সরকারের শিক্ষাবিভাগ বলিয়া কোনও বিশেষ বিভাগ না থাকিলেও বাবরের আমলে 'সুরহাৎ-ই-আম' নামক বিভাগটির তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষায়তন নির্মিত হইয়াছিল। মোগল সম্রাট ও অভিজাতদের অনেকেই শিক্ষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা মাদ্রাসা, মক্তব্ ও হিন্দুশিক্ষায়তন গঠন করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাটদের প্রায় সকলেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। হুমায়ুন শেরশাহ্ কর্তৃক নির্মিত পুরাতন কেল্লাটি পাঠাগারে পরিণত করিয়াছিলেন। মোগল আমলে শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে আকবরের রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি আগ্রা, ফতেপুরসিক্রী ও অন্যান্যস্থানে উচ্চ শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন। শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন। পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে আকবর সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন যে, কোনও ধনী ব্যক্তির উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার সম্পত্তির আয় শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবে। জাহাঙ্গীর হিন্দু শিক্ষায়তন ও মাদ্রাসাগুলির পুনঃসংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

মোগল আমলে নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল। রাজপরিবারের ও অভিজাতদের কন্যাদের গৃহে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাবরের কন্যা গুলবদনবেগমের রচিত হুমায়ুননামা একখানি মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মুসলিম রাজপরিবারের ও অভিজাতদের গৃহ-শিক্ষিকাদের অধিকাংশই পারস্য হইতে আসিয়াছিলেন। মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যেও নারীশিক্ষার প্রচলন ছিল।

মোগল-দরবারে বহু পণ্ডিত ও গুণীব্যক্তি বিরাজ করিতেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও ঔরঙ্গজেবের আমলে বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি রচিত হয়। দারা শিকোহ্-র ('দারা শিকোহ্' দ্র) পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিষদ, গীতা, প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ফার্সীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের আমলেও বহুমূল্যবান্ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

মোগল আমলে বাংলাদেশে বৈষ্ণব সাহিত্য ও অন্যান্য লৌকিক সাহিত্যের যথেষ্ট প্রসার ঘটে।

মোগল আমলে হিন্দী সাহিত্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে জায়সীর 'পদুমাবৎ' প্রভৃতি কাব্য, তুলসীদাসের 'রামচরিত-মানস' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অতুলচন্দ্র রায়

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৬ খ্রী) প্রখ্যাত মুসলমান কবি, সাময়িক পত্র-সেবী ও শিক্ষাবিদ্। নদিয়া জেলায় শান্তিপুরে জন্ম। তিনি 'হজরত মোহাম্মদ', 'অপূর্ব দর্শন', 'ইসলাম সংগীত', 'মহর্ষি মনসুর', 'তাপস কাহিনী', 'শাহনামা', 'টিপু সুলতান', 'হাতেমতাই', 'দরাফখান গাজী', 'ফেরদৌসী চরিত', প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'শান্তিপুর মাসিকপত্র', 'লহরী' ও 'মোসলেম ভারত' উল্লেখযোগ্য। এই 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতেই নজরুল ইস্‌লামের প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। মৃত্যু শান্তিপুরে।

দেবকুমার বসু

মোটরগাড়ি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশের নিকোলাস কুনো তিনচাকার বাষ্পচালিত গাড়ি তৈরি করেন। ইহার গতিবেগ ছিল ঘন্টায় আড়াই মাইল। কেহ কেহ বলেন এইটিই প্রথম মোটরগাড়ি। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে অনেকে বিভিন্ন ধরনের মোটরগাড়ি তৈরি করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নিকোলাস অটো তাঁহার ফোর স্ট্রোক ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল ও বাতাসের মিশ্রণ ব্যবহার করিয়া এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ক্রমে রোল্‌স্, রয়েস, মরিস (লর্ড নাফিল্ড), হেনরি ফোর্ড তাঁহাদের উন্নত ধরনের ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়া মোটরগাড়ির জগতে নবযুগের সূত্রপাত করেন।

মোটরগাড়ির অংশগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ১. ইঞ্জিন ২. ইঞ্জিনের গতিবিধিকে যে

যে যন্ত্রের সাহায্যে চক্রগতিতে রূপান্তরিত করা হয় ৩. কাঠামো ও আকৃতি।

ইঞ্জিনের কাজ পেট্রোল বা গ্যাসোলীনে নিহিত রাসায়নিক শক্তিকে আহরণ করিয়া যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। ইঞ্জিনের অংশ হইল মোটামুটি চারটি। ১. সিলিন্ডার—ইহাতে বাতাস ও জ্বালানি মিশ্রণ থাকে, ২. পিস্টন, ৩. ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌ট—যাহা সরলরেখাকার গতিকে বৃত্তাকার গতিতে রূপান্তরিত করে, ৪. কার্বুরেটর—যাহাতে জ্বালানি মিশ্রণ তৈরি হয়।

গাড়ির গতি স্বাচ্ছন্দ্যময় করিবার জন্য ইঞ্জিনে বেশিসংখ্যক্‌ সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়। ২, ৩, ৪, ৬, ৮ হইতে ১২ সংখ্যক সিলিন্ডারযুক্ত ইঞ্জিনের প্রচলন আছে। বিকিরকের ('রেডিয়েটর') সাহায্যে ইঞ্জিনকে ঠাণ্ডা করা হয়।

জ্বালানি হইতে উদ্ভূত মোট তাপশক্তির শতকরা ১৫ হইতে ২২ ভাগ মাত্র কাজে লাগানো হয়। ভারতবর্ষে এখন উন্নতধরনের মোটর, ট্রাক প্রভৃতি নির্মিত হয়।

কমল নন্দী

মোপাসাঁ, গী দ্য (১৮৫০-৯৩ খ্রী) ফরাসী ছোটগল্প-লেখক। আধুনিক ছোটগল্পের উদ্গাতা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকারদিগের অন্যতম। রুশ লেখক শেখভের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সৈন্যবিভাগে চাকরির পর সরকারি দপ্তরে কেরানীর পদে কাজ করেন। কৈশোরেই তিনি ফরাসী লেখক ফ্লোবেয়ারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সূক্ষ্ম লিপিকুশলতা ফ্লোবেয়ারের নিকট হইতে লাভ করেন।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Des Vers' (১৮৮০ খ্রী)। সেই বৎসরেই তিনি 'Boule de suif' নামক গল্প রচনা করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। এই গল্পেই তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার উন্মেষ ও স্ফূর্তি ঘটে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অত্যধিক পরিশ্রম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য তাঁহার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটে। প্রথমে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত ও পরে উন্মাদ ব্যাধিগ্রস্ত হন। দশ বৎসর কাল (১৮৮০-১৮৯০ খ্রী) তিনশত ছোটগল্প, ছয়টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গী, হৃদয়বেদনার প্রতি সহানুভূতিসূচক অভিব্যক্তি ও মানুষের হীনতা ও যৌন অসংযমের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মানসিক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ছোটগল্প সরল ঋজু স্বল্পায়ত অথচ ব্যঞ্জনাগভীর।

মোপাসাঁ নীতিবাদী নহেন। তাঁহার অসাধারণ ও প্রখর জীবনদৃষ্টি মানবমনের গভীর ও গহনতম রাজ্যকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। তিনি আধুনিক ছোটগল্পের উদ্গাতা, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

মোরাদাবাদ (২৮°৫১′ উঃ ৭৮°৪৬′ পূঃ) তহশীল ও জেলার প্রধান শাসন কার্যালয়। সমুদ্রতীর হইতে ২০৫.১৩ মি. ও রামগঙ্গার দক্ষিণে তীরে নদীগর্ভ হইতে ৯.১৪ মি. উচ্চ একটি টিলার উপর অবস্থিত। জনসংখ্যা ১৯১৮২৬ (রেলওয়ে কলোনিসহ) (১৯৬১ খ্রী)। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ৮৪৫ জন। শহরটি কাটেরের শাসক রুস্তম খান কর্তৃক নির্মিত ও শাহ্‌জাহান-পুত্র মুরাদের নামানুসারে নামাঙ্কিত। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই নগরপালিকার দ্বারা পরিচালিত। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত জুম্মা মসজিদ, রুস্তম খান নির্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও সতীস্তম্ভ ইত্যাদি প্রধান দ্রষ্টব্যস্থান। শহরটির মুদ্রণশিল্প ও কারুকার্যময় কাঁসা-পিতলের কাজের খ্যাতি ভারতপ্রসিদ্ধ। বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা সুষ্ঠু ধরনের।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ্‌ লুড্‌উইগ্‌ মোস্‌বাওয়ার তাঁহার আবিষ্কারের জন্য মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার নাম অনুযায়ী এই আবিষ্কার মোস্‌বাওয়ার এফেক্ট নামে পরিচিত। অনিয়তাকার বস্তুর পরিবর্তে গামা রশ্মির বিকিরক-শোষকরূপে কেলাস (crystal) ব্যবহার করিয়া গামা-বর্ণালীর অনুনাদবেধ (resonance width) হ্রাস করা এই আবিষ্কারের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

মোস্‌বাওয়ার গামা বিকিরণ ও শোষণের উৎস হিসাবে কেলাস (crystal) গ্রহণ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, কেলাস ব্যবহারে নিখুঁত অনুনাদ পাওয়া যায়। মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্যে যন্ত্রবিজ্ঞান, নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে বহু সূক্ষ্ম পরীক্ষা সম্ভব হইয়াছে। 'গতিশীল ফোটনের ভর আছে'—আইনস্টাইনের এই তত্ত্বটি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাউণ্ড (Pound) ও রেব্‌কা (Rebka) মোস্‌বাওয়ার এফেক্টের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মোস্‌বাওয়ারের আবিষ্কারের সূত্রে অসংখ্য মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও ইহার প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব ইহার জন্ম কলিকাতায় 'মোহনবাগান ভিলা'তে (১৮৮৯ খ্রী, ১৫ আগস্ট)। তখন ক্লাবের নাম ছিল মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সম্পাদক যতীন্দ্রনাথ বসু।

ক্লাবের সভ্য ও খেলোয়াড় নির্বাচনের জন্য স্থানীয় বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভা হইত। তখন কেবলমাত্র ছাত্ররা সভ্য হইত। প্রত্যেক ছাত্র অভিভাবকের অনুমতিপত্র লইয়া আসিত। মধ্যে মধ্যে তাহাদের পড়াশোনার খবর ও স্বাস্থ্যের প্রতি কড়া নজর রাখা হইত। নিয়মপালনের কড়া শাসন ছিল। স্থানীয় হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের সহিত প্রথম ফুটবল ম্যাচ হয় এই ভিলার তৃণভূমিতে। প্রথম বার্ষিক উৎসবের দিনে 'মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব' নামটি 'মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব'-এ পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামপুকুর মাঠে স্থানান্তরিত ক্লাবে। এখানে এরিয়ান ও শ্যামপুকুর ক্লাবদ্বয়ের সহিত মোহনবাগান একত্রভাবে খেলিবার অনুমতি পায়।

ফুটবল খেলা ছাড়াও ক্লাবে ক্রিকেট ও হকি খেলা হইত। গোরা টীমের মধ্যে সাসেক্স রেজিমেন্টের সঙ্গে ক্লাবের প্রথম ফুটবল খেলা হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম টুর্নামেন্ট কুচবিহার কাপ খেলা হয়। কুচবিহারের মহারাজা কেবলমাত্র ভারতীয় দলগুলির মধ্যে খেলার জন্য কাপটি দেন। ময়দানে ফুটবল খেলিবার জন্য প্রথম প্রেসিডেন্সি কলেজ মাঠে অংশীদার হিসাবে স্থান পায় এবং ঐ মাঠে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত খেলে। অতঃপর ন্যাশন্যাল অ্যাথলেটিক ক্লাবের মাঠের অংশীদার হইয়া ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই নিজস্ব মাঠে খেলে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শৈলেন বসু সম্পাদক হওয়ার পর ১৯০৪, ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহার কাপের খেলায় জয়ী হয়; ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেড্স কাপ লাভ করে এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আই. এফ. এ. শিল্ড-এ যোগদান করে।

মোহনবাগান ক্লাব তখন 'জুনিয়ার টীম' বলিয়া পরিগণিত হইলেও স্থানীয় বাঘা বাঘা টীমগুলিকে হারাইয়া আই. এফ. এ. শিল্ড-এর ফাইন্যালে ওঠার পরে চারিদিকে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দুর্ধর্ষ গোরা টীম সাসেক্স রেজিমেন্টকে ২—১ গোলে পরাজিত করিয়া ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। তখনও পর্যন্ত ক্লাব খালি পায়ে খেলিত। তাহার পর অনেক বড় বড় টুর্নামেন্ট খেলিয়া ক্লাবের সুনাম বর্ধিত হয়। এখন ক্লাব পুরাতন মাঠ ছাড়িয়া কলিকাতা ফুটবল ক্লাবের মাঠে আসিয়া নিজেদের তাঁবু এবং গ্যালারি স্থায়ীভাবে তৈয়ারি করিয়া লইয়াছে। এখন সভ্যসংখ্যা কমবেশি ৬০০০।

উমাপতি কুমার

মোহনলাল বাঙ্গলার নবাবের অতিবিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী। সিরাজ বাংলার নবাব হইয়া তাঁহাকে দেওয়ান-খানার পেশকার নিযুক্ত করিয়া মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। মনিহারির যুদ্ধে তিনি নবাবের বিরুদ্ধাচারী মাসতুতো ভাই ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকৎ জঙ্গকে পরাজিত করেন।

তিনি পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রী, ২৩ জুন) নবাবের পক্ষে আপ্রাণ যুদ্ধ করেন এবং সিরাজ মীরজাফরের কুপরামর্শে তাঁহাকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দিলে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হন।

হিলের বর্ণনায় পাওয়া যায় মোহনলাল আহত হইয়াছিলেন। সিয়ার-উল-মুতাখেরিনের মতে মোহনলাল শত্রুদের হাতে ধরা পড়িলে তাঁহাকে রায়দুর্লভের হেপাজতে রাখা হয় এবং খুব সম্ভবতঃ সেখানে তিনি নিহত হন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০—১৯০৬ খ্রী) বিশিষ্ট সাহিত্যানুরাগী অধ্যাপক, রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ-সম্পাদক। পিতা জয়কৃষ্ণ সেন।

হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় (১৮৮৮ খ্রী) ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পাইয়া ঐ কলেজ হইতেই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র ১৮।১৯ বৎসর বয়সে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। তখন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ঢাকায় ও হুগলিতে কিছুদিন অধ্যাপনার পর তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধের জন্য সরকারি চাকরি ছাড়িয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপক হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চবিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন ও উহার একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপর 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের' অধ্যাপনা বিধি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের ভার দেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে

মে মাসে মোহিতচন্দ্র ইহার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। কঠিন পীড়া হওয়ায় চারিমাস পরেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি উহাতে যোগ দেন ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহিত পার্কে পার্কে বক্তৃতা করেন। ঐ সময় তিনি ইংরেজী ছন্দে 'মুণ্ডকোপনিষদের' অনুবাদ করেন। ভগিনী নিবেদিতা, অধ্যাপক মুরহেড প্রভৃতি অনেকেই এই অনুবাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভাগলপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা সুশীলা দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের দুইটি কন্যা হয়। মোহিতচন্দ্রের ধর্মজীবন কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মৃত্যুর চারিমাস পূর্বে তিনি উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট 'নব সংহিতা' অনুসারে সাধকব্রত গ্রহণ করেন।

তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও জীবনের কথা বহু উচ্চাঙ্গের ইংরেজী ও বাঙ্গলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

তাঁহার 'এলিমেণ্টস অভ্ মর‍্যাল ফিলসফি' (প্রকাশঃ জন্ মারে, লণ্ডন, ১৯০৪, ১৯১৩) বইটির একটি মৌলিকতা হইল হেগেল-পদ্ধতি ও মার্টিনোর-পদ্ধতির সমন্বয়সাধন।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২ খ্রী) রবীন্দ্রপরবর্তী বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক। বাংলা ১২৯৫ বঙ্গাব্দ ১১ কার্তিক নদিয়ার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলায় বলাগড় গ্রামে। পিতা নন্দলাল মজুমদার, মাতা হেমমালা দেবী। বাল্য ও কৈশোর কাটিয়াছিল বলাগড়ে। সেখানকার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া (১৯০৪ খ্রী) কলিকাতা মেট্রোপলিটন কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন (১৯০৮ খ্রী)। এই সময়ে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯১০-১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার তালতলা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী জরীপ বিভাগে কানুনগোর পদ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিন বৎসর পরে ঐ কাজ ছাড়িয়া আবার স্কুল মাস্টারি গ্রহণ করেন। (১৯১৭ খ্রী)। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে-র আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন এবং ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ স্থানে অধ্যাপনা করেন। ইংরেজী ও সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং তাঁহার অধ্যয়ন ছিল বিস্তৃত। শেষ জীবন কাটিয়াছিল কলিকাতার বেহালা অঞ্চলে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬ জুলাই প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন এবং তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্ হইলেও কল্পনায় ও রচনাশৈলীতে তিনি অনেকাংশে স্বতন্ত্র। আবেগময় মনন এবং তাহার উপযোগী ধ্বনিস্পন্দময় সংহত গম্ভীর ভাষা তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার কাব্যে বিষয় এবং প্রকরণ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মত। পৌরাণিক বিষয়ে সংস্কৃত শব্দের এবং আরব, পারস্য বা মোগল যুগের কাহিনীতে আরবী-পারসী শব্দের নিপুণ প্রয়োগ তাঁহার অনেক রচনার বিশেষত্ব। তাঁহার শেষোক্ত ধরনের কবিতা এবং 'আমি' নামক একটি কবিত্বময় গদ্য-রচনা সম্ভবতঃ কাজী নজরুল ইস্‌লামের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেহ-কামনার কথা এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন বলিয়া তিনি সেখানে অবাস্তবতার অভিযোগ করিয়াছেন; কবিগুরুকে 'বসন্তের পাখী'র সহিত তুলনা করিয়া নিজেকে কল্পনা করিয়াছেন 'বসন্তের ফুল'রূপে। তাঁহার বক্তব্য, কবিগুরু আকাশ-বিহারী, কিন্তু তিনি ফুটিতে চান মাটির বুকে। তাঁহাকে দেহবাদী বলিলে ভুল হইবে। বরং বলা চলে দেহাত্মবাদী। ভাবে ও ভাষায় তিনি দৃঢ়তার পক্ষপাতী। গাঢ়বন্ধ রচনার গুণেই তাঁহার সনেট অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কয়েকটি অনুবাদ কবিতাতেও তাঁহার দক্ষতার প্রমাণ রহিয়াছে। দেশীয় কবিগণের মধ্যে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব বোধ হয় তাঁহার উপর সর্বাধিক। বিদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজ রোমাণ্টিক কবিগণের রচনা তাঁহাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সমালোচকরূপেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের ঐতিহ্যকে তিনি একান্তভাবে ভালবাসিতেন এবং তিনি ছিলেন পৌরুষের পক্ষপাতী। 'বীরভূমি', 'মানসী', 'বাণী', 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'কল্লোল', 'কালি কলম', ও 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্যায়) ও 'বঙ্গভারতী' পত্রিকা তিনি স্বয়ং সম্পাদনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কাব্যঃ 'স্বপন পসারী' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'বিস্মরণী' (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), 'স্মরগরল' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)

প্রবন্ধ গ্রন্থঃ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য কথা' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'বিবিধ কথা' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), 'বিচিত্র কথা' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য বিতান' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), 'বাংলা কবিতার ছন্দ' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), 'বাংলার নবযুগ' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), 'জয়তু নেতাজী' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ),

'কবি শ্রীমধুসূদন' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য বিচার' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'বঙ্কিম বরণ' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), 'রবি-প্রদক্ষিণ' (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ), 'জীবন জিজ্ঞাসা' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'বাংলা ও বাঙ্গালী' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য'ঃ ১ম-২য় (১৩৫৯-৬০ বঙ্গাব্দ), 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (১৯৫৫ খ্রী)। অনুবাদঃ 'বিদেশী ছোটগল্প সঞ্চয়ন' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), 'বিদেশী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মোহিনী দেবী (১৮৬৩-১৯৫৫ খ্রী) জন্ম ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের বেউথা গ্রামে। পিতা রামশঙ্কর সেন, মাতা উমাসুন্দরী। শিক্ষা ভিক্টোরিয়া স্কুল, কলিকাতা। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে গ্রেপ্তার; ১৯৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনে ছয় মাস কারাদণ্ড এবং পরে আরও ছয় মাস স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস মহিলা সম্মিলনী'র তিনি ছিলেন সভানেত্রী।

স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ও বাল্যবিবাহে বাধাদান ব্যাপারে মোহিনী দেবী সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

কমলা দাশগুপ্ত

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯৩৬ খ্রী) সুপরিচিত আইনব্যবসায়ী সমাজসেবী ও সাহিত্যিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ., বি. এল. পরে অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজা দেবীর সহিত বিবাহ হয়। এক সময়ে থিওসফি আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, ও ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলনের নেত্রী মাদাম ব্লাভাট্স্কির একান্তসচিবরূপে ইওরোপ পরিদর্শন করেন। উত্তরকালে থিওসফি আন্দোলনের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি অ্যাটর্নির বৃত্তি অবলম্বন করেন ও বহুবিধ সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যে যুক্ত হন। পরিণত জীবনে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ইংরেজী ও বাংলা পুস্তকাদির মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান স্পিরিচুয়ালিটি', 'হিস্টরি অ্যাজ এ সায়েন্স', 'ভিক্ষার ঝুলি' 'জীবনপ্রবাহ' (কবিতা), 'পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

মৌখরিবংশ হর্ষচরিত অনুসারে মুখর হইতে এবং হারাহা লিপি অনুসারে অশ্বপতির শত পুত্র হইতে মৌখরিবংশের উৎপত্তি। কোটারাজ্য, বরাবর ও নাগার্জুনী লিপি হইতে মৌখরিকুলের পূর্বেতিহাস জানা যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হরিবর্মন-প্রতিষ্ঠিত কনৌজের মৌখরিকুল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা অবন্তিবর্মনের পুত্র গ্রহবর্মন ছিলেন থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর স্বামী। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে নিহত হন। অল্পকাল পরে কনৌজ হর্ষবর্ধনের অধিকারে আসে। নেপালে প্রাপ্ত লিপি হইতে মৌখরি শূরসেন ও ভোগবর্মনের নাম পাওয়া যায়। অনুমিত হয়, মৌখরিগণ শ্রীহর্ষের পরেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন।

অধীর চক্রবর্তী

মৌদ্গল্যায়ন মহামোগ্গল্লান দ্র

মৌমাছি সন্ধিপদগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত পতঙ্গ-শ্রেণীর প্রাণী। আপোইদেয়া নামক অধি-গোত্রের অন্তর্গত। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ কর্তৃক বাসায় পুষ্পপরাগ ও মধুসঞ্চয়, পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের দেহে পরাগ আহরণের জন্য বিশেষ রোম, নলের মত মুখাংশ, পশ্চাতের পদযুগলের কিয়-দংশের স্থূলতা, দুইজোড়া পাত্লা ডানা, কাঁটার দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাতের ডানার সংযুক্তি এবং প্রথম জোড়া ডানার আপেক্ষিক বৃহদায়তন; ইহা ছাড়া ইহাদের শূক-কীট পদহীন। এইগুলি ইহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

মুখ্যতঃ সমাজবদ্ধ মৌমাছিদের প্রজাতিগুলি লইয়া আপিনী উপ-গোত্র গঠিত। ইহার মৌমাছিগুলি মনুষ্যভোগ্য মধু-উৎপাদন করে। সর্বাপেক্ষা পরিচিত প্রজাতি আপিস মল্লিফেরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই পালিত। ইহাদের তৈয়ারি মৌচাকে রানী বা স্ত্রী মৌমাছি থাকে। শ্রমিক মৌমাছি খাদ্য সংগ্রহ, মৌচাক নির্মাণ ও সংরক্ষণ, অপরিণত শাবকদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজ করে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক শ্রমিক মৌমাছিরা মৌচাকে থাকিয়া সেখানে কাজ করে। ইহাদের ধাত্রী মৌমাছি বলে; বয়স্ক শ্রমিক মৌমাছিরাই বাহিরের কাজ করিয়া থাকে। রানী মৌমাছি নির্দিষ্ট সময়ে ডিম পাড়ে ও এই ডিম ফুটিয়া নূতন মৌমাছির জন্ম হয়। পুং মৌমাছি নির্দিষ্ট সময়ে যৌনমিলনের দ্বারা রানী মৌমাছির দেহে ডিম নিষিক্তকরণে সাহায্য করে। শ্রমিক মৌমাছি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু ইহার নলের মত মুখাংশ সর্বাধিক দীর্ঘ। ফুলে ফুলে ঘুরিবার সময় পরাগরেণু দেহের রোমে লাগিয়া যায়; ঐ রেণু সংগ্রহার্থে পায়ে পরাগ-ঝাড়ন ও পরাগপেটিকা নামক কয়েকটি অঙ্গ বর্তমান। ইহাদের উদরের কৃত্তিক সংলগ্ন

গ্রন্থি হইতে রস-মোম নিঃসৃত হয়। উহা ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিবার জন্য পায়ে শলাকার অঙ্গ বর্তমান ; মুখের দাঁতও এ-কার্যে ব্যবহৃত হয়। মুখের বাকি উপাঙ্গগুলি একত্রে ফাঁপা নলের মত মধু ইত্যাদি পানীয় আহরণ করে এবং পৌষ্টিক নালীর প্রথমাংশে মধু-পাকস্থলী নামক অঙ্গে এগুলি সঞ্চিত থাকে। উদরের পশ্চাৎভাগে তিন জোড়া উপাঙ্গ দিয়া গঠিত হুল থাকে। হুল আত্মরক্ষার অস্ত্র।

মৌমাছির হুলের বিষের গন্ধ অন্যান্য মৌমাছিকেও আকর্ষণ করিয়া আনে এবং তাহারাও আক্রান্ত প্রাণীকে দংশন করে। আত্মরক্ষায় এরূপ সহযোগিতা মৌমাছির বিশেষত্ব। শ্রমিক-মৌমাছি প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাসায় ফিরিয়া বিশেষভাবে অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া ও উড়িয়া অন্যদের সে তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করে ; ইহাকেই মৌমাছি-নৃত্য (বী-ড্যান্স) বলে।

মৌচাক মোম-নির্মিত অসংখ্য ষট্‌কোণ কক্ষের সমষ্টি। এই মোমে শ্রমিক-মৌমাছি বাসা বানায়। মৌচাকের পার্শ্বদেশ ও উপরিভাগের কক্ষগুলিতে মধু-সঞ্চয়ের পর সেগুলিকে মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। অবশিষ্ট কক্ষগুলি বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট থাকে। শ্রমিক-কক্ষগুলিতে ডিম হইতে পূর্ণাঙ্গ পর্যন্ত বিভিন্ন দশায় মৌমাছি থাকে ও এগুলিতেই শূককীট গুটি বানাইয়া মূককীটে পরিণত হয়। গ্রীষ্মে দলে দলে শ্রমিক মৌমাছি সর্বদা পাখা সঞ্চালন করিয়া কক্ষের তাপমাত্রা ৩৩° সে. গ্রেডের কাছাকাছি রাখে ; শীতে উহাদের বিবিধ অঙ্গ-সঞ্চালন-জনিত উত্তাপকক্ষের শৈত্য দূর করে। পরিণত মৌচাকে ১টি রানী, কতিপয় পুং, ৮০০০০ পর্যন্ত শ্রমিক এবং বহু অপরিণত মৌমাছি থাকে। স্থানাভাব ঘটিলে একটি বয়স্ক রানী মৌমাছি ও বহু শ্রমিক মৌমাছির একটি দল বাসা ছাড়িয়া নূতন বাসা বানায়।

পূর্ণাঙ্গ দশাপ্রাপ্তির প্রায় এক সপ্তাহ পরে রানী ও পুং মৌমাছি আকাশ-বিহারে যায় ও উহাদের যৌন-মিলন ঘটে। পুং জননাঙ্গের বহিরাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া রানীর দেহে থাকিয়া যায় ; সঙ্গমশেষে বাসায় ফিরিলে শ্রমিক-মৌমাছিরা রানীর দেহ হইতে উহা তুলিয়া দেয়। রানী মৌমাছিরা দিনে প্রায় ১০০০ ডিম, কয়েক দফায় প্রায় কয়েক লক্ষ ডিম পাড়ে। অনিষিক্ত ডিম হইতে পুং মৌমাছি এবং নিষিক্ত ডিম হইতে অপরিণত দশায় গৃহীত খাদ্যের পার্থক্য অনুযায়ী শ্রমিক বা রানী মৌমাছি উৎপন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম্বজাত শূককীট 'রয়্যাল জেলি' ধাত্রী মৌমাছির দেহনিঃসৃত রস গ্রহণ করিলে রানী মৌমাছিতে পরিণত হয় ; নচেৎ ইহা শ্রমিক মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয়।

রানী মৌমাছি প্রায় ৩-৫ বৎসর বাঁচে। পুং মৌমাছি যৌনমিলনের প্রাক্কালে জন্মায় ও মিলন শেষেই আশ্রয়হীনভাবে মারা যায়। শ্রমিক মৌমাছি ৬-৮ সপ্তাহ বা ততোধিক সময় বাঁচে।

বোলতা, ফড়িং প্রভৃতি খাদক পতঙ্গ, খাদক পাখী, মাকড়সা, ভালুক, গন্ধগোকুল প্রভৃতি প্রাণী মৌমাছির শত্রু। মধু উপাদেয় ও ক্যালরিপ্রদায়ী খাদ্য ('খাদ্য' দ্র) এবং ভেষজ। মোমের নানা ব্যবহার আছে। মৌমাছির চাষ বা এপিকাল্‌চার অর্থকরী কুটিরশিল্প। প্রসাধনদ্রব্য, বাতি, পালিশ, ছাঁচ ও মডেল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার হয়।

সুজিতকুমার দাশগুপ্ত

মৌর্য ভারতের ইতিহাসে মৌর্যযুগ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মৌর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস সঠিক জানা যায় না। 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক, 'বিষ্ণুপুরাণ' ও 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি গ্রন্থে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে মগধের নন্দবংশোদ্ভব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মধ্যযুগের কয়েকটি শিলালিপিতে মৌর্যদিগকে সূর্য-বংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। জৈন গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে এক ময়ূরপালকদিগের গ্রামণীর দৌহিত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে মৌর্যদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে মৌর্য বা মোরিয়াগণ রুম্মিন্‌দেঈ ও কাশিয়ার মধ্যবর্তী 'পিপ্‌ফলবন' নামক এক ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসক ছিলেন। নন্দরাজগণ এই রাজ্য তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিলে মৌর্যদিগের অত্যন্ত দুর্দশা হয়। চন্দ্রগুপ্ত বিন্ধ্যারণ্যে ময়ূরপোষক ও শিকারীদিগের মধ্যে লালিত হইয়াছিলেন ('চন্দ্রগুপ্ত' দ্র)। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার গুরু ও মন্ত্রণাদাতা বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের সহায়তায় নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আফগানিস্তান হইতে মহীশূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাত তাঁহার আত্মীয় সিরিয়ার গ্রীক নৃপতি আন্তিওক্স সোতবের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছিলেন ('বিন্দুসার' দ্র)। তাঁহার পুত্র প্রিয়দর্শী অশোক কলিঙ্গবিজয় করিয়া সুদূর দক্ষিণের সামান্য অংশ ব্যতীত সমগ্র আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ('অশোক' দ্র)। অশোকের মৃত্যুর পর হইতে মৌর্যদিগের অবনতির সূত্রপাত হয়। মৌর্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথ অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন সেই সময়ে গ্রীকগণ বারবার ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করিতেছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র প্রভুকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করেন ('পুষ্যমিত্র' দ্র)।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও গ্রীকদূত মেঘাস্থিনিসের বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মৌর্যযুগে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি হয়। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় মুসলমান আক্রমণের কাল পর্যন্ত এই উন্নতির ধারাটি অবিচ্ছিন্ন ছিল।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের গুণে ও ইহার অধিবাসিগণের সহজাত নৈপুণ্যে মৌর্যযুগে ভারত শিল্প ও বাণিজ্যে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বস্ত্রশিল্প, কাষ্ঠ, হস্তিদন্ত ও চর্মশিল্প, ধাতুশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতিতে ভারতীয় শিল্পীগণ বিস্ময়কর নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ভারতকে অপরিসীম সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছিল। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রধানতঃ নদীপথ ধরিয়াই যতদূর সম্ভব চলিত। যেখানে নদীপথ মিলিত না সেখানে স্থলপথে গো-শকটে পণ্যদ্রব্য দূরদূরান্তরে প্রেরিত হইত। দেশের অভ্যন্তরে বড় বড় রাজপথ বা মহামার্গ ছিল। ইহা ছাড়া বহু ছোট ছোট উপপথ ছিল। আলেক্সান্দরের আক্রমণের পর হইতে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত মৌর্যদিগের সৌহার্দ্যস্থাপনের ফলে ঐ সকল দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদানও সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভারতের উপকূলের বন্দরসমূহ হইতে ভারতীয় পোতসমূহ পণ্য লইয়া মেসোপটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের বন্দরে যাইত। সমুদ্রপথ ব্যতীত স্থলপথেও পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল। ভারতের বণিকগণ সিংহল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সুবর্ণভূমি প্রভৃতি দেশগুলির সহিত বাণিজ্য করিতেন। অশোকের সাম্রাজ্যের শিলালিপিসমূহ হইতে বুঝা যায় যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার হইয়াছিল। অশোকের উত্তরাধিকারিগণের অযোগ্যতা ও বৈদেশিক আক্রমণ মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের মুখ্য কারণ। তবে অনেকে মনে করেন যে, অশোকের অহিংস নীতিও এই পতনের জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

ত্রিদিবনাথ রায়

মৌল যে পদার্থকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নূতন বা ভিন্ন পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহাকে মৌল বা মৌলিক পদার্থ বলে। রবার্ট বয়েল ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে মৌলের এই সংজ্ঞা দেন। একটি মৌলের ক্ষুদ্রতম কণা অর্থাৎ পরমাণুগুলি পরস্পরের সমান অর্থাৎ ইহাদের ওজন, ধর্ম ও গুণাবলী অভিন্ন। পরমাণু-বিজ্ঞানের ভাষায় প্রতিটি মৌলের একটি নির্দিষ্ট পারমাণবিক সংখ্যা আছে। পরমাণুর কেন্দ্রে যতগুলি প্রোটন থাকে তাহার সংখ্যাকেই পারমাণবিক সংখ্যা বলে। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন, তাহাদের পারমাণবিক সংখ্যাও বিভিন্ন। মৌলগুলিকে তাহাদের পারমাণবিক সংখ্যানুযায়ী সাজাইলে মোটামুটি সমান রাসায়নিক ধর্মসম্পন্ন মৌলগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপস্থিত হইতে দেখা যায়। মেন্ডেলিফ্ প্রথম মৌলগুলিকে এইভাবে তালিকাবদ্ধ করেন। সেই সময় এই তালিকার কতকগুলি স্থান শূন্য ছিল। পরে ক্রমশঃ আবিষ্কৃত নূতন নূতন মৌল ঐ শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ করিয়া মেন্ডেলিফের তালিকার যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত করে।

পৃথিবীতে প্রাকৃতিক মৌলের সংখ্যা ৯২। ইহার মধ্যে ২৫টি পৃথক্ অবস্থায় পাওয়া যায়; বাকিগুলি অন্যান্য মৌলের সহিত যৌগিক অবস্থায় বিদ্যমান। পারমাণবিক বিক্রিয়ার সাহায্যে এ পর্যন্ত ১১টি কৃত্রিম মৌল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের পরমায়ু অত্যন্ত অল্প। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে এই কৃত্রিম মৌলগুলি দ্রুত অন্যান্য মৌলে পরিবর্তিত হয় এবং এই কারণেই প্রকৃতিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে বিভিন্ন মৌলের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বাধিক (৪৯.৮৫%), তাহার পর সিলিকন (২৬.০৩%), অ্যালুমিনিয়াম (৭.২৮%), লৌহ (৪.১২%) ইঃ। সমগ্র বিশ্বের হিসাবে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের পরিমাণই সর্বাধিক। ওজনে হাইড্রোজেনের পরমাণু সর্বাপেক্ষা হাল্কা এবং ইউরেনিয়াম পরমাণু সর্বাপেক্ষা ভারী। অক্সিজেনের পরমাণুর ওজন কাল্পনিকভাবে ১৬ ধরিয়া অপর মৌলের পরমাণুর ওজন তুলনামূলকভাবে ধরা হয়। ইহাকেই পারমাণবিক ওজন বলে। যেমন, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন ১.০০৮ এবং ইউরেনিয়ামের ২৩৮.১।

অনাদিনাথ দাঁ

মৌলিক অধিকার সংবিধান, ভারতীয় দ্র

মৌলিক কণা অন্য কোনও ক্ষুদ্রতর কণার সমাহারে গঠিত হয় নাই এইরূপ কণা মৌলিক কণা। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত মৌলিক কণার মধ্যে অনেকগুলি অস্থায়ী। গড় জীবনকাল অনুসারে এগুলি কণিকায় রূপান্তরিত হয়। মৌলিক কণাগুলি যে নিয়মে পরমাণু বা তাহার নিউক্লিয়াস গঠন করে, অস্থায়ী মৌলিক কণা হইতে জাত কণিকাগুলি সেই নিয়ম অনুসারে জনক কণিকাটিকে গঠন করে না, অথবা কোন্ নিয়ম অনুসারে করে তাহা স্পষ্ট নয় বলিয়া, জনক ও জাত উভয়েই মৌলিক কণা নামে পরিচিত।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জে. জে. টম্সন প্রথম মৌলিক কণা ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে

এন্ডার্সন ও ব্ল্যাকেট ইলেকট্রনের বিপরীত কণা ধন আধান বিশিষ্ট পজিট্রন আবিষ্কার করেন। ইহার ভর ও স্পিন ইলেকট্রনের অনুরূপ, কেবল আধান সমপরিমাণ হইলেও বিপরীতধর্মী। কোনও কোনও নিউক্লিয়াস হইতে তেজস্ক্রিয়তায় পজিট্রন পাওয়া যায়। মুক্ত অবস্থায় পজিট্রন ইলেকট্রনের সহিত যুক্ত হইয়া আইন্‌স্টাইনের সূত্র অনুযায়ী প্রায় অর্ধ মিলিয়ন ইলেকট্রন-ভোল্টের অধিক শক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানী জয়ট্‌শ্‌ আবিষ্কার করেন যে, বিনাশের অব্যবহিত পূর্বে ইলেকট্রন ও পজিট্রন পজিট্রনিয়াম নামে একটি অস্থায়ী পরমাণু গঠন করে। ইলেকট্রনের ১৮৩৬.১২ গুণ ভর বিশিষ্ট স্থায়ী মৌলিক কণা প্রোটন হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বলিয়া পরিচিত। ইহার আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু ধনধর্মী; স্পিন ইলেকট্রনের অনুরূপ। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বার্কলের বিজ্ঞানমন্দিরে ইহার বিপরীত কণা ঋণবিদ্যুৎধর্মী অ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কৃত হয়। ইহার অন্যান্য ধর্ম প্রোটনের অনুরূপ। প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটনের বিনাশে যে গামারশ্মি পাওয়া যায় তাহার শক্তি ইলেকট্রন পজিট্রনের বিনাশে উদ্ভূত শক্তি অপেক্ষা ১৮৩৬.১২ গুণ বেশি।

হাইড্রোজেন অপেক্ষা ভারি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অন্যতম মৌলিক কণা নিউট্রন যুক্ত থাকে। মুক্ত নিউট্রন অস্থায়ী, অর্ধজীবনকাল প্রায় ১২ মিনিট। নিউট্রনের বিপরীত কণা অ্যান্টিনিউট্রনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মৌলিক কণার নাম ফোটন। তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রে ফোটন যেরূপ শক্তির বাহন, মহাকর্ষ ক্ষেত্রে সেইরূপ বাহনরূপে গ্র্যাভিটন নামক কণিকার কল্পনা করা হয়। অবশ্য ইহা কাল্পনিক এবং বাস্তবে এরূপ কণিকা আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউকাওয়া নিউক্লীয় বন্ধনশক্তির সহিত সংশ্লিষ্ট একটি মৌলিক কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা বলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই মৌলিক কণা পাই (Π) মেসন আবিষ্কার করেন। গড় জীবনকাল অনুসারে এই মেসন মৌলিক কণাও রূপান্তরিত হয়।

ইলেকট্রনের সমান আধানের ঋণধর্মী ও তাহার বিপরীত ধর্মী যে মিউমেসন সেগুলি নূতন মৌলিক কণা। মিউমেসন নিউট্রিনো। ইলেকট্রন-নিউট্রিনোর সমধর্মী হইলেও একই কণিকা নয় বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মিউমেসনগুলিও রূপান্তরিত হয়।

ইলেকট্রন-নিউট্রিনো ও তাহার বিপরীত কণা এবং মিউ-নিউট্রিনো ও তাহার বিপরীত কণা—এই চারিটি মৌলিক কণাকেও ধর্মের পার্থক্যহেতু চারিটি বিভিন্ন মৌলিক কণা বলা হয়। পাই মেসন অপেক্ষা হাল্‌কা বলিয়া এগুলিকে লেপ্‌টন বলা হয়।

লেপ্‌টন ও মেসন ছাড়া মৌলিক কণার তৃতীয় গোষ্ঠীর নাম বেরিয়ন। নিউক্লিয়ন নামে পরিচিত প্রোটন ও নিউট্রন এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। বেরিয়নগোষ্ঠীতে এই দুই পরিচিত মৌলিক কণা অপেক্ষা ভারি হাইপেরন মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই বিপরীত কণা আছে। মেসনগোষ্ঠীতেও আরও কয়েকটি অতি ক্ষণস্থায়ী মৌলিক কণা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

ম্যাগ্‌নিসিয়াম ১২ সংখ্যক রাসায়নিক মৌল। প্রতীক চিহ্ন Mg। একটি রূপালী নমনীয় প্রসারণশীল ধাতু। প্রকৃতিতে ম্যাগ্‌নিসিয়াম ধাতু পাওয়া যায় না, কিন্তু নানা প্রকার ম্যাগ্‌নিসিয়াম যৌগ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। ভূত্বকের ২.৫% ও সমুদ্র জলের ০.১৩% ম্যাগ্‌নিসিয়াম। প্রধান আকরিকঃ ডোলোমাইট, ম্যাগ্‌নিসাইট, লিভিন ও সার্‌পেন্‌টিন। ম্যাগ্‌নিসিয়াম ধাতুর প্রধান উৎস সমুদ্রজল কিংবা ডোলোমাইট। সমুদ্রজল হইতে চুন দ্বারা ম্যাগ্‌নিসিয়াম হাইড্রক্সাইড আলাদা করিয়া আনিয়া ম্যাগ্‌নিসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত করা হয়। পরে শেষোক্ত দ্রব্যটিকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাগ্‌নিসিয়াম ধাতু প্রস্তুত করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ডোলোমাইটকে উত্তপ্ত করিয়া ক্যাল্‌সিয়াম এবং ম্যাগ্‌নিসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণে পরিণত করা হয়। অতঃপর এই মিশ্রণের সহিত ফেরোসিলিকন চূর্ণ মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে ম্যাগ্‌নিসিয়াম অক্সাইড বিজারিত হইয়া ম্যাগ্‌নিসিয়াম ধাতুতে পরিণত হয়। ঘনত্ব কম বলিয়া অনেক হাল্‌কা ধাতু-সংকর প্রস্তুতিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিমানের কাঠামো প্রস্তুত হয় বিশেষ এক প্রকার ম্যাগ্‌নিসিয়াম-এর ধাতু-সংকর হইতে। জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, বাজি শিল্পে, ঔষধে ম্যাগ্‌নিসিয়ামের ব্যবহার আছে। ম্যাগ্‌নিসিয়ামের আকরিক মহীশূর, ওড়িশা, রাজস্থান, মাদ্রাজ, বিহার প্রভৃতি নানা প্রদেশে পাওয়া যায়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রথম সমুদ্রজল হইতে ম্যাগ্‌নিসিয়াম ক্লোরাইড প্রস্তুত হয় খারাগোদায়। এখন ভারতের নানা স্থানে বিভিন্ন ম্যাগ্‌নিসিয়াম যৌগ প্রস্তুত হইতেছে।

ফণীন্দ্রনাথ বাগচী

ম্যালেরিয়া অ্যানোফেলিস জাতীয় মশকীর দংশনে সংক্রামিত হয়; প্রথমে শৈত্য হেতু কম্পন ও তৎপরে অত্যধিক জ্বর, মাথার যন্ত্রণা এবং পরিণামে রক্তশূন্যতা ও প্লীহাবৃদ্ধি ইহার লক্ষণ; ইহা সূক্ষ্ম প্রটোজোয়া-ঘটিত একটি সংক্রামক ব্যাধি।

পূর্বে ধারণা ছিল দূষিত (বিশেষতঃ জলাভূমির) বায়ু হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী লেভেরান এই রোগের পরজীবী জীবাণু আবিষ্কার করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যান্‌সন ম্যালেরিয়া ও মশার কার্যকারণ সম্বন্ধে মতামত প্রচার করেন এবং তিন বৎসর পরে কলিকাতার মিলিটারি হাসপাতালে রোনাল্ড রস ('রস, রোনাল্ড' দ্র) অ্যানোফেলিস মশকীর পাকস্থলীর প্রাচীরের মধ্যে ম্যালেরিয়ার জীবাণু লক্ষ্য করেন এবং পর বৎসর কিভাবে মশকীর দ্বারা ম্যালেরিয়া সংক্রমণ হয় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ম্যান্‌সনের মতবাদের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন।

ম্যালেরিয়া প্রতিবিধানের প্রধান উপায় তিনটিঃ ১. ম্যালেরিয়া রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা—কুইনাইন, প্ল্যাজমোচিন, অ্যাটেব্রিন, মেপাক্রিন সেবন। ২. ম্যালেরিয়ার জীবাণু সমূলে ধ্বংস করা—খানা-ডোবা, ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল প্রভৃতি পরিষ্কার করা এবং কীটাণুনাশক ডি. ডি. টি., পাইরিথ্রাম প্রভৃতি দ্রবণ পিচকারির সাহায্যে সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়া মশকের জন্মরোধ ও তাহাদের সমূলে বিনাশের ব্যবস্থা। ৩. মশারির সাহায্যে মশকের দংশনের হাত হইতে আত্মরক্ষা। ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত স্থানে প্রতিদিন পাঁচ গ্রেন করিয়া কুইনাইন সেবনে সাময়িকভাবে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

উপযুক্ত প্রতিষেধকের ও চিকিৎসার ফলে ভারতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত দ্রুত হারে কমিয়াছে। হাসপাতালগুলিতে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ১৬ লক্ষ, ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২ লক্ষ ৬২ হাজার এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান ৩৫ হাজার মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ম্যালেরিয়া এখন অদৃশ্য প্রায়।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

যক্ষ্মা অতি প্রাচীন রোগ। জার্মান চিকিৎসক রবার্ট কক্ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগের কারণ টিউবার কল্ ব্যাসিলাস আবিষ্কার করেন।

যক্ষ্মার জীবাণু শরীরের প্রায় প্রত্যেক তন্তুতে বিস্তারলাভ করিতে পারে। সাধারণতঃ যক্ষ্মা বলিতে বুকের যক্ষ্মা বা পালমোনারী টিউবারকুলোসিস বোঝায়। শতকরা নব্বইটি যক্ষ্মাই বুকের যক্ষ্মা। বুকের যক্ষ্মায় বা টি. বি.তে রোগীর প্রধান উপসর্গের মধ্যে জ্বর, কাশি (ক্ষয়কাশ), কাশির সহিত রক্তপাত বা হিমপ্‌টিসিস্, অবসাদ, শারীরিক দুর্বলতা, ওজন-হ্রাস, শ্বাসকষ্ট, নিশা-ঘাম প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

যে কোনও বয়সেই যে কোনও লোকেরই যক্ষ্মা হইতে পারে। বেশি বয়সে রোগটি হইলে ইহার প্রকোপ শিশু বয়সের তুলনায় কম হয়।

ভারতে সাধারণতঃ ২৫-৩৫ বয়ঃক্রমকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। সাধারণতঃ স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরা বেশি আক্রান্ত হয়।

যক্ষ্মাজীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে একদিকে বর্ধিষ্ণু যক্ষ্মা জীবাণুর আক্রমণ, অন্যদিকে দেহের সামগ্রিক প্রতিরোধশক্তির ক্রমবর্ধমান সংঘাত চলিতে থাকে ও সময় সময় জীবাণুরা 'বন্দীত্ব' (ক্যাল-সিফিকেশন) প্রাপ্ত হইয়া চুন-প্রধান একটি বর্মদ্বারা আবৃত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণ বহুক্ষেত্রে অধিক মারাত্মক হয় না। প্রথম আক্রমণের অব্যবহিত "জীবাণু-অবশেষ" (প্রাইমারী কম্‌প্লেক্স) দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকিবার পর আবার সক্রিয় হইয়া উঠিলে রোগের সূচনা করে।

বুকের যক্ষ্মারোগে, রোগীর কাশি, কফ্, হাঁচি রোগবীজাণুকে সূক্ষ্ম বারিবিন্দুর আকারে বা 'ড্রপলেটইনফেক্‌সান' মারফৎ প্রশ্বাসের সহিত অপরের শরীরে সঞ্চারিত করে। যত্রতত্র থুথু নিক্ষেপ করিলে, তাহা সূর্যতাপে বা অন্যভাবে বিনষ্ট না হইলে ধুলার আকারেও প্রশ্বাসের সহিত অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। যক্ষ্মার জীবাণু দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকার পরেও অবস্থান্তরে সক্রিয় হইতে পারে। সূর্যরশ্মির 'আলট্রা-ভায়ালেট রে' এই জীবাণুর পক্ষে বিশেষ মারাত্মক।

বর্তমানে যক্ষ্মাজীবাণু-ধ্বংসকারী কতিপয় ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও এই রোগের চিকিৎসার পক্ষে এক যুগান্তর আসিয়াছে। 'স্যানাটোরিয়াম' নির্ভর চিকিৎসা অধুনা দ্রুত অপসৃত হইতেছে। আধুনিক ঔষধের মধ্যে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন (১৯৪৪ খ্রী), 'পাস' (প্যারাঅ্যামিনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড), আই. এন. এইচ. (আইসো নিকোটিনিক অ্যাসিড হাইড্রাজাইড) সর্বাধিক প্রচলিত।

অধুনা যথাযথভাবে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে অত্যন্ত প্রারম্ভিক অবস্থায় যক্ষ্মারোগ নির্ণয় ও আরোগ্য করা যায়।

যক্ষ্মার অস্তিত্ব জানিবার জন্য বুকের ছবি একস্‌-রে, কফ পরীক্ষা ও টিউবারকুলিন পরীক্ষা করা হয়।

অন্যথায় কোনও স্ফীত যক্ষ্মার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানে টিউবারকুলিন পরীক্ষার দ্বারা জনসমষ্টিকে 'পজেটিভ' ও 'নেগেটিভ' দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যাহাদের কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটে না, তাহাদের শরীরে বি. সি. জি. (Bacillus Calmette Guerin) প্রবেশ করাইয়া টিকা দেওয়া হয়। বি. সি. জি. বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও দেখা যায় যে, বি. সি. জি. টিকা-রক্ষিত শিশুদের ক্ষেত্রে যক্ষ্মার প্রসার ও প্রকোপ অরক্ষিত শিশু অপেক্ষা অনেক কম। জীবনধারণের মান উন্নীত করিতে পারিলেই যক্ষ্মা উচ্ছেদ সহজ হইবে।

এই যক্ষ্মা-প্রতিরোধ বিষয়ে দেশের জাতীয় সরকারকেই সম্যক্ অবহিত থাকিতে হয়। ভারতে যক্ষ্মা জাতীয়-স্বাস্থ্যপ্রকল্পের বিষয়ীভূত।

অরুণ শীল

যজুর্বেদ যজ্+উস্—যজুস্—যজ্ঞের মন্ত্র। যে বেদে যজুর্মন্ত্র রহিয়াছে, তাহাকে বলা হয় যজুর্বেদ। যজুর্মন্ত্র অধ্বর্যু নামক ঋত্বিকের দ্বারা অনুচ্চস্বরে উচ্চার্য। যে মন্ত্রের উচ্চারণে চরণ বা অবসান সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নাই, তাহাই যজুঃ অর্থাৎ গদ্য।

যজুর্বেদের দুই প্রধান বিভাগ। কৃষ্ণ এবং শুক্ল। শুক্লযজুর ভাষ্যকার মহীধরের বিবৃতি অনুসারে বেদব্যাস বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ শিক্ষা দেন। বৈশম্পায়নের নিকটে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শিষ্যরা যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। কোনও কারণে বৈশম্পায়ন যাজ্ঞবল্ক্যের উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অধীত বেদ ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য অধীত যজুর্মন্ত্র-সমূহ বমন করিয়া ফেলিলেন। বৈশম্পায়নের আদেশে অন্যান্য শিষ্যরা তিত্তিরি পক্ষী হইয়া বমনকৃত যজুর্মন্ত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই শিষ্যদের মলিন বুদ্ধির দরুণ এই যজুর্মন্ত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। ইহাই কৃষ্ণ যজুঃ। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্যকে আরাধনা করিয়া শুক্ল (বিশুদ্ধ) যজুর্মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। সেই যজুর্মন্ত্র কণ্ব, মধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্যকে শিখাইলেন। এই প্রকারে শুক্ল যজুর কাণ্ব শাখা, মাধ্যন্দিন শাখার সৃষ্টি হইল। বাজসনির পুত্র বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁহার দ্বারা কথিত যজুর্বেদ বাজসনেয়ী-শুক্লযজুরূপে পরিচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক বেদের একাধিক শাখা রহিয়াছে। আনুপূর্বী বা ক্রমিক সন্নিবেশ, পাঠভেদ ইত্যাদি কারণ বশতঃ শাখার সৃষ্টি। যজুর্বেদের একশত শাখার কিংবদন্তী রহিয়াছে। যজুর্বেদের মূল শাখা—(১) চরক; (২) বাজসনেয়; (৩) তৈত্তিরীয়। চরক শাখার অন্তর্ভুক্ত ১২টি বিভাগ বা শাখা। বাজসনেয় শাখাতে ১৭টি বিভাগ বা শাখা। তৈত্তিরীয় শাখাতে ২টি বিভাগ বা শাখা। এই ২টির একটিতে ৫টি বিভাগ বা শাখা। বর্তমানে যজুর্বেদের পাঁচটি শাখার সংহিতাই সুলভ। কৃষ্ণযজুর্বেদের চারিটি সংহিতা—কঠ শাখার কাঠক সংহিতা, কপিষ্ঠল-কঠ সংহিতা, মৈত্রায়ণীয় শাখার মৈত্রায়ণী সংহিতা, তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয় সংহিতা। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা। এই সংহিতার দুই সংস্করণ কাণ্ব সংহিতা ও মাধ্যন্দিন সংহিতা। মাধ্যন্দিন সংহিতাই সর্বাধিক প্রচলিত। কৃষ্ণযজুর কপিষ্ঠল-কঠ সংহিতা অংশত সংরক্ষিত।

কৃষ্ণযজুর সংহিতাগুলিতে মন্ত্রাংশ ও ব্রাহ্মণাংশ সংযোজিত হইয়াছে। শুক্লযজুঃ সংহিতাতে শুধু মন্ত্রাংশ আছে, ব্রাহ্মণাংশ নাই। ব্রাহ্মণাংশ প্রদত্ত হইয়াছে শতপথ ব্রাহ্মণে। মন্ত্র হইতে ব্রাহ্মণকে আলাদা করায় শুক্লত্ব বা বিশুদ্ধি। পক্ষান্তরে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের মিশ্রণ ঘটায় কৃষ্ণত্ব বা অবিশুদ্ধি। কৃষ্ণযজুর সংহিতাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তৈত্তিরীয় সংহিতা। শুক্লযজুর ২৬ হইতে ৪০ অধ্যায় খিল বা পরবর্তী সংযোজনরূপে গণ্য। এই খিল অংশের আলোচিত বিষয়গুলি কৃষ্ণযজুর সংহিতাগুলিতে প্রায় দৃষ্ট হয় না।

কৃষ্ণ ও শুক্লযজুতে ঋক্‌মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। ঋক্‌মন্ত্রের কিছু কিছু উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটিয়াছে কাঠক ও মৈত্রায়ণী সংহিতায়। কিন্তু তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতায় ঋক্‌মন্ত্রের বিশুদ্ধি রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, কাঠক ও মৈত্রায়ণী প্রাচীনতর সংহিতা এবং তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী অর্বাচীন।

তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতার বিষয় যাগযজ্ঞ ও তাহাদের বিবরণ। বাজসনেয়ী সংহিতার ত্রিংশ অধ্যায়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের উপকরণ আছে। এই অধ্যায়ে শ্রমবিভাগ ও বিভিন্ন জীবিকা বা বৃত্তির খবরও পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদ যজ্ঞীয় সাহিত্যরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু সামবেদ ও যজুর্বেদ একান্তভাবে যজ্ঞীয় সাহিত্য। যজ্ঞীয় গীতির জন্য সাম সংকলন এবং যজ্ঞীয় আনুষ্ঠানিক অংশের জন্য যজুঃসংকলন। কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় যে গদ্য আছে তাহাই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় প্রথম গদ্যের নিদর্শন। এই গদ্য প্রাণবন্ত ও সরল। যজুঃসংহিতার পদ্য মন্ত্র ঋক্-রূপে গণ্য এবং গদ্য-মন্ত্র যজুর্মন্ত্ররূপে কথিত। যজুর্মন্ত্র সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বচন—কখনও প্রতীকী বচন, কখনও রূপকাশ্রয়ী বাক্য।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

যজ্ঞ কোনপ্রকার সম্পদ বা সমৃদ্ধি লাভের জন্য অথবা শত্রুর ক্ষয়, যুদ্ধে জয়, আরোগ্য অথবা স্বর্গ ইত্যাদি কামনা পূর্বক দেবতার উদ্দেশে নতিজ্ঞাপন ও আহুতিপ্রদানের নাম যজ্ঞ। আহুতির দ্রব্য হবি, বা হব্য। সাধারণতঃ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। দেবতার নিকটে হব্য বহন করেন অগ্নি। এই রীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় ভূতযজ্ঞে, পিতৃযজ্ঞে ও সাকমেধ নামক চাতুর্মাস্য যাগে।

বৈদিক যজ্ঞের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যঃ অনুবাক্যা মন্ত্রের দ্বারা দেবতাকে আহ্বান; মন্ত্রসহযোগে আহুতির পূর্বে যাজ্যামন্ত্র পাঠ; দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হব্যদ্রব্য প্রদান; যজমান ও ঋত্বিক্‌দের দ্বারা হব্যদ্রব্যের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ (হব্যদ্রব্যের মধ্য দিয়া অলৌকিক শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয় এই বিশ্বাসে)। যাজক ও ঋত্বিক যজ্ঞান্তে

দক্ষিণা লাভ করেন। দক্ষিণা-রূপে প্রদত্ত হইত হিরণ্য, গো, অশ্ব, বস্ত্র ইত্যাদি। সোমযাগে আবশ্যক হইত ষোলজন ঋত্বিক্।

হব্যদ্রব্য ছিল পুরোডাশ (যবের বা চালের পিষ্টক), ধানা (ভাজা যব), করম্ভ (দধিমিশ্রিত যবের ছাতু), পরিবাপ (ঘৃতপক্ক খই), চরু (ঘৃতপক্ক চাল), আজ্য (ঘৃত), বাজিন (ঘোল), ঘর্ম (উষ্ণদুগ্ধ), আমিক্ষা (দধিমিশ্রিত দুগ্ধ), সোমরস, সুরা, বপা (পশুমেদ) ইত্যাদি।

যজ্ঞীয় চর্যায় আবশ্যক অঙ্গ বেদি-নির্মাণ। বেদির উপরে রাখিতে হয় যজ্ঞীয় দ্রব্য। গার্হপত্য, আহবণীয় ও দক্ষিণাগ্নি,—এই তিন শ্রৌত অগ্নি। গার্হপত্য সর্বদার জন্য প্রজ্বলিত রাখিবার নিয়ম। গার্হপত্য হইতে অগ্নি লইয়া আহবণীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালান হয়। অগ্নিশালায় এই তিন অগ্নি স্থাপনের নাম অগ্ন্যাধান। এই অনুষ্ঠানের পরে প্রতিদিন আহবণীয় অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম করিতে হয়। অরণি-ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্বালনের ব্যবস্থা ছিল। ইহার নাম অগ্নিমন্থন। আহবণীয় কুণ্ডে সমিধ্ (কাষ্ঠ) স্থাপনের নাম অগ্নি সমিন্ধন।

বৈদিক যজ্ঞ ছিল দুই শ্রেণীভুক্তঃ হবির্যজ্ঞ এবং সোমসংস্থা। হবির্যজ্ঞের অন্তর্গত দর্শ, পূর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টিযাগ, নিরূঢ় পশুবন্ধ বা স্বতন্ত্র পশুযাগ, চাতুর্মাস্য, সুরা আহুতি-যুক্ত সৌত্রামনী যাগ। সোমযাগের অঙ্গ পশুযাগও ছিল। যাবতীয় একাহ (একদিনে সম্পাদ্য) সোমযাগের অন্তর্ভুক্ত—অগ্নিস্তোম, গোস্তোম, ব্রাত্য-স্তোম, রাজসূয়, বাজপেয় ইত্যাদি। অশ্বমেধ অহীন সোমযাগ (দুই থেকে বার দিনে সম্পাদ্য) যজ্ঞীয় পশু-রূপে বিবেচ্য ছিল পুরুষ, অশ্ব, গো, অধি (মেষ) অজ (ছাগ)। পুরুষমেধ অহীন সোমযাগরূপে যজ্ঞের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই যজ্ঞে যূপে বন্ধ মনুষ্যকে পর্যগ্নিকরণের পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, যথার্থ নরবলি অনুষ্ঠিত হইত না। ছাগবলি ছিল পশুযাগের সাধারণ রীতি।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯ খ্রী) পিতাঃ বঙ্কিমচন্দ্র দাস। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে আই. এ. পড়িতে পড়িতে তিনি কলেজ ছাড়িয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। পিতা অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করেন। কংগ্রেসের কর্মী হন। পরে বিপ্লবের আদর্শ গ্রহণ করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামখ্যাত বিপ্লবী শচীন সান্যাল ভবানীপুরে ঘাঁটী করিলে তিনি এই দলে যোগ দেন। বাঁকুড়ায় বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচার উপলক্ষে শচীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইলে দক্ষিণেশ্বরের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়।

অতঃপর তিনি দেওঘরে গিয়া এই দলে মিশিয়া বোমানির্মাণ শিক্ষা করেন।

এই দল ধরা পড়িলে (১৯২৫ খ্রী) তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং প্রায় তিন বৎসর জেলে থাকেন। মুক্ত হইয়া বোমা-নির্মাণ ব্যবস্থায় উদ্যোগী হন। কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া লাহোরে ষড়যন্ত্র-মামলার আসামী-শ্রেণীভুক্ত হন।

জেলে সরকার এই বন্দীদের রাজনৈতিক বন্দীর অধিকার না দেওয়ায় তিনি অন্যান্য বন্দীদের সহিত অনশন শুরু করেন। ৬৩ দিন অনাহারে থাকিয়া যতীন্দ্র-নাথ জেলের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করেন।

নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০ খ্রী) ভারতের অন্যতম প্রধান মুক্তিযোদ্ধা। জন্মঃ বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে (১৯ নবেম্বর)। পিতা কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যশোহর আদালতের পেশকার ছিলেন। কলেজে পড়ার সময়েই যতীন্দ্রনাথের মনে দেশ স্বাধীন করিবার স্বপ্ন জাগে এবং যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার উদ্দেশ্যে তিনি বরোদায় উপস্থিত হন। অরবিন্দ ঘোষ তখন বরোদা-রাজের একান্ত-সচিব। তাঁহার আনুকূল্যে তিনি 'যতীন্দর উপাধ্যায়' নাম লইয়া সেনাবিভাগে প্রবেশ করেন। পরে মহারাজের দেহরক্ষী হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুশীলন-সমিতি গড়িয়া ওঠে। ইহা অচিরে একটি বিপ্লব-কেন্দ্রে পরিণত হয়। যতীন্দ্রনাথ দেশে আসিয়া এই সমিতিতে যোগ দেন। বাঘা যতীন ('যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্র) প্রমুখ বিপ্লবীরাও এখানে তাঁহার সহিত যুক্ত হন। এই সময়ে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় ইতালীর বিপ্লব সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর তিনি পাঞ্জাবে যান। সেখানে সর্দার অজিত সিং, বিখ্যাত বিপ্লবী ভগৎ সিংহের পিতা কিষণ সিং, লালা হরদয়াল প্রভৃতি তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। নানা স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি সোহম্ স্বামীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব লইয়া 'নিরালম্ব স্বামী' নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া চিন্ময়ী দেবী নামে পরিচিত হন। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পরলোক গমনের পর তিনি কিছুদিন 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। মায়ের অনুরোধে কিয়ৎকাল স্বগ্রামে গিয়া থাকেন। বরাহনগরে জনৈক সহকর্মীর গৃহে তাঁহার দেহাবসান ঘটে (৫ সেপ্টেম্বর)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫ খ্রী)। দেশপ্রেমিক বীর বিপ্লবী। সচরাচর 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত। নদিয়া জেলার কয়া গ্রামে জন্ম (৮ ডিসেম্বর)। অল্প বয়সে পিতৃহীন। ছেলেবেলা হইতে সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতিতে দক্ষতা ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া (১৮৯৮ খ্রী) কলিকাতা সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন। এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়া বাংলা সরকারে টাইপিস্ট ও স্টেনোগ্রাফারের কাজ লন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সংস্পর্শে আসিয়া বৈপ্লবিক-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানির সহায়তায় ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতে বিশিষ্ট অংশ লন। 'মাভেরিক' নামক জাহাজ হইতে জার্মানি-প্রেরিত অস্ত্র নামাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সঙ্গী-সহ বালেশ্বরে যান। অস্ত্র পৌঁছিল না। পুলিশ সংবাদ পাইয়া অনুসরণ করিল। বুড়িবালাম নদীর তীরে এক ধানক্ষেতে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া আহত অবস্থায় হাসপাতালে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয় (১০ সেপ্টেম্বর)। সঙ্গীদের কেহ নিহত হন, কাহারও বা ফাঁসি হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪ খ্রী) বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে জন্ম ; পৈতৃক নিবাস শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম। পিতা দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত। শিবপুর কলেজ হইতে বি. ই. ডিগ্রি পাইয়া (১৯১২ খ্রী) ওভারশিয়ার হন। তৎপূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যে আকৃষ্ট এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সান্নিধ্যে কবিতা রচনায় উৎসাহিত হন। প্রকাশিত গ্রন্থঃ 'মরীচিকা' (১৩৩০) ; 'মরুশিখা' (১৩৩৪) ; 'মরুমায়া' (১৩৩৭) ; 'কাব্য-পরিমিতি' (১৩৩৮) ; 'সায়ম্' (১৩৪৮) ; 'অনুপূর্বা' (১৩৫৩) ; গান্ধীবাণী-কণিকা (১৩৫৫), 'ত্রিযামা' (১৩৫৫) ; 'নিশান্তিকা' (১৩৬১)।

'মানুষ', 'ডাকহরকরা', 'বারনারী', 'পল্লীর দোকানী', 'দুঃখবাদী', 'চাষার বেগার', 'নাস্তিক' ইত্যাদি কবিতাবলীর শিরোনামগুলিই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিশেষ মনোভঙ্গির স্মারক। তাঁহার কবিদৃষ্টি ছিল তির্যক। ভাবের দৃঢ়তায়, মৃদু ও তীব্র ব্যঙ্গের ঝাঁজে, দুঃখদর্শনে, মধ্যবিত্ত বাঙালী-জীবনের স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘাত-চেতনায়, বিদ্রোহী মনোভাবে তিনি সেকালের রবীন্দ্রানুসারী সমসাময়িক কবিদিগকে নূতন পথ প্রদর্শন ও অনুজ কবিদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। শেষ বয়সে 'ম্যাক্‌বেথ', 'হ্যামলেট', 'ওথেলো', 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা', 'কুমারসম্ভব' ইত্যাদি অনুবাদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শেষ জীবনের কবিতায় প্রথম জীবনের বিদ্রোহী-মানসের পরিবর্তনও লক্ষণীয়।

হরপ্রসাদ মিত্র

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৩১-১৯০৮ খ্রী) উনবিংশ শতাব্দীর ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের নেতৃস্বরূপ। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিক্‌পাল, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। হরকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ মে কলিকাতায় জন্ম। ওরিয়েন্টাল সেমিনারি এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ। বাল্যকাল হইতেই ইনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ('ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' দ্র) 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ কবিতা ও 'লিটারারি গেজেট'-এ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে বাংলার পেশাদারী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ তাঁহারই উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' প্রকাশিত হয়। ছোটলাটের শাসন পরিষদের (১৮৭০ খ্রী) ও পরে উপর্যুপরি কয়েকবার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। রাজা বাহাদুর (১৮৭১ খ্রী) ও মহারাজা (১৮৭৭ খ্রী) খেতাব পান। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই খেতাব বংশানুক্রমিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি প্রভৃতি বহু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। কয়েকটি কমিশনের সদস্য হন এবং কে. সি. এস. আই. উপাধি পান (১৮৮২ খ্রী)।

ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অল্প বয়সে লিখিত কাব্য ও গল্পসংকলন 'ফ্লাইট্‌স অভ্ ফ্যান্সি' উল্লেখযোগ্য রচনা। 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক এবং স্তব ও সংগীতের সংকলন 'গীতিমালা' তাঁহার সাহিত্য-কীর্তির পরিচায়ক। সংগীতের প্রতিও অনুরাগ ছিল ; বহু বাদ্যযন্ত্রের কুশলী শিল্পী ছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অনেক অর্থ দান করেন। নানা জাতীয়তা পরিপোষক প্রতিষ্ঠানের সহিতও সংযুক্ত ছিলেন।

কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮ খ্রী) বাংলার রবীন্দ্রানুসারী কবিকুলের অন্যতম। জন্মঃ ২৭ নভেম্বর, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের নদিয়ার জামশেরপুর গ্রামে। পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। পিতা, হরিমোহন বাগচী। যতীন্দ্রমোহনের ছাত্রজীবন কাটে কলিকাতায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাফ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু (১৮৯১ খ্রী) উপলক্ষে প্রথম কবিতা রচনা করেন। পরে 'সাহিত্য'

ও অন্যান্য পত্রিকায় এবং পরে 'মানসী'তে নিয়মিত লিখিতে থাকেন। ১৯০৯-১৩ খ্রীষ্টাব্দ 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদক, 'যমুনা' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক (১৯২১-২২ খ্রী)। পরবর্তীকালে 'পূর্বাচল' নামক একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকাঃ লেখা (১৯০৩ খ্রী) রেখা (১৯১০ খ্রী), অপরাজিতা (১৯১৫ খ্রী), নাগকেশর (১৯১৭ খ্রী), বন্ধুর দান (১৯১৮ খ্রী), জাগরণী (১৯২২ খ্রী), নীহারিকা (১৯২৭ খ্রী), মহাভারতী (১৯৩৩ খ্রী), পাঞ্চজন্য (১৯৪১ খ্রী), পথের সাথী প্রভৃতি। মৃত্যুর পরে কবিতা-সংকলন 'কাব্যমালঞ্চ' প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় পল্লীপ্রীতি, নিপীড়িতের প্রতি সমবেদনা, প্রকৃতি ও মানবজীবনের রূপসম্ভোগ প্রবণতা, পৌরাণিক চরিত্রের মহিমা স্মরণ ইত্যাদির সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়াছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

যতীন্দ্রমোহন সিংহ (?-১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। জন্ম ঃ ফরিদপুরে। 'উড়িষ্যার চিত্র' (১৩১০ বঙ্গাব্দ), 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব-বিচার' (১৩০৫ বঙ্গাব্দ), 'অনুপমা', 'তপস্যা', 'গল্প-মাল্য', 'তোড়া', 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'সন্ধি' (১৩৪১ বঙ্গাব্দ) তাঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩ খ্রী) ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা, 'দেশ-প্রিয়' আখ্যায় ভূষিত। চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে জন্ম। পিতা যাত্রামোহন সেনগুপ্ত। কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পাশ করিয়া বিলেতে যান; কেম্ব্রিজ হইতে বি. এ. এবং অতঃপর ব্যারিস্টারি পাশ করেন। ১৯১০-১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্‌ করিয়া গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তাও (পূর্বনাম নেলী গ্রে) ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রসিদ্ধা নেত্রী। সরকারী নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। বর্মা অয়েল কোম্পানি এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ধর্মঘট সফল করিবার জন্য যতীন্দ্রমোহন বহু ত্যাগস্বীকার করেন এবং সস্ত্রীক কারাদণ্ড ভোগ করেন। পরেও কয়েকবার আইনভঙ্গের অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হয়। দেশবন্ধুর প্রধান দুই সহকারী ছিলেন যতীন্দ্রমোহন এবং সুভাষচন্দ্র। কলিকাতার মেয়র এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি-রূপে যতীন্দ্রমোহন সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কংগ্রেস-প্রতিনিধিরূপে তিনি বিলেতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন; ফিরিবার পর গ্রেপ্তার হন এবং বন্দী অবস্থায় রাঁচিতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮ খ্রী) জন্মঃ উত্তর-বঙ্গে করচমারিয়া গ্রামে। পিতাঃ রাজকুমার। রাজসাহীর স্কুল ও কলেজ হইতে এনট্রান্স ও এফ. এ. পরীক্ষা পাস করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন (১৮৯১ খ্রী) ও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি পান। পর বৎসর ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কটক র‍্যাভেন শ কলেজ ও পাটনা কলেজে অধ্যাপনাকার্য করেন ও শেষোক্ত কলেজ হইতেই অবসর লন। দুই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলরের পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও তিনি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. ও প্রথমে ঐ বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন তথাপি কিছুদিনের মধ্যেই ইতিহাস-চর্চায় আকৃষ্ট হন। পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা ও মুসলমান যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন।

তাঁহার প্রধান গ্রন্থ ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ঔরঙ্গজেবের ইতিহাস। এই গ্রন্থরচনার জন্য তিনি ফারসী ও মারাঠা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ও বিদেশ হইতে বহু পুথি ও দলিলপত্র সংগ্রহ করেন। ইহা ছাড়া তিনি শিবাজীর ইতিহাস, মোগল যুগ সম্বন্ধে কয়েকখানি ছোট গ্রন্থ এবং 'ফল অভ্‌ দি মোগল এম্পায়ার' নামক চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ গ্রন্থ (১৯৩২-৫০ খ্রী) লেখেন। ইতিহাস ছাড়া তিনি যে সমুদয় গ্রন্থ রচনা করেন তাহার মধ্যে 'চৈতন্য', 'ব্রিটিশ আমলের অর্থনীতি' এবং 'ইণ্ডিয়া থ্রু দি এজেস' প্রসিদ্ধ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারত-বর্ষের ইতিহাসের চতুর্থ খণ্ডের চারিটি অধ্যায় তাঁহার রচনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার সম্পাদনায় বাংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। তিনি 'মাসিরী আলমগিরি'র ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের জ্যারেট-কৃত ইংরেজী অনুবাদ সম্পাদনা করেন। বহুকাল 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস্‌ কমিশন'-এর সক্রিয় সভ্য ছিলেন এবং বহু ইংরেজী, মারাঠী ও ফারসী

দলিলের অনুবাদ করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. ও 'নাইট' উপাধি দেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

যদুভট্ট (১৮৪০-১৮৮৩ খ্রী) স্বনামধন্য ধ্রুপদগায়ক ও ধ্রুপদগান-রচয়িতা। জন্মঃ বিষ্ণুপুরে। পিতাঃ সেতারবাদক মধুসূদন ভট্টাচার্য। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী রামশংকর ভট্টাচার্যের নিকটে প্রথম সংগীতশিক্ষা। ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ধ্রুপদাচার্য গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকটে প্রায় ১০ বৎসর যাবৎ ধ্রুপদ শিক্ষার পর সংগীত-জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পঞ্চকোট, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ-দরবারে বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের সংগীতাচার্য হন। রবীন্দ্রনাথেরও সংগীত শিক্ষক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও যদুভট্টের সংগীতশিষ্য হইয়াছিলেন এবং যদুভট্টই 'বন্দেমাতরম্' সংগীতের প্রথম সুর-সংযোজক। যদুভট্টের ধ্রুপদ সংগীতের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ কিছু বাংলা ধ্রুপদাঙ্গ গান রচনা করিয়াছিলেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

যন্ত্র সোনা, রুপা বা তামার পাতে বা ভূর্জপত্রে সোনার কলমের দ্বারা কুমকুমাদির সাহায্যে অঙ্কিত দেবতার প্রতীক মন্ত্রাদি। মূর্তির মত যন্ত্রে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর দেবতার পূজা প্রশস্ত। অঙ্গে যন্ত্র ধারণ করিবারও বিধান আছে। দেহের সঙ্গে আত্মার যে সম্বন্ধ যন্ত্রের সঙ্গে দেবতারও সেইরূপ সম্বন্ধ।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

যন্ত্রগণক মানুষের মস্তিষ্কের কর্মধারার সঙ্গে ইলেক্‌ট্রনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটার যন্ত্রের প্রভূত সাদৃশ্য আছে; এজন্য এই কম্পিউটারকে 'যন্ত্রগণক' বলা হয়। মানুষের মতই এই যন্ত্র অঙ্ক কষিতে, স্মরণ রাখিতে এবং যুক্তির আশ্রয় লইতে পারে। তবে ইন্‌টিউয়িশন বা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া মানুষের যে যুক্তির ক্ষমতা, যন্ত্রগণকের তাহা নাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কম্পিউটার মূলতঃ দুই ধরনেরঃ ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক এবং অ্যানালগ বা সাদৃশ্যাত্মক। প্রথমোক্ত কম্পিউটারে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা হয়। সংশ্লিষ্ট সব রাশিকে বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করে। দ্বিতীয়োক্ত কম্পিউটারে ঐ কাজের জন্যে সংশ্লিষ্ট রাশিগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখিয়া অন্য কয়েকটি উপযোগী অবিচ্ছিন্ন রাশির মাধ্যমে তাহাদের প্রকাশ করা হয়। ইলেক্‌ট্রনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের তুলনায় সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটার সাধারণতঃ অধিকতর দ্রুতগতিসম্পন্ন, কিন্তু সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের সমাধান অপেক্ষাকৃত বেশি নিখুঁত এবং এই কম্পিউটারে যত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে, সাদৃশ্যাত্মক কম্পিউটারের সাহায্যে তাহা সম্ভব নয়।

প্রায় ২৫০০ বছর আগে অ্যাবাকাস্ নামে যে গণকযন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়, তাহাকেই প্রথম সংখ্যাত্মক কম্পিউটার বলা চলে। তবে যন্ত্রগণক অর্থাৎ ইলেক্‌ট্রনিক সংখ্যাত্মক কম্পিউটারের সৃষ্টি হইয়াছে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। এই কম্পিউটারটির নাম 'Electronic Numerical Integrator and Computer' (সংক্ষেপে ENIAC)। এটি তৈয়ারি হয় আমেরিকার পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এটি পূর্ণতা লাভ করে; তখন ইহাতে ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌বের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০০। অতঃপর কম্পিউটারের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, ভাল্‌বের পরিবর্তে ট্র্যান্‌জিস্টর ও সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড ব্যবহৃত হইতেছে, উপাদানের সংখ্যাও বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে লক্ষাধিক কম্পিউটার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রহিয়াছে।

যন্ত্রগণকের ভাষা হইল দ্বিসংখ্যক ভাষা। ইহাতে সব কিছুকেই দুইটি সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়; ঐ সংখ্যা দুইটি হইতেছে ০ ও ১। যে কোনও সংখ্যার এক একটি 'ডিজিট' বা অঙ্ক হইতেছে ঐ দুইটির মধ্যে একটি—এইজন্য এই রকম অঙ্ককে ইংরেজীতে বলা হয় Binary Digit সংক্ষেপে Bit (বিট)। বিট শুধু যে সংখ্যা এবং + বা – চিহ্নের প্রকাশক তাহা নয়, ইহা যন্ত্রগণকের যুক্তিশক্তিরও ভিত্তি। হ্যাঁ, নির্ভুল বা সত্য বোঝানো হয় ১ দিয়া; আর না, ভুল বা মিথ্যা বোঝানো হয় ০ দিয়া। কম্পিউটারের ইলেক্‌ট্রনিক সার্কিটের ক্ষেত্রে এই প্রতীকধর্মী যুক্তিধারার প্রয়োগের মূল বক্তব্য হইতেছে কোনও সুইচ বন্ধ বা খোলা থাকিলে তাহা যথাক্রমে ১ বা ০ নির্দেশ করে।

যন্ত্রগণকের অংশ হইল পাঁচটিঃ প্রবেশ, স্মৃতি, নিয়ন্ত্রক, পাটিগণিত ও প্রস্থান। সমাধানযোগ্য সমস্যা অনুযায়ী প্রথমে 'প্রোগ্রামিং' বা একটি কর্মসূচী নির্ধারণ করিয়া কর্মসূচীর তথ্যগুলিকে দ্বিসংখ্যক ভাষায় প্রচিছন্ন কার্ড, কাগজের ফিতা বা চৌম্বক ফিতার উপর লিখিতে হয়। যন্ত্রগণকের প্রবেশ অংশ ঐ তথ্যগুলিকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তরিত করিয়া স্মৃতিতে পৌঁছাইয়া দিলে সেখানে সেগুলি সঞ্চিত হয়। স্মরণ রাখিবার উপাদান নানারকম হইতে পারে: সবচেয়ে বেশি যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইতেছে চৌম্বক ফিতা। স্মৃতিতে সংগৃহীত তথ্য-

গুলি নিয়ন্ত্রকের নির্দেশে গাণিতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ধারা অনুযায়ী পাটিগণিত অংশে প্রেরিত হয়। সেখানে ইলেক্‌ট্রনিক সুইচের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আঙ্কিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হয়। ফলাফলগুলি আবার নিয়ন্ত্রক সংকেতে স্মৃতিতে গিয়া সঞ্চিত হয়। পরিশেষে সেগুলি নিয়ন্ত্রকের নির্দেশক্রমে প্রস্থান-অংশে প্রেরিত হইলে সেখানে বৈদ্যুতিক সংকেতকে রূপান্তরিত করিয়া কার্ড বা ফিতার উপর মুদ্রিত করা হয় এবং সেখান হইতে ঈপ্সিত ফলাফলগুলি এইভাবে যন্ত্রের বাহিরে আসে। পরে ঐগুলিকে মানুষের প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইবার ব্যবস্থা থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের প্রস্থান-অংশ হইতেই সরাসরি মানুষের ভাষায় ঈপ্সিত সমাধান মুদ্রিত হইয়া বাহির হয় অথবা কথা বা ছবির মাধ্যমেও তাহাকে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা থাকে।

মানুষের মস্তিষ্কের কর্মধারার সঙ্গে কম্পিউটারের কর্মধারার যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিলেও কম্পিউটারের স্মৃতি-শক্তি কিন্তু মানুষের স্মৃতিশক্তির মত এত বিপুল নয়; অপরপক্ষে মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় কম্পিউটার অনেক বেশি দ্রুত গতিতে কাজ করিতে পারে। যে সমস্যার সমাধান করিতে একজন বিজ্ঞানীর কয়েক মাস কাটিয়া যাইবে, কম্পিউটার তাহা কয়েক মিনিটে করিয়া দিতে পারে। মহাকাশ অভিযান হইতে শুরু করিয়া শিল্প, ব্যবসায়, গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যাপক প্রয়োগ হইতেছে। বস্তুতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যায় যে আশ্চর্যরকম উন্নতি হইয়াছে যন্ত্রগণককে তাহার অন্যতম প্রধান ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

জয়ন্ত বসু

যব যবের উৎপত্তি উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং তৎসন্নিকটবর্তী অঞ্চলে। তণ্ডুল-জাতীয় শস্যের মধ্যে প্রধান শ্রেণীভুক্ত। গমের মতই নাতিশীতোষ্ণ এবং শীত-মণ্ডলেই প্রধানতঃ চাষ হয়। ভারতে গাঙ্গেয় পলিমাটির অঞ্চলে এবং হিমালয়ের ১৪০০০ ফিট উচ্চতা পর্যন্ত ইহার চাষ। হালকা মাটি বিশেষ করিয়া উর্বরা দো-আঁশ মাটিই চাষের পক্ষে উপযোগী। গম অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষারমিশ্রিত জমিতেও চাষ সম্ভব।

গাঙ্গেয় উপত্যকায় শীতকালে এবং হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে ইহার চাষ হয়। যব গম অপেক্ষা কম সময়ে পাকে ও অনেক নাবী করিয়া বোনা চলে। চৈত্রে ফসল তোলার পর মাড়াই, ঝাড়াই করিয়া গুদামজাত করা প্রয়োজন। প্রধানতঃ নানাপ্রকার মদ (বিয়ার, হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি) তৈয়ারিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। গুঁড়া করিয়া জলে ফুটাইয়া লইলে সুপাচ্য পুষ্টিকর পানীয়ের উপাদান (মল্ট) হয়। বার্লি ও যবচূর্ণ অভিন্ন।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

যবদ্বীপ মালয় দ্বীপপুঞ্জ অথবা 'ইন্দোনেশিয়ার' একটি দ্বীপ। ইহার উত্তর-পশ্চিমে বিশাল সুমাত্রা, পূর্বে ক্ষুদ্র বালিদ্বীপ, দক্ষিণে ভারত সমুদ্র। যবদ্বীপের দৈর্ঘ্য ৬২২ মাইল, প্রস্থ ৫৫ হইতে ১২১ মাইল। সন্নিহিত মাদুরা ও অন্য ক্ষুদ্র কয়েকটি দ্বীপসহ ইহার পরিমাণ ৫১০০০ বর্গমাইল। যে কয়টি দ্বীপের নাম করা হইল ইহার সকলগুলিতেই খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীতে বা তাহার পূর্বেই ভারত হইতে হিন্দুরা বাণিজ্য, ধর্মপ্রচার বা রাজ্যস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিত এবং ক্রমে ক্রমে উক্ত অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় যবদ্বীপেও একটি প্রকাণ্ড হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া ওঠে। খুব প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্যে যবদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। যবদ্বীপের কিংবদন্তীতেও মহাভারতের অনেক রাজা ও রাজবংশের কথা আছে। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই যে যবদ্বীপে হিন্দুদের উপনিবেশ ছিল গ্রীক্-লেখক টলেমির ব্যবহৃত যবদ্বীপ এই নামটিই তাহার প্রমাণ। আর একটি প্রমাণ এই যে, দেববর্মন নামে যবদ্বীপের এক রাজা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে এক দূত পাঠাইয়া-ছিলেন।

মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় যবদ্বীপেও হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের কয়েকখানি শিলালিপিতে রাজা পূর্ণবর্মনের উল্লেখ আছে। তাঁহার পিতা ও পিতামহ যথাক্রমে রাজাধিরাজ ও রাজর্ষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বহু হিন্দু-রাজার নাম ও অন্যান্য বিবরণ প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্র-শাসন হইতে জানা যায়। যবদ্বীপের কয়েকজন হিন্দুরাজা প্রায় সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

সংস্কৃত সাহিত্য পঠন-পাঠনের ফলে যবদ্বীপে একটি বিরাট সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষার মিশ্রণে কবি নামে এক নূতন ভাষায় এই সাহিত্য রচিত হয়। 'কবি' ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হয় এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বহু উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হয়। 'অর্জুন-বিবাহ', 'ভারত-যুদ্ধ' প্রভৃতি অনেক কাব্য বর্তমান ইউরোপীয় লেখকগণও খুব উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া মনে করেন। যবদ্বীপে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম,

হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, ভারতীয় শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল এবং মনুস্মৃতি প্রভৃতি অনুসারে আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। ভারতে প্রায় এমন কোনও দেবতার মূর্তি নাই যাহা যবদ্বীপে পাওয়া যায় নাই। যদিও পঞ্চদশ শতাব্দীর পর হইতে যবদ্বীপে মুসলমান রাজ্য ও ইসলামধর্ম প্রচলিত হয়, তথাপি যবদ্বীপের হিন্দুগণ অনেকে বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতেছে। যবদ্বীপেও এখন বাজাং নামে ছাপা নাটকে (অনেকটা পুতুল নাচের মত) রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীর দর্শন মিলে।

যবদ্বীপে বহু হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ স্তূপ আছে। বিখ্যাত বরবুদুর স্তূপ বিশ্বের বিস্ময়স্থল। ইহার নয়টি তলা—প্রত্যেকটি অপূর্ব ভাস্কর্যে খোদিত—সর্বোচ্চ তলার উপর একটি বৃহৎ স্তূপ। ইহার সর্বনিম্ন তলা প্রায় ৪০০ গজ দীর্ঘ। ইহার মধ্যে ৪৩২টি অপূর্ব ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি ও ১৫০০ খোদিত ফলক আছে। এই সমুদয় ফলকে বৌদ্ধ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ লোরা জংগ্রাং মন্দিরে রামায়ণের কাহিনী খোদিত আছে। আজিও যবদ্বীপে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় বহু নিদর্শন বিদ্যমান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

যবন হরিদাস (আনুমানিক ১৪৫০-১৫৩০ খ্রী) চৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদদের অন্যতম। 'চৈতন্য-চরিতামৃত', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বর্তমান, সম্ভবতঃ আঠার বৎসর বয়সে হরিপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া 'নিজ গৃহত্যাগ কৈলা' অনতিদূরে 'বেনাপোলের বনমধ্যে' হরিসাধনায় নিমগ্ন হন এবং 'রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্তন' করিতেন। চৈতন্যদেবের বহুপূর্বেই অদ্বৈতাচার্য তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র দান করেন। চৈতন্যদেবের পুরীধামে অবস্থানকালে সমুদ্র-তীরের একটি গোফায় বাস করিতেন এবং প্রতিমাসে এক কোটি নামজপে মগ্ন থাকিতেন। চৈতন্যদেবের পদতলে মাথা রাখিয়া আশি বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। সপার্ষদ চৈতন্যদেব মৃতদেহটি স্কন্ধে লইয়া নিজ হস্তে তাহা সমাহিত করিয়া হরিদাস-বিজয়োৎসব সম্পন্ন করেন।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

যম ঋগ্বেদে যম পরলোকের রাজা—পিতৃপতি। পরলোকে পিতৃগণ যমের সঙ্গে মিলিত হন। ইঁহার সহজাতা ভগিনী জয়ী বা যমুনা। যমের ন্যায় একই মাতৃগর্ভের একাধিক সন্তান যমজ (যম ইব জাতঃ) নামে খ্যাত। মহাভারতে ও পুরাণে যম মৃত্যুর দেবতা-রূপে কল্পিত। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবাস-পরিহিত ও মহিষারূঢ়রূপে বর্ণিত। যমের অস্ত্র পাশ, পরশু, জাল ও খড়্গ। শ্যাম ও শবল নামক দুইটি কুকুর যমের অনুচর। বৈদিকমতে ইনি বিবস্বান্ ও সরণ্যূর পুত্র। পুরাণমতে রবি ও সংজ্ঞার পুত্র।

মানুষের মৃত্যুকালে যমদূতেরা আসিয়া তাহাদের মর্ত্যলোক হইতে যমলোকে লইয়া যান। সেখানে কর্ম অনুসারে যন্ত্রণাভোগের দ্বারা আত্মার পাপ ক্ষয় হয়। পুরাণে যম ভীষণ-দর্শনরূপে বর্ণিত। তাঁহার অনুচরেরাও ভয়াবহ এবং প্রেতাত্মাদের প্রতি তাঁহাদের আচরণও বিভীষিকাময়। মহাভারত ও পৌরাণিক উপাখ্যানে যম মৃত্যু, ধর্মরাজ, কাল, কৃতান্ত এবং অনন্ত-রূপে কথিত।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

যমদ্বিতীয়া দ্রাতৃদ্বিতীয়া দ্র

যমপুকুর পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলের ব্রত। কুমারীরা কার্তিক মাসে এই ব্রত করে। উদ্‌যাপনের বৎসর এক কাহন কড়ি ভাই পাইয়া থাকে। উঠানে পুকুর খুঁড়িয়া পিটালির আলপনার উপর দক্ষিণঘাটে মাটির তৈয়ারি যমরাজা ও যমরানী, উত্তরঘাটে মেছো-মেছোনী, পূর্বঘাটে ধোপা-ধোপানী এবং পশ্চিমঘাটে কাকচিল হাঙ্গর-কুমীর প্রভৃতির মূর্তি স্থাপন করা হয়। পুকুরটি জলে ভরিয়া দিতে হয়; উহার পাড়ে থাকে হলুদ-কচুর গাছ এবং ভিতরে ভাসে সুষনি-কলমি-হিংচের ঝাড়। কুমারীরা ছড়া বলিয়া মূর্তিগুলিকে পূজা করে, পুকুরে জল ঢালে, লতাগুল্মে বসায় ও পিতৃগৃহের সুখ-সমৃদ্ধি ও ধনজনের প্রার্থনা করে। ব্রতের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ব্রতকথাও বলা হয়। কোথাও কোথাও এই ব্রতকে 'পুণ্যি-পুকুর' বলে।

কামিনীকুমার রায়

যমুনা উত্তর ভারতের একটি পবিত্র নদী। ইহা তেহরি রাজ্যের বন্দর পুঞ্চ পর্বতের উত্তর-পশ্চিম হইতে উত্থিত হইয়া বাহির্হিমালয় ও শিবালিঙ্গ পর্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমতলে অবতরণ করে। হিমাচল প্রদেশের সীমানা স্পর্শ করিয়া হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের সীমা নির্ধারণ করিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে। মথুরা অতিক্রম করিবার পর পূর্বমুখী হইয়া এলাহাবাদের নিকট প্রয়াগে গঙ্গা এবং সরস্বতীর সহিত মিলিত হইয়া ত্রিবেণীতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। যমুনার মোট দৈর্ঘ্য ১৩৭৬ কি. মি.। দিল্লী, বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, এলাহাবাদ প্রভৃতি যমুনার তীরবর্তী প্রধান শহর। যমুনার আর এক নাম কালিন্দী। শ্রীকৃষ্ণের

বৃন্দাবন ও মথুরা-লীলার সহিত এই নাম বিশেষ ভাবে জড়িত।

সলিলকুমার চৌধুরী
রেবা দে

যযাতি নহুষের পুত্র। পুরাণ ও মহাভারতে ইঁহার উপাখ্যান বিবৃত আছে। যযাতি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা পরিচারিকারূপে দেবযানীর সহিত গিয়াছিলেন, যযাতি গোপনে তাঁহাকেও বিবাহ করেন। যদু ও তুর্বসু দেবযানীর পুত্র, এবং শর্মিষ্ঠার পুত্র অনু, দ্রুহ্যু ও পুরু বা পুরু। এই বিবাহের কথা প্রকাশ পাইলে ক্রুদ্ধ দেবযানী পিতৃগৃহে যান। শুক্রাচার্য যযাতিকে অকাল-বার্ধক্যের শাপ দেন; পরে যযাতির অনুনয়ে তিনি এই জরা কোনও তরুণের দেহে সংক্রামিত করিয়া যযাতিকে যৌবন ভোগ করিবার ক্ষমতা দেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু এই জরা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল যৌবন ভোগ করিয়া তিনি পিতৃভক্ত পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া পুত্রের মর্যাদাসহ সিংহাসন দেন এবং স্বয়ং বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

যশোদা শব্দার্থে যশোদাত্রী। গোকুলবাসী নন্দগোপের পত্নী, শ্রীকৃষ্ণের পালয়িত্রী জননী। দেবকীর সাতটি পুত্র কংসের হাতে নিহত হওয়ার পর বসুদেব অষ্টম গর্ভজাত পুত্র কৃষ্ণকে যশোদার নিকটে রাখিয়া আসেন, এবং যশোদার সদ্যোজাত কন্যা যোগমায়াকে আনিয়া দেবকীর ক্রোড়ে দেন। দেবকীর সন্তানজ্ঞানে সেই কন্যাকে কংস হত্যা করিতে গেলে যোগমায়া অন্তর্ধান করেন ও বলিয়া যান—'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' যশোদার অপত্য-স্নেহ বাৎসল্যরসের পরাকাষ্ঠা হিসাবে পরিগণিত হয় এবং সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহা ভাবমাধুর্যের এক অতুলনীয় সম্পদ। বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্যরসের পদাবলীর মধ্যে যশোদার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ প্রায় সর্বত্র দেখা যায়।

যশোদার কথা দেবী ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, ভাগবত ১০ম স্কন্দ, লিঙ্গপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কথিত আছে যে, বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তাঁহার পত্নী ধরা ভগবানের দর্শনলাভের আশায় গন্ধমাদন পর্বতে কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান বলেনঃ 'জন্মান্তরে তোমরা হরির দর্শন পাইবে'।

যথাসময়ে বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ নন্দরূপে ও তাঁহার পত্নী ধরা যশোদারূপে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন।

অমলেন্দু ঘোষ

যশোধর্মন ঔলিকরবংশীয় মালবরাজ। সম্ভবতঃ গুপ্তদের সামন্তরাজ হিসাবে মালবেই শাসন শুরু করেন। বোধ হয় গুপ্ত সম্রাটের অধীনে 'অনমিত-মস্তক' মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া মালবে হূণ-শাসনের অবসান ঘটান। আনুমানিক ৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহগুপ্তকে উপেক্ষা করিয়া 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীন হন। মান্দাসোরের স্তম্ভগাত্রে যশোধর্মনের প্রশস্তিতে উৎকীর্ণ আছে, তিনি পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) পর্যন্ত ভূ-ভাগ এবং গুপ্ত ও হূণদের অনধিকৃত প্রদেশসমূহও জয় করেন। ইহা অতিশয়োক্তি। তবে তিনি উত্তর ভারতের বিস্তৃত ভূ-ভাগ সাময়িকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গুপ্তসম্রাটের সামন্ত মালবের 'পরবর্তী গুপ্তবংশ' ও মৌখরিদের উত্থানের ফলে তাঁহার পতন ঘটে।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

যশোবন্ত রাও হোলকার দ্র

যশোবন্ত সিংহ যোধপুরের (মারবাড়) মহারাজা, বিদ্যানুরাগী ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, মোগল সরকারের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি।

সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব হয় ইহাতে যশোবন্ত ধর্মাটের যুদ্ধে (১৬৫৮ খ্রী) মোগল সরকার ও যুবরাজ দারার পক্ষে এবং ঔরঙ্গজেবের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হন। পরে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দেন কিন্তু খাজোয়ার যুদ্ধের পূর্বে মিত্র পক্ষের শিবির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া অধীনস্থ ১৪০০০ রাজপুত সৈন্যসহ নিজের দেশে চলিয়া যান। পরে ঔরঙ্গজেবের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যমরুদে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

যশোবর্মন ৭০০ হইতে ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। বাক্‌পতিরাজ-বিরচিত 'গৌড়বহো' গ্রন্থে তাঁহার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, তিনি মগধরাজ (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত)-কে পরাজিত ও নিহত করিয়া বঙ্গরাজকে পরাস্ত করেন। একটি নালন্দা লিপি হইতে মগধে যশোবর্মনের প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ দেশ বিজয়ে তিনি বেশি সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই কারণ চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্য যে 'সকলোত্তরাপথনাথ'কে পরাজিত করিয়াছিলেন কালবিচারে তিনি যশোবর্মন বলিয়া খ্যাত হন। সম্ভবতঃ আরব ও তিব্বতীয়দের বিরুদ্ধে তিনি সমসাময়িক কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য

মুক্তাপীড়ের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়াছিলেন। চৈনিক ইতিহাসে বলা হইয়াছে যে, 'মধ্যভারতের রাজা' ই-শ-ফু-মো (=যশোবর্মন) তাহার মন্ত্রী পু-ত-সিন (বুদ্ধসেন)-কে চীনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে কাশ্মীররাজ কর্তৃক চীনে প্রেরিত দৌত্য হইতে বুঝা যায় যে, আরব ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য যশোবর্মন ও ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় একযোগে চীন-সম্রাটের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। পরবর্তী কালে ললিতাদিত্য কোনও অজ্ঞাত কারণে যশোবর্মনকে বন্দী করেন। যশোবর্মনের সভা 'মালতীমাধব', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ভবভূতি ও 'গৌড়বহো'র রচয়িতা বাক্‌পতিরাজ কর্তৃক অলংকৃত হয়।

অধীর চক্রবর্তী

যশোরাজ খান সম্ভবতঃ বাংলার সুলতান হুসেন শাহের (শাসনকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী) কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদ রসিক-জনের সমাদর লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে তিনিই প্রথম ব্রজবুলি পদ রচনা করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যশোহর বর্তমান বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গ) রাজসাহী বিভাগের একটি জেলা ও শহর। জেলাটির উত্তরে কুষ্ঠিয়া, দক্ষিণে খুলনা, পূর্বে ফরিদপুর ও পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ। জনসংখ্যা ২১৯০০০০ (১৯৬১ খ্রী) পলিমাটি গঠিত সমভূমি। জেলার নদী ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, কপোতাক্ষী প্রধান।

জেলার প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যঃ ধান, ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, ডাল ও পাট। জেলায় পাটকল, তৈলকল, চর্ম-শিল্প, হোসিয়ারী প্রভৃতি ১৩টি প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে।

কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড়, ঝুড়ি, গরুর গাড়ির চাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার ও লাক্ষার চুড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সদর শহর যশোহর ভৈরব নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল। শহরই জেলার প্রধান শিল্পস্থান। যশোহরে বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। সামরিক প্রয়োজনে সামরিক বিমানক্ষেত্রও প্রস্তুত হইয়াছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্য প্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি। কথিত আছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার গুরু বৈশাম্পয়নের সহিত মতভেদহেতু তাঁহার নিকট অধীত যজুর্বেদ বমন করেন, ফলে ঐ বেদবিদ্যা স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারাইয়া 'কৃষ্ণযজুর্বেদ' আখ্যা লাভ করে। পরে সূর্যের তপস্যা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্বেদের অধিকার লাভ করেন ও ইহার প্রথম প্রবক্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

বিদেহরাজ জনকের সভায় সমাগত ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে তিনি নিজেকে 'ব্রহ্মিষ্ঠ' বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার পত্নীদ্বয়ের অন্যতমা মৈত্রেয়ী তাহার নিকট হইতে পরা-বিদ্যার উত্তরাধিকার পান। আরণ্যক, যোগশাস্ত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্র-রচয়িতা হিসাবে যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ আছে। এই সকল শাস্ত্রের রচয়িতাকে অভিন্ন ব্যক্তি মনে করা নিতান্তই অসংগত।

সুব্রতা সেন

যাত্রা শব্দের রূঢ় অর্থ নির্বিঘ্নে দীর্ঘপথ অতিক্রম করা। বাংলা ভাষায় শব্দটির একটি বিশেষ যোগরূঢ় অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—উৎসব-পরিবেশে কোনও গ্রথিত কথাবস্তুর গীত-নৃত্য-সংলাপ সহযোগে অভিনয়। হাজার বছর আগে এ-দেশে দেবপূজা অথবা অন্যবিধ ধর্মানুষ্ঠানে শোভাযাত্রা হইত, তাহাই যাত্রা নাম পায়। সে শোভাযাত্রার মধ্যে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের স্থানও ছিল (যেমন ছিল জেলেপাড়ার সঙে)। পরে শোভাযাত্রার বাহিরে, মঙ্গল-পাঁচালীর মতো আসর করিয়া গাওয়া হইত। এই অর্থে 'যাত্রা' আমাদের দেশে তিন-চার শত বৎসর পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যাত্রাপালার কাহিনীর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল 'কৃষ্ণযাত্রা'। অন্যান্য দেবদেবী ও মহাপুরুষের চরিত্র লইয়া বিরচিত যাত্রা-পালাও ছিল। যাত্রাপালা-অভিনয়ে গোড়ার দিকে হাস্য-রসাত্মক দৃশ্য অভিনীত হইত। এই দৃশ্যে সমসাময়িক ঘটনা ও পাত্রপাত্রীও স্থান পাইত। ইহাকে বলিত 'সঙ'। ('সঙ' কথাটির আসল অর্থ 'স্বাঙ্গ', অর্থাৎ কোনও রকম সাজ-সজ্জা বা মুখোশ ইত্যাদি না পরিয়া স্বাভাবিক বেশ ধরিয়া অভিনয়)।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাংলায় বিলেতি ছাদের রঙ্গমঞ্চ পাতিয়া অভিনয়ের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে যাত্রার পালা গঠনে ও অভিনয়ে পরিবর্তন দেখা দিল এবং 'যাত্রা'র এখন হইতে নূতন নাম হইল 'গীতাভিনয়'। এই নূতন যাত্রার প্রবর্তনে দুই জন অধিকারীর নাম স্মরণীয়ঃ ব্রজমোহন রায় (১২৩৮-৮২ বঙ্গাব্দ) ও মতিলাল রায় (১৮৪৩-১৯১১ খ্রী)। পুরানো ধরনের কৃষ্ণযাত্রার শেষ দক্ষ অধিকারী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৪১-১৯১২ খ্রী)। 'নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়' দ্র।

সুকুমার সেন

যান্ত্রিক মস্তিষ্ক যন্ত্রগণক দ্র

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৫৩ খ্রী) তৈলচিত্র-শিল্পী। পিতা জ্যোতিঃপ্রকাশ কলিকাতার বড়-বাজারের গঙ্গোপাধ্যায়-পরিবারভুক্ত। কলিকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাশ্চাত্য চিত্রকলার আদর্শ ও রীতিকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিল্পকর্ম কলিকাতা, সিমলা ও বোম্বাই-এ বহু পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

কমল সরকার

যাযাবর বাস্তুহীন, গৃহহীন, অকৃষিকারী ভ্রাম্যমাণ নরসমাজ। উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ (অখন্ড) ভারতবর্ষে যাযাবর-সম্প্রদায় আছে। তাহারা মাঝে মাঝে বঙ্গদেশেও আসে। তাহাদের সাধারণতঃ ইরাণী (অর্থাৎ ইরাণ দেশের লোক) বলা হয়। পশ্চিম এশিয়ায় ও পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইওরোপে নানা স্থানে যাযাবর 'জাতি' আছে। ইংরেজীতে ইহাদের বলা হয় জিপ্‌সী। এই জাতি মূলতঃ ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বসবাস করিয়াছিল। তাহার পর যায় ইরাণে। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাণদেশে তাহাদের উপস্থিতির প্রমাণ মিলিয়াছে। সেখান হইতে তাহাদের এক ভাগ আর্মেনিয়া তুর্কি ও সিরিয়া হইয়া পূর্ব ইওরোপে যায়, আর এক ভাগ মিশর ও উত্তর আফ্রিকা হইয়া পশ্চিম ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ইওরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার সর্বত্র যাযাবরদের ভাষায় স্থানীয় ভাষার প্রভাব পড়িয়াছে, তৎসত্ত্বেও সে ভাষার মূল যে আর্যভাষা তাহা সুস্পষ্ট। এই কারণে এই যাযাবরদের ভাষা নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার একটি বিশিষ্ট শাখা বলিয়া পরিগণিত। ভারত-বর্ষ হইতে বিনির্গত মূল দলটি ছিল 'ডোম্ব' বা 'ডোম'জাতীয়। এই শব্দ হইতে উৎপন্ন 'রোম্' শব্দ যাযাবরদের ভাষায় বোঝায় পুরুষ মানুষ। তেমনই 'ডোম্বিনী' হইতে জাত 'রোম্‌নি' বোঝায় মেয়ে মানুষ।

সুকুমার সেন

যীশু খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক, খ্রীষ্টধর্মীদের দ্বারা প্রভু ('লর্ড') ও মুক্তিদাতা ('সেভিয়ার')-রূপে স্বীকৃত। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জেরুসালেমের নিকটবর্তী বেথ্‌লেহেমে জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ 'নবসন্ধি' ('নিউ টেস্টামেণ্ট')-তে তাঁহার জীবনী ও বাণী এবং প্রথম অনুগামী শিষ্যদের বিশ্বাস ও সাধনার বিষয়ে তথ্যাদি সংকলিত আছে।

যীশু জাতিতে ইহুদী ছিলেন। হিব্রু ভাষায় তাঁহার নাম যীহোশুয়া (অর্থাৎ ঈশ্বর-ই ত্রাণকর্তা বা মুক্তি-দাতা)। ইহুদীরা ঈশ্বর-প্রেরিত একজন মুক্তিদাতার আবির্ভাব বহুকাল ধরিয়া প্রত্যাশা করিতেছিল। যাঁহারা যীশুকে মসীহ (অভিষিক্ত) বলিয়া স্বীকার করিয়া বিশ্বের ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করিলেন তাঁহারাই খ্রীষ্টান নামে অভিহিত। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু ঈশ-মানব ('গড-ম্যান') অর্থাৎ গৃহীতদেহ স্বয়ং ভগবান্। ভগবান্ বলিয়া তিনি ঈশ্বর-পুত্র।

যীশুর জীবনের বেশির ভাগ গালিলেয়া প্রদেশের অন্তর্গত নাজারেথে অতিবাহিত হয়। যীশুর মা মারীয়ার ('মেরী' দ্র) স্বামী যোসেফ গ্রাম্য সূত্রধর ছিলেন। যীশুও ছুতার মিস্ত্রির কাজ করিতেন। পরে বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। ২৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিক্ হইতে ৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গালিলেয়া ও যুদেয়ার স্থানে স্থানে এবং জেরুসালেমে ইহুদী জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করিলেন যে, প্রতিশ্রুত 'স্বর্গীয় রাজ্য' (কিংডম্ অভ্ হেভেন')-এর প্রতিষ্ঠা আসন্ন। সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নবজীবন লাভ করিতে তিনি কেবলমাত্র ইহুদীদের নয়, সকল মানুষকেই আহ্বান জানাইলেন। তাঁহার বাণী হইল—ভগবান্‌ই সকল মানুষের পিতা, পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল; তাঁহার সেবা করিতে হইলে মানুষেরই সেবায় আত্ম-নিয়োগ করা বিশ্বাসী ভক্তের কর্তব্য; অহংকার, হিংসা, ভোগস্পৃহা দমন করিয়া শিশুসুলভ সারল্য ও পবিত্রতা অবলম্বনে পরম পিতার উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে; মানুষকে সর্বপ্রকার লৌকিক মনোভাব ও স্বার্থপর সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া ঐশ আত্মা ('হোলি স্পিরিট')-র প্রেরণায় চালিত হইতে হইবে। এই বাণী শ্রবণ করিয়া অনেক ইহুদী যীশুকে খ্রীষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তখনকার ইহুদী-সমাজের প্রতিপত্তিশীল যাজক-সম্প্রদায় ও অতিরক্ষণশীল ফারিসি-সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ যীশুর এই বাণী গ্রহণ করিতে নারাজ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বিদেশী শাসনকর্তার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। ইহুদী জনসাধারণও যীশু-প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম-রাজ্যের বাণী উপলব্ধি করিতে পারিল না। ফলে শত্রুকে ক্ষমা করিয়া এবং বিশ্বমানব-জাতির পরিত্রাণ উদ্দেশ্যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া জেরুসালেমের প্রান্তে কাল্‌ভারি নামক স্থানে তাঁহাকে ক্রুশবদ্ধ হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্যে মৃত্যু বরণ করিতে হয় (শুক্রবার, ৭ এপ্রিল, ৩০ খ্রী)। নিকটবর্তী এক উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করা হয়। পরবর্তী রবিবার প্রত্যূষে যীশু মৃত্যুকে জয় করিয়া পুনরুত্থান করিলেন এবং বার বার তাঁহার শিষ্যদের দর্শন দিয়া চল্লিশ দিন পরে সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

পিয়ের ফালোঁ এস. জে.

যুগ কালবাচক শব্দ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি-কল্পিত চারি যুগে সমগ্র কালকে বিভক্ত করা হইয়াছে। অথর্ববেদ, ঋগ্বেদ, মহাভারত ইত্যাদিতেও যুগ শব্দটি কালবাচক। ঋগ্বেদে যুগ অর্থে কোথাও ১ বৎসর বা আরও কম। বেদাঙ্গজ্যোতিষ ও বৃহৎসংহিতা মতে এই কালপরিমাণ ৫ বৎসর। অথর্ববেদে যুগের কালপরিমাণ অন্তত দশ হাজার বৎসর। ঋগ্বেদে কল্পিত সত্যাদি যুগচতুষ্টয়ের আদর্শ পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে গৃহীত হইয়াছে।

অমলেন্দু ঘোষ

যুগান্তর দল বিপ্লব আন্দোলন দ্র

যুধিষ্ঠির চন্দ্রবংশীয় নৃপতি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দুর্বাসা-প্রদত্ত মন্ত্রপ্রয়োগে ধর্মসংসর্গে কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। লক্ষ্যভেদদ্বারা অর্জুন দ্রৌপদী লাভ করিলে কুন্তীর আদেশে অন্য ভ্রাতাদের সহিত দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। ঈর্ষান্বিত দুর্যোধন তাঁহাকে দুইবার অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করেন। প্রথমবার পরাজয়ের পর ধৃতরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে কোনও ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু দ্বিতীয়বারের পরাজয়ের ফলে দ্রৌপদী ও ভ্রাতাদের সহিত দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও বিরাট রাজ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হয়। অজ্ঞাতবাসের পর দুর্যোধনের নিকট পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর হয়। যুদ্ধে তিনি কেবল শল্যকে বধ করেন। 'অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ' এই মিথ্যা উক্তিতে দ্রোণাচার্যের মৃত্যু ঘটায় তাঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয়। যুদ্ধজনিত পাপক্ষালনের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে স্বর্গে উপস্থিত হন।

দ্রৌপদীর গর্ভে জাত প্রতিবিন্ধ্য ও দেবিকার গর্ভে জাত যৌধেয় নামে যুধিষ্ঠিরের দুই পুত্র। ধর্মরূপী যক্ষের সহিত আলোচনা যুধিষ্ঠিরের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক।

যূথিকা ঘোষ

যোগ যোগ ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম। সাংখ্য-দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত যোগের সম্বন্ধ থাকায় যোগদর্শনে কপিলের সাংখ্যযোগের প্রাধান্য। এই সনাতন যোগের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট। শাস্ত্রে ইহা অনাদি বলিয়া প্রখ্যাত।

পতঞ্জল যোগদর্শন যোগের বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ্, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যোগের বিশদ আলোচনা আছে।

যোগশাস্ত্র, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। যোগের অষ্টাঙ্গ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম্, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সমাধি যোগের পূর্ণাবস্থা।

যোগের প্রকৃত অর্থ জীবাত্মার সজ্ঞানে পরমাত্মার সহিত যুক্ত হওয়া। সাধন ও প্রক্রিয়াভেদে যোগের বিভিন্ন বিভাগ করা হইয়াছে। যথা, রাজযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ ও লয়যোগ। অথবা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

যোগের উদ্দেশ্য প্রকৃত 'স্বরূপদর্শন', এবং মনের ও চিত্তের লয়দ্বারা বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের যে আসক্তি ও বন্ধন তাহা ছিন্ন করিয়া পূর্ণ চৈতন্য বোধ ও সেই চৈতন্যে স্থিতি।

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

যোগবাশিষ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম সুবিদিত দার্শনিক গ্রন্থ। মহাজ্ঞানী দেবর্ষি বশিষ্ঠ অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকে ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়স্বরূপ শান্তিসম্বন্ধীয় যোগোপদেশ প্রদান করেন। তাহাই এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দুরূহ অধ্যাত্মতত্ত্বের যুক্তি-পূর্ণ বিচার ও বিশ্লেষণসমন্বিত এই গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈরাগ্য, মুমুক্ষা, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্বাণ নামে ছয়টি প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। নির্বাণ প্রকরণটি পূর্বভাগ ও উত্তরভাগে দ্বিধাবিভক্ত রহিয়াছে। গ্রন্থটি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের উত্তরভাগ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। বাশিষ্ঠ রামায়ণ নামে ইহা তত্ত্বজ্ঞানার্থীর নিকট সুপরিচিত। এই গ্রন্থের টীকাকারগণের মধ্যে অন্বয়ারণ্য, মাধব সরস্বতী, গঙ্গাবরেন্দ্র সরস্বতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যূথিকা ঘোষ

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রী) জন্মস্থান চব্বিশ পরগনা জেলার নিতাড়া গ্রাম। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষকতা শুরু করেন। দেওঘর ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্য করিবার সময়ে রাজনারায়ণ বসুর সান্নিধ্যে আসেন, তাঁহারই উৎসাহে সাহিত্য-সাধনায় মন দেন। বাংলাসাহিত্যে জীবন-চরিতকার হিসাবে যোগীন্দ্রনাথ সুপরিচিত। সাপ্তাহিক 'সুরভি' (১২৮৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'অমরকীর্তি অথবা ফাদার-দামিয়েনের জীবন-চরিত' (১২৯৭ বঙ্গাব্দ), 'মাইকেল

মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত' (১৩০০ বঙ্গাব্দ), 'অহল্যাবাঈ' (১৩০২ বঙ্গাব্দ), 'তুকারাম-চরিত' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অধীর দে

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭ খ্রী) প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক। বাংলা ভাষায় যোগীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উদ্ভট ছড়া রচনা করেন। 'খুকুমণির ছড়া' (১৮৯৯ খ্রী) যোগীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছড়া সংকলন। 'জ্ঞানমুকুল' (১৮৯০ খ্রী), 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১ খ্রী), 'ছবি ও গল্প' (১৮৯২ খ্রী), 'রাঙাছবি' (১৮৯৬ খ্রী), 'হাসিখুসি-১ম' (১৮৯৭ খ্রী), 'হাসিরাশি' (১৮৯৯ খ্রী) প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত ছড়া-গ্রন্থ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্রকৃতিপরিচয়-জ্ঞাপক 'পশুপক্ষী' (১৯১১ খ্রী) ও 'বনেজঙ্গলে' (১৯২৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

রজত রায়চৌধুরী

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫ খ্রী) সাংবাদিক-সাহিত্যিক। বর্ধমান জেলার ইলসবাগ্রামে জন্ম। পিতা মাধবচন্দ্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৮৭২ খ্রী) হইবার পরে এলাহাবাদে আইন শিক্ষা করেন।

চুঁচুড়ায় 'সাধারণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক-রূপে তাঁহার প্রথম আত্মপ্রকাশ ও পরে বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠা (১৮৮১ খ্রী)। হিন্দী 'বঙ্গবাসী', বাংলা 'দৈনিক' ও ইংরেজী সান্ধ্য দৈনিক 'টেলিগ্রাফ' ও মাসিকপত্র 'জন্মভূমি' তাঁহারই উদ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত হয়। বাংলার প্রাচীনসাহিত্য ও বঙ্গানুবাদসহ শাস্ত্রগ্রন্থাদির সুলভমূল্যে প্রচার তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। বেনামে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা : 'মডেল ভগিনী', ৪ ভাগ (১২৯৩-৯৫ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালী-চরিত', ৩ ভাগ (১২৯২-৯৩ বঙ্গাব্দ), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৮৬ খ্রী), 'মহীরাবণের আত্মকথা' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), 'কালাচাঁদ' (১৮৮৯-৯০ খ্রী), 'কৌতুককণা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ), 'নেড়া হরিদাস' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী', ৬ ভাগ (প্রথম তিন ভাগ ১৯০২ খ্রী)।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪ খ্রী) সুবিখ্যাত জীবনীকার ও দেশপ্রেমিক। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই নদিয়া জেলার শিমহাট গ্রামে জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন ও এম. এ. পাশ করিয়া (১৮৭২ খ্রী) শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হন। ক্যাথিড্রাল্ মিশন কলেজে কিছুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপক, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ ও ডেপুটি কালেক্টর।

রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ), 'ম্যাট্সিনির ইতিবৃত্ত' (১২৮৬ বঙ্গাব্দ), 'সমালোচনা-মালা' (১২৯২ বঙ্গাব্দ), 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' (১৮৯০ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখ্য। 'আর্যদর্শন' (১২৮১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বঙ্গরঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার। প্রথম জীবনে স্কুলের শিক্ষক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে কিছুদিন অভিনয় করেন। পরে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নট ও নাট্যকাররূপে শিশির-কুমারের সহিত যোগদান করেন। তাঁহার রচিত 'সীতা' নাটক লইয়াই শিশিরকুমার মনোমোহন নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। নাট্যকার এবং অভিনেতারূপে বঙ্গদেশের রঙ্গালয়ের সহিত যুক্ত ছিলেন। বহু পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে 'সীতা' (১৯২৪ খ্রী) 'দিগ্বিজয়ী' (১৯২৮ খ্রী), 'বিষ্ণুপ্রিয়া' (১৯৩১ খ্রী), 'মহানিশা' (১৯৩৩ খ্রী), 'পতিব্রতা' (১৯৩৪ খ্রী), 'বাংলার মেয়ে' (১৯৩৪ খ্রী), 'মাকড়সার জাল' (১৯৩৯ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধকুমার দাস

যোগেশচন্দ্র বাগল (১৯০৩-৭২ খ্রী) প্রখ্যাত সাহিত্য-সাধক ও ইতিহাস গবেষক। বরিশালের কুমিরমোড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা জগবন্ধু বাগল। কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়ু', 'দেশ', এবং 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করেন।

পুরাতন সরকারি নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন সাময়িকপত্র, প্রাচীন প্রতিষ্ঠানের দুর্লভ কার্যবিবরণ প্রভৃতি নানা মূল উপাদান হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যোগেশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু সুধীজনের জীবনকথা ও নানা প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংকলন করেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনীষী-জীবনী প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার প্রায় ২০০ প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৩৪৮), 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' (১৩৫৫), 'সংকল্প ও সাধনা' (১৩৫৬) প্রভৃতি।

দেবজ্যোতি দাশ

যোগেশচন্দ্র রায় (১৮৫৯-১৯৫৬ খ্রী) বহুতত্ত্ববিদ্ ও পণ্ডিত। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০ অক্টোবর হুগলি জেলার দিগ্‌ড়া গ্রামে জন্ম। বর্ধমানের মহারাজার বিদ্যালয় হইতে বৃত্তিসমেত এন্‌ট্রান্স্ (১৮৭৮ খ্রী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন (১৮৭৮-৮৩ খ্রী)। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদ্-বিদ্যায় এম. এ. পাশ করিয়া কটক র‍্যাভেন শ কলেজে উপাধ্যায়রূপে যোগদান করেন। পুরীর পাণ্ডিতসভা কর্তৃক বিদ্যানিধি (১৯১০ খ্রী) এবং মৃত্যুর অব্যবহিত-পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট্. (১৭ এপ্রিল ১৯৫৬ খ্রী) উপাধিতে ভূষিত হন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিভিন্ন সম্মানিত পদ অলংকৃত করেন।

তাঁহার সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১ম-৪র্থ খণ্ড), 'সিদ্ধান্তদর্পণ' (১৮৯৯ খ্রী), 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' (১৯০৩ খ্রী), 'বাংলা ভাষা' (১৩১৫-২২ বঙ্গাব্দ), 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) ও 'Ancient Indian Life' (১৯৪৮ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

যোধপুর রাজস্থানের একটি জেলা ও শহর। রাজস্থানের এই দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরটি দিল্লী হইতে ৬২৫ কিলোমিটার। ভারতীয় মরুভূমির ঠিক পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত। শহরের উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে গিরিশ্রেণী, শহরের অন্যান্য দিক্ মরুভূমির দ্বারা বেষ্টিত।

জলবায়ু শুষ্ক, গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩৫° সে. ও ১৭° সে.। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩২৫ মিলিমিটার।

রাও যোধা রাঠোর ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গিরিশ্রেণীর উপর দুর্গ নির্মাণ করিয়া ইহার দক্ষিণে অর্ধ-বৃত্তাকারে প্রাচীর নির্মাণ করেন। প্রাচীরের অভ্যন্তরে গড়িয়া ওঠে যোধপুর শহর। ইহাই যোধপুর সিটি, পুরাতন যোধপুর। ইহার বাহিরে গড়িয়া উঠিয়াছে আধুনিক শহর। অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র, ভারতীয় বিমান বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম কেন্দ্র, রাজস্থান হাইকোর্টের কেন্দ্র, যোধপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়, মরু গবেষণার কেন্দ্র, দেশরক্ষা বৈজ্ঞানিক সংগঠনের গবেষণাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিই যোধ-পুরের উন্নতির ও বিকাশের মূল কারণ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া যোধপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যাল কলেজ উল্লেখযোগ্য।

যোধপুরের চপ্পল, উটের চামড়ার ব্যাগ, বাদলা, চুনরির শাড়ি, পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। এখান-কার শ্বেতপাথরের তৈজসপত্র উল্লেখযোগ্য।

আরাবল্লীর পাদদেশে জওয়াই নদে বাঁধ দিয়া যোধপুরে জল সরবরাহ হয়।

দ্রষ্টব্যের মধ্যে কেল্লা, রাজপ্রাসাদ, উমেদভবন, বাল-সামন্দ-এর হ্রদ ও প্রাসাদ, কইলানা হ্রদ, ঘণ্টাঘর, গুলাব-সাগর, মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মীনা সেন

যোশীমঠ বা জ্যোতির্মঠ শঙ্করাচার্য কর্তৃক স্থাপিত চারটি মঠের অন্যতম। হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ; উত্তর প্রদেশের গাড়োয়াল জেলার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। উচ্চতা ৬,১৫০ ফিট। হৃষীকেশ হইতে দূরত্ব ২৫২ কি. মি.। বদ্রীনাথ হইতে ৩১ কি. মি.। ইহা অলকনন্দা ও বিষ্ণুপ্রয়াগের ১,৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে বাজার, হোটেল, ডাক ও তারঘর, বেতারকেন্দ্র, দাতব্যচিকিৎসালয়, ধর্মশালা প্রভৃতি আছে। ইহার উত্তরে তিব্বত সীমান্ত।

এই স্থানটি বদ্রীনাথের শীতাবাস। কালীপূজার পরই তুষারপাতের জন্য বদ্রীনাথের মূল মন্দির বন্ধ হইয়া যায়। তখন প্রধান পূজারী রাওল ও অন্যান্য পাণ্ডাগণ এইখানে আসিয়া দেবতার উদ্দেশে পূজা দেন।

মঠের বক্রাকার পর্বতের নিচে সমতলভূমিতে মন্দির। মঠটি দ্বিতল, টানা বারান্দা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ আছে। একটিতে তাকিয়া হেলানো শঙ্করাচার্যের গদি, কিছু দূরে চতুর্ভুজ মূর্তি। নৃসিংহদেবসহ আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, একটিতে শিব ও পার্বতীকে কিরাত বেশে দেখা যায়।

বদ্রীনাথ বৎসরে ৭।৮ মাস তুষারাবৃত থাকে বলিয়া উহার কিছু দক্ষিণে এই মঠ স্থাপিত হয়। এখানে বহু পুঁথি আছে। কালক্রমে ইহা 'রাওল'দের নিকট বিক্রীত হয়। বর্তমানে ভারত সরকার ইহার ও কেদারনাথের মন্দিরগুলি দেখাশোনার জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া দিয়াছেন।

কমলা মুখোপাধ্যায়

যৌথ কোম্পানি একধরনের বহুমালিকানা-বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। মূলধন সংগ্রহ এবং সংগঠন-পরি-চালন বিষয়ে সুবিধাজনক বলিয়া বৃহদাকার ব্যবসায়-ক্ষেত্রে কোম্পানি-ব্যবস্থা প্রচলিত, ছোট ব্যবসায়েও কোম্পানি-ব্যবস্থা বিরল নহে। ব্রিটিশ ধারণায় কোম্পানি এবং যৌথ কোম্পানি একই ব্যবস্থা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যৌথ কোম্পানিকে কোম্পানি হইতে ভিন্ন-

তর বলিয়া ধরা হয়। ইহাকে অংশীদারী ব্যবস্থা এবং কোম্পানি-ব্যবস্থার মধ্যবর্তী বলা যাইতে পারে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় কয়েকটি সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্যতম সুবিধা হইতেছে সীমাবদ্ধ দায়। ইহা ছাড়া, স্থায়িত্ব, মালিকানার অংশ হস্তান্তরের সুবিধা, মূলধন-সংগঠন, পরিচালন-নীতির ব্যাপারে ঐক্য, দক্ষ পরিচালন, উন্নতির সম্ভাবনা, জনগণের আস্থা, সামাজিক লাভ ও করসংক্রান্ত ব্যাপারে সুবিধা যৌথ কোম্পানির আছে। যৌথ কোম্পানির অসুবিধাও কিছু আছে। সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া নিয়মের কড়াকড়ি, ক্ষেত্রবিশেষে স্বৈরাচারী ও মমত্ববোধহীন পরিচালন, সংখ্যালঘুদের অবহেলা, জালিয়াতির সম্ভাবনা ইত্যাদি অসুবিধা যৌথ কোম্পানির আছে।

সংগঠকগণ প্রচারের মাধ্যমে উদ্দেশ্য বর্ণনা ও শেয়ার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগৃহীত হয়। যৌথ কোম্পানির মূলধনের তিনটি ভাগ আছেঃ বরাদ্দীকৃত, সংগৃহীত এবং আদায়ীকৃত। গণতান্ত্রিক উপায়ে শেয়ারহোল্ডারগণ পরিচালকবর্গ নির্বাচিত করেন। শেয়ার-এরও প্রেফারেন্শিয়ল, অর্ডিনারী প্রভৃতি ভাগ আছে।

লাভ হইতে কোম্পানির দায়দায়িত্ব মিটাইয়া শেয়ারের শ্রেণী অনুযায়ী লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানির ইতিহাস ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গেই আরম্ভ হয়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে যৌথ কোম্পানি-বিষয়ক আইন পাশ হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সীমাবদ্ধ-দায়ের প্রচলন হয়। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানি আইনে যৌথ কোম্পানির স্থলে কোম্পানি কথাটি চালু হইয়াছে।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়

যৌনব্যাধি যে সমস্ত রোগ প্রধানতঃ যৌনসংসর্গদ্বারা সংক্রামিত হয় তাহাদের যৌনরোগ বলা হয়, যথা—গনোরিয়া (প্রমেহ), সিফিলিস্ ইত্যাদি। নাইসেরিয়া গনোরিয়া নামক জীবাণুদ্বারা সংক্রমণ গনোরিয়ার কারণ। পুরুষ ও রমণী উভয়েরই মূত্রনালী ও জননেন্দ্রিয় আক্রান্ত হইতে পারে, তবে শারীরিক গঠন ও আকারের বৈচিত্র্যহেতু সাধারণতঃ পুরুষের পক্ষেই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গনোরিয়ার অস্তিত্ব-নির্ণয় বিশেষ আয়াসসাধ্য। স্ত্রীলোককে রোগবাহিকা হিসাবে ভয়ংকরী বলা যায়।

ট্রেপোনেমা প্যালাইডা নামক জীবাণু যৌনসংগমকালে শরীরে প্রবেশ করায় সিফিলিসের আক্রমণ হয়। সংক্রমণ-স্থলে ফুস্কুড়ি ও পরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পুরাতন রোগে দূষিত ক্ষত দেখা দেয়—অস্থিতে, নাসিকায় বা তালুতে। কাহারও মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হইয়া জড়ত্ব, পঙ্গুতা আনয়ন করে, কাহাকেও বা চলচ্ছক্তিরহিত বা অন্ধ করিয়া দেয়। বিভিন্ন লক্ষণ, উপসর্গ, রক্তপরীক্ষা ইত্যাদিতে রোগ ধরা পড়ে। মাতার গর্ভাবস্থায় এই রোগ ভ্রূণে সংক্রমিত হইতে পারে এবং গর্ভপাত, মৃতবৎস প্রসব বা রোগগ্রস্ত শিশুর জন্ম হইতে পারে।

যৌনব্যাধি এখন দুরারোগ্য নহে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশে প্রায় সকল সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে, গোপনে যৌনরোগ নির্ণয়ের ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সৌরীন ঘোষ

য়াকোবি, কার্ল গুস্তাভ (১৮০৪-৫১ খ্রী) জার্মান অংকশাস্ত্রজ্ঞ। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন (১৮২৫ খ্রী)। পদার্থবিজ্ঞানী ও অংকশাস্ত্রজ্ঞ গাউসকে তিনি একখানি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পত্র লেখেন। ঐ পত্রে 'থিওরি অভ্ নাম্বারস্' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ছিল। অতঃপর য়াকোবি রাতারাতি বিখ্যাত হইয়া যান। ১৮২৭ হইতে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনিগ্‌স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অংকশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। অংকশাস্ত্রে তাঁহার আবিষ্কার অসংখ্য। 'থিওরি অভ্ ইলিপ্‌টিক্ ফাংশন্‌স' এবং 'থিওরি অভ্ লস্ট মাল্‌টিপ্লায়ার'-এর প্রবর্তক। ঘূর্ণমান তরলপদার্থের অবস্থা সংক্রান্ত তত্ত্ব উপস্থিত করিয়া তিনি দেখান যে, সংশিলষ্ট 'ইলিপ্‌সয়েড'গুলি 'ফিগার্‌স অভ্ ইকুইলিব্রিয়াম' হইবে। এগুলি এখন 'য়াকোবির ইলিপ্‌সয়েড্' নামে খ্যাত। 'ডিটারমিনেণ্ট'-তত্ত্বেরও তিনি অন্যতম আবিষ্কারক। তাঁহার আবিষ্কৃত এক বিশেষ 'ডিটারমিনেণ্ট' 'য়াকোবিয়ান' নামে পরিচিত।

অমিতাভ সেন

য়েট্‌স, উইলিয়াম বাটলার (১৮৬৫-১৯৩৯ খ্রী) ইংরেজ (আইরিশ) কবি ও নাট্যকার, আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম আয়ার্ল্যান্ডের ডাব্‌লিন শহরে; সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্ব শুরু লন্ডনে। তেতাল্লিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই প্রচুর কবিখ্যাতি অর্জন করেন। ইহার মধ্যে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার যুগ শুরু হয় আরও পরে। প্রথমে কেল্টিক উপকথা ও রূপকথার রোমাণ্টিক কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার কবিমানসকে আধুনিকতার

অভিমুখীন করিয়া তোলার মূলে ছিল এজরা পাউন্ড-এর প্রভাব। তাঁহার কাব্যে তৎকালীন ইমেজিস্ট সম্প্রদায়ের প্রভাবই সুস্পষ্ট। Abbey Theatre (১৮৯৪ খ্রী)-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং কয়েকখানি নাটক রচনা করেন।

অস্‌ওয়াল্ড স্পেঙ্গলারের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Decline of the West' তাঁহাকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। ফলে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময়ে তাঁহার চিন্তাধারা হিন্দুধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন প্রভাবের আবর্তে পড়িলেও বিবিধ রচনায় তাঁহার নিজস্ব জীবনদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত। 'Leda and the Swan' (১৯২৪ খ্রী), 'The Second Coming' (১৯২০ খ্রী), 'Sailing to Byzantium' (১৯২৮ খ্রী), 'Byzantium' (১৯৩২ খ্রী) কবিতাগুলি প্রকাশিত হইলে সুনাম ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার কাব্যচিন্তায় এক পরিবর্তন আসে। নূতন অনুভূতির বৈচিত্র্য তাঁহার কাব্যজীবনের শেষ পর্যায়ে প্রতিফলিত হয়। প্রবীণ য়েট্‌স এইসময় ইংল্যান্ডের নবীন কবিগোষ্ঠীর সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া এক নবতর শৈলীতে কাব্য-রচনায় ব্রতী হন। 'Crazy Jane' (১৯৩০ খ্রী) কবিতাগুচ্ছই তাঁহার নবোন্মেষিত কাব্যভাবনার পরিচায়ক। তাঁহার কাব্যে আধুনিক মানসের রহস্যময় বিচিত্রতা সার্থকরূপে প্রতিভাত। এক সময় য়েট্‌সের সহিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

রংপুর জেলাটি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। ইহার উত্তরে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহার, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে বগুড়া ও পশ্চিমে দিনাজপুর জেলা। রংপুর জেলায় রংপুর সদর, নীলফামারি, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম—এই ৪টি মহকুমা। অধুনা রংপুর বাংলাদেশের (পূর্ব বাংলা) অন্তর্ভুক্ত। জেলার মধ্যে কতকগুলি পাটকেন্দ্র আছে। এই জেলায় অনেক পুরাতন মন্দির ও মসজিদ আছে এবং নানা স্থানে পর্ব-বিশেষে মেলা বসে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রকেট বর্তমান যুগে মহাকাশে প্রত্যক্ষ গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে রকেট (Rocket)। 'হাউই' বাজি আধুনিককালে সৃষ্ট রকেটের সরলতম রূপ। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে জার্মানীর আবিষ্কৃত ভি-২ রকেট হইতে ইহার আরম্ভ। ইণ্টার-কণ্টিনেণ্ট্যাল ব্যালিস্টিক মিসিল ইহারই উন্নততর রূপ। এক মহাদেশ হইতে উৎক্ষিপ্ত এই রকেট আকাশে অধিবৃত্তাকার পথে চলিয়া অপর মহাদেশে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর উপরে নির্ভুলভাবে আঘাত করে ও আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। রকেট পরি-চালনার জন্য সাধারণতঃ কঠিন ও তরল দুই জাতীয় জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। সেকেণ্ডে ৪.৯ মাইল গতিবেগ পাইলে রকেট বৃত্তাকার পথে এবং সেকেণ্ডে ৭ মাইল গতিবেগ পাইলে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চতুর্দিক ঘুরে। এই পরিক্রমণশীল রকেটই মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহ।

সেকেণ্ডে ৭ মাইল অপেক্ষা অধিকতর গতিবেগ থাকিলে রকেটের গতিপথ পরাবৃত্তাকার হয়; এরূপ গতিবেগ-সমন্বিত রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব-মুক্ত। সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হইতে গ্রহান্তরে যাওয়ার পক্ষে এই গতিবেগই বাঞ্ছনীয়। সূর্যের আকর্ষণকে জয় করিয়া মহাশূন্যের পথে অগ্রসর হইবার জন্য রকেটের গতিবেগ সেকেণ্ডে ১০ মাইলের অধিক হওয়া প্রয়োজন। সৌর আকর্ষণমুক্ত রকেটই প্রকৃত মহাকাশ-যান। ইহারই সাহায্যে আজ চন্দ্রে অভিযান চলিতেছে। কৃত্রিম উপ-গ্রহের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বে এবং চন্দ্রে প্রত্যক্ষ গবেষণাও আরম্ভ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ রায়

রক্ত শরীরের কোষগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহ করা রক্তের কাজ। হৃদ্‌যন্ত্র রক্তকে অসংখ্য নালীপথে চালিত করে। শ্বাসযন্ত্র রক্তকে অক্সিজেন সরবরাহ করে। খাদ্য পরিপাক হইবার পর রক্তই ঐ খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে। দেহের অপ্রয়োজনীয় জিনিস রক্তের মাধ্যমেই বাহিরে যায়। শরীরে আগত নানারকম বিষ নিষ্ক্রিয় করিবার শক্তি রক্তের আছে।

রক্তে সাধারণতঃ শতকরা ৫৫ ভাগ জলীয় অংশ ('প্লাজ্‌মা') ও কোষের ভাগ ৪৫। কোষ তিন প্রকার—লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা ('প্লেট-লেট্‌স')। পুরুষদের প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫,০০০,০০০ লোহিত কণিকা ও মহিলাদের ৪,৫০০,০০০ থাকে। এই কণিকাগুলির মধ্যে হিমো-গ্লোবিন থাকে যাহার জন্য রক্ত লাল দেখায়। লোহিত কণিকার আয়ু ১২০ দিন। দেহে অনবরত এই কণিকা তৈয়ারি হইতে থাকে। অস্থির মজ্জায় ইহাদের নির্মাণ-কার্য চলে। রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা কমিয়া গেলে রক্তাল্পতা ('এনিমিয়া') হয়।

প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৬ হাজার হইতে ৮ হাজার শ্বেতকণিকা থাকে। শ্বেতকণিকা পাঁচ প্রকারঃ

নিউট্রোফিল, ইয়োসিনোফিল, বেসোফিল, লিমফোসাইট ও মনোসাইট।

চণ্ডীচরণ দেব

রক্ত আমাশয় অন্ত্রের প্রদাহজনিত রোগ। রোগীর একাধিকবার তরল দাস্ত হয়, তলপেটে যন্ত্রণা হয়, দেহতাপ বৃদ্ধি পায়, মলের সহিত রক্ত ও আম পড়ে এবং অত্যধিক রক্তক্ষরণের জন্য দুর্বলতা এবং রক্তাল্পতা হয়। কোনও কোনও রোগীর পেটে সামান্য যন্ত্রণা ব্যতীত আর কোনও লক্ষণ নাও থাকিতে পারে। মলের সহিত অ্যামিবা বা অন্য জীবাণু ('ব্যাসিলাস') পাওয়া যায়। অধুনা এই রোগের বহু ভাল ভাল ঔষধ বাহির হইয়াছে।

কমলকুমার মল্লিক

রক্তচাপ ('ব্লাড প্রেশার') হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত ছোট ব্যাসবিশিষ্ট নালী-প্রণালীতে সজোরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া রক্তবাহে যে চাপ সৃষ্টি করে তাহাতেই রক্ত প্রবাহিত হয়। ধমনীর গাত্রে ইহা যে চাপের সৃষ্টি করে তাহাকে রক্তচাপ বলে।

হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন, উপধমনী ও জালক-নালীর উপরি-উক্ত শক্তি এবং রক্তের পরিমাণ ও 'ঘনত্বের' উপর এই চাপ নির্ভর করে। হৃৎপিণ্ড হইতে দূরত্ব ও রক্তবাহের বিস্তৃতির ফলে রক্তের চাপ কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অনুসারে রক্তচাপের তারতম্য হয়। রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের সংকোচনে বৃদ্ধি পায় ('সিসটলিক') এবং প্রসারণে কমিয়া যায় ('ডায়োস্টলিক')। পরিণত বয়সে এই চাপ যথাক্রমে ১১০-১২০ এবং ৮৫-৯৫ মি. মি. পারদ। ইহাদের স্বাভাবিক তফাত ('পাল্‌স প্রেশার') ৩৫-৪৫ মি. মি. পারদ। বয়সের সঙ্গে রক্তচাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং একই পরিণত বয়সে স্ত্রীলোকের রক্তচাপ কিছুটা বেশি।

রক্তচাপ স্নায়বিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত হয় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত-প্রবাহের প্রয়োজন অনুসারে তারতম্য ঘটায়। এই নিয়ন্ত্রণে ব্যাঘাত ঘটিলে শরীরের রক্তচাপ স্বাভাবিক মাত্রা হইতে কম বা বেশি হইতে পারে; এবং এই অবস্থাকে রোগ বলিয়া গণ্য করা হয়। কম চাপে রক্তপ্রবাহের ঘাটতি হইলে শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক বিমর্ষতার কারণ হইতে পারে এবং অধিক চাপে রক্তনালী ছিন্ন হইয়া রোগীর মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। ইহা ছাড়া অধিক বয়সে রক্তচাপজনিত রোগে করোনারি থ্রম্বোসিস্‌ হইবার আশঙ্কা থাকে।

সুখময় লাহিড়ী

রক্তবাহ ('ব্লাড ভেসেল্‌স') দেহের রক্ত চলাচলের নালী-প্রণালীগুলিকে রক্তবাহ বলে। যে সকল রক্তবাহ রক্তকে হৃৎপিণ্ড হইতে কলায় লইয়া যায় তাহাদের ধমনী ও যাহারা কলা হইতে হৃৎপিণ্ডে রক্তকে ফিরাইয়া আনে তাহাদের শিরা বলে। ধমনী ও শিরার সংযোগকারী সূক্ষ্মপ্রণালীগুলিকে ক্যাপিলারি বলে। ক্যাপিলারির রক্ত হইতে বিভিন্ন সামগ্রী সহজেই কলাকোষে যায়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের চাপে ধমনীতে রক্ত একই দিকে প্রবাহিত হয়। শিরায় সেই চাপ তেমন নাই; অধিকাংশ শিরার মধ্যে নিয়মিত দূরত্বে ভাল্‌ভ্‌ থাকে, তাহারাই রক্তকে বরাবর একই দিকে চলিতে দেয়।

নার্ভগুলি রক্তবাহের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটায়।

সুখময় লাহিড়ী

রক্তবীজ চণ্ডী দ্র

রক্তসংবহনতন্ত্র ('সার্কুলেশন') হৃৎপিণ্ড ('হার্ট'), ধমনী ('আর্টারি'), শিরা ('ভেন'), লসিকানালী ('লিম্প ভেসেল্‌স') প্রভৃতি লইয়া সংবহনতন্ত্র গঠিত। দেহের কোষতন্তুগুলিতে ('টিস্যু সেল্‌স') অম্লজান ও খাদ্যবস্তু পৌঁছাইয়া দেওয়া, অঙ্গারজান প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে দেহ হইতে নিষ্কাশনের জন্য ফুসফুস ও কিড্‌নিতে লইয়া যাওয়া, দেহের উত্তাপ ও অন্যান্য অভ্যন্তরীণ অবস্থার সমতা আনয়ন প্রভৃতি সংবহনতন্ত্রের কার্য।

একটিমাত্র কোষে গঠিত জীবদেহে ইহার আবশ্যকতা হয় না। ইহার কেন্দ্রস্থল হৃৎপিণ্ড যাহা রক্ত সঞ্চালন করে। হৃৎপিণ্ডের উপরে ও নীচে দুইটি করিয়া কক্ষ, অলিন্দ (auricle) এবং নিলয় (ventricle) আছে। সংবহনতন্ত্রের প্রথম পর্বে দুইটি মহাশিরার দ্বারা সমস্ত দেহ হইতে রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আসে এবং প্রসারিত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় সংকুচিত হইলে ইহা হইতে উত্থিত পাল্‌মোনারি ধমনীর সাহায্যে এই রক্ত ফুসফুসে যায়। ফুসফুস হইতে এই পরিশোধিত রক্ত পালমোনারি শিরার দ্বারা বাম অলিন্দে ফিরিয়া আসে।

দ্বিতীয় পর্বে রক্ত বাম অলিন্দ হইতে বাম নিলয়ে আসিয়া পৌঁছায় ও নিলয়ের সংকোচনের ফলে মহাধমনীতে প্রবেশ করে। অতঃপর এই রক্ত শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হইয়া আবার হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আসে। এইভাবে সংবহনতন্ত্রের সাহায্যে রক্ত ক্রমাগতই দেহে আবর্তন করিতে থাকে। 'নাড়ী', 'রক্ত', 'রক্তচাপ', 'রক্তবাহ', 'হৃৎপিণ্ড' দ্র।

সুখময় লাহিড়ী

রঘু সূর্যবংশীয় নৃপতি। কালিদাস-বিরচিত রঘুবংশ অনুসারে রঘুর পিতা দিলীপ, মাতা সুদক্ষিণা, পুত্র অজ, পৌত্র দশরথ ও প্রপৌত্র রামচন্দ্র। রঘু রাজ্যলাভ করিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হন, দিগ্বিজয় শেষে বিশ্বজিৎযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণদের সর্বস্ব দান করেন। রঘুর নামানুসারে বংশের নাম রঘুবংশ এবং রামচন্দ্রকে রাঘব ও রঘুপতি বলা হয়। রামায়ণে রঘু ককুৎস্থের পুত্র।

যূথিকা ঘোষ

রঘুনন্দনদাস গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর দশম অধস্তন পুরুষ। ইনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার মাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলায় রামরসায়ন কাব্য, রাধামাধবোদয় এবং সংস্কৃতে গৌরাঙ্গচম্পূ রচনা করেন। ইহা ছাড়া বহু পদ রচনা করিয়া গীতমালায় সন্নিবন্ধ করেন। গোস্বামী মহাশয় স্মৃতিবিষয়কও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার দেশিকনির্ণয়ে গুরুশিষ্যের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে; এবং বৈষ্ণব ব্রত নির্ণয়ের প্রথম খণ্ডে হরিভক্তিবিলাসোক্ত ব্রতাদি ও দ্বিতীয় খণ্ডে দোল, রথযাত্রা, হিন্দোলা, রাস প্রভৃতি ব্রতের বর্ণনা আছে।

বিবিধছন্দে রচিত বাংলা শব্দের সহিত বিভক্তি-যুক্ত সংস্কৃত শব্দ মিশাইয়া তিনি শব্দঝংকার সৃষ্টি করিয়াছেন। গীতমালায় শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলা সুন্দর-ভাবে বর্ণিত আছে।

গৌরাঙ্গচম্পূতে শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে ৩২টি বিলাস আছে। দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ বিলাসে কবি, লক্ষ্মী ও গৌরাঙ্গের পূর্বরাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিলনের চিত্র অংকন করিয়াছেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্ম। পিতা হরিহর। বঙ্গদেশের প্রখ্যাত নিবন্ধকার। তিনি 'স্মৃতিতত্ত্ব'-এর অন্তর্ভুক্ত আটাশখানি নিবন্ধ, তীর্থযাত্রাবিধি প্রভৃতি প্রয়োগগ্রন্থ, দায়তত্ত্ব, এবং বঙ্গীয় নিবন্ধকার জীমূতবাহনের (১২শ শতাব্দী) রচিত বিখ্যাত 'দায়ভাগ' গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। স্মৃতিশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে 'স্মার্ত ভট্টাচার্য' আখ্যায় প্রসিদ্ধ। বহু নিবন্ধ আলোচনা করিয়া তাৎকালিক বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজকে সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। আজও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই চলে। তাঁহার স্মৃতিতত্ত্বের টীকাকারদিগের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংগালী কাশীরাম বাচস্পতিই সর্মাধিক প্রসিদ্ধ।

ভবতোষ ভট্টাচার্য

রঘুনাথদাস চৈতন্য-অনুগৃহীত বিনয়ী ভক্ত-সাধক। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীর মধ্যে একজন। চৈতন্যদেবের আশ্রয় ও কৃপালাভ করেন। চৈতন্যদেবের লীলাবসানের পর বৃন্দাবনে আসেন ও ভজন-পূজনে ব্রতী হন। এখানে সংগী ছিলেন 'চৈতন্য-চরিতামৃত'-কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 'স্তবমালা', 'চৈতন্যাষ্টক', 'গৌরাংগস্তব-কল্পবৃক্ষ', 'মুক্তাচরিত', 'দানকেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচনা। স্বরূপ দামোদরকৃত চৈতন্যজীবনী-মূলক কড়চার-ও বৃত্তিকার ছিলেন। বৃন্দাবনেই ইনি দেহরক্ষা করেন।

প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

রঘুনাথ ভট্ট মহাপ্রভুর পরিবারের ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম। পিতা তপন মিশ্র। গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে কাশীধামে তপন মিশ্রের গৃহে আহারাদি করিয়াছিলেন। কিশোর রঘুনাথ সেই সময়ে মহাপ্রভুর সেবা করিয়া ধন্য হন। নীলাচলে মহা-প্রভুর লীলা প্রত্যক্ষ করেন এবং পরে তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীরূপ ও সনাতনের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রঘুনাথ ভাগবতাচার্য শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে (১৫১৩ খ্রী) বরাহনগরে রঘুনাথের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভাগবত পাঠ শুনিয়া প্রভু বলিলেন: 'তোমার নাম আজ হইতে ভাগবতাচার্য হইল। তুমি ভাগবত পড়া ছাড়া আর কোনও কার্য করিও না' (চৈতন্য ভাগবত ৩।৫)। মনে হয় শ্রীচৈতন্যের আদেশেই রঘুনাথ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী রচনা করেন।

এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রথম নয়টি স্কন্ধের সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ ও দশম এবং একাদশ স্কন্ধের প্রায় প্রতি শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ দেখা যায়।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দার্শনিক তত্ত্বগুলি রঘুনাথ সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

রঘুনাথ শিরোমণি নব্য ন্যায়শাস্ত্রে অসামান্য মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া বঙ্গদেশকে চূড়ান্ত গৌরবের অধিকারী করিয়াছিলেন। টীকা ও মূলগ্রন্থ মিলাইয়া

ন্যূনাধিক ৪০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লেখা 'তত্ত্বচিন্তামণি'-র দীধিতি টীকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে রঘুনাথের টীকাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌমের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মিথিলায় গিয়া পক্ষধর মিশ্রের নিকট নব্য ন্যায় শিক্ষা করেন। শিক্ষান্তে নব্য ন্যায়ের অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ক্রমশঃ নব্য ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া ভারত-ব্যাপী খ্যাত হয়। তাঁহারই প্রভাবে নব্য ন্যায়-চর্চার কেন্দ্র মিথিলা হইতে নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়।

নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ

রঙ্গমঞ্চ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে নাট্যবস্তু ও নাট্যাভিনয়ের উদ্ভব—প্রাচীন গ্রীস, রোম, চীন, ভারতবর্ষ ও পশ্চিম ইওরোপে। তবে কোথাও ক্রমবিকাশ উত্তমরূপে ঘটে, কোথাও সেরূপ ঘটে নাই। ইওরোপের নাট্যশালা গ্রীক-আদর্শেই বিকাশলাভ করে। গ্রীক থিয়েটার বা রঙ্গশালার গোলাকৃতি নৃত্যভূমির আদি নাম ছিল অর্কেস্ট্রা ; ইহার পশ্চাতে যে মঞ্চ থাকত তাহাই ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চ হইয়া দাঁড়ায়। ইওরোপীয় রঙ্গ-শালার ইতিহাসে এথেন্সের নাগরিকদের সমক্ষে গ্রীক নাট্যকার Aeschylus-এর 'The Suppliants' নাটকের অভিনয়ই (আনুমানিক ৪৯০ খ্রী) সর্ব প্রাথমিক। তৃণহীন পাহাড়ের নিম্নগাত্রে দর্শকগণ আসীন এবং ঢালুর আরও নীচে গোলাকারে চিহ্নিত সমতলভূমির মধ্যস্থলে বেদী। ইহাই রঙ্গমঞ্চের প্রারম্ভ। রোমের রঙ্গশালা ও রঙ্গমঞ্চ গ্রীক-আদর্শে নির্মিত হইলেও এমন বিশিষ্ট অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল যে পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের মূল আদর্শ গ্রীসের না বলিয়া রোমেরই বলা যুক্তিসঙ্গত। রোমানরাই আগাগোড়া প্রস্তর দিয়া প্রথম রঙ্গশালা নির্মাণ করে (৬১ খ্রী) এবং রঙ্গমঞ্চের উচ্চতা ১২ ফিট হইতে ৫ ফিটে আনে।

ইংল্যাণ্ডে (লণ্ডনে) প্রথম নাট্যশালা (১৫৭৬ খ্রী)-র স্রষ্টা জেম্‌স্ বারবেজ। ইতালি ও ফ্রান্সে তৎপূর্বেই ইহার সৃষ্টি। ইহার পর ইংল্যাণ্ডে গ্লোব (১৫৯৯ খ্রী), ফর্চুন (১৬০০ খ্রী) প্রভৃতি নাট্য-শালার সৃষ্টি। গ্লোবেই শেক্‌স্‌পীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রী) নাটক প্রথমে অভিনীত হয় এবং কবি স্বয়ং এই নাট্যশালার অন্যতম অংশীদারও ছিলেন। এই যুগেই মঞ্চের পশ্চাতে অভিনেতাদের সজ্জাকক্ষের প্রবর্তন হয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতেই চিত্রাকার (পিক্‌চার ফ্রেম) মঞ্চের প্রচলন হয়, যাহা আজও সর্বত্র চলিতেছে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও অভিনয়ে ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। 'অভিনয়দর্পণ' ইত্যাদি গ্রন্থই ইহার প্রমাণ। অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চের যে ছবি মিলে তাহা খুবই উন্নত স্তরের।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রঙ্গমঞ্চ, বাংলা বিলেতী রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করিয়া সংস্কৃত নাটককে ইংরেজী নাটকের ধাঁচে ঢালিয়াই বাংলা নাটকের গোড়াপত্তন। প্রহসনগুলি সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক কুরীতি বা নব্যাদর্শের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে গড়িয়া উঠে।

কলিকাতায় বিলেতী ধরনের প্রথম রঙ্গমঞ্চে সর্ব-প্রথম বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার কৃতিত্ব হেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৮ খ্রী) নামে এক রুশের। দুইখানি ইংরেজী নাটক 'দি ডিসগাইজ' ও 'লভ্ ইজ দি বেস্ট ডক্টর' তাঁহার দ্বারা বাংলায় অনূদিত হইলে প্রথমোক্তটি তৎকৃত নাট্যশালায় দুইবার মঞ্চস্থ হয় (১৭৯৫, ২৭ নভেম্বর ; ১৭৯৬, ২১ মার্চ)। ইহার পরে উল্লেখ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'-এ বাংলায় অনূদিত 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের অভিনয় (১৮৩১, ১৪ ডিসেম্বর)। অনন্তর শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর ভবনে প্রতিষ্ঠিত রঙ্গশালায় (১৮৩৩ খ্রী) বিলেতী ধরনে প্রস্তুত রঙ্গমঞ্চে বাঙালী নটনটী কর্তৃক বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী নাট্যাকারে অভিনীত হয় (১৮৩৫, অক্টোবর)। পরবর্তী পর্যায়ে কিছুকাল স্কুল-কলেজে ও তাহার বাহিরে প্যারীমোহন বসুর জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় (১৮৫৪ খ্রী) শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক বা নাট্যাংশ ইংরেজীতেই অভিনীত হয়। স্কুল কলেজের মধ্যে অভিনয় করে হিন্দু কলেজ (গভর্নমেণ্ট হাউসে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায়ঃ ১৮৩৭ খ্রী), ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমি (১৮৫৩ খ্রী), ওরিয়েন্টাল সেমিনারি (নিজস্ব নাট্যশালা 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে': ১৮৫৩, ৫৪, ৫৫ খ্রী) প্রভৃতির ছাত্রগণ।

অতঃপর অভিনীত বাংলা নাটক (নন্দকুমার রায়ের) 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' (রচনা, ১৮৫৫ খ্রী)। আশুতোষ দেবের বাড়িতে ইহার অভিনয় হয় (১৮৫৭ খ্রী, ৩০ জানুয়ারি)। এই বৎসরেই রামজয় বসাকের বাড়ির রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' ও কালীপ্রসন্নের 'বিক্রমোর্বশী' অভিনীত হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুতর ঘটনা বেলগাছিয়ায় পাইকপাড়ার রাজাদের বাগানবাড়িতে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী'-র অভিনয় (১৮৫৮ খ্রী, ৩১ জুলাই)। এখানেই মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠার'-র প্রথম অভিনয়

(১৮৫৯ খ্রী, ৩ সেপ্টেম্বর)। এই সময়ে 'সিঁদুরে পটিতে'ও উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনীত হয় (১৮৫৯ খ্রী, ২৩ এপ্রিল) মেট্রোপলিটন কলেজের নাট্যশালা মেট্রোপলিটন থিয়েটারে। ইহার পরের পর্যায়ের নাট্যশালা পাথুরিয়া ঘাটার 'বঙ্গ-নাট্যালয়,; এইখানে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক ও রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনীত হয় (১৮৬৫ খ্রী)। অতঃপর শোভাবাজারের ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির নাট্যশালা দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে প্রথম অভিনয় মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র (১৮৬৫ খ্রী, ১৮ জুলাই)। দ্বিতীয়টিতে রামনারায়ণের 'নবনাটক' (অভিনয়ঃ ১৮৬৭ খ্রী, ৫ জানুয়ারি), মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রভৃতি অভিনীত হয়। এই যুগের আর একটি বিখ্যাত রঙ্গালয় 'বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়'; এখানে প্রথম অভিনীত হয় (১৮৬৮ খ্রী) মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', পরে তাঁহার 'সতী নাটক' ও 'হরিশচন্দ্র'। কলিকাতার বাহিরে মফস্বলেও এই কালে নাট্যাভিনয় চলিতেছিল। এই যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি (১৮৬৫ খ্রী) 'গীতাভিনয়' (অপেরা)—ইহা যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ের মাঝামাঝি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নাম লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে রঙ্গালয়ের ইতিহাসে দ্বিতীয় যুগের শুরু। ইহার পূর্ব পর্যন্ত নাট্যাভিনয়-যুগকে সখের রঙ্গালয়ের যুগ বলা হয়। প্রথম যুগের (শখের) শেষের দিকে বাগবাজারে একটি শখের দল 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' (পরিবর্তিত নাম 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ') গঠন করে।

এখানে প্রথমে দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (অভিনয় ১৮৬৮ খ্রী) ও পরে তাঁহার 'লীলাবতী' (অভিনয় ১৮৭২ খ্রী) অভিনীত হয়। এই বাগবাজারের শখের দলই ক্রমশঃ 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামে সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হয়। পরে কলহের ফলে ইহার আর একটি ভাগ হয় 'হিন্দু ন্যাশন্যাল থিয়েটার' (১৮৭৩ খ্রী)।

এই যুগের 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার', 'বেঙ্গল থিয়েটার', 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' ও 'দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল থিয়েটার' নামগুলিও উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুকালের (১৯১২ খ্রী) মধ্যে কলিকাতায় অন্তত আরও তিনটি থিয়েটার 'স্টার', 'মিনার্ভা' ও 'কোহিনুর' চলিতেছিল। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের দানও অসামান্য। শান্তিনিকেতনে উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চ (ওপ্‌ন্ এয়ার স্টেজ)-এ তাঁহার লেখা বহু অভিনব নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য প্রভৃতি রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭ খ্রী) বর্ধমান জেলার কাকুলিয়া গ্রামে জন্ম। শিক্ষাঃ গ্রামের পাঠশালায়, মিশনারী স্কুলে ও হুগলি কলেজে। তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টির শুরু ঈশ্বর গুপ্তের সাহচর্যে 'সংবাদ প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায়।

ইংরেজী, সংস্কৃত ও প্রাচীন ওড়িয়া কাব্য সাহিত্যে তাঁহার অধিকার ছিল। প্রাচীন ওড়িয়া কাব্যের অনুসরণে রচিত 'কাঞ্চী-কাবেরী' (১৮৭৯ খ্রী) কাব্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তিনি 'উৎকল দর্পণ' সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা এবং ওড়িশার পুরাতত্ত্ব ও ওড়িয়া ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ রচনা করেন।

তাঁহার রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ও ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শ দৃষ্ট হয়। ইংরেজী-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮ খ্রী) রঙ্গলালের সর্বাধিক জনপ্রিয় কাব্য। বাংলা কাব্যে ইতিহাসাশ্রিত যে রোমান্স রচনার ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার প্রারম্ভিক নিদর্শন 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। বাংলাসাহিত্যে দেশপ্রেমের প্রবেশ প্রধানতঃ এই কাব্যের সূত্রে। এই কাব্যের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' গানটির স্থান দেশ-প্রীতির মন্ত্ররূপে একদা 'বন্দে মাতরম্'-এর পরেই ছিল।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০ খ্রী) সাহিত্য-সেবাই ব্রত ও জীবিকারূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে 'আর্যকীর্তি', ৫ খণ্ড (১৮৮৩-৮৫ খ্রী), 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস', ৫ খণ্ড (১৮৭৯-১৯০০ খ্রী), 'প্রতিভা' (১৮৯৬ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি আজীবন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার তিনিই প্রথম সম্পাদক। তাঁহারই উদ্যোগে পরিষদের পরিভাষা-সমিতি, ব্যাকরণ-সমিতি, গ্রন্থরচনা-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

রজনীকান্ত গুহ (১৮৬৭-১৯৪৫ খ্রী) স্বদেশ-প্রেমিক, সুপণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী ও ব্রাহ্মনেতা। ময়মন-সিংহের টাঙ্গাইল মহকুমানিবাসী উমাকান্ত গুহের তৃতীয় পুত্র, জন্ম ২০ অক্টোবর, ১৮৬৭ খ্রী। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যথাক্রমে বি.এ. ও এম্.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। উত্তরকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং 'ব্রাহ্ম সম্মিলনী'র সভাপতি হন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

প্রভাত বসু

রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ খ্রী) 'কান্তকবি' নামে সুপরিচিত। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্ম। পিতা গুরুপ্রসাদ, মাতা মনোমোহিনী। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বি.এল. পাশ করার পর আইন-ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই......' সংগীতটি কবিকে দেশ-বিখ্যাত করিয়া তুলে। তাঁহার রচিত 'বাণী' (১৯০২ খ্রী), 'কল্যাণী' (১৯০৫ খ্রী), 'অমৃত' (১৯১০ খ্রী), 'আনন্দময়ী' (১৯১০ খ্রী), 'অভয়া' (১৯১০ খ্রী), 'বিশ্রাম' (১৯১০ খ্রী), 'সদ্ভাবকুসুম' (১৯১৩ খ্রী), 'শেষদান' (১৯২৭ খ্রী) এই আটটি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশই গীত। তাঁহার গানগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে—ভক্তিমূলক, দেশপ্রেমে উজ্জ্বল ও হাস্যরস প্রধান।

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ

রণজিৎ সিংজি (১৮৭২-১৯৩৩ খ্রী) ক্রিকেটের ইতিহাসে রণজিৎ সিংজি এক অবিস্মরণীয় নাম। কাথিয়াবাড় রাজ্যের সারোদা নামক গ্রামের এক বিখ্যাত রাজপুতবংশে তাঁহার জন্ম। দত্তক পুত্র হইয়া তিনি দেশীয় রাজ্য নবনগরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ছোট রাজ্যের রাজা রণজিৎ পৃথিবীর মানুষের কাছে ক্রিকেটের রাজা বলিয়াই সমধিক পরিচিত। তিনি বেপরোয়া ব্যাট চালাইতেন; এবং নিপুণ ফিল্ডারও ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ৫৫ ইনিংস খেলিয়া ১০টি সেঞ্চুরীসহ ২৭৮০ রান সংগ্রহ করিয়া ইংলিশ ক্রিকেটের গিলবার্ট গ্রেস-এর পঁচিশ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তাঁহাকে পৃথিবীর সেরা পাঁচজন ব্যাটস্‌ম্যানের অন্যতম বলা হয়। কাউণ্টি খেলায় তিনি প্রথম ভারতীয়, যিনি আজীবন ইংল্যাণ্ডের সাসেক্স ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে অধিনায়কও হইয়াছিলেন। তিনি ক্রিকেটে কেম্ব্রিজ ব্লু এবং প্রথম ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড় ('ক্রিকেট, ভারতে' দ্র)। শিকারের সময় গুলি লাগিয়া তাঁহার ডান চোখের দৃষ্টি লোপ পায় (১৯১৫ খ্রী) এবং ক্রিকেট-জীবনেরও অন্ত হয়। দিল্লীতে চিরকুমার রণজিৎ-এর মৃত্যু হয়। তাঁহার রচিত 'দি জুবিলি বুক অভ্ ক্রিকেট' গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার স্মরণার্থে কলিকাতার ইডেন স্টেডিয়ামের নামকরণ হইয়াছে 'রণজিৎ স্টেডিয়াম' এবং ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় 'রণজিৎ ট্রফি' খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে। 'জামনগর' দ্র।

প্রশান্ত দাঁ

রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রী) পাঞ্জাবের সুকরচুকিয়া মিস্‌ল্ (সামন্তরাজ্যের)-এর নেতা মোহন সিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহ গুজরানওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর বারো বৎসর বয়সে রণজিৎ সিংহ মিস্‌লের নেতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

কাবুলের জমানশাহ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে রণজিৎ সিংহ তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন। জমানশাহ এই সাহসী তরুণকে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ করিয়া 'রাজা' উপাধি দেন। জমানশাহের প্রত্যাবর্তনের পর রণজিৎ লাহোর দখল করেন (১৭৯৯ খ্রী)। তিনি জম্মুর দিকে অগ্রসর হইলে সেখানকার রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। শিখদের পীঠস্থান অমৃতসর জয় (১৮০২ খ্রী) করায় তাঁহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি 'মহারাজা' উপাধি ধারণ করেন ও স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন। শতদ্রু নদীর পূর্বপারের মিস্‌ল্‌গুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে তিনি স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হন; কিন্তু ইংরেজরা বাধা দিলে দূরদর্শী রণজিৎ সন্ধি করেন। শতদ্রু নদী ইংরেজ কোম্পানি ও রণজিৎ সিংহের রাজ্যসীমা নির্ধারিত করে।

শতদ্রুর পশ্চিমপারের মিস্‌ল্‌গুলি একত্র করা ছাড়াও তিনি কাংড়া, আটক (১৮১৩ খ্রী), মুলতান (১৮১৮ খ্রী), কাশ্মীর (১৮১৯ খ্রী), পেশোয়ার, ডেরা ইসমাইল খাঁ, ডেরা গাজি খাঁ প্রভৃতি অঞ্চল জয় করিয়া এক বিরাট শিখরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে মারা যান। কূটনীতিজ্ঞ, রণকুশল রণজিৎ 'পাঞ্জবকেশরী' আখ্যা পান।

কুমুদরঞ্জন দাস

রত্নগিরি ওড়িশার কটক জেলার একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশস্থ গ্রামটিরও এই নাম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে অপেশাদারী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এই পাহাড়টির প্রতি সর্বপ্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৫৮-৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রত্নগিরির শীর্ষে খননকার্য পরিচালনার ফলে এমন একটি বৌদ্ধ ধর্মপীঠের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা একদা ভারতবর্ষ ও বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি-প্রসারে শীর্ষস্থানীয় মহাবিহারগুলির অন্যতম ছিল। ১৬শ-১৭শ শতকের তিব্বতীয় পুথিতে রত্নগিরি মহাবিহারের উল্লেখ আছে। খননের ফলে সহস্রাধিক একশিলা ক্ষুদ্র স্তূপ, দুটি বিরাটকার সংঘারাম ও আটটি মন্দির উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই সংঘারামদ্বয়ের নির্মিত-পরিকল্পনা চতুঃশালা রীতি-অনুযায়ী। দুইটি সংঘারামই ভাস্কর্য ঐশ্বর্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। সংঘারামের উত্তর পার্শ্বের কক্ষটি উপাসনাগার ছিল। অভ্যন্তরে বেদির উপর ভূমিস্পর্শমুদ্রায় আসীন বুদ্ধদেবের মূর্তি; পার্শ্বে দণ্ডায়মান পদ্মপাণি ও বজ্রপাণির

মূর্তি। আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুরাজির মধ্যে বৌদ্ধ দেবদেবীর বিচিত্র মূর্তি আছে।

দেবলা মিত্র

রথযাত্রা আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের যে রথব্রজের উৎসব তাহাকেই রথযাত্রা অনুষ্ঠান বলা হয়। সাধারণতঃ জগন্নাথ, তাঁহার ভাই বলরাম এবং ভগিনী সুভদ্রা ঐদিন রথে চড়িয়া বাহির হন। পুরীর রথযাত্রাকে কেন্দ্রীয় উৎসব হিসাবে ধরিয়া ভারতের কোনো কোনো প্রদেশে বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে সাড়ম্বরে রথযাত্রার উৎসব ও মেলা হয়।

জরা নামক শিকারীর হাতে মৃত্যুবরণ করিয়া কৃষ্ণ এক কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হন এবং পরে পুরীর সমুদ্রতীরে জাগিয়া ওঠেন। নীলাচলের অধিপতি তাঁহাকে মন্দিরে সংস্থাপন করেন। দেবলোক হইতে বিশ্বকর্মা আসেন এই মূর্তি তক্ষণের কাজে। পূর্ব হইতে সর্ত ছিল মূর্তি নির্মাণকালে বন্ধ দ্বার খোলা হইবে না। রাজা স্বয়ং সেই সর্ত ভঙ্গ করায় বিশ্বকর্মা কার্য অর্ধসমাপ্ত রাখিয়া দেন।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১ খ্রী) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্ম ২৭ নভেম্বর, মৃত্যু ৩ জুন। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করিয়া আমেরিকায় কৃষি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভান্তে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পল্লীর কৃষি ও শিল্পের উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হন। পরে বিশ্বভারতীর পরিচালনাকার্যে পিতার সহায় হন। জীবনের প্রায় প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত এই কর্মে তিনি ব্রতী ছিলেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে পরিগণিত হইলে তিনি প্রথম উপাচার্য হন।

বিবিধ কারুশিল্পে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। শেষজীবনে চিত্রাঙ্কনেও নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। উদ্যানরচনায় ও উদ্ভিদের উৎকর্ষবিধানে তিনি যথেষ্ট মনোযোগ দেন।

তাঁহার লেখা 'প্রাণতত্ত্ব' (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), 'অভিব্যক্তি' (১৩৫২ বঙ্গাব্দ), অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিতের বঙ্গানুবাদ, 'On the Edges of Time' (১৯৫৮ খ্রী) গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য।

পুলিনবিহারী সেন

রবার অনতিকাল-পূর্ব পর্যন্ত রবার বলিতে দক্ষিণ আমেরিকাজাত 'হিভিয়া ব্রেজিলিয়ান্সিস' নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন একপ্রকার আঠালো দ্রব্যকে বুঝাইত। রবারের মুখ্যগুণ উভয়মুখী প্রসারণশীলতা। রাসায়নিক বিচারে রবার আইসোপ্রিন একক গঠিত অতিকায় অণুর সমষ্টি। বর্তমানে রবার-সদৃশ গুণসম্পন্ন অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ইহারা সংশ্লিষ্ট রবার নামে অভিহিত। রবার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় টায়ার, হোস, বেল্ট, ওয়াটারপ্রুফ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে। স্বভাবজাত এবং সংশ্লিষ্ট রবার অশক্ত চট্চটে জিনিস। সেইজন্য ইহাদের সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভালকানাইজেশন-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীতে রূপায়িত করিতে হয়। ব্যুটাডাইন, স্টাইরিন, সিলিকোন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট রবারের বিশেষ গুণ থাকায় এগুলি নানাপ্রকারে ব্যবহারের উপযুক্ত। সিলিকোন রবার -১৩০° হইতে +৬০০° ফা. পর্যন্ত তাপমাত্রার মধ্যে নমনীয়তা হারায় না, গরম তেলে বিনষ্ট হয় না এবং অতি চমৎকার বিদ্যুৎ প্রবাহরোধক।

অঞ্জনকুমার রায়

রবিবর্মা (১৮৪৮-১৯০৬ খ্রী) পাশ্চাত্যরীতির অনুসরণকারী শিল্পীদের মধ্যে প্রথম স্মরণীয় চিত্রকর। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল কেরলের কিলিমানুর গ্রামে জন্ম। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ-পরিবারের সহিত পুরুষানুক্রমে ও নিজ বিবাহের সূত্রে আত্মীয়তায় বদ্ধ। বাল্যে মাতুল (রাজা)-এর নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার পারিবারিক চিত্র অঙ্কনের জন্য ডেনমার্ক-দেশীয় চিত্রশিল্পী থিওডোর জ্যানসেনকে আমন্ত্রণ করা হয়। ইঁহার নিকট 'পোর্ট্রেট'-অঙ্কনের কলাকৌশল শিক্ষা করেন (১৮৬৮ খ্রী)। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার অঙ্কিত 'অ্যাট দি টয়লেট' চিত্রটি মাদ্রাজ ফাইন আর্টস্ সোসাইটির প্রদর্শনীতে গভর্নরের স্বর্ণপদক লাভ করে ও পরে তিনি দক্ষিণ ভারতের বহু চিত্র প্রদর্শনীতে নানা পুরস্কার লাভ করেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশন্যাল এক্‌জিবিশন' (১৮৮৩-৮৪ খ্রী), ভিয়েনার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড কলোনিয়াল এক্‌জিবিশন', 'শিকাগো ওয়ার্ল্ড ফেয়ার' (১৮৯৩ খ্রী) এবং প্যারিস প্রদর্শনীতে তাঁহার চিত্র সমাদৃত হয়। তাঁহার তৈলচিত্রকলাকে দুই ভাগে ফেলা যায়ঃ পৌরাণিক চরিত্র বা দেবদেবীর ছবি এবং সমসাময়িক দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও রাজন্যবর্গের পোর্ট্রেট। তাঁহার আঁকা 'অজবিলাপ', 'গঙ্গাবতরণ', 'দুর্বাশার অভিশাপ', 'হরধনুভঙ্গ', 'জটায়ুবধ', 'শ্রীরামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন', 'অশোকবনে সীতা' প্রভৃতি চিত্রগুলি একদা জনগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাইতে এক মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আঁকা প্রায় ১০০টি চিত্রের

লক্ষাধিক রঙিন প্রতিলিপি মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যে সমগ্র দেশে প্রচার করেন। শারীরস্থান-এর গভীর বর্ণবোধ এবং বর্ণের গাঢ় অথচ সুষম-প্রয়োগ তাঁহার প্রতিকৃতি চিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কমল সরকার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী) কলিকাতায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে (১২৬৮ বঙ্গাব্দ, ২৫ বৈশাখ) জন্ম। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ পিতামাতার চতুর্দশ সন্তান বা অষ্টম পুত্র। স্কুলে (সেণ্ট জেভিয়ার্স প্রভৃতি)-র পড়ায় মন না বসায় বাড়িতেই পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়। শৈশবকাল হইতেই কবিতা-রচনায় মত্ত। 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮২-৮৩ বঙ্গাব্দ) 'বনফুল' ও 'ভারতী'তে 'কবি-কাহিনী' (১২৮৪ বঙ্গাব্দ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। হিন্দুমেলার দশম বার্ষিক অধিবেশনে যে কবিতা আবৃত্তি করেন, তাহাই প্রথম স্বাক্ষরযুক্ত রচনা, 'অমৃতবাজার' (দ্বৈভাষিক) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৪, ফেব্রুয়ারি ২৫)।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'ভারতী' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে বহু রচনা ইহাতে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে 'ভানুসিংহের পদাবলী' (১৮৮৪ খ্রী) সুপরিচিত। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিলাতে যান (১৮৭৮, সেপ্টেম্বর)। কিছুকাল ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে পড়ার পর তাঁহাকে লণ্ডনে পাঠানো হয়। সেখানে মাস তিনেক অধ্যাপক মর্লির নিকট পড়েন। ইংল্যাণ্ডে বাসকালে 'ভারতী'তে (১২৮৬-৮৭ বঙ্গাব্দ) 'য়ুরোপ প্রবাসী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র' নামে পত্রধারা প্রকাশিত হয়। কোনো প্রকার পাঠক্রম শেষ না করিয়া দেশে ফেরেন (১৮৮০, ফেব্রুয়ারি)। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুটি গ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১ খ্রী) ও 'রুদ্রচণ্ড (১৮৮১ খ্রী) প্রকাশিত হয়। বাড়িতে তখন গানের চঞ্চল আবহাওয়া; এই আসরের মধ্যমণি সেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র)। এই পরিবেশে রচিত গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১ খ্রী) বিদ্বজ্জন সমাগমের বাৎসরিক সভা উপলক্ষে অভিনীত হয় (১৮৮১, ফেব্রুয়ারি ২৬)। কবি স্বয়ং বাল্মীকির ভূমিকায় ও সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা প্রতিভা সরস্বতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামের মধ্যেও এই ইঙ্গিত আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত গঙ্গাতীরে চন্দননগরে বাসকালে লেখেন 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩ খ্রী), 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২ খ্রী)-এর কবিতা ও 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস (১৮৮৩ খ্রী)। মহীশূরের কারোয়ার-এ বাসকালে প্রথম নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪ খ্রী) রচনা করেন। কবির জীবনদর্শনের ও সমাজের অস্পৃশ্যতা-সমস্যার কথা প্রথম পাই এই নাটকে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবির বিবাহ হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যু (১৮৮৪, ১৯ এপ্রিল) তরুণ কবিকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। এই বৌঠাকুরাণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে সাহিত্যসঙ্গিনী। এই মহীয়সী নারীর প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর কী পরিমাণ ছিল, তাহার বহু নিদর্শন কবিতায়, গানে, কথিকায়, পত্রে পাওয়া যায়। এই সময়ে ঠাকুর এস্টেটের কাজকর্ম দেখিতেন দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁহার মৃত্যুতে জমিদারির কাজকর্ম দেখিবার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের উপর। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের পদও তাঁহাকে লইতে হয় (১৮৮৪, ১৬ সেপ্টেম্বর)। এই কর্মকালে মাঘোৎসবাদির জন্য অজস্র ব্রহ্মসংগীত ও ব্রাহ্মমত সমর্থনে বহু প্রবন্ধ লেখেন। এই সময়ে নব হিন্দুত্বের সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে যুবক কবির মসীযুদ্ধ চলে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হইলে ইহাতে কবিতা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাস লেখেন (১৮৮৭ খ্রী)। এই পর্বে 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হয় (১৮৮৬ খ্রী)। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে বাসকালে 'মানসী' (১৮৯০ খ্রী) কাব্যের মূল কবিতাগুলি লেখেন। এইখান হইতেই কাব্যজীবনের এক নূতন পর্বের শুরু। কলিকাতার সখী সমিতির অনুরোধে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য লেখেন (১৮৮৮ খ্রী)। সখী সমিতির সদস্যারা ইহার অভিনয় করেন (১৮৮৮ খ্রী)। বোম্বাই প্রদেশের সোলাপুরে বাসকালে লেখেন প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯ খ্রী); এই বৎসরই শীতকালে সাহাজাদপুর জমিদারি কাছারিতে বসিয়া লেখেন 'বিসর্জন' (১৮৯০ খ্রী)। মাত্র আড়াই মাসের জন্য (১৮৯০ খ্রী) সত্যেন্দ্রনাথ ও বন্ধু লোকেন পালিতের সহিত বিলাতে যান। এই সফরের কথা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'তে (১৮৯১ খ্রী) লেখেন; এই বইয়ের ভূমিকায় পূর্ব ও পশ্চিম জগতের প্রথম সমালোচনা প্রকাশ করেন।

'হিতবাদী' পত্রিকায় (প্রথম প্রকাশ ১৮৯১, এপ্রিল) ৬টি ছোট গল্প লেখেন—বাংলা সাহিত্যে যাহা নূতন সৃষ্টি। এই বৎসরের শেষ ভাগে ঠাকুর বাড়ি হইতে মাসিকপত্র 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রকাশিত হয়—কবিতা, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্যিক প্রবন্ধ, 'পঞ্চভূতের ডায়ারি', 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ও ৩৬টি ছোট গল্প। মোট ছোট গল্পের সংখ্যা ৯০টির মধ্যে ৪ বৎসরে লেখেন ৪২টি। জমিদারি তদারকির মধ্যেই (১৮৮৭-

৯৫ খ্রী) ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে যে সব পত্র লেখেন তাহা 'ছিন্নপত্র' বা 'ছিন্ন পত্রাবলী' নামে প্রকাশিত (১৯১২ খ্রী)। বাংলাদেশকে কবি কী নিবিড়ভাবে জানিতেন, তাহা বোঝা যায় এই বইটি হইতে। এই পর্বে 'সোনার তরী' (১৮৯৪ খ্রী), 'চিত্রা' (১৮৯৬ খ্রী), প্রভৃতি কাব্য; 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২ খ্রী), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭ খ্রী) প্রহসন; 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'র প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এক বৎসর 'ভারতী'র সম্পাদনা করেন ও এই পত্রিকার জন্য অজস্র রচনা লেখেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে বোলপুরে আসিয়া 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে এক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই স্থানটি শান্তিনিকেতন নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানই পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয় (১৯২১ খ্রী)। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের জন্য দুই বৎসরের মধ্যে কবির স্ত্রীবিয়োগ ও মধ্যমা কন্যার মৃত্যু ঘটে। পত্নী-বিয়োগের শোক ব্যক্ত করেন 'স্মরণ' কবিতাগুচ্ছে (১৯১৪ খ্রী)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৩ খ্রী)-এর যুগে দেশের কাজ বলিতে কি বুঝায় তাহা ব্যক্ত করেন 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে (১৯০৪ খ্রী)। বঙ্গচ্ছেদ ঘোষিত হইলে প্রতিবাদে বহু প্রবন্ধ ও গান রচনা করেন এবং বহু সভায় বক্তৃতা দেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুতে দারুণ আঘাত পান। এই আঘাত হইতে উৎসারিত 'গীতাঞ্জলি'র (১৯১০ খ্রী) গান ও শান্তিনিকেতন-উপদেশমালা তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অপূর্ব বাণীমূর্তি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে দেশবাসী বিরাট সভা করিয়া কবিকে সম্বর্ধনা জানায় (১৯১২, জানুয়ারি ২৮)। কয়েক মাস পরে পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলাতে যান (মে, ১৯১২ খ্রী) ও বৎসরের শেষে সেখান হইতে আমেরিকায় যান; সেখানে প্রায় ছয় মাস কাটে। বিলাতে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ বা 'Song Offerings' প্রকাশিত হয় (১৯১২ খ্রী, নবেম্বর)। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় যে-সব বন্ধু লাভ হয় তন্মধ্যে সর্বপ্রধান সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ ('অ্যান্ড্রুজ, চার্লস ফ্রীয়র' দ্র)। দেশে ফিরিবার মাস খানেকের মধ্যে শান্তিনিকেতনে খবর আসে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ('নোবেল পুরস্কার' দ্র) পাইয়াছেন (অক্টোবর, ১৯১৩ খ্রী)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে কবিকে ডি. লিট্. উপাধি দান (১৯১৩, ডিসেম্বর ২৬)।

প্রমথ চৌধুরী ('প্রমথ চৌধুরী' দ্র) সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ খ্রী)-এ দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের নূতন নূতন সমস্যামূলক অনেকগুলি ছোটগল্প, 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসদ্বয় (১৯১৪-১৬ খ্রী)। কাব্যেও নূতন বাণী, নূতন ছন্দ দেখা দিল 'বলাকা'র (১৯১৬ খ্রী) কবিতাবলীতে। তাঁহার বহু গ্রন্থ ও রচনার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে। 'সাধনা' নামে ইংরেজী প্রবন্ধমালা পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ আসে। যাইবার পথে জাপানে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যে জাপানীদের উগ্র জাতীয়তাবাদের নিন্দা করিলে তাহারা ক্ষুব্ধ হয়। দেশে ফিরিয়া বিদেশী শাসকদের হস্তে স্বাধীনতা-অভিলাষী ভারতবাসীর লাঞ্ছনার প্রতিবাদে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৯১৭ খ্রী) প্রবন্ধ সভায় পাঠ করেন। আবার পারিবারিক জীবনে জ্যেষ্ঠ কন্যার মৃত্যুতে (১৯১৮, মে) নিদারুণ আঘাত পাইয়া লেখেন 'পলাতকা' কবিতাগুচ্ছ (১৯১৮ খ্রী)।

রাউল্যাট বিলের ('রাউল্যাট অ্যাক্ট' দ্র) প্রতিবাদে যে বিক্ষোভ পাঞ্জাবে দেখা দেয় তাহার চরম রূপ দেখা দিল (১৯১৯, ১৩ এপ্রিল) অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালা-বাগের ('জালিয়ানওয়ালাবাগ' দ্র) হত্যাকাণ্ডে। প্রতিবাদে তিনি 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করিয়া বড়লাটকে খোলা চিঠি দেন (প্রকাশিত ১৯১৯ খ্রী, ২ জুন)। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। সর্বত্রই তিনি ভারতের একমাত্র আদর্শ 'বিশ্বমৈত্রী'র কথা প্রচার করেন।

ভারতে যখন ফিরিলেন তখন গান্ধীজীর ('গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ' দ্র) অসহযোগ ('অসহযোগ আন্দোলন' দ্র) ও খিলাফৎ আন্দোলন ('খিলাফৎ আন্দোলন' দ্র) চলিতেছে। তাঁহার এই সময়কার কয়েকটি প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশ পায় যে, তিনি গান্ধীজীর কোনও কোনও মতের সমর্থক নন।

ইওরোপের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও অতিরিক্ত বাস্তববাদে ক্ষুণ্ণ কবি এই সময় লেখেন 'মুক্তধারা' (১৯২২ খ্রী) ও 'রক্তকরবী' (১৯২৬ খ্রী)।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীকে সর্বসাধারণের হাতে তুলিয়া দেন। ইহার দেড় মাস পরে সুরুলে (শ্রীনিকেতন) গ্রামোদ্যোগ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এখানে কাজ করিতে আসেন ইংরেজ যুবক লেনার্ড এল্‌মহার্স্ট। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিকে নিমন্ত্রণ জানান চীন রিপাব্লিক। এই বছরের ১২ এপ্রিল হইতে ৩০ মে পর্যন্ত কবি চীনের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। ইহার পর পেরু রিপাব্লিকের স্বাধীনতা সমরের শত-বার্ষিকী উৎসবে কবি নিমন্ত্রণ লইয়া যান দক্ষিণ আমেরিকায়। অসুস্থ হওয়ায় বুয়েন্স এয়ারিসের শহর-

তালিতে ভিক্তোরিয়া ওকাম্বো নামে এক ভক্ত শিষ্যার কাছে থাকিতে হয়। কবি এই স্পেনীয় মহিলার নাম দিয়াছিলেন 'বিজয়া'—যাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হয় তাঁহার 'পূরবী' কাব্য (১৯২৫ খ্রী)। দেশে ফিরিবার পথে ইতালিতে কয়েকদিন থাকেন। দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসাত্মক কলহ দেখিয়া তিনি লিখিলেন 'নটীর পূজা' (১৯২৬ খ্রী), অহিংসা যার নির্গলিত বাণী। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ মে তাঁহার জন্মদিনে এই নাটিকাটি শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয়। এই বৎসরে এই মাসেই ইতালি যান মুসোলিনীর আমন্ত্রণে ('মুসোলিনী' দ্র)। সেখান হইতে গিয়া সাক্ষাৎ করেন রোম্যাঁ রোলাঁ-র সঙ্গে ('রোলাঁ, রোম্যাঁ' দ্র)। অতঃপর যান ইংল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও জার্মানির বহু স্থানে। বার্লিনে দেখা হয় আইনস্টাইনের সঙ্গে ('আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট' দ্র)। অনন্তর চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, গ্রীস ও মিশরে যান। দেশে ফিরিয়া লেখেন 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' (১৯২৭ খ্রী)। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে যান সিঙ্গাপুর, মালাক্কা, মালয় উপদ্বীপের বহু স্থানে এবং জাভা ও বলিদ্বীপে। পরে বাঙ্গালোরে কিছুদিন থাকেন এবং সেখানে বাসকালে লেখেন 'শেষের কবিতা' (১৯২৯ খ্রী)। 'যোগাযোগ' (১৯২৯ খ্রী) উপন্যাস রচনা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতায় ফিরিয়া লিখিলেন 'মহুয়া' কাব্য (১৯২৯ খ্রী)।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কানাডার আমন্ত্রণে গিয়া সেখানকার শিক্ষা সম্মেলনে বক্তৃতা দেন। ফিরিবার পথে জাপান, ইন্দোচীন সফর করিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯ খ্রী) নাটকটির কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া লেখেন গদ্য নাটক 'তপতী' (১৯২৯ খ্রী)। 'তপতী'র অভিনয়ে ৬৯ বৎসর বয়সে কবি স্বয়ং বিক্রমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হিবার্ট বক্তৃতা দিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এবারকার ইওরোপ ভ্রমণের তালিকায় পড়ে মস্কো ভ্রমণ। ইহার পর যান আমেরিকায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে দেশবাসী কবির ৭০তম জন্মবার্ষিকী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করেন। ৭১ বৎসর বয়সে আকাশযানে ইরাণে যান। বাদশাহ রেজা শাহ পহ্লবীর আমন্ত্রণে ইরাণ হইতে ইরাক হইয়া দেশে ফেরেন। দেশে ফিরিয়া আমৃত্যু অনশনব্রতধারী গান্ধীজীর সহিত পুনা জেলে দেখা করেন এবং অনশন-ব্রত ভঙ্গ হইলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে 'মানুষের ধর্ম'-বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এটি বিলাতে হিবার্ট বক্তৃতামালার সারমর্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে ইতিপূর্বে তিনি আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে আল্‌মোরায় থাকাকালে 'বিশ্ব-পরিচয়' (১৯৩৭ খ্রী) এবং 'ছড়ার ছবি' (১৯৩৭ খ্রী) লেখেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দেন। এই বৎসর অসুস্থ হইয়া ১১ মাস শয্যাগত থাকেন। ইহারই মধ্যে লেখেন 'রোগশয্যায়' (১৯৪০ খ্রী), 'আরোগ্য' (১৯৪১ খ্রী), 'জন্মদিনে' (১৯৪১ খ্রী), 'ছড়া' (প্রকাশ মৃত্যুর পরে, ভাদ্র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), 'শেষ লেখা' (প্রকাশ মৃত্যুর পরে, ভাদ্র ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কাব্যগুলি। ইহার পর পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িলে স্থির হয় তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইবে। সুতরাং অবিলম্বে তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয় (১৯৪১, ২৫ জুলাই)। কলিকাতায় ৩০ জুলাই অস্ত্রোপচার করা হয়। সেই দিন সকালে শেষ কবিতা বলিয়া গেলেনঃ

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে, হে ছলনাময়ী।'

কবির অবস্থা ক্রমে মন্দের দিকে যায় এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) রাখী পূর্ণিমার দিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র (১৮৯৮-১৯৩২ খ্রী) মূলতঃ ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত কথাশিল্পী। রংপুরের সেরেস্তাদার প্রিয়নাথের কনিষ্ঠ পুত্র। 'মেবার কাহিনী' (গল্প), 'সিন্ধুসরিৎ' (কবিতা), 'মায়ার জাল' (উপন্যাস), 'থার্ডক্লাস' (গল্প), 'উদাসীর মাঠ' (গল্প), 'দিবাকরী', 'বাস্তবিকা', 'ত্রিলোচন কবিরাজ' (ব্যঙ্গ গল্প), 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (ব্যঙ্গনাট্য) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। 'ঘৃতকুম্ভ' নামক আর একটি উপন্যাস তাঁহার অকালমৃত্যুতে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

অরুণ সান্যাল

রমাপ্রসাদ রায় (১৮১৭-১৮৬২ খ্রী) রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি কালেক্টার পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে আইন ব্যবসায় শুরু করেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের 'লেজিস্‌লেটিভ-কাউন্সিল'-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরেই হাই-কোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারপতি নিযুক্ত হন কিন্তু কার্যভার গ্রহণের পূর্বেই মৃত্যু হয়।

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভার সভাপতি। তত্ত্ববোধিনী সভার সক্রিয় সভ্য। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। হিন্দু দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৪৬ খ্রী)।

বেথুন সোসাইটির দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা শাখার সভাপতি (১৮৫৯ খ্রী); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থক। বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন (১৮৫৭ খ্রী)।

'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

অরুণ সান্যাল

রমাবাঈ, পণ্ডিতা (১৮৫৮-১৯২২ খ্রী) প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিদুষী ও সমাজ-সেবিকা। পিতাঃ অনন্ত শাস্ত্রী। বাংলা ও আসামের নানাস্থানে হিন্দুমহিলাদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থার জন্য বক্তৃতা দেন। কলিকাতার পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহাকে 'পণ্ডিতা' ও 'সরস্বতী' উপাধি দেন। বিপিনবিহারী মেধাবী নামে শ্রীহট্টবাসী বাঙ্গালী যুবককে বিবাহ করেন (১৮৮০ খ্রী)। বিবাহের দুই বৎসর পরে স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনায় আর্যমহিলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া স্বদেশে 'সারদা সদন', 'মুক্তি সদন', 'কৃপা সদন' প্রভৃতি বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইংরেজী ও মারাঠী ভাষায় কয়েকটি পুস্তকও রচনা করেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ খ্রী) সাহিত্যিক, অর্থনীতিবিশেষজ্ঞ, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান রমেন্দ্রচন্দ্র দত্ত রামবাগান দত্তপরিবারের ঈশানচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় (১৮৬৬ খ্রী) উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. পড়িতে পড়িতেই বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিসের শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তাঁহার বিবাহ হয়।

দেশে ফিরিয়া বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ও ওড়িশায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর, বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি পদে (১৮৭১-৯৭ খ্রী) বিশেষ কৃতিত্ব ও সুনামের সহিত কাজ করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় অবসর লইয়া বিলাতযাত্রা করেন। সেখানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপকপদে কাজ করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নিযুক্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বরোদায় রাজস্ব-সচিব-পদ গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেণ্ট্রালাই-জেশন কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। কমিশনের কাজ শেষ হইলে তিনি বরোদার দেওয়ান-পদে ফিরিয়া যান।

রাজকার্যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তাঁহার অন্তরে গভীর জাতীয়তাবোধ চিরজাগরূক ছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন মডারেটপন্থী।

রমেশচন্দ্রের ইংরেজী ও বাংলা রচনাবলীকে দুই ভাগে ফেলা যায়—ভারতবর্ষ-বিষয়ক, এবং সাহিত্য-বিষয়ক। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস, দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে লর্ড কার্জনকে লেখা পত্রাবলী, ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক আলোচনা, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতি প্রথম ভাগে পড়ে। পক্ষান্তরে সংস্কৃত কাব্যের ইংরেজী পদ্যানুবাদ, রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরেজী পদ্যানুবাদ, টীকাসহ ঋগ্‌বেদ সংহিতা (১৮৮৫-৮৭ খ্রী), হিন্দু শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ, এবং সর্বোপরি বাংলা উপন্যাসগুলি সমস্তই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। তাঁহার ইংরেজী রচনাগুলি বিদেশীদের ভারতকে চিনিবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক হয়। বিলাত হইতে ফিরিবার পর ইংরেজীতে Arcydae ছদ্মনামে কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন। ইতিপূর্বে তাঁহার 'থ্রি ইয়ার্স ইন ইওরোপ' (১৮৭২ খ্রী) বঙ্কিমসম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রশংসিত হইয়াছিল। অতঃপর বাংলা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছয়টি উপন্যাস লিখিলেন। প্রথম চারখানি উপন্যাস 'বঙ্গ-বিজেতা' (১৮৭৪ খ্রী), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭ খ্রী), 'জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮ খ্রী) এবং 'জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯ খ্রী) ঐতিহাসিক তথ্যে উজ্জ্বল মোগল যুগের পট-ভূমিতে রচিত। এগুলির মধ্যে দেশাত্মবোধের সুর অতি উচ্চে বাঁধা। 'সংসার' (১৮৮৬ খ্রী) ও 'সমাজ' (১৮৯৪ খ্রী) নামে দুখানি সামাজিক উপন্যাসে তিনি বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণবিবাহের সমর্থনসূচক কাহিনী লিখিয়াছেন। প্রথম উপন্যাসের কাহিনীর সূত্রই দ্বিতীয়-টির মধ্যে চলিয়াছে এবং দুইটির মধ্যেই পল্লীসমাজের বর্ণনার অবিসংবাদিত দক্ষতা পরিস্ফুট। রমেশচন্দ্র 'সংসার' (The Lake of Palms), এবং 'মাধবী-কঙ্কণে'র (The Slave Girl of Agra) ইংরেজী অনু-বাদও করিয়াছিলেন।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়াও রমেশচন্দ্র স্কুলের উপযোগী করিয়া বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়া-ছিলেন। ইংরেজীতে লেখা 'বাংলাসাহিত্য' নামক

বইটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতেও (১৯০২ খ্রী) তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

রমেশচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি (১৩০১ এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দ) ছিলেন। পরিষদভবনে একটি কক্ষ তাঁহারই নামাঙ্কিত। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ভবতোষ দত্ত

রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব স্থাপিত ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। ইংরেজ আমলে সেনানীরা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম ঘোড়দৌড় ক্রীড়ার প্রবর্তন করেন। কলিকাতায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই ক্রীড়ার প্রবর্তন হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কলিকাতা টার্ফ ক্লাব গঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ এবং রানী মেরী ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা রেসকোর্স পরিদর্শন করিলে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই ক্লাবের নামের আগে 'রয়্যাল' শব্দটি যুক্ত হয়। বর্ষাকালে ও শীতকালে কলিকাতায় ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ শনিবার এবং কখনও কখনও রবিবার বা অন্য ছুটির দিনেও রেসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

অধুনা ঘোড়দৌড়ের জয়-পরাজয় নির্ধারণে ভুল-ভ্রান্তি এড়াইবার জন্য ফটো-ফিনিস ক্যামেরার বন্দোবস্ত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক গণকের সাহায্যে টিকিট বিক্রয় এবং লভ্যাংশ প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এই ক্লাব হইতে প্রমোদকর বাবদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক ন্যূনাধিক দেড় কোটি টাকা আয় হয়।

রস, রোনাল্ড (১৮৫৭-১৯৩২ খ্রী) ম্যালেরিয়া রোগজীবাণু-আবিষ্কারক, ব্রিটিশ চিকিৎসক ও গবেষক। জন্ম ভারতবর্ষে আলমোড়া শহরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ মে। লণ্ডনের সেণ্ট বার্থলোমিউ হাসপাতালে চিকিৎসা-শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। কলিকাতার একটি হাসপাতালে (বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল) কর্তব্যরত থাকার সময় ঐ হাসপাতালে তাঁহার গবেষণাগারে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমণের কারণ আবিষ্কার করেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ চিকিৎসক স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন (১৮৪৪-১৯২২ খ্রী) মশকদংশনে মানবরক্তে ফাইলেরিয়ার সংক্রমণ আবিষ্কার করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী চিকিৎসক চার্লস লাভেরন (১৮৪৫-১৯২২ খ্রী) মানবরক্তে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার প্যাট্রিক অনুমান করেন ম্যালেরিয়াও মশকদংশন হইতে সংক্রামিত। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রস ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রস আবিষ্কার করেন যে এনোফেলিস্ মশকের দংশন হইতে মানবরক্তে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ হয়, এনোফেলিসের লালাস্রাবী গ্রন্থিতে ম্যালেরিয়া জীবাণুর আশ্রয়। রসের গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে ম্যালেরিয়ার রহস্য উন্মোচিত হয়, রোগজীবাণুর ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তর প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রস কিউলেক্স মশার দংশনে পক্ষিদেহে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ আবিষ্কার করেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ও লিভারপুলে স্কুল অভ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ বৎসর বয়সে রস ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার জন্য পশ্চিম আফ্রিকায় যান। সেখান হইতে যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া লিভারপুলের স্কুল অভ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে লেক্চারার ও পরে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক হন। রয়্যাল সোসাইটির তিনি ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল সোসাইটি রসকে রয়্যাল মেডাল প্রদান করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধীয় গবেষণার জন্য রস চিকিৎসাবিদ্যার নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রস লণ্ডনের কিংস কলেজ হাসপাতালে ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। পরে 'রস ইনস্টিট্যুট অ্যাণ্ড হসপিটাল ফর ট্রপিক্যাল ডিজিজেস'-এর ডিরেক্টর-ইন-চীফ্ হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ যুদ্ধ মন্ত্রকের ম্যালেরিয়া বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন।

রোনাল্ড রস বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় ও জীবাণুতত্ত্বে গবেষণা ও গ্রন্থরচনা ছাড়াও তিনি গণিত ও মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। 'দি রেভেলস্ অভ্ অরসেরা' নামে একখানি রোম্যান্সও লিখিয়াছিলেন। 'সায়েন্স প্রেসেস'-এর তিনি সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থঃ 'প্রিভেনশন অভ্ ম্যালেরিয়া' (১৯১০ খ্রী), 'ফিলসফিজ' (১৯১০ খ্রী), 'সাইকলজিস' (১৯১০ খ্রী), 'মেময়র্‌স্' (১৯২৩ খ্রী) ইত্যাদি।

মদনমোহন কুমার

রসময় দত্ত (১৭৭৯-১৮৫৪ খ্রী) কলিকাতার রামবাগান দত্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র। কলিকাতার ছোট আদালতে তিনিই প্রথম বাঙালী জজ

নিযুক্ত হন। বহু ভাষাবিদ্ ছিলেন। ইওরোপীয় এবং ভারতীয় আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই আদালতের কাজে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক মনোনীত হন এবং একটানা প্রায় দশ বৎসর আংশিক সময়ের জন্য এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মতভেদ ঘটায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কার্যভার বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হন। সেকালের বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-জীবনের সহিত তিনি সক্রিয়-ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত খ্রীষ্ট-ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার এক পুত্র গোবিন্দচন্দ্রেরই দুই কন্যা বিখ্যাত মহিলা-কবি অরু ও তরু দত্ত ('তরু দত্ত' দ্র)। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও ঔপন্যাসিক রমেশ-চন্দ্র দত্ত ('রমেশচন্দ্র দত্ত' দ্র) রসময়েরই বংশধর।

অমলেন্দু ঘোষ

রসায়ন প্রাচীন ভারতে রস বলিতে বুঝা যাইত গাছ-গাছড়া, লতাপাতা পেষণ করিয়া প্রাপ্ত রস অথবা জ্বাল দিয়া প্রাপ্ত ক্বাথ।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতে চরক আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহাতে আয়ুর্বৃদ্ধিকর জরা ও রোগনাশক ঔষধের নাম দেওয়া হইয়াছে রসায়ন।

ইওরোপের অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও একদা অ্যালকেমি বা কিমিয়াবিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করে। সিন্দুর দহন করিয়া তরল পারদ ধাতু পাওয়া যায়। সেযুগে একদিকে যেমন সোনা তৈয়ারির প্রচেষ্টায় পারদ লইয়া অনেক কাজ হয় অন্যদিকে তেমনি ঔষধে গাছ-গাছড়ার সঙ্গে পারদ-ঘটিত পদার্থও ব্যবহৃত হয়। তখন রস বলিতে প্রধানতঃ পারদকেই বুঝানো হইত।

নবম শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ্ হইলেন নাগার্জুন। তিনিই সর্বপ্রথম পারদ-গন্ধক-ঘটিত পদার্থ কজ্জলী ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে পৃথক্ প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর বা মকর-ধ্বজ, ঔষধ হিসাবে যাহার মর্যাদা আজিও অক্ষুণ্ণ। প্রস্তুতির পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্নরকম দেখাইলেও কজ্জলী, সিন্দুর এবং মকরধ্বজের মধ্যে উপাদানগত পার্থক্য কিছু নাই ; আধুনিক রসায়নশাস্ত্রে এই সবই মারকিউরিক সালফাইড নামে পরিচিত। যাহা হোক, ঔষধে পারদ এবং অন্যান্য ধাতুপ্রয়োগ করার নাম দেওয়া হয় রসায়ন। কালে কালে এই বিদ্যা অনেক সুশৃঙ্খল হইয়াছে এবং তাহার ফলে আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমানে বস্তুর উপাদান, ধর্ম এবং সম্বন্ধ-বিষয়ক বিদ্যাকেই রসায়ন বলা হয়। আধুনিক যুগে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে পদার্থের উপাদান ও গঠন, তাপ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ইহার উপাদান-গত স্থায়ী পরিবর্তন এবং দুই বা ততোধিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় তাহার নাম রসায়ন (chemistry)। রসায়নবিজ্ঞানকে কয়েকটি শ্রেণীতে ফেলা যায়ঃ অজৈব বা অ-কার্বনিক, জৈব বা কার্বনিক, ভৌত, বৈশ্লেষিক ও ফলিত রসায়ন। কার্বন-হীন মৌলের যৌগগুলির আলোচনার ক্ষেত্র অজৈব রসায়ন ; উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ হইতে প্রাপ্ত পদার্থের রাসায়নিক আলোচনার ক্ষেত্র জৈব রসায়ন ; পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের সীমারেখায় অবস্থিত তত্ত্বের আলোচনা-ক্ষেত্র ভৌত রসায়ন ; বিভিন্ন ধাতুর অবস্থিতি-নির্ণয়, পৃথকীকরণ বা তাহাদের পরিমাণ-নির্ণয় প্রভৃতি বৈশ্লেষিক রসায়নের অন্তর্গত এবং শিল্প উৎপাদনজনিত যে রসায়ন তাহাই ফলিত রসায়ন।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮ খ্রী) 'ইয়ং ক্যাল-কাটা' ও 'ফাইভ ফ্লাওয়ার্স অভ্ হিন্দু কলেজ'-এর অন্যতম। পিতা নবকিশোর ও মাতা মনোমোহিনী। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে যোগদান করিলে তাঁহার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন। হিন্দু কলেজের পাঠ শেষ করিয়া সিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করেন (১৮৩১ খ্রী)। হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন (১৮৩১-৩৭ খ্রী)। দ্বৈভাষিক সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রকাশে অন্যতম উদ্যোক্তা (১৮৩১-৪০ খ্রী)। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহার সম্পাদনায় কিছু দিনের জন্য সাময়িকী 'জ্ঞান-সিন্ধু-তরঙ্গ' প্রকাশিত হয়। সতীদাহ নিবারণ-প্রচেষ্টায় রামমোহন রায়ের এবং বিধবা-বিবাহ আইন পাশের পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রের সহায়তা করেন। তিনি হাইকোর্টে গঙ্গাজল স্পর্শে অঙ্গীকার করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন—আন্তরিক সাধুতাবশেই তিনি সত্য বলিবেন।

গোলোকেন্দু ঘোষ

রাইবেশে গৌড়বঙ্গের একটি প্রাচীন লোকনৃত্য। পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এই নৃত্য এখনো প্রচলিত আছে। বিবাহ ও অনুরূপ শুভকার্যে রাইবেশে নাচ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রাজবংশী (তিওর) ও বীর-বংশী (ডোম) যুবকেরা রাইবেশে দল গঠন করে। প্রতিটি দলে দশ বারোজন যুবক ও সেই সঙ্গে ঢোল, কাঁসি ও শিঙাবাদক থাকে। রাইবেশেরা সকলেই সুদক্ষ লাঠিয়াল। তাহাদের মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরণে ঘাগরা, গায়ে অঙ্গরাখা, পায়ে নূপুর, এবং মনিবন্ধে ঘুঙুর।

তাহারা উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে লাঠি ও সড়কি খেলা করে। রণোন্মত্ত বীরাঙ্গনার ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচে এবং লাঠি ও সড়কি লইয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাহাছাড়া নানারূপ খেলা ও অঙ্গ-সঞ্চালনের কৌশল প্রদর্শন করে। রাই বা রাধার ন্যায় বেশ ধারণ করে বলিয়া তাহাদিগকে 'রাইবেশে' বলা হয়।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স গোলটেবিল বৈঠক দ্র

রাউরকেলা ওড়িশার সুন্দরগড় জেলার ৯৮টি গ্রাম লইয়া গঠিত।

ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রসূত সরকারি লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জার্মানীর বিখ্যাত ক্রুপ ও ডিমাগ (Krupp and Demag) প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারের এক চুক্তিতে এই কেন্দ্রে প্রধানতঃ জাহাজ ও মোটরগাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরনের লৌহ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পরিকল্পনা হয়।

রাউরকেলা লৌহখনি ও কয়লা-চুনাপাথর অঞ্চলের অতি নিকটে অবস্থিত। রেলপথে কাঁচামাল আমদানি ও তৈয়ারি মাল রপ্তানি রেল সহযোগে করা হয় ও লৌহ প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য সম্প্রতি বহু শাখা পথ নির্মাণ করা হইয়াছে।

ওড়িশার অপেক্ষাকৃত অনুন্নত স্থানে এই কারখানা কেন্দ্র স্থাপন করায় ঐ স্থানের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করিতেছে। সরকারি সাহায্যে এখানে একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে। সার এবং কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য (আলকাতরা, বেনজিন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি) প্রস্তুত-করণের কারখানাও হইয়াছে।

প্রণীতা ভট্টাচার্য

রাউল্যাট অ্যাক্ট ইংরেজ আমলের কেন্দ্রীয় বিধানসভার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ সংখ্যক আইন। আসল নাম 'সন্ত্রাসমূলক বৈপ্লবিক অপরাধ আইন' (The Anarchical and Revolutionary Crimes Act), লর্ড জাস্টিস রাউল্যাট-এর নেতৃত্বে গঠিত সিডিশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রণীত বলিয়া রাউল্যাট অ্যাক্ট নামে খ্যাত। রাউল্যাট অ্যাক্টের প্রতিবাদকল্পেই সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রথম পদার্পণ। প্রবল জনবিক্ষোভ, ভারতব্যাপী হরতাল, জালিয়ানওয়ালাবাগ, অসহযোগ আন্দোলন ও তাহার ক্রমাভিব্যক্তি এই সমস্তই ইহার পরের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শৈবালকুমার গুপ্ত

রাওয়ালপিণ্ডি পাকিস্তান রাজ্যের অন্তর্গত জেলা ও শহর।

তক্ষশিলা রাওয়ালপিণ্ডি শহর হইতে ৪৮ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বর্তমান শহর অপেক্ষাকৃত নবীন। ছাউনি (ক্যান্টনমেণ্ট) অঞ্চলে গ্রীক-ব্যাস্ট্রিয়াক মুদ্রা, প্রাচীন ইষ্টক প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। ১৪শ শতাব্দীতে এই এলাকায় মোঙ্গলগণ হানা দেয়। শহরটির বর্তমান নামকরণ গাথর-দলপতি মণ্ডা খান-দ্বারা কৃত। দুইটি রাজপথ ইহাকে পেশোয়ার ও ভারতীয় কাশ্মীর রাজ্যের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের সময় শিখগণ এই শহরে আত্মসমর্পণ করেন; এই হিসাবে শহরটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। রাওয়ালপিণ্ডি পেশোয়ারের ৩২ কি. মি. পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে এবং লাহোরের ২৫৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। পেশোয়ারের সহিত রেলপথে ও রাজপথে যুক্ত। এই দুইটি পথ কলিকাতা পর্যন্ত প্রসারিত।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

রাংতা রাং নামক ধাতু হইতে প্রস্তুত পাতার মত পাতলা পাত বা তবক। ইহা বায়ু ও আর্দ্রতা-নিরোধক। ফটোগ্রাফী ফিল্ম, চকোলেট, সিগারেট প্রভৃতির আবরণী হিসাবে এবং সস্তা আয়নার পশ্চাদ্‌ভাগে, ইলেক্‌ট্রোটাইপিং, ইলেক্‌ট্রন-মাইক্রস্কোপ প্রভৃতিতে রাংতা ব্যবহার করা হয়। বায়ুশূন্য অবস্থায় পাতনদ্বারা অতি সূক্ষ্ম রাংতা পাওয়া যায়। আজকাল অনেক ক্ষেত্রে সীসা বা অ্যালুমিনিয়াম-পাত রাং-এর বদলে ব্যবহৃত হয়।

অমূল্যধন দেব

রাক্ষস রামায়ণে (উত্তরকাণ্ডঃ চতুর্থসর্গ) রাক্ষসদের উৎপত্তির বিবরণ আছে। সৃষ্টপ্রাণিগণের রক্ষার জন্য ব্রহ্মা অপর কয়েকটি জীবসৃষ্টি করিয়া মনুষ্যদিগের রক্ষাভার তাহাদের উপর অর্পণ করেন। 'রক্ষামঃ' উক্তি দ্বারা স্বকর্তব্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মা তাহাদের রাক্ষস আখ্যা দেন। হরপার্বতীর বরে রাক্ষসজাতি সদ্যঃ গর্ভত্যাগ ও সদ্যঃ পুত্রপ্রসব করিতে পারিত এবং সদ্যোজাত সন্তানের মাতৃতুল্য বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিত। রাক্ষসগণ মায়াবী, কামচারী, অমিতবলশালী, যজ্ঞনাশক ও বিবিধ রূপধারী। মহাভারতে বক, কির্মীর, হিড়িম্ব, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের উপাখ্যান পাওয়া যায়। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে হত্যা বা অঙ্গচ্ছেদ করিয়া গৃহপ্রাচীরাদি ভেদপূর্বক রোদনশীলা কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহের নাম ছিল রাক্ষসবিবাহ।

যূথিকা ঘোষ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০ খ্রী) মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী বহরমপুরে জন্ম। পিতা মতিলাল ঐ স্থানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে অনার্সসহ বি. এ. ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ বিষয়ে এম. এ. পাশ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও থিওডোর ব্লকের নিকট ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব-বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ভারতের প্রাচীন মুদ্রা ও লিপি-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এম. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ-পদে এবং পর বৎসরেই সহকারী সুপারিন্‌টেন্‌-ডেন্টের পদে নিযুক্ত হন (১৯১১ খ্রী)। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগে সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের পদে বহাল হন। ৭ বৎসর পরে কলিকাতায় বদলি হন। কিন্তু ২ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার সহিত গভর্নমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হয়। অফিস-সংক্রান্ত কয়েকটি ব্যাপারের জন্য গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং ভরণপোষণের জন্য সামান্য পেন্‌সন মঞ্জুর করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী' অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগে চাকরি করার সময়ে রাখালদাসের প্রধান কীর্তি মহেঞ্জোদড়োর ('মহেঞ্জোদড়ো' দ্র) ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার। রাখালদাসের আবিষ্কারের ফলে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাচীনতা এক হাজার বৎসর পিছাইয়া গেল এবং ইহা যে মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার প্রায় সমকালীন এবং এই সমুদয় সভ্যতার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও যোগাযোগ ছিল তাহাও প্রমাণিত হইল।

অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া তিনি বহু মূল্যবান্ ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশের পাহাড়পুরে পালযুগের যে বিরাট বিহার ও মন্দির ছিল তাহার খননকার্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের লিপি ও মুদ্রাপাঠে রাখালদাসের অনন্যসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁহার রচিত পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থরাজির মধ্যে 'দি অরিজিন অভ্‌ বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট' (১৯১৯ খ্রী), ভারতীয় মুদ্রাসম্বন্ধে প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'প্রাচীন মুদ্রা', 'পালস অভ্‌ বেঙ্গল' (১৯১৩ খ্রী), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১ম ভাগঃ হিন্দুযুগ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; ২য় ভাগঃ মুসলমান যুগ, ভারতীয়, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ), 'হিস্ট্রি অভ্‌ ওড়িশা' (২য় খন্ড, ১৯৩০-৩১ খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস বাংলা ভাষায় 'করুণা', 'ধর্মপাল' ও 'শশাঙ্ক' নামক তিনখানি উপন্যাস রচনা করেন। 'পাষাণের কথা' গ্রন্থে তিনি এক পাষাণখন্ডের মুখ দিয়া প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

রাখীবন্ধন১ শ্রাবণী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত উত্তরভারতের জনপ্রিয় উৎসব। এই উপলক্ষ্যে হাতে রক্ষা বা রাখী (রঙিন সুতা) বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাঁধার মন্ত্রে বলা হয়ঃ যাহা দ্বারা মহাবলশালী দানবরাজ বলিকে বন্ধন করা হইয়াছিল আমি তাহার দ্বারা তোমাকে বন্ধন করিতেছি ইত্যাদি। হিন্দু সমাজ ও জৈনদের মধ্যেও ইহা প্রচলিত। বাংলাদেশে এই উৎসবের তেমন প্রচলন ছিল না। তবে, আধুনিক যুগে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্মৃতিতে ৩০ আশ্বিন, এবং বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষ্যে আশ্বিনের শুক্লা-অষ্টমীতে নূতনভাবে এই উৎসবের প্রবর্তন করা হইয়াছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাখীবন্ধন২ বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে পালিত বাঙালীর জাতীয় ঐক্য-অনুষ্ঠান। ৩০ আশ্বিন ১৩১২ (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ খ্রী) বঙ্গদেশ আইনের দ্বারা খণ্ডিত হয়। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠে। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করেনঃ "আগামী ৩০ আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা খণ্ডিত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটি এই ঃ ভাই ভাই এক ঠাঁই।"

বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের এই আন্দোলনের ভিতর আনিবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলার ব্রতকথার ঢঙে অপূর্বসুন্দর ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' লিখিলেন।

৩০ আশ্বিন বঙ্গভঙ্গের দিন বাঙালী অরন্ধন পালন করিল, উপবাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিল, রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করিয়া নগ্নপদে শোভাযাত্রা করিয়া ভাগীরথীতীরে সমবেত হইয়া হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের হাতে 'স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে' রাখীবন্ধন করিল। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গান বাংলার সর্বত্র ধ্বনিত হইল। ঐ দিন অপরাহ্নে ২৯৪ আপার সার্কুলার রোডে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে 'ফেডারেশন হল্'-এর (জাতীয় মিলন মন্দিরের) ভিত্তিস্থাপনা হইল।

মদনমোহন কুমার

রাঙামাটি কর্ণসুবর্ণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম দ্র

রাঁচি বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর বিভাগের বৃহত্তম জেলা। উত্তরে পালামৌ ও হাজারীবাগ জেলা; পূর্বে পুরুলিয়া (পশ্চিম বাংলা); দক্ষিণে সিংহভূম এবং সুন্দরগড় (ওড়িশা) এবং পশ্চিমে রায়গড় (মধ্যপ্রদেশ)। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১২৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ছোটনাগপুর বিভাগের প্রধান কার্যালয় ও বিহার রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

জেলার প্রধান নদী সুবর্ণরেখা, দক্ষিণ কোয়েল এবং শঙ্খ। হুড্রু (বা হুণ্ড্রু), জোনা জলপ্রপাত দুইটি, এবং দামোদর নদের উৎপত্তিস্থল ও রাজরপ্পা মনোরম দ্রষ্টব্য স্থল।

কয়লা, অ্যাসবেস্টস, বেরাইট, পাথর ও অন্যান্য খনিজসম্পদ পাওয়া যায়। জেলার অনেক অংশ ব্যাপিয়া গভীর অরণ্য আছে। প্রাচীনকালে জেলাটির অধিকাংশ অঞ্চলই মুণ্ডা ও ওঁরাও উপজাতি দ্বারা অধিকৃত ছিল; তৎকালীন নাম ছিল সাড়খণ্ড (জঙ্গল এলাকা)। হিন্দী, মুণ্ডারী ও ওঁরাও প্রধান ভাষাগুলির অন্যতম। প্রধান শিল্প লাক্ষা উৎপাদন। রাঁচির কারখানা বিখ্যাত। লোহ:র ডাগার তামা ও কাঁসার তৈজসপত্র উল্লেখযোগ্য।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (?) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্নেহভাজন সাহিত্যিক। গ্রীক-কাহিনী অবলম্বনে রচিত ফরাসী পণ্ডিত ফেনেলন-এর 'টেলিমেকস' গ্রন্থটির তিনি বাংলা ভাষায় ভাবানুবাদ করেন (১২৬৫ বঙ্গাব্দ)। এটি একটি সুখপাঠ্য রচনা।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬ খ্রী) নদিয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে জন্ম। পিতা আনন্দচন্দ্র। প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজ ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ক্ষান্তমণি দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, এবং কটক, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের বাংলা অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বাংলাসাহিত্যে প্রথম কবিরূপে আবির্ভূত হন। প্রথম গ্রন্থ 'যৌবনোদ্যান' কাব্য (১৮৬৮ খ্রী)। পরে গদ্য রচনায় হাত দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনে ইতিহাস-পুরাতত্ত্ব-দর্শন-সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁহার 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৮৭৪ খ্রী) গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। তাঁহার লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: 'মিত্রবিলাপ' (১৮৬৯ খ্রী) 'কাব্য-কলাপ' (১৮৭০ খ্রী), 'রাজবালা' (১৮৭০ খ্রী), 'কবিতামালা' (১৮৭৭ খ্রী), 'নানা প্রবন্ধ' (১৮৮৫ খ্রী)।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪ খ্রী) কাব্য-কবিতা, নাটক-প্রহসন, উপন্যাস-গল্প ও গদ্যগ্রন্থের অক্লান্ত লেখক। 'বীণা' পত্রিকা (১৮৭৮ খ্রী) ও 'বীণা-রঙ্গভূমি'র (১৮৮৭ খ্রী) প্রতিষ্ঠাতা। বীণা, বেঙ্গল. ন্যাশনাল ও স্টার থিয়েটারে তাঁহার বহু নাটক অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার রচিত প্রথম নাটক 'পতিব্রতা' (১৮৭৫ খ্রী)। সর্বপ্রথম 'হরধনুভঙ্গ' ১৮৮১ খ্রী) নাটকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। 'বর্ষার মেঘ' (আর্যদর্শন, জুলাই ১৮৮৪ খ্রী) কবিতায় ও 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪ খ্রী) নাটকে গদ্য-কবিতা রচনা প্রয়াসের কৃতিত্ব রাজকৃষ্ণের। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) ও নরমেধযজ্ঞ (১৮৯১ খ্রী) তাঁহার সর্বাধিক জনপ্রিয় নাটক। 'অবসর-সরোজিনী' (১৮৭৬-৭৯ খ্রী) তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

রজত রায়চৌধুরী

রাজকোট গুজরাট রাজ্যের একটি জেলা, সৌরাষ্ট্র উপদ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। জেলার আয়তন ১১০৬১.৬ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১২০৮৫১৯ (১৯৬১ খ্রী)। পূর্বে এই জেলা মধ্যসৌরাষ্ট্র নামে পরিচিত ছিল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকোট নামকরণ হয়। সমুদ্র এবং অন্যত্র হইতে প্রচুর মৎস্য সংগ্রহ করা হয়; তবে অধিবাসীরা মৎস্য শিকারের বিপক্ষে। এই জেলা হইতে প্রচুর লঙ্কা, চীনাবাদাম ও রেড়ির বীজ রপ্তানি করা হয়। রাজকোট অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী। শহরের প্রধান প্রধান দর্শনীয় বস্তু ধর্মেন্দ্র সিংজী কলেজ, কোটক ইন্স্টিটিউট অভ্ সায়েন্স, অন্যান্য কারিগরী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ল্যাং ও লখানীরাজ গ্রন্থাগার, ওয়াস্টসন মিউজিয়াম, রাষ্ট্রীয়শালা, বালভবন ইত্যাদি। জাতীয় আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। রাজকোটের স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার ও নানা প্রকার হাতের কাজ ভারতবিখ্যাত।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

রাজগৃহ, রাজগির (২৫°২′ উ. ৮৫°২৬′ পূর্ব) বর্তমান রাজগির বিহারে অবস্থিত, পাটনা হইতে প্রায়

৬৪ কি. মি. দক্ষিণপূর্বে। মহাভারতোক্ত জরাসন্ধের 'গিরিব্রজে' পরবর্তীকালে বিম্বিসার রাজগৃহ স্থাপন করেন। প্রাচীনকালের বহু স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখা যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থ-স্থান। বর্ধমান মহাবীর এই স্থানে চতুর্দশবার বর্ষাবাস করেন। তাঁহার প্রধান দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে একাদশজনের দেহাবসান এখানেই ঘটে। মহাবীরের পূর্বের বিংশতি সংখ্যক তীর্থংকর মুনিসুব্রতের জন্মস্থান। মহাবীরের নির্বাণের সহস্র বৎসর পরেও এখানে জৈনদের প্রভাব হ্রাস পায় নাই। হিউএন্-ৎসাঙ লিখিয়াছেন, যে-পর্বতে একদা বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হইত, তাহারই উপরে বহু দিগম্বর সন্ন্যাসী উপাসনা করিতেন এবং বৈভার পর্বতেও দিগম্বর সন্ন্যাসীদের বাস ছিল। রাজগৃহের পাঁচটি পর্বতের শিখরেই জৈনমন্দির বর্তমান। বুদ্ধদেবও বহুবার এখানে আসেন ; এবং এখানেই তিনি প্রথম ভিক্ষায় বাহির হন। রাজগৃহস্থ গৃধ্রকূট পর্বতে বুদ্ধদেব দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সপ্তপর্ণী গুহায় শিষ্যগণ প্রথম সমবেত হন বলিয়া কিংবদন্তী।

এখানে অপূর্ব অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ আছে। লক্ষ লক্ষ নরনারী এই প্রস্রবণের উষ্ণজলে স্নান করিতে আসেন এবং স্থানটি স্বাস্থ্য-নিবাস হিসাবে পরিগণিত হয়।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রী)। আদি নিবাস চব্বিশ পরগনা জেলার বোড়াল গ্রাম। পিতা নন্দকিশোর/ হিন্দু কলেজে (প্রবেশ ১৮৪০ খ্রী) ক্যাপটেন রিচার্ড সনের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়ী। রাজনারায়ণ ফার. ভাষাও জানিতেন।

ছাত্রজীবনে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের অনেকের মত রাজনারায়ণও কুসংস্কার ভঙ্গের উগ্র প্রেরণায় মত্ত হন এবং ধর্মমতের দিক্ হইতে সংশয়বাদী হইয়া উঠেন। কিন্তু পিতা ও প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া বৈদান্তিক ধর্ম বা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। কঠ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের ইংরেজী তর্জমা করেন।

যাহাতে দেশের কল্যাণ হয় তাহাই দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের স্বপ্ন ও সাধনা ছিল। হিন্দুমেলার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক উৎসবে রাজনারায়ণ সভাপতিত্ব করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাঁহার পরিচালিত 'সঞ্জীবনী সভা' নামক গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেমে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণের রচিত 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪ খ্রী), 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত' (১৮৭৬ খ্রী), 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৯৩ খ্রী), এবং 'আত্মচরিত' (১৯০৯ খ্রী) স্মৃতিমূলক গ্রন্থ। মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন, 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ (১৮৮২ খ্রী) সংকলিত 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা' (১ম ভাগ, ১৮৬৬ খ্রী, ও ২য় ভাগ, ১৮৬৭ খ্রী), 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩ খ্রী), 'বৃদ্ধহিন্দুর আশা' (১৮৮৭ খ্রী), 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮ খ্রী), 'আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত' (১৮৬৭ খ্রী) প্রভৃতি তৎকৃত উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি ইংরেজীতে ব্রাহ্মধর্ম এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কেও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ পরলোকগত হন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রাজবল্লভ পূর্ববঙ্গের বৈদ্যকুলে জন্ম। কৌলিব উপাধি সেনগুপ্ত। আলীবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা নোয়াজিস্ খাঁর অধীনে সরকারি কর্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নোয়াজিস্ খাঁর মৃত্যুর পর রাজবল্লভ তাঁহার বিধবা পত্নী ঘর্টেসি বেগমের দেওয়ান হন। বিষয়কর্ম উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে আসিলে সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার ধনরত্ন হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাঁহাকে কয়েদ করেন। কিন্তু রাজবল্লভের ধনরত্ন সিরাজুদ্দৌলার হস্তগত হয় নাই। কারণ পুত্র কৃষ্ণবল্লভ তাঁহার অস্থাবর ধনসম্পত্তি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মীরজাফর বাংলার নবাব হইলে তিনি মীরজাফর পুত্র মীরণের দেওয়ান হন এবং সুবে বাংলার দেওয়ান দুর্লভরাম কর্মচ্যুত হইলে সেই পদে উন্নীত হন। মীরকাশিমের রাজত্বকালেও কিছুদিন রাজবল্লভ ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি বিহারের শাসনকর্তা হন। কিন্তু মনোমালিন্য ঘটায় মীরকাশিম তাঁহাকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারেন। তিনি পূর্বাঞ্চলের বৈদ্যদের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার প্রবর্তনের এবং অল্পবয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার সময়ে দুইটি চেষ্টার কোনওটিই সফল হয় নাই।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

রাজমহল পাহাড়। বিহারের সাঁওতাল পরগনা জেলার সাহেবগঞ্জ হইতে রামপুরহাট রোড স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূবিদ্যামতে এই পাহাড় বিন্ধ্য পাহাড়ের অংশ

নহে, ইহা একটি বিচ্ছিন্ন পর্ব। ইহা অপেক্ষাকৃত নবীন ব্যাসাল্ট্ নামক আগ্নেয় শিলায় গঠিত ও গন্ডোয়ানা-যুগের নীস জাতীয় রূপান্তরিত শিলা ও কয়লাস্তরের উপর সজ্জিত আছে। মুসলমানযুগে ইহাকে 'দামান-ই-খো' বলিত। আকবরের মন্ত্রী মানসিংহ ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। রামজহল শহর সাঁওতাল পরগনা জেলার রাজমহল মহকুমার প্রধান শহর ও গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। পুরাতন শহরের ধ্বংসস্তূপ শহরের ৬ কি. মি. পশ্চিমে। জুম্মা মসজিদ, সুলতান সুজার ও মীরকাশিম আলীর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও ফুলের বাগান দর্শনীয়।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রাজশাহী পূর্বদিকে ভারতের আসাম রাজ্য ও স্বাধীন বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ; পশ্চিমদিকে দিনাজপুর বিভাগ; দক্ষিণে বগুড়া ও উত্তরে ভারতের কুচবিহার অবস্থিত।

পদ্মা ও মহানন্দা দুইটি উল্লেখযোগ্য নদী। ইহাদের মধ্যে পদ্মা দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত। রাজশাহী জেলা পুরাকালে পৌণ্ড্র্য বা পৌণ্ড্রবর্ধন নামে এবং সেন-রাজবংশের শাসনকালে বরেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। কেহ কেহ বলেন, রাজা গণেশের (১৪০৮-১৪২১ খ্রী) পর হইতে রাজশাহী নামের প্রচলন। এখানে মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওরাঁও প্রভৃতি আদি-বাসী কিছু আছে। অধুনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

রাজশেখর রাজশেখরের গ্রন্থাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন দর্দুক বা দুহিক ও শীলবতীর পুত্র। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্রে বাস করিতেন: কিন্তু তিনি নিজে বহুকাল মহোদয় বা কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্রপাল ও তৎপুত্র মহীপালের উপাধ্যায় ছিলেন এবং পরে ত্রিপুরীর কলচুরি-রাজ প্রথম যুবরাজ কেয়ূরবর্ষের আশ্রিত ছিলেন। তাঁহার কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার 'বালকবি' ও 'কবিরাজ' উপাধি দেখা যায়। তাঁহার কাল খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের শেষ পাদ হইতে ১০ম শতকের প্রথম পাদ বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজশেখর জৈন রাজ-শেখর সূরি হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

রাজশেখরের সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থগুলির নাম: 'বাল-রামায়ণ' (দশাঙ্ক), 'বালভারত' ও 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' (মাত্র দুই অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে)। তাঁহার রচনায় মুরারি, ভবভূতি ও শ্রীহর্ষের প্রভাব সুস্পষ্ট। সর্বাধিক জনপ্রিয় হইতেছে তাঁহার 'কর্পূরমঞ্জরী' নামক সট্টক-শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থ। ইহা ছাড়া কবি ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি 'কাব্য মীমাংসা' নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০ খ্রী) জন্ম: ১৬ মার্চ বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের নিকটস্থ বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলগৃহে। মৃত্যু: কলিকাতায় ২৭ এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা চন্দ্রশেখরের নিজবাড়ি নদিয়া জেলার বীরনগর (উলা), কর্মব্যপ-দেশে বিহারে বসবাস করিতেন। রাজশেখর দ্বার-ভাঙ্গার রাজ স্কুল হইতে এন্ট্রান্স (১৮৯৫ খ্রী) ও পাটনা কলেজ হইতে ফার্স্ট আর্টস (১৮৯৭ খ্রী) পাস করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এ. ক্লাসের বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ওই বৎসরই শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের পৌত্রী মৃণালিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্সে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাস করেন। রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯০০ খ্রী)। দুই বৎসর পরে বি. এল. পাস করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে আসিয়া রাজশেখর বেঙ্গল কেমিক্যালের রাসায়নিকের পদ গ্রহণ করেন (১৯০৩ খ্রী)। কালক্রমে এখানকার সর্বময় কর্তা হন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিলেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উপদেষ্টা হিসাবে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'পরশুরাম' ছদ্মনামে তাঁহার 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' ব্যঙ্গ রচনাটি প্রকাশিত হয়। হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়ী ইত্যাদি ভাষায় তাঁহার রচনা অনূদিত হইয়াছে।

জগত্তারিণী পদক (১৯৪০ খ্রী), সরোজিনী পদক (১৯৫৫ খ্রী), রবীন্দ্র-পুরস্কার, সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার প্রভৃতির দ্বারা সম্মানিত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্. উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থতালিকা: গড্ডলিকা (১৩৩১ বঙ্গাব্দ); কজ্জলী (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ); চলন্তিকা (অভিধান: ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ); হনুমানের স্বপ্ন (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ); লঘুগুরু (১৩৪৬ বঙ্গাব্দ); মেঘদূত (১৩৫০ বঙ্গাব্দ); কুটীরশিল্প (১৩৫০ বঙ্গাব্দ); ভারতের খনিজ (১৩৫০ বঙ্গাব্দ); বাল্মীকি রামায়ণ (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ); মহাভারত (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ); হিতো-পদেশের গল্প (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ); গল্পকল্প (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ); ধুস্তুরীমায়া (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ); কৃষ্ণকলি (১৩৬০ বঙ্গাব্দ); বিচিন্তা (১৩৬২ বঙ্গাব্দ);

নীলতারা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ); আনন্দীবাঈ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

রাজ সিংহ মেবারের রাণা জগৎ সিংহের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৫৪ খ্রী)। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু ও রাজপুত বিদ্বেষ-নীতি এবং জিজিয়া কর পুনঃস্থাপনের জন্য অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। ঔরঙ্গজেব মারোয়াড় দখল করিলে মারোয়াড়ের শিশুরাজা অজিত সিংহ ও তাঁহার মাতাকে আশ্রয় দিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতীয় যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন। মোগল-শক্তি শেষপর্যন্ত মেবারের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে আগ্রহী হয়। কিন্তু আলোচনা আরম্ভের পূর্বেই রাজ সিংহের মৃত্যু হয় (১৬৮০ খ্রী)।

কুমুদরঞ্জন দাস

রাজসূয় রাজার করণীয় বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। ইহা একাহ অর্থাৎ একদিনে সম্পাদ্য সোমযাগ। ইহাতে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয়।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

রাজস্থান ভারতের একটি রাজ্য ২৩°৩′-৩০°১২′ উ, ৬৯°৩০′-৭৮°১৭′ পূ)। উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে পাকিস্তান, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাত। আরাবল্লী পর্বতমালা ইহাকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছে। রাজস্থানের জলবায়ু চরম প্রকৃতির। শীত ও গ্রীষ্মের এবং দিন ও রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন গড় উত্তাপ যথাক্রমে ৩৫° সে. ও ১৬° সে.। পশ্চিম অংশ প্রায় বৃষ্টিহীন। রাজস্থানের লোকসংখ্যা ২০১৫৫৬০২ (১৯৬১ খ্রী)। ১০৫৬৪০৮২ জন পুরুষ. ৯৫৯১৫২০ জন স্ত্রীলোক। শুষ্ক অঞ্চল বলিয়া রাজস্থানে চাষের খুবই অসুবিধা। বর্তমানে নানা সেচপ্রকল্পের দ্বারা চাষের উন্নতি করা হইতেছে। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য গম, যব, জোয়ার, ছোলা ও ভুট্টা। কিছু পরিমাণ তুলা, চিনাবাদাম, তৈলবীজ, ইক্ষু, তামাক, ধান, আলুও জন্মায়।

রাজস্থান খনিজসম্পদে পূর্ণ। ব্যারিথোরিয়াম সালফেট, এমারেল্ড, দস্তা, সীসা, মার্বেল পাথর, ম্যাঙ্গানিজ, রূপা, সাজিমাটি, জিপ্‌সাম, অ্যাস্‌বেস্টস, তাম্র, চুনাপাথর, কোবাল্ট, কয়লা, অভ্র প্রভৃতি এবং হ্রদ-গুলি হইতে সোডিয়াম সালফেট ও লবণ পাওয়া যায়। সূচীশিল্পে, হাতির দাঁত, এনামেল বাঁধনী শাড়ি, সোনা-রূপার উপর মিনা প্রভৃতির কাজে এখানকার নাম আছে। বহু ঐতিহাসিক নগর ও মন্দিরাদি আছে।

ঈশ্বরপ্রসাদ মুরারকা

রাজস্থানী ভাষা রাজস্থানে ও আশেপাশে কথিত নব্য-ভারতীয় আর্যভাষা। রাজস্থানীর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বপ্রথম গ্রীয়ার্সন। 'রাজস্থানী' নাম-করণও তাঁহার। গ্রীয়ার্সন রাজস্থানীর অন্ততঃ ১৬টি উপভাষা স্বীকার করিয়াছেন। প্রধান উপভাষা চারটিঃ মেওয়াতী, মালবী, জয়পুরী বা ঢুণ্ডারী এবং মারোয়াড়ী।

রাজস্থানীর উপভাষাগুলির মধ্যে মারোয়াড়ীর স্থান সর্বাগ্রগণ্য, ইহা রাজস্থানের আদর্শ সাহিত্যিক ভাষা—যোধপুর ইহার কেন্দ্র। মূল ভাষাঞ্চল হইল পশ্চিম রাজস্থান (মারোয়াড়, মেবার, বিকানীর, উদয়পুর, জয়সলমীর)। পশ্চিমা রাজস্থানী অর্থাৎ মারোয়াড়ী এবং গুজরাতী 'প্রাচীন পশ্চিমা রাজস্থানী' হইতে উদ্ভূত। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতক হইতে রাজস্থানী (বিশেষতঃ মারোয়াড়ী) ও গুজরাতী পৃথক্ হইয়া গিয়াছে।

জয়পুরী বা ঢুণ্ডারী পূর্ব রাজস্থানের প্রতিনিধি-স্থানীয় ভাষা। জয়পুরী জয়পুর, লাওয়া, কিসনগড় এবং আজমীর-মেরোয়াড়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এবং ইহার বিভাষা হাড়ৌতী, কোটা ও বুন্দী অঞ্চলে প্রচলিত। ইহাতে মারোয়াড়ী, গুজরাতী এবং ব্রজভাষার প্রভাব যথেষ্ট।

রাজস্থানী ভাষার কয়েকটি লক্ষণ হইল—মূর্ধন্য ণ ও ল্ ধ্বনির অস্তিত্ব, অন্তঃস্থ ব্ ও বর্গীয় ব্-ধ্বনি-দ্বয়ের পার্থক্য, দুইটি লিঙ্গ (পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ), বহুবচনে ও তির্যক্ কারকের একবচনে 'আঁ' বিভক্তি অনুসর্গীয় প্রত্যয়ের উপভাষাগত প্রাচুর্য, অতীতকাল কৃদন্ত পদজাত, 'ল'-যোগে নবীন ভবিষ্যৎকাল গঠন, সংস্কৃত স্য-জাত বিভক্তির সংরক্ষণ ইত্যাদি।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

রাজস্থানী সাহিত্য রাজস্থানী সাহিত্যের আদিযুগ একাদশ হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। আদি-যুগের সাহিত্যের ভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বৈশিষ্ট্য-সহ প্রাচীন রাজস্থানী ও প্রাচীন গুজরাতীর এক মিশ্ররূপ। এই যুগের সাহিত্য প্রধানতঃ জৈনধর্মকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইহার গৌরবকাল। পশ্চিমা রাজস্থানী বা মারোয়াড়ী ভাষাই ধীরে ধীরে সমগ্র রাজস্থানের সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয় এবং এই ভাষার সাহিত্যই উত্তর ভারতের ইতিহাসে ডিঙ্গল সাহিত্য নামে প্রসিদ্ধ। সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কল্লোল-বিরচিত প্রেমগাথা 'ঢোলা-মারূরা দূহা'। ডিঙ্গল সাহিত্যের অপর একখানি প্রসিদ্ধ কাব্য কবি পৃথ্বী-

রাজের 'বেলিত্রিসন রুকমনীরী' শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর বিবাহ ইহার বিষয়। ষোড়শ শতাব্দী হইতে রাজস্থানী সাহিত্যে ভক্তিধারার রূপটি প্রকট। আধুনিক যুগের সূত্রপাত কবি সূরজমলের সময় (১৮১৫-১৮৬৩ খ্রী) হইতে। ইনি বীররসের শ্রেষ্ঠ কবি। আধুনিক কবিদের মধ্যে কন্‌হৈয়ালাল সেঠিয়া, রামনিবাস হারীত, মেঘরাজ গণপতি স্বামী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজস্থানীর গদ্য-সাহিত্য অকিঞ্চিৎকর।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

রাজস্ব সরকারি আয়-ব্যয়নীতি দ্র

রাজারাম (১৬৭০-১৭০০ খ্রী) শিবাজী ও সয়রাবাইর পুত্র। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভুজীর মৃত্যুর পর ছত্রপতিপদে অভিষিক্ত হন এবং দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মারাঠা জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজধানী রায়গড়ের পতনের পর (নভেম্বর ১৬৮৯ খ্রী) জিঞ্জীতে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। জিঞ্জীর পতনের পর ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাতারায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আংশিক সাফল্যলাভ করিলেও মহারাষ্ট্রে জায়গীর-প্রথা পুনঃপ্রবর্তিত করিয়া তিনি মারাঠা সর্দারদিগের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজ্যশাসনে দুর্বলতা ঘটান।

কল্যাণকুমার সেনগুপ্ত

রাজিয়া সম্রাজ্ঞী রাজিয়া দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিলেও দিল্লীর আমির-ওমরাহগণ স্ত্রীলোকের শাসনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা রাজিয়ার অযোগ্য ভ্রাতা রুকনুদ্দীনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজিয়াকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (১২৩৬-৪০ খ্রী)। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন এবং দক্ষতার সহিত শাসনকার্য সম্পন্ন করিতেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের ('মিনহাজ-ই-সিরাজ' দ্র) মতে তিনি ছিলেন বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ, দয়াশীল, সুবিচারক, বিদ্যোৎসাহী, প্রজাবৎসল, সমরকুশল এবং রাজোচিত অন্যান্য গুণের অধিকারিণী। কিন্তু রাজ্যশাসনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও রাজ্যের তুর্কি আমিরবর্গ তাঁহার বিপক্ষে যান। প্রথমতঃ স্ত্রীলোক হইয়া প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত হওয়া বা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা তাঁহাদের নিকট দৃষ্টিকটু ও ধর্মবিরুদ্ধ মনে হয়; দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁহার অশ্বশালার অধ্যক্ষ জামালউদ্দীন ইয়াকুৎ নামক এক হাবসী-দাসের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করায় তাঁহার প্রতি আমিরবর্গের বিরাগ আরও বৃদ্ধি পায়। সরহিন্দের শাসনকর্তা আলতুনিয়া প্রথমে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিলে অনেক আমির গোপনে তাঁহাকে সমর্থন করেন। বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া তিনি বন্দী হন। দিল্লীর আমিরগণ তাঁহার এক ভ্রাতা মুইজুদ্দীন বহরম্ শাহকে সিংহাসনে বসান। রাজিয়া বিদ্রোহী-নেতা আলতুনিয়াকে বিবাহ করিয়া স্বপক্ষে আনিয়া দিল্লী পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ ও বিদ্রোহীদের হাতে স্বামীসহ নিহত হন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় (?) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ('ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' দ্র) কার্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কেরি ('কেরি, উইলিয়াম' দ্র) তাঁহার সহকারীদের দ্বারা বাংলা গদ্যে গ্রন্থরচনা করাইতে লাগিলেন এবং নিজেও কিছু কিছু রচনা করিলেন। এই সমস্ত গ্রন্থ শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। কেরির সহকারী লেখকদের মধ্যে অন্যতম এই রাজীবলোচন। ইঁহার লেখা 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার একটি সংস্করণ লন্ডনেও ছাপা হয় (১৮১১ খ্রী)।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৩-১৯৩৫ খ্রী) সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও সুলেখক। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। 'কালিদাস ও ভবভূতি' (১৩১৩ বঙ্গাব্দ), 'কালিদাস' (১৩১৫ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীকণ্ঠ' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ), 'তপোবন' (১৩২০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার পাণ্ডিত্য ও রসবোধের নিদর্শন। কালিদাসের কয়েকখানি কাব্য ইনি বাংলায় অনুবাদও করিয়া গিয়াছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৫৪-১৯৩৬ খ্রী) ভারতের যশস্বী শিল্পপতি। ভারতবিখ্যাত শিল্পসংস্থা মার্টিন অ্যান্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ নির্মাণে তাঁহার স্থাপত্যশিল্পজ্ঞানের অপূর্ব পরিচয় মেলে। তিনি কলিকাতার শেরিফ মনোনীত ও 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন (১৯১১ খ্রী)। বিবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয় তাঁহাকে সাম্মানিক ডি. এস.-সি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯৩১ খ্রী)।

রমেশ ঘোষাল

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১ খ্রী) জন্ম কলিকাতার উপকণ্ঠ শুঁড়ায়। পিতা জনমেজয়। কয়েক বৎসর মেডিক্যাল কলেজে ও পরে আইন পড়েন। সংস্কৃত, ফার্সী, উর্দু ও হিন্দী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও লাইব্রেরিয়ান-এর পদ লাভ করেন (১৮৪৬ খ্রী)। দশ বৎসর সোসাইটির লাইব্রেরিয়ানের পদে থাকেন। এই সময় তাঁহার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'জার্নাল অভ্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি'তে বাহির হয়। কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেন; সেগুলি সোসাইটির 'বিব্লিওথিকা ইন্ডিকা' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হয়।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সারস্বত সমাজ' প্রভৃতি সংস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সর্বপ্রথম সম্মানসূচক ডক্টর অভ্ ল উপাধিতে ভূষিত করেন (১৮৭৬ খ্রী)। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেন্ট-পদে বৃত হন। 'রায় বাহাদুর' (১৮৭৭ খ্রী), 'সি.আই. ই.' (১৮৭৮ খ্রী) ও 'রাজা' (১৮৮৮ খ্রী) উপাধি লাভ করেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের স্তম্ভরূপে দীর্ঘকাল ইহার সহিত যুক্ত থাকেন। কয়েকবার ইহার সহসভাপতি ও সভাপতি হন। কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি (১৮৮৬ খ্রী)। বিলেতী 'পেনি ম্যাগাজিন'-এর আদর্শে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে সচিত্র মাসিকপত্র বাহির করেন (১৮৫১ খ্রী)। অতঃপর 'রহস্য-সন্দর্ভ' নামে যে সচিত্র মাসিক-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে (১৮৬৩ খ্রী),তিনি তাহার সম্পাদক হন। পঞ্চম-পর্বের পত্র সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৫০-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সহায়তায় সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বঙ্গাক্ষরে কয়েকটি মানচিত্র প্রকাশিত করেন।

সুশীলকুমার গুপ্ত

রাজ্যপাল (গভর্নর) রাজ্যের পালক ও সংরক্ষক। রাজ্যসমূহের শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থারই অনুরূপ। তবে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন। রাজ্যসমূহের এই দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন করিয়া রাজ্যপাল নিযুক্ত আছেন। রাজ্যপালকে নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। সাধারণতঃ তাঁহার কার্যকাল ৫ বৎসর। কিন্তু প্রয়োজন বোধে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় তাঁহাকে অপসারিত করিতে পারেন। রাজ্যপালের ন্যূনতম বয়স ৩৫ বৎসর এবং ভারতীয় নাগরিক হওয়া চাই। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা মাত্র। কিন্তু দুইটি বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা ডিস্‌ক্রিশনারি পাওয়ার আছে—ক. রাজ্যের তপশীলী উপজাতি অঞ্চলের (শিডিউল্ড এরিয়া) শাসন ব্যাপারে, এবং খ. শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সম্বন্ধে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সহিত পরামর্শ না করিয়াও রাষ্ট্রপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। রাজ্যপাল রাজ্যের আইনসভার অধিবেশন আহবান করেন। কিন্তু প্রয়োজনবোধে পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং বিধানসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোনও 'বিল' আইনে পরিণত করা যায় না। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে, তিনি অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন জারি করিতে পারেন। রাজ্যপালের সুপারিশ ব্যতীত খরচের কোনও টাকা বিধান সভার নিকট দাবি করা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। এইসব কারণে রাজ্যপালকে সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অধিনায়ক বলা যায়।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাজ্যবর্ধন স্থানীশ্বরের (থানেশ্বরের) পুষ্যভূতি বংশীয় নৃপতি প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকরবর্ধনের রাজ্য হূনদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে যুবরাজ রাজ্যবর্ধনকে হূনদের বিরুদ্ধে উত্তর-ভারতে প্রেরণ করা হয়। এই সময় প্রভাকরবর্ধনের আকস্মিক অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। রাজধানীতে ফিরিয়া পিতাকে জীবিত দেখিতে পান নাই।

মৌখরী ('মৌখরী বংশ' দ্র) ও পুষ্যভূতি ('পুষ্যভূতি বংশ' দ্র) বংশের শত্রু মালবরাজ দেবগুপ্ত, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু (৬০৫ খ্রী)-র সংবাদ পাইয়াই কনৌজ আক্রমণ করেন এবং প্রভাকরবর্ধনের জামাতা কনৌজ-রাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যু এবং ভগিনী রাজ্যশ্রী বন্দিনী হওয়ায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনকে রাজ্যভার দিয়া তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হন। কিন্তু দেবগুপ্তের মিত্র গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক মিত্রতার ছলে কৌশল করিয়া রাজ্যবর্ধনকে নিজ শিবিরে আনিয়া হত্যা করেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'হর্ষবর্ধন' দ্র।

নিরঞ্জন ঘোষ

রাজ্যশ্রী সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভগিনী। কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্মা বা গ্রহবর্মণের ('গ্রহবর্মা' দ্র) সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রাজ্যশ্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন। বিবাহের কিছুকাল পরে মালবের রাজা গ্রহবর্মণকে হত্যা করিয়া রাজ্যশ্রীকে অপহরণ করিয়া বন্দী করিয়া রাখেন। কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া রাজ্যশ্রী বিন্ধ্যপর্বতের গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করেন। হর্ষবর্ধন সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে বিন্ধ্যাচলে উপস্থিত হন এবং রাজ্যশ্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পরের ঘটনা ঠিকমত জানা যায় না। 'শশাঙ্ক' দ্র।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাঢ় বঙ্গ দ্র

রাণাডে, এম. জি. (১৮৪২-১৯০১ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তারাজ্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। বোম্বাই-এর 'প্রার্থনা-সমাজ' ও পুণার 'সার্বজনিক সভা'র সহিত তাঁহার যোগ ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আবেদন করেন (১৮৭৪ খ্রী)। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রিটিশ-শাসন ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর। বোম্বাই-এর হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া দ্বাদশ বৎসর (আমৃত্যু) এই পদে থাকেন।

তিনি যুবসমাজকে লইয়া নানাভাবে দেশসেবায় নিযুক্ত হন। বোম্বাই-এর প্রার্থনা-সমাজ (প্রতিষ্ঠাঃ ১৮৬৭ খ্রী) এবং পুণার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (প্রতিষ্ঠা: ১৮৮২ খ্রী)-এর প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন তিনি। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস' (১৮৮৫ খ্রী)-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। পুণার 'ডেকান-সভা'রও সৃষ্টি তাঁহারই উদ্যোগে। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে 'রাইজ অভ্ দি মারাঠা পাওয়ার' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

এস. আর. টিকেকর

রাণাপ্রতাপ প্রতাপ সিংহ দ্র

রাধা নামটি অপ্রাচীন নয়। মহাভারতে কর্ণের ধাত্রী-মাতার নাম রাধা। গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতীতে মহাভারতোক্ত মৎস্যচক্রকে বলা হইয়াছে 'রাধাচক্র'। অর্জুন এই চক্র ভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম রাধাভেদী বা রাধাবেধী।

কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গেই রাধা নামের গুরুত্ব। কৃষ্ণ-প্রিয়ারূপে 'রাহিআ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায় হালের 'গাহাসত্তসঈ'তে, অপ্রাচীন পুরাণে, সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ কবিতায় এবং নারদপঞ্চরাত্রে। এ সকল স্থলে রাধা বিষ্ণুবল্লভা শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর গুণ ও লক্ষণ-যুক্তা। লক্ষ্মী সাগরবাসিনী ও পদ্মাসীনা; বড়ু চণ্ডী-দাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার পিতার নাম সাগররাজা, মাতা পদুমা। অধিকাংশ পুরাণমতে রাধা বৃষভানুর কন্যা, মাতা কৃত্তিকা (কীর্তিদা) বা কলাবতী।

আদিতে রাধা ছিলেন কৃষ্ণপ্রিয়া গোপী। ক্রমে রাধাকৃষ্ণ যুগলে আরাধ্যা দেবীতে রূপান্তরিতা হন। রাধাতত্ত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

রাধাকুণ্ড মথুরার অন্তর্গত রাধাকুণ্ড প্রাচীন বৈষ্ণব-তীর্থ। শ্রীরূপগোস্বামী ইহার প্রাচীনত্ব আদিবরাহ ও পদ্মপুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধাকুণ্ডকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধ্যাহ্নকালের প্রধান মিলনস্থানরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে বল্লভা-চার্য গোকুলনাথজী এবং হিতহরিবংশেরও বৈঠক আছে।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০ খ্রী) ডিরোজিও-শিষ্য এবং হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র; সংস্কৃত, ইংরেজী, গ্রীক ও লাতিন ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, গণিতশাস্ত্রজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারকরূপে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অন্যতম কৃতী সন্তান। জন্মঃ কলিকাতা জোড়াসাঁকোর এক দরিদ্র পরিবারে। প্রথম ভারতীয়, যিনি টাইট্‌লার সাহেবের নিকট নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়া' অধ্যয়ন করেন ও জর্জ এভারেস্টের অধীনে ত্রিকোণমিতিভিত্তিক জরিপ-বিভাগে প্রথম ভারতীয়রূপে কর্ম গ্রহণ (১৮৩২ খ্রী); জরিপের কাজে এভারেস্ট আবিষ্কৃত 'এক্সরে সিস্টেম'-এর প্রথম প্রযোক্তা। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গরূপে হিমালয়ের এভারেস্ট-শৃঙ্গের আবিষ্কার এবং ঐ বৎসরেই চিফ কম্পিউটার পদের সঙ্গে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে বৃত। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ। ব্যক্তিগত জীবনে সমাজ-কল্যাণমূলক কর্মের সঙ্গে যুক্ত, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সমর্থক; প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে 'মাসিক পত্রিকা'র সম্পাদনা।

শিবদাস চক্রবর্তী

রাধামোহন ঠাকুর 'পদামৃত সমুদ্র'-এর সুপ্রসিদ্ধ সংকলয়িতা। বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদের মালিহাটি

গ্রামে। নিজেও আলংকারিক রীতির কবি ছিলেন। বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন পদকল্পতরুতে তাঁহার ১৮২টি পদ ধরিয়াছেন। যদিও তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে লেখা তবু বাংলাপদ-রচনাতেও পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

বাংলা পদাবলীর টীকা সংস্কৃত ভাষায় লেখেন। এক বিচারে সভাস্থ পণ্ডিতদের পরাজিত করিয়া তিনি পরকীয়াবাদ স্থাপন করেন। পণ্ডিতেরা পরাজয় স্বীকার করিয়া 'ইস্তফাপত্র' লিখিয়া দেন (১৭১৯ খ্রী)। বিচার-সভাতে তৈলঙ্গ দেশের রামজয় বিদ্যালংকার, সোনার গ্রামের রামরাম বিদ্যাভূষণ এবং নবদ্বীপের কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

উমা রায়

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩-১৯২৪ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদ ও খেয়াল-গায়ক। বিষ্ণুপুরের সংগীতজ্ঞ গোস্বামী-পরিবারের সন্তান এবং পাখোয়াজ-বাদক জগৎচাঁদের পুত্র। সংগীতশিক্ষা প্রধানতঃ কলিকাতায় শিবনারায়ণ মিশ্র ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র এই ভ্রাতৃদ্বয়ের অধীনেই সম্পন্ন হয়। দীর্ঘকাল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী-স্থাপিত বহরমপুর সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের সহিতও সংগীতাচার্যরূপে কিছুকাল যুক্ত ছিলেন। তাঁহার বহু শিষ্য প্রসিদ্ধ সংগীতবিশারদরূপে গণ্য।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

রানীখেত রানীখেত ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত আলমোড়া জেলায় অবস্থিত সৈনিকদের স্বাস্থ্যনিবাস। বর্তমানে ইহা সাধারণ সেনানিবাস হিসাবে পরিগণিত। নিকটতম রেলস্টেশন কাঠগোদাম হইতে রানীখেতের দূরত্ব ৮৩ কিলোমিটার। মোটরপথে আলমোড়া ও নৈনিতালের সহিত সংযুক্ত। চারিপাশে হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ। সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা ৫৯৮০′। অদূরে 'চৌবাটিয়া'য় সরকার-পরিচালিত আপেলের বাগান একটি বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান।

অর্চনা নিয়োগী

রাবণ রাক্ষসরাজ, রামায়ণের প্রতিনায়ক। পিতামহ ঋষি পুলস্ত্য, পিতা মুনি বিশ্রবা, মাতামহ রাক্ষস সুমালী, মাতা নিকষা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যক্ষরাজ কুবের। ব্রহ্মার বরে নরবানর ভিন্ন সর্বপ্রাণীর অবধ্য হন। কুবেরের পুষ্পক রথ এবং বিশ্বকর্মা-নির্মিত লঙ্কা-নগরী অধিকার করেন। ভুজবলে কৈলাস উত্তোলন করিতে গিয়া প্রথমে পীড়িত হইলেও স্তুতিমুগ্ধ শিব শেষে ইঁহাকে চন্দ্রহাস খড়্গ এবং রাবণ আখ্যা দান করেন। অপ্সরা রম্ভা এবং তপস্বিনী বেদবতীর প্রতি অধর্মাচরণের কারণে অভিশাপগ্রস্ত হন। রামচন্দ্র বানর-সেনা লইয়া ইঁহাকে সবংশে বধ করেন। শিবপুরাণ, অধ্যাত্মরামায়ণ ও মহাভারতে রামায়ণের কাহিনী দৃষ্ট হয়। অদ্ভুত রামায়ণে সীতা কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণ-বধের কাহিনীতে বৈচিত্র্য চরমে উঠিয়াছে।

কল্যাণী দত্ত

রাম ব্যক্তিনাম। পৌরাণিক ও প্রাচীন সাহিত্যে তিন-চারিজন প্রসিদ্ধ ছিলেন এই নামে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাম মার্গবেয়, পুরাণে ও রামায়ণে রাম জামদগ্ন্য (অর্থাৎ পরশু-রাম), পুরাণে রাম রৌহিণেয় (অর্থাৎ বলরাম) এবং রামায়ণে রাম দাশরথি। দশরথের পুত্র রাম রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক। পরবর্তীকালে শেষ তিনজন বিষ্ণুর অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছেন বটে কিন্তু দাশরথি রাম বিষ্ণুর স্থলাভিষিক্ত হইয়া পরমেশ্বররূপে পূজিত হইয়া আসিয়াছেন। কবীর, দাদূ প্রভৃতি ভিন্নপন্থী মরমিয়া কবি-সাধকগণ 'রাম' নামটি ব্রহ্মবাচক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থে 'রাম' শান্তিসুখের দেবতার নাম হিসাবে পাওয়া যায়।

সুকুমার সেন

রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রী) হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্ম (১৮ ফেব্রুয়ারি)। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মাতা চন্দ্রমণি দেবী। রামকৃষ্ণের বাল্যনাম ছিল গদাধর। ধর্মপ্রাণ পিতামাতার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর শৈশব হইতে ভগবৎপরায়ণ ছিলেন। রানী রাসমণির নবনির্মিত কালীমন্দিরে পূজারী হইয়া মৃন্ময়ী দেবী মূর্তিতে চিন্ময়ীর দর্শন পাইলেন। অতঃপর বিভিন্ন ধর্মমার্গের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। ইসলাম, খ্রীষ্ট, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের সহিতও তাঁহার পরিচয় ঘটিল। ফলে, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হইল। তখন তিনি প্রচার করিলেন: 'সব ধর্মই সত্য; যত মত তত পথ।'

তেইশ বৎসর বয়সে সারদামণির পাণিগ্রহণ করেন। সারদামণির বয়স তখন ছয় বৎসর। ইহা নামে বিবাহ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনওকালেই কোনও দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। পরে উনিশ বৎসর বয়সে যখন সারদামণি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে পূজা করেন। ক্রমে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ তাঁহার সাধনালব্ধ জ্ঞান, কামিনী-কাঞ্চন-বিমুক্ত জীবন, সংগীত এবং উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া

দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং অনেকে তাঁহাকে যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে গলরোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার জন্য প্রথমে শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরে আসেন। শেষোক্ত স্থানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট তিনি সমাধিতে লীন হইয়া যান।

রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এবং অন্যান্য নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য বহু ভাষায় উহা অনূদিতও হইয়াছে। তাঁহার জীবন যেমন অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধিতে পরিপূর্ণ, বাণীও তেমনি কথাশিল্পের চমকপ্রদ নিদর্শন এবং ভগবদ্-ভক্তির অপূর্ব উৎস।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন এই মিশনের প্রকৃত উৎস শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন উপদেশচ্ছলে তিনি বলেন যে, দয়া করিতে পারেন একমাত্র ভগবান্; মানুষ দয়া করিতে পারে না, সে কেবল শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে পারে। বিবেকানন্দ এই সেবার বাণীটিকে সার্থক করিতে সংকল্প করেন। ইহারই ফলে বরাহনগরে প্রথম মঠ স্থাপিত হয় (১৮৮৬খ্রী)। ৫-৬ বৎসর পরে উহা আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড়ে স্থায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। ইহার কিছু পূর্বেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে কলিকাতায় ৫৭, রামকান্ত বোস স্ট্রীটে বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন'-এর সূত্রপাত করেন। পরে ইহার প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে উহা আইন অনুযায়ী 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে রেজেস্ট্রিকৃত হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান—যদিও জনসমাজে উভয়ই রামকৃষ্ণ মিশন নামে পরিচিত। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনার জন্য একটি গভর্নিং বডি আছে। উহা সাধারণ সভ্যদের নিয়ন্ত্রণাধীন। শাখাকেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ এক একটি স্বতন্ত্র পরিচালক-সমিতির কর্তৃত্বাধীন। উহারা তাহাদের কার্যের জন্য গভর্নিং বডি-র নিকট দায়ী। মিশন ত্যাগ ও সেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে উহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবসেবায় নিযুক্ত। দুর্বিপাককালে মিশন-কর্তৃক সেবা পরিচালিত হয়। তাহা ছাড়া বহু স্থায়ী কেন্দ্র হইতেও সংস্কৃতিমূলক কার্য, শিক্ষা, অনাথ আশ্রম, পুস্তকাগার, চিকিৎসালয় প্রভৃতি পরিচালনা এবং নিয়মিত অর্থ সাহায্য করা হয়। দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনার ভার সন্ন্যাসীদের উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রয়োজনবোধে বেতনভোগী কর্মী বা স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যও লওয়া হয়। মিশনের স্থায়ী ভান্ডার নিতান্তই অল্প বলিয়া অর্থের জন্য জনসাধারণ ও সরকারের উপর নির্ভর করিতে হয়।

রামকৃষ্ণ মঠ কয়েকজন ট্রাস্টির পরিচালনাধীন। উহার প্রধান কাজ পূজা, উৎসব, ধর্মপ্রচার, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক গ্রন্থাদি প্রকাশ এবং জনসাধারণকে ধর্মপথে সাহায্য করা। এই সব কাজের জন্য অর্থ ভক্তগোষ্ঠীই জোগাইয়া থাকেন। মঠের নিজস্ব কাজের সহিত অনেক ক্ষেত্রে মিশনের অনুরূপ জনসেবাও অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা ও ইওরোপের কেন্দ্রগুলি মঠ-বিভাগেরই অধীন, এবং ধর্মপ্রচারই তাহাদের একমাত্র কার্য। বিদেশের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিদেশীরাই দিয়া থাকেন। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্র সর্ববিষয়ে বেলুড়ের প্রধান কেন্দ্রদ্বয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হইলেও অর্থ-বিষয়ে প্রত্যেক কেন্দ্রকে স্বাবলম্বী হইতে হয়; এই কেন্দ্রের অর্থ অন্যত্র ব্যয়িত হয় না।

মঠ ও মিশনের ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের কার্যবিবরণী হইতে জানা যায়, ঐ বৎসর ভারত ও ভারতের বাহিরে মোট ৭৪টি মিশন-কেন্দ্র, ৬৬টি মঠ-কেন্দ্র এবং তাহাদের অধীন ২২টি শাখাকেন্দ্র বর্তমান ছিল। মিশনের তত্ত্বাবধানে বহু হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি আজও সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে এবং সংখ্যাতীত নরনারী এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রভূত উপকার পাইতেছে।

স্বামী গম্ভীরানন্দ

রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-৯৪ খ্রী) পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। জন্মস্থানঃ হুগলি জেলার ইলছোবা গ্রাম। গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষালাভের পর সংস্কৃত কলেজে পড়েন। পরে শিক্ষকজীবন শুরু করেন হুগলি নর্মাল স্কুলে এবং প্রধান শিক্ষক হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ভাগ, ১৮৭২ খ্রী)। বাংলা ব্যাকরণ, ইতিহাস, গল্প, নাটক, চরিতকথা প্রভৃতি বিষয়ক এবং শিশুপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। 'রোমাবতী' (১৮৬২ খ্রী) ও 'ইলছোবা' (১৮৮৮ খ্রী) দুইখানি তাঁহার লেখা মৌলিক আখ্যায়িকা গ্রন্থ।

রজত রায়চৌধুরী

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮ খ্রী) ডিরোজিও-শিষ্য, 'ইয়ং বেঙ্গল' দলভুক্ত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী, সে

যুগের হিন্দু কলেজে শিক্ষিত বাঙালী যুবকদের অন্যতম। আদি নিবাস ত্রিবেণীর নিকটবর্তী বাঘাটী গ্রাম। পিতা গোবিন্দচন্দ্র। প্রথমে শেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। হেয়ার ও ডিরোজিও সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। 'জ্ঞানান্বেষণ' মাসিক পত্রিকাতে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' নামক পত্রিকাও তাঁহার আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে আইনের চক্ষে বর্ণবিভেদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে আনীত 'ব্ল্যাক্ অ্যাক্ট' সমর্থন করিয়া কলিকাতার বর্ণদ্বেষী ইংরেজ সমাজের অসন্তোষ-ভাজন হন। রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বদেশহিতৈষী হইলেও ঠিক ইংরেজ-বিরোধী ছিলেন না। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ সভারও একজন প্রধান সদস্য হন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতা ময়দানে লর্ড হার্ডিঞ্জের মূর্তি ও প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে ডেভিড হেয়ারের মূর্তি স্থাপিত হয়। এডুকেশন কাউন্সিলের সদস্য (১৮৪৮ খ্রী) ও ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৮৬২-৬৪ খ্রী) ছিলেন। আহারে-বিহারে নব্যপন্থী এবং স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহের সমর্থক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব-বোধিনী সভার সহিতও তাঁহার সংযোগ ছিল।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫ খ্রী) প্রখ্যাত অভিধানকার ও স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম পালপাড়া নামক গ্রামে। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ। তিনি কলিকাতায় আসিলে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রাজার ইচ্ছানুযায়ী তিনি উপনিষদ্ ও বেদান্ত-দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। তিনি এই সময়ে বঙ্গভাষাতে একখানি অভিধান ও জ্যোতিঃশাস্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রাজা রামমোহনের আনুকূল্যে হেদুয়ার নিকটে একটি চতুষ্পাঠীও স্থাপন করেন।

তিনি ১০ বৎসর কলিকাতা গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন (১৮২৭-৩৭ খ্রী)। ইহার পর তিনি হিন্দু কলেজ পাঠশালার অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮৩৯ খ্রী) ও ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কার্য গ্রহণ করেন ও আমৃত্যু এই পদে নিযুক্ত থাকেন। সমাজ সম্বন্ধে রাম-চন্দ্রের মত ছিল আধুনিক। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের পূর্বেই বিধবা-বিবাহের পক্ষে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভা'য় তিনি নিয়মিত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিতেন। মৃত্যুকালে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ 'জ্যোতিষ সংগ্রহসার' (১৮১৭ খ্রী), 'অভিধান' (১৮১৮ খ্রী), 'পরমেশ্বরের উপাসনা বিষয়ে প্রথম ব্যাখ্যান' (১৭৫০ শকাব্দ), 'বিবাদচিন্তা-মণিঃ' (১৮৩৭ খ্রী), 'হিন্দু কলেজ পাঠশালার পাঠারম্ভকালে বক্তৃতা' (১৮৪০ খ্রী), 'শিশুসেবধি' (১৮৪০ খ্রী) ও 'নীতিদর্শন' (১৮৪১ খ্রী)।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮ খ্রী) উনিশ শতকের বাংলাদেশে শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের ইতিহাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। শিক্ষিত সমাজে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেন। জন্মঃ নদিয়া জেলার বারুইহুদা গ্রাম। পিতাঃ রামকৃষ্ণ। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিও তাঁহার শিক্ষাগুরু। ডিরোজিওর প্রভাবে, চিন্তায় ও কর্মে বৈপ্লবিক ভাবধারা সংক্রামিত হয়। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই কলেজে নিম্নতন শিক্ষকের কর্মগ্রহণ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ধমান, উত্তরপাড়া, বারাসত, রসাপাগলা প্রভৃতি স্থানের স্কুলে এবং বরিশাল জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। কৃষ্ণনগর কলেজে তিনবার শিক্ষকতা করেন এবং এই কলেজ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন (নভেম্বর, ১৮৬৫ খ্রী)। পরে গোবরডাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন।

বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। দেশে প্রচলিত সর্ব-প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু চিরায়ত ভারত-সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেন নাই। এদেশে নারীশিক্ষা ও নারী-প্রগতির অন্যতম অগ্রদূত। বিধবা বিবাহের সমর্থক এবং জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাকে সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ মনে করিতেন। সমস্ত যুক্তিহীন প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রথাগুলিকে পরিহার করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে পৈতা ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী হন। কেশবচন্দ্রের ভক্ত হইলেও কোনও ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন না। সত্যই ছিল তাঁহার ঈশ্বর। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন। 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৬ খ্রী) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাজনৈতিক আন্দোলনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। 'প্রথম জাতীয় অধিবেশন'-এর (১৮৮৬

খ্রী) উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহাকে লোকে 'আর্নল্ড অড্ বেঙ্গল' বলিত।

হারাধন দত্ত

রামদাস স্বামী (১৬০৮-১৬৮২ খ্রী) ছত্রপতি শিবাজীর গুরু। তুকারামের সমসাময়িক। জন্মঃ জম্ব্-এ। পিতা সূর্যজীপন্ত্ ও মাতা রানুবাঈ। ক্ষাত্রবীর্যে বিশ্বাসী। রামভক্ত, এবং মহাযোদ্ধা রামের পূজায় বিশ্বাসী। বিবাহ-মণ্ডপ হইতে পলায়ন করিয়া গোদাবরীতীরে দ্বাদশ বৎসর রামনাম ও তপস্যা করেন। সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন ও অনেক মারুতি (হনুমান)-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 'দাসবোধ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অন্যায়ের প্রতিশোধে অন্যায়ের সমর্থক ছিলেন, তবে শ্রীরামচন্দ্রের উপর শাশ্বত বিশ্বাস রাখিবার কথাও বলিয়াছেন। তিনি রামদাসী পন্থার প্রবর্তক। মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জাগরণের মূলে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ বিশেষ কার্যকরী হয় এবং তাঁহার শিষ্যেরাও এ-বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। রাজনীতিজ্ঞ ধর্মগুরুদের মধ্যে তাঁহার নাম অগ্রগণ্য। জীবনের শেষের দিকে তিনি সাতারার নিকট পরেলিতে থাকিতেন। তিনি রামায়ণের যুদ্ধখণ্ডের অনুবাদ করেন ও মানবচিত্তের পক্ষে কি করণীয় এবং কেন করণীয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদধিক ২০০ কবিতা লেখেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তৎপুত্র শম্ভুজীকে উদ্দেশ করিয়া যে পত্র লেখেন তাহার মধ্যে অনেক অপূর্ব উপদেশ ছিল। এই উপদেশগুলি মহারাষ্ট্রে অদ্যাবধি বহু প্রচলিত। তাঁহার ভক্তিভাবপূর্ণ অনেক কবিতা ভক্ত মহারাষ্ট্রীয়েরা উপাসনার সময়ে আবৃত্তি করেন।

এস. আর. টিকেকর

রামদুলাল সরকার (১৭৫২-১৮২৫ খ্রী) বাঙালীর স্বাধীন শিল্পোদ্যম ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম। বাল্যকালেই পিতৃ-মাতৃহীন হন ও মাতামহীর আশ্রয়ে থাকেন। মাতামহী কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী মদনমোহন দত্তের বাড়িতে পাচিকা ছিলেন। মদনমোহন দত্তের স্নেহ লাভ করেন এবং সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার গদীতে দশটাকা বেতনের চাকরিতে নিযুক্ত হন। মদনমোহন তাঁহাকে একটি নিলাম ক্রয় করার জন্য প্রেরণ করেন। ঈপ্সিত নিলাম ক্রয় করিতে না পারিয়া চোদ্দ হাজার টাকায় একখানি ডুবোজাহাজ ক্রয় করেন এবং অতিরিক্ত একলক্ষ টাকায় জাহাজটিকে এক সাহেবের কাছে বেচিয়া দেন। এই সম্পূর্ণ টাকা তিনি মালিকের হস্তে দেন। তাঁহার ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া মদনবাবু তাঁহাকে ঐ এক লক্ষ টাকা দান করেন। এই টাকায় স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করিয়া বিপুল ধন সঞ্চয় করেন। অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার বহির্বাণিজ্যের যোগাযোগ ঘটে প্রধানতঃ তাঁহারই মাধ্যমে। আমেরিকার ব্যবসায়ীরা তাঁহার নামে একখানি জাহাজের নামকরণ করেন। চীন হইতে ইংল্যান্ড-আমেরিকা পর্যন্ত বণিকমহলে তাঁহার অশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁহার অর্জিত অর্থ জনকল্যাণ ও দেশহিতার্থে ব্যয়িত হয়।

হারাধন দত্ত

রামন এফেক্ট ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন বস্তুর অণুতে আলোকের সংঘাতে আপাততঃ আলোকের কম্পনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইয়া যে আলোকের বিকিরণ ঘটে তাহা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করেন—এই পরীক্ষালব্ধ ফল রামন এফেক্ট নামে খ্যাত।

বস্তুতে আলোকের শোষণ ও বিকিরণ লইয়া বিগত শতাব্দীতে বহু গবেষণা হইয়াছে। তন্মধ্যে অণুতে আলোকের বিকিরণ লইয়া র‍্যালের গবেষণাটিকে রামনের আবিষ্কারের পটভূমি বলা যাইতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যার আলো অণুর সংঘাতে বিক্ষিপ্ত হইলে তাহার দীপ্তি হ্রাস পায়, কিন্তু কম্পনসংখ্যা আপতিত আলোকের সমান থাকে। এই বিকিরণকে র‍্যালের বিকিরণ বলা হয়। কিন্তু এই বিকিরণের সঙ্গে হ্রাস বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কম্পনসংখ্যার যে আলোক বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার দীপ্তি এত ক্ষীণ যে পরীক্ষায় সহজে ধরা পড়ে না। অথচ ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী স্মেকাল এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্রামার্স ও হাইসেনবার্গ তাত্ত্বিক বিচারে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে অণুর সংঘাতে আলোকের কম্পনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি অবশ্যই হইতে পারে। তাহার কারণ হইল অণুর মধ্যে পরমাণুগুলি যখন বাঁধা পড়ে, তখন ইহাদের মধ্যে জাগে স্পন্দন ('ভাইব্রেশান')। এই স্পন্দনজনিত শক্তিস্তরগুলি অণুর স্পন্দন শক্তির নির্দেশ দেয়। কোনও বস্তুপিণ্ডে তাহার বিভিন্ন অণুগুলি বিভিন্ন শক্তিস্তরে থাকিতে পারে। ভূমিস্তরে ('গ্রাউন্ড স্টেট') বা শূন্য শক্তিস্তরে অবস্থিত অণু বাহিরের শক্তি শোষণ করিয়া ঊর্ধ্বতর-স্তরে উত্তেজিত হয় ও আবার নিম্নতরস্তরে ফিরিয়া আসে। এই ওঠা-নামার শক্তিস্তরের শক্তিটুকু বাহিরে বিকীর্ণ হয়। অণুতে এরকম স্পন্দনজনিত শক্তি অবলোহিত আলোকের কম্পনসংখ্যার পর্যায়ে পড়ে। তাহার দীপ্তি এত ক্ষীণ যে, সহজে বাহিরে ধরা যায় না। তাই অবলোহিত আলোকের শোষণ ঘটাইয়া ঐ

আলোকের শোষিত বর্ণালী হইতে অণুর শক্তিস্তর জানিবার পদ্ধতি বেশ কঠিন। অণুর সাম্যধর্মী স্পন্দন কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় ধরা পড়ে না। অণুতে একজাতের স্পন্দন আছে যাহাতে পরমাণুগুলি একসঙ্গে একমুখী হইতেছে ও বাহিরের দিকে সরিয়া যাইতেছে। ফলে, মনে হয় অণুর আয়তন যেন বাড়িতেছে ও কমিতেছে, ইহাই সাম্যধর্মী স্পন্দন। অণুর এই প্রকার স্পন্দনে তাহার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি একটুও নড়াচড়া করে না। অবলোহিত অদৃশ্য আলো সে-ক্ষেত্রে শোষিত হয় না। কেবল দৃশ্য আলোর পক্ষে এরকম শক্তিস্তরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু অণুর স্পন্দনের কম্পনসংখ্যা তো, দৃশ্য আলো অপেক্ষা অনেক কম। তাই ইহার শোষিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু কোনও একবর্ণী আলো অণুর সংঘাতে অণুর কোনও একটি স্পন্দনের কম্পনসংখ্যা বিযুক্ত বা যুক্ত হইয়া পৃথক্ কম্পন-সংখ্যার আলোরূপে বাহির হইতে পারে। এইরকম বিকিরণের দীপ্তিও এত ক্ষীণ যে সহজে ধরা পড়ে না। রামন তাঁহার তৈয়ারি বিশেষ বর্ণালীবীক্ষণযন্ত্রে প্রথম এই ধরনের আলোক ধরিতে সক্ষম হন। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে 'নোবেল প্রাইজ' ('নোবেল প্রাইজ' দ্র) লাভ করেন।

এই আবিষ্কারের ফলে অণুরাজ্যের বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। বিকিরণধর্ম, তরঙ্গতত্ত্ব, তাপগতিবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের গবেষণায় রামন-ক্রিয়া একটি যুগান্তকারী পদ্ধতিরূপে পরিগণিত হয়। বর্তমানে তীব্র লেসার রশ্মি আবিষ্কৃত হওয়ায় রামন-ক্রিয়া প্রয়োগের পরিধি আরও বিস্তৃততর হইয়াছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

রামনবমী চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীই রামনবমী। পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত এই তিথিতে ভগবান্ রামচন্দ্র জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে রামনবমী বলা হয়। এই নবমীর মধ্যাহ্ন পুণ্য পবিত্র কাল। এই সময়েই শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভাবনা করা হয়। এই তিথি সর্বকাম-প্রদা। রামমন্ত্রসাধক বৈষ্ণবগণের পক্ষে রামনবমীব্রত অবশ্য পালনীয়। এই তিথিতে উপবাস করিয়া রামার্চন করিতে হয়। শুদ্ধা নবমী তিথিই উপবাসের পক্ষে প্রশস্ত। বৈষ্ণবগণ অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে কদাচ উপবাস করেন না। ব্রতদিনে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতা, দশরথ, ভরতাদি ভ্রাতা ও সুগ্রীব-বিভীষণাদিকেও অর্চনা করিতে হয়। প্রতি প্রহরে পূজা, রামমন্ত্র জপ ও রামগীতা পাঠেরও বিধান আছে। রামনবমীতে রামভক্তকে রাম-প্রতিমা দান করিলে মহাপুণ্য হয়। রাত্রি জাগরণপূর্বক দশমীতে ব্রতকথা শ্রবণ করিয়া পারণ করার বিধি। কোথায়ও কোথায়ও রামচন্দ্রের জন্মোৎসব দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া পালন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া-রাম-রাজাতলায় এই তিথিতে যে পূজা ও মেলা আরম্ভ হয় তাহা চারি মাস ধরিয়া চলে। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে বিশাল শোভাযাত্রা করিয়া মহাসমারোহে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

রামনাথ তর্করত্ন (১৮৪৭-১৯১০ খ্রী) সংস্কৃত কাব্য-নাটক-বেদান্ত-স্মৃতি-ন্যায়শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থরচয়িতা, প্রাচীন পুঁথিসংগ্রাহক। শান্তিপুরের কালিদাস বিদ্যাবাগীশের পুত্র। শান্তিপুরে চতুষ্পাঠীতে বেদান্ত-অধ্যয়নকালে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় জন-সাধারণের ক্লেশে বিচলিত হইয়া ২০ বৎসর বয়সে 'কমলাকরুণাবিলাসঃ' (১৮৬৭ খ্রী) নাটক রচনা করেন। নাটকটি রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রশংসা লাভ করে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি রামনাথকে প্রাচীন পুঁথি অনুসন্ধান ও সংগ্রহের জন্য Travelling Pandit নিযুক্ত করেন। ১৮৭৩-৯২ খ্রীষ্টাব্দে বিশ বৎসর দূরদূরান্তে ভ্রমণ করিয়া এসিয়াটিক সোসাই-টিতে চারি সহস্রাধিক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। রামনাথের প্রস্তুত বর্ণাত্মক তালিকা হইতে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'Notices of Sanskrit Manuscripts' এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেন।

রামনাথের মহাকাব্য 'বাসুদেববিজয়ম্' (১৮৮৩ খ্রী) ম্যাক্সমুলার কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রামনাথের সম্পাদিত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য প্রথম খণ্ড (১৮৮৮ খ্রী), দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯০ খ্রী), তৃতীয় খণ্ড (১৮৯১ খ্রী) এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশ করেন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Age of Consent Bill আনীত হইলে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ সহবাসসম্মতির বয়স ১০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ বৎসর করার বিরোধিতা করেন। রামনাথ সনাতনপন্থীদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া 'Opinion on the Garbhadhana Ceremony according to the Hindu Shastras delivered to the Government' (১৮৯১ খ্রী) প্রকাশ করেন, পুস্তিকাটির আখ্যাপত্র ইংরেজীতে, রচনা সরল ঋজু বাঙলা গদ্যে।

রামনাথের 'বিলাপলহরী' (১৮৯২ খ্রী) খণ্ডকাব্য, 'আর্যালহরী' প্রণয়কবিতার কোষকাব্য। তাঁহার 'দেবী-বিসর্জন-ব্যবস্থা' স্মৃতিশাস্ত্রের নিবন্ধ। রামনাথের সর্বশেষ মুদ্রিত রচনা 'প্রভাতস্বপ্নম্' (১৯০৫ খ্রী) রঘুপতি রাম ও জনকনন্দিনী সীতাকে লইয়া সপ্তাঙ্ক নাটক।

মদনমোহন কুমার

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-৮৬ খ্রী) বাংলা নাটকের আদিপর্বের প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর চব্বিশ পরগনার হরিনাভি গ্রামে জন্ম। পিতা রামধন শিরোমণি। কলিকাতায় দশ বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। প্রায় সাতাশ বৎসর কার্য করিবার পর অবসর গ্রহণ করিয়া হরিনাভিতে বাস করেন। এখানেও একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন।

নাটক রচনায় নৈপুণ্যের জন্য এবং বাংলাভাষায় প্রথম বিধিবদ্ধভাবে নাটক রচনার জন্য দি বেঙ্গল ফিলহার্মোনিক অকাদেমি তাঁহাকে 'কাব্যোপাধ্যায়' উপাধি ও হরকুমার ঠাকুর 'কনক-কেয়ূর' প্রদান করেন। 'পতিব্রতোপাখ্যান' গ্রন্থ (১৮৫৩ খ্রী) ও বাংলা নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪ খ্রী) রচনা করিয়া পুরস্কার পান। তাঁহার অন্যান্য নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রত্নাবলী', 'বেণীসংহার', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল', 'রুক্মিণী-হরণ', 'কংসবধ', 'নবনাটক' প্রভৃতি। তিনি 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'উভয়সংকট' ও 'চক্ষুদান' নামে প্রহসন এবং দুই-একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার নাটকগুলি সেকালের রাজাদের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাত হন।

নিরুপমা বন্দ্যোপাধ্যায়

রামপাল পালবংশ দ্র

রামপ্রসাদ (আনুমানিক ১৭২০-৮১ খ্রী) কবি ও শাক্তসাধক। ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম তাঁহার জীবনী সংকলন করেন। পরেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে কিংবদন্তী এবং ভক্তি রসাশ্রিত অলৌকিকতার মধ্য হইতে যথার্থ ঘটনা নির্ণয় করা কঠিন। পিতা রামরাম, নিবাস চব্বিশ পরগনার হালিশহরে। প্রথমে কলিকাতার কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে মুহুরিগিরি করেন। পরবর্তীকালে কয়েকজন ভূস্বামীর বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তান্ত্রিক শক্তিসাধকরূপে সমকালে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কবি, সাধক এবং গায়ক এই তিনটি স্বতন্ত্র পরিচয় তাঁহার ব্যক্তিত্বে সমন্বিত হইয়াছিল। প্রসাদী সুর তাঁহার গায়ক-পরিচয়ের নিদর্শন হইয়া আছে।

রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দর কাব্যে' আদিরস পরিবেশনে বহুক্ষেত্রে স্থূলরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তবে এই কাহিনীতেও কালীভক্তির সুর অক্ষুণ্ণ আছে। 'কালী-কীর্তন' তাঁহার একটি ক্ষুদ্র রচনা। তাঁহার নামে প্রচারিত তিন শতাধিক পদের সবগুলি সম্ভবতঃ তাঁহার লেখা নয়। অধিকাংশ পদে কালীভক্তির ব্যাকুলতা প্রকাশিত। উমার আগমনী ও বিজয়া-বিষয়ক পদ অল্প কয়েকটি। রামপ্রসাদই বাংলা সাহিত্যে শাক্তগীতির নূতন ধারার উদ্বোধক।

ক্ষেত্র গুপ্ত

রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮ খ্রী) পুরা নাম রামমোহন বসু। পিতা রামলোচন। জন্মস্থান, হাওড়া জেলার শালিখা। কবির দলের জন্য গান বাঁধিয়া বিখ্যাত।

প্রথমে কবিওয়ালা ('কবিওয়ালার গান' দ্র) ভবানী বেনের দলের জন্য নিয়মিত গান রচনা করেন এবং কবি-গানে শেষ পর্যন্ত যোগ দেন। ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ প্রভৃতি কবিওয়ালা-দিগের জন্য গান বাঁধিয়া প্রভূত উপার্জন করেন। তিনি নিজেও একটি শখের দল (পরে পেশাদারী) গঠন করিয়াছিলেন। আগমনী ও সখীসংবাদের গানে প্রেম ও বিরহাবস্থার বর্ণনে তাঁহার কৃতিত্ব।

রজত রায়চৌধুরী

রামমোহন রায়, রাজা (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রী) বাংলা-দেশের তথা ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক অগ্রদৃষ্টিমান্ চিন্তানায়ক ও কর্মনেতা। জন্ম আধুনিক হুগলি (তখনকার বর্ধমান) জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগনার মধ্যবর্তী রাধানগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কুলীন (বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণবংশে। প্রপিতামহ কৃষ্ণকান্ত ফরুখ-শিয়রের আমলে বাংলার সুবেদারের আমিনের কার্য করিতেন। সেই সূত্রেই বোধ করি ইঁহাদের 'রায়' পদবীর ব্যবহার। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ রামমোহনের পিতামহ। পিতা রামকান্ত। রামকান্তের তিন বিবাহ। মধ্যমা পত্নী তারিণীর এক কন্যা ও দুই পুত্র—জগমোহন (মৃত্যুঃ চৈত্র, ১২১৮ বঙ্গাব্দ) ও রামমোহন। ইঁহাদের বংশ ছিল বৈষ্ণব, কিন্তু রামমোহনের মাতা ছিলেন ঘোর তান্ত্রিক ঘরের কন্যা। রামকান্ত পৈত্রিক এজমালি ভদ্রাসন ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী

লাঙগুলপাড়া গ্রামে সপরিবারে উঠিয়া যান (১৭৯১ খ্রী)। রামমোহন সংস্কৃত পড়েন ও ফারসী শিখেন। তাঁহার ফারসী ও আরবী শিক্ষা রাধানগরের শিক্ষিত মুসলমানদের কাছেই। ফারসী-আরবী পড়িয়া তাঁহার মনে প্রচলিত হিন্দুধর্মের আচার-বিচার সম্বন্ধে সংশয় জাগে। অনুমান হয়, ইহা লইয়া মাতা-পিতার সঙ্গে তাঁহার মতবিরোধ হয়। পনেরো-ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করিয়া নানাস্থানে ঘোরেন। কাশীতে ও সম্ভবতঃ পাটনায় কিছুকাল ছিলেন এবং নেপালে গিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার সহিত তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা সুপণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের (পরে হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত) যোগাযোগ হয়। রামোহনের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি, তাঁহার বেদান্তে অনুরাগ নন্দকুমারের সহযোগিতায় হইয়াছিল। ব্রহ্ম-উপাসনার প্রতিষ্ঠায় হরিহরানন্দই তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন।

তাঁহার তিন বিবাহ। প্রথম পত্নী অকালে মৃত। দ্বিতীয় পত্নীর (মৃত্যু ১৮২৪ খ্রী) গর্ভে তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয়—রাধাপ্রসাদ (জন্ম ১৮০০ খ্রী) ও রমাপ্রসাদ (জন্ম ১৮১২ খ্রী)।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পর রামমোহন অর্থোপার্জনে মন দেন। কলিকাতায় প্রায়ই আসিতেন এবং নবাগত সিভিলিয়ানদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া তাঁহাদের নানা বিষয়ে সাহায্য করেন। এই সুযোগে ভালো করিয়া ইংরেজী শিখিয়া লন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মচারীদের মধ্যে জন ডিগবীর সহিত তাঁহার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠতা হয়। কোম্পানির কাজে ইঁহার অধীনে তিনি দেওয়ানরূপে রংপুরে কর্ম করেন—মোটা-মুটি ১৮০৫ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার ভুটান সীমান্তে যান কোম্পানির হইয়া দৌত্যকার্যে। ডিগ্‌বীর সাহচর্যে তাঁহার সমস্ত নূতন চিন্তা এই সময়ের মধ্যেই পরিপক্বতা লাভ করে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামমোহন কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন, এখন হইতেই প্রকাশ্যে তাঁহার সংস্কার-প্রচেষ্টার শুরু। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় লেখা (ভূমিকা অংশ আরবীতে) 'তুহ্‌ফাতুল মুবাহ্‌হিদ্দীন' (১৮০৩ খ্রী)। বইটিতে একেশ্বরবাদের সমর্থন আছে। অতঃপর একেশ্বরবাদ (বা ব্রহ্মবাদ) প্রতিষ্ঠাকল্পে বেদান্ত-সূত্র ও তৎসমর্থক উপনিষদ্‌গুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৮১৫ হইতে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়া গেল 'বেদান্তগ্রন্থ', 'বেদান্তসার', 'কেনোপনিষদ', 'ঈশোপনিষদ', 'কঠোপনিষদ', 'মাণ্ডূক্যোপনিষদ' ও 'মুণ্ডকোপনিষদ'। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার লেখার প্রতিবাদ লিখাইতে লাগিলেন। এই সব প্রতিবাদ কটূক্তিপূর্ণ এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন। রামমোহনও প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলেন যুক্তি দিয়া ও ভদ্রভাষায়। প্রতিবাদ-কর্তারা অবিলম্বে থামিয়া গিয়াছিলেন। প্রতিবাদ-কর্তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার, ইঁহার গ্রন্থের নাম 'বেদান্তচন্দ্রিকা' (১৮১৭ খ্রী)। 'বেদান্তচন্দ্রিকা'র প্রতিবাদে রামমোহন 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' (১৮১৭ খ্রী) লিখিয়া প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখাইলেন 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠা করিয়া (১৮১৫ খ্রী)। এই আত্মীয় সভাকেই পরে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ও রূপ দেন (১৮২৮ খ্রী)।

বেদান্ত-উপনিষদ্‌গুলি বাহির করিবার কালেই তিনি সতীদাহ অশাস্ত্রীয় এবং নীতিবিগর্হিত প্রমাণ করিয়া পুস্তিকা লিখিলেন 'প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (নভেম্বর, ১৮১৮ খ্রী)। প্রতিবাদে পুস্তিকা বাহির হইল 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ'। তাহার প্রতিবাদে দ্বিতীয় (১৮১৯ খ্রী) ও তৃতীয় পুস্তিকা (১৮২৯ খ্রী) বাহির হয়। এই বছরেই ডিসেম্বর মাসে আইন করিয়া সহমরণ-রীতি নিষিদ্ধ করা হয়। তবুও গোঁড়ারা চেষ্টা করিতে লাগিল যাহাতে পার্লামেণ্টে বিষয়টি পুনর্বিবেচিত হয়। এই চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য রামমোহন বিলেত যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

বাংলায় ও ইংরেজীতে সাময়িকপত্র ছাড়া তিনি ফারসীতে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র চালাইয়াছিলেন এক বছর ধরিয়া (১৮২২-২৩খ্রী)। সংবাদপত্রটির নাম 'মিরাতুল্‌-আখ্‌বার'। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এমন কি ইরাণেও এই ফারসী সংবাদপত্রটির গ্রাহক ছিল। গভর্নর জেনারেল যখন হুকুমজারি করিলেন যে, সংবাদ ও সাময়িকপত্র মাত্রেরই রেজেস্টারিভুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তখন তিনি সে হীনতা স্বীকার না করিয়া কাগজটি উঠাইয়া দিলেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বরে তিনি কলিকাতা হইতে বিলেত যাত্রা করেন। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়া ভার দিলেন বিলেতে গিয়া রাজ-দরবারে যেন বাদশাহের তন্‌খো বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ এপ্রিল রামমোহন লিভারপুলে পৌঁছিলেন। সেখানে সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বৎসমাজে তাঁহার প্রচুর সমাদর হইয়াছিল। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে কিছুদিনের জন্য তিনি ফ্রান্সেও গিয়াছিলেন। ফিরিয়া ব্রিস্টলের নিকটবর্তী স্টেপ্‌লটন্‌হিল গ্রামে থাকার সময়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮ অক্টোবর দেহ ব্রিস্টলে সমাধিস্থ হয়।

তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারতবর্ষকে আগাইয়া যাইবার পথনির্দেশ করিয়াছিলেন। তিনিই আমাদের দেশের প্রথম লিঙ্গুয়িস্ট। বাংলা ছাড়া তিনি জানিতেন সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, হিব্রু (কিছু) ও গ্রীক (কিছু)। বাংলা গদ্যের তিনি জনক—এই অর্থে যে তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে স্বীয় স্বাধীন চিন্তা লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁহার ভাষা কোনও গ্রন্থের অনুবাদ-গন্ধী নয়। তাঁহার বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (ইংরেজীতে লেখা, পরে বাংলায় অনূদিত) বাংলা ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। স্বাধীনচিত্ততার প্রকাশে তাঁহার জুড়ি নাই। সংস্কৃত কলেজ করিবার আবশ্যক নাই, আমাদের ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিখিতে হইবে—উচ্চকণ্ঠে এ-কথা ঘোষণা করিবার সাহস সেকালে তাঁহার ছাড়া অন্য কাহারও ছিল না।

সুকুমার সেন

রামরাম বসু (আনুমানিক ১৭৫৭-১৮১৩ খ্রী) বাংলা গদ্যের ইতিহাসে বাংলা গ্রন্থ-রচয়িতা হিসাবে রামরাম বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেরির ('কেরি, উইলিয়াম' দ্র) প্রেরণা ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ('ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' দ্র) পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১ খ্রী) ও 'লিপিমালা' (১৮০২ খ্রী) গদ্যগ্রন্থ দুইখানি রচনা করেন। কলেজ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অনুমোদিত এবং শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হয়। বাংলা গদ্য-রচনার নিদর্শন হিসাবে এবং ঐতিহাসিকতার বিচারেও 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' গ্রন্থখানির মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। লিপিমালার প্রাঞ্জলতা, বিষয়বস্তু ও রীতিবৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। বাংলায় প্রথম বাইবেল অনুবাদ এবং খ্রীষ্টসংগীত ও খ্রীষ্টজীবনী প্রভৃতি রচনায় কেরি ও অন্যান্য মিশনারি সাহেবদের সাহায্য করেন।

জন টমাসের মুন্‌শীপদে নিযুক্ত হইয়া (১৭৮৭ খ্রী) শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটির সহিত যুক্ত হন। পাঁচ বৎসর (১৭৮৭-৯২ খ্রী) টমাসের সহিত কাজ করিবার পর কেরির মুন্‌শী হন (১৭৯৩ খ্রী)। 'কেরি সাহেবের মুন্‌শী' নামেই সমধিক পরিচিত হন। ব্যক্তিগত কারণে কেরির সহিত তাঁহার ছাড়াছাড়ি হয় (১৭৯৬ খ্রী)। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা হইলে কেরি আবার তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। পাঠ্যপুস্তকের অভাবমোচনকল্পেই এই সময় 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' লিখিত হয় এবং কলেজ-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে তিনি তিনশত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত কর্মসূত্রে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। সংস্কারমুক্ততার বিচারেও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণীয়। স্বরচিত লিপিমালার ভূমিকায় তিনি 'এক পরম ব্রহ্মের' উদ্দেশে নতি জানাইয়াছেন।

অমলেন্দু ঘোষ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩ খ্রী) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্‌। জন্ম বাঁকুড়া জেলার পাঠকপাড়ায় (২৯ মে)। প্রবেশিকা (১৮৮৩ খ্রী) ও এফ. এ. (১৮৮৫ খ্রী) পাশ করিয়া ইংরেজী অনার্সে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর এম. এ. পাশ করেন। কিছুকাল এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা নামক কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। প্রথমদিকে 'দাসী' (১৮৯২ খ্রী), 'মুকুল' (১৮৯৫ খ্রী), 'প্রদীপ' (১৮৯৭ খ্রী) প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদনা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ প্রবাসে (এলাহাবাদে) বলিয়া পত্রিকার নাম হয় 'প্রবাসী'। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী পত্রিকা 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশ করেন। হিন্দী ভাষায় 'বিশাল ভারত' প্রকাশ করেন। ভারতীয় সাংবাদিকতা ('জার্নালিজম্‌')-র ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

রামানুজ (আনুমানিক ১১শ-১২শ শতাব্দী) মাদ্রাজের অনতিদূরস্থ শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংসারজীবন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসজীবনে প্রবিষ্ট হন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং 'যতিরাজ' আখ্যা পান। শ্রীরঙ্গমে স্থায়িভাবে বাস করিতে থাকেন। এক শিষ্যের সাহায্যে বেদান্তসূত্র, বেদার্থসংগ্রহ ও বেদান্তদীপ রচনা করেন এবং ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা লেখেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর তাঁহার টীকা 'শ্রীভাষ্য' নামে বিখ্যাত এবং তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদমতে বিশ্বাসী এবং বিষ্ণুভক্ত। ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া মুক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। পাঞ্চরাত্রিক ভাগবতে উল্লিখিত মতের সহিত তাঁহার মতের সাদৃশ্য আছে। শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ অনুসারে কেবল ব্রহ্মই সত্য, জগৎপ্রপঞ্চ সমস্তই মিথ্যা। কিন্তু রামানুজ-দর্শনে তিনটি বস্তু স্বীকৃত—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ ও

অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনই স্বীকার্য। অতএব জগৎপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা ঠিক নয়। ঈশ্বর পরম কারুণিক ও ভক্তবৎসল। অতএব ভক্তিমার্গ আশ্রয়ে মোক্ষলাভ করা যায়। তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-ভিত্তিক ('শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' দ্র)। তিনি বহু বৌদ্ধ ও জৈনকে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করেন। শ্রীরঙ্গমে থাকিবার সময়ে তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে তাঁহাকে শ্রীসম্প্রদায় লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া মনে করেন ('শ্রীসম্প্রদায়' দ্র)। আনুমানিক ১১৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

উমা রায়

রামায়ণ দাশরথি রামের কাহিনী লইয়া বিরচিত প্রাচীন মহাকাব্য, সংস্কৃত ভাষায় লেখা। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। রচয়িতা চ্যবনপুত্র (বা চ্যবনবংশীয়) বাল্মীকি ('বাল্মীকি' দ্র) এই গ্রন্থটি রচনা করিয়া ভারতবর্ষে আদি কবি বলিয়া সম্মান লাভ করিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণ কাব্যটি ৭ খণ্ডে বিভক্তঃ আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দর, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা ও উত্তর। এখনকার পণ্ডিতেরা আদি ও উত্তর কাণ্ড দুইটি কিছু পরবর্তীকালে সংযোজিত বলিয়া মনে করেন।

রামায়ণের কাহিনী অতি সংক্ষেপে এইঃ অযোধ্যার রাজা দশরথের চারি পুত্র ও তিন মহিষী। প্রথম পত্নীর গর্ভে রাম, দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে ভরত, তৃতীয় পত্নীর গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করেন। মুনি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে তাড়কা রাক্ষসীর ('তাড়কা' দ্র) উপদ্রব হওয়ায় বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া গিয়া রাক্ষসী-নিধন করান এবং রাজা জনকের ('জনক' দ্র) সভায় রামকে লইয়া যান। জনকের সভায় শিবের ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়া তাহা ভাঙিয়া ফেলেন। অপরের অসাধ্য এই বীরকর্মের জন্য জনক রামের সঙ্গে কন্যা সীতার বিবাহ দেন। সেই সঙ্গে জনকের ভ্রাতুষ্কন্যাদের সঙ্গে রামের তিন ভাইয়েরও বিবাহ দেওয়া হয়। যথাকালে দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সংকল্প করেন। তাহাতে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ী ('কৈকেয়ী' দ্র) ছাড়া সকলেই খুশি হন। কৈকেয়ী একদা পতিকে খুশি করিয়া একটি যথেচ্ছ বর পাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তিনি রামকে বনবাস দিয়া পুত্র ভরতকে রাজা করিতে চাহিলেন। আপন প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে যাইতে হইল। তিনি সঙ্গে লইলেন পত্নী সীতা ও অনুরক্ত অনুজ লক্ষ্মণকে। রামকে বনবাস দিতে বাধ্য হইয়া দশরথও ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভরত তখন অযোধ্যায় ছিলেন না। আসিয়া তিনি পিতৃকৃত্য করিলেন এবং রামকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজা করিতে চেষ্টা করিলেন। রাম রাজি হইলেন না। ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে অযোধ্যায় শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

সীতা ও লক্ষ্মণ সঙ্গে রাম শান্তিতে আছেন দণ্ডকারণ্যে। শান্তি ভঙ্গ হইল রাক্ষসী শূর্পণখার অভিসারে। লক্ষ্মণ তাহাকে শাস্তি দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। শূর্পণখা লঙ্কার রাজা বিষম প্রতাপশালী রাবণের ('রাবণ' দ্র) ভগিনী। সে রাবণকে সীতাহরণ করিতে প্রবৃত্তি দিল। শঠতা করিয়া রাবণ একাকিনী অসহায়া সীতাকে অপহরণ করিল। ভার্যাহারা হইয়া রাম ঘুরিতে ঘুরিতে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে বানররাজ্য এবং দুই ভাইয়ে দারুণ বিবাদ। ছোট ভাই সুগ্রীবের পক্ষ লইয়া রাম বড় ভাই বালীকে ('বালী' দ্র) বধ করিলেন। সুগ্রীব রাজা হইয়া সমগ্র বানরবাহিনী লইয়া রামের সাহায্যে প্রস্তুত হইল। সুগ্রীবের এক প্রধান অনুচর রামের ভক্ত হইল এবং সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গিয়া সীতার খোঁজ আনিল। বানরসৈন্যের সাহায্যে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কায় গিয়া রাম রাবণ ও তাহার বীরপুত্র ও ভাইদের নিহত করিলেন। তাঁহার সহায় হইয়াছিল রাবণের এক ভ্রাতা বিভীষণ। বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া সিংহাসনে বসিলেন। কিছু দিন সুখে রাজ্য করিবার পর রাম শুনিলেন যে, রাবণের কারাগারে সীতা দীর্ঘকাল ছিলেন বলিয়া প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সচ্চরিত্রতায় সন্দিহান। শুনিয়া রাম সীতাকে বাল্মীকি-আশ্রমে নির্বাসন দিলেন। সীতা তখন গর্ভবতী। বাল্মীকির আশ্রয়ে রামের দুই পুত্র কুশ ও লব ('কুশ' দ্র) ভূমিষ্ঠ হইল। বাল্মীকি তাহাদের সবরকম শিক্ষা দিয়া মানুষ করিলেন এবং নিজে রামচরিত-কাব্য রচনা করিয়া তাহাদের গান করিতে শিখাইলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে কুশ ও লব অযোধ্যার রাজসভায় আসিয়া রামায়ণ গান গাহিল। রামের ভুল ভাঙিল। তিনি পুত্রদের স্বীকার করিয়া সীতাকে আনাইলেন ও তাঁহার চারিত্রশুদ্ধির প্রমাণ দিতে বলিলেন। দুঃখে-অপমানে সীতা ভূমিগর্ভে অপসৃত হইলেন। কিছুকাল পরে কুশকে সিংহাসনে বসাইয়া রাম ভ্রাতৃবর্গ ও অমাত্য-পরিজনসহ সরযূ নদিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উপরে কথিত রামচরিত কাহিনী ভারতবর্ষের সব অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দেশে প্রচলিত আছে অথবা একদা প্রচলিত ছিল। এই সব কাহিনীর মধ্যে অল্পস্বল্প গরমিল থাকিলেও মোট কথাটি একই।

সুকুমার সেন

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রী) বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ে প্রবন্ধকারদের পুরোধা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো-কান্দিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গোবিন্দসুন্দর। রামেন্দ্রসুন্দর পাঠশালা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্রই উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষায় (১৮৮৭ খ্রী) প্রথম স্থান লাভ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। স্কুলে পড়িবার সময়েই জেমোর রাজপরিবারে তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর রিপন কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অবসর গ্রহণ করিলে রামেন্দ্র-সুন্দরই স্থায়িভাবে অধ্যক্ষপদে মনোনীত হন (১৯০৩ খ্রী)।

বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয়কে অত্যন্ত সহজ করিয়া বাংলা ভাষাতে লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬ খ্রী) কয়েকটি বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সংকলন। পরবর্তী গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা' (১৯০৪ খ্রী)। রামেন্দ্রসুন্দরের বেদচর্চার ফল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ (১৯১১ খ্রী) এবং 'যজ্ঞকথা' (১৯২০ খ্রী)। তিনি বেদের যে ব্যাখ্যা করেন তাহা 'চরিতকথা'য় (১৯১৩ খ্রী) হেলমহোলৎজ ও ম্যাক্সমুলারসহ বাংলাদেশের কয়েকজন স্মরণীয় ব্যক্তির চিন্তা ও কীর্তির কথা আছে। রামেন্দ্রসুন্দরের নিজস্ব দার্শনিক ভাবনা নিবদ্ধ হইয়াছে 'কর্মকথা'য় (১৯১৩ খ্রী)। যুগ ও জীবন, ব্যক্তি ও সমাজ, শিক্ষানীতি ও সমাজধর্মের কতকগুলি প্রচলিত সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন 'নানা কথা'র (১৯২৪ খ্রী) প্রবন্ধাবলীতে। 'শব্দকথা' (১৯১৭ খ্রী) বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও পরিভাষা বিষয়ক আলোচনা।

রামেন্দ্রসুন্দর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার লেখা অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ 'পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা' (১৯০০ খ্রী), 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬ খ্রী), 'মায়াপুরী' (১৯১১ খ্রী), 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০ খ্রী), 'জগৎকথা' (১৯২৬ খ্রী)।

ভবতোষ দত্ত

রামেশ্বর দক্ষিণ ভারতে পম্বন হইতে ৬ কি. মি. উত্তরে পিতৃতীর্থ রামেশ্বর অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় গমন করিবার জন্য এইস্থানে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর, শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণবতীর্থ। রামেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে পার্বতীর মন্দির। শ্রীচৈতন্যও রামেশ্বর দর্শন করিয়াছিলেন। সমুদ্রতীরে ২০ বিঘা জমির উপর অবস্থিত। ইহার পূর্বদ্বারের গোপুর দশতলা এবং পশ্চিমদ্বারের গোপুর সাততলা। রামেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণমণ্ডিত স্তম্ভ আছে। রামেশ্বর ক্ষেত্রে গন্ধমাদন, সাক্ষী বিনায়ক, জটাতীর্থ, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শনীয়।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

রামেশ্বর চক্রবর্তী (ভট্টাচার্য) (আনু. ১৬৬৭-১৭৪৮ খ্রী) মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিবসংকীর্তন (শিবায়ন)-এর কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই যুগের চণ্ডীমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল কাব্যসমূহের প্রথমাংশই শিবায়ন। তাঁহার কাব্যের প্রথমার্ধে পুরাণের অনুসরণ, দ্বিতীয়ার্ধে লোকজীবনের পরিচয় আছে। বাংলার কৃষি ও কৃষকের অন্তরঙ্গ চিত্র অপূর্ব মহিমায় ফুটিয়াছে। তাঁহার 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'ও বাঙ্গালীর প্রিয় গ্রন্থ। সত্যনারায়ণ-পূজানুষ্ঠানে ইহা প্রায় সর্বত্র পঠিত হয়। ইহাকে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের সত্যনারায়ণ-মহিমা অংশের বঙ্গানুবাদ বলা চলে। জন্মঃ মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামে। 'বেণীসংহার' নাটক-রচয়িতা বিখ্যাত ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব। পিতা লক্ষ্মণ।

কবি বরদার তৎকালীন রাজা শোভাসিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা হেমৎসিংহের অত্যাচারে স্বীয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া (১৬৯৭ খ্রী) মাতুলালয়ে আশ্রয় লন। তৎপূর্বেই তাঁহার 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনা সম্পূর্ণ হয়। পরে স্থানীয় কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের সভায় পুরাণ-পাঠক নিযুক্ত হন। রাজা অযোধ্যানগর গ্রামে তাঁহার বাসগৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। এখানে তিনি সিংহবংশের প্রতিষ্ঠিত দেবী মহামায়া ও অভয়ার পূজারী, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পরে সিদ্ধিলাভ করেন। এই জন্যই তাঁহাকে 'সাধক কবি' বলা হয়। রামসিংহের পুত্র রাজা হইয়া তাঁহাকে সভাকবি করেন। এই সময়ে কবির 'শিবায়ন' রচনা সমাপ্ত হয় (১৭১১ খ্রী)। কবির স্বহস্ত-লিখিত মহাভারত শান্তিপর্বের একখানি পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অনুলিপি ১১৫১ বঙ্গাব্দের ২১ আষাঢ় শেষ হয়। যদুপুরের অধিবাসীরা বৈশাখী পূর্ণিমাকে কবির মৃত্যুতিথি ভাবিয়া গ্রামপ্রান্তে একটি বটবৃক্ষতলে প্রতি বৎসর অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন করিয়া থাকেন।

কর্ণগড়ে দেবীমন্দিরের পার্শ্বে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা যশোমন্তের নির্মিত সমাধি-মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখা বিগত ১৩৬৯ বঙ্গাব্দের ২৯ পৌষ, সোমবার সেই স্থানেই একটি নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

রায়গড় শিবাজী দ্র

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত যে ভূমিবন্দোবস্তে জমি যাহার দখলে আছে সেই রায়তের উপর রাষ্ট্র সরাসরি ভূমিরাজস্ব আরোপ করিতে পারে এবং কোনওরূপ মধ্যবর্তী আদায়কারীর সাহায্য বিনা তাহার নিকট হইতে প্রতি বৎসর সেই ভূমিরাজস্ব আদায় করিতে পারে তাহাকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত বলে। এই প্রথায় নির্দিষ্ট ধরনের চাষের জমির নির্দিষ্ট পরিমাণের উপর (যেমন বিঘা-প্রতি) ('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্র) টাকার অঙ্কে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হয়। ইহা জমিদারি বন্দোবস্তের বিপরীত।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে লর্ড কর্নওয়ালিশ জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করেন। এদিকে সেই বৎসর হইতেই মাদ্রাজে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিবৃন্দ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের এই রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত গড়িয়া তুলিতে থাকেন। মাদ্রাজের বড়মহল ও সালেম অঞ্চল দুইটি শাসনের ভার লন (১৭৯২ খ্রী) ক্যাপ্টেন রীড ও তাঁহার তিনজন সহকারী মনরো, গ্রাহাম ও ম্যাকলিয়ড্। মনরো নিজের অঞ্চলে সরাসরি রায়তদের সহিত বন্দোবস্ত শুরু করেন (১৭৯৩ খ্রী)। ঐ সকল অঞ্চলে রাজস্ব আদায়কারী জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। প্রধানতঃ মনরো-র উদ্যোগে রায়তদের সহিত প্রত্যক্ষ বন্দোবস্ত করার ব্যবস্থা হয়। এইভাবে ভারতের দুই প্রান্তে প্রায় একই সময় হইতে দুইটি বিপরীত ধরনের ভূমিবন্দোবস্ত দেখা দেয়। ইংল্যান্ডের বোর্ড অভ্ কন্ট্রোল রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের অনুকূলে মত প্রকাশ করিলে ইহা ব্রহ্মদেশ সহ সারা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই প্রবর্তিত হয়। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মূল ভিত্তি ছিল উপযুক্ত জরিপ এবং প্রতিটি জমিখণ্ড সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ। এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিটি জমিখণ্ডের উপর টাকার অঙ্কে রাজস্ব আরোপিত হয়। রাজস্ব নির্ধারণের সময় সকল বিষয় এমন কি সারের ব্যবহার, বাজারের দূরত্ব প্রভৃতিও বিচার করা হইত। প্রতি রায়তকে চলতি বৎসরের জন্য এক একখানি পাট্টা (বা বাৎসরিক লীজের দলিল) দেওয়া হইত ; তাহাতে সে কোন্ কোন্ জমিখণ্ড দখল করিয়া আছে এবং প্রতিখণ্ডের দরুণ দেয় রাজস্বের পরিমাণ উল্লিখিত থাকিত। জরিপ বা ভূমিরাজস্ব ধার্য করার সময়ে কারণ দর্শাইয়া রায়ত ভূমিরাজস্ব হ্রাস করার আবেদন করিতে পারিত। মনরো রায়তদের সহিত নিম্নহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার কথা বলিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ সে মত গ্রহণ করেন নাই। রমেশচন্দ্র দত্ত এই অস্থায়ী বন্দোবস্তকেই দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বলিয়া গিয়াছেন। জমিদারদের সহিত বন্দোবস্তের অসংখ্য কুফল বিশ্লেষণ করিয়া রায়তওয়ারী বন্দোবস্তকে সমর্থন করা হয়।

স্বাধীনতালাভের পরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে ভূমিসংস্কার আইনগুলি প্রণীত হইয়াছে, উহাদের সকলের লক্ষ্য মধ্যস্তরের খাজনা আদায়কারী শ্রেণীকে অপসারণ করিয়া রাষ্ট্রের সহিত রায়তের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত।

হরশংকর ভট্টাচার্য

রায়দুর্লভ পলাশিযুদ্ধের সময়ে মীরজাফর ও ইয়ারলতিফের সহিত ইনিও নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

আলিবর্দীর প্রধানমন্ত্রী জানকীরামের পুত্র। প্রথমে ওড়িশার পেস্কার ছিলেন ও পরে শাসনকর্তা হন। রঘুজী ভোঁসলা ওড়িশা আক্রমণ করিলে তাঁহার শরণাগত হন ও বৎসরাধিককাল বন্দী থাকিবার পর ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দিয়া মুর্শিদাবাদে যান। তথায় রাজা রামনারায়ণ তাঁহাকে প্রধান মুৎসুদ্দি নিযুক্ত করেন। সিরাজুদ্দৌলা তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিলে মীরজাফরের সহিত নবাবের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীরজাফর নবাব হইয়া তাঁহাকে দেওয়ান করেন কিন্তু পরে শত্রু হন। শেষজীবনে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অবস্থায় রায়দুর্লভের মৃত্যু হয়।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

রায়পুর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত বিভাগীয় শহর, জেলা ও প্রধান শহর। জেলার আয়তন ২১২৭৩.২ বর্গ কি. মি. (১৯৬১ খ্রী)। জেলাটি মহানদী নদীদ্বারা দ্বিধাবিভক্ত। উচ্চতম পাহাড় দেওদানগড়। অনেকগুলি বিখ্যাত জলপ্রপাত আছে। জেলার জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। বনভূমি ও বৃক্ষাদির স্বল্পতা হেতু গ্রীষ্মকালে উত্তর-মধ্যভাগে নিদারুণ কষ্ট হয় ; দক্ষিণে ও পূর্বে শাল বনের জন্য গরম কম।

সিরপুরের প্রাচীন মন্দিরগুলি দর্শনীয়। জেলার বিভিন্ন অংশে অনেক শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। কুটিরশিল্পের মধ্যে পিতল, কাঁসা ও তামার তৈজসপত্রাদি, তসর ও কার্পাস বস্ত্র বয়ন, চুড়ি ও বালা নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রবিশংকর শুক্লা বিশ্ববিদ্যালয় রায়পুর শহরে অবস্থিত।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

রায় রামানন্দ ওড়িশার নৃপতি গজপতি প্রতাপরুদ্রের অমাত্য ও শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ। শ্রীচৈতন্যের সহিত

সাক্ষাৎকারের পূর্বেই ইনি 'জগন্নাথবল্লভ নাটক' রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ঐ নাটকে শ্রীচৈতন্যের নাম নাই। উহার ২১টি সংস্কৃত পদের প্রত্যেকটিতে প্রতাপ-রুদ্রের স্তুতি আছে। মহাপ্রভু ঐ নাটক আস্বাদন করিয়া আনন্দ পাইতেন। এই রসসমৃদ্ধ ক্ষুদ্র নাটকটি পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত।

শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তীর্থযাত্রা করিবার পথে গোদাবরীতীরে রামানন্দের সহিত প্রথম মিলিত হন। তখন প্রভুর বয়স ২৪ বৎসর মাত্র, আর রায় রামানন্দ প্রবীণ রাজপুরুষ ও খ্যাতনামা কবি। কবিকর্ণপুর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত কাব্যে (১৫৪২ খ্রী) উভয়ের কথোপকথনের সারাংশ দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার সময়ে ইঁহার সহিত পুনরায় মিলিত হন (১৫১২ খ্রী)। অতঃপর ইনি পুরীতে শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিয়া বাস করেন।

শুধু যে গীতিকার ছিলেন তাহা নহে, নৃত্যবিদ্যা-তেও তাঁহার অধিকার ছিল। 'ক্ষুদ্রগীত প্রবন্ধ' নামে এক গানের বইও লেখেন। 'পাহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল'—এই বিখ্যাত ব্রজবুলি পদটি ইঁহারই রচনা।

বিমানবিহারী মজুমদার

রায়শেখর সপ্তদশ শতকে গোবিন্দদাসের পরবর্তী-কালে আবির্ভূত। রায়শেখরের পরিচয় সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। শেখর কথাটির পূর্বে কবি-নৃপ-নব ভণিতাযুক্ত অনেক পদ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'গৌরপদতরঙ্গিণী' গ্রন্থে ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর বা চন্দ্রশেখর বলিয়া উল্লেখ করেন। সুকুমার সেন মনে করেন, ইনি 'গোপালবিজয়' কাব্যের রচয়িতা দৈবকীনন্দন সিংহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত রায়শেখর পদাবলীতে নব-কবি ভণিতাযুক্ত রায়শেখরের পদ বর্তমান। মনে হয় কবির আসল নাম শেখর। 'পদকল্প-তরু'তে শেখরযুক্ত সব রকম ভণিতায় ১৭৯টি পদ আছে। তন্মধ্যে ব্রজবুলিতে রচিত কবিশেখর ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'শেখর' ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির অনেক পদকে রায়শেখরের অন্তর্গত করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মনে করেন বিদ্যাপতির কিছু পদ শেখরের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে।

রায়শেখর শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রঘুনন্দনের শিষ্য। তিনি অষ্টকালীয় নিত্যলীলার পদ রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবসমাজে তাঁহার দণ্ডাত্মিকা পদগুলি জনপ্রিয় হইয়াছিল।

রজত রায়চৌধুরী

রাশিচক্র আকাশে সূর্যের গতিপথকে ক্রান্তিবৃত্ত বলে। ক্রান্তিবৃত্তের সমান্তরাল এবং ইহা হইতে সমদূরবর্তী দুইটি বৃত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ ১৬ ডিগ্রি পরিমিত খগোলের বলয়াকৃতি স্থানকে রাশিচক্র বলা হয়। চন্দ্র এবং গ্রহগণ সর্বদা রাশিচক্রের ভিতর অবস্থান করে। কেবলমাত্র প্লুটোগ্রহ কখনও কখনও রাশিচক্রের বাহিরে যায়। রাশিচক্রে বারটি তারামণ্ডল আছে; ইহারা দ্বাদশ রাশি নামে পরিচিত: মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। প্রত্যেক রাশি বা তারামণ্ডল ৩০ ডিগ্রি পরিমিত ধরা হয়। বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া বার মাসে সূর্য যথাক্রমে এই বার রাশিতে অবস্থান করে। চন্দ্র এবং গ্রহদের কোন্‌টি কখন কোন্ রাশিতে থাকে পঞ্জিকায় তাহার নির্দেশ থাকে।

কামিনীকুমার দে

রাশিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নামান্তর। পূর্বে এখানকার সমতল বনভূমিতে (উত্তর ও দক্ষিণ) উপজাতিরা বাস করিত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ইহাদের সহিত তুরস্কের সংঘর্ষ হয়। অনেকে বলেন, ইহার পর হইতেই এখানকার অধিবাসীদের রুশ বা রাশিয়ান বলা হইতে থাকে। ১০ম-১১শ শতাব্দীতে এই দেশের কীভ্ (কীফ্) অঞ্চলে নরম্যান বংশধর-গণের রাজত্ব শুরু হয়। ইঁহাদের শেষ রাজা আলেক-জাণ্ডার নেভেস্কির পরে মস্কো, নোভগোরভ ও হ্যালিসিজ নামে তিনটি রাজ্য মাথাচাড়া দিলে জায়গির-প্রথায় শাসনপর্ব চলে। অতঃপর একের পর এক রাজবংশীয়েরা রাশিয়ার জার (ৎসার) পদে অধিষ্ঠিত হন। অবশেষে দ্বিতীয় নিকোলস (১৮৯৪-১৯১৭ খ্রী) ও অ্যালেক্সিস (১৯১৮ খ্রী)-এর রাজত্বকালে রুশবিপ্লব দেখা দেয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বরে দুইবার বিপ্লব হয় ও পরিশেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জুলাই লেনিনের নেতৃত্বে সমগ্র রাজ্যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের নবরচিত সংবিধান আইন-সংগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪ খ্রী) পরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থান পায়। স্ট্যালিনের অভ্যুত্থান ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের পর। সেই সময় হইতে পঞ্চবার্ষিকী প্রকল্পের মাধ্যমে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতের সহিত রুশের মৈত্রী দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান আয়তন প্রায় ২২০ লক্ষ বর্গ কি. মি.। লোকসংখ্যা প্রায় ২৪ কোটি। অন্ততঃ ১০০টি জাতি ও উপজাতি লইয়া এই বৃহৎ প্রজাতন্ত্র গঠিত। রাষ্ট্রের উত্তর ও পূর্বভাগ প্রাকৃতিক কারণে

মনুষ্যবসতির অনুকূল নহে, তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে এইসব অঞ্চলও এখন আর অবহেলিত বা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত নহে। প্রায় ১৭০০ শহরে ৯ কোটি লোকের বাস। প্রধান শহর মস্কো, লোকসংখ্যা ন্যূনাধিক ৬৫ লক্ষ। সমগ্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ৩৮° উ—৭৫° উ অক্ষাংশের এবং ২২° পূ—১৭০° পূ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে ৫০০ কি. মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১০০০০ কি. মি. দীর্ঘ। জলবায়ু নানাধরনের। সর্বোত্তর তুন্দ্রাঞ্চলের ভূভাগ সারা বৎসর বরফে ঢাকা। রাষ্ট্রের অন্যত্র জলবায়ু হিমোষ্ণ। শীতকালে তাপ বেশ নিম্ন। প্রায় সর্বত্র তুষারপাত হয় এবং উত্তর ভাগ বহুদিন ধরিয়া ঢাকা থাকে। দক্ষিণ ভাগের বরফ বসন্তকাল হইতে গলিতে থাকে। বসন্তকালে বরফ গলিতে থাকিলে ফুল ও ফলে চারিদিক ঢাকিয়া যায়। রাষ্ট্রে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ৩০০-৬০০ মি. মি. মাত্র। বরফ গলা জলে কৃষিকার্য শুরু হয়। রাষ্ট্রে বহু নদ-নদী ও হ্রদ আছে। ভল্‌গা ও ডন নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাষ্ঠ ব্যবসা ও শিল্প উত্তর ও পূর্বভাগে কেন্দ্রীভূত। সাইবেরিয়ার মৃত্তিকায় অনুকূল জলবায়ুতে গম ও বীট উৎপন্ন হয়। নদী উপত্যকায় শাকসবজি, কার্পাস, তামাক, ভুট্টা, চা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। খনিজসম্পদেও রাষ্ট্র বেশ সমৃদ্ধ। কয়লা, খনিজতৈল, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনাম, তাম্র, দস্তা, সীসা, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি পাওয়া যায়। গম, রাই, আলু, তুলা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। বর্তমানে ৯৯ শতাংশ রাষ্ট্রবাসী শিক্ষিত। অধিবাসীদের মধ্যে ১৫ কোটি লোক উচ্চশিক্ষিত এবং ৪৫ কোটি জন মধ্যশিক্ষা প্রাপ্ত। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও মহাকাশ-অভিযানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বর্তমান স্থান রীতিমত উচ্চে।

পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

রাষ্ট্রকূট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্যের রাজবংশ। শব্দটির অর্থ কোনও রাষ্ট্র বা জেলার শীর্ষ-স্থানীয় কর্মচারী। পরে বংশগত নামে পরিণত হয়। রাষ্ট্রকূট-বংশীয়দের আদি বাসস্থান ও জাতি সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না। কেহ বলেন ইঁহারা উত্তর ভারতের রাঠোর বংশীয়, কেহ বলেন অন্ধ্রদেশীয় রেড্ডিদের অথবা কৃষক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কেহ বলেন ইঁহারা কর্ণাটকের আদি অধিবাসী এবং কানাড়ি ইঁহাদের মাতৃভাষা।

অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে বিভিন্ন রাষ্ট্রকূট-বংশের শাসনের উল্লেখ বিভিন্ন অনুশাসন-লিপিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাষ্ট্রকূটবংশের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, দক্ষিণ ভারতীয় রাজগণের মধ্যে তাঁহারাই সর্বপ্রথম একাধিকবার উত্তর ভারতে বিজয়াভিযানে সাফল্য লাভ করেন। তাঁহাদের অপর কৃতিত্ব এই যে, তাঁহারা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূট, গুর্জর প্রতিহার ও পালবংশীয় সম্রাটগণের মধ্যে যে যুদ্ধ চলে তাহাতে রাষ্ট্রকূটেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করেন। সম্রাট দন্তিদুর্গের (৭৫২-৭৫৮ খ্রী) সময়েই রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সাম্রাজ্যের সূচনা। দন্তিদুর্গের পিতা প্রথম ইন্দ্র, চালুক্যরাজ-পরিবারে বিবাহ করিয়া বংশমর্যাদা বৃদ্ধি করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সামন্তরূপে দন্তিদুর্গ গুজরাতে আরব আক্রমণ প্রতিহত করিয়া 'পৃথ্বী-বল্লভ' ও 'খড়্গাবলোক' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ক্রমে নন্দিপুরী, মালব, মধ্য ও দক্ষিণ গুজরাত এবং সমগ্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরার অধিকার করেন। দন্তিদুর্গের পর এই বংশের কীর্তিমান্ সম্রাট ছিলেন, যথাক্রমে ধ্রুব নিরুপম, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ ও তৃতীয় কৃষ্ণ। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য, জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়া ৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করে। সমসাময়িক প্রতিহার, পাল, পূর্ব-গঙ্গ ও চোল রাজবংশগুলির সহিত দীর্ঘকাল সংগ্রামে রাষ্ট্রকূটেরা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেন। প্রতিপক্ষের নিকট কোনও কোনও সময়ে পরাজিত হইলেও অধিকাংশ সময়ে বিজয় গৌরব তাঁহারাই লাভ করেন।

কেবল রণক্ষেত্রে নহে, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধিতে রাষ্ট্রকূটদের দান স্মরণীয়। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তাঁহাদের উদার সমর্থন লাভ করে। এই বংশের রাজা প্রথম কৃষ্ণ ইলোরায় যে কৈলাসনাথ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, পর্বত কাটিয়া মন্দির নির্মাণের শিল্পে তাহার স্থান অদ্বিতীয়। আরব লেখকগণ রাষ্ট্রকূটদের ধর্মক্ষেত্রে উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইসলাম ধর্মও তাঁহাদের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছিল।

প্রেমবল্লভ সেন

রাষ্ট্রপতি সংবিধান, ভারতীয় দ্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদ্যার একটি প্রধান অঙ্গ। নির্দিষ্ট জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজবদ্ধ মানুষ স্বীকৃত সরকারের মাধ্যমে যে সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তাহা 'রাষ্ট্র' (স্টেট) নামে খ্যাত। রাষ্ট্র-সম্পর্কে যে বিশেষ জ্ঞান, তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান (পলিটিক্যাল সায়ান্‌স্)। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল (৩৮৪-২২ খ্রী পূর্ব) ('আরিস্তোতল' দ্র) সমকালীন ভারতীয় পণ্ডিত কৌটিল্য এই শাস্ত্রের প্রারম্ভিক সূত্রাবলী সর্বপ্রথম সুপরিস্ফুট করেন। আরিস্তোতল রচিত সূত্রাবলী অবলম্বন করিয়াই রাষ্ট্রের প্রকৃত ও স্বরূপ

সম্বন্ধে আজও আলোচনা হয়। অনুরূপভাবে, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, কূটনীতির বিবিধ কলাকৌশল, সুশাসকের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি লইয়া যে সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ, সেগুলি আজও সমাদৃত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার পরীক্ষামূলক (ইনডাক্টিভ) ও ব্যবহারিক (ডিডাক্টিভ) এই দ্বিবিধ প্রণালী প্রয়োগ করা হয়।

পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অবলম্বনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত 'রাষ্ট্রনীতি', 'রাষ্ট্রতত্ত্ব' প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যায়; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অসংখ্য মতাদর্শ বা থিওরি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা জন্মে।

পক্ষান্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক পদ্ধতির সাহায্যে একদিকে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, উপদল, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ইত্যাদির প্রভাব, শাসন-ব্যবস্থা ও জনসংযোগ, সংবিধান ও তাহার প্রচলনের পথে বিভিন্ন সমস্যাবলী এবং অপরদিকে রাষ্ট্রের বৈদেশিক কূটনীতি আন্তর্জাতিক আইন, আন্তঃরাষ্ট্রিক পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা জন্মে।

প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১ খ্রী) আদর্শবাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান প্রবক্তা। তিনি রাষ্ট্রকে সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান্ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার কল্পনায় রাষ্ট্র এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংক্রিয়, স্বয়ম্ভূ ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান, যাহা ব্যতীত ব্যক্তির কোনও অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। হেগেলের মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী, গণতন্ত্রবিরোধী ও আন্তর্জাতিক শান্তির প্রতিকূল বলিয়া ব্যাপকভাবে সমালোচিত।

কমিউনিজম বা সাম্যবাদের প্রবর্তক প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্ক্‌স্ ('মার্ক্‌স্, কার্ল' দ্র) তাঁহার জড়বাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁহার মতে, শোষণ-প্রবণ ধনিকগোষ্ঠী সর্বহারা শ্রমিকদের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্যই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের অত্যাচারের হাতিয়ার করিয়া রাখে।

ফলতঃ সমস্ত সাম্যবাদী রাষ্ট্রেই সাম্যবাদী বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্যের পর শ্রমিকদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্রকে প্রাগ্‌যুগের মতই শক্তিমান্ থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে অস্বীকার করিলেও মার্ক্‌স্‌বাদী দেশগুলি কার্যতঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না।

বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অধ্যাপক **হ্যারল্ড** ল্যাস্‌কি (১৮৯৩-১৯৫০ খ্রী, 'ল্যাস্‌কি, হ্যারল্ড' দ্র) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বহুত্ববাদের (প্লুরালিজম্) প্রবর্তক। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইলে শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠে, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হয় ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হইয়া ওঠে। উপরন্তু সমাজবাসী মানুষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানারূপ অভাব অভিযোগের মীমাংসা করিতে রাষ্ট্র অসমর্থ; কারণ, রাষ্ট্র প্রধানতঃ একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং বৃহত্তম সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। এই যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া ল্যাস্‌কি তাঁহার বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও নিজ নিজ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতাপ্রদানের পক্ষপাতী। ব্যক্তিস্বাধীনতার দিক্ হইতে মূল্যবান্ বিবেচিত হইলেও এই মতবাদ অবাস্তব বলিয়া পরিত্যক্ত। সমাজের অসংখ্য সংস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনকে সুপরিচালিত করিয়া তুলিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং তদনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজ ও ব্যক্তির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিলেও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রশাসন-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখিবার যুক্তি অভ্রান্ত বলিয়া ধরা হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আধুনিক সুসভ্য মানবসমাজে নানাবিধ বৈচিত্র্যের সার্থক সমন্বয় (সিনথিসিস্) সাধনের উদ্দেশ্যকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন।

অতি আধুনিক সমন্বয়-প্রয়াসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নীতিনির্ধারক ফলিতবিদ্যার (অ্যাপ্লায়েড্ পলিসি সায়ান্স) অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হইয়া বহু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, সংখ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি মানব-কেন্দ্রিক বিভিন্ন শাস্ত্রের (হিউম্যানিটিজ) সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ও পরস্পর প্রভাবশালী বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকল্যাণকর রূপটি উদ্‌ঘাটিত করেন।

শোভনলাল মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের একান্নটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয়, রুশ ও চীনা ভাষায় লিখিত দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই স্বাক্ষর তাঁহাদের রাষ্ট্রগুলির দ্বারা ২৪ অক্টোবরের মধ্যে অনুমোদিত হইলে, এই দিনটি 'রাষ্ট্রসংঘ দিবস'-রূপে স্বীকৃত হয়। পাঁচটি ভাষা রাষ্ট্রসংঘের সরকারি ভাষা। এই প্রতিষ্ঠানের দুইটি মূল অংশ—সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি-পরিষদ। সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সাধারণ পরিষদের

সদস্য। স্বস্তিপরিষদের দায়িত্ব যুদ্ধনিবারণ। এই পরিষদের এগারটি সদস্যের মধ্যে স্থায়ী সদস্য পাঁচটি— চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য (ইউ. কে.) এবং যুক্তরাষ্ট্র (ইউ.এস.এ.)। অস্থায়ী ছয়টি সদস্যরাষ্ট্রকে সাধারণ পরিষদ দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত করে। স্বস্তিপরিষদের যে কোনও সিদ্ধান্ত বাতিল করার অধিকার ('ভেটো') স্থায়ী পাঁচটি সদস্যের আছে। প্রধান দপ্তর ও অধিবেশন কেন্দ্র নিউইয়র্কে। শাখা সংস্থাগুলির দপ্তর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত। লোকহিতকর কার্য পরিচালনার জন্য ইহার অনেক সংস্থা যেমন শিক্ষামূলক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান (ইউনেস্কো), বিশ্বব্যাংক, বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, বিশ্বআবহাওয়া সংস্থা ইত্যাদি।

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

রাসযাত্রা শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উপলক্ষে কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে অনুষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণের পূজোৎসব। এই উৎসবের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে নাই। তবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা মূলতঃ বৈষ্ণবদের উৎসব। নবদ্বীপে এই সময়ে বিভিন্ন শাক্ত দেবতার পূজাও হয়। কেহ বলেন, বৈষ্ণবদের রাসের উৎসব পণ্ড করিবার জন্য শাক্তদের এই আয়োজন। এরূপও বলা হয় যে অন্যেরা বলেন এই সমস্ত দেবতারা কৃষ্ণের রাস দেখিবার জন্য সমবেত হন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১খ্রী) স্বনামখ্যাত হাইকোর্টের উকিল, অসাধারণ আইনজ্ঞ ও দানবীর। জন্ম বর্ধমান জেলার খন্ডঘোষ গ্রামে। পিতা জগবন্ধু, মাতা পদ্মাবতী। বাল্যশিক্ষা বর্ধমান ও বাঁকুড়ায়। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এফ.এ.(১৮৬২খ্রী), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বি. এ. (১৮৬৫ খ্রী), প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. (১৮৬৬ খ্রী), এবং প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বি. এল. (১৮৬৭ খ্রী) পাশ করেন। বহরমপুর কলেজে কিছুকাল ইংরেজী সাহিত্য ও গণিত অধ্যাপনা করিবার পর বরিশালে ওকালতি করিতে যান। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ভারতবর্ষে রেহান(মর্গেজ) সম্পর্কিত আইন বিষয়ে প্রসন্নকুমার-প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে (১৮৭৫-৭৬খ্রী) তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা রেহান আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্যগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। ১৮৮৪খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি.এল. উপাধি লাভ করেন। কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের (১৮৮৩-১৮৯৩ খ্রী) ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের (১৮৯১-৯৪ এবং ১৯০৬-০৯খ্রী) সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিন্ডিকেট ও আইন ফ্যাকাল্টির সভ্য হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় তিনি তাহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সভাপতি। বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ টাকা দান করেন এবং পরে আরও বহু টাকা দেন। উইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে বারো লক্ষ টাকা দিয়া যান, এবং যাদবপুরে উহার শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। উহাই এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

চারুচন্দ্র চৌধুরী

রাসমণি, রানী খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁহার জন্ম। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস ছিলেন কৃষিজীবী কৈবর্ত। রাসমণি ছিলেন অসামান্য রূপবতী। একাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতার বিরাট্ ধনী প্রীতিরাম মাড়ের পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তীক্ষ্ন বুদ্ধিশালিনী রাসমণি পতিগৃহে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীর সাহচর্যে লেখাপড়া শিখিলেন। প্রীতিরামের মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। বিষয়কর্মে রাসমণি স্বামীর সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন হইতে সেই বিপুল সম্পত্তির পরিদর্শনভার রাসমণি স্বহস্তে গ্রহণ করেন। দুর্গোৎসবের সময় রাসমণির দেবালয়ের সম্মুখে যে বাদ্যধ্বনি হইত ইংরেজরা তাহা বন্ধ করিতে বলেন। তেজস্বিনী রাসমণি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ দিলেন যে তাঁহার অধিকারভুক্ত এলাকায় (বর্তমান চৌরঙ্গী) কোনও ইংরেজ প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ইহাতে ইংরেজ প্রমাদ গণিলেন এবং রাসমণির নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া বিরোধের মীমাংসা করেন। দেশী ধীবরদের মাছ ধরায় বিঘ্ন হওয়ায় তিনি দশ হাজার টাকা সেলামী দিয়া গঙ্গায় বিদেশী বণিকদের স্টীমার প্রভৃতি চলাচল বন্ধ করেন।

দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ধর্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস ও দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল। প্রভূত অর্থব্যয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীরে কালীমন্দির, দ্বাদশ শিবালয় ও অতিথিসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই কালীর পূজারী নিযুক্ত হইলেন গদাধর চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ)। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ভারতের এক মহান্ তীর্থ হইয়া

উঠিল। রাজরানী না হইয়াও রাসমণি তাঁহার দানশীলতা, কর্মনিষ্ঠা ও মহানুভবতার জন্য জনগণের নিকট রানী রাসমণি নামে পরিচিতা হইলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

রাস্কিন, জন (১৮১৯-১৯০০ খ্রী)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ গদ্যরচয়িতা, চিত্রসমালোচক এবং কবি। অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের স্নাতক। টার্নারের চিত্রকলার প্রশংসায় মুখর। স্থাপত্য-পর্যালোচনা সংবলিত 'সেভেন ল্যাম্প্স্ অভ্ আর্কিটেক্চার' এবং 'দি স্টোন্স অভ্ ভেনিস'-এ তাঁহার গথিক রীতির মূল্যায়ন স্বীকৃতিযোগ্য। ইদানীং লেখক হিসাবে জনপ্রিয়তাভ্রষ্ট কিন্তু তাঁহার রচনা প্রকৃতি-প্রেম-সৌন্দর্যবোধে অতুলনীয়। ধর্মোপদেষ্টা, নীতিজ্ঞ, সংস্কারক ও ভবিষ্যদ্বক্তা। খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামির বিরোধী। তাঁহাকে ব্রিটিশ সোস্যালিজম-এর অগ্রদূত বলা হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন লইয়াও লিখিয়াছেন, যথা, 'ফর্স্ ক্লাভিগেরা' (শ্রমিকগণের প্রতি পত্রাবলী), 'আনটু দিস্ লাস্ট' (ইহার দ্বারা মহাত্মা গান্ধী প্রভাবিত হইয়াছিলেন)। 'মুনেরা পুল্ভেরিস', 'সিসেমি অ্যান্ড লিলিজ', 'দি ক্রাউন অভ্ ওয়াইল্ড অলিভ' ইত্যাদি। জনকল্যাণের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছেন এবং 'গিল্ড্ অভ্ সেণ্ট জর্জ' তাঁহারই সৃষ্টি। দীর্ঘবাক্য সংবলিত, চিত্রকল্পময়, ছন্দময় ভাষায় সেকালের বণিকবৃত্তি, বস্তুতন্ত্রবাদ, যন্ত্রবাদ এবং ধনতন্ত্রবাদকে তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহার অসমাপ্ত আত্মজীবনীর নাম 'প্রীটেরিটা'।

সূর্যশংকর রায়

রাহু১ পুরাণমতে চন্দ্র-সূর্য গ্রাসকারী গ্রহ। অসুর বিপ্রচিত্তি ও সিংহিকার পুত্র। পুত্র মেঘহাস, কন্যা প্রভা। সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত পরিবেশনকালে দেবগণের মধ্যে ছদ্মবেশী রাহুকে দেখিয়া চন্দ্র ও সূর্য বিষ্ণুকে জানাইলে তিনি সুদর্শন-চক্রে উহার মস্তক ছেদ করেন। অমৃতপানে অমরত্ব লাভ করায় ছিন্ন মস্তক রাহু এবং অবশিষ্ট শরীর কেতুরূপে গ্রহ মধ্যে স্থান লাভ করে।

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে নৈঋত কোণের দিক্পাল এবং উৎপাত ও অশুভের অধিপতি। মধ্যে মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করিলে গ্রহণ হয়। ভারতের নানাস্থানে, এমন কি ভারতের বাহিরে চম্পা ও কম্বোডিয়াতেও রাহু ও কেতুর মূর্তিসম্বলিত বহু উৎকৃষ্ট নবগ্রহ পট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কল্যাণী দত্ত

রাহু২ খ-গোলকে রবিমার্গের সহিত চন্দ্রের ছেদ বিন্দুদ্বয় রাহু ও কেতু। রাহু উচ্চপাতবিন্দু, কেতু নিম্নপাত। এই দুই বিন্দুর যে কোনওটির কাছে পূর্ণিমার চন্দ্র থাকিলে চন্দ্রগ্রহণ এবং অমাবস্যার চন্দ্র থাকিলে সূর্যগ্রহণ হয় ('গ্রহণ' দ্র)। হিন্দুদের নবগ্রহ মধ্যে রাহু ও কেতু দৃষ্টিগোচর কোনও জ্যোতিষ্ক নহে।

কামিনীকুমার দে

রাহুলমাতা ইনি গোপা, সুপ্পবুদ্ধ নামক এক শাক্যের কন্যা। তাঁহার গাত্রবর্ণ সোনার মত উজ্জ্বল ছিল বলিয়া তাঁহার আর এক নাম ছিল ভদ্দা কচ্চানা। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে শাক্যরাজকুমার গৌতমের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্রের নাম রাহুল। রাহুলের জন্মদিবসে গৌতম সংসার ত্যাগ করেন। রাহুলমাতাও সন্ন্যাসিনী বেশ ধারণ করিয়া রাজপরিবারে অবস্থান করিতে থাকেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর রাহুলমাতা ভিক্ষুণী সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যথাকালে তিনি অর্হত্বস্তরে উন্নীতা হন।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

র‍্যাফায়েল, রাফায়েলো সাঞ্জো (১৪৮৩-১৫২০ খ্রী) ইতালীয় রেনেসান্সের সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী। বাল্যবয়সে পিতৃবিয়োগের পরে তিনি চিত্রশিল্পী পেরুজিনের সংস্পর্শে আসেন। ফ্লরেন্সে অবস্থানকালে তাঁহার উপর লিওনার্দো ও মিকাএলআঞ্জেলোর প্রভাব পড়ে। ১৫০৮ খ্রী পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের আমন্ত্রণে রোমে যান এবং ভ্যাটিকানের অংশ বিশেষে প্রাচীরচিত্র আঁকিবার ভার লন। চিত্রের পরিকল্পনা, অঙ্গবিন্যাস, রেখা ও রঙের সুষম ব্যবহার এবং সর্বোপরি অঙ্কিত চিত্রের স্থির সংযতভাব এবং অপার্থিব সৌন্দর্য তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁহার অসংখ্য চিত্রের মধ্যে 'স্কুল অভ্ এথেন্স' নামক প্রাচীর চিত্র (ভ্যাটিকান, রোম) এবং 'সিস্টাইন মাদোনা' (ড্রেসডেন গ্যালারি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

রিঅ্যাক্টর যাহাতে স্বতঃপরিচালিত, শৃঙ্খলিত কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়া হইতে শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাহাই রিঅ্যাক্টর বা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর ('কেন্দ্রক বিভাজন' দ্র)। রিঅ্যাক্টরের অংশসমূহ মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত থাকে। মধ্যভাগের সক্রিয় অংশ, যেখানে কেন্দ্রক বিভাজন-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। এই অন্তঃপ্রদেশে বিভাজনযোগ্য পদার্থ রাখা হয়। এই বিভাজনযোগ্য পদার্থকে সাধারণভাবে রিঅ্যাক্টরের

'জ্বালানী' বলা হয়। প্রশমক বা মডারেটর, যাহাদের দ্বারা বিভাজন-প্রক্রিয়ার ফলে নির্গত নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করা হয়। স্বল্প আণবিক ভরযুক্ত পদার্থ-সমূহ, যথা—সাধারণ জল, ভারী জল, গ্রাফাইট, বেরিলিয়াম অক্সাইড প্রভৃতি মডারেটর হিসাবে উত্তম। মন্দগতিযুক্ত নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রক বিভাজন-ক্রিয়া সংঘটিত করিতে পারে। নিউট্রন শোষক নিয়ন্ত্রক দণ্ড, ইহারা বিভাজন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন নিউট্রন শোষণ করিয়া তাহাদের সংখ্যা পরিমিত রাখে। সাধারণতঃ ক্যাডমিয়াম ধাতু বা রৌপ্য, ক্যাডমিয়াম ইণ্ডিয়াম এবং একপ্রকার সংকর ধাতু এই জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ রিঅ্যাক্টরে বিভাজন-ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন তাপশক্তি ইহার চতুষ্পার্শ্বে, সাধারণ জল, ভারী জল, তরল ধাতু, গ্যাস ইত্যাদি প্রবাহিত করাইয়া সংহৃত করা হয়।

সাম্প্রতিককালে নানা প্রকার রিঅ্যাক্টরের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের কার্যপ্রণালী বিভিন্ন। তাপীয় রিঅ্যাক্টরে প্রধানতঃ মন্থরগতিসম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে বিভাজন-ক্রিয়া সংঘটিত করা হয়। এই প্রকার রিঅ্যাক্টরের জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হইলে রিঅ্যাক্টরের আয়তন বড় হয়। দ্রুত রিঅ্যাক্টর বা ফাস্ট রিঅ্যাক্টরে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউট্রনের সাহায্যে বিভাজন-ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইহার জ্বালানীতে অন্ততঃ শতকরা ২০ বা ২৫ ভাগ বিভাজনযোগ্য কেন্দ্রক থাকা প্রয়োজন এবং ইহাতে প্রশমক ব্যবহৃত হয় না। কোনও কোনও দ্রুত রিঅ্যাক্টর বিভাজন-ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন নিউট্রনের সাহায্যে কেন্দ্রক-ক্রিয়াদ্বারা স্বীয় জ্বালানী উৎপাদন করে—ইহাদিগকে ব্রীডার রিঅ্যাক্টর বলা হয়। পাওয়ার রিঅ্যাক্টরে বিভাজন-ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন তাপশক্তির সাহায্যে বাষ্প বা উচ্চচাপযুক্ত উত্তপ্ত গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। ইহার সাহায্যে টারবাইন এবং বিদ্যুৎ-উৎপাদক চালাইয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

রিকেট্‌স ইংরেজী মূল অর্থ অঙ্গ-বৈকল্য। রিকেট্‌স হাড়ের রোগ। হাড়ের পুষ্টি না হইলে এই রোগ হইতে পারে। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের বিশেষ সংযোগে শরীরের হাড় গড়িয়া ওঠে। ভিটামিন ডি-র অভাবেই অস্থিতে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস জমিতে না পাইলে এই রোগ হয়। এই রোগে শরীরের পুষ্টি নষ্ট হয়, হাড় বাঁকিয়া যায় ও নানারূপ স্নায়বিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

সাধারণতঃ চারি মাস হইতে দু'বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে এই রোগ হয়। অনেক ক্ষেত্রে মাতৃদুগ্ধের অভাব, দারিদ্র্য ও খোলা হাওয়ার অভাবে ইহা হয়। বেশি মাত্রায় ভিটামিন ডি ইন্‌জেকশান ও রোগীকে খোলা গায়ে রৌদ্রে রাখাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। ('ভিটামিন ডি' দ্র)

ননীগোপাল মজুমদার

রিচার্ড্‌সন, ডি. এল., ক্যাপটেন (১৮০১-১৮৬৫ খ্রী) হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত শিক্ষক, কবি ও সমালোচক। সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া নব্য বাংলার অন্যতম মন্ত্রদাতারূপে স্বীকৃত। পিতা ডেভিড টমাস রিচার্ড-সন।

রিচার্ডসন শৈশবে পিতৃহীন হইয়া খুড়ার কাছে মানুষ হন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'বেঙ্গল নেটিব ইনফ্যান্‌ট্রি'তে চাকরি লইয়া দমদম সৈন্যনিবাসে আসেন এবং কর্নেল ডব্লিউ. স্কট-এর কন্যা মেরিয়ানের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় (১৮২১ খ্রী)। সৈন্যবিভাগে ক্রমশঃ উন্নতি করিলেও পরে অক্ষম (ইন্‌ভ্যালিড) হইয়া সাংবাদিকতা ও অধ্যাপনাকার্যে যোগ দেন। মাঝে ছোটলাটের 'এডিকং' হন। তিনি বহু পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন, যেমন—'লণ্ডন উইক্‌লি রিভিউ' (লণ্ডন), 'ক্যালকাটা লিটারারি জার্নাল', 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নাল', 'বেঙ্গল অ্যানুয়েল', 'হরকরা' ইত্যাদি। বঙ্গদেশে অনেক কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে ছিলেন, যেমন—হিন্দু কলেজ (অধ্যক্ষ ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক), কৃষ্ণনগর ও হুগলি কলেজ, হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের (পূর্বনাম হিন্দু কলেজ) সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়। জেম্‌স সিল্ক বাকিংহামের পত্রিকা 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এ তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় (১৮২০ খ্রী)। তিনি 'Miscellaneous Poems', Literary Leaves', 'Sonnets and other Poems', Literary Chit chat' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মারে প্রদেশের ক্লাপহাম পল্লীতে দেহত্যাগ করেন।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র

রিজার্ভ ব্যাংক ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ব্যাংকরূপে রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বাণিজ্যিক এবং সামবায়িক ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই কেবল আমানত গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন মতো তাহাদিগকেই ঋণ মঞ্জুর করে। সরাসরি জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ আমানত রাখে না বা তাহাদিগকে ঋণদান করে না।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। রিজার্ভ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আমানতের একটি সুনির্দিষ্ট

অংশ জমা পাওয়ার অধিকারী। কাজের সুবিধার জন্য অন্যান্য ব্যাংক সাধারণতঃ আরও কিছু অতিরিক্ত অর্থ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট গচ্ছিত রাখে। এই জমা হইতেই ব্যাংকগুলি পরস্পরের প্রাপ্য মিটায় যাহা, 'ক্লীয়ারিং' নামে পরিচিত।

সাধারণ ব্যাংক গচ্ছিত আমানতের একটা বড় অংশকে সরকারি ঋণপত্রে লগ্নী করে, কিংবা হুণ্ডি ('বিল্‌স'), তমসুক ('প্রমিসরি নোট্‌স') প্রভৃতি ব্যক্তিগত ঋণপত্রের ভিত্তিতে জনসাধারণকে ঋণ দেয়। প্রয়োজন অনুসারে এই সকল ব্যাংক উক্ত ঋণপত্রসমূহ রিজার্ভ ব্যাংকের নিকট হস্তান্তরিত করিয়া ইহার অধমর্ণ হইতে পারে। অবশ্য সুদের হার নির্ভর করে রিজার্ভ ব্যাংকের ঘোষিত 'ব্যাংকরেট্'-এর উপর। সাধারণতঃ এই প্রদত্ত ঋণের মেয়াদ তিন হইতে ছয়মাস, তবে কৃষিঋণ ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে দীর্ঘতর মেয়াদের ঋণও মঞ্জুর করার ব্যবস্থা আছে।

ইহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের রাজস্ব আমানত রাখে, উহাদের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্র ব্যাংক ও জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে এবং আবশ্যকমত ঐ ধরনের ঋণপত্র ক্রয় এবং পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া সরকারি ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজন হইলে ইহা নিজস্ব তহবিল হইতেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ দিয়া সাহায্য করে।

'নোট্'-এর প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের উপর। অবশ্য এই জন্য ইহাকে অন্যূন ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণভাণ্ডার মজুত রাখিতে হয়; কিন্তু কত পরিমাণ 'নোট' বাজারে ছাড়া হইবে তাহা মজুতস্বর্ণের পরিমাণদ্বারা নির্দিষ্ট নয়, রিজার্ভ ব্যাংকের নিজস্ব নীতির উপরই তাহা নির্ভর করে। কেবল একটাকার 'নোট' প্রবর্তনের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাংকের নয়। উহা কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের উপর ন্যস্ত।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে শিল্পঋণ ও কৃষিঋণকে সুলভতর করিবার জন্য যে সকল বিশেষ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে (যথা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাংক, এগ্রিকাল্‌চারাল রি-ফিনান্স কর্পোরেশন ইত্যাদি) উহাদের প্রত্যেকটিতেই রিজার্ভ ব্যাংকের অর্থ নিয়োজিত আছে এবং উহাদের সংগঠনে ইহার দায়িত্বপূর্ণ অংশ আছে।

ইহার আর একটি দায়িত্ব বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার ('ফরেন এক্সচেঞ্জ') সংরক্ষণ এবং ভারতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। বর্তমানে ভারতীয় মুদ্রা আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ০.১১৮৪৮৯ গ্রাম বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমতুল্য। বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ইহাকে এই মানমূল্য সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হয়।

ইহার দুইটি প্রধান বিভাগ ঃ ইসু বিভাগ ও ব্যাংকিং বিভাগ। ইসু বিভাগ 'নোট'-ব্যবস্থা পরিচালনা করে এবং ব্যাংকিং বিভাগ আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদির ভার গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া কৃষি-ঋণ বিভাগ, সরকারি ঋণ দপ্তর, শিল্পঋণ বিভাগ, বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ ইত্যাদি বহু শাখা প্রশাখা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ডই ইহার সাধারণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এই বোর্ডের প্রধানকেই বলা হয় ইহার গভর্নর।

যখন ইহা প্রথম স্থাপিত হয়, তখন ইহার নিজস্ব মূলধন সংগৃহীত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট 'শেয়ার' বিক্রয়ের সাহায্যে এবং সে সময় ইহা ছিল এই 'শেয়ার' মালিকগণেরই সম্পত্তি। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ঐ সমস্ত 'শেয়ার' কিনিয়া লইয়া ইহাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত ('ন্যাশনালাইজ') করিয়াছেন।

ধীরেশ ভট্টাচার্য

রিপন, জর্জ ফ্রেডরিখ স্যামুয়েল রবিনসন (১৮২৭-১৯০৯ খ্রী) ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন (১৮৮০-৮৪ খ্রী)। ভারতবাসীদের সম্পর্কে উদার বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়া তিনি শান্তিস্থাপন করেন এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগী হন। 'কারখানা আইন' প্রবর্তন করিয়া শিশুদের বয়স ও কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করেন। পরবর্তী বড়লাট লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইন রদ করিয়া সমালোচনার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। রুর্‌কী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির সুযোগ তিনি ভারতবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। একজন ভারতীয়কে (রমেশচন্দ্র মিত্র) কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। জেলা, মহকুমা ও তালুকে মিউনিসি-প্যাল বোর্ড গঠন করেন। নির্বাচনের অধিকার বিস্তৃত করেন এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদের শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেন। 'হাণ্টার-কমিশন' নিযুক্ত করিয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লৌহশিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বরাকর লৌহ কারখানা সরকারের পক্ষে ক্রয় করেন। 'অবাধ বাণিজ্যের' নীতি অনুযায়ী বহু পণ্যের উপর শুল্ক তুলিয়া দেন এবং লবণের উপর শুল্ক হ্রাস

করেন। কিন্তু এই নীতির ফলে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিলাতের বস্ত্রশিল্প লাভবান্‌ হয়। মূল্যবৃদ্ধির কারণ ছাড়া ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করা হইবে না এই নীতি ঘোষিত হওয়ায় কৃষক-সম্প্রদায় উপকৃত হয়। 'ইলবার্ট বিল' উত্থাপন করিয়া শ্বেতাঙ্গদের বিচারে দেশী ও ইওরোপীয় বিচারকদের সমান অধিকার দিবার প্রস্তাবে শ্বেতাঙ্গসমাজে তুমুল বিক্ষোভ হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নতি স্বীকার করিতে হয়। কার্যকাল শেষ হইবার এক বৎসর পূর্বেই (১৮৮৪ খ্রী) তিনি পদত্যাগ করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যান। জাতীয় আন্দোলনের দুইজন নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও গোখ্‌লে তাঁহার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

নির্মাল্য বাগ্‌চী

রিয়ালিজ্‌ম্‌ সাহিত্যে বা শিল্পে জীবনের যথাযথ রূপায়ণকে সাধারণভাবে 'রিয়ালিজ্‌ম্‌' বা বাস্তববাদ বলা হয়। ইহা কতকটা রোমান্‌টিসিজ্‌মের বিপরীত। তাই বলিয়া শুধু জীবনের ক্লেদাক্ত দিকে মন দিলে তাহা বাস্তববাদ হয় না। এইরূপ বাস্তববাদী কখনও মহৎ-শিল্পের সৃষ্টি করিতে পারে না। বাস্তববাদী সাহিত্যিক বিষয়নিষ্ঠ। রোমান্‌টিক্‌ শিল্পের আত্মমগ্নভাব ইহাতে অচল। ইহা বহির্জগৎকে শুধু চোখের আলোতেই দেখে। ইহার চরম রূপকে কখনো কখনো 'ন্যাচারা-লিজ্‌ম' (স্বভাববাদ) বলা হয়। ইহার একটি চরম অভিব্যক্তি আধুনিক 'স্ট্রীম্‌ অভ্‌ কনশাস্‌নেস্‌' টেকনিকের লেখকগণের রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। আধুনিক বাংলা উপন্যাসেও এই রিয়ালিজ্‌ম্‌ নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রিলেটিভিটি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ('আইনস্টাইন' দ্র) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ-বিষয়ক তাঁহার বিশেষ তত্ত্ব (স্পেশাল থিয়োরি) প্রকাশ করেন। কোনও বস্তুর যে বেগ আমরা মাপিতে পারি, তাহা উহার আপেক্ষিক বেগ মাত্র (অর্থাৎ অপর কোনও বস্তু বা পশ্চাৎপটের বেগের তুলনায় যে বেগ)। আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে আইনস্টাইন নিউটন-এর ('নিউটন, আইজ্যাক' দ্র) গতির সূত্রগুলিকে কোনও পশ্চাৎপটের উপর নির্ভরশীল নয়, এমনভাবে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। রিলেটিভিটি তত্ত্বানুযায়ী, কোনও বস্তুর বেগ আলোকের বেগ অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না: আলোকের বেগ একটি ধ্রুবক ও তাহার মান আলোক-উৎসের বেগের উপর নির্ভর করে না এবং বস্তুর বেগের পরিবর্তনের সহিত তাহার ভরেরও পরিবর্তন ঘটে। আপেক্ষিকতাবাদ-তত্ত্বের অপর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ভর ও শক্তি নিম্নোক্ত সূত্রদ্বারা গ্রথিত, যথা শক্তি = ভর × আলোকের বেগের বর্গ। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আইনস্টাইন তাঁহার আপেক্ষিকতাবাদ-বিষয়ে সাধারণ তত্ত্বের (জেনারেল থিয়োরি) মাধ্যমে পূর্বোক্ত বিশেষ তত্ত্বের নীতিগুলি মহাকর্ষের নিয়ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহনক্ষত্রের গতি ও বেগের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করেন।

অনাদিনাথ দাঁ

রুই (রোহিত; রোহু) কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি যে সব মিঠাজলের পোনা মাছ আছে তাহাদের মধ্যে রুই অন্যতম এবং মৎস্যভুক্‌দের কাছে শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর মৎস্য বদ্ধজলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। নদী-সংলগ্ন অগভীর বা চ্যাটালো গর্তে স্বল্প জলে ঘোর বর্ষণের পর ডিম ছাড়ে। নিষেকের পর হইতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতে প্রায় ১৭ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় লাগে। রুই সাধারণতঃ জলের মধ্যস্থলের খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। এই মাছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম্‌, শরীরোপযোগী লৌহ, ফসফরাস্‌, ফ্যাট প্রভৃতি উপাদান থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 'লেবিও রোহিতা'।

বিশ্বনাথ মিত্র

রুইদাস (রবিদাস) (আনুমানিক ১৫শ-১৬শ শতক) মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ সন্ত-সাধক। কথিত আছে, ইনি গুরু রামানন্দের প্রধান দ্বাদশজন শিষ্যের অন্যতম। কাশীর উপকণ্ঠে এক চর্মকারবংশে জন্ম। কবীর ও মীরাবাঈ-এর রচনায় ইঁহার নাম সসম্মানে উল্লিখিত আছে। শিখধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'-এ ইঁহার লেখা প্রায় ত্রিশটি ভজন সংকলিত আছে। তিনিও একটি ধর্মমতের প্রবর্তক। এই মত ভক্তিপ্রধান এবং ইহার জন্য পরম বৈরাগ্য, একনিষ্ঠা প্রভৃতি প্রয়োজন। পরমাত্মা অক্ষয় ও অবিনশ্বর ও জীবাত্মারূপে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই বর্তমান।

পাঞ্জাব, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান ও উত্তর-প্রদেশের নানাস্থানে এই পন্থার বহু অনুগামী বর্তমান। ইঁহারা নিজেদের 'রৈদাসী' বলিয়া থাকেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রুক্মিণী কৃষ্ণ দ্র

রুজভেল্ট, এফ. ডি. (১৮৮২-১৯৪৫ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রবিশারদ। জন্মস্থান হাইডপার্ক, নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে আইনজীবী হিসাবে কর্মারম্ভ। নিউইয়র্ক

সেনেটের ডিমোক্র্যাট-সদস্য নির্বাচিত হন (১৯১০ খ্রী), নিউইয়র্কের গভর্নর নির্বাচিত হন (১৯২৯ খ্রী)। ক্রমান্বয়ে ৪ বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ খ্রী)। দেশের অলিখিত আইন লঙ্ঘন করিয়া তৃতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নীতিতে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। স্বদেশে সুপ্রীম কোর্টের রক্ষণশীল বিচারকদের সরাইয়া উদারনীতিকদের নিযুক্ত করেন। বৈদেশিক ব্যাপারে যুদ্ধ নিবারণের জন্য হিটলার, মুসোলিনি ও হিরোহিটোর নিকট ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করেন; বেতারে বক্তৃতা দিয়া নির্লিপ্ততা-নীতি বর্জনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেন। সমস্ত শক্তি দিয়া যুদ্ধ চালনা করিয়া চক্রশক্তিকে পরাস্ত করিয়া শান্তিস্থাপনের জন্য চার্চিল, চিয়াংকাইশেক ও স্ট্যালিনের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনা করেন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে বিশ্বনেতার মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন এবং যুদ্ধোত্তর বিশ্বে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনায় চিরকাল সচেষ্ট ছিলেন।

নির্মলকান্তি মজুমদার

রুড়কি উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলায় এই শহর। এই অঞ্চলের শীত ও গ্রীষ্ম দুই-ই বাংলাদেশ হইতে বেশি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ইহা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া যায়। বর্তমানে এই কলেজে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শাখার (যেমন রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক ইত্যাদি) বিশেষ গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। শক্তিচালিত অনুলিখন যন্ত্রসাহায্যে কার্য করিবার শিক্ষাও দেওয়া হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রণীতা ভট্টাচার্য

রুদ্র বৈদিক দেবতা, পরবর্তীকালে শিবের এক নাম। বেদের রুদ্র যুবা পুরুষ, অতি উগ্র অতীব বলশালী। তাঁহার অস্ত্র ধনুর্বাণ, তবে বজ্রও নিক্ষেপ করেন। তাঁহার বাহন রথ। রুদ্রের দেহবর্ণ কপিশ, মুখকান্তি সুন্দর, তিনি নানা অলংকারে সুসজ্জিত। রুদ্র বিশ্বের কর্তা ('ঈশান')। রুদ্রের রোষে পড়িলে মানব, পশু কাহারও নিস্তার নাই। পৃশ্নির (=বাঘাফট্‌কা রঙের গাই) গর্ভজাত মরুদ্‌গণ তাঁহার পুত্র ও পরিজন। তুষ্ট হইলে রুদ্র 'শিব' অর্থাৎ মঙ্গলময় হন। বৈদিক দেবসমাজে তিনি আদিত্যতুল্য। তাঁহাকে কল্পনা করা হয় যেন দ্যুলোকের বিরাট্‌ বরাহ। রুদ্রের বিশেষ গুণ এই যে, তিনি 'ভিষজাং ভিষক্‌তম'; অর্থাৎ তাঁহার মত চিকিৎসক নাই।

পৌরাণিক শিবের সঙ্গে রুদ্রের মিল অনেক বিষয়েই নাই। শিব যুবা নহেন, প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধ। তিনি অলংকৃত নহেন, সর্প ও বিভূতি তাহার ভূষণ। গাভী তাঁহার ভার্যা নহে, তাঁহার বাহন, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে বিশেষ মিল আছে তাঁহার রোষ ও তুষ্টির সহজসাধ্যতায়। অর্থাৎ 'শিব' এই নামের মধ্য দিয়াই বৈদিক ও অবৈদিক দেবতার প্রধান যোগাযোগ।

সুকুমার সেন

রুদ্রদাম, রুদ্রদামন প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নৃপতি কার্দমকরাজ রুদ্রদামন। চষ্টনের প্রপৌত্র ও জয়দামনের পুত্র ছিলেন। অন্ধাউ-লেখ মতে তিনি ৫২ শকাব্দে (১৩০ খ্রী) মহাক্ষত্রপ চষ্টনের সহিত একত্রে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৩০ হইতে ১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি স্বাধীন ও মহাক্ষত্রপ হন। জুনাগড় লেখ হইতে জানা যায়, তিনি নাসিক ও পুণা জেলা ব্যতীত লুপ্ত ক্ষহরাত রাজ্যের সকল স্থান উদ্ধার করেন। তিনি শতকর্ণিরাজ গৌতমীপুত্রের সাম্রাজ্যের বহু অংশ দখল করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ব মালব, আনর্ত (দ্বারকার চতুর্দিকস্থ স্থান) মরু (মারোয়াড়), কচ্ছ, প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। তিনি দুইবার দাক্ষিণাপথ-স্বামী শাতকর্ণিরাজকে পরাজিত করেন। এই শাতকর্ণিরাজ কে ছিলেন তদ্বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। রুদ্রদামনের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী এবং ইনি বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। সুশাসক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং তাঁহার রাজত্বে ব্যাধ, তস্কর, বন্যজন্তু প্রভৃতির উপদ্রব ছিল না বলিলেই চলে।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

রুশ-জাপান যুদ্ধ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় কতকগুলি বৃহৎশক্তি যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হইয়াছিল রাশিয়া ও জাপান তাহাদের অন্যতম। জাপান ও রাশিয়ার বিরোধের ক্ষেত্র ছিল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া। প্রথমটায় আপোষ ও বোঝাপড়ার চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া পড়িল।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়াই জাপান আক্রমণ শুরু করে এবং জলে ও স্থলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতে থাকে। কিছুকাল যুদ্ধ চলিবার পর জাপানের কাছে রুশকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। অবশেষে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় পোর্টস্‌মাথের সন্ধির দ্বারা (সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ খ্রী) এই যুদ্ধের অবসান ঘটে। রাশিয়া জাপানকে পোর্ট আর্থার বন্দর ও দক্ষিণ সাখালিন ছাড়িয়া দেয় এবং সমগ্র কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার

দক্ষিণাঞ্চলে জাপানের আধিপত্য স্বীকার করা হয়। এই যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ, তাহার অগ্রগতির পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুশবিপ্লব ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর বিপ্লবের পটভূমি রুশ দেশে অনেকদিন আগে হইতেই প্রস্তুত হইতেছিল। ছোট ছোট কৃষকবিদ্রোহ মাঝে মাঝে হইতেছিল। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকালে (উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ) শিক্ষিতদের মধ্যেও অসন্তোষ দেখা দেয়। বিফল ডিসেম্বর বিদ্রোহও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সময়ে বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী সন্ত্রাসনীতি গ্রহণ করে; এবং দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্রাণ হারান ইহাদের হাতে (১৮৮১ খ্রী)। ক্রমশঃ রাশিয়ার বিপ্লবী মন মার্ক্সীয় সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকিল। সাম্যবাদী প্রচার ও মজুর সংগঠনের কাজ চলিতে লাগিল। অতঃপর রাজধানী পিটার্সবার্গে সংগ্রাম-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিলেন লেনিন (১৮৯৫ খ্রী) এদিকে তত্ত্বপ্রচার, এই আন্দোলনকে রাজকীয় দমননীতি ঠেকাইতে পারিল না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সাম্যবাদী বিপ্লবীদের প্রথম কংগ্রেসের গোপন বৈঠক হয়। ১৯০৩খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কংগ্রেস ঠিক পথে চালাইবার জন্য একটি পার্টি প্রতিষ্ঠা করিল। ইহার ভিতর দুইটি উপদল দেখা দিল—লেনিনের অনুগামী বলশেভিক উপদল ও অন্য মেনশেভিক উপদল। রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫ খ্রী) শাসকদের অকর্মণ্যতা প্রকট হইয়া উঠে এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিল প্রথম বিপ্লব। এই বিপ্লব কিন্তু ধীরে ধীরে ব্যর্থ হইল। এই বিপ্লব ব্যর্থ হইলেও লেনিন পার্টি সংগঠনকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং বলশেভিকদের মার্কস্‌বাদে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মেনশেভিকদের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র বলশেভিক পার্টি গঠিত হইল। প্রচারের জন্য প্রাভ্‌দা পত্রিকা হইল প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪খ্রী) রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিলে লেনিন ভাবিলেন এই অবসরে শ্রমিকেরা নিজ সরকারকে উচ্ছেদ করিতে পারে। অবশেষে বিপ্লব আবার সত্যই আসিল (মার্চ ১৯১৭ খ্রী) এবং সম্রাট পদচ্যুত হইলেন। লেনিন বুঝিলেন এইবার গণতান্ত্রিক বিপ্লব হইতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পৌঁছাইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তাঁহার পরিচালনায় বলশেভিক-দল ক্ষমতা দখল করিল (৭ই নভেম্বর, ১৯১৭খ্রী)

বলশেভিকেরা ক্ষমতা হাতে পাইয়া জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া চাষীদের হাতে জমি দিল; দেশে শান্তি আনিল; শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করিল (ব্যাঙ্ক ও বিদেশী বাণিজ্যসমেত) চাষী মজুরদের নির্বাচিত সোভিয়েত সমিতিগুলির উপর নির্ভরশীল নূতন রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল; বিপ্লব বিরোধী দলগুলিকে বিতাড়িত করিল। পার্টির নূতন নাম হইল কমিউনিস্ট। অন্যদেশের সাম্যবাদীদের সঙ্গে সংযোগের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইল। ইতিমধ্যে বিপ্লবে আতঙ্কিত অন্য দেশগুলি রাশিয়া আক্রমণ করিতে থাকে, বিদেশী প্ররোচনায় গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়। বলশেভিক সরকার নূতন সৈন্যদল গঠন করিয়া আর্থিক জীবন কেন্দ্রায়িত করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করে। যুদ্ধান্তে ১৯২১খ্রীষ্টাব্দে দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়। বিপদ এড়াইবার জন্য লেনিন নূতন আর্থিক নীতি প্রবর্তন করেন এবং মূল লক্ষ্যে অবিচল থাকিয়া অবস্থা-উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হন। জেনোয়া বৈঠকে (১৯১২খ্রী) লেনিনের নির্দেশে ঘোষণা করা হইল যে, সোভিয়েত রাশিয়া সকল দেশের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। লেনিনের মৃত্যুর পর (১৯২৪খ্রী) পার্টির নেতৃত্ব আসে স্ট্যালিনের হাতে। অতঃপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাহায্যে দেশে অগ্রগতির ধারা নির্দিষ্ট হয়।

সুশোভন সরকার

রুশভাষা আধুনিক রুশভাষা অনেক সময় (গ্রেট রুশীয় নামে অভিহিত) সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বাধিক লোকের কথ্য ভাষা। দুইটি উপশাখা হইল শ্বেত (হোয়াইট) রুশীয় এবং ইউক্রেনীয়। গ্রেট রুশীয় হইল সোভিয়েত দেশের সংস্কৃতি, শাসন এবং যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম।

রুশভাষার প্রধানতঃ তিনটি উপভাষা। উত্তর অঞ্চলের উপভাষা লেনিনগ্রাদ হইতে সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণী উপভাষা মধ্য ও দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আর মধ্যদেশীয় উপভাষা উপরি-উক্ত দুইটি উপভাষার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া অবস্থিত। এই উপভাষাগুলির মধ্যে ভাষাগত ব্যবধান রহিয়াছে যথেষ্ট, কিন্তু তথাপি ইহাদের একটি সামগ্রিক গঠনসাদৃশ্য আছে, যাহার ফলে এগুলির মধ্যে পারস্পরিক বোধগম্যতার কোনও অসুবিধা নাই। পঞ্চদশ শতকের পরে মস্‌কো হইয়া উঠিয়াছে রুশ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। ফলে আদর্শ (স্ট্যান্ডার্ড) রুশভাষা মস্‌কোকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। মস্‌কো উত্তরাঞ্চলের উপভাষার অন্তর্গত কেন্দ্র; কিন্তু দক্ষিণদেশীয় উপভাষার প্রভাবে ইহার ভাষায় মধ্যাঞ্চলের ভাবাবৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

গ্রেট রুশীয়, হোয়াইট রুশীয় এবং ইউক্রেনীয় এই তিনটি উপশাখাই হইল রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলের ভাষা। পশ্চিমা ভাষাগুলি হইল পোলিশ্‌, চেকোস্লোবাক্‌ এবং বেণ্ডিশ্‌। দক্ষিণ-রাশিয়ার ভাষাগুলি হইল শ্লোবিন্‌, সার্বো-ক্রোট্‌ এবং বুলগেরীয়। এই সমস্ত ভাষা একত্রে

শলাবনিক বলিয়া কথিত হয়। প্রত্ন-শলাব স্তরের (৬ষ্ঠ-৯ম শতক) ভাষা হইতেই রুশ ভাষার উদ্ভব। রুশ-ভাষার প্রকৃত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে ৯ম-১২শ শতকের মধ্যে, কিন্তু লিখিত নিদর্শনের স্বাক্ষর ১২শ শতকের পূর্বে মেলে না।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

রুশো, জে. জে. (১৭১২-১৭৭৮খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক, রাষ্ট্রতত্ত্বজ্ঞ, শিক্ষাবিদ্ ও সুরস্রষ্টা। জন্মস্থান জেনেভা। তাঁহাকে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। টুরিনের একটি বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু হয়। ১৭৪১খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে গিয়া দিদেরো-র ('দিদেরো, ডেনিস' দ্র) সঙ্গে পরিচিত হন ও তাঁহার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া-র জন্য সংগীত-বিষয়ক অংশটি রচনা করেন। ধর্মরীতি-নীতিবিরুদ্ধ মত প্রকাশের জন্য প্রাচীনপন্থীদের বিরাগভাজন হন এবং কিছুকাল বিদেশে বাস করিতে বাধ্য হন। ১৭৬৬খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হিউম ইংল্যান্ডে আসার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান।

রুশোর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ ১. ডিস্‌কোর্স অন দি আর্ট্‌স্ অ্যান্ড সায়েন্সেস্ (১৭৫০খ্রী), ২. ডিস্‌কোর্স অন দি অরিজিন অভ্ ইনইকুয়ালিটি (১৭৫৫খ্রী), ৩. ডিস্‌কোর্স অন পলিটিক্যাল ইকনমি (১৭৫৫খ্রী), ৪. সোশ্যাল কনট্র্যাক্‌ট্ (১৭৬২ খ্রী), ৫. এমিল (১৭৬২ খ্রী), ৬. কনফেশন্‌স্ (১৭৭৬ খ্রী)। প্রথম গ্রন্থে বলেন কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটাইয়াছে। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আছে। 'সোশ্যাল কনট্র্যাক্‌ট্' ভারসম্পদে ও ভাষা-গৌরবে অতুলনীয়। ৫ম গ্রন্থে শিক্ষাসংস্কারের পথ দেখানো হইয়াছে। ৬ষ্ঠ গ্রন্থ তাঁহার আন্তরিক ও অকপট আত্মজীবনী। তাঁহার চিন্তাধারার নানা ব্যাখ্যা হইয়াছে। বিভিন্ন দল দাবি করেন রুশো তাঁহাদের মতবাদের আদিম উৎস। ফরাসী-বিপ্লবের মন্ত্রকার হিসাবে তিনি যুগপৎ বন্দিত ও নিন্দিত হইয়াছেন।

যাঁহারা অধুনিক বিশ্বের মনকে রীতিমত আলোড়িত করিয়াছেন রুশো তাঁহাদের অন্যতম।

নির্মলকান্তি মজুমদার

রূপগোস্বামী (আনু ১৪৮৯-১৫৬৪ খ্রী) শ্রীচৈতন্যের অভীষ্ট গৌড়ীয় 'বৈষ্ণবরসতত্ত্ব' ও সাধন-ভজন রীতির প্রবর্তক। পিতৃদত্ত নাম সন্তোষ, শ্রীচৈতন্য-প্রদত্ত রূপ নামে সর্বজনবিদিত। পিতা কুমারদেব। বাংলার সুলতান হুসেন শাহের দবীর খাস (খাস মুন্‌সি) ছিলেন। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলিতে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়া মনে নির্বেদ জাগায় রাজকার্য পরিত্যাগ করেন। এক বৎসর পরে মহাপ্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন গমনের আদেশ করেন। শেষবার পুরীতে মহাপ্রভু তাঁহাকে ব্রজে গিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ, লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিতে নির্দেশ দেন। তদনুসারে তিনি অবশিষ্ট জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন ও মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করেন। তিনি, তাঁহার অগ্রজ সনাতন, অনুজ বল্লভের পুত্র জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস, বৃন্দাবনের এই ছয় গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করেন। 'লঘুতোষণী' ও 'ভক্তিরত্নাকর' অনুসারে তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন সংস্কৃতে লেখা হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, দানকেলি কৌমুদী (১৫২৯ খ্রী), বিদগ্ধমাধব (১৫৩৩ খ্রী), ললিতমাধব (১৫৩৭ খ্রী), ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১৫৪১ খ্রী), উজ্জ্বলনীলমণি, লঘু গণোদ্দেশ-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনিই সর্বপ্রথম ভক্তিরসের বিশদ আলোচনা এবং মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের নায়ক-শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীরাধার নায়িকা-শ্রেষ্ঠত্ব ও ব্রজ-জাতীয় মধুরভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। মঞ্জরীভাবের উপাসনার রীতিরও তিনি প্রবর্তক।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

রূপচাঁদ পক্ষী রূপচাঁদের পিতার নাম গৌরহরি দাস। আদি নিবাস ওড়িশা। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কলিকাতায় নাচ-গানের আসরে সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবে রূপচাঁদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। কলিকাতার বাহিরেও তাঁহার যশ ছড়াইয়াছিল। রূপচাঁদের একখানি খাঁচার মত গাড়ি ছিল। ঐ গাড়িতে চড়িয়া বেড়াইতেন বলিয়া তাঁহার নাম হয় 'পক্ষী'। আবার অনেকে মনে করেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে 'পক্ষীরদল' নামক গায়কগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন, রূপচাঁদ অনুরূপ একটি দলের নেতা ছিলেন। দাশরথি রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত সাময়িক ঘটনা লইয়া রূপচাঁদ অনেক গান বাঁধিয়াছিলেন। আবার আগমনী-বিজয়াগান, বাউল-দেহতত্ত্ব গান এবং নিধুবাবুর টপ্পা ধরনের গান রচনাতেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার গানে 'দীন খগ' ও 'খগরাজ' ভণিতা পাওয়া যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রূপচাঁদ জীবিত ছিলেন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রেওয়া রেওয়া রাজ্যটি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত বাগেলা খণ্ডজাতীয়রা প্রতিষ্ঠা করে। ইহা রেওয়া মাল-ভূমির অন্তর্গত এবং বুন্দেলখণ্ড উচ্চভূমি ও শোন উপত্যকার মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। মালভূমির

দক্ষিণাংশ বেশ খাড়াভাবে শোন অববাহিকায় মিশিয়াছে। উত্তরাংশও প্রাচীরের মত খাড়া। অঞ্চলটি প্রধানতঃ বালি পাথর (স্যান্ডস্টোন) দ্বারা গঠিত। চুনাপাথর (লাইমস্টোন) ও শেল দ্বারা গঠিত শিলাস্তরও লক্ষ্য করা যায়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০১৬ মিলিমিটার হইতে ১২৭০ মিলিমিটার। উপযুক্ত বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকা সত্ত্বেও মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ জমিতে কৃষিকার্য হয়। কৃষিকার্যই লোকের প্রধান উপজীবিকা। কয়লা, চুনাপাথর, কোরান্ডাম কিঞ্চিৎ পাওয়া যায় বলিয়া খনিতে উপজীবিকার কিছু সুযোগ আছে। রেওয়া এই অঞ্চলের প্রধান শহর। বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত।

পীযূষ সাহা

রেজাখাঁ, মহম্মদ ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বিভিন্ন উচ্চপদে এমন কি নায়েব-নাজিমের পদেও (ডেপুটি গভর্নর) অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি মোগল সম্রাটের দ্বিতীয় শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে যখন দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তখন বাংলার নায়েব-দেওয়ান হন। দ্বৈত শাসনকালে অব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় ও অসংখ্য লোক মারা যায়। রাজস্বের একটা বড় অংশ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া তাঁহার পুনর্নিয়োগ হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

রেজিন একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর কঠিন জৈব রাসায়নিক দ্রব্য। রেজিনকে দুইভাগে ভাগ করা হয়—প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল) ও সংযোজিত (সিন্থেটিক)। প্রাকৃতিক রেজিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তৈলস্ফটিক, কোপাল, রজন ও লাক্ষা। শেষোক্ত তিনটি রেজিন বার্নিশ তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয়। সহজতর জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য হইতে সংযোজিত রেজিন প্রস্তুত হয়। ইহাদের মধ্যে পলিথিন, পলিস্টাইরিন, পলিএক্রাইলেট প্রভৃতি প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্র তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়। আর রেজিন হইতে তন্তু প্রস্তুত করিয়াও টেরিলিন বস্ত্র তৈয়ারি হয়। এই সংযোজিত রেজিনগুলিকে থার্মো-প্ল্যাস্টিক রেজিন বলে। থার্মো-সেটিং রেজিন নামে আর এক জাতীয় সংযোজিত রেজিনও আছে। এই শ্রেণীর মধ্যে বেকে-লাইট (যাহা ইলেক্ট্রিক সুইচ তৈয়ারিতে ব্যবহৃত হয়) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফণীন্দ্রনাথ বাগছী

রেডার 'রেডিও ডিটেক্শান ও রেঞ্জিং' হইতে শব্দটির উৎপত্তি। ইহার সাহায্যে বস্তুর অস্তিত্ব, দূরত্ব ও দিক্ নির্ণয় করা যায়। শত্রুর বিমানের গতিবিধি-নির্ণয়ের জন্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহার প্রচলন এবং বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯ খ্রী) ইহার প্রভূত উন্নতি হয়।

রেডার যন্ত্র হইতে একটি বেতার-তরঙ্গের ঝলক বাহির হইয়া লক্ষ্যবস্তুটির উপর পড়ে। এই ঝলকের একাংশ প্রতিফলিত হইয়া বেতার প্রতিধ্বনির আকারে ধরা পড়ে বেতারগ্রাহক-যন্ত্রে। লক্ষ্য বস্তুটি পর্যন্ত গিয়া এই ঝলকে ফিরিয়া আসার সময়টি রেডারযন্ত্রে পরিমাপ করিলেই বস্তুটির দূরত্ব জানা যায়। স্পষ্টতঃই বেতার ঝলকটি যত জোরালো হইবে তত দূরের বস্তুতে সহজে পৌঁছিবে। তাই বেতার-তরঙ্গের সমগ্র শক্তিকে বস্তুটির দিকে ধাবিত করিবার জন্য একটি প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়। প্রতিফলকের মুখটিকে ইহার কেন্দ্রস্থ এরিয়াল সমেত চারিদিকে নির্দিষ্ট গতিবেগে ঘোরানো হয়। রেডারগ্রাহক-যন্ত্রের পর্দার উপর বেতার-প্রতিধ্বনিটি ফুটিয়া ওঠে ও ছবি পড়ে। লক্ষ্যবস্তুর এই রকম প্রতিচ্ছবি দেখানোর ব্যবস্থাকে বলা হয় পি. পি. আই. (প্ল্যান পোজিশান ইণ্ডিকেটর) প্রেজেন্টেশান। রেডারের পর্দায় বিভিন্নরকম প্রতিচ্ছবি ফেলা যায়, যাহার মধ্যে পড়ে আর. এইচ. (রেঞ্জ-হাইট) প্রেজেন্-টেশান। এই পদ্ধতিতে বস্তুটির দূরত্ব ও উচ্চতা একই সঙ্গে জানা যায়। একই রেডার যন্ত্রে অনেক সময় পি. পি. আই. ও আর. এইচ. প্রেজেন্টেশান-এর ব্যবস্থা থাকে। আসন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝার ইঙ্গিত পাইবার জন্য এই ধরনের রেডারের ব্যবস্থা বিমানঘাটিতে থাকে। উহার সাহায্যে মেঘের দূরত্ব, উচ্চতা, গতির দিক্ ও বেগ, এমনকি বৃষ্টিপাত শুরু হইয়াছে কি-না তাহাও জানা যায়। শত্রুর বিমান বা ডুবোজাহাজের সন্ধান, কুয়াসার মধ্যে বিমানের নিরাপদে অবতরণ, সমুদ্রে হিমশৈলের আঘাত হইতে জাহাজকে বাঁচানো প্রভৃতি ব্যাপারেও রেডারের ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

অরুণকুমার সেন

রেডিওথেরাপি রেডিয়াম বা রেডিয়াম-গুণযুক্ত দ্রব্যের দ্বারা চিকিৎসার নাম রেডিওথেরাপি। রেডিয়াম হইতে সাধারণতঃ তিন প্রকার তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ হয়। এগুলি শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি সাধারণতঃ তিন প্রকারের ঃ আল্ফা, বিটা ও গামা। গামা রশ্মির অনুপ্রবেশ-শক্তি সর্বাধিক। জীবকোষ সম্পর্কে এই তিন রশ্মির ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের। সম্প্রসারণশীল কোষগুলির উপর গামা

রশ্মির প্রভাব বেশ মারাত্মক অথচ স্বাভাবিক কোষগুলি গামা রশ্মির দ্বারা সহজে বিনষ্ট হয় না। আল্‌ফা ও বিটা রশ্মি স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুই প্রকার কোষের প্রতি প্রায় সমভাবে ক্ষতিকারক। যদি আল্‌ফা ও বিটা রশ্মির নির্গমন বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র গামা রশ্মির নিঃসরণ করা যায় তাহা হইলে দুষ্টকোষ বিনষ্ট হইবে কিন্তু স্বাভাবিক কোষ ততটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

অতএব কেবল গামা রশ্মি নিঃসরণের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা হয়ঃ ১. সীসক ধাতুর মধ্যে রেডিয়াম স্থাপন করিলে সীসকাবৃত রেডিয়াম হইতে আপেক্ষিক ভাবে গামা রশ্মি বেশি বিকীর্ণ হইবে এবং রশ্মি চিকিৎসার পক্ষে সুগম হইবে; ২. রেডিয়ামের মূলাধারের কিছু দূরে কোনও বিশেষ ধাতু রাখিলে সেই ধাতু কিছুদিনের জন্য গামারশ্মি ধারণ করিতে পারে ও পরে অনুপ্রবিষ্ট গামারশ্মি ধীরে ধীরে বিকীর্ণ হয়। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে এই ধাতুতে তেজস্ক্রিয়তা সঞ্চারণ এবং রেডিয়ামের বিকল্প হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা যায়। কোবাল্ট ও সিজিয়াম ধাতু এই কাজে ব্যবহার করা সহজ; ৩. পরমাণু বিভাজনযন্ত্রের দ্বারা (অ্যাটমিক রিঅ্যাক্‌টর) অনেক মৌলপদার্থকে তেজস্ক্রিয় করা যায়। এই তেজস্ক্রিয় মৌলপদার্থ চিকিৎসা-নির্ণয়ে এবং কখনও কখনও প্রত্যক্ষ চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেমন তেজস্ক্রিয় আয়োডিন (রেডিও অ্যাক্‌টিভ আয়োডিন)।

রেডিয়াম ব্যবহারের প্রণালীঃ ১. সীসকাবৃত রেডিয়াম শরীরের কোনও সুগম স্থানে স্থাপন করিয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ ক্যান্সারের চিকিৎসা করা হয়। ২. শক্তিশালী রেডিয়ামের মূলাধারের সুনির্দিষ্ট দূরত্বে রোগীকে রাখিয়া বিকীর্ণ গামা রশ্মি দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। ইহাকে 'টেলি রেডিয়াম' কিংবা 'টেলি কোবাল্ট' চিকিৎসা বলা হয়। ৩. তেজস্ক্রিয় মৌলপদার্থ শরীরে প্রবেশ করাইয়া বিশেষ জাতীয় ক্যান্সারের চিকিৎসা ('ক্যান্সার' দ্র) করা হয়। যেমন তেজস্ক্রিয় আয়োডিন কিংবা তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস।

রেডিওথেরাপির আর একটি অংগ রঞ্জন রশ্মির দ্বারা চিকিৎসা। রঞ্জন রশ্মি সাধারণতঃ রোগ নির্ণয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কখনও কখনও প্রত্যক্ষ চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

১. অভ্যন্তরীণ রঞ্জন রশ্মি চিকিৎসা (ডীপ এক্স-রে থেরাপি)ঃ শক্তিশালী রঞ্জন রশ্মি যন্ত্রদ্বারা অতিক্ষুদ্র তরংগের রশ্মি শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া ক্যান্সারের চিকিৎসা করা সম্ভব। ২. নিকটবর্তী রঞ্জন রশ্মির (কন্‌ট্যাক্ট-রে) দ্বারা বাহিরের ত্বকের কোনও দুষ্টক্ষত কিংবা অন্য জাতীয় রোগের চিকিৎসা হয়।

মুকুলিকা কোনার

রেডিওলজি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশেষ একটি শাখা। এই শাখায় এক্স-রে ও অন্যান্য বিভিন্ন রশ্মির সাহায্যে রোগ-নির্ণয় ও নিরাময় করা হয় ('এক্স-রে' দ্র)। এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মির যে সকল বিশেষ বিশেষ গুণ আছে তাহার মধ্যে প্রধান হইল এই যে, ইহা কঠিন পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। কোনও বিশেষ পদার্থের উপর পড়িলে আলো বিকিরণ করে এবং ফটোগ্রাফিক প্লেটকে কালো করে। রঞ্জন রশ্মির এই গুণকে চিকিৎসাশাস্ত্রে কাজে লাগাইয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা হয়। কলকারখানায় তৈয়ারি ধাতবদ্রব্যের মধ্যে অদৃশ্য ফাটল বা খুঁত আছে কি-না তাহাও ইহার সাহায্যে ধরা পড়ে। ইহা ছাড়া এই রশ্মির প্রয়োগে জীবদেহের বিভিন্ন কোষেরও বিশেষ পরিবর্তন হইয়া থাকে এবং এই গুণটির জন্য এই রশ্মি ব্যবহারের দ্বারা মনুষ্য শরীরের কয়েকটি রোগের বিশেষ ক্যান্‌সারের চিকিৎসা হয়। 'রেডিওথেরাপি' দ্র।

ভারতবন্ধু ঘোষ

রেমব্রাণ্ট, হারমেন্‌জ ভ্যান্‌ রিন্‌ (১৬০৬-১৬৬৯ খ্রী) ডাচ চিত্রকর। আমস্টার্ডামের খ্যাতনামা শিল্পী পিটার লাস্টম্যানের অধীনে ছয়মাস শিল্পশিক্ষার পর স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই হল্যান্ডের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিকৃতি-চিত্রকররূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তৈলচিত্র ও এচিঙের মাধ্যমে তিনি প্রতিকৃতি, দৃশ্যচিত্র, ধর্মীয়চিত্র, দৈনন্দিন জীবনালেখ্য প্রভৃতি বিষয় রূপায়ণে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার চিত্রে ব্যারক, ক্লাসিক ও রোম্যাণ্টিক গুণগুলির সবই কম-বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। সেই কারণেই তিনি অনন্যসাধারণ। সপ্তদশ শতকে হল্যান্ডের ক্যাল্‌ভিনিস্টগণ কোনও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে চারুশিল্প প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। তাই ঐসময় হল্যান্ডের কোনও শিল্পীই ধর্মীয় চিত্র বিশেষ আঁকেন নাই। এই বিষয়ে রেমব্রাণ্টই ব্যতিক্রম। তিনি বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে প্রায় আটশতের অধিক চিত্র অংকন করেন। নিজবাসস্থানের পার্শ্ববর্তী লোকসমাজ ও জনসাধারণ হইতে তিনি চিত্রের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এত সামান্য অভিজ্ঞতা দিয়া যে কত বিচিত্র ও গভীর বিষয় রচনা সম্ভব তাহা একমাত্র তাঁহার চিত্রেই দেখা যায়।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

রেয়ন একজাতীয় কৃত্রিম রেশম। সিনথেটিক্ ফাইবার লইয়া বস্ত্রবয়নশিল্পে ব্যবসায়ক্ষেত্রে আসে প্রায় ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। তবে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাহার বেশ কিছু পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সুইস্ রাসায়নিক Schonbein নাইট্রো-সেলুলোস আবিষ্কার করিয়া রেয়নশিল্পের পথ উন্মুক্ত করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে George Audemars রেয়ন প্রস্তুত করা ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগী। Count Hilaire de Chardounet-কেই 'রেয়নশিল্পের জনক' বলা হয়। ইনিই প্রথম বৃক্ষপত্র হইতে রেয়নতন্তু বাহির করেন (১৮৮৪ খ্রী)। ইহার পর একাধিক পদ্ধতির সাহায্যে বস্ত্রবয়নের জন্য রেয়নতন্তু প্রস্তুত হয় ও শিল্পের ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। বর্তমানে নানাশ্রেণীর রেয়ন প্রস্তুত হইতেছে—ভিস্কোস্ রেয়ন, কুপ্রামোনিয়ম রেয়ন, অ্যাসিটেট্ রেয়ন ইত্যাদি। বহু প্রকার পরিধেয়-শিল্পে আজ রেয়নের ব্যবহার যথেষ্ট ব্যাপক। 'রেশম' দ্র।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

রেলপথ আধুনিক যুগে রেলপথ শিল্পসম্প্রসারণে সর্বাধিক সাহায্য করিতেছে। ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের ব্যবহারে রেলপথ সুগম হইয়াছে ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়াছে। ভারতীয় রেলপথ দৈর্ঘ্য ৫৯০০০ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর রেলপথ-গুলির মধ্যে দ্বিতীয় এবং দেশের সরকার-পরিচালনাধীন সংস্থাগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ইহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু লক্ষ লোকের জীবিকার্জনে সাহায্য করিতেছে। স্বদেশে ও বিদেশে আমদানি ও রপ্তানির ব্যাপারে রেলপথের উপযোগিতা সর্বাধিক। প্রতিদিন ৬২ লক্ষ যাত্রীর পরিবহণের জন্য ভারতীয় রেলপথে ১১৬০০ ইঞ্জিন, ৩৩৮০০ যাত্রীগাড়ি ও ৩৭৪০০০ মালগাড়ি আছে এবং ইহাদের সাহায্যে প্রতিদিন ১০০০০ ট্রেন চলে। মানুষ ও মাল-চলাচলের জন্য ২০০০ স্টেশন আছে। অবশ্য এই সমস্ত সংখ্যাই দেশের উন্নতির সহিত ক্রমাগত বাড়িতেছে। অধুনা আমাদের দেশে রেলপথে ভ্রমণের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। রেলের কারখানায় যে ডিজেল ও বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন তৈয়ারি হইতেছে তাহার শতকরা ৮০ ও ৭৫ ভাগ স্বদেশী মালে তৈয়ারি। এদেশে প্রচলিত বড় ও ছোট লাইনগুলির মধ্যে বড় লাইন আছে শতকরা ৪৮.৭ ভাগ। সম্প্রতি ছোট লাইনের অনেক অংশ বড় লাইনে রূপান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং নূতন এলাকায় রেল-লাইন পাতিবার ব্যবস্থাও হইতেছে। ট্রেনের গতিও অধুনা বাড়ানো হইতেছে। 'রাজধানী এক্সপ্রেস' এখন ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার বেগে চলে। যাত্রী ও মাল-চলাচল অতি দ্রুত বাড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে দুর্ঘটনার হার গত ১২ বছর ধরিয়া ক্রমাগত নামিয়া আসিতেছে এবং জাপান, ক্যানাডা, সুইডেন প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক কম।

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

রেশম রেশমের উৎপত্তি শুঁয়া পোকা জাতীয় এক-প্রকার কীটের লালা হইতে। তুঁত গাছের পাতা খাইয়া কীট তৈয়ারি করে তুঁত-রেশম। এণ্ডির পাতা খাইয়া কীট তৈয়ারি করে এণ্ডি; সোয়ালো, সুম ও আসন পাতা খাইয়া মুগা; আর শাল, কুল, সিধা প্রভৃতি গাছের পাতা খাইয়া তসর। এই চারি জাতীয় রেশমই ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাংশের কয়েকটি রাজ্যে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে তুঁত-রেশম পশ্চিমবাংলা, মহীশূর ও কাশ্মীরেই বেশি আর সব শ্রেণীর রেশমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এণ্ডি ও মুগা জন্মে আসামেই বেশি, তসর জন্মে বিহার, ওড়িশা ও মধ্যপ্রদেশে। আসাম, বিহার, গাড়োয়াল, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজেও তুঁত-রেশম চাষের অল্পাধিক চেষ্টা চলিতেছে। তুঁত-রেশম ও এণ্ডির কীট গৃহপালিত; আর মুগা অর্ধগৃহপালিত এবং তসর বন্য। কিন্তু সব রেশম-কীটের জীবনধারণ-পদ্ধতি প্রায় একই রকমের।

রেশম-কীটের লালা বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়। উহাই রেশমের আঁশ (ফিলা-মেণ্ট)। এই আঁশের দুইটি অংশ। উপরে জিলাটিন-জাতীয় একরকম আঠা (সেরিসিন) থাকে, আর ভিতরের আঁশ-জাতীয় পদার্থের নাম ফাইব্রয়ন। রেশমের আঁশ তারের ন্যায় সূক্ষ্ম। রেশমের জাত অনুযায়ী এক একটি গুটিতে ৩০০ মিটার হইতে ১০০০ মিটার পর্যন্ত তার থাকে। কয়েকটি গুটির তার একত্র করিয়া সুতা কাটিতে হয়। গুটি হইতে একটানা সমান তারের রেশম-সুতা বাহির করিতে হইলে আস্ত গুটি দরকার। মুখ-কাটা গুটির সুতার নাম 'মটকা'। সেরিসিন তারের গায়ে লাগিয়া থাকায় উহা মাড়ের কাজ করে। কাজেই বিনা মাড়ে কাঁচা রেশম দিয়া কাপড় বোনা চলে, তাহাকে বলা হয় কোরা রেশমবস্ত্র বা সিল্ক। আর কাঁচা রেশম-সুতাকে সোডা ও সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া সেরিসিন ছড়াইয়া পরে সুতা পাকাইয়া যে রেশমবস্ত্র বোনা হয় তাহার সাধারণ নাম গরদ।

মটকা সুতা সাধারণতঃ কাটা হয় তকলিতে। উহা হইতে 'মটকা' বস্ত্র তৈয়ারি হয়। আর রেশমসুতা কাটার সময় গুটির উপরের অংশের খেই অগোছালো ও কাটা থাকে বলিয়া উহা হইতে অবিচ্ছিন্ন তার পাওয়া যায়

না। এই অগোছালো খেই বা রেশমের নাম ছাট রেশম। ইহা হইতেও সুতা কাটা চলে। কুটিরশিল্পে রেশম সুতা কাটা ব্যাপারে সব কিছুই হাতে করা হয়। বর্তমানে রেশমসুতা কাটায় বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত পদ্ধতিরও প্রচলন হইয়াছে।

রেশমবস্ত্র বয়ন-পদ্ধতি প্রায় সর্বত্রই একরকম। হস্তচালিত তাঁতেও হয়। কোরা রেশম বুনিবার পরে ধোলাই করিয়া নানাপ্রকার রং ও ডিজাইনে ছাপা হয়। গরদ অবশ্য বোনার সময়ই ডিজাইনে বোনা হয়।

প্রকৃতিজাত এই রেশমের জন্মভূমি এশিয়ার জাপান, চীন, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ ও তুর্কীস্তান আর ইওরোপের ইতালি। বর্তমানে রেশম-উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে জাপানের স্থানই সর্বোচ্চ। ভারতবর্ষের উৎপাদনের পরিমাণ সে তুলনায় নগণ্য। রেশমের সুতার তারের শক্তি সমান পরিধিবিশিষ্ট একটা স্টীলের তারের শক্তির প্রায় ১/৩। প্রায় ২৫ মণ তুঁত পাতা খাওয়াইলে এক মণ কাঁচা রেশমগুটি পাওয়া যায়। ১৮ মণ কাঁচা গুটি হইতে সুতা মেলে মাত্র ১ মণ।

প্রাকৃতিক রেশমের এখন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রেয়ন বা নকল রেশম। দেখিতে রেশমের মতো উজ্জ্বল বলিয়া রেয়নকে বলা হয় নকল রেশম। কিন্তু গুণে প্রাকৃতিক রেশমের তুলনায় উহা খুবই নিকৃষ্ট। প্রাকৃতিক রেশমের ঔজ্জ্বল্য ব্যবহারের সঙ্গে বাড়ে, আর রেয়নের কমে। শক্তিতে তো রেয়ন রেশমের কাছে দাঁড়াইতেই পারে না।

সত্যরঞ্জন সেন

রো, টমাস মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের জন্য সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্যে সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে টমাস রো ইংল্যাণ্ডরাজ প্রথম জেম্‌সের রাষ্ট্রদূত হিসাবে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন করেন।

তিন বৎসরের বেশি তিনি ভারতে ছিলেন। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের জন্য অল্প কিছু সুবিধা তিনি আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের সমকালীন যে সমস্ত তথ্যপূর্ণ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতকগুলি বেশ মূল্যবান্।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

রোজা বা উপবাস। ইসলাম ধর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ যাহা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য করণীয়। ফারসী 'রোজহ্'-র কোরানে ব্যবহৃত আরবী প্রতিশব্দ 'সৌম' (বা স্বৌম্)। সাধারণভাবে ইহার অর্থ এক সূর্যাস্ত হইতে পরবর্তী সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্ভোগ হইতে নিবৃত্তি। ইসলামি মাস রমজানের প্রতিটি দিন রোজা রাখিবার নির্দেশ কোরানে আছে। যিনি নিরবচ্ছিন্ন রোজা পালন করিবেন, তাঁহাকে সূর্যাস্তে সামান্য জলপানে রোজা-ভঙ্গ, মধ্যরাত্রের পরে আবার সামান্য জলপানদ্বারা পরবর্তী দিনের রোজা পালনের সংকল্প এবং সেই দিনটি নির্জলা উপবাস করিতে হইবে। ঈশ্বরের জ্যোতিতে আপন প্রাণ ও মনকে দীপ্ত করাই রোজার আসল উদ্দেশ্য।

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

রোটারি ক্লাব পৃথিবীর প্রথম রোটারি ক্লাবের উদ্বোধন হয় যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে (১৯০৫ খ্রী, ২৩ ফেব্রুয়ারি)। ক্লাব স্থাপনা করেন এক তরুণ ব্যবহারজীবী পল. পি. হ্যারিস্। সদস্য নির্বাচনের মূলসূত্র ছিল প্রত্যেক ব্যবসায় বা পেশা হইতে প্রতিনিধি হিসাবে একটিমাত্র সভ্য লওয়া। ক্লাবের উদ্দেশ্য সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ ও সহযোগিতা স্থাপন ও জনগণের সেবা। বৈঠকের আবর্তনী ধারা হইতে ক্লাবের নাম হয় 'রোটারি'। ক্রমশঃ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগরে রোটারি ক্লাবের স্থাপনা হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬টি বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত ক্লাব লইয়া রোটারির জাতীয় সংস্থা গঠিত হয় এবং এই বৎসরেই ক্যানাডায় উইনিপেগ ক্লাব স্থাপনার পর রোটারি আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিন, লণ্ডন ও বেলফাস্টে রোটারি ক্লাব 'ইণ্টারন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন অভ্ রোটারি ক্লাব্‌স্' নাম লইয়া গঠিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'রোটারি ইণ্টারন্যাশন্যাল' নাম চলিতেছে। আজ ১৫০টি দেশে ১৫৩০০ ক্লাব আছে, যাহার সভ্য-সংখ্যা ৭২৩০০০। ভারতবর্ষে রোটারির আরম্ভ কলিকাতা শহরে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৫৫০টি ক্লাব ও ২০০০০ সদস্য। রোটারির উদ্দেশ্য মানবসেবার ভিত্তিতে লোকহিতকর কার্যকলাপ-প্রচেষ্টাকে পুষ্ট করা।

প্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায়

রোটেনস্টাইন, উইলিয়াম (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রী) ইংরেজ চিত্রকর। ইয়র্কশায়ারের ব্র্যাডফোর্ডে জন্ম। দীর্ঘকাল (১৯২০-৩৫ খ্রী) রয়্যাল কলেজ অভ্ আর্টের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। দুই মহাযুদ্ধ কালেই তিনি সরকারি সমরশিল্পী নিযুক্ত হন। তাঁহার আঁকা ছবির মধ্যে পেটার, সুইনবার্ন রোঁদ্যা ও কনরাডের প্রতিকৃতি এবং 'মর্নিং অ্যাট বেনারস' নিসর্গচিত্র উল্লেখযোগ্য। তাঁহার তিনখণ্ড আত্মজীবনী 'মেন অ্যাণ্ড মেমারিজ'

সুখপাঠ্য রচনা। দেগার অঙ্কনশালায় অপ্সরা মূর্তি দেখিয়া তিনি ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণে আসেন। সেই ভ্রমণের প্রধানতম সুফল রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সৌহার্দ। পর বৎসর রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ড গেলে ৩০ জুন রোটেনস্টাইনের গৃহেই গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ পাঠের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অগ্রণী। তাঁহার সহিত এই যোগাযোগ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের পথ সুগম করিয়া থাকিতে পারে। রোটেনস্টাইনের আঁকা 'সিক্‌স্ পোর্ট্রেটস্ অভ্ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বন্ধু-প্রীতির এক জ্বলন্ত নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল।

অশ্রুকুমার সিকদার

রোভার্স কাপ বলখেলা, ফুটবল দ্র

রোম্যাণ্টিসিজম শিল্প ও সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপকে 'রোম্যাণ্টিক' আখ্যা দেওয়া হয় ও এই দৃষ্টিভঙ্গী ও রূপের প্রকাশকে 'রোম্যাণ্টিসিজম' বলা হয়। কেহ বলেন, ইহা 'বিস্ময়-বোধের পুনরুদ্বোধন'; কেহ বলেন, 'ইহা সৌন্দর্যের সহিত অজানার সংযোগ'। সহজভাবে বলা যায় রোম্যাণ্টিসিজমের লক্ষ্য কল্পনার আলোকে জীবনের বাস্তবাতীত রূপায়ণ। জীবনের প্রকৃত রূপের পরিবর্তে অন্য এক বিচিত্র রূপের প্রকাশ রোম্যাণ্টিক শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দার্শনিক রুশো সভ্যতা-বিরোধী রোম্যাণ্টিক ভাবধারার প্রবর্তক। গ্যেটের সময় হইতেই জার্মানিতে এক ধরনের রোম্যাণ্টিক ভাবপ্রবণতা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়ায়। হাইনের গীতিকবিতাগুলির মাধ্যমে জার্মান সাহিত্য রোম্যাণ্টিকতার এক মহান্ উৎকর্ষে পৌঁছায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজী সাহিত্যকে 'পুনরভ্যুদয়ের যুগ' বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। অনেক সময় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই যুগের আরম্ভ ধরা হয় (এই বৎসর ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের কাব্যগ্রন্থ 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স' প্রথম প্রকাশিত হয়) ও ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে শেষ ধরা হয় (এই বৎসর স্কটের মৃত্যু হয়)। এই যুগের প্রধান লেখকগণের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, বায়রন, শেলি, কীট্‌স ও স্কট প্রধান। রোম্যাণ্টিসিজমের গভীরতর দিক্ ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় পাওয়া যায়। তিনি ঐকান্তিক প্রকৃতি-প্রেমিক। বিশ্বের অণু-পরমাণুতে তিনি ঐশীলীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কোল্‌রিজের কবিতায় রহস্যলোকের বাস্তব রূপান্তর ঘটিয়াছে। শেলি বিপ্লবের জয়গান গাহিয়া নূতন যুগের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কীট্‌স্ বিশ্বাস করিতেন, সত্য ও সুন্দর অভিন্ন। রবীন্দ্রকাব্যে রোম্যাণ্টিকতার চূড়ান্ত মহিমা দৃষ্ট হয়। কল্পনার পাখা মেলিয়া তিনি কালিদাসের কালে পৌঁছিয়াছেন, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়াকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। আরও আধুনিক-যুগে দেখি, জীবনানন্দ দাশের কাছে বনলতা সেন এই রোম্যাণ্টিক কল্পনার আলোকেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রোলাঁ, রোম্যাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪ খ্রী) ফরাসী লেখক। শিল্পকলা ও সংগীতশাস্ত্রের গবেষক রোলাঁ ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'বেটোফেন-চরিত' (১৯০৩ খ্রী); অতঃপর মিকেলাঞ্জেলোর জীবনী (১৯০৬ খ্রী) ও টলস্টয়ের জীবনী (১৯১১ খ্রী) রচনা করেন। 'জাঁ-ক্রিস্তফ্' (১০ খণ্ড, ১৯১০-১২ খ্রী) তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এই গ্রন্থের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান (১৯১৫ খ্রী)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও সহানুভূতি এবং রবীন্দ্রনাথের সহিত গভীর সম্প্রীতি ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধী (১৯২৪ খ্রী), রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের (১৯৩০ খ্রী) জীবনী রচনা করেন।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

রৌপ্য ভারত, মিশর ও চীনের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। রৌপ্যের পরমাণুক্রমাঙ্ক ৪৭, পরমাণুগুরুত্ব ১০৭.৮৮, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০.৫, উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ধাতু। গলনাঙ্ক ৯৬০.৫° সে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৯৫০° সে.। মৌলাবস্থায় প্রকৃতিতে থাকে না, যৌগরূপে পাওয়া যায়। প্রধান কয়েকটি আকরিক, যথা—গন্ধকঘটিত, আরজেন্‌টাইট, স্ট্রমেরাইট, রুবি, সিলভার ইত্যাদি। নরওয়ে, পেরু ও কানাডা অঞ্চলে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ অন্য ধাতুর (তামা ও সীসা) নিষ্কাশনের সময় উপজাত (বাই প্রডাক্ট) হিসাবে ইহা পাওয়া যায়। বাতাসের সংস্পর্শে ইহার পৃষ্ঠে সিলভার সালফাইড-এর আবরণ পড়ে। জল বা ক্ষারের সংস্পর্শে ইহার কোনও পরিবর্তন হয় না। মুদ্রা, তৈজসপত্র, আয়না প্রস্তুতিতে ও ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং-এ ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়। ঔষধ-

রূপে কলয়ডাল সিলভার ও আলোকচিত্রের ফিল্মে সিলভার ব্রোমাইডের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য।

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

লং, রেভারেণ্ড জেম্‌স্‌ (১৮১৪-১৮৮৭ খ্রী) উদারমতি ইংরেজ মিশনারী। ধর্মপ্রচার-উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন। বাংলা ভাষা ইনি ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং এদেশের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় গ্রন্থ রচনা করেন। ষাট বৎসরের (১৭৯৫-১৮৫৫ খ্রী) ১৪০০ বাংলা বইয়ের বিবরণ প্রকাশ তাঁহার মূল্যবান্ কীর্তি। ইহাতে পুস্তকগুলি বিষয়ানুসারে মন্তব্য সহকারে সাজানো এবং গ্রন্থকার, প্রকাশক ও গ্রন্থমূল্য নির্দেশ করা আছে। এই বিবরণীতে অনেক পারিভাষিক শব্দের সাক্ষাৎ মেলে। তাহা ছাড়া 'প্রাচ্য প্রবচন', 'পুরাতন কলিকাতা', 'অপ্রকাশিত সরকারি-বিবরণ', 'আঘাতের পূর্বে শোনো' (নীলকর অত্যাচার-সম্পর্কিত) তাঁহার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের ('দীনবন্ধু মিত্র' দ্র) 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের দায়ে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারে তাঁহার এক হাজার টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয়। জরিমানার টাকাটি রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কালীপ্রসন্ন সিংহ ('কালীপ্রসন্ন সিংহ' দ্র) দাখিল করেন। বাঙ্গালীর আক্ষেপ সেদিনের একটি গানে প্রকাশ পায়ঃ 'নীল বানরে সোনার লঙ্কা করল এবার ছারেখার/অসময়ে হরিশ ম'ল, লং-এর হ'ল কারাগার'।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লক, জন (১৬৩২-১৭০৪ খ্রী) খ্যাতনামা ইংরেজ দার্শনিক। তাঁহার লেখা গ্রন্থ ঃ 'লেটার অন্ টলারেশন' (১৬৮৯-৯১ খ্রী), 'এসে অন্ আণ্ডার্স্ট্যাণ্ডিং' (১৬৯০ খ্রী), 'ট্রিটিজেস্ অন্ সিভিল গভর্নমেণ্ট' (১৬৯০ খ্রী), 'সাম থট্‌স কন্‌সার্নিং এডুকেশন' (১৬৯৩ খ্রী)। দ্বিতীয়টি তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার মধ্যে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে সমস্ত জ্ঞানেরই উৎপত্তি অভিজ্ঞতা হইতে। তৃতীয় গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় জেম্‌স-এর সিংহাসনচ্যুতি ও নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্রের সমর্থন করেন যাহার ফলে 'রক্তহীন বিপ্লব' ও 'গৌরবময় বিপ্লবের' মুখপাত্র হিসাবে দেশবাসীদের অভিনন্দন লাভ করেন।

তাঁহার রাষ্ট্রতত্ত্বের মর্মকথা ঃ রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনমঙ্গল, ভিত্তি জনগণের সম্মতি, শক্তি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্র নিয়মতান্ত্রিক হইবে অর্থাৎ আইনের প্রাধান্য স্বীকার করিবে—'যেখানে আইনের শেষ, সেখানে স্বেচ্ছাচারের আরম্ভ।' রাষ্ট্র জনমঙ্গল উপেক্ষা করিলে জনগণ ন্যায়সঙ্গতভাবে রাষ্ট্রশক্তিকে অপসারিত করিতে পারিবে।

নির্মলকান্তি মজুমদার

লক্ষ্মণসেন বাংলার সেনবংশের রাজা বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি গৌড়, কলিঙ্গ (পুরী) এবং কামরূপ অধিকার করেন। গয়া, ছোটনাগপুর এবং প্রয়াগে তাঁহার শাসন সম্প্রসারিত হয়। কিন্তু গৌড়বঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক অভ্যুত্থান দমন করিতে পারেন নাই। সুন্দরবন অঞ্চলে, ত্রিপুরার পট্টিকেরায়, মেঘনার পূর্বতীরে এবং মুঙ্গেরে তাঁহার রাজত্বকালে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মৌলানা মিন্‌হাজ-উদ্দীন রচিত 'তবকাত্-ই-নাসিরী' (১২৬০ খ্রী) এবং ইসমি রচিত 'ফুতুহ্-উস্-শালাতিন্' (আনু. ১৩৬০ খ্রী) নামক দুইটি গ্রন্থে, 'রায় লখ্‌মনিয়া' বা লক্ষ্মণসেন-এর রাজধানী(?) নদিয়াতে, অষ্টাদশ কিংবা ঊনবিংশ অশ্বারোহী সৈনিক সমভিব্যাহারে, বখ্‌ত্-ইয়ার খিলজী-র আগমন, হঠাৎ আক্রমণ ও অধিকার স্থাপনের বিবরণ আছে। অভাবিত আক্রমণে পরাজিত লক্ষ্মণসেন প্রাসাদের পশ্চাৎদ্বার দিয়া 'বঙ্গ' অভিমুখে পলায়ন করেন। ঘটনাটির ঐতিহাসিকতা স্বীকৃত ; কিন্তু নদিয়া তখন লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল কিনা, এবং বখ্‌ত্-ইয়ার-এর সৈন্যগণ সৈনিকরূপেই সেখানে গিয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, ঐ ঘটনায় বাঙ্গালীদের কাপুরুষতা প্রমাণিত হয় না। বরঞ্চ ইহাই প্রমাণিত হয় যে, লক্ষ্মণসেন নদিয়াতে বখ্‌ত্-ইয়ার-এর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বহিরাগত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তখন কোনও প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল না। আনুমানিক ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে উপরি-উক্ত ঘটনা ঘটে। 'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এর সাক্ষ্য অনুসারে লক্ষ্মণসেন ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে জীবিত ছিলেন। তিনিই ছিলেন সেনবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য নরপতি।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

লক্ষ্মী সম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নারায়ণের পত্নী। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে তদীয় পত্নী দক্ষকন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম। লক্ষ্মী সীতারূপে রামচন্দ্রের ভার্যা, রুক্মিণীরূপে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে বিষ্ণুপত্নীরূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। একবার দুর্বাসা মুনি নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত পারিজাত পুষ্প স্বর্গরাজ ইন্দ্রকে দিলে রম্ভার

সহিত ভোগসুখে প্রমত্ত ইন্দ্র অনবধানতাবশতঃ তাহা ঐরাবতের মস্তকে স্থাপন করেন এবং ক্রুদ্ধ দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট। পরে ইন্দ্রের তপস্যায় প্রীত নারায়ণের অনুমতিক্রমে স্বর্গচ্যুতা লক্ষ্মীদেবী সমুদ্র-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুরাসুর কর্তৃক সমুদ্র-মন্থনকালে কমলাসীনা পদ্মহস্তা লক্ষ্মী আবির্ভূতা হইলে তাঁহাকে পাইবার জন্য দেবাসুরের কলহ হয়। বিষ্ণু সকলকে নিরস্ত করিয়া স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীকে গ্রহণ করেন। তখন ইন্দ্রও স্বর্গরাজ্যে লক্ষ্মীকে ফিরিয়া পান।

যূথিকা ঘোষ

লক্ষ্মীবাঈ বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসি নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের শেষ শাসনকর্ত্রী ('ঝাঁসি' দ্র)। মারাঠা শাসনকালে এই রাজ্য পেশোয়ার আশ্রিত ছিল। বুন্দেলখণ্ড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীনে আসিলে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তদানীন্তন শাসনকর্তা রামচন্দ্র রাওয়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে শাসনভার দেওয়া হয়। যখন রঘুনাথেরও অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় (১৮৩৮ খ্রী) তখন তাঁহার ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন। গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার মোরোপন্ত তাম্বের কন্যা মনুবাঈয়ের পাণিগ্রহণ করেন। শ্বশুরালয়ে লক্ষ্মীবাঈ বলিয়া ইঁহার নূতন নামকরণ হয়। লক্ষ্মীবাঈয়ের একটি পুত্র হইয়াছিল, শৈশবে তাহার মৃত্যু হয়। পুত্রহীন গঙ্গাধর রাও মৃত্যুর পূর্বে আনন্দ রাও নামক এক আত্মীয় বালককে দত্তক গ্রহণ করেন (১৮৩৫ খ্রী)। তাহার নূতন নামকরণ হয় দামোদর গঙ্গাধর রাও। গভর্নর জেনারেল লর্ড ড্যাল্‌হৌসি 'দত্তক পুত্রের উত্তরাধিকার অস্বীকারের নীতি'তে ঝাঁসিরাজ্য অধিকার করিতে উদ্যত হইলে ২৩ বৎসর বয়স্কা রানী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসির অধিকার ছাড়িতে অস্বীকৃত হন এবং দৃঢ়সংকল্প হইয়া কোম্পানির বিরোধিতা করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় তিনি বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দিয়া অত্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন (১৮৫৮ খ্রী, ১৮ জুন)।

দ্র সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ঃ ৫ম খণ্ড—রজনী-কান্ত গুপ্ত, কলিকাতা।

ত্রিদিবনাথ রায়

লখ্‌নৌ উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী। লখ্‌নৌ, উন্নাও, রায়বেরিলি, সীতাপুর, হরদোঈ ও খেরী এই ছয়টি জেলার মধ্যে ক্ষুদ্রতম লখ্‌নৌ জেলার আয়তন ২৫০১ বর্গ কি. মি.। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমে হরদোঈ ও সীতাপুর; উত্তর-পূর্বে ফৈজাবাদ বিভাগের বারাবংকী জেলা, দক্ষিণ-পূর্বে রায়বেরিলি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে উন্নাও জেলা। লখ্‌নৌ শহর স্থানীয় শাসকের, জেলার ও রাজ্যের সদর কার্যালয় এবং রাজ্যের অন্যতম প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে শহরটি অবস্থিত; কলিকাতা হইতে রেলপথে দূরত্ব ১০৬৫ কি. মি.। বিমানপথেও কলিকাতার সহিত ইহার যোগাযোগ আছে। কানপুরের পরেই ইহা রাজ্যের সর্ববৃহৎ শহর ('উত্তর প্রদেশ' দ্র)। ইহার জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণ এই শহরে বাস করেন। এই শহরের খ্রীষ্টান মিশনারিগণের কার্যকলাপ উল্লেখযোগ্য—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জেনানা মিশন, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চার্চ মিশনারি সোসাইটি মিশন, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান মেথডিস্ট এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্‌লিয়ান মিশন স্থাপিত হয়। ব্রিটিশ আমল হইতে এখানে একটি ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট আছে।

প্রবাদ, শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই নগরীর পত্তন করেন, ইহা হইতেই নাকি লখ্‌নৌ নাম। মোগল সাম্রাজ্যের অবনতির সময়, মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৭১৯-৪৮ খ্রী) সাদৎ খান বুরহান-উল্‌-মুল্‌ক অওধের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন (১৭২৪ খ্রী) ও বিশৃংখল সুবার শৃঙ্খলাবিধান করেন। চতুর্থ নবাব আসফউদ্দৌলা ফৈজাবাদ হইতে লখ্‌নৌয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ('অযোধ্যা' দ্র)। তাঁহার রাজত্বকালে লখ্‌নৌয়ের জাঁকজমক বৃদ্ধি পায়। সেতু, মসজিদ, ইমাম-বাড়া, রুমীদরওয়াজা, রেসিডেন্সি প্রভৃতি বহু মনোরম সৌধ নির্মিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কুশাসনের অজুহাতে লর্ড ড্যালহৌসি নবাব ওয়াজেদ আলী শাহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অওধকে কোম্পানির ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সিপাহীগণ লখ্‌নৌয়ের রেসিডেন্সি অবরোধ করে, এই যুদ্ধে স্যার হেনরি লরেন্স নিহত হন। সেপ্টেম্বর মাসে আউটরাম ও হ্যাভেলক বাহির হইতে সৈন্য আনিয়া অবরুদ্ধ রেসিডেন্সি উদ্ধার করেন। দুই মাস পরে ইংরেজগণ লখ্‌নৌ পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নূতন সেনাপতি স্যার কলিন ক্যাম্পবেল লখ্‌নৌ পুনরধিকার করেন।

জরি, তামা ও পিতলের কারুকার্য, বস্ত্রবয়ন, হস্তি-দন্তশিল্প, রেশমের কাজ, চিকণশিল্প, অলংকারশিল্প, মাটির পুতুল, কাচের চুড়ি, জুতা, আতর, জর্দা, তামাক ইত্যাদি শিল্পের জন্য লখ্‌নৌ বিখ্যাত। লখ্‌নৌয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে জামা মসজিদ, হুসেনাবাদ, ইমামবাড়া, বরাদারী, রেসিডেন্সি, বেইলী গার্ড গেট, মচ্ছিভবন, মার্টিনিয়ার কলেজ, উইংফিল্ড পার্ক,

রুমীদরওয়াজা, বিশ্ববিদ্যালয়, ছত্তর মঞ্জিল, স্টেডিয়াম, রেল স্টেশন, হজরতগঞ্জ, রাজ্যপালের বাসভবন সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে প্রচুর বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়, প্রাচীন উদ্ভিদ্‌বিদ্যা গবেষণাকেন্দ্র ও অন্যান্য মূল্যবান্‌ শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত। সংগীতের পীঠস্থান হিসাবে 'ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যালয়'-এর নাম অতি সুপরিচিত।

ত্রিদিবনাথ রায়

লছমনঝোলা (৭৮°২০′ পূ ও ৩০°৩৮′ উ) উত্তর রেলের প্রান্তসীমা হৃষীকেশ স্টেশন হইতে পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, উত্তরপ্রদেশের টিহরী জেলায় অবস্থিত। ১৩৭ মিটার লম্বা ইস্পাতের দড়ির পুল, নীচে কাঠের পাটাতন। তাহার নীচে গঙ্গা প্রবাহিত। ইহা সমুদ্র-সমতা হইতে ৩৩৫ মিটার ঊর্ধ্বে। পুলের ওপারে দক্ষিণের পথটি কেদার-বদ্রীর পুরাতন হাঁটাপথ। বাঁয়ের পথটি গিয়াছে স্বর্গাশ্রম। গঙ্গাতটে সোমেশ্বর শিবের মন্দির। এস্থান হইতে মোটরবোটে গঙ্গা পারাপারের সুবন্দোবস্ত আছে। শিবমন্দিরের দক্ষিণে শেঠ জয়দয়াল গোয়েঙ্কা-নির্মিত গীতাভবন। এই ভবনের দেওয়ালে সম্পূর্ণ গীতা ও রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ড উৎকীর্ণ আছে। ভবনে যাত্রীদের থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। লছমনঝোলার ১১ কিলোমিটার পূর্বে, দ্বীপের মধ্যে ১২১৯ মিটার উচ্চে নীলকণ্ঠেশ্বর শিবের মন্দির। ওখানে একটি ধর্মশালা আছে। শ্রাবণ মাসে প্রতি সোমবার পূজা হয়। সারামাস ধরিয়া মেলা বসে। আরোও ছয় কিলোমিটার দূরে ভুবনেশ্বরী মন্দিরটিও দর্শনীয়।

কমলকুমার গুহ

লন টেনিস প্রাচীন রীতিতে কোর্ট টেনিস খেলার আধুনিক নামকরণ হইল লন টেনিস। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচশত বছর পূর্বে এই খেলার জন্ম হয় ইজিপ্টে (মতান্তরে পারসিয়াতে)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেজর ওয়াল্‌টার উইংফিল্ড নামে এক ইংরেজ তাঁহার নিজস্ব নূতন পরিকল্পনা (টেনিস অন দি লন) অনুসারে ইংল্যান্ডে ঘাসের উপর প্রথম এই খেলার আয়োজন করেন। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রে টেনিস খেলার প্রবর্তন করেন মিস্‌ ই. অটারব্রীজ (১৮৭৪ খ্রী)। এই মহিলার আনুকূল্যেই আমেরিকার মাটিতে প্রথম টেনিস খেলার প্রতিযোগিতা হয় নাহাণ্টে (১৮৭৬ খ্রী)। ৭৮ ফিট লম্বা ও ২৭ ফিট চওড়া জায়গায় খড়িমাটির গুঁড়া দিয়া কোর্ট কাটিয়া, দিনের আলোকে কিংবা তীব্র বৈদ্যুতিক আলোতে এই খেলা হয়। সিংগল্‌স্‌, ডাব্‌ল্‌স্‌ ও মিক্স্‌ড্‌ ডাব্‌ল্‌স্‌ লন টেনিস-প্রতিযোগিতা হয়। অধুনা প্রায় সমস্ত সভ্য দেশেই লন টেনিস খেলার আয়োজন আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে উইম্বেলডন ও ডেভিস কাপের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমটির শুরু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়টির ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রশান্ত দাঁ

লবণ এক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ। লবণ বলিতে আমরা যাহা বুঝি রসায়নশাস্ত্রে তাহাকে 'খাদ্য লবণ', 'সাধারণ লবণ' বা 'সোডিয়াম ক্লোরাইড' বলে। অম্লের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু বা ধাতুকল্প দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক প্রতিস্থাপিত হইয়া লবণ গঠন করে। অম্লের সহিত অন্য লবণ উত্তপ্ত করিয়া এবং ক্ষার বা ক্ষারক ও অম্লের প্রশমন ঘটাইয়াও লবণ প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে শমিত লবণ, আম্লিক লবণ, ক্ষারকীয় লবণ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। সমুদ্রজল উত্তপ্ত করিয়া খাদ্যলবণ পাওয়া যায়। খনিতেও নানাপ্রকার লবণ থাকে। মাটিতে অবস্থিত লবণ প্রধানতঃ গাছের খাদ্য।

মনোতোষ দাশগুপ্ত

লরেন্স, ডি. এইচ. (১৮৮৫-১৯৩০ খ্রী) ইংরেজ ঔপন্যাসিক, কবি, সমালোচক ও চিত্রকর। জন্ম নটিংহামশায়ারে। তিনি চির রুগ্‌ণ ছিলেন। মাতার প্রতি তাঁহার ছিল প্রবল অনুরাগ এবং মাতার প্রভাব ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের উপর সক্রিয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দি হোয়াইট পিকক্‌' (১৯১১ খ্রী) প্রকাশিত হইলে ইহা সাহিত্য-জগতের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক, হীনম্মন্যতাবোধে জর্জরিত এবং কলহপরায়ণ।

'সন্স অ্যান্ড লাভার্স' পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে (১৯১৩ খ্রী) তিনি মাতার প্রভাব হইতে মুক্ত হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি এক জার্মান মহিলাকে বিবাহ করেন। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ইতালিতে দেহত্যাগ করেন।

লরেন্স বুদ্ধির প্রাধান্য অস্বীকার করিতেন। সহজাত প্রবৃত্তির উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস ও কবিতা এই সহজাত প্রবৃত্তি (প্রাইম্যাল ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌)-র জয়গানে মুখর। তাঁহার মতে নারী সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত বলিয়া পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর সত্য ও সৃজনশীল। তাঁহার মতে যৌনপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই

প্রবৃত্তির চরিতার্থতার মাধ্যমেই মানুষ একদিন তাহার দেবত্বকে আবিষ্কার করিবে। মূর্খতার বশে মানুষ ইহাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বস্তু মনে করে। তিনি ছিলেন আর্টিস্ট। আর্টের মাধ্যমেই তিনি অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন। লরেন্সের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'দি রেন্‌বো' (১৯১৫ খ্রী), 'উইমেন ইন লাভ' (১৯২১ খ্রী), 'ক্যাঙ্গারু' (১৯২৩ খ্রী), 'দি প্লুম্‌ড্‌ সার্‌পেন্ট' (১৯২৭ খ্রী) ও 'লেডি চ্যাটার্লিস্‌ লাভার' (১৯২৮ খ্রী)। তাঁহার ছোটগল্পের মধ্যে 'ইংল্যান্ড, মাই ইংল্যান্ড' (১৯২২ খ্রী), 'দি উওম্যান হু রোড অ্যাওয়ে' (১৯২৮ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৮-১৯২৯ খ্রী) নদিয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামের নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুসুমকামিনী দেবীর পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় (১৮৮৮ খ্রী) প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৮৮৯-১৯২৯ খ্রী)। সুপণ্ডিত, আদর্শ অধ্যাপক ও 'শেক্‌সপীরিয়ানস্কলার' হিসাবে ললিতকুমারের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

বাংলা গদ্যরচনায় ললিতকুমার সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মুখ্যতঃ লঘু রস-রচনাকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা বিষয় লঘু রসিকতার সাহায্যে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। ললিতকুমার সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী, সাহিত্য, ভারতী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ফোয়ারা' (১৯১১ খ্রী), 'ব্যাকরণ-বিভীষিকা' (১৯১১ খ্রী), 'অনুপ্রাস' (১৯১৩ খ্রী), 'কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব' (১৯১৬ খ্রী), 'পাগলা ঝোরা' (১৯১৭ খ্রী), 'সাহারা' (১৯২৭ খ্রী), 'কৃষ্ণকান্তের উইল-এর আলোচনা' (১৯২৮ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অধীর দে

লাইন এনগ্রেভিং এনগ্রেভিং বলিতে ধাতু, প্রস্তর ও কাষ্ঠাদির উপর খোদাই করিয়া সৃষ্ট শিল্পকে ও সেই শিল্প হইতে প্রতিলিপি মুদ্রণের পদ্ধতিকে বুঝায়। প্রতিলিপি মুদ্রণের এনগ্রেভিং বা খোদকারি রীতিকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ১. রিলিফ পদ্ধতি, ২. ইনট্যালিও পদ্ধতি।

রিলিফ পদ্ধতি সাধারণতঃ কাঠ খোদাই, লিনোলিয়াম বা রবার কাটাই প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে মুদ্রিতব্য চিত্রটি উচ্চরূপে খোদিত হয়। ইনট্যালিও পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল তাম্রফলক খোদাই (কপার এনগ্রেভিং)। ইনট্যালিও পদ্ধতিতে কেবলমাত্র গভীরতাযুক্ত অংশ হইতে ছাপ ওঠে, পক্ষান্তরে রিলিফ পদ্ধতিতে ছাপ ওঠে কেবলমাত্র উচ্চ অংশ হইতেই। এচিং-এও ইনট্যালিও পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় ('এচিং' দ্র)। ইনট্যালিও পদ্ধতিতে ড্রাই পয়েন্ট, অ্যাকোয়াটিন্ট, ইস্পাত খোদাই, মেজোটিন্ট প্রভৃতি প্রয়োগবিধিও আছে।

ভারতে এনগ্রেভিং বা খোদকারি শিল্পের প্রচলন খুবই প্রাচীন। এখানে খোদকারির কাজে বহু প্রাচীন যুগে প্রস্তর বা পোড়া মাটির ফলক, হাতির দাঁত, হাড়, ধাতু ফলক, লোহার এবং কাঠের পাটা, শুষ্ক তালপাতা বা বৃক্ষবল্কল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়োর প্রাপ্ত পোড়ামাটির বর্ণলিপিযুক্ত সীলগুলি, অশোক স্তম্ভের নির্দেশমালা এবং শিলালেখগুলি আজ সর্বজন পরিচিত। কোয়াত-উল্‌-ইসলাম মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রোথিত গুপ্তবংশীয় লৌহস্তম্ভে খোদিত রাজা চন্দ্রের লিপিমালা সকলকে বিস্মিত করে। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে সম্ভ্রান্ত নাগরিক বা শ্রেষ্ঠীদের বৈষয়িক প্রমাণ-পত্রিকা, সমাজবিধি প্রভৃতি স্বর্ণফলকে খোদিত করিয়া রক্ষিত হইত। মোগলরীতিজাত মোজেক শিল্পও খোদকারির অনুকরণ হইতে আসিয়াছে। দামাস্কাসের কারুশিল্পীরা অস্ত্রশস্ত্রের ধাতব গাত্রকে সোনা, রুপা বা তামার তার বসাইয়া অলংকৃত করিত। ভারতে আজও তাহার অস্তিত্ব বজায় আছে মোরাদাবাদি ও জয়পুরি কাজ করা তৈজসের গাত্রে।

ভারতে পর্তুগীজ আমলে কাঠখোদাই-মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ও পরবর্তীকালে কেবল হরফ খোদাই নহে, পুস্তকচিত্রণের চাহিদাও মিটাইয়াছে কাঠখোদাই শিল্প। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত ব্লক তৎকালে মুদ্রিত বহু গ্রন্থের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দ, রথীন্দ্রনাথ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাঠখোদাই ও লিনোলিয়ান কাটাই-এ উৎসাহ দেন। শিল্পাচার্য নন্দলাল খোদকারির বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁহার অনেক চিত্র সৃষ্টি করেন। আরও অনেক ভারতীয় শিল্পী এই শিল্পকার্যে উৎসাহী হন।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

লাও-ৎসু খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন। জীব, জগৎ, বিবর্তন, পুরুষার্থ প্রভৃতি বিষয়ক তাও-সিদ্ধান্তগুলি ('তাও' দ্র) তিনি সুবিন্যস্ত করেন এবং 'তাও-তে কিঙ্‌ (বা চিঙ্‌)' নামক গ্রন্থ রচনা

করেন। যদিও তত্ত্বগুলি পূর্ব হইতেই সুবিদিত ছিল তথাপি তাঁহার হাতে এইগুলি নবরূপ লাভ করে। বিশদ ও মৌলিক আলোচনার জন্য অনেকে তাঁহাকে তাও-বাদের প্রবর্তক মনে করেন। লাও-ৎসুর মতে তাও রূপরস-গন্ধস্পর্শহীন গুণাতীত এক অনির্বচনীয় সত্তা, নিরাকার শক্তি। ঈশ্বর ইহার সাকার প্রকাশ। লাও-ৎসু ইহা লাভের উপায় বলিয়াছেন। প্রথমতঃ জীবকে বিত্তৈষণা, পার্থিব সম্পদলোভ, পাণ্ডিত্য ও তাহার বোধ পরিহার করিয়া শিশুসুলভ সরলচিত্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্বাভাবিকভাবে ধর্মাচরণ কর্তব্য। নিষ্কাম ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে বোধির উদয় হয় এবং জীব তাওকে অবগত ও তাহার সহিত একাত্ম হয়।

জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

লাক্ষা লাক্ষা কীটের (ল্যাক্সিয়ার ল্যাক্কা) দেহনিঃসৃত রজন। ইহাই একমাত্র ব্যবহার্য প্রাণীজ রজন। ইহা জলে দ্রবণীয় লাল ও অদ্রবণীয় হলুদ অংশের সমন্বয়ে গঠিত। হলুদ অংশটিই বাজারে বিক্রীত রজন। বহুসংখ্যক লাক্ষাকীট পলাশ ও কুসুম গাছের ডালে একত্র অবস্থান করে। ভারতবর্ষের বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে; ব্রহ্মদেশে ও থাইল্যাণ্ডে এবং কিয়ৎপরিমাণে শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয় ও ইন্দো-চীনে ইহার চাষ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে লাক্ষা রপ্তানি ভারতের একচেটিয়া ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে 'ডিস্ক্‌রেকর্ড' তৈয়ারিতে ইহা সর্বাধিক ব্যবহৃত হইত। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সিমেণ্ট তৈয়ারিতে; পালিশ ও দেওয়াল রঙের কাজে; ঘড়িশিল্পে; কালি, জুতার কালি ও প্রসাধনদ্রব্য তৈয়ারিতে; দন্ত চিকিৎসায়; ঔষধ বটিকার আবরক তৈয়ারিতে; রবার, বস্ত্র ও চর্মশিল্পে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মনোতোষ দাশগুপ্ত

লাক্ষাদ্বীপ ভারতের মালাবার উপকূলের পশ্চিমে আরবসাগরে ৮° হইতে ১৪° ডিগ্রি অক্ষাংশ ও ৭১° হইতে ৭৪° দ্রাঘিমাংশে লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিনদীবি দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। দ্বীপপুঞ্জের আয়তন ১০৭.৫ বর্গ কি.মি. হইলেও ১৯টি ছোট দ্বীপের মধ্যে ৯টি দ্বীপে মাত্র ৩৩.৩ বর্গ কি.মি. অধ্যুষিত।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এগুলি ভারতের অধিকারে আসে। বর্তমানে ইহার শাসনভার একজন কেন্দ্রীয় শাসন অধিকর্তার হাতে আছে। তাঁহার প্রধান কার্যালয় কালিকটে। দ্বীপপুঞ্জের উত্তরদিকের পাঁচটি দ্বীপকে আমিনদীবি বলে, যথা—আমিনী, কাদামঠ, কিলতান, চেটলাট ও বিত্র। অন্যান্য দ্বীপের মধ্যে রহিয়াছে আনড্রথ, কবরাট্টি, অগাট্টি, কালাপানি ও মিনিকয়। সুহেলী ও পিট্টিতে লোকবসতি নাই। প্রায় প্রতিটি দ্বীপই অর্ধচন্দ্রাকৃতি এবং সমুদ্ররেখা হইতে দশ অথবা পনের ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের ভূ-পৃষ্ঠ হইতে ছয় ফিট নীচে ভূ-গর্ভস্থ জল পাওয়া যায়। এপ্রিল-মে মাসে দ্বীপপুঞ্জের তাপমাত্রা ৭০° ফারেনহাইট হইতে ৯০° ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে। এই সময়ে ৫০″ হইতে ৭০″ বৃষ্টিপাত হয়। প্রধান চাষ নারিকেলের। মিনিকয় দ্বীপ ব্যতীত প্রায় সব দ্বীপের গরু ও ভেড়া পালন করা হয়। অনেকক্ষেত্রে গৃহপালিত পক্ষীও দেখা যায়। উপহ্রদগুলিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ লইয়া অধিবাসীরা ভারত ও সিংহলে বিক্রয়ের জন্য যায়। কচ্ছপ, প্রবাল ও সামুদ্রিক শঙ্খও তাহারা বিক্রয় করে।

এই সকল প্রবালদ্বীপের সমাজব্যবস্থা অনেকটা একপ্রকার। কিন্তু তাহার মধ্যে মিনিকয় দ্বীপের বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। মিনিকয় দ্বীপের চার হাজার অধিবাসী এক একটি গ্রামে বাস করে এবং উহা দ্বীপের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ব্যক্তিগত কাহারও জমি নাই। বিবাহের পূর্বে কোনও পুরুষ নিজস্ব গৃহ রাখিতে পারে কিন্তু বিবাহ হইলে তাহাকে তাহার স্ত্রীর উপাধি গ্রহণ করিয়া স্ত্রীর গৃহে বাস করিতে হয়। সমাজে মহিলার স্থান অতি উচ্চে। যদিও ইহাদের শৈশবে বিবাহ হয়, তবুও মহিলাদের স্বামি-নির্বাচনে অধিকার রহিয়াছে। মহিলারা প্রায় সকলে শিক্ষিত এবং তাহারা নিজ শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। বর্তমানে শতকরা ১৫.২৩ জন (পুরুষ ও মহিলা) শিক্ষিত। মহিলাদের 'বারাঙ্গি' ও পুরুষদের 'আদ্রি' নামে দুইটি সামাজিক সংঘ আছে। 'আদ্রি'র নির্বাচিত প্রধানকে 'মাপান' বলে। অধিবাসীরা মুসলমান হইলেও তাহাদের মধ্যে একৈক দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিবাহকালে পাত্রীকে যৌতুক দিতে হয় না, উপরন্তু পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রী উপহার গ্রহণ করে।

আমিনদীবি দ্বীপেও সমাজব্যবস্থা একই প্রকার। এ স্থলেও উত্তরাধিকারসূত্র মহিলাগত। উহাকে 'মরুমাক্কাট্টায়াম' উত্তরাধিকার বলে। ইহাদের ভাষা অনেকটা মালয়ালমের ন্যায়। পূর্বে ব্যক্তিগত জমির অধিকার ছিল না। বর্তমানে জনসংখ্যা বাড়ায় জমির মূল্য বাড়িয়াছে এবং ব্যক্তিগত জমির অধিকার লইয়া মামলা হইয়া থাকে।

অঞ্জনা রায়চৌধুরী

লাজপৎ রায় লালা, লাজপৎ রায় দ্র

লামা বিশিষ্ট শ্রেণীর তিব্বতীয় বৌদ্ধ যতি। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হইতে কালক্রমে তিব্বতে লামাবাদ প্রচলিত হয়। মঙ্গোলীয়েরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজককে 'দলাই লামা' নামে অভিহিত করে ('দালই লামা' দ্র)। ধর্মপ্রাণ তিব্বতীয়দের মধ্যে লামাগণ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সর্বসম্পদ ভোগের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন। এই জন্যই অনেকেই এই আচার্য-পদের প্রার্থী হইয়া থাকেন। তিব্বতের বহু লোক সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়া লামার শিষ্য হন। শিক্ষানবিশীকালে লামা-পদপ্রার্থী বালকদিগকে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়; তৎসত্ত্বেও তিব্বতবাসী গৃহস্থেরা প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ করিবার জন্য মঠে প্রেরণ করেন। অবশ্য অন্যান্য পুত্রেরা বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করে। তিব্বতের প্রধান প্রধান সংঘারামের অধ্যক্ষ যতিরাই 'লামা' উপাধিলাভের অধিকারী। মঠের বাহিরেও লামাদের প্রভাব বিস্তৃত থাকে। লামা যতিগণের মৃতদেহ ধ্যানরত বুদ্ধমূর্তির আসনের অনুকরণে উপবেশন করাইয়া সমাধিস্থ করা হয় এবং ঐ সমাধিস্থান তীর্থরূপে গণ্য হয়; অবশ্য সাধারণ লামাদের দেহ দাহ করিতে বাধা নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০-১৯০৭ খ্রী) প্রসিদ্ধ গায়ক। খেয়াল ও টপ্-খেয়াল গানে কৃতিত্বের জন্য স্মরণীয়। ভারতের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞদের নিকট ইনি বিভিন্ন সংগীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁহার ২৮ খানি গান বিধৃত আছে। বহুবাজারের সুপরিচিত বড়ালবংশীয় কৃতী অ্যাটর্নী ও 'হিতবাদী'-সংস্থার অন্যতম পরিচালক নবীনচাঁদের একমাত্র পুত্র ছিলেন লালচাঁদ। লালচাঁদের তিন পুত্রই কিষণচাঁদ, বিষণচাঁদ ও বিশেষ করিয়া রাইচাঁদ সংগীতজগতে সুপরিচিত।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রী) বাংলার বাউল কবিদের মধ্যে ইঁহার নাম সর্বাগ্রগণ্য। কুষ্ঠিয়ার গোরাই নদীর ধারে, সেঁউড়িয়া গ্রামে তাঁহার আখড়া ছিল। এখানেই তাঁহার সমাধি আছে। রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ইঁহার ২৯৮টি গান সংগ্রহ করেন এবং ২০টি 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন (১৩২২ বঙ্গাব্দ)। 'লালন-গীতিকা' সংগ্রহগ্রন্থে মোট ৪৬২টি গান সংকলিত হইয়াছে।

সদানন্দ ভট্টাচার্য

লালবিহারী দে (১৮২৪-৯৪ খ্রী) খ্রীষ্টধর্মযাজক, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ-রচয়িতা ও পত্রিকাসম্পাদক। লালবিহারী বর্ধমান জেলার সোনা-পলাশী গ্রামে এক দরিদ্র বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী সুবর্ণবণিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে গ্রামের পাঠশালায় পরে কলিকাতায় ডাফ সাহেবের জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশনে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুলাই তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। গুজরাতের পার্শি খ্রীষ্টান রেভারেন্ড হরমদজি পেসটনজির বিদুষী কন্যা বাচু-ভাইয়ের সহিত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ হয়। ডাফ সাহেবের চার্চে ধর্মযাজক (১৮৪৬-৬৭ খ্রী) রূপে লালবিহারী কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে সরকারি শিক্ষাবিভাগে এবং বহরমপুরে কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন (১৮৬৭-৭২ খ্রী)। কিছুকাল বহরমপুর কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকরূপে কাজ করিবার পর হুগলি মহসীন কলেজে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত থাকেন (১৮৭২-৮৮ খ্রী)। সরকারি চাকরিতে তাঁহার পদোন্নতির ব্যাপারে বর্ণবৈষম্য নীতি অনুসৃত হওয়ায় তিনি হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন নাই। পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব, আর্থিক দুর্দশা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার শেষ জীবন (১৮৮৯-৯৪ খ্রী) কষ্টের মধ্যে কাটে।

স্বধর্মত্যাগী হইলেও গভীর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতিগর্ব, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনচেতনা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। রো এবং ওয়েব সাহেবদ্বয়ের লেখা 'হিণ্ট্স্ অন্ দি স্টাডি অভ্ ইংলিশ' (১৮৭৪ খ্রী) বইতে 'বাবু ইংলিশ' পরিচ্ছেদের প্রত্যুত্তরে তিনি ইংরেজদের লেখা ইংরেজীর অজস্র ভুল দেখান। তাঁহার 'বেঙ্গল পেজেণ্ট লাইফ্' সেকালের সাধারণ গ্রাম্যজীবনের অপূর্ব আলেখ্য। তাঁহার 'ফোক্ টেল্স্ অভ্ বেঙ্গল' বাংলার নিজস্ব উপকথার প্রথম সংগ্রহ। বেঙ্গল ম্যাগাজিন (১৮৭২-৮৩ খ্রী), ফ্রাইডে রিভ্যু, ইণ্ডিয়ান রিফর্মার প্রভৃতি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডঃ জনসনের 'ভ্যানিটি অভ্ হিউম্যান উইশেস্' ও পার্নেলের 'হারমিট্' কাব্যের টীকাটিপ্পনীসহ একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। তাঁহার একটি প্রবন্ধে তিনি শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

লালমোহন বিদ্যানিধি (১৮৪৫-১৯১৬ খ্রী) প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত ও শিক্ষাব্রতী। জন্মস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুর। পিতা রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা

সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি বিদ্যানিধি উপাধি লাভ করেন (১৮৬৮ খ্রী) ও এই বৎসরেই কটক কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭০-১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিনাজপুর, বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর ছিলেন। এই সময়ে কখনও কখনও ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। পরে তিনি হুগলি নর্মাল স্কুলের হেডপন্ডিত নিযুক্ত হন (১৮৮৮ খ্রী)। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার মৌলিক বাংলাগ্রন্থের মধ্যে 'কাব্যনির্ণয়' (১৮৬২ খ্রী), 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' (১৮৭৫ খ্রী) এবং 'ভারতীয় আর্যজাতির আদিম অবস্থা' (১৮৯১ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। 'কবিকল্পদ্রুম' (১৯২৩ সং), 'পত্র প্রবন্ধ' (১৮৭৬ খ্রী), 'শিক্ষাসোপান' (১৯০৩ খ্রী) ও 'চারুপ্রবন্ধ' (১৯১০ খ্রী) তাঁহার লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক। বঙ্গদর্শন ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহার নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে (অগ্রহায়ণ ১২৮২) 'সম্বন্ধনির্ণয়ের' প্রশংসা করেন। রিজ্‌লে তাঁহার 'দি ট্রাইব্‌স অ্যান্ড কাস্ট্‌স অভ্‌ বেঙ্গল' (১৮৯১ খ্রী) গ্রন্থপ্রণয়নে বিদ্যানিধি মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন।

হারাধন দত্ত

লালা লালাগ্রন্থিগুলির ক্ষরণ। মানবদেহে কর্ণমূলের নিকট, জিহ্বার নীচে ও চোয়ালের নীচে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি আছে। প্রথম জোড়া প্রধানতঃ জলীয় রস ক্ষরণ করে। অন্যগুলির ক্ষরণ শ্লেষ্মাজাতীয় পদার্থের জন্য অপেক্ষাকৃত গাঢ়। প্রতিটি গ্রন্থিরই একটি করিয়া প্রণালী আছে, তাহাই লালাকে মুখবিবরে লইয়া আসে। মুখবিবরকে সিক্ত রাখা, খাদ্যকে চিবাইতে ও গিলিতে সাহায্য করা ও কথোপকথনকে সহজসাধ্য করাই লালার প্রধান কার্য। এতদ্ব্যতীত লালায় টায়ালিন নামক একটি এন্‌জাইম থাকে। ইহা শর্করাজাতীয় খাদ্যের পাচনে সাহায্য করে। খাদ্যের সহিত এই এন্‌জাইমটি পাকস্থলীতে পৌঁছায়। সেখানেও যতক্ষণ না যথেষ্ট অম্ল ক্ষরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত (প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল) ইহার কার্য চলিতে থাকে। প্রধানতঃ খাদ্যের স্বাদ, দর্শন, গন্ধ, চিন্তা প্রভৃতি কারণে নার্ভের প্রভাবে লালাক্ষরণ হয়।

অজিতকুমার চৌধুরী

লালাবাবু পূর্বনাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। পাইকপাড়া রাজ-বংশের আদিপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। পিতা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ। বর্ধমানে কালেক্টারের সেরেস্তাদারি-পদে থাকিবার সময়ে লালাবাবু বর্ধমানের বহু পরগনা ক্রয় করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশায় দেওয়ানি-পদ লাভ করেন। তাঁহার বদান্যতা ও ক্রিয়াকর্মে আড়ম্বরের গল্প তখন লোকের মুখে মুখে কীর্তিত হইত। কথিত আছে, পথিপার্শ্বের এক বালিকার কণ্ঠে 'ওঠ বাবা, বেলা যায়' শুনিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া মথুরা যান। বৃন্দাবনে তিনি কৃষ্ণবিগ্রহসহ এক বিরাট্‌ মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন অন্নসত্র 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে খ্যাত এবং বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থ।

আরতি গুহ

লালা, লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮ খ্রী) ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ নেতা। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি পাঞ্জাবের জারগাঁও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন এবং পর বৎসর আর্য-সমাজে যোগ দেন। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্ট্রাল প্রভিন্সে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেবাকার্যের জন্য সেখানে যান। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি লন্ডন যান (১৯০৫ খ্রী)। রাজনৈতিক কারণে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার ও পর বৎসর মান্দালয়ে (ব্রহ্মদেশ) নির্বাসিত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বরাজ্যদলের প্রতি আনুগত্য দেখান ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। কেবলমাত্র রাজনীতিকরূপে নহে জীবনীকার ও লেখকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি ও শিবাজীর জীবনী উর্দুভাষায় রচনা করেন। দুই বৎসর পর স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনী রচনা করেন।

ইংরেজীতে লেখা তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থঃ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া', 'ইংল্যান্ডস্‌ ডেব্‌ট টু ইণ্ডিয়া', 'পলিটিক্যাল ফিউচার ইন ইণ্ডিয়া', 'প্রব্লেম অভ্‌ ন্যাশন্যাল এডুকেশন ফর্‌ ইণ্ডিয়া', 'দি আনহ্যাপি ইণ্ডিয়া'।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় তিনি পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন, এবং কিছুদিন পরে ১৭ নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

নকুল চট্টোপাধ্যায়

লাসা তিব্বতের রাজধানী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পীঠস্থান। লা-সা শব্দের অর্থ দেবভূমি। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট সাধারণতন্ত্রী চীনের অন্তর্ভুক্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৮৩০ ফিট উচ্চে (২৯°৩৯′ উত্তর, ৯১°০৬′ পূর্ব) অবস্থিত।

তিব্বতী ধর্মগুরু লামাদের বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান লাসায় বিদ্যমান ছিল। গো-লুগ-পা সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু দলাইলামা (মঙ্গোলীয় তা-লই, অর্থ 'সমুদ্র' + তিব্বতী লা-মা, অর্থ 'গুরু' = সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ধর্মগুরু) অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে ধর্মীয় ও শাসনক্ষমতার সর্বোচ্চ পদে আসীন ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদদুর্গ পোটালা লাসায় অবস্থিত। চীনা অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত হিমালয়ের মালভূমির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী লাসায় আসিতেন। তৎকালে লাসার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০০০০, তন্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ধর্মযাজক।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত লাসা বহিরাগতদের নিকট 'নিষিদ্ধ নগরী' ছিল। ঊনবিংশ শতকের একবারে শেষে শরৎচন্দ্র দাস ছদ্মবেশে লাসায় গিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড ইয়ংহাসব্যান্ডের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ হইতে লাসায় ব্রিটিশ অভিযান ও বাণিজ্যচুক্তি হয়।

দার্জিলিং, সিমলা ও শ্রীনগরের সহিত লাসা পার্বত্যপথে যুক্ত হওয়ায় ভারতের সহিত বাণিজ্য বাড়িয়া উঠে। দার্জিলিং হইতে লাসার দূরত্ব পার্বত্যপথে ৪১৬ কি. মি.। নেপাল, ভারত ও চীন হইতে বহু দক্ষ কারিগর, শিল্পী ও ব্যবসায়ী লাসায় যাইতেন। বৎসরের নানা সময়ে লাসায় অনেকগুলি মেলা বসিত, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মেলা ছিল তিব্বতী নববর্ষে মাঘমাসের শেষ দুইটি সপ্তাহে।

১৭ মার্চ ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনা আধিপত্যের বিরুদ্ধে লাসা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। লাসায় তীব্র যুদ্ধের পর চীনাসৈন্যের হাতে বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়। দলাইলামা লাসা ত্যাগ করিয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চীনা জঙ্গী-শাসনের অধীনে পাঞ্চেন-লামা উপ-শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

মদনমোহন কুমার

লাসেন, ক্রিশ্চিয়ান (১৮০০-১৮৭৬ খ্রী) নরওয়ে দেশের বের্গেন নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। প্রথম যৌবনে সংস্কৃত শিক্ষা-মানসে জার্মানি আসেন ও অবশিষ্ট জীবন এখানেই থাকেন। হাইডেলবার্গ ও বন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সুদীর্ঘকাল বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ইওরোপের বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইঁহার ছাত্র ছিলেন। লাতিন ভাষায় সাংখ্যকারিকা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনুবাদ করিয়া ইনি যশস্বী হন। জার্মান ভাষায় ভারতবিদ্যা-সংক্রান্ত একটি বিশ্বকোষ সংকলন ইঁহার জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। এই বিশ্বকোষটি প্রাচীন ভারতের ভূগোল, ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনীতি-সংক্রান্ত বহু তথ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ। প্রাকৃত ভাষা এবং কুষাণযুগের মুদ্রা সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

লাহোর জেলা পাকিস্তানের লাহোর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত, ৩০°৩৮′ ও ৩১°৫৪′ এবং ৭৩°৩৮′ ও ৭৪°৫৮′ এর মধ্যে অবস্থিত। বর্তমান আয়তন প্রায় ৫৭০০ বর্গ কি. মি.। ইহার পূর্বে ভারতের অমৃতসর জেলা, উত্তরে ও পশ্চিমে সেখুপুরো, দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মণ্টগোমারি জেলা। লাহোর জেলায় কোনও পর্বত নাই। ইহা ইরাবতী ও শতদ্রুর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বৃষ্টিপাত উত্তরে ২২″ ও দক্ষিণে ১৩″। তাপ-মাত্রার গ্রীষ্মকালীন গড় ১৩০° ফা., শীতকালীন গড় ৪৫° ফা.। লাহোরের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হিউএন্-ৎসাঙ-এর ভ্রমণের সময় (৬৩০ খ্রী) হইতেই পাওয়া যায়। ১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর গজনীর অধীন ও গজনীরাজ্যের রাজধানী হয় (১০৯৯-১১১৪ খ্রী)। ১১৮১ খ্রীষ্টাব্দে শহরটি মহম্মদ ঘুরীর দ্বারা লুণ্ঠিত ও ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অধিকৃত হয়। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কুতবুদ্দীন আইবকের রাজ্যাভিষেক হয়। ১২৪১-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত লাহোর বলবন কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয় (১২৭০ খ্রী)। তৈমুরের সৈন্যবাহিনী লাহোর লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে (১৩৯৪ খ্রী)। মুবারক শাহ ইহার পুনর্নির্মাণ করেন (১৪২২ খ্রী)। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শেখ আলি ও ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে জালোখান লোদী ইহা অধিকার করেন।

আকবর এখানে তাঁহার দরবার (১৫৮৪-৯৮ খ্রী) বসান। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে কাসুর অবরুদ্ধ হইলে গুরু অর্জুন ধৃত ও বন্দী হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। জাহাঙ্গীর ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে দরবার করেন ও ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানেই মারা যান। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আহ্‌মদ শাহ্ দুরাণী ও ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শিখরা ইহা অধিকার করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা দলীপ সিংহের নিকট হইতে ইংরেজরা ইহা অধিকার করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রধান খাদ্যশস্য গম, বার্লি ও ভুট্টা; ইহা ছাড়া তুলা উৎপন্ন হয়। খনিজ দ্রব্য এ জেলায় কিছুই নাই। কুটির-শিল্পের মধ্যে জাল, কার্পেট, কম্বল, গহনা, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য, কাচশিল্প, খেলনা, মোমবাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লাহোর জেলার লোকসংখ্যা ২৪৭৯৬৮৭ (১৯৬১ খ্রী)। মোট জনসংখ্যার ৯৮% মুসলমান, ১% খ্রীষ্টান ও ১% অন্যান্য। জাট প্রভৃতি উপজাতিও আছে। মোট জনসখ্যার ১২.৪% শিক্ষিত। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও

বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। জেলার প্রধান শহর লাহোর (৩১°৩৭′ উত্তর ও ৭৪°২৬′ পূর্ব) ইরাবতী তীরে অবস্থিত। জনসংখ্যা ১২৯৬৪৭৭ (১৯৬১ খ্রী)। এখানে সামরিক গুরুত্ব থাকায় একটি সৈন্যনিবাস আছে। বর্তমানে শহরটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য বারিদোয়াব খাল হইতে পরিখা কাটিয়া ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। শহরের ঐতিহাসিক স্থানসমূহের মধ্যে লাহোর দুর্গ, জাহাঙ্গীর নির্মিত বাদশাহী মসজিদ ও আনারকলির স্মৃতি-সৌধ, জাহাঙ্গীরের সমাধি, শাহজাহান নির্মিত প্রাসাদ, হাকিম আলাউদ্দীন (বা ওয়াজীর খাঁ) কর্তৃক নির্মিত মসজিদ, ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবউন্নিসা কর্তৃক নির্মিত মিনারযুক্ত তোরণদ্বার (১৬৪১ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শহর হইতে অল্প দূরে 'শালিমার বাগ' নামে বাগানটি আলি মার্দান খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয় (১৬১৭ খ্রী)। ইহার ৭টি স্তর ইসলামে বর্ণিত ৭টি স্বর্গের প্রতীকরূপে নির্মিত। লাহোর শহর হইতে কিছু দূরে শিখগুরু অর্জুন সিংহের সমাধি আছে। স্বাধীন শিখরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিংহের চিতাভস্ম এবং খারাক সিংহ ও নৌনিহার সিংহের চিতাভস্মও রাখা আছে। লাহোর হইতে কিছু দূরে শাহদারায় জাহাঙ্গীর, নূরজাহান ও নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খানের সমাধি আছে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ল্যান্সডাউন উত্তরপ্রদেশের পাউড়ি গাড়োয়াল জেলায় ল্যান্সডাউন তহসিলে (২৯°৫২′ উত্তর ও ৭৮°৪১′ পূর্ব) অবস্থিত একটি শৈলনিবাস। ইহার বর্তমান আয়তন ৬.০৯ বর্গকিলোমিটার। ইহা ৬৫০০-৬৬০০ ফিট উচ্চ বহির্হিমালয়ের একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। উত্তর রেলপথের কোটদোয়ারা স্টেশন হইতে ৩০ কিলোমিটার মোটরপথে যাইতে হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি সৈন্যনিবাস স্থাপিত হয়। পাউড়ি ল্যান্সডাউন রাস্তার উপর একটি গির্জা আছে। দক্ষিণ ও পূর্বাংশে সৈন্যদের ছাউনি, প্যারেড গ্রাউন্ড, বাজার, রেজিমেন্টের অফিস প্রভৃতি আছে। এখানে আদালত, কালেক্টরের বাসভবন ইত্যাদি আছে। ল্যান্সডাউন তহসিলে ৩টি শহর, যথা কোটদোয়ারা, ল্যান্সডাউন ও দোগাদ্দা এবং অনেক গ্রাম আছে। শহরটির নামকরণ তদানীন্তন ভারতের ভাইসরয় ল্যান্সডাউনের (১৮৮৭-৯৪ খ্রী) নাম অনুসারে হইয়াছিল। সৈন্যদের ছাউনি হিসাবেই শহরটির পত্তন করা হয়, পরে ইহা শৈলনিবাসরূপে গড়িয়া ওঠে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ল্যাস্কি, হ্যারল্ড জে. (১৮৯৩-১৯৫০ খ্রী) বিশ্ব-বিশ্রুত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। ম্যাক্‌গিল ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ম্যাগ্‌ডালেন কলেজে (কেম্ব্রিজ) অধ্যাপনা করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন স্কুল অভ্‌ ইকনমিক্‌স অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল সায়ান্সের সহিত যুক্ত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আমরণ ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

তিনি বহু গ্রন্থপ্রণেতা। কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থঃ 'পলিটিক্যাল থট্‌ ফ্রম লক টু বেন্থাম' (১৯২০ খ্রী), 'কার্ল মার্ক্‌স্‌' (১৯২২ খ্রী), 'গ্রামার অভ্‌ পলিটিক্‌স' (১৯২৫ খ্রী), 'কমিউনিজ্‌ম্‌' (১৯২৭ খ্রী), 'লিবার্টি ইন দি মডার্ন স্টেট' (১৯৩০ খ্রী), 'স্টেট ইন থিয়োরি অ্যান্ড প্রাক্‌টিস' (১৯৩৫ খ্রী), 'রাইজ অভ্‌ ইওরোপিয়ান লিবারালিজ্‌ম্‌' (১৯৩৬ খ্রী)। তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠামূলক রচনাদ্বারা ল্যাস্কি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সার্বভৌমিকতা, আইন, যুক্তরাষ্ট্রতত্ত্ব জাতীয়বাদ, আন্তর্জাতিকতা, এক-পরিষদ-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার দান যথার্থই মূল্যবান্‌। তৎপ্রদত্ত ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ব্যাখ্যার মধ্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে।

তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সংঘস্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং মানবসভ্যতা ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সমর্থক। তাঁহার নির্ভীক মন্তব্য, অনবদ্য প্রকাশভঙ্গি এবং উপেক্ষিত ও উৎপীড়িত মানুষের প্রতি উদার মনোভাব ও সহজ সহানুভূতি পাঠককে মুগ্ধ করে। ল্যাস্কির চিন্তাধারার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঃ ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, উদ্দেশ্যবাদ, সমাজ-বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, বহুত্ববাদ, প্রয়োগবাদ, পরবর্তীকালের রচনায় সাম্যবাদের প্রভাব প্রভৃতি।

নির্মলকান্তি মজুমদার

লিউকিমিয়া আমাদের শরীরের প্রবহমান শোণিতে শ্বেতকণিকার (লিউকোসাইট) অস্বাভাবিক সংখ্যাধিক্য ঘটিলে লিউকিমিয়া নামক রোগের সৃষ্টি হয়। আমাদের শোণিতে দুইপ্রকার রক্তকণিকা দেখা যায় ঃ লোহিত ও শ্বেতকণিকা ('রক্ত' দ্র)। শ্বেতকণিকা নানা প্রকারের, পলিমর্ফো নিউক্লিয়ার, লিম্‌ফোসাইট ইত্যাদি। শরীরে বীজাণু-সংক্রান্ত আক্রমণ প্রতিরোধে শ্বেতকণিকার বিশেষ ভূমিকা আছে। কোনও রকম সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পায়। বীজাণুভেদে শ্বেতকণিকার বৃদ্ধির তারতম্য এমন কি কখনও কখনও হ্রাসও ঘটে। রোগনির্ণয়ের ক্ষেত্রে শ্বেতকণিকার হ্রাস-বৃদ্ধি অবশ্য বিবেচ্য। সাধারণ রোগে শ্বেতকণিকা

বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। কিন্তু লিউকেমিয়া রোগে রক্তে শুধু যে শ্বেত-কণিকার সংখ্যাবৃদ্ধিই হয় তাহাই নহে, অস্বাভাবিক ও অতি নবীন কণিকাও রক্তস্রোতে প্রবেশ করে। পলিমর্ফো নিউক্লিয়ার শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পাইলে পলিমর্ফো নিউক্লিয়ার লিউকেমিয়া এবং অনুরূপভাবে লিম্‌ফোসাই-টিক লিউকেমিয়া রোগ হয়। সাধারণতঃ লিউকেমিয়াকে শ্বেতকণিকার একপ্রকার ক্যান্সার বলিয়া ধরা হয়। ইহা দুরারোগ্য ব্যাধি, তবে বর্তমানে চিকিৎসার কিছু কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। রোগনির্ণয়ের জন্য রক্তপরীক্ষা অবশ্যই দরকার। তাহা ছাড়া রক্তের উৎপত্তিস্থল বক্ষ-পঞ্জরের অস্থিমজ্জা (স্টার্নাল পাংচার) পরীক্ষা করা হয়। প্লীহা ইত্যাদিরও স্ফীতি ঘটে। চিকিৎসার জন্য বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিক কিংবা রাসায়নিক ঔষধ সাইক্লোফস্ফামাইড, মেথোট্রিক্‌সেট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফোরাস শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়াও চিকিৎসা হয়। অতিরিক্ত সংকটের সময় শরীরে রক্তসঞ্চালন করিতে হয়।

মুকুলিকা কোনার

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রী) ইতালীয় রেনেসাঁসের লোকোত্তর প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পী। ভাস্কর, স্থপতি, সংগীতজ্ঞ, সামরিক যন্ত্রশিল্পী ও বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সুপরিচিত। জন্ম ঃ ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী এক গ্রামে। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আন্দ্রিয়া দেল ভেরোচ্চিয়োর নিকট কয়েক বৎসর শিক্ষানবিশ ছিলেন। মিলনের এক দেয়ালে অংকিত সশিষ্য যীশু-খ্রীষ্টের শেষ ভোজনের দৃশ্য (লাস্ট্‌ সাপার) তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁহার 'মোনা লিসা' চিত্র আজিও সুধীসমাজে বিস্ময়ের বস্তু। তাঁহার অন্যান্য ছবির মধ্যে 'মাদোনা অভ্‌ দি রক্‌স', 'সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট' এবং অসমাপ্ত 'সেন্ট জেরোম' প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। কালিকলম, খড়ি, কাঠকয়লার সাহায্যে অংকিত তাঁহার বহু ছবি, নকসা এবং নানা বিষয়ে রচনার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি উইন্ডসর কাস্‌ল, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লুভার, ভেনিস আকাদেমি প্রভৃতি স্থানে সংরক্ষিত আছে।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

লিচ্ছবি বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে উল্লিখিত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর ষোলটি বৃহৎ জনপদের অন্যতম ছিল ক্ষত্রিয় লিচ্ছবি জ্ঞাতৃক, বিদেহ প্রভৃতি জাতির সমন্বয়ে গঠিত বৃজি সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘ। ইহার রাজধানী ছিল বৈশালী (মুজফ্‌ফরপুর জেলান্তর্গত বেসার)। বৈশালীর উপকণ্ঠে কুণ্ডগ্রামে জাত জৈন তীর্থংকর মহাবীরের মাতুল চেতক নয়টি লিচ্ছবি গণরাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রু বিদেহ অধিকার করিলেও বৃজি সাধারণতন্ত্র স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়। পরবর্তী-কালে লিচ্ছবিরাষ্ট্র গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু প্রায় একই সময়ে নেপালে লিচ্ছবি রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউএন্‌-ৎসাঙ বৈশালী রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। লিচ্ছবি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় গণতান্ত্রিক রীতিতে সংঘাগার হইতে রাজা পর্যন্ত থাকিতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার পর্যায়ক্রমে বিনিচ্চয় মহামাত্ত, সুত্তধার, সেনাপতি ইত্যাদি হইতে রাজা পর্যন্ত সম্পাদন করিতেন। কোনও স্তরে নির্দোষ প্রমাণিত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিত। অন্যথা শাস্তি হইত। বিভিন্ন লিচ্ছবিকুল বিভিন্ন বর্ণের পোশাক ও অলংকার ব্যবহার করিত। ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ এবং সাধারণভাবে অন্তর্বিবাহ (এন্ডোগ্যামি) চলিত ছিল। লিচ্ছবি রাষ্ট্রে বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মাবলম্বী লোক ছিল।

অধীর চক্রবর্তী

লিপি, লিপিতত্ত্ব সংস্কৃত লিপ্‌ ধাতু হইতে 'লিপি' শব্দটির উৎপত্তি। লিপ্‌ ধাতুর অর্থ লেপন করা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জপত্রে ও তালপত্রে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র কলমদ্বারা দাগ কাটিয়া তাহার উপর কালি মাখাইয়া দেওয়া হইত। এই রঞ্জক পদার্থ লেপন করা হইতে 'লিপি'র উৎপত্তি।

অশোকের গিরিঅনুশাসনে ব্রাহ্মী হরফে 'লিপি' শব্দটি অন্ততঃ ৬ বার উৎকীর্ণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শাহবজ্‌গঢ়ী ও মানসেহ্‌রায় অনুশাসনগুলির খরোষ্ঠী প্রতিলিপিতে 'লিপি'-স্থলে 'দিপি' ব্যবহৃত। খরোষ্ঠী অনুশাসনে 'দিপি' প্রাচীন পারসীক হইতে গৃহীত। হখামনিষবংশীয় সম্রাটগণের (খ্রী. পূ. ৬-৪ শতক) শিলালিপিতে 'দিপি' শব্দ 'লিখন' অর্থে ব্যবহৃত। ব্রাহ্মী হরফে উৎকীর্ণ অশোকলিপিতে 'লিখিত', 'লেখিত', 'লেখাপিত' শব্দগুলি খরোষ্ঠী প্রতিলিপিতে 'নিপিস্ত', 'নিপেসিত', 'নিপেস্‌পিত'-রূপে ব্যবহৃত। প্রাচীন পারসীক 'নিপিস্ত' শব্দের অর্থ 'লিখা' (টু রাইট)।

আদিম যুগ হইতে বিবিধ স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে মানুষ ঘটনাবস্তু বা ভাবকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর প্রাচীন অধি-বাসীরা নানা রঙের সরু-মোটা দড়ির গুছি বিভিন্ন ধরনে, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে, বিভিন্ন দূরত্বে, গিঁট বাঁধিয়া নানা ঘটনার সময়, পণ্যবস্তুর সংখ্যা, মূল্য, লেনদেনের হিসাব,

নিজ নিজ বিভিন্ন পশুর, শস্যের ও সম্পদের হিসাব প্রভৃতি রাখিত। দক্ষিণ আমেরিকার ইন্‌কা সাম্রাজ্যে এই গ্রন্থিপদ্ধতিতে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় আদেশ ও রাজকীয় হিসাব রাখা হইত। ইওরোপে পুরুষেরা রুমালে এবং এদেশে মেয়েরা আঁচলে গিঁট বাঁধিয়া এই স্মারক-পদ্ধতির সাহায্যে ভবিষ্যৎ কৃত্যালিপির কাজ চালাইতেছে।

লিপি আবিষ্কারের চারিটি স্তর। প্রথম স্তরে মানুষ শব্দ-দ্যোতিত বস্তুর রেখাচিত্র অঙ্কন শুরু করে। এই 'চিত্রলিপি' (পিক্টোগ্রাম) ইহার প্রথম সোপান। ক্রমে ভাববস্তু বা ঘটনা বুঝাইতে রেখাচিত্র অঙ্কন না করিয়া গোষ্ঠীমধ্যে সুপ্রচলিত প্রতীকচিহ্ন আঁকিয়া শব্দের দ্যোতনা। এই দ্বিতীয় স্তরের প্রচেষ্টা 'ভাবলিপি' (ইডিওগ্রাম)। প্রতীক চিহ্নের দ্বারা শব্দের ভাব বা অর্থের ইঙ্গিত ইহার বৈশিষ্ট্য। তৃতীয় স্তরে শব্দের প্রতীকরূপে সুনির্দিষ্ট চিহ্নমাত্র অঙ্কনের দ্বারা 'শব্দ-লিপি' (ফোনোগ্রাম)। এই স্তরে রেখালিপির সাহায্যে শব্দ প্রকাশিত। চতুর্থ স্তরে শব্দের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র ক্রমে শব্দের আদ্যধ্বনিকে বুঝাইতে লাগিল। হিব্রু আলেফ্ (āleph) অর্থ বৃষ, ফিনিশীয় বর্ণমালার মাধ্যমে আদ্যধ্বনির প্রতীক চিহ্নের রূপান্তরে গ্রীক বর্ণমালার alpha (আলফা বর্ণ)। এই আদ্যধ্বনি নির্দেশের ফলে 'অক্ষরলিপি'র (সিলেবিক্ স্ক্রিপ্ট) এবং আধুনিক 'বর্ণলিপি'র (অ্যালফাবেটিক্ স্ক্রিপ্ট্) উদ্ভব। চিত্রলিপির নিদর্শন উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের লিপিতে। চিত্রলিপি ও ভাবলিপির নিদর্শন মেক্সিকোর আস্‌তেক এবং ইউকাটন ও গুয়াতেমালার মায়া লিপিতে। শব্দলিপির নিদর্শন প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদের হাইঅ্যারোগ্লিফিক্ লিপিতে, প্রাচীন চীনীয় লিপিতে। চিত্রলিপি, ভাবলিপি, শব্দলিপি চীনদেশের লিপিতে ক্রমবিকশিত। চীন, জাপান ও কোরিয়া তিন প্রতিবেশী দেশে তিনটি পৃথক্ লিপি-পদ্ধতি—চীনে ভাবলিপি, জাপানে অথারলিপি, কোরিয়ায় সংস্কৃত বর্ণমালা হইতে গৃহীত বর্ণলিপি।

খ্রীষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দের পূর্বে মেসোপোটেমিয়ার দক্ষিণাংশে সুমেরীয় জাতির লিপি এখনও পর্যন্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন। এই লিপি বাণমুখ, কীলকাকৃতি। সুমেরীয়দের নিকট হইতে ব্যাবিলনিয়েরা বাণমুখলিপি গ্রহণ করে। সুমেরীয় প্রভাবে আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরীয় লিপির উদ্ভব। মিশরীয় লিপির প্রভাব প্রাচীন ঈজিয়ানদের মধ্যে পড়ে এবং অনুমান ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীটদ্বীপে মিনোআন লিপির উদ্ভব। ইহার কিছুকাল পরে আনাতোলিয়ায় হিত্তীসাম্রাজ্যে হিত্তী হাইঅ্যারোগ্লিফিক্ লিপির উদ্ভব, পরে হিত্তী বাণমুখ লিপির বিকাশ। চীনদেশে চীনীয়, পশ্চিম ইরানে শুশা-অঞ্চলে প্রত্ন-এলামীয় (প্রোটো-এলামাইট), সিন্ধু-অঞ্চলে প্রত্ন-ভারতীয় (প্রোটো-ইন্ডিক) লিপির উদ্ভব ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘটে।

পৃথিবীর ৭টি প্রাচীন লিপি সুমেরীয়, মিশরীয়, ক্রীটদ্বীপীয়, হিত্তী, চীনীয়, প্রত্ন-এলামীয় ও প্রত্ন-ভারতীয়র মধ্যে প্রথম ৫টির পাঠোদ্ধার হইয়াছে, শেষের ২টির পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রত্ন-ভারতীয় লিপিই অখন্ড ভারতে প্রাপ্ত প্রাচীনতম লিপির নিদর্শন।

৪টি সুপ্রাচীন লিপি-পদ্ধতি হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্তমানে ব্যবহৃত লিপির বিবর্তন ঘটিয়াছে : ১. মেসোপোটেমিয়ায় সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় বাণমুখ লিপি, ২. মিশরীয় পুরোহিতদের প্রাচীন লিপিচিত্র ও তাহা হইতে উদ্ভূত শিষ্টজনের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্র (ডিমোটিক্ রাইটিং), ৩. প্রত্ন-ভারতীয় লিপি, ৪. চীনীয় লিপি।

মিশরের সংক্ষিপ্ত লিপিচিত্রে ২৪টি (মতান্তরে২৫) প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি চিত্রিত। ফিনিশীয় বণিকগণ এই ২৪/২৫টি ধ্বনিচিত্ররূপ গ্রহণ ও রূপান্তর করে। ফিনিশীয়দের নিকট হইতে গ্রীকরা এই বর্ণমালা গ্রহণ করে, তাহা হইতে বর্তমান গ্রীক ও রোমক বর্ণমালার উদ্ভব। হিব্রু, আরবী, আরামীয় প্রভৃতি সেমীয় (সেমিটিক) বর্ণমালাও মিশরীয় সংক্ষিপ্ত লিপি হইতে উদ্ভূত। সেমীয় বর্ণমালা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিতে হয়। চীনীয় লিপিচিত্র হইতে চীন ও জাপানের লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন।

মহেঞ্জো-দড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীলমোহরে উৎকীর্ণ প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় পরবর্তী ভারতীয় লিপির সহিত তাহার যোগসূত্র নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রত্ন-ভারতীয় লিপির পর খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের উৎকীর্ণ গিরি অনুশাসনে প্রাচীন ভারতীয় লিপির দুইটি পদ্ধতি পাওয়া যাইতেছে—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মীলিপি। খরোষ্ঠী সেমীয় (আরামীয়) লিপি হইতে উদ্ভূত বাণমুখ লিপি, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে খরোষ্ঠী ভারত হইতে চীনীয় তুর্কীস্তান পর্যন্ত প্রসৃত হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। দেড় হাজার বৎসর পূর্বেই খরোষ্ঠী লিপি ভারতে লুপ্ত, ব্রাহ্মী সর্বভারতীয় লিপি হয়। ব্রাহ্মী বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত। অশোকের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ব্রাহ্মী উদ্ভূত ও প্রতিষ্ঠিত ধরা যায়। ব্রাহ্মী ভারতবর্ষের বাহিরে কোনও লিপি হইতে উদ্ভূত অথবা সিন্ধুসভ্যতার প্রত্ন-

ভারতীয় লিপিচিত্র হইতে বিবর্তিত সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

ব্যুলার-এর মতে ব্রাহ্মী সেমীয় লিপি। যুক্তিসহ প্রমাণের অভাবে এই মত গ্রাহ্য হয় নাই। প্রত্ন-ভারতীয় লিপির মহেঞ্জো-দড়ো-হরপ্পায় প্রাপ্ত শত শত মুদ্রালিপির বিকাশের ফল ব্রাহ্মীলিপি ইহাই আধুনিক মত। ব্রাহ্মী লিপি রূপান্তরিত হইয়া আধুনিক ভারতীয় লিপিমালায় এবং ভোট, বর্মী, যবদ্বীপী, সিয়ামী, কোরিয় প্রভৃতি লিপিতে পরিণত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে ব্রাহ্মী-লিপি ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া রূপান্তরিত হইয়া স্থান-ভেদে নানারূপ গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশের মোন্ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ম্রন্মা বা বর্মী লিপি, কম্বোজের কম্বোজী ও তজ্জাত দৈ বা থাই বা সিয়ামী লিপি, ইন্দোনেশিয়ার যবদ্বীপীয় ও অন্যান্য লিপি, প্রাচীন চম্পার লিপি, ভোট বা তিব্বতী লিপি, মধ্য এশিয়ার খোটানের লিপি, কুচার-কুচী (তুষার বা তোখারীয়) লিপি, কোরিয়ার লিপি ইত্যাদি ব্রাহ্মীলিপির রূপান্তর। ভারতীয় ধর্মপ্রচারক ও বণিকদের প্রভাবে ব্রাহ্মীলিপির এই প্রসার।

উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপির স্বতন্ত্র ধারার বিবর্তন ঘটিয়াছে। উত্তর ভারতে খ্রীষ্টীয় প্রথম, দ্বিতীয় শতকে কুষাণ রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মীলিপির পরিবর্তন ঘটে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাহ্মী উত্তর ও পূর্ব ভারতে অঞ্চল-ভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করেঃ ১. 'শারদা' (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাব অঞ্চলে), ২. 'নাগর' (দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাত-রাজপুতানা-মালবে ও মধ্য-দেশে), ৩. 'কুটিল' (পূর্বভারতে)। গুজরাতের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তর ভারতে নাগরীর প্রসার। নাগর হইতে পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাতী, কায়থী লিপির উৎপত্তি; শারদা হইতে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের গুরুমুখী; এবং কুটিল হইতে বাংলা, মৈথিল, অসমীয়া, ওড়িয়া ও নেপালী লিপির উদ্ভব। প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলা ও দেবনাগরী লিপি নিজস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হইয়া বট্টেঝুত্তু ও পল্লব লিপির মধ্য দিয়া আধুনিক তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, মালয়ালম, গ্রন্থ প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ অর্থাৎ ধ্বনির প্রতীক চিহ্ন-গুলির সমষ্টি 'বর্ণমালা' (অ্যাল্‌ফাবেট)। গ্রীকবর্ণ-মালার প্রথম বর্ণ Alpha ও দ্বিতীয় বর্ণ Beta-র সমবায়ে গ্রীক alphabetos, লাতিন alphabetum ও ইংরেজী alphabet। কোনও ভাষার বর্ণমালাই নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় সমস্ত ধ্বনিকে প্রকাশ করিতে পারে না। একই বর্ণচিহ্নের দ্বারা একাধিক ধ্বনি নির্দেশিত হয়, যথা বাংলার অ-বর্ণের দুইটি ধ্বনি—অনন্ত, অতুল (ওতুল); ইংরেজীতে a ৬টি স্বরধ্বনির প্রতীক—তু° father, man, have, spade, water, was; আবার একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ ব্যবহৃত, যথা বাংলায় জ-য, শ-ষ-স। কালক্রমে ভাষায় বহু ধ্বনি লুপ্ত হইলেও বর্ণমালায় লুপ্ত ধ্বনির বর্ণ সুচিরাগত প্রথায় রক্ষিত—বাংলা বর্ণমালায় ঋ, ৯, য, ব, ণ।

বিভিন্ন ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা বিভিন্ন। মিশরীয় বর্ণমালায় ২৪ (২৫) টি বর্ণ, হিব্রুতে ২২, গ্রীকে ২৫ (৫টি স্বর, ২০টি ব্যঞ্জন), রোমকে ২৬টি। ইংরেজীতে ২৬, ফরাসীতে ২৩, লাতিনে ২২, ডাচে ২৬, স্পানিশে ২৭, ইতালিয়ানে ২০, রাশিয়ানে ৪৮, সংস্কৃতে ৫০টি বর্ণ। আরবীতে ২৮, পারসীকে ৩১, তুর্কীতে ৩৩, বর্মীতে ১৯টি বর্ণ। K'anghsi Dictionaryতে (১৭১৬ খ্রী) চীনীয় বর্ণমালা ৪০৫৪৫; পরবর্তীকালে সংক্ষিপ্ত হইয়া ১০০০০। পিকিংয়ের উপভাষায় ৪২০০ শব্দের জন্য ৪২০টি প্রতীকলিপি, অর্থাৎ গড়ে একটি প্রতীকচিহ্নে ১০টি শব্দ।

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা সর্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক, পুরাপুরি ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত। সংস্কৃতে মূল ধ্বনির সংখ্যা ৫০, বর্ণমালায় বর্ণসংখ্যাও ৫০, প্রতিটি ধ্বনির চিহ্ন সুনির্দিষ্ট। গ্রীক, রোমক বর্ণমালার মত সংস্কৃতে স্বর, ব্যঞ্জন এলোমেলোভাবে সজ্জিত নয়। উচ্চারণস্থানও হ্রস্ব-দীর্ঘ অনুসারে ১৪টি স্বরবর্ণ বিন্যস্ত, সর্বাপেক্ষা লঘুস্বর অ প্রথমে, সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ যৌগিকস্বর ঔ সর্বশেষে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ক্রমবিভক্ত ও বর্গীকৃত, পাঁচটি বর্গের প্রতি বর্গে যথাক্রমে অঘোষ অল্পপ্রাণ, অঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষ-বৎ অল্পপ্রাণ, ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ও নাসিক্য বর্ণ; চারিটি অর্ধব্যঞ্জন অন্তঃস্থবর্ণ; ৪টি উষ্মবর্ণ; অনুস্বার, বিসর্গ ও অনুনাসিকাবিন্দু। এইরূপ ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত বর্ণমালা আর কোনও ভাষায় নাই।

মদনমোহন কুমার

লীলাবতী অসামান্য ধীমতী নারী। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হয়। তদানীন্তন ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য একমাত্র কন্যা লীলাবতীর ভাগ্যগণনায় জানিয়াছিলেন যে তাঁহার অকাল বৈধব্য ঘটিবে। সেইজন্য সতর্কতার সহিত তিনি বিবাহের শুভক্ষণ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু লীলাবতীর অসাবধানতায় কালনির্ণয়ে বিঘ্ন ঘটিল। নিয়তির অনিবার্য বিধানে, বিবাহের অব্যবহিত পরেই লীলাবতী পতিহীনা হইলেন। ভাস্করাচার্য কন্যাকে স্বগৃহে রাখিয়া

পরম যত্নে বিদ্যাশিক্ষা দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' নামক যে বিখ্যাত গ্রন্থ ভাস্করাচার্য রচনা করেন, তাহার তৃতীয় খন্ড লীলাবতীর দ্বারা রচিত। ভাস্করাচার্য এই গ্রন্থের নাম দিলেন 'লীলাবতী'। পাটীগণিত ও বীজগণিতের এই সূত্রগুলি অদ্যাবধি লীলাবতীর নামেই প্রচলিত।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

লীলাশুক 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' রচয়িতা কবি বিল্বমঙ্গল। অপর নাম কৃষ্ণলীলা শুক, সংক্ষেপে লীলাশুক। পিতা দামোদর, মাতা নীবী, আচার্য ঈশানদেব, দীক্ষাগুরু সোমগিরি। পূর্বনাম শিহ্লন মিশ্র, নিবাস দক্ষিণ-ভারতের কৃষ্ণবেণ্বা নদীর পশ্চিমতীরে। নদীর অপর তীরবাসিনী রক্ষিতা চিন্তামণির আকর্ষণে পিতৃশ্রাদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রিতে শবদেহ-অবলম্বনে উত্তাল নদী অতিক্রম করিয়া চিন্তামণির গৃহদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দেওয়ালে লম্বমান রজ্জু অবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার কক্ষদ্বারে মূর্ছিত হন। জ্ঞানলাভান্তে চিন্তামণির উক্তিতে বিবেকোদয় হয়, গৃহত্যাগ করিয়া সোমগিরির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুদত্ত নাম বিল্বমঙ্গল।

কৃষ্ণভক্তির আকুলতায় স্বতঃস্ফূর্ত শ্রীকৃষ্ণমহিমাস্তব কীর্তন করিতে করিতে বৃন্দাবনে গমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত অতি মধুর উজ্জ্বল-রসাশ্রিত কাব্য। শ্রীচৈতন্যদেব দক্ষিণভারত পরিভ্রমণকালে কৃষ্ণ-বেণ্বা নদীতীরে বৈষ্ণব-ভক্তগণের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রবণ করিয়া গ্রন্থখানির ১১২টি শ্লোক নকল করিয়া আনেন। নীলাচলে বিরহোন্মত্ত মহাপ্রভু যে-সকল রচনা আস্বাদন করিতেন 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' সেগুলির অন্যতম।

হিবুন্টেরনিৎস ও কীথের মতে লীলাশুক খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর কবি ; গণপতি শাস্ত্রীর মতে খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর।

মদনমোহন কুমার

লুথার, মার্টিন (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রী) প্রটেস্টান্ট মতবাদের প্রবর্তক জার্মান ধর্মসংস্কারক। পিতা হান্স্ তাম্রখনির শ্রমিক ছিলেন। আঠারো বৎসর বয়সে এরফার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্নাতক ও পর বৎসর 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত হন। পিতার ইচ্ছা ছিল পুত্র আইনজীবী হয় কিন্তু লুথারের ধর্ম-প্রবণতা তাঁহাকে অগাস্টাইন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত করিল। হঠাৎ বাইবেল পাঠকালে সত্যের আলোক দেখিতে পান এবং অনুধাবন করেন, ঈশ্বরের করুণায় স্থির বিশ্বাসই মুক্তির একমাত্র উপায়। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে উইটেন্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে রোমে গিয়া ধর্মযাজকদের বিলাস-ব্যসন দেখিয়া চার্চ-সম্পর্কে তাঁহার মোহভঙ্গ হয়। পোপ দশম লিও অর্থের প্রয়োজনে এক ডোমিনিকান সন্ন্যাসীকে ইন্ডাল্জেন্স বা মুক্তিপত্র বিক্রয় করিতে পাঠাইলে লুথার তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, মুক্তিপত্র ক্রয় করিলে পাপমুক্তি হয় ইহা ভ্রান্ত ধারণা ; ইহার দ্বারা প্রকারান্তরে পাপকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ইন্ডাল্জেন্সের বিরুদ্ধে যুক্তিগুলি '৯৫ নিবন্ধ' নামক এক ইস্তাহারে সন্নিবিষ্ট করিয়া (৩১ অক্টোবর, ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ) উইটেন্বার্গ চার্চের দরজায় টাঙ্গাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই রেফর্মেশন আন্দোলনের সূত্রপাত। পোপ রুষ্ট হইয়া লুথারকে রোমে ডাকিয়া পাঠান। স্যাক্সনের ইলেক্টরের মধ্যস্থতায় লুথার সে যাত্রায় বাঁচিয়া যান। ইন্ডাল্জেন্স-এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে পোপের প্রতিভূদের সহিত তাঁহার বহু তর্ক হয়, কিন্তু কেহই তাঁহাকে স্বমত হইতে বিচ্যুত করিতে পারেন নাই। নিজ ধর্মমত ব্যাখ্যার নিমিত্ত ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে লুথার যে তিনটি রচনা লিপিবদ্ধ করেন (রেফর্মেশন ট্রিটিজেস্) সেগুলির মূল বক্তব্য ছিল, পোপই বাইবেলের একমাত্র ব্যাখ্যাতা নন। যেকোনও ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান, নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী, ধর্মযাজকের মধ্যস্থতা ছাড়াই ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে। পোপ আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে চার্চ হইতে বহিষ্কৃত করেন। অসংখ্য শিষ্য ও অনুগামীদের সম্মুখে সাড়ম্বরে লুথার এই দণ্ডাদেশ অগ্নিদগ্ধ করেন। তখন তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী সাব্যস্ত করা হয়। তিনি এই সময়ে জার্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। ইতি-মধ্যে জার্মানিতে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দিলে (১৫২৫ খ্রী) তিনি ইহার নিন্দা করেন এবং বিদ্রোহদমনে রাজপুরুষ-দের সহায়তা করেন। কৃষকবিদ্রোহের পরবর্তী ২০ বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে দেখা যায়, জার্মানদের রাজন্য-বর্গ প্রধানতঃ প্রটেস্টান্ট ও ক্যাথলিক এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হইতে উদ্যত। গৃহযুদ্ধের প্রারম্ভেই (১৫৪৫ খ্রী) তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে লুথার সাদাসিধা নিরহংকার মানুষ ছিলেন। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল। কর্ম-জীবনের নানা সমস্যায় ব্যাপৃত থাকিলেও গার্হস্থ্য জীবনকে কোনদিন অবহেলা করেন নাই।

সুবোধকুমার মজুমদার

লুম্বিনী, লুম্বিনিদাব, রুম্মিনদেঈ (৮৫°১১′ উ. ও ২৫°৫৮′ পূ.) গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে পাদেরিয়া গ্রামের ১.৬ কি. মি. দূরে

নেপালতরাইয়ে, শাক্যরাজধানী কপিলাবস্তুর ১৬ কি. মি. পূর্বে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার পিপরাওয়ার প্রায় ১৬ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে নেপালতরাইয়ের তিলৌরাকোট নামক স্থানে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ কপিলাবস্তুর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া অনুমিত।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে সিদ্ধার্থ লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের বিংশতিতম বর্ষে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দ) সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের জন্মস্থানে তীর্থযাত্রায় আসেন ও একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মী অক্ষরে শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন ও প্রস্তরবেষ্টনীদ্বারা বুদ্ধের পবিত্র জন্মস্থান ঘিরিয়া দেন এবং এই স্থানের অধিবাসীদের সকল প্রকার ধর্মীয় কর (বলি) হইতে অব্যাহতি দেন ও ভূমিরাজস্ব কমাইয়া দেন।

হিউএন্-ৎসাঙ্ রুম্মিনিদেঈ স্তম্ভটি পরিদর্শনে আসিয়া বজ্রাঘাতে উহার উপরিভাগ ভগ্ন হইয়াছে শুনিয়াছিলেন। স্তম্ভটির বর্তমান উচ্চতা ২১ ফিট (প্রায় সাড়ে ছয় মিটার)।

মদনমোহন কুমার

লুসেই, লুসাই ভোট-চীনায় গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ভোট-বর্মী উপশাখার কুকি-চীন গুচ্ছের অন্তর্গত ভাষা। এভাষা মেইথেই (বা মণিপুরী) ভাষার সহোদরা স্থানীয়। আসাম-বর্মার সীমান্ত প্রদেশে পার্বত্য অঞ্চলে পূর্বতন আসাম রাজ্যের লুসাই পর্বত জেলায়, অধুনা মিজোরাম রাজ্যে, অধিবাসীদের কথিত ভাষা। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের গণনা অনুসারে লুসেই-ভাষীর সংখ্যা আনুমানিক দেড় লক্ষ।

সুকুমার সেন

লেজার শব্দটি কয়েকটি ইংরেজী শব্দের (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) আদ্যাক্ষর লইয়া গঠিত। এই ইংরেজী শব্দ কয়টির ভাবার্থ 'উদ্দীপ্ত বিকিরণের সাহায্যে আলোর পরিবর্ধনা'। লেজার-রশ্মি আধুনিক বিজ্ঞানের একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাল্‌ব্ অসিলেটার (ভ্যাকুয়াম টিউব অসিলেটার)-এর সাহায্যে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ সৃষ্টির নীতি আবিষ্কৃত হয় ও ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মেজার-রশ্মি' আবিষ্কৃত হয় ('মেজার' দ্র)। কোয়াণ্টাম-মতবাদ অনুসারে বিকিরণ ফোটন নামে কণাদ্বারা গঠিত এবং ফোটনের শক্তি উহার কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক। দুইটি শক্তিস্তরে অবস্থিত এক পরমাণু-সমন্বয়ের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কবিশিষ্ট একটি ফোটন পাঠানো হইলে নীচের শক্তিস্তরে বিদ্যমান কোনও একটি পরমাণুকে যদি ফোটন কণাটি আসিয়া আঘাত করে এবং এই সংঘাত-প্রক্রিয়ায় যদি পরমাণুটি ফোটন হইতে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তি প্রাপ্ত হয় তবে ঐ পরমাণুটি উপরের শক্তিস্তরে উন্নীত হইতে পারে। কিন্তু যদি পরমাণুটি উপরের শক্তিস্তরে অবস্থিত থাকে তবে ফোটন-কণাটি উহাকে আঘাত করিলে পরমাণুটি নিম্নতর শক্তিস্তরে নামিয়া আসিবে এবং তৎসহ একটি নূতন ফোটন অর্থাৎ একটি নূতন বিকিরণ সৃষ্টি করিবে। ইহাকে উদ্দীপ্ত বিকিরণ (স্টিম্যুলেটেড এমিশন অভ্ রেডিয়েশন) বলে। পক্ষান্তরে পরমাণুগুলির নিম্নতম শক্তিস্তরে থাকিবার স্বাভাবিক প্রবণতা হইতেই স্বতোবিকিরণ (স্পণ্টেনিয়াস এমিশন অভ্ রেডিয়েশন)-এর সৃষ্টি। স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্নতম স্তরে সর্বাপেক্ষা বেশি পরমাণু নিম্নতর হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। কিন্তু যদি কোনও উপায়ে উচ্চতর শক্তিস্তরের বহুসংখ্যক পরমাণুকে একত্রীভূত করিয়া তাহার মধ্য দিয়া ফোটন-বর্ষণ পাঠানো হয় তবে অনেক বেশি সংখ্যক পরমাণু নিম্নতর স্তরে আসিবে এবং উদ্দীপ্ত বিকিরণের সৃষ্টি করিবে। ইহাই মেজার ও লেজার-রশ্মি সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। সুতরাং মেজার ও লেজার-রশ্মি সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে উচ্চতর শক্তিস্তরবিশিষ্ট অণু ও পরমাণু সৃষ্টি করিতে হইবে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিউগেস গবেষণাগারে মেইমান প্রথম লেজার-রশ্মি উৎপন্ন করেন। প্রথম আবিষ্কারের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারে হিলিয়াম ও নিয়নগ্যাস মিশ্রণের সাহায্যে লেজার উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস লেজারে অবলোহিত (ইনফ্রা রেড) বিকিরণও থাকে। ইহার পর নানা ধরনের গ্যাস লেজার উৎসের উদ্ভব হইয়াছে। উহাদের দ্বারা অতি বেগুনী (আলট্রা ভায়োলেট) রশ্মি হইতে অবলোহিত রশ্মি পর্যন্ত নানা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের লেজার-রশ্মি পাওয়া যায়।

লেজার-রশ্মির উজ্জ্বলতা পূর্বেকার উজ্জ্বলতম আলো অপেক্ষাও বহু গুণ বেশি। ইহা ভিন্ন লেজার-রশ্মি পূর্ণ সমধর্মী (কোহেরেণ্ট) আলো। লেজার নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মধ্যে বহুদূরবর্তী স্থানে বার্তা প্রেরণ, 'মাইক্রো ওয়েল্ডিং', চোখের শল্যচিকিৎসা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে লেজার-উৎসের সাহায্যে আরও বিস্ময়কর আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে।

অমলকান্তি ঘোষ

লেন্‌স্‌ দুইটি গোলীয় তল অথবা একটি গোলীয় তল এবং সমতল পৃষ্ঠদ্বারা সীমাবদ্ধ স্বচ্ছ আলোক-মাধ্যমকে লেন্‌স্‌ বলে। প্রতিবিম্ব গঠন করিবার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রে লেন্‌স্‌ ব্যবহৃত হয়। কোনও বিন্দু হইতে আগত অপসারী আলোকরশ্মিগুচ্ছ লেন্‌সের উপর আপতিত হইয়া সৎ বা অসৎ প্রতিবিম্ব গঠন করে। সাধারণতঃ কাচ দ্বারাই লেন্‌স্‌ প্রস্তুত করা হয়। তবে বিশেষ উদ্দেশ্যে কখনও কখনও কোয়ার্ট্‌স্‌ রক সলট্‌ বা ফ্লোরস্পার প্রভৃতি দ্বারাও লেন্‌স্‌ নির্মিত হয়। সর্বপ্রথম মিসনারের বিবরণ (১২৬০-৮০ খ্রী) হইতে লেন্‌স্‌ ব্যবহারের কথা জানা যায়। ইহাতে আছে যে, ঐ সময় বৃদ্ধেরা চোখের ত্রুটি দূর করিতে চশমা ব্যবহার করিত। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ব্যাপ্‌টিস্‌টা পোর্টা রচিত 'ম্যাজিয়া ন্যাচারেলিস্‌' পুস্তকে সর্বপ্রথম লেন্‌স্‌ তৈয়ারির পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। অধুনা অল্প শ্রমে ও সময়ে উৎকৃষ্ট লেন্‌স্‌ প্রস্তুত সম্ভব। ১৯৩৫-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্লাস্টিকনির্মিত লেন্‌স্‌ শিল্পক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু দুইটি কারণে প্লাস্টিকের ব্যবহার বিশেষ আপত্তিকর। প্রথমতঃ অপবৃদ্ধিতে প্লাস্টিক লেন্‌সের আকার-বিকৃতি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ মোল্ডিং ইত্যাদি প্রক্রিয়া-কালে প্লাস্টিকের প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে।

লেন্‌স্‌ প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ অভিসারী লেন্‌স্‌ ও অপসারী লেন্‌স্‌। অভিসারী লেন্‌সের বেধ প্রান্ত হইতে কেন্দ্রে বেশি। এইরূপ লেন্‌স্‌কে উত্তল লেন্‌স্‌ও বলা হয়। অপসারী লেন্‌সের ক্ষেত্রে প্রান্তের বেধ কেন্দ্রের বেধ হইতে বেশি। এইরূপ লেন্‌সের অপর নাম অবতল লেন্‌স্‌।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, গোলীয় তলবিশিষ্ট লেন্‌স্‌ ছাড়া বেলনাকার (সিলিণ্ড্রিক্যাল) লেন্‌স্‌ও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ লেন্‌সের একটি অথবা উভয়পৃষ্ঠই স্তম্ভকের অংশ। আরবদেশীয় বিজ্ঞানী অ্যালহাজেন সর্বপ্রথম লেন্‌স্‌ কিভাবে কাজ করে তাহা বলেন (খ্রী ১১শ শতাব্দী)। পরে রোজার বেকন এই ব্যাখ্যায় উন্নতি সাধন করেন (খ্রী ১৩শ শতাব্দী)। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গাউস লেন্‌সের প্রসিদ্ধ সমীকরণটি উদ্ভাবন করেন। উক্ত সমীকরণটি গঠন করিবার সময় ধরা হয় যে, সকল আলোকরশ্মিই লেন্‌সের অক্ষের সহিত ক্ষুদ্র কোণ উৎপন্ন করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাতে ত্রুটি দেখা যায়। এই ত্রুটিকে অপেরন (অ্যাবারেশন্‌) বলা হয়। অপেরন নানা প্রকার হইতে পারে। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে দুই বা ততোধিক লেন্‌সের সমন্বয়ে যৌগিক লেন্‌স্‌ সৃষ্টি করা হয়।

অমলকান্তি ঘোষ

লেনিন, ভ্লাদিমির ইলীচ উলিয়ানভ (১৮৭০-১৯২৪ খ্রী) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত রুশ-বিপ্লবের প্রধান নায়ক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। জন্ম ভল্‌গা-তীরস্থ সিম্বির্‌স্ক শহরে, ২২ এপ্রিল। পিতা ইলিয়া নিকোলায়েভিচ ও মাতা মারিয়া আলেকজাণ্ড্রোভ্‌নার ছয় সন্তানের মধ্যে তিনি তৃতীয়।

সিম্বির্‌স্ক স্কুল ও কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভের পর তিনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণীতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

রুশ সম্রাটকে হত্যা করার চেষ্টার অপরাধে জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুদণ্ড ছাত্রাবস্থায় লেনিনের মনে গভীর রেখাপাত করে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ছাত্র-আন্দোলনে যোগদানের জন্য তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হন। নির্বাসিত রুশবিপ্লবীরা বিদেশে যে শ্রমিক মুক্তি-সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (১৮৮৩ খ্রী) তাহার নেতা প্লেখানভের এবং মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল-সের রচনার সঙ্গে ঐ সময়ে তাঁহার প্রথম পরিচয় এবং সেই সূত্রে মার্ক্‌সীয় পাঠচক্রে যোগদান ও গভীরভাবে মার্ক্‌সবাদ চর্চা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন বিদেশ যাত্রা করেন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর সেণ্টপিটার্স্‌বুর্গের মার্ক্‌সীয় চক্রগুলিকে একটি 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘে' ঐক্যবদ্ধ করেন এবং শ্রমিকদের নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি গঠনের সূচনা করেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে তিনি গ্রেপ্তার ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ঐখানে বিপ্লবী সহকর্মিণী ক্রুপস্কায়া-র সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাসন হইতে ফিরিয়া তিনি বিদেশযাত্রা করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আন্দোলনের মূল-ভাবধারা প্রচার ও সংগঠনের উদ্দেশ্যে তাঁহার উদ্যোগে বিদেশ হইতে 'ইস্‌ক্রা' (স্ফুলিঙ্গ) পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। অতঃপর লেনিন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দেন (১৯০৩ খ্রী) এবং অধিকাংশ প্রতিনিধির নেতৃত্ব পান ('রুশবিপ্লব' দ্র)। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে দেশে ফিরিয়া তিনি গোপনে বিপ্লব পরিচালনা করিতে থাকেন। ঐ সময় ওডেসা বন্দরে 'পোটেমকিন' যুদ্ধজাহাজে বিদ্রোহ হইয়াছে খবর শুনিয়াই তিনি বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে শ্রমিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'সোভিয়েত' নামক সংস্থার উদ্ভব হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বস্তুবাদ ও 'প্রায়োগিক-সমালোচনা' নামে দর্শনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার আন্দোলনে আবার জোয়ারের লক্ষণ দেখা দিলে তিনি পার্টিকে

আরও শক্তিশালী করার জন্য পোল্যান্ডের ক্রাকাও শহরে বাস করিতে থাকেন। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিতে জাতীয়তার সমস্যা বিষয়ে ঐ সময়ে তিনি বহু রচনা প্রকাশ করেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লেনিন গ্রেপ্তার হন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মুক্তি পাইয়া সুইজারল্যান্ড যান। এই সময় রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে ঘোষণা করেন যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার যুদ্ধ—ইহাতে শ্রমজীবী মানুষের কোনও স্বার্থ নাই। তিনি আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিশিষ্ট লক্ষণাদি বিশ্লেষণ করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত স্তর' গ্রন্থের রচনা শেষ করেন। অতঃপর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের প্রস্তাব অনুসারে পার্টির নাম হয় কমিউনিস্ট্ পার্টি এবং এই বৎসরেই রুশবিপ্লব নূতন করিয়া দেখা দিলে তাঁহার নেতৃত্বে বলশেভিক দল ক্ষমতা অধিকার করে। অতঃপর সোভিয়েত সরকারের প্রধান নায়ক হিসাবে তিনি সমস্ত প্রতিবিপ্লবী চেষ্টা ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তাঁহার উদ্যোগে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ মার্চ জার্মানির সহিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং বিভিন্ন দেশগুলির সহিত শান্তিপূর্ণ অবস্থানের নীতি ঘোষিত হয়। তাঁহার নির্দেশে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'নূতন অর্থনৈতিক নীতি' প্রবর্তিত হয় ও সারা দেশে সমস্ত দিকে অগ্রগতির জন্য ব্যাপক চেষ্টা শুরু হয়। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তাঁহার মৃত্যু হয়।

চিন্মোহন সেহানবীশ

লেবু কাগজি বা পাতি লেবুর রস টক, বাতাবি লেবু টক মিষ্টি মিশানো, মোসাম্বি বা সরবতি লেবু টক নয় তবে খুব মিষ্টিও নয় এবং কমলালেবু সাধারণতঃ মিষ্টি। সাধারণতঃ পাতি ও কাগজি লেবুর চারা বসানো হয়, বীজও বসানো চলে। বাতাবি লেবুর বীজ, সরবতি এবং কমলালেবুর কলম বসানো হয়। কোনও লেবুই জল-জমা সহ্য করিতে পারে না। কাগজি, পাতি বা কমলা-লেবু ১০ হাত, বাতাবি ১৮ হাত অন্তর বসানো উচিত। আষাঢ়-শ্রাবণে চারা বসানো চলে এবং প্রতি বৎসর অপ্রয়োজনীয় ডালপালা পরিষ্কার করা দরকার। গ্রীষ্ম-কালে সেচ দিলে ভাল হয়। গাছপ্রতি প্রথমে এক ঝুড়ি এবং ফলন্ত অবস্থায় দুই ঝুড়ি জৈবসার সকলপ্রকার লেবু গাছেই দিতে হয়। ইহা ছাড়া রাসায়নিক সার ফলন্ত গাছে মাটির তারতম্য অনুযায়ী কম বেশি করিয়া দেওয়া উচিত। কাগজি বা পাতিলেবু বাঙ্গালার তথা ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। কমলালেবু নাগপুরে, কুর্গে, আসামের খাসিয়া, লুসাই পাহাড়, দার্জিলিং এবং সিকিমে জন্মায়। পুরুলিয়ায় নাগপুরির কমলা জন্মে। যে মাটিতে চুনের ভাগ বেশি তাহাই লেবু-চাষের উপযোগী। অবশ্য জমির ক্ষারত্ব বাড়াইবার জন্য চুন প্রয়োগ করিয়া সুফল পাওয়া যায়।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

লেবেদেফ্, হেরাসিম (১৭৪৯-১৮১৮ খ্রী) ইংরেজী বানানে ইঁহার প্রথম নাম Gerasim ; কিন্তু রুশ ভাষায় G-এর উচ্চারণ H বা 'হ'-এর মতো। বাংলাদেশে প্রথম পাশ্চাত্য-রীতি-অনুসারী নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে এই রুশ ভদ্রলোকের নাম জড়িত ('রঙ্গমঞ্চ' দ্র)। ইনি ছিলেন একাধারে সংগীত-শিল্পী, চিত্রশিল্পী, অভিনেতা, অনু-বাদক, জাতি-বিজ্ঞানী ও প্রাচ্যভাষাবিদ্। সেন্ট-পিটার্স্-বার্গ শহরে এক সংগীত-চক্রের তিনি গায়ক ও বেহালা-বাদক।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ আগস্ট তিনি মাদ্রাজে অবতরণ করেন ও প্রথম দুই বৎসর আপন শিল্পপ্রতিভার সাহায্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বেহালায় ভারতীয় সুরের প্রয়োগ ঘটান। সম্ভবতঃ লেবে-দেফ্ই ভারতীয় ও ইওরোপীয় সংগীতের প্রথম সেতুবন্ধ রচনা করেন। কলিকাতায় তিনি গোলোকনাথ দাসের সহায়তায় বাংলা ও হিন্দী ভাষা শিক্ষায় ছয় বৎসর ব্যয় করেন। তাঁহার আর এক বন্ধু ভগৎ দাস তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় সাহায্য করেন। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যে থাকিবার কালে তিনি নিজের চেষ্টায় কয়েকটি দক্ষিণী-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি একটি হিন্দুস্তানী ভাষার ব্যাকরণও রচনা করেন। নিজের অর্থে ২৫নং ডোম তলার (বর্তমান এজরা স্ট্রীট) একটি বাড়িকে নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী থিয়েটার-হলে রূপান্তরিত করেন। এই নাট্যশালাতেই ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর তৎকর্তৃক বাংলায় অনূদিত 'দি ডিস্গাইজ' নাটক অভিনীত হয়। পর বৎসর (১৭৯৬ খ্রী) ২১ মার্চ এই নাটকটির পুনরভিনয় হয়। শেষপর্যন্ত ইংরেজদের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহার রঙ্গালয় নীলামে বিক্রয় হইয়া যায়। ইংরেজ-আদালতে তো তিনি কোনও সুবিচার পানই নাই, বরং তৎকালীন কলিকাতার গভর্নর জেনারেল কীড্ তাঁহাকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। আফ্রিকা ঘুরিয়া স্বদেশে ফিরিয়া তিনি সামান্য করণিকের কার্যে যোগ দেন এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অরুণ সান্যাল

লেসিং, গট্‌হল্‌ট এফ্রাইম (১৭২৯-৮১ খ্রী) জার্মান সমালোচক ও নাট্যকার; অষ্টাদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জগতে 'আলোক বিকিরণ'-এর অন্যতম নায়ক। নাট্যসমালোচনায় তিনি ফরাসী ক্লাসিক্যাল লেখকদের অনুকরণকারীদের তীব্র নিন্দা করেন ও শেক্‌স্‌পীয়রকে জার্মান নাট্যকারদের প্রকৃত আদর্শরূপে উপস্থাপিত করেন। তাঁহার সমালোচনা আরিস্তোতল-এর কাব্যতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ও তিনি একরকম প্রমাণই করেন যে, শেক্‌স্‌পীয়র আরিস্তোতল-এর নির্দেশ মানিয়াছেন। মূলঘটনা-সম্পর্কিত ঐক্যনীতি বা 'ইউনিটি অভ্‌ অ্যাক্‌শন' শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলিতে অনুসৃত হইয়াছে এবং 'ঘটনা-সম্পর্কিত ঐক্যনীতি প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের প্রথম বিধি'। তাঁহার লেখা 'লেওকুঅন্' (১৭৬৬ খ্রী) আধুনিক নন্দনতত্ত্বের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে, কাব্যের অস্তিত্ব কাল-ব্যাপী এবং চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতির অস্তিত্ব স্থানব্যাপী।

লেসিং-এর লেখা 'শ্রীমতী সারা স্যাম্‌প্‌সন্' (১৭৫৫ খ্রী), 'এমিলিয়া গালোট্টি' (১৭৭২ খ্রী) ও 'জ্ঞানী নেথান' (১৭৭৯ খ্রী) নাটকগুলির স্থান বিশ্বের নাট্যসাহিত্যে খুব উচ্চে নয়; কিন্তু এইগুলিই আধুনিক জার্মান নাটকের ভিত্তিভূমি। প্রগাঢ় পান্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির সহিত চারিত্রিক ঋজুতার সমন্বয় তাঁহার মধ্যে লক্ষণীয়। মানবমনের পূর্ণবিকাশে সত্য-সন্ধানী লেসিং-এর বিশ্বাস ছিল; এই দিক্‌ ও অন্যান্য বহুদিক্‌ হইতে তিনি ছিলেন গ্যেটের সার্থক পূর্বসূরী।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

লোকসংগীত, বাংলা লোকসাহিত্য, বাংলা দ্র

লোকসংস্কৃতি লোকসাহিত্য বাংলা দ্র

লোকসাহিত্য, বাংলা নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মৌখিক প্রচলিত সাহিত্যই লোকসাহিত্য নামে পরিচিত। ছড়া,, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী (মিথ), ইতিকথা (লেজেন্ড) ইত্যাদিই লোকসাহিত্যের বিষয়। ঘুমপাড়ানি ছড়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, খেলার ছড়া, কন্যা বিদায়ের ছড়া, অপ্রাকৃত-বিষয়ক ছড়া ইত্যাদি বাংলার নিরক্ষর সমাজের মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

ছড়ার পরেই গীতির কথা উল্লেখ করিতে হয়। ইহারও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। যেমনঃ আঞ্চলিক গীতি, ব্যবহারিক (ফাংশন্যাল) গীতি, আনুষ্ঠানিক (ক্যালেন্‌-ড্রিক) গীতি, প্রেম-গীতি, কর্ম-গীতি (ওয়ার্ক সঙ্‌), সাময়িক ঘটনামূলক গীতি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে প্রেম-গীতির সঙ্গে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলেই রাধা-কৃষ্ণের নাম এমনভাবে জড়িত যে, লোকে বলে 'কানু ছাড়া গীত নাই'। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যে-সকল অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব ব্যাপক নহে, যেমন উত্তরবঙ্গ, সেখানে লোকসংগীতে রাধাকৃষ্ণের নাম বিশেষ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

লোকসাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের নাম গীতিকা। ইহা কাহিনীমূলক। বাংলার উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল এই বিষয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। উত্তর বাংলার 'রাজা মানিকচন্দ্রের গান', পূর্ব মৈমনসিংহের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' ইহার নিদর্শন। লোককথাকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা। ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। এখনও পশ্চিম বাংলার কোনও কোনও অঞ্চলে বিবাহে ধাঁধা জিজ্ঞাসার প্রচলন আছে। পশ্চিম বাংলার নিম্নশ্রেণীর কোনও কোনও সমাজের বিবাহোপলক্ষে বরযাত্রীকে ধাঁধার জবাব দিয়া কন্যার গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাহাছাড়াও বুদ্ধির পরীক্ষা এবং কৌতুক উপভোগের জন্যও পল্লী অঞ্চলে এখনও ধাঁধার বিস্তৃত ব্যবহার আছে।

লোকসংগীতঃ পল্লীর সমাজজীবনে যে সংগীত মুখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখেই প্রচার লাভ করে তাহাই লোকসংগীত। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত পটুয়ার গান, ভাদু, টুসু, জাওয়া, ঝুমুর, সাখী, বাঁধনা; উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চট্‌কা, জাগ; মধ্যবঙ্গে আলকাপ, ছেঁচরা, রোলান, পাঁচালী; পূর্ববঙ্গে ভাটিয়ালি, ঘাটু ইত্যাদি। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যেই এগুলি সীমাবদ্ধ। তবে বিষয়ের দিক্‌ দিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহাদের মধ্যে একটি অখন্ডতা থাকে। যেমন, ঝুমুর পশ্চিম বাংলার, ভাওয়াইয়া উত্তর বাংলার এবং ঘাটু পূর্ব বাংলার বিশেষ আঞ্চলিক সুরে গীত হইলেও ইহাদের প্রত্যেকেরই বিষয়বস্তু প্রেম; সেইজন্য ইহাদের আবেদন সর্বজনীন। তবে সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য নহে। যেমন, গম্ভীরা গান মালদহ, আলকাপ গান মুর্শিদাবাদ ব্যতীত কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না।

বাংলার ব্যবহারিক সংগীতের মধ্যে মেয়েলী বিবাহের গান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই এগুলি প্রধানতঃ প্রচলিত। তবে পূর্ব বাংলা বিশেষতঃ পূর্বমৈমনসিংহ, উত্তর ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্ট জেলাই এই বিষয়ে সমৃদ্ধতম। উত্তর বাংলা এবং পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজেও মেয়েলী বিবাহ-সংগীত প্রচলিত আছে। কন্যাকে বিদায় দিবার সময়ে যে গান গাওয়া হয়, তাহা বাস্তবজীবনের অনুভূতিতে করুণ এবং মর্মস্পর্শী। ইহা দুই প্রকারঃ কন্যার

প্রতিনিধিরূপে পল্লীর নারীদের দ্বারা গীত এবং কন্যা-কর্তৃক গীত। প্রথম শ্রেণীর গান বাংলার সর্বত্রই প্রচলিত আছে, দ্বিতীয় শ্রেণীর গান প্রধানতঃ ঝাড়গ্রাম মহকুমার ওড়িশার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে বহুল প্রচলিত ; সেখানে এগুলিকে 'কাঁদনা গীত' বলে।

নানা পাল-পার্বণ উপলক্ষে যে গান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আনুষ্ঠানিক সংগীত বলে। যেমন, মনসা পূজার গান, পৌষপার্বণের গান, গাজনের গান ইত্যাদি। প্রেমসংগীতই বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক। প্রেমের বিষয়-বর্ণনার প্রধানতঃ তিনটি ধারা ঃ লৌকিক, পৌরাণিক ও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। ইহার আর একটি প্রধান ধারা বারমাস্যা। বারমাস্যার পরিবর্তে ছয়মাস্যা এবং অষ্ট-মাস্যাও হইতে পারে। প্রধানতঃ প্রেম-সংগীতের নায়ক কৃষ্ণ এবং নায়িকা রাধা, তবে ইঁহারা কোনও পুরাণ হইতে আসেন নাই, বাংলার সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে ইঁহাদের জন্ম। বাংলার মুসলমান সমাজেও যে প্রেম-সংগীত প্রচলিত আছে, রাধাকৃষ্ণ তাহারও নায়ক-নায়িকা। ইহা ছাড়া কর্ম-সংগীত বলিয়াও একটি শ্রেণী ধরা যায়। সারিগান বা নৌকা বাওয়ার সঙ্গে যে-গান গাওয়া হয়, তাহা ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। পূর্ব-বঙ্গে ও নিম্নবঙ্গে সারিগানের প্রচলন অধিক। কর্ম-সংগীত মাত্রই তালপ্রধান। সারিগানেরও বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম।

বাংলার লোকগীতির সুর প্রধান দুইটি ভাগে বিভক্তঃ ভাটিয়ালি ও সারি। যে সুর দীর্ঘ টানের মধ্য দিয়া একবার চড়ায় উঠিয়া পরমুহূর্তেই খাদে নামিয়া আসে তাহাই ভাটিয়ালি ; এবং যে সুরে দ্রুত কিংবা ধীর তাল ব্যবহৃত হয়, তাহাই সারিশ্রেণীর গান। নৃত্য-সম্বলিত গান মাত্রই সারিশ্রেণীর গান। ধর্মীয় সংগীতকে অনেকে লোকসংগীত বলিয়া মনে করেন না ; কারণ, ধর্মীয় সংগীত গুরুমুখী বিদ্যা। ইহাতে সুরের আবেদন থাকিলেও ভাবের আবেদন সম্প্রদায়গত। তথাপি বাংলার পল্লীতে প্রচলিত বাউল, মুর্শীদ্যা, দেহ-তত্ত্বের গানকে বাংলার লৌকিক ধর্মীয় লোকসংগীত বলা যায়। বাংলার লোকসংগীত নানাপ্রকার তারের যন্ত্রসাহায্যে গীত হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

লোকসংস্কৃতিঃ লোকসংস্কৃতি লোকায়ত সংহত সমাজের সমষ্টিগত প্রয়াসের জীবনচর্যা ও মানসচর্চার সামগ্রিক কৃতি। ইহা মূলত আদিমসমাজের অমার্জিত সাংস্কৃতিক প্রয়াস। অগ্রবর্তী সমাজের সুমার্জিত বিদগ্ধ সংস্কৃতি অপেক্ষা ইহা কম-বেশি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র, শিক্ষাগত অতিপ্রযত্ন নিরপেক্ষ ঐতিহ্যাশ্রয়ী—ভাষা, কারুকলা-চারুকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ, রান্নাবান্না, সুর-ছন্দ, ক্রীড়া-অভিনয়, ঔষধ-তুক্‌তাক্‌, প্রথা-উৎসব, বিশ্বাস-সংস্কার, ধর্ম-অনুষ্ঠান, মেলা-পার্বণ ইত্যাদিতে অভিব্যক্ত ; এবং ক্রেমানুসারে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় মূর্ত বা বিস্মৃতিতে অবলুপ্ত হইলেও সামগ্রিকভাবে আদিমসমাজের হারানো অতীতে মূল প্রোথিত করিয়া বিবর্তনের ধারায় চলমান কালের সত্যে উদ্ভাসিত হইয়া আগামী দিনের বাতাবরণে সম্প্রসারিত।

সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের উৎস হইতে লোক-সংস্কৃতির উদ্ভব। ইহার অনুশীলনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাদ, রসবাদ, রোম্যান্টিক জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি অভিমত এবং পুরাতাত্ত্বিক, ভাবাতাত্ত্বিক, সমাজ-তাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি গোষ্ঠীপ্রধান। ইহার প্রধানতঃ তিনটি দিক্‌—জ্ঞানের দিক্‌, অনুশীলনের দিক্‌ এবং প্রয়োগের দিক্‌। এই তিনটি দিকের যথাযথ সমন্বয়েই লোকসংস্কৃতির পূর্ণতা। ইহাই মানুষের আত্ম-আবিষ্ক্রিয়া ও স্বরূপ অনুসন্ধানের উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জনগণের জীবনযাত্রার ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক পরিচয় অনুশীলন করা হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শৈল্পিক অভিব্যক্তির মধ্যে শিল্পরসমূল্য ও নন্দনতত্ত্ব-গত বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়। ইহার মধ্যে দেশকালধৃত মানবসমাজের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানা যায়। জাতিবিশেষের লুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। মূলতঃ ঐতিহ্যাশ্রয়ী হইলেও ইহা চলমানকালেরও কণ্ঠস্বররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তাই ইহা অতীতের জীবাশ্মমাত্র নয়, জীবন-প্রবাহ ও আদিম সংস্কৃতির ধারাবাহিকতারও অন্যতম নিদর্শন। ইহার মাধ্যমে সমাজ ও জীবনবিকাশের স্বরূপও উপলব্ধি করা যায়। লোকসাহিত্য, লোক-সংগীত, লোকশিল্পকলা, লোকশিক্ষা, লৌকিক আচার, লৌকিক ধর্ম প্রভৃতির সমন্বয়েই ইহার স্বরূপ গঠিত। সভ্যতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহা তাহা হইতে পৃথক্‌ ও স্বমহিমায় উজ্জ্বলতর।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

লোচন দাস ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্ধমানের কোগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পুরা নাম লোচনানন্দ দাস। পিতা কমলাকর দাস, মাতা সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্ত-কবির শিক্ষাগুরু। লোচন দাস শ্রীখণ্ড বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা নরহরি সরকারের শিষ্য। লোচনের লেখা চৈতন্যমঙ্গলের নাম সর্বজন-বিদিত। কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু

বলা কঠিন। অনুমান হয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকালে ইহার রচনা ; সম্ভবতঃ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর পরে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এর পূর্বে লেখা। লোচনের গ্রন্থ প্রায় এগার হাজার ছত্রে সম্পূর্ণ চারিখণ্ডে বিভক্ত চৈতন্যজীবনীকাব্য, পাঁচালীর ঢঙে রাগরাগিণীর উল্লেখসহ রচিত। গৌরনাগরভাব প্রচার ও সাধন-ভজন প্রণালীর ব্যাখ্যা কাব্যটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার কাব্যে চৈতন্য-অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নূতনত্ব ও চৈতন্যতিরোধান সম্পর্কে অভিনবত্ব আছে। এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু জগন্নাথ-কলেবরে লীন হইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা গৌরলীলাবিষয়ক 'ধামালি'র পদগুলি প্রসিদ্ধ। চরিতকার অপেক্ষা গীতিকার হিসাবেই তাঁহার অধিকতর কৃতিত্ব।

রজত রায়চৌধুরী

লোদীবংশ দিল্লী রাজবংশে লোদীবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বহ্‌লুল লোদী। তিনি ছিলেন আফগান জাতির শাহু খেল নামক লোদী উপদল সম্ভূত। এই বংশের তিনজন সুলতান, বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯ খ্রী), সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রী) ও ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬ খ্রী) উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন।

বহ্‌লুল প্রথমে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা হন এবং ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ এপ্রিল দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া বহ্‌লুল শাহগাজি উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বপূর্ণ কাজ জৌনপুর বিজয়। দোয়াব-অঞ্চলে তিনি দিল্লীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং কিয়ৎপরিমাণে সাম্রাজ্যের হৃত গৌরব ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, দানশীল, ধর্মভীরু এবং সুদক্ষ শাসক।

বহ্‌লুলের তৃতীয় পুত্র এবং এই বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকন্দর লোদী জৌনপুরের বিদ্রোহদমন, তিরহুত ও বিহার জয় এবং বাংলার সুলতান হুসেন শাহের সহিত সন্ধি করেন।

১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আগ্রা শহর পত্তন করিয়া এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও ন্যায়পরায়ণ এবং উদ্ধত আফগানদের দমন করিতে সমর্থ হন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি ও খাদ্য-দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। কবি ও বিদ্যোৎসাহীরূপেও তাঁহার খ্যাতি ছিল ; কিন্তু ধর্মব্যাপারে তিনি ছিলেন অনুদার ও সংকীর্ণমনা।

তাঁহার পুত্র ও পরবর্তী সুলতান ইব্রাহিম লোদী দৃঢ়চেতা হইলেও দূরদর্শী ছিলেন না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা অন্যান্য বিষয় সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া ক্ষমতা ও দমননীতি প্রয়োগ করায় আফগান অভিজাতরা তাঁহার শত্রু হন। তাঁহার খুল্লতাত আলম খাঁ ও লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের অধিপতি বাবরের সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। ইহারই পরিণতি ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের পাণিপথে যুদ্ধ (এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রী), ইব্রাহিম লোদীর পরাজয় ও মৃত্যু এবং লোদীবংশের শাসনের অবসান।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

লৌহ সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে আবিষ্কৃত একটি ধাতু। ভূপৃষ্ঠে প্রাচুর্যের তালিকায় সমস্ত মৌলের মধ্যে লোহের স্থান চতুর্থ। ইহার পরমাণবিক সংখ্যা ২৬, ওজন ৫৫.৮৫ এবং চিহ্ন Fe। রৌপ্যধূসরবর্ণ, চৌম্বকশক্তিসম্পন্ন এই ধাতুর ঘনত্ব ৭.৮৬; গলনাংক ১৫৪০° সে. এবং স্ফুটনাংক ২৮০০° সে.। আকরিক লৌহ, হেমেটাইট, পাইরাইটিস্ ইত্যাদি খনিজপদার্থে অক্সিজেন, গন্ধক, সিলিকন্ ইত্যাদি মৌলের সহিত যৌগ হিসাবে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও বহু খনিজ-পদার্থে, ভূনিম্নস্থ জলে, রক্তের লোহিতকণিকায় লৌহের অস্তিত্ব বর্তমান। উত্তপ্ত ভূকেন্দ্রের গলিত পদার্থের প্রধান অংশই লৌহ। ভারতে প্রচুর হেমেটাইট পাওয়া যায়।

বিশুদ্ধ লৌহ নমনীয় ধাতু; কিন্তু ব্যবহার্য লৌহকে বিভিন্ন পরিমাণে কার্বন এবং অন্যান্য মৌলের মিশ্রণে দৃঢ়তর করা হয়। সাধারণ ইস্পাত এবং অন্যান্য ধাতু-সংস্কারযুক্ত ইস্পাত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কাজে লাগে। ঢালাই লৌহ গৃহ, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি, রান্নার সরঞ্জাম, পেরেক, হাতুড়ি, কৃষি সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য বস্তুর প্রস্তুতিতে লৌহের ব্যবহার অপরিহার্য। রক্তে লৌহের পরিমাণ কমিয়া গেলে বিভিন্ন প্রকার লৌহঘটিত ঔষধ শরীরে প্রবেশ করাইতে হয়।

লৌহ নিষ্কাসনের জন্য অক্সিজেনঘটিত হেমেটাইট এবং প্রচুর কয়লা ৭০০° সে.—১০০° সে. তাপাংকে ব্লাস্ট ফার্নেসে উত্তপ্ত করা হয়। ব্লাস্ট ফার্নেসে প্রস্তুত লৌহ গলিত অবস্থায় ইস্পাত তৈয়ারির জন্য এবং কঠিন অবস্থায় ঢালাই লৌহ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দুর্গাপুর, বার্নপুর, টাটানগর, রাউরকেলা ও ভিলাই—ভারতে এই কয়টি স্থানে লৌহ ও ইস্পাত-কারখানা অবস্থিত। বাতাস এবং জলের সংস্পর্শে লৌহের পৃষ্ঠ মরিচায় আবৃত হয়। লৌহ প্রধানতঃ দুই এবং তিন যোজ্যতাবিশিষ্ট দুই ধরনের যৌগের সৃষ্টি করে।

কল্যাণময় সেন

লৌহ ও ইস্পাতশিল্প মৌলিক দ্রব্যগুলির মধ্যে লৌহ চতুর্থ স্থানে অবস্থিত। মানবজীবনে একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। ইহা মুক্ত অবস্থায় প্রায়ই থাকে না। যাহা পাওয়া যায় তাহা গন্ধক বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায়। খনি হইতে তুলিবার সময় লৌহের সহিত বিভিন্ন প্রকৃতির ও পরিমাণের অ্যামোনিয়া, সিলিকা, চুন, ফস্‌ফোরাস ও আরও অনেক লৌহেতর বস্তুও মিশ্রিত থাকে; কার্যোপযোগী করিবার পূর্বে ঐ সকল মিশ্রণ এবং অক্সিজেনকে দূর করিয়া লইতে হয়। তাপ ও অঙ্গারপূর্ণ দ্রব্যাদির সাহায্যে উহা করা হয়। প্রাগৈতিহাসিককালে মেসোপটেমিয়া এবং এশিয়া মাইনরে পার্থিব লৌহ-আকর পরিচিত ছিল। লৌহ ঢালাই সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ায় প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ইওরোপের উত্তরভাগে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে উহা বিস্তৃত হয়। অতীতকালে কৃষি ও অন্যান্য গার্হস্থ্যকর্মে ব্যবহৃত বস্তুনিচয় লৌহে প্রস্তুত হইত। বর্তমানে মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এই শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০০,০০০,০০০ টন। লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের ইতিহাসে দেখা যায় লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারি করিবার প্রণালী যুগে যুগে উন্নত হইতে উন্নততর হইয়াছে। মধ্যযুগে কাঠকয়লার চুল্লীতে লৌহ হইতে ইস্পাত তৈয়ারি হইত। ডার্বিতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাঠকয়লার পরিবর্তে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। সেই সময় ডার্বিতে চুল্লী পিছু সাপ্তাহিক দশ টন ইস্পাত উৎপাদনকে এক বিরাট্ উৎপাদন বলিয়া ধরা হইত। বর্তমানকালে একটি চুল্লী একদিনে এক-হাজার টনও ইস্পাত উৎপাদন করিতে পারে। এখানে একই সঙ্গে কোক ওভেন-এ কোক, ব্লাস্ট ফার্নেসে লৌহ পিণ্ড এবং ইস্পাত তৈয়ারির যন্ত্রে ইস্পাত তৈয়ারি হইতেছে। রোলিং মিলে গলিত লোহাকে ইচ্ছামত আকৃতি দিবার ব্যবস্থা আছে। ইস্পাত তৈয়ারির (অর্থাৎ লৌহ হইতে অক্সিজেন বাহির করিয়া লইয়া কার্বন সংযোজন) প্রচলিত চাররকম প্রণালী আছে—প্রাচীন, বেনমার, ওপেন হার্থ এবং ব্লাস্ট ফার্নেস। ভারতে লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পের ইতিহাস প্রাচীন। দক্ষিণ ভারতে ক্ষুদ্রাকারের লৌহশিল্প বহুদিন ধরিয়া চালু রহিয়াছে। উত্তর ভারতেও এই শিল্পের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। আলেকজান্ডার পাঞ্জাবের দলপতিদের নিকট হইতে লৌহনির্মিত কিছু অস্ত্র উপহার পাইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতকের ইস্পাতস্তম্ভ একটি প্রাচীন নিদর্শন। উত্তর ভারতে কুমারগুপ্তের নির্মিত লৌহ-স্তম্ভও সুপ্রাচীন। শুধু তাই নয় ২৩ ফিট উচ্চ এবং ৬ টনেরও বেশি ওজনের এই স্তম্ভে যে বিশালাকার ঢালাই ও গলাই-এর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইওরোপে অপরিচিত ছিল। বর্তমান ভারতীয় লৌহ এবং ইস্পাতশিল্পের ইতিহাস জামশেদজী নাসেরওয়ানজী টাটার প্রচেষ্টার সঙ্গেই শুরু। তিনি শুরু করিয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদের চেষ্টায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস্' রেজিস্ট্রীকৃত হয় এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লৌহপিণ্ড প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পর আরও দুইটি কারখানা কাজ আরম্ভ করে—একটি আসান-সোলের কাছে 'ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টীল কোম্পানি' (১৯০৮ খ্রী), অপরটি মহীশূরে ভদ্রাবতীতে 'মহীশূর স্টেট আয়রন ওয়ার্কস্' (১৯২৩ খ্রী)। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বেসরকারি ক্ষেত্রে সৃষ্ট তিনটি লৌহ-কারখানা তৈয়ারির কাজ শেষ হইবার পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মোট ইস্পাত-উৎপাদনের ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষমতা ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টন। নূতন তিনটি কারখানা ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে। বোকারোয় অবস্থিত সরকারিক্ষেত্রের চতুর্থ কারখানার ইস্পাত উৎপাদনও আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে মাথা পিছু ইস্পাত ব্যবহার (১৮ পাউন্ড) ইংল্যান্ড (৬২৮ পাউন্ড) ও আমেরিকার (১২৩৭ পাউন্ড) তুলনায় অনেক কম।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়

শক শক জাতি চীন-সীমান্ত হইতে ইউচি জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বাহ্লীকে আসিয়া পৌঁছায় ও শেষ গ্রীকরাজা হেলিয়ক্লেয়কে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করে। কিছুদিনের মধ্যেই আবার ইউচিরা তাহাদের বাহ্লীক হইতে বহিষ্কৃত করে। হেলিয়ক্লেয় তখন কাবুল উপত্যকায় অধিষ্ঠিত থাকায় শকেরা পারদ রাজ্যভুক্ত দ্রাঙ্গিয়ানায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদের নামানুসারে ঐ প্রদেশের নাম 'শকস্থান' (সীস্তান) হয়। পরে তাহারা নিম্নসিন্ধু উপত্যকায় 'শকদ্বীপ' নামে আর একটি উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। এই স্থান হইতে তাহারা উত্তরে পাঞ্জাব, পূর্বে মথুরা ও দক্ষিণ-পূর্বে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হয়।

সম্ভবতঃ পারদরাজ দ্বিতীয় মিথ্রাদাতের মৃত্যুর পরই উত্তর-পশ্চিম ভারতে মোঅ ও সীস্তানে ভনোন 'রাজাতিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

সীস্তানে রাজাতিরাজ ভনোন প্রথমে ভ্রাতা স্পলহোর ও পরে স্পলহোর-পুত্র স্পলগদমের সহিত রাজত্ব করেন। স্পলহোর আবার 'রাজভ্রাতা' হিসাবে বোধহয় কান্দাহারে পুত্র স্পলগদমের সহিত কিছুকাল রাজত্ব করেন। ইহার পর ভনোনের আর এক ভ্রাতা স্পলিরিশ প্রথমে 'রাজ-ভ্রাতা' হিসাবে একাকী ও পরে (সম্ভবতঃ পুত্র) অয়ের

সহিত এবং ভনোনের মৃত্যুর পর একাকী বোধহয় সীস্তানের অধিপতি হিসাবে 'রাজাতিরাজ' উপাধি লইয়া রাজ্য চালান। শেষোক্ত সময়ে অয়কে আমরা মোঅর উত্তরাধিকারী হিসাবে 'রাজাতিরাজ' উপাধি লইয়া পাঞ্জাবে রাজত্ব করিতে দেখি।

এদিকে মোঅ সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বস্থ ভূভাগে গ্রীকশাসনের অবসান ঘটাইয়া রাজত্ব করেন এবং গ্রীকদের অনুকরণে মুদ্রাঙ্কন করান. তক্ষশিলায় প্রাপ্ত আনুমানিক ৭২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে লিখিত একটি তাম্রপট্টে মোঅকে 'মহারাজ মহান মোগ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মোঅর উত্তরাধিকারী অয় পূর্ব পাঞ্জাবের গ্রীকরাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন লেখে ৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রবর্তিত বিক্রমাব্দের সহিত অয়ের নাম জড়িত থাকায় অনেকেই মনে করেন অয়ই তথাকথিত বিক্রমাব্দের প্রবর্তক। অয়ের পুত্র অয়িলিশ প্রথমে কিছুদিন পিতার সহিত ও পরে একাকী এবং সর্বশেষে পুত্র দ্বিতীয় অয়ের সহিত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় অয় শেষ পর্যন্ত একাকী রাজ্য চালান। তাঁহার পর শকরাজ্য পহ্লববংশীয় Gondophares কর্তৃক অধিকৃত হয়। শক রাজাদের সম্বন্ধে এইসব তথ্য মূলতঃ তাঁহাদের দ্বিভাষিক মুদ্রালেখ হইতেই জানা যায়।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

শকুন্তলা ঋষি বিশ্বামিত্র ও অপ্সরা মেনকার কন্যা। শৈশবে পিতামাতার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে কণ্বমুনি ইঁহাকে কন্যানির্বিশেষে লালন করেন। মৃগয়া করিতে আসিয়া দুষ্যন্ত কণ্বের তপোবনে ইঁহাকে দেখিয়া রূপে মুগ্ধ হন ও গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। রাজধানীতে ফিরিয়া দুষ্যন্ত ইঁহাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার শাপকে বিস্মরণের কারণরূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। নাটকে সন্তানসম্ভবা শকুন্তলা রাজসভায় উপস্থিত হইলে দুষ্যন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন ও মেনকা তাঁহাকে কশ্যপের আশ্রমে লইয়া যান। সেখানে ইঁহার পুত্র সর্বদমনের (ভরত) জন্ম হয়। কশ্যপের আশ্রমেই আকস্মিকভাবে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার সাক্ষাৎ ও পুনর্মিলন হয়। মহাভারতে ও পদ্মপুরাণেও এই উপাখ্যান পাওয়া যায় ; সেখানে শকুন্তলা বালক পুত্রকে লইয়া রাজসভায় আসেন ও সন্তানের ভরণপোষণ দাবি করেন। দৈববাণীর দ্বারা দুষ্যন্তের পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে দুষ্যন্ত স্ত্রী ও পুত্রকে স্বীকার ও গ্রহণ করেন।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

শক্তিপূজা সুপ্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষে শক্তিপূজা চলিয়া আসিতেছে। চিত্রময় যন্ত্রাঙ্কন, একাক্ষরী বীজমন্ত্র জপ এবং সম্ভোগ উপকরণ গ্রহণ প্রভৃতি শক্তিপূজার অঙ্গ। এই রীতিগুলি আদিম সংস্কারের পরিচয়বহ। আর্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে শক্তিপূজার রূপ পরিবর্তিত হইলেও তান্ত্রিক পূজাপদ্ধতি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। বিশেষভাবে মাতৃপ্রতীকগুলিই শক্তি-পূজকদের ধ্যেয়। এইগুলির ভিতর দশ মহাবিদ্যা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা বিখ্যাত ('দশ মহাবিদ্যা' দ্র)। শক্তিপূজকেরা শ্রীকুল ও কালীকুলভেদে দ্বিবিধ। শ্রীকুলের মূল দেবতা ষোড়শী, কালীকুলের কালী। শ্রীকুলে তত্ত্বের প্রাধান্য, কালীকুলে তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব। অধিকারীভেদে শক্তিপূজার তিনটি ভাব—পশু, বীর ও দিব্য। বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল—এই সাতটি আচার। তন্মধ্যে বীরভাবে বামাচার সাধনা প্রশস্ত। শবসাধন, লতাসাধন, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। এই সাধনায় স্থূল পঞ্চতত্ত্ব (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন) গ্রহণের বিধি আছে। পশুভাব ও দিব্যভাবের সাধনায় পঞ্চ ম-কারের অনুকল্প গ্রহণ করা হয়। শক্তিসাধনায় দিব্যভাবটিই সর্বোত্তম। বস্তুতঃ বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে যে মহাশক্তির লীলা বিদ্যমান, দেহমধ্যে সেই শক্তির উদ্বোধন করাই শক্তিপূজার আসল লক্ষ্য। দেহে নাদরূপে শক্তিস্রোত প্রবাহিত। এই নাদের প্রতীক স্থূল ধ্বনি ও বর্ণ। এইগুলিই মাতৃকাশক্তি। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া পূজক ভূতশুদ্ধি করেন, মাতৃকা বর্ণগুলিদ্বারা ন্যাস করিয়া দেহকে মাতৃময় করিয়া তোলেন। তৎপরে বাহ্য পূজা করিয়া বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সাধক শক্তির আনন্দস্রোতে মগ্ন হইয়া যান।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শঙ্করদেব (? ১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রী) অসমীয়া সাহিত্য ও সমাজের একটি গৌরবময় যুগের মধ্যমণি। তাঁহার পিতা কুসুমবর কোচ-নৃপতি বিশ্বসিংহ-কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কামরূপ পরিত্যাগ করিয়া অহম-রাজদের অধীনে নওগাঁ জেলার বড়দোয়া গ্রামে আসেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করদেব কামতায় চলিয়া যান এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কামতা-কামরূপ রাজার আশ্রয়ে থাকেন। তাঁহার প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে রাধাভাবের স্থান নাই বলিলেই চলে, যদিও তাহার 'রাসক্রীড়া' (বা 'কেলিগোপাল') নাটকে রাধার উল্লেখ আছে। তবে এই অংশ প্রক্ষিপ্তও হইতে পারে। রামানুজীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিতেন না।

তিনি ও তাঁহার শিষ্য মাধবদেব গ্রামে গ্রামে কীর্তনের প্রবর্তন করেন। তিনখানি পুস্তক, 'বড়গীত', 'ভাটিমা' ও 'গুণমান্না' শঙ্করদেব ও মাধবদেবের রচনা। শঙ্করদেব মাধবকন্দলী-কৃত রামায়ণের (শ্রীরাম পাঁচালী) উত্তর-কান্ড এবং পদাবলী ছাড়া ভাগবতপুরাণের কয়েক স্কন্ধ অনুবাদ করেন। তিনি দুইখানি তত্ত্ব-নিবন্ধ 'অনাদি পাতন' ও 'ভক্তিপ্রদীপ' ছাড়া ছয়খানি 'নাট' রচনা করেনঃ 'কালিয়-দমন', 'পত্নী-প্রসাদ', 'পারিজাত-হরণ', 'রুক্মিণী-হরণ', 'রাসক্রীড়া' (বা 'কেলিগোপাল') এবং রামবিজয় (বা 'সীতাস্বয়ম্বর')। তাঁহার নাটকগুলি তাঁহাকে বৈষ্ণব কবি-ভক্তদের মধ্যে বিশিষ্ট আসন দিয়াছে। সংস্কৃত কাব্য ও পদরচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ সুরকার এবং চিত্রশিল্পীও ছিলেন। শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যরা আসামে বৈষ্ণবী সংস্কৃতির একটি নূতন প্রবাহ আনিয়াছিলেন।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করাচার্য শঙ্করাচার্য বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, অদ্বৈতবাদের প্রথম প্রবক্তা না হইলেও তিনিই অদ্বৈতবাদের ('অদ্বৈতবাদ' দ্র) প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মূলে। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এবং পূর্বমীমাংসামতের প্রাবল্যের যুগে আনুমানিক অষ্টম শতাব্দীতে (৭৮৮ খ্রী) দক্ষিণ ভারতে কেরলদেশে কানাডি নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। অতি অল্প বয়সেই তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন এবং নর্মদাতীরে গোবিন্দপাদের নিকট দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদের ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বিবেকচূড়ামণি এবং বিবিধ স্তোত্র রচনা করিয়া তিনি খ্যাত। মুখ্যতঃ বৌদ্ধ এবং পূর্ব-মীমাংসা মত খন্ডন করিয়া স্বীয় অদ্বৈতবেদান্তমত প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈত-বিরোধী বিভিন্ন দার্শনিক পন্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্রবিচারে তিনি সকলকে পরাজিত করেন। বৌদ্ধধর্মের প্লাবন হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষার জন্য তিনি ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরিমঠ, পূর্বে গোবর্ধনমঠ ও পশ্চিমে সারদামঠ। দশনামী তীর্থ, আশ্রম ইত্যাদি। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে এই চারি মঠের অধীনে স্থাপন করেন। এই চারি মঠের অধ্যক্ষদের এখনও শঙ্করাচার্য বলা হয়। প্রবাদানুসারে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতবাদের মূলকথা—এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্ম (চৈতন্য বা আত্মা) একমাত্র সত্য; জগৎ মিথ্যা, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, অজ্ঞানবশতঃ জীব তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হইলে জীবের ব্রহ্মস্বরূপতা প্রকাশের আর কোনও বাধা থাকে না; এই অবস্থার নামই মুক্তি। এই মুক্তি বা অজ্ঞানতার অপসারণ একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব।

নীরদবরণ চক্রবর্তী

শণ অনুচ্চ বহুশাখাযুক্ত ঝাড়বিশিষ্ট গাছ। উদ্ভিদ্-বিদ্যায় ইহার নাম 'কান্নাবিস সাতিভা'। সাধারণতঃ ৫ হইতে ১০ ফিট পর্যন্ত এই গাছের উচ্চতা। শণের তন্তু বস্ত্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। ইহার ত্বক্-জাত সুতা রজ্জু প্রস্তুতকরণে বিশেষ উপযোগী। বহু প্রাচীনকালে সম্ভবতঃ চীনে ইহার প্রথম চাষ হয়। অধুনা রাশিয়া, ইতালি, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি বহু দেশে ইহার চাষ হয়। ভারতবর্ষে বহুকাল পূর্ব হইতে ইহার চাষ হইয়া আসিতেছে। শণের তৈল রং, বার্নিশ এবং সাবান প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। ভারত, পারস্য প্রভৃতি স্থানে গাঁজা ('গাঁজা' দ্র), চরস ও সিদ্ধি বা ভাঙের জন্যই প্রধানতঃ ইহার চাষ। এই সব বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে একই গাছের ভিন্নরূপ চাষের প্রয়োজন হয়। এই গাছ হইতে নির্গত আঠাবৎ পদার্থে চরস এবং পত্র হইতে অন্যান্য মাদকদ্রব্য প্রস্তুত হয়। তবে ঔষধ হিসাবে ইহার উপযোগিতা সন্দেহজনক। ইহা হইতে প্রস্তুত মাদকদ্রব্যগুলির বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম আছে। ভারতে যেমন ভাং, চরস, গাঁজা; মিশর প্রভৃতি দেশে তেমনি হ্যাশিশ্, উত্তর আফ্রিকায় কিফ্ এবং পাশ্চাত্য-দেশে ম্যারিজুয়ানা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শনি প্রাচীনকাল হইতে যে কয়টি গ্রহের কথা জানা ছিল তাহাদের মধ্যে শনি-ই সবচেয়ে দূরবর্তী। খালি-চোখে ইহাকে একটি উজ্জ্বল তারার মতো দেখায়।

শনিকে সর্বপ্রথম দূরবীন দিয়া পর্যবেক্ষণ করেন বিজ্ঞানী গ্যালিলেও (১৬১০ খ্রী, 'গ্যালিলেও' দ্র)। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী হাইগেন্স-ই সর্বপ্রথম শনির চতুর্দিকে একটি বলয় লক্ষ্য করেন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দূরবীন-সাহায্যে বোঝা গেল যে শনিকে বেষ্টন করিয়া আছে পর পর ৩টি বলয়। এই বলয়-গুলি অতিশয় পাতলা। কক্ষপথে শনির অবস্থান অনুসারে ইহাকে কখনও সরু আবার কখনও মোটা দেখায়। এই বলয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জড়কণাদ্বারা গঠিত। সূর্য হইতে দূরত্ব অনুসারে, শনি হইল ষষ্ঠ গ্রহ। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব প্রায় ১৪১ কোটি ৭৭ লক্ষ কি. মি.। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে ইহার সময় লাগে প্রায় ২৯.৫ বছর। আয়তন ও ওজন অনুসারে বৃহস্পতির পরেই শনির স্থান। আয়তন পৃথিবীর

প্রায় ৭৬০ গুণ, কিন্তু ওজন পৃথিবীর প্রায় ৯৫ গুণ মাত্র। এই হিসাবে ইহার গড় ঘনত্ব (জল = ১) দাঁড়ায় মাত্র ০.৭ ; অর্থাৎ জলের চেয়েও কম।

ইহার স্বাবর্তনকাল প্রায় ১০.৫ ঘণ্টা। খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিতেছে বলিয়া শনির উত্তর-দক্ষিণ বেশ চাপা, ইহার পূর্ব-পশ্চিমের ব্যাস প্রায় ১২০০০০ কি. মি., কিন্তু উত্তর-দক্ষিণের ব্যাস প্রায় ১০৮৩৫০ কি. মি.। বৃহস্পতির মতো শনিও ঘন মেঘের আবরণে ঢাকা। বেগে ঘোরার জন্য এই সব মেঘ কতকগুলি পেটির আকার ধারণ করিয়াছে। বৃহস্পতি হইতে আরও দূরে থাকায়, শনি আরও বেশি ঠাণ্ডা। শনিপৃষ্ঠের গড়-উষ্ণতা প্রায় -১৫৫° সেণ্টিগ্রেড। শনির আবহমণ্ডল প্রায় ২৫৬৫০ কি. মি. গভীর। ইহার উপাদান প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস ; আর আছে মিথেন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস। ইহার নীচে শনির সবটা জল জমিয়া বরফ হইয়া প্রায় ১০০০০ কি. মি. পুরু একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি করিয়াছে। কেন্দ্রে যে ধাতব-পিণ্ডটি রহিয়াছে তাহার ব্যাসার্ধ ন্যূনাধিক ২২৫০০ কি. মি.।

শনির বলয় তো আছেই তাহা ছাড়া আছে নয়টি উপগ্রহ। তাহাদের নাম মাইমস, এন্‌সেলাডস্, টেথিস্, ডাইওন্, রীয়া, টাইটান্, হাইপেরিয়ন্, আয়াপিটস্ ও ফীবি।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

শবর ভারতবর্ষের আদি জাতিবিশেষ। ওড়িশা ও মধ্যভারতের বন্য পর্বতাঞ্চলে এখনও এই জাতির বাস আছে। ইহাদের প্রধান উপজীবিকা বনের কাঠ কাটিয়া বা বনজসম্পদ সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্তী নগর বা গ্রামে বিক্রয় করা। মহাভারতের আদি, ভীষ্ম, শান্তি ও অনুশাসন পর্বে শবর জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা চর্যাগীতিতেও শবর-শবরী ও তাহাদের নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ওড়িশা অঞ্চলে পর্ণশবর নামে এই জাতির এক শাখা আছে। ইহারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। দক্ষিণ ভারতের পূর্বঘাট পর্বতমালায় যে শূরা জাতি বাস করে, তাহারাও শবর বলিয়া কথিত। ইহারা বনের কোনও একটি স্থান পরিষ্কার করিয়া ঘর তৈয়ারি করে। ইহারা খর্বাকার কিন্তু অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদের নাক খ্যাঁদা, নাসারন্ধ্র বিস্তৃত, চক্ষুগোলক ঘন কালো। ইহারা ধীর এবং নম্র স্বভাবের। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ শবদাহ করিবার রীতি প্রচলিত; কিন্তু শবদেহ প্রোথিত করার প্রথাও আছে।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

শবরস্বামী জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার ও প্রসিদ্ধ মীমাংসক। তাঁহার ভাষ্য শাবর-ভাষ্য নামে পরিচিত। এক মতে তিনি আনুমানিক ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জীবিত ছিলেন। কিন্তু অনেক পণ্ডিত তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ২০০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ই‍ঁহাদের মতে শবরস্বামীর প্রকৃত নাম ছিল আদিত্যদেব। জৈনদের নির্যাতনের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি বনে আত্মগোপন করিয়াছিলেন বলিয়াই শবর নামে পরিচিত। তিনি বোধহয় উত্তর ভারতের কাশ্মীর বা তক্ষশিলার অধিবাসী।

দীপ্তস্বামীর পুত্র এক শবরস্বামী 'লিঙ্গানুশাসন'-এর 'সর্বার্থলক্ষণ' নামে এক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। আর এক শবরস্বামী শ্রৌতসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করেন। জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী এবং এই দুই ভাষ্যকার একই ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শাবর-ভাষ্যের উপর ভর্তৃমিত্র, কুমারিলভট্ট, প্রভাকর ও মুরারি মিশ্র যে বার্তিক বা টীকা লেখেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিটি মীমাংসক-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নীরদবরণ চক্রবর্তী

শবরী ইহা গোদাবরীর বামতটের উপনদী। ওড়িশার দক্ষিণে কোরাপুট জেলায় ৯০০ ফিট উচ্চে উৎপন্ন হইয়া কিছুদূর পর্যন্ত ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের সীমারেখা নির্দেশ করিয়া রাজমহেন্দ্রী হইতে প্রায় ১০০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গোদাবরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

জয়শ্রী রায়

শবসংস্কার মৃত্যুর পর মনুষ্যদেহের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রধান দুটি অঙ্গ—মৃতদেহের ব্যবস্থা ও তৎসম্পৃক্ত ধর্মীয় কার্যকলাপ। ধর্মীয়-অঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। হিন্দুরা অশৌচ পালন করে এবং শাস্ত্রীয় মতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে। খ্রীষ্টানরা কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শোক প্রদর্শন করে এবং খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ অনুসারে আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনাদি করে। মুসলমানদের মধ্যে শবানুগমন অবশ্য কর্তব্য। কবরস্থানে আলোকদানেরও বিধি আছে। ৪০ দিনে মুসলমানদের মৃত্যুত্তর অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হয়। তবে এই আচার পর্যায়ক্রমে ১০, ২০, ৩০ ও ৪০ দিনে সমাপ্ত হয়। আত্মার সদ্‌গতির জন্য পবিত্র কোরান হইতে অংশবিশেষ পঠিত হয়।

শবদাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে দেখা যায় যে, সুপ্রাচীন কাল হইতেই শবদাহ করা ও শব মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত করা উভয় প্রথাই চলিয়া আসিতেছে। মিশরে মৃত্তিকা-

গর্ভে শব অবিকৃতভাবে রক্ষিত করার নানা প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত 'মমি'গুলি ইহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন পারসীক এবং আসিরীয়গণের মধ্যেও মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ করার রীতি ছিল। কালদীয় জাতিরাও মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ করিত। প্রাচীন রোমকেরা শবদাহের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত রোগী-বিশেষকে কবরও দেওয়া হইত। প্রাচীন গ্রীক জাতিও শবদাহ করিত। ইহাদের শবসংকার প্রণালী অনেকটা ভারতীয় আর্যগণের মতো। প্রাচীন শকজাতির মধ্যেও মৃতদেহ সমাধিস্থ করার রীতি ছিল। দাক্ষিণাত্যে নীলগিরিবাসী অসভ্য জাতিদের অনেক সমাধিপ্রস্তর দৃষ্ট হয়। হায়দরাবাদ রাজ্যে এবং বলরাম ও সেকেন্দ্রানগরের চারিধারে সমাধিক্ষেত্র দেখা যায়। খ্রীষ্টানজগৎ বহু প্রাচীনকাল হইতেই মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। হিন্দুসমাজে অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে শব দাহ করার রীতি আছে। তবে সন্ন্যাসী বিশেষের দেহ সমাধিস্থও করা হয়। চীন দেশবাসীরা মৃতব্যক্তিকে বিশেষভাবে সম্মান করে এবং কাষ্ঠের বাক্সে পুরিয়া মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। দক্ষিণ ভারতের পারিয়া প্রভৃতি জাতি এবং শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু, জঙ্গম ও লিঙ্গায়ৎ-রা মৃতদেহ প্রোথিত করে। আধুনিক উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সকলেই মৃতদেহ দাহ করে। পূর্বে সতীদাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। অনেক আর্যেতর জাতির মধ্যে সাধারণতঃ মৃতদেহ পোঁতার ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। আর্য হিন্দুদিগের মধ্যেও, বিশেষ করিয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর, শব সমাধিস্থ করার প্রথাও আছে। জরথুস্ত্রবাদী অগ্নি-উপাসক পার্শিরা মৃতদেহ পক্ষী প্রভৃতিকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে অতি উচ্চ অট্টালিকা নির্মিত হয়। বোম্বাই শহরে এইরূপ একটি অট্টালিকা আছে। ইহার নাম 'টাওয়ার অভ্ সাইলেন্স'। এইরূপ অট্টালিকার চূড়ায় মৃতদেহ ফেলিয়া রাখা হয় এবং শকুনি-গৃধিনী প্রভৃতি পক্ষীরা তাহা ভক্ষণ করে। সাধারণ ব্রহ্মবাসীর দেহ মৃত্যুর পর দাহ করা হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে মৃতদেহ সমাধিস্থ ও দাহ করা দুই-ই প্রচলিত আছে।

বর্তমানকালে শব দাহ করাই প্রশস্ত রীতি বলিয়া ক্রমশঃ প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইতেছে। বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা (ক্রিমেটোরিয়াম) হিন্দু, অহিন্দু অনেকেই শবদাহ করার রীতি গ্রহণ করিতেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শব্দ যে শক্তি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অনুভূতি জন্মায় তাহাই শব্দ। বস্তুর কম্পন হইতে শব্দের উৎপত্তি হয়। ক্রমবেশি ২০ হইতে ২০০০০-এর মধ্যে থাকা প্রয়োজন। ইহাকে কম্পাঙ্কের শ্রুতিসীমা (অডিব্‌ল লিমিট) বলে। কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বাস্তব মাধ্যমেই শব্দের সঞ্চালন হয়; শূন্যস্থানে (ভ্যাকুয়াম) হয় না। স্থলচরের নিকট বায়ু এবং জলচরের নিকট জলই শব্দের মাধ্যম। স্বনকের কম্পনের দ্বারা বায়ুস্তরে পরপর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপস্তর উৎপন্ন হইয়া মাধ্যমের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই বায়ুতে শব্দতরঙ্গ। শব্দতরঙ্গ কানের পরদায় স্বনকের অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করিয়া মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জন্মায়।

শব্দের বেগ মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল। বায়ু (০° সে. তাপাঙ্কে), জল ও ইস্পাতে শব্দের বেগ যথাক্রমে প্রতি সেকেন্ড ৩৩২ মিটার, ১৪০০ মিটার এবং ৫১০০ মিটার। প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বায়ুতে বেগবৃদ্ধির হার প্রায় ৬১ মি. সে.। বায়ুর আর্দ্রতার সহিতও বেগ সামান্য বাড়ে।

শব্দতরঙ্গ দেওয়াল, পাহাড়, গাছের সারি প্রভৃতিতে বাধা পাইলে যে প্রতিফলিত শব্দ ফিরিয়া আসে তাহাকে প্রতিধ্বনি বলে। কোনও শব্দ শুনিবার পর ১/১০ সেকেন্ড পর্যন্ত মস্তিষ্কে উহার অনুভূতি বা শ্রুতিরেশ বর্তমান থাকে। শ্রুতিরেশের সময় পার হইবার পরে পৌঁছিলে প্রতিধ্বনি শুনা যায় অন্যথা উহা মূলধ্বনিতে মিশিয়া যায়। এই হিসাবে ৩০° সে. উষ্ণতায় প্রতিফলকের দূরত্ব কমপক্ষে ১৭.৫ মিটার হওয়া প্রয়োজন। মানুষের উচ্চারিত প্রতি শব্দাংশের (সিলেবল) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দূরত্ব ইহার দ্বিগুণ।

সমস্ত শব্দ সুরযুক্ত ও সুরবর্জিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি সুরযুক্ত শব্দ; বোমা-বন্দুকের আওয়াজ, যন্ত্রের ঘর্ঘর প্রভৃতি সুরবর্জিত শব্দ। সুরযুক্ত শব্দ শ্রুতিমধুর এবং তীক্ষ্ণতা (পিচ্), প্রবলতা (ইন্‌টেন্‌সিটি) ও স্বকীয়তা (কোয়ালিটি) এই তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

শব্দ কোন্ গ্রামের (চড়া বা খাদের) তীক্ষ্ণতা তাহারই নির্দেশক। স্বনকের কম্পাঙ্ক দ্বারা তীক্ষ্ণতা নির্ধারিত হয়। সুর যত চড়া তাহার তীক্ষ্ণতা এবং কম্পাঙ্ক তত বেশি। প্রত্যেক স্বনকের গঠন অনুযায়ী একটি স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক থাকে। হারমোনিয়ামের মধ্যম সপ্তকের 'সা' সুরের তীক্ষ্ণতা প্রতি সেকেন্ডে ২৫৬, মশার 'ডাক'-এর (পাখার কম্পনজাত শব্দ) তীক্ষ্ণতা কমবেশি ৩০০। টান করা তারের কম্পাঙ্ক দৈর্ঘ্যের ব্যাপ্তির অনুপাতী। তারযন্ত্রের টান বাড়িলে কম্পাঙ্ক বাড়ে। তাই 'কান' মুচড়াইয়া টানের তারতম্য করিয়া সুর-বাঁধা হয়। টান ও দৈর্ঘ্য সমান থাকিলে মোটা তারের তুলনায় সরু তারে চড়া সুর ওঠে। কিন্তু বাঁশীর বেলায়

গায়ের ছিদ্রগুলি চাপিয়া বা খুলিয়া কম্পনশীল বায়ুস্তরের দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটানো এবং বিভিন্ন তীক্ষ্ণতার সুর তোলা হয়।

প্রবলতা দ্বারা শব্দের জোর বুঝায়। প্রতি সেকেন্ডে শব্দতরঙ্গবাহিত শক্তির উপর প্রবলতা নির্ভরশীল। কম্পনের বিস্তার, স্বনকের আয়তন, প্রতিফলক ও অনুনাদী বস্তুর সান্নিধ্য প্রবলতা বৃদ্ধি করে। (দুইটি স্বনকের একই স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক হইলে তাহাদের অনুনাদী বলে।) সেতার-তানপুরার ফাঁপা লাউ, ঢাকের বিরাট আয়তন প্রবলতাবৃদ্ধির সহায়ক।

একই তীক্ষ্ণতা ও প্রবলতাবিশিষ্ট দুইটি শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা উহাদের স্বকীয়তায়। সেতার ও এস্রাজে একই তীক্ষ্ণতা ও প্রবলতাযুক্ত সুর বাজাইলে এই কারণে উহাদের পার্থক্য ধরা যায়। বিশুদ্ধ সুর (টোন) বা একটি মাত্র কম্পাঙ্কযুক্ত শব্দ প্রকৃতিতে দুর্লভ। অধিকাংশ সুরযুক্ত শব্দই একটি মূলসুর (ফান্ডামেন্টাল) বা সর্বনিম্ন কম্পাঙ্ক ও অনেকগুলি উপসুর (ওভারটোন) বা উচ্চতর কম্পাঙ্কবিশিষ্ট সুরের সংমিশ্রণ। মূলসুরের সহিত কোন্ কোন্ উপসুর কি অনুপাতে মিশ্রিত আছে তাহাই বিশিষ্টতার নির্ধারক। মূলসুরের গুণিতক কম্পাঙ্কবিশিষ্ট উপসুরকে সমমেল (হারমোনিক) বলে। সমমেলের প্রাচুর্য শব্দকে সুরসমৃদ্ধ, ঝংকারযুক্ত ও শ্রুতিমধুর করে।

সুহাসরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪ খ্রী) ইংরেজী ভাষায় একাধিক গ্রন্থরচয়িতা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক। ছাত্রাবস্থায় বন্ধু কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে 'ক্যালকাটা মান্থলি ম্যাগাজিন' প্রকাশের মধ্য দিয়া সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি হয়। অতঃপর তিনি 'মর্নিং ক্রনিক্‌ল্', 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট্', 'সমাচার হিন্দুস্থানী', 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন (১ম ও ২য় পর্যায়), 'Reis and Rayet' পত্রিকাগুলির সহিত যুক্ত হন। তিনি বিভিন্ন সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম, কাশীপুরের রাজা, রামপুরের নবাব এবং পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান বা সচিবরূপে কার্য করেন।

কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রথম যুগে (১৮৬১ খ্রী) তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনা এবং গবেষণা করেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্যঃ ১. দি মিউটিনিস অ্যান্ড দি পীপ্‌ল্ (১৮৫৯ খ্রী), ২. মিঃ উইল্‌সন, লর্ড ক্যানিং অ্যান্ড দি ইনকাম ট্যাক্স (১৮৬০ খ্রী), ৩. দি কেরিয়ার অভ্ অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস্ (১৮৯৬ খ্রী), ৪. দি প্রিন্স ইন ইন্ডিয়া (১৮৭১ খ্রী), ৫. ট্রাভেল্‌স অ্যান্ড ভয়েজেস্ (১৮৯৭ খ্রী)।

অলোক রায়

শম্ভুনাথ পণ্ডিত (১৮২৩-১৮৬৭ খ্রী) জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে। পিতা সদাশিব পণ্ডিত, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা। কিছুকাল গবর্নমেন্টের জুনিয়ার ও পরে সিনিয়ার উকিল ছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ইনিই হাইকোর্টের এদেশীয় প্রথম বিচারপতি। ইহার পূর্বে রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হাইকোর্টের জজ হইবার সনদ পাইয়াছিলেন কিন্তু সেই সনদ ভারতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয় ('রামমোহন' দ্র)। শম্ভুনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

শরচ্চন্দ্র দাশ (১৮৪৯-১৯১৭ খ্রী) চট্টগ্রাম জেলার আলামপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্ম। প্রথমে দার্জিলিঙের একটি ভুটিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। উক্ত বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক উগ্যেন্ গ্যাছোর সহিত তিব্বতের টাসি-লুম্পু নগরীতে যান। লাসার রাজপ্রাসাদের পুস্তকাগার হইতে বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তিব্বতী ভাষা শিখিয়া লাসাতে লামার পরিচ্ছদে 'কাকু লামা' বা 'নেপালী লামা' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রকৃত পরিচয় জানাজানি হইলে সংগৃহীত পুঁথিপত্র লইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। তিনি রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. (১৮৪৫ খ্রী) খেতাব পান। শ্যামদেশ হইতে রাজকীয় পদক পান। তাঁহার ভৌগোলিক তথ্যের মধ্যে নেপাল, তিব্বত ও সিকিমের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়। তাঁহার মানচিত্র ও অন্যান্য বিবরণী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভারত গভর্নমেন্টের কূটনৈতিক কার্যে তিনি চীনে গমন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেকলে সসৈন্যে তিব্বত সীমান্তে গেলে, তিনি উপদেষ্টারূপে সঙ্গে ছিলেন। মেকলে তাঁহাকে 'হার্ডি সন্ অভ্ সফট্ বেঙ্গল' বলিয়াছিলেন। তিনি তিব্বত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ পর্যটন করেন। বৌদ্ধসাহিত্য ও তিব্বত-সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 'বুদ্ধিস্ট্ টেক্সট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা ও 'জার্নাল' প্রকাশ করেন। বহু সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থের সম্পাদক ও অনুবাদক। তিব্বতী-সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান সম্পাদনা তাঁহার একটি মহৎ কাজ। এশিয়াটিক সোসাইটি অভ্ বেঙ্গলের

সহিত যেমন তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, সেইরূপ সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার কার্যে সহায়তা করেন। পরবর্তীকালে পরিষদের বিশেষ সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। তিনি 'জার্নি টু লাসা অ্যান্ড সেন্ট্রাল টিবেট', 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা (১ম-৩য় খণ্ড)', 'ইন্ডিয়ান পণ্ডিট্স্ ইন দি ল্যান্ড অভ্ স্নো' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। চট্টগ্রাম শহরে স্বীয় বাসভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপদ ভট্টাচার্য

শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১-১৯২০ খ্রী)। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর পত্নী। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক-গোষ্ঠীতে ছিলেন এবং উভয়ের বহু রচনা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু নাম-প্রকাশে দুইজনেরই ছিল সমান কুণ্ঠা। বহু-প্রশংসিত 'শুভবিবাহ' গ্রন্থেও লেখিকার নাম ছিল না।

পিতা শশিভূষণ বসুর কর্মস্থল লাহোরে তাঁহার শৈশবকাল কাটে। ঐ স্থানে প্রথমে বঙ্গবিদ্যালয়ে পরে ইওরোপীয় স্কুলে লেখাপড়া করেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের বাল্যসুহৃদ্; সেই সূত্রে শরৎকুমারীও ঠাকুরবাড়ির সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার অনেক লেখা নানা পত্রিকায় ছড়াইয়া আছে, সংকলিত হয় নাই। 'শুভবিবাহ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন ঃ 'মেয়ের কথা মেয়েতে যেমন করিয়া লিখিয়াছে, এমন কোনও পুরুষ গ্রন্থকার লিখিতে পারিত না। ... এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনও গল্পের বই-এ আমরা দেখি নাই।'

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮ খ্রী) জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে (১৫ সেপ্টেম্বর)। পিতা ঃ মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ঃ ভুবনমোহিনী দেবী। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র 'হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল'-এ পড়িতেন। পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের দুর্গাচরণ এম. ই. স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল-এ প্রবেশ করেন। এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া টি. এন. জুবিলী কলেজ-এ এফ. এ. পড়িতে থাকেন। এই সময়ে (নভেম্বর, ১৮৯৫ খ্রী) তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয় এবং তাঁহার কলেজের শিক্ষাও সমাপ্ত হয়। ভাগলপুরে ছাত্রাবস্থাতেই শরৎচন্দ্র সাহিত্যরচনা শুরু করেন। বনেলীরাজ এস্টেটে প্রথম চাকরি লন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাজ ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশে নানা দেশ ঘুরিয়া একসময় মজঃফরপুরে আসেন। সংগীতজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি রটায় স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহু তাঁহাকে নিজের কাছে রাখেন। অনন্তর কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পর একদা (১৯০৩ খ্রী) গোপনে ব্রহ্মদেশে চলিয়া যান। সেখানে দীর্ঘ বার-তের বৎসর কাটাইয়াছিলেন। মধ্য কলিকাতায় আসিয়া এক বিপন্না ব্রাহ্মণ-যুবতীকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্রহ্মদেশে লইয়া যান এবং তাঁহাকেই (হিরণ্ময়ী দেবী) শেষ পর্যন্ত জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের 'স্বরাজ-আন্দোলনে' যোগ দেন, কিন্তু বিপ্লবীদলের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল।

১৩০৯ বঙ্গাব্দে 'কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতা'র জন্য আত্মীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে 'মন্দির' শীর্ষক একটি গল্প লেখেন। গল্পটি প্রথম স্থান লাভ করিয়া এই বৎসরেই প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩১৪ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' মাসিকপত্রে তাঁহার দ্বিতীয় গল্প 'বড়দিদি' বাহির হয়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ হইতে 'যমুনা', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গবাণী', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'বসুমতী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা মুদ্রিত হয় ও পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থগুলির তালিকা ঃ 'বড়দিদি' (১৯১৩ খ্রী); 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিত মশাই' (১৯১৪ খ্রী); 'মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প' (১৯১৫ খ্রী); 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', (১৯১৬ খ্রী); 'শ্রীকান্ত ঃ ১ম পর্ব', 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'চরিত্রহীন' (১৯১৭ খ্রী); 'স্বামী', 'দত্তা', 'শ্রীকান্ত ঃ ২য় পর্ব' (১৯১৮ খ্রী); 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ ১ম খণ্ড' [বসুমতী সংস্করণ] (১৯১৯ খ্রী), 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ ১ম-৪র্থ খণ্ড', 'ছবি', 'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০ খ্রী).; 'বারোয়ারি উপন্যাস' [২১শ ও ২২শ অধ্যায়] (১৯২১ খ্রী).; 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ ৫ম খণ্ড' [বসুমতী সংস্করণ], 'দেনাপাওনা' (১৯২৩ খ্রী); 'নারীর মূল্য' [অনিলা দেবী-ছদ্মনামে], 'নববিধান' (১৯২৪ খ্রী); 'হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী' (১৯২৬ খ্রী); 'শ্রীকান্ত ঃ ৩য় পর্ব', 'ষোড়শী' ['দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ] (১৯২৭ খ্রী); 'রমা' ['পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপ] (১৯২৮ খ্রী]; 'তরুণের বিদ্রোহ' [সন্দর্ভ] (১৯২৯ খ্রী); 'শেষ প্রশ্ন' (১৯৩১ খ্রী); 'স্বদেশ ও সাহিত্য' [সন্দর্ভ] (১৯৩২ খ্রী); 'শ্রীকান্ত ঃ ৪র্থ পর্ব' (১৯৩৩ খ্রী); 'অনুরাধা, সতী ও পরেশ', 'বিরাজ বৌ' [নাট্যরূপ], 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড' [বসুমতী সংস্করণ], 'বিজয়া' ['দত্তা'র নাট্যরূপ] (১৯৩৪ খ্রী); 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ঃ ৭ম খণ্ড' [বসুমতী সংস্করণ], 'বিপ্রদাস'

(১৯৩৫ খ্রী) ; 'রসচক্র' [বারোয়ারি উপন্যাস, পৃ ৩-১৩-এর ১৪ পংক্তি পর্যন্ত]।

তাঁহার তিরোধানের পর প্রকাশিত পুস্তকাবলী : 'শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ', 'ছেলেবেলার গল্প', 'শুভদা' (১৯৩৮ খ্রী) ; 'শেষের পরিচয়' [অসমাপ্ত উপন্যাস ; শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সম্পূর্ণ করেন] (১৯৩৯ খ্রী) ; 'শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' (১৯৪৮ খ্রী) ; 'শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' (১৯৫১ খ্রী)।

বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় কাহিনীকার। তাঁহার রচনায় বাঙালী নিম্নমধ্যবিত্ত-জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়াছে। বঞ্চিতের মর্মবেদনা এবং নারীহৃদয়ের জটিল রহস্যের আলেখ্য-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। ভাষাভংগীতে শরৎচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকিলেও তাঁহার নিজস্বতাও কিছু কম নহে। তাঁহার ভাষা সুস্নিগ্ধ, সহজ, সরল এবং হৃদয়াবেগে পূর্ণ। কাহিনীরচনার দক্ষতায় তাঁহার প্রতিভা বিস্ময়কর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী সুবর্ণ পদক (১৯২৩ খ্রী), বংগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশিষ্ট সদস্য পদ (১৯৩৪ খ্রী) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি. লিট্. উপাধি (১৯৩৬ খ্রী) প্রদান করেন। কলিকাতার পার্ক নার্সিং হোমে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬ জানুয়ারি, ১৯৩৮ খ্রী)।

নরেন্দ্র দেব

শরৎচন্দ্র রায় (১৮৭১-১৯৪২ খ্রী)। আইনসম্মত-পন্থায় আদিবাসীদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাঁচি যান (১৮৯৭ খ্রী) এবং সেই সূত্র হইতে ক্রমশঃ নৃতত্ত্ববিদ্যায় আত্মনিয়োগ করেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় আদিবাসী-জীবনের বিষয়ে লেখা আরম্ভ করেন (১৯১৩ খ্রী)। দুই একটি প্রবন্ধ বংগীয়-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুণ্ডাজাতির বিষয়ে তাঁহার প্রথম প্রামাণ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়। পরে উরাঁও জাতি (১৯১৫ খ্রী), বিরহড় (১৯২৫ খ্রী), উরাঁওদের ধর্ম ও আচার (১৯২৮ খ্রী), ভুইয়াঁ (১৯৩৫ খ্রী) এবং খাড়িয়া (১৯৩৭ খ্রী) জাতির বিষয়ে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক পত্রিকা 'ম্যান-ইন-ইণ্ডিয়া' প্রকাশিত করিতে থাকেন। আদিবাসী-দের ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে তিনি সরকারকে সহায়তা দেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হন। এতদ্ভিন্ন দেশে ও বিদেশে নানাভাবে আদৃত ও সম্মানিত হন। শরৎচন্দ্র বিহার ও ওড়িশার আইনসভার সদস্য ছিলেন এবং পরে সাইমন কমিশন এবং লোথিয়ন কমিটিতেও সাক্ষ্যদানের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁহার লেখায় আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিবরণ প্রকাশিত হয়। রাঁচি শহরে শরৎচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। আজও তিনি ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গুরুরূপে সম্মানিত হন।

নির্মলকুমার বসু

শর্মিষ্ঠা দৈত্যপতি বৃষপর্বার কন্যা, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির ('যযাতি' দ্র) কনিষ্ঠা ভার্যা। একবার ভ্রান্তিবশতঃ জলক্রীড়ান্তে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার বস্ত্র বিনিময় হইলে তাঁহাদের কলহ হয়। ক্রুদ্ধ শর্মিষ্ঠা কর্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত দেবযানীকে রাজা যযাতি উদ্ধার করেন। শর্মিষ্ঠার আচরণে অসন্তুষ্ট ও রাজ্যত্যাগে উদ্যত শুক্রাচার্যের কোপ প্রশমিত করার জন্য দেবযানীর শর্তানুযায়ী শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করেন এবং যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহের পর তাঁহাদের অনুগমন করেন। শর্মিষ্ঠার রূপে মুগ্ধ যযাতির সহিত গোপন বিবাহের ফলে শর্মিষ্ঠার দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্রের জন্ম হয়। ইহার জন্য যযাতি শুক্রাচার্যের নিকট জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ পান। শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধে জরা গ্রহণ করিয়া স্বযৌবন পিতাকে দান করেন। সহস্র বৎসর পরে যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

যূথিকা ঘোষ

শল্যচিকিৎসা প্রাচীন যোদ্ধাদের দেহে বিদ্ধ শল্য বা তীর উৎপাটনের প্রক্রিয়া হইতে আয়ুর্বেদীয় শল্যতন্ত্র বা শল্যচিকিৎসার উৎপত্তি। প্রাচীন ভারতের শল্য-চিকিৎসক সুশ্রুতের কথা সর্বজনবিদিত। সুশ্রুত শারীরস্থান-শাস্ত্রজ্ঞ ও শল্যচিকিৎসায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার মতে শল্যতন্ত্রপ্রক্রিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত : ১. ছেদন (অ্যাম্পুটেশন), ২. ভেদন (এক্সসিসন্), ৩. লেখন (স্ক্রেপিং), ৪. এষ্যন (প্রোবিং), ৫. আহরণ (এক্সট্রাক্শন), ৬. বিস্রবণ (ড্রেনেজ), ৭. সীবন (স্যুটিউরিং)। এমন কি পুনর্গাঠনিক শল্য-তন্ত্রের (প্ল্যাস্টিক সার্জারী) জ্ঞানও প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসকদের ছিল। মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসাও তাঁহারা জানিতেন। সম্ভবতঃ ভারত হইতেই শল্যতন্ত্র-জ্ঞান সুমের, ব্যাবিলোন, আরব প্রভৃতি দেশের মাধ্যমে ইওরোপে ছড়াইয়া পড়ে। আজও কর্তিত নাসিকার পুনর্গঠন-পদ্ধতি 'ইণ্ডিয়ান রাইনো প্ল্যাসটি' নামে বিখ্যাত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শরীরে চর্মের স্থানান্তর বা সংযোজনের (স্কিন-গ্রাফটিং) কথা আছে। পরবর্তী যুগে 'ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসক' (বার্‌বার্ সার্জন) নামে

এক শ্রেণীর শল্যচিকিৎসকেরও উদ্ভব হইয়াছিল। ইঁহারা ক্ষুর ও নরুনের সাহায্যে অস্ত্রোপচার করিতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন ও উইলিয়াম হাণ্টার নামক চিকিৎসক ভ্রাতৃদ্বয় শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। তবে প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। কিন্তু লুই পাস্তুরের ('পাস্তুর লুই' দ্র) জীবাণু সম্বন্ধীয় গবেষণার পর হইতে পাশ্চাত্যজগতে জীবাণুনাশক নানা ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এগুলির প্রয়োগে সহজেই জীবাণু-সংক্রমণ নিবারণ করা যায়। জার্মানির বের্গমান বাষ্পের সাহায্যে জীবাণু-নিধনের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আজও ইহা 'স্টেরিলাইজেশন' বা 'অটোক্লেভিং' নামে সুপরিচিত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ডোমাগ্ 'প্রন্‌টোসিল' আবিষ্কার করিয়া এই দিকে আর এক পদ অগ্রসর হন। ইহার পর সাল্‌ফা-গোষ্ঠীয় ঔষধ আবিষ্কৃত হয় ; এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লণ্ডনের সেণ্ট মেরি হাসপাতালের ডঃ ফ্লেমিং তাঁহার সহযোগীদের সঙ্গে মিলিতভাবে গবেষণা করিয়া ছত্রাক ('ছত্রাক' দ্র) হইতে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে অস্ত্রোপচারের পরে জীবাণু-সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় দূরীভূত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঈথর, ক্লোরোফর্ম, স্থানীয় অবসাদক (লোক্যাল অ্যানেস্‌থেটিক) প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে অস্ত্রোপচার যেমন সহজ হইয়াছে, শল্যচিকিৎসার উন্নতিও তেমনি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। অধুনা শল্যচিকিৎসা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যেমন, সাধারণ শল্যচিকিৎসা (জেনারেল সার্জারি), হৃৎপিণ্ড ও শিরাধমনীর শল্যচিকিৎসা (কার্ডিও-ভ্যাস্‌কিউলার সার্জারি), পুনর্গঠনিক শল্যচিকিৎসা (প্ল্যাস্‌টিক সার্জারি), স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের শল্যচিকিৎসা (গাইনি-কলজিক্যাল সার্জারি), চক্ষুশল্যচিকিৎসা (অফ্‌থ্যাল-মোলজিক্যাল সার্জারি), মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের শল্য-চিকিৎসা (নিউরো সার্জারি) ইত্যাদি।

অশোক বাগ্‌চী

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮১৫-১৯২৮ খ্রী) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, বাগ্মী ও হিন্দুধর্মের রহস্য-ব্যাখ্যাতা। জন্ম ফরিদপুর জেলার মুগডোবাগ্রামে। দেশে যখন খ্রীষ্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মধর্মের আধিপত্য তখন তিনি হিন্দু-ধর্মপ্রচার ও শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হন। তিনি ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে হরিসভা ও ধর্মসভা স্থাপিত হয়। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় আসিয়া লেখনী চালনা করেন ও বক্তৃতা দেন। তাঁহার চেষ্টায় অনেকের হিন্দুধর্মে অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব দূর হয়। ধর্মপ্রচারে অনেকে তাঁহার সহায়তা করেন। মুখ্যতঃ তাঁহার প্রেরণায় 'বঙ্গ-বাসী' পত্রিকা হিন্দুধর্মের মুখপাত্র হইয়া দাঁড়ায়। তিনি 'বেদব্যাস' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) নামে একখানি মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। তিনি সহবাস-সম্মতি (এজ অভ্ কনসেণ্ট ঃ ১৮৯০-৯২) আইনের বিরুদ্ধতা করেন। এই উপলক্ষে 'বঙ্গবাসী' রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয় (১৮৯১ খ্রী)। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দিকে তাঁহার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পরে আর তাঁহাকে সমর্থন করেন নাই। অতঃপর কিছুকাল স্বগ্রামে বাস করিয়া বহরমপুরে টোলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং শাস্ত্রানুশীলন ও গ্রন্থরচনায় জীবন অতিবাহিত করেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু নিবন্ধ বিক্ষিপ্ত আছে। তাঁহার লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ধর্মব্যাখ্যা' (১৮০৬ শক), 'বেদ বিষয়ে ইংরেজী মতের প্রতিবাদ' (১৮০৭ শক), 'ভক্তিসুধালহরী' (১৮২৯ শক, ২য় সং) 'ভগবদ্গীতা' (১৩১৯, ১১শ সং) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

হারাধন দত্ত

শশাঙ্ক বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট। ইঁহার বংশ-পরিচয় বা প্রথম জীবনের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছুই সঠিকরূপে জানা যায় না। বিহারে রোটাসগড়ের গিরিগাত্রে 'শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক' এই নামটি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি প্রথমে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি গুপ্তবংশীয় মহাসেন-গুপ্তের সামন্ত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে অথবা তাহার কিছু পূর্বেই তিনি বাংলার স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা হন। তাঁহার রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার 'রাজবাড়িডাঙ্গা'য় খনন করিয়া এই নগরীর সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ রক্তমৃত্তিকা নামক প্রাচীন বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। রাঢ়দেশের এই অঞ্চল তখন গৌড়দেশ নামে অভিহিত হইত এবং তিনি প্রথমে এই গৌড়রাজ্যেরই রাজা ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করার ফলেই সম্ভবতঃ গৌড়দেশ বলিতে সমগ্র বাংলাদেশ বুঝাইত। শশাঙ্ক সমগ্র বাংলাদেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। পশ্চিম কান্যকুব্জ এবং দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা পর্যন্ত জয় করেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' হইতে শশাঙ্কের কান্যকুব্জ-অভিযান সম্বন্ধে সংবাদ পাওয়া যায়। কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্মণ স্থানীশ্বরের (থানেশ্বর) রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে

('রাজ্যশ্রী' দ্র) বিবাহ করেন। প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজ্যবর্ধন পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যলাভ করিয়াই সংবাদ পাইলেন যে মালবের অধিপতি গ্রহবর্মণকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে ভগ্নীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া পথে মালবরাজকে পরাস্ত ও নিহত করেন। কিন্তু কান্যকুব্জে পৌঁছিবার পূর্বেই গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক তাঁহাকে হত্যা করেন। অতঃপর রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শশাঙ্কের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু পথিমধ্যে শুনিলেন যে তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পালাইয়া বিন্ধ্যপর্বতের দিকে গিয়াছেন। এই সংবাদে হর্ষবর্ধন ভগ্নীর সন্ধানে যান ও তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভ করেন। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের ('বাণভট্ট' দ্র) 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে ঘটনার বিবরণ এই খানেই শেষ হইয়াছে; এবং অন্য কোনও সূত্র হইতে ইহার উপসংহার জানা যায় না। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে, মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হইয়া নিরস্ত্র রাজ্যবর্ধন একাকী শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্তৃক নিহত হন। বাণভট্ট ইহার কোনও কারণ দেখান নাই। পক্ষান্তরে হর্ষবর্ধনের শিলালিপিতে আছে যে রাজ্যবর্ধন 'সত্যানুরোধে' শত্রুভবনে প্রাণত্যাগ করেন। আবার চীনদেশীয় পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধনের মন্ত্রীদের দোষেই রাজ্যবর্ধন শত্রুহস্তে নিহত হন। এই তিনটি বিভিন্ন মতামত হইতে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বাণভট্টের কথা বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় যে, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াই রাজ্যবর্ধনকে স্বভবনে লইয়া গিয়া হত্যা করেন। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া থাকিলেও তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক কান্যকুব্জ অধিকার করেন। তাহার পরের ঘটনা জানা নাই। কিন্তু তিনি যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলা ও ওড়িশার রাজা ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত মগধ (দক্ষিণ বিহার) তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। তাঁহার নামে বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের যে অপবাদ ছিল হিউএন্-ৎসাঙ্ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার স্বপক্ষে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শশাঙ্কমোহন সেন (১৮৭২-১৯২৮ খ্রী) কবি ও সমালোচক। জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলার ধলঘাট নামক গ্রাম। চট্টগ্রাম হইতে এন্‌ট্রান্স ও এফ. এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন। পরে বি. এল. পাশ করিয়া চট্টগ্রামে ওকালতি শুরু করেন। চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে তাঁহার 'সিন্ধুসংগীত', 'শৈলসংগীত', 'স্বর্গে ও মর্ত্যে', 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ের অধ্যাপনা-কার্যে যোগদান করেন। এই সময়েই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গোপালদাস চৌধুরী অধ্যাপক'-রূপে যে বক্তৃতা দেন, তাহাই 'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

তাঁহার লেখা গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা এখানে দেওয়া হইলঃ—'সিন্ধুসংগীত' (কাব্য, ১৮৯৫ খ্রী), 'শৈলসংগীত' (কাব্য, ১৮৯৯ খ্রী), 'সাবিত্রী' (নাটক, ১৯০৯ খ্রী), 'স্বর্গে ও মর্ত্যে' (কাব্য, ১৯১২ খ্রী), 'বঙ্গবাসী' (সমালোচনা, ১৯১৫ খ্রী), 'বিমানিকা' (কাব্য, ১৯২৪ খ্রী), 'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' (সমালোচনা, ১৯২৮ খ্রী), 'বাণীমন্দির' (সমালোচনা, ১৯২৮ খ্রী), 'বিশ্বামিত্র' (কাব্যনাট্য, কবির মৃত্যুর পর 'অঞ্জলি' পত্রিকায় প্রকাশিত)।

প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৬৪ খ্রী) বিশিষ্ট অধ্যাপক ও সাহিত্য-সমালোচক। জন্মস্থান ঃ বরিশাল জেলার চন্দ্রহার গ্রাম। পিতা ঃ কালীপ্রসন্ন। স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া বি. এ. পাশ করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করিয়া তিনি পি. এইচ্. ডি. উপাধি লাভ করেন (১৯৪০ খ্রী); ইহার দুই বৎসর পূর্বেই তিনি পি. আর. এস. হইয়াছিলেন (১৯৩৮ খ্রী)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথমে লেক্‌চারার ও পরে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হন (১৯৫৫ খ্রী)। 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) রচনা করিয়া ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীঃ 'Obscure Religious Cults ঃ As a Background of Bengali Literature' (১৯২৬ খ্রী), 'উপমা কালিদাসস্য' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'ত্রয়ী' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ), 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে' (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

শশিভূষণ বিদ্যালংকার, চক্রবর্তী (১৮৬২-১৯৪৭ খ্রী) শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। প্রধানতঃ 'জীবনীকোষ' গ্রন্থের সংকলয়িতা হিসাবেই পরিচিত। জন্মঃ অবিভক্ত বাংলার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বিদ্যাকূট গ্রামে। কলিকাতার 'কেশব একাডেমী' বিদ্যালয়ে কিছু-কাল শিক্ষকতা করেন এবং পরে রেঙ্গুন প্রবাসী হন। রেঙ্গুনে 'বেঙ্গল একাডেমী' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানেই শিক্ষকতাকালে বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। শেষ জীবনে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তিঃ 'জীবনীকোষ', ২ খণ্ডে সম্পূর্ণ পৌরাণিক অংশ এবং ৭ খণ্ডে সংকলিত (অসম্পূর্ণ) ঐতিহাসিক অংশ। 'বাল্যসখা' ও 'স্বাবলম্বী' নামে দুইখানি সাময়িকপত্র সম্পাদনার কৃতিত্বেও তাঁহার অংশ ছিল।

অমলেন্দু ঘোষ

শশীকুমার হেশ (১৮৬৯-?) প্রতিভাধর তৈলচিত্র-শিল্পী। পৈতৃক নিবাস মৈমনসিংহ জেলার সাজিউড়া গ্রাম। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য ইতালি যাত্রা করেন। রোমের 'রয়্যাল একাডেমি'তে তিন বছর পেন্টিং ক্লাশ-এর ছাত্র ছিলেন। অতঃপর মিউনিকে তাঁহার শিক্ষা। সেখান হইতে লণ্ডন যান। এখানে তিনি একাধিক বিশিষ্ট ইওরোপীয় ও ভারতীয়ের পোর্ট্রেট্ আঁকেন। ইওরোপে প্রায় ছয় বৎসর কাটাইয়া কলিকাতায় আসেন (১৯০০ খ্রী) এবং শিল্পীরূপে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনে প্রবেশের পূর্বে জনৈকা ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্বে উভয়ে ব্রাহ্ম-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বিবাহে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী পৌরোহিত্য করেন। শশীকুমার মুখ্যতঃ পোর্ট্রেট্ বা প্রতিকৃতি-শিল্পী। তিনি বরোদার গায়-কোয়াড়ের একাধিক পারিবারিক চিত্র আঁকেন।

অশীতিপর বৃদ্ধ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ণাবয়ব পোর্ট্রেট্ অঙ্কন তাঁহারই কীর্তি (মে, ১৯০০ খ্রী)। তাঁহার আঁকা 'ডাব্লিউ. সি. বোনারজি', 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী' ও 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর পোর্ট্রেট্ যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। কলিকাতার মার্বেল প্যালেস-এ তাঁহার আঁকা সর্বাধিক তৈলচিত্র ও অন্যান্য চিত্র সংগৃহীত আছে। দীর্ঘকাল কলিকাতা বাসের পর তিনি স-পরিবারে ফ্রান্স যান এবং সম্ভবতঃ সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কমল সরকার

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ (১৮৮৫-১৯৬৯ খ্রী) বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং বাংলাভাষার অধ্যাপক। বসিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১০ জুলাই)। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার সহজাত অনুরাগ ছিল। সিটি কলেজ হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি. এ. (১৯১০ খ্রী) এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন (১৯১২ খ্রী)। আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া তিনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বসিরহাট কোর্টে ওকালতী শুরু করেন। অতঃপর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকরূপে কাজ করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বৌদ্ধগান ও দোহা-বিষয়ে গবেষণা করিয়া তিনি প্যারিস হইতে ডি. লিট্. ডিগ্রী লাভ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিবার পর রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার বিভাগীয় প্রধান-রূপে যোগদান করেন। তাঁহার লেখা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্যঃ 'ইকবাল', 'ওমরখৈয়াম', 'রকমারি' (১৯৩১ খ্রী), 'বাংলাসাহিত্যের কথা' (১৯৫৩ খ্রী), 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'শেষ নবীর সন্ধানে' (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি। 'বিদ্যাপতি-শতক' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তিনি অনেক তথ্যপূর্ণ মূল্যবান্ প্রবন্ধ লেখেন এবং পরিষদের সহিত তাঁহার আমৃত্যু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

শিশিরকুমার সিংহ

শাক্তপদাবলী, সংগীত বাঙালীর মাতৃভাবানুরাগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক প্রকাশ শাক্ত-সংগীত। গানগুলি শাক্ত-পদাবলী নামে পরিচিত। পল্লী-নির্ভর বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের গভীর সুর শাক্ত-সংগীতের মধ্যে পরিস্ফুট। ইহার প্রকাশভঙ্গীতে গ্রাম-বাংলার উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ, নিরাবরণ ও নিরাভরণ সারল্য এবং প্রবাদ-প্রবচনাদিও স্থান পাইয়াছে। কেবল দুঃখ-চিত্রই নয়, দুঃখ-মুক্তির কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে ধর্মের গোঁড়ামি নাই। গভীর অন্তর্বেদনার সঙ্গে আশার আনন্দ এখানে স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে। শাক্ত-সংগীতের পথিকৃৎ সাধক কবি 'কবি-রঞ্জন' রামপ্রসাদ ('রামপ্রসাদ', 'লোকসাহিত্য' দ্র)। তাঁহার পূর্বে এই ধরনের মাতৃগীতি বাংলাসাহিত্যে দেখা যায় নাই। তাঁহার গান তেজ, সাধনা ও আত্ম-সমর্পণের ভাবে ভরা। প্রসাদী সংগীত আগম-তন্ত্রের তত্ত্বে পরিপূর্ণ, কিন্তু দুর্বোধ্য নয়; নীরসও নয়।

ভক্তির নিবিড়তায়, প্রকাশের সরলতায় তত্ত্বের দুরূহতা ঘুচিয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদকে অনুসরণ করিয়া অসংখ্য কবি শাক্ত-সংগীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অম্বিকা-কালনার কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। তাঁহার 'মজিল মন-ভ্রমরা কালীপদ-নীল-কমলে', কিংবা 'নবজলধর কায়, কালোরূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায়' প্রভৃতি গান শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার পর্যায়ভুক্ত। তাঁহার গানে সমাজচেতনা অপেক্ষা পারি-বারিক ভাবেরই প্রাধান্য; গানগুলিতে বৈষ্ণবভাবের প্রভাবও লক্ষণীয়। বগুড়া-সেরপুরের সাধক কবি গোবিন্দ চৌধুরীর গানও কবিত্বময়। কবির ভক্তিভাব জ্ঞানগরিমায় সংযত। আন্দুল গ্রামের সাধক ভক্ত মহেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য-এর গানও তত্ত্বগভীর ও ভাবময়। সাধক কবিরূপে চোৎখণ্ড আলিপুরের নীলাম্বর মুখো-পাধ্যায় ও বালির রামলাল দাসদত্তের নামও উল্লেখ-যোগ্য। অষ্টাদশ শতক হইতে বহু রাজা, মহারাজাও শক্তিসাধনার পোষকতা করিয়াছেন এবং নিজেরাও শাক্ত-সংগীত রচনা করিয়াছেন। নদিয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র, নবদ্বীপ রাজবংশের নরচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, ইতিহাস বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, কোচবিহারের হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, নাড়াজোলের রাজা মহেন্দ্র পাল খান এবং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ প্রভৃতি অনেকে বহু শ্যামাসংগীত রচনা করিয়াছেন।

রাজাদের দেওয়ান কবিদের মধ্যে ব্রজকিশোর রায়, তৎপুত্র নন্দকিশোর ও রঘুনাথ রায় এবং ত্রিপুরারাজের দেওয়ান রামদুলাল নন্দীর নাম উল্লেখযোগ্য। শাক্ত-সংগীতের প্রধান ভাগ দুইটিঃ সাধনসংগীত ও লীলা-সংগীত। সাধনসংগীত তত্ত্বপ্রধান। এগুলি শক্তিতত্ত্ব ও সাধনতন্ত্রের ইঙ্গিতে পূর্ণ কিন্তু পদগুলি তত্ত্বগত হইলেও তত্ত্বভারাক্রান্ত নয়, রসস্নিগ্ধ। দেবীকে জননী কল্পনা করিয়া সন্তানভাবে সাধক মনের কথা বলিয়া-ছেন। সন্তানের অনুযোগ-অভিযোগ-আত্মনিবেদনে গানগুলি প্রাণময়।

লীলাসংগীত সম্পূর্ণভাবে রসপ্রধান, বাৎসল্য-রসের প্রস্রবণ। এখানে দেবীকে কন্যা সাজাইয়া বাঙালী ভক্ত লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন। এই লীলার আশ্রয়-আলম্বন মেয়ে উমা, বিষয়-আলম্বন মা মেনকা। গিরিরাজ অষ্টমবর্ষীয়া উমাকে বৃদ্ধ মহাদেবের করে অর্পণ করিয়াছেন। উমা সম্বৎসর কৈলাসে থাকেন; বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য গিরিপুরে আসিয়া আবার চলিয়া যান। পুরাণের এই ক্ষীণ কাহিনী সূত্রে মা মেনকার অপার বাৎসল্য অবলম্বন করিয়া লীলা-গান-গুলি রচিত। এগুলিতে পরগৃহগত কন্যার জন্য বাঙালী মাতৃহৃদয়ের অনন্ত মমত্ব ও বেদনা বাণীবদ্ধ হইয়াছে। লীলাগানের আবার দুইভাগ, আগমনী ও বিজয়া। উমার পতিগৃহে আগমন উপলক্ষে রচিত গানগুলির নাম আগমনী; এবং পিতৃগৃহ হইতে বিদায় উপলক্ষে রচিত গানগুলির নাম বিজয়া। আগমনী-বিজয়া বাঙালী মায়ের অশ্রু-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। রামপ্রসাদ উভয় প্রকার গানই রচনা করিয়াছেন। তবে লীলাসংগীতকে তিনি ছুঁইয়া গিয়াছেন মাত্র। কমলাকান্তে বরং লীলাসংগীত স্ফুটতর। সাধক কবিগণ লীলা অপেক্ষা সাধনার কথাই বেশি বলিয়াছেন। লীলার বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছে কবি-পাঁচালী-যাত্রা গানগুলির মধ্যে। শাক্তসংগীতের বিবর্তন-ধারায় এই ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ হইতে শাক্তসংগীত কবি আখড়াই পাঁচালীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি এগুলি যাত্রার পালাতেও স্থান লাভ করে। হরু ঠাকুর, রাম বসু, নীলমণি পাটনী, অ্যান্টুনি ফিরিঙ্গি, নিধুবাবু, কালী-মির্জা, রূপচাঁদ পক্ষী, দাশরথি রায়, রসিক রায়, নীলকণ্ঠ, মদন মাস্টার, ব্রজমোহন রায়, তিনকড়ি বিশ্বাস প্রভৃতির গানে ঘরোয়া রসের প্রাধান্য। সাধন রাজ্যের কথা তাহাতে বড় নাই, আছে পারিবারিক জীবনের তুচ্ছ ক্ষুদ্র কথা, লোকলৌকিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এবং মাতৃহৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। এই প্রকারের গান রচনায় রাম বসু ছিলেন সিদ্ধহস্ত। দাশরথি রায়ের সাধন-সংগীত, 'দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি', কিংবা রসিক রায়ের 'আয় মা সাধন সমরে, দেখবো মা হারে কি পুত্র হারে'— অতি উচ্চাঙ্গের সাধন-ভাবে পূর্ণ। 'কণ্ঠের পদ' (নীল-কণ্ঠের গান) ভক্তি উচ্ছ্বাসে আপ্লুত; এবং মদন মাস্টারের গান মাতৃনামের মহিমায় বিগলিত।

শাক্তভাব বাঙালীর জীবনে গূঢ়সঞ্চারী। তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীও ইহার দ্বারা আকৃষ্ট। মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র আগমনী-বিজয়ার কবিতা লিখিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র নাটকে শ্যামাসংগীত পরি-বেশন করেন। মুসলমান কবিরাও শাক্তসংগীত রচনা করিয়াছেন। দরাপ খাঁর গঙ্গাস্তোত্র বিখ্যাত। নজরুল ইসলামের 'বল্ রে জবা বল্' কিংবা 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' প্রভৃতি গানে অপূর্ব ভাবাবেগ ও বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শাক্তপীঠ শাক্তমতে যে সকল স্থান শক্তির অর্থাৎ দেবী পূজার অধিষ্ঠানভূমি, সেইগুলিই শাক্ততীর্থ। এই গুলির ভিতর আবার কতকগুলি স্থান বিশিষ্ট পীঠ-

রূপে স্বীকৃত। এ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী এই যে, সত্যযুগে দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা-শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন। শোকোন্মত্ত মহাদেব মৃত সতীদেহকে মস্তকে লইয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তাহাতে সৃষ্টি বিপর্যস্ত হয় দেখিয়া বিষ্ণু শঙ্করের অনুগমন করিয়া চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলেন। মহাদেব পূর্বদিকে যতদূর গমন করেন, ততদূর পর্যন্ত যাজ্ঞিক ভূমি বলিয়া কথিত হয় এবং যে-যে স্থানে সতীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পতিত হয়, তাহাই পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই পুণ্য স্থানগুলিই শাক্তপীঠ।

প্রচলিত মতে শাক্তপীঠের সংখ্যা ৫১, উপপীঠের সংখ্যা ২৬। একাধিক গ্রন্থে এই ৫১টি পীঠের যেখানে যেখানে যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ আছে। তন্মধ্যে 'তন্ত্রচূড়ামণি' গ্রন্থের বিবরণই বহুপ্রচলিত। এই গ্রন্থে শাক্তপীঠের অধিদেবতা ও ভৈরবের নামও উল্লিখিত আছে। যেমন—সুগন্ধা (বরিশাল)—নাসিকা, দেবী ঃ সুনন্দা, ভৈরব ঃ ত্র্যম্বক ; জলন্ধর—স্তন, দেবী ঃ ত্রিপুরমালিনী, ভৈরব ঃ ভীষণ ; নেপাল—নাসিকা, দেবীঃ সুনন্দা, ভৈরবঃ ত্র্যম্বক ; জলন্ধর—নাভিদেশ, দেবী ঃ বিমলা, ভৈরব ঃ জগন্নাথ ; বহুলা (কাটোয়ার কেতুগ্রাম)—বামবাহু, দেবী ঃ বহুলা, ভৈরবঃ ভীরুক ; প্রয়াগ—হস্তাঙ্গুলি, দেবী ঃ ললিতা, ভৈরবঃ ভব। কাঞ্চীদেশ (বোলপুরের নিকট কোপাই নদীর তীরে)—কঙ্কাল, দেবী ঃ দেবগর্ভা, ভৈরব ঃ রুরু ; মিথিলা—বামস্কন্ধ, দেবী ঃ উমা, ভৈরব ঃ মহোদর ; নলহাটি—নলা, দেবী ঃ কণিকা, ভৈরব ঃ যোগেশ ; বক্রেশ্বর—মনঃ (ভ্রূমধ্য), দেবী ঃ মহিষমর্দিনী, ভৈরবঃ বক্রনাথ ইত্যাদি।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শাঁখা শাঁখা সামুদ্রিক শঙ্খ বা শাঁখ হইতে প্রস্তুত হয়। শাঁখা যাঁহারা তৈয়ারি করেন তাঁহাদের নাম শঙ্খকার বা শাঁখারি। শঙ্খ মাদ্রাজ অঞ্চলে টিউটিকোরিন, রামনাদ, দক্ষিণ আর্কট প্রভৃতি স্থানে সমুদ্রের গর্ভে পাওয়া যায়। শাঁখা তৈয়ারির শিল্পটি প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিমবাংলাতেই ব্যাপক। ভারত বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর শাঁখারির বাস ছিল। বর্তমানে ইঁহারা কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে বঙ্গের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। শাঁখার এক নাম সাবিত্রী-শাঁখা। যে কোনও বিবাহিতা বাঙালী রমণীর পক্ষে ইহা পরম শ্রদ্ধার বস্তু। স্বামী যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন বিবাহিতা রমণী শাঁখা হাতে দেন। বিধবাদের শাঁখা পরিতে নাই। বিহার এবং ওড়িশার কিছু অঞ্চলেও শাঁখা পরার নিয়ম আছে। বিবাহে শাঁখার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আজকাল শিক্ষিত সমাজে শাঁখা পরার রেওয়াজ কমিয়া গিয়াছে।

শঙ্খকে শাঁখের করাত (বিশেষ ধরনের অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভারি লৌহনির্মিত অতি ধারালো করাত) দিয়া কাটিয়া ৩-৪ জোড়া শাঁখা পাওয়া যায়। আজকাল শাঁখা মেসিনেও কাটা হয়। পরে নানা ডিজাইন এই শাঁখার গায়ে খোদাই করা হয়। শাঁখাতে গালা দিয়াও নক্সা করা হয়।

পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপ, ডোমকল, করিধ্যা (বীরভূম), ব্যারাকপুর, বাটুল, হাটগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে শাঁখা তৈয়ারি হয়।

আশীষ বসু

শান্তিনিকেতন 'শান্তিনিকেতন' মূলতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-নির্মিত একটি অট্টালিকার নাম। এই গৃহটির নাম হইতেই কালে আশ্রম, বিদ্যালয়, পোস্ট-অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড এমন কি ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিও এই নামের সহিত যুক্ত হয়। বোলপুর স্টেশনের নাম ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে হইতে বোলপুর শান্তিনিকেতন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সাধন-ভজনের জন্য কোনও নির্জন স্থানের সন্ধানে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। অজয়-তীরবর্তী রায়পুর বা রাইপুর তখন গণ্ডগ্রাম ; সেখানে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্রাহ্মধর্মানুরক্ত লোকের বাস। মহর্ষি দুইবার সেখানে আসেন। এই আসা-যাওয়ার সময়ে বোলপুর গ্রামের উত্তরের সীমাশূন্য প্রান্তর মহর্ষির মন হরণ করে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১ মার্চ রায়পুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ সিংহের নিকট হইতে মহর্ষি বোলপুর মৌজার ভুবনডাঙ্গা গ্রামে ২০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লন।

মহর্ষি প্রথমে এখানে একটি একতলা গৃহ নির্মাণ করেন। সেই গৃহে বালক রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন। এই গৃহই 'শান্তিনিকেতন' নামে পরিচিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্থির করেন যে, 'শান্তিনিকেতন' গৃহকে কেন্দ্র করিয়া একটি আশ্রম স্থাপন করিবেন। তখন সমস্ত স্থানটিই শান্তিনিকেতন বলিয়া পরিচিত হয়। অতঃপর ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মার্চ (১২৯৪ বঙ্গাব্দ, ২৬ ফাল্গুন) মহর্ষি শান্তিনিকেতনের জন্য ট্রাস্টডীড নিষ্পন্ন করিয়া উহা সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেন। নিজ জমিদারির কয়েকটি পরগনার আনুমানিক ১৮৪৫২ টাকার সম্পত্তি আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থ দান করেন। ট্রাস্টডীড নিষ্পন্ন হইবার দুই বৎসর পরে

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর (১২৯৭ বঙ্গাব্দ, ২২ অগ্রহায়ণ) ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর (১২৯৮ বঙ্গাব্দ, ৭ পৌষ) মহর্ষির ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদিন স্মরণে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বুধবার এই মন্দিরে উপাসনা হয়। ট্রাস্টডীডের সর্তানুসারে এখানে মেলা, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগারাদি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। তাই মন্দির প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ, ১৩০২ বঙ্গাব্দ) মেলা বসিল মন্দিরের উত্তরের মাঠে। বহু বৎসর একদিনের জন্য মেলা হইত —যাত্রা হইত দিনের বেলায় এবং সন্ধ্যার পর হইতে বাজি পোড়ানো হইত। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ এই স্থানে ব্রহ্মবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ অভিভাষণে ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেন। সেই সন্ধ্যায় মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ 'ঔপনিষদব্রহ্ম' শীর্ষক রচনাটি পাঠ করেন। দুই বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বোর্ডিং বিদ্যালয়' এই শান্তিনিকেতন-গৃহকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপন করেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দ, ৭ পৌষ)। 'বিশ্বভারতী' দ্র।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুর নদিয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার ২৩° ১৫′ উত্তর ও ৮৮°২৭′ পূর্বে হুগলি নদীর বামতীরে অবস্থিত। ইহা নবদ্বীপ ধাম হইতে দক্ষিণে, কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট শহর হইতে প্রায় সমান দূরে ও কলিকাতা হইতে ৯৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ইহা একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। এই শহরটির ইতিহাস অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে রাজা গণেশ যখন বাংলার অধিপতি ছিলেন তখন হইতেই ইহার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। নদিয়া-রাজ রুদ্ররায়ের সময় এই শহরটির সমৃদ্ধি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শান্তিপুর বাংলাদেশের একটি অতি প্রসিদ্ধ তন্তুশিল্প-কেন্দ্র ছিল। দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গ হইতে আগত অনেক তন্তুজীবী এখানে আসিয়া শান্তিপুরী নকশার সহিত টাঙ্গাইল নকশাও চালু করিয়াছেন। নদিয়া জেলা বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রভূমি। ইহার প্রভাব শান্তিপুরের উপরও বহুল পরিমাণে রহিয়াছে। কার্তিকী পূর্ণিমার দিন এখানে খুব জাঁকজমকসহকারে রাসোৎসব হয়। এখানে অনেক মন্দির ও মসজিদ আছে। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদটি ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়। শান্তিপুরের শ্যামচাঁদের মন্দির, গোকুলচাঁদের মন্দির এবং জলেশ্বরের মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। নানা পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা হয়। নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও পূর্বে সংস্কৃতচর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় ('আশানন্দ ঢেঁকি' দ্র) নামে একজন বীরপুরুষ এখানে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ আজও তাঁহার বীরত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। বর্তমানে এখানে অনেকগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইয়াছে।

মুক্তি দাশগুপ্ত

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ ঐতিহাসিক অল্‌ সখাওয়ী-র মতে হাজী ইলিয়াসের আদি নিবাস ছিল পূর্ব ইরাণের সিজিস্তানে। রিয়াজ-উস্‌ সালাতিনের মতে ইলিয়াস ছিলেন উত্তর-বঙ্গের শাসনকর্তা আলাউদ্দীন আলি শাহের ধর্মভ্রাতা। বুকাননের মতে তিনি ছিলেন আলি শাহের ভৃত্য। যাহা হউক ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে আলি শাহ্‌কে পরাজিত ও নিহত করিয়া হাজী ইলিয়াস লক্ষ্মণাবতীর (উত্তরবঙ্গ) সিংহাসন দখল ও বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমগ্র বাংলাদেশে এক সার্বভৌম রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ত্রিহুত, চম্পারণ, গোরক্ষপুর, কাশী ও কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন। নেপাল ও ওড়িশার বিরুদ্ধেও তাঁহার যুদ্ধাভিযান সফল হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও গৌরব দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের ঈর্ষ্যা ও আশঙ্কার কারণ হয়। সুতরাং ইলিয়াস শাহ্‌কে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ফিরোজ শাহ এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। তবে ইলিয়াস শাহের সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দিল্লীর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারণী ও সিরাজ আফিফ্‌ ইলিয়াসের বিরুদ্ধে ফিরোজ শাহের জয়লাভের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহের ব্যাপারে ইলিয়াস শাহ্‌ যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শাসনদক্ষতা কিরূপ ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না।

অতুলচন্দ্র রায়

শামুক (শম্বুক) মোলাস্কা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অমেরুদণ্ডী প্রাণী। গঠনবৈচিত্র্যে ইহারা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। স্থলে এবং স্বাদু ও সমুদ্রজলে থাকে। গুগুলি, শামুক, ঝিনুক, কাইটন, কাট্‌ল্‌ফিশ, অক্টোপাস প্রভৃতি প্রাণীরা এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের দেহ নরম, অখণ্ডিত এবং একটি পাতলা পর্দা (ম্যান্ট্‌ল) দিয়া আচ্ছাদিত, সাধারণতঃ পর্দাটি চুনজাতীয় পদার্থের কঠিন

বহিরাবরণ বা খোলা। বিভিন্ন শ্রেণীতে খোলার প্রকার-ভেদ আছে। ঝিনুকের খোলা, সংখ্যায় দুইটি এবং পরস্পর সংযুক্ত— কাট্‌ল্‌ফিস্‌ ও অক্টোপাসের খোলা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত, গুগ্‌লিজাতীয় শামুকের খোলাটি দক্ষিণাবর্ত ও বহিশ্ছিদ্রটি বন্ধ করিবার জন্য একটি ঢাক্‌না (ওপারকুলাম) আছে, কোনও কোনও শামুকের আবার খোলাই নাই। শামুকের বামাবর্ত খোলা স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম এবং দুর্লভ ; এ ধরনের শামুক অনেকে পূজা করিয়া থাকে। নিরামিষাশী ও মাংসাশী উভয় প্রকারেরই শামুক আছে। শ্বাসকার্যের জন্য জলচর শামুকদের ফুল্‌কা এবং স্থলচরদের ফুসফুস ও ফুল্‌কা থাকে। শামুকের রক্ত বর্ণ-হীন, হৃৎপিণ্ডে অলিন্দ ও নিলয় আছে।

একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ—দুই প্রকারের শামুকই দেখা যায়। ইহারা ডিম পাড়ে। মুক্তা, ঝিনুকের বোতাম, শঙ্খ, শাঁখা ও বিভিন্ন প্রকার সজ্জাদ্রব্য শম্বুকপর্বের প্রাণী হইতে উৎপন্ন হয়। শামুকের খোলা হইতে চুন তৈয়ারি হয়। গেঁড়ি, গুগ্‌লি, ঝিনুক, কাট্‌ল্‌ ফিশ ও অক্টোপাস পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়। 'ঝিনুক' দ্র।

অরূপকুমার সিংহ

শারদালিপি লিপি, লিপিতত্ত্ব দ্র

শারীরবিদ্যা জীবিত প্রাণীর অঙ্গ, দেহকলা (টিসু), কোষ প্রভৃতির স্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের যে শাখায় চর্চা করা হয়, তাহাকে শারীরবিদ্যা (ফিজিওলজি) বলে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ (অর্গ্যান) ভিন্ন ভিন্ন জৈব-ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে ; তদনুসারে দেহের অঙ্গ-সমষ্টিকে কয়েকটি তন্ত্রে (সিস্টেম) ভাগ করা হয়। প্রত্যেক তন্ত্র কয়েকটি অঙ্গের সমাহারে গঠিত ; আবার প্রতিটি অঙ্গ কয়েকপ্রকার দেহকলার সমন্বয়ে এবং প্রত্যেক দেহকলা কয়েক প্রকার কোষের সমষ্টির দ্বারা গঠিত।

পরিপাকতন্ত্রের অন্তর্গত পৌষ্টিক নালী (অ্যালি-মেন্টারি ক্যানাল) এবং উক্ত নালী-সংলগ্ন লালাগ্রন্থি, যকৃৎ প্রভৃতি আহার্যের পরিপাক ও বিশোষণে (অ্যাব্‌সর্‌প্‌শন) সাহায্য করে।

শ্বসনতন্ত্রের অন্তর্গত শ্বাসনালী (ট্র্যাকিয়া), ক্লোমশাখা (ব্রংকাস), ফুসফুস প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণে এবং দেহ হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বহিষ্করণে সাহায্য করে। যে অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ করে, রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে তাহা সর্বদেহে সঞ্চালিত হয়।

সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত হৃৎপিণ্ড, ধমনী, শিরা, কৈশিকপ্রণালী (ক্যাপিলারি) প্রভৃতির সাহায্যে রক্ত দেহের সর্বত্র প্রবাহিত হয় ('রক্তবাহ' দ্র)। হৃৎ-সংকোচনের দ্বারা ধাবিত রক্ত ফুসফুস হইতে অক্সি-জেনকে এবং পরিপাকতন্ত্র হইতে খাদ্যবস্তুকে বিভিন্ন অঙ্গ ও দেহকলায় পোঁছাইয়া দেয়, আবার ঐ রক্ত নানা অঙ্গ ও দেহকলা হইতে বহু বর্জ্যদ্রব্য (ওয়েস্ট প্রডাক্ট) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহা-দের যথাক্রমে বৃক্ক ও ফুসফুসে পোঁছাইয়া দেয়। সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত লসিকাপ্রণালী (লিম্‌ফ্‌ ভেস্‌ল্‌) নামক প্রণালীগুলি দিয়া লসিকারস (লিম্‌ফ্‌) প্রবাহিত হয়.; অন্ত্র হইতে স্নেহপদার্থের বিশোষণ এই লসিকার মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে।

রেচনতন্ত্রের (এক্‌স্‌ক্রিটরি সিস্টেম) অন্তর্গত বৃক্ক, মূত্রাশয় (ইউরিনারি ব্লাডার), গবিনী (ইউরেটার), মূত্রনালী (ইউরেথ্রা) প্রভৃতি অঙ্গ মূত্রক্ষরণ ও দেহ হইতে মূত্র নিঃসরণে অংশগ্রহণ করে। বৃক্ক রক্ত হইতে নানাপ্রকার বর্জ্যদ্রব্যকে মূত্রে রেচন করিয়া দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাম্য অব্যাহত রাখে। ত্বক্‌ও রেচনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ; ত্বকের স্বেদগ্রন্থিগুলি হইতে ক্ষরিত ঘর্মে বহুপ্রকার বর্জ্যদ্রব্য বাহির হইয়া যায়।

কঙ্কালতন্ত্রের অন্তর্গত অস্থিগুলি দেহের ভার বহন করে, হস্তপদাদি অঙ্গ গঠন করে, অভ্যন্তরীণ কোমল অঙ্গগুলির যথাযথ অবস্থান ও বিন্যাসে সাহায্য করে।

পেশীতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত পেশীগুলি প্রধানতঃ তিন-প্রকার। ঐচ্ছিক বা সরেখ (স্ট্রায়াটেড) পেশীগুলি সাধারণতঃ অস্থির সহিত সংলগ্ন থাকে এবং ঐ সকল পেশীর সংকোচনের ফলে হস্তপদাদির সঞ্চালন ও চলা-ফেরা সম্ভবপর হয়। অনৈচ্ছিক বা অরেখ (আন্‌স্ট্রায়া-টেড) পেশীগুলি অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির গাত্রে অবস্থিত এবং ঐ সকল পেশীর সংকোচনেই অন্ত্র, পাকস্থলী, মূত্রাশয়, পিত্তাশয়, জরায়ু প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ আকুঞ্চিত, প্রসারিত ও সঞ্চালিত হয়। হৃৎ-পেশী (কার্ডিয়াক মাস্‌ল্‌) হৃৎপিণ্ডের গাত্রে অবস্থিত এবং ইহার দ্বারাই হৃৎপিণ্ডের সংকোচনাদি সংঘটিত হয়।

মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, বহু নার্ভ প্রভৃতি লইয়া নার্ভতন্ত্র গঠিত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে অনুভূতি নানা অন্তর্মুখ নার্ভ বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ, বেদনা, শীতোষ্ণতা প্রভৃতি বোধের সৃষ্টি করে। আবার মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড হইতে উদ্ভূত আবেগ (ইম্‌পাল্‌স্‌) বিভিন্ন বহির্মুখ নার্ভ বাহিয়া নানা

পেশী ও গ্রন্থিতে পৌঁছিয়া যথাক্রমে পেশীর সংকোচন ও গ্রন্থির রসক্ষরণ উদ্দীপিত করে। মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতিরও কেন্দ্রস্থল। ক্রোধ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রক্ষোভের (ইমোশন) কেন্দ্রও মস্তিষ্কেই অবস্থিত। নার্ভতন্ত্রের একাংশ আবার স্বতঃক্রিয় (অটোনমিক) নার্ভতন্ত্র নামে পরিচিত; ইহা প্রত্যক্ষভাবে ইচ্ছাধীন নহে। স্বতঃক্রিয় নার্ভতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সমবেদী (সিম্‌প্যাথেটিক) ও পরাসমবেদী (প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক) নার্ভগুলি দেহাভ্যন্তরে অনৈচ্ছিকপেশী ও গ্রন্থিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যেসকল অঙ্গ রসক্ষরণ করে, তাহাদের গ্রন্থি বলে। কতকগুলি গ্রন্থির রস সোজাসুজি রক্তে ক্ষরিত হয় এবং রক্তপ্রবাহের সাহায্যে সর্বদেহে ছড়াইয়া পড়িয়া দেহের বহু অংশে প্রভাব বিস্তার করে। শেষোক্ত গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি এবং তাহাদের রসের সক্রিয় উপাদানকে হর্মোন বলে; এই গ্রন্থিগুলিকে অন্তঃস্রাবীতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। থাইরয়েড, অ্যাড্রেন্যাল, পিটুইটারি, প্যারাথাইরয়েড প্রভৃতি গ্রন্থি ইহার দৃষ্টান্ত।

প্রজননতন্ত্রের অন্তর্গত অঙ্গগুলি প্রাণীর প্রজনন ও বংশরক্ষায় সাহায্য করে। পুংদেহে অন্ডকোষ, প্রস্টেট, লিঙ্গ, শুক্রস্থলী (সেমিন্যালভেসিক্‌ল্‌) প্রভৃতি অঙ্গ এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয় (ওভারি), জরায়ু, জরায়ুনালী প্রভৃতি অঙ্গ প্রজননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। পুংদেহে অন্ডকোষকে ও স্ত্রীদেহে ডিম্বাশয়কে মুখ্য জননাঙ্গ বলা হয়; ইহারা যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদন করে; তাহা ছাড়া অন্ডকোষ হইতে ক্ষরিত পুংযৌনহর্মোন এবং ডিম্বাশয় হইতে ক্ষরিত স্ত্রীযৌনহর্মোন যথাক্রমে অন্যান্য পুং ও স্ত্রীজননাঙ্গগুলিকে বিকশিত ও কর্মক্ষম রাখিয়া স্বাভাবিক প্রজনন সম্ভবপর করে।

এইরূপে নানাতন্ত্রের সুসংহত ক্রিয়ার দ্বারাই প্রাণিদেহের স্বাভাবিক কার্যাদি সুসম্পন্ন হয়।

দেবজ্যোতি দাশ

শারীরসংস্থান প্রাপ্তবয়স্ক মানব-দেহের কাঠামোটি ২০৬টি হাড় দিয়া তৈয়ারি। তাহাদের বাহিরে আছে রক্তসংবাহক ধমনী, শিরা ও লসিকানালী এবং নার্ভসহ অসংখ্য পেশী, চর্বি ও ত্বক্‌ ('শারীরবিদ্যা' দ্র)। মুখ্যতঃ ইহাদের দ্বারা দেহটি চারিটি অংশে বিভক্ত : ১. মুখমণ্ডলসহ মাথার খুলিতে থাকে ২২টি চ্যাপ্টা হাড়। উপরকার ৮টি দিয়া তৈয়ারি যে প্রকোষ্ঠ তাহার ভিতরে মেরুমস্তিষ্ক, তরল উপাদানের ব্যবধানে তিনটি পাতলা আবরণে ঢাকা থাকে মস্তিষ্ক এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ১২ জোড়া নার্ভ বাহির হইয়া আসে অস্থিময় করোটির ছিদ্র-পথে। মস্তিষ্কের ভৌমিক অংশের সহিত একটি বোঁটার দ্বারা লাগিয়া থাকে ক্ষুদ্র পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটি। নাসিকামূলের দুই পাশে অস্থিময় দুইটি গহ্বরে দুইটি চোখের গোলক আর নাসিকার ভিতরে ঝিল্লী আবরণের মধ্যে থাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মস্তকের দুই দিকে কর্ণের ফুটা দিয়া নালীপ্রান্তের শেষ প্রকোষ্ঠে থাকে শ্রবণেন্দ্রিয়। মুখগহ্বরের মধ্যে থাকে জিহ্বা ও পেশীময় স্বাদেন্দ্রিয়গুলি, এবং আরো পশ্চাতে গলবিলের সহিত যুক্ত থাকে সম্মুখে শ্বাসনালী ও পশ্চাতে খাদ্যনালীর মুখ। শেষোক্ত নালি দুইটি করোটি ও ধড়ের সংযোগী অংশ, পশ্চাতে সাতটি কশেরুকা-গঠিত এবং সম্মুখে ও পার্শ্বে পেশীসহ ত্বক্‌-আবরণে ঢাকা গ্রীবা দিয়া নীচে ধড়ের মধ্যে নামিয়া যায়। কোমলাস্থি-গঠিত শ্বাসনালীর সম্মুখে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের অবস্থান। ২. গ্রীবার নিম্নপ্রান্ত হইতে বস্তিগহ্বরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ধড়। তাহা তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ক. সকলের উপরের অংশটির পশ্চাতে ১২টি কশেরুকা, দুই পাশে ১২টি করিয়া বাঁকানো লম্বা, সরু হাড় ও সম্মুখে উরঃফলক নামীয় চ্যাপ্টা একটি হাড় দিয়া বক্ষঃপঞ্জরটি গঠিত। অন্তর্বর্তী মহাধমনী, মহাশিরা, দুইটি ফুসফুস্‌ ধমনী ও চারিটি ফুস্‌ফুস্‌ শিরাযুক্ত হৃৎপিণ্ড। সকলের পশ্চাতে শিরদাঁড়ার সম্মুখে খাদ্যনালীটি অবস্থিত। খ. বক্ষোদেশের নীচে মধ্যচ্ছদার ব্যবধানে, পশ্চাতে ৫টি কটিদেশীয় কশেরুকা ও অন্য সকলদিকে পেশী, চর্বি ও ত্বক্‌ দিয়া ঘেরা উদর-প্রকোষ্ঠ। মধ্যচ্ছদার নীচেই ডানদিকে থাকে যকৃৎ, মাঝখানে পাকস্থলী ও বাঁয়ে প্লীহা। তাহার পরেই থাকে পাকস্থলীর নির্গমমুখসংলগ্ন কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্রান্ত্র ও তন্মধ্যে প্যান্‌ক্রিয়াস্‌। তৎপরে থাকে দক্ষিণদিকে, কিছুটা উপরে ও বাঁয়ে বৃহদন্ত্রের কতকটা অংশ এবং দুইপাশে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যান্ডসহ দুইটি গবিনীযুক্ত বৃক্ক। সকল আন্তর যন্ত্রই থাকে ঝিল্লী-আবরণ পেরিটোনিয়ামে ঢাকা। গ. পশ্চাতে শ্রোণিদেশীয় চারিটি যুক্ত কশেরুকা এবং দুই পাশে ও সম্মুখে দুইটি শক্ত, চওড়া ও চ্যাপ্টা নিতম্বাস্থি দিয়া গড়া বস্তিগহ্বরের মধ্যে থাকে—মূত্রাশয়, মলভাণ্ড, স্ত্রীদেহে জরায়ু ও ডিম্বাণুবাহী নলসহ দুইটি ওভারি এবং পুরুষদেহে প্রস্টেট গ্ল্যান্ড্‌, দুইটি বীর্যকোষ ও বীর্যবাহী নল; সবকয়টিই বিশেষ পেরিটোনিয়ামে ঢাকা। গুহ্যদ্বার ও স্ত্রীদেহে যোনিমুখসহ বস্তিগহ্বরের নীচেকার প্রাচীরটি শুধু পেশী ও ত্বক্‌ দিয়া তৈয়ারি। পুংদেহের বহির্যৌন অঙ্গগুলি দেহের বাহিরে দুইটি ঊরুর মাঝখানে অবস্থিত। করোটির নীচেকার বৃহৎ ছিদ্র দিয়া মস্তিষ্কসংলগ্ন সুষুম্নাকাণ্ডটি শিরদাঁড়ার পশ্চাৎস্থ নল বাহিয়া কটিদেশীয় তৃতীয় কশেরুকা পর্যন্ত লম্বিত এবং তাহা মস্তিষ্কের মতই দুই স্তর মেরুমস্তিষ্ক তরল

পদার্থসহ ৩টি ঝিল্লী-আবরণে ঢাকা থাকে। তাহা হইতে উৎপন্ন কশেরুকার সমসংখ্যক চেষ্টীয় নার্ভগুলি শির ও গ্রীবা ভিন্ন দেহের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়ে এবং সে সকল স্থান হইতে আগত সংবেদীয় নার্ভগুলিও আসিয়া সুষুম্নাকাণ্ডের বিভিন্ন অংশে প্রবিষ্ট হয়। ৩. ঊর্ধ্বাঙ্গে সামনের দিকে বক্ষঃপঞ্জরের উপরিভাগে থাকে কণ্ঠার হাড় এবং পিছনের দিকে একটি ত্রিকোণ চওড়া ও চ্যাপ্টা অংশ-ফলক নামে হাড়। বাহুতে থাকে লম্বা ও মোটা প্রগণ্ডাস্থি, প্রকোষ্ঠে দুইটি লম্বা সরু হাড়, মণিবন্ধে আটটি ছোট ছোট, করতলে পাঁচটি লম্বা, সরু এবং আঙুলে ১৪টি আরো ছোট, সরু, লম্বা হাড়। ৪. নিম্নাঙ্গে থাকে ঊরুদেশে একটি মোটা শক্ত লম্বা হাড় (ঊর্বস্থি), জঙ্ঘায় শক্ত মোটা ও লম্বা হাড় (জঙ্ঘাস্থি) এবং সরু ক্ষীণ লম্বা অন্য হাড় (অনুজঙ্ঘাস্থি); জানুর সম্মুখে চ্যাপ্টা ও গোল জানুকাপালিক, গোড়ালিতে সাতটি পুরু ও শক্ত হাড়, পায়ের পাতায় পাঁচটি সরু ও লম্বা হাড় এবং পায়ের আঙুলে আরো সরু ও খাটো ১৪টি হাড় থাকে।

ঊর্ধ্বাঙ্গে ও নিম্নাঙ্গের পেশীগুলির সাহায্যেই আমরা চলা-ফেরা উঠা-বসা, কাজকর্ম সব কিছুই করি।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শাল ডিপটেরোকারপেসি-গোত্রীয় বৃক্ষ। ইহার বিজ্ঞান-সম্মত নাম শোরিয়া রোবাস্টা। ভারত-বর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই ইহার অল্পবিস্তর চাষ হয়। সাধারণতঃ উত্তর বাঙলা, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ইহার প্রাধান্য বেশি। ইহারা চিরহরিৎ, পাতাগুলি বড় বড় এবং খসখসে হয়। গন্ধযুক্ত উভয়লিঙ্গ ফুল হয়। বৃত্যংশ ঘটাকৃতি এবং পাঁচটি। পরাগমিলনের পর বৃত্যংশগুলি স্ফীত হয় এবং বীজ সম্প্রসারণে সাহায্য করে। দলমণ্ডলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে। ইহার তলদেশ যুক্ত। পুংস্তবক পনেরো বা তদধিক হয়। পরাগধানীতে দুইটি আধার থাকে। পুংদণ্ডগুলি ক্ষুদ্র হয়। গর্ভপত্র তিনটি ও তিনটি আধারযুক্ত। প্রতি আধারে দুইটি করিয়া ডিম্বাণু থাকে। বীজে কোনও শ্বেতসার থাকে না।

গৃহনির্মাণ ও মানুষের বহু কল্যাণকর কার্যে ইহার কাষ্ঠের ব্যবহার হয়। পাতাও নানাভাবে কাজে লাগে।

বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর মূর্তিরূপে পরিগণিত চক্র বা ছিদ্রযুক্ত গোলাকার প্রস্তরখণ্ড। ইহার উদ্ভবস্থল গণ্ডকী নদী এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। হিন্দু সমাজে বহু সমাদৃত এই শিলা একদা ব্রাহ্মণের ঘরে ঘরে রক্ষিত ও নিত্য পূজিত হইতেন। এখনও হিন্দুর বিবাহাদি শুভ-কর্ম ইঁহার সাক্ষাতে সম্পাদন করা নিয়ম। বিশিষ্ট চিহ্ন, চক্রসংখ্যা প্রভৃতি অনুসারে শালগ্রাম অনন্ত, শ্রীধর, দধিবামন প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। কোন শ্রেণীর শিলা গৃহস্থের মঙ্গলজনক, কোন শ্রেণী অনিষ্টকারক। শালগ্রাম শিলা লইয়া সমস্ত দেবতার পূজা করা চলে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শালিবাহন প্রাচীন হিন্দুযুগে এই নামের একজন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে—যথা তিনি শকগণকে পরাজিত করিয়া একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন; তিনি দিগ্বিজয়ী সম্রাট ছিলেন ইত্যাদি। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, শালিবাহন নামে কোনও রাজা ছিলেন না। ইহা শাতবাহন শব্দের অপভ্রংশ এবং যে পরাক্রান্ত শাতবাহন-রাজবংশ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন সেই বংশীয় রাজগণের কীর্তিকলাপ সামগ্রিক-ভাবে একজন রাজার নামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। 'সাতবাহন' দ্র

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শাহ্ আলম্, ১ম বাহাদুর শাহ্ ১ম দ্র

শাহ্ আলম, .২য় (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রী) মোগল-সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার আসল নাম মির্জা আবদুল্লা, কিন্তু আলি গওহর ও শাহ আলম উপাধিতেই তিনি বেশি পরিচিত।

পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া (ডিসেম্বর, ১৭৫৯ খ্রী) তিনি নিজেকে মোগলসম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু রাজধানী দিল্লী বৈরিভাবাপন্ন মন্ত্রী ইমাদ-উল্-মুল্কের অধিকারে থাকায় এবং আহমদশাহ আবদালি ও মারাঠাদের মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম আসন্ন বুঝিতে পারিয়া তিনি রাজধানীতে যাইতে সাহসী হইলেন না। সম্রাট হইবার পূর্বে এবং পরেও বহু বৎসর তাঁহাকে দিল্লীর বাহিরেই বিভিন্ন স্থানে থাকিতে হয়।

বিহারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি তিনবার ব্যর্থ হন। পরিশেষে মীরকাশিমকে ('মীরকাশিম' দ্র) ইংরেজপ্রদত্ত বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাবীপদে মানিয়া লন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার সহিত সম্মি-লিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্সারের যুদ্ধে আবার পরাজিত হন। পরবর্তী বৎসর আগস্ট মাসে ইংরেজদের সহিত তাঁহার সন্ধি হয় এবং তিনি তাঁহাদিগকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী প্রদান করেন। তাঁহারা

তাঁহাকে কোরা ও এলাহাবাদ জেলা এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের সাহায্যে তিনি দিল্লী যান। মীর বক্সী গোলাম কাদের রোহিলা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া চক্ষু উৎপাটিত করে (১৭৮৮ খ্রী)। অনন্তর তাঁহার অনুরোধে মহদজি সিন্ধিয়া সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া গোলাম কাদেরের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজগণ দিল্লী অধিকার করিলে তিনি তাঁহাদের বৃত্তিভোগী হন ও ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শাহ্‌জাহান মোগল-সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা খুর্‌রম আহম্মদনগরের সেনাপতি মালিক অম্বরের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সন্ধি করিলে সম্রাট তাঁহাকে শাহ্‌জাহান উপাধিতে ভূষিত করেন (১৬১৭ খ্রী)। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, নূরজাহানের জামাতা, শাহরিয়রকে খুসরোর পুত্র দাওয়ার বক্সকে পরাজিত ও বন্দী করেন। সিংহাসনের অপরাপর দাবিদারগণকে হত্যা করিয়া শ্বশুর আসফ খাঁ ও সেনাপতি মহাবৎ খাঁর সাহায্যে তিনি পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮ খ্রী)।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি বীরসিংহ বুন্দেলার পুত্র জুঝর সিংহের এবং পর বৎসর খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহ দমন করেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আসফ খাঁর কন্যা অর্জুবন্দবানু বা মমতাজ-মহলের পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার গর্ভে শাহ্‌জাহানের ১৪টি সন্তান হইয়াছিল ; শেষ সন্তান প্রসবের সময় মমতাজমহলের মৃত্যু হয় (১৬৩১ খ্রী)।

পত্নীর সমাধির উপর জগদ্বিখ্যাত ‘তাজমহল’ নির্মাণ করিয়া শাহ্‌জাহান পত্নীপ্রেম ও শিল্পানুরাগের পরিচয় দেন। তিনি কঠোর হস্তে পর্তুগীজদের দমন ও হুগলি অধিকার করেন (১৬৩২ খ্রী)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে হস্তচ্যুত কান্দাহার তিনি পুনরুদ্ধার করেন (১৬৩৮ খ্রী), যদিও পারস্যের শাহ আব্বাস ২য় তাহা পুনর্দখল করেন (১৬৪৯ খ্রী)। তাঁহার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বৈদেশিক নীতি নিষ্ফল হওয়ায় পরবর্তী-কালে মোগলসাম্রাজ্য পারস্যের শাসনকর্তাদের দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্‌জাহান পীড়িত হইয়া পড়িলে পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ঔরঙ্গজেব বাহুবলে ও কৌশলে অন্যান্য ভাইদের পরাজিত, বন্দী ও নিহত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার ও বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করেন (১৬৫৮ খ্রী)। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থাতেই শাহ্‌জাহানের জীবনাবসান হয়।

শাহ্‌জাহান যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ও বীর-যোদ্ধা ছিলেন। ফার্সী, হিন্দী ও তুর্কী ভাষা জানিতেন ; কাব্য, সংগীত ও চিত্রকলায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি বহু সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণ করিয়া দিল্লী ও আগ্রাকে শ্রীমণ্ডিত করেন। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা খুসরোকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলেও পিতামহ আকবরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার পত্নীপ্রেম ও সন্তান স্নেহের কথা সর্বজনবিদিত। কন্যা জাহানারা (‘জাহানারা’ দ্র) তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়পাত্রী ছিলেন। শাহ্‌জাহানের নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি পরধর্মদ্বেষী ছিলেন। বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন, সিয়া মুসলমান ও খ্রীষ্টানদিগের উপরও অত্যাচার করেন। তাঁহার আদেশে হিন্দু পুরুষ-দিগের মুসলমান-কন্যা বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়। তিনি সে-সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা বলিয়া বিবেচিত হন। আকবরের প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যকে তিনি গৌরবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষকতায় স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। দিল্লীতে শাহ্‌জাহানাবাদ নামে নূতন শহর প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬৪৮ খ্রী) ; সেখানে বহু শিল্পসুন্দর সৌধাবলী ও জামি মস্‌জিদ এবং আগ্রার মোতি মস্‌জিদ ও তাজমহল নির্মাণ তাঁহারই কীর্তি। বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন তাঁহার শিল্পজগতের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সাহিত্যসৃষ্টিতেও তিনি অনেককে উৎসাহিত করেন।

কুমুদরঞ্জন রায়

শাহ্‌জী ভোঁসলে, ভোঁসলে দ্র

শিক্ষা অন্তরসত্তা ও পরিবেশের মধ্যে নিয়ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষের অন্তরসত্তায় যে সক্রিয় ও সচেতন ক্রমবিবর্তন ঘটে ব্যাপক অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। অপরপক্ষে মানুষের যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ বিষয়জ্ঞানের মধ্য দিয়া আয়ত্ত করাকে সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলা হয়। শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য মানুষকে সমাজের উপযোগী করা। শিক্ষার ক্রমোন্নতির মূলে প্রথম যুগে গ্রীকসভ্যতার প্রভাবই সর্বাধিক। গ্রীসেই প্রথম শিক্ষা-সংগঠনকে একটি আবশ্যিক রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ৬ হইতে ১৪ এবং ১৫ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত দুইটি পর্যায়ের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা গ্রীসে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৮ বৎসর বয়সে গ্রীসের প্রত্যেকটি পুরুষকে দুই বৎসরব্যাপী

বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো (খ্রী. পূ. ৪২৭-৩৪৭) শৈশবে শিশুকে পারিবারিক গণ্ডি নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে একমাত্র উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিত চরিত্রবান্ নিঃস্পৃহ মানুষের উপরই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা কর্তব্য। আরিস্তোতলের (খ্রী. পূ. ৩৮৪-৩৪২) মতে পরিবারই শিক্ষার সূতিকাগার। প্লেটোর সহিত এ-বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও আরিস্তোতল শিক্ষা সম্পর্কে প্লেটোর অধিকাংশ অভিমতের সমর্থক। রোমরাজ্যে ৭ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রায় সকল অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ভাষা ও সাহিত্য এবং অলংকারশাস্ত্র। ধনী ও উচ্চ শিক্ষা লাভেচ্ছুরা এথেন্স, আলেকজান্দ্রিয়া, রোম, অথবা কন্স্টান্টিনোপল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যাইতেন। খ্রীষ্টধর্মের যুগে গির্জায় গির্জায় বিদ্যালয় গড়িয়া ওঠে। পরে গ্রীস ও রোমের সভ্যতা লুপ্ত হইলে ইওরোপে যে অন্ধকার যুগ দেখা দেয় তখনও শিক্ষার ক্ষীণ দীপালোক খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকেরাই সযত্নে জ্বালাইয়া রাখেন। অতঃপর আবার শিক্ষার আলোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের বিদ্যার্থীদের সহিত ভারতের অঙ্কশাস্ত্র, ভেষজবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, আরব সভ্যতার বীজগণিত, ফলিত রসায়ন, গ্রীসের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির পরিচয় ঘটে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-শিক্ষার একাত্মীকরণে স্পেনের মূর সভ্যতার দান অসামান্য।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কি আক্রমণে প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়িলে সেখানকার প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সমগ্র ইওরোপে ছড়াইয়া পড়েন। ফলে গ্রীক সাহিত্য ও শিল্প-বিজ্ঞানের ধারাবর্ষণে ইওরোপ সরস হইয়া ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার প্রথম উন্মেষ ঘটে। এই সময়ে চেক শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াস (১৫৯২-১৬৭০ খ্রী) তাঁহার 'গ্রেট ডায়াডেক্টিক' নামক গ্রন্থে আধুনিক শিক্ষার কয়েকটি মূল সূত্র উপস্থাপিত করেন। তিনি শিক্ষার সমানাধিকার দাবি করেন এবং তথ্য মুখস্থ করা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উপর অধিকতর জোর দেন। তিনিই দৃশ্যশিক্ষার প্রথম উদ্গাতা। ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২-৭৮ খ্রী) শিক্ষা ব্যাপারে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের প্রবর্তক সুইস শিক্ষাচার্য পেস্তালৎসী (১৭৪৬-১৮২৭ খ্রী) ভাদুনে তাঁহার জগদ্বিখ্যাত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের প্রভাব ক্রমশঃ সমগ্র ইওরোপে ও আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। তিনি মনোবিজ্ঞানসম্মত পাঠ্যসূচীর প্রবর্তন করেন এবং ছাত্র-শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর জোর দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অগ্রগতি দ্রুততর হয় ও ডারউইনের (১৮০৯-৮২ খ্রী) বিবর্তনবাদ মানুষের চিন্তাধারায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত করে। হার্বার্টের (১৭৭৬-১৮৪১ খ্রী) পঞ্চসোপান পদ্ধতি ও ফ্রয়েবেলের (১৭৮২-১৮৫২ খ্রী) কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতির প্রভাব বিশ্বের সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমশঃ শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কারের ফলে শৈশবকালে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে নূতন চেতনা জন্মে। ইতালিতে মারিয়া মন্তেসরি (১৮৭০-১৯৫২ খ্রী) শিশুশিক্ষার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ও তাহা সমগ্র বিশ্বে অনুসৃত হয় ('মন্তেসরি প্রণালী' দ্র)।

ইহার পর আমেরিকার জন ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রী) শিক্ষাবিষয়ে গবেষণা করিয়া শ্রেণী-শিক্ষার পরিবর্তে বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি বিকাশের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। অধুনা বিশ্বের সকল দেশেই রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা চলিতেছে।

অনিলমোহন গুপ্ত

শিক্ষা, ভারতেঃ বৈদেশিক যুগে প্রধানতঃ বর্ণাশ্রমই সমাজের ভিত্তি ছিল। তখন ব্রাহ্মণদের মধ্যেই শিক্ষার বহুল প্রচলন ছিল। মনুসংহিতাতেও বিদ্যা ব্রাহ্মণেরই শেবধি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। গুরু ও শিষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই সে যুগের বিশেষত্ব ছিল। শিক্ষণীয় বিদ্যা তখন দুই প্রকারের ছিল, পরা ও অপরা; পরাবিদ্যা পরলোক ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আর অপরাবিদ্যা ইহলোক সম্বন্ধীয় অন্য সকল প্রকারের বিদ্যা। অপরাবিদ্যার মধ্যে ছন্দ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বিদ্যা ইত্যাদি সকল প্রকারের বিদ্যাই ছিল। তখন শিক্ষা গ্রহণের কোনও কাল বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল না; কেহ বারো বৎসর বা ততোধিককাল ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিত। শিক্ষা শেষ করিয়া স্নাতক হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিত। কেহ বা আজীবন বিদ্যাচর্চা করিত। সকলেই যে বিদ্যা-শিক্ষা সম্পূর্ণ করিত তাহাও মনে হয় না; যাহার যে ধরনের যতখানি প্রয়োজন সে ততখানি বিদ্যাই অভ্যাস করিত। প্রয়োজনবোধে শিষ্য এক গুরুর নিকটে বিদ্যা গ্রহণ শেষ করিয়া অন্য গুরুর নিকটে যাইত। বৌদ্ধযুগেই ভারতে প্রথম শিক্ষার গণতান্ত্রিক ভিত্তি রচিত হইল। শিক্ষা আর ব্রাহ্মণের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মঠ, বিহার ও দেবালয়গুলি

ধীরে ধীরে বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ফলে কোনও কোনও শিক্ষাকেন্দ্র আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করে। সেগুলিতে দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থী আসিয়া শিক্ষালাভ করিত। তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, ওদান্তপুরী মহাবিহারের খ্যাতি সভ্যজগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মুসলমানদের আগমনের পরেও শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোটা অনেকটা একই রকম ছিল। দেশের নানা স্থানে মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইল; সেখানে আরবী, ফারসীর চর্চা চলিল, হিন্দুদের টোলে-চতুষ্পাঠীতে যেমন হিন্দুশাস্ত্রসমূহের চর্চা হইত মক্তব-মাদ্রাসায় তেমনই মুসলমানী শাস্ত্রের চর্চা চলিত। ফারসী রাজভাষা হওয়ায় প্রয়োজনের খাতিরেও অনেকে ফারসী শিখিত। যাত্রা, পাঁচালি, কথকতা, প্রভৃতি বয়স্ক জনসাধারণের চিত্তকে ধর্ম ও নীতি-বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানে অভিষিক্ত করিত ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর আনন্দের খোরাক জোগাইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ অবধি এই ধারা চলিয়াছিল। ইওরোপীয়দের আগমনে, বিশেষ করিয়া মিশনারীদের হস্তক্ষেপেই এই প্রাচীন ধারার আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। ইঁহারা দেশের নানা স্থানে যে নূতন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন সেখানে শুধু লেখা, পড়া ও অঙ্ক ছাড়াও, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি নানা নূতন বিষয় পড়ানো শুরু হইল। ছাত্রদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল। এক শ্রেণীতে পাঠের কাল নির্দিষ্ট করা হইল। এইভাবে এদেশে এক নূতন শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন হইল। মিশনারীরা এদেশের মেয়েদের জন্যও কিছু কিছু বিদ্যালয় খুলিলেন, কিন্তু সেগুলি তখন তেমন চলিল না। মুখ্যতঃ ইঁহাদের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এদেশে শিক্ষার জন্য, প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা ও ইওরোপীয় বিদ্যার প্রচারের জন্য, সামান্য কিছু অর্থ বরাদ্দ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ মনীষীদের উৎসাহে ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার জন্য ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষার জয়যাত্রা শুরু হইল। অতঃপর বেণ্টিঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্তের পর হইতেই ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রচলন করাই ভারত সরকারের শিক্ষানীতি হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সরাসরি ভারত শাসনের ভার লইল। এই বৎসরেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই) প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বি. এ. পরীক্ষা লওয়া হইল। লোকে মুখ্যতঃ চাকরির জন্যই ইংরেজী শিক্ষার আদর করিতে লাগিল। এই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার যতখানি প্রসার হউক না হউক মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রসার দ্রুত হইতে লাগিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের পর হইতেই এদেশে নব প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নানা রকম সমালোচনা হইতে থাকে এবং ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হইল। ফলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও তাহার অধীনে বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাদেরই একটি—বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ যাহা বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইয়াছে। গান্ধীজী ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সাত বৎসরব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থা হওয়া চাই এবং সে শিক্ষা কোনও একটা শিক্ষামূলক হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া চলিবে। অতঃপর স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধানে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক করার বিধান দেওয়া হইল। গভর্নমেণ্ট সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজী শিক্ষার সংস্কারের জন্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে এক কমিশন বসিল। কিছুদিন পরে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য মুদালিয়র কমিশন নিযুক্ত হইল। এদিকে (ও অন্যান্য) ক্ষেত্রে পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল ও আরও হইতেছে। এইরূপ পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট অর্থ বরাদ্দ করিতেছেন। মেডিক্যাল, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য নানা বৃত্তি শিক্ষার জন্য নূতন নূতন কলেজ খোলা হইতেছে। চারিদিকে নূতন নূতন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যাপক চেষ্টাও হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিস্তার সম্ভব মত দ্রুতভাবে চলিয়াছে। এখানে হায়ার সেকেণ্ডারী অর্থাৎ বহুমুখী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১১ বৎসরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে তিন বৎসরের প্রথম ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন হয়। সাম্প্রতিক কালে তাহারও আবার সংস্কার চলিতেছে। ভারতে শিক্ষার উন্নতিতে অনেক বাধা দেখা দিয়াছে। তথাপি উচ্চতর বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে খানিকটা উন্নতি হইয়াছে। নানা প্রদেশে কয়েকটি নূতন মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইয়াছে। শিল্পশিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে কয়েকটি পলিটেকনিক নামে নূতন ধরনের বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশেও আমরা আর কৃষিপ্রধান না থাকিয়া শিল্পপ্রধান রাজ্যে পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছি। ভারতীয়

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নূতন পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ('বিশ্বভারতী', 'শান্তিনিকেতন' দ্র)। তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেন এবং হাতেকলমে শিক্ষারও নানারূপ ব্যবস্থা শান্তিনিকেতনে করেন।

অনাথনাথ বসু

শিখধর্ম ভারতে মুসলমান আগমনের পর হইতে এখানকার বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কেহ অর্থ বা পদোন্নতির জন্য, কেহ বা হিন্দুর সামাজিক অত্যাচারের কারণে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা বহু লক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। তখন কোনও কোনও হিন্দু নেতা বুঝিতে পারেন যে জাতিভেদ, বহু দেবতার পূজা প্রভৃতির সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। এই প্রকার ভারতীয় পটভূমিতে গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রী)-এর জন্ম হয় ('নানক' দ্র)।

শৈশবকাল হইতেই নানক ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার জন্য উৎসুক হইয়া ওঠেন এবং এই উদ্দেশ্যে অনেক সাধু ও যোগীদের নিকট গমনাগমন করেন। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০ আগস্ট অকস্মাৎ তাঁহার আধ্যাত্মিক জাগরণ হয় এবং তিনি উপলব্ধি করেন যে হিন্দু-মুসলমান বলিয়া কিছু নাই, সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। বস্তুতঃ ধর্মীয় ঔদার্য প্রচারে তিনি অতিশয় অগ্রণী ছিলেন। তিনি আন্তরিক উদারতা, বিশ্বপ্রেম ও জাতিধর্মনির্বিশেষে ঈশ্বর উপলব্ধির শিক্ষা এত সরলভাবে দেন যে, সকলেরই অন্তরে তাহা গভীরভাবে অতি সহজে প্রবেশ করে। তিনি কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস-নির্ভর রীতি-নীতির বিশেষ বিরোধী ছিলেন। ২২ বৎসর ভ্রমণের ফলে তিনি বহু লোকের ভক্তি অর্জন করেন এবং এই ভক্তেরা নিজদিগকে গুরুর শিষ্য বা 'শিখ' বলিয়া অভিহিত করেন। এই সমস্ত শিষ্যেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর লোক হইতে উদ্ভূত। নানক বিশ্বপ্রেম ও একেশ্বরবাদের আদর্শ সকলকে গ্রহণ করিতে বলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য গুরু অঙ্গদকে ('অঙ্গদ' দ্র)। তাঁহার শিক্ষাবলী প্রচারের জন্য আদেশ দিয়া যান ; এবং অঙ্গদই হইলেন শিখদের দ্বিতীয় ধর্মগুরু। অতঃপর ক্রমান্বয়ে আরও আটজন শিখ ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়। ইঁহারা সকলেই নানকের ধর্মমত জনসমাজে প্রচার করেন। চতুর্থ গুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর শিখ-ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য অমৃতসরে অতি রমণীয় একটি স্থান দান করেন। এই স্থানেই শিখদের হরিমন্দির বা সুবর্ণমন্দির নির্মিত হয় ('অমৃতসর' দ্র)। এই স্থানটি এখন শিখদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। পঞ্চম গুরু অর্জন শিখদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ' সংকলন করেন ('আদিগ্রন্থ' দ্র)। এই গ্রন্থে বহু ধর্মগুরুর শিক্ষা ও তাঁহাদের লেখা স্তোত্রাদি লিপিবদ্ধ আছে। অতঃপর মোগল-শাসকদের হস্তে গুরু অর্জন ও গুরু তেগবাহাদুর নিহত হইলে তেগবাহাদুরের পুত্র শেষ বা দশম গুরু গোবিন্দ গুরুর আসনে উপবিষ্ট হন ('গুরুগোবিন্দ সিংহ' দ্র)। তখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল এবং হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন চলিতে থাকে। গুরুগোবিন্দ এই নির্যাতন-স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সমস্ত শিখশক্তিকে সংহত করিতে সচেষ্ট হন। মৃত্যুভয়হীন পাঁচজন বীরকে তিনি নির্বাচন করেন ; এবং শিখধর্মকে এক নূতন রূপ দেন—যাহার নাম খালসা বা পবিত্র। ইঁহাদের পালনীয় ৫টি প্রতীক আছে। ১. কেশ ঃ দীর্ঘ শ্মশ্রু ও মাথায় দীর্ঘ কেশ ; ২. কঙ্ঘ (কঙ্কতিকা) ঃ মাথায় ধারণযোগ্য চিরুণি ; ৩. কর বা লৌহনির্মিত কঙ্কণ ঃ হস্তের বলয় ; ৪. কচ্ছ ঃ অন্তর্বাস এবং ৫. কৃপাণ ঃ তরবারি। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিখের নামের সহিত বীরত্বব্যঞ্জক 'সিংহ' পদবী যুক্ত থাকিবে। এইভাবে শান্তিপ্রিয় ধর্মশিষ্যদের ধর্মযোদ্ধা হিসাবে প্রস্তুত করা হইল। গুরুগোবিন্দ নির্দেশ দিলেন যে শিখেরা সিংহের মত তেজস্বী ও মৃত্যুভয়হীন হইবে এবং সর্বপ্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া প্রয়োজনবোধে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিবে। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই ভ্রাতৃবন্ধনে বদ্ধ হইবে, একই পাত্র হইতে আহার করিবে এবং কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিবে না। এই নূতন ধর্মবিশ্বাস যাঁহারা গ্রহণ করিলেন তাঁহারাই খালসা বা পবিত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই প্রত্যেকেই এই খালসা-ধর্মে দীক্ষিত হইবে, নামের সহিত সিংহ পদবী যুক্ত করিবে এবং জাতিভেদ ভুলিয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত শিখমাত্রেই সত্যবাদী হইবে, টাকা ধার দিবে না, সাধু উপায়ে জীবিকা-অর্জন করিবে, লোভ ত্যাগ করিবে এবং প্রভাতে 'জপুজি' মন্ত্র উচ্চারণসহকারে প্রার্থনা করিবে। সময় মত তাহারা শিখমন্দির 'গুরুদ্বার' দর্শন করিবে এবং বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করিবে। গুরুগোবিন্দের এই শিক্ষা শিখদিগকে সাহস এবং ধর্মবুদ্ধির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিল। অনন্তর মোগলরাজশক্তির সহিত এই শিখদের ঘন ঘন সশস্ত্র যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গুরুগোবিন্দের চারি পুত্র যুদ্ধে প্রাণ দেন। তখন গুরুর পর্যায় বন্ধ হইয়া যায় এবং গুরুগোবিন্দ নির্দেশ দেন যে, এখন হইতে যাহা কিছু ধর্মাদেশ তাহা 'আদিগ্রন্থ' ('আদিগ্রন্থ' দ্র) হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুগোবিন্দের এক সৈন্যাধ্যক্ষ ভাই গুরবক্স সিংহ বা বান্দা বাহাদুর এই কালে মোগলসৈন্যদের সহিত যুদ্ধে ব্রতী হন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিখরা পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থান এবং উত্তরপ্রদেশ নিজেদের অধিকারে আনেন। বিজিত অংশগুলিকে 'মিসল' বা সাম-

রিক রাষ্ট্রে ভাগ করা হয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঞ্জাবে শিখধর্মই সর্বশক্তিমান্ বলিয়া ঘোষিত হয় ; এবং পাঞ্জাব প্রদেশ দ্বাদশটি শিখ 'মিসল'-এ পরিণত হয়। 'আদিগ্রন্থে' শিখধর্মের বীজমন্ত্র হিসাবে বলা হইয়াছে ঃ 'প্রতি ধর্ম-গুরুকে ভালবাসিবে ; গর্ব করিবে না ; ধর্মের সারাংশ বিনয় ও সমবেদনা বলিয়া জানিবে ; দীর্ঘপ্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ, কৃচ্ছ্রসাধনা, যোগপদ্ধতি প্রভৃতির দ্বারা পূজা হয় না, প্রলোভনের জগতে কেবল পবিত্র জীবনযাপন করিলেই পূজা সার্থক। যে ব্যক্তি সকল মানুষকে সমান বলিয়া মনে করেন তিনিই প্রকৃত ধার্মিক।

হীরালাল চোপরা

শিখযুদ্ধ শিখধর্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের মধ্যে শিখযুদ্ধের অংশ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ('শিখধর্ম' দ্র)। মোগলদের হাতে দারুণ নির্যাতনের পরেও শিখদের দৃপ্ত গরিমা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয় নাই। গুরু নানক এবং গুরুগোবিন্দের শিক্ষা শিখদের অন্তরে ধর্মবুদ্ধির সহিত বীরত্বের প্রেরণাও সমানভাবে জাগাইয়া তোলে। তাই নাদির শাহের ('নাদিরশাহ' দ্র) আক্রমণের সুযোগ লইয়া শিখেরা আবার মাথা তুলিল এবং ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পর কিছু কিছু পরাজয়ের মধ্য দিয়া তাহারা অচিরে বিজয়লাভ করিল এবং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর ('পাণিপথ' দ্র) তাহারা ক্রমশঃ প্রায় সমগ্র পাঞ্জাব দখল করিয়া বসিল (১৭৭৩ খ্রী)। বিজিত ভূখণ্ডকে তাহারা ১২টি, মিস্‌ল-এ ভাগ করিল এবং রণজিৎ সিংহ যখন শিখ-নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তখন শিখদের প্রভুত্ব সম্পূর্ণ হইল। অবশ্য রণজিতের এই প্রভাব শিখপ্রধানদের কেহ কেহ বিশেষ পছন্দ করিলেন না ; এমনকি ইংরেজের সাহায্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। ইংরেজ প্রথমে ইহাতে সাড়া না দিলেও শীঘ্রই শিখশক্তি-দমনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ইহার ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দেও নূতন করিয়া অনুমোদিত হইল। কিন্তু রণজিতের রাজ্য-সম্প্রসারণের চেষ্টা ইহাতেও নিবৃত্ত হয় নাই। তবে স্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করিলেও তিনি ইংরেজশক্তি দমনের বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নাই।

রণজিতের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে গোলমাল দেখা দিল। কিছু পরেই রানী ঝিন্দন-এর তত্ত্বাবধানে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নাবালক দলীপ সিংহ রাজ্যভার লইলেন ('দলীপ সিংহ' দ্র)। কিন্তু শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত শিখদের খোলাখুলি যুদ্ধ শুরু হইল ; এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ শিখের যুদ্ধে সেনাপতি তেজ সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে শিখদের জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। যাহা হোক, আপাততঃ পরাজয় মানিলেও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিখরা পুনরায় যুদ্ধে নামিয়া ইংরেজকে পরাজিত করিল। কিন্তু ঐ বৎসরই ১০ ফেব্রুয়ারি সোব্রাওন-এর যুদ্ধে প্রায় সমস্ত শিখসেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজদের কাছে শিখেরা সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। ইংরেজরা এখন লাহোর দখল করিল এবং মার্চ মাসের সন্ধিপত্রে শিখদিগকে ইংরেজদের প্রায় সকল সর্তই মানিয়া লইতে হইল। কিন্তু ইহাতেও শিখশক্তি সম্পূর্ণরূপে দমিত হইল না। নানা কারণে তাহাদের অসন্তোষ বাড়িতেছিল, এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইংরেজ যখন রানী ঝিন্দনকে অপসারিত করিল তখন শিখরা রীতিমত বিরক্ত হইয়া যুদ্ধের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। তখন শের সিংহের নেতৃত্বে শিখ-ইংরেজের আর একটি বৃহৎ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এদিকে লর্ড গাফ্-এর নেতৃত্বে ইংরেজসৈন্য শের সিংহের সম্মুখীন হইল। এই সময়ে শিখেরা চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শিখরা আফগানদের সহিত যুক্ত হইয়া যুদ্ধ করে কিন্তু তথাপি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। অতঃপর শিখরা ইংরেজদের প্রভুত্ব মানিয়া লয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শিব রজতগিরিসদৃশ, চন্দ্রকলা যাঁহার ভূষণ, যিনি চারি হস্তে মৃগ, বর ও অভয় ধারণ করেন, যিনি প্রসন্ন এবং পদ্মাসীন, যাঁহাকে চতুর্দিক হইতে দেবগণ স্তব করিয়া থাকেন, যিনি বিশ্বের আদি, বীজ ও নিখিল ভয়নাশক সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের নিয়ামক দেবাদিদেব শিবকে ভারতীয় দেবদেবী চিন্তার আদিমতম নমুনা বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে বৈদিকযুগের বহুপূর্ব হইতে সিন্ধুসভ্যতায় প্রতিষ্ঠিত দেব হিসাবে তিনি বন্দিত। অনার্য বলিয়াই বৈদিক যাগযজ্ঞে তাঁহার হবির্ভাগ ছিল না। দক্ষ এই কারণেই আয়োজিত যজ্ঞে শিবকে আমন্ত্রণ জানান নাই। এই যজ্ঞায়োজন পণ্ড হইলে অন্যতম যজত্ররূপে তাঁহার স্বীকৃতিলাভ ঘটে। অপরপক্ষে শিবকে বৈদিক রুদ্র, পূষা এবং সোমের বিবর্তিতরূপে বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পুরাণ ও তন্ত্রের শিবতত্ত্বে তাঁহার মহিমা স্বপ্রকাশ।

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

শিব ও শৈব সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্মজগতে শিব প্রধান দেবতাগণের অন্যতম। শিবের কল্পনার মূলে রহিয়াছে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয় ও সংঘাত।

ঋগ্‌বেদে রুদ্র দেবতারূপে ('রুদ্র' দ্র) উল্লিখিত হইয়াছেন। এখানে তিনি একাধারে ভীষণ ও সুন্দর। পর-

বর্তীকালে রুদ্র ও শিবের মধ্যে মিশ্রণ ঘটায় রুদ্র দেবতা 'শিব'-নামে আহূত হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় শিবকে 'গিরিশ গিরিত্র' বলা হইয়াছে। এই গিরিশ হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য দেবতা, পার্বতী তাঁহার স্ত্রী। এই দেবতা অথর্ব বেদে কিরাতরূপী ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণে মৃগয়াধিপ। মহাভারতেও শিব কিরাতরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে একটি জটাধারী ত্র্যম্বক যোগি-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পাতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির শিলে একটি যোগি-মূর্তির পিছনের দিকে বৃষ ও ত্রিশূল ধ্বজ উল্লেখযোগ্য।

রুদ্র শরণার্থীকে রক্ষা করেন, রোগাদি দূর করেন ও গ্রামকে সুস্থ রাখেন। অন্যদিকে, 'শিব' শস্য ও উর্বরতার দেবতা ; গ্রাম ক্ষেত্র ও পশুরক্ষক এবং মারীভয়নিবারক। রুদ্র ও শিবের এই ভাবগত মিলন হইতেই বর্তমান শিব দেবতার সৃষ্টি। শিবকে আর্যদেবমণ্ডলীর বিরোধের সম্মুখীনও হইতে হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ ইহারই রূপক কাহিনী। শিবলিঙ্গপূজা ও শিব-শিবাণী পূজা পরবর্তীকালে তত্ত্বরূপ পাইলেও আসলে ইহারা কৃষি সংস্কৃতি হইতে জাত ও লালিত। উভয়েই শস্য, পৃথিবী ও প্রজননের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই শিবলিঙ্গ ভারতীয় শৈবদিগের প্রধান পূজা-প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। শিবের সহিত শিবাণীর যোগও ঘনিষ্ঠ। দক্ষিণ ভারতের প্রাক্-আর্য দ্রাবিড়ী 'অয়্‌থ উম্ম' ও উত্তরভারতের 'গিরিশ-পার্বতী'র মধ্যেই 'শিব-উমা'র মূল নিহিত। জাতকাদি বৌদ্ধগ্রন্থেও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণে ও তন্ত্রে এই শিবই দার্শনিক তত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কালিদাস প্রভৃতির রচনায় এবং পাঁচালী প্রভৃতি লোক-সাহিত্যেও শিব বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। মধ্যপ্রাচ্যেও শিব-সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

উপাসকদের নিকট শিব একক, শিবানীসহ দ্বৈত এবং পুত্র কন্যা প্রমথাদি পরিবৃত বহু। বহুরূপের এক বিচিত্র সমন্বয় শিব। অসীম ঐশ্বর্যসত্ত্বেও তিনি চিরদরিদ্র ও নিরহংকার ; কখনও তিনি রজতগিরিনিভ কখনও বা মহাকাল ঘোর কৃষ্ণ, নটরাজমূর্তিতে মুহূর্তে প্রলয় ঘটান। সংসারে তাঁহার নিঃসীম আসক্তি অথচ বন্ধনে তাঁহার চির ঔদাসীন্য। তাঁহাকে ঘিরিয়া রূপ পাইয়াছে বহু তত্ত্ব, কাহিনী, ভাব, রস, কাব্য, কল্পনা ও জীবনাদর্শ। তিনি ভারতবাসীর জনপ্রিয় আরাধ্য দেবতা।

শৈব সম্প্রদায় ঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া শৈব দর্শন ও সাধনা বিকাশ লাভ করিয়াছে ('শৈব ও শাক্ত দর্শন' দ্র)। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই বিভিন্ন শৈব সম্প্রদায়েরও উদ্ভব ঘটিয়াছে। শৈব ধর্মে শিব পরমপুরুষ, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, উৎস ও লয়-স্থান। শৈবদের বিশ্বাস শৈবধর্মের প্রবক্তা স্বয়ং শিব। শৈব সাধন প্রণালীর নাম 'যোগাচার'। তন্দ্রের সহিত যোগ সাধিত হওয়ায় 'ষট্‌চক্র' ('ষট্‌চক্র' দ্র) ও 'ভৈরবীসাধনা'ও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মূলতঃ শৈবসাধন পদ্ধতি যোগাশ্রিত। শৈব যোগী নারীত্যাগী একক সাধক। তিনি দেহে ভস্ম লেপন, রুদ্রাক্ষ ধারণ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রকধারণ এবং সম্বিদাসেবন করেন। শৈব সাধক 'উদাসীন' নামেও পরিচিত। নানা গ্রন্থে শৈব সম্প্রদায়ের অসংখ্য দল-উপদলের কথা উল্লিখিত আছে। ইহাদের সকলকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে চিহ্নিত করা যায় ঃ—এক দলের সাধনা দর্শনতত্ত্বনির্ভর এবং অন্য দল ব্যবহারিক সাধন প্রণালী-কেই মুখ্য মনে করেন। একটি প্রধান শৈব সম্প্রদায় হইতেছে মাহেশ্বর পাশুপত—মহাভারত, শাংকরভাষ্য প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। অন্যান্য শৈব দল উপদলের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের শৈব সম্প্রদায়, কাপালিক ও কালামুখ, বীরশৈব বা লিঙ্গায়েৎ, কাশ্মীরী শৈব, দশনামী সম্প্রদায়, দণ্ডী, অঘোরী, যোগী; জাঙ্গম যোগী (লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়েরই উপশাখা), সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, অবধূত, নাগা, অলেখিয়া (ইহার 'অলখ' নামোচ্চারণ ও ভিক্ষাচরণকে সাধন প্রক্রিয়া মনে করেন) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়াও শৈব সম্প্রদায়ের আরও দল উপদল আছে।

গুরুদাস ভট্টাচার্য
কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০ খ্রী) হুগলি জেলার কোন্নগরে জন্ম। হিন্দু কলেজের ছাত্র, ডিরোজিও-র স্নেহধন্য। প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহপাঠী বন্ধু। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ (১৮৪৬ খ্রী) ও কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৬৩ খ্রী)। কোন্নগরের একাধিক বিদ্যালয় ও বিবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইঁহারই সহায়তায় ও অনুপ্রেরণায় গঠিত হয়। ইনি 'শিশুপালন' (১৮৫৭ খ্রী) ও 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' (১৮৬৭ খ্রী) গ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনা করেন (২৩. ১. ১৮৭৯ খ্রী) ও চারিবৎসর সমাজের সভাপতি (১৮৮০-৮৪ খ্রী) ছিলেন।

নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব (১৮৬০-১৯১৩ খ্রী) প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত, ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যাতা ও সাধক। তাঁহার তন্ত্রশাস্ত্রের জ্ঞান ও সাধনার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর জন উড্‌রফ ('উড্‌রফ, স্যর জন জর্জ' দ্র)। উড্‌রফ সাহেব ইঁহার লেখা 'তন্ত্রতত্ত্ব' নামক দুইখণ্ড বাংলা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করাইয়া 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অভ্ তন্ত্র' (১৯১৪, ১৯১৬

খ্রী) নামে প্রচার করেন। শিবচন্দ্র-রচিত অপর গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা হিসাবে লিখিত 'রাসলীলা' (১৩৩৪ বঙ্গাব্দ), স্বরচিত শাক্তসংগীতের সংকলন 'গীতাঞ্জলি' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ) ও 'গঙ্গেশ' নাটকের (১৩০৫ বঙ্গাব্দ) নাম করা যাইতে পারে। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'চণ্ডীতত্ত্ব' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শিবদাস ভাদুড়ী (১৮৮৫-১৯৩২ খ্রী) কৃতী ফুটবল খেলোয়াড়। তিনি পশুচিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়া ভেটারিনারি কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ফুটবল খেলাই তাঁহার ব্যায়াম ও প্রমোদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। খেলার সময়ে গোলপোস্ট তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত থাকিত এবং আচম্বিতে প্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষকের সম্মুখীন হইয়া অব্যর্থ শটে গোল করিতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে চিনসুরার গ্লাডস্টোন কাপের খেলায় শিবদাস ভাদুড়ী-পরিচালিত মোহনবাগান দল দুর্ধর্ষ ড্যালহৌসি ক্লাবকে ৫-১ গোলে পরাজিত করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার অধিনায়কত্বে মোহনবাগান দল ইস্ট ইয়র্ক-দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করিয়া প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে আই. এফ. এ. শীল্ড পান ও ফুটবল খেলার ইতিহাসে বাঙালী তথা ভারতীয়ের মুখ উজ্জ্বল করেন।

উমাপতি কুমার

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রী) সুপণ্ডিত, সুলেখক, সমাজসংস্কারক, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক, শিক্ষাবিদ্ ও দেশসেবক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্ম। মাতুল সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ('দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ' দ্র)। পিতা পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য। শিক্ষা মজিলপুর পাঠশালায়, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে এবং সংস্কৃত কলেজে। এম. এ. পাশ করার পর কিছুকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। চাংড়িপোতা, ভবানীপুর ও সাউথ সাবার্বান স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ, ভারতসভা এবং নানা প্রতিষ্ঠানের কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাল্যেই প্রসন্নময়ীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পরে তাঁহার পিতা ঐ বধূর পিতৃকুলের উপর বিরক্ত হইয়া শিবনাথের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও বিরাজমোহিনীর সহিত তাঁহার আবার বিবাহ দেন। শিবনাথ উভয়ের প্রতি কর্তব্যপালনের চেষ্টা করিয়াও গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তিনি উহার প্রচারে যত্নবান্ হন। কেশবচন্দ্র সেনের ('কেশবচন্দ্র সেন' দ্র) প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পরে কোনও কোনও বিষয়ে 'নববিধান' সমাজের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ('দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) সহায়তায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'সোমপ্রকাশ', 'তত্ত্বকৌমুদী' ও 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার' সম্পাদনাতেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'সিটি স্কুল' স্থাপন ও 'সাধনাশ্রম' প্রতিষ্ঠা তাঁহার দুইটি স্মরণীয় কাজ।

তাহার উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : কাব্য—'নির্বাসিতের বিলাপ' (১৮৬৮ খ্রী), 'পুষ্পমালা' (১৮৭৫ খ্রী), 'হিমাদ্রি-কুসুম' (১৮৮৭ খ্রী), 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৮৮ খ্রী) প্রভৃতি। উপন্যাস—'মেজ বৌ' (১৮৮০ খ্রী), 'যুগান্তর' (১৮৯৫ খ্রী), 'নয়নতারা' (১৮৯৯ খ্রী), 'বিধবার ছেলে' (১৯১৬ খ্রী) প্রভৃতি। প্রবন্ধাদি—'বক্তৃতা-স্তবক' (১৮৮৮ খ্রী), 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' (১৯০৪ খ্রী), 'প্রবন্ধাবলি' : ১ম খণ্ড (১৯০৪ খ্রী), 'ধর্মজীবন' : ১ম-৩য় খণ্ড (১৯১৪-১৬ খ্রী), 'আত্মচরিত' (১৯১৮) প্রভৃতি।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শিবরাত্রি মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী। ইহা শিবচতুর্দশী ও মহাশিবরাত্রি নামেও পরিচিত। এই দিন অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসের দ্বারা হিন্দুরা শিবকে পরিতুষ্ট করেন। এই দিনে পূজা অপেক্ষা উপবাসের প্রাধান্য।

রাত্রি জাগিয়া চার প্রহরে শিবের চারবার পূজা করিবার ব্যবস্থাও আছে।

পরদিন ব্রতের পারণান্তে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। বলা হয়, শিব নিদ্রিত ব্রতীর পদ সেবা করেন। বাংলাদেশে প্রচলিত ব্রতকথায় এক ব্যাধের কাহিনী বর্ণিত আছে। এই ব্যাধ এক শিবরাত্রির দিন বনের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এক বেল গাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। সমস্ত দিন তাহার খাওয়া হয় নাই—চক্ষে ঘুমও ছিল না। এই অবস্থায় বেলগাছের একটি পাতা ও একবিন্দু শিশির তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া গাছের তলায় অবস্থিত শিবলিঙ্গের উপর পড়ে। ফলে শিব পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং ব্যাধ পাপমুক্ত হইয়া মৃত্যুর পরে শিবলোকে গমন করে। শিবরাত্রি উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হয়—অনেক স্থানে মেলা হয়।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শিবাজী শিবাজীর জন্মতারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যদুনাথ সরকারের মতে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল সোমবার তাঁহার জন্ম হয়। (মতান্তরে ১৬২৮ বা ১৬৩০ খ্রী)। তাঁহার পিতা শাহজী প্রথমে আহম্মদনগরের ও পরে বিজয়পুরের মুসলমান সুলতানগণের অধীনে উচ্চপদের কর্মচারী ছিলেন। পুণা জেলায় শাহজীর জায়গীরের অন্তর্গত

বর্তমান জুন্নারের নিকটবর্তী শিবনের গিরিদুর্গে শিবাজীর জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই শিবাজী লেখাপড়ায় মন না দিয়া স্থানীয় শক্তিশালী মাওলি নামক কৃষক-সম্প্রদায়ের বালকগণের সহিত মিশিয়া নানারকম অস্ত্রশস্ত্র চালনায় ও সমরকৌশলে নিপুণ হন। কিশোর বয়সেই তিনি একটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছোটখাট গিরি দুর্গ অধিকার করিয়া একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি কোঙ্কণপ্রদেশ ও জাওলি রাজ্য হস্তগত করিলেন। এই সমুদয় স্থানের অধিপতি বিজাপুরের সুলতান তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আফজল খাঁ নামক সেনাপতির অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে শিবাজী আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিলে আফজল তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ছলে জড়াইয়া ধরিয়া ছুরিকা দ্বারা পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। অমনি শিবাজী 'বাঘনখ' নামক লোহার তৈয়ারি অস্ত্র এবং বিছুয়া নামক তীক্ষ্ন ছুরি দিয়া আফজলকে হত্যা করিলেন। অতঃপর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে মোগল সাম্রাজ্যে লুঠপাট করায় মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করিবার জন্য প্রথমে শায়েস্তা খাঁ ও পরে শাহজাদা মুয়জ্জমকে পাঠাইলেন। ইঁহারা অকৃতকার্য হইলে মোগলসম্রাট রাজপুত রাজ জয়সিংহকে পাঠাইলেন। জয়সিংহ শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিবার পর শিবাজী মোগল-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন এবং ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে আগ্রা গমন করিলেন। শিবাজী আগ্রায় গেলে তাঁহার কোন বিপদ হইবে না স্বয়ং জয়সিংহ এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে আগ্রায় বন্দী করিয়া রাখিলেন। অদ্ভুত চাতুরীর সাহায্যে শিবাজী পলায়ন করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া প্রবল-প্রতাপ মোগল-সম্রাট ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া সন্ধি করিলেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ জুন শিবাজী রাজধানী রায়গড়ে 'ছত্রপতি' এই উপাধি গ্রহণ করিয়া মহা সমারোহে হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান-সহকারে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং মারাঠা জাতিকে একটি প্রবল শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিয়া যান।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শিবায়ন ও শিবগীতি বাংলার শিবপূজার তিনটি ধারা। একটি কৃষি ও শিল্পকর্ম তথা প্রয়োজনের জগতে প্রবাহিত, একটি ধর্ম ও উপাসনার জগতে ও তৃতীয়টি প্রথম দুই ধারাকে ভিত্তি করিয়া কাব্যলোকে বাহিত হইয়াছে। এই তৃতীয় ধারা হইতেই 'শিবায়ন' নাম পরিচিত।

বাংলা শিবায়নের আধার দুইটি। এক. শিবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কাব্য ও লৌকিক গীতিকা-গাথা-গান। দুই. অন্য দেবতাকে কেন্দ্রে রাখিয়া রচিত কাব্যে শিবের বন্দনা বা শিব-কাহিনীর বর্ণনা।

বাংলা কাব্যের গ্রন্থারম্ভে অন্যান্য দেবদেবীর সহিত শিবের যে বন্দনা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহার ঐতিহ্যগত রূপগুণের ভাষাচিত্র। তাঁহার 'জন্মকথা'য় পুরাণের নীললোহিত অর্ধনারীশ্বর ইত্যাদি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর দক্ষযজ্ঞ সতী ও উমার আখ্যান, শিবের বিবাহ প্রভৃতি সর্বজনীন প্রাধান্য পাইয়াছে। শিবমাহাত্ম্যজ্ঞাপক কিছু পৌরাণিক আখ্যানও সংযোজিত হইয়াছে। শিবসম্পৃক্ত বাংলা কাব্যের ইহা একটি দিক্। ইহার অপর একটি দিক্ আছে যাহা প্রকৃত শিবায়ন কাব্যের অবলম্বন। এখানে শিব মর্ত্যের মানুষ হইয়া দেখা দিয়াছেন। অভাব অনটনের সংসারে তিনি অল্পবিত্ত বৃদ্ধ গৃহস্থ। কুলীন বলিয়াই অভিজাত বংশের কন্যা উমা তাঁহার তরুণী ভার্যা। স্ত্রীর পরামর্শে শিব কৃষিকার্যে মন দেন। এইভাবে হাসিকান্না, সন্ধিকলহের মধ্যে দম্পতির দিন কাটে। এই মানবরস প্রধান শিবচরিতকে কেন্দ্র করিয়া যে শিবায়ন কাব্য তাহা বাঙালিরই জীবনায়ন।

শৈব রচনা বলিতে শিবকে কেন্দ্র করিয়া রচিত কাব্য ও গান। এখানে তিনিই কবির আরাধ্য দেবতা এবং কাহিনীর নায়ক। এই জাতীয় রচনার দুটি স্তর। একটি লোকায়ত সাহিত্য—কৃষিকৃত্যে, ব্রতসমূহে, ছড়া-গান-পাঁচালীর আকারে মুখে মুখে প্রচলিত। যেমন—নীলের গান, চড়কের গান, পৌষালী ছড়া, শিবের গান, তীর্থ-পাঁচালী ইত্যাদি। অন্যটি প্রসাধিত কাব্য-সাহিত্য, যাহা 'শিবায়ন' নামে পরিচিত। ইহার আবির্ভাবকাল সপ্তদশ শতাব্দীতে—একটি দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে, অন্যটি দক্ষিণ-পশ্চিমে।

পূর্বমুখী ধারা তথা চট্টগ্রামের কাব্যগ্রন্থগুলিকে ভঙ্গির দিক্ দিয়া পাঁচালী বলাই সঙ্গত। এই রচনায় প্রথম যে কবির নাম পাওয়া যায় তিনি 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' রচয়িতা রামরাজা। ইঁহার সময় অজ্ঞাত। তাঁহার কাব্যটি ক্ষুদ্রকায় ; ইহাতে শিবের মহিমা, সরল ভক্তির মাহাত্ম্য প্রভৃতি সহজভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুস্পষ্টভাবে যে কবির সময় জানা গিয়াছে, তিনি সুচক্রদণ্ডী গ্রামের ব্রাহ্মণবংশীয় কবি দ্বিজ রতিদেব (১৬৭৪ খ্রী)। তাঁহার 'মৃগলুব্ধ' আকারে পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে বড়ো।

ইহাতে মূল কাহিনীর সহিত দক্ষযজ্ঞ, লিঙ্গমাহাত্ম্য ইত্যাদি পৌরাণিক আখ্যান সংযোজিত হইয়াছে।

পশ্চিমবাহিনী ধারার 'শিবায়নকাব্য' বিবৃতিমূলক আখ্যানকাব্য। এই পর্যায়ের শিবায়নের অন্যতম প্রাচীন কবি রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের লোক ছিলেন। কবি মহাকাব্য ও পুরাণ হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছেন। জীবন মৈত্রের (১৭৪৪ খ্রী) লেখা 'শিবায়ন'ও যথারীতি পুরাণ ঘেঁষা। একমাত্র শিব-শিবানীর কলহ বর্ণনায় তাঁহার মৌলিকতা পরিস্ফুট হইয়াছে। শিবায়নকাব্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মেদিনীপুরের রামেশ্বর ভট্টাচার্য ('রামেশ্বর' দ্র)। অবশেষে শৈবকাব্য বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে কবিগান পাঁচালী ইত্যাদিতে।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

শিবনিবাস নদিয়া জেলার একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রাম। পূর্ব রেলপথের শিয়ালদহ-বাণপুর লাইনে মাজদিয়া বা তারকনগর স্টেশনে নামিলে শিবনিবাসে পৌঁছান যায়। পূর্বে এই স্থানটির নাম ছিল 'নসরৎ খাঁর-বেড়'। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মারাঠা আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের আশায় এখানে নূতন রাজধানী নির্মাণ করেন ও রাজপুরীর নাম রাখেন শিবনিবাস। তাহা হইতেই জনপদটির এই নাম হয়। বর্তমান মাজদিয়া স্টেশনেরও পূর্বনাম ছিল শিবনিবাস। সুরম্য রাজসৌধ, দেবায়তন প্রভৃতির দ্বারা তখন এই নগরী সুসজ্জিত ছিল। ভৈমী একাদশী উপলক্ষে এখানে পক্ষকালব্যাপী হরিসভার মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

হারাধন দত্ত

শিয়া শব্দটির অর্থ অনুগামী বা সমর্থক। হজরত মহম্মদ মোস্তাফার (আঃ) আপন পিতৃব্য-পুত্র, জামাতা ও ইসলাম জগতের ৪র্থ খলিফা আমিরুল মোমেনীন হজরত মওলায়ে কায়েনাত, আলিয়া মুর্তজা, শেরে খোদা (আঃ) ও তাঁহার বংশধরদের অনুগামী ও সমর্থকগণ নিজদিগকে 'শিয়া' নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা ইসলাম জগতের অপর তিনজন খলিফা হজরত আবুবকর রাজি, হজরত ওমর ফরুক (রা) এবং হজরত ওসমান গণি (রা)-দিগকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। হজরত মহম্মদ (আঃ)-এর তিরোধানের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ও বৈধ উত্তরাধিকারীরূপে হজরত আলি (আঃ)-কে খলিফা-পদে নির্বাচনের তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন। তজ্জন্য যে মতভেদ দেখা দেয় উহার ফলে মুসলিম জগৎ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায় এবং শিয়া ও সুন্নির উদ্ভব হয়। হজরত আলী (আঃ)-র খেলাফত কালে সিরিয়ার শাসনকর্তা মারিয়া খলিফার বিরুদ্ধাচরণ করে ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। খলিফা হজরত আলী (আঃ) বিদ্রোহী মারিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং সিফ্‌ফিন নামক প্রান্তরে দুইপক্ষের মরণপণ সংগ্রাম হয়। এই যুদ্ধে মারিয়া পরাজিত হয় ও সন্ধি প্রার্থনা করে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই হজরত আলী (আঃ)-র সমর্থক ও অনুগামীরা শিয়া নামে অভিহিত হন। হজরত আলী (আঃ) ও তদীয় পত্নী হজরত খাতুনে জান্নাত (আঃ) ও তাঁহাদের বংশধর ও সমর্থকগণ দ্বারা বর্ণিত হাদিস ব্যতীত অন্য কোনও রাবীর হাদিস শিয়ারা বিশ্বাস করেন না। পরবর্তীকালে ইসলামজগতে চারিজন এমাম বা ব্যবস্থাদাতার আবির্ভাব হয় এবং মজহারের সৃষ্টি হয়। অতঃপর নিয়ম হয়, যে-কোনো একটি মজহারের এমামের অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু শিয়াগণ উপরি-উক্ত কোনও এমামকে অনুসরণ করেন না বা কোনও মজহারের অন্তর্ভুক্ত নন। তবে তাঁহারা হজরত আলী (আঃ)-র অধস্তন দশম পুরুষ পর্যন্ত একজন প্রধান ব্যক্তিকে তাঁহাদের উভয় জগতের নেতা বা এমাম রূপে গ্রহণ করিয়া কেবল তাঁহাদের কথাই মানিয়া চলেন।

আব্দুস সোবহান

শিলং মহকুমা ও শহর। শিলং আসামের খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ী জেলার মহকুমা ও সদর শহর এবং আসাম প্রদেশের রাজধানী। মহকুমার বিস্তৃতি ২৫°৭′ হইতে ২৬°৭′ উত্তর ও ৯০°৪৫′ হইতে ৯২°১৬′ পূর্ব। আয়তন ১০৩৫০ বর্গ কি. মি.। মহকুমায় শিলং শহর-গোষ্ঠী ব্যতীত ১৬৫৬টি গ্রাম আছে; তন্মধ্যে ৩৮টি গ্রাম বসতিহীন। ইহা আসাম গিরিশ্রেণীর অংশ ও উচ্চ মালভূমি। সুর্মা গিরিখাত হইতে খাড়া উঠিয়াছে ৪০০০′ ফিট ও বন্ধুরভাবে শিলং শিখরে ৬৪৫০′ ফিট পৌঁছিয়াছে ও পরে ক্রমনিম্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে শেষ হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম ঢালে বারিপাত সর্বাধিক (চেরাপুঞ্জিতে ৪৫৮″)। কিন্তু এই বায়ু শিলং মালভূমিতে পৌঁছিলে ইহার জলীয়ভাগ যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস পায় এবং শিলং-এ গড় বারিপাত দাঁড়ায় ৮২″, যদিও শিলং চেরাপুঞ্জির দূরত্ব মাত্র ৪৮ কি. মি.। ইহা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা ৮০° ফারেনহাইটের বেশি উঠে না ও শীতকালে তাপমাত্রা ৪০°-৪৫° ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে। ক্বচিৎ কখনও তুষারপাত ঘটে। প্রধান নদী উমিশিরূপি ও উমখড়া। শিলং-এর মলকি অঞ্চল হইতে উৎসারিত হইয়া ওরা-রো-রোতে পতিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে কয়েকটি প্রস্রবণও আছে। বৃষ্টিপাতের ক্রমহ্রস্বতার জন্য এখানে পাইন বৃক্ষের বনভূমি,

তৃণভূমি অঞ্চল ও চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায়। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে প্রধান হইল—ধান, ভুট্টা, বাজরা, আলু ও বহুবিধ আনাজ জন্মে। ফলের মধ্যে পীচ, নাসপাতি, আপেল, লেবু, আনারস, কলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানে কয়লা ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। জুমচাষ এখানকার স্থানীয় পদ্ধতি। বন জ্বালাইয়া সেখানে উপর্যুপরি ২/৩ বৎসর চাষ করা হয় ও পুনরায় জঙ্গল জন্মাইবার জন্য সে স্থান পতিত রাখা হয়। জুমচাষ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। প্রধান বাসিন্দা খাসি ও ভাষা খাসি ও অসমীয়া। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনায় জনসংখ্যা ৩৮০০০৫ ; তন্মধ্যে ১৯৯৭৮৮ পুরুষ ও ১৮০২১৭ স্ত্রী. শহরবাসীর সংখ্যা ১০২৩৯৮। কলিকাতা হইতে আকাশ-পথে ইহার দূরত্ব প্রায় ৫০০ কি. মি.। গৌহাটির সহিত পাকা রাস্তায় যুক্ত ও দূরত্ব ১০০ কি. মি.। এই সড়কটি শিলং হইয়া চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত গিয়াছে। চেরাপুঞ্জির নিম্নেই সিলেটের সমভূমি। শিলং ও সিলেট সড়কপথে যুক্ত। শহর বেষ্টন করিয়া আছে নদী ও পাহাড়। ইহা একটি ভাল স্বাস্থ্যনিবাস। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ১২ জুন প্রবল ভূকম্পনে পুরানো শহর বিধ্বস্ত হয় ও পরে নূতন শহর পরিকল্পনামত গড়িয়া উঠে। এখানে জেলখানা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ ও তসর উৎপাদনের একটি গবেষণাগার আছে। ব্যবসায়ের প্রধান ধান, চাল, তুলা, লেবু, আলু, সুপারি ও নানাবিধ ফল। শিলং শহরগোষ্ঠী চারটি ভাগে পড়ে—শিলং, শিলং ক্যাণ্ট, নঙাথিম্মাই ও মবলাই।

সলিলকুমার চৌধুরী

শিলা ভূত্বক্ যে সকল উপাদানে গঠিত তাহা শিলা নামে খ্যাত। শিলা তিন প্রকার—আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত। উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থা হইতে উদ্ভূত শিলাকে আগ্নেয়শিলা বলা হয়। আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়া উদ্গীরিত অথবা ভূত্বকে উত্থিত হইলে যথাক্রমে ভল্কানিক ও প্লুটনিক আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমটির উদাহরণ ব্যাসল্ট ও দ্বিতীয়টির উদাহরণ গ্র্যানাইট। শিলাকণা হ্রদ বা সমুদ্রে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া যে শিলা গঠিত হয় তাহাকে পাললিক শিলা বলে। স্থলবিশেষে ফসিল ও পাললিক শিলায় সমন্বিত দেখা যায়। বেলেপাথর, চুনাপাথর, শেল প্রভৃতি পাললিক শিলার উদাহরণ। উত্তাপ, চাপ ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগ্নেয়শিলা বা পাললিক শিলা রূপান্তরিত হইলে নিস (গ্র্যানাইট হইতে) মার্বেল (চুনাপাথর হইতে) বা কোয়ার্টজাইট (বেলেপাথর হইতে) প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র গুণাবলীর জন্য এগুলিকে রূপান্তরিত শিলা বলে।

উষা সেন

শিলার, ফ্রীডরিখ্ ফন (১৭৫৯-১৮০৫ খ্রী) জার্মান কবি, নাট্যকার, দার্শনিক ও ডাক্তার, ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৭৮১ হইতে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার রচনাগুলিতে সমাজ ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা আছে। বিয়োগান্তক 'দস্যুদল' নাটকে বলপ্রয়োগ ও চক্রান্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'চক্রান্ত ও প্রেম' (১৭৮৪ খ্রী) ট্র্যাজেডিতে ভাবপ্রবণতা পরিস্ফুট। মন্ত্রীর পুত্র ও সঙ্গীত শিল্পীর কন্যার প্রেম এই নাটকের বিষয়বস্তু। অভিজাত সমাজে দুর্নীতির আতিশয্য ও হৃদয়হীনতা তিনি অনাবৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। এগুলি গদ্যে রচিত। ১৭৮৫ হইতে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিলার যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ ইতিহাস-বিষয়ক ও দর্শনমূলক। কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রী)-এর দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করেন, কবি দুই প্রকারঃ স্বভাব-কবি ও ভাবপ্রবণ কবি।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত শিলার কয়েকটি কাব্যনাট্য রচনা করেন। ডন কার্লোস (১৭৮৭ খ্রী) তাঁহার প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা নাটক। স্পেনের রাজপুত্রের বিমাতার প্রতি আকর্ষণ এই নাটকের মূল কাহিনী। শেষ দুই অঙ্কে অবশ্য রাজনৈতিক দিক্ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'ভালেন্স্টাইন' (১৭৯৮-৯৯ খ্রী) তিন ভাগে বিভক্ত। নায়ক ভালেন্স্টাইন্কে সহজেই শেক্স্পীয়রের ট্রাজেডির নায়কের সহিত তুলনা করা চলে। 'ভিলহেল্ম্ টেল' (১৮০৪ খ্রী) সুইট্জারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের শৌর্যদৃপ্ত কাহিনী। গ্যেটের (১৭৪৯-১৮৩২ খ্রী) সহিত শিলারের বন্ধুত্ব দুই মহান্ সাহিত্যিকের জীবনেরই স্মরণীয় অধ্যায়। গ্যেটের মত বহুমুখী প্রতিভা না থাকিলেও জার্মান সাহিত্যে শিলার এক অবিস্মরণীয় নাম। 'মানুষে মানুষে ভাই' রচনায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। তিনি কয়েকখানি ইতিহাসের বইও লিখিয়া গিয়াছেনঃ 'নেদারল্যাণ্ডের পতন', 'ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ' ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পবিপ্লব খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রার এক অভূতপূর্ব বিপ্লব দেখা দেয়। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের কারণেই এই বিপ্লব সম্ভব হয়, এবং শিল্প জগতেই ইহা সর্বাধিক লক্ষিত হয়। হঠাৎ কয়েকটি নূতন উদ্ভাবনের ফলে সুতা কাটা, বয়নশিল্প, ধাতু শিল্প, খনিজ পদার্থের জন্য খনি খনন, পণ্যদ্রব্য পরিবহণ-কলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরাট্ পরিবর্তন ঘটিল। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হারগ্রীভ্স্ 'স্পিনিং জেনি'

বা একসঙ্গে একাধিক সুতা কাটিবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহাতে প্রচুর পরিমাণে সুতা উৎপাদন সহজ-সাধ্য হইল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কার্টরাইট বাষ্পচালিত তন্তুযন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া বয়নশিল্পে বিপ্লব আনয়ন করিলেন। ঠিক এই সময়ে জেম্স ওয়াট ('ওয়াট, জেম্স' দ্র) বাষ্পযন্ত্রের উৎকর্ষসাধন করিলে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ও জাহাজে রেলপথে ও জলপথে সহজে পণ্যদ্রব্য অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে পরিবহণ করা সম্ভবপর হইল। নূতন যন্ত্রগুলির জন্য বাষ্পোৎপাদনের প্রয়োজনে ইন্ধন সরবরাহ করিতে পাথুরিয়া কয়লা আবশ্যক হওয়ায় খনি হইতে কয়লা উত্তোলন একটা বিরাট্ শিল্পে পরিণত হইল। বৃহৎ ও সুদৃঢ় যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য খনি হইতে ধাতু উত্তোলন ও আকরিক লৌহ গলাইবার পদ্ধতি শিল্পসমূহের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন গুরুত্ব অর্জন করিল। স্বভাবতঃই শিল্পক্ষেত্রে এই সকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কার মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটা যুগান্তর আনিয়া দিল।

ত্রিদিবনাথ রায়

শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ খ্রী) বাংলার তথা ভারতের প্রসিদ্ধ জার্নালিস্ট, দেশপ্রেমিক ও ধর্মাত্মা ব্যক্তি। জন্ম ঃ যশোহর জেলার পলুয়া মাগুরা (পরে 'অমৃতবাজার') গ্রামে। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ এবং মাতা অমৃতময়ী। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। প্রথম যৌবনেই নীল-আন্দোলনে (১৮৫৯-৬০ খ্রী) চাষীদের নেতৃত্ব করেন এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবৃত করিয়া 'হিন্দু প্যেট্রিয়টে' কয়েকখানি পত্র প্রকাশ করেন। নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্রে ছাপিয়া 'অমৃত প্রবাহিণী' নামক (ডিসেম্বর, ১৮৬২ খ্রী) পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনায় জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসন্তকুমারকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। পত্রিকাখানি উঠিয়া গেলে তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, এবং কিছুকাল পর ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদেও উন্নীত হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই জার্নালিজম্ লাইনে আসেন ও নিজ গ্রাম হইতে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামক একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ খ্রী)। পরে কলিকাতায় আসিয়া পত্রিকা প্রকাশ করিতে থাকেন। দ্বিতীয় বৎসর হইতেই ইহা ইংরেজী-বাংলা দ্বি-ভাষী পত্রিকায় পরিণত হয়। লর্ড লিটনের 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন'-এর (ভার্নাকুলার-প্রেস অ্যাক্ট) প্রকোপ এড়াইবার নিমিত্ত পত্রিকাটিকে পুরাপুরি একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিকে পরিণত করেন (২১ মার্চ ১৮৭৮ খ্রী)। 'সম্মতি আইন' (এজ অভ্ কন্‌সেণ্ট বিল) আন্দোলনকালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পত্রিকাখানি দৈনিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। সম্পাদনাভার অনুজ মতিলালের হস্তে দিয়া স্বয়ং অবসর গ্রহণ করিলেও প্রধান পরিচালক ও অন্যতম লেখকরূপে তিনি বরাবর পত্রিকাখানির উন্নতি-সাধনে তৎপর ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাধিকার লাভ এবং স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের জন্য তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় অবিরত লেখনী চালনা করেন। জাতীয় উন্নতি-মূলক বিবিধ অনুষ্ঠানের সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান লীগ' স্থাপন করেন (২৫, সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ খ্রী) এবং ইহারই আনুকূল্যে স্থাপিত হয় 'এলবার্ট টেম্প্‌ল্ অভ্ সায়ান্স' নামক শিল্প ও কারিগরী বিদ্যালয়। শিশিরকুমার প্রথমে ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন, পরে সংশয়বাদী হন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়া ওঠেন এবং ইহার প্রচারে সাহিত্যকেই প্রধান বাহন করিয়া লন। তাঁহার 'অমিয় নিমাইচরিত' (ছয় খণ্ড) চৈতন্যদেবের অপূর্ব জীবনালেখ্য। 'শ্রীনরোত্তম চরিত', 'শ্রীকালাচাঁদগীতা' (কাব্য), 'শ্রীনিমাই সন্ন্যাস' (নাটক), দুই খণ্ডে 'লর্ড গৌরাঙ্গ অর্ স্যালভেশন্ ফর অল্' তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'শ্রীশ্রীগৌর বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা', 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমেও তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার অন্য কয়েকখানি পুস্তকের নাম ঃ 'সর্পাঘাতের চিকিৎসা', 'নয়শো রূপেয়া' (প্রহসন), 'বাজারের লড়াই' (প্রহসন), এবং 'সংগীতশাস্ত্র'।

যোগেশচন্দ্র বাগল

শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯ খ্রী) প্রখ্যাত যুগপ্রবর্তক অভিনেতা এবং নাট্যাচার্য। জন্মস্থান মেদিনীপুর। পৈতৃক বাসভূমি হাওড়া জেলার রামরাজা-তলায়। ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করিয়া অধ্যাপনাকার্যে ব্রতী হন। অধ্যাপনা-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াও সৌখীনভাবে অভিনয় করিতেন। পরে ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিয়াই নাট্যামোদী জনসাধারণের চিত্ত জয় করেন। কিন্তু ম্যাডান থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন এবং পরিচালক ও অভিনেতারূপে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো', 'চন্দ্রনাথ'-এর চিত্ররূপ দেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ঐ বৎসরেই বড়দিনে নিজের একটি দল গড়িয়া ইডেন গার্ডেন্স-এ ক্যালকাটা একজিবিশনে 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বাংলার নাট্য-

শিশু-অপরাধ

জগৎকে অভিভূত করেন। অতঃপর বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে একের পর এক বহু নাটক অভিনয় করিয়া তিনি অসামান্য যশের অধিকারী হন। নিজ নাট্যসম্প্রদায় লইয়া তিনি ভারতের নানা স্থানে অভিনয় করিয়াও সুনাম অর্জন করেন। বহু নির্বাক্ ও সবাক্ চলচ্চিত্রেও অভিনয় করিয়া তিনি যশস্বী হন।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি নিজস্ব নাট্যগোষ্ঠী লইয়া আমেরিকায় যান। সেখানে নিউইয়র্ক শহরে 'সীতা' মঞ্চস্থ করিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন বটে কিন্তু আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। অভিনয়ে খ্যাতি পাইলেও তিনি ব্যবসায়ে তেমন সাফল্য লাভ করেন নাই। ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ উপাধি গ্রহণে তিনি অসম্মত হন (১৯৫৯ খ্রী)।

শিশিরকুমার অভিনয় বৃত্তি গ্রহণ করায় বহু শিক্ষিত অভিনয়-দক্ষ যুবক পেশাদারী নট-বৃত্তি গ্রহণে উৎসাহিত হন। বরাহনগরস্থ নিজ বাসভবনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মন্মথ রায়

শিশু-অপরাধ আইনগত ব্যাখ্যানুযায়ী অপরাধীরা তিন শ্রেণীতে পড়েঃ ১. শিশু-অপরাধী, ২. কিশোর-অপরাধী, ৩. বয়স্ক-অপরাধী। কিন্তু শিশু-অপরাধী বলিলে আমরা উহার সহিত কিশোর-অপরাধীদেরও বুঝিয়া থাকি। কৈশোর কদাচারকে ইংরেজীতে 'জুভেনাইল ডেলিংকোয়েন্সি' বলা হয়।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত অপরাধী শিশু-অপরাধী। পাঁচ হইতে আঠারো বৎসর বয়স্ক অপরাধী কিশোর-অপরাধী এবং তদূর্ধ্ব বয়স্করা বয়স্ক-অপরাধী। কিশোর-অপরাধীদের মন অপরিণত। উহাদিগকে শুধরাইবার জন্য সংশোধনাগার আছে। কে শিশু-অপরাধী বা কিশোর-অপরাধী বা বয়স্ক-অপরাধী তাহা এক্স-রে দ্বারা অস্থি পরীক্ষা, তাহাদের বার্থ সার্টিফিকেট প্রভৃতি ও তাহাদের বগল ও যৌনদেশের কেশ পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে।

ক. শিশু-অপরাধীঃ আইন শিশুদিগকে অপরাধীরূপে স্বীকার না করিলেও বিজ্ঞানীদিগের নিকট উহাদের অপরাধ বিশেষরূপে বিবেচ্য বিষয়। শিশুদের মধ্যে প্রায়ই কিছু পরিমাণ অপরাধপ্রবণতা দেখা যায়। স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, হিংসা-দ্বেষ, দ্রব্যাদি কাড়িয়া লওয়া বা উহা লুকাইয়া রাখা উহাদের স্বভাব। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত উহাদের ঐ স্বভাব পরিত্যক্ত হয়। শিশুদের কদাচার বারংবার সংশোধন করিয়া দেওয়ার রীতি। উহার মূল দায়িত্ব পিতামাতার উপর বর্তাইয়া থাকে। এই জন্য ডেলিংকোয়েন্ট বিজ্ঞানে উহাদের পিতামাতার স্বভাব-চরিত্র আলোচ্য বিষয়।

অপরাধের মূল বীজ শিশুদের মধ্যেও নিহিত থাকে। সামান্য ভুল-ভ্রান্তিতে কিংবা স্টিমিউলাসে উহাদের মস্তিষ্কের সূক্ষ্মস্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। ফলে, বয়ঃপ্রাপ্তির পরও উহারা অপরাধপ্রবণ রহিয়া যায়। শিশুরা তাহাদের জগতে বড়দের প্রবেশ পছন্দ করে না। ঐ রূপ বারংবার অনুপ্রবেশ উহাদের ক্ষতির কারণ হয়। তাহা ছাড়া পিতামাতার জীবনের নিন্দনীয় দিক্‌গুলি (যেমন, উভয়ের মধ্যে কলহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পৃথক্ বসবাস প্রভৃতি) মন্দ দৃষ্টান্ত হিসাবে শিশুমনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। শিশুদের বুদ্ধির উপরে বড়দের শ্রদ্ধা রাখা কর্তব্য। বাড়ি তৈয়ারি প্রভৃতি ব্যাপারে ও দ্রব্যাদি ক্রয়কালে শিশুদের মতামত গ্রহণ করিলে ফল সর্বোত্তম হয়। শিশু কোনও প্রকারে ভয় পাইলে উহার কারণ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করিতে হইবে।

পিতামাতা স্নেহহীন, দুশ্চরিত্র ও অপরাধী হইলে, তাঁহাদের শাসনকার্য নির্দয় ও কদর্য হইলে, পরিবার সুসংহত না হইলে, বুদ্ধিমত্তা, জাতি ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশুদের অপরাধী হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে শিশুদের স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। উপরন্তু তাহাদের প্রতিটি সৎকার্যে স্বীকৃতি দিলে ফল ভালো হয়।

খ. কিশোর-অপরাধীঃ কিছু সংখ্যক শিশু-অপরাধী কিশোর বয়সেও অপরাধী রহিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির শিশুদের সম্বন্ধে বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ কিশোর-অপরাধী উহাদের কিশোর বয়সে উপনীত হওয়ার পর অপরাধী হইয়াছে। সাধারণতঃ কিশোর-অপরাধীরা একাকী অপরাধ করে। কয়েক ক্ষেত্রে উহারা দলবদ্ধ হইয়াও অপরাধ করিয়াছে। তবে বালক ও বালিকাদের দল প্রায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। উহাদের মিশ্রদল কদাচিৎ দেখা যায়। বালিকা-অপরাধীদের দল সকল দেশেই কম।

এগারো বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালকদের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহার প্রকাশ পায়। উহার ঊর্ধ্বতন বয়স্ক বালকেরা অপদল সৃষ্টি করে ও ইহা তাহাদের একটি সাধারণ প্রবণতা। উহাদের দলভুক্তির বয়স বারো বৎসরের পরের বয়স বলা যাইতে পারে। বালকেরা পরস্পরকে কম ক্ষেত্রেই মন্দ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে বড়দের প্রবেশ সকল অনর্থের মূল।

প্রায়ই বলা হয় যে, কুপরিবেশ, সঙ্গদোষ, কুআদর্শ, অভাব-দারিদ্র্য প্রভৃতি অপরাধ সৃষ্টির কারণ। কিন্তু বহু বস্তিবাসী দরিদ্র বালক আবার অপরাধী হয়ও নাই। পক্ষান্তরে প্রাচুর্যের মধ্যেও বালক-অপরাধী সৃষ্টি হইয়াছে। বেকার বালকদের অপেক্ষা কর্মরত বালকদের (ওয়ার্কিং বয়েজ) মধ্যে অপরাধীদের আনুপাতিক হার

অধিক। জুতা-পালিশ, সংবাদপত্র-বিক্রেতা এবং হকার বালকদের মধ্যে বহু অপরাধী দেখা গিয়াছে। পিতৃ-আবাসে অন্নচিন্তা না থাকিলেও অপরাধী সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

কিশোর-অপরাধী সৃষ্টির জন্য ডেলিঙ্কোয়েন্ট-বিজ্ঞানীরা অভিভাবকদের সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেও দায়ী করেন। কিশোর-অপরাধীদের সংশোধনের জন্য বিজ্ঞানীরা পারিবেশিক, ঔষধাদি প্রয়োগে, দৈহিক, মনস্তাত্ত্বিক, সিমবলিক, প্রাশাসনিক প্রভৃতি বহুবিধ চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে নিম্নোক্ত দোষগুলি উহাদের অপরাধী হওয়ার পূর্বাভাসরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে ঃ পশু-পক্ষীদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার, ক্রীত নয় এমন দ্রব্যের অধিকার, অতিরিক্ত অবাধ্যতা, বিদ্যালয় হইতে পলায়ন, কৈফিয়ৎহীন ক্ষত-আদি, দেরিতে গৃহে ফেরা, বিসদৃশ ও মলিন পরিচ্ছদ, অকর্তিত কেশ ও মলিন আকৃতি, অবাঞ্ছিত বন্ধু-বান্ধব, নেশা-ভাঙ্ করা ও উল্কিধারণ, সন্দেহজনক ব্যক্তিদের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে এই বিপাক এড়ানো সম্ভব।

কিশোর-অপরাধীরা দুই প্রকারের হইয়া থাকেঃ এক্টোমরফাস ও মেসোমরফাস। অবশ্য এই বিষয়ে মতভেদও আছে। প্রথমোক্ত দল হাল্‌কাদেহী, কৃশ, গোপনীয়তাপ্রিয় এবং ভীরু কিন্তু চতুর ; শেষোক্ত দল বলবান্, সাহসী, বেপরোয়া, নিষ্ঠুর ও আনুগত্যহীন। উহাদের মধ্যে বহু প্রকার মনোজট (কম্‌প্লেক্স) দেখা যায়। কিশোর-অপরাধীদের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রায়ই দেখা যায়ঃ ১. দৈহিক স্বাস্থ্যঃ নিরেটদেহী, সুসংবদ্ধ ও পেশীবহুল ; ২. মানসিক প্রবণতাঃ অস্থির, ধৈর্যহীন ও ভাবুক ; ৩. কর্মশক্তিঃ মাত্রাহীন, আক্রমণাত্মক ও নাশকতাপ্রিয় ; ৪. আচরণঃ শত্রুবৎ, বেপরোয়া, বিঘ্নসৃষ্টিকারী, সন্দিগ্ধ, জেদি, অধিকারবিলাসী, দুঃসাহসিক, সংস্কারবিহীন ও আনুগত্যহীন ; ৫. মনস্তাত্ত্বিক ঃ জবরদস্তি স্বভাবের, নেতৃত্ববিলাসী, সফলতার জন্য অন্যায় পন্থা গ্রহণকারী, নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর।

পঞ্চানন ঘোষাল

শিশুনাগ কয়েকটি পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে. মগধের একজন বিখ্যাত রাজা ও একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিশুনাগ। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু এই বংশের দুইজন রাজা। কিন্তু পালি বৌদ্ধগ্রন্থে বিম্বিসার হর্যঙ্কবংশীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণের মতে শিশুনাগ-বংশীয় দশজন রাজা মোট ৩৬০ (মতান্তরে ১৬৩) বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশ-তালিকা সত্য হইলে এই রাজবংশ প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজা বিম্বিসার অঙ্গদেশ প্রভৃতি জয় করিয়া মগধরাজ্যকে বিশাল এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিবার সূত্রপাত করেন। অজাতশত্রু লিচ্ছবি-রাজ্য জয় করেন। এই বংশের একজন রাজা মগধের প্রাচীন রাজধানী রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া পাটলিপুত্র (বর্তমান পাটনা) নামক নগরীতে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। বহু শত বৎসর পর্যন্ত পাটলিপুত্র বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শিশুপাল পিতা চেদিরাজ দমঘোষ, মাতা শ্রুতশ্রবা শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা। ইনি ত্রিনয়ন এবং চতুর্ভুজরূপে জন্মগ্রহণ করিবার পর কৃষ্ণ ইঁহাকে ক্রোড়ে লইলে ইঁহার অতিরিক্ত বাহুদ্বয় ও তৃতীয় নয়ন লুপ্ত হয়। দৈববাণী হইতে কৃষ্ণকে পুত্রের ঘাতক জানিয়া জাতকের মাতার অনুরোধে কৃষ্ণ ইঁহার শত অপরাধ ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। শিশুপাল জন্মাবধি কৃষ্ণদ্বেষী।

কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে ইনি দ্বারকানগরী অবরোধ করেন। ইনি বভ্রুর ভার্যাকে অপহরণ করেন।

রাজসূয় যজ্ঞসভায় যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে ইনি উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনিন্দা করিতে থাকেন। অপরাধসীমা পূর্ণ দেখিয়া কৃষ্ণ সভাস্থলে চক্রাঘাতে শিশুপালকে বধ করেন।

এই ঘটনা লইয়া কবি মাঘ 'শিশুপালবধ' নামক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। বিষ্ণু-পুরাণ-মতে শিশুপালই পূর্ব দুই জন্মে হিরণ্যকশিপু এবং রাবণ ছিলেন।

কল্যাণী দত্ত

শিশুপাল গড় ভুবনেশ্বর দ্র

শিশুরোগ জন্মের পরমুহূর্ত হইতে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বয়সকে শিশুকাল বলা হয় এবং যে সকল বিশেষ ব্যাধিতে ঐ সময়ে কেবল শিশুরাই আক্রান্ত হয়, সেইগুলিই শিশুব্যাধি। শিশুব্যাধিগুলিকে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১. পিতৃমাতৃ দেহ হইতে গর্ভস্থ ভ্রূণে সংক্রামিত রোগসমূহঃ যথা উপদংশ, হিমোফিলিয়া প্রভৃতি ; ২. ভ্রূণাবস্থায় কোনও দেহাংশের গঠনবিকৃতিহেতু রোগসমূহঃ যথা শশকৌষ্ঠ, দ্বিধাবিভক্ত তালু, বদ্ধজিহ্বা, আজন্ম হৃদরোগ, অনবতরিত অণ্ডকোষ প্রভৃতি ; ৩.

সদ্যোজাত শিশুর রোগসমূহঃ প্রসূতির প্রসব-দ্বার হইতে গনোরিয়ার জীবাণু সংক্রমণহেতু চোখ ওঠা, একইভাবে স্টেফাইলোকক্কাস্ জীবাণুর সংক্রমণহেতু খোলস ছাড়ার মতো চর্মরোগ, নাড়ীচ্ছেদকালে বিশেষ কোনও জীবাণুর সংক্রমণের ফলে ধনুষ্টংকার, প্রসবের পর প্রথম হইতে তৃতীয় দিন পর্যন্ত ন্যাবারোগ প্রভৃতি ; ৪. পরিপুষ্টির অভাবজনিত শিশুরোগঃ যেমন অস্থি-চর্মসার কৃশতা, ভিটামিন 'সি'র অভাবজনিত স্কার্ভি রোগ, ভিটামিন 'ডি'র অভাবজনিত রিকেট্স্ রোগ, দন্তক্ষয়রোগ প্রভৃতি, আয়োডিনের অভাবজনিত স্থানীয় গলগণ্ড রোগ, খাদ্যে স্নেহজাতীয় পদার্থের আধিক্যহেতু সবুজ উদরাময় ও পরিণামে যকৃৎবৃদ্ধিরোগ প্রভৃতি ; ৫. অন্তঃস্রাবী গ্ল্যান্ডসমূহের কোনও কোনটির অক্ষমতা হেতু ক্রেটিন-বামনত্ব, বামনত্ব, টিটানি, কিংবা অতিসক্রিয়তা-হেতু অতিকায়ত্ব প্রভৃতি ; ৬. শিশুদের দেহে অতিসহজে সংক্রামিত প্রতিষেধ্য রোগসমূহ ঃ যেমন বসন্ত, হাম, স্কার্লেট জ্বর, ডিফ্থেরিয়া, পলিয়োমায়েলাইটিস্, মাম্প্স্ প্রভৃতি। শেষোক্ত কতকগুলি রোগের জন্য জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিষেধক টিকা লওয়া আবশ্যক। বসন্তের টিকা, ডিফ্থেরিয়া, পলিয়ো রোগ ও যক্ষ্মার প্রতিষেধক টিকা শিশুদের দিলে এই সকল রোগের প্রতিষেধ সম্ভবপর। এই সমস্ত প্রতিষেধক ছাড়াও গর্ভাবস্থায় জননীর স্বাস্থ্য, শিশুর জন্মের পর প্রসূতির স্বাস্থ্য, শিশুদের পরিপুষ্টি, প্রয়োজন মতো উপযুক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে ; তবেই শিশুমৃত্যুর হার অন্যান্য সভ্য দেশের মতো আমাদের দেশেও কমিয়া যাইবে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শিশুশিক্ষা কিণ্ডার গার্টেন ও মন্তেসরি প্রণালী দ্র

শিশুসাহিত্য, বাংলা অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা যে গল্প, ছড়া, কবিতা প্রভৃতি শুনিয়া, বলিয়া বা আবৃত্তি করিয়া আনন্দ পায়, সাধারণভাবে তাহা অর্থাৎ শিশুদের উপযোগী বা মনোরঞ্জক রচনাই শিশুসাহিত্য। রূপকথা ও ছেলেভুলানো ছড়ার সাহায্যে বাঙালী শিশু স্মরণাতীত কাল হইতে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছে। স্বনামধন্য বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' (১৮৫১ খ্রী), 'কথামালা' (১৮৫৬ খ্রী) এবং 'আখ্যান মঞ্জরী' (১৮৬৯ খ্রী) এই সাহিত্যসম্ভাবনাকে প্রকৃত পথে চালিত করে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হজসন প্র্যাট্, রেভারেণ্ড লং, ই. বি. কাউয়েল, বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রাধাকান্ত দেব ইত্যাদির উদ্যোগে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি' বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইলে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় একটি উৎকৃষ্ট পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রী) প্রচারিত হয়। 'আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা'র জন্য প্রকাশিত হইলেও ইহাতেই শিশু-পত্রিকার প্রথম সূত্রপাত। 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'-এর সহকারী সম্পাদক মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরেজী হইতে অনূদিত 'চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ' (১৮৫৭ খ্রী), 'কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়ের বিবরণ' (১৮৫৮ খ্রী) প্রভৃতি এবং অন্যান্যদের দ্বারা কৃত ইংরেজীর অনুবাদ 'বিচার' (১৮৫৮ খ্রী), 'এলিজাবেথ' (১৮৫৮ খ্রী), 'হিতকথাবলী' (১৮৬০ খ্রী), 'নানকের জীবনচরিত' (১৮৬৫ খ্রী), 'কথা তরঙ্গ' (১৮৬৭ খ্রী) ইত্যাদি একাধারে স্ত্রীশিক্ষা ও শিশুসাহিত্যের স্থায়ী ভিত্তি রচনা করে। হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ), 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯ খ্রী) নামে প্রথম মৌলিক শিশু-উপন্যাস বা রূপক রচনা করেন। নীলমণি বসাক চমৎকার গদ্যে 'নরনারী' (১৮৫২ খ্রী) ও 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮৫৪ খ্রী) নামে দুখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন সোসাইটি 'সত্য প্রদীপ' নামে একখানি শিশুদের মাসিকপত্র প্রচার করেন। ইহারই অনুসরণে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারিদের কল্যাণে আবির্ভূত হয় 'জ্যোতিরিঙ্গণ'। এই দুইটি পত্রিকাই কেশবচন্দ্র সেনকে 'বালকবন্ধু' (১৮৭৮ খ্রী) নামে একটি উচ্চ-শ্রেণীর শিশু-পাক্ষিক প্রচারে প্রেরণা দেয়। অতঃপর আবির্ভূত হয় প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' (১৮৮৩ খ্রী)। ইহাতেই উত্তরকালের প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুরবাড়ি হইতে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করেন ; ইহাতে শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে 'বালক'-এ মুকুট, রাজর্ষি এবং শিশু-কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা বাহির হয়। ভুবনমোহন রায় প্রকাশ করেন 'সাথী', 'সখা ও সাথী' (১৮৯৩-৯৪ খ্রী)। তারপর আসে শিবনাথ শাস্ত্রীর বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত 'মুকুল' (১৮৯৫ খ্রী) এই কালে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' (১৮৮৬ খ্রী), অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' (১৮৯৫ খ্রী) ও 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬ খ্রী) যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসি ও খেলা' (১৮৯১ খ্রী), 'রাঙাছবি' (১৮৯৬ খ্রী), 'হাসি খুশি' (১৮৯৭ খ্রী), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'ছেলেখেলা' (১৮৯৭ খ্রী), 'টুকটুকে রামায়ণ' (১৯০৭ খ্রী, উপেন্দ্রকিশোরের 'ছেলে-

দের রামায়ণ' (১৮৯৬ খ্রী), 'টুনটুনির বই' (১৯১০ খ্রী), মনোমোহন সেনের 'খোকার দপ্তর' (১৯০২ খ্রী), দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি' (১৯০৭ খ্রী) এবং 'চারু ও হারু' (১৯১১ খ্রী) প্রভৃতি ছোটদের পাঠোপযোগী অসংখ্য উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিল উপেন্দ্রকিশোরের দিগ্বিজয়ী পত্রিকা 'সন্দেশ'। ইহাতেই সুকুমার রায়চৌধুরীর 'আবোল-তাবোলে'র কবিতা-সমূহ, ধারাবাহিক 'হ-য-ব-র-ল' ও 'পাগলা দাশু'র গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। ইহারই এক বৎসর আগে 'শিশু' এবং 'ধ্রুব' (১৯১৩ খ্রী) নামে আরও দুইটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ১৯২২, ১৯২৩ এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আরও তিনখানি সার্থক শিশু-পত্রিকার জন্ম হয়। ইহারা যথাক্রমে 'মৌচাক', 'শিশুসাথী' ও 'খোকাখুকু'। ইহাদের প্রথম দুইখানি আজিও সগৌরবে বিদ্যমান। 'মৌচাকে' হেমেন্দ্রকুমার রায় ছোটদের প্রথম রোমাঞ্চকর উপন্যাস লেখেনঃ 'যখের ধন' (১৯১৪ খ্রী), 'মেঘদূতের মর্তে আগমন' (১৯২৬ খ্রী) এবং 'ময়নামতীর মায়াকানন' (১৯১৭ খ্রী)। এই যুগের ও পূর্বানুবৃত্ত শিশু-সাহিত্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাম—দীনেন্দ্রকুমার রায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলদারঞ্জন রায়, সুবিমল রায়, জগদানন্দ রায় (বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ), জলধর সেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ ঘোষ, সুনির্মল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যচরণ চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র দাস, ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। সাম্প্রতিক কালেও বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, অখিল নিয়োগী (স্বপন-বুড়ো), বিমল ঘোষ, (মৌমাছি), খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার প্রভৃতি লেখকেরা শিশুসাহিত্যকে নানা দিক্ দিয়া ক্রমোন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছেন।

আশা দেবী

শিশোদিয়া উদয়পুর দ্র

শিহ্লন নাম হইতে মনে হয়, ইনি ছিলেন কাশ্মীরী। ইঁহার জীবনী ও কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। শ্রীধর দাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামক কোশকাব্যে শিহ্লনের নামাঙ্কিত শ্লোক আছে। এই কোশকাব্যের সংকলন কাল ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ; সুতরাং শিহ্লন, ইহার পূর্ববর্তী লেখক। কোনও কোনও স্থলে, বিহ্লণের শ্লোকও শিহ্লনের নামাঙ্কিত হইয়াছে। শিহ্লনের নামে প্রচলিত 'শান্তিশতক' পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোক-সমূহের সমষ্টি। শ্লোকগুলি চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; যথা—পরিতাপ প্রশমন, বিবেকোদয়, কর্তব্যতা ও ব্রহ্মপ্রাপ্তি। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের গুণাবলীর বর্ণনা 'শান্তিশতক'-এর বিষয়বস্তু। গ্রন্থখানি সরল ও হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে শতকত্রয়ের রচয়িতা ভর্তৃহরির প্রভাব স্পষ্ট। কোথাও অবিকৃতভাবে কোথাও বা পরিবর্তনসহ উদ্ধৃত হইয়াছে। হর্ষের 'নাগানন্দ'-এর একটি শ্লোকও ইহাতে আছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতলা বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে উত্তর ভারতের বহুত্র শীতলা বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অপ্রিয় কথা বিপরীতার্থক শব্দদ্বারা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি হইতেই নিদারুণ দৈহিক জ্বালা যন্ত্রণাময় রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শীতলা হইয়াছে। এই প্রবৃত্তি হইতেই এই রোগকে 'মায়ের দয়া'ও বলা হয়। ওড়িশায় এই দেবীর নাম 'ঠাকুরানী', আসামে 'আই'। শীতলা নাম উভয় স্থানেই অপরিচিত। দেবীর যে ধ্যান শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহাকে শ্বেতাঙ্গী, রাসভ-বাহনা, সম্মার্জনী-হস্তা, পূর্ণ-কুম্ভ কক্ষস্থিতা, দিগ্‌বস্ত্রা (অর্থাৎ উলঙ্গ), মস্তকে সূর্পধারিণী, ত্রিনেত্রা, বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ধ্যান-মন্ত্রে তিনি বিস্ফোটকের উগ্রতাপ প্রশমনকারী শীতলা বলিয়া উল্লিখিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমায় নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামক একজন কবি এই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া 'শীতলা মঙ্গল' নামক একখানি সুদীর্ঘ মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে কাব্যরচনায় অন্যান্য কবিরও নাম পাওয়া যায়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বায়ুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকে মূলতঃ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ কেবল যে মানুষের শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ঘটায়, তাহা নহে, বহুবিধ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতার জন্যও ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সাধারণতঃ তাপমাত্রা ৭৫° ফা. অর্থাৎ ২৪° সে. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৫০ রাখা হয় (কোনও নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভর এবং ঐ তাপমাত্রায় বায়ুকে সম্পৃক্ত করিতে প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের ভরের অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে; ইহার পরিমাণ যত বেশি হয় শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য তত বাড়ে)। কক্ষের বাতায়নে যে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাতে প্রধানতঃ ইচ্ছামত শৈত্যে উৎপাদনের ব্যবস্থা, বায়ু পরিশোধনের জন্য উপযুক্ত ফিল্টার বা পরিশোধক, আর্দ্রতা হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যবস্থা এবং বায়ুর পরিচালনের জন্য পাখা থাকে। একটি এক টন ক্ষমতাবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ঘণ্টায় ৩০ লক্ষ ক্যালরি তাপ অপসারিত করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এক গ্রাম জলের ১° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজনীয় তাপকে ১ ক্যালরি বলে এবং একজন সাধারণ মানুষ লঘু পরিশ্রমের সময় ঘণ্টায় ১,২৫,০০০ ক্যালরি তাপ সৃষ্টি করে।

অনাদিনাথ দাঁ

শুক্র১ ভৃগুবংশীয় সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দৈত্যগুরু। বিষ্ণু-কর্তৃক মাতৃবধহেতু তিনি অতিশয় দেববিদ্বেষী হন। মহাদেবের শিশ্নদ্বার দিয়া নির্গত হন বলিয়া নাম শুক্র। ষণ্ড ও অমর্ক তাঁহার দুই পুত্র, কন্যা দেবযানী। বামনা-বতারে বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমিদানব্যাপারে দৈত্যরাজ বলিকে তিনি নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহার উপ-দেশে কর্ণপাত না করায় বলিরাজা অভিশপ্ত হন। মৃত-সঞ্জীবনীবিদ্যা দ্বারা তিনি নিহত দৈত্যদের পুনরু-জ্জীবিত করিতে পারিতেন। দেবযানীর অনুরোধে বৃহস্পতিপুত্র কচকে তিনি মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যা শিক্ষা দেন। নৃপতি যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ হয়। পুনরায় দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করিলে শুক্রাচার্য যযাতিকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন। 'যযাতি' দ্র।

যূথিকা ঘোষ

শুক্র২ সূর্যোদয়ের সময়ে পূর্ব এবং সূর্যাস্তের সময়ে পশ্চিম আকাশে এই উজ্জ্বল গ্রহটিকে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। আকারে ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অল্প ক্ষুদ্র। ইহার ব্যাস ১২১৩৬ কি. মি. এবং ভর পৃথিবীর ভরের ৪/৫ অংশ। সূর্য হইতে এই গ্রহের গড় দূরত্ব প্রায় ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ ২০ হাজার কি. মি. এবং ২২৫ দিনে ইহা সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইহার কোনও উপগ্রহ নাই। শুক্রগ্রহের চারিদিক্ ২৫-৩০ কি. মি. ঘন মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহার আবহমণ্ডল হইতে প্রতিফলিত আলোকের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া গ্রহটিতে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও সামান্য অক্সিজেনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠদেশ যথেষ্ট উত্তপ্ত। তাপমাত্রা ৩১৫° সে. পর্যন্ত হইতে পারে। এই কারণে গ্রহটিতে তরল অবস্থায় জল থাকিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন। সম্প্রতি 'মেরিনার' নামক অনুসন্ধানকারী রকেট শুক্রগ্রহের মাত্র ৩৫২০০ কি. মি. নিকটে গিয়া মূল্যবান্ তথ্যাদি আনিয়াছে। এই তথ্যাদি হইতে শুক্রগ্রহের কঠিন অংশের ব্যাস ৬০৫০ কি. মি. বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

অনাদিনাথ দাঁ

শুক্রাচার্য পৌরাণিক দানবগুরু শুক্রাচার্য ভৃগুর পুত্র বলিয়া কথিত। তবে 'শুক্রনীতিসার'-এর রচয়িতা যে কোন্ শুক্র তাহা ঠিক জানা যায় নাই। মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতিতে এবং কৌটিল্য প্রভৃতির রচনায় শুক্রের অভিমতের উল্লেখ থাকিলেও বর্তমানকালে আমরা 'ধর্মশাস্ত্র' এবং 'শুক্রনীতিসার' ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও পুস্তকের সন্ধান পাই না। শুক্রনীতিসারের রচনাকাল লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইহাতে এমন কতকগুলি তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে যাহা হইতে রচনাকাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। কিছু অংশ সম্ভবতঃ আরও পরবর্তীকালের। শুক্র-নীতিসারে চারিটি অধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল রাজ্য, রাজা, রাজপুত্র এবং রাজা-প্রজার সম্বন্ধ। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন নীতি, জাতিভেদ, কারুশিল্প, বৃক্ষরোপণ, প্রতিমানির্মাণ, বিচার, সৈন্য-ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। শুক্রাচার্যের মতে রাজা হইবার জন্য উত্তরাধিকার অপেক্ষা ধীশক্তি ও শৌর্যের প্রয়োজন অধিক। রাজার ব্যয়ের হিসাবও শুক্র-নীতিসারেই প্রথম মিলিতেছে। রাজকর্মচারীদের বশে রাখিবার জন্য নিয়মিত স্থানান্তরে ও বিভিন্ন বিভাগে প্রেরণ, উৎসাহিত করিবার জন্য যোগ্যতা অনুসারে পদমর্যাদা বৃদ্ধি, ক্ষতিপূরণ এবং অবসরবৃত্তির ব্যবস্থার কথাও শুক্র উল্লেখ করিয়াছেন। উদার মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তিনি গুণবান্ শূদ্রকেও মন্ত্রণা পরিষদে লইতে অনিচ্ছুক এবং তাঁহার মতে সমাজের জন্য প্রজাদের কোনও নূতন নিয়ম প্রবর্তনের অধিকার নাই।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

শুক্লযজুর্বেদ যজুর্বেদ দ্র

শুঙ্গবংশ মৌর্যবংশ দুর্বল হইলে ঐ বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আনু. ১৮৭ খ্রী. পূ.)। এই বংশ ইতিহাসে শুঙ্গবংশ নামে পরিচিত।

পূর্বতন মৌর্যসাম্রাজ্যের মধ্যাংশমাত্র লইয়া পুষ্য-মিত্রের রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। পাটলিপুত্র তখনও পর্যন্ত রাজধানী থাকিলেও পূর্ব-মালবের অন্তর্গত বিদিশাও একটি প্রধান শাসন-কেন্দ্র ছিল। ইহা ব্যতীত অযোধ্যা এবং কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ও শাকল নগরীসমূহও শুঙ্গসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

পুষ্যমিত্রেরা বিদর্ভ রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করেন। অন্যদিকে, বহ্লীক দেশস্থ গ্রীকদের আক্রমণ পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্র কর্তৃক প্রতিহত হয়। সম্ভবতঃ, এই দুই বিজয়কে স্মরণীয় করিবার জন্যই পুষ্যমিত্র দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উহার সপক্ষে কোনও নিরপেক্ষ প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, বৌদ্ধশিল্পের বিশেষ নিদর্শন ভারহুত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপের দ্বারপথের লৌহবেষ্টনী শুঙ্গ আমলেরই কীর্তি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি সম্ভবতঃ পুষ্যমিত্রের সমকালীন।

পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্রকে অবলম্বন করিয়াই কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'-নামক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই বংশের এক রাজা দেবভূতি তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বসুদেবের ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হন (আনু. ৭৫ খ্রী. পূ.)।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

শুদ্ধাদ্বৈতবাদ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার বল্লভ শাঙ্করাদ্বৈত পন্থায় জীবজগৎকে মিথ্যা বলিয়া এবং সেই মিথ্যাত্ব প্রমাণের জন্য অবিদ্যাত্মিকা মায়ার সাহায্য গ্রহণ না করিয়াও ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার মতবাদের নাম 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' অর্থাৎ অশুদ্ধ অবিদ্যাত্মিকা মায়ার সংস্পর্শশূন্য অদ্বৈতবাদ। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, যেহেতু জীবজগৎ মিথ্যা। বল্লভ কিন্তু বলেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, যেহেতু জীবজগৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন।

কিন্তু বল্লভ এই ভাবে ব্রহ্ম ও জীবজগৎকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করিলেও অন্যান্য ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায়, একথাও বলিয়াছেন যে, জীব অণু এবং ব্রহ্মের অংশ, কার্য বা পরিণাম, সেবক, সৃষ্ট্যাদি শক্তিবিহীন এবং ব্রহ্মের সৎ ও চিৎ গুণের প্রকাশ মাত্র; এবং জগৎও ব্রহ্মের অংশ, কার্য বা পরিণাম এবং ব্রহ্মের সৎগুণের প্রকাশ মাত্র। এইভাবে তিনি ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদের কথাও বলিয়াছেন।

অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায় তাঁহার মতেও অবিদ্যাই বন্ধের অথবা সংসার-দশার মূলীভূত কারণ। এই অবিদ্যার অর্থ ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ 'অহং-মম' ভাবের দাস হইয়া নিজেকে ব্রহ্মভিন্ন, স্বাধীন কর্তা এবং স্বতন্ত্র দ্বিতীয় তত্ত্বরূপে গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে জীব সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের অধীন। কিন্তু যে জীব অবিদ্যাবশতঃ নিজেকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, সে স্বভাবতঃই সকামকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার জন্মজন্মান্তরভাগী হয়। ইহারই নাম 'বন্ধাবস্থা' অথবা 'সংসার-চক্র'।

বল্লভের মতে, মোক্ষকালে জীব ব্রহ্মের সহিত স্বীয় অভিন্নতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তজীবও অণুসৃষ্ট্যাদিশক্তিরহিত, ব্রহ্মের অধীন, উপাসক, সেবক ও দাসানুদাস। সাম্প্রদায়িক মতানুসারে, বল্লভ বলিয়াছেন যে, গোলোকস্থ বৃন্দাবনে গোপীভাবপ্রাপ্ত হইয়া পতিভাবে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই 'মোক্ষ'। মোক্ষ অথবা মুক্তি পরমানন্দরসঘন অবস্থা, কারণ, এরূপ প্রেম, সেবা ও রসলীলার মাধ্যমে মুক্তজীব পরমানন্দরসপানে ধন্য হয়।

অন্যান্য একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায়, তিনিও বিদেহমুক্তিবাদী। অর্থাৎ, তাঁহারও মতে, জীবিত অবস্থাতে বর্তমান দেহ ও জগতে, মোক্ষলাভ অসম্ভব; মৃত্যুর পরেই তাহা সম্ভবপর।

অন্যান্য একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণের ন্যায়, তিনিও ভক্তিবাদী। ভক্তি দুই প্রকারের : মর্যাদা-ভক্তি ও পুষ্টি-ভক্তি। প্রথম শ্রেণীর ভক্ত স্বপ্রচেষ্টায়, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে, উপযুক্ত সাধন অবলম্বনে মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্ত কেবলমাত্র শ্রীভগবানের অনুগ্রহের মাধ্যমেই মোক্ষলাভে ধন্য হন। তাঁহার পক্ষে সাধন অথবা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার কোনও রূপ প্রয়োজনই হয় না।

বল্লভের মতে, এই উভয় প্রকারের ভক্তির মধ্যে পুষ্টি-ভক্তিই শ্রেয়ঃ। 'পুষ্টি' অথবা 'পোষণের' অর্থ 'অনুগ্রহ'। পুষ্টি-ভক্তিতে থাকে শ্রীভগবানের দিক্ হইতে, কেবলমাত্র কৃপা এবং প্রেম; জীবের দিক্ হইতে কেবলমাত্র সেবা এবং প্রীতি।

পুষ্টি-ভক্তি চার প্রকারের : প্রবাহ-পুষ্টি-ভক্তি, মর্যাদা-পুষ্টি-ভক্তি, পুষ্টি-পুষ্টি-ভক্তি, শুদ্ধ-পুষ্টি-ভক্তি।

এই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল শুদ্ধ-পুষ্টি-ভক্তি। এরূপ ভক্তি প্রেমপ্রধানা এবং ভগবদনুগ্রহেরই ফল। প্রেমপ্রধান ভক্তগণ স্নেহের বশবর্তী হইয়াই কেবল শ্রীভগবানের পরিচর্যা ও গুণগানাদিতে রত থাকেন। সেজন্য শুদ্ধ-পুষ্টি-ভক্তির অপর নাম 'প্রেমভক্তি'।

এইরূপে বল্লভের মতে, রাগমার্গ অথবা, রসমার্গই শ্রেষ্ঠ মার্গ। তাঁহার মতে জ্ঞানমার্গিগণ অথবা মর্যাদা-ভক্তগণ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত অভিন্নত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু, ভক্তিমার্গিগণ অথবা, পুষ্টি-ভক্তগণ সালোক্য মুক্তি লাভ করেন, অর্থাৎ, তাঁহারা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমলোক-

স্থিত হইয়া তাঁহার সহিত গোপ, গোপী, গাভী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, নদী প্রভৃতি নানারূপে রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন।

এরূপ রাসক্রীড়াই শ্রেষ্ঠ মুক্তি। কারণ, মুক্তজীব ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ লীলাভরে নিজের সহিত নিজেই রাসকেলিতে মগ্ন হন, অর্থাৎ, নিজের ও ভক্তের মধ্যে যে ভেদের সৃষ্টি করেন, তাহাই হইল নিঃসন্দেহে ভক্তের শ্রেষ্ঠ কাম্যধন। বস্তুতঃ পতিভাবিত শ্রীকৃষ্ণের সেবাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। এইভাবে বল্লভ-বেদান্তে মধুরভাব এবং শৃঙ্গার-রসেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। বল্লভ-বেদান্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল—ইহাতে ভক্তিবাদের ভিত্তিতেই অদ্বৈতবাদ স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ জ্ঞানবাদাবলম্বী কিন্তু বল্লভের অদ্বৈতবাদ ভক্তিবাদাবলম্বী। বস্তুতঃ ভক্তিবাদ সর্বদাই দ্বৈত অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক, যেহেতু ভজনীয় ঈশ্বর ও ভজক ভক্তের মধ্যে প্রভেদ না থাকিলে ভক্তি অথবা উপাসনা সম্ভবপর নহে। এই কারণে, বল্লভ ভক্তিবাদের ভিত্তিতে অদ্বৈতবাদ, অথবা অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে ভক্তিবাদ স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া একটি নূতন দার্শনিক মত ও সাধনপ্রক্রিয়া প্রবর্তনে বিশেষ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন।

অবশ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার এই মতবাদ স্ব-বিরোধদোষদুষ্ট। কারণ, তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জীবজগৎ একাধারে সম্পূর্ণ অভিন্ন ও ভিন্নাভিন্ন; যেহেতু ব্রহ্ম বিভু জীব সর্বদাই অণু; ব্রহ্ম সৃষ্টিস্থিতি লয়শক্তিমান্, জীব সর্বদাই এই সকল শক্তিহীন; ব্রহ্ম অজড়, জগৎ সর্বদাই জড় ইত্যাদি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ন্যায়শাস্ত্রের সুকঠিন কষ্টিপাথরের সহায়তায় দোষ-ত্রুটিশূন্য প্রমাণিত না হইলেও জীবনের দিক্ হইতে বল্লভের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' চিরভাস্বর।

বল্লভের পিতার নাম লক্ষ্মণভট্ট ও মাতার নাম যল্লমাগারু। তাঁহার পিতা অন্ধ্রদেশীয় যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাভুক্ত, ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বল্লভের প্রখ্যাততম গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য সাধারণ্যে 'অণুভাষ্য' নামে পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি এই গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র বিঠ্ঠলনাথ ইহা সমাপ্ত করেন।

রমা চৌধুরী

শুভঙ্কর শুভঙ্কর দাস, শুভঙ্কর রায়, ভৃগুরাম দাস—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে জীবিত ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে বর্ধমান জেলায় জন্ম। কিন্তু তাঁহার সর্বপ্রধান কীর্তি বাঁকুড়া জেলার 'শুভঙ্করের দাঁড়া'। বাংলাদেশে মন, সের, ছটাক প্রভৃতি মাপের সহিত টাকা, আনা, পয়সা প্রভৃতির হিসাবের সামঞ্জস্য বিধান শুভঙ্করের আর্যার বৈশিষ্ট্য। বিঘা, কাঠা, ছটাক প্রভৃতির দ্বারা জমির কালি (এরিয়া) মাপিবার সূত্র-গুলি অপূর্ব। 'শুভঙ্করের দাঁড়া' তাঁহার জমি পরি-মাপের গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। শুভঙ্করের তুল্য মানসাঙ্ক পদ্ধতির আবিষ্কর্তা আর কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

শুল্কনীতি 'শুল্ক' বলিতে আমরা বুঝি আন্ত-র্জাতিক সীমা অতিক্রম করিয়া কোনও সামগ্রীর আগমন (বহির্গমন) ঘটিলে সেই সামগ্রীর উপর আরোপিত অথবা আদায়ীকৃত অর্থ। আরোপণ ও আদায়-সংক্রান্ত নীতি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ইহাকেই আমরা শুল্কনীতি বলি। শুল্কনীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটি: প্রথম রাজস্ব-সংগ্রহ এবং রাজস্বের পরিমাণবৃদ্ধি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ শিল্পকে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণ। অবশ্য রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালিত শুল্কনীতি সংরক্ষণের কার্যও করিতে পারে। সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত নীতি ও রাজস্ব উপার্জন করে। রাজস্ব সংগ্রহমূলক এবং সংরক্ষণ-মূলক বিভাগ ছাড়াও আমরা শুল্ককে আরও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। ১. আমদানী শুল্ক ২. রপ্তানী শুল্ক ৩. চলাচলকালীন শুল্ক। শুল্কনীতি বলিতে প্রধানতঃ আমদানী শুল্ক সংক্রান্ত নীতিকেই বুঝায়। সংরক্ষণমূলক শুল্ক আমদানী শুল্কের আওতার বাইরে যায় না। রপ্তানী শুল্ক বর্ত-মানে প্রায় অচল। একদেশ হইতে দ্বিতীয় দেশের মধ্য দিয়া তৃতীয় দেশে আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত সামগ্রীর উপর দ্বিতীয় দেশ কর্তৃক আরোপিত শুল্ক তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে।

আমদানী শুল্কনীতির গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। এই শুল্ক, সুনির্দিষ্ট (specific) বা হারাহারি (advalorem) হইতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে দ্রব্যের সংখ্যা বা পরিমাণের উপর শুল্ক আরোপিত হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্রব্যের মূল্যের একটা অংশ শুল্করূপে আদায় করা হয়।

প্রত্যেক দেশের একটি শুল্ক তালিকা থাকে। দেশের শুল্কনীতি অনুযায়ী শুল্কতালিকা রচিত হয়। এই তালিকা দুই প্রকারের হইতে পারে। ১. একক তালিকা; ২. বহুপদী বা যৌগিক তালিকা। একক তালিকায় আমদানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে যেগুলির উপর শুল্ক আরো-পিত আছে তাহাদের নাম, হার এবং হারের প্রকৃতি

দেওয়া থাকে। যে কোন দেশ হইতেই আমদানি করা হোক না কেন, শুল্ক সমহারে আরোপ করা হইবে। বহুবিধ তালিকায় বিভিন্ন কলমে বিভিন্ন দেশ হইতে আনীত দ্রব্যসামগ্রীর উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে শুল্ক আরোপিত হয়। কোনও দেশ সুযোগ-সুবিধা পায়। কোনও দেশ পায় না।

শুল্কনীতির সাফল্য সংরক্ষণ-এর বেলায় নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বর্ধিত বিক্রয়, বিনিয়োগ ও নিয়োগের উপর এবং রাজস্বের বেলায় বর্ধিত রাজস্বের পরিমাণের উপর। শুল্ক-আরোপিত দ্রব্যের সংখ্যা অথবা দেশের সংখ্যা বাড়িলেই যে শুল্কনীতি সফল হইবে তাহা নহে। তাহাছাড়া আরোপকারী দেশ শুল্ক আরোপের জন্য অন্যদিক্ হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে ;— যদি সেই দেশ হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের উপর অপর দেশ সমহারে বা অধিকতর হারে শুল্ক আরোপ করে এবং তার ফলে রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া যায়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শুল্কনীতিরও পরিবর্তন ঘটে। বিংশ শতকের পূর্বে পৃথিবীতে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতির প্রচলন ছিল না বলিলেই চলে। তখন শুল্কনীতি রাজস্ব-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আমদানি নিয়ন্ত্রণের কাজে শুল্কনীতির ব্যবহার হইত। তৃতীয় দশকে অপেক্ষাকৃত উদার শুল্কনীতির প্রবর্তনের চেষ্টা হইলেও বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে নিয়ন্ত্রিত আমদানীনীতির প্রবর্তন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কঠোর শুল্কনীতি দেখা গেলেও ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর পরবর্তীকালে উদারতর শুল্কনীতি অনুসরণের প্রচেষ্টা হয়। বিভিন্ন চুক্তি ও গোষ্ঠীর আবির্ভাব বর্তমান শতকের শেষভাগে পরিবর্তিত শুল্কনীতির প্রতিফলন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে অটাওয়া-চুক্তি ও ইন্দোব্রিটিশ বাণিজ্যচুক্তিতে আংশিক বাধানিষেধের ব্যবহার হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর বিভিন্ন ব্যবস্থায় ভারত বিদেশী বিনিময়-মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর শুল্কনীতি গ্রহণ করিয়াছে।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়

শুশুনিয়া শুশুনিয়া নামক পাহাড় ও গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত। পাহাড়টি রাণীগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে ২৭.২ কিলোমিটার, দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং বাঁকুড়া শহর হইতে ১৯.২ কিলোমিটার, উত্তর-পশ্চিমে (২৩° অক্ষাংশ ও ৮৭° দ্রাঘিমা) অবস্থিত। এই পাহাড়ের পাদদেশে গন্ধেশ্বরী নদী প্রবহমান। সাগরপৃষ্ঠ হইতে পাহাড়ের উচ্চতা ১৪৪২ ফিট, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ কিলোমিটার ও পরিধি ৯.৬ কিলোমিটারের কিছু বেশি। এই পাহাড়ে নিস্, সিস্ট, কোয়ার্টজাইট, ফেলস্‌পার, গ্রানাইট প্রভৃতি প্রস্তরের বিদ্যমানতা হইতে শুশুনিয়া পাহাড়ের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয়। শুশুনিয়া পাহাড় একাধিক গুহাবিশিষ্ট। এই গুহাগুলির মধ্যে মারাং ঢেরী, ভালুক ও ভরতপুরের নাম উল্লেখযোগ্য। মারাং ঢেরী (সাঁওতালী নাম) অর্থাৎ বৃহৎ স্তূপ। সাঁওতাল ও বাউরি-সম্প্রদায়ের নিকট মারাং ঢেরী দেবতাজ্ঞানে পূজিত হয়। পর্ব ও মেলা উপলক্ষে অঞ্চলবাসীরা পাহাড়ের শীর্ষে উঠিয়া পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে প্রদীপ ও অপর সামগ্রী উৎসর্গ করে। এই পাহাড়ের সংলগ্ন স্থানে দর্শনীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে উদ্গত প্রস্রবণ ও ইহার নিকট অবস্থিত একটি কৃষ্ণপ্রস্তর-স্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। স্তম্ভশীর্ষে একটি উপবিষ্ট সিংহমূর্তি আছে। স্তম্ভটি নৃসিংহদেব নামে পূজিত হয়। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে এখানে মেলা উপলক্ষে বহু জনসমাগম হয়। এখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম এবং নানাবিধ প্রস্তর-নির্মিত হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে। এই পাহাড়ের গুহাগাত্রে নিম্নের লেখাটি খোদিত আছেঃ—

পুষ্করণাধিপতের্মহারাজ শ্রীসিংহবর্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্মণঃ কৃতিঃ
চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রণাতিসৃষ্ট (দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ)

শুশুনিয়া লেখাটি প্রায় সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ('সমুদ্রগুপ্ত' দ্র)। এই লেখা হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শ্রীসিংহবর্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মা 'পুষ্করণ' নামক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, শুশুনিয়ার প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে দামোদর তীরের পোখরনা গ্রামই প্রাচীন পুষ্করণের স্মৃতি বহন করিতেছে। পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্মার সনাক্তকরণ কোনও প্রামাণিক তথ্যের ভিত্তিতে সম্ভবপর হয় নাই। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এলাহাবাদলেখের চন্দ্রবর্মাই শুশুনিয়া-লেখের পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্মা। এখানে আবিষ্কৃত নানা তথ্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন বঙ্গের বহু স্মৃতি-বিজড়িত ঐতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান এই শুশুনিয়া।

অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়

শূকর স্তন্যপায়ী পশু। উদ্ভিজ্জ পদার্থ ও মাংস— উভয় প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করে। ইহার একটি পাকস্থলী এবং ইহারা রোমন্থন করে না। ছোট তুন্ডের (স্নাউট)

সাহায্যে মাটি খুঁড়িয়া ইহা মূলাদি আহার করে। শূকরী ১০৯ দিন গর্ভধারণান্তে ১০ হইতে ১৬টি শাবকের জন্মদান করে। প্রতীচ্যে, আমেরিকায় ও চীনদেশে শূকরের মাংস জনপ্রিয় আহার্য। ইহার চর্বি রন্ধনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। ভারতে সর্বশ্রেণীর লোক ইহার মাংস ভক্ষণ করে না, তবে ভারতের অনেক প্রধান শহরে ইহার মাংসের চাহিদা আছে।

প্রাচীন ভারতের শূকর হইল বন্য বরাহ। বর্তমানে মেথর জাতীয় লোকের দ্বারা ইহারা প্রতিপালিত হয়। দেশীয় শূকর ও তাহাদের মাংস খুব ভালো নয় ; এজন্য বাহির হইতে আমদানিকরা শূকরের প্রজনন করাইয়া এদেশেও কেহ কেহ উত্তম শ্রেণীর শূকর-মাংসের ব্যবসায় করিতেছেন। ব্যবসায়ের জন্য শূকর প্রতিপালনের সময় শূকরগুলিকে আচ্ছাদিত কক্ষে (শেড) রাখা হয়, কিন্তু মাঠেও বিচরণ করিতে দেওয়া হয়। ইহাদিগকে শস্যের দানা, ছোলা প্রভৃতি খাইতে দেওয়া হয়।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

শূদ্রক মৃচ্ছকটিক নামে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা। এই দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনায় নৃপতি শূদ্রক সুপুরুষ, বলশালী, বেদজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, নৃত্যগীতাদিবিদ্, কৃষিবাণিজ্যবিদ্ ও অশ্বমেধযজ্ঞকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। একশত বৎসর দশদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এই বিবরণের সত্যতা অদ্যাপি অনির্ধারিত। পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা এই গ্রন্থের যে বিভিন্ন রচনাকাল নিরূপণ করিয়াছেন তাহা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাণভট্টের কাদম্বরীর বিদিশার নৃপতি শূদ্রক ও মৃচ্ছকটিক-প্রণেতা শূদ্রক অভিন্ন ব্যক্তি ইহা কেহ কেহ অনুমান করেন। প্রকৃতপক্ষে নৃপতি শূদ্রক কাল্পনিক অথবা ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাহা আজও অনির্ণীত।

যূথিকা ঘোষ

শূন্যপুরাণ পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতঃ রাঢ় অঞ্চলে ধর্ম-ঠাকুর নামে যে এক লৌকিক দেবতার পূজা প্রচলিত আছে, কালক্রমে তাহার একটি পূজাপদ্ধতি সংকলিত হইয়াছিল। যিনি ইহা সর্বপ্রথম সংকলন করেন তাঁহার নাম রামাই পণ্ডিত এবং তাঁহার সংকলিত পূজা-পদ্ধতির নাম 'শূন্যপুরাণ'। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব কিংবা গ্রন্থসংকলনের কাল কিছুই নিশ্চিত-ভাবে জানিতে পারা যায় না। তবে তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শূন্যপুরাণের পুঁথিতে পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুরের বিভিন্ন পুরোহিত তাঁহাদের স্বরচিত বহু ছড়া এবং মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সেইজন্য ইহার ভাষার মধ্যে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার কোনও কোনও অংশ প্রাচীন, কোনও কোনও অংশ নিতান্ত অর্বাচীন। ইহাতে বাংলা ভাষার কতকগুলি অত্যন্ত প্রাচীন ছড়ার সন্ধান পাওয়া যায়। 'শ্রীনিরঞ্জনের রুস্মা' অংশটিতে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের বিবরণটি রূপকছলে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

শেক্স্পীয়র, উইলিয়াম (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রী) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার; সাধারণতঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে স্বীকৃত। পিতা জন্ শেক্স্পীয়র ও মাতা মেরি আর্ডেন। কবি ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। জন্মস্থান ঃ স্ট্র্যাট্ফোর্ড-অন-অ্যাভন্। জন্ম-দিন সম্ভবতঃ ২৩ এপ্রিল। স্থানীয় বিদ্যালয়েই শেক্স্-পীয়র বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় অ্যান্ হ্যাথাওয়েকে তিনি বিবাহ করেন (১৫৮৩ খ্রী)। শেক্স্পীয়রের প্রথম সন্তান সুজানা (১৫৮৩ খ্রী) ও পরে দুই যমজ সন্তান পুত্র হ্যামনেট ও কন্যা জুডিথ (১৫৮৫ খ্রী)। ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সমকালীন নাট্যকার রবার্ট গ্রীন্-এর একটি গদ্যরচনা হইতে জানা যায় যে, এই সময় শেক্স্পীয়রের জন-প্রিয়তা অনেকের ঈর্ষার উদ্রেক করে। অভিনয়-নৈপুণ্য, রচনা-লালিত্য ও নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের জন্য তিনি প্রভূত সম্মান অর্জন করেন। প্রথমে তিনি পেমব্রোক নাট্যগোষ্ঠীর সহিত যুক্ত ছিলেন। পরে লর্ড চেম্বার্লিন নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন (১৫৯৪ খ্রী)। শেক্স্-পীয়রের নাট্যসংস্থা নৃপতি প্রথম জেম্সের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করার ফলে লণ্ডনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি গ্লোব রঙ্গমঞ্চের অংশীদার ছিলেন এবং পরে ব্ল্যাকফ্রায়ার্স থিয়েটার-এরও অংশীদার হন।

নাট্যজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতিরূপে বেশ কয়েক বৎসর কাটাইবার পর জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিয়া অবসর জীবন যাপন করেন। এখানে তাঁহার বাসভবনটি অতি সুন্দর ছিল। তাঁহার উইল হইতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার লণ্ডনের বন্ধুদের বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুদিবসও সম্ভবতঃ ২৩ এপ্রিল। মুখ্যতঃ নাট্যকাররূপে পরিচিত হইলেও শেক্স্পীয়রের কবিখ্যাতিও অসাধারণ। তাঁহার কাব্যের মধ্যে 'ভীনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিস', 'দি রেপ অভ্ লুক্রীস্' ও সনেটগুলি ('সনেট' দ্র) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অধিকাংশ সনেট তাঁহার কোনও সম্ভ্রান্ত ও সুদর্শন তরুণ বন্ধুর উদ্দেশে রচিত। এই বন্ধুটি উইলিয়াম হার্বার্ট কিংবা হেন্রি রিওথেস্লি হওয়া সম্ভব।

শেষের বেশ কয়েকটি সনেট মানসী 'ডার্ক লেডিকে লইয়া রচিত। একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবির কথাও সনেটে পাওয়া যায়। অন্যান্য মহান্ নাট্যকারদের মতন শেক্‌স্‌পীয়রও রঙ্গালয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার নাটকগুলি রচনা করেন। রচনাকালের পৌবাপর্য অনুসারে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলিকে সাধারণভাবে চারিটি যুগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম যুগে পরিধি হইল ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। এই যুগের লেখা নাটকগুলি হইল কিছু ঐতিহাসিক নাটক এবং কিছু কমেডি ও ট্রাজেডি। উদাহরণস্বরূপ 'দি লাইফ অ্যান্ড ডেথ অভ্ কিং রিচার্ড সেকেণ্ড', 'দি লাইফ অ্যান্ড ডেথ অভ্ কিং রিচার্ড থার্ড', 'টু জেনট্‌ল্‌মেন অভ্ ভেরোনা' 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। 'টোয়েল্‌ফ্‌থ্ নাইট', 'দি মার্চ্যাণ্ট অভ্ ভেনিস্' প্রমুখ বিখ্যাত কমেডিগুলি এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কিং হেনরি ফোর্থ' (১ম ও ২য়) প্রভৃতি এই যুগের রচনা। কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি 'হ্যামলেট', 'ওথেলো' 'কিং লীয়ার', 'ম্যাক্‌বেথ', 'অ্যানটনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা' প্রভৃতি তৃতীয় যুগের (১৬০১-১৬০৮ খ্রী) রচনা। শেষ যুগে অর্থাৎ ১৬০৮-১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত নাটকগুলি বিয়োগান্তক না হইলেও পূর্বকালের কমেডিগুলির মতোও নয়। তাই এই নাটকগুলিকে ('দি টেম্‌পেস্ট' ইহাদের অন্যতম) অনেক সময়ে 'ড্রামাটিক রোমান্স' আখ্যা দেওয়া হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের চরিত্র-চিত্রণ অনন্যসাধারণ। কি চরিত্রাঙ্কন, কি কাহিনী-বিন্যাস, কি কবিত্ব, কি নাট্যশৈলী, সমস্তর মধ্যেই তাঁহার রচনায় অন্তহীন বৈচিত্র্য। তাঁহার ট্রাজেডিতে স্বগতোক্তিগুলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কমেডিতে কাহিনীর বিভিন্ন ধারা সুকৌশলে একটি মূল স্রোতে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, মিলন ও সংঘাতের নীতিকে শেক্‌স্‌পীয়র পূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। নাটকের কাহিনী সৃষ্টি করার কোনও প্রচেষ্টা তিনি কোনও দিন করেন নাই। তাঁহার প্রায় সব নাটকেরই আখ্যানভাগ বিভিন্ন লেখকের রচনা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু তাঁহার স্পর্শে অন্য লেখকের সাধারণ কাহিনীও আমূল পরিবর্তিত হইয়া অসাধারণত্বের মর্যাদা পাইয়াছে। বাজে ধাতুও তাঁহার রস-রসায়নে সুবর্ণ হইয়াছে।

শেক্‌স্‌পীয়রের কবিত্ব-শক্তিও অসাধারণ। তাঁহার নাটকগুলি মূলতঃ ছন্দোবন্ধ এবং অপরূপ কাব্য-দ্যুতিতে উদ্‌ভাসিত। জীবনের জয়গানে তিনি মুখর। মানুষের মতো বাঁচিবার অধিকার সকলের আছে, ঐশ্বর্যলোভী শাইলকেরও। মানুষকে তিনি ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দেখিয়াছেন। সকলের ব্যথা তাঁহার মর্ম স্পর্শ করে। তাঁহার কাব্য-সংসারে সকলের বাঁচিবার অধিকার আছে। তিনি সর্বসমেত ৩৭খানি নাটক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে ১৬টি কমেডি, ১১টি ট্র্যাজেডি এবং ১০খানি (বিভিন্ন খণ্ডসহ) ঐতিহাসিক নাটক।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শেখভ, আনতোন পাভলোভিচ (১৮৬০-১৯০৪ খ্রী) রুশ নাট্যকার ও ছোট গল্পকার। শেখভের পূর্ব-পুরুষ ক্রীতদাসসম্ভূত হইলেও তিনি স্বয়ং উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি আজীবন দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত সমাজের নিম্নশ্রেণীর অবহেলিত ব্যক্তি-সম্প্রদায়ের প্রতি অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া নিজেকে তাহাদেরই সগোত্র হিসাবে দেখিয়া গিয়াছেন। শেখভের শিল্পপ্রতিভা তাঁহার ছোটগল্প ও নাটকের মধ্য দিয়া দীপ্ত গরিমায় পরিস্ফুট। দারিদ্র্য-তমসাবৃত জীবনের উত্তরণে যে নব প্রত্যাশিত জীবনের অরুণোদয় ঘটে, তাহারই সন্ধানে শেখভ সদা উৎসুক। ছোট গল্প-লেখক ও নাট্যকার হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বিশ্বসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। 'ইভ্যানফ্' (১৮৮৯ খ্রী), 'দি সী গাল' (১৮৯৪ খ্রী), 'থ্রি সিস্টার্স' (১৮৯৯ খ্রী), 'আংক্‌ল ভান্যা' (১৯০২ খ্রী), 'দি চেরি অরচার্ড' (১৯০৪ খ্রী), প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

শেয়ার বাজার শেয়ার বাজার বলিতে আমরা সেই বাজার বুঝি যে-বাজারে সরকারী ঋণপত্র (গভর্নমেণ্ট সিকিউরিটিজ) ও যৌথমূলধনী কারবার (জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি)-সমূহের অংশপত্র (শেয়ার) ও ঋণপত্র (ডিবেনচার্‌স) প্রভৃতির কেনাবেচা হয়। স্টক্ এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে শেয়ার বাজারের অধিবেশন হয়। শেয়ার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য বাজারে যেমন মূল ক্রেতা ও বিক্রেতা স্বয়ং যাইয়া কেনাবেচা করিতে পারে, শেয়ার বাজারে তাহা পারে না। কেননা, শেয়ার বাজারে সদস্য-দালাল ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। সুতরাং শেয়ার বাজারে কেনাবেচা সদস্য-দালালের মধ্যস্থতায় করিতে হয়।

শেয়ার বাজারের কেনাবেচাকে 'সওদা' বলা হয়। সওদা নির্দিষ্ট লটে সম্পন্ন করিতে হয়। লট্ বলিতে কেনাবেচার জন্য ব্যবসায়িক একক বোঝায়। শেয়ারের আদায়ীকৃত মূল্য অনুযায়ী লটের পার্থক্য হয়। যেমন, শেয়ার প্রতি ২৫ টাকা পর্যন্ত আদায়ীকৃত শেয়ারের

লট্‌গুলি হয় ১০০ শেয়ারের.; ২৫ টাকার ঊর্ধ্বে এবং ৫০ টাকার নিম্নে আদায়ীকৃত শেয়ারের লট্ হয় ৫০ শেয়ারের ; আবার ৫০ টাকার ঊর্ধ্বে কিন্তু ৫০০ টাকার নিম্নে আদায়ীকৃত শেয়ারের লট্ হয় ২৫ শেয়ারের, ইত্যাদি। তবে নির্দিষ্ট লটের কমসংখ্যক শেয়ারও বাজারে কিনিতে বা বেচিতে পারা যায়। সেরূপ লট্‌কে 'বিকৃত লট্' (অড লট) বলা হয়। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র লট্‌কে বলা হয় 'ক্ষুদ্র বিকৃত লট্' (স্মল অড লট্)। প্রকৃত লটের তুলনায় বিকৃত লটের মূল্যের কিছু তারতম্য থাকে। সেজন্য স্টক্ এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত শেয়ারের দৈনিক মূল্য তালিকায় এরূপ লটের দামের পর 'o.l.' ও 's.o.l.' চিহ্ন দেওয়া হয়।

শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য অর্থনীতির 'চাহিদা ও যোগান' সম্পর্কিত মৌলিক নিয়ম অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয়। স্টক্ এক্সচেঞ্জে সমস্ত সওদা নিলামের মত দর হাঁকিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু সাধারণ নিলামে মাত্র একজন বিক্রেতা আর যাহারা দরের ডাক দেয় তাহারা সকলেই ক্রেতা। শেয়ার বাজারে কিন্তু দরের ডাক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই দেয়। ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতা বেশি থাকিলে, দর নিম্নগামী হয়। পক্ষান্তরে, বিক্রেতার তুলনায় ক্রেতা বেশি থাকিলে, দর ঊর্ধ্বগামী হয়। সেজন্য কোনও শেয়ারের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পাইলে দর রাতারাতি বাড়িয়া যায়।

শেয়ার বাজারের সওদা দুই প্রকার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়—ক্যাশ ও ফরওয়ার্ড। এই উভয় প্রকার ভিত্তি অনুযায়ী শেয়ারগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—ক্যাশ সিকিউরিটিজ্ ও ক্লিয়ার্ড সিকিউরিটিজ্। ক্যাশ সিকিউরিটি কিনিলে (বা বেচিলে) বাজারের নির্ধারিত দিনে পূর্ণমূল্য দিয়া (বা লইয়া) শেয়ার ডেলিভারি লইতে (বা দিতে) হয়। নির্ধারিত ডেলিভারি দিন সম্পর্কে নিয়ম এই যে—সওদার তারিখ ও ডেলিভারির দিনের মধ্যে ন্যূনপক্ষে দুইটি কাজের দিনের (ওয়ার্কিং ডেজ) ব্যবধান থাকা চাই। ক্লিয়ার্ড-সিকিউরিটির সওদার নিষ্পত্তি (সেটেল্‌মেণ্ট) প্রতি পনের দিন অন্তর হয়। উক্ত পনের দিনের মধ্যে প্রতি সদস্য-দালাল ক্লিয়ার্ড সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত যে বিশেষ শেয়ারের কেনাবেচা করে, নিষ্পত্তির দিনে (সেটেল্‌মেণ্ট ডে) তাহাকে উহার হিসাব প্রস্তুত করিয়া ক্লিয়ারিং হাউসে বা নিকাশ-ঘরে দাখিল করিতে হয়। কেনাবেচার পরিমাণের মধ্যে যাহা ফাজিল থাকে, দালাল মাত্র সেই পরিমাণ শেয়ারই ডেলিভারি দেয় বা গ্রহণ করে।

সাধারণের মধ্যে যাহারা শেয়ারের কেনাবেচা করে তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ ১. বিনিয়োগকারী (ইনভেস্টর) ও ২. ফাট্‌কাওয়ালা (স্পেকুলেটর)। বিনিয়োগকারী আয় বা ব্যাজের আশায় শেয়ার কেনে। পক্ষান্তরে, ফাট্‌কাওয়ালা শেয়ার কেনে মূল্যের পার্থক্য হইতে লাভের আশায়। ফাট্‌কাওয়ালা আবার দুই শ্রেণীরঃ তেজীওয়ালা (বুলস) ও মন্দীওয়ালা (বিয়ার্স)। তেজীওয়ালা শেয়ার কেনে অদূরভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে, ক্রীত শেয়ার বেচিয়া লাভ করিবার আশায়। মন্দীওয়ালা শেয়ার (যে শেয়ার তাহার হাতে নাই) বেচে, অদূর ভবিষ্যতে মূল্য পতন ঘটিলে উক্ত শেয়ার বাজার হইতে কমমূল্যে কিনিয়া ডেলিভারি দিয়া লাভ করিবার আশায়।

প্রায়ই শেয়ারের মূল্যতালিকায় দরের সহিত 'c.d.' বা 'x.d.'অক্ষর সংযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই অক্ষরগুলির অর্থ যথাক্রমে 'লভ্যাংশ-সহ' (কাম ডিভিডেণ্ট) ও 'লভ্যাংশ-বাদ' (এক্স-ডিভিডেণ্ট)। যখন কোম্পানির লভ্যাংশ প্রদানের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসে তখন এই অক্ষরগুলি ব্যবহার করা হয়। 'লভ্যাংশ-সহ' সওদায় ক্রেতা লভ্যাংশ পায় ; এবং 'লভ্যাংশ-বাদ' সওদায় লভ্যাংশ পায় না। সাধারণতঃ কোম্পানির সাধারণ সভার (জেনারেল মিটিং) পরের দিন হইতে 'লভ্যাংশ-বাদ' ভিত্তিতে সওদার তারিখ শুরু হয়। উক্ত তারিখের আগে যে-সমস্ত কেনাবেচা হয়, তাহা 'লভ্যাংশ-সহ' ভিত্তিতে হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হয়। 'লভ্যাংশ-সহ' ভিত্তিতে নিষ্পন্ন সওদার ডেলিভারি যদি কোম্পানির বহি-বন্ধ হইবার পূর্বে পাঁচদিনের কম সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রেতা ক্রয়-মূল্য হইতে লভ্যাংশ কাটিয়া লইবার অধিকারী হয়। কিন্তু যদি পাঁচ বা তাহার বেশি দিন থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা লভ্যাংশ বাদ দিতে পারে না। এরূপ স্থলে লভ্যাংশ পাইবার জন্য ক্রেতাকে শেয়ারগুলি যথাসময়ে কোম্পানির অফিসে রেজিস্টারি করিবার জন্য পাঠাইতে হয়।

শেয়ার বাজারে মাত্র তালিকাভুক্ত সিকিউরিটির কাজ হয়। তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিগুলি যথাক্রমেঃ ১. কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ঋণপত্র, ২. মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্টট্রাস্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টসমূহের ঋণপত্র, ৩. যৌথ কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চারসমূহ। শেয়ারগুলি আবার তিনশ্রেণীতে বিভক্তঃ ১. অর্ডিনারি বা ইকুইটি, ২. প্রেফারেন্স এবং ৩. ডেফার্ড। শেষোক্ত শ্রেণীর শেয়ারগুলি আজকাল দুর্লভ, কেন-না সেগুলি অতিদ্রুত অর্ডিনারি শেয়ারে রূপান্তরিত হইতেছে। প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ দিতে হয়। কোম্পানি মুনাফা অর্জন করিলে সর্বাগ্রে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর লভ্যাংশ প্রদানের দাবী মিটাইতে হয় ; পরে যথেষ্ট পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিলে অর্ডিনারি শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হয়।

কিন্তু কোম্পানি মুনাফা অর্জন করুক আর নাই করুক, সর্বাগ্রে যথাসময়ে ডিবেঞ্চারের উপর সুদ দিয়া দিতে হয়। না দিলে ডিবেঞ্চার-হোল্ডার কোম্পানির সম্পত্তি ক্রোক্ করিতে পারে। শেয়ার-হোল্ডারের এরূপ কোনও অধিকার নাই। কেন-না, ডিবেঞ্চার-হোল্ডার উত্তমর্ণ, কিন্তু শেয়ার-হোল্ডার মালিক মাত্র।

অতুল সুর

শের আফগান আসল নাম আলী কুলি বেগ। প্রথম জীবনে ইরানের শাহ্ ইস্‌মাইলের (১৫৭৬-৭৮ খ্রী) ভৃত্য ছিলেন। শাহ্ ইস্‌মাইলের মৃত্যুর পর ভাগ্যান্বেষণে ইরান হইতে ভারতে আসিয়া কর্মদক্ষতা দেখাইয়া সম্রাট আকবরের অধীনে উচ্চপদ লাভ করেন (১৫৯৪ খ্রী)। সম্রাটের সহযোগিতায় সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইরানীয় আমীর মীর্জা গিয়াসবেগের সুন্দরী কন্যা মেহেরউন্নিসার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। খালি হাতে বাঘ শিকার করায় শাহ্‌জাদা সেলিম তাঁহাকে 'শের আফগান' উপাধি দেন (১৫৯৬ খ্রী)। বাদশাহ্ হইবার পর জাহাঙ্গীর তাঁহাকে বর্ধমানের জায়গীরদার নিযুক্ত করেন (১৬০৫ খ্রী)। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিশৃংখলা ও বিদ্রোহ দেখা দিলে (১৬০৬ খ্রী) জাহাঙ্গীর সন্দেহবশতঃ শের আফগানকে বন্দী করিতে সুবাদার কুতবুদ্দীনকে নির্দেশ দেন। বর্ধমানে সাক্ষাতের সময়ে কুতবুদ্দীনের সন্দেহজনক ব্যবহারে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তিনি কুতবুদ্দীনকে তরবারির আঘাতে গুরুতর-ভাবে আহত করেন। প্রত্যুত্তরে কুতবুদ্দীনের অনুচরেরা শের আফগানকে হত্যা করিয়া তাঁহার বিধবা স্ত্রী মেহেরউন্নিসা (পরবর্তীকালের বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান) এবং শিশুকন্যা ও পুত্রকে রাজধানীতে প্রেরণ করেন (১৬০৭ খ্রী)।

কুমুদরঞ্জন দাস

শেরশাহ্ শূরবংশীয় আফগান শেরশাহ্ সসারামের জায়গীরদার হাসানের পুত্র। প্রকৃত নাম ফরিদ খাঁ। খালিহাতে বাঘ হত্যা করায় বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানী তাঁহাকে 'শের খাঁ' উপাধি দেন। বহর খাঁর নাবালক পুত্র জলাল খাঁর অভিভাবকরূপে বিহারের শাসনভার গ্রহণ করিয়া চারি বৎসরের মধ্যে তিনি রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া ওঠেন। তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শংকিত জলাল খাঁ বাংলার সুলতানের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে জলাল খাঁ ও বাংলার সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করিয়া শের খাঁ বিহারে নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। কয়েক বৎসর পরে মোগল-বাদশাহ হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসেন (১৫৪০ খ্রী) এবং স্বনামে মুদ্রা প্রচার করেন। অতঃপর পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান, রায়সিন, চান্দেরী ও রাজপুতানার অধিকাংশ অঞ্চল জয় করিয়া সিন্ধু হইতে বাংলা পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের অধীশ্বর হন। কালিঞ্জর দুর্গ ('কালিঞ্জর' দ্র) অবরোধকালে হঠাৎ বারুদের বিস্ফোরণে তাঁহার জীবনাবসান হয় (১৫৪৫ খ্রী)।

মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্বের অধিকাংশ সময় যুদ্ধ ও বিদ্রোহ-দমনে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তিনি প্রজাহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জমি জরীপ করিয়া সুষ্ঠু ও সুশৃংখল রাজস্বব্যবস্থা, যোগাযোগের উন্নতির জন্য দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ, দ্রুত ডাকবিলি এবং নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা স্থাপন প্রভৃতি বিষয়ে তিনি মহামতি আকবরের পথপ্রদর্শক। শেরশাহ্ সুশিক্ষিত, পরধর্ম-সহিষ্ণু, ধার্মিক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন।

কুমুদরঞ্জন দাস

শেলি, পার্সি বিশি (১৭৯২-১৮২২ খ্রী) রোমান্টি-সিজমের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবুক আদর্শবাদী ও উদ্দীপক গীতিকবিতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজ কবি। অল্পবয়স হইতেই বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন। উইলিয়াম গড্‌উইনের মতবাদ, গ্রীককাব্য ও প্লেটোর দর্শনচিন্তা তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। অক্সফোর্ডে ছাত্রাবস্থায় 'দি নেসেসিটি অভ্ এথেইজম্' রচনার জন্য বিতাড়িত হন। সেই বৎসরেই হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক নাম্নী এক অজ্ঞাত-কুলশীল কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া মেরি গড্‌উইনের সহিত দেশান্তরে পলায়ন করেন। হ্যারিয়েট আত্মহত্যা করিলে তিনি মেরিকে বিবাহ করেন। নানা প্রকার পারি-বারিক অশান্তির জন্য স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই আকস্মিকভাবে জলে ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বিশ্বসাহিত্যে শেলি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। তাঁহার মানবপ্রেম, অফুরন্ত সৌন্দর্য-পিপাসা এবং আদর্শগতভাবে মানবচেতনার উর্ধ্বায়নই তাঁহাকে এক অপূর্ব প্রাণবন্ত মহাকবির আসন লাভের অধিকারী করিয়াছে। তাঁহার খণ্ডগীতি কবিতাগুলির মধ্যে 'হিম টু ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি' (১৮১৬ খ্রী), 'ওড্ টু দি ওয়েস্ট্ উইন্ড্' (১৮১৯ খ্রী), 'টু নাইট' (১৮২১ খ্রী), 'প্রমেথিয়াস আন্‌বাউন্ড' (১৮১৮-১৯ খ্রী), 'কুইন ম্যাব' (১৮১৩ খ্রী), 'দি রিভোল্ট অভ্ ইস্‌লাম' (১৮১৮ খ্রী), প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

শৈব ও শাক্ত-দর্শন শিব ও শক্তির উপাসনাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভারতভূমিতে প্রসংগতঃ যে-সকল দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই শৈব ও শাক্তবাদের আলোচ্য বিষয়। তন্ত্রশাস্ত্রই এই সকল মতবাদের উপজীব্য। শৈব ও শাক্ত-সিদ্ধান্ত প্রায় একই রকমের। এই হেতু শৈবাগম ও শাক্তাগমে পার্থক্য খুবই অল্প। এইগুলির দার্শনিক সিদ্ধান্তও প্রায় একই রকমের। বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যে শাক্তবাদ এবং কাশ্মীরাদিতে শৈববাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ শিব ও শক্তি অভিন্ন। সাধক বা উপাসকগণের রুচি অনুসারেই কেহ শৈব কেহ বা শাক্ত। দার্শনিক বিচারে এই বিশ্বে ছত্রিশটি তত্ত্ব বর্তমান। এইগুলির বাহিরে কোনও বস্তু নাই। তত্ত্বগুলি হইতেছে—শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, বিদ্যা, মায়া, অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল, নিয়তি, জীব, প্রকৃতি, মনঃ, বুদ্ধি, অহংকারে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহবা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী।

পরম শিব বা ব্রহ্ম যখন বহু রূপ ধারণের ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছারূপ উপাধিবিশিষ্ট পরম শিবই শিবতত্ত্ব। তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ হইলেও সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছার উদয়ে সগুণত্ব প্রাপ্ত হন। প্রলয়কালে সূক্ষ্মতাপন্ন জগৎকে সাঙ্গীভূত করিয়া শক্তি শিবে বিলীন হইয়া থাকেন। তখন শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকেন বলিয়া অবস্থাপন্ন নির্গুণ ব্রহ্মই পরম শিব। তন্ত্রমতে সকল বস্তুই চৈতন্যযুক্ত, সংসারে কিছুই জড় নহে। সকল বস্তুই প্রকাশ স্বরূপ। বস্তুর প্রকাশ-রূপতা বাদ দিলে বস্তুর অস্তিত্বই থাকে না। যে সাধক যেভাবে ভাবনা করেন, তিনি শিবকে সেইভাবেই প্রাপ্ত হন। শিবের সংকোচক এই ভুবনাদির প্রলয় ঘটিলেও শিব একইভাবে বিরাজ করেন। যেহেতু তিনি বিশ্বাত্মক হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ। শিবের একমাত্র ধর্ম প্রকাশময়ত্ব। এই প্রকাশময়ত্বকেই বলা হইয়াছে স্বাতন্ত্র্য শক্তি। এই স্বাভাবিকী শক্তির যোগেই তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সমর্থ। এই স্বাতন্ত্র্য শক্তিই ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় কীর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যশক্তিমত্তা আর অনন্ত শক্তিমত্তা একই কথা। শিব স্বয়ং শক্তিস্বরূপ হইলেও 'শিব শক্তিমান্' এই প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়। শিব ও শক্তি উভয় তত্ত্বই এক।

শিবের সৃষ্টিবিষয়ণী ইচ্ছা, অর্থাৎ শিবের ধর্মকেই শক্তি বলে। এই শক্তিকে বিমর্শও বলা হয়। এক পরম শিবই অনাদিসিদ্ধ মায়ার যোগে ধর্মী ও ধর্ম উভয়রূপে প্রকাশিত। যদিও নিখিল বিশ্বই পরমেশ্বরের শক্তিস্বরূপ, তথাপি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিনরূপেই শক্তির সর্মাধক স্ফুরণ। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। শক্তি সকল বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। প্রত্যেক বস্তুতেই আপন আপন প্রয়োজনসাধিকা শক্তিরূপে শক্তির এবং বস্তুরূপে শিবের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। এই শক্তিকেই আদ্যাশক্তি এবং মহামায়া বলে। বেদান্ত-দর্শনের মায়া আর এই শক্তি এক বস্তু নহে। মায়া জড় পদার্থ, পরন্তু এই মহামায়া নিত্য চৈতন্যরূপিণী। বন্ধনের ক্ষেত্রে সংসারাসক্ত জীবকে এই শক্তিই মায়ারূপে বন্ধন করেন, মোচনের ক্ষেত্রে ইনিই মহামায়া (শিব)-রূপে জীবকে মুক্ত করেন। শিব ও শক্তির মিলিত মূর্তিই অর্ধনারীশ্বরে প্রকাশিত। আচার্য শংকরও 'আনন্দ-লহরী'তে বলিয়াছেন, শিব ও শক্তি বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। শক্তি হইতেছেন শিবের দেহ। উভয়ের মধ্যে অংগাংগিভাব-সম্বন্ধ। শিবশক্তির মিলনের পরিণামই বিশ্বপ্রপঞ্চ। জগতের সকল বস্তুতেই চৈতন্যরূপিণী শক্তির লীলা চলিতেছে; সকল পদার্থই চেতন। মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বর মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহার পুংমূর্তি ও স্ত্রীমূর্তি উভয়ই শক্তিস্বরূপ। শিব ও শক্তির সম্বন্ধ নিত্য, কখনও তাঁহাদের বিচ্ছেদ নাই। শক্তির পুংস্ত্বের স্ফুরণে শিব, বিষ্ণু প্রমুখ দেবতার আবির্ভাব, আর স্ত্রীত্বের স্ফুরণে কালী, দুর্গা প্রমুখ স্ত্রীদেবতার আবির্ভাব।

শিব ও শক্তির ভেদ কল্পিত মাত্র। কিন্তু এই কল্পনারও সার্থকতা আছে। শিব প্রকাশস্বরূপ, তিনি অখণ্ড পূর্ণস্বভাব। তথাপি তিনি শক্তির যোগেই ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন। শক্তিবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সাধক শিববিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন। সুতরাং শক্তিই হইতেছেন শক্তিমান্ শিববিষয়ক জ্ঞানের উপায়স্বরূপ এবং শিব উপেয়। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাই শক্তির স্ফুরণ। কর্মের ও বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই শক্তির অনন্ত প্রকাশ। পরমশিবের স্বাতন্ত্র্য শক্তির প্রকাশ বলিয়াই সমগ্র জগৎ শক্তিময়। শিবের বিভূতিই তাঁহার শক্তি। এইরূপে অনন্ত বিভূতি বা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বরূপ এই জগতের প্রাণস্বরূপ একমাত্র আনন্দঘন শিবই বিরাজ করিতেছেন। পরমশিব ধ্যানের গোচর হন না বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা যায় না। তাঁহার শক্তির উপাস্য দেবতারূপে প্রকটিত হন। স্বপ্রকাশ সংবিৎ উপাসকের দেবতারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এই স্ফুরিত শক্তির উপাসনার চরম ফল শিবত্বপ্রাপ্তি।

স্বাতন্ত্র্যশক্তির অর্থ নিখিল বিশ্ব পরমশিবে প্রতি-বিম্বিত হয়; অর্থাৎ সব কিছুই শিব-সত্তায় নিমগ্ন। শিবের স্বাতন্ত্র্যবলেই বিশ্ব শিবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, অপর কিছুর সহায়তার প্রয়োজন হয় না। এই

স্বাতন্ত্র্যশক্তিকে 'পরা প্রতিভা'ও বলে। এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব যাঁহাতে উদিত ও অস্তমিত হয়, তান্ত্রিক পরিভাষায় তাঁহাকে 'কুল' বলে। কুল, শক্তিরই স্ফুরণ বিশেষ। কুল ব্যতিরেকেও যাঁহার সত্তা আছে, তিনি অর্থাৎ পরমশিব হইতেছেন 'অকুল'। তিনি স্বাতন্ত্র্যবশে লীলাচ্ছলে বিশ্বকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনাতে শিবশক্তি-রূপতা প্রকটিত করেন। শিব কখনও শক্তি-বিরহিত হন না। উভয়ের এই মিলনকেই 'যামল' বা 'যুগল' বলা হয়। শক্তি শিব হইতে অভিন্না হইলেও শিবনিষ্ঠা, শিবের ধর্মরূপা এবং যামলরূপে কর্তৃত্বের সম্পাদিকা। এইভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিবের সহিত তাঁহার ঈষৎ ভেদ কল্পিত হইয়াছে। শক্তিবিরহিত শিব নির্গুণ বলিয়া তাঁহার ধ্যান, স্তুতি, নামকীর্তন সম্ভবপর নহে। অতএব নাম ও গুণের সহিত পরমশিবের রূপ তাঁহারই ইচ্ছায় কল্পিত হয়। সেইরূপেরই অপর নাম শক্তি। শৈববাদ ও শাক্তবাদ বস্তুতঃ একই, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের কল্পনাতে কোনও তাত্ত্বিকতা নাই। শক্তিতত্ত্ব (শিব ও শক্তি) ব্যতিরেকেও যে চৌত্রিশটি তত্ত্ব আছে বাস্তব-দৃষ্টিতে সেগুলিও শক্তিতত্ত্বেরই অন্তর্গত। শিবশক্তির লীলারূপ ক্রমিক পরিণতিই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ। শিব শক্তিযুক্ত হইলেই আপন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অন্যথা তাঁহার কোনও সামর্থ্যই থাকে না। উভয়ে পরস্পর অভিন্নভাবে উভয়ের মধ্যে অনুস্যূত। ইহাকে বলা হয় 'সমরসভাব'। এই সামরস্য-সম্বন্ধে শক্তিবিশিষ্ট শিবই পরমশিব বা ব্রহ্ম। প্রত্যেক জীবে শিব-শক্তিতত্ত্ব রহিয়াছে। বিশেষতঃ পুরুষে শিবভাব এবং নারীতে শক্তিভাবের সমধিক প্রকাশ। পঞ্চম ম-কারের গূঢ় রহস্যও শিবশক্তির সামরস্যের আস্বাদন।

অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্ত হইতেছে মায়াই চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের শক্তি বা ধর্ম। মায়া অবিদ্যা-রূপিণী এবং জড়স্বভাবা। মায়া হইতে উৎপন্ন জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। শিবশক্তিবাদিগণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, মহামায়া শিবে অধিষ্ঠিতা। ধর্ম ও ধর্মীর অভিন্নতাহেতু এই মহামায়া জড়স্বভাবা নহেন, পরন্তু চিতিরূপা। এই জগৎ শিবশক্তির পরিণতি। শক্তিনির্বাহ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ শিবকুক্ষিতে নিয়ত অধিষ্ঠিত। ইঁহাদের মতে জগৎও আনন্দস্বরূপ, দুঃখের হেতু নহে। ইঁহারা চৈতন্যের লীলারূপে বিশ্বপ্রপঞ্চকে অনুভব করেন। নিমিত্ত কারণরূপে শিবই জগতের নিয়ন্তা, উপাদান কারণরূপে তিনিই জগদাত্মক।

বিশ্বের প্রলয়দশায় প্রাণিগণের কর্মফলকে সূক্ষ্মরূপে আপনাতে সংহত করিয়া একমাত্র শিবই অবস্থান করেন। শক্তিও তখন অব্যক্তরূপে শিবকুক্ষিতে প্রবেশ করেন। প্রলয়ের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে প্রাণিগণের কর্মফল অনুসারে পুনরায় সৃষ্টিদশায় অব্যক্তা শক্তি সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছারূপে স্ফুরিত হন। অতঃপর আবির্ভূতা এই শক্তিই ক্রমশঃ বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। দৃশ্যমান জগৎ শিবশক্তির বিচিত্র লীলার রঙ্গমঞ্চ। সুতরাং এই সংসারকেও অসত্য বলা চলে না। সমস্তই শিবশক্তির স্বরূপ। শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণু দেবতার বিভিন্ন নাম ও মূর্তি লইয়া সাধকগোষ্ঠীর বিভিন্নতা সৃষ্টি করিয়াছে। উপাস্যের নাম-রূপের অনন্ততা থাকিলেও উপাসক-সম্প্রদায় অভিন্ন। নির্গুণ শিবে বুদ্ধি স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। নির্গুণ শিবই স্বেচ্ছায় নামরূপ প্রভৃতি গুণের যোগে উপাসনার নিমিত্ত সগুণ হইয়াছেন। তান্ত্রিক উপাসনায় পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব নামে তিন প্রকার ভাব এবং বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম, (বোমা), সিদ্ধান্ত ও কৌল নামে সাত প্রকার আচারের কথা আছে। এই সমস্ত আচারের মধ্যে বামাচারের বিশেষত্ব লক্ষণীয়। এই আচারে রাত্রিতে ভোজনান্তে পঞ্চ ম-কারের যোগে শক্তি-উপাসনা বিধেয়। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। বাম হস্তে পূজা প্রশস্ত। মতান্তরে শক্তিরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া উপাসনা (বামা+আচার) করা বিধেয়। সিদ্ধান্তাচারও অনেকাংশে বামাচারের মত। বামাচার প্রভৃতিতে বাহ্যপূজায় উপাসনার অঙ্গরূপে পঞ্চতত্ত্ব বা ম-কারের কথা পাওয়া যায়। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা (লুচি প্রভৃতি ভাজা খাদ্য) ও মৈথুন এই পাঁচটি বস্তুর নামের আদিতে 'ম' রহিয়াছে। এই জন্যই ম-কার বলা হয়। মন্ত্রশোধিত ম-কার, তন্ত্রের অনুশাসনে অগ্রাহ্য নহে। পঞ্চম ম-কারের অপর সংজ্ঞা 'দূতীযাগ'। স্বল্পায়াসে চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্তই সাধকের ম-কার গ্রহণ।

সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজেই তখন তান্ত্রিক উপাসনার প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রে গণেশ ও সূর্যের উপাসক অনেক আছেন। দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য, শৈব এবং শাক্তও কম নহেন। উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতে শক্তি-উপাসকের সংখ্যা বেশি। উত্তর-ভারতে শৈব সম্প্রদায়ও আছেন। বঙ্গদেশ ও আসামে শাক্তের সংখ্যাই বেশি, বাকী প্রায় সকলেই বৈষ্ণব। বঙ্গীয় শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কালী, তারা প্রমুখ দেবতার উপাসকের আধিক্য। এক সময় ভারতে তিনটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় ছিল—গৌড়-সম্প্রদায়, কেরল-সম্প্রদায় ও কাশ্মীর-সম্প্রদায়। গৌড়-সম্প্রদায়ে বাম মার্গের আদর বেশি। এই সম্প্রদায়ের পূজাদিতে পঞ্চ ম-কারের মুখ্য দ্রব্যই গৃহীত হইয়া থাকে। ইঁহারা স্বীয় হৃদয়ে দেবতার বিসর্জন

করেন। কাশ্মীর-সম্প্রদায়ে পঞ্চ ম-কারের অনুকল্প গৃহীত হয়। ইঁহারা স্বকীয় সহস্রারে দেবতাকে বিসর্জন করেন। কেরল-সম্প্রদায়ে পঞ্চ ম-কারের ভাবনা মাত্র। কোনও দ্রব্য অপেক্ষিত নহে। এই মতেও হৃদয়েই দেবতার বিসর্জন। এই তিনটি সম্প্রদায় ব্যতীত 'বিলাস' নামে আরও একটি সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। শিব ও শক্তির (বিশ্বের) ভেদজ্ঞানপ্রসূত। সাধনার দ্বারা সাধক এই ভেদবুদ্ধিকে নাশ করিতে পারিলেই মুক্ত হইয়া থাকেন।

সুখময় ভট্টাচার্য

শৈলেন্দ্রবংশ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে-রাজবংশ যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়া এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের পত্তন করে ইতিহাসে তাহা শৈলেন্দ্র-বংশ নামে পরিচিত। কেহ বলেন, শৈলেন্দ্রগণ ভারত-বর্ষের কলিঙ্গ অঞ্চল হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে গিয়াছিলেন। অন্যেরা বলেন, শৈলেন্দ্রগণ সম্ভবতঃ কাম্বোডিয়া ও কোচিন-চীন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পূর্বতন ফু-নান্ রাষ্ট্রের রাজবংশের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। এ-বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে এবং নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে শৈলেন্দ্রগণ যেখান হইতে আসুন না কেন, তাঁহারা যে মনেপ্রাণে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় শিল্প-সভ্যতার অভাবনীয় বিস্তার ঘটিয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন্ অঞ্চলে শৈলেন্দ্র রাজ্যের প্রথম উদ্ভব হয় সে সম্পর্কেও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এক সময়ে মনে করা হইত শৈলেন্দ্র-গণ মূলতঃ সুমাত্রা দ্বীপস্থিত শ্রীবিজয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং এই প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ যবদ্বীপ, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অনুমিত হইয়াছে, উক্ত রাজবংশ প্রথমে যবদ্বীপে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে সুমাত্রা ও মালয়েশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। যাহা হোক, অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্ররাজ্যের শক্তি সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছিল। সমসাময়িক আরব ও চীনা লেখকগণের ও ক্ষোদিত লিপির সাক্ষ্যানুসারে এই সময়ে শৈলেন্দ্ররাজগণ সমগ্র মালয়েশিয়া ও সাময়িকভাবে ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত কম্বোজ ('কম্বোজ'[১] দ্র) ও চম্পা ('চম্পা' দ্র) রাষ্ট্রদ্বয়ের উপরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। আরব লেখকগণ শৈলেন্দ্ররাজকে সাধারণতঃ জাবগ্ বা জাবজ্ নামে অভিহিত করিয়াছেন; উহার চীনা নাম ছিল সান্-ফো-ৎসি। নবম শতাব্দীতে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের আংশিক পতন আরম্ভ হয়, পরবর্তী এক শতাব্দীরও অধিককাল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবলতম রাষ্ট্রীয় শক্তিরূপে ইঁহাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত ছিল। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ গৌড়বঙ্গের পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপালদেবের নালন্দা তাম্রশাসনের সাক্ষ্যানুসারে সুবর্ণদ্বীপাধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় নৃপতি বালপুত্রদেব নালন্দায় এক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন। আরব লেখকগণ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত শৈলেন্দ্ররাষ্ট্রের প্রভাব ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে এক বাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত চোলরাজবংশের সহিত শৈলেন্দ্রগণের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজেন্দ্র চোল (১০১৪-৪৪ খ্রী) শৈলেন্দ্ররাজ্যের বহু অঞ্চল সাময়িকভাবে আপন অধিকারে আনেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পরে শৈলেন্দ্রগণ ধীরে ধীরে তাঁহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু অতঃপর ইঁহারা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়েন এবং ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোনও সময়ে যবদ্বীপ কর্তৃক বিজিত হইলে সম্ভবতঃ শৈলেন্দ্ররাজ্যের অবসান ঘটে। শৈলেন্দ্র যুগে ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীন ভারতবর্ষীয় শিল্প ও সংস্কৃতির এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব প্রসার হয়; শৈব-তান্ত্রিক মতবাদের ব্যাপক উদ্ভবও সম্ভবতঃ এই যুগে। যবদ্বীপ বরবুদুর ('বরবুদুর' দ্র) বৌদ্ধস্তূপ ও তারাদেবীর উদ্দেশে নির্মিত চণ্ডী কলসান মন্দির শৈলেন্দ্রশাসন-যুগেরই কীর্তি। ভারতবর্ষীয় নাগরী লিপির প্রচলন ও অভিজাত সমাজে সুললিত সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার শৈলেন্দ্রশাসিত ইন্দোনেশিয়ার সভ্যতার অপর দুই বৈশিষ্ট্য। যবদ্বীপীয় অধুনাতন সংগীতের প্রচলিত স্বরগ্রামদ্বয়ের অন্যতম 'স্লেন্দ্রো' সম্ভবতঃ এখন পর্যন্ত শৈলেন্দ্রগণের স্মৃতি বহন করিতেছে।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

শোপেনহাওয়ার, আর্থার (১৭৮৮-১৮৬০ খ্রী) জার্মান দার্শনিক। তাঁহার দার্শনিক মতবাদ সংক্ষেপে বলা যায় এই যে, বিশ্বজগৎ স্বরূপতঃ এক অন্ধ বিচার-বিহীন জৈবশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও এক অধ্যাত্মশক্তির বহিঃপ্রকাশে পরিসমাপ্ত। এই জৈবশক্তিই মূলতঃ মানুষের কর্মকে পরিচালিত করে। 'যুক্তির বলে কাজ করিতেছি' মানুষের এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এই জৈবশক্তির সহজাত প্রবৃত্তিই জীবনতৃষ্ণা। বিশ্বজগতের বিবর্তনধারায় এই মূলীভূত জীবনতৃষ্ণার উপর প্রসারিত হয় এই অধ্যাত্ম

বা বৌদ্ধিক শক্তি। যে 'জৈবশক্তি মানুষকে তাহার অভীষ্টসাধনে অগ্রসর করে, বুদ্ধি তাহাকে সাহায্য করে মাত্র। এই জৈবশক্তি বা প্রাণতৃষ্ণা হইতে উদ্ভূত হয় মানুষের যাবতীয় দুঃখদাহ, মর্মপীড়া। উহার সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্তিতে মানুষের দুঃখনিরাস বা শান্তিলাভ। ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের 'নির্বাণ'-মতবাদ ও উপনিষদাদিতে উক্ত মুক্তিবাদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার তাঁহার এই দুঃখবাদ ও দুঃখমুক্তির পূর্ণ সমর্থন দেখিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছিলেন—উপনিষদাদির অধ্যয়ন আমার পার্থিবজীবনে যেরূপ শান্তিপ্রদ হইয়াছে, মৃত্যুকালীন ও পারলৌকিক জীবনেও তাহা সেই রূপ শান্তির উৎসস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

সরোজকুমার দাস

শোভা সিংহ সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ রাঢ়ের শক্তিশালী ভূইঞাদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনচেতা জমিদার। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপুতানা হইতে আগত গন্ধর্ব সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তি ২৪ পরগনার আনুলিয়া পরগনা অধিকার করেন। তাঁহার বংশে শোভা সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রঘুনাথ সিংহ সরকার মান্দারুণের অন্তর্গত মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগনা ক্রয় করিয়া শাসন করিতে থাকেন। শোভা সিংহ জমিদারী পাইয়া বরদা পরগনার বাগ্‌দী রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন। তিনি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির জমিদার ছিলেন। তাঁহার সময়ে মোগল-শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল তাহা তাঁহার নেতৃত্বে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পায়। চন্দ্রকোণার রাজা রঘুনাথ সিং, বিষ্ণুপুরের দ্বিতীয় গোপাল সিংহ এবং ওড়িশার পাঠান-দলপতি রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া তিনি ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে নিহত করেন এবং হুগলি অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া নৌবাণিজ্যের চুঙ্গি, শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করিতে থাকেন। মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ শেষে ওলন্দাজ ও ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় ঐ বৎসরেই তাঁহাকে পরাজিত করেন। অনেকে বলেন যে, শোভা সিংহ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার ছুরিকাঘাতে নিহত হন কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

শৌরসেনী প্রাকৃত ভারতীয় আর্যভাষার মধ্যস্তরভুক্ত একটি প্রাকৃত ভাষা। নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত হিসাবে ইহার বিশেষ মূল্য আছে। বররুচির (৫০০ খ্রী) প্রাকৃত ব্যাকরণেও ইহার উল্লেখ আছে।

বিশুদ্ধ শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত কোনও সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায় নাই। ইহার পুরানো সাহিত্যিক নিদর্শন বলিতে গেলে কেবল সংস্কৃত নাটকে কোন কোন পাত্রপাত্রীর উক্তি অংশের কথাই বলিতে হয়। পরবর্তীকালে শৌরসেনী ভাষায় রাজশেখর একটি নাটক ('শট্টক') লিখিয়াছিলেন, নাম 'কর্পূরমঞ্জরী' ('রাজশেখর' দ্র)। ভৌগোলিক বিচারে শৌরসেনীর মূল ভিত্তি ছিল উত্তর-ভারতের শূরসেন বা মথুরা অঞ্চল। প্রাকৃত কবিতার ভাষা এবং স্ট্যাণ্ডার্ড প্রাকৃত ভাষা মাহারাষ্ট্রীর সহিত শৌরসেনীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। যেমন, সং. রথ, শৌ. রধ, মাহা. রহ. ইত্যাদি। ব্যাকরণের বিচারে শৌরসেনী অন্যান্য প্রাকৃতের তুলনায় কিছু সংরক্ষণশীল অর্থাৎ সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠতর।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৪০-১৯১৪ খ্রী) হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্মস্থান কলিকাতা। সাহিত্যে ও সঙ্গীতে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। হিন্দু সঙ্গীতশাস্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য ইনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অভ্ মিউজিক প্রতিষ্ঠা তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। ফিলাডেল্‌ফিয়া এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডক্টর অভ্ মিউজিক উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থঃ 'মুক্তাবলী' (নাটক), 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ' (সঙ্গীতশাস্ত্র), 'যন্ত্রকোষ' (দেশী ও বিদেশী বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের পরিচয়)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্যাওলা বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাল্‌জী (Algae)। একজাতীয় উদ্ভিদ্ যাহার প্রকৃত মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল নাই। ইহা উদ্ভিদ্‌জগতের থ্যালোফাইটা শ্রেণীর একটি প্রধান উপশ্রেণী ('থ্যালোফাইটা' দ্র)। ইহাতে ক্লোরোফিল নামক সবুজ রঙ্গক পদার্থ আছে; কিন্তু ছত্রাকের (fungus) ক্লোরোফিল থাকে না। শ্যাওলার ক্লোরোফিল থাকে বটে, কিন্তু সকল শ্যাওলা বিশুদ্ধ সবুজ নয়; কারণ অনেক সময় অন্য রঙের আড়ালে ইহার রং লুক্কায়িত থাকে। এই বিভিন্ন রঙের জন্য ইহাদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। শ্যাওলা পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সমুদ্র ও মিঠাজলে উভয় জায়গাতেই থাকে। ইহা সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিদ্‌রূপে জীবন ধারণ করে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌ই (Sea weeds) সামুদ্রিক শ্যাওলা। যেমন, সরলতম শ্যাওলা যাহা একটি কোষদ্বারা গঠিত (যথা, ডায়াটম); জটিলতম আকৃতি, যাহা বহু সংখ্যক কোষ-

দ্বারা গঠিত (যথা, ভলভক্স) ; ফিতার মতো আকৃতি-বিশিষ্ট (যথা, স্পাইরোগাইরা) ; নিবিড় থ্যালসবিশিষ্ট (যথা, ফিউকাস)। গোষ্ঠীর (কলোনিজ) কোষগুলি সাধারণতঃ একই রকম, কিন্তু কতকগুলি কোষ পরিবর্তিত হয় প্রজননের বা অন্যান্য কাজের জন্য। বহু শ্যাওলার আকৃতি আণুবীক্ষণিক, কিন্তু কখনও কখনও সামুদ্রিক থ্যালমাসেরা ১০০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হইয়া থাকে।

শ্যাওলার অংগজ, অযৌন ও যৌন জনন আছে। নীল-হরিৎ শৈবাল ও হরিৎ শৈবাল সাধারণতঃ মিঠাজল-ভুক্ত। পিংগল ও লোহিত শৈবাল প্রধানতঃ সামুদ্রিক। মাছের প্রধান খাদ্য শ্যাওলা। সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে ('সালোকসংশ্লেষ' দ্র) ইহা অক্সিজেন সরবরাহ করে বলিয়া অন্যান্য জলজ জীবের কাছে ইহার গুরুত্ব আছে। সার হিসাবেও শ্যাওলা প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

জল, স্থল তুষারাবৃত স্থান এমন কি উষ্ণ প্রস্রবণেও ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোষমধ্যস্থ সঞ্চিত খাদ্য বিভিন্ন প্রকারের হয় ; যেমন, শ্বেতসার, সাইয়ানোফিসিয়ান্ শ্বেতসার, তৈল বা চর্বি, লেমিনারিন্ প্রভৃতি। নস্টক্, অ্যান্‌বিনা প্রভৃতি ব্যতীত সমস্ত শৈবালের কোষে নির্দিষ্ট নিউক্লিয়াসের গঠন দেখা যায়। ইহারা নাইট্রোগ্লিসারিন প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্যের ধারক। মাজন তৈয়ারি, নাইট্রোজেন-ঘটিত সার, জল-পরিকরণ প্রভৃতি কার্যে ইহাদের ব্যবহার হয়। অনেক সময় ইহাদের দেহনিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থে পানীয় জল দূষিত হয়। প্রায় ২০০ কোটি বৎসরের পুরাতন শৈবালের জীবাশ্ম দেখা গিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র কুণ্ডু
প্রভাতকুমার বসু

শ্যামজী, কৃষ্ণবর্মা (১৮৫৭-১৯৩০ খ্রী) ইঁহাকে বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবান্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তদানীন্তন কচ্ছ রাজ্যের মান্দাভি শহরে ভাঁসালি পরিবারে তাঁহার জন্ম। বোম্বাই-এ ছাত্রাবস্থাতে বিবাহ হয় (১৮৭৫ খ্রী)। এই বৎসরেই বোম্বাইতে তিনি স্বামী দয়ানন্দ ও অক্সফোর্ডের অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের সংগে পরিচিত হন। দয়ানন্দের প্রভাবে তিনি আর্যসমাজ-মতাবলম্বী হন। শ্যামজীর সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য দেখিয়া অধ্যাপক উইলিয়াম্‌স্ নিজের সহকারীরূপে কাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অক্সফোর্ডে আমন্ত্রণ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কঠিন চক্ষুপীড়া দেখা দেয়, ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহাতে নিরাশ না হইয়া তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লিভারপুল পৌঁছান এবং অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট গঠনের কার্যে অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়াম্‌সের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেলিয়ল কলেজ হইতে তিনি বি. এ. পাশ করেন ও পরে ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে দেশে ফিরিয়া উদয়পুর, জুনাগড় প্রভৃতি রাজ্যের দেওয়ানি-পদে ও কয়েকটি কাপড়ের কলে কাজ করিবার পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চিরকালের জন্য সপরিবারে বিলেত চলিয়া যান। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হার্বার্ট স্পেনসারের স্মৃতির উদ্দেশে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুবিধার জন্য তিনি পাঁচটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। সর্ত ছিল যে বৃত্তিভোগীরা কেহ সরকারি চাকরি করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষে চরমপন্থী রাজনীতির প্রসার দেখিয়া তিনি বিদেশে উপযুক্ত প্রচারকার্য চালাইতে ও বিপ্লবীদল গঠন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রচার শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইবার ও তাঁহাদের একত্র বাসের সুযোগ দিবার জন্য তিনি লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নাম দিয়া এক ছাত্রাবাস খোলেন। এখানে তাঁহার নেতৃত্বে এক চরমপন্থী আন্দোলনের ব্যবস্থা হয়। এই আন্দোলন 'ইণ্ডিয়া হাউস' আন্দোলন নামে পরিচিত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিনায়ক সাভারকর তাঁহার প্রধান সহচর হিসাবে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' যোগদান করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে বাস নিরাপদ নহে মনে করিয়া তিনি প্যারিসে গিয়া বসবাস শুরু করেন। সেখান হইতে ইণ্ডিয়া হাউসের কার্যকলাপ ও 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' পত্রিকা পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁহার অনুবর্তীদের ভিতর এই সময় অসন্তোষ দেখা দেয় এবং যদিও তিনি মদনলাল ধিংড়া, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, সত্যেন বসু প্রমুখ শহীদদের নামানুযায়ী ছাত্রবৃত্তি ঘোষণা করেন তবু ইওরোপের ভারতীয় চরমপন্থী আন্দোলন হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। অতঃপর আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আগত দেখিয়া তিনি প্যারিস ত্যাগ করিয়া জেনিভা চলিয়া যান ও 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' কাগজ বন্ধ ও রাজনীতি ত্যাগ করিয়া এখানে নাগরিকরূপে বসবাস করিতে থাকেন।

অরুণচন্দ্র বসু

শ্যামদেশ বঙ্গোপসাগরের পূর্ব উপকূলে দক্ষিণে মলয় উপদ্বীপের উত্তরে, বর্তমানে থাইল্যাণ্ড নামে পরিচিত রাজ্য প্রাচীনকালে শ্যামদেশ নামে অভিহিত হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্বে ভারতীয়েরা এইখানে উপনিবেশ স্থাপিত করে। এই

সময়েই এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সহস্র বৎসর যাবৎ অনেক বৌদ্ধরাজগণ এখানে রাজত্ব করেন। ভারতীয় লিপি, বৌদ্ধমন্দির ও মূর্তি এখনও সেখানে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনরূপে বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উত্তর হইতে আগত থাই জাতি শ্যামদেশ অধিকার করে। তাহাদের নাম অনুসারেই এই রাজ্য এখন 'থাই দেশ' নামে পরিচিত। বৌদ্ধধর্ম এখনও এই দেশের বর্তমান অধিবাসীদের ধর্ম।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী (১৮৬৯-১৯৩২ খ্রী) জন্ম পাবনা জেলায়। প্রথম জীবনে পাবনায় ও পরে কলিকাতায় আর্যসমাজ-প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ভেদিক্ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি 'প্রতিবাসী', 'দি পীপ্ল্ অ্যান্ড প্রতিবাসী', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম্' (ইংরেজী দৈনিক), 'দি সার্ভেন্ট', ইংরেজী 'বসুমতী' প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনে তিনি শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের সহযোগী ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ 'ক্রাইম অ্যান্ড ন্যাশন্যালিজম্' সমগ্র দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মান্দালয়ে দ্বীপান্তরিত হন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া প্রথমে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও পরে 'দি বেঙ্গলী'র সম্পাদকমণ্ডলীভুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারত প্রতিরক্ষা আইনে বন্দী হইয়া (১৯১৭ খ্রী) প্রায় ৩ বৎসর অন্তরীণ থাকেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং 'দি সার্ভেন্ট' (১৯২০-২৬ খ্রী) পত্রিকার মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারকার্য চালান, এই সময় গান্ধী-পন্থী ও দাস-নেহরুপন্থীদের মধ্যে কাউন্সিল প্রবেশ প্রসঙ্গে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয় তাহাতে তিনি প্রথমোক্ত দলের নেতৃত্ব করেন। মিস্ মেয়োর 'মাদার ইন্ডিয়া' গ্রন্থের (১৯২৭ খ্রী) প্রতিবাদে তিনি 'মাই মাদার্স পিক্চার' রচনা করেন (১৯২৯ খ্রী)। শেষ-জীবনে তিনি ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণবসাহিত্য-চর্চায় প্রবৃত্ত হন।

দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩ খ্রী)। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম কলিকাতায়, ৬ জুন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সুধা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া এম. এ. এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট তালিকাভুক্ত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে নির্বাচিত হন। অতঃপর আইনবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা লাভার্থে ইংল্যান্ডে যান ও ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদ (বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল)-এ সদস্য নির্বাচিত হন। লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯-৩০ খ্রী)-এ আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহাকে পরিষদের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে আবার ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয়। ইতিমধ্যে তাঁহাদের দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা সন্তান হইয়াছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদে বৃত হন. আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্ষদের তিনি প্রথমে অন্যতম সদস্য ও পরে তাহার চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতশাসন আইন মতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্দলীয় প্রার্থী-রূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাম্মানিক ডি. লিট্. এবং বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় সাম্মানিক এল. এল. ডি. অভিধায় ভূষিত করে। ভারতসরকার শ্যামাপ্রসাদকে লীগ-অফ-নেশন্স (জাতি-সংঘ)-এর কমিটি অভ্ ইন্টেলেক্চুয়াল কো-অপারেশনের সদস্য মনোনীত করেন।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বীর সাভারকারের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সাভারকরের অসুস্থতাহেতু ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে কার্য-নির্বাহী প্রেসিডেন্টের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই বছরেই তিনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে অভিভাষণ দেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ফজলুল হক লীগ কোয়ালিশন সরকার ভাঙিয়া দিয়া প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশান সরকার গঠন করিলে তিনি তাহাতে অর্থ-মন্ত্রিরূপে যোগ দেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার মন্ত্রী থাকিতেই তিনি ভাগলপুরে নিষিদ্ধ হিন্দু মহা অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। মতানৈক্য ঘটায় তিনি মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। অনন্তর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইলে তিনি পণ্ডিত নেহরুর মন্ত্রিসভায় আমন্ত্রিত হইয়া শিল্প সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নেহরুজীর সহিত মতানৈক্য ঘটায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ এপ্রিল মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুমহাসভার সংস্রব ত্যাগ

করনে এবং ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে 'জনসংঘ' নামান্তরে 'পিপলস পার্টি' গঠন করেন। এই বৎসর ২১ অক্টোবরের নিখিল ভারতীয় কনভেনশানে তিনি জনসংঘের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে তিনি দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন এবং শীঘ্রই বিরোধীপক্ষের মুখপাত্ররূপে গণ্য হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ১১মে নূতন পার্লামেন্টে তিনি কাশ্মীর-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন. জম্মু প্রজা পরিষদ কাশ্মীরের সর্বাঙ্গীণ অন্তর্ভুক্তির দাবীতে যে আন্দোলন করিতেছিল সরকার সেই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেন। ইহার প্রতিবাদে দিল্লীতে এক মিছিল বাহির হইলে শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হয়। অনন্তর তাঁহার নেতৃত্বে জনসংঘ ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জুন কাশ্মীরের পৃথক্ গণ পরিষদ, পতাকা, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি ভারতীয় সার্বভৌমত্বের বিরোধী বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে নেহরু আবদুল্লার মধ্যে 'জুলাই চুক্তি' হইলে শ্যামাপ্রসাদ তাহার প্রতিবাদ করেন। অনন্তর জম্মু ও কাশ্মীর দিবস পালন করা হইলে (৫ মার্চ, ১৯৫৩.খ্রী) তিনি ও অন্যান্য কয়েকজন নেতা বন্দী হন। সুপ্রীম কোর্টের আদেশে তাঁহারা মুক্তি পান। অতঃপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮ মে সকাল সাড়ে ছয়টায় তিনি পুনরায় কাশ্মীর যাত্রা করেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা রাভি ব্রীজের মাঝখানে পৌঁছিলে এক পুলিশ অফিসার তাঁহাকে নিষেধাজ্ঞাপত্র দেখান।.তিনি ইহা অগ্রাহ্য করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা ও নিশাতবাগের কাছে এক কুটিরে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তাঁহার সহিত কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়া হইত না। অতঃপর কারাবরোধের মধ্যে তিনি পীড়িত হইলে শেখ আবদুল্লা সরকারের ডাক্তারেরা তাঁহার চিকিৎসা করেন কিন্তু বাহিরের সহিত সর্বপ্রকার যোগাযোগ বন্ধ রাখা হয়। এইভাবে অবরোধের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয় ২৩ জুন (ইংরেজী মতে ২৪ জুন) রাত্রি আড়াইটার সময়।

পুলকেশ দেসরকার

শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী (১৮৫৫-১৯২৬) প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও সমাজসেবী। জন্ম—পাঞ্জাবে জলন্ধর জেলায় তালবন নামক গ্রামে। পিতা ছিলেন পুলিশ ইন্‌স্পেকটর। গৃহাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। কাশীতে বিদ্যাভ্যাসের পর তিনি কিছুদিন জলন্ধরে ওকালতি করেন; পরে ধর্মে ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বামী দয়ানন্দের ('দয়ানন্দ সরস্বতী' দ্র) মৃত্যুর পর তিনি আর্যসমাজে যোগ দিয়া অচিরে উহার নেতৃপদে বৃত হন এবং শ্রদ্ধানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করেন। হরিদ্বারের নিকটবর্তী কনখলে প্রাচীন হিন্দু-আদর্শে পরিকল্পিত 'গুরুকুল' নামক বিদ্যাপীঠ তাঁহার অন্যতম কীর্তি। জাতীয় আন্দোলন দমনের জন্য রাউলাট আইন পাস হইলে দেশময় যে প্রবল প্রতিবাদ উপস্থিত হয়, তিনি উহাতে নেতৃত্ব করেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। সেই সূত্রেই তিনি হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা দূরীকরণের প্রয়োজন অনুভব করেন এবং অচিরে কংগ্রেস ছাড়িয়া সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, অনেক সময়ে হিন্দু নরনারী সমাজের অকারণ গোঁড়ামির ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্মান্তরিত হয় এবং স্বধর্মে ফিরিবার সুযোগ পান না। তাঁহাদের এই সুযোগ দিবার জন্য এবং অন্যধর্মীকেও ইচ্ছা করিলে হিন্দুধর্ম গ্রহণের অধিকার দিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'শুদ্ধি' প্রথার প্রচলন করেন। এই প্রথায় একজন বিদুষী মুসলমান মহিলা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলে এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত লোক উত্তেজনা প্রকাশ করেন এবং শ্রদ্ধানন্দকে অপদস্থ করিতে চাহেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা যদিও সফল হয় নাই তথাপি একজন মুসলমান আততায়ীর হস্তে স্বামীজী নিহত হন। আবদুর রসিদ নামক এক ব্যক্তি জলপানের অছিলায় তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া অতর্কিতে তাঁহাকে হত্যা করে। এই ব্যাপারে সকল সম্প্রদায়ের লোকই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারই স্মরণে কলিকাতার মির্জাপুর পার্ক পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রবণবেলগোলা মহীশূর রাজ্যে হাসান জেলার অন্তর্গত দিগম্বর জৈনদের বিখ্যাত তীর্থস্থান। এককালে জৈন ধর্ম ও শিক্ষার অন্যতম বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। রাজাবলকথে অনুযায়ী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া জৈন সন্ন্যাসীরূপে এখানে বাস করেন এবং দ্বাদশ বৎসর পরে অনাহারে এখানেই দেহোৎসর্গ করেন। কোনও একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে মহাবীরের ছয়জন 'শ্রুতকেবলে'-র অন্যতম ভদ্রবাহু দ্বাদশ সহস্র জৈন ভিক্ষুসহ শ্রবণবেল-গোলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতে এখানে জৈনদের আগমন শুরু হয়। চন্দ্রগিরি পর্বতে অদ্যাবধি ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্তের পদ-চিহ্ন বর্তমান। ঐ পদচিহ্ন কতদিন পূর্বে স্থাপিত তাহা জানা যায় না। তবে শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্নিকটে প্রাপ্ত ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে চন্দ্রগিরির পদ-চিহ্নের উল্লেখ আছে। গঙ্গরাজাদের সেনাপতি চামুণ্ডরায় চন্দ্রগিরির নিকটে বিন্ধ্যগিরির শিখরে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত দিগম্বর সন্ন্যাসী গোমটেশ্বর বাহুবলীর বিশাল

মূর্তি নির্মাণ করান (৯৮৩ খ্রী)। মূর্তিটি ৫৭ ফিট উচ্চ। একটি প্রস্তর হইতে নির্মিত এত উচ্চ মূর্তি পৃথিবীর অন্যত্র নির্মিত হয় নাই। মূর্তিটি হাজার বছর ধরিয়া মুক্তস্থানে পূজিত হইলেও উহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। পঁচিশ বৎসর অন্তর গোমটেশ্বরকে দধি, দুগ্ধ এবং ঘৃতদ্বারা স্নান করান হয়।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

শ্রমিক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন দ্র

শ্রাদ্ধ শব্দের অর্থ মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক দান। হিন্দুর ধর্মকার্যের মধ্যে শ্রাদ্ধ বা পিতৃকৃত্য সুপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অশৌচকাল শেষ হইবার পর আদ্যশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হয়। আদ্যশ্রাদ্ধ মৃতের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ শ্রাদ্ধ। কলাগাছের খোলা দিয়া তৈয়ারি পাত্র এবং সাদা ফুল শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত হয়। শ্রাদ্ধকার্যে বিচিত্রাসন দান, মহান্নদান, শয্যাদান, দানসাগর, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি দানের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। শ্রাদ্ধকর্তা নিজের সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে এই সমস্ত দানের আয়োজন করেন। এগুলির মধ্যে দানসাগরের গৌরব সর্বাধিক। প্রচলনের দিক্ দিয়া আদ্যশ্রাদ্ধের পর আভ্যুদয়িক বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ উল্লেখযোগ্য। গৃহপ্রবেশ, পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করার বিধি আছে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের সঙ্গে ষোড়শ মাতৃকাপূজা, বসুধারা দান প্রভৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অর্ঘ্যদান, গন্ধদান, অন্নদান, মধুদান প্রভৃতি শ্রাদ্ধের বিশিষ্ট অঙ্গ। মধুদান উপলক্ষে পঠিত, 'মধুবার্তা' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে সমগ্র বিশ্বের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

হারাধন দত্ত

শ্রাবস্তী ইহার ধ্বংসাবশেষ উত্তর প্রদেশের গোন্ডা ও বহ্‌রাইচ জেলাদ্বয়ের সীমানায় (২৭°৩০′ উত্তর ও ৮২° ২′ পূর্ব) বিক্ষিপ্ত। রাপ্তী (প্রাচীন অচিরাবতী) নদীর তীরে শ্রাবস্তীর অট্টালিকা প্রভৃতি বর্তমানে মৃত্তিকাগর্ভে।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে শ্রাবস্তীর উল্লেখ আছে। মহাভারত অনুসারে রাজা শ্রাবস্ত এই নগরীর পত্তন করেন। শ্রাবস্তীর প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বুদ্ধদেবের সময়েই। শ্রাবস্তী তখন কোশলের ('কোশল' দ্র) রাজধানী। এই রাজ্যের পরাক্রান্ত নৃপতি প্রসেনজিৎ ('প্রসেনজিৎ' দ্র) বুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বকালে শ্রাবস্তী সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে পৌঁছায়। জৈন তীর্থংকর মহাবীরের প্রভাবও এখানে বহু দিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন কি বৌদ্ধধর্মের পতনের পরেও।

বুদ্ধদেবকে শ্রাবস্তীতে আনার মূলে শ্রাবস্তীর ধনী শ্রেষ্ঠী সুদত্ত অনাথপিণ্ডক। রাজগৃহে গিয়া তিনি প্রথম সাক্ষাতেই বুদ্ধের শিষ্য হন এবং বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে আগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সশিষ্য বুদ্ধদেবের বাসস্থানের জন্য তিনি রাজপুত্র জেতের উদ্যানে এক বিরাট বুদ্ধাবাস নির্মাণ করেন ('জেতবনবিহার' দ্র)। জেতবনের অনতিদূরে, শ্রাবস্তী নগরীর পূর্বদিকে পূর্বারাম নামে অপর একটি বিখ্যাত সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ বিশাখা ইহা নির্মাণ করেন। আর একটি সংঘারাম হইল নৃপতি প্রসেনজিতের উদ্যোগে ভিক্ষুণীদের বসবাসের জন্য নির্মিত রাজকারাম। শ্রাবস্তীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অঙ্গুলিমাল নামক দুর্ধর্ষ দস্যুর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা। এই দস্যু মনুষ্যদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অঙ্গুলিগুলি মালারূপে ধারণ করিত। প্রয়োজনীয় সংখ্যা পূরণের জন্য এই পাপমতি স্বীয় মাতাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বুদ্ধদেব তাহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়া দেশে শান্তি আনয়ন করেন।

জেতবন-সংঘারামে বুদ্ধদেবের চন্দনকাষ্ঠের প্রাচীনতম মূর্তির উল্লেখ করেন ফা-হিয়েন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক হইতেই এই বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি ক্রমিক ধ্বংসের কুক্ষিগত। হিউএন্-ৎসাং-এর পর্যটনকালে অধিকাংশ সৌধই ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক স্তূপ, মন্দির ও সংঘারামের ভগ্নাবশেষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কুষাণযুগের কয়েকটি ভগ্ন সৌধ ও মূর্তিই প্রাচীনতম প্রত্ন নিদর্শন। শ্রাবস্তী নগরীর ভিতরে বৌদ্ধসৌধের নিদর্শন বিরল। নগরের অভ্যন্তরে পক্কী কুটী ও কচ্চী কুটী নামে পরিচিত দুইটি বিরাট্‌কায় সৌধের নিম্নাংশ বিদ্যমান। তবে ইহারা কোন্ ধর্মসংশ্লিষ্ট তাহা নিরূপিত হয় নাই। জৈন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোভনাথের মন্দির। তীর্থংকর সম্ভবনাথের জন্মস্থান বলিয়াই স্থানটি বিদিত। ইহার পশ্চিম অংশে মুসলমানদের একটি সমাধি-সৌধ আছে।

জেতবন ও শ্রাবস্তীর বাহিঃসীমায়, নগরী-প্রাকারের দক্ষিণ দিকে তিনটি বিরাট্ সৌধের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ইহাদের বর্তমান স্থানীয় নাম পনহিয়াঁ-ঝার, খরহুয়াঁ-ঝার এবং ওরা-ঝার।

দেবলা মিত্র

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৭০ খ্রী) প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক। বীরভূম জেলার হাতিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা ঃ মধুসূদন। ইংরেজীতে ঈশান-স্কলার (১৯১০ খ্রী)। ইংরেজীতে এম. এ., প্রথম শ্রেণীতে প্রথম (১৯১২ খ্রী)। ইংরেজী রোম্যান্টিক কবিতা

সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ (১৯২৭ খ্রী)। প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী প্রভৃতি কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিভাগে 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' হন (১৯৪৬-৫৫ খ্রী)। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসঙ্গমে' (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রী) বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যের একখানি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ইহার আদি অন্ত খণ্ডিত, ভিতরের পাতাও কতকগুলি পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থটি সম্পাদন করেন আবিষ্কর্তা স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি তাঁহারই দেওয়া। পাণ্ডুলিপিতে গ্রন্থের কোনও নাম ছিল না। গ্রন্থটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রী) প্রকাশিত হয়। খণ্ডিত পদসহ পাণ্ডুলিপির পদসংখ্যা ৪১৭। ভণিতা হইতে জানা যায় কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। তিনি বাসলীদেবীর সেবক ছিলেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যের ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রাচীন বাংলাভাষার পরিচায়ক হিসাবেও পুঁথিটি বিশেষ মূল্যবান্ ('চণ্ডীদাস' দ্র)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। ইহার অধিকাংশ পদ কৃষ্ণ-রাধা অথবা দূতী-বড়াইর উক্তি প্রত্যুক্তি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদমাত্রেই এক একটি গীত। প্রত্যেক পদের আরম্ভেই সুর তাল-আদির নির্দেশ আছে। পুঁথির প্রাপ্ত অংশ জন্ম, তাম্বুল, দান, নৌকা, ভার, বৃন্দাবন, যমুনা, বাণ, বংশী—এই ৯টি খণ্ড ছাড়াও রাধাবিরহ অংশটি আছে। ছত্রখণ্ড নামক একটি ক্ষুদ্র খণ্ড আছে, উহা ভারখণ্ডেরই অংশীভূত। যমুনা খণ্ডটিও কার্যতঃ তিনটি খণ্ডাংশের সমষ্টি। ইহার প্রথম ও তৃতীয় অংশের নাম কালিয়দমন এবং হারখণ্ড। মধ্যাংশের নাম পাওয়া যায় নাই কিন্তু ইহার বর্ণনীয় বিষয় রাধার বস্ত্রহরণ। এই গ্রন্থে আরম্ভসূচক এবং পূর্বাপর সম্বন্ধরক্ষার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে। এগুলিও কবির স্বহস্তরচিত বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনীর জন্য কবি ভাগবত এবং গীতগোবিন্দের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছেন। কবির স্বকালে প্রচলিত লৌকিক কথা-কাহিনীও এই কাব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

শ্রীক্ষেত্র পুরী দ্র

শ্রীখণ্ড বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা হইতে পাঁচ মাইল দূরে কাটোয়া গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ নরহরি দাস (সরকার), তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দ ও তাঁহার পুত্র রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব দাস, সুলোচন প্রভৃতি বৈষ্ণব সাধকগণের জন্য পাণ্ডিত-প্রধান শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ের খ্যাতি ছিল। কার্তিক কৃষ্ণা-দশমীতে গৌরাঙ্গ গোপীনাথের মন্দিরে নামকীর্তন মহোৎসব এবং একাদশীতে নরহরিঠাকুরের তিরোভাব তিথি উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

শ্রীধর আচার্য তাঁহার রচিত 'ত্রিশতিকা' (৩০০ আর্যছন্দে রচিত শ্লোকে সম্পূর্ণ) পাটীগণিতের গ্রন্থ এবং 'শ্রীধর-পদ্ধতি' জাতকখণ্ডের গ্রন্থ। 'ত্রিশতিকা' ৯১৩ শকাব্দে বা ৯৯১ খ্রীস্টাব্দে রচিত। এই শ্রীধরই 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থের রচয়িতা হইলে গ্রন্থস্থ প্রমাণ অনুযায়ী তাঁহার পিতার নাম বলদেব শর্মা, মাতা অব্বোকা এবং জন্মস্থান গঙ্গার পশ্চিমতটে রাঢ়দেশের এক গ্রাম। শ্রীধর আচার্যের যে বিস্তৃত বীজগণিতের উল্লেখ ভাস্করাচার্য করিয়াছেন তাহা এখনও পাওয়া যায় নাই। ভাস্করাচার্য নিজগ্রন্থে শ্রীধরের বহু নিয়ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কোথাও শ্রীধরের নাম উল্লেখ করেন নাই। 'ত্রিশতিকা'য় বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় আছে কিন্তু গোলের পৃষ্ঠক্ষেত্রফল নির্ণয় নাই।

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

শ্রীধর কথক, ভট্টাচার্য জন্মঃ ১২২৩ বঙ্গাব্দে হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে। পিতা রতনকৃষ্ণ (শিরোমণি) এবং পিতামহ প্রসিদ্ধ কথক লালচাঁদ (বিদ্যাভূষণ)। শ্রীধর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ভাগবতে তাঁহার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। যৌবনে তিনি পাঁচালী ও কবি গাহিতেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত জীবনকৃষ্ণ শিরোমণির নিকট তিরস্কৃত হইয়া ইহা পরিত্যাগ করেন এবং মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। পরে ব্যবসায় ছাড়িয়া বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি পিতামহের ধারা অনুসরণ করিয়া কথকতায় বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করেন।

শ্রীধর কথক সুগায়ক ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ টপ্পা-

জাতীয় গান রচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার গানগুলি তদানীন্তন টপ্পা-রচনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা মার্জিত ও রুচিসম্পন্ন ছিল। শ্রীধরের উপর রামনিধি গুপ্তের ('নিধুবাবু' দ্র) প্রভাব লক্ষণীয়। প্রেমসংগীত ব্যতীত শ্রীধর কিছু শ্যামাসংগীত, আগমনী ও সংস্কৃত ভজনও রচনা করিয়াছিলেন।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

শ্রীধরস্বামী পঞ্চদশ শতকের গুর্জরদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। প্রথম জীবনে তিনি কৃতদার সংসারী ছিলেন এবং শাস্ত্রানুশীলনের দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। ক্রমে ঈশ্বর প্রেম-পিপাসু হইয়া সাংসারিক বিষয়ে বীতরাগ হন, গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করেন ও পরমানন্দ পুরীর নিকট সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হন এবং তপস্যা ও গ্রন্থাদিরচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের উপর 'ভাবার্থদীপিকা', ভগবদ্‌গীতার উপর 'সুবোধিনী', বিষ্ণুপুরাণের উপর 'আত্মপ্রকাশ' প্রভৃতি টীকা রচনা করিয়া সূক্ষ্ম ও গূহ্যতত্ত্বগুলি সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করেন। এইগুলি অদ্যাপি সর্বত্র সমাদৃত। চৈতন্যদেব 'ভাবার্থদীপিকা' অতি শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতেন। শ্রীধরস্বামীর আরাধ্য দেবতা নৃসিংহদেব। ধর্মে তিনি বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষ পরমভাগবত ছিলেন কিন্তু দার্শনিক মতবাদে অদ্বৈতপন্থী।

জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীনগর জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগর আয়তনে ও লোকসংখ্যায় প্রদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ৭৪°-৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমা ও ৩৪°-৫′ উত্তর অক্ষরেখায় ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৫০ ফিট উচ্চে এই শহর অবস্থিত। ঝিলাম নদীর দুই তীরের প্রায় ৩৮ বর্গ কি. মি. জুড়িয়া শহরটি নদীর উপর নয়টি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। শহরের মধ্যেই সুদীর্ঘ ডাল হ্রদ। নদীপথে যাতায়াত ও হ্রদে নৌকাবিহারের সুযোগ থাকায় এই শহরকে অনেকে পশ্চিমের ভেনিসের সঙ্গে তুলনা করেন।

কবি কহ্লণের ('কহ্লণ' দ্র) 'রাজতরঙ্গিণী'তে এবং মির্জা হায়দার ও আবুল ফজলের বর্ণনাতেও প্রাচীন কালে এই শহরে অবস্থিত অনেক সুন্দর সুন্দর প্রাসাদের কথা পাওয়া যায়। শ্রীনগরের বারমাসের আবহাওয়ার মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। বৎসরে দুইবার, একবার মৌসুমী ও অন্যবার ভূমধ্যসাগরীয় হাওয়ার প্রভাবে, বৃষ্টি অথবা তুষারপাত হয়। সেইজন্য তাপমাত্রার মধ্যেও বিশেষ তারতম্য (সর্বনিম্ন—২.৬° সে. গ্রে. ও সর্বোচ্চ ৩১.০° সে. গ্রে.) দেখা যায়।

শ্রীনগরের শিল্পকলা দেশে ও বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। শাল, কার্পেট রুপা, তামা ও কাঠের কাজ, চামড়া ও পশুর লোম (ফার) শিল্প, নৌকা তৈয়ারি ইত্যাদি এই শহরের আকর্ষণীয় প্রধান শিল্প। বয়নশিল্পের মধ্যে শালের খ্যাতি বহু দেশব্যাপী। ওয়ালনাট কাঠের উপর খোদাই করা কাশ্মীরী সামগ্রী বিশ্ববিখ্যাত। বর্তমানে ক্লাব, গল্ফ খেলার মাঠ, হ্রদে সাঁতার কাটার ব্যবস্থা, সিনেমা, পক্ষী, মৎস্য ও পশুশিকারের ব্যবস্থা প্রভৃতি এখানে আছে। দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে যাদুঘর, গাগারিবল, লালমণ্ডি, চশমসাহী, নিশাদবাগ, শালিমারবাগ, নাসিমবাগ প্রভৃতি প্রধান। এখানকার সর্বাধিক আকর্ষণীয় হইতেছে হাউসবোটগুলি হোটেলের মত সব সুবিধাই হাউসবোটে পাওয়া যায় এবং ইচ্ছামত তীরে আসিবার জন্য 'শিকারা' নামে ছোট নৌকা আছে। কাশ্মীরের অন্যান্য স্থানগুলি, যেমন, পহলগাঁও, ইসলামাবাদ, গুলমার্গ, খিলেনমার্গ, বরামুলা, প্রভৃতি শ্রীনগরের সহিত গাড়ি চলার রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুযায়ী শ্রীনগরের লোকসংখ্যা ২৮৫২৫৭। তন্মধ্যে ১৫২৯৬৭ পুরুষ ও ১৩২২৯০ স্ত্রীলোক। শতকরা ৩৩ ভাগ পুরুষ ও ১৪ ভাগ স্ত্রীলোক শিক্ষিত।

শরদিন্দু বসু

শ্রীনিবাস আচার্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ; পিতা গঙ্গাধর, নামান্তর চৈতন্য দাস। পুরী যাইবার সময় শ্রীনিবাস শুনিতে পান যে, শ্রীচৈতন্য অপ্রকট হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসের বয়স অন্ততঃ ১৬।১৭ বৎসর হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে যান। যাইবার পথে মথুরাতে রূপসনাতনের তিরোধানের কথা জানিতে পারেন। রূপ-সনাতন ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (রূপ গোস্বামী' দ্র)। শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে কয়েক বৎসর বাস করেন। তিনি শ্রীজীবগোস্বামীর ('জীবগোস্বামী' দ্র) নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং গোপালভট্ট গোস্বামীর নিকট দীক্ষা লন। গোস্বামীদের রচিত গ্রন্থাদি তিনি বাংলাদেশে আনিয়া প্রচার করেন।

শ্রীনিবাস ভাগবতের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার ভাগবত পাঠ শুনিয়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ব্যাখ্যা লেখেন। তাঁহার লিখিত ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্‌ ও নরহরিঠক্কুরাষ্টকম্‌ হইতে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। শ্রীনিবাস 'বদন চাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিলে গো' ইত্যাদি 'অনুক্ষণ কোণে থাকি

বসনে আপনা ঢাকি', প্রভৃতি পাঁচটি সুন্দর পদ রচনা করেন।

তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান্ হইতেছেন গোবিন্দদাস কবিরাজ ('গোবিন্দদাস' দ্র) গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজও তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং 'স্মরণদর্পণ' রচনা করেন। তাঁহার অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দ চক্রবর্তী, গোকুলদাস, গোপীরমণ, নৃসিংহ কবিরাজ প্রভৃতিও কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও শ্রীনিবাসকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐসব পত্র 'ভক্তি রত্নাকরে' ও 'কর্ণানন্দে' উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাসের জীবনের অনেক কথা 'প্রেমবিলাস' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতেও জানা যায়। তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দও কবি ছিলেন। শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী সুপ্রসিদ্ধ কবি যদুনন্দন দাসের দীক্ষাগুরু ছিলেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী (১৮৬৯-১৯৪৬ খ্রী) প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্, বাগ্মী ও দেশসেবক। জন্মঃ দক্ষিণ ভারতের এক গ্রামে। এফ. এ. (১৮৮৫ খ্রী) পরীক্ষায় প্রথম স্থান ও বি. এ. পরীক্ষায় (১৮৮৮ খ্রী) সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইংরেজী ভাষায় দক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ নগদ ৩৫০ টাকা ও সুবর্ণ-পদক পান। প্রথমে এক স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন ও পরে গোপালকৃষ্ণ গোখলের ('গোখলে, গোপালকৃষ্ণ' দ্র)। সংস্পর্শে আসেন। তিনি গোখলের জীবনী লেখেন এবং চাকরিতে ইস্তফা দিয়া গোখলের সৃষ্ট 'ভারত সেবক' সংস্থাতে যোগদান করেন (১৯০৭ খ্রী)। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৯১০-২০ খ্রী), মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য, সার্ভেন্টস্ অভ্ ইন্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচিত বা মনোনীত হন। এই শেষোক্ত সদস্য পদে থাকা কালে 'রাউলাট' বিলের তীব্র প্রতিবাদ জানান। নাসিকে অনুষ্ঠিত বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন (১৯১৭ খ্রী)। হোমরুল ও সংস্কৃত শাসনব্যবস্থার সমর্থনে তিনি বিভিন্ন স্থানে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই সময় হইতেই বাগ্মী বলিয়া খ্যাত হন। ১৯১৮-২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যান। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে 'এজেন্ট জেনারেলের' পদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি 'কমলা লেকচার' দিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। ১৯৩৫-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ইংরেজী ভাষায় তিনি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

অশোকা সেনগুপ্ত

শ্রীপঞ্চমী মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী। বসন্ত পঞ্চমী নামেও পরিচিত। বাংলাদেশে এবং ক্রমশঃ ভারতের নানা প্রদেশে, এমন কি, ইওরোপ, আমেরিকাতেও এই সময়ে সরস্বতী পূজার উৎসব হয়। এইদিন অনধ্যায় বা লেখাপড়া বন্ধ, তবে ছেলেমেয়েদের বিদ্যারম্ভ বা হাতে-খড়ির অনুষ্ঠান করা চলে। শাস্ত্রে এইদিনে সরস্বতী পূজার স্পষ্ট উল্লেখ নাই—লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে। তবে দোয়াতকলম পূজা ও সারস্বতোৎসব করিবার কথা কোনও কোনও গ্রন্থে আছে। বিহারেও দোয়াত পূজা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্ব গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে শ্রীপঞ্চমীর 'শ্রী'-র অর্থ সরস্বতী। শ্রীপঞ্চমী অর্থ সরস্বতীর প্রিয় পঞ্চমী; সুতরাং এইদিনে সরস্বতীর পূজা কর্তব্য। তিনি তাঁহার 'কৃত্যতত্ত্ব' গ্রন্থে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই দুই দেবীর পূজারই ব্যবস্থা দিয়াছেন। রঘুনন্দনের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী গোবিন্দানন্দের মতে এই দিনের সরস্বতী পূজা ও অনধ্যায় বাংলাদেশের লোকাচার। অনন্তদেবের 'স্মৃতি কৌস্তুভ' গ্রন্থে মাঘ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে কামদেব ও রতির পূজার নির্দেশ আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

শ্রীবৎস নৃপতি চিত্ররথের পুত্র। ইঁহার মহিষী চিত্রসেন-তনয়া চিন্তা। কাশীদাসী মহাভারতের বনপর্বে শ্রীবৎস রাজার বিস্তৃত কাহিনী পাওয়া যায়। শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই বিচারে লক্ষ্মীদেবীর পক্ষ সমর্থন করায় শনির কোপদৃষ্টিতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্রীবৎস সস্ত্রীক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হন। বনবাসী রাজার ধনরত্নজড়ানো কাঁথা শনি অপহরণ করিলে শ্রীবৎস নিঃস্ব অবস্থায় কাঠুরিয়ার গৃহে অবস্থান করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে এক বণিক্ বলপূর্বক চিন্তাদেবীকে হরণ করিলে পতিপত্নীর বিচ্ছেদ ঘটে। অনন্তর নৃপতি বাহুদেবের কন্যা ভদ্রার সহিত শ্রীবৎসের বিবাহ হয়। দ্বাদশ বৎসরের অবসানে শনির কোপ প্রশমিত হইলে শ্রীবৎস স্বরাজ্য ও পত্নী চিন্তাকে ফিরিয়া পান।

যূথিকা ঘোষ

শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই হিন্দুগণ সুমাত্রা দ্বীপে এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার রাজধানী শ্রীবিজয় ক্রমে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের

রাজধানী ও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রায় সমগ্র মলয় উপদ্বীপ এই রাজ্যের অধীন ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিং (সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ) লিখিয়াছেন যে, শ্রীবিজয় রাজ্যের বাণিজ্যতরী একদিকে ভারতবর্ষ ও অন্যদিকে চীন দেশে যাতায়াত করিত।

শৈলেন্দ্র বংশীয় ('শৈলেন্দ্র বংশ' দ্র) রাজাদের আমলে যবদ্বীপ, কম্বুজ দেশ, মলয় উপদ্বীপে ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ লইয়া এক বিশাল শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। এই বংশীয় সম্রাটগণ পালবংশীয় দেবপাল এবং দক্ষিণ ভারতের চোলরাজগণের সভায় দূত প্রেরণ করিতেন। পরে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে চোলরাজগণ এই সাম্রাজ্যের অনেকাংশে প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং ক্রমে শ্রীবিজয়-রাজ্যের পতন হয়। শৈলেন্দ্র-রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং যবদ্বীপের বরবুদুর ('বরবুদুর' দ্র) ও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত মন্দির তাঁহাদেরই কীর্তি।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণ বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশ-পুরাণের অন্যতম এবং তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রের দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক অকৃত্রিম ভাষ্য। শ্রীমদ্‌ভাগবতপুরাণ সর্গাদি দশলক্ষণযুক্ত। তন্মধ্যে শ্রীহরির রূপ-গুণ-লীলাকথা-বর্ণনা উপলক্ষেই নয়টি লক্ষণের অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্। অবতারেরা তাঁহার পুরুষমূর্তির অংশ অথবা কলামাত্র। কৃষ্ণই পরম সত্য বা স্বয়ং ভগবান্ ইহাই ভাগবতের মহাবাক্য। কৃষ্ণ হত্যারিগতি-দায়ক। ভাগবতে ভক্তচরিত্রাবলম্বনে নবধাভক্তি, গোপ-গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ ক্রীড়া ও গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতির পরাকাষ্ঠা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একাধারে সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য, ভগবদ্ভক্তির বৈচিত্র্য এবং ভগবৎপ্রেমের মাধুর্য-বর্ণনে ইহা অতুলনীয়। বৈষ্ণবমতে শ্রীমদ্‌ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক মহাপুরাণ। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটি ধারা এবং শ্লোকসংখ্যা আঠার হাজার। প্রথমে সত্যস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মার হৃদয়ে ইহার মর্ম প্রকাশিত করেন; এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ, নারদের নিকট হইতে বেদব্যাস, বেদব্যাসের নিকট হইতে শুকদেব প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে ইহা শ্রবণ করেন। ইহার দ্বিতীয় ধারাটির প্রথম শিক্ষক সংকর্ষণ। তাঁহার নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে সনৎকুমার, সাংখ্যায়ণ, পরাশর, মৈত্রেয় এবং অবশেষে বিদুর এই ধারাটি লাভ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ স্তব-স্তুতি ও ভক্তিমূলক আখ্যানে সমৃদ্ধ। এই সকল আখ্যানের মধ্যে হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদ, সমুদ্রমন্থন, বামনরূপী বিষ্ণু ও বলি প্রভৃতির বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধটি মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে নব্বইটি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণের জন্মলীলা, গোকুলগমনলীলা, স্তন্যপানচ্ছলে পূতনাবধলীলা, বিবিধ-অসুরনিধন, গোচারণ, কালীয়-দমন, গোপবালাদের মনোহরণ ও বস্ত্রহরণ, গোবর্ধনধারণ ও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ, গোপীদিগের সহিত রাস-বিহার, কংসবধ, জরাসন্ধবিজয়, রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ, স্যমন্তক-হরণ, পারিজাতহরণ, শিশুপালবধ, কুরুক্ষেত্রে গমন ইত্যাদি বহু বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অন্তিম স্কন্ধের সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তি ও হরি-সংকীর্তন ব্যতীত কলির জীবের মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

শ্রীরামপুর পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার প্রধান শহর ও সদর কেন্দ্র। শহরটি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ব্যারাকপুরের বিপরীত দিকে অবস্থিত (২২° ৪৫′ ২৬″ উত্তর এবং ৮৮° ২৩′ ১০″ পূর্ব); কলিকাতা হইতে রেলপথে দূরত্ব প্রায় ২১ কি. মি.। এই মহকুমা চারটি থানা শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা ও জঙ্গীপাড়া লইয়া গঠিত। মহকুমার মোট জনসংখ্যা ৫৭৩৩১১ (১৯৬১ খ্রী) এবং শ্রীরামপুর শহরের মোট জনসংখ্যা ৯১৭৩৪৫ (১৯৬১ খ্রী)। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমার ব্যবসায়ীরা চন্দননগর গোয়ালপাড়া অঞ্চল হইতে আসিয়া শ্রীরামপুরে বসতি স্থাপন করে এবং তাহাদের উদ্যোগে এখানে সেণ্ট ওলাফ্ গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮০৫ খ্রী)। প্রকৃতপক্ষে দিনেমারদিগের সহায়তা-তেই শ্রীরামপুর শহরের প্রাথমিক উন্নতি ঘটে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে যে ধর্মযাজক সম্প্রদায় শ্রীরামপুরে আসিয়া তাঁহাদের কেন্দ্র স্থাপন করেন তাঁহাদিগের মধ্যে মার্শম্যান, কেরি ও ওয়ার্ড সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুর কলেজ এই মিশনারিদেরই কীর্তি। শিল্প-ইতিহাসে 'শ্রীরামপুর পেপার মিল' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এটি ভারতের কাগজ তৈয়ারির প্রথম কারখানা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই শহরেই সর্বপ্রথম একটি কটন মিল স্থাপিত হয়। এখানকার কেন্দ্রীয় বয়ন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎচালিত তাঁতের কলা-কৌশলের সহিত হস্তচালিত তাঁতবয়নও শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের ছাপাখানার ইতিহাসে 'শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস' অবিস্মরণীয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এখান হইতেই বাংলা মাসিক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' এবং ঐ বৎসর ২৩মে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম কেরি 'দিগ্‌দর্শনের' এবং জোশুয়া মার্শম্যান 'সমাচার দর্পণের' সম্পাদক ছিলেন। অপর একটি সাপ্তাহিক পত্র 'দি ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া'ও প্রথম শ্রীরাম-

পুরেই প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের নিকটস্থ চাতরা-র গৌরাঙ্গদেবের মন্দির, শীতলাদেবীর মন্দির, দেওয়ানঘাট প্রভৃতি উল্লেখ্য। শ্রীরামপুরের নিকটে অবস্থিত মাহেশের ('মাহেশ' দ্র) জগন্নাথ-মন্দিরটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন মন্দির। ১২৬৫ বঙ্গাব্দে ইহা নির্মিত হয়। রথযাত্রার সময়ে মাহেশে বিরাট মেলা বসে। শ্রীরামপুরের সমাধিক্ষেত্রেই কেরি, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের সমাধি আছে। শহরে অনেকগুলি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি অবস্থিত।

দিনেমারগণ এইস্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়া দিনেমাররাজ পঞ্চম ফ্রেডারিকের নামানুসারে স্থানটির নাম 'ফ্রেডারিক নগর' রাখিয়াছিলেন। এই শহরের স্থপতি-কীর্তিগুলির মধ্যে দিনেমার গভর্নরের গৃহ, গীর্জা, সমাধিক্ষেত্র, রাধাবল্লভজীর মন্দির, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দির, হেনরি মার্টিনের প্যাগোডা, শ্রীরামপুরের কলেজ (ভারতবর্ষের প্রাচীনতম কলেজগুলির অন্যতম), কেরি গ্রন্থাগার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

শ্রীরামপুর মিশন ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চায় নাই, এবং মিশনারিদের প্রতি তাহাদের মনোভাব বিরূপ ছিল। ফলে ব্রান্সডন, গ্র্যান্ট, মার্শম্যান প্রমুখ (ব্যাপটিস্ট) মিশনারিগণ দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুরে আশ্রয় লন (১৭৯৯ খ্রী)। উইলিয়াম কেরি জন ফাউন্টেন সহ এই দলে আসিয়া যোগ দিলে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়। কেরি এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। এই মিশনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য খ্রীষ্টধর্ম প্রচার হইলেও শিক্ষার প্রসার এবং এতদ্দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে ইহার প্রচেষ্টা ও প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্শম্যান ও তাঁহার স্ত্রীর উৎসাহে ইওরোপীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় বালক-বালিকাদের জন্য শ্রীরামপুরে একটি বোর্ডিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় (মে, ১৮০০ খ্রী)। অতঃপর বাঙ্গালী ছেলেদের জন্যও একটি স্কুল স্থাপিত হয় (জুন, ১৮০০ খ্রী)। বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা এতই জনপ্রিয় হয় যে, মিশনের উৎসাহে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের জন্য প্রথম স্কুল স্থাপিত হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে। এই মিশনারিদলের প্রাণপণ প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজ এশিয়ার মধ্যে প্রথম উপাধিদানের অধিকার ও মর্যাদা পায় (১৮২৭ খ্রী)। মিশন-প্রকাশিত গ্রন্থরাজি বাংলা ও বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। মিশন হইতে বহু ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ ছাড়াও ব্যাকরণ এবং অভিধান প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত নিদর্শন 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' (আগস্ট, ১৮০০ খ্রী)। বাংলায় 'নিউ টেস্টামেন্ট' (১৮০১ খ্রী), চারি খন্ডে 'ওল্ড্ টেস্টামেন্ট' (১৮০২-১৮০৯ খ্রী), বিভিন্ন পুস্তক, 'বাংলা ব্যাকরণ' (১৮০১ খ্রী), 'বাংলা অভিধান (১৮১৮-২৫ খ্রী), বাল্মীকির রামায়ণের ইংরেজী অনুবাদের প্রথম খন্ড (১৮০৬ খ্রী), 'সংস্কৃত ব্যাকরণ' (১৮০৬ খ্রী) প্রভৃতি ছাড়াও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তকাবলী ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মিশন ভারতীয় জ্ঞানচর্চার জগতে নবযুগের প্রবর্তন করে। মাসিক 'দিগ্দর্শন' (১৮১৮ খ্রী), ও সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮ খ্রী) প্রকাশও মিশনের কীর্তি ('শ্রীরামপুর' দ্র)। মিশন-প্রকাশিত 'ফ্রেন্ড অভ্ ইন্ডিয়া' (১৮১৮ খ্রী) পত্রিকা অদ্যাবধি 'স্টেটস্ম্যান' পত্রিকার মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস (১৮০০ খ্রী) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের (১৮১৮ খ্রী) সঙ্গে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মিলিত হইয়া যায়।

শক্তিব্রত ঘোষ

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮ খ্রী) পিতা প্রসন্নকুমার পুঠিয়া স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। পুঠিয়ার মহারানী শরৎকুমারী দেবীর প্রেরণায় শ্রীশচন্দ্র সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তিনি দীর্ঘদিন সাব-ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

শ্রীশচন্দ্রের প্রথম রচনা 'বর্তমান বঙ্গসমাজ ও চারিজন সংস্কারক' (মাসিক সমালোচক, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১২৮৬ বঙ্গাব্দ)। তিনি কিছুকাল 'বঙ্গদর্শন' (১৮৮৩ খ্রী) পরিচালনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত যুগ্মভাবে তিনি বৈষ্ণব-পদের সংকলন গ্রন্থ 'পদরত্নাবলী' (১৮৮৫ খ্রী) সম্পাদনা করেন। তাঁহার 'ফুলজানি' (১৮৯৪ খ্রী) উপন্যাসের সমালোচনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ (সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১ বঙ্গাব্দ)। শ্রীশচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থ, 'শক্তিকানন' (১৮৮৭ খ্রী) 'কৃতজ্ঞতা' (১৮৯৬ খ্রী) 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬ খ্রী), 'রাজতপস্বিনী' (১৯১২ খ্রী)।

রজত রায়চৌধুরী

শ্রীশচন্দ্র রায় নদিয়ারাজ গিরিশচন্দ্রের দত্তকপুত্র শ্রীশচন্দ্র ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাইশ বৎসর বয়সে সম্পত্তির অধিকারী হন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের

সুপরামর্শে শ্রীশচন্দ্র প্রথম হইতেই বিষয়বুদ্ধি এবং শৃঙ্খলা-স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে ধর্ম ও শিক্ষা-সংস্কারকর্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৪৬ খ্রী) জন্য তিনি ভূমিদান করেন। কলেজ কমিটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। পুত্র সতীশচন্দ্রকে কলেজে পড়িতে দিয়া তিনি শিক্ষা ব্যাপারে সাধারণের সহিত রাজপরিবারের সমপর্যায় রক্ষা করেন। কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ আনুকূল্য ছিল। তাঁহারই অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক হাজারিলালকে পাঠাইয়াছিলেন। আটত্রিশ বৎসর বয়সে এক পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া তিনি পরলোক গমন করেন। মহারাজা শিবচন্দ্রের পর শ্রীশচন্দ্রই ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

ভবতোষ দত্ত

শ্রীসম্প্রদায় শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়। ইহার আদি প্রবর্তয়িত্রী শ্রীদেবী ('লক্ষ্মীদেবী')। পরবর্তীকালে আড়্‌বারগণ রচিত দিব্যসূক্তিগত ভগবদ্‌বিষয়ক ভাবধারা এই সম্প্রদায়কে বহুভাবে পুষ্ট করিয়াছে। এই কারণে ইহা 'আড়্‌বার-সম্প্রদায়' নামে অভিহিত। রামানুজস্বামী একদিকে উক্ত দিব্যসূক্তিগত তত্ত্বাবলী 'তমিল বেদান্ত' এবং অন্য দিকে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত বেদান্ত এই উভয় বেদান্তের একত্ব স্থাপন করতঃ শ্রীসম্প্রদায়কে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করায় শ্রীসম্প্রদায় 'রামানুজ-সম্প্রদায়' নামেও প্রসিদ্ধ। নাথমুনি, যামুনমুনি, রামানুজাচার্য, লোকাচারী স্বামী, বেদান্তদেশিকস্বামী, বরবরমুনিস্বামী এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান আচার্যবর্গ। শ্রীসম্প্রদায়ের সার দার্শনিক সিদ্ধান্ত হইতেছে 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'। চিৎ অচিৎ ব্রহ্ম-তত্ত্বত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্বশরীরী সর্বান্তর্যামী ব্যাপক বস্তু, চেতন জীবাত্মা ও অচেতন জড়বস্তু তাঁহার শরীর। এই শরীররূপী চিদ্‌চিদ্‌ বিশিষ্ট শরীরী ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বয় বস্তু। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, এবং রামকৃষ্ণাদি বিভিন্ন অবতার। সর্ব সুলভতা হেতু তাঁহাদের অর্চাবিগ্রহে উপাসকগণের সর্বাধিক প্রবণতা। ইঁহাদের মতে সংসারবিমুক্তির উপায় শরণাগতি।

যতীন্দ্র রামানুজাচার্য

শ্রীহট্ট পূর্ব বাংলার (বাংলা দেশ) পূর্ব সীমায় ভারতের আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার সংলগ্ন। ইহার উত্তরে খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়, পূর্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে লুসাই পাহাড় ও পাবর্ত্য ত্রিপুরা। পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা। শ্রীহট্ট জেলা ২৩°৫৯′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ২৫°১৩′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৬′ পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৯২°৩৬′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ৭৪৫৫ বর্গকিলোমিটার প্রশস্ত নিম্নভূমি। জমি অতিশয় উর্বর; লোকসংখ্যা ৩০৬৬২৯ (১৯৫১ খ্রী); আবাদী জমির আয়তন প্রায় ১০০০ বর্গ কি. মি.।

জেলার ভূপ্রকৃতি অতিশয় সমতল, নদী ও হাওর বা জলাশয়ে পূর্ণ। জেলার পূর্ব সীমায় অসংখ্য ছোট ছোট পাহাড়। জেলার সদর শ্রীহট্ট শহরের চারিদিকেও অনেক ছোট ছোট টিলা আছে। এইসব টিলার উপরে চায়ের বাগান আছে। ত্রিপুরা অঞ্চল হইতে কয়েকটি পাহাড়শ্রেণী শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিম হইতে পূর্বে এই পাহাড়শ্রেণীর নাম যথাক্রমে রঘুনন্দন, সাতগাঁও, বালিসরা, ভানুগঞ্জ ও পাথরিয়া—ইহার মধ্যে শেষোক্ত পাহাড়-শ্রেণী ভারত-সীমান্তে অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গেলেও তাহা সামান্য ও ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। বরাক নদীর দুই শাখা : সুরমা ও কুশিয়ারা এই জেলার প্রধান নদী। উত্তরের শাখা সুরমা ও দক্ষিণেরটি কুশিয়ারা। এখানে অনেক উপনদীও আছে। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। বৎসরে প্রায় ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালে বৃষ্টিপাত প্রায় নাই। গ্রীষ্মকালে অতিশয় বৃষ্টিপাত হয়। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে তিনটি রাজ্য ছিল; গৌড় বা বর্তমান শ্রীহট্ট অঞ্চল, লাউর এবং জয়ন্তিয়া। ১৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌড় মুসলমানের অধিকারে যায়। লাউর আকবরের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্যের অধীন হয়। পরে প্রথম দুইটি অঞ্চল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং শেষোক্তটি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের অধীনে যায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্ট পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশের (পূর্ববাংলা) অন্তর্গত। ধান ও পাট শ্রীহট্টের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য। অন্যান্য প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য—তিসি, সরিষা এবং আখ। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তুলার চাষ করে। ইহা ছাড়া শ্রীহট্টের চা-বাগান সুপ্রসিদ্ধ। নিকটবর্তী উত্তরের পাহাড় অঞ্চলের চুনা পাথর বিখ্যাত। ইহা অন্যান্য প্রদেশেও রপ্তানি হয়।

কুটিরশিল্পের মধ্যে শীতলপাটি, শাঁখা, ঝুড়ি, গাছের পাতার ছাতা, নৌকা তৈয়ারি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র প্রথমে শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন।

জেলার সদর শ্রীহট্ট শহর সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত (অক্ষরেখা ২৪°৫৪′ উত্তর এবং দ্রাঘিমা রেখা ৯১°৫২′ পূর্ব)। শহরের লোকসংখ্যা ৩২৭৭৩ (১৯৫১ খ্রী)। শিলং হইতে কাছাড় যাইবার রাস্তা

এই শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আবহাওয়া মোটামুটি আরামদায়ক। ইহা বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র।

মনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহর্ষ১ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ কবি। সম্ভবতঃ কান্যকুব্জরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পিতা শ্রী হীর, মাতা মামল্লদেবী। কাব্য ছাড়াও তিনি অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থের নাম 'খণ্ডন খণ্ডখাদ্য'। দ্বাবিংশতি সর্গে রচিত 'নৈষধচরিত' বা 'নৈষধীয়চরিত' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এই মহাকাব্যে মহাভারতের নল-দময়ন্তীর আখ্যান পরিবর্ধিত আকারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সমগ্র আখ্যানটিকে তিনি কাব্যের বিষয়ীভূত করেন নাই, কেবল নলের সহিত দময়ন্তীর বিবাহ ও নলের রাজধানীতে কলির আগমন পর্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন। 'নৈষধে পদলালিত্যম্‌' শ্রীহর্ষের রচনার এই প্রসংশা ভারতীয় সুধীসমাজে সুদীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। মূল আখ্যানে কবি যে পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভার পরিচয় আছে। শ্রীহর্ষের কাব্যে নলের চরিত্র রীতিমত মহৎ। দময়ন্তী দেবতার পরিবর্তে নলকে পতিত্বে বরণে কৃতসংকল্প জানিলে নল তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। অবশেষে দময়ন্তীর করুণ অবস্থা দর্শনে দয়াভিভূত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। কবি দময়ন্তীর রূপ, স্বয়ংবর সভা প্রভৃতির বর্ণনা অতিরিক্ত দীর্ঘ করিয়াছেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ, শ্লেষাদি অলংকার প্রভৃতির বহুল প্রয়োগে এবং দার্শনিক মতবাদের অবতারণায় কাব্যখানি স্থানে স্থানে দুর্বোধ্য হইয়াছে ও উহার রসগ্রহণে ব্যাঘাত জন্মে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহর্ষ২ হর্ষবর্ধন দ্র

শ্রুতি বেদ দ্র

শ্রেণী মর্যাদা, ক্ষমতা, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির ভিত্তিতে যখন সমাজের এক অংশ অন্য অংশ হইতে নিজেকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে তখন শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শ্রেণী মূলতঃ সামাজিক ধারণা। বস্তুতঃপক্ষে প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সমাজই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইয়া আছে। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর উপরই সামাজিক স্তরবিন্যাস ঘটিয়াছে। বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রেণীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অবশ্য পৃথক্‌ হইতে পারে। যেমন কোনও সমাজে বা কোনও সময়ে ধনসম্পত্তি শ্রেণীসত্তা নির্ণয়ে বড় মাপকাঠি হইতে পারে কিন্তু অন্য সমাজে বা অন্য সময়ে সামাজিক ক্ষমতাই শ্রেণীসত্তা নির্ধারণে বেশি গুরুত্ব পাইতে পারে। আবার কতকগুলি শ্রেণীর মূল্যায়ন সকল সমাজেই সমান। চিকিৎসক ও সামরিক উচ্চপদস্থগণ পৃথিবীর সকল সমাজেই উচ্চশ্রেণীভুক্ত। অপর পক্ষে ধর্মীয় নেতা বা কৃষকশ্রেণীর মর্যাদা বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন।

শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যায় কার্ল মার্কস্‌ উৎপাদন-পদ্ধতিকে দায়ী করিয়াছেন। তাঁহার মতে উৎপাদনের উপাদান (জমি, মূলধন ইত্যাদি) যাঁহাদের হাতে ছিল তাঁহারা এক শ্রেণী—অবশিষ্ট যাঁহারা পূর্বতনদের দ্বারা পরিচালিত হইতেন, তাঁহারা আর এক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। বিশিষ্ট জার্মান সমাজবিজ্ঞানী মাক্স ওয়েবের অবশ্য মর্যাদা, ক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণীকাঠামো বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী।

সামাজিক শ্রেণী ও সামাজিক জাতিপ্রথার মধ্যে পার্থক্য গভীর। পাশ্চাত্য সমাজ মূলতঃ শ্রেণীর উপর বিন্যস্ত। ফলে, ক্ষমতা, পেশা, ধনসম্পত্তি ইত্যাদির পরিবর্তন বা হ্রাসবৃদ্ধির ফলে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে ওঠা-নামা সম্ভবপর। সেইজন্য পাশ্চাত্য সমাজ কিছুটা মুক্ত। অপর পক্ষে হিন্দুসমাজ মূলতঃ জাতিপ্রথার উপর বিন্যস্ত। জাতিপ্রথা জন্মসূত্র, ধর্ম, সংস্কার ইত্যাদির দ্বারা স্থিরীকৃত। ফলে, সাধারণতঃ এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে ওঠা-নামা সম্ভবপর নয়। শ্রেণী এবং জাতির পার্থক্য এইখানেই। তবে ইওরোপ, আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষজাত যে পার্থক্য তাহা হিন্দু সমাজের জাতিভেদ অপেক্ষা অধিকতর সমস্যাসংকুল, যদিও ইহা শ্রেণীর মধ্যেও পড়ে না।

অরূপকুমার ভট্টাচার্য

শ্লেগেল, আউগ্যুস্ট ভিল্‌হেল্‌ম্‌ ফন্‌ (১৭৬৭-১৮৪৫ খ্রী) জার্মান অনুবাদক, সমালোচক, কবি ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্‌, রোমান্‌টিসিজ্‌মের প্রচারক। ইনি ও ইঁহার ভ্রাতা, ফ্রিড্‌রিখ্‌, যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তাহা সাহিত্য-প্রতিভার জন্য খ্যাত ছিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্লেগেল ইয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন এবং রোমান্‌টিসিজ্‌মের প্রসারে ব্রতী হন। তিনি প্যারিসে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং জার্মানির প্রথম ভারতীয়বিদ্যার অধ্যাপকরূপে বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন (১৮১৮ খ্রী)। তিনি ক্ল্যাসিক্যাল-শৈলীতে নাটক রচনা করেন। তাঁহার রচিত

কবিতার সংখ্যাও বহু। তাঁহার লেখা সমালোচনা-সাহিত্য জার্মান রোমান্টিক্ আন্দোলনে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চারিত করে। 'ভগবদ্গীতা' এবং স্পেনীয় নাট্যকার কাল্-ডেরোনের (১৬০০-৮১ খ্রী) কাব্যের অনুবাদেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। অবশ্য টিয়েকের সহযোগিতায় শেক্স্পীয়রের নাটকের অনুবাদেই (১৭৯৭-১৮১০ খ্রী) তাঁহার খ্যাতি সমধিক।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্লেগেল, কার্ল্ ভিল্হেল্ম্ ফ্রিডরিষ্ ফন্ (১৭৭২-১৮২৯ খ্রী) জার্মান লেখক, সমালোচক ও প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ; জার্মানিতে রোমান্টিসিজ্মের অন্যতম প্রবর্তক। বিখ্যাত 'আথেনাউম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। তিনি অবাধ প্রেমের বিষয়-নির্ভর রোমান্টিক উপন্যাস 'লুট্সিন্ডে' (১৭৯৯ খ্রী) রচনার পর রোমান্টিক ট্রাজেডি 'আলার্কস্' (১৮০২ খ্রী) রচনা করেন। দর্শন ও নন্দনতত্ত্ব-বিষয়ক নিবন্ধ-গুলি তাঁহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনা। এইগুলিতে ফিখ্টের দার্শনিক মতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

ষট্কর্ম ছয় প্রকার বিশিষ্ট কর্মকে 'ষট্কর্ম' বলা হয়। কিন্তু স্মৃতি, যোগশাস্ত্র ও তন্ত্রের মতে ষট্কর্মের ক্রিয়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন। স্মৃতিতে ব্রাহ্মণের অবশ্যকৃত্য ছয়টি কর্মকেই (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ) ষট্কর্ম বলা হইয়াছে। হঠযোগমতে যোগীরা ঘট অর্থাৎ দেহ শোধনের জন্য ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলী, ত্রাটক্ ও কপালভাতিরূপ যে ছয়টি ক্রিয়া করিয়া থাকেন তাহাই ষট্কর্ম। কিন্তু 'ষট্কর্ম' বলিতে তন্ত্রোক্ত শান্তি, বশ্য, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ ক্রিয়া-গুলিই বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রচলিত। রোগ ও গ্রহপীড়াদি নিরাসের জন্য শান্তি, কাহাকেও বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে বশীকরণ, অন্তরের প্রবৃত্তি রোধের নিমিত্ত স্তম্ভন, পরস্পরের ভিতর বিদ্বেষভাব সৃষ্টির জন্য বিদ্বেষণ, স্বদেশ হইতে বিতাড়নের জন্য উচ্চাটন এবং প্রাণবিনাশের জন্য মারণকর্ম অবলম্বন করিতে হয়। ষট্কর্মের উপাস্য দেবতা কাল, আসন, মুদ্রা ও তত্ত্ব-ক্রিয়াভেদে বিভিন্ন। যথা, শান্তিকর্মে দেবতা রতি, কাল হেমন্ত বা প্রভাত, আসন পদ্ম, তত্ত্ব জল ; বশ্যকর্মে দেবতা বাণী, কাল বসন্ত বা পূর্বাহ্ন, আসন স্বস্তিক, তত্ত্ব বহ্নি ; স্তম্ভনে দেবতা রমা, কাল শিশির বা প্রদোষ, আসন বিকট, তত্ত্ব পৃথ্বী ; বিদ্বেষণে দেবতা জ্যেষ্ঠা, কাল গ্রীষ্ম বা মধ্যাহ্ন, আসন কুক্কুট, তত্ত্ব ব্যোম ; উচ্চাটনে দেবতা দুর্গা, কাল প্রাবৃট্ বা অপরাহ্ন, আসন বজ্র, তত্ত্ব বায়ু ; মারণকর্মে দেবতা কালী, কাল শরৎ বা অর্ধরাত্র, আসন ভদ্রক, তত্ত্ব অগ্নি। তান্ত্রিক আভিচারিক ক্রিয়াকর্মগুলিকে অনেকেই নিন্দার চোখে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য সায়ণ এগুলিকে নিন্দনীয় বলেন নাই। তান্ত্রিক ষট্কর্ম আত্মরক্ষা, সপত্ননিধন, দুর্দৈব বিনাশন ও সৌভাগ্যকরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ষট্চক্র পঞ্চভূতময় এই দেহে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং মধ্যভাগে কন্দমূল হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত। সুষুম্নার অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম চিত্রিণী নাড়ী ; এই নাড়ীতে যোগগম্য ছয়টি চক্র, পদ্মমৃণালে পদ্মের মত গ্রথিত। চক্রগুলির শিব, শক্তি, মাতৃকাবর্ণ ও তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্। ১. গুহ্যমূলে মূলাধার বা সুবর্ণবর্ণ চতুর্দল আধার পদ্ম ; দল-গুলিতে ব, শ, ষ, স বর্ণ ; শিব ব্রহ্মা, দেবতা ডাকিনী, তত্ত্ব পৃথিবী ; ২. লিঙ্গমূলে অগ্নিবর্ণ ষড়্দল স্বাধিষ্ঠান ; ষড়্দলে ব, ভ, ম, য, র, ল বর্ণ ; শিব বিষ্ণু, দেবতা রাকিণী, তত্ত্ব অপ্ ; ৩. নাভিদেশে বিদ্যুদাভ দশদল মণিপুর, ইহাতে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ বর্ণ ; শিব রুদ্র, দেবতা লাকিনী, তত্ত্ব তেজ ; ৪. হৃদ্দেশে অরুণবর্ণ দ্বাদশদল অনাহত ; ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ দ্বাদশ বর্ণ, শিব ঈশ্বর, দেবতা কাকিনী, তত্ত্ব মরুৎ ; ৫. কণ্ঠদেশে ষোড়শদল ধূম্রবর্ণ বিশুদ্ধাখ্য ; অ, আ প্রভৃতি ষোলটি স্বরবর্ণ ; শিব সদাশিব, শক্তি শাকিনী, তত্ত্ব আকাশ ; ৬. ভ্রূমধ্যে শ্বেতবর্ণ দ্বিদল আজ্ঞাচক্র; ইহাতে হ, ক্ষ, দুইটি বর্ণ, শিব পরাশিব, শক্তিদেবী হাকিনী ; ইহা আত্মতত্ত্ব প্রণবের স্থান। যোগিগণ জীবাত্মাসহ কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারে জাগ্রত করিয়া ষট্চক্র ভেদপূর্বক সহস্রারে পরমশিবের সহিত মিলিত করান এবং শিবশক্তির সামরস্যদ্বারা দেহ-দেবতার তর্পণ করিয়া নিজে নিত্যানন্দ ধারায় মগ্ন হন।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ষড়্গোস্বামী সনাতন, রূপ, রঘুনাথদাস, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও শ্রীজীবগোস্বামী এই ছয়জন চৈতন্য-পরিকরকে ষড়্গোস্বামী নামে অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীজীব শ্রীচৈতন্যকে শিশুকালে দর্শন করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন নাই। অন্য পাঁচজন শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ কৃপা পাইয়া-ছিলেন। ষড়্গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ ভট্ট ছাড়া আর

সকলেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তি তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সনাতন, রূপ ও জীব কর্ণাট-দেশীয় ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত কিন্তু সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ প্রথম বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। রূপ, সনাতন ও শ্রীজীব বাংলাভাষায় কোনও গ্রন্থ লেখেন নাই। গোপাল ভট্ট সম্ভবতঃ দ্রাবিড় দেশের লোক। রঘুনাথ ভট্ট যদি বাঙ্গালী হনও, তবু তিনি ও তাঁহার পিতা কাশী-প্রবাসী ছিলেন। রঘুনাথদাস গোস্বামী খাঁটি বাঙ্গালী। জাতিতে কায়স্থ হইয়াও তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে আচার্যের পদবী পাইয়াছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ষড়্‌গোস্বামী' শব্দের উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতে শুধু রূপ ও সনাতনের নাম আছে। রঘুনাথদাসের নাম পর্যন্ত উহাতে নাই। লোচনের চৈতন্যমঙ্গলে ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও রূপসনাতন ছাড়া অন্য কোনও গোস্বামীর নাম নাই। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ছয়জনের নামই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু 'ছয় গোস্বামী' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। শ্রীনিবাস আচার্য 'শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্‌' লেখেন। তাহার প্রত্যেক শ্লোকের শেষ চরণে আছে— 'বন্দেরূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ'। গোপালভট্ট শ্রীনিবাসের দীক্ষাগুরু হইলেও তাঁহার নাম তিনি সর্বশেষে করিয়াছেন। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নামসংকীর্তনে স্পষ্ট করিয়া ছয় গোস্বামীর নাম লইয়া বলা হইয়াছে যে ইঁহাদের চরণ-বন্দনা করিলে বিঘ্ননাশ ও অভীষ্টপূরণ হয়। সনাতন ('সনাতনগোস্বামী দ্র') হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী) 'সাকর মালিক' বা সাকর মল্লিক (প্রধানমন্ত্রী) এবং রূপ ('রূপগোস্বামী' দ্র) দবীর খাস (প্রাইভেট সেক্রেটারি) ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া দুই ভাই-ই রাজকার্যে ইস্তফা দিয়া বহু বিপদ অতিক্রম করিয়া মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন—'অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার'। সনাতন পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের নিকট থাকিতেন। সেখান হইতে বৃন্দাবনে গিয়া স্থায়ী ভাবে ব্রজমণ্ডলে বসবাস করেন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনেই বাস করিতেন। শ্রীরূপগোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান আচার্য। তাঁহার নির্দিষ্ট রাগানুগ ভজনপ্রণালীই এই সম্প্রদায়ের প্রধান। তিনিও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরূপের কবিত্ব অনুপম এবং তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসগ্রাহিতা অনন্য-সাধারণ। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব ('জীবগোস্বামী' দ্র) অনেকদিন তাঁহাদের সাহচর্যে বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও বহু গ্রন্থ-রচয়িতা ও অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। রঘুনাথদাস ('রঘুনাথদাস' দ্র) গোস্বামী সপ্তগ্রামের জমীদার গোবর্ধনের পুত্র। তিনি পুরীতে ছিলেন এবং প্রভুর ও স্বরূপ দামোদরের তিরোধানের পর শ্রীরূপ-সনাতনের সহিত ব্রজমণ্ডলে বিশেষ করিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করেন। তাঁহার মুখে শুনিয়া ও তাঁহার রচিত কবিতাবলী অবলম্বনে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনাথদাস 'মুক্তাচরিত', 'দান কেলিচিন্তামণি' প্রভৃতি মনোরম গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রঘুনাথ ভট্ট ('রঘুনাথ ভট্ট' দ্র) তপন মিশ্রের পুত্র। তপন মিশ্র কাশীতে বাস করিতেন। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে দুই মাস তাঁহার বাড়িতে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় বালক রঘুনাথ ভট্টের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য পুরীতে গমন করেন ও আট মাস কাল প্রভুর পরিচর্যা করিবার সৌভাগ্য পান। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন তাঁহার ভাগবতপাঠে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। গোপাল ভট্টের ('গোপাল ভট্ট' দ্র) বিবরণ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বা ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার লিখিত কোনও শ্রীচৈতন্য-জীবনীতে পাওয়া যায় না। শ্রীনিবাস আচার্য গোপাল ভট্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের শিষ্য কর্ণপূর কবিরাজ সংস্কৃতে শ্রীনিবাস আচার্যের যে সূচক রচনা করিয়াছেন তাহাতে গোপাল ভট্টের কথা আছে।

বিমানবিহারী মজুমদার

ষষ্ঠী শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে যে জাতকর্মের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম ষষ্ঠী। শিশুকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সূতিকাগৃহেই লৌকিক বিধানে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। তিনি শিশুকে রক্ষা করিয়া থাকেন, হারীতী এবং জাতাপহারিণী নামক অপদেবতাগণ যখন শিশুর প্রাণ হরণ করিতে চাহে, তখন তিনি তাহাদের বাধা দেন। তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়েকখানি ষষ্ঠীমঙ্গল-কাব্য ('মঙ্গলকাব্য' দ্র) রচিত হইয়াছিল।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

ষোড়শ মহা-জনপদ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (বুদ্ধের আবির্ভাবকালে) ভারতে কয়েকটি রাজ্য প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে ইহারা ষোড়শ মহা-জনপদ (প্রধান রাজ্য) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল মহা-জনপদ অধিকাংশই বর্তমান বিহার, উত্তর-

প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল। এই ষোড়শ মহা-জনপদগুলির নামঃ— ১. অঙ্গ, ২. মগধ, ৩. কাশী, ৪. কোশল, ৫. বৃজি, ৬. মল্ল, ৭. চেদি, ৮. বৎস, ৯. কুরু, ১০. পঞ্চাল, ১১. মৎস্য, ১২. শূরসেন, ১৩. অশ্মক, ১৪. অবন্তী, ১৫. গন্ধার ও ১৬. কম্বোজ। ১. অঙ্গ ঃ মহাভারতের বর্ণনানুযায়ী মনে হয় অঙ্গ-রাজ্য বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলাদ্বয় লইয়া গঠিত ছিল ('অঙ্গ' দ্র)। ২. মগধঃ বিহারের দক্ষিণভাগে আধুনিক পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া মগধ-রাজ্য গঠিত ছিল ('মগধ' দ্র)। ৩. কাশীঃ জাতকে কাশীরাজ্যের সমৃদ্ধির বিবরণ পাওয়া যায়। বারাণসী ছিল ঐ রাজ্যের রাজধানী ('কাশী' দ্র)। ৪. কোশলরাজ্যঃ আধুনিক অযোধ্যার কিছু অংশ লইয়া গঠিত ছিল ('কোশল' দ্র)। সরযূ নদী উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী এবং দক্ষিণ কোশলের রাজধানী কুশাবতী। কাশীজয়ের পর কপিলবস্তু এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাজ্যের উপরও কোশলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসেনজিৎ এই বংশের সর্বাধিক খ্যাতিমান্ নরপতি। ৫. বৃজিঃ আট বা নয়টি গোষ্ঠী সমবেত হইয়া বৃজিরাষ্ট্র গঠিত হয়। উহাদের মধ্যে বিদেহ, লিচ্ছবি, জ্ঞাতৃক ও বজ্জি (বৃজি) প্রধান। লিচ্ছবিদের রাজধানী বৈশালী (বর্তমান মজঃ-ফরপুর জেলার অন্তর্গত) এই সমবায়ের রাজধানী ছিল। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'-এ বজ্জিদের উল্লেখ আছে। ৬. মল্লঃ মহাভারতে মল্ল-রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ বৃজিরাজ্যের উত্তরে অবস্থিত ছিল, যদিও এই রাজ্য প্রথমে রাজশাসিত ছিল, কিন্তু পরে ইহাতে গণশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়. নয়টি গোষ্ঠীর নয়টি রাজ্য লইয়া মল্ল গঠিত হইয়াছিল. বুদ্ধ-দেবের অভ্যুদয়ের সময় ইহাদের দুইটি গোষ্ঠী প্রাধান্য লাভ করে. একটি গোষ্ঠীর রাজধানী ছিল কুশীনারায় (আধুনিক উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায়), অন্যটির ইহারই নিকটবর্তী পাবাতে। মল্লদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশি ছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মল্লরাজ্য মগধের অধীন হয়। ৭. চেদি ঃ ভারতের অন্যতম সুপ্রাচীন বংশ। ঐ রাজ্য সম্ববতঃ আধুনিক বুন্দেলখন্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল ('চেদি' দ্র)। ৮. বৎস্যঃ অবন্তীর উত্তর-পূর্বে যমুনার তীরবর্তী বৎস্য অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র বলিয়া পরিচিত ছিল। কৌশাম্বী ছিল উহার রাজধানী। এলাহাবাদের নিকটে যমুনার দক্ষিণ তীরে বর্তমান কোসম্ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল লইয়া এই বিশাল নগরী অবস্থিত ছিল। এই বংশের রাজা উদয়নের সহিত অবন্তরাজ প্রদ্যোতের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। উদয়নের পর বৎস্যরাজ্যের কোনও সুনির্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। ৯. কুরু ঃ প্রাচীনকালে (খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কুরুরাজ্যের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। আধুনিক দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল ইহার রাজধানী ('কুরু' দ্র)। ১০. পঞ্চাল ঃ আধুনিক উত্তর প্রদেশের রোহিলখন্ড এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অংশ লইয়া পঞ্চাল রাজ্য গঠিত ছিল। ('পঞ্চাল' দ্র)। ১১. মৎস্যঃ আধুনিক জয়পুররাজ্যের সীমানার মধ্যে আধুনিক আলোয়ার রাজ্যের সমগ্রভাগ ও ভরতপুররাজ্যের কিয়দংশ লইয়া ইহার অবস্থান ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে এই রাজ্যের বিশেষ কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না। ১২. শূরসেনঃ শূরসেনের রাজধানী ছিল মথুরা বা মথুরা। শূরসেনরাজ অবন্তিপুত্র বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই বৌদ্ধধর্ম মথুরা অঞ্চলে বিস্তারলাভ করে। শূরসেনরাজ্য কালক্রমে মৌর্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩. অশ্মকঃ প্রথমে সিন্ধুনদের অব-বাহিকায় অবস্থিত একটি দেশকে অশ্মক বলা হইত। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত অস্সক দক্ষিণ ভারতে গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ('অশ্মক' দ্র)। ১৪. অবন্তী ঃ অবন্তীরাজ্য আধুনিক মালব, নিমার ও উহাদের সংলগ্ন মধ্যপ্রদেশের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল ('অবন্তী' দ্র)। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকালে ভারতবর্ষে যে চারিটি প্রধান রাজতান্ত্রিক দেশ ছিল অবন্তী উহাদের অন্যতম। প্রথমে মাহিষ্মতী (নর্মদার তীরবর্তী আধু-নিক মান্ধাতা) অবন্তীর রাজধানী ছিল। পরে মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সময়ে উজ্জয়িনী রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। ইহা বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই রাজ্যের শেষ রাজা মগধরাজ শিশুনাগ কর্তৃক পরাজিত হন এবং অবন্তী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫. গন্ধারঃ আধুনিক পেশোয়ার ও রাওয়ালপিন্ডি জেলা লইয়া গন্ধাররাজ্য গঠিত ছিল ('গান্ধার' দ্র)। ১৬. কম্বোজ ঃ কম্বোজরাজ্য সম্ভবতঃ রাজৌরী বা প্রাচীন রাজপুরকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থিত ছিল ('কম্বোজ' দ্র)।

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সওকৎ জঙ্গ আলীবর্দী খাঁর মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহমদের পুত্র। আলীবর্দী খাঁর আমলে সৈয়দ আহমদ পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর সওকৎ জঙ্গ পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা হন। আলীবর্দী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার কোনও পুত্র-সন্তান ছিল না বলিয়া সওকৎ জঙ্গের মনে মনে বিশ্বাস

ছিল যে, সুবে-বাংলার নবাবী-পদ তাঁহারই প্রাপ্য। আলীবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজুদ্দৌলা যখন বাংলার মসনদে আরোহণ করেন, তখন তিনি দিল্লীর উজীর গাজীউদ্দিনকে এক কোটি টাকা উৎকোচ প্রদানের লোভ দেখাইয়া বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব-পদের খেলাৎ পান। গোপনে ঘসিটি বেগম, মীরজাফর প্রভৃতি অনেকেই সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সওকৎ জঙ্গকে উৎসাহ দিতে থাকেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর মনিহারীঘাটের নিকট সওকৎ জঙ্গের সহিত সিরাজুদ্দৌলার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুলির আঘাতে সওকৎ জঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

সংক্রান্তি পুণ্য দিন বলিয়া পরিগণিত। শাস্ত্র ও লোকাচারে বিভিন্ন সংক্রান্তিতে স্নান, দান, ব্রত ও উপবাসের বিধান আছে। শ্রাবণ ও ভাদ্রের সংক্রান্তিতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে মনসাপূজার প্রচলন আছে। ('মনসা' দ্র)। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গে ভাদ্রের সংক্রান্তিতে অরন্ধন-পর্ব অনুষ্ঠিত হইত ('অরন্ধন' দ্র)। বর্তমানে এই দিনে বিশ্বকর্মা পূজার উৎসব কল-কারখানায় প্রতিপালিত হয়। ('বিশ্বকর্মা' দ্র)। ঘুড়ি উড়ানো ও নৌকার বাছ খেলাও এই দিনে নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্বিনের সংক্রান্তিতে 'গার্সি' বা 'গারু' ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। কার্তিকের সংক্রান্তিতে কার্তিকের ব্রত পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়—পশ্চিমবঙ্গেও অনেক স্থানে কার্তিকের পূজা করা হয়। এই দিন হইতেই ইতু পূজার আরম্ভ ('ইতু পূজা' দ্র); অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে ইহার সমাপ্তি ও 'সর্বজয়া' ব্রতের সূচনা। এই ব্রতে এক এক মাসে যথাক্রমে শাক, লবণ, তৈল, সুপারি, পুষ্পমাল্য, অন্ন, ধারাজল, দধি, বস্ত্র, চামর বা ব্যজন, ঘৃত ও শয্যা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া উহার ব্যবহার হইতে বিরত হইতে হয়। পৌষসংক্রান্তির পৌষপার্বণ পিঠা খাওয়ার উৎসব। এই দিনেই গঙ্গাসাগরে স্নানের উৎসবে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই সংক্রান্তির দিন পূর্ববঙ্গে বাস্তুপূজার অনুষ্ঠান হয় ('বাস্তুদেব' দ্র)। দধিসংক্রান্তি ব্রতেরও আরম্ভ এই সংক্রান্তিতে। কোথাও কোথাও এই দিনে নবান্ন উৎসবও হয়। পশ্চিমবঙ্গে পৌষসংক্রান্তি রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। প্রতি বৎসর পৌষ মাস যাহাতে আসে ও গৃহস্থের কল্যাণ করে তাহার জন্য নানা ছড়া কাটিয়া উৎসব হয়। খড়ের গুচ্ছ রাখিয়া ধনসম্ভার প্রভৃতি রক্ষার প্রতীক পালন করা হয়—ইহাকে বলে বাউনি (বা বাঁউরি) বাঁধা।'

ফাল্গুনের সংক্রান্তির প্রাতে ঘন্টাকর্ণ ('ঘন্টাকর্ণ' দ্র) পূজার উৎসব কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রসংক্রান্তির চড়কপূজা এক যুগে বাঙালীর জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত ('চড়ক' দ্র)। এই দিনে দেবতাকে নিবেদন করিয়া ছাতু খাওয়ার প্রথা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। এই সংক্রান্তিতে বহু ব্রতের আরম্ভ। অনেকে সংক্রান্তিতে সত্যনারায়ণ পূজা করেন। কোনও কোনও সংক্রান্তিতে পুরাতন হাঁড়িকুঁড়িসহ রান্নাঘর পরিষ্কার করিয়া ফেলার প্রথা আছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সংখ্যা পূর্ণসংখ্যা (১, ২, ৩ প্রভৃতি) ও বাস্তব রাশি (যেমন $\frac{2}{3}$, 0, π প্রভৃতি) প্রত্যেকেই সংখ্যা। সামান্যীকরণে জটিল সংখ্যার উদ্ভব হয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে গোরু, ছাগল প্রভৃতি গণনার ভাষার অভাবে মানুষকে কাঠি, ঢিল প্রভৃতির সাহায্যে পূর্ণসংখ্যার হিসাব রাখিতে হইত। পরে সংকেতদ্বারা ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার ও লিখিবার বহুপ্রকার প্রণালী বিভিন্ন দেশে উদ্ভাবিত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ এবং ০ এই দশটি সংকেত চিহ্নের সাহায্যে সংখ্যার লিখন, পঠন, যোগ ও গুণ-প্রক্রিয়া এবং ইহাদের বিপরীত প্রক্রিয়া বিয়োগ ও ভাগ সম্পন্ন হয়। শূন্যের আবিষ্কার সভ্যতার প্রগতির ইতিহাসে ভারতীয় আর্যদের দান। সংখ্যা নানা প্রকারের হয়।—পরিমাণ হিসাব সংখ্যাঃ দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন এবং ভার প্রভৃতির পরিমাণ জানিবার জন্য সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। মূলদ সংখ্যাঃ সকল সংখ্যা লইয়া ভাগ ও বিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্ভব করিতে হইলে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হইতে মূলদ সংখ্যার ধারণায় যাইতে হয়। তখন আমরা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ভগ্নাংশ বা পূর্ণসংখ্যা এবং শূন্য পাই। কোনও ধনাত্মক বা ঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যাকে একটি ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহা মূলদ সংখ্যা। মনে রাখিতে হইবে 0 দিয়া ভাগ অর্থহীন। অমূলদ সংখ্যাঃ যে সংখ্যা কোনও মূলদ সংখ্যার বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি হইতে পারে না, তাহা অমূলদ সংখ্যা। অবাস্তব ও জটিল সংখ্যা $x^2 = -1$ এই সমীকরণের কোনও বাস্তব সমাধান হইতে পারে না, ইহা একটি অবাস্তব সংখ্যা। বাস্তব ও অবাস্তব সংখ্যার সমন্বয়ে হয় জটিল সংখ্যা, যেমন ৩+২ $\sqrt{-১}$। বীজগাণিতিক সংখ্যা ও অতি প্রাকৃত সংখ্যা (ট্রানসেন্ডেণ্টল নাম্বার)ঃ $a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0 (a_0 a_1, \dots a_n$ সহগসমূহ পূর্ণসংখ্যা। এই প্রকার n পদ বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান করিলে n সংখ্যক মূল পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে $\sqrt[৩]{৫}$, $\sqrt{-১}$ প্রভৃতির মত সংখ্যা পাওয়া যায়; ইহারা বীজগাণিতিক সংখ্যা।

বীজগাণিতিক রাশিসমূহের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ-প্রক্রিয়া হইতে বীজগাণিতিক সংখ্যাই পাওয়া যায়।

যে সমস্ত বাস্তব বা জটিল সংখ্যা বীজগাণিতিক নয় তাহাদিগকে অতিপ্রাকৃত সংখ্যা বলে। একক দৈর্ঘ্যের ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য অবশ্যই পরিমাপযোগ্য। কিন্তু ইহা একটি অতিপ্রাকৃত সংখ্যা এবং ইহাকে π (পাই) বলা হয়। গণিতশাস্ত্রের সম্প্রসারণ করিতে গিয়া আরও কয়েকপ্রকার সংখ্যা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কামিনীকুমার দে

সংগীত ললিতকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা। শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে এই কলার মাধ্যমে এমন শৈল্পিক মহিমা দেওয়া যায় যে ইহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অন্তরে প্রবেশ করে এবং প্রজ্ঞা ও আবেগকে এক অনির্বচনীয় উপায়ে স্পন্দিত করে। সংগীতশাস্ত্রকারগণের অনেকে সংগীত বলিতে নৃত্য, গীত এবং বাদ্য বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দটি সাধারণভাবে বিবিধ গীতরূপকে অধিকার করিয়াই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার কারণ সংগীত-কলার মধ্যে কণ্ঠসংগীতের প্রাধান্যই সর্বাধিক। সংগীতের সুরেলা ধ্বনি বা সুরলহরী (মেলডি), তাল বা মাত্রা (রিদ্‌ম্‌), সুরসঙ্গতি (হার্মনি), তান বা স্বরবিস্তার (টিউন), স্বরের উচ্চ-নিম্ন ধ্বনি (পিচ্‌) প্রভৃতি বহু লক্ষণ আছে।

আদিতে সংগীত বলিতে ধর্মসংগীতই বুঝাইত। তবে উৎসব, অনুষ্ঠান, এমন কি সাধারণ কার্যেও সুর করিয়া ছড়া, গাথা প্রভৃতি গাওয়া হইত। সংগ্রাম-বিজয়ী বীরদের প্রশস্তিমূলক গাথা-কবিতাও (হিরোয়িক ব্যালাড্‌স্‌) গান করা হইত। সুদূর অতীতে চীন, মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় বিশুদ্ধ কণ্ঠসংগীত অথবা ধনুকের গুণ আকর্ষণ করিয়া বাদ্যসহযোগে গান গাওয়া হইত। ভারতেও বেদগান, রামায়ণ-গান প্রভৃতি সুদূর অতীতেও ছিল। প্রাচীন গ্রীসে সংগীতকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলার স্থান দেওয়া হইত। ইওরোপে বাদ্যযন্ত্রেরও নানা প্রকারভেদ যুগে যুগে দেখা দেয় এবং অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু সংগীত স্রষ্টাদের নাম পাওয়া যায় ; যেমন, মোট্‌সার্ট, বেটোভেন, শোপেন, ভাগনের প্রভৃতি।

ভারতীয় ঃ সকলেই স্বীকার করেন যে, সামগান হইতেই ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির উদ্ভব। বৈদিক সংগীত হইতে সাক্ষাৎভাবে ঋক্‌, গাথা এবং সাম এই তিন প্রকার গীতের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। সামবেদের সাতটি স্বরকে পরবর্তীকালে বলা হইত—পঞ্চম, মধ্যম, গান্ধার, ঋষভ, ষড়জ, ধৈবত ও নিষাদ। সাম বা ঋক্‌-বর্গীয় গীতে প্রযুক্ত প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন, হিংকার এবং ওংকার—এই সাতটি অঙ্গ হইতেই পরবর্তীকালে দেশীয় সংগীতের উদ্‌গাহ, ধ্রুব, আভোগ ইত্যাদি কলি বা ধাতুর পরিকল্পনা হইয়াছে। ভারতীয় সংগীতের রূপকল্পনায় মূর্ছনার প্রয়োগ সংগীতের বিশেষ বিশেষ রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই মূর্ছনাগুলির সহিত বিবিধ যজ্ঞের নাম সংযুক্ত আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে ভারতে যখন নাট্য-আন্দোলনে সংগীতের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে তখন পূর্বোক্ত গীতিগুলি ছাড়া মদ্রক, অপরান্তক, ছন্দক, প্রভৃতি গানগুলিও প্রচলিত দেখা যায়। প্রাচীন নাটকে বিভিন্ন পরিবেশে প্রযুক্ত ধ্রুবা গীতিগুলিতে এই সমস্ত গানের বিভিন্ন অংশ গাওয়া হইত। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন মার্গতালের প্রাধান্য ছিল। অন্যান্য গীতের সহিত মিশ্রিত হওয়ায় পরবর্তী-কালে ইহাদের ঐতিহ্য বিলুপ্ত হয়।

সুদূর অতীত হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তরাজ্যের গৌরবকাল পর্যন্ত মগধের সংস্কৃতিকে অবলম্বন করিয়া যে গীতরূপ সংগঠিত হয় তাহা হইতেই বর্তমান রাগসংগীতের অভ্যুদয়। এই গীতি-গুলির নাম—মাগধী, অর্ধমাগধী, সম্ভাবিতা এবং পৃথুলা। বর্তমানে যেরূপ রাগের সাহায্যে গীতাদি রূপায়িত হয় পূর্বে গীতগুলি সেইরূপ জাতি সহযোগে রূপায়িত হইত। স্বরাদির গুরুত্ব, তাহাদের বিচিত্র বিন্যাস, প্রযোজ্যত্ব, মূর্ছনা, আরোহণ, অবরোহণ প্রভৃতি নির্দেশ অনুসারে সুরের যে বিশিষ্ট প্রকৃতি তাহাকে জাতি বলা হইত। শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরাদির সহযোগে অষ্টাদশ জাতির পরিকল্পনা হইয়াছিল। মাগধী প্রভৃতি গীত-গুলিতে অবয়ব, তাল, প্রয়োগপদ্ধতি এবং নিয়মশৃঙ্খলার বিশেষ কঠোরতা ছিল। পরে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে এগুলিকে দেশীয় রুচির উপযোগী করিয়া গঠন করা হয়। জাতি-র এই সংস্কৃত রূপই 'রাগ' নামে পরিচিত। যে গায়ন-পদ্ধতি শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেগ-স্বরা এবং সাধারণী—এই পাঁচটি গীতকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা 'গ্রামরাগ' নামে খ্যাত। ইহাই রাগসংগীতের প্রধান রূপ। গ্রামরাগের ব্যাপ্তির ফলে ইহাতে বহুতর মিশ্রণ ঘটে। এই পরিবর্তনের পরিমাণ অনুসারে মূল হইতে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহাকে গ্রামরাগের ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা—এই তিন প্রকারে চিহ্নিত করা হয়। অধিকতর পরিবর্তন বা মিশ্রণের ফলে আরও যে সকল শ্রেণীর উদ্ভব হয় সেগুলি ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ নামে পরিচিত। রাগসংগীত ক্রমশঃ দেশীয় গীতগুলির বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিও হারাইয়া ফেলে। অতঃপর যে বৃহৎ মিশ্রিত শ্রেণী রহিয়া যায় তাহাই রাগ নামে

পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। অবশেষে ইহাদের রূপগত বা গীতগত প্রভাব অনুসারে ইহাদিগকে ঠাট-মেল পদ্ধতি অথবা কাল-ঋতু অনুযায়ী বিভাগ করা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত গীত ও জাতিগুলিকে 'গান্ধর্ব' বলা হইত। পরে ইহাকেই মার্গসংগীত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে এবং রাগসংগীতকেও মার্গসংগীতের অন্তভুর্ক্ত করা হইয়াছে। একদিকে যেমন রাগসংগীত প্রতিষ্ঠালাভ করে অপরদিকে তেমনি প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া বিবিধ দেশী সংগীতও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। এই সকল দেশী সংগীতেও রাগসংগীতের কলাকৌশল উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা হইত। দেশ-প্রচলিত গীতগুলি প্রবন্ধসংগীতের অন্তভুর্ক্ত ছিল। প্রবন্ধসংগীতের উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তর, আভোগ—এই কলিগুলি হইতেই বর্তমান স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ—এই চারিটি কলির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রবন্ধসংগীতের গুণ অনুসারে ছয়টি অঙ্গ পরিকল্পিত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধসংগীত ষড়ঙ্গ প্রবন্ধসংগীত নামে খ্যাত। বঙ্গদেশীয় পদাবলী কীর্তন এই ষড়ঙ্গপ্রবন্ধের আদর্শে রচিত।

দেশীয় সংগীতের যে শ্রেণীর গীতে অপর বিশুদ্ধ গীতের ছায়াপাত হইত তাহাকে সূড়প্রবন্ধ বলা হইত। ইহারই মিশ্ররীতির নাম ছায়ালগ বা সালগ। ছায়ালগ শ্রেণীর মধ্যে ধ্রুব একটা প্রধান গীত। ইহা হইতেই বর্তমান ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সংগীতের উদ্ভব ('ধ্রুপদ' দ্র)। ধ্রুপদ ক্রমিক সংগঠন গোয়ালিয়রের রাজা মানসিং তোমর এবং আকবরের সভাস্থ তানসেন-এর প্রচেষ্টাতে ('তানসেন' দ্র) সম্ভব হয়। প্রবন্ধসংগীতের আর একটি শ্রেণীর নাম রূপক। ইহার সংগঠনে তেমন কঠোরতা ছিল না। ইহার সহিত ঠুংরির ('ঠুংরি' দ্র) সাদৃশ্য লক্ষণীয়। প্রবন্ধসংগীতের অন্তর্গত কৈবাড় বা কায়বাল নামক অপর একশ্রেণীর সংগীতের সহিত মধ্যযুগে দিল্লীতে মুসলমান-সমাজ 'কওল' এবং 'তারণা' নামক গীতের সংমিশ্রণে বর্তমান 'খেয়াল'-এর অভ্যুদয় ('খেয়াল' দ্র) বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সর্বপ্রকার রাগকল্পে সংযম ও সঙ্গতিরক্ষাই ভারতীয় সংগীতের আদর্শ। বিশ্বসংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সুরলহরী (মেলডি) শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সুরের ব্যাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুরবিহারকে ভারতীয় সংগীতে বিশেষভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। সুরসঙ্গতি (হার্মনি) যাহা পাশ্চাত্য সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাহার বিকাশ ভারতীয় সংগীতে ঘটে নাই। তাহার কারণ উক্ত রীতিতে সংগীত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষীয় ভাবধর্মী গীতে অনুভূত হয় নাই।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

কর্ণাটকী ঃ প্রাচীন কাল হইতেই দক্ষিণ ভারত তাহার সংগীতের জন্য সুপরিচিত। স্বয়ং ভরত দক্ষিণীদিগের সংগীত-প্রতিভার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী সংগীতধারা যে সকল বিদেশী সংগীত-উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল, দক্ষিণী কর্ণাটকী সংগীত সেই সকল প্রভাব হইতে মুক্ত ছিল।

সংগীতে ৭২টি মেল বা ঠাটের পরিকল্পনা দক্ষিণ ভারতেরই দান। তুলনামূলক সংগীততত্ত্বের দিক্ হইতে সপ্তস্বরযুক্ত এই ৭২টি মেল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, সপ্তকের যে ১২টি শুদ্ধ ও কোমল স্বরের উপর এই পরিকল্পনার ভিত্তি, তাহা বিশ্বের সর্বত্র পরিচিত। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর-নিবাসী সপ্তদশ শতকের সংগীতজ্ঞ বেঙ্কটমখী এই পরিকল্পনার স্রষ্টা। কর্ণাটকী সংগীতের তালরীতি বিশেষ বিস্তৃত। বিভিন্ন সংগীত-সভায় মার্গশ্রেণীর কর্ণাটকী সংগীতের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সংগীত সভাগুলিতে শিল্পীদের কণ্ঠে রাগালাপ তান ও পল্লবীর বিস্তার ছাড়াও তানবর্ণ, কৃতি, রাগমালিকা, পদ, জাবালি, তেলেনা প্রভৃতি শোনা যায়। মহাবৈদ্যনাথ আয়ারের ৭২ মেল রাগমালিকা ও রামস্বামী দীক্ষিতর-কৃত ১০৮ রাগ-তাল-মালিকা পৃথিবীর দীর্ঘতম সুরসৃষ্টিগুলির অন্তভুর্ত। ইহাদের প্রত্যেকটির অনুষ্ঠানকাল ২ ঘণ্টারও বেশি। দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে বৈদিক স্তোত্রাদি ছাড়াও তেবারম্, দিব্যপ্রবন্ধম্ প্রভৃতি গীত হয়। ভজনগানে প্রায়শঃই তেবারম্, তিরুপ্পুগঝ, দিব্যনাম-কীর্তন, উৎসবসম্প্রদায়কীর্তন, চূর্ণিকা, নামাবলী, অষ্টপদী, তরঙ্গ, অভঙ্গ, ভজন ও অরুট্পা প্রভৃতি রীতির সংগীত শোনা যায়। কালক্ষেপম্ (অর্থাৎ সংগীত সহযোগে ধর্মীয় কথকতা)-এ পঞ্চপদী, নিরূপণম্ (কাহিনী সংগীত), সাকি, দিন্দি, দোহার, ওবি প্রভৃতি রীতির সংগীত শ্রুত হয়। 'গেয় নাটক' (গীতিনাট্য) ও নৃত্যনাটকগুলিতে সাধারণ 'দারু' ছাড়াও 'সংবাদ-দারু' (সুরসহযোগে কথোপকথন) এবং 'স্বগত-দারু (গীতাশ্রয়ী স্বগতোক্তি) প্রভৃতির অপূর্ব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। অলারিপু, জাতিস্বরম্, শব্দম্, পদবর্ণনম্ প্রভৃতি নৃত্যসংগীত নৃত্যের সহযোগী ঐক্যবাদনের মাধ্যমে শ্রুত হয়। দক্ষিণ ভারতের লোক-সংগীতের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায় কুম্মি, কম্মি, ওদম্, কাবাদিচিণ্ডু, নণ্ডিচিণ্ডু, ভঝিনদাইচিণ্ডু এবং লাবানি (লাউনি?) প্রভৃতি বিচিত্র গীতরীতিতে।

যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ ভারতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। বীণাবাদনে ব্যাপক অঙ্গুলি-কর্মের ব্যবহার এবং চক্রবন্ধম্, বন্ধতানম্ প্রভৃতি মনোরম বাদনরীতির স্বকীয়তা লক্ষণীয়। গোট্টুবাদ্যম্ ও নাগস্বরম্ প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিরূপ বৈশিষ্ট্যসূচক। ইহাদের বাদনরীতিও বহু বিস্তৃত। মৃদঙ্গ, গোট্টুবাদ্যম্, ঘটম্, কাঞ্জিরা, ডোলক, কিরিকট্টি, শুদ্ধমদ্দলম্, পঞ্চমুখবাদ্যম্, চেণ্ডা, তিমিলা, ইড়ক্কা প্রভৃতি তাল-যন্ত্রগুলির বাদনরীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইড়ক্কা একটি মিশ্রবাদ্যযন্ত্র।

দক্ষিণ ভারতে বহু প্রথিতযশা সুরকার ও লক্ষ্মণ-গীত-রচয়িতার জন্ম হইয়াছে। পঞ্চদশ শতকের তাল্লপকম্ সুরকারবৃন্দ, পুরন্দর দাস, ক্ষেত্রজ্ঞ (১৭শ শতক) এবং ত্যাগরাজ (১৭৬৭-১৮৪৭ খ্রী)—ইঁহাদের প্রত্যেকের রচিত গীতের সংখ্যা সহস্রাধিক।

পি. শাম্বমূর্তি

সংবিধান, ভারতীয় জনগণের পরোক্ষ নির্বাচনে গঠিত সংবিধায়ক-সভা কর্তৃক ভারতীয় সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর। প্রবর্তনের তারিখ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি। তারপর অনেকবার সংশোধিত হইয়া বর্তমানে সংবিধানের যে আকার দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ইহার কাঠামো ফেডারেল বা অঙ্গরাজ্যভিত্তিক এবং শাসনপদ্ধতি পার্লামেণ্টারি রীতিসম্মত। কয়েকটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাদে বাকি সব অঙ্গরাজ্য এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ। ভারতীয় সংবিধানকে কেন্দ্র ও রাজ্যের ক্ষমতা, গঠনতন্ত্র ও শাসন প্রণালীর পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ-সম্বলিত একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দলিল বলা চলে। সংবিধানের সপ্তম অনুসূচীর (শিডিউল) তিনটি তালিকায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা অধিকারের বিবরণ আছে। প্রথমটিতে কেন্দ্রের, দ্বিতীয়টিতে রাজ্যের, তৃতীয়টিতে (যৌথ তালিকায়) উভয়ের। পাছে কিছু বাদ পড়িয়া যায় তাই বলা হইয়াছে—তালিকাতে অলিখিত যাহা কিছু সবই কেন্দ্রের অধিকারে। প্রথম তালিকা অর্থাৎ কেন্দ্রাধিকৃত বিষয়ের তালিকার মধ্যে পড়ে—প্রতিরক্ষণ, সামরিক বাহিনী, যুদ্ধোপকরণ শিল্প, পারমাণবিক শক্তি, পররাষ্ট্র ও কূটনীতি, যুদ্ধ ও শান্তি, নাগরিকাধিকার, রেলপথ, সমুদ্র বা বিমানপথে যাতায়াত, ডাক-তার, টেলিফোন, বেতার, কারেন্সি, টাঁকশাল, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, রাষ্ট্রীয় ঋণ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়, বীমা, পেটেণ্ট, কপিরাইট, খনি (পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির), বৈদেশিক ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি। পুরাতত্ত্বসমৃদ্ধ স্থান, লোকগণনা, সংসদীয় ও পরিষদীয় নির্বাচন, উচ্চ ও উচ্চতম ন্যায়ালয়, ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি। কেন্দ্রাধিকৃত রাজস্বের (কৃষি বহির্ভূত) মধ্যে পড়ে—আমদানি-রপ্তানি, শুল্ক, কোহল, আফিম, গাঁজা, ইত্যাদি বাদে তামাক ও অন্যান্য দেশজ পণ্যের উপর অন্তঃশুল্ক, নিগম কর, রেলভাড়া ও রেল, সমুদ্র ও বিমান-যাত্রীর উপর প্রান্তিক কর, চেক, প্রমিসরি নোট, সংবাদপত্র ও তদন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞাপনের উপর কর ইত্যাদি।

অবশ্য উপরি-উক্ত রাজস্বের সবটাই কেন্দ্র আত্মসাৎ করে না। যেমন মুদ্রাঙ্কশুল্ক এবং ভেষজ ও প্রসাধন-দ্রব্যের উপর শুল্কের হার স্থির করে কেন্দ্র কিন্তু আত্মসাৎ করে আদায়কারী রাজ্য। বিভিন্ন রাজ্যে লব্ধ আয়করের ও অন্তঃশুল্কের একটা অংশ বিভিন্ন রাজ্যে বণ্টনীয়। কিন্তু অংশের পরিমাণ ও বণ্টনের নীতি পাঁচ বৎসর পর পর স্থির করে রাষ্ট্রপতি-নিযুক্ত 'ফিনান্স কমিশন'।

দ্বিতীয় তালিকার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, কারা, সংশোধনাগার, ন্যায়-প্রশাসন ও হাইকোর্টের অধস্তন বিচারালয়, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষণ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কৃষি, সেচ, হাটবাজার, কারখানা, প্রেক্ষাগৃহ, বিধানমণ্ডলের নির্বাচন, মন্ত্রী, স্পীকার ও সদস্যদের আচরণবিধি, রাজ্য সরকারের নিয়োগ কমিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যাধিকৃত রাজস্বের মধ্যে পড়ে কৃষি জমি, কোহল, আফিম, গাঁজা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য প্রবেশ (অক্‌ট্রোয়া), স্থল বা নদীপথের যাত্রী, সড়কযোগ্য যানবাহন ইত্যাদি। তৃতীয় অর্থাৎ যৌথ তালিকায় কোনও করের উল্লেখ নাই। বিষয়ের মধ্যে আছে—ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও কার্যবিধি, নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশু ও নাবালক দত্তক গ্রহণ, আদালতগ্রাহ্য খেসারতযোগ্য ক্ষতি, দেওয়ানী ব্যবহারবিধি, সাক্ষ্য ও শপথ, আদালত-অবমাননা, যাযাবরত্ব, উন্মত্ততা ও উন্মাদ আশ্রম, পশুক্লেশ নিবারণ, খাদ্যে বা অন্য বস্তুতে ভেজাল, ভেষজ ও বিষ, শ্রমিক-কল্যাণ, ব্যবহারজীবী ও অন্যান্য বৃত্তি সম্পর্কিত বিধি, পূতকার্য, রোগসংক্রমণ প্রতিরোধ, জন্মমৃত্যু পরিসংখ্যান, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, পুস্তক প্রকাশন, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি।

সর্বভারতীয় ব্যাপারে কেন্দ্রের অধিকার এবং স্থানীয় ব্যাপারে রাজ্যের। যেখানে একই বিষয়ে উভয়ের অধিকার, সেখানেও প্রত্যেকের এলাকা যথাসম্ভব পরস্পর নিরপেক্ষ ও সীমানা চিহ্নিত। রাজস্বের বেলাতেও তাই। বৈদেশিক সন্ধি বা চুক্তির রূপায়ণে রাজ্যাধিকৃত বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ বারিত নয়; জনস্বার্থের খাতিরে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হইলে রাজ্য

পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে রাজ্যের অধিকারভুক্ত যে কোনও বিষয় সাময়িকভাবে কেন্দ্রায়ত্ত করা যায়; একাধিক রাজ্যের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত স্বীকৃতিতে তাহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যাপার সংসদের আওতায় আনা যায়; জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলে যতদিন সেই ঘোষণা বলবৎ থাকে ততদিন রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক অধিকারই কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে আসে এবং রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংসদের বিধান প্রণয়নের অধিকার জন্মে। যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অন্তর্বিপ্লব, রাজ্যে সাংবিধানিক অচল অবস্থা, অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণের আশঙ্কা হইলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন, কিন্তু দুমাসের মধ্যে সংসদ্ কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে ঘোষণা পাকা হয় না। ঘোষণার স্থায়িত্ব প্রথমতঃ ছয় মাস, কিন্তু পর পর পুনর্ঘোষণা দ্বারা তিন বৎসর পর্যন্ত জরুরী অবস্থার মেয়াদ টানিয়া লওয়া যায়। রাজ্যে অচল অবস্থায় বিধান সভার স্থান গ্রহণ করে সংসদ; এবং প্রশাসন পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপতির নির্দেশে রাজ্যপাল।

সংবিধানে পৃথক্‌ভাবে বর্ণিত হইলেও কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসনপদ্ধতিতে সাদৃশ্য খুব বেশি। রাষ্ট্র-পতিকে নির্বাচন করে সংসদ্ ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ একলসংক্রমণীয় (সিংগ্‌ল্ ট্রান্‌স্‌ফারেব্‌ল্) গোপন ভোটে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের উভয় সদনের নির্বাচিত সদস্যদের একলসংক্রমণীয় ভোটে। ইঁহার প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত হওয়া, যতদিন না (অনধিক ছয় মাসের মধ্যে) নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কাহারো পুনর্নির্বাচনে বাধা নাই। সংসদাধিকৃত সকল বিষয়ে ভারত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির এবং বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যপালের শাসনাধিকার। উভয়েই কিছু কিছু ক্ষেত্রে (বিশেষতঃ মৃত্যুদণ্ডের বেলায়) দণ্ড হ্রাস ও মকুবের অধিকারী।

সংবিধানের ভাষায় মন্ত্রিমণ্ডলী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের উপদেষ্টা, কার্যতঃ প্রশাসন-ক্ষমতা সমস্তই মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে এবং তাঁহাদের দায়িত্ব যুক্তভাবে লোকসভা বা বিধানসভার কাছে। রাষ্ট্রপতি বা রাজ্য-পালের দায়িত্ব হইল প্রধান বা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী নিযুক্ত করা। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি রাষ্ট্রপতি-নিযুক্ত মুখ্য প্রশা-সকের কর্তৃত্বাধীন। গোয়া, ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে মনোনয়ন বা নির্বাচন দ্বারা গঠিত বিধায়ক সভা ও মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর প্রশাসন-ক্ষমতার আংশিক ভারার্পণ চলে। কিন্তু গঠনের রীতি ও অর্পিত ক্ষমতার পরিমাণ সংসদ্-রচিত বিধানে স্থির হয়। আন্দামান-নিকোবর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর অঞ্চলে রাষ্ট্রপতি-রচিত বিধিই বলবৎ। কেন্দ্রীয় সংসদের দুইটি সদন লোকসভা এবং রাজ্য পরিষদ। রাজ্যে কোথাও একক বিধানসভা, কোথাও বা বিধান পরিষদ্ লইয়া দ্বিসদনযুক্ত বিধানমণ্ডল। যেখানে বিধান পরিষদ্ আছে সেখানেও ইহা বিধানসভার দুই তৃতীয়াংশের ভোটে বাতিলযোগ্য, তবে তাহার জন্য সংসদে বিল পাশ করানো প্রয়োজন। রাজ্য পরিষদের আসনসংখ্যা মনোনীত ১২ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল কর্তৃক নির্বাচিত ২৩৮। বিধান পরিষদের সদস্য-সংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম, তবে ৪০-এর নীচে নয় এবং বিধানসভায় সদস্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। লোকসভার সর্বোচ্চ আসনসংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যের জন্য ৫০০ এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য ২৫। কোন্ রাজ্যের কত আসন তাহা লোকসংখ্যার ভিত্তিতে স্থির হয়। বিধানসভার আসন-সংখ্যা সর্বত্র এক নয়। সর্বনিম্ন ৬০ এবং অনধিক ৫০০; নির্ভর করে লোকসংখ্যা ও আয়তনের উপর।

সংসদ্ এবং বিধানসভার নির্বাচনে জাতিধর্ম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার। নির্বাচন-প্রার্থীর নিম্নতম বয়স পরিষদে ৩০ এবং সভায় ২৫। লোকসভা ও বিধানসভার আয়ু পাঁচ বৎসর, যদি না তাহার পূর্বেই রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল কর্তৃক বিঘটিত (ডিজলভ্‌ড্) হয়।

লোকসভা ও বিধানসভার কার্য পরিচালনা করেন সদস্যগণ-নির্বাচিত স্পীকার ও পরিষদের চেয়ারম্যান। লোকসভা এবং বিধানসভা বিঘটিত হইলেও নব-নির্বাচিত সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব পর্যন্ত স্পীকার স্বপদে বহাল থাকেন। সংসদ্ ও বিধানমণ্ডলের আহ্বান ও সত্রাবসান (প্রোরোগেশন্) করেন যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল। আলোচিত বিষয়ের ও তৎ-সম্পর্কীয় আইনের তিনটি শ্রেণীঃ ১. অর্থ বিধেয়ক (মানি বিল), ২. অপরাপর বিত্তীয় (ফিনান্‌সিয়াল) বিষয়ক এবং ৩. অন্যান্য। শেষোক্ত শ্রেণীর বিল যে কোনও সদনে আনা যায়। যেখানে দুইটি সদন সেখানে বিল পাশ উভয় সদনের অনুমোদনসাপেক্ষ। মতবিরোধ-স্থলে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির আহ্বানে যুক্ত বৈঠকের ব্যবস্থা আছে।

বিত্তীয় অপরাপর বিল বা বিষয় বাজেট-সংক্রান্ত। ইহার আরম্ভে বার্ষিক আয়-ব্যয় সম্বলিত আর্থিক বিবরণী রাষ্ট্রপতির বা রাজ্যপালের জবানিতে লোকসভা বা বিধানসভায় উপস্থাপিত হয়। বেশির ভাগই সভার

অনুমোদনসাপেক্ষ। রাজস্ব আদায় ও বিনিয়োগের গলদ পরীক্ষা করেন অডিটর জেনারেল।

ভারতে উপর হইতে নীচ পর্যন্ত ন্যায়পালিকার একই ধারা প্রবাহিত। সর্বশীর্ষে আছে উচ্চতম ন্যায়ালয় (সুপ্রীম কোর্ট) যাহার অধিকার রাষ্ট্রব্যাপী। প্রতিটি রাজ্যে উচ্চন্যায়ালয় (হাইকোর্ট) আছে এবং তাহার অধীনে আছে জেলা আদালত ও অধস্তন আদালত-সমূহ মুখ্যন্যায়াধীশ ও অন্যান্য অবর ন্যায়াধীশ লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি, মুখ্যন্যায়াধীশ ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সহিত পরামর্শক্রমে। অন্যান্য অবর বিচারপতি নিয়োগের বেলায় ইঁহাদের সঙ্গে প্রধান বিচারপতির মতও গ্রহণীয়। সুপ্রীম কোর্টের আইনের ব্যাখ্যা হাইকোর্ট হইতে অধস্তন সমস্ত আদালতের পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয়।

সংবিধানের আদর্শের মধ্যে আছেঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা অনুপ্রাণিত সমাজব্যবস্থা, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে পর্যাপ্ত জীবিকার্জনের সংস্থান, শ্রমিক কল্যাণ (বিশেষতঃ নারী ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য কাজে না নিয়োগ), সকলের কর্মসংস্থান (অন্যথা জীবন ধারণোপযোগী সাহায্য), অনুন্নতের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ইত্যাদি অনেক কিছু। মৌলিক অধিকারগুলি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী নীতির সার সংকলন এবং যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণিত অধিকারের পরিমার্জিত সংস্করণ।

মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ঃ ১. মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভেদ লোপ এবং সমতা প্রতিষ্ঠা, আইন ও বিচারে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, অস্পৃশ্যতা বর্জন, উপাধি বিলোপ ইত্যাদি। ২. ব্যক্তি স্বাধীনতাভিত্তিক অধিকারের মধ্যে পড়ে বাক্য ও মত প্রকাশের, নিরস্ত্র সমাবেশের, সংঘ গঠনের, নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানের ও সাংস্কৃতিক বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনার, ক্ষতিপূরণ ব্যতীত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হইবার, সর্বত্র যাতায়াত ও বসবাসের, বেগার না খাটার, ইচ্ছানুরূপ বৃত্তি বা ব্যবসায়ের, এইরূপ নানা বিষয়ে অধিকার বা স্বাধীনতা। তবে অধিকারগুলি একেবারে নিরঙ্কুশ নয়. দেশের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও অখণ্ডতা রক্ষা, আদালত অবমাননা নিবারণ, শালীনতা ও সদাচার রক্ষা ইত্যাদি কারণে বাক্ স্বাধীনতা সংযমিত, সমাবেশের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ এবং সংগঠনের স্বাধীনতা সংকুচিত হইতে পারে।

শৈবালকুমার গুপ্ত

সংস্কার সংস্কার বলিতে সাধারণভাবে বুঝায় শুদ্ধি ও শোধন। জীবজন্ম কতকগুলি পাপের সমুচ্চয়। তাই হিন্দুরা জন্মের পূর্বে ও পরে শুদ্ধিক্রিয়া করিয়া থাকেন। এইগুলিকে বলা হয় দশবিধ সংস্কার, যথাঃ বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন। প্রথম চারিটি ক্রিয়া দ্বারা মাতা-পিতৃজ পাপ বিনষ্ট হয়। জাতকর্ম হইতে উপনয়ন পর্যন্ত পাঁচটি সংস্কার দ্বারা গর্ভোপঘাত ক্ষালিত হয়। আর সমাবর্তন দ্বারা জীব হয় পবিত্র স্নাতক।

কিন্তু দর্শনের পরিভাষায় 'সংস্কার' বলিতে বোঝায় পূর্বজন্মের কর্ম ও স্মৃতিজনিত অতীন্দ্রিয় মনোবৃত্তি। জীব জন্মমাত্র এই সংস্কারের অধীন হয় এবং ইহাই অদৃষ্ট স্বভাবরূপে জীবকে পরিচালিত করে। বৌদ্ধমতে 'সংস্কার' ভাবচক্রের হেতু দ্বাদশ নিদানের অন্তর্গত দ্বিতীয় নিদান। ইহা একপ্রকার মানস প্রতীতি। অবিদ্যাই এই প্রতীতির হেতু। ইহা অনিত্য ও মিথ্যা, ক্ষণিক ও আপেক্ষিক। অবিদ্যার বিনাশে সংস্কার বিনষ্ট হয়।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

সংস্কৃত ভাষা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রাচীনকালের ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের বাহন এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত অধিকাংশ অর্থাৎ আর্য-গোষ্ঠীর অন্তর্গত কথা ভাষার মূল। কাল এবং ভাব অনুযায়ী এই ভাষার দুইটি স্তর। একটি স্তর বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, আর একটি স্তর বৈদিকেতর সাহিত্যের (ব্যাপক অর্থে) ভাষা। সাধারণ ব্যবহারে দ্বিতীয় স্তরের ভাষাই সংস্কৃত (ক্ল্যাসিক্যাল স্যানস্কৃট) নামে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত ভাষার মূল হইল ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা এবং এই মূলের সূত্রে ইওরোপের গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহিত ইহা সম্পর্কযুক্ত। ইরাণের প্রাচীন ভাষা আবেস্তীয় ও প্রাচীন পারসীকের সহিত সংস্কৃতের সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ।

বৈদিক সংস্কৃতের সঙ্গে অবৈদিক সংস্কৃতের পার্থক্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে। বৈদিকে স্বরধ্বনিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন গ্রামভেদ (অ্যাক্সেন্ট) আছে, অবৈদিকে তাহা নাই। বৈদিকে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা অবৈদিকে অজ্ঞাত এবং অবৈদিকে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা বৈদিকে অজ্ঞাত।

বৈয়াকরণ পাণিনি (খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দ) যে সরণী বাঁধিয়া দিয়াছেন একাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সেই সরণী হইতে চ্যুত হয় নাই। উত্তরা-

সংস্কৃত সাহিত্য

পথের বৌদ্ধরা সংস্কৃত লিখিবার সময় পাণিনির অনুশাসন মানিতেন না। তাঁহাদের গ্রন্থের ভাষা অধুনা 'বৌদ্ধ সংস্কৃত' অথবা 'বৌদ্ধমিশ্র সংস্কৃত' নামে প্রসিদ্ধ।

সুকুমার সেন

সংস্কৃত সাহিত্য সংস্কৃত রচনাবলীর মোটামুটি ভাগ—সাহিত্য, দর্শন ও তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও বিবিধ। সাহিত্য সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ যুগবিভাগ করা চলেঃ বৈদিক যুগ, মহাকাব্য ও পুরাণের যুগ, ক্ল্যাসিক্যাল বা পাণিনির পরবর্তী যুগ। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদের রচনা বা সংকলনকাল ধরা যাইতে পারে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। বৈদিক সাহিত্য তিন পর্যায়ে বিভক্তঃ বেদ বা সংহিতা ; ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্। তিনটি যজ্ঞীয় বেদ—ঋক্, সাম ও যজুঃ এবং চতুর্থ অযজ্ঞীয় অথর্ববেদ. ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা, কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যান বা উপাখ্যানের টুকরা। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট উপনিষদ্ ('উপনিষদ্' দ্র)। আরণ্যকগুলিতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা আছে ('আরণ্যক' দ্র)। প্রত্যেক বেদের একাধিক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ আছে। ঋগ্‌বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ('ঋগ্‌বেদ' দ্র)। ইহাই প্রাচীনতম ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত ছান্দোগ্যোপনিষদ্ সামবেদের অন্তর্ভুক্ত ('সামবেদ' দ্র)। শুক্লযজুর্বেদের ('যজুর্বেদ' দ্র) বিখ্যাত ব্রাহ্মণ শতপথ ব্রাহ্মণ।

ধর্ম ও স্বরাদির জ্ঞান এবং শুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল শিক্ষাশ্রেণীর গ্রন্থসমূহে। আপিশালি, শাকটায়ন, শৌনক, পাণিনি প্রভৃতির নাম এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষার কতক বিষয় 'প্রাতিশাখ্য' নামক গ্রন্থরাজির অন্তর্ভুক্ত। শৌনকের 'ঋক্‌প্রাতিশাখ্য' অতি প্রসিদ্ধ। কল্পের অন্তর্গত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ('গৃহ্যসূত্র' দ্র), ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র ('কল্পসূত্র' দ্র)। গৌতম, বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, আপস্তম্ব, বৈখানস প্রভৃতি ঋষিরা ধর্মসূত্রের ('ধর্মশাস্ত্র' দ্র) ব্যাখ্যাতা। যজ্ঞশালা ও যজ্ঞবেদীর নির্মাণ ও পরিমাপ সংক্রান্ত বিধি শুল্বসূত্রের আলোচ্য বিষয়। শব্দজ্ঞানের জন্য রচিত হয় ব্যাকরণ। ব্যাকরণসমূহের মধ্যে পাণিনির (আ. খ্রী. পূ. ৪র্থ শতক) 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রাচীনতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। কাত্যায়ন (সম্ভবতঃ খ্রী. পূ. ৩য় শতক) ইহাতে 'বার্তিক' নামক কতক সূত্র সংযোজিত করেন এবং পতঞ্জলি (আ. খ্রী. পূ. ২য় শতক) সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন 'মহাভাষ্য' নামক গ্রন্থে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত ব্যাকরণ লেখা হয় তন্মধ্যে বোপদেবের (খ্রী. ১৩শ শতক) মুগ্ধবোধ উল্লেখযোগ্য। 'নিঘণ্টবস' নামক গ্রন্থে বেদপ্রযুক্ত শব্দরাশি সংগৃহীত হইয়াছে। 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থে যাস্ক (আ. খ্রী. পূ. ৬ষ্ঠ শতক) ঐ শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের আলোচনা করিয়াছেন। ছন্দোবিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ পিঙ্গলাচার্যের 'ছন্দঃসূত্র'। আলংকারিকদের মধ্যে দণ্ডী (আ. খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক), ভামহ (খ্রী. ৭ম শতক), আনন্দবর্ধন, মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', ধনঞ্জয়ের (খ্রী. ১০ম শতক) 'দশরূপ' প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। যজ্ঞকাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। বেদাঙ্গের সঙ্গে 'বৃহদ্দেবতা' ও 'অনুক্রমণী' উল্লেখযোগ্য। শৌনকের নামাঙ্কিত প্রথম গ্রন্থটিতে আছে ঋগ্‌বেদের দেবদেবীর নির্ঘণ্ট ও উহাদের আখ্যান-উপাখ্যান। বৈদিক মন্ত্রগুলির ঋষি, দেবতা, ছন্দ, বিনিয়োগ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে শেষোক্ত শ্রেণীর গ্রন্থে।

মহাকাব্য ও পুরাণের যুগঃ রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুইটি মহাকাব্য। ইহাদের রচনা এক সময়ের বা এক ব্যক্তির বলিয়া মনে হয় না। এই উভয় গ্রন্থেই পরবর্তীকালের সংযোজন আছে। ইহাদের আদিম রূপ ঠিক কোন্‌কালের রচনা তাহা অজ্ঞেয়। বর্তমানরূপে মহাভারত বোধহয় সম্পূর্ণ হইয়াছিল খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে বা তাহার নিকটবর্তী সময়ে ('মহাভারত' দ্র). এবং রামায়ণ সম্ভবতঃ ইহার এক কি দুই শতাব্দী পূর্বেকার ('রামায়ণ' দ্র)। রামায়ণের প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ কাণ্ডের কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেক পণ্ডিত মনে করেন। রামায়ণের কবি বাল্মীকি এবং মহাভারতের কবি বেদব্যাস বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তবে দুই মহাকাব্যেই একাধিক কবির অল্পবিস্তর সূক্ষ্ম ও স্থূল হস্তাবলেপ আছে। 'ভগবদ্‌গীতা' মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের নির্দেশক হিসাবে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। পুরাণ গ্রন্থগুলি বহু সংখ্যক ('পুরাণ' দ্র)। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পৌরাণিক কাহিনী অনেক কাব্য নাটকের উপজীব্য।

ক্ল্যাসিক্যাল যুগঃ পাণিনির কালকে (আ. খ্রী. পূ. ৪র্থ শতক) ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রারম্ভ বলিয়া ধরা হয় ('পাণিনি' দ্র)। এই যুগের কাব্যগ্রন্থগুলিকে দৃশ্য ও শ্রব্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। রূপক ও উপরূপক শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থাবলী দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। কালিদাস-পূর্ব যুগের প্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকার অশ্বঘোষ ও ভাস। অশ্বঘোষ (আ. খ্রী. ১ম-২য় শতক) দুইখানি কাব্য 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' রচনা করেন। তিনি একখানি বড় নাটকও (প্রকরণ)

লিখিয়াছিলেন, নাম 'শারিপুত্র' ('অশ্বঘোষ' দ্র)। ভাসের (কাল অজ্ঞাত) নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। 'চারুদত্ত' ও 'স্বপ্নবাসবদত্ত' ইহার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ('ভাস' দ্র) কালিদাস (আ. খ্রী. ৫ম শতক) 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কাব্য এবং 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি নাটক রচনা করিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হিসাবে বিবেচিত হন ('কালিদাস' দ্র)। কালিদাসোত্তর যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকার হইতেছেন—'কীরাতার্জুনীয়ম্'-এর কবি ভারবি (খ্রী. ৬ষ্ঠ শতক, 'ভারবি' দ্র) 'শিশুপালবধ'-এর কবি মাঘ (খ্রী. ৭ম শতক), 'মৃচ্ছকটিক'-এর লেখক শূদ্রক, 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি নাটক-প্রণেতা ভবভূতি (খ্রী. ৮ম শতক), 'মুদ্রারাক্ষস'-এর নাট্যকার বিশাখদত্ত (খ্রী. ৮ম শতক), 'রত্নাবলী' প্রভৃতির কবি রাজা হর্ষ (খ্রী. ৭ম শতক), 'রাবণবধ' বা 'ভট্টিকাব্য'-এর কবি ভট্টি (খ্রী. ৭ম শতক), 'জানকীহরণ'-এর কবি কুমারদাস (আ. ৭ম শতক), 'নৈষধচরিত'-এর কবি শ্রীহর্ষ (খ্রী. ১২শ শতক) প্রভৃতি। পরবর্তী যুগের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কহ্লণ ('কহ্লণ' দ্র), বিহ্লন ('বিহ্লন' দ্র), জয়দেব ('জয়দেব' দ্র), রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ—পদ্য, গদ্য ও চম্পূ। পদ্যকাব্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের কথা বলা হইল। পদ্যকাব্যের অন্তর্গত কোশকাব্যগুলিও উল্লেখযোগ্য। এইগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কবির শ্লোক সংকলিত হইয়াছে। কোশ-কাব্যসমূহের মধ্যে বাঙ্গালী বিদ্যাকরের (আ. ১১শ শতক) 'সুভাষিত রত্নকোশ' প্রাচীনতম। নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ গদ্যে রচিত মূল 'পঞ্চতন্ত্র' লুপ্ত। ইহার কয়েকটি রূপমাত্র অধুনা বিদ্যমান। 'দশকুমারচরিত'-এর লেখক দণ্ডী, 'বাসবদত্তা'র লেখক সুবন্ধু (খ্রী. ৭ম শতক) এবং 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-এর লেখক বাণভট্ট (খ্রী. ৭ম শতক) বিখ্যাত গদ্যকাব্য রচয়িতা। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ত্রিবিক্রমভট্টের (খ্রী. ১০ম শতক) 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তীকথা' ও 'মদালসা-চম্পূ'। ভোজের নামে প্রচলিত 'রামায়ণচম্পূ'র নামও এই প্রসঙ্গে করা যায়। স্বীয় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জৈনগণ কিছু চম্পূকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

দর্শন ঃ ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রকে আস্তিক ও নাস্তিক-ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আস্তিক দর্শনের অন্তর্গত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ ('সাংখ্যযোগ' দ্র) এবং মীমাংসা-বেদান্ত। নাস্তিক দর্শনের অন্তর্ভুক্ত বৌদ্ধদর্শন ও চার্বাক দর্শন ('চার্বাক' দ্র)। সাংখ্যদর্শনের ভূমিকাও নিরীশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ('সাংখ্য' দ্র)। তত্ত্ববিদ্যা, শীলবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দুতন্ত্র ছাড়া বৌদ্ধতন্ত্র সম্বন্ধেও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। তন্ত্রগুলির বিষয়বস্তুকে মোটামুটি চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—মন্ত্রযন্ত্রাত্মক জ্ঞান, যোগ, ক্রিয়া ও চর্যা।

ধর্মশাস্ত্র ঃ স্মৃতি বা ধর্মশাস্ত্রে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি, বর্ণাশ্রমধর্ম, রাজধর্ম ও ব্যবহার অর্থাৎ আইন-কানুন প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে ('ধর্মশাস্ত্র' দ্র)।

বিজ্ঞান ও বিবিধ ঃ বিজ্ঞানের যে সকল শাখা সম্বন্ধে সংস্কৃতে গ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, কামশাস্ত্র, জ্যোতিষ, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন ইত্যাদি। বাৎস্যায়নের (আ. খ্রী. ৩য়-৪র্থ শতক) 'কামসূত্র' যৌনবিজ্ঞান-সম্পর্কে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাচীন-তম ও সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ কৌটিল্য বা চাণক্যের নামাঙ্কিত 'অর্থশাস্ত্র' ('অর্থশাস্ত্র' দ্র)। আয়ুর্বেদ ('আয়ুর্বেদ' দ্র) প্রসঙ্গে চরক ('চরক' দ্র), সুশ্রুত ('সুশ্রুত' দ্র) ও বাগ্ভটের ('বাগ্ভট' দ্র) নাম স্মরণীয়। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধেও সংস্কৃতে নানা গ্রন্থ আছে ('জ্যোতির্বিদ্যা', 'জ্যোতিষ' দ্র)। উত্তর-পশ্চিম ভারতে আবিষ্কৃত একখানি পুথিতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতির বহু তত্ত্বের আলোচনা আছে। কল্পসূত্রের অন্তর্গত শুল্বসূত্র জ্যামিতি-বিষয়ক। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতে সংগীতশাস্ত্রবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এমনকি চৌর্যবিদ্যা, রন্ধনকলা, কৃষি, হস্তী ও অশ্বপালন সম্পৃক্ত রচনাও যথেষ্ট ছিল।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সক্রেটিস (আনু. খ্রী. পূ. ৪৬৯-৩৯৯) সুবিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। জন্মস্থান এথেন্স। ভাস্করের পুত্র। কিছুকাল পৈতৃক বৃত্তি অনুসরণ করেন। পরে অধ্যয়ন ও জনশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। অধর্মাচরণের অভি-যোগে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং বিষপানে তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিতে হয়। জনসমাগমের স্থলে তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করিতেন এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত উপদেশ দিতেন। এইভাবে প্রশ্নো-ত্তরের ভিতর দিয়া মানুষের ব্যক্তিগত ও সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং একটি সমাজ-দর্শন গড়িয়া তোলেন। তিনি বলেন ঃ 'গুণ ও জ্ঞান অভিন্ন ; জ্ঞানের অর্থ মুখস্থবিদ্যা নয়, সাধনা-লব্ধ নির্ভুল বোধশক্তি। গুণী সূত্রধর সেই ব্যক্তি যিনি তক্ষণবিদ্যা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন : প্রকৃত গুণী লোক তিনিই যিনি সৎকর্মের মূল্য পূর্ণ মাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তার মূল-

সূত্র ঃ ১. রাষ্ট্র অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক ; ২. আইন পবিত্র ও অপরিবর্তনীয় ; ৩. পশুশক্তি শাশ্বত অধিকারের অধীন ; ৪. সমাজ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় ; ৫. শাসন পরিচালনা একটি মহৎ বিশ্বজনীন কাজ, ইহার জন্য আবশ্যক সর্বাধিক জ্ঞানী ও গুণীর অকৃপণ সহায়তা। সক্রেটিস কোনও রচনা রাখিয়া যান নাই। তাই তাঁহার চিন্তা ও ভাবের সঠিক বিশ্লেষণ কঠিন। প্লাতো তাঁহার ভাবগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়াছেন ('প্লাতো' দ্র)। সক্রেটিস অবিশ্রান্তভাবে নৈতিক সত্য নির্ধারণের প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন।

নির্মলকান্তি মজুমদার

সংঘ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসীদের তিনটি মূল আশ্রয়ের ('ত্রিশরণ') অন্যতম। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' (অর্থাৎ আমি বুদ্ধের শরণ লই), 'ধর্মং শরণং গচ্ছামি' (অর্থাৎ আমি ধর্মের শরণ লই), 'সংঘং শরণং গচ্ছামি' (অর্থাৎ আমি সংঘের শরণ লই)—ইহা হইল সুগতপন্থীদের ত্রিশরণ মন্ত্র ; মহাযান মতে পরে ইহা 'ত্রিরত্ন'ও অভিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম বৈরাগ্য ধর্ম, তবে এ ধর্মের বৈরাগীরা সাধারণতঃ একাকী থাকিতেন না, একত্র অর্থাৎ সংঘবদ্ধ হইয়া বিহারে বা মঠে থাকিতেন। এই জন্য ভিক্ষুসংঘের আবাস বা বিহারের আর এক নাম ছিল সংঘারাম। বৌদ্ধধর্মে গুরুবাদ ছিল না। গুরুর স্থানে ছিল সংঘ। সংঘই ভিক্ষুসমাজ শাসন করিত।

সুকুমার সেন

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২ খ্রী) কবি, সাহিত্যগবেষক, সমালোচক ও সাময়িকপত্রের পরিচালক। পিতা হরেন্দ্রলাল দাস। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে সজনীকান্ত বি. এস্.-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক (১৯২৫-২৮ খ্রী), প্রবাসী প্রেসের মুদ্রাকর ও কর্মাধ্যক্ষ (১৯২৮-৩১ খ্রী), 'দৈনিক বসুমতী'র 'সাময়িক প্রসঙ্গ'-এর লেখক (১৯৩২ খ্রী) 'বঙ্গশ্রী' মাসিকপত্রের সম্পাদক (১৯৩২-৩৫ খ্রী) প্রভৃতি পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর হইতেই তিনি আজীবন উহার সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন (১৯২৮-৩২, ১৯৩৬-৬২ খ্রী) ; 'শনিরঞ্জন প্রেস' ও 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস'ও তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

বলিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনা ও নির্মম বিদ্রূপবহুল আক্রমণ তাঁহাকে সমালোচক হিসাবে গুরুত্ব দান করে। তিনি ব্যঙ্গ কবিতা ও ভাবগম্ভীর কাব্য দুইই লিখিয়াছেন। তিনি 'অঙ্গুষ্ঠ' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ), 'মনোদর্পণ' (১৩৩৮), 'বঙ্গরণভূমে' (১৩৩৮), 'রাজহংস' (১৩৪২), 'আলো-আঁধারী' (১৩৪৩), 'কেড্‌স ও স্যান্ডাল' (১৩৪৭), 'পঁচিশে বৈশাখ' (১৩৪৯), 'মানস-সরোবর' (১৩৪৯), 'ভাব ও ছন্দ' (১৩৫৯), 'পান্থ-পাদপ' (১৩৬৭) প্রভৃতি কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৬৯) পুস্তকটিতে গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইতে বিদ্যাসাগরের কাল পর্যন্ত ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সংকলিত হইয়াছে। 'রবীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে তিনি কবিগুরুর জীবনকথা ও প্রতিভার আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। 'অজয়' (১৩৩৬), 'কলিকাল' (১৩৪৭), 'আকাশ-বাসর' (১৩৫১), 'স্বনির্বাচিত গল্প' (১৩৬৬) প্রভৃতি গ্রন্থ কথাসাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার ভূমিকার পরিচয় দেয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বহু গ্রন্থে তাঁহার বলিষ্ঠ সম্পাদনার অংশ রহিয়াছে। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক (১৩৫২-৫৫ বঙ্গাব্দ), সহ সভাপতি (১৩৫৬-৫৮, ১৩৬৩-৬৭), সভাপতি (১৩৫৮-৬২), কোষাধ্যক্ষ (১৩৬৮), 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক (১৩৪৭) প্রভৃতি পদে ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আজীবন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা-সংসদের সদস্য ছিলেন।

দেবজ্যোতি দাশ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯ খ্রী) বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যম অগ্রজ ('বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' দ্র)। মেদিনীপুরের স্কুলে ও হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। বর্ধমান কমিশনারের অফিসে কিছুকাল কেরানির কাজ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 'বেঙ্গল রায়ত্‌স ঃ দেয়ার রাইট্‌স অ্যান্ড লায়াবিলিটিজ' (১৮৬৪ খ্রী) পুস্তক লিখিয়া যশস্বী হন এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান। 'বঙ্গদর্শন' (১২৮৪-৮৯ বঙ্গাব্দ) এবং 'ভ্রমর' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন (১২৮১-৮২ ও ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যা)। তিনি বহু সারগর্ভ প্রবন্ধ ও কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রশংসার্হ গ্রন্থ 'পালামৌ' নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী ঃ 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭ খ্রী), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭ খ্রী) 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৩৩ খ্রী), 'মাধবীলতা' (১৮৮৫ খ্রী)।

অতুল্যচরণ দে

সৎনামী দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবে নরনোলের নিকটবর্তী বিজেশ্বরে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বীরভান একেশ্বরবাদী

সংনামী সম্প্রদায় গঠন করেন। ইঁহারা একমাত্র সৎনাম বা সত্যনামে বিশ্বাস করিতেন; তাই সংনামী বলিয়া পরিচিত। রায়দাসী হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন হইলেও এই সম্প্রদায়কে রায়দাসীর শাখা বলা হয়। সংনামী বলিয়া আরও দুইটি সম্প্রদায় থাকিলেও যাঁহারা ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ করেন তাঁহারা সাধ-সংনামী। ইঁহাদের আস্তানা উত্তরপ্রদেশের কয়েক স্থানে, দিল্লীর পরিপার্শ্বস্থ জেলাসমূহে ও রোহতকে ছিল। ঐতিহাসিক ঈশ্বরদাস নাগরের মতে তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বিশেষ নিন্দনীয় ছিল কিন্তু খাফি খাঁ তাঁহাদের চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তুচ্ছ কারণ হইতে সংনামীদের সহিত সরকারের বিবাদ বাধে এবং ক্রমশঃ ইহা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে হিন্দুবিদ্রোহে দাঁড়ায়। ঔরঙ্গজেব সৈন্য পাঠাইয়া সংনামীদিগকে পরাজিত ও বিদ্রোহ দমন করেন।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

সতরঞ্চ (ফার্সি. শতরঞ্জ) দাবা খেলারই ('দাবা' দ্র) আর এক নাম। প্রাচীন বাংলা ভাষার চর্যাপদে এই অর্থে 'নঅবল' শব্দের প্রয়োগ আছে। মধ্য বাংলাসাহিত্যে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ('বিপ্রদাস পিপিলাই' দ্র) 'মনসাবিজয়'-এ সতরঞ্জ এবং আলাওলের 'সয়ফলমুলুক বদিওজ্জমাল'-এ ('আলাওল' দ্র) সতরঞ্জ শব্দে এই খেলারই উল্লেখ আছে। সংস্কৃতে চতুরঙ্গ ক্রীড়ার কথা পাওয়া যায়। তাহাও এই একই খেলা। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' (আনু. খ্রী. ৩য় বা ৪র্থ শতক) ও বাণভট্টের রচনায় এই খেলার উল্লেখ আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সতীদাহ প্রথা সংস্কৃত ভাষায় 'সতী' বলিতে পূতচরিত্রা ও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্তা নারীকেই বুঝায়। কিন্তু একদা প্রচলিত ব্যবহারে মৃত স্বামীর সহিত যে রমণী মৃত্যুবরণ করিতেন তাঁহাকেই এদেশে 'সতী' আখ্যা দেওয়া হইত। আদিম যুগ হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে (যথা, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, শ্লাভদেশ, গ্রীস, মিশর, চীন ইত্যাদি) কোনও না কোনও ভাবে এই আত্মবলিদান প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোনও সভ্য দেশে এই প্রথা আধুনিক যুগের সূচনা পর্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। ভারতে সতীদাহ প্রথা সুপ্রাচীন কাল হইতে আর্য ও অনার্য উভয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় বিধবা নারীদের আমরণ কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনেরই নির্দেশ আছে কিন্তু পরবর্তীকালে বহু স্মৃতিকার-ই সহমরণ-ব্যবস্থার সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও কেহই ইহাকে বাধ্যতামূলক [illegible] বলিয়া বিধান দেন নাই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সহমরণের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্রাট্ আকবর ও জাহাঙ্গীর সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। এমন কি ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই প্রথা কোথাও কোথাও অজ্ঞতাবশতঃ অনুসৃত হইত। রাজা রামমোহনের চেষ্টায় ও ইংরেজ সরকারের আন্তরিক সমর্থনে শেষ পর্যন্ত এই প্রথা ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট উইলিয়ম বেন্টিন্‌ক কর্তৃক নূতন আইনের সাহায্যে নিষিদ্ধ হয়। এই নিষেধের বিরুদ্ধে ধর্মসভা স্থাপন করিয়া এবং বিলাতে প্রিভি কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিয়াও কোনও ফল হয় নাই।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫ খ্রী) শক্তিমান্ কথাসাহিত্যিক। জন্ম ও বাসভূমি বিহারের পূর্ণিয়া। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. এবং বি. এল. পাশ করেন। 'জাগরী' (১৯৪৬ খ্রী) উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভা সাহিত্যানুরাগীদের সাদর সম্বর্ধনা লাভ করে। ১৯৪২-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে এই উপন্যাস রচিত। তাঁহার উপন্যাসে ও গল্পে বিহারের অংশ-বিশেষের সুন্দর আঞ্চলিক পরিবেশের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' ঃ ১ম-২য় (১৯৪৯-৫১ খ্রী), 'সত্যি ভ্রমণকাহিনী' (১৯৫১ খ্রী), 'অপরিচিতা' (১৯৫৪ খ্রী), 'অচিন রাগিণী' (১৯৫৪ খ্রী), 'সংকট' (১৯৫৭ খ্রী) ও 'গণনায়ক' (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সতীমা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে চব্বিশ পরগনা এবং নদিয়া এই দুইটি জেলার সংযোগস্থলে সহজিয়া সাধনায় এক ব্যক্তি (আউলচাঁদ) কর্তাভজা ('কর্তাভজা' দ্র) অর্থাৎ গুরু-উপাসক সম্প্রদায় গঠন করেন। এই বিশেষ ধর্মমতের উপাসকদের মধ্যে গুরু বা ঈশ্বরকে 'কর্তা' বলার রীতি প্রচলিত হয়। আউলচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার দলের কর্তা হন রামশরণ। রামশরণের স্ত্রীর নাম সরস্বতী। কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের ভক্তরা শ্রদ্ধাবশতঃ সরস্বতী দেবীকে 'সতীমা' আখ্যা দেন। উক্ত সতীমার সিদ্ধপীঠ ও সমাধি-মন্দির প্রভৃতি নদিয়া জেলার ঘোষপাড়া-পল্লীতে আছে, প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার দিনে উক্ত পল্লীতে সতীমার স্মৃতি-উৎসবে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা যোগদান করেন এবং সপ্তাহব্যাপী মেলা হয়।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০ খ্রী) বহু-ভাষাবিদ্ ও বহুশাস্ত্রবিদ্ প্রথিতযশা পণ্ডিত। সংস্কৃত কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া (১৮৯৩ খ্রী) কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে বুদ্ধিস্ট্ টেক্স্ট্ সোসাইটির গ্রন্থ প্রকাশকালে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বহুমূল্য পালি-গ্রন্থসমূহ সম্পাদনা করেন। তথ্যপূর্ণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ মনীষীদের প্রশংসা লাভ করেন। তিব্বতী-ইংরেজী অভিধান রচনার জন্য তিন বৎসরের জন্য (১৮৯৭-১৯০০ খ্রী) তিব্বতী পর্যটক-গবেষক শরচ্চন্দ্র দাসের ('শরচ্চন্দ্র দাস' দ্র) সহকারী-রূপে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পালি-ভাষায় এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক ভারত-পরিভ্রমণরত তাসিলামার দ্বিভাষী নিযুক্ত হন এবং 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলো এবং এশিয়াটিক সোসাইটির সহযোগী ভাষা-সম্পাদক হন। পি.-এইচ. ডি. ডিগ্রী ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করেন (১৯০৮ খ্রী) এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন (১৯১০ খ্রী)। সরকার-প্রবর্তিত তিব্বতী ভাষায় ব্যুৎপত্তিমূলক পরীক্ষাসমূহ পাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ও তিব্বতী ভাষার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। তিনি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন (১৯১৩-১৬ খ্রী)। তাঁহার লেখা 'এ হিস্ট্রি অভ্ ইণ্ডিয়ান লজিক' গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বাংলা ও ইংরেজীতে তিনি ২২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং বহু প্রবন্ধ লিখিয়া প্রশংসা পান।

অনিলকুমার আচার্য

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮ খ্রী)। একনিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী কর্মী, 'ডন সোসাইটি'র প্রতি-ষ্ঠাতা। খ্যাতিপ্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া তিনি শিক্ষাবিস্তারে এবং দেশাত্মবোধ-উদ্বোধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। 'ডন' নামে মাসিকপত্রও তিনি বাহির করিয়াছিলেন। উহাতে রাজনীতি ও শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়সমূহ যোগ্যতার সহিত আলোচিত হইত। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষাপরিষদ গঠিত হয় এবং ইহার অধীনে জাতীয় মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইলে শ্রীঅরবিন্দ হন উহার প্রথম অধ্যক্ষ, আর সতীশচন্দ্র হন তত্ত্বাবধায়ক। স্বদেশী যুগের বহু দেশনায়ক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ১৮ এপ্রিল কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সতীশচন্দ্র রায়¹ (১২৭৩-১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) বৈষ্ণব পদাবলীর সংগ্রাহক, সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতারূপে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন ঢাকা জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনা করিবার পর গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'পদকল্পতরু' (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ) তাঁহার পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞান ও পরিশ্রমের পরিচয় দেয়। তিনি বহু পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে ৬২৩টি পদ প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'রসমঞ্জরী', ভবানন্দের 'হরিবংশ', 'নায়িকা রত্নমালা' ও 'গোপাল চরিতম্' সুধীদের নিকট আদৃত হইয়াছে। তিনি হিন্দীতেও কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সতীশচন্দ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তিনি শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না, সংগীতশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি মৃদঙ্গ ও তবলা খুব ভাল বাজাইতে পারিতেন।

বিমানবিহারী মজুমদার

সতীশচন্দ্র রায়² (১৮৮২-১৯০৪ খ্রী) আদিনিবাস বরিশাল জেলার উজিরপুর গ্রাম। বি. এ. পড়িবার সময় রবীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ হয়। পাঠক্রম সম্পূর্ণ না করিয়াই তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যোগ দেন। চরিত্রমাধুর্য, অধ্যাপনকুশলতা, সাহিত্য-রসজ্ঞতা, ভাবুকতা প্রভৃতি গুণে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রের চিত্তে ও শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ের ইতিহাসে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁহার গদ্য-পদ্য রচনার পরিমাণ মুষ্টিমেয়, তথাপি ঐ স্বল্প পরিমাণ লেখা হইতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না তাহা জ্বলিলে নিবিত না'। তাঁহার স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের মনে জীবনান্তকাল পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিল। দ্বিজেন্দ্র-নাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর ও রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র যে আলোচনা সতীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তাহা অদ্যাপি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মৃত্যুর পর অজিতকুমার চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সতীশ-চন্দ্রের গদ্য-পদ্য রচনার সংগ্রহ 'সতীশচন্দ্রের রচনাবলী' (১৯১২ খ্রী) নামে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে ছাত্রদের জন্য রচিত উতঙ্কের কাহিনী 'গুরুদক্ষিণা' (১৯০৪ খ্রী) নামে প্রচারিত হইয়াছিল।

পুলিনবিহারী সেন

সত্যনারায়ণ, সত্যপীর প্রসিদ্ধ দেবতা বিশেষ। ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইঁহার পূজা প্রচলিত। প্রদেশ ভেদে সত্যনারায়ণের ধ্যানমূর্তির বা পূজা-পদ্ধতির কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে শুক্লবর্ণ, কেহ বা ইন্দীবরদলশ্যাম বলিয়া ধ্যান করেন। আবার কেহ কেহ প্রচলিত নারায়ণের ধ্যানের অনুযায়ী তাঁহাকে 'হিরণ্ময়বপু'রূপেও কল্পনা করেন। পূর্ণিমা বা সংক্রান্তির দিনে ইঁহার পূজা হয়। বঙ্গদেশে শনিবারে শনিঠাকুরের সহিত সত্যনারায়ণের পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রদোষকালই সত্যনারায়ণ পূজার প্রশস্ত। এই পূজায় 'সিন্নি' প্রস্তুত করিয়া সত্যনারায়ণের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। সত্যনারায়ণ পূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা কঠিন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে ও ভবিষ্য-পুরাণে ইহার বিবরণ আছে। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের চারিটি কাহিনী আছেঃ ১. দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ২. কাঠুরিয়া, ৩. সদাগর ও জামাতা এবং ৪. বংশধ্বজ রাজা। বঙ্গদেশে ইহার প্রথম তিনটি কাহিনী প্রচলিত। বাংলা, ওড়িশা পাঞ্জাবের জলন্ধর প্রভৃতি অঞ্চলে সত্যনারায়ণের ন্যায় সত্যপীরের পূজাও প্রচলিত। উঁচু মাটির ঢিবি বা পাকা স্তূপে মুসলমানগণ এই পীরের অর্চনা করেন। বাংলা ও ওড়িশায় সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর অনেক ক্ষেত্রে এক হইয়া গিয়াছেন এবং বিভিন্ন পালাগানে ইঁহাদের অভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সত্যপীর সত্যনারায়ণের ন্যায় নাথপন্থে সত্যনাথও বিরাজিত। মহারাষ্ট্রে সত্যবিনায়কের পূজাও প্রচলিত। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডের তিনটি কাহিনী লইয়া বহু বাঙ্গালী কবি সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার কয়াল

সত্যব্রত সামশ্রমী (১৮৪৬-১৯১৯ খ্রী) প্রসিদ্ধ বেদবিদ্ আচার্য। জন্মস্থান পাটনা, আদিনিবাস কালনা ধাত্রীগ্রাম, বাল্যনাম কালিদাস। পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায় ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। বুন্দিরাজ্যের রাজা ইঁহাকে 'সামশ্রমী' উপাধি দেন। ভাষ্য, প্রাতিশাখ্য, সূত্র ও ব্রাহ্মণসহ সমগ্র সাম ও যজুর্বেদ বাংলা অনুবাদের সহিত প্রকাশ ইঁহার প্রধান কীর্তি। সমগ্র নিরুক্ত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং বহু দুষ্প্রাপ্য বৈদিক গ্রন্থ ইনি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। ইঁহার বৈদিক প্রবন্ধাবলী এবং 'ঊষা' ও 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' নামে দুইখানি বৈদিক পত্রিকা বিদেশে সমাদর লাভ করে। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির অ্যাসোসিয়েট মেম্বর ও অনারারী ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

কল্যাণী দত্ত

সত্যাগ্রহ সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটির সূত্রপাত হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। এখানে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয়দের বিধিকরণ আইনের (১৯০৭ খ্রী) বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তিনি ইহাকে সত্যাগ্রহ বলিয়াছিলেন, যদিও কার্যতঃ তাহা ছিল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। দ্বিতীয় স্তরটি শুরু হয় ভারতে—রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে ('অসহযোগ আন্দোলন' দ্র) এখানে গান্ধীজী সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা দিয়াছিলেন—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। ইহাতে অবশ্য তিনি অহিংস রূপটিতেই জোর দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার তৃতীয় স্তরটি আসে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন। এই সত্যাগ্রহে অহিংস চরিত্রটি বজায় থাকে, কিন্তু আরও সক্রিয়ভাবে। ইহার বিশিষ্টতা বুঝাইতে গান্ধীজী ইহাকে সরকারী আইন-অমান্য আন্দোলন আখ্যা দিয়াছেন।

উপরি-লিখিত ধারণার সূত্রে সত্যাগ্রহ বলিতে বোঝায় অন্যায়ের অর্থাৎ জনগণের উপর অন্যায় আইন চাপানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। সুতরাং সত্যাগ্রহ অর্থে বুঝিতে হইবে ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ। অহিংসা ইহার স্বরূপ। নৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সহিংস প্রতিরোধ-পন্থা পরিহার করে। সুতরাং ইহার গভীরে উচ্চস্তরের নৈতিক সুর চিরবিদ্যমান। সব সময়েই যে ইহা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-পন্থাই হইবে, তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে ইহার দ্বারা সক্রিয়ভাবে অন্যায় আইনভাঙা আন্দোলনও করা যাইবে, তাই ইহার নূতন নামকরণ হয় আইন-অমান্য আন্দোলন। 'সত্যাগ্রহ' ধারণায় সত্য অর্থে বুঝিতে হইবে 'ন্যায়', তর্কশাস্ত্রে যাহাকে সত্য বলে ইহা ঠিক তাহা নহে।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

ইহা গান্ধীজী-প্রবর্তিত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নৈতিক ও আত্মিক প্রতিরোধ-পদ্ধতি। অত্যাচারীর ভিতরও বিবেক আছে; সাময়িকভাবে তাহা লোভ বা মোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তাহাকে দুষ্কৃতিতে প্ররোচিত করে; কিন্তু এই পন্থায় ত্যাগ ও নিগ্রহের মাধ্যমে তাহার বিবেককে জাগ্রত করাইয়া তাহার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া তাহাকে এই দুষ্কৃতি হইতে নিবৃত্ত করার প্রয়াস করা হয়। অন্যায়কারীর সহিত অসহযোগ ছাড়াও প্রয়োজন হইলে ইহা পিকেটিং, বয়কট, অনশন, এমনকি আমৃত্যু অনশনের রূপও লইতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সম্পর্কে বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করা হয় তাহাকে কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ না বলিয়া এই আন্দোলনের জনক ও

নেতা গান্ধীজি ইহাকে 'সৎ+আগ্রহ=সদাগ্রহ বা সত্যাগ্রহ' নামে অভিহিত করেন। নিরস্ত্র প্রতিরোধের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন রোম (খ্রী. পূ. ২৬০), মহীশূর রাজ্য (১৮৩০ খ্রী), আয়ারল্যান্ড (১৮৮১ খ্রী), ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য (১৮৮৭ খ্রী) ইত্যাদিতে সংগঠিত অহিংস প্রতিরোধের মধ্যে এই পদ্ধতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গান্ধীজীর বৈশিষ্ট্য হইল, তিনি ব্যাপক গণসংগ্রামের অস্ত্ররূপে এই পদ্ধতিকে নিরস্ত্র মানুষের হাতে তুলিয়া দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়াও ভারতে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ও প্রেরণায় পরিচালিত চম্পারণ, খেড়া, বারদৌলি, আহমেদাবাদ ও ভাইকমের সত্যাগ্রহ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আঙ্গিক হিসাবে দফায় দফায় অসহযোগ, আইন-অমান্য, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ, আগস্ট-আন্দোলন প্রভৃতিও সত্যাগ্রহরূপেই পরিচালিত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য গান্ধীজীর আজীবন সাধনা, যাহা শেষ জীবনে কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার-দিল্লীতে বিশেষভাবে প্রকট হয়, তাহাও সত্যাগ্রহ।

ভারত ছাড়াও প্যালেস্টাইন, জার্মানি, ফিন্‌ল্যান্ড, নরওয়ে ও ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে স্থানীয় নেতৃত্বে সময়ে সময়ে সফল সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীজীর পরও আফ্রিকার কোনও কোনও রাজ্যে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার) ও তাঁহার সহযোগীদের নেতৃত্বে যেভাবে সফল সত্যাগ্রহ পরিচালিত হয়, তাহাতে ইহাকে সাধারণ মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এক শাশ্বত অস্ত্র আখ্যা দেওয়া যায়।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩ খ্রী) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম বিলেতে গিয়া ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া চাকরি লাভ করেন। দেশের সামাজিক উন্নতির পক্ষে সত্যেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা খুব উল্লেখযোগ্য। ইনি কয়েকটি ভাল অধ্যাত্ম সংগীত ও দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচনা 'সুশীলা ও বীরসিংহ নাটক' (১৮৬৭ খ্রী), 'বোম্বাইচিত্র' (১২৯৫ বঙ্গাব্দ), 'বাল্যকথা', 'বৌদ্ধধর্ম' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ), টিলকের ভগবদ্‌গীতা ভাষ্যের অনুবাদ, মেঘদূতের অনুবাদ (১২৯১ বঙ্গাব্দ) ও তুকারামের অভঙ্গের অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

সুকুমার সেন

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২ খ্রী) প্রখ্যাত ছন্দ-বিশারদ রবীন্দ্রাদর্শনিষ্ঠ কবি। জন্ম: ১১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার। পিতামহ অক্ষয়কুমার ('অক্ষয়কুমার দত্ত' দ্র)। পিতা রজনীনাথ; মাতা মহামায়া দেবী। সত্যেন্দ্রনাথের মানস-প্রকৃতিতে অক্ষয়কুমারের প্রভাব ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম যুগের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের নৈকট্য লাভ করেন। প্রধানতঃ কবি হইলেও ভাষা, ছন্দ, সাহিত্যাদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে এবং উপন্যাস-রচনার প্রয়াসে লিখিত তাঁহার গদ্য রচনার পরিমাণও তুচ্ছ নহে। তাঁহার জীবৎকালে প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা: 'সবিতা' (১৯০০ খ্রী); 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫ খ্রী); 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬ খ্রী); 'হোমশিখা' (১৯০৭ খ্রী); 'তীর্থসলিল' (অনুবাদ কবিতা, ১৯০৮ খ্রী); 'তীর্থরেণু' (অনুবাদ কবিতা, ১৯১০ খ্রী); 'ফুলের ফসল, (১৯১১ খ্রী); 'কুহু ও কেকা' (১৯১২ খ্রী); 'জন্মদুঃখী' (অনুবাদ উপন্যাস, ১৯১২ খ্রী); 'চীনের ধূপ' (অনুবাদ প্রবন্ধ, ১৯১২ খ্রী); 'রঙ্গমল্লী' (অনুবাদ নাট্যসংগ্রহ, ১৯১৩ খ্রী); 'তুলির লিখন' (১৯১৪ খ্রী); 'মণি-মঞ্জুষা' (অনুবাদ কবিতা, ১৯১৫ খ্রী); 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬ খ্রী); 'হসন্তিকা' (ব্যঙ্গ কবিতা, 'নবকুমার কবিরত্ন' ছদ্মনামে, ১৯১৭ খ্রী); 'বারোয়ারি উপন্যাস' (২৯-৩২ পরিচ্ছদ মাত্র তাঁহার লেখা, ১৯২১ খ্রী)। 'প্রবাসী' পত্রিকায় (আষাঢ়-কার্তিক, ১৩৩০) 'ডঙ্কানিশান' নামে (অসমাপ্ত) একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাও প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তিনখানি বই: 'বেলাশেষের গান' (১৯২৩ খ্রী); 'বিদায়-আরতি' (১৯২৪ খ্রী) এবং 'ধূপের ধোঁয়ায়' (নাটিকা, ১৯২৯ খ্রী)। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার কবিতা-সংগ্রহ 'কাব্যসঞ্চয়ন' এবং ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে 'শিশুকবিতা' প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন 'ভারতী' পত্রিকাগোষ্ঠীর অন্যতম কবি। স্বদেশপ্রীতি, জ্ঞানবিজ্ঞানে আগ্রহ, তথ্য-বহুলতার প্রতি ঝোঁক, প্রথম জীবনে মধুসূদন, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ইত্যাদির প্রভাব-স্বীকৃতি এবং পরিণত পর্বে ছন্দের নানা বৈচিত্র্যে সদাজাগ্রত আগ্রহ এবং অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের কাব্যসাহিত্যের সহিত বাংলার যোগসাধন—ইহাই সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখের 'ভারতী'তে ছন্দ সম্পর্কিত তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রকাশিত হয়।

হরপ্রসাদ মিত্র

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪ খ্রী) সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 'যুগান্তর'-এর সহিতও তিনি কিছুদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দৈনিক 'সত্যযুগ' এবং সাপ্তাহিক 'অরণি' সম্পাদনাতেও তাঁহার কৃতিত্ব স্মরণীয়। এ সকলের পূর্বে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রবর্তিত 'নারায়ণ' মাসিকপত্রের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। বাল্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। 'বিবেকানন্দ চরিত', 'ছেলেদের বিবেকানন্দ', 'গান্ধী না অরবিন্দ', 'স্ট্যালিনের জীবনী', 'আমার দেখা রাশিয়া', প্রভৃতি তাঁহার রচনা। নানা পত্রিকায় 'নন্দী-ভৃঙ্গী', ছদ্মনামে তিনি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য লিখিতেন। 'জওহরলাল নেহরুর আত্মচরিত' তাঁহার অনুবাদ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। স্বৈরিণী' উপন্যাস আনাতোল-ফ্রান্সে 'Thais' উপন্যাসের অনুসরণে লেখা।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৮৬৩-১৯২৮ খ্রী) স্বনামখ্যাত ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ ও রাজনীতিজ্ঞ। বীরভূম জেলার রাইপুর বা রায়পুরের জমিদার সিতিকণ্ঠ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। শিক্ষাঃ বীরভূম জেলা স্কুল, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও লন্ডনে লিংকন্স্ ইন্। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরে নভেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারির সনদ লাভ করেন। তিনি এই সময়ে কিছুকাল সিটি কলেজে আইনের অধ্যাপক ছিলেন। ব্যারিস্টারিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ভারতবর্ষের আইন-জগতে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে বহু উচ্চ আসন ও পদমর্যাদা লাভ করিয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি হাইকোর্টের স্ট্যান্ডিং কাউনসেল, অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদের আইন-বিষয়ক সদস্য নিযুক্ত হন। প্রথমে 'নাইটহুড' পাইয়া পরে 'ব্যারন' উপাধিতে ভূষিত এবং লর্ড সিংহ নামে পরিচিত হন। এদেশে তিনিই সর্বপ্রথম 'কিংস্ কাউনসিল' ও 'প্রিভি কাউনসিলে'র সদস্যপদ লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তিনি ভারত সরকারের যুদ্ধ পরিষদের সভ্য ছিলেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'সহকারী ভারতসচিবে'র পদে নিযুক্ত হন। ইংরেজ শাসনের আমলে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি প্রাদেশিক (বিহার-ওড়িশার) গভর্নরের পদ অলংকৃত করেন (১৯২০-২১ খ্রী)। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন।

হারাধন দত্ত

সনাতনগোস্বামী বৃন্দাবনের ষড়্গোস্বামীর অন্যতম। পূর্বপুরুষ কর্ণাটের ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ রূপেশ্বর কর্ণাট ত্যাগ করিয়া পূর্ব ভারতে আসেন। সনাতনের প্রপিতামহ পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে নবহট্টে (বর্তমান নৈহাটিতে) বসবাস করেন। পদ্মনাভের পঞ্চপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ মুকুন্দ জাতিকলহে নবহট্ট ত্যাগ করিয়া বাবলা চন্দ্রদ্বীপ পরগনার যশোহরের নিকট ফতোয়াবাদে বাস করেন। তাঁহার পুত্র কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনজন—সনাতন, রূপ ও অনুপম—পরম বৈষ্ণব-ভক্তরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপালাভ করেন।

সনাতন নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা (রত্নাকর) বিদ্যা বাচস্পতির নিকট নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের সাকর মল্লিক (মহামন্ত্রী) রূপে সনাতন বিপুল বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়া রাজধানীর নিকট রামকেলি গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত বাস করিতেন। রামকেলিতেই শ্রীচৈতন্যের সহিত প্রথম সাক্ষাতে তিন ভ্রাতার চিত্তে বৈরাগ্য জন্মে এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাদের সনাতন, রূপ ও অনুপম নামকরণ করেন। কিছুকাল পরে রূপ ও অনুপম গৃহত্যাগ করিয়া প্রয়াগে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার আদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। সনাতন অসুস্থতার ভান করিয়া রাজকার্যে অনুপস্থিত হইয়া স্বগৃহে ভাগবত-শ্রবণ ও সাধন ভজনে দিনযাপন করিতে থাকিলে এবং গৌড়েশ্বরের সহিত ওড়িশাবিজয়ে যাইতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে রাজাদেশে বন্দী হন। কৌশলে বন্ধনমুক্ত হইয়া ভিক্ষুবেশে সনাতন বারাণসীতে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হন। মহাপ্রভু সনাতনকে ভক্তিতত্ত্বাদি শিক্ষা দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রেরণ করেন ও পরে পুরীতে আসিতে বলেন। পুরীধামে শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্য ও প্রেমভক্তি বিষয়ে শিক্ষালাভের পর সনাতন বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং ব্রজমণ্ডলের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশ, বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থাদি রচনা প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যের আদিষ্ট কার্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

সনাতনের রচনাবলী ১. বৃহদ্ভাগবতামৃত ২. হরিভক্তি বিলাস ও দিগ্দর্শনী টীকা ৩. লীলাস্তব (বা দশম চরিত) ৪. বৈষ্ণবতোষণী বা দশমটিপ্পনী (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা)।

মদনমোহন কুমার

সনেট বিশেষ ধরনের গঠন ও মিল-সংযুক্ত এবং চতুর্দশ পঙ্ক্তিতে সম্পূর্ণ কবিতা। সনেট রচনার সূত্রপাত হয় ইতালিতে এবং ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে দান্তেও পেত্রার্কার ('পেত্রার্কা' দ্র) মতো করিয়া সনেট রচনা

করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজী সাহিত্যে ইহার প্রবর্তন করেন স্যার টমাস্ ওয়াআট্ ও সারে। পেত্রার্কীয় সনেটের এগারোটি সিলেব্‌ল্-যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম আটটি পঙ্‌ক্তি (অষ্টম), এবং এগুলিতে মিল ক খ খ ক ক খ খক ; দ্বিতীয় ছয়টি পঙ্‌ক্তি (ষট্‌ক)-তে দুই বা তিনটি নূতন মিল, সাধারণতঃ গ ঘ গ ঘ গ ঘ, গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ, কিংবা গ ঘ ঙ ঘ গ ঙ। ইংরেজী সনেটের পঙ্‌ক্তিগুলি দশটি সিলেব্‌ল্ যুক্ত আয়ম্‌বিক ছন্দে রচিত। অনেক ইংরেজ কবি সনেটে ইতালীয় রূপের অনুসরণ করিলেও তাঁহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মিল্‌টন্ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের নাম উল্লেখযোগ্য। কীট্‌স্ ও দান্তে গ্যাব্রিএল রসেটির নামও সনেটকার হিসাবে স্মরণীয়। অন্যান্য ইংরেজ কবিরা সনেটের যে বিশেষ গঠন বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ইংরেজী বা শেক্‌স্‌পীরীয় রূপ নামে পরিচিত। এই রূপের বৈশিষ্ট্য অষ্টক ও ষট্‌কের পরিবর্তে তিনটি চার পঙ্‌ক্তির স্তবক এবং শেষে দুইটি অন্ত্যমিল-বিশিষ্ট চরণ। ইংরেজী ভাষার অন্যান্য উল্লেখ-যোগ্য সনেটকারদের মধ্যে রহিয়াছেন স্পেন্‌সার (ইঁহার সনেটের মিল কখ কখ খগ খগ গঘ গঘ ঙঙ), সিড্‌নি, এলিজাবেথ ব্যারেট্ ব্রাউনিং, মেরেডিথ্ (ইনি ষোড়শ পঙ্‌ক্তির সনেট লিখিয়াছেন), হপকিন্‌স, য়েট্‌স প্রভৃতি। সনেট গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ। সেই-জন্য সনেটে একটি অনুভূতি বা একটি হৃদয়াবেগই মূর্ত হইয়া উঠে। এই ভাবাবেগের তীব্রতা সনেটের সীমাবদ্ধ পরিসরে নিয়ন্ত্রিত হইয়া নূতন মূর্তি পরিগ্রহ করে। বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত ('মধুসূদন দত্ত' দ্র)। ফ্রান্সের ভের্সাই নগরীতে অবস্থানকালে মধুসূদন তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেন। এগুলির মধ্যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'কালিদাস', 'মেঘদূত', 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিজয়াদশমী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'পেত্রার্কা', 'ভিক্‌তর হুগো', 'পুরুলিয়া', 'বটবৃক্ষ' কিছুই বাদ পড়ে নাই। গঠনভঙ্গীতে তিনি অনেক স্থলে পেত্রার্কাকে অনুসরণ করিয়াছেন ; তবে মিল্‌টনের অনুসরণও আছে। পরবর্তী সনেটকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী এবং মোহিতলাল মজুমদার। 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বাংলা সনেট অভিনব মহিমা লাভ করিয়াছে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সন্তদাস বাবাজী (১২৬৬-১৩৪২ বঙ্গাব্দ) শ্রীহট্ট জেলার বামৈ গ্রামের ব্রাহ্মণ চৌধুরীবংশে জন্ম। পূর্বনাম তারাকিশোর চৌধুরী। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. ; কিছুদিন সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহট্ট জেলা বারে ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি ছাড়িয়া বৃন্দাবন-বাসী হন। ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়া বাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মহন্ত ও সাধুগণ মিলিয়া তাঁহাকে সন্তদাস (সাধু-দিগের সেবক) নাম ও সন্ন্যাস প্রদান করিয়া ব্রজবিদেহী মহন্তপদে বরণ করেন। সন্তদাসই বৃন্দাবনে প্রথম ব্রজ-বিদেহী বাঙ্গালী মহন্ত। তাঁহার চেষ্টায় ভারতবর্ষের বহুস্থানে নিম্বার্ক ('নিম্বার্ক' দ্র) আশ্রম স্থাপিত হয়। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি ঃ 'ব্রহ্মবাদী ঋষি ও ব্রহ্মবিদ্যা' ৪ খন্ড, 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' ৩ খন্ড, 'ভেদাভেদ দ্বৈতা-দ্বৈত সিদ্ধান্ত', শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার টীকা, 'রামদাস কাঠিয়া বাবার জীবনী' ইত্যাদি।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

সন্ধান জীবাণু অথবা ছত্রাকের সহায়তায় নানা প্রকার জৈবপদার্থকে গাঁজাইয়া তোলাকে সন্ধান (ফার্মেন্টেশন) বলে। সন্ধানের ফলে ঐ পদার্থগুলি ভাঙিয়া ক্ষুদ্রতর রাসায়নিক অণুতে পরিণত হয়। আবার কোনও কোনও সময়ে এই ক্ষুদ্র অণুগুলির পুনর্বিন্যাসে গঠিত হয় বৃহত্তর অণু। সন্ধানের সময় প্রায়ই কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড, মিথেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস-বুদ্‌বুদ্‌গুলি ভাসিয়া উঠিয়া সন্ধানপাত্রে গাঁজলা ফেনা সৃষ্টি করে। জীবাণু ও ছত্রাক-ঘটিত কোনও কোনও পরিবর্তনে গ্যাস বাহির হয় না। বিশেষ অর্থে ইহারাও সন্ধান নামে পরিচিত। মদ সন্ধান-প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি উল্লেখযোগ্য পানীয়। সকল প্রকার সুরা ও আসবের প্রধান উপাদান ইথাইল অ্যালকোহল। এই ইথাইল অ্যালকোহলের শিল্পজ ব্যবহার আবিষ্কৃত হওয়ায় শিল্প-প্রয়োজনেও ইহা প্রস্তুত করা দরকার হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানীরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন নানা জাতীয় ঈস্ট্। ইহাদের মধ্যে কোনো জাতের ঈস্ট্‌কে সুরা প্রস্তুত করিবার কাজে লাগানো হইয়াছিল। আবার কোনও কোনও জাতের ঈস্টের উপযোগিতা প্রমাণিত হয় ইথাইল অ্যালকোহল তৈয়ারি করার কারখানায়। বর্তমানে বিভিন্নদেশে অ্যাল-কোহল প্রস্তুত করার জন্য এমন সব কাঁচা মাল ব্যবহার করা হয় যাহাতে নানাপ্রকার কার্বোহাইড্রেট বর্তমান। সন্ধানের আগে সমস্ত কার্বোহাইড্রেটকে যথাসম্ভব সন্ধানযোগ্য শর্করাতে পরিণত করা হয়। কাঁচা মালের প্রকৃতি এবং সন্ধানের সময় পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের জন্য অল্প পরিমাণে বহু রসায়ন পদার্থও উৎপন্ন হইতে

থাকে। পাতন প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই মিশ্রিত পদার্থ হইতে শুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল সংগ্রহ করা হয়। অনেক দেশেই খাদ্য হিসাবে দধির বহুল প্রচলন আছে। ল্যাক্‌কোব্যাসিলাস জাতীয় জীবাণু দুধের ল্যাক্‌টোজ চিনিকে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করিলে দুধ জমিয়া দধি হয় ('দই' দ্র)। সাধারণতঃ এই জাতীয় জীবাণু এই সন্ধানশিল্পে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে লেবু, আনারস প্রভৃতি অম্লফল হইতে সিট্রিক অ্যাসিড তৈয়ারি হইত। বর্তমানে সিট্রিক অ্যাসিড বেশি পরিমাণে তৈয়ারি হয় ছত্রক সন্ধানের সাহায্যে। খাদ্য, পানীয় ও রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন ছাড়াও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণে জীবাণুঘটিত সন্ধানের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কে পুরীষাদি জৈব ক্লেদ নানাপ্রকার জীবাণু প্রভাবে তরলিত হইয়া প্রায় নির্গন্ধ জৈবসারে পরিণত হয়। কোনও কোনও পৌরসংস্থায় উপযুক্ত বৃহৎ আধারে এইরূপ ময়লা জিনিস সংগ্রহ করিয়া জীবাণুর সাহায্যে উহা গাঁজাইয়া উহা হইতে স্বল্পব্যয়ে মিথেন প্রভৃতি জ্বালানী গ্যাস তৈয়ারি করার ব্যবস্থা আছে ; অবশিষ্ট অংশ জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে।

পরিমলবিকাশ সেন

সন্ধ্যাকর নন্দী কবি সন্ধ্যাকর নন্দী উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতে শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনপুরের সন্নিকটে বৃহদ্‌বটু নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। পিতার নাম প্রজাপতি নন্দী। 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক জীবনচরিতমূলক শিলষ্ট সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া সন্ধ্যাকর নন্দী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই গ্রন্থের শ্লোকগুলিতে শ্লেষ অলংকারের মহিমায় একপক্ষে দশরথনন্দন রামচন্দ্রের ও অন্যপক্ষে গৌড়াধিপতি রামপালের চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যগ্রন্থখানি চারিটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে বিংশতি-শ্লোকাত্মক কবিপ্রশস্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে কবি তাঁহার আত্মপরিচয়, দুর্জন নিন্দা, সজ্জনপ্রশংসা ও গ্রন্থের উৎকর্ষের কথা বিবৃত করিয়াছেন।

হরিহর মিশ্র

সপুষ্পক উদ্ভিদ এ. ডব্লু. আইখ্‌লের ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় সপুষ্পক উদ্ভিদের নাম রাখেন 'ফ্যানেরোগ্রাম'। ইহাদের মূল কাণ্ড এবং পত্র আছে। ফুল হইতে উৎপন্ন বীজদ্বারা ইহাদের বংশবিস্তার হয়। ফ্যানেরোগ্রামকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—জিম্‌নোস্পার্ম বা ব্যক্তবীজী এবং এন্‌জিয়োস্পার্ম বা গুপ্তবীজী। ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের কোনও ফল হয় না, বীজগুলি অনাবৃত অবস্থায় থাকে। কিন্তু গুপ্তবীজী উদ্ভিদের বীজ ফলের অভ্যন্তরে জন্মাইয়া থাকে।

ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের প্রায় সকলেই বৃক্ষ এবং অধিকাংশের পত্র সূচ্যাকার। সাধারণতঃ ইহারা ঝাউগাছ বলিয়া পরিচিত। সমতল ভূমির 'সাইকাস' ও শীতল পার্বত্য-অঞ্চলের পাইন ও ঝাউ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রায় ১০ কোটি বৎসর পূর্বে মেসোজোয়িক পিরিয়ডে ইহারা পৃথিবীর বহু স্থানে নিবিড় অরণ্য সৃষ্টি করিত। ইহাদের বিভিন্ন গণের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এখনও পৃথিবীতে কোনও কোনও স্থানে অতিবৃহৎ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্যালিফোর্নিয়ার সুবৃহৎ 'রেড উড' বৃক্ষ প্রায় ৩৬৪ ফিট উচ্চ হয় এবং Sequoia Gigantia প্রায় ২৯৩ ফিট উচ্চ হয়। কোনও কোনও বৃক্ষের বয়স আনুমানিক ৪৫০০ বৎসর এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গুঁড়ির ব্যাস প্রায় ৩৭ ফিট।

বীজপত্রের সংখ্যা অনুসারে গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় : দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী। গুপ্তবীজী উদ্ভিদের সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় ৪০০০০ একবীজপত্রী। গুপ্তবীজী উদ্ভিদ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিভিন্ন আবহাওয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্ত ক্ষুদ্র উদ্ভিদ হইতে মেহগিনি, শিরীষ ও বটের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অজস্র পুষ্পসম্ভার ডালিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, অর্কিড প্রভৃতি ফুল এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য খাদ্য, বস্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি এই এন্‌জিয়োস্পার্ম উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়।

দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পত্রের শিরাবিন্যাস জালিকার ন্যায় এবং ইহাদের সাধারণতঃ একটি প্রধান মূল থাকে। ইহাদের নালিকাবাণ্ডিল বলয়াকারে সাজানো থাকে এবং কাণ্ডের বেধ ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। এইজন্য আম, কাঁঠাল, বট প্রভৃতি বৃক্ষের কাণ্ড প্রস্থে বাড়িয়া থাকে। আদা, হলুদ, কচু প্রভৃতি একবীজপত্রী উদ্ভিদের ভূগর্ভস্থ কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চিত থাকে ; ইহাদের পত্রের শিরাবিন্যাস সমান্তরাল এবং নালিকাবাণ্ডিল বিক্ষিপ্তাকারে থাকায় ইহাদের বেধের বৃদ্ধি হয় না।

সুনীলকুমার ভট্টাচার্য

সপ্তগ্রাম, সাতগাঁ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার মগরা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। হুগলি শহরের উত্তরে সরস্বতী নদীর বাম তীরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত। গ্রামের আয়তন ১২৬.৭৪ একর।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুসারে মোট জনসংখ্যা ৫০৬, তন্মধ্যে ২৭২ জন পুরুষ ও ২৩৪ জন স্ত্রীলোক। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ১৪৬ ও স্ত্রীলোকের ৭৪। ব্যান্ডেল স্টেশনের পরে আদিসপ্তগ্রাম (পূর্বনাম ত্রিশবিঘা) নামে একটি স্টেশনও আছে। বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বচোরা ও বলদঘাটি লইয়া সপ্তগ্রাম। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বে কিছু ভগ্নাবশেষ ছাড়া সপ্তগ্রামের লুপ্ত গরিমার কোনও চিহ্ন বা সাক্ষ্য এখন আর নাই। পূর্বে ভাগীরথীর জলরাশি সরস্বতীর খাতে প্রবাহিত হইত ও সপ্তগ্রাম ছিল পূর্বভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ও শহর। ১১শ হইতে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার গৌরব বজায় ছিল ('কলিকাতা' দ্র)। ১৭শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তগ্রামের মহিমা খর্ব হয়। শেরশাহ সপ্তগ্রাম হইতে দিল্লী পর্যন্ত যে রাস্তা নির্মাণ করেন তাহাই গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে পরিচিত।

সলিলকুমার চৌধুরী

সপ্তর্ষি একটি প্রসিদ্ধ তারামণ্ডল, অনেকেই এই মণ্ডলের সহিত পরিচিত। আমাদের দেশে এই মণ্ডলকে চৈত্রমাসের সান্ধ্য আকাশে উত্তর-পূর্ব দিকে দেখা যায়। বৈশাখ সন্ধ্যায় ইহা আরও উপরে আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যায় এই মণ্ডলকে মধ্যরেখা অতিক্রম করিতে দেখা যায়।

সপ্তর্ষি একটি বড় মণ্ডল, ইহার আর এক নাম বৃহৎ ঋক্ষ (great bear)। এই মণ্ডলে সাতটি বেশ উজ্জ্বল তারাকে একটি লাঙলের আকারে বা জিজ্ঞাসা চিহ্নের আকারে দেখা যায়। সাতজন প্রসিদ্ধ ঋষির নামানুসারে এই সাতটি তারার নাম। জিজ্ঞাসা চিহ্নের আরম্ভ হইতে যথাক্রমে ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। বশিষ্ঠের কাছে একটি অতি ক্ষীণপ্রভ তারা আছে। ঋষি বশিষ্ঠের সাধ্বী পত্নীর নামানুসারে ইহার নাম অরুন্ধতী। বিবাহের সময় নববধূকে সতীত্বের আদর্শ স্থানীয়া অরুন্ধতী দর্শন করাইবার প্রথা আছে।

সপ্তর্ষির পুলহ এবং ক্রতুকে একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া নীচের দিকে বাড়াইয়া দিলে উহা একটি মাঝারি উজ্জ্বল তারার পাশ দিয়া যায়। এই তারাটির নাম ধ্রুবতারা। নিকটে আর কোনও উজ্জ্বল তারা না থাকায় ধ্রুবতারাকে চিনিতে অসুবিধা হয় না; ধ্রুবতারা উত্তরদিকে একই স্থানে স্থির আছে বলিয়া মনে হয়। এজন্য ধ্রুবতারা রাত্রে দিক্‌ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

কামিনীকুমার দে

সপ্তশতী (গাথা) বা গাহাসত্তসঈ। মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষায় রচিত কয়েকশত গাথার প্রাচীনতম সংকলন। নামে সপ্তশতী থাকিলেও পুঁথিতে শ্লোকসংখ্যার বিভিন্নতা দেখা যায়। সাতবাহনরাজ হাল-এর নামে চলিলেও অনেক কবিরই কবিতা ইহাতে আছে। কোনও কোনও পুঁথিতে অধিকাংশ কবিতার কবিদের নামও আছে; এমন কি কয়েকজন মহিলা-কবির নামও পাওয়া যায়। সংকলনটি এক সময়ে ঘটে নাই। কয়েক শতাব্দীর যোগে সংকলন সম্পূর্ণ। বাণ প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা সংকলনটিকে 'সপ্তশতী' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। 'হর্ষচরিত'-এ বাণভট্ট এটিকে সাতবাহনের রচনা বলিয়াছেন। সাতবাহন রাজাদের কাল খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন, ভাষার সঙ্গে এই কালের সঙ্গতি নাই। ইঁহাদের মতে গাথা সপ্তশতীর শ্লোক সংকলন ৪০০ হইতে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে হইয়া থাকিতে পারে। সপ্তশতীর সব কবিতাই শৃঙ্গার-রসাত্মক। ইহার অনেকগুলি কবিতা দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলের সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করা হয়। সংকলনটি সর্বভারতীয় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। মম্মট, আনন্দবর্ধন, বিশ্বনাথ প্রভৃতি আলংকারিকেরা তাঁহাদের গ্রন্থে ইহা হইতে বিভিন্ন অলংকারের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অজিত দত্ত

সবজি বাংলার সরস মাটিতে কিছু লাগাইয়া যত্ন করিলেই তাহা হইতে প্রচুর শাক-সবজি পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণে আলো-বাতাস পায় এমন জমিতেই সবজির চাষ করা উচিত। জল দাঁড়ায় না এইরূপ দোআঁশ মাটি এই চাষের উপযোগী। মাটি ভাল করিয়া তৈয়ারি করার পর ইহাতে পচানো গোবর বা কম্পস্ট দিতে হইবে। পরে গাছ বড় হইলে রাসায়নিক সার প্রয়োজন মত অথবা বাজারের প্রচলিত মিশ্রসার পরিমাণ মত বারে বারে দিতে হয়। বরবটি, লাউ, কুমড়া, শশা, তরমুজ, ফুটি, করলা ইত্যাদির বীজ বপন করিয়া গাছ হইলে ইহাকে মাটিতে ছড়াইয়া অথবা মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। ডাঁটা, পালং, মটর ইত্যাদি ছিটাইয়া বোনা হয়; তবে লাইনেও বোনা চলে। কপি, টমাটো, বেগুন, শালগম, গাজর ইত্যাদির চারা লাইনে বসাইতে হয়।

পোকা-মাকড় ইত্যাদির হাত হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করা দরকার। পাতা কুঁকড়াইয়া গেলে বুঝিতে হইবে ভাইরাস রোগের আক্রমণ হইয়াছে। এ অবস্থায় গাছ উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বর্তমানে নানাপ্রকার রোগ ও কীটনাশক বস্তু বাজারে পাওয়া যায়; প্রয়োজন মত তাহাও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

সবরমতী পশ্চিম ভারতের একটি নদী। ইহা আরাবল্লী পর্বত হইতে বাহির হইয়া কাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩২০ কি. মি.। সবর ও হাতীমতী এই দুইটি নদীর যুক্তধারাই সবরমতী। সবরমতী নদীর অপর পারে আহমদাবাদের উপকণ্ঠে গান্ধীজির আশ্রম ছিল। এই আশ্রম উঠিয়া গেলে (১৯৩৩ খ্রী) সেখানে হরিজন শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়। পরে আশ্রমবাসীরা ভূদানযজ্ঞে ব্রতী হন।

উষা সেন

সবুক্তগীন সবুক্তগীন ছিলেন গজনীরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলপ্তগীনের জামাতা। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই ভারতে সুপরিকল্পিত তুর্কী অভিযান আরম্ভ হয়। তাঁহার ভারত-অভিযানের প্রথম ও প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন পাঞ্জাবের শাহীবংশের রাজা জয়পাল ('জয়পাল' দ্র)। সবুক্তগীন দুইবার রাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আফগানিস্তান ও পেশোয়ার দখল করেন। সবুক্তগীন ভারতের অন্তর্দেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই সত্য কিন্তু তিনি তুর্কীদের ভারত-অভিযানের পথ সুগম করেন। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতুলচন্দ্র রায়

সমতট সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণলিপিতে সমতট কামরূপ ও নেপাল প্রভৃতি সীমান্ত করদ রাজ্যের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমতট একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল—কিন্তু ইহার রাজারা গুপ্তসম্রাট্কে কর দিতেন, তাঁহার নির্দেশ মানিতেন এবং মাঝে মাঝে গুপ্তসম্রাটের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। সমতট পূর্ব-বঙ্গে (বর্তমান বাংলা দেশে) অবস্থিত ছিল—কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বৃহৎ-সংহিতা গ্রন্থে সমতট ও বঙ্গ দুইটি পৃথক্ রাজ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন-ৎসাঙ লিখিয়াছেন যে, ইহা কামরূপ অর্থাৎ আসামের দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল এবং এই রাজ্যের পরিধি ছিল প্রায় ৮০০ কি. মি. এবং ইহার রাজধানী প্রায় ৬ কি. মি. ব্যাপী ছিল। রাজভট নামে সমতট রাজ্যের এক রাজার রাজধানী ছিল কুমিল্লার নিকটে। কুমিল্লা হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাজ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ জানা নাই। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সমতট নামক রাজ্য বা প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সমবায় প্রকৃষ্টতর কৃষিকার্য, প্রকৃষ্টতর ব্যবসায় এবং প্রকৃষ্টতর জীবনযাত্রাগত অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মিলিত প্রচেষ্টা সমবায়ের আদর্শগত ভিত্তি। উনিশ শতকে কৃষি-অর্থনীতির দুরবস্থা হইতে মুক্তির উপায় হিসাবে ইওরোপে (প্রথম জার্মানিতে) এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ইওরোপে এই আন্দোলন মোটামুটি ৫টি ধারায় প্রবাহিত ছিল ঃ পণ্য উৎপাদন, পণ্য সরবরাহ, পণ্য বিক্রয়, ঋণদান ও বীমা। বর্তমানে সমবায়-কৃষি সংগঠন ইহারই অন্যতম ফল হিসাবে বিভিন্ন দেশে দেখা দিয়াছে। জার্মানিতে গ্রাম্য ও পৌর এই দুই ধরনের সমিতির প্রবর্তন ঘটে এবং পরে প্রায় সকল দেশে উহা অনুসৃত হয়। গ্রাম্য-সমবায়-সমিতিগুলির প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল জার্মান সমাজসংস্কারক রাইফাইজেন-এর অনুপ্রেরণা। কৃষিঋণের অভাব মোচনের জন্য তিনি যে ধরনের সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছিলেন ইওরোপ ও এশিয়ায় বিভিন্ন দেশে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে। নগরাঞ্চলে দরিদ্র কারিগর ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যেও সমবায়নীতি জার্মানিতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পৌর সমবায় সমিতিগুলিও এই জার্মান-পদ্ধতি আশ্রিত। অবশ্য বর্তমানে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, বীজ, সার, ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি সরবরাহ, ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক, গৃহনির্মাণ, বীমাকার্য ইত্যাদি বহু কিছুই সমবায় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ভারতে সমবায় ঃ ভারতবর্ষে সমবায়-আন্দোলন কৃষি-ঋণদান আন্দোলন হিসাবেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৯ শতকের শেষভাগে ভারতে যখন কৃষিঋণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে তখন স্যার উইলিয়াম ওয়েদার বার্ন, জাস্টিস রাণাডে প্রমুখ মনীষী ব্যক্তিরা ভারতে সমবায়-ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দেন। ফলে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সমবায় ঋণদান-সমিতি আইন পাশ হওয়ার মধ্য দিয়া ভারতে সমবায়-ব্যবস্থার উদ্বোধন ঘটে। এখানেও সমিতিগুলিকে ইওরোপের মত গ্রাম্য ও পৌর এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তবে জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলির মত ভারতবর্ষে এই আন্দোলন দুঃস্থ জনসাধারণ, কারিগর ও কৃষকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হিসাবে শুরু হয় নাই, প্রধানতঃ সরকারি উদ্যমেই এই ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সমবায় সমিতি আইন পাশ হয়। এই আইনের পর দুগ্ধ সরবরাহ, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়, গবাদি পশুবীমা, সুতা ও সার ক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নূতন ধরনের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার সহিত কৃষিঋণ-বিভাগ সংযুক্ত হওয়ায় সমবায়-আন্দোলন বিশেষভাবে উপকৃত হয়।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ইহার ফলে, সমবায় আন্দোলন আরও কিছুটা জোর পায়। বিভিন্ন প্রদেশে অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ক্রেতাদের সমবায় সমিতি এবং উৎপাদক যাহাতে পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে সেই জন্য সমবায় বিক্রয়-সমিতি সংগঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হইলে এই আন্দোলন আরও গুরুত্ব পায়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-অর্থনীতির উপর গুরুত্বও দেওয়া হয়, উপরন্তু সমবায় পন্থায় পল্লী সংগঠন ও উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কুটির-শিল্পের প্রসারের উপরও জোর দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারের ফলে সমবায় আন্দোলনের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে গ্রামবাসীরা যাহাতে সমবায় আন্দোলনের সুফল লাভ করিতে পারে সেজন্য বিভিন্ন থানায় এবং পঞ্চায়েতে সেবা প্রতিষ্ঠান ও যৌথ সমবায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়

সমাজতন্ত্রবাদ একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দার্শনিক মতবাদ। ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদের বিরোধী। যদিও প্রাচীন গ্রীক ও রোমান চিন্তানায়কদের এবং ক্রিশ্চান ধর্মযাজকদের রচনায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমালোচনা ও সাধারণ মালিকানার স্বপক্ষে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, সমাজতন্ত্রবাদের বর্তমান রূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত। সমাজতন্ত্রবাদের স্থূল কথা ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি। উৎপাদনের উপাদান সামগ্রিকভাবে সমাজের অধিকারে থাকিবে। পরিকল্পিত উপাদান, বণ্টন ও বিনিময়ের মাধ্যমে কল্যাণ এবং স্বাচ্ছন্দ্য সমগ্র সমাজের জন্য আহৃত হইবে। ধনহীনদের উপর ধনবান্‌দের চাপের সমালোচনার সূত্রে সমাজতন্ত্রবাদের আভাস পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর ম্যাবলি, নেকার, রুশো এবং অপরাপর লেখকদের লেখায়। ঐ শতাব্দীতেই . বাবুফ্ ফরাসী সরকারের উচ্ছেদের বাসনায় 'সমানদের ষড়যন্ত্র' পরিচালনা করিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলেও সমাজতন্ত্রবাদের সকল গোষ্ঠীরই মূলমন্ত্ররূপে আজও উৎপাদনের সর্বজনীন মালিকানার ভিত্তিতে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী অর্জনই লক্ষ্য হিসাবে রহিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রবাদের সমর্থকদের মধ্যে সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়া, রবার্ট আওএন এবং লুই ব্ল্যাংক-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক চিন্তাধারার নায়ক হইতেছেন কার্ল মার্ক্‌স ('মার্ক্‌স, কার্ল হাইনরিখ' দ্র) ও ফ্রিড্‌রিষ এঙ্গেল্‌স ('এঙ্গেল্‌স, ফ্রিডরিষ' দ্র)। ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য ক্রমশঃ খারাপই হইতে থাকিবে, সুতরাং বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বজনীন মালিকানার প্রতিষ্ঠাই একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আর্থিক সাচ্ছল্য জীবনধারণের মানে যে উন্নতি আনে তাহাতে সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তাধারায় কিছু পরিবর্তন আসে। ক্রমান্বয়বাদী বা গ্রাজুয়ালিজম্‌-এর আবির্ভাব সেইখানেই। ইঁহারা বুর্জোয়া-সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অপর মতবাদীরা মৃতপ্রায়-সমাজে থাকা অপেক্ষা স্বতন্ত্র থাকা পছন্দ করিতেন। সমাজতন্ত্রবাদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে মতবাদের বিভিন্নতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সম্পূর্ণতা পায় এবং সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ভিন্নরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় পর্যন্ত ইওরোপে বহু সমাজতন্ত্রবাদী দলের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রবাদীরা বিরোধী দলরূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত অর্থ এবং মূল সূত্র লইয়া বিতর্কের সমাপ্তি আজও হয় নাই। কিন্তু মার্ক্‌সীয় ও অমার্ক্‌সীয়, স্থিতিবাদী ও চলনশীল বা উদার, বিপ্লববাদী ও ক্রমান্বয়বাদী প্রভৃতির মধ্যে মতানৈক্য যাহাই থাক না কেন, এক বিষয়ে সকলেই একমত যে, সম্পত্তি, উৎপাদনের উপাদান বা আয়ের উৎস সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সর্বজনের (অন্ততঃ বহুজনের) কল্যাণ-সাধনই সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য। এই সমাজতন্ত্রবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের অবাঞ্ছনীয় দিক্‌গুলিকে বাদ দিবার প্রয়াসী।

ভারত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যাবলীর তালিকায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনকে রাখিয়াছিল এবং বর্তমানেও সমাজতন্ত্রবাদকেই রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসাবে ধরা হইয়াছে।

আদ্যাশক্তিপ্রসাদ রায়

সমাজমনোবিদ্যা বিভিন্ন সামাজিক সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-মনের আলোচনার নাম সমাজমনোবিদ্যা। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান এবং বিচিত্র সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে যে মনোবৃত্তি ক্রিয়াশীল তাহার প্রকৃতি ও প্রকাশের নিয়মাবলী এই শাস্ত্র আলোচনা করে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি, ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠী, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠী যে সম্বন্ধে আবদ্ধ তাহার প্রকৃতি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই সম্বন্ধের মানসিক ভিত্তি আবিষ্কারও এই শাস্ত্রের অন্তর্গত। গোষ্ঠী-চেতনা, জনতার মনস্তত্ত্ব উচ্ছৃঙ্খল জনতার মানসিকতা, দলনেতার বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলী, দলনেতার শ্রেণীবিভাগ, নেতৃত্বগঠনের শিক্ষা, নেতার মানসিক বিবর্তন প্রভৃতিও এই শাস্ত্রের আলোচ্য

বিষয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কারের মধ্যে যে মানসিকতা প্রকাশিত তাহার রীতিনীতিও এই শাস্ত্রের আলোচনার বিষয়। কোন বিশেষ সমাজে যে নীতিবোধ প্রচলিত, যে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কাঠামো বর্তমান, ইহার মধ্যে যে মানসিকতা প্রতিফলিত, তাহাও এই শাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়। সে জন্যই বলা হয় যে, সমাজ-জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে মন প্রকাশিত তাহার সামগ্রিক আলোচনাই সমাজমনোবিদ্যা। মনোবিদ্ ভুণ্ট সর্বপ্রথম সমাজমনোবিদ্যার ধারা আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি সভ্যজাতির সঙ্গে তুলনা করিয়া আদিবাসী সাধারণ মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগালকে সাধারণতঃ সমাজমনোবিদ্যার পথিকৃৎ বলা হয়। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি (ইন্‌স্টিংক্‌ট্‌স্) গোষ্ঠীভবনে কিভাবে সাহায্য করে তিনি সেই প্রসঙ্গের উপরই অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন। যৌনপ্রবৃত্তি এবং ইহার অবদমন সামাজিক জীবনে কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তাহা ফ্রয়েড্ ('ফ্রয়েড্' দ্র) বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অধুনা বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

নীরদবরণ চক্রবর্তী

সমাজশিক্ষা বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা ব্যবস্থার নাম। এ-বিষয়ে কয়েকটি নীতি আছেঃ ১. নিরক্ষরতা দূর করা ; ২. সমাজের উপযুক্ত 'ব্যক্তি' হইতে সাহায্য করা ; ৩. স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে জ্ঞানদান ; ৪. দৈনন্দিন কার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহারে সাহায্য দান ; ৫. দেশ ও বৃত্তিবিষয়ে (ভোকেশন) নানা সংবাদ ও কার্যকৌশল জানিতে সাহায্য করা ; ৬. অবসর-বিনোদন সুন্দরভাবে কিরূপে করা যায় তাহা জানিতে সাহায্য করা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে সমাজশিক্ষায় এই নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই কার্যের সহায়ক হিসাবে সমাজগোষ্ঠী উন্নয়নের বিভাগ (কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লক) স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভাগে প্রতি ১০০টি গ্রামে দুইজন কর্মচারী থাকেন— একজন সমাজশিক্ষা সংগঠনকারী (সোস্যাল এডুকেশন অর্গানাইজার) আর একজন মুখ্য সেবিকা। ইঁহাদের কার্য পরিদর্শনের জন্য আছেন জেলা-সমাজশিক্ষা সংগঠনকারী। তাঁহার উপরে রাজ্য সরকারের একজন অধিকর্তা। গ্রামের প্রতিনিধিদের শিক্ষণের জন্য রাজ্য সরকার-পরিচালিত জনতা কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। সমাজশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নানা প্রকার কাজ আছেঃ ১. গ্রন্থ প্রকাশন ; ২. নূতন পুস্তকের জন্য পুরস্কার দান ; ৩. শিক্ষাদাতাদের জন্য সাহিত্যরচনার ব্যবস্থা ; ৪. ইউনেস্কো কর্তৃক পরিচালিত নূতন বয়স্ক শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য ; ৫. উপযুক্ত কোষগ্রন্থ প্রকাশন।

শিল্প কারখানার কর্মীদের শিক্ষার জন্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোরে 'কর্মীদের সমাজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছে। এই সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে এই শিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সমাজ-শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে নিরক্ষরতার হার ইতিমধ্যে বেশ কিছুটা কম হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৩১০১টি এইরূপ সমাজশিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এখানে বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০৮১৭০ জন, ইহার মধ্যে ৮৬৪৫৯ জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে।

সুধীরকুমার রায়

সমুদ্র জলরাশির দ্বারা আবৃত ভূপৃষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলকে সমুদ্র বা মহাসাগর বলা হয়। সমুদ্র-অঞ্চল প্রধানতঃ প্রশান্ত, আটলাণ্টিক, ভারত, উত্তর ও দক্ষিণ মহাসাগরে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরই সর্ববৃহৎ। মহাদেশের কিছু অংশ সমুদ্রের ভিতরে ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহাকে মহীসোপান বলে। মহীসোপান যে-অংশে খাড়াভাবে সমুদ্রের তলদেশ অবধি নামিয়া গিয়াছে, সে-অংশকে মহীঢাল ও সমুদ্রের তলায় বিস্তৃত সমভূমিকে তলদেশ বলা হয়। স্থলভাগ হইতে বায়ু, নদী প্রভৃতি দ্বারা বাহিত অবক্ষেপ (কর্দম, বালুকাদি) মহাসাগরে নীত হয়। ইহা ছাড়া সামুদ্রিক জীবজন্তুর দেহাবশেষও এই তলদেশে সঞ্চিত হয়। গভীর সমুদ্রের সামুদ্রিক প্রাণীর বিভিন্ন পদার্থের সঞ্চয়কে সিন্ধুমল বলা হয়। এই সিন্ধুমলে শামুক ও ঝিনুকের ভগ্নাবশেষ, গ্লোবিজেরিনা, ডায়াটাম্, রেডিওলারিয়া প্রভৃতি থাকে। গভীর সমুদ্রে এইরূপ বিভিন্ন প্রকার সিন্ধুমল সঞ্চয় ছাড়া অজৈব সঞ্চয়ের মধ্যে লোহিত কর্দম প্রধান। সমুদ্রের জলে লবণাদি বহু পদার্থ দ্রব অবস্থায় থাকে। সমুদ্র সর্বদা আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলনই সমুদ্রতরঙ্গ। তরঙ্গের জল স্থানান্তরে গমন করে না। উষ্ণতার তারতম্য, বাষ্পীভবন ও বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য প্রভৃতি নানা কারণে সমুদ্রস্রোত এক অংশ হইতে অন্য অংশে প্রবাহিত হয়।

জাহ্নবী বাগচী

সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তবংশের দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পিতা গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও মাতা লিচ্ছবি-বংশীয়া কুমার দেবী। পরবর্তী গুপ্ত-রাজগণের সমুদয় বংশতালিকাতেই সমুদ্রগুপ্ত 'লিচ্ছবি

দৌহিত্র' এই বিশেষ সংজ্ঞাতে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি পরাক্রান্ত লিচ্ছবিজাতির সাহায্যেই বিশেষ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে সম্রাট্ অশোকের লিপিযুক্ত একটি স্তম্ভের গাত্রে এক সুদীর্ঘ গদ্যে-পদ্যে রচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত অনন্যসাধারণ গুণাবলী ও তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'তিনি সংগীত বিশারদ ও দৈহিক শক্তিশালী রাজা ছিলেন'—শিলালেখের এই উক্তি তাঁহার মুদ্রায় বীণাবাদনরত ও ব্যাঘ্রহননকারী রাজমূর্তি দ্বারা সমর্থিত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গদেশ হইতে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গ, আসাম, নেপাল রাজ্য এবং পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশের অনেক গণতন্ত্রশাসিত দেশ হইতে তিনি কর আদায় করিতেন। দক্ষিণ ভারতে তিনি কাঞ্চীনগর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বারজন রাজাকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা কর দিতে স্বীকার করিয়া পুনরায় স্বীয় স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের শক ও কুষাণ রাজগণ নামতঃ স্বাধীন থাকিলেও নানাভাবে গুপ্ত-সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুদূর লঙ্কাদ্বীপ ও ভারত মহাসাগরের অন্যান্য অনেক দ্বীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি লুপ্ত-প্রায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন সত্য সত্যই 'সমরশতবিজয়ী'। একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তাহার অনতিকাল পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সরকারি আয়-ব্যয়নীতি ভারত সরকারের আয়ের প্রধান উৎস হইল কর, রেলপথ ও ডাক-তার বিভাগের লাভের অংশ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক হইতে আগম এবং সরকারি শিল্প-ব্যবসায়ে অর্জিত উদ্বৃত্ত। ভারতের মত সংযুক্ত রাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে একাধিক সমস্যা দেখা যায়। প্রথমতঃ যাহাতে অঙ্গরাজ্যগুলির বেশ খানিকটা আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে তাহা দেখা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, কর ও অন্যান্য আগম কি করিয়া নিখুঁতভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা দেখা দরকার। তৃতীয়তঃ জনসংখ্যা না প্রয়োজন, কোন্‌টিকে ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য অঙ্গ-রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা উচিত তাহা স্থির করা আবশ্যক। যে সমস্ত ব্যাপার রাজ্যসমূহের আওতায় পড়ে সেইগুলির উন্নয়ন সম্ভবপর করার জন্য কেন্দ্রকে ঋণ ও সাহায্য দিতে হয় অংশ-রাজ্যগুলিকে। সেইভাবে আয়কর ও (কয়েকটি) আবগারির মত আয়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল করের ক্ষেত্রে কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত রাজস্বের অংশবিশেষ দেওয়া হয় রাজ্যগুলিকে। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে অসুবিধা ও বাধা থাকার ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজস্বের জন্য পরোক্ষ কর (যেমন বিক্রয় কর, আবগারি-শুল্ক)-এর উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়। আবশ্যক-দ্রব্যের উপর অল্পহারে ও শৌখিন জিনিসের উপর উচ্চহারে কর বসাইয়া পরোক্ষ কর ব্যবস্থাকে উন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত করা সম্ভব। যাহাদের কর দেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাহাদের ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর অধিক কর আরোপ করা যাইতে পারে ; সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে দরিদ্র-শ্রেণীর নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর অযথা কর বৃদ্ধি করা না হয় সেদিকে সতর্ক হওয়া উচিত। সরকারি ব্যবস্থার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রত্যাশিত আয় প্রায়ই অর্জন করা যায় না। ইহার জন্য উন্নত সংগঠন-পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রচলিত কর হইতে সংগৃহীত মোট রাজস্বের পরিমাণের ভিতর ব্যয়কে আবদ্ধ না রাখিয়া দরকার হইলে মন্দার সময় সরকারি খরচ বাড়াইয়া দিয়া কাজের যোগান বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহার জন্য বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলেও আক্ষেপের কারণ নাই। ভারতের সরকারি ব্যয়ের একটা বিবর্ধমান অংশ নিয়োজিত হয় নানা উন্নয়ন-পরিকল্পনায়। উন্নয়ন ও বণ্টনের উদ্দেশ্য মিটাইতে যেমন বাজেটে ব্যয় বাড়ে, জন-সংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধির ফলে শাসন-সংক্রান্ত খরচ, লোক-কল্যাণের যাবতীয় ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উপর ব্যয় তেমনি আরও ঊর্ধ্বগামী হয়। সরকারি আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই সব দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভারত সরকারের মোট ব্যয় প্রতিরক্ষা, অসামরিক ও মূলধন-সংক্রান্ত এই তিনটি খাতে নিয়োজিত হয়। উন্নয়নমূলক খরচ, স্থায়ী ঋণ শোধ ও রাজ্যগুলিকে কর্জদান একটা স্বতন্ত্র মূলধন বাজেটের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যয় বহনের জন্য কর ও সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের লাভের উপর বেশি নির্ভর করিতে হইবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য বর্ধিত উৎপাদনের বেশি ভাগ অংশই করের মাধ্যমে সরকারের আয়ত্তে আনা যাইবে। সেইভাবে করনীতির পুনর্বিন্যাস করিলে কর হইতে সরকারের প্রান্তিক আয় তার গড় রাজস্ব অপেক্ষা বেশি হইবে। এই রকম ব্যবস্থায় যাহাদের আয় অন্য অনেকের চাইতে বাড়িয়া যাইতেছে এবং যাহাদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের উপর করভার চাপানো যাইবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

সরফরাজ খাঁ মুর্শিদকুলী খাঁর একমাত্র সন্তান জিনৎ উন্নেসা বেগমের একমাত্র সন্তান সরফরাজ খাঁ। মুর্শিদ-কুলী খাঁ ('মুর্শিদকুলী খাঁ' দ্র) সরফরাজ খাঁকেই তাঁহার পরে বাংলার নবাব নির্বাচন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা সরফরাজ খাঁর পিতা সুজাউদ্দীন খাঁ কটক হইতে আসিয়া বাংলার মসনদ দখল করিলেন (১৭২৭ খ্রী)। সুজাউদ্দীনের দেহান্তে (১৭৩৯ খ্রী) সরফরাজ খাঁ বাংলার নবাব-পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি দুশ্চরিত্র ও অকর্মণ্য ছিলেন। এই সময় আলীবর্দী খাঁ বিহার প্রদেশের নায়েব সুবেদার অর্থাৎ ডেপুটি গভর্নর। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহম্মদ নবাবের কয়েকজন অমাত্যের সহিত চক্রান্ত করিয়া সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে (২২ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে গিরিয়ার মাঠে সরফরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান (১৭৪০ খ্রী)। তখন আলীবর্দী ('আলীবর্দী খাঁ' দ্র) বাংলার নবাব হইলেন।

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫ খ্রী) পিতা জানকীনাথ ঘোষাল, মাতা রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি দেশপ্রেমিক এবং সাহিত্য ও সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মজিজ্ঞাসাও তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিক্। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তো ছিলই, তাহাছাড়া তিনি স্বামী বিবেকানন্দের এবং ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেথুন কলেজ হইতে ইংরেজী অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত সমাজসেবী ব্যবহারজীবী রামভজ দত্তচৌধুরীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সরকারী রোষ অগ্রাহ্য করিয়া কিছুদিন তাঁহার প্রবর্তিত 'হিন্দুস্থান' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেও 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনার সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯০১ খ্রী) তাঁহার 'অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী' গানটি গাওয়া হইয়াছিল। আরও অনেক গান তিনি রচনা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন। যুবকগণকে বীরধর্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ব্যায়ামাগার এবং লাঠি ও ছোরাখেলার আখড়া প্রতিষ্ঠায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। বিজয়াদশমীর দিন 'বীরাষ্টমী-ব্রত' তাঁহার উদ্‌যোগে অনুষ্ঠিত হইত।

রচিত পুস্তক : 'শতগান', 'নববর্ষের স্বপ্ন' (গল্প), 'জীবনের ঝরাপাতা' (আত্মকথা), 'শিবরাত্রি পূজা' প্রভৃতি।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী১ ১. নদীনাম। ঋগ্‌বেদে প্রসিদ্ধ এবং 'দেবী মহিমায় উন্নীত। একমতে এই নদী সিন্ধুর সহিত অভিন্ন, অন্যমতে মধ্যদেশে দৃষদ্বতীর সহযোগী এবং কুরুক্ষেত্রের কাছে বিনশনপ্রাপ্ত। পৌরাণিক ধারণায় সরস্বতী অন্তঃ-সলিল হইয়া আসিয়া প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ('সরস্বতী২' দ্র)।

২. ভাগীরথীর শাখানদী, হুগলির কিছু উপর হইতে বাহির হইয়া আবার ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। পূর্বে সাগরে পড়িত এবং তখন ইহা ভাগীরথীর প্রধান খাত ছিল।

৩. নদী দেবতা হইতে সরস্বতী বৈদিক ভাবনায়, পুষ্টি, আরোগ্য, শ্রী ও ধনের দেবতায় পরিণত হইয়াছিল। সেই অর্থে ইহা ইলার সমার্থক। পরে এই জলস্রোত ও দেবতা দুইটি রূপ লইয়াছিল। এক রূপে বাগ্‌দেবতা, অপর রূপে শ্রীদেবতা। বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বাগ্‌দেবতা সুন্দরী নারীরূপে অসুরদের মোহিত করিয়া দেবতাদের অমৃত আহরণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইনিই আমাদের পরিচিত দেবী সরস্বতীর পূর্ব রূপ।

মেধা ও বিদ্যার দেবতারূপে সরস্বতী স্বতন্ত্রভাবে আগে পূজা পাইতেন না। শুধু দুর্গার সহচরী (বা কন্যা)-রূপে দশভুজা প্রতিমার অঙ্গরূপে পূজা পাই-তেন। এদেশে পড়ুয়ারা বসন্ত পঞ্চমী দিনে যে বিদ্যা-দেবীর পূজা করিতেন, তিনি শ্রীদেবীর সহিত অভিন্ন। শ্রীপঞ্চমী নামেই ইহার প্রকাশ। পূজায় যবশীর্ষ ইত্যাদির নৈবেদ্যও তাহা প্রমাণ করে। বিদ্যাদেবীরূপে পূজায় তাঁহার প্রতীক ছিল পুস্তক, মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনী। মূর্তি গড়িয়া সরস্বতী পূজা উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতায় প্রবর্তিত হয়।

সুকুমার সেন

সরস্বতী২ ভারতবর্ষে ছোট-বড় তিনটি নদীর নাম সরস্বতী। ইহাদের মধ্যে প্রধান ও স্বনামখ্যাত সরস্বতী পাঞ্জাবের আম্বালা জেলার সীমান্তে শিরমুর পাহাড় হইতে উৎসারিত হইয়া সমভূমিতে পতিত হইয়াছে। অতঃপর কখনও বালুতলে অদৃশ্য, কখনও বা উপরে দৃশ্যমান হইয়া পাতিয়ালায় খগ্গর নদীতে যুক্ত হইয়াছে। মোট দৈর্ঘ্য ১৭৬ কিলোমিটার।

পুণ্যসলিলা সরস্বতী বহু প্রাচীনকাল হইতে বিদিত এবং বেদে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতের আর একটি নদীর নাম সরস্বতী। ইহা আরাবল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত হইতে উৎসারিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার জল হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র। উৎসস্থলের অম্বা ভবানীর মন্দিরটি বিখ্যাত ও প্রাচীন। সরস্বতী নামে খ্যাত তৃতীয়

নদীটি পশ্চিম বাংলায় হুগলি জেলায় ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী হইতে নির্গত হইয়া হুগলি ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া গিয়া পুনরায় ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্বে ইহাই ছিল ভাগীরথীর প্রধান খাত, বড় বড় জাহাজ চলার উপযোগী। প্রাচীন বন্দর ও শহর সপ্তগ্রাম ইহার তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে ইহা শুষ্কপ্রায়।

সলিলকুমার চৌধুরী

সরিষা তৈলবীজ দ্র

সরীসৃপ মেরুদণ্ডী প্রাণী। গঠনবৈচিত্র্যে উভচর ও পক্ষী এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাঝামাঝি। প্রমাণিত হইয়াছে যে, সরীসৃপ শ্রেণী কার্বোনিফেরাস (Carboniferous) যুগের প্রথম দিকে ল্যাবিরিন্থোডন্ট (Labyrinthodont) জাতীয় উভচর হইতে ক্রম-বিকাশের মাধ্যমে সৃষ্ট হইয়াছে। সরীসৃপ শ্রেণী আজ হইতে ১৫ কোটি বছর আগে মেসোজোয়িক (Mesozoic) যুগে এই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বিশালাকার ডাইনোসেরস, স্টেগোসরস ইত্যাদি সরীসৃপ বর্তমান সরীসৃপের পূর্ব পুরুষ। বর্তমানে মাত্র চারি বর্গের সরীসৃপ পাওয়া যায়। এই চারিটি বর্গের নাম ও উদাহরণ হইল ১. ক্রোকোডিলিয়া—কুমির ও মেছো কুমির ; ২. স্কোয়ামাটা (Squamata)—সাপ ও টিকটিকি ; ৩. রীনকোকেফালিয়া—নিউজিল্যান্ডের স্ফেনোডন (Sphenodon) এবং ৪. কিলোনিয়া—কচ্ছপ বা কাছিম। ৪০০০ প্রজাতির সরীসৃপ আছে।

সরীসৃপের দেহ বহিস্ত্বক্ হইতে সৃষ্ট আঁশ দ্বারা আবৃত। সাপ ছাড়া সব সরীসৃপ চতুষ্পদ। প্রতি পদে পাঁচটি করিয়া নখরযুক্ত আঙুল থাকে। কয়েকটি সরীসৃপের, যেমন টিকটিকি, গিরগিটি ইত্যাদির পায়ু-ছিদ্র আড়াআড়ি অবস্থায় থাকে, এবং ইহাদের পুরুষ বহির্জনন অঙ্গ দুইটি করিয়া। সরীসৃপ জল ও স্থলে বাস করে। জলে বাস করিলেও সরীসৃপেরা ডিম পাড়িবার সময় স্থলে আসে। ডিম্ব স্ত্রী-সরীসৃপের দেহের ভিতরে থাকাকালে নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত হওয়ার পর স্ত্রী-সরীসৃপ ডিম পাড়ে এবং পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। সরীসৃপেরা প্রধানতঃ জল ও স্থলে বাস করিলেও মালয়ের ড্রাকো গণের টিকটিকি একগাছ হইতে স্বল্প দূরত্বের অন্য গাছে উড়িয়া যাইতে পারে। পাখিদের মত উড়িবার ক্ষমতা না থাকিলেও ইহারা প্যারাসুটের মত চামড়ার পর্দার সাহায্যে কিয়ৎ পরিমাণে উড়িবার ক্ষমতা ধরে। অতীত যুগের সরীসৃপ টেরাডাক্টিলের বেশ উড়িবার ক্ষমতা ছিল। সরীসৃপের দাঁতের গঠনে বৈচিত্র্য আছে। অধিকাংশ সরীসৃপের দাঁত তীক্ষ্ণ এবং শিকার ধরিবার সুবিধার জন্য মুখের ভিতরের দিকে বাঁকানো। দাঁতগুলি পড়িয়া যাওয়ার পরও নূতন দাঁত গজায়। কচ্ছপের দাঁত নাই। সরীসৃপেরা মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি ভক্ষণ করে। কচ্ছপ এবং গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপের বিকটদর্শন ইগুয়ানো জলজ উদ্ভিদ খাইয়া জীবনধারণ করে। সরীসৃপের চোখের উপর তিনটি পরদা থাকে। সাপের চোখের উপরের ও নীচের পরদা নাই। তৃতীয় পরদাটি স্বচ্ছ এবং চোখের উপর দিয়া বিস্তারিত। এক শ্রেণীর মরুভূমির টিকটিকির (টিফ্‌লফ্) চোখের নীচের পরদাটি চোখের উপর বিস্তারিত থাকে। এই পরদাটিতে জানালার মত একটি ফুটা থাকে এবং এই ফুটা দিয়া টিকটিকি দেখে। নিউজিল্যান্ডের স্ফেনোডনের মাথার হাড়ের মধ্যে একটি ফুটা আছে। এইটিকে কেহ কেহ তৃতীয় নয়ন বলেন। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহার আলোকানুভূতির ক্ষমতা নাই। নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বের উত্তাপময় অঞ্চলে সরীসৃপ পাওয়া যায়। এই রেখার ভিতরে ও দক্ষিণে যতই যাওয়া যায় সরীসৃপের সংখ্যা ততই কমিয়া যায়। মেরু অঞ্চলে সরীসৃপ পাওয়া যায় না। ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাটলান্টিক সাগরে কিলোন (Chelone) গণের যে কচ্ছপ পাওয়া যায় তাহার মাংস উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কুমির, বড় সাপ ইত্যাদির চামড়া দিয়া ব্যাগ, মেয়েদের জুতা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

করেক ধরনের সাপ মারাত্মক বিষধর। টিকটিকির মধ্যে মরুবাসী হেলোডার্মা (Helloderma) ছাড়া আর কেহ বিষধর নয়।

সীমানন্দ অধিকারী

সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৮৪৯ খ্রী) পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ('অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়' দ্র), মাতা বরদাসুন্দরী। সরোজিনীর জন্ম হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি। হায়দ্রাবাদের পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাঁহার বাংলা শেখা হয় নাই। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র বার বছর বয়সে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে নিজামের প্রদত্ত বৃত্তি লইয়া ১৮৯৫-১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাতে থাকেন। সেখানে প্রথমে লণ্ডনে ও পরে কেম্ব্রিজে শিক্ষা লাভ করেন। হায়দ্রাবাদে ফিরিয়া আসার পর ডাক্তার গোবিন্দরাজুলু নাইডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১৮৯৮ খ্রী)। তাঁহার সন্তানদের মধ্যে শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু অন্যতম।

অল্প বয়সেই তিনি ইংরেজী ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইংরেজীতে কবিতা লিখিয়া তিনি যশস্বিনী

হন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে 'গোল্ডেন থ্রেশোল্ড', 'দি বার্ড অভ্ টাইম', 'দি ব্রোকেন্ উইং' উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং বিশেষ করিয়া ইংরেজী ভাষায় বাগ্মিতার জন্য তাঁহার খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নাগপুরের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। স্বাধীনতার পর তিনি উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই পদ অলংকৃত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয় (২রা মার্চ)।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বানন্দ রাঢ়ের বন্দ্যঘটী গ্রামনিবাসী আধুনিক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের আর্তিহরের পুত্র সর্বানন্দ ১১৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'টীকাসর্বস্ব' নামে অমরকোষের প্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। টীকাটি সংস্কৃতে রচিত হইলেও ঐ টীকায় উদাহৃত তিন শতাধিক প্রাচীনতম বাংলা শব্দ (দেশী, অর্ধতৎসম ও তদ্ভব), প্রাচীন বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব আলোচনায় মূল্যবান্ সম্পদ।

পঞ্চদশ শতকের বৈয়াকরণ বৃহস্পতি রায়মুকুটের 'পদচন্দ্রিকা' (১৪৩১ খ্রী) নামক অমরকোষের টীকায় সর্বানন্দের 'টীকাসর্বস্ব' সর্বভারতীয় প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও বাঙ্গালাদেশে এযাবতকাল ইহার একটিও পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। মালাবারে রক্ষিত একখানি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি হইতে টি. গণপতি শাস্ত্রী 'টীকাসর্বস্ব' সম্পাদন করিয়া ত্রিবান্দ্রম-সংস্কৃত-সিরিজে প্রকাশ করেন।

মদনমোহন কুমার

সর্বাস্তিবাদ বৌদ্ধ দর্শন দ্র

সর্বোদয় কথাটি মহাত্মা গান্ধীর-সৃষ্টি। ইহার অর্থ সকলের কল্যাণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময়ে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী রাস্কিন-এর 'আন্টু দিস্ লাস্ট্' (১৮৬২ খ্রী) বইটি পড়েন এবং গুজরাতী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইহার নাম দেন 'সর্বোদয়' ('রাস্কিন, জন' দ্র)। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই বইটি এক সময়ে ভারতবর্ষে বাজেয়াপ্ত করেন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী এই বইটির প্রকাশ্য বিক্রয়কে আইন অমান্য আন্দোলনের অন্যতম অঙ্গরূপে ঘোষণা করেন। রাস্কিন-এর বইটির যে তত্ত্ব গান্ধীজীকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা এই : সকলের কল্যাণের মধ্যে ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত; সকলেরই যখন জীবিকা অর্জনের কাজ আছে তখন একজন উকিলের কাজের মূল্য একজন নাপিতের কাজের মূল্যের সমান এবং প্রত্যেক শ্রমজীবীর জীবন মর্যাদাপূর্ণ। এই আদর্শের ভিত্তিতে কল্পিত সমাজের নামকরণ হইল সর্বোদয়। প্রচলিত 'অধিকতম লোকের প্রভূততম কল্যাণ'—এই মতবাদের প্রতিবাদস্বরূপ সকলের সর্বোত্তম কল্যাণের কথাই ইহাতে কল্পনা করা হইয়াছে। অহিংসা হইল এই সমাজের আদর্শ এবং ইহার লক্ষ্য হইল সমাজকে শাসন ও শোষণ হইতে মুক্ত করা। রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীকরণ কিছু থাকিলেও মূলতঃ রাষ্ট্রক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ইহার লক্ষ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার লক্ষ্য হইল সমতা এবং তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রমভিত্তিক কুটির-শিল্পের প্রচলন। সাধনশুদ্ধির উপরেও সর্বোদয় সমধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর নির্দিষ্ট গঠনকর্মে নিরত কর্মীরা পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের জন্য 'সর্বোদয় সমাজ' নামে একটি শিথিল সংগঠন স্থাপন করেন এবং গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত গঠনকর্মের সংস্থাগুলি 'সর্বসেবা সংঘ' নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত হয়। ভারতবর্ষে ভাবী সর্বোদয় সমাজ গঠনের দায়িত্ব ইঁহারা গ্রহণ করেন। বর্তমানে আচার্য বিনোবাভাবে প্রবর্তিত ভূদান অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষকদের জন্য ভূমিদান এবং গ্রামদান অর্থাৎ গ্রামসভার কাছে ভূমির মালিকানা বিসর্জন ও ভূমিহীনদের জন্য ভূমির একটি নির্দিষ্ট অংশ দান—এই কর্মসূচী ইঁহারা অনুসরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে এইভাবে বহু ভূমি ও গ্রামদান সংগৃহীত হইয়াছে। এগুলিকে আইনসিদ্ধ করার জন্য আইনও প্রণীত হইয়াছে। সর্বোদয়-সমাজের কর্মীরা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন এবং যাঁহারা দলগত বা নির্বাচনের রাজনীতি করেন তাঁহারা লোকসেবক অর্থাৎ ইহার সদস্য হইতে পারেন না। ইহাদের সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মতি অথবা সর্বানুমতিতে গৃহীত হয়।

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সহজিয়া১ খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম, সহজ-সাধনারূপ একটি গুহ্য-সাধনা অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ-সহজিয়াধর্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকগণ নিজেদের ধর্মমত ও সাধন-প্রণালী ব্যাখ্যা করিয়া সংস্কৃতে যে সকল তন্ত্র ও তাহার ভাষ্য, অপভ্রংশে যে-সকল দোহা এবং বাংলায় যে-সকল চর্যাগীতি রচনা করেন, তাহা বৌদ্ধ-সহজিয়া সাহিত্য নামে খ্যাত।

একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বুঝাইতে 'সহজিয়া' শব্দটির ব্যবহার খুব প্রাচীন নহে। বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের সাহিত্যে সহজিয়া শব্দটির কোনও ব্যবহারই পাওয়া যায় না। এমন কি, সহজ-যান কথাটির ব্যবহারও কোনও

বৌদ্ধ তন্ত্রে, দোহায় বা গীতিতে পাওয়া যায় নাই ; কেবল সহজ কথাটির ব্যবহার প্রচুর পাওয়া যায়। যাঁহারাই সহজ-মতে সাধনার কথা বলিয়াছেন পরবর্তী-কালে একটি ব্যাপক অর্থে তাঁহারাই 'সহজিয়া' সাধক-রূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। পূর্বভারতের বঙ্গ, বিহার, আসাম ও ওড়িশা অঞ্চলে এবং উত্তরের নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চলে বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধন-পদ্ধতি নানারূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এই সম্প্রদায়কে সহজিয়া নামাঙ্কিত করিবার দুইটি মুখ্য কারণ আছে। প্রথমতঃ 'সহজ'কে উপলব্ধি করিবার জন্য সর্বদা বিশেষ একটি সহজ বা ঋজু প্রণালীকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী বলিয়াও ইঁহাদের সহজিয়া বলা হয়। 'সহজ' শব্দের অর্থ হইল যাহা সঙ্গে সঙ্গেই জন্মায়। কোনও মানুষের বা অন্য কোনও প্রাণীর অথবা জড় বস্তুর বাহ্য রূপের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ভিতরে একটি শাশ্বত স্বরূপও জন্মলাভ করে। সেই শাশ্বত স্বরূপই হইল 'সহজ'। 'সহজে'র উপলব্ধির অর্থ হইল নিজের ভিতরকার এই শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি এবং সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়া দৃশ্যমান যাবতীয় প্রাণী ও বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত শাশ্বত স্বরূপের উপলব্ধি। এই উপলব্ধির জন্য সহজ বা ঋজু প্রণালী অবলম্বনও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যাহা আমাদের স্বভাবের অনুকূল তাহাই সহজ। যাহা প্রতি-কূল তাহা বক্র। মনুষ্য-স্বভাবকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিবার চেষ্টা না করিয়া সেই স্বভাবের অনুকূল পথ অবলম্বন করিয়া যোগপথে আত্মোপলব্ধির যে চেষ্টা তাহাই হইল ধর্মের ক্ষেত্রে সহজ পথ।

মহাযান-বৌদ্ধধর্মের নানা শাখার মধ্যে একটি ছিল বজ্রযান-বৌদ্ধধর্ম। এই বজ্রযান হইতেই উদ্ভূত হইল সহজপন্থী মত, পরবর্তীকালে যাহার নাম হইয়াছে সহজযান। বজ্রযানের মধ্যে মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-অর্চা, ব্রত-নিয়ম, শাস্ত্রবিধি ইত্যাদির যে প্রাবল্য দেখা দিল, সহজিয়াগণ আবার তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, মন্ত্র-তন্ত্র, ধ্যানব্যাখ্যান বৃথা, মহাসুখরূপ সহজের উপলব্ধিই হইল পরম নির্বাণ। সহজ-সাধক শান্তিপাদ বলিলেন, 'যাহারা যাহারা গেল এই ঋজু বা সরল পথে, তাহারাই হইল অনাবর্ত' অর্থাৎ তাহাদিগকে আর জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। সবহপাদ বলিলেন, ঋজুকে ছাড়িয়া কেহ বাঁকাকে লইও না, নিকটেই বোধি আছে। নিকটে নিজের দেহের মধ্যেই যে বোধি বা বুদ্ধ রহিয়াছে ইঁহার উপলব্ধিই সহজ পথের কথা।

চর্যাপদের রচয়িতৃগণ কোনও দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া এই গীতিগুলি রচনা করেন নাই। কতকগুলি চর্যার মধ্যে সাধারণ বৌদ্ধচিন্তাধারাই লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধধর্মে জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে শাশ্বত বলিয়া কিছু স্বীকার করা হয় নাই ; সকল অস্তিত্ব-প্রবাহকেই একটি নদীপ্রবাহের সহিত তুলনা করা হই-য়াছে। চর্যাপদেও বলা হইয়াছে, ভবনদী গহন গম্ভীর-বেগে প্রবাহিত, দুইধারে কাদা, মাঝে থই নাই। মহা-যানীদের অনুসরণ করিয়া চর্যাকারগণ বলিলেন, ভব-নদীর এক অন্তে শূন্যতা এবং অপর দিকে করুণা ; ইহার কোনটিই এককভাবে গ্রহণীয় নহে ; উভয়কে একত্র করিয়া যে মধ্যপথ বা অদ্বয়ের পথ, তাহাই কেবল গ্রহণীয়।

ভাব ও অভাব—ইহার কোনওটাই সত্য নয়, সত্য শুধু দুর্লক্ষ্য বিজ্ঞান—যাহা সমস্ত অস্তিত্ব-প্রবাহের মধ্যেই বিলাস করিতেছে, কিন্তু অভূত পরিকল্প বলিয়া যাহা সম্পূর্ণ—'অবাঙ্মনসোগোচরম্'। চর্যাপদগুলিতে প্রতিভাত সংসারের অনুৎপন্নত্ব এবং অনস্তিত্বই নানা-ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু মিথ্যা প্রতিভাসের পিছনে অপর কোনও সত্যকে স্বীকার করা হয় নাই।

এই সহজ-শূন্যে নিজেকে পূর্ণ করিতে হইবে, ইহাই হইল সহজিয়া বৌদ্ধগণের সাধনা। এই সহজকে ধ্যান-ধারণাসমাধি দ্বারা ধরা যায় না, মনের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা গোচরীভূত করা যায় না, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য-তর্কের দ্বারা অধিগত করা যায় না ; —ইহাকে লাভ করা যায় কেবল গুরু-উপদেশে, সহজ-পন্থায় সাধনার দ্বারা। স্বয়ংবেদ্য এই সহজ ; ইহা বাহিরে নাই,—আছে আমাদের ঘরে (দেহে), অরূপ বুদ্ধরূপে। শরীরের ভিতরকার সেই অশরীরীকে একবার জানিতে পারিলেই হইল মুক্তি। মনের দ্বারা যুক্তি-তর্কের দ্বারা এই সহজকে যেমন লাভ করা যায় না, তেমনি লাভ করা যায় না আগম পুঁথি-ইণ্টমালা দ্বারা। কাহ্নুপাদের একটি পদে (৪০ সংখ্যক) বলা হইয়াছে, গুরু বোবা শিষ্য কালা। অর্থাৎ অনুভূতিশীল গুরু কোনও রকমে আকারে ইঙ্গিতে যাহা বুঝাইয়া দেন, শ্রদ্ধাশীল শিষ্য তাহাতেই আভাস পান।

আমাদের সহজ-স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে আমাদের চঞ্চলচিত্তের সকল সংকল্প-বিকল্পাত্মক বৃত্তি। প্রথমে তাই এই মনকে মারিতে হইবে, অর্থাৎ বৃত্তিহীন করিতে হইবে। এই মনকে রূপকচ্ছলে কোথাও বলা হইয়াছে চঞ্চল হরিণ (৬ সংখ্যক পদ), কোথাও বলা হইয়াছে চঞ্চল মূষিক (২১ সংখ্যক পদ), কোথাও বলা হইয়াছে দাবা খেলার 'ঠাকুর' বা রাজা। বৃত্তিহীন হইয়া অদ্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই চিত্ত প্রকৃতি প্রভাস্বরত্ব লাভ করে। এই প্রকৃতি প্রভাস্বর চিত্তে বা বোধিচিত্তে অন্য কোনও অনুভূতি থাকে না,— থাকে

শুধু মহাসুখের অনুভূতি। এই মহাসুখের মধ্যে চিত্তের নিঃশেষ নিমজ্জনই হইল পরম নির্বাণ। এই মহাসুখই হইল আমাদের স্বরূপ ;— ইহাই সহজানন্দ, অর্থাৎ সহজ-স্বরূপকে অনুভূতির অতীন্দ্রিয় আনন্দ।

বৌদ্ধ-সহজিয়াগণ পরমার্থ অনুভূতির জন্য যে অদ্বয়ের সাধনা করিতেন, দেহই তাহার অবলম্বন। এই দেহভাণ্ডই হইল ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রহ্মাণ্ড। সহজিয়াগণের সাধনা হইল বোধিচিত্ত-লাভের সাধনা ; বোধিচিত্ত লাভেই সহজ-স্বরূপের উপলব্ধি। বোধিচিত্তের দুইটি রূপ, একটি সাংবৃত্তিক, অপরটি পারমার্থিক। সাংবৃত্তিক বোধিচিত্তের উৎপাদনে মণিমূলে বা নির্মাণকায়ে যে আনন্দের উৎপত্তি তাহা সর্বপ্রকার প্রকৃতিদোষযুক্ত। পক্ষান্তরে বোধিচিত্তের ঊর্ধ্বায়নের ভিতর দিয়া সকল প্রকৃতি-মল বিধ্বস্ত হইয়া যে-সর্ববিধমলমুক্ত সহজানন্দ-প্রবাহ অবশিষ্ট থাকে তাহাই হইল যোগিজনবাঞ্ছিত পারমার্থিক বোধিচিত্ত।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সহজিয়া২ বাংলাদেশের বৈষ্ণবদিগের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে একটি বিশেষ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধসহজিয়াগণের ('সহজিয়া১' দ্র) ন্যায় ইঁহারাও সহজ-পন্থী ছিলেন ; অর্থাৎ ইঁহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল মহাভাব-রূপ সহজ-বস্তুকে লাভ করা, সাধন-পন্থাও ছিল সহজ বা অবক্র। নিজেদের সহজিয়া মত প্রচার করিবার জন্য ইঁহারা বাংলায় অনেক গান এবং পদ্যে ও গদ্যে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্বগ্রন্থ ও গান লইয়াই বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্য। বহু প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি চণ্ডীদাসই ('চণ্ডীদাস' দ্র) প্রথম বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের সাধক এবং প্রচারক। তিনি রামী-নাম্নী এক রজকিনীর সহিত এই সহজ-সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ রাগাত্মিকা পদাবলীর ভিতর দিয়া তিনি এই সহজ-সাধনার গূঢ় তত্ত্বই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই সহজিয়া চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বকার কিংবদন্তী ভিন্ন তাহার অন্য কোনও প্রমাণ নাই। বরঞ্চ চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত এই রাগাত্মিক পদগুলি পরীক্ষা করিলে মনে হয়, এগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন কবির রচনা ; প্রাচীনত্ব এবং প্রামাণিকত্ব দান করিবার জন্যই যেন এগুলির সহিত চণ্ডীদাসের নাম যুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। সহজিয়াগণ তাঁহাদের অনেক তত্ত্বগ্রন্থ এবং গান বিদ্যাপতি, রূপ-গোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি, নরোত্তম, লোচন, চৈতন্যদাস প্রভৃতির নামে চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের নামে প্রচলিত রচনাবলীর মধ্যে 'বিবর্ত-বিলাস' (অকিঞ্চন দাস), 'আনন্দভৈরব', 'অমৃতরসাবলী', 'আগমগ্রন্থ', 'প্রেমবিলাস' (যুগলকিশোর দাস), 'রাধা-রস-কারিকা', 'দেহ-কড়চা' (নরোত্তম), 'সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব' (তরুণী রমণ), 'সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়', 'রতিবিলাস-পদ্ধতি', 'রাগময়ীকণা', 'রত্নসার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইগুলির তেমন কোনও সাহিত্যিক মূল্য নাই ; সাহিত্যিক মূল্য আছে সহজিয়াগণের লেখা পদাবলীর। বৌদ্ধ-সহজিয়াগণের রচিত গানগুলির ন্যায় বৈষ্ণব-সহজিয়াদের গানগুলির মধ্যেও সাধনপ্রণালী বা সাধন-অনুভূতির বর্ণনায় বহুলভাবে সন্ধ্যা ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের বৈষ্ণব-সহজিয়া সম্প্রদায় পূর্ববর্তী বৌদ্ধ-সহজিয়া সম্প্রদায়েরই যুগোচিত বিবর্তন। বৌদ্ধ-সহজিয়াদের মত বৈষ্ণব-সহজিয়াগণও বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক নর-নারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ বা সহজরূপ লুক্কায়িত আছে। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ ; তেমনই নারীরূপে নারী, স্বরূপে রাধা। রূপ ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। রূপের মিলনে যখন স্বরূপের মিলন সংঘটিত হইবে তখনই আসিবে অনাবিল সামরস্যের অনুভূতি। ইহাই মহাভাব বা সহজের অনুভূতি। বৈষ্ণব-সহজিয়াগণ কামকেই প্রেমে পরিণত করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইল আরোপ-সাধনা ; রূপে স্বরূপের আরোপ, নর-নারীতে কৃষ্ণ-রাধার আরোপ। এই আরোপ-সাধনার দ্বারা যখন স্বরূপে ধ্রুবা স্থিতি লাভ হয়, তখন নর-নারীর আকর্ষণে আর কাম থাকে না, তাহা প্রেমে পরিণত হয়। তবে এ সহজ-সাধনা বিশেষ সহজ নয়। সহজিয়াদের নিজের ভাষায় 'সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি'—তবেই সম্ভব হইবে এই সহজ-সাধনা। চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন, প্রকৃত সহজ-সাধক 'কোটিতে গোটিক হয়।'

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

সহদেব চক্রবর্তী খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাঢ় অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাব্যের যে বহুসংখ্যক কবির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সহদেব চক্রবর্তী তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার কাব্য-রচনার কাল ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে বলিয়া অনুমিত হয়। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রাম কবির জন্মস্থান। তিনি কালু রায় ধর্মের স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মপুরাণ (বা অনিল পুরাণ বা ধর্মমঙ্গল) অনেকটা পুরাণ-জাতীয় রচনা। ইহাতে লাউসেনের কাহিনী নাই। তাঁহার উপর নাথধর্ম

ও সাহিত্যেরও প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁহার রচনার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে সামগ্রিক ঐক্যের অভাব অনুভূত হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সাঁই১ বৃক্ষবিশেষ, সংস্কৃতে (Prosopia spicigera অথবা Mimosa Suma)। কাষ্ঠ কঠিন, অগ্নিগর্ভ বলিয়া বিশ্রুত।

সাঁই২ সংস্কৃত 'স্বামী' হইতে জাত তদ্ভব। ১. পশ্চিমবঙ্গের জাতি বিশেষে প্রচলিত পদবীবিশেষ। ২. মরমিয়া সাধকদের ব্যবহারে 'গুরু' অথবা 'ঈশ্বর'। ৩. 'আউল বাউল দরবেশ সাঁই'—এই লোকোক্তি অনুসারে মরমিয়া বা গুহ্য সাধকদের সম্প্রদায়বিশেষ। 'আউল' অর্থে উদাসীন গৃহত্যাগী সাধক। 'বাউল'-এর অর্থ যে-সাধকের আচার-আচরণ বাতুলের মত, অর্থাৎ সাধারণ সংসারীর অবোধ্য এবং যাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় আছে। 'দরবেশ' যিনি গৃহস্থাবস্থায় মুসলমান ছিলেন। 'সাঁই' অর্থাৎ আউল, বাউল ও দরবেশ—এই তিন সম্প্রদায়ের উন্নত স্তরের সাধক, অর্থাৎ যিনি সিদ্ধপ্রায় অথবা সিদ্ধ হইয়াছেন।

সুকুমার সেন

সাইকেল প্যারিসে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি ভারী কাঠের চাকা একটি কাঠের লাঠিদ্বারা সংযুক্ত করিয়া তাহাতে কোনও রকমে বসিবার একটি স্থানের ব্যবস্থা করিয়া যে গাড়ির প্রচলন হয় তাহাই সাইকেল তৈয়ারির আদিম প্রচেষ্টা। উহাকে মাটিতে পা দিয়া সামনের দিকে ঠেলিতে হইত। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে Baron de Saverbrun আর একটি ঐ ধরনের সাইকেল প্রস্তুত করেন। তদানীন্তন সৌখিন বাবুরা উহা ব্যবহার করিতেন বলিয়া উহা 'ড্যান্ডি হর্স' নামে পরিচিত ছিল। লন্ডনে সমসাময়িক হাস্যরসিক কবিরা উহাকে হাড়-কাঁপানো (বোন-শেকার) গাড়ি বলিয়া ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। স্কটল্যান্ডবাসী ম্যাক্মিলান একটি উন্নত ধরনের সাইকেল তৈয়ারি করেন (১৮৪০ খ্রী)। ভারসাম্য বজায় রাখিয়া সেটিকে চালাইতে হইত। ফরাসী দেশীয় ব্যবসায়ী এম. মিকাউ (M. Michaux) তাঁহার কর্মচারী পিয়ের-এর সহযোগিতায় সামনের চাকার সহিত পাদানী (পেড্যাল) সংযুক্ত করিয়া ঘোরাইবার ব্যবস্থা করেন (১৮৬৫ খ্রী)। এইচ. জে. লসন শৃঙ্খল (চেন) ও দাঁতওয়ালা চাকার সাহায্যে পিছনের চাকাকে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেন (১৮৭৬ খ্রী)। স্টারলে আরও উন্নত ধরনের সাইকেল নির্মাণ করেন (১৮৮৫ খ্রী)। বায়ুপূর্ণ রবারের চাকা ব্যবহারের প্রচলন করেন বিখ্যাত রবার-ব্যবসায়ী জে. বি. ডান্লপ (১৮৮৯ খ্রী)। চাকায় ব্রেক দিবার ব্যবস্থা করেন একজন সাংবাদিক। আরামদায়ক সিট প্রস্তুত করেন গেরার্ড নামে একজন চর্মকার। সিটের তলার রডটিতে হাতপাম্প ধরিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ ধরনের ক্লিপ তৈয়ারি করেন আয়ার্ল্যান্ডের ধর্মযাজক রেভারেন্ড হ্যানলন। সাইকেলের গতিবেগ পাদানীর সহিত যুক্ত দাঁতওয়ালা চাকার পরিধি ও পিছনের যে চাকাটিতে শৃঙ্খল লাগানো হয়, উহার পরিধির অনুপাতের উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষে এখন উন্নত ধরনের সাইকেল নির্মিত হয় এবং বিদেশে ইহার চাহিদা আছে।

কমল নন্দী

সাইক্লিক অ্যাক্সেলারেটর বৃত্তাকার ত্বরণযন্ত্র। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লরেন্স আহিত কণিকা আয়নকে উচ্চ-শক্তি সম্পন্ন করার যন্ত্র সাইক্লোট্রন্-এর পরিকল্পনা করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিভিংস্টোন সাইক্লোট্রন দ্বারা আয়নত্বরণ-কার্যে পরিণত করেন। ইহাই আদিম বৃত্তাকার ত্বরণযন্ত্র। উইড্রো নির্মিত রেখাকার ত্বরণযন্ত্র শাঁখের মত প্যাঁচালো (স্পাইর্যাল) করিয়া একটি বায়ুহীন কক্ষে রাখিলে ও উহার সমতলের সহিত লম্বভাবে একটি উপযুক্ত স্থির চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করিলে উহা বৃত্তাকার ত্বরণযন্ত্র সাইক্লোট্রনের আকার পায়। সাইক্লোট্রনযন্ত্রে প্রায় ২০।২৫ মি. ই. ভো. ((Mev) শক্তিসম্পন্ন প্রোটন পাওয়া যায়। অধিকতর শক্তিসম্পন্ন প্রোটন সাইক্লোট্রনে পাওয়া যায় না, তাহার কারণ শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়নের ভর বাড়ে। উহা আপেক্ষিকবাদের ('আপেক্ষিকবাদ' দ্র) সিদ্ধান্তও বটে। সিন্ক্রোসাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে ৭।৮ শত মি. ই. ভো. শক্তির প্রোটন পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু এই যন্ত্রে বিশালাকার চুম্বকের প্রয়োজন হয় বলিয়া, সিন্ক্রোট্রন যন্ত্র নির্মিত হয়। সিন্ক্রোট্রনের চুম্বকক্ষেত্র পরিবর্তনশীল, প্রযুক্ত বেতার তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যাও পরিবর্তনশীল। বাহির হইতে কিছু শক্তিসম্পন্ন আয়ন উহাতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। আয়নগুলি একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে বিচরণ করে। উহার কক্ষপথের একাংশে উপযুক্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তনশীল কম্পন-সংখ্যার বেতারতরঙ্গ প্রযুক্ত হয়, চুম্বক ক্ষেত্রটিও পরিবর্তনশীল বলিয়া আয়নের শক্তি বর্ধিত হইলেও উহা একই ব্যাসার্ধে বিচরণ করে। বৃত্তাকার ত্বরণযন্ত্রে ইলেকট্রন ত্বরণও সম্ভব। লিনিয়ার অ্যাক্সেলারেটরে ক্রমবর্ধমান নল ব্যবহার না করিয়া তরঙ্গ-চালক (ওয়েভ গাইড)-এর সাহায্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে ইলেক্ট্রন ত্বরণ সম্ভব হয়। বৃত্তাকার ইলেক্ট্রন-সিন্ক্রোট্রন যন্ত্র প্রোটন সিন্ক্রোট্রনের

অনুরূপ; কিন্তু প্রযুক্ত অণুতরঙ্গ-এর কম্পন-সংখ্যা পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না, কারণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি আসিয়া আর বাড়িতে পারে না। অথচ তাহার শক্তি বাড়িয়া চলে। ইলেকট্রন ত্বরণের জন্য বিটাট্রন নামক আর একটি যন্ত্র আছে। উহার চুম্বকক্ষেত্র পরিবর্তনশীল এবং মধ্যবর্তী চুম্বকক্ষেত্রের পরিমাণ বহির্ভাগ অপেক্ষা যে কোনও সময়ে দ্বিগুণ থাকে। বাহির হইতে ইলেকট্রন প্রবেশ করাইলে বহির্ভাগের চুম্বকক্ষেত্র উহাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে ধরিয়া রাখে। মধ্যস্থলের পরিবর্তনশীল চুম্বকক্ষেত্র বলরেখা পরিবর্তনের দ্বারা যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে তাহা দ্বারা ইলেকট্রনের ত্বরণ সম্ভব হয়। বহির্ভাগের চুম্বকক্ষেত্রও পরিবর্তনশীল বলিয়া ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধে উচ্চশক্তিসম্পন্ন হইয়া বিচরণ করিতে পারে।

কোনও কোনও ইলেকট্রন সিনক্রোট্রন যন্ত্রে বিটাট্রন-পদ্ধতিতে ইলেকট্রনকে কয়েক মি. ই. ভো. শক্তিসম্পন্ন করিয়া উহার গতিবেগ আলোর মানে আসিলে সিন্ক্রোট্রন প্রক্রিয়ায় অধিকতর শক্তিসম্পন্ন করা হয়।

বৃত্তাকার ত্বরণযন্ত্রে আহিত কণিকার চুম্বকীয় ফোকাসিং একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। চুম্বকক্ষেত্রটি এরূপ হওয়া দরকার যাহাতে কণিকাগুলি আবর্তনকালে অপসারী (ডিভারজেণ্ট) হইয়া কক্ষের দেওয়ালে প্রতিহত না হয়—অর্থাৎ চুম্বকক্ষেত্রটির আহিত বস্তুর ক্ষেত্রে লেন্সের মতো কার্য করা প্রয়োজন। সাধারণ সাইক্লোট্রনে চুম্বক মেরুতল সমান্তরাল থাকে বটে, কিন্তু বহির্ভাগের দিকে তলদেশ কিছুটা অসম করিতে হয়। সিন্ক্রোট্রন বা বিটাট্রনের চুম্বকক্ষেত্রের মেরু সমান্তরাল হয় না। সে ক্ষেত্রে চুম্বকক্ষেত্রের মান কেন্দ্রের দিকে ক্রমবর্ধমান থাকে। উহাতে ফোকাসিং বলবত্তর হয়। বর্তমানে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড চুম্বকের সমবায়ে ত্বরণযন্ত্র নির্মিত হইতেছে। এ রকম চুম্বকের সাহায্যে এ. জি. সিন্ক্রোটন (অলটারনেটিং গ্রেডিয়েণ্ট সিন্ক্রোট্রন) নির্মিত হয়। অধুনা এ. ভি. এফ. (Azimuthally varying field) সাইক্লোট্রন আবিষ্কৃত হওয়ায় উচ্চশক্তির তীব্র প্রোটন-স্রোত পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রনের চুম্বকক্ষেত্রটি দিগংশে (azimuthally) পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ একই পরিকেন্দ্রে উহা কোথাও বেশি কোথাও কম। এইরূপ চুম্বকের ফোকাসিং ক্ষমতা বেশি বলিয়া সাধারণ সাইক্লোট্রন অপেক্ষা একই রকম শক্তির অথচ তীব্রতর আয়নস্রোত পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রোটন সিন্ক্রোট্রনে ৩০ বিলিয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট প্রোটন ও ইলেকট্রন সিন্ক্রোট্রনে ১ বি. ই. ভো. পর্যন্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন অপেক্ষা বৃহত্তর ভরের আয়নত্বরণও সম্ভব হইয়াছে।

ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত উচ্চশক্তিসম্পন্ন কণিকা দ্বারা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠনবিন্যাস, নিউক্লীয় বল, মৌলিক কণা ও বিপরীত কণার স্বরূপ প্রভৃতি বহু মৌলিক আবিষ্কার সম্ভব হইতেছে।

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

সাঁওতাল পূর্বভারতের আদিবাসী জাতি। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুসারে ইহাদের সংখ্যা আঠাশ লক্ষ এগার হাজার। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ, বিহারের ঝাড়খন্ড (সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ, মানভূম ও সিংভূম জেলা) এবং পশ্চিমবঙ্গ (মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা)—এই সব অঞ্চলে প্রধানতঃ ইহাদের বাস। সাঁওতালী ভাষা খেওয়ারি ভাষার এক উপভাষা ('সাঁওতালী' দ্র)। সাঁওতালরা সকলেই দ্বিভাষী, নিজেদের ভাষা ছাড়াও যে-রাষ্ট্রে থাকে সে-রাষ্ট্রের ভাষাও জানে। দেহের গঠন, অঙ্গকান্তি প্রভৃতি ধরিয়া সাঁওতাল জাতি অস্ট্রেলিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া নৃতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

উন্নতিশীল আদিবাসী জাতির মধ্যে সাঁওতাল অন্যতম। ইহারা গ্রাম বাঁধিয়া বাস করে। গ্রামের প্রধান (মাঝি) বংশানুক্রমে দলপতি। সাঁওতালেরা চাষবাসের কাজে দক্ষ। আচার-ব্যবহার ঋজু ও পরিচ্ছন্ন।

সুকুমার সেন

সাঁওতাল বিদ্রোহ তৎকালীন ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত 'দামিন-ই-কো' অঞ্চল হইতে বীরভূম পর্যন্ত বিস্তৃত সাঁওতাল ভাষাভাষী, বিনিময় প্রথামূলক ও কৃষিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী কর্তৃক ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানকে 'খেরওয়ারী হুল' বা সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৪-৫৬ খ্রী) বলা হয়।

এই সাঁওতালেরা অনেকে গোষ্ঠীপতি 'মাঝি'দের অধীনে বঙ্গ-বিহার সীমান্তের জঙ্গল পার্বত্য অঞ্চলে কৃষিকার্য গ্রহণ করিয়া সকলে কৃষিজীবী শ্রেণীতে পরিণত এবং 'ধনসম্পত্তি'রও অধিকারী হয়। কিন্তু ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান খাজনা দাবী ও জোতদার কর্তৃক জঙ্গল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধির ফলে বেশির ভাগ সাঁওতাল কৃষিজীবী জমি হারাইয়া 'ডিকু' মহাজনদের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জমিদারের নায়েব, দুর্নীতিপরায়ণ দারোগা, নতুন রেল লাইনের ঠিকাদার, নীলকর ও ইজারাদার সাহেবদের অত্যাচার এবং সাঁওতালদের অমিতব্যয়িতা ও সুরাসক্তি এই বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পূর্ব দশকের জঙ্গলমহাল, রাঁচী ও

পালামৌ অঞ্চলের চুয়াড় ও কোলদের বিদ্রোহও তাহাদের অনুপ্রেরণা দেয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ জুন গোক্কো ও বীর সিং নামক গোষ্ঠীপতিদের উপর উৎপীড়নের প্রতিবাদে বহু সহস্র সাঁওতাল 'দামিন'-অঞ্চলে সমবেত হয়। এই রসদহীন দরিদ্র সশস্ত্র দলগুলি পাঁচকেতিয়ার বাজারে উপস্থিত হইয়া নির্বিচারে লুণ্ঠন এবং দারোগা ও মহাজনদের হত্যা করিতে থাকে। বিদ্রোহ ক্রমশঃ বীরভূম অঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে সরকার এক ঘোষণা দ্বারা বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের দাবি জানায় ও ১৩ নভেম্বর সামরিক আইন বলবৎ হয়। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ ও নেতৃত্বের অভাবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত সশস্ত্র দরিদ্র জনতার এই বিদ্রোহ অনতিবিলম্বেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগেই দলপতি সিদু, চাঁদ, ভৈরব ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত পনের হইতে পঁচিশ সহস্র সাঁওতাল নিহত হয়। বিদ্রোহের অবসানে ব্রিটিশ সরকার একটি স্বতন্ত্র সাঁওতাল পরগনা গঠন করে, যদিও ভূমি-রাজস্ব হ্রাস করা হয় নাই। বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই একদিকে সম্পন্ন চাষীদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় এবং অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকেরা কাজ ও জমির সন্ধানে বাংলার জেলাগুলিতে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

বিনোদশংকর দাশ

সাঁওতালী অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত কোল-মুণ্ডা উপ-শাখার পূর্বী গুচ্ছের অন্তর্গত ভাষা। একমতে এই ভাষার নামান্তর খেরওয়ারি, অপরমতে ইহা খেরওয়ারির উপভাষা। এই গুচ্ছের অপর ভাষা হইল মুণ্ডারী, হো, ভূমিজ ইত্যাদি। সাঁওতাল অর্থাৎ সাঁওতাল-ভাষী জনগণ বিহারে সাঁওতাল পরগনা, হাজারিবাগ মানভূম ও সিংভূম জেলার, পশ্চিমবাংলায় বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলার এবং ওড়িশার ও পশ্চিমবাংলার সংলগ্ন জেলার অধিবাসী। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমার অনুসারে সাঁওতাল-ভাষীদের সংখ্যা ২৮১১০০০।

সাঁওতালীর প্রথম এবং ব্যাপক চর্চা করিয়াছিলেন ইওরোপীয় মিশনারিরা এবং এই ভাষার নিজস্ব কোনো লিপি না থাকায় ইঁহারা রোমান লিপি ব্যবহার করিয়াছেন। বাংলাদেশে এখন বঙ্গাক্ষরই বেশি ব্যবহৃত হয়।

দীর্ঘকালের প্রতিবেশী বলিয়া সাঁওতালী ও বাংলাভাষা পরস্পরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

সুকুমার সেন

সাংখ্য হিন্দুর ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শন অন্যতম। মহর্ষি কপিলকে ইহার রচয়িতা বলা হয়। 'সংখ্যা' শব্দের একটি অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। পুরুষ বা আত্মতত্ত্বের অথবা তত্ত্ববিদ্যার সম্যক্‌জ্ঞান দেয় বলিয়া এই দার্শনিক মতবাদকে সাংখ্যদর্শন বলা হয়।

সাংখ্য মূলতঃ দুইটি তত্ত্বের সত্তা স্বীকার করে। একটি পুরুষ বা আত্মা, আর একটি অনাত্মা প্রকৃতি। ইঁহাদের একটি শুদ্ধচেতনা অর্থাৎ আত্মা, ইনিই পুরুষ এবং অপরটি অচেতন বা জড় সত্তা প্রকৃতি। পুরুষ নিরুপাধিক ও নির্গুণ, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের সমাবেশে প্রকৃতি। সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের মূলে থাকে এই দুইটি। এই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ কি করিয়া হইল তাহা বলা যায় না। সৃষ্টি অনাদি। শুধু এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, পুরুষ-সান্নিধ্যবশতঃ পরিণামশীল প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ গুণ-ত্রয়ের মধ্যে এক মহাবৈষম্যের সৃষ্টি হয় এবং ইহারই ফলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ কর্তা নয়, ভোক্তা নয়, কিন্তু অবিবেক জ্ঞানহেতু প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকিয়া জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি চক্রে ভ্রমণ করিতেছে। সৃষ্টিতত্ত্বে সাংখ্য যেমন দ্বৈতবাদ প্রচার করে, আত্মতত্ত্বে আবার বহুপুরুষবাদ স্বীকার করে। পুরুষের কার্যানুসারেই তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে। অবিবেকহেতু যে সুখদুঃখবোধ তাহার নিরোধই হইল মোক্ষ। সাংখ্যমতে মোক্ষ হইল ত্রৈকালিক দুঃখনিরোধ। আত্মা যখন বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন হইবে তখনই তাহার উপলব্ধি হইবে—আত্মা (পুরুষ) প্রকৃতি নয় এবং প্রকৃতি আত্মা নয়। এই দুইয়ের অভেদ-জ্ঞানই বন্ধন এবং ইহাদের ভেদত্বের জ্ঞানই পাপ হইতে জীবের মুক্তি বা মোক্ষ। সাংখ্যাচার্যেরা ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না। সাংখ্য-প্রবচনন সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণের অভাব আছে।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংখ্যযোগ সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ('সাংখ্য' দ্র); কিন্তু যোগমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার্য। অচেতন প্রকৃতির পক্ষে স্বেচ্ছায় পুরুষার্থ-সাধন করা সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ প্রলয় ও সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। যখন প্রাণিগণের কর্মফল-ভোগের জন্য জগৎ-সৃষ্টির প্রয়োজন হয় তখন প্রকৃতিতে গুণ-বৈষম্য দেখা দেয়। অন্য সময়ে গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। ঈশ্বরের ইচ্ছা না থাকিলে যথাকালে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিত না, কর্মফলানুরূপ সৃষ্টিও হইত না। যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণ পুরুষের সহিত ঈশ্বরের পার্থক্য

এই যে, সাধারণ পুরুষ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও মৃত্যুভয় (এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ), পাপ ও পুণ্য (এই দুই প্রকার কর্ম), কর্মফল (বিপাক) এবং কর্ম-ফলানুযায়ী সংস্কারের (আশয়ের) অতীত নহেন। কিন্তু ক্লেশ, কর্ম, বিপাক এবং আশয় ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। মুক্ত হইলে সাধারণ পুরুষেরও ক্লেশাদির সহিত সম্পর্ক থাকে না। তথাপি সাধারণ মুক্ত পুরুষের সহিত ঈশ্বরের পার্থক্য এই যে, ঈশ্বরের সহিত ক্লেশাদির সম্পর্ক কোনও কালেই ছিল না। ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। তিনি কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন; তিনি কালাতীত এবং গুণা-তীত। তিনি সর্বজ্ঞ। তাঁহাতেই জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। কল্পমন্বন্তরের প্রারম্ভে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞেরা তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন ('মনু' দ্র)। এইজন্য তাঁহাকে প্রাচীন পুরুষ-গণেরও গুরু বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের ধ্যান সমাধিসিদ্ধির অন্যতম উপায়। সংসার দুঃখের আলয়। এই দুঃখ হইতে মুক্তিই মোক্ষ এবং এই মোক্ষ সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়।

সুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

সাতবাহন বংশ খুব প্রাচীনকাল হইতে ভারতে শালিবাহন নামক এক প্রাচীন রাজার সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। খুব সম্ভবতঃ শালিবাহন নামক কোন রাজা ছিলেন না ('শালিবাহন' দ্র)। কিন্তু সাতবাহন বংশে অনেক প্রসিদ্ধ বিক্রমশালী রাজাদের কাহিনীর জনশ্রুতি হইতে সাতবাহনের অপভ্রংশ শালিবাহন একটি রাজার নামে পরিচিত হইয়াছে। সাতবাহন একটি প্রাচীন রাজবংশের নাম। পুরাণে এই রাজবংশের বিবরণী পাওয়া যায়। কয়েকজন রাজার শিলালিপি ও মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন যে-দেশকে অন্ধ্রপ্রদেশ বলা হয় সেখানে বহু প্রাচীনকাল হইতে অন্ধ্র নামে পরিচিত একদল লোক বসবাস করিত। তাহাদের রাজারাই ছিলেন সাতবাহন বংশীয়। এই রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক গোদাবরী নদীর উপত্যকায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। কোনও কোনও পুরাণের মতে সাতবাহন বংশের ৩০ জন রাজা ৪৫৬ বৎসর রাজত্ব করেন। আবার কোনও কোনও পুরাণের মতে এই রাজবংশের রাজত্বকাল ৩০০ বৎসর। মৌর্যবংশ পতনের পর দাক্ষিণাত্যে এই রাজবংশের অভ্যুদয় অথবা শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছিল ইহাই সঙ্গত মনে হয়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হইলে উত্তর ভারতে শক, যবন, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্ত সাতবাহন বংশীয় রাজাগৌতমীপুত্র শাতকর্ণী ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যকে ইহাদের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হন। ইতিহাসে ইহাই তাহাদের প্রধান কীর্তি বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। একজন সাতবাহন রাজার মুদ্রাতে ক্ষোদিত জাহাজের প্রতিকৃতি হইতে অনুমিত হয় যে, এই রাজবংশের নৌবাহিনী ছিল। একসময়ে সাতবাহন সাম্রাজ্য কেবল সমগ্র দাক্ষিণাত্যে নহে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতেও বিস্তৃত হইয়াছিল। নাসিক ও অন্যান্য স্থানে পাহাড় খুঁড়িয়া কতকগুলি গুহা, মঠ ও মন্দির দেখা গিয়াছে। সেগুলি সম্ভবতঃ সাতবাহন বংশের রাজত্বকালের নিদর্শন, সাতবাহন বংশের রাজ্য দ্বিতীয় কি তৃতীয় খ্রীষ্ট শতকে ধ্বংস হয়। সাতবাহন বংশীয় রাজারা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মেও তাঁহাদের ভক্তি ছিল। এই বংশের রাজা হাল-এর নামে 'সপ্তশতী' ('সপ্তশতী' দ্র) নামক কবিতা গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সাতবাহন রাজাদের সময়ে শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সাঁতার অতি পুরাকাল হইতেই অন্যান্য ব্যায়ামের তুলনায় সন্তরণ অধিক মাত্রায় আদরণীয় ছিল। প্রাচীন-কালে মিশর, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সকল দেশেই সন্তরণচর্চা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক হাতি, দোহাতি পাড়ি, বুক পাড়ি, যাহা আমরা আধুনিক বলিয়া জানি, তাহার চিত্র প্রাচীন ভাস্কর্যে দৃষ্ট হয়। রোম এবং তাহার উপকণ্ঠে এক সময়ে আটশো হইতে নয়শো সাধারণ স্নানাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐ সব স্নানের জায়গা এত বড় ছিল যে, একসঙ্গে এক হাজার লোক স্নান করিতে পারিত। রোমের স্নানাগারে গরম জলেরও বন্দোবস্ত থাকিত। পেশাদার সাঁতারুদের শিক্ষার জন্য স্কুল ইত্যাদি ছিল। মধ্যযুগেও সন্তরণ সকল শ্রেণীর লোকের কাছে আদরণীয় বা আমোদ-প্রমোদ হিসাবে পরিগণিত ছিল। ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই, তাঁহার পার্শ্বচরেরা এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের যুবকেরা অবগাহন স্নান করিতেন এবং সাঁতার কাটিতেন। ইংল্যান্ডেও দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন নিপুণ সাঁতারু ছিলেন তাহা আমরা তাঁহার জীবনচরিত গ্রন্থে দেখিতে পাই। ঊনবিংশ শতকে আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যেও সন্তরণবিদ্যার প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভাল সাঁতার কাটিতে পারিতেন। নরেন্দ্রনাথও (বিবেকানন্দ) নিয়মিত সাঁতার কাটিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে ইওরোপের সর্বত্রই বিজ্ঞান-সম্মত সন্তরণের প্রবর্তন হয়। আমাদের দেশে বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের প্রায়

সকলকেই সন্তরণবিদ্যা অভ্যাস করিতে হয় অনেকটা আত্মরক্ষার কারণেই। ইদানীং কলিকাতাতেও সাঁতার শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু অতি অল্প লোকেই এ সুযোগ গ্রহণ করে। সুরেশচন্দ্র পাল ইংল্যান্ডে থাকাকালে (১৮৭৯) টেম্‌স নদী কয়েকবার পার হইয়াছিলেন এবং ইংলিশ চ্যানেল প্রায় ৩০/৩৫ কি. মি. পর্যন্ত বেসরকারীভাবে সাঁতার দিতে সাহস করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে সন্তরণ-প্রতিযোগিতা পৃথিবীব্যাপী এক মহাচাঞ্চল্যকর ঘটনা। ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার প্রচেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়াই চলিয়াছে এবং আজ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক লোক এ-বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মেয়েরাও আছেন। ডোভার হইতে ফ্রান্সের উপকূল মাত্র ৩৩ কি. মি. কিন্তু চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারুদের প্রায় সকলকেই ঝড়, তুফান মাঝে মাঝে প্রতিকূল হিমশীতল স্রোত, কুয়াশা প্রভৃতি নানা বাধাবিঘ্ন কাটাইয়া ৬০/৭০ কি. মি. পর্যন্ত সাঁতারে যাইতে হয়। ভারতীয়দের মধ্যে মিহির সেন, নীতীন্দ্রনারায়ণ রায়, ডাঃ বিমল চন্দ্র, ব্রজেন্দ্র দাস, আরতি সাহা প্রমুখ সাঁতারুরাও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কুমারী আরতি সাহার (বর্তমানে আরতি গুপ্তা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময়ের মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করিয়া (ফ্রান্স হইতে ইংল্যান্ড) সন্তরণে সমগ্র এশিয়ার নারীজাতির মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২২ সেপ্টেম্বর আর্জেন্টিনার ৪২ বৎসর বয়স্ক সন্তরণ-শিক্ষক অ্যান্টনিও আর্বাটান্ডো সন্তরণে চ্যানেল পার হইয়া না থামিয়া ফিরিয়া আসেন।

শান্তি পাল

সাদি (সাউদি), রবার্ট (১৭৭৪-১৮৪৩ খ্রী) ইংরেজ কবি, গদ্য লেখক ও ঐতিহাসিক। কোলরিজের বিশিষ্ট বন্ধু ('কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর' দ্র) ; ইঁহারা উভয়ে 'প্যান্টিসোক্রাটিক্' সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেন। কোলরিজ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর সহিত তিনি লেক ডিস্ট্রিক্টে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাদি রাজকবি-পদে বৃত হন। তাঁহার 'থালাবা' (১৮০১ খ্রী), 'দি ভিজান অভ্ জাজমেণ্ট' (১৮২১ খ্রী) প্রভৃতি কবিতায় শিল্পকলা আছে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষিত হয়। তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাগুলি এবং গাথাসংগীতগুলি এখনও বেশ জনপ্রিয় ; এইগুলির মধ্যে 'After Blenheim', 'Inchcape Rock' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'হিস্ট্রি অভ্ ব্রেজিল' তাঁহার লেখা ইতিহাস গ্রন্থ এবং 'লাইফ অভ্ নেলসন' (১৮১৩ খ্রী), 'লাইফ অভ্ ওয়েস্‌লি' (১৮২০ খ্রী) প্রভৃতি জীবনচরিত। সহজ, সুন্দর ভাষায় লিখিত তাঁহার চিঠিগুলি পত্র-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় ('রামমোহন রায়' দ্র) কর্তৃক 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) অনুসৃত রক্ষণশীল নীতির প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র সেন ('কেশবচন্দ্র সেন' দ্র) 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' ('আদি ব্রাহ্মসমাজ' দ্র) নাম গ্রহণ করে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ মে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায়, মুখ্যতঃ সমাজ পরিচালনা-বিধি সম্পর্কে গুরুতর মতভেদ হওয়ায় শিবনাথ শাস্ত্রী ('শিবনাথ শাস্ত্রী' দ্র) আনন্দমোহন বসু ('আনন্দমোহন বসু' দ্র) প্রমুখ ব্রাহ্মগণ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মূল প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ ঃ 'এই সভা, ব্রাহ্মসমাজের নিয়মতন্ত্রপ্রণালী-প্রতিষ্ঠিত কোনও গঠন নাই দেখিয়া, গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তদ্বশতঃ যে সমস্ত বহুবিধ মহান্ দোষ ব্রাহ্মসমাজে বর্তমান রহিয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থ এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের কার্যের উন্নতি ও মঙ্গল যে-সমস্ত বিষয়ের উপরে নির্ভর করে, তদ্বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মত গ্রহণ ও সম্মিলিত চেষ্টার উপায় বিধানার্থ, 'সাধারণ সমাজ' নামে একটি সমাজ স্থাপন করিতেছেন।' শিবনাথ শাস্ত্রীর মতে সম্ভবতঃ গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ এই নামটি প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র-ব্যাখ্যাত 'আদেশবাদ', 'মহাপুরুষবাদ' ও 'বিধানবাদ' অনেকের নিকট ব্রাহ্ম-আদর্শের পরিপন্থী বলিয়া বোধ হয়। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে সাধারণ মনুষ্য ঈশ্বরের সাধারণ সন্তান, কিন্তু মহাপুরুষেরা তাঁহার বিশেষ সন্তান—তাঁহারা ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ, তাঁহারা ঈশ্বরতুল্য মনুষ্য। এই মত প্রচারের ফলে ব্রাহ্মসমাজে গৃহবিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ ব্রাহ্মবিবাহ-বিধি-বহির্ভূত বলিয়া অভিযোগ আসিলে বিচ্ছেদ পরিপূর্ণ হয়।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রথম সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে আনন্দমোহন বসু, শিবচন্দ্র দেব ও উমেশচন্দ্র দত্ত। প্রাদেশিক সমাজগুলির প্রতিনিধি-সহ ৪৯ জন 'কমিটি'র সভ্য ছিলেন। ইহা স্থির হয় যে, গরিষ্ঠসংখ্যক ব্রাহ্মের অনুমোদন লাভ না করিলে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মাদর্শ বা মতবাদ বলিয়া কিছু প্রচার করা

যাইবে না। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সংঘটিত এই সমাজ বহুবিধ কর্মধারার মাধ্যমে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহার প্রথমতম প্রচারকবৃন্দ নিযুক্ত হন—বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও গণেশচন্দ্র ঘোষ। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নিজস্ব ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী মুখপত্র 'দি ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রকাশিত হয়।

প্রভাত বসু

সান-ইয়াৎ-সেন (১৮৬৭-১৯২৫ খ্রী) চীন প্রজাতন্ত্রের জনক। জন্মস্থান : দক্ষিণ চীনের সুই হেং। পিতা ছিলেন দরিদ্র ক্রিশ্চান কৃষিজীবী। হনলুলু ও হংকং-এ মিশন স্কুলে শিক্ষা লাভ। চিকিৎসাবিদ্যায় হংকং-এর ১ম স্নাতক (১৮৯১ খ্রী)। ম্যাকাও ও ক্যান্টনে ডাক্তারি করেন ও চীনা প্রজাতন্ত্রী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৯৫ খ্রী)। বিদেশে গিয়া প্রবাসী চীনাদের সাহায্যে জাতীয় দল (Huo Min Tang) গঠন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে ন্যানকিং-এ প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হন। ২য় বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার নির্বাসন হয়। প্রত্যাবর্তন (১৯১৭ খ্রী) করিয়া ন্যানকিং-এ দক্ষিণ চীন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি (১৯২১ খ্রী) হন। রুশ পরামর্শদাতা মাইকেল বোরোডিন-এর সহযোগিতায় জাতীয় দল পুনর্গঠন করেন এবং সাম্যবাদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া (১৯২৩ খ্রী) চীনের জাতীয় ভাবভূমি ও কর্মসূচী রচনা করেন। তিনি চীনের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা পূর্ণরূপ পায় নাই ; কারণ জাতীয় দলে ভাঙ্গন ধরে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীরা দুইটি উপদলে বিভক্ত হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাকে ভোলেন নাই। তাঁহারা তাঁহার শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ ন্যানকিং-এ সমাধিস্থ করা হয় এবং এই সমাধি অচিরে জাতীয় পুণ্যতীর্থে পরিণত হয়। তিনি দীনের বন্ধু ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রেত ছিল জ্ঞানীদের শাসন। চীনের ইতিহাসে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয়।

নির্মলকান্তি মজুমদার

সাবর্ণ চৌধুরী সাবর্ণগোত্রীয় ও গাঙ্গুলি-বংশীয় প্রাচীন এই ব্রাহ্মণ জমিদার শুধু সাবর্ণ চৌধুরী নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত, বাংলার সুবেদার মানসিংহের সুপারিশে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে অন্যান্য স্থানের সহিত জায়গীর স্বরূপ কলিকাতা পরগনা প্রাপ্ত হন। দক্ষিণে বেহালা-বড়িশা ও উত্তরে দক্ষিণেশ্বর ; ইহার মধ্যে কালীক্ষেত্র বা কলিকাতা পরগনা অবস্থিত। লক্ষ্মীকান্তের পৈত্রিক বাসস্থান ছিল হুগলি জেলার গোহাট্য গোপালপুরে। মোগল-দরবার কর্তৃক তিনি মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন। সাবর্ণ চৌধুরীরা আদিগঙ্গার উপর কালীঘাটে এক কালী মন্দির নির্মাণ করেন। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে তাঁহাদের কাছারি বাড়ি ছিল। প্রবাদ আছে, এই কাছারি বাড়িতে অ্যান্টনী-ফিরিঙ্গি দপ্তরের খাতা লিখিতেন। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত সাবর্ণ চৌধুরীদের সম্পত্তির কর্মকর্তা ছিলেন। জোব চার্নকের ('চার্নক, জোব' দ্র) সময় (১৬৯০ খ্রী) এই বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরী সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—এই তিনখানি গ্রামের মালিক ছিলেন। নানা জিনিসপত্রের সহিত নগদ ১৬ হাজার টাকা নবাবকে উপঢৌকন দিয়া ইংরেজরা এই তিনটি গ্রাম কিনিয়া লইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ১০ নভেম্বর এক-কেতা দলিলের দ্বারা ইংরেজরা সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ হইতে এই গ্রাম তিনখানি কিনিয়া লয়।

সুবোধকুমার মজুমদার

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬৫ খ্রী) সুকবি ও সাহিত্যিক। জন্ম নদিয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে। পিতা কালীপ্রসন্ন। ১৯২১ সালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রাবস্থাতেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া শিক্ষাপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন। সাবিত্রীপ্রসন্নের যথার্থ কবিজীবনের সূত্রপাত ঘটে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পল্লীব্যথা' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে। ১৯২৪ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার কাব্যসাধনা অবাধে চলে। স্বনামে ও ছদ্মনামে তৎকালে তাঁহার বিভিন্ন রচনা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'মধুমালতী', 'রক্তরেখা', 'আহিতাগ্নি', 'চিত্তরঞ্জন', 'মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র', 'মনোমুকুর', 'অতসী', 'বন্দনা', 'অনুরাধা' প্রভৃতি বহু কাব্য ও জীবনীগ্রন্থ কবির তৎকালীন সাহিত্যসাধনার ফলশ্রুতি। তিনি একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী কবি হিসাবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। পরোপকারী দরদী মানুষ হিসাবে তাঁহার স্থান ছিল খুবই ঊর্ধ্বে, শিক্ষাবিদ্ ও

কুশলী প্রচারবিদ্ হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

সাভারকার, বিনায়ক দামোদর (১৮৮৩-১৯৬৬ খ্রী) ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে দেশপ্রেমিক মুক্তিসংগ্রামী হিসাবে এবং লেখকরূপে তাঁহার নাম অবিস্মরণীয়। জন্মস্থান ঃ নাসিক জেলার ভাগুর গ্রাম। পিতা ঃ কবি ও পণ্ডিত—দামোদর কণ্ঠ সাভারকার। পুণা ফার্গুসন কলেজ হইতে বি. এ. (১৯০৫ খ্রী) পাস করিয়া শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া লণ্ডনে যান ও ব্যারিস্টারি পাশ করেন (১৯০৯ খ্রী)। তিনি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. লিট. (১৯৪৩ খ্রী) এবং পুণা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এল. (১৯৫৯ খ্রী) উপাধি লাভ করেন। বিপ্লব ও সংগ্রাম তাঁহার সমগ্র জীবনের মর্মবাণী। এই শতকের প্রত্যুষলগ্নে 'মিত্রমেলা', 'অভিনব ভারত' সংস্থা গঠন, লণ্ডনে 'ফ্রি ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউটে' তাঁহার অনুচর মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক স্যার কার্জন উইলির হত্যা, নাসিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্সন নিধন প্রভৃতি সন্ত্রাস-মূলক কার্য-কলাপের অপরাধে তিনি লণ্ডনে ইংরেজ-সরকার কর্তৃক ধৃত হন (মার্চ, ১৯১০ খ্রী)। বিচারের জন্য সৈনিক ও প্রহরীবেষ্টিত যুদ্ধজাহাজে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার সময় তিনি সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলায়নের চেষ্টা করেন, কিন্তু পুনরায় ধৃত হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশে আন্দামানে (১৯১১-১৯২১ খ্রী) ও নাসিকের রত্নগিরি জেলে (১৯২১-১৯৩৭ খ্রী), ২৬ বৎসরকাল অবরুদ্ধ থাকিয়া তিনি মুক্তিলাভ করেন (মে, ১৯৩৭ খ্রী)। এই সময়ে তিনি 'বীর সাভারকার' অভিধায় ভূষিত হন। তাঁহার জীবনব্রত ছিল মহাহিন্দুজাতি গঠন। মুক্তিলাভের পর তিনি হিন্দুমহাসভার সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করে। আহমেদাবাদ (১৯৩৭ খ্রী), নাগপুর (১৯৩৮ খ্রী), কলিকাতা (১৯৩৯ খ্রী), মাদুরা (১৯৪০ খ্রী), ভাগলপুর (১৯৪১ খ্রী), কানপুর (১৯৪২ খ্রী) প্রভৃতি স্থলে হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধী হত্যা-ষড়যন্ত্রে তিনি ধৃত হন এবং মামলায় নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের সতর্কতা-মূলক আটক-আইনে তিনি পুনরায় ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি হিন্দুমহাসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। মারাঠী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থ সংখ্যা ৩৮ খানি। বিপ্লব ও জাতীয়তার জয়গান তাঁহার রচনার মর্মবাণী। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দি ওয়ার অভ্ ইনডিপেনডেন্স' (১৯০৮ খ্রী), 'হিন্দুত্ব' (১৯২৩ খ্রী), 'সাভারকার সাহিত্য' (১৯৩২ খ্রী), 'দি স্টোরি অভ্ মাই ট্রান্সপোর্টেশন (১৯৫০ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

হারাধন দত্ত

সামবেদ গানের জন্য ব্যবহৃত ঋক্ মন্ত্রই সাম। তিন জন ঋত্বিক্ সামগান করেন। ইঁহারা—উদ্গাতা, প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তা। যে অংশ উদ্গাতার গেয় তাহা উদ্গীথ। প্রস্তোতার গেয় অংশ প্রস্তাব। প্রতিহর্তার গেয় অংশ প্রতিহার। তিন জনের দ্বারা একসঙ্গে গেয় অংশ নিধন। কয়েকটি সামমন্ত্রের সমষ্টি স্তোত্র। গানের মধ্যে একটি সামমন্ত্র বারে বারে উচ্চারিত হয়। তিনটি মন্ত্রকে আবৃত্তি দ্বারা পঞ্চদশ পরিণত করা যায়। সে ক্ষেত্রে স্তোত্রকে বলা হইবে পঞ্চদশ স্তোম। সোমযজ্ঞে হোতা প্রভৃতির শাস্ত্রপাঠের পূর্বে স্তোত্র গীত হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারে তিনটি ঋক্ সামের সহিত যুক্ত হয়, যেমন বহু স্ত্রী একজন পতির সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রচলিত সামবেদের অন্তর্গত দুই অংশ—পূর্বার্চিক বা ছন্দ আর্চিক, উত্তরার্চিক বা উত্তর সংহিতা। পূর্বার্চিকের পাঁচ অংশ বা কাণ্ড। প্রথম তিন কাণ্ডে ৫৮৫টি একর্চ বা এক ঋক্-যুক্ত সূক্ত আছে। একটি ঋক্মন্ত্রই একটি সূত্র। ইহাই সাম-যোনিমন্ত্র। তৃচ বা তিন ঋক্ দ্বারা গঠিত সূক্তই সর্বাধিক। তিনের কম বা বেশি ঋক্ দ্বারা গঠিত সূক্তও আছে। সর্বসমেত ৪০০ সূক্ত; তাহার ভিতরে ২৮৭টি তিন ঋক্-যুক্ত। এই সূক্তগুলি যজ্ঞীয় প্রয়োজনে গঠিত। প্রত্যেকটি সূক্তই একটি সম্পূর্ণ গানের মন্ত্র বা মন্ত্রগুচ্ছ।

সামগানের গ্রন্থ সাম-যোনিমন্ত্র অবলম্বনে রচিত। যথা ঃ গ্রামে গেয় গান, অরণ্যে গেয় গান, ঊহ গান, এবং ঊহ্য গান বা রহস্যগান। ঊহ এবং ঊহ্য গান পরবর্তী-কালের রচনারূপে প্রতিভাত হয়। প্রচলিত সামবেদ সংহিতা গানের উদ্দেশ্যে সংকলন মাত্র এবং ইহার সাহিত্যিক মূল্য নাই বলা চলে, যদিও ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এবং যজ্ঞতত্ত্বের বিবেচনায় ইহার মূল্য অবশ্য-স্বীকার্য। সামন্-শব্দের প্রাথমিক অর্থ দেবস্তুতিমূলক গান। ছন্দোগ অর্থাৎ ছন্দ বা বৈদিক সংগীতের গায়কদের সহিত সামগানের সম্বন্ধ ছিল। ছন্দোগেরাই সামগান গাহিত। ঋগ্বেদীয় অষ্টম মণ্ডলের ঋষি কণ্বগোত্রীয়রাও সামগান গাহিত। ঋক্মন্ত্রের মত সামমন্ত্রেরও ঋষি বা দ্রষ্টা ছিল।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

সাময়িকপত্র, বাংলা (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাংলা ভাষায় যে-সমস্ত সাময়িকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা যেমন প্রচুর, বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বহুজনের পাঠের জন্য সাময়িকপত্র প্রকাশ এ-দেশে ইংরেজ-আগমনের পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য মোগলযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্রশাসন ও ব্যক্তি-গত প্রয়োজনে লিপির আকারে সংবাদ পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল; তাহা 'আখবার' নামে পরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রাযন্ত্রাদির ব্যবহার শুরু হইলে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি হিকি সাহেবের সম্পাদনায় 'বেঙ্গল গেজেট' নামে যে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় তাহাই এই অঞ্চলের প্রথম সাময়িকপত্র, অবশ্য ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথম পর্ব নির্দেশ করা যাইতে পারে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন হইতে 'দিগ্‌দর্শন' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সামান্য পরে উক্ত মিশন হইতে মার্শম্যানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় (১৮১৮ খ্রী, ২৩ মে)। কলিকাতা হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামে যে মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় তাহাই হইতেছে বাঙালী-সম্পাদিত ও কলিকাতা হইতে মুদ্রিত প্রথম সাময়িকপত্র। 'সমাচার দর্পণ' এবং 'বাঙ্গাল গেজেটি'র মধ্যে কোন্‌-খানি অগ্রে প্রকাশিত হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' বন্ধ হইয়া গেলে কলি-কাতার ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত সাপ্তাহিক বৎসর-কাল সম্পাদনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারী-সম্প্রদায় সাময়িকপত্রের সাহায্যে হিন্দুধর্মের দোষকীর্তন শুরু করিলে কলিকাতার বাঙালীসমাজের নেতৃবৃন্দ ইহার প্রতিবিধানকল্পে সাময়িকপত্র প্রকাশ করিয়া মিশনারীদের আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট হইলেন। রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙালীর প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সম্বাদকৌমুদী' (১৮২১ খ্রী, ৪ ডিসেম্বর) প্রকাশিত হয়। রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (দ্বিভাষিক, ১৮২১ খ্রী, সেপ্টেম্বর) ঐ একই উদ্দেশ্যে ইহার সামান্য পূর্বে প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ পরে সেকালের হিন্দুসমাজের মুখপত্রস্বরূপ বিখ্যাত সাপ্তা-হিক পত্রিকা 'সমাচারচন্দ্রিকা' (১৮২২ খ্রী, ৫ মার্চ) সম্পাদনা করেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। জনপ্রিয়তার দাবি মিটাইতে গিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহার সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত সংস্করণ ও মাসিক সংস্করণ (মাসপয়লা) এবং দৈনিক সংস্করণ (১৮৩৯ খ্রী, ১৪ জুন) প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই হইতেছে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। তিনি সম্পাদক-হিসাবে একাধিক পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আধুনিক সমাজের মুখপত্রস্বরূপ দ্বিভাষিক 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' (মাসিক) ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানান্বেষণ' (সাপ্তাহিক, ১৮৩১ খ্রী, ১৮ জুন), 'বিজ্ঞানসেবধি' (মাসিক, ১৮৩২ খ্রী, এপ্রিল), 'সংবাদ ভাস্কর' (সাপ্তাহিক, ১৮৩৯ খ্রী, মার্চ), 'সংবাদ রসরাজ' (১৮৩৯ খ্রী, নভেম্বর) প্রভৃতি আধুনিক ও পুরাতন মতামতের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র পূর্বেই জনসমাজে যথেষ্ট প্রচার লাভ করিয়া-ছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ আগস্ট (১৫ ভাদ্র, ১৭৬৫ শক) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবর্তনায় এবং অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনীসভার মুখপত্রস্বরূপ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইলে শিক্ষিত বাঙালীর অনেক দিনের অভাব ঘুচিল। এই মাসিকপত্রিকা দীর্ঘজীবী হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহার সম্পাদনা করিয়াছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেম-চন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতঃপর কলিকাতা ও মফঃস্বল হইতে নানা শ্রেণীর সাময়িকপত্র প্রকাশের ধুম পড়িয়া গেল। সেই সমস্ত অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে এখানে কয়েকখানির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। রাজা রাজেন্দ্র-লাল মিত্র-সম্পাদিত সচিত্র মাসিক-পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রী) ও 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৬৩ খ্রী), প্যারী-চাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪ খ্রী), কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র-স্বরূপ মাসিক 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫ খ্রী) এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ'-এর নাম স্মরণযোগ্য। এই শেষোক্ত পত্রে সর্বপ্রথম ধীরস্থিরভাবে রাজনৈতিক সমা-লোচনার সূত্রপাত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় এই পত্রিকা একদা শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া-ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মহকুমা শহর, এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতেও অনেক পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা ক্রমে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্র হইতেই প্রকাশিত হইতে থাকে। বারাণসী হইতে ১৮৪৯

খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 'বারাণসী চন্দ্রোদয়' লিথোয় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী সম্পাদিত ইহাই প্রথম সাময়িক পত্রিকা। বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ, রংপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলা হইতেও ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অনেকগুলি মাসিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্যারীচরণ সরকার ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ' (সাপ্তাহিক, ১৮৫৬ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজে ও সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। একালে বোধহয় 'বঙ্গদর্শন'ই (১৮৭২ খ্রী) বাঙালীর নবজাগরণে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন' ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) 'বঙ্গদর্শন'কে সুষ্ঠু সম্পাদনার দ্বারা যথার্থ প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রে পরিণত করেন। পরবর্তীকালে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্গদর্শনে'র পুনঃপ্রবর্তন করেন (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) বঙ্গদর্শনের সাময়িককালে এবং অল্প কিছু পরে 'সাধারণী' (সাপ্তাহিক ১২৮০ বঙ্গাব্দ), 'মাসিক ভ্রমর' (১২৮১ বঙ্গাব্দ), 'নবজীবন' (১২৯১ বঙ্গাব্দ), 'বান্ধব' (মাসিক, ১২৮১ বঙ্গাব্দ), 'ভারতী' (মাসিক, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ), 'বঙ্গবাসী' (সাপ্তাহিক ও দৈনিক ১২৮৮ বঙ্গাব্দ), 'সঞ্জীবনী' (সাপ্তাহিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'নব্যভারত' (মাসিক, ১২৯০ বঙ্গাব্দ), 'সাহিত্য' (মাসিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ), 'হিতবাদী' (সাপ্তাহিক ১২৯৮ বঙ্গাব্দ), 'সাধনা' (মাসিক, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত), 'দাসী' (মাসিক, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত), 'বসুমতী' (সাপ্তাহিক, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ ; দৈনিক, ১৩২১ বঙ্গাব্দ ; মাসিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'উদ্বোধন' (পাক্ষিক, পরে মাসিক ; ১৩০৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত), 'প্রবাসী' (মাসিক, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত), 'ভাণ্ডার' (মাসিক, ১৩১২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত), 'স্বরাজ' (সাপ্তাহিক, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত), 'ভারতবর্ষ', (মাসিক, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) 'নারায়ণ' (মাসিক, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস-সম্পাদিত), 'সবুজপত্র' (মাসিক, ১৩২১ বঙ্গাব্দ, প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত), 'মানসী' (মাসিক, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ), 'মর্মবাণী' (মাসিক, শ্রাবণ, ১৩২২), 'মানসী ও মর্মবাণী' (মাসিক, ফাল্গুন, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; 'মর্মবাণী' উঠিয়া গিয়া 'মানসী'র কলেবর বৃদ্ধির জন্য, 'মানসী ও মর্মবাণী'র সৃষ্টি হয়), 'বিজলী' (সাপ্তাহিক, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ), 'বাংলার কথা' (সাপ্তাহিক, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, চিত্তরঞ্জন দাশ ও বাসন্তী দেবী-সম্পাদিত), 'বঙ্গবাণী' (মাসিক, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ, দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার-সম্পাদিত), 'আত্মশক্তি' (সাপ্তাহিক, ১৩২৮-২৯ বঙ্গাব্দ), 'ধূমকেতু' (পাক্ষিক, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, কাজী নজরুল ইস্‌লাম-সম্পাদিত), 'কল্লোল' (মাসিক, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, দীনেশচন্দ্র দাশ-সম্পাদিত), 'শনিবারের চিঠি' (প্রথম সাপ্তাহিক ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, তৎপরে মাসিক, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, সম্পাদনায় যোগানন্দ দাস, সজনীকান্ত দাস), 'বিচিত্রা' (মাসিক ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত), 'কালিকলম' (মাসিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি-সম্পাদিত), 'পরিচয়' (ত্রৈমাসিক, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ; পরে মাসিক), 'দেশ' (সাপ্তাহিক, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালীসমাজে প্রচারিত রহিয়াছে। অবশ্য উল্লিখিত পত্রিকার অত্যন্ত অল্পসংখ্যকই দীর্ঘজীবী হইয়াছে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও রাজনৈতিক আনুগত্যের ব্যাপারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রসিদ্ধ। চুক্তির ফলে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌গণের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, গ্রীসের সোফিস্ট দার্শনিকদের রচনায় এবং প্লেটো ও আরিস্তোতলের রচনাতেও সামাজিক চুক্তির ইঙ্গিত আছে। ইঁহাদের সকলের বক্তব্য এক ছিল না এবং আলোচনার উদ্দেশ্যও পৃথক্ ছিল। সর্বোপরি তাঁহাদের কাহারও রচনাতেই ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদে পরিণত হয় নাই। একাদশ শতাব্দীতে ধর্মযাজক ম্যানেগোল্ডের হস্তে ইহা একটি মতবাদের রূপ পায়। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের টমাস হব্‌স্ (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রী) ও জন লক (১৬৩২-১৭০৪ খ্রী) এবং বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রী) সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই তিনজনকে সেইজন্য 'চুক্তিবাদী' বলা হয়। তিনজনেই চুক্তির ফলে কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে এই মতবাদের বক্তব্য হইল যে, রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পূর্বে মানুষ একপ্রকার 'প্রাকৃতিক অবস্থায়' বাস করিত। বিভিন্ন কারণে সেই অবস্থা সমস্যাজর্জর ও সংকটপূর্ণ হইয়া উঠে। ফলে মানুষ সেই অবস্থা হইতে

মুক্তি পাইবার জন্য চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্টি করে এবং একজনকে রাজা নির্বাচিত করে। রাজার নিকট হইতে কয়েকটি প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে তাহারা রাজার প্রতি আনুগত্য অর্পণ করে। রুশো অবশ্য রাজার উল্লেখ করেন নাই। তিনি রাজার পরিবর্তে 'সাধারণের ইচ্ছা'কে সর্বশক্তিমান্ বলিয়াছেন।

পরবর্তীকালে এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা হিসাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ চুক্তির ফলে রাষ্ট্র হইয়াছে এইরূপ ঘটনা ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। ইহা ছাড়াও রাষ্ট্র জন্মের পূর্বেই মানুষের মস্তিষ্কে চুক্তির ধারণা থাকা অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

এই সকল কারণে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইলেও একটি বিষয়ে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রাষ্ট্র যে জনগণের দ্বারা সৃষ্ট এবং জনগণই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি, বর্তমান গণতন্ত্রের এই যে মূল সুর, তাহা সামাজিক চুক্তি মতবাদেই প্রথম শোনা যায়। বিশেষ করিয়া রুশোর অভিমত ও তাঁহার 'সাধারণের ইচ্ছা'র ধারণা পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশে নিঃসন্দেহে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

অরূপকুমার ভট্টাচার্য

সাম্যবাদ কমিউনিজম দ্র

সাম্রাজ্যবাদ ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ছলে ও বলে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংস্থার অধীনে রাখিয়া শাসন করার স্পৃহাকে বলে সাম্রাজ্যবাদ। যোদ্ধা ও রাষ্ট্রনায়কদের উচ্চাভিলাষ হইতে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। আলেকজান্ডার (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৬-৩২৩) এশিয়া ও ইওরোপের দেশগুলিকে লইয়া সাম্রাজ্য গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের সীজার এবং ঊনবিংশ শতকের নেপোলিয়ন দুইজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী।

অনেক সময় সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে নানা ধরনের প্রেরণা থাকে—যেমন ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রভুত্ব, অর্থলোভ, বাণিজ্যবিস্তার প্রভৃতির প্রেরণা। আরব সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে ছিল ধর্মের প্রেরণা। সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার অভিলাষে সপ্তম ও অষ্টম শতকে খলিফার নেতৃত্বে এশিয়া, ইওরোপ ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়িয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। নবম শতকে ইওরোপের উপজাতিগুলির মধ্যে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানসভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার নাম করিয়া জার্মান রাষ্ট্রনায়করা তাহাদের 'পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য' গঠনে নামিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকে উগ্র জাতীয়তাবোধ সাম্রাজ্যবাদে ইন্ধন জোগাইয়াছে। প্যান-জার্মান ও প্যান-স্লাভ আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য ছিল যথাক্রমে জার্মান ও স্লাভ জাতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলির উপর প্রভুত্ব করা।

পঞ্চদশ শতক হইতে ইওরোপে যে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয় তাহার মূলে ছিল ইওরোপের বণিক শ্রেণী। এশিয়ার মশলার বাণিজ্য এবং মেক্সিকো ও পেরুর সোনার ভান্ডারের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে অর্থলোভাকৃষ্ট স্পেনীয় ও পর্তুগীজরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। ক্রমশঃ ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। এইভাবে এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ইওরোপীয় জাতিগুলির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। গোড়ায় বণিকরা সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা লইয়া না আসিলেও তাহাদের মানদণ্ডই শেষে রাজদণ্ডের রূপ লইল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বণিক শ্রেণীর পিছনে পিছনে উপনিবেশগুলিতে আসিয়াছিল খ্রীষ্টান পাদ্রী ও মিশনারী। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লোককে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করা। কিপলিং বলিয়াছিলেন কৃষ্ণকায়দের উন্নতিবিধান শ্বেত জাতির দায়িত্ব (হোয়াইট ম্যান্স্ বার্ডেন)। কিন্তু অচিরেই বণিকরা শিল্পপণ্য জোরজবরদস্তি করিয়া সস্তাদরে কিনিয়া আনিয়া ইওরোপের বাজারে চালান দিতে লাগিল। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি মুনাফালাভের একটি পরোক্ষ উপায় বাহির করিল। শুধু তাহাই নহে, উপনিবেশে মূলধন আনিয়া কলকারখানা স্থাপন করিয়া বণিকরা সেখানেই ব্যবসায় শুরু করিল। ইহার ফলে একদিকে মাতৃভূমির মূলধন উপনিবেশে খাটাইবার ব্যবস্থা হইল, অন্যদিকে উপনিবেশগুলির জাতীয় শিল্প সরকারি নিগ্রহে এবং প্রতিযোগিতায় পড়িয়া ধ্বংস হইল। ইংরেজ শাসনকালে ভারতের বস্ত্রশিল্প এইভাবে ইংল্যান্ডের কাপড়ের কলগুলির হাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাণিজ্য ও উপনিবেশ লইয়া ইওরোপের রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতার পরিণাম প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮ খ্রী); ইহার মূলে ছিল ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের সঙ্গে জার্মানির দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৬ খ্রী) কারণও একই প্রকার। জার্মানি ও জাপানের দ্বন্দ্বের পিছনে পড়িয়া ইতালি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা করিতে পারিতেছিল না বলিয়াই যুদ্ধে নামিয়াছিল। দুই মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদের মুঠি শিথিল হইয়াছে। এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীন হইয়াছে, আফ্রিকার দেশগুলিও স্বাধীনতা অর্জন করিতেছে; কিন্তু মূলধন

খাটাইয়া অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির শোষণ এখনও বন্ধ হয় নাই।

নারায়ণী বসু

সায়ণ বৈদিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাকাররূপে সায়ণাচার্য পরিচিত। ঋগ্‌বেদ, অথর্ববেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, শতপথ ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, সামবেদ সায়ণের ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহাই লোকশ্রুতি। এক মতে মাধবাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণ। উভয়ের পিতার নাম সায়ণ এবং মাতার নাম শ্রীমতী। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট রাজ্যে বিজয়-নগরে রাজা বুক্ক ছিলেন। তাঁর কুলগুরু ও মন্ত্রী ছিলেন মাধব। পূর্বমীমাংসার ব্যাখ্যাকাররূপে মাধবের প্রসিদ্ধি ছিল। বেদার্থের প্রকাশনে তিনি বুক্ক রাজার দ্বারা আদিষ্ট হন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সায়ণের উপর বেদের ব্যাখ্যার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সায়ণ ও মাধব একই ব্যক্তি। 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' গ্রন্থের রচয়িতারূপে উভয় নামের একত্র উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ভিন্ন জনশ্রুতিতে মাধবের অনুজরূপে সায়ণকে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য। সায়ণকে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করা হয়। সায়ণ মীমাংসাপন্থী এবং বেদের ব্যাখ্যায় ছয় বেদাংগ, পুরাণ ও মীমাংসা দর্শনের সাহায্য লইয়াছেন।

নৃপেন্দ্র গোস্বামী

সার জমির উর্বরতা বজায় ও বৃদ্ধির জন্য যে-সমস্ত প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তু জমিতে মেশে বা মেশানো হয়, সাধারণভাবে তাহাকেই সার বলা হয়। নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাস প্রভৃতি রাসায়নিক বস্তু জমিতে জাত গাছপালার লালন-পালন ও বৃদ্ধির সহায়ক। কাজেই জমিতে এগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার।

বজ্রপাত সহকারে বৃষ্টির জন্য আমাদের ভারতবর্ষের মাটি, আকাশ হইতে নামিয়া আসা জলের ধারার সহিত সহজলভ্য নাইট্রোজেন পাইতে পারে। প্লাবনে বা জলের ধারায় উর্বরা পলিমাটি নদী-নালা দিয়া জমিতে আসে এবং তাহাতে অনেক জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসবই প্রকৃতির দান। কেবলমাত্র প্রকৃতির উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। ভাল ফসল তুলিতে হইলে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে সার দিতেই হইবে। উৎপত্তি অনুসারে সারকে আমরা জৈব এবং অজৈব বা রাসায়নিক সার বা উর্বরক বলিয়া থাকি। উদ্ভিদ-জাত বা পশু-পক্ষীর মারফৎ আমরা যে সার পাই তাহা জৈব সার; যেমন, সবুজ সার, খামারের আবর্জনা সার, গোবর, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি। নানা প্রকার তৈলবীজ হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খইল থাকে তাহাও উৎকৃষ্ট জৈব সারের কাজ করে। সবুজ গাছ বা বড় গাছের ডালপালাও মাটিতে মিশাইয়া দিলে তাহা সহজে পচিয়া যে উদ্ভিদ খাদ্যে পরিণত হয় তাহাকেই সবুজসার বলা হয়, যেমন, শণ, ধনিচা, জয়ন্তী ইত্যাদি। শুঁটি জাতীয় গাছ সবুজসার হিসাবে ব্যবহার করিলে বিশেষ লাভ হয়। সবুজসার মাটিকে শুধু যে উর্বর করে তাহাই নহে, এঁটেল মাটিকে হাল্‌কা ও ভুরভুরে করে এবং হাল্‌কা বালি মাটিকে একটু আঁঠাল বা আঁটসাঁট করে। পশু-পক্ষীর মলেও নাইট্রোজেন, ফসফেট এবং পটাস সার থাকে এবং এই কারণেই গোবর একটি উৎকৃষ্ট সার। এমন কি গোবর গ্যাস (মিথেন) উৎপাদন করার পরেও ব্যবহৃত গোবরের সারমূল্য বজায় থাকে এবং জমিতে প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু জৈব সার অধিক পরিমাণে মিলে না। পক্ষান্তরে রাসায়নিক সার অল্প পরিমাণে দিলেই অনেক কাজ হয়। তবে এই সার কেবলমাত্র শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিই প্রয়োগ করিতে পারে। খরিফ অথবা রবিখন্দে সুযোগমত সবুজসারের ব্যবস্থা করা উচিত। সার জমিতে পচানোর জন্য খরিফে বর্ষার জল অধিকাংশ অঞ্চলে উপযুক্ত; কিন্তু যেখানে সেচের ব্যবস্থা আছে সেখানেই খরিফ এবং রবিতে ইচ্ছামত সবুজসার দেওয়া চলে। যে সব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম এবং সেচের ব্যবস্থা নাই সেখানে সবুজসার ব্যবহার করা উচিত নয়।

রাসায়নিক সার বা উর্বরক হইতে আমরা ফসলের জন্য প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, ফসফরিক অ্যাসিড এবং পটাস পাইয়া থাকি, যদিও প্রয়োজনমত অন্যান্য আবশ্যক মৌল বা পোষকের ব্যবহার বাতিল করা চলে না। সুপার ফসফেট নাইট্রোজেন-ঘটিত সারের মত অংকুরিত চারার ক্ষতি করে না, অতএব বপনের সময় বীজের সংগে অথবা বীজের কাছেই যন্ত্রের সাহায্যে ইহা প্রয়োগ করা চলে।

অল্প পরিমাণ সার দিয়া গাছের দ্রুত বৃদ্ধি এবং অপচয় রোধের জন্য পাতার উপরে জলে গুলিয়া সিঞ্চন-যন্ত্রের সাহায্যে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ (যেমন ইউরিয়া) বর্তমানে প্রচলিত হইতেছে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে দ্রবণের গাঢ়তা শতকরা ৩ঃ৫ ভাগের বেশি যেন না হয়, কারণ পাতার জ্বলিয়া যাইবার ভয় থাকে। উপরন্তু সেচের ব্যবস্থা না থাকিলে বেশি পরিমাণে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

মুরারিপ্রসাদ গুহ

সারদাচরণ মিত্র প্রসিদ্ধ আইনজীবী, বিদ্যানুরাগী, ও গ্রন্থকার। জন্মস্থান ঃ হুগলি জেলার সেহালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাবান্‌ ছাত্র।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। এফ. এ. (১৮৬৭ খ্রী) ও বি. এ. (১৮৭০ খ্রী) পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অর্জন করিয়া যথাক্রমে ডাফ্ ও ঈশান স্কলারশিপ পান। অচিরেই এম. এ., পি. আর. এস. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্ম-জীবনের সূচনাতে প্রেসিডেন্সী কলেজে (১৮৭১ খ্রী) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে তিনি সুনাম অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (১৮৭৮-৮০ খ্রী), টেক্সট্‌বুক কমিটির সভ্য (১৮৮৪-৯০ খ্রী), বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৫ খ্রী) প্রভৃতি সম্মানজনক পদ অলংকৃত করেন। কলিকাতা আর্য-বিদ্যালয় বা সারদাচরণ এরিয়ান ইন্‌স্টিটিউশন (১৮৮৪ খ্রী) স্থাপন তাঁহার অন্যতম কীর্তি। হরিপালে গুরুদয়াল উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্যও তাঁহার উদ্যম স্মরণযোগ্য। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে বৈদ্যবাটিতে 'সারদাচরণ মিউজিয়াম' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং ভারতধর্ম মহামণ্ডলের (বারাণসী) প্রধান-সচিবের পদে নির্বাচিত হন। মহেশ ন্যায়রত্নের সহিত একযোগে তিনি পঞ্জিকা সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। ইহারই ফলশ্রুতি 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' (১৮৯০ খ্রী)। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯০৯-১১, ১৩২০-২৪ বঙ্গাব্দ) ও সভাপতি (১৩১২-১৯ বঙ্গাব্দ) ছিলেন। ভারতবর্ষের বহু ভাষাভাষী সমাজে একলিপি বিস্তারে তিনি ছিলেন অগ্রপথিক। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে একযোগে 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সম্পাদনা করেন। তিনি 'প্রকৃতিরমণ' (১৮৭৪ খ্রী) মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নানা সাময়িকপত্রের লেখক সারদাচরণ সাহিত্যসেবী হিসাবেও গণনীয় ব্যক্তি। রচিত গ্রন্থঃ 'বিদ্যাপতির পদাবলী' (২য় সং ১২৮৫ বঙ্গাব্দ), 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) 'ভারতরত্নমালা', 'কায়স্থ কারিকা', 'টেগোর ল লেক্‌চার্স' (১৮৯৫ খ্রী), 'ল্যান্ড ল অভ্ বেঙ্গল' ইত্যাদি।

হারাধন দত্ত

সারদারঞ্জন রায় (১৮৫৮-১৯২৫ খ্রী) সারদারঞ্জনের জন্ম ঃ ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ। ছাত্রজীবনেই তিনি খেলাধুলায়, বিশেষতঃ ক্রিকেটে দক্ষতা ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কলিকাতার মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রথমে গণিতের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি গণিত বিষয়ে কয়েকটি ইংরেজী গ্রন্থ এবং সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থের সটীক সংস্করণ রচনা করেন। খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রেরণা ও প্রচেষ্টায় বঙ্গদেশে ক্রিকেটের চর্চা প্রসার লাভ করে।

অজিত দত্ত

সারনাথ বারাণসীর ছয় মাইল দূরে অবস্থিত বৌদ্ধতীর্থ। নাম ঋষিপতন বা মৃগদাব বা শারঙ্গনাথ। গৌতমবুদ্ধ এখানে সর্বপ্রথম উপদেশ দান বা ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। হিউএন-ৎসাঙের মতে যে স্থানে ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয় তথায় অশোক ৭০ ফুট একটি স্তূপ নির্মাণ করান। অশোকের পরে এবং পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এখানে ধর্মরাজিক এবং ধামেক স্তূপ নির্মিত হয়। অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এখানে আরও কয়েকটি মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়। বর্তমান শতাব্দীতে দেশী ও বিদেশী অর্থসাহায্যে মূলগন্ধকুটি-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই স্থান খনন করিয়া বহু মূল্যবান্ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানেই অশোকের চারি সিংহযুক্ত স্তম্ভ ও ধর্মচক্র পাওয়া গিয়াছে। এখানে বৌদ্ধ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার নবনির্মিত বৌদ্ধবিহারের দেয়ালে জাপানী চিত্রশিল্পে ফ্রেস্‌কো কাজের মাধ্যমে বুদ্ধের জীবনকথা বহু বর্ণে অঙ্কিত আছে।

ভক্তপ্রসাদ মজুমদার

সারিগান সাধারণতঃ নৌকাচালনার গান। 'সারি' অর্থ শ্রেণী। সারিতে অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধভাবে যখন বহু লোক এক সঙ্গে একই প্রকারের কোনও কাজ করে তখনই এই গান গাহিতে শোনা যায়। দৈহিক ছন্দের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিয়া গাহিতে হয় বলিয়া সারি ছন্দোবদ্ধ বা তালবদ্ধ গান। ভাটিয়ালীর সঙ্গে এই বিষয়ে ইহার প্রভেদ লক্ষণীয়। অনেক মাঝি একসঙ্গে যখন বৈঠা চালনা করে, অনেক শ্রমিক একসঙ্গে যখন ছাদ পেটার কাজ করে বা অনুরূপভাবে অনেক লোক যখন একই ছন্দে কোনও কাজ করিতে থাকে, তখন সারিগান তাহাদের মনে উৎসাহ যোগায়। নৌকার বাচ খেলায় নানা রকমের সারিগান শোনা যায়। খেলার আয়োজন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সারি গাওয়া হয়। শব্দ রচনায় অনেক সময়েই ভাটিয়ালী ও সারিতে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সারিপুত্ত বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য (অগ্‌গ-সাবক)। পিতা ঃ বঙ্গন্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ; মাতা ঃ রূপ-সারী। এমনও কথিত হয় যে, সারিপুত্তের ব্যক্তিগত নাম ছিল উপতিস্‌স কিন্তু মায়ের নামানুসারেই তাঁহার পরি-

চিতি ঘটে। পালিটীকাকারদের মতে তিনি উপতিস্স নামক এক গ্রামের মুখ্য পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। সংযুক্ত নিকায়ের মতে তিনি নালগামকের অধিবাসী ছিলেন এবং অন্যান্য সূত্রে তাঁহাকে নালকের অধিবাসী বলা হইয়াছে।

সারিপুত্ত ও মোগ্গল্লানের (মৌদ্গল্যায়ন) জীবন ও কর্মধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইঁহারা দুজনেই প্রথমে পরিব্রাজক সঞ্জয়ের শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহে বুদ্ধশিষ্য অস্সজির কাছে বুদ্ধের 'ধম্মে'র তত্ত্ব শুনিয়া সারিপুত্ত মুগ্ধ হন এবং বন্ধু মোগ্গল্লানকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহে তথাগত সমীপে উপস্থিত হন। বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া উভয়েই তাঁহার নিকট দীক্ষা লন। তাঁহাদের প্রতিভা দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাদের অগ্গসাবক রূপে ঘোষণা করেন। সঙ্ঘের ঐক্য ও নিয়মশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখাই সারিপুত্তের প্রধান কর্তব্য ছিল। দীক্ষান্তে সপ্তম দিবসে মোগ্গল্লান অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন কিন্তু সারিপুত্ত অর্হৎ হন আরও এক সপ্তাহ পরে। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়েক মাস আগেই সারিপুত্তের দেহাবসান ঘটে।

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ভেন্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় পুণা শহরে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে, ১২ জুন। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি (১৯০৫-১৫) হইলেন মহারাষ্ট্রের প্রখ্যাত নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে। প্রথম তিনজন যাঁহারা ৭ দফা শপথ গ্রহণ করিয়া এই সোসাইটির সদস্য হন, তাঁহারা হইলেন নাটেশ্বর এ. দ্রাবিদ, এ. ভি. পটবর্ধন, জি. কে. দেওধর। গোখলে স্বয়ং এই সোসাইটির সংবিধান তৈয়ারি করেন। প্রধান উদ্দেশ্য, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ, এমন এক দল স্বেচ্ছাসেবক গড়িয়া তোলা যাঁহারা নিঃস্বার্থ ও আইনসঙ্গতভাবে জনকল্যাণকর কার্যকলাপের মাধ্যমে ভারতবাসীর সার্বিক উন্নতিসাধন করিতে পারে। এই সোসাইটির শাখা মাদ্রাজ (১৯১০ খ্রী), নাগপুর (১৯১১ খ্রী), বোম্বাই (১৯১১ খ্রী) ও এলাহাবাদে (১৯১৩ খ্রী) খোলা হয়। ইহার প্রভাব ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। গোখলে ও তাঁহার পরবর্তী সভাপতি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দেশসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেন প্রধানতঃ রাজনীতিতে (ব্যবস্থা-পরিষদে) সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। জনসেবার উদ্দেশ্যে এই সার্ভেন্টস্ অভ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির আদর্শে ক্রমশঃ নানা প্রদেশে নানা প্রকারের সেবক-সমিতি গড়িয়া তোলা হয়। এই সোসাইটির দ্বারা তিনটি পত্রিকাও প্রকাশিত হইত। 'দি সার্ভেন্ট অভ্ ইণ্ডিয়া', মারাঠী দৈনিক 'জ্ঞানপ্রকাশ' এবং মারাঠী সাপ্তাহিক 'হিতবাদ'। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনুন্নত ও হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সোসাইটির সেবামূলক কাজ দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করে।

নির্মল সিংহ

সালফাবর্গীয় ঔষধ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়াবাসী গেলমো (Gelmo) সালফ-অ্যানিল এমাইড (Sulphanilamide) নামক সালফার যুক্ত রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবন করেন। পরে ডোমাগের (Domagk) নেতৃত্বে জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা ইহার এক যৌগিক উদ্ভাবন করেন (প্রন্টোসিল)। এই সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ডোমাগ নোবেল পুরস্কার পান (১৯৩৮ খ্রী)। এই প্রন্টোসিল স্ট্যাফাইলোককাস ও স্ট্রেপটোককাস জীবাণুর প্রতিরোধক। ক্রমে আরও নব নব যৌগিক উদ্ভাবিত হইল ও সেগুলির জীবাণু প্রতিরোধক ও রোগসংহারক গুণও আবিষ্কৃত হইল। এই সব বিভিন্ন ফলপ্রদ যৌগিকগুলিকে সালফাবর্গীয় ঔষধ বলিয়া অভিহিত করা হয়। জীবাণুর বাঁচার জন্য, প্রয়োজন এমন এক প্রকারের খাদ্য যাহার সহিত সালফাবর্গীয় ঔষধের অণুর রাসায়নিক কাঠামোর অনেকটা মিল আছে। জীবাণু তাই খাদ্যের পরিবর্তে এই সালফারাসায়নিক বস্তু গ্রহণ করিয়া বসে এবং তাহার বাঁচা ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে অপব্যবহারে বা অন্য কারণে অনেক সময় জীবাণুগুলি সালফাপ্রতিরোধে (bacterial resistance) সমর্থ হয়; তখন সালফাবর্গীয় ঔষধে ফল হয় না। সালফাবর্গীয় ঔষধ নানা অবস্থায় প্রযুক্ত হয়—রক্তামাশয়, মেনিনজাইটিস, কোলাই জাতীয় জীবাণু-জাত ও অন্যান্য মূত্রপ্রণালীর প্রদাহ, স্ট্যাফাইলোককাস-জাত প্রদাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। এই ঔষধগুলি রক্তকণিকা প্রস্তুত ক্রিয়া, বৃক্ক, যকৃৎ বা ত্বকের বা অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি করিতে পারে বলিয়া চিকিৎসকের পরামর্শ না লইয়া ইহাদের অবাধ ব্যবহার ঠিক নহে। কয়েকটি নবাবিষ্কৃত সালফ-অ্যানিল-এমাইড জীবাণু নাশ না করিলেও অন্য ভেষজফল দেখায়—যথা মূত্রবর্ধন (অ্যাসিটাজোলামাইড) অথবা ডায়াবিটিস প্রতিরোধ (কারবুটামাইড) ইত্যাদি।

সিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

সালোকসংশ্লেষ (ফোটোসিন্থেসিস) ইহা উদ্ভিদদেহের সবুজ অংশের সূর্যালোকের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া। গাছের সবুজ পাতায় এবং সবুজ শ্যাওলা ('শ্যাওলা' দ্র) ও সালোকসংশ্লেষক (ফোটোসিনথেটিক) ব্যাক্টিরিয়ার দেহে এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের সবুজ

অংগে বর্তমান ক্লোরোফিল নামক রংগক পদার্থ (পিগ্‌-মেন্ট) সূর্যালোকের শক্তিকে সংহত করিয়া সালোক-সংশ্লেষে সাহায্য করে। ক্লোরোফিল বর্ণালীর সবুজ অংশের আলোক শোষণ করিতে পারে। এই শোষিত আলোকের শক্তি ক্লোরোফিলকে সক্রিয় করে। গাছের সবুজ পাতার তলদেশে স্টোমা বা পত্ররন্ধ্র নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বর্তমান। রৌদ্রালোকে ঐ ছিদ্রগুলি অধিকতর উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং ছিদ্রপথে বায়ু পাতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মাটি হইতে মূলের সাহায্যে আহৃত জল কাণ্ডের মধ্য দিয়া পাতায় আসিয়া পৌঁছায়। পাতায় সক্রিয় ক্লোরোফিলের সাহায্যে বায়ুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মাটি হইতে শোষিত জল এবং পাতায় বর্তমান রাইবিউলোজ ডাইফসফেট নামক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ইহার ফলে ফস্‌ফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। অক্সিজেন পত্ররন্ধ্র দিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। ফসফোগ্লিসেরিক অ্যাসিড বারংবার বিজারণের সাহায্যে গ্লুকোজ ফসফেট-এর বহু অণুর মিলনে স্টার্চ বা শ্বেতসার অণুর উদ্ভব ঘটে।

দীর্ঘকাল আলোকে থাকিলে সালোকসংশ্লেষের ফলে উদ্ভিদ-দেহের পক্ষে আবশ্যক কয়েকটি পদার্থ ব্যয় হইয়া যায় ও সালোকসংশ্লেষের গতি হ্রাস পায়। সে সময় কিছুকাল অন্ধকারে রাখিলে এ সকল পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়া আসে। তাহার পর আলোক-সম্পাত করিলে সালোকসংশ্লেষের গতি আবার বর্ধিত হয়।

অশোকগোপাল দত্ত

সাহানী, বীরবল (১৮৯১-১৯৪৯ খ্রী) প্রখ্যাত ভারতীয় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী। জন্মস্থান ঃ পশ্চিম পাঞ্জাবের ভেরা নামক স্থানে। পিতা ঃ রুচিরাম। কেমব্রিজের ইম্যানুয়েল কলেজে যোগ দিয়া বীরবল প্রকৃতি-বিজ্ঞানে 'ট্রাইপস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপক সীওয়ার্ডের নিকট গবেষণায় রত হন ; জার্মান অধ্যাপক গোয়েবেলের নিকটেও তিনি গবেষণা করেন। লণ্ডন ও কেমব্রিজ উভয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই তিনি ডি. এস.-সি. উপাধি লাভ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথম দিকে তিনি বারাণসী ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। পরে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যার অধ্যাপকরূপে যোগদান করিয়া (১৯২১ খ্রী) দীর্ঘকাল এখানে কাজ করেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। তিনি ব্যক্তবীজী, ফার্ন ও বিশেষ করিয়া উদ্ভিদ্‌-জীবাশ্ম বিষয়ে প্রচুর গবেষণা করেন। উদ্ভিদ্‌-জীবাশ্ম (প্যালিওবটানি) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিয়া তিনি আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন এবং 'রয়্যাল সোসাইটি'র 'ফেলো' (এফ. আর. এস.) হন (১৯৩৬ খ্রী)। তিনি 'সাহানী প্যালিওবটানিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট' নামক বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'ইণ্ডিয়ান বটানিক্যাল সোসাইটি'রও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

সন্তোষকুমার পাইন
সুভাষচন্দ্র কুণ্ডু

সাহিত্য ও শিল্প সাহিত্যের বাহন ভাষা। এই ভাষা দুইভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ তথ্য পরিবেশনের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ হৃদয়বৃত্তি হইতে উদ্ভূত নানা অনুভূতি প্রকাশের জন্য। উভয়কে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। যে রূপে তাহা তথ্য পরিবেশন করে সেরূপকে তথ্য-সাহিত্য বলিতে পারা যায় ; যেমন—বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি। যখন তাহা অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে তখন রসসাহিত্য মেলে ; যেমন—কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য, শিল্প বলিয়া বিবেচিত হয় না ; কারণ তাহা কেবল বিশুদ্ধ সত্য পরিবেশন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য, শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয় ; কারণ সেখানে তথ্যের সংগে কল্পনা সংযুক্ত হইয়া সাহিত্য সৃজনধর্মী হইয়া পড়ে। সুতরাং এই শ্রেণীর সাহিত্যের সংগে শিল্পের নিবিড় সংযোগ আছে।

সাধারণতঃ শিল্পের বর্ণনীয় বিষয় একটি অনুভূতি। শিল্পীর মনে ইহাই প্রেরণা হিসাবে কাজ করে। শিল্পী ইহাকে প্রকাশ করেন একটি রূপের মধ্য দিয়া। তাহাকেই আমরা শিল্পকর্ম বলি। শিল্পবস্তু সৃষ্টি করিয়া শিল্পীর মনে এক বিশেষ অনুভূতি পরিস্ফুট হয় ; রসিক তাহার রস গ্রহণ করিয়া অনুরূপ অনুভূতি লাভ করেন। এই অনুভূতির প্রকৃতি কি তাহা আলোচনার যোগ্য।

আরিস্তোতল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বলিতেন; ইহাতে সুখ লাভ হয়। কিন্তু বিয়োগান্তক নাটক দেখিয়া তো সুখ পাই না, তবু এই বিশেষ অনুভূতির উদয় হয়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই অনুভূতি সুখ-দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাকে কেহ কেহ শিল্পতান্ত্রিক অনুভূতি (এসথেটিক্‌ ইমোশান) বলিয়াছেন। আমাদের দেশে এই অনুভূতিকে 'আনন্দ' বলা হইয়াছে। অলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহাকে 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' বলিয়াছেন। শিল্পের বাহন বিভিন্ন হইতে পারে। যেমন চিত্রের বাহন রঙ্‌ ও রেখা ; ভাস্কর্যের বাহন প্রস্তর বা ধাতু ; নৃত্যের বাহন দেহভঙ্গী ; সংগীতের বাহন সুর ; রসসাহিত্যের বাহন ভাষা। বাহনের প্রকৃতির ভিন্নতা অনুসারে কোনও শিল্প স্থানে বিধৃত, কোনও শিল্প প্রধানতঃ কালে বিধৃত। যেটি স্থানে বিধৃত তাহাকে স্থির শিল্প বলিতে পারি ; যেমন চিত্র ও ভাস্কর্য। যাহা প্রধা-

নতঃ কালে বিধৃত তাহাকে গতিশীল শিল্প বলিতে পারি ; যেমন—নৃত্য, সংগীত, অভিনয় ও রসসাহিত্য। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—'পিক্‌চার ইজ মিউট পোয়েট্রি, পোয়েট্রি ইজ্‌ স্পীকিং পিক্‌চার।' রসসাহিত্য অক্ষরের সজ্জায় স্থিররূপে বিধৃত হইলেও গতিশীল ; কারণ তাহা পড়িতে হয় ও আবৃত্তি করিতে হয়। অভিনয়ের দুইটি রূপ আছে ঃ একটি সাহিত্যরূপ, অপরটি অভিনয়-রূপ। অভিনয়ের কথোপকথন সংগীতে নিষ্পন্ন হইলে তাহা গীতিনাট্য (অপেরা) ; নৃত্যে নিষ্পন্ন হইলে তাহা ব্যালে (Ballet) ; সংগীতে ও নৃত্যে যুগপৎ নিষ্পন্ন হইলে তাহা রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত পরিভাষায় নৃত্যনাট্য।

একটা ধারণা প্রচলিত আছে, যে শিল্পকর্ম আমাদের আনন্দ দেয় তাহা সুন্দর বলিয়া। তাহা ঠিক নয় ; কারণ কুৎসিত বস্তুও শিল্পের বিষয় হইয়া আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এই আনন্দের কারণ শিল্পবস্তুর অভ্যন্তরীণ সুষমা। শিল্পবস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে এমন একটি সুন্দর পারস্পরিক সামঞ্জস্য থাকে যাহা তাহাকে একটি সামগ্রিক ঐক্য দান করে। তলস্তয় বলিয়াছেন আদর্শ শিল্পবস্তুর মধ্যে যেখানে যাহা সাজে সেখানেই তাহা স্থাপিত হয়। ইহাকে অঙ্গাঙ্গীসূচক ঐক্যও (অর্গ্যানিক ইউনিট) বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে সামগ্রিক সুমিতি বলিয়াছেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে শিল্পবস্তুর প্রকৃতিগত সুষমা বা সামগ্রিক সুমিতিই শিল্পী ও শিল্পরসিকের আনন্দের কারণ।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহেথ-মাহেথ শ্রাবস্তী দ্র

সিউড়ী বীরভূম জেলার প্রধান শহর। কেহ বলেন, 'শূরী' বা 'শৌর্য' শব্দের অপভ্রংশ সিউড়ী। আবার বৌদ্ধদের 'শিকড়ী' হইতে 'সিউড়ী' হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ এককালে এখানে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আবার কাহারও মতে 'শিয়ারী'-শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের নামের অপভ্রংশ এই 'সিউড়ী' শব্দটি। সিউড়ীর লোকসংখ্যা ১৮১৩৫ (১৯৫১ খ্রী) এবং আয়তন ২৯১০ বর্গ কি. মি.। ইহা ২৩৭ ডিগ্রী ৩৩ মিটার এবং ২৪ ডিগ্রী ৭ মিটার উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৭ ডিগ্রী ১০ মিটার ও ৮৭ ডিগ্রী ৫৮ মিটার পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। বীরভূমের দুইটি মহকুমার একটি সদর মহকুমা সিউড়ী এবং অপরটি রামপুরহাট। ময়ূরাক্ষী নদী এই জেলার প্রায় মধ্যস্থলে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তরের মহকুমা রামপুরহাট এবং দক্ষিণের মহকুমা সিউড়ী। সিউড়ীর মাত্র মাইল বারো দক্ষিণ-পশ্চিমে বক্রেশ্বর বা বক্রেশ্বরে বক্রনাথের মন্দির আছে এবং এই মহকুমারই অন্তর্গত লাভপুরে আছে 'ফুল্লরা পীঠ'। বোলপুর হইতে কিছু দূরে 'কঙ্কালী পীঠ' অবস্থিত ; প্রবাদমতে সেখানে সতীর কঙ্কাল পড়িয়াছিল। কবি জয়দেবের কেন্দুবিল্ব ও চণ্ডীদাসের নানুর এই মহকুমারই অন্তর্গত। এই মহকুমার সুপুর গ্রামে এককালে ফরাসীরা (১৭৬৮ খ্রী) কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। সুপুরের নিকটে সুরথেশ্বরের মন্দির আছে। প্রবাদ যে, রাজা সুরথ কালীর নিকট লক্ষ বলি প্রদান করেন ; তাহা হইতেই নাকি 'বলিপুর' বা 'বোলপুর' নাম। সুরুল আর একটি গ্রাম যেখানে জন চীপ্‌ ব্রিটিশের পক্ষ হইতে নীলচাষের একটি কেন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এবং আজিও সেখানে চীপ্‌ সাহেবের কুঠির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামেরই একাংশে রবীন্দ্রনাথের পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রীনিকেতন থাকায় সুরুল আজ বহুপরিচিত। সিউড়ী শহরের উত্তরে এবং মাত্র দুই মাইলের ব্যবধানে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত ময়ূরাক্ষী নদীর উপর মাসাঞ্জোর বাঁধটিকে কেন্দ্র করিয়া একটি লোকালয় গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শিল্প-চেতনার সমন্বয়ে দর্শনীয় স্থান। বীরভূমের প্রসিদ্ধ তসর সিউড়ীর পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে তন্তুবায়দের হস্তে-নির্মিত শিল্প। সিউড়ীর আখের চাষ, গুড়ের ব্যবসা ও মোরব্বার বিশেষ খ্যাতি আছে।

শুভেন্দুগোপাল বাগচী

সিংহ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর কার্নিভোরা (carnivora) বর্গভুক্ত প্রাণী। ইহার বিজ্ঞানসম্মত নাম প্যানথেরা লিও (panthera leo)। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিংহ সমগ্র ইওরোপে পাওয়া যাইত। পরবর্তীকালে আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীকদেশে ইহার বিস্তার ঘটিয়াছিল। বর্তমানে পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, মেসোপোটেমিয়া ও ভারতবর্ষের গির অঞ্চলে সিংহ পাওয়া যায়।

পূর্ণবয়স্ক সিংহের বর্ণ হলুদাভধূসর। পুরুষ সিংহের গলায় কেশর থাকে। নাক হইতে সরু করিয়া লেজের শেষ পর্যন্ত পূর্ণগঠিত সিংহের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩.৩ মিটার, ওজন প্রায় ৩০০ কি. গ্রা., স্ত্রী সিংহের দৈর্ঘ্য এবং ওজন পুরুষ সিংহের তুলনায় কিছু কম।

ইহারা বালি বা প্রস্তরময় ভূখণ্ড বাসস্থান হিসাবে পছন্দ করে। সাধারণতঃ ইহারা যূথবদ্ধ অবস্থায় বাস করে। গরু, মহিষ, হরিণ ইত্যাদি বৃহদাকার তৃণভোজী প্রাণী ইহাদের প্রিয় খাদ্য। স্ত্রী সিংহরাই সক্রিয় ভাবে শিকার সংগ্রহ করে। সিংহ শক্তিধর এবং দ্রুতগামী। শিকার মুখে লইয়া ইহারা ছোট বেড়া বা প্রাচীর স্বচ্ছন্দে

লাফ দিয়া পার হইতে পারে। বৃদ্ধ সিংহ শিকার ধরিতে অক্ষম হইলে সচরাচর 'মানুষ খেকো' হইয়া ওঠে।

সীমানন্দ অধিকারী

সিংহল ৩২ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি প্রণালী দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ এবং নৃত্তিকার সহিত দক্ষিণ ভারতের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আবহমানকাল হইতেই বিদ্যমান। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপটি ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি সিংহল দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে। ইংরেজ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির অন্যতম।

সিংহল দ্বীপের প্রায় অধিকাংশ অংশই প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান স্ফটিক শিলাস্তর দ্বারা গঠিত।

জলবায়ু সামুদ্রিক প্রভাবান্বিত। সমভূমি অঞ্চলে গড় মাসিক তাপমাত্রা অধিক এবং মাসিক তারতম্য অতি অল্প (কলম্বো : শীতকালে ৭৭.৫° ফা., গ্রীষ্মে ৮২.১° ফা.)। তাপমাত্রা একই ধরনের হওয়ায় কৃষিকার্যের সহায়ক। পার্বত্য অঞ্চলে উচ্চতার জন্য তাপমাত্রা হ্রাস পায়। মে মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিংহল দ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুদ্বারা এবং নভেম্বর হইতে জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত। দক্ষিণ-পশ্চিমের পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টিপাত অধিক। উত্তর ও পূর্বের 'শুষ্ক অঞ্চলে' বার্ষিক বৃষ্টিপাত অল্প। শুষ্ক অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হয়।

সিংহল দ্বীপের অধিকাংশ নদীই ক্ষুদ্রকায়, চক্রাকার এবং মধ্যভাগের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উত্থিত হইয়া তটভাগের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। মাহেওয়ালী গঙ্গা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। পার্বত্য অঞ্চলে অধুনা নানাপ্রকার বৃক্ষাদি দেখা যায়। মূল্যবান্‌ বৃক্ষাদির মধ্যে এবনি ও স্যাটিন-উড্‌ই প্রধান। সিংহলের জনজীবনে পাশ্চাত্যপ্রভাব যথেষ্ট হইলেও অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। ধানচাষই সিংহলের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্তম্ভ। ঝুমচাষ, সামান্য সবজী ও ফল-উৎপাদনও সিংহলের কোনও কোনও অংশের বৈশিষ্ট্য। নারিকেল, চা ও রবার ব্যাপক আকারে উৎপন্ন হয় ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনে প্রচুর সহায়তা করে। তাল, তামাক, কোকো প্রভৃতির চাষও উল্লেখযোগ্য। শুষ্ক ও পাহাড়ী অঞ্চলে, ঝুমচাষ ব্যাপক। যব, ভুট্টা ও ধান প্রধান ফসল। ঝুমচাষের স্থানীয় নাম 'চেনা' (chena) জনগণের বেশ কিছু অংশ মৎস্য আহরণের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্র ও পুষ্করিণী মৎস্যসম্পদের প্রধান উৎস। মান্নার উপসাগরে মুক্তা আহরণ করা হয়। ইদানীং সরকারী সাহায্য ও অনুপ্রেরণার ফলে ক্ষুদ্রাকার কুটিরশিল্পের ব্যাপক বিস্তার সম্ভব হইয়াছে। সিংহলের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নানাবিধ ধাতব বাসনপত্রাদির প্রসিদ্ধি সুবিদিত। রত্নপুরার পললস্তরে মণিমুক্তা আহরণ করা হয়। কলম্বো বিখ্যাত বন্দর, রাজধানী, এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

সিংহলী সিংহলের ভাষা, ভারতীয় আর্যভাষা গুচ্ছের অন্তর্গত। একমতে এই ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য শাখা হইতে উদ্ভূত, অপর মতে পাশ্চাত্য শাখা হইতে। ভারতীয় আর্যভাষা সমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সিংহলী অনেকটা নিজস্ব পথে বিবর্তিত হইয়াছে। তাহার উপর ইহাতে তামিল ভাষার বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। সেইজন্য সিংহলী ভাষার গতিপ্রকৃতি অন্যান্য ভারতীয় আর্যভাষা হইতে কিছু পৃথক্‌ ধরনের। সিংহলী প্রাকৃত হইতে সিংহলী অপভ্রংশ উদ্ভূত হয় খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে। এই ভাষাকে প্রাচীন সিংহলীও বলিতে পারা যায়। ইহার নাম 'এলু' (সিংহল শব্দ হইতে জাত)। বিহারের সিগিরি (সিংহগিরি) পর্বতগুহাগাত্রে এলু কবিতা অনেক পাওয়া গিয়াছে। নবীন সিংহলী ভাষার উদ্ভব আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাহার আগেই সিংহলীতে গদ্য রচনা প্রচলিত হইয়াছিল। সিংহলীর নিজস্ব লিপিমালা আছে। তাহা অশোকের সময়ের ব্রাহ্মী হইতে উদ্ভূত।

সুকুমার সেন

সিকিম ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত দার্জিলিং জেলার উত্তরে অবস্থিত রাজ্য। রাজ্যটি ৮৭°৫৯′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হইতে ৮৮°৫৬′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২৭°৫′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ২৮°৯′ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অপর নাম দেমোজঙ্‌ বা দেনজঙ্‌ (ধান্যের লুক্কায়িত উপত্যকা)। ইহার পশ্চিমে নেপাল, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে তিব্বত, দক্ষিণ-পূর্বে ভুটান এবং দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং। রাজ্যটির আয়তন প্রায় ৭০০০ বর্গ কি. মি. এবং জনসংখ্যা ১৬২১৮৯ (১৯৬১ খ্রী)। একটি বিশেষ চুক্তি অনুযায়ী সিকিমের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা ভারতবর্ষের দ্বারা সাধিত হয়। ইহা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায় অধিকাংশই ভারতের উপর নির্ভরশীল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সড়কপথে তিব্বতের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগসূত্র ছিল—আজ উহা ছিন্ন। ত্রয়োদশ শতকে আসাম পার্বত্য অঞ্চল হইতে লেপচা জনগণ আসিয়া এই স্থানে বসবাস

করিতে আরম্ভ করে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহায়তায় নেপাল-সিকিম সীমান্ত নির্ধারিত হয়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমরাজ দার্জিলিং জেলাটি ব্রিটিশকে দান করেন, পরিবর্তে ইংরেজগণ তাঁহাকে বাৎসরিক কর দিতে স্বীকৃত হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমরাজ্যে ইংরেজগণ অনুপ্রবেশ করিয়া সিকিমের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সহিত পুনরায় সিকিমের বিশেষ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার ফলে সিকিমস্থিত ভারতীয় রাজনৈতিক কর্মচারী দেশের বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেন। সিকিমের অধিকাংশ অঞ্চলই নাইস্ জাতীয় শিলাস্তর দিয়া গঠিত, কেবলমাত্র মধ্যভাগে ডালিংস্তরের রূপান্তরিত শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। খনিজসম্পদ-সমূহের মধ্যে তামার ব্যবসায়িক গুরুত্বই সর্বাধিক, স্বল্প পরিমাণ জিপ্‌সাম ও ডোলোমাইট্ চুনাপাথরের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। সামান্য সীসা ও দস্তাও সংগ্রহ করা হয়। হিমালয়ের মূল অংশটি পূর্ব হইতে পশ্চিমে পরি-ব্যাপ্ত এবং তিব্বত ও সিকিমের সীমান্ত হিসাবে পরি-গণিত হয়। মৌসুমীবায়ুর প্রবল বর্ষণ এখানে সহজেই বরফের স্তরে রূপান্তরিত হয়। অধিবাসীরা প্রধানতঃ নেপালী, তাহার সহিত ভুটিয়া ও লেপ্‌চাও আছে। তিস্তা এই রাজ্যের প্রধান নদী। সিকিমের বর্তমান রাজ-ধানী গ্যাংটক। ইহা নদী-বিধৌত এলাকায় অবস্থিত। বর্ষার সময়ে এখানে প্রচুর বজ্রপাত হওয়ায় সিকিমকে ‘বজ্রের দেশ’ এবং বসন্তকালে ফুলের শোভার জন্য ‘হিমালয়ের উদ্যান’ বলা হয়। সিকিমের উত্তর প্রান্তের জলবায়ুর সহিত দক্ষিণাঞ্চলের জলবায়ুর প্রভেদ লক্ষণীয়। উত্তরাংশে হিমবাহের কার্য সহজেই দেখা যায়। এই অংশে তাপমাত্রা অত্যন্ত কম ও প্রায় সারা বৎসরই আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। দক্ষিণের জলবায়ু অনেকাংশেই উত্তম। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৭০° ফা. হইতে ৪৫° ফারেনহাইটে নামিয়া আসে। বর্ষাকালে মৌসুমীবায়ুর জন্য বৃষ্টিপাত সর্বাধিক।

সিকিম নানাপ্রকার বৃক্ষ ও বন্যজন্তুর কেন্দ্রস্থল। বনজংগলে অসংখ্য প্রকারের জীবজন্তু ও মাছি আছে। অজস্র পুষ্পবহনকারী উদ্ভিদ, লতা, পরগাছা জন্মায়। যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক সেখানেই অরণ্য। অরণ্যে শাল, লরেল, ওক, চেস্টনাট বন্য ধরনের কলা গাছ ও বাঁশ বেশি জন্মায়। অরণ্যসম্পদ উল্লেখযোগ্য। এখানকার গাছ হইতে প্রচুর রেলওয়ে স্লিপার প্রস্তুত করিয়া বিদেশে চালান দেওয়া হয়। অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক প্রভৃতি বহু বন্য জন্তু আছে। সিকিমে নানা ধরনের সংস্কৃতির সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। নানা জাতির নানাভাষা সিকিমের বৈশিষ্ট্য। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মই রাজ্যের ধর্মহিসাবে স্বীকৃত।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

সিদ্ধাচার্য সিদ্ধ বা সিদ্ধা (∠ * সিদ্ধক) শব্দের অর্থ—যিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এইরূপ আচার্য বা গুরুই সিদ্ধাচার্য। তিব্বতী ও নাথ ঐতিহ্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের কথা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই ৮৪ সিদ্ধাচার্যের মধ্যে অনংগ বজ্র (আ. ৭ম শতকের শেষার্ধ) অন্যতম। তাঁহার ‘প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি’ সংস্কৃতে রচিত। বজ্রযান সম্পর্কে তাঁহার কিছু কিছু রচনার তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে। ‘বর্ণনরত্নাকর’-এ ৮৪ সিদ্ধাচার্যের মধ্যে বাঙালী সিদ্ধাচার্যের নামও আছে। চর্যাপদ সম্পর্কেও সিদ্ধাচার্য প্রসংগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধক বলিয়া অনুমান হয়। তবে সকলেই যে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন একথা বলা চলে না। নাথপন্থী, যোগপন্থী প্রভৃতিও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। অনুমান করা যায় যে, চর্যায় আদি সিদ্ধাচার্য হিসাবে লুই (-পাদ)কে (আ. ১০ম-১১শ শতাব্দী) স্বীকার করা হইয়াছে। কুক্কুরী পা (পাদ), বিরুআ, চাটিল, ভুসুক, কাহ্ন প্রভৃতি অনেক সিদ্ধাচার্য ও তাঁহাদের শিষ্যানু-শিষ্যের নামপর্যায় পাওয়া যায়। চর্যারচয়িতা সিদ্ধাচার্য-দের কিছু নাম তিব্বতী ৮৪ সিদ্ধার মধ্যেও আছে। চর্যা-পদের সিদ্ধাচার্যেরা কেহ সহজবোধ্য রূপকের সাহায্যে, কেহ বা প্রহেলিকার মাধ্যমে সন্ধ্যা বা সন্ধা ভাষায় (‘চর্যাগীতি’ দ্র) সাধনতত্ত্বের ইংগিত দিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সিদ্ধান্ত পূর্বপক্ষ নিরস্ত করিয়া সিদ্ধপক্ষ স্থাপনের নাম সিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ কোনও বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত মীমাংসাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু ‘সিদ্ধান্ত’ শব্দের কতকগুলি রূঢ় প্রয়োগ লক্ষণীয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের নাম সিদ্ধান্ত, যথা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত ইত্যাদি। তান্ত্রিক সপ্ত আচারের একটি সিদ্ধান্তাচার। কুলার্ণব-তন্ত্রে বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তের উৎকর্ষ ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত বলিতে বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত শৈব সিদ্ধান্তকেই বোঝায়। এই মতবাদের আচার্যগণ ‘সিদ্ধান্তী’ নামে পরিচিত। ইঁহাদের মূল প্রাচীন গ্রন্থগুলি তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পরবর্তীকালের আচার্যগণ সংস্কৃত ভাষাতে এই শৈব-সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন। তাহা হইতে সিদ্ধান্তীদের দার্শনিকতা, আচার-অনুষ্ঠান এবং ধর্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তমতে মূলতত্ত্ব তিনটি—পশুপতি,

পশু ও পাশ। পশুপতিই পরমতত্ত্ব; তিনিই ঈশ্বর ও জগতের নিমিত্ত কারণ। জীব ও শিব স্বরূপতঃ অভিন্ন; পার্থক্য এই যে জীব পাশবদ্ধ, শিব পাশমুক্ত। পাশবদ্ধ জীবই পশু। পাশমুক্ত হইয়া পশুর পশুপতিত্ব লাভই জীবের মোক্ষ। এই লক্ষ্যেই জীবের সাধনা। এই সাধনপথে গুরুবরণ ও দীক্ষার স্থান খুব উচ্চে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

সিন্ধিয়া পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের শাসনকালে মারাঠাশক্তির চরম উন্নতি হইয়াছিল। মারাঠা সাম্রাজ্য সমস্ত দক্ষিণ ও মধ্যভারত এবং উত্তর ভারতের কিয়দংশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের জন্য কয়েকজন শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের অধীনে তাঁহাদের নিজস্ব সেনাদল ছিল। এই শাসনকর্তাগণ বংশানুক্রমে শাসনভার লাভ করায় কয়েকটি রাজবংশের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা নামমাত্র পেশোয়ার অধীন ছিলেন। আসলে নিজ নিজ স্বার্থ অনুসরণ করিয়াই চলিতেন এবং সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে চারিটি বংশই প্রধান— ১. গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া; ২. ইন্দোরের হোলকার; ৩. বরোদার গাইকোয়াড় এবং নাগপুরের ভোঁসলা। সিন্ধিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রণোজী সিন্ধিয়া। তিনি বাজীরাওয়ের অত্যন্ত অনুগত অনুচর ছিলেন। সিন্ধিয়ার সৈন্যগণ ফরাসী সেনানায়কদিগের দ্বারা শিক্ষিত ও পরিচালিত হইত। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠাশক্তি পর্যুদস্ত হওয়ার পর মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে হিন্দুস্থানে কিছুকাল মারাঠাগণ আবার প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট মারাঠাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে সিন্ধিয়া ও হোলকার তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া দ্বিতীয় মারাঠাযুদ্ধ (১৮০৩-৪ খ্রী) পর্যন্ত প্রায় বন্দী অবস্থায় রাখেন। ব্রিটিশশাসনকালে সিন্ধিয়াবংশীয় নৃপতিগণ করদ মিত্র নৃপতি হিসাবে নিজরাজ্যে রাজত্ব করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর তাঁহাদের রাজ্য স্বাধীন ভারত ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিদিবনাথ রায়

সিন্ধী পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধুপ্রদেশের ভাষা। সিন্ধীর উপভাষা কচ্ছী। সিন্ধী ভাষায় প্রাচীনত্ব অধিক দৃষ্ট হয়। পশ্চিমা পাঞ্জাবী বা হিন্দকীর সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। সিন্ধী সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা সুফীমতবাদ ও অধ্যাত্মরসে পুষ্ট। সিন্ধী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবি হইলেন 'শাহ্-জো-রিসালো'-রচয়িতা শাহ্ আবদুল লতিফ (১৬৮৯-১৭৫২ খ্রী)। অন্যান্য প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান হইলেন কাজি কাজান (১৫শ শতকের শেষপাদ), মাচল (১৭৩৯-১৮২৬ খ্রী), সামি (১৭৪৩-১৮৫০ খ্রী), বেদিল (১৮১৪-১৮৭৩ খ্রী) ইত্যাদি। লেখার কাজে ফারসী লিপিই অধিক প্রচলিত; ১৯শ শতকের শেষে এই লিপিকে সিন্ধী বর্ণমালার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হয়। সিন্ধীর ভাষাতাত্ত্বিক কয়েকটি লক্ষণ হইল—ইহাতে এককীভূত যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয় নাই, পদের অন্তস্থিত ই-কার ও উ-কার লুপ্ত হয় নাই, র-কারযুক্ত ব্যঞ্জনও অনেক সময় সমীভূত হয় নাই; 'ন্দ' ছাড়া দন্ত্যবর্ণ মূর্ধন্য হইয়াছে, এবং চতুর্থ বর্ণ (ঘ, ঝ, ধ, ভ) যথাক্রমে কণ্ঠনালীয় স্পর্শযুক্ত তৃতীয় বর্ণ ('গ', 'জ', 'ড', 'ব') হইয়াছে।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

সিন্ধু, সিন্ধুসৌবীর সিন্ধু নদী প্রকৃতি নির্দিষ্ট ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা। পশ্চিম দিক্ হইতে যাহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহারা সকলেই প্রথমে সিন্ধু নদীর তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছে।

প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সিন্ধু নদীর তীরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায় ('মহেঞ্জোদড়ো' দ্র)। ইহাই বর্তমান কালে ভারতের সর্বপ্রাচীন সভ্যতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই সভ্যতার ধারক যে প্রাচীন জাতি তাহাকে পরাজিত করিয়াই আর্যগণ ভারতে অধিকার স্থাপন করেন। আর্যেরাও সর্বপ্রথম এবং বহুকাল পর্যন্ত সিন্ধু ও তাহার শাখানদীগুলির তীরেই বাস করেন। তাঁহাদের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই সমুদয় নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে পারস্য দেশের আকিমিনীয় বংশের রাজা দরেইওস (Darius, ৫২২-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্ব), গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডার (৩২৭ খ্রী. পূ.), বহ্লীকদেশের (ব্যাক্‌ট্রিয়া) গ্রীকরাজগণ, শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে। পারসীকগণ 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া সিন্ধু নদী ও তাহার তীরস্থিত লোকদিগকে 'হিন্দু' বলিত; সম্ভবতঃ ইহা হইতেই হিন্দু নামের উৎপত্তি।

সিন্ধুদেশের পূর্বদিকে সৌবীর দেশ অবস্থিত। এই দুয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ ছিল। এইজন্য এই দুইটি স্থান প্রাচীন গ্রন্থে সিন্ধুসৌবীর নামে আখ্যাত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সিন্ধু নদী উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার। হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতে কৈলাসগিরির নিকট 'সিন-কা-বাব'

(সিংহমুখ) নামক জলধারা হইতে নামিয়া উত্তর-পশ্চিমে লাদাকে গিরিমালার সমান্তরাল বহিয়া পাকিস্তানের (পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ) মধ্য দিয়া গিয়া আরব সমুদ্রে পড়িয়াছে। মোহনায় বদ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে। আটক, ডেরাগাজি খাঁ, সক্কর, হায়দরাবাদ সিন্ধু নদীর তীরস্থ পাকিস্তানের প্রধান শহর। সক্করের ব্যারাজ সুপ্রসিদ্ধ। সিন্ধু নদী সুপ্রাচীন। মৎস্যপুরাণে দিব্যগঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। সিন্ধুর তীরে যে প্রাচীন সভ্যতা একদা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা আজ সর্বজনবিদিত ('সিন্ধু, সিন্ধুসৌবীর' দ্র)।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সিন্ধুসভ্যতা মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা, হরপ্পাসভ্যতা দ্র

সিন্দ্রি বিহারের ধানবাদ জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত এবং ৮৬°২৯' পূর্ব দ্রাঘিমা ও ২৩°৪০' উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত। ইহার আয়তন ৫৯.৪৯ বর্গকিলোমিটার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই স্থানে ভারতসরকার কর্তৃক প্রথম বৃহৎ-শিল্পোদ্যোগ, এশিয়ার বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক সারকারখানা স্থাপনের ফলে এককালের অখ্যাত গ্রাম আজ একটি শিল্পনগরীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে—কোকচুল্লী, গ্যাস, প্ল্যান্ট, সিমেন্ট কারখানা প্রভৃতি সহযোগী শিল্পোদ্যোগ। এখানকার লোকসংখ্যা ৪১৩১৫ ; তন্মধ্যে পুরুষ ২৪৭৫০ ও স্ত্রী ১৬৫৬৫ ; ইহা ছাড়া তপশিলি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৫৩৩১ জন। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ জন বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত। অধিকাংশই কারখানার বিভিন্ন স্তরের কর্মী। শিক্ষিতের হার শতকরা ৪৯। এখানকার কারখানায় বহুলোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত উন্নয়নকেন্দ্রে শ্রমিকদের আমোদ-প্রমোদ এবং খেলাধুলার ব্যবস্থা ছাড়াও পাঠাগার, বয়স্কশিক্ষা, হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া এখানে একটি ক্রীড়াসংস্থা (স্পোর্টস্ বোর্ড) ও একটি প্রেক্ষাগৃহ আছে। এখানে নিম্ন, মধ্য, ও উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়াও বিহার ইনস্টিটিউট্ অভ্ টেকনলজি, সেন্ট্রাল ফার্টিলাইজার টেকনলজি ইনস্টিটিউট্ অবস্থিত।

দুর্গাদাস সাহা

সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যে প্রচণ্ড সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, ইতিহাসে তাহা সাধারণভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া কথিত হয়। তবে ইহার প্রকৃত চরিত্র ও স্বরূপ আজও নিঃসন্দিগ্ধভাবে নির্ণীত হয় নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহার দুইটি রূপ ছিল—সামরিক বিদ্রোহ ও গণ-বিক্ষোভ।

সাধারণভাবে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পিছনে চারটি বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান দেখা যায়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়। লর্ড ড্যালহৌসী-অনুসৃত ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি, মোগলসম্রাটের বংশধরদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার, পেশোয়ার দত্তক-পুত্র নানাসাহেবের বৃত্তির বিলোপসাধন ইত্যাদি রাজনৈতিক কারণভুক্ত। কিছুসংখ্যক ভূস্বামীদের উচ্ছেদ, সাতারা, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের বিলুপ্তির ফলে বহুব্যক্তির কর্মচ্যুতি, ড্যালহৌসী-নিয়োজিত ইনাম কমিশনের তদন্তের ফলে দাক্ষিণাত্যের বহু জমিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়া এবং অযোধ্যা অধিকারের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি ইত্যাদি বিদ্রোহের অর্থনৈতিক পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। আবার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও বিস্তৃতি, বিধবাবিবাহ-আইন প্রবর্তন, খ্রীষ্টান মিশনারিদের উগ্র তৎপরতা এবং সর্বোপরি চর্বিযুক্ত কার্তুজ সম্বলিত এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। ইহা ছাড়াও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামরিক বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য বা সিপাহীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং নানা সঙ্গত ও কাল্পনিক কারণে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষের ক্রমবিস্তৃতি সামরিক বিদ্রোহের অব্যবহিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছিল ইহাও অনস্বীকার্য। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীরা তখন ছিল খুবই ধর্মভীরু এবং ধর্মসচেতন। খ্রীষ্টান ব্রিটিশ সরকার ছলে ও কৌশলে তাহাদিগকে ধর্মভ্রষ্ট করিতে সচেষ্ট হইয়াছে এ ধারণাও তাহাদের মধ্যে প্রবল ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে ব্যারাকপুর মঙ্গলপাণ্ডের বিক্ষোভ যে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়াছিল তাহার পূর্ণ আত্মপ্রকাশ হইল ঐ বৎসরের ১০ মে তারিখে মীরাটে। মীরাটের সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রথমেই ছড়াইয়া পড়িল মোগল রাজধানী দিল্লীতে এবং সেখানে সমস্ত রাজকীয় মহিমা হইতে বিচ্যুত বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করা হইল। দিল্লী হইতে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন তদানীন্তন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য-ভারত ও বিহারের অংশবিশেষে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে দিল্লী, বেরিলী, কানপুর, লখ্‌নৌ, বিহারের জগদীশপুর এবং মধ্যভারতের ঝাঁসী। নানাসাহেব, আজিমুল্লা, তাঁতিয়া টোপী, লক্ষ্মীবাঈ, কুমার সিং, বেগম হজরৎমহল, মৌলবী আহামদ উল্লা, খান্ বাহাদুর খাঁ ইত্যাদি প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সহিত যোগ দিলেন। শঙ্করপুরের

বেণীমাধব, সুবাদার বখ্‌ত্‌ খাঁ, শাহজাদা ফিরোজ শাহ, নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত অথচ দুর্ধর্ষ নেতা।

বিদ্রোহের প্রথম হইতেই নববিজিত পাঞ্জাব ইহার আওতার বাহিরে ছিল, অনেকটা সেখানকার শাসনকর্তা স্যার জন লরেন্সের চেষ্টায় এবং শিখ ও সিপাহীদের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবের জন্য। ফলে ইংরেজ সেনারা শিখসৈন্যের নিকট হইতে যে সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল, দিল্লীর পুনরধিকার (সেপ্টেম্বর ১৪, ১৮৫৭) এবং পরিশেষে বিদ্রোহের দমন তাহারই ফলে সম্ভব হয়। নেপালের মন্ত্রী জংবাহাদুর এবং তাঁহার গুর্খাসৈন্যের সামরিক সাহায্যও বিদ্রোহীদের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লখ্‌নৌ পুনরধিকারের পরই হয়তো বিদ্রোহের অবসান ঘটিত, কিন্তু এই সময় ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং একটি অবিজ্ঞোচিত ঘোষণা করিয়া ফেলেন যে, রাজভক্ত ব্যতীত তালুকদারের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ইহার ফলে উত্তরপ্রদেশের তালুকদাররা বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং যুদ্ধ আরও কয়েক মাস অব্যাহত থাকে।

এই বিদ্রোহে ভারতীয় পক্ষ কয়েকটি ক্ষেত্রে নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার দ্বারা কুমার সিং, লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপী ও মৌলবী আহম্মদ উল্লার মত নেতাদের শৌর্য ও প্রগাঢ় দেশানুরাগের মহিমা কোনও মতে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। মৌলবীর দেশানুরাগ ও মহানুভবতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মালেসনের শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে রানী লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি হিউ রোজের প্রশস্তিবাক্য স্বতঃই তুলনীয়। আর কানপুরের নৃশংসতাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিল ইংরেজ সেনাপতি হড্‌সন ও নীলের অমানুষিক কার্যকলাপ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহ, যাহা কোনও কোনও অঞ্চলে গণবিদ্রোহের রূপ লইয়াছিল, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহা মারাঠীনায়ক তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদন্ডের সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্ত হয়। তাহার পূর্বেই ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারানীর ঘোষণায় বিদ্রোহের আনুষ্ঠানিক অবসান সূচিত হয়। ঐ ঘোষণায় ভৌমিক সম্প্রসারণনীতি, ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের নীতি এবং কর্মনিয়োগ ব্যাপারে সমস্তপ্রকার বৈষম্যের নীতি বর্জন করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাহার'ও পূর্বে (অগাস্ট, ১৮৫৮ খ্রী.) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি আইনের দ্বারা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলোপসাধন করা হয় এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তথা মহারানী স্বয়ং ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহাই হইল ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের রাজনৈতিক পরিণাম।

এই বিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে নাড়া দিলেও শেষপর্যন্ত সফল হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ সামরিক। অস্ত্রবল, রণনৈপুণ্য, রণনীতি এবং বহিরাগত সাহায্য সব দিক্‌ দিয়াই যে ইংরেজসৈন্য ভারতীয় সিপাহীদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শিক্ষা, অধিকতর অভিজ্ঞতা ও সুযোগ-সুবিধার অধিকারী ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ইংরেজসৈন্যের সংঘবদ্ধতা, ঐক্য এবং দেশপ্রেম তাহাদিগকে প্রেরণা ও বল জোগাইয়া ছিল। পক্ষান্তরে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কোনও পূর্ব পরিকল্পিত সমরনীতি ছিল না, এমন কি সম্ভবতঃ যোগাযোগও ছিল না। সমগ্রদেশের মাত্র কিছু কিছু অংশ বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিয়াছিল, বাকি অংশ হয় ছিল নিশ্চেষ্ট, নয় ইংরেজদের অনুকূলে। গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, নেপাল এবং শিখেরা সকলেই ইংরেজ পক্ষে ছিল। তাই সিপাহীবিদ্রোহ কোনও কোনও স্থানে জনসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করিলেও এবং ইহার নেতৃবৃন্দের মধ্যে শৌর্যবান্‌ দেশভক্ত বীরের অভাব না থাকিলেও শেষপর্যন্ত ইহা বিফল হয়।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিমলা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী এবং সিমলা জেলার প্রধান শহর। ইহা ৩১°৬′ উত্তর ও ৭৭°১৩′ পূর্বে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১৮.১৩ বর্গকিলোমিটার। এখানকার জলবায়ু শীতযুক্ত নাতিশীতোষ্ণ। শীতকালে বরফ পড়ে ও জানুয়ারিতে সর্বোচ্চ ৮.৬° সে. গ্রে., সর্বনিম্ন ১.৯ সে. গ্রে. ; জুনে সর্বোচ্চ ২৪° সে. গ্রে., সর্বনিম্ন ১৫.৫° সে. গ্রে.। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৫৫ সেন্টিমিটার।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্য করার জন্য সিমলা নামে ক্ষুদ্র গ্রামটিকে জিন্দ রাণার নিকট হইতে লইয়া পাতিয়ালার রাজাকে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব সরকারের গ্রীষ্মাবাস ও স্বাধীনতার পর ইহা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী ও ওয়েস্টার্ন কমান্ডারের ঘাঁটি এবং শৈলনিবাসে পরিণত হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যানাটোরিয়াম স্থাপিত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ৪২৫৯৭ (পুরুষ ২৬৬৬৭, স্ত্রীলোক ১৫৯৩০)। প্রতি গ্রীষ্মে প্রায় ৪০০০০ এবং প্রতি শীতকালে প্রায় ৪০০ যাত্রী ও পর্যটক আসে। এখানকার কম্বল, গায়ে দিবার শাল, আলু, আপেল, শুকনা ফল, বনজ দ্রব্য প্রভৃতি সমভূমিতে রপ্তানি হয়। সিমলা ভারতের বীজ আলুর সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার। সিমলার জাকু পর্বতে হনুমানের মন্দির আছে। অন্যান্য দেবায়তনের মধ্যে কালীবাড়ি, প্রস্‌পেক্‌ট হিলের মন্দির, দিগম্বর জৈন মন্দির, আর্য সমাজ মন্দির, গুরুদ্বার,

জুম্মা মসজিদ, ক্যাথলিক চার্চ, ক্রাইস্ট চার্চ, ব্যাপটিস্ট চার্চ প্রভৃতি প্রধান। শহরের ৬৫% লোক শিক্ষিত। এখানে গম-গবেষণাকেন্দ্র এবং আলু ও উদ্যানকর্ষণ-গবেষণাকেন্দ্র আছে।

সিমলার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গান্ধী মেমোরিয়াল, লাজপৎ রায় চৌক, রিজ, রাষ্ট্রপতি ভবন, অবজার্ভেটরি হিল, ইলিসিয়াম, রেসকোর্স, জলপ্রপাত, নালদেরা, কুফ্রী, ফাগু, নারকান্দা প্রভৃতি প্রধান।

শম্ভুদয়াল কৌশিক

সিমেন্ট গৃহনির্মাণে গাঁথুনি দৃঢ় করিবার প্রয়োজনে চুনমিশ্রিত কাদা ও ছাই-এর ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। অষ্টাদশ শতকের জন স্মিটন নামক একজন ইঞ্জিনিয়ারকে সিমেন্টের আবিষ্কারক বলা হয়।

বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত সিমেন্টকে 'পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট' বলা হয়; কারণ এই সিমেন্ট জলে মিশাইয়া শুকাইলে ইংল্যান্ডের পোর্টল্যান্ড দ্বীপের পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া যায়। রাসায়নিক বিশেলষণ অনুযায়ী সিমেন্ট চুন, অ্যালুমিনিয়া এবং বালি এই তিন পদার্থের বিভিন্ন অনুপাতে সংশিলষ্ট যৌগ। জলের সহিত সংস্পর্শে বিভিন্ন অনুপাতে জলের অণু সিমেন্ট-অণুতে প্রবেশ করিয়া নতুন যৌগের সৃষ্টি করে। শুকনা কাদা ও চুনাপাথর গুঁড়াইয়া মিশ্রিত করিয়া কিংবা উপযুক্ত পরিমাণ জলে কাদাকাদা করিয়া ঘূর্ণায়মান চুল্লিতে (Rotary Kiln) দুই হইতে চারঘণ্টা কাল পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। কাদা এবং চুনাপাথর প্রচন্ড উত্তাপে বিশিলষ্ট হইয়া চুন, অ্যালুমিনিয়া এবং বালিতে রূপান্তরিত হইয়া আবার বিভিন্ন যৌগে পরিণত হয়। গলিত পদার্থটি ঠান্ডা হইলে ডেলা পাকাইয়া ক্লিংকার-এ পরিণত হয়। ক্লিংকারকে গুঁড়াইয়া মিহি সিমেন্টে পরিণত করা হয়। আধুনিক যুগে গৃহ, ব্রিজ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণে তথা সর্বপ্রকার গাঁথুনির কাজে সিমেন্টের ব্যবহার অপরিহার্য।

কল্যাণময় সেন

সিরাজুদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব আলিবর্দির দৌহিত্র। পিতা জৈনউদ্দীন আহম্মদ আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মাতা আমিনা বেগম আলিবর্দির কনিষ্ঠা কন্যা। আলিবর্দি তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান এবং ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হন। তাঁহার বিরোধী স্বজনদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল পুর্ণিয়ার শাসনকর্তা তাঁহার মাসতুতো ভাই শৌকৎ জং, জ্যেষ্ঠ মাসী ঘসিটি বেগম ('ঘসিটি বেগম' দ্র) এবং আলিবর্দির ভগ্নীপতি ও সেনাধ্যক্ষ মীরজাফর আলি খাঁ। ঘসিটি বেগমের সম্পত্তি অধিকার ও তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ (বখ্সী) করা হইল মীরমদনকে এবং শৌকৎ জং যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইল। কিন্তু ইহার পরেও নবাবের শত্রুর অভাব ছিল না। রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, শেঠেরা এবং সৈন্যবাহিনীর অনেকেই তাঁহার বিরোধী ছিল। এই অন্তর্বিরোধের পূর্ণ সুযোগ ইংরেজরা গ্রহণ করে। ইংরেজের সহিত নবাবের বিরোধের কারণ আলিবর্দির জীবতকালে তাহাদের কাশিমবাজারের নিকট কুঠিতে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, তাঁহার অভিষেককালে প্রথানুযায়ী উপঢৌকন পাঠাইয়া অভিনন্দিত না করা, রাজবল্লভের বিরুদ্ধে অভিযোগকালে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দান, বাণিজ্য-সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার অপব্যবহার প্রভৃতি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের কালকাতায় দুর্গ সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা।

ইংরেজদের শাস্তি বিধানের জন্য নবাব প্রথমে তাহাদের কাশিমবাজারের বাণিজ্য-কুঠি অধিকার করেন এবং ১৬ জুন (১৭৫৬ খ্রী) কালকাতা আক্রমণ করিয়া ২০ জুন তিনি উহা দখল করেন। এই যুদ্ধকালে কলিকাতায় এক ক্ষুদ্র কারাকক্ষে বন্দী ইংরেজদের অনেকে মারা যায় এবং ইহাই তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যা বলিয়া অভিহিত হয় ('অন্ধকূপ হত্যা' দ্র)।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২ জানুয়ারি ইংরেজরা কলিকাতা পুনরুদ্ধার করে। পরবর্তী মাসে উভয়পক্ষে সন্ধি হইল বটে কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইল না। ইহার পরে যখন ক্লাইভ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর দখল করিতে অগ্রসর হইলেন তখন নবাব তাঁহাকে নিরস্ত করিবার বা ফরাসীদের কোনও সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিলেন না। ইংরেজদের সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতার পরেও তিনি তাহাদিগকে চন্দননগরে ফরাসীশক্তি ধ্বংসের ও তাঁহার শত্রুর ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ দিলেন। এদিকে সিরাজকে পদচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার এক গোপন চুক্তি মীরজাফর ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পাদিত হইল। কালক্ষেপ না করিয়া ক্লাইভ সসৈন্যে নবাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, এবং কাটোয়া দুর্গ অধিকৃত হইলে তিনি পলাশি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন (বৃহস্পতিবার) এই যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় এবং ভাগ্য অস্তমিত হইল। রায়দুর্লভ ও মীরজাফর যুদ্ধে বিরত ছিলেন ('পলাশির যুদ্ধ' দ্র)।

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সিরাজ মুর্শিদাবাদ যান; তারপর ভগবানগোলা হইয়া নদীপথে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন

এবং মীরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে মহম্মদ-ই-বেগ তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভাগীরথীর অপর তীরে খোসবাগে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সিস্তান, শকস্থান বর্তমানে ইরান ও আফগানিস্থানের সীমান্তে অবস্থিত সাত হাজার বর্গমাইলবিশিষ্ট একটি অঞ্চল। ইহার ২/৫ অংশ ইরানে ও বাকী ৩/৫ অংশ আফগানিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ১৮৭২ ও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দুই দেশের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়া সীমান্তের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয়।

সিস্তানের ভূ-প্রকৃতির সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার নদীগুলি (হারুদ, ফারা, হেলমন্দ ও খাস) সমুদ্রে না পড়িয়া স্থলভাগে অবস্থিত দুইটি লেগুনে (সমুদ্রের সহিত যুক্ত উপহ্রদ জাতীয় জলাশয়) পড়িতেছে। নদীগুলিতে অত্যধিক জলস্ফীতি দেখা দিলে দুই লেগুন জুড়িয়া এক বিরাট হ্রদের সৃষ্টি হয়। সিস্তানের অধিবাসীরা অধিকাংশই তাজিক, বালুচি ও কোয়েন সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রাচীন শকজাতির ('শক' দ্র) বাসভূমি শকস্থান এখানেই অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, ইহারা তিনটি বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়াছিল। প্রথমতঃ বলা হয়, ইহাদের বাসভূমি হখামনীষীয় সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রের পরপারে বসবাসকারী শকেরা, ইওরোপের অন্তর্গত রাশিয়ার স্টেপভূমি বা কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। তৃতীয়তঃ বলা হয়, আর এক দল শক উপজাতি ড্রাঙ্গিয়ানা প্রদেশের অধিবাসী ছিল। এই অঞ্চলের উপর দিয়া হেলমন্দ নদী প্রবাহিত হইয়া হামুন হ্রদে পড়িতেছে। এই হামুন হ্রদের উপকূলেই শকজাতির উপনিবেশ শকস্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের গ্রীক রাজা ইমিডোর অভ্ চারাক্স সর্বপ্রথম শকস্থান নামটি উল্লেখ করেন এবং সম্ভবতঃ এই শতকেই হামুন হ্রদ অঞ্চলে শকজাতির আগমন ঘটে। ভারতে প্রাপ্ত মথুরা শিলালিপিতে (Mathura Lion Capital Inscription) শকস্থানের উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে এই অঞ্চলের নাম ছিল সিজিস্থান, বর্তমানে নাম হইয়াছে সিস্তান।

সুবোধকুমার মজুমদার

সীতাদেবী অদ্বৈত আচার্যের পত্নী। শিশুকালে মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা নৃসিংহ ভাদুড়ী অদ্বৈত আচার্যকে শ্রী ও সীতা দুই কন্যা দান করেন। ফুলিয়ায় বিবাহ-অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের পর অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে বাস করিতে থাকেন। সীতাদেবীর ছয় পুত্র—অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, গোপাল, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ।

সীতাদেবী ছিলেন শচীমাতার গুরুপত্নী। শচীমাতার পর পর কয়েকটি সন্তান জন্মিয়া মরিয়া যাওয়ায় গৌরাঙ্গের জন্মের পর সীতাদেবী নবজাতকের নাম রাখেন 'নিমাই'। অদ্বৈতের তিরোধানের পর বহু সাধু বৈষ্ণব সীতাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

লোকনাথ দাসের 'সীতাচরিত্র' নামক ক্ষুদ্র কাব্যে সীতাদেবীর পবিত্র জীবনকথা ও মাহাত্ম্য বর্ণিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা) উক্ত পুঁথির পরিচয় প্রথম প্রকাশিত হয়।

মদনমোহন কুমার

সীতারাম রায় খুলনা জেলার ভূষণা পরগনার ফৌজদারের অধীনস্থ উদয়নারায়ণ রায় নামক এক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ তহশিলদারের পুত্র সীতারাম রায় নিয়মিতভাবে খাজনা দিবার ও স্থানীয় বিদ্রোহী আফগান ও দস্যুদিগকে দমন করিবার অঙ্গীকারে বাংলার সুবাদারের নিকট হইতে আনুমানিক ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নলদী' (বর্তমান নড়াইল) পরগনা বন্দোবস্ত লন। সুদৃঢ় হস্তে শাসনদ্বারা শক্তিবৃদ্ধি করিয়া এবং সুবাদারের নিকট হইতে আরও অনেক পরগনা বন্দোবস্ত লইয়া তিনি একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লীর বাদশাহকে উপঢৌকন দিয়া ফার্মান ও 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। ভূষণার দশ মাইল দূরে রাজধানী নির্মাণ করিয়া ইহার নামকরণ করেন 'মহম্মদপুর'। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাদল গড়িয়া তোলেন। অতঃপর তিনি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করেন ও সুবাদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলির ফৌজদারকে হত্যা করায় মুর্শিদকুলি খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে ভূষণার ফৌজদার বক্শ আলি খাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি সীতারামকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সপরিবারে তাঁহাকে বন্দী করেন। সীতারাম অনেক মন্দির নির্মাণ ও জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সীতারাম' নামক উপন্যাসে বাঙালী পাঠকের কাছে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন।

ত্রিদিবনাথ রায়

সীসা প্রাচীন মিশরে ও প্রাচীন রোমে সীসার ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার পারমাণবিক সংখ্যা ৮২, ওজন ২০৭, ঘনত্ব ১১.৩৪ ; বর্ণ উজ্জ্বল নীলাভ, কিন্তু বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই ঔজ্জ্বল্য কমিয়া ধূসর হইয়া

যায়। ইহা অতি নরম ধাতু, গলনাঙ্ক ৩২৭.৪° সে. গ্রে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ১৭৪০° সে. গ্রে.।

গন্ধকঘটিত গ্যালেনা, অক্সিজেনঘটিত ওকার এবং অন্যান্য মৌলের সহিত যৌগ হিসাবে আকরিক সীসা পাওয়া যায়। তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি, যথাঃ রেডিয়াম ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি ধাপে ধাপে তেজ বিকিরণ করিয়া সীসায় পরিণত হয়। ধাতব সীসা নিষ্কাশনের জন্য প্রথমে গ্যালেনাকে রেভারবারেটারি চুল্লিতে অল্প উত্তপ্ত করা হয়। ফলে উহা আংশিক অক্সাইড ও আংশিক সাল্‌ফেটে রূপান্তরিত হয়। বাকী অপরিবর্তিত থাকে। ইহার পর কিছু পাথুরে চুন মিশ্রিত করিয়া চুল্লির উত্তাপ বর্ধিত করা হয়। গ্যালেনা, লেড্‌অক্সাইড ও লেড্‌সালফেটের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ধাতব সীসার সৃষ্টি হয়। অপরিশুদ্ধ সীসাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তামা, এন্টিমনি, রৌপ্য এবং অন্যান্য ধাতু হইতে পরিশ্রুত করা হয়। মোটরগাড়ির ব্যাটারি তৈয়ারির কাজে সীসার ব্যবহার সর্বাধিক। অ্যাসিড ও জলে ক্ষয় প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে বলিয়া জলের পাইপ, কারখানার রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করণের পাত্র, বিভিন্ন ধাতুর উপরের আবরণ ইত্যাদি তৈয়ারিতে ইহার ব্যবহার হয়। ইহার ঘনত্বের কারণে রঞ্জনরশ্মি ও অন্যান্য উচ্চশক্তি-সম্পন্ন রশ্মি-প্রবাহী যন্ত্রের আবরণ এবং বন্দুকের বুলেট নির্মাণে ইহার ব্যবহার আছে। আবরক হিসাবে কাচ তৈয়ারির কাজে পলিভিনাইল্‌ ক্লোরাইড প্ল্যাস্টিকের রক্ষক হিসাবে এবং পেট্রলের উৎকর্ষবিধানে সীসাযৌগের প্রচুর উপযোগিতা আছে।

কল্যাণময় সেন

সুইফ্‌ট, জোনাথন (১৬৬৭-১৭৪৫ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ব্যঙ্গশিল্পী, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার ও পুস্তিকা লেখক। আয়ার্ল্যান্ডের জীবনযাত্রার সহিত তাঁহার এক অচ্ছেদ্য আত্মিক যোগ স্থাপিত ছিল। 'ড্রেপিয়ার্স লেটার্স' (১৭২৪ খ্রী) ও 'এ মডেস্ট প্রোপোজাল' ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ লেখক স্যর উইলিয়ম টেম্প্‌লের (১৬২৮-১৬৯৯ খ্রী) সচিবরূপে কাজ করিবার সময়ে টেম্প্‌লের বিরাট্‌ পাঠাগারে সুইফ্‌ট তাঁহার প্রথম সাহিত্যের পাঠ আরম্ভ করেন এবং এখানেই তাঁহার প্রথম সাহিত্যকৃতি জন্মলাভ করে। তিনি কতকগুলি 'পিন্‌ডারিক ওড' ধরনের কবিতা রচনা করেন, অতঃপর তাঁহার 'ডেস্‌ক্রিপ্‌শান অভ্‌ এ সিটি শাওয়ার' (১৭০৯ খ্রী), 'ডেস্‌ক্রিপ্‌শান অভ্‌ দি মর্নিং' (১৭০৯ খ্রী), 'দি লেডিজ ড্রেসিং রুম' (১৭৩২ খ্রী) প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম যুগের ব্যঙ্গধর্মী গ্রন্থের মধ্যে 'ব্যাট্‌ল অভ্‌ দি বুক্‌স্‌' ও 'টেল অভ্‌ এ টাব্‌' উল্লেখযোগ্য। কিয়ৎকাল তিনি এস্‌থার জনসন নামক একজন মহিলার গৃহশিক্ষকতার কার্য করেন। কথিত আছে তাঁহাকেই তিনি গোপনে বিবাহ করেন। এই এস্‌থার জনসনকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার বিখ্যাত 'জার্নাল টু স্টেলা' (১৭১০-১৩ খ্রী) নামক গ্রন্থের অবতারণা। এক সময়ে তিনি টোরি রাজনৈতিক দলভুক্ত হন ও নানাবিধ বিদ্রূপাত্মক ও রাজনীতি প্রণোদিত পুস্তিকা রচনা করেন। অতঃপর রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটিলে তিনি ভগ্নহৃদয়ে পুনরায় ডাবলিনে প্রত্যাগমন করেন এবং জীবনের অবশিষ্টাংশ সেইখানেই অতিবাহিত করেন। 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স' (১৭২৬ খ্রী) তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি। ইহা রূপকথার ধরনে রচিত হইলেও ইহার অন্তর্নিহিত মর্মকথা মানব-জীবনের অতি নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসী। ইহার মধ্য দিয়া তিনি তদানীন্তন সমাজের গোঁড়ামি ও ভণ্ডামির উপর নির্মম কশাঘাত হানিয়াছেন। তৎকালের আধারে রচিত হইলেও এই অপূর্ব সাহিত্য-কৃতি শাশ্বত ও চিরন্তনকালের মানব-জীবনের মূঢ়তা ও ব্যর্থতার এক অনবদ্য আলেখ্য। সুইফ্‌টের গালিভার এক চিরন্তন সত্যের প্রকাশ। তাঁহার অন্যান্য রচনার মধ্যে 'এ লেটার টু এ ইয়ং ক্লার্জিম্যান' (১৭২১ খ্রী), 'এ লেটার অভ্‌ অ্যাডভাইস টু এ ইয়ং পোয়েট' (১৭২১ খ্রী), 'এ লেটার টু এ ভেরি ইয়ং লেডি অন হার ম্যারেজ' (১৭২৯ খ্রী), 'ডিরেকশান্‌স টু সারভ্যান্টস্‌' (১৭৩১ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত দরদী মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে সুইফ্‌টের রচনার প্রতিটি পৃষ্ঠায়। বিশ্বসাহিত্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক ও অতি তীব্র ব্যঙ্গ-রচনাকার হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁহার জীবনবোধ গভীর ও সহানুভূতিশীল। দুঃখের বিষয় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি প্রায় উন্মাদ অবস্থায় কাটান।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৩৩৩-১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের তরুণ কবি। কাব্যের মূল সুর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। জন্মস্থান কলিকাতা। নিবারণচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুনীতিদেবীর ইনি দ্বিতীয় পুত্র। আদি নিবাস ফরিদপুরের কোটালীপাড়া। বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন (১৩৫২ খ্রী)। ছড়া রচনা আরম্ভ করেন নিতান্ত শৈশবে। রাজনৈতিক জীবনে ছিলেন তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোরসভা অংশের ছিলেন

প্রতিষ্ঠাতা ও আজীবন সম্পাদক। রচনা ঃ কাব্যগ্রন্থ—'ছাড়পত্র' (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), 'ঘুম নেই' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), ও 'পূর্বাভাস' (১৩৫৭ বঙ্গাব্দ)। অন্যান্য রচনা—'মিঠেকড়া' (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ), 'অভিযান' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), 'হরতাল' (১৩৬৯ বঙ্গাব্দ) এবং 'গীতিগুচ্ছ' (১৩৭২ বঙ্গাব্দ)। ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের পক্ষে সম্পাদনা করেন কাব্যগ্রন্থ 'আকাল' (১৩৫১ বঙ্গাব্দ)।

নারায়ণ দত্ত

সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭-১৯২৩ খ্রী) বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ছাত্রজীবন কৃতিত্বপূর্ণ। দুইটি বিষয়ে অনার্স লইয়া বি. এস.-সি. পাশ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ' লাভ করিয়া ইংল্যান্ডে যান এবং ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অভ্ টেক্‌নলজি হইতে ফোটোগ্রাফী ও ব্লক নির্মাণবিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। উপেন্দ্রকিশোর প্রতিষ্ঠিত 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স' কোম্পানির পরিচালনা করিতেন।

সুকুমার রায়ের সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ অতি শৈশবেই ঘটিয়াছিল। ১৩০২ বঙ্গাব্দে মাত্র আট বছর বয়সে তাঁহার 'নদী' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা শিবনাথ শাস্ত্রী-সম্পাদিত শিশু পত্রিকা 'মুকুলে' প্রকাশিত হয়। ১৩২০ বঙ্গাব্দে উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' প্রতিষ্ঠিত হইলে সুকুমার রায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠে। গল্প, নাটক, চিত্র ও কবিতায় বাংলাদেশের শিশুচিত্ত তিনি জয় করিয়া লন।

খেয়ালী কবিতা এবং তৎসহ তাঁহার অংকিত অসামান্য ছবিগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। আধুনিক বাংলা শিশু সাহিত্যের তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। মৃত্যুর পরেই একে একে তাঁহার 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'ঝালাপালা', 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী', 'খাই খাই' প্রভৃতি বইগুলি প্রকাশিত হয়। বয়স্কদের জন্য রচিত তাঁহার ব্যঙ্গ নাটক 'চলচিচত্ত-চঞ্চরী'ও একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। সুগায়ক ও সুঅভিনেতা রূপেও তিনি খ্যাতিমান্ ছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুখলতা রাও (১৮৮৬-১৯৬৯ খ্রী) শিশুসাহিত্যের প্রখ্যাত লেখিকা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। সুখলতা কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বেথুন কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়েন। ওড়িশার জয়ন্ত রাও-এর সহিত বিবাহ হয়। কটকে শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, ওড়িয়া নারীসেবা সংঘ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাত্রী। বাংলায় শিশুসাহিত্য রচনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ছোটদের জন্য লেখা তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'হিতোপদেশের গল্প', 'নানান দেশের রূপকথা', 'দুই ভাই', 'লালিভুলির দেশে', 'ঈশপের গল্প', 'সোনার ময়ূর' প্রভৃতি

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সুজা (১৬১৬-১৬৬১ খ্রী) সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। মোগলরাজকুমারদের উপযোগী শিক্ষা তিনি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার শৌর্য, চরিত্র-মাধুর্য ও বুদ্ধিমত্তা ছিল খুব প্রশংসনীয়।

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে তিনি বাংলার এবং ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল পর্যন্ত (মাঝে মাঝে কিছু কিছু সময় বাদে) তিনি বাংলার ও ওড়িশার প্রদেশপাল ছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল রাজমহল। তাঁহার শাসনকালে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকার ফলে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও সম্পদ্ বর্ধিত হয়। তিনি ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরাগী।

১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার অসুস্থতার সময়ে সিংহাসনের জন্য যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় তাহাতে তিনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বারাণসীর প্রায় পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে বাহাদুরপুরে দারার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমানের নিকট পরাজিত হন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তিনি উত্তর প্রদেশের ফতেপুর জেলার খাজোয়াতে ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হইয়া বাংলায় প্রত্যাবর্তন করিলেও শেষপর্যন্ত আরাকানের মগরাজা সন্দথুধম্মের (১৬৫২- ১৬৮৪ খ্রী) আশ্রয় লইতে বাধ্য হন (১২ মে, ১৬৬০ খ্রী)। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি সেখানে নিহত হন। সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি আলাওল ('আলাওল' দ্র) তাঁহার 'সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমাল' কাব্যে সুজার শেষ জীবনের উপর কিছু আলোকপাত করিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সুজাউদ্দৌলা (১৭৩২-১৭৭৫ খ্রী) অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার পূর্বনাম ছিল মির্জা জালালউদ্দীন হায়দার। তিনি ছিলেন অযোধ্যার নবাব সাদাত্ খাঁর দৌহিত্র এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা (পরে দিল্লীর উজীর) সফদর জঙ্গের পুত্র। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যা ও এলাহাবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্

শাহ্ আলম সুজাউদ্দৌলাকে উজির নিযুক্ত করেন। বাংলার নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইয়া সুজাউদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুজাউদ্দৌলা তখন অযোধ্যার নবাব। তিনি ইংরেজদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন; কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এলাহাবাদে পলায়ন করেন এবং ইংরেজদের সহিত তাঁহার সন্ধি হয় (১৭৬৫ খ্রী)। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে সুজাউদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং কোরা ও এলাহাবাদ ইংরেজ কোম্পানিকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। অযোধ্যা কোম্পানির আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। মারাঠারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলে তিনি সে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া রোহিলখণ্ড নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। প্রথম জীবনে বিলাসব্যসনে অতিবাহিত করিলেও উত্তরকালে তিনি সুদক্ষ শাসক ও কূটনীতিবিদ্ হিসাবে ইতিহাসে খ্যাত হন। তাঁহার সময়ে অযোধ্যার শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির এবং চারুকলা ও সাহিত্যের উন্নতি হয়। তাঁহার কোনও রূপ ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না এবং রাজ্যের বিভিন্ন উচ্চপদে তিনি হিন্দুদের নিয়োগ করিতেন।

অতুলচন্দ্র রায়

সুজাতা বুদ্ধশিষ্যা সুজাতা উরুবেলার নিকটবর্তী সেনানি গ্রামের ভূস্বামী সেনানির কন্যা। তিনি অশ্বত্থ-বৃক্ষদেবতার নিকট মানসিক করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন তবে তিনি তাঁহাকে পায়সান্ন নিবেদন করিবেন। গৌতম নিরঞ্জনা নদীতে স্নান সমাপন করিয়া বোধিবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। সুজাতা তাঁহাকেই বৃক্ষদেবতা মনে করিয়া তাঁহাকে পায়সান্ন নিবেদন করেন, দেবগণ তাহা স্বর্গীয় সৌরভযুক্ত করিয়া দেন। গৌতম তাহা গ্রহণ করেন। তারপর তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ৪৯ দিনের মধ্যে ইহাই তাঁহার একমাত্র খাদ্য ছিল।

সুজাতার পুত্রের নাম যশ। যশ যখন অর্হত্ব লাভ করেন, তখন তাঁহার পিতা পুত্রের অনুসন্ধানে আসিয়া বুদ্ধের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে সুজাতাও ত্রিশরণ গ্রহণ করেন। ত্রিশরণ-গ্রহণকারিণী গৃহী উপাসিকাদিগের তিনি ছিলেন অগ্রবর্তিনী।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধসাহিত্য-গ্রন্থে রমণী সুজাতা বিভিন্ন পরিচয়ে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সাকেতবাসী সেট্ঠির কন্যা সুজাতাথেরী অঞ্জনবনে বুদ্ধের উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিয়া পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং স্বামীর অনুমতিক্রমে বুদ্ধের শিষ্যা হন। তপস্যারত গৌতমকে আহার্যদানকারী নয়জন রমণীর অন্যতমা ছিলেন সুজাতা (ললিতবিস্তর)। পুত্রসন্তান কামনা করিয়া গোপনারী সুজাতা বটবৃক্ষ-দেবতার নিকটে মানসিক করিলেন। মনস্কাম পূর্ণ হইলে তিনি পায়সান্ন রাঁধিয়া দাসী পুণ্ণাকে বটবৃক্ষতলে মার্জিত করিতে বলিলেন। দাসী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া সদ্যোধ্যানোত্থিত গৌতম বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিল এবং তাঁহাকে দেবতা মনে করিয়া সুজাতাকে জানাইল। সুজাতাও আসিয়া দেবতাজ্ঞানে গৌতম বুদ্ধকে পায়স খাইতে দিলেন; গৌতম বুদ্ধ পরিতৃপ্তির সঙ্গে পায়স আহার করিলেন। সুজাতাপ্রদত্ত পায়স গৌতম বুদ্ধের দেবভোগ্য সর্বোত্তম বলিয়া কীর্তিত। সুজাতা ধম্ম-সংঘ-বুদ্ধ-শরণ-গামিনী উপাসিকা-কুলে অগ্রগণ্যা।

নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯২৯ খ্রী) সুসাহিত্যিক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন (১৮৯০ খ্রী)। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রথম রচনা ‘বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার ছোটগল্প, বিশেষ করিয়া করুণরসাত্মক গল্পগুলি, বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা হইতে ১৩০১ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত ‘সাধনা’ মাসিক পত্রিকা তিনি কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। চতুর্থ বৎসর হইতে ‘সাধনা’র সম্পাদনাভার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গ্রহণ করেন। সুধীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য রচনা এইগুলিঃ প্রবন্ধ ‘ধর্মের অভিব্যক্তি’ এবং ‘ব্রাহ্মসমাজ’ (১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ‘প্রসঙ্গ’ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ); কাব্যঃ ‘দোলা’ (১৩০৩ বঙ্গাব্দ), ‘দাসী’ (১৩১১ বঙ্গাব্দ), ‘বৈতানিক’ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ); গল্প ঃ ‘মঞ্জুষা’ (১৩১০ বঙ্গাব্দ), ‘চিত্ররেখা’ (১৩১৭ বঙ্গাব্দ), ‘করঙ্ক’ (১৩১৯ বঙ্গাব্দ), ‘চিত্রালী’ (১৩২৬ বঙ্গাব্দ); উপন্যাসঃ ‘মায়ার বন্ধন’ (১৩১১ বঙ্গাব্দ)। ব্যক্তিগত জীবনে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন নিরহংকার, অনাড়ম্বর এবং সরল প্রকৃতির মানুষ।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০ খ্রী) কবি ও সমালোচক। জন্মস্থান ঃ কলিকাতা। পিতা বিখ্যাত দার্শনিক, হীরেন্দ্রনাথ। মাতা ঃ ইন্দুমতী। কাশীতে অ্যানি বেসান্ট প্রতিষ্ঠিত থিয়সফিস্ট হাইস্কুলের ছাত্র

ছিলেন (১৯১৪-১৭ খ্রী)। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন (১৯১২ খ্রী)। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ছবি বসুর সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পাঁচ বৎসর পরে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন এবং ইওরোপ, আমেরিকা ও জাপান ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'পরিচয়' নামক একখানি উচ্চাংগ ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতে থাকেন। পাঁচ বৎসর পরে উহা মাসিক পত্রে পরিণত হয় এবং তাঁহার সম্পাদনায় আরও সাত বৎসর চলে। 'ফরওয়ার্ড', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' এবং 'সবুজপত্রে'র সহিত যুক্ত থাকিয়া তিনি সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৫৪-৬০ খ্রীষ্টাব্দ তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন ; তন্মধ্যে দুই বৎসর তাঁহার প্রবাসে কাটিয়াছিল। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ গায়িকা রাজেশ্বরী বাসুদেবের সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে কবিদল রবীন্দ্র-প্রভাব কাটাইয়া স্বতন্ত্রভাবে কাব্য রচনায় প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। স্বল্প পরিচিত এবং নবগঠিত শব্দ-প্রয়োগের প্রতি তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। নানা বিষয়ে তাঁহার ব্যাপক পড়াশুনা ছিল এবং তাঁহার লেখায় পাণ্ডিত্যের ছাপ আছে। তাঁহার কাব্যাদর্শে ফরাসী লেখক প্রুস্তের (১৮৭১-১৯২২ খ্রী) প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। শেক্‌স্‌পীয়র, গ্যেটে, ভ্যালেরি, মালার্মে প্রভৃতির কয়েকটি কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। প্রবন্ধেও তাঁহার মননশীলতার পরিচয় আছে। তাঁহার রচনাবলী ঃ কাব্য ঃ 'তন্বী' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), 'অর্কেস্ট্রা' (১৩৪২ বঙ্গাব্দ), 'ক্রন্দসী' (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ), 'সংবর্ত' (১৩৬০ বঙ্গাব্দ), 'প্রতিধ্বনি' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), 'দশমী' (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ), প্রবন্ধ ঃ 'স্বগত' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'কুলায় ও কালপুরুষ' (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুনয়নী দেবী (১৮৭৫-১৯৬২ খ্রী) চিত্রশিল্পী। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা ভগিনী। স্বামী রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় অ্যাটর্নি ছিলেন। অগ্রজদের অনুপ্রেরণায় তাঁহার চারুকলা-চর্চার সূত্রপাত হইলেও এ-বিষয়ে তাঁহার কোনও শিক্ষক ছিল না। সংসারের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেও তাঁহার চারুকলা-চর্চা অব্যাহত ছিল। রামায়ণ মহাভারতের নানা চরিত্র ও দেবদেবী এবং রাধাকৃষ্ণের মুখাবয়বের রূপায়ণ তাঁহার চিত্রকলার প্রধান বিষয়। হাল্কা জলরঙে দেবদেবী ও নারীর মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি তাঁহার তুলিকায় প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতা, মাদ্রাজ, লণ্ডন, প্রভৃতি স্থানে তাঁহার চিত্র প্রদর্শিত হয়। ত্রিবান্দ্রমের 'শ্রীচিত্রালয়ম্‌', ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অভ্‌ মাদ্রাজ, মহীশূরের 'শ্রীজগমোহন চিত্রশালা', কলিকাতার 'আকাদেমি অভ্‌ ফাইন আর্ট্‌স্‌' এবং অন্যান্য চিত্রশালায় তাঁহার চিত্র সংগৃহীত আছে। উল্লেখ্য চিত্র ঃ মা যশোদা, রাধা, বাউল, আয়েষা, পূজারতা, নেপথ্যে, নীল অঞ্জনা, সখী-পরিবৃতা বিবাহের বধূ, অর্ধনারীশ্বর, বৃন্দাবনের গোপিনী, গ্রাম্যবধূ, গোকুল হইতে কৃষ্ণের বিদায় প্রভৃতি।

কমল সরকার

সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২ খ্রী) মহারানী, কুচবিহার। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান ('কেশবচন্দ্র সেন' দ্র)। তিনি মহিলা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার পিতৃদেবের শিক্ষাও তাঁহার জীবনকে সমৃদ্ধ করে। ঐ সময়ে ব্রিটিশ সরকার কুচবিহার রাজ্যের রিজেন্ট স্বরূপ ছিল। কুচবিহারের নাবালক মহারাজার এদেশের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা ও তৎপূর্বে তাঁহার বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছিল। বহু অন্বেষণের পর কেশবচন্দ্রের এই কন্যাকে মনোনীত করা হয় ও কেশবচন্দ্রের নিকট ঐ প্রস্তাব যায়। কেশবচন্দ্র কয়েকটি সর্তে ঐ প্রস্তাবে অগ্রসর হন। প্রথম সর্ত ছিল যে, ঐ বিবাহ তখন বাগ্‌দান-স্বরূপ হইবে এবং দুই বৎসর পরে পরিপূরক বিবাহানুষ্ঠান হইলে তাঁহারা স্বামী স্ত্রীরূপে একত্র সংসারে প্রবেশ করিবেন। দ্বিতীয় সর্ত ছিল যে, পাত্র একেশ্বরে বিশ্বাসী (Theist) হইবেন এবং এক ভিন্ন দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিবেন না। তৃতীয় সর্ত ছিল যে, বিবাহ-সভায় দেবদেবীর বিগ্রহ, শালগ্রামশিলা বা অগ্নি থাকিবে না ; বিবাহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে, অব্রাহ্মণ আচার্য পৌরোহিত্য করিবেন এবং দেবদেবীসূচক শব্দ পরিহার করিয়া বিবাহানুষ্ঠান হইবে। আলোচনার পর রাজগুরু, রাজমাতা ও ব্রিটিশ সরকার এই সর্তে স্বীকৃত হন। অতঃপর ৬ মার্চ, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সহিত সুনীতিদেবীর বিবাহ কুচবিহারে সম্পন্ন হয়। বিবাহানুষ্ঠানের পরেই মহারাজা উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত চলিয়া যান, এবং সুনীতিদেবী পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণে প্রবৃত্ত হন। মহারাজা বিদেশ হইতে ফিরিলে কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সর্বসমক্ষে পরিপূরক বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হয় (২০ অক্টো, ১৮৮০ খ্রী)। এক্ষণে সুনীতিদেবী সংসারধর্ম পালনের সহিত কুচবিহার রাজ্যের বহু

কল্যাণকর কার্যে ব্রতী হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সপরিবারে বিলাতে আনা হয় এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহারানী সুনীতি-দেবী নববিধান প্রচার ও পিতৃপ্রতিষ্ঠানাদির কার্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সেবিকা নামে আখ্যাত হন। তিনি সুন্দর ব্রহ্মোপাসনা ও অপূর্ব কথকতা করিতেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত 'মহিলা বিদ্যালয়' (বর্তমান ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন) কলেজ ও স্কুলের জন্য তিনি আজীবন সাহায্য করিয়াছেন। শেষপর্যন্ত পিতৃগৃহ 'কমল কুটীর' ভ্রাতাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া 'নবদেবালয়'সহ একটি ট্রাস্ট গঠন করিয়া ঐ বিদ্যালয়কে ইহা দান করেন। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি সুলেখিকা ছিলেন এবং বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন। 'অমৃতবিন্দু' (সংগীত), 'শব্দ শঙ্খ' (সংগীত), 'শিশু কেশব', 'বেঙ্গল ডেকয়েট্স্ অ্যান্ড টাইগার্স', দি রাজপুত প্রিন্সেসেস্' প্রভৃতি তাঁহার লেখা গ্রন্থ। তিনি চিত্রাঙ্কনেও নিপুণ ছিলেন।

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরবন (২১°৩১'-২২°৩৮' উত্তর; ৮৮°৫'-৯০°২৮' পূর্ব)। ইহা জলাকীর্ণ বিশাল জলভূমি। হুগলি নদীর মোহনা হইতে মেঘনা পর্যন্ত, প্রায় ২৭২ কি. মি. দীর্ঘ। বর্তমানে এই বিশাল বনভূমির এক তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে ও বাকি অংশ পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে)। সুন্দরবন নূতন পলিগঠিত গাঙ্গেয় বদ্বীপের সম্মুখস্থ অঞ্চল। ইহা হুগলি, মাতলা, রায়-মঙ্গল, মালঞ্চ প্রভৃতি নদী এবং খাড়ীর মোহনা অঞ্চল। এই নদী ও খাড়ীগুলি আড়াআড়ি প্রবাহদ্বারা পরস্পর সংযুক্ত।

উপকূল অঞ্চল সুপারি, নারিকেল ও তাল বৃক্ষে পূর্ণ। সুন্দরী, গরাণ, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও হোগলা ইহার বনজ সম্পদ। এখানে মধু আহরণে অনেক লোক নিযুক্ত আছে। সম্প্রতি তুলা ও সূর্যমুখী চাষের প্রবর্তন হইয়াছে। অরণ্যে পশুর মধ্যে বাঘই প্রধান।

জলবায়ু আর্দ্র। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৮২" হইতে ২০০"। পশ্চিমাঞ্চল আবাদীভূমি ও লোকবসতিপূর্ণ। লবণ উৎপাদন এখানকার জীবিকার্জনের অন্যতম অবলম্বন।

জাহ্নবী বাগচী

সুন্দরীমোহন দাস (১৮৫৭-১৯৫০ খ্রী) পিতাঃ দেওয়ান স্বরূপচন্দ্র দাস। মাতা ঃ অন্নপূর্ণা দেবী। কলিকাতায় এফ. এ. ও মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পাশ করেন। তারাকিশোর রায়চৌধুরী ('সন্তদাস বাবাজী' দ্র), বিপিনচন্দ্র পাল ('বিপিনচন্দ্র পাল' দ্র) ও সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীহট্টের তিনটি উজ্জ্বল রত্ন, পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনজনেই প্রথমে ব্রাহ্ম ছিলেন, পরে বৈষ্ণবসাধনার পথ গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করিলে সুন্দরীমোহন প্রতিশ্রুতি দেন যে তাহারা গোলামখানা ছাড়িলে তিনি জাতীয় মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল করিয়া দিবেন। ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট ও চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি এই প্রতি-শ্রুতি পালন করেন। তিনি প্রথমাবধি এই প্রতিষ্ঠানের সেবক, সংগঠক ও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং জয়পুরের মন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেনের বিধবা ভাগিনেয়ী হেমাঙ্গিনী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনিও দেশসেবায় সর্বতোভাবে তাঁহার স্বামীর অনুবর্তিনী ছিলেন। তাঁহার সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে চিত্তরঞ্জন, ব্রহ্মবান্ধব, অরবিন্দ, লিয়াকৎ হোসেন, শ্যাম-সুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি আসিয়া স্বরাজ-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতেই পরে স্বরাজ পার্টির নামকরণ হয়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরও তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী ছিলেন। সুন্দরীমোহন শ্রীহট্ট সম্মিলনীর অন্যতম স্থাপয়িতা এবং আমরণ ইহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার গৃহে বহু অনাথ-আতুর ছাত্র, বিধবা ও বিপ্লবীরা পালিত হইতেন। নিজের পুত্রদেরও তিনি বিপ্লবী অনুশীলন সমিতির সভ্য করিয়া দেন। তিনি নিত্য প্রাতে উপাসনা ও নাম-সংকীর্তন করিতেন। তাঁহার রচিত দুই শতাধিক কীর্তন গানে তাঁহার ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত পালাকীর্তন 'নৌকা-বিলাস' রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঠাকুর বাড়িতে গীত হয়। তাঁহার রচিত 'বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা' অতি উচ্চাঙ্গের অভিনব রচনা। ইহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-রস যুগপৎ পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি নিজের হাসপাতালেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার দেহ ঐ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের ব্যবচ্ছেদের জন্য দান করিয়া যান, তবে প্রতিষ্ঠান তাঁহার পবিত্র দেহ ব্যবচ্ছেদ না করিয়া যথাবিধি সৎকার করে।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

সুন্নি সুন্নাতের অনুসরণকারী 'সুন্নী' নামে অভি-হিত হন। তাঁহাদিগকে আহলে সুন্নাত বা সুন্নাতাল জামাতও বলা হয়। ইসলামের ১২ জন এমাম পাকের প্রতি তাঁহারা শ্রদ্ধাশীল এবং চারি মজহার স্রষ্টা ৪ জন এমামের অনুসরণকারী। ইসলাম ধর্মের বহু মনীষী সুন্নত-পন্থী ছিলেন।

আব্দুস সোবহান

সুপারসনিক্‌স্‌ শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে ২০০০০-এর অধিক হইলে তাহা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় না। এই ধরনের 'শ্রবণোত্তর তরঙ্গের' আলোচনা ও তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সম্পর্কিত প্রসঙ্গকে সুপারসনিক্‌স্‌ (অধুনা আল্‌ট্রাসনিক্‌স্‌) বলে। শ্রবণোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ককে সেকেণ্ডে কয়েক শত সহস্র পর্যন্ত হইতে পারে। ইহাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ সে. মি-এর দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। এই দৈর্ঘ্য শ্রুতিগোচর শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (৩০ সে. মি.) অপেক্ষা অনেক অল্প হওয়ায় কতকগুলি বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্রে ইহারা খুবই উপযোগী।

রেডার যন্ত্র-প্রেরিত অতি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে যেমন আকাশে দূরবর্তী অজানা বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়, শ্রবণোত্তর তরঙ্গের মাধ্যমে 'সোনার' (Sonar) যন্ত্রের সাহায্যে তেমনি জলের অভ্যন্তরে মৎস্যকুলের অবস্থান-নির্ণয়, শত্রুপক্ষের ডুবোজাহাজের উপস্থিতি-নির্ধারণ, সংকেতের আদান-প্রদান প্রভৃতি করা যায়। এতদ্ব্যতীত এই তরঙ্গের সাহায্যে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির অংশ ও অপরিচ্ছন্ন বস্ত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করা, রবারজাত বা ধাতব কোনও পদার্থের মধ্যে সম্ভাব্য ফাটল বা অন্য প্রকার ত্রুটির সন্ধান, শরীরের অভ্যন্তরে টিউমার, ক্যান্‌সার প্রভৃতির অস্তিত্ব নিরূপণ, বিশেষ ধরনের রোগজীবাণু নাশ প্রভৃতি কাজও সম্ভব হয়।

প্রধানতঃ দুইটি পদ্ধতিতে শ্রবণোত্তর তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। নিকেল জাতীয় ধাতুখণ্ড চুম্বকত্ব পাইলে তাহার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন ঘটে। অতএব ঐরূপ পদার্থের চুম্বকত্বের দ্রুত পরিবর্তন ঘটাইলে বস্তুটি কম্পিত হইতে থাকে এবং উক্ত কম্পনের ফলে শ্রবণোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোয়ার্টস্‌ জাতীয় কেলাসে দ্রুত পরিবর্তনশীল তড়িৎবিভব প্রয়োগ করিলে তাহাদের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটে। এইভাবেও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করা যায়।

যে গতিবেগ (যেমন বিমানের ক্ষেত্রে) শব্দের গতিবেগ (ঘণ্টায় প্রায় ১২৩২ কি. মি.) অপেক্ষা অধিক, তাহাকে 'সুপারসনিক্‌' গতিবেগ বলে। আলোচিত 'সুপারসনিক্‌স্‌' শব্দটির সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষণীয়।

অনাদিনাথ দাঁ

সুফী, মতবাদ ও সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় শতাব্দী বা হিজিরায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী এক বিশেষ শ্রেণীর সাধু বা নির্জনতাপ্রিয় ফকিরদের সুফী আখ্যা দেওয়া হয়। 'সুফ' শব্দটির মূল অর্থ হইতেছে পশম বা উল। অধিকাংশ পণ্ডিতই মনে করেন যে, উক্ত শ্রেণীর সাধু সম্প্রদায় সাধারণতঃ (যদিও অব্যতিক্রমে নয়) পশমের একপ্রকার পোশাক পরিধান করিত বলিয়াই তাহারা সুফী নামে অভিহিত হইত। সাধারণভাবে সুফীবাদের মূল বলিয়া ইসলামকে ধরা হইলেও নিরপেক্ষবিচারে পরবর্তীকালে ইহার উপর হিন্দু বেদান্তের প্রভাব অবশ্য স্বীকার্য। এমন কি সুফীবাদের উত্তর যুগে ইহার উপর বৌদ্ধ দর্শন, নিওপ্লেটোনিক দর্শন প্রভৃতির প্রভাবও স্বীকার করা হয়। ইহাই নব সুফীবাদ। আদি সুফীমত প্রধানতঃ নীতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু নব সুফীগণ কেবল যে বৈরাগ্য-ধর্মী ছিলেন তাহাই নহে, তাঁহারা মরমী ভক্তও ছিলেন ; তাই নব সুফীমতকে মরমিয়াবাদ মূলক বলিলে দোষ হয় না।

প্রসিদ্ধ সুফী জামির মতে আবু হাসিম-ই প্রথম সুফী। নব সুফীমতের প্রচারকদের মধ্যে মারুফ্‌ আল্‌ কার্‌খী, আবু সুলেমান আল্‌ দারানী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু ঘজালী ('ঘজালী' দ্র) সুফী ধর্মের সহিত ইসলাম ধর্মের সমন্বয় বিধানে অগ্রণী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে বিখ্যাত সুফী কবি-ত্রয়, ফরিদ্‌-উদ্‌-দীন-আত্তার, জালালুদ্দীন রুমী ও শেখ সাদীর আবির্ভাবে সুফীমতবাদের মহিমা খুবই বৃদ্ধি পায়।

অন্যতম সুফী সম্প্রদায়ের (অর্ডারের) সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা মুইনালদীন মুহম্মদ চিস্তীর (১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে আসেন) মতবাদই ভারতে ব্যাপক প্রসারতা পায়। বহু সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরওয়ার্দি ও চিস্তীই প্রথম দিকে ভারতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, পরে অবশ্য আরও অনেক সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ভারতে অনুপ্রবেশ করে ও জনপ্রিয় হয়। কথিত আছে যে, বঙ্গদেশের সহিত, বিশেষ করিয়া চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরের সহিত, সর্বপ্রথম সুফীবাদের সংস্পর্শ ঘটে ফরিদ্‌-উদ্‌-দীন শকরগঞ্জ নামক চিস্তী সাধুর প্রচেষ্টায়। ১৫শ শতাব্দীতে কাদিরীয় সুফী শ্রেণীভুক্ত (ইহার অধিকর্তা ছিলেন ১১-১২শ শতাব্দীর আব্‌দ্‌ আল্‌-কাদির, গিলানি) সৈয়দ মুহম্মদ ঘাউথ (গিলানি)ও ভারতে তাঁহাদের সুফীমতবাদ প্রচার করেন। এই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যতম প্রচারক বাগ্‌দাদের শাহ্‌ কামীস (মৃ ১৫৮৪ খ্রী) বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। উত্তর ভারত হইতেই সুফীবাদের বন্যা

বঙ্গদেশে আসে এবং এখানে অন্ততঃ সাতটি বিভিন্ন সুফী সম্প্রদায় আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সুফীমতে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি-অনন্ত। সুফীমতবাদীদের কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর জগতে লীন হইয়া আছেন, অর্থাৎ তিনি শুধুই জগল্লীন, জগদতিরিক্ত নহেন। এই মতে ঈশ্বরই বিশ্ব, বিশ্বই ঈশ্বর। এমন কি ইঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর স্বয়ংই জগৎ। আবার কোনও কোনও সুফীর মতে ঈশ্বর জগল্লীন নহেন, তিনি জগদ্-বহির্ভূত, তবে জগতের অতি নিকটবর্তী। জগল্লীন বলিতে জল ও সুরার মত মিলিয়া যাওয়া বুঝায়। পক্ষান্তরে জগদ্বহির্ভূত অথচ অতি নিকটবর্তী বলিতে বুঝিতে হইবে ঈশ্বর ও বিশ্বের সম্পর্ক জল ও তৈলের ন্যায়—মিলিতেছে না কিন্তু পরস্পর অতি নিকটবর্তী। একশ্রেণীর সুফীর মতে ঈশ্বর নির্গুণ ও সগুণ—উভয়ই। নির্গুণরূপে তিনি শুদ্ধস্বরূপ, নির্বিশেষ, সকল ভেদবিবর্জিত। সগুণরূপে তিনি নিজের স্বরূপে অনভিব্যক্ত-ভাবে নিহিত গুণাবলীকে অভিব্যক্ত করেন। এইরূপেই তিনি ঈশ্বর অথবা দেবতা (দি ডিভিনিটি)। আর একদল সুফী মনে করেন, ঈশ্বর সর্বদাই সগুণ ও সবিশেষ। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া তাঁহা হইতে ভিন্ন অপর কিছু থাকিতে পারে না। অতএব, ঈশ্বর ও তাঁহার গুণাবলী সম্পূর্ণ অভিন্ন। সনাতনপন্থী সুফী-গণের মতে ঈশ্বরের গুণাবলী ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। সুফীদর্শনে ঈশ্বরের সাতটি গুণ ধরা হয়—প্রাণ, জ্ঞান, সংকল্প, বল, বাক্য, শ্রবণ ও দর্শন। প্রাণদ্বারা ঈশ্বর নিত্য স্থিতিশীল এবং চরা-চরের স্থিতির কারণ; জ্ঞানদ্বারা তিনি সর্বজ্ঞ এবং সকলের জ্ঞানের কারণ; সংকল্পদ্বারা তিনি উপকরণ ও প্রচেষ্টা ব্যতীত আপ্তকাম; বলদ্বারা তিনি অসাধ্য-সাধক; বাক্যদ্বারা তিনি আজ্ঞাদায়ক; শ্রবণদ্বারা তিনি প্রার্থনা-শ্রোতা এবং দর্শনদ্বারা তিনি সর্বদ্রষ্টা। ঈশ্বরের গুণাবলী সম্পর্কে অপর প্রকারের সুফীমতও আছে।

সুফীগণের মতে ঈশ্বরের গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। এই মতে ঈশ্বর ও তাঁহার নামাবলী অভিন্ন, যদিও সনাতনপন্থীরা বলেন, নাম-সমূহ ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে। ঈশ্বরের নামাবলী দুই শ্রেণীর : স্বরূপবাচক অর্থাৎ আল্ আহাদ বা এক ও অদ্বিতীয়; গুণবাচক আল্ রহমান অর্থাৎ করুণাময়। ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম আল্লা। ঈশ্বর জগৎ ও মানবকে সৃষ্টি করিলেন মানবের নিকট নিজেকে জ্ঞাত করিবার জন্য। অন্য সুফী-মতে ঈশ্বর স্বীয় স্বরূপকে জানিবার জন্যই জগৎ, জীব, মানব ও পরিশেষে সিদ্ধপুরুষদিগকে সৃষ্টি করিলেন। এই সিদ্ধপুরুষ বা পূর্ণ মানবই ঈশ্বরের দর্পণস্বরূপ।

অধিকাংশ সুফীর মতে জগৎ সাদি ও সান্ত অর্থাৎ অনিত্য। যদিও এবিষয়ে মতান্তরও প্রচলিত আছে। যেমন এক মতে জগতে ক্রমবিবর্তন চলিতেছে. যথা জড় বস্তু, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, মানব। আবার মানব, দেবদূত ও ঈশ্বর। এইখানেই বিবর্তনের সমাপ্তি। কোনও কোনও সুফী জগৎকে ক্ষণিক বলিয়া মনে করেন। এই মতে জগৎ প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে এবং পুনরায় সৃষ্টি হইতেছে। তবে অজ্ঞতা-বশতঃ মানুষ তাহা জানে না। অবশ্য বেশির ভাগ সুফীই ক্ষণবাদে বিশ্বাস করেন না। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে সুফীরা বলেন, মানব জড়দেহেন্দ্রিয় ও অজড়-আত্মার সমাহার। অধিকাংশ সুফীর মতে ঈশ্বর পূর্ণ মানবের মাধ্যমে জগতে অবতরণ করিয়া পুনরায় ঐ একই মাধ্যমে নিজস্বরূপে প্রত্যাবর্তন করেন। অর্থাৎ একমাত্র পূর্ণ মানব বা সিদ্ধপুরুষই ঈশ্বরের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কিন্তু তাই বলিয়া সুফীরা অবতারবাদে বিশ্বাস করেন না। সাধারণভাবে সুফীমতে ঈশ্বর-জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ তথা মোক্ষস্বরূপের দুইটি দিক্ঃ নঞর্থক 'ধ্বংস' অর্থাৎ আমিত্বের বিনাশ এবং সদর্থক 'স্থিতি' অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ। ধ্বংসের অর্থ মানবের স্বতন্ত্র মানবত্ব ও মানবীয় গুণা-বলীর ধ্বংস; এবং স্থিতি শব্দের অর্থ ঈশ্বরের শাশ্বত স্থিতি—স্বতন্ত্র সত্তাবান্ ব্যক্তিরূপে নহে, ঈশ্বর হইতে অভিন্নরূপে। অধিকাংশ সুফীর মতে মোক্ষলাভ এই জগতেই এবং বর্তমান জীবনেই সম্ভবপর। তবে সনাতনপন্থী সুফীগণের মতে ঈশ্বর-দর্শন ইহলোকে নয়, পরলোকে। ঈশ্বরের সহিত মিলনাভিলাসী সাধককে সুফীরা বলেন 'পর্যটক' এবং মানবের ঈশ্বরলাভের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'পর্যটন'। পর্যটক হইবার জন্য গুরুর ('শেখ' বা 'পীর') নিকট হইতে সুফীসাধনমার্গের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে। তাঁহার যোগ্যতায় গুরু সন্তুষ্ট হইলে তাঁহাকে দীক্ষিত করিবেন এবং তালিদেওয়া পোশাক (বৈরাগ্য ও দারিদ্র্যের চিহ্ন) দিবেন। সুফী মতে পর্যটককে সাতটি সোপান অতিক্রম করিতে হইবে।—অনুতাপ, সংযম, বৈরাগ্য, দারিদ্র্য, ধৈর্য, ঈশ্বরবিশ্বাস এবং সন্তোষ। মতান্তরে শেষ চারিটি সোপান হইতেছে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জ্ঞান, প্রেম, সমাধি ও মিলন। ইঁহাদের মতে প্রেমই সুফী ধর্মের মূলতত্ত্ব। এবং ঈশ্বর-মানবের

মিলনসেতু। তবে এই স্তরেও ঈশ্বর ও মানবের মধ্যে ভেদজ্ঞান থাকে ; কিন্তু সমাধিস্তরে এই ভেদজ্ঞান একেবারেই লোপ পায়। ঈশ্বরের সহিত মিলন এই অবস্থারই ফল।

সুফীরা বিচার-বুদ্ধিলব্ধ স্থিরতাধর্মী জ্ঞান অপেক্ষা আবেগপ্রধান উন্মাদনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন।

রমা চৌধুরী

সুবচনী সুবচন বা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবীর নাম সুবচনী, সংস্কৃত করিয়া কখনও শুভচণ্ডী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ইনি পূর্ব বাংলায় সধবা হিন্দু নারী কর্তৃক পূজিতা হন। পূজার উপকরণ সিন্দুর, তৈল, পান-সুপারী। এই দেবীর ব্রতকথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রের একটি খোঁড়া হাঁস চুরি করিয়া খাইবার কথা আছে। সুবচনীর দয়ায় হাঁসটি পুনরায় বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। বাংলায় 'সুবচনীর হাঁস' কথাটি প্রচলিত আছে।

আশুতোষ ভট্টাচার্য

সুবন্ধু সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গদ্যরচয়িতা। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কালও অনিশ্চিত। তাঁহার গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্য-ভাগের রচনা উদ্দ্যোতকর-এর নামোল্লেখ হইতে মনে হয়, তিনি এই কাল-সীমার পরবর্তী লেখক। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' 'বাসবদত্তা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। কাহারও কাহারও মতে এই নামে বাণভট্ট সুবন্ধুর গ্রন্থকে বুঝাইয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়েও নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা কঠিন। 'বাসবদত্তা'য় বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ হইতে কেহ কেহ সুবন্ধুকে গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন মনে করেন। কিন্তু মনে হয়, যে-স্থলে বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ আছে, তাহা অতীতের ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াছে। সুতরাং সুবন্ধুর কাল সম্বন্ধে উক্ত কোনও যুক্তিই অখণ্ডনীয় নহে। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের প্রথমার্ধে বাক্‌পতি 'গৌড়বহো' নামক প্রাকৃত কাব্যে সুবন্ধুর নামোল্লেখ করিয়াছেন ; আবার ঐ শতকেই, কিছু পরে, আলংকারিক বামন স্বীয় গ্রন্থে এমন একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা, সামান্য পাঠান্তর সহ, সুবন্ধুর গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে সুবন্ধুকে আনুমানিক ৭ম শতকের লেখক বলা চলিতে পারে। তিনি বাণের সমসাময়িকও হইতে পারেন। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্য। উদয়ন-কাহিনীর প্রসিদ্ধ বাসবদত্তার আখ্যান সুবন্ধুর গ্রন্থের বিষয় হইলেও তিনি যে ঘটনাবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় না। মনে হয়, 'বাসবদত্তা'র আখ্যানভাগ কবির কল্পনাপ্রসূত। নানাবিধ শব্দালংকার ও অর্থালংকারের প্রয়োগে কবির নৈপুণ্য থাকিলেও স্থানে স্থানে শ্লেষ, বিরোধাভাস প্রভৃতির অতিরিক্ত প্রয়োগ পাঠকের কাছে বিরক্তিকর হইয়াছে, আখ্যানভাগও মাঝে মাঝে অসংলগ্ন।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবর্ণগ্রাম বর্তমান ঢাকা শহরের সন্নিকটে অবস্থিত মধ্যযুগের সোনারগাঁও বা সুবর্ণ গ্রাম একটি স্বাধীন হিন্দু রাজার রাজধানী ছিল। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি দিল্লীর সম্রাট বলবন বিদ্রোহী পূর্ববঙ্গের শাসনকর্তা তুগবল খানকে দমন করিবার জন্য বাংলাদেশে আসিলে তুগবল পলায়ন করেন। বলবন তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুবর্ণ গ্রামের রাজার সহিত সন্ধি করেন। মুসলমান ইতিহাসে এই রাজাকে 'রায় দনুজ' বলা হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্বে পূর্ববঙ্গে দশরথদেব রাজত্ব করিতেন। তাঁহার তাম্রশাসনে তাঁহার 'অরিরাজ দনুজ মাধব' এই উপাধি পাওয়া যায়। বাংলার কুলজীশাস্ত্রে এই সময়ে দনুজমাধব নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। এই সমুদয়ই সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত রাজা দশরথদেবকে সূচিত করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুবর্ণদ্বীপ, সুবর্ণভূমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে দেশগুলিকে এখন ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশীয়া বলা হয় প্রাচীন হিন্দুরা তাহাদিগকে 'সুবর্ণভূমি' আখ্যা দিয়াছিলেন। দ্বীপগুলিকে কখনও কখনও পৃথক্‌ভাবে সুবর্ণদ্বীপও বলা হইত। সম্ভবতঃ আরবজাতির ন্যায় হিন্দুরাও বিশ্বাস করিতেন যে, এই সমুদয় দেশে সহজেই বহু পরিমাণ সোনা বা বহুমূল্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক বা তাহার পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষ হইতে বহু ভাগ্যান্বেষী গণক, রাজপুত্র প্রভৃতি এবং ধর্মপ্রচারকগণ এই দেশে গিয়া বসবাস করেন। ক্রমে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ ('কম্বোজ' দ্র), চম্পা ('চম্পা' দ্র), মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, বোর্নিও, ফিলিপ্পীনদ্বীপে ইঁহারা উপনিবেশ বিস্তার করেন এবং এই অঞ্চলে হিন্দুরাজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুবোধকুমার মিত্র (১৮৯৬-১৯৬১ খ্রী) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি. পাশ করিয়া বার্লিনে গিয়া এম. ডি. ও এডিনবরা হইতে এফ. আর. সি. এস. পাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যোগ দেন। প্রথমে সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পরে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং শেষে ডিরেক্টর হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অভ্ মেডিসিনের অব্স্‌টেট্রিক্স্ ও গাইন্যাকলজিক্যাল বিভাগের অধ্যক্ষও ছিলেন। সেবাসদনে কাজ করিতে করিতেই তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে স্ত্রী অঙ্গে ক্যান্সার ব্যাধির চিকিৎসা শুরু করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও উদ্যমে চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল ও ইহার গবেষণা-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্ত্রী অঙ্গে ক্যান্সার ব্যাধি সারাইবার জন্য তিনি স্বয়ং একটি অপারেশন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইহা 'মিত্র অপারেশন' নামে অভিহিত হয় ('ক্যান্সার' দ্র)। তাঁহার এই পদ্ধতি জাপান, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি ইত্যাদি দেশে প্রশংসা অর্জন করে। 'জার্মান আকাদেমি অভ্ সায়েন্স' তাঁহাকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার সদস্য পদ দেয়। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রথম ভারতীয় সদস্য।

তাঁহার লেখা বাংলা বই 'ক্যান্সার চিকিৎসা'। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা, কানাডা ও ইংল্যান্ড হইতে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়—'মিত্র অপারেশন ফর্ ক্যান্সার অভ্ দি সার্ভিক্স্'। অব্স্‌টেট্রিক ও গাইন্যাকলজিক্যাল কংগ্রেসের ৩য় অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য অসুস্থ দেহে ভিয়েনা গিয়া সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০ খ্রী)। পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসুমল্লিক পরিবারের সন্তান। আদিনিবাস হুগলি জেলার পান্ডুয়া থানার কাঁটাগোড় গ্রামে। পিতা প্রবোধচন্দ্র। সুবোধচন্দ্রের দুইবার বিবাহ হয়। প্রথমপক্ষের স্ত্রী ছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর নাতিনী প্রকাশিনী। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম ছিল কমলাপ্রভা। কমলাপ্রভার পিতৃ-ষ্বসা ছিলেন কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ('গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী' দ্র)। সুবোধচন্দ্রের একমাত্র ভগ্নী ইন্দুমতীর সঙ্গে বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিবাহ হয় ('হীরেন্দ্রনাথ দত্ত' দ্র)। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ('সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' দ্র) তাঁহার ভাগিনেয়।

সুবোধচন্দ্র সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে আইন পড়িতে যান। পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অচিরে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁহার বাড়িটি তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার বাড়িতে কয়েক বছর ছিলেন। 'ডন সোসাইটি'র সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগ ছিল। 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকা তাঁহার অর্থানুকূল্যে চলিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য পান্তির মাঠে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রাবাসের স্থান) যে সভা হয় সেখানে তিনি একলক্ষ টাকা মূল্যের একটি জমিদারি দান করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তিনি অছি ছিলেন। তাঁহার বদান্যতার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। মুগ্ধদেশবাসী তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেন। বাংলাদেশের বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৮-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অন্তরীণ ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩ নম্বর আইনে সর্বপ্রথম যে নয়জন গ্রেপ্তার হন সেই অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখের মধ্যে সুবোধচন্দ্রও ছিলেন।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভারতীয় সংগীত সমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। পরবর্তীকালে তিনি 'লাইট অভ্ এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন।

সুধীর বেরা

সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৬৭-১৯৫৩ খ্রী) প্রখ্যাত শারীরবিজ্ঞানী ও জীববিদ্যাবিশারদ্। পিতা গুরুচরণ মহলানবিশ। কিছুকাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের পর তিনি এডিনবরা যান এবং শারীরবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণায় রত হন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরাস্থিত রয়্যাল সোসাইটি-র ফেলো নির্বাচিত হন; এবং কার্ডিফ-এর ইউনিভার্সিটি কলেজে শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০০-২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজের এবং ১৯২৭-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (বর্তমানে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) শারীরবিদ্যার প্রধান অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। ১৯১০-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগেও অধ্যাপনা করেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডারউইন শত-

বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অভ্ ইন্ডিয়া-র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং বোটানিক্যাল সোসাইটি অভ্ বেঙ্গল (১৯৩৭-৪০ খ্রী) ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরও সভাপতি ছিলেন। তিনি শিক্ষাবিদ্, সুবক্তা, বিজ্ঞানবিষয়ে সুলেখক এবং স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজ সেবায় অনুরাগী ছিলেন। নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতভেদ দূর করিয়া মিলনের সেতু প্রস্তুত করিতে তিনি সতত প্রয়াস পাইতেন। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা মণিকা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন।

পরিমলবিকাশ সেন

সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১ খ্রী) তামিল ভাষার এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তাঁহার কাব্য আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ হইলেও সংসার-বিমুখ নহে। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের গানও তিনি গাহিয়াছেন। প্রকৃতি, প্রেম এবং মুক্তিকামনা তাঁহার কাব্যের তিনটি প্রধান প্রেরণা। কেবল বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তির কথা তিনি বলেন নাই, সর্বপ্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পীড়নের বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন। 'কেহ কাহাকেও আঘাত করিব না, ভারতের সন্তান আমরা, সকলে মিলিয়া চলিব সত্যের পথে, আলোকের পথে'—ইহাই ছিল তাঁহার মনোগত আদর্শ। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল; আধুনিক ভাবসম্ভারকেও সযত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা অনেক গান তামিল-ভাষীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে তাঁহার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭—?) ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল নাম। 'নেতাজী' নামে ইনি সুপরিচিত। পিতা জানকীনাথ বসু ও মাতা প্রভাবতী দেবী। জন্ম কটক শহরে। সুভাষচন্দ্র জানকীনাথের ষষ্ঠ সন্তান। কটকের সাহেবী প্রটেস্ট্যান্ট স্কুলে সুভাষচন্দ্রের পড়াশোনা শুরু হয়। কিন্তু সেখানে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছেলেদের এবং শিক্ষকদের ব্যবহার পছন্দ না হওয়ায় তিনি র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হন। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কটকে ছিলেন। এই সময় র‍্যাভেন শ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস সুভাষের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেন। সে সময় কটকের অনেক জনহিতকর সমাজসেবার কাজে সুভাষ নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কটক হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পর কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ভরতি হন। ভারতবর্ষে তখন রাজনীতি ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ইংরেজ অধ্যাপক এসময় ক্লাসে এমন সব উক্তি করিতে থাকেন যাহা ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক। এই সাহেব অধ্যাপকের উক্তির প্রতিবাদের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ত্যাগ করিতে হয়। পরে অনেক অসুবিধা ও অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভরতি হইয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পাইয়া বি. এ. পাশ করেন। সেই বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ইংল্যান্ড গমন করিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হইলেন। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' তাঁহার জীবনে নূতন আলোকপাত করিল। বেদান্তের মায়াবাদ তিনি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেন না বটে কিন্তু স্বদেশপ্রেমের মহিমা তিনি যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষায় সফলতা লাভ করেন। সে সময় মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলন ('অসহযোগ আন্দোলন' দ্র) আরম্ভ হইয়াছে। তাই তিনি সিভিল সার্ভিসের দাসত্ব করিতে অস্বীকার করিলেন। ইংল্যান্ড ত্যাগের পূর্বে তিনি কেম্ব্রিজ হইতে দর্শনে ট্রাইপস পাশ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে তিনি দেশের কাজে যোগ দেন এবং কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কংগ্রেসের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইহার পরই তাঁহার কারাজীবন শুরু হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ইঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা হইলে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত দেশবাসীর সেবা করেন। তাহার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ম্যানেজার ও সম্পাদক, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে কাউন্সিলার এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসাররূপে দেশের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু আবার ব্রিটিশ রাজপুরুষদের টনক নড়িল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে সুভাষ অন্তরীণ হইলেন। প্রথমে কলিকাতায়, তাহার পর বহরমপুরে এবং অবশেষে তাঁহাকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। এখানে তিনি অনশন সত্যাগ্রহ করেন।

ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬মে তিনি ছাড়া পাইলেন। তাহার পরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সর্বভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশন বসিল। ইহাতে সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা ছিলেন (জি. ও. সি.)। ইহার পর তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সম্পাদকপদে মনোনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট আবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। এইরূপে বারংবার কোনও না কোনও অছিলায় গভর্নমেন্ট তাঁহার স্বাধীনতা হরণ করিতে লাগিলেন। ইহারই মধ্যে তাঁহাকে দুইবার কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে মনোনীত করা হইল। জেলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সন্দেহ হইল তাঁহার যক্ষ্মা হইয়াছে। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর এবং তাঁহার সহগামীদের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়। এদিকে ভারত সরকার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ইওরোপে প্রেরণ করেন। সেখানে ভিয়েনায় তাঁহার সহিত বিঠলভাই প্যাটেলের ('প্যাটেল, বিঠলভাই' দ্র) সাক্ষাৎ হয়। বিঠলভাইয়ের সহিত সুভাষচন্দ্রের মতের খুব মিল হয়। বিঠলভাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা এবং নিজের মতবাদ ইওরোপে প্রচার করিবার জন্য উইল করিয়া এক লক্ষ টাকা সুভাষচন্দ্রকে দিয়া যান। কিন্তু সে টাকা শেষ পর্যন্ত তিনি পান নাই। পিতার গুরুতর অসুখের সংবাদ পাইয়া তিনি রাজবন্দী অবস্থাতেই দেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু আসিয়া পিতাকে দেখিতে পান নাই। পুনরায় তাঁহাকে ভিয়েনায় ফিরিয়া যাইতে হয়। সেখানে তিনি নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড যান। পরে সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় কারাবরণ করেন। ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলে সরকার অবশেষে তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দান করিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী নেতাদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য চরমে উঠিল এবং তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন। এই সময় তিনি কুখ্যাত অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ উৎপাটন করান এবং তাঁহারই চেষ্টায় কলিকাতায় একটি কংগ্রেস-ভবন স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দেন 'মহাজাতি সদন'। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ণস্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'হিসাবনিকাশের দিন' শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখেন। মহম্মদ আলি পার্কে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতাও দেন। ইহার ফলে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে স্বগৃহে বন্দী করেন। ইহার পর স্বগৃহ হইতেই তাঁহার বিস্ময়কর অন্তর্ধান একটি অনন্য ইতিহাস সৃজন করিয়াছে। অন্তর্ধান করিয়া তিনি পেশোয়ার হইয়া কাবুলে যান। সেখান হইতে রাশিয়া এবং রাশিয়া হইতে জার্মানি। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ('বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয়' দ্র) চলিতেছে। বার্লিনে কিছুদিন থাকিয়া তিনি টোকিও চলিয়া যান রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে। সেখানে বিশ্ববিখ্যাত আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন ('আজাদ হিন্দ ফৌজ' দ্র)। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজোর আনুকূল্যে এই ফৌজ গঠিত হয়। এই ফৌজগঠন সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ ফৌজেরও পতন হয়। মণিপুর জয় অসম্পূর্ণ থাকে। তবু একথা বলিতেই হইবে যে, স্বাধীন ভারতের মাটিতে সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। ইহার পর আবার তিনি রহস্যময়ভাবে অন্তর্ধান করেন। তিনি জীবিত কি মৃত তাহা এখনও সুনিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। সুভাষচন্দ্র সত্যনিষ্ঠ, দুঃসাহসী, নির্ভীক নেতা ছিলেন। তাঁহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: 'দুঃখকে তুমি করেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনও পরাভবকে তুমি সত্য বলে মানো নি—।' কবির এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

সুমাত্রা মালয় দ্বীপপুঞ্জের (ইন্দোনেশিয়ার) পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিমে ১০৬০ মাইল দীর্ঘ; দুই প্রান্ত মধ্যভাগ অপেক্ষা অনেক কম প্রশস্ত। বোর্নিও ব্যতীত এরূপ বৃহৎ দ্বীপ মালয় দ্বীপপুঞ্জে আর নাই। খুব প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুরা এখানে বসবাস এবং বড় বড় রাজ্য স্থাপন করেন। শ্রীবিজয় রাজ্য ও শৈলেন্দ্রবংশীয় সম্রাট্‌দের সাম্রাজ্য খুবই শক্তিশালী ছিল ('শ্রীবিজয়' দ্র)। হিন্দুসভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু নিদর্শন বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দির এবং দেবমূর্তি, প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান। শৈলেন্দ্রবংশের শক্তি হ্রাসের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুমাত্রায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠে। ক্রমে ইহার সকলগুলিই মুসলমানগণ অধিকার করে। মার্কোপোলো ও ইবন্‌ বতুতা দ্বীপ ভ্রমণ করিয়া ইহার বিবরণ লিখিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুমের এশিয়ার পশ্চিম-প্রান্তে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায়, এশিয়া মহাদেশের সর্বপ্রাচীন যে-জাতিদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে সুমেরীয় জাতিই সর্বপ্রাচীন। এই জাতি যে প্রাচীন

লিখিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে তাহা হইতেই পরবর্তীকালে কিউনিফর্ম বর্ণমালার উৎপত্তি হয়। খাল কাটিয়া পূর্বোক্ত দুইটি নদীর জল-প্লাবন রোধ ও অনেক শহরের পত্তন করার কৃতিত্বও এই সুমেরীয়দেরই প্রাপ্য। তাহাদের পরে এই অঞ্চলে এক সেমিটিক জাতি অ্যাকাড (Akkad) -কে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই প্রদেশ হইতেই আসিরীয়গণ আরও উত্তরে অগ্রসর হইয়া বিশাল এক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই দেশে বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হয় এবং অনেক রাজা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। হ্যামুরাবি (অথবা খ্যামুরাবি) নামে একজন পরাক্রান্ত সম্রাট্ যে আইনগুলি প্রচলন করেন মানবসভ্যতার ইতিহাসে তাহাই প্রাচীনতম বিধিবদ্ধ আইন-সংগ্রহ (কোড) বলিয়া বিবেচিত হয় (২৩৪০ খ্রী. পূ.)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুরাট তাপ্তীনদীর মোহনায় বোম্বাই হইতে ২৭২ কিলোমিটার উত্তরে সুরাট শহর গুজরাত প্রদেশের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহা জনবহুল এবং জনসংখ্যার ৮৫.০ ভাগই গ্রামীণ ; ইহার মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা হইল ৪৬.৭১ ভাগ। জনসংখ্যার ৭০ ভাগই পুরুষ, কৃষিকার্যই অধিবাসীদিগের প্রাথমিক উপজীবিকা, তবে শিল্প প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। বিশেষতঃ কুটির-শিল্পের ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। এখানে ৭৫ ভাগ লোক কারখানায় এবং এক পঞ্চমাংশ লোক কুটিরশিল্পে নিযুক্ত। টালির কাজ, বিশেষ ধরনের ইটের কাজ এবং নল ও মাটির কাজই প্রধান। কাপড়ের কল (প্রধানতঃ সিল্ক), ধানের কল ও কাগজের কারখানাও গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ইহা প্রাশাসনিক কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। ইহা একমাত্র বোম্বাই-নাগপুর রেলপথদ্বারা প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত।

জাহ্নবী বাগচী

সুরেন্দ্রনাথ কর (১৮৯৪-১৯৭০ খ্রী)। জন্ম বিহারের মুঙ্গের জেলায়। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হিসাবে খ্যাত। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম শান্তিনিকেতনে আসেন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ড্রয়িং শিক্ষক হইয়া। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে সচিব এবং ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বিনয়ভবনের' (ইনস্টিটিউট অভ্ এডুকেশন) ডাইরেক্টর হন। কর্তৃপক্ষ ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে মরণোত্তর 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন।

অবনীন্দ্র-সৃষ্ট 'ধোওয়া ছবির' (ওয়াশ পেন্টিং) লালিত্য এবং মিনিয়েচার ছবির সৌকুমার্য ও রেখাধর্মিতা সুরেন্দ্রনাথের চিত্রাবলীর প্রধান উপাদান। হাল্কা বর্ণবিন্যাস-জাত লাবণ্য তাঁহার অধিকাংশ চিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্থাপত্য নক্সার প্রতি তাঁহার সহজাত আকর্ষণ ও ইহার অবচেতন প্রতিফলন তাঁহার বিভিন্ন চিত্ররচনারীতিতে প্রচ্ছন্ন। অলিন্দ, গবাক্ষের জালি নক্সা, কার্নিসের কারুকার্য ইত্যাদির আলংকারিক ও জ্যামিতিক রচনাকৌশল তাঁহার অনেক চিত্রেই পশ্চাৎপটরূপে ব্যবহৃত। সাঁওতাল দম্পতি, গ্রাম্যবিধবা, অথবা কারুময় প্রাসাদ-পশ্চাৎপটে বিভিন্ন রমণীভঙ্গিমা ইত্যাদি তাঁহার চিত্রের অন্যতম বিষয়বস্তু।

সৃজনশীল স্থাপত্যপরিকল্পনাতেও তাঁহার মনীষা লক্ষণীয়। সরল অলংকার-সমৃদ্ধ নক্সা, বিভিন্ন গঠনের বিভাজন, প্রতিবিভাজন, প্রক্ষেপণ ইত্যাদিতে স্বকীয় স্থাপত্যপরিকল্পনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম, কলিকাতার দেশবন্ধু মেমোরিয়াল, বেনারসের মন্তেসরী স্কুল, আমেদাবাদের শ্রীঅম্বালাল সারাভাইয়ের বাসভবন, বোকারোর ডি. ভি. সি.র বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম, কলিকাতা ও কল্যাণীতে এ. আই. সি. সি. অধিবেশনের (১৯৫৩-৫৪ খ্রী) জন্য সজ্জা ও অলংকরণ ইত্যাদি তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অরুণ পাল

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রী) বাংলার নাট্যজগতে 'দানীবাবু' নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং স্বনামধন্য অভিনেতা। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্রের তিনি একমাত্র পুত্র ও নট-প্রতিভার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। স্বভাবের প্রবণতায় তরুণ বয়সেই, পিতার অজ্ঞাতে, সুরেন্দ্রনাথের অভিনয়-জীবনের সূচনা হয়। পরে ২২ বৎসর বয়সে 'স্টার' মঞ্চে 'চণ্ড' নাটকে রঘুদেবের ভূমিকায় তিনি প্রথম জন-সমাদর লাভ করেন। কালক্রমে তিনি রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসাবে অসামান্য যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। তাঁহার অভিনীত বহু সার্থক ভূমিকার মধ্যে ওসমান, গদাধরচন্দ্র, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, শিবাজী, ঔরঙ্গজেব, চাণক্য, যোগেশ প্রভৃতি স্মরণীয় হইয়া আছে।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭৩-১৯৪০ খ্রী) পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ('সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) ও মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জন্মস্থান ঃ বোম্বাই। বাংলাদেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অন্যতম পথিকৃৎ। সহধর্মিণী ঃ সংজ্ঞা

দেবী। কৈশোরেই খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সাহিত্যচর্চা ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই রেলশ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন করেন। লোকমান্য টিলকের সহিত ঘনিষ্ঠতা হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ লন। বাংলার বিপ্লববাদী দলের সহিত যোগাযোগ ছিল; অনুশীলন দলের কোষাধ্যক্ষ। স্বদেশী শিল্পকে উৎসাহদানের প্রয়াসে 'হিন্দুস্থান জীবনবীমা সমবায় সমিতি'র গোড়াপত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আদিযুগে তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ ও বহু প্রবন্ধের রচয়িতা। 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা করিতেন। শেষজীবনে সাম্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁহার লেখা উল্লেখযোগ্য বই : 'একটি বসন্ত প্রাতের প্রস্ফুটিত সকুরা-পুষ্প' (১৩১১ বঙ্গাব্দ), 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ' (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) প্রভৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে-র ইংরেজী অনুবাদ 'হোম অ্যান্ড দি ওয়ার্ল্ড' (১৯১৯ খ্রী), ছিন্নপত্রের অনুবাদ 'গ্লিম্‌প্‌সেস্‌ অভ্‌ বেংগল : সিলেক্‌টেড ফ্রম দি লেটার্স' (১৯২১ খ্রী), চার অধ্যায়-এর অনুবাদ 'ফোর চ্যাপ্‌টার্স' (১৯৫০ খ্রী) প্রভৃতি। ইহা ছাড়া তাঁহার বহু প্রবন্ধ 'ভারতী', 'সাধনা', 'বেঙ্গলী', 'মডার্ন রিভিউ', 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'ইনস্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি অনেক দিন 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি'র সম্পাদক ছিলেন।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৫২ খ্রী) আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুপণ্ডিত অধ্যাপক। আদিনিবাস বরিশাল জেলার গৈলা গ্রাম। কুষ্ঠিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা রিপন কলেজ হইতে সংস্কৃতে সম্মানসহ বি. এ. পাশ করার পর সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম. এ. (১৯০৮ খ্রী) পাশ করেন। তিনি পাশ্চাত্য দর্শনেও এম. এ. পাশ করেন (১৯১০ খ্রী)। কিছুদিন রাজশাহী কলেজে অধ্যাপনার পরে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার প্রধান অধ্যাপক হন। অতঃপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন এবং কিছুকাল পরে বিলেতে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.-এইচ. ডি. উপাধি পান (১৯২২ খ্রী)। সেখানে তিনি কিছুদিন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক হন।

তিনি একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত জড়িত ছিলেন। রোম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন (১৯৩৯ খ্রী)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্যারিসে অনুষ্ঠিত 'ইণ্টার-এলায়েড কংগ্রেস অভ্‌ ফিলসফিতে' কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপ্‌ল্‌স-এ এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে হার্ভার্ড-এ আন্তর্জাতিক ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাশিয়ায় নিমন্ত্রিত হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শিকাগোতে হ্যারিস বক্তৃতা দেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে এবং ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জাতিক 'কংগ্রেস অভ্‌ রিলিজন'-এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্টেফানস নির্মলেন্দু ঘোষ বক্তৃতা দেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি ইংরেজীতে রচিত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস। এই গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। বঙ্গ সাহিত্যের সেবার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সকলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজস্ব দার্শনিক মতবাদও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জড়পদার্থ (ম্যাটার), চেতন পদার্থ (কনসাশনেস), জীবন (লাইফ), মন (মাইণ্ড) প্রভৃতি গুণগত বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। ইহাদের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত যোগসূত্র বর্তমান। ইহার উপলব্ধিই সত্যের উপলব্ধি। সাধনার দ্বারা মানুষ তাহার মনকে এমন স্তরে তুলিতে পারে যেখানে সে তাহার সহজাত জৈবিক প্রবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, ইহাদের বহির্মুখী গতিকে রোধ করিয়া এগুলিকে অন্তর্মুখী করিতে সমর্থ হয়। এইরূপে জ্ঞানময় এবং প্রেমময় হৃদ্য পুরুষটির সহিত মানবের পরিচয় ঘটে। অন্তঃপুরুষের উপলব্ধিতে জীব ভূমানন্দের অধিকারী হয়। এই স্তরের উপলব্ধি পূর্ব-পূর্বস্তরের দেহ-মন প্রভৃতির—অভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা পূর্ব-পূর্বস্তরের উপর নির্ভরশীল—জীবের সামগ্রিক সত্তাবোধ, পরমপুরুষার্থ, এবং জীবনের চরম অভিব্যক্তি। ইহাই সুরেন্দ্রনাথের Theory of dependent emergence বা সাপেক্ষ সম্ভূতিবাদ।

তাঁহার লেখা বহু গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'এ হিস্ট্রি অভ্‌ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' (৫ খণ্ড) ; 'এ স্টাডি অভ্‌ পতঞ্জলি' (১৯২০ খ্রী) ; 'যোগ ফিলসফি ইন

রিলেশন্ টু আদার সিস্টেম্স্ অভ্ ইণ্ডিয়ান থট্' (১৯৩০ খ্রী) ; 'এ হিস্ট্রি অভ্ স্যান্স্ক্রিট্ লিটারেচার' (১৯৪৭ খ্রী) । 'রবীন্দ্রনাথ, দি পোয়েট অ্যান্ড ফিলসফার' (১৯৪৮ খ্রী) ; 'কাব্য বিচার', 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব', 'রবি দীপিকা' ইত্যাদি।

জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রী) ভারতের জাতীয়তার আদি পুরোহিত, তাই দেশবাসী তাঁহাকে 'রাষ্ট্রগুরু' আখ্যা দিয়াছে। তাঁহার পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বিহারীলাল গুপ্তের সহিত বিলাতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীহট্টের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার অল্পদিন পরেই কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া তিনি পদচ্যুত হন। অতঃপর মেট্রোপলিটন ও সিটি কলেজে এবং পরে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে তিনি সুনামের সহিত ইংরেজীর অধ্যাপনা করেন। তাঁহার বাগ্মিতার খ্যাতি সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দেশসেবীরূপেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। 'বেঙ্গলী' নামক দৈনিক পত্রের সম্পাদকরূপে তিনি যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাও অসামান্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা 'ভারতসভা' প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে গড়িয়া ওঠে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায়ও তিনি উৎসাহী ছিলেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে দুইবার তিনি উহার বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জন-কৃত বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে এবং স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার নির্ভীক নেতৃত্ব সমগ্র দেশকে সংঘবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেসময় অনেকে তাঁহাকে বলিত 'বঙ্গের মুকুটহীন রাজা'। পরে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজনীতিক্ষেত্রে 'মডারেট' বা নরমপন্থী দলে যোগ দিয়া তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তা হারাইয়া ফেলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেস মুক্তিসংগ্রামে মাতিয়া ওঠে এবং অসহযোগ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। তখন ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসনসংস্কার সমর্থন এবং মন্ত্রিত্বগ্রহণ করিয়া তিনি অনেকের নিন্দাভাজন হন। একদিন শাসকের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন ; আবার আর এক দিন দেশবাসীর বিরুদ্ধ সমালোচনা তুচ্ছ করিয়া তিনি শাসন-সংস্কারকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৌরশাসনে দেশবাসীর যেটুকু কর্তৃত্ব আসিয়াছিল, তাহা তাঁহারই চেষ্টার ফল। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে 'স্যর' উপাধি দিয়াছিলেন। ভারত ও ইংল্যাণ্ডের আর্থিক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আহূত কমিশনে তিনি আমন্ত্রিত প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার সকল কাজের সমর্থন না করিলেও দেশবাসী তাঁহাকে স্থায়ী গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-১৮৭৮ খ্রী) কবি ও সুলেখক। *জন্মস্থান ঃ যশোহর জেলার জগন্নাথপুর।* রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। পিতা প্রসন্ননাথ। কলিকাতায় ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, হেয়ার স্কুল ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়িয়া পাঠ সাঙ্গ করেন। আবাল্য সংগীতানুরাগী। আপন চেষ্টায় সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় এবং দর্শন ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুকাল উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করিয়া ১২৬৯ বঙ্গাব্দে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য মুঙ্গের গিয়া (১২৭৮ বঙ্গাব্দ) সেখানেই অসমাপ্ত প্রসিদ্ধ 'মহিলা' কাব্য রচনা করেন। এই খ্যাতিবিমুখ কবি জীবিতকালে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই।

দার্শনিকতা এবং কবিত্বের মিলনে ভাবোচ্ছ্বাসহীন সুবিন্যস্ত গাঢ়বন্ধ তাঁহার কবিতা সেকালে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ ঃ 'ষড়ঋতু-বর্ণন' (কবিতা, ১৮৫৬ খ্রী), 'সবিতা সুদর্শন' (আখ্যায়িকা কাব্য, ১৮৭০ খ্রী), বর্ষবর্তন (কবিতা, ১৮৭২ খ্রী), 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' (টডের গ্রন্থের পাঁচখণ্ডে অনুবাদ ১৮৭২-১৮৭৩ খ্রী), 'বিশ্বরহস্য' (গদ্য, ১৮৭৭ খ্রী), 'মহিলা' (কাব্য, ১ম অংশ প্রকাশ ১৮৮০, ২য় অংশ ১৮৮৩ খ্রী), 'হামির' (ঐতিহাসিক নাটক, ১৮৮১ খ্রী) ইত্যাদি। 'বিবিধার্থসংগ্রহ', 'নলিনী' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার গদ্য ও কবিতা ছড়াইয়া আছে। ১২৭৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমেলা উপলক্ষে তিনি লেখেন 'ভারতের ব্রিটিশ শাসন পরিদর্শন'।

ভবতোষ দত্ত

সুরেন্দ্রনাথ সেন (১৮৯০-১৯৬২ খ্রী) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। জন্ম ঃ বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে। পিতা মথুরানাথ। ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাশ করিয়া (১৯১৫ খ্রী) তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক হন (১৯১৭ খ্রী) এবং পরে আশুতোষ অধ্যাপক হন (১৯৩১-৩৯ খ্রী)। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পি. আর. এস. বৃত্তি পান এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পি.-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পরে তিনি ইম্পীরিয়াল রেকর্ড্স্ ডিপার্টমেন্টে যোগ দেন ও

ইহা 'ন্যাশন্যাল আর্কাইভ্‌সে' পরিবর্তিত হইলে তিনি ইহার সর্বাধ্যক্ষ হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ও অচিরে ইহার উপাচার্য হন (১৯৫০-৫৩ খ্রী)। ইহার পর তিনি সরকার কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি 'অশোক', 'হিন্দুগৌরবের শেষ অধ্যায়', 'শিবা ছত্রপতি', 'অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ সিস্টেম অভ্ দ্য মারহাট্টাজ', 'মিলিটারি সিস্টেম অভ্ দ্য মারহাট্টাজ,' 'স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি', প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথের আর একটি প্রশংসনীয় কীর্তি হইতেছে যে, তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন পোর্তুগালের এভোরা নগরে রক্ষিত রোমান অক্ষরে লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'-এর মূল পাণ্ডুলিপিখানি ('দোম আন্তোনিও' দ্র) এভোরায় গিয়া নকল করিয়া আনেন এবং 'উপাসনা' পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয় (কার্তিক, ১৩৩৯ খ্রী)।

বিজয়কৃষ্ণ দত্ত

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৭৩ খ্রী) খ্যাতনামা সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ইনি কাশী হইতে 'উত্তরা' নামক পত্রিকা বাহির করিয়া (আশ্বিন, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ) প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই পত্রিকায় সেকালের বহু যশোলিপ্সু তরুণ সাহিত্যিকের, যাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একালে সুবিখ্যাত লেখক হিসাবে গণ্য, প্রথম রচনা বাহির হইয়াছিল। তিনি নিজেও 'সবুজপত্রে'র তরুণ লেখকদের দলে ছিলেন। তাঁহার লেখা গল্পের বই 'রহমান খাঁর দুর্গোৎসব' (১৯২১ খ্রী) ও 'মানসী' (১৯২২ খ্রী) এবং উপন্যাস 'মধুপ' (১৯২৫ খ্রী) উল্লেখযোগ্য। তিনি কবি অতুলপ্রসাদ সেনের ('অতুলপ্রসাদ সেন' দ্র) বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অতুলপ্রসাদের জীবনী ও কবিকীর্তি সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রবন্ধের একটি সংকলনগ্রন্থ 'অতুলপ্রসাদ সেন' তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া বাহির হইয়াছে (১৯৭১ খ্রী)।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, কর্নেল (১৮৬১-১৯০৫ খ্রী) বিচিত্র ঘটনাবহুল দুঃসাহসিক জীবনের জন্য তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। আদি নিবাস কৃষ্ণনগরের নিকট নাথপুর গ্রাম। পিতা : গিরীশচন্দ্র। পিতার সহিত কলিকাতায় বাস করিতে আসেন ও ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা শরীরচর্চা, শিকার ইত্যাদিতে তাঁহার অধিকতর আসক্তি দেখা যায়। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে স্কুল ও গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমে রেঙ্গুনে যাত্রা করেন ও ফিরিয়া আসিয়া ১৬ বৎসর বয়সে বিলাত গমন করেন। লন্ডনে বিভিন্ন জীবিকাবৃত্তির পর এক সার্কাস দলে যোগ দেন ও হিংস্র জন্তুদের খেলায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া বহু পদক, প্রশংসাপত্র ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেন। সার্কাস দলের সঙ্গে জার্মানি ও পরে আমেরিকায় যান। আমেরিকার মেক্সিকোতে কিছুকাল থাকিয়া ব্রেজিলে যান। বিভিন্ন ইওরোপীয় ভাষা, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও বিজ্ঞানে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্রেজিলে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং নাথেরয় যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কর্নেল পদে উন্নীত হন। ব্রেজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনিরোর সম্ভ্রান্ত নাগরিক হইয়া সুরেশচন্দ্র স্থানীয় বিশিষ্ট পরিবারে বিবাহ করেন এবং তাঁহার তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫৪ খ্রী) আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশসেবক, ভারতীয় সংসদের সদস্য এবং 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ঈস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি'র ভূতপূর্ব সভাপতি। কৃষ্ণনগরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম এবং এখানেই তাঁহার বাল্যশিক্ষা। সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য তৎকালীন যুবকগণের মনে স্বাদেশিকতার যে নবমন্ত্র জাগিয়াছিল তিনি তাহাতে দীক্ষিত হইয়া কলিকাতায় আসেন। ইতিমধ্যে তিনি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছেন। বালেশ্বর-বিপ্লবখ্যাত বাঘা যতীনের ('যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্র) নেতৃত্বে তিনি দেশসেবায় ব্রতী হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে পুলিশ সুপার সামসুল হুদাকে হত্যার অভিযোগে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের সহিত সুরেশচন্দ্রও গ্রেপ্তার হন এবং ১৬ মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ইরাসমাস অ্যান্ড জোন্স' কোম্পানির ক্যাম্ব্রিয়াম প্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে প্রেস খোলেন তাহাই বর্তমানে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' প্রেস নামে খ্যাত। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ সমগ্র দেশবাসীর চিত্তপটে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই সময় সুরেশচন্দ্র ও তাঁহার সুহৃদ্‌রা (যাঁহাদের অন্যতম ছিলেন প্রফুল্লকুমার সরকার) প্রয়োজন অনুভব করিলেন একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার। ইহারই ফলে সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকারের দ্বৈত প্রয়াসে জন্ম হইল দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার (১৯২২ খ্রী)। অতঃপর পত্রিকা পরিচালনাক্রমে ও দেশের কাজের জন্য সুরেশচন্দ্রকে

১৯৩৩, ১৯৩৮ ও ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দেও কারাবরণ করিতে হয়। সুরেশচন্দ্রের জীবনের অক্ষয় কীর্তি বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তন (উদ্বোধন ১৯৩৫ খ্রী)। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত তাঁহার আত্মিক যোগ ছিল এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সংগে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজীকে ভারতত্যাগে তিনি সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণ পরিষদে নির্বাচিত হন। স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারতের সংবিধান রচনায় তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতকে গ্রহণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে রাজ্যপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

অশোককুমার সরকার

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১ খ্রী) জন্মস্থান ঃ কলিকাতা। পিতা গোপালচন্দ্র ঘোষাল সমাজপতি। মাতা হেমলতা দেবী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পৈর্তৃক নিবাস কৃষ্ণনগরের আংশুমালী গ্রাম। 'পতাকা', 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সুরভি ও পতাকা'র পৃষ্ঠায় বাল্য রচনার সূত্রপাত। মাঘ ১২৯৬ হইতে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' এবং বৈশাখ ১২৯৭ হইতে 'সাহিত্য' মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইহা ছাড়া 'বসুমতী', 'সন্ধ্যা', 'নায়ক' ও 'বাঙগালী' ইঁহার সম্পাদিত সংবাদ-পত্র। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক, সরস ও নির্ভীক সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'কল্কিপুরাণ', 'সাজি', 'রণভেরী', 'ইওরোপের মহাসমর', 'ছিন্নহস্ত', 'আগমনী', 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' ইঁহার বিচিত্রধর্মী রচনা। দীর্ঘকাল তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভাল বক্তাও ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

সুলতান মামুদ মামুদ (গজনি) দ্র

সুলেমান কররানী কররানীবংশ দ্র

সুশীলকুমার দে (১৮৯০-১৯৬৮ খ্রী) জন্মস্থান কলিকাতা। বরাবর কৃতী ছাত্র। ইংরেজী সাহিত্যে ১ম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এ. (১৯০৯ খ্রী) এবং এই বিষয়েই ১ম শ্রেণীর এম. এ. (১৯১১ খ্রী)। বি. এল.ও পাশ করেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে ও পরে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতের অধ্যাপনাও করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিবার পরে সেখানকার সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ হন। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট্. উপাধি পান। তিনি বাংলায় কবিতা লিখিয়াও খ্যাতি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর লইবার পরে (১৯৪৭ খ্রী) তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন (১৯৫৮ খ্রী)। তিনি দীর্ঘকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং দুইবার (১৯৫০ ও ৫৬ খ্রী) ইহার সভাপতি হন। তিনি ইংরেজীতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে 'হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গলি লিটারেচার ইন দি নাইনটীন্থ্ সেঞ্চুরি', 'স্টাডিজ ইন্ দি হিস্ট্রি অভ্ স্যান্স্ক্রিট পোয়েটিক্স', 'ট্রীট্মেন্ট অভ্ লাভ্ ইন্ স্যান্স্ক্রিট্ লিটারেচার', 'আর্লি হিস্ট্রি অভ্ দি বৈষ্ণব ফেথ্ অ্যান্ড মুভমেন্ট ইন্ বেঙ্গল', 'হিস্ট্রি অভ্ স্যান্স্ক্রিট লিটারেচার' (১৯৪৭ খ্রী) প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হয়। তাঁহার লেখা বাংলাগ্রন্থের মধ্যে 'দীনবন্ধু মিত্র' ও নানা কাব্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

সুশ্রুত আয়ুর্বেদে চরকের গ্রন্থের ন্যায় সুশ্রুতের গ্রন্থও প্রখ্যাত। মহাভারতে সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রপুত্র বলা হইয়াছে। চরকের ন্যায় সুশ্রুতের খ্যাতিও খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের মধ্যেই পূর্বে কম্বোজে এবং পশ্চিমে আরবে বিস্তৃতি লাভ করে। চক্রপাণি দত্তের (খ্রী. ১১শ শতক) টীকা রচিত হওয়ার পূর্বে সুশ্রুতের গ্রন্থের (সুশ্রুত সংহিতা) স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। চক্রপাণি দত্তের ব্যাখ্যার পরিপূরক হিসাবে রচিত হইয়াছিল ডল্লনের (১৩শ শতক) ব্যাখ্যা। 'সুশ্রুত সংহিতা' সম্বন্ধে জৈয্যট ও গয়দাসের ব্যাখ্যা প্রাচীনতর। জৈয্যটের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে চন্দ্রট গ্রন্থটিকে নূতন রূপ দেন।

সুশ্রুত সংহিতা ছয় খণ্ডে রচিত। এই খণ্ডগুলির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপ ঃ ১. সূত্রস্থান ঃ ইহাতে সাধারণ আলোচনা আছে। শব্দসমূহের অর্থ এবং ভেষজসমূহের শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যান্য কতক বিষয় সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ২. নিদানস্থান ঃ ইহাতে রোগের কারণ ও লক্ষণ আলোচিত হইয়াছে। ৩. শারীরস্থান ঃ শারীরসংস্থানবিদ্যা ও ভ্রূণতত্ত্ব এই অংশের আলোচ্য। ৪. চিকিৎসাস্থান ঃ এই অংশে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে। ৫. কল্পস্থান ঃ ইহাতে বিষতত্ত্ব ও বিষের প্রতিকার আলো-চিত হইয়াছে। ৬. উত্তরতন্ত্র ঃ ইহা পরবর্তী সংযোজন

হওয়া সম্ভব। এই অংশটি যে বিভিন্ন গ্রন্থের অংশ-বিশেষের সংকলন সে সম্বন্ধে সংকলকের স্বীকৃতি রহিয়াছে। 'সুশ্রুত সংহিতা'র শল্য চিকিৎসা ('শল্য চিকিৎসা' দ্র) বা অস্ত্রোপচারবিদ্যা খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুষুম্নাকাণ্ড মেরুদণ্ডের কশেরুকার পিছনের ছিদ্রগুলির উপর উপর অবস্থানের জন্য যে অস্থিময়-প্রণালী আছে তাহারই অভ্যন্তরে থাকে সুষুম্নাকাণ্ড। সুষুম্নাকাণ্ড অবশ্য কশেরুকা অস্থিকে স্পর্শ করিয়া থাকে না। ইহা আগাগোড়া যে তিনটি আস্তরণের দ্বারা আবৃত থাকে, সেগুলিকে একত্রে ইংরেজীতে 'মেনিন্‌জেস্' বলে। এই আস্তরণগুলির প্রদাহের রোগের নাম 'মেনিন্‌জাইটিস্'। সুষুম্নাকাণ্ডের সূচনা সুষুম্না-শীর্ষকের নীচে হইতে ও প্রথম কশেরুকার ছিদ্রের মধ্যে। নিম্নভাগে কটিদেশীয় প্রথম বা দ্বিতীয় কশেরুকার সমতলে ইহা শঙ্কুর আকারে শেষ হয়। তৎপরে সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষীণ তন্তুগুচ্ছের মত সূক্ষ্ম হইয়া মেরুদণ্ডের প্রায় শেষ পর্যন্ত যায়। এই সূক্ষ্ম অংশকে 'অন্তিম-সূক্ষ্ম-লাঙ্গুলান্ত' বলা হয়। সুষুম্নাকাণ্ডের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ৪৫ সেন্টিমিটার (সাধারণ স্বাভাবিক গঠনের পুরুষের) এবং গড় ওজন ৩০-৩৫ গ্রাম। ইহার দুইটি স্থানে কিছুটা স্ফীতি দেখা যায়—গ্রীবা স্ফীতি ও কটি স্ফীতি। ইহার উভয় পার্শ্বে ৩১ জোড়া স্নায়ু পাওয়া যায়; এই স্নায়ুগুলিকে মেরুস্নায়ু বলা হয়। কার্যানুসারে প্রত্যেকটি মেরুস্নায়ুর দুইটি ভাগ—সংবেদী স্নায়ু ও চেষ্টীয় স্নায়ু। আড়াআড়ি ভাবে সুষুম্নাকাণ্ডের কোন অংশকে কাটিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে একটি ছিদ্র দেখা যাইবে। ইহাই ইহার কেন্দ্রনালী। এই কেন্দ্রনালী উপরে মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ নিলয়ের সহিত সংযুক্ত এবং এই নালীর অভ্যন্তরে অতি সামান্য স্নায়ুতন্ত্র লসিকা থাকে। সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্ভাগ শ্বেত ও কেন্দ্রভাগ ধূসর দেখায়। ধূসর অংশটি ইংরেজী H-এর মত। ধূসর অংশকে পশ্চাৎশৃঙ্গ, পুরঃশৃঙ্গ ও পার্শ্বশৃঙ্গে ভাগ করা হয়। পুরঃশৃঙ্গের স্নায়ুকোষের স্নায়ুগুলি চেষ্টীয় স্নায়ু; তাহাদের বিনাশে পক্ষাঘাত হয়। পার্শ্বশৃঙ্গের স্নায়ুকোষগুলি স্বতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক। পশ্চাৎশৃঙ্গের সকলপ্রকার কোষই কোন না কোন সংবেদী স্নায়ুর কাজ করে। শ্বেত অংশে শুধুমাত্র স্নায়ুধারক তন্তু ও শ্বেতাবরণ বিশিষ্ট স্নায়ু পাওয়া যায়। শ্বেত অংশের মধ্যে অন্তর্মুখী, বহির্মুখী, সংযোগকারী ও সংযোজনকারী এই চারিপ্রকার স্নায়ুগুচ্ছ আছে। মস্তিষ্কের নীচে শরীরের সকল অংশের স্পর্শ, বেদনা, উত্তাপ প্রভৃতি অনুভূতি পেশী-কণ্ডরা (tendon) অস্থিসন্ধি হইতে সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যদিয়া কেন্দ্রে যায়। পেশীর সংকোচন, তাহাদের নিয়ন্ত্রণ, শিথিলতা নিবারণ প্রভৃতি সমস্তই সুষুম্নাকাণ্ডের পুরঃশৃঙ্গের বিভিন্ন স্নায়ুকোষের দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। পরোক্ষভাবে স্বতন্ত্র স্নায়ু পরিচালিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সুষুম্নাকাণ্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। হাঁটুর ও গোড়ালীর ঝাঁকানি প্রভৃতি প্রতিবর্তিত স্নায়বিক ক্রিয়ার কেন্দ্র সুষুম্নাকাণ্ড। মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রও সুষুম্নাকাণ্ডের নিম্নভাগে অবস্থিত।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

সুহ্মদেশ রাঢ় দ্র

সূর্য সূর্য একটি অতি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসীয় গোলক। ইহা একটি সাধারণ তারামাত্র। অন্যান্য তারারা সূর্যের তুলনায় অতি দূরের জ্যোতিষ্ক, তাই তাহাদিগকে আলোর বিন্দুর মত দেখায়। সূর্য পৃথিবী হইতে ১৫ কোটি কি. মি. দূরে আছে। সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিদধিক ৮ মিনিট সময় লাগে; আর আমাদের নিকটতম তারা হইতে আলো আসিয়া পৌঁছিতে ৪ বৎসরের অধিক সময় লাগে। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১০৯ গুণ (১,৩৮২,৪০০ কি. মি.); আয়তন পৃথিবীর ১০৯^{৩} অর্থাৎ প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ। সূর্যের ভর পৃথিবীর ভরের ৩.৩ লক্ষ গুণ, সুতরাং ইহার গড় ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের এক চতুর্থাংশ; ইহা জলের ঘনত্বের ১.৪ গুণ। সূর্যপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৬০০০° সেন্টিগ্রেড। যদিও প্রত্যক্ষভাবে জানিবার উপায় নাই কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণে বুঝা যায় সূর্যের অভ্যন্তরে কেন্দ্রের দিকে যাইতে থাকিলে তাপমাত্রা কোটি ডিগ্রিতে গিয়া পৌঁছায়। অত্যধিক তাপ ও চাপ হেতু পরমাণুর কেন্দ্রিণ হইতে ইলেকট্রনসমূহ বিমুক্ত হইয়া পড়ে এবং কেন্দ্রিণসমূহের সংঘাতে অপরিমিত শক্তির উদ্ভব হয়।

অক্ষের উপর সূর্যের আবর্তনকাল ২৫ দিন; এই আবর্তন পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে। আমাদের সকল শক্তির উৎস হইল সূর্য। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সকলেই সূর্য হইতে তাপ ও আলো পায়। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে চলে।

সূর্যের পৃষ্ঠদেশকে আলোকমণ্ডল বলা হয়। ইহাকে ঘিরিয়া দেড় শত হইতে আড়াই শত কিলোমিটার পর্যন্ত একটা অপেক্ষাকৃত শীতল স্তর রহিয়াছে। এখানে সূর্য বর্ণালীর কালো দাগের উদ্ভব হয়। ইহার পর প্রায় ৮০০০

কি. মি. পর্যন্ত সূর্যের আবহমণ্ডলকে বর্ণমণ্ডল বলে। পূর্ণ সূর্যগ্রহণকালে যখন চন্দ্র সূর্যের আলোকমণ্ডলকে আড়াল করে তখন স্নিগ্ধ বর্ণমণ্ডল গোলাপী রঙের বলয়ের আকারে দেখা দেয়। পূর্ণসূর্যগ্রহণকালে বর্ণমণ্ডলের উপরে লক্ষাধিক কি. মি. পর্যন্ত গোলাপী আভার ধোঁয়ার মেঘ অন্ধকার চন্দ্রের দ্বারা আবৃত সূর্য-পৃষ্ঠের বাহিরে দেখা যায় ; ইহার নাম সৌরশিখা।

সূর্যের আবহমণ্ডলের বাহিরে অতি লঘু এক গ্যাসীয় আবরণ সূর্যকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা সূর্যের কিরীটমণ্ডল বা ছটামণ্ডল ; এখানকার তাপমাত্রা অত্যধিক।

সৌরকলঙ্ক ঃ অনেক সময়ে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি অন্ধকার কালো চিহ্ন দেখা দেয় ; ইহাদিগকে সৌরকলঙ্ক বলা হয়। সাধারণতঃ ইহারা দলবদ্ধ হইয়া দেখা দেয়। এবং বেশির ভাগ যুগ্মভাবে থাকে। বড় কলঙ্ক দূরবীন ব্যতীতও দৃষ্টিগোচর হয় এবং সূর্যের পৃষ্ঠদেশে বহু কোটি বর্গ কি. মি. স্থান অধিকার করিয়া থাকে। কলঙ্কসমূহ প্রথমে পূর্বপার্শ্বে আবির্ভূত হয় এবং সূর্যের পৃষ্ঠদেশে ধীরগতিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়। কোনও কোনও কলঙ্ক কয়েকদিনের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। কতকগুলি অনেকদিন থাকে এবং পশ্চিমপার্শ্বে অন্তর্হিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সূর্য আপন মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে ঘোরে। কয়েক বৎসর সূর্যপৃষ্ঠ কদাচিৎ কলঙ্কমুক্ত থাকে, আবার কোনও কোনও বৎসর বহুদিন কোন কলঙ্ক দেখা যায় না। সৌরকলঙ্কের অধিকতম আবির্ভাবের গড় পর্যায়কাল কিঞ্চিদধিক ১১ বৎসর। ইহারা অতি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র। সৌরকলঙ্ক যখন প্রচুরভাবে আবির্ভূত হয় তখন পৃথিবীর আবহাওয়াতে পরিবর্তন ঘটে, বেতারতরঙ্গ গ্রহণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়, চৌম্বক ঝড় বহিয়া যায়। চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোকমণ্ডলের তুলনায় সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা প্রায় ১০০০° কম, এইজন্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইহাদিগকে কালো দেখায়।

তারাসমূহ বিভিন্নদিকে ছোটাছুটি করিতেছে। যেহেতু সূর্যও একটি তারা তাই সূর্যেরও নিজস্ব একটা গতি আছে। চারিপাশের তারাদের মধ্যে সূর্য সেকেণ্ডে ১৯ কি. মি. বেগে অভিজিৎ তারার দিকে ছুটিতেছে। আমাদের নক্ষত্রজগতের আবর্তনহেতু প্রত্যেক তারার ন্যায় সমগ্রভাবে সূর্যেরও একটা গতি আছে। ইহার ফলে সূর্য সেকেণ্ডে ২৪০ কি. মি. বেগে নক্ষত্র জগতের কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতেছে ; এই গতি বর্তমানে হংসমণ্ডলের অভিমুখে।

কামিনীকুমার দে

সূর্যকুমার চক্রবর্তী (১৮২৪-১৮৭৪ খ্রী) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। আদি নিবাস ঢাকা জেলার এক গ্রামে। পিতা রাধামাধব। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়িবার সময় তিনি উক্ত কলেজের অধ্যাপক গুডিভ সাহেবের সংস্পর্শে আসেন ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। অতঃপর 'গুডিভ' চক্রবর্তী বলিয়া অনেকের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের পাঠ শেষ করিয়া তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহায়তায় বিলাত যান ও সেখান হইতে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। তিনি একজন ইংরেজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও তিনটি কন্যা হয়। দ্বিতীয়বার ইংল্যাণ্ডে যাইবার পথে লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকা সেনগুপ্ত

সূর্যসিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিদ্যার বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থের অন্যতম আদি গ্রন্থ ('জ্যোতির্বিদ্যা' দ্র)। তবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রন্থ আমাদের নিকট অবিকৃত আদিরূপ লইয়া আসে নাই। এই গ্রন্থের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিযুগের মান দিব্যবর্ষের মান অনুসারে কথিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যন্ত্রাদি নির্মাণ সম্পর্কে দৃষ্ট হয়। শংকু, যষ্টি, ধনু এবং চক্রযন্ত্র সম্বন্ধে অন্যান্য সিদ্ধান্তকারগণের গ্রন্থেও উল্লেখ আছে ; কিন্তু ময়ূর, নর এবং বানর যন্ত্রের উল্লেখ অন্য কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাতে কাষ্ঠ, তাম্র, পারদ, বালুকা, জল, তৈল এবং সূত্র প্রভৃতি উপাদানের সাহায্যে গুরুর উপদেশ অনুসারে যন্ত্রনির্মাণ করিবার নির্দেশ আছে। এই গ্রন্থে পৃথিবীর ব্যাসকে 'ভূকর্ণ' বলা হইয়াছে। অতি সহজ পন্থায় এবং সহজ ভাষায় সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের সকল বিষয়ই এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত ১৪টি অধ্যায় আছে। গ্রন্থখানি বর্তমানে যেভাবে আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহাকে যত প্রাচীন বলা হয় ইহা বস্তুতঃ তত প্রাচীন নহে। কারণ বরাহমিহির (খ্রী. ৫ম শতক) তাঁহার গ্রন্থে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বর্তমানে প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্তে সে সকল শ্লোক নাই। বল্লাল সেন (১২০০ খ্রী.) 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থেও সূর্যসিদ্ধান্তের যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও এই গ্রন্থে দেখা যায় না। সুতরাং এই গ্রন্থখানি প্রাচীন সূর্যসিদ্ধান্ত নহে। ইহার মধ্যে প্রচুর প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। অনেকের মতে, এই গ্রন্থ লাট (আনু. ৫০৫ খ্রী.)-এর হস্তে পরবর্তীকালে কিছুটা নবরূপ প্রাপ্ত হয়।

জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪ খ্রী) স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুঃসাহসী যোদ্ধা। চট্টগ্রাম ও বহরমপুর কলেজে পড়াশুনা করেন এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। মেধাবী ছাত্ররূপে তাঁহার সুনাম ছিল। জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালে বিদ্যাবত্তা, স্বভাব-মাধুর্য এবং চরিত্রবলে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। 'মাস্টার দা' নামে ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি যুবকদের সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পরে সশস্ত্র বিপ্লব-সাধনে উদ্যোগী হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং জালালাবাদ ও কালার পোলের খন্ড যুদ্ধ তাঁহার ও তাঁহার অনুবর্তী তরুণতরুণীদের আত্মত্যাগ ও রণ-কৌশলের দৃষ্টান্তরূপে স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ১২ জানুয়ারি তাঁহার ফাঁসি হয়।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সেকশুভোদয়া লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হলায়ুধ মিশ্রের নামাঙ্কিত পুষ্পিকা সম্বলিত অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লেখা সাতাশটি পরিচ্ছেদের খণ্ডিত আখ্যায়িকামূলক এই গদ্যগ্রন্থটিতে মুসলমান ধর্মপ্রচারক শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, হলায়ুধ মিশ্রের নাম থাকিলেও এই অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা গ্রন্থ কদাপি তাঁহার রচনা নহে। তদুপরি এই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট জালালুদ্দীন তাব্রিজকে ঠিকমত সনাক্ত করাও অসম্ভব। গ্রন্থমধ্যে জালালুদ্দীনের মাহাত্ম্যের কাহিনীর সহিত প্রসঙ্গক্রমে অন্যদের কথাও আছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে পশুকাহিনী এবং লৌকিক কাহিনীও (ফোক্ টেল্স্) আছে। গৌড়ের বাইশহাজারী দরগার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ এই শেখ, এই গ্রন্থের কাহিনী অনুসারে গঙ্গার উপর হাঁটিয়া একদা লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে আবির্ভূত হন। ঈর্ষাপরায়ণ রাজসভাসদ্দের তাঁহাকে অপদস্থ করার এমনকি হত্যা করার সকল চক্রান্ত তিনি ব্যর্থ করেন। তাতঃপর নানা চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া অচিরে এক মহৎ যোগীহিসাবে গৌড়েশ্বরের আস্থা অর্জন করেন এবং মসজিদের চারিপাশের বিপুল জায়গীর লাভ করেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন রচনাটি জাল। জায়গীরগুলির উপর মসজিদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করাই হয়ত গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ছিল। তবুও গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ নয়। কেননা ইহার রচনা বা সংকলনকাল কোনক্রমেই ষোড়শ শতাব্দীর পরে নয় এবং সেই কারণে গ্রন্থটি তৎকালীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক রাজসভার জীবনচর্যার একটি প্রামাণ্য চিত্র বহন করে।

নারায়ণ দত্ত

সেকেন্দার (সিকান্দর) লোদী পাঠান সম্রাট্ বহলুল লোদীর পুত্র নিমাজ খাঁ সেকেন্দার শাহ্ উপাধি লইয়া ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ভ্রাতা জৌনপুরের শাসনকর্তা বরবক শাহ্ ও তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত তাঁহার অনবরত যুদ্ধ হইতে থাকে। অবশেষে সেকেন্দার ভ্রাতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আগ্রা শহরের পত্তন করিয়া তথায় সেনা-নিবাস স্থাপন করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ত্রিদিবনাথ রায়

সেকেন্দ্রা আগ্রার পাঁচ মাইল দূরস্থিত একটি গ্রাম। এখানে সম্রাট্ আকবরের সমাধি আছে। আকবর স্বয়ং এই সমাধি-মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাহা সমাপ্ত করেন। একটি বিশাল উদ্যানের মধ্যে চারিধারে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ইহা বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যস্থলে ৭০ ফিট উচ্চ এক একটি করিয়া প্রবেশদ্বার আছে। সমাধি-মন্দিরের নিচের তলার মধ্যস্থ খিলান পথে গিয়া দেউড়ী হইতে একটি গড়ানে পথ ধরিয়া নামিয়া গেলে একটি স্বল্পালোকিত উচ্চখিলান-বিশিষ্ট কক্ষে শ্বেত প্রস্তরনির্মিত শবাধারে রক্ষিত সম্রাটের মরদেহ দৃষ্ট হয়। এই কক্ষটির উপরে পর পর আরও তিনটি কক্ষ আছে, সব কটিতেই ঐ আসল শবাধারের অনুকরণে নির্মিত শবাধার আছে। সর্বোচ্চ তলায় একটি চতুষ্কোণ মর্মর বেদীর উপর ঠিক মধ্যস্থলে আসল সমাধিটির অনুকরণে শ্বেত মর্মরনির্মিত একটি সমাধি আছে। তাহার মাথার দিকে 'আল্লা-হো-আকবর' আর পায়ের দিকে 'জল্লি জালালো হু' লেখা আছে। পায়ের দিকে একটি কারুকার্য করা মর্মরনির্মিত স্তম্ভে সুবর্ণনির্মিত ধূপদানি থাকিত। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় আকবরের শবাধারের শিরোভাগ পশ্চিম অর্থাৎ মক্কার দিকে না হইয়া পূর্ব অর্থাৎ সূর্যোদয়ের দিকে।

ত্রিদিবনাথ রায়

সেকেন্দ্রাবাদ (৭৮°৫' পূর্ব ১৭°৫' উত্তর) দক্ষিণ ভারতের ও অন্ধ্রপ্রদেশের অন্যতম প্রধান নগরী। হায়দ্রাবাদ শহরের উত্তরাংশে অবস্থিত সেকেন্দ্রাবাদ (লোকসংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ) ব্রিটিশ আমল হইতেই ভারতের অন্যতম প্রধান ও বৃহৎ সেনানিবাস। ১৮০৬

খ্রীষ্টাব্দে নিজাম সিকিন্দার জাহ্‌-এর নামানুসারে স্থাপিত। ইহা মধ্য রেলপথের একটি উল্লেখযোগ্য জংশন স্টেশন। সুসজ্জিত এই নগরীতে অন্যান্য প্রাসাদ ভিন্ন সেণ্ট জন্‌স গীর্জা, সেণ্ট মেরীজ গীর্জা, মহাত্মা গান্ধী হাসপাতাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেকেন্দ্রাবাদ পাইকারী ব্যবসায়ের অন্যতম কেন্দ্র।

কৃষ্ণপ্রসাদ দে

সেগ্‌ন 'ভারবিনেসী' গোত্রীয় বৃক্ষ। ইহার বিজ্ঞান-সম্মত নাম টেক্‌টোনা গ্রান্‌ডিস। সাধারণতঃ পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে হইয়া থাকে। পাতাগুলি খুব বড় বড় এবং খস্‌খসে। সাদা উভয়লিঙ্গবিশিষ্ট বৃন্তযুক্ত ফুল হয়। নিয়ত পুষ্পমঞ্জরী। পুষ্পপুট বর্তমান। বৃত্যংশ পাঁচটি, ঘণ্টাকৃতি ও স্থায়ী। পরাগমিলনের পর দলমণ্ডল পড়িয়া যায়। পুংস্তবক পাঁচটি বিদ্যমান; পরাগধানীর দুইটি আধার। গর্ভপত্র দুইটি এবং চারিটি আধারে বিভক্ত। প্রতিটি আধারে একটি করিয়া ডিম্বাণু থাকে। গৃহ ও আসবাবপত্র-নির্মাণে এবং মানুষের বহুবিধ কার্যে ইহার কাষ্ঠের প্রচুর ব্যবহার হয়; কারণ তাপমাত্রার পরিবর্তনে ইহার পরিবর্তন খুবই সামান্য।

বরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেচ প্রকৃতিদত্ত জলের পরিপূরক হিসাবে শস্যক্ষেত্রে জলসরবরাহের কৃত্রিম উপায়ের নাম সেচ। সাধারণতঃ জলসেচের তিনটি প্রণালী আছে—কূপ, জলাশয় ও খাল। জমিতে গভীর কূপ খনন করিয়া বলদ বা যন্ত্রচালিত পাম্পের সাহায্যে জল তোলা হয়। তাহার পর নালা কাটিয়া সেই জল জমিতে লইয়া যাওয়া হয়। সেচব্যবস্থায় খালই প্রধান। নদী হইতে খাল কাটিয়া শস্যক্ষেত্রে জল লইয়া যাওয়া হয়। কোনও কোনও খালে বর্ষাকালে নদীর জল বাড়িয়া গেলে তবেই জল পাওয়া যায়। ইহাকে প্লাবন খাল বলে। যেখানে নদী পাহাড় হইতে ভূমিতে নামিয়াছে, সেখানে খাল কাটা হইলে তাহাতে সারা বৎসর জল পাওয়া যায়। ইহাকে নিত্যবহ খাল বলে। অনেক সময় স্বাভাবিক গর্তে অথবা নিম্নভূমির একদিকে বাঁধ দিয়া জল সঞ্চয় করা হয়। তাহা ছাড়া, নদীর উপর কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণ করিয়া তাহাতে জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বহুমুখী ব্যবহার অধুনা বাড়িয়া উঠিতেছে।

জাহ্নবী বাগচী

সেঁজুতি পশ্চিমবঙ্গে কুমারীরা অগ্রহায়ণ মাসের ১ তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে 'সেঁজুতিব্রত' নামে একটি ব্রত করিয়া থাকে। অবশ্য বর্তমানে এই অনুষ্ঠান খুব কমই দেখা যায়। পিটালি দিয়া উঠানে শিব, শিবমন্দির, নানাবিধ গৃহ-সামগ্রী, অলংকারপত্র, গাছগাছড়া, পশুপাখি প্রভৃতির নানা প্রকার রেখাচিহ্ন আঁকিয়া জলঘট বসাইয়া ধূপদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ব্রতকারী বালিকারা এক একটি আল্‌পনার উপর দূর্বা ধরিয়া ছড়া বলিয়া নিজ নিজ কামনা ব্যক্ত করে। সেঁজুতিব্রতের প্রায় প্রত্যেকটি ছড়াই পিতৃগৃহের, না হয় ভাবী শ্বশুরগৃহের এবং দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তির ও ঐশ্বর্যের কামনায় ভরপুর। দুই একটি ছড়ায় শিবের উল্লেখ থাকিলেও ইহলোকের ঘর-সংসারের সকল বস্তুকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং মনোবাসনা সেইভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

কামিনীকুমার রায়

সেটন্‌কার, ওয়াল্‌টার স্কট (? —১৯০৩ খ্রী) প্রসিদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়ান। তিনি আই. সি. এস. হইবার পর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কার্যে যোগ দেন। ইংরেজ শাসনকালে এদেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন বাংলা সরকারের আণ্ডার সেক্রেটারি (১৮৪৭-৫৩ খ্রী), 'ইণ্ডিগো কমিশনে'র সভাপতি (১৮৬০ খ্রী), বাংলা সরকারের সেক্রেটারি (১৮৬০-৬১ খ্রী), গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্য (১৮৬১ খ্রী), বঙ্গদেশের আইন পরিষদের সদস্য (১৮৬২ খ্রী), সদর আদালতের জজ্‌ (১৮৬২ খ্রী), কলিকাতা হাইকোর্টের অবর বিচারপতি (পিউনি জজ্‌, ১৮৬২-৬৮ খ্রী), ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি (১৮৬৮ খ্রী) এবং রেকর্ড কমিশনের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগে উপাচার্যরূপে (১৮৬৮-৬৯ খ্রী) তাঁহার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি লেখকও ছিলেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে লিখিতেন এবং তাঁহার সম্পাদনায় 'সিলেক্‌শান ফ্রম দি ক্যালকাটা গেজেট' প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'দি মারকুইস্‌ কর্নওয়ালিশ', 'গ্র্যাণ্ট অভ্‌ রথিমার্কাস' (১৮৯৯ খ্রী) উল্লেখযোগ্য।

হারাধন দত্ত

সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্‌ মাদ্রাজ প্রদেশের রামনাথপুরম্‌ জেলায় ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ ও শহর রামেশ্বরম্‌। দ্বীপটির আয়তন ৩২ বর্গ কি. মি.। জনসংখ্যা ৬৮০১ (১৯৬১ খ্রী); তন্মধ্যে পুরুষ ৩৪২৬ ও স্ত্রী ৩৩৭৫। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ২৩৫৩ ও স্ত্রীর সংখ্যা ১৩৫৩। প্রবাল দ্বীপ, পূর্বাঞ্চলে বালুকাময় বেলাভূমি আছে। কলিকাতা হইতে

রামেশ্বরমের দূরত্ব ২০৪৪ কি. মি. এবং মাদ্রাজ হইতে প্রায় ৬৫০ কি. মি.। মাদ্রাজের এগমোর স্টেশন হইতে ধনুষ্কোটির পথে পামবন জংশনে নামিয়া রামেশ্বরম্ যাইতে হয়। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির বারান্দা ৭০০ ফিট দীর্ঘ এবং ইহা দ্রাবিড় স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শত শত পুণ্য লোভাতুর হিন্দু যাত্রী প্রতি বৎসর এখানে আসেন। রামায়ণোক্ত সেতুবন্ধ এখানেই ছিল বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহার উপকূল-ভাগে নানাপ্রকার মাছ পাওয়া যায়; পূর্বে মুক্তাও পাওয়া যাইত। সেতুবন্ধ (অ্যাডাম্'স ব্রিজ) সিংহল ও ভারতের মধ্যে ছোট ছোট কতকগুলি বালি ও প্রবালের টিলা বা দ্বীপের সমষ্টি। দৈর্ঘ্যে উহা ৪৮ কি. মি.। ইহার পূর্বে পকপ্রণালী ও পশ্চিমে মানার বা মান্নার উপসাগর। জনশ্রুতিমতে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণের সময় যে সেতু নির্মাণ করেন এগুলি তাহারই ভগ্নাবশেষ।

সলিলকুমার চৌধুরী

সেনবংশ সেনবংশের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর শেষ দিক্ হইতে ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বিজয়সেনের রাজত্বকালে দেওপাড়া প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে, চন্দ্রবংশে জাত বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। সামন্তসেন সেনবংশের প্রথম ঐতিহাসিক পুরুষ। মনে হয় তিনিই প্রথম পূর্বভারতে আসিয়াছিলেন কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসন হইতে ইহাও মনে হয় যে, সামন্তসেনের কোনও এক পূর্বপুরুষই রাঢ়ায় (পশ্চিমবঙ্গে) প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

সেনগণ কিরূপে এবং ঠিক কোন্ সময়ে কর্ণাট হইতে রাঢ়ে আসিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত। সামন্তসেনের পরে হেমন্তসেন পূর্বাঞ্চলে আসেন। হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন আনুমানিক ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের দীর্ঘ রাজত্বকাল সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যে উজ্জ্বল। তিনি শূর-বংশের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং গৌড়াধি-পতিকে (খুব সম্ভবতঃ পালবংশের মদনপাল) পরাজিত করিয়া উত্তরবঙ্গ করায়ত্ত করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিজয়পুর নগর পত্তন করেন এবং সেনবংশের ইহাই রাজ-ধানী হয়। মনে হয় তিনি বর্মনদের উৎখাত করিয়া পূর্ব-বঙ্গের বিক্রমপুর জয় করেন এবং ইহা তাঁহাদের দ্বিতীয় রাজধানীর মত হয়।

বিজয়সেনের উত্তরাধিকারী তৎপুত্র বল্লালসেন (আনু. ১১৫৮-১১৭৯ খ্রী) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সর্মাধিক পরিচিত। বাংলায় কৌলীন্যপ্রথার প্রব-র্তনের সহিত তাঁহার নাম জড়িত। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' শীর্ষক গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা। বল্লালসেনের উত্তরাধিকারী তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজনৈতিক জীবনও সামরিক সাফল্যে ভাস্বর। তাঁহার বিজয় অভিযান কামরূপ, কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তিনি কাশীরাজ (সম্ভবতঃ গাহড়বালবংশীয়)-কে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।

লক্ষ্মণসেনের শেষ জীবন অশান্তিময়। তাঁহার জীবদ্দশাতেই সামন্ত নরপতিগণ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে (আনু. ১১৯৭-৯৮ খ্রী) অথবা ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে (আনু. ১২০২-০৩ খ্রী) বখ্তিয়ার খল্জী নদিয়া আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণসেন প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া পূর্ববঙ্গে আরও তিন চারি বৎসর রাজত্ব করেন। এই আক্রমণের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সত্যতা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। উমাপতিধরবিরচিত কয়েকটি শ্লোকে ম্লেচ্ছদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণসেনের সাফল্যের উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেন প্রায় সাতাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি 'পরমবৈষ্ণব' ও 'পরমনারসিংহ' উপাধিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'গীতগোবিন্দে'র কবি জয়দেব, 'পবনদূতে'র কবি ধোয়ী, এবং তৎসহ কবি শরণ ও উমাপতিধর তাঁহার সভা অলংকৃত করিতেন। দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্রবিশারদ হলায়ুধ ছিলেন রাজপণ্ডিত।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর সেনবংশের পতন আরম্ভ হয়। তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন ক্রমান্বয়ে আরও প্রায় পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করেন। বিশ্ব-রূপসেনের তাম্রশাসনে কুমার সূর্যসেন ও পুরুষোত্তম-সেন-এর নাম আছে। সেনরাজগণ সম্ভবতঃ ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 'রাজাবলী', 'বিপ্র-কল্পলতিকা', 'আইন-ই-আকবরী' ইত্যাদি গ্রন্থে সেন উপনামধারী বহু রাজার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা মূল সেনবংশের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

সেমীয়-হামীয় কতকগুলি অধুনালুপ্ত প্রাচীন ভাষা ও অশ্রেণীভুক্ত ভাষাগুলিকে বাদ দিলে পৃথিবীর ভাষা-গুলিকে ১২টি ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের মধ্যে সেমীয়-হামীয় অন্যতম। এই গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান শাখা—সেমীয় ও হামীয়, যদিও অনেক ভাষাবিজ্ঞানী এ দুইটিকে শাখা না বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলিতে চান। সেমীয় শাখার আবার দুইটি উপশাখাঃ পূর্বী ও পশ্চিমী। পূর্বী শাখার মধ্যে ছিল ঃ আসীরীয় এবং আক্কাদীয় বা ব্যাবিলোনীয়। এই দুইটি ভাষারই প্রত্নলেখ মিলিতেছে ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের—বাণমুখ (কিউনি-ফর্ম) লিপিতে পাথরের অথবা কাদার টালির উপর খোদাই

করা। পশ্চিমী উপশাখার আবার উত্তর ও দক্ষিণ শাখা বা বর্গ মিলিতেছে।

উত্তর বর্গের মধ্যে ছিল কনানীয় (Canaanite), ফিনিসীয় (Phoenician) ও আরামীয় (Aramic)। হিব্রু (Hebrew) ভাষা (বাইবেলের ওল্‌ড্‌ টেস্টামেণ্টের মূল রচনার ভাষা) এই উপশাখায় পড়ে। পশ্চিমী উপশাখার দক্ষিণ বর্গের অন্তর্ভুক্ত প্রধান ভাষা হইল—আরবী এবং আবিসিনিয়ায় প্রচলিত ভাষাসমূহ। অধুনা আরবীকেই সেমীয় শাখার প্রধান ভাষা বলিতে হয়।

হামীয় শাখার ভাষা বলিতে একমাত্র প্রাচীন মিশরীয় ভাষারই নাম করা চলে। ইহার নিদর্শন প্রায় ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। এই প্রাচীন মিশরীয় ভাষা হইতেই কপ্‌টিক (Coptic) ভাষার জন্ম। অবশ্য এই ভাষাও ১৭শ শতাব্দী হইতেই লুপ্ত এবং আরবী এখন সারা মিশরেরই ভাষা।

সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর আর যে দুইটি শাখা আছে তাহাদের নাম বের্‌বের ও কুশীয়। বের্‌বের শাখায় পড়ে লিবিয়ার কতিপয় ভাষা ; আর কুশীয় শাখার অন্তর্গত হইল সোমালিল্যান্ডের কতকগুলি ভাষা।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সেরামিক, সেরামিক্‌স্‌ পোড়ামাটির পাত্র, ইট, পোরসেলিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার বস্তু উৎপাদনের যে শিল্প তাহাই সেরামিক্‌স্‌। কেওলিন (অ্যালুমিনিয়াম্‌ সিলিকেট্‌), চিনা মাটি (চায়না ক্লে) ও বিভিন্ন গুণাবলী সম্পন্ন মাটি, নানাধরনের বালি (সিলিকা) যেমন, ফ্লিন্ট, কোয়ার্ট্‌স্‌ ইত্যাদি সেরামিক্‌সের প্রধান উপাদান।

মাটিকে জলে ধুইয়া মোটাদানা থিতাইয়া বাদ দিয়া, মিহিদানাগুলিকে কাদা করা হয়। উহার সহিত ফ্লিন্টের গুঁড়া কিংবা পটাসিয়াম্‌ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট (ফেল্‌স্‌পার)-এর গুঁড়া মিশাইয়া বাতাসে শুকাইয়া লইলে অতি নমনীয় (প্ল্যাসটিক) মাটি তৈয়ারি হয়। এই মাটিকে ছাঁচে ফেলিয়া বিভিন্ন আকৃতির বস্তু গড়া হয়। এই বস্তুগুলিকে চুল্লির উপর পোড়াইলে ইহারা শুকাইয়া সংকুচিত হয়। এই অবস্থায় ইহাদের বিস্কিট আখ্যা দেওয়া হয়। মাটিতে লৌহ আছে বলিয়া ইটের রং লাল হয়। ইহার প্রস্তুতিতে চুল্লির উত্তাপ ১০০০° সে. গ্রে. পর্যন্ত হয়। রিফ্যাক্টরি ইট প্রস্তুতির জন্য উপাদানে কোয়ার্টসের গুঁড়া ও অল্প চুন মেশানো হয়। পোড়ামাটির পাত্রের জন্য মাটিতে লৌহের পরিমাণ কম ও চুল্লির উত্তাপ অনেক বেশি থাকা প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট পোর্‌সেলিন প্রস্তুতির উপাদানে লৌহ একেবারেই থাকে না। কোয়ার্ট্‌স্‌ ও ফেল্‌স্‌পার মিশ্রিত করিয়া ৭০০° সে. গ্রে. তাপে পোড়াইতে হয়। উহার মসৃণতার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া আরও উচ্চতর তাপে উত্তপ্ত করা হয়। মসৃণক (গ্লেজার)-জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে লবণ, বোরাক্স, ফ্লিন্ট, কোয়ার্ট্‌স্‌ ইত্যাদির গুঁড়া ও কেওলিন প্রধান। পোর্সিলেনকে রঙিন করার জন্য মসৃণকের সহিত বিভিন্ন ধাতু এবং অক্সিজেনঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়।

বর্তমানে সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে, ম্যাগনেসিয়াম্‌, প্রভৃতি ধাতব অক্সাইডযুক্ত সেরামিক্‌সের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হইতেছে এবং নিত্য-নূতন গুণাবলীযুক্ত সেরামিক্‌স্‌ আবিষ্কৃত হইতেছে।

কল্যাণময় সেন

সেলিম চিস্তি, শেখ আগ্রা হইতে প্রায় ৩৭ কি. মি. দূরে সিক্রি গ্রামে সেলিম চিস্তি নামক এক পীরের আস্তানা ছিল। প্রথম যমজ সন্তানদ্বয়ের মৃত্যুর পর পুত্রার্থী সম্রাট্‌ আকবর একটি যুদ্ধ হইতে ফিরিবার সময়ে ঐ পীরের দরগায় উপস্থিত হন। পীর তাঁহাকে সিক্রিতে আসিয়া বাস করিতে উপদেশ দেন। পীরের প্রসাদে নয় মাস পরে সম্রাজ্ঞী যোধা বাঈয়ের গর্ভে সম্রাটের এক পুত্র হয়। সম্রাট্‌ তাঁহার নাম পীরের নামানুসারে 'সেলিম' রাখেন। ইনিই পরে সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর নামে পরিচিত হন ('জাহাঙ্গীর' দ্র)। সম্রাট্‌ পীরের উপদেশ অনুসারে সিক্রিতে এক বিরাট দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। ইহাই ফতেপুর সিক্রি। এই দুর্গের মধ্যস্থিত জামী মসজিদের অভ্যন্তরে সেলিম চিস্তির সমাধি আছে। বন্ধ্যা স্ত্রীলোকগণ ঐ সমাধির মর্মরনির্মিত জাফরীতে কাপড়ের টুকরা ঝুলাইয়া সন্তানের জন্য মানসিক করে।

ত্রিদিবনাথ রায়

সেলুলোজ উদ্ভিদকোষের প্রধান উপাদান। ইহা অতিকায় অণু-বিশিষ্ট একটি জৈব রাসায়নিক দ্রব্য। বহুসংখ্যক গ্লুকোজ-অণু একত্র গ্রথিত হইয়া এই দ্রব্যের অণু গঠিত হয়। তুলা এবং কাগজ প্রায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ। কাষ্ঠ, পাট, শণ প্রভৃতির প্রধান উপাদান সেলুলোজ। রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা পাইন এবং স্প্রুস্‌ জাতীয় কাষ্ঠ হইতে সেলুলোজকে আলাদা করিয়া আনা যায়। অতঃপর ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া মণ্ডে পরিণত করা হয়। ঐ মণ্ড বেলিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া সেলুলোজের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইয়া ইহাকে দ্রবীভূত অবস্থায় আনা যায় এবং ঐ দ্রবণ হইতে সেলুলোজকে তন্তু-আকারে পরিণত করা যায় যাহা রেয়ন বস্ত্র প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়

('রেয়ন' দ্র)। সেলুলোজকে রেজিনে পরিণত করিয়া ঐ রেজিন হইতে স্বচ্ছ সর (ফিল্ম) প্রস্তুত করিয়া আলোক-চিত্রের ফিল্ম তৈয়ারি হয়।

অনিলকুমার কুণ্ডু

সোডিয়াম রাসায়নিক চিহ্ন Na। পর্যায়সারণীর একাদশতম ক্ষারীয় ধাতব মৌল। প্রকৃতিতে মৌলাবস্থায় পাওয়া যায় না। সমুদ্র-জলে, সোডিয়াম ক্লোরাইডে, খনিজ লবণে, চিলি সল্টপিটারে, ভারতবর্ষে সাজিমাটিতে, মিশরে ট্রোনায়, পূর্ব আফ্রিকায় মাগাদি হ্রদে সোডিয়াম সেস্কুইকার্বনেটে, সোডা ফেল্স্পারে এবং সোহাগায় সোডিয়াম থাকে। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী ডেভি বিগলিত কস্টিক সোডার তড়িৎ-বিশ্লেষণের দ্বারা কাস্ট্নার-পদ্ধতিতে বিগলিত সোডিয়ামক্লোরাইডকে কাস্ট্নার-পদ্ধতিতে বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ সোডিয়াম রৌপ্যের ন্যায় সাদা, জল অপেক্ষা হাল্কা, নরম এবং উত্তম তাপ ও তড়িৎ-পরিবাহী ধাতু। ইহার পারমাণবিক ভার ২২.৯৯৭, আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৯৭৮, গলনাঙ্ক ৯৭.৮° সে. গ্রে.।

অন্যান্য ক্ষারীয় ধাতুর ন্যায় সোডিয়ামও তীব্র তড়িৎ-ধনাত্মক বলিয়া অত্যন্ত সক্রিয়। জলের সহিত সাধারণ উষ্ণতায় ইহা তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে; ফলে উৎপন্ন হয় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও হাইড্রোজেন। বায়ুর সহিত ইহা সহজেই বিক্রিয়া করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন অ্যাসিড এবং উচ্চ তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি গ্যাসের সঙ্গে সোডিয়ামের বিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

ব্যবহার ঃ সোডামাইড, সোডিয়াম পার-অক্সাইড, সোডিয়াম সায়নামাইড, অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল প্রভৃতি প্রস্তুতিতে; সোডিয়াম-পটাসিয়াম ধাতু-সংকরের স্ফুটনাঙ্ক উচ্চ বলিয়া ইহা উচ্চ তাপমাত্রা পরিমাপক তাপমান যন্ত্রে তাপক পদার্থ হিসাবে, সোডিয়াম ও উহার পারদ-সংকর জৈব রসায়নে ও কৃত্রিম নীলপ্রস্তুতিতে এবং বিজারকরূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্বেতকেতু ঘোষাল

সোফোক্লেস (আনু. ৪৯৫-৪০৫ খ্রী. পূ.) গ্রীক-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক কবি। এথেন্সের নিকটবর্তী কলোনাস নামক স্থানে তাঁহার জন্ম। পিতা ঃ সোফিল্লস্। সোফোক্লেস নানা বিষয় শিক্ষার সঙ্গে সংগীত বিষয়েও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দেখিতে যেরূপ সুদর্শন ছিলেন, তাঁহার চরিত্রমাধুর্য, রাজনৈতিক গুণাবলী এবং বহুমুখী প্রতিভাও তেমনি অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা সহজেই মনে হয়।

তিনি একশটি বা তাহারও অধিক গ্রন্থ (অধিকাংশই নাটক) রচনা করিয়াছিলেন। তবে বর্তমানে কেবলমাত্র সাতটি নাটকই পাওয়া যায়। অন্যান্য রচনার নিদর্শন বিচ্ছিন্নভাবে ঈজিপ্ট এবং প্রাচীন বাইজানটাইন শহরে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার যে সাতটি ট্র্যাজিক নাটক পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইল ঃ 'আন্তিগোনে', 'এলেক্ট্রা', 'ত্রাখিনিয়াই', 'ওইদিপৌস্ তুরান্নুস', 'আয়াক্স', 'ফিলোক্তেতেস্' এবং 'ওইদিপৌস্ কোলোনেউস্'। এই নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হইল প্রথম, চতুর্থ এবং সপ্তম নাটকটি। তাঁহার 'আন্তিগোনে' নাটকটিকে বেশিরভাগ সমালোচকই গ্রীক-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সোফোক্লেসের নাটকগুলির রচনাকাল সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। তবে 'ফিলোক্তেতেস্' নাটকটি যে ৪০৯ খ্রী. পূর্বাব্দে রচিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রমাণ আছে। 'ওইদিপৌস্ কোলোনেউস্' তাঁহার শেষ বয়সের রচনা। 'আন্তিগোনে' সম্ভবতঃ ৪৪১ অথবা ৪৪২ খ্রী. পূর্বাব্দে রচিত।

ট্র্যাজিক নাটক রচনায় সোফোক্লেসের গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ও শিল্পকুশলতা তাঁহাকে বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করিয়াছে। তিনি তাঁহার নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে মানবতাবোধের সঙ্গে নীতির যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহার নাটকগুলিকে সর্বাধিক মহিমা দিয়াছে। তিনি জীবনকে খণ্ডিতরূপে দেখেন নাই, সম্পূর্ণভাবে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ভাষার যে সৌন্দর্য এবং সৃষ্ট-চরিত্রগুলির মধ্যে যে উজ্জ্বলতা, মহত্ত্ব ও মর্যাদা লক্ষ্য করা যায় তাহা সত্যই দুর্লভ। বিশেষ করিয়া 'এলেক্ট্রা', 'আন্তিগোনে' ইত্যাদি স্ত্রীচরিত্রগুলি তাঁহার সহানুভূতির স্পর্শে অপূর্ব-মূর্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি নাটকের মধ্যে অনেক নূতন নূতন রীতির অবতারণা করিয়া ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম নাটকের মধ্যে 'তৃতীয় চরিত্রে'র (থার্ড অ্যাক্টর সিস্টেম) প্রবর্তন করিয়া প্রচলিত যৌথদল অপেক্ষা অভিনেতার গুরুত্ব বর্ধন করেন। নাটকে সমবেত সংগীতও ১২টি হইতে ১৫টিতে তিনিই প্রথম বাড়াইয়া দেন। তাঁহার রচিত গানগুলি সত্যই অপূর্ব। তিনিই নাটকের মধ্যে সর্বপ্রথমে চরিত্র ও ঘটনার ক্রমবিকাশের উপর জোর দেন। ইহার ফলে অভিনয় শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। ইহা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের উন্নতিকল্পেও তিনি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। রঙ্গমঞ্চের দেওয়ালে, অর্কেস্ট্রাদলের পিছনে, নক্শা ইত্যাদি আঁকার ব্যবস্থা তিনিই করেন।

পূর্বে উক্ত সাতটি নাটক ছাড়াও তাঁহার আর একটি রচনা ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ঈজিপ্টে

প্রাপ্ত প্যাপাইরাসের উপর লিখিত ৪০০ পঙ্‌ক্তির একটি 'স্যাটার প্লে' (*Satyr play*)

শিশিরকুমার সিংহ

সোমনাথ গুজরাত রাজ্যের জুনাগড় জেলায় অবস্থিত বেরাবলের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র শহর। শৈব এবং বৈষ্ণবতীর্থক্ষেত্র। সাগরের উপকূলে প্রভাসপত্তনে (স্থানীয় নাম পাটন) সোমনাথ শিবের লিঙ্গমূর্তিযুক্ত মন্দিরের জন্য খ্যাত। প্রবাদানুযায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে দেহত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের দ্বাদশ শৈবতীর্থের অন্যতম এই সোমনাথ (প্রভাসপত্তন) বহুবার বিদেশী আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। ১০২৪ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ সোমনাথ আক্রমণ করিয়া প্রভূত সম্পদ ও চন্দনকাষ্ঠ-নির্মিত বিশাল মন্দির দ্বারটি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। ৫০০০০ ভারতীয় বীর প্রাণবলি দিয়াও এই ধ্বংস নিবারণ করিতে পারেন নাই। গুজরাতের চৌলুক্য ('সোলাঙ্কি' দ্র) রাজারা সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণ করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আলাউদ্দীন খিলজীর আক্রমণে মন্দিরটি পুনরায় বিধ্বস্ত ও মসজিদে পরিণত হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রানী অহল্যাবাঈ ('অহল্যাবাঈ' দ্র) কর্তৃক স্থাপিত মন্দির অদ্যাবধি বর্তমান আছে।

পুরাতন মন্দিরের ভিত্তির উপর ভারত সরকার কর্তৃক নির্মীয়মাণ মন্দিরে রাষ্ট্রপতি লিঙ্গমূর্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯৫১ খ্রী, ১১ মে)।

জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায়

সোমপুর পাহাড়পুর দ্র

সোলাঙ্কি হিন্দুযুগের চৌলুক্য রাজবংশ মধ্যযুগে সোলাঙ্কি রাজপুত নামে পরিচিত ছিল ('চালুক্যবংশ' দ্র)। এই বংশ গুজরাতে রাজত্ব করিত এবং মুসলমান রাজাদের সহিত তাহাদের অনেক যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। সুলতান মামুদ যখন এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন তখন এই বংশের রাজা ভীম রাজধানী অনহিল্লপাটক ত্যাগ করিয়া কচ্ছদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন (১০২৪ খ্রী)। সুলতান মামুদ ফিরিয়া গেলে এই রাজ্য পুনরায় ভীমের হস্তগত হয় এবং তিনি প্রতিবেশী কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করেন। জয়সিংহ সিদ্ধরাজ এই বংশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তিনি মালব দেশের পরমার রাজ নরবর্মন ও যশোবর্মনকে পরাজিত করিয়া মালব স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন এবং চন্দেল্ল ও চালুক্য-রাজগণকে পরাজিত করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও পুরাণ প্রভৃতি পাঠের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত জৈন-আচার্য হেমচন্দ্র তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করিতেন। আনুমানিক ১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত রাজা ভীমের এক বংশধর কুমার পাল এই রাজ্যের রাজা হন। তিনিও একজন প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এবং জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ এই রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজমাতা নাইকী শিশুরাজা ভীমসিংহকে ক্রোড়ে করিয়া স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং শিহাবুদ্দীনকে পরাজিত করেন। এই বংশের শেষ রাজা দ্বিতীয় ভীম ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজ্যকালেই বাঘেলা বংশীয় বীরধবল এই রাজ্যের প্রকৃত রাজশক্তি অধিকার করেন। এই নূতন বংশও সোলাঙ্কিরই একটি শাখা। এই বংশের শেষ রাজা কর্ণকে পরাজিত করিয়া আলাউদ্দীন খিলজী গুজরাত অধিকার করেন এবং এই রাজ্য মুসলমানদের হস্তগত হয় (১২৯৭ খ্রী)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

সৌরজগৎ সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, বহুসংখ্যক গ্রহাণুপুঞ্জ ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি লইয়া সৌরজগৎ। ('গ্রহ' 'উপগ্রহ', 'ধূমকেতু' ও 'উল্কা' দ্র)।

সৌরজগতে গ্রহ নয়টি; সূর্য হইতে ক্রমবর্ধমান দূরত্ব অনুসারে ইহাদের নাম বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো। প্রত্যেক গ্রহ উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্য এই উপবৃত্তের নাভিতে (ফোকাস) থাকে। মঙ্গল এবং বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে অবস্থিত বহু ক্ষুদ্র গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids) আছে।

যে জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারিদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে তাহাকে উপগ্রহ বলে। সৌরজগতে অনেকগুলি উপগ্রহ আছে। বুধ, শুক্র, প্লুটোর ('প্লুটো' দ্র) কোনও উপগ্রহ নাই। চন্দ্র পৃথিবীর ('পৃথিবী' দ্র) একমাত্র উপগ্রহ। অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে অনেকেরই একাধিক উপগ্রহ আছে। উপগ্রহেরাও সূর্যের আলো প্রতিফলিত করিয়া উজ্জ্বল দেখায়। সৌরজগৎ অতিবিস্তৃত এবং সূর্য এত প্রকাণ্ড যে সৌরজগতের সকল গ্রহ-উপগ্রহের মিলিত ভর সূর্যের একসহস্রাংশও নহে।

কামিনীকুমার দে

সৌরাষ্ট্র শাক্তসংগমতন্ত্রে ভারতবর্ষের যে ৫৬টি দেশের উল্লেখ আছে তাহাদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রের সীমা সম্বন্ধে যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহাতে বলা হইয়াছে কোঙ্কণ হইতে হিঙ্গুলাজ পর্যন্ত ১০০ যোজন বিস্তৃত এই দেশ পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং ইহা গুর্জর নামেও অভি-

হিত হয়। মোটামুটিভাবে কাথিয়াবাড় উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগই সৌরাষ্ট্র নামে প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে শকগণ এই দেশে রাজত্ব করিত। তাহার পরও এখানে অনেক রাজ্যের উত্থান-পতন হয়।

সৌরাষ্ট্রের ইতিহাস গুজরাত প্রদেশেরই ইতিহাস ('গুজরাত' দ্র)।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্যাদ্বাদ জৈনমতে জ্ঞাত বিষয়মাত্রেরই অনন্ত ধর্ম আছে। তাই তাঁহারা অনেকান্তবাদী। জৈন দর্শন যে অস্তিত্ব প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করে তাহা স্যাদ্বাদ নামে খ্যাত। জৈন দার্শনিকগণ বলেন যে, কোনও বস্তু সম্বন্ধে কোনও অবধারণ ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে, সর্তহীন উক্তি না করিয়া 'স্যাৎ' অর্থাৎ 'একভাবে' বস্তুটি এইরূপ—ইহাই বলা উচিত। বস্তু সম্বন্ধে যে কোনও অবধারণই হইল আপেক্ষিক বিবরণ মাত্র। তাই জৈন দর্শন মতে প্রত্যেক বর্ণনা বা অবধারণের পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। স্যাৎ শব্দের অর্থ হইল 'হয়তো' বা 'হইতে পারে'। 'ঘট আছে' বলিলে সর্বকালে সর্বস্থানে ঘট আছে ইহাই বুঝায়। কিন্তু তাহা তো সত্য নয়। কোনও ঘটই সর্ব দেশে, সর্বকালে, সর্বগুণবিশিষ্ট হইয়া বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুতরাং 'ঘট আছে' বা 'ঘট বিদ্যমান' এইরূপ নিঃসর্ত উক্তি না করিয়া বাক্যাংশে 'স্যাৎ' যোগ করা উচিত, অর্থাৎ বর্তমান কালে এক বিশেষ স্থানে ঘটের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণবিশিষ্ট বস্তু বিদ্যমান আছে। সংক্ষেপে 'একভাবে ঘট বিদ্যমান' ইহাই বলা উচিত এবং ইহাই স্যাদ্বাদের মূল কথা। জৈনরা এই স্যাদ্বাদ হইতেই সপ্তভঙ্গিনয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তর্কশাস্ত্রে প্রচলিত দুইপ্রকার অবধারণের পরিবর্তে জৈনরা সাতপ্রকার অবধারণ স্বীকার করেন।

সুধীরকুমার নন্দী

স্কট, স্যার ওয়াল্টার (১৭৭১-১৮৩২ খ্রী) ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি। জন্মস্থান: এডিনবরা। তিনি ইংরেজী কাব্যে সর্বপ্রথম ব্যালাডধর্মী লোকগাথা রচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রথম দিকে কবি হিসাবেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত আছে, বায়রনের আবির্ভাবের পর স্বীয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া তিনি উপন্যাস রচনার পথ গ্রহণ করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সাহিত্যিক কৃতির জন্য তাঁহাকে 'ব্যারোনেট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। Charlotte Charpentier নামক একজন মহিলাকে (জনৈক ফরাসী উদ্বাস্তুর কন্যা) তিনি বিবাহ করেন (১৭৯৬ খ্রী)।

স্কটের সাহিত্যসৃষ্টি মোটামুটি দুই ভাগে পড়ে: গাথা ও আখ্যানমূলক কাব্য এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম ভাগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'দি লে অভ্ দি লাস্ট মিন্স্ট্রেল' (১৮০৫ খ্রী); 'মারমিয়ন' (১৮০৮ খ্রী); ও 'দি লেডি অভ্ দি লেক' (১৮১০ খ্রী)। তবে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবেই তিনি বিশ্বের সাহিত্য-জগতে সুপ্রসিদ্ধ। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ওয়েভার্লি' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। ইহার পর একে একে তাঁহার 'ওয়েভার্লি উপন্যাস' বাহির হয়। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ওল্ড মর্ট্যালিটি' (১৮১৬ খ্রী); 'দি রব রয়' (১৮১৭ খ্রী); 'হার্ট অভ্ মিডলোথিয়ান' (১৮১৮ খ্রী); 'আইভ্যান্হো' (১৮১৯ খ্রী); 'কেনিলওয়ার্থ' (১৮২১ খ্রী) ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তিনি জীবনীও রচনা করেন। তিনি সুইফ্ট ও ড্রাইডেনের গ্রন্থ সম্পাদন করেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুত-গতিসম্পন্ন লেখক ছিলেন। তাঁহার উদার, মনোরম চরিত্রের জন্য তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিতেন। চরিত্রাঙ্কন ও বর্ণনা-শক্তিতে তিনি অসামান্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস তথা আধুনিক উপন্যাস স্কটের নিকট চিরঋণী।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

স্কন্দগুপ্ত গুপ্তসম্রাট্ কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তৎপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন (আনু. ৪৫৫ খ্রী)। কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ ভাগে যখন বর্বর হূণজাতি গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় তখন কুমার স্কন্দগুপ্ত বাহুবলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্য রক্ষা করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বর্বর হূণজাতি রোমসাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়াছিল। হূণদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্যও এইরূপ বিপদের মুখেই পতিত হইয়াছিল; ইহা বুঝাইবার জন্য একখানি প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, যখন গুপ্তরাজ্যের কুললক্ষ্মী বিচলিত হইয়াছিলেন তখন স্কন্দগুপ্ত তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে রণক্ষেত্রে এক রাত্রি তাঁহাকে ভূশয্যায় শয়ন করিতে হইয়াছিল।

অনুমান হয়, স্কন্দগুপ্তের মাতা কুমারগুপ্তের প্রধানা মহিষী (অর্থাৎ পাটরানী) ছিলেন না। সম্ভবতঃ এইজন্যই কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষীর পুত্র পুরুগুপ্ত সিংহাসনের দাবী করিয়াছিলেন; তাঁহাকে পরাজিত করিয়াই স্কন্দগুপ্ত রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা যায় না।

বর্বর হূণজাতি ভিন্ন অন্যান্য শত্রুকেও স্কন্দগুপ্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে

কাথিয়াবাড় পর্যন্ত ভূভাগ—অর্থাৎ প্রায় সমগ্র আর্যাবর্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ছিল। আনুমানিক ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

স্টাইন, মার্ক আউরেল (১৮৬২-১৯৪৩ খ্রী) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও পরিব্রাজক। জন্মস্থান হাঙ্গেরির বুদাপেস্ট শহরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে ইংল্যান্ডে আসিলে সুধীসমাজ তাঁহাকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকরি লইয়া ভারতে আসেন এবং লাহোরে ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হন। ভারতে আসিবার কিছুকালের মধ্যেই তিনি কবি কহ্লণ-কৃত কাশ্মীরের ইতিহাস 'রাজতরঙ্গিণী'র অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে বদলি হইয়া আসেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ছুটি লইয়া তিনি মধ্য এশিয়ায় প্রথম অভিযানে বাহির হন। হিন্দুকুশের অতিদুর্গম গিরিসংকট অতিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার দলটিকে লইয়া খোটানে আসেন। এই অঞ্চল হইতে তিনি ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, চীনা, তিব্বতী প্রভৃতি লিপিতে লিখিত অনেক পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেন। দ্বিতীয় অভিযানে (১৯০৬-৮ খ্রী) তিনি আরও অধিক দূর অগ্রসর হইয়া নিয়া, মিয়ান, লব-নোর প্রভৃতি অঞ্চলে খননকার্য চালান। চীন সীমান্তের 'হাজার বুদ্ধের গুহা'র এক অজ্ঞাত প্রকোষ্ঠ হইতে পুঁথিপত্রের সহিত তিনি প্রাচীন চিত্রকলার অনেক অপূর্ব নিদর্শন আবিষ্কার করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার মধ্য এশিয়ায় আসেন ও বহু অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। তাঁহার সর্বশেষ অভিযান (১৯২৯-৩০ খ্রী) ব্যর্থ হয়, কারণ চীনে তিনি প্রবেশাধিকার পান নাই। অতঃপর সিন্ধু সভ্যতার সহিত প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার কোন যোগ সূত্র আছে কি না তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি বেলুচিস্থান ও পারস্যে কিছু কিছু খনন কার্য পরিচালনা করেন। যে পথে আলেকজান্ডার ভারত আক্রমণ করেন এবং পরে ব্যাবিলন নগরীতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহার সঠিক পরিচয় জানিবার জন্য তিনি পারস্য, ব্যাবিলন হইতে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত যতগুলি পার্বত্য পথ আছে সে গুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত ইরাকের উত্তরে প্রাচীন পার্থিয়া রাজ্যের উপ-কণ্ঠে রোমান সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত ভূমির সঠিক সীমানা নির্ধারণের নিমিত্তও তিনি কিছুকাল অনুসন্ধান চালান। 'ক্রনিক্‌স্ অভ্ কিংস্ অভ্ কাশ্মীর', 'স্যান্ড বেরিড্ রুইন্‌স্ অভ্ খোটান', 'এন্‌শেন্ট খোটান', 'রুইন্‌স্ অভ্ ডেজার্ট ক্যাথে' (২ খণ্ড), 'ইনারমোস্ট এসিয়া' প্রভৃতি তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর আশী বৎসর বয়সে কাবুলে বাল্‌খ্ অঞ্চলে খননকার্য চালাইবার অভিপ্রায়ে সেখানে গিয়া তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দেহান্ত ঘটে।

সুবোধকুমার মজুমদার

স্টালিন, স্ট্যালিন ইওসিফ ভিসারিয়োনোভিচ যুগা-শভিলি (১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রী) সোভিয়েত রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিশারদ ও সর্বাধিনায়ক (ডিক্টেটর)। জন্মস্থান ঃ ট্রান্সককেসিয়া। জর্জিয়ার কৃষক চর্মকারের পুত্র। যাজক বৃত্তির জন্য শিক্ষালাভ। ককেসাসের তৈল-খনিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান। বলশেভিস্টদলের সদস্য (১৯০৩ খ্রী), ছদ্মনাম (Stalin বা 'ইস্পাতের মানুষ') গ্রহণ, জারের বিরোধিতা, বারংবার কারাদণ্ড এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ বিপ্লবের পর পিটার্সবার্গে গমন করেন; কমিউ-নিস্ট দলের রাজনৈতিক সমিতির সভ্য এবং সোভিয়েত সরকারের বিভাগীয় প্রধান হন। কেন্দ্রীয় দলীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক (১৯১৯ খ্রী)।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন ও ট্রট্‌স্কির মধ্যে নেতৃত্বের সংগ্রাম। ট্রট্‌স্কি-ভক্তেরা দাবি করে বিশ্ব বিপ্লবের পথে দ্রুত পদক্ষেপ; স্টালিন-ভক্তেরা চায় 'একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠন' অর্থাৎ সমাজ-তন্ত্রের পথে রাশিয়ার সম্পদের ত্বরিত উন্নয়ন। স্টালিনের নেতৃত্বে 'জাতীয় সমভোগবাদে'র জয়লাভ। তাঁহার নির্দেশে সমাজতন্ত্রবাদের শাস্ত্রীয় নীতি অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির ক্রমিক রূপায়ণ। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দলের 'শোধন', মস্কো বিচার এবং প্রাক্তন সম-ভোগবাদী প্রধানদের মৃত্যুদণ্ড।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান আক্রমণের প্রতিরোধে সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ। মিত্রশক্তির কনফারেন্সে যোগদান। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টদলের ২০শ অধিবেশনে ক্রুশ্চেভ স্টালিনের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভি-যোগ আনেন ঃ ১. মার্ক্‌স্-লেনিনবাদকে অতিক্রম, ২. বলপ্রয়োগ, ৩. অবিচার-অত্যাচার, ৪. নামজাহির এবং ৫. ব্যক্তি ভজনার আশকারা। ফলে সোভিয়েত শাসনের দৃঢ়তা হ্রাস পায়, সমভোগবাদ উদারতা লাভ করে এবং সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সন্দেহ ও সন্ত্রাসের ভাব কিছু পরিমাণে প্রশমিত হয়।

সমভোগবাদী ভাবাদর্শ সত্ত্বেও স্টালিনের নীতি ছিল বাস্তবধর্মী। তাঁহার সময়ে রাশিয়ার অভ্যুদয় হইয়াছিল জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

স্টালিনবাদ বলিতে সাধারণভাবে বোঝায় স্টালিনের সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, কিন্তু বিশেষভাবে বোঝায় মার্ক্স-লেনিন প্রবর্তিত সমভোগবাদের তত্ত্ব ও প্রয়োগের নূতন সংস্করণ। স্টালিনবাদের বিশেষত্ব ১. 'একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গঠন', ২. জাতীয়তা, ৩. কঠিন কর্তৃত্ব, ৪. ব্যক্তিগত নায়কত্ব, ৫. কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, ৬. আমলাতন্ত্র, ৭. ভীতিসঞ্চার, ৮. সর্বাত্মক রাষ্ট্র।

স্টালিনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ১. ফাউণ্ডেশনস্ অভ্ লেনিনিজ্ম্ (১৯২৪ খ্রী), ২. 'প্রবলেম্স্ অভ লেনিনিজ্ম্' (১৯২৬ খ্রী) ; ৩ ইকনমিক প্রবলেম্স্ অভ্ সোস্যালিজ্ম্ ইন্ দি ইউ. এস. এস. আর. (১৯৫২ খ্রী)।

নির্মলকান্তি মজুমদার

স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স বা বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্স। সাংখ্যায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বস্তুজগতের বিভিন্ন প্রকার জটিল সমাবেশের সমষ্টিগত ধর্ম ও আচরণের অনুশীলনকে সাংখ্যায়নিক বলবিদ্যা বা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স বলে। উদাহরণস্বরূপ একটি নির্দিষ্ট আয়তনের কোনও গ্যাসের কথা ধরা যাক্। যে কোনও গ্যাস অসংখ্য বিভিন্ন বেগসম্পন্ন নিয়ত চলমান পরমাণুর সমাবেশে গঠিত। এই পরমাণুগুলির প্রত্যেকটির গতি-প্রকৃতি পৃথক্‌ভাগে, বিবেচনা করিয়া উক্ত গ্যাসের সমষ্টিগত ধর্ম নির্ধারণ করা স্পষ্টতঃই অসম্ভব। কিন্তু সাংখ্যায়নিক বলবিদ্যা বিশেষ গাণিতিক কৌশলে পরমাণুগুলির অবস্থিতি, গতি এবং উহাদের একটির অপরের উপর প্রভাব ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া উক্ত গ্যাসের সম্ভাব্য আচরণ স্থির করিতে পারে। অর্থাৎ এই বলবিদ্যার সাহায্যে কোনও সমাবেশের খুঁটিনাটি বিবরণ পূর্ণভাবে না জানিয়াও উহার সামগ্রিক আচরণ (অন্ততঃ আংশিকভাবে) স্থির করা যায়। ('বলবিদ্যা' দ্র)।

সাংখ্যায়নিক বলবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বোস (বসু)-উদ্ভাবিত বোস-সংখ্যায়ন নিঃসন্দেহে একটি অতি মূল্যবান্ পদক্ষেপ। এই সংখ্যায়নের সাহায্যে অধ্যাপক বোস কোয়ন্টামবাদের একটি সুসংগত প্রমাণ দেন এবং আলোক-কণা বা ফোটনের মধ্যে শক্তির সম্ভাব্য বন্টনসূত্র নির্ণয় করেন। কেবল আলোক-কণা নয়, একপরমাণুক গ্যাসের অণুর ক্ষেত্রেও যে এই সংখ্যায়ন প্রযোজ্য, তাহা আইনস্টাইন প্রমাণ করেন ('আইনস্টাইন, অ্যালবার্ট' দ্র)। এই কারণে এই সংখ্যায়ন 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত।

বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নের সাহায্যে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বস্তুকণার সমাবেশে কোন্ শক্তিসম্পন্ন বস্তুকণার সংখ্যা কত, তাহার আনুমানিক হিসাব দেওয়া যায়। ইলেক্ট্রন ও অন্যান্য কয়েকটি কণার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সংখ্যায়নের প্রয়োগ সফল হয় না। ইহাদের জন্য ফার্মি ও ডিরাক অধ্যাপক বোসের প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া 'ফার্মি-ডিরাক-সংখ্যায়ন' নামে এক নূতন সংখ্যায়নের প্রবর্তন করেন। যে-সকল কণা এই শেষোক্ত সংখ্যায়ন মানিয়া চলে, তাহাদের 'ফার্মিয়ন' এবং যেগুলি অধ্যাপক বোসের সংখ্যায়নের অধীন, তাহাদের 'বোসন' বলে।

অনাদিনাথ দাঁ

স্তন বক্ষের দুইপাশে নালীযুক্ত একত্র অবস্থিত কতকগুলি গ্ল্যাণ্ডের উপর চর্বি ও ত্বক-আবরণে ঢাকা স্তন দুইটি অবস্থিত। তাহাদেরই কেন্দ্রস্থলে সামান্য উঁচু বোঁটাতে ঐ নালীগুচ্ছের মুখগুলি থাকে। পুরুষদেহে যুগ্মস্তন ক্ষুদ্রাকার ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু যৌবনোদ্গমে মস্তিষ্কভূমিসংলগ্ন পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের সম্মুখ অংশে ক্ষরিত যৌনগ্ল্যাণ্ড-উত্তেজক দুইটি হর্মোনের প্রভাবে বর্ধিত বোঁটাসহ পীবর অর্ধবর্তুলাকার স্তনদ্বয় নারীদেহের সুষমাকে বাড়াইয়া তোলে এবং গর্ভাবস্থায় বোঁটা যেমন আরও উঁচু হইয়া ওঠে তেমনি তাহাদের চক্রাকার আবেষ্টনীর চিহ্নের রঙ্‌ও গাঢ়তর হয়। কেবল সন্তান প্রসবের পরেই পিটুইটারিতে ক্ষরিত 'প্রোল্যাকটিন' নামক অপর হর্মোনের প্রভাবে স্তনে দুধের ক্ষরণ হইতে আরম্ভ হয় এবং বোঁটাকে শিশু যতই চুষিতে থাকে ততই বেশি দুধ ক্ষরিত হইতে থাকে। শিশুর দশমাস বয়স পর্যন্ত মাতৃস্তন্যই প্রকৃষ্ট খাদ্য। তাহার পরে কিংবা আগেও শিশুকে দুধ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলে স্তন দুইটি পুনরায় নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

স্তন্যপায়ী প্রাণী শব্দগতভাবে স্তন্যপায়ী অর্থে সেই সব প্রাণীকে বোঝায় যাহারা ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতৃস্তন পান করে। মানুষ, গোরু, বাঘ, ঘোড়া ইত্যাদি ইহার পরিচিত উদাহরণ। স্তন্যপায়ী প্রাণী মাত্রেরই এক বা একাধিক জোড়া স্তন থাকে। পতঙ্গভোজী সেন্টিটেস প্রাণীর ১১ জোড়া স্তন আছে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী প্রাণীতে এই স্তন সুগঠিত ও কর্মক্ষম হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণী ভূমিষ্ঠ হইবার পর মাতৃদুগ্ধ পান করিয়া বড় হয়। ইহাদের শরীর লোমে আবৃত থাকে। অন্য কোনও প্রাণীর লোম বা চুল থাকে না। অবশ্য জলচর স্তন্যপায়ী তিমির শরীরে চুলের সংখ্যা অত্যন্ত পরিমিত। হংসচঞ্চু ছাড়া স্তন্যপায়ীদের দেহের উত্তাপ একই রকম থাকে, উভচর বা সরীসৃপ শ্রেণীর ন্যায় পারিপার্শ্বিক উত্তাপের সহিত ওঠানামা করে না। অবশ্য অসুস্থ বা জ্বর হইলে দেহতাপ

কিরং পরিমাণে বাড়িয়া যায়। তাপ সংরক্ষণে চুল বা লোম এবং চামড়ার নীচের চর্বির স্তর সাহায্য করে। মেরু অঞ্চলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জলে যে তিমি বাস করে তাহার শরীরে এই চর্বির স্তর এক মিটারের মত পুরু হইতে পারে। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর আর এক বৈশিষ্ট্য হইল দাঁত। এক ধরনের তিমি, হংসচঞ্চু ও পিপীলিকা-ভুক্ ছাড়া ইহাদের সবারই দাঁত আছে। ইহাদের দাঁত দুইবার ওঠে। ইহাদের মগজের আধার (ব্রেন কেজ) অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় আকারে বড়; গলার হাড়ে পাঁজর থাকে না। জুরাসিক (Jurassic) যুগে থেরিওডন্ট জাতীয় কয়েকটি স্তন্যপায়ী সদৃশ সরীসৃপ হইতে স্তন্যপায়ী বর্গের প্রাণীর উদ্ভব ঘটে। আদি স্তন্যপায়ী প্রাণীরা আকারে ক্ষুদ্র কিন্তু বুদ্ধিতে দড় ছিল। চার হাজার বিভিন্ন ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে। ইহাদের তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ ১. প্রটোথেরিয়া—অস্ট্রেলিয়ার হংসচঞ্চু ও ইকিড্না ইহার দৃষ্টান্ত; স্তন্যপায়ী হইলেও ইহারা প্রথমে ডিম পাড়ে; এই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইয়া মায়ের দুধ খায়। ২. মেটাথেরিয়া—অস্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির ক্যাংগারু, কোয়ালা, আমেরিকার অপোসাম প্রভৃতি প্রাণী ইহার দৃষ্টান্ত। ৩. ইউথেরিয়া—মানুষ, হাতি, গোরু, তিমি প্রভৃতি প্রাণী এই উপশ্রেণীভুক্ত। জীবিত প্রাণীদের মধ্যে স্তন্যপায়ীরাই আকারে বৃহৎ। স্থলবাসী প্রাণীদের মধ্যে হাতি ও জলবাসী প্রাণীদের মধ্যে তিমি আকারে সর্ববৃহৎ।

সীমানন্দ অধিকারী

স্তূপ বৌদ্ধস্থাপত্যের যে প্রাচীনতম নিদর্শন চৈত্য নামে অভিহিত, শিল্পবিদ্যায় তাহাকেই স্তূপ বলা হয়। বৌদ্ধশিল্পে বুদ্ধের ভস্ম, অস্থি, কেশ, দন্ত অথবা ব্যবহৃত বস্তুর উপর নির্মিত স্তূপকেই চৈত্য বলা হইয়াছে।

কালিঙ্গবোধি জাতকে ভগবান্ বুদ্ধ তিন প্রকারের ‘চেতিয়’ বা ‘চৈত্যে’র উল্লেখ করিয়াছেন—শারীরিক, পারিভোগিক এবং ঔদ্দেশিক। বুদ্ধগণের পরিনির্বাণের পর তাঁহাদের দেহাবশেষের উপর নির্মিত চৈত্যকে শারীরিক চেতিয় এবং তাঁহাদের পরিভুক্ত স্থানে নির্মিত চৈত্যকে পারিভোগিক চেতিয় বলা হয়। বুদ্ধ-সম্বন্ধীয় কোনও ভাবের শিল্পায়নকে ঔদ্দেশিক চেতিয় বলে। চৈত্য-গৃহ একটি মন্দির বিশেষ এবং ইহার অভ্যন্তরে ব্রত পালনার্থে নির্মিত স্তূপই পূজাবেদী। চৈত্য গৃহগুলি ‘বিহার’ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ চৈত্যগৃহ পূজাগৃহরূপে এবং বিহার শ্রমণগণের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

বৌদ্ধ চৈত্যগৃহের প্রাচীনতম নিদর্শন ভারহুত হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ চিত্রে পাওয়া গিয়াছে। অনুরূপ অপর একটি দ্বিতল চৈত্যগৃহের চিত্র অমরাবতী হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরফলকে চিত্রিত। স্তূপ বা চৈত্যের ন্যায় চৈত্যগৃহগুলিও প্রাচীন স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। চৈত্যগৃহের বিশিষ্টরূপ ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিয়াছে। বিহারের গয়া জেলার পর্বতমালায় উৎকীর্ণ গুহাশ্রেণী পরবর্তীকালের অলংকৃত চৈত্যগুহার সূচনা করে। এখানকার সুদামা গুহার একটি কক্ষ দেখিলে মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ স্তূপস্থাপনার জন্য ব্যবহৃত হইত। পুণার নিকটবর্তী জুন্নর চৈত্যগুহার স্তূপটি ১২টি স্তম্ভদ্বারা বেষ্টিত। কালক্রমে চৈত্যগুহাগুলিতে হর্ম্যমুখ ও স্তম্ভশ্রেণীর অলংকরণপ্রথা বিকাশলাভ করে। পরবর্তীকালে বুদ্ধপ্রতিমা নির্মাণ প্রচলিত হইলে চৈত্যগৃহগুলিতে স্তূপের স্থানে বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ষষ্ঠ শতকে নির্মিত অজন্তার ১৯ সংখ্যক গুহাতে হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার ন্যায় অভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে স্তূপের আধারের উপর বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

যূথিকা মৈত্র

স্ত্রীব্যাধি স্ত্রীদেহে প্রজনন সম্বন্ধীয় অঙ্গগুলি হইতেছে বহির্যোনি, যোনিপথ, জরায়ু, ডিম্বাণুবাহী নল, ডিম্বাধার প্রভৃতি। ইহাদের ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা (ফাংশন্যাল ডিস্টার্ব্যান্স) কিংবা রোগগুলিই সাধারণতঃ স্ত্রীব্যাধির সংজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে। স্ত্রীব্যাধিগুলিকে সাধারণতঃ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ ১. যৌনাঙ্গগুলির ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধীয়, যেমন, সাময়িক ঋতু বন্ধ (amenorrhoea), অত্যধিক বা প্রলম্বিত ঋতুস্রাব (menorrhagia), পৌঢ়-বয়সে ঋতুবন্ধকালীন অতিস্রাব (metrorrhagia), বাধক (dysmenorrhoea), যৌনমিলনকালে ব্যথাজনিত অস্বস্তি (dysparennia), বন্ধ্যাত্ব (sterility) প্রভৃতি। ২. বিভিন্ন যৌন-দেহাংশের জীবাণুঘটিত প্রদাহ, যেমন, বহির্যোনি প্রদাহ (valvitis), যোনিপথে প্রদাহ (vaginitis), শ্বেত প্রদর (teucorrhoea), জরায়ুগ্রীবায় প্রদাহ ও মুখে ক্ষত, ডিম্বাণুবাহী নলের প্রদাহ (salpingitis), তলপেটে পেরিটোনিয়সের প্রদাহ (pelvic peritonitis), ডিম্বাধারের প্রদাহ (ovaritis) প্রভৃতি। ৩. জরায়ুর আকারের অস্বাভাবিকতা কিংবা স্থানচ্যুতি হেতু, যথা, অপরিণত জরায়ু (infantile uterus), জরায়ুর পশ্চাদ্‌বক্রতা ও পশ্চাদ্‌গম (retroflexion and retroversion of uterus) কিংবা সম্মুখ-বক্রতা ও সম্মুখগমন (antiflexion and antiversion of uterus) মূত্রাধার বা মলাধারসহ অথবা এতদুভয় সহ কিংবা একক

জরায়ুর নিম্নাবতরণ, জরায়ুর অভ্যন্তরের বহির্ভাগে রূপান্তর (inversion of the uterus) প্রভৃতি। ৪. যৌন-অঙ্গগুলির অর্বুদ (tumour)। অর্বুদগুলি নির্দোষ কিংবা দূষিত এবং প্রাণান্তকর (যেমন কর্কট বা ক্যান্সার জাতীয়) হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর স্ত্রীব্যাধিগুলির পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের সম্মুখ অংশ থাইরয়েড, অ্যাড্রিন্যাল ও ওভ্যারি গ্ল্যান্ডগুলির অন্তঃক্ষরণের অস্বাভাবিকতা এবং তাহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সক্রিয়তার অভাবে (অর্থাৎ কোনটির অক্ষমতা কিংবা কোনও কোনটির অতি সক্রিয়তার ফলেই) ঘটে। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগগুলি সাধারণতঃ যৌনমিলনকালে, কিংবা ঋতুস্রাবের পরে, কিংবা সন্তানপ্রসবের পরে অথবা ঐ সকল দেহাংশে অস্ত্রোপচারের পরে গনেককাস্, ট্রিপোনিমা পেল্লিডাম, স্ট্রেপটোককাস্ স্টেফাইলোককাস্ প্রভৃতি জীবাণু প্রবেশের ফলেই ঘটিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর রোগগুলি সাধারণতঃ আকস্মিক পতন কিংবা প্রসবকালে অনভিজ্ঞ দাই প্রভৃতির দ্বারা অস্বাভাবিকভাবে প্রসব করানো বা ফরসেপ্স্ প্রভৃতি প্রয়োগের ফলে, কিংবা সন্তানপ্রসবের পর জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা লাভের পূর্বে লাফালাফি বা গুরুভারবহন প্রভৃতির ফলেও হইতে পারে। চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাধিগুলির কারণ এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আধুনিক যুগে চিকিৎসার সুবিধা সত্ত্বেও স্ত্রীব্যাধির হার সর্বত্রই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। তাহার কারণ ঃ ১. অর্থোপার্জনের জন্য মেয়েদের স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কলকারখানায় ছুটিতে হইতেছে ; অথচ প্রতি মাসের কয়েকদিন যখন বিশ্রাম অত্যাবশ্যক, কর্তব্যের দায়ে তখন শরীরকে অবহেলা করা হয়। ২. প্রসবকালে ছুটি, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবের পরেও প্রয়োজনানুরূপ বিশ্রামের অবসর নাই। ৩. পুরুষোচিত কার্য ও পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য দৈহিক ও মানসিক অস্বাভাবিকতাও কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীব্যাধির জন্য দায়ী। ৪. উপযুক্ত পরিপুষ্টির অভাব। ৫. জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য পেসারী বা ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার। ৬. অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভপাত। ৭. স্বাস্থ্যনাশের ভয়ে সন্তানকে স্তন্যদানে বিমুখতা। এই সমস্ত নানা কারণে বর্তমানে স্ত্রীরোগের হার বৃদ্ধি পাইতেছে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপন করেন। তাঁহারা নির্দেশ দিলেন ১. মেয়েদের শিক্ষা যে এক বিশেষ সমস্যা তাহা কিছুকাল দেশকে মানিয়া লইতে হইবে এবং সেই ভাবে সরকারকে অর্থবরাদ্দ করিতে হইবে ; ২. স্ত্রীশিক্ষার জন্য জাতীয় এবং পর্ষৎ স্থাপন করিতে হইবে ; ৩. কেন্দ্রে ও রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিশেষ বিভাগও থাকিবে। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে পড়ুয়া মেয়ের সংখ্যা ঃ ৩৬০৫০, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১২৪৬৭৯। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী বৃত্তিকরী এবং বিশেষ শিক্ষা লইতেছিলেন ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৮২৬ জন, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের সংখ্যা ঃ ২১৮৩৬। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেয়েদের সংখ্যা ঃ ৫৭৫৫০৫৩ ; ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১৩৮৯৯৭৪। বিদ্যালয় মানের বৃত্তিকরী এবং বিশেষ শিক্ষায় ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে মেয়ের সংখ্যা ঃ ২১৫৪০১, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭৮৪৫২। একুনে ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১১৮১৪৯৫১ জন মেয়ে শিক্ষা লইতেছেন। ছেলেদের অনুপাতে শিক্ষার্থিনী মেয়ের সংখ্যা ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ জন, ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪০। দেখা যাইতেছে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি যোগ দিতেছেন প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, গবেষণা বিভাগে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে এবং বৃত্তিকরী শিক্ষায়। উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অর্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালিকার শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হইয়াছে। শতকরা ৬০ জন ঐ বয়সী মেয়েরা এখন লেখাপড়া করিতেছে বলিয়া মনে করা হয়। খরচ হইয়াছে ১৯ লক্ষ টাকা আর ছাত্রী সংখ্যা ৪৬০০০।

সুধীরচন্দ্র রায়

স্থাপত্য প্রাসাদ, মন্দির, গির্জা, মস্জিদ, সমাধি, স্মৃতিসৌধ (মৌসোলিয়ম) স্তূপ বা চৈত্য, সৌধ, বিজয়স্তম্ভ, প্রেক্ষাগৃহ, দুর্গ ইত্যাদি স্থাপত্য বলিয়া পরিচিত। ভিত্তির উপর নির্মিত অট্টালিকা মাত্রই স্থাপত্য নয়। প্রকৃত স্থাপত্যের মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। প্রথম ঃ নির্ভুল ও অদ্বিতীয় পরিকল্পনা ; দ্বিতীয় ঃ যে উদ্দেশ্যে স্থাপত্যবিশেষ নির্মিত হইয়াছে, তাহার সার্থকতা ; এবং তৃতীয় ঃ স্থাপত্যটির সৌন্দর্য। স্থাপত্য নির্মাণের মূল পদ্ধতিও তিনটি। প্রথম ঃ দেয়াল বা স্তম্ভের উপরে অনুভূমিকভাবে ছাদ বসান ; দ্বিতীয় ঃ খিলানের সাহায্যে অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ সংস্থাপন করা ; এই খিলান আবার দুই রকমের— খিলানের উপরাংশ বৃত্তাকারে গড়া, অথবা খিলানের পাশ দুইটি বৃত্তাকারে আসিয়া একটি বিন্দুতে মিলিত। তৃতীয় পদ্ধতি ঃ লোহার ফ্রেম বসাইয়া অট্টালিকা নির্মাণ ; এখানে দেয়াল শুধু পর্দার কাজ করে এবং ফ্রেমকে

ঢাকিয়া রাখে। বিগত শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত প্রথম দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাহার পর হইতে তৃতীয় পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। অতীতে স্থাপত্যের উপাদান ছিল কাঠ, ইট (রোদে শুকানো বা আগুনে-পোড়ানো), চুনা পাথর, বালি পাথর, শ্বেত পাথর ইত্যাদি। কালক্রমে সিমেন্টের ব্যবহার প্রচলিত হয়। বর্তমান যুগে লোহা, ইট, সিমেন্ট, কংক্রিট প্রভৃতির সহিত বহুল পরিমাণে কাচ অ্যালুমিনিয়াম ও নানা পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত বিবিধ বস্তুর ব্যবহার চলিতেছে। অতীতে দেশবিদেশের স্থাপত্যের ধারা, ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য নির্ভর করিত তথাকার আবহাওয়া, সামাজিক চেতনা, বিশেষভাবে ধর্ম ও প্রাপ্ত উপাদানের উপর। প্রসঙ্গতঃ প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, বাইজানটাইন, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বিচিত্র স্থাপত্য-সম্পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্থাপত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এক দেশের বা এক যুগের স্থাপত্য অন্য দেশের বা যুগের স্থাপত্য শিল্পের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; ফলে শেষোক্ত দেশের বা যুগের স্থপতিদের সৃজনী প্রতিভা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। আবার কখনও বা সে প্রভাব শেষোক্ত দেশের বা যুগের স্থাপত্য-শিল্পে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের স্থাপত্য দেশ-বিদেশের ইতিহাসে প্রধানতম উপাদান। প্রাচীন স্থাপত্য বা তাহার ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক দেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সার্থক ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

স্থাপত্য, ভারতীয় ইহার ইতিকথা বহু যুগব্যাপী। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহার বিস্তার। প্রাগৈতিহাসিক অর্থাৎ মহেঞ্জো-দড়ো-হরপ্পার যুগে ভারতীয় স্থাপত্য বেশ উন্নত স্তরের ছিল। গৃহনির্মাণ রীতিতে দেখা যায় সাধারণতঃ অঙ্গনের তিনপাশে পাকশালা, অতিথিশালা ও ভৃত্যাবাস ; শৌচাগার ও স্নানাগার প্রবেশদ্বারের সহিত সন্নিবিষ্ট হইত। গৃহগুলি দ্বিতল এবং দ্বিতলের সবটাই শয়নাগার। জল-বহিষ্কারের প্রণালী ছিল। স্নানাগার খুবই প্রশংসনীয়।

বৈদিক যুগে ঘরবাড়ির বিবরণ খুব সুস্পষ্ট নয়। তবে অনুমান হয়, সাধারণ বাড়ির দেওয়ালগুলি শরের উপর মৃত্তিকার প্রলেপ দিয়া গঠিত হইত। ছাদগুলি তৃণাচ্ছাদিত হইত। তবে বৃহৎ অট্টালিকা, প্রস্তর নির্মিত নগর ও দেওয়ালের উল্লেখও পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শিশুনাগবংশীয় রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে রাজগৃহে একটি শহর—ইহার বিশাল প্রাচীর ও তন্মধ্যস্থ প্রাসাদ-নির্মাণের রীতিকে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের মূল্যবান্ নিদর্শন বলা চলে। বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের অভ্যুদয় প্রায় এই সময়েই হয়। তবে ইহার নিদর্শন কেবলমাত্র স্তম্ভ, স্তূপ বা চৈত্য ও বিহার। সারনাথ হইতে শুরু করিয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের নানা স্থানে স্তম্ভের বহু নিদর্শন মিলিয়াছে। স্তূপ পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি বৌদ্ধ-স্থাপত্য যুগের সাঁচি, ভারহুত, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে যে-সকল অপূর্ব নিদর্শন। বৌদ্ধ-স্থাপত্যশিল্প খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে চরম স্থান অধিকার করিয়া ক্রমে অবনতির দিকে যায়। অতঃপর গুপ্তযুগের স্থাপত্যের অভ্যুদয়। ইহা কোনও ধর্মকে আশ্রয় করিয়া গঠিত হয় নাই। এই স্থাপত্যের আদর্শ প্রায় খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ওড়িশা, খাজুরাহো, রাজস্থান, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর, কোণারক ও পুরীর মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এ সমস্তই আর্য স্থাপত্যের নিদর্শন।

দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য একটি বিভিন্ন রূপ ও ধারা অবলম্বনে গঠিত। ইহার বিস্তার বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এবং কালবিস্তৃতি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে ১৭শ শতাব্দী। এই স্থাপত্যকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। ১. পল্লব (৬০০-৯০০ খ্রী), ২. চোলা (৯০০-১১৫০ খ্রী), ৩. পান্ড্য (১১৫০-১৩৫৫ খ্রী), ৪. বিজয়নগর (১৩৫০-১৫৬৫ খ্রী), ৫. মাদুরাই বা নায়ক (১৫৬৫-১৭০০ খ্রী বা তৎ-পরবর্তী কিছুকাল)। পল্লব স্থাপত্যে রথ, মণ্ডপ ও মন্দিরের কারুকলা দৃষ্ট হয়। চোলা মন্দিরসমূহ একটি নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করে। এগুলি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা প্রাকারে বেষ্টিত। প্রবেশদ্বার পূর্ব প্রাকারের মধ্যদেশে। মণ্ডপগুলি একতলা। ছাদ স্তম্ভের উপর অবস্থিত। চোলাস্থাপত্যে শিখরের উচ্চতায় মন্দিরের প্রাধান্য দেওয়া হইত। পান্ড্য রাজাদের আমলে পূর্বকাল হইতে স্থাপত্যশিল্পে যে প্রভেদ দেখা যায়, তা প্রাকার ও গো-পুরমে প্রকট। গোপুরমে ঋজুভাগ সাধারণতঃ প্রস্তর নির্মিত ও দেবদেবীর মূর্তিভূষিত। শিখরভাগ ইট-চুন ও বালির দ্বারা নির্মিত। বিজয়নগরের স্থাপত্যে স্তম্ভ রচনায় উৎকৃষ্ট ভাস্কর্যশিল্পের পরিচয় আছে। মাদুরার নায়ক রাজাদের রাজত্বকালে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের চরম উন্নতি হয়। মাদুরায় বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির প্রাকারস্থ গোপুরমের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সমসাময়িক রামেশ্বর মন্দিরের বিন্যাসও এই ধরনের। অন্তর্দেশে কালো গ্রানাইট পাথরে ক্ষোদিত সিংহ মূর্তি প্রায় সব

মন্দিরেই দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে আরও অজস্র মন্দির কালজয়ী স্থাপত্য-মহিমায় উজ্জ্বল।

চালুক্যযুগে আইহো, বাদামী প্রভৃতি স্থানে ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে নির্মিত মন্দিরগুলির রীতি মিশ্রিত ভাবের অর্থাৎ কোনওটিতে গুপ্ত স্থাপত্যের প্রভাব, কোওটিতে দাক্ষিণাত্যের পল্লব স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। মহীশূর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এবং সোমনাথপুর, নাকুন্ডা প্রভৃতি স্থানে চালুক্য স্থাপত্যের পরিণত রূপ দেখা যায়। শাস্ত্রে ভারতীয় স্থাপত্যের তিনটি রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ নাগর, দ্রাবিড় ও বেশর। নাগর শিল্পে মূল হইতে শিখর পর্যন্ত চতুষ্কোণ; দ্রাবিড়ে কেবল পাদদেশ অষ্টকোণ বা ষড়্‌কোণ কিন্তু শিখরভাগ চতুষ্কোণ; এবং বেশরে কেবল পাদদেশ বৃত্তাকার।

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যকে কয়েকটি বিশেষ শাখায় বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১. পাঠান রীতি (১১৯৩-১৫৫৪ খ্রী): এই রীতি দেহলি বা তন্নিকটস্থ প্রদেশগুলিতে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ২. যৌনপুর স্থাপত্য (১৩৯০-১৪৭৫ খ্রী)। ৩. গড়মানদা স্থাপত্য (১২০৩-১৫৭৫ খ্রী)। ৪. গুজরাত-আহমদাবাদ স্থাপত্য (১৩৯০-১৫৭৭ খ্রী)। ৫. দক্ষিণ-ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য (১৫৯০-১৬৬০ খ্রী)। ৬. মোগল স্থাপত্য (১৫২৫-১৭৫০ খ্রী) এবং পরবর্তী আরও কিছুকাল। এই সমস্ত মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের নির্মাণকৌশল নানা দিক্‌ দিয়া বহু বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। বিভিন্ন মসজিদ ও এগুলির গম্বুজ ও ছাদ নির্মাণে এই স্থাপত্যের ঐতিহ্য আজও বর্তমান আছে। সূচ্যগ্র খিলান ও জ্যামিতিক ভূষণে সজ্জিত মুসলিম স্থাপত্যের বহির্দৃশ্য সমুজ্জ্বল। বঙ্গদেশে গৌড় ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে-স্থাপত্যের উদ্ভব হয়, তাহা পাঠান রাজত্বের শেষ ভাগ পর্যন্ত প্রচলিত থাকে। এই স্থাপত্যে টেরাকোটা ও বাটালির দ্বারা কাটা ইটের ব্যবহার ছিল। ১৭শ শতাব্দীর শেষ হইতে প্রায় ১৯শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ভারতে যে মুসলিম স্থাপত্য প্রচলিত ছিল তাহার নিদর্শন লখনৌ, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। মোগল স্থাপত্যের বিশেষত্ব প্রথম পর্যায়ে গুজরাত মুসলিম স্থাপত্য হইতে গৃহীত। ইহাতে হিন্দু ভূষণাবলীর প্রয়োগ, খিলান এবং শ্বেত ও লোহিত প্রস্তরের ব্যবহার এবং অর্ধগম্বুজবিশিষ্ট প্রবেশদ্বার প্রভৃতি বিশেষ লক্ষণীয়। মোগল স্থাপত্যের প্রধান দান উদ্যান রচনা-শিল্প। ইহার নমুনা সেকেন্দ্রা, তাজ, কাশ্মীরের শালিমার-উদ্যান প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়।

১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ইঙ্গ-ভারতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব। ইহা যে কেবল মাত্র সরকারী ইমারতেই অবলম্বিত হয় তাহাই নহে, ইংরেজী শিক্ষায় প্রভাবিত ভারতীয়েরাও আপন আবাসভবন নির্মাণেও এই শিল্প গ্রহণ করে। অতি আধুনিক যুগে মার্কিনী স্থাপত্যের অনুকরণে ভারতেও আকাশচুম্বী প্রাসাদসমূহ বিচিত্র-কৌশলে নির্মিত হইতেছে।

শিবচরণ মুখোপাধ্যায়

স্নেহপদার্থ এক দিকে ঘি, মাখন, চর্বি প্রভৃতি এবং কড্‌, হেরিং, হাঙ্গর, হ্যালিবাট প্রভৃতি প্রাণীর লিভার বা যকৃতের তৈল, অপর দিকে তিল, সরিষা, নারিকেল, চিনাবাদাম প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজতৈল সবই স্নেহপদার্থ। সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় থাকিলে ইহাকে চর্বিজাতীয় পদার্থ এবং তরল অবস্থায় থাকিলে তৈল বলিবার রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু রসায়নের মতে স্নেহপদার্থ মাত্রই স্নেহজ অ্যাসিড (ফ্যাটি-অ্যাসিড)-এর গ্লিসেরাইড। স্নেহপদার্থের সঙ্গে কস্টিক সোডা (অথবা কস্টিক পটাশ) মিশাইয়া তাপ দিলে একদিকে গ্লিসেরল, অপরদিকে স্নেহজ অ্যাসিডের সোডিয়াম (অথবা পটাসিয়াম) ঘটিত লবণ, অর্থাৎ সাবান, উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম সাবানভবন। এক গ্রাম ওজনের স্নেহপদার্থ বিশ্লেষণ করিতে কত মিলিগ্রাম কস্টিক পটাশ লাগে, সেই পরিমাপকে সাবান-ভবন-গুণ (স্যাপনিফিকেশন ভ্যালু) বলা হয়। ঘি বা তৈলের বিশুদ্ধতা নিরূপণে এই প্রণালী বিশেষ সহায়তা করে। স্নেহপদার্থ প্রকৃতপক্ষে কয়েক প্রকার গ্লিসেরাইড-এর মিশ্রণ। তৈলে অসম্পৃক্ত স্নেহজ অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকে। এই অসম্পৃক্ত অ্যাসিড আয়োডিন শোষণ করিয়া লইতে পারে। এই জন্য এক শত গ্রাম ওজনের তৈল যে কয় গ্রাম আয়োডিন শোষণ করিতে পারে তাহা হইতে তাহার আয়োডিন শোষণগুণ (আয়োডিন ভ্যালু) নির্ণয় করা হয়। ইহা হইতে তৈলের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা যায়। চিনাবাদাম তৈল (অথবা তুলা-বীজ তৈল) নিকেল অনুঘটকের সাহায্যে হাইড্রোজেনায়িত করিলে তাহা হাইড্রোজেনযুক্ত হইয়া ঘি বা মাখনের মতো গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ এই প্রণালীতে 'ভেজিটেবিল ঘি' তৈয়ারি করা হয়। স্নেহ-জাতীয় খাদ্য জীবদেহে তাপ ও শ্রমশক্তির উৎস। ইহা দেহে মেদ সঞ্চার করিতেও সাহায্য করে, তবে তাহা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ কতটা ইহা পরিপাক করিতে পারে তাহার উপর। কতকগুলি অসম্পৃক্ত স্নেহজ অ্যাসিড দেহে উৎপন্ন হয় না, তাই এগুলি খাদ্যের স্নেহপদার্থের মাধ্যমে দেহে যাওয়া প্রয়োজন; কারণ ইহাদের অভাবে একরকম চর্মরোগ দেখা দেয়। এই জন্য

ইহাদের অত্যাবশ্যক স্নেহজ অ্যাসিড বলা হয়। স্নেহ-জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে এ, ডি, ই, প্রভৃতি (স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়) ভিটামিনগুলিও পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

স্পর্শ ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ অনুভূত হয়। দেহের ত্বক্ আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়স্থান। মাত্রানুভবে স্পর্শ দুই প্রকার: সূক্ষ্ম ও স্থূল। সূক্ষ্ম স্পর্শ দ্বারা মৃদু স্পর্শ, নাতিশীতোষ্ণ অবস্থার পার্থক্য, দেহের কোন্ অংশে স্পর্শ হইয়াছে এবং দুই স্পর্শস্থানের তারতম্য ও ব্যবধান বুঝিতে পারা যায়। স্পর্শের সূক্ষ্মতাবোধ সকল প্রাণীর মধ্যে সমান থাকে না। মানুষের মধ্যেও ব্যক্তি বিশেষে এই অনুভূতির তারতম্য দেখা যায়। স্পর্শ দ্বারা যেমন স্পর্শের তারতম্য অনুভব হয়, সেইরূপ কি বস্তু-দ্বারা স্পর্শ হইয়াছে তাহাও উপলব্ধি করা যায়:— যেমন, সেই বস্তু শীতল কি উষ্ম, তীক্ষ্ম কি ভোঁতা, লম্বা কি গোলাকৃতি ইত্যাদি। ত্বকের মধ্যস্থ বিভিন্ন স্পর্শ-গ্রাহক যন্ত্র (রিসেপ্টর) এইরূপ বিভিন্ন অনুভূতির সঞ্চার করে। যদিচ স্পর্শ-অনুভব বস্তুবিশেষের সংস্পর্শে হয় তথাপি পরিধেয় বস্ত্রাদির সদা স্পর্শ অনুভূত হয় না। এইরূপ অচেতন স্পর্শ আমাদের ত্বক্ হইতে সর্বক্ষণ স্পর্শ অনুভূতি বহন করিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে যায় এবং এই অচেতন স্পর্শের দ্বারা পরিবেশের অস্তিত্ব ও দেহ-ভঙ্গিমার অবস্থান ঠিক করা সম্ভব হয়।

স্পর্শানুভূতি-বাহী নার্ভগুলি সুষুম্নাকাণ্ডের ('সুষুম্নাকাণ্ড' দ্র) পশ্চাৎ শৃঙ্গের কোষগুলির মাধ্যমে মস্তিষ্কে যায়। প্রকারভেদে বিভিন্ন স্পর্শানুভূতির বিভিন্ন নার্ভ-পথ আছে। ইহাদের মধ্যে কিছু গুরু-মস্তিষ্কের (cerebrum) সংবেদী কেন্দ্রে গিয়া শেষ হয় এবং ইহাই স্পর্শ অনুভবের সর্বশেষ স্থান।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়

স্পিনোজা, বারুচ (বেনিডিক্ট) (১৬৩২-৭৭ খ্রী) ওলন্দাজ ইহুদি দার্শনিক। ইহুদি ধর্মের অন্ধ প্রথা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া-ছিলেন। ফলে ইহুদি ধর্মসভা তাঁহাকে ধর্মীয় সংস্থা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সমাজ-পরিত্যক্ত স্পিনোজা তখন আত্মনিয়োগ করিলেন দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায়। তিনি একের পর এক বই লেখেন। তাঁহার লেখা 'এথিক্স', 'পোলিটিক্যাল ট্রীটিজ', 'প্রিন্সিপ্‌ল্‌স অভ্ দি ফিলসফি অভ্ দেকার্ত' প্রভৃতি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা দার্শনিক। তিনি বলেন, ভূমার দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের ফলেই সত্যদর্শন ঘটে; খণ্ডিত দৃষ্টি খণ্ডসত্যের সন্ধান দেয় মাত্র; ভূমাবোধ হইলেই আমরা বাসনার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইব। তাঁহার দর্শনে জগতের স্বরূপ, স্রষ্টা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রভৃতি প্রধান আলোচ্য বিষয়।

সুধীরকুমার নন্দী

স্পেন্সার, হারবার্ট (১৮২০-১৯০৩ খ্রী) বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডারবি শহরে জন্ম। কিছুকাল (১৮৪৮-৫৩ খ্রী) 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার সরকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার মধ্যে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও তত্ত্ববিজ্ঞান প্রধান। তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে সমন্বয়-দর্শন (সিনথেটিক ফিলসফি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে মানবজ্ঞান মাত্রেই আপেক্ষিক। আমাদের সাধারণ জ্ঞান অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন ও সসীম। সুতরাং আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হইতে পারে তাহা এই সান্ত সসীম ও উপাধিবিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চের। অসীম ব্রহ্মকে (দি অ্যাব-সোলিউট) মানবজ্ঞান কখনই জানিতে পারে না। এই ব্রহ্ম কেবলমাত্র 'আছে' এইটুকু বলা চলে, তাহার স্বরূপ লক্ষণ সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদের (এম্-পিরিসিজ্‌ম্) উপরেই এই দর্শনের ভিত্তি এবং পাশ্চাত্য দর্শনে স্পেন্সারীয় দর্শন অজ্ঞেয়বাদ (অ্যাগ্‌নস্টিসিজ্‌ম্) নামে পরিচিত। তাঁহার ক্রমবিকাশ-বাদের (থিয়োরি অভ্ ইভলিউশন) দার্শনিক ব্যাখ্যা এক অপূর্ব অভিনব চিন্তার ধারা প্রবর্তিত করিয়াছে।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ফটিক শিলার একটি সাধারণ খনিজ উপাদান। তাপ ও চাপের তারতম্য অনুসারে সিলিকা পৃথিবী পৃষ্ঠে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন খনিজরূপে কেলাসিত হয়। এই-গুলির মধ্যে কোয়ার্ট্‌স্ বা স্ফটিক অন্যতম ও সর্বপ্রধান। আবার তাপমাত্রা ভেদে এই স্ফটিক দুইটি রূপে দেখা দেয় ১. 'আলফা স্ফটিক'—ইহা ৫৭৩° সেঃ গ্রে. পর্যন্ত স্থায়ী। 'বিটা স্ফটিক'—ইহার স্থায়িত্ব ৫৭৩° সে. গ্রে হইতে ৮৭০° সে. গ্রে.-এর মধ্যে। আল্‌ফা ও বিটা কোয়ার্টস্-এর কেলাস পদ্ধতি পৃথক্। যদিও এই স্ফটিক প্রধানতঃ সিলিকন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত, তথাপি অতি সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহার মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম, লিথিয়াম, লৌহ ইত্যাদির অতিসামান্য উপস্থিতি বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে। অপদ্রব্য হিসাবে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতিই এই স্ফটিকের বিচিত্র বর্ণের কারণ। শুদ্ধ স্ফটিক সাধারণতঃ বর্ণহীন; কিন্তু হলুদ, বাদামী, ধূম্র ও বেগুনী বর্ণের

কোয়ার্টস্‌ও দুর্লভ নহে, শেষোক্ত কোয়ার্টস্‌কে 'এমেথিস্ট' নামে চিহ্নিত করা হয়। উপযুক্ত পরিবেশে সৃষ্ট হইলে কোয়ার্টস্ সাধারণতঃ ষট্‌পার্শ্ব বিশিষ্ট কেলাসের মূর্তিতে দেখা দেয় এবং ইহার শিখরাকৃতিটি প্রায়ই অতিমাত্রায় পরিস্ফুট হয়। স্ফটিকের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫১। চাপ বিদ্যুৎ গুণের (Piezo electricity) আধার বলিয়া স্ফটিক বেতার যন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোয়ার্টস্ বা স্ফটিক প্রধানতঃ আগ্নেয়-শিলার শিরার মধ্যে বৃহৎ আকারে কেলাসিত হইয়া থাকে। বিহারে অভ্রের খনি অঞ্চলে এইরূপ কোয়ার্টস্‌-এর শিরা প্রচুর দেখা যায়। নদীতীরবর্তী ও সমুদ্র সৈকতের বালুরাশির উপাদান প্রধানতঃই কোয়ার্টস্ কণা। যদি এইরূপ বালুকা বিশুদ্ধ কোয়ার্টস্ হয় তাহা হইলে তাহা কাচ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত কোয়ার্টস্ 'ঘর্ষণকারী পদার্থ' (abrasive) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়।

মিহির বসু

স্ফোটবাদ বর্ণের অতিরিক্ত ও বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য অর্থের প্রত্যায়ক নিত্য শব্দকেই স্ফোট বলে। স্ফোটত্ব বলিতে অর্থপ্রকাশকত্বকে বুঝায়। 'গো' এইরূপ ধ্বনি হইলে তাহা হইতে প্রতিধ্বনির ন্যায় অন্য একটি নিঃশব্দ শব্দ জন্মে ; ঐ সূক্ষ্ম 'গো' শব্দই স্ফোট এবং ইহা নিত্য। ইহারই সামর্থ্যে পশুবিশেষের প্রতীত হয়। বাক্যস্ফোট এক ও অখণ্ড। শাব্দিকগণের মতে ইহাই অক্ষর, আত্মা, পরা সত্তা বা শব্দব্রহ্ম। ইহা নিত্য ও অনাদি এবং ইহাই সমগ্র জগতের উদ্ভবস্থল।

অক্ষর ব্রহ্ম হইতে শ্রবণযোগ্য শব্দ পর্যন্ত চারিটি স্তর স্বীকৃত হইয়াছে—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থা পরা, ইহার স্থান মূলাধার ; এতৎপরবর্তী অবস্থা পশ্যন্তী, ইহার স্থান নাভি। পরা ও পশ্যন্তী উভয়ই সূক্ষ্ম স্ফোট। এতদপেক্ষা স্থূলতর অবস্থা মধ্যমা, ইহার স্থান হৃদয়। মধ্যমার নাদাংশই আন্তরস্ফোট, ইহা মনোমাত্রগোচর। শব্দের স্থূলতম অবস্থা বৈখরী, ইহা বাহ্যস্ফোট এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

স্ফোট প্রধানতঃ দ্বিবিধ—ব্যক্তিস্ফোট ও জাতিস্ফোট। তবে ইহাদেরও আবার নানা ভেদ আছে। সমস্ত মিলাইয়া ব্যাপক অর্থে স্ফোট অষ্টবিধ। শব্দব্রহ্মই পরা বাক্। পশ্যন্তী প্রভৃতি শব্দব্রহ্মেরই বিবর্ত। শব্দব্রহ্মের উপাসনার দ্বারাই পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

স্বদেশী আন্দোলন লর্ড কার্জনের ভেদনীতি অনুসারে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ সরকারিভাবে কার্যকর হইলে তাহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশব্যাপী যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলন বলিতে সংক্ষেপে তাহাকেই বুঝায়। কিন্তু ইতিহাস ও তাৎপর্যের দিক্ হইতে অন্ততঃ হিন্দুমেলায় ইহার সূত্রপাত।

প্রধানতঃ ঠাকুরবাড়ির দেবেন্দ্রনাথ ও গণেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে এবং রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার প্রথম অধিবেশন হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্রসংক্রান্তির দিন (১৮৬৭ খ্রী, ১২ এপ্রিল)। হিন্দুমেলার দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন '...যাহাতে আত্মনির্ভরতা ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার উদ্দেশ্য।' স্বদেশীশিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সংগীতের চর্চা, শরীরচর্চা প্রভৃতি সম্পর্কেও উদ্যোক্তাগণ উৎসাহী ছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করিয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২ খ্রী), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫ খ্রী), স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো কীর্তি (১৮৯৩ খ্রী) ও অন্যান্য বক্তৃতা, ভবানীপুরে ভাগবত চতুষ্পাঠী (১৮৯৫ খ্রী), সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' পত্রিকা (মার্চ, ১৮৯৭ খ্রী), কার্তিকচন্দ্র নাথের ভবনে ব্রহ্মবান্ধবের বিদ্যালয় (পরবর্তীকালে সারস্বত আয়তন), শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম (ডিসেম্বর, ১৯০১ খ্রী), ডন সোসাইটি (জুলাই, ১৯০২ খ্রী)। স্বদেশী আন্দোলনের অনুষঙ্গরূপে দেখা দিল রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয় (৮ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রী) ; তৎসহ যুক্ত হইল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার্থে রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের উদ্দীপ্ত ভাষণ ও এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি (৯ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রী) এবং কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা (১১ মার্চ, ১৯০৬ খ্রী)। (abrasive)

স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত সূত্র যে বঙ্গচ্ছেদ তাহা একযোগে বাঙ্গালীকে ব্যথিত এবং উদ্দীপিত করিয়াছিল। দেশভাগের জন্য বেদনা এবং ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া জাতির জীবনে নবশক্তির অভ্যুদয়কে বরণ করিয়া লইবার জন্য আবেগদীপ্ত উৎসাহ স্বদেশী আন্দোলনকে সম্ভব করিয়াছিল। এই উপলক্ষে অরন্ধন, রাখীবন্ধন ও গঙ্গাস্নান, তৎসহ এই প্রসঙ্গে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সংগীত গাহিয়া গাহিয়া পরিক্রমা সেদিন সারা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ আগস্ট টাউনহলের বিশাল জনসভায় সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের পোশাক বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে দেশব্যাপী বয়কট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। লবণ, চিনি ও মনোহারী দ্রব্য বর্জনের উৎসাহে দোকানে, বাজারে পিকেটিং শুরু হইল। পূর্ববঙ্গের

মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে এই সব আন্দোলন তেমন জমাট না বাঁধিলেও বয়কট-আন্দোলন সফল হইল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সার্কুলার জারি করিয়া স্কুল কলেজের প্রধানগণকে জানাইয়া দিল, রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান হইবে ছাত্রদের পক্ষে অপরাধ। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বরে তাই এক অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপিত হইল। এই প্রসঙ্গে তরুণ নেতা রমাকান্ত রায় ও শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর নাম স্মরণীয়।

বঙ্গচ্ছেদ-আন্দোলন স্বাধীনতালাভের সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' দৈনিক (১৯০৪ খ্রী), রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের অর্থ-সাহায্যে প্রকাশিত অরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' (১৯০৬ খ্রী), সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' (মার্চ, ১৯০৬ খ্রী) পত্রিকার দান স্বদেশী আন্দোলনে অবিস্মরণীয়। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের 'অ্যাব্‌সলিউট অটোনমি ফ্রী ফ্রম ব্রিটিশ কন্‌ট্রোল' প্রবন্ধটি স্বাধীনতার নূতন বাণী শুনাইল।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

স্বপ্ন আমরা সকলেই দেখি এবং আমাদের স্বাভাবিক ব্যবহারের অঙ্গ হিসাবে স্বপ্নকে মনোবিদ্যার বিষয়সূচীতে দেওয়া হইয়াছে। তবে কেহ কেহ বলেন যে, মানুষের অস্বভাবী ব্যবহারবিধির প্রকাশ ঘটে স্বপ্নের মাধ্যমে।

আদিম মানুষেরা বিশ্বাস করিতেন যে, স্বপ্নের মাধ্যমেই দেবতা ও মৃত পূর্বপুরুষেরা জীবিতদের সহিত কথাবার্তা বলেন ও উপদেশাদি দেন। আবার এমন ধারণাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে স্বপ্নে আত্মা আপন আপন দেহ ত্যাগ করিয়া অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করে এবং ইহার ফলে ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে তাহার সংকেত পাওয়া যায় স্বপ্নের মধ্য দিয়া। এই ধরনের বিশ্বাস আজিও কোনও কোনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে রহিয়াছে। মনঃসমীক্ষণ-তত্ত্বের প্রবক্তা ফ্রয়েড বলেন যে মানুষের অবদমিত যৌন ইচ্ছাই নানা ছদ্মবেশে স্বপ্নে প্রকাশ পায়। অহম্ (ego) -এর কঠিন প্রহরা এড়াইবার জন্যই অবদমিত যৌন ইচ্ছার এই ছদ্মবেশ। অদস্ (Id) হইল এই অবদমিত যৌন ইচ্ছার বাসগৃহ। অদস্ হইতে অবদমিত যৌন ইচ্ছা স্বপ্নে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেন যে সংক্ষিপ্তকরণ, অপসারণ, প্রতীকীকরণ ও গৌণ রূপারোপ হইল স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার মূলসূত্র। তবে স্বপ্নদর্শনের ভিত্তি হিসাবে একমাত্র যৌনবোধের উপর ফ্রয়েড যে জোর দিয়াছেন, তাহা সকল মনোবিজ্ঞানী মানেন না। ('ফ্রয়েড, সিগ্‌মন্ড' দ্র)

সুধীরকুমার নন্দী

স্বভাববাদ স্বভাববাদ বলিতে বুঝায় প্রাকৃতিক জড়সত্তার নিরপেক্ষ ও স্বয়ম্ভূ অস্তিত্বের তত্ত্বকে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর চূড়ান্ত সত্যতাকে এবং প্রান্তিক প্রাকৃত সত্যের স্বনির্ভরতাকে। স্বভাববাদে আত্মার স্থান নাই, যে সত্য ইন্দ্রিয়গোচর নয় সে সত্য স্বভাববাদে স্বীকৃত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপে যে স্বভাববাদের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল তাহার দুইটি রূপ ঃ ১. ডগ্‌ম্যাটিক স্বভাববাদ, যাহাকে 'বিশুদ্ধ স্বভাববাদ' বলিতে পারা যায় ; ইহাকে (জড়বাদ) বা 'মেটারিয়ালিজম' আখ্যাও দেওয়া হয়। ২. নিরীশ্বরীয় স্বভাববাদ বা Agnostic Naturalism ; এই ধরনের ঈশ্বরতত্ত্বে অবিশ্বাসী স্বভাববাদকেই অধিকাংশ পণ্ডিতেরা যথার্থ স্বভাববাদ আখ্যা দিয়াছেন, ইহাকে আবার বৈজ্ঞানিক স্বভাববাদও বলা হয়। জড়বাদী দর্শনে অর্থাৎ প্রথমোক্ত স্বভাববাদে আত্মাকে বলা হয় জড়কণার রূপান্তর মাত্র। নিরীশ্বরীয় স্বভাববাদে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীর প্রাকৃত জগতের বাহিরে যদি কোনও অতি-প্রাকৃত সত্তা থাকে তাহা হইলে সেই সত্তার আলোচনা স্বভাববাদীদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। ভারতীয় দর্শনের লোকায়ত দর্শন-শাখা এই স্বভাববাদের এলাকার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। জড়বাদী চার্বাক দর্শনের মতকে ডগ্‌ম্যাটিক ন্যাচারালিজমের রূপভেদ বলা যাইতে পারে। চার্বাকদের এক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষবাদী এবং আর এক সম্প্রদায় অনুমানবাদী। সম্প্রদায় হিসাবে চার্বাকেরা জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। ইঁহারা কোন অপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করেন নাই। অবশ্য, কান্ট, গ্রীন প্রভৃতি দার্শনিকেরা স্বভাববাদীদের পরিকল্পিত প্রাকৃত সত্তার মধ্যে অনুস্যূত বিধিবদ্ধতা ও ক্রমপর্যায়ের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়া মনকে স্বীকার করার কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক স্বভাববাদের (সাইকলজিক্যাল ন্যাচারালিজ্‌ম্) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মতবাদ ডার্‌উইনের বিবর্তনবাদ ও মায়ারের অবচেতন মানসতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুধীরকুমার নন্দী

স্বরাজ ইহার অর্থ স্বায়ত্তশাসন এবং ইহার ধারণাটি দাদাভাই নৌরজীর কল্পনাতেই প্রথম আসে (১৮৯৯ খ্রী)। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়াই তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক্‌টি দেখিয়াছিলেন। 'স্বায়ত্তশাসন' তাঁহার মতে দেশের দুঃখ যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিষেধক। বালগঙ্গাধর টিলক ইহার উপর রাজনৈতিক রূপ আরোপ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। মহাত্মা গান্ধী স্বরাজের ধারণাটিকে আরও বৃহত্তর পরিধিতে দেখেন। তিনি ইহার একটি নৈতিক রূপও দেন। তাঁহার মতে সত্যাগ্রহ ('সত্যাগ্রহ' দ্র) এবং সর্বোদয়ের ('সর্বোদয়' দ্র) যোগফল হইল স্বরাজ।

মহাত্মা গান্ধীর স্বরাজ-চেতনা ও সর্বোদয় (সকলের মঙ্গল) সম্বন্ধে এই যে নূতন ধারণা, ইহাই ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশিষ্ট মহিমা যোগ করে। তাঁহার মতে মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক সত্তার গভীরেই এই স্বরাজ-বোধ স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ইহাই ক্রমশঃ চরম রাষ্ট্রীয় শক্তির দাবিতে বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি ও স্বায়ত্তশাসন কামনা করে। তিনি ঘোষণা করেন 'কোনও সুশাসনই স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হইতে পারে না'। রাজনৈতিক দর্শনে এমন অপূর্ব বাঙ্ময় বাণী কেহ কখনও ভাবিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ঘোষণায় 'সৎ সরকার স্বায়ত্তশাসনের কোনও বিকল্প নয়'—বোধহয় রাজনৈতিক দর্শনের চিরকালের ইতিহাসের সর্বোত্তম ঘোষণা।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

স্বরাজ্য পার্টি ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আইনসভা প্রবেশ সম্পর্কে কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিলে কারামুক্তির পর চিত্তরঞ্জন স্পষ্টতই ইহার পক্ষে যুক্তি দিতে থাকেন ('চিত্তরঞ্জন দাশ' দ্র)। কিন্তু গয়া কংগ্রেসে, বিধান পরিষদ প্রবেশ সম্বন্ধে তাঁহার সমর্থিত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। চিত্তরঞ্জন তৎক্ষণাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতির এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সাধারণ কর্মসচিবের পদ ত্যাগ করেন। পদত্যাগ করার পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরু স্বরাজ্যদল গঠন করেন। প্রথমে নাম হইয়াছিল কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্যদল; কিন্তু শীঘ্রই 'কংগ্রেস খিলাফৎ' শব্দ দুইটি বর্জিত হয়। এই সংখ্যালঘু স্বরাজ্যদলের প্রচারভার গ্রহণ করেন উত্তর ভারতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়, অবশিষ্ট ভারতে স্বয়ং চিত্তরঞ্জন। কলিকাতায় 'বাংলার কথা' নামে সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় এক দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইল। মাদ্রাজে তামিল দৈনিক 'স্বদেশ মিত্রম্', পুণাতে মারাঠী 'কেশরী' স্বরাজ্যদলকে সমর্থন করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি চিত্তরঞ্জনের অভিমত সমর্থন করে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫মে হইতে ২৮মে বোম্বেতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় চিত্তরঞ্জন সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। এই বৈঠকে স্বরাজ্যদলের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য বন্ধের নির্দেশ থাকে। কিন্তু স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের নামে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার অধিকার পায় না। এদিকে বাংলা স্বরাজ্যদল বাংলায় ব্রিটিশ দ্বৈতশাসন বানচাল করিয়া দেয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতেও স্বরাজ্যদল অসামান্য সাফল্য লাভ করে। বাংলায় যেমন নেতৃপদে ছিলেন চিত্তরঞ্জন, কেন্দ্রীয় সভাতে তেমনি মতিলাল নেহরু। শুধু তাহাই নহে, স্বরাজ্যদলের শক্তিতেই বিঠলভাই প্যাটেল ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি লখ্নৌ-এ স্বরাজ্যদলের বৈঠক বসে, সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন। স্বরাজ্যদলের কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ১. রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি; ২. দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, ৩. দায়িত্বশীল প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী; ৪. মন্ত্রীদের বেতন নামঞ্জুর অথবা হ্রাস; ৫. প্রয়োজনে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপন; ৬. বাজেট নামঞ্জুর করা; ৭. কেবল জাতীয় দাবী স্বীকৃত হইলেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ। বাংলায় এই কার্যসূচী যেভাবে অনুসরণ করা হয় তাহার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁহাদের একমাত্র হাতিয়ার দমনমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করিলেন ২৫ অক্টোবর, চিত্তরঞ্জন ও স্বরাজ্যদলকে কাবু করিবার জন্য। বাংলা এক বিরাট ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া গেল এবং গ্রেপ্তারে, তল্লাসীতে বহুগৃহ তছনছ হইয়া গেল। এইভাবে স্বরাজ্যদল সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন চেতনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু স্বরাজ্যদলের এইসব ক্রিয়াকলাপ গান্ধীজীর মনঃপূত ছিল না। চিত্তরঞ্জন এবং মতিলাল জুহুতে তাঁহার সহিত দেখা করিয়াও তাঁহাকে মতে আনিতে পারেন নাই। তখন বাধ্য হইয়া চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল এক যুগ্ম বিবৃতি প্রকাশ করেন। অপর পক্ষে গান্ধীজীও কংগ্রেসের প্রধান স্রোত তাঁহার পথানুসারী করিতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ জুন আমেদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক বসে তাহাতে গান্ধীজীর সহিত মতভেদ ঘটায় স্বরাজীরা সদলে সভাস্থল ত্যাগ করেন এবং চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এদিকে বাংলায় স্বরাজ্যদলের অসামান্য সাফল্য, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে যেমন ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, জনমত তেমনি স্বরাজ্যদলের অনুকূল হইতেও থাকে। এইবার গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়, স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের হইয়া বিধান পরিষদে কাজ চালাইয়া যাইবে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ নভেম্বর বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এই যুক্ত বিবৃতি সমর্থিত হয়। এতদিনে স্বরাজ্যদলের কাজ কংগ্রেস গ্রহণ করে।

এই স্বরাজ্যদলের উদ্যোগে শুধু বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক সভা নয়, কলিকাতা কর্পোরেশনের মত বৃহত্তম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানও কংগ্রেসের দখলে আসে। প্রথমে চিত্তরঞ্জন ইহার মেয়র হন এবং সুভাষচন্দ্র বসু এক্জিকিউটিভ অফিসার হন। বাংলার স্বরাজ্যদলের সাধারণ

সম্পাদক ছিলেন কিরণশংকর রায়। চিত্তরঞ্জন স্বয়ং 'ফরওয়ার্ড' নামে একটি ইংরেজী দৈনিক প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহাই ছিল স্বরাজ্যদলের মুখপাত্র। অবশেষে চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের পর গান্ধীজী সুস্পষ্টভাবে স্বরাজ্যদলের প্রশংসা করেন এবং দেশবন্ধুর কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

পুলকেশ দে সরকার

স্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ মর্মজ্ঞ পার্ষদ। পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য। নবদ্বীপে মাতামহ জয়রাম চক্রবর্তীর গৃহে জন্ম। পিতা ভিটাদিয়া নিবাসী পদ্মনাভ আচার্য (লাহিড়ী) বারাণসীতে মাধবেন্দ্রপুরীর গুরু লক্ষ্মীপতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পুরুষোত্তমের পরিচয় ছিল। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসগ্রহণের পর পুরুষোত্তম নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গিয়া দণ্ডীসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হন, নাম হয় স্বরূপদামোদর। পরে নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ লীলাসহচর হন। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় তিনি দিবারাত্রি পার্শ্বচররূপে সযত্ন দৃষ্টি, সতর্ক প্রহরা ও অতন্দ্র সেবায় মহাপ্রভুর তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বরূপ সুকণ্ঠ সংগীতজ্ঞ, রসজ্ঞ ও মর্মজ্ঞ ছিলেন। ভাববিহ্বল বিরহোন্মত্ত শ্রীচৈতন্যকে তিনি জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদাবলী গান করিয়া শুনাইতেন, বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ও রায় রামানন্দের নাটকাদি আস্বাদ করাইতেন। স্বরূপ আগে শুনিয়া অনুমোদন না করিলেও কোনও সংগীত, শ্লোক, কাব্য, নাটক মহাপ্রভু শুনিতেন না। মহাপ্রভুর মর্মীভক্ত বা পাত্র ছিলেন সাড়ে তিনজন—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাইতি এই তিন জন এবং শিখির ভগিনী মাধবী দাসী অর্ধজন। মহাপ্রভু নীলাচলে স্বরূপদামোদরকে রঘুনাথদাসের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর স্বরূপ বৃন্দাবনে বাস করেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনী তিনি সূত্রাকারে সংস্কৃতে রচনা করেন। গ্রন্থখানি স্বরূপদামোদরের কড়চা নামে খ্যাত, অধুনালুপ্ত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থে স্বরূপদামোদরের কড়চার কয়েকটি শ্লোক রক্ষিত। মহাপ্রভুর মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলা বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বহু তথ্য স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কবি কর্ণপুরের 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় স্বরূপদামোদরকে বৈষ্ণব পঞ্চতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে।

মদনমোহন কুমার

স্বর্ণ (রাসায়নিক চিহ্ন Au) পরমাণুক্রমাঙ্ক ৭৯. পরমাণুগুরুত্ব ১৯৭.২ আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯.৩২। বিশিষ্ট উজ্জ্বল, হরিদ্রাভ, তাপ ও বিদ্যুৎপরিবাহী এই ধাতুর গলনাঙ্ক ১০৬৩° সে. গ্রে. এবং স্ফুটনাঙ্ক ২৮০৯° সে. গ্রে.। ইহা নমনীয় অথচ অভঙ্গুর ; ফলে ইহাকে অতি পাতলা চাদরে পরিণত করা যায়। ইহা মৌলাবস্থায় অ্যালুভিয়াল (alluvial) বালুকণার সহিত পাওয়া যায়। ভারতের মহীশুর, উত্তর-আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়ায় স্বর্ণখনি আছে।

আকরিকে স্বর্ণ অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে থাকার ফলে উহাতে প্রথমে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের অনুপাত বর্ধিত করা হয়। অতঃপর তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে স্বর্ণ নিষ্কাশিত করা হয়। স্বর্ণ কোনও অম্লে দ্রবীভূত হয় না। কেবলমাত্র একোয়ারিজিয়াতে (৩ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ১ ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ) দ্রবীভূত হয়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ অত্যন্ত নরম বলিয়া তামা ও রৌপ্যঘটিত সংকর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা ক্যারট (carot) এককে প্রকাশ করা হয়—যথা ৯, ১২, ১৫, ১৮ ও ২২। বিশুদ্ধ স্বর্ণ ২৪ ক্যারট। মুদ্রা হিসাবে স্বর্ণের ব্যবহার বর্তমানে অপ্রচলিত। অলংকার হিসাবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রী)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১০ম সন্তান। বিবাহ ১৮৬৭ খ্রী ; স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। দেশনেত্রী সরলা দেবী ইঁহার কন্যা।

বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণকুমারীকেই প্রধান মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রথম বলা যায়। 'দীপ নির্বাণ' (১৮৭৬ খ্রী), 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯ খ্রী), 'মালতী' (১৮৮০ খ্রী), 'কাহাকে' (১৮৯৮ খ্রী), 'হুগলির ইমামবাড়ি' (১৮৮৮ খ্রী), ইত্যাদি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস। উপন্যাস ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বর্তমান। বাংলাভাষায় তিনি বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন ; এই প্রবন্ধগুলি 'পৃথিবী' (১৮৮২ খ্রী) পুস্তকে প্রকাশিত হয়। সংগীত-রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তাঁহার মুদ্রিত গ্রন্থ-সংখ্যা ত্রিশোধর্ব। কয়েকটি গ্রন্থ বিদেশীভাষাতেও অনূদিত।

স্বর্ণকুমারী ১৮৮৪ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহুবিধ সমাজহিতকর ও নারীকল্যাণকর কার্যের সহিত যুক্ত ছিলেন।

তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন'-এর (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রথম মূল মহিলা সভানেত্রী হন। ১৯২৭

খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী পদক দিয়া সম্মানিত করেন।

আশাপূর্ণা দেবী

স্বর্ণময়ী দেবী (১২৩৬-১৩০৪ বঙ্গাব্দ) বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে জন্ম। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় (১২৪৭ বঙ্গাব্দ)। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া বিপুল কাশিমবাজার রাজ এস্টেটের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তখন হইতেই দানশীলতা এবং জনহিতকর কার্যের জন্য বিখ্যাত হন। তাঁহার বিবিধ দানের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। বহরমপুরে জলের কল প্রতিষ্ঠাকালে এবং কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী নিবাস (স্বর্ণময়ী হস্টেল) নির্মাণের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা করিয়া দান করেন।

বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজ, ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুল, এবং ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান সভা তাঁহার দানে পুষ্ট। বর্তমান বটানিক্যাল গার্ডেন এবং বি. ই. কলেজের সমস্ত জমি মহারানী স্বর্ণময়ীর দান। মাইকেল মধুসূদনের অর্থকষ্টের সংবাদ পাইয়া তিনি তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মারফৎ অর্থ সাহায্য করেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সি. আই. (ক্রাউন অভ্‌ ইণ্ডিয়া) উপাধিতে ভূষিতা হন।

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

স্বর্ণমান যে কারেন্সি বা চল্‌তি মুদ্রাব্যবস্থায় মানমুদ্রার (স্ট্যাণ্ডার্ড কয়েন) উপাদানে স্বর্ণের পরিমাণ আইনদ্বারা নির্দিষ্ট থাকে তাহা স্বর্ণমান। স্বর্ণমানে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অপর কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থা-বিহিত মুদ্রার (লিগ্যাল টেণ্ডার) পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে বা নির্ধারিত মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে স্বর্ণমান দেশসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় মূল্যের একটা স্থিরতা থাকে এবং এই বিনিময় মূল্যের উত্থান-পতন স্বর্ণের রপ্তানি ও আমদানি খরচের (গোল্ড পয়েন্টস্‌) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে স্বর্ণের অবাধ আমদানি ও রপ্তানি স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য। তবে স্বর্ণমান দেশসমূহেও চল্‌তি মুদ্রারূপে স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার সব সময় দেখা যায় না।

ইংল্যাণ্ডে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আইনদ্বারা স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের বিভিন্ন দেশেও ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রী) সকল দেশেই স্বর্ণমান লোপ পায়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড আইনদ্বারা ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেও ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

১৯৩৯-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সকল দেশের মুদ্রামান ভাঙিয়া পড়ে। বিশ্বের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রাবিনিময় ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমেরিকায় মিত্রপক্ষের জাতিসমূহ বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ড) গঠন করে (১৯৪৪ খ্রী)। কিন্তু ইহাতেও স্বর্ণমান স্থাপিত হইতে পারে নাই, কারণ মার্কিন ডলার ব্যতীত অপর কোনও মুদ্রাই স্বর্ণে পরিবর্তনীয় ছিল না। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ আগস্ট, এক ঘোষণাদ্বারা ডলার স্বর্ণে পরিবর্তিত হওয়ার সুবিধা বাতিল হওয়ায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় তথা আর্থিক জগৎ এক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন।

অনাথবন্ধু দত্ত

স্মৃতি স্মৃতির অর্থ স্মরণপটে ধরিয়া রাখা। পূর্বে লব্ধ কোনও অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করাকে আমরা সাধারণতঃ স্মৃতি আখ্যা দিয়া থাকি। অতএব স্মৃতি বলিতে ধৃতি ও পুনরুদ্রেক দুই অর্থই বুঝায়। স্মৃতিকে এই পুনরুদ্রেক অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম্‌ জেম্‌স্‌। দার্শনিক বের্গসঁ পুনরাবৃত্ত স্মরণক্রিয়াকে অভ্যাসগত স্মরণক্রিয়া বলিয়াছেন এবং বৌদ্ধিক স্মরণক্রিয়াকে যথার্থ স্মৃতিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

স্মৃতির নানা রূপ আছে। কেহ কেহ অপরের মুখ কখনও ভোলেন না, সুতরাং ইঁহাদের লোক চিনিতে ভুল হয় না। কেহ বা নাম ভুল করেন না, আবার কেহবা স্থান ও কাল সম্বন্ধে সঠিক তথ্যগুলি মনে রাখিতে পারেন। মনোবিজ্ঞান বলে যে বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অনুরাগ ও আগ্রহের তারতম্য থাকার জন্যই মনে রাখার ব্যাপারে এইরূপ পার্থক্য ঘটে। স্মৃতির মূলে আছে ধারণক্রিয়া, পুনরুদ্রেক ও প্রত্যভিজ্ঞা। ধারণ ও পুনরুদ্রেক ক্রিয়া মূলতঃ নির্ভর করে—মস্তিষ্কের প্রখরতা, পুরাতন অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টতা, এবং স্মৃতি ঘটনার বারবার সংঘটন ও সাম্প্রতিককালে ঘটনাটি ঘটার উপর। এতদ্ব্যতীত মনোযোগ, অনুরাগ ও স্মরণ করার ইচ্ছার উপরেও স্মৃতি বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল।

সুধীরকুমার নন্দী

স্মৃতিশাস্ত্র ‘স্মৃতি’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘যাহা স্মৃত হয়’; ইহা শ্রুতি (যাহা শ্রুত হয়) বা বেদ হইতে স্বতন্ত্র। খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক দুই শতকের মধ্যে রচিত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বিংশতি ধর্মশাস্ত্রকারের নাম আছে (‘ধর্মশাস্ত্র’ দ্র)। স্মৃতিকারদের মধ্যে মনু

সম্ভবতঃ প্রাচীনতম ; মনুস্মৃতির বর্তমানরূপের রচনা বা সংকলন আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে হইয়া থাকিবে। স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বর্ণাশ্রমধর্ম। ইহাকে আচার, প্রায়শ্চিত্ত, ব্যবহার ও রাজধর্ম এই চারিটি প্রধানভাগে বিভক্ত করা যায়। আচার অংশে মনু অন্যান্য নানা বিষয়ের সহিত বিবাহের প্রকারভেদ ও বিবাহবিধির কথাও বিস্তারিতভাবে লিখিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে নিন্দিত কার্যজনিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্তের কথা আছে। ব্যবহার অর্থাৎ আইনকানুনের ব্যাপারে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র ব্যবহারাধ্যায় অত্যন্ত প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয়। বিজ্ঞানেশ্বরকৃত ইহার 'মিতাক্ষরা' টীকা দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের সর্বত্র প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত। বঙ্গদেশে জীমূতবাহনকৃত 'দায়ভাগ' এই ব্যাপারে অনুসৃত হইত। ব্যবহারাধ্যায়ে বিচার-পদ্ধতি, বিভিন্ন অপরাধ ও তজ্জন্য শাস্তি প্রভৃতিও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। রাজধর্ম প্রকরণে রাজার কর্তব্যাকর্তব্য, দূত, গুপ্তচর, মন্ত্রী, রাজস্ব, দুর্গ, ব্যূহ, যুদ্ধসংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রভৃতি বিষয়ের এবং রাজনীতি প্রসঙ্গের আলোচনা আছে। এতদ্ব্যতীত এই অংশে অস্ত্রবিষয়ে নির্দেশ আছে। যুদ্ধে কাহারা অবধ্য তাহারও উল্লেখ আছে ; যথা—রথ হইতে অবতরণপূর্বক ভূমিস্থিত, ক্লীব, কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশ, বর্মহীন, আত্মসমর্পণকারী, উপবিষ্ট, সুপ্ত, নগ্ন, অস্ত্রহীন, অপরের সহিত যুদ্ধরত, দর্শক, ভগ্নায়ুধ, আর্ত, গুরুতররূপে আহত, ভীত ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ এইরূপ ব্যক্তিরা। মূলস্মৃতির বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যার ফলে ভারতের নানা অঞ্চলে স্মার্তনিবন্ধের উদ্ভব হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রঘুনন্দনের ('রঘুনন্দন ভট্টাচার্য' দ্র) স্মৃতি-নিবন্ধগুলি। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে তাঁহার স্মার্তনির্দেশ অদ্যাপি প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত হয়। মনুস্মৃতিতে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হইলেও নারীকে খুবই উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হক, ফজলুল আবুল কাশেম (১৮৭৩-১৯৬২ খ্রী) জন্ম বরিশালের সাতুরিয়া গ্রামে। পিতা বরিশালের আইনজীবী ওয়াজেদ আলী। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে এক কাবুলীওয়ালা যুবক যখন প্রত্যেককেই পাঞ্জায় পরাস্ত করিতেছিলেন তখন ফজলুল হক সেই কাবুলীওয়ালাকে পরাস্ত করেন। এই পরাজিত কাবুলীওয়ালাই নাকি তাঁহার নাম দেন 'শের-এ-বঙ্গাল' (বাঙ্গালার বাঘ)। বিভাগীয় বৃত্তিসহ তিনি এনট্রান্স ও এফ. এ. পাশ করেন। এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গণিত, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা এই তিন বিষয়েই প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেন (১৮৯৪ খ্রী)। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণিতে এম. এ. পাস করেন। তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ছাত্র গণিতে এম. এ.। বি. এল. পাশ করিয়া সাংবাদিকতা ও বরিশাল রাজেন্দ্রকলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ওকালতি আরম্ভ করেন। জীবনের প্রথম মোকর্দমায় জয়ী হইলে মক্কেলের কাছে ফি বাবদ প্রাপ্য পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে মক্কেলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন ; কারণ, এই মক্কেল তাঁহার পিতার মক্কেল ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটির চাকরি গ্রহণ করেন ও পরে বাংলা, বিহার, ওড়িশার সহকারী কো-অপারেটিভ রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অশ্বিনী দত্ত তাঁহাকে এই সরকারী গোলামি করিতে দেখিয়া নিন্দা করিলে তিনি পদত্যাগ করিয়া আবার ওকালতি শুরু করেন। অতঃপর দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি কংগ্রেসেও যোগ দিয়াছিলেন। অবশ্য মুসলিম লীগে যোগ দিয়া তিনি বাংলার প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হন। ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়া তিনি অনেক উচ্চ পদ পান। এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের রাজ্যপালও হন (১৯৫৬ খ্রী)।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হজ ইসলামধর্মানুযায়ী তীর্থদর্শন। ইহা মুসলিমদের অতি অবশ্য পালনীয় কর্ম। তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরানের মতে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তি জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কার অন্তর্ভুক্ত কাবা গৃহে বা মসজিদে হজক্রিয়া সম্পাদন করিতে যাইবে। 'কোরান শরীফ'-এ হজের উদ্দেশ্য ও বিধিনিষেধ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চান্দ্রমাস জুল-হিজ্জর প্রথম পক্ষে এই হজক্রিয়া সাধন করিতে হয় এবং মক্কা শহরে পৌঁছিবামাত্র প্রতিটি মুহরিম বা পবিত্র তীর্থযাত্রীকে ইহরাম বা পবিত্র বেশ পরিধান করিয়া 'উম্‌র বা কাবা দর্শন করিতে হইবে। সে সাতবার কাবা প্রদক্ষিণ করিবে এবং স্বফা ও মরউঅ পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাতবার দ্রুতবেগে ধাবিত (সু'য়) হইবে। তারপর ইচ্ছা করিলে সে ক্ষৌরকার্য সমাধা করিয়া ইহরাম ত্যাগ করিতে পারে। তখনই প্রকৃষ্ট হজ সূচিত হয়। ৭ জুল-হিজ্জ তারিখে সাধারণতঃ তীর্থযাত্রীদের প্রস্তুতির জন্য কাবা মসজিদে ধর্মালোচনার ব্যবস্থা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় বা পরবর্তী দিন সকালে মক্কা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রীরা মিনা

ও মুজদালিফ্অ হইয়া 'অরফাৎ প্রান্তরে পৌঁছায়। তথায় ৯ তারিখ বিকাল পর্যন্ত বিশ্রামান্তে আবার মুজদালিফ্অ-য় আসিয়া মুঘ্‌রিব ও 'ইশার নমাজ সম্পাদন করিয়া তাহারা তথায় রাত্রিবাস করে। পরদিন সকালে ভোরের নমাজ সমাধা করিয়া তাহারা আবার মিনায় যায়। সেখানে গিয়া মুজদালিফ্অ হইতে আনীত প্রস্তর খণ্ড (শয়তানের উদ্দেশে) নিক্ষেপ করে। এই তীর্থ ভ্রমণকালে তীর্থযাত্রীদের সর্বদা মনে মনে উচ্চারণ করিতে হয় "লব্বইক অল্লাহুম্ম্অ লব্বইক্অ" অর্থাৎ হে আল্লা, আমরা এখানে তোমার সম্মুখেই উপস্থিত আছি। এইভাবে মন্ত্রের প্রকৃষ্ট অর্থ উদ্‌যাপন করিয়া প্রতিটি হজ-যাত্রী হজ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন করে এবং উৎসর্গের নানা বস্তু বিতরণ করে। ঐ দিনই মক্কায় ফিরিয়া নব-দৃষ্টি লাভে নূতন করিয়া আবার কাবা প্রদক্ষিণ করে। ভক্ত মুসলিমের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই হজ-ক্রিয়া আত্মোপলব্ধির প্রচেষ্টা ও আত্মদর্শন বলিয়া গণ্য হয়।

হরেন্দ্রচন্দ্র পাল

হটী বিদ্যালঙ্কার (?—আনু ১৮১০ খ্রী) বিদুষী কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। ইঁহার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার সোঞাই গ্রাম। হটীর জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। ইঁহার পিতা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তখনকার বঙ্গদেশের অধিকাংশ কুলীন কন্যার মত হটীকেও বিবাহের পর পিতৃগৃহেই থাকিতে হয়। পিতার নিকট হইতে ইনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি শাস্ত্র পাঠ করেন। পতি ও পিতৃ-বিয়োগের পর নিতান্ত দুরবস্থায় পড়িয়া সংসারের প্রতি ইঁহার বিরাগ জন্মে। ইহার পর কাশীতে আসেন। এইখানে ইনি স্মৃতি ও ব্যাকরণ ছাড়াও নব্যন্যায়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। যে সময় বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয় নাই, সেই সময় এই অসামান্যা বিদুষী মহিলা কেবল যে বিবিধ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তাহাই নহে, কাশীর মত জায়গায় গিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা শুরু করেন। শুনা যায়, চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের ন্যায় ইনিও দক্ষিণা লইতেন। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র ইঁহার নিকটে নব্য ন্যায় পড়িতে আসিত। এই সময় ইনি 'বিদ্যালঙ্কার' উপাধি পান। ইঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শ্রীরামপুর মিশনের পাদরী উইলিয়াম ওয়ার্ড তাঁহার 'হিন্দু' গ্রন্থে ইঁহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা হইতে অনুমান হয় যে ইঁহার মৃত্যু সম্ভবতঃ ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল।

অর্চনা ঘোষ

হটু বিদ্যালঙ্কার (?১৭৭৫-১৮৭৫ খ্রী) অব্রাহ্মণ বংশীয়া সেকালের বিদুষী বাঙালী রমণী। বর্ধমান জেলার কলাইঝুটি গ্রামে বৈষ্ণব পরিবারে ইঁহার জন্ম; পিতা ঃ নারায়ণ দাস, মাতা ঃ সুধামুখী। হটুর আসল নাম রূপমঞ্জরী। মৃত-বৎসা দোষ এড়াইবার জন্য পিতা-মাতা নাম রাখিয়াছিলেন 'হটু'। হটুর জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না, তবে মৃত্যু ১২৮২ বঙ্গাব্দের ১৫ পৌষ হইয়াছিল। ইনি চিরকুমারী ছিলেন। ইঁহার পোষ্যপুত্র রাধারমণ দাস নামে এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। শৈশবেই হটুর মা মারা যান। পিতা যত্নের সহিত কন্যাকে বাড়িতেই পড়াইতে আরম্ভ করেন। পরে ইঁহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া নিকটস্থ গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করিয়া দেন। তখন হটুর বয়স ষোলো-সতের বৎসর। ইহার পরেই নারায়ণ দাসের মৃত্যু হয়। টোলের পড়া শেষ করিয়া হটু সরগ্রাম নিবাসী গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েন। অধ্যয়ন শেষে পিতৃ-কৃত্য করিতে গয়া যান এবং সেখান হইতে কাশী গিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করেন। কাশীতেও নানারকম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া দেশে ফিরিলে ইঁহার নাম 'হটু বিদ্যালঙ্কার' হয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন ছাড়াও ইনি পরে আবার গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ অধিকার হওয়ায় অনেকে ইঁহার নিকটে চরক, নিদান প্রভৃতি পড়িতে আসিত। এমন কি অনেক বিখ্যাত কবিরাজও ইঁহার পরামর্শ লইতেন। বেশভূষা সম্বন্ধে হটুর বৈচিত্র্যের কথা শুনা যায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনুকরণে তিনি মাথা মুড়াইয়া শিখা রাখিতেন এবং পুরুষের মত উত্তরীয় ব্যবহার করিতেন। এদেশে যে-যুগে নারীশিক্ষা প্রায় অজ্ঞাত ছিল, এমন কি অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইত, সে-যুগে ইনি নারী শিক্ষার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

দেবনারায়ণ রায়

হঠযোগ যোগ দ্র

হনুমান স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত প্রাইমেট-বর্গের প্রাণী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম প্রেশ্‌বাইটিশ এনটেলাস। মধ্য-ভারতে প্রচুর সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। প্রেশ্‌বাইটিশ গণভুক্ত হনুমান প্রধানতঃ প্রাচ্য দেশে, যেমন, ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোচীন, মালয় প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। ছাপ্পান্ন প্রজাতির হনুমান আছে।

পূর্ণবয়স্ক হনুমানের বৃহদাকার দেহটি হাল্‌কা হলুদ বর্ণের লোমে আচ্ছন্ন থাকে। ইহাদের হাতের চেটো,

পায়ের তলা ও মুখমণ্ডল গাঢ় কালো রঙের, লেজ লম্বা। চলিবার সময় ইহারা লেজটি পিঠের উপর ধনুকাকারে রাখিয়া দেয়।

ইহারা বৃক্ষবাসী। একলাফে ৬ হইতে ৮ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব পার হইতে পারে। ফল, বীজ ও গাছের কচিপাতা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। রামায়ণে হনুমানের উল্লেখ থাকায় ভারতবর্ষের বহু হিন্দু ইহাদের পবিত্র প্রাণী বলিয়া মনে করে এবং কোনও কোনও অঞ্চলে ইহাদের পূজা করা হয়। পোষ মানিলেও ইহারা অত্যন্ত প্রতিহিংসা-পরায়ণ। হনুমানের সাহায্যে প্রতিবেশীর ক্ষতি সাধনের কিছু কিছু কাহিনী শুনা যায়।

সীমানন্দ অধিকারী

হব্‌স, টমাস (১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রী) প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। ধর্মযাজকের পুত্র। অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। প্রথম জীবনে 'থুসিডাইডিস্‌'-এর অনুবাদ এবং শেষ বয়সে 'ইলিয়াড' ও 'ওডেসি'-র কাব্যানুবাদ করেন। দীর্ঘকাল ফ্রান্সে বাস। ফ্রান্সে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ঃ 'De Cive' (১৬৪২ খ্রী) এবং 'Leviathan' (১৬৫১ খ্রী)। 'লেভায়াথান' তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি চরম রাজতন্ত্র ও ধর্মের উপর রাষ্ট্রের প্রাধান্যের সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদগ্ধসমাজে পরিচিত হন কিন্তু তাঁহার মতবাদের তীব্র সমালোচনা হয়। এমন কি তাঁহার জীবন বিপন্ন হয়। পুরাতন 'সমাজ-চুক্তি' মতবাদ হব্‌সের হাতে নূতন রূপ পায়। চুক্তিবাদী হব্‌সকে যাঁহারা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিয়াছেন তাঁহারাও যুক্তিবাদী হব্‌সকে শ্রদ্ধা করেন। চিন্তার স্বকীয়তা এবং ভাষার স্বচ্ছতা তাঁহার রচনাকে গৌরব দান করিয়াছে। হব্‌সের রাষ্ট্রতত্ত্বের সারকথাঃ ১. রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান, এমন কি ধর্মও ইহার অধীন ; ২. রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি, ইহা একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা ; ৩. রাষ্ট্র মানুষের সেবা করে—ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয় ; ৪. রাষ্ট্র বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে। মৌলিক, শক্তিশালী লেখক হিসাবে হব্‌স চিরস্মরণীয়। হব্‌সকে 'নিয়ম নিষ্ঠার প্রথম দার্শনিক' বলা হইয়াছে। তাঁহার 'লেভায়াথান'-কে ইংরেজী ভাষায় রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ, এমন কি একমাত্র রাষ্ট্রদর্শনের গ্রন্থও বলা হয়। বস্তুতঃ হব্‌সের বাণী শুধু সপ্তদশ শতকের ইংল্যাণ্ডবাসীদের জন্য নয়, সকল যুগের সকল মানুষের জন্যই।

নির্মলকান্তি মজুমদার

হবিষ্য ব্রতাদি উপলক্ষে গ্রহণীয় পবিত্র সাত্ত্বিক আহার। আতপ চাল, গরুর দুধ, গব্য ঘৃত, সৈন্ধব লবণ, কলা হবিষ্যের প্রধান উপকরণ। আরও কিছু ফলমূল ও শাকসবজি, আম, কাঁঠাল, আমলকী, নারিকেল, শাক, মুগ, যব, তিল, ইত্যাদি হবিষ্যে ব্যবহার করা চলে। হবিষ্য এক পাকে রান্না করিয়া দিনের মধ্যে একবার গ্রহণ করিতে হয়। সম্প্রদায় বিশেষের মতে হবিষ্যে কোনওরূপ লবণ, জ্বাল দেওয়া দুধ ও মিষ্টি ব্যবহার সঙ্গত নয়। রান্না করা হবিষ্য রাত্রিতে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। হবিষ্যে বসিয়া কোনও কথা বলার নিয়ম নাই। বর্তমানে উপনয়ন এবং পিতা-মাতা ও পতির মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্য করা হয়। বিধবা নারীর হবিষ্যে অধিকার নাই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হরকুমার ঠাকুর (১৭৯৮-১৮৫৮ খ্রী) কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের সন্তান গোপীমোহন ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার পারিবারিক আবহাওয়ায় লালিত হরকুমার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদিসহ বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন করেন এবং শেরবোর্ন সাহেবের বিদ্যালয়ে ও হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষালাভ করেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইনি অন্যের জ্ঞানার্জনে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন। শাস্ত্র-পুরাণ গ্রন্থাদি হইতে তাঁহার দ্বারা সংকলিত 'হরতত্ত্বদীধিতি' (১৮৮১ খ্রী) ও 'পুরশ্চরণ বোধিনী' (১৮৯৫ খ্রী) শাস্ত্রজ্ঞ-মহলে স্থায়ী কীর্তি হিসাবে সমাদৃত। রাজা রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮১৯-৫৮ খ্রী) সংকলনে এবং পারিবারিক গ্রন্থাগার স্থাপনকালে হরকুমারের নিকট হইতে সাহায্য ও সুপরামর্শ লাভে উপকৃত হন। ভারতীয় রাগ-রাগিণী বিষয়ে হরকুমারের বিশেষ জ্ঞান ছিল। বিবিধ রত্ন এবং শালগ্রাম শিলা সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মূল্যবান্‌ রত্নের তাঁহার একটি সংগ্রহ-শালা ছিল। তাঁহার দুই কৃতী পুত্র যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত।

অমলেন্দু ঘোষ

হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪ খ্রী) প্রথম পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজ। বাংলা নাটকের প্রথম পর্বের নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধ। পিতাঃ হলধর ঘোষ। আদি নিবাস হুগলির খানাকুল কৃষ্ণনগরে।

হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র ও ডিরোজিও-র শিষ্য হইলেও তিনি নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার লেখা নাটকের মধ্যে তিনটি অনুবাদ নাটক—যথাঃ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩ খ্রী ; শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অভ্‌ ভেনিস' অবলম্বনে), 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪ খ্রী ; শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট অবলম্বনে) ও

'রজতগিরিনন্দিনী' (১৮৭৫ খ্রী ; ব্রহ্মদেশীয় কাহিনী অনুসরণে রচিত ইংরেজী নাটক 'দি সিলভার হিল' অবলম্বনে)। ইহা ছাড়া তিনি একটি মৌলিক (পৌরাণিক) নাটক 'কৌরববিজয়' (১৮৫৮ খ্রী) রচনা করেন।

প্রমোদগোপাল মুখোপাধ্যায়

হরদয়াল নাগ (১৮৫৩-১৯৪২ খ্রী) স্বদেশসেবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা। আদিনিবাস ত্রিপুরা জেলা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেন। কিন্তু ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যাবেগ সমগ্র দেশকে প্লাবিত করিলে তিনি পূর্ববঙ্গে এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ হইতে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বহুবার ইংরেজ সরকারের বিরাগ-ভাজন হন এবং একাধিকবার কারাবরণ করেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুগামী ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকালে (১৯৩২ খ্রী) একদল যুবকসহ তিনি সর্বপ্রথম নোয়াখালিতে লবণ-আইন ভঙ্গ করিবার অভিযানে নেতৃত্ব করেন। বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবেও (১৯৫৩ খ্রী) তিনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়া চাঁদপুরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যাদবপুর জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি ইহার সহিত জড়িত ছিলেন। ১৯২২-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি ছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন হইতে তিনি ইহার সক্রিয় সদস্য। গান্ধীজীর আদর্শে তিনি হিংসার রাজনীতি অপেক্ষা সংগঠনমূলক জাতীয়তাবাদের উপর অধিক গুরুত্ব দেন। ছাত্রজীবনে তিনি কিছুকাল 'ঢাকাপ্রকাশ' পত্রিকাখানির সম্পাদনা করেন। জাতীয়তা, জনকল্যাণ ও স্বদেশচিন্তামূলক তাঁহার বহু প্রবন্ধ সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত আছে। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন প্রয়াসী ছিলেন।

হারাধন দত্ত

হরপ্পা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের মণ্ট্‌গোমারী জেলায় অবস্থিত। খননকার্যের ফলে এখানে সুপ্রাচীন তাম্রপ্রস্তর যুগের এক সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী নগরীর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে ('হরপ্পাসভ্যতা' দ্র)। প্রাচীন হরপ্পানগরী ইরাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ঐ নদী হরপ্পা হইতে প্রায় ৯।১০ কি. মি. উত্তরে প্রবাহিত। খননের পর দেখা যাইতেছে যে, নগরের মধ্যভাগে প্রায় সমান্তরাল, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্রাকার দুর্গ ; উত্তর দিকে রাজকীয় বিশাল শস্যাগার এবং দক্ষিণ দিকে শ্মশানভূমি ছিল। সমতলভূমি হইতে দুর্গের পরিধি বহু উচ্চ করা হইয়াছিল এবং গৃহনির্মাণের জন্য উচ্চ বপ্র বা ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইত। এই দুর্গ চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের ভিতরে বপ্রের উপর নির্মিত নানারূপ গৃহাদির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ঐখানে ইটের পয়ঃপ্রণালী এবং জলকূপ প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। দুর্গের বাহিরে উত্তর দিকে মজুর-দের বাসগৃহ এবং ইতস্ততঃ কয়েকটি চুল্লীর চিহ্ন এবং একটি মুচি পাওয়া গিয়াছে। এমন অনুমান হয় যে, এখানে ব্রন্‌জ্‌ গলাইবার কারখানা ছিল। মজুরপল্লীর উত্তরে ইষ্টক-নির্মিত ১৮টি বৃত্ত দৃষ্ট হয়। এগুলি দেখিয়া মনে হয় কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে এই স্থানে বোধহয় গম প্রভৃতি চূর্ণ করা হইত। ইহার উত্তরে প্রাচীন ইরাবতী নদীর তীরে ১২টি রাজকীয় শস্যভাণ্ডার অবস্থিত ছিল। ইহাদের মুখ নদীর দিকে। এই জন্য মনে হয় এই সকল শস্যভাণ্ডারের শস্যের আদান প্রদান জলপথে সম্পন্ন হইত। হরপ্পায় দুর্গের দক্ষিণ দিকে মৃত সৎকারের স্থান ছিল। সেখানে মৃতদেহ প্রোথিত করা হইত বলিয়া মনে হয়। শবের মাথা সাধারণতঃ উত্তরদিকে রাখিয়া ব্যক্তিগত অলংকার ও বিভিন্ন আকারের মৃৎপাত্র এবং সময় সময় প্রসাধন দ্রব্যাদিও সঙ্গে দেওয়া হইত। চিত্রিত মৃৎপাত্রের জন্য হরপ্পা প্রসিদ্ধ।

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

হরপ্পাসভ্যতা দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবে পাকিস্তানের অন্তর্গত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন-ধারক স্থান। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা সমসাময়িক যুগের ('মহেঞ্জোদড়ো' দ্র)। এই সভ্যতা খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক তিন বা চার সহস্র বৎসর পূর্বেকার বলিয়া পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ('রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্র) কর্তৃক আবিষ্কৃত মহেঞ্জোদড়োর পুরাবস্তুই এই অভিনব সভ্যতার প্রতি সর্বপ্রথম বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তথাপি তৎপূর্বে আবিষ্কৃত হরপ্পার পুরাবস্তুরও এই একই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উত্তরকালে প্রমাণিত হওয়ায় কোনও কোনও পণ্ডিত এই নবাবিষ্কৃত সভ্যতাকে 'হরপ্পাসভ্যতা' আখ্যা দেন। অবশ্য ইহাকে সাধারণভাবে 'সিন্ধু-সভ্যতা' আখ্যা দেওয়া হয়। এই সভ্যতার যুগ তাম্রপ্রস্তর যুগ (ক্যালিওলিথিক এজ)

নামে পরিচিত। ভাষার রূপদানের জন্য চিত্রাক্ষরের সৃষ্টি, সংঘবদ্ধভাবে নাগরিকজীবনের উন্মেষ, শৃঙ্খলাযুক্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, দৈনন্দিন জীবনের অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহ সামগ্রীর জন্য ব্রন্‌জ্‌ ও তাম্রের বহুল ব্যবহার, যাতায়াতের জন্য চক্রযানের আবিষ্কার, স্থানভেদে ইট কিংবা পাথরের দ্বারা গৃহনির্মাণ ইত্যাদি এই যুগের বিশেষত্ব। এই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গণ্ডি সুদূর-প্রসারী ছিল। হরপ্পাসভ্যতার লিপিযুক্ত শীলমোহর প্রভৃতি এই যুগের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অনুরূপ কিংবা সমান এক সভ্যতার বিবিধ পুরাবস্তু ডেনমার্ক দেশীয় প্রত্নবিভাগের খননের ফলে কিছুদিন পূর্বে পারস্যোপসাগরে অবস্থিত বহ্‌রাইন নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল পুরাবস্তু পরীক্ষা করিয়া কেহ কেহ মনে করেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ও প্রতিপত্তি জলপথে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্য দিয়া পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইওরোপে বিস্তারলাভ করিয়া থাকিতে পারে। সৌরাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় হরপ্পাসভ্যতার বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। গুজরাতে আহমদাবাদ জেলায় এক স্থানে হরপ্পাসভ্যতার বহু চিহ্নযুক্ত এক বিস্তীর্ণ নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুসভ্যতার লেখযুক্ত নরম পাথরের শীলমোহর, পোড়া ইটের পয়ঃপ্রণালী এবং কাঁচা ইটের ঘরবাড়ি, মৃত্তিকা-নির্মিত প্রশস্ত দুর্গপ্রাচীর, স্নানাগার, রাজপথ, তামা ও ব্রন্‌জের অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন পরিমাপের পাথরের ওজন, পাশা খেলার ঘুঁটি, পোড়ামাটির খেলনা ও পুতুল, চিত্রিত ও চিত্রহীন বিবিধ মৃৎপাত্র ইত্যাদি হরপ্পাসভ্যতার বহু নিদর্শন এখানেও পাওয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব রাষ্ট্রে আম্বালা শহর হইতে ৯৬ কিলোমিটার উত্তরে রূপার নামক স্থানেও হরপ্পাসভ্যতার অক্ষরযুক্ত নরম পাথরের শীলমোহর, ব্রন্‌জের কুঠার ও চকমকি, পাথরের ছুরি প্রভৃতি পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী

হরপ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অন্যতম অস্থায়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাঁচড়াপাড়া নিবাসী ছিলেন; এতদ্ব্যতীত তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ইনি বিদ্যাপতির সংস্কৃতে লেখা 'পুরুষ-পরীক্ষা' বইটি বাংলায় অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রকাশিত হয়। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৩। ইহাতে ৫২টি চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। মনে হয়, গল্পগ্রন্থ হিসাবে ইহা জনপ্রিয় হইয়াছিল। উইলিয়াম য়েট্‌স তাঁহার সংকলন গ্রন্থে (ইনট্রোডাক্‌শন টু বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ, ২য় খণ্ড) ইহা হইতে ১৬টি গল্প সংকলন করিয়াছেন। হরপ্রসাদ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের সংস্কৃত-ঘেঁষা ও পাণ্ডিত্যী গদ্যরীতির অনুসরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনুমান করিয়াছেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে এই বইটি পড়াইতে গিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৮১৮, ১৮২৬ ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্রসাদের বইটির আরও তিনটি সংস্করণ হইয়াছিল। বইটির অনুকরণে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য তাঁহার 'নবনীতিসার' (১ম ভাগ, ১৮৫৮ খ্রী) রচনা করিয়াছিলেন।

সত্যনারায়ণ দাশ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১ খ্রী) নৈহাটির এক প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম। পিতা রামকমল ভট্টাচার্য (ন্যায়রত্ন)। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হইলে বহু কষ্টে লেখাপড়া করেন। তৎসত্ত্বেও যথাসময়েই এনট্রান্স, এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ হইতে একমাত্র ইনিই প্রথম বিভাগে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। বি. এ. পড়িবার সময় তিনি 'ভারতমহিলা' নামে একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার পান। এই নিবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশ করেন (১২৮২ বঙ্গাব্দ, মাঘ-চৈত্র)। ইহাই হরপ্রসাদের প্রথম রচনা। পরে এইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৮১ খ্রী)। এম. এ. পাস করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সরকারি চাকরি পান। কয়েক বৎসর পরে তিনি বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন (১৮৮৬ খ্রী)। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সান্নিধ্যে আসিয়া তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন (১৮৮৫ খ্রী) এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর সেখানকার সংস্কৃত পুথি সংগ্রহকার্য পরিচালনার ভার লন। কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকরূপে এবং তাহার পর প্রায় ৮ বৎসর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-রূপে কাজ করিয়া হরপ্রসাদ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় ১৩ বৎসর পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দেয়। ইহার পূর্বেই, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি লাভ করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মকাল হইতেই তিনি ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। কয়েকবার তিনি পরিষদের সভাপতির প্রদও অলংকৃত করেন। তাঁহার বহু গবেষণা-

মূলক প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়।

তিনি উপর্যুপরি দুইবার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। সোসাইটি হইতে ভার লইয়া তিনি ভারতের নানা স্থান হইতে পুথি সংগ্রহ করেন; পুথির খোঁজে কয়েকবার নেপালেও যান। তাঁহার সংগৃহীত সংস্কৃত, বাংলা, মৈথিল, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষার পুথি এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় রক্ষিত আছে। তিনি এই সমস্ত পুথির বর্ণাত্মক তালিকাও প্রস্তুত করেন। তাঁহার জীবৎকালে এই তালিকার কয়েকটি খণ্ড এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত হয়। নিজের সংগৃহীত এই সব আকরগ্রন্থ অবলম্বনে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের নানা দিক্ সম্বন্ধে, বিশেষভাবে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম লইয়া, ইংরেজী ও বাংলাতে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় তিনিই যে সর্বপ্রথম এই বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করেন তাহা অবশ্যস্বীকার্য। এইরূপ আরও নানা বিষয়ের আলোচনায় পথিকৃতের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য। তিনি কবি অশ্বঘোষের ('অশ্বঘোষ' দ্র) 'সৌরানন্দ'-এর পুথি আবিষ্কার করেন। পালযুগের বাঙালী কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর সংস্কৃত দ্ব্যর্থক ঐতিহাসিক কাব্য 'রামচরিতের' পুথিও তাঁহারই আবিষ্কার। জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকরের (বর্ণনরত্নাকর) পুথিও তিনিই পুনরুদ্ধার করেন। হরপ্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার চর্যাপদের পুথি ('চর্যাগীত' দ্র)। এই পুথিটি তিনি নিজের সম্পাদনায় স্বলিখিত দীর্ঘ ভূমিকাসহ 'হাজার বৎসরের পুরান বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে পুস্তকাকারে সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন (১৯১৬ খ্রী)।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধারে তাঁহার কৃতিত্ব যেমন অবিসংবাদিত,, বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনাতেও তাঁহার সিদ্ধি তেমনি অনস্বীকার্য। সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষভাবে কালিদাসের কাব্যের, তিনি ছিলেন একান্ত অনুরাগী। বাংলায় লেখা তাঁহার অজস্র মূল্যবান্ প্রবন্ধ নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য:—'বাল্মীকির জয়' (১৮৮১ খ্রী), 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' (১৯০২ খ্রী), 'কাঞ্চনমালা' (উপন্যাস, ১৯১৬ খ্রী), 'বেণের মেয়ে' (উপন্যাস, ১৯২০ খ্রী), 'প্রাচীন বাংলার গৌরব' (১৯৪৬ খ্রী), 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯৪৮ খ্রী), প্রভৃতি এবং 'Vernacular Literature of Bengal before the Introduction of English Education' (১৮৯১ খ্রী), 'Discovery of Living Buddhism in Bengal' (১৮৯৭ খ্রী), 'Magadhan Literature' (১৯২৩ খ্রী), 'Sanskrit Culture in Modern India' (১৯২৮ খ্রী) প্রভৃতি।

অনিলকুমার কাঞ্জিলাল

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯৫৯ খ্রী) শান্তিনিকেতনের শিক্ষক। একক প্রচেষ্টায় তিনি বৃহৎ অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলন করেন। চব্বিশ পরগনা জেলার রামনারায়ণপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। কলিকাতার টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানকার প্রধান-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু অচিরে রবীন্দ্রনাথের জমিদারির অন্তর্গত পতিসরের কাছারিতে সুপারিণ্টেনডেণ্টের কাজে যোগ দেন। কিছুদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জ্ঞানচর্চার আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে শান্তিনিকেতনে লইয়া আসেন (১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে) সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে এবং এখানেই রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সংকলনে হাত দেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দে তিনিই এই কাজ শুরু করেন এবং শেষ করেন ১৩৫২ বঙ্গাব্দে। 'রবীন্দ্রনাথের কথা', 'সংস্কৃত প্রবেশ', 'পালি প্রবেশ' প্রভৃতি আরও অনেক বই তিনি রচনা করেন।

সুশীল রায়

হরিণ স্তন্যপায়ী, তৃণভোজী, শৃঙ্গী, চর্বিতচর্বণকারী চতুষ্পদ প্রাণী। শৃঙ্গের পার্থক্য অনুসারে ইহাদের দুইটি শ্রেণী: অ্যাণ্টিলোপ ও ডিয়ার। অ্যাণ্টিলোপের শৃঙ্গ শাখা-প্রশাখাহীন, ফাঁপা ও স্থায়ী; সাধারণতঃ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শৃঙ্গ থাকে। ডিয়ার-এর শৃঙ্গ শাখাপ্রশাখাযুক্ত নিরেট ও অস্থায়ী, স্থায়ী শুধু পুরুষের। অ্যাণ্টিলোপ-এর প্রধান বাসস্থান আফ্রিকা। তবে ভারতবর্ষেও কিছু আছে। নীলগাই, কৃষ্ণসার, চৌশিঙ্গা, কুরঙ্গ প্রভৃতি এই দলে পড়ে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র চারিটি শৃঙ্গযুক্ত প্রাণী চৌশিঙ্গা। কৃষ্ণসার দেখিতে খুব সুন্দর এবং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী প্রাণী। ডিয়ার-এর আসল দেশ ভারতবর্ষ, যদিও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডিয়ার পাওয়া যায় আমেরিকায়। আমাদের দেশে প্রায় ৫' ফিট উচ্চ 'সম্বর' হইতে আরম্ভ করিয়া, কস্তুরী মৃগ, হাঙ্গুল, পারা, জলা-হরিণ, চিতেল এইরূপভাবে একেবারে খরগোসের মত ছোট পর্যন্ত প্রায় ৯/১০ রকমের হরিণ পাওয়া যায়। গায়ে সাদা ছোপ-ছোপ দাগ থাকায় চিতেল দেখিতে খুব সুন্দর। হরিণরা কেহ একা, কেহ জোড়া, আবার কেহ বা থাকে দলবদ্ধ হইয়া। কোনও কোনওটি আবার নিশাচর। কেহ কেহ বেশ পোষ মানে। ব্যাঘ্র, সিংহ ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণী

হইতে শুরু করিয়া মানুষ পর্যন্ত ইহাদের শত্রু। ইহাদের মাংস খাওয়া হয়, চর্ম ও শৃঙ্গ নানা শৌখিন কাজে লাগে। চর্যাগীতে আছে ঃ 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' অর্থাৎ মাংসের জন্য হরিণ নিজেরই শত্রু।

বংশীধর হাজরা

হরিদাস যবন হরিদাস দ্র

হরিদাস বাগচী (১৮৮৮-১৯৬৮খ্রী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ অধ্যাপক। শিক্ষক-জীবনের শেষ ৩ বৎসর (১৯৫১-১৯৫৩ খ্রী) তিনি গণিতের হার্ডিঞ্জ অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পি. আর. এস., পি.-এইচ্. ডি. প্রভৃতি ডিগ্রী লাভ করেন এবং এফ্. এন্. এ. এস্.-সি. উপাধিতে ভূষিত হন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'কোর্স অভ্ জিওমেট্রিক্যাল অ্যানালিসিস' প্রকাশিত হইলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণিত-বিজ্ঞানীরা ইহার খুব সুখ্যাতি করেন। ইওরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশের মুখ্য গণিত-পত্রিকাসমূহে তাঁহার বহু উচ্চাঙ্গ গণিতবিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং ঐগুলি বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিত সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য তাঁহাকে উত্তর প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তিনি কলিকাতা গণিত বিজ্ঞান সমিতির (ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন এবং জীবনের শেষ কয় বৎসর ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ (১৮৭৬-১৯৬১ খ্রী) পূর্ব-বঙ্গের (বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া পরগনার উনশিয়া গ্রামে জন্ম। কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক হন। তিনি 'স্মৃতিচিন্তামণি' নামক স্মৃতি-শাস্ত্রের সানুবাদ ব্যবস্থাগ্রন্থ, 'কাব্যকৌমুদী' নামক সরল সংক্ষিপ্ত অলংকার গ্রন্থ, টোলপাঠ্য অনেকগুলি কাব্যনাটক এবং মহাভারতের অনুবাদ ও টীকা রচনা করেন। তিনি ১৫৯ খণ্ডে মহাভারতের সটীক অনুবাদ কার্য শেষ করেন। বঙ্গাক্ষরে মূলসহ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের ফলে সাধারণ বাঙালী পাঠকের পক্ষে মহাভারত আলোচনার পথ সুগম হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি এবং ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মভূষণ' সম্মান প্রদান করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৩৪২-৪৩ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হরিদ্রা ওষধি বিশেষ। চলিত বাংলা নাম হলুদ। ইংরেজী turmeric । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম curcuma longa । গন্ধবিস্তারী রাইজোম (rhizome)- যুক্ত, অর্থাৎ ইহার মূলজাতীয় দণ্ড (স্টেম্) ভূগর্ভে অবস্থিত, সাধারণতঃ আনুভূমিক (horizontal) অবস্থায় থাকে ও নীচে মূলের জন্ম দেয় এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে ক্রমশঃ বিটপ (shoots) বাহিরে ছড়ায়। 'Zingiberaceae' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত (আদা প্রভৃতিও এই গোষ্ঠীতে পড়ে)। হরিদ্রা বহুকাল হইতে রন্ধনের মশলা, রঞ্জক (dyestuff) ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ক্ষারের রাসায়নিক পরীক্ষাতেও ইহার ব্যবহার হয় (ইহার এই বিষয়ে উপযোগিতার প্রথম আবিষ্কারক H. A. Vogel ১৮১৫ খ্রী)।এই কাজের জন্য হরিদ্রা-কাগজ (turmeric paper) প্রচলিত আছে। মাদ্রাজ, বঙ্গদেশ, জাভা, চীন প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন কয়েক প্রকারের হরিদ্রা পাওয়া যায়। এই সমস্ত শ্রেণীর হরিদ্রার আকৃতি, বর্ণ ও গন্ধের মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সব শ্রেণীর হরিদ্রাই কঠিন, যদিও সহজে ভাঙ্গা যায়। বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা ভ্যানিলাগন্ধী পীতবর্ণ কেলাসের আকারে পাওয়া যায়। ইহা অ্যাল্কোহল ও ক্লোরোফর্মে দ্রবীভূত হয় এবং জলেও কিছু পরিমাণে দ্রাব্য। হিন্দুর বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্মে হরিদ্রার ব্যবহার অপরিহার্য।

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়

হরিদ্বার হরিদ্বার উত্তরপ্রদেশের মীরাট বিভাগে সাহারাণপুর জেলায় রুড়কী তহসিলে (২৯°৫৭′৩০″ উঃ ৭৮°১২′৫২″ পূঃ) অবস্থিত। আয়তন ১১.৯১ বর্গ কি. মি.। যেখানে শিবালিক পাহাড়ের গহ্বর হইতে গঙ্গা সমতলে পড়িয়াছে সেইখানেই হরিদ্বার অবস্থিত। তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বার লুণ্ঠন করেন। শৈবগণের মতে ইহার নাম হরিদ্বার নহে, হরদ্বার, কিন্তু বৈষ্ণবদের মতে হরিদ্বার। গঙ্গা এইস্থানে অবতীর্ণ বলিয়া মহাভারতে ইহাকে গঙ্গাদ্বার বলা হইয়াছে। বহু পূর্ব হইতেই ইহা একটি প্রধান তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর এখানে বহু সহস্র তীর্থ-যাত্রী আসে। বিষ্ণুর চরণচিহ্ন একটি প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। প্রতি বারো বৎসর অন্তর এখানে কুম্ভ-

মেলায় বহু লক্ষ লোকের সমাগম হয়। এই তীর্থে গঙ্গা-স্নানই প্রধান ও স্নানের পরে দান করা আবশ্যক। হরিদ্বারে মায়াদেবী, নারায়ণ শিলা ও ভৈরবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ ও লছমনঝোলা যাওয়া যায়। 'হরি কী পাওরি' বা 'হরির চরণ' নামক ঘাটের সন্নিকটে গঙ্গাদ্বার মন্দির। ইহা হরিদ্বারের মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম ও ইহার দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অন্যান্য মন্দির আছে। কনখল শহর হরিদ্বারের শহরতলী। এখানে দক্ষের মন্দির আছে এবং এখানেই দক্ষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকবিশ্বাস। ভোলাগিরি আশ্রমে শংকরাচার্যের মূর্তি আছে। হৃষীকেশের পথে সত্যনারায়ণের মন্দির। হৃষীকেশের ত্রিবেণী ঘাটের উপরে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। গীতা ভবনে খোদাই করিয়া সম্পূর্ণ গীতা লিখিত আছে। শংকরাচার্যের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির আছে। তিনটি ধর্মশালা আছে। লছমনঝোলার ঝুলন্ত পুল ও লছমনজির মন্দির বিখ্যাত। এই পুল দিয়া গঙ্গা পার হইয়া কেদারবদরী যাওয়া যায়।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১ খ্রী) বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন সুপণ্ডিত শিক্ষাবিদ্‌। চব্বিশ পরগনা জেলার আড়িয়াদহ গ্রামে জন্ম। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় লাতিন ও ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে যথাক্রমে ১ম ও ৪র্থ স্থান পাইয়া উত্তীর্ণ হন। এই বছরেই এম. এ. পরীক্ষায় লাতিনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। পর বৎসর (১৮৯৭ খ্রী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীকে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কেম্‌ব্রিজের ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস্‌, প্রথম ভাগে প্রথম শ্রেণীতে, এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষায় ট্রাইপসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।. ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক এবং হুগলি কলেজে অধ্যক্ষের কাজ করিবার পর কলিকাতার ইম্‌পীরিয়াল লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক হন (১৯০৭ খ্রী)। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিতে এবং সংস্কৃতের 'এ' ও 'ই' গ্রুপে এম. এ. পরীক্ষা দিয়াও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এনট্রান্‌স্‌ হইতে এম. এ. পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় বিভিন্ন ভাষার (গ্রীক, লাতিন, ইংরেজী, ফরাসী, আরবী, সংস্কৃত, পালি প্রভৃতির) তিনি প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। বহু-ভাষায় তাঁহার বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তি ছিল। 'Miscellanea' (১৯০৪ খ্রী)-তে ইব্‌ন বতুতার 'বাংলাদেশের বিবরণ' এবং হাফিজের 'গয়াসুদ্দিনের উদ্দেশে একটি গীতিকবিতা' টীকাসহ তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তিনি টীকাসহ কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল'-এর দুইটি অঙ্কের ছন্দোবদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় নবাব নসরৎ জঙ্গের ঢাকার বিবরণীমূলক পারসীক রচনা 'তারিখ-ই-নস্‌রৎজঙ্গী' প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধদর্শনের আদি ইতিহাসের অন্যতম প্রামাণিক নিদর্শন হিসাবে তিনি 'নির্বাণব্যাখ্যানশাস্ত্রম্‌' ও 'লংকাবতরসূত্র' সম্পাদনা করেন। Memoire de M. Jean Law-র ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার সম্পাদনায় মুদ্রিত হইয়াছিল। পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁহার রচনার পরিমাণ অনেক। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদিত 'শাহ্‌-আলম্‌-নামা' প্রকাশিত হয়।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিনাথ মজুমদার কাঙাল হরিনাথ দ্র

হরিনামামৃত জীবগোস্বামী দ্র

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯৪৫ খ্রী) বারাণসীর নেতৃস্থানীয় ধ্রুপদগুণী। রামদাস গোস্বামীর নিকট শিক্ষালাভের ফলে তাঁহার সংগীতজীবন গঠিত হয়। পশ্চিমাঞ্চলের সংগীতজগতে সুকণ্ঠ গায়ক, ঐতিহ্যপন্থী নিষ্ঠাবান্‌ সংগীতাচার্য ও ধ্রুপদ সংগীতে পারদর্শী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি কৃতী শিষ্যমণ্ডলীও গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ সংগীতজীবনের অধিকাংশই বারাণসীতে কাটিয়াছিল। তাঁহার রচিত 'সংগীতে পরিবর্তন', 'সংগীতে গুরুপ্রসাদ', চার খণ্ডে 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান্‌।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়[১] (?) ইনি গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। 'কাদম্বিনী নাটক' (১৮৬১ খ্রী), 'জয়াবতীর উপাখ্যান' (? ১৮৬৩ খ্রী), 'মণিমালিনী' (নাটক : ১৮৭৪ খ্রী) প্রভৃতি ইঁহার রচনা। ইনিই ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিচরিত' (১ম) নামে বিখ্যাত গ্রন্থটিও রচনা করেন। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথমে উপক্রমণিকা ; এই অংশে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবরণ দিবার চেষ্টা করা এবং বাংলা ভাষার উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অন্যান্য সাতটি অধ্যায়ে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরামদাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন তর্কালংকার ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আলোচনা আছে। হরিমোহনের 'কবিচরিত' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশেরও পরিকল্পনা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব হয় নাই।

দেবনারায়ণ রায়

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়² (১৮৬০ খ্রী—?) ইনি চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটি থানার অধীনস্থ রাহুতা গ্রামের অধিবাসী। বিখ্যাত রূপকথাধর্মী উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'-র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন ইঁহার অগ্রজ ('ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্র)। ইনি 'সাধারণী', 'সোমপ্রকাশ', 'বান্ধব', 'নবজীবন' প্রভৃতি পত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। কিছুকাল 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদনও করেন। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, নাটক ও উপন্যাস রচনাও করেন। মহাকাব্য 'মুকুট উদ্ধার' (নামপত্রে 'মুকুট উদ্ধার', অন্যত্র 'মুকুটোদ্ধার') ও 'অদৃষ্ট বিজয়' (১৮৮১ খ্রী) ; খণ্ডকাব্য 'সকের ঠানদিদি' (১৮৭৩ খ্রী), 'জীবন সংগীত' (১৮৮০ খ্রী), নাটক 'প্রণয় প্রতিমা' (১৮৮২ খ্রী) ; উপন্যাস 'যোগিনী' (১৮৭৯ খ্রী), 'কমলাদেবী' (১৮৮৫ খ্রী) ও 'জীবনতারা' (১৮৮৯ খ্রী)।

দেবনারায়ণ রায়

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়³ (?) হুগলি জেলার সানিহাটি (সেনেট) গ্রামনিবাসী। ইনি 'নকুড়বাবু', 'ভজহরি সর্দার' প্রভৃতির রচয়িতা। বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক থাকাকালে ইঁহারই সম্পাদনায় ১৩১১ বঙ্গাব্দে বঙ্গবাসী স্বত্বাধিকারীর উদ্যোগে ও খরচে 'বঙ্গভাষার লেখক' (প্রথম ভাগ) নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'সংগীত তরঙ্গ', 'দাশরথি রায়ের পাঁচালী' প্রভৃতিও ইনিই সম্পাদনা করেন।

দেবনারায়ণ রায়

হরিয়ানা রাজ্যটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ২৭°৩০′ উত্তর হইতে ৩০°১৫′১৫″ উত্তর এবং ৭৫°৩১′ পূর্ব হইতে ৭৭°৩২′৫০″ পূর্ব অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। পাঞ্জাব, রাজস্থান, ও উত্তর প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত। রোটক, গুরগাঁও, হিসার, কার্নাল, মহেন্দ্রগড় এই চারিটি জেলা এবং ঝিন্দ, নারওয়ানা, নরিনগড় প্রভৃতি তহসিল লইয়া ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাঞ্জাবী ভাষাভাষীদের দাবি অনুসারে পূর্ব পাঞ্জাবের হিন্দী ভাষী অঞ্চল লইয়া হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হইয়াছে। আয়তন ৪৩৩৭৯.২ বর্গ কি. মি.। রাজস্থানের মরুভূমির সংলগ্ন হওয়ায় বালিয়াড়ি দেখা যায়। মরুভূমির অগ্রসর রোধ করিবার জন্য বনাঞ্চল (গ্রীন বেল্ট) সৃষ্টি করা হইয়াছে।

রাজ্যের প্রধান নদী যমুনা পূর্বসীমান্ত দিয়া বহিয়াছে। অন্যান্য ক্ষুদ্র নদীও আছে। তন্মধ্যে ঘাঘর নদী তিনটি হ্রদ সৃষ্টি করিয়াছে। রাজ্যের দক্ষিণের উচ্চভূমিতে আলওয়ার শ্রেণীর কোয়ার্ট্জাইট ভিন্ন অন্য সকল স্থানেই নদীবাহিত পলি দেখা যায়। মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অনেক কম অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে বৎসরে ৬০ সেন্টিমিটার মাত্র বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে বাৎসরিক তাপমাত্রার গড় ১০৫° ফা.। শীতকালে বেশ শীত, তাপমাত্রার গড় ৪০° ফা.।

রাজ্যের বনভূমির প্রধান বৃক্ষ অশ্বত্থ, শিমুল, শিরীষ, তুঁত, শিশু প্রভৃতি। বনভূমির পরিমাণ ৫০০০০ একর। তিনটি সংরক্ষিত বনভূমি (রিজার্ভড্ ফরেস্ট্) আছে। মোট ভূমির মধ্যে ৮৫ লক্ষ একরে কৃষিকার্য হয়। গম, ভুট্টা, জোয়ার, ইক্ষু, ডাল, ছোলা, প্রভৃতি প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। রাজ্যে অনেকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে। বৃষ্টিপাত কম বলিয়া সেচ-ব্যবস্থা উন্নত করা হইয়াছে। এই রাজ্যের মধ্যেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাণিপথ অবস্থিত।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪-১৯৩০ খ্রী) সুকবি। জন্মস্থান : কলিকাতা। পিতা : কৃষ্ণকিশোর। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রসিক নিয়োগীর নামে বাগবাজারের গঙ্গার ঘাট সুবিদিত। হরিশ্চন্দ্রের শিক্ষা শুরু হয় সেকালের জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইনস্‌টিটিউশনে। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি গৃহেই পড়াশোনা করেন। সতের বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। 'শ্রীহঃ—' ছদ্মনামে তাঁহার অনেক কবিতা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে হরিশ্চন্দ্রের বহু কবিতা 'জন্মভূমি', 'সাহিত্য', 'সাহিত্য-সংহিতা', 'সাহিত্য সংবাদ', 'সংকল্প' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার গীতিকাব্য 'দুঃখসঙ্গিনী'র (১৮৭৫ খ্রী) সপ্রশংস আলোচনা 'বান্ধব', 'আর্যদর্শন' ও 'বঙ্গদর্শন'-এ বাহির হইয়াছিল। তাঁহার অন্যান্য গীতিকাব্য 'বিনোদমালা' (১৮৭৮ খ্রী), 'মালতীমালা' (১৮৯৯ খ্রী) ও 'সন্ধ্যামণি' (১৯২৬ খ্রী) উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। ভাবের আবেশই তাঁহার কাব্যের বৈশিষ্ট্য। উল্টাডাঙ্গায় তাঁহার নিজস্ব গৃহ 'বিনোদকুঞ্জ'-এ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বর্তমানে ঐ পল্লীতে তাঁহার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হইয়াছে।

কুমারেশ ঘোষ

হরিশ্চন্দ্র মিত্র (আনু. ১৮৩৮-১৮৭২ খ্রী) পিতা অভয়াচরণ। পৈতৃক নিবাস হাওড়ার অন্তর্গত সালিখা। তবে শোভাবাজার রাজপরিবারের ঢাকাস্থ কর্মচারীরূপে অভয়াচরণ ঢাকাপ্রবাসী ছিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের জন্মস্থানও ঢাকা। পিতার অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় হরিশ্চন্দ্র শৈশবে যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই বটে, তবে নিজের চেষ্টায় তিনি বহু বিষয়ে শিক্ষা-

লাভ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র বহু কবিতা, নাটক এবং পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ-খানিরও বেশি। তিনি অকৃতদার ছিলেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ঢাকার একটি বাংলা স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে বন্ধুবর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ('কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার' দ্র) সাহায্যে সাহিত্য-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঢাকা হইতে প্রথম বাংলা মাসিকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী' প্রকাশ করেন। সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 'কবিতা কুসুমাবলী' ব্যতীত তাঁহার সম্পাদিত 'চিত্তরঞ্জিকা' (১৮৬১ খ্রী), 'অবকাশ রঞ্জিকা' (১৮৬২ খ্রী), 'ঢাকাদর্পণ' (১৮৬৩ খ্রী), 'কাব্যপ্রকাশ' (১৮৬৪ খ্রী), 'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৬৫ খ্রী), 'হিন্দুরঞ্জিকা' (১৮৬৮ খ্রী) এবং 'মিত্রপ্রকাশ' (১৮৭০ খ্রী) পত্র-পত্রিকাগুলির নাম উল্লেখ্য। তিনি 'শুভস্য শীঘ্রং' (প্রহসন, ১৮৬১ খ্রী), 'হাস্যরসতরঙ্গিণী' (কবিতা, ১৮৬২ খ্রী), 'ম্যাও ধরবে কে' (প্রহসন, ১৮৬২ খ্রী), 'ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে' (প্রহসন, ১৮৬৩ খ্রী), 'কৌতুক শতক' (কৌতুকপূর্ণ গল্প সংকলন, ১৮৬৩ খ্রী), 'বিধবা বঙ্গাঙ্গনা' (কাব্য, ১৮৬৩ খ্রী), 'কবিতা কৌমুদী' (১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, ১৮৬৩-১৮৭০ খ্রী), 'জানকী নাটক' (১৮৬৩ খ্রী), 'জয়দ্রথ বধ বৃত্তান্ত' (নাটক, ১৮৬৪ খ্রী), 'কীচকবধ-কাব্য' (১৮৬৬ খ্রী), 'বঙ্গবালা' (দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৮ খ্রী), 'রামায়ণ' (আদিকান্ড, ১৮৬৯ খ্রী), 'নির্বাসিতা সীতা' (কবিতা, ১৮৭১ খ্রী), 'প্রহ্লাদ নাটক' (১৮৭২ খ্রী), 'হতভাগ্য শিক্ষক' (নাটক, ১৮৭২ খ্রী) প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সাহিত্য হিসাবে তাঁহার রচনাবলী বিশেষ উচ্চস্তরের নহে।

কুমারেশ ঘোষ

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-১৮৬১ খ্রী) দেশ-সেবক, সমাজ-সংস্কারক ও সাংবাদিক। জন্মঃ কলিকাতায় ভবানীপুরে। পিতা রামধন। দারিদ্র্যের জন্য কৈশোরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইলেও স্বকীয় প্রচেষ্টায় তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'মিলিটারি অডিটর জেনারেল' অফিসে কার্যে নিযুক্ত হন ও ক্রমশঃ সহকারী মিলিটারি অডিটরের পদে উন্নীত হন। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সমাজসেবামূলক কার্যে ও রাজনীতির চর্চায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজ-নীতিতে অংশ গ্রহণ করেন 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশন'-এর সদস্যরূপে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে হরিশ্চন্দ্রের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সাংবা-দিকতার ইতিহাসে তাঁহার নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের আরম্ভ হইতেই তিনি ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন এবং অল্পদিন পরেই ইহার সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সংবাদপত্রটিতেই তিনি সরকার ও বিদ্রোহী উভয়পক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন এবং বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধ খন্ডন করেন। এই পত্রিকায় তাঁহার রচনা বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধেও হরিশ্চন্দ্র তাঁহার শক্তিশালী লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করায় তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮ খ্রী) সাহিত্য-সেবক ও ইতিহাস-লেখক। দক্ষিণ কলিকাতার খিদির-পুর-ভূকৈলাসে এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম। পিতাঃ গিরিশচন্দ্র। ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট অফিসে চাকরি লাভের পর হইতে হরিসাধন নিয়মিতভাবে সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' (১২৯১ বঙ্গাব্দ) মাসিকপত্রে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রকাশিত হয়। পরে সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী কলিকাতার ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস, গল্প ও নাটক রচনা করেন। তাঁহার 'রঙ্গমহাল' (১৯০১ খ্রী), 'শীশমহল' (১৯১২ খ্রী), 'নূরমহল' (১৯১৩ খ্রী), 'সুখের বাসর' (১৯১৪ খ্রী), 'কলিকাতা—সেকালের ও একালের' (১৯১৫ খ্রী) প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়োছে।

অধীর দে

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী, কুলাবধূত (আনু. ১৭৬২-১৮৩২ খ্রী) পালপাড়া গ্রামে জন্ম। গার্হস্থ আশ্রমের নাম ছিল নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার। ন্যায় ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার নিকট তন্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইবার কালে হরিহরানন্দও তাঁহার সহিত কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি 'কুলার্ণবতন্ত্র' প্রকাশ এবং 'মহানির্বাণতন্ত্র'-এর টীকা রচনা করেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বাংলা ভাষার প্রথম অভিধানকার।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হরুঠাকুর, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী (আনু. ১৭৩৯—আনু. ১৮০৯ খ্রী) প্রখ্যাত কবিয়াল। জন্মস্থানঃ কলিকাতায় সিমলা অঞ্চল। সখী-সংবাদ সংগীত রচনায় ও প্রেমের চিত্র অংকনে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অল্প হইলেও বর্ষাঋতু অবলম্বনে তাঁহার বিরহ-বর্ণনা প্রশংসার যোগ্য। বাল্যকাল হইতেই হরুঠাকুর কবিতা ও সংগীত রচনায় আত্মীয় বান্ধবদিগের নিকটে প্রচুর প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেন। কবি ও সংগীত রচয়িতারূপে বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও শোভাবাজার রাজবাড়িতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যৌবনে তিনি প্রথমে শখের কবির দল গঠন করেন এবং এইভাবে খ্যাতিলাভ করিয়া পরবর্তীকালে পেশাদারী হন। শেষবয়সে তিনি দল ছাড়িয়া শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাকবি হন।

দেবকুমার বসু

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৬ খ্রী) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁহার জন্ম (৩ অক্টোবর)। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) হইতে এফ্. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি পি. এইচ. ডি. উপাধি পান। তাঁহার কর্মজীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ। স্কুলের শিক্ষকতায় ইহার সূচনা এবং রাজ্যপালে সমাপ্তি। প্রথমে কলিকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হন। কিছুদিন পরে বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক এবং পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইহার পর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৫ বৎসর তিনি কলিকাতার সিটি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেক্চারার হিসাবে যোগ দান করেন। কিছুকাল পরে তাঁহাকে 'ইনস্পেকটর অভ্ কলেজেস'-এর পদ দেওয়া হয়। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের তিনি প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৩৭-৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাংলার আইন সভার সদস্য ছিলেন। তিনি দুইবার 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অভ্ ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ানস্'-এর সভাপতি হন। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গঠিত 'কন্স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লী'র ভাইস্ প্রেসিডেণ্টের পদে তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১ নভেম্বর তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি যেমন কর্মবীর তেমনি দানবীর। রাজ্যপাল নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯ লক্ষ টাকা দান করেন। রাজ্যপাল হইবার পর আরও ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত টাকা তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন। জীবনের সব সঞ্চয়ই তিনি দেশের কল্যাণকার্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত অমায়িক, নিরহংকার মানুষ এ যুগে বিরল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ আগস্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। হরেন্দ্রকুমার অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা। উহাদের মধ্যে 'ইণ্ডিয়ান্স্ ইন্ ব্রিটিশ ইণ্ডাস্ট্রিজ', 'কংগ্রেস অ্যাণ্ড দি ম্যাসেস্', 'হি ফলোজ ক্রাইস্ট', 'হেম্প-ড্রাগ ইন্ ইণ্ডিয়া', 'ওপিয়াম অ্যাণ্ড ইট্স্ প্রহিবিশন' উল্লেখযোগ্য।

নলিনীকান্ত রায়

হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (১৮৮৯-১৯৬৬ খ্রী) প্রখ্যাত রাজনীতিক, শিক্ষাসংস্কারক এবং সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে হরেন্দ্রনাথ এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক-এর মুন্সি টাকির রামকান্ত রায়চৌধুরীর বংশের সন্তান। বেণ্টিংক-প্রদত্ত 'রায়' উপাধিতেই গৃহপরিবার সমধিক পরিচিত হয়। হরেন্দ্রনাথের জন্ম বরাহনগরে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ এবং মাতা স্বর্ণময়ী। হরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এ. ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনে এম. এ. ও আইন পাশ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে জয়ী হন। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় ১৯৪৮ এবং ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার লাভ করেন। মুসলীম লীগ সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'The New Meance to High School Education in Bengal' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাষাসমস্যার উপর তাঁহার সুচিন্তিত গ্রন্থ 'আওয়ার ল্যাংগুয়েজ প্রব্লেম' প্রকাশিত হয়। 'শিবানন্দ' ছদ্মনামে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসঃ সমালোচনা' নামক একখানি গ্রন্থ (১৯৫০ খ্রী) ও স্বনামে লিখিত টীকা ও ভাষ্য সহ দুই খণ্ডে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সংস্করণ বাহির করেন (১৯৬১ খ্রী)। অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

হরেস্, কুইন্তুস্ হোরাতিউস্ ফ্লাক্কুস (খ্রী. পূ. ৬৫-৮) লাতিন কবি ও সমালোচক। জন্মস্থানঃ Venusia । তাঁহার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল। ইহার ফলে তিনি পুত্রকে প্রথমে রোমে ও পরে এথেন্সে শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। হরেস ব্রুটাসের সৈন্যদলে যোগদান করেন ও ফিলিপিতে সেনানায়করূপে যুদ্ধ করেন (খ্রী. পূ. ৪২)। অক্ষত শরীরে, তবে নির্বান্ধব ও কপর্দকশূন্য অবস্থায়, রোমে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি মিসিনাসের (Maecenas) বন্ধুত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত মিসিনাসের সুপ্রসিদ্ধ সেবিনের (Sabine) খামারটি উপহার পান। এই অঞ্চলের বহুবিধ বর্ণনা হরেসের কবিতায় পাওয়া যায়। ভার্জিলের মৃত্যুর (খ্রী. পূ. ১৯) পরে তিনি রাজসভার প্রধান কবি হন ও সম্রাট্ অগাস্টাসের প্রীতিলাভ করেন।

হরেসের প্রথমদিকের ব্যঙ্গ-কবিতায় তীব্র বিদ্রূপ রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কালের ব্যঙ্গ-কবিতায় এই তীব্রতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত আক্রমণ সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। এদিক্ দিয়া তাঁহার রুচিবোধ বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতার প্রথম খণ্ডে স্বগতোক্তি ধরনের দশটি কবিতা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডের আটটি কবিতার মধ্যে কয়েকটি স্বগতোক্তি ও কয়েকটি কথোপকথনের রীতিতে রচিত। ইহার মধ্যে দুইটি কবিতায় তিনি সরল, অনাড়ম্বর জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় অনাবিল হাস্যরস আছে। তাঁহার 'কার্মিনা' শীর্ষক ১০৩টি কবিতাকে সাধারণতঃ 'ওড' আখ্যা দেওয়া হয়। এইগুলির তিনটি খণ্ড আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২৩ অব্দে ও চতুর্থ খণ্ড খ্রীষ্টপূর্ব ১৩ অব্দে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলি সাধারণভাবে গীতিকাব্যধর্মী। চপলভঙ্গীর প্রেমের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুগম্ভীর নীতি-বিষয়ক কবিতা, স্তোত্র, প্রশস্তি, রাজস্তুতি, দেশপ্রেমমূলক কবিতা প্রভৃতি 'কার্মিনা'র অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার 'Epistles' বা 'পত্রাবলী' (খ্রীষ্টপূর্ব ১৩ অব্দে প্রকাশিত) দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ কবিতাই আচার-আচরণ, নীতি ও সুখবোধ-সংক্রান্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় কবিতাটি অংশতঃ আত্মজীবনীমূলক।

'আর্স্ পয়েটিকা' (কাব্যাদর্শ) বা 'পিসোদের প্রতি পত্র' (রচনাকাল আ. খ্রী. পূ. ১০ অব্দ) গ্রন্থে পিসো নামক দুই তরুণ ভ্রাতার অনুরোধে তিনি কাব্য (বিশেষতঃ নাটক) সম্পর্কিত কয়েকটি নীতির নির্দেশ সহজ ও সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁহার কাব্যাদর্শ গ্রন্থের স্থান ও গুরুত্ব আরিস্তোতলের কাব্যতত্ত্বের পরেই। হরেসের মতে অবিচলিত-চিত্তে জীবনকে গ্রহণ করাই আমাদের ধর্ম। তিনি বলেন, জীবন ক্ষণস্থায়ী ও অনিশ্চিত, মৃত্যু অবধারিত; কীর্তির মধ্য দিয়াই শুধু ব্যক্তিগত অমরত্ব লাভ করা যায়। রোমকদের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি বলিতে হরেস্‌কেই বুঝায়।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

হর্মোন দেহের কোনও কোনও সেল-নিঃসৃত উত্তেজক বিশেষ রাসায়নিক উপাদানকেই হর্মোন বলা হয়। সাধারণতঃ প্রণালীহীন গ্ল্যান্ড, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের শৈল্মিক ঝিল্লী, বিশিষ্ট নার্ভসেল ও নার্ভতন্ত্রপ্রান্তে উৎপন্ন হর্মোন উৎপত্তিস্থান হইতে রক্তস্রোতে কোনও সন্নিহিত বা দূরবর্তী অংশে বাহিত হইয়া তাহাদের ক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। হর্মোনগুলির অধিকাংশই প্রোটিন বা পলিপেপ্‌টাইড জাতীয় হইলেও অ্যাড্রিন্যাল ত্বক ও যৌনগ্ল্যান্ডগুলির হর্মোন স্টেরোয়েড-শ্রেণীর। প্রণালীহীন গ্ল্যান্ডগুলিতে, যেমন মস্তিষ্কের ভূমি-সংলগ্ন পিটুইটারিতে, গলদেশের থাইরয়েডে, উদরাভ্যন্তরে বৃক্কের উপরিস্থিত অ্যাড্রিন্যালে এবং স্ত্রীদেহে ওভ্যারিতে ও প্রণালীযুক্ত প্যান্‌ক্রিয়াস্ ও পুংযৌন-গ্ল্যান্ডের মধ্যে বহু, দুই বা একটি হর্মোন ক্ষরিত হয়। পিটুইটারির সম্মুখভাগে উৎপন্ন নানা হর্মোনের দ্বারা দেহবৃদ্ধি, থাইরয়েড ও অ্যাড্রিন্যালত্বকের হর্মোন-ক্ষরণ এবং প্রসূতির স্তনে দুগ্ধক্ষরণও নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস্ অংশের ক্ষরণক্ষম সেল হইতে উৎপন্ন উত্তেজক উপাদান যখন রক্তস্রোতে পিটুইটারির সম্মুখভাগে পৌঁছায় তখন সেখানে FSH ও LH-নামক হর্মোন-দুইটি সঞ্জাত হইয়া যৌন-গ্ল্যান্ডকে সক্রিয় করে এবং তাহাদের নিজ নিজ হর্মোন-ক্ষরণেও উদ্বোধিত করে। প্রথমটির প্রভাবে স্ত্রীদেহে ওভামের উৎপত্তি ও আকারবৃদ্ধি ঘটে ও ঈস্ট্রোজেন-জাতীয় বিশিষ্ট হর্মোনের ক্ষরণ হয় এবং পুংদেহে শুক্রকীটের উৎপত্তি ও পূর্ণপরিণতিও ঘটে। আবার দ্বিতীয়টির প্রভাবে ওভ্যারি হইতে যেমন ওভামের নিষ্ক্রমণ ও হর্মোন প্রজেস্টেরোনের ক্ষরণ হয় তেমনি পুং-যৌনগ্ল্যান্ডের অভ্যন্তরেও টেস্টোস্টেরোনেরও ক্ষরণ ঘটে। অপর পক্ষে হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন দুইটি নিউরোহর্মোন অক্সিটোসিন ও মূত্ররেচন-প্রতিষেধক হর্মোন (ADH) সংযোজক নার্ভগুচ্ছ মাধ্যমে

পিটুইটারির পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। অন্যত্র প্যান্‌ক্রিয়াসের দ্বৈপিক অংশে দুইটি হর্মোন, বহুমূত্র-প্রতিষেধক ইন্‌সুলিন ও রক্তের গ্লুকোজ-বর্ধক গ্লুকাগোন এবং পাকস্থলী ও গ্রহণীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে যথাক্রমে গাসট্রিন ও সিক্রিটিন ক্ষরিত হয়। গর্ভাবস্থায় গর্ভফুলেও ক্ষরিত হয় প্রজেস্টেরোন, ঈস্ট্রোজেন ও বিশিষ্ট যৌন-গ্ল্যান্ড্‌-উত্তেজক হর্মোন। আবার অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যান্ডের মজ্জাতে যেমন ক্ষরিত হয় অ্যাড্রিনেলিন ও নোর-অ্যাড্রিনেলিন, তেমনি কয়েকটি স্থান ব্যতীত সকল সমব্যথী নার্ভপ্রান্তে প্রস্তুত হয় তাহাদেরই সমধর্মী সিম্পেথিন। পক্ষান্তরে পরাসমব্যথী ও চেষ্টীয় নার্ভপ্রান্তগুলিতে উৎপন্ন হয় অ্যাসেটিল-কোলিন। দেহের পক্ষে স্বাভাবিক পরিমাণে হর্মোনগুলির ক্ষরণ অত্যাবশ্যক এবং অত্যধিক কিংবা অত্যল্প ক্ষরণে দেহের বৈকল্য অবশ্যম্ভাবী। পিটুইটারির সম্মুখ-ভাগের অক্ষমতায় অল্পবয়সে ঘটে বামনত্ব, অকালবার্ধক্য এবং অতিকৃশতা, থাইরয়েডের ক্রিয়া-স্বল্পতায় শিশুকালে ক্রেটিন-বামনত্ব এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বিশেষ মেদ বাহুল্য, ইনসুলিনের অভাবে মধুমেহ এবং অ্যাড্রিন্যালের অক্ষমতায় অ্যাডিসন্‌স্‌ রোগ। বিপরীত-ভাবে পিটুইটারির অতি সক্রিয়তার ফলে অল্প বয়সে দেখা দেয় অতিকায়ত্ব এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সুদীর্ঘ বাহুসহ গরিলার মত মুখাবয়ব। একইভাবে থাইরয়েডের ক্রিয়াবৃদ্ধিহেতু কৃশকায়ত্ব, 'ছানাবড়াচোখ', বুকধড়ফড়ানি ও হাতের কাঁপুনিসহ গ্রেভ্‌স্‌ রোগ। অ্যাড্রিন্যালত্বকের অতিসক্রিয়তার ফলে মেয়েদের মুখে ও সর্বদেহে লোমের আধিক্য সহ যৌন পরিবর্তন। ও LH -এর FSH প্রভাবে ওভ্যারি বা পুংগ্ল্যান্ডের নিজস্ব হর্মোনের যখন ক্ষরণ আরম্ভ হয়, তখনই নারী বা পুরুষদেহে দেখা দেয় যৌবন লক্ষণসমূহ। আবার তাহাদেরই পরস্পরের সহায়ক ক্রিয়ার সাহায্যে নারীদেহে যথাসময়ে মাসিক ঋতু হইতে থাকে এবং অস্বাভাবিকতার দরুন নানা ব্যতিক্রম ঘটে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

হর্ষঙ্ক বিম্বিসার দ্র

হর্ষ 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ'—এই তিনখানি নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীহর্ষের পরিচয় এক সময়ে বিতর্কের বিষয় থাকিলেও বর্তমানে ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, ইনি রাজা হর্ষবর্ধন ('হর্ষবর্ধন' দ্র)। উক্ত নাট্যগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, ভাষা, ভাব প্রভৃতি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় উহা এক ব্যক্তির রচনা। দামোদর গুপ্ত (খ্রী. ৯ম শতাব্দী) তাঁহার 'কুট্টনীমত'-এ 'রত্নাবলী'কে হর্ষের রচনা বলিয়াছেন। ই-ৎসিং (Yi tsing; ৭ম শতাব্দের শেষ পাদ)-এর সাক্ষ্য অনুসারে 'নাগানন্দ' হর্ষ রচিত। কেহ কেহ মনে করেন যে, হর্ষের সভাশ্রিত বাণভট্ট উক্ত নাট্যগ্রন্থগুলির রচয়িতা; কিন্তু বাণভট্টের ('বাণভট্ট' দ্র) রচনাশৈলী প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়; তাহা ছাড়া এই কল্পনার সমর্থক কোনো প্রমাণও নাই। চারি অঙ্কে রচিত 'রত্নাবলী' নাটিকার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে এইরূপঃ জাহাজডুবির ফলে রাজকন্যা রত্নাবলীর বৎসরাজ উদয়নের সভায় আগমন, উদয়ন-মহিষী বাসবদত্তার পরিচারিকারূপে সাগরিকা নামে রত্নাবলীর অবস্থান, সাগরিকার প্রেমপাশে উদয়নের বন্ধন, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে সাগরিকা ও উদয়নের পরিণয়।

'প্রিয়দর্শিকা'ও চতুরঙ্ক নাটিকা। ইহার বিষয়বস্তু এইরূপঃ ঘটনাক্রমে উদয়নের সেনাপতির সাহায্যে অঙ্গরাজকুমারী প্রিয়দর্শিকার উদয়নের অন্তঃপুরে প্রবেশ ও আরণ্যকা নামে বাস; তাহার প্রতি উদয়নের আসক্তি, মহিষীর ক্রোধ, পরিশেষে আরণ্যকার পরিচয় প্রকাশ ও উদয়নের সহিত মিলন।

পঞ্চাঙ্ক নাটক 'নাগানন্দে'র বিষয়বস্তু এইরূপঃ জীমূতবাহন ও মলয়বতীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার পরে তাঁহাদের বিবাহ: নাগকুলের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ গরুড়ের নিকট জীমূতবাহনের আত্মাহুতি, গৌরী দেবীর কৃপায় জীমূতবাহনের পুনর্জীবনলাভ ও মলয়বতীর সহিত সুখে বাস।

বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় বিশেষ মৌলিকতা না থাকিলেও ঘটনাবিন্যাসে ও চরিত্রচিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। হর্ষের ভাষা সরল, সরস ও সুখপাঠ্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হর্ষবর্ধন পুষ্যভূতিবংশীয় মহারাজাধিরাজ প্রভাকর-বর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হইলে ইনি থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬০৬ খ্রী) এবং সৈন্যদলসহ কনৌজ অভিমুখে অগ্রসর হন। ('পুষ্যভূতি বংশ' দ্র)। কিন্তু পথিমধ্যে রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি ও বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশের সংবাদ পাইয়া তিনি সেখানে যান এবং চিতায় আত্মবিসর্জনে উদ্যত রাজ্যশ্রীকে রক্ষা করেন। কনৌজরাজ্য অচিরে হর্ষবর্ধনের অধিকার-ভুক্ত হয় এবং তিনি কনৌজেই রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

রাজত্বলাভের পর হর্ষবর্ধন পূর্ব দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বলভী, গুর্জর, সিন্ধু, মগধ, গৌড়, ওড্র এবং কোঙ্গদ দেশের (চিল্কা হ্রদ ও মহেন্দ্র গিরির মধ্যবর্তী রাজ্য) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে 'সকলোত্তরাপথনাথ' হর্ষ পরাজিত হন ('পুলকেশী' দ্র)। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন মগধ জয় করেন। মাতোয়ানলিন অনুসারে ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মগধরাজ উপাধি ধারণ করেন। হিউ-এন্-ৎসাঙের জীবনী হইতে জানা যায় যে, ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে হর্ষবর্ধন ওড়িশা ও কোঙ্গদ জয় সমাপ্ত করিয়া রাজমহলের নিকটবর্তী কজঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রথমে স্থানীশ্বর কনৌজ ও নিকটবর্তী ছোট ছোট অনেকগুলি রাজ্য এবং পরবর্তী-কালে মগধ, ওড়িশা, কোঙ্গদ ও সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গ, হর্ষের অধীন ছিল।

৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন চীনের তাঙ্সম্রাটের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। চীন সম্রাট্ তাঁহার নিকট ৬৪১ ও ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দূত প্রেরণ করেন। হিউ-এন্-ৎসাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হর্ষের রাজ্যকালে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তিনি নিজে সাম্রাজ্যের নানাস্থানে ঘুরিয়া শাসনকার্য দেখাশোনা করিতেন।

বাণভট্ট, ময়ূরমাতঙ্গ, দিবাকর প্রভৃতি কবিগণ হর্ষের সভা অলংকৃত করিতেন। প্রচলিত মত অনুসারে হর্ষবর্ধন স্বয়ং 'প্রিয়দর্শিকা', 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নামে তিনখানি নাটক রচনা করেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই মত মানিয়া লইয়াছেন। কবির এই সকল নাটকে শ্রীহর্ষ বলিয়া অভিহিত হইলেও রাজা হর্ষবর্ধন ও শ্রীহর্ষ অভিন্ন ব্যক্তি ('হর্ষ' দ্র)।

নালন্দা মহাবিহারে হর্ষবর্ধন মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন। মহাজান বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়াগে তিনি যে পঞ্চবার্ষিক মহামোক্ষ পরিষদের সম্মেলন করিতেন তাহাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে যথাক্রমে বুদ্ধ, আদিত্যদেব এবং ঈশ্বর (শিব) দেবের প্রতিকৃতি সৎকারে শোভাযাত্রা হইত। এই উপলক্ষে দুই মাস যাবৎ বৌদ্ধভিক্ষু, ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী এবং অনাথ-আতুর, দরিদ্র ও অন্যান্য প্রার্থীকে তিনি বস্ত্র, আভরণ অর্থ প্রদান করিতেন। এই দানক্রিয়ায় রাজকোষে সঞ্চিত সমুদয় অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি, এমন কি তাঁহার নিজস্ব অলংকারাদি পর্যন্ত নিঃশেষ হইত। ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে হর্ষের মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর অ-ল-ন-সুয়েন (অর্জুন বা অরুণাশ্ব) নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সাম্রাজ্যের কিয়দংশে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং পুষ্যভূতি সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

অধীর চক্রবর্তী

হলডেন, জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন (১৮৯২-১৯৬৪ খ্রী) প্রজননবিজ্ঞান, ক্রমবিবর্তনবাদ ও শারীর-বিদ্যার ক্ষেত্রে বহুবিশ্রুত নাম। প্রাকৃতিক নির্বাচনের গাণিতিক তত্ত্ব, ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধশক্তির ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার গবেষণা বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া স্বীকৃত। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ও পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। অধ্যাপক হলডেনের বিজ্ঞান-বিষয়ক কোনো ডিগ্রী ছিল না এবং ডিগ্রীর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্থায়িভাবে ভারতে বসবাসের জন্য চলিয়া আসেন ও পরে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কেবল নাগরিকত্ব নয় তিনি সর্বতোভাবে ভারতীয় জীবনধারা ও বেশভূষা গ্রহণ করেন ও আহারে নিরা-মিষাশী ছিলেন। ১৯৫৭-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউটে গবেষণার অধ্যাপকরূপে কাজ করিবার পর তিনি ভুবনেশ্বরের প্রজনন বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গবেষণাগারে যোগদান করেন। আমাদের দেশের গবেষণাগারগুলিতে মূল্যবান্ যন্ত্রপাতি ব্যতিরেকেও যে গবেষণা করা চলে, সে বিষয়ে তিনি সর্বদাই পরামর্শ দিতেন। শিক্ষক, বক্তা ও গবেষণার পরিচালক হিসাবে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি প্রায় ৪০০-এর অধিক গবেষণাপত্র, বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ও অসংখ্য জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক রচনার প্রণেতা ছিলেন। হলডেন আজীবন পারমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।।

অনাদিনাথ দাঁ

হলদিঘাটের যুদ্ধ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুরের ৩২ কি. মি. উত্তর-পশ্চিমে গোগুন্দার নিকটবর্তী হলদি-ঘাটের সংকীর্ণ গিরিপথে মহারাণা প্রতাপ ও আকবর বাদশাহের মোগল বাহিনীর মধ্যে যে-যুদ্ধ হয় তাহাই এই নামে প্রসিদ্ধ। আকবরের রাজ্য-প্রসারের স্বপ্ন এবং রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প হলদিঘাটের যুদ্ধকে অনিবার্য করিয়া তোলে। মোগলপক্ষে, অম্বররাজ মানসিংহ ও আসফ খাঁর অধীনে যত সৈন্য প্রেরিত হয়,

প্রতাপের সৈন্যসংখ্যা তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। উপরন্তু তাঁহার রাজধানী শত্রুবেষ্টিত, ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত, রাজস্থানের অধিকাংশ শাসক মোগলের অনুগত। কিন্তু অবিচলিত প্রতাপ অরণ্য ও পর্বতের আদিবাসীদিগকে স্বাধীনতারক্ষার দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করিয়া মোগলদের সম্মুখীন হইলেন। এই যুদ্ধে মোগলদের নিকট পরাজিত হইলেও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রতাপ অসাধারণ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ অবিস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন ('প্রতাপ সিংহ' দ্র)। এই যুদ্ধে ঝাল-পতি নিজেকে রাণা বলিয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন, যাহাতে বিপন্ন প্রতাপ প্রাণ লইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। এই ঘটনাটিও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আজিও অমর হইয়া আছে।

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

হলদিয়া পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হলদি নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দর তথা শিল্পপ্রকল্পের ক্ষেত্র। হলদি নদী ও সমুদ্রের মোহনায় বঙ্গোপসাগরের মুখে এই বন্দরপ্রকল্প সরকারি প্রচেষ্টায় চালু হইয়াছে। তীরের নিকট জল গভীর থাকায় পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতের সুবিধা হইবে। এই স্থান সড়কপথে ও বৈদ্যুতিক রেলপথে কলিকাতা ও আশপাশের সহিত উত্তমরূপে যুক্ত। একাধিক শিল্প ও কারখানার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ইহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী

হলায়ুধ আনুমানিক ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে কবি-বৈয়াকরণ এক হলায়ুধের আবির্ভাব হয়। ইনি 'অভিধান-রত্নমালা' রচনা করেন। গ্রন্থখানি Thomas Aufrecht কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (১৮৬১ খ্রী)। ইঁহার লেখা 'কবিরহস্য'-এ একাধারে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রসঙ্গ বিশেষের আলোচনা এবং তৎসঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের (আনু. ৯৪০-৫৬ খ্রী) প্রশস্তি আছে। রাজা লক্ষ্মণসেন (১২শ শতাব্দীর শেষের দিক্)-এর সভাপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত দ্বিতীয় এক কবি হলায়ুধের নামে প্রচলিত, 'ব্রাহ্মণ সর্বস্বম্' গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। ইহা রাজাদেশে লিখিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্কন (১৮০২-১৮৩২ খ্রী)। আসামের সুপণ্ডিত লেখক। পিতা পরশুরাম গৌহাটিতে আগত দ্রাবিড় দেশীয় এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক পালিত ছয়জন নিঃস্ব বালকের অন্যতম হইলেও পরে রাম হাদিরচৌকি বা বাঙ্গালহাটের দুয়রীয়া বড়ুয়া (কাস্টম অফিসার) হন। পরশুরামের মৃত্যুর পর হলিরাম দুয়রীয়া বড়ুয়া পদে নিযুক্ত হন। হলিরামের পুত্র আনন্দরাম সমগ্র আসামে অসমীয়া ভাষা প্রবর্তনের অগ্রদূতরূপে স্বীকৃত। হলিরাম চন্দ্রকান্ত সিংহ স্বর্গদেবের প্রিয়পাত্র হইয়া তৎকর্তৃক 'ঢেকিয়াল ফুক্কন' উপাধিতে ভূষিত হন। অতঃপর হলিরাম গৌহাটিতে কালেক্টরির সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর পরেই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট-পদে উন্নীত হন। হলিরাম বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনিই বাংলা ভাষায় প্রথম আসামের ইতিহাস লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (১৮২৯ খ্রী)। গ্রন্থটির গদ্যরীতি সে যুগের পক্ষে প্রশংসনীয়। ইঁহার রচিত, স্বনামে ও বেনামীতে বহু বাংলা পত্রাদি সে যুগের একাধিক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার রচিত 'কামরূপযাত্রাপদ্ধতি' গ্রন্থখানি সহজ সংস্কৃতে রচিত। তাঁহার অকাল মৃত্যুর পর গ্রন্থটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

হলেবিদ, হালেবিদ মহীশূর হইতে প্রায় ৮০ কি. মি. দূরে অবস্থিত অধুনা ইহা একটি নগণ্য গ্রাম। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১১শ-১৪শ শতাব্দী পর্যন্ত ইহা দক্ষিণাপথের এক জনাকীর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। এই তিনশত বৎসর ইহা হোয়সাল রাজবংশের ('হোয়সাল' দ্র) রাজধানী দ্বারসমুদ্র নামক নগরীরূপে পরিচিত ছিল। মালিক কাফুরের আক্রমণ ও অত্যাচারে ইহার পূর্ব-গৌরবের বিশেষ কিছু আর নাই। ইহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কেবল হোয়সালেশ্বর এবং কেদারেশ্বর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দির অবশিষ্ট আছে। হোয়সাল দেবালয়গুলি সমন্বয় ধর্মী, সুষম এবং অপূর্ব ভাস্কর্য ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। এখানকার প্রত্যেকটি মূর্তির তলায় 'রূপকারের' নাম পাওয়া যায়। একমাত্র হোয়সালেশ্বর মন্দিরগুলি হইতেই ষট্‌ত্রিংশ রূপকারের নাম পাওয়া গয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম দ্বিতীয় ল্লিতম। হলেবিদ ব্যতীতও নানা স্থানে হোয়সাল-শৈলীতে নির্মিত পাষাণ-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই শৈলীর মন্দিরগুলির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এগুলি শিল্পসমৃদ্ধ, ইহাদের সংস্থানক (গ্রাউণ্ড প্ল্যান) বহুভুজ, অথবা, তারকাকার (পলিগোন্যাল অথবা স্টারসেপ্ড্) এবং শিখরগুলি পিরামিডাকৃতি। হলেবিদে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবালয় হোয়সালেশ্বর। ইহাতে দুইটি সংযুক্ত মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দির দুইটি দ্রাবিড় শৈলীর অন্তর্গত এবং

প্রত্যেকটিতে গর্ভগৃহ, অন্তরাল, মণ্ডপ প্রভৃতি আছে। হোয়সালেশ্বর মন্দিরের নন্দীমণ্ডপের পূর্বে একটি সূর্য-মন্দির আছে। বীরভদ্র মন্দির আর একটি ক্ষুদ্র দেবালয় এবং ইহারও গর্ভগৃহ আছে। বীরভদ্র মন্দিরের উত্তরে গুড্ডালেশ্বর নামক মণ্ডপযুক্ত একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেবালয়গুলির নাম রুদ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর প্রভৃতি।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্‌পিট্যাল ফর মেন্টাল ডিজিজেস, কাঁকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচি ইওরোপীয়ান মেণ্টাল অ্যাসাইলাম (পরে ইহা 'ইওরোপীয়ান মেণ্টাল হস্‌পিটাল' আখ্যা পায়) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহার শয্যাসংখ্যা ছিল ১৮০ এবং হাসপাতালটি কেবলমাত্র ইওরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ইহার ভার গ্রহণ করেন; এবং তখন হইতে মানসিক চিকিৎসার ব্যাপারে ইহাকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা সক্রিয়ভাবে চলিতে থাকে। বর্তমানে এখানে নিদান তাত্ত্বিক ও ভৈষজ ব্যাপারে বহু প্রকারের সুবিধা আছে, যথা—মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, পেশা সম্পর্কিত নির্দেশ, বিবাহ সম্বন্ধে উপদেশ, মানসিক রোগের বিবিধ অনুসন্ধান, মনঃসমীক্ষণ, ব্যক্তিগত মানসিক চিকিৎসা (ইন্‌ডিভিজুয়াল সাইকো থেরাপি), বর্গীয় মানসিক চিকিৎসা (গ্রুপ সাইকো থেরাপি), তড়িৎ-আক্ষেপমূলক চিকিৎসা (ইলেক্‌ট্রো কন্‌ভালসিভ থেরাপি), ইনসুলিন-কোমা চিকিৎসা, ইনসুলিন সাবকোমা চিকিৎসা, ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা, মনোবিকারের চিকিৎসা প্রভৃতি।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগের রোগীদের (আউটডোর পেসেণ্ট) চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শিশু পরিচালনার একটি রোগপরীক্ষার (ক্লিনিক) রাঁচি সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের সহিত যুক্ত আছে। অধুনা রাঁচির এই মানসিক রোগের হাসপাতালে উচ্চাঙ্গের গবেষণার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই প্রতিষ্ঠান মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও সামাজিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন; রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ডিপ্লোমা দিয়া থাকেন।

কৃষ্ণস্বামী ভাস্করণ

হস্তিনাপুর মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডবদের রাজধানী বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন ভারতের কোনও এক রাজা হস্তিন্ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মীরাটের ৩৫ কি. মি. উত্তর-পূর্বে পুরানো গঙ্গার খাতে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ২৯°৯′ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৮°৩′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। মহারাজ নিচক্ষুর রাজত্বকালে গঙ্গার প্লাবনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হইয়া গেলে কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কেহ কেহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 'হস্তি' নগরকেই প্রাচীন হস্তিনাপুর বলার পক্ষপাতী। হস্তিনাপুরকে এক অর্থে পাঞ্জাবের বাহিরে আর্যদের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপনিবেশ বলা চলে।

কৃষ্ণপ্রসাদ দে

হাইড্রলিক্‌স সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী প্যাস্‌ক্যাল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, স্থির তরলের কোনও এক বিন্দুতে প্রযুক্ত চাপ তরলের মধ্যে সর্বত্র সমপরিমাণে সঞ্চারিত হয়। প্যাস্‌ক্যালের সূত্র নামে অভিহিত এই তথ্যই হইতেছে হাইড্রলিক্‌সের মূলতত্ত্ব। (গ্রীক ভাষায় 'হাইড্রোস' শব্দের অর্থ জল এবং 'অলাস' শব্দের অর্থ নল)। যেহেতু চাপ হইতেছে প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপরে প্রযুক্ত বল, অতএব প্যাস্‌ক্যালের সূত্রানুযায়ী স্থির তরলের কোনও ক্ষুদ্র মুক্ত তলের উপরে প্রযুক্ত অল্প পরিমাণ বলের প্রভাবে উক্ত তরলের অন্য কোনও বৃহদায়তন মুক্ত তলের উপরে অনেক বেশি পরিমাণ বলের উদ্ভব হইবে।

আধুনিক যুগের শিল্পবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে হাইড্রলিক্‌সের সমধিক ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন, হাইড্রলিক প্রেসের সাহায্যে তুলা, পাট প্রভৃতি দ্রব্যের বড় বড় গাঁটের উপরে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করিয়া সেগুলির আয়তন কমানো হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে দুইটি পরস্পর সংযুক্ত নলের মধ্যে দুইটি পিস্টন ওঠা-নামা করিতে পারে। একটির ক্ষেত্রফল অন্যটির অপেক্ষা বহুগুণ বেশি হয়। সরু নলের মধ্যকার জলের উপরে পিস্টনের সাহায্যে যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহা অপরিবর্তিতভাবে জলের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া অন্য পিস্টনটির উপরে ক্রিয়া করে; ইহার ফলে সেটির উপরে অত্যুচ্চ বলের উদ্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি সরু নলটির পিস্টনের ক্ষেত্রফল হয় দশ বর্গসেণ্টিমিটার এবং ইহার মধ্যে অবস্থিত জলের উপরে প্রতি বর্গসেণ্টিমিটারে দশ কিলোগ্রাম ওজনের সমান চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে ইহার চেয়ে কুড়িগুণ বেশি ক্ষেত্রফলসম্পন্ন প্রশস্ত নলের পিস্টনের উপরে মোট ১০×১০×২০=২০০০ কিলোগ্রাম, অর্থাৎ দুই টন ওজনের সমান বল ক্রিয়া করিবে। এই পিস্টনের উপরে অবস্থিত একটি তক্তা এবং তাহার কিছু উপরে অবস্থিত আর একটি

স্থায়ীভাবে আবদ্ধ তত্তার মধ্যে রাখা তুলা বা পাটের বড় বড় গাঁট পিস্টনের উপরে ক্রিয়াশীল প্রচণ্ড বলের প্রভাবে আয়তনে সংকুচিত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে মোটর গ্যারাজে মোটর গাড়ির তলদেশে পরিষ্কার করিবার সময়ে গাড়িকে উপরে তুলিবার জন্য যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে তাহাও হাইড্রলিক্সের সাহায্যে সংঘটিত হয়। মাটির নীচে একটি আবদ্ধ আধারের মধ্যে বিশেষ ধরনের তেল রাখা থাকে। একটি সরু নলের মধ্যে পিস্টনের সাহায্যে এই তেলের উপরে প্রয়োজনমত যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহা ইহার সহিত সংযুক্ত আর একটি প্রশস্ত নলের মধ্যে একটি বড় পিস্টনের উপরে অপরিবর্তিতভাবে সঞ্চারিত হয়। যেহেতু শেষোক্ত পিস্টনটির ক্ষেত্রফল প্রথমটির অপেক্ষা বহুগুণ বেশি, অতএব ইহার উপরে ক্রিয়াশীল মোট বলের পরিমাণ এত বেশি হয় যে, ইহার উপরে অবস্থিত মোটর গাড়িকে সহজেই উপরদিকে ঠেলিয়া তোলা যায়।

ইহা ছাড়া আধুনিক মোটর গাড়ির ব্রেক, নরম ধাতু বা প্ল্যাস্টিক-নির্মিত নানা আকারের বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত, এয়ারোপ্লেনের হাল, এলেরন প্রভৃতি গতি-নির্ধারক যন্ত্রাবলীর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে হাইড্রলিক্সের সূত্র প্রযুক্ত হয়।

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল

হাইড্রোজেন (রাসায়নিক চিহ্ন H) ইহা জলে অদ্রবণীয়, বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস। লঘুতম মৌল। পরমাণুক্রমাঙ্ক ১ এবং পরমাণুভার ১.০০৭৮। সাধারণতঃ ইহা অন্যান্য মৌলের সহিত সংযুক্ত অবস্থায় থাকে; তন্মধ্যে জল, পেট্রোলিয়াম ও বিভিন্ন জৈব পদার্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার অপর দুইটি পারমাণবিক রূপ (isotope) -এর নাম যথাক্রমে ডয়েটেরিয়াম ও ট্রাইসিয়াম।

বিভিন্ন ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা হয়, যথাঃ ১. অম্লের সহিত দস্তা (জিঙ্ক), ম্যাগনিসিয়াম, লৌহ দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে; ২. ক্ষারের সহিত অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, সিলিকন ইত্যাদির সংমিশ্রণে; অথবা, ৩. জলের সহিত লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতুর মিশ্রণে। বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন, জলের বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ হইতে মেলে। হাইড্রোজেন দাহ্য পদার্থ। অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় অগ্নি সংস্পর্শে আসিলেই উহা জ্বলিয়া ওঠে এবং রাসায়নিক মিলনের ফলে জল উৎপন্ন হয়। কোনও কোনও ধাতব দ্রব্য, যেমন প্যালেডিয়াম (palladium), হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করিয়া লইতে পারে কিন্তু উত্তপ্ত করিলেই ধাতু হইতে বিযুক্ত হইয়া পুনরায় হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসে। এই শোষণ কার্যকে হাইড্রোজেনের অন্তর্ধৃতি (occlusion of hydrogen) বলা হয়। কোনও কোনও দ্রব্য সাধারণভাবে হাইড্রোজেনের সহিত কোনও রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে না; কিন্তু 'সদ্যোজাত' অবস্থায় করিয়া থাকে। এই শক্তিশালী সদ্যোজাত হাইড্রোজেনকে nascent hydrogen বলা হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিকশিল্পে হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হয়, যথাঃ বনস্পতি, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, কৃত্রিম পেট্রল, অ্যামোনিয়া, মিথাইল অ্যালকোহল প্রভৃতি প্রস্তুতিতে। বেলুন ও উড়োজাহাজের কাজেও হাইড্রোজেন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অরুণকুমার দাশগুপ্ত

হাউপ্টমান, গেরহার্ট (১৮৬২-১৯৪৬ খ্রী) জার্মান নাট্যকার। সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার নাটকের বিষয়বস্তু অঙ্কিত। তাঁহার ন্যাট্যচিন্তায় আধুনিক মানবমনের প্রকাশ সার্থকভাবে অনুসৃত।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'Vor Sonnenaufgang' নামক তাঁহার নাটক রঙ্গমঞ্চজগতে এক অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'Die Weber' (The Weavers তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাটক। এই নাটকে তন্তুবায়-জীবনের ব্যথাহত চিত্র সুনিপুণ ভঙ্গিমায় অঙ্কিত। সমগ্র তন্তুবায়শ্রেণী নাটকটির নায়ক। নাটকটিতে কোনও ব্যক্তিবিশেষ প্রাধান্য পায় নাই। ইহাই নাটকটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'The Beaver Coat' নামক একটি হাস্য-রসাশ্রিত বাস্তবধর্মী নাটক রচনা করেন। এক নূতন শৈলী অনুসরণ করিয়া তিনি 'The Assumption of Hanneles' নামক নাটকটি রচনা করেন। ইহার গঠনকৌশল 'ন্যাচারালিজ্ম্' ভাবধারার অনুষঙ্গী। 'The Sunken Bell' নামক একটি সাংকেতিক নাটকও তিনি রচনা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের নাট্যচিন্তা তাঁহার প্রসিদ্ধ নাট্যকৃতিগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাঃ 'The Fool in Christ Emmanuel Quint' (১৯১০ খ্রী), 'The Heretic of Soana' (১৯১৮ খ্রী), 'The Island of the Great Mother' (১৯২৪ খ্রী) প্রভৃতি

শিশির চট্টোপাধ্যায়

হাওড়া পশ্চিমবাংলার বর্ধমান ' বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হাওড়া জেলার দুইটি মহকুমাঃ

সদর বা হাওড়া এবং উলুবেড়িয়া। হাওড়া জেলা ২২°১২′ হইতে ২২°৪৮′ উত্তর অক্ষাংশের এবং ৮৭°৫০′ হইতে ৮৮°২৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে হাওড়া জেলা-অঞ্চল নদিয়া, চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার সহিত যুক্ত ছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা পৃথক্ জেলারূপে গণ্য হয়।

প্রায় ত্রিভুজাকৃতি এই জেলার নিম্নকোণে রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর সঙ্গম হইয়াছে। দামোদর নদ জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। নদীমাতৃক এই জেলার প্রায় সকল স্থানই সমভূমি। দো-আঁশ ও এঁটেল মাটিযুক্ত জমির প্রাচুর্য দেখা যায়। কলিকাতা অঞ্চলের মতই জলবায়ু। জনসংখ্যা ২,০৩৮,৪৭৭। ১,১২৭,৩৯২ পুরুষ ও ৯,১১,০৮৫ স্ত্রীলোক। কৃষিজ—ধানই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। নানাপ্রকারের ডালও উৎপন্ন হয়। আখ, তামাক ও পানের চাষ হয়। আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, আতা ইত্যাদির প্রাচুর্য দেখা যায়। ধানের পরই পাটচাষ উল্লেখ-যোগ্য। যন্ত্রশিল্প ও কুটিরশিল্প দুইই, এই জেলায় রহিয়াছে। যন্ত্রশিল্পের অধিকাংশই হাওড়া শহরের ভিতর আছে। হাওড়াকে পাটশিল্পের কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। কুটিরশিল্পের ভিতর হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রবয়ন এই জেলার একটি প্রধান শিল্প। ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, আমতা, বাগনান ইত্যাদি থানার ভিতর এই শিল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়। বিরাট কলিকাতা শহরকে হাওড়া স্টেশন সারা ভারতের সহিত যুক্ত করিয়াছে। গঙ্গার উপর একটি সুন্দর ব্রিজ বা পুলের দ্বারা এই যোগ প্রতিষ্ঠিত। হাওড়া শহরের শিবপুর অঞ্চল হইতেই বিখ্যাত গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোডের শুরু। এই রাস্তার পূর্ব দিকে ভাগীরথী নদীর তীর পর্যন্ত প্রায় সকল স্থানই কলকারখানায় পূর্ণ। এই শিবপুর অঞ্চলে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রহিয়াছে। পূর্বে এইস্থানে বিশপ্ কলেজ ছিল। হাওড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত বটানিক্যাল্ গার্ডেন আছে। হাওড়ার উত্তরদিকে ঘুসুড়ীতে পুরানো এক তিব্বতীদের মন্দির আছে। ইহার নাম অনুসারে ঐ অঞ্চলের নাম ভোটবাগান হইয়াছে। হাওড়া শহরের উত্তর সীমানার পরেই বিখ্যাত বেলুড় মঠ। এই জেলার আর একটি বড় শহর বালি। এই স্থানেও কিছু কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। বালি হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ভাগী-রথীর উপর 'বিবেকানন্দ সেতু' নদীর দুই তীর যুক্ত করিয়াছে।

অমিয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়

হাঙ্গর তরুণাস্থিবিশিষ্ট মৎস্য। সাধারণতঃ সামুদ্রিক। বিভিন্ন দেশের সমুদ্রে পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরেও অভাব নাই। মোহানা অঞ্চলে এবং নদীতেও কিছু পাওয়া যায়। দেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশে আবৃত, জোড় ও বিজোড় পাখনাযুক্ত। মস্তকের পিছনে কানকুয়াবিহীন ফুল্কা-ছিদ্র। ফুল্কা ইহাদের শ্বাসযন্ত্র। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে তিমি ছাড়া এত বৃহৎ প্রাণী আর নাই। তিমিহাঙ্গর (Rhinodon) প্রায় ৭০ ফিট লম্বা। হাঙ্গর ছোটও আছে। স্কোলিওডন্ নামে যে হাঙ্গর আছে, তাহা পরিণত অবস্থায় প্রায় দুই ফিট মাত্র। ইহাদের মস্তক চ্যাপ্টা, অগ্রভাগ ত্রিকোণাকার। হাঙ্গরের মধ্যে অনেকে স্বভাবে হিংস্র। বৃহৎ শ্বেত হাঙ্গর কারকারোডন লম্বায় প্রায় ৩৬ ফিট। ইহাদের দাঁত প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা। ইহারা মানুষকে আক্রমণ করে। হাতুড়ী হাঙ্গরের মস্তকের অগ্রভাগ হাতুড়ীর ন্যায়। ভারতে নানাপ্রকার হাঙ্গর পাওয়া যায়। হাঙ্গর আমিষভোষী। মাছ এমন কি মানুষ পর্যন্ত ইহার খাদ্য। ইহা সন্তান প্রসব করে। ইহার যকৃৎতৈল পুষ্টিকর। ইহার চামড়ায় বাক্স, পুস্তকের মলাট, তরোয়াল, ছোরা, বেয়নেট প্রভৃতির খাপ তৈয়ারি হয়। আঁশবিহীন অবস্থায় জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

বিশ্বনাথ মিত্র

হাড়-ভাঙ্গা দুর্ঘটনার ফলে যে কোনও বয়সেই মানুষের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় কোনও কোনও বিশেষ হাড় বিশেষ বয়সেই ভাঙ্গিয়া থাকে, যেমন: শিশুদের কণ্ঠার হাড় (collar-bone) বালকদের ঊর্ধ্ববাহুর নিম্নাংশের (কনুইয়ের নিকট supracondylar) হাড়, যুবকদের নিম্নবাহুর দুইটি হাড় (radius and ulna) এবং বৃদ্ধদের উরুতের হাড় (femur)।

হাড়-ভাঙ্গার বহুপ্রকার কারণের মধ্যে অধুনা রাস্তাঘাট ও কলকারখানার দুর্ঘটনাই অনেকাংশে দায়ী। শিশু ও বৃদ্ধদের আকস্মিক পতন অনেক সময়েই ইহার কারণ হইয়া থাকে। দায়িত্বজ্ঞানহীন নাগরিকদের অসাবধানতার জন্য কিছু লোক দুর্ঘটনায় পড়েন এবং কোনও কোনও হাড় (যথা মালাই চাকতি, petella) ভাঙ্গিয়া যায়। ক্বচিৎ বিশেষ কোনও রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে (টিউমার) অল্প আঘাতেই হাড় ভাঙ্গিয়া যায় (প্যাথোলজিক্যাল ফ্রাকচার)।

সাধারণ হাড়-ভাঙ্গা (সিম্পল্ ফ্রাকচার) হইলে হাড় ভাঙ্গিয়া দুই টুকরায় পরিণত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক টুকরাও হয় (কমিনিউটেড ফ্রাকচার)। শিশুদের হাড় অনেক সময় বাঁশের কঞ্চির মত ফাটিয়া যায় (গ্রীনস্টিক ফ্রাকচার)। যে সব ক্ষেত্রে হাড় ভাঙ্গিয়া মাংসপেশী ও চামড়া ভেদ করিয়া হাড়ের টুকরা বাহিরে

আসে সেইসব ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয় (কম্পাউন্ড ফ্রাকচার)। কিছুক্ষেত্রে হাড় ভাঙিয়া হাড়ের টুকরা দেহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শিরা-উপশিরাকে জখম করিতে পারে (কমপ্লিকেটেড ফ্রাকচার)। রঞ্জনরশ্মির দ্বারা ভাঙা-হাড়ের বিশেষ অবস্থান বুঝা যায়।

ভাঙা হাড়গুলিকে তাহাদের সাধারণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা এবং সেই অবস্থায় হাড় জোড়া লাগানোই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য। রোগের গুরুত্ব অনুসারে রোগীকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া মাংসপেশীগুলিকে শিথিল করা হয় ; তাহার পর ভাঙা হাড়গুলিকে তাহাদের পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়া অঙ্গটিকে প্ল্যাস্টার অভ্ প্যারিস দ্বারা ধরিয়া রাখা হয় : এবং হাড় জুড়িয়া গেলে বন্ধন খুলিয়া ফেলা হয়। শল্যচিকিৎসার প্রভূত উন্নতি সাধন হওয়াতে অধুনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করিয়া হাড়জোড়া লাগানোর চেষ্টা করা হয়।

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

হাড়ি পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত অন্ত্যজ এক জাতি হাড়ি নামে পরিচিত। তাহাদের মোট সংখ্যা ৯৬১৮৯ (১৯৫১ খ্রী)। ইহারা কয়েকটি শাখা-জাতিতে বিভক্ত, যেমন—বারভাগিয়া, মধ্যভাগিয়া, খোরিয়া, সিউলি, মেথর, মঘয়া, করায়া পুরন্দার প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কেবল মেথরশ্রেণী ময়লা পরিষ্কার করে। অন্যান্যরা চৌকিদার, পাল্কিবেহারা, সহিস, বাজনদার প্রভৃতির কাজ ও দিন মজুরি করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া শূকর পালন, খেজুর-রস সংগ্রহ ইত্যাদি প্রকার কাজও ইহারা করে। সনাতনপন্থী হিন্দুদের অপরাপর জাতি ইহাদের জল গ্রহণ করে না। ক্রিয়া-কর্মের জন্য ইহাদের নিজস্ব পুরোহিত আছে।

দীপালি ঘোষ

হান্টার, উইলিয়ম উইলসন (১৮৪০-১৯০০ খ্রী)। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'ভারতীয় সিভিল সার্ভিস'-এ যোগদান করেন। এই পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। পরবৎসর ইনি ভারতে আসেন এবং বীরভূম জেলায় সহকারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। বীরভূমে অবস্থানকালেই তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি অ্যানাল্‌স্ অভ্ রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থটি রচনা করেন (১৮৬৮ খ্রী)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডাইরেক্টর জেনারেল অভ্ স্ট্যাটিস্টিক্‌স্'-পদে নিযুক্ত হন। এই পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি ২২ খণ্ডে বাংলা ও আসামের পরিসংখ্যান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদনায় গেজেটিয়ারের ৯ খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অভ্ ইন্ডিয়া' নামীয় এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৮৮৫-৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১৪টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ওড়িশা সম্বন্ধে একটি তথ্যমূলক গ্রন্থ লিখিয়াও তিনি ঐতিহাসিকরূপে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার লেখা 'এ ব্রীফ্ হিস্ট্রি অভ্ ইন্ডিয়ান্ পীপ্‌ল্‌স্' গ্রন্থটিও বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিল। তিনি ভারতের গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নিযুক্ত হন (১৮৮১-৭ খ্রী)। ভারতসরকার যে 'এডুকেশন কমিশন' গঠন করেন, তিনি তাহার সভাপতিরূপে কার্য করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে আসীন হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অবসর লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ডক্টর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতীয় নাম ও শব্দগুলির ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণ (ট্রান্সলিটারেশন) বিষয়ে হান্টার যে পদ্ধতি স্থির করিয়া দেন সেই পদ্ধতিই পরবর্তীকালে বিদ্বৎমণ্ডলী কর্তৃক অনুসৃত হয়। তাঁহার লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী—'দি থ্যাকারেস্ ইন্ ইন্ডিয়া', 'দি আর্ল অভ্ মেয়ো', 'এ কম্প্যারেটিভ্ ডিক্‌শনারী অভ্ দি নন্-এরিয়েন ল্যাঙ্গুয়েজেস্ অভ্ ইন্ডিয়া অ্যান্ড হাই এশিয়া' ইত্যাদি।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

হাতি স্থলের জীবিত প্রাণীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ। ইহার উচ্চতা সাধারণতঃ ৯/১০ ফিট হয়, কখনও কখনও ১২ ফিট বা তাহার বেশিও হইতে পারে। ওজন ১৭৭৬ কিগ্রা. হইতে ২০৪৪ কিগ্রা. পর্যন্ত হয়। শুঁড় দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ ৪/৫ ফিট। ইহার উপরের মাড়ির দুইটি ছেদক (ইনসাইজর) খুব বড়, কখনো কখনো ৭।৮ ফিট পর্যন্ত হইতে পারে। ইহা ৮০ হইতে ১৫০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। হস্তিনী সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়সে সন্তানধারণ করিতে পারে। হস্তিনীর গর্ভধারণকাল ১৯ হইতে ২১ মাস।

দুই প্রজাতির (স্পীসিজ) হস্তী পাওয়া যায়— এশীয় ও আফ্রিকান্। এশিয়ার হস্তীর তুলনায় আফ্রিকার হস্তীর উচ্চতা অধিক, কর্ণ বৃহত্তর, মস্তক ক্ষুদ্রায়তন এবং ললাট অবতল (কনকেভ) হইয়া থাকে। যে হস্তী দল ছাড়িয়া চলিয়া যায় বা দল হইতে বিতাড়িত হয়, সে সাধারণতঃ একাকীই বাস করে। এইরূপ হস্তীকে 'মত্তহস্তী' বলে, ইহারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রকৃতির হয়। বন্য হাতী ধরিবার জন্য বনের মধ্যে শালের গুঁড়ি ইত্যাদির সাহায্যে উপযুক্ত পরিমাণ জমি ঘিরিয়া 'খেদা' প্রস্তুত করা হয়। পালিত হস্তীর সাহায্যে বন্য হস্তীযূথকে তাড়াইয়া লইয়া ঐ খেদায় প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। প্রায় সকল পালিত হস্তীই এক কালে বন্যহস্তী

ছিল। ধরিবার পরে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ইহাদের কাজে লাগানো হয়।

বন্য অবস্থায় হস্তী প্রধানতঃ ঘাস, কচি শাখা-প্রশাখা, গাছের পাতা ইত্যাদি খায়। পালিত হস্তীকে সবুজ ও শুকে ঘাসপাতা ছাড়াও চাউল বা ধান্যজাতীয় কিছু শস্য খাওয়ানো প্রয়োজন হয়। সাধারণ আয়তনের হস্তীকে প্রত্যহ প্রায় ১৫ পাউণ্ড শস্য, ২০০ পাউণ্ড শুষ্ক ঘাস-পাতা ও ৪০০ পাউণ্ড সবুজ ঘাসপাতা দিতে হয়। আসামের ও মহীশূরের অরণ্যে বহু হস্তী পাওয়া যায়।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

হানবংশ চীন দ্র

হানসেন, জি. আরমাউএর (১৮৪১-১৯১২ খ্রী) কুষ্ঠরোগের জীবাণুর আবিষ্কর্তা (১৮৭৪ খ্রী) বলিয়া ইঁহার নাম প্রসিদ্ধ। কুষ্ঠরোগ পৃথিবীর অতি প্রাচীন ও ভীতি-সঞ্চারী রোগ। এই রোগ 'হানসেনের রোগ' নামেও খ্যাত ('কুষ্ঠ' দ্র)। যদিও হানসেনের বেশির ভাগ সময় কুষ্ঠরোগের গবেষণায় ব্যয়িত হইয়াছে তবুও তাঁহার আলোচনার গণ্ডি মোটেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি জৈবিক উৎপত্তি (ইভলিউশন) এবং ডারউইনের মত লইয়াও গবেষণা করেন।

সুকুমার ঘোষ

হানিমান (১৭৫৫-১৮৪৩ খ্রী) ডাঃ স্যামুয়েল ক্রিস্টিয়ান ফ্রীড্রিক হানিমান হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর আবিষ্কারক ও প্রবর্তক। ইনি জার্মানির স্যাক্সনি প্রদেশের Meissen নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন (১০ এপ্রিল)। দুই বৎসর Leipzig -এ পড়াশুনা করার পর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা যান। সেখানে তাঁহার অর্থ সম্বল শেষ হইয়া আসিলে ট্র্যানসিলভেনিয়ার গভর্নর তাঁহাকে স্বীয় পরিবারের চিকিৎসক এবং তাঁহার গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং হানিমান অনেকগুলি বিদেশী ভাষা শিক্ষার এবং বহু পারিপার্শ্বিক জ্ঞান সঞ্চয় করার সুযোগ লাভ করেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এরলানগেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে ড্রেসডেন শহরে যান। এখানে বাস করার সময়ে তিনি 'সেঁকোবিষের বিষক্রিয়া, তাহার চিকিৎসা এবং আইনগত পরীক্ষা-অনুসন্ধান' নামক বই লেখেন এবং পুনরায় Leipzig -এ যান। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিঙ্কোনার ছাল খাইয়া লক্ষ্য করেন তাঁহার শরীরে কম্প-জ্বরের লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। অতঃপর তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া নিজের শরীরে এবং সুস্থ বন্ধুবান্ধব এবং অনুগত ছাত্রদের শরীরে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ এবং পদার্থের প্রতিক্রিয়ার লক্ষণাবলী পরীক্ষা করেন। তাঁহার ধারণা হয়, যে-সমস্ত রোগের জন্য যে-সমস্ত ঔষধ ব্যবহার করা হয় সেই সেই ঔষধের ক্রিয়া সুস্থ শরীরে ঠিক সেই সেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নানা বই জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সময়েই নূতন চিকিৎসাধারা সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ 'সদৃশ বিধান' প্রকাশিত হয়। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, প্রতিটি শক্তিশালী ঔষধ মানব দেহে একপ্রকার রোগের সৃষ্টি করে। ঔষধ যত শক্তিশালী হইবে রোগ-লক্ষণ ততই বেশি প্রকাশ পাইবে। ইহা হইতে তাঁহার ধারণা হইল যে, মানুষের রোগ-লক্ষণকে সমভাবাপন্ন ঔষধের শক্তিদ্বারা আরোগ্য করা যাইবে। এই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে 'সদৃশ বিধান' (Law of Similars)-এ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হয়, এবং তিনি 'Similia Similibus Curantur' এই লাটিন উক্তির সত্যতার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন, যে-ঔষধ নীরোগ দেহে যে-রোগের লক্ষণ পরিস্ফুট করিবে সেই ঔষধের দ্বারাই ঐ রোগ আরোগ্য হইবে বা হওয়া উচিত। তাঁহার এই মতবাদ হইতেই 'হোমিওপ্যাথি' বা সদৃশ বিধান মতে চিকিৎসার পদ্ধতি প্রবর্তিত করেন। তিনিই প্রথম বলিলেন যে, চিকিৎসকের কর্তব্য হইবে রোগীর চিকিৎসা করা, রোগের নহে। তাঁহারই আবিষ্কার ঔষধ ও রোগের সমতা। তিনি ঘোষণা করিলেন—মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রম হইলেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। রোগ নিরাময় করিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার অন্যতম প্রধান দান। তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনী শক্তির অতি সূক্ষ্ম পরিবর্তনের জন্য রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় ভেষজশক্তি প্রয়োগ করিয়া রোগ আরোগ্য করা যায়। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করিলেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার শক্তি এবং ইহার নিয়মধারা। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার নিয়মধারা সম্বলিত সুপ্রসিদ্ধ বই 'অর্গানন' প্রকাশিত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'মেটীরিয়া মেডিকা পুরা' প্রকাশিত হয়। তিনি মানবদেহের রোগ-গুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১. তরুণ রোগ, যাহা হঠাৎ আক্রমণ করে; ২. মহামারী ; এবং ৩. পুরাতন রোগ। তাঁহার মতে প্রতিটি রোগ শক্তি এককভাবে জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করে এবং মানবদেহে মানসিক ও শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করে। হানিমানের জীবনকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমঃ ১৭৫৫-১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ—ছাত্রজীবন ;

দ্বিতীয়ঃ ১৭৯২-১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ—ভবঘুরে পরীক্ষার জীবন এবং চিকিৎসায় নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার; তৃতীয়ঃ ১৮১১-১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ—অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকদের সহিত সংঘর্ষ; চতুর্থঃ ১৮২১-১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ—শান্তি ও জ্ঞান বিস্তারের জীবন; পঞ্চমঃ ১৮৩৫-১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দ—গৌরবময় শেষ জীবন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহাদের মোট এগারটি সন্তান ছিল, দুইটি ছেলে এবং নয়টি মেয়ে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার ৩৫ বৎসর বয়স্কা এক ধনী বিদুষী ফরাসী মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত তিনি প্যারিসে যান এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (২ জুলাই, ১৮৪৩ খ্রী)।

হরপ্রসাদ চৌধুরী

হাঁপানি নিঃশ্বাসের কষ্টজনিত রোগ। রক্তচাপের আধিক্য হেতু, পুনঃ পুনঃ ঠান্ডা লাগিলে, রক্তে ইয়োসিনোফিল বৃদ্ধি পাইলে, অ্যালার্জি এবং কখনও কখনও কোনও জ্ঞাত কারণ ব্যতীতই রোগী হাঁপাইতে থাকে। ইহার সহিত কাশি এবং শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ভোরের দিকে অথবা রাত্রিতে এই রোগের আধিক্য দেখা যায়। অনেক সময় মানসিক উদ্বেগ, অত্যধিক ধুলা বা ধোঁয়ায় এবং অ্যালার্জির জন্য এই রোগের বৃদ্ধি হয়। হাঁচি, নাক হইতে জল পড়া, নাক বন্ধ ইত্যাদি চিহ্নাবলী প্রকাশ পায়। বহুকাল হাঁপানি রোগ থাকিলে অথবা রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য হাঁপানি হইলে শরীরের নিম্নভাগে জল জমে।

ব্রঙ্কাইটিস্ অথবা ব্রঙ্কাসের প্রদাহ থাকিলে এবং কফ পীতবর্ণ অথবা ধূসরবর্ণ হইলে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হইবে। রোগবৃদ্ধির কারণটি দূর করিতে হইবে। অ্যামাইলোফাইলিন জাতীয় ঔষধ দিলে নিঃশ্বাসের কষ্ট কম হয়। ইয়োসিনোফিল বেশি হইলে হেট্রাজেন জাতীয় ঔষধের প্রয়োজন। আইসোপ্রেনালিন জাতীয় ঔষধ এই রোগের পুনরাবির্ভাব হইতে রক্ষা করিতে পারে।

কমলকুমার মল্লিক

হাব্‌ল্, এড্‌উইন পাওএল (১৮৮৯-১৯৫৩ খ্রী) প্রসিদ্ধ মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আমাদের নীহারিকা-জগতের বাহিরে যে আরও নীহারিকা-জগৎ (এক্‌স্ট্রা গ্যালাক্‌টিক নেবিউলি) আছে, ইনি তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন (১৯২৩ খ্রী)। তিনি নক্ষত্রজগতের স্বরূপ ও দূরত্ব নির্ণয়, শ্রেণীবিভাগ, ক্রমপরিণতি প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। আমেরিকার মাউন্ট উইল্‌সন বীক্ষণাগারের সুবৃহৎ দূরবীন দিয়া তিনি নক্ষত্র-জগতের বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

কামিনীকুমার দে

হাম মনুষ্যসমাজের সুপরিচিত রোগ। সাধারণতঃ শৈশবকালেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তবে অধিক বয়সেও হইতে পারে। ইহা 'ভাইরাস'-ঘটিত রোগ এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে সংক্রমণ ঘটে। প্রবল জ্বর ও কাঁপুনি সহ রোগের আরম্ভ। ইহার সঙ্গে শুরু হয় অক্ষিঝিল্লিপ্রদাহ, সর্দি ও কাশি। রোগের চতুর্থ দিনে কপালে, গালে, ঘাড়ের পিছনে এবং ক্রমশঃ সমস্ত শরীরের চামড়ায় ঘামাচির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল 'উদ্‌গম' (ইরাপশন্) দেখা যায়। দুই-তিন দিনের মধ্যেই এই উদ্‌গমগুলি মিলাইতে শুরু করে। প্রায় দু সপ্তাহের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। সাধারণতঃ জীবনে একবারই এই রোগ হয়। একপ্রকার হামের নাম 'রুবেলা'; ইহাকে 'জার্মান হাম'ও বলা হয়। 'জার্মান হাম' রীতিমত ভয়ানক। ইহাতে শিশুর প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। হামের প্রতিরোধ-ক্ষেত্রে সূচিকা সাহায্যে 'গামাগ্লবিউলিন' শরীরে দিলে, ইহার অবশ্যম্ভাবী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রতিষেধক-ক্ষমতা স্থায়ী নহে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হামরোগের স্থায়ী প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হামের ভাইরাস্‌কে নির্বল করিয়া এই টীকা তৈয়ারি করা হয়।

অশোক বাগচী

হাম্‌সুন, ক্নুট (১৮৫৯-১৯৫২ খ্রী) নরওয়ের বিখ্যাত লেখক। দরিদ্র পরিবারে জন্ম। প্রথম জীবনে কেরানিগিরি, গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতা প্রভৃতি কাজ করেন। ভাগ্যান্বেষণে আমেরিকায় গিয়া ট্রামের কন্ডাক্‌টারি ও শ্রমিকের কাজ করিয়াছিলেন। **'Sult'** (ক্ষুধা, ইংরেজীতে 'হাঙ্গার') উপন্যাসে তিনি নায়কের যে দারিদ্র্যের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে তাঁহারই জীবনচিত্র। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম সাহিত্যিক বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। বহু গ্রন্থে তিনি ভবঘুরের জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার নিজেরই মনের ছায়া পড়িয়াছে। 'জনপদের জন্ম' (ইংরেজী 'গ্রোথ্ অভ্ দা সয়েল') তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রকৃতি আর মানুষের আত্মীয়তার যে-ছবি তিনি তাঁহার গ্রন্থসমূহে দিয়াছেন তাহা অপূর্ব। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁহার লেখা 'প্যান', 'ভ্যাগাবন্ড্‌স্' প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস আছে।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হার্মাফ্রি, ওজিয়াস (১৭৪২-১৮১০ খ্রী) ব্রিটিশ চিত্র-শিল্পী। লন্ডনে অনুষ্ঠিত স্প্রিং গার্ডেন প্রদর্শনীতে (১৭৬৬ খ্রী) ইঁহার আঁকা একখানি মিনিয়েচার ছবি সম্রাট্ তৃতীয় জর্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তিনি সম্রাজ্ঞী ও রাজপরিবারের কয়েকখানি মিনিয়েচার ছবি আঁকিবার সুযোগ পান। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আসেন। সেখানে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল স্যর জন ম্যাক্‌ফারসনের পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পদিনের মধ্যে গণ্যমান্যদের অনেক ছবি আঁকেন। ভারতে আসিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই হার্মাফ্রি তাঁহার ব্যবসা জমাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখানে তিনি একখানা মিনিয়েচার প্রতিকৃতির পারিশ্রমিক লইতেন পাঁচশো হইতে হাজার টাকা। ব্যবসাক্ষেত্রে ডায়না নাম্নী এক মহিলা শিল্পীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ঊনিশ মাস ভারতবাস করিয়া তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করেন। স্বদেশে তাঁহার শিল্পচর্চার স্বীকৃতি হিসাবে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়্যাল আকাদেমিসীয়ান (আর. এ.) নির্বাচিত হন। জীবনের শেষ ১৩ বছর কাল তিনি অন্ধের জীবনযাপন করেন। তাঁহার আঁকা ছবি, বিশেষ করিয়া মিনিয়েচার, রসিকজনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে।

সুনীল ঘোষ

হামীয় সেমীয়-হামীয় দ্র

হামির চিতোরের রাণা রতনসিংহের পুত্র। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী রতনসিংহের হাত হইতে চিতোর জয় করিয়া উহার শাসনভার নিজপুত্র খিজির খাঁর উপর অর্পণ করেন। পরে মালদেব নামক এক রাজপুত সামন্তকে উহার শাসনভার দেওয়া হয়। ইহার অল্পকাল পরেই হামির মালদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মেবারের এক অংশ পুনরুদ্ধার করেন। মালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জৈসকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করিয়া তিনি সমগ্র মেবার রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ মহারাণা কুম্ভের একটি অনুশাসনে উল্লিখিত আছে হামির যুদ্ধে বহু মুসলমান সৈন্য নিহত করিয়া বিশেষ গৌরব অর্জন করেন। হামিরের মৃত্যুকালে (১৩৪৮ খ্রী.) মেবার তাঁহার সুশাসনের ফলে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল।

ত্রিদিবনাথ রায়

হাম্বির ষোড়শ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে হাম্বির বা বীর হাম্বির বীরভূম ও বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ অংশের অধিপতি ছিলেন। বিষ্ণুপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি (মতান্তরে ইঁহার পূর্ববর্তী রাজা হামির) ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে পাঠানদের বিরুদ্ধে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের ভাগবতপাঠ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত দুইটি পদ পদকল্পতরুতে ধৃত হইয়াছে। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেও তিনি কার্যতঃ ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মোগলদের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বীর হাম্বিরের প্রভাবে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হয় ('বিষ্ণুপুর' দ্র)।

বিমানবিহারী মজুমদার

হায়দরাবাদ অন্ধ্ররাজ্যের একটি জেলা, তালুক ও শহর। এই জেলা ১৬°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ হইতে ১৮°২০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৭°৩০′ পূর্ব অক্ষাংশ হইতে ৭৯°৩০′ পূর্ব অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন প্রায় ৭৬০০ কি. মি.।

জেলাটির বেশির ভাগই ঘন অরণ্যে আবৃত ও পর্বতসংকুল। প্রধান পর্বতশ্রেণীর মধ্যে রাজকোন্ডা পর্বত ও অনন্তগিরি পর্বত আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ও ল্যাটেরাইট দ্বারা গঠিত। ইহা ব্যতীত সর্বত্রই গ্র্যানিট শিলায় গঠিত বিচ্ছিন্ন পর্বত দেখা যায়। জেলার দুইটি সংরক্ষিত বনভূমিতে সেগুন, মেহগনি, শাল প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। অসংরক্ষিত বনভূমি সর্বত্রই দেখা যায়। জলবায়ু সর্বত্রই সমভাবাপন্ন। শীতকালীন তাপমাত্রা ১৩° সেন্টিগ্রেড ও গ্রীষ্মকালীন ৩৭° সেন্টিগ্রেড। বৃষ্টিপাত ৯০ সে. মি.। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক এই জেলা অধিকৃত হয় (১৬৮৫-৮৭ খ্রী) ও সম্পূর্ণভাবে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মোগলসাম্রাজ্যের পতনের পর হায়দরাবাদের নিজামশাহী শাসকগণ ঈঙ্গ-ফরাসী বিবাদে জড়াইয়া পড়েন। পরে ইংরেজের করদ রাজ্যে পরিণত হয় ও ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধিতে অধিকারে আসে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হইলে হায়দরাবাদ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও নিজামের মাসোয়ারা-ব্যবস্থা করিয়া ইহার ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ হয়। অন্ধ্ররাজ্য সৃষ্টি হইলে ইহা অন্ধ্ররাজ্যভুক্ত হয়। জেলাটি প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে কাচশিল্প, অলউইন মেটাল ওয়ার্কস্, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল্‌স্, হিন্দুস্থান মেশীন টুল্‌স্, হিন্দুস্থান এয়ারোনটিকস্, সিনথেটিক ড্রাগ প্রকল্প, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্ররাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ শহরের লোকসংখ্যা ১২৫১১১৯ জন (১৯৬১ খ্রী), আয়তন ২১ বর্গ কি. মি.। প্রধান দর্শনীয় চারমিনার

গেট, কিংকোঠি প্রাসাদ, হাইকোর্ট, মিউজিয়াম, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। শহর হইতে ১১ কি. মি. পশ্চিমে গোলকোণ্ডা দুর্গ আর একটি দর্শনীয় স্থান। হনমনকোণ্ডায় দ্বাদশ শতাব্দীর সহস্র স্তম্ভের মন্দির চালুক্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হায়দার আলী মহীশূরের অন্যতম ফৌজদার ফতে মহম্মদের পুত্র হায়দার আলী তরুণ বয়সে সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া দিন্দিগলের ফৌজদার হন (১৭৫৫ খ্রী)। দক্ষিণ ভারতের অরাজক অবস্থার সুযোগ লইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি মহীশূর রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া ওঠেন এবং অবিলম্বে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন (১৭৬৬ খ্রী)। শ্রীরঙ্গপত্তনে রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হইলে পেশোয়া, নিজাম ও ইংরেজগণ শংকিত হয়। হায়দার অর্থ দিয়া মারাঠাদের নিবৃত্ত এবং কূটনৈতিক চালে নিজামকে ইংরেজ-পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেন (১৭৬৯ খ্রী)। সন্ধির সর্তানুসারে মারাঠা আক্রমণের সময় সাহায্য না করায় এবং মাহে দখল করায় তিনি নিজাম, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়ার সহিত জোট বাঁধিয়া ইংরেজদের পরাজিত করিয়া আর্কট দখল করেন (১৭৮০ খ্রী)। কিন্তু নিজাম, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া পুনরায় তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করায় তিনি পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। ইংরেজদের সহিত বিরোধকালেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৭৮২ খ্রী)। নিরক্ষর হইলেও হায়দার তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী ও প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি দুঃসাহসিক যোদ্ধা ও নিপুণ শাসক ছিলেন।

কুমুদরঞ্জন দাস

হায়নে, হাইন্‌রিখ (১৭৯৭-১৮৫৬ খ্রী) জার্মান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমালোচক। জার্মানির ডুসেলডর্ফে এক মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে জন্ম। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গেডিখ্‌টে' (১৮২১ খ্রী)। স্বাধীনতাপ্রীতি ও গণতন্ত্রে অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকায় তিনি ফরাসী জাতিকে 'নূতন মানবধর্মের নির্বাচিত প্রতিভূ' মনে করিতেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি স্থায়ীভাবে পারী শহরে বাস করেন। এখানে তিনি উদ্দীপ্ত গণতন্ত্রবাদী ও সাহিত্যানুরাগীদের দলে যোগ দেন।

মেরুদণ্ডের পীড়াতে তাঁহার শরীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। এই 'শয্যাসমাধি'তেই (১৮৪৮-৫৪ খ্রী), তাঁহার 'রোমান্‌ট্‌সেরো' (১৮৫১ খ্রী) ও 'লেট্‌স্‌টে গেডিখ্‌টে উন্‌ড্ গেডাঙ্কেন' (১৮৫৩-৫৫ খ্রী) রচিত হয়। 'বুখ ডেয়ার লীডের' (১৮২৭ খ্রী) গ্রন্থখানি গীতিকাব্যকার রূপে তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করে ও জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁহার আসন করিয়া দেয়। 'ডী হার্ট্‌স্‌-রাইজে' (১৮২৬ খ্রী) ও ছয়খণ্ডে সমাপ্ত 'রাইজেবিলডের' (১৮২৬-৩১ খ্রী) তাঁহার বিভিন্ন দেশ-ভ্রমণের বিবরণ। তিনি সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ, দুইটি নাটক ও কিছু ছোট গল্পও লিখিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি প্রধানতঃ তাঁহার গীতিকাব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অনেক কবিতায় বিশিষ্ট সুরকারেরা সুর দিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে শোক ও আনন্দ, সৌন্দর্য ও কদর্যতা, উচ্ছ্বাস ও হতাশা, সুখ ও দুঃখের নিগূঢ় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ডি রোমান্টিশে শুলে', 'ডেয়ার জালন', 'আটা ট্রোল, আইন সমেরনাখ্‌ট্‌স্ট্রাউম', 'ডয়েটশলাণ্ড্, আইন হিবন্টের ম্যার্শেন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হারমোনিয়ম চাবিযুক্ত ইওরোপীয় বাদ্যযন্ত্র। টেব্‌ল হারমোনিয়মরূপে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইহার প্রচলন হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরে আলেকজাণ্ডার দেঁব ইহার প্রথম নির্মাণকর্তা। বাদকের পদ-চালিত বেলো হইতে উদ্ভূত বায়ুর চাপে স্পন্দিত ধাতব রীড হইতে ইহার স্বরধ্বনি নির্গত হইয়া থাকে। অভ্যন্তরে কোনও নল নাই। সাধারণ হারমোনিয়মের স্বর-পরিধি সার্ধ তিন সপ্ত (৩ ½ অকটেভ্) হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে টেব্‌ল হারমোনিয়মের প্রচলন থাকিলেও বক্‌স্ হারমোনিয়মই অধিকতর ব্যবহৃত ও সুপ্রচলিত। হস্তাঙ্গুলিতে চাবি টিপিয়া ও বাম হাতে বেলো করিয়া বাজাইবার যন্ত্র বক্স হারমোনিয়ম ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে কলিকাতায় প্রচলিত হয়। ইহার পরিকল্পনা এদেশেই হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। সে যুগের হারমোনিয়মের বেলো থাকিত বাক্সের উপরে, এখনকার মত পিছনে নয়। রীড-গুলি ছিল যুক্তভাবে, অর্থাৎ এক একটি প্লেটে দুইটি করিয়া এক সুরে বাঁধা রীড থাকিত। কেহ কেহ বলেন, ডোয়ার্কিন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকানাথ ঘোষ বক্স হারমোনিয়মের বর্তমান আকার দান করেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী (১৮৪৯-১৯৩৫ খ্রী) আধুনিক যুগে আয়ুর্বেদোক্ত অস্ত্রচিকিৎসার প্রবর্তক প্রসিদ্ধ কবিরাজ। জন্ম : পাবনা জেলার (পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশ) অন্তর্গত নাকুলিয়া গ্রামে। পিতা কবিরাজ আনন্দচন্দ্র। গ্রামের টোলের পাঠ সমাপন করিয়া হারাণচন্দ্র মুর্শি-

দাবাদের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর সেনের কাছে আয়ুর্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন ও পরে নিজ গ্রামে কবিরাজি আরম্ভ করেন। তদনন্তর রাজশাহীতে ও পরে কলিকাতায় কবিরাজি করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 'সুশ্রুতার্থ সন্দীপন' নামে সুশ্রুত সংহিতার তৎকৃত ভাষ্য পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮২৭ শকাব্দ, নিদান স্থান ১৮৩০ শকাব্দ, শারীরস্থান ১৮৩২ শকাব্দ, চিকিৎসাস্থান ১৮৩৫ শকাব্দ এবং কল্পস্থান উত্তরতন্ত্র ১৮৩৯ শকাব্দ। চক্ষু ও যকৃতে অস্ত্রোপচার, শিরাবেধের দ্বারা রক্তমোক্ষণের মাধ্যমে কঠিন শিরোরোগের চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী শুনা যায়। বহু দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি শুধু বঙ্গদেশে নয়, বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য রাজ্যেও ছড়াইয়া পড়ে।

বগলাকুমার মজুমদার

হারাণচন্দ্র চাকলাদার (১৮৭৪-১৯৫৮ খ্রী) ভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত অধ্যাপক। পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলার দক্ষিণপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। ছাত্রজীবনেই 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশবৎসল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ('সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' দ্র) সংস্পর্শে আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী কর্মী হন। এই সোসাইটির মুখপত্র 'ডন'-এ ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ভারত সরকারের অধীনে ডাক বিভাগে কর্মরত থাকার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হন। ইহার পর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি শিবপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং রিপন কলেজ ও বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐতিহাসিক গবেষণা ব্যতীত নৃতত্ত্ব বিষয়েও তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁহাকে পরে এই বিভাগেরই অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, পালি ব্যতীত জার্মান ও ইতালী ভাষাতেও তাঁহার দখল ছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের ইন্দোর অধিবেশনে তিনি নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার নিম্নলিখিত রচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—'দি ফার্স্ট আউট্‌লাইন্‌স অভ্ এ সিস্টেমেটিক অ্যানথ্রোপলজি অভ্ এশিয়া' (ইতালী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ, ১৯২১ খ্রী), 'স্টাডিজ্ ইন্ দি কামসূত্র অভ্ বাৎস্যায়ন' (১৯২৫ খ্রী), 'সোস্যাল লাইফ ইন্ এন্‌শেন্ট ইণ্ডিয়া' (১৯২৯ খ্রী), 'এরিয়ান অকুপেশন অভ্ ঈস্টার্ন ইণ্ডিয়া ইন্ আর্লি ভেদিক টাইম্‌স্' (১৯২৫ খ্রী), 'দি জিওগ্রাফি অভ্ কালিদাস' (১৯৬৩ খ্রী)।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (১৮৬৪-১৯২৬ খ্রী) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সুলেখক। জন্মস্থান ঃ চব্বিশ পরগনা জেলার মজিলপুর। পিতা ঃ হরিদাস। অল্প বয়সেই হারাণচন্দ্র সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 'কর্ণধার' পত্রিকা সম্পাদনার পর তিনি 'বঙ্গবাসী'-র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। তিনি চার্লস্ ল্যামের 'টেল্‌স্ ফ্রম্ শেক্‌স্‌পীয়র'-এর অনুসরণে বাংলায় চার খণ্ডে 'শেক্‌সপীয়র' (১৮৯৬-১৯০৩ খ্রী) প্রকাশ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সরকারের নিকট হইতে 'রায়সাহেব' খেতাব পান। তিনি বহু উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধাদি রচনা করেন। সমসাময়িক সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁহার সুনামও ছিল যথেষ্ট। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'বঙ্গের শেষ বীর' (১৮৯৭ খ্রী), 'মন্ত্রের সাধন' (১৮৯৮ খ্রী), 'সাহিত্য-সাধনা' (১৯০১ খ্রী), 'রানী ভবানী' (১৯০৩ খ্রী), 'প্রতিভাসুন্দরী' (১৯০৪ খ্রী), 'কামিনী ও কাঞ্চন' (১৯০৬ খ্রী), 'ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য' (১৯১১ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নির্মল ঘোষ

হার্ডি, টমাস (১৮৪০-১৯২৮ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি। ডরসেটশায়ারে জন্ম। ষোলো বৎসর বয়সে একজন স্থপতির অধীনে শিক্ষানবিশরূপে কাজ করেন। স্থাপত্যবিষয়ক একটি রচনার জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেন। প্রথমে সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার কয়েকটি ছোট ছোট স্থাপত্য সম্পর্কিত লেখা ও কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ডেসপারেট রেমিডিস' ও দ্বিতীয় 'আণ্ডার দি গ্রীনউড ট্রি' যথাক্রমে ১৮৭১ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'এ পেয়ার অভ্ ব্লু আইস্' এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কর্নহিল ম্যাগাজিন'-এ ধারাবাহিকভাবে 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' উপন্যাস লিখিয়া তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতঃপর তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়, যেমন—'The Hand of Ethelberta (১৮৭৬ খ্রী), 'The Return of the Native (১৮৭৮ খ্রী), 'The Trumpet Major (১৮৮০ খ্রী), 'Two on a Tower' (১৮৮২ খ্রী), 'The Mayor of Casterbridge' (১৮৮৬ খ্রী), 'The Woodlanders' (১৮৮৭ খ্রী), 'Wessex Tales (১৮৮৮ খ্রী), 'A Group of Noble

Dames' (১৮৯১ খ্রী), 'Tess of the D'Urbervilles' (১৮৯১ খ্রী), 'The Well Beloved' (১৮৯২ খ্রী), 'Life's Little Ironies' (১৮৯৪ খ্রী), 'Jude the obscure' (১৮৯৫ খ্রী), 'Wessex Poems' (১৮৯৮ খ্রী), 'Poems of the Past and Present' (১৯০২ খ্রী), 'The Dynasts' (১৯০৪-০৮ খ্রী) প্রভৃতি। তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে চরিত্র-সৃষ্টির মাধ্যমে (যেমন, টেস্, জুড, হেন্‌কার্ড প্রভৃতি চরিত্র) উপন্যাসকে ট্রাজিক আর্টের পর্যায়ে উন্নীত করা হইয়াছে। তাঁহার জন্মভূমি ডরসেটশায়ারের (তাঁহার রচনায় Wessex) মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখমিশ্রিত জীবনালেখ্য প্রভৃতি অপূর্ব মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'Tess of the D'Urbervilles', 'The Mayor of Casterbridge, এবং 'Jude the obscure' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, তাঁহার রচনা শেষপর্যন্ত পাঠক-চিত্তকে গভীর নৈরাশ্যব্যঞ্জক অনুভূতি ও বিষাদে অভিভূত করিয়া ফেলে। তাঁহার সুবৃহৎ কাব্যনাট্য 'The Dynasts' এক বিস্ময়কর সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁহার খণ্ড কবিতাগুলিও অতি সুন্দর। এমন কি যাঁহারা তাঁহার উপন্যাসপাঠে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নন তাঁহারাও তাঁহার কবিত্বে মুগ্ধ।

শিশির চট্টোপাধ্যায়

হার্ডিঞ্জ, আর্থার এডওয়ার্ড (১৮২৮-১৮৯২ খ্রী) ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের ('হার্ডিঞ্জ, হেনরি' দ্র) দ্বিতীয় পুত্র। ঈটনে শিক্ষা লাভ করেন। পিতার এ. ডি. সি. হইয়া ভারতে আসেন। প্রথম শিখ-যুদ্ধে (১৮৪৫-৪৬ খ্রী) মুদ্‌কি, ফিরোজশহর ও সোব্রাওনের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন। মেজর জেনারেল (১৮৭১ খ্রী), বোম্বাইয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ (কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, ১৮৮১ খ্রী) এবং পরে সৈন্যদলের অধিনায়কের (জেনারেল) পদ পান (১৮৮৩ খ্রী)। শকট দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

তপনী মুখোপাধ্যায়

হার্ডিঞ্জ, হেনরি (১৭৮৫-১৮৫৬ খ্রী) প্রথম ভাইকাউন্ট। ভারতের গভর্নর জেনারেল (১৮৪৪-৪৮ খ্রী), সৈন্যবিভাগের 'কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ' (১৮৫২-৫৬ খ্রী) এবং ফীল্ড মার্শাল। ইঁহার রণ-নৈপুণ্যের অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালব্যাপী। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। ওয়াটার-লুর যুদ্ধে ('ওয়েলিংটন, আর্থার ওয়েলেসলি' দ্র) প্রুশীয় হেডকোয়ার্টারে ব্রিটিশ কমিশনার ছিলেন। এই সময় যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি লাগিয়া আহত হন (১৬ জুন, ১৮১৫ খ্রী) ও বাম হস্তটি খোয়া যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য (১৮২০ ও ১৮২৬ খ্রী) এবং একাধিক দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হন।

ভারতে ব্রিটিশ রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় ইঁহার রণ-নীতি যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরে ('রণজিৎ সিংহ' দ্র) পাঞ্জাবে অশান্তি দেখা দিলে যখন শিখ (খালসা) যোদ্ধারা শক্তিমান্ হইয়া ওঠে ('শিখধর্ম' ও 'শিখযুদ্ধ' দ্র) তখন ইনি শতদ্রু সীমান্তে রণ-প্রস্তুতি বিশেষভাবে দৃঢ় ও সময়োপযোগী করিয়া তোলেন। ফলে, শিখেরা শতদ্রু পার হইয়া বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও শেষপর্যন্ত মুদ্‌কি ও ফিরোজ-শহরের যুদ্ধে (১৮৪৫ খ্রী) এবং সোব্রাওনের যুদ্ধে (১৮৪৬ খ্রী) পরাজিত হন। এই সময় যুদ্ধচালনার নির্দেশ প্রদানে গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জের অংশ বড় কম ছিল না। অতঃপর বিজয়ী ব্রিটিশ-বাহিনী লাহোরে প্রবেশ করিলে (২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬ খ্রী), শিখেরা হার্ডিঞ্জের শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির অন্যতম শর্ত অনুসারে অন্যান্য স্থানের সহিত কাশ্মীরও ইংরেজের হাতে আসে, যদিও ইংরেজরা অচিরেই লাহোর দরবারস্থ সর্দার গোলাপ সিংহকে বহু অর্থের বিনিময়ে ইহা হস্তান্তরিত করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জই ভারতের সরকারি দপ্তরে রবিবার কাজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন। ভারতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়, রেলপথের উন্নতিবিধানে এবং সেচকার্য প্রবর্তনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ভারতে চাকরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারই মাথায় আসে এবং চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের উপর তিনি বিশেষ জোর দেন। বস্তুতঃ ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজী ভাষার প্রসার ও জনপ্রিয়তার মূলে লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাথমিক দান অবশ্যস্বীকার্য। ভারতে সতীদাহ ও শিশুহত্যা (গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জন) নিবারণের মধ্যেও তাঁহার সক্রিয় সহায়তা স্মরণীয়। ওড়িশায় আদিবাসীদের (খোন্দ) মধ্যে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরবলি দেওয়ার যে প্রথা ছিল তাহার উচ্ছেদের ব্যবস্থাও তাঁহারই উদ্যমে সফল হয়।

তপনী মুখোপাধ্যায়

হার্শেল, উইলিয়াম (১৭৩৮-১৮২২ খ্রী) আদি নাম Friedrich Wilhelm Herschel। প্রসিদ্ধ ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্। জন্মস্থান জার্মানির অন্তর্গত হ্যানোভার। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংল্যাণ্ডে

আসেন, সংগীতজ্ঞ হিসাবে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে। অবসর সময়ে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা করিতেন। প্রথমে ২ ইঞ্চি ব্যাসের একটি সাধারণ দূরবীন লইয়া তিনি কাজ আরম্ভ করেন। পরে নিজেই ৬ ফিট ফোকাস দূরত্বের এক দূরবীন তৈয়ার করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শনিগ্রহের কক্ষের বাহিরে উপগ্রহ সমেত নূতন একটি গ্রহ, পরে যাহার নাম হয় ইউরেনাস, আবিষ্কার করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজার (তৃতীয় জর্জ) জ্যোতিষী নিযুক্ত হইবার পর তিনি জ্যোতিষচর্চাতে উত্তমরূপে মনোনিবেশ করেন। পূর্বে শনিগ্রহের মাত্র পাঁচটি উপগ্রহের কথাই জানা ছিল। তিনি ইহার আরও দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। তিনি গ্রহ ও তাহাদের উপগ্রহগুলির ঘূর্ণন লইয়া অনেক গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার তালিকায় বহু যুগ্মতারা ও নীহারিকা রহিয়াছে। তিনি ৪ ফিট ব্যাসের এবং ৪০ ফিট ফোকাস দূরত্বের এক বৃহৎ দূরবীন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁহার অধিকাংশ কাজ ২০ ফিট দীর্ঘ দূরবীনের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ছায়াপথ যে দূরের অসংখ্য তারা লইয়া গঠিত ইহা প্রথমে তাঁহার দূরবীনে ধরা পড়ে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন নীহারিকাগুলি দূরে অবস্থিত কতকগুলি নক্ষত্র জগৎ। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সমগ্র সৌরজগৎ মহাকাশে একদিকে ছুটিতেছে, এবং যে-বিন্দুর দিকে ছুটিতেছে তিনি তাহারও অবস্থানের নির্দেশ দেন। তিনি ইহাও নির্ণয় করেন যে, যুগ্মতারা পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির প্রথম সভাপতি হন। তাঁহার ভগিনী ক্যারোলিন লুক্রেশিয়া হার্শেল (১৭৫০-১৮৪৮ খ্রী) তাঁহার গবেষণাকার্যে প্রচুর সহায়তা করেন। বস্তুতঃ এই ভগিনীর সাহায্য ব্যতীত উইলিয়াম হার্শেলের পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব হইত না। তাঁহার ভগিনীও একটি ছোট দূরবীনের দ্বারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করিয়া ৮টি ধূমকেতু (৫টি অজ্ঞাতপূর্ব) এবং তিনটি নীহারিকা আবিষ্কার করেন। উইলিয়াম হার্শেলের পুত্র স্যর জন হার্শেলও খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ছিলেন ('হার্শেল, জন ফ্রেডারিক উইলিয়াম' দ্র)।

কামিনীকুমার দে

হার্শেল, জন ফ্রেডারিক উইলিয়াম (১৭৯২-১৮৭১ খ্রী)। ইংরেজ জ্যোতির্বিদ। ইনি উইলিয়াম হার্শেলের একমাত্র পুত্র ('হার্শেল, 'উইলিয়াম' দ্র)। ব্যবহারজীবিরূপে জীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু অচিরেই জ্যোতির্বিদ্যার চর্চায় মনোযোগ দেন। পিতার সাহায্যে তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণে মন দেন। পরে উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়া (১৮৩৫ খ্রী) সেখানকার আকাশ পর্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকেন। ইহার ফলে তাঁহার লেখা 'কেপ অব্‌জার্ভেশন্‌স্‌' নামক গ্রন্থ বাহির হয়। ইহা ছাড়া তিনি 'অন্‌ দি স্টাডি অভ্‌ ন্যাচার্যাল ফিলসফি' (১৮৩০ খ্রী) ও 'অ্যান্‌ আউটলাইন অভ্‌ অ্যাস্ট্রনমি' (১৮৪৯ খ্রী) গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কামিনীকুমার দে

হালিশহর হুগলি নদীর পূর্বতীরে হালিশহর বা কুমারহট্ট, ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর মহকুমার মধ্যে ২২°৫৬′ উত্তর ও ৮৮°২৯′ পূর্বে অবস্থিত। ইহা কলিকাতা হইতে ৪৩ কি. মি. দূরে অবস্থিত। হালিশহরের দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত মঠ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের গণনার হিসাবে এখানকার লোকসংখ্যা ৫১,৪২৩, তন্মধ্যে ৩১,৩০৩ পুরুষ ও ২০,১২০ স্ত্রীলোক।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হালিশহর সাধককবি রামপ্রসাদের জন্মভূমি। পূর্বনাম কুমারহট্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এখানকার অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে চৈতন্যদেব তাঁহার গুরুর নিবাসস্থল দেখিতে আসিয়া এখানকার ধূলা উত্তরীয়-প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতও এখানে আসিয়া মাঝে মাঝে বাস করিতেন। রামপ্রসাদের বাস্তুভিটা, সাধনাস্থল এখনও বর্তমান। শ্যামাপূজায় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়।

পঞ্চানন চক্রবর্তী

হাঁস পাতিহাঁস ও রাজহাঁস প্রধানতঃ ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের অপেক্ষাকৃত আর্দ্র ও জলা জায়গায় (সেমি অ্যাকোয়াটিক) বহু সংখ্যায় প্রতিপালিত হয়। পালনকালে মুরগীর প্রতি যতখানি মনোযোগ দিতে হয়, হাঁসের প্রতি তদপেক্ষা অনেক কম মনোযোগের প্রয়োজন হয়। ডোবা, জলা, পুকুর, নিম্নভূমিতে সঞ্চিত জল প্রভৃতি হইতেই হাঁসেরা খাদ্য সংগ্রহ করে। ইহাদের রোগজনিত মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত কম। মুরগী অপেক্ষা ইহারা বৎসরে অধিক ডিম দেয়। কোন কোন অঞ্চলে এক একটি হাঁস বৎসরে ১৩০টি পর্যন্ত ডিম দিয়া থাকে। এই সকল কারণে গ্রামবাসীরা হাঁস প্রতিপালন পছন্দ করে।

ভারতে সাদাবুক নাগেশ্বরী, সিলেট মেটে, ভারতীয় রানার প্রভৃতি পাতিহাঁস এবং বাদামীপিঠ ও সাদা রাজহাঁস প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন বর্ণের সাদাবুক নাগেশ্বরী হাঁস আসাম ও বঙ্গদেশে পাওয়া যায়। পূর্ব ভারতের সাধারণ গ্রাম্য হাঁসই সিলেট মেটে ; ইহাদের বর্ণ হালকা বাদামী ও ইহারা বৎসরে ৫০/৬০টি ডিম দেয়। ভারতীয় রানারের রঙ্ সাদা ও ইহারা বৎসরে গড়ে ৫৪টি ডিম দিয়া থাকে। বাদামীপিঠ রাজহাঁস ও সাদা রাজহাঁস ওজনে সাধারণ পাতিহাঁসের প্রায় দ্বিগুণ হয়। ইহাদের গড় ওজন ৭ /৮ পাউন্ড। ইহারা বৎসরে দুইবার—প্রতিবারে ৮/১০টি করিয়া ডিম দেয় এবং ডিমের ওজন গড়ে ৪ হইতে ৪ $\frac{১}{২}$ আউন্স হয়।

অমলচন্দ্র চৌধুরী

হাসান মহরম দ্র

হ্যাজলিট, উইলিয়াম (১৭৭৮-১৮৩০ খ্রী) প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রাবন্ধিক, সমালোচক ও লেখক। প্রথমে কোল্‌রিজের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয় এবং অচিরেই ল্যামের সহিত তিনি দীর্ঘকালের জন্য বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিতও তাঁহার পরিচয় হয়। এখন হইতে তিনি নানা পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর উপরই প্রধানতঃ তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। 'ক্যারেক্‌টারস্ অভ্ শেক্‌স্‌পীয়র্স প্লেজ' (১৮১৭ খ্রী), 'ইংলিশ কমিক্ রাইটার্স' (১৮১৯ খ্রী), 'ড্রামাটিক্ লিটারেচার অভ্ দি এজ্ অভ্ এলিজাবেথ্' (১৮২১ খ্রী), 'টেব্‌ল্‌টক্' (১৮২১-২২ খ্রী), 'দি স্পিরিট অভ্ দি এজ্' (১৮২৫ খ্রী) প্রভৃতি প্রবন্ধ নিচয় তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁহার কিছু কিছু রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'লাইফ অভ্ নেপোলিয়ন' তাঁহার লেখা সার্থক জীবনী গ্রন্থ। ইংরেজী সাহিত্যে সমালোচক এবং প্রবন্ধকার হিসাবে হ্যাজলিটের স্থান প্রথম সারিতে। ল্যাম্, কোলরিজ ও হ্যাজলিট ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের রোম্যানটিক্ যুগে সাহিত্যবিচারে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। শেক্‌স্‌পীয়র ও এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্য নাট্যকারদের এবং সমসাময়িক রোম্যান্‌টিক যুগের কবিদের আলোচনায় হ্যাজলিট যে সহানুভূতি, রসবোধ ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সমালোচনার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত করিয়াছে। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ লেখক ও পাঠকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়িয়া তোলে।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হ্যাফ্‌কিন ইনস্টিটিউট ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই গবেষণাগারটি মুখ্যতঃ জনস্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। এখানে মাইক্রোবায়োলজি, জৈব-রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি), ফার্মাকোলজি, কেমোথেরাপি, রসায়ন, ব্যাক্‌টিরিওলজি, এনটমোলজি, প্যাথোলজি, হিমোটলজি, পুষ্টি (নিউট্রিশন) ইত্যাদি বিষয় শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা আছে। গবেষকগণ এখান হইতে মাস্টার (স্নাতকোত্তর) ও ডক্টরেট্ ডিগ্রি লইতে পারেন। এখানে প্লেগ ও কলেরা রোগের সংক্রমণনিরোধক টিকার উন্নতিবিধান এবং সর্পবিষ প্রতিষেধকের গবেষণার ব্যবস্থা আছে। ইহা ব্যতীত এখানে প্লেগের মহামারী সংক্রান্ত গবেষণা, কলেরার চিকিৎসা, সাল্‌ফাড্রাগের উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিষয়েও কাজ হয়। এখানকার শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পাঠক্রম (কোর্সেস) প্রচলিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিবিষ (অ্যান্টিটক্‌সিন,) ভ্যাক্‌সিন, সর্পবিষনাশক ঔষধ, ব্লাড-প্লাজ্‌মা (রক্তরস), সাল্‌ফাড্রাগ, মাল্টি ভিটামিনযুক্ত দ্রব্য ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি রাজ্যের বীজাণুবিষয়ক গবেষণাগার, ঔষধ ও প্রসাধনদ্রব্যের পরীক্ষাগার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। পুষ্টি-বিষয়ক গবেষণার জন্য একটি স্বতন্ত্র গবেষণাগার আছে। এখানে ব্লাড ব্যাংকও আছে। গবেষণাগারের উপযুক্ত পশুসরবরাহের জন্য এখানে একটি পশুশালা এবং অশ্ব ও সর্পপালনের উপযোগী স্থানও আছে।

পুনার নিকট পিম্পিরিতে হ্যাফ্‌কিন ইনস্টিটিউট-এর অধীনে একটি সুসজ্জিত সিরাম ল্যাবরেটরি আছে। এই গবেষণাগারে প্রতিবিষ, বিশেষতঃ সর্পবিষনাশক ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালীর কোনও কোনও স্তরের কার্যের ব্যবস্থা আছে।

হ্যাভেল, আর্নেস্ট বিনফিল্ড (১৮৬১-১৯৩৪ খ্রী) লণ্ডনের 'রয়্যাল কলেজ অভ্ আর্টে' শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজ শিল্পী। পাশ্চাত্য-রীতি অনুসারে শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। এই পদে তিনি ছয় বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৯৬-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতায় 'গভর্নমেন্ট স্কুল অভ্ আর্টে' অধ্যক্ষতা করেন। ইতিমধ্যে ভারতীয় ছবি, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। কলিকাতায় আসিয়া অবনীন্দ্রনাথের ('অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্র) সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার অনুরোধে ও প্রচেষ্টায় অবনীন্দ্রনাথ উক্ত আর্ট স্কুলের সহকারী অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে স্বাধীনভাবে নিজের পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিবার সুযোগ সুবিধা করিয়া

দেন। এ পর্যন্ত সরকারি আর্ট স্কুলে পাশ্চাত্য-রীতিতে শিল্পশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল ; ফলে বিদেশী ছবির প্রতিলিপির অনুকরণ ব্যতীত শিল্প-শিক্ষার্থীদের আর কিছুই শিখিবার উপায় ছিল না। হ্যাভেল এ ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া দেশীয় রীতিতে শিল্পশিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। অবনীন্দ্রনাথের কথায় এদিক্ দিয়া হ্যাভেলকে এদেশের শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। বিদেশী ছবির প্রতিলিপি বর্জন করিয়া হ্যাভেল দেশীয় ছবির সাহায্যে আর্ট স্কুলের সংগ্রহশালাকে সমৃদ্ধ করেন। একাজে তাঁহার প্রধান সহায়ক ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এই সংগ্রহশালা হইতেই উত্তরকালে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের বিরাট ও বিচিত্র ছবির সংগ্রহশালা গড়িয়া ওঠে। যাঁহাদের আগ্রহে ও যত্নে কলিকাতায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অভ্ ওরিয়েন্টাল আর্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়, হ্যাভেল তাঁহাদের অন্যতম। ইংল্যাণ্ডে স্থাপিত (১৯১০ খ্রী) ইণ্ডিয়া সোসাইটির সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ডেনমার্কে ব্রিটিশ দূতাবাসে কাজ করেন। ভারতের কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শ্রমশিল্পের উন্নতি সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নাম দেওয়া হইল : 'বেনারস দি সেক্রেড সিটি' (১৯০৫ খ্রী), 'মনোগ্রাফ অন্ স্টোন কার্ভিং ইন্ বেঙ্গল' (১৯০৬ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান স্কাল্প্চার অ্যাণ্ড পেন্টিং' (১৯০৮ খ্রী), 'ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার, ইট্স সাইকলজি, স্ট্রাক্চার অ্যাণ্ড হিস্ট্রি' (১৯১৩ খ্রী), 'ইলেভেন প্লেট্স্ রেপ্রিজেন্টিং ইণ্ডিয়ান স্কাল্প্চার চীফলি ইন্ ইংলিশ কালেক্শন', 'এন্শেন্ট অ্যাণ্ড মেডিঈভ্ল্ আর্কিটেক্চার ইন্ ইণ্ডিয়া' (১৯১৫ খ্রী), 'হ্যাণ্ড বুক অভ্ ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯২০ খ্রী), 'দি হিমালয়াস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়ান আর্ট' (১৯২৪ খ্রী)।

বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

হ্যামিলটন, আলেকজাণ্ডার (১৭৬২-১৮২৪ খ্রী)। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ভারতে সৈন্যবিভাগে কাজ করেন ও ক্যাপ্টেন হন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও পারীর সরকারি পাঠাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি পাঠ করিয়া নিজের চেষ্টায় ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ভারত হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে তিনি ফ্রান্সে ফরাসী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দী হন। এই সময়ে তিনি পারীতে বহু ছাত্রকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন এবং কর্তৃপক্ষের অনুরোধে পারীর সরকারি পাঠাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ইংরেজ ও ফরাসীর বিরোধের মীমাংসা হইলে তিনি মুক্তিলাভ করিয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত 'হেইলবেরি'র কলেজে 'সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুসাহিত্য' বিষয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৮০৬-১৮১৮ খ্রী)। লণ্ডনস্থ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ইনি একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। রচিত গ্রন্থ : 'দি হিতোপদেশ ইন দি স্যান্স্ক্রিট ল্যাংগুয়েজ', 'ট্রীটিজ অন্ দি টার্ম্স্ অভ্ স্যান্স্ক্রিট গ্রামার' এবং 'এ কী টু দি ক্রনলজি অভ্ দি হিন্দুজ'।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

হ্যামিলটন, স্যর ড্যানিয়েল (১৮৬০-১৯৩৯ খ্রী) জন্ম স্কটল্যাণ্ডে। ভারতীয় সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় সমবায় ('সমবায়' দ্র) আন্দোলন সংগঠনে তাঁহার কাজ স্মরণীয়। সুন্দরবনের 'গোসাবা' অঞ্চলকে সমবায় কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তিনি সমবায় ভাণ্ডার, স্বাস্থ্য সমিতি, সমবায় চাউলের কল, ঋণদান সমিতি, কেন্দ্রীয় ধান্য বিক্রয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, পঞ্চায়েৎ, চিকিৎসালয়, জনশিক্ষামূলক নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি গঠন করেন। 'গোসাবা' সমবায় উপনিবেশ সর্বভারতীয় সমবায় সাফল্যের দৃষ্টান্ত ও আদর্শরূপে গণ্য হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এই সূত্রে তাঁহার অন্তরঙ্গতা ঘটে। কর্মজীবনে 'ম্যাকিনন ম্যাকাঞ্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি'র তিনি অন্যতম অংশীদার ছিলেন ; কিন্তু ধনিক-সুলভ আভিজাত্যের অহংকার তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাই বিভিন্ন সমবায় সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি 'গোসাবা'কে সমবায় উপনিবেশে পরিণত করিতে এত সহজে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তদন্ত কমিটিতে (১৯২৯ খ্রী) তিনি কৃষিঋণ প্রদানের উপর গুরুত্ব দেন। এই কৃষিঋণদান-নীতি গৃহীত হওয়ার ফলেই চাষীরা মহাজনের হাত হইতে নিস্তার লাভ করার সুযোগ পায়। তিনি সর্বদা প্রচার করিয়াছেন যে, দেশের সমৃদ্ধিলাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা সমবায়।

কালীপদ ভট্টাচার্য

হ্যালহেড, নাথানিয়েল ব্রাসি (১৭৫১-১৮৩০ খ্রী) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী। কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য 'এ গ্রামার অভ্ দি বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ' (১৭৭৮ খ্রী) রচনা করেন। জন্ম ২৫ মে, ওয়েস্টমিনিস্টার, লণ্ডনে। পিতা উইলিয়াম হ্যালহেড 'ব্যাংক অভ্

ইংল্যান্ড'-এর ডিরেক্টর ছিলেন। বাল্যশিক্ষা হ্যারোর অভিজাত স্কুলে, রিচার্ড ব্রিন্সলি শেরিডান (পরে বিখ্যাত নাট্যকার ও বাগ্মী) সেখানে হ্যালহেডের সহপাঠী ছিলেন; পরবর্তীকালে উভয়ে মিলিয়া গ্রীক-গদ্যলেখক Aristaenetus-এর পত্রচ্ছলে লেখা প্রণয়োপাখ্যানের ইংরেজী পদ্যানুবাদ 'The Love Letters of Aristaenetus translated by N. B. Halhead and Sheridan' (১৭৭১ খ্রী) প্রকাশ করেন এবং 'Jupiter' নামে একখানি প্রহসন রচনা করেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্টচার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে পড়ার সময়ে হ্যারোর প্রাক্তন ছাত্র উইলিয়াম জোন্সের (পরে স্যার) সংস্পর্শে আসেন ও জোন্সের প্রেরণায় প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষা করেন।

শেরিডান ও হ্যালহেড উভয়েই পরমাসুন্দরী ষোড়শী এলিজাবেথ অ্যান লিনলের পাণিপ্রার্থী হন: ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের সহিত শেরিডানের পরিণয়ের পর হ্যালহেড ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটারের চাকরি গ্রহণ করিয়া ভারতে আসেন ও ওয়ারেন হেস্টিংস্-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হেস্টিংসের নির্দেশে ১৭৭৪-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ 'Gentoo Code' অনুবাদ করেন।

'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গানামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালেদঙ্গেজী A Grammar of the Bengal Language by Nathaniel Brassey Halhead' ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্ষাকালে, ১১৮৫ বঙ্গাব্দে হুগলি হইতে মুদ্রিত হয়। ব্যাকরণখানি ইংরেজীতে লিখিত, দৃষ্টান্ত ও উদ্ধৃতিসমূহ বাংলায়। কোম্পানির অন্যতম কর্মচারী চার্ল্‌স উইল্‌কিন্স (পরে স্যার) হুগলিতে পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়া কাঠের খোদাই বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করান। হুগলির মুদ্রাযন্ত্র হইতে হ্যালহেডের বাংলা ভাষার ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। হ্যালহেডের ব্যাকরণেই সর্বপ্রথম বঙ্গাক্ষর মুদ্রিত হয়।

পোর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল-দ্য-আস্‌সুম্পসাওঁ কর্তৃক পোর্তুগীজে রচিত এবং রোমান হরফে মুদ্রিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ (১৭৪৩ খ্রী) অপেক্ষা হ্যালহেডের ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণাঙ্গ। ৮টি অধ্যায়ে হ্যালহেড বাংলা বর্ণমালা, অঙ্কফলা, বানান, উচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষ্যের লিঙ্গ-বচন-কারক, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, সংখ্যাবাচক-পূরণবাচক-পরিমাণবাচক শব্দ, পদতত্ত্ব, বাক্যরীতি এবং বাংলা ছন্দ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ।

কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের পুঁথি হইতে বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম ও প্রয়োগ বুঝাইবার জন্য হ্যালহেড প্রচুর উদাহরণ দিয়াছেন। সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, ফার্সী, আরবি, হিন্দুস্থানী ও বাংলা ভাষায় হ্যালহেডের ব্যুৎপত্তির পরিচয় ব্যাকরণখানিতে আছে। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার উৎকর্ষসম্বন্ধে ভূমিকায় হ্যালহেড সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে হ্যালহেড চুঁচুড়ার ডাচ গভর্নরের কন্যা Helena Rebaut-কে বিবাহ করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালহেড ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৯১-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত হন। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাথানিয়েল জন হ্যালহেড (১৭৮৭-১৮৩৬ খ্রী) দেওয়ানী আদালতের বিচারক হইয়াছিলেন, বাংলা ভাষায় তাঁহার বেশ ভালো দখল ছিল এবং বাংলা যাত্রা-অভিনয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মদনমোহন কুমার

হ্যালি, এড্‌মণ্ড (১৬৫৬-১৭৪২ খ্রী) স্বনামধন্য ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্। গ্রহের কক্ষপথ-সম্পৃক্ত তাঁহার প্রথম নিবন্ধ রয়্যাল সোসাইটির 'ফিলসফিক্যাল্ ট্রান্‌জ্যাক্‌শন'-এ প্রকাশিত হয় (১৬৭৬ খ্রী)। তাঁহার সর্বাধিক প্রসিদ্ধি ধূমকেতু নিরীক্ষণের জন্য। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি ধূমকেতুর কক্ষপথ সম্পর্কে গণনা করেন এবং নিউটনের গতিসূত্র ('লজ্ অভ মোশন') অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই ধূমকেতুটি (পরে তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম হয় 'হ্যালির ধূমকেতু') পুনরায় ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা দিবে। তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। শুধু তাহাই নহে, এই গণনানুযায়ী প্রতি ৭৬ বৎসর পরে পরে ইহা দেখা দিয়া থাকে এবং এ যাবৎ দিয়াছে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা শেষ বার দেখা গিয়াছিল, সুতরাং ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার পুনরাবির্ভাবের কথা। নিউটনের সহিত হ্যালির বন্ধুত্ব হয়, এবং হ্যালির অপর এক মহতী কীর্তি এই যে, তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও ব্যয়ে নিউটনের বিশ্ববিখ্যাত 'প্রিন্‌সিপিয়া' প্রকাশিত হয়। হ্যালি জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে আরও বহু গবেষণা করেন। নক্ষত্রদের যথার্থ গতি (প্রপার মোশন অভ্ স্টার্‌স্), চন্দ্রের মধ্যগতির ত্বরণ (অ্যাক্‌সিলারেশন অভ্ মুন্‌স্ মীন মোশন) প্রভৃতি আবিষ্কার তাঁহারই। শুক্রগ্রহের সংক্রমণের (ট্রানজিট) সাহায্যে তিনি সূর্যের লম্বন (সোলার প্যারাল্যাক্স্) নির্ধারিত করেন

এবং তাঁহার এই পদ্ধতি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

হ্যালোজেন ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এই চারিটি এবং তেজস্ক্রিয় মৌল অ্যাস্টাটাইন্, পিরিয়ডিক তালিকার সপ্তমগ্রুপস্থ এই কয়টি মৌলকে, হ্যালোজেন বলা হয়। যথাক্রমে ইহাদের প্রতীক চিহ্ন F, Cl, Br, I এবং At ; মৌলসংখ্যা ৯, ১৭, ৩৫, ৫৩, ৮৫ ; পারমাণবিক ওজন ১৯, ৩৫.৫, ৮০, ১২৭ এবং ২১০ ; ইহাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অন্যান্য মৌলের সহিত তুলনায় এক ধরনের হইলেও পরস্পরের মধ্যে এই ধর্মের মধ্যে প্রভেদ আছে। সাধারণ তাপমাত্রায় ফ্লোরিন ও ক্লোরিন গ্যাস, ব্রোমিন তরল এবং আয়োডিন কঠিন ; বর্ণও ঐরূপে ক্রমে গাঢ়তর। তেজস্ক্রিয়তা ব্যতীত অ্যাস্টাটাইনের অন্য কোনও ধর্মের পরিচয় এখনও গবেষণার বিষয়।

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধাতুর সহিত যৌগহিসাবে, খনিজ লবণগুলিতে হ্যালোজেন বর্তমান। এই লবণগুলির সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড ও ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়ার ফলে ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন প্রস্তুত হয়। পটাসিয়াম ও ফ্লোরিন-ঘটিত লবণকে গলিত অবস্থায় বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করিলে ফ্লোরিন উৎপন্ন হয়।

হ্যালোজেনগুলি অত্যন্ত সক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য। অন্য মৌলের সহিত সংস্পর্শে আসিলেই উত্তাপ বিকিরণ করিয়া সংযুক্ত হইয়া তাহাদের জারিত (অক্সাইড) করিয়া ফেলে। হ্যালোজেন-ঘটিত জৈব রাসায়নিক দ্রব্যগুলি সংশ্লেষণ-রাসায়নিকদের (সিনথেটিক কেমিস্ট) পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ছত্রাক পরিশোধক, বিজাণু, গুল্ম ও কীটনাশক হিসাবে এবং ঔষধ প্রস্তুতিতে, হ্যালোজেন এবং হ্যালোজেন-ঘটিত যৌগগুলির সর্বাধিক ব্যবহার প্রচলিত।

কল্যাণময় সেন

হ্যেল্ডেলির্ন, জে. সি. ফ্রীড্রিখ (১৭৭০-১৮৪৩ খ্রী) জার্মান কবি। ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করার পর তিনি যাজকবৃত্তি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরীতে শিক্ষকতা করার সময় তিনি তাঁহার নিয়োগ-কারীর পত্নী Susette Gontard -এর প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত হন। মহিলাটিও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন (ইনিই হ্যেলডেলির্নের কাব্যের Diotima) । ঈর্ষাগ্রস্ত Gontard কর্তৃক বিতাড়িত হইবার পর হ্যেল্ডেলির্ন প্রথমে সুইজারল্যান্ড পরে বোর্দোতে (Bordeaux): চাকরি গ্রহণ করেন, কিন্তু শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা লইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি উন্মাদ অবস্থায় কাটান।

রোম্যান্টিক্ যুগের সূচনাতেই গীতিকবি হিসাবে পুরোভাগে তাঁহার স্থান। একদিকে যেমন প্রাচীন গ্রীসের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল, অন্যদিকে তেমনই 'ঝটিকা ও সংঘাত' এবং গ্যেটের 'ভের্থের্' প্রভৃতি আত্মনিষ্ঠ রচনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার উপর 'শিলার' ও 'ক্লপস্টকের' প্রভাবও উল্লেখ-যোগ্য। হ্যেল্ডেলির্নের অনেক কবিতা ধ্রুপদীশৈলীতে ও ধ্রুপদী ছন্দে রচিত। মুক্ত ছন্দও তাঁহার কবিতায় বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। আন্তরিকতার অভাব না থাকিলেও মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতা জটিল ও কিছুটা দুর্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির একাত্মতা তিনি হৃদয়ংগম করিতে পারিয়াছিলেন। অতীত গ্রীসের সুবর্ণ যুগকে কোনও দিন ফিরাইয়া আনা যাইবে না, এই চিন্তা তাঁহাকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুর তমসায় আচ্ছন্ন মানব-জীবনের বেদনার সুর তাঁহার কবিতায় বারংবার স্পন্দিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশেই তাঁহার কবি-প্রতিভা প্রথম স্বীকৃতি পায়। মোহভঙ্গ-জনিত সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের অনুরণন তাঁহার কবিতায় প্রায়ই শোনা যায়। দর্শনমূলক দীর্ঘ উপন্যাস (তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী গ্রীসের এক নির্ভীক যুবকের কাহিনী) 'হাইপীরিয়ন' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অদৃষ্টের গানে' এই সুর বিশেষভাবে প্রকট।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

হিউএন-ৎসাঙ্ (৬০০-৬৬৪ খ্রী) ভারত পর্যটন-কারী প্রাচীন চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের অন্যতম এবং প্রধানতম। চীনদেশে থাং-রাজবংশের (৬১৮-৯০৭ খ্রী) শাসনকালে বর্তমান হো-নান প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত-কু-শিহ্ নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছেন-পাও-কু নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পারিবারিক নাম ছিল ছেন-য়ি, কিন্তু ইতিহাসে তিনি হিউএন-ৎসাঙ্ (ভিন্ন উচ্চারণে ইউয়ান্-চুয়াঙ্) নামেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। পিতা ছেন-হুই-এর চারি পুত্রের মধ্যে হিউএন-ৎসাঙ্ সর্ব কনিষ্ঠ ছিলেন। ছেন-হুই কন্ফুসীয় মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন এবং পুত্রদিগকে কনফুসীয় শাস্ত্রই শিক্ষা দিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলে হিউএন-ৎসাঙ্ ভ্রাতার দৃষ্টান্তে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও বৌদ্ধশাস্ত্র

অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর জীবন অবলম্বন করেন। অল্পকালের মধ্যেই তিনি প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান মনোহারিণী ব্যাখ্যা শক্তি ও সংস্কৃত ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনসম্রাটের বিনা অনুমতিতেই গোপনে মধ্য এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারতে প্রবেশ করেন। যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন সেরূপ অপর কোনও প্রাচীন চীনা পর্যটক করেন নাই। ভারতবর্ষে তিনি প্রায় ১৪ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি গান্ধার, শালাতুর, উড্ডিয়ান, তক্ষশীলা, কাশ্মীর, জালন্ধর, শতদ্রু, মথুরা, স্থানেশ্বর, কান্যকুব্জ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, লুম্বিনী, কুশীনগর, বারাণসী, বৈশালী, বৃজি, নেপাল, মগধ, পাটলিপুত্র, গয়া, রাজগৃহ, নালন্দা, চম্পা, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশল, অন্ধ্র, চোল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মালব, সুরাষ্ট্র, গুর্জর, প্রভৃতি বহু স্থান পরিদর্শন করেন। ভারত হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি মধ্য এশিয়ার কাশননগর, খোটান, নিয়া, সেন-সেন প্রভৃতি অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে উপনীত হন ও বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন। সমগ্র ভারতের বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ তীর্থসমূহ পর্যটনপূর্বক তিনি বুদ্ধের ১৫০টি পবিত্র দেহাবশেষ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠে নির্মিত কিছুসংখ্যক বুদ্ধমূর্তি ও বিভিন্ন বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বদেশে লইয়া যান। সর্বসমেত তিনি ৭৬ খানি গ্রন্থের প্রণেতা, ইহার মধ্যে তাঁহার ভারত পর্যটন-বৃত্তান্ত 'সি-য়ু-কি' অন্যতম।

হিউএন-ৎসাঙ্‌ মহাযান-পন্থী ছিলেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে বৌদ্ধবিহারসমূহে দীর্ঘকাল বাস করিয়া তিনি সমকালীন ভারতীয় বৌদ্ধাচার্যগণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। মগধের সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা মহাবিহারে পাঁচ বৎসরকাল তিনি তথাকার সর্বাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ আচার্য শীলভদ্রের নিকট মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিশিষ্ট শাখা যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে, বিশেষতঃ মহাযান মত বিষয়ে, গভীর ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত সমকালীন ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত-সমাজে তিনি 'মোক্ষাচার্য' ও 'মহাযানদেব' নামে অভিহিত হইতেন। 'যোগাচার' সম্প্রদায়ের নানা মৌলিক গ্রন্থ তিনি চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে 'যোগাচার ভূমিশাস্ত্র', 'মহাযানসম্পরিগ্রহশাস্ত্রমূল', 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত তিনি বসুবন্ধুকৃত সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অভিধর্মকোশ'-এর চীনা অনুবাদও প্রকাশ করেন। হিউএন-ৎসাঙের বৌদ্ধশাস্ত্রানুবাদ ও শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রেরণায় চীনদেশে অন্ততপক্ষে তিনটি বিশিষ্ট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের পত্তন হইয়াছিল। যথা ধর্মলক্ষণ সম্প্রদায়, কোশসম্প্রদায় ও লিউ বা বিনয়সম্প্রদায়।

সি-য়ু-কি বা তাঁহার ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্তখানি প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির ছাত্রগণের নিকট একখানি অতীব মূল্যবান্‌ আকর গ্রন্থ। তাঁহার বর্ণনার ভিত্তিতে আধুনিককালে বৌদ্ধবিহার ও তীর্থাদির অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। পুষ্যভূতিবংশীয় হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছিল। তাই সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু তথ্যও তাঁহার বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। মুখ্যতঃ তাঁহারই অনুরোধে হর্ষবর্ধন ও চীনসম্রাট থাই-ৎসুঙের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও দূত বিনিময় হইয়াছিল।

দিলীপকুমার বিশ্বাস

হিউম, ডেভিড (১৭১১-১৭৭৬ খ্রী) জন্মস্থান এডিনবরা। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্রীটিজ-অন্‌ হিউম্যান নেচার' প্রকাশিত হইলে প্রথমে মোটেই সমাদর পায় নাই। তাঁহার 'মানবজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশ্ন' (ইন্‌কোয়ারি কন্‌সার্নিং হিউম্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং) প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। পাশ্চাত্য জগতে হিউমের দর্শন সংশয়বাদ (স্কেপ্‌টিসিজ্‌ম্‌) নামে পরিচিত। তিনি লকের মতই ('লক, জন' দ্র) প্রত্যক্ষবাদী (empiricist) ছিলেন। তাঁহার মতে মানুষের জ্ঞান এত সংকীর্ণ যে এই আলোকে প্রকৃতির রহস্যভেদ করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কোনও কিছুরই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান মানুষের হইতে পারে না। জ্ঞানের পথেও মানবচিত্তে সংশয় ওঠে। এমন কি এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধেও সঠিক জ্ঞান আমাদের নাই। জাগতিক জ্ঞানের মূল ভিত্তি হইল কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ শুধু দুইটি ঘটনার; একটি নিয়ত পূর্ববর্তী আর একটি নিয়ত পরবর্তী—ইহাই কেবল প্রত্যক্ষীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত কোনও অত্যাবশ্যিক সংযোগ (নেসেসারি টাই) ইহাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। মানবচিন্তা অভ্যাসের দাস। বারম্বার একটি ঘটনাকে অতীতে প্রত্যক্ষ করিয়া এই অভ্যাসের (কাস্টম অর হ্যাবিট) সাহায্যে ভবিষ্যতের অনুমান আমরা করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ কোনও জ্ঞানই এই অনুমান পদ্ধতিতে বা যুক্তিতে নাই। হিউম সংশয়বাদীরূপেই পরিচিত, অজ্ঞেয়বাদী (অ্যাগ্‌নস্টিক) রূপে নয়। তাঁহার লেখা 'পোলিটিক্যাল ডিস্‌-

কোর্সেস্‌' (১৭৫১ খ্রী), 'হিস্ট্রি অভ্‌ ইংল্যান্ড' (১৭৫৪-৫৬ খ্রী), ও 'ন্যাচর্যাল হিস্ট্রি অভ্‌ রিলিজন্‌' (১৭৫৭ খ্রী) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিকি, জেম্‌স অগাস্টাস্‌ ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের ইতিহাসে তাঁহার ও তাঁহার 'বেঙ্গল গেজেট'-এর নাম নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। হিকির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্যই অজ্ঞাত রহিয়াছে। মাত্র ১৭৭৬-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁহার কার্যকলাপের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে দেনার দায়ে তাঁহাকে কলিকাতায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয় (অক্টোবর, ১৭৭৬ খ্রী)। মুক্তি পাইবার পর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি, শনিবার, তাঁহার সম্পাদনায় 'বেঙ্গল গেজেট' নামে ইংরেজী সংবাদপত্রটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই বাংলা দেশ, তথা ভারতবর্ষের, প্রথম মুদ্রিত ইংরেজী সংবাদপত্র। 'বেঙ্গল গেজেট' কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখপত্র ছিল না। ইহাতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সব রকম সংবাদই প্রকাশিত হইত, এমন কি কবিতাও বাদ যাইত না। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই হিকি কলিকাতার ইংরেজ-সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের সম্বন্ধে নানা কুৎসা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্‌ ও সেকালের কলিকাতাস্থ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে (এলিজা ইম্পে) তাঁহার আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিলেন। অনেকে মনে করেন হিকির কার্যকলাপের পশ্চাতে হেস্টিংসের রাজনৈতিক শত্রু ফিলিপ ফ্রান্সিসের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। এইরূপ অনুমানের কারণ হিকির কাগজে ফ্রান্সিস্‌কে কখনও আক্রমণ করা হয় নাই। হিকি পত্রিকা সম্পাদনায় বিশেষ সুরুচি ও শালীনতাবোধের পরিচয় দেন নাই। স্বজাতীয়া মহিলাদের সম্বন্ধেও তিনি নানা অশোভন ইঙ্গিত পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। শেষপর্যন্ত হিকিকে ১ বৎসর ৭ মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় এবং ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পত্রিকাটি বন্ধ হইয়া যায়।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

হিজরী ইসলামধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ ধর্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করিলে মক্কার অধিবাসীরা প্রাচীন ধর্মের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া নবধর্মের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করে। তাহারা মহম্মদের উপর নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতে থাকে, এমনকি, ক্রুদ্ধ মক্কাবাসীদের হস্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হয়। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় তিনি অল্প কয়েকজনকে মাত্র তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে মক্কাবাসীদের অত্যাচার এত প্রবল হইল যে তিনি ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে সদলে মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় আশ্রয় লইলেন। মদিনার অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল। মক্কা হইতে মদিনায় যাত্রা হিজরৎ (পলায়ন) নামে খ্যাত এবং এই সময় হইতে হিজরী অব্দের প্রবর্তন হয়। ইহা চান্দ্রমাসের হিসাবে গণনা করা হয়, সেই জন্য সৌরজগৎ হইতে এই বৎসর ১১ দিন কম।

ত্রিদিবনাথ রায়

চান্দ্রমাস ধরিয়া গণনার জন্য হিজরী অব্দকে খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তিত করার নিয়ম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

ক = খ্রীষ্টাব্দ ; খ = হিজরী অব্দ।

গণনা অনুসারে, ক=.৯৭০২২৪×খ+৬২১.৫৭৭৪

এক্ষণে, .৯৭০২২৪×খ —এই গুণফলের দক্ষিণ দিক হইতে ছয়টি সংখ্যার পরে দশমিক বিন্দু বসিবে এবং যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর পূর্ণ সংখ্যাংশটি খ্রীষ্টাব্দ হইবে।

দৃষ্টান্ত ঃ খ = ৯২৭ হিজরী

অতএব খ্রীষ্টাব্দ=.৯৭০২২৪×খ+৬২১.৫৭৭৪

=৮৯৯.৩৯৭৬৪৮+৬২১.৫৭৭৪

=১৫২০.৯৭৫০৪৮

অতএব ৯২৭ হিজরী = ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ।

এইরূপ হিসাবে ১০৭০ হিজরী = ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

হিটলার, অ্যাডল্ফ (১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রী) জার্মানির একনায়ক (ডিক্‌টেটর, ১৯৩৩-৪৫ খ্রী)। জন্মস্থান অস্ট্রিয়া। ভিয়েনায় শিল্পজীবী ছিলেন। ইহুদী-বিদ্বেষী ছিলেন এবং মার্ক্‌স-বিরোধী মত পোষণ করিতেন। ব্যাভেরিয়ায় বিদ্রোহ ঘটাইতে গিয়া (১৯২৩ খ্রী) তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়। অতঃপর জার্মানিতে ফাসিবাদ ('ফাসিবাদ' দ্র) আন্দোলনের আবহাওয়া অনুকূল হইলে তাঁহার নেতৃত্বে নাৎসীদল ক্ষমতায় আরোহণ করে। চ্যান্সেলার হিণ্ডেনবার্গের মৃত্যুর পর 'নেতা' (Fuhrer, ১৯৩৩ খ্রী) ও দেশরক্ষা বাহিনীর অধিনায়ক হন। তাঁহার আমলে শ্রমিক আন্দোলন বিধ্বস্ত এবং সমস্ত বিরোধী দল (সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, ইহুদী) নির্যাতিত ও নিহত হয়। সাংঘাতিক প্রচারনীতি ও আতঙ্কসৃষ্টির ফলে জার্মান-রাষ্ট্র একটি ভয়ঙ্কর আক্রমণকারীযন্ত্রে পরিণত হয়। অতঃপর হিটলার কর্তৃক রাইনল্যান্ড অধিকার (১৯৩৬

খ্রী), অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল (১৯৩৮-১৯৩৯ খ্রী), পোলাণ্ড আক্রমণ, ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণা (সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রী) এবং হিটলার কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ (১৯৪১ খ্রী) প্রভৃতি অতিদ্রুত নাটকীয় ঘটনাবলীর শেষ অঙ্কে হিটলারের চরম পরাজয় (১৯৪৫ খ্রী) ও আত্মহত্যা সংঘটিত হয় (এপ্রিল, ৩০)। তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে পীড়িত, মূর্ছিত জার্মানজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দেশকে সামরিক শৌর্যের উচ্চশিখরে উন্নীত করিয়াছিলেন। সে দিক্ দিয়া তিনি সত্যই অদ্ভুত-কর্মা। যেমন তাঁহার নাটকীয় অভ্যুদয় তেমনি নাটকীয় সমাপ্তি। 'আমার সংগ্রাম' (২ খণ্ড, ১৯২৫-২৭ খ্রী) তাঁহার আত্মজীবনী-মূলক সর্বজনবিদিত গ্রন্থ।

নির্মলকান্তি মজুমদার

হিতোপদেশ 'পঞ্চতন্ত্রে'র কোনো একটি অধুনালুপ্ত গ্রন্থ-রূপ হইতে হিতোপদেশের উৎপত্তি। 'হিতোপদেশে'র রচয়িতার নাম নারায়ণ। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ধবলচন্দ্রের নামোল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের একটি পুথির লিপিকাল ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং গ্রন্থটি নিশ্চয়ই ইহার পূর্বে রচিত। হিতোপদেশে রবিবার অর্থে 'ভট্টারক-বার' শব্দটির উল্লেখ আছে; ৯০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় হইতে এই শব্দটি প্রচলিত। অতএব, 'হিতোপদেশ' উক্ত কালসীমার পূর্বেকার রচনা হইতে পারে না।

'পঞ্চতন্ত্রে'র একমাত্র 'হিতোপদেশ' রূপটিই বাংলা-দেশে প্রচলিত। বস্তুতঃ ইহাকে বাংলাদেশেই উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হয়।

মূল 'পঞ্চতন্ত্রে'র পাঁচটি প্রসঙ্গের স্থলে 'হিতোপদেশে' চারিটি প্রসঙ্গ এইরূপ ক্রমে আছে: ১. মিত্রলাভ, ২. সুহৃদ্ভেদ, ৩. বিগ্রহ, ৪. সন্ধি। 'হিতোপদেশ' গদ্যেপদ্যে রচিত; নীতিকথাগুলি সাধারণতঃ শ্লোকাকারে লিখিত। পশুপক্ষীর গল্পই গ্রন্থখানির উপজীব্য। রচনারীতিতে লক্ষণীয় যে, একটি গল্পের কাঠামোতে বহু গল্প অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থটির ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য, শ্লোকগুলির ভাব হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ইহার উদ্দেশ্য সংস্কৃত ভাষা ও নীতি-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষাদান। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই গ্রন্থের উপজীব্য 'পঞ্চতন্ত্র' ও অপর একটি গ্রন্থ, যাহার নামোল্লেখ করা হয় নাই। 'হিতোপদেশে' অনেক নূতন গল্পও আছে। এইরূপ একটি গল্প বীরবরোপাখ্যান। অপর একটি নূতন গল্প মুনিমূষিককথা। এই গল্পে এক মুনির কৃপায় এক মূষিক ক্রমশঃ মার্জার, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের রূপে পরিণত হয়; কিন্তু ব্যাঘ্ররূপে সে ঐ মুনিকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে মুনি উহাকে পুনরায় মূষিকে পরিণত করেন। ইহা মহাভারতের কুক্কুর-বিষয়ক একটি গল্পের পরিবর্তিত রূপ বলিয়া মনে হয়।

'পঞ্চতন্ত্রে'র কয়েকটি গল্প 'হিতোপদেশে' বর্জিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। হিতোপদেশের কতক গল্প বোধ হয় 'শুকসপ্ততি' ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতিকা' হইতে গৃহীত। 'কামন্দকীয় নীতিসার'-এর বহু নীতিমূলক অংশও হিতোপদেশ-এ উদ্ধৃত হইয়াছে। হিতোপদেশের কিছু শ্লোক গ্রন্থকারের লেখা হইতে পারে, তবে অনেক শ্লোকই, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যত্র হইতে গৃহীত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হিত্তী ২০০০-১২০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়ার আনাতোলিয়ায় (এশিয়া মাইনরে) অধিষ্ঠিত প্রাচীন সুসভ্য জাতি। এশিয়া মাইনরের উত্তরাংশে তুরস্কের বর্তমান রাজধানী আঙ্কারার ১৪৫ কি. মি. পূর্বে আধুনিক Boghazkeui গ্রামের নিকটে প্রাচীন হিত্তী সাম্রাজ্যের রাজধানী অবস্থিত ছিল। ১৯০৬-০৭ এবং ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ওরি-য়েণ্ট সোসাইটির পক্ষে Hugo Winckler -এর অনুসন্ধান ও খননকার্যের ফলে ঐ স্থানে হিত্তী সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ এবং হিত্তীভাষায় বাণমুখ লিপিতে উৎকীর্ণ প্রায় দশ হাজার মৃৎফলক ও অন্যান্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্যাবিলনীয় চিত্র-লিপিতে ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত কিছু কিছু প্রত্ন-লেখ ঐখানে পাওয়া গিয়াছে।

হিত্তী ভাষাকে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর অতি প্রাচীন শাখা বলিয়া চেক পণ্ডিত Bedrich Hrozny, আমেরিকান পণ্ডিত E. H. Strutevant, জার্মান পণ্ডিত J. Friedrich, ইরানীয় পণ্ডিত তারাপোর-ওয়ালা ও ভারতীয় পণ্ডিত সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা-ভাষীদের আদি নীড় হইতে হিত্তীরাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসে এবং এশিয়া মাইনরে উপনিবিষ্ট হয়। হিত্তী প্রত্নলেখগুলিতে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন মিলিতেছে। এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোকিয়া প্রদেশে বহিরাগত এই ভাষা হিত্তীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করে। লুবীয় (Luwian), লীসীয় (Lycian), পলীয় (Palaic) প্রভৃতি অন্যান্য ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার সহিত হিত্তীভাষা ঐ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের (যাহারা ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা-বর্গের ভাষা বলিত না তাহাদের) প্রাচীন ভাষা-গুলিকে হটাইয়া দিয়া প্রসার লাভ করে। প্রাচীন হালিস্ (Halys) নদীর (তুর্কি কিজিল্-ইরমাক,

Kizil-Irmak, Red river বা লোহিত নদের) বাঁকে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০-৪০৭৫ ফিট ঊর্ধ্বে আনাতোলিয়ার উচ্চ মালভূমিতে দুর্গম গিরিদুর্গের মধ্যে হিত্তী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৮০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হিত্তী সাম্রাজ্যের শাসন অব্যাহত থাকে। সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিত্তী জাতি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণে ও পূর্বে সমর-অভিযান শুরু করে এবং উত্তর সিরিয়া ও ব্যাবিলনে রাজ্য বিস্তার করে (১৭৫৮-১৬০০ খ্রী. পূ.)। হিত্তীরাজ সুপিলুল্যুমস্ (Suppiluliumas)-এর রাজত্ব-কালে (১৩৮৫-৪০ খ্রী. পূ.) হিত্তীদের সামরিক শক্তি সর্বোচ্চ শিখরে ওঠে। মিশরের প্রাধান্য খর্ব করিয়া লেবানন সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর সিরিয়া তিনি হিত্তী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এশিয়া মাইনরের অন্যান্য রাজ্য জয় করেন এবং মিতান্নিদের পরাস্ত করেন।

১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় রামেশেস হিত্তীদের নিকট পরাস্ত হন। ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর হিত্তী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং রাজধানী হত্তুসস্ (Hattusas) অগ্নিদগ্ধ ও পরিত্যক্ত হয়। ১১৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সমুদ্রপথে বহিরাগত শত্রুরা হিত্তীদের উপনিবেশগুলির উপর আক্রমণ চালায়, ইন্দো-ইও-রোপীয় ভাষাভাষী থ্রেসীয়, ফ্রীজিয় ও আর্মেনিয়রা এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহার কিছু পূর্বে আসিরীয়রা মিতান্নি রাজ্য জয় করিয়াছিল, সিরিয়ায় হিত্তীরাজ্য ও উপনিবেশগুলিও আসিরীয়রা জয় করে।

প্রাচীন মিশরীয় ও আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় জাতির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল হিত্তীজাতি। হিত্তী সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যাবিলন ও মিশরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। Boghazkeui-এ খনন-কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হিত্তী সাম্রাজ্যের মহাফেজ-খানায়, মৃৎফলকের পর মৃৎফলক, গ্রন্থের পৃষ্ঠার মত সুসজ্জিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্যে হিত্তী অভিধান, শব্দকোষ, আইন, শাসনকার্য সংক্রান্ত দলিল, ইতিহাস, রাজকীয় চিঠিপত্র-আদেশ-নির্দেশ, সন্ধিপত্র, হিসাবপত্র, উপকথা, পুরাকাহিনী, সাহিত্য, সংগীত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, অশ্ববিদ্যা-সম্বন্ধীয় নিবন্ধ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। কোনও কোনও শব্দকোষে তিনটি স্তম্ভে—প্রথম স্তম্ভে সুমেরীয়, দ্বিতীয় স্তম্ভে ব্যাবিলনীয়, তৃতীয় স্তম্ভে হিত্তী—তিনটি প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। হিত্তী-লিপিকর ও পণ্ডিতেরা অনেকে ষড়্ভাষাবিদ্ ছিলেন, প্রত্নলেখে তাহার প্রমাণ আছে। বিভিন্ন রাজকীয় ঘোষণা, সন্ধিপত্র, সামরিক অভিযানের তথ্য, শাসনকার্য-সংক্রান্ত দলিল-পত্রাদি মৃৎফলকগুলিতে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত থাকায় হিত্তীদের ঐতিহাসিক চেতনার ও হিত্তী ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ২০০ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হিত্তী ন্যায়সংহিতা হিত্তীদের ন্যায়বিচার ও নীতিবোধের উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করিতেছে। হিত্তী ন্যায়-সংহিতার এক অংশে হিত্তী রাজ্যে নির্ধারিত দ্রব্যমূল্যের তালিকা—গৃহপালিত বিভিন্ন পশু, বিভিন্ন প্রকার মাংস ও চামড়া, কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন শ্রেণীর জমি ও ধাতুর মূল্য—হিত্তী অর্থনীতির ও মূল্যনিয়ন্ত্রণের পরিচয় বহন করিতেছে। আবিষ্কৃত প্রত্নলেখগুলি হইতে জানা যায় যে, হিত্তীরা যব, গম, দ্রাক্ষা ইত্যাদি উৎপাদন করিত, যব হইতে পানীয় (বীয়ার) প্রস্তুত করিত। সমাজে সুরার প্রচলন ছিল। হিত্তী অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি, গোপালন ও মধুমক্ষিকাপালন। অশ্ব ও রথের প্রচলন ছিল। তাম্র, রৌপ্য, সীসা, লৌহ ও ব্রন্জের ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন ওজনের রৌপ্যখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। প্রতিবেশী ব্যাবিলনীয়দের নিকট হইতে সভ্যতার নানা উপাদান তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল।

হিত্তীরা বহু দেবদেবীর উপাসক ছিল। বিভিন্ন সন্ধিপত্রে সহস্র দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন আবহ-দেবতা বরুণ এবং প্রাণদেবতা সূর্য। দেবদেবীদের আয়ুধ, মুদ্রা, পক্ষ, বাহন ছিল। আবহ-দেবতার বাহন ছিল পবিত্র বৃষযুগল। দেবতার প্রতীক হিসাবে বৃষও পূজিত হইত। দুই সহচরী-সমন্বিতা সিংহবাহিনী, হলবাহন কৃষিদেবতা, মৃগবাহন গ্রামদেবতা, ক্ষেত্র-দেবতা প্রভৃতি নানা দেবতার মূর্তি ও বর্ণনা প্রত্নলেখে পাওয়া গিয়াছে। পুরুষোচিত শক্তি বা পৌরুষের দেবতা ইনর বা ইনরস্ (তুলনীয়, সংস্কৃত নরঃ, ইন্দরঃ, ইন্দ্রঃ, মিশরের সম্রাট দ্বিতীয় রামেশেসের সঙ্গে হিত্তীদের সন্ধিপত্রে 'ইন্দর')।

হিত্তীরা আকাশ, পৃথিবী, পর্বত, নদী, কূপ, বায়ু, মেঘ প্রভৃতির উপাসনা করিত। হিত্তী-উপাসকের নিকট দেবতা ছিলেন প্রভু; উপাসক তাঁহার সেবক, ক্রীতদাস। দেবতাকে আহার্য নিবেদন, দেবতার সেবা, তুষ্টি ও স্তুতি উপাসকের কর্তব্য। মন্দির ছিল দেবতার বাসগৃহ এবং পুরোহিতেরা ছিলেন তাঁহার গৃহভৃত্য। ক্ষেতের প্রথম ফসল বা গাছের প্রথম ফল দেবতাকে নিবেদন করা হইত। দেবতার নিকট ছাগ, মেষ, বৃষ বলিদান করা হইত। ক্বচিৎ 'অশুদ্ধ' পশু শূকর ও কুকুর বলি হইত। যুদ্ধে পরাজয় হইলে কদাচিৎ নরবলি দেওয়া হইত। হিত্তী দেবতা 'অরুণস' (সমুদ্র), 'অগ্নিস' আর্যদের 'বরুণ' ও অগ্নির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৩৬০

খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি হিত্তী প্রস্তলেখের পাঠোদ্ধার করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে Hugo Winckler বিশ্বের পণ্ডিতসমাজকে চমকিত করেন। হিত্তীরাজ সুপিলুল্যুমস্ ও মিতান্নিরাজ মত্তিয়াউজ সম্পাদিত তাঁহাদের পুত্রকন্যার বিবাহের এই চুক্তিপত্রে মিতান্নিরাজ তাঁহার পূজিত যেসব দেবতাকে সাক্ষী রাখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 'মি-ইৎ-র', 'উরু-ব-ন', 'ইন-দ-র', 'ন-সত-তি-য়ন' দেবনামগুলির সহিত বৈদিক মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য তুলনীয়।

আদি ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষার কয়েকটি ধ্বনি হিত্তীতে পরিবর্তিত বা লুপ্ত হয়। ইন্দো-ইওরোপীয় মূল ভাষার তুলনায় হিত্তীর ধ্বনিসংখ্যা কম। অঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ হিত্তীতে নাই। ইন্দো-ইওরোপীয় তিন 'ক'-বর্গ—পুরঃকণ্ঠ্য, পশ্চাৎকণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য হিত্তীতে একটি 'ক'-বর্গে পরিণত। কয়েকটি কণ্ঠনালীয় ধ্বনি হিত্তীতে আসিয়াছে। হিত্তী ভাষার কয়েকটি শব্দ ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাবর্গের অন্য ভাষাতেও সহজেই চেনা যায়, একই মূল ভাষা হইতে তাহারা আগত। হিত্তী vadar, uatar ইংরেজী water জার্মান wasser রুশ voda; ; হিত্তী genu ইংরেজী knee সংস্কৃত জানু; হিত্তী kardi গ্রীক kardia লাতিন cordem (সম্বন্ধ পদ cordis) ইংরেজী heart জার্মান herz সংস্কৃত হৃদ্; হিত্তী pahhur ইংরেজী pyre, fire জার্মান feuer ইত্যাদি।

হিত্তী প্রাণবন্ত ভাষা ছিল, আক্কাদীয় ও সুমেরীয় ভাষা হইতে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। হিত্তীভূমির আদিম ভাষাগুলি হইতেও তাহারা শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় ভাষা ছাড়াও মিশরের সহিত সংস্পর্শের ফলে মিশরীয় ভাষা হইতেও হিত্তী কিছু কিছু শব্দ পরিগ্রহণ করিয়াছিল। হিত্তী ভাষার মৌলিক শব্দভাণ্ডার, প্রত্যয়-বিভক্তি, শব্দরূপ, ধাতুরূপ বিচার করিয়া হিত্তী ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। হিত্তী বিশেষ্যপদের শব্দরূপে ৬টি কারকের বিভক্তিগুলির (হিত্তীতে অধিকরণ কারকের বিভক্তি নাই) সহিত গ্রীক, লাতিন ও সংস্কৃতের সাদৃশ্য আছে। হিত্তীতে ব্যক্তি-নামের সম্বোধন পদ আছে। হিত্তী নাম পদের দুইটি লিঙ্গ—চেতন ও অচেতন। হিত্তীতে বহুবচন আছে, দ্বিবচন নাই। ক্রিয়াপদের দুইটি বাচ্য।

বাণমুখ লিপি ব্যতীত চিত্রলিপির ব্যবহারও হিত্তীদের মধ্যে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব হইতে প্রচলিত হয়। এই চিত্রলিপির অধিকাংশই কারকেমিশ নামক স্থানে (আধুনিক জেরাব্লুস্ গ্রামের নিকটে) খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পূর্ব আনাতোলিয়ায় হিত্তীরা বহিরাগত বিদেশী হইলেও তাহারা তাহাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের স্থানীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সমুন্নত করিয়াছিল। সুসভ্য ব্যাবিলনীয়দের সংস্পর্শে আসিলেও এবং তাহাদের নিকট হইতে সভ্যতার নানা উপাদান গ্রহণ করিলেও হিত্তীরা ধর্মবিশ্বাস, লৌকিক আচার ও সামাজিক প্রথায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। অগ্নিকার্যের দ্বারা হিত্তীদের শবসৎকার হইত, যব হইতে প্রস্তুত বীয়ার ঢালিয়া চিতা নির্বাপণ করা হইত, চিতাভস্মপূর্ণ পাত্র রক্ষিত হইত। শবদেহ সমাধিস্থ করার রীতিও ছিল। সহোদর-সহোদরা বা জ্ঞাতি ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। নৈতিক অনুশাসনে হিত্তীসমাজ নিয়ন্ত্রিত ছিল। বেশভূষায়, অলংকারে, স্থাপত্যে, নগর-পরিকল্পনায় হিত্তীরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিল।

প্রথম দিকে সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয় শিল্পকলা দ্বারা প্রভাবিত হইলেও এবং পরে মিশরীয় শিল্পকলার কিছু প্রভাব পড়িলেও হিত্তী শিল্পকলা নিজস্ব পথ ও পদ্ধতিতে বিকাশলাভ করে। তোরণ, প্রবেশদ্বার, প্রাসাদের দেওয়াল ও ভিত্তিগাত্র, দেবমন্দির ও মূর্তিনির্মাণে হিত্তী শিল্পকলার নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিল্পকলার ইতিহাসে সেগুলির বিশিষ্ট স্থান ও মূল্য আছে।

মদনমোহন কুমার

হিন্দী গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাগুলির সাধারণ নাম। হিন্দী ভাষাগুচ্ছ দুই ভাগে পড়ে। এক ভাগ পশ্চিমা হিন্দী; তাহার অন্তর্গত ভাষা হইতেছে ব্রজভাষা, কনৌজী, বুন্দেলী (বা হরিয়ানী) এবং আম্বালা হইতে রামপুর পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুস্তানী। অপর ভাগ পূর্বী হিন্দী। তাহার মধ্যে পড়ে অবধী (কোশলী বা বইসওয়াড়ী), বঘেলী এবং ছত্তিসগঢ়ী।

ফারসী হরফে লেখা উর্দু এবং দেবনাগরী হরফে লেখা এখনকার হিন্দী ভাষা (যাহা এখন সাধু ভাষা বা 'খড়ী বোলী' রূপে গৃহীত হইয়াছে) হিন্দুস্তানী হইতে উদ্ভূত। উর্দুতে আরবী ফারসী শব্দ প্রচুর আছে। এখনকার হিন্দী সাধু ভাষায় বা 'খড়ী বোলী'তে সংস্কৃত (অর্থাৎ তৎসম) শব্দেরই আধিক্য।

'হিন্দী' শব্দটির প্রাচীন রূপ হিন্দবী। ইহা আসিয়াছে 'হিন্দবী' হইতে এবং সে শব্দটির মূল হইল

মধ্যপারসীক (পহ্লবী) 'হিন্দুগী' (অর্থ: সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা)।

সুকুমার সেন

হিন্দী সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যের ত্রিকাল হইল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিককাল। অপভ্রংশের পর প্রাচীন হিন্দী কাব্যের কালকে 'বীরগাথা কাল' (১০ম-১৪শ শতক) বলা হয়। এই বীরগাথাগুলির মধ্যে কবি চন্দ বরদাঈ বিরচিত 'পৃথ্বীরাজ রাসো' (খ্রী. ১২শ শতক) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যুগের হিন্দী কবিদের মধ্যে আমীর খুসরোর (খ্রী. ১৪শ শতক) যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। মধ্যযুগ (খ্রী. ১৫শ-১৮শ শতক) হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই যুগের প্রথম পর্বে (খ্রী. ১৫শ-১৭শ শতক) ব্রজভাষা ও অবধীতে ভক্তিকাব্য ও নির্গুণ-পন্থী কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। শেষ পর্বে (খ্রী. ১৭শ-১৮শ শতক) ব্রজভাষায় আলংকারিক 'রীতি' প্রকাশক কবিতাগুলি রসবিচারে স্বতন্ত্র শ্রেণীর। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ 'ভক্তিকাল'-এ হিন্দী সাহিত্য-গগনের চিরভাস্বর সুরদাস, তুলসীদাস ('তুলসীদাস' দ্র) ও কেশবদাসের আবির্ভাব। মধ্যযুগের প্রথম পর্বের নির্গুণপন্থী কবিদের সর্বাগ্রগণ্য কবীর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের কবি ('কবীর' দ্র)। কবীরের অনুগামী কবিদের মধ্যে ধর্মদাস (১৬শ শতক), নানক (১৬শ শতক) ও দাদু (১৬শ-১৭শ শতক) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পর্বের প্রেম মার্গীয় সুফী কবিদের হাতে হিন্দী অবধী সাহিত্যের সার্থক আবির্ভাব ষোড়শ শতকে। ইঁহাদের রচনায় মৌলিক প্রেমকাহিনী ভক্ত-ভগবানের মিলন-লীলার রূপক। সুফী কবি 'কুতবন'-বিরচিত 'মৃগাবতী' (১৫০৩ খ্রী) ও মঞ্ঝন-বিরচিত 'মধু-মালতী' (পুথি খণ্ডিত) কাব্যে এই ধারার সূত্রপাত। এই ধারার চরমতম বিকাশ মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যে (আনু. ১৫২০ হইতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোনও এক সময়) বর্ণিত পদ্মিনী-রতন সেন-আলাউদ্দীনের কাহিনীতে। বাংলা সাহিত্যে ১৭শ শতকে আলাওল ('আলাওল' দ্র) এই কাব্যের কোথাও আংশিক বিশুদ্ধ অনুবাদ, কোথাও বা ভাবানু-বাদ করিয়াছেন। পরবর্তী সুফী কবিদের মধ্যে ওসমান, শেখ নবী, কাশিম শাহ্, নূর মহম্মদ প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য।

এই পর্বের সগুণ ভক্তিকাব্যের কৃষ্ণবিষয়ক ও রাম-বিষয়ক কবিতার প্রাদুর্ভাব। কৃষ্ণবিষয়ক কাহিনীর ভাষা ব্রজভাষা, হিন্দীর প্রধানতম কাব্যভাষা। হিন্দী ব্রজ-ভাষায় কৃষ্ণলীলার অগ্রণী কবিদের নাম 'অষ্টছাপ'। এই 'অষ্টছাপ'ভুক্ত আটজন কবি হইলেন সুরদাস, নন্দদাস, কৃষ্ণদাস, পরমানন্দদাস, কুম্ভনদাস, চতুর্ভুজদাস, ছীত স্বামী, গোবিন্দ স্বামী। ইঁহারা বল্লভাচার্য বা তৎপুত্র বিঠ্ঠলনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রজভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান গদাধর ভট্ট এবং ষড়্গোস্বামীর অন্যতম গোপালভট্ট স্মরণীয়। হিত হরিবংশ প্রথমে শ্রীচৈতন্যপন্থী পরে রাধাবল্লভী-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। মীরাবাঈ মাধুর্যভাবের উপাসনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবগোস্বামীর দ্বারা প্রভাবিত। স্বামী-হরিদাস প্রথমে নিম্বার্কপন্থী পরে স্ব-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। রস খান বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্ঠলনাথের শিষ্য। ধ্রুবদাস রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ভুক্ত। কৃষ্ণভক্তি শাখার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সুরদাসের শ্রেষ্ঠ পদ আছে 'সুরসাগর'-এর 'ভ্রমরগীত' অংশে। এই অংশে মথুরা হইতে কৃষ্ণ-প্রেরিত দূত উদ্ধবের সহিত গোপীদের সগুণ-নির্গুণ বিষয়ক যে আলোচনা আছে তাহা হিন্দীতে উপালম্ভ কাব্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।

এই পর্বের রামভক্তি শাখার প্রথম ও প্রধান কবি গোস্বামী তুলসীদাস (১৬শ শতক, 'তুলসীদাস' দ্র)। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' হিন্দী সাহিত্যের অতুল-নীয় গ্রন্থ, নিত্য শ্রদ্ধার সামগ্রী। তুলসীদাসের কাব্যসংখ্যা অনেকের মতে বারো। তন্মধ্যে পাঁচটি বড় কাব্যগ্রন্থ—দোহাবলী, কবিত্ত (হিন্দীর ছন্দ বিশেষ) রামায়ণ, গীতাবলী, রামচরিতমানস, বিনয় পত্রিকা। সাতটি ছোট গ্রন্থ হইল—রামলীলা নহছু, পার্বতীমঙ্গল, জানকী-মঙ্গল, বরবৈ রামায়ণ, বৈরাগ্য সন্দীপনী, কৃষ্ণগীতাবলী, রামাজ্ঞা প্রশ্নাবলী।

এই যুগের অন্য কবিদের মধ্যে গঙ্গের কবিত্ব, অবদুর রহিম খান্খানার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাব্যকলা অতীব প্রশংসনীয়। কেশবদাসের রচনা ক্লিষ্ট, অলংকারপ্রিয়তায় পরিপূর্ণ। ইঁহার 'কবিপ্রিয়া', 'রসিকপ্রিয়া', 'রামচন্দ্রিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগের রীতিকালের (১৭শ-১৮শ শতক) কবিদের সংখ্যা অনন্ত। কিন্তু মৌলিক ভাবনাক্ষেত্রে অনন্তকালের কবি কাহাকেও বলা চলে না। তবে এই যুগের কবিদের ভিতর বিহারীলাল অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাঁহার 'সাত শত' শ্লোকসংগ্রহ বা 'সতসঈ' প্রাকৃত কবি হাল-এর 'সতসঈ' এবং গোবর্ধনাচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী'র অনুগামী। এই রীতিকালীন কবিদের মধ্যে স্বতন্ত্র পথগামী কবি 'ভূষণ'। মধ্যযুগের ব্রজভাষা সাহিত্যে গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে চুরাশি বৈষ্ণবের কথা ('চৌরাশি বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা') বা দুই শত বাহান্ন বৈষ্ণব-ভক্তের কাহিনী ('দো সৌ বাওন বৈষ্ণবোঁ কী বার্তা') বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক হিন্দী সাহিত্য ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পরবর্তী যুগের। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

কেন্দ্রে লল্লুলাল-বিরচিত ‘প্রেমসাগর’ (ভাগবত পুরাণের ১০ম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত) এবং সদল মিশ্র-বিরচিত ‘নাসকেতোপাখ্যান’ (নচিকেতা কাহিনী অবলম্বনে লেখা)-এর ভিতর দিয়া হিন্দী (খড়ী বোলী বা স্ট্যান্ডার্ড হিন্দী) গদ্য সাহিত্য নূতনরূপে দেখা দিল। ইঁহাদের সহিত সমসাময়িক সদাসুখলাল ও ইন্‌শা অল্লা খাঁকে ধরিলে গদ্যরচনার চারিটি প্রধান স্তম্ভ কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল বুঝিতে পারা যায়। অতঃপর কলিকাতা, কাশী ও আরও কয়েকটি কেন্দ্র হইতে সাময়িকপত্র, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি অবলম্বনে খড়ী বোলী গদ্য বিকশিত হইতে লাগিল। কবিতার ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ব্রজভাষার স্থান খড়ী বোলী অধিকার করিয়া লইল। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের আদিপুরুষ হিসাবে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫ খ্রী)-এর নাম চিরস্মরণীয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামে প্রচলিত বাংলা নাটক ‘বিদ্যাসুন্দর’ অনুবাদের মধ্য দিয়া ভারতেন্দু হিন্দী নাট্যসাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করিলেন। আধুনিক হিন্দীসাহিত্যের প্রথম পর্বে ভারতেন্দুর নির্দেশ ছিল ‘বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারের সহায়তায় হিন্দীভাষার উন্নতিবিধান।’ এই যুগের হিন্দী সাহিত্য বাংলাসাহিত্যের অনুবাদ-অনুসরণের দ্বারা পুষ্ট। ভারতেন্দুর পরে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদীর নাম করিতে হয়। তাঁহার প্রেরণায় ও তৎসম্পাদিত ‘সরস্বতী’ (১৮৯৯ খ্রী) পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে নূতন রসস্রোত সঞ্চালিত হইল, বিশেষ করিয়া কবিতার ক্ষেত্রে। অতঃপর হিন্দী কাব্যসাহিত্যে দ্বিবেদীমণ্ডলভুক্ত মৈথিলীশরণের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। একদিকে তিনি মধুসূদনের অনুবাদক, অন্যদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে নূতন আলোর সন্ধানী। এই পথেই ‘ছায়াবাদী’ হিন্দী কবি-ত্রয়ের (প্রসাদ-পন্ত-নিরালা) পদযাত্রা। জয়শঙ্কর প্রসাদ বা কবি ‘প্রসাদ’ একাধারে কবি, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক। ছায়াবাদী ভাবাকুলতা ছাড়া তাঁহার এপিকধর্মী কাব্যে মননশীলতা লক্ষণীয়। ‘প্রসাদ’-বিরচিত ‘কামায়নী’ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কবি সুমিত্রানন্দন পন্ত দার্শনিক কবি। ‘নিরালা’ অভিধায় সুপরিচিত সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী হিন্দী ছায়াবাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ কবি ও কথাসাহিত্যিক। ছায়াবাদী হিন্দী কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছায়া লক্ষণীয়। তবে সে ছায়া শ্রীমতী মহাদেবী বর্মায় অস্পষ্ট, ‘নিরালা’র ভাবে ও ভাষায় সুস্পষ্ট।

সাম্প্রতিককালে এলিয়ট-এর অনুসরণে হিন্দীতে দেখা দিয়াছে ‘প্রয়োগবাদ’। এখানেও বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদের সহিত ইঁহাদের তুলনা স্বতঃই মনে আসে। তবে ‘দিনকর’ প্রভৃতি আধুনিক কবিরা এখনও কাব্যে রবীন্দ্রাদর্শকেই অনুসরণ করেন। আধুনিক হিন্দী কথাসাহিত্য প্রেমচন্দ, জয়শঙ্কর প্রসাদ, কৌশিক, বৃন্দাবন বর্মা, পান্ডেয় বেচন শর্মা ‘উগ্র’, জৈনেন্দ্রকুমার, যশপাল, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক, ভগবতীচরণ বর্মা, ‘অজ্ঞেয়’ (সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন), ইলাচাঁদ যোশী, ফণীশ্বর রেণু প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

হিন্দী নাট্যসাহিত্যে ভারতেন্দুর পরেই জয়শঙ্কর প্রসাদের স্থান। তাঁহার ‘চন্দ্রগুপ্ত’, ‘স্কন্দগুপ্ত’ প্রভৃতি নাটক সুপ্রসিদ্ধ। অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে হরিকৃষ্ণ প্রেমী, শেঠ গোবিন্দদাস, উদয়শঙ্কর ভট্ট, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক প্রভৃতির নাম করা যায়। হিন্দীর প্রবন্ধসাহিত্যও যথেষ্ট সমৃদ্ধ এবং অনুবাদক্ষেত্রেও হিন্দী সাহিত্য বিশেষভাবে অগ্রণী। আধুনিক রসসমৃদ্ধ হিন্দী প্রবন্ধসাহিত্যে পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীর নাম উল্লেখযোগ্য। ‘বাণভট্ট কী আত্মকথা’ লিখিয়া তিনি আকাদেমি পুরস্কার পাইয়াছেন।

সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু এই শব্দটি একটি জাতি বা ধর্মের নাম-রূপে ব্যবহৃত হয়। বহু প্রাচীনকালে পারসীকগণ সম্ভবতঃ সিন্ধু নদীর তীরস্থিত প্রতিবেশী ভারতীয়গণকে হিন্দু বলিত এবং সমগ্র ভারতবাসীই তাহাদের নিকট এই নামে পরিচিত হয়। গ্রীকদের মুখে ‘হিন্দু’ এই নাম ‘ইন্দু’-তে পরিণত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশীয় লোকের নিকট এই দেশ ও লোক India, Inde প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইত।

জাতিবাচক হিন্দু নাম প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। মুসলমানেরা ভারত অধিকার করার পর বিজিত ভারতবাসীকে এই নামে অভিহিত করে এবং এদেশের অধিবাসীদের সকলেরই ধর্মকে ‘হিন্দু’ এই সাধারণ সংজ্ঞা দেয়। সুতরাং শৈব, শাক্ত, জৈন, বৌদ্ধ, প্রভৃতি, ইসলাম ব্যতিরেকে, অন্যান্য প্রচলিত ভারতীয় ধর্ম, হিন্দু ধর্ম বলিয়াই ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া ওঠে।

মোটের উপর ‘হিন্দু’ কোনও একটি বিশিষ্ট ধর্মের নাম নহে। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ্য, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকল ধর্মই কালক্রমে ‘হিন্দু’ এই সাধারণ সংজ্ঞায় সূচিত হইয়া আসিতেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি, অর্থাৎ যে-সব ধর্মে ‘বেদ’, ‘বেদান্ত’ প্রভৃতি মূল ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয় নাই, সেই সব ধর্মের লোকেরা, সাম্প্রদায়িক (বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি) নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক উৎপত্তি বিবেচনা করিলে

ভারতে 'ইস্‌লাম' ব্যতীত প্রাচীন কালের আর সকল ধর্মই হিন্দুধর্ম সূচিত করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

হিন্দু আইন সিন্ধু নদীর অববাহিকায় যে আর্য-সভ্যতার বিকাশ তাহার ব্যক্তি-সম্পর্কিত (পার্সোনাল) আইনকে হিন্দু আইন বলে। হিন্দু আইনের তিনটি কালপর্যায়—শ্রুতি বা বৈদিক কাল, ধর্মশাস্ত্রীয় কাল, ও স্মৃতির পরবর্তী কাল। ঋগ্‌বেদে ('ঋগ্‌বেদ' দ্র) পূর্বপুরুষ অনুসৃত মনুর নিয়ম পালন করার নির্দেশ আছে। গরু চুরি করিয়া চোর ধরা না পড়িলে রাজাকেই সেই ক্ষতিপূরণ করার বিধান আছে। অথর্ববেদে শাস্ত্রসম্মতভাবে করধার্যের কথা আছে। বেদের ব্রাহ্মণ-অংশে বস্তুপালনের নিয়ম আছে। উপনিষদ-অংশে দর্শন চিন্তাই প্রধান হইলেও বৃহদারণ্যক উপনিষদে সম্পত্তির কথা আছে। ধর্মশাস্ত্রের ('ধর্মশাস্ত্র' দ্র) কালই হিন্দু আইনের স্বর্ণযুগ। এই যুগের দুই ভাগ—সূত্র ও স্মৃতি। সূত্রাংশে উত্তরাধিকার, সম্পত্তির বিভাগ-বণ্টন, বিবাহ, স্ত্রীধন, দত্তকঋণ, সুদ ইত্যাদি Substantive দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন এবং আর্জি, জবাব, Res Judicata ইত্যাদি Procedural আইনের বিশদ বিবরণ আছে। স্মৃতিকারদের মধ্যে মনুর দ্বাদশ সংহিতাই সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মনুসংহিতার ('মনুসংহিতা' ও 'স্মৃতিশাস্ত্র' দ্র) অষ্টম অধ্যায়ে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের আঠারোটি বিষয়ে নিয়ম প্রণয়ন করা আছে। মনুর মতে বেদ, স্মৃতি, প্রথা ও বিবেক হিন্দু আইনের এই চারিটি উৎস। বৈদিক বা ধর্মশাস্ত্রের যুগে স্থায়ী বিচারবিভাগের প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রাম অথবা শ্রেণী-সভার দ্বারা বিচারকার্য চলিত। রাজা প্রথাগত আইন স্বীকার করিতেন। মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে যখন ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে ওঠে তখন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার আইন ও বিচারবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় শংকরাচার্য বৌদ্ধ-সংঘের অনুকরণে মঠ স্থাপন করেন। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতাগণের মত প্রচলিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর কৃত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির ব্যাখ্যা বাংলা ও আসাম ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র মিতাক্ষরা নামে প্রচলিত। মিতাক্ষরা চারিটি মতে বিভক্ত—কাশী, মিথিলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ। দ্বাদশ শতাব্দীতে জীমূতবাহন বাংলা ও আসামে দায়ভাগ ('জীমূতবাহন' ও 'রঘুনন্দন ভট্টাচার্য' দ্র) প্রথা স্থাপন করেন। হিন্দুদের জীবনে আইন ও ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মনুর মতে বেদজ্ঞরা যাহা আচরণ করেন এবং যাহা তাঁহাদের বিবেকসম্মত তাহাই ধর্ম। সুতরাং হিন্দু আইন প্রথাভিত্তিক এবং বিবেকের অনুশাসনের দ্বারা তাহার বিকাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠের অধিকারী ছিল, সেইহেতু হিন্দু আইন উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের আচরিত ও ব্যাখ্যাত আইন। মুসলমান আমলে হিন্দু আইনের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয় নাই। ব্রিটিশ আমলে হাইকোর্ট, প্রিভি কাউন্সিল, ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দু আইনের যে বিকাশসাধন করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের লিখিত আইন। ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দুদের সম্বন্ধে নূতন অনেক আইন প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বিবাহ, উত্তরাধিকার বিষয়ে সনাতন আইনের স্থলে ভারতীয় আইনসভা নূতন আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ভারতীয় সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টগুলিও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু আইনের বিকাশসাধন করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে আর্য সভ্যতা বিস্তারের পূর্বেও ভারতবর্ষে যে অনার্য সমাজ ছিল তাহা প্রথাশাসিত ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণের পরেও তাহারা নিজ নিজ প্রথা পালন করার ফলে সেই প্রথাগুলিও হিন্দু আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখা যেমন বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও ব্রাহ্ম মতাবলম্বী লোকেরাও হিন্দু আইনের দ্বারা শাসিত। আবার ধর্মান্তরের পরেও কিছু কিছু মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী লোক উত্তরাধিকার-বিষয়ে হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত।

স্বদেশভূষণ ভূঞ্যা

হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত। রামমোহন রায়ের বাড়িতে এক ঘরোয়া সম্মিলনে ডেভিড হেয়ার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হিন্দু বিদ্যার্থীগণকে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য উন্নতধরনের বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা উত্থাপন করেন ('হেয়ার, ডেভিড' দ্র)। ১৪ মে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের চীফ্‌ জাস্টিস এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের (Edward Hyde East) বাড়িতে বিশিষ্ট হিন্দু ও ইওরোপীয়দের সভায় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এক সপ্তাহ পরে ২১ মে তারিখের সভায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের 'হিন্দু কলেজ' নামকরণ হয়, ১০ জন ইওরোপীয় এবং ২০ জন ভারতীয়কে লইয়া কলেজ কমিটি গঠিত হয়। স্যার এডওয়ার্ড হাইড ঈস্ট কমিটির সভাপতি এবং জোসেফ ব্যারেটো (Joseph Baretto) নামক একজন বদান্য পর্তুগীজ সওদাগর কোষাধ্যক্ষ হন। রামমোহন কমিটিতে থাকিলে সনাতনীরা সহযোগিতা করিবেন না আশংকা করিয়া রামমোহন কমিটির বাহিরে থাকেন।

বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ১২,০০০ টাকা, পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর ১০,০০০, বড়বাজারের মল্লিক পরিবার ২৫,০০০ টাকা দান করেন। অল্পকালের মধ্যে ১,১৩,১৭৯ টাকা চাঁদা ওঠে। ২৭ আগস্ট ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সভায় হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী গৃহীত হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দুসন্তানগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য হিন্দু কলেজ 'স্কুল' বা 'পাঠশালা' ও 'একাডেমি' বা 'মহাপাঠশালা' দুই বিভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর ও গোপীমোহন ঠাকুর কলেজের গভর্নর হন এবং গঙ্গানারায়ণ দাস, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, গোপীমোহন দেব ও হরিমোহন ঠাকুর পরিচালক নিযুক্ত হন। ৪ ডিসেম্বর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের সভায় চন্দননগরের James Isaac D'Anselme মাসিক ২০০ টাকা বেতনে হিন্দু কলেজের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জানুয়ারি গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪ সংখ্যক চিৎপুর রোডের ভাড়া বাড়িতে ২০ জন ছাত্র লইয়া হিন্দু কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরে সেখান হইতে টিরেটি বাজারের ভাড়া বাড়িতে যায়।

হিন্দু কলেজের স্কুল বা পাঠশালা বিভাগে ইংরেজী, বাংলা, ব্যাকরণ ও গণিত পড়ানো হইত। একাডেমি বা মহাপাঠশালা বিভাগে ইংরেজী, বাংলা অথবা সংস্কৃত, পারসী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, কালনিরূপণবিদ্যা, রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞান পড়ান হইত। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা কিছুকাল পরে বন্ধ হয় এবং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পারসী শিক্ষাও বন্ধ হয়। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাশ শুরু হয়, ডি. রস ('সোডা সাহেব') বিজ্ঞানের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইলেও কলেজ কয়েক বৎসরের মধ্যে আর্থিক সংকটে পড়ে। হিন্দু কলেজের জন্য সংগৃহীত ১,১৩,১৭৯ টাকা ব্যারেটো অ্যান্ড সন্স-এ রাখা হয়, ঐ টাকার উপস্বত্ব হইতে টাকা লইয়া পরিচালকেরা কলেজের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ব্যারেটো অ্যান্ড সন্স লোকসানের ফলে উঠিয়া যাওয়ায় এবং কলেজের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ায় হিন্দু কলেজের তহবিল ৬৫,০০০ টাকায় ঠেকে (১৮২৩ খ্রী)। ঐ টাকার উপস্বত্ব মাসিক ৪০০ টাকা হইতে কলেজের ব্যয় নির্বাহ অসম্ভব হওয়ায় ডেভিড হেয়ারের পরামর্শে পরিচালকগণ সরকারের নিকট আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার হিন্দু কলেজের জন্য অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করেন।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারি ৬৬ সংখ্যক বহুবাজারের ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। হিন্দু কলেজের পরিচালকগণ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ সন্নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হইলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ হিন্দু কলেজের বক্তৃতা, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতির সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে। পটলডাঙ্গা স্কোয়ার বা গোলদীঘির উত্তরাংশে হেয়ার সাহেবের দুই বিঘা জমি ৫০০ টাকা কাঠা দরে এবং তৎসংলগ্ন আরও তিন বিঘা ৭ কাঠা জমি ক্রয় করিয়া মোট ৫ বিঘা ৭ কাঠা জমির উপর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল আমহার্স্ট হিন্দু কলেজের অট্টালিকা নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর ('The Foundation Stone of this Edifice, the Hindu College of Calcutta') স্থাপন করেন। উইলিয়াম বার্ন ও ম্যাকিণ্টশ্ আড়াই বৎসরে কলেজের গৃহ নির্মাণ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে নবনির্মিত অট্টালিকার মধ্যভাগে সংস্কৃত কলেজ এবং অট্টালিকার দুই বাহুতে হিন্দু কলেজ স্থানান্তরিত হয়। পরে ছাত্রবৃদ্ধির জন্য ঐ অট্টালিকায় হিন্দু কলেজের জন্য আরও দুইটি অংশ নির্মিত হয় এবং অট্টালিকার মধ্যভাগের কিছু অংশও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হয়।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকপদে যোগদান করেন ('ডিরোজিও, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান' দ্র)। তাঁহার 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' বিতর্ক-সভা এবং 'পার্থেনন' পত্রিকা হিন্দু যুবচিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে, ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা বিকাশ লাভ করে। ডিরোজিওর ছাত্রদল বাঙলাদেশে নবযুগের সূচনা করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ড্রয়িং ক্লাশ খোলা হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে 'ল অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইকনমি' বিভাগ খোলা হয়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। ইংরেজী সাহিত্য, বিশেষ করিয়া শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অপূর্ব ব্যাখ্যায় তিনি ছাত্রগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে ৫৩৯ এবং জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টে ৩৭২ জন ছাত্র হয়। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রিন্সিপ্যাল পদ সৃষ্টি হয় (হেডমাস্টার J. Kerr প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন) এবং প্রিন্সিপ্যালের কোয়ার্টার ও ছাত্রগণের জন্য অতিরিক্ত ক্লাশরুম নির্মাণের জন্য কলেজ স্ট্রীটে জমি খরিদ করা হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে

'এক্সপেরিমেণ্টাল অ্যান্ড ন্যাচারাল ফিলজফি' বিভাগ এবং 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ খোলা হয় এবং ঐ দুই বিভাগে সর্ব শ্রেণীর ও সর্বধর্মের ছাত্রদের যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ নভেম্বর সরকার হিন্দু কলেজকে ধর্ম ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রের শিক্ষাদানের জন্য সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১ অক্টোবর সরকার কলিকাতায় একটি প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১১ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ কমিটির সর্বশেষ সভায় হিন্দু কলেজের পরিচালনাভার সরকারের হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর সরকার বিজ্ঞাপিত করেন যে, হিন্দু কলেজের নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ হইবে, সরকার ইহার সমগ্র ভার গ্রহণ করিবেন, সর্বসম্প্রদায়ের জন্য এই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্ট কলেজ হইতে পৃথক্ করা হইবে, উহা কেবলমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাসিক ছাত্রবেতন পাঁচ টাকা সরকার ধার্য করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে ৪টি বিভাগঃ জেনারেল, মেডিক্যাল, ল, ইঞ্জিনিয়ারিং খোলার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজ বন্ধ হয় এবং ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুন প্রেসিডেন্সি কলেজের কার্য শুরু হয়। হিন্দু কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্ট 'হিন্দু স্কুলে' পরিণত হয়।

বঙ্গে নবজাগরণের ইতিহাসে হিন্দু কলেজের দান অবিস্মরণীয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক, মধুসূদন দত্ত, শিবচন্দ্র দেব, দিগম্বর মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ চিরস্মরণীয়।

মদনমোহন কুমার

হিন্দুকুশ মধ্য এশিয়ার পর্বতমালা। হিমালয়ের পশ্চিমে আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত। পামীর উপত্যকা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া কাবুলের পশ্চিমে কোহ-ই-বাবা (Koh-i-Baba) পর্যন্ত ৮০০ কি. মি. দীর্ঘ। হিন্দুকুশকে কাবুল উপত্যকা ও আমুদরিয়া অববাহিকার (oxus basin) বিভাজক রেখা বলা যাইতে পারে। পামীরের দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত হিন্দুকুশের প্রথম ২০০ মাইলকে ঐ অঞ্চলে আফগানিস্তানের দক্ষিণ সীমান্ত বলা যায়। আমুদরিয়ার উপনদী অব্-ই-পঞ্জ (Ab-i-Panja)-এর উৎসের নিকট হিন্দুকুশের মধ্যবর্তী আফগানিস্তানের ভূখণ্ড মাত্র দশ মাইল। পামীর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত হিন্দুকুশের প্রথম ১০০ মাইলে সুউচ্চ শিখর নাই, অনেকগুলি পর্বতশিখরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। অব্-ই-পঞ্জ হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হিন্দুকুশের উচ্চতর শিখর দেখা যায়। ১২,৫০০ হইতে ১৭,৫০০ ফিট উচ্চে কয়েকটি গিরিবর্ত্ম আছে। কোনও কোনও শিখর ২৪,০০০ ফিটেরও বেশি উচ্চ। সর্বোচ্চ শিখর তিরাচ্ মীর (Tirach Mir) ২৫,৪০০ ফিট উচ্চ।

আমুদরিয়া ও চিত্রলের অববাহিকার মধ্যে হিন্দুকুশের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গিরিবর্ত্ম আছে। কাফিরিস্তান, বাদক্শান, কাবুল, তুর্কীস্তান, চীন ও ভারতবর্ষের সহিত যোগাযোগের পথরূপে হিন্দুকুশের বহু গিরিবর্ত্ম স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যবহৃত। হিন্দুকুশের উত্তরে মধ্য এশিয়ার বিরাট মালভূমির সহিত নানা গিরিবর্ত্মের যোগ আছে।

হিন্দুকুশের শিখরে অবস্থিত তুষারাবৃত হ্রদ গজ কুল (Gaz Kul) হইতে চিত্রল ও হুনজা (Hunza) নদী বাহির হইয়াছে। ইয়াস্কুন-চিত্রল-কুনর নদীর বারিধারা কাবুলের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছে।

চিত্রল উপত্যকার সহিত যোগাযোগকারী বরোগিল (Boroghil) গিরিবর্ত্ম (১২৪৮০ ফিট উচ্চে অবস্থিত) চৈনিক পরিব্রাজকেরা ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে গ্রীক, হূণ, মঙ্গোল প্রভৃতি জাতি হিন্দুকুশের বিভিন্ন গিরিবর্ত্ম দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যে হিন্দুকুশের নদী ও অধিবাসীর উল্লেখ আছে। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সময় কাবুল উপত্যকা ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য ও গুপ্তযুগে ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দুকুশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। অশোক ও কণিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুকুশের বিভিন্ন গিরিপথে মধ্য এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবর্ষে মোগল সম্রাটদের শাসনকালেও বর্তমান আফগানিস্তান তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে হিন্দুকুশের দক্ষিণ ও পূর্বের ভূখণ্ড আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে ভারতবর্ষের সহিত এই

সকল অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বরাবরই ছিল। হিন্দুকুশকে অখণ্ড ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রাকৃতিক সীমারেখা মনে করা হইত। ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সহিত আফগানিস্তানের সীমান্ত হিন্দুকুশের দ্বারা বিভক্ত।

হিন্দুকুশের কোনও কোনও অঞ্চলে ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আর্যশাখার দরদীয় উপশাখার কয়েকটি ভাষা—কাফির (বশ্‌গলী), প্রেসুন, খোবার (চিত্রালী), সীণা, কোহিস্তানী ইত্যাদি প্রচলিত। আধুনিক ইরাণীয় ভাষা পশ্‌তো বা পখ্‌তো (পখতুন বা পাঠানদের ভাষা) আফগানিস্তানের প্রধান ভাষারূপে হিন্দুকুশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুপ্রচলিত। আর্মেনিয়া ও ইওরোপে কথিত 'জিপসী' ভাষা একসময়ে হিন্দুকুশের বিভিন্ন অঞ্চলে রূপলাভ করে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্ত (পাঞ্জাব ও সন্নিহিত অঞ্চল) এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে কতকগুলি যাযাবর জাতি বিভিন্ন সময়ে দলবদ্ধ হইয়া হিন্দুকুশের বিভিন্ন অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়। ইহারা আর্য-ভাষার দরদীয় উপশাখার সহিত ভারতীয় উপশাখার মিশ্রণে তাহাদের নিজস্ব সংকেত ভাষা (Argot) সৃষ্টি করে। পরে ইহারা বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরাণ হইয়া আর্মেনিয়ায় যায়, কোনও কোনও দল তুরস্কে ও সিরিয়ায় যায়। ইহাদের অপর শাখা ইওরোপে হাঙ্গেরী, রাশিয়া, পোল্যান্ড ও জার্মানীতে ছড়াইয়া পড়ে, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডেও স্বল্পসংখ্যক জিপ্‌সী প্রবেশ করে। জিপ্‌সী-দের সকলের ভাষার মধ্যেই উত্তর-পশ্চিমা আর্যভাষার সহিত হিন্দুকুশের দরদীয় উপভাষার প্রভাব স্পষ্ট।

মদনমোহন কুমার

হিন্দুগণিত ইতিহাসের পরিভাষায় 'হিন্দুগণিত' বলিতে প্রাচীন ভারতীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত বা অধিগত গণিতজ্ঞানকে বুঝায়। হিন্দুধর্ম-নির্দেশিত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি এই গণিতচর্চায় বেশ কিছুটা প্রেরণা যোগাইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহার সহিত হিন্দুধর্মের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই এবং জৈন ও বৌদ্ধদেরও ইহাতে কিছু কিছু দান ছিল।

হিন্দুগণিতের ব্যাপ্তিকালকে সাধারণতঃ দুইটি যুগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—বৈদিক যুগ আর বেদোত্তর যুগ। বৈদিক যুগের সূচনা সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে, বিস্তার খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত। শেষোক্ত কাল হইতে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী পর্যন্ত বেদোত্তর যুগ। বৈদিক হিন্দুগণিতের পরিচয় খণ্ড খণ্ড ভাবে বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি নানা বৈদিক রচনার মধ্যে ছড়ানো আছে ; ঐ রচনাগুলিতে প্রসঙ্গতঃ অনেক গাণিতিক বিষয়ের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। বেদাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত 'শুল্বসূত্র' এবং 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষ' নামে পরিচিত রচনাগুলিতে সে-পরিচয় অপেক্ষাকৃত পূর্ণতর এবং সুসংবদ্ধ। বেদোত্তর হিন্দুগণিতের স্রষ্টা হিসাবে আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর, শ্রীধরাচার্য, মুঞ্জাল (বা মঞ্জুল), শ্রীপতি, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি বেশ কয়েকজন অলোকসামান্য গণিতজ্ঞের নাম ইতিহাস-পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া আছে। ইঁহাদের মধ্যে আর্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্যকে তাঁহাদের নিজ নিজ কালের পরিপ্রেক্ষিতে জগৎশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলা চলে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কয়েকজন গণিত-ঐতিহাসিক এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের দ্বারা রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের মধ্যে 'আর্যভটীয়', 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত' এবং 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' সুবিখ্যাত ; শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থের খ্যাতি বেদোত্তর যুগের শেষ ভাগে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও প্রসারিত হয় এবং সেগুলি আরবী-ফাসী ভাষায় অনূদিত হয়। বেদোত্তর যুগের অন্যান্য গুরুত্ব-পূর্ণ রচনাগুলির মধ্যে আছে ১৮টি 'সিদ্ধান্ত' গ্রন্থ। এগুলি বেদোত্তর যুগের গোড়ার দিকে রচিত হয়। ইহাদের মধ্যে 'সূর্যসিদ্ধান্ত' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈদিক হিন্দুগণিতের ৪টি শাখা—পাটীগণিত, বীজ-গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতির্বিদ্যা। বিরাট বিরাট সংখ্যার কল্পনা ও নামকরণ বৈদিক পাটীগণিতের একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক্‌। প্রাচীন গ্রীকগণিতে যেখানে 'মীরিয়াড' বা ১০,০০০ এর ঊর্ধ্বে কোনও সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় না, প্রাচীন হিন্দুগণিতে সেক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যা অপেক্ষা উত্তরোত্তর দশগুণ বৃহত্তর নিযুত, প্রযুত, অর্বুদ, ন্যর্বুদ প্রভৃতি ৮/৯টি সংখ্যার বারংবার উল্লেখ ও ব্যবহার পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র সংখ্যা বা ভগ্নাংশের ক্ষেত্রেও হিন্দু মনীষা যথেষ্ট সুক্ষ্মতার পরিচয় রাখিয়াছে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং বর্গমূল নির্ণয়ের অনেক নিদর্শন আছে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে। বীজগণিতের ক্ষেত্রে, আধুনিক পরিভাষায় যাহাদের সমান্তর প্রগতি ('এরিথমেটিক্যাল প্রগ্রেশান') ও গুণোত্তর প্রগতি ('জিওমেট্রিক্যাল প্রগ্রেশন') বলা হয় তাহাদের বহু ব্যবহার আছে বৈদিক হিন্দু গণিতে। সেখানে সমীকরণ ও সহ-সমীকরণ সমাধানেরও অনেক আলোচনা ও দৃষ্টান্ত আছে। জ্যামিতিক প্রশ্নের বীজগাণিতিক সমাধান করিতে কোথাও কোথাও এক ও দুই মাত্রা ('ডিগ্রি')-র অনির্ণেয় ('ইনডিটারমিনেট') সমীকরণ সমাধানের

আলোচনাও করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের এক জায়গায় 'বিকল্প' অর্থাৎ সমবায়-বিন্যাস ('কম্বিনেশন অ্যান্ড পারমিউটেশন') তত্ত্বেরও যৎসামান্য আলোচনা আছে। বৈদিক হিন্দু জ্যামিতি আলোচিত হইয়াছে প্রধানতঃ বৌধায়ন, আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন-রচিত তিনটি শুল্ব গ্রন্থে, যজ্ঞের বেদীনির্মাণ-সংক্রান্ত নির্দেশ প্রসঙ্গে। গ্রীক জ্যামিতির মত সুন্দর, সুসংবন্ধভাবে বিন্যস্ত না হইলেও এখানে গভীর জ্যামিতিক সত্যোপলব্ধির অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন আছে। যেমন, 'পৈতৃকী বেদী'-র আলোচনা প্রসঙ্গে এমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে যে, 'পিথাগোরাস'-এর নামের সহিত যুক্ত উপপাদ্যটি সম্বন্ধে হিন্দু শুল্বকারদের জ্ঞান সহজেই অনুমিত হয়। বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যার উদ্দেশ্য ছিল ঋতু-নির্ধারণ, কাল-নির্ণয় এবং শুভাশুভ ক্ষণ-নির্ণয়। ঋতু ছিল ছয়টি, মাস বারটি। সৌর এবং চান্দ্র উভয় মাসেরই প্রচলন ছিল এবং উহাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য আছে তাহা দূর করিতে মাঝে মাঝে বৎসরে একটি অতিরিক্ত চান্দ্র মাস সংযোজনা করা হইত। বৎসরে দিন-সংখ্যা ছিল বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ৩৬০, শেষদিকে ৩৬৬। আকাশের পটভূমিতে সূর্য ও চন্দ্রের গতিপথ নির্ধারণে যথাক্রমে ১২টি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্রের পরিকল্পনা করা হয়। চন্দ্র-সূর্য ছাড়া, রাশিচক্রের নিকটবর্তী তারকাগুলি এবং বুধ, শুক্র প্রভৃতি ৫টি দৃশ্য গ্রহ ছিল বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়বস্তু।

বেদোত্তর গণিত বৈদিক গণিত অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত—কালপ্রবাহে ক্রমোন্নতির হিসাবে যতটা অবশ্যম্ভাবী বা স্বাভাবিক তাহার চাইতেও অনেক বেশি পরিমাণে। হিন্দু গণিতের তুলনাবিহীন, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দান শূন্য আবিষ্কার। সংখ্যা লিখনের দশমিক স্থানীয় মান অঙ্কপাতন পদ্ধতিও বেদোত্তর যুগেই আবিষ্কৃত হয়। এই দুই কীর্তি সর্বকালের সর্বদেশের শ্রেষ্ঠ গাণিতিক চিন্তা বা কৌশলগুলির অনতম বলিয়া সর্বজনস্বীকৃত। এই আবিষ্ক্রিয়ার পর যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার যে রীতি বা কৌশল বেদোত্তর পাটীগণিতে প্রচলিত হয় বর্তমানকালের সহিত তাহার কোনও পার্থক্য নাই। বর্তমানকালের ত্রৈরাশিকের নিয়ম, ল. সা. গু.-গ. সা. গু. নির্ণয়পদ্ধতি প্রভৃতিও বেদোত্তর পাটীগণিতের অনুরূপ। সুদ, বিনিময়, মিশ্রণ, অংশীদারী প্রভৃতি বিভিন্ন পাটীগাণিতিক সমস্যা লইয়াও বেদোত্তর যুগের হিন্দুরা যথেষ্ট আলোচনা করেন। পাটীগণিত অপেক্ষা বেদোত্তর ভারতীয় মনীষার অধিকতর গৌরবজনক বিকাশ হইয়াছিল বীজগণিতের ক্ষেত্রে। এক ও বহু মাত্রার সমীকরণ, সহ-সমীকরণ এবং অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের যে বিশদ, সূক্ষ্ম, উচ্চাঙ্গের আলোচনা ও দৃষ্টান্ত বেদোত্তর বীজগণিতে পাওয়া যায় বিশ্বের অপর কোনও প্রাচীন জাতির বীজগণিতে তাহার কোনও তুলনা নাই। দুই মাত্রার সমীকরণ সমাধানের যে সাধারণ পদ্ধতি শ্রীধরাচার্য নির্দেশ করেন, 'শ্রীধরাচার্যের পদ্ধতি' হিসাবে তাহা আজও বিখ্যাত হইয়া আছে। ঐরূপ সমীকরণের দুইটি সমাধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বেদোত্তর বীজগণিতকারদের যেরূপ সম্যক্ সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পাটীগণিত ও বীজগণিতের তুলনায় জ্যামিতির ক্ষেত্রে বেদোত্তর গণিত কিছুটা অনগ্রসর ছিল। এই জ্যামিতির প্রধান দান ক্ষেত্রফল, ঘনফল, ইত্যাদি নির্ণয়ের কয়েকটি সূত্র ('ফরমুলা') এবং কয়েকটি উপপাদ্য, যাহাদের মধ্যে বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ সংক্রান্ত 'ব্রহ্মগুপ্তের উপপাদ্য' সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। আর্যভট, মহাবীর এবং ভাস্করাচার্যের π ('পাই') সংখ্যাটির মাননির্ণয়ের একাধিক পদ্ধতি এই জ্যামিতির অপর এক উল্লেখযোগ্য দিক্। বিশুদ্ধ জ্যামিতি অপেক্ষা ত্রিকোণমিতিতে বেদোত্তর হিন্দুদের দান বেশি প্রশংসাযোগ্য। এই গণিতশাখাটির অনেকগুলির মূল ধারণা ও সূত্রের প্রথম উদ্ভাবক হিন্দুরা। দৃষ্টান্ত হিসাবে, বেদোত্তর হিন্দুদের 'জ্যা' ও কোটি-জ্যা' বা সংক্ষেপে 'কো-জ্যা' এবং আধুনিক কালের যথাক্রমে 'সাইন' ও 'কোসাইন' পরস্পরের খুব নিকটবর্তী, প্রায় তুল্যমূল্য; একথা কিন্তু গ্রীক ত্রিকোণমিতির অনুরূপ বা তুলনীয় রাশিগুলি সম্পর্কে বলা চলে না। আধুনিক ত্রিকোণমিতি এবং গোলক ('স্ফেরিক্যাল') ত্রিকোণমিতির বেশ কিছু সূত্রই বেদোত্তর হিন্দুদের জানা ছিল। গণিত শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে যাহা বেদোত্তর হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ লাভ করে তাহা জ্যোতির্বিদ্যা। প্রায় সকল গণিতকারই ঐ শাখায় কিছু না কিছু চর্চা এবং সংযোজনা করেন। ঐ যুগের প্রধান প্রধান আবিষ্ক্রিয়াগুলির মধ্যে আছে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, আহ্নিক লম্বন ('ডায়ারন্যাল প্যারালাক্স'), কাল-শোধন ('করেকশন ফর ইকোয়েশান অভ্ টাইম'), অয়নচলন ('প্রিসেশন অভ্ ইকুইনক্সেস') ইত্যাদি। তাহা ছাড়া গ্রহণ, গ্রহগতি প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান জ্যোতিষিক ঘটনা সম্পর্কেই কিছু না কিছু আলোচনা আছে। বেদোত্তর জ্যোতির্বিদ্যায় নির্ণীত ও ব্যবহৃত কতকগুলি রাশির মান বিশেষ প্রশংসনীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, ব্রহ্মগুপ্ত-ব্যবহৃত চন্দ্রের সর্বাধিক লম্বনের পরিমাণ ছিল ৫৩ মিনিট, যাহার আধুনিক গৃহীত মান প্রায় ৫৭ মিনিট। বেদোত্তর হিন্দুরা ৩৬৫.২৫৮ দিনকে বৎসর বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রধানতঃ ভাস্করাচার্যের এবং কতকাংশে মুঞ্জালের রচনা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাতে অন্তরকলন ও সমাকলন ('ডিফারেন্সিয়াল অ্যান্ড ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাস')-এর ধারণা ও কৌশলের

আভাস রহিয়াছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোনও কোনও গণিত-ঐতিহাসিক এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

রমাতোষ সরকার

হিন্দুবিবাহ বিবাহ ও বিবাহ আইন ভারতে দ্র

হিন্দু মহাসভা ভারতবর্ষে হিন্দুসভা তথা হিন্দুমহাসভার প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলন প্রায় শতবর্ষ পূর্বে সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক কারণেই ইহার উদ্ভব হইয়াছিল (১৮৭০ খ্রী)। 'সনাতনধর্মরক্ষিণী সভা' নামক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রচেষ্টা হইতেই ক্রমশঃ হিন্দুসভার উৎপত্তি হয়। ইহার পূর্বে সামাজিক সংস্কারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ এবং আর্যসমাজের উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান না ঘটায় সনাতনী, ব্রাহ্মসমাজী ও আর্যসমাজীদের মিলিত প্রয়াসে যে নূতন প্রতিষ্ঠানের কল্পনা রূপ পরিগ্রহ করে তাহাই হিন্দুসভা নামে পরিচিত। পরে ইহাতে বৌদ্ধ, শিখ, জৈন এবং পার্শীরাও যোগদান করায় ইহা ভারতীয় জাতীয় মহাসভায় পরিণত হয়।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নবীনচন্দ্র রায় ও রায় বাহাদুর চন্দ্রনাথ মিত্র ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে প্রথম হিন্দুসভা স্থাপন করেন। স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার সভাপতি ও নবীনচন্দ্র রায় সম্পাদক হন। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বহু হিন্দুসভা গঠিত হয়, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগাযোগ না থাকায় আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচীও নানা প্রকার বৈপরীত্যের মধ্য দিয়া চলে। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে এক বৃহৎ সম্মেলনে ইহা একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তখন ইহার নাম হিন্দুসভার পরিবর্তে হিন্দুমহাসভা রাখা হয়। পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, স্যর সাদিলাল, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, লালা হংসরাজ প্রভৃতি ইহার পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অখিল ভারতীয় হিন্দু-মহাসভার সম্মেলন এবং বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে নিয়মিতভাবে হিন্দুমহাসভার বার্ষিক অধিবেশন ও কার্যকরী সমিতির নির্বাচন হইয়া আসিতেছে। এই সময় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ, ডাঃ বি. সি. মুঞ্জে প্রভৃতি নেতৃবর্গ ইহার পরিচালনা করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সভাপতি এবং পীযূষকান্তি ঘোষকে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া বঙ্গদেশে প্রথম হিন্দুসভা স্থাপিত হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গীয় হিন্দুসভার বি. সি. চ্যাটার্জি এবং অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বিপ্লবী বীর সাভারকার ('সাভারকার, বিনায়ক দামোদর' দ্র) হিন্দু মহাসভার সভাপতি নিযুক্ত হইবার পর ইহার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মহাসভার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অধিবেশনের প্রাক্কালে কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখার্জি, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, এন. সি. চ্যাটার্জি, এন. কে. বাসু প্রভৃতি মহাসভায় যোগদান করেন। বস্তুতঃ এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মহাসভার রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও মর্যাদা প্রভৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বীর সাভারকারের 'Hinduize Politics and Militarize Hindudom' এই বাণী ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেককে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে ও নানা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিন্দুমহাসভার বিশিষ্ট সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর হিন্দুমহাসভার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ইহা গৃহীত হইলেও বাংলার তরুণ কর্মীদের সহায়তায় ঐ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয় ; ফলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাসভা ত্যাগ করেন।

মনুজচন্দ্র সর্বাধিকারী

হিন্দুমেলা নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৭৩ বঙ্গাব্দ) কলিকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বৎসরে একবার করিয়া অনুষ্ঠিত হইত, এবং ক্রমান্বয়ে চৌদ্দ বৎসর চলিয়াছিল। মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন। স্বদেশীয় বিদ্যানুশীলনে উৎসাহ দান, শিল্পকর্মে আনুকূল্য এবং শরীরচর্চার আয়োজন দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত বিভিন্ন মণ্ডলীর উপর এই কার্যের ভার অর্পিত হয়।

হিন্দুমেলার আনুকূল্যে নবগোপাল মিত্র ন্যাশনাল স্কুল, ন্যাশনাল সোসাইটি ও ন্যাশনাল জিম্নেসিয়ম স্থাপন করেন। ন্যাশনাল থিয়েটার-স্থাপনেও হিন্দুমেলার প্রেরণা ছিল। পূর্বে স্থাপিত ন্যাশনাল পেপার ইহার মুখপত্র হয়।

মেলার প্রধান অঙ্গ ছিল স্বদেশীয় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসমূহ প্রদর্শন, বক্তৃতা, সংগীত, আবৃত্তি, কবিতা ও প্রবন্ধপাঠ এবং শরীর চর্চার আয়োজন। কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীরা যোগ্যতানুসারে পুরস্কৃত হইতেন। এই মেলা একদা ভারতবাসীর প্রাণে অভূতপূর্ব

উন্মাদনা আনিয়াছিল। ইহাকে 'জাতীয় মেলা' আখ্যা দেওয়া হয়।

যোগেশচন্দ্র বাগল

হিন্দু সম্পত্তি উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকার দ্র

হিন্দু স্টুয়ার্ট, চার্লস স্টুয়ার্ট (১৭৫৮-১৮২৮ খ্রী) ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে যে দুই একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী ভারতবর্ষীয় প্রজাদের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিয়া ব্যক্তিগত জীবনে কিছু কিছু আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মেজর জেনারেল চার্লস স্টুয়ার্ট অন্যতম। এদেশে বসবাস করিবার সময় তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন এবং কিছু কিছু পৌত্তলিক আচার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে উড্ স্ট্রীট ও থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে তাঁহার বাড়ি ছিল এবং কথিত আছে, তিনি সেই বাড়ি হইতে প্রত্যহ পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। তিনি বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং একবার ইংলন্ডে এই সব মূর্তিগুলি তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া শালগ্রাম শিলার পূজা করিয়া যাইতেন বলিয়া শোনা যায়। এই সব কারণে কলিকাতার ইংরেজ মহলে তিনি 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' নামে পরিচিত ছিলেন। পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার সুন্দর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত সমাধিটি হিন্দু মন্দিরের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

হিপার্কাস (সমৃদ্ধিকালঃ খ্রী. পূ. ১৪৬-১২৭) প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। কথিত আছে তিনি কয়েকটি জ্যোতিষসংক্রান্ত যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং এইগুলির সাহায্যেই জ্যোতিষ্কদের গতি-বিধি লক্ষ্য করেন। তবে এই সমস্ত যন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য জানা নাই। তিনি প্রথম তাঁহার কল্পিত বৃত্তকে ৩৬০ ডিগ্রীতে বিভক্ত করেন। তিনি নিরক্ষ-বৃত্তের সূর্যকক্ষ ও চন্দ্রকক্ষের অবনতিও নির্ধারণ করেন।

তিনিই সর্বপ্রথম সায়নবর্ষ (ট্রপিক্যাল ইয়ার) এবং নাক্ষত্রবর্ষ (সাইডিরিয়্যাল ইয়ার) এই দুইরকম বৎসরের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, প্রথমোক্ত বর্ষের পরিমাণ শেষোক্ত বর্ষ অপেক্ষা সামান্য (প্রায় ২০ মিনিট) কম। ইহার অর্থ এই যে, আকাশে নক্ষত্র স্থির, কিন্তু সে তুলনায় বিষুব বিন্দু (ইকুইনক্সেজ) স্থির নয়; ইহারা ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে সরিয়া যায়। বিষুব বিন্দুর এই অয়নচলন (প্রিসেশন অভ্ দি ইকুউনক্সেজ) তাঁহারই আবিষ্কার। হিপার্কাসই সর্ব-প্রথম নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করেন; এই তালিকায় প্রায় ৮৫০টি নক্ষত্র স্থান পায়। তিনিই ত্রিকোণমিতির প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। টলেমির ('টলেমি' দ্র) উপর হিপার্কাসের আবিষ্কারসমূহের গভীর প্রভাব পড়িয়াছিল।

মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

হিব্রু সেমীয়-হামীয় দ্র

হিমবাহ অতি শীতপ্রধান মেরু অঞ্চলে অথবা উচ্চ পার্বত্যভূমিতে, যেখানে উত্তাপ সর্বদাই হিমাঙ্কের নিম্নে থাকে, সেখানে সহজেই তুষার সঞ্চিত হয়; অতঃপর উপরের তুষারের চাপে নিম্নস্থ তুষাররাশি বরফে পরিণত হইয়া অতি ধীরে ধীরে ঢাল বাহিয়া নিম্নে বাহিত হয়; ইহাই হিমপ্রবাহ বা হিমবাহ। হিমরেখা অতিক্রম করিয়া হিমবাহ কিছুদূর অগ্রসর হয় এবং শেষ পর্যন্ত উহার অগ্রভাগ গলিয়া যায়। উপরিভাগের তুষারক্ষেত্রে ক্রমাগত তুষারপাত হইতে থাকিলে সম্মুখভাগ গলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও হিমপ্রবাহ অব্যাহত থাকে বলিয়া হিমপ্রবাহের দৈর্ঘ্য হ্রাস পায় না। তুষারপাত বেশি হইলে বা তাপ অত্যন্ত হ্রাস পাইলে হিমপ্রবাহ আরও বেশি আগাইয়া আসে; ইহার বিপরীত অবস্থায় হিমবাহের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। মেরু অঞ্চলে বা কোনও বিস্তৃত ভূমির উপর হিমবাহ চতুর্দিকে বিস্তারিত থাকিলে তাহাকে মহাদেশীয় হিমবাহ বলে। গ্রীনল্যান্ড ও এন্টার্কটিকায় যে হিমসঞ্চয় দেখা যায় তাহা স্থানে স্থানে প্রায় ৩৫০০ মিটার গভীর। ইহার উপর ক্রমাগত তুষারপাত হইলে চাপ বৃদ্ধির ফলে নিম্নস্থ বরফ সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অনেক সময় অতি বৃহৎ বরফ-খণ্ড ভাঙিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়া যায়; ইহার নাম হিমশৈল। পর্বত্যভূমির উপর হিমবাহ সাধারণতঃ উপত্যকা অনুসরণ করে; এইগুলি পার্বত্য বা উপত্যকা-বাহিত হিমবাহ। পার্বত্য হিমবাহগুলির দৈর্ঘ্য, স্থান-বিশেষে অল্প বা অধিক হইতে দেখা যায়; আল্প্স্ পর্বতের এলেট্স্ হিমবাহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭ কিলো-মিটার, কারাকোরম পর্বতের বিয়াফো হিমবাহের দৈর্ঘ্য ৬০ কিলোমিটার। হিমালয়ের রিমো হিমবাহ ৪০ কিলোমিটার এবং গঙ্গোত্রী ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ। হিমবাহের উপরিভাগে দীর্ঘাকৃতি ফাটল থাকে। প্রবাহের সময় উপত্যকার নিম্ন ও পার্শ্বদেশের সহিত ঘর্ষণে ইহার গতি কিঞ্চিৎ ব্যাহত হইলে হিমবাহের উপরের অংশে টান পড়ে এবং এইরূপ ফাটলের সৃষ্টি

হয়। পর্বতারোহীদিগকে হিমবাহের উপর দিয়া অগ্রসর হইবার সময় অতি সাবধানতার সহিত ঐ সকল ফাটল অতিক্রম করিতে হয়। হিমবাহ পার্বত্যভূমির ক্ষয়সাধন করিয়া তীক্ষ্ন শৃঙ্গ ও গভীর খাদ সৃষ্টি করে। হিমবাহ উচ্চভূমি হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তরখণ্ড ও আবর্জনা অপসারণ করিয়া সম্মুখভাগের অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির উপর তাহা স্তূপাকারে সঞ্চিত করে। পরে ঐগুলি জলস্রোতের সাহায্যে ধীরে ধীরে সম্মুখবর্তী নিম্নভূমির উপর ছড়াইয়া পড়ে।

অরুণকুমার মিত্র

হিমাংশুকুমার দত্ত (১৯০৮-১৯৪৪ খ্রী) কাব্য-সংগীতের প্রতিভাবান্ সুরকার। কুমিল্লায় জন্ম। বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ধারায় সুর রচনার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুর-সংযোজনায় মিড় ও বিস্তারের মনোহারী প্রয়োগে এবং সূক্ষ্ম কারুকৃতিতে তাঁহার হৃদয়ের আবেগ, মাধুর্য ও কমনীয় অনুভূতি প্রকাশ পাইত। তাঁহার সুররচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন-রূপে 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে', 'বনের চামেলি ফিরে আয়', 'আজি আমারি কথা', 'প্রেমের সমাধি তীরে' প্রভৃতি স্মরণীয়। তিনি ১০।১১ বৎসর বয়স হইতেই কুমিল্লার সভাদিতে গান গাহিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলেজ জীবন হইতে কলিকাতাবাসী হন এবং ক্রমে কণ্ঠসংগীতের পরিবর্তে সুর রচনায় একান্ত নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। বহুসংখ্যক্ গানের সুরকাররূপে তিনি সংগীতজগতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। ঢাকার সারস্বত সমাজ তাঁহাকে অতি তরুণ বয়সে 'সুরসাগর' উপাধি দেন।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

হিমাচল প্রদেশ হিমাচল প্রদেশ রাজ্যটি ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ৩০°৮′ উত্তর হইতে ৩৩°৩′ উত্তর এবং ৭৫°৮′ পূর্ব হইতে ৭৯° পূর্ব অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ২৮৫০০ বর্গকিলোমিটার। রাজ্যটি ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। বহিহিমালয়, মধ্যহিমালয় ও বৃহৎ হিমালয়। প্রদেশের উচ্চতা সর্বনিম্ন ১৫০০′ এবং সর্বোচ্চ ২২০০০′। বহিহিমালয় অংশে বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ ৬০″-৭০″ এবং মধ্যহিমালয় অংশে ৩০″-৪০″ ; বৃহৎ হিমালয় বৎসরের পাঁচ-ছয় মাস বরফে আবৃত থাকে। উত্তাপ গ্রীষ্মে ৭০° ফা., শীতে ৪০° ফা.। বিপাশা, শতদ্রু, ইরাবতী প্রভৃতি প্রধান নদী। পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চল হইতে ২১টি দেশীয় রাজ্য লইয়া ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ এপ্রিল তারিখে হিমাচল প্রদেশ গঠন করা হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই বিলাসপুর রাজ্যটিকে এই নূতন প্রদেশের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যে প্রথম দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা গঠিত হয়। ধান, ভুট্টা, বার্লি ছাড়া রাজ্যে ছোলা, লংকা, আদা, ডাল, গম, আলু, সরিষা, রেড়ি, তিল, তিসি, কার্পাস, চা ও তামাক উৎপন্ন হয়। রাজ্যটি খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ নহে। উত্তোলিত খনিজ-দ্রব্যগুলির মধ্যে লবণই প্রধান। ইহা ছাড়া শ্লেটপাথর, চুনাপাথর ও বেরাইট পাওয়া যায়। অ্যালাম ও আকরিক লৌহও আছে। রাজ্যের বিভিন্ন অংশের তৈল, বাঁশের কাজ, কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য, খেলনা এবং মৃৎশিল্প বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সংরক্ষিত বনভূমিতে হরিণ ও বন-মোরগ আছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে রাজস্থানের কিছু সংখ্যক ক্ষত্রিয় রাজপুত হিমালয়ের গভীর অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। বর্তমানে আদিম অধিবাসীরা এইসব রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

এখানকার গ্রামে দুইটি শ্রেণী দেখা যায়—উচ্চবংশের ক্ষত্রিয় এবং হরিজন কোলী সম্প্রদায়। আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থায় নারীদের জীবন অত্যন্ত কণ্টকর। বহু-বিবাহ বর্তমান। এক পরিবারের একটি নারী সকল ভ্রাতার যৌথ স্ত্রী হিসাবে পরিগণিত হয়। সকল কায়িক পরিশ্রম ও কৃষির অধিকাংশ কার্যই স্ত্রীলোকেরা করে। পুরুষেরা আলস্যে দিন অতিবাহিত করে। সমাজে মদ্য-পান ব্যাপক হারে চলে। রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ১৩৫১১৪৪ (১৯৬১ খ্রী) ; তন্মধ্যে ৭০২৬৯৭ পুরুষ ও ৬৪৮৪৪৭ স্ত্রীলোক। হিমাচল প্রদেশটি পার্বত্য হওয়ায় যোগাযোগ-ব্যবস্থা সুবিধাজনক নহে। এই রাজ্যের রাজধানী সিমলা (৩১°৬′ উত্তর, ৭৭°১৩′ পূর্ব) ৭২০০′ উচ্চে অবস্থিত, বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান এবং গ্রীষ্মকালে অতি রমণীয়। ড্যালহৌসী (৩২°৩২′ উত্তর ৭৫°৫৮′ পূর্ব) হিমাচল প্রদেশের চম্বা জেলার ধওলাধর পর্বতে অবস্থিত শৈলাবাস। একটি সেনানিবাস আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। এই রাজ্যে আরও অনেক মনোরম স্থান আছে, সেগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্যে খুবই সুন্দর।

বিলাসপুর তহসিলে বসন্তপঞ্চমীর মেলা হয়। ইহা ছাড়াও এখানে বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে নানা মেলা হইয়া থাকে।

সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতমালা, ভারত ও পাকিস্তান জুড়িয়া উত্তর সীমানায় বিন্যস্ত। ইহা দৈর্ঘ্যে ২৪০০ কি. মি. এবং প্রস্থে প্রায় ২৪০ কি. মি.। উত্তরতম অংশটি হইল মূল হিমালয় (দি গ্রেট হিমা-

লয়াস্)। ইহার অনেকগুলি শৃঙ্গের উচ্চতা বিশ হাজার ফুটেরও অধিক এবং হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গগুলি এখানেই অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে নাঙ্গাপর্বত, কেদারনাথ, বদরিনাথ, নন্দাদেবী, কৈলাস, ধবলগিরি, গৌরীশঙ্কর, এভারেস্ট (উচ্চতা ন্যূনাধিক ২৯১৪১ ফিট), কাঞ্চনজঙ্ঘা (উচ্চতা ন্যূনাধিক ২৮১৪৬ ফিট)। এভারেস্ট পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ। মূল হিমালয় পর্বতমালার বিস্তার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হইতে পঁচানব্বই মাইল। মূল হিমালয়ের দক্ষিণে মধ্য হিমালয় (দি লেসার হিমালয়াস্); এখানে পার্বত্য অঞ্চল বেশ জটিল এবং উচ্চতা ১২০০০ হইতে ১৫০০০ ফিট। মধ্যহিমালয় ও সমতলের মাঝখানে বহির্হিমালয়, এখানে শিবালিক পর্বতমালা অবস্থিত। এখানকার উচ্চতা ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট।

ভূতত্ত্ব অনুসারে হিমালয়কে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। উত্তরে তিব্বতীয় অঞ্চল। সেখানে প্যালিওজোইক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মেসোজোইক যুগ পর্যন্ত সঞ্চিত পাললিক শিলা (সেডিমেণ্টারি রক) স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া আছে। ইহার দক্ষিণে হিমালয় অঞ্চল। এই অঞ্চল মূল ও মধ্যহিমালয় জুড়িয়া আছে। এই অঞ্চলে আছে—অতি প্রাচীন পরিবর্তিত শিলার (মেটামরফিক রক) উপরে প্রাচীন পাললিক শিলা। ইহার দক্ষিণে শিবালিক পর্বতমালাতে টার্শিয়ারি যুগের পাললিক শিলাস্তর আছে। ভূতাত্ত্বিক সময়ের হিসাবে এই শিলাস্তরগুলি খুবই নবীন। হিমালয় ও শিবালিক অঞ্চলের শিলাস্তরগুলির মাঝখানে একটি একটানা চ্যুতি (ফল্ট) আছে। যে শিলাসমষ্টিদ্বারা মূল ও মধ্যহিমালয় পর্বতমালা সংগঠিত হইয়াছে, তাহাদের গঠন ও প্রকৃতি একটি বিলুপ্ত সমুদ্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। সমুদ্রটি পঞ্চাশ কোটি বৎসরেরও অধিক পুরাতন। এই বিলুপ্ত সমুদ্রকে ভূবিজ্ঞানীরা 'টেথিস্' আখ্যা দিয়াছেন। টেথিস্ সমুদ্রে সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ পলির স্তরগুলি কিছুটা দুই পাশের চাপে এবং ততোধিক পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের সহিত সমস্থিতির (Isostary) প্রবণতার দরুণ উত্তুঙ্গ হইয়াছিল। এই সমুদ্রের খাতে জমা বিপুল আয়তন পলির রাশি পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের সহিত সমন্বয়ের (Adjustment) জন্য ঊর্ধ্বগামী হইয়াছিল। হিমালয়ের গগনস্পর্শী অভ্যুত্থানের পাশেই অতলনিহিত অবনতি দেখা দিয়াছিল এবং সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা অঞ্চল জুড়িয়া গভীর খাতের সৃষ্টি হইয়াছিল। সমুদ্রের গর্ভ হইতে হিমালয়ের উত্থানের সূত্রপাত হয় প্রায় ছয় কোটি বৎসর পূর্বে 'ইওসিন' যুগে। এই উত্থানের ফলে মূল হিমালয়ের অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্তী উত্থানের পর্ব আসিল প্রায় দুই কোটি বৎসর পূর্বে 'মায়োসিন' যুগে এবং প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ বৎসর পূর্বে 'প্লায়োসিন' যুগ পর্যন্ত চলিল এই উত্থানপর্ব। প্লায়োসিন যুগের মধ্যে মূল ও মধ্যহিমালয়ের উত্থানপর্ব সম্পূর্ণ হয়। সর্বশেষে শিবালিক পর্বতমালার অভ্যুদয়। টেথিস্-সমুদ্রে লীন নদীগুলির জলে জমা পলি হইতে শিবালিকের সৃষ্টি। প্রায় এক কোটি বৎসর পূর্বে শিবালিকের উত্থানের সূচনা এবং প্রায় দশ লক্ষ বৎসর পূর্বে শিবালিক পর্বতমালা বর্তমান আকার গ্রহণ করে। হিমালয়ের তুষারক্ষেত্রের মধ্যে অসংখ্য হিমবাহ রহিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ লম্বায় ২/৩ মাইলের বেশি নয়, কিন্তু কয়েকটি বিপুল আকারে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উপরে বিরাজ করিতেছে। হিমবাহের প্রবাহ হিমালয় পর্বতের উপরে অনেকগুলি ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। জলে ভরিয়া তাহারা হ্রদে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই হ্রদগুলির মধ্যে মানস সরোবর, নৈনিতাল, ভীমতাল প্রভৃতি এবং কাশ্মীরের ডাল হ্রদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু, ভাগীরথী, অলকানন্দা, যমুনা, গণ্ডক, কোশী, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি অনেক নদনদী হিমগিরি ছাড়িয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই নদীগুলির উৎপত্তি হিমালয় পর্বতমালার উত্থানের পূর্বেই ঘটিয়াছিল।

হিমালয় পশ্চিমে পাকিস্তানের পশ্চিম প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া পূর্বে আসাম পর্যন্ত একটানা ভূভাগের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলেই হিমালয়ের বনরাজির মধ্যে উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ এবং শীতপ্রধান অঞ্চলের গাছপালা সবই আছে। হিমালয়ের ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত খনিজের খবর মিলিয়াছে ঃ ১. কয়লা, ২. তামা, ৩. গ্র্যাফাইট, ৪. অ্যান্টিমনি, ৫. লবণ, ৬. সীসা ও দস্তা, ৭. রুপা এবং ৮. কয়েকটি তেজস্ক্রিয় খনিজ।

সঙ্কর্ষণ রায়

হিমু শূরবংশীয় শেষ সুলতান আদিল শাহের প্রধান মন্ত্রী হিমু মেওয়াট অঞ্চলের এক দরিদ্র (বেনিয়া) পরিবারের সন্তান। অসাধারণ রাজনৈতিক ও সামরিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি আদিল শাহের রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া ওঠেন। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুর সুযোগে হিমু আগ্রা ও দিল্লী দখল করিয়া বিক্রমজিৎ বা বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি আহত, পরাজিত ও নিহত হন ('পাণিপথ' দ্র)।

কুমুদরঞ্জন দাস

হিমোগ্লোবিন রক্তের অসংখ্য লোহিত কণিকার মধ্যে গাঢ় লাল রঙের বর্ণদ্রব্য হিমোগ্লোবিন থাকাতেই রক্তের ঐ রকম রঙ। ইহার মধ্যে আছে লোহাঘটিত 'হিম'-সহ

হিস্টোন-জাতীয় একটি সরল প্রোটিন 'গ্লোবিন'। প্রায় তিনমাস স্বাভাবিক আয়ুষ্কালশেষে যকৃত, প্লীহা, প্রভৃতির মধ্যে লোহিত কণিকার ধ্বংসের পর হিম-অংশের লোহা মুক্ত হইয়া আবার প্রয়োজনমত হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির জন্য ঐ সকল স্থানে সঞ্চিত হইয়া থাকে এবং অপর অংশ পিত্তের বর্ণদ্রব্য বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিনে রূপান্তরিত হয়। ঐগুলি আবার পিত্তরসের সঙ্গে প্রথমে ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং পরে বৃহদন্ত্রে যায় এবং শেষোক্ত স্থানে জীবাণু-ক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হয়—মলের বর্ণদ্রব্য স্টের্কোবিলিন এবং মূত্রের বর্ণদ্রব্য ইউরোবিলিনোজেন ও ইউরোক্রোমে। জন্মের পর হইতে সারাজীবন ধরিয়া সব কয়টি চ্যাপ্টা হাড়ে এবং লম্বা হাড়গুলির প্রান্তস্থিত ফোঁপরা অংশে বর্তমান লোহিত মজ্জার মধ্যে বর্ণহীন নিউক্লিয়াস-যুক্ত শিশু লোহিত কণিকাগুলি তৈয়ারি হইতে থাকে। এদিকে যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতিতে সঞ্চিত লোহা ও যৎসামান্য তামা, নিকেল প্রভৃতির সাহায্যে এবং থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের হর্মোন থাইরোক্সিন, খাদ্যের ভিটামিন C, B12, ফোলিক অ্যাসিড প্রভৃতির প্রভাবে হিমোগ্লোবিন পুনঃ প্রস্তুত হয়। অতঃপর ইহা শিশু লোহিত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং এইভাবে নিউক্লিয়াসহীন হিমোগ্লোবিনযুক্ত পূর্ণ বিকশিত লোহিত কণিকা রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়। হিমোগ্লোবিনই ফুসফুস হইতে দেহের সর্বত্র সেলগুলিতে শিথিল যৌগিকরূপে অক্সিজেনকে লইয়া যায় এবং একইভাবে সেগুলি হইতে কার্বন-ডাইঅক্সাইডকে বহিষ্কারের জন্য ফুসফুসে লইয়া আসে।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

হিরণ্ময় রায়চৌধুরী (১৮৮৪-১৯৬২ খ্রী) খ্যাতনামা ভাস্কর ও শিল্পশিক্ষক। জন্ম ঃ যশোহর জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামে। পিতা কৃষ্ণভূষণ। হিরণ্ময়ের মাতা কাত্যায়নী দেবীর একমাত্র ভগিনী দাক্ষায়ণী দেবীর (স্বামী বেণীমাধব রায়চৌধুরী) কন্যা ভবতারিণী বা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সম্পর্কে হিরণ্ময় বিশ্বকবির শ্যালক। আত্মীয় মহারাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর নিজ পৌত্র রাজা প্রফুল্লনাথের সঙ্গে হিরণ্ময়ের সর্বকনিষ্ঠা ভগিনী অমিয়বালা দেবীর বিবাহ দেন।

কলিকাতার 'হিন্দু স্কুল' হইতে হিরণ্ময় 'এন্ট্রান্স' পাস করেন। হ্যাভেল সাহেব যখন কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ তিনি তখন সেখানে ছাত্র হন এবং পরে অবনীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেন। নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার তাঁহার সমসাময়িক ছাত্র। বিলাতের রয়্যাল কলেজে ভাস্কর্য শিক্ষা করেন এবং সেখানে অ্যাডভেন্ট অভ্ স্প্রিং (ব্রন্জ্) মূর্তির জন্য প্রথম পুরস্কার পান। শিক্ষান্তে রয়্যাল কলেজের 'অ্যাসোসিয়েট' অর্থাৎ এ. আর. সি. এ. হন এবং স্নাতকোত্তর কালে লন্ডনের 'অ্যালবিয়ন ওয়ার্কসে' (ফুলহ্যাম) ভাস্কর্য শিক্ষা করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং শ্রীনগরের ড্রইং স্কুলে স্বল্পকালের জন্য শিক্ষকতা করেন। পরে জয়পুর আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হন (জুলাই, ১৯২৫ খ্রী)।

অতঃপর তিনি লখ্নৌ-এর 'গভর্নমেন্ট স্কুল অভ্ আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্ট্স'-এ সুপারিন্টেন্ডিং ক্র্যাফ্ট্সম্যান হিসাবে চৌদ্দ বৎসর কাজ করিয়া (১৯২৯-৪৩ খ্রী) অবসর গ্রহণ করেন। ভারতের একাধিক কৃতী ভাস্কর তাঁহার ছাত্র। তাঁহার ভাস্কর্যের অধিকাংশই খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি। তাঁহার উল্লেখ্য ভাস্কর্য ঃ বাস্ট অভ্ এ লেডি, গান্ধী (গোন্ডা ও লখ্নৌ বিশ্ববিদ্যালয়) ; রাজা স্যর রামপাল সিং (লখ্নৌ ; শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (ব্রন্জ্, লখ্নৌ), অতুলপ্রসাদ সেন (মার্বেল, আবক্ষ, মিউনিসিপ্যাল পার্ক, লখ্নৌ) প্রভৃতি।

কমল সরকার

হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্যাধিপতি। দিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে জন্ম। ভার্যা কয়াধু। প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ ও হ্লাদ নামে চারি পুত্র। সনন্দাদি ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া জয় ও বিজয় নামে বিষ্ণুলোকের দুইজন দ্বারপাল হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ নামে জন্মগ্রহণ করে। কঠোর তপস্যায় প্রীত ব্রহ্মা হিরণ্যকশিপুর প্রার্থনানুযায়ী তাহাকে দিনে বা রাত্রে, অভ্যন্তরে বা বহির্ভাগে, আকাশে বা ভূমিতে, দেবতা বা দৈত্য, নর বা পশু দ্বারা অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু না হওয়ার বর দেন। পুত্র প্রহ্লাদের প্রগাঢ় বিষ্ণুভক্তিতে কুপিত পিতা পুত্রবধের প্রচেষ্টায় বিফল হন। প্রাসাদের স্ফটিকস্তম্ভে প্রহ্লাদ হরির অস্তিত্ব স্বীকার করায় ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে পদাঘাত করিলে নৃসিংহরূপী বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া স্বজানুদ্বয়ে রাখিয়া সন্ধ্যাকালে নখরাঘাতে তাহাকে বধ করেন।

যূথিকা ঘোষ

হীনযান এই নামাঙ্কিত মতবাদটির উদ্ভব হইয়াছিল ভগবান্ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে। মহাপরিনির্বাণের বেশ কিছু কাল পরে বৌদ্ধধর্মে ১৮টি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, স্থবির বা থেরবাদী এবং আচার্য বা আচারিয়বাদী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে মহাসাংঘিক নামে একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল।

এই মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হইতেই মহাযান বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। মহাযান সম্প্রদায়ের উত্থানের পর সুপ্রাচীন থেরবাদীকে আখ্যা দেওয়া হয় হীনযান।

হীনযান মতে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান ও তপস্যা-সম্পাদনের মাধ্যমে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের অধিকারী হওয়া যায়; পক্ষান্তরে মহাযানীরা নির্বাণের প্রত্যাশী নহেন, তাঁহারা গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশী। মহাযানীদের ধারণা যে বুদ্ধত্ব লাভ ব্যতীত সঠিক মুক্তি সম্ভব নয়। সেইজন্য তাঁহারা ভগবান্ বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের জীবন অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। 'ধর্মচক্র প্রবর্ত্তন সূত্রে' ভগবান্ বুদ্ধ তাঁহার যে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই হীনযানীদের সাধন মার্গের নির্দেশ আছে। তাঁহার এই উপদেশাবলী অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে সুপ্রসিদ্ধ। ইহাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—শীল, চিত্ত ও প্রজ্ঞা। শীল বলিতে বুঝিতে হইবে—১. সম্যক্ বাক্য (অর্থাৎ মিথ্যা, কর্কশ অসার ইত্যাদি বাক্য কথন হইতে বিরতি); ২. 'সম্যক্ কর্ম' (অর্থাৎ চুরি, প্রাণিহত্যা, অব্রহ্মচর্য ইত্যাদি হইতে বিরতি); এবং ৩. 'সম্যক্ আজীব' (অর্থাৎ আহার নিয়ন্ত্রণ)। চিত্ত বলিতে বুঝিতে হইবে—৪. 'সম্যক্ ব্যায়াম' (অর্থাৎ অনুৎপন্ন অকুশলাদির অনুৎপত্তি, উৎপন্ন অকুশলাদির পরিহার, অনুৎপন্ন কুশলের উৎপাদন, উৎপন্ন কুশলাদির বৃদ্ধি); এবং ৫. 'সম্যক্ স্মৃতি' (অর্থাৎ কায়িক যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার সম্বন্ধে স্মৃতিমান্ থাকা, অনুভূতিতে যাহা কিছু হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সজাগ থাকা, চিত্তে যেসব কল্পনা জাগ্রত হইতেছে তাহা মনে রাখা, ধর্ম সম্বন্ধে সচেতন থাকা)। প্রজ্ঞা বলিতে বুঝিতে হইবে—৬. 'সম্যক্ সমাধি' (অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ের ধ্যান); ৭. 'সম্যক্ সংকল্প'; এবং ৮. 'সম্যক্ দৃষ্টি' (অর্থাৎ বিবিধ প্রকার জ্ঞান)। দুঃখ, অনাত্মন্ ও অনিত্য—এই তিনটি শব্দের দ্বারা হীনযানী বৌদ্ধদর্শন প্রকাশিত। ১. দুঃখ ঃ অর্থাৎ জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু। ২. অনাত্মন্ ঃ ইহার তাৎপর্য হইল যে এই নশ্বর শরীরে কোনও চিরস্থায়ী আত্মা থাকিতে পারে না। ইহাই হইল বৌদ্ধমতের সহিত উপনিষদ-বেদান্তের মতভেদের প্রধান ভিত্তি। বুদ্ধদেবের মতবাদ অনুযায়ী নশ্বর শরীরে নিত্য আত্মার কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নহে। শরীর যখন নশ্বর তখন উহার আত্মাও নশ্বর। আত্মা অর্থে বৌদ্ধ দর্শনে আমিত্ব-জ্ঞান বুঝিতে হইবে। ৩. অনিত্য ঃ ইহার তাৎপর্য হইল যে জাগতিক সকল জীব ও বস্তুনিচয় অবিরাম পরিবর্তনশীল, প্রতিক্ষণে উহাদের পরিবর্তন হইতেছে; এই মত অনুসারে বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, বীজ যখন পচনশীল অবস্থায় থাকে, তাহার শেষ অবস্থা হইতে নূতন অঙ্কুরের উৎপত্তি ও পরে তাহার সৃষ্টি হয়। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ইহার নামকরণ করিয়াছেন 'ক্ষণিকবাদ'। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতবাদ অনুযায়ী হেতু ও প্রত্যয় থাকিলে জীব বা বস্তুর উৎপত্তি হয়, আবার হেতু ও প্রত্যয় বিনষ্ট হইলে জীবের বা বস্তুর আর উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ জন্ম-নিরোধ হয়। এই হীনযান বৌদ্ধ ধর্ম সিংহল, বর্মা ও শ্যামদেশে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। ভারত ও পূর্ব-বাংলার (বাংলাদেশ) চট্টগ্রামের অনেকে এই হীনযানী মতবাদে বিশ্বাসী।

এন. জিনরত্ন মহাস্থবির

বুদ্ধদেব প্রবর্তিত আদি ধর্মমতাবলম্বিগণের মতে যাঁহারা বুদ্ধের ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের মুখে ধর্মোপদেশ শুনিয়াছেন সেই সদ্ধর্মাচারনিরত শ্রাবকেরাই কেবল নির্বাণ লাভের অধিকারী। কিন্তু পরবর্তী কালে নাগার্জুনের সময়ে (আনু. খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) গঠিত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আচার্যেরা সর্বজীবের মুক্তি ও বোধি-সত্ত্ব প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া লন এবং বলেন যে সকলেই নির্বাণলাভে অধিকারী। এই শেষোক্তেরা মহাযান-পন্থী বলিয়া অভিহিত হন এবং আদি মতাবলম্বীদিগকে হীনযান-পন্থী আখ্যা দেওয়া হয়। এখানে 'মহাযান' শব্দের অর্থে বুঝিতে হইবে 'বৃহৎ শকট' অর্থাৎ যে-শকটে বহু নির্বাণ-কামী লোকের স্থান আছে। পক্ষান্তরে 'হীনযান' শব্দের অর্থ 'ক্ষুদ্র শকট' অর্থাৎ যে-শকটে অল্পসংখ্যক মাত্র নির্বাণকামীর স্থান হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

হীরক মৌল কার্বনের বহু রূপের মধ্যে একটি রূপ হীরক। ইহা অক্টাহেড্রন, ডোডেকাহেড্রন ও কিউব রূপে কেলাসিত হয়। হীরকের ঘনত্ব ৩.৫১, প্রতিসারাঙ্ক (রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স) ২.৪১৭। পৃথিবীতে যতপ্রকার বস্তু আছে তাহাদের মধ্যে ইহা কঠিনতম।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে ও বোর্নিওতে স্রোতবাহিত উপলখণ্ডের সহিত সর্বপ্রথম হীরকের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। হীরকপ্রাপ্তির দেশ হিসাবে সিয়েরালিওন, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, ট্রান্সভাল, ব্রেজিল, সাইবেরিয়া, অ্যাঙ্গোলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। ভারতের কয়েক স্থলেও হীরক পাওয়া যায়। তবে অধিকভাগ হীরকই আফ্রিকায় পাওয়া যায়। স্রোতবাহিত উপলখণ্ডের সহিত ইহা পাওয়া গেলেও অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী উপলখণ্ডের সহিত মিশ্রিত হীরকের অস্তিত্বের কথাও সুবিদিত। আগ্নেয়শিলা ও পাললিকশিলার সহিত হীরক প্রাপ্তির যোগসূত্র থাকিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে আদিমশিলার সহিত ইহাদের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। সম্ভবতঃ ভূগর্ভস্থ অত্যধিক

চাপ ও তাপে মৌল কার্বনের এই রূপান্তর ঘটে। মিশ্রিত উপলখণ্ডের পৃথক্ ঘনত্বের সুবিধা লইয়া ইহাকে কিয়ৎ পরিমাণ আলাদা করিয়া পরে হস্তদ্বারা অথবা অন্যান্য বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ আলাদা করা হয়।

সাধারণতঃ হীরকখণ্ডগুলি আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইলেও ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেটোরিয়াতে আবিষ্কৃত 'কুলিয়ন' হীরক (কিঞ্চিদধিক ৩০০০ ক্যারেট) এবং ভারতবর্ষের 'কোহিনূর' (অধুনা ১০৯ ক্যারেট) নামীয় হীরকখণ্ড সর্বজনবিদিত। নীল বর্ণের 'হপ' নামীয় হীরকখণ্ড (৪৪.৫ ক্যারেট) অতি প্রসিদ্ধ।

হীরকখণ্ডগুলি স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ এই দুইভাগে বিভক্ত। স্বচ্ছ হীরকখণ্ড হইতে নানাবর্ণের আলোক বিচ্ছুরিত হয় এবং সেজন্য ইহারা অতি মূল্যবান্ পাথর হিসাবে অলংকারে ব্যবহৃত হয়। অস্বচ্ছ হীরকগুলি পাথরকাটা, কাচকাটা ও আরও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহারা তাপের পরিবাহক কিন্তু সাধারণতঃ বিদ্যুতের নহে। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ময়সান (Moissan) সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে হীরকখণ্ড তৈয়ারি করেন। বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি কারখানায় অত্যধিক তাপ ও চাপের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে কয়লাকে হীরকে রূপান্তরিত করা হইতেছে। এগুলি সর্বরকমে খনিজ হিরকের সমতুল্য। এক্স-রে সাহায্যে আমরা আসল ও নকল হীরকের পার্থক্য বুঝিতে পারি।

অনিলকুমার কুণ্ডু

হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা ভারতের ওড়িশা রাজ্যে মহানদীর উপর যে-স্থানে একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে সেই স্থানটির নাম হীরাকুদ। মহানদী ওড়িশা রাজ্যের বৃহত্তম নদী; ইহার উৎপত্তি মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দক্ষিণ অংশে বাস্তার পাহাড়ী অঞ্চলে। এই নদী মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় অধিত্যকার মধ্যদিয়া উত্তরে প্রবাহিত হইয়া পরে পূর্বদিকে বাঁকিয়া ওড়িশায় প্রবেশ করিয়াছে। সম্বলপুরের নিকট হইতে মহানদী দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া ওড়িশার পাহাড়ী অঞ্চল অতিক্রম করিয়া পুনরায় পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। মহানদীর দৈর্ঘ্য ৪৫০ কিলোমিটার এবং সমগ্র অববাহিকার আয়তন ১৩২০০০ বর্গ কিলোমিটার। অববাহিকার পশ্চিমাংশ মধ্যপ্রদেশের এবং পূর্বাংশ ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্গত। ওড়িশার সম্বলপুর, বোলান্গীর, ফুলবানী, কালাহাণ্ডি, ঢেন্কানাল, পুরী এবং কটক এই জেলাগুলি সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে মহানদী অববাহিকায় অবস্থিত। নদীটির অববাহিকা ঘিরিয়া পাহাড়ী অঞ্চল। এই সকল পাহাড়ী অঞ্চল হইতে বহু নদী মহানদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। নদীগুলি বর্ষাকালে মহানদীতে প্রচুর জল সরবরাহ করে। সমগ্র মহানদী অববাহিকার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৩৭ সেন্টিমিটার; অবশ্য পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি। সম্বলপুরের নিকট মহানদীর জলের শীতকালীন গড় প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০০০০ ঘন মিটার, কিন্তু বর্ষায় সর্বাধিক প্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০০০ ঘন মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐ সময় নদীটি স্ফীত হইলে উহার প্রস্থ এক কিলোমিটারের বেশি হয়। প্রায় প্রতি বৎসরেই মহানদীর বন্যায় অববাহিকার নিম্নাঞ্চলে চাষ-আবাদ ও জনবসতির অত্যন্ত বেশি ক্ষতি হইত। বন্যা-নিরোধ, নদীর জলের অপচয় নিবারণ, কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচন ও শহরগুলিতে জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন কল্যাণকর উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মহানদী পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে মহা-নদীর উপর হীরাকুদ, নারাজ ও টিকারপাড়ায় তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া নদীর নিয়ন্ত্রণ ও কয়েকটি জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র স্থাপন স্থির করা হয়।

সমগ্র মহানদী পরিকল্পনার মধ্যে হীরাকুদ বাঁধের পরিকল্পনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ওড়িশার সম্বলপুর শহরের দশ কিলোমিটার উত্তরে হীরাকুদ নামক স্থানে মহানদীর উপর হীরাকুদ বাঁধের নির্মাণকার্য ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হইয়াছে। এই বাঁধের দৈর্ঘ ৪৮০০ মিটার, উচ্চতা ৪৯ মিটার এবং বাঁধের পশ্চাতে যে জলাধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে ৮১০ কোটি ঘনমিটার জল সঞ্চিত হইতে পারে। হীরাকুদ জলাধার হইতে তিনটি প্রধান খাল কাটা হইয়াছে, এই-গুলি বড়গড় খাল, শাশন খাল এবং সম্বলপুর খাল। প্রধান খালগুলি হইতে বহু শাখা-খাল কাটিয়া ওড়িশার সম্বলপুর ও বোলানগীর জেলার প্রায় ২৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার কৃষিভূমির সেচব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। হীরাকুদ বাঁধের জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র হইতে ১.২৩ লক্ষ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। ইহা ব্যতীত হীরাকুদ বাঁধ নির্মাণের ফলে মহানদীর নিম্ন অববাহি-কায় বন্যার প্রকোপ যথেষ্ট কমিয়াছে। হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের কার্য প্রায় শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে আরও কয়েকটি বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপন এবং শাখাখাল খনন অন্তর্ভুক্ত। টিকারপাড়া ও নারাজ বাঁধের কার্য এখনও অসম্পূর্ণ।

ওড়িশা খনিজ-সম্পদে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যে বক্সাইট, আকরিক লৌহ, তাম্র, কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হীরাকুদ জলাধার হইতে বিদ্যুৎ

উৎপাদনের ফলে ঐ সকল খনিজের সদ্ব্যবহার সম্ভব হইয়াছে এবং নানা স্থানে কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে ; ইহাদের মধ্যে হীরাকুদের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ও রাউরকেল্লার ইস্পাত কারখানা উল্লেখযোগ্য। হীরাকুদ অর্থে হীরকের খনি, অপর অর্থে ঐশ্বর্যের উৎস। ওড়িশার অর্থনীতি এখন হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনার উপর নিবদ্ধ।

অরুণকুমার মিত্র

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৪২ খ্রী) কলিকাতায় জন্ম। মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগ দিয়া ইংরেজী, সংস্কৃত এবং দর্শনে প্রথম বিভাগে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করেন (১৮৮৮ খ্রী) এবং দুইটি স্বর্ণপদকও পারিতোষিক পান। এম. এ. পরীক্ষাতে ইংরেজীতে (১৮৮৯ খ্রী) এবং আইন পরীক্ষাতেও প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি স্বর্ণপদক পান। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পুরস্কার পান।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতা হাই-কোর্টের অ্যাটর্নি তালিকাভুক্ত হন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই ব্যবসায়ে প্রচুর পসার ও খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য, সমাজ এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিন বৎসর ইহার সভাপতি ও কয়েক বৎসর সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গবিভাগের পর যে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন হয় তিনি ছিলেন ইহার অন্যতম নেতা। তিনি বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ও ইন্টার ন্যাশনাল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি ছিলেন। কাশী কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি অ্যানি বেসান্তের সহিত যুক্ত ছিলেন, ইহা পরে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়। তিনি বাংলায় পনেরো খানিরও বেশি পুস্তক ও দুইখানি ইংরেজী পুস্তক লেখেন এবং নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার দর্শন-সম্বন্ধীয় বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলাসাহিত্যে তাঁহার দানের জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে 'কমলা বক্তৃতা' দেন।

হিরণকুমার সান্যাল

হুইট্‌ম্যান, ওয়াল্‌ট্‌ (১৮১৯-১৮৯২ খ্রী) মার্কিন কবি। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কম্পোজিটর ও সম্পাদকের কার্য করেন. এবং অর্থের জন্য নানা ধরনের স্থূল ঘটনা-বহুলকাহিনী রচনা করেন। তাঁহার প্রখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ 'লীভ্‌স্‌ অভ্‌ গ্রাস'-এর প্রথম সংস্করণে বারোটি কবিতা ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হওয়ার পরে মনীষী এমার্সন্‌ কবিকে অভিনন্দিত করেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে হুইট্‌ম্যান্‌ বহু নূতন কবিতা সংযোজন করেন। এইগুলির বিষয়বস্তু-নির্বাচনে ও 'মুক্তছন্দের' প্রবর্তনে কবি যথেষ্ট সাহস ও শক্তির পরিচয় দেন। অতীন্দ্রিয়বাদ ও মানবপ্রেমের পরিচয় এই সব কবিতায় পাওয়া যায়। কবির আন্তরিকতা সুস্পষ্ট। লিংকনের মৃত্যুতে রচিত 'হোয়েন্‌ লাইল্যাক্‌স্‌ লাস্ট্‌' শোকগাথায় মৃত্যু পরম রমণীয় রূপ ধরিয়াছে। 'ও ক্যাপ্‌টেন! মাই ক্যাপ্‌টেন!' তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। যাত্রার শেষলগ্ন সমাগত, তীরভূমি আসন্ন কিন্তু কান্ডারীর হিমশীতল দেহ প্রাণহীন। হুইট্‌ম্যান্‌ যুক্তরাষ্ট্রের মহত্তম কবিদের অন্যতম এবং কাব্যের ভাব, ভাষা ও প্রকরণে তাঁহার প্রভাব মার্কিন দেশের বাহিরেও বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রেম, মৃত্যু, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র—হুইট্‌ম্যানের কবিতার মুখ্য বিষয়। তিনি জন-গণের জয়গান গাহিয়াছেন ও সাধারণ লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

হুগলি বর্ধমান বিভাগের অন্তর্গত হুগলি জেলা, চারিটি মহকুমা লইয়া গঠিত—হুগলি, শ্রীরামপুর, আরামবাগ ও চন্দননগর। এই জেলা ২২°৩৬′ ও ২৩°১৪′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°৩৭′ ও ৮৭°৩৪′১৫″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার তিনটি প্রধান নদী ঃ হুগলি, দামোদর ও দারকেশ্বর। অন্যান্য ক্ষুদ্র নদীগুলির মধ্যে কুন্তী ও সরস্বতীর নাম করা চলে। এই জেলার বালীখাল ডানকুনি জলাভূমি হইতে বাহির হইয়াছে। জেলার আরামবাগ মহকুমাতে বিস্তৃত চাষোপযোগী জমি আছে। নদীবহুল হওয়াতে ও জলাভূমি থাকাতে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। সেজন্য মৎস্য ব্যবসায় ও চাষ এই স্থানের একটি প্রধান উপজীবিকা। ধান্যই এই জেলার প্রধান খাদ্যশস্য। ধানের পরেই পাটের চাষ প্রধান। পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে এখানেই পাটের চাষ সর্বাধিক হয়। পাট-ব্যবসায়ের কেন্দ্র শেওড়াফুলী। খাদ্যশস্যের মধ্যে ধানের পরে ডাল ও তৈলবীজ। তিল, সরিষা, তিসি গ্রামের চারিধারে ও চরে জন্মায়। এখানে আলুও প্রচুর উৎপন্ন হয়। শাকসবজি ও নানারকম ফলের চাষ হয়। এই জেলার প্রধান শিল্প পাট। হুগলি নদীর তীরে বহু পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। চাঁপদানী, শ্রীরামপুর, রিষড়া এবং ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থান এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এই জেলার ধনিয়াখালী ও ফরাসডাঙ্গা শাড়ী ও ধুতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুতী-বস্ত্র অধিকাংশ গ্রামেই প্রস্তুত হয়। ইহার প্রধান কেন্দ্র

সদর মহকুমাতে ধনিয়াখালী। চন্দননগরের ফরাসডাঙ্গা কাপড়ের বিশেষ খ্যাতি আছে। চিকনের কাজ অথবা লেস ধনিয়াখালী ও চণ্ডীতলার গ্রামের মুসলমান মেয়েদের হস্তশিল্প। শ্রীরামপুরে বয়নশিল্পের একটি কলেজ আছে। এখানে উন্নত ধরনের বয়নশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। শ্রীরামপুরে কাগজ প্রস্তুত হয়। উত্তরপাড়াতে টিসুপেপারের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলার অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ইট, টালি ও সুরকি প্রস্তুত উল্লেখযোগ্য। পাট ও শণ হইতে এখানে দড়িও যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। দড়ি প্রস্তুতির প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর, বালী, উত্তরপাড়া ইত্যাদি। এই জেলাতে কাঁসা-পিতলের বাসনও প্রস্তুত হয়। কামারপাড়া, চাঁপা-ডাঙ্গা, বালী ও কুমারগঞ্জ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই জেলাতে আখ হইতে দেশীয় চিনি ও গুড়ও প্রস্তুত হয়। প্রধানতঃ খেজুর ও তালগাছের রস হইতে গুড় ও মিছরি প্রস্তুত হয়। চন্দননগর, কেওটা এবং চুঁচুড়াতে উৎকৃষ্ট কাঠের আসবাব প্রস্তুত হয়। আবলুস কাঠের বিশেষতঃ হুঁকার নলচে কামারপুকুর, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তৈয়ারি হয়। বাঁশের ঝুড়ি, নলখাগড়ার চাটাই ও মাদুর জেলার নানা স্থানে প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন ইওরোপীয় জাতির সংস্পর্শে আসিয়া হুগলি জেলা সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল। মিশনারীগণের উদ্যোগে বহু স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে শ্রীরামপুর কলেজ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ('শ্রীরামপুর', 'শ্রীরামপুর মিশন' দ্র)। হুগলি কলেজ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ আগস্ট মহসীন ফান্ড হইতে স্থাপিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সরকারের হাতে আসে। এই কলেজসংলগ্ন একটি উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে। উত্তরপাড়া কলেজ রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র পিয়ারীমোহনের দানে ও উৎসাহে স্থাপিত হয়।

হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল এই জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়। ইহা ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন হুগলির বিচারক ডি. সি. স্মিথ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। হুগলি কলেজিয়েট স্কুল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রন্থাগারের মধ্যে উত্তরপাড়া গ্রন্থাগারটি রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। হুগলি পাব্লিক লাইব্রেরি ১৮৫৩ এবং শ্রীরামপুর পাব্লিক লাইব্রেরি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। হুগলি শহর হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। দানবীর মহম্মদ মহসীনের ইমামবাড়া এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহার গম্বুজ প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ। ইহার দেওয়ালে কোরানের শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। মহরমের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। বর্তমানে চুঁচুড়াই হুগলি জেলার সদর। স্থানীয় আর্মানি গির্জাটি প্রসিদ্ধ আর্মেনীয় মার্কার কর্তৃক ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। হুগলির মহসীন কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা চুঁচুড়ায় অবস্থিত। হুগলি জেলার আর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ব্যান্ডেল। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজগণ এখানে সুবৃহৎ গির্জা নির্মাণ করেন। ইহা যথেষ্ট প্রাচীন গির্জা। ইহার প্রাচীর গাত্রে অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র অঙ্কিত আছে। একদা সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত স্থান ছিল ('সপ্তগ্রাম' দ্র)। হুগলি মহকুমার অন্তর্গত পান্ডুয়ারও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে ('পান্ডুয়া' দ্র)। হুগলি জেলার তারকেশ্বর ও ত্রিবেণী ('ত্রিবেণী' দ্র) দুই সুবিখ্যাত তীর্থস্থান। এই জেলার মান্দারণে দুইটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উত্তরে গড়মান্দারণ ও দক্ষিণে ভিটারগড়। হুগলি জেলার আর একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান চন্দননগর ('চন্দননগর' দ্র)।

কল্যাণী দাশগুপ্ত

হুড় একটি লৌকিক অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিকভাবে বলিদানের পর পাঁঠার ধড়ের অধিকার লইয়া উপস্থিত জনগণের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হুড়া-হুড়ি বা খণ্ডযুদ্ধ হয় তাহাই 'হুড়' নামে পরিচিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন আবাদ-অঞ্চলের স্থানবিশেষে ইহার প্রচলন দেখা যায়।

সাধারণতঃ বৈশাখের মধ্য হইতে আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর মধ্যে যে কোনও দিন হুড় অনুষ্ঠিত হয়। ইহা স্থানীয় যে কোনও দেব-দেবীর থান বা মন্দিরে বিশেষ পূজা উপলক্ষে অথবা সাধারণ যে কোনও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে হয়। হুড়ের পূর্বে মল্লযুদ্ধ, বুকে, কাঁধে, মানুষতোলা, পাথরতোলা প্রভৃতি বীরত্ব-ব্যঞ্জক অনুষ্ঠান হয়। হুড় ও ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান সকলেই অংশগ্রহণে অধিকারী। সাধারণতঃ নিম্নবর্ণের কৃষিজীবী লোকেরাই ইহাতে অধিক অংশ গ্রহণ করে। বলির পর ছিন্নমুণ্ড রক্তাপ্লুত পশুর ধড়টিকে প্রথমে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে তুলিয়া ধরা হয় এবং পরক্ষণেই ঐ ধড়টি অধিকার করিবার জন্য বিভিন্ন প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে টানাটানি, ধাক্কাধাক্কি, চিৎকার ইত্যাদিতে স্থানটি একটি সমরাঙ্গণে পরিণত হয়। বিজয়ী দল পাঁঠাটি পায় এবং সকলের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়। হুড়ে একাধিক বলির চল আছে। বর্তমানে সাধারণতঃ পাঁঠার ব্যবহার হইলেও পূর্বে হাঁস-মহিষ প্রভৃতি বলিরও প্রচলন ছিল। বীজবপণ শস্যারোপণ প্রভৃতির প্রাক্কালে হুড় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে কৃষি-সহায়ক জাদুবিশ্বাসমূলক ঘটনার অবশেষ প্রত্যক্ষ করা যায়।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

হুপিং কফ প্রধানতঃ শিশুরাই এই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস, হাঁচি, কাশি হইতে এই রোগের জীবাণু অন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

সর্দি, কাশি লইয়া রোগের সূত্রপাত। একবার কাশি আরম্ভ হইলে রোগী ক্রমাগত প্রবলবেগে কাশিতে থাকে, সারামুখ লাল, কখনও বা নীলাভ হইয়া ওঠে। কাশি শেষ হইবার সময় প্রায়-অবরুদ্ধ শ্বাসনালীর মধ্য দিয়া শ্বাস লওয়ার জন্য একপ্রকার শব্দ ('হুপ') হয়; এইজন্যই ইহার নাম হুপিং কফ। কাশির পরই রোগী প্রায়ই বমি করে এবং প্রচুর পরিমাণ আঠালো কফ বাহির হয়। কিছুদিন এইরূপ চলিবার পর কাশির বেগ কমিতে থাকে।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, ফুস-ফুসের একাংশ চুপসাইয়া যায় ও খিঁচুনি শুরু হওয়া। কাশির বেগে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষরণ হইতে পারে।

রোগের প্রথম অবস্থায় টেট্রাসাইক্লিন ফলপ্রদ। খাদ্য অল্পপরিমাণে বারে বারে দেওয়া উচিত। কাশির বেগ শেষ হওয়ার পর খাওয়ানো সুবিধাজনক। প্রতিরোধক হিসাবে 'হুপিং কফ ভ্যাক্সিন' ফলপ্রদ।

সিদ্ধেশ্বর রায়

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯ খ্রী) হুমায়ুন জাহিরুদ্দিন আমির-ই-কবির রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষা-বিদ্ ও কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস ফরিদপুর (বর্তমান বাংলা দেশের অন্তর্গত)। পিতা কবিরুদ্দিন আহ্‌মদ ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট ছিলেন। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় হুমায়ুন কবির অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি 'অক্সফোর্ড ইউনিয়নে'র সম্পাদক ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি অন্ধ্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। সেই সময়েই তিনি 'ট্রেড ইউনিয়ন' আন্দোলনে যোগদান করেন এবং নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। এ. কে. ফজ্‌লুল হক ('হক, ফজলুল আবুল কাশেম' দ্র) সাহেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া তিনি 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করেন এবং ঐ দলের প্রতিনিধি হিসাবে 'বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে'র সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন। ভারতীয় রেল অনুসন্ধান সমিতি ও আরও অনেক সর্বভারতীয় সংস্থার অনুসন্ধান সমিতির কাজে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদের একান্তসচিব ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতারূপে কাজ করেন (১৯৪৬ খ্রী)। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপনেতা হিসাবে তিনি 'ইউনেস্কো'র তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি হন। ১৯৫২-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের সচিব ও উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে পর্যায়ক্রমে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং পেট্রোলিয়াম ও কেমি-কালস্ মন্ত্রকে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি নিখিল ভারত দর্শন কংগ্রেসের সভাপতিপদেও বৃত হইয়াছিলেন। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া 'বাংলা কংগ্রেসে'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি লোক-দলের সভাপতি ও ভারতীয় ক্রান্তিদলের সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ অগাস্ট তিনি পরলোকগমন করেন। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে 'কান্টের দর্শন', 'স্বপ্নসাধ' (১৯২৭ খ্রী, কবিতা), 'সাথী' (১৯৩০ খ্রী, কবিতা), 'অষ্টাদশী' (১৯৩৮ খ্রী, কবিতা) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অমিয়কুমার মজুমদার

হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের পুত্র হুমায়ুন পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৫৩০ খ্রী)। দশ বৎসর রাজত্ব করার পর শূরবংশীয় আফগান শের খাঁর নিকট প্রথমে চৌসা (১৫৩৯ খ্রী) এবং পরে কনৌজের (১৫৪০ খ্রী) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পারস্যের শাহ্-এর সহায়তায় তিনি নিজের বিরোধী ভ্রাতা মির্জা কামরানের সহিত যুদ্ধ করিয়া কান্দাহার ও কাবুল জয় করেন (১৫৪৫ খ্রী)। দশ বৎসর পরে শূরবংশীয় শেষ সুল-তানের দুর্বলতার সুযোগে তিনি পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা জয় করিয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। দিল্লীর পাঠা-গারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫৫৬ খ্রী)।

কুমুদরঞ্জন দাস

হুসেন মহরম দ্র

হুসেন কুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ শাহমৎজঙ্গের দেওয়ান। নওয়াজেস খাঁর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না, তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী। সেই জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত কার্যভার তাঁহার স্ত্রী ঘসিটি বেগম ও দেওয়ান হুসেন কুলির উপর ছাড়িয়া

দিয়া মুর্শিদাবাদে মোতিঝিল প্রাসাদে বাস করিতেন। সিরাজউদ্দৌলা হুসেন কুলির অর্থ ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন। অতঃপর হুসেন কুলির সহিত ঘসিটি বেগমের অবৈধ প্রণয়ের অপবাদ উপলক্ষ করিয়া সিরাজ ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুর্শিদাবাদের রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে হুসেন কুলি খাঁকে হত্যা করান।

ত্রিদিবনাথ রায়

হুসেন শাহ্ (রাজ্যকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী) সৈয়দ-বংশীয় আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ পিতার সহিত তুর্কী-স্থানের তারমুজ শহর হইতে বঙ্গদেশে আসেন এবং রাঢ়-দেশের চাঁদপুর মৌজায় দারিদ্র্যের মধ্য দিয়াই তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। কিন্তু ক্রমে তিনি রাজ্যে উচ্চপদ লাভ করেন এবং হাবশী রাজাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৯৩ খ্রী)। তিনি সুযোগ্য ও পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। পূর্ব আমলে বঙ্গদেশে যে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি তাহা দূর করিয়া সমগ্র রাজ্যে শৃঙ্খলা ও শান্তি ফিরাইয়া আনেন। তিনি বঙ্গদেশের কামতাপুর (কোচবিহার) ও কামরূপ (আসাম) রাজ্য জয় করেন। তিনি ওড়িশা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন, যদিও ওড়িশার ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ওড়িশারাজ প্রতাপরুদ্রই হুসেন শাহ্‌কে পরাজিত করিয়া গঙ্গা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ওড়িশার ন্যায় ত্রিপুরার রাজার সহিতও হুসেন শাহের বহুকালব্যাপী যুদ্ধ হয়—উভয়পক্ষই জয়ের দাবী করেন। আরাকান রাজার সহিতও তাঁহার যুদ্ধ হয়। তিনি বর্তমান বিহার দেশের অনেক অংশ জয় করেন। পাটনা ও মুঙ্গের জেলায় এবং বিহারের পশ্চিম প্রান্তে সারণ জেলায় তাঁহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, বিহারের অনেকাংশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধারণা এই যে, হুসেন শাহ্ বঙ্গসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উদার চরিতের রাজা ছিলেন। ইঁহার সময়েই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটায় সম্ভবতঃ এই মত প্রচলিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থ অনু-সারে তিনি অনেক হিন্দু মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেন। চৈতন্যের ভক্ত-শিষ্য সনাতন ও রূপ পূর্বে হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু হুসেন শাহের হস্তেই সনাতন কারারুদ্ধ হন। কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান করিয়া সনাতন বৃন্দাবনে যান। হুসেন শাহের রাজ্যকালে কয়েকজন বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হুসেন শাহের কর্মচারী ছিলেন অথবা তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহাদের কাব্যসৃষ্টির মূলে যে হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতা বা অনুপ্রেরণা ছিল সেরূপ কোনও প্রমাণ নাই।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

হুসেন শাহী বংশ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ এই নামে পরিচিত। হাবশী সুলতান শমস্‌উদ্দীন মুজফ্‌ফর শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থার অবসানের জন্য হিন্দু ও মুসলমান সামন্তগণ সুলতানের আরব বংশোদ্ভূত মন্ত্রী আলাউদ্দীন হুসেনকে বাংলার সুলতান নির্বাচিত করেন (১৪৯৩ খ্রী)। হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরুদ্দীন নসরৎ শাহ্ (১৫১৮-৩৩ খ্রী), নসরতের পুত্র আলাউদ্দীন ফিরুজ শাহ্ (১৫৩৩ খ্রী—মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেন) এবং সর্বশেষে গিয়াসউদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহ্ বাংলা দেশ শাসন করেন। হুসেন শাহী বংশের প্রথম দুই জনের (হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ) রাজত্বকালে বাংলা সাহিত্য ও শিল্পকলার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে এবং হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। হুসেন শাহী বংশের শেষ রাজা গিয়াস্‌উদ্দীন শাহ শের খাঁ সুর কর্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হন।

কুমুদরঞ্জন দাস

হূণ মধ্য এশিয়ার নিষ্পাদপ প্রান্তরভূমি হইতে উদ্ভূত এই দুর্দান্ত জাতির একটি দল পশ্চিমে রোমান রাজ্যের অভিমুখে এবং অপর একটি দল পারস্য ও ভারতের দিকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সর্বধ্বংসী লক্ষ্য লইয়া ধাবিত হয়।

প্রথম বারে ভারত-আক্রমণকারী হূণেরা আনুমানিক ৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া পারস্যের দিকে গমন করে ও সেখানে একটি হূণরাজ্যের পত্তন করে। গন্ধার অচিরে এই হূণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে ভারতে হূণ অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই অভিযানের নায়ক ছিলেন তোরমান, যদিও তিনি নিজে হূণজাতীয় ছিলেন কিনা বলা কঠিন। গন্ধার বা পাঞ্জাবের কোনও স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া মধ্যপ্রদেশের এরান পর্যন্ত ভূভাগ তিনি অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনিও ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ভানুগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন।

তোরমানের পুত্র মিহিরকুল (‘মিহিরকুল’ দ্র) রাজা হইয়া পিতার ন্যায় অভিযান চালান এবং প্রথমে বেশ কিছুটা কৃতকার্যও হন। তাঁহার রাজ্যের পঞ্চদশ বর্ষে উৎকীর্ণ গোয়ালিয়র দুর্গস্থ একটি শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থান পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীরও জয় করেন। হিউএন-ৎসাঙের

বিবরণ এবং কহ্লণের গ্রন্থ হইতে ইঁহার অত্যাচারের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। মিহিরকুল শেষপর্যন্ত মালবের গুপ্ত সামন্তরাজ যশোধর্মণ কর্তৃক পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর অচিরেই ভারতে হূণ-শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাসানীয়, কুষাণ ও গুপ্ত মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত তোরমান ও মিহিরকুলের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হৃৎপিণ্ড মানবদেহে হৃৎপিণ্ড বক্ষপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিত। প্রজনন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ড জাতকের জন্মকালের পূর্ণ আকৃতিটি প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চালন করা এই পরিণত হৃৎপিণ্ডের কাজ। এই কাজে সংবহন-তন্ত্রের সাহায্যে দক্ষিণ নিলয় ফুস্‌ফুসে এবং অন্যদিকে বাম নিলয় সমস্ত দেহে রক্ত চালনা করে (‘রক্ত সংবহন-তন্ত্র’ দ্র)। এই চলাচল কপাটিকার সাহায্যে একদিক্‌গামী।

যদিও হৃৎপিণ্ডের প্রতিকক্ষে রক্তের অভাব নাই, তথাপি এক বিশেষ তন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে নিজের কোষে সংবহন চালু রাখিতে হয়। ইহার নাম করোনারি সংবহনতন্ত্র। এই ধমনী বৃহৎ ধমনীর গোড়ায় কপাটিকার ঠিক উপর হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে ও বামে সমস্ত হৃৎপিণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে এবং অবশেষে দক্ষিণ অলিন্দে নানা পথে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ড এই সংবহনতন্ত্র দ্বারা বাহিত অম্লজান আহরণ করে এবং কার্যক্ষমতা বজায় রাখে। ইহা প্রতিহত হইলে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়। ‘করোনারি থ্রম্বোসিস্‌’ রোগে রক্তসংবহন বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটায়। হৃৎপিণ্ড তিন প্রকারের বিশেষ কোষে নির্মিত এবং মাংসপেশী কয়েক স্তরে বিভক্ত। হৃৎপিণ্ডের একটি অসাধারণ প্রকৃতি হইতেছে যে, ইহা আপনা হইতে উদ্দীপ্ত হইতে পারে। এই উদ্দীপনা দক্ষিণ অলিন্দ ও ‘সুপীরিয়র ভেনা কেভা’-র সংযোগস্থলে ‘সাইনো-অরিকিউলার নোড্‌’ হইতে শুরু হয়, এবং অলিন্দের মাংসপেশীর সাহায্যে ‘অরিকিউলো-ভেণ্ট্রিকিউলার নোডে’ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থান হইতে এক বিশেষ কলার (টিস্যু) সাহায্যে নিলয়ে পৌঁছিয়া আকুঞ্চনের সৃষ্টি করে। নিলয় আকুঞ্চনের পূর্বে অলিন্দ হইতে নিলয়ে কপাটিকাযুক্ত পথে রক্ত প্রবেশ করে। এই পর্বের শেষে অলিন্দ কিছুটা সংকুচিত হয় এবং প্রায় একই সময়ে নিলয়ও সংকুচিত হয়। এই সময় অলিন্দ-নিলয়ের অভ্যন্তরের চাপবৃদ্ধির ফলে পাল্মোনারি ও বৃহৎ ধমনীর উৎপত্তি-স্থলের কপাটিকাগুলি খুলিয়া যায়; ফলে রক্ত ধমনীপথে প্রবাহিত হয়। সংকোচনের শেষে প্রসারণের শুরু। এই সময়ে নিলয়ের চাপ ক্রমশই কমিতে থাকে। রক্ত ধমনীতে বিপরীত মুখে প্রবাহিত হইবার পূর্বেই কপাটিকাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। নিলয়ের চাপ আরও কম হইলে অলিন্দ-নিলয়ের কপাটিকা খুলিয়া যায় এবং নিলয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ড একবার আকুঞ্চন-প্রসারণের ফলে রক্ত এই ভাবে চলাচল করে। একবারের এই সমস্ত ঘটনাকে ‘কার্ডিয়াক্‌ সাইক্‌ল্‌’ বলে। ইহা নাড়ীতে স্পন্দনের সৃষ্টি করে। এই স্পন্দন শৈশব অবস্থায় প্রতি মিনিটে প্রায় ১২০ বার হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সহিত কমিয়া প্রাপ্ত বয়সকালে ৭০-৮০ বার হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই নাড়ী-স্পন্দন সাধারণতঃ বেশি হয়।

সুখময় লাহিড়ী

হৃদ্‌রোগ বক্ষোদেশে দুটি ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থলে মধ্যচ্ছদার উপর শোণিত সংবহনের পাম্পযন্ত্র বিশিষ্ট পেশীময় হৃৎপিণ্ডের (‘হৃৎপিণ্ড’ দ্র) অবস্থান। ইহার বাহিরে ও ভিতরে থাকে যথাক্রমে হৃদ্‌ধরা কলা ও অন্তঃ-আবরণ। ঊর্ধ্ব ও নিম্ন মহাশিরা দিয়া ডান অলিন্দে আসে অশোধিত এবং ফুস্‌ফুস-শিরা-চারিটি দিয়া বাম অলিন্দে আসে পরিশোধিত রক্ত। দুই দিকের অলিন্দ ও নিলয়ের সংযোগমুখে থাকে যথাক্রমে ত্রিপত্রী ও দ্বিপত্রী কপাটক এবং বাম নিলয় ও মহাধমনী এবং ডান নিলয় ও ফুস্‌ফুস-ধমনীর সংযোগস্থলে থাকে অপর দুইটি অর্ধ-চন্দ্রাকৃতিত্রয়ীযুক্ত কপাটক, যাহাদের সাহায্যে হৃৎসংকোচনকালে রক্তস্রোত শুধু একটি দিকেই চালিত হয় (‘রক্ত-সংবহনতন্ত্র’ দ্র)। আবার হৃৎপেশীর নিজের পরিপুষ্টির জন্য আছে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশের পেশীর মধ্যে মহা-ধমনীর উৎস-মুখ হইতে উৎপন্ন হৃদ্‌ধমনী-নামে দুইটি ‘অন্ধ’ শাখা।

উল্লিখিত যে কোন স্থানের বৈকল্যের নামই হৃদ্‌-রোগ। যেমন : ১. হৃৎপেশী, হৃদ্‌ধরা কলা কিংবা অন্তঃ-আবরণের জীবাণুপ্রদাহজনিতরোগ ; ২. অত্যধিক ক্রিয়া-জনিত হৃৎপেশীর অস্বাভাবিক স্থূলত্ব ও প্রসার ; ৩. জীবাণু-দুষ্টির ফলে কিংবা অন্য কারণে যে কোন কপাটকযুক্ত সংযোগস্থলের সংকোচন এবং কপাটকগুলির বৈকল্যজনিত বিপরীত মুখে রক্তের প্রত্যাবর্তন ; ৪. সঞ্চিত কোলেস্টেরোলের দ্বারা কোনও হৃদ্‌ধমনীতে রক্তস্রোতের ক্রমঃসংকোচ-সহ প্রতিরোধজনিত বিপর্যয়।

আবার কখনও কখনও অলিন্দের পেশীতে হইতে থাকে নিয়মিত কিংবা দারুণ অনিয়মিত কম্পন-সংকোচন ; ইহার ফলে অত্যধিক নিষ্ফল ক্রিয়া হইতে থাকে। শিশুদের আবার অলিন্দ মধ্যবর্তী পর্দায় ডিম্বাকার ছিদ্র, কিংবা মহাধমনী ও ফুস্‌ফুস্‌ ধমনীর মাঝে একটি

সংযোগ-নল বর্তমান থাকাতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত রক্তের মিশ্রণসহ জন্মগত হৃদ্‌রোগও দেখা যায়।

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

হৃষীকেশ শাস্ত্রী (১৮৫০-১৯১৩ খ্রী) চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ভট্টপল্লীগ্রামে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে হৃষীকেশ শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, মাতা মুক্তকেশী দেবী। স্বগৃহে হৃষীকেশের বিদ্যারম্ভ হয়। তীক্ষ্ণধী বালক অল্পকাল মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শীঘ্রই ছড়াইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃ-পিতামহ-পরিচালিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সনাতন-ধর্মাবলম্বী হইলেও হৃষীকেশ সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বর্তমান কালে সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে ইংরেজী ভাষার সাহায্যগ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। তিনি তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার বাসনা পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে রক্ষণশীল পিতা ইহাতে অসম্মত হন। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ হৃষীকেশের এত তীব্র হয় যে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে লাহোর গমন করেন এবং এক আত্মীয়ের গৃহে থাকিয়া লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি বিশারদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। তাঁহার সুললিত সংস্কৃত ও ইংরেজী রচনা পাঠ করিয়া লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি ডঃ লাইট্‌নার (Dr. Leitner) অতীব প্রীত হন এবং তাঁহাকে ওরিয়েন্ট্যাল কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। প্রাচ্যবিদ্যাপ্রচারে বিশেষ উৎসাহী লাইট্‌নার সাহেব লাহোরে 'বিদ্যোদয়' নামে একটি সংস্কৃত মাসিকপত্র প্রকাশ করেন এবং শাস্ত্রীমহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। পৃথিবীর সর্বত্র প্রচারিত এই মাসিক পত্রের মাধ্যমে ম্যাক্সমুলার, হেনবের, য়াকবি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সহিত শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিচয় ঘটে। এইরূপে পাঞ্জাবে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু রুগ্‌ণ, বৃদ্ধ পিতার আকর্ষণে অচিরে তিনি প্রতিষ্ঠা, সম্মান, পদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সংস্কৃত কলেজের স্কুল শাখায় সামান্য শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই পদ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ ডিসেম্বর ভট্টপল্লীর পৈতৃক ভদ্রাসনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সংস্কৃত পুথির বিশদ তালিকা প্রণয়ন, আমরণ বিদ্যোদয়ের সেবা, ও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থ ঃ 'সুপদম্‌ ব্যাকরণ ব্যাখ্যানম্‌', 'কবিতাবলী', 'রাজপুত্রাসমনম্‌', 'প্রাকৃত ব্যাকরণম্‌' (ইংরেজী অনুবাদসহ), 'সংস্কৃত শ্রুতবোধ', 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়নাটকব্যাখ্যা', বিদ্যোদয় পত্রিকায় 'হ্যামলেট চরিতম্‌' নামক হ্যামলেটের সংস্কৃত অনুবাদ। হিন্দীভাষায় লিখিত গ্রন্থ 'ছন্দবোধ', 'অর্থসংগ্রহানুবাদ', 'তর্কামৃতানুবাদ', 'দত্তকচন্দ্রিকানুবাদ'। বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থঃ 'হিন্দী ব্যাকরণ', 'মেঘদূত' (মল্লিনাথের টীকা-সহিত বাংলাভাষায় পদ্যে অনুবাদ), 'উদ্বাহতত্ত্বানুবাদ', 'তিথিতত্ত্বানুবাদ', 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বানুবাদ', 'শ্রাদ্ধতত্ত্বানুবাদ', 'মলমাসতত্ত্বানুবাদ', 'শুদ্ধিতত্ত্বানুবাদ', 'শাণ্ডিল্যসূত্রানুবাদ' প্রভৃতি।

জটিলকুমার মুখোপাধ্যায়

হেগেল, গেঅর্ক হিবলহেল্‌ম্‌ ফ্রীডরীশ (১৭৭০-১৮৩১ খ্রী)। অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান দার্শনিকরূপে খ্যাত। দর্শনেতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্বজনীন দর্শনের (ইউনিভার্সাল ফিলসফি) কথা বলেন। হেগেলের মতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বুদ্ধি বা বিশ্লেষণমূলক বোধ (ইন্‌টেলেক্ট অর অ্যানালিটিক আনডার্‌স্ট্যান্ডিং) অতিক্রম করিয়া দূরকল্পী যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে। এই যুক্তি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে আমরা পরিদৃশ্যমান্‌ জগতের (ফেনোমেনাল ওয়ার্ল্ড) অন্তর্নিহিত পরমভাব (অ্যাবসোলিউট আইডিয়া) বা পরমাত্মার (গড) জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তাঁহার মতে চিন্তা বা প্রজ্ঞা সম্বন্ধে যে ডায়ালেক্‌টিক প্রযোজ্য তাহা বাস্তব (রিয়্যালিটি) সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁহার প্রতিপাদ্য হইল জড়জগৎ, মানব ইতিহাস, নীতি ও ধর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়েই ডায়ালেক্‌টিক্‌ অনুসারে ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। এই বিচারশাস্ত্র অনুসারে জীবজগৎ পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে। এইরূপ ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পরমাত্মা তাঁহার স্বারূপ্য ও পূর্ণতা লাভ করিতেছেন। উত্তরকালে হেগেলপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হইয়া দক্ষিণপন্থী (দি হগেলিয়ান রাইট) এবং বামপন্থী (হেগেলিয়ান লেফ্‌ট) হেগেলবাদীরূপে পরিচিত হন।

হেগেল-প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখ্য হইল ঃ 'Phenomenology of Mind', 'Science of Logic', 'Encyclopeadia of Philosophical Sciences', 'Logic and Philosophy of Mind', 'The outlines of the Philosophy of Right', 'Philosophy of Religion', 'Philosophy of

fine Art', 'The Lectures on the Philosophy of History' এবং 'Life of Jesus'.

সুধীরকুমার নন্দী

হেমচন্দ্র (১০৮৮-১১৭২ খ্রী)। 'দেশীনামমালা'র সুপ্রসিদ্ধ লেখক। বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, জনৈক প্রসিদ্ধ জৈন আচার্য ইঁহার আদি নাম পরিবর্তন করিয়া হেমচন্দ্র নাম দেন এবং কুলপ্রথানুসারে তাঁহার দীক্ষাকার্য সমাধা হয়। হেমচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে চৌলুক্যবংশীয় রাজা কুমারপাল (১১৪৩-১১৭২ খ্রী) তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের সম্মানিত পদ দান করেন। হেমচন্দ্রের প্রভাবে রাজা কুমারপাল জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'ত্রিষষ্ঠিশলাকাপুরুষচরিত্র' (১১৬০-১১৭২ খ্রী), 'পরিশিষ্ট পর্বন্', 'কুমারপালচরিত' বা 'দ্ব্যাশ্রয়কাব্য' (১১৬৩ খ্রী), 'যোগশাস্ত্র', 'অভিধান চিন্তামণি', 'ছন্দোনুশাসন', 'দেশীনামমালা' প্রভৃতি। তন্মধ্যে 'দেশীনামমালা' নানা কারণে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে সর্বসমেত প্রায় চার হাজার শব্দ সংকলিত হইয়াছে। সংস্কৃত টীকায় দেশী শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দও প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহাতে এমন অনেক দেশী শব্দ আছে যেগুলি প্রকৃতপক্ষে তদ্ভব শব্দ। এমন কি কিছু কিছু তৎসম শব্দও এই গ্রন্থে দেশী শব্দের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ধনপাল 'পাইয়লচ্ছী (প্রকৃত লক্ষ্মী) নামমালা' বলিয়া যে প্রাকৃত অভিধান রচনা করেন, হেমচন্দ্র তাঁহার 'দেশীনামমালা' প্রণয়নে তাহার সাহায্য লইয়াছিলেন। বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র কবি-প্রতিভা হইতেও বঞ্চিত ছিলেন না। 'দেশীনামমালা'য় আর্যাছন্দে রচিত যে সমস্ত 'গাথা' আছে তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভারও পরিচয় রহিয়াছে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র কানুনগো বিখ্যাত বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা। 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে ইনি বিগত যুগের বিপ্লব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩ খ্রী) বঙ্গসাহিত্যের স্বনামধন্য কবি। জন্ম: হুগলি জেলার গুলিটা রাজবল্লভহাট গ্রামে। লেখাপড়া কলিকাতায়, হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এ., বি. এল. পর্যন্ত প্রায় সব পরীক্ষাই কৃতিত্বের সহিত পাস করেন। হাইকোর্টে ওকালতির আগে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা ও মুন্সেফি করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে তাঁহার পসার বেশ জমিয়াছিল। হেমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। সমসাময়িক বাঙ্গালী কাব্যরসিকদের কাছে তাঁহার রচনা প্রচুর সাধুবাদ পাইয়াছিল। তিনি 'মেঘনাদবধ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দেন। ইহা হইতে সহজেই তাঁহার কবিখ্যাতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তাঁহার কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর দেশপ্রেমের। হেমচন্দ্রের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃত্রসংহার' (১ম খণ্ড—১৮৭৫ খ্রী; ২য় খণ্ড—১৮৭৭ খ্রী)। এই কাব্যের মহাকাব্যোচিত বিস্তার, বিচিত্র চরিত্র, ঘটনা সমাবেশ, ছন্দের অভিনবত্ব ও লালিত্য, উপমার সুষমা সে যুগের বাঙ্গালীকে রীতিমত মুগ্ধ করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের অপর রচনাগুলির মধ্যে 'আশাকানন' (১৮৭৬ খ্রী), 'ছায়াময়ী' (১৮৮০ খ্রী), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২ খ্রী) বিখ্যাত। 'আশাকানন' সাঙ্গরূপক কাব্য। ইংরেজীতে যাহাকে 'অ্যালিগরি' শ্রেণীর কাব্য কহে, ইহা সেই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। 'ছায়াময়ী' দান্তের 'দিভিনা কম্মেদিয়া' কাব্য অবলম্বনে রচিত ('দান্তে' দ্র)। এই কাব্যের সূচনাটি উজ্জ্বল শব্দ-চিত্রের উদাহরণ। 'দশমহাবিদ্যা'য় পুরাণ অংশ গৌণ, কাব্যাংশ মুখ্য। এই কাব্যের 'রে সতি, রে সতি, কান্দিল পশুপতি পাগল শিব প্রমথেশ' ইত্যাদি ছত্রে কবির ছন্দোনৈপুণ্যের পরিচয় লক্ষণীয়।

হেমচন্দ্র ইংরেজী হইতে কিছু কিছু অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা কিছু লঘু-চালের সাময়িকী কবিতাও আছে। সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে সেগুলিতে তিনি চমৎকার রসসৃষ্টি করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমমূলক-গীতিগুলি সার্থক রচনা। ভাষা-ছন্দের উদ্দীপনাশক্তি ও আবেগ এগুলিকে সার্থক করিয়াছে। 'ভারত-সংগীত' দীর্ঘকাল বঙ্গের জাতীয়-সংগীতের মর্যাদায় আসীন ছিল।

গুরুগম্ভীর আখ্যায়িকা কাব্য, সহজসুরের খণ্ড কবিতা, ওজস্বিনী স্বদেশ-গীতি, লঘু সাময়িকী কবিতা, অনুবাদকর্ম প্রভৃতি হেমচন্দ্রের লেখনীনিঃসৃত হইয়া বিচিত্র রূপ ও রস সৃষ্টি করিয়াছে।

তাঁহার কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'কবিতাবলী'। ছন্দ-ভাব-ভাষা আবেগ সহযোগে এগুলি নানা রসে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত খণ্ড কবিতায় নানা স্থানে ইংরেজী কাব্যের ছায়া লক্ষ্য করা যায় সত্য, তথাপি মাধুর্যের দিক্ দিয়া, রসসৃষ্টির দিক্ দিয়া, সেগুলি সার্থক রচনা তো বটেই, বাংলা সাহিত্যে সেগুলি আজও অম্লান সৌন্দর্যে বিরাজমান।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

হেমন্তকুমার বসু (১৮৯৪-১৯৭১ খ্রী) প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও দেশসেবক। তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানার্কিস্ট্ পার্টির ছাত্র-সদস্য হিসাবে। এই সময় হইতে তিনি রাজনৈতিক জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র বসুর ('সুভাষচন্দ্র বসু' দ্র) সহিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণকার্যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ভলান্টিয়ার কোর-এর জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং হইলে তিনি হন অ্যাডজুট্যান্ট। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং হেমন্তকুমার হন জি. ও. সি. (জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং)। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করিলে ('ফরওয়ার্ড ব্লক' দ্র) তিনি উক্ত দলে যোগ দেন এবং বাংলা প্রাদেশিক শাখার সম্পাদক নির্বাচিত হন। কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি থাকার পর তিনি সমগ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেস-সদস্য হিসাবে অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেস দলের সহিত তাঁহার মতবিরোধ ঘটিলে তিনি কংগ্রেসের সদস্যপদ ও বিধানসভার সভ্যপদ ত্যাগ করেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিধানসভায় যোগ দেন। অতঃপর আরও চারিবার তিনি বিধানসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিনি 'পাবলিক ওয়ার্কস অ্যান্ড হাউসিং'-এর মন্ত্রী হন। কলিকাতার বিধান সরণীতে তিনি আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন (২০ ফেব্রুয়ারি)।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

হেমলতা দেবী (১২৮০-১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রজ্যোতি ও জামাতা শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়; শ্যামলালের পুত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা। বিদ্যাসাগর বংশের সঙ্গেও ইঁহাদের আত্মীয়তা ছিল। জন্ম ঃ কৃষ্ণনগরে, ২৯ পৌষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইনি দ্বিতীয়া পত্নী। তিন মহাবংশের তীর্থবারিস্নাতা হেমলতা ঠাকুর। তিনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পালয়িত্রীরূপে আশ্রমিকগণের নিচু বাংলার 'বড়মা' ছিলেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে বিলেতে গিয়াছিলেন ব্রিস্টলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিমন্দির সন্দর্শন-মানসে। তাঁহার প্রখর স্মরণশক্তি ছিল সংখ্যাহীন স্মৃতিকথার আকর। সুদীর্ঘ জীবনের সত্য ও গভীর অনুভূতিপুঞ্জ তাঁহার সাহিত্য-কৃতিতে সমুজ্জ্বল। কায়-মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন নারী-সমাজের কল্যাণ-ব্রতে। স্বামী, শ্বশুর ও স্নেহভাজন সপত্নী পুত্র দিনেন্দ্রনাথের দেহান্তে শান্তিনিকেতনে নবলব্ধ 'দেহলি' ভবনের স্বত্ব ত্যাগ করেন। কলিকাতার 'সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি'র সম্পাদিকা ছিলেন; পুরীধামে প্রতিষ্ঠিত 'বসন্তকুমারী বিধবাশ্রমে'র ছিলেন পরিচালিকা। জীবন-বৃত্ত পূর্ণ করেন বাঙালী বিধবাগণের ক্লান্তিবিহীন পরিচর্যায়। শ্রীক্ষেত্রে দেহাবসান হয় ৯৫ বৎসর বয়সে ১৩৭৪ বঙ্গাব্দের ১৭ আশ্বিন। তাঁহার রচনাবলী—কবিতা সংগ্রহ ঃ 'জ্যোতি', 'অর্কাল্পতা'; গল্প-সংগ্রহ ঃ 'দুনিয়ার দেনা', 'দেহলি'; নাটিকা ঃ 'শ্রীনিবাসের ভিটা'; শিশু সাহিত্য ঃ 'দুপাতা'; মাসিকপত্র-সম্পাদনা ঃ 'বঙ্গলক্ষ্মী' (প্রথম প্রকাশ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ); প্রবন্ধাবলী ঃ 'কাহার নাম সত্য', 'মেয়েদের কথা', 'সার কথা', 'জল্পনা'; প্রকীর্ণ প্রবন্ধাবলী ঃ 'শ্বশুর-মহাশয়', 'মনের ছবি', 'সংসারী-রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসর', 'পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত' ইত্যাদি।

পঞ্চানন মণ্ডল

হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট্ (১৮৯৯-১৯৬১ খ্রী) প্রথিতযশা মার্কিন সাহিত্যিক, প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প-রচয়িতা। জন্ম ২১ জুলাই। বিদ্যালয় জীবনের অন্তে তিনি 'ক্যানজ্যাস্ সিটি স্টার' পত্রিকায় শিক্ষানবীশ সাংবাদিকরূপে যোগদান করেন। অসাধারণ এক মার্কিন সেবা-সংস্থার সদস্যরূপে তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, ইতালিতে অবস্থিতিকালে তিনি আহত হন, এবং আরোগ্যের পর 'টরন্টো স্টার' পত্রিকায় নিজস্ব সংবাদদাতারূপে ইওরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। 'দি সান্ অল্সো রাইজেস্' (১৯২৬ খ্রী) গ্রন্থের সূত্রে হেমিংওয়ের সাহিত্যিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাজাত উপন্যাস 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'-এ (১৯২৯ খ্রী) তাঁহার যুদ্ধ-সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা বিধৃত হইয়াছে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে হেমিংওয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস 'ফর হুম্ দি বেল্ টোল্স্' (১৯৪০ খ্রী) স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। একমতে এইটিই তাহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ইহার পর তাঁহার গীতিধর্মী অসামান্য উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান্ অ্যান্ড্ দি সী' (১৯৫২ খ্রী) প্রকাশিত হয়। হেমিংওয়ের গল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ 'মেন উইদাউট উইমেন' (১৯২৭ খ্রী), 'উইনার টেক্ নাথিং' (১৯৩৩ খ্রী), 'টু হ্যাভ্ অ্যান্ড হ্যাভ্ নট' (১৯৩৭ খ্রী) ইত্যাদি। স্পেন

দেশের ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই (বুল ফাইট)-এর উপর রচিত 'ডেথ্ ইন্ দি আফটার নুন' (১৯৩২ খ্রী) তাঁহার লেখা একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। 'ফর হুম্ দি বেল টোলস্'-এর নাট্যরূপ 'দি ফিফথ্ কলাম' (১৯৩৮ খ্রী) তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিৎসের পুরস্কার এবং ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'কাহিনী-কলার শ্রেষ্ঠ কারুকার'রূপে নোবেল পুরস্কার দ্বারা তাঁহাকে সম্মানিত করা হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মজীবনী-মূলক রচনা 'এ মুভেবেল ফিস্ট' (১৯৬৪ খ্রী) এবং উপন্যাস 'আইল্যান্ড ইন্ দি স্ট্রীম' (১৯৭০ খ্রী) প্রকাশিত হয়।

সুভদ্রকুমার সেন

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৩ খ্রী) সাহিত্যিক ও সাময়িক-পত্রসেবী। শিশুসাহিত্যিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধ। জন্মস্থান কলিকাতা। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'বসুধা' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৩২২ বঙ্গাব্দে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকা নবকলেবরে প্রকাশিত হইলে হেমেন্দ্রকুমার ইহার লেখকগোষ্ঠীতে যোগদান করেন। সাপ্তাহিক 'নাচঘর' (১৩৩১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকাখানি তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। ইহা ছাড়া 'রংমশাল' প্রভৃতি নানা পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হেমেন্দ্রকুমার চিত্রশিল্পেও নৈপুণ্য দেখান। শিশুসাহিত্য, গল্প ও উপন্যাস ছাড়া কবিতা-নিবন্ধ ও গীতরচয়িতা রূপেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি শিশির-কুমারের 'সীতা' নাটকের নৃত্যপরিচালক ছিলেন। হেমেন্দ্রকুমারের গ্রন্থসংখ্যা অনেক। কেবলমাত্র তাঁহার শিশুসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা ৮০ খানির অধিক। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে 'ভোরের পূরবী' (১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'মালাচন্দন' (১৩২৯ বঙ্গাব্দ), 'মায়াকানন' (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), 'অমাবস্যার রাত' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ), 'অন্ধকারের বন্ধু' (১৩৪৯ বঙ্গাব্দ), 'যাদের দেখেছি' (২ খণ্ড, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ), 'বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ), 'ওমর খৈয়ামের রুবায়ত', 'যাঁদের দেখেছি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

হারাধন দত্ত

হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৩০১-১৩৫০ বঙ্গাব্দ) প্রখ্যাত শিল্পী। জন্ম ময়মনসিংহের গচিহাটা গ্রামে। কলিকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পঞ্চম জর্জের ভারতাগমন উপলক্ষে ঐ কলেজের ছাত্রদের তোরণসজ্জার আদেশ দেওয়া হইলে দেশপ্রেমিক হেমেন্দ্রনাথ আদেশ অমান্য করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন এবং স্বাধীনভাবে শিল্পসাধনায় ব্রতী হন। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রতি-যোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া শিল্পী সমাজে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হন। চিত্রকলার প্রায় সর্ববিভাগেই তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। সদ্যস্নাতা নারীচিত্র অংকনে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'বসুমতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার বহু চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে তিনি পাঞ্জাবের পাতিয়ালা রাজ্যের রাজশিল্পীপদে ব্রতী হন। তাঁহার 'স্মৃতি', 'মানসকমল', 'পরিণাম', 'অনন্তের সুর', 'সাকী', 'কমল না কণ্টক' প্রভৃতি চিত্র সুপ্রসিদ্ধ। 'আর্ট অভ্ এইচ্. মজুমদার', 'শিল্পী', 'ইণ্ডিয়ান মাস্টার' শীর্ষক চিত্র-পত্রিকাসমূহ তাঁহার সম্পাদনা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬-১৯৬২ খ্রী) আদি-নিবাস যশোহর জেলায় চৌগাছা গ্রামে। পিতা গিরীন্দ্র-প্রসাদ। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশুনা করেন। বি. এ. পাশ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। আর. জি. করের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধারমণ করের জ্যেষ্ঠা কন্যা মনোরমার সহিত ঐ বৎসরই তাঁহার বিবাহ হয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কাছে সাংবাদিক জীবনের দীক্ষা। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখের সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদও 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার পরিচালনার সহিত যুক্ত ছিলেন। 'আর্যাবর্ত' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন ১৯১০-১৪ খ্রী)। বেশ কিছুদিন দৈনিক বসুমতীরও সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেসোপোটেমিয়ায় প্রেরিত সাংবাদিক প্রতিনিধি দলে যান। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সাংবাদিকদের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম মহা-যুদ্ধের সঠিক বিবরণ জানিবার জন্য ইংল্যাণ্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে যান। লণ্ডন ইনস্টিটিউট্ অভ্ জার্নালিস্টের সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে বহুগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বিপত্নীক' প্রকাশিত হয়। ইহার পর 'অধঃপতন', 'প্রেমের জয়', 'নাগপাশ', 'মৃত্যুমিলন', 'অদৃষ্টচক্র', 'অশ্রু', 'প্রেমমরীচিকা', 'মুক্তার মালা' প্রভৃতি উপন্যাস এবং অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়। শিশুদের জন্য 'আষাঢ়ে গল্প', ও 'রবিন্সন্ ক্রুসো', নামক দুইখানি বই লেখেন।

তাঁহার 'নবীন জার্মানি' সমকালীন জার্মানির বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি উল্লেখযোগ্য বই।

সুধীর বেরা

হেমেন্দ্রলাল রায় (১৮৯২-১৯৩৫ খ্রী) কবি, গল্প-লেখক ও সাময়িকপত্রসেবী। জন্মস্থান পাবনা জেলার (বাংলা দেশ) ফুলকোচা গ্রাম। পিতা ব্রজদুলালের পাণ্ডিত ও সংগীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি ছিল। হেমেন্দ্রলালের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় সিরাজগঞ্জ বি. এল. স্কুলে, রাজসাহী কলেজে ও সিটি কলেজে। ছাত্রজীবনেই কবিতাদি প্রকাশিত হয়। তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা অধুনা-লুপ্ত 'হিন্দুস্থান' দৈনিকের সহকারী সম্পাদক রূপে। তিনি তাঁহার স্বল্পায়ু-জীবনে বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রের সম্পাদনাকার্যে যুক্ত ছিলেন। 'বাঁশরী', 'মহিলা', 'রাষ্ট্রবাণী', 'উদয়ন' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির সম্পাদনা বিভাগের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রতিষ্ঠিত 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র প্রচার বিভাগে হেমেন্দ্রলালের কর্মনৈপুণ্য বিশেষ স্মরণীয়। দেশসেবা ও খাদির প্রচারকার্যে তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। শেষজীবনে তিনি 'বেঙ্গল কেমিক্যাল'-এর প্রচার-বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলের ব্যথা' প্রকাশিত হয়। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ-গুলিই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাকে যশস্বী করে। গল্পলেখক, শিশুসাহিত্যিক ও নিবন্ধকাররূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার অন্য দুইটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'মায়াকাজল' (১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) ও 'মণিদীপা' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'মায়ামৃগ' (১৩৩২ বঙ্গাব্দ), 'গল্পের ঝরণা' (১৯২৯ খ্রী), 'গল্পের আলপনা' (১৯৩০ খ্রী), 'গল্পের মায়াপুরী' (১৯৩৩ খ্রী), 'পাঁচ সাগরের ঢেউ' (১৯৩৩ খ্রী), 'দুর্গম পথের যাত্রী' (১৯৫৫ খ্রী), 'ছোটদের গল্প সঞ্চয়ন' (১৯৫৬ খ্রী), 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫৬ খ্রী), 'আরব্য উপন্যাস' (১৩৪০ বঙ্গাব্দ) ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজনৈতিক নিবন্ধ গ্রন্থ : 'রিক্ত ভারত' ও 'বিলাতে গান্ধীজী' উল্লেখযোগ্য।

হারাধন দত্ত

হেয়ার, ডেভিড (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রী) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত যে-সমস্ত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, মানবহিতৈষী স্কটল্যান্ডবাসী ডেভিড হেয়ারের নাম তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘড়ির ব্যবসা ও মেরামতি-কার্যে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং ব্যবসাসূত্রে ও স্বাভাবিক মানবপ্রীতিবশতঃ বাঙালী-সমাজের সহিত পরিচিত হন। ঘড়ির কারবারে বিত্তসঞ্চয় করিবার পর গ্রে নামক তাঁহার এক আত্মীয়কে উক্ত ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দেন। কয়লাঘাটার নিকট (আধুনিক হেয়ার স্ট্রীট) তিনি অতি সাধারণভাবে বাস করিতেন। নিজে বিশেষ শিক্ষিত না হইলেও এ-দেশের বাঙালীসমাজের শিক্ষার জন্য তিনি নিদারুণ পরিশ্রম করিয়াছেন, অকাতরে নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বাঙালী ছাত্র ও যুব সমাজ তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে ভক্তি করিত। তিনি ছাত্রসমাজকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহাদের আয়োজিত সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতেন। বন্ধু রাজা রামমোহনের নিকট তিনিই প্রথম কলিকাতায় ইংরেজী স্কুল খোলার প্রস্তাব করেন। শুনা যায় পাশ্চাত্য মহাবিদ্যালয়ের আদর্শে হিন্দু কলেজ স্থাপনার প্রথম পরিকল্পনাও তাঁহার চিত্তেই উদিত হয়। ইহার ফলে বাংলার প্রধান বিচারপতি (১৮১৩-১৮২১ খ্রী) স্যর এডওয়ার্ড ঈস্ট এবং হেয়ার ও তাঁহার বাঙালী বন্ধুদের সাহায্যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় (২০ জানুয়ারি, ১৮১৭ খ্রী)। প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু কলেজ পরিচালক সমিতির তিনি অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং উক্ত কলেজের উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন। 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'স্কুল সোসাইটি'র কর্মোদ্যমের সঙ্গেও তাঁহার বিশেষ সংযোগ ছিল। কলিকাতায় ইংরেজী এবং বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সোসাইটির জন্ম। হেয়ার সাহেব সিমলা স্কুল, আরপুলি স্কুল ও পটলডাঙ্গা স্কুলের প্রতিষ্ঠা-পক, পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পটলডাঙ্গা স্কুলই পরিশেষে হইল 'হেয়ার স্কুল'। প্রধানতঃ দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনাবেতনে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই এই তিনটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে একখানি পাল্কীযোগে কলিকাতা পরিক্রমা করিতেন, হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলি পরিদর্শন করিতেন, ছাত্রসমাজের সংবাদ লইতেন, তাহাদের অভাব-অভিযোগ শুনিতেন এবং দরিদ্রকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। তাঁহার সদা-দর্শ ছাত্রসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের উন্নতির মূলেও তাঁহার যথেষ্ট দান ছিল। মরিশাস (Mauritius) ও বরবনে (Bourbon) প্রেরণের জন্য ধৃত ভারতীয় কুলিদের তিনি আড়কাঠির কবল হইতে রক্ষা করেন। ১ জুন বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর এ-দেশীয় অনুরাগিবৃন্দ তাঁহার মরদেহ হিন্দু কলেজের সম্মুখে (আধুনিক প্রেসি-ডেন্সি কলেজ) সমাহিত করেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায়

উক্ত সমাধির উপরে তাঁহার মর্মরমূর্তি স্থাপিত হয়।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চানন মণ্ডল

হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (১৮৫৭-১৯৩৮ খ্রী) বিখ্যাত অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী। এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান লাভ করিয়া অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে কলিকাতা সিটি কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন; কয়েক বৎসরের জন্য ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষও হইয়াছিলেন। পরে সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া দীর্ঘকাল ছাত্রসমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইংরেজী বিভাগে অধ্যাপনা কার্যের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। শুধু অধ্যাপনা নহে, ইংরেজী ভাষায় রচনাতেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। এমার্সনের উপরে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার প্রতিভার একটি দিক্ অনুদ্ঘাটিত রহিয়া গিয়াছে। বাংলা ভাষায় রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনীর' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং ইহাতে নানা বিষয়ে মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্যরূপে প্রদত্ত তাঁহার বাংলা বক্তৃতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে কংগ্রেস-অধিবেশনে তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা শুনিয়া শ্রোতারা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'দি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এর সম্পাদক রূপে তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ফেলো ও সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রিটিশ এম্পায়ার ইউনিভার্সিটিজ কংগ্রেস-এ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইবার জন্য তিনি কিছুকাল ইওরোপ ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিশুদ্ধ (পিউরিট্যানিক) নীতি ও চরিত্রাদর্শ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিতেন। সুনীতি সম্বন্ধে তাঁহার খ্যাতি বঙ্গদেশে গল্প-কাহিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হেরুক ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের কুলে উদ্ভূত বৌদ্ধ-দেবমণ্ডলীর অন্যতম প্রধান দেবতা হেরুক স্বনামে এবং রূপভেদে হেবজ্র, বুদ্ধকপাল, সম্বর বা বজ্রডাক, মহামায়া, ত্রৈলোক্যাক্ষেপ ও সপ্তাক্ষর নামে আত্মপ্রকাশ করেন। বৌদ্ধ দেবদেবীর পরিচয়-জ্ঞাপক 'সাধনমালা' গ্রন্থে ইঁহাদের সকলেরই ধ্যান আছে। 'সাধনমালা'র ২৪৩ সংখ্যক ধ্যানে হেরুককে 'জগন্নাথ' বলা হইয়াছে। হেরুক বিঘ্ননাশী এবং ভক্তকে বুদ্ধত্ব পর্যন্ত দানে সমর্থ। চীন, তিব্বত ও নেপালে হেরুক জনপ্রিয়, বঙ্গদেশের নানা স্থানেও একমুখ ও দ্বিভুজ হেরুকের অথবা তাঁহার আট অবধি মুখ এবং ষোল অবধি হাতযুক্ত হেবজ্রাদি রূপ-ভেদের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। 'হেরুকতন্ত্র' ইঁহার সম্পর্কে তন্ত্রগ্রন্থ। ইনি করুণাময় কিন্তু আকৃতিতে অতি ভয়ঙ্কর। তিনি নীলবর্ণ, রক্তচক্ষু, করালদ্রংষ্ট্রী, মনুষ্যচর্ম পরিবৃত, ভস্মাস্থিভূষিত। হস্তে তাঁহার শোণিতপূর্ণ নরকপাল। মুখের স্নিগ্ধ হাসির রেখাটুকুই যেন তাঁহার করুণাময়তার আভাস। রূপভেদেও হেরুকের এই মূল আকৃতি-প্রকৃতির বিশেষ প্রভেদ নাই। হেরুককে এককরূপে শবোপরি অর্ধপর্যঙ্কাসন নৃত্য-ভঙ্গিতে এবং ত্রৈলোক্যাক্ষেপ, হেবজ্র, সম্বর প্রভৃতি রূপ-ভেদে আপন শক্তির সহিত যুগনদ্ধ বা দৃঢ়-আলিঙ্গিত অবস্থায় দেখা যায়।

শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক ভীষণমূর্তি দেব এবং বজ্রযানের প্রধান উপাস্য। ইনিই বিন্দু বা বোধিচিত্ত বা করুণা। চর্যাগীতিতে হেরুকের উল্লেখ আছে—'বাজই অলো সহি হেরুঅ (∠ হেরুক) বীণা', অর্থাৎ (চর্যাকার) বীণায় 'হেরুক' এই কথাটি বাজায় (১৭ সংখ্যক চর্যা)। এই বাদনের ফলে 'সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা', অর্থাৎ শূন্যতা-রূপ তন্ত্রীধ্বনি করুণায় ব্যাপ্ত হইতেছে। ভাষা-বিজ্ঞানীদের মতে হেরুক শব্দটি এইভাবে আসিয়াছে ঃ হেরুক ∠* ভেরুক = ভৈরব(ক)।

হেরোডোটাস্ (আনু. খ্রী. পূ. ৪৮৪-৪২৫) গ্রীক ঐতিহাসিক ও 'ইতিহাসের জনক' বলিয়া খ্যাত। জন্মস্থান সে সময় পারস্যের অধীন এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত Halicarnassus শহরে। পিতা Lyxes, মাতা Rhaeo বা Dryo । হেরোডোটাস দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন (আনু. খ্রী. পূ. ৪৬৪-৪৪৭)। ভ্রমণশেষে (আনু. খ্রী. পূ. ৪৪৭) তিনি এথেন্স শহরে চলিয়া আসেন এবং সেখানে রীতিমত সমাদরও পান। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার স্থান পরিবর্তন করিয়া দক্ষিণ ইতালির থুড়ি অঞ্চলে গিয়া শেষ বাস করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে এবং সাহিত্য-জগতে হেরোডোটাসের দান অসাধারণ। তাঁহার 'ইতিহাস' শুধুমাত্র প্রাচীন জগতের প্রথম ইতিহাস হিসাবেই অমূল্য নয়। ইহা পৃথিবীর সাহিত্যে প্রাচীনতম গদ্য রচনারও অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতি। তাঁহার গ্রন্থের প্রথম অংশ সম্পূর্ণভাবে গ্রীস ও পারস্যসাম্রাজ্যের ভূগোল ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কেই লেখা। দ্বিতীয় অংশটিতে আছে গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাস। হেরোডোটাস্ তাঁহার গ্রন্থের নাম 'ইতিহাস' দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার মতে ইহা প্রশ্নাবলী মাত্র এবং ইহার নাম হওয়া উচিত 'হেরোডোটাসের প্রশ্নাবলী'। হেরোডোটাসের তথ্যের প্রধান এক অংশ স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে গৃহীত। কিংবদন্তীর ভিত্তিতে তিনি অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছেন। প্রায়ই লিখিয়াছেন 'যতদূর শুনিয়াছি' (অ্যাজ আই ওয়াজ টোল্ড)। তাঁহার ইতিহাসে ভুল-ভ্রান্তি আছে, সন্দেহ নাই। তথাপি প্রাচীনযুগের ইতিহাস হিসাবে ইহা খুবই মূল্যবান্।

উমা দাশগুপ্ত

হেলিওদোরস্ মধ্যপ্রদেশের ভিলসার নিকটস্থ বেশনগরে প্রোথিত একটি গরুড়-ধ্বজ-স্তম্ভে উৎকীর্ণ লেখনে তক্ষশিলারাজ অন্তিঅলিকিত (Antialkidas) ও তাঁহার দূত হেলিওদোরস্ (Heliodorus) অমর হইয়া আছেন। ইহাতে লিখিত আছে যে, তক্ষশিলাবাসী দিয়নের পুত্র হেলিয়দোরস্ 'মহারাজ অন্তিলিকিত' কর্তৃক [বিদিশার] 'রাজা ত্রাণ-কর্তা কৌৎসীপুত্র ভাগভদ্রে'র সভায় দূত হিসাবে প্রেরিত হন এবং হেলিওদোরস্ ভাগবতধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভাগভদ্রের রাজ্যের চতুর্দশ বর্ষে স্তম্ভটি স্থাপন করেন। বিদেশীয়ের পক্ষে ভারতীয় ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের- ইহাই বোধহয় প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

অমরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

হেস্টিংস্, ওয়ারেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠার মূলে যে সমস্ত ইংরেজ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। প্রথমে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হইয়া ভারতে (কলিকাতায়) আসেন (১৭৫০ খ্রী)। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলায় নিদারুণ বিশৃংখলা ও অরাজকতা দেখা দিলে কোম্পানি তাঁহাকে বঙ্গদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেন (১৭৭২ খ্রী)। গভর্নর হইয়াই তিনি দেশের শাসনকার্যের অনেক সংস্কার করেন। বাংলা দেশকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করিয়া তিনি প্রতি জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রতি জেলায় একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। এই কর্মচারীটিই দেওয়ানী আদালতের বিচারকার্যও করিতেন। ফৌজদারী আদালতে পূর্বের ন্যায় এদেশীয় লোকেরাই বিচার করিতেন। কিন্তু কলিকাতায় দুইটি আপিল আদালত স্থাপিত হইল—দেওয়ানী বিচারের জন্য সদর দেওয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী বিচারের জন্য সদর নিজামৎ আদালত। গভর্নর নিজে সদর দেওয়ানী আদালতের অধ্যক্ষতা করিতেন। হেস্টিংস্ গভর্নর হইয়াই দেখিলেন যে, রাজকোষ শূন্য এবং কোম্পানি ঋণজালে জড়িত। তাঁহার চেষ্টা ও কৌশলে অনতিবিলম্বে কোম্পানির অর্থসংকট দূর হইল। এই সময় বিলেতে নূতন এক আইন পাশ হইল। ইহার নাম 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' (১৭৭৩ খ্রী)। এই আইনের বলে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলায় তিনজন গভর্নর থাকিলেও সমগ্র ভারতে ইংরেজ-অধিকৃত স্থানগুলির শাসনভার একজন বড়লাট (গভর্নর জেনারেল) ও চারিজন সদস্যযুক্ত একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত হইল। হেস্টিংস্ এইবার বড়লাট নিযুক্ত হইলেন (১৭৭৪ খ্রী)। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধি তো দূরের কথা তিনি পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। কারণ তাঁহার শাসন-পরিষদের চারিজন সদস্যের মধ্যে যে তিনজন বিলেত হইতে আসিলেন তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন এবং ভোটের আধিক্য থাকায় তাঁহারা নানা বিষয়ে হেস্টিংসের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের মত অনুসারে ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এই সময় মারাঠাদের সহিত ইংরেজের যুদ্ধ বাধিল। ইহা প্রথম মারাঠা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হেস্টিংস্ বঙ্গদেশ হইতে সুদূর বোম্বাই প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং কূটনীতি অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন। মারাঠা যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই মহীশূরের অধিপতি হায়দার আলীর সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিল। ইহা দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হেস্টিংসের বুদ্ধি, কৌশল, উদ্যোগ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে মহীশূরের যুদ্ধেও শেষপর্যন্ত ইংরেজরা রক্ষা পাইল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধের খরচ চালাইবার জন্য হেস্টিংস্ কতকগুলি গর্হিত কার্য করিলেন। বারাণসীর সামন্ত রাজা চৈৎসিংহের প্রতি অন্যায় জুলুম করিয়া তিনি বহু অর্থ আদায় করেন এবং অবশেষে তাঁহার অন্যায় ও অসঙ্গত দাবি মিটাইতে অসমর্থ হওয়ায় চৈৎসিংহকে তিনি নিজের প্রাসাদে বন্দী করেন। ইহাতে বারাণসীতে বিষম বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং চৈৎসিংহ পলাইয়া যান। ইহার শাস্তিস্বরূপ চৈৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। অযোধ্যার বেগমগণকে যে-ভাবে নির্যাতিত

করিয়া হেস্টিংস্ অযোধ্যার নবাবের নিকট প্রাপ্য টাকা আদায় করেন তাহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। মহারাজা নন্দকুমার কাউন্সিলে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করেন। ইহার ফলে জাল করার অভিযোগে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। এই জালের মোকর্দমায় যে হেস্টিংসের যথেষ্ট হাত ছিল এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পে যে হেস্টিংসের সহিত বন্ধুতার খাতিরেই অবিচার করিয়া নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন—ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত। হেস্টিংস্ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া বিলেত যান। সেখানে তাঁহার দুর্নীতিমূলক কাজগুলির জন্য পার্লামেন্টের 'হাউস অভ্ লর্ডস'-এ তাঁহার বিচার হয়। বার্ক, শেরিডন, ফক্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মীরা তাঁহার বিরুদ্ধে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সাত বৎসর ধরিয়া এই বিচার চলে ; কিন্তু অবশেষে হেস্টিংস্ নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। হেস্টিংস্ প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনে সহায়তা করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

হো অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর এক বিশেষ শাখার ভাষা এবং ছোটনাগপুরের একটি আদিবাসী উপজাতি। পশ্চিমবাংলায় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী এই আদিবাসীদের সংখ্যা ১০৭৫ মাত্র। ইহাদের ভাষার নামও 'হো'। সিংভূমের কোলহান অঞ্চল হো-প্রধান। অনেকে ইহাদের 'লড়কা-কোল' বলিয়াও অভিহিত করেন। অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভারতীয় শাখা হইতে নির্গত কোলমুণ্ডা শাখার পূর্ব উপশাখার ভাষা হো, (এবং সাঁওতালী প্রভৃতি)। সাঁওতালীর সহিত তুলনা করিলে দেখা যায়, হো-তে শব্দান্তের ব্যঞ্জনবর্ণ 'ড়' লুপ্ত হইয়াছে। যেমন হড় হ বা হো। কোড়া কোয়া : কুঁড়ি কুই, ইত্যাদি। হো-রা কৃষিজীবী, খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরগুলিকে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকটা ভাগে ভাগ করে। একটি ঘরে মাটির বেদী থাকে, তাহার নাম আদিং। ইহাদের বিশ্বাস পূর্বপুরুষের আত্মা ইহাতে থাকে। চাষের যন্ত্রপাতি ছাড়া কিছু কিছু শিকারের উপকরণ ইহারা রাখে। ইহাদের সমাজে অনেক গোত্র আছে ; সেগুলিকে তাহারা 'কিলি' বলে। ইহাদের মধ্যে স-গোত্রে বিবাহ করা নীতিবিরুদ্ধ। হো-দের মধ্যে নানা উৎসব বা পূজাপার্বণ প্রচলিত আছে। সিং বোঙ্গা, 'মারংবুরু' পূজাছাড়া সারহুল পরবে বুড়াবুড়ির আরাধনা হয়। গ্রাম দেবতা বা গরামের পূজায় মোরগ ও ছাগল বলি দেয়। মাঘ মাসে মাঘ পরব ও চৈত্রমাসে চৈতপরব হয়। আজকাল ইহাদের অনেকেই খ্রীষ্টান হইয়াছে।

প্রবোধকুমার ভৌমিক
সুহৃদকুমার ভৌমিক

হোমার (আনু. খ্রী. পূ. ৯ম শতাব্দী) সুপ্রাচীন গ্রীক কবি। গ্রীক ভাষায় রচিত 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুইটি ইঁহার রচনা বলিয়া কথিত হয়। ইনি অতি প্রাচীন সাহিত্যের রচয়িতা ও ইওরোপের আদি কবি রূপে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, ইলিয়ডে হোমার ট্রয়ের যুদ্ধের প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যান ও গাথাগুলি গ্রন্থন করিয়া তাহাদের একটি সুসংবদ্ধ রূপ দিয়াছেন মাত্র।

হোমার সম্বন্ধে, এমন কি তাঁহার জন্মস্থান বা জন্মকাল সম্বন্ধেও সঠিক কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, হোমার নামে কেহ কখনও ছিলেন না। সাতটি বিভিন্ন শহর (এই নামের মধ্যেও আবার বিভিন্নতা আছে) তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া দাবি করা হয়। গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্ ('হেরোডোটাস্' দ্র) তাঁহাকে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। অনেকের ধারণা হোমারের মহাকাব্য প্রথমে লোকে মুখে মুখে আবৃত্তি করিত, পরে তাহা লিখিতরূপ গ্রহণ করে।

ট্রয়ের রাজা প্রায়মের পুত্র প্যারিস, স্পার্টার রাজা মেনিলিয়সের স্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে হেলেনকে পুনরুদ্ধার করার জন্য গ্রীকরা আর্গসের রাজা মেনিলিয়সের ভ্রাতা অ্যাগামেমননের নেতৃত্বে ট্রয় অবরোধ করে। দশ বৎসরের এই অবরোধ ও যুদ্ধের শেষ কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলী, বিশেষ করিয়া একিলিসের সহিত অ্যাগামেমননের বিবাদ ও তজ্জনিত একিলিসের ক্রোধ ও পরে বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একিলিসের যুদ্ধে যোগদান ও তৎকর্তৃক হেক্টর বধ প্রভৃতি লইয়া 'ইলিয়ডে'র বিষয়বস্তু গঠিত। 'ইলিয়ডে'র কাহিনী বিয়োগান্তক।

ট্রয়ের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সঙ্গীদের সহিত ইথাকার রাজা ওডিসিউস্ (ইউলিসিস্)-এর নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ 'ওডিসি'র বিষয়বস্তু। 'ওডিসি'র পরিশেষ আনন্দময়। 'ইলিয়ডে' দেখা যায় দেবতারা সাধারণতঃ উন্নত চরিত্রের মানুষ মাত্র। এই কাব্যে ট্রয়ের যুদ্ধে তাঁহারা বিভিন্ন পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। জীয়ুসের দেবরাজত্ব তখনও পর্যন্ত সন্দেহাতীত ভাবে স্বীকৃত নয়। ইহা ছাড়া 'ইলিয়ডে' দেখা যায়, ভূমি সমাজের যৌথসম্পদ, সমষ্টিগত ভাবে ইহার চাষ হয়। কিন্তু 'ওডিসি'তে জীয়ুস পুরাপুরি দেবরাজরূপে স্বীকৃত এবং ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইয়াছে। দুইটি

কাব্যে বর্ণিত সমাজের চিত্রে এই সকল ও অন্যান্য পার্থক্যের জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, ইলিয়ডের অনেক পরে 'ওডাস' রচিত হইয়াছে এবং এই কাব্যদ্বয়ের রচয়িতা হয় দুই বিভিন্ন ব্যক্তি, নয় তাহারা একই লেখকের জীবনের দুই প্রান্তের রচনা। এই বিষয়ে আধুনিক মত এই যে, এই দুই কাব্য একই লেখকের রচনা। এই উভয় মহাকাব্যই চব্বিশটি সর্গে বিভক্ত।

হোমার অন্ধ ছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ইহা সত্য হইলে জীবনের শেষ দিকে তিনি দৃষ্টি হারাইয়া থাকিতে পারেন; কেননা, তাহার কাব্যে গীত, রূপ ও রেখার সৌন্দর্যে সচেতনতা ও আনন্দের অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার বর্ণনায় সজীবতা ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্য চিত্তাকর্ষক।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

হোমিওপ্যাথি ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ডাক্তার হ্যানিমান কর্তৃক 'সদৃশ বিধান'মতে প্রবর্তিত চিকিৎসা-প্রণালী। Cullen's Materia Medica অনুবাদ করিবার সময় (১৭৯০ খ্রী) ডাঃ হ্যানিমান দেখিলেন যে, সুস্থ শরীরে সিংকোনা ছাল সেবন করিলে এক প্রকার কম্পজ্বর হয়, আবার সিংকোনা ছালই কম্পজ্বরের প্রধান ঔষধ। তিনি ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, ঔষধের পরিমাণ যতই স্বল্প হয় ততই তাহার আরোগ্য করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসামতে চিকিৎসকের কর্তব্য হইতেছে রোগীর চিকিৎসা করা—রোগের নহে। সেইজন্য রোগীর চরিত্রগত লক্ষণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য জানা বিশেষ প্রয়োজন। রোগ নিরাময় করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মমাত্রায় ঔষধপ্রয়োগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার অভিনবত্ব। এই চিকিৎসা-পদ্ধতির মূলে রহিয়াছে 'Similia Similibus Curantur' বা সদৃশ বিধানমতে ঔষধ প্রয়োগের যুক্তি। ইহার অর্থ হইতেছে এই, যে-গুণবিশিষ্ট ঔষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে রোগবিশেষের লক্ষণ উৎপত্তি হয়, সেই রোগ সেই গুণবিশিষ্ট ঔষধদ্বারা প্রশমিত হয়। পরীক্ষিত ঔষধ অল্পমাত্রায় সেবন করিলে অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। এই চিকিৎসার নিয়মাবলী-সম্বলিত প্রধান গ্রন্থ 'অর্গানন' (Organon) ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেস্ডেন শহরে প্রথম প্রচারিত হয় এবং ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে হোমিওপ্যাথি-মতে ভেষজ পরীক্ষায় প্রমাণিত ঔষধের প্রথম 'মেটিরিয়া মেডিকা পুরা' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ('হ্যানিমান' দ্র)। হ্যানিমান ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিলেন 'পুরাতন রোগ ও তাহার চিকিৎসা-প্রণালী' নামক গ্রন্থ। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, কতকগুলি কঠিন রোগের বিষক্রিয়া সুস্থ মানবদেহে প্রবেশ করিলে বা অন্তর্নিহিত থাকিলে পুরাতন রোগের সূচনা হয়। এই সকল বিষক্রিয়া এককভাবে কিংবা মিলিতভাবে জীবনী শক্তিকে আক্রমণ করিয়া সুস্থ মানবদেহে মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটাইয়া রোগ-লক্ষণ প্রকাশ করে। তাঁহার মতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নিয়মাবলীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন—সমমানের সূক্ষ্ম ঔষধ যাহা সুস্থ মানবদেহে সমপর্যায়ের রোগ-লক্ষণ সৃষ্টি করিতে পারে। ২. ঔষধের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহাকে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করা যাইবে ততই তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি বাড়িয়া যাইবে এবং তাহার দ্বারা রোগ-নিরাময়ের শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে। ৩. মানবদেহে আক্রমণকারী রোগগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: ক. তরুণ রোগ (অ্যাকিউট ডিজিজেস), খ মহামারী (এপিডেমিক ডিজিজেস) ও গ. পুরাতন রোগ (ক্রনিক ডিজিজেস)। হ্যানিমান বলেন—প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে রোগ নিরাময় করিবার সকলপ্রকার শক্তি এবং এই ঔষধ-শক্তি আহরণের ক্ষেত্র চারিটি—খনিজদ্রব্য, উদ্ভিদ্‌জগৎ, জীবজগৎ এবং রোগ-বীজাণু।

হোমিওপ্যাথি-মতে রোগসৃষ্টি ও তাহার চিকিৎসার যেমন নিয়মধারা আছে, সেইরূপ রোগ আরোগ্যেরও নিয়মধারা (ল অভ কিওর্স্) আছে। আরোগ্যের নিয়মধারাগুলি এইরূপ: ১. রোগ আরোগ্যের লক্ষণ ভিতর হইতে বাহিরে প্রকাশ পাইবে (Symptoms disappear from within outward); ২. আরোগ্যের সময় রোগ-লক্ষণ উপর হইতে নীচের দিকে পরিচালিত হইবে (Symptoms disappear from above downwards); ৩. রোগ আরোগ্যের গতিপথ আক্রমণের গতিপথের ঠিক বিপরীতগামী (Symptoms disappear in the reverse order of their coming)

হরপ্রসাদ চৌধুরী

হোয়সাল ইতিহাসে ইঁহারা হোয়সাল, হয়শাল, হোয়-সান, পয়শাল, পয়শণ প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইঁহারা নিজদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইঁহাদের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ কল্যাণের চালুক্যবংশের (ওয়েস্টার্ন চালুক্য) অথবা চোল সম্রাট্‌গণের সামন্ত-রূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ 'সাল' নামক কোনও ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী ইঁহাদের সমৃদ্ধিকাল। বিষ্ণুবর্ধন (আনু. ১১১০-১১৪০ খ্রী) এই বংশের প্রধান নৃপতি। যদিও তিনি কখনও স্বাধীন

নরপতির উপাধি ব্যবহার করেন নাই, তথাপি তিনি অনেক যুদ্ধে বিজয়লাভ করেন। তিনি চোল, মাদুরার পান্ড্য, গোয়ার কদম্বগণ প্রভৃতিদের নতি স্বীকার করান। সর্বশেষ তলকান (Talakad) সমরাঙ্গনে তিনি গঙ্গদের পরাজিত করিয়া হয়শাল রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বিজয়ের ফলে দ্বারসমুদ্রের হয়শাল রাজবংশ বেশ একটি নাতিবৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। ১১৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুবর্ধন মালাবার দেশের পেরুমলদের ধ্বংস করিয়া দাক্ষিণ কর্ণাটে গিয়া কোয়েম্বাটুর জয় করেন। উত্তরে তাঁহার বিজয়-বাহিনী বর্তমান মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া কাঞ্চীনগর অবরোধ করে। ধীরে ধীরে তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা কৃষ্ণাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। বিষ্ণুবর্ধনের পর তাঁহার পুত্র প্রথম নরসিংহ দ্বারসমুদ্রের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। অতঃপর তুর্কবাহিনী যখন দেবগির হইতে যাত্রা করিয়া দ্বারসমুদ্র অবরোধ করে (আনু. ১৩১৫ খ্রী), তখন হয়শাল সিংহাসনে তৃতীয় বীর বল্লাল সমারূঢ়। তিনি নতি স্বীকার করিয়া দ্বারসমুদ্রের তোরণ মালিক কাফুরের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেন। অনন্তর খলজী সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পরে ইহান (তৃতীয় বীর বল্লাল) দাক্ষিণাপথের হিন্দু নরপতি-গণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া সমস্ত কর্ণাট ও তামিল-নাড়ু জয় করেন। কেবল মাদুরা তখন মুসলমানদের দখলে ছিল। ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদুরার সুলতান তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। ইঁহার রাজ্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়শাল রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। হয়শাল রাজবংশ ভারতের অন্যান্য প্রাচীন রাজবংশের ন্যায় সাহিত্য, কলা, সংগীত ও নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হগ, স্যর স্টুয়ার্ট সন্ডার্স (১৮৩৩-?) কলিকাতায় জন্ম। পিতা স্যর জেম্‌স্ হগ কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার (১৮২২-৩৩ খ্রী), ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর (১৮১৯ খ্রী) প্রভৃতি পদে ছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্টুয়ার্ট হগ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টে নিযুক্ত হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে পাঞ্জাবে দক্ষতার পরিচয় দেন। পরে বদলি হইয়া বাংলা সরকারে যোগ দেন ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হন। ১৮৬৩-৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতার পৌরসভার চেয়ারম্যান-পদে থাকার সময়ে কলিকাতার পৌরব্যবস্থা ও নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি সাধন করেন। কলিকাতার সুরম্য ও অভিজাত বাজার 'হগ মার্কেট' তাঁহার নামাঙ্কিত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'নাইট্‌হুড' লাভ করন।

মদনমোহন কুমার

(অনবধানবশতঃ উপরি-উক্ত প্রসঙ্গটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হয় নাই। ইহা 'হক, ফজলুল আবুল কাশেম'—প্রসঙ্গের পরে বসিবে।)

হোলকার মলহর রাও হোলকার ইন্দোরের হোলকার শাসক বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জায়গীর প্রথার ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যে যে পাঁচটি অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ইন্দোর অন্যতম। পেশোয়ার অধীনে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য মলহর রাও মালবের একাংশ প্রাপ্ত হন; ইহার ফলে ইন্দোরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ঐ বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। মলহর রাও ছিলেন বীর যোদ্ধা, অভিজ্ঞ সেনাপতি, এবং মারাঠা সাম্রাজ্যে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। কিন্তু সিন্ধিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধের ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি বিনষ্ট হয়।

১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র খন্ডে রাওয়ের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল (১৭৫৪ খ্রী)। এখন খন্ডে রাওয়ের পুত্র মালে রাও ইন্দোরের শাসক হইলেন; কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য। পরের বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মাতা অহল্যাবাঈ ইন্দোরের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন ('অহল্যাবাঈ' দ্র)। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অহল্যাবাঈ-এর মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রধান সেনাপতি তুকোজি হোলকার প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে ইন্দোরের শাসক হন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তুকোজির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র কাশি রাও, সিন্ধিয়ার সহায়তায় ও পেশোয়ার সমর্থনে, পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু পরে তাঁহার ভ্রাতা যশোবন্ত রাও তাঁহাকে হত্যা করিয়া এবং সিন্ধিয়া ও পেশোয়াকে পরাজিত করিয়া ইন্দোরের শাসনক্ষমতা অধিকার করেন (১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ)।

অতিরিক্ত রাগী ও পানাসক্ত হইলেও যশোবন্ত রাওয়ের বীরত্ব, দৃঢ়তা ও সময়োপযোগী নেতৃত্বের ক্ষমতা তাঁহাকে সাময়িকভাবে জয়ের পথে লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শাসকরূপে তাঁহার তেমন যোগ্যতা ছিল না। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হইলে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে হোলকার রাজ্যও ইংরেজ-কর্তৃক আক্রান্ত হইল এবং যশোবন্তের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। শেষপর্যন্ত তিনি ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে উন্মত্ততা সহ মৃগী-রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে

তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার নাবালক পুত্র দ্বিতীয় মলহর রাও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধে দ্বিতীয় মলহর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যোগ দিয়া মাহিদপুরের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। অতঃপর তাঁহাকে ইংরেজের প্রাধান্য মানিয়া লইতে হয় এবং ইন্দোরে ব্রিটিশ 'রেসিডেন্সি' স্থাপিত হয়।

যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী

হোলি দোল দ্র

হ্বিন্‌টের্নিৎস, মোরিৎস (M. Winternitz, ১৮৬৩-১৯৩৭ খ্রী) বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত। প্রাগে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার রচিত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস (জার্মান ভাষায়, তিন খণ্ডে) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সর্ববৃহৎ এবং প্রামাণিক ইতিহাস। ১৯২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিশ্বভারতীতে অতিথি অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

সুকুমার সেন

হেবের, আলব্রেখ্‌ট্‌ ফ্রীড্‌রীখ্‌ (Albrecht Friedrich Weber, ১৮২৫-১৯০১ খ্রী)। তিনি ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে জীবনান্তকাল পর্যন্ত বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকপদে নিযুক্ত থাকেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নাম দিয়া সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশ করেন (Akademische-Vorlesungen Uber Indische Literatur-geschichte, ১৮৫২ খ্রী)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ভাষায় রচিত এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে, ইহার ইংরেজী অনুবাদ 'হিস্ট্রি অভ্‌ ইন্ডিয়ান লিটারেচার' আখ্যায় লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (১৮৭৮ খ্রী)। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হেবের শুক্ল যজুর্বেদের একটি সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন ; ইহার শেষ খণ্ডটি দশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। প্রাকৃত ভাষায় রচিত হালের 'গাথা সপ্তশতী' ('গাথা সপ্তশতী' দ্র) গ্রন্থটি তৎকর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হয় (১৮৭২ খ্রী)। প্রাকৃত ভাষা ও জৈনধর্ম চর্চার ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃৎ-রূপে গণ্য। বার্লিনের সরকারি গ্রন্থশালায় রক্ষিত বহু সহস্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থের তালিকা প্রণয়ন করিয়া তিনি পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত ও প্রাকৃত চর্চার পথ প্রশস্ত করেন। 'Indische Studien' নামে একটি ভারতবিদ্যা-বিষয়ক পত্রিকা পরিচালনা করেন (১৮৫০-৮৫ খ্রী) ; ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত এই পত্রিকার অধিকাংশ নিবন্ধই তিনি স্বয়ং লেখেন। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত বা অনূদিত গ্রন্থের মধ্যে 'মালবিকাগ্নিমিত্র' (কালিদাস), 'বজ্রসূচী' (অশ্বঘোষ), 'শতপথ ব্রাহ্মণ' 'তৈত্তিরীয় সংহিতা' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

পরিশিষ্ট

নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি যথাস্থানে মুদ্রিত না হওয়ায় ভারতকোষের তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পঞ্চম খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

ঘনীভবন বায়ুতে সব সময়েই এবং সর্বত্র বিভিন্ন পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকে। এক ঘনফুট বায়ু কতখানি বাষ্প ধারণ করিতে পারে তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বায়ুর উষ্ণতার উপর। বায়ু যখন শীতল হয় তখন তাহার জলীয় বাষ্প ধারণের ক্ষমতা কমিতে থাকে। নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যখন তাহার ক্ষমতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ পরিমাণ জলীয় বাষ্পকণা ধারণ করে তখন তাহাকে সম্পৃক্ত বায়ু বলা হয় এবং যে-উষ্ণতায় বায়ুর সম্পৃক্তি ঘটে তাহাকে শিশিরাঙ্ক (ডিউ পয়েন্ট) বলে। বায়ু যদি শিশিরাঙ্ক অপেক্ষাও শীতল হয় তাহা হইলে ঘনীভবন ঘটে এবং ঐ উষ্ণতায় যে-পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ু ধারণ করিতে পারে তাহার অতিরিক্ত বাষ্প শিশির, কুয়াশা, তুহিন, বৃষ্টি বা তুষারের আকারে ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে। ঘনীভবনের সময় বায়ুর উষ্ণতা ০°সে. গ্রে.-এর উপরে থাকিলে দেখা দেয় কুয়াশা, শিশির, মেঘ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ইহা ০°সে. গ্রে.-এর নীচে থাকিলে তুহিন বা তুষার-পাত ঘটে। বায়ু শীতল হয় তিনটি প্রধান কারণে। প্রথমতঃ, রাত্রিবেলা ভূপৃষ্ঠ উপরিভাগের বাতাসের তুলনায় দ্রুততর গতিতে শীতল হয়। এই অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত বায়ুর উষ্ণতা বিকিরণ (রেডিয়েশন) ও পরিবহণের (কনডাক্‌শন) কারণে ক্রমশঃ কমিতে থাকে; শীতকালে রাত্রিতে পরিষ্কার আকাশের নীচে ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি ভিন্ন তাপ বা আর্দ্রতা-সম্পন্ন বাতাসের সংমিশ্রণ হইলে অপেক্ষাকৃত লঘু বায়ুস্তরের উষ্ণতা কমিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, বাতাস ভূপৃষ্ঠ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার সময় শীতল হয়। প্রথম দুইটি অবস্থায় বায়ুর ঘনীভবন ঘটে সীমাবদ্ধভাবে, বিশেষ করিয়া ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুর সংযোগস্থলে। ব্যাপক ঘনীভবন হয় তৃতীয় অবস্থায়। ঘনীভবনের আংশিক কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, বায়ুতে মিশ্রিত জলকণা, যাহা সম্পৃক্তির পূর্ব পর্যন্ত বাষ্পের আকারেই থাকে, তাহার উষ্ণতা হিমাঙ্কের নীচে নামিলে, বাষ্প হইতে সরাসরি ইহা অতরল বা কঠিন অবস্থায় পরিবর্তিত হইয়া ঘনীভবন ঘটায়। তবে জলীয় বাষ্পের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধযুক্ত কিছু কিছু বিশেষ ধরনের বস্তুর কণা হইতেছে সার্থক ঘনীভবনের বাহক, যেমন, সমুদ্র হইতে বাষ্পের সহিত উত্থিত লবণের কণা, কয়লা ও তেলের দ্বারা সৃষ্ট ধূম, ইত্যাদি। ঘনীভবন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ইহার প্রাথমিক পর্যায়ে হাল্‌কা কুয়াশার সৃষ্টি হয় (হেজ)। আপেক্ষিক আর্দ্রতা (অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুতে প্রকৃত আর্দ্রতা [অ্যাবসোলিউট হিউমিডিটি]-র সহিত উহার সম্পৃক্ত অবস্থার আর্দ্রতার অনুপাত) যখন সম্পৃক্তির নিকটবর্তী হইতে থাকে তখন বায়ুতে অবস্থিত জলকণা দ্রুতগতিতে আকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই সময় ভূপৃষ্ঠের অনতিউচ্চে বায়ুর বিকিরণ, পরিবহণ বা ভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতা-সম্পন্ন বাতাসের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়া, কুয়াশা সৃষ্টি হয়। এই কুয়াশা আসলে মেঘেরই প্রকারান্তর। কুশায়া প্রধানতঃ দুই প্রকারের—বিকিরণ-সৃষ্ট স্থাণু কুয়াশা এবং বায়ুপ্রভাবে সঞ্চারিত তাপের ফলে সৃষ্ট অনুভূমিক কুয়াশা। বিকিরণ-সৃষ্ট স্থাণু কুয়াশার জন্য প্রয়োজন একদিন পূর্বে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত এবং কোন অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি বা উপত্যকায় অত্যধিক শীতল বাতাসের কেন্দ্রীভবন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ভূপৃষ্ঠের বায়ু উত্তপ্ত বা শুষ্ক হইতে পারে না। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইলে বায়ু যথেষ্ট পরিমাণে আর্দ্র থাকিয়া কুয়াশা সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে। বিকিরণ কুয়াশার আয়ু নিতান্তই স্বল্প। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে জমাট বাঁধিতে থাকে এবং সূর্যোদয়ের পরে নিশ্চিহ্ন হয়।

দ্বিতীয় প্রকার কুয়াশা প্রধানতঃ গ্রীষ্মকালে সমুদ্র বা বৃহৎ হ্রদ অঞ্চলে এবং শীতকালে দেশের অভ্যন্তর ভাগে দেখা যায়। তাহার কারণ শীতকালে ভূভাগের উপরে এবং গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে, অনুভূমিক তাপের বিতরণে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাসের একটি বৃহৎ স্রোত যখন শীতল অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখনই এই ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। বায়ুতে ঘনীভবন না হইয়া কোন অতরল

(সলিড) বস্তুপৃষ্ঠে ঘনীভবন হইলে তাহাকে শিশির বা তুহিন বলা হয়। বাষ্পই ঘনীভূত হইয়া শিশিরে পরিণত হয় এবং তাহা মাটি, ঘাস, গাছপালা প্রভৃতি হইতে উত্থিত হয়। পৃথিবীর অনেকাংশের জলবায়ুই কম বেশি আর্দ্র এবং এই সব অঞ্চলে ক্রমাগত বাষ্পীভবনের মধ্য দিয়া বাতাসে জলকণা সঞ্চারিত হয়। বাষ্পীভবনের এই প্রক্রিয়াকে গাছপালা ও ঘাস দ্রুততর করে। ভূত্বক যত উষ্ণ হয় তত দ্রুত বাষ্পীভবন হয়। যতক্ষণ বায়ু এবং ভূত্বক উভয়েই উষ্ণ থাকে ততক্ষণ জলকণা বাষ্পের আকারে থাকিতে পারে। কিন্তু রাত্রিবেলা বিকিরণের ফলে গাছপালা, মাটি শীতল হয় এবং তাহাদের দেহ হইতেই উত্থিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরে পরিণত হয়।

সুনীলকুমার মুন্সী

চিদম্বরম্ পূর্বতন মাদ্রাজ বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের দক্ষিণ আর্কট জেলার চিদম্বরম্ তালুকে অবস্থিত প্রাচীন মন্দিরময় নগর। সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী কোলেরুন নদীতীরে অবস্থিত। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণে মাদ্রাজ-রামেশ্বরম্ রেলপথে ২৪৪ কি. মি. (১৫১ মাইল)। মাদ্রাজ-পণ্ডিচেরি-চিদম্বরম্- তাঞ্জোর-তিরুচিরপল্লী নিয়মিত মোটর বাস চলাচল করে। নগরের উপকণ্ঠে সমুদ্রতীরে বিখ্যাত আন্নামালাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২৯ খ্রী. প্রতিষ্ঠিত)।

দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যকলার বিশিষ্ট নিদর্শন চিদম্বরমের নটরাজ মন্দির বিরাট প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে দণ্ডায়মান। মন্দিরের প্রাঙ্গণ প্রায় ১০০ বিঘা (১৩ হেকটর), চারিদিকে চারিটি গোপুরম্, দুইটি গোপুরম্ ১৬০′ ফিট (৪৯ মিটার) করিয়া উচ্চ। মন্দির-প্রাঙ্গণে পবিত্র বারিপূর্ণ বিরাট দীর্ঘিকা টেপাকুলম্ বা তীর্থকুণ্ড ; কুণ্ডের দক্ষিণে সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ ৩৪০′ ফিট (১০৪ মিটার) দীর্ঘ, ১৯০′ ফিট (৫৮ মিটার) প্রস্ত। দুইটি প্রস্তর-নির্মিত প্রাচীরের দ্বারা মন্দির বেষ্টিত, বাহিরের প্রাচীর ১৮০০′ ফিট (৫৫৮ মিটার) দীর্ঘ, ১৪৮০′ ফিট (৪৫১ মিটার) প্রস্থ।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঞ্জোরের চোল রাজবংশ নিম্ন কাবেরী ও কোলেরুন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে রাজ্য বিস্তার করেন। এই শৈব রাজবংশ বহু শিবমন্দির নির্মাণ করেন। চিদম্বরের মন্দির-নগর এই রাজবংশের কীর্তি। তাঞ্জোর হইতে পরে তাঁহারা চিদম্বরমে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চোলরাজাদের রাজধানী চিদম্বরমে বা সন্নিকটবর্তী গঙ্গইকোণ্ড-চোলপুরমে অবস্থিত ছিল। চোলরাজ প্রথম পরান্তক (রাজত্বকাল ৯০৭-৫৩ খ্রী) পরম শৈব ছিলেন, তিনি চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের স্বর্ণময় ছাদ নির্মাণ করেন। এই রাজবংশের সুন্দর চোলের পুত্র রাজরাজ চোল (রাজত্বকাল ৯৮৫-১০১৪ খ্রী) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর (বা রাজরাজেশ্বর) মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র চোলের (রাজত্বকাল ১০১২-৪৪ খ্রী) সাম্রাজ্য ওড়িশা হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁহার সেনাপতিরা পূর্বভারত অভিযান-কালে পবিত্র গঙ্গাবারি আনয়ন করিয়া চিদম্বরমের সন্নিকটে খনিত চোলগঙ্গ জলাশয় পূর্ণ করেন, রাজেন্দ্র চোল 'গঙ্গইকোণ্ড' অর্থাৎ গঙ্গাবিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিয়া চিদম্বরমের সন্নিকটে নূতন রাজধানী গঙ্গইকাণ্ড চোলপুরম্ প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিল্পকলামণ্ডিত বহু সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া রাজধানীর শোভা বর্ধন করেন। চোলরাজ প্রথম বীর রাজেন্দ্র (রাজত্বকাল ১০৬৩-১০৭০ খ্রী) মহামূল্যবান একখণ্ড পদ্মরাগমণি চিদম্বরমের শ্রীনটরাজকে অর্পণ করেন। ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রম চোল নটরাজ মন্দিরে প্রভূত সম্পদ দান করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ (রাজত্বকাল ১১৩৩-১১৫০ খ্রী) নাটরাজ মন্দিরে অনুরূপ দান করেন।

সেন্দমঙ্গলমের কোপ-পেরুঞ্জিঙ্গ বা মহারাজসিংহ (রাজত্বকাল ১২২৯-১২৭৮ খ্রী) চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের পূর্বদিকের গোপুরম্ নির্মাণ করেন। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যকলার বিচিত্র ভঙ্গী ও সৌন্দর্যের নিদর্শন এই গোপুরম্‌টির স্থাপত্য লক্ষণীয়। পূর্বদিকের গোপুরমে বিষ্ণুর যজ্ঞপুরুষ বা যজ্ঞেশ মূর্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের স্মারক। দ্বিশিরস্ক, ত্রিপাদ, চতুঃশৃঙ্গী, সপ্তভুজ বিষ্ণুর যজ্ঞপুরুষ মূর্তির পার্শ্বে বৃষ দণ্ডায়মান।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পাণ্ড্য রাজারা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের বিরাট গোপুরম্ নির্মাণ ও অলংকরণ করেন। পাণ্ড্যবংশের মারবর্মণ সুন্দরপাণ্ড্য (রাজত্বকাল ১২১৬-১২৩৮ খ্রী) চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঞ্জোর দগ্ধ করেন এবং চিদম্বরম্ পর্যন্ত অগ্রসর হন। পরম প্রতাপশালী পাণ্ড্য নরপতি জটাবর্মণ সুন্দরপাণ্ড্য (রাজত্বকাল ১২৫১-১২৬৮ খ্রী) চোল-রাজশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া চোলরাজ্য পাণ্ড্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। চিদম্বরমের নটরাজ শিবের মন্দিরে তিনি স্বর্ণশিখর এবং নটরাজের নৃত্যের জন্য স্বর্ণমণ্ডিত নটন-সভা বা

কনক-সভা নির্মাণ করেন। শ্রীরঙ্গমের অনন্তশয়নম্ বিষ্ণুর মন্দিরেও তিনি স্বর্ণশিখর নির্মাণ করেন এবং শ্রীরঙ্গম মন্দিরে ১৮ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা অর্পণ করেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি মালিক নাইব কাফুর দক্ষিণ ভারত অভিযান-কালে ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে চিদম্বরম্ আক্রমণ করিয়া নির্বিচারে লুণ্ঠন ও নরহত্যা করেন, চিদম্বরমের নটরাজের স্বর্ণমন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেন। শ্রীরঙ্গমের মন্দিরও লুণ্ঠিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় (রাজত্বকাল ১৫০৯-২৯ খ্রী) চোলমণ্ডলের শিব ও বিষ্ণু মন্দিরগুলির সংস্কার ও উৎসবাদির জন্য প্রভূত ধন-সম্পদ দান করেন। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের উত্তরদিকের গোপুরম্ নির্মাণ করন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে মাদুরার নায়ক-বংশীয় নরপতিরা পূর্বেকার রাজবংশীয়দের নির্মিত বহু প্রাচীন মন্দির সুসংস্কৃত, অলংকৃত ও সুসজ্জিত করেন। বহু মণ্ডপ, তোরণ, প্রাচীর ও আড়ম্বরপূর্ণ অলংকরণ যোজনা করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলির সৌন্দর্য বর্ধন করেন। চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপটি নায়ক রাজাদের কীর্তি।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে নির্মিত চিদম্বরমের পার্বতী মন্দির ও সুব্রহ্মণ্য মন্দির দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যকলার বিশিষ্ট নিদর্শন। পার্বতী মন্দিরের মণ্ডপটিতে বিজয়-নগর শিল্পশৈলীর প্রথম যুগের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়—সহজ শিল্পরীতি, সূক্ষ্ম মণ্ডনকলা ও ভাবগাম্ভীর্যে মণ্ডপটি অনন্যসাধারণ।

মদনমোহন কুমার

চুম্বকবিদ্যা লোড্‌স্টোন নামক এক বিশেষ ধরনের প্রস্তর লোহার টুক্‌রাকে আকর্ষণ করে এ তথ্য মানুষ প্রাচীন কাল হইতে জানে। এই লোড্‌স্টোন ম্যাগনেটাইট নামক লোহার একটি আকর বিশেষ। লোড্‌স্টোনের অপর একটি ধর্ম হইতেছে যে, সুতা দ্বারা অনুভূমিক-ভাবে ঝুলাইয়া দিলে ইহার একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত সর্বদা মোটামুটিভাবে উত্তর দিক্ নির্দেশ করে। এই কারণে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে ইহার ব্যবহার সুপ্রচলিত। যে সকল পদার্থের লোড্‌স্টোনের ন্যায় ধর্ম আছে, তাহাদের চুম্বক বলে। লোড্‌স্টোন যেহেতু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য উহাকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক চুম্বক বলে।

সাধারণ লোহাকে প্রাকৃতিক চুম্বক দ্বারা বিশেষ-রূপে ঘষিলে উহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। নরম লোহাকে যেমন সহজে কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়, উহার চুম্বকত্বও তেমনি সহজে লোপ পায়। এই কারণে ইহাদের অস্থায়ী চুম্বক বলে। অপরপক্ষে, ইস্পাতকে একবার কৃত্রিম উপায়ে চুম্বক করিলে উহার চুম্বকত্ব সহজে লোপ পায় না। এই জন্য উহাদের স্থায়ী চুম্বক বলা হয়।

চুম্বকের দুই প্রান্তে আকর্ষণ ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা অধিক। ঐ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল বলিয়া কল্পিত দুইটি বিন্দুকে চুম্বকের মেরু বলে। চুম্বকের দুই মেরুর প্রকৃতি বিপরীত। দুইটি চুম্বকের দুই সমমেরুর মধ্যে বিকর্ষণ ও দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক Coulomb দেখাইয়াছেন যে, এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ দুইটি চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের অনুপাতে হ্রাস পায়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ওরস্টেড্ আবিষ্কার করেন যে, কোনও তারের মধ্য দিয়া তড়িৎশক্তি প্রবাহিত হইলে উহার চারিদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। আরো দেখা যায় যে, নরম লোহাকে তড়িৎ প্রবাহী তার দ্বারা বেষ্টন করিলে যতক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চালিত থাকে, ততক্ষণ উহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এই ধরনের চুম্বককে তড়িৎচুম্বক বলে। ইহার সাহায্যে অত্যন্ত শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায়।

পৃথিবীকে একটি বিরাট চুম্বক বলিয়া কল্পনা করা হয়। ইহার উত্তর মেরু স্বভাবতঃই অপর যে কোন চুম্বকের বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ করিবে। সেইজন্য শেষোক্ত চুম্বকের যে মেরু পৃথিবীর উত্তর দিকের অভিমুখী হয়, তাহাকে উত্তর সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে উত্তর মেরু বলে এবং বিপরীত মেরুকে দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা সংক্ষেপে দক্ষিণ মেরু বলে। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারাডে সকল পদার্থকে মূলতঃ দুই ভাগে ভাগ করেনঃ ১. প্যারাম্যাগ্নেটিক—ইহারা চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ২. ডায়াম্যাগ্নেটিক—চুম্বক দ্বারা ইহাদের বিকর্ষণ হয়। প্রথমোক্ত বিভাগে কিছু পদার্থ আছে যাহারা চুম্বক কর্তৃক বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। যেমন লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট। ইহাদের ফেরোম্যাগ্নেটিক পদার্থ বলে। এই পদার্থগুলির পরমাণু কেন্দ্রের চারিপাশে ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনগুলির বিশেষ প্রকৃতিই উহাদের চুম্বকত্বের জন্য দায়ী বলিয়া বর্তমানে মনে করা হয়।

অনাদিনাথ দাঁ

তদন্তকার্য 'তদন্ত' একটি সংস্কৃত শব্দ (অর্থঃ তাহার শেষ); সাধারণভাবে কোন বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা

সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাকে তদন্তকার্য বলে। আইনের ক্ষেত্রে তদন্ত চার প্রকারঃ দেওয়ানী আদালত কর্তৃক, ফৌজদারী আদালত কর্তৃক, ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের তদন্ত-কমিশন-আইন অনুসারে নিযুক্ত কমিশন কর্তৃক, অথবা পার্লামেণ্টারি কমিটি কর্তৃক তদন্ত।

ক. মামলা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে আলোকসম্পাত করিবার জন্য, অথবা কোন সম্পত্তির মূল্যে বা বার্ষিক আয় নিরূপণ করিবার জন্য, অথবা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিবার জন্য দেওয়ানী আদালত তদন্ত করিবার অভিপ্রায়ে কমিশন নিযুক্ত করিতে পারেন। উক্ত কমিশন সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া আদালতে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহা এবং কমিশন কর্তৃক গৃহীত সাক্ষ্য সেই মামলার সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। আদালত অথবা আদালতের অনুমতিক্রমে মামলার বাদী বা বিবাদী প্রকাশ্য আদালতে উক্ত কমিশনারের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন। খ. ফৌজদারী আইনে তদন্ত দুই প্রকারঃ বিচারের পূর্বে— ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক; অথবা পুলিশ কর্তৃক। ম্যাজিস্ট্রেট যে তদন্ত করেন তাহা অপরাধ সম্পর্কে কিংবা অপরাধ নহে এমন বিষয়ে। অপরাধ বিষয়ে তদন্ত দুই প্রকার— সেসন কোর্টে চালান দেওয়ার পূর্বে তদন্ত এবং চার্জ দেওয়ার পূর্বে তদন্ত। অপরাধ নহে এমন বিষয়ে তদন্ত তিন প্রকার—অপরাধ বন্ধ করিবার জন্য; অস্থাবর সম্পত্তির দখল নির্ধারণ করিবার জন্য; এবং স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবার জন্য। পুলিশ নিজ ক্ষমতাবলে কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের জন্য পুলিশী তদন্ত করে। গ. ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে তদন্ত-কমিশন-আইন পাশ করার পূর্বে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের আদেশে তদন্ত কমিশন বসিত। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নিজ দায়িত্বে অথবা লোকসভা বা বিধানসভার প্রস্তাবের ফলে তদন্ত কমিশন গঠিত হইতে পারে। লোকসভা বা বিধানসভার প্রস্তাব পালন করিতে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার বাধ্য। তদন্ত কমিশনের প্রধান কাজ সর্বসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে তদন্ত করিয়া সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করা, যাহার ভিত্তিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য নহেন। কমিশনের তদন্ত আদালতের বিচার নহে। আদালতের বিচারে যেমন বাদী-বিবাদী, বা আসামী-ফরিয়াদী থাকে, তদন্ত কমিশনে সেরূপ কেহ থাকে না; তাহা ছাড়া আদালতের বিচারের শেষে যেমন রায় দেওয়া হয় তদন্ত কমিশন সেরূপ রায় দেয় না। তদন্ত কমিশনের সুবিধা এই যে, ইহা সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের জজের সভাপতিত্বে গঠিত হওয়ায় ইহার উপর রাজনৈতিক প্রভাবের সম্ভাবনা কম। পক্ষান্তরে ইহাতে প্রকাশ্য আদালতের বিচারের সুবিধা নাই। ঘ. ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে তদন্ত কমিশন গঠনের ব্যবস্থা থাকিলেও পার্লামেণ্টারি কমিশন গঠন করার কোনও বাধা নাই। রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্লামেণ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিতে পারেন।

স্বদেশভূষণ ভূঞ্যা

তরঙ্গতত্ত্ব বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক হাইগেন্‌স্‌ আলোকের তরঙ্গতত্ত্বের সূত্রপাত করেন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। এই তত্ত্বের মূল কথা এই যে আলোক তরঙ্গ দ্বারা প্রবাহিত হয়। আলোক তরঙ্গ আলোকিত বস্তু হইতে নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষুতে আঘাত করিলে আলোকের অনুভূতি জাগে। বিভিন্ন রঙের অনুভূতি আসে বিভিন্ন তরঙ্গ হইতে। ঈথর নামক কাল্পনিক মাধ্যমের মধ্য দিয়া এই তরঙ্গ পরিচালিত হয়। প্রথম দিকে বিজ্ঞানী মহলে এই তত্ত্ব বিশেষ আদৃত হয় নাই। তাহার পরিবর্তে নিউটনের কণাবাদ অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করে। এই কণাবাদ অনুযায়ী, আলোকিত পদার্থ হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা নির্গত হইয়া আমাদের চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিলে আমরা ঐ পদার্থটি দেখিতে পাই। কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষালব্ধ ফল, যেমন আলোক রশ্মি নিখুঁতভাবে সরলরেখায় ভ্রমণ করে না, ক্ষেত্র বিশেষে দুইটি আলোকরশ্মি কোন বিন্দুতে একে অপরের প্রভাব বিনষ্ট করিয়া অন্ধকার সৃষ্টি করে, ইত্যাদি কণাবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইল না। অপরপক্ষে ইয়ং, ফ্রেনেল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ তরঙ্গতত্ত্বের ভিত্তিতে এই সকল তথ্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করিলেন এবং এই তত্ত্ব তখন বিজ্ঞান জগতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। ক্রমশঃ এক্স-রশ্মি, গামারশ্মি, বেতার তরঙ্গ প্রভৃতি সকলই আলোকের ন্যায় ঈথর তরঙ্গ বলিয়া নির্ধারিত হইল। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। পরে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ম্যাক্সওয়েল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করেন এবং তদনুযায়ী আলোক তরঙ্গ ঈথর তরঙ্গের পরিবর্তে এক ধরনের তড়িৎচুম্বকীয় বিকীরণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি ঘটনা দেখা গেল যাহা তরঙ্গতত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়

না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক প্লাংক ('প্লাংক, ম্যাক্স' দ্র) কোয়াণ্টামবাদের উদ্ভাবন করিলেন। এই তত্ত্বে আলোকশক্তি 'ফোটন' নামক এক একটি গুচ্ছ বা প্যাকেটরূপে প্রবাহিত হইতেছে বলা হইল। এই ফোটন যেন, অনেকাংশে একটি কণার ন্যায়। অতএব আলোকরশ্মি যে কণা ও তরঙ্গ এই দ্বৈতরূপে বিরাজমান, তাহা প্রমাণিত হইল।

অপরদিকে ফরাসী বৈজ্ঞানিক De Broglie দেখাইলেন যে একটি ইলেকট্রন কেবল কণামাত্র নয়, ইহার সহিত তরঙ্গও জড়িত আছে, অর্থাৎ ইলেকট্রনের তরঙ্গ ধর্ম আছে এবং তরঙ্গতত্ত্ব ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অনতিবিলম্বে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের দ্বারা ইহা পরীক্ষার সাহায্যেও প্রতিপন্ন হইল। ফলে, তরঙ্গের যেমন কণারূপ, কণারও তেমনি তরঙ্গরূপ আছে বলিয়া স্বীকৃত হইল। পরে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাহায্যে এই বিষয়টি সুদৃঢ় গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধান হয়।

অনাদিনাথ দাঁ

ত্বরণযন্ত্র যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনও তড়িতাহিত কণাকে ত্বরান্বিত করা যায়, তাহাকেই সাধারণভাবে ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাক্সিলিরেটর, বা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, কণাত্বরণযন্ত্র বা 'পার্টিক্ল অ্যাক্সিলিরেটর' বলে। যে সকল যন্ত্র কেবল ইলেকট্রন কণাকে ত্বরান্বিত করে, তাহাদের ইলেকট্রন ত্বরণযন্ত্র বলা হয়। গতি বিদ্যায় বলে কোনও কণাকে ত্বরান্বিত করিলে তাহার বেগ বৃদ্ধি পায়, এবং বেগ বৃদ্ধি পাইলে তাহার গতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়। এই কারণে ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে কণার বেগবৃদ্ধি ঘটাইয়া অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কণা উৎপাদন করা যায়। এই শক্তি পরিমাপের জন্য সাধারণতঃ 'মেভ্' (Mev. বা Million Electron Volt) এককটি ব্যবহার করা হয়। একটি ইলেকট্রন কণা ১০ লক্ষ ভোল্ট বৈদ্যুতিক বিভব দ্বারা চালিত হইলে যে শক্তি-সম্পন্ন হয়, তাহাকেই ১ মেভ্ বলে। ত্বরণযন্ত্রগুলির সাহায্যে কয়েক 'মেভ্' হইতে কয়েক সহস্র 'মেভ্' শক্তি-সম্পন্ন কণা পাওয়া যায়।

ত্বরণযন্ত্র এক্স বা রঞ্জনরশ্মি উৎপাদন, কৃত্রিম তেজ-স্ক্রিয়তা সৃষ্টি, পরমাণুকেন্দ্র সংক্রান্ত গবেষণা, নূতন ধরনের প্রাথমিক কণিকার অনুসন্ধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। ইহাকে পরমাণু ধ্বংসকারীও বলা হয়, যেহেতু এই যন্ত্রোদ্ভূত কয়েক 'মেভ্' শক্তিবিশিষ্ট কণার আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রক বিদীর্ণ করা যায়। আরো অধিক শক্তিবিশিষ্ট (কয়েকশত বা ততোধিক 'মেভ্') কণার সাহায্যে নিউট্রন, প্রোটন প্রভৃতি কণাকে আঘাত করিয়া কয়েক ধরনের 'মেসন' এবং অন্যান্য কতিপয় অস্থায়ী প্রাথমিক কণা সৃষ্টি করা গিয়াছে।

প্রথম উল্লেখযোগ্য ত্বরণযন্ত্র হিসাবে ত্রিশ দশকে ভ্যান ডি গ্রাফ্ উদ্ভাবিত 'ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্ জেনারেটর' এবং ই. ও. লরেন্স উদ্ভাবিত 'সাইক্লোট্রন' যন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত ত্বরণযন্ত্র-গুলির মধ্যে 'বিটাট্রন', লিনিয়ার অ্যাক্সিলিরেটর, সিন্‌ক্রোসাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন, প্রোটন সিন্‌ক্রোট্রন ও অল্‌টারনেটিং গ্রেডিয়েণ্ট সিন্‌ক্রোট্রনের নাম সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই সকল উন্নত ধরনের ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে প্রায় আলোকের বেগবিশিষ্ট কণা পাওয়া গিয়াছে।

অনাদিনাথ দাঁ

দলীপ সিংজি (১৯০৫-১৯৫৯ খ্রী) প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। জন্ম নওয়ানগর সরোদার নামক স্থানে, ১৩ জুন। বাল্যকাল হইতে ক্রিকেট খেলার প্রতি আকর্ষণ ছিল। কৃতী খেলোয়াড় রণজিৎ সিংজি ('রণজিৎ সিংজি' দ্র) হইলেন দলীপ সিংহের কাকা। দলীপ সিংজির বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় হইবার পিছনে রণজিৎ সিংহের প্রেরণা যথেষ্ট কাজ করিয়াছিল। রাজকোটে কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময়ে মাত্র ১৩ বছর বয়সে এক ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচে দলীপ এক শত রান করেন। ইহাই তাঁহার জীবনে প্রথম সেঞ্চুরি।

ইংলাণ্ডে পাঠকালে তিনি তাঁহার নিজের কলেজকে পরাজয়ের মুখে মাত্র ৭২ রানে ১১টি উইকেটের পতন ঘটাইয়া ৬ উইকেটে জয়ী হইতে সাহায্য করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে হোভ-এ অনুষ্ঠিত সাসেক্স বনাম নর্থহ্যাম্পটন্-শায়ারের খেলায় তিনি একাই ৩০০ রান করেন। ঐ বছরই ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে ১৭৩ রান করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। আড়াই ঘণ্টায় ১২০ রান তাঁহার ক্রিকেট-জীবনে স্বল্পতম সময়ে সেঞ্চুরি করার নিদর্শন। তাঁহার ব্যাক-প্লে, ডিফেন্সিভ ব্যাক স্ট্রোক যেরূপ জোরালো ছিল, বডি মুভমেণ্ট, রিস্ট ওয়ার্ক এবং ফুট স্টেপ তেমনি অনবদ্য ছিল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহরু কর্তৃক দলীপ অস্ট্রেলিয়ায় হাই কমিশনার-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরিয়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। আন্তর্জাতিক টেস্ট

ক্রিকেটে তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

সাউথ আফ্রিকা	ইনিংস্‌	রান	সর্বোচ্চ রান
(১৯২৯)	২	১৩	১২
নিউজিল্যান্ড (১৯২৯-৩০)	৬	৩৫৮	১১৭
অস্ট্রেলিয়া (১৯৩০)	৭	৪১৬	১৭৩
নিউজিল্যান্ড (১৯৩১)	৪	২০৮	১০৭

বম্বেতে তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রশান্ত দাঁ

ধর্মপাল (স্থিতিকালঃ আনু. খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও ৭ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীর অধিবাসী। হিউ-এন্‌-ৎসাঙ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইঁহার পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তরুণ বয়সেই বৌদ্ধ ও হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হইতে বহু অংশ আবৃত্তি করিতেন। যোগাচার মতাবলম্বী ছিলেন। অনেক স্তব ও স্তোত্রাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি গয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। কৌশাম্বীর নিকট তর্কসভায় তিনি বহু হীনযান পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করেন। তিনি নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন (৬৩৫ খ্রী) এবং যোগাচার দর্শন সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শীলভদ্র তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং তাঁহার পরে শীলভদ্রই মঠাধ্যক্ষ হন। সুবিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধ ঘোষ (আনু. খ্রী. ৫ম শতাব্দী)-এর অল্প কিছুকাল পরের বা প্রায় সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যের আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ধম্মপাল (ধর্মপাল) 'পরমত্থ দীপনী' নামে 'খুদ্দক নিকায়'-এর অন্তর্ভুক্ত সাতটি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইঁহার নামে আরও টীকা গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তবে তিনিই যে এই সমস্তের প্রণেতা ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৭৬-১৯৪৫ খ্রী) প্রসিদ্ধ আইনশাস্ত্রবিদ্‌, বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষী। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পুরোধা প্যারীচরণ সরকারের পৌত্র। পিতা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের খ্যাতিমান্‌ পুরুষ নগেন্দ্রনাথ সরকার। শিক্ষা 'মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন', প্রেসিডেন্সি কলেজ, রিপন ল কলেজ ও লন্ডন ; বি. এ. ট্রিপ্‌ল্‌ অনার্স (গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন) ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। এম. এ. (রসায়ন)-তে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ ফাউন্ডেশন বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। বি. এল. (১৮৯৭ খ্রী) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রিপন ল. কলেজ হইতে। রিপন ল. কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়া ভাগলপুরে ওকালতি শুরু করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'সাবঅর্ডিনেট জুডি-শিয়াল সার্ভিসে' যোগদান করেন। কেন্দ্রাপাড়া, বাগেরহাট, কাঁথি প্রভৃতি স্থলে মুন্সেফের চাকুরি করিয়া ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়িতে যান। ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'কলিকাতা হাইকোর্টে' যোগদান করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে আইন ব্যবসায়ে অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৮-৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অ্যাডভোকেট জেনারেলের পদ অলংকৃত করেন। বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদের আইন সদস্য নিযুক্ত (১৯৩৩ খ্রী) হইয়া অসাধারণ স্বকীয়তা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেন। এই সময়ে মুখ্যত তাঁহারই প্রচেষ্টায় ও কৃতিত্বে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও 'ভারতীয় কোম্পানি আইন' ও 'ভারতীয় বীমা-আইন' গৃহীত হয়। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩২ খ্রী) বাঙালী হিন্দুর প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়া তিনি পাটের রপ্তানি শুল্কের তিন চতুর্থাংশ প্রাদেশিক রাজস্ব হিসাবে মঞ্জুর করাইয়া বাংলার উপকার করেন। এই সময়ে তিনি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে যোগদান করেন। ইংরেজ সরকার তাঁহাকে 'সার' (১৯৩১ খ্রী) ও কে. সি.-এস্‌-আই. (১৯৩৬ খ্রী) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্যের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদে নিযুক্ত করেন। হিন্দু নারীজাতির অধিকার ও হিন্দু স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহার প্রয়াস প্রশংসার্হ। শিক্ষা ও সমাজহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার দানশীলতা বহুবিদিত। তাঁহার স্মৃতিকল্পে কলিকাতায় 'সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জীবনের শেষ পর্বে তিনি 'হিন্দুস্তান কোয়ার্টারলি' নামক একখানি উন্নত ধরনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিচালনের কাজে লিপ্ত ছিলেন।

হারাধন দত্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১	৬	নৈর্ঋৃত	নৈর্ঋত
৫	১	৪৪	গাঙ্গারিদাই	গাঙ্গারিদাই
২৮	১	২৭	স্পষ্টধ্বনি	স্পৃষ্টধ্বনি
৪৮	২	৪২	মরাঠী	মারাঠী
৫০	১	৩৫	অনুসর্গগুলি	অনুসর্গগুলিকে
৫২	১	৪	কেম্দ	কেন্দ
৫৩	২	১৭	স্যাবার-	সেবার-
৫৩	২	১৮	লিওপার্ড	লেপার্ড
৬৫	১	১	উপক্রান্তীর	উপক্রান্তীয়
৬৫	১	৮	রোরিং ফোয়ার্টিজ	রোরিং ফর্টিজ
৮৮	১	১১	Poynting vector	Poynting's vector
১০৬	১	১০	নভোচারী	নভশ্চারী
১১৮	১	২৩	সৈৃতিকতত্ত্ব	স্থৈতিকতত্ত্ব
১২৯	১	৩৬	আর্যভট্ট	আর্যভট
১৩৮	১	৬,৮	কর্বিধার	কড়িধ্যার
১৪০	২	৩৯	মতদ্বৈধতা	মতদ্বৈধ
১৪৫	১	২১	I ors	I. Q.
১৫৬	১	২৮	হিন্দি	হিন্দী
১৭২	২	৮	আয়ত্তাধীন	অধীন
১৮৫	২	১	বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
২১৪	২	১	ট্রিপোস	ট্রাইপস
২৫৮	১	৮	সমরাঙ্গনাসূত্রধার	সমরাঙ্গণসূত্রধার
২৫৮	২	১	বিশেষের	বিশেষে
২৭৪	১	১৭	নভোস্থানাঙ্ক	নভঃস্থানাঙ্ক
২৮২	২	১৮	Patridges	Partridges
৩৩০	১	১৫	লণ্ডনের	লণ্ডনে
৩৩৫	২	৩৪	ভারতের	ভরতের
৩৩৮	১	৬	সায়ন-	সায়ণ-
৩৩৮	২	৬	দীয়	স্বীয়
৩৪১	২	৯	অনিমা	অণিমা
৩৪২	১	২৩	আশ্রম	আশ্রয়
৩৪৩	১	৮	'আজীবন্-	'আজীজন্—
৩৫১	১	৬	এনালুল	এনামুল
৩৬১	১	২৭	ইড়িয়োপ্যাথিক	ইডিয়োপ্যাথিক
৩৬২	১	৩৩	সমূহের	সমূহ
৩৬৫	২	১৭	Tharmal ionasation	Thermal ionisation
৩৬৯	১	১২	খ্যাতি	খ্যাত্র

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭৭	২	১৩	পশ্চাদপসারণ	পশ্চাদপসরণ
৩৭৯	২	১৪	মহামোগ্গয়ান্	মহামোগ্গল্লান
৩৮০	১	৩৫	বাহিরাংশ	বাহিরংশ
৩৮২	১	৯	জয়ট্শ্	ওয়েট্শ্
৩৮২	১	৩৯	নিউট্রিনো।	নিউট্রিনো
৩৮৫	১	১১,১৪,১৮,১৯	আহবণীয়	আহবনীয়
৩৮৫	১	২৯	অধি (মেষ)	অবি (মেষ)
৩৯০	১	৩৯	জমী	যমী
৪০২	১	৪৩	প্রভৃতি রঙ্গালয়ের	প্রভৃতির অভিনয় রঙ্গালয়ের
৪০৯	২	৩৫	'সায়েন্স প্রেসেস'	'সায়েন্স প্রোগ্রেস'
৪২৯	১	২১-২২	তাহা 'চরিতকথায়'	তাহা এ বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলোচনা বলিয়া গণ্য। 'চরিতকথায়'
৪৩২	২	৪৩	প্রকৃত	প্রকৃতি
৪৩৪	১	২১-২২	এরূপও বলা হয় যে অন্যেরা বলেন এই সমস্ত	এরূপও বলা হয় যে এই সমস্ত
৪৪০	১	১৭	লেনিন (১৮৯৫)	লেনিন (১৮৯৫ খ্রী)।
৪৪০	১	১৮	এদিকে তত্ত্বপ্রচার, এই	এই
৪৪৮	১	৩	লক্ষ্মীভ্রষ্ট	লক্ষ্মীভ্রষ্ট হন।
৪৫৩	২	২৯	ডেব্ট	ডেট্
৪৫৬	১	৪০	লিচ্ছবি	লিচ্ছবি,
৪৫৭	১	৩২	অথার লিপি	অক্ষর লিপি
৪৫৭	২	৪৩	বাহিরে	বাহিরের
৪৫৮	১	১৫-১৬	কুচার-কুচী	কুচার কুচী
৪৫৮	১	২০	ধারার বিবর্তন	ধারায় বিবর্তন
৪৫৮	১	৩১	কাশ্মীর	কাশ্মীরী
৪৫৮	২	২৪	উচ্চারণ স্থানও	উচ্চারণস্থান ও
৪৫৯	১	৯	কৃষ্ণলীলা শুক	কৃষ্ণলীলাশুক
৪৬১	১	২০	অপবৃদ্ধিতে	তাপবৃদ্ধিতে
৪৬৪	২	১৪	গোষ্ঠীপ্রধান।	গোষ্ঠী প্রধান।
৪৬৪	২	৪০	গুপ্ত-কবির	গুপ্ত কবির
৪৬৮	১	৩৫	দশনামী তীর্থ, আশ্রম ইত্যাদি।	দশনামী (তীর্থ, আশ্রম ইত্যাদি)
৪৭০	১	৪২-৪৩	শব্দের উৎপত্তি হয়। কমবেশি ২০ হইতে	শব্দের উৎপত্তি হয়। শব্দের উৎস বা স্বনকের কম্পাঙ্ক কমবেশি ২০ হইতে
৪৭৩	২	৩১	এষ্যান	এষ্যাণ
৪৭৮	১	১৮	জলন্ধর	জালন্ধর
৪৭৮	১	২০	নাসিকা, দেবীঃ সুনন্দা, ভৈরবঃ ত্র্যম্বক ; জলন্ধর—	জানুদ্বয়, দেবীঃ মহামায়া, ভৈরবঃ রূপালী ; উৎকল—
৪৮২	১	৩৭	মুখোপাধ্যায়	চট্টোপাধ্যায়
৪৮৩	১	১৮	শাহরিয়রকে খুসরোর	শাহরিয়রকে এবং খুসরোর
৪৮৩	২	২৭	রায়	দাস

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৮৪	২	২১	বৈদেশিক	বৈদিক
৪৮৮	১	১৭	-শিবাণী	-শিবানী
৪৯২	২	৪৩	হারগ্রীড্‌স্‌	হারগ্রীভ্‌স্‌
৪৯৪	২	১০	বৃদ্ধির	বুদ্ধির
৫০০	২	৩৪	advalorem	ad valorem
৫০৩	১	১৬	'টোথেল্‌ফ্‌থ্‌	টোয়েল্‌ফ্‌থ্‌
৫০৩	১	১৮	'কিং হেন্‌রি ফোর্থ'	'হেনরি দি ফোর্থ'
৫০৭	২	১৫	(বোমা)	(বামা)
৫১৯	১	৩১	চিদ্‌চিদ্‌	চিদচিদ্‌
৫২১	১	১৮	ফিথ্‌টের	ফিখ্‌টের
৫২৩	১	৩৯	বৎস্য	বৎস
৫২৩	১	৪৪	অবন্তরাজ	অবন্তীরাজ
৫২৯	১	৮	সমূহ	সমূহ।
৫২৯	২	২৪	কথা	কথ্য
৫৩৭	২	৭	জাতিকলহে	জ্ঞাতিকলহে
৫৩৭	২	৭	বাবলা	বাক্‌লা
৫৪৩	২	১৪	সুধীরকুমার	সুধীরচন্দ্র
৫৪৭	১	১২-১৩	বন্দ্যঘটী গ্রাম নিবাসী আধুনিক বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের	"বন্দ্যঘটীয়" অর্থাৎ বন্দিঘাটী গাঁইয়ের (আধুনিক বন্দ্যো-পাধ্যায় বংশের) সন্তান
৫৪৭	১	২০-২১	'টীকাসর্বস্ব' সর্বভারতীয়	'টীকাসর্বস্ব' হইতে বহু উদ্ধৃতি লক্ষণীয়। 'টীকা-সর্বস্ব' সর্বভারতীয়
৫৫০	১	৪	সংস্কৃতে (Prospia	সংস্কৃতে শমী, (prospia
৫৬০	১	১০	পিতার নাম সায়ণ	পিতার নাম মায়ণ
৫৬৪	১	২২	ইউনিট	ইউনিট
৫৬৮	১	২১	গ্যাস, প্ল্যাণ্ট	গ্যাস-প্ল্যাণ্ট
৫৬৮	২	৩১	ব্যারাকপুর	ব্যারাকপুরে
৫৭১	১	৪	সরকার	চৌধুরী
৫৭৩	২	২৯	সন্দযুধম্মের	সন্দথুধম্মের
৫৭৪	২	৬	বটবৃক্ষতলে	বটবৃক্ষতল
৫৭৭	১	৬	কঙপাঙককে	কম্পাঙ্ক
৫৭৮	২	২৪	নঞ্‌র্থক	নঞর্থক
৫৮২	২	৩৯	ভূভাগ	ভূভাগে
৫৮৬	২	৮	মেস্কিকোতে	মেক্সিকোতে
৫৯০	১	১৮,২২	হলাযুধ	হলায়ুধ
৫৯৩	১	৩৮	রিফ্যাক্টরি	রিফ্র্যাক্টরি
৫৯৪	১	১২-১৫	ডেভি বিগলিত কস্টিক সোডার তড়িৎ-বিশ্লেষণের দ্বারা কাস্ট্‌নার-পদ্ধতিতে বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডকে কাস্টনার পদ্ধতিতে বিগলিত	ডেভি বিগলিত কস্টিক সোডার তড়িৎ বিশ্লেষণের দ্বারা সর্বপ্রথম সোডিয়াম প্রস্তুত করেন। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কাস্ট্‌নার-পদ্ধতিতে

পৃষ্ঠা	কলম	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
			সোডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম পাওয়া যায়।	বিগলিত কস্টিক সোডা এবং ডাউন্‌স্‌ পদ্ধতিতে বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করিয়া সোডিয়াম পাওয়া যায়।
৬০১	২	৭-৮	৭ম পঙ্‌ক্তির পরে ৮ম	৮ম পঙ্‌ক্তির পরে ৭ম
৬০৫	২	৭	মেটারিয়া-	মেটিরিয়া-
৬০৭	১	২৫	করিলেও	করিলে
৬০৭	২	১৭	ক্যারট (Carot)	ক্যারাট (Carat)
৬১৭	১	২০	বঙ্গবাসী	বঙ্গবাসীর
৬১৯	২	৩৬	Meance	Menace
৬২২	১	১৭	৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে	৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে
৬২২	১	৩৩	মহাজান	মহাযান
৬২৩	২	৩৬	ল্লিতম	মল্লিতম
৬২৪	১	৩২	রোগপরীক্ষার	রোগিপরীক্ষাগার
৬২৬	২	৩৩	Petella	Patella
৬৪৮	১	৪০-৪১	হিমালয়ের পশ্চিমে আফগানিস্থানের দক্ষিণে অবস্থিত।	হিমালয়ে পশ্চিমে, আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত।
৬৬৩	২	৩	সুপদম্‌	সুপদম
৬৬৩	২	৩-৪	রাজপুত্রা-সমনম্‌	রাজপুত্রাগমনম্‌
৬৭৭	১	১১	রাম	রায়